প্রবাসী, ৪৯শ ভাগ, প্রথম খণ্ড, ১৩৫৬

সূচীপত্র

বৈশাখ—আশ্বিন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

প্রবাসী, ৪৯শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫৬

সূচীপত্র

কার্ত্তিক—চৈত্র

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

দীনবন্ধু সি. এফ. এণ্ড্রুজ

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর প্রতিমূর্তি
ভাস্কর : শ্রীসুধীর খাস্তগীর

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৯শ ভাগ ১ম খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৫৬ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নববর্ষ

নূতন বৎসর আগতপ্রায়। বর্ষফল গণনা দৈবজ্ঞ জ্যোতিষীর কর্ম্ম, আমাদের সে অধিকার নাই। বিগত বৎসরের হিসাব-নিকাশ ও আগামী বৎসরের ভবিতব্যের পূর্ব্ব লক্ষণ বিচার—ইহাই আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আছে।

বিগত বৎসরের পূর্ব্বার্দ্ধ গিয়াছে বিষম আশঙ্কা ও ঘোর অন্ধকারের মধ্যে; উত্তরভাগে দেশে শান্তি কিছু ফিরিয়াছে বটে, কিন্তু অনাচারের স্রোত পূর্ব্বের মতই প্রবল থাকায় আশার আলো স্তিমিত ভাবেই রহিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পরে জনসাধারণ উৎফুল্ল চিত্তে যে সুখ, শান্তি ও শৃঙ্খলার আশায় ভবিষ্যকালের দিকে উৎসুক নেত্রে চাহিয়াছিল, সে আশা এখনও সফল হয় নাই। বরং যাঁহাদের নেতৃত্ব ও পুরুষকারের উপর নির্ভর করিয়া লোকে দেশের ও জাতির প্রগতির বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল, আজ দেশের জনগণ তাঁহাদের উপর আস্থা ও শ্রদ্ধা হারাইতে বসিয়াছে। কাণ্ডারী যেখানে দুর্ব্বলচিত্ত ও তন্দ্রাভিভূত সেখানে তরণীর গতি সরল ও শঙ্কাহীন হওয়া অসম্ভব—এই ভয় আজ প্রত্যেকের মনে রহিয়াছে।

বাংলা ও বাঙালীর উপর বিগত বৎসরে প্রতিপদে বিপদ-বিপত্তি আসিয়াছে। প্রথমে হইল দেশের অঙ্গচ্ছেদ—তাহার পর আসিল ভিন্ন প্রদেশীয়গণের বিদ্বেষ ও হিংসার প্লাবন। শরণার্থীর দল আসিল অগণিত, লক্ষ-লক্ষ, তাহাদের অভাব, অভিযোগ ও অনুযোগের শব্দে বাংলার গগন কাঁপিয়া গেল। অন্যদিকে দেশের শাসন রক্ষণ ও গঠন সকল ক্ষেত্রই পঙ্কিল হইল অনাচার ও অর্থলালসার কলুষে। চোরাবাজারীর লুঠের ফলে দরিদ্র বাঙালী সর্ব্বহারা অসহায় ভিখারীতে পরিণত হইতে চলিল। দেশের জনসাধারণের রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ সকল ব্যবস্থাই শিথিল হইয়া পড়িল শাসনতন্ত্রের বিকারে। ভিন্ন প্রদেশের লোক দেখিল বাঙালী অসহায় এবং তাহাদের কর্ণধার সাজিয়া, কংগ্রেসের ভেক পরিয়া, যাঁহারা বাঙালী জাতির নেতৃত্বপদ অধিকার করিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদী, এবং সামান্য যে নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবা করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের দল ক্ষুদ্র সুতরাং শক্তিও ক্ষীণ। বাংলার ঘিরে যাহাদের প্রত্যেক শিরায়, ধমনীতে বহিতেছে, তাহারা স্বাধীনতা অর্থে বুঝে স্বৈরাচার ও দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার। সুতরাং বিহারে, আসামে ও উড়িষ্যায় বাঙালীর উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। উড়িষ্যায় কংগ্রেসের দেহ সম্পূর্ণভাবে বিকারগ্রস্ত হয় নাই, সুতরাং সেখানে এই অত্যাচার স্থায়ী হইল না। কিন্তু বিহারে ও আসামে তাহা বাড়িয়াই চলিল। উপরন্তু দেশবিভাগের ফলে ক্ষীণবল পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর স্কন্ধে আশ্রয়প্রার্থী বাস্তুহারা দলের গুরুভার পড়ায় ফলে দেশের শাসন ও চালনের ব্যবস্থা বিকল হইবার উপক্রম হইল। শরণার্থীদিগের নেতা সাজিয়া স্বার্থান্বেষী ভণ্ডের দল দেশে বিক্ষোভ ও আর্থিক অপচয়ের স্রোত বহাইয়া দিল। ইহাই বাংলায় ১৩৫৫ সালের বিবরণ।

আগামী বৎসর বাঙালীর জন্য কোনও সুসমাচার আনিতেছে কি? আশার আলোর কোনও ক্ষীণ রশ্মি এদেশের আকাশে প্রতিফলিত হইয়াছে কি? ইহার উত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, ঘোরতর তমিস্রার পরেই জ্যোতি দেখা যায়। যদি বাঙালীর হৃদয়ে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষা-বহ্নি পূর্ব্বেকার মত আবার জ্বলিয়া উঠে তবে রাত্রির পর প্রভাত আসিবেই। কপট নেতার স্তোকবাক্য ও নৈরাশ্যবাদী হা-হুতাশে কর্ণপাত না করিয়া আমাদের মন ও বুদ্ধির ভিতর হইতে জঞ্জাল বাহির করিয়া দিতে হইবে। যুবশক্তিকে উদ্দাম বিশৃঙ্খলার পথ হইতে ফিরাইয়া দেশের রক্ষা ও সংস্কারের কাজে লাগাইতে হইবে। ১৩৫৬ সালে প্রভাতের আশা পোষণ করিয়া আমাদের দৃঢ়চিত্তে ভবিষ্যের প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

মানভূমে দমন-নীতি

পুরুলিয়ার "সংগঠন" পত্রিকার গত ১লা চৈত্রের সংখ্যায় পুরুলিয়া সহরে গত দোল-উৎসব উপলক্ষে যে "রক্তের হোলী

খেলা" হইয়াছিল তাহার একটা বর্ণনা আছে এইরূপ : "গত ১৫।৩।৪৯ তারিখে দোল-পর্ব্বের পরদিন একদল পুলিশ মোটর-যোগে পথিপার্শ্বে রং ও কাদা-মাটি নিক্ষেপ করিয়া চলিতে থাকে। নামপাড়ায় কোন এক কাপড়ের দোকানে উপবিষ্ট লোকদের রং ছুড়িলে দোকানের কাপড়-চোপড় নষ্ট হওয়ায় তাহারা প্রতিবাদ করে। পুলিশের দল তাহা উপেক্ষা করিয়া বাগ্‌বিতণ্ডা সুরু করে; ফলে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। বহু ব্যক্তি আহত হইয়াছে।" পুরুলিয়ার বাঙালী প্রধানদের মধ্যে অনেককেই হাজতে টানিয়া লওয়া হইয়াছিল; ২।১ দিন পর তাঁহারা জামিনে খালাস পাইয়াছেন।

রক্তের এই হোলী খেলায় পুরুলিয়ার মারোয়াড়ী শ্রেণীর নাম সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে; তাঁহারা নাকি এই হাঙ্গামায় উৎসাহ-দাতারূপে কাজ করিয়াছে; কোন কোন স্থানে সক্রিয় অংশ-গ্রহণ করিয়াছে। বিহারী হিন্দী ভাষা-ভাষীদের মনোভাব কি তাহা মুরলীমনোহর প্রসাদের উক্তিতে প্রতিফলিত—মাতৃভাষার রক্ষাকল্পে বাঙালীরা যে আন্দোলন করিতেছে অন্য কোন দেশে তাহার শাস্তিস্বরূপ তাহাদের কামানের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইত। এই ব্যক্তি ভুলিয়া গিয়াছে যে, কামানের মুখের আগুনে কোন ভাব-সংঘর্ষের মীমাংসা হয় না; বিহারেই কুমার সিংহের বিদ্রোহে এবং ১৯৪২ সালের আন্দোলনে ইংরেজ সে চেষ্টা করিয়াছিল; আজ তাহার ফল কি হইয়াছে তাহার অর্থ বুঝিলে মুরলীমনোহর প্রসাদ নিজের মন ও জিহ্বাকে সংযত করিত। আমরা বাঙালীকে উত্তেজিত করিতে চাই না। এই "সত্যাগ্রহের" নেতা শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ তাঁহার নানা বিবৃতিতে এইরূপ সংযমের উপদেশ দিয়াছেন। তিনি যে সব অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূচনা করিয়াছেন নিম্নলিখিত দাবীগুলির মধ্যে তাহার আকৃতি ও প্রকৃতির পরিচয় পাই :

১ম দাবী—আজ মানভূমের জীবনে যে সকল বহু প্রকারের অন্যায় দেখা দিয়াছে—মানভূমের অধিকার, শান্তি, সম্প্রীতি, সংগঠনশক্তি যে ভাবে বিনষ্ট করা হইতেছে তাহা দ্বারা আজ প্রমাণিত হইয়াছে—যাহাদের উপর কংগ্রেস বিশ্বাস করিয়া জনগণের শাসন পরিচালনের ভার দিয়াছে সেই সকল ব্যক্তির অযোগ্যতা এবং দুর্নীতি আশ্রয়ের ফলেই মানভূমের জনগণের এই দুঃখ এবং শান্তি ও অধিকারের পথে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। ঐ সকল ব্যক্তির কর্ম্ম ও আচরণের বিচার করিবার অধিকার ঊর্দ্ধতন কংগ্রেসের আছে; তাঁহাদের দ্বারা আজ উহার বিচার করা হউক—এবং যাঁহাদের অযোগ্যতা ও অন্যায় কার্য্য প্রমাণিত হইবে তাহাদের হাত হইতে কংগ্রেস তথা জনগণের এই শাসনযন্ত্রকে মুক্ত করিয়া উহাকে যথার্থ কংগ্রেস শাসনযন্ত্রে পরিণত করা হউক।

২য় দাবী—প্রাদেশিক সরকারের প্রশ্রয় এবং নিজেদের দুর্নীতিমূলক মনোবৃত্তির ফলে জেলার সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে বহু প্রকারের দুর্নীতি এবং জনগণের প্রতি অবিচার অত্যাচারমূলক অন্যায় আচরণ করা হইয়াছে। এই সকলের বহু অবিসংবাদী প্রমাণ ও জেলাব্যাপী অগণিত দুষ্কৃতির দৃষ্টান্তে তাহা পূর্ণ হইয়া আছে। এই সকল অফিসারের কাজের বিচার করা হউক এবং বিচারে অন্যায় প্রমাণিত হইলে জনগণের শাসন-যন্ত্রকে ইঁহাদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া জনগণের যথার্থ শাসন পরিচালনার উপযোগী ব্যবস্থা করা হউক।

৩য় দাবী—কংগ্রেসী সরকারের ন্যায় কংগ্রেসের প্রাদেশিক ও জেলা কমিটিগুলির উপরও জনগণের সুব্যবস্থার দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। কোথায় ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করিবেন, জেলা ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পরিচালকদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা এই সকল অন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করিতেছেন। তাঁহাদের এই সকল কর্ম্মের প্রমাণসমূহ রহিয়াছে। ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা এই সকলের পূর্ণভাবে বিচার করা হউক—এবং অন্যায় প্রমাণিত হইলে তাহাদের হাত হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত করিয়া উহাকে আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে ব্যবস্থা করা হউক।

৪র্থ দাবী—স্বরাজের অর্থ জনগণের শাসন। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয়া আমরা এক শাসনের ব্যবস্থাবন্ধনে আবদ্ধ আছি। তাহা সকলকেই মানিতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেক স্থানের জনগণের মতামত জানাইতে, তাহাদের ন্যায্য দাবী অনুযায়ী ব্যবস্থা পাইতে, সকল স্থানের জনগণের সহিত জেলার শাসনে অংশ লাভ করিতে অধিকার রহিয়াছে। আজ মানভূমের জীবনে এমন অবস্থা আসিয়াছে যে, জেলার শাসন ব্যবস্থায় জেলার লক্ষ লক্ষ লোকের বিন্দুমাত্র স্থান বা অধিকার নাই। জনমতের অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, জেলার লক্ষ লক্ষ লোক যদি কোন জেলা কর্ম্মচারীর নিয়োগ বা জেলার কোন ব্যবস্থাকে অন্যায় বলিয়া মনে করে তথাপি তাহার ন্যায্য দাবীর কোন মর্য্যাদা নাই। ইহার অবসান করিতে হইবে। জেলার শাসন ব্যবস্থায় যথার্থ জনমতের মূল্য থাকিবে। শাসন-যন্ত্রে জনশক্তির—পঞ্চায়েত শক্তির অংশ ও অধিকার থাকিবে—ইহাই আমাদের দাবী।

৫ম দাবী—শাসন-যন্ত্রে পঞ্চায়েত শক্তির আংশিক অধিকার লাভ তো দূরের কথা—আমাদের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে এমন কতকগুলি আইন আছে, যাহা জনগণের অসুবিধাজনক। তাহার বিচার ও পরিবর্ত্তনসাধন করা হউক।

৬ষ্ঠ দাবী—আমাদের জেলায় সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি করার পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে নিরাপত্তা আইন জারী রহিয়াছে। নিরাপত্তা আইন প্রতিষেধক আইন। কোন

স্থানের পরিস্থিতি গুরুতর ও বিপদসূচক হইলেই সেখানে প্রতিষেধক আইন জারী করা হয় এইজন্য যে, অন্যায় করিবার পূর্ব্ব হইতে মানুষকে আইনে বাঁধিয়া রাখা হয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অনুযায়ী আইনের আদর্শ হইল যে—আইন থাকিবে, যদি কেহ অন্যায় করে তবে সে আইনে পড়িবে। মহাত্মাজীর ৬ই এপ্রিলের যে অভিযান ছিল তাহা রাউলাট আইন নামক এই প্রকার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-হরণকারী অন্যায় আইনের বিরুদ্ধেই অভিযান ছিল। সমগ্র ভারত এই অন্যায় আইন রদ করিতে সেদিন বিরাট অভিযান করিয়াছিল। মানভূমে নিরাপত্তা আইন জারী করার মত কোন অবস্থা ছিল না বা নাই। উহা রাখিবার যৌক্তিকতা নাই। উহা কেবলমাত্র জনমত দমনের জন্যই রাখা হইয়াছে। যদি মানভূমে নিরাপত্তা আইন রাখা কোন দিক দিয়া প্রয়োজন হয় তবে নিরাপত্তা আইনের ব্যবহার করার ক্ষমতা আজ যাহাদের হাতে তাহাদের আচরণের বিরুদ্ধেই তাহা জারী থাকা প্রয়োজন। এই অন্যায়ভাবে জারী করা আইন প্রত্যাহার করিবার জন্য আমরা দাবী জানাইতেছি।

৭ম দাবী—জেলায় জনগণের ভাষার উপর, শিক্ষার উপর, জেলার জীবন পরিচালনের স্বাধীন ইচ্ছার উপর আজ বহু প্রকারের বাধা ও অবিচার ঘটিতেছে। ভাষা ও শিক্ষার অধিকার অন্যায়ভাবে, কঠোরভাবে এবং বেআইনীভাবে পিষ্ট করা হইতেছে। এই সকল অন্যায় অবিচারপূর্ণ হস্তক্ষেপের অবসানের জন্য দাবী জানাইতেছি।

৮ম দাবী—বিহার সরকার আজ এক বিশেষ উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করিতেছেন। কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি গ্রহণ করিয়াছে। কংগ্রেস এই নীতি গ্রহণ করায় বিহার সরকারের চিন্তা হইয়াছে যে, মানভূমের অধিকাংশের ভাষা বাংলা হওয়ায় মানভূমের জনগণের কল্যাণ হইবে বিবেচনায় কংগ্রেস মানভূমকে ভাষার ভিত্তির নীতি অনুসারে বাংলার সহিত যুক্ত করিয়া দিবেন। তজ্জন্য এই ভাষার ভিত্তির নীতির যথার্থ প্রয়োগকে এড়াইবার উদ্দেশ্যে মানভূমের ভাষা হিন্দী প্রতিপন্ন করিতে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির আশ্রয় লইতেছেন। বিহার সরকারকে এই আচরণ হইতে নিবৃত্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মানভূমের ভাষা শিক্ষা বিষয়ে মানভূমের বাহিরের কাহারও হস্তক্ষেপ করা কখনই উচিত নহে। মানভূমের জনগণই তাহা নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করিবে। ইহার যাহাতে ব্যতিক্রম না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে—ইহাই আমাদের দাবী।

৯ম দাবী—জনসাধারণের অমঙ্গলকারী, সমাজ-বিরোধী, কংগ্রেস-বিরোধী যে সকল ব্যক্তি জনগণের বিশ্বাসভাজন নহেন, তাঁহারা আজ নানাভাবে শাসন পরিচালকদের হাত হইতে এবং জনপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে জনগণের কার্য্য করিবার কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা পাইতেছেন। এই সকল লোকের কার্য্যসমূহ বিচার পূর্ব্বক তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন যাহাতে এই সকল লোক এই ভাবে শাসন বিভাগ হইতে বা জনপ্রতিষ্ঠান হইতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা পাইয়া জনগণের অমঙ্গল করিতে না পারে। দেশের অগ্রগতির জন্য আজ সর্ব্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থ ও দূষিতচক্র হইতে দেশের জনস্বার্থকে মুক্ত করা প্রয়োজন। তজ্জন্য এ বিষয়ে কার্য্যপন্থা গ্রহণ করা হউক। কতকগুলি সাময়িক পত্র দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে জনগণের মধ্যে ভেদ, বিদ্বেষ, প্রাদেশিকতা প্রচার করিতেছে তাহার বিচার করিয়া, তাহারা যাহাতে এই ক্ষতিকর কার্য্য করিতে সুযোগ না পায় তাহার ব্যবস্থা করা হউক। মানভূমে সহসা কতকগুলি নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান নিজেদের অন্যায় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দেখা দিয়াছে। তাহারা সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবে জনগণের মধ্যে ভেদ, বিদ্বেষ, দুর্নীতি প্রসার করিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিচার করিয়া তাহাদের কর্ম্ম এবং উদ্দেশ্য অন্যায় প্রমাণিত হইলে, ইহাদের এই সুযোগ হইতে নিরস্ত করিতে হইবে ইহাই আমাদের দাবী।

১০ম দাবী—জঙ্গল প্রভৃতি ব্যাপারে জেলায় এক ব্যাপক দুর্নীতি ও ঘোর অব্যবস্থা চলিতেছে। জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের সরবরাহ ও বণ্টন বিষয়েও বহু অসুবিধা, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। অতি শীঘ্র এই সকল ব্যবস্থার অসুবিধা দূর করিয়া জনগণের কষ্টের লাঘব করা হউক ইহাই দাবী।

১১শ দাবী—সরকারী দুর্নীতির ফলে বহু জনের উপর বহু অবিচার ও ক্ষতিসাধন করা হইয়াছে। এই সকলের তদন্ত করিয়া যাহার যাহা ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ করা হউক ইহাই দাবী।

১২শ দাবী—মানভূমে অনুষ্ঠিত সর্ব্বপ্রকার অন্যায়ের—বর্ত্তমানে যাহা চলিতেছে এবং সম্প্রতি দেড় বৎসর যাবৎ যাহা মানভূমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হইয়াছে—তাহার পূর্ণরূপে তদন্ত, উপযুক্ত বিচার ও যোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক। মানভূমের মুক্তি আন্দোলনের দাবীর যথার্থতা ও অধিকার স্বীকার করা হউক এবং জনসাধারণের জীবন হইতে এই বিশৃঙ্খলাময় অবস্থার অবসান করিয়া মানভূমের জীবন ক্ষেত্রকে সর্ব্বাঙ্গীণ গঠনমূলক কর্ম্মের ও পঞ্চায়েত শক্তির প্রসার ক্ষেত্ররূপে পরিণত ও পরিচালিত করার ব্যবস্থা করা হউক ইহাই আমাদের দাবী।

কংগ্রেসী শাসকবৃন্দের মধ্যে যে অহমিকা ও ক্ষমতালাভের লোভ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে এই

"সত্যাগ্রহের" প্রয়োজন ছিল। জাতি ও রাষ্ট্রের বন্ধু যাঁহারা তাঁহারা এই আন্দোলনের সাফল্য কামনা করিবেন।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন

গত পৌষ মাসে জয়পুর কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্ব্বে শাসনতন্ত্র গঠন পরিষদের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্ত্তৃক নিয়োজিত কমিশন ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করেন। ৩০ বৎসর ব্যাপী কংগ্রেসী নীতি তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়া দেন এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা অযৌক্তিক বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই অজ্ঞায় ও স্পর্দ্ধিত মত দেশের গণ-মত গ্রহণ করিতে পারে নাই; তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলিয়া জয়পুর কংগ্রেসকে এক নূতন কমিটির উপর এই বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিতে বাধ্য করে। তিন জন সর্ব্বোচ্চ নেতার উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। গত ২৩শে চৈত্র এই ত্রয়ী তাঁহাদের ফতোয়া দিয়াছেন—বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন অযৌক্তিক। আমরা বিশেষ মনোযোগ সহকারে এই ত্রয়ীর মতামত বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই মতামতের সপক্ষে কোন যুক্তি পাইলাম না। একটা কথা আমাদের নিকট আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, বর্ত্তমান কংগ্রেসী নেতৃত্ব বর্ত্তমানে দেশের সম্মুখে যেসব সমস্যা দেখা দিয়াছে তৎসম্বন্ধে কোন মীমাংসা করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন; অবস্থার জটিলতা তাঁহাদের বিভ্রান্ত করিয়াছে; অতি সামান্য কোন সমস্যা সম্বন্ধে মনস্থির করিতে তাঁহারা ভয় পান। তাঁহারা দিনগত পাপ-ক্ষয় করিয়া যাইতেছেন; অবর্ণনীয় ভয় দেখাইয়া লোকমতকে স্তব্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ত্রয়ীর এই রিপোর্টের মধ্যে এই মনোভাবের ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

"বর্ত্তমানে প্রদেশগুলির শাসনব্যবস্থা খুবই দুর্ব্বল। তদুপরি নূতন প্রদেশ গঠন দ্বারা চাপ বৃদ্ধি করা উচিত নয়।" শাসন-যন্ত্র দুর্ব্বল, কারণ তাহার যন্ত্রী যাহারা তাহারাও দুর্ব্বল। না হইলে উত্তর-ভারতে প্রাদেশিক সীমা সংশোধনের দাবীকে "সামান্য" বিষয় "(petty adjustment of provincial boundaries)" বলিয়া, তাহার সমাধান চেষ্টাও এড়াইয়া যাওয়া হইত না। বরং ইংরেজের ব্যবস্থার সপক্ষে এই তিন জন প্রাজ্ঞ কংগ্রেস-নেতা ওকালতী করিয়াছেন।

> "এই সকল প্রদেশের মূল যাহাই হউক না কেন, এবং তাহাদের গঠন যতই কৃত্রিম হউক না কেন, বর্ত্তমানে প্রত্যেকটি প্রদেশে শতাব্দীর রাজনীতিক, শাসনতান্ত্রিক এবং কিয়ৎপরিমাণে অর্থনীতিক ঐক্য কতকটা স্থায়িত্ব ও ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

এই যুক্তির বলে দুই শত বৎসরের মধ্যে বিদেশীর আধিপত্যে যে "ঐতিহ্যের" সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বজায় রাখিবার সপক্ষে অনেক যুক্তি ইংরেজ দিয়াছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংরেজের সে যুক্তি অপাংক্তেয় ছিল। আজ তাহাও জাতে উঠিলে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইব না যখন পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর আগামী লণ্ডন যাত্রাকে জয়ধ্বনিসহ অভ্যর্থনা করিবার অপেক্ষায় অনেকেই আছেন বলিয়া মনে হয়।

ভারতরাষ্ট্রের "মূলগত" নীতির ভিত্তি এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে—"বর্ত্তমান অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও অন্যান্য পৃথকীকরণের মনোভাবকে কোনরূপ উৎসাহ দেওয়া চলিবে না।" এই নীতিকে স্বীকার করিয়াও, মনেপ্রাণে এই নীতি গ্রহণ করিয়াও, এই কথা কি বলা যায় না যে, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্পর্কে যে দাবী বিগত ৪০ বৎসর হইতে ভাবে ও কর্ম্মে গৃহীত হইয়াছে, তার ফলে দেশে "পৃথকীকরণের" মনোভাব প্রশ্রয় পাইবে তাহা কি ভ্রান্ত ধারণা-প্রসূত? ভাষার বন্ধনে নানা জাতি, নানা লোক নানা পরিচয় যে ভাবে গ্রথিত হইয়া এক মহাভারতের সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় দিন গুনিতেছে, কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবর্গ তার মাহাত্ম্য বুঝিবেন না; সে সামর্থ্য তাঁহাদের নাই। মহাভারতের ইতিহাসে যে ইঙ্গিত ও নির্দ্দেশ প্রতি পৃষ্ঠায় দেদীপ্যমান, তাহার অর্থোদ্ধার করিবার শক্তি থাকিলে এই ঐতিহাসিক অনুজ্ঞা এরূপভাবে তাঁহারা লঙ্ঘন করিতেন না।

কংগ্রেসী ত্রয়ীর ফতোয়াকে আমরা গ্রাহ্য করার যোগ্য মনে করিতে পারিলাম না। কারণ ইহা জনমতকে বিভ্রান্ত করিয়া দেশের প্রকৃত সমস্যার প্রতি মনঃসংযোগ করিবার অবসর দিতেছে না। ভাষার ভিত্তির উপর ভারতরাষ্ট্রের পুনর্গঠনকে আমরা এমন কোন কঠিন কাজ বলিয়া মনে করি না। বাস্তবিকই তাহা "সামান্য" (petty)। কংগ্রেসী নেতৃবর্গ সাহস হারাইয়াছেন বলিয়াই ভয়ে তাহার সমাধান চেষ্টা করিতে পারিতেছেন না। বর্ত্তমান অবস্থা স্থায়ী হইতে দিলে বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী যে ভাবে ঐ প্রদেশে "শান্তি-রক্ষা" করিতেছে, তাহার কুদৃষ্টান্ত ভারতরাষ্ট্রের দিকে দিকে বিস্তার লাভ করিবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টির সমক্ষে, মানভূম "সত্যাগ্রহের" উপর যে জুলুমবাজী চলিতেছে তাহার পরিণতি কি হইবে বা হইতে পারে, তাহা সর্দ্দার বল্লভভাইয়ের মত লোকও বুঝিতে পারেন না,—একথা আমরা বিশ্বাস করিতে অসমর্থ।

মানভূম সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে বামপন্থীদের মনোভাব

ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা পণ্ডিত শীলভদ্র যাজী মানভূম জেলার সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:

"আমি সবেমাত্র মানভূম জেলায় আমার সফর শেষ

করিয়াছি। আমি ঝরিয়া, আদ্রা ও পুরুলিয়া পরিদর্শন করিয়াছি। জনসাধারণের মাতৃভাষা বাংলার উচ্ছেদ এবং অনিচ্ছুক লোকদের উপর জোর করিয়া হিন্দীভাষা চাপাইয়া দেওয়ার জন্ত স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারিগণ লোকদের উপর উৎপীড়ন করিতেছেন। মাতৃভাষা প্রচারে জনসাধারণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করার জন্ত সরকারী কর্ম্মচারিগণ নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করিতেছেন। করাচী কংগ্রেসে এবং বর্ত্তমান গণ-পরিষদে মানুষের মৌলিক অধিকারের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বিহার সরকারের এবং স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যকলাপ তাহার বিরোধী।

"জিলার বহু ফরোয়ার্ড ব্লক কর্ম্মী এবং অন্যান্ত বিশিষ্ট নাগরিকদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এখন সেখানকার অবস্থা ক্রমশঃই খারাপের দিকে যাইতেছে। সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে মানভূম জেলা লোকসেবকসঙ্ঘের উদ্যোক্তা শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে জেলার প্রবীণ কংগ্রেস-কর্ম্মিবৃন্দ ৬ই এপ্রিল হইতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে জনসাধারণের শিক্ষালাভের অধিকার অর্জ্জন হইল ইঁহাদের প্রধান দাবি। অন্যান্ত দাবি এই মৌলিক দাবি অথবা জনসাধারণের সেই মৌলিক অধিকার অস্বীকারের যে সম্মিলিত চেষ্টা চলিতেছে তাহা হইতে উদ্ভূত। মানভূম ও ধলভূমের বাংলা ভাষাভাষী অধিবাসী হিন্দী ভাষার বিরোধী নহে; কিন্তু তাহাদের মাতৃভাষার স্থলে মানভূম ও ধলভূমের বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণের উপর হিন্দীভাষা চাপাইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্ত জনসাধারণের আন্দোলনে বাধা দিতে নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করা অনুচিত।

আমি বিহারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ এবং শিক্ষামন্ত্রীকে পুরুলিয়ায় গিয়া শ্রীযুক্ত অতুল ঘোষ এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদের সহিত আপোষে মীমাংসা করিতে এবং তাঁহাদের ন্যায্য দাবি মানিয়া লইয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

সরকারের বর্ত্তমান দমননীতি বাঙালীদের উপর নোয়াখালীর অনুরূপ শত শত ঘটনার পুনরাবৃত্তি করার হুমকী দেখাইয়া রাঁচী ও অন্যান্ত স্থান হইতে বেনামী চিঠিপত্র প্রেরণ এবং পরিষদে শ্রীমুরলীমনোহর প্রসাদের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতার দ্বারা অবস্থার উন্নতি হইবে না।

"আমি আশা করি বিহারের প্রধান মন্ত্রী পুরুলিয়া পরিদর্শন করিয়া মানভূম ও ধলভূমের বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণের দাবি মানিয়া লইবেন। তাঁহারা শুধু তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভের জন্ত আন্দোলন করিতেছেন।"

মানভূম সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে বামপন্থী ফরোয়ার্ড ব্লক তাঁহাদের কিংকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং সত্যের ও সত্যাগ্রহীদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। সোশালিষ্ট দলের মনোভাব এ বিষয়ে স্পষ্ট হওয়া উচিত। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বিহারের লোক, তাঁর অভিমত প্রকাশ হওয়া দরকার।

মানভূম ও ধলভূম

মানভূম ও ধলভূম বাংলায় প্রত্যর্পণের দাবি সম্পর্কে বিহার-সরকার মন স্থির করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা বঙ্গভাষী অঞ্চল বাংলায় ফেরত দিবেন না। ঐ অঞ্চলগুলি তাঁহাদেরই ছিল এই মিথ্যা ইতিহাস রচনার দ্বারা আবশ্যক সমর্থনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার বাংলা ভাষা উচ্ছেদ করিয়া হিন্দী প্রচলনের দ্বারা উহা হিন্দীভাষী অঞ্চলে পরিণত করিবার জন্তও তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ হইতে সুরু করিয়া মানভূমের ডেপুটি কমিশনার পর্য্যন্ত এ বিষয়ে একমত এবং একই উদ্দেশ্যে সেখানে বাংলা ভাষা উচ্ছেদের জন্ত সরকারের দমননীতির তূণ হইতে সব কয়টি অস্ত্রই প্রয়োগ করা হইতেছে। শিষ্যবর্গের সত্যনিষ্ঠা ও অহিংসার পরিচয়ে রাজেন্দ্রবাবু নিজেকে নিশ্চয় ধন্ত জ্ঞান করিতেছেন।

মানভূমে প্রবীণ কংগ্রেস-সেবকদের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে। মানভূম ও ধলভূম বাংলায় প্রত্যর্পণের দাবির সহিত সত্যাগ্রহের কোন সম্পর্ক নাই, সত্যাগ্রহের কারণ স্পষ্ট ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যত্র আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম। সত্যাগ্রহ এবং প্রত্যর্পণ আন্দোলন মূলতঃ একই সমস্যা হইতে উদ্ভূত হইলেও উহা জড়াইয়া এক করা সমীচীন হইবে না। সত্যাগ্রহের নেতাদেরও তাহা ইচ্ছা নহে।

প্রত্যর্পণ আন্দোলন তীব্র করিয়া তোলার দায়িত্ব বাংলার। মানভূম সত্যাগ্রহের ফলে এই আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিলে উহা অস্বীকার করিবার উপায় কম থাকিবে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগঠন-বিষয়ক প্রস্তাবে ওয়ার্কিং কমিটির মনোভাবে বুঝা যায় যে আন্দোলন প্রবল হইলে ফল লাভের আশা আছে। কার্য্যতঃও তাহাই দেখা যাইতেছে। অন্ধ্রের নেতারা ও জনসাধারণ তাঁহাদের আন্দোলন সম্বন্ধে এত সজাগ যে, অন্ধ্রের দাবি উড়াইয়া দেওয়া যায় নাই, উহা স্বীকার করা হইয়াছে। বাংলায় আন্দোলন হয় নাই বলিলেও চলে, এই জন্ত বাংলা এত উপেক্ষিত হইতেছে। গণ-পরিষদে বাংলার প্রতিনিধিরা একটি মেমোরাণ্ডাম দাখিল করিয়াই নিরাময় হইয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিও একবার হঠাৎ উত্তেজিত হইয়াই পুনরায় পূর্ব্বের নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট বিশেষ কিছুই করেন নাই। সভা ডাকিলে লোক হয় না, খবরের কাগজও গতানুগতিকতা

পরিহার করিয়া শক্ত হইতে পারিল না। বাংলার দাবী ব্যর্থ হইবে না তো কি ?

বীরভূম হইতে তাঁহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষকে জানানো হইয়াছে যে, তিনি যেন ওয়ার্কিং কমিটিতে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া কর্তব্য পালন করেন। প্রধান মন্ত্রী থাকাকালে ডাঃ ঘোষ মানভূম প্রত্যর্পণ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন, এ বিষয়ে আন্দোলন নিষ্ফল ইহাও তিনি জানাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বিহার গিয়া বাঙালীদের সম্পর্কে যে সব কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন তাহাও বাঙালীদের সপক্ষে যায় নাই। এখন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেস সভাপতি নহেন, ডাঃ ঘোষেরও তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া প্রধান মন্ত্রীর গদীতে আসীন থাকার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। বোধ করি এই জন্যই সম্প্রতি দুই-একটা বক্তৃতায় তাঁহার পূর্ব্ব মত পরিবর্ত্তনের সুর একটুখানি অন্ততঃ ধরা পড়িতেছে। মেমোরাণ্ডামের দিন শেষ হইয়াছে, পরে কমিশন এবং ওয়ার্কিং কমিটির সাব-কমিটির রিপোর্ট পেশ হইয়াছে; চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং আবেদন-নিবেদন মেমোরাণ্ডাম প্রভৃতি এখন নিরর্থক। এবার আন্দোলনের পালা আসিয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটি নিজেই প্রকারান্তরে বলিয়া দিয়াছেন জনমত প্রবল না হইলে তাঁহারাই বা কি করিবেন ? পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের এখন আশু কর্ত্তব্য গণ-পরিষদে, ওয়ার্কিং কমিটিতে, নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে তাঁহাদের প্রতিনিধিবর্গকে সচেতন করিবার জন্য অবিরাম টেলিগ্রাম ও সভাসমিতির প্রস্তাব প্রেরণ করা যাহাতে তাঁহারা সজাগ হন এবং আন্দোলন আরম্ভ করিতে জোর পান। দেরাদুনে শীঘ্রই এ-আই-সি-সির অধিবেশন হইবে এবং উহাতে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব পাশ হইবে। বাঙালীকে ঐখানে সক্রিয় হইতে হইবে।

ভারতরাষ্ট্রের ভাষা-সমস্যা

উত্তর-ভারতের সংবাদপত্রে হিন্দী-হিন্দুস্থানীর মধ্যে কোনটি ভারতরাষ্ট্রের সরকারী ভাষার স্থান অধিকার করিবে, তৎসম্বন্ধে উগ্র বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে; কোন্ অক্ষরে তাহা লেখা হইবে তাহাও তর্কের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এই তর্ক নূতন নয়; গান্ধীজীর জীবদ্দশায় তাহার লক্ষণ দেখা দেয়। দেবনাগরী ও ফারসী এই উভয় অক্ষরে উত্তর-ভারতে প্রচলিত ভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার কাম্য। শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন প্রমুখ কংগ্রেস-নেতা এই ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন; গান্ধীজীর তিরোধানের পর তাঁহাদের বিরোধ বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিতে পাই। ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু একটি প্রবন্ধে সম্প্রতি গান্ধীজীর অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন; তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন মধ্যপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল; ভারতবর্ষের ১৫ কোটি লোক হিন্দী ভাষাভাষী—এই যুক্তির জোরে তিনি হিন্দীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। ফার্সী অক্ষরে হিন্দুস্থানী ভাষার প্রচলনের সমর্থকেরা মুসলিম ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া "পাকিস্থানী" ওলট-পালটের পর বর্ত্তমানে নীরব আছেন। কিন্তু ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ প্রভৃতি ভারতরাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিক প্রধানগণ পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল প্রভৃতির মনোভাবের ঘোরতর বিরোধী; এবং তাঁহাদের মন রক্ষার জন্যই পণ্ডিত নেহরু রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে আপাতবিরোধী মতামত প্রকাশ করিতেছেন।

দেশের অন্যান্য চিন্তানায়কগণ কি ভাবিতেছেন ও বলিতেছেন তাহার আলোচনারও প্রয়োজন আছে। দ্রাবিড়-ভাষাভাষী অঞ্চলের লোকেরা, বিশেষতঃ তামিল ভাষাভাষী লোকেরা, হিন্দী-হিন্দুস্থানী বিরোধী বলিয়া মনে হয়। তাহার নানা কারণ আছে। আচার্য্য বিনোবা ভাবে তাহার একটির বর্ণনা এই ভাবে করিয়াছেন :

> ব্যাকরণের দিক হইতে বাংলা ভাষা হিন্দীর তুলনায় অনেক সহজ। বাংলা ভাষায় লিঙ্গের পরিবর্তনের সহিত মূল শব্দের পরিবর্ত্তন হয় না। যদি হিন্দী ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে সাত দিন লাগে তবে বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে এক দিন লাগিবে। দক্ষিণ ভারতের ভাষা-সমূহের মধ্যে মালয়ালম্ ভাষায় ক্রিয়ার ব্যবহার অতি সহজ। মালয়ালম ভাষায় ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান যে কোন কাল সম্পর্কে মূল ধাতু ব্যবহার করা হউক না কেন, লিঙ্গ এবং পুরুষের পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার পরিবর্তন ঘটে না। দক্ষিণ ভারতের কোন ভাষারই লিঙ্গের ব্যবহার মোটেই জটিল নয়। পশু জগতে পুরুষ পশু পুংলিঙ্গের, স্ত্রীপশু স্ত্রীলিঙ্গের, অন্যান্য বিশেষ্য ক্লীব-লিঙ্গের। কিন্তু হিন্দীভাষায় 'পাত্থর' (প্রস্তর) শব্দ পুংলিঙ্গ, 'দিবাল' (দেওয়াল) প্রস্তরের দ্বারা প্রস্তুত হইলেও তাহা স্ত্রীলিঙ্গ। দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের নিকট ইহা অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়, এবং এইজন্য হিন্দীকে তাহারা কঠিন বলিয়া মনে করে।

হিন্দীর উগ্রপন্থী প্রচারকেরা সমস্ত বিদেশী শব্দকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইতে দূর করিয়া দিবার পক্ষপাতী। আচার্য্য ভাবে, হিন্দী-হিন্দুস্থানীর সমর্থক হইয়াও, এই দাবির বিরোধী; এই বিষয়ে তাঁহার মনোভাব ১৯৪৯ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ওয়ার্দ্ধায় যে রাষ্ট্রভাষা প্রচারক সম্মেলন হইয়াছিল সেই উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতায় স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে; বর্ত্তমানে হিন্দীর যে রূপ প্রকট করিয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে, তাহা সংশোধিত না হইলে, রাষ্ট্রভাষা লইয়া একটা বিরাট

সমস্যা দেখা দিবে, এরূপ আশঙ্কার ইঙ্গিতও তিনি করিয়াছেন।

বাঙালী আজ দুর্ব্বল; ৬।৭ কোটি লোকের মাতৃভাষা বলিয়া ভারতরাষ্ট্রে তাহার শ্রেষ্ঠতার দাবি লইয়া উপস্থিত হইতে পারিতেছে না; ভাব ও চিন্তার মাধ্যমরূপে তাহার দাবি "সত্য" বলিয়া গ্রহণ করিয়াও আচার্য্য ভাবে হিন্দী-হিন্দুস্থানীর সমর্থক। এই বিষয়ে "প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের" ষড়-বিংশ অধিবেশনের সভাপতিরূপে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য :

> প্রদেশের রাষ্ট্রকাজ চলবে প্রত্যেক প্রদেশের মুখ্য ভাষায়, সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রকাজের জন্য প্রচলিত ভাষার মধ্যে একটি কি দুটি ভাষা বেছে নিতে হবে, প্রয়োজন হলে তাদের বদলে নিতে হবে। এই সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রকাজের ভাষার নাম দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রভাষা। প্রদেশের রাষ্ট্রকাজও চলুক এই রাষ্ট্রভাষায় এমন দাবিও কিছুদিন শোনা গিয়েছিল, এখন আর বড় যায় না। বোধ হয় রাষ্ট্রভাষার অত্যুৎসাহী ভক্তরাও বুঝেছেন যে, তার অর্থ প্রদেশের রাষ্ট্রকাজ চলবে সেই ভাষায় প্রদেশের জনসাধারণের যার সঙ্গে পরিচয় নেই। এবং কোনও ঐক্যের খাতিরেই এই রাষ্ট্রভাষা যে সব প্রদেশের মাতৃভাষা নয় তার লোকেরা এ আবদার সহ্য করবে না। কিন্তু সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রকাজের জন্য যে রাষ্ট্রভাষা তাকে ঘিরেই তর্ক ও দ্বন্দ্ব জমা হয়েছে।
>
> এই দ্বন্দ্বের তর্কে ভেবে দেখা ভাল ভারতবাসীর জীবনে এই রাষ্ট্রভাষার প্রসার ও প্রভাব কতটা। এই রাষ্ট্রভাষা হবে কাজ চালাবার ভাষা এবং কেবল ভারত মহারাষ্ট্রের কেন্দ্রের ও সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রকার্য্যের কেন্দ্রে ভাষা, ও ভাষার বাধ্যকর শিক্ষা তাদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে যারা ঐ রাষ্ট্রকার্য্যের কর্ম্মপ্রার্থী ও সর্ব্বভারতীয় পলিটিক্যাল রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উচ্চাশা যাদের আছে। তারা একটু অসাধারণ লোক। মাতৃভাষা না হলেও এ ভাষা কাজ চালাবার মত শিখতে তাদের বেশী কষ্ট কি অসুবিধা হবার কথা নয়। বরং এ প্রস্তাব সমীচীন যে, হিন্দীর সঙ্গে একটি দাক্ষিণাত্যের ভাষাকেও সমমর্য্যাদার রাষ্ট্রভাষা করা হোক। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মনের মধ্যে যে একটি বিন্ধ্যপর্ব্বত আছে, তার শৃঙ্গ এতে কিছু নীচু হবে। যে অঞ্চলের রাষ্ট্রভাষা শিখতেই হবে একটির জায়গায় দুইটি ভাষা তাদের আয়ত্ত করা কঠিন নয়। হিন্দীভাষীদের তো একটি মাত্র অতিরিক্ত ভাষা শিখতে হবে। যাঁরা অপরকে নিজের ভাষা শিখতে ক্রমাগত বলছেন, একটা পরের ভাষা শিখতে তাঁদের আপত্তি থাকতে পারে না। বিশেষতঃ ভারতীয় ঐক্যের এও একটা বন্ধনী। কিন্তু এই রাষ্ট্রভাষাকে ভারতবর্ষের সকল বিদ্যালয়ে অবশ্য-শিক্ষণীয় করার কোনও অর্থ নেই। এই কেন্দ্রে ভাষা যার কাজে প্রয়োজন সে শিখবেই। যার প্রয়োজন নেই তার উপর একটা অনাবশ্যক ভাষা শিক্ষার চাপ অত্যাচার। এ চাপে অনেক শিক্ষার্থীর মনের বিকাশ রুদ্ধ হয়।

এই প্রস্তাব সাহিত্য-রস-বেত্তার নয়; ইহা ভারত-রাষ্ট্রের একজন নাগরিক-প্রধানের। অতুলবাবু যে সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব করিয়াছেন, সেই সমস্যার "গভীরে" প্রবেশ করিলে যে উৎকট মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই বিপদের প্রতিও তিনি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়াছেন :

> বিরোধ আরম্ভ হবে যদি রাষ্ট্রভাষাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জায়গায় চালাবার চেষ্টা হয় ওকে National Language নাম দিয়ে। যদি ও ভাষার সাহিত্যকে সাহিত্যিক বিচারে অন্য ভারতীয় ভাষার শ্রেষ্ঠতর সাহিত্যের চেয়ে বড় মর্য্যাদা দেবার চেষ্টা হয় রাষ্ট্রভাষায় লেখা সাহিত্য বলে। রাষ্ট্রীয় ঐক্যের নামে যাঁরা রাষ্ট্র-ভাষাকে সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রকাজের ভাষা না রেখে সর্ব্ব-ভারতীয় ভাষা বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন তাঁদের মনে জাতি ও রাষ্ট্র এক, নেশন ও ষ্টেটে ভেদ নেই। কিন্তু জাতি ও রাষ্ট্র এক নয়। রাষ্ট্র জাতির একটা বিশেষ প্রকাশ মাত্র। রাষ্ট্ররূপের অতিরিক্ত জাতির বহুধা প্রকাশ রয়েছে। রাষ্ট্র যতই জাতির জীবনে বহুপ্রসারী হোক তার বাইরেও জাতির জীবন রয়েছে। যে জাতির নেই তার দুরদৃষ্ট। বৃহৎ জীবন থেকে সে জাতি বঞ্চিত। জার্ম্মানীর দুর্দিনে যখন সমস্ত জার্ম্মান জাতিকে একরাষ্ট্রে না বাঁধলে জাতির মৃত্যু ঘটবে মনে হয়েছিল তখন জার্ম্মান দার্শনিক জাতি ও রাষ্ট্রের, নেশন ও ষ্টেটের অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছিলেন। তার পর থেকে জার্ম্মানীর ভিতরে ও বাহিরে যখন যে শক্তিকামী রাষ্ট্রনেতা কি সমর-নায়কের প্রয়োজন হয়েছে এই আপতত্ত্বকে ধ্রুবসত্য বলে প্রচার করেছেন। আরম্ভের ফল ফলেছে, কিন্তু পরিণামে হয়েছে সর্ব্বনাশ। এ তত্ত্বের বিকট পরিণতি আমরা দেখেছি হিটলারের জার্ম্মানীতে, মুসোলিনীর ইতালীতে। ষ্টালিনের রুশিয়ায় এ পরিণতি অসম্ভব নয়। দুর্ভাগা সেই জাতি, দুর্ভাগা সেই যুগ যার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা পলিটিক্স। ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা এ পরিণাম থেকে ভারতবাসীকে রক্ষা করবেন।

বিহার প্রদেশের বর্ত্তমান শাসন-কর্তৃপক্ষের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া মনে ভরসা পাওয়া যায় না যে আমরা এই বিপদের হাত হইতে উদ্ধার পাইব।

আসামে বাঙালীর বিরুদ্ধে আর একদফা অভিযান

গৌহাটির দৈনিক "অসমীয়া"র ৩০শে মার্চ তারিখের সংখ্যায় আসাম জাতীয় মহাসভার সম্পাদক শ্রীঅম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী বাঙালখেদা আন্দোলনের নূতন আর এক পর্ব্ব আরম্ভ করিয়া একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন আসামে কাহারও বাংলায় কথা বলা উচিত নয়। "বাঙালী প্রণীত কোন পুস্তকই অসমীয়াদের পড়া উচিত নহে বরং অবাঙালী প্রণীত যে কোন হিন্দী বা ইংরেজী পুস্তক অসমীয়াদের পড়া কর্ত্তব্য।" তাঁহার মতে আসামের বাঙালীরা অসমীয়া ভাষা শিখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া আসামের শত্রুতা করিয়াছে, এজন্য "এরূপ শত্রুদিগকে আসামে থাকিতে দেওয়া বিপজ্জনক।" "আসামের অধিবাসীদের বাংলা গান শুনা বা বাংলা সিনেমা দেখা উচিত নয়। যে সমস্ত দোকানে বাংলা সাইনবোর্ড আছে, সেগুলির পরিবর্ত্তন করিয়া অসমীয়া ভাষায় করা দরকার।"

বাঙালীর উপর আসামে আর এক পর্ব্ব আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার ইঙ্গিত এই বিবৃতিতে সুস্পষ্ট। বাঙালীরা অসমীয়া ভাষা শিখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আসাম-প্রবাসী প্রত্যেক বাঙালী সেখানে অসমীয়াদের সঙ্গে অসমীয়া ভাষাতে কথা বলেন, বাংলায় বলেন না, যেমন এখানে আমরা হিন্দী-ভাষীদের সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলি, তাহারা কেহ বাংলা বলে না। আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াও বিদেশী বা ভিন্ন প্রদেশবাসীকে তুষ্ট করিবার এই মজ্জাগত অভ্যাস বাঙালী কোথাও ছাড়ে নাই, আসামেও নয়। বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে বহুজনের কথা বাংলা হইলেও উহাতে হিন্দীর টান বেশ বুঝা যায়। আসামের বা বিহারের বাঙালী বাংলার সঙ্গে অসমীয়া বা হিন্দী শিখিতে কখনও আপত্তি করে নাই, মাতৃভাষা বাংলার পরিবর্ত্তে অসমীয়া বা হিন্দী চাপাইবার প্রতিবাদ তাহারা করিয়াছে।

আসাম বা বিহার গবর্ণ্মেণ্ট বাঙালীর বিরুদ্ধে যে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে তাহা করাচী কংগ্রেসে এবং গণপরিষদে গৃহীত ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। ভারত-সরকার কিরূপে ইহাতে উদাসীন রহিয়াছেন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়।

ক্ষুদিরাম-স্মৃতি উদ্বোধনে পণ্ডিত নেহরুর অনিচ্ছা

মজঃফরপুরে বিহার রাজনৈতিক সম্মেলনে পণ্ডিত নেহরুর আগমনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর স্মৃতিরক্ষা কমিটি ক্ষুদিরাম-স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তি স্থাপনের জন্য পণ্ডিত নেহরুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী প্রথমটা রাজী হইয়াছিলেন। স্মৃতি কমিটিকে জানান হইয়াছিল যে, বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সহিত পরামর্শ ক্রমে যেন প্রোগ্রাম ঠিক করা হয়। শেষ মুহূর্ত্তে কমিটিকে জানান হয় যে, পণ্ডিতজী নীতিগত ভাবে এইরূপ অনুষ্ঠানের সহিত নিজেকে যুক্ত করার ঘোর বিরোধী। নীতিগত বিরোধ কবে এবং কোথায় হইল আমরা তাহা বুঝিলাম না। আই-এন-এর বীর শাহনওয়াজ প্রভৃতি যখন কোর্ট মার্শালে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন তখন পণ্ডিতজী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়াছিলেন। ভগৎ সিংহের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা লাহোর কংগ্রেসে প্রকাশ পাইয়াছে। এই সেদিনও তিনি চন্দ্রশেখর আজাদের মাতাকে অর্থসাহায্য করিয়াছেন। ১৯৪২-এর বিপ্লব অহিংস সত্যাগ্রহ ছিল না, তাহার অন্যতম কীর্ত্তিস্থল বালিয়া জেলার বীরদের প্রশংসা তিনি প্রকাশ্যে করিয়াছেন। বিয়াল্লিশের বিপ্লবে যাঁহাদের জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল তাঁহাদিগকে উহা ফেরত দেওয়া হইয়াছে। অহিংস বিপ্লব ও সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে যে আবরণটুকু ছিল, পণ্ডিতজী নিজে কখনও তাহাতে খাঁটি গান্ধীপন্থানুলভ গোঁড়া মনোভাব দেখান নাই, বিয়াল্লিশের বিপ্লবের পর কংগ্রেস নিজেই যাহাকে হিংস সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল তাহাকে মানিয়া লইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। অনেক খাঁটি অহিংস কংগ্রেসসেবী বিয়াল্লিশের হিংস সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিলেন। গান্ধীজীও ইহা জানিতেন, পণ্ডিতজীও নিশ্চয়ই জানেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মন্ত্রীপদও দখল করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে আদর্শগত বা নীতিগত কারণে কংগ্রেসে স্থান দিতে কেহ আপত্তি করে নাই। বাংলার বিপ্লবী নায়কদের মধ্যেই বহুজনে কংগ্রেসে যোগ দিয়া কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিয়াছেন। এখন হিংসা-অহিংসার তৌলদণ্ডে স্বদেশপ্রেম মাপিবার দিন শেষ হইয়াছে ইহাই দেশবাসীর বিশ্বাস। এই সময়ে অকস্মাৎ ক্ষুদিরাম স্মৃতি উদ্বোধনে পণ্ডিতজীর অস্বীকৃতি রূঢ় আঘাতরূপে দেশের তরুণদের উপর পড়িয়াছে। ক্ষুদিরাম ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক বিশিষ্ট অধ্যায় সুরু করিয়াছিলেন, তাঁহার সে দান পণ্ডিতজী অস্বীকার করিতে পারেন কিন্তু ইতিহাস অনন্তকাল তাহা সোনার অক্ষরে বুকে ধরিয়া রাখিবে।

পশ্চিমবঙ্গের নূতন বিপদাশঙ্কা

বারাসত-বনগাঁও-বসিরহাট অঞ্চলের সুপ্রতিষ্ঠিত মুখপত্র "সংগঠনী" পত্রিকার ১৬ই চৈত্রের সংখ্যায় নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-শস্যের অবস্থা চিন্তা করিয়া এই বিষয়ের প্রতি আমরা পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণ্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি :

২৪-পরগণার সীমান্তবর্তী এলাকা বনগাঁ ও গাইঘাটায় প্রত্যহই পাকিস্থানের ত্রিপুরা, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলা হইতে বহু মুসলমান পরিবার আসিয়া স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীদের সাহায্যে বিনামূল্যে বা অল্প মূল্যে জমি সংগ্রহ করিয়া সীমান্ত এলাকায় বসবাস স্থাপন করিতেছে ; এবং ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উহারা বসবাসের জন্য সীমান্ত এলাকাই বাছিয়া লইতেছে, কিছুতেই প্রদেশের অভ্যন্তরে যাইতেছে না। ইতিমধ্যেই কয়েক শত পরিবার আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে এবং অনেক হিন্দু জমিদারের নিকট হইতেও জমি সংগ্রহ করিতেছে। একে ত পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগী হিন্দু পরিবারদের আগমনে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে তাহার উপর এইভাবে যদি মুসলমান অধিবাসীরা এখানে আসিতে থাকে তাহা হইলে খাদ্য-সংকট আরও ঘনায়মান হইবে। আর এই সমস্ত মুসলমান পরিবার কি উদ্দেশ্যে সীমান্তবর্তী এলাকায় আসিয়া ভীড় জমাইতেছে তাহাও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র-বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আন্দামান দ্বীপে বাঙালী বসতি

গত ৩০শে ফাল্গুন কলিকাতার জাহাজ-ঘাট হইতে প্রায় ৫০০ শত উদ্বাস্তু স্ত্রী-পুরুষ-শিশু "মহারাজ" নামক জাহাজে আন্দামান যাত্রা করিয়াছেন।

ইঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আরও এক শত পরিবার আন্দামানে গমন করিয়াছেন। এই দুই দলের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী ও গ্রাম্য-শিল্প-জীবী। প্রত্যেক পরিবারে ৩০ বিঘা জমি পাইবেন ; ছয় মাস এক বৎসর খাদ্যশস্য ও অন্ত প্রকার অর্থ সাহায্য পাইবেন সরকার হইতে ; শিল্পীরা পাইবেন শিল্পের সরঞ্জাম ; গৃহনির্ম্মাণের জন্যও অর্থ সাহায্য পাইবেন ; চাষের জন্য গো ও মহিষ পাইবেন। আন্দামানের আবহাওয়া পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের আবহাওয়ার সদৃশ ; সেইজন্য আশা করা যায় এই অভিযাত্রীরা সশরীরে সুস্থ থাকিবেন।

আমরা জানি না এই দ্বীপপুঞ্জে কত লোকের ব্যবস্থা হইতে পারে ; কেহ বলিতেছেন এক লক্ষ ; কেহ বলিতেছেন দুই লক্ষ ; এর বেশী লোকের সংস্থান হইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগের উপযোগী জীবনযাত্রা সংস্থান করিবার জন্য কত দিন লাগিবে, তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমানে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। এইরূপ গঠন-কার্য্যে বাঙালী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর স্থান নিজেদের করিয়া লইতে হইবে। এই ব্যাপারে কেহ অগ্রণী হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাই নাই। যদি তাঁহারা হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের অপেক্ষায় কেহ বসিয়া থাকিবে না ; আন্দামানের বাঙালী সমাজের মধ্য হইতে এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সৃষ্টি হইলে আমরা খুশী হইব।

একটা কথা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। এই যে ৬০০।৭০০ শত বাঙালী অনির্দ্দিষ্টতার আহ্বানে দেশত্যাগ করিলেন, তাঁহারা বাঙালী সমাজের অঙ্গ ; তাঁহাদের সঙ্গে বাঙালী প্রধানবৃন্দের হৃদয়-মনের যোগ রক্ষা করিতে হইবে।

রাজস্ব আদায়ে গলদ

আয়-কর, বিক্রয়-কর, ভূমি-রাজস্ব প্রভৃতি বিভাগ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব দ্রুত আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট জারীর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই বিভাগের গলদের জন্য বহু টাকা মারা যাইতেছে বা অনাদায়ী থাকিতেছে। সার্টিফিকেট অফিসারেরা ইচ্ছা করিয়া একটু ঢিলা দিলে নাজির প্রভৃতি বড় বড় দেনদারের ঠিকানা পাওয়া গেল না বলিয়া রিপোর্ট দেয় অথবা নানা অছিলায় টালবাহানা করিয়া খাতককে সম্পত্তি বেচিয়া সরিয়া পড়িবার সুযোগ দেয়। ইহাতে ইহাদের কিছু উপরি রোজগার হয় বটে, কিন্তু প্রভূত পরিমাণ রাজস্ব ইহাতে অনাদায়ী থাকে ও শেষ পর্য্যন্ত মারা যায়। কলিকাতার অনেক রাজস্ব আলিপুর সার্টিফিকেট আপিস কর্ত্তৃক আদায় হয়। এই বিভাগের কার্য্যকলাপে কিছু কিছু গলদের সংবাদ শোনা যাইতেছে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ে তদন্ত করিলে ভাল হয়।

নূতন বিক্রয়-কর আইন

বিক্রয়-কর সংশোধন আইন কার্য্যকরী হইয়াছে এবং নূতন আইনে কর আদায় আরম্ভ হইয়াছে। সরিষার তৈল, দেশলাই ও খবরের কাগজ আপাততঃ রেহাই পাইল কিন্তু কয়লা, কাঠ, ফল, ফুল প্রভৃতির উপর কর রহিয়া গেল। ফলের উপর ট্যাক্স আদায় লইয়া ইতিমধ্যেই গোল বাধিয়াছে, সংবাদপত্রে প্রকাশ মালগাড়ী বোঝাই যে সব ফল আসিয়াছে তাহা ডেলিভারী লইতে ফলওয়ালারা আপত্তি করিতেছে, বহু ফল পচিয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

বাংলাদেশে বিক্রয়-করে বহু প্রকার গলদ রহিয়াছে—ইহা আমরা কয়েকবার আলোচনা করিয়াছি। নূতন সংশোধনেও এমন ব্যবস্থা রহিয়া গিয়াছে যাহাতে কর আদায়ের জটিলতা, এবং করের উপর সাধারণের বিরক্তি থাকিয়াই যাইবে। উচ্চহারে এক পয়েন্ট বিক্রয়-কর এমন একটি জিনিষ যাহা দিতে গিয়া লোকের সামর্থ্যে কুলায় না এবং অসন্তোষ জন্মায়। সামান্য হারে 'মাল-পয়েন্ট' কর ইহার চেয়ে ভাল, কারণ উহা পরোক্ষ কর হইয়া পড়ে এবং সাধারণ ক্রেতারা উহা টের পায় না। করের হার কম থাকিলে পণ্যমূল্যের উপরেও উহার প্রত্যক্ষ প্রভাব কম পড়ে। মাদ্রাজে এই কারণে কর কম, আদায় সবচেয়ে বেশী এবং লোকে বিক্রয়-করের উপর অসন্তুষ্ট নয়।

বিক্রয়-কর একপয়েন্ট করিতে হইলে এমন জিনিষের উপর উহা বসানো উচিত যাহাতে লোকে পীড়িত না হয়।

বাংলাদেশে এটা আগেও কম দেখা হইয়াছে, নূতন সংশোধনে তো এই নীতির মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। বিক্রয়-করে অন্য সমস্ত প্রদেশের চেয়ে বাংলার জনসাধারণ বেশী বিব্রত হইতেছে। কারণ এখানে কর-নির্দ্ধারণ-নীতি ভুল, কর আদায়ে গলদ অত্যন্ত বেশী।

এখানে রেজিষ্টার্ড ডিলারদের নিকট হইতে কর আদায় হয়। ম্যানেজিং এজেন্সির দৌলতে বড় বড় কলকারখানা ভুঁইফোঁড় কোম্পানী খাড়া করিয়া তাহাদের নিকট হইতে মাল কেনে এবং তাহাদের নিকটে বিক্রয় করে। কারখানা এবং ভুঁইফোঁড় কোম্পানী উভয়েই রেজিষ্টার্ড ডিলারের সার্টিফিকেট লয়। এক রেজিষ্টার্ড ডিলার হইতে অপর রেজিষ্টার্ড ডিলারের ক্রয়-বিক্রয়ে কর লাগে না, যে রেজিষ্টার্ড ডিলার আন-রেজিষ্টার্ড ডিলারকে বিক্রয় করে তাহাকে শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে কর আদায় করিয়া সরকারে জমা দিতে হয়। বছরখানেক ব্যবসা চালাইয়া রেজিষ্টার্ড ডিলার কোম্পানী কারবার গুটাইয়া চলিয়া যায় এবং কর আদায় হয় না। কেবল রেজিষ্টার্ড ডিলার হইয়া মাল বেচাকেনা দ্বারা বিক্রয়-কর আত্মসাৎ করাই আজকাল একটা নূতন লাভজনক ব্যবসা দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

আমরা আগেও বলিয়াছি চটকলের চট ও থলিয়ার উপর বিক্রয়-কর বসানো হউক। মাদ্রাজের রপ্তানী দ্রব্য চামড়ার উপর বিক্রয়-কর আছে, বোম্বাইয়ের রপ্তানী দ্রব্য কাপড়ের উপর বিক্রয়-কর বসানোতে তাহাদের আয় প্রায় তিন কোটি টাকা বাড়িয়া গিয়াছে। বাংলার চট ও থলিয়া একচেটিয়া কারবার, উহার উপর বিক্রয়-কর বসাইলে অন্ততঃপক্ষে তিন কোটি টাকা আয় হইবে এবং অনায়াসে বই, কাগজ, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, কয়লা, ফুল, ফল প্রভৃতি বাদ দেওয়া চলিবে। এটা কেন করা হইতেছে না আমরা তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না।

বিক্রয়-কর আপিসের অনেক কর্ম্মচারীর যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ আছে ইহা আমরা আগেও বলিয়াছি। বর্ত্তমান কমিশনার বড় ভুল করিয়াছেন। দেড় বৎসর পূর্ব্বে বাড়তি অফিসার বলিয়া একদল সাব-ডেপুটি কালেক্টর ও সাব-রেজিষ্ট্রারকে বিক্রয়-কর আপিসে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইঁহারা এতদিনে কাজকর্ম্ম খানিকটা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন, এবার ইঁহাদিগকে সরাইয়া নূতন লোক আনিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ইঁহারা কি সকলেই অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন? বাংলায় ডেপুটি অফিসার বাড়তি হইয়াছে একথা বারবার বলা হইয়াছে, তবে নূতন লোক নিযুক্ত করাই বা হইতেছে কেন, ইঁহারা যখন কাজ শিখিয়া ফেলিয়াছেন তখন ইঁহাদিগকে সরাইয়া আবার বাড়তি অফিসারে পরিণতই বা করা হইতেছে কেন? বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে বি-কম পাস এবং মার্চেন্ট আপিসের অভিজ্ঞতা না থাকিলে দরখাস্ত নিষ্ফল। ইহারও তাৎপর্য্য দুর্ব্বোধ্য। আয়-কর বিভাগে অর্থনীতি বা অঙ্কে অনার্স গ্রাজুয়েট এবং এম-এ পাশ ছেলেদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হয় এবং তাহাদের মধ্যে বাছাই করিয়া উপযুক্ত লোক লওয়া হয়। ইহাতে দক্ষ অফিসারের সংখ্যা বাড়িয়াছে। বিক্রয়-কর আপিসে বি-এ, এম-এ বাদ দিয়া শুধু বি-কমের উপর ঝোঁক দেওয়ার অর্থ কি? অভিজ্ঞতার দিকে মার্চেন্ট আপিসের অভিজ্ঞতাকেই একমাত্র যোগ্যতা করা হইয়াছে, বিক্রয়-কর আপিসের অভিজ্ঞতা পর্য্যন্ত বাদ দেওয়া হইয়াছে; বিক্রয়-কর আপিসে বি-এ, বা এম-এ পাশ অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীরাও আবেদন করিতে পারিবেন না, বিজ্ঞাপনে ইহাই বুঝা যায়। ইহাতে বিক্রয়-কর আপিসে অসন্তোষ সৃষ্টি হইতে বাধ্য। এসিষ্টাণ্ট কমিশনার পদের জন্য সরাসরি দরখাস্ত আহ্বান করা হইয়াছে; ইহাও যুক্তিসহ নহে। এসিষ্টাণ্ট কমিশনারেরা আপীল শোনেন, ট্যাক্স অফিসাররূপে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা না থাকিলে আপীলের বিচার ভাল হইতে পারিবে না। যুক্তপ্রদেশ এবার বিক্রয়-করের আওতা হইতে অনেক জিনিষ বাদ দিয়া দিয়াছে, বিহার বিক্রয় কর অর্দ্ধেক কমাইয়া এক পয়সা করিয়াছে, অথচ বাংলায় কি অবস্থা! এখানে কর আদায় ঠিকমত হইলে নূতন জিনিষের উপর কর বসাইবার প্রয়োজন তো হইতই না, বরং আরও কতকগুলি জিনিষকে করের কবল হইতে মুক্ত করা যাইত। বিক্রয়-কর আপিসের গলদ তদন্তের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

মাধ্যমিক শিক্ষাবিল

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের বাজেট অধিবেশন শেষ হইয়াছে। শেষের দিকে মাধ্যমিক শিক্ষাবিল সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট দাখিল করা হইয়াছে। পরিষদের পরবর্ত্তী অধিবেশনে বিলের দফাওয়ারি আলোচনা আরম্ভ হইবে। মূল বিলের কতকগুলি প্রস্তাব সিলেক্ট কমিটি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ও উহার কার্য্যকরী পরিষদকে বিভিন্ন স্বার্থের অধিকতর প্রতিনিধিমূলক করিবার উদ্দেশ্যে উহাদের গঠনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন; বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারি নিয়োগ বিষয়ে বোর্ডের ক্ষমতা বাড়াইয়াছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিপূর্ণ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন।

সিলেক্ট কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, মূল বিলে প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আরও অধিকতর প্রতিনিধিমূলক করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত বোর্ডের গঠনতন্ত্র পরিবর্ত্তন সাধন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। মূল বিলে বোর্ডের মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ৪২, কমিটি সদস্য-সংখ্যা বাড়াইয়া মোট ৪৪ করিবার সুপারিশ করিয়াছেন।

তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব কর্মচারী বা মনোনীত ব্যক্তিদের লইয়া মোট নয়জন সরকারী সদস্য থাকিবেন। আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ডে মূল বিলে প্রস্তাবিত সাত জনের পরিবর্তে একণে মোট আট জন সদস্য থাকার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারও পদাধিকারবলে বোর্ডে থাকিবেন।

বোর্ডের গঠনতন্ত্রে কমিটি যে পরিবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে এই যে, বোর্ডে প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষয়িত্রীগণের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে এবং কমিটি বোর্ডে শিক্ষকগণের দুই জন শিক্ষক প্রতিনিধি এবং শিক্ষয়িত্রীদের একজন শিক্ষয়িত্রী প্রতিনিধি থাকিবার সুপারিশ করিয়াছে। কমিটি অপর পক্ষে বোর্ডে বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষকগণের মূল বিলে প্রস্তাবিত চারি জন প্রতিনিধির স্থলে তিন জন প্রতিনিধি এবং প্রধান শিক্ষয়িত্রীগণের দুই জন প্রতিনিধির স্থলে এক জন প্রতিনিধি থাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বোর্ডে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ম্যানেজিং কমিটিগুলির প্রতিনিধির সংখ্যা মূল বিলে প্রস্তাবিত তিন জনই রাখা হইয়াছে।

কমিটি বোর্ডে জেলা স্কুল বোর্ডগুলির দুই জন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি থাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মূল বিলে জেলা স্কুল বোর্ডগুলির প্রতিনিধিত্বের কোন ব্যবস্থা ছিল না। শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষদ্বয়কে পদাধিকারবলে বোর্ডে সদস্য লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরকারী যুব-মঙ্গল অফিসারও পদাধিকারবলে বোর্ডের সদস্য থাকিবেন বলিয়া সুপারিশ করা হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটি এইরূপ সুপারিশ করিয়াছেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠিত হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা গ্রহণ বন্ধ হওয়ার দরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আর্থিক ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে বার্ষিক কত টাকা সাহায্য করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া ঐরূপ বিলে প্রস্তাবিত ট্রাইবুন্যাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৭, ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সালে ৩০শে জুন তারিখে যে বৎসরগুলি শেষ হইতেছে, সেই বৎসরগুলিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক আয়ব্যয়ের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। মূল বিলে বিশ্ববিদ্যায়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব করিবার ব্যাপারে বিশেষ কোন বৎসর নির্দিষ্ট করা ছিল না। কমিটি আরও বলিয়াছেন যে, ঐভাবে ট্রাইব্যুন্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক অর্থসাহায্যের যে পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন তাহা চিরতরে ঐ একই রূপ নির্দ্ধারিত থাকিবে এবং ট্রাইবুন্যালের ঐ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে রদবদল করিবার কোন ক্ষমতাই কোন আদালত বা অপর কোন কর্তৃপক্ষের থাকিবে না। আর কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ট্রাইবুন্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত তিন বৎসরের যে যে খাতের আয়ব্যয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন সেগুলি হইতেছে: ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থিগণ কর্তৃক প্রদত্ত ফীর টাকার পরিমাণ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রবেশিকা পরীক্ষার টেক্সট বই-সমূহের আয়, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিবিধ রূপ ব্যয়, প্রবেশিকা পরীক্ষার টেক্সট বইগুলি প্রকাশের ব্যয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ বন্ধ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোনরূপ আয় বন্ধ হইলে সেই আয়ের পরিমাণ।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটি আমরা আগেও সমর্থন করিতে পারি নাই, সিলেক্ট কমিটি হইতে উহা যে আকারে বাহির হইয়াছে তাহাতেও আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। মুসলিম লীগ আমলে শিক্ষা সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল আনা হইয়াছিল সেইটিকেই অদলবদল করিয়া লওয়া হইতেছে মাত্র, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষার উন্নতির সর্ব্বাঙ্গীন এবং সম্পূর্ণ প্রয়াস দেখা যাইতেছে না। জোড়া-তালির ভাবটাই উহার মধ্যে বেশী পরিস্ফুট। ক্ষুদ্রায়তন পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্কুল বোর্ড—এই তিনটি স্ব স্ব প্রধান বে-সরকারী বা আধাসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তদুপরি সরকারী শিক্ষাবিভাগ এতগুলি আলাদা কর্ত্তা প্রতিষ্ঠান গড়িবার সার্থকতা কি, ইহার প্রয়োজন কি, এই ব্যয়বাহুল্যের আবশ্যকতাই বা কোথায় তাহা এখনও দেশবাসীকে শোনানো হয় নাই।

সিলেক্ট কমিটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতিপূরণের জন্য দরাজ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মতি ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। মূল বিলে ক্ষতিপূরণের হিসাব করার জন্য কোন বৎসরের উল্লেখ ছিল না, সিলেক্ট কমিটি উহার জন্য ১৯৪৭, '৪৮, '৪৯ এই তিন বৎসর ঠিক করিয়া দিয়াছেন। এই তিন বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গ বিভাগের আর্থিক লাভটা ষোল আনা কুড়াইয়া লইয়াছে, এই তিন বৎসরকে লাভের হিসাবের মূল বৎসর ধরিলে লাভের অঙ্ক সবচেয়ে বেশী হইবার কথা। যুদ্ধের সময় অতিরিক্ত লাভকর হইতে বিলাতী কোম্পানীগুলিকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ভারতে ইংরেজ সরকার তাহাদের সব চেয়ে লাভজনক তিনটি বৎসরকে হিসাবের বৎসর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। এই চালটা যেন তারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। এখন বিবেচ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষা বাহির হইয়া গেলে তাহারা ক্ষতিপূরণ

পাইবে কোন্ যুক্তিতে ? ম্যাট্রিকের ছেলেদের নিকট হইতে বেশী টাকা আদায় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরের ঠাট বজায় রাখিতে হইয়াছে, এই টাকাটা বন্ধ হইলে বেকায়দায় পড়িতে হইবে—এই অবস্থাটা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে গৌরবজনক নহে।

আমাদের এখনও বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য ব্যয়বহুল ও কর্ত্তাবহুল তিনটি বিভিন্ন স্ব-স্ব প্রধান প্রতিষ্ঠান গড়িবার পরিবর্ত্তে একটিমাত্র উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের হাতে শিক্ষা প্রসারের ভার অর্পণ করা উচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শতাব্দীপুরাতন গঠনতন্ত্র ভাঙিয়া ফেলিয়া উহার বনিয়াদ সম্প্রসারিত করিয়া উহারই হাতে শিক্ষা বিস্তারের ভার দেওয়া যায়।

"ফসল বাড়াও" আন্দোলন

এই দুইটি কথা আজ একটা বিদ্রূপের ভাবে ব্যবহৃত হয়। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে গত ১লা চৈত্রের "খাদ্য-উৎপাদন" পত্রিকায় তাহা পাওয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-মন্ত্রীর দৃষ্টি এই মন্তব্যের উপর পড়িয়াছে কিনা জানিতে পারিলে খুসি হইব :

> পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক পরিচালিত ৮৮টি বীজাগারের মারফত পল্লী অঞ্চলে বৎসরে প্রায় এক কোটি টাকার বীজ, সার, কৃষিযন্ত্র প্রভৃতি সরবরাহ হইয়া থাকে। কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক বীজ সরবরাহ সম্বন্ধে প্রায়ই কোন না কোন প্রকারের অভিযোগ শোনা যায়। কিছু দিন আগে আমরা অবগত হইয়াছিলাম যে, বর্ত্তমান বৎসরে রবি খন্দের সময় (কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস) হুগলী জেলার হরিপাল বীজাগার হইতে মুসুরের বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছিল ; কিন্তু বীজ এত নিকৃষ্ট ও ধুলা মাটি বালিতে মিশান ছিল যে কৃষকেরা উক্ত বীজ কেনেন নাই ; তাহার সমান মূল্যে (মণ প্রতি ১৭৲ টাকা) স্থানীয় বাজার হইতে ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বীজ ক্রয় করিয়া বপন করিয়াছিলেন। কিন্তু চাকরি বজায় রাখিবার জন্য বীজাগারের পরিচালক মহাশয়কে বীজের কাটতি দেখাইতেই হইবে ; সুতরাং তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণকে ধরিয়া কতক পরিমাণ বীজ বিক্রয় করিয়াছিলেন—বপনের জন্য নহে, মুসুর ডাল রান্না করিয়া খাইবার জন্য। এইরূপ ক্রেতাদের মধ্যে আমাদেরও এক জন বন্ধু ছিলেন ; তিনিও রান্না করিয়া খাইবার জন্য ৮৷০ মূল্যে আধ মণ মুসুরের বীজ ক্রয় করিয়াছিলেন। শুনিলাম বীজাগারে মুসুরের বীজ এখনও মজুত আছে ; উপরোক্ত ভাবেও পরিচালক মহাশয় সম্পূর্ণ বীজ বিক্রয় করিতে পারেন নাই। পল্লী অঞ্চলের একটি বীজাগারের এই ক্ষুদ্র উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে কৃষি-বিভাগ কৃষির উন্নতিকল্পে কৃষক-দিগকে কিরূপ সাহায্য করিতেছেন এবং অধিকতর খাদ্য উৎপাদনে তাঁহাদের উদ্যম কতটুকু। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভাল শস্যের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য গত বৎসরে (১৯৪৮-৪৯) সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান বৎসরের (১৯৪৯-৫০) বাজেটে ইহার জন্য সাড়ে পনের লক্ষ টাকা রাখা হইয়াছে।

গ্রামবাসীর আত্মনির্ভরতা

রাষ্ট্রের প্রতি একান্ত নির্ভরতা বর্ত্তমান যুগের একটা লক্ষণ ; জন্ম-পূর্ব্ব কাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত রাষ্ট্র আমাদের সকল দায় গ্রহণ করিবে এই মনোভাব অল্প-বিস্তর সভ্যজগতের চিন্তার মধ্যে দানা বাঁধিয়াছে এবং এই চিন্তা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সামগ্রিক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা ও দলীয় বা ব্যক্তির একনায়কত্ব। আমাদের দেশের চিন্তার সঙ্গে এই বিধানের খাপ খায় না ; অন্ততঃ স্বদেশী-যুগ পর্য্যন্ত আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তা ছিল ইহার বিপরীত ধর্ম্মী। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধ ও তৎসম্বন্ধে বিরাট আলোচনা। আজ সেই সব কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠার কোণে কোথাও একটু স্থান পাইয়াছে মাত্র ; লোকের চিন্তা ও কর্ম্ম সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ব্যক্তির মাহাত্ম্য অপমান করিতে চেষ্টা করিতেছে।

গান্ধীজী রাষ্ট্রের উপর এরূপ একান্ত নির্ভরতার পক্ষপাতী ছিলেন না। ব্যষ্টির বা ব্যক্তিত্বের উপর বিশ্বাস তাঁহার জীবনাদর্শের সঞ্জীবন-মন্ত্র ছিল এবং এই আদর্শের উদ্দেশেই তিনি গত ত্রিশ বৎসর আমাদের সমস্ত কর্ম্ম-পন্থাকে পরিচালিত করিয়াছেন। আজ তাঁহার তিরোধানে এই আদর্শ ম্লান হইয়া গিয়াছে ; তিনি জীবিতকালেই দেখিয়া গিয়াছেন দেশের লোকের মন বিপরীত দিকে চলিয়াছে। কিন্তু তাঁহার জীবনাদর্শে বিশ্বাসী লোকের অভাব এখনও হয় নাই। সেই জন্যই ভারতরাষ্ট্রের জীবনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা একেবারে নিরাশ হইতে পারিতেছি না, এবং এই আদর্শের আলোয় অনেক সময়েই আমরা নানা গঠনমূলক কর্ম্ম-প্রচেষ্টার আলোচনা ও বিচার করিয়া থাকি।

ভারতরাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতির জন্য যে সব বিরাট পরিকল্পনার কথা শুনিতেছি, তাহাকে রূপ দিবার প্রচেষ্টাকে কোনরূপে ক্ষুণ্ণ না করিয়াও আমরা মনে করি যে, ১০।১২ বৎসর আমাদের দেশের লোকের হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সেইজন্য একান্তভাবে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরতার দিনেও আমরা সমাজ-জীবনে আত্মনির্ভরতার পরিচয় পাইলে উৎফুল্ল হই। এরূপ একটা কর্ম্মের বিবরণ "নির্ণয়" পত্রিকার একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণীর কতকাংশ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

"১৯৪৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে দ্বারকেশ্বর নদীতে প্রবল বন্যা হয়। হুগলী জেলার কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ 'হুগলী জেলা বন্যা সাহায্য সমিতি' গঠন করিয়া বন্যাপীড়িত অঞ্চলগুলিতে সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। সেবাকার্য্য করিতে করিতেই তাঁহাদের চিন্তায় এক আমূল বিপ্লব ঘটে। তাঁহারা চিন্তা করিতে সুরু করেন, নদীর জল-স্রোতকে কিরূপে কল্যাণ উৎসে পরিণত করা যাইতে পারে ? সহসা তাঁহাদের জ্ঞানোন্মেষ হয়—বন্যার এই জলোচ্ছ্বাস, এই সুবিশাল জলরাশিকে বহু সুরক্ষিত ও অগভীর নদীনালা ও খালের মধ্য দিয়া দেশাভ্যন্তরে প্রবাহিত করাইয়া দিতে পারিলে, দেশমাতৃকার মুক্তিস্নান হয়। জল আপন গতিপথ পায়, ফলে বন্যার প্রকোপ বন্ধ হয়। কৃষিক্ষেত্রে পলি পড়িয়া ক্ষেত্র উর্ব্বর হয়, খানা ডোবা বুঁইয়া গিয়া মশক-কীট ধ্বংস হয়, জলাশয়ে মৎস্য বৃদ্ধি পায় ও সর্ব্বোপরি জল সেচের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হওয়ায় কৃষির শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটে। ১৯৪৪ সনের শেষ-ভাগেই কর্ম্মিগণ এই মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া 'খানাকুল থানা বোরো বাঁধ কমিটি' গঠন করেন।

"১৯৪৫ সনে কংগ্রেস-কর্ম্মিগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও জনসাধারণের পারস্পরিক সহযোগিতায় খানাকুল অঞ্চলে প্রথম বোরো বাঁধ নির্ম্মিত হয়। এই বাঁধ নির্ম্মাণের ফলে ৫টি গ্রামের ১৫ হাজার বিঘা জমিতে জলসেচ হয় এবং ফলে প্রায় ১ লক্ষ মণ বোরো ধান উৎপন্ন হয়। সর্ব্বসমেত ৪৭০০ পরিবার ইহাতে উপকৃত হয়। তদ্ব্যতীত আক, তিল, পেঁয়াজ, আলু প্রভৃতি শীতের ফসলেরও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। মোট অর্থব্যয় হয় ২২৫৩৬৷৶১০, ফসল গোলায় উঠিলে কৃষকেরা বিঘা প্রতি ২৷৹ চারানী দিয়া প্রায় ২১০০০৲ টাকা শোধ করে।".

বাঙালী সমাজ আজ জীবন-যাত্রার অত্যাবশ্যক দ্রব্য ভাত-কাপড়-তেলের জন্য পরপ্রত্যাশী। এই অবস্থায় প্রবন্ধ লেখকের নিম্নলিখিত আবেদনের প্রতি আমরা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তিনি স্বীকার করিয়াছেন শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়-লিখিত "হুগলীতে বাঁধ-কার্য্য" (১৩৫৩ সনের বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত) প্রবন্ধটির সহায়তায় এই তথ্যপূর্ণ বিবরণী দিতে পারিয়াছেন :

> ভারতযুক্তরাষ্ট্র সরকার ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে খানাকুল অঞ্চলে বাঁধ নির্ম্মাণের প্রয়োজন থাকিবে না সত্য, কিন্তু যে কয় বৎসর তাহা না হয়, সেই কয় বৎসর এইরূপ বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া শস্যোৎপাদনের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এবং সমবায় প্রথায়ই ইহা করা যথার্থই যুক্তিসঙ্গত ও প্রশংসনীয়।

আমাদের বন-সম্পদ

ডাঃ রিপলে নামক একজন বৈজ্ঞানিকের নেতৃত্বে মার্কিন মুলুকের একদল পর্য্যবেক্ষক নেপালের পাহাড়-পর্ব্বতে ভৌগোলিক নানা অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাদের বন-সম্পদ সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন তাহা আমাদের অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে নানা চিন্তার উদ্রেক করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিহার প্রদেশের কোশী নদীর উপরে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া উত্তর-বিহারের বাৎসরিক বন্যা-নিবারণের পরিকল্পনার উল্লেখ করা যায়। যে অঞ্চলে, নেপাল-বিহার সীমানার মধ্যে, এই বাঁধ নির্ম্মাণ হইবার কথা, তথায় সমস্ত বন উজাড় করিয়া ফেলায় বাঁধ টিকিতে পারে না, ইহাই ডাঃ রিপলের মত। গাছের শিকড় চাই প্রস্তর ও মাটিকে নিজ স্থানে রাখিবার জন্য। অন্যদিকে শুনিতে পাইয়াছিলাম যে ডাঃ স্যাভেজ (Savage) নামক একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিকের মতানুসারে কোশী নদীর বাঁধ-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে এবং তাঁহার মতের উপর নির্ভর করিয়াই ১০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা স্থির হইতেছে। শেষে কি দুই মার্কিনী বৈজ্ঞানিকের মত-ভেদের জন্য এই পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যাইবে ?

এতৎসম্পর্কে "বাঁকুড়া দর্পণ" পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গের "এই অধিষ্ঠিতম" জেলার বনরক্ষা সম্বন্ধে একটি মন্তব্য প্রণিধান-যোগ্য। এই অঞ্চলেও বন-জঙ্গল-পাহাড় উজাড় হইয়াছে যাহার কল্যাণে ভূমি হইয়াছে রুক্ষ ; বর্ষার সময় বন্যা আসে ; বন্যার জল ধরিয়া রাখিবার ব্যবস্থাগুলি অচল হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি নাকি বাঁকুড়ার ৪,৫০০ বর্গ মাইল পরিধির মধ্যে অন্ততঃ ২৫০ বর্গ মাইল সরকারী প্রচেষ্টায় নূতন করিয়া বন-জঙ্গলে আবৃত করিবার চেষ্টা হইতেছে। "যে সমস্ত পতিত ডাঙা পড়িয়া আছে," তাহা সরকারের হাতে তুলিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই পরি-কল্পনায় পল্লীবাসীর নিশ্চেষ্টতা ও পরনির্ভরশীলতা পরি-স্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ভাবি, স্বাধীন দেশের সরকার পঞ্চায়েত-রাজের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা প্রবর্ত্তন করিতে পারিতেছেন না কেন ? এক সময়ে বৃক্ষ-রোপণ ছিল হিন্দু-সমাজের বাৎসরিক ধর্ম্ম-কর্ম্মের একটি অঙ্গ। সেই অনুষ্ঠানের অর্থ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ তাহা বাৎসরিক উৎসবে পরিণত করিয়া, ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে হল-কর্ষণ প্রবর্ত্তন করিয়া ভূমি-লক্ষ্মীর প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যের কথা মনে করাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যে শ্রেণী হইতে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ আসিয়াছেন, তাঁহারা আজ দুই-তিন পুরুষ হইতে ভূমির সঙ্গে সম্পর্কহীন। সুতরাং তাঁহারা শান্তিনিকেতনের শিক্ষাকে ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে রূপ দান করিতে পারেন নাই।

ভারতে বৈদেশিক মূলধন

পণ্ডিত নেহরু শেষ পর্য্যন্ত ভারতে বৈদেশিক মূলধন আগমনের সদর দরজা খুলিয়া দেওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন।

বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে ভারত-সরকারের মনোভাব কি হইবে পণ্ডিতজী ভারতীয় পার্লামেণ্টে ৬ই এপ্রিল তারিখে তাহা ঘোষণা করিয়াছেন। বৈদেশিক মূলধন ভারতীয় স্বার্থে খাটিবে এই উদ্দেশ্যে চারিটি সর্ত্তাধীনে উহা দেশে আসিতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। দেশী কারখানার ন্যায় ভারত-সরকারের শিল্পনীতি অনুসারে বৈদেশিক কারখানাগুলিকে কাজ করিতে হইবে এবং ভারত-সরকারের আইন উভয়কেই সমানভাবে মানিতে হইবে। বিদেশী কারখানাগুলি লাভ করিতে পারিবে এবং লাভের টাকা দেশে পাঠাইতে পারিবে। বিদেশী কারখানাকে ভবিষ্যতে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং ঐ টাকা দেশে পাঠাইবার সুযোগ দেওয়া হইবে। বিদেশী কারখানার উচ্চপদে, বিশেষতঃ টেকনিক্যাল কাজে, অস্থায়ী ভাবে বিদেশী নিয়োগ করিতে দেওয়া হইবে। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র বিদেশী কারখানার পরিচালনায় ভারতবাসীর হাত থাকিবে।

পণ্ডিতজীর ঘোষণার পর দেশের ভবিষ্যৎ স্বার্থের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত এই মহাগুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি সম্বন্ধে কোন আলোচনা হইতে দেওয়া হয় নাই। পণ্ডিতজীর বিবৃতিতে ভারতের ইংরেজ ও মারোয়াড়ী বণিকদের প্রতিনিধিরা আনন্দিত হইয়াছেন এবং ভারতের জাতীয় অর্থনীতির সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত প্রতিনিধি, জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির প্রাণ এবং বর্ত্তমানে তথা হইতে অপসারিত অধ্যাপক কে. টি. সাহা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের মনেও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা জাগিতেছে বিশেষতঃ এই কথাটিই বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে যে, ভারতশাসন আইনে বিলাতী কোম্পানীর যে রক্ষাকবচগুলিকে বহু আন্দোলনের ফলে তুলিয়া দিতে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে বাধ্য করা হইয়াছিল স্বেচ্ছায় সেইগুলি আবার আমরা গলায় পরিলাম।

ভারতীয় কোটিপতিরা যুদ্ধের সময় যে অভূতপূর্ব্ব বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছেন দেশের শিল্পোন্নতির জন্য তাঁহারা উহা বাহির করিলেন না, পণ্ডিতজী ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, হয়ত ক্রুদ্ধও হইয়াছেন। অগত্যা তাঁহাকে বিদেশী মূলধন ডাকিয়া আনিতে হইয়াছে দেশের শিল্পোন্নতির জন্য। যুদ্ধে আমাদের শিল্পপতিদের হাতে যে টাকা আসিয়াছে তাহার সদ্ব্যয় হইলে বিদেশী মূলধনের প্রয়োজন আমাদের হইত না ইহা আমরাও মনে করি, কিন্তু তাঁহারা সে টাকা সরকারের ন্যায্য প্রাপ্য ফাঁকি দেওয়ার আশায় লুকাইয়াছেন, উহা বাহির করিবেনও না। ব্যাঙ্কের টাকা ধার লইয়া তাঁহারা কারবার করিতেছেন, এমন ভাব দেখাইতেছেন যেন তাঁদের হাতে টাকা নাই। কতকগুলি বড় কারখানা এবং বিদ্যুৎ-উৎপাদন-ব্যবস্থা দেশে না হইলেও চলে না, তাহার জন্য টাকা মিলিতেছে না, সুতরাং এই অবস্থায় বাহিরের টাকা আনা ছাড়া উপায় কি—পণ্ডিতজীর মনে এই ধারণা জন্মিয়া থাকিতে পারে।

সংরক্ষণ শুল্কের সুযোগ লইয়া চিনিওয়ালারা যে ভাবে দেশবাসীকে শোষণ করিতেছেন, বাজারে চাহিদা অপেক্ষা মালের সাময়িক অভাবের সুযোগে কাপড়, লোহা, সিমেণ্ট প্রভৃতি কারখানার মালিকেরা ক্রেতাদের যেভাবে শোষণ করিতেছেন তাহাতে বিদেশী প্রতিযোগিতায় ফেলিয়া তাঁহাদিগকে যত শীঘ্র সম্ভব শায়েস্তা করিয়া জিনিষের দাম কমানো ভাল—এই মনোভাবও অনেকের মনে জাগিতে পারে এবং তার জন্য বিদেশী মূলধন সমর্থনে তাঁহারাও আগ্রহশীল হইতে পারেন। ম্যানেজিং-এজেন্সি-পরিচালিত ভারতীয় কলকারখানা যেরূপ বেপরোয়া ভাবে ক্রেতা, অংশীদার ও রাষ্ট্র এই তিনকেই ঠকাইতেছে উহাদের ধ্বংস-সাধনে কাহারও দুঃখিত হইবারও কথা নয়।

কিন্তু যে সব সর্ত্তে বিদেশী মূলধন আমরা ডাকিয়া আনিলাম তাহাতে এই সব পাপ কি কমিবে, না আরও বাড়িবারই পথ পরিষ্কার হইবে? একজাতীয় ব্যবসায়ী সম্বন্ধে এবার স্পষ্ট ভাষায় কথা বলা দরকার। নিজের খাত আলাদা রাখিয়া যাহারা বিক্রয়ের খাতে ভেজাল মিশায় তাহারা এতদিন বেচাকেনার ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল। গত যুদ্ধের শেষের দিক হইতে তাহারা ব্যাপক ভাবে কলকারখানা কিনিয়াছে এবং উৎপাদন-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ঠিক ঐ পাপ আরম্ভ করিয়াছে। কলিকাতায় দেখা যাইতেছে বহু বড় বড় ইংরেজ কোম্পানীতে ইহারা অংশীদাররূপে প্রবেশ করিয়াছে, বিলাতী অনেক কারখানা এবং কলিকাতার বিখ্যাত ইংরেজের দোকান ক্রয় করিয়াছে। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন বিদেশী কারখানার উপর ভারতীয় কর্তৃত্ব রাখিতে হইবে। টাকা দিবে একজন, কর্তৃত্ব করিবে অপরে ইহা বাস্তব অবস্থা নহে। এই অবস্থা তখনই আসিতে পারে যখন উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন হয়, প্রতিযোগিতা থাকে না। ইহাই একচেটিয়া কারবারের চরম অবস্থা এবং ক্রেতাসাধারণের ও দেশের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ। বিদেশীর টাকা এবং দেশী বণিকের স্থানীয় জ্ঞান, কূটবুদ্ধি, ট্যাক্স ও কণ্ট্রোল কর্ত্তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা এবং শক্তিশালী মন্ত্রীদের উপর প্রভাব—এই সব যোগাযোগ ঘটিলে দেশের অবস্থা কি হইবে তাহা বস্তুতঃই ঘোর আশঙ্কার বিষয়। ম্যানেজিং এজেন্সি ও সিণ্ডিকেট ভাঙ্গিয়া দিয়া বিদেশী মূলধন আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সরকার যদি এই কথা বলিতেন যে দেশী বা বিদেশী কোন কারখানাকে কোনরূপ একচেটিয়া জোট বাঁধিতে দেওয়া হইবে না তাহা হইলে অন্ততঃ কতকটা বিপদ প্রথম হইতেই কমিয়া যাইত। পণ্ডিতজীর ঘোষণার পর এখনই যে সব দীর্ঘ মেয়াদী কনট্রাক্ট হইয়া যাইবে, পরে সেগুলি ভাঙ্গা অত্যন্ত কঠিন হইবে। উহার খেসারত দিতে হইবে জনসাধারণকে।

ব্রহ্মরাষ্ট্রে ব্রিটিশ মূলধন

স্বাধীন ব্রহ্মরাষ্ট্রে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীর প্রাধান্য সম্বন্ধে একটা হিসাব দেখিলাম। নিম্নে তাহার সারাংশ তুলিয়া দিতেছি। এই প্রাধান্যের ফলে গোড়ায় যে মূলধন ব্রিটিশ শিল্পপতিগণ তাহাদের তাঁবেদার দেশে নিয়োজিত করে, তাহা অতি অল্প দিনের মধ্যেই উশুল করিয়া লয়।

স্বাধীনতা লাভ করিয়াও ব্রহ্মদেশ এই সব বিদেশী পুঁজি-পতির প্রভাবমুক্ত হইতে পারিয়াছে কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে।

ষ্টীল ব্রাদার্স (Steel Brothers) নাকি ৬ বৎসরের মধ্যে মূলধনের শতকরা ২৩৫ভাগ লভ্যাংশ দিয়াছিল। এংলো-বর্মা টিন কোং (Anglo-Burma Tin Co.) প্রতিষ্ঠার ৫ বৎসর পরে শতকরা ১৩০ ভাগ হারে লভ্যাংশ দিতেছে; বর্মা তেল কোং (Burma Oil Co.) ১৯৩১-৩৫ অংশীদারদের লভ্যাংশ দিয়াছে শতকরা ১১৩ ভাগ হারে; ১৯৪৭ সনে দেখা যায় যে কোম্পানীর আয় তিন গুণ বাড়িয়াছে। ব্রিটিশ সরকারের আনুকূল্যে চালের ব্যবসায়ে ষ্টীল ব্রাদার্স প্রায় একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বোম্বাই বর্মা ট্রেডিং কোং (Bombay Burma Trading Company) ব্রহ্মদেশের কাষ্ঠ ব্যবসায়ের মালিক বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইরাবতী জাহাজ কোং (Irrawady Flotilla Company) ব্রহ্মদেশের জলপথে যাতায়াতের নিয়ামক। বর্মা করপোরেশন লিঃ (Burma Corporation Ltd.) দেশের টিন, রৌপ্য, সীসা, দস্তা, টাংষ্টেন (Tungsten), তামা ইত্যাদি ধাতব-দ্রব্যের উপর প্রভুত্ব করে।

কয়লার খনির শ্রমিক

ভারতীয় মাইনিং এসোসিয়েশনের বাঙালী সভাপতি এবং বেঙ্গল কোল কোম্পানীর ইংরেজ সভাপতির বক্তৃতায় একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, কয়লার খনিতে কয়লা উৎপাদন কমিয়াছে এবং খরচ বাড়িয়াছে। প্রথম জন বলিয়াছেন যে, ১৯৩৫ সালে একজন শ্রমিক গড়পড়তা সপ্তাহে ২.৫ টন কয়লা তুলিত, ১৯৪৭ সালে সে তুলিয়াছে ১.১৬ টন। দ্বিতীয় জন বলিতেছেন ১৯৩৮ হইতে ১৯৪৭-এর মধ্যে কয়লার খনিতে শ্রমিক সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ষাট জন, উৎপাদন বাড়িয়াছে—মাত্র শতকরা সাত টন। তবে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, খনির যাহারা আসল শ্রমিক অর্থাৎ মাটির নীচে যাহারা কাজ করে তাহারা মন দিয়াই কাজ করিতেছে, মাটির উপরে যাহাদের কাজ কঠিনও নয় বিপজ্জনকও নয় গোলমাল তাহারাই করে। কয়লার খনিতে শ্রমিকের মজুরী অনেক বাড়িয়াছে। যুদ্ধের আগে যাহারা মূল বেতন আট আনা রোজ পাইত তাহারা এখন পায় বারো আনা; তাহার উপর বেতনের দেড়গুণ মাগ্‌গি ভাতা বাবদ ১৵০ এবং অন্যান্য সুবিধা ।৶০, মোট দৈনিক ২৷০ আনা পায়। ইহার উপর হাজিরা বোনাস, উৎপাদন বোনাস প্রভৃতি আছে।

কয়লার দাম যে ভাবে বাড়িয়াছে তাহা দেশের শিল্পোন্নতির সহায়ক নহে, কারণ ইহাতে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির জন্য উহা অনেকটা দায়ী। যাহারা কয়লায় রন্ধন করে তাহাদের পক্ষে দীর্ঘকাল ছয় আনা মণের কয়লা পৌনে দুই টাকায় ক্রয় করিতে থাকা কঠিন। অংশীদারের লভ্যাংশও কম নহে, লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ আইনে কিন্তু ইহা কমিবে না। বেঙ্গল কোলের চেয়ারম্যান বলিতেছেন যে, কোম্পানীর ৩৫টা শেয়ার (১০০ টাকার) যাঁহাদের আছে ১৯৪৮ সালে তাঁহারা মাসে ৭৩৲ টাকা করিয়া পাইয়াছেন। ঐ বৎসর কোম্পানী যে লভ্যাংশ দিয়াছে ১৯৪৭-এ দিয়াছে তাহার প্রায় দ্বিগুণ এবং ১৯৪৬-এ প্রায় তিন গুণ। অর্থাৎ এই কোম্পানীতে যাঁহাদের শেয়ার আছে গত তিন বৎসরেই তাঁহারা শেয়ারের দাম তুলিয়াও তাহার উপর এক-তৃতীয়াংশ লাভ করিয়াছেন; আগের লভ্যাংশ তো ছাড়িয়াই দেওয়া গেল। মজুরী বাড়িবে, লভ্যাংশ বাড়িবে এবং উৎপাদন কমিবে—এই অবস্থা চলিতে থাকিলে কয়লার দাম কমিবে কিরূপে?

সোভিয়েট রাষ্ট্রে পাটচাষের সাফল্য

এই সম্বন্ধে দিল্লী হইতে প্রচারিত প্রচারপত্রে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে:

সাধারণ লোকের ধারণা ভারতের কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও পাট চাষ করা সম্ভব নয়। রুশিয়ায় রাজতন্ত্রের আমলে পাট চাষের কম চেষ্টা হয় নাই। সোভিয়েট যুগে বিজ্ঞান অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতেছে। পাট চাষের জন্য কৃষিবিদেরা পাট গাছের প্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করিয়া নির্বাচন-নীতিকে নির্ভুল ভাবে খাটাইয়া পাটের চাষ সফল করিয়াছেন। উজবেকিস্থানে যে সকল পাটের গাছ ফলিয়াছে সেগুলি শিল্পের চাহিদা মিটাইবার উপযুক্ত। ১৯৩৯ সাল হইতে ১ হেক্টেয়ারে (২.৪৭ একর) ৭ টন (এবং আরো বেশী) শুষ্ক ডাঁটা, দেড় টন পর্য্যন্ত তন্তু এবং অর্দ্ধ টন পর্য্যন্ত বীজ পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪১ সালে ১০ টন পর্য্যন্ত ডাঁটা ১ হেক্টেয়ার হইতে পাওয়া গিয়াছে।

১৯৪৭ সালে ক্রাসনোদার অঞ্চলে কুবান নদীর অববাহিকার ক্ষেত্রে দুই বার জল সেচন করিয়া নূতন ধরণের পাট চাষ হইতেছে। এই পাট অপেক্ষাকৃত শীতল আবহাওয়ায় চাষ করা যায়।

সোভিয়েটে যে পাট উৎপন্ন হইতেছে তাহা কোন কোন

অংশে আমদানী করা পাট অপেক্ষা ভাল। বিদেশ হইতে আমদানী করা পাটের তন্তুর "breaking point" সোভিয়েটের পাটের চেয়ে ৪।৬ কিলোগ্রাম কম। ভারতে শত শত বৎসরের পর যে পরিমাণ ফলন হইতেছে সোভিয়েটে প্রথম বৎসরেই তাহা হইয়াছে। ঠিক মত লাঙল দেওয়া interrow cultivation খাতব সার প্রয়োগের দ্বারা প্রতি হেক্টারে ১০ টন ডাঁটা এবং দেড় টন তন্তু পাওয়া যাইতে পারিবে। গ্রীষ্ম প্রধান আবহাওয়ার পাটগাছ সোভিয়েটে ৪০ ডিগ্রী অক্ষাংশে ফলান যাইবে। ইহা সোভিয়েট কৃষির দান।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রশংসাকে কোনরূপ খাট না করিয়াও এই কথা বলা যায় যে, বাংলাদেশের প্রায় ৭ বিঘা জমিতে "খাতব সার" না দিয়াও (২'৪৭) একরে দেড় টন (প্রায় ৪১মণ) পাট তন্তু পাওয়া যায়। সোভিয়েট রাষ্ট্রে পাট চাষের ব্যয়ের হিসাব পাইলে তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হইবে।

দীনবন্ধু সি. এফ্. এণ্ড্রুজের স্মৃতিতর্পণ

গত ৫ই এপ্রিল দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের অষ্টম বার্ষিকী মৃত্যু-দিনে সমাধি ক্ষেত্রে সকালে তাঁহার সমাধির উপরে মাল্যদান করা হয়। বৈকালে ডক্টর কালিদাস নাগের সভাপতিত্বে তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি জনসভারও অধিবেশন হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে ভারতবাসীর কল্যাণকর বহু প্রচেষ্টায় এণ্ড্রুজ আত্মনিয়োগ করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে নানারূপ দুঃখবরণ করেন। মরিশস, ফিজী ও দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি একাধিকবার ঐসব স্থলে গমন করিয়াছিলেন। পীয়ার্সন সাহেবের সঙ্গে তিনি শেষোক্ত স্থানে যান এবং মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। জাতির প্রগতিমূলক প্রতিটি আন্দোলনের সহিত দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের আন্তরিক যোগ ছিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকার হিতসাধনের জন্য তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এবং 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' এতাদৃশ ত্যাগী মহানুভবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বিশেষ ভাবে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

হরিনারায়ণ সেন

এই অক্লান্ত কর্ম্মীর তিরোধানে বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্য শ্রেণীর সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হইল, তাহা শীঘ্র পূরণ হইবার নহে। মাত্র ৬১ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শানুযায়ী জীবন গঠন করিয়া সেন মহাশয় যৌবনেই অস্পৃশ্য শ্রেণীর সেবা-ব্রত গ্রহণ করেন। ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতৃবর্গ পূর্ব্ববঙ্গের পতিত জাতির উন্নতিকল্পে একটি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন; তখন হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল হরিনারায়ণ অনন্যকর্ম্মা হইয়া সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কারে পিষ্ট শ্রেণীর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন।

দেশ বিভাগের পর তিনি ২৪-পরগণা জেলার কোন অঞ্চলে নিজের কর্ম্মশক্তির ব্যবহারের পথ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন। এই নূতন ক্ষেত্রে তাঁহার শক্তির পরিচয় দিবার অবসর পাইলেন না। ভগবান তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থিত-লোকে লইয়া গেলেন। আমরা তাঁহার পরিবারের উদ্দেশে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত

ক্যাপ্টেন দত্ত নামে সুপরিচিত এই বাঙালী প্রধানের দেহত্যাগ সংবাদ অপ্রত্যাশিত। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত পরিচয় এই সামরিক উপাধির মধ্যে পাওয়া যাইবে না। তাহা পাওয়া যাইবে "বেঙ্গল ইমিউনিটি" নামক ঔষধপত্র প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের সংগঠক রূপে। দেশের রাজনীতিক জীবনে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে নবজাগরণের সূচনা হয় তাহাতে তিনি মুক্তহস্তে অর্থসামর্থ্য দিয়া এই জাগরণকে শক্তিশালী করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্রের কর্ম্মের সঙ্গে তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল। ইহা তাঁহার আর এক পরিচয়।

ক্যাপ্টেন দত্ত বঙ্গদেশের রাজনীতিক জীবনের নানা আবর্তের মধ্যে কখনও তলাইয়া যান নাই; দর্শকের মত থাকিয়া যতদূর সম্ভব রাজনীতির সেবা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি ত্রিপুরা জেলার স্বগ্রাম শ্রীকাইলে কলেজ প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দিয়াছিলেন; আজ তাহা পূর্ব্ববঙ্গের একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। "পাকিস্থানের" পরিবেশে তাঁহার পুরাতন আদর্শ কত দূর বজায় থাকিবে, তাহা বলা কঠিন। নরেন্দ্রনাথ বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত তাহাকে নূতন রূপ দিতে পারিতেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে সেই দায়িত্ব পড়িয়াছে তাঁহার অগ্রজ শ্রীকামিনীকুমার দত্তের উপর।

ভারতের বিচার্য।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি।

১। ভারতরাষ্ট্র।

সংবাদপত্রে দেখিতেছিলাম, ভারতরাষ্ট্ররচনা-পরিষদে (Constituent Assembly) তর্ক উঠিয়াছে, India নামের ভারতীয় নাম কি হইবে। কেহ বলিয়াছেন ভারতবর্ষ, কেহ ভারত, কেহ হিন্দুস্থান। প্রশ্নটি এত গুরুতর বোধ হইয়াছে যে ইহার উত্তর পাওয়া যায় নাই; ভাবীকালের নিমিত্ত তর্ক স্থগিত আছে। কিন্তু কে না জানে, আমাদের দেশের নাম ভারত? দুষ্মন্ত-পুত্র ভরত যে দেশের রাজা ছিলেন, সে দেশের নাম ভারত। ঋগ্‌বেদের কালে ভরত নামে এক বংশ ছিল। দুষ্মন্তের পূর্বে ভরতবংশীয়েরা সরস্বতী নদীর তীরে বাস করিতেন। সেহেতুও এদেশের ভারত নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ভূ-পৃষ্ঠের এক এক ভাগের নাম বর্ষ ছিল। পর্বত দ্বারা বিচ্ছিন্ন অংশ, বর্ষ। এই সকল পর্বতের নাম বর্ষ পর্বত। ভারতবর্ষ হিমাচল দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। অতএব ভারত ও ভারতবর্ষ, একই অর্থ। বিস্তীর্ণ জলরাশি দ্বারাও ভূপৃষ্ঠের বিভাগ কল্পিত হইয়াছিল। এই সকল বিভাগের নাম দ্বীপ। হিমাচলের পূর্ব ও পশ্চিম বাহু দক্ষিণে প্রসারিত হইয়া দুই সমুদ্রে পড়িয়াছে। দুই দিকে দুই জলরাশি। এই হেতু ভারত একটি দ্বীপ। পামীর অধিত্যকায় জম্বু ফলের আকারের কৃষ্ণবর্ণের বহু গণ্ড শৈল আছে। সেই সকল শৈলের নাম জম্বু। এই জম্বু নাম হইতে ভারতবর্ষের নাম জম্বু দ্বীপ। এখন জম্বু দ্বীপ, এই নাম অপরিচিত হইয়াছে। কিন্তু কাশ্মীরের মহারাজা জম্মুরও মহারাজা। এই জম্মু নাম পুরাতন জম্বু। জম্বুর নিকটস্থ নদীতে সোনা পাওয়া যাইত। সেই হেতু সোনার এক নাম জাম্বুনদ।

ভারত শব্দ হইতে ভারতের অধিবাসী ও ভারতের ভাষা ভারতী। তুমি কে? আমি ভারতী (Indian National)। আমি হিন্দু, কি মুসলমান, কি পার্সী ইত্যাদি ধর্মজ্ঞাপক নাম বলিতে হইল না।

ভারত একটা দেশ। এই দেশের যাহারা অধিবাসী, তাহারা ভারত প্রজা। প্রজা People; যে জন্মে সে প্রজা, শাবক। প্রজা শব্দের করদাতা অর্থ পরে আসিয়াছে। প্রজাদের মধ্যে যিনি প্রভু, তিনি রাজা। কেহ ভুজবল দ্বারা প্রভু হইয়া থাকেন, কাহাকেও প্রজারা প্রভু-পদে বরণ করে। পুরুষানুক্রমে প্রভুত্ব না করিলে রাজা নাম পায় না, এমন কথা নাই। রাজাতে প্রজার ইচ্ছাশক্তি পুঞ্জীভূত হইয়াছে। কেহ সেবা দ্বারা, কেহ অর্থ দ্বারা, কেহ শস্ত্র দ্বারা নিজেদের দেশ রক্ষণ ও পালন করে। এই কারণে প্রজা শব্দের এক অর্থ করদাতা হইয়াছে। ভারতের একজন রাজা আছেন। এখন তাঁহার নাম Governor-General. তিনি অধিরাজ, অথবা রাজ-রাজ। কারণ, অনেক রাজা তাঁহার অধীনে আছেন। রাজা পাইলাম, অতএব ভারত একটা রাজ্য। ইহাকে রাষ্ট্রও বলিতে পারি। রাজ্য ও রাষ্ট্র শব্দের মূল একই, অর্থও এক। দুইএরই অর্থ State. আমরা United States of America যুক্তরাজ্য বা রাজ্যযুতি বলি। Native States of India দেশীয় রাজ্য। অন্যান্য রাজ্য হইতে পৃথক বুঝাইবার নিমিত্ত ভারতকে রাষ্ট্র বলাই ঠিক। Congress Presidentকে 'রাষ্ট্রপতি' বলা কিছুতেই সঙ্গত নয়। যিনি রাজরাজ, তিনিই রাষ্ট্রপতি। Congress একটা দল। Congress President কন্‌গ্রেস-পতি। নানা Congress হইয়াছে। যেমন Science Congress, Trade Union Congress, Student's Congress ইত্যাদি। কিন্তু কন্‌গ্রেস নাম রাজনীতিকের (Politician) কন্‌গ্রেস, এই অর্থে প্রচলিত হইয়াছে।

রাজ্য আছে, রাজা আছেন, রাজার মন্ত্রী, অমাত্য, পাত্র ও বহু রাজপুরুষ আছেন। কেহ দেশ-শাসন-মন্ত্রী (Home Minister), কেহ বৈদেশিক মন্ত্রী (Minister for Foreign Affairs), কেহ রাজস্ব মন্ত্রী (Revenue Minister), কেহ আয়ব্যয়-মন্ত্রী (Finance Minister), ইত্যাদি। রাজার মন্ত্রী-পরিষদ্ (Council of Ministers) ব্যতীত ব্যবস্থাপক পরিষদ্ (Legislative Assembly) আছে। ইহার সদস্যেরা রাজপারিষদ। ইহাঁদের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা ভা. পা. (ভারত পারিষদ)। পরিষদের President পরিষৎপতি। পতি শব্দ দ্বারা সকল স্থলে President বুঝিতে হইবে। সভার President, তিনি নারী হইলেও সভাপতি; সভানেত্রী নহেন। ভারত-রাষ্ট্র-রচনা পরিষদের কার্য অচিরে সমাপ্ত হইবে। তখন ভারত-ব্যবস্থাপক পরিষৎ একমাত্র পরিষৎ থাকিবে।

ভারতরাষ্ট্র কতকগুলি রাজ্যের সঙ্ঘ (Union)। রাজ্য তিন প্রকার—(১) পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, ওড়িষ্যা প্রভৃতি অঙ্গ রাজ্য; (২) কাশ্মীর, মহীশূর প্রভৃতি সামন্ত রাজ্য; (৩) মধ্য ভারত, সুরাষ্ট্র, রাজস্থান প্রভৃতি ছোট ছোট

রাজ্যের সমষ্টি, রাজকরাজ্য। অতএব ভারতরাষ্ট্র রাজ্য-সঙ্ঘ (United States of India)। পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার পাটেলের যত্নে আকুমারিকা-হিমাচল একরাট্ হইয়াছে। এমনটি পূর্বে কখনও হয় নাই। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় বিন্ধ্যাচলের উত্তরের ভারত যুধিষ্ঠিরকে সার্বভৌম স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভারত অজ্ঞাত-প্রায় ছিল। বৌধায়ন দক্ষিণ ভারতে খ্রীষ্টের সহস্র বৎসর পূর্বে ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির ইহার ৪।৫ শত বৎসর পূর্বে ছিলেন। নন্দবংশের মহাপদ্মনন্দ অত্যাচার দ্বারা একরাট্ হইয়াছিলেন। কিন্তু মগধের নিকটবর্তী মাত্র কয়েকটি রাজ্যকে মগধ রাজ্যের অন্তর্গত করিয়াছিলেন। মহারাজা অশোক ভারতে ও ভারতের বাহিরে ধর্ম-বিজয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তৎকালীন রাজ্য-সমূহের অধিপতি হন নাই। রাজন্যবর্গের যোগ দ্বারা ভারতরাষ্ট্র বলবান্ হইয়াছে।

যখন ভারতকে ভূপৃষ্ঠের একটা অংশ মনে করিব, তখন পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, ওড়িষ্যা ইত্যাদি এক এক প্রদেশ। যুক্ত-প্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ, মধ্য-ভারত ইত্যাদি কতকগুলি নাম দ্বারা স্থান বুঝিতে পারা যায় না। এইরূপ নাম অচিরে পরিবর্তন করা আবশ্যক। এই সকল দেশ এক এক রাজ্য। প্রত্যেক রাজ্যের রাজা, মন্ত্রী, ব্যবস্থা-পরিষৎ ইত্যাদি সবই আছে।

ভারত প্রজাতন্ত্র (Republic) হইলেও একজন রাজা অবশ্য থাকিবেন। তিনি তখন প্রজাপতি (President of the Republic) নামে আখ্যাত হইবেন। যখন ভারতীয় প্রজাকে ভারতী বলিতেছি তখন ভারতী এক Nation স্বীকার করিতেছি। ভারতীরা এক রাষ্ট্রের সজাত। অতএব Nationalism সাজাত্য। আর, Nationalist সাজাত্যী। Nationalization রাষ্ট্রস্বীকরণ। Provincialization রাজ্যস্বীকরণ।

২। ভারতভাষা ও ভারতলিপি।

এতদিন ইংরেজী ভাষা দ্বারা ভারতের সকল প্রদেশের লোক-ব্যবহার ও রাজকার্য চলিতেছিল। এখনও কি ইংরেজীই থাকিবে? যিনি বিজ্ঞানের উচ্চাঙ্গ শিখিতে চাহিবেন, দেশদেশান্তরের বার্তা জানিতে চাহিবেন, অপরাপর দেশের সহিত বাণিজ্য করিতে চাহিবেন, অন্যান্য দেশের উত্তম সাহিত্য উপভোগ করিতে চাহিবেন, তাঁহাকে ইংরেজী শিখিতেই হইবে। ইংরেজী পরিত্যাগ করিলে চলিবে না; কেবল দেখিতে হইবে, ১৫।১৬ বৎসর বয়সের এদিকে কোন বালক ইংরেজী শিখিতেছে না। আর, অল্প বালক ইংরেজী শিখিলেই ভারতের কার্য চলিতে পারিবে।

একটা ভারতভাষা অবশ্য চাই। যে ভাষায় ভারত-রাষ্ট্রের কার্য ও লোক-ব্যবহার চলিতে পারিবে, ভারতের সমুদয় রাজ্যের অধিবাসী সহজে শিখিতে পারিবে, ও শিখিতে অভিলাষী হইবে, সে ভাষা ভারতভাষা হইবার যোগ্য। এমন ভাষা একটিও নাই।

হিন্দী-প্রচারক বলিতেছেন, মাথাগনতি করিয়া দেখ কোন্ ভাষায় কতলোক কথা কহে।

জনতন্ত্রের (Democracy) দোষই এই, সব মাথা সমান মনে করে। যদি হিন্দীভাষা রাষ্ট্রভাষা হয়, তাহা হইলে আমাদের পুত্রকন্যাকে চারিটি ভাষা শিখিতে হইবে। ১। মাতৃভাষা—বাংলা; (২) মাতৃভাষার বীজ—সংস্কৃত; (৩) ভারতভাষা—হিন্দী; (৪) ইংরেজী ভাষা। অবশ্য সকলকে এই রাষ্ট্রভাষা কিম্বা ইংরেজী শিখিতে হইবে না। তথাপি যাঁহারা উচ্চ শিক্ষালাভের অভিলাষী হইবেন, তাঁহাদিগকে ইংরেজী এবং যাঁহারা রাষ্ট্রের পদপ্রার্থী হইবেন তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রভাষা শিখিতেই হইবে। বিদ্যামন্দিরের প্রবেশপথে চারিটি অর্গল উল্লঙ্ঘন করা সহজ হইবে না। দ্রাবিড়-ভাষীকেও চারিভাষা শিখিতে হইবে। কেবল হিন্দীভাষীকে তিনটি ভাষা শিখিতে হইবে। জনতন্ত্রের দিনে সকলের সুখ-দুঃখ সমান ভাবিতে পারিতেছি কই?

আমরা সকলেই চাই, ভারত বলবান্ হউক, ধনধান্যে ভরিয়া যাউক, সুখ-সম্পদে অগ্রগণ্য হউক। বলবান্ করিবার নিমিত্ত রাজনীতিকেরা জাতিভেদ ভাষাভেদ দূর করিয়া সকল ভারতীকে সমান দেখিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু ইহা অসাধ্য মনে হয়। এই ভারতখণ্ডেই কত বিভিন্ন 'রয়' (race) বাস করিতেছে। কত প্রকার আদিবাসী, কত প্রকার আর্যীয়, শত শত বৎসর বাস করিয়া আসিতেছে; কিন্তু অতি অল্প 'রয়' মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়াছে। প্রত্যেক 'রয়'ই জাতিস্মর। পুরুষানুক্রমে বুঝিয়া আসিতেছে, সে অন্য হইতে ভিন্ন, আচার-ব্যবহারে ভিন্ন, ভাষায় ভিন্ন। কিন্তু এত ভেদ সত্ত্বেও একটি বিষয়ে সকলেই অপরের সহিত নিজের সাজাত্য বোধ করে। সেটি ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টি। এক সংস্কৃতির দ্বারা আমরা সকলেই, হিমাচলবাসীই বা কি আর কুমারিকা-বাসীই বা কি, ভাবিতেছি, বেদব্যাস আমাদের ছিলেন; তিনি মহাভারতে ও পুরাণে আমাদেরই পূর্বপুরুষের কীর্তি বর্ণনা করিয়াছেন। রামায়ণ আমাদেরই, উপনিষদ্ ও গীতা সকলেই মানি। কালিদাস তোমার যেমন, আমারও তেমন। এই একটি বিষয়ে ভারতী প্রজার ঐক্য আছে,

অপর বিষয়ে অনৈক্য। যদি ভারতকে বলবান করিতে চাই, তাহা হইলে এই ঐক্যকে দৃঢ় ও স্পষ্ট করিতে হইবে।

সংস্কৃত ভাষা এই ঐক্যের সাধন। সংস্কৃত ভাষাকে ভারতভাষা করিলে অনেক সুফললাভ হইবে,—

(১) ভাষায় ভাষায় দ্বন্দ্ব থাকিবে না। কেহ বলিবে না, বলপূর্বক হিন্দীভাষা শেখানা হইতেছে। (২) সংস্কৃত ভাষা শিখিলে সকল ভাষাই পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইবে। তদ্দ্বারা ভারতীয় মুসলমানদেরও স্ব স্ব রাজ্যের ভাষা শিখিবার সুবিধা হইবে। (৩) সংস্কৃত ভাষা দ্বারা উত্তর-দক্ষিণের, পূর্ব-পশ্চিমের আত্মীয়তা বৃদ্ধি হইবে।

(৪) সংস্কৃত সাহিত্য উন্মুক্ত হইয়া আমাদের আত্ম-গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

(৫) সংস্কৃত সাহিত্য এত উত্তম যে ইয়োরোপ ও আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা শিখিবার ব্যবস্থা আছে। এক আন্ধ্র শাস্ত্রী আমায় লিখিয়াছিলেন,—সংস্কৃত ভাষা থাকিতে কেন সংস্কৃত-আশ্রয়ী পরন্তু দূরাগত ভাষা শিক্ষা করিব? সংস্কৃত শিখিয়া আমরা ইয়োরোপ কিম্বা আমেরিকা গিয়া কথা কহিবার লোক পাইব। সেখানে কে হিন্দী বুঝিবে?

(৬) সেদিন সংবাদপত্রে পড়িতেছিলাম, আফগানরাজ কাবুল-বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা অবশ্যক করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন? যেহেতু সংস্কৃত ভাষা দ্বারা আফগান ভাষা পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইবে। হিন্দী ভাষা শিখিলে কোন্ ভাষার কোন্ সাহিত্যের উপকার হইবে? এই কারণেই মাদ্রাজে বহুলোক, জ্ঞানীলোক, হিন্দীর বিরোধী হইয়াছেন।

(৭) রাজকার্যের নিমিত্ত ও লোকব্যবহারের নিমিত্ত বহু বহু ইংরেজী শব্দের স্ব স্ব রাজ্যের ভাষায় পরিবর্তন করিতে হইবে। সে সকল শব্দ কোথা হইতে আসিবে?

(৮) পূর্ব পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ ভারতখণ্ডের যেখানেই যাই, দুই পাঁচ জন সংস্কৃত-জানা লোক পাওয়া যায় এবং তাহাদের দ্বারা কথাবার্তাও চলে। আমি দেখিয়াছি, মালয়লম-ভাষী, মারাঠী-ভাষী, তেলুগু-ভাষী সহজ সংস্কৃতে কথা কহিয়াছেন, আর আমরা সংস্কৃত না জানিলেও বুঝিতে পারিয়াছি। এই সেদিন কাশ্মীর হইতে এক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন; তাঁহার মাতৃভাষা ডোগরা। কিন্তু অল্প স্বল্প সংস্কৃত ভাষা দ্বারা, কেন আসিয়াছেন, কোথায় যাইতেছেন, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে হইলে পণ্ডিত হইতে হয় না। (৯) সংস্কৃতই এক ভাষা যাহার সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশের সামর্থ্য আছে।

সংস্কৃত নাম শুনিয়া চমকাইবার কিছু নাই। যিনি সংস্কৃতকে ভারতভাষা-রূপে শিক্ষা করিবেন, তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় কাব্য লিখিতে হইবে না, কিম্বা ন্যায়দর্শনের টীকাও করিতে হইবে না। তিনি বহু সমাস-বদ্ধ শব্দও রচনা করিবেন না, আর বহু ক্রিয়াপদের রূপও শিখিবেন না। আমি পুরীতে ১৫।১৬ বৎসরের দুই ওড়িয়া বালককে সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে ও তর্ক করিতে দেখিয়াছি। তাহারা অল্প সংস্কৃত শব্দ জানিত, অল্প ক্রিয়াপদ জানিত। কিন্তু সেই অল্প ভাষাজ্ঞান লইয়াই তর্ক করিয়াছে। সংস্কৃত ভারতভাষা হইলে সে ভাষা বাহুল্য-বর্জিত হইয়া প্রারম্ভিক (basic) সংস্কৃত হইবে। সে নিমিত্ত অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে না।

কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষাকে ভারতভাষা করার বিরুদ্ধে বলিবার যুক্তি আছে। সংস্কৃত ভাষা চলিত ভাষা নয়। ইহাতে বর্তমান কালের উপযোগী সাহিত্যও নাই। সংস্কৃত ভাষাকে ভারতভাষা করিলে ভারতের লোকব্যবহার চলিতে পারিবে, কিন্তু বর্তমান কালের উপযোগী সাহিত্যের অভাবে কিছুকাল জীবন্মৃত হইয়া থাকিবে। ইতিমধ্যে পণ্ডিতেরা সর্দার পাটেলের বক্তৃতা, রাষ্ট্রপরিষদের প্রশ্নোত্তর, ইত্যাদি সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া নাগরাক্ষরে প্রচার করিতে থাকুন। সংস্কৃতের ভারত-ভাষা হইবার যোগ্যতা আছে কিনা সহজে পরীক্ষিত হইবে। এই পরীক্ষার পূর্বে সংস্কৃত ত্যাগ করা অবিবেচনার কার্য হইবে।

রাষ্ট্রভাষা সংস্কৃত হউক, কিম্বা হিন্দী হউক, নাগরী-লিপি সর্বত্র প্রচলিত হইলে ভাষা শিক্ষার প্রথম কণ্টক থাকিবে না। বহুকাল পূর্বে এই পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ৫০০৯ কল্যব্দের মেষমাসে, অর্থাৎ ১৯০৮খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে কলিকাতা হইতে 'দেবনাগর' নামে এক মাসিক পত্র প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার কিছু পূর্ব্বে কলিকাতায় 'একলিপি বিস্তার পরিষদ্' নামে এক পরিষদ স্থাপিত হইয়াছিল। অনেক মান্যগণ্য বিদ্বান্ এই পরিষদের সদস্য ও সমর্থক ছিলেন। মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন। এক হিন্দীভাষী পণ্ডিত 'দেবনাগরে'র সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রে ভারতের নানা ভাষার প্রবন্ধ নাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইত। নাগরাক্ষরে বাংলা, ওড়িয়া, উর্দু, কানাড়ী প্রভৃতি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ পড়িতে পারা যাইত, যদিও অর্থবোধ হইত না। নাগরাক্ষর দ্বারা সকল ভাষার শব্দের উচ্চারণও ঠিক হইত না। যদি ভারতবাসীর সাজাত্যবোধ জাগাইতে হয়, এক লিপি প্রচলন প্রথম কর্তব্য বিবেচিত হইবে।

কালে বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন লিপি লুপ্ত হইয়া নাগরী লিপি ভারতের সর্বত্র প্রচলিত হইবেই। এ বিষয়ে এখন হইতে উদ্যোগ কর্তব্য। হিন্দী ও মারাঠী ভাষা নাগরাক্ষরে লিখিত হয়। যাবতীয় সংস্কৃতমূলক ভাষার যেমন, গুজরাতী, ওড়িয়া, বাংলা, মৈথিলী ও আসামীর অক্ষর নাগরাক্ষরের সামান্য রূপান্তর, অতএব সংস্কৃতমূলক ভাষায় নাগরী প্রচলনে আপত্তি থাকিবার কথা নয়। কেবল দ্রাবিড়-ভাষীকে নূতন অক্ষর শিখিতে হইবে।

বর্তমান প্রচলিত নাগরাক্ষরের আকারের ও সংযোগের দোষ আছে। অসংযুক্ত ও ঔ, অ অক্ষরে সংযুক্ত ো ৌ যোগ করিয়া নির্মিত হইয়াছে। ইহার কোন যুক্তি নাই। নাগরাক্ষর খ ও স্ব দেখিতে একই প্রকার, ইত্যাদি। আমি 'বাংলা নবলিপি'তে যে প্রস্তাব করিয়াছি তাহার মূলসূত্র ধরিয়া নাগরাক্ষরের সংযোগ-রীতির সংস্কার করিলে লিখন- ও পঠন-কষ্ট অতিশয় লঘু হইবে। ছয়টি অনুনাসিক বর্ণের ছয়টি নাগরাক্ষর আছে। কিন্তু নাগরী লেখকেরা এক বিন্দুদ্বারা এই ছয় অনুনাসিক বর্ণ জ্ঞাপন করিতেছেন। ইহা অত্যন্ত দোষাবহ। পড়িবার পূর্বে পাঠককে জানিতে হইবে, পরে ক বর্গের অক্ষর থাকিলে বিন্দুদ্বারা ঙ বুঝিতে হইবে, ট বর্গের থাকিলে ণ বুঝিতে হইবে, ইত্যাদি। এইরূপ সঙ্কেত পণ্ডিতেরা বুঝিতে পারেন, কিন্তু শিক্ষার্থীরা সকল বিন্দুই এক মনে করে। এই দোষের এক বিখ্যাত উদাহরণ দিতেছি। রমেশ দত্ত মহাশয় ঋগ্‌বেদ সংহিতা বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বোধ হয় নাগরাক্ষরে সে বেদের মাতৃকা ছিল। ফলে 'ইন্দ্র' স্থানে ছাপা হইয়াছে 'ইংদ্র'। বোধ হয় এইরূপ কারণে বংশী শব্দ হিন্দীতে বন্‌সী হইয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন রোমীয় লিপি শেখা সহজ। তাঁহারা ইংরেজীতে ২৬টি অক্ষর দেখিয়া মনে করিয়াছেন, নাগরাক্ষরমালা অতিশয় দীর্ঘ। কিন্তু বোধ হয় সব দিক তলাইয়া দেখেন নাই। বালক ইংরেজী শিখিতেছে এ, বি, সি (A. B. C), নাগরী লিখিবার সময় পড়িবে অ, ব, চ। ইংরেজী laugh পড়িবে লাফ্‌, নাগরাক্ষরে পড়িবে লৌঘ। বালকের নিকট বিষম জঞ্জাল স্বরূপ হইবে। আমাদের ভাষায় ৫০টি বর্ণ অবশ্য চাই, পঞ্চাশটি অক্ষরও চাই। ঙ, ঞ, ণ, ন স্থানে ইংরেজীতে মাত্র একটি ন (n) আছে। সে অক্ষরের মাথায় তলায় বিন্দু ও তরঙ্গ দিয়া ঙ, ঞ, ণ বর্ণ করিলে তিনটি অক্ষরই আসিয়া পড়িল। ক লিখিতে ইংরেজীতে ka, খ লিখিতে kha ইত্যাদি অক্ষর যোগ দ্বারা বর্ণের নূতন অক্ষরই শিখিতে হইবে। আর, যখন সাধারণ লোকে ইংরেজী বর্জন করিতেছে তখন তাহার লিপি গ্রহণ কদাপি প্রীতিকর হইবে না।

এই প্রবন্ধ লিখিবার পর ১৯৪৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে সংবাদপত্রে দেখিলাম, The Question of Language, এই নাম দিয়া ভারত-মহামন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, দুই প্রয়োজনে তিনি ভাষা সম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন (১) সে ভাষায় ভারতরাষ্ট্রের কার্য পরিচালিত হইবে; (২) সে ভাষা দ্বারা হিন্দুমুসলমানের সদ্ভাব রক্ষিত হইবে। তাঁহার মতে, হিন্দীই বল, আর হিন্দুস্থানীই বল, এই ভাষা ভিন্ন আর কোন ভাষা ভারত-ভাষা হইতে পারে না। তিনি উত্তম ভাষার এই এই লক্ষণ দিয়াছেন। সে ভাষার-প্রত্যেক শব্দ একার্থ ও স্পষ্টার্থ হইবে; সে ভাষা সাধারণ লোকের ভাষা হইবে; সে ভাষা আপনাতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, পৃথিবীর গতির দিকে দৃষ্টি রাখিবে; সে ভাষা অন্যভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিতে পারিবে ও সকল প্রকার ভাব প্রকাশে সমর্থ হইবে; সে ভাষা ক্রমশঃ পুষ্ট হইবার শক্তি রাখিবে এবং ওজস্বী হইবে। তিনি মনে করেন ইংরেজী ভাষার এই সকল গুণ আছে বলিয়া এত প্রসারিত হইতে পারিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা আমাদের মহাধন বটে, কিন্তু ইহা জীবন্ত ভাষা নহে। ইহাকে পুনর্জীবিত করা অসম্ভব। ইহা হইতে শব্দ গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু ইহার শব্দ বলপূর্বক প্রচলিত ভাষায় প্রবেশ করাইবার চেষ্টা বাঞ্ছনীয় নহে, আবশ্যকও নহে। কয়েক শত বৎসর হইতে ফারসী ভাষার প্রভাব, ইহার শব্দ ও ভাব, আমাদের ভাষায় চলিয়া আসিতেছে। সে ভাষার শব্দ ও ভাব রাখিলে আমাদের ভাষা সমৃদ্ধ হইবে। ইহা সাধারণ লোকের ভাষা হইবে, কয়েক জন পণ্ডিতের ভাষা নয়, ইত্যাদি। এই নিমিত্ত তিনি প্রায় তিন সহস্র শব্দের একটি কোশ সঙ্কলন বাঞ্ছনীয় মনে করেন। লোকব্যবহারে যে সকল শব্দ চলিয়াছে, সে সকল শব্দ এই কোশে থাকিবে। প্রয়োজন হইলে কোন কোন শব্দের পর্যায় শব্দ থাকিবে। আর একখানি পারিভাষিক শব্দের কোশ সঙ্কলন করিতে হইবে। তাঁহার মতে, নাগরীলিপি ভারতলিপি হইবে, এবং আবশ্যকক্ষেত্রে উর্দু ও চলিবে।

ভারতভাষার কি কি গুণ থাকিলে ভাল হয়, সে বিষয়ে সকলেই পণ্ডিতজীর সহিত একমত। কিন্তু সে সকল গুণ হিন্দুস্থানী ভাষার আছে কি? লোকব্যবহৃত কোনও সাধারণ ভাষার শব্দের একার্থতা ও স্পষ্টার্থতা গুণ নাই। দেখা যাইতেছে, পণ্ডিতজী হিন্দী ভাষায় পাঁচ-ছয় সহস্র বাঞ্ছিত শব্দ যোগ করিয়া উর্দু র তুল্য এক

নূতন ভাষা কল্পনা করিয়াছেন। উর্দু জবানে আকবর ও জাহাঙ্গীর বাদশাহ উৎসাহ দিলেও উহা প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর বাজারী জবান ছিল। ইংরেজের প্রয়োজনে মাত্র ৫০।৬০ বৎসর উহা সভ্যসমাজের ভাষা ও কবির ভাষা হইতে পারিয়াছে। অনুমান হইতেছে, এই 'নয়ী জবানে' বহু বহু আরবী-ফারসী শব্দ থাকিবে, অর্থাৎ উর্দু-প্রায় হিন্দী হইবে। তদ্দ্বারা রাষ্ট্রকার্য চলিতে পারে, কিন্তু দেশে এক সাধারণ ভাষার অভাব পূরণ হইবে না। আরবী-ফারসী-বহুল হিন্দীভাষার নাম উর্দু বা হিন্দুস্থানী। এই ভাষা দিল্লী অঞ্চলে ও যুক্ত-প্রদেশের লক্ষ্নৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে, বিশেষতঃ মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অন্য স্থানের মুসলমানেরা সে ভাষা জানেন না। উর্দু অতি অল্প ভারতীয় মুসলমানের মাতৃভাষা। ভারতের জনমত অনুসন্ধান করিলে অতি অল্প লোক উর্দুর পক্ষে মত দিবেন।

৩। ভারত কালাদি-মান

আমরা ইংরেজী সন তারিখ লিখিতেছি। স্বাধীন ভারতেও কি তাহাই চলিবে? ১৯৪৯, ১০ ফেব্রুআরি, এই সন তারিখ ইংরেজী নয়, খ্রীষ্টানী। এই হেতু যাবতীয় খ্রীষ্টান দেশে প্রচলিত আছে। আমরা শক ও সৌরমাস কেন ত্যাগ করিব? শকারম্ভের উত্তম জ্যোতিষিক কারণ ছিল। এই হেতু আমাদের জ্যোতির্বিদেরা শকাব্দ গণিতেন। শক গণনা বৈজ্ঞানিক। লোক-ব্যবহারের নিমিত্ত সৌর মাস গণনা শ্রেষ্ঠ। চান্দ্র মাস কোথাও পূর্ণিমান্ত, কোথাও অমান্ত। আর, জ্যোতির্বিদ ব্যতীত তিথি গণনা অন্যের দুঃসাধ্য। কিন্তু সৌর মাসের দিন-সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিলে যে-সে লোক দিন গণিতে পারিবে। ইংরেজীতে যেমন জানুআরি ৩১, এপ্রিল ৩০, ইত্যাদি মাসের দিনসংখ্যা নির্দিষ্ট আছে, কেবল এক ফেব্রুআরি মাস কোন বৎসর ২৮, কোন বৎসর ২৯ দিন হয়, সেইরূপ ক্রমে বৈশাখাদি মাসেরও দিন সংখ্যা নির্দিষ্ট রাখিতে পারা যায়। কোন কোন মাসে সংক্রান্তি দিবসের অনৈক্য হইতে পারে। কিন্তু পঞ্জিকায় যেমন তিথি নক্ষত্র লিখিত হইতেছে, তেমনই সংক্রান্তিও লিখিত থাকিবে। সংক্রান্তি কৃত্যের বিঘ্ন হইবে না। আমরা সূর্যোদয় হইতে বার গণনা করি। এই কারণে খনার বচনে, "মঙ্গলের ঊষা বুধে পা। যথা ইচ্ছা তথা যা।" ইহার অর্থ, বুধবারের ভোর, সূর্যোদয় হইলেই বুধবার আরম্ভ হইবে। কিন্তু এখন আমরা ইংরেজী মতে অর্ধ রাত্রে বার আরম্ভ করিতেছি। যাহা মঙ্গলের ঊষা, তাহা বুধের ঊষা হইয়া পড়িতেছে। তাহা হইলেও আমাদের অনেক জ্যোতির্বিদ্ সূর্যোদয়ে বার প্রবৃত্তি না ধরিয়া অর্ধরাত্রে ধরিতেন। তাহা বৈজ্ঞানিকও বটে। আমরা তাহা স্বীকার করিয়া লইলে বর্তমানের রীতি রাখিতে পারা যাইবে।

আমরা তিন মান লইয়া সংসার চালাইতেছি। (১) অঙ্গুলি মান অর্থাৎ দৈর্ঘ্য পরিমাণ; (২) তুলামান অর্থাৎ দ্রব্যের ওজন; (৩) কাল মান অর্থাৎ সময় পরিমাণ। এই তিন মান সকল মানের আদি। আমরা ইঞ্চি, গজ, ফুট, মাইল মাপিতে থাকিব? টন, হন্দর, পাউণ্ড, আউন্স দ্বারা ওজন করিব? ভারতের সর্বত্র এখন ইংরেজী মান চলিতেছে। পরেও কি সেই মান থাকিবে? আমি এখানে প্রশ্নটি উত্থাপন মাত্র করিলাম। ফরাসী দেশে প্রচলিত মীটরকে দৈর্ঘ্যের মিতি (Unit) করিতে পারা যায় কি না তাহাও বিবেচ্য। বেতার বার্তা শুনিতে হইলে মীটর ও কিলোওাট বুঝিতে হইতেছে। বিজ্ঞানে ইংরেজী মিতির (Unit) চলন নাই। সঙ্গে সঙ্গে আর এক প্রশ্ন মনে আসে। দশমিক পদ্ধতিতে গণিত কর্ম প্রচলিত করিতে পারা যায় না কি? দশমিক পদ্ধতি কোন্ অতীত কালে আর্যেরা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সভ্য দেশে তাহাই গৃহীত হইয়াছে।

৪। ভারত বন্দনাগীত।

আমরা ভারতী। ভারতের বন্দনা অবশ্য গাহিব। সে বন্দনার নাম ভারত বন্দনাগীত (Indian National Anthem)। ইহাকে সঙ্গীত বলিতে পারি যদি ইহার সহিত বাদ্য থাকে কিম্বা অনেকে একসঙ্গে গাহিতে থাকে। কেহ কেহ ইহাকে 'জাতীয় সঙ্গীত' বলিয়াছেন। কিন্তু জাতীয় সঙ্গীত নামে অনেক গীত রচিত হইয়াছে। সে সকল গীত আধ্যাত্মিক স্তুতি নহে, ভারতের সর্বত্র প্রচলিতও নহে। সুতরাং জাতীয় সঙ্গীত, এই নাম পরিত্যাজ্য।

ভারত বন্দনাগীত কোন্টা হইবে, তাহা লইয়া ভারত-রাষ্ট্র-রচনা-পরিষদে তর্ক উঠিয়াছে। কিন্তু যিনি 'স্বদেশী' প্রাবল্য কালে 'বন্দেমাতরম্' গীতের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি অন্য কোন গীতকে ভারত বন্দনাগীত হইবার যোগ্য মনে করিবেন না। রাজদ্রোহী যুবক প্রহার খাইতেছে, কিন্তু 'বন্দেমাতরম্' ছাড়ে নাই। 'বন্দেমাতরম্' এক মন্ত্র স্বরূপ হইয়াছিল, অপর কোনও গীত হয় নাই। কি শুভ লগ্নে বঙ্কিমচন্দ্র এই গীত রচনা করিয়াছিলেন! তখন কংগ্রেসের জন্ম হয় নাই, 'স্বদেশী' ভাবের উদয় হয় নাই।

প্রথমে তিনি ভারতমাতার বাহ্যমূর্তি বর্ণনা করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে

এক মহা মহিমময়ী শক্তি বিরাজ করিতেছেন। ইহা কবির অলীক কল্পনা নয়; জল, মাটি, বাতাসে আত্মার আরোপ নয়। বিশ্বচরাচর যে শক্তির প্রকাশ, সেই শক্তিই ভারতের জলে, ফুলে, শস্যে, যামিনীর জ্যোৎস্নায়, পুষ্পিত দ্রুমে, নর-নারীর যুদ্ধোদ্যমে, হৃদয়ের ভক্তিতে, বাহুর বলে প্রকাশিত হইয়াছে। কবি সেই চিন্ময়ী শক্তিকেই 'মাতা' বলিয়াছেন। তাঁহার নাম নাই, রূপ নাই। কেহ তাঁহাকে পিতা বলে, কেহ মাতা, কেহ প্রভু, কেহ সখা। যখন সঙ্গীতবিশারদ ওঙ্কার নাথ এই গীত গাহিতেন—আমি গ্রামোফোন রেকর্ডে শুনিয়াছি—তখন সকল শ্রোতা এই গীত বুঝিতে পারুক আর না-ই পারুক, তাহাদের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। ছন্দের ঝঙ্কারে, ভাষার ওজস্বিতা ও লালিত্যে, ভাবের ঔদার্য ও গাম্ভীর্যে এই গীত অতুলনীয়। কিন্তু সুরটি কঠিন, সকলে গাহিতে পারিবে না। আর, সে চেষ্টা করাও বৃথা। ইহার এমন সুর দিতে হইবে যে সুরে গীতের গাম্ভীর্য ও পবিত্রতা রক্ষিত হয়। দেখিতে হইবে, আধুনিক নামে যে সব গান রচিত হইতেছে, সে 'তিড়িং রাগিণী' না আসে।

এই গীতে ৭৮টি মূল শব্দ আছে। তন্মধ্যে ৬টি মাত্র বাঙ্গলা, অবশিষ্ট সকল শব্দ সংস্কৃত। এ কারণ এই গীত ভারতের সর্বত্র সুবোধ্য। এই ৬টি বাঙ্গলা শব্দের (কেন, মা, তুমি, এত, তোমারই, গড়ি) স্থানে সংস্কৃত শব্দ অক্লেশে বসাইতে পারা যায়।

বাঙ্গালী মুসলমান, বিশেষতঃ যুবকেরা, এই গীতের প্রতি প্রসন্ন নহেন। তাঁহারা মনে করিয়াছেন, এই গীতে হিন্দুকে মুসলমানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হইয়াছে। তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। যে সময়ে এই গীত রচিত হইয়াছিল, সে সময় বঙ্গ-বিহার-ওড়িষ্যায় সাত কোটি লোকের বাস ছিল। তন্মধ্যে অন্ততঃ আড়াই কোটি মুসলমান ছিলেন। তাঁহাদিগকে না লইলে "সপ্ত কোটি কণ্ঠ" কোথায় পাওয়া যাইবে? কবি বলিয়াছেন, হিন্দু মুসলমান মিলিত হইয়া দেশের মুখ উজ্জল করুন। এই গীতের 'রিপু' ব্রিটিশরাজ।

মুসলমানদিগের আর এক আপত্তি, এই গীতে পৌত্তলিকতা আছে। যদি বলি, হিন্দু পুতুলের পূজা করেন না, তাহাতেও তাঁহারা এই গীত গ্রহণ করিতে পারেন না। হিন্দুই হউন, আর মুসলমানই হউন, সাধারণ লোকে যেমন বুঝে তেমনই করা উচিত। কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করিলে মুসলমানদের আপত্তি দূর হইতে পারে। যেমন 'সপ্ত কোটি' স্থানে ত্রিংশৎ কোটি, 'দ্বিসপ্ত কোটি' স্থানে দ্বিত্রিংশৎ কোটি করা হইতেছে, তেমন 'নমামি তারিণীং' স্থানে নমামি পালিনীং, 'তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে' স্থানে তোমারই মহিমা হেরি অন্তরে অন্তরে। যে কলিতে দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর উল্লেখ আছে, সে কলিটি ত্যাগ করিলেও ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ গীতটি ছোট করিতে হইবে, নচেৎ বন্দনাগীত দুই মিনিটের মধ্যে সমাপ্ত হইবে না। ইহার অধিক কাল শ্রোতা নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না। কিন্তু প্রথম তিন কলি বন্দনা গীতের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। চতুর্থ কলিটি এইরূপ করিলে সকল আপত্তির খণ্ডন হয়—

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই মহিমা হেরি
অন্তরে অন্তরে॥
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥

শুনিতেছি, এই গীত ঐকতান বাদ্যের উপযোগী নয়। গীতটি ভক্তের স্তুতি। ইহা নাচনী ছন্দে গাহিলে ইহার মর্মচ্ছেদ হইবে। সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার ইহাকে ঐকতান বাদ্যের উপযোগী করিয়াছেন। মাস দুই তিন পূর্বে 'ভারতবর্ষে' সে সুরের স্বরলিপি প্রদর্শিত হইয়াছে। সে সুরে ভক্তিভাব ও গাম্ভীর্য রক্ষিত হইয়াছে।

এই গীত স্তুতি মন্ত্র। যেখানে-সেখানে যখন-তখন গাহিলে ইহার মাহাত্ম্য লুপ্ত হইবে।

(১) কোন সভা ভঙ্গের সময় এই গীত গাহিবে না। তখন শ্রোতারা চঞ্চল-চিত্ত হয়।

(২) নিত্য ও নিয়মিত কর্মের আরম্ভ কালেও এই বন্দনা গীত গাহিবে না।

(৩) সিনেমা ও থিয়েটারে কদাপি এই গীত গাহিবে না।

(৪) রেডিওতেও এই গীত গাহিবে না। কারণ, উপযুক্ত সময় নাই।

৫। মনুষ্য নামের পূর্বে শ্রী, শ্রীমতী।

এত কাল মনুষ্য নামের পূর্বে বাবু শব্দ লেখা হইতেছিল। এখন নামের পর ব্যবহৃত হইতেছে। যেমন, সুরেন্দ্রবাবু। বাবু শব্দ অতিশয় গৌরবজনক। ইহার ইংরেজী প্রতিশব্দ Sir. সংস্কৃত বপ্তা (জনক) শব্দ হইতে বপা—বাপা—বাপ, আদরে বাপু, তাহা হইতে বাবু। ইংরেজীতেও Sire শব্দ

হইতে Sir শব্দ আসিয়াছে। কালক্রমে বাবু শব্দের নানা অর্থ হইয়াছে। ইংরেজেরা বাবু নামে এ দেশের ভদ্রলোক বুঝিতেন। কেরাণী, আপিসের বাবু। হেড বাবু প্রধান কেরাণী। ক্রমে ক্রমে ইংরেজের মুখে বাবু শব্দের গৌরব নষ্ট হইয়াছিল। Baboo, a native (of Bengal), বহু কাল পূর্বে প্রোফেসর রো সাহেব তাঁহার ইংরেজী ব্যাকরণে "Baboo English" নামে এক অধ্যায় লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বাবুদের ইংরেজী ভাষা জ্ঞানের ভুল ধরিয়াছিলেন। এইরূপ নিন্দা শুনিতে শুনিতে আমরা বাবু ছাড়িয়া Mr. ধরিয়াছিলাম। এখন আমাদের স্বরাজ। মহাত্মা গান্ধী Mr. শব্দ প্রয়োগের অনৌচিত্য প্রথম দেখাইয়া দেন। ইয়োরোপের এক এক জাতির ভাষায় সম্মান-জ্ঞাপক এক এক শব্দ আছে। Mr. John, কিন্তু Herr Hitler, ইত্যাদি। তেমনি আমাদেরও নামের পূর্বে শ্রী লেখা আরম্ভ হইয়াছে। এখন ছোটলাট, বড়লাট, সকলেরই নামের পূর্বে শ্রী, লেখা হইতেছে।

অনেক দিন পূর্বে আমি 'প্রবাসী'তে শ্রী ও শ্রীমতী লেখার যুক্তি দেখাইয়াছিলাম। পুরুষের নামের পূর্বে শ্রী, শ্রীমান, শ্রীযুত, শ্রীযুক্ত, যেমন লিখিতে পারি, নারীনামের পূর্বেও তেমন শ্রীমতী, শ্রীযুতা, শ্রীযুক্তা। কেহ কেহ মনে করেন, বাৎসল্যে শ্রীমান্ ও শ্রীমতী; ইহা এক বিষম ভ্রম। সধবা অথবা বিধবা নারীর নামের পূর্বে শ্রীমত্যা লেখা শত শত দলিলে দেখা যায়। দলিলে শ্রীমত্যা ভবসুন্দরী দেব্যা, এইরূপ প্রয়োগ দ্বারা বুঝায় না তিনি বালিকা কি যুবতী, সধবা কি বিধবা। পুরুষনামের পূর্বে শ্রী লিখিলে বুঝি তিনি শ্রীযুক্ত আর তিনি জীবিত। এইরূপ, শ্রীমতী লিখিলেও বুঝি, নারী জীবিত। অবিবাহিতা নারীর নামের পূর্বে কুমারী লেখা অতিশয় নিন্দনীয়। এটি ইংরেজী Miss শব্দের ভুল অনুবাদ। ইহা পরিত্যাজ্য। কোন নারী অনূঢ়া, সধবা কিম্বা বিধবা জানান ভারতীয় শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। ইয়োরোপে নারী স্বয়ম্বরা হয়। তাহাদের গান্ধর্ব বিবাহও হয়। অনূঢ়া কি না জানাইবারও প্রয়োজন ঘটে। আমাদের দেশে কন্যা পিতৃদত্তা। কিন্তু কি আশ্চর্য, নামের পূর্বে কুমারী শব্দ এখনও শুনিতে পাই। "তোমার নাম কি ?" কন্যাটি বলিতেছে, "কুমারী অর্চনা চাটার্জি"। "তোমার দিদির নাম কি ?" (একটু ভাবিয়া) "শ্রীমতী বন্দনা বানার্জি।" "তুমি বুঝি শ্রীমতী নও ?" বালিকার বয়স ১৫।১৬ বৎসর, কিন্তু উত্তর করিতে পারিল না। সে বিদ্যালয়ে শিখিয়াছে, বিবাহের পূর্বে কন্যা শ্রীমতী হয় না।

ইদানীর কোন কোন লেখক স্বীয় নামের পূর্বে শ্রী বর্জন করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন, শ্রী লিখিলে পাঠক-সমাজকে জানান হয়, তিনি শ্রীমন্ত। তেমনি কোন কোন লেখিকা শ্রীমতী ত্যাগ করিয়া শ্রী লিখিতেছেন, কেহ বা শ্রীও ত্যাগ করিতেছেন। বাস্তবিক, নামের পূর্বে শ্রী থাকিলে বুঝি, যাঁহার নাম তিনি জীবিত। মৃত ব্যক্তির নামের পূর্বে শ্রী বসে না। কিন্তু যদি তিনি বিখ্যাত ও মান্য হন, তাহা হইলে তাঁহার নামের পূর্বে শ্রী লেখা কর্তব্য। দেবদেবীর নামের পূর্বে ও মান্য গ্রন্থের নামের পূর্বে শ্রী লেখা উচিত। "জয়তি শ্রীচণ্ডীদাসঃ কবিঃ।" চণ্ডীদাস বহুকাল স্বর্গগত, কিন্তু এখনও তিনি শ্রীমান্। এইরূপ, শ্রীভাগবত, শ্রীমান্ ভাগবত। পত্র কিম্বা গ্রন্থের আরম্ভে শ্রী লেখার রীতি ছিল। ইহা হইতে আমরা চলিত ভাষায় বলি 'শ্রী কাঁদা।'

পুরুষের নামের পূর্বে শ্রী, নারীর নামের পূর্বে শ্রীমতী লেখা আমাদের শিষ্টাচার। শ্রীযুক্তা লিখিলে বর্ষীয়সী বুঝায় না। এরূপ প্রয়োগ ইদানী দেখিতেছি, পূর্বে কখনও দেখি নাই। অন্যান্য প্রদেশেও এই প্রভেদ অজ্ঞাত।

শ্রীজওহরলাল নেহরু, স্বচ্ছন্দে লিখিতে পারি, কিন্তু শ্রীনেহরু লিখিলে মনে হয় তাঁহার সম্মান করা হইল না। যাঁহাকে সম্মান করি, তাঁহার নামের পূর্বে দীর্ঘ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। শ্রী, শ্রীল, শ্রীযুক্ত, সকলের একই অর্থ। কিন্তু সম্মান জানাইবার নিমিত্ত শ্রীল শ্রীযুক্ত লিখি। এই কারণে শ্রী অপেক্ষা শ্রীযুত বা শ্রীযুক্ত অধিক সম্মানজ্ঞাপক। ইংরেজীতেও Sj. ঠিক চলিয়াছে। যেখানে পুরা নাম না লিখিয়া উপনাম লিখিতে হয়, সেখানে শ্রীযুত বা শ্রীযুক্ত লেখা কর্তব্য। শ্রীনেহরু লিখিতে পারি না। লেখা উচিত শ্রীযুত নেহরু বা শ্রীযুক্ত নেহরু। তেমনই শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, এখানে শ্রীমতী নাইডু লেখাই ঠিক। ইংরেজীতে Sm. Naidu. ইহার পরিবর্তে শ্রীযুক্তা লেখা শুধু পাণ্ডিত্য প্রকাশ।

শ্রী শব্দ গৌরব বুঝায়। যিনি মনুষ্যজন্মে গৌরববোধ না করেন তিনি শ্রী লিখিবেন না। আসল কথা, ইংরেজেরা নামের পূর্বে Mr. বা . লেখেন না, অতএব আমরাও লিখিব না। ইংরেজ আচার-ব্যবহারের বহু অনুকরণের মধ্যে ইহা একটি।

শ্রীমতী লিখিবার হেতু আছে,—

(১) ইহা আমা দেশের শিষ্ট রীতি; । আমরা কেন ত্যাগ করিব ?

(২) ইদানী এমন অনেক নাম আছে, যাহা শুনিয়া নর কি নারী বুঝিতে পারা যায় না। যেমন, হেমশশী সোম, পরিমল খাঁ, সবিতা তপস্বী, কিরণ বসু, শান্তি মুখার্জি, প্রকৃতি গুপ্ত, বিদ্যুৎ রাহা, নীলিমা বসু, অরুণিমা

কর, বাসন্তী ঘোষ, ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কে নর, কে নারী, কেহ বলিতে পারিবে না। নাম-বিভ্রাটের আর এক কারণ জুটিয়াছে। কোন কোন পুরুষ স্বীয় নামের মধ্য শব্দ বর্জন করিয়া সংক্ষেপ করিতেছেন। যেমন, কালী মিত্র, পার্বতী সেন, শান্তি সান্ন্যাল ইত্যাদি। যাঁহারা ইঁহাদিগকে না চিনেন, তাঁহারা ইঁহাদিগকে নারী মনে করিবেন।

কিছু দিন হইতে নারী নিজ নামের শেষে দেবী কিম্বা দাসী লেখা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই কারণেই নাম শুনিয়া নর কি নারী, বুঝিতে পারা যায় না। ভাষার ব্যাকরণেও এক বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের নামে দুই অংশ আছে; প্রথমাংশ স্বনাম, দ্বিতীয়াংশ কুলনাম বা উপনাম। সমুদয় কুলনাম পুংলিঙ্গ। অতএব অচলা চক্রবর্তী, এই নামটি পুংলিঙ্গ, যদিও সে কন্যা। অচলা চক্রবর্তীকে শ্রীমতী বলিতে পারি না। ইহার এক সমাধান আছে। কুলনামে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করিলে নামের পূর্বে শ্রীমতী স্বচ্ছন্দে লিখিতে পারি।

বিবাহের পর কন্যা পিতৃকুল ত্যাগ করিয়া শ্বশুরকুলে প্রবেশ করে। পিতৃকুলে সে পিতৃকুলজাতা, শ্বশুরকুলে বধূ। শ্রীমতী নির্মলা বসুজাতা, সংক্ষেপে বসুজা, বিবাহের পর শ্রীমতী নির্মলা মিত্রানী বা মিত্রনী। পত্নী শব্দের সংক্ষেপে 'নী'; যেমন, শিবানী, ভবানী, মাতুলানী। আনী ও নী প্রত্যয় যোগে কুলের বধূও বুঝায়। এইরূপ, নাপিতানী, মালিনী, জেলেনী, মজুমদারনী, সরকারনী, চৌধুরানী ইত্যাদি গ্রামে বহু প্রচলিত আছে। ইদানী শিক্ষিকা অর্থে মাষ্টারনী শব্দ চলিতেছে। এখানে 'নী' যোগে স্ত্রী-মাষ্টার বুঝায়, মাষ্টার কুলের বধূ নয়। এইরূপ, ডাক্তারনী। যিনি শ্রীমতী সরোজিনী চট্টোপাধ্যায়জা ছিলেন, তিনি পরে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুনী হইয়াছেন। এই রীতি প্রচলিত হইলে নারীর কুল বুঝিতে অসুবিধা হয় না। কেহ কেহ নিজের নামের পরে গুপ্তা লিখিতেছেন। এইরূপ 'আ' দিয়া স্ত্রীলিঙ্গ বুঝিতে পারি, কিন্তু তিনি কন্যা না বধূ, বুঝিতে পারা গেল না।

একবার এক মহিলা আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পুরুষের নামের পর বাবু বলিয়া সম্বোধন করা চলে; যেমন সুরেন্দ্রবাবু। আমরা এই রকম একটি শব্দের অভাব বোধ করিতেছি। আমরা এখন বলি 'অর্চনা দি'। কিন্তু অপরিচিতা মান্যা মহিলার নামের পরে 'দি' যোগ করিতে পারি না; পূর্ণ আকারে দিদিও বলিতে পারি না।" ইহার একটি সমাধান আছে। বাবা শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বাবী। তাহা হইতে 'বাঈ' আসিয়াছে। উত্তর-ভারতে ও মহারাষ্ট্রে বাঈ শব্দ বহু প্রচলিত আছে। মরাঠীতে বাঈ শব্দের প্রথম অর্থ মাতা। হিন্দীতেও বাঈ শব্দের অর্থ মাতা বা গৃহিণী। ইহা হইতে মান্যা নারীর নামের পর বাঈ বলা হয়; অর্থাৎ তিনি মাতৃ-স্বরূপা। যেমন প্রাতঃস্মরণীয়া মীরাবাঈ, অহল্যাবাঈ ইত্যাদি। কিন্তু বাঙ্গলায় বাঈ বলিলে বাঈনাচ মনে আসে। রক্ষা এই, ইদানী আর বাঈনাচ নাই। আর কত দিকে ভাষা সাবধান হইবে? মধ্য-প্রদেশে ও উত্তর-ভারতে বাবুর পত্নীকে বাঈ বলা প্রচলিত আছে। যেমন রেলের মালবাবুর পত্নী মালবাঈ। যদি বাঈ বলিতে সঙ্কোচ বোধ হয়, মহিলারা বাবী বলিতে পারেন। এই বাবী শব্দ নূতন রচিত নয়। বাঁকুড়ায় ছত্রিদের নারীরা বাবী। কোন কোন ছত্রিবংশের পদবী বাবু আছে। যেমন শ্রীকেদারনাথ বাবু। তাঁহাদের নারী বাবী নামে খ্যাত। যেমন, শ্রীমতী অন্নপূর্ণা বাবী। অতএব বঙ্গ-মহিলা বাবী সম্বোধন অক্লেশে করিতে পারেন। প্রথম প্রথম নূতন ঠেকিবে, অভ্যাসে নূতনত্ব চলিয়া যাইবে।

এখানে বঙ্গের রীতিই আলোচিত হইল। ভারতের সর্বত্র যাহাতে একই রীতি গৃহীত হয়, তদ্‌বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

শিক্ষার মাধ্যম

ভাস্কর

১
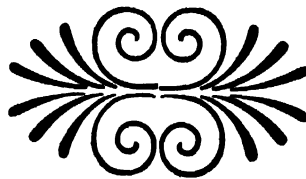
এই পাড়ারই ছেলে। যেমন বুদ্ধিমান্ তেমনি সপ্রতিভ। সকলেই ইহার কাছে অনেক কিছু আশা করে। কিন্তু অকস্মাৎ এ কি হইল? এক দিন প্রাতে দেখা গেল ছেলেটি বাড়ীতে নাই। অনেক খোঁজ করিয়াও কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। নচিকেতা নিরুদ্দেশ।

আসল কথা, নচিকেতার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে। পড়াশুনা, আহার, বিহার, লেক, পার্ক, সিনেমা, ক্রিকেট, সবই বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে। অতি সাধারণ বেশে সে যাত্রা করিয়াছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করিয়া সে বাড়ী ফিরিবে না।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর যাইতেই, পাড়ার মেয়ে বাসন্তী ডাকিয়া বলিল, নচিদা, এত সকালে কোথায় যাচ্ছ বল তো?

নচিকেতার কোন উত্তর না পাইয়া সে আবার বলিল, শোন, মনে আছে ত, বলেছিলে কলেজ স্কোয়ারের রেলিং থেকে আমাকে দু' গজ ছিট এনে দেবে। আজ যেন ভুল না হয়।

আমার দ্বারা ওসব হবে না।

সে কি! তুমি অত রাগ করছ কেন বল তো?

আমায় বিরক্ত কর না। আমায় দিয়ে আর সংসারের কোন কাজ হবে না। আমি সংসার ত্যাগ করেছি।

বাসন্তী গালে হাত দিয়া বলিল, ওমা, সে কি!

হ্যাঁ, তাই।

পাগল হলে নাকি?

না, পাগল হই নি। তোমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তুমি বুঝবে না। মোট কথা, আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। আমি চললাম।

'যমের বাড়ী যাও' বলিয়া বাসন্তী মুখ ফিরাইল।

'তাইতো যাচ্ছি' বলিয়া নচিকেতা পা বাড়াইল। বাসন্তীর চোখের কোণে বোধ হয় এক ফোঁটা জল টল্ টল্ করিয়া উঠিল।

২

নচিকেতা চলিয়াছে। কত পথ অতিক্রম করিয়াছে। আরও কত দীর্ঘ পথ যাইতে হইবে। যমালয় তো এখানে নয়। স্বর্গে গিয়া তবে যমের সহিত সাক্ষাৎ মিলিবে।

কত বন, কত পর্বত, কত মরু উত্তীর্ণ হইয়া দুর্গম পথ বাহিয়া নচিকেতা চলিয়াছে। বনপ্রদেশে মুনি-ঋষিরা মত ফল-মূল আহার করিয়া কোন মতে জীবনধারণ করিতেছে। বনের মধ্যে কিছু দূর পর পরই গাছে আপেল, ন্যাসপাতি, কমলালেবু, আঙ্গুর, আতা, পেয়ারা প্রভৃতি ঝুলিতেছে। ছোট ছোট গাছগুলিকে মাটি হইতে টানিলেই শাক-আলু, রাঙা-আলু, মিষ্টি-মূলা প্রভৃতি উঠিয়া আসে। সুতরাং মুনি ঋষিদের ক্ষুধা পাইলে ফল-মূলের কোন অভাব হয় না। অবশ্য পাওয়া যায় বলিয়াই তাঁহারা যখন তখন যত ইচ্ছা খান, তা নয়। শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সামান্য যেটুকু দরকার, তার বেশী খান না। নচিকেতাও এইরূপ পরিমিত আহার করিতে করিতে ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে শীর্ণতর হইতে হইতে স্বর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এক স্থানে একটি সুন্দর মাঠ। অনেকগুলি ছেলে খেলিতেছে। তাহারা নচিকেতাকে দেখিয়া বলিল, এস না ভাই, আমাদের সঙ্গে খেলবে।

নচিকেতা বলিল, না ভাই, আমি খেলাধুলা ছেড়ে দিয়েছি। ও সবে আমার আর মন নেই।

সে কি! এই বয়সে এখনই খেলাধুলা ছেড়ে দিলে চলবে কেন? এস খেলবে এস। খেলার পর, একটু জলযোগের ব্যবস্থাও আছে। মনে হচ্ছে, অনেক দূর থেকে আসছ। খিদেও পেয়েছে। এস, ভাই এস।

না ভাই, আমার ওসব খাবার খেতে নেই। আমি সংসার ত্যাগ করেছি। বনের ফলমূল ছাড়া আমার আর কিছু খেতে নেই।

কি সর্বনাশ!

হ্যাঁ ভাই! তোমরা আমার কথা বুঝবে না। আমি যাই।

নচিকেতা চলিতে লাগিল। ছেলেরা খেলায় মন দিল।

আরও অনেক দূরে। একটি সুন্দর ঝর্ণা। ঝর্ণার পাশে অনেকগুলি বড় বড় পাথর। পাথরের পাশে অগভীর জল। একটি চেপ্টা বড় পাথরের উপরে একটি গিন্নী-বান্নী গোছের মহিলা ঢাকাই সাবান দিয়া কাপড় কাচিতেছেন। পথে নচিকেতাকে দেখিয়া একটু আশ্চর্যান্বিত হইলেন। এ অঞ্চলে তো এমন মানব-সমাগম দেখা যায় না। তিনি একটু ইতস্তত করিয়া নচিকেতাকে ডাকিলেন, ওহে ছেলে, এদিকে এস ত

নচিকেতা কাছে গেল। মহিলাটি বলিলেন, বাছা, মুখখানা শুকিয়ে গেছে। বসো, একটু জিরোও। আমি এখুনি বাড়ী যাচ্ছি। চল আমার সঙ্গে। ভাল জলখাবারের যোগা আছে। খেয়ে একটু জল খেয়ে নিও।

নচিকেতা বলিল, না মা, সে হয় না। আমি ফিরা

ব্রহ্মচারী। আমি ওসব খেতে পারি নে। আমি যাচ্ছি অনেক দূরে। পথে বনের মধ্যে ফলমূল যা পাওয়া যায় তাই খেয়ে আমাকে থাকতে হবে।

মহিলাটি বলিলেন, এমন পাগল ছেলে তো দেখিনি। চল আমার সঙ্গে, দুটো মোয়া খেতেই হবে।

না, সে আমি পারব না। আমি চললাম, আমায় মাপ কর।

এই কথা বলিয়া নচিকেতা আবার যাত্রা করিল। মহিলাটি কাপড়ে সাবান মাখাইয়া ঝর্ণার জলে ধুইতে লাগিলেন এবং মনে মনে বলিলেন, কি ডেঁপো ছেলেরে বাবা!

অবশেষে নচিকেতা স্বর্গে পৌঁছিয়াছে। একজন দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইন্দ্রপুরীর পথ ধরিয়া সোজা ইন্দ্র-ভবনের সম্মুখে পৌঁছিল। সম্মুখে কি বিরাট প্রাসাদ! নচিকেতা অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। বিশাল প্রাচীর, অসংখ্য প্রকার কারুকার্য্য-খচিত বিবিধ আকারের ভাস্কর্য্য, আকাশচুম্বী তোরণ, বিবিধ মণিমুক্তাবিশোভিত দ্বার প্রভৃতি অলৌকিক দৃশ্য নচিকেতাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। কিন্তু কোন বাহ্য আড়ম্বর নচিকেতার মত ছেলেকে বেশীক্ষণ অভিভূত করিতে পারে না। সে সোজা গিয়া বিশালবপু বিবিধ অস্ত্রাদিভূষিত প্রহরীকে বলিল, যমরাজের বাড়ীটা কোথায় বলতে পার?

নিশ্চয়ই পারি, স্বর্গের সমস্ত রাস্তা ও সমস্ত বাড়ীর ঠিকানা আমাদের জানা। এ না হলে আমরা প্রহরীর চাকরী পেতাম না।

তা হলে আমাকে বলে দাও না, কোন্ পথে যাব।

প্রহরী বলিল, এই সোজা পথে ত্রয়োদশ মোড় পর্য্যন্ত যাবে। তারপর ডান দিকে ফিরে একাদশ মোড় পর্য্যন্ত যাবে। তারপর বাম দিকে ফিরে নবম মোড় পর্য্যন্ত যাবে। তার পর আবার ডান দিকে গিয়ে সপ্তম বাড়ীটাই যমরাজের বাড়ী।

'ধন্যবাদ' বলিয়া নচিকেতা অগ্রসর হইল। স্বর্গের পথ-ঘাট খুব ভাল। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেব ও দেবীরা পদব্রজে, রিক্সায়, মোটরে যাতায়াত করিতেছেন। আকাশ নীল। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। চির বসন্ত বিরাজ করিতেছে। ফুলগুলি ফুটিবার পরে আর শুকায় না। জরা ও মৃত্যু নাই। সেইজন্য দেব-দেবীগণের জন্মসংখ্যা সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে হয়। নতুবা অতিরিক্ত ভীড়ে স্বর্গের স্বর্গত্ব রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিত। দেব ও দেবীগণ যৌবনে পদার্পণ করিবার পর আর তাঁহাদের বয়স বাড়ে না। নচিকেতা দেখিল, একটিও বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা নাই। শিশুর সংখ্যাও অতিশয় অল্প।

এ-দিক ও-দিক দেখিতে দেখিতে এবং মোড়ের সংখ্যা গুণিতে গুণিতে নচিকেতা যমের প্রাসাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীটির নিকটে গিয়া তিনটি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া একটি প্রশস্ত বারান্দায় উপনীত হইল। বাড়ীটি চিনিতে কাহারও কষ্ট হইবার কথা নয়। সমস্ত বাড়ীটাই অদ্ভুত রকমের কালো। সমস্ত বাহিরটায় ব্লু-ব্ল্যাক কলার-ওয়াশ, ভিতরে সমস্ত দেওয়ালে আলকাতরার ডিস্টেম্পার। মেঝেতে কালো মার্বেল পাথর। সমস্ত আসবাবেই মেহগনি পালিশ। সোফা ও সেটিগুলির ঢাকনি সিল্কের ছাতার কাপড়ে প্রস্তুত।

নচিকেতা ইতস্তত চাহিয়া একটি বড় দরজার পাশের কলিং-বেল টিপিতেই একটি প্রকাণ্ড বেয়ারা বাহির হইয়া আসিল, ঠিক যেন একটি কালো পাথরের মূর্ত্তি। দেখিতে ভয়ঙ্কর হইলেও কথাবার্ত্তা কিন্তু বেশ ভদ্র। বেয়ারাটি নচিকেতার আপাদ-মস্তক একবার দেখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাকে চাই?

নচিকেতা বলিল, যমরাজকে।

আপনি এখানে বসুন। আমি খবর দিচ্ছি। তাঁকে কি বলব?

বলবে, মর্ত্ত্য থেকে একটি ছেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বিশেষ জরুরী কাজ।

বেয়ারা চলিয়া গেল। নচিকেতা বারান্দার পাশেই বেয়ারা-নির্দিষ্ট হল ঘরে ঢুকিয়া একটি সোফার উপরে বসিয়া পড়িল। পথের ক্লান্তিতে তাহার প্রায় ঘুম আসিতেছিল।

যমরাজ আসিলেন। বিশাল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেহ, কারু-কার্যখচিত কৃষ্ণবর্ণ ভূষায় সর্বাঙ্গ ভূষিত। সঙ্গে বিশাল দণ্ড ধারণ করিয়া একজন প্রহরী। দণ্ডটি দেখিতে অনেকটা আমাদের কাউন্সিলের সভাপতির দণ্ডের মত। যমরাজ অগ্রসর হইয়া আসিয়া নচিকেতার পাশের একখানি কেদারায় বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নামটি কি বল তো?

নচিকেতা।

নিবাস?

মর্ত্ত্যে, কলকাতায়।

বেশ! তা এখানে কেন? তোমার তো ভয়ানক সাহস দেখ্‌ছি।

আজ্ঞে, আমার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে। আমি এসেছি আপনার কাছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে।

এই সময়ে হল ঘরের একটি দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন যমপত্নী। তাঁহাকে দেখিয়াই প্রহরী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যমপত্নী ধীরে ধীরে আসিয়া নচিকেতার পার্শ্বে বসিলেন।

ইঁহাকে দেখিয়া নচিকেতা মুগ্ধ হইয়া গেল। যেমন সোনার মত গায়ের বর্ণ, তেমনি সুন্দর বর্ণাভ ভূষায় ভূষিত দেহ, তেমনি সোনার মত মৃদু হাসি। যমের পার্শ্বে যমপত্নীকে সম্পূর্ণ একটি বিপরীত চিত্র মনে হইতেছিল। এমন একটা দুর্বিষহ বৈপরীত্য গ্রামে খালেও বড় একটা দেখা যায় না। নচিকেতা যমপত্নীকে এবং যমরাজকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

যমপত্নী বলিলেন, সুখে থাক বাছা। অনেক দূর থেকে এসেছ, নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।

নচিকেতা বলিল, মায়েদের তো ঐ এক রোগ। কাউকে দেখলেই মনে হয়, তার খিদে পেয়েছে।

হ্যাঁ, বাবা, সেই জন্যেই তো আমরা মা। বসো, একটু খাবার কিছু নিয়ে আসি। চা খাও তো?

সবই তো খেতাম, কিন্তু এখন সব ছেড়ে দিয়েছি। এখন শুধু ফলমূল খাই।

যখন বনে ছিলে, পাহাড় পর্বত ভেঙে হাঁটছিলে, তখন ফলমূল খেয়েছ, বেশ করেছ। এখন আমাদের বাড়ীতে, বাড়ীর মতই খাবে। এটা তো বন নয়।

এই কথা বলিয়া যমপত্নী বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে একখানি বড় রেকাবীতে অনেকগুলি নানা প্রকারের খাবার আনিয়া একখানি টিপয়ের উপর রাখিয়া সেটি নচিকেতার সামনে আগাইয়া দিলেন। পশ্চাতে একটি চাকর চা আনিয়া খাবারের পাশে রাখিল। অনেক দিন পরে চায়ের গন্ধ নচিকেতার নাকের ভিতর দিয়া প্রায় মরমে পশিয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল।

সাধারণ কথাবার্তার সঙ্গে চা-পান শেষ হইল। যমপত্নী উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন। যমরাজ বলিলেন, এইবার বল, তোমার কি কাজ।

নচিকেতা সবিনয়ে বলিল, আমার সংসারধর্মে স্পৃহা নেই। আমাকে আপনি ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিন। আমি আজীবন এই জ্ঞানলাভ ও তদুপযুক্ত তপস্যায় নিযুক্ত থাকবো।

তুমি ভুল করেছ, নচিকেতা, বড় ভুল করেছ।

কেন বলুন তো!

তুমি আধুনিক যুগের কোন খবরই রাখ না। এক সময় ছিল, যখন ব্রহ্মজ্ঞানই হোক, বা অন্য কোন প্রকার জ্ঞানই হোক, তার পন্থা ছিল—অভ্যাস, অধ্যবসায়, সাধনা, গুরু-সেবা প্রভৃতি। কিন্তু এই সব সেকেলে পন্থা এখন আর নেই। এখনকার শিক্ষার মাধ্যম বা উপায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বর্তমান পন্থা এত সহজ ও মনোরম যে এখন এই পন্থাই সর্ব-প্রকার জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলে গণ্য ও স্বীকৃত হয়েছে।

এই নূতন পন্থাটি কি? শিক্ষার মাধ্যম কি সত্যই পরি-বর্তিত হয়েছে?

হাঁ, সেই কথাই তোমাকে বলছি। কথাটা একটা প্রকৃত ঘটনা অবলম্বন করেই বলব। তত্ত্বের চেয়ে উদাহরণ ভাল।

যমরাজ বলিলেন, 'কিছুদিন আগের কথা বলছি। আমা-দের ওপাড়ার বরুণের ভাগনেটি বেয়াড়া হয়ে উঠল। খালি মিথ্যে কথা বলে। কত বোঝান হ'ল, কোন ফল হ'ল না। বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ভাগ থেকে 'সদা সত্য কথা বলিবে' এক হাজার বার আবৃত্তি করান হ'ল, কিছু হ'ল না। তারপর রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ থেকে রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি কত উদাহরণ দিয়ে কত উপদেশ দেওয়া হ'ল, কিছুই হ'ল না। 'সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্'-মন্ত্র বহু দিন ধরে জপ করান হ'ল, সবই বৃথা গেল। এমন কি জর্জ ওয়াশিংটন ও চেরী গাছের গল্প শেখান হ'ল। কিন্তু কোন ফলই পাওয়া গেল না।

একদিন গণেশের সঙ্গে দেখা। সব শুনে সে বললে, ওসবে কোন কাজ হবে না। সুশিক্ষার জন্য সুমাধ্যম আবশ্যক। এক কাজ করুন। ওকে কয়েকদিন পর পর 'সত্যের পথ' নামে যে সিনেমাটা একসঙ্গে পাঁচটি সিনেমায় দেখান হচ্ছে; তাইতে পাঠিয়ে দিন। কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের মিথ্যাকথা বলার দোষ সেরে যাবে।

কি যে বল গণেশ ভায়া!

আমি ঠিকই বলছি। 'সত্যের পথ' বলে মন্দাকিনী এভেনিউতে যে ছবিটা দেখান হচ্ছে, ওটার উদ্বোধন করেছেন স্বয়ং শ্রীইন্দ্র, প্রশস্তিবাণী দিয়েছেন শ্রীশুক্রাচার্য উদ্বোধন রজনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন দেবাদিদেব শ্রীশঙ্কর, অভিনেতা ও অভিনেত্রী কিন্নর কিন্নরী ও অপ্সরাগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন স্বয়ং শ্রীনারায়ণ, আর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছেন শ্রীকুবের। এ পর্যন্ত কোন ছবিতেই এমন দেব-সমাগম হয় নি। কাতারে কাতারে দেবদেবীরা যাচ্ছেন, এক যোজন, দুই যোজন লম্বা কিউ হচ্ছে। টিকিটঘরের সামনে একেবারে দেবে দেবারণ্য।

তা, এই ছবি দেখলে বরুণের ভাগে সত্যপরায়ণ হয়ে উঠবে, এই তোমার ধারণা?

নিশ্চয়ই। কলেন পরিচীয়তে।

এই আলোচনার পর বরুণের ভাগেটিকে ঐ ছবি দেখতে পাঠান হ'ল। ছবির মধ্যে একটা গান আছে, সেই গানটিই তাদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে দিল। একটি অনিন্দ্য সুন্দরী অপ্সরা, মুখের কিঞ্চিৎ যা কিছু দোষ ছিল, সব রং দিয়ে ঢাকা। অপূর্ব পরিচ্ছদ, বেশি বর্ণনা অনাবশ্যক। পায়ে নূপুর। অপূর্ব ভঙ্গীতে নাচতে নাচতে গান করছে—তোমরা সত্য বল রে—(হৃদ—ন্নিনেনিনা—আকাশে চাঁদ ছিল রে—)। এই

নৃত্য ও এই গান দেখবার ও শুনবার পর পরম মিথ্যাবাদীরাও সত্যবাদী হয়ে উঠল। তারেটিও সত্যবাদিতার পরম প্রেরণা পেয়ে রোজ একবার করে 'সত্যের পথ' দেখতে আরম্ভ করল। মামা বরুণ আশ্বস্ত হলেন।"

৬

একটু থামিয়া যমরাজ নচিকেতাকে বলিতে লাগিলেন, এখন বুঝেছ, বর্তমান যুগের প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যম কি? সাহিত্য বল, বিজ্ঞান বল, ইতিহাস বল, ধর্ম বল, যা-কিছু শিক্ষা, করতে চাও, সব এরই মধ্যে পাবে। শুষ্ক নীরস সাধনা, অধ্যবসায়, পরিশ্রম, এ সকলের কোন প্রয়োজন নেই একালে। শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি সম্পূর্ণ অবান্তর।

নচিকেতা বলিল, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলে চাই শাস্ত্রজ্ঞান, শাস্ত্রপাঠ করতে হলে বহু সাধনা, ব্যাকরণ পাঠ প্রভৃতি চাই। এসব কেমন করে হবে?

ব্যাকরণ! হাসালে হে নচিকেতা, হাসালে। বর্তমান যুগে ব্যাকরণ সম্পূর্ণ বাহুল্য। তার পরিবর্তে এখন হয়েছে দ্রুত-পঠন। তাড়াতাড়ি পড়লেই আর ব্যাকরণ দরকার হয় না। বর্তমান জগৎটাই একটা তাড়াতাড়ির জগৎ। তাড়াতাড়ি কাজ সারার কৌশল আয়ত্ত করাই বর্তমান ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র সাধনা। কাজেই যদি তুমি তাড়াতাড়ি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে চাও তো সিনেমায় যাও। ব্যাকরণ, শাস্ত্র, অধ্যয়ন, সাধনা, এ সবের কোনই দরকার হবে না।

নচিকেতা বলিল, তাই ত, এ কথাটি এমন ভাবে ত ভেবে দেখি নি, মর্ত্যলোকে এমন ভাবে কেউ আমাকে বুঝিয়েও দেয় নি। তা হলে আর এত কষ্ট করে আমাকে এত দূর আসতে হতো না, আপনাকে বিরক্ত করতে।

তা যাক, জগতে কিছুই অনর্থক নয়। তোমার এই আগ্রহ, অদম্য আকাঙ্ক্ষায় আমি প্রীতিলাভ করেছি। আশীর্বাদ করি, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

আচ্ছা, তা হলে আমি বিদায় হই।

কিন্তু ফিরবে কি করে? আবার সেই বনজঙ্গল ভেঙে? কিছু দরকার নেই। আমি তাড়াতাড়ি ফেরবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

যমরাজ উঠিয়া গিয়া ইন্দ্রকে টেলিফোন করিলেন, দেখো, মর্ত্য থেকে একটি খাসা ছেলে এসেছে। তার সব কথা পরে তোমায় বলব। সে মর্ত্যে ফিরবে। তোমার পুষ্পকটা এক ঘণ্টার জন্যে পাঠিয়ে দিও। ওকে কলকাতায় রেখে আসবে।

ইতিমধ্যে যমপত্নী হলঘরে আসিয়া মোটামুটি সব কথা শুনিয়া নচিকেতার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন, পাগল ছেলে! যাও বাড়ী গিয়ে ভাল করে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ব্যবস্থা কর গে।

পুষ্পক আসিয়া যমরাজের গৃহের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে থামিল। ঘর্ঘর শব্দ শুনিয়া নচিকেতা উঠিল এবং যমরাজ ও যমপত্নীকে প্রণাম করিয়া প্লেনে উঠিল। প্লেন ছাড়িবার সময়ে যমরাজ নচিকেতাকে বলিলেন, মনে রেখো—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
সিনেমৈব যং বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥

নচিকেতা মর্ত্যে ফিরিয়া প্রত্যহ বাছিয়া বাছিয়া সিনেমা দেখিতে লাগিল। যে সকল ছবিতে লৌকিক মতে রমণীয় অথচ বৈদান্তিক মতে বর্জনীয় বস্তুগুলি বেশী করিয়া দেখান হয়, বৈরাগ্যলাভের অনুকূল বলিয়া সেইগুলি বার বার দেখিতে লাগিল। নচিকেতাকে দেখিয়া পাড়ার বাসন্তীও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়াশুনা ও গৃহকর্ম ছাড়িয়া বাছা বাছা ছবি দেখিতে আরম্ভ করিল এবং সিনেমাগৃহের সম্মুখে অপ্রত্যাশিতভাবে নচিকেতার সহিত সাক্ষাৎ হইতে লাগিল।

কিছু দিনের মধ্যেই উভয়ে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া স্ব স্ব গৃহ ও সংসার ত্যাগ করিল।

এখন উহারা উভয়ে মিলিয়া তারকা ও তারকিনীরূপে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ব্রহ্মজ্ঞানলাভে উদ্বুদ্ধ করিয়া জীবন সার্থক করিতেছে।

সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গমহিলা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-হিতৈষী ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন্ (বেথুন) কলিকাতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় (বর্ত্তমান বেথুন কলেজ) প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের বাধাবিপত্তি দূর করেন। তদবধি দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসার লাভ করিতে থাকে। এই শুভ অনুষ্ঠানের পর হইতে আমরা কোন কোন বঙ্গমহিলাকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখি। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকামিনী দাসী 'চিত্তবিলাসিনী' নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রকাশ করেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তৎসম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' (২৮ নবেম্বর) ইহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বিপুল আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গুপ্ত-কবি স্বীয় পত্রে কুলকন্যাদের গদ্য-পদ্য রচনা স্থান দিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন; ইঁহাদের মধ্যে "ঠাকুরাণী দাসী" এই ছদ্ম নামে এক বিপ্র-বিধবা রচনা প্রকাশ করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছিলেন: "এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতিরা সংপ্রতি বিদ্যালোচনাপূর্ব্বক রচনার সূচনা করিতেছেন, ইহার অপেক্ষা অধিক আহ্লাদকর ব্যাপার আর কি আছে! ইঁহারা বিদ্যাবতী হইলেই দেশের সমস্ত দুর্দ্দশা, দুর্গতি এবং দুর্নাম দূর হইবে তাহাতে আর সংশয় কি?" ('সংবাদ প্রভাকর,' ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৯)

মহিলাকুলের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের নিমিত্ত, তাঁহাদের রচনাবলী প্রকাশের জন্যও বটে, স্ত্রীপাঠ্য-বিষয়-সম্বলিত পত্র-পত্রিকারও আবির্ভাব হইল। এগুলির মধ্যে মজিলপুর নিবাসী উমেশচন্দ্র দত্তের মাসিক 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (আগষ্ট ১৮৬৩) ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত পাক্ষিক 'অবলাবান্ধব' (২২ মে ১৮৬৯) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্তঃপুরবাসিনীদের জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল; ক্রমশঃ তাঁহারা নিজেদের অধিকার ও অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধেও সচেতন হইয়া উঠিলেন। এ-বিষয়ে আন্দোলনের ভার তাঁহারা নিজেরাই গ্রহণ করিলেন;—দেশে মহিলা-সম্পাদিত সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র দেখা দিল।

আমরা গত শতাব্দীর মহিলা-পরিচালিত যে-সকল বাংলা পত্র-পত্রিকার সন্ধান পাইয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেগুলির কথা আলোচনা করিব।

বঙ্গমহিলা: মহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাময়িকপত্র—'বঙ্গমহিলা' নামে একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র, খিদিরপুর-নিবাসিনী জনৈক মহিলার সম্পাদনায় ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭০) প্রকাশিত হয়। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (জ্যৈষ্ঠ ১৭৯২ শক) লেখেন:—

"এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। একটি হিন্দু স্ত্রী এই পত্রিকার সম্পাদিকা, কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে। সম্পাদিকা আশা করেন, এখানি বঙ্গদেশের সকল শ্রেণী স্ত্রীলোকদিগের মুখস্বরূপ হইবে। স্ত্রীলোক-দিগের স্বস্ব প্রকৃতির সমর্থন করা ইহার উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোকের সম্পাদিত সংবাদপত্র এ দেশে এই নূতন প্রকাশিত হইল। আমরা হৃদয়ের সহিত ইহার পোষকতা করিতেছি এবং আশা করি যে, কয়েক সংখ্যা পত্রিকাতে যেমন স্ত্রীজনোচিত শান্ত ভাব প্রকাশ পাইতেছে, চিরকালই সেইরূপ দেখিতে পাইব। সম্পাদিকা যদি অনুচিত বিজাতীয় অনুকরণে ব্যগ্র না হইয়া আমাদের বাস্তবিক অবস্থা বুঝিয়া ও সমুচিত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া প্রস্তাব সকল প্রকটিত করেন, এখানি ভদ্রসমাজে অত্যন্ত আদরণীয় হইবে।"

রচনার নিদর্শনস্বরূপ প্রথম সংখ্যা 'বঙ্গমহিলা'র প্রকাশিত "স্বাধীনতা" নামে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিতেছি:—

"প্রকৃত স্বাধীনতা কি? বোধ করি, এ কথা নব্য সম্প্রদায়ের অনেকে বুঝেন না, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতাকেই স্বাধীনতা মনে করিয়া থাকেন। বঙ্গমহিলারা যথার্থ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন, কিন্তু কেহ কেহ তাহা পরাধীনতা জ্ঞান করিয়া স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত বলিয়া যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, আমরা তাহা অনুমোদন করিতে পারি না। ইউরোপীয় কামিনীগণের যেরূপ স্বাধীনতা আছে, বঙ্গীয় স্ত্রীলোক-দিগকে ঠিক সেইরূপ স্বাধীনতা দিতে এদেশীয় কতক-গুলিন লোকের বড় ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গমহিলাদের সে ইচ্ছা নাই। ইউরোপীয় ও আমেরিকান স্ত্রীজাতির যেরূপ স্বাধীনতা দেখা যায়, তাহাকে আমরা স্বেচ্ছা-চারিতা বলিয়া থাকি। স্ত্রীলোকে মনে করিলেই যে ঘোড়া চড়িয়া উড়িয়া যায়, ইচ্ছামতে পরপুরুষের সহিত হাস্যকৌতুক অথবা নৃত্যাদি করে, লজ্জাহীনার ন্যায় পুরুষদের সঙ্গে পান ও আহার করে, যখন তখন ভিন্ন পুরুষের হাত ধরিয়া যথাতথা বেড়াইয়া বেড়ায়, এমন স্ত্রীলোকদিগকে কি বলা যায়? তাহাদিগকে মেয়ে বলিতে তো আমাদের সাহস কুলায় না। নম্রতা এবং লজ্জাশীলতাই স্ত্রীলোকদের প্রধান গুণ। যে সকল স্ত্রী লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক নম্রতাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বীরবেশে দেশ বিদেশে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করে, তাহারা

কি স্ত্রী? না বীর? নারীজাতির এই সকল কার্য্য কি ভদ্রোচিত? না সভ্যোচিত? অথবা তা স্বাধীনতার ফল? এরূপ স্বাধীনতা যে বঙ্গস্ত্রীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ, দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান রমণীগণই তাহার প্রমাণস্থান। তাঁহারা ইউরোপীয় কামিনীদের ন্যায় স্বাধীনতা লাভে লোলুপ হইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতির প্রতিকূলাচরণে এ পর্য্যন্তও সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মুখভঙ্গিমা ও সলজ্জভাব অবলোকন করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যেন তাঁহারা উক্তরূপ স্বাধীনতালাভার্থে স্ব স্ব প্রকৃতির উপরে বল প্রকাশ করিতেছেন।

ঐরূপ স্বেচ্ছাচারিতারূপ স্বাধীনতায় বঙ্গমহিলাদের কাজ নাই। তাঁহাদের যে স্বাধীনতা আছে, তাহাই প্রকৃত স্বাধীনতা। কে বলে যে বঙ্গমহিলারা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গৃহরূপ কারাগারে আবদ্ধা আছে? তাঁহারা কি আপন আপন ইচ্ছামত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পারেন না? ইচ্ছানুসারে অশন বসন প্রাপ্ত হন না? আত্মীয়স্বজনের বাটিতে কি গমনাগমন করিতে পারেন না? তাঁহাদের মন কি স্বাধীন নহে? তবে তাঁহারা পরাধীনতা-শৃঙ্খলে বন্দীদশায় অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে?

বঙ্গমহিলাদের অনেক অভাব আছে, একথা আমরা পূর্ব্বাবধিই স্বীকার করিয়া আসিতেছি, আর সেই সকল অভাব যে ক্রমে ক্রমে মোচন হইবে এক্ষণে তাহার আকার-প্রকারও দেখিতেছি। শিক্ষাভাব এদেশীয় স্ত্রীলোকদের একটি বিশেষ অভাব ছিল, কিন্তু অধুনা বঙ্গাঙ্গনাগণের জন্যে সেই শিক্ষার দ্বার মুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের বর্ত্তমান পোষাক পরিবর্ত্ত হউক, উচ্চতর শিক্ষা লাভ হউক, তখন দেখা যাইবে যে তাঁহাদের ন্যায় যথার্থ সভ্য, ভদ্র ও স্বাধীনচিত্ত স্ত্রী-জগতের আর কোথায়ও নাই। (সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা অনেক স্থলে ভারতীয় নারীজাতিকে স্ত্রীরত্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।) তখনই দেখিব যে বঙ্গস্ত্রী রত্নবিশেষ হইয়াছেন।

সে যাহা হউক, আজিকালি নব্য সম্প্রদায়ের কোন কোন লোক আপন আপন স্ত্রীকে কিছু কিছু স্বেচ্ছাচার-রূপ স্বাধীনতা দিতে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের রমণীরা তদ্বিষয়ে সম্মতা নহেন, তজ্জন্য নবীন বাবুরা কিছু পীড়াপীড়িও লাগাইয়াছেন।

নবীন বাবু! এখন তুমি অল্প দিনের জন্য ক্ষান্ত হও, তোমার শোণিত কিঞ্চিৎ শীতল হইয়া আসুক। তুমি কি করিতে উদ্যত হইতেছ, তাহা যত একটা বুঝিতেছ না, অতএব আমাদের দেশের বিজ্ঞলোকদের কাছে পরামর্শ লও। তোমার স্ত্রীকে যদি দশ জন অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে বসাইয়া দাও, তবে তিনি ভয়ে পাণ্ডুবর্ণা, লজ্জায় মলিনা হইয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইবেন সন্দেহ নাই।

(২৩ এপ্রিল ১৮৭০ তারিখের 'হিন্দুহিতৈষিণী' পত্রে উদ্ধৃত)

অনাথিনী: ইহাই মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা; সম্পাদিকা—থাকমণি দেবী; প্রকাশকাল—শ্রাবণ ১২৮২ (জুলাই ১৮৭৫)। ইহার প্রথম সংখ্যা পাঠে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' (২১ শ্রাবণ ১২৮২) লিখিয়াছিলেন:—

"অনাথিনী (মাসিক পত্রিকা)—শ্রীমতী থাকমণি দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আজিমগঞ্জ বিশ্ববিনোদ যন্ত্রে মুদ্রিত। এই শ্রাবণ মাস হইতে ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত সাময়িক পত্র এ দেশে এই আমরা প্রথম দেখিলাম। পত্রিকাখানি স্ত্রীশিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদিগের অনন্ত আহ্লাদের কারণ হইবে।"

সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়ের জামাতা—কাঁটালপাড়া-নিবাসী অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ম্মস্থল ধুলিয়ান হইতে 'অনাথিনী' প্রকাশ করেন। থাকমণি দেবী সম্ভবতঃ তাঁহার কন্যা হইবেন।* 'বান্ধব' (ভাদ্র ১২৮২) লিখিয়াছিলেন—"শুনিয়াছি, সম্পাদিকা অল্প বয়সের বালিকা।"

হিন্দুললনা: বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র। এই পাক্ষিক পত্রিকা ১২৮৪ সালের মাঘ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮) মাসে বারাকপুরের নবাবগঞ্জ হইতে প্রকাশিত হয়। 'হিন্দু-ললনা'র সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' (১৮ ফাল্গুন) লিখিয়াছিলেন:—

"হিন্দুললনা—এতন্নামী একখানি পত্রিকার ১ম কাণ্ড ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা, এবং কোন হিন্দুললনা কর্ত্তৃক সম্পাদিত। সম্পাদিকা ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—'বাঙ্গালা ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে বঙ্গভাষায় বঙ্গমহিলা নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা স্বদেশহিতৈষিণী তথা বঙ্গ-বাসিনীগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী একটি হিন্দুমহিলা কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিতা হয়। বঙ্গদেশে স্ত্রীলোক দ্বারা সংবাদ-পত্র প্রচারের সূত্রপাত তিনিই করিয়া দেন। আমরা তাঁহারে সম্যক্‌রূপে অবগত থাকিলেও তাঁহার পরিচয়

---

* 'অনাথিনী' প্রকাশিত হইবার তিন মাস পূর্ব্বে, নসীপুর হইতে ভুবনমোহিনী দেবী-সম্পাদিত 'বিনোদিনী' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকার গৌরব দিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে "ভুবনমোহিনী দেবী"—এই নামের আড়ালে 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পত্রিকাখানি পরিচালন করিতেন। সুতরাং ইহাকে মহিলা-পরিচালিত মাসিক পত্রিকা বলা উচিত হইবে না।

প্রদানে ইচ্ছা করি না। বঙ্গমহিলা পত্রিকাখানি ৯।১০ মাস চলিয়া বন্ধ হইলে পর…।' হিন্দুললনার সংবাদপত্র প্রচারে পারগতা ও মতি হিন্দু সমাজের গৌরবের বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই।…বারাকপুর নবাবগঞ্জ হইতে ইহার প্রচার হইতেছে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক তিন টাকা।"

ভারতী : 'ভারতী'র নাম সাহিত্য-সংসারে সুবিদিত। ইহা ১২৮৪ সালের শ্রাবণ (জুলাই ১৮৭৭) মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী ও কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী—সকলেই সম্পাদকীয় চক্রের মধ্যে ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ১২৯০ সাল পর্য্যন্ত, সাত বৎসর, সুষ্ঠুভাবে পত্রিকা পরিচালন করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী, সাহিত্যানুরাগিণী কাদম্বরী দেবীর অপমৃত্যুর (৮ বৈশাখ ১২৯১) সঙ্গে সঙ্গে 'ভারতী'র সেবকেরা উহার প্রচার রহিত করাই সাব্যস্ত করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ঘোষণা করেন—"ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না।" কবি অক্ষয়চন্দ্রের সহধর্ম্মিণী শরৎকুমারী চৌধুরাণী যথার্থই লিখিয়াছেন :—

"ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে বাঁধা থাকে, তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি-পরিবারে গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন ছিঁড়িল,—ভারতীর সেবকেরা আর ফুল তোলেন না, ভারতী ধূলায় মলিন। এই দুর্দ্দিনে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী নারীর পালন-শক্তির পরিচয় দিলেন।" ("ভারতীর ভিটা" : 'বিশ্বভারতী পত্রিকা,' ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা)

অতঃপর ১৩২১ সাল পর্য্যন্ত (১৩০৫ সাল বাদে) ত্রিশ বৎসর কাল 'ভারতী'র লালন-পালনের ভার মহিলা-হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইঁহাদের কার্য্যকাল এইরূপ :—

১২৯১—১৩০১ সাল — স্বর্ণকুমারী দেবী
১৩০২—১৩০৪ " — স্বর্ণকুমারীর কন্যা হিরণ্ময়ী ও সরলা দেবী
১৩০৬ -১৩১৪ — সরলা দেবী
১৩১৫—১৩২১ — স্বর্ণকুমারী দেবী।

সম্পাদিকাগণের বহু সুলিখিত রচনা 'ভারতী'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল।

খৃষ্টীয় মহিলা : নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১২৮৭ সালের মাঘ (জানুয়ারি ১৮৮১) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহা সম্পাদন করিতেন—কুমারী কামিনী শীল। ইহাতে মহিলাদের রচিত সহজবোধ্য গদ্য-পদ্য রচনা স্থান পাইত। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' (২৯ এপ্রিল ১৮৮১) লিখিয়াছিলেন :—

"খৃষ্টীয় মহিলা—মাসিকপত্র—কুমারী কামিনী শীল কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে কেবল স্ত্রীলোকেরাই লিখিয়া থাকেন, যে সকল স্ত্রীলোক ইহাতে প্রবন্ধাদি লেখেন, প্রবন্ধগুলি পাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তাঁহারা সুশিক্ষিতা। এক একটী পদ্য প্রবন্ধ অতি সুন্দর লেখা হয়।"

সোহাগিনী : একখানি মাসিক পত্রিকা, প্রকাশকাল বৈশাখ ১২৯১ (এপ্রিল ১৮৮৪)। কুক্ষরঙ্গিণী বসু ও তারাদিনী দে 'সোহাগিনী' সম্পাদন করিতেন। ইহা ১ নং সয়াপহাটা ষ্ট্রীট হইতে মদনলাল শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইত।

বালক : ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৮৫) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্ম্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' নামে সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—"বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করার জন্য মেজবউঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।" এক বৎসর সগৌরবে চলিবার পর 'বালক' 'ভারতী'র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

পুণ্য : ১৩০৪ সালের আশ্বিন মাসে (অক্টোবর ১৮৯৭) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর সম্পাদনায় 'পুণ্য' নামে একখানি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। পত্র-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"এই পত্রে জনসমাজের উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতি নানাবিষয়ক প্রবন্ধই স্থান লাভ করিবে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে গৃহস্থের এবং মানবসমাজেরই সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন আহারের বিষয় প্রতি মাসেই থাকিবে। ইহাতে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত শিল্পবিদ্যা প্রভৃতিরও অভাব দূর করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা যাইবে।"

অন্তঃপুর : এ নামের একখানি মাসিকপত্রিকা ১৩০৪ সালের মাঘ (জানুয়ারি ১৮৯৮) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদিকা—সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা বনলতা দেবী। 'অন্তঃপুর' "কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত"। প্রথম সংখ্যায় "প্রস্তাবনা"র সম্পাদিকা পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"আজকাল মাসিকপত্রিকার অভাব নাই, রমণীদিগের উপযোগী পত্রিকাও কয়েকখানি সুন্দররূপে পরিচালিত হইয়া রমণীদিগের উন্নতির সহায়তা করিতেছে।

আমরাও আজ ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া রমণীদিগের ও তাহাদের সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগের জন্য একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি। অন্যান্য খ্যাতনামা পত্রিকার সহিত প্রতিযোগিতা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সেরূপ দুঃসাহসও নাই। কেবল বঙ্গরমণীদিগের উন্নতিকল্পে আপনাদের যৎসামান্য শক্তি নিয়োগ করিয়া ধন্য হইব এই আশা।"

বর্ত্তমান শতাব্দীতে মহিলা-পরিচালিত বাংলা পত্র-পত্রিকার অসদ্ভাব নাই, সেগুলির আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

ধ্বনি-ধ্বংসে ধ্বনির জন্ম

শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী

ইতিপূর্ব্বে এ বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। এখানে আরো কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল।

ইন্দ্র। বৈদিক "ইন্দ্র" শব্দটি নেহাত অর্থহীন। অবশ্য, পরবর্ত্তী কালে এর অর্থ হয়েছিল শ্রেষ্ঠ, কি, -পতি, কেননা, ইন্দ্র দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আবার সেই কারণেই দেবতাদের পতিস্থানীয়—এই ভাবধারার অনুসরণ করে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, মৌলিক কোন্ শব্দ থেকে এই বৈদিক "ইন্দ্র" শব্দের সৃষ্টি হ'ল। তার কারণ—অবেস্তায় "ইন্দর" আর বেদে "ইন্দ্র" ছাড়া অন্য কোন সমগোত্রীয় প্রাচীন লোক-সাহিত্যে ঐ শব্দের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। বরং অন্য শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখতে পাওয়া যায়, যেমন—Jupiter (="দ্যৌঃ-পিতর্)" ; Jove (="দ্যাবঃ") ; Woden বা Odin (="ব্রহ্মন্" <*"ব্রধ্ মন্" কিনা বৃদ্ধিসম্পন্ন), ইত্যাদি। এই রকম খোঁজ পাওয়ার পর বাধ্য হয়ে আমাদের বিবেচনা করতে হয় যে, "ইন্দ্র" শব্দ ওই "দ্যৌঃ-পিতর্" ইত্যাদি শব্দের সমবয়সী নয়, বরং পরবর্ত্তীকালীন। "ইন্দ্র" শব্দ "দ্যৌঃ-পিতর্" ইত্যাদির দ্যোতকও নয়। কেবলমাত্র পারস্যে ও ভারতে উপনিবিষ্ট আর্য্যমহলে ঐ নাম অপেক্ষাকৃত প্রাচীন "দ্যৌঃ-পিতর্, দ্যাবঃ"-র পরিবর্ত্তে দেবরাজ অর্থে ব্যবহৃত হ'ত।

এইরূপ প্রয়োগের ইতিহাস এইবার বলব। অনুসন্ধানের ফলে জানতে পারা যায় যে, ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠির মধ্যে "খকন্দর,১ বৃকন্দর,২ পুরন্দর"—কিনা, খকংদর, বৃকংদর, পুরংদর—অর্থাৎ সিংহ বা ভল্লুক হন্তা, বৃক বা নেকড়ে হন্তা, পুর, পুরী বা দুর্গ-বিদারণকারী, নামের প্রচলন ছিল। এই "পুর" শব্দটি কিন্তু একটি ইন্দো-ইউরোপীয় আর্য্য শব্দ (loan word)। হয় অষ্ট্রিক "উর্" (ur) নয়, দ্রাবিড়ীয় "কুর্" (kur) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-ভাষীর কাছে "পুর" শব্দে রূপান্তরিত হয়। শব্দটির আদি ও আসল অর্থ ছিল, citadel বা প্রাচীর-বেষ্টিত দুর্গ। আবার তা থেকে দুর্গসমেত নগর।

কালক্রমে "পুর" শব্দের variant জন্মায়—"পুরী",—বোধ হয়, এখানে দুর্গ আছে এই অর্থে। বহু পরে এই শব্দটি আবার দুর্গের নামগন্ধহীন, সাধারণ নগর বোধক হয়ে দাঁড়ায়। সে যাই হোক্—ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠির ইন্দো-ইরাণীয় শাখার ভ্রমণ-পথে বহু অনার্য্য রাজ্য ও প্রতিষ্ঠান পড়েছিল। বাবিল, অসুর থেকে আরম্ভ করে সিন্ধু প্রদেশ পর্য্যন্ত এক নাগাড়ে হয় অষ্ট্রিক, নয় দ্রাবিড়দের সঙ্গে ঐ ইন্দো-ইরাণীয় শাখার সম্মিলন ও দ্বন্দ্ব ঘটেছিল। সুতরাং এই ভ্রমণ-পথের মধ্যে আনুমানিক দুই হাজার খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ থেকে পঞ্চদশ শতক খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের ভিতরে আর্য্যেরা দেবরাজকে শত্রু-দুর্গ ধ্বংস করার হেতুস্বরূপ ধারণায় "পুরন্দর" (=পুরংদর) এই নূতন নামে অভিহিত করতে থাকেন। "পুরন্দর" কালক্রমে "পুরীন্দরে" রূপান্তরিত হয় এবং "দ্যৌঃ-পিতর্" "দ্যাবঃ" প্রভৃতি আখ্যা অপ্রচলিত হয়ে পড়ে।

আরও পরবর্ত্তী কালে এই "পুরীন্দর"-এর প্রথমাংশ "পুর" পরিত্যক্ত হওয়ায় "ইন্দর্" ও "ইন্দ্র" রূপ চালু হয়। "ইন্দর্"-এর সহিত স্ত্রীত্ব-বোধক আ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন "ইন্দিরা"৩ রূপের উদ্ভব হয়। তাই আমরা আবেস্তিক সাহিত্যে পাই "ইন্দর্" শব্দ এবং বৈদিক-সংস্কৃত সাহিত্যে পাই "ইন্দ্র", "ইন্দিরা" শব্দ। বোধ হয় "ইন্দর্" শব্দের স্বর-সঙ্কোচনের ফলেই বৈদিক সাহিত্যে গড়ে উঠে "ইন্দ্র" শব্দ।

রুদ্র। সংস্কৃতে "রুদ্র" শব্দের রূপ দেখান হয়, রুদ+রক্, কিনা, যিনি রোদন করেন। বোধ হয় এই রোদনের দ্বারা বজ্রের হুঙ্কারকে লক্ষ্য করা হয়। সুতরাং বজ্রের স্বরূপ, কি অধিদেবতা যিনি, তিনিই রুদ্র।

আমাদের মনে হয় এর উৎপত্তি অন্যভাবে হয়ে থাকতে পারে। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় * "রুধ রস্" বলে একটি শব্দ ছিল, যা থেকে গ্রীক Ruthros, লাতিন Ruber, English red ও সংস্কৃত "রুধির" শব্দ উদ্ভূত হয়। সেই * "রু-ধ্-রস্" (স্=ঃ) শব্দ বৈদিক-সাহিত্যে "রুদ্র" রূপে পরিণত হয়ে থাকতে পারে। বজ্রের মেঘের সিঁদুরে রঙ এই শব্দ প্রয়োগের মূল কারণ হওয়াই বেশী সম্ভবপর।

লক্ষ্মী। "রুক্মী শব্দটি অবৈদিক। পুরাণে পাওয়া যায় ইন্দিরা। তবু এই শব্দের অবতরণ বৈদিক (আলোক বা জ্যোতির্বাচক) রুচ্‌+ইন্‌+ঈ = "রুক্মিণী" শব্দ থেকেই ঘটেছে বলে এখানে এর উল্লেখ করা হ'ল।

হিন্দু-পারস্ত। আমাদের পরম্পরা' খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ ইন্দো-ইরাণীয় শাখার "অণু", "পুরু" বা "দ্রুহ্যু", "তুর্ব্বস্‌" বা "তুর্ব্বাস" "বিশ্বমিত্র" বা "বিশ্বামিত্র" "ভৃগু" প্রভৃতি কতকগুলি দল তাঁদের সাংস্কৃতিক পুঁথি-পাটা সমেত কুভা বা কাবুল নদ অতিক্রম করে এগিয়ে এসে "পঞ্চ-অপ" বা "পঞ্চ-আপ" যেখানে কিনা—পঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করেন। কালক্রমে তাঁরা ঐ প্রদেশের মূলনদী সিন্ধুর নামানুযায়ী "সিন্ধবঃ" ("দেশ বাচিত্বাৎ বাহুল্যম্‌"—সূত্রানুযায়ী) বলে নিজেদের চিহ্নিত করে নেন। প্রাচীন পারসীকদের মুখে তারই রূপ দাঁড়ায় "হিন্দব"। তাই থেকে (এক বচনে) "হিন্দু" রূপ হয়। প্রাচীন গ্রীকেরা এই "হিন্দু"কে দাঁড় করায় Indus-এ। তা থেকে India ইত্যাদি। "পর্শু" শব্দ দ্বারা আর্য্যেরা পার্শ্বাদি বুঝাতেন। তা থেকে উদ্ভূত হয় "পার্শ্বিক" কিনা পাশের কেউ বা কোন কিছু। ঐ শব্দই পরবর্ত্তী কালে "পারসীক" রূপ পরিগ্রহ করে এবং "পার্শ" থেকে জন্মায় "পারস্ত"। এর থেকে বোঝা যায় যে ভারতীয় আর্য্যেরা ইরাণীয়দের পাশের লোক কিনা, জ্ঞাতি বলেই গণ্য করতেন।

আর্য্য-ইরাণ-আর্মানী-হেল্লাস্‌। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের প্রথমে শোনান যে, "ইরাণ" কথাটা (দেশের নাম) *"অইর্য্যানাম্‌" থেকে এবং * "অইর্য্যানাম্‌" পূর্ব্ববর্ত্তী "অর্য্যানাম্‌" বা "আর্য্যানাম্‌" থেকে উৎপন্ন।

আমরা দেখতে পাই যে, "আর্ম্মানিয়া" (Armenia) শব্দের মূলেও ঐ একই "অর্য্যানাম্‌" বা "আর্য্যানাম্‌" শব্দ রয়েছে। শব্দের মধ্যেকার দ্বিগুণিত "য"-র বদলে পরবর্ত্তী কালে যে "ম"-ধ্বনির উদ্ভব হয়েছিল তার কারণ হতে পারে—কোন নাসিক্য ধ্বনির সংস্পর্শে ঐ "য"-ধ্বনি এসে "অর্ম্যানাম্‌ বা "আর্ম্যানাম"-এ বিকৃত হয়েছিল। তার থেকে বর্ত্তমানের "আরমানী, আর্ম্মানিয়া" রূপের অবতরণ ঘটেছে।

আবার গ্রীক জাতি-বাচক "হেল্লেনেস্‌" (Hellenes), ও দেশবাচক "হেল্লাস্‌" (Hellas) শব্দ দুটিও এসেছে মৌলিক "অর্য্যানাম্‌" বা "আর্য্যানাম্‌" ও "আর্য্যাঃ" বা "অর্য্যাঃ" শব্দ দুটি থেকে। "আর্য্য" বা "অর্য্য" শব্দের প্রাচীন উচ্চারণ ছিল—"অর্‌-য-য" ও "আর্‌ য-য"। এই "অ" বা "আ"-ধ্বনি গ্রীক "এ"-ধ্বনির সমান। এই গ্রীক "এ"-ধ্বনি "হে"-ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। আবার "র"-স্থানে অনেক ক্ষেত্রে গ্রীকেরা "ল"-ধ্বনি ব্যবহার করতেন। তার ওপর, "য"-ধ্বনির পরিবর্ত্তে আর একটি "ল"-ও দেখা দেয়, এবং এমনি করে গড়ে ওঠে 'হেল্লাস্‌'-শব্দ। সুতরাং গ্রীক 'হেল্লাস্‌' = 'অর্য্যাঃ' বা 'আর্য্যাঃ'। আর পূর্ব্বোক্ত 'অর্য্যানাম্‌' বা 'আর্য্যানাম্‌' থেকেই ঐ ভাবে উৎপন্ন হয়েছিল 'হেল্লেনেস্‌' শব্দ। কিন্তু তফাৎ দাঁড়িয়েছে অর্থের দিক থেকে। যেহেতু 'আর্য্য' বা 'অর্য্য' একটি জাতির নাম, কিন্তু তারই সমান শব্দ 'হেল্লাস্‌' একটি দেশের নাম। আবার, 'অর্য্যানাম্‌' বা 'আর্য্যানাম্‌' বলতে দেশ বোঝায়, কিন্তু 'হেল্লেনেস্‌' বলতে একটি জাতি বোঝায়।

বেদ্‌-বয়্‌। বাক্‌ বা speech-কে আর্য্যেরা বহু নামে অভিহিত করতেন, যেমন, 'ঋক্‌, গির্‌, গো, ধেনু' ইত্যাদি। বিশেষ ভাবে বাক্‌-রূপিণী ধেনুতে রূপ দৃষ্টি অর্থাৎ বাক্‌-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিষদের অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে। যেমন:—'১। বাচং ধেনুমুপাসীত তস্যাশ্চত্বারঃ স্তনাঃ, স্বাহাকারো, বষট্‌কারো হন্তকারঃ স্বধাকারস্তস্যৈ দ্বৌ স্তনৌ দেবা উপজীবন্তি, স্বাহাকারং চ বষট্‌কারং চ হন্তকারং মনুষ্যাঃ স্বধাকারং পিতরঃ তস্যাঃ প্রাণ ঋষভো মনো বৎসঃ।'[৪]

পশু ছিল আর্য্যদের সম্পত্তি। গাভী পশু, সুতরাং গাভী-বোধক ধেনু ছিল তাঁদের সম্পত্তিস্বরূপ। বাক্‌-ও মানুষের সম্পত্তিবিশেষ। বোধ হয় সম্পত্তিবোধ হইতে 'ধেনু' নাম বাক্য বোঝাতে ব্যবহৃত হ'ত। তার পর এল বাক্যের পবিত্রতা ও অবিনশ্বরত্বে দৃষ্টিভঙ্গী। যার প্রমাণ আমরা পাই সংস্কৃত 'ঋক্‌' শব্দে, গ্রীক 'লোগস্‌' (logos) ও লাতিন 'লোকস্‌' (loguos) শব্দে।

লিথুয়ানীয় ভাষায় আমরা 'ধেনু' শব্দকে পাই 'দয়্‌নু' রূপে। আবার ঐ নামে প্রচলিত প্রাচীন লোক-সাহিত্যের সন্ধানও পাই। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'ইউরোপ'—২য় খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠায় লিখছেন যে, 'লিথুয়ানীয়-দের মধ্যে, তারা খ্রীষ্টান হয়ে যাবার পূর্ব্বে যে-সব দেবতা বিষয়ক গান আর দেব-কাহিনী, আর অত গান প্রচলিত ছিল, সেগুলি সংগ্রহ করা হয়; ধর্ম্মেতিহাস আর ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে এ সব গান অমূল্য; এই গানগুলিকে লিথুয়ানীয় ভাষায় 'দয়্‌নু' বলে—শব্দটি বৈদিক 'ধেনা' শব্দের লিথুয়ানীয় প্রতিরূপ—বৈদিক 'ধেনা'র সাধারণ অর্থ 'ধেনু' কিন্তু 'বাক্য, শব্দ' অর্থেও এর ব্যবহার আছে; লিথুয়ানীয় 'দয়্‌নু' আর বৈদিক ঋক্‌ বা সূক্ত এক পর্য্যায়ের সাহিত্য, এ বিষয়ে মনে হয় যেন বৈদিক-সূক্তের মত রচনার ধারা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক পর্য্যন্ত লিথুয়ানীয়দের মধ্যে চলে এসেছিল। লেট্‌দের মধ্যেও অনুরূপ লোকগীত পাওয়া গিয়াছে।'

সুতরাং লিথুয়ানীয়[৫] 'দয়্‌নু' = সংস্কৃত 'ধেনু' = 'ঋক্‌, সূক্ত, বাক্‌' ইত্যাদি।

১। গ্রীক 'Alexander' শব্দ 'অলক্ষেন্দ্র' হইতে উদ্ভূত।

২। মহাভারতের যুগে এই শব্দ বিকৃত হয়ে 'বৃকোদরে' পরিণত হয়।

ইন্দিরা শব্দ কিন্তু বর্ত্তমানে লক্ষ্মীকে বুঝায়।

৪। দ্রষ্টব্য—সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ'।

৫। 'লিথুয়ানীয়' বানান কিন্তু সুনীতিকুমার মহাশয় 'লিথুয়ানীয়'—আছে।

শ্যাম উপসাগরের ধারে "কাউসেং—"ট্রেজার পাহাড়

পেনাঙের কথা

শ্রীগৌরমোহন দাস দে

ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি পেনাং ছবির মত সুন্দর শহর, —সাগরের বুক থেকে উঠেছে। তাই যুদ্ধের চাকরির কল্যাণে মালয়ে আসবার পর থেকেই পেনাং যাবার সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম। সেজন্যে হঠাৎ এক দিন যখন আমার টাইপিঙে বদলির হুকুম এল তখন খুশী হয়ে উঠলাম—কেননা, টাইপিং থেকে পেনাং যাওয়ার সুবিধা অনেক। আমি টাইপিং যাবার দিনকতক পরে আমার ভ্রমণ-সঙ্গী চাটুজ্যেমশায় পুরাতন ভৃত্য বুদ্ধুকে সঙ্গে করে পোর্ট ডিকসন থেকে আমার আস্তানায় এসে হাজির হলেন—উদ্দেশ্য আমাকে নিয়ে একবার সমুদ্র-মেখলা পেনাঙের পথে পাড়ি দেওয়া। পেনাং যাবার দুয়েকটি রাস্তা আছে। রেল-ষ্টেশন থেকে একটা আঁকাবাঁকা রাস্তা আসামগোমা গ্রামের ভেতর দিয়ে 'সোয়েটনহ্যাম' নামক রাস্তা দিয়ে বরাবর পেনাঙের দিকে চলে গেছে—আর একটি সিধা রাস্তা আছে, সেটা ইপো থেকে টাইপিঙে আসবার পথে পড়ে। আমরা 'আসাগোমা' গ্রামের মধ্য দিয়ে যাব স্থির করলাম।

পরদিন সকাল আটটায় কিছু জলযোগ করে চাটুজ্যে-মশায়কে দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখাবার জন্যে জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে পেনাং থেকে ত্রিশ মাইল দূরে এক জায়গায় এসে পৌছলাম। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের পেনাঙে পৌছবার সম্ভাবনা। সমুদ্র-পরিশোভিত পেনাঙের বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করা আমার কতদিনের সাধ। এবার তা সফল হতে চলেছে ভেবে মনটা খুশীতে ভরে উঠল। জিপের গতি বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। ডানদিকে সবুজ ধানের ক্ষেত একেবারে গিরি-পাদমূল পর্য্যন্ত প্রসারিত। মাঝে মাঝে নারিকেল-বৃক্ষের বন। মসৃণ চিক্কণ দীর্ঘ পত্রগুলো যেন তালপাকলা প্রকৃতির দেহে চামর ব্যজন করছে। এখানে দুটো পুল আছে। একটা বৃটিশরা ভেঙে দিয়ে যায়, সেটা জাপানীরা আবার তৈরি করেছে আর একটা এখন মেরামত হচ্ছে। আমরা নতুন পুলটার ওপর দিয়ে জীপ চালিয়ে নিয়ে গেলাম। একটু পরে আমরা 'বুকিট টেঙ্গা' গ্রামে এসে পৌছলাম। ভারতীয়, মালয়ী ও চীনা এই তিন জাতিরই লোক এখানে আছে। এখানে ভারতীয়দের একটা মন্দিরও আছে। মন্দিরে পূজা-অর্চনা হচ্ছে, পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করছেন—এ সমস্ত সুপরিচিত দৃশ্য দেখে আমার দেশের কথা মনে পড়ে গেল। এখানে আমাদের একটি রেলওয়ে জংসন পার হতে হ'ল। একটা চৌরাস্তায় এসে দেখি বাঁদিকে ষ্টেশন, ডানদিকের রাস্তাটি কুলিম অভিমুখে গেছে। এদিকটায় রবার-ক্ষেত খুব কম। ধানক্ষেত আর নারিকেলের বন সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলাদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে দেখি যে, পেনাং পাহাড়টি প্রাকারের মত দাঁড়িয়ে আছে—দূরত্ব এখান থেকে ছয় মাইল মাত্র। এখানটায় মালয়ী ও চীনা বস্তি বিস্তর। রাস্তা দিয়ে পঞ্জাবীরা চলেছে গরুর পাল ঠেঙাতে ঠেঙাতে। এখানকার তামিল কুলিদের বস্তিগুলি প্রবাসী ভারতীয় শ্রমিকদের দুরবস্থার কথাই
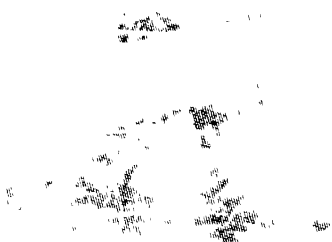
লেকের ধারের একটি দৃশ্য। দূরে পাহাড়ের কোলে জেলেদের ঘর

স্মরণ করিয়ে দেয়। এদেশের সমৃদ্ধির সোপান তৈরী করে দিলে এরা, অথচ মানুষের মত খেয়ে পরে সুস্থদেহে বাঁচবার অধিকার থেকে এরা বঞ্চিত। জায়গাটা সমুদ্রের কাছে বলে জলে জলময়। এখানে একটা ছোট্ট নদী পার হলাম।

নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে দেখতে বেলা বারোটা বেজে গেছে। আমাদের ইচ্ছা যে আমরা পেনাং শহর, জর্জ টাউন পরিক্রমা করে সেই দিনই টাইপিঙে পৌঁছুব। সেজন্যে আর দেরী না করেই পথে বেরিয়ে পড়লাম। দূর থেকে যে টাওয়ার ক্লক দেখা যাচ্ছিল সেটা জেনারেল পোষ্ট আপিসের ওপর। এখানে আগে বিদেশ গমনেচ্ছু লোকেদের টিকিট কিনতে হ'ত। এখন মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা সেই সব বড় বড় ঘরে আস্তানা গেড়েছে। জাপ অধিকারের সময় মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা ডানদিকের পিট্ স্ট্রীটের বাড়ীগুলোর ওপর অতর্কিতে চড়াও হয়ে বোমা বর্ষণপূর্ব্বক অনেকগুলো বাড়ী ভেঙে চুরমার করে ফেলে। গির্জ্জাটাও বাদ দেয় নি। তবে হাইকোর্টের কোন ক্ষতি হয়নি। এ সবের ধ্বংসাবশেষ এখনো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পিট স্ট্রীটের যে বাড়ীটা ভেঙে গেছে সেটা একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান ছিল বলে মনে হ'ল। সামনেই একটি দশ-বার বছরের শিখ ছেলেকে দেখতে পেয়ে এই বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে উত্তর দিলে নেতাজীর 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগে'র বাড়ী ছিল এটা তবে শত্রুর আক্রমণে এক জন ছাড়া বেশী লোক মরেনি।

শুনেছিলাম যে 'আয়ার হিতাম' মন্দির এখানকার একটি দর্শনীয় স্থান। আমরা এক চীনা ডাক্তারের দোকানে গিয়ে ঐ মন্দিরে যাবার পথের কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। ভদ্রলোক ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বলতে পারেন—তিনি কতকটা ভাষায়, কতকটা আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে শেষে পথের ছবি এঁকে দেখিয়ে দিলেন। রাস্তার মানচিত্র আমাদের কাছে সব সময়ে থাকে, কিন্তু আয়ার হিতাম মন্দিরে যাবার রাস্তার নির্দেশ সেই মানচিত্রে ছিল না। চীনা ডাক্তারটির নির্দেশ-মত আমরা 'ডাটো কারামং' রোড ধরে ট্রলি বাসের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চললাম। বহুক্ষণ জিপ চালিয়ে এক খরস্রোতা গিরিনদীর ধারে এসে পৌঁছলাম। সেখানে খানিক জিরিয়ে আমরা পায়ে হেঁটে নিকটবর্তী একটা মন্দির দর্শনে চললাম।

২

পুলটি পার হতেই ছোট ছোট দোকানের সারি নজরে পড়ল। সেখানে আম, জামরুল ইত্যাদি নানা ফল-মূল আর ধূপকাঠি ইত্যাদি বিক্রী হচ্ছে। মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বুদ্ধমূর্ত্তিকে ভেট

পেনাঙের একটি রাজপথের দৃশ্য

দেবার জন্যে কেউ কেউ এ সব কিনে নিয়ে যাচ্ছে। সকল চীনারই হাতে দেখলাম একটি করে চন্দনকাষ্ঠ। প্রায় পঞ্চাশটি ধাপ অতিক্রম করে মন্দিরদ্বারে পৌঁছুতে হয়। সোপানগুলোর দু'পাশে ভিখারীর দল হাত পেতে কাতরাচ্ছে।

মন্দির-মধ্যে বেজায় ভিড়, সব জাতের সকল বর্ণের লোকের নিকটেই মন্দিরদ্বার অবারিত। প্রভু বুদ্ধের নিকট কেউই অস্পৃশ্য হরিজন নয়। এখানে মন্দিরাভ্যন্তরে সর্ব্ব জাতিবর্ণ-সমন্বয় দেখে খুব আনন্দ হ'ল। মনে পড়ল আমাদের দেশের দেবমন্দিরে ছোঁয়াছুঁয়ি আর জাতি-বিচারের কথা। উচ্চবর্ণের হিন্দু ভিন্ন আর কোনও জাতিরই আমাদের দেশের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই। এমনি ভাবে দেবতার দর্শন ও স্পর্শন থেকে বহু মানুষকে বঞ্চিত করে আমরা কোন্ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছি কে জানে? চীনাদের এ সব বালাই নেই। বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ের সকল বর্ণের লোকেরই তাদের মন্দিরে অবাধ গতি। এখানে কোন ভেদ-বৈষম্য নেই। বুদ্ধের মূর্ত্তির

'আয়ার হিতাম' মন্দির

যে, আমাদের দেশের কুসংস্কারের অচলায়তন আজ ভেঙে' পড়েছে—কোন কোনও জায়গায় হরিজনেরা দেবমন্দিরে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে।

সোপানাবলী পার হয়ে একটা পুকুরের পাড়ে এসে হাজির হলাম। পুকুরটা কচ্ছপে ভর্তি—এরা কলমী শাক খায়। চীনা দোকানদার বসে রয়েছে কলমী শাক নিয়ে, দু' আঁটি শাক কিনলাম। ডাঁটাসুদ্ধ পাতা একটা ফেলতেই একপাল কচ্ছপ গলা বাড়িয়ে এসে হাজির। তারপর—সেই পাতাটি দখল করবার জন্যে তাদের মধ্যে সে কি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এ ওঠে ওর পিঠে, একটা দেয় আর একটাকে কামড়ে, বহুক্ষণ ধরে চলে কামড়া-কামড়ি, ঠোকাঠুকি। দৃশ্যটা বেশ উপভোগ্য। এ ছাড়া আর একটা পুকুরও আছে। তাতে কতগুলো কই ও অন্যান্য মাছ দেখলাম। এখানেও কতকগুলো শাকপাতা ফেলে দিলাম। গাইড বললে যে এগুলো 'হলি' পুকুরের 'হলি' মাছ কেউ ধরে না। একটু ওপরে একটা ফুল-বাগান, তাতে রংবেরঙের ফুল ফুটে রয়েছে। সামনে একটা গম্বুজ—ওপরে বৌদ্ধ মন্দির। পাহাড়ের নিভৃত স্থানে অবস্থিত মন্দিরটির স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য হৃদয়কে নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিলে। এই মন্দির যেন ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্রভেদী বিরাট মহিমারই প্রতীক। খানিকটা গিয়ে আমরা বাঁদিকের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। সামনেই একটা বড় কাঠের মাছ ঝোলানো রয়েছে। ওপরে উঠে প্রথমেই সামনের মন্দিরে গেলাম। মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে চন্দনকাঠ জ্বালাবার প্রকাণ্ড একটা পেতলের চুল্লী রয়েছে। চীনারা এ চুল্লীটির নাম দিয়েছে —'কেক্ লক্ সী টেম্পল'। এখানে দিনরাত অনবরত চন্দন-কাঠ জ্বালানো হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের বিমল রশ্মিচ্ছটায় একদা কেমন করে অর্দ্ধেক এশিয়া উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তাই ভাবতে

এটিকে আনা হয় ষাট বছর আগে চীনদেশ থেকে। পেছনে কাঠের একটি বড় টেবিলের ওপরে টিনের কৌটার মধ্যে আছে কতকগুলো কাঠি। চীনারা হাঁটু গেড়ে বসে কাঠি নাড়ছে। কাঠিগুলো কিছুক্ষণ নাড়বার পরে দু-একটি কাঠি মাটিতে পড়ে গেলে লোকেরা সেই কাঠি তাদের পুরোহিতের কাছে নিয়ে যায়। ব্যাপারটা প্রথমে একটু দুর্ব্বোধ্য ঠেকেছিল, কিন্তু শেষে যখন দেখলাম যে পুরোহিত কতকগুলো ছাপানো ব্যবস্থাপত্র পড়ে সেগুলো এদের বিলিয়ে দিতে লাগলেন তখন বুঝলাম যে এরা সব রোগীর দল। এরা সেই ব্যবস্থাপত্র নিয়ে চীনা ঔষধালয়ে গিয়ে ঔষধ কিনে নিয়ে আসে।

এই কাঠিনাড়ার জায়গাটার পেছনে রয়েছে একটি কৃত্রিম পাহাড়—আর ঐ পাহাড়ের মধ্যে রয়েছে প্রস্তরাবৃত কতকগুলো শাস্ত্রীয় মূর্ত্তি—সেগুলি সোনালী রং করা। মাঝখানে আছে 'দয়ার দেবী'র প্রতিমূর্ত্তি, তাঁর পদতলে তাঁর দুই বোন উপবিষ্ট। বাঁদিকে এক কোণে আছেন বজ্রের দেবতা আর সৃষ্টিকর্ত্তা। মূর্ত্তিগুলোর ডাইনে ও বাঁয়ে নয় জন করে আঠার জন ভক্ত ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। বিদ্যুতের দেবী ও মৃত্যুদেবতা পাহাড়ে গুহার মধ্যে আছেন। এই ঘরটির ডানদিকে একটি ছোট ঘরে আমরা ঢুকলাম। ব্যাধির দেবতা এখানে আছেন—ভীষণদর্শন প্রহরীরা এঁকে পাহারা দিচ্ছে। ঔষধের কাঠি এখানেও রয়েছে, ব্যবস্থাপত্র পাশের ঘরে ঝুলছে। একব্যক্তি একটি খাতা নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আমরা কিছু কিছু তাকে দিলাম। এই অর্থ মন্দিরের কাজেই ব্যয়িত হবে। সামনের দালানে একটি পিতল-নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে—মূর্ত্তিটি ভারি সুন্দর, তাঁর আনন স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত। এরই নীচে আলাবাষ্টারের কতকগুলো ছোট ছোট বুদ্ধমূর্ত্তি আছে—কোনটি শ্যামদেশ থেকে কোনটি বা রেঙ্গুন থেকে আনীত। দালানের পিছনের ঘরটিতে আছে দুটি বিকটাকৃতি দেবমূর্ত্তি। এঁরা হচ্ছেন পাপীদের শাস্তিদাতা দেবতা। এঁদের উচ্চতা হবে প্রায় ষোল ফুট। চারটি মনুষ্যমূর্ত্তিকে এঁরা পদতলে নিষ্পিষ্ট করছেন। এ চার জন হচ্ছেন জুয়াড়ী, মাতাল, আফিংখোর ও মিথ্যাবাদী। এই চার শ্রেণীর অপরাধীর প্রতিমূর্ত্তি—এই সব দেখিয়ে লোকেদের পাপের কুফল সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা হয়। লোকশিক্ষার এই অভিনব পন্থাটি প্রশংসনীয়। সেখান থেকে

পেনাঙ্‌ রেলষ্টেশন
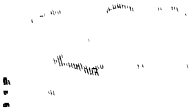
আমরা পেছনের ঘরে গেলাম, দুই দিকে আঠার জন বৌদ্ধ ভিক্ষু (প্রত্যেক দিকে নয় জন করে) ধ্যানমগ্ন রয়েছেন। এই ঘরটির শেষপ্রান্তে তিনটি প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি—একটি মূর্তির মুখে প্রসন্ন হাসি, একটি ধ্যানীবুদ্ধ আর একটি হচ্ছে শিষ্যদের শিক্ষাদানরত বুদ্ধমূর্তি। এই মূর্তিগুলোর সামনে শ্যামদেশ থেকে আনীত একটি ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তি। বড় বড় মূর্তিগুলো, বেণীর ভাগ, কাগজ আর মাটি দিয়ে তৈরি। প্রায় ষাট বছর আগে এদের প্রধান পুরোহিত পুনটাং চীন দেশ থেকে ভাস্কর ও শিল্পীদের আনিয়ে এই মন্দির আর এ সব মূর্তি তৈরি করিয়েছিলেন। মন্দিরে ঢোকবার পথে একটা ঘরে এঁর ছবি টাঙানো আছে। ইনি এখানেই মহাপ্রয়াণ করেন। তাঁর শিষ্যেরা এই প্রাঙ্গণে তাঁর মৃতদেহ দাহ করেন। এখানে সব ঘরের ছাদের মাথায় একটি করে কাষ্ঠনির্ম্মিত ড্রাগন আছে। এগুলোর গঠনকৌশল অনিন্দ্য। আমরা এ সব দেখে পাশের একটি প্যাগোডা দেখতে গেলাম। এটি নির্ম্মিত হয় ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবার সময় দেখি চীনা পুতুলের মত ধবধবে সাদা কয়েকটি চীনা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে একটিকে ডেকে এনে চীনা ভাষায় তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম "নু আ মিয়া হামি" (তোমার নাম কি?) সে তার নাম বললে আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, যে সে আমাদের সঙ্গে ভারতে যাবে কিনা? মেয়েরা সকলেই হেসে একেবারে লুটোপুটি—যেন বড় একটা মজার কথা। ছোটদের বিদায় জানিয়ে চলে এলাম।

আমরা 'খারার হিতাম' রোডের দিকে ফিরে চললাম। ষ্টেশনে থেকেই একজন গাইডকে সঙ্গে করে নেওয়া হ'ল। লোকটি ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে কথা বলে—আমাদের কলিকাতার অশিক্ষিত চীনাম্যানদের মত। যাক, একে দিয়েই আমাদের কাজ চলবে।

আমরা 'খারার হিতাম' রোড ধরে 'ডাটো কারামাথ' রোডে এসে পড়লাম। চারদিকে চলে গেছে গ্রীন লেন—আমরা সেই দিকেই মোড় নিলাম। এ দিকটা শহরের নিকটবর্ত্তী, লোকের বসতি খুব ঘন। এখানে 'ব্রি স্কুল' নামক একটি বিদ্যালয় আছে। এই জায়গাটির সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত। এখানেই তিনি আজাদ হিন্দ স্কুল স্থাপনা করেন। তার পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন নিশীথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতাজী কর্ত্তৃক সংগঠিত যে বালসেনাদের সাহস আর বীরত্বের কাহিনী আজ সমগ্র বিশ্ববাসীর বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে তারা এখানেই শিক্ষালাভ করত। এটা ছিল দশ থেকে সতের বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালকদের শিক্ষাকেন্দ্র। এদের চেয়ে বয়সে বড় তরুণদের সিঙ্গাপুরে নিয়ে শিক্ষা দিতে

পেনাঙ পাহাড়ের উপর রেললাইন

হ'ত। এখানে ছ' মাস শিক্ষা গ্রহণ করার পর বাছাই করা ছেলেদের সিঙ্গাপুরে বিভাধরী ক্যাম্পে পাঠানো হ'ত। এখানে এখন ডাচ সৈন্যেরা অবস্থান করছে—ওলন্দাজ সৈন্যদের যবদ্বীপ আক্রমণের তোড়জোড় সুরু হয়েছে পুরোমাত্রায়। দলে দলে এখানে এসে এরা সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। বৃটিশ এদের সাহায্য করছে অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য ও বস্ত্রাদি দিয়ে।

আরও এগিয়ে আমরা 'হুদিন্‌গার' গ্রাম পার হয়ে চললাম। এই গ্রামপ্রান্তে মালয়ীদের কবর রয়েছে। প্রতি কবরের ওপর প্রস্তরনির্ম্মিত ছোট ছোট পুতুল পোঁতা। বাঁদিকে প্রণালীতে 'সাঁয়েবের' ঘাঁটি। চারদিকে পাহাড়ের ওপর বৃটিশ সৈন্যদের থাকবার কেল্লা, টেনিস কোর্ট, বাগান

পেনাঙের একটি রাস্তা

ইত্যাদি দেখলাম। এ সব ছাড়িয়ে আমরা 'সুদিনিরং' গ্রামে এসে পড়লাম। গ্রামটি মন্দ নয়, বাজারটি খুব ছোট—রাস্তার উপরেই কেনা-বেচা চলছে। আমরা আরও নয় মাইল এগিয়ে গিয়ে সর্পমন্দিরে এসে পড়লাম। এটি 'পায়ান লাপাস্' গ্রামের সন্নিকটে এক পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। গাইড আমাদের মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গেল। জুতা পায়েই ঢুকে পড়লাম, কেউ বাধা দিলে না। সব জায়গায় একটি করে বিষধর সর্প কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে—গুণে দেখলাম একুশটি সর্প। জিজ্ঞাসা করে জানলাম আরও অনেক আছে। এগুলি নাকি মুরগী কিংবা হাঁসের ডিম খেয়ে বেঁচে থাকে। মন্দিরের পুরোহিত মালয়ী ও চীনা উভয় ভাষায়ই কথা বলতে পারেন। মন্দিরের ইতিহাস জানতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কেউ তা বলতে পারলে না। তবে মন্দিরটি যে খুব পুরাতন সকলেরই প্রমুখাৎ সে তথ্য জানতে পারলাম। এখানেও দেখি ঔষধ নেবার জন্যে লোকের ভিড়। মন্দিরটি দেখে আমরা চলে এলাম। রাস্তাটি সোজা চলে গেছে বৃটিশ এরোড্রামের ভেতরে। এবার আমাদের গন্তব্য স্থল পেনাঙ পাহাড়। গ্রীন্ লেন পার হয়ে আমরা 'আরার রাজা' লেনে এসে পড়লাম। এ স্থানটিরও ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে—এখানে ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের বালিকা সেনাদলের শিক্ষাকেন্দ্র। সতের বৎসরের অধিক বয়স্ক বয়স্কা বালিকাদের রাণী ঝান্সী বাহিনীতে যোগদান করতে হ'ত—সেটা ছিল সিঙ্গাপুরের উড্ স্ট্রীটে। মিসেস্ থিবীর ছিলেন এখানকার পরিচালিকা।

পেনাঙ পাহাড় ষ্টেশনে এসে টিকিট কেটে আমরা ট্রেনে উঠলাম। ট্রেনটি ছোট, আয়তনে ট্রামের চেয়ে বড় নয়। এই রেল লাইনটি তৈরি হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। দুর্গম পার্ব্বত্য পথে প্রথম যখন রেল চালানোর চেষ্টা হয় তখন অনেক লোক মারা পড়ে। তারপর কোন দুর্ঘটনা হয়েছে বলে শোনা যায় না।

সামনের দিকে তাকিয়ে আছি। ঊর্দ্ধগামী রেলপথের মধ্যে দিয়ে মোটা কাছির মত একটা তার সিধা ওপরে উঠে গেছে। ভাবছি এ অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হবে; ট্রেনের এ স্বর্গারোহণপর্ব্ব কি করে সম্পন্ন হবে? পরে শুনলাম যে মোটা তারটাই আমাদের গাড়ীটাকে ওপরে টেনে নিয়ে যাবে। আড়াইটা বাজল, ওপর থেকে টেলিফোন এল—এবার ট্রেন ছাড়বে, ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল—গাড়ীর দরজা জানালা সব বন্ধ করা হ'ল। আমরা একটু একটু করে ওপরে উঠতে লাগলাম। যদি একবার ট্রেনের অধোগতি হয় তা হলে আমাদের যে কি দুর্গতি হবে তা ভেবে শিউরে উঠলাম। গাড়ী চলল খুব আস্তে আস্তে। যতই ওপরে উঠছি ততই নীচের ঘরবাড়ী সব ছোট দেখাচ্ছে—ঠিক যেন ছেলেদের খেলাঘরের মত। পাহাড়ের ওপর বেশ খানিকটা ওঠবার পর বাঁদিকে চীনাদের একটা মন্দিরের সামনে গাড়ীটাকে থামানো হ'ল। কণ্ডাক্টারের হাতে একটি ছড়ি ছিল সেটাকে ছুটো তারে লাগিয়ে দিতেই গাড়ীর গতি থেমে গেল। আবার ছড়িটি হাতে নিয়ে নিলে গাড়ী চলতে আরম্ভ করে। গাড়ীতে চালক থাকে না—চালক থাকে ওপরে বিদ্যুতের ঘরে. সেখান থেকে দরকারমত গাড়ীর গতি বাড়ায় ও কমায়। যতই ওপরে উঠতে লাগলাম নীচেকার অর্দ্ধ টাউন শহরের দৃশ্যটি ততই নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করতে লাগল। ধরাপৃষ্ঠে সবুজ আর লাল রং দিয়ে কে যেন একখানি সুন্দর ছবি এঁকে রেখেছে। কোথাও গভীর বনানী, কোথাও বেগবতী ঝরণা-ধারার কলগান, পাখীর কূজনের সঙ্গে মিশে শ্রবণ পরিতৃপ্ত করছে। ঠাণ্ডা এখন একটু একটু করে বাড়ছে। কিছুক্ষণ ওঠবার পর আমরা এমন এক জায়গায় এলাম যেখানে লাইনটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দু'দিকে চলে গেছে। এই সময় আচমকা আর একটা ট্রেন আমাদের পাশ দিয়ে হুস্ করে নীচে নেমে গেল। প্রায় দু'হাজার ফুট ওপরে ওঠবার পর ট্রেনটি এসে একটি ষ্টেশনে থামল। এখানে একটি 'ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস' আছে। এখান থেকে চালক আমাদের ওপরে নিয়ে এল, এই জায়গায় আমাদের গাড়ী বদলাতে হ'ল। ট্রেন এ সময়ে যাত্রীদের নিয়ে ওপরে যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা তাড়াতাড়ি ট্রেনের মধ্যে যে যেখানে পারি বসে পড়লাম। খানিক পরে যাত্রীদের নিয়ে ট্রেনটি ছাড়ল। আমরা আবার ওপরে উঠতে লাগলাম। ঠাণ্ডা বেশ লাগছে—কুয়াসার সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করে আমাদের ট্রেন এগিয়ে চলেছে। দু'পাশে চীনাদের সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাগুলো দাঁড়িয়ে আছে—অধিকাংশ জনশূন্য। একপাশে একটি শান বাঁধানো বড় নালা রয়েছে—তার ভেতর দিয়ে ঝরণার জল নীচে গড়িয়ে

। কিছুক্ষণ পরে আমরা একটি সুড়ঙ্গ পার হলাম। এটি পাহাড় ভেদ করে ওপর উঠে গেছে। সুড়ঙ্গটি অতিক্রম করে আমাদের ট্রেন ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে আরোহণ করতে লাগল। ডানদিকে পাহাড়ের কিয়দংশ কেটে সমতল ক্ষেত্রে পরিণত করে চৌবাচ্চা তৈরি করে সাঁতার কাটবার জন্য সেটি জলে ভরতি করে রাখা হয়েছে। আশেপাশে অনেক চীনার বাড়ী দেখলাম। যাত্রীর দল মাঝে মাঝে ওঠানামা করছে। আমরা কিছুক্ষণ পরে ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম।

ষ্টেশনটি খুব ছোট, পাহাড়ের ওপর থেকে নীচেকার ভাসমান মেঘগুলোকে ভারি চমৎকার দেখায়। দূরে বহু নিম্নে পেনাঙ প্রণালীর বারিরাশির অনন্ত বিস্তার, কোথাও প্রণালীর গর্ভোত্থিত পাহাড়ের মালা উন্নতশিরে দণ্ডায়মান। পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে জেলেদের ছোট ছোট ঘরগুলো যেন পায়রার খোপের মত দৃশ্যমান। দূরে পাহাড়ের গায়ে ঝরণার জলে বাঁধ দিয়ে একটি জলাধার তৈরি হয়েছে—সেখান থেকে গোটা পেনাঙ শহরে জল সরবরাহ করা হয়।

কিছুক্ষণ যাবার পর আমরা যাবার রোডে এসে উপস্থিত হলাম। সব দেখা শেষ হলে আমরা বাড়ীর পথে রওনা হলাম। ট্রেন দাঁড়িয়েছিল, আমাদের নিয়ে নীচে নেমে এল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়; আমরা পেনাঙ পাহাড় ত্যাগ করে আরব মসজিদ দেখে পেনাঙ ঘাটে এসে পৌঁছলাম। পেনাঙ কেল্লা, প্যাভিলয়ন, রেজথিয়েটার ও সুপ্রীম কোর্ট, পিকাডেলী, নাচঘর এসব পথের মাঝেই নজরে পড়ল।
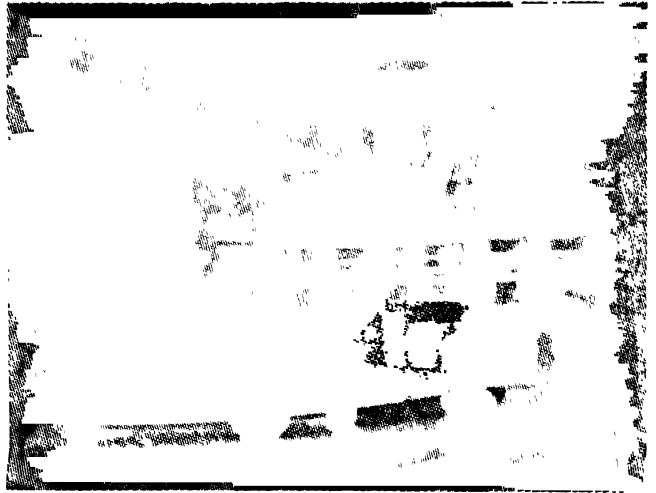
আয়ার হিতাম মন্দিরের মুখে বাগান

ফেরী ছাড়বার অনতিপূর্ব্বে আমরা ভেতরে গিয়ে স্থান সংগ্রহ করলাম। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে—আকাশ ভেঙে আরম্ভ হ'ল বৃষ্টি। আমরা ওয়াটারপ্রুফ মুড়ি দিয়ে জাহাজের মধ্যে বসে আছি। আশেপাশের অনেকগুলো লোক ভিজতে আরম্ভ করেছে। কেউ ঢুকছে ট্রাকের নীচে, কেউ গিয়ে পার্শ্বস্থ কোন ছত্রধারীর ছাতার নীচে আশ্রয় নিয়ে বৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস পাচ্ছে।

অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণের ভেতর দিয়ে আমরা আমাদের পেনাঙ ভ্রমণ-পর্ব্ব শেষ করলাম। এই ভ্রমণের স্মৃতি মানস-পটে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

ভাস্কর্য

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

অনেক দিনের আশা তোমাকে শোনাবো আমি গান,
তাই ত মেঘের ঘরে নীলাকাশে নক্ষত্র-আহ্বান।
ফুলের ঘোমটা খুলে যে-মুহূর্ত না স্পর্শ রেখে যায়—
ঝড় নয়, ভালবাসা ভুলেছিল মর্ম্মর ডানায়।
উজ্জ্বল হলুদে-চাঁদ আমিই ত কল্পনায় আলি,
মমতার মোমে যতো হৃদয়ের করে জোড়াতালি।
জীবন কিছুই নয়, দাম নেই না থাকলে আশা,
তাই ত তোমাকে দিই আঙুরের মত ভালবাসা।

ঠুনো-কাঁচ তুমি শুধু তোমার যে নেই কোনো দাম-ই,
নক্ষত্রের গান নিয়ে কাছে এসে না দাঁড়ালে আমি।
পাথরকে কুঁদে কুঁদে দিয়েছি ত ভাস্কর্য মর্ম্মরে—
এনেছি অনেক প্রেম, ভালবাসা শিল্পহাত'পরে।
হ্রদের মতন কাঁপে তবু যেন অর্পিত হৃদয়।
তুমি না রইলে কাছে পৃথিবীকে মাঠ মনে হয়।

প্রবাহ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

১৯

রাধু বিস্মিত চোখে চাহিয়া রহিল। কোথাও যে একটা মারাত্মক ভুল হইয়া গিয়াছে একথা সে বিশ্বাস করিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া একটা কথাও বলিতে পারিল না। তার চোখে মুখে একটা অসহায় উদ্বেগ-ব্যাকুল ভাব ফুটিয়া উঠিল।

মৃন্ময় ততক্ষণে অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। গ্রাম ছাড়িয়া আজই সে চলিয়া যাইবে। আজই—এই মুহূর্তেই। একটি মুহূর্তের বিলম্ব তাহাকে পাগল করিয়া তুলিতে যথেষ্ট। তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সমাধি রচনা হইয়াছে। এখানে আর কিসের মোহে সে পড়িয়া থাকিবে?

গ্রামকে সে ভালবাসে। এই মাটির উপর তাহার গভীর টান। কিন্তু কোন আকর্ষণই আর তাহার গতিপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে না। গ্রামের প্রকৃতিও যেন তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। তাহার পানে চাহিয়া অবিশ্বাসের তিক্ত হাসি হাসিতেছে। আকাশে যেন কিসের একটা কুটিল ইঙ্গিত। চতুর্দ্দিকে শুধু ছি ছি রব উঠিয়াছে। কিন্তু কেন? সে ত কোন অন্যায় কাজ করে নাই—কোন দিন অন্যায়ের প্রশ্রয়ও দেয় নাই।

মৃন্ময়ের গতি দ্রুততর হইয়া উঠিল। তাহার অতীত জীবন সব মুছিয়া যাক, বিলুপ্ত হইয়া যাক। কিন্তু নদীতীরের বুড়ো বটগাছের তলায় আসিয়া সহসা তাহাকে থামিতে হইল। তাহার চলার গতি কে যেন অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিতে থামাইয়া দিয়াছে। অতীতের কত কথাই না মনের কোণে আসিয়া ভিড় করিয়াছে। এই গাছতলায় বসিয়া কত দিন সে আর মঞ্জুষা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করিয়া কাটাইয়া দিয়াছে। সেই গাছ—সেই নদী—সবুজ ঘাসের মসৃণ আস্তরণ—সব কিছুই বিগত দিনের মধুর স্মৃতি বহন করিয়া আজিও বিরাজ করিতেছে। আজিও নদীর জলে তেমনি ঢেউয়ের নৃত্য... তাহাদের দু'জনের বুকেও যাহার দোলা লাগিত। একই সুর, একই তাল নিত্য তাহাদের কাছে নূতন রহস্যের সন্ধান বহিয়া আনিত। কিন্তু আজ নদী তাহার কাছে সুরহারা, ছন্দহীন। নাই তার কোন রূপ, কোন রস, কোন আকর্ষণ। শুধু একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা, শুধু একটা স্মৃতির আলোড়ন তাহার বুকের পাঁজরগুলিকে পর্য্যন্ত যেন শিথিল করিয়া দিয়াছে।

মঞ্জুষাকে লইয়া নীড় রচনা করিবার কত মধুর কল্পনা যে অনুক্ষণ তাহার মনে জাগিত সে খবর কেউ রাখে না—এমন কি, মঞ্জুষা নিজেও নয়। কেমন করিয়া দাম্পত্য জীবনের রচনা করিবে তাহারই নিপুণ আলেখ্য মনের পাতায় পাতায় অঙ্কিত করিয়া সে স্বকীয় চেতনা দ্বারা তাহা অনুভব করিয়া দেখিত। হয়তো মঞ্জুষা তাহার মায়ের সহিত গল্প করিতে থাকিবে, কিংবা গৃহস্থালির সহায়তায় রত থাকিবে। মৃন্ময় মায়ের অলক্ষ্যে অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া আত্মগোপন করিবে, কিম্বা পাঠরত মঞ্জুষার চোখ টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে চমকিত করিয়া দিবে। তাহার পরে নিজেই প্রশ্ন করিবে, বলতো কে? মঞ্জুষা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া জবাব দিবে, রাজা বাদশা কেউ বোধ করি। কিন্তু দয়া করে চোখ ছাড়ুন। মৃন্ময় হয়তো তখন এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া অতি সন্তর্পণে একটি...

মঞ্জুষা এক হাতে তার চিবুক ঠেলিয়া ধরিয়া ত্রস্ত কণ্ঠে কহিবে, এই ছাড়...আ...জ্যাঠাইমা! মৃন্ময় সে কথায় কান দিবে না—মুচকি হাসিয়া কহিবে, এই কি...বল নিরুদা...নইলে...এক, দুই, তিন...শেষ পর্য্যন্ত মঞ্জুষা তার দুই বাহুর বন্ধনে পরিপূর্ণ ভাবে ধরা দিবে।

জ্যোৎস্না রাত্রে সে তাহার মনের পুঞ্জিত কথার ভাণ্ডার উজাড় করিয়া ফেলিবে। এত কথা যে সে জানে সেকথা তাহার নিজেরও অগোচর ছিল। কিসের পরশে যেন আজ তাহা দুকূল ছাপাইয়া উপচাইয়া উঠিয়াছে। গল্পের মাঝ-খানে হয়তো পাখীরা কলরব করিয়া জানাইবে প্রভাতের নির্দ্দেশ। মঞ্জুষা হাসিয়া কহিবে, এত কথাও তুমি জান! তখন ত একদম বোবা হয়ে থাকতে। মঞ্জুষার কথায় মৃন্ময় রাগ করিবে না বরং হাসিমুখে তাহাকে আরও কাছে টানিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিবে, এই মুহূর্ত্তে ওসব পুরনো কথা টেনে এনে নিজেকে ফাঁকি দিতে আমি পারব না। মঞ্জুষা তখন হয়তো ঘাড় বাঁকাইয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিবে, বুঝেছি থাক, মশাই।

তাই ত মৃন্ময় আজ আবার নূতন করিয়া ভাবিতেছে। কোথায় রহিল সেদিনের কল্পনা। তাহার আশার স্বপ্ন-সৌধ-রচনা। তাহার জীবনে মঞ্জুষার যে এমন করিয়া মৃত্যু ঘটিবে তাহা কে ভাবিতে পারিয়াছে। অথচ একদিন তাহাদের মৃদু-গুঞ্জনে এখানকার আকাশ-বাতাস পর্য্যন্ত মুখরিত হইয়া উঠিত। নদীজলের কলতানে তাহাদের বুকের কথা ছন্দে সুরে বহিয়া যাইত।

মৃন্ময় হঠাৎ যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল। এ সব সে কি ভাবিতেছে। তাহার জীবনে এ চিন্তাও আজ নিছক বিলাসিতা। মৃন্ময় পুনরায় চলিতে সুরু করিল। সম্মুখে তাহার সীমাহীন পথ।...গৃহে ফিরিয়া আর কাজ নাই।

এখান হইতেই সোজা সে ষ্টীমার-ঘাটে যাইবে। ষ্টীমার যদি পাওয়া যায় ত ভালই, নহিলে নৌকাযোগেই সুরু হইবে তাহার নিরুদ্দেশ যাত্রা। এখানে আর একটি দিনও সে থাকিতে পারিবে না। এখানে সবকিছুই তাহার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছে। তাহার উপর আর কাহারো আস্থা নাই। মৃন্ময়ের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাপ্-মা তাহাকে অবিশ্বাস করেন। মঞ্জুষাও তাহাকে বিশ্বাস করে না। অথচ সে একদিন মৃন্ময়কে ভালবাসিত—যে ভালবাসায় খাদ ছিল না। একথা মৃন্ময়ের চেয়ে বেশী করিয়া আর কে জানে? কিন্তু মঞ্জুষা যে তাহার উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে একথা ত কেহ তাহাকে বলে নাই। জবাবটাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে পাইল, যে কথা গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতায় সত্য বলিয়া ধারণা হইয়াছে সে কথা মঞ্জুষা অবিশ্বাস করিবে কোন যুক্তিতে। আর সত্য বলিয়াই যদি সে না মনে করিবে তবে নাগালের বাহিরে চলিয়া গেল কেন? অন্ততঃ তাহার মুখের স্বীকারোক্তির অপেক্ষায় না হয় আর দিনকয়েক অপেক্ষা করিত।

একথা মৃন্ময়ের মনে একবারও জাগিল না যে, মন যখন ভাঙিয়া যায়, তখন যুক্তিতর্ক অথবা কাণ্ডজ্ঞান মানুষের স্বাভাবিক ভাবেই পঙ্গু হইয়া যায়।

ষ্টীমার আধ ঘণ্টার মধ্যেই পাওয়া গেল। নূতন করিয়া মৃন্ময়ের যাত্রা সুরু হইল। যদিও সে জানে না কোথায় কত দূরে গিয়া তার এ নিরুদ্দেশ-যাত্রা শেষ হইবে।

গ্রামের উপর, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের উপর, এমন কি তার নিজের উপর পর্য্যন্ত তার প্রবল অভিমান দেখা দিয়াছে। সহসা মৃন্ময়ের দু'চোখ সজল হইয়া উঠিল। সে সতৃষ্ণ নয়নে গ্রামের পানে চাহিয়া রহিল, গ্রাম্যপ্রকৃতির অনেক কিছুর সহিত আজও মঞ্জুষা মৃন্ময়ের কাছে জীবন্ত। এখানকার বেতঝোপ, বনকাঁটালির ঝাড়, ফণীমনসা গাছের সারি, নাড়ুদের কলাবাগান, চাটুজ্যেদের আমবাগান, বড় চালতা গাছটা, কেলিদিদির বনে শাকের ক্ষেত ইহারা তাহাদের অতীতের বহু ঘটনার মূক সাক্ষী। কোথায় একটা পাখী অবিশ্রান্ত "বউ কথা কও" রবে ডাকিয়া মরিতেছে। অনন্তকাল ধরিয়াই বুঝি এমনি করিয়া ডাকিয়া চলিবে।

কত তুচ্ছ ঘটনা—যাহা শৈশবে তাহাদের দিনগুলিকে মনোরম করিয়া তুলিত, কৈশোরে তাহাই ভাবিতে গিয়া কেমন একটু কুণ্ঠিত লজ্জা অনুভব করিত, যৌবনে আলোচনার বস্তু হইয়া তাদের কত কথার রসদ যোগাইত। আজ সেদিনের সে কাহিনী অনুক্ষণ তাহার মনকে পীড়া দিবে। অথচ এক দিন এই স্মৃতিকে সে সংগোপনে নিজের অন্তরের মণিকোঠায় বহন করিত।

রাত নয়টায় মৃন্ময় আসিয়া কলিকাতা পৌঁছিল। পেটে ক্ষুধা আছে, কিন্তু আহারে প্রবৃত্তি নাই। সে রাতটা সে ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে কাটাইয়া দিল। পরদিন ভাবিল, একবার সুনির্ম্মলের বাড়ী গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আসে যে, কেন সে মৃন্ময়ের এত বড় ক্ষতি করিল। মনের মধ্যে প্রতি-হিংসা-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিলেও সে আত্মসম্বরণ করিল। অন্যায়ের প্রতিবাদ অন্যায় দ্বারা করিতে তার বিচারবুদ্ধি সায় দিল না। সুনির্ম্মলের যদি মনুষ্যত্ব থাকিত ত তাহার সহিত দেখা করায় ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যে শুধুমাত্র পশুপ্রবৃত্তি লইয়া জন্মিয়াছে, নারীমাত্রেই যাহার কাছে ভোগ-বিলাসের পণ্য-সামগ্রী তাহার সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইতেও তাহার অন্তরাত্মা ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তবুও কিন্তু ভিতর হইতে তাগিদ আসে। একবার রুবির সহিত দেখা করিতে মন উন্মুখ হইয়া উঠে। জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, তুমি ত সবই জানিতে তবু কেন এই চক্রান্ত, এই দুরভিসন্ধি...এমনি অভিনয়, এত বড় ছলনা করিলে?

মৃন্ময়ের চিন্তাধারা যেন একটা সহজ পথ ধরিয়া চলিতে পারিতেছে না। সে শুধুই ভাবে, এবং এক সময় তাহাকে সুনির্ম্মলের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখা যায়। আজ আর সহজ ভাবে এ বাড়ীতে সে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। কেমন একটা অনাবশ্যক কুণ্ঠা এবং সঙ্কোচ তাহাকে বাধা দিতেছিল। অথচ তাহার কুণ্ঠিত অথবা সঙ্কুচিত হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

কিন্তু অপমানের চূড়ান্ত হইল যখন রুবি তাহাকে চরিত্র-হীন বলিয়া বিদ্রূপ করিল, সত্যই এতটা সে আশা করে নাই। হ্যাঁ—বিদ্রূপ ইহারা করিতে পারে বটে! কথাটা এই মুহূর্ত্তে মৃন্ময় নূতন করিয়া অনুভব করিল। ইহাদের সাহস আছে—বিদ্রূপ করিবার মত মনোবৃত্তিও আছে। কিন্তু এখনও তুমি অন্তঃপুরিকা কেন? খাসা অভিনয় করিতে শিখিয়াছ। মৃন্ময় মনে যাহাই ভাবুক না কেন মুখে সে একটি কথাও বলিতে পারিতেছিল না। দু' চোখে তার বিস্মিত দৃষ্টি।

তার সে দৃষ্টির মধ্যে কি ছিল জানি না, কিন্তু রুবির কণ্ঠস্বর সহসা নরম হইয়া আসিল। মৃদু কণ্ঠে কহিল, দেখুন মৃন্ময়বাবু মিথ্যে আপনি আর আমায় জ্বালাতন করতে আসবেন না। আমার একান্ত অনুরোধ, আমার দ্বারা আর কোন অপ্রীতিকর কাজ করাতে আপনি আমাকে বাধ্য করাবেন না। এটুকু দয়া আপনি করবেন—

মৃন্ময় সহসা পাগলের মত হাসিয়া উঠিল। কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল সুতীব্র ব্যঙ্গের সুর—দয়া...দয়া করবার জন্যই ত এসেছি। কিন্তু আমি ভাবছি আপনারাও মানুষ। মানুষেরই মত আপনারা হেসে কথা বলেন, দু'পায়ে হেঁটে চলেন।

রুবির স্বর পুনরায় কঠিন হইয়া উঠিল। তীব্রকণ্ঠে ডাকিল, মৃন্ময়বাবু—

মৃন্ময় তেমনি বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, আপনি রাগ করেন কেন? দুটো সত্য কথাই না হয় বলেছি।—একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, না হয় আর বলব না। কিন্তু রুবিদেবীর আর কোন অনুরোধ নেই আমার কাছে, আর কোন রকমের সাহায্য? আর একবার দাদার বিরুদ্ধে মামলা করবার অনুরোধ করবেন না? কিংবা অন্য কিছু...

রুবি পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল, এর পরেও যদি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকেন তবে বাধ্য হবে আমাকে...

তার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া পুনরায় মৃন্ময় কহিল, দারোয়ান ডাকবেন এই ত? আপনাদের অনেক টাকা আছে —দেউড়ীতে দারোয়ান আছে সে কথা জেনে শুনেই এ বাড়ীতে পা দিয়েছি। নিজেদের অনেক ছোট করেছেন— এটুকু আর বাকী রাখেন কেন। আপনাদের আসল পরিচয় জানতে ত আমার বাকী নেই—

মৃন্ময়ের মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। আর কোন প্রকার বাদানুবাদ না করিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

সেইদিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া রুবি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। আজ তাহার এই সর্ব্বপ্রথম মনে হইল যে, কাজটা সে ভাল করে নাই।

পুনরায় মৃন্ময় চলিতে সুরু করিল। ক্ষুধা তৃষ্ণা তাহার নাই। কিন্তু জীবনধারণ করিতে গেলে মানুষকে অনেক কিছুই করিতে হয়, এবং এই প্রয়োজনের তাগিদ মিটাইতে হইলে অর্থেরও একান্ত আবশ্যক। নিজেকে সে স্রোতে ভাসাইয়া দিতে পারে না। তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে এবং মানুষের মতই বাঁচিতে হইবে।

মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে একটি পার্কে আসিয়া বসিল। সেখানে নানা শ্রেণীর লোকের ভিড়। মৃন্ময় সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিল যে, মানুষ মাত্রেই অবস্থার দাস। সে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিতে চায়। কিন্তু অকস্মাৎ মঞ্জুষা যেন চোখের সম্মুখে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়ায়। তাহাকে যেন আর চেনাই যায় না। অনেকখানি শীর্ণ হইয়াছে। মুখে আর সে লাবণ্য নাই। শুধু দুই চোখে তার নালিশের ইঙ্গিত।

মৃন্ময় অর্থহীন চোখে চাহিয়া দেখিতেছে—যেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড় জমিয়াছে, যেখানে ওরা খেলার আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। উহাদের মধ্যে যেন তাহার শৈশবের সঙ্গিনী মঞ্জুষা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেন সে তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া চুপি চুপি বলিতেছে, জান মিনুদা, আমাদের বাগানে কত পেয়ারা পেকেছে, চলো দু' জনে পেড়ে খাই গে। পরে অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে পুনশ্চ যেন বলিয়া উঠিল, বাঁড়ুয্যেদের চালতা গাছে অনেক চালতাও আছে—টক টক আর মিষ্টি মিষ্টি, ধনে শাক আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে বেশ হয় কিন্তু। বা রে—চলো না।—মৃন্ময় গিয়াছিল বৈকি। তার পরে আর একদিন—মৃন্ময় খুব মনোযোগের সহিত বাঁশের কঞ্চি আর নারিকেল গাছের পাতার সাহায্যে ঠাকুরঘর নির্ম্মাণে ব্যস্ত—মঞ্জুষা আসিয়া পিছন হইতে ডাকিল। অন্যমনস্কভাবে কঞ্চি কাটিতে গিয়া মৃন্ময় একটা আঙুলের আধখানা কাটিয়া ফেলিল। তার আজও পরিষ্কার মনে পড়ে এক হাতে নিজের কাটা আঙুল চাপিয়া ধরিয়া মঞ্জুষাকেই তাহার সান্ত্বনা দিতে হইয়াছিল। বোকা মেয়ে কাঁদিয়া আকুল। সেদিনকার কাটা ঘা আজ শুকাইয়াছে, দাগও মিলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু নাড়া পাইয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে। অতীতের অতি তুচ্ছ ঘটনাও বিলুপ্ত হয় না, মনের গহনে ঘুমাইয়া থাকে মাত্র। ইহার প্রভাব মানুষের জীবনে নিতান্ত কম নয়। তাহাদের চেতনার সহিত ইহার অস্তিত্ব। প্রয়োজনে ঘটে আবির্ভাব।

কিন্তু মঞ্জুষা কেমন করিয়া সেদিনকার কথা ভুলিয়া গেল! কেমন করিয়া সে মৃন্ময়কে এমন অসঙ্কোচে অবিশ্বাস করিতে পারিল। নহিলে দিনকয়েক সে অপেক্ষা করিত একবার তার মুখের স্বীকারোক্তির জন্য। সে ত মৃন্ময়কে ভাল করিয়াই জানিত। বস্তুতঃ একথাটা মুহূর্ত্তের জন্যও মৃন্ময় ভাবিল না, যে নিখুঁত অভিনয়ের জালে পড়িয়া সে নিজেও পথ খুঁজিয়া পায় নাই—প্রায় প্রতি দিনের নিয়মিত সাহচর্য্য তাহাকে যে সত্য জানিতে দেয় নাই তাহাদের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের কাছে মঞ্জুষা যদি হারিয়া গিয়াই থাকে তবে তাহার উপর দোষারোপ করা যায় কোন্ যুক্তিতে। মৃন্ময় না জানিলেও আমরা জানি মঞ্জুষা কেমন করিয়া নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল—যাহার জন্য গ্রামে রুবির আবির্ভাব— মৃন্ময় এবং মঞ্জুষার পিতার কলিকাতা গমন। কিন্তু মৃন্ময়ের সামান্য ভুলের জন্য সুনির্ম্মলের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইল না।

মঞ্জুষা তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, এ হতেই পারে না বাবা। নিশ্চয় এর মধ্যে কোন দুরভিসন্ধি আছে। মিনুদাকে আমি জানি, এত ছোট কাজ সে করতে পারে না।

জীবানন্দ বলিয়াছিলেন, তোমার কথাই সত্য হোক মা। কিন্তু মানুষই দেবতা হতে পারে, আবার তারাই পশুর পর্য্যায়ে নেমে যায়। তবে এমনি একটা খবর যখন পেয়েছি তখন একেবারে চুপ ক'রে থাকি কেমন করে। আমারও যে একটা কর্ত্তব্য আছে মা।

কর্ত্তব্য তিনি পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু চক্রব্যূহে প্রবেশ-পথ পাইলেও বাহিরের পথ খুঁজিয়া পান নাই। জীবানন্দ এবং প্রতুলকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইল। মৃন্ময়ের আকস্মিক অন্তর্ধান এবং সর্ব্বোপরি তাহার নীরবতা সুনির্ম্মলকেই সহায়তা করিল। তাঁহাদের বিশ্বাসের শেষ অবলম্বনটুকুও আর অবশিষ্ট রহিল না।

পিতার মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়াই মঞ্জুষা তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুমান করিয়া লইল। তাই আর অনাবশ্যক প্রশ্ন করিয়া পিতাকে লজ্জা দিতে এবং সেই সঙ্গে নিজেও ব্যথা পাইতে সে চাহিল না, এবং সকল সময়ই সে মানুষের সংস্রব এড়াইয়া চলিতে লাগিল। মৃন্ময়ের অপরাধের বোঝা যেন শত গুণ হইয়া মঞ্জুষার উঁচু মাথা মাটির সহিত মিশাইয়া দিল।

ইহার পরেই মঞ্জুষার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিল। জীবানন্দ নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। মঞ্জুষার মনের কোণে যেটুকুও বা অনুকম্পা এবং বিশ্বাসের ছায়া অবশিষ্ট ছিল তাহাও এই বিপর্য্যয়ে ছত্রাকার হইয়া গেল। মঞ্জুষার মুখের প্রতিটি রেখা কর্কশ এবং কঠিন হইয়া উঠিল। সেখানে দয়ামায়ার লেশমাত্র নাই। জীবানন্দ ভয় পাইয়া গেলেন। মঞ্জুষাকে একান্তে ডাকিয়া কহিলেন, সবই আমার অদৃষ্টলিপি মা। নইলে এমন ত কোনদিন আমি ভাবি নি।

মঞ্জুষা শান্ত কণ্ঠে পিতাকে বলিয়াছিল, তুমি এতে কষ্ট পাচ্ছ কেন বাবা। আমি তোমারই মেয়ে একথা ভুলে যেয়ো না। কারুর কোন কাজেই আমাদের এতটুকুও ক্ষতি হবে না।

জীবানন্দ বলিয়াছিলেন, কথাটা ঠিক অমনি করে ভাবতে পারলে ত কোন কথাই ছিল না মা, আমি সবই বুঝি। বোঝাতে আমায় তোরা পারবি নে, কিন্তু আমি যে বড় অসহায়, বড় নিরুপায়।

জীবানন্দ একটু থামিয়া পুনরায় কহিয়াছিলেন, কারুর বিরুদ্ধে আমার একবিন্দু নালিশ নেই। মৃন্ময় যত বড় অন্যায় করুক না কেন সে সুখী হোক, কিন্তু এখানে আর আমি টিকতে পারছি নে মঞ্জু। তার চেয়ে এক কাজ করলে হয় না মা?

মঞ্জুষা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পিতার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

জীবানন্দ কহিলেন, এ গাঁ ছেড়ে অন্য কোন দূর দেশে চলে যাব মা।

মঞ্জুষা যেন হাতে স্বর্গ পাইয়াছে এমনি আগ্রহের সহিত পিতার কথা সমর্থন করিয়া কহিল, সেই ভাল বাবা। এমন কোথাও চলো যেখানে কোন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের দেখা পাওয়া যাবে না।

জীবানন্দের কাছে মঞ্জুষার এতখানি আগ্রহ কেমন যেন অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল। তিনি কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া পুনরায় কহিলেন, কিন্তু এর পরে মিনু যদি আবার ফিরে আসে মা।

মঞ্জুষার দুই চোখ সহসা জ্বলিয়া উঠিল। শান্ত অথচ কঠিন কণ্ঠে সে কহিল, তা হলে সে এসে এই কথাই জানবে যে, কারুর জন্যই কারুর আটকে থাকে না। কিন্তু এ সব কথা তুমি ভাবতে পারবে না বাবা। আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা বেশ করে ভেবে দেখেছি।

মঞ্জুষা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিয়াছিল, আমি যে মিথ্যে বলছি নে তার প্রমাণ একদিন তুমি পাবে বাবা। মঞ্জুষা মনে মনে এক কঠিন শপথ করিল।

ইহারই পরে তাহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে।

কিন্তু এত কথা মৃন্ময়ের জানিবার নয়, জানেও না। যতটুকু খবর সে রাধু বোষ্টমের নিকট ভাসা ভাসা ভাবে পাইয়াছে তাহাতেই তার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, এবং বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নটাই তার চোখে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু মঞ্জুষার মত সে কঠিন হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। বরং তাহার চিন্তা, তাহাদের অতীতের বহু ঘটনা তাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কখন চলিয়া গিয়াছে মৃন্ময়ের হুঁস নাই। বৈদ্যুতিক আলোয় চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মনে পড়িল, তাহাদের গ্রামেও সন্ধ্যা হয়। অন্ধকার নামে, আবার চাঁদের আলো হাসিয়া উঠে। পারিপার্শ্বিকের প্রকৃত রূপ কোথাও ব্যাহত হয় না। আজ তাহার চিরদিনের সেই একান্ত আপন গ্রামকে সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। এত ছি ছি আর অপমানের বোঝা মাথায় লইয়া সেখানে মৃন্ময় আর ফিরিয়া যাইবে না।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস মৃন্ময়ের বুক ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। এই কয়টা দিন তাহার কেমন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। শুধু চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাত, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিজেকেই সহস্র রকমে প্রশ্ন করা। হঠাৎ তাহার মনে হইল যে, সে নিজের উপরই অবিচার করিতেছে। জীবনে পরিবর্ত্তন সকলেরই আসে। তাই বলিয়া এই ভাবপ্রবণতা তাহার কেন। তাহাকে বাঁচিতে হইবে, সুদিনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

মৃন্ময় পুনরায় পথ চলিতে সুরু করিল। রাস্তার শেষে একটা হোটেল হইতে কিছু খাইয়া লইয়া সে পুনরায় বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু এই ভাবে উদ্দেশ্যহীনের মত পথে পথে আর কতদিন সে কাটাইবে?

লিলির কথা তাহার মনে পড়িল। সেই সঙ্গে মনে পড়িল রাজাবাবুর ছেলের কথা। সে-ই ভাল—মৃন্ময় ভাবিল।

ইহার চেয়ে সহজ কোন চিন্তা বা পথের সন্ধান আপাতত তাহার মিলিল না। তা ছাড়া যেখানে...সুনির্ম্মল, কবি, তাহার আত্মীয়পরিজন রহিয়াছে, তাহার ত্রিসীমানার মধ্যেও সে থাকিতে ইচ্ছুক নয়। সকলের চোখের সম্মুখে হইতে সে একেবারে মুছিয়া যাইতে চায়, নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে চায়।

মৃন্ময় সহসা শিয়ালদহগামী বাসে উঠিল। আপাতত গতি তাহার ষ্টেশন পর্য্যন্ত।

(২০)

গ্রামের আবহাওয়া মঞ্জুষার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আত্মীয় স্বজনের সহানুভূতি জ্ঞাপন···তাহার বাবাকে একই প্রশ্ন বারে বারে করা, অনুকম্পার দৃষ্টিতে মঞ্জুষার পানে চাহিয়া থাকা তাহার কাছে যেমন ঠেকিত বিরক্তিকর, তেমনি মনে হইত অপমানজনক। ফলে মৃন্ময়ের প্রতি মঞ্জুষার মন অধিকতর বিরূপ হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং কতকটা আত্মীয়-স্বজনের ভয়ে ও আত্মগ্লানিতে যখন সে ম্রিয়মাণ তখনই মঞ্জুষার বাবার তরফ হইতে বিদেশে যাইবার প্রস্তাব আসিল। সে বাঁচিয়া গেল।

গ্রাম ত্যাগ করিয়া প্রথমে তারা কলিকাতায় আসিল। কিন্তু এখানকার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাহারা নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছিল না। অথচ কথাটা কেহই মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতেছে না। জীবানন্দ ভাবিতেছেন মঞ্জুষার কথা, আর মঞ্জুষা তার বাবার কথা। একে অপরের সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করিয়া মৌন হইয়া আছে। মঞ্জুষা ভাবে, তাহার বাবা হয়তো শহরের এই কোলাহলের মাঝে নিজেকে খানিকটা অন্যমনস্ক রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। জীবানন্দের মনের চিন্তাধারাও ঠিক একই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আহা, মেয়েটার মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না।

কিন্তু দিন যতই চলিয়া যাইতে থাকে মঞ্জুষা মনের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর চাঞ্চল্য অনুভব করে। যে আশা অতি সঙ্গোপনে মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিল তাহাও আজ পর্য্যন্ত সাফল্য লাভ করিল না। তার প্রত্যেকটি গোপন প্রয়াসই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে যাহার ফলে মঞ্জুষা আরও বেশী বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। অথচ তাহার মনের কথা কাহারও নিকট খোলাখুলি প্রকাশ করিবার উপায় নাই।

ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার অছিলায় বহু স্থানেই মঞ্জুষা খবর লইয়াছে, কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। বরং নিদারুণ ব্যর্থতা তাকে প্রতিপদেই ভিন্ন পথে চিন্তা করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। তার নারীত্বের মর্য্যাদা হইয়াছে আহত। মনের কোণের ক্ষীণতম আশাও শেষ পর্য্যন্ত অবশিষ্ট রহিল না।

মঞ্জুষা নিজেকে সহস্র রকমে ধিক্কার দেয় তাহার এই চিত্তদৌর্ব্বল্যের জন্ত। পিতাকে প্রকাশ্যে বলে, তোমার বোধ হয় এখানকার জলহাওয়া সহ্য হচ্ছে না বাবা ?

জীবানন্দ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, এ কথা কেন মা ? আমি ত বেশ ভালই আছি।

মঞ্জুষা বলে, এর নাম কি ভাল থাকা বাবা ? তোমার চেহারা দিন দিন কি হচ্ছে তা কি দেখছ না ?

জীবানন্দ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, আমিও যে ঠিক এই কথাটাই ক' দিন ধরে তোমায় বলব ভাবছিলাম মঞ্জু।

মঞ্জুষা জোর করিয়া একটু হাসিল। গভীর কণ্ঠে বলিল, এ ভাবে আমার কথাটা তুমি চাপা দেবার চেষ্টা করো না বাবা। অন্তত আমার দিকে চেয়েও তোমার নিজের কথা ভাবা উচিত।

শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ ভারী হইয়া উঠিল।

জীবানন্দ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, আমি ত তোমার কোন কাজে বাধা দিই না মা!

মঞ্জুষা নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে। অনর্থক পিতাকে এভাবে বিব্রত করিয়া সে আত্মগ্লানি অনুভব করিল। কতবড় ব্যথা যে তার বৃদ্ধ পিতা নিঃশব্দে বহন করিয়া ফিরিতেছেন একথা মঞ্জুষার চেয়ে বেশী ত আর কেহ জানে না। তথাপি কেন এই মিথ্যা ছলনা!

মঞ্জুষা লজ্জিত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল, আমি ত সে কথা বলছি না বাবা। আমি ভাবছিলাম এখানকার জলবায়ু যখন আমাদের সহ্য হচ্ছে না তখন না হয় অন্ত কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাওয়া যাক। এখানকার এই হৈ চৈ আমারও আর ভাল লাগছে না।

জীবানন্দ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, অতি উত্তম কথা মা। আজই তা হ'লে তৈরি হয়ে নাও। কথা কয়টি তিনি এমন ভাবে বলিলেন যেন এই মুহূর্ত্তে রওনা হইতেও তাঁর বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই।

মঞ্জুষা পিতার এই অস্বাভাবিক আগ্রহে মনে মনে ব্যথিত হইল। পিতার স্নেহপ্রবণতার উপর কত অন্যায় আব্দার সে করিতেছে। প্রকাশ্যে কহিল, আজ আর সম্ভব হবে না বাবা! তা ছাড়া দিনটাও আজ মোটেই ভাল নয়।

জীবানন্দ বার কয়েক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, এক সময় বচ্ছ মেনে চলতাম, কিন্তু আজ আর ভাবতেও ভাল লাগে না। আমার ভাল যে চারিদিকেই দেখতে পাচ্ছি।

মঞ্জুষা মৃদু কণ্ঠে কহিল, এসব ত তোমার কথা নয় বাবা! এত সহজেই আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলব কেন ? আমাদের আজন্মের বিশ্বাস এই সামান্ত কারণে ক্ষুণ্ণ হতে দেব কিসের জন্ত!

জীবানন্দ পুনরায় ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ মাথা নাড়িলেন। মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, আজন্মের বিশ্বাস···সামান্ত কারণ···আচ্ছা মা···থাক্ মঞ্জু···কিন্তু যাওয়ার ব্যবস্থা দু' এক দিনের মধ্যেই করে ফেল। শরীরটা বোধ হয় সত্যিই আমার খুব খারাপ যাচ্ছে।

মঞ্জুষা পিতার নিকটে আগাইয়া আসিল। আলগোছে তার চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিয়া মৃদু কণ্ঠে

কহিল, আমি শুধু আজকের দিনের কথাই বলছিলাম। নইলে আমি নিজেও যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি বাবা। আমরা কালই এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব।

পুনরায় নূতন করিয়া তাহাদের যাত্রা সুরু হইল। ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার দ্রুত গতির সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুষার মন উধাও হইয়া চলিয়াছে বহু দূরের নানা স্মৃতির রাজ্যে। সে দিনগুলি তার জীবনে আর ফিরিয়া আসিবে না; শুধু ফেলিয়া গেছে স্মৃতি…বেদনা…জ্বালা। মঞ্জুষার মনে কত চিন্তাই না আনাগোনা করিতেছে। মৃন্ময়ের প্রতি কখনও অনুকম্পা দেখা দেয়, কখনও একটা হিংস্র প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তাহার কল্পনা শুধু কল্পনাই থাকিয়া যায়। তাহার চিন্তার এই বিচিত্র ধারা শুধু তাহাকেই শেষ পর্য্যন্ত ব্যঙ্গ করে—আপন অন্তরে আপনিই শুধু জ্বলিয়া মরে। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবারও উপায় নাই। সবার চেয়ে ভয় মঞ্জুর বাবাকে লইয়া। এ কথা সে ভাল করিয়াই জানে—কতখানি ব্যাকুল আগ্রহে তিনি দিবারাত্র মঞ্জুষার চালচলন কথাবার্ত্তা লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

মঞ্জুষা প্রাণপণে অভিনয় করিয়া চলিয়াছে। তথাপি মাঝে মাঝে সে ধরা পড়িয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ অভিনয় করিয়া নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। অন্ততঃ মঞ্জুষা তাহা পারিতেছে না।

কত কথাই একের পর এক তার মনের কোণে উঁকি মারিতেছে। তাদের আদর্শ পরিকল্পনার কথা, ভবিষ্যৎ জীবনে স্বর্গরচনার কথা। যে স্বর্গে তথাকথিত ছোট-বড়র প্রভেদ থাকিবে না, তাদের মধ্যে ওরা নামিয়া যাইবে উঁহাদিগকে নিজেদের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে। সাড়া পাইয়া আরও কত কথা তার মনে আলোড়ন তুলিয়াছে। আজিকার এই পরিণতির কথা ভাবিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই অতীতের বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনা একের পর এক সার বাঁধিয়া তার চোখের সম্মুখে রূপ পরিগ্রহ করে। তাকে অস্থির করিয়া তোলে।…

হায়রে, কোথায় গেল তাদের সে কল্পনার মায়াসৌধ? এমনি করিয়াই কি সবকিছু ব্যর্থ হইয়া যাইবে? কিন্তু কেন? কিসের জন্য? মঞ্জুষা একথার কোন উত্তর খুঁজিয়া পায় না। শুধু এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লক্ষ্যহারার মত সে তার বাবাকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দার্জ্জিলিঙের গিরিকান্তার, পুরীর সমুদ্র, কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির, এগুলির কিছুতেই তাহার প্রয়োজন নাই। তবুও সে ঘুরিয়া বেড়ায়। মনকে আয়ত্তে রাখিতে সক্ষম হইতেছে না বলিয়া বাহিরে তার এই অনির্দ্দিষ্ট পথ-চলা।

শেষ পর্য্যন্ত জীবানন্দকেও এক দিন বাধা দিতে হইল। মৃদু প্রতিবাদ করিয়া তিনি কহিলেন, এমনি করে নিজেদের ক্ষতি করায় কোন লাভ নেই মঞ্জু। তার চেয়ে বরং গ্রামেই ফিরে যাই চলো।

মঞ্জুষা প্রথমে তার বাবার কথাটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু মুহূর্তেই অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়া মৃদু শান্ত কণ্ঠে কহিল, আজ হঠাৎ এ কথা কেন বাবা?

জীবানন্দ কহিলেন, এর নাম ত বায়ুপরিবর্ত্তন নয় মা!

মঞ্জুষা কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া লইয়া কহিল, কথাটা তুমি মিথ্যে বলো নি বাবা। বহু পূর্ব্বেই আমার একথা বোঝা উচিত ছিল যে, আমার পক্ষে যেটা অনায়াসসাধ্য তোমার পক্ষে তা মোটেই সহজ নয়। কিন্তু গ্রামে আমি আর ফিরে যেতে পারব না। তার চেয়ে বিদেশেই কোথাও স্থির হয়ে বসো বাবা।

শেষ পর্য্যন্ত হইলও তাহাই। পুরীতেই তাহারা তখনকার মত রহিয়া গেল।

মঞ্জুষা তার বাবাকে লইয়া রোজই একবার করিয়া বাহির হয়। কখনও সমুদ্রতীরে, কখনও জগন্নাথের মন্দিরে। অবসর সময় দেশ-বিদেশের গল্পে পিতাপুত্রী সময় কাটাইয়া দেয়। একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন।

মঞ্জুষা যেন একেবারেই ফুরাইয়া গিয়াছে। জীবানন্দ শঙ্কিত হইয়া উঠেন। মেয়েকে কাছে ডাকিয়া অনুযোগ দেন। মঞ্জুষা হাসিয়া তা লাঘব করিবার চেষ্টা করে। বলে, এ তোমার দৃষ্টিভ্রম বাবা। স্নেহে তুমি অন্ধ হয়ে গেছ। এখানে ত আমি বেশ ভালই আছি।

জীবানন্দ সংগোপনে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। পিতা-পুত্রীর মধ্যে এই ধরণের ছলনার অভিনয় ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই।

জীবানন্দ মুখে একপ্রকার শব্দ করিয়া বার কয়েক মাথা নাড়িয়া কহিলেন, মিথ্যে আমায় ভুলাতে চাইছ মঞ্জু, কিন্তু দোহাই তোমার, এমনি করে আমার কষ্ট দিও না মা।

মঞ্জুষা বিস্মিত হয়, কিন্তু প্রতিবাদ করে না। বরং পুরাতন ক্ষত আবার নূতন ভাবে জ্বালা করিয়া উঠে। কি সে করিবে! কতখানি ক্ষমতা তার, পিতাকে এই সর্ব্বনাশা দুর্ভাবনা হইতে কেমন করিয়া সে মুক্তি দিবে। নিজের কথা সে আর ভাবিতে চাহে না। সে ভাবনাই যে তাদের জীবন-যাত্রাকে নিরন্তর জটিল করিয়াই তুলিতেছে! ভাবিব না মনে করিলেই ত তার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না।

এমনি নানা চিন্তায় মঞ্জুষার মন যখন ভারাক্রান্ত…দিশাহারা অন্ধের মত সে যখন তার ভাবী পথের সন্ধান করিয়া ফিরি-তেছে তখন একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে মাছুর সাক্ষাৎ মিলিল জগন্নাথ-মন্দিরে। মঞ্জুষা নিজে হইতে না ডাকিলে মাছুর কাছে হয়তো সে অপরিচিতাই থাকিয়া যাইত। বহু বৎসর পূর্ব্বে দেখা বালিকা মঞ্জুষার সহিত আজিকার মঞ্জুষার কোথাও একবিন্দু সাদৃশ্য নাই। তাই মঞ্জুষা যখন অনুযোগ দিয়া কহিল, না ডাকলে বোধ হয় চিনতেই পারতে না?…তখন কথাটা নীরবে মানিয়া লইয়া হাসিমুখে মাছু কহিল, খুব সত্যি

কথা, কিন্তু তার জন্ত আমাকে অনুযোগ দেওয়া চলে না। এক যুগ আগের মঞ্জু যে কত ছোট ছিল তা সে ভুলে গেলেও আমি ভুলি নি। কিন্তু তোমার সাক্ষাৎ যে এখানে পাব এ আমার স্বপ্নের অতীত। কত খুশী যে হয়েছি সে তুমি কল্পনা করতেও পারবে না।

ইহার পরে সংক্ষেপে তাহাদের মধ্যে নানা আলোচনা হইল। তাদের পারিবারিক বিপর্য্যয়ের কথা, গ্রামের কথা, রাধু বোষ্টমের কথা। মৃন্ময়ের কথাটা মঞ্জুষা ইচ্ছা করিয়াই তুলিল না। কিন্তু মঞ্জুষা কথাটা এড়াইয়া যাইতে চাহিলেও নান্টুর তার সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ আছে এবং তাদের ভিতরের গোলযোগের কোন খবরও সে রাখে না। কাজেই সে অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল, মিনুর কথা ত কিছু বললে না মঞ্জু?···

মঞ্জুষা মুহূর্ত্তের জন্ত একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেও অল্পেই সামলাইয়া লইয়া বলিল, সে এক মস্ত বড় ইতিহাস নান্টুদা। এখানে এই জনতার মাঝে তা নাই বা শুনলে। আমাদের বাড়ী চল সেখানে গিয়ে সব বলব। বাবার শরীর ভাল যাচ্ছে না। তাঁকে নিয়েই এখানে আছি। কিন্তু তুমি কোথায় আছ সে কথা ত বললে না?

নান্টু বলিল, হোটেলে।

মঞ্জুষা কহিল, আর ত হোটেলে থাকা তোমার চলবে না।

নান্টু বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, কেন!

মঞ্জুষা স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, আমরা এখানে থাকতে তুমি থাকবে হোটেলে? এ কখনও হতে পারে না। লোকে শুনলেই বা বলবে কি!

নান্টু প্রাণ খুলিয়া কিছুক্ষণ হাসিল, বলিল, লোকের কথায় গায়ে ফোস্কা পড়ে না।

নান্টুর কথার ধরণে মঞ্জুষাও হাসিয়া উঠিল। কহিল, কিন্তু আমাদের পড়ে। তা ছাড়া এই বিদেশে একবার যখন তোমার দেখা পেয়েছি তখন তোমার কোন আপত্তিই শোনা হবে না।

আপত্তি শেষ পর্য্যন্ত নান্টু করে নাই। তার সামান্ত জিনিষ পত্র লইয়া সেই দিনই সে হোটেল ত্যাগ করিল।

ক্রমশঃ

খেলাভঙ্গ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নীলকণ্ঠ নামটি তাহার—সুযশ বড় তার
দেশের সে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাবার খেলোয়াড়।
কোনো খেলায় হারত নাকো, এতই তাহার '
দাবা খেলার কুরুক্ষেত্রে—সেই ছিল অর্জ্জুন।
ভক্তী খেলার দেখতো শত নয়ন সতৃষ্ণ—
বিজয় তাঁরই—সারথি তার বুঝি শ্রীকৃষ্ণ।

একটি দিবস চলছে খেলা—ঘটলো অঘটন,
নীলকণ্ঠ উৎকণ্ঠিত বিষণ্ণ বদন।
'চটে গেল বাজি এবার' বলিয়া চঞ্চল
ছকটি দাবার উল্টে রাখে—নয়ন ছল ছল।
দেহে মনে সে কি গভীর নিরাশা চিহ্ন!
বেদনা তার বুঝবে কে আর দরদী ভিন্ন?

'চটে গেল বাজি' এ তো সহজ কথা নয়—
এ যেন এক দিগ্বিজয়ীর ভাগ্যবিপর্য্যয়।
এ যেন রে অভ্রভেদী আকাঙ্ক্ষা চুরমার,
চটলো বাজি ভগ্ন-হৃদয় ভাবিছে 'হিটলার'।

লাল কেল্লা বহুৎ দূরে—চটলো যে বাজি!
'কোহিমাতে' এ যেন রে কাতর নেতাজী।

রিক্ত করে, তিক্ত করে, জীবন সুদুর্লভ—
প্রারম্ভেতে বন্ধ হলো কাঙ্ক্ষিত উৎসব।
ফাঁসলো পরিকল্পনা তার—ডুবলো যেন হায়—
আশার বিশাল বহিত্র এক—সাগর মোহানায়।
বিফল হ'ল কি নৈপুণ্য? কি মহা উদ্যম!
এত বড় ওলটপালট বাথা কি এর কম?

এমনি আহা কতই বাজি চটছে দুনিয়ায়।
বার্ত্তা তাহার মর্ম্মব্যথার ক'জন বল পায়?
জ্যোতিষ্ক যায় উল্কা হয়ে—বিধির অভিশাপ—
অসমাপ্ত খেলার বেদন রেখে যে যায় ছাপ।
আনে যুগের পুষ্ট আশা কেমনে নৈরাশ!
চটা বাজির ব্যথায় ভরা—ধরার ইতিহাস।

বুদ্ধের অন্তরঙ্গ অন্তেবাসী আনন্দ

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

আনন্দ বুদ্ধের একজন প্রধান এবং পরম অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। তিনি বুদ্ধের খুল্লতাত অমৃতোদনের পুত্র।১ বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য অনুরুদ্ধ ও (গৃহস্থ শিষ্য) মহানাম আনন্দের (সম্ভবত বৈমাত্রেয়) ভ্রাতা ছিলেন। আনন্দ ছিলেন বুদ্ধের সমবয়সী, একই দিনে উভয়ের জন্ম হয়।২ ধর্মচক্র প্রবর্তনের দ্বিতীয় বৎসরে তিনি অনুরুদ্ধ, দেবদত্ত প্রভৃতি আরও কয়েক জন শাক্যবংশীয় রাজকুমারের সহিত সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। বুদ্ধ স্বয়ং তাঁহাকে সন্ন্যাসে দীক্ষা দেন।৩

বুদ্ধত্বলাভের বিশ বৎসর পর তথাগতের বয়স যখন পঞ্চাশ পার হইয়াছে তখন এক দিন ভিক্ষুগণের সমক্ষে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, বয়োবৃদ্ধি হেতু তাঁহার সর্বক্ষণের জন্য এক জন পার্শ্বচরের প্রয়োজন।

প্রধান শিষ্যগণের প্রত্যেকেই আগ্রহের সহিত তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন। বুদ্ধ কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। আনন্দ নীরবে বসিয়াছিলেন। অন্যেরা যখন জানিতে চাহিলেন—তিনি কেন এ বিষয়ে আগ্রহ দেখাইতেছেন না; আনন্দ তখন বলিলেন—"ভগবান তথাগতের উপরই নির্বাচনের ভার দেওয়া ভাল। তাঁহার যোগ্য সেবক তিনিই ঠিকমত বাছিয়া লইবেন।"

অবশেষে বুদ্ধ যখন আভাস দিলেন যে, তিনি আনন্দকে চান আনন্দ তখনই সম্মত হইলেন, কিন্তু আটটি শর্তে। এই সর্তগুলি হইতে আনন্দের মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। (১) উপহার প্রদত্ত কোন বিশেষ খাদ্য বা (২) বিশেষ পরিচ্ছদ বুদ্ধ তাঁহাকে দিবেন না। (৩) তাঁহার জন্য কোন "গন্ধকুটী" বা বিশেষ বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবেন না। (৪) বুদ্ধের কোনো নিমন্ত্রণে বুদ্ধ তাঁহাকে সঙ্গে লইবেন না। (৫) তাঁহার গৃহীত নিমন্ত্রণে তথাগতকে যাইতে হইবে। (৬) দূরদেশ হইতে আগত দর্শনার্থীকে, আসিবামাত্র তিনি বুদ্ধের নিকট লইয়া যাইবেন।

নিজের জন্য তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা এই: (৭) তাঁহার যখনই ইচ্ছা হইবে তখনই বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইয়া অন্তরের সংশয় নিবেদন করিবেন। (৮) তাঁহার অবর্তমানে ভগবান যে ধর্মব্যাখ্যা করিবেন, তাহা পুনরায় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে হইবে।৪

বুদ্ধ সবগুলি সর্তই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

অতঃপর পঞ্চবিংশতি বর্ষ ব্যাপিয়া৫ আনন্দ পরম আনন্দে তথাগতের সেবায় আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। পঞ্চবিংশতি বর্ষ ব্যাপিয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। অতি প্রত্যূষে মুখপ্রক্ষালনের জল ও দন্তকাষ্ঠ আনয়ন, সম্মার্জনীর দ্বারা তথাগতের কুটীর পরিষ্কার; দিবাভাগে সর্বদা সর্বত্র তাঁহার অনুগমন, সমীপে অবস্থান, ইঙ্গিতমাত্রেই তাঁহার ইচ্ছা পূরণ; রাত্রিতে দীর্ঘ যষ্টি ও উল্কা লইয়া বহুবার তাঁহার "গন্ধকুটী" পরিক্রমণ—যদি তথাগতের কোনো প্রয়োজন হয়—যদি কেহ তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত ঘটায় সেজন্যই তাঁহার এই উদ্যোগ—এই সতর্কতা।৬

এ যেন দণ্ডকারণ্যে পঞ্চবটীর পর্ণকুটীরে রামচন্দ্র নিদ্রা যাইতেছেন এবং ভ্রাতৃস্নেহাসক্ত পরম ভক্তিপরায়ণ সেবক লক্ষ্মণ অনিদ্র নয়নে নীরবে প্রহরা দিতেছেন।

না—ইহা তাহাকেও অতিক্রম করিয়াছে। এক প্রৌঢ় নিজের সমবয়সী আর এক প্রৌঢ়ের সেবা করিতেছেন। দেহে তাঁহার ক্লান্তি নাই, নয়নে নিদ্রা নাই। ক্রমে প্রৌঢ় বার্ধক্যে উপনীত হইলেন। বয়ঃক্রম তাঁহার পঞ্চষষ্টি, সপ্ততি, পঞ্চসপ্ততি, ঊনঅশীতি হইল। তাঁহারই সেবার প্রয়োজন—কিন্তু তিনিই সেবা করিয়া চলিয়াছেন, ঊনঅশীতি বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ অন্যতম সমবয়সী বৃদ্ধের জন্য জল তুলিতেছেন। তাঁহার দেহে তৈলমর্দন করিতেছেন, তাঁহাকে স্নান করাইতেছেন, তাঁহার শয্যা প্রস্তুত করিতেছেন; নানা প্রয়োজনীয় অবশ্যকরণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ গ্রহণ করিতেছেন এবং অতিক্রত তাহা সম্পাদন করিতেছেন।

একাধারে ভ্রাতা, বন্ধু, গুরু, তথাগতের প্রতি কি তাঁহার স্নেহ, কি তাঁহার প্রেম, কি তাঁহার শ্রদ্ধা। একসূত্রে বাঁধা

১ সুমঙ্গল বিলাসিনী, (P. T. S) ২য় খণ্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা। মনোরথপূরণী (S. H. B.) ১ম খণ্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা। মহাবস্তুতে (edited by Senart) আনন্দকে শুক্লোদনের অন্যতম ভ্রাতা শুক্লোদনের পুত্র ও দেবদত্তের ভ্রাতা (মহাবস্তু, ৩য় খণ্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা) এবং তিব্বতী গ্রন্থে আনন্দকে অমৃতোদনের পুত্র ও দেবদত্তের ভ্রাতা বলা হইয়াছে। *Life of Buddha* by Rockhill, p. 13.

২ *Psalms of the Brethren* (Mrs. Rhys Davids) p. 349.

৩ ঐ পৃষ্ঠা ৩৪৯। বিনয়পিটক (Oldenborg) ২য় খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা।

৪ *Psalms of the Brethren*, pp. 350-51, জাতক-অট্ঠ বন্ননা (V Fausbøll) চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬।

৫ থেরগাথা (P. T S) ১০৩৯-৪৪ গাথা। জাতক-অট্ঠ বন্ননা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৬।

৬ মনোরথ পূরণী, প্রথম খণ্ড. ১৫৯ পৃষ্ঠা। *Psalms of the Brethren* p. 351,

বীণাযন্ত্রের এক তন্ত্রীতে আঘাত করিলে যেমন অন্য তন্ত্রীতে তাহার প্রতিধ্বনি জাগে সেইরূপ তথাগতের পীড়া হইলে, সমবেদনশীল আনন্দেরও পীড়া হইত।৭

তথাগতকে রক্ষা করিবার জন্য কতবার তিনি প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছেন। দেবদত্তের প্ররোচনায় রাজমাহুতগণ রাজহস্তী নালাগিরিকে (বা ধনপালকে) মদ্যের দ্বারা মত্ত করিয়া বুদ্ধকে যাহাতে সে পদদলিত করিয়া হত্যা করে, সেজন্য তাঁহার গমনপথে ছাড়িয়া দিল। সেই মত্ত হস্তীকে তথাগতের দিকে বেগে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া আনন্দ চকিতে বুদ্ধের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। বুদ্ধ বার বার তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু সতত বশংবদ আনন্দ তাঁহার আদেশ পালনে অস্বীকৃত হইলেন। বুদ্ধ তাঁহার ঋদ্ধিশক্তির দ্বারা আনন্দকে রক্ষা করিলেন, এবং তাঁহার মৈত্রীগুণের দ্বারা সেই দুরন্ত হস্তীকে বশীভূত করিলেন।৮

আনন্দের প্রতি বুদ্ধের স্নেহেরও সীমা ছিল না। কত অন্তরঙ্গ আলাপ, কত বিচিত্র বিষয়ের আলোচনাই না তিনি আনন্দের সঙ্গে করিয়াছেন। আনন্দেরও প্রশ্নের অন্ত নাই। পরম কুতূহলী ছিল তাঁহার চিত্ত। প্রশ্নের পর প্রশ্ন লইয়া তিনি তথাগতের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এবং তথাগতও পরম স্নেহভরে তাঁহার সংশয়জাল ছিন্ন করিয়াছেন।৯

অনেক সময় তিনি তথাগতকে এমন প্রশ্ন করিয়া বসিতেন, যাহা অন্য কেহ করিতে সাহসী হইত না। তাঁহাকে নীরব দেখিলে আনন্দ কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন।১০ তাঁহার মুখে হাসি দেখিলে আনন্দ প্রশ্ন করিতেন—"হাসিতেছেন কেন?"১১ বুদ্ধও হাসিমুখে তাহার কারণ দেখাইতেন। এমনই অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁহারা।

আনন্দ যাহা অনুরোধ করিতেন বুদ্ধ তাহা না করিয়া পারিতেন না। আনন্দের অনুরোধে অনেক সময় তিনি তাঁহার পূর্বসিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়াছেন। অত্যন্ত গুরুতর বিষয়েও বুদ্ধ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আনন্দের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন।

সঙ্ঘে নারীর প্রবেশাধিকার আনন্দের অনুরোধেই সম্ভব হইয়াছিল। কপিলাবস্তুতে মহাপ্রজাপতী গৌতমী (বুদ্ধের মাতৃষসা বিমাতা এবং ধাত্রীদেবী) যখন শাক্য রাজান্তঃপুরের বহু নারীর সহিত সঙ্ঘপ্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন বুদ্ধ তখনই তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। তথাপি তাঁহারা বৈশালী পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে গেলেন এবং সেখানে গিয়া পুনরায় সঙ্ঘ-প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। বুদ্ধ তখনও তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। নারীগণ তথাপি রাজান্তঃপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন না। মনের দুঃখে ক্রন্দন করিতে করিতে সেইখানেই তাঁহারা অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। রাজান্তঃপুরিকা তাঁহারা। কখনও কোনও শারীরিক শ্রম করেন নাই। পথ হাঁটিয়া পা তাঁহাদের ফুলিয়া গিয়াছে। দাঁড়াইবার শক্তি নাই, দেহ অবসন্ন, মন বিমর্ষ। তাঁহাদের দেখিয়া আনন্দের কোমলচিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি তথাগতকে তাঁহাদের সঙ্ঘে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বুদ্ধ কিন্তু, স্বীকৃত হইলেন না।

বার বার তিন বার তিনি এই ভাবে অনুরোধ করিলেন এবং তিন বারই বুদ্ধ সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

আনন্দ তখন অন্য পথ ধরিলেন। তিনি বুদ্ধকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—"বুদ্ধপ্রচারিত ধর্মের অভীষ্ট ফললাভের যোগ্যতা নারীদের আছে কিনা?" উত্তর হইল—"আছে। নারীগণও অর্হৎ হইতে পারেন বা নির্বাণ লাভ করিতে পারেন।"

এইরূপ স্বীকৃতির পর আনন্দের অনুরোধ অনুযায়ী কার্য না করা আর তথাগতের পক্ষে সম্ভব হইল না। আটটি সর্তে বুদ্ধ নারীদের সঙ্ঘ-প্রবেশ অনুমোদন করিলেন।১২

কথিত আছে—এই সময় বুদ্ধ মন্তব্য করিয়াছিলেন আনন্দ যদি তাঁহাকে নারীদের সঙ্ঘপ্রবেশের অনুমতি দিতে বাধ্য না করিতেন তবে তাঁহার প্রচারিত ধর্মের পরমায়ু হইত সহস্র বৎসর। নারীদের সঙ্ঘপ্রবেশের জন্য তাঁহার ধর্ম মাত্র পঞ্চশত বৎসর জীবিত থাকিবে।১৩

নারীদের প্রতি আনন্দের সহানুভূতি ছিল এইরূপ। এই জন্য নারীগণও আনন্দকে বড় ভালবাসিতেন। নারীদের এত ভালবাসা ও শ্রদ্ধা বোধ হয় বুদ্ধ-শিষ্যগণের আর কেহ পান নাই।

গৃহস্থ ও সন্ন্যাসিনী উভয় শ্রেণীর নারীদের মধ্যেই আনন্দের

৭ দীঘনিকায় (P. T. S.) ২য় খণ্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা।

৮ জাতক+অট্ঠ-বণ্ণনা (V. Fausboll) ৫ম খণ্ড, ৩৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা। বিনয়পিটক, ২য় খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা (চুল্লবগ্গ)।

৯ সংযুত্তনিকায় (P. T. S.) তৃতীয় খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা, চতুর্থ খণ্ড, ৫৩-৫৪ পৃ, পঞ্চম খণ্ড, ২৮২-৮৬, ৩২৮-৩৪ পৃষ্ঠা। মজ্ঝিম নিকায় (P.T.S.) তৃতীয় খণ্ড, ৬২-৬৭, ১০৪-২৪ পৃষ্ঠা। অঙ্গুত্তর নিকায় (P. T. S.) প্রথম খণ্ড, ১৩২-৩৩, ২২২-২৮ পৃষ্ঠা, তৃতীয় খণ্ড, ১৩২-৩৪, ২১৪-১৮ পৃষ্ঠা। চতুর্থ খণ্ড, ২৭৯-৮০, পঞ্চম খণ্ড, ৭-৮, ৭৫-৭৭, ৩১৮-২২ পৃষ্ঠা। ধম্মপদ-অট্ঠ কথা (P. T. S.) তৃতীয় খণ্ড, ২৩৬, ২৪৮, পৃষ্ঠা।

১০ সংযুত্তনিকায়, চতুর্থ খণ্ড, ৪০০-৪০১ পৃষ্ঠা।

১১ মজ্ঝিমনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৫, ৭৪ পৃষ্ঠা। জাতক, অট্ঠ কথা, ৩য়, ৪০৫ পৃষ্ঠা, ৫র্থ, ৭ পৃষ্ঠা।

১২। অঙ্গুত্তর নিকায় (P. T. S. খণ্ড, ২৭৪-৭৯ পৃষ্ঠা। বিনয়পিটক দ্বিতীয় খণ্ড ২৫৩-৫৬ পৃষ্ঠা।

১৩। বিনয়পিটক, চুল্লবগ্গ।

সরোজিনী নাইডু

শ্রীচিত্রনিভা চৌধুরী অঙ্কিত

সারিপুত্ত ও মোগগল্লানের দেহাবশেষ সংরক্ষণ-ক্ষেত্র, সাঁচি

মন্দির ও মঠ, সাঁচি
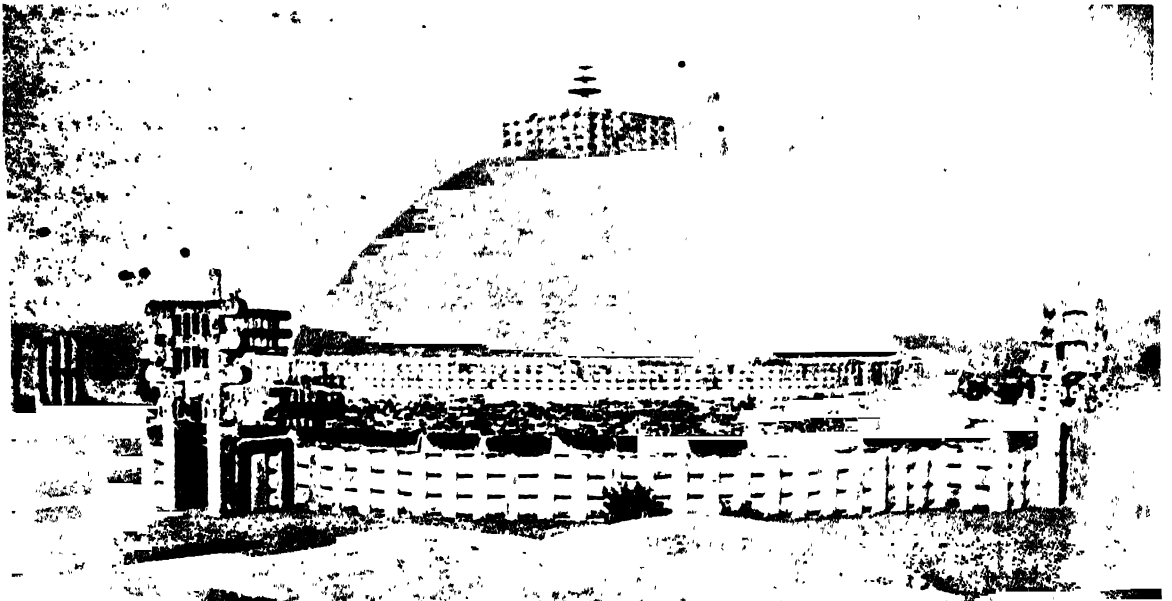
সাঁচি স্তূপ

প্রভাব ছিল অসীম। তিনি যখন উপদেশ দিতেন নারীগণ তাঁহার চতুর্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইতেন। তাঁহারা তাঁহাকে ব্যজন করিতে থাকিতেন এবং ধর্ম সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করিতেন।

তিনি যখন কৌশম্বী যান তখন রাজা উদয়নের অন্তঃপুরের মহিলাগণ তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য উপবনে সমবেত হন। তাঁহার উপদেশ শ্রবণে পরম সন্তোষ লাভ করিয়া, তাঁহারা আনন্দকে পঞ্চশত চীবর উপহার দেন।১৪

ধর্মপদের ভাষ্যে আছে—কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তথাগতকে পঞ্চশত ভিক্ষুসহ প্রতিদিন তাঁহার প্রাসাদে পদধূলি দিবার জন্য অনুরোধ করেন। বুদ্ধ যাহাতে তাঁহার মহিষী মল্লিকা ও বাসবখত্তিয়া এবং অন্যান্য রাজান্তঃপুরিকাগণকে প্রতিদিন উপদেশ দেন—সেজন্যই তাঁহার এই অনুরোধ। বুদ্ধ তাঁহার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার পক্ষে প্রতিদিন এক স্থানে যাওয়া সম্ভব নহে। রাজা তখন অন্য কোনও এক উপযুক্ত শিক্ষককে পাঠাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। বুদ্ধ আনন্দকেই এই কার্যের ভার দেন।১৫

জাতকের ভাষ্যে আছে—রাজান্তঃপুরের মহিলাগণকেই বুদ্ধের আশিজন প্রধান শিষ্যের মধ্য হইতে গুরু নির্বাচনের ভার দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহারা সর্বসম্মতিক্রমে আনন্দকেই তাঁহাদের গুরু নির্বাচিত করিয়াছিলেন।১৬

পুরুষের সহিত নারীর অধিকার সমান হোক—ইহাই ছিল আনন্দের অন্তরের অভিপ্রায়। একবার তিনি বুদ্ধকে প্রশ্ন করেন—"নারীরা কেন ধর্মাধিকরণের পদ অধিকার করেন না? নারীরা কেন বাণিজ্যাদিতে যোগ দেন না?" [অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য় খণ্ড, ৮২ পৃষ্ঠা।]

অঙ্গুত্তর-নিকায়ের ভাষ্য হইতে জানা যায়, আনন্দের আকৃতি ছিল সুন্দর। একে দেখিতে সুন্দর১৭ তাহার উপর নারীদের প্রতি গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন—ইহার জন্য আনন্দকে একবার বিশেষ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। 'শার্দূলকর্ণাবদানে' তাঁহার সেই বিপত্তির ইতিহাস পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের "চণ্ডালিকা"তে পাঠক তাহা অবগত আছেন। সুতরাং এখানে আর তাহার উল্লেখ করিলাম না। বুদ্ধ তাঁহাকে এই বিপদ হইতে যেভাবে উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহা হইতেও তাঁহার প্রতি বুদ্ধের গভীর স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়।১৮

দর্শনার্থী মাত্রই যাহাতে বুদ্ধের দর্শন পান, জিজ্ঞাসু মাত্রই যাহাতে বুদ্ধকে প্রশ্ন করিতে পারেন আনন্দ তাহার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতেন। এমন কি, যদি তিনি বুঝিতেন বুদ্ধ কাহাকেও দেখা দিলে বা উপদেশ দিলে তাঁহার উপকার হইবে তবে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎকার বা উপদেশের ব্যবস্থা করিতেন।১৯ অথচ কেহ যাহাতে তথাগতকে অনর্থক বিরক্ত না করে, সেদিকে তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। সতীর্থ ও সহকর্মী ভিক্ষুদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল মধুর। তাঁহারা অনেকেই অকপটভাবে আনন্দের নিকট নিজেদের দুর্বলতার বিষয় প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। নারীর দর্শনমাত্রেই বঙ্গীশ নামে এক ভিক্ষুর চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইত। তিনি আনন্দকে ব্যাকুলভাবে ইহা নিবেদন করেন এবং তাঁহার উপদেশ চান।২০

বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ভাষণ যাঁহাদের তেমন বোধগম্য হইত না তাঁহারা আনন্দের নিকট তাহা বুঝিতে আসিতেন। আনন্দ ব্যাখ্যা করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিতেন। বুদ্ধপ্রচারিত ধর্মের যথার্থ ব্যাখ্যাতা বলিয়া তাঁহার বিশেষ সুনাম ছিল।২১

কখন কখন বুদ্ধ তাঁহার অসমাপ্ত ভাষণ আনন্দকে সমাপ্ত করিতে বলিয়া নিজে বিশ্রাম করিতেন। ভাষণ সমাপ্ত হইলে আনন্দ তথাগতের প্রশংসালাভ করিতেন।২২

কখন কখন এমনও দেখা গিয়াছে যে, আনন্দ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভিক্ষু ও গৃহস্থগণকে ধর্মোপদেশ দান করিতেছেন। আবার কখনও বা সমস্ত ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট তিনি তাঁহার পূর্বশ্রুত তথাগতভাষণ পুনরাবৃত্তি করিতেছেন।

কথিত আছে, আনন্দের স্মৃতিশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি বুদ্ধের বচন অক্ষরে অক্ষরে স্মরণ রাখিতে পারিতেন। বুদ্ধের দীর্ঘভাষণও বহুকাল পরে তিনি যথাযথ আবৃত্তি করিতে পারিতেন। এজন্য তিনি "ধর্মভাণ্ডাগারিক" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।২৩

সুত্তপিটকের প্রথম হইতে চতুর্থ নিকায়ের প্রত্যেকটি সুত্ত আনন্দের স্মৃতিপট হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। "আমি ইহা এইরূপ শুনিয়াছি" বলিয়া তিনি সুত্তগুলি আরম্ভ করিয়াছেন। বুদ্ধের সমস্ত ভাষণের সময়ই যে আনন্দ উপস্থিত ছিলেন তাহা নাও হইতে পারে। কিন্তু বুদ্ধের সহিত আনন্দের সর্বক্ষণস্থায়ী সাহচর্য বশতঃ তাঁহার অশ্রুত ভাষণমাত্রই বুদ্ধ তাঁহাকে পুনর্বার শুনাইয়াছিলেন।

১৪। বিনয়পিটক, ২য় খণ্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা।

১৫। ধম্মপদ-অট্ঠকথা (P. T. S.) ১ম খণ্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা।

১৬। 'তাসক্কা মত্তেরা ধম্মভণ্ডাগারিকং আনন্দথেরং এব রোচেসুং।' জাতক-অট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা।

১৭। মনোরথ পূরণী, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৩৩ পৃষ্ঠা।

১৮। দিব্যাবদান (E. B. Cowell) পৃঃ ৬১১। শার্দূলকর্ণাবদান, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩, পৃঃ ১৯২।

১৯। সংযুত্ত, ১ম খণ্ড, ১৮২-৮৩ পৃঃ. পঞ্চম খণ্ড, ৫২০ পৃঃ। মজ্ঝিম নিকায় (P. T. S.) ১ম খণ্ড, ১৬০-১৭৫, ২৩৭-২৫১ পৃষ্ঠা।

২০। সংযুত্তনিকায়, ১ম খণ্ড, ১৮৫-৮৮ পৃ। থের গাথা, ১২২৩-২৬। *Psalms of the Brethren*, pp. 397-401.

২১। অঙ্গুত্তর, ৫ম খণ্ড, ২২৫ পৃ। সংযুত্ত, ৪র্থ, ৯৩ পৃষ্ঠা।

২২। মজ্ঝিম, ১ম খণ্ড, ৩৫৩-৫৯।

২৩। থেরগাথা অট্ঠকথা (S. H. B.) ২য় খণ্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা। জাতক-অট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, ৩৮২ পৃ।

সারিপুত্ত, মহামোগ্গল্লান, মহাকস্সপ—আনন্দের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার সারিপুত্তের সহিত আনন্দের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য বলিয়া আনন্দ সারিপুত্তকে যেমন ভালবাসিতেন তেমনি শ্রদ্ধাও করিতেন। আর সারিপুত্ত নিজে যে-ভাবে বুদ্ধের সেবা করিতে চান আনন্দকে ঠিক সেইভাবে সেবা করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহ ও কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন। তাঁহাদের দুই জনের কাহাকেও যদি কোনো উত্তম বস্ত্র উপহার দেওয়া হইত তবে তাহা তাঁহারা উভয়ে ভাগাভাগি করিয়া লইতেন। একবার আনন্দ এক বহুমূল্য চীবর উপহার পান। আনন্দের ইচ্ছা তিনি উহা সারিপুত্তকে দেন। সারিপুত্ত তখন অন্যত্র থাকায় বুদ্ধের অনুমতি লইয়া তিনি উহা সারিপুত্তের জন্য তুলিয়া রাখেন।

এই অন্তরঙ্গ সুহৃদ সারিপুত্তের মৃত্যু আনন্দকে শোকে অভিভূত করিয়া ফেলে। কথিত আছে, সারিপুত্তের মৃত্যু-সংবাদ যখন তাঁহার নিকট পৌঁছায়, তখন তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে। তাঁহার চিত্ত যেন বিপর্যস্ত, দেহ যেন বিবশ এবং মস্তিষ্ক যেন শূন্য হইয়া যায়।২৪

তথাগতের এরূপ অন্তরঙ্গ শিষ্য হইয়া পঞ্চবিংশতিবর্ষ যাবৎ এমন সতত তাঁহার সংস্পর্শে থাকিয়াও আনন্দ বুদ্ধের জীবিত অবস্থায় নির্বাণ বা অর্হত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। ইহা উল্লেখ করিয়া উদায়ী একবার তাঁহাকে বিদ্রূপ করেন, বুদ্ধ তাহা শুনিয়া বলেন—"বলিও না উদায়ী, এমন কথা বলিও না। * * * আনন্দ এই জীবনেই নির্বাণ লাভ করিবেন।"২৫

বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।

অবশেষে এক দিন আনন্দের নিদারুণ প্রিয়বিয়োগ, তথাগতের মহাপরিনির্বাণের দিন সমাগত হইল। কুশিনারার শালবীথিকায় আনন্দ দুইটি শালবৃক্ষের অন্তরালে তথাগতের অন্তিম শয্যা রচনা করিলেন। বৈশাখ মাস। নবীন কিশলয়ে, বিকশিত মঞ্জরীতে বিটপীবৃন্দ পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। চতুর্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। দেখিতে দেখিতে সুগন্ধি শাল-কুসুমে তথাগতের কুসুমসম পবিত্র কলেবর আচ্ছাদিত হইয়া গেল।

আনন্দ তথাগতকে প্রশ্ন করিলেন—"অন্ত্যেষ্টি কি ভাবে হইবে?" ইহার পর তাঁহার পক্ষে আত্মসংবরণ করা আর সম্ভব হইল না, তিনি দূরে সরিয়া গিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।—

অবশেষে পরিনির্বাণের সময় যখন নিকটবর্তী তথাগত দেখিলেন—আনন্দ পার্শ্বে নাই। শুনিলেন নিরাশার ভগ্নহৃদয়ে তিনি অন্যত্র রোদন করিতেছেন। তিনি তাঁহাকে কাছে আনাইলেন এবং মধুর স্বরে বলিলেন—"আনন্দ, যাহার উৎপত্তি হইয়াছে ধ্বংস তাহার অনিবার্য। ইহা প্রকৃতির নিয়ম, দুঃখ করিও না। দীর্ঘকাল ধরিয়া তুমি আমার বড় অন্তরঙ্গ ছিলে, আমার প্রতি তোমার স্নেহ, তোমার সেবা, তোমার একনিষ্ঠতার তুলনা নাই।"

বৈশাখী-পূর্ণিমা। রাত্রি তৃতীয় প্রহর। জ্যোৎস্নার বন্যায় আকাশ, পৃথিবী প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। শালফুলের সুগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত—এই অপূর্ব আবেষ্টনীর মধ্যে তথাগত সমাধিস্থ হইলেন। চিত্ত তাঁহার রূপ হইতে অরূপে মগ্ন হইল।

অরূপ সমাধির সর্বশেষ স্তরে চিত্ত যখন তাঁহার স্থিতিলাভ করিয়াছে, যখন তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ, হৃদ্স্পন্দন নীরব, দেহ নিস্পন্দ, মৃত্যুর সর্বপ্রকার লক্ষণ যখন প্রকাশিত হইয়াছে—আনন্দ তখন কুকারিয়া উঠিলেন—"আর্য অনিরুদ্ধ! তথাগত কি পরিনির্বাণ লাভ করিলেন?" অনিরুদ্ধ উত্তর দিলেন—"আনন্দ! তথাগত পরিনির্বাণ লাভ করেন নাই, তথাগত "সংজ্ঞাবেদিতনিরোধ" সমাধি লাভ করিয়াছেন।"২৬

এইভাবে সমাধি হইতে সমাধিতে প্রবেশ করিতে করিতে ভগবান বুদ্ধ রজনীর অন্তিমপ্রহরে ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন।

শৈশবে যাঁহার সহিত একত্রে বর্ধিত হইয়াছেন, যৌবনে যাঁহার সাহচর্যে নূতন জীবন লাভ করিয়াছেন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থায় যাঁহার পরম অন্তরঙ্গ পার্শ্বচররূপে সর্বদা সর্বত্র ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিয়াছেন, সেই তথাগত যখন দীর্ঘ অশীতি বৎসরের অনুচর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন তখন আনন্দের মনের অবস্থা কেমন হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়।

এমন নিদারুণ বিচ্ছেদ-দুঃখের মধ্যেও আনন্দ দিকে দিকে বুদ্ধের গৃহস্থ শিষ্যগণকে সান্ত্বনা দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই কাজে তিনি এমন ব্যাপৃত রহিলেন যে, নিজের ধ্যানসমাধির সময় পর্যন্ত তাঁহার রহিল না।

এই আত্মভোলা পরার্থপর পুরুষপ্রবরের কোনদিন নিজের

২৪। 'মধুরকজাতো বিয় কাযো দিসা পি ন পক্খায়ন্তি, ধম্মা পি মে ন পটিভন্তি, আয়স্মা সারিপুত্তো পরিনিব্বুতো তি সুত্বাতি।'

সংযুত্ত, ৫ম খণ্ড, ১৬১-৬২ পৃষ্ঠা

২৫। অঙ্গুত্তর (P. T. S.) ১ম খণ্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা।

২৬। মহাপরিনিব্বাণসুত্ত।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে নয় প্রকার ধ্যান বা সমাধির বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে চারিটি রূপধ্যান, চারিটি অরূপধ্যান। নবমটি হইতেছে ধ্যানের সর্বশেষ স্তর, যখন সর্বপ্রকার চেতনা ও অনুভূতি সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হয়। ধ্যানের এই স্তরে মৃতদেহের সহিত ধ্যানীর দেহের প্রায় কোনও প্রভেদই থাকে না। মৃতের সহিত এই (সংজ্ঞাবেদিত নিরোধ) সমাধিতে সমাহিত যোগীর প্রভেদ মাত্র এই যে—দেহ তাঁহার উষ্ণ থাকে প্রাণ বহির্গত হয় না এবং ইন্দ্রিয়গণ নষ্ট হয় না। বুদ্ধ যখন এই সমাধিতে সমাহিত হন তখন প্রিয়-বিচ্ছেদ-কাতর আনন্দের আশঙ্কা হয় যে তথাগত ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কথা ভাবিবার অবসর মিলে নাই। তথাগতের পরিনির্বাণের পরও তাঁহার এই স্বভাবের পরিবর্তন হইল না।

হয়ত এইভাবেই তাঁহার জীবন কাটিয়া যাইত। হয়ত এ জীবনে আর তাঁহার নির্বাণ লাভ হইত না। কিন্তু তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদগণের আগ্রহে এবং উৎসাহে আনন্দ এ বিষয়ে তৎপর হইলেন। পরম অধ্যবসায়ের সহিত সমাহিত হইয়া এক দিন তিনি তাঁহার সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করিলেন।[২৭]

আনন্দ অতি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। এক শত কুড়ি বৎসর বয়সে[২৮] তাঁহার দেহত্যাগ হয়। এইরূপ দীর্ঘজীবী বলিয়াই তাঁহার পক্ষে আশি বৎসর বয়সেও তথাগতের সর্বপ্রকার সেবা করা সম্ভব হইয়াছিল।

কনিষ্ঠ সহধর্মীদের শিক্ষা দিয়া এবং ধর্মানুপ্রেরণার দ্বারা তাঁহাদের উৎসাহিত করিয়া তিনি তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

২৭। সংযুক্ত, ১ম খণ্ড, ১৯৯-২০০ পৃষ্ঠা। বিনয়পিটক, ২য় খণ্ড, ২৮৬-৮৮ পৃঃ। সুমঙ্গলবিলাসিনীর (P. T. S.) প্রথম খণ্ডের ৯-১৩ পৃষ্ঠাতে বিস্তৃত বিবরণ মিলিবে।

২৮। ধম্মপদ অট্‌ঠ কথা, ২য় খণ্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা।

উচ্চশিক্ষার অবস্থা

শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গত মহাযুদ্ধের সঙ্কটকালে পৃথিবীর সকল জাতিই নিজ নিজ দুর্বলতার কেন্দ্রগুলি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছে। তাহা দূর করিবার অন্যতম উপায়-স্বরূপ তাই তাহারা শিক্ষা-সংস্কারের জন্য যুদ্ধ সমাপ্তির পূর্ব্ব হইতেই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। ইংলণ্ড ১৯৪৪ সালে নূতন শিক্ষা-আইন প্রণয়ন করিয়া সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। আমাদের দেশেও সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা অনেক দিনই প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। অধুনা বিশেষ করিয়া উচ্চশিক্ষার সংস্কারের জন্য অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের নায়কত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। কমিশনের সদস্যগণ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ এবং দেশীয় ভিন্ন বিদেশীয় সদস্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত। উচ্চতর নীতির দিক দিয়া প্রয়োজনীয় সংস্কারের সকল তথ্যই যে আমরা অবগত হইব ইহা নিঃসন্দেহ।

এই পরিস্থিতিতে, আশা করি, আমাদের স্নাতক-পূর্ব্ব (under-graduate) শিক্ষার বাস্তব অবস্থার বিবৃতি একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ সংস্কারের পরিকল্পনা যতই নিখুঁত হোক না কেন, সাফল্য বাস্তব ক্ষেত্রের প্রকৃতির উপর অনেকাংশে নির্ভর করিবে। উচ্চতর নীতির দিক দিয়া সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব ক্ষেত্রেরও মূল সংস্কার প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় সংশোধন ও আইন-কানুনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রের সকল অংশের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন আনয়ন করাও প্রয়োজন। এই স্তরের শিক্ষার বাস্তব অবস্থার সহিত আমরা সকলেই ন্যূনাধিক পরিচিত। সকল দৈনন্দিন সমস্যার মত ইহাও আমাদিগকে পীড়ন করিতেছে। সকল দৈনন্দিন সমস্যার মতই ইহার সম্বন্ধে সমালোচনা অপ্রিয় হইলেও অনভিপ্রেত হইবে না।

স্নাতক-পূর্ব্ব শিক্ষাক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আজ একটি দুষ্টচক্রে (vicious circle) পরিণত হইয়াছে। এই চক্রের কোন একটি অংশ হইতে বর্ণনা আরম্ভ করিতে হইবে। পর্য্যায়ক্রমে অংশগুলির বর্ণনায় মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ প্রতীয়মান হইলেও কোন একটি অংশই শিক্ষাক্ষেত্রের সকল ত্রুটির মূল, এইরূপ মনে করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। প্রকৃতপক্ষে সকল ত্রুটির জন্য সকল অংশই দায়ী। সকল অংশেরই আজ সংস্কারের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

এই স্তরের শিক্ষার্থীদের কথা প্রথমে ধরা যাক। ইহারা সকলে সমান কারণে কলেজীয় শিক্ষার জন্য উপস্থিত হয় না। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর উপর সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ; কিন্তু ডিগ্রীর প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন রকমের। যদি কোন অভিনব বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করিয়া অল্পতর পরিশ্রমের বিনিময়ে এই ডিগ্রী বণ্টনের ব্যবস্থা করা যায়, তবে সকলেই আনন্দিত না হইয়া দুঃখিত হইবে না। ডিগ্রীই সকলের প্রয়োজন, অন্য কিছু নহে। কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা বা কোন কার্য্যে দক্ষতা অর্জ্জন করা তাহাদের উদ্দেশ্য নহে; কোন প্রকার জ্ঞানলাভ তাহাদের অভীষ্টের সীমারেখার বাহিরে। তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক বণিকশ্রেণীর। এই শ্রেণীর ডিগ্রীর প্রয়োজন অন্য সকলের চেয়ে পৃথক। তাহাদের সুদৃশ্য বাড়ী, গাড়ী, পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র সকলই আছে। এইগুলির সহিত মানাইয়া একটি ডিগ্রীও তাহাদের প্রয়োজন। যেমন বাড়ী, গাড়ী প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার জন্য তাহারা মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া থাকে, সেইরূপ ডিগ্রী লাভের জন্যও তাহারা যথোপযুক্ত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নহে। ভবিষ্যতে বিদ্যা ও বুদ্ধি সঞ্চালন করিবার, বুদ্ধিজীবীর বৃত্তি অবলম্বন করিবার কোন অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই। তাহাদের পেশা এবং অর্থোপার্জ্জন ও জীবনযাত্রা-প্রণালী পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত হইয়া আছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর সহিত তাহার

কোন সংশ্রব নাই। ইহা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী প্রকৃতপক্ষে ধনিক-শ্রেণীর নহে; কিন্তু তাহারা প্রতিপত্তিশালী গৃহ হইতে উপস্থিত হয়। ইহারা ভবিষ্যতে নানাক্ষেত্রে মর্য্যাদাপূর্ণ পদগুলি অধিকার করিয়া থাকিবে। তাহা তাহাদের জন্য একরূপ নির্দ্দিষ্টই রহিয়াছে। কিন্তু পাছে লোকে অযোগ্য বলিয়া মনে করে এইজন্য তাহাদের একটা ডিগ্রীর প্রয়োজন—আপিসের বাহিরে নামের সহিত একটা ডিগ্রী না থাকিলে লোকের অশ্রদ্ধার কারণ হইতে পারে। তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী দরিদ্র; তাহাদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহারাই প্রকৃতপক্ষে "শিক্ষিত বেকার" শ্রেণীর উৎস। তাহাদিগকে কঠিন জীবন-সংগ্রামে প্রায় একক অবতীর্ণ হইতে হইবে। তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিবার নানা কৌশল রহিয়াছে, এমন কি তাহাদের ডিগ্রীটাও যে তাহাদের উপযোগিতার মাপকাঠি নহে—তাহা কেবলমাত্র কাগজীয় নজির (paper qualification) ইহাও তাহাদিগকে শুনাইয়া দেওয়া হয়। তথাপি অন্ততঃ ডিগ্রীটা সম্বল না থাকিলে কোনও পদের প্রার্থী হইবারও সুযোগ থাকিবে না; কাজেই প্রাণপণে সে ডিগ্রীর প্রয়াসী।

প্রথম দুই শ্রেণীর ছাত্র সম্পূর্ণই অবগত আছে যে কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীতে যে অধ্যাপনা হইয়া থাকে তাহা সময়ে সময়ে তাহাদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য কার্য্যকরী হইলেও বস্তুতঃ ডিগ্রীলাভ করিবার পক্ষে একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। তাহাদের গৃহশিক্ষক আছেন; তাঁহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি গুছাইয়া এক একটি করিয়া উত্তর প্রস্তুত করিয়া দিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নগুলির প্রকৃতিই এরূপ যে দুই-এক মাসের মধ্যেই উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত কতকগুলি উত্তর মুখস্থ করিয়া ফেলা যায়। ইহার জন্য প্রকৃতপক্ষে কলেজের শ্রেণীতে উপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের কথা কিছু স্বতন্ত্র। তাহাদের গৃহশিক্ষক নাই—অপেক্ষাকৃত অধিক পরিশ্রম করিয়া তাহারা সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা মুখস্থ করে। তাহাই অবলম্বন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব হয় না।

সুতরাং অধিকাংশ ছাত্রই কলেজের শ্রেণীতে যে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা শিক্ষার উদ্দেশ্যে নহে, অন্য কারণে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম এই যে, প্রতি বিষয়ে যতগুলি বক্তৃতা (lectures) দেওয়া হয় তাহার মধ্যে অন্ততঃ নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিতে হইবে। তদ্ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার অধিকারী বলিয়া বিবেচিত কেহ হইবে না। সংক্ষেপে ইহাকেই ছাত্র-জগতে "পার্সেণ্টেজ" রাখা বলা হয়। প্রধানতঃ ইহার জন্যই কলেজের শ্রেণীতে ছাত্রদের সমাগম হইয়া থাকে। অংশতঃ গতানুগতিক ভাবেও তাহারা উপস্থিত হয় বটে; কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য যে শিক্ষা সেকথা কচিৎ তাহাদের মনে উদিত হয়। ডিগ্রী পাইবার উপায়-স্বরূপ বলিয়া "পার্সেণ্টেজের" উপর ছাত্রদের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। ছলে, বলে, কৌশলে "পার্সেণ্টেজ" রাখিতেই হইবে। কাজেই "প্রক্সি" দিবার বিধি প্রচলিত হইয়াছে। কলেজের বক্তৃতা শুনিবার প্রয়োজন অনুভূত না হইলে, বক্তৃতা অনুধাবন ব্যতীতই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হইলে, শ্রেণীতে উপস্থিত হইবার জন্য এরূপ কড়াকড়ি ব্যবস্থার তাৎপর্য্য কি থাকিতে পারে? কাজেই অধিকাংশ ছাত্রই "প্রক্সি" দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ মনে করে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় নাকি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে তৈয়ারী। একটি ক্ষুদ্র বিষয়ে পার্থক্য এই যে, "পার্সেণ্টেজ" রাখিবার কোন নিয়ম তথায় নাই। কে কে উপস্থিত হইয়াছে তাহার অধ্যাপক কোন হিসাব রাখেন না। আমাদের কলেজগুলিতে কিন্তু ইহাই প্রধান বিষয়; ইহা লইয়া কত আড়ম্বর, কত আস্ফালন, কত কৌশল, কত বিরোধ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, "পার্সেণ্টেজের" আকর্ষণ না থাকিলেও সেখানে শ্রেণীতে বড় কেহ সহজে অনুপস্থিত হয় না; নিজের গরজেই উপস্থিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও কি ছাত্রেরা নিজের গরজেই শ্রেণীতে উপস্থিত হইবে? যদি হয়, তবে "পার্সেণ্টেজ" রাখিবার বিধির প্রয়োজন কি? যদি না হয়, তবে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রেণীতে উপস্থিত করিয়া কি কিছু লাভ হইতে পারে? শ্রেণীতে উপস্থিত হইলেই যে অধ্যাপকের বক্তৃতা মনোযোগ দিয়া শুনিবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ নহে। মনোযোগী নহে এরূপ অবাঞ্ছিত ছাত্রকে আবদ্ধ রাখিয়া অন্যান্যের শিক্ষার ব্যাঘাত জন্মাইবার কোন অর্থ হইতে পারে না।

কলেজের ছাত্রদের মনস্তত্ত্বের প্রথম কথা এই যে, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে যে অধ্যাপনা হয় তাহা ডিগ্রী অর্জ্জনের পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়; এবং দ্বিতীয় কথা এই যে, বাস্তব জীবনেও তাহার মূল্য কিছু নাই। ধনী কি দরিদ্র সকল শ্রেণীর ছাত্রেরই ডিগ্রীর প্রয়োজন আছে, কিন্তু জ্ঞানলাভের—বিশেষ করিয়া কলেজের শিক্ষায় যে জ্ঞানলাভ হয় তাহার প্রয়োজন নাই। শিক্ষার উপর এই অবিশ্বাস দূর করিয়া শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে এবং বাস্তব জীবনে এই শিক্ষার উপযোগিতা বৃদ্ধি করিতে না পারিলে, তাহাদের বর্ত্তমান মনোভাবের পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব।

দেখিয়াছি পরীক্ষার্থী তাহার পাঠ্য সাহিত্য ফেলিয়া রাখিয়া কোনও সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা হইতে চরিত্র-বিশ্লেষণ বা কাব্যের সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ মুখস্থ করিতেছে। এই বিশ্লেষণ শিখিবার আগ্রহ তাহার নাই এবং অধিকাংশ ছাত্র তাহা শিখেও না। কলেজের অধ্যাপনা হইতে যে এই সব শিখিতে পারা যায় এরূপ বিশ্বাসও তাহাদের নাই। কিন্তু পরীক্ষার

পাস করিতে হইবে; সুতরাং মুখস্থ করে এবং উত্তরপত্রে উদ্গীরণ করিয়া দিয়া আসে। যদি কখনও কোন পরীক্ষার্থী নিজ বিচারমত উত্তর লেখে, পরীক্ষক তাহা মুখস্থ করা বস্তুর সহিত সমপর্য্যায়ে ফেলিয়া বিচার করিবেন, ছাত্রদের ইহাই বিশ্বাস। সুতরাং তাহারা মুখস্থ করা ত্যাগ করিয়া বিশ্লেষণী শক্তির চর্চ্চা কখনও করে না। এক সময়ে স্নাতক-পূর্ব্ব স্তরে অঙ্কশাস্ত্রের অন্তর্গত "হাইড্রোষ্টাটিক্স" পাঠনা-কালে একটি ছাত্রকে অমনোযোগী দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তর যাহা পাইয়াছিলাম তাহার ভাবার্থ এই: "আমি কলা বিভাগের ছাত্র; বিষয়টি শিখিতে গেলে পরিশ্রম দরকার। কিন্তু উহা বাদ দিয়াই অঙ্কশাস্ত্রের পরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায় তাহা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। বিশেষতঃ আমার অর্থনীতিতে 'অনার্স'। তাহার সহিত 'হাইড্রোষ্টাটিক্সের' কি সংযোগ? ভবিষ্যতে অর্থনীতিই যখন পড়িব তখন ইহা অবহেলা করিলে এমন কি দোষের হইল?" আর একটি ছাত্রকে অনুরূপ প্রশ্ন করিলে সে বলিয়াছিল, "আমি মধ্যস্তরে (I.Sc.) ঐ বিষয়টি পড়িয়াছি। মোটামুটি তাহা হইতেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মত উত্তর করা যায়। আর দুই-একটা বিষয় যাহা দরকার বাছিয়া অবসরমত পড়িব। সমগ্রভাবে বিষয়টি শিখিবার আমার কি আগ্রহ থাকিতে পারে? আমি ভূতত্ত্বে 'অনার্স' লইয়াছি। তাহার সহিত বিষয়টির কি সংস্রব?" এ সব উক্তির উত্তর দিবার চেষ্টা করি নাই; কারণ সঙ্গত উত্তর খুঁজিয়া পাই নাই। ছুতারী শিখিতে যাইয়া কোনও সাগরেদ কি তাহার ওস্তাদকে এরূপ বলিবে:—"করাতখানি তুলিয়া রাখুন; উহার শিক্ষা ভিন্নই আমার ছুতারী চলিয়া যাইবে?" করাত ভিন্ন ছুতারী চলে না বলিয়াই এবং করাতের কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন হয় বলিয়াই এরূপ উক্তি শোনা যায় না। হয়ত কলেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে অবস্থা অন্যরূপ; হয়ত কোন কোন বিষয়ে অবহেলার ন্যায্য কারণ যথেষ্ট আছে। আজ তাহা বিশ্লেষণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যে সকল ছাত্রের প্রধান পাঠ্য অর্থনীতি তাহাদের পক্ষে অঙ্কশাস্ত্রের যে সব বিষয় প্রয়োজনীয়, যে সকল ছাত্রের প্রধান পাঠ্য পদার্থ-বিদ্যা তাহাদের পক্ষে তাহা প্রয়োজনীয় না হইতে পারে। বিবিধ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একই বিষয়ে বিভিন্ন রূপ পাঠ্য নির্ব্বাচন করা যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহা ভাবিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার গোড়াকার আমলে যেরূপ পুঁথিগত বিদ্যার যুগ চলিয়াছিল এখন আর তাহা চলিবে না। শিক্ষার উপর শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিতে হইলে বাস্তব জীবনে তাহার উপযোগিতা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

শিক্ষকদিগের কার্য্যক্ষেত্রের এক স্তর এই ছাত্রগণ; অপর স্তর ছোট ও বড়, অজ্ঞ ও বিজ্ঞ-কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ। সাধারণতঃ এই দুই স্তরকে জাঁতার উপর ও নীচের পাথর বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে যে গতানুগতিকতার স্রোত বহিতেছে কোনরূপ আঘাত করিয়া তাহাতে কল্লোলের সৃষ্টি না করা হয় ইহা কি সরকারী, কি বে-সরকারী কর্তৃপক্ষ উভয়েই চান। সুতরাং শিক্ষককে এই মূলমন্ত্রটি মনে রাখিয়া কাজ করিতে হয়। উপায়স্বরূপ তাঁহাকে অধ্যাপনার সময় কতকগুলি নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়। একটি এই যে, কোন কঠিন বিষয়বস্তু ছাত্রদিগের নিকট উপস্থিত করা চলিবে না। কোন বিষয় আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে উদ্ঘাটিত করিতে গেলেও ছাত্রদের বিরক্তি উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা। সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ পন্থা হইতেছে "পল্লবগ্রাহিতা"—অর্থাৎ উপর উপর বিষয়টির আলোচনা করা। ইহার মধ্যে মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নাবলীতে কোন কোন বিষয় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকে, তাহা যথাযথ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করিতে হইবে। ছাত্রজগতে ইহারই নাম "suggestion"। উপযুক্ত "suggestion" পরিবেশন করিতে পারিলেই ছাত্রসমাজ শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবার কারণ দেখিতে পায়; নতুবা নহে। শুধু অধ্যাপনার সময়ে নহে, অন্য সময়ে ও অন্যপ্রকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য প্রশ্ন উদ্ধার-কার্য্যে সহায়তা করিতে পারিলে ছাত্ররা আরও কৃতজ্ঞ হয়। কোন সহকর্ম্মী ছাত্রদের উপকারার্থে কলিকাতায় আসিয়া এই "suggestion" সংগ্রহ করিয়া যাইতেন এরূপ আমরা শুনিয়াছি; পুরস্কার-স্বরূপ তিনি ছাত্রদের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। আদর্শের দিক দিয়া ইহা যে অবাঞ্ছনীয় তাহা কে বুঝিবে? পরীক্ষায় সমগ্র বিষয়টির অভিজ্ঞতা নির্ণয় করাই যে উদ্দেশ্য এবং মাত্র নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্ব হইতে তৈয়ার করিয়া রাখিলে যে শিক্ষার ও পরীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় তাহা কে বুঝিবে? সমগ্র বিষয়টি না বুঝিয়া, কয়েকটি বিচ্ছিন্ন বিষয় মুখস্থ করিবার প্রবৃত্তির অধিক প্রশ্রয় দেওয়া যে শিক্ষকের কর্ত্তব্য নহে—বাস্তব অবস্থায় এই আদর্শ কে মানিয়া চলিবে?

বড় বড় শ্রেণীতে যে সকল বক্তৃতা দেওয়া হয়, শিক্ষার দিক দিয়া তাহা যে বিশেষ ফলপ্রদ হয় না, ইহা প্রায় অবিসংবাদিত সত্য। তথাপি গতানুগতিক ভাবে শিক্ষককে এই বক্তৃতাগুলি দিয়া যাইতে হয়। অন্যান্য দেশে বক্তৃতার বিষয়বস্তু, ছোট ছোট অনুশীলন-শ্রেণীতে (tutorial class) ছাত্রদিগের নিকট হইতে যাচাই করিয়া লইবার প্রথা আছে। অনুশীলন-শ্রেণীর ফলাফল দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল প্রভাবান্বিত হয়। তদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নগুলির সহিত বক্তৃতাসমূহের একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ। সুতরাং ছাত্রদের মনোযোগ স্বভাবতঃই বক্তৃতাগুলির উপর অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং বক্তৃতাগুলি বহুল

পরিমাণে সার্থক হয়। আমাদের দেশের অবস্থা অন্যরূপ। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করেন তাঁহারা এই স্তরে অধ্যাপনা করেন না। এমন হইতে পারে, শিক্ষক যে বিষয়টি প্রয়োজনীয় মনে করিয়া বিশেষ করিয়া শিখাইলেন, পরে দেখা গেল প্রশ্নকর্তা তাহা একেবারেই বর্জন করিয়াছেন। সমগ্র ভাবে পাঠ্য বিষয়টির সহিত পরিচয় প্রশ্নকর্তার থাকে কিনা সন্দেহ। তিনি উচ্চতর বিষয় লইয়া অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন করেন; নিম্ন স্তরের পঠিত বিষয় সম্বন্ধে এবং ছাত্রদের দক্ষতা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ পরিচয় তাঁহার নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ না থাকায় বক্তৃতাগুলির গুরুত্ব কমিয়া যায়। উপরন্তু অনুশীলন শ্রেণীদ্বারা বক্তৃতার বিষয়বস্তু যাচাই করিয়া লইবার প্রথা আমাদের দেশে এখনও প্রচলিত হয় নাই। সুতরাং বড় বড় শ্রেণীতে যে সকল বক্তৃতা দেওয়া হয় তাহার সার্থকতা বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ অনুশীলন-শ্রেণী প্রচলন করা বর্ত্তমান অবস্থায় প্রায় অসম্ভব। বে-সরকারী কলেজগুলিতে উপযুক্ত স্থান ও উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক উভয়েরই অভাব। কোন কোন সরকারী কলেজে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক এবং উপযুক্ত স্থান আছে বটে; কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ উভয়েরই ইহাতে অকুণ্ঠ সমর্থন আজিও মিলে নাই। তাই শিক্ষার শকট একমাত্র "লেক্‌চারে"র ভগ্নচক্রের উপরই বাহিত হইতেছে। শিক্ষকের কোন গত্যন্তর নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও কর্তৃপক্ষ উভয়কে ডিঙাইয়া নূতন কোন ব্যবস্থা চালাইবার ক্ষমতা তাহার নাই। যে স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহার মোড় ফিরাইবার ক্ষমতা তাহার নাই; অসহায় ভাবে স্রোতের সহিতই তাহাকে চলিতে হইবে।

অপাত্রে বিদ্যা দান করা নাকি নিষিদ্ধ। আজিকার দিনে শিক্ষক "বিদ্যা দান" করিতে আদৌ সক্ষম হন কিনা সন্দেহজনক। তথাপি বিদ্যাদানের যে অভিনয় চলিয়াছে তাহাতে তাহার পাত্রাপাত্র বিচার করিবার অধিকার নাই। বে-সরকারী কলেজগুলিতে ছাত্রের উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা বিচার করিবার অবকাশ কোথায়? ছাত্রদের উপরই কলেজের অস্তিত্ব এবং শিক্ষকদিগের জীবিকা অর্জ্জন নির্ভর করিতেছে। পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া কাহাকেও ফিরাইয়া দেওয়া চলে না। সরকারী কলেজে পাত্রাপাত্র বিচার করা অনেকটা সম্ভব হইত, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষ বাহিরের মুখোসের উপর যত মনোযোগী, শিক্ষানীতির প্রতি তত নহেন। বে-সরকারী কলেজের অনুকরণে অনেক সময় তাঁহারাও নির্ব্বিচারে ছাত্রসংখ্যা স্ফীত করিবার পক্ষপাতী। [illegible] ছাত্রসংখ্যা বেশী হইলেই কলেজ "বড়" হয় এবং কলেজ বড় হইলেই কর্তৃপক্ষের কার্য্যদক্ষতার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহার পর হতভাগ্য শিক্ষককে ছাত্র-সাগরের নানাপন্থী যুবকদের সহিত কারবার করিতে হয়। সকলকে সংযত রাখিয়া অন্ততঃ উপরের সজ্জাটুকু রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সকল শক্তি নিয়োগ করিতে হয়; শিক্ষার আদর্শ হয় ধূলায় অবলুণ্ঠিত। কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইলে, অধ্যক্ষের সহায়তালাভ ভাগ্যে খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটে; তিনি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিয়া শিক্ষকের সমালোচনা করেন মাত্র।

আদর্শের কথা চিন্তা করা যেন অধিকাংশ শিক্ষকের পক্ষে ভাববিলাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে; জাতিকে নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে; জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ, শক্তিশালী করিতে হইবে—এই গঠনকার্য্যের একটি বিশিষ্ট অংশের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত; এই পতাকা বহন করিবার মত শক্তি তাঁহাকে অর্জন করিতে হইবে। শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে তিনিও একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন। ইহা কে না চাহে? কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সময় ও সুযোগ তাঁহার নাই। বে-সরকারী কলেজে শিক্ষকতা করিলে দিবারাত্র অন্নচিন্তার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়; আজ সরকারী কলেজেও অনেকের অনুরূপ অবস্থা। হয়ত বা ইহার মধ্যেও কিঞ্চিৎ সময় বাঁচাইয়া এই কর্তব্যে মনঃসংযোগ করা যাইত। কিন্তু তাহারও সুযোগ সঙ্কীর্ণ। যদি কর্মস্থল কলিকাতার বাহিরে হয়, তবে ত আধুনিক চিন্তাধারার সহিত সংযুক্ত থাকিবার মত সকল প্রকার সাহিত্য (literature) তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে। কলিকাতায় কর্মস্থল হইলে সুযোগ কতকটা আছে বটে; কিন্তু বিঘ্ন এই—প্রথমতঃ স্নাতকোত্তর (post-graduate) ও স্নাতক-পূর্ব্ব (under-graduate) এই দুই স্তরের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক বিচ্ছেদ আমাদের দেশে বিদ্যমান। যাঁহারা নিম্ন স্তরে শিক্ষকতা করেন তাঁহারা প্রায় সকলেই উচ্চ স্তর হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া কেবলমাত্র অবসর সময়ে কোন উচ্চতর বিষয়ের সহিত নিত্যকার সংস্রব রক্ষা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে মাত্র শিক্ষক কেন, সমাজের নানা স্তর হইতে উচ্চতর বিষয়ে গবেষণার সৃষ্টি হইত। প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা উচ্চতর বিষয় লইয়াই সর্ব্বদা নিযুক্ত, তাঁহারাও আধুনিক চিন্তাধারার সহিত সর্ব্বদা সম্যক্ যোগ রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন না। স্নাতক-পূর্ব্ব স্তরের শিক্ষকের পক্ষে তাহা অধিকতর দুরূহ। উচ্চস্তরের সহিত সংযুক্ত না হইলে এবং কোন গবেষণার প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট না হইলে, চিন্তার আধুনিক ধারার সহিত যোগ রক্ষা করা যায় না; ইহা পরীক্ষিত সত্য। দ্বিতীয়তঃ, অক্লান্ত ভাবে চেষ্টা করিয়া যদি কোন শিক্ষক উচ্চতর বিষয়ে দক্ষতা অর্জ্জন করেন, তাহা হইলে কি তাহার

কোন পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে? শিক্ষাদান কর্মের মাহাত্ম্য যথেষ্ট; কিন্তু সাধারণ মানুষের ধর্ম এই যে, সে কর্মের ফল আশা করিয়া থাকে। সত্যকার বিদ্যোৎসাহী কি শিক্ষা পরিচালকদের মধ্যে অধিক আছেন? যদি না থাকেন, তবে শিক্ষকদের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণ-স্পৃহা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষা কখনই জাগ্রত হইবে না।

ছাত্র ও শিক্ষক ব্যতীত শিক্ষাক্ষেত্রের অপর একটি অংশ কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের মধ্যে কলেজের অধ্যক্ষ অন্যতম। সাধারণতঃ তিনি শিক্ষকদের মধ্য হইতেই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন; যদিও কখন কখন ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। শিক্ষকদের মধ্য হইতে যাঁহারা নির্ব্বাচিত তাঁহারা শিক্ষা-ক্ষেত্রের সকল অবস্থার সহিত পরিচিত এবং শিক্ষকদের সহিত তাঁহাদের একটা সূক্ষ্ম সহানুভূতি বিদ্যমান। আদর্শের কথা তিনি সকলই অবগত আছেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সে দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর তাঁহার নাই। হয় তিনি কলেজের (বে-সরকারী) আর্থিক স্থায়িত্ব বজায় রাখিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত, অথবা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জন করিবার জন্ত কেবল-মাত্র বাহিরের ঠাট বজায় রাখিতে অধিকতর প্রয়াসী। শিক্ষা-নীতির কথা উভয় ক্ষেত্রেই অবহেলিত হইয়া থাকে।

অপর কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত; (১) স্নাতকোত্তর ও (২) স্নাতক-পূর্ব্ব—এই উভয়বিধ শিক্ষার নীতিগত পরিচালনার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত। প্রথম ভাগটির পরিচালনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যক্ষ-ভাবে ও সমগ্রভাবে করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় ভাগের পরি-চালনা কার্য্যতঃ পাঠ্যতালিকা নির্দ্ধারণ ও পরীক্ষাগ্রহণে পর্য্য-বসিত। অন্যান্য দেশে এই দুই স্তরের মধ্যে একটা নিকট-সম্বন্ধ রক্ষা করা হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেশে অন্যরূপ। আজ যে আমাদের শিক্ষা ব্যর্থ প্রতিপন্ন হই-তেছে, সম্ভবতঃ ইহা তাহার অন্যতম কারণ। যাঁহারা পাঠ্য তালিকা নির্দ্ধারণ, প্রশ্ন রচনা ইত্যাদি করিয়া থাকেন তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে এই স্তরের শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন। এই স্তরের ছাত্রদের সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই। কাজেই সময়ে সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দেশগুলি পাত্রোপযোগী হয় না। অপর পক্ষে এই স্তরের শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সহিত সংস্রবের অভাবে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া উঠেন না। কি কারণে পাঠ্য-তালিকা পরিবর্ত্তিত হইল, প্রশ্নপত্রের ধারা পরিবর্ত্তিত হইল—তাহার প্রয়োজন স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করিতে পারেন না। শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যাপক দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। শিক্ষকের আন্তরিকতার অভাবে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশগুলিও কার্য্যকরী হয় না। এই দুই স্তরের সংযোগের জন্য কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই না। কলিকাতা শহরে যাঁহারা শিক্ষকতা করেন তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও স্নাতকোত্তর শিক্ষার সহিত সংযুক্ত করা হইয়া থাকে। কলিকাতার বাহিরে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের পক্ষে এ সুযোগ উপস্থিত হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এ সুযোগপ্রদান অনুগ্রহ বলিয়া মনে করেন; আবশ্যিক বলিয়া মনে করেন না। তথাপি কতক পরিমাণে কলিকাতার শিক্ষকদের পক্ষে আধুনিক চিন্তাধারার সহিত সংযোগ রক্ষা করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সহিত ভাববিনিময় করা সম্ভব। কলিকাতার বাহিরে যাঁহারা শিক্ষকতা করেন তাঁহাদের ব্যবস্থা কি হইবে? উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে তাঁহাদের কার্য্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হইলে সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাই কি ক্ষুণ্ণ হইবে না? তাহার জন্ত কি শিক্ষকই একমাত্র দায়ী?

স্নাতক-পূর্ব্ব স্তরের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর সংযোগ পরীক্ষা-পরিচালনায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অধিকাংশ স্থলে ছাত্র-দের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রশ্নকর্ত্তার থাকে না। সুতরাং প্রশ্নের প্রকৃতি সময়ে সময়ে অত্যন্ত সরল ও অত্যন্ত কঠিন এই দুই অবস্থার মধ্যে দোলায়মান হয়; সাধারণতঃ একটা নিম্নপর্য্যায়ে স্থির থাকে। কতকগুলি প্রশ্ন প্রতি তিন-চার বৎসর পর পর পুনরাবৃত্তি করা হয়। ইহা প্রশ্নকর্ত্তার শৈথিল্য নহে; অবস্থাগতিকে তিনি এরূপ করিতে বাধ্য হন। এরূপ না করিলে অধিকাংশ ছাত্র উত্তীর্ণ হয় না। হঠাৎ কোন পরিবর্ত্তন করিলে সমগ্র কাঠামোটি ভাঙিয়া পড়িবে। তাই দেখিতে পাই আদর্শের দিকে এক পা বাড়াইয়া, দুই পা পিছাইতে হয়।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ; স্নাতকোত্তর ও স্নাতক-পূর্ব্ব উভয় স্তরের শিক্ষাই একই অধ্যাপকমণ্ডলী দিয়া থাকেন। প্রত্যেক কলেজের স্বাতন্ত্র্য আছে; এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিও স্বতন্ত্রভাবে হইয়া থাকে। অপর পক্ষে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমতঃ স্নাতকোত্তর স্তর স্নাতক-পূর্ব্ব স্তর হইতে বিচ্ছিন্ন; দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষা-কার্য্য কেন্দ্রীভূত। ইহার ফলাফল আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারা সুফল পাওয়া যাইবে কিনা তাহা বিবেচনার সময় আসিয়াছে। কিন্তু আদর্শের দিক দিয়া বিকেন্দ্রীকরণই শ্রেয়ঃ স্থির হইলেও হয়ত বাস্তব অবস্থা দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিবে।

ছাত্র, শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ সকলে মিলিয়া তাই একটি দুষ্ট-চক্রের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রশ্ন বাছিয়া মুখস্থ করিলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়; সেইজন্ত ছাত্রের শিক্ষার আগ্রহ থাকে না—ফলে শিক্ষক গতানুগতিক ভাবে চলেন এবং কর্তৃপক্ষ শিক্ষা-তরণীর মুখ স্রোতের বিপরীত দিকে ফিরাইতে সাহস করেন না। এই দুষ্টচক্র কিরূপে ভেদ করিতে হইবে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা শিক্ষাবিদ্‌গণের হস্তে। কিন্তু ইহা যে আমা-দিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এই সত্য সর্ব্বসাধারণের উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

চট্টগ্রাম বিপ্লব-কাহিনী

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী

প্রীতিলতার অন্তিম-বাণী

"Long Live the Revolution"

I solemnly declare I belong to the Chittagong Branch of the Indian Republican Army whose lofty ideal is to liberate my mother-country from the yoke of the tyrannical, exploiting and imperialistic British Government and to establish a Federal Indian Republic instead. This remarkable Chittagong party has captured the imagination of the youths and has given a new impetus to the Revolutionaries of Bengal, nay of the whole of India by its unprecedented display of the memorable 18th April, 1930, and its subsequent heroic achievements on the holy Jalalabad hill, at Samirpur, at Feni, at Chandannagar, at Chandpur, at Dacca, at Comilla and at Dhalghat. I feel proud that I have been thought fit to be a member of such a glorious party.

We are fighting freedom's battle. Today's action is one of the items of that continued fight. British people have snatched away our independence, have bled India white and have played havoc with the lives of millions of Indians both male and female. They are the sole cause of our complete ruin,—moral, physical, political and economic—and thus have proved the worst enemy of our country, the greatest obstacle in the way of recovering our independence. So we have been compelled to take up arms against the lives of any and every member of the British community, official or non-official, though it is not at all a pleasant thing to us to take the life of any human being. In a fight for freedom we must be ready to remove, by any means whatsoever, every obstacle that stands in our way.

When I was summoned by Great *Mastarda*, the venerable leader of my party to join today's armed raid I felt myself fortunate enough seeing my long-felt hankering fulfilled at last and accepted the task with full sense of responsibility. But when I was asked by that exalted personality to lead the raid, I felt diffident and protested by saying why a sister should take the lead when so many able and experienced brothers were present. *Mastarda* soon convinced me by his able arguments and I took my leader's command on my head and invoked the Almighty Father, whom I have adored since my childhood, to assist me in discharging my grave duty.

I think I owe an explanation to my countrymen. Unfortunately there are still many among my countrymen who may be shocked to learn how a woman brought up in the best tradition of Indian womanhood has taken up such a horrible deed as to massacre human lives. I wonder why there should be any distinction between males and females in a fight for her cause (sic) why not sisters? Instances are not rare that Rajput ladies of hallowed memory fought bravely in the battlefield and did not hesitate to kill their country's enemies. The pages of history are replete with high admiration for the heroic exploits of these distinguished ladies. Then why should we, the modern Indian women, be deprived of joining this noble fight to redeem our country from foreign domination. If sisters can stand side by side with the brothers in a Satyagraha movement, why are they not so entitled in a revolutionary movement? Is it because the method is different or because females are not fit to take part in it? As regards the method, *i.e.,* armed rebellion it is not a novel method. It has been successfully adopted in many countries and the females have joined it in hundreds. Then why should India alone regard this method as an abominable one? As regards fitness, is it not sheer injustice to the females that they will always be thought less fit and weaker than the males in a fight for freedom? Time is come when this false notion must go. If they are yet less fit it is because they have been left behind.

Females are determined that they will no more lag behind and stand side by side with their brothers in any activities however dangerous or difficult. I earnestly hope that my sisters will no more think themselves weaker and will get themselves ready to face all dangers and difficulties and join the revolutionary movement in their thousands.

Now I shall briefly relate how I was drawn into the revolutionary organisation.

When I was studying in the Matriculation Class in the Dr. Khastagir's Girls' School, I got an idea of a revolutionary organisation in Chittagong and was told that there was a very powerful man, endowed with many qualities befitting a revolutionary leader, at the helm of this organisation.

During the two years' stay at Dacca for my Intermediate course I was engaged in preparing myself as a fit comrade of the Great *Masterda*. However I did not neglect my study and in the year 1930, I passed the Intermediate Examination standing first among the girls and fifth in the General Competition.

It was the morning of the 19th April, 1930, when I came home after the examination and heard of the glorious activities (of the previous night) of the Chittagong heroes. My heart was filled with deep admiration for these great souls. But it pained me much that I could not take part in such heroic exploits and could not have a glimpse of *Masterda* whom I

have adored since I heard his name. The thought of Jalalabad Martyrs tinched my heart to its very depth. With such a state of mind I left Calcutta for my B.A. Degree. The thought of my country was ever predominant in my mind. I saw the tears of mothers mourning the loss of their beloved sons who sacrificed their lives on the alter of freedom.

With all these new impetus came to me when I was asked by one of my brothers to visit Ram Krishnada in the Alipore Central Jail where in a solitary cell he was awaiting extreme penalty meted out to him by the British Law for his love of country. I passed for a cousin sister of Ramkrishnada and anyhow managed to see every day this smart jolly young hero. I had about forty interviews with him before his execution. His dignified look, free conversation, calm surrender to death, sincere devotion to God, childlike simplicity, loving heart, sound knowledge and profound realisation impressed me very deeply and made me ten times more forward than what I have been. The association of this dying patriot made a great contribution to the advancement of my life towards perfection. After Ramkrishnada's execution my hankering after some practical revolutionary action grew more intense. However, I had to pass some 9 months more in Calcutta for my B.A. Examination. In the meantime I tried several times to have an interview with *Masterda* but failed.

After my examination in 1932, I hurried towards home with a strong determination to interview *Masterda* anyhow. In a few days my long-cherished desire was fulfilled and I soon stood before *Masterda* and Nirmalda the two great personalities guiding the famous Chittagong Revolutionary Party.

In my short interviews with Nirmalda I recognised his noble and beautiful heart in which staunch revolutionary principles and strong religious temperament so nicely combined. I am fortunate that I got opportunities to come in touch with such a great soul that silently passed away from the world without giving the countrymen any opportunity to know how great, how pure, how uncommon it was.

Nirmalda's tragic end gave me a severe shock and I became more desperate. The result of B.A. Examination was out by this time and I passed with Distinction. A few days after I plunged myself heart and soul into the revolutionary preparations leaving for good my beloved family.

Firm faith in my Almighty Father and cordial devotion to Him have been the most valuable treasure to me since my childhood. I have carefully cherished this treasure in my bosom throughout my whole life and today when I have come finally prepared to embrace his feet, that I have so earnestly hankered, my treasure seems to be more precious, more pleasant and more illuminating. Had not my revolutionary ideal been throughly consistent with my devotion to the Almighty I would never have been a revolutionary.

With an invocation to Him, I launch to discharge my today's responsibility and pray to him to purge me clean so that I may be worthy offering to Him.

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমি ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার অন্তর্ভুক্ত। এই বাহিনীর উদ্দেশ্য—অত্যাচারী, শোষণকারী, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের কবল হইতে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করিয়া একটি ফেডারাল ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিক বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা। চট্টগ্রাম শাখার ১৯৩০ সনের ১৮ই এপ্রিল তারিখের অভূতপূর্ব কৃতিত্ব এবং ইহার অব্যবহিত পরের জালালাবাদ পাহাড়, সমীরপুর, ফেণী, চন্দননগর, চাঁদপুর, ঢাকা, কুমিল্লা ও ধলঘাটে ইহার অসমসাহসিক কার্য্যকলাপে শুধু বাংলাদেশের কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের বিপ্লবী দলের মধ্যে নূতন সাড়া জাগিয়াছে, যুবশক্তির দৃষ্টিও বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। আমি এইরূপ একটি দলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে ধন্য মনে করি।

আমরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত। আজিকার কার্য্যটি এই সংগ্রামেরই একটি অঙ্গ। ইংরেজ জাতি আমাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়া লইয়াছে, অবারিত শোষণের ফলে কোটি কোটি নরনারীর জীবন আজ বিপন্ন। আমাদের নৈতিক, শারীরিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ধ্বংসের মূল কারণ তাহারাই। তাহারা এইরূপে আমাদের দেশের নিকৃষ্টতম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির পক্ষে তাহারা বিষম বিঘ্ন। এ হেতু সরকারী বেসরকারী সকল ইংরেজের বিরুদ্ধেই আমরা অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছি, যদিও মনুষ্যের জীবন লওয়া কোন মতেই সুখকর কার্য্য নহে। স্বাধীনতার যুদ্ধে, যে-কোন উপায়েই হউক, সকল বাধাবিঘ্ন দূর করিতেই আমরা প্রস্তুত।

দলের শ্রদ্ধাস্পদ নেতা মাষ্টারদা যখন আজিকার আক্রমণে যোগদানের জন্য আমাকে আহ্বান করিলেন তখন আমি আমার বহুদিন পোষিত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করি, এবং সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াই এই কার্য্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছি। কিন্তু যখন তিনি ইহার নেতৃত্বভার আমার উপর অর্পণ করেন তখন আমি কতকটা কিন্তু বোধ করি এবং এই বলিয়া অনুযোগ দেই যে, এতগুলি অভিজ্ঞ ও যোগ্য ভ্রাতা উপস্থিত থাকিতে একজন ভগিনীর উপর কেন এই ভার দেওয়া হইতেছে। মাষ্টারদা তাঁহার ব্যবস্থার যুক্তিযুক্ততা আমাকে বুঝাইয়া দিলে আমি তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম এবং আশৈশব পূজিত সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইলাম, আমার কর্তব্য পালনে তিনি যেন আমার শক্তি দেন।

স্বদেশবাসীদের নিকট আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। তাঁহারা অনেকেই হয়ত ভাবিবেন, একজন ভারতীয় নারী স্বকীয় শিক্ষা-সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়া নরহত্যারূপ বীভৎস কার্য্যে কি করিয়া লিপ্ত হইতে পারে। আমি ভাবিয়া বিস্মিত হই, স্বাধীনতা-সংগ্রামে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে তারতম্য করা হয় কেন। রাজপুত-নারীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুনিধন করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাঁহাদের বীরত্ব-কাহিনীতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল। এইরূপ দৃষ্টান্ত থাকিতে আমরা আধুনিক ভারতীয় নারীগণই বা কেন বিদেশীর কবল হইতে স্বদেশ উদ্ধারের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিব না? সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যখন নারী-পুরুষ পাশাপাশি কার্য্য করিয়াছে, তখন বিপ্লবী আন্দোলনেই বা কেন পুরুষের সঙ্গে নারীগণ একযোগে কাজ করিতে পারিবে না? পদ্ধতি ভিন্ন, না নারীজাতি অযোগ্য বলিয়া? সশস্ত্র বিদ্রোহের ক্ষেত্রে নারীর যোগদান তো নূতন নহে। বিভিন্ন দেশে যে সব সার্থক বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে নারীগণ শতে শতে যোগ দিয়াছে। ভারতবর্ষেই বা ইহা কেন নিন্দার্হ হইবে? যোগ্যতা যদি বিচারের মাপকাঠি হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতা-সংগ্রামে নারীকে সর্ব্বদা পুরুষের চেয়ে কম যোগ্য বিবেচনা করা কি অসঙ্গত নহে? এই মিথ্যা ধারণা বর্জ্জন করিবার সময় আসিয়াছে। আজ সকল রকম কঠিন ও বিপৎসঙ্কুল কার্য্যেই নারীগণ তাহাদের ভ্রাতাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার বিশ্বাস, আমার ভগিনীরা দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া হাজারে হাজারে আসিয়া বিপ্লবী দলে যোগ দিবে। আমি কিরূপে বিপ্লবী দলে আসিয়া ভিড়িলাম এখন সেই কথা সংক্ষেপে বলিব। যখন ডঃ খাস্তগির বালিকাবিদ্যালয়ে প্রবেশিকা শ্রেণীতে পড়ি তখন আমি চট্টগ্রামের এই বিপ্লবী দলের কতকটা আঁচ পাই। তখন আমি শুনি যে, একজন বিশেষ শক্তিশালী লোক দ্বারা এই দলটি পরিচালিত হইতেছে। আই-এ পড়িবার জন্য আমি ঢাকায় দুই বৎসর কাটাই। তখন আমি মাষ্টারদার যোগ্য অনুচর হইবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে থাকি। আমি পড়াশুনা রীতিমত করি এবং ১৯৩০ সনে আই-এ পরীক্ষা দিয়া সমগ্র ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করি।

আমি ১৯৩০ সনের ১৯শে এপ্রিল প্রাতে ঢাকা হইতে চট্টগ্রামে পৌঁছি এবং ইহার পূর্ব্বরাত্রের বীরত্বব্যঞ্জক ব্যাপারটির বিষয় অবগত হই। আমার অন্তঃকরণ স্বতঃই ইহার বীর অনুষ্ঠাতাদের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রশংসায় ভরিয়া উঠে। কিন্তু আমি এই কারণে বিশেষ দুঃখিত হইলাম যে, আমি এই ব্যাপারে তখনও যোগ দিতে পারি নাই এবং মাষ্টারদাকে এত দিনে একটিবারের তরেও দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইল না। জালালাবাদে বীর-সন্তানদের নিধনে আমি প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইয়াছিলাম। মনের যখন এইরূপ অবস্থা তাহার মধ্যেই আমি বি-এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় রওনা হইলাম। দেশমাতৃকার কথা প্রতিনিয়ত আমার মন অধিকার করিয়া থাকিত। জননীর যে-সব প্রিয় সন্তান স্বাধীনতা-আহবে আত্মাহুতি দিয়াছে, তাঁহাদের সাশ্রুনয়ন দেখিয়া আমি অভিভূত হই।

আমি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রামকৃষ্ণদাকে দেখিতে যাইয়া নূতন প্রেরণা পাইলাম। এই সময়ে স্বদেশপ্রেমের অপরাধে ব্রিটিশ আইনে প্রাণদণ্ডে তিনি দণ্ডিত। তাঁহার ভগিনী বলিয়া আমি আমার পরিচয় দি, এবং প্রতিদিন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এইরূপে ফাঁসি হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি প্রায় চল্লিশ বার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তাঁহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চাহনি, তাঁহার সুমধুর আলাপন, মৃত্যুর নিকটে তাঁহার একান্ত আত্মসমর্পণ, ঈশ্বরে অচলা ভক্তি, শিশুবৎ সারল্য, প্রীতিপূর্ণ হৃদয়, গভীর জ্ঞান এবং প্রগাঢ় অনুভূতি আমার উপরে একটি দৃঢ় ছাপ রাখিয়া যায় এবং আমি পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ কর্ম্মতৎপর হই। আমার জীবনাদর্শ পরিপূর্ত্তির পক্ষে তাঁহার সঙ্গ অনেকখানি দায়ী। রামকৃষ্ণদার ফাঁসি হইয়া যাইবার পর আমি বিপ্লবী-কার্য্যে যোগ দিবার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ি। যাহা হউক, বি-এ পরীক্ষা দিবার জন্য আমাকে কলিকাতায় আরও নয় মাস থাকিতে হইল। ইতিমধ্যে মাষ্টারদার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কয়েক বারই চেষ্টা করি, কিন্তু দেখা হয় নাই।

১৯৩২ সনে আমার পরীক্ষা শেষ হইবার পর আমি এই সঙ্কল্প লইয়া বাড়ী যাই যে, যে প্রকারেই হউক এবারে আমি মাষ্টারদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবই। কয়েক দিনের মধ্যেই আমার দীর্ঘকালের বাসনা পূর্ণ হইল। শীঘ্রই আমি মাষ্টারদা ও নির্ম্মলদার দেখা পাইলাম। এই দুই জনই চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের প্রধান নেতা ও পরিচালক।

নির্ম্মলদার সঙ্গে স্বল্প আলাপেই বুঝিলাম তাঁহার অন্তঃকরণ কত উঁচু। খাঁটি বিপ্লবী-ধারা ও প্রগাঢ় ভগবদ্‌ভক্তি তাঁহাতে এমন সুন্দরভাবে মিলিয়াছে। এরূপ একটি মহৎ প্রাণের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল। ইহা যে আমার কত সৌভাগ্য বলিয়া শেষ করিতে পারি না। নির্ম্মলদা নীরবে চলিয়া গেলেন। স্বদেশবাসীরা তাঁহার মহিমা কিছুই বুঝিতে পারিল না।

নির্ম্মলদার শোচনীয় মৃত্যুতে আমি প্রাণে ভীষণ আঘাত পাইলাম, এবং আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলাম। এই সময়ে বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হয়। আমি প্রশংসার সহিত বি-এ পাশ করিলাম। ইহার কয়েক দিন পরেই প্রিয় পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনীর আবেষ্টনী চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া আমি বিপ্লবী কার্য্যে মনপ্রাণ সঁপিয়া দিলাম।

আশৈশব ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস এবং আন্তরিক ভক্তি আমার

জীবনের মূল সম্পদ। এই সম্পদকে আমি বরাবর সাগ্রহে রক্ষা করিয়া চলিয়াছি। আজ আমার চিরবাঞ্ছিত সেই ঈশ্বরপদলাভের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আমার ঈশ্বরে ভক্তি ও বিপ্লবের আদর্শের মধ্যে যদি সামঞ্জস্য না থাকিত তাহা হইলে আমি আদৌ বিপ্লবীই হইতে পারিতাম না। তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া আমি আমার গুরুদায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইতেছি। তিনি যেন আমাকে শুদ্ধচিত্ত করিয়া লন যাহাতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে চিরতরে সমর্পণ করিতে পারি।

প্রীতিলতার উদ্দেশ্যে সূর্য্য সেনের "Female organisation" প্রবন্ধের উৎসর্গ-পত্র

স্নিগ্ধ সুষমায় ভরা একটি পবিত্র ফুল তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য নিয়ে এই দীন পূজারীর কাছে এসেছিল মায়ের চরণে অর্ঘ্য হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। পূজারীকে কত বড়ই সে মনে করেছিল। কত বড় শ্রদ্ধার আসন তাকে দিয়েছিল, মায়ের কাছে উৎসর্গীকৃত হওয়ার জন্য। পূজারী ফুলটিকে অতি সমাদরে গ্রহণ করেছে। তার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতায়, সৌরভে মুগ্ধ হয়েছে, মায়ের চরণে তার যাওয়ার ব্যাকুলতা দেখে তাকে শ্রদ্ধা করেছে, শেষ মায়েরই চরণে তাকে অঞ্জলি দিয়ে তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছে। সে আজ মায়ের কাছে চলে গেছে, মা তাকে কত যত্নে কত আদরে বুকে তুলে নিয়েছেন।

পূজারী আজ ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে সে যেন আজ ফুলের সঙ্গে তার পরিচয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে ফুলের মহত্ত্বটুকু নষ্ট করে না ফেলে।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের পত্র

(১)

আলিপুর, সেণ্ট্রাল জেল
শুক্রবার বেলা দশটা
১০।৭।৩১ ইং

মনে হচ্ছে, একদিন তোমার ব্লাউজে একখানা স্বামীজির মনোগ্রাম আঁটা দেখেছিলাম। আমার ওটা খুব ভাল লেগেছিল। যুগগুরুর প্রতি এই অকপট শ্রদ্ধা এমনি করে চিরদিন তোমার অন্তর আলো করে রাখবে কি? ওকে তোমার খুব ভাল লাগে, আমারও তাই। কেউ যদি আমায় জিজ্ঞাসা করে ওর কী পরিচয় তোমার জানা আছে? কি জবাব দেবো ভেবে ত পাইনে। ওকে কতখানিই বা আমরা চিনতে পেরেছি। পশ্চিমের লোকেরা বলেছে cyclonic Hindu—আমার মতে He is the moral and spiritual force of all India—আজকালকার দিনে কথা কাটাকাটির ত অন্ত নেই। কারণ Blind belief জিনিষটা পছন্দ করে না কেউ। কিন্তু বিবেকানন্দর বেলায় কোন যুক্তিতর্কের আমল দিতে চাইনে। ওর প্রত্যেকটি কথা শুধু ওর কথা বলেই বিনা বিচারে মেনে নেওয়া চলে, ওর আদর্শের উপর একান্ত চিত্তে নির্ভর করা চলে। শুধু sentiment এর দিক থেকে আমার এ ধারণা জন্মেনি, ওকে চিনবার যেটুকু চেষ্টা আমি করেছি তার তরফ থেকেই আমি বলছি, মনুষ্যত্বের এত বড় আদর্শ আর কেউ দিতে পারেনি, পারবে কিনা তাও জানি না। মানুষকে শুধু মানুষ বলেই আর কেউ এমন ভালো বেসেছে কি?

অনেকদিন ভেবেছি তোমায় লিখব। তুমি লিখবে বলে আমিও লিখিনি। আমার চিঠির উত্তর পাব নিশ্চয়। বড় চিঠি লিখব ভেবেছিলাম কিন্তু ভাবলেই ত লেখা যায় না, তেমন পুঁজি ত থাকা চাই। সে যাক্ আমার চিঠি কিন্তু চাই-ই। বেশ ভালই আছি। বেহায়া শরীরটাকে বাগ মানাতে এখনও পারিনি। সব সময় অসুস্থ হব হব করে। আশা করি ভাল আছ। ভালবাসা জেনো। আসি তা হলে।

তোমার "রামকৃষ্ণদা"

(২)

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল
বুধবার ২৯।৭।৩১ ইং

তোমার baby envelopeখানা অদ্য দুপুরে পেলাম। তার মধ্যে দেখি এক দুই করে চার পাতা চিঠি। দেখে খুসী হলাম। বসে বসে অনেকবার পড়া যাবে। পড়তে গিয়ে পড়লাম গণ্ডগোলে। কিছুই দেখি পড়তে পারিনে। অবাক হয়ে লেখাগুলোর দিকে চাইছিলাম। আগে তোমার লেখা দেখে কত হাসতাম আজ কিন্তু প্রশংসা না করে পারছিনে। আমার লেখা দেখে তুমি নিশ্চয় হাস, হেসো না কিন্তু; আমি রাগ করব।

এত লম্বা চিঠি লিখেছ আমার কাছ থেকে তেমন একখানি পাবে বলে। কিন্তু তোমাকে জানাচ্ছি আমার লিখতে বড় কষ্ট হচ্ছে। আজ তুমি যখন এসেছিলে তখন তোমাকে বলেছিলাম সর্দ্দি হয়েছে কিন্তু তখনই ১০২° জ্বর ছিল। দুপুরের দিকে জ্বর বাড়তে লাগল, প্রায় ১০৪° এর বেশী উঠল। বিছানা নিতে হ'ল কিন্তু তবুও ইচ্ছা হ'ল তোমার চিঠির উত্তর লিখি। কাগজ তখনও পাইনি কাজেই লেখাও হয় নি। এখন রাত আটটা বেজেছে কিন্তু জ্বর ত এখনও একটু কমলো না। মাথাটা বুঝি এবার ভেঙ্গে যাবে। সারাদিন সকলে হুড়াহুড়ি করেছে, এখন

চিঠি লিখতে আমাকে সবাই বারণ করছে। কিন্তু এক দিন দেরী হওয়া যে আমার পক্ষে কি তাও বুঝতেই পার। বাম হাতে মাথায় ice bag চেপে ধরে লিখছি কিছুতেই সুবিধা পাচ্ছি না। তবু লিখে যাচ্ছি—তোমার কথা না রাখলে যে রাগ করবে।

এত কথাও তোমার মনে থাকে? আজ তোমার চিঠি পড়ে সমস্ত অতীতটা একবার চোখের উপর ভেসে উঠল। তুমি কিন্তু ভারী দুষ্ট, কি সব মনে করিয়ে দিচ্ছ বল ত? তুমি মনে করেছ আমি সব ভুলে গেছি কিন্তু সত্যি আমি ভুলিনি। আমার আজও মনে পড়ছে।

তোমার সজল চোখ দুটি, আর কাঁদ কাঁদ মুখখানি, কি নিষ্ঠুরই আমি ছিলাম। তুচ্ছ একটা কানবালার লোভে তোমার কান পাকড়ে ধরে ছিলাম; তোমার হয়ত এই স্মৃতিটুকুই আনন্দ দিচ্ছে, কিন্তু আমি ত আনন্দ পাচ্ছি না মোটেই। ঝোঁকের মাথায় কিলটা চড়টা মেরে বসি কিন্তু তুমি কাঁদছ দেখলেই প্রাণটা হায় হায় করে ওঠে। কিন্তু তোমার কাছে তা প্রকাশ করতে পারিনে। দাদাগিরির অভিমান এসে বাধা দেয়। এখনও কথা বলতে গিয়ে কোথায় জানি তোমাকে offend করে ফেলি। যখন বলি তখন হুঁশই থাকে না পরে analyse করে দেখে যখন টের পাই তখন তা বুকে তীরের মত বেঁধে।

ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। কত মধুর স্মৃতিই মনের কোণে জোট বেঁধেছে। সে দিন নেই কিন্তু সে সুখের রেশও ত যায়নি, আজ সুর গিয়েছে থেমে তবু "নীরবতায় বাজছে বীণা বিনা প্রয়োজনে", সত্যি সকল জিনিষেরই কল্পনা অতি মধুর। যতক্ষণ তুমি তোমার প্রার্থিত বস্তুটি পাওনি ততক্ষণ তা পেলে কেমন আনন্দ হবে তা ভেবে যতখানি তৃপ্তি পাও সত্যি সত্যি জিনিষটা পেয়ে গেলে তেমনটি পাও না, মনে হয় এ আর বিশেষ কি, যেন খুব সহজেই পেতে, এ কথা সত্যি নয় কি?

তোমার মতে আমি শুষ্ক, গান জিনিষটা মোটেই পছন্দ করিনে এই ত। কিন্তু তোমার এ ধারণা ভুল। গান জিনিষটা পছন্দ করে না এমন কাউকে ত আমি দেখিনে। উহার এমন আশ্চর্য্য শক্তি যে যে-কোন অবস্থায় মানুষের মনের একটা স্বচ্ছন্দ ভাব এনে দিতে পারে। তোমার গান শুনতে আমার সব সময়ে ভাল লাগত। কিন্তু তোমাদের মত বসে বসে তর্জ্জমা করবার ফুরসৎ আমার কোথায়—বিশেষতঃ আমি মোটেই সমঝদার নই, কানে বেশ লাগে—আসলে ছাই-পাঁশ কিছুই বুঝিনে; তোমাকে আমার গানের একটা নমুনা দিচ্ছি। একদিন এক বন্ধুর বাড়ীতে আমি আর সে দুইখানি চেয়ার পেতে বসে আছি, এমন সময় একটি ছোট মেয়ে কোলে একটি ছেলে নিয়ে এলো। ছেলেটির সে কি কান্না। কিছুতেই থামবে না। অগত্যা বন্ধুকে relief দেওয়ার জন্য বললাম "আমি একটা গান করি" শুনেই বন্ধুটি দু' হাতে আমার মুখ চেপে ধরল "তুই থাম ভাই, তোর গানের চেয়ে ছেলের কান্না ঢের ভাল।" দেখতো কেমন তারিফ করল আমার গানের। এখানে কিন্তু আমরা দু'জনে গান করতাম, কয়েকটি কোরাস আমাদের বাঁধা ছিল। বাইরে হলে এমন দুঃসাহস কখনো করতাম না। গানের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত পিঠে বিশ চড়ই পড়ত। কিন্তু এখানে বাধা দেয় না কেউ, তবে দু'জনে যখন সুর ভাঁজতাম তখন হাত শতকের ভিতর কেউ বোধ হয় কারো কথা শুনতে পেত না।

এখন তুমি কি করছ জানিনে। হয়ত বই নিয়ে বসেছ কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যাচ্ছে তোমার দু' পাতাও পড়া হচ্ছে না। 'মনটা তোমার কোথায় উধাও হয়ে চলে গেছে, তুমি তাকে বইতে গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করছ কিন্তু পারছ না। তুমি লিখেছ ডিগ্রী পাওয়াটাই বড় নয়; ডিগ্রী না পেলেও অনেকে বিদ্বান্ হতে পারে। এ যুক্তি আমি মানি নে তা নয় তবে আমার মত ব্যক্তি যদি একথা বলে তখনই লোকে মুখের উপর বলবে "Grapes are sour" কেমন বলবে ত? আমার কিন্তু বড় ভয় আমি কিছুতেই এ কথা বলতে পারিনে।

প্রায় তিন পাতা ত লিখলাম—আর ত পারছিনে, মাথাটা কেবল টন টন করছে, এবার আমাকে ছুটি দাও, এই নিয়ে খুসী থেকো, কেমন?

হিন্দু মেলা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সূচনা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইতে—কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা। কিন্তু এই ধারণা যে কতখানি ভ্রান্তিমূলক তাহা আজিকার দিনে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলা বোধ হয় আর আবশ্যক করে না।

নবগোপাল মিত্র

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্ব হইতেই ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মনে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্রত হইতে থাকে। আর এই বিষয়ে বাংলাদেশ ছিল অগ্রণী। ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভারতবাসীরা যে এক ও অভিন্ন এরূপ জ্ঞান তাহাদের বরাবর ছিল। রাষ্ট্রীয় বিষয়েও যে তাহাদের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য একই প্রকারের—ইংরেজ আমলে আধুনিক শিক্ষা গুণে আমরা এইরূপ ভাবিতে শিখি। এই ধরণের একজাতীয়তাবোধ—যাহাকে আমরা ইংরেজীতে বলিতে পারি "Indian nationhood"—বাঙালী মনীষীদের মনেই উদিত হয়। হিন্দু মেলাকে এই একজাতীয়তাবোধের প্রথম বহিঃপ্রকাশ বলিলে অতিরঞ্জন হইবে না। হিন্দু মেলার ইংরেজী নাম দেওয়া হইয়াছিল "National Gathering"। কিন্তু ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সহিত এই 'ন্যাশনাল গ্যাদারিং' বা হিন্দু মেলার একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। হিন্দু মেলা ছিল হিন্দুধর্ম্মাধীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলন-ক্ষেত্র, আর কংগ্রেস হইল বিভিন্ন ধর্ম্মাধীন ভারতবাসী মাত্রেরই সম্মিলন-স্থল। তবে একটি নিখিল-ভারতীয় সম্মেলনের ভাবাদর্শ আমরা হিন্দু মেলার মধ্যেই প্রথম পাইতেছি।

হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা হয় ১২৭৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংক্রান্তিতে (১২ এপ্রিল ১৮৬৭)। রাজনারায়ণ বসু রচিত একটি জাতীয় সভার অনুষ্ঠানপত্র হইতে ভাব লইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়ে কলিকাতা নগরীতে নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ইহার ছয় বৎসর পূর্ব্বেই একটি জাতীয় মেলার প্রতিষ্ঠার আয়োজনের কথা ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ তারিখের অমৃত-বাজার পত্রিকায় এইরূপ পাইতেছি,—

"হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক লিখিয়াছেন যে চৈত্র মেলার স্রষ্টা ব্রাহ্মেরা নন। হিন্দু পেট্রিয়ট জানেন না যে কয়েকজন ব্রাহ্ম কয় বৎসর হইল এইরূপ একটা মেলা করিবার নিমিত্ত বাঙ্গালার অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন।"*

পত্রিকা ১৮৭৪ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হিন্দু মেলার যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করেন তাহাতেও ইহার কিছু সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। পত্রিকা লেখেন,—

"অনেক দিন হইল একজন মহাপুরুষ দেশের দুর্গতি দেখিয়া ব্যাকুল হন। তিনি গ্রীক দেশীয় অলিম্পিক মেলার ন্যায় এখানে একটি মেলার উদ্যোগ করেন। তিনি ইহার নাম বসুর্ধজ রাখেন। ইহার নিমিত্ত দেশের কয়েকজন প্রধান২ লোকের নিকট উপস্থিত হন। সংবাদপত্রেও ইহা লইয়া আলোচনা হয়। কিন্তু বিধাতা তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইতে দেন না। ইহার কিছুদিন পরে মেদিনীপুরে এই বিষয়ে কতক উদ্যোগ করা হয়। তাহার পর বাবু নবগোপাল মিত্র এই বৃহৎ ব্যাপারে কৃতসঙ্কল্প হন।..."

হিন্দু মেলার মূল উদ্দেশ্য—সর্ব্বরকম পরবশ্যতা পরিহার পূর্ব্বক স্বাবলম্বন গুণটির উন্মেষ এবং আত্মশক্তি ও ঐক্যবোধের বৃদ্ধি। ইহার উপায়স্বরূপ জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় শিক্ষালয়, জাতীয় সভা ও জাতীয়

---

* 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র প্রথম তিন বৎসরের ফাইল হইতে বর্তমান লেখক কর্তৃক সংকলিত "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য। হিন্দু মেলা সম্পর্কে কিছু কিছু নূতন তথ্য ইহাতে আছে।

ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা এবং প্রতি বৎসর হিন্দু মেলার প্রকাণ্ড অধিবেশনে এ সকল বিষয়ের উন্নতি-পরীক্ষা, সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্র, ব্যায়াম ও কৃষিশিল্প দ্রব্যাদি প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা করা। সপ্তম-দশকের প্রথম দিকে যে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাও এই হিন্দু মেলারই প্রত্যক্ষ ফল বলা যায়।

২

জাতির সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষেও অভিনব। আমি "জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত" পুস্তকে (প্রকাশকাল ১৩৫২ আশ্বিন) ইহার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহার পর মেলাসম্পর্কিত কিছু কিছু নূতন তথ্য আমার হস্তগত হইয়াছে। এ সকল হইতেও মেলার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি হয়। মেলার চতুর্থ অধিবেশনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭০ তারিখে এইরূপ প্রকাশিত হয়,—

"হিন্দু মেলা। বিগত শনিবার ও রবিবার [১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী] মৃত বাবু আশুতোষ দেবের বেলগেছিয়াস্থ প্রশস্ত উদ্যানে মহাসমারোহে হিন্দু মেলা নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। মেলাস্থলে উক্ত দুই দিবসই অসংখ্য ইংরাজ, বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী, ও মুসলমান প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক একত্রিত হইয়াছিল। তথায় এতদ্দেশীয় নানাবিধ দ্রব্যজাত ও এতদ্দেশীয় স্ত্রীপুরুষগণের কৃত শিল্পাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। কৃষিপ্রদর্শন এবং নানাবিধ বৃক্ষলতাদির পারিপাট্য প্রদর্শন হয়, যে সকল দ্রব্যাদির প্রদর্শন হয় তাহা অতি চমৎকার, সকলে সেই সকল দেখিয়া একেবারে মোহিত হইয়াছেন। আমরাও এতদ্দেশীয়দিগের প্রাচীন কালের বাদ্যযন্ত্রাদি এবং পূর্ব্বকালে এতদ্দেশীয়দিগের সংগীত ও শিল্পশাস্ত্রাদির যেরূপ উন্নতি ছিল, তাহা দর্শন করিয়া বিস্মিত ও বর্ত্তমান সময়ের সহিত তাহার সাদৃশ্য সমালোচন করতঃ দুঃখিত হইয়াছি। মেলার কার্য্যবিবরণ পাঠ, এতদ্দেশীয়দিগের উত্তেজক সংগীতাবলি, ভীষ্মদেবের জীবনচরিত ঘটিত পুরস্কৃত প্রবন্ধ পাঠ, হিন্দুস্থানী বক্তৃতা প্রভৃতি যে সকল সভার কার্য্য দেখা গেল তাহাতে বোধ হয় এই সভা দ্বারা ভারতবর্ষের বিশেষ উপকার সাধন হইবে। মেলাস্থলে, ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ, সন্তরণ, নৌকার বাচ, অশ্বচালন প্রভৃতি বিষয়ে অপূর্ব্ব কৌশল সকল প্রদর্শিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আমোদজনক নানা প্রকার সঙ্গীত ও অঙ্গভঙ্গী, সাধারণের হাস্যরসোদ্দীপক হইয়াছিল। একদল ঐকতান বাদক স্বীয় নৈপুণ্যও প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমরা যেরূপ দেখিলাম তাহাতে এই মেলার কোন অংশই নিন্দনীয় নহে। অতএব সর্ব্বসাধারণেরই এ বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। অবশেষে আমাদের বক্তব্য এই—এই মেলার প্রারম্ভে ইহার নাম চৈত্র মেলা রাখা হয়। কিন্তু সাধারণে চৈত্রমাসে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন সময় পরিবর্ত্তনের অনুরোধ করাতে ইহার কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া হিন্দু মেলা নাম দিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিলাম এবারেও দুই জনের 'সর্দ্দিগর্ম্মি' হইয়াছিল। বিশেষ এ সময়েও রৌদ্রের প্রাদুর্ভাব বড় কম নহে। অতএব যখন চৈত্র মেলার নাম পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, তখন আরও একমাস পূর্ব্বে অর্থাৎ মাঘ মাসে হইলে আর কোন অসুবিধাই থাকে না।"

হিন্দু মেলার পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হয় ১৮৭১ সনের ১১, ১২ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী হীরালাল শীলের নৈনানস্থ বাগানে। এখানে প্রদর্শিত দুইখানি চিত্রের পরিচয় পরবর্ত্তী ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় এইরূপ পাওয়া যাইতেছে,—

"হিন্দু মেলা।...শ্রীযুক্ত বাবু তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় নামক একজন অবৈতনিক চিত্রকর কুমারসম্ভবের অনুকরণ করিয়া যে দুইখানি চিত্র চিত্রিত করিয়াছিলেন, তাহা পরম প্রীতিকর হইয়াছিল। একখানির ছবির নিম্নভাগে এই শ্লোক লিখিত ছিল,—

'ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি
যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার।'

অপর চিত্রখানির প্রতিকৃতি এই, কন্দর্প মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে উদ্যত, পার্ব্বতীও পুষ্কর-বীজমালা শিবের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন, বনদেবতাদ্বয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান। মহাকবি কালিদাস কন্দর্পের আকার অবলোকন করিয়া নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন :—

'স দক্ষিণাপাঙ্গ নিবিষ্টমুষ্টিং
নতাংশ মাকুঞ্চিত সব্যাপাদম্।
দদর্শ চক্রীকৃত চারু চাপম্
প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্।'

এই দুইখানি চিত্র সামাজিক মাত্রেরই মনোহরণ করিয়াছে। তদ্ভিন্ন ডাকাতে বাজী, ভোজবাজী, ব্যায়াম প্রদর্শন, ঘোড় দৌড়, বোট্ রেশ, কথকতা, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি নানা বিষয়ে যে সকল প্রদর্শন হইয়াছিল, তাহা যে কতদূর প্রীতিপ্রদ, তাহা লেখনীদ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে না।"

৩

বাঙালী এককালে অঙ্গচালনায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। তাহার তেজবীর্য্যও বহু ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইত। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার আওতায় এবং অধিক পরিমাণে শাসন-

নীতিবৈগুণ্যে তাহার শক্তিচর্চ্চায় ভাটা পড়িয়া যায়। বাঙালী যুবকদের মধ্যে শরীরচর্চ্চার উৎকর্ষ সাধন হিন্দু মেলার কর্ত্তৃপক্ষ একটি বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। নবগোপাল মিত্রের উৎসাহে জাতীয় ব্যায়ামাগার ব্যতীত আরও বহু ব্যায়াম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হিন্দু মেলার সাধারণ অধিবেশনে যুবকদের মধ্যে ব্যায়ামের প্রতিযোগিতা হইত। যাঁহারা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতেন তাঁহাদের হিন্দু মেলা নামাঙ্কিত পদক দেওয়ার রীতি ছিল। এইরূপ একটি পদকের উভয় পৃষ্ঠের চিত্র এখানে প্রদত্ত হইল।

হিন্দুমেলা
১৭৯৭ শক

প্রদর্শন
অন্নদা প্রসাদ মিত্রকে
হইল

* হিন্দু মেলার প্রদত্ত পদক

পদকটির অপর পৃষ্ঠা

ব্যায়ামকুশলী অন্নদাপ্রসাদ মিত্র এই পদকটি* পান। সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাঁহার যৎসামান্য পরিচয় এখানে দেওয়া গেল। অন্নদাপ্রসাদের আদিনিবাস হাওড়া জেলার অন্তর্গত বাঁকুল গ্রামে। তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সেই অতিশয় সাহসী বলিয়া পরিচিত হন। ডন কুস্তি ব্যায়াম সন্তরণ প্রভৃতিতে তিনি সুপটু ছিলেন। তাঁহার জন্ম ১২৬৭ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ। সুতরাং পদক প্রাপ্তিকালে ১৭৯৭ শক বা ইংরেজি ১৮৭৬ সনে তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক যুবক। তিনি বাংলার বাহিরে সুদূর পঞ্জাব পর্য্যন্ত গমন করেন। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া তাঁহার ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। বর্ত্তমান এম-এল বসু কোম্পানী নামক শিল্প-প্রতিষ্ঠান চেষ্টায় গড়িয়া উঠে। অন্নদাপ্রসাদ মিত্র তাঁহার রাশ্‌ নাম, পরবর্ত্তীকালে তিনি 'রাখালচন্দ্র মিত্র' নামে পরিচিত হন। হিন্দু মেলা ১৮৭৬ সনের ১৯শে ও ২০শে ফেব্রুয়ারী রাজা বদনচাঁদের টালা উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয়। এবারে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়।

হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাংলার বিভিন্ন অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্রমশঃ ব্যাপ্তিলাভ করে। ব্যায়াম বিদ্যালয়ও নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে।*

* অন্নদাপ্রসাদের পৌত্র শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার মিত্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পূর্ব্বের আগ্রহ-উদ্দীপনা কতকটা হ্রাস পাইলেও ১৮৭৯ সনেও ইহা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার বিবরণ ১৮৭৯, ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে গৃহীত হইল। এবারেও মেলার অধিবেশন হয় রাজা বদনচাঁদের টালার উদ্যানে ১১ই হইতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত। এবারকার একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল, বিখ্যাত বিদুষী পণ্ডিতা রমাবাঈর প্রধান অধিবেশন-দিনের (১৫ই ফেব্রুয়ারী) বক্তৃতা। প্রভাকরের বিবরণটি এই,—

"হিন্দু মেলা। বিগত মাঘ সংক্রান্তির দিবস উক্ত জাতীয় মেলা টালার রাজা বদনচাঁদের উদ্যানে আরম্ভ হইয়া গত সোমবারে সমাপ্ত হইয়াছে। মেলার প্রথম দিন অর্থাৎ সংক্রান্তির দিবস ১নং শঙ্কর ঘোষের লেনে নূতন কলেজিয়েট স্কুলবাটীতে খেলা সংক্রান্ত সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। কলিকাতা নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু চন্দ্রশিখর বসু হিন্দুধর্ম্মের সারবত্তা সম্বন্ধে এবং বাবু পদ্মনাভ ঘোষাল ভারতবর্ষের ইতিহাস নবীনরূপে লেখা আবশ্যক সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। বসুজ মহাশয়ের বক্তৃতা অনেকগুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণযুক্ত। পদ্মনাভ বাবুর বক্তৃতা সারগর্ভ এবং মনোহর হইয়াছিল।

মেলার দ্বিতীয় দিবস ১২ই ফেব্রুয়ারি বুধবার বৈকালে ভাসনাল স্কুলে নর্ম্যাল স্কুল, চাঁপাতলা স্কুল, এবং ভাসনাল

* একটি ব্যায়াম বিদ্যালয়ের কথা 'সংবাদ প্রভাকর' ১৮৭৮ সনের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে এইরূপ লেখেন,—

বঙ্গযুবকদিগের বলোৎকর্ষসাধন বিদ্যালয়। কয়েক দিবস অতীত হইল, আমরা প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি যে, আপার সারকিউলার রোডে বঙ্গীয় যুবকদিগের বলোৎকর্ষসাধন জন্য একটি নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। গত বুধবার ২৫শে ডিসেম্বর বৈকালে সেই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাধা হইয়াছে। তৎকালে রেবারেণ্ড ম্যাকডনাল্ড, বিবি ম্যাকডনাল্ড, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকার জমিদার বাবু শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, বাবু কালীচরণ সোম এবং বাবু লোকনাথ মৈত্র প্রভৃতি অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হইলে বিদ্যালয়ের ব্যায়াম বিভাগের শিক্ষক বাবু হরিচরণ মুখোপাধ্যায় বিশেষ দক্ষতার সহিত কতিপয় ব্যায়াম প্রদর্শন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। পরে সমবেত ছাত্রবৃন্দ ক্রিকেট, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি ক্রীড়ায় নিযুক্ত হন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিদ্যালয়ের কার্য্য সমাপ্ত হয়।...

স্কুলের ছাত্রগণ নানাবিধ ব্যায়াম প্রদর্শন করেন, দর্শকবৃন্দ এই ব্যা[illegible] দর্শনে পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

তৃতীয় দিবস বৃহস্পতিবারে এক সভা হয়, এবং বাবু রাজনারায়ণ বসু সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। মেলার সুযোগ্য সহ সম্পাদক বাবু নবগোপাল মিত্র ছাত্রবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া অনেকগুলি সারযুক্ত উক্তি দ্বারা নীতিগর্ভ উপদেশ দান করেন। পিতৃভক্তি, মনুষ্যত্ব এবং সাহস প্রকাশের উপায়, এবং রাজনীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্কবাদ করা ছাত্রদিগের কর্ত্তব্য নহে, এই কয়টি বিষয় তিনি বিশেষরূপে বিবৃত করেন।

চতুর্থ দিবস শুক্রবারে ১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে নবগোপাল বাবুর আবাসে জাতীয় সংগীত সমিতি হয়। শনিবার দিবসে কাশীপুরে কামানের কারখানার ঘাটের নিকট গঙ্গাবক্ষে ছাত্রদিগের বাচ খেলা হয়। ন্যাসনাল স্কুলের ছাত্রগণ তাহাতে জয়ী হন।

মেলার প্রধান দিবস রবিবারে উপরোক্ত উদ্যানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় নানাবিধ প্রদর্শনী, ক্রীড়া, গীত, বাদ্য, এবং অগ্নি-ক্রীড়া হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে বেলা সার্দ্ধ নবম ঘটিবার সময় ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে মহাসমারোহে মেলাস্থলে যাত্রারম্ভ হয়। পতাকা, আশাসোঁটা, এবং জাতীয় কীর্ত্তন করিতে করিতে মেলার অনুষ্ঠাতা এবং হিতসাধকগণ বরাবর মেলাস্থলে গমন করেন। এতদ্দর্শনার্থ সহস্র সহস্র লোক রাজপথে সমবেত এবং অসংখ্য নরনারী নিজ নিজ বাটীর গবাক্ষাদি হইতে দেখিতে থাকেন। এ দৃশ্যটি পরম রমণীয় হইয়াছিল। মেলাস্থল নানাবিধ পতাকা, পত্র এবং পুষ্পাদিতে পরম রমণীয়রূপে শোভিত হইয়াছিল। দ্বারদেশে হিন্দু প্রথামত কদলী বৃক্ষাবলী রোপিত হইয়াছিল। মেলাস্থলে নানাপ্রকার ক্রীড়া এবং ব্যায়াম প্রদর্শিত হইয়াছিল। একজন বাঙ্গালীর সহিত একজন পঞ্জাবী পালোয়ানের কুস্তী হইয়াছিল। বাঙ্গালী জয়লাভ জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও শেষে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, ইহা দুঃখের বিষয় নহে। গতবর্ষে বাঙ্গালী পঞ্জাবীকে হারাইয়াছিল, এবার বাঙ্গালী হারিল, তাহাতে দুঃখ কি? চেষ্টা করা হউক আগামীবর্ষে আবার পঞ্জাবী হারিতে পারে। ইতিহাস যে বাঙ্গালী ও পঞ্জাবীকে শৃগাল এবং সিংহরূপে প্রভেদ করিতেছে, সেই বাঙ্গালী যে এখন পঞ্জাবীর সহিত কুস্তী করিতে সমর্থ হইল, ইহাই প্রশংসার বিষয়। উক্ত কুস্তীর পর দেবী সিংহ এবং পালোয়ান সিংহ পরস্পর অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া কুস্তী করে, কিন্তু শেষ জয় পরাজয় ধার্য্য হয় না। কয়েকজন কর্ণাটী বিচিত্র ক্রীড়া করিয়া দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় বাঙ্গালী বালিকাগণও বিচিত্র শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেলাস্থলে নানাবিধ দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। সূচীকার্য্য, কারুকার্য্য, এবং নানা স্থানের বহুবিধ প্রস্তর ও মৃত্তিকার দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। বিখ্যাতা বিদুষী রমাবাই ভারতীয় ভাষা শিক্ষা আবশ্যক, হিন্দুললনাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং পুরাকালে আর্য্য নারীদিগের স্বাধীনতা সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা করেন, তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে দর্শক মাত্রেই বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দান করেন। রজনীতে অগ্নিক্রীড়ার পর মেলা ভঙ্গ হয়। দিবাভাগে বৃষ্টি হওয়ার আশামত লোক সমবেত হয় নাই। বলা বাহুল্য যে মেলার সুযোগ্য সম্পাদক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সহকারী সম্পাদক বাবু নবগোপাল মিত্রের যত্নে, শ্রমে, এবং অধ্যবসায়ে এই মেলা জাতীয় মান রক্ষা করিতেছে।"

হিন্দু মেলার চতুর্দ্দশ অধিবেশন খুব জাঁকাল রকমের হয় নাই। ইহার পরবর্ত্তী অধিবেশনের কথা আর জানা না গেলেও হিন্দু মেলার জাতীয় ভাব এবং নিখিল-ভারতীয় আদর্শে ভারতবাসী নেতৃবৃন্দ অচিরেই উদ্বুদ্ধ হইলেন। কলিকাতার ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স এবং বোম্বাইয়ের ন্যাশনাল কংগ্রেস উক্ত ভাবাদর্শেরই প্রতিরূপ বলা যায়।

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

(১)

সে দিন বঙ্গের বুকে যুগান্তের জাগিল জোয়ার,
গঙ্গার তরঙ্গে বাজে শতাব্দীর অপূর্ব্ব সঙ্গীত,
মূর্চ্ছিত প্রাণের মাঝে ফিরে আসে মুহূর্ত্তে সম্বিৎ,
সে উল্লাসে বিপ্লাবিত জীবনের এ-পার ও-পার।
মন্ত্রিত কাব্যের পথ, দিকে দিকে শুনি যে ঝঙ্কার,
কলার জগতে কই সে কল্লোল? কোথা পথিকৃৎ?
বসন্তের আগমনে স'রে যাক্ দুর্দ্দিনের শীত;
তুমি এলে, এল পুষ্প, এল বর্ণ-সুষমা-সম্ভার।

চোখে তুমি দিলে দৃষ্টি, প্রাণে নব-সৃষ্টির সন্ধান,
রেখায় নূতন ছন্দ, রূপে দিলে যে রীতি স্বকীয়
চিরন্তন ভারতের, নহে তুচ্ছ বিদেশের দান,—
কিছু-বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিছু তার জানি অতীন্দ্রিয়।
আত্মবিস্মৃতের স্মৃতি ফোটালো কি সে-তুলির টান?
হে শিল্পী অতুলনীয়, তুমি এক, তুমি অদ্বিতীয়।

(২)

হে স্রষ্টা, আনিয়া দিলে জীবনের নূতন প্রেরণা,
নবীনের চিত্তে হ'ল অন্তহীন আশার উদ্ভব,
নব-নবোন্মেষ যার সে বুদ্ধির ঘটিল সম্ভব,
তোমার জ্যোতির স্পর্শে দীপে দীপে জাগে উদ্দীপনা।
প্রতিমা রচিয়া চলে অপরূপ তোমার কল্পনা,
কত সম্রাটের স্বপ্ন, ভাষাহীন কত দিব্য স্তব,
কত বন্দিনীর ব্যথা! এনে দিল আনন্দ-বিপ্লব
কলা-কুতূহলী মনে অনুপম তোমার রচনা।

কত বর্ণ, কত ছন্দ, কত ভাব, কত-না ভঙ্গিমা,
প্রতি অঙ্গে রূপায়িত, রেখায়িত লীলার লাবণি,
চিত্রে চিত্রে বৈচিত্র্যের নাহি বুঝি সীমা-পরিসীমা,
কখনো কঠোর তুমি, কখনো বা কোমল নবনী।
যুগে যুগে জেগে রবে, শিল্পীগুরু, তোমার মহিমা,
সূর্য্য-চন্দ্র চেয়ে থাকে যার পানে, তুমি সে অবনী।

(৩)

চঞ্চল জগতে চলে অন্তহীন ছন্দের হিন্দোল।
যে ছন্দে আনন্দময় নিখিলের শাশ্বত কবিতা,
যে ছন্দে বাজায় বীণা জ্যোতির্ম্ময়ী বাণীর সবিতা,
সে ছন্দে তোমার তুলি তুলিল যে রসের হিল্লোল।
ঘুমন্ত পুরীর মাঝে দিকে দিকে জাগরণ-রোল,
বিস্মৃতির পার হ'তে দেশে ফিরে এল নির্ব্বাসিতা,
দেখা দিল স্বপ্নোত্থিতা নব রূপে চির-পরিচিতা,
মূর্চ্ছিত নিঃশব্দ চিত্রে শুনিলাম জীবন-কল্লোল।

অতি সুনিপুণ স্পর্শে বেজে ওঠে যন্ত্রের বেদনা,
মায়াময় সে অঙ্গুলি ধরে তুলি, ধরে তা লেখনী,
যৌবনে মাতায় সে যে, জাগায় তা শিশুর চেতনা,
লেখায় রেখায় তাই শুনি সুর-সৌন্দর্য্যের ধ্বনি।
অভিনন্দনের ছলে গাহি আজ তোমার বন্দনা,
তোমার প্রতিভা, দেব, লোকোত্তর হৃদয়-রঞ্জনী।

(৪)

আলো-ছায়া লুকোচুরি—এই সৃষ্টি কার খেলাঘর?
সোনার আকাশ-পটে গ্রহ-তারা সূর্য্য-চন্দ্র আঁকা,
লীলায়িত ভঙ্গীভরে বিহঙ্গেরা মেলে দেয় পাখা,
সে লীলায় যোগ দিলে তুমি শিল্পী, তুমি চিত্রকর।
তুমি কবি, কলাবিৎ, রূপদক্ষ, তুমি যে ভাস্কর।
ভেসে চলে ভাবগুলি সংখ্যাহীন সে হংস-বলাকা,
তবুও সুদূর নও, তুমি কর ধুলা-মাটি-মাখা,
শিশুর খেলার সাথী, বিধাতার লীলা-সহচর।

অতি ক্ষুদ্র পুত্তলিকা প্রাণ পেলে হোক তা মৃন্ময়ী,
ছোট-বড় নাহি ভেদ, নির্ব্বিচারে রচিছ খেলনা।
মনের মাধুর্য্যে তুমি মনোহর, তাই ত বিনয়ী,
শিশুচিত্তে, হে সুন্দর, আনো নিত্য নব সম্ভাবনা।
অবনীর ইন্দ্র তুমি, তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি যে বিজয়ী,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সেতু বাঁধে, হে আচার্য্য, তোমার কল্পনা।*

* রূপবাণী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অবনীন্দ্র-জয়ন্তী-সভায় পঠিত

দক্ষিণ-স্পেনের সেভিয়ে অঞ্চলের একটি নৃত্য

স্পেনের লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত সকল দেশেরই সাংস্কৃতিক সম্পদ। সরল পল্লীজীবনের ইহা সুখ-দুঃখের স্বতস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি। সুদূর অতীতে উদ্ভূত হইয়া কালস্রোতের বহু পরিবর্ত্তিত পারিপার্শ্বিকের প্রভাব সহ্য করিয়া এই সকল লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত এখনও এত প্রাণবন্ত রহিয়াছে যে, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকল রসগ্রাহী মনে তাহা আনন্দ পরিবেশন করিয়া আসিতেছে। আধুনিক যুগের আড়ম্বরময় জীবন-যাত্রায় আকৃষ্ট হইয়া লোকে এই অপূর্ব্ব সম্পদকে অবহেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ফলে বহু প্রকারের লোকনৃত্য লোপ পাইয়াছে, কোনও নৃত্যের মধ্যে আধুনিক নৃত্য মিশ্রিত হইয়া তাহার আসল রূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

কিছুদিন হইতে যে সকল পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে পুরাতন ঐতিহ্যকে রক্ষা করিবার প্রবণতা দেখা গিয়াছে স্পেন তাহাদের অন্যতম। স্পেনের প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন বিচিত্র, স্পেনিশ জাতির ইতিহাসও তেমনি বৈচিত্র্যময়। এই কারণেই ইহাদের লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের তুলনা সমগ্র ইউরোপে আর কোথাও মেলে না। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়া স্পেন একটি প্রকাণ্ড উপদ্বীপ, আয়তনে আমাদের ব্রহ্মদেশের সমান। ইহার উত্তর সীমায় সু-উচ্চ পিরেনিস্ পর্ব্বত, মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ পর্ব্বতবহুল মালভূমি, মালভূমির মধ্য দিয়া অনেকগুলি গভীর নদী প্রবাহিত। সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী পূর্ব্বাংশ সমতল। দক্ষিণে গোয়াদাল্কুইভার নদীর জলময় উপত্যকা। দেশের কোনও অংশে সারা বৎসর প্রচুর বারিপাত হয়, সেই অংশের জমি উর্ব্বর—তাহাতে কমলা, আঙ্গুর প্রভৃতি ফলের এবং গম, ভুট্টা প্রভৃতি ফসলের চাষ হয়। আর এক অংশ ঊষর পর্ব্বতমালার উপরি-ভাগে পাইনবন, পাদদেশ ঘন তৃণসমাচ্ছন্ন। একদিকে এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আর এক দিকে স্পেনীয়দের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। বর্ত্তমান স্পেনীয়েরা বহুজাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত। অতীতে কেল্ট, লাটিন, টিউটনিক ও মুর প্রভৃতি জাতিসমূহ এই দেশ জয় করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। বিজেতা জাতিগুলির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান স্পেনীয়দের মধ্যে বর্ত্তাইয়াছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ঐ সকল জাতির বৈশিষ্ট্যের ছাপ সুস্পষ্ট। এই কারণেই এখানে এত সুন্দর সুন্দর ও রকমারি লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত প্রচলিত। নৃত্যের পদক্ষেপের ভঙ্গী, সঙ্গীতের ছন্দ ও ঝঙ্কার এবং নৃত্য-গীত উৎসবে যোগদান-কারীদের পোশাক-পরিচ্ছদের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়।

স্পেনের নৃত্যে প্রধানতঃ দুইটি বিশিষ্ট ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। এক ক্লাসিক—সম্পূর্ণ ভাবে স্পেনের নিজস্ব। অতি পুরাতন কাল হইতে শিল্পীপরম্পরায় এই ধারা চলিয়া আসিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নাচ ও গান বিভিন্ন ধরণের। প্রত্যেক প্রদেশ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অতীব নিষ্ঠার সহিত রক্ষা

বার্সেলোনায় প্রচলিত একটি বিশেষ নৃত্য

ধনী লোকের সামাজিক নৃত্যের আসরে সমাদর পাইলেও ইঁহাদের নৃত্য লোকনৃত্যের মর্য্যাদা পায় নাই।

ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে যে সকল বিভিন্ন প্রকারের লোকনৃত্য প্রচলিত, তাহা পুরাকাল হইতে শিল্পীপরম্পরায় অবিকৃত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। এই সকল নৃত্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা স্পেনীয়েরা তাহাদের পবিত্র ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। তাহাদের মতে নৃত্যশিল্প স্বভাবজাত, সৌন্দর্য্যময় প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত। যে বৃক্ষে এই পুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়াছে তাহার মূল দেশের মৃত্তিকার অন্তস্তলে নিহিত।

কথিত আছে, এক সময় পোপের নিকট অভিযোগ আসিল ফান্দাগো নৃত্য দুর্নীতিপূর্ণ। এই নৃত্য বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ধর্ম্মযাজক পরিষদে এই মর্ম্মে প্রস্তাব উপস্থাপিত হইল যে, যে কেহ এই নৃত্য দেখাইবে, স্পেন হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া

বেলেয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের একটি নৃত্যভঙ্গী

করিয়া আসিতেছে। ঐ সকল প্রদেশের নাচ ও গানের সঙ্গে যে সকল বাদ্যযন্ত্র বাদিত হয় তাহাও অঞ্চলভেদে স্বতন্ত্র। ক্লাসিক পর্য্যায়ের নৃত্যে পাদক্ষেপে সামান্য পরিবর্ত্তন করাকেও ইহারা অপরাধ বলিয়া মনে করে।

অপর ধারার নাচের নাম ফ্লামেঙ্কো। মূলতঃ ইহা বেদিয়া নাচ। কালক্রমে দেশীয় নৃত্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া পরিবর্ত্তনের ফলে বর্ত্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। খাঁটি স্পেনীয় নৃত্যে বেদিয়া নাচের প্রভাব একেবারেই নাই। বেদিয়া নাচের গতি দ্রুত, ভঙ্গী লীলায়িত, নর্ত্তক বা নর্ত্তকীর দেহ-বাহু দ্রুত সঞ্চরমাণ। বেদিয়া নাচ দর্শককে চমৎকৃত করে, আনন্দ দেয়—কিন্তু তবুও ইহা চটুল ও হাল্কা। স্পেনীয়দের মতে যাহাতে গাম্ভীর্য্য নাই তাহা ইতর শ্রেণীভুক্ত। কোনও গৃহস্থের কন্যা সাধারণতঃ বেদিয়া নাচ শেখে না। তবে কেহ যদি নৃত্যবিদ্যাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। আধুনিক কালের কোন কোন প্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী বেদিয়া নাচের সহিত স্পেনীয় নৃত্যের দুই-একটি পদক্ষেপের ভঙ্গী সংযোগ করিয়া নূতন নৃত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইঁহারা রঙ্গমঞ্চে খ্যাতিলাভ করিলেও বা সৌখিন

দেওয়া হইবে। ধর্ম্মগুরু পোপই ছিলেন স্পেনীয় রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা। একজন ধর্ম্মযাজক বলিলেন যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইতেছে, তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া উচিত। ইহা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় নর্ত্তককে বিচারকমণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থিত হইবার আদেশ দেওয়া হইল। অভিযুক্ত নর্ত্তক ধর্ম্মযাজকদিগের সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিল।

দাবে। নৃত্য
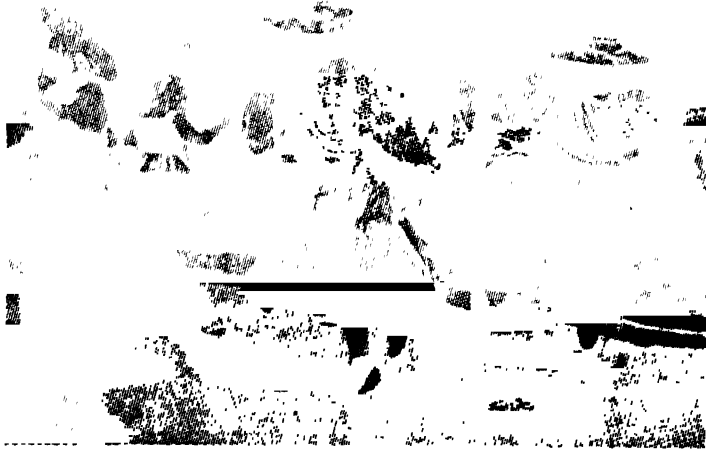
অল্পক্ষণের মধ্যেই বিচারকদিগের রুক্ষ ভ্রুকুটিপূর্ণ মুখমণ্ডল বিমল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। একে একে তাঁহারা নৃত্যের তালে তালে হাতে ও পায়ে তাল দিতে লাগিলেন। শেষে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া সকলেই সেই নর্ত্তকের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অঙ্গভঙ্গী অনুকরণ করিয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। ফান্দাগো নৃত্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বাতিল হইয়া গেল। এই কাহিনীটি সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত।

কয়েক বৎসর হইতে স্পেনের লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীতের একটি সুপরিচালিত বাৎসরিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। মেয়েরাই বিশেষ করিয়া এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া থাকে। ইহার ফলে এক দিকে যেমন আঞ্চলিক নৃত্য-গীতগুলির উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে অন্য দিকে তেমনি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের নৃত্যগীত শুধু সেই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। এই প্রতিযোগিতা অন্যান্য ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার ন্যায় সর্ব্বোতোভাবে নিয়মানুগ। নিয়মগুলি কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি কার্য্যালয় হইতে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রাদেশিক কার্য্যালয়গুলিতে প্রেরিত হয়। সেখান হইতে স্থানীয় নৃত্যগীতের দলের মধ্যে প্রচারিত হয়। প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন ও ইহার জন্য সকল ব্যবস্থা করেন তাহা দেখিলেই যায়, প্রতিযোগিতার সাফল্যের জন্য তাঁহারা কতদূর যত্নশীল।

কোন্ দলের সহিত কোন্ দলের কোন্ তারিখে কোথায় প্রতিযোগিতা হইবে এবং প্রতিযোগী দলগুলিকে তাহাদের সাজসরঞ্জামসহ কিভাবে প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে সে সম্বন্ধে এক রকম ব্যবস্থা হয়। অনুরূপ ব্যবস্থা হয় কোন্ কোন্ শ্রেণীর নৃত্যগীতের প্রতিযোগিতা হইবে তাহা লইয়া।

আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় যে দল শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষিত হয়, সেই দলকে পরবর্ত্তী প্রাদেশিক প্রতিযোগিতার জন্য পাঠানো হয়। প্রাথমিক প্রতিযোগিতার আসরে বিচারক থাকেন সেই অঞ্চলের খ্যাতনামা নৃত্যগীত-বিশারদগণ। প্রাদেশিক প্রতিযোগিতার আসরের বিচারকমণ্ডলী গঠন করিয়া দেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি কার্য্যালয়। এই বিচারকমণ্ডলীতে থাকেন দুই জন খ্যাতনামা গায়ক, যাঁহারা লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ, আর থাকেন জাতীয় সংসদের একজন প্রতিনিধি।

নৃত্য ও গীতের দলগুলি অঞ্চল হিসাবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। গ্রাম্য, নাগরিক ও প্রাদেশিক। নৃত্য বা গীত অথবা মিশ্র নৃত্য-গীতের দল, এ দিক দিয়াও দলগুলি তিন পর্য্যায়ে বিভক্ত। প্রতিযোগিতার আসরে গানের দলকে তিনটি গান অবশ্যই গাহিতে হয়—একটি ধর্ম্মবিষয়ক, একটি পল্লীগীতি এবং একটি পৌরাণিক গাথা। ইহা ছাড়া, দলের ইচ্ছা ও পছন্দ-মত তাহাদের নিজ অঞ্চলে প্রচলিত লোকসঙ্গীত অন্ততঃপক্ষে দুইটি গাহিতে হয়।

ক্যানারি দ্বীপের 'কোনিয়া' নৃত্য

আরাগোন প্রদেশের 'বোতা' নৃত্য

দল, ১১৪টি নাচের দল ও ৫০টি মিশ্র নৃত্য-গীতের দল—মোট শিল্পী-সংখ্যা ছিল ৭৬৭৭। তৃতীয় বৎসরে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় নিম্নলিখিত রূপ—গায়ক-দল ৩০৩, নর্তক-দল ২১২, মিশ্র নর্তক ও গায়কের দল ১৭৫—যোগদানকারী শিল্পী-সংখ্যা ২৪৭২৪।

এই প্রসঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য, ধীরে ধীরে কি ভাবে লোপ পাইয়া যাইতেছে তাহা ভাবিলে এবং ইহা সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাই যে নাই, সেকথা মনে হইলে গভীর নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। পল্লীবাসীর সহজ জীবনধারা ব্যাহত হইয়া যাওয়ায় স্বাস্থ্যহীন, অন্নহীন, ঋণজর্জরিত, দারিদ্র্যক্লিষ্ট পল্লীবাসীর প্রাণে পূজা-পার্ব্বণে আর উৎসবের আনন্দ দেখা যায় না। লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যে তাহাদের সজীবতা আর প্রকাশ পায় না। বহুপ্রকার লোকনৃত্য এবং বহু পালাগান একদা পূর্ব্ববঙ্গে প্রভূত পরিমাণে প্রচলিত ছিল। ঐ সকল পালাগান কিছু কিছু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নির্দ্দেশে চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাহা কয়েক খণ্ডে ছাপা হইয়াছে। মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন সাহেবের সংগৃহীত লোকসঙ্গীত এক সময় 'হারামণি' নামে 'প্রবাসী'তে ছাপা হইত। তাঁহার সঙ্কলিত 'হারামণি' এক খণ্ডও

সমস্ত লোকনৃত্যই যুগ্মনৃত্য। প্রতি দলে নর্ত্তকী-সংখ্যা চারি জোড়া হইতে আট জোড়া পর্য্যন্ত হইতে পারে। সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় যেমন কি ধরণের সঙ্গীত গাহিতে হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত, নৃত্য-প্রতিযোগিতায় সেরূপ কোন নৃত্য কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়া দেন না। তাহারা যে-কোন নৃত্যই দেখাইতে পারে। যে দল নৃত্য-কলার দিক হইতে এমন কোন সুন্দর নৃত্য দেখাইতে পারে যাহা কোন গ্রাম্য নৃত্যশিল্পীর নিকট হইতে সংগৃহীত ও সেই বিশেষ নৃত্য বিলুপ্তপ্রায়, তাহা হইলে সেই দলই প্রতিযোগিতায় সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করে।

মিশ্রিত নৃত্যগীতের দলে ন্যূনকল্পে পাঁচশ ও ঊর্দ্ধসংখ্যায় সত্তর জন অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এই মিশ্রিত দলের সঙ্গে তাহাদের আঞ্চলিক বাদ্যযন্ত্র থাকে। উক্ত দল কর্ত্তৃক যে বিশেষ নৃত্য প্রদর্শিত হইবে বা সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হইবে, ঐ সকল বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া তাহারই পটভূমি রচিত হয়। কয়েক বৎসর হইতে যে বাৎসরিক প্রতিযোগিতা হইতেছে, তাহাতে যোগদানকারীর সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে উহাতে মনে হয় ইহা সাধারণের মধ্যে দ্রুত-গতিতে প্রসারলাভ করিতেছে। প্রথম বৎসর প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিল ৭৪টি গানের দল, ২৪টি নাচের দল এবং ১৮টি মিশ্র নাচ ও গানের দল। মোট শিল্পী-সংখ্যা ছিল ৩১৩৫। দ্বিতীয় বৎসরে যোগদান করে ২০৩টি গানের

'জতম' নৃত্য

ছাপা হইয়াছে। সঙ্গীত বা পালাগানের কথা-অংশ কতকটা রক্ষা পাইয়াছে—ইহার কলা-অংশ কখনও যে পুনরুজ্জীবিত হইবে এরূপ সম্ভাবনা আপাততঃ সুদূর পরাহত বলিয়া মনে হয়—শিল্পীপরম্পরায় লোক-নৃত্যের ধারা প্রবহমাণ না থাকিলে ইহার অস্তিত্বই থাকে না। রবীন্দ্রনাথ ও গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের চেষ্টায় কয়েক প্রকার লোকনৃত্যের পুনরুজ্জীবন হইয়াছিল—যদিও তাহা তেমন ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে নাই। অকৃত্রিম লোকনৃত্যের উৎপত্তি ও পরিণতি নিরক্ষর পল্লীবাসীর মধ্যে—সেখানে ইহাকে স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

দেশ স্বাধীন হইয়াছে। সাংস্কৃতিক সম্পদ বিবেচনায় লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত রক্ষা করা ও তাহা সঞ্জীবিত করা জাতীয় সরকারের অবশ্যকর্তব্য।

পরাধীনতার বন্ধন কাটিবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের ভাগ্যে এমন এক বিপর্য্যয় আসিয়া পড়িল যে, লোকের পেটের ভাত ও পরনের কাপড়ের তাগিদই আজ প্রবলতম। পল্লীবাসীর উৎসব-আনন্দই বা কোথায়, আর সেই উৎসবে নৃত্যগীত করিবার মত মনের অবস্থাই বা তাহাদের কোথায়!

রবীন্দ্রকাব্যে নারী

দাশগুপ্ত

রহস্যময়ী নারীপ্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে মুগ্ধ করিয়া বারবার তাঁহার কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। বিশ্বের সৌন্দর্য্যের সন্ধান হইতেছে নারী। নারীর দেহ-লাবণ্যে, অন্তরের চিত্তের শুচিতায় রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছিলেন এক প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশী' কবিতায় নারীর যে পরিচয় পাওয়া যায় সে মাতা নহে, কন্যা নহে, বধূও নহে। তাহার দুইটি রূপ—একরূপে পুরুষের চিত্তে সে উন্মাদনার সঞ্চার করে—তাহার কল্যাণশ্রীমণ্ডিত আর এক মূর্ত্তি মানব-হৃদয়কে বিস্ময়ে অভিভূত করে। গৃহে নারীর পরিচয় মাতারূপে, কন্যারূপে, ভগ্নীরূপে বা গৃহিণীরূপে। কিন্তু কবির ধ্যাননেত্রে এই সাংসারিক সম্পর্কের অতীত নারীর এই বিশ্ববিমোহিনী রূপ নিয়ত মানব-মনকে মুগ্ধ করে।' তাহার এই সৌন্দর্য্যের আদি-অন্ত নাই, কবে যে তাহার প্রথম বিকাশ তাহা কেহ বলিতেও পারে না। তাই কবির মনে প্রশ্ন জাগে—

> বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি,
> কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশী?

এই সৌন্দর্য্য যেমন যাবতীয় ঐহিক সম্পর্কের অতীত, তেমনি দেশ কালেরও বাহিরের:

> যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী।

নারীর এই মোহিনী-শক্তি দেহাতীত অনন্ত সৌন্দর্য্যেরই প্রতীক। নারীর এই সৌন্দর্য্য জগতে দুইটি জিনিষ আনিয়াছে—অমৃত ও বিষ। এই সৌন্দর্য্যই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সঞ্জীবনীসুধা।

নারীর সৌন্দর্য্য এক দিকে যেমন অতীন্দ্রিয় রহস্যময়, অন্য দিকে তেমনি স্থূলভাবে তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই সৌন্দর্য্যই পুরুষকে নারীর প্রতি আকৃষ্ট করে, তাহার হৃদয়ে অনুরাগের সঞ্চার করে, মুনি-ঋষিগণও এই প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

> মুনিগণ ধ্যান ভাঙি' দেয় পদে তপস্যার ফল,
> তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল,
>
> * * *
>
> তর্ব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
> অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
> নাচে রক্তধারা।

পুরুষের হৃদয়ের সুপ্ত প্রেমকে জাগ্রত করে নারী। সৌন্দর্য্যোপাসনার প্রথম হোমশিখা জ্বালিয়া দেয় নারী। এই সৌন্দর্য্যানুরাগের পরিণতিই ভালবাসায় বা প্রেমে। এই প্রেম পূজারই নামান্তর। কবি তাই বলিয়াছেন—"যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা।" এই প্রেমই মানুষকে সুন্দর করে, অতি সাধারণকে দান করে সম্রাটের মর্য্যাদা। প্রথমে পুরুষের কাছে নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্যই চরম বলিয়া প্রতিভাত হয়। 'অচ্ছোদ সরসীনীরে' স্নানার্থিনীর কথা স্মরণ করুন। রমণী আবক্ষ জলে ডুবাইয়া সযত্নপালিত শুভ্র রাজহংসটিকে নগ্ন বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া আদর করিতেছিল। বসন্তসখা মদন বকুলমূলের অন্তরালে বসিয়া ব্যগ্র কৌতূহলে সুন্দরীর স্নানলীলা দেখিতেছিল এবং উৎসুক নয়নে তাহার কোমল বক্ষস্থলে শর নিক্ষেপের সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। যখন রমণী স্নান সমাপন করিয়া উপরে উঠিল তখন তার—

> স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি' গেল খসি'।
> অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
> লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল

বন্দী হয়ে আছে, তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র, ললাটে অধরে
উরুপরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে, সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে।

নারী সুন্দর ও পবিত্র হইলেও কামনাকলুষিত দৃষ্টিতে দেখিলে তাহার আসল রূপ চোখে প্রতিভাত হয় না। নারীর নিরাবরণ পবিত্র মূর্ত্তি মুগ্ধ ভক্তের হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। অনঙ্গও স্নানরতা রমণীর নগ্নরূপে বিমুগ্ধ হইল। সে বকুলমূল ত্যাগ করিয়া আসিয়া নিমেষহীন নিশ্চল নয়নে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, পরক্ষণেই ভূমিপরে

জানুপাতি বসি', নির্ব্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে, পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি।

নারী কেবল বিধাতার সৃষ্টি নহে ; পুরুষ নিজের কল্পনায়ও তাহাতে সকল সৌন্দর্য্য আরোপ করিয়া, নানাভাবে তাহাকে সাজাইয়া নূতন রূপে সৃষ্টি করিয়াছে। শিল্পীরা তাহাদের মানসীমূর্ত্তিকে নব নব রূপ দান করিয়াছে। শিল্পীর এই মানস-প্রতিমাকেই তো লক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন, 'অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা"। এই যে সৃষ্টি ইহা মানব-মনেরও বটে, বহির্জগতেরও বটে। এ দুইয়ে মিলিয়া ইহার পরিপূর্ণ সার্থকতা।

তুমি এ মনের সৃষ্টি তাই মনোমাঝে
এমন সহজে তব প্রতিমা বিরাজে।
যখন তোমারে হেরি জগতের তীরে
মনে হয় মন হতে এসেছ বাহিরে।

নারীর প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে কবি লাভ করিয়াছিলেন সত্যদৃষ্টি। যে পর্য্যন্ত নারী কেবলমাত্র ভোগের সামগ্রীরূপে তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইতেন সে পর্য্যন্ত তিনি তাহার প্রকৃত রূপ দেখেন নাই।

যখন তোমার 'পরে পড়েনি নয়ন
জগৎলক্ষ্মীর দেখা পাইনি তখন।

সৌন্দর্য্যবোধের মধ্যে ভোগাকাঙ্ক্ষা মিশিয়া থাকা পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করা যায় না। দেহের মিলনে কখনও পরিপূর্ণ মিলনানন্দ লাভ করিতে পারা যায় না। তাই কবি বলিলেন—

এ কি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে ?

তিনি 'নিস্ফল প্রয়াস' কবিতায় লিখিয়াছেন :—

কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে ?"

ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিতে না পারিলে নারীর আত্মিক সৌন্দর্য্যের অনন্ত রহস্যবার অনুদ্ঘাটিতই থাকিয়া যায়। কবি যখন এই দুয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে নারীর পানে চাহিলেন তখন তিনি তাহার মধ্যে নারীত্বের সত্যরূপ, জগৎলক্ষ্মীর রূপ দেখিলেন।

বিমুগ্ধ কণ্ঠে কবি গাহিয়া উঠিলেন—

তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে
তব পিছে পিছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।

তিনি নারীর মুখশ্রীতে স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টার রূপমাধুরী অবলোকন করিলেন—

নিত্যকালে মহাপ্রেমে বসি বিশ্বভূপ
তোমা মাঝে হেরিছেন আত্মপ্রতিরূপ।

কবি দেখিলেন নারীর মধ্যে এক অপূর্ব্বসুন্দর বিশ্ববিজয়িনী রূপ। সৃষ্টির অসীম রহস্য বাঁধা পড়িয়াছে রমণীর দেহে মনে, রূপের আভায়। স্নেহের গভীরতায়, ভক্তির মধুরতায়, ত্যাগের মহিমায় নারী মহিমময়ী। প্রেমের আলো কুরূপা নারীকেও মণ্ডিত করিয়া তোলে এক অপরিমেয় সৌন্দর্য্যে। প্রিয়তমের জন্য দেহমন-প্রাণ উৎসর্গ করিতে তাহার কি ব্যাকুলতা! কিন্তু তাহার মনে সংশয় জাগে—দেবতা তাহার পূজা গ্রহণ করিবেন কি না। যা-কিছু সুন্দর তাহা দিয়াই তো দেবতার পূজা করা হয়। সে অসুন্দর, সে রূপহীনা তাই তাহার কুণ্ঠার অন্ত নাই। কোন্ অর্ঘ্য লইয়া সে প্রিয়তমের নিকট উপস্থিত হইবে! সে নিজেকে প্রশ্ন করে—

পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়া।

*   *   *

দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে   চাহিয়া দেখি তারে
কি বলে আপনারে দিব তার।
তাই লুকিয়ে থাকি   সদা পাছে সে দেখে,
ভালবাসিতে মরি সরমে।
রুধিয়া মনোদ্বার   প্রেমের কারাগার
রচেছি আপনার মরমে।

পুরুষ আশা করে গৃহলক্ষ্মীরূপে নারী একদিন তাহার গৃহে আসিয়া সংসারকে কল্যাণশ্রীতে মণ্ডিত করিয়া তুলিবে। সে স্বপ্ন দেখে—

একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে
চন্দনচর্চ্চিত ভালে রক্ত পট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরী সঙ্গীতে, তার পরে
সুদিনে দুর্দ্দিনে, কল্যাণ-কঙ্কণ-করে,

সীমন্তসীমার মঙ্গলসিন্দুর বিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্রশিয়রে।

কিন্তু নারী তো শুধু পুরুষের গৃহলক্ষ্মীই নয়, সে যে তাহার মানস-সুন্দরী, আজন্ম সাধনার ধন, তাহার জীবনের কবিতা তাহার কল্পনার উৎস।

শুধু তাহাই নহে, নারী পুরুষের,
জীবনের দুঃখ-দৈন্য অতৃপ্তির পর
করুণকোমল আভা গভীর সুন্দর।

এদিকে দয়িতের জন্য চিরকাল ধরিয়া নারীরও ব্যাকুল প্রতীক্ষার আর অন্ত নাই। প্রিয়তমের আহ্বান কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া নারীকে আত্মহারা করিয়া তোলে। তাই সে বলে—

মনে লেগেছিল হেন আমায় সে যেন ডেকেছে।
যেন চির-যুগ ধ'রে মোরে মনে করে রেখেছে।
সে আনিবে বহি' ভরা অনুরাগ,
যৌবন নদী করিবে সজাগ,
আসিবে নিশীথে, বাঁধিবে সোহাগ বাঁধনে,
আহা, সে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে॥

একদিকে নারী পুরুষের মানস-সুন্দরী, আর বাস্তবতার দিক দিয়া সে তার ঘরের গৃহিণী। ঘরসংসার লইয়া গৃহলক্ষ্মীর কত না চিন্তা! সে গৃহের শ্রী, স্বামী পুত্র পরিজনের মঙ্গল চিন্তায় সতত নিরত। প্রিয়তমের জন্য সে হৃদয়ের স্নেহপ্রীতি নিঃশেষে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দেয়। স্বামীর বিদেশ গমনকালে তাহার কত না চিন্তা! যাহাতে বিদেশে যাইয়া কোনরূপে অসুবিধা না হয় সে দিকে তাহার সজাগ দৃষ্টি।

সামান্য কয়েকটি কথায় বিদায়-কালের কি করুণ চিত্রই না কবি আঁকিয়াছেন।

চক্ষু ছল ছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার
তবুও সময় তার নাহি, কাঁদিবার
এক দণ্ডের তরে।
তার পর বিদায়-মুহূর্ত যখন ঘনাইয়া আসে তখন
অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষু 'পরে বস্ত্রাঞ্চল টানি,
অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন।

পুরুষের কাছে একান্ত নির্ভরতায় নারীর নিঃশেষে আত্মসমর্পণের চিত্র আছে নীচের কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে—

সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণ করে, কুলায়প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখীর মত—মুখখানি তার
নতবৃন্ত পদ্মসম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে।

রবীন্দ্রনাথের 'নারী' যে কেবল স্বামী-পুত্র-পরিজনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী গৃহের লক্ষ্মী, তাহাই তাহার সবটুকু পরিচয় নহে, শুধু ইহাকে নারীত্বের চরম বলিয়া কবি স্বীকার করেন নাই। গৃহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে বিশ্বের বিচিত্র কল্যাণ-কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত না হইতে পারিলে যে নারীত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় না সেকথা তিনি নানা স্থানে নানা ভাবে বলিয়াছেন।

নম্রতা, কমনীয়তা, স্নেহপ্রবণতা নারী-চরিত্রের বিশেষত্ব। তাই বলিয়া চিরাচরিত সংস্কার পালনের জন্য নারী অন্তরের সত্যকে ও আদর্শকে অস্বীকার করিবে, অবমাননা করিবে রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মা তাহাতে সায় দিত না। নারীত্বের পরিপূর্ণ আদর্শ কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে চিত্রাঙ্গদার মুখ দিয়া কবি বলাইয়াছেন—

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নহি, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখদুঃখের মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

নারী শক্তিরূপিণী বলিয়া নিজের শক্তিদ্বারা পুরুষের কর্মসাধনার পথে সাহায্যকারিণী হইতে পারে। সমাজে নারীর স্থান হওয়া উচিত পুরুষের পাশে; তাহার কর্মসঙ্গিনীরূপে। নারীত্বের সার্থকতার পথ চিনিয়া লইতে হইবে নারীকেই :

কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ?
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্গা-পাশে
দুর্জয় আশ্বাসে।
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ।

বিষ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

অতীন একদা প্রতিজ্ঞা করেছিল—সামাজিক দুর্নীতি উচ্ছেদের জন্য যথাসাধ্য করবে। সেই প্রতিজ্ঞার ঝোঁকেই এক গরীব গৃহস্থের মেয়েকে সে এক দিন বিয়ে করে ফেললে। এ নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে খানিকটা মনকষাকষি হয়েছিল—আর তার ফলে শুধু শাঁখা সিঁদুর হরিতকী নিয়ে আশা এ ঘরে আসে নি। আশার বাবা বিয়ের যৌতুক যথাসাধ্য দিলেও—সাধারণ্যে প্রচারিত হ'ল অতীনের প্রতিজ্ঞার কথা আর অতীনের পিতামাতার উদারতা। এ নিয়ে যেটুকু আন্দোলন হ'ল—তারই আত্মপ্রসাদে ওঁরা বেশ কিছুদিন স্ফীত হয়ে রইলেন। কালক্রমে বিয়েবাড়ির বাজনা, ভোজ, কুটুম্ব-সমাগম বন্ধ হলে—ব্যাপারটা পুরাতন সংসারের অঙ্গীভূত হয়ে যায়—এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। পুরাতন সংসারের হিসাবনিকাশটা নতুন করে আরম্ভ হ'ল।

পড়শীদের এক জন অতীনের মাকে বললেন, তা যাই বল দিদি, কাজটা অবিশ্যি খুব ভালই হয়েছে কিন্তু এ যেন জাত গেল অথচ পেটও ভরল না গোছের হ'ল।

অতীনের মা সুখদা বললেন, ও কথা বলো না ভাই, সোনার-মোড়া মেয়ে ফেলে আশাকে ঘরে তুলেছি। একরত্তি সোনা না দিলে বিয়ের অঙ্গহানি হয় বলেই না ওই ফুঁয়ে-ওড়া চুড়ি ক'গাছা ওরা দিয়েছে।

প্রতিবেশিনী বললেন, সে অবিশ্যি তোমাদের মহত্ত্ব—কিন্তু বেয়াইয়ের কি চোখের চামড়া নেই? এমন ঘর বর পেলি—দু' দুটো পাস-করা রোজগেরে ছেলে—বাড়ি ভাড়ার আয়—শত জন্মের তপিস্যেতেও মেয়ের ভাগ্যে জুটতো না—

সুখদা বললেন, তা বেয়াই একটু কঞ্জুস আছেন—

একটু নয়, বিশেষ। প্রতিবেশিনী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন। একখানি ভাল গরদের শাড়ীও কি বেয়ানকে প্রণামী দেওয়া যেত না—সাতটা তো ননদ যখন নেই।

সুখদা ম্লান হেসে বললেন, তা ভাই আশীর্বাদ কর ওরা সুখী হোক—আমাদের আর কতদিনই বা। ছেলে যে ভীমের প্রতিজ্ঞা করে বসল গরীবের কুলমান উদ্ধার করবে।

উদগত নিশ্বাসটি বুকের মধ্যে টেনে নিলেন তিনি।

২

প্রতিজ্ঞা রক্ষার ব্যাপারটি মিটলে অতীনও ফিরে এল পুরাতন সংসারে। ওর এই মহৎ দৃষ্টান্তে সমাজদেহে কোন পরিবর্তন ঘটল বা আর কেউ এতে অনুপ্রাণিত হ'ল কিনা—ওটা অনুভব করতে পারল না। বন্ধুরা তাকে প্রশংসা করলে, কিন্তু বিশেষ মাতামাতি করলে না। মাতামাতি খানিকটা হলে তার ত্যাগের মহিমায় সে হয়ত পুরাতন সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মালিন্য থেকে মুক্তি পেত—মনটাকেও বশে রাখতে পারত। কিন্তু ব্যাপারটা হ'ল বড় একটা পুকুরে ছোট্ট একটি ঢিল ফেলার মত। টুপ করে একটু শব্দ, কয়েক মুহূর্তের জন্য জলের সামান্য একটু কম্পন; সামান্যক্ষণের শব্দ ও কম্পনের সঙ্গে জলতলশায়ী ঢিলটাও লুপ্ত হয়ে গেল দৃশ্যমান জগৎ থেকে।

সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে আশাকে নিয়ে গৌরব করা চলে না—শিক্ষার দিক দিয়েও নয়। নেহাত সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়ে—বাপ ভাইয়ের বৃত্তি করণিক—সংসারে অভাব অভিযোগ যথেষ্ট। এ মেয়ের সেবা-প্রত্যাশা চলে—সখ্য-প্রত্যাশা চলে না—এরা পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করে না—পায়ের কাছে বসবার অভ্যাসে অভিভূত। নিশ্বাস ফেলে অতীন ভাবলে—সংসারে কাব্যের অবসর ক'টি লোকেরই বা থাকে।

চতুর্থী, ফুলশয্যা ইত্যাদি রঙ-মেশানো অনুষ্ঠানগুলি মিটলে অতীনের নীল আকাশ ধূসর হয়ে এল ক্রমশ। সে চেষ্টা করলে—রঙের খেলাটা জমিয়ে রাখতে।

এক দিন উপহার দেওয়া মেঘদূতের অনুবাদখানি সে আশার হাতে তুলে দিয়ে বললে, ভাল করে পড়ে দেখো, এ অনুবাদটা নাকি ভালই হয়েছে।

দিন দুই পরে অভিমত জানতে চাইলে আশা প্রশংসা করলে বইয়ের ছবিগুলির। ছবিওয়ালা বইয়ের মোহ শিশুমনে যে প্রভাব বিস্তার করে—আশার মেঘদূতকে ভাল-লাগার অর্থ সেই ধরণের। তা ছাড়া প্রিয়জনের দেওয়া জিনিসে যথেষ্ট প্রীতির সম্পর্ক তো আছেই।

অতীন বললে, তোমার গল্পের বই পড়তে ভাল লাগে বুঝি?

আশা সসঙ্কোচে জবাব দিলে, গল্প শুনতে ভালই লাগে তো। আপনি বলুন না একটা গল্প।

সাহিত্য-আলোচনার ক্ষেত্রটি এই ভাবে বিস্তৃত হ'ল।

৩

এক দিন অতীন বললে, সিনেমায় যাবে—শরৎচন্দ্রের একখানা ভাল বই এসেছে।

সিনেমায় গিয়ে অতীন বুঝলে—শরৎচন্দ্রের কাহিনীর কৌতূহলে আশা এখানে আসেনি—ও এসেছে গান শুনতে—কৌতুক দেখতে—আর নতুন পরিবেশে নিজেকে [illegible] করতে। প্রেক্ষাগৃহের মিশ্র কোলাহলে—সিগারেটের [illegible]—ও সাদায়কালোতে মেশা জাতি [illegible]—চা-চানাচুর-আইস-

জীব বিক্রেতার তীক্ষ্ণ চিৎকারে খান্ খান্ হয়ে মানুষগুলিকে অকারণে উত্তেজিত করে তুলছে। এর বিচিত্র স্বাদে খানিক-ক্ষণের জন্য সংসার ভুলে-যাওয়ার নেশায় মেতে থাকে অনেকে, আশাও মেতে রইল।

সিনেমার বাইরে এসে অতীন জিজ্ঞাসা করলে, কেমন লাগল?

স্বপ্ন-ঘোর-মাখা চোখে আশা ওর মুখের পানে চাইল। একটু মাথা নেড়ে বললে, আর এক দিন আসবেন?

আসব—যদি গল্পটি আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পার।

গল্প আর কি—এক জনের সঙ্গে এক জনের বিয়ে হবেই। কত বাধা—কত বিপদ। আচ্ছা সংসারে এত খারাপ মানুষ থাকে কেন?

অতীন রাগ করে বললে, ভাল মানুষরা খুব বেশী ভাল কি না—তাই।

ওর বিদ্রূপ কণ্ঠস্বর আশার মনে খোঁচা দিলে, সে বোকার মত একটু হাসলে।

তারপর বন্ধুর গৃহে ফুলশয্যার নিমন্ত্রণ। বন্ধু অতীনের মতই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। না বিদ্যায় না বা উপার্জনে অতীনের হাতে হাত মেলাতে পারে, অথচ বিয়ের পাল্লায় সে পৌঁছেছে সব সতীর্থের পুরোভাগে। বিয়ের পাওনা যা হয়েছে—তা অর্দ্ধেক রাজত্বের রসদ—রাজকন্যা বিত্তশালিনী বলে রূপের বিচার-বিতর্ক তেমন জমেনি।

বন্ধুকে একান্তে পেয়ে অতীন বললে, আমাদের প্রতিজ্ঞার কথাটা বোধ হয়—

বন্ধু বললে, ভুলিনি। কিন্তু বাবা মা এঁরা তো দাবি করেন নি কিছু। ওঁরা স্ব ইচ্ছায় যা দিয়েছেন—

অতীন প্রতিবাদ করলে, কথা ছিল দরিদ্র ঘরে আমরা বিয়ে করব।

বন্ধু ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললে, কন্যাপক্ষকে পীড়ন করব না এই ছিল আমাদের পণ। কে গরীব কে বড়লোক অত চুলচেরা বিচার করবার সময় কোথায়! তা ছাড়া অভিভাবক-দের ছেঁটে ফেলাটি আমি পছন্দ করি না।

অতীন খোঁচা দিয়ে বললে, তাঁরা যখন অসুবিধা কিছু ঘটান নি!

বন্ধুও চড়া গলায় বললে, তোমার মত আবেগ ত্যাগের কোন মানে হয় না।

প্রীতিভোজের আসরে এ ধরণের তিক্ত আলোচনা অশোভনীয় বলেই অতীন তর্কের জের টানলে না।

ফিরবার পথে আশা বললে, বউ তেমন সুবিধের হয় [illegible] চাপা।

অতীন বললে, রূপের অভাবটা রূপোয় পুষিয়ে দিয়েছে—বন্ধুকে বেশ খুশীই দেখলাম।

আশা উত্তর দিতে গিয়ে সামলে নিলে। যার ভাগ্যে রূপ বা রূপো কোনটাই জোটে নি তার সঙ্গে এ আলোচনা চালানো যায় না।

৫

একে একে কয়েকজন বন্ধুর বিয়ে হয়ে গেল। প্রত্যেকের বউভাতে নিমন্ত্রণ খেয়ে অতীন বুঝলে—জীবনের দুটি বিভাগ আছে। সামনে যা মানুষকে চালায়—তার চাকা থাকে পিছনে—দৃষ্টির বাইরে। বয়সের গুণে ভাবপ্রবণতা অদেখা ভূতের মত পেয়ে বসে মানুষকে। এ রোগ ছোঁয়াচে কিন্তু অল্পায়ু। সংসারের হিসাব-নিকাশ এ জীবাণুকে অনায়াসে ধ্বংস করতে পারে—সেজন্য মহৎ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে এত বিরল। যে দৃষ্টান্ত বইয়ের পাতায় আছে—তাকে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে উদ্ঘাটন করা মানায়। নিমন্ত্রণে-যাওয়ার দামী পোষাকের মত সদাসর্ব্বদা ব্যবহার করা চলে না। তার দৃষ্টান্ত দেখেই কি বন্ধুরা সাবধান হতে পারল। যে যা পেয়েছে সংগ্রহ করেছে—অভিভাবকদের দোহাই দিয়ে। যেন নিজের লোভ বলতে কোন বৃত্তিই পৃথিবীতে নাই—গুরুজনের মনে বেদনা না-দেওয়ার কঠিন কর্ত্তব্যে অনুপ্রাণিত সবাই। সে একা ব্যতিক্রম হয়ে রইল। না উঠবে সে বইয়ের পাতায় —না রইবে সে সংসারের খাতায় হিসাব-দক্ষতার পরিচয়ে। তাকে সবাই বলছে নির্ব্বুদ্ধি—অকেজো—আদর্শপরায়ণ। আশার গরীব বাপ তার নির্ব্বোধ ভাবালুতার সুযোগ নিয়ে খুব ঠকিয়েছে!

বন্ধুরা স্পষ্টই বলে, সংসারে ভুলের সংশোধন আছে—ভাবালুতার মার্জ্জনা নাই। সূর্য্যের আলোয় বসে চাঁদের স্বপ্ন দেখে যারা—তাদের পথ অন্ধকারেই হারিয়ে যায়।

বয়সের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বাড়ছে—মনে জমছে তিক্ততা। পৃথিবীর উপর—মানব-গোষ্ঠির উপর ঘৃণা বাড়ছে—এ তিক্ততাকে দমন করার কৌশল অতীন জানে না।

আশার সঙ্গে সংঘর্ষ বেড়েই উঠল তার।

৬

মা বলেন, আমাদের ঠকিয়েছেন বেয়াই—ছেলেটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এমন যাদু করলে—

ঠকিয়ে যারা সামলে থাকে না—তাদের জব্দ করার পন্থাও তিনি জানেন—সেই পথ বেছে নিলেন তিনি। দু-দিকের চাপে আশা ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠল। বউকে গঞ্জনার অস্ত্রে বিঁধে বিঁধে—এঁদের মনে হ'ল—অস্ত্রের ধার তেমন নাই —আঘাতের নেশায় নতুন করে মেতে উঠলেন সবাই। নির্যাতনে প্রতিহিংসা চরিতার্থতার আনন্দলাভ হয়—, আনন্দ লাভের উৎসাহিত হয়েই—ব্যাপারটি বাইরে ছড়িয়ে পড়ল।

এক দিন অতীনের বন্ধু সুরেশ বললে, একটা কথা বলব—রাগ করবি না তো? সুবিধাটা পেয়ে অতীনের কাঁধে ঝুঁকে পড়ে সে ফিস্ ফিস্ করে বললে, তুই নাকি বোয়ের গায়ে হাত তুলিস্? সত্যি?

অতীন তীব্র দৃষ্টিতে চাইল ওর পানে। এ কথা বলার সাহস কোথায় পেল সুরেশ? এই তো কিছু দিন আগে—কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে—অতীনকে মহৎ দৃষ্টান্ত বলেও উল্লেখ করেছিল।

অতীন বললে, হাঁ—তুলি। আর কিছু শুনেছিস?

তুই রাগ করবি জানলে এ কথা তুলতাম না। কিন্তু জানিস তো মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলা—

মহাপাপ—ভারশাস্ত্র বিরুদ্ধ—এই তো? তোমরা যাকে বলি দাও—তাকে খাঁড়া দিয়ে—পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে খোলাবের করে কাট—একেবারে কেটে কোপ বসাও না। হত্যাটা দোষের নয়—তার ধরণটাতেই তোমাদের আপত্তি।

বুঝলাম না তোর কথা—

বুঝবার দরকার নাই। রাগ করে অতীন চলে এল সেখান থেকে। চলে এল বটে—সুরেশের কথাটাকে ফেলে আসতে পারল না। সে বুঝতে পারছে না—কেন তার মনের অশান্তি বাড়ছে—আশাকে দেখলে কেন তার সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। রূপের পিপাসা মিটলো না—আদর্শ কুয়াসার মত গেল মিলিয়ে—তাই কি মনের হাহাকার!

বন্ধুরা বলে, তোর মেজাজ বিগড়েছে—কিছুদিন চেঞ্জে যা।

মা অনুযোগ করেন, যখনই হা-ঘরের মেয়ে ঘরে এনেছি—তখনই জানি একটা অঘটন ঘটবে।

বাবা বৈঠকখানায় বসে খালি তামাকের শ্রাদ্ধ করেন। ছেলের সঙ্গে কোন বিষয়েই পরামর্শ করেন না তিনি। আশার কোল আলো করে একটি অতিথি এলে হয় তো সংসারের রূপ যেত বদলে। কিন্তু ঘটনা চরম পরিণতিতে পৌছবে বলে সেটা ঘটল না।

৭

লোকের মুখে অনেক কিছুই রটল। আশার বাবা এক দিন তাকে দেখতে এলেন।

ঘন ঘন কলকে পালটে—তামাকের ধোঁয়ার ঘটাকে করে অতীনের বাবা আত্মগোপন করলেন। বৈঠকখানার পাশ দিয়ে চটির শব্দ তুলে অতীন কোথায় বার হয়ে গেল—শ্বশুরকে একটা প্রণামও করলে না।

অতীনের মা দুয়োরের ফাঁকে উঁকি মেরে অভ্যর্থনা জানালেন নেপথ্যে, বেশ দেখি—এখন কাকে ডেকে মান মতে করি। কুটুম এসেছে বাড়িতে—তা যেমন তাদের ব্যাভারই হোক—এক থালা সাজিয়ে না দিলে লোকে ছি-ছাকার করবে না? আমারে হয়েছে মরণ—।

সত্যি এঁরা কেমন অভদ্র বল। আশার অভিযোগ শেষ হ'ল।

মেয়ে বললে, বাবা, তুমি এঁদের উঠানে কেন?

ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়লেন, উঠিয়েছি! এঁরা কি তাই বলেন? অতীনই ত—

মেয়ে চোখের জল মুছে বললে, কলেজে পড়ার সময় ছেলেরা তো অনেক কিছুই বলে—সেগুলো সব সত্যি কি!

ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে বললেন, তোকে যন্ত্রণা দেয় খুব?

আশা রুষ্টে বললে, না—না। রোজ এক কথা শুনলে গায়ে লাগে না। তুমি যাও বাবা—আর এস না।

হাঁ রে—তোর গায়ে গহনা দেখছি না যে?

ভারি তো গহনা—কি-ই বা দিয়েছিলে শুনি! মনের জ্বালা চেপে রাখতে পারলে না সে, বাপের পায়ের উপর উপুড় হয়ে দু' চোখের সঞ্চিত ধারাকে মুক্ত করে দিলে।

চোখের জল মুছতে মুছতে আশার পিতা বেরিয়ে এলেন।

৮

চিঠিপত্রের আদান-প্রদান অতঃপর বন্ধ হয়ে গেল। বেশ কিছুদিন কাটল এইভাবে।

আশার মা অনুযোগ তুললে—তার বাবা উত্তর দেন, মেয়েকে পরের ঘরে পাঠিয়েছি—তার সঙ্গে আর কি সম্পর্ক বল। সে বেঁচে থাক—কি নাই থাক—

মা শিউরে ওঠেন, ষাট্—ষাট্ ওকি অলুক্ষণে কথা!

আশার বাবার চোখ জ্বলে ওঠে—গভীর কণ্ঠে বলেন, বাংলাদেশে মানুষ নেই। এখানকার ছেলেরা ভাবুক, কথা করে জ্বলে ওঠে—নেচে ওঠে—কিন্তু মেরুদণ্ডহীন। এই পণ-প্রথাটিকে কিছুতেই কি উপড়ে ফেলা গেল না বাংলার মাটি থেকে।

আশার মা বলেন, তা কন্যাদানের মর্য্যাদা—

ছাই মর্য্যাদা! আদায়ের ফন্দ ছাড়া আর কিছু নয়। ক্ষোভে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হ'ল।

খানিক পরে বললেন, আমাদের বিয়ের কথা মনে পড়ে? আমিই কি অন্যায় করিনি?

আশার মা বললেন, তখন আমরা ছেলেমানুষ, কি-ই বা বুঝতাম?

আশার বাবা হেসে উঠলেন, হাঁ—ছোট বীজে যে প্রকাণ্ড গাছ হয়—আর সে গাছ যে বটগাছ তা বুঝেও বুঝিনি। একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, বড় বড় কথায় কি যায়—যদি কাজের সঙ্গে তা খাপ না খায়। বিয়ের ব্যাপারটা আজ আর আনন্দের ব্যাপার নয়—যেন দেনা-পাওনার শোধ তোলাতুলির ব্যাপার।

৯

প্রতিশোধ তোলার মতই ব্যাপারটা ঘটল।

আশ্বিন মাস—বর্ষা পুরোদমে চলছে। শিউলি ফুল ফুটেছে—নদীর ধারে কাশের গুচ্ছও শ্বেত চামরে পরিণত হয়েছে—দোয়েল পাখীর শিস সকাল বেলাটাকে মধুর করে তোলে। শরৎ এসেছে তবু প্রকৃতির বিষণ্ণতার ঘোর কাটেনি।

আশার বাবার কাছে খবর এল, আশা আর নাই। যদি শেষ দেখা দেখতে চান তো একেবারে শ্মশানঘাটে চলুন—দেরী করবেন না।

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বললেন, না।

প্রতিবেশীরা বললেন, এ মৃত্যু স্বাভাবিক নয়—খুনের চার্জ আনুন। সাক্ষীসাবুদের অভাব হবে না।

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, না।

সবাই জিদ ধরলে, কেন নয়? এ অন্যায়ের শোধ না নিলে ওদের স্পর্দ্ধা বেড়ে যাবে।

বৃদ্ধ বললেন, শোধ তোলার কেউ চাইন না আর। এমনধারা কত ঘটনাই তো হয়েছে—কত লোকই শাস্তি পেয়েছে, কি লাভ হয়েছে আমাদের। মেয়েদের মৃত্যুর সময় যেখানে আমরা ছিলাম—তার থেকে এক পাও তো এগিয়ে যেতে পারিনি।

দূরে আগমনীর নহবৎ বাজছে—সে সুরে আকৃষ্ট হয়ে সকলেই ক্ষণকালের জন্য চুপ করে রইলেন। আশার বাবার বিষণ্ণ সুর তার সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে মিশেছে।

অগ্রহায়ণের শেষে খবর এল অতীন আবার বিয়ে করছে। মেয়ের বাপের অবস্থা ভাল। দ্বিতীয়পক্ষ হলেও ছেলেকে তাঁরা যৌতুক দেবেন প্রচুর। প্রাপ্তির তুলনায় অতীনের বন্ধুরা এবার অনেকখানি পিছিয়ে পড়বে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

এমন এক সময়ের কথা আজও আমরা স্মরণ করিয়া থাকি, যখন ভারতভূমির উপর দিয়া জড়বাদের মহাপ্লাবন বহিয়া যাইতেছিল, আর শিক্ষিত সাধারণ তাহার খরস্রোতে আপন ধর্ম ও সংস্কৃতি হারাইয়া বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া উঠিতেছিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে এক শুভ মুহূর্তে এই জড়বাদের বন্যায় বাধা পড়িল। যে কয়জন বিশিষ্ট পুরুষ সে সময়ে পশ্চিমের বহির্মুখী ভাবধারা রোধ করিয়া স্বদেশের অন্তর্মুখী অমৃতধারা বহাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যেন চিরদিন নিজের স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই ক্ষণজন্মা মহামানব এক শত দশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসাধারণ বাগ্মিতাদ্বারা দেশবিদেশে বিস্ময় উৎপাদন করিতেন, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দ্বারা চতুষ্পার্শ্বে শক্তি সঞ্চার করিতেন, অপূর্ব সংগঠনক্ষমতায় জনগণকে চমৎকৃত করিতেন—এসকল কেশবচন্দ্রের মহত্ত্বকথার একদিক মাত্র। তিনি ছিলেন সকল প্রকার অগ্রগতির একনিষ্ঠ সাধক—একাধারে দেশপ্রেমিক, সমাজসংস্কারক ও ধর্মনায়ক। তাঁহার অসামান্য উদ্যম, গভীর দেশাত্মবোধ সেকালে জাতিকে বিষম অনর্থ হইতে রক্ষা করিয়াছিল এবং একালেও জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ধর্মক্ষেত্রে 'নববিধান' কেশবচন্দ্রের অপূর্ব অবদান। এই 'বিধানে'র সহিত কোন ধর্মের মূলতঃ বিরোধ নাই। অথচ ইহা একটি স্বতন্ত্র ধর্মমত। ইহার মধ্যে অদ্বৈতবাদী দার্শনিক নিজ মতের সার খুঁজিয়া পাইবেন, আবার ভক্তিবাদী বৈষ্ণবও নানারূপ মিল দেখিতে পাইবেন। 'নববিধানে' কেশবচন্দ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন ও আধুনিক, যাহা ভাল বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই; বিশ্বাস ও যুক্তি, জ্ঞান ও কর্ম, ভক্তি ও যোগ—এ-সকলও নববিধানে প্রয়োজনমত স্থান পাইয়াছে।

অতি অল্প বয়সে কেশবচন্দ্রের ধর্মসাধনা আরম্ভ হয়। যে বয়সে সাধারণ লোক বিষয় সংসারে নূতন নূতন লালসায় উন্মত্ত হইয়া উঠে, জীবনের সেই আরম্ভক্ষণেই তাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণ হইয়াছিল। বাল্যকালেই তিনি দুষ্কর্মে ঘৃণা বোধ করিতেন, পাপভয়ে অস্থির হইয়া উঠিতেন, পাপের সম্ভাবনাকে ভয়ঙ্কর জ্ঞান করিতেন। প্রথম হইতেই তাঁহার নির্মল হৃদয় আস্তিক্যবুদ্ধিতে প্রদীপ্ত ছিল। কোনদিন সেখানে অবিশ্বাসের মালিন্য প্রবেশ করিতে পারে নাই। তিনি বারংবার প্রার্থনা করিতেন, আর ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেন। তাঁহার 'জীবনবেদে' (২ পৃঃ) তিনি বলিয়াছেন—

"যখন কোন ধর্ম-সমাজে সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্মগুলি বিচার করিয়া কোন একটি ধর্ম গ্রহণ করি নাই, সাধু বা সাধক শ্রেণীতে যাই নাই, ধর্মজীবনের সেই উষা-

কানে 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর' এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতরে উথিত হইল।"

এইরূপে তাঁহার ধর্মজীবন আরম্ভ হয়। ইহার পরে কেশবচন্দ্র ভক্তির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সংসারে বিতৃষ্ণা এবং ঈশ্বরে নিষ্ঠা ও নির্ভরতাই ভক্তি-সাধনের মূলতত্ত্ব। "অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক যেমন সর্বতোভাবে জননীর উপর নির্ভরশীল হয়, ক্ষুধার্ত গোবৎস যেমন অনন্যপরায়ণ হইয়া মাতৃস্তনের সন্ধানে প্রবৃত্ত থাকে", তেমনই ভক্তসাধক গভীর ব্যাকুলতার সহিত ঈশ্বরকে পাইতে ইচ্ছা করেন। কেশবচন্দ্রের ঈশ্বরানুরাগও এইরূপ ছিল। ক্রমে সাধনবলে তাঁহার প্রাণে নূতন নূতন অনুভূতির সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি সাধনপ্রণালীতে শুষ্কতা বোধ করিলেন। তাঁহার সাধনার মধ্যে এত দিন জ্ঞানের আধিক্য ছিল; এখন তিনি প্রেমভক্তির পথ ধরিলেন। এই পথের সাধকগণ উপনিষদের পরমতত্ত্বকে কোন এক নামে অভিহিত করিয়া ভজনা করেন। ইঁহাদের নিকট ভগবান বাক্যমনের অগোচর বা ইন্দ্রিয়বোধের অতীত নন। ইঁহারা আরাধ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, তাঁহাকে পতি, পুত্র, সুহৃৎ, প্রভু পিতা বা মাতা-জ্ঞানে ধ্যান করিয়া থাকেন। পরব্রহ্মের উপাসক কেশবচন্দ্রও প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে উপাস্যকে জননী বলিয়া সম্বোধন আরম্ভ করিলেন। এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"প্রার্থনা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, দেখিতে চাহিলে দেখা যায়, শুনিতে চাহিলে শোনা যায়, এই জানিতাম"।—(জীবনবেদ, ৫ পৃঃ)

এইরূপে একদিক দিয়া তাঁহার সাধনের সহিত বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধানুগা ভক্তির মিল হইল। কিন্তু আর একদিক দিয়া কেশবচন্দ্র তাঁহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি অরূপ ব্রহ্মের ধ্যান করিতেন, বিভু ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিতেন।

কেশবচন্দ্রের সাধনপ্রণালী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, বৈষ্ণবের সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার অনেক বিষয়ে ঐক্য আছে। বৈষ্ণবগণ বলেন—আরাধ্য দেবতা অসীম ও অপরিমেয় হইলেও নিজের বিশিষ্ট ক্ষমতা বলে ভক্তের কাছে সসীম হইয়া ধরা দিয়া থাকেন। যিনি উপনিষদে নাম-রূপহীন নিরাকার ব্রহ্ম, তিনিই যোগীর নিকট জ্যোতির্ময় পরমাত্মা, আবার ভক্তের সম্মুখে রূপধারী ভগবান—

"ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।"

এইরূপ ধারণাই বৈষ্ণব সাধনের ভিত্তি। বৈষ্ণব সাধক চরাচর সকল বস্তুতে আরাধ্যের রূপ দর্শন করেন।

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ।
স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তাঁর মূর্তি।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফুর্তি।—চৈঃ চঃ

কেশবচন্দ্র নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবভক্ত যেমন স্থাবর-জঙ্গমে আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণের স্ফুরণ দেখেন, কেশবচন্দ্রও তেমনই বাহিরের সকল পদার্থে তাঁহার উপাস্য ব্রহ্মকে দেখিতেন। তিনি সাধনার এমন এক অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, যখন সাধক—

"সংসারের ভিতর যে ঈশ্বর বাস করেন, যাহ তাবৎ পদার্থে কেবল তাঁহাকেই দর্শন করেন।...তখন সাকারেও নিরাকার দর্শন হয়।...যোগী বাহিরের অনন্ত পদার্থ ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে নিরাকার ব্রহ্মকে দর্শন করেন। যাহা দেখেন তাহারই মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেন।" (ব্রহ্মগীতোপনিষদ্ ৫৬, ৫৭ পৃঃ)।

ভক্তিসাধনার ধ্যানকালে অখণ্ড ব্রহ্মকে আপনার মনের মত ক্ষুদ্র করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। কেশবচন্দ্রও সাধনকালে ব্রহ্মকে অল্পাকাশে ধারণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"ঈশ্বর সৎ, সর্বব্যাপী। সাধনের অবস্থায় সাধক তাঁহাকে অল্পাকাশে ধারণ করিবেন।"

কিন্তু এই কথা বলিয়াই আবার সাবধান করিয়া দিয়াছেন—"এই অল্প স্থানে আবদ্ধ রাখিলে পৌত্তলিকতা হয়।" সুতরাং "অল্পাকাশে ধারণ" করিলেও "সঙ্গে সঙ্গে সর্বাকাশে স্মরণ" করিতে হইবে (ব্রহ্মগীতোপনিষদ্ ১৫ পৃঃ)। এই সকল ভাবের সহিত বৈষ্ণব উপাসনা-প্রণালীর বিরোধ দেখা যায় না।

সংসারে সমস্ত বস্তুই পরব্রহ্মের রূপভেদ মাত্র—ইহা উপনিষদের কথা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—চরাচরে আমি ছাড়া কিছু নাই। সকল পদার্থে ব্রহ্মদর্শনের উপদেশ দিয়া কেশবচন্দ্র সেই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অদ্বৈতমতের মায়াবাদে বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু অদ্বৈতীর যাহা মূল কথা—জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের ঐক্য—তাহা পূর্ণরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। 'ত্রিমূর্তিবাদ' বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া তিনি বলিলেন—

"এই ঈশ্বর, এই আমি, এই তোমরা—যতক্ষণ এই তিন স্বতন্ত্র দেখিতেছি, ততক্ষণ আমরা ভ্রান্ত, ত্রিতাপে সন্তপ্ত। এই ভেদজ্ঞান হইতে নানাপ্রকার অধর্ম, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা উৎপন্ন হয়। যতক্ষণ আমরা এই তিনের মধ্যে এক না দেখিতে পাই, ততক্ষণ কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারি না।"

ইহাই ত অদ্বৈতবাদ। কেশবচন্দ্র তাঁহার 'নববিধানে' অদ্বৈতবাদের সহিত ভক্তির মিলন ঘটাইয়াছিলেন। 'যিনি ব্রহ্ম তিনি হরি' এই কথার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

"যদি বৈষ্ণবের হরিকে ছাড়িয়া কেবল বেদান্তের ব্রহ্মকে লও, তবে অনেক অনিষ্ট হইবে। সকলে শুষ্ক-হৃদয় হইয়া পড়িবে। এখনকার হরিভক্তির সঙ্গে সঙ্গে বৈদান্তিক ব্রহ্মযোগকে একত্র মিলিত কর। যোগভক্তির যখন সম্মিলন হইল, হরিব্রহ্ম যখন অভেদ হইলেন, তখন বঙ্গবাসীর সৌভাগ্যের দিন উদিত, ভারতবাসীর সুখের দিন নিকটস্থ হইল।

প্রকৃতপক্ষে কেশবচন্দ্র ভক্তিবাদ, অদ্বৈতবাদ বা কোন বিশেষ বাদেরই খুঁটিনাটির অনুগামী ছিলেন না। তিনি ভগবদ্‌গীতা ও চৈতন্যচরিতামৃতের এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" গীতা

"যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।" চৈ: চ: ২।৮

'তীর্থচতুষ্টয়' নামক বাণীর মধ্য দিয়া তিনি স্পষ্ট করিয়াই সার কথা বলিয়া গিয়াছেন—

"যোগাসনে বসিয়া যদি দেখ, দেখিবে ধর্মে ধর্মে মূলগত বিবাদ নাই। আত্মরাজ্যে যাঁহারা বাস করেন, বিবাদের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা বলেন, কি আশ্চর্য? ঈশার সঙ্গে গৌরাঙ্গের বিবাদ? কিসে কিসে বিবাদ হয়? অভেদ যেখানে, সেখানে বিবাদ হইবে? সমুদয় সত্য এক।"

কেশবচন্দ্র সমুদয় সত্য এক বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার 'নববিধানে' বেদ, কোরাণ, বাইবেল সবই মান্য। বুদ্ধ, যীশু, গৌরাঙ্গ সকলেই পূজ্য।

ন্যূনাধিক শতবর্ষ পূর্বে কেশবচন্দ্রপ্রমুখ মহাপুরুষগণ এদেশে একটা আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহাতে জাতির উপকার হইয়াছিল, সে কথা বলিয়াছি। সেরূপ আবহাওয়ার আবশ্যকতা আজ আমরা পদে পদে অনুভব করিতেছি। মনে হয়, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সকল দেশেই মানুষের অধ্যাত্মভাব এবং দৈনন্দিন কাজকর্মের উপর তাহার প্রভাব বিশেষ ভাবে কমিয়া গিয়াছে। মানুষ যেন আর সাংসারিক সীমার ঊর্ধ্বে অপর কোন কথা ভাবিতে পারে না। চারিদিকেই অভাব, অপচার বৃদ্ধি পাইতেছে, নিয়মানুবর্তিতার হ্রাস হইতেছে। এইরূপ নৈতিক অবনতি ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির ব্যবহারেও যেমন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনই দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে। এসকল অনর্থের প্রধান কারণ হইতেছে ধর্মবুদ্ধির অভাব। জড় জগতের বাহিরে যে এক অদৃশ্য শক্তি বর্তমান আছে, সমস্ত জীবের মধ্যে যে এক আত্মা অনুস্যূত রহিয়াছে, এ জ্ঞান থাকিলে কেহই এত অভাব করিতে পারে না; আত্মিক দৃষ্টি থাকিলে কখনই আত্মাশ্রয়ী জীবকে অবজ্ঞা করা যায় না। এইজন্যই আজ আধ্যাত্মিক আলোচনার বড় বেশী প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

আত্মিক দৃষ্টির প্রসার না হইলে পৃথিবীর কল্যাণ নাই। বৈজ্ঞানিকগণের যে উদ্ভাবনী শক্তি সর্বতোভাবে মানব-সমাজের কল্যাণার্থ নিয়োগ করা উচিত, তাহাই আজ ধ্বংসের কার্য চালাইতেছে। ইহার মূলে আছে সেই আত্মিক দৃষ্টির ন্যূনতা। আমাদের দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অনেকেই বিজ্ঞানচর্চার বৃদ্ধির জন্য প্রযত্ন করিতেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জড় বিজ্ঞানের সহিত সমান ভাবে আত্মবিজ্ঞানের অনুশীলন না হইলে ফল ভাল হইতে পারে না। জগৎ কেবলই বহির্মুখে চলিতেছে, তাহাকে অন্তর্মুখ করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিকগণও এখন এ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডক্টর অ্যালেকসিস্ ক্যারেল[১] ও জে. বি. রাইন[২] এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণের বিস্ময় উৎপাদনের জন্য আমেরিকার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক রীতিতে আত্মানুশীলন চলিতেছে। ডক্টর রাইন প্রয়োগশালার পরীক্ষা দ্বারা এখন পর্যন্ত এইটুকু প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন যে, মানুষের মধ্যে শরীর-নিরপেক্ষ আরও কিছুর অস্তিত্ব আছে। জাগতিক বস্তুর মত আত্মাকে সর্বপ্রকারে বৈজ্ঞানিকের প্রয়োগশালায় বিশ্লেষণ করা চলিবে, এমন আশা করা যায় না। এইখানে আত্মার একটা স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়া মনে করি।

যাহা হউক, যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সমাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আত্মিকবোধের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। এই আত্মিকবোধের ফলেই আমাদের বৈদিক ঋষি বিশ্বজনের হিতের জন্য সুবুদ্ধি প্রার্থনা করিতেন, বহুজনের প্রীতির জন্য ধন-সম্পদ্ কামনা করিতেন। আত্মিকবোধের ফলেই ভক্ত প্রহ্লাদ সকল প্রাণীর আর্তি নিজে বহন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে দুঃখহীন করিতে চাহিয়াছিলেন। আত্মিকবোধের ফলেই বোধিসত্ত্বগণ অপরের মঙ্গলের জন্য নানা কষ্ট বরণ করিতে পারিতেন, আর এই আত্মিকবোধের ফলেই বৈষ্ণব ভক্ত নিজে দুঃখ সহিয়া অপরকে রক্ষা করিবার কথা চিন্তা করেন—"ধর্ম বৃক্ষ সহে আনের করয়ে পোষণ।"

(ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পঞ্চষষ্টিতম তিরোধান বার্ষিকী উপলক্ষে ৮ই জানুয়ারী ১৯৪৯ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা।)

১. *Man, the Unknown,*
২. *The Reach of the Mind.*

মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি

অনাথবন্ধু দত্ত

বর্তমানে দ্রব্যমূল্য এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, দেশের সর্বশ্রেণীর, বিশেষতঃ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতরে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মূল্যবৃদ্ধির দরুনই নানাক্ষেত্রে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে এবং সরকারের ও মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলন বিপুল ভাবে প্রসারলাভ করিতেছে। শিক্ষক-সম্প্রদায়—যাঁহারা চিরকাল অতি ধৈর্য্যশীল বলিয়াই পরিচিত, তাঁহারাও সম্প্রতি প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতিবাদ-স্বরূপ ধর্মঘট পালন করিয়াছেন। শ্রমিকশ্রেণীর ত কথাই নাই—ধর্মঘট ও সালিসী বিচার (ট্রাইবিউনাল) তাহাদের মধ্যে লাগিয়াই আছে—বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কেহই সুখী হইতে পারিতেছে না। সালিসের রায়ে শ্রমিক-মালিক উভয়েই অসন্তুষ্ট, সুতরাং ইহাতে অসন্তোষের আগুন না নিবিয়া ক্রমেই অধিকতর প্রচণ্ডভাবে জ্বলিয়া উঠিতেছে। সমাজ-জীবনে এরূপ অবস্থা ভাবী বিপ্লবের সূচনা করে। রাষ্ট্রের দিক দিয়া এরূপ অবস্থা ও তাহার পরিণতি আরও ভয়াবহ—এজন্য চিন্তাশীল রাষ্ট্রনায়ক ও অর্থনীতিবিদ্‌গণ এই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। গত বৎসর কলিকাতা, বোম্বাই এবং দিল্লীতে অর্থনীতিবিদ্‌গণ এবং সরকারের মুখপাত্র প্রভৃতি সমবেত হইয়া বর্তমান আর্থিক দুর্গতির কারণনির্ণয় ও তন্নিরাকরণের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বোম্বাই ও কলিকাতায় সাধারণতঃ ধনবিজ্ঞানী শিক্ষাবিদ্‌গণ এবং দিল্লীতে সরকারের মুখপাত্র, ধনিক-সম্প্রদায় ও শিল্পপতিদের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। কিরূপে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিয়া অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি স্বল্প মূল্যে সাধারণের লভ্য হয়, সকলেই সেই বিষয়ে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিয়াছিলেন। এখন বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচন করা যাক। মুদ্রাস্ফীতি জিনিষটা কি? এ প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা হয়, টাকা ফাঁপিয়া উঠা—তাহা হইলেও বিষয়টি ঠিকমত বোধগম্য হইল না। সঙ্গে সঙ্গেই আরও কতকগুলি প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসে: টাকা আবার ফাঁপিয়া উঠে কিরূপে? আর ফাঁপিয়া উঠিলেই বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয় কেন? অপিচ এইরূপ ব্যাপারের সহিত সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেদের কিরূপ সম্বন্ধ? এই সামান্য ব্যাপার হইতেই দেশ ও রাষ্ট্রের এই বিপুল অনর্থ ঘটা সম্ভব হইলে, রাষ্ট্রনায়কেরা গোড়াতেই এই অনাচার রোধ করিবার চেষ্টা করেন নাই কেন? আরও অনেক প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে, সেগুলির উত্তর দেওয়া সহজ নহে এবং যে মূল সমস্যা লইয়া এই সকল প্রশ্নের উদ্ভব তাহার সমাধান খুবই কঠিন।

বিষয়টি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে গোড়াতেই সরকারী আয়ব্যয়ের একটু আলোচনা প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট সর্বসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থদ্বারা যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকেন। সরকারী আনুমানিক আয় এবং ব্যয়ের বরাদ্দকে বাজেট বলা হয়। আদায়ীকৃত কর হইতে অধিকাংশ সরকারী আয় হইয়া থাকে। কর আদায় নানারূপে হয়, যথা—ভূমি-রাজস্ব, আমদানী-রপ্তানী-কর, নানা প্রকার উৎপাদন-কর, এক্সাইজ, আয়কর, রেলের আয় প্রভৃতি। যাঁহারা সরকারী চাকুরীয়া তাঁহাদের আয় নিশ্চিত, কিন্তু সরকারের নিজস্ব আয় অনিশ্চিত। কারণ কোন্ খাতে কর কতটা আদায় হইবে,—কি পরিমাণ ঘাটতি পড়িবে তাহা বৎসরের শেষেই জানা যায়—বাজেটের অঙ্ক আনুমানিক ব্যয়বরাদ্দ মাত্র। কিন্তু নিশ্চিত ও নির্দ্ধারিত ব্যয় গবর্ণমেণ্টকে রাষ্ট্ররক্ষার জন্য করিতেই হয়, নতুবা দেশে বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ, বিপ্লব, অব্যবস্থা ইত্যাদির আশঙ্কা থাকে। যদি আয়ে ঘাটতি পড়ে তাহা হইলেও সরকারের উপযুক্ত অর্থের সংস্থান করিতেই হয়। ইহা নানা উপায়ে হইতে পারে। একটা উপায় হইতেছে—ধার বা কর্জ করিয়া খরচ চালানো। এই কর্জ স্বল্প-মেয়াদী হইলে গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারী বিল বেচিয়া অর্থ সংগ্রহ বা কর্জ করেন। আর দীর্ঘ-মেয়াদী হইলে দস্তুর মত কর্জ (Loan) করিতে হয়। কর্জ করিলে অবশ্যই সুদ দিতে হয়, তাহাতেও গবর্ণমেণ্টের খরচ বাড়িয়া যায়। কারণ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ছয় মাস অন্তর গবর্ণমেণ্টকে ধার-করা টাকার সুদ দিতে হয় এবং কর্জের মেয়াদ ফুরাইলে আসল টাকা গবর্ণমেণ্টকে পরিশোধ করিতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টকে আয় বাড়াইয়া অর্থাৎ করবৃদ্ধি করিয়া এই সকল ঋণপরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হয়। তবে সে ক্ষেত্রেও ব্যাপার খুব সহজ নহে, কারণ করবৃদ্ধি করিলেই যে আশানুরূপ কর আদায় হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই, অপর পক্ষে করবৃদ্ধি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের স্বার্থে আঘাত করে বলিয়া তাহার দরুন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরেও গোলযোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং বেশী সুদ দিয়া সরকারের কর্জগ্রহণ যেরূপ দেশ ও রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর, তেমনি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বেশী কর ধার্য্য করিয়া আয়বৃদ্ধিও নানা জটিলতার সৃষ্টি করে। গবর্ণমেণ্টকে অবশ্য এই উভয় নীতির মধ্যে কোন্‌টি কতটা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা স্থির করিয়া কাজ করিতে হয়। কারণ এতদুভয়ের ঘাতপ্রতিঘাত ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে সরকারী নীতির প্রতিক্রিয়া অপরিহার্য্য। ধরুন, কর আদায় দ্বারা খরচ কুলাইল না, কর্জ করিয়াও বিশেষ ফললাভ

হইল না অর্থাৎ ব্যয় নির্ব্বাহ করা গেল না তখন গবর্ণমেণ্টকে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না—তাহাকে রাষ্ট্রযন্ত্র সুষ্ঠুভাবে চালু রাখিতেই হইবে, কারণ রাষ্ট্রের সুপরিচালনার উপরেই ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের কল্যাণ নির্ভর করে।

প্রথম দুই উপায় অবলম্বন করা সত্ত্বেও যদি আশানুরূপ ফললাভ না হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শেষ পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না—অর্থাৎ সরকারকে তখন মুদ্রাস্ফীতির আশ্রয় লইতেই হয়। কর্জ্জ গ্রহণ করিলে গবর্ণমেণ্টের কর্জ্জদাতাকে সুদ দিতে হয় এবং পরিশেষে মূলধন পরিশোধ করিতে হয়। কিন্তু এই সমস্ত ঝঞ্ঝাট এড়াইবার উপায়ও গবর্ণমেণ্টের আছে। গবর্ণমেণ্ট বা রাষ্ট্র যদি কাগজের মুদ্রা ছাপাইয়া বিবিধ ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে কর আদায় এবং ঋণ গ্রহণ [illegible] রাষ্ট্রের কার্য্যাদি পরিচালনার ব্যয়-সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব হয়। ইহাতে প্রথমতঃ কাহাকেও অতিরিক্ত কর দিতে হইল না, দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টকেও অর্থাভাবের জন্ত কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইল না, অপিচ গবর্ণমেণ্টের সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইল। একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই ব্যবস্থার ফলে গবর্ণমেণ্ট বিনা সুদের প্রতিশ্রুতি-পত্র (Hand-note) দ্বারা দেনা মিটাইলেন। কাগজী মুদ্রা আর কিছুই নহে চাহিবামাত্র পরিশোধনীয় সরকারী প্রতিশ্রুতি।

যদি এই ভাবে গবর্ণমেণ্টের ঘাটতি বাজেটের ব্যয় নির্ব্বাহের ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে দেশের আর্থিক গতির মোড় কোন্ দিকে ফিরে তাহা বিবেচ্য। একথা সহজেই বুঝা যায় যে, এই ব্যবস্থায় কাগজী মুদ্রা ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে, কেননা এইরূপ বৃদ্ধিতে গবর্ণমেণ্টের সাময়িক অসুবিধা খুবই কম—ছাপার কারখানা মোটামুটি চালু রাখিলেই হইল। কাগজী মুদ্রার সাহায্যে ব্যয় নির্ব্বাহ করিলে পরোক্ষে ইহা সাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণের সামিল হয় অথচ ইহার জন্ত সুদ দিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং রাষ্ট্রের অর্থকৃচ্ছ্রতার সময় ইচ্ছাকৃত না হইলেও এরূপভাবে ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সরকার অনেক সময় বাধ্য হইয়া থাকেন। যুদ্ধবিগ্রহের সময় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর বাড়াইয়া বা কর্জ্জ করিয়া ব্যয় নির্ব্বাহ সম্ভব হয় না, সুতরাং বাধ্য হইয়া গবর্ণমেণ্টকে শেষোক্ত পন্থা অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির আশ্রয় লইতে হয়। ফল যে পরিণামে ভাল হয় না তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা দেশের আর্থিক জীবনে যে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে দেশ ও জাতিকে তাহার শোচনীয় কুফল বহু বৎসর ধরিয়া ভোগ করিতে হয়।

এখন এই মুদ্রাস্ফীতির সহিত দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধির কি সম্বন্ধ সেকথা আলোচনা করা যাক। প্রতিদিনের বৈষয়িক অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, যাহা পরিমাণে বেশী পাওয়া যায় তাহার দাম কমে। প্রত্যেক পণ্যদ্রব্যের পক্ষেই এ কথা খাটে। অবশ্য আর কোন পরিবর্ত্তন যদি না হয় এবং পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ না বাড়ে তবেই ঐ দ্রব্যের মূল্য কমে। ধরুন, টাকার পরিমাণ বাড়িয়া চলিল, কিন্তু সেই টাকার যে পরিমাণ জিনিষের কেনা-বেচা হইবে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি হইল না তখন এটাই স্বাভাবিক যে দ্রব্যের অনুপাতে টাকার পরিমাণ বেশী হইয়া পড়িবে এবং ফলে বেশী টাকায় জিনিষ বিকাইবে। এ অবস্থায় সাধারণ লোকে বলিবে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়াছে। দ্রব্যের মূল্যকে টাকা দ্বারা প্রকাশ করিলেই আমরা তাহাকে বলি 'দাম' বা 'মূল্য'। টাকা দ্বারা দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ হয়। এই টাকা মূল্যবান ধাতুনির্ম্মিত হইলে একটা সুবিধা এই যে, অন্ত ভাবে উক্ত মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে যখন উহার মূল্য হ্রাস পায় তখন সঙ্গে সঙ্গেই লোকে ঐ মুদ্রার ধাতু-দ্রব্য গলাইয়া নানাবিধ অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতে ও শিল্পের কাজে লাগাইতে পারে। কারণ ধাতব মুদ্রার নিছক বিনিময়ের জন্ত ব্যবহার ব্যতীত অন্যান্ত ব্যবহারও চলে। লোকে সস্তা মোহর এবং মুদ্রার সোনা বা রূপা গলাইয়া গয়না গড়াইতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র দ্রব্য ক্রয় ছাড়া অন্য কোনো দিক দিয়া লাভজনক ভাবে কাগজী টাকার ব্যবহার চলে না, উহার প্রচলন বিনিময়ের জন্য—জিনিষ কিনিবার জন্য। ইহার পরিমাণ যত বাড়িবে ততই বিনিময়ের জন্য ইহা বাজারে আসিয়া জমা হইতে থাকিবে, ফলে ইহার অর্থাৎ টাকার দাম বা বিনিময়-মূল্য হ্রাস পাইবে। অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা চড়া দামে দ্রব্যাদি কিনিতে হইবে। পরিমাণ যত বাড়িবে টাকার দাম ততই কমিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের দাম বাড়িয়া চলিবে। এক কথায় টাকার দাম কমার অর্থ জিনিষের দাম বাড়িয়া যাওয়া এবং জিনিষের দাম কমার অর্থই হইতেছে টাকার দাম বৃদ্ধি পাওয়া। গত মহাযুদ্ধের বকৃশিস্‌স্বরূপ আমরা বহু কাগজী মুদ্রা লাভ করিয়াছি—ফলং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। যুদ্ধ থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ্ এবং চিন্তানায়কগণ যাহাতে এই মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা যায় তাহার পন্থা আবিষ্কারের জন্য গবেষণা করিতেছেন এবং এই অস্বাভাবিক মুদ্রামূল্য বৃদ্ধির প্রতিকারের জন্য নানা কার্য্যকরী পন্থার নির্দ্দেশও তাঁহারা দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে ভাল কিছু হইবার নহে। যদি বা আমরা স্বরাজ পাইলাম তো তাহা আসিল দেশকে খণ্ডিত করিয়া—লক্ষ লক্ষ লোকের ভিটা-মাটি উৎসন্ন হইল, রক্তারক্তিতে ইতিহাস হইল কলঙ্কিত। সর্ব্বোপরি ইহাতে আমাদের আর্থিক জীবন বিপর্য্যস্ত করিয়া এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হইল যে, জটিল সমস্যা-জালে আজ আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া পড়িয়াছি। সেগুলির সমাধানের আশা যেন আলেয়ার আলোর মত ক্রমেই দূরে সরিয়া গিয়াছে।

এখন এদেশের বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির কথা বাদিয়া দিলেও গত এক বৎসরের মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলি খতাইয়া দেখার প্রয়োজন আছে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ১৯৪৬-৪৭ সন হইতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ যথাক্রমে কেন্দ্রের এবং প্রদেশগুলির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে বিশেষ ভাবে এই মুদ্রাস্ফীতির আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। অবশ্য গবর্ণমেণ্টের আয়ের অঙ্কে ঘাটতি পড়াতেই এরূপ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৪৬-৪৭, ১৯৪৭-৪৮ এবং ১৯৪৮-৪৯ সনের আনুমানিক ঘাটতি যথাক্রমে ১০৭,৪৭ এবং ১২৪ কোটি টাকা। প্রাদেশিক বাজেটে চল্‌তি খাতে এ পর্য্যন্ত ঘাটতি ১১ কোটি, আর ইহাদের মূলধন খাতে খরচের ঘাটতি ৫১ কোটি অর্থাৎ মোট ঘাটতি ৬২ কোটি টাকা। সুতরাং চল্‌তি বৎসরের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার এ দুটির সম্মিলিত ঘাটতির পরিমাণই ১৮৬ কোটি টাকা। নানা কারণে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে আর ঘাটতির পরিমাণও ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। অনেক উন্নয়ন-পরিকল্পনা যথা দামোদর উপত্যকা এবং মহানদী পরিকল্পনা প্রভৃতি, কর্ম্মচারীদের মাহিনা বৃদ্ধি, বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বসতি ইত্যাদির ব্যবস্থা এবং কাশ্মীর যুদ্ধ ইত্যাদি নানা ব্যাপারে রাষ্ট্রের ব্যয় ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলে। অথচ ওদিকে দেশের উৎপাদনবৃদ্ধি তো হয়ই নাই, বরং শ্রমিকগণের অসন্তোষ ও পৌনঃপুনিক ধর্ম্মঘটের দরুন বহুক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। বিদেশী মাল (যাহা গবর্ণমেণ্টের মতে কম প্রয়োজনীয়) আমদানী সম্পর্কে বাধা-নিষেধ আরোপ করায় ঐ সকল দ্রব্যও উপযুক্ত পরিমাণে বাজারে আসিতেছে না। অবশ্য গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই নীতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ১৯৪৭-৪৮ সনে গবর্ণমেণ্টের ১৫০ কোটি টাকা কর্জ্জ করিয়া যোগাড় করিবার কথা ছিল কিন্তু ৭৫ কোটি টাকার বেশী পাওয়া যায় নাই। এদিকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যের দ্রব্যাদি—যথা কাপড়-চোপড় এবং কোন কোন স্থানে, খাদ্যশস্য বিনিয়ন্ত্রণের পর হইতেই অগ্নিমূল্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রতিক্রিয়া যে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কিরূপ ভয়াবহ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। উৎপাদনবৃদ্ধি সম্বন্ধে শিল্পপতিগণও খুব উৎসাহ দেখাইতেছেন বলিয়া মনে হয় না, বরং তাঁহাদের কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টের সকল্পিত, অদূর ভবিষ্যতে শিল্পের জাতীয়করণ নীতির দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। এই সকল পুঁজিপতি গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণ যোগাইয়া থাকেন, শিল্পে অর্থনিয়োগ করিতে ভয় পান অথচ ইঁহাদেরই চেষ্টা লাভের অঙ্ক দিন দিন স্ফীত হইতে থাকে। কিন্তু এই প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ইঁহাদিগকে অবিলম্বে নিজেদের কর্ম্মপন্থা বদলাইতে হইবে নতুবা অদূর ভবিষ্যতে সমষ্টির অকল্যাণকর কার্য্যের জন্য ইঁহাদিগকে বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে।

যে মুদ্রাস্ফীতি আজ সর্ব্বত্র দেশে হাহাকারের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা রোধ করিবার জন্য এবং ইতিমধ্যেই তাহা যে কুফল প্রসব করিয়াছে তাহা নির্মূল করিবার জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি কার্য্যকরী পন্থা অচিরে অবলম্বন করা প্রয়োজন—

১। জীবনধারণের অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সম্পর্কে অবিলম্বে পুনরায় সরকারী মূল্য এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন। এই সকল দ্রব্যাদি হইতেছে—খাদ্যশস্য, শাকসব্জী, ধনিজ-তৈল, চিনি, বস্ত্র, লবণ, কয়লা ও কুইনাইন প্রভৃতি। গৃহনির্ম্মাণের উপকরণাদিও ইহার অন্তর্গত।

২। বিদেশ হইতে আমদানী সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্যের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। অবশ্য এই আমদানীর বিনিময়ে ভারতকেও বিদেশে যথেষ্ট পণ্যদ্রব্য রপ্তানী করিতে হইবে। নতুবা দেশের শিল্পোন্নতির জন্য কলকজার আমদানী ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা।

৩। যে সকল দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্ট হাতে লইয়াছেন তাহাও চালু রাখিতে হইবে, কারণ আশু না হইলেও ভবিষ্যতে এই সকল পরিকল্পনার কার্য্যকরী প্রয়োগ দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইবে।

৪। যাহাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি হয় তাহার জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে সক্রিয় চেষ্টা।

৫। আর এরূপভাবে ব্যবসা ও শিল্পপতিগণের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতে এবং কর ধার্য্য করিতে হইবে যাহাতে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নীতিতে আস্থাবান থাকিয়া দেশের আর্থিক উন্নতির সহায়ক হন। অবশ্য ভার ও কূল দুই-ই রাখা খুবই কঠিন। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কারণ আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামো ধনতান্ত্রিক—ইহাকে সমাজতান্ত্রিক করিয়া তুলিতে কিছু সময়ের আবশ্যক। প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণ, বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ, রেল ও যানবাহন ব্যবস্থা, সেচ-ব্যবস্থা, সার উৎপাদন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পরিসংখ্যান প্রস্তুত, কৃষিবিষয়ক গবেষণা প্রভৃতি এখন হইতে গবর্ণমেণ্টের নিজ হস্তে গ্রহণ করা উচিত।

৬। যাহাতে সাধারণের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বসাধারণকে উৎসাহ দান।

৭। আমাদের দেশে অগণিত দীনদরিদ্র লোকের মধ্যে কুটির-শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। চরকার প্রসার এই ব্যাপারে যাহাতে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

৮। সর্ব্বশেষে এই দুঃখদৈন্যের মধ্যেও যাহাতে জনসাধারণ সঞ্চয়ী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। কারণ এই উপায়েই আমরা সামাজিক মূলধন বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনের সহায়তা করিতে পারি। সোভিয়েট রুশিয়ার মত সাম্যবাদী রাষ্ট্রও দেশবাসী এবং শ্রমিকদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

সৌরশক্তির উৎস

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

১৯৪৫ সনের ৬ই আগষ্ট প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন, সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধের জন্য যাহারা দায়ী তাহাদের বিরুদ্ধে সেই শক্তি ব্যবহৃত হইতেছে যাহা দ্বারা সূর্য্য তাহার বিপুল শক্তি আহরণ করে।

ঐ বৎসরেই জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর দুইটি মাত্র এটম্-বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। রুজভেল্টের কথায়, এটম্-বোমার অমিত শক্তি এবং লক্ষ কোটি বৎসর ধরিয়া সূর্য্য আলো ও উত্তাপরূপে যে শক্তি বিতরণ করিতেছে তাহার মূল উৎস একই। ব্যাপারটি প্রণিধানযোগ্য।

সার জেম্‌স্ জিন্‌স্ বলেন, কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আলো ও উত্তাপ ব্যতীত পৃথিবী জীবনধারণের সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং এই পৃথিবীতে অদ্যাবধি যে প্রাণিজগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার কারণ পৃথিবী সূর্য্য হইতে উপযুক্ত পরিমাণেই আলো এবং উত্তাপ আহরণ করিতেছে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যে, সূর্য্য যে প্রতিনিয়ত আলোরূপে এত প্রভূত শক্তি হারাইতেছে তাহার ভবিষ্যৎ কি? সৌরশক্তির পরিমাণ কি অফুরন্ত? যদি না হয়, তবে এমন এক দিন আসিবে কি যখন সূর্য্য আর প্রাণীসমূহের জীবনধারণোপযোগী আলোক-শক্তি বিকিরণ করিতে সমর্থ হইবে না। জিন্‌স বলেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাণিজগতের নিমিত্ত তৈয়ারী হয় নাই। একান্ত "আকস্মিকভাবে"ই যখন পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব হইয়াছে তখন এক দিন আকস্মিকভাবেই ধরাপৃষ্ঠে জীবন বলিতে কিছুই থাকিবে না তাহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে! তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সূর্য্যের জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণিজগতের অস্তিত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, আর সূর্য্যের ভবিষ্যৎও "অন্ধকার" বলিয়াই মনে হয়। তাই সৌরশক্তির উৎস এবং তাহার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার নিমিত্তই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

দুই শত কোটি বৎসর ধরিয়া সূর্য্য যে বিপুল পরিমাণ শক্তি তাপরূপে হারাইয়াছে তদ্দৃষ্টে মনে করা স্বাভাবিক যে, সূর্য্যের তাপসঞ্চয় অপরিমিত। এত অধিক তাপসঞ্চয়কারী পদার্থের উত্তাপ ন্যূনকল্পে এক শত কোটি ডিগ্রী (সেণ্টিগ্রেড) হওয়া একান্তই উচিত, অথচ অন্যরূপ পরীক্ষায় উহা মাত্র সাত কোটি ডিগ্রী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। উত্তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের পদার্থরাশির তাপধারণ ক্ষমতার বৃদ্ধি হইলেও এত অধিক তাপ সঞ্চয় করা সূর্য্যের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু ইহারও ব্যতিক্রম প্রমাণিত হইয়াছে। বলা যাইতে পারে যে, কোন রাসায়নিক উপায়ে দহন-ক্রিয়ার নিমিত্ত সূর্য্য এতাদৃশ শক্তি যোগাইতেছে। কিন্তু এত প্রচণ্ড শক্তিদানকারী কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কথা আমরা জ্ঞাত নই। তদ্ব্যতীত সূর্য্যের অভ্যন্তরের উত্তাপ বাদ দিলেও বহির্ভাগে যে উত্তাপ আছে তাহাতে কোন প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব।

উনবিংশ শতাব্দীতে আরও দুইটি মতবাদ প্রচলিত হয়। আমরা জানি, কোন যান্ত্রিক শক্তিকে তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে। অনেকের অভিমত, সূর্য্যের বায়ুমণ্ডলে উল্কারাশির সংঘর্ষণজনিত উত্তাপই সূর্য্যে শক্তি যোগাইতেছে। হেলম্‌হোজ্ এবং কেলভিন্ বলিলেন, সূর্য্যের আয়তন অনবরতই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে এবং এইজন্য যে স্থিতিস্থাপক শক্তির সৃষ্টি হইতেছে তাহাই হইল সৌরশক্তির উৎস। কিন্তু এই উভয় মতবাদই ধোপে টিকে নাই।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সৌরশক্তির উৎস সম্বন্ধে কোন মতবাদই গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ১৮৯৬ সনে হেন্‌রী বেকেরেলের 'স্বতঃদীপ্তি' (Radio activity) আবিষ্কার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল; জ্যোতির্বিদ্যাও বাদ পড়ে নাই।

১৮৯৯ সনে লর্ড রাদারফোর্ড প্রমাণ করিতে সমর্থ হইলেন যে, রেডিয়াম্, ইউরেনিয়াম্ প্রভৃতি স্বতঃদীপ্ত ধাতু হইতে অনবরত আলফারশ্মি, বিটারশ্মি, গামারশ্মি নামে তিন প্রকার শক্তিরূপে রশ্মি নির্গত হইতে থাকে। এইরূপ শক্তি নিঃসরণ করিয়া উক্ত ধাতুগুলি লক্ষ লক্ষ বৎসর পর সাধারণ সীসায় পরিণত হয়। তিনি ইহাও বলিলেন যে, এমনিধারা রশ্মিরূপে যে শক্তি পাওয়া যাইতেছে তাহার কারণ হইল পদার্থের পরমাণুর নিয়ত পরিবর্ত্তন এবং এই পরিবর্ত্তনটি নির্ভর করিতেছে অনেকটা দৈবের উপর। পরে অবশ্য প্রাকৃতিক উপায়ে পরমাণু ভাঙা সম্ভব হইয়াছে। উপরন্তু শক্তি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা এটম্-বোমা।

সে যাহাই হোক, সূর্য্যের ভিতরে যদি রেডিয়াম্, ইউরেনিয়াম্ প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় ধাতু বিদ্যমান থাকে তবে হয়তো আলোরূপে এতাদৃশ শক্তি লাভ করা সম্ভব। কিন্তু এখানেও আপত্তির বিশেষ কারণ বিদ্যমান। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, যদি সূর্য্যের সমস্তটাই ইউরেনিয়াম্ ধাতুগঠিত হইত তবেই সূর্য্য হইতে বর্ত্তমানে যে শক্তি পাওয়া যাইতেছে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র পাওয়া সম্ভব হইত। তাহা ছাড়া, সূর্য্যের ভিতরে ইউরেনিয়ামের বিদ্যমান অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই; থাকিলেও তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্পই হইবে। তবে এ প্রসঙ্গে অন্য একটা কথা উঠে। আইন্‌ষ্টাইনের

'আপেক্ষিক তত্ত্ব' (Theory of Relativity) অনুসারে দেখা যায়, পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা খুবই সম্ভব। নিম্নলিখিতভাবে তাহা বিবৃত করা যাইতে পারে :—

$$E = mc^2$$

[E = শক্তির পরিমাণ, m = পদার্থের ভর এবং c = আলোর গতিবেগ (প্রতি সেকেণ্ডে)]। আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল ধরিলে দেখা যাইবে যে, অতি সামান্য পরিমাণ পদার্থ-ক্ষয়ে বিপুল শক্তি পাওয়াই সম্ভব। কাজেই যদি মনে করিয়া লওয়া হয় যে, সূর্য্যের অভ্যন্তরস্থ পদার্থরাশিই অনবরত আলো-ও-উত্তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে তবে তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আসে। ব্যাপারটা যথাযথ বুঝিতে হইলে আমাদের জানা প্রয়োজন— সূর্য্যের অভ্যন্তরে কি কি পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং এত অধিক উত্তাপে উহাদের মধ্যে কি প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, অর্থাৎ সূর্য্যের ভৌতিক এবং রাসায়নিক গঠনবিধি।

কোন তারকা বা সূর্য্যের ভৌতিক এবং রাসায়নিক অবস্থা বুঝিতে হইলে তিনটি জিনিসের দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে—উত্তাপ, ঘনত্ব এবং চাপ। সূর্য্যের উপরিভাগ হইতে যাহাতে সর্ব্বদাই অত্যধিক পরিমাণে তাপ বিকীর্ণ হইতে পারে তজ্জন্য আমাদের ধরিয়া লইতে হয় যে, সূর্য্যের কেন্দ্রের দিকের উত্তাপ উপরিতল হইতে অনেক বেশী। ঘনত্বও কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া উপরিতলের দিকে ক্রমশঃই কমিয়া আসিয়াছে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, সূর্য্যের উপরিভাগে চাপের পরিমাণ পৃথিবীপৃষ্ঠের চাপ অপেক্ষা এক সহস্র কোটি গুণ অধিক। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, সূর্য্য প্রধানতঃ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম নামে দুইটি বায়বীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত ; কোন ভারী মৌলিকের বিদ্যমানতা অনেকটা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়, থাকিলেও যৎসামান্য।

এ প্রসঙ্গে পদার্থের গঠনবিধি সম্বন্ধেও কিছু জানা একান্ত প্রয়োজন। পদার্থ-পরমাণু বিভিন্নসংখ্যক ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণিকা দ্বারা গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে নিউক্লিয়াস্ বা কেন্দ্রীন—নিউক্লিয়াসে পরমাণুর সমস্ত ধনাত্মক বিদ্যুৎকণিকা বা প্রোটন এবং কয়েকটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণিকা বা ইলেক্‌ট্রন রহিয়াছে, বাকী ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রীনের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তুলাকার পথে অনবরত ঘুরিয়া বেড়ায়। সাধারণ অবস্থায় পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন প্রোটনের সংখ্যা একই থাকে। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীনে একটিমাত্র প্রোটন এবং ঘুরানো পথে একটিমাত্র ইলেকট্রন থাকে ; হিলিয়াম্ পরমাণুতে থাকে চারিটি প্রোটন এবং চারিটি ইলেকট্রন, উহাদের মধ্যে দুইটি ইলেকট্রন কেন্দ্রীনে এবং দুইটি বাহিরে রহিয়াছে। যদি কোন পদার্থ-পরমাণুর কেন্দ্রীনের সঙ্গে অন্য কোন পরমাণু কেন্দ্রীনের সংঘর্ষ হয় তবে উহাদের মধ্যে একটা ভাঙনের কার্য্য সংঘটিত হয় এবং ফলে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের পরমাণুর সৃষ্টি হয়। উপরন্তু এইরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য খানিকটা শক্তিও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এখন আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, সূর্য্যের অভ্যন্তরে কি প্রকারের পরমাণু-ভাঙনের কার্য্য চলিতেছে যাহার ফলে সূর্য্য এতাদৃশ বিপুল শক্তি বিকিরণ করিতে পারিতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সূর্য্যের ভিতরে ভারী পদার্থের বিদ্যমানতা খুবই কম বলিয়া মনে হয়। সুতরাং একমাত্র হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীনে কেন্দ্রীনে সংঘর্ষের ফলে কি ব্যাপার সংঘটিত হয় তাহা দেখা যাক। অতি বেগে ধাবমান দুইটি হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনের মধ্যে সংঘর্ষণের ফলে একটি ডিউটেরন্ * এবং একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎপরিপূর্ণ কণিকার সৃষ্টি হয়। তৎপর ডিউটেরন এবং আর একটি হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনের মধ্যে সংঘর্ষণ-কার্য্য চলে এবং তিন ভরযুক্ত একটি হিলিয়াম্ পরমাণু এবং কিছু পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই প্রকারে প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ এবং সৌর শক্তির পরিমাণ একই।

* পরমাণবিক ভর যাহার দুই এইরূপ হাইড্রোজেন। উল্লেখযোগ্য সাধারণ হাইড্রোজেনের পরমাণবিক ভর এক।

কিন্তু এখানেও কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য রহিয়া যাইতেছে। সূর্য্যের কেন্দ্রে যে পরিমাণ তাপ আছে তাহাতে এবম্প্রকার কেন্দ্রীয় ভাঙনের কার্য্য চলিলেও উপরিস্তরের তাপ অনেক কম থাকে বলিয়া এত শক্তিদানকারী ক্রিয়া নাও ঘটিতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এমন অনেক তারকা আছে যাহারা এই প্রকারেই তাহাদের বিচ্ছুরিত শক্তির উৎস আহরণ করে। তবে সূর্য্যের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কোন ভারী পদার্থের পরমাণু হয়তো এই প্রকারে ভাঙিয়া যাইয়া উপযুক্ত পরিমাণ শক্তি প্রদান করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু উহাদের পরিমাণ যে সূর্য্যের মধ্যে নির্দিষ্ট। কাজেই এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, যদি অঙ্গার, অক্সিজেন প্রভৃতি পদার্থগুলি এমনিভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে তবে হয়তো একদিন সূর্য্যে উহাদের ঘাটতি পড়িতে পারে এবং সূর্য্যের উত্তাপও সেদিন নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান হইয়াছে অন্য প্রকারে। পণ্ডিতগণ বলেন, প্রকৃতপক্ষে হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনই ভাঙে, তবে অঙ্গার-পরমাণুর কেন্দ্রীন নিজে সাময়িক ভাবে ভাঙিয়া হাইড্রোজেনকে সাহায্য করে মাত্র। অঙ্গার যতটুকু ভাঙে ঠিক ততটুকুই গঠিত হইয়া থাকে। এইভাবে কেন্দ্রীয় সংঘর্ষণজনিত শক্তি এবং সৌরশক্তির পরিমাণ যে একই তাহা প্রমাণিত হয়।

সৌরশক্তির উৎস সম্বন্ধে যখন সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হইয়াছে তখন সূর্য্যের সম্ভাব্য জীবনকাল সম্বন্ধেও মোটামুটি একটা ধারণা করা মোটেই অসম্ভব নহে। একমাত্র হাইড্রোজেনই যদি সৌরশক্তি সংগ্রহের মূল হয় তবে সূর্য্যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ কত তাহা ঠিকমত নির্ণয় করিয়া প্রতিনিয়ত কি পরিমাণ হাইড্রোজেন ব্যয়িত হইতেছে তাহা হিসাব করিলে সূর্য্যের পরমায়ু কতকাল সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিবে। ইহা প্রায় এক সহস্র কোটি বৎসর বলিয়া অনুমিত হয়, অথচ সূর্য্যের বর্ত্তমান বয়স মাত্র দুই শত কোটি বৎসর। তাহা ছাড়া, পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, হাইড্রোজেনের পরিমাণ যত দিনে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, ঠিক সেই সময়-মধ্যে তাপের পরিমাণ আরও এক শত গুণ বর্দ্ধিত হইবে। তারপর অতিক্রান্ত সূর্য্য তাহার আলো-উত্তাপদানকারী ক্ষমতা হারাইয়া চিরতরে নিভিয়া যাইবে। কিন্তু মা ভৈঃ, তাহার এখনও আট শত কোটি বৎসর বাকী।

পুস্তক-পরিচয়

দামোদর পরিকল্পনা—শ্রীচন্দ্রশেখর ঘোষ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় কলিকাতা—পৃষ্ঠা ৫৭, মূল্য ।০ আনা।

বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ গ্রন্থমালার ৬৭তম গ্রন্থ। স্বাধীন ভারতবর্ষকে নূতন করিয়া গড়িবার উদ্দেশ্যে বিবিধ পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। দামোদর পরিকল্পনা উহাদের অন্যতম। বিহার ও বাংলা এই দুই প্রদেশের মধ্য দিয়া দামোদর নদী প্রবাহিত। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই এই নদীতে জল থাকে না। কিন্তু যখন বর্ষার প্লাবন আসে তখন ইহা করাল মূর্তি ধারণ করে। এইজন্যই 'দামোদরের বন্যা' পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদের মনে চিরদিনই ভীতির সঞ্চার করে। আমেরিকার টেনেসিভেলি প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে এই প্রলয়ঙ্করী নদীকে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষের কাজে লাগাইবার জন্য যে কল্যাণ-প্রচেষ্টা সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে তাহার বিবরণ একটি ইংরেজী পুস্তকে প্রকাশিত হইলেও, বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আর কোনো পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। এই পুস্তকের গোড়ায় দামোদর নদী ও দামোদর উপত্যকার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। পরে কিরূপে দামোদর পরিকল্পনা সফল হইলে (ক) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, (খ) বিদ্যুৎ সরবরাহ, (গ) সেচ-ব্যবস্থা, (ঘ) জলপথে চলাচল, (ঙ) পানীয় জল সরবরাহ, (চ) ম্যালেরিয়া নিবারণ, (ছ) জমির ক্ষয়নিবারণ ইত্যাদি হইবে তাহা বিশদভাবে দেখান হইয়াছে। এই পরিকল্পনার সফলতার সহিত দেশের বহুমুখী উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত রহিয়াছে। এইরূপ অত্যাবশ্যক বিষয় দেশবাসী মাত্রেরই জ্ঞাতব্য। আমরা এই পুস্তিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

বাংলার নদনদী—ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪৮, মূল্য ।০ আনা।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক। নদীকে আশ্রয় করিয়া দেশে দেশে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। আর্য্যভারতের সভ্যতা বিশেষভাবে সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সহিত ওতঃপ্রোত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমাদের সভ্যতা 'গাঙ্গেয় সভ্যতা'। গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় গঙ্গা-ভাগীরথী, ছোট গঙ্গা, বড় গঙ্গা, আদি গঙ্গা, গঙ্গার প্রাচীনতম প্রবাহ, যমুনা গঙ্গার উত্তর প্রবাহ, পদ্মা, গড়াই, মধুমতী, শিলাইদহ, ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা, জলাঙ্গী, চন্দনা, লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র, সুরমা-মেঘনা, করতোয়া, তিস্তা, পুর্ণভবা, মহানন্দা, আত্রাই প্রভৃতি নদনদীর আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য হইতে এবং বিদেশীয়দের পুরাতন নক্সা হইতে এই সকল নদীর পূর্ব্বকথা যথাসম্ভব উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক দেখাইয়াছেন যে, বাংলা ও বাঙালীর ভাগ্য যুগে যুগে এই নদীপ্রবাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত ছিল; বলা বাহুল্য এখনও আছে। এই সকল নদীর গতিবিধি এদেশের নগর-গ্রামের সৃষ্টি-বিলয় আর্থিক ও সামাজিক উত্থান-পতন নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছে। লেখকের সরস বর্ণনায় নদনদীর কথা এরূপ মনোজ্ঞ হইয়াছে যে পাঠক মাত্রেই ইহা পড়িয়া একাধারে জ্ঞান অর্জন ও আনন্দ উপভোগ করিবেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার—শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, চীনভবন, বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতী, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে বৌদ্ধ সংস্কৃতগ্রন্থ বোধিচর্যাবতারের প্রথম আটটি পরিচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ সংকলিত হইয়াছে। ইহার আর একখানি বঙ্গানুবাদ কয়েক বৎসর পূর্বে মূলসহ প্রকাশিত ও প্রবাসীতে (ফাল্গুন ১৩৪২) সমালোচিত হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে মূল দেওয়া হয় নাই। তবে পূর্বপ্রকাশিত অনুবাদে কয়েকটি পরিচ্ছেদ অসম্পূর্ণ ছিল। সুজিতবাবু সেই অসম্পূর্ণ অংশের মূল সংগ্রহ করিয়া তাহারও অনুবাদ করিয়াছেন। ফলে বর্তমান গ্রন্থখানি পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। পাদটীকায় ও দীপিকা নামে পরিশিষ্টে কঠিন ও পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ হইলেও ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধমাত্র নাই। পক্ষান্তরে, সাধারণ গৃহস্থের জানিবার, বুঝিবার ও শিখিবার মত বিষয়ে ইহা পরিপূর্ণ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতার মত এই গ্রন্থের বহুল প্রচার ও আলোচনা বিশেষ কাম্য। বিশ্বভারতী এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বাংলা-সাহিত্য ও বাঙালী সমাজের উপকার করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে দুই জন বোধিসত্ত্বের আত্মত্যাগ-কাহিনী সংকলিত হইয়াছে। ইঁহাদের আদর্শের সহিত যীশু চৈতন্য-গান্ধীর আদর্শের ঐক্য সকলকে মুগ্ধ করিবে। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

১। আয়না (দ্বিতীয় সংস্করণ) **২। ফুড্‌ কন্‌ফারেন্স।** আবুল মনসুর আহমদ। নওরোজ লাইব্রেরী, ৪৭।১, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য প্রত্যেকটি ৩্ টাকা।

আয়না ও ফুড্‌ কন্‌ফারেন্স—এই দুটি গল্প-সঙ্কলনের বই। প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যে ব্যঙ্গ-সৃষ্টির প্রয়াস আছে। বাংলা-সাহিত্যে ব্যঙ্গ-রচনার চেষ্টা সার্থক হইলেও পরিমাণে তা অজস্র নয়। অসাধারণ প্রয়োগ-নৈপুণ্য না থাকিলে সমস্ত সৃষ্টিই বিকৃত হইয়া উঠে। 'আয়না'র ফ্রেমে নজরুল ইসলাম যথার্থই বলিয়াছেন, 'এ যেন সেতারের কান মলে সুর বের করা—সুরও বেরুবে, তারও ছিঁড়বে না।' এই ধরণের দুর্লভ রসসৃষ্টির ক্ষমতা ওস্তাদ শিল্পীরই সাধ্যায়ত্ত। সুখের বিষয়—আবুল মনসুর বহুলাংশে এই ক্ষমতাকে আয়ত্ত করিয়াছেন। প্রতিটি গল্পের মধ্যে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় আছে। সব মিলাইয়া আয়নার গল্পগুলিতে যে সব মানুষের স্বরূপ ফুটিয়াছে তাহাদের মন্দিরে, মসজিদে,

বক্তৃতামঞ্চে, রাজনীতির আখড়ায় ও সমাজ-ব্যবস্থার পুরোভাগে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি। কুড্‌কন্‌কারেন্সের গল্পগুলিও মনের খাদ্য হিসাবে উৎরাইয়াছে ভাল। বিগত লীগমন্ত্রিমণ্ডলীর অনেকেই কুড্‌কন্‌কারেন্সের ভোজের আসর জমাইয়াছেন। সমাজের অনাচার ও শাসননীতির ব্যভিচার দুই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিল্পী ছবির পর ছবি আঁকিয়াছেন। হাসিতে অশ্রুতে বেদনার বিদ্রূপে ছবিগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ভাষা সম্বন্ধে অনুযোগের হেতু না থাকিলে আবুল মনসুরের রস-সৃষ্টিকে অনবদ্য বলা চলিত। হয়ত মুসলমান-সমাজের প্রতিবেশ ফুটাইবার জন্য আরবী ফারসীর অতিরিক্ত অলঙ্কার গল্পগুলির সর্ব্বাঙ্গে চাপাইতে হইয়াছে—ইহার ফলে আরবী ফারসী অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে কাহিনীর রসগ্রহণে যথেষ্ট বাধা জন্মিয়াছে। তা ছাড়া—সাস্থবান প্রাতস্মরণিয়, পুর্বপুরুষ, দিতীয়ত, সতন্ত্র, শশানে, প্রিতি, সার্থ, থির প্রভৃতি অজস্র বানানের যথেচ্ছাচারিতা কাহিনীর কৌতুক রস-উপভোগে বাধা জন্মায়।

কুড্‌কন্‌কারেন্সে বিদেশী শব্দ আমদানীর ঝোঁকটা কম—গল্পগুলিও সেইজন্য অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ ও কৌতুক রসোত্তীর্ণ।

লীলাসঙ্গিনী—শ্রীশৈলেন বসু। বি, সিংহ এণ্ড ব্রাদার্স। ৩৮, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১৷৷৹ আনা।

লীলাসঙ্গিনী একখানি উপন্যাস। প্রথম খণ্ডে ইহার যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে নানাজাতীয় ফুলের গুচ্ছে বাঁধা একটি তোড়ার কথা স্বতঃই মনে হয়। বিচিত্র বর্ণের ফুলের বিন্যাসভঙ্গীতে তার জাতি বা জন্ম ইতিহাস থাকে অমুক্ত, উগ্র, মিষ্ট এবং গন্ধহীন সবরকম ফুলের সমষ্টি তখন একটি মাত্র স্তবকে রূপান্তরিত এবং সেইটিই তার রূপগুণময় কায়া।

লীলাসঙ্গিনীর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ গল্পের অবকাশ নাই বলিয়াই বিভিন্ন চরিত্রের বিকাশও চোখে পড়ে না। একটি ড্রয়িং রুমে আধুনিক যুগের তরুণতরুণীর মেলা, তাদের ফ্যাসান-দুরস্ত আচার-আচরণ, বাগ্‌বিভূতির কৌশলে বিশ্ব-সংস্কৃতির পরিচয় জ্ঞাপন, জীবন-দর্শনের লঘু একটি দিকের প্রতি ইঙ্গিত—কৌতুকে ব্যঙ্গে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে আলাপবৃন্তকে সুষ্ঠু আকার দেওয়ার চেষ্টা ইহার মধ্যে নাই। এই ধরণের ড্রয়িংরুম-কেন্দ্রিক অতি আধুনিক জীবনের আলোকচিত্র বাংলা-সাহিত্যে বিরল নহে। এই ধরণের চিত্র দৃষ্টিতে বিভ্রম জন্মাইলেও তোড়ায় হারাইয়া যাওয়া ফুলের মতই ভঙ্গীসর্ব্বস্ব—যদিও সমাজের উপরের স্তরের কায়া এবং তার অনুসরণরত মধ্যস্তরের খানিকটা ছায়া ইহার মধ্যে পড়িয়াছে, এবং মোটের উপর অবাস্তব নহে। কালের গতি-প্রবাহে এ জিনিস আসিয়াছে—সমগ্র জীবনের অনুভূতি ইহার মধ্যে নাই। যাহা হউক, মাত্র প্রথম খণ্ডে কাহিনীর আরম্ভে উপন্যাস সম্বন্ধে ভালমন্দ কিছু বলা কঠিন। সংলাপ রচনায় লেখকের ক্ষমতার পরিচয় আছে। পরবর্ত্তী খণ্ডে কাহিনীর সঙ্গে ইহা সুপ্রযুক্ত হইলে চরিত্রগুলি স্বকীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দেশের জ্ঞাতব্য আইন (১ম খণ্ড)—এস, এন, ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল। ১২২+১৬ পৃঃ, ইষ্টার্ণ ল হাউস, পি-১৩, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য ২৸৹ আনা।

বাংলা ভাষায় লিখিত আইনের বই বিরল। অথচ দেশের আইন সম্বন্ধে ইংরেজী অনভিজ্ঞ লোকেদের মোটামুটি জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। ইংরেজী অনভিজ্ঞ লোকের মধ্যে আইনের বিধানসমূহ জানিবার আগ্রহও খুব। বর্ত্তমান সমালোচক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অল-ইণ্ডিয়া রেডিও হইতে দেশের আইন সম্বন্ধে বাংলায় কয়েকটি বক্তৃতা দেন। লোকে সেগুলি আগ্রহের সহিত শুনিত। লেখক এই পুস্তক লিখিয়া দেশের একটি প্রকৃত অভাব দূর করিয়াছেন। বইখানি যে কেবলমাত্র অল্পশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকেদের উপকারে আসিবে তাহা নহে, শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও কাজে লাগিবে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন দলিল রেজিষ্টারী করিতে কি কি লাগিবে তাহা অনেকেই জানেন না, উকীল-বাড়ী গিয়াও সঠিকভাবে জানা যায় না—কারণ বাংলা-সরকার ১৯৩২ সালের পর আর Registration Manual ছাপেন নাই। নূতন উকীলের নিকট এই বই না থাকিবারই সম্ভাবনা। থাকিলেও ১৯৩৯ সালে ফি-এর যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা লিখিত নাই। আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি। লেখকের দুরূহ বিষয় সরল করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা আছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

দুর্গম হয় পন্থা। শ্রীঅশোক সেন। সেঞ্চুরী পাব্লিশার্স: ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

লেখকের প্রথম নাট্য-সঙ্কলন 'অযাত্রা পথে যাত্রী যাহারা চলে' পাঠকসমাজের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। আলোচ্য পুস্তকখানি তাঁহার দ্বিতীয় নাট্য-সঙ্কলন। লেখকের শক্তির উপর শ্রদ্ধা লইয়াই বইখানি পড়িতে বসিয়াছিলাম। কিন্তু লেখক আমাদের খুশী করিতে পারেন নাই। 'দুর্গম হয় পন্থা', 'কেন এমন হয়', এবং 'অভিনেতা' এই তিনটি নাটিকার ভিতর দিয়াই লেখক আপন বক্তব্য ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন—তাই উক্ত নাটিকাগুলি নাটকের ধর্ম্ম এবং চরিত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া তর্কবহুল আত্মচিন্তায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। চরিত্রের যেন কোন নিজস্ব বক্তব্য বা গতি নাই—লেখকের চিন্তারই তাহারা প্রতিধ্বনি করিতেছে। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-যোগ্যতার কথা বাদ দিলেও যে বাস্তবানুগ ও জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টি এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত রচনা—শ্রেষ্ঠ নাটকের উপাদান, উক্ত তিনটি নাটিকার একটিতেও তাহা লক্ষ্য করিলাম না। নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র-চিত্রণ এবং সংলাপ এমন হওয়া উচিত যাহা পড়িতে পড়িতে পাঠকের হৃদয়াবেগ আলোড়িত হইয়া উঠে—তবেই তাহা শ্রেষ্ঠ নাটকের পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারে।

হৈমন্তী সেনের প্রচ্ছদপট চমৎকার, ছাপা ও বাঁধাই সুরুচির পরিচায়ক।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

পঙ্কিল—আলেকজান্দার কুপরিন। অনুবাদ: শ্রীকুমারেশ ঘোষ ও সুকুমার গুপ্ত। রীডার্স কর্ণার। ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

ইদানীং অনুবাদ-সাহিত্যের কদর বাড়িয়াছে। অনুবাদের মারফৎ বিদেশী ভাবধারার সহিত সহজে পরিচয় ঘটে, কিন্তু তাই বলিয়া যাঁরা বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ করেন তাদের আমাদের দেশের সামাজিক পরিবেশ, তার ঐতিহ্যের কথা ভুলিয়া যাওয়া সঙ্গত নয়। ভারতবর্ষ রুশিয়া নয়। এখানকার আধ্যাত্মিকতাকে ছোট করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে হয় না। বিগত মহাযুদ্ধ এবং সাম্প্রদায়িক হানাহানির ফলে যে পাপাচার এ দেশের সমাজ-জীবনের একটা অংশকে পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে সেদিকে জনসাধারণের সজাগ দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যকতা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের উক্ত কুপরিনের কথায় সায় দিতে পারিতেছি না।

রুশিয়ায় সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বারবনিতাদের কেন্দ্র করিয়া পাপাচারের যে কদর্য্য পরিণতি দেখা দিয়াছিল তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই কুপরিন "য়ামা দি পিট" নামক পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। পঙ্কিল ইহারই স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। অনুবাদ ভালই হইয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

বেণু ও বীণা (চতুর্থ সংস্করণ)—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। আর. এইচ. শ্রীমাণী এণ্ড সন্স, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩৷০।

রবীন্দ্রনাথের রশ্মিচ্ছটায় দীপ্যমান হইয়াও যে দুই জন কবি বাংলার কাব্যগগনে নিজস্ব উজ্জ্বল মহিমায় বিদগ্ধমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন সত্যেন্দ্রনাথ, অপর জন নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইঁহাদের কবিতার বলিষ্ঠ, ঋজু, প্রকাশভঙ্গী ও অকৃত্রিম বৈশিষ্ট্য অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন। 'বেণু ও বীণা' সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা-পুস্তক। 'কুহু ও কেকা', 'বেলাশেষের গান' প্রভৃতির ন্যায় ইহাতে কবির পরবর্ত্তী জীবনের কাব্যসৃষ্টির সকল বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বলভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই বটে, কিন্তু একটি উদার মানবতা ও দেশমাতৃকার ভক্ত-পূজারী কবি-হৃদয়ের যে স্বরূপ ইহাতে প্রকটিত হইয়াছিল, বাংলার সুধীগণ কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবামাত্র তাহা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতেই 'কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল', 'কে মা তুই বাঘের পিঠে বসে আছিস্ বিরস মুখে' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়। পুস্তকের গোড়ার দিকে সত্যেন্দ্র স্মরণে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি ও শেষের দিকে কবি ও কাব্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বইখানির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। উৎকৃষ্ট বাঁধাই ও রয়েল সাইজ পুরু কাগজে প্রত্যেকটি সচিত্র পৃষ্ঠায় রঙীন কালিতে মুদ্রিত এই বইখানি উপহারযোগ্য করিতে প্রকাশক চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

খেজুর বনের দেশে—শ্রীদেবেন্দ্রকুমার পাল চৌধুরী। পর্য্যটক প্রকাশনা ভবন, ১৫৬ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য ১৷০।

বিগত যুদ্ধে সৈনিকব্রত গ্রহণ করিয়া ইরাক ও ইরাণের সীমারেখায় টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে এবং সাত-অল-আরবের তীরে অবস্থিত সাহেবা, কারিও, সাম নদী, তামুমা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া সৈনিক-কবি দেবেন্দ্রকুমার পাল এই কবিতাগুলি লিখিয়াছেন।

মরুভূমি, খেজুরকুঞ্জ, দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও গুলবাগিচায় ভরা এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আর সুন্দরীদের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের বন্দনা পারস্যের অমর কবি ওমর খৈয়াম এবং আরব ও ইরাণের অন্যান্য কবিগণ শতমুখে করিয়াছেন। এই 'খেজুর বনের দেশে' ঘুরিয়া কবি অতি সহজ ভাষায় ও ছন্দে তাঁহার কবিত্বপূর্ণ হৃদয়-দুয়ার উন্মুক্ত করিয়াছেন। কঠোর সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করিয়াও কবি তাঁহার ভাবপ্রবণ হৃদয়ের মাধুর্য্য হারাইয়া ফেলেন নাই। ভাবমাধুর্য্য ও কবিত্বরসে মণ্ডিত কবিতাগুলি পাঠক উপভোগ করিবেন। মলাটে অঙ্কিত, খর্জ্জুরবৃক্ষশোভিত গ্রামপ্রান্তে জলাশয়ের ধারে দুইটি ইরাণী তরুণীর চিত্রটি সুন্দর। গ্রন্থকার যদি সত্যই কবিযশঃপ্রার্থী হন, তো ভাষা, ছন্দ ও বানানের দিকে তাঁহাকে আর একটু লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার ভদ্র একটি সুন্দর ভূমিকায় এই পুস্তকের কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

ছোটদের তুরস্কের গল্প—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷০ টাকা।

লেখক ইংরেজী হইতে তুরস্কের নিম্নলিখিত ছয়টি উপকথা এই বইয়ে সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন (১) প্রধান জ্যোতিষী (২) ক্রিষ্টাল (৩) বিষাদ (৪) সৎপরামর্শ (৫) নৈবাচুর (৬) নাসপাতি ভক্ষক (৭) লবণ
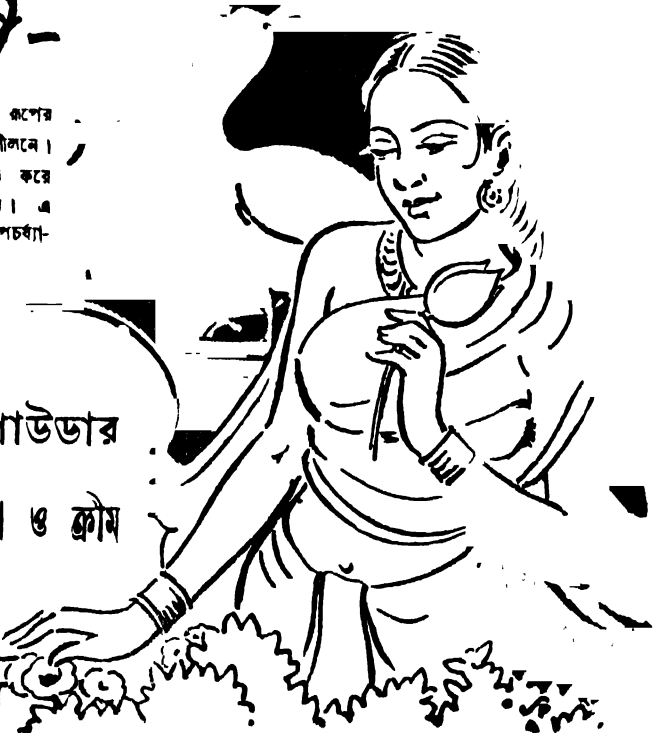
(৮) সোনার পাহাড়ের রাজা। এই সংগ্রহের মধ্যে প্রধান জ্যোতিষী, ক্রিষ্ট্যাল এবং সোনার পাহাড়ের রাজা এই তিনটি গল্প শিশুমনে বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক করিবে। সৎপরামর্শ এবং লবণ এই দুইটি গল্প উপদেশাত্মক—এগুলিতে গল্পচ্ছলে নীতি-কথা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। লেখকের গল্প বলার ভঙ্গীটি সুন্দর—বাহুল্য ও উচ্ছ্বাস বর্জ্জন করিয়া তিনি লেখনীর উপর সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তকখানিতে শুধু রাজা, উজীর, রাজপুত্র, রাজকন্যা, ডাইনি, দৈত্য প্রভৃতির কথাই নয়—সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের কাহিনীও স্থান পাইয়াছে।

শিকারের কথা—শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ। সংস্কৃতি বৈঠক। ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ কলিকাতা।

মৈমনসিংহের সুসঙ্গ দুর্গাপুরের মহারাজা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ একজন ওস্তাদ শিকারীরূপে বাংলাদেশে সুপরিচিত। শ্রেষ্ঠ মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত তাঁহার শিকার সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী সংস্কৃতি বৈঠক 'শিকারের কথা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। লেখক বাল্যকাল হইতেই আরণ্য প্রকৃতি ও শিকারের অনুরাগী। আসামের গারো পাহাড় এবং বাংলা ও উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে শিকারের সন্ধানে দীর্ঘকাল ঘোরাঘুরি করিয়া তিনি যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এই পুস্তকে 'সুসঙ্গের বনে শিকার' 'সুন্দরবনের শিকার, 'পুরীর কাছে এক দিনের শিকার' 'গারো পাহাড়ে হেঁটে মোষ শিকার' প্রভৃতি কতকগুলি অধ্যায়ে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। পুস্তকখানিকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে লেখকের কবিত্ব-মণ্ডিত ভাষা ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনাভঙ্গী।

পুস্তকখানি দুইখানি অধ্যায়ে বিভক্ত। শেষার্দ্ধে পাখীর শাবক পাখীর প্রেম, হরিণের স্নেহ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কয়েকটি বড় করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে—এগুলি হইতে কুতূহলী পাঠক পশুপক্ষীর মনস্তত্ত্ব অধ্যয়নেরও সুযোগ পাইবেন। পুস্তকখানি শুধু শিকারের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা হিসাবে নয়, সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যে এবং বর্ণনা-মাধুর্য্যেও কিশোর ও বয়স্ক সকল শ্রেণীর পাঠকেরই মনোহরণ করিবে। লেখকের অরণ্য-প্রীতি সহজাত। অরণ্যের নিভৃত নির্জ্জনতায় তিনি সময় সময় নিজের প্রকৃত সত্তাকে খুঁজিয়া পান, এবং এমন অপূর্ব্ব ভাষায় নিজের নিঃসঙ্গ মনের অনুভূতিকে প্রকাশ করেন যে, পাঠককে তাঁহার ধ্যানী প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতে হয়। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এই পুস্তকে একটি সুন্দর ভূমিকায় বলিয়াছেন—"আমরা এতদিন শান্তিরক্ষা আর দেশরক্ষার ভার বিদেশীর উপর ছেড়ে দিয়ে অহিংসার আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেছি, মনে করেছি শিকার শুধু জনকয়েক ধনী বা নিষ্ঠুর লোকের খেলা। কিন্তু এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, সকল দায়িত্ব আমাদের উপর পড়েছে, সুতরাং ক্ষাত্রবৃত্তির উপযুক্ত চর্চ্চা এখন ধর্ম্মকার্য্য।"

এই ক্ষাত্রবৃত্তির চর্চ্চায় দেশের কিশোর ও তরুণদের উদ্বুদ্ধ করিতে পুস্তকখানি বিশেষ সহায়ক হইবে।

নতুন ঠিকানা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু। দি ফিনিক্স প্রেস লিমিটেড। ৫৬, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট। কলিকাতা—১। মূল্য ৩৲ টাকা।

লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত। সম্ভবতঃ এখানি তাঁর প্রথম উপন্যাস। কিন্তু এই প্রথম উপন্যাসেই তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদিগকে আশান্বিত করিয়া তোলে। কাহিনীটি মোটামুটি এই:—ছেলেবেলায় মাতৃহীন প্রশান্ত প্রতিপালিত হইয়াছিল পশ্চিমের এক শহরে তাহার এক বৈজ্ঞানিক মামার নিকটে।

বাপের সহিত তাহার কোন যোগাযোগ ছিল না। এমনি ভাবে জীবনের বাইশটি বছর কাটিয়াছিল তাহার 'ধীরগতি নদী'র মত। অকস্মাৎ মৃত্যুশয্যাশায়ী পিতার নিকট হইতে আসিল আহ্বান। অন্তিম শয্যায় পিতা প্রীতিতোষ প্রশান্তকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইলেন যে, সে তাঁহার বন্ধু-কন্যা মণিমালাকে বিবাহ করিবে। প্রীতিতোষের মৃত্যুর পর প্রভাবতী কন্যা মণিমালা সহ প্রশান্তর বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। কিছুদিন পরে তাহাদের বিবাহ হইল, এবং যথাসময়ে একটি ছেলেও জন্মিল। ছেলেটি হঠাৎ মারা গেলে পর মণিমালার মধ্যে পাগলামির লক্ষণ প্রকাশ পাইল। সুরু হইল প্রশান্তর জীবনে নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, অদৃষ্টের রুদ্রলীলা। শেষ পর্য্যন্ত রাজপুতানার গভীর খাদে আত্মাহুতি দিয়া প্রশান্ত পিতৃকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

নিয়তির নিকট মানুষ যে কিরূপ অসহায়, অদৃষ্টের হস্তে সে যে ক্রীড়নক মাত্র তাহাই এই উপন্যাসের নায়ক প্রশান্তর ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যে মর্ম্মান্তিকভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন এক অদৃশ্য শক্তির হস্তে প্রশান্তর অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ পাঠক-চিত্তকে বেদনায় পূর্ণ করিয়া তোলে, তার জীবন-নাটকের ঘাতপ্রতিঘাতে পাঠকচিত্ত বিচিত্রভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠে। উপন্যাসে দুটি জিনিষের আশ্চর্য্য সমন্বয় দেখিতে পাই—লেখকের কল্পনার প্রসার আর তাহার বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী। প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী, উগ্র স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্না প্রভাবতীর চরিত্রটি লেখকের একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। প্রশান্তর জীবন মন্থন করিয়া যে হলাহল উঠিয়াছিল তাহার মূলে রহিয়াছে এই আত্মকেন্দ্রিক মহিলার চক্রান্ত। লেখকের ভাষা বেগবতী, নদীর মত সহজ স্বচ্ছন্দ ও দুর্ব্বারগতি। রাজপুতানার পর্ব্বতসঙ্কুল রুক্ষ নৈসর্গিক দৃশ্যের বর্ণনায় তিনি ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন—একটি অভিনব পটভূমিকায় কাহিনীটি বেশ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

চিরদিনের রূপকথা—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার। মডার্ণ, বুকস্ লিমিটেড। ১৬০।১এ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা।

বাংলার রূপকথা-সাহিত্যের আসরে দক্ষিণারঞ্জন নিজের আসনটি কায়েম করিয়া লইয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে রূপকথার বই অজস্র রচিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার 'ঠাকুরমার ঝুলি' আজও এ ক্ষেত্রে অপরাজেয় হইয়া আছে। জাতীয় জীবনের গভীরতম উৎস হইতে উৎসারিত রূপকথার রূপময় ভাষা ও বিশিষ্ট ভঙ্গীকে অবিকৃত রাখিয়া তিনি যে অনবদ্য রস পরিবেশন করিয়াছেন তাহা কালজয়ী হইয়া বাংলার আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে চিরদিন আনন্দ-দান করিবে।

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস

ভারতের অতীত ছিল পণ্ডিতের ধ্যান, শিল্পীর সাধনা, জনগণের আনন্দক্ষেত্র। পরাধীন দেশ ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি দেখেছে সেই অতীতে। তবু একান্ত প্রত্যক্ষতা ছিল না সেই অতীতের, আপন বলে তাকে চেনা হয়নি। বিদেশীর হাতে তৈরি ঘষা কাঁচের মধ্য দিয়ে তার অস্পষ্ট মূর্তিমাত্র দেখেছে শিক্ষিত সম্প্রদায়। তার বার্তা কখনো ছড়িয়ে পড়েনি সাধারণের রাজপথে।

আজ ভারতবর্ষের জীবনের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। শুধু অতীত নয়, ভারতবর্ষের সামনে বিপুল বর্তমান, বিপুলতর ভবিষ্যৎ। তাই অতীতকে আজ নিজের চোখে নতুন করে দেখতে হবে, বর্তমানের সঙ্গে মেলাতে হবে তাকে, ভবিষ্যতের পথকে দেখতে হবে তারই আলোকে।

ধর্মে, বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রতত্ত্বে, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ভারত অপ্রতিবীর্য ছিল। সেই ভারতের দীপ্ত ইতিহাসকে সাধারণের জন্য ব্যাপকভাবে মেলে ধরেছেন ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তাই এ বই নিষ্প্রাণ তথ্যের বোঝা নয়, সজীব আলেখ্য। শুধু জানা নয়, সানন্দে জানা। সচিত্র। দাম ৪৲

অচিন্ত্যকুমারের

দুখানা বিখ্যাত উপন্যাস

বেদে

অচিন্ত্যকুমার চিরকাল নতুন পথের প্রণেতা। সনাতনের ঘেরাটোপ ভেঙে বাংলা সাহিত্যকে যাঁরা জীবনের প্রশস্ত পথে টেনে আবার বিপ্লবসাধন করেছিলেন, অচিন্ত্যকুমার তাঁদের অন্যতম অগ্রনায়ক। সেই সাহিত্যবিপ্লবের প্রথম দিকচিহ্ন 'বেদে'। অম্ল, মধুর, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত যেমন ছয়টি রস, তেমনি ছয়টি নায়িকা। কিন্তু প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন, প্রত্যেকেরই অন্তরে স্বতন্ত্র রহস্যের অন্ধকার। এই বিচিত্র, রহস্যঘন তটরেখা ছুঁয়ে ছুঁয়ে নদীর মত প্রবাহিত যার জীবন, সেই 'বেদে'। সচিত্র। দাম ৩৷৷৹

জননী জন্মভূমিশ্চ

মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারের একটি চিরকালিক সমস্যার আধুনিকতম আলেখ্যলিখন। ভঙ্গপ্রবণ সমাজের প্রথমতম প্রসঙ্গ। পুরনোর সঙ্গে নতুনের সংঘর্ষ, সংস্কারের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যের। একটি ঘরোয়া কাহিনীকে অনুভবের গুণে গভীর বর্ণাঢ্য করে আঁকা হয়েছে। জীবন্ত ভাষা, উজ্জ্বল চরিত্র, বলিষ্ঠ মনোভঙ্গি —যা অচিন্ত্যকুমারের বিশেষত্ব, সবই এই উপন্যাসে পরিস্ফুট। দাম ২৷৷৹

শচীন্দ্র মজুমদারের

দুখানা অভিনব উপন্যাস

লীলামৃগয়া

উপন্যাসের আঙ্গিকে কাব্যের রস পরিবেশন করলে তার আস্বাদ কতো মধুর হতে পারে 'লীলামৃগয়া'য় তার নিঃসংশয় পরিচয় মিলবে। আধুনিক সমাজ ও আধুনিক নর-নারী এই উপন্যাসের উপজীব্য, কিন্তু বিষয় সেই চিরন্তন, সেই পরকীয়া-প্রেম। ইন্দ্রিয়াতীত হয়েও যা ইন্দ্রজালের অতীত নয়। আধুনিক কালের প্রসঙ্গে পরকীয়াপ্রেমের এমন সম্মোহনী কাহিনী বাংলা সাহিত্যে আর লেখা হয়নি। দাম ৩৲

পলাতকা

স্থান : এলাহাবাদ। কাল : ১৯৪২। পাত্রী : বহ্নিশিখার মতো বাঙালী এক মেয়ে। এ-মেয়ে বিজ্ঞানের সাধনা করে, পুলিশের গুলির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, প্রয়োজনে পুরুষবেশে পালিয়ে বেড়ায়। কিন্তু ছায়ার মতো অবিরাম তাকে অনুসরণ করে শুধু পুলিশবাহিনীর গোয়েন্দা নয়, লম্পট বিত্তশালী এক পুরুষ। সেই লালসাময় আলিঙ্গন থেকে তার ঊর্ধ্বশ্বাস পলায়ন। নতুন যুগের নারী, যেন নারীচরিত্র থেকেই পলাতকা। সচিত্র। দাম ৩৲

১০/২ এলগিন রোড, কলিকাতা ২

চিরদিনের রূপকথায় 'রাজকন্যা', 'শিউলি', 'চাঁদের দেশ', 'কমল সায়র', 'মুকুট', 'চিরদিনের রূপকথা' এই কয়টি গল্প স্থান পাইয়াছে। এই ধরণের রূপকথা চিরপুরাতন হইলেও চিরনূতন। রাজপুত্র রাজকন্যার কাহিনী, পরিকথা ইত্যাদি স্মরণাতীত কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষ সমান আগ্রহে শুনিয়া আসিতেছে। দক্ষিণাবাবু যে ভাষায় এই রূপকথাগুলি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিছক পুঁথির ভাষা নয়, তাহাতে দিদিমা ঠাকুরমার মুখের ভাষার সার্থক অনুকৃতি আছে বলিয়া এগুলিতে বাংলার খাঁটি রূপকথার আমেজ লাগিয়াছে।

অবশ্য সবগুলি গল্পই যে সার্থক সৃষ্টি হইয়াছে এমন কথা বলিতেছি না। কোনো কোনো গল্প পড়িয়া মনে হয় ঠিক যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাইলাম না। সেগুলিকে যেন টানিয়া বুনিয়া কোনমতে শেষ করা হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ গল্পেই কথার যাদুকর দক্ষিণারঞ্জনের স্বকীয়তার স্বাক্ষর রহিয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বসন্তরোগ ও প্রতিকার—কবিরাজ শ্রীকালীকেশব ঘোষ, সেবাব্রত ঔষধালয়—শ্যামলাল রোড, বর্ধমান। মূল্য এক টাকা। পৃঃ ২৪০।

কবিরাজ শ্রীকালীকেশব ঘোষ সহজ ভাষায় বসন্ত রোগ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। সাধারণ গৃহস্থ ইহা পাঠ করিয়া যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। বিভিন্ন প্রকারের বসন্তের লক্ষণ ও দেশী, অথচ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার বিষয় বইখানিতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উপরন্তু মূল্য কম হওয়ায় ইহা বহুজনসমাদৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

স্মৃতিকথা—মন্মথকুমার বসু রচিত ও শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু-সম্পাদিত। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ, ১১+২৪৭। মূল্য চারি টাকা।

মন্মথকুমার বসু মহাশয় দীর্ঘকাল সরকারী চাকুরী করিয়া পরিণত

বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি যে-সব কাহিনী পুস্তকখানিতে লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বেকার বাঙালী সমাজের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। গ্রামের তৎকালীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, দোল-দুর্গোৎসব, পূজা-পার্ব্বণ, পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তাবোধ এবং দলাদলি প্রভৃতি সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতাপ্রসূত বর্ণনা উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক। তাঁহার কর্ম্ম-জীবনেরও নানা বিচিত্র ঘটনা সে যুগের শাসন-পরিচালনা-পদ্ধতির উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। অবসর-জীবনে স্বদেশী আন্দোলনের গঠনমূলক কোন কোন কার্য্যের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। স্বদেশী বস্ত্র এবং অন্যান্য ব্যবসায়ে অল্প দিন পরেই কেন ভাটা পড়িয়া যায় তাহার কারণগুলি মন্মথ বাবু যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন আজিও সে সকল বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। পুস্তক-খানির ভাষা সরস ও প্রাঞ্জল। সে যুগের সামাজিক চিত্র হিসাবে ইহার মূল্য যথেষ্ট।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

শরৎ জীবনী—'অরূপ' প্রণীত এবং কলিকাতা ৮৯ নং আপার সারকুলার রোডস্থ ভারতী সাহিত্য সভা হইতে শ্রীরমানাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৮৮ পৃষ্ঠা মূল্য এক টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া যে সব কর্ম্মযোগী গৃহী ভক্ত পরমার্থ সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই অন্যতম ছিলেন হুগলী আরামবাগ মহকুমার তিরোল গ্রাম নিবাসী শরচ্চন্দ্র মিত্র। পরিণত বয়সে পার্শীবাগান রামকৃষ্ণ সমিতি এবং শঙ্কর ঘোষ লেনস্থ একটি মেসবাড়ী ছিল তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র। এই সব অঞ্চলের বহু যুবক তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিবিধ জনহিতকর অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার কাছে যখনই যিনি গিয়াছেন, কেবল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা এবং দরিদ্রনরনারায়ণের সেবার উপদেশ ও উৎসাহই পাইয়াছেন। জীবনে বহু বাধা বিঘ্নে অবিচলিত থাকিয়া এই কর্ম্মযোগী যে ভাবে কর্ম্মযোগের সাধনা করিয়া গিয়াছেন তাহা বিস্ময়-কর। ইঁহার ত্যাগপূত কর্ম্মবহুল জীবনের কথা যত বেশী আলোচিত হইবে, ততই সমাজের কল্যাণ সুনিশ্চিত।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দেশ-বিদেশের কথা

খিদিরপুর একাডেমির বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী খিদিরপুরস্থ বি. এন. রেলওয়ে গ্রাউণ্ডে জেনারেল ম্যানেজার পি. সি. মুখোপাধ্যায়ের

সাধারণ দৌড়-প্রতিযোগিতায় প্রথম তিনজন :—
(বাম দিক হইতে) প্রভাত : তারিণী : চিত্ত

সভাপতিত্বে খিদিরপুর একাডেমির বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রতিযোগিগণের মধ্যে প্রভাত দত্ত, চিত্ত দাস ও তারিণী ভট্টাচার্য্য বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বিত্তালয়ের শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্রগণের দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বয়সের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ং যোগদান-পূর্ব্বক ছাত্রদের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। উৎসব-শেষে পুরস্কার বিতরণ হয় এবং প্রতিযোগী ছাত্রবৃন্দ ও সমবেত মণ্ডলীকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

কিশোরদের দৌড়-প্রতিযোগিতায় প্রথম তিন জন
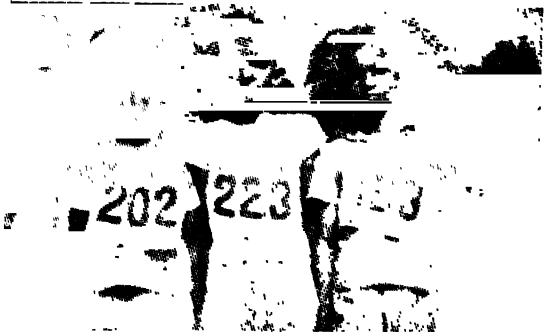
বালকদের দৌড়-প্রতিযোগিতায় প্রথম তিন জন

ব্যায়াম-প্রতিযোগিতায় খিদিরপুর একাডেমির ছাত্রবৃন্দ

একাডেমির ছাত্রবৃন্দের ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শন

যাদুকর পি. সি. সরকার

সম্প্রতি প্রকাশ যে, বর্ত্তমান বৎসরে স্ফিনিক্স ১৯৪৯ সুবর্ণ পদক বাংলার সুপ্রসিদ্ধ যাদুকর শ্রীযুক্ত পি. সি. সরকার লাভ করিয়াছেন।

বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়

গত ৩রা মার্চ্চ বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক-গমন করিয়াছেন। ইনি লক্ষ্ণৌ টেকনিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া লক্ষ্ণৌয়েই বাস করিতে-ছিলেন। ইনি এলাহাবাদের সায়ান্টিফিক ইন্‌স্ট্রুমেন্ট কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা এবং ভারতে Table-blown glass apparatus প্রস্তুতকারকদের অন্যতম ছিলেন। ইঁহার শিক্ষা-লাভ এলাহাবাদেই হয়। সেই সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ইঁহার বিশেষ আলাপ-পরিচয় হয়। বেণী-মাধব বাবুর কার্য্যকলাপের কথা বহুকাল আগে 'প্রদীপে' প্রকাশিত হইয়াছিল। "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক পুস্তকেও তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

বসন্ত

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

প্রবাসী প্রেস কলিক

১২৩০০ ফুট উচ্চ কুমারী গিরি-সঙ্কট হইতে হিমালয়ের চৌখাম্বা শৃঙ্গ (বামে) ও নীলকণ্ঠ শৃঙ্গের (দক্ষিণে) দৃশ্য। ভারত গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে একদল বৈজ্ঞানিক, গবেষণাগার স্থাপনের জন্য ঐ স্থান পরিদর্শন করেন।
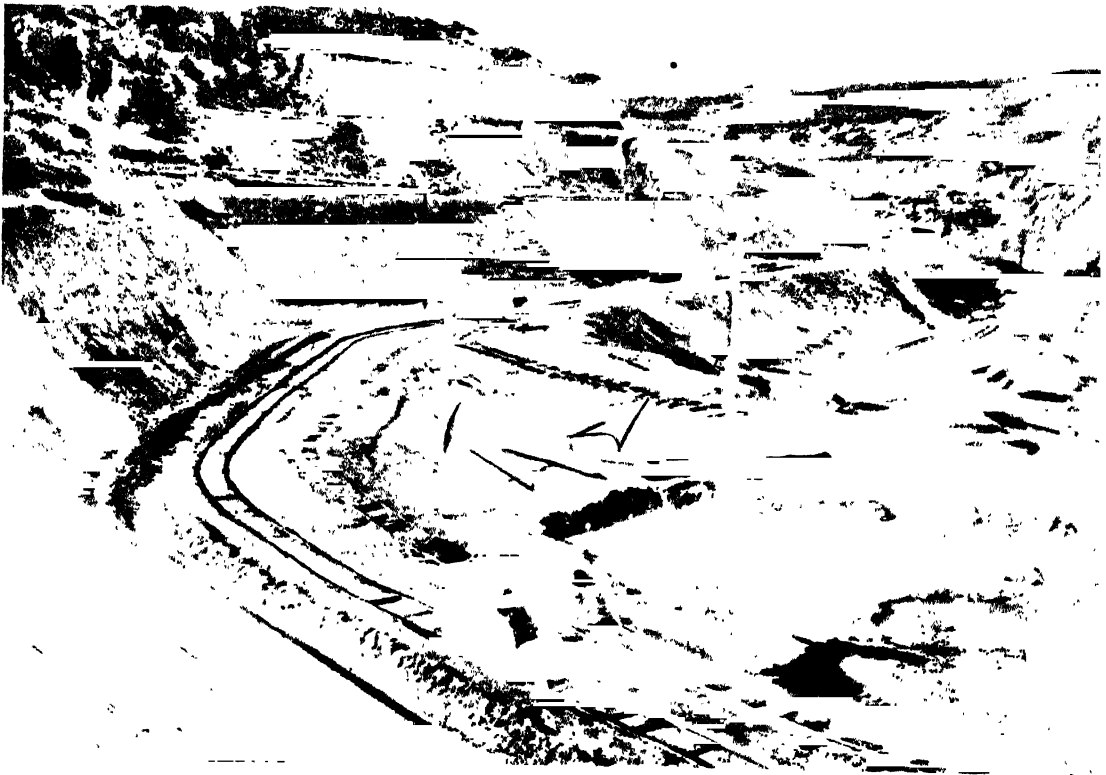
মালয়ের একটি টিনের খনি। এই জাতীয় সম্পদ রক্ষার জন্যই বৃটিশ পুঁজিবাদীর দল গণপতির হত্যাকাণ্ড ঘটায়
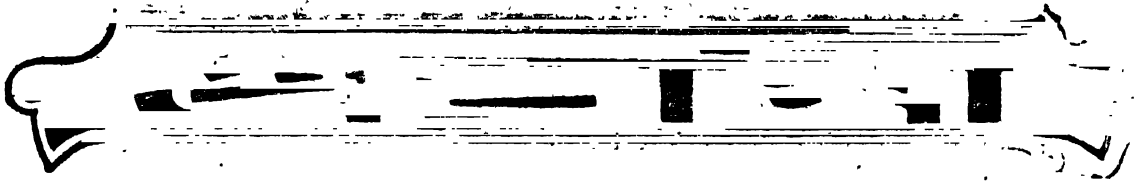
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৯শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৫৬

সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

দক্ষিণ-কলিকাতা উপনির্ব্বাচন

"ভাগের মা গঙ্গা পায় না" এটা প্রাচীন বাংলা প্রবাদ। কিন্তু দক্ষিণ-কলিকাতার উপনির্ব্বাচনে আমরা দেখিলাম তথাকথিত পশ্চিমবঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ভাগা-ভাগির ফলেই কংগ্রেসের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিল। পুরাণে শুনিয়াছি এক ভগীরথ শত পিতৃ-পিতৃব্যের গঙ্গাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, একালে দেখিলাম তিন ভগীরথের পাকেচক্রে কংগ্রেসকে আদি-গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হইল। এখন বাকী কেবল ঘোষজা মহাশয়দিগের মধ্যে লভাভাগ।

উপনির্ব্বাচনের দিনক্ষণ স্থির হইলে শুনিলাম শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর গর্জ্জন। কংগ্রেসী দলে তখন কালনেমীর লঙ্কাভাগের পর্ব্ব চলিতেছে, সুতরাং সেদিক হইতে কোনও সাড়াশব্দ আসিল না। তবে একটা উড়ো কথা কানে আসিল যে, আমাদের সেই ঘোষজা মহাশয়, যিনি পূর্ব্ববঙ্গে ঝড়ের আশঙ্কা দেখিবামাত্রই সেখানকার অনুগত শিষ্যদিগকে জলে ফেলিয়া, ডেরাডাণ্ডা তুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গে আব জুড়াইতে আসিয়াছিলেন এবং কৃপালনির কৃপায় ফললাভও করিয়াছিলেন যথেষ্ট, তিনি নাকি শ্রীযুক্ত বসুর বিপক্ষে কংগ্রেসী প্রার্থী দাঁড় করাইবার বিরুদ্ধে মত দিয়া ডেরাডুন যাত্রা করিয়াছেন।

ডেরাডুনে গুজরতে-খোদ বলিলেন, লড়িতে হইবে, সুতরাং ঘোষজা মহাশয় নাচার হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান কর্ণধার ও বিবেকের সংরক্ষক সেখানে রহিয়াই গেলেন। ফিরিয়া আসিয়াই তিনি দেখিলেন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার আর এক সুযোগ ঘটিয়াছে মানভূমে, সুতরাং তিনি আপদের শান্তি হইল বুঝিয়া, হাঁফ ছাড়িয়া, চলিলেন মানভূম ডুবাইতে। বাকী রহিলেন পালের গোদা ঘোষ মহাশয়। কিন্তু তাঁহাকেও দিল্লীর রাণীপথ ছাড়িয়া আসিতে হইল [illegible] দোহকে। কারণ দিল্লীশ্বরেরা দিলেন হুকুম লড়াইয়ের "মোরচা" বাঁধিতে, উপরন্তু হইল লঙ্কাভাগের সময় আগতপ্রায় এবং কলিকাতা হইতে দিল্লী "দূর অস্ত্‌"। এইরূপে যখন শিয়রে সংক্রান্তি, তখন আরম্ভ হইল নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বের পালা এবং কংগ্রেসের সুপ্রসিদ্ধ "ল্যাম্প-পোষ্ট" হিসাবে আসরে নামান হইল বেচারা সুরেশ দাসকে। সেকালের এক দিল্লীশ্বর বাদশাহের হুকুমে আজমীরে আড়াই দিনে এক প্রাসাদ তৈরি হইয়াছিল, আজও তাহা "আড়াই দিনকা ঝোপড়া" নামে সুবিখ্যাত। আর একালের দিল্লীশ্বরদিগের হুকুমে কলিকাতায় ঘটিল "আড়াই দিনকা ইলেকশন।" কেননা ঘরে-ঘরে দেখিলে বুঝা যাইবে যে বি. পি. সি. সি-র মহারথীগণ আড়াই দিনের বেশী মনোনিবেশ করেন নাই উপনির্ব্বাচনে। তাঁহারা ব্যস্ত ছিলেন রিকুইজিশন মারফত পশ্চিমবঙ্গে অরাজকতা তুলিতে। সময়মত ও নিয়মমত চেষ্টা হইলে উপনির্ব্বাচনের ফল কি হইত বা হইত না সে কথা এখন অবান্তর। যাহা হউক, উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় হইয়া গেল। জয় হইল শরৎচন্দ্র বসুর বা "লাল ঝাণ্ডার"—সে বিচার যথা-সময়ে করা যাইবে। তবে সুসংবাদের মধ্যে এইমাত্র যে উপনির্ব্বাচনের পরই "পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের" গঙ্গা-যাত্রা ঘটিল রিকুইজিশনে পূর্ব্ববঙ্গের ঘোষজা মহাশয়দের জন্যে। এখন বাকী কেবল নূতন সভাপতিকে অভিনন্দিত করিয়া তাঁহার দলের সদ্গতির জন্য মন্ত্রোচ্চারণ করা :—

"ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।"

নির্ব্বাচনের পালা তো সাঙ্গ হইল, তারপর? এখনও কি দেশের কর্ণধারবৃন্দের বুঝিবার সময় হয় নাই যে, দেশের আবহাওয়া এ রকমে বদল হইয়া গেল কি কারণে? দুই বৎসরও হয় নাই কংগ্রেস দেশের শাসনদণ্ড হাতে লইয়াছে, ইহার মধ্যেই ভারতের বৃহত্তম মহানগরীতে এরূপ কংগ্রেস-

বিরোধী প্রতিক্রিয়া, এবং অল্পদিন পূর্ব্বেই বোম্বাই নগরীতেও অনুরূপ ব্যাপার। কার্যকারণ নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা করার সময় আজ আসিয়াছে কংগ্রেসের উচ্চতম অধিকারিবৃন্দের সম্মুখে। এইরূপ প্রতিক্রিয়া কখনও অকারণে ঘটিতে পারে না।

হইতে পারে যে রাষ্ট্রশত্রুদের তাণ্ডবলীলার ফলে কংগ্রেসের পক্ষের অধিকাংশ ভোটার নির্ব্বাচনে উপস্থিত হইতে পারে নাই। যথাযথ ব্যবস্থা ও অনুকূল অবস্থা হইলে প্রায় ৬২০০০ ভোটের মধ্যে মাত্র ২৫০০০ ভোট পড়িত না, হয়ত ৪৫০০০ পড়িত। কিন্তু ইহাও সত্য যে বিক্ষোভকারীদিগের বিরুদ্ধে কোনও সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধীদল সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ায় নাই। স্থানীয় জনমত যাহা কিছু প্রকাশ্যে ঘোষিত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই ছিল কংগ্রেস-বিরোধী। কোথায় গেল দক্ষিণ-কলিকাতার কংগ্রেস কর্ম্মীদল, কংগ্রেসের সহিত জনগণের আন্তরিক সহযোগ ?

দলগত স্বার্থের সন্ধানে বা ব্যক্তিগত লাভের আশায় দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া কংগ্রেসের নেতৃবর্গ কোথায় চলিয়াছেন তাহার অতি পরিষ্কার নির্দ্দেশ পাওয়া গেল এই উপনির্ব্বাচনে। ইহাতেও যদি তাঁহাদের এবং দেশের শাসনকর্ত্তাদের চক্ষু উন্মীলিত না হয় তবে এ জাতির আশা-ভরসা নাই। পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত মঙ্গলচিন্তা যাঁহারা করেন তাঁহাদের এখন এবিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস, পশ্চিমবঙ্গ শাসন-পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এখন জঞ্জালমুক্ত করা প্রয়োজন হইয়াছে এবং সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের ঘোরশত্রু যাহারা, যাহাদের পাপেচক্রান্তে কংগ্রেস ও সমস্ত প্রদেশ ডুবিতে বসিয়াছে তাহাদের বলা "কুইট ওয়েষ্ট বেঙ্গল"।

দমদম ও প্রেসিডেন্সি জেলে গুলি চালনা

দমদম এবং প্রেসিডেন্সি জেলে কম্যুনিষ্ট বন্দীদের সঙ্গে পুলিস ও জেল ওয়ার্ডারদের দুইটি খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। দমদমে তিন জন এবং প্রেসিডেন্সি জেলে এক জন বন্দী বন্দুকের গুলিতে নিহত হইয়াছে। "খণ্ডযুদ্ধ" কথাটা আমাদের নয়, সরকারী প্রেসনোট পড়িলে ইহাই মনে হয় এবং ষ্টেটসম্যান পত্রিকা দমদমের ঘটনাকে "দমদম জেলে চার ঘণ্টা খণ্ডযুদ্ধ" এই শিরোনামা দিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। প্রায় একই সময়ে বেঙ্গল পটারির কারখানাতেও অনুরূপ খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছে; শ্রমিকরা কিছু সময়ের জন্য কারখানা "অধিকার" করিয়া বসিয়াছিল। দমদম এবং প্রেসিডেন্সি জেল সম্বন্ধে প্রকাশিত সংবাদপত্রের বিবরণ দুইটি এইরূপ :

গত বুধবার রাত্রে প্রেসিডেন্সী জেলে এক গুরুতর হাঙ্গামা হয়। রাত্রি ৯টার সময় নিরাপত্তা বন্দী কম্যুনিষ্টগণ নিজ নিজ কক্ষে প্রবেশ করিতে অস্বীকার করায় পুলিস ও জেল ওয়ার্ডারগণের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ হয়। বন্দিগণ নানা প্রকার হাতিয়ার লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। আসবাবপত্রাদি দ্বারা উপরে উঠিবার সিঁড়ি বন্ধ করে এবং প্রজ্বলিত পদি নীচের দিকে ছুঁড়িতে থাকে। অবস্থা আয়ত্তে আনিবার জন্য পুলিস গুলী চালাইতে বাধ্য হয়।

হাঙ্গামার ফলে ১৩ জন কম্যুনিষ্ট বন্দী আহত হয়। তন্মধ্যে গোবর্দ্ধন রায় নামে একজন মারা গিয়াছে। পুলিসের একজন ডেপুটি কমিশনার, একজন এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার এবং অপর ৩৫ জন পুলিসের লোক আহত হইয়াছে। জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টও আহত হইয়াছেন।

ঘটনার বিবৃতি দান প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বৃহস্পতিবার এক প্রেসনোটে বলেন—গবর্মেণ্ট এমন প্রমাণ পাইয়াছেন যাহাতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়—গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ নিরাপত্তা বন্দীরা জেলে যে হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার অঙ্গ-বিশেষ। চারিদিকে অশান্তি সৃষ্টি করা তাহার উদ্দেশ্য। জেলের ভিতর হিংসামূলক কর্ম্মপন্থা চালাইবার নির্দ্দেশ কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্ত্তৃপক্ষ দিয়াছেন।

বিগত বুধবার রাত্রে প্রেসিডেন্সী জেলের হাঙ্গামার পরে গত বৃহস্পতিবার রাত্রে দমদম সেণ্ট্রাল জেলেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার রাত্রে কম্যুনিষ্ট নিরাপত্তা বন্দী ও কম্যুনিষ্ট বিচারাধীন বন্দিগণ জেলের কক্ষসমূহ তালাবদ্ধ করার সময় নিজ নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অস্বীকার করায় তাহাদের সহিত পুলিস ও জেলের কর্মীদের সংঘর্ষ হয়।

হাঙ্গামা গুরুতর আকার ধারণ করে এবং হাঙ্গামাকালে পুলিস অবস্থা আয়ত্তে আনার নিমিত্ত কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে এবং গুলী চালায়। ৩ জন বন্দীর মৃত্যু হয় এবং অনুমান ৮ জন আহত হয়। মৃত ব্যক্তিদের নাম হইতেছে—প্রভাত কুণ্ডু, সুমথ চক্রবর্ত্তী এবং কুমুদ চক্রবর্ত্তী। ৯ জন পুলিস এবং ৩ জন জেল ওয়ার্ডার আহত হয়।

গত বৃহস্পতিবার রাত্রে দমদম জেলে হাঙ্গামা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত শুক্রবার যে প্রেসনোট প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, দমদম জেলে বৃহস্পতিবার রাত্রে হাঙ্গামার ফলে তিনজন নিরাপত্তা বন্দী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং অপর ৮ জন আহত হইয়াছে। ৯ জন পুলিশ এবং ৩ জন জেল ওয়ার্ডার আহত হইয়াছে।

জেলের ঘটনার শিক্ষা

প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলিয়াছেন যে কম্যুনিষ্ট পলিট-বুরোর নির্দ্দেশে জেলে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। তাঁহার বক্তব্য এই : "পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট সংবাদ পাইয়াছেন যে, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির তথাকথিত পলিট-বুরো বিশেষভাবে জেলে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা এবং ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি এবং

কর্তৃপক্ষকে অগ্রাহ্য করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছে।" বাহিরের ঘটনাসমূহ হইতে মনে হয় শুধু জেলের ভিতরে নয় বাহিরেও এরূপ নির্দ্দেশ আছে। বেঙ্গল পটারির ঘটনা ইহার সর্ব্বশেষ পরিচয়; হাওড়াতেও এরূপ ব্যাপারের উপক্রম গত কয়েক দিনের মধ্যে দেখা গিয়াছে।

একটা প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার অবস্থা যে সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই; ডাঃ রায়ের বিবৃতিও তাহাই সমর্থন করিতেছে। দুইটি জেলের এবং বেঙ্গল পটারির ঘটনাতে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। তিনটি স্থানেই রীতিমত খণ্ডযুদ্ধের কায়দাকানুন অবলম্বন করা হইয়াছে, সহজপ্রাপ্য ঢিল প্রভৃতি হাতিয়ার লইয়া সশস্ত্র পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধ হইয়াছে এবং উভয় ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত দুঃসাহসের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কম্যুনিষ্টদের সংগ্রাম-পদ্ধতি ক্রমশঃ অধিকতর দুঃসাহসিক, বেপরোয়া এবং সুশৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে। এই ব্যাপারে কম্যুনিষ্ট তৎপরতা এবং পুলিসের—বিশেষে গোয়েন্দা বিভাগের অযোগ্যতা এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি বেশী দায়ী এখনও তাহা বিশেষভাবে বিচার করিয়া সতর্ক না হইলে বাংলাদেশে প্রকৃত বিপদ দেখা দিতে বেশী দেরী হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এখন পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে কম্যুনিষ্টদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে ইহা অস্বীকার করা আর বালুতে মুখ গুঁজিয়া উটপাখীর ন্যায় বসিয়া থাকা একই কথা।

জেলের ঘটনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য—

(১) বন্দীরা অজস্র ঢিল, ভাঙা কাচ, বোতল প্রভৃতি ছুড়িয়াছে।

(২) পূর্ব্ব হইতে ঢিলের গাদা তৈরি করা হইয়াছিল এবং পায়খানার দেওয়াল ভাঙিয়া ও রাস্তার দুই পাশের ইট তুলিয়া ব্যারাকে লইয়া যাওয়া হয়।

(৩) ওয়ার্ডের দরজায় লোহার খাট প্রভৃতি সাজাইয়া ব্যারিকেড করা হয়। আক্রমণের পরিকল্পনা বহু পূর্ব্ব হইতে করা হইয়াছিল।

(৪) পলিট-ব্যুরোর নির্দ্দেশে যুদ্ধ হয়।

এইবার এইগুলি বিচার করিয়া দেখা যাক।

(১) (২)—জেলের নিয়মানুসারে প্রতি দিন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রত্যেক ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন; তাঁর সঙ্গে জেলার, ডাক্তার, সার্জ্জেণ্ট, ওয়ার্ডার প্রভৃতি সকলে থাকেন। এই সময়ে ওয়ার্ডের সর্ব্বত্র অস্বাভাবিক কিছু আছে কিনা তাহা লক্ষ্য করা হয় এবং বন্দীদের অভাব-অভিযোগ শোনা হয়। ইহা ছাড়া প্রতিদিন ওয়ার্ড এবং ইয়ার্ড উভয়ই তল্লাসী করা নিয়ম আছে। উভয় জেলে এত বড় বড় অফুরন্ত ইটের গাদা, ভাঙা কাঁচ, বোতল প্রভৃতি জোটানো হইল অথচ জেল 'সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট' হইতে সুরু করিয়া জেল সার্জ্জেণ্ট, ওয়ার্ডার প্রভৃতি কেহই ইহা জানিতে পারিল না ইহা কিরূপে সম্ভব? রাস্তার দুই পাশ হইতে ইট উঠিয়া ব্যারাকে চলিয়া গেল তাহাও কাহারও নজরে পড়িল না এমনই তবে পাহারার ব্যবস্থা! এই সব নিয়ম কি বদলাইয়া গিয়াছে, না কম্যুনিষ্ট ওয়ার্ডে পাহারা রাখা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে?

(৩) বন্দীদের রাত্রি নয়টায় লক-আপে ঢুকিবার কথা। তাহারা তাহা না করিয়া মাঠে বসিয়াছিল। বোধ হইতেছে তার আগেই তাহারা ওয়ার্ডের ব্যারিকেড সারিয়া আসিয়াছে, কারণ পুলিস তাদের পিছন পিছন তাড়া করিয়া গিয়া ব্যারিকেডে বাধা পাইয়াছে। মনে হয় ব্যারিকেড আগেই সারা হইয়াছিল, প্রয়োজনানুসারে একটু ফাঁক নিজেদের জন্য রাখা হইয়াছিল, বন্দীরা নিজেরা প্রবেশ করিয়াই তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। অন্ততঃ রাত্রি ৮॥টা নাগাদ তবে এই ব্যারিকেড হওয়ার কথা। এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে জেলার এই খবর লইতে পারিলেন না কেন? খবরটা জানা থাকিলে প্রেসিডেন্সি জেলে পিছনের ইয়ার্ড দিয়া ওয়ার্ডার পাঠাইয়া ব্যারিকেড আগেই সরাইয়া দেওয়া যাইত অথবা বন্দীদের আসল মতলব বুঝিতে পারিয়া ঐখানেই সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করা যাইত।

(৪) পলিট-ব্যুরোর নির্দ্দেশের কথা ডাঃ রায় ঘটনার পরে বলিয়াছেন। তিনি কখন উহা জানিতে পারিয়াছিলেন? নিশ্চয়ই ঘটনার আগে নয়, কারণ তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি পুলিসকে উহা জানাইতেন এবং পুলিস আগেই ব্যারাক ঘেরাও করিয়া বন্দীদের ষড়যন্ত্র অনায়াসে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারিত। পুলিস কি এ সংবাদ জানিত না? জানিলে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা আগে সতর্কতা অবলম্বন করা যাইত এবং তাহা হইলে এই দুটি দুর্ঘটনা ঘটিতেই পারিত না।

এই দুই ঘটনায় সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার এই যে, দুই জেলেই যুদ্ধের ও আক্রমণ রোধের আয়োজন একই প্রকার হইয়াছিল এবং আক্রমণ ও প্রতিরোধের ধারাও একই মত হইয়াছিল। ইহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই যে, উক্ত দুই জেলেই বাহির হইতে পরিকল্পনা এবং আদেশ আসিয়াছিল এবং অতি সুষ্ঠুভাবে কয়েক দিন ধরিয়া বন্দীদিগকে সমস্ত কার্য্য-প্রকরণ সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, জেলের কর্ম্মচারীদের সহায়তা কিম্বা অন্ততঃপক্ষে বিশেষ অসাবধানতা ভিন্ন এরূপ কি করিয়া হইতে পারে।

কলিকাতা পুলিসের—বিশেষ ভাগে গোয়েন্দা বিভাগের—অযোগ্যতা সম্বন্ধে আমরা অনেকবার মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছি এবং বারবার দেখাইয়াছি যে শহর সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ গ্রাম্য পুলিস দিয়া কলিকাতায় শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা বাতুলতা মাত্র। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ শহর ও গ্রামের পুলিস কলিকাতায় একাকার করিয়া পুলিসের যে সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছেন, ডাঃ রায় তার প্রতিকার না করিয়া উহাকেই চালাইয়া যাইতেছেন। দক্ষ কর্ম্মচারীদের কোণঠাসা করা

হইয়াছে, অযোগ্য প্রিয়পাত্রদের উচ্চপদে প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার ফলে পুলিসে দলাদলি সৃষ্টি হইয়া উহার কার্য্যকারিতা রসাতলে গিয়াছে—ইহা আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছি। গ্রামের যে সব দারোগা কলিকাতার রাস্তা চিনে না, শহরের রাজনৈতিক কর্ম্মীদের জানে না তাহাদের দিয়া থানা এবং গোয়েন্দা বিভাগ ভর্ত্তি করিলে অবস্থা কি হইবে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ তাহা না বুঝিতে পারেন, কিন্তু ডাঃ রায়ের মত বুদ্ধিমান ব্যক্তিও এত আঘাতের পরেও তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না ইহাই আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় মনে হয়। টেলিফোনের আগুন, জলের কল সাবোটাজের চেষ্টায়, দমদম বিমান ঘাঁটি আক্রমণ, বসিরহাটে থানা ও ট্রেজারি লুট, প্রেসিডেন্সি জেল ও দমদম জেলে যুদ্ধ—এত বড় বড় ঘটনা একটির পর একটি ঘটিয়া কম্যুনিষ্টদের শক্তিবৃদ্ধি হইতেছে অথচ কলিকাতা পুলিস তাহার একটিরও খবর সময় থাকিতে পায় না, এক একটি ঘটনার পরেও সতর্ক হয় না ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য এবং অন্যায় কথা আর কি হইতে পারে? অবস্থা যাহা দাঁড়াইতেছে তাহাতে দেখা যায় কাহারও যেন কোন দায়িত্ব নাই। আগে আমরা দেখিয়াছি সাধারণ একটা খুনের কিনারা করিতে না পারিলে পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে শাস্তি বা ভর্ৎসনা ভোগ করিতে হইয়াছে। আর এখন অক্ষমতার কোন কৈফিয়ৎ পর্য্যন্ত দিতে হয় না, বরং উন্নতি হয়। এই ভয়াবহ অবস্থা চলিতে থাকিলে কম্যুনিষ্ট আক্রমণ আটকাইবে কে? তারপর পুলিসের ভিতরে কত কম্যুনিষ্ট ঢুকিয়াছে তাহা কে বলিবে? আমরা জানিতে পারিয়াছি পুলিস ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষানবিশ একাধিক কনেষ্টবল কম্যুনিষ্ট কাগজপত্র সহ ধরা পড়িয়া বরখাস্ত হইয়াছে। ইহারা ঘটনাচক্রে ধরা পড়িয়াছে, খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা কতটা হইয়াছে তাহা জানা দরকার।

টেলিফোন আপিসে আগুন সম্পর্কে দীর্ঘ তদন্তের পর আমরা শুনিলাম উহা সাবোটাজ নহে আকস্মিক ঘটনা। বলিহারি তদন্ত এবং বলিহারি তদন্তকারি! কয়মাস পরে হয়ত আমরা শুনিব যে ঐ দুই জেলের ব্যাপারও আকস্মিক উত্তেজনার ফল উহাতে বাহিরের কাহারও কোন কারসাজী ছিল না। পটারীর ব্যাপার তো আরও অদ্ভুত তবে তাহার আলোচনা করিতে হইলে পুলিসের সমস্ত ব্যাবহার ব্যাপক আলোচনা করিতে হয়। সেরূপ আলোচনা ইতিপূর্ব্বে আমরা করিয়া দেখিয়াছি যে কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। সুতরাং আমরা এইমাত্র বলিব যে কলিকাতা পুলিসের দক্ষতা যেভাবে রসাতলে গিয়াছে কম্যুনিষ্টরা তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। পশ্চিম বাংলা এখন ভারতের সীমান্ত প্রদেশ, ভারত-সরকারেরও আর এই প্রদেশের পুলিসের অযোগ্যতা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা উচিত নহে।

দুর্নীতির প্রতিকার ও হাইকোর্ট

ভারত-সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ সকলেই দুর্নীতি-দমন সম্পর্কে সমান অক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাতে জনসাধারণের লাঞ্ছনা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে, অপর দিকে দুর্নীতির পথ উত্তরোত্তর সিদ্ধির সহজ এবং নিরাপদ পন্থারূপে প্রতিপন্ন হওয়ায় সমাজের মধ্যে নৈতিক বাঁধন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যতটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা একেবারে ভাঙিয়া পড়িতেছে। দৈনন্দিন আহার্য্য, পরিধেয়, বাসস্থান, ঔষধ প্রভৃতি সংগ্রহ হইতে সুরু করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-আদালত প্রভৃতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি এত বেশী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে যে, সৎপথে কাজ করার কথা লোকে ক্রমশঃ যেন ভুলিয়া যাইতেছে এবং সততাকে লোকে নির্ব্বুদ্ধিতা বলিয়া বুঝিতে শিখিতেছে। যুদ্ধের বাজারে যাহারা অর্থ-সঞ্চয়ের জন্য সর্ব্ববিধ অন্যায় এবং দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহাদের ক্রমেই গণ-প্রতিষ্ঠানে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে দেখা যাইতেছে। সমাজের শত্রু বলিয়া যাহাদিগকে বিষবৎ বর্জ্জন করা উচিত সেই সব লোক যে সমাজের মাথা হইয়া উঠে, সেই সমাজ ও দেশকে কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

ইহার উপর আর এক নূতন বিপদ দেখা দিয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টে পর পর কয়েকটি বড় বড় দুর্নীতির মামলায় আসামীরা মুক্তিলাভ করিয়াছে। দুর্নীতিপরায়ণদের মধ্যে এখন এই ধারণা জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, টাকার কাছে দেশের উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণও কিছু নয়। দুর্নীতির প্রতিকারে দেশের সর্ব্বোচ্চ আদালতও যদি অসহায় হইয়া উঠে তবে দেশ বাঁচিবে কিরূপে তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। ষ্টীল-প্রোডাক্টস লিমিটেডের মামলার যে পরিণতি হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে বিচার করা দরকার।

ষ্টীল-প্রোডাক্টস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীগোপাল খৈতান এবং আর দুই জনের নামে সরকার পক্ষ হইতে এই মর্ম্মে অভিযোগ করা হইয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি সরকারী জিনিষ তৈরির জন্য বহু টন লোহা এই কোম্পানীকে দিয়াছিলেন, উক্ত তিন ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া তাহা আত্মসাৎ করিয়াছে; গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভাল লোহা লইয়া তাঁহাদিগকে খারাপ লোহার জিনিষ দিয়াছে এবং ভাল লোহাগুলি ব্ল্যাকমার্কেটে বেচিয়া দিয়াছে। আলিপুরের অতিরিক্ত সেসন জজ তিন জনকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দেন কিন্তু বিশ্বাস-ভঙ্গের অভিযোগে এবং ভারত রক্ষা আইনানুসারে ম্যানেজিং ডিরেক্টর খৈতানকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং ৭৫,০০০৲ টাকা জরিমানা করেন। হাইকোর্ট প্রমাণাভাবে তাহাকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন। আমাদের প্রশ্ন এই, গবর্ণমেণ্ট এই কোম্পানীকে কতকগুলি জিনিষ তৈরীর

জন্ত উৎকৃষ্ট লোহা দিয়াছিলেন, তাহার বদলে খারাপ লোহায় তৈরি জিনিষ পাইয়াছিলেন এবং ভাল লোহাটা ব্ল্যাকমার্কেটে গিয়াছে বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, ইহা সত্য কিনা। কোম্পানীর আপিস তল্লাস করিয়া গাড়ী গাড়ী কাগজ-পত্র পুলিস আনিয়াছিল। গবর্মেন্টের তরফ হইতে সমস্ত অভিযোগ ছিল, সেসন জজ যতটা প্রমাণ পাইয়াছিলেন তাহাতেই অভিযোগ বিশ্বাস করিয়া দণ্ডদানের ন্যায়সঙ্গত কারণ পাইয়াছিলেন, অথচ হাইকোর্ট বলিতেছেন যে অভিযোগ অকাট্যভাবে প্রমাণ করিবার জন্ত যে সব কাগজ দাখিল করা উচিত ছিল তাহা তাঁহারা পান নাই বলিয়া তাঁহারা দণ্ড বহাল রাখিতে অসমর্থ, এমন কি, পুনর্ব্বিচারের আদেশ দেওয়ার মত প্রমাণও নাকি তাঁহাদের সম্মুখে নাই। মামলার পরিণতি হইতে ইহাই বুঝা যায় যে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে এটা ঠিক, কিন্তু হয় পুলিস ভুল লোককে ধরিয়াছে, অথবা পাব্লিক প্রসিকিউটার ঠিক পথে চালাইবার চেষ্টা করেন নাই, অথবা অপরাধের উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, অথবা হাইকোর্ট আইনের চুলচেরা তর্কে এত ব্যস্ত ছিলেন যে মামলার আসল ব্যাপারটা তাঁহারা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। এই মামলায় প্রধান বিচারপতি নিজে ছিলেন। মেজর ভিলের মামলা, রক্ষিতের ঘিয়ের মামলার পর ষ্টীল-প্রোডাক্টসের মামলারও একই অবস্থা হইতেছে দেখিয়া হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি যদি এ বিষয়ে আনুপূর্ব্বিক তদন্তের আদেশ দিতেন তবেই ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হইত। প্রদেশের সমগ্র বিচার-ব্যবস্থার উপর হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানের অধিকার আছে। মামলা পরিচালনায় কোথায় এমন গলদ হইতেছে যাহাতে গাড়ী গাড়ী কাগজ-পত্র সংগ্রহ করা সত্ত্বেও ঠিক যে কয়েকটি প্রমাণ আদালতে পৌঁছানো দরকার সেগুলি আসিতেছে না। তাহা অবশ্যই তদন্তের বিষয়। সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে একজন পাবলিক প্রসিকিউটারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল। ইনিই এই মামলা চালাইয়াছেন, বিশেষ ভাবে এই কারণে হাইকোর্ট এ বিষয়ে তদন্ত করিতে পারিতেন এবং করা উচিত ছিল। বিনা বিচারে নির্দ্দেশক পুলিসের সন্দেহ ক্রমে আটক রাখা, অনির্দ্দিষ্টকাল ১৪৪ ধারা বহাল রাখিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ, নানাবিধ বিধিনিষেধের বেড়াজালে ফেলিয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতালোপ প্রভৃতি যে দেশে চলিতেছে সেখানে সূক্ষ্ম তৌলদণ্ডের ন্যায় বিচার হইবে শুধু ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার ও দুর্নীতিপরায়ণদের বেলায়। হাইকোর্টের অতি উদারতার ফলে এই ধারণা লোকের মনে জন্মিতেছে যে, পয়সার জোর ও মুরুব্বীর জোর থাকিলে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনও বিশেষ কঠিন কাজ নহে। দুর্নীতি দমনের ইহার চেয়ে বড় অন্তরায় আর কিছু হইতে পারে না।

দুর্নীতি সম্বন্ধে বাংলার অর্থ-সচিবের মন্তব্য

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ব্যবসায়ী, ক্রেতা ও বণ্টনব্যবস্থাকারী সরকারী কর্ম্মচারী—এই তিন জন একজোট হইয়াই চোরাকারবার চালু রাখে। ইহার যে কোন দুই জন যদি চোরাকারবার না করিতে একজোট হয় তবে চোরাকারবার বন্ধ হইতে পারে। চোরাকারবারের এই সংজ্ঞা নূতন নয়, রোলাণ্ড কমিটি বহু পূর্ব্বেই ইহা বলিয়াছেন। তবে ঐ সঙ্গে তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, চোরাকারবার বহাল থাকিবার প্রধান কারণ সরকারী কর্ম্মকর্ত্তাদের নির্ব্বিরোধী মনোভাব এবং এই গুরুতর অন্যায় সহিয়া যাওয়ার প্রবৃত্তি। সরকার মহাশয় যে কোন দুই পক্ষকে একজোট হইয়া চোরাকারবার বন্ধ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আসলে তিন পক্ষ নহে, দুই পক্ষ আছে—এক পক্ষ শিকার এবং অপর পক্ষ শিকারী। শিকারীরা দুই ভাগে বিভক্ত—সরকারী কর্ম্মচারী এবং ব্যবসায়ী; উদ্দেশ্য ইহাদের উভয়েরই এক। ইহাদের এক পক্ষ আসিয়া শিকারের সঙ্গে মিলিয়া শিকারের স্বার্থ দেখিতে গিয়া নিজেদের ক্ষতি করিবে এতটা উদারতা সরকারী কর্ম্মচারী বা ব্যবসায়ীদের মধ্যে থাকিলে চোরাকারবারের উদ্ভবই হইত না।

গবর্মেন্ট জনসাধারণের প্রতিনিধি, জনসাধারণের পক্ষে একজোট হইয়া চোরাকারবারী ঠেকাইতে বাহির হওয়া অসম্ভব। নিরর্থকও বটে, কেননা জনসাধারণ সরকারের দুর্নীতি দমন বিভাগের ব্যয়ভার বিশেষ ভাবে বহন করিতেছে। চোরাকারবার করার জন্ত বা ঐ দুষ্কার্য্যে উৎসাহ দান ও সাহায্য করার জন্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন দেওয়া হয় না, জনসাধারণ এজন্ত ট্যাক্স দেয় না। কোন সরকারী কর্ম্মচারী দুর্নীতির আশ্রয় লইতেছে কিনা, চোরাকারবারীর সঙ্গে জোট বাঁধিতেছে কিনা তাহা দেখিবার দায়িত্ব গবর্মেন্টের কর্ত্তাদের এবং ঐরূপ দুষ্কর্ম্ম ধরা পড়িবা মাত্র উহাদিগকে শাস্তি দান ও চাকুরি হইতে বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা গবর্মেন্টকে জনসাধারণ দিয়াছে।

সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে সকলে দুর্নীতিপরায়ণ নহেন একথা আমরা ভাল করিয়া জানি। এমন অনেক কর্ম্মচারী আছেন যাঁহারা দুর্নীতি বন্ধ করিবার জন্ত যথেষ্ট উৎসাহিত ছিলেন এবং ঐরূপ করিতে গিয়া বিপদেও পড়িয়াছেন। উপরওয়ালারা যেখানে পয়সাওয়ালা চোরাকারবারীদের উপর সহনশীল, সেখানে নিম্নস্থ কর্ম্মচারী অগ্রসর হইতে গেলে আঘাত পাইয়া ফিরিয়া আসিবে ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। আমেরিকায় দুর্নীতিপরায়ণ দলগুলি আগে বিভাগীয় বড় কর্ত্তাদের সহানুভূতি ক্রয় করে, অবশিষ্ট কাজ তখন আপনিই সহজ হইয়া আসে। আমাদের এখানেও এই রীতিই ঘটিতেছে। এখানে

উপরিস্থ সহানুভূতি ক্রয় কতটা হইতেছে তাহা জানা যায় না, তবে উপরওয়ালাদের defeatist mentality বা পরাজিতের মনোভাবের পূর্ণ সদ্ব্যবহার তাহারা করিয়া লইতেছে ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। দুর্নীতি-পরায়ণতা শুধু লাইসেন্সদাতা বা বণ্টন ব্যবস্থাকারী সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যেই আর এখন সীমাবদ্ধ নাই, উহা সুদূর-প্রসারিত হইয়াছে। পুলিস তো বরাবরই আছে, এখন পাবলিক প্রসিকিউটাররাও সন্দেহের উর্দ্ধে উঠিতে পারিতেছেন না। বড় বড় মামলায় দেখা যাইতেছে নীচের আদালতে দণ্ডলাভ ঘটিতেছে কিন্তু আপিলে মুক্তির ফাঁক সেখানেই রহিয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে কতটা ইচ্ছাকৃত তাহা বিশেষভাবে অনুসন্ধানের সময় আসিয়াছে।

ব্যবসায়ীরা চোরাকারবারে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে, মধ্যে ও পরে অভিজ্ঞ আইনজীবী ও অডিটার প্রভৃতির সাহায্য পায়। তার উপর সরকারী কর্ম্মচারী, পুলিস এবং আইন-আদালতও যদি তাহাদেরই পক্ষে যাইতে আরম্ভ করে তবে দুর্নীতি দূর হইবে কিরূপে, দেশ দাঁড়াইবে কোথায়? নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের চোরাকারবার চলে এইজন্য যে, উহা না হইলে লোকের চলে না, লোকে বাধ্য হইয়া চড়া দামে উহা কিনে, বেশী দামে কিনিতে হয় বলিয়া অল্প পরিমাণ কিনিয়া কাজ চালায়। জনসাধারণ অন্নবস্ত্রের অভাব সহ্য করিয়া জিনিষ না কিনিয়া চোরাকারবারীদের এবং দুর্নীতি-পরায়ণ সরকারী কর্ম্মচারীদের কোণঠাসা করিবে এতবড় আশা হয়ত বাকুনিন এবং ক্রোপটকিনের রাষ্ট্রোত্তর সমাজে কল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান বাস্তব সমাজে উহা অসম্ভব; এবং অসম্ভব বলিয়াই জনসাধারণ রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে এই দায়িত্ব তুলিয়া দিয়া উহার ব্যয়ভার বহন করিতেছে। ইংলণ্ডের ন্যায় আসল গণতন্ত্রে এজন্যই সরকারী কর্ম্মচারী, পার্লামেন্টের সদস্য বা মন্ত্রীসভার সদস্য কাহারও বিরুদ্ধে দুর্নীতিপরায়ণতা বা অসাধুতার গুজবও যদি প্রবল হইয়া উঠে তবে তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসন্ধানের জন্য ট্রিবিউনাল বসে এবং প্রতিকার হয়। আমাদের দেশের নকল গণতন্ত্রে গুজব তো দূরের কথা, দুর্নীতিপরায়ণতা হাতেনাতে ধরিতে গেলে বিবেক বলে সরকারী কর্ম্মচারীদের বিপদে পড়িতে হয় এবং জনসাধারণকে শুনিতে হয়—তোমরাই হইতেছ চোরাকারবারের আসল প্রশ্রয়দাতা, তোমরা ঘুষ দাও বলিয়াই তো কর্ম্মচারীরা ঘুষ খায়, অতএব দুর্ভোগ তোমাদের হইবেই আমরা আর কি করিতে পারি?

দুর্নীতি সম্বন্ধে কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর বিবৃতি

দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্ব্বাচন সম্বন্ধে কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী কালা ভেঙ্কট রাও কলিকাতা আসিয়াছেন। দুর্নীতি সম্বন্ধে কংগ্রেসের উচ্চতম অধিকারীবর্গের মনোভাব ক্রমশঃ যে ভাবে নরম হইয়া আসিতেছে তিনিও তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—"কথায় কথায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে এবং কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টে দুর্নীতির কথা বলা আজকাল একটা ফ্যাসন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" ইহার উপর আরও এক কাঠি চড়াইয়া তিনি বলিয়াছেন, "সকলেই জানে অভিযোগের অনেকটা অতিরঞ্জিত, তথাপি সকলেই ঐ কথাই বলিয়া থাকে। আমি জানিতে চাই, পশ্চিম-বঙ্গে কত পারমিট আছে তার কতটা কংগ্রেসসেবীরা পাইয়াছেন এবং যাঁহারা পারমিট পাইয়াছেন তাঁহারা কয় পুরুষ যাবৎ ঐ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। নিছক ব্ল্যাকমার্কেট করিয়া লাভ করিবার জন্য কতজন নূতন কংগ্রেসকর্ম্মী পারমিট সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহাদের আসল সংখ্যাও আমি জানিতে চাই। আমি এই কথা বলিতে পারি যে পার্লামেণ্টারি বোর্ডের সম্মুখে ক্ষমতা অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিলে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।"

ভেঙ্কট রাও মহাশয় প্রশ্নটা করিয়াছেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত রিপোর্টারবৃন্দকে। দুর্নীতি নিবারণে তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে তিনি স্বয়ং মন্ত্রীদের নিকট হইতে বা অন্য কংগ্রেসকর্ম্মীদের নিকট হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারি বোর্ডে ব্যাপারটা পৌঁছাইতেই দেওয়া হয় না, পৌঁছাইবে কে? বিহারের গুড় কেলেঙ্কারীর কাহিনী প্রায় দুই বৎসর পরে পার্লামেণ্টারি বোর্ডে উঠিয়াছে এবং বোধ হয় এক প্রকার নিঃসংশয়েই বলিয়া ফেলা যায় যে উহাও যথাসময়ে ধামাচাপা পড়িবে। ভেঙ্কট রাও মহাশয় বড়বাজার অঞ্চলে একটু অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিতেন যে, কাপড়ের পারমিটের একটা দস্তুরমত বাজার গড়িয়া উঠিয়াছে। যে সব কংগ্রেসকর্ম্মী পারমিট পাইয়া থাকেন তাঁহারা কোন পুরুষেই কাপড়ের ব্যবসা করেন নাই, সে সঙ্গতি তাঁহাদের নাই, থাকিবার কথাও নয়। অত টাকা যাহাদের ছিল তাহারা কংগ্রেসের কর্ণধার হইয়াছে, কর্ম্মী হয় নাই। বাস, ট্যাক্সি প্রভৃতিতেও এই ব্যাপার চলিতেছে। কাপড়ের পারমিট যেমন শেষ পর্য্যন্ত মাড়োয়ারীর হাতে আসে, বাস, ট্যাক্সির বেলায়ও তাহাই ঘটে, কংগ্রেকর্ম্মীরা মাঝখানে কিছু দালালী ভোগ করেন এই পর্য্যন্ত। চাউল প্রোকিউরিং (সংগ্রহ), কাপড়ের পারমিট প্রভৃতিতে শতকরা ২ টাকা এই দালালীর প্রায় নির্দ্দিষ্ট রেট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু যদি বলেন দুর্নীতি সবদেশেই কিছু না কিছু থাকে, সর্দ্দার প্যাটেল যদি বলেন সরকারী কর্ম্মচারীদের আয় এক-তৃতীয়াংশ হইয়া গিয়াছে অতএব তাহারা করেই বা কি, কালা ভেঙ্কট রাও যদি বলেন দুর্নীতির অভিযোগের অধিকাংশই অতিরঞ্জিত তবে দুর্নীতি দূর হইবে কিরূপে, করিবেই বা কে? দুর্নীতি

সম্বন্ধে এই ঔদাসীন্য পরাজিতের মনোভাব-সঞ্জাত হইলেও উহা মারাত্মক জিনিষ ; স্বাধীনতার এত বড় শত্রু আর নাই। রোম হইতে সুরু করিয়া দেখা যাইবে আজ পর্য্যন্ত যত রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি তাহাদের সর্ব্বনাশের একটা প্রধান কারণ। একটু শক্ত হইলেই যেখানে এই পাপ দূর করা যায় এবং শক্ত হওয়ার উপায় ও সুযোগ যেখানে রহিয়াছে সেখানে কংগ্রেসের উচ্চতম অধিকারীবৃন্দ কেন এত নরম হইয়া পড়িতেছেন তাহা বাস্তবিকই সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বেও গান্ধীজী এই মহা অনিষ্টকর বস্তুটি সম্বন্ধে বার বার জাতিকে সাবধান করিয়াছেন, এই দুর্নীতি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানেরও সর্ব্বনাশের কারণ হইবে তাহাও বলিয়াছেন। কোন প্রকার দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করিলে দেশ বাঁচানো অসম্ভব হইবে।

মাতৃভাষা সম্বন্ধে ডাঃ ঘোষের নূতন সংজ্ঞা

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ মানভূম গিয়াছেন এবং তীব্র বাঙালী বিরোধী বিহার কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীপ্রজাপতি মিশ্রের সঙ্গে সেখানে ঘুরিয়াছেন ও বক্তৃতা করিয়াছেন—এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ডাঃ ঘোষের বক্তৃতার রিপোর্ট তাঁহার পরিচালিত "লোকসেবক" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে এই কথাগুলি আছে—"মাতৃভাষা" কথাটি নির্ভুল নহে। বিলাতে প্রতিপালিত বাঙালী শিশু শুধুমাত্র ইংরেজী ভাষাই বলে। বিহার প্রবাসী বাঙালীদিগকেও সেইরূপ রাষ্ট্রভাষা হিন্দী শিক্ষা করিতে হইবে।" এই উক্তি হইতে এই অর্থই দাঁড়ায় যে, বিলাতে বাঙালী শিশু প্রতিপালিত হইলে সে শুধুমাত্র ইংরেজী ভাষা বলে, অর্থাৎ মায়ের সঙ্গেও ইংরেজীতে কথা বলে, সুতরাং বিহারে বাঙালী শিশু প্রতিপালিত হইলে সেও শুধুমাত্র হিন্দী ভাষাই বলিবে, ঘরে মায়ের সঙ্গেও বলিবে, তার উপর হিন্দী যখন রাষ্ট্রভাষা তখন তো কথাই নাই।

এই একটি ব্যক্তি সততার ভেক ধরিয়া পূর্ব্ববাংলা পশ্চিম বাংলা এবং বৃহত্তর বাংলার যে অনিষ্ট সাধন করিতেছেন বাংলার ইতিহাসে তার তুলনা খুব কম আছে। পূর্ব্ববঙ্গের পাতভাড়ি গুটাইয়া ইনি সকলের আগে পলায়ন করিয়া পশ্চিম বঙ্গের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীদের উপদেশ দিয়াছেন সেখানে থাকিতে। বাছিয়া বাছিয়া পুরানো যুগের বহু অযোগ্য এবং দেশের বিরুদ্ধাচরণকারী কর্ম্মচারীদের উচ্চপদে বসাইয়া এবং শহর ও গ্রামের পুলিস একাকার করিয়া ইনি পশ্চিমবঙ্গের যে অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন তাহার জের সামলাইতে আজ প্রাণান্ত হইতেছে। প্রধান মন্ত্রী থাকা কালে ইনি বিহারে গিয়া এক বক্তৃতায় মানভূম প্রত্যাবর্ত্তন আন্দোলনের বিরুদ্ধে মন্তব্য করিয়া আসিয়াছিলেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যহিসাবে প্রকাশ্য বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন যে বাংলায় মানভূম ফিরিবার কোন আশা নাই। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য ছিল তিনি তাহা পালন করেন নাই। বিহার কংগ্রেস কমিটির সভাপতির সঙ্গে একযোগে ইনি মানভূম সত্যাগ্রহ বিষয়ে আপোষের সর্ত্ত তৈরি করিতেছেন এই সংবাদে আমাদের মনে আশঙ্কা হইতেছে যে মানভূমের বাঙালীদের সর্ব্বনাশের পথটিও তাহা হইলে প্রশস্ত হইবে।

সামরিক বৃত্তি ও বাঙালী

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট হইতে "প্রবাসী" পত্রিকায় এই বিষয়ে নূতন করিয়া নানা ভাবে আলোচনা করা হইতেছে। ভারতীয় সামরিক বিভাগের নানা কর্ম্মে দু'চারটি উচ্চপদ ছাড়া কোথাও বাঙালীর স্থান নাই বলিলেই হয় ; এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য আমরা বাঙালী সমাজকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইংরেজের সামরিক বাহিনীতে লোক-সংগ্রহের নীতি আমাদের সামরিক ঐতিহ্য ভুলাইয়া দিয়াছে ; যেসব শ্রেণী সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত তাহারা কলম পিষিয়া ও ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া চার-পাঁচ পুরুষকাল, প্রায় ১৫০ বৎসর, কাটাইয়া দিয়াছে। এই অপমানের জ্বালা মনকে ক্ষুব্ধ ও বিষাক্ত করিলেও, ইংরেজ আমলে তাহার প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না। "স্বদেশী" আন্দোলনের পর হইতে নিজের প্রাণের জ্বালায় বাঙালী সন্ত্রাসবাদী এই জাতীয় অপমান মুছিয়া ফেলিবার জন্য বোমা রিভলবারের আশ্রয় লইয়াছিল। ব্যক্তিগত বা দলগত আত্মসম্মান এই উপায়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও বাঙালী সমাজের সমস্যার সমাধান হয় নাই।

সেই সমাধানের সুযোগ আসিয়াছে ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট হইতে। প্রায় দুই বৎসরে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা হইয়াছে কি না, তৎসম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের গবর্মেণ্ট এই বিষয়ে তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কতদূর পালন করিয়াছেন সেই প্রশ্নও এই জিজ্ঞাসার সঙ্গে জড়িত। প্রাদেশিক রক্ষী-বাহিনী দল গঠন করা হইতেছে, তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং হাজার দুই লোকের শিক্ষা এক ভাবে সম্পূর্ণ হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার বিভাগের প্রসাদে এই সব সংবাদ আমরা মাঝে মাঝে পাইয়া থাকি। কিন্তু এই সব সংবাদে কোন উৎসাহ পাই না এইজন্য যে, তাহার মধ্যে এ বিষয়ে বাঙালীর সমষ্টিগত মনোবৃত্তির ব্যাপক পরিবর্ত্তনের জন্য উদ্যম বা প্রচেষ্টার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না!

গত দেড় শত বৎসরের অবহেলার ফলে সমাজ-জীবনে সামরিক বৃত্তি সম্বন্ধে যে নিশ্চেষ্টতা দেখা দিয়াছে, তাহা দূর করিতে হইলে বর্ত্তমান উপায় ত্যাগ করিয়া সমাজ-মনকে নূতন করিয়া একটু জোরে নাড়া দিতে হইবে। বুঝাইয়া বলিতে

হইবে—স্বাধীনতার আমলেও বাঙালী কোথায় অসুবিধা অনুভব করে। এই নূতন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে অনেক বাধা অতিক্রম করিতে হইবে, অন্যান্য প্রদেশবাসীর ব্যঙ্গোক্তি সহ্য করিয়া সামরিক জীবনে নীরবে আপনাদের স্থান করিয়া লইতে হইবে। বর্ত্তমানে যাঁহারা জাতীয় জীবনের এই বিভাগে প্রায় একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া, আপনাদের শরীর-মনের শক্তির পরীক্ষা দিয়া বাঙালী যুবকবৃন্দকে নিজের স্থান করিয়া লইতে হইবে। অন্য পথ নাই। শিখ-পঞ্জাবী, গাড়োয়ালি-গোরখা, রাজপুত-মারাঠা এই সব তথাকথিত "সামরিক জাতি" কেহই অনুগ্রহ করিয়া আমাদের যুবকদের স্থান ছাড়িয়া দিবেন না। বাঙালী প্রধানদের এই কথাটাই সর্ব্বাগ্রে বুঝিয়া লইতে হইবে; তাঁহারা বুঝিলেই পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী এই বিষয়ে সজাগ হইবেন। ঘরে বসিয়া কেন্দ্রীয় সামরিক বিভাগের দোষ-ত্রুটি, আত্মীয়-বাৎসল্যের আলোচনা করিলে পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

সামরিক জীবন সম্বন্ধে বাঙালী সমাজের দুর্ব্বলতা কোথায়, তৎসম্বন্ধে আমাদের নূতন করিয়া সন্ধান লইতে হইবে; প্রকাশ্যে তাহার আলোচনা করিতে হইবে; নচেৎ রোগের নিদান ধরা পড়িবে না। এই সম্বন্ধে "প্রবাসী" পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় একজন গোরখা ভদ্রলোক শ্রীমন বাহাদুর সিং একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; তার সার্থকতা আজ নূতন করিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে যখন "বাঙালী রেজিমেণ্ট" গঠন করিবার কার্য্য "দ্রুততর করিবার" দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ গবর্ন্মেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটি "বসুমতী" (দৈনিক) পত্রিকার ২১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে—

> বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বাঙালী রেজিমেণ্ট গঠনের কার্য্য দ্রুততর করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্ভব হইলে জুন মাসের মধ্যেই সামরিক ট্রেনিং দিবার উদ্দেশ্যে দুই শতাধিক বাঙালী যুবক সংগ্রহ করিবেন। নির্ব্বাচিত যুবকদের মধ্যে ১ শত জনকে আর্টিলারীতে এবং অবশিষ্টদের ইনফ্যাণ্ট্রি ও আর্ম্মার্ড কোরে যোগদানের জন্য আবশ্যক ট্রেনিং দেওয়া হইবে। ট্রেনিং সমাপ্ত হইলে ইঁহারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনে একটি বাঙালী ইউনিট গড়িয়া তুলিবেন।
>
> আরও জানা গিয়াছে যে, আর্টিলারীতে যোগদানেচ্ছু যুবকগণকে ন্যূনকল্পে উচ্চতায় ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি ও ওজনে ১২০ পাউণ্ড হইতে হইবে এবং শিক্ষার দিকে মাতৃভাষা লিখিতে পড়িতে জানিলেই চলিবে। তাঁহারা নিয়োগকাল হইতে বিনামূল্যে রেশন, বাসস্থান, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি ব্যতীত মাসিক ৩৭।০ টাকা হিসাবে ভাতা পাইবেন। ইনফ্যাণ্ট্রি ও আর্ম্মার্ড কোরে যোগদানকারী যুবকদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

এই সংবাদ প্রকাশের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আর একটি সংবাদ পরিবেশিত হয় যে বাছিয়া বাছিয়া প্রান্তীয় রক্ষীদল হইতে দশ জনকে ফতেগড়ে (যুক্ত প্রদেশ) অবস্থিত রাজপুত রেজিমেণ্টে পাঠানো হইয়াছে; ইহারা ভবিষ্যত বাঙালী রেজিমেণ্টের পথিকৃৎরূপে, অগ্রণীরূপে কাজ করিবেন। এই হারে রংরুট চলিলে "বাঙালী রেজিমেণ্ট" গড়িয়া তুলিতে কত দিন লাগিবে, তাহা সংখ্যা-তত্ত্ববিদ্ বলিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ন্মেণ্ট এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট মন, উদ্ধৃত সংবাদে তাহা বুঝা যায়; তাঁহারা জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের মধ্যে ২০০ জনকে পাঠাইতে চান।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা বিস্তার

গত বৎসর, ১৮ই জুন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগ বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে উপায় নির্দ্ধারণ কল্পে একটি কমিটি নিয়োগের সংবাদ ঘোষণা করেন। হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এই কমিটির সভাপতি পদে নিযুক্ত হন। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী এবং ১৭।১৮ জন শিক্ষাবিদ্, কংগ্রেস-নেতা ও নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এই কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত ও মনোনীত হন। জুলাই মাসের ২৩ তারিখে কমিটির প্রথম সভা বসে।

গত ৭ই জুন (২৪শে জ্যৈষ্ঠ) কমিটির শেষ অধিবেশন বসে; মাত্র ৯।১০ জন সভ্য নাকি তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনে চূড়ান্ত রিপোর্ট স্বাক্ষর করা হয়। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ও ইহাতে স্বাক্ষর করেন। এই অনুষ্ঠানের পর তিনি নাকি ঘোষণা করেন যে, তিন মাসের মধ্যে বয়স্কদের শিক্ষাদানকার্য্য পরীক্ষামূলক ভাবে করিবার সিদ্ধান্ত শিক্ষা বিভাগ গ্রহণ করিয়াছেন, যদিও সদ্য স্বাক্ষরিত রিপোর্টে দেখিতে পাই যে, ৮ মাস কালের মধ্যে বয়স্কদের লিখন-পঠনক্ষম করার চেষ্টাই করিতে হইবে। ডাঃ স্নেহময় দত্তের ঘোষণা এই বিদ্বন্মণ্ডলীর সিদ্ধান্তের পরিপোষক কিনা তাহা পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকবৃন্দের বিচার্য্য।

৯০ লক্ষ বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষার ব্যবস্থার একটা পরিচয় পাইলাম। বাধ্যতামূলক বালক-বালিকার শিক্ষা সম্বন্ধে যে ব্যবস্থার কথা শুনিতেছি, তাহা আরও চমৎকার। বৈগাছিতে এই শিক্ষার নামে, বুনিয়াদি শিক্ষার নামে, একটি শিক্ষক প্রস্তুতের কারখানা তৈরি হইতেছে। এই কারখানার কার্য্য-বিবরণ যাহা আমাদের নিকট পৌঁছিতেছে তাহাতে মনে হয় যে 'বয়স্ক-শিক্ষার' মত আর একটা কৌতুককর ব্যবস্থা বৈগাছিতেও করা হইতেছে। প্রায় ৫০ জন শিক্ষা-বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর ও সাব-ইন্‌স্পেক্টরকে তথায় জড় করা হইয়াছে। ২।৩

মাসের মধ্যে তাঁহাদের চরকা-কাটার কৌশলটি ও বুনিয়াদি শিক্ষার ভাব ও কৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইবে। এই ৫০ জনের মধ্যে এখন ৭।৮ জন নাকি আছেন যাঁহারা কয়েক মাসের মধ্যে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন বা বয়সানুযায়ী অবসর গ্রহণ করিবার দিন যাঁহাদের ঘনাইয়া আসিবে। বয়স্ক-শিক্ষার সংগঠনকল্পে যেমন একজন সদ্য পেনশন-প্রাপ্ত অধ্যাপককে নিযুক্ত করা হইয়াছে, সেইরূপ বালক-বালিকার শিক্ষার ক্ষেত্রেও শরীর মনে অথর্ব্ব কয়েকজন প্রাচীনপন্থীর সাহায্যে বুনিয়াদি শিক্ষার মত একটি বৈপ্লবিক শিক্ষা-পরিকল্পনাকে রূপদান করিবার চেষ্টা হইতেছে।

এই মিথ্যাচারের প্রয়োজন সম্বন্ধে একটা অজুহাতের কথা আমাদের কাছে পৌঁছিয়াছে। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট বুনিয়াদি শিক্ষার খাতে একটা বড়রকমের অর্থ সাহায্যের আশা দিয়াছেন। তাঁহারাও নাকি গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত এই নামটি থাকিলেই সন্তুষ্ট হইবেন, এই ভরসায় প্রতি প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলী ও শিক্ষার ব্যাপারে তাঁহাদের পরামর্শদাতাগণ বুনিয়াদি শিক্ষার নাম ভাঙাইয়া কিছু টাকা মারিবার জন্ম ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন।

বয়স্ক-শিক্ষার ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের সাহায্যের কথা শুনিতে পাই; "সামাজিক শিক্ষার" নামে তাহা ব্যয় হইবে এবং গৌরীসেনের টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলিবার নূতন সুযোগের সন্ধান পাইয়া সকলেই আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে বয়স্ক-শিক্ষার নামে যে কৌতুককর আয়োজন-উদ্যোগ চলিতেছে, তাহার সাজগোছ দেখিয়া 'বয়স্ক-শিক্ষা' কমিটির সভ্যবৃন্দ কি মনে করিতেছেন তাহা আমরা জানি না। সরকারী শিক্ষা বিভাগের হালচাল তাঁহারা জানেন না এমন নয়। তবুও তাঁহারা কেন এই বিভাগের হাতে বয়স্ক-শিক্ষা পরিচালনার ভার ছাড়িয়া দিলেন, তাহা বুঝিলাম না।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন প্রণীত "শিক্ষা পরিকল্পনা" নামক পুস্তিকায় আমরা দেখিতে পাই গত ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্রতীবৃন্দের সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে একটি প্রস্তাব এই :—"বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রীয় স্বতন্ত্র পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে।" প্রিয়রঞ্জন বাবু বয়স্ক শিক্ষা কমিটির সভ্য ছিলেন; তিনি এই কমিটিতে এই প্রস্তাব গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করেন নাই কেন, তাহা জানি না।

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর সংখ্যা

পশ্চিমবঙ্গের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর কর্তৃক নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রচারিত হইয়াছে :

ভারত ইউনিয়নের বিভিন্ন অংশে পুনর্বসতি সমস্যা সমাধানকল্পে তথ্য সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ভারত গবর্মেণ্ট নিজেদের ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া যে সকল উদ্বাস্তু পাকিস্থান হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তথায় আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে কিম্বা এইরূপ গোলযোগের আশঙ্কায় অথবা ভারত ও পাকিস্থান এই দুইটি ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পশ্চিম পাকিস্থান হইতে ১৯৪৭ সনের ১লা মার্চ অথবা ইহার পরে কিম্বা পূর্ব্বে পাকিস্থান হইতে ১৯৪৬ সালের ১৫ই অক্টোবর অথবা ইহার পরে যে ব্যক্তি তাঁহার বাড়ীঘর ত্যাগ করিয়া কিম্বা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া ভারতে আসিয়াছেন, তাঁহাকেই এই উদ্দেশ্যে উদ্বাস্তু বলিয়া গণ্য করা হইবে।

বর্ত্তমানে কলিকাতার কালেক্টর শ্রী কে এন মিত্র এই আদমসুমারীর প্রাদেশিক তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন। ১১নং নেতাজী সুভাষ রোডে তাঁহার অফিস স্থাপিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে শীঘ্রই উদ্বাস্তু ব্যক্তিগণের গণনা আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উদ্বাস্তুদের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াতের ফলে যাহাতে কেহ গণনায় বাদ না পড়েন কিম্বা কাহারও দুই বার গণনা না হয় তজ্জন্য প্রদেশের সর্ব্বত্র একই সময়ে গণনা আরম্ভ হইবে। এক মাসের মধ্যেই গণনা সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। যে সকল অঞ্চলে উদ্বাস্তু ব্যক্তিগণের সংখ্যা অল্প এবং তাঁহারা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছেন, তথায় পরিবারের কর্ত্তাকে পূর্ব্ব বিজ্ঞাপিত কোন কেন্দ্রে উপস্থিত হইতে হইবে। যে সকল অঞ্চলে উদ্বাস্তুগণের সংখ্যা খুব বেশী তথায় বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া গণনা করা হইবে। গণনাকালে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী সংগৃহীত হইবে :—(ক) পরিবারের কর্ত্তার নাম, (খ) তাঁহার সম্প্রদায় এবং পাকিস্থানের বাড়ীর বর্ণনা এবং পরিবারের লোকদের নাম, বয়স এবং (গ) পাকিস্থানে থাকাকালে বেতন, মজুরী ও কাজ-কারবার হইতে এবং ভূমিসম্পত্তি হইতে ও অন্যান্য সূত্রে পরিবারের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ। দেশ বিভাগের পূর্ব্বে উদ্বাস্তু ব্যক্তির ভারত ইউনিয়নে কোন সম্পত্তি থাকিয়া থাকিলে তাহারও বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে ভারত ইউনিয়নে তাঁহার কোন উপজীবিকা থাকিলে তাহার এবং আনুমানিক বার্ষিক আয়ের বিবরণও লইতে হইবে। ইহা ছাড়া বর্ত্তমানে কি ভাবে তাঁহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন তাহার বিবরণও সংগ্রহ করিতে হইবে, যথা—তাঁহারা খরিদ করা কিম্বা ভাড়া বাড়ী, অথবা উদ্বাস্তু শিবির কিম্বা ধর্ম্মশালায় বাস করেন, কিম্বা কোন আত্মীয় বা বন্ধুর গৃহে আছেন, তাহা জানিতে হইবে। পুনর্ব্বসতির জন্য ইতিমধ্যে গবর্মেণ্টের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য পাইয়া থাকিলে, তাহারও বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

ইহা অত্যন্ত জরুরী বিষয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ অবিলম্বে গবর্মেণ্টকে এই কার্য্যে সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করিবেন

বলিয়া আশা করা যায়। এতদিন পরে ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুগণের সম্পর্কে তাঁহাদের দায়িত্ব স্বীকার করিলেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। প্রকৃত উদ্বাস্তু, যাহারা সত্য সত্যই পূর্ব্ববঙ্গের ভিটা-মাটি ছাড়িতে বাধ্য হইয়া অসহায় ভাবে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে, তাহাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রকৃত চেষ্টা এবার হইবে আশা করা যায়। বলা বাহুল্য, এই প্রচেষ্টা প্রকৃত উদ্বাস্তু ও মেকী ঠগ—অর্থাৎ যাহারা পূর্ব্ববঙ্গের সব কিছু রাখিয়া এখানে ফাঁকতালে বেশ কিছু গুছাইবার ফন্দিতে আসিয়াছে—এই দুইয়ের মধ্যে বাছাই করিয়া আরম্ভ না করিলে পূর্ব্বেকারই মত ব্যর্থ হইবে।

এই সম্পর্কে আর একটা প্রস্তাব আমরা করিতেছি। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া উপার্জ্জন করিতেছে। তাহাদের সংখ্যাও নির্দ্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। বিরোধী ও পররাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ ভারতরাষ্ট্রে বসবাস করিতেছে, তাহাদের পরিচয় জানিয়া রাখা ভাল। আদমসুমারি হইতে তাহা জানা যায়। তাহারা যে সব কাজে নিযুক্ত আছে, যথা—কলিকাতার বন্দর, কলিকাতার জলের কল, কাশীপুরের অস্ত্রের কারখানা—তাহার সঙ্গে রাষ্ট্রের জীবন-মরণ সমস্যা জড়িত। পাকিস্থানী মনোভাব লইয়া তাহারা এই রাষ্ট্রে আছে; সেই মনোভাবের প্রেরণায় তাহারা কি করিতেছে, কি না করিতেছে, তাহার সন্ধান হওয়া প্রয়োজন। যে সময়ে হিন্দুরা পূর্ব্ববঙ্গে থাকিতে পারিতেছে না, সেই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান আসিয়া পশ্চিমবঙ্গে স্থান জুড়িয়া বসিবে, তাহা বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। ইহার প্রতিকার চেষ্টা বাঞ্ছনীয় মনে করি। তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গের পাকিস্থানীরা একটু সাবধান হইতে পারে।

ভারতরাষ্ট্রের আদিবাসী

বোম্বাই নগরী হইতে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে নিম্নলিখিত বিবরণ পরিবেশিত হইয়াছে :

> ভারতের দুই কোটি ষাট লক্ষ আদিবাসী বর্তমানে সামাজিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক সমুন্নতির নব যুগসন্ধিক্ষণে অপেক্ষা করিতেছে।
>
> পার্ব্বত্য উপত্যকা ও দুরধিগম্য অরণ্যস্থলীতে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে আধুনিক সভ্যতার স্পর্শের বাহিরে আদিবাসীরা বাস করে।
>
> এই সকল উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে "পুনরুদ্ধার" করিয়া জনসমষ্টির অবশিষ্টাংশের সহিত সমান মর্য্যাদায় স্বাধীন ভারতের নাগরিকাধিকারের জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া তুলিবার নিমিত্ত ভারত গবর্মেণ্ট এখন চেষ্টা করিতেছেন। এই আদিম জাতিগুলির মধ্যে ২৫ বৎসর যাবৎ যে ধর্ম্মমূলক ও সমাজকল্যাণকর কাজ চলিতেছে, বর্ত্তমান পরিকল্পনা তাহারই চরম পরিণতি। সমাজসেবাব্রতীদের মতে শতাব্দীর পর শতাব্দী এই উপজাতিগুলিকে নিঃস্বতা ও অশিক্ষার মধ্যে রাখা হইয়াছে। সরলচিত্ত ও কঠোর পরিশ্রমী ইহারা 'মাটি মায়ের' করুণার নির্ভর করিয়া বনে-জঙ্গলে তাহাদের আরণ্য জীবনযাপন করে। দেশের কোন কোন অঞ্চলে বিত্তশালী ভূস্বামিগণ বনভূমিকে নিজেদের বলিয়া দাবী করিয়া সরলপ্রাণ উপজাতীয়দিগকে স্বার্থের জন্য শোষণ করিয়াছে। এক সময় ছিল যখন ইহারাই অরণ্য শাসন করিত, তীর-ধনুকের সাহায্যে শিকার করিত, নির্জ্জনে শান্তিতে কালাতিপাত করিত। কিন্তু এখন অনেক অঞ্চলে তাহারা ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছে, প্রভুদের জন্য জমি চাষ করিতেছে, কাঠ কাটিতেছে।
>
> আদিবাসীরা মাঝে মাঝে বহিরাগত ও শোষকদের হাত হইতে নিজেদের ঘরবাড়ী ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চেষ্টা করিত; কিন্তু সর্ব্বগ্রাসী স্বভাবদুর্বৃত্ত জাতি আইনের সাহায্যে তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখা হইত। অধুনা অধিকাংশ পার্ব্বত্য জাতির নাম (বিপজ্জনক সম্প্রদায়গুলি ব্যতীত) স্বভাবদুর্বৃত্ত জাতির তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।
>
> ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক আদিবাসীই ভারতীয় ইউনিয়নের পুরাদস্তুর নাগরিক। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে তাহাদেরও ভোটদানের যোগ্যতা আছে। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যে সকল উপজাতীয় পরামর্শদাতা পরিষদ গঠিত হইবে, তাহাতেও আদিবাসীদের সংখ্যাধিক্য থাকিবে। প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যসমূহের উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে সেখানকার শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য এই সকল পরিষদ গঠিত হইবে।
>
> উপজাতীয়গণ যাহাতে স্বাধীন ভারতের নাগরিকের দায়িত্ব ও অধিকার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে, সেজন্য ভারতের প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলি ইহাদিগকে শিক্ষাদানের আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছেন। প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলি ইহাদের অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানেরও চেষ্টা করিতেছেন।

এই সংবাদে দেশের হিতকামী সকলেই আনন্দিত হইবেন। আজ যাহারা ভারতবর্ষে আদিবাসী ও "শোষিত" শ্রেণী ও সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত, ইতিহাস পাঠে দেখা যায় তাহাদের মধ্য হইতে অনেক সময় রাষ্ট্রের শাসকবৃন্দ মনোনীত হইয়াছেন বা আত্মশক্তির পরিচয় তাঁহারা দিয়া রাষ্ট্রের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আজ আমাদের ইতিহাস সে কাহিনী ভুলিয়া গিয়াছে বা উচ্চশ্রেণীর স্বার্থের খাতিরে সে ইতিহাস বিকৃত করা হইয়াছে। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার দিন

আসিয়াছে। খ্রীষ্টান প্রচারকেরা আমাদের চোখে আঙুল দিয়া আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করিয়া দিয়াছেন। এবং এই আদিবাসীদের বর্ত্তমান যুগোপযোগী শিক্ষা-দীক্ষায় অনুপ্রাণিত করা যতটা সহজ বলিয়া মনে হয়, কেত্রকর্ম্মে তাহা কত কঠিন তাহাও দেখাইয়া দিতেছেন।

প্রধানতঃ দুই কারণে শিক্ষকেরা তাহাদের সংস্কারানুযায়ী কাজ করিতে গিয়া দেখেন যে তাহা আদিবাসীদের সংস্কারের সঙ্গে খাপ খায় না; এবং এই সংস্কারপুঞ্জকে রক্ষা করিতে গেলে বর্ত্তমান যুগোপযোগী শিক্ষাদান ব্যর্থ হইয়া যায়। এই সমস্যা সমাধানের কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থা নাই। দেশ-ভেদে ও প্রকৃতি-ভেদে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা চলিতেছে দেশে-বিদেশে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পীতবর্ণ আদিবাসীরা একটা অস্বাভাবিক জীবনযাপন করে; শ্বেতাদের দাপটে তাহারা নিজ বাসভূমে "সংরক্ষিত"(protected) জীবনযাপন করে। এমন কথাও পড়িয়াছি বর্ত্তমান যুগের পোষাক-পরিচ্ছদ ও অভ্যাসাদি আদিবাসীর মধ্যে প্রবর্ত্তন করিলে, তাহা তাহাদের পক্ষে শুভজনক হয় না; বর্ত্তমান যুগের সৃষ্ট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়া তাহাদের পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠে।

আমাদের দেশেও সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হইতেছে। বোম্বাই নগরীর প্রদত্ত বিবরণে তাহার ইঙ্গিত আছে। আমাদের "সভ্য" কৃষি-ব্যবস্থা তাহাদের উপযোগী নয়। এই সব কথা মনে করিলে মনে হয় কিছুই করিবার নাই। কিন্তু কোন রাষ্ট্র ত কোটি কোটি লোকসমষ্টি সম্বন্ধে চোখে ঠুলি বাঁধিয়া থাকিতে পারে না। ধার্ম্মিক, সেবা-প্রবণ লোকদের সেইজন্য আমাদের দেশেও এই আদিবাসীদের সেবাব্রতে জীবন যাপন করিতে দেখা যায়। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে নীলমণি চক্রবর্ত্তী এই ভাবের প্রেরণায়ই খাসিয়াদের মধ্যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনও ইহাদের মধ্যে ও অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যে বর্ত্তমান যুগোপযোগী শিক্ষা-দীক্ষা দানের ব্যবস্থা করিয়াছে।

এই বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সনের ২৪-২৫ অক্টোবর তারিখে দিল্লী নগরীতে একটি সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনের প্রবর্ত্তক শ্রীঠক্কর বাবা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে আদিবাসীদের উন্নতিকল্পে তাঁহাদের চেষ্টার একটি বিবরণী প্রদান করেন। সম্মেলনের বিবরণীতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯২১ সনে ভীল সেবামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে নবজাতীয়তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের নানা সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই বিবরণী হইতে দেখিতে পাই যে, বিহার প্রদেশেই তাহাদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—৪৫ লক্ষ, আসামে প্রায় ২৫।২৬ লক্ষ (জনসংখ্যার ৮০ লক্ষের এক-তৃতীয়াংশ,) তার পর মাদ্রাজে প্রায় ২০ লক্ষ, পশ্চিমবঙ্গে ১৩।১৪ লক্ষ, মধ্যভারত ইউনিয়নে ১১ লক্ষ; রাজপুতনায় ১০ লক্ষ; মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ৪৪ লক্ষ, উৎকলে ২৮ লক্ষ। অন্যান্য প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে বাকী ৬০ লক্ষ।

পাকিস্থানে হিন্দু-শিখ

গত ১৩ই বৈশাখ "পাকিস্থানের" রাজধানী করাচী নগরী হইতে প্রেরিত নিম্নলিখিত সংবাদটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল:

> সিন্ধু সরকার হিন্দু উদ্বাস্তদের ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের বিষয়টি সরকারীভাবে সমর্থন করিয়াছেন। তবে তাঁহারা জেলার সরকারী কর্ম্মচারীদের এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে প্রত্যাগত অমুসলমান উদ্বাস্তদের জন্য বাসস্থানের সংস্থান করিতে যাইয়া যেন মুসলমান উদ্বাস্তগণ বর্ত্তমানে যে সকল গৃহে আশ্রয় লইয়াছে, সেখান হইতে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করা না হয়।
>
> এ সম্পর্কে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যাগত হিন্দু উদ্বাস্তদের বাসস্থানের সংস্থান করিবার উদ্দেশ্যে জেলা কর্ত্তৃপক্ষ ইতিপূর্ব্বে উদ্বাস্তরা যে সব গৃহ দখল করিয়া রহিয়াছে, তাহা ছাড়িয়া দেওয়ার নির্দ্দেশ দিতেছেন বলিয়া প্রায়ই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু সিন্ধু সরকারের ঘোষিত নীতি হইল এই যে, শরণাগত উদ্বাস্তদের বাসস্থানের বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব, প্রত্যাগত উদ্বাস্তদের পুনর্ব্বসতির দায়িত্ব অপেক্ষা সমধিক বলিয়া গণ্য করা হইবে। সুতরাং প্রত্যাগত উদ্বাস্তদের বর্ত্তমানে যে সব গৃহ বা দোকান দখল হয় নাই, তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

সিন্ধু সরকারের এই দুমুখো নির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, পশ্চিম পাকিস্থানে সিন্ধু প্রদেশ, বেলুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পশ্চিম পঞ্জাবে হিন্দু ও শিখেরা প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি ফেলিয়া আসিয়াছেন; তাহার মধ্যে শহরের সম্পত্তির দামের একটা হিসাব দেখিয়াছি; তাহার পরিমাণ নাকি ৮৪৭ কোটি টাকা; পল্লী-অঞ্চলের সম্পত্তির মূল্য ৩,০৮২ কোটি টাকা। সিন্ধু-প্রদেশে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল্য ১,০০০ কোটি টাকার কম হইবে না।

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা যাঁহারা ভারতরাষ্ট্রে চলিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ও মূল্যের কোন হিসাব দেখি নাই। ইহার প্রকৃত কারণ আমরা জানি না, কিন্তু যাহারা সত্য সত্যই পূর্ব্ব পুরুষের ঘর বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের সম্পত্তির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

সম্প্রতি ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার মুসলিম

সম্প্রদায়ের পক্ষে একটি নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে; পূর্ব্ব পাকিস্থানে হিন্দুর পরিস্থিতি সম্পর্কে ইহার বিবরণ প্রণিধানযোগ্য। মুসলিম লীগ পার্টির মনোনীত প্রার্থী চাঁদ মিয়ার পুত্র হারিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁকে জিতাইবার জন্ত মুসলিম লীগ যে ভাবে প্রচার করে তার ফল হিন্দুর পক্ষে আশাপ্রদ নহে। কলিকাতার দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকায় ২রা জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় তার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী নুরুল আমিনসহ আধ ডজন মন্ত্রী ও ১৬ জন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী সপ্তাহকালের অধিক এই প্রচার-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন; সেইজন্ত তাহা জানিয়া রাখা ভাল:

> মুসলিম লীগকে ভোট দিলে ইসলামের ইজ্জৎ রক্ষা হইবে। মুসলিম লীগ পরাজিত হইলে পাকিস্থান ধ্বংস হইবে ও হিন্দুস্থানের সঙ্গে আবার যুক্ত হইয়া যাইবে। প্রতিদ্বন্দ্বী শামসুল হক হিন্দুদের উস্কানীতে নির্ব্বাচনে দাঁড়াইয়াছে। পণ্ডিত নেহেরু পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া সমস্ত হিন্দু কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীদিগকে কলিকাতা হইতে শামসুল হক সাহেবের জন্ত পাঠাইয়া দিয়াছেন। শামসুল হক সাহেব হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও ঐক্য চাহে···এই ছিল তাঁহাদের নির্ব্বাচনী প্রথার ধারা। কয়েক জায়গায় পল্লীতে প্রচার করা হইয়াছিল যে, "আমরাও নাকি হিন্দু!"

যে ভয় মুসলিম লীগের পাণ্ডারা করিতেছে তাহা ফলিলে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা আমরা জানি। কিন্তু মুসলিম জনসাধারণ তাহাতে ভীত হইবে না—ফরিদপুরের পল্লী-গীতই তার প্রমাণ। ঢাকার "সোনার বাংলা" সাপ্তাহিকে তৎসম্বন্ধে শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিতেছেন। ১৯৪৭ সনের ডিসেম্বর মাসে (পৌষ মাসে) জারিগায়কেরা বাড়ী বাড়ী গিয়া এই গানটি গাহিয়াছিল:

> "স্বাধীন দ্যাশে লোক পলাইল
> এমন খবর শুনছ কি?
> বাপ-দাদার ঐ ভিটা ছাইড়া
> চলেছে সব বিদেশে কি?
> হিন্দু মুসলমান একই জাত ভাই
> একই দ্যাহের দুইটি হাত,
> কেউ কারও নয় শত্তুর রে ভাই
> ছুঁয়ে ছুঁয়ে মিত্তির হয়।
> রোজ সকালে আজান গায়,
> (আর) বেরাম্ভনের মন্তর পাঠ।
> সন্ধ্যাকালে নামাজ পড়ে,
> কুলনারী পিদিপ দ্যায়।
> এক সাথেতে রইছি মোরা,
> এক সাথেতে করছি খেলা,
> একই সঙ্গে চলছি ফিরছি
> এখন কেন ভিন্ন ভাব?
> পরের কথায় পরের ভরসায়
> ছাইড়োনা দ্যাশ, মাথা খাও।"

এই মিনতির হৃদ্যতা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্ত সফল হইবে কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করার কোনও উপায় আমরা জানি না।

আসামের ভবিষ্যৎ

আমরা আসামের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর সংকীর্ণ নীতি সম্বন্ধে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। ২৫।২৬ লক্ষ আহম-ভাষাভাষী লোক বাকী ৫৫ লক্ষ লোকের উপর প্রভুত্ব খাটাইতে চায়; এই ৫৫ লক্ষের মধ্যে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক আছে বাংলা ভাষাভাষী; বাকি ৩০ লক্ষ লোকের মধ্যে আছে প্রায় ৪।৫ লক্ষ মণিপুরী; ৩।৪ লক্ষ খাসিয়া; প্রায় ৪ লক্ষ মিজো (লুসাই পাহাড়ের অধিবাসী); প্রায় ৯।১০ লক্ষ চা-বাগানের শ্রমিক যাহাদের কেহই আহম ভাষাভাষী নয়; তাহারা বা তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা আসিয়াছে বিহার, যুক্ত-প্রদেশ, উৎকল,মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে; বাকি কয়েক লক্ষ গারো, কুকি, মিকির, দাফলা, মিশ্‌মি প্রভৃতি।

এই নানা জাতি, নানা লোক, নানা পরিচয়ের জন-সমষ্টিকে লইয়া কি করা হইবে তাহাই হইল আসামের আসল সমস্তা। এই সমস্তা মিটাইবার একটি উপায় মাত্র গোপীনাথ বড়দলই-এর মন্ত্রিমণ্ডলী শিখিয়া রাখিয়াছে—সকলকে দাবাইয়া ২৫।২৬ লক্ষ লোকের প্রভুত্ব কায়েম করা।

সাপ্তাহিক "যুগবাণী" এই নীতিকে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ-প্রধানদের নীতির সঙ্গে এক পর্য্যায়ে ফেলিয়া তাহার নামকরণ করিয়াছেন "আসামের মালান গবর্ণেণ্ট।" ৩১শে বৈশাখের সংখ্যায় এই বিষয়ে আমাদের সহযোগী বলিতেছেন:

> যে কারণে মালান গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়দিগকে দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থান দিতে অনিচ্ছুক আসাম গবর্ণমেণ্টের 'বঙ্গাল-খেদা' ও বাঙ্গালী বিদ্বেষের পশ্চাতে সেই মনো-ভাব বিদ্যমান। আসামে জমির অভাব এই অজুহাত এত হাস্তকর যে কোন স্কুলের ছাত্রও ইহা বিশ্বাস করিবে না। পার্ব্বত্য অঞ্চল ছাড়িয়া দিলেও শুধু সমতল জেলাগুলিতে এখনও এক কোটি একর কৃষি-উপযোগী পতিত জমি পড়িয়া আছে। বিগত বজেট অধিবেশনে আসামের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ সাদউল্লা ইহা স্বীকার করিয়াছেন। আসাম ব্যবস্থা-পরিষদের শ্বেতাঙ্গ চা-কর সদস্ত মিঃ টুলক কিছুদিন পূর্ব্বে "আসাম ট্রিবিউন" পত্রে এক প্রবন্ধে লক্ষ লক্ষ একর জমি পতিত রাখার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে আসাম গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সরকারী কৃষি ও রাজস্ব

বিভাগ কর্ত্তৃক সংগৃহীত বিবরণীতেও আসামে মোট পতিত জমির পরিমাণ এক কোটি একর স্বীকার করা হইয়াছিল। আসাম প্রদেশে লোকসংখ্যার পরিমাণ প্রতি বর্গ মাইলে ১৫০ জনের বেশী নহে—পার্ব্বত্য অঞ্চল বাদ দিলেও লোকবসতির ঘনত্ব ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মধ্যে আসামেই সর্ব্বাপেক্ষা কম।

এই অনাচারের বিরুদ্ধে ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের করণীয় কিছু নাই কি? ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় যে বড়দলই মন্ত্রিমণ্ডলী নেহেরু-প্যাটেল পরিচালিত মন্ত্রিমণ্ডলীকে থোড়াই কেয়ার করে। কাছাড় জেলার করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত "যুগশক্তি" পত্রিকায় যে বর্ণনাটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমাদের মন্তব্যের সমর্থক :

> কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বসতি বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় ডিরেক্টার মিঃ বি, কে, মুখার্জী, আসাম সরকারের স্পেশিয়াল অফিসার মিঃ আর, এল, উজির এবং আণ্ডার-সেক্রেটারী মিঃ জে, দাস সমভিব্যাহারে কাছাড় সফরে বাহির হইয়া গত ১৮ই মে তারিখ অপরাহ্ণে শিলচর হইতে করিমগঞ্জ আগমন করেন।
>
> স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছিলেন যে, ১৯শে মে তারিখে উঁহারা এখানে আসিবেন এবং ঐদিন ৩টার সময় সার্কিট হাউসে করিমগঞ্জে আগত উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য জননেতা ও কর্মীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ১৮ই মে তারিখে মিঃ মুখার্জীর আগমন-সংবাদ দৈবক্রমে জানিতে পারিয়া পরদিন তাঁহাদের উদ্বাস্তু প্রতিনিধি ও দরদী ব্যক্তিগণ করিমগঞ্জ চরবাজারের সন্নিকটস্থ বাস্তুহারা বস্তি পরিদর্শনের জন্য লইয়া যান। পূতিগন্ধময় পরিবেশের মধ্যে কর্দমাক্ত এক একটি অতি ক্ষুদ্র পিঞ্জরবৎ কুঁড়ের মধ্যে অসংখ্য বাস্তুহারা আবালবৃদ্ধ-বনিতা গরু ছাগল ভেড়ার চেয়েও শোচনীয় অবস্থায় তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া সকলেই অভিভূত হন। মিঃ মুখার্জী ও উজির বলেন যে, এখানেও বাস্তুহারাগণ এরূপ দুরবস্থায় বাস করিতেছে, ইহা তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন নাই।
>
> করিমগঞ্জের সরকারী কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে কোন সাহায্যই করেন নাই। মিঃ মুখার্জী দলবল সহ এখানে আসিলে পর তাঁহাদের সহিত স্থানীয় সরকারী মহল সম্পূর্ণ অসহযোগের নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অল্প সময়ের জন্য একখানা গাড়ীর ব্যবস্থা করিতেও মহকুমা হাকিম নাকি অসামর্থ্য জানাইয়াছিলেন।

বড়দলই মন্ত্রিমণ্ডলীর এই নিষ্ঠুরতার প্রায়শ্চিত্ত একদিন চোখের জলে করিতে হইবে। হিন্দু বাঙালীকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য এই মন্ত্রিমণ্ডলীর সমর্থকগণ মুসলিম লীগের পাণ্ডাদের সাহায্য লইতেছে। একদিন এই সাহায্যই যদুবংশের মুষলের মতন আসামকে বিপর্য্যস্ত করিবে। আসামে গত ১৮ মাসে কত মুসলমান গিয়াছে তাহার হিসাব কে রাখে। বড়দলই মন্ত্রিমণ্ডলী ত একচক্ষু হরিণ!

কাশ্মীর সমস্যা

১৯৪৯ সনের ১লা জানুয়ারি ঘটা করিয়া কাশ্মীরের যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করা হইল। সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘের পর্য্যবেক্ষক-গণ ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের মধ্যে শান্তি আনয়নের ব্যবস্থা-কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। কিন্তু আজ ছয় মাস চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। নিম্নলিখিত বিবৃতিতে এই স্বীকৃতিই তাঁহারা করিয়াছেন। জাতি-সঙ্ঘের কাশ্মীর কমিশনের শ্রীনগরস্থ কেন্দ্র হইতে গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ইহা প্রচারিত হইয়াছে :

> গত ১লা জুন সর্ব্বপ্রথম উভয় গবর্ন্মেণ্টের উত্তর আমরা জানিতে পারি এবং তদবধি কমিশন একান্ত ভাবে উহার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। কমিশন দেখিতে পাইয়াছেন যে কোন কোন বিষয়ে ভারত ও পাকিস্থানের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য এখনও প্রায় পূর্ব্বের মতই রহিয়া গিয়াছে। গণভোট গ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্য কাশ্মীর হইতে সৈন্য অপসারণ সম্পর্কেই প্রধানতঃ উভয় গবর্ন্মেণ্টের মধ্যে এই মতভেদ দেখা যাইতেছে। গণ-ভোট গ্রহণের বিষয়ে কিন্তু উভয় গবর্ন্মেণ্টই পূর্ব্বে সম্মত হইয়াছেন।
>
> কমিশনের ১৯৪৮ সনের ১৩ই আগষ্টের এবং ১৯৪৯ সনের ৫ই জানুয়ারীর প্রস্তাবে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সমস্যা সমাধান সম্পর্কে কমিশনের নির্দ্দেশাবলী সন্নিবিষ্ট ছিল। স্মরণ থাকিতে পারে যে, ১৯৪৯ সনের ১লা জানুয়ারি উভয় গবর্ন্মেণ্টই যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্ত মানিয়া লন। কিন্তু উহার পরে এ পর্য্যন্ত চারি মাস কালব্যাপী আলাপ-আলোচনার পরেও উহা (যুদ্ধ-বিরতি) কার্য্যকরী করা সম্পর্কে কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। উভয় গবর্ন্মেণ্টের পক্ষ হইতে সম্মিলিত ভাবে কোনও উদ্যম প্রদর্শিত না হওয়ায় গত ১৫ই এপ্রিল তারিখে কমিশন নিজস্ব সর্ত্ত উপস্থাপিত করেন। উভয় দলের মতামত শ্রবণ এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত উহা পর্য্যালোচনার পর কমিশন উভয় পক্ষের মতামতকে যথাসম্ভব গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক প্রস্তাবের সংশোধন করেন। গত ২৮শে এপ্রিল তারিখে কমিশনের সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয়।
>
> বর্ত্তমানে কমিশন উভয় গবর্ন্মেণ্টের উত্তর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতেছেন এবং এতৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয়াদি

বিবেচনার পর কমিশনের ভবিষ্যৎ স্থিরীকৃত হইবে। কমিশন এই সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত আছেন। কমিশন জানেন যে, ভারত ও পাকিস্থানের গবর্ণেণ্ট এবং জনগণ কাশ্মীর বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত। প্রকৃতপক্ষে ভারত এবং পাকিস্থান উভয়েই উত্তরে এই বিষয়ের উপর জোর দিয়াছে। কাজেই কমিশন সাফল্যে আস্থা হারান নাই। কমিশন ভবিষ্যতে যে কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিবেন তাহা খুব সম্ভবতঃ এই লক্ষ্য-সিদ্ধির সহায়ক হইবে বলিয়া কমিশন মনে করেন। এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মত-বিরোধের আসল কারণ সম্বন্ধে কাশ্মীর কমিশন এখন পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে কিছু বলেন নাই।

জাতি-সঙ্ঘের ভারতরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীনরসিংহ রাও লেক সাকসেসের এক সাংবাদিক সম্মেলনে গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে এই সম্বন্ধে দুইটি কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন :

> প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তি সীমানার পাকিস্থানী ভাগে 'আজাদ কাশ্মীর বাহিনী' নামে বেসরকারী সেনাদল নিরস্ত্রীকরণ ও ভাঙ্গিয়া দিবার যে দাবী ভারতরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে করা হইয়াছে, তাহা করিতে পাকিস্থানের অস্বীকৃতি; রাজ্যের উত্তরাঞ্চল সম্বন্ধে একটা মত বিরোধ রহিয়াছে, বাহির হইতে প্রায় ষাট হাজার 'অনিয়মিত সেনা' এই এলাকায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে। এই এলাকা সম্বন্ধে এই প্রস্তাব করা হয় যে, এই সকল 'অনিয়মিত সেনা' যাহারা অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের সরিয়া যাইতে হইবে, অর্থাৎ কাশ্মীরে 'পাকস্থানী' অভিযানের পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল, সেই অবস্থা পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।...
>
> কমিশনের ১৩ই আগষ্ট তারিখের প্রস্তাবে এই এলাকার কোন উল্লেখই করা হয় নাই। ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও কাশ্মীর কমিশনের মধ্যে পত্রালাপে এই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলা হয়।...ভারতের সহিত প্রাচীন বাণিজ্য-পথ উত্তর কাশ্মীরের যে এলাকার উপর দিয়া গিয়াছে গিলগিট ব্যতীত সেই সমস্ত এলাকায় সৈন্য মোতায়েন করিবার অধিকার ভারত-সরকার দাবীকরেন।

এই দাবী সম্বন্ধে ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে কখনও কিছু গোপন করিয়া রাখা হয় নাই; প্রথমাবধি যে দাবী করা হইয়াছে, তাহাই এখন পর্য্যন্ত অটুট আছে। গত ২১-২২শে ডিসেম্বর কাশ্মীর কমিশনের সভাপতি ডাঃ লোজানোর সঙ্গে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার বিবরণে দেখা যায় যে কমিশনের ইহাই উদ্দেশ্য যে, "আজাদ কাশ্মীর বাহিনী"-কে ব্যাপকভাবে অস্ত্র ত্যাগ করাইতে হইবে। এই আলোচনার সময় আবার দেখা যায় যে, একটা কূট তর্ক উঠিয়াছে; "আজাদ কাশ্মীর বাহিনী"-কে প্রথম ছত্রভঙ্গ করা হইবে; অস্ত্র ত্যাগ আপনা হইতেই ঘটিয়া যাইবে। ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী এর বিরুদ্ধে এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, ছত্রভঙ্গ করা ও অস্ত্রত্যাগ করানো সমপর্য্যায়ের কাজ নয়; অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ছত্রভঙ্গ সেনাবাহিনী অনেক সময় অধিক বিপজ্জনক হয়। দেখা যায়, ডাঃ লোজানো এই যুক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে ছয় মাস পূর্ব্বে পাকিস্থানীরা "আজাদ কাশ্মীর বাহিনীর" অস্ত্র-ত্যাগ ও ছত্রভঙ্গ সম্বন্ধে যে আপত্তি তুলিয়াছিল, আজও তার শেষ হয় নাই এবং এই তর্কের শেষ কোথায় তাহাও আমরা বুঝিতেছি না যদিও ভারতের প্রতিনিধি শ্রীনরসিংহ রাও ও কাশ্মীর কমিশন প্রমুখাৎ শুনিতেছি যে, শান্তি আনয়নের জন্য একটা উপায় বাহির হইবেই। তবুও আমরা কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।

ইতিমধ্যে কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লা বলিয়া বসিলেন যে, কাশ্মীর-জম্মুকে "স্বাধীন" রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করা হউক। হঠাৎ এইরূপ মনোভাব প্রকাশ আমরা সন্দেহজনক মনে করি।

শিক্ষা-বিজ্ঞান-সাংস্কৃতিক উন্নতি

সম্মিলিত রাষ্ট্র-সংঘের অধীনে একটি প্রতিষ্ঠান আছে; তাহা দুনিয়ার প্রতি দেশে শিক্ষা-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নতির চেষ্টায় ব্যাপৃত আছে। ১৯৪৮ সনের নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে লেবানন সাধারণ-তন্ত্রের বেইরুট নগরীতে এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হয়; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকবর্গ কর্ত্তৃক পরিচালিত একটি বিশ্ববিদ্যালয় এই নগরীতে স্থাপিত হওয়াতে শিক্ষার জগতে ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্য বলিয়া পরিচিত—ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া এই তিন মহাদেশের—এই অঞ্চলের সকল দেশের প্রায় সকল দেশনায়ক ও চিন্তানায়ক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

এই সম্মেলনের বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রচার-বিভাগ তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবাদপত্রের সহযোগে দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। এই বিবরণ হইতে দেখিতে পাই ভারতীয় প্রতিনিধি-মণ্ডলীর নেতা শ্রীসর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বিশ্বের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বিপদের অন্ধকার ঘনায়মান হইতেছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই বিপদের আশঙ্কায় "শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইতেছে না।" এই বিপদ "রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও আদর্শবাদের সংঘাত" হইতে উৎপন্ন এবং তাহা সংযত করিতে পারা যাইতেছে না বলিয়া বিশ্বের গণ-মন সম্মিলিত জাতি-সংঘের প্রতি বিশ্বাস অটুট রাখিতে পারিতেছে না।

এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রীসর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন যাহা বলিয়াছেন তাহা নূতন না হইলেও তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন আছে। একটি বিবরণী হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

সামাজিক অন্যায়ের প্রতিকারের প্রতি তিনি বিশেষ জোর দেন। খাদ্য, আশ্রয় এবং অন্যান্য মানবিক অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে জনগণের দাবী উপেক্ষিত হইলে সভ্যতার সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী। কম্যুনিজমের চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—একথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিশ্বের অনুন্নত সম্প্রদায় এবং দুর্ব্বল অশিক্ষিত, নিপীড়িত ও দরিদ্র জনগণই কম্যুনিজমের আহ্বানে বিশেষ সাড়া দিয়াছে। কম্যুনিজম তাহাদের জীবনের মান উন্নত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। সামাজিক অন্যায়ের প্রতিকার বিধানের জন্য ইহা নিষ্করুণ পন্থার আশ্রয় গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের সদস্য আমরাও সামাজিক অন্যায়ের প্রতিকার কামনা করি; মানুষের কল্যাণ সাধনায় আমরাও আত্মনিয়োগ করিয়াছি; কিন্তু শ্রেণীসংগ্রাম বা ডিক্টেটরী প্রথা প্রবর্ত্তনের দ্বারা আমরা ইহা চাহি না।

সোভিয়েট রাশিয়ার শক্তির মূল উৎস হইতেছে শ্রেণী সাম্যের বুলির উপর। আমরা শ্রেণী সাম্যের কথা বলি, কিন্তু জাগ্রত এশিয়া বা আফ্রিকার সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া নিরুপায় মনে করি। যেখানে জনগণের বিরাট অংশ রাজনৈতিক অধিকারে বঞ্চিত—যেখানে মাত্র কোন কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আইনানুমোদিত, যেখানে পার্লামেণ্টারি-গবর্ণমেণ্ট সামরিক শক্তির নিকট অবনত, অর্থাৎ যেখানে সামরিক শক্তির অধিকারী, সেখানে সত্যকার গণতন্ত্র থাকিতে পারে না। সাম্যবাদের প্রসার আমাদের এই সমস্ত ভ্রান্তিকে অবলম্বন করিয়াই হইয়াছে। আমরা যদি আমাদের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া চলি তাহা হইলে আমাদের সাধ্যায়ত্ত স্থলে সামাজিক সুবিচার ও শ্রেণীসাম্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ সম্বন্ধে কাহারও কোন মতবিরোধ নাই। কিন্তু তবুও সমস্ত রাষ্ট্র কেন একযোগে কাজ করিতে পারিতেছে না, তাহার কারণও খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তাহার কোন সন্ধান আমরা এই বিবরণীতে পাইলাম না।

তাল ও খেজুরের গুড় চিনি

১৯৪৮ সনে ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কৃষিবিভাগ শ্রীগজানন নায়েককে দেশের তাল গাছ ও খেজুর গাছ হইতে গুড় ও চিনি প্রস্তুতের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই কার্য্যে ব্যয়ের জন্য গত বৎসর ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। এই অনুসন্ধানের ফলে নায়েক মহাশয় নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহার সাহায্যে "হরিজন" পত্রিকায় ১লা জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে এই দুই বৃক্ষের বিপুল সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহা পাঠ করিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে আক হইতে গুড় ও চিনি উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিয়া আমাদের দেশ বেশী লাভবান হয় নাই।

ভারতরাষ্ট্রে প্রায় ৫ কোটি তাল ও খেজুর গাছ আছে বলিয়া একটা হিসাব দেখিয়াছি। তাহা হইতে কিছু গুড়, চিনি ও মিছরি উৎপন্ন হয় মাত্র মাদ্রাজ ও বাংলা দেশে। এই বিপুল সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ মাত্র হইতে রস বাহির করা হয়; বাকী গাছগুলি একপ্রকার অব্যবহৃত হইয়া পড়িয়া থাকে। তাহাদের পাতা হইতে কিছু চাটাই প্রস্তুত হয়; কিছু পাতা গৃহপালিত পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়; গৃহকর্ম্ম ও কৃষির কার্য্যে মৃত গাছের ব্যবহার করিতে দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতির এই বিরাট দানের আমরা সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছি না।

অন্য একটা হিসাবে দেখিয়াছি যে, প্রতি তাল গাছ হইতে যত গুড় উৎপাদন করা হয় তাহার অর্দ্ধেক হয় আক হইতে। অথচ আমাদের দেশে জন প্রতি গুড় চিনি ব্যবহৃত হয় বৎসরে প্রায় ১৩ সের যেখানে স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে হওয়া উচিত ২৩ সের। বিলাতে প্রতি জনে গুড় চিনি খায় প্রায় ৩২ সের, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৪২ সের।

এত অবহেলার মধ্যেও কুটির শিল্পরূপে প্রতি বৎসর মাত্র ৪০।৫০ লক্ষ তাল খেজুর গাছ হইতে প্রায় ৫০ লক্ষ মণ গুড় চিনি উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমানে ১ কোটি ১২ লক্ষ বিঘায় উৎপন্ন আক হইতে প্রায় ১০ কোটি মণ গুড় ও প্রায় ৩ কোটি মণ চিনি উৎপন্ন হয়, অথচ আমাদের মিষ্ট-দ্রব্যের প্রয়োজন ১৬।১৭ কোটি মণের। তাল খেজুর গাছ হইতে অল্প আয়াসে এই মিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের ভাগে অবিভক্ত বঙ্গদেশের যে সামান্য অংশ পড়িয়াছে তাহাতে খেজুর গাছ কম, কিন্তু তাল গাছ বেশী, পূর্ব্ববঙ্গে তাল গাছ নাই বলিলেই হয়। কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ, বোম্বাই যাইবার রেল-লাইনের দুই দিকে যে অগণিত তাল খেজুর গাছ দেখা যায়, তাহার কোন ব্যবহার দেখিতে পাই নাই। ১৯৩৭ সনের বোম্বাই-এর কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী তাল খেজুর গাছ হইতে রস বাহির করিয়া গুড় প্রস্তুতের কৌশল শিখাইতে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ৩৪ জন শিল্পীকে লইয়া গিয়াছিলেন। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যখন পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রি ছিলেন তখন তিনি তাল খেজুর গাছ হইতে গুড় প্রস্তুত সম্বন্ধে একজন অভয় আশ্রমের বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যেমন বোম্বাইয়ের পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে কোন বিবরণ দেখি নাই, সেইরূপ

পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধেও আমরা কিছু জানি না যদিও প্রচার বিভাগের কল্যাণে অনেক বিবরণ আমরা পাইয়া থাকি।

চীনের সমস্যা

প্রায় বিশ বৎসর চিয়াং-কাই-শেক চীনদেশের গণ-জাগরণের প্রতীক ছিলেন; এতদিন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তিনি দেশের ভাগ্য-নিয়ন্তা ছিলেন। ১৯৪৫ সালের মে মাস পর্য্যন্ত তাঁহার নেতৃত্বে চীনের জনসাধারণ জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে; চীনের কম্যুনিষ্টরা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাধান্ত অস্বীকার করিবার সাহস পায় নাই। তারপর ধীরে ধীরে তাঁহার সেই ক্ষমতা শিথিল হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে; কুও-মিন-টাঙ্ দলের মধ্যেও ভাঙন দেখা দেয়। এই পরিবর্ত্তনের ফলে আজ চীনের ভাগ্যাকাশে আর এক যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্কিক্ষণ দেখা দিয়াছে। মহাচীনের ৪০।৪৫ কোটি নর-নারীর ভবিষ্যৎ কম্যুনিষ্টদের হাতে চলিয়া যাইতেছে।

এই অঘটন-ঘটন কি করিয়া সম্ভব হইল তাহা এখনও অস্পষ্ট হইয়া আছে। কেন শত শত কোটি মূল্যের মার্কিনী সাহায্য পাইয়াও চিয়াং-কাই-শেক কর্ত্তৃক পরিচালিত গবর্মেণ্ট কম্যুনিষ্টদের হাত হইতে দেশরক্ষা করিতে পারিলেন না তাহা আজও অজ্ঞাত। কেন মার্কিনী নেতৃবর্গ চীন রক্ষার জন্ত এত আয়োজন-উত্তোগ করিয়াও আজ চীনের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেছেন, তাহার রহস্ত আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। মার্কিনী প্রচার-বিভাগ তাহার গূঢ়ার্থ এখনও প্রচার করেন নাই। আজ সামান্ত ১৫০ কোটি টাকা সাহায্য-দানের ব্যবস্থায় মার্কিণের পররাষ্ট্র-সচিব ডিন একিসন আপত্তি তুলিতেছেন। কেন?

এদিকে চারিদিক হইতে শুনিতে পাই কম্যুনিষ্ট ভাব ও কর্ম্মের বিরুদ্ধে 'সাজ সাজ' ধ্বনি। জাপানে সেনাপতি ম্যাক আর্থার খুঁটি গাড়িয়া বসিয়া আছেন; জাপান সমুদ্রের ওপারে যে চীনদেশ হস্তচ্যুত হইয়া গেল, তৎসম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব কি তাহা বুঝিতেছি না। নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকার কথা ত নয়। তবুও আমরা ম্যাক আর্থারী নীতির হদিস পাইলে পূর্ব্ব-এশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনায় যোগদান করিতে পারিতাম। এই সম্বন্ধে নানা কথা সংবাদপত্রে পড়িতে পাই। মার্কিন মুলুক ও ব্রিটেন উভয়েই চীনে কম্যুনিষ্ট বিধানকে স্বীকার করিয়া লইবে। এদিকে ইউরোপ খণ্ডে কম্যুনিষ্ট মতবাদকে বেড়া দিয়া ঠেকাইয়া রাখিবার বিরাট চেষ্টা চলিতেছে। "মার্শাল সাহায্য" ও "আটলাণ্টিক প্যাক্ট" এই উদ্দেশ্যেই সংগঠিত হইয়াছে। এশিয়ায় এক নীতি ও ইউরোপে অন্ত নীতি—এই দুই পরস্পর বিরোধী নীতির মধ্যে সামঞ্জস্ত বিধান হইতে পারে না। ফলে কম্যুনিষ্ট ও ক্যাপিটালিষ্ট এই দুই শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য্য।

১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে আপ্টন ক্লোজ নামক একজন মার্কিনী লেখকের একখানি বই পড়িয়াছিলাম। তাহাতে জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখলের ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাত তখনই ঘটিবে যখন কম্যুনিষ্টরা চীনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবে। তখন সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে ৫০ কোটি পীতবর্ণ লোক শ্বেতাঙ্গের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সুযোগ পাইবে; তখন সোভিয়েট রাষ্ট্র হইতে বহির্গত হইবেন এই মণ্ডলীর ভাব-নায়ক; চীনদেশ হইতে তাহার তত্ত্বাবধায়ক (manager) এবং জাপান হইতে তাহার সৈন্তসামন্ত। ১৯৪৯ সনের মধ্যভাগে কি আমরা সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিণতি দেখিবার অবস্থায় আসিতেছি?

মাঠকে শূন্য রাখিসনে ভাই

প্রথম বৎসর "খাত্ত-উৎপাদন" পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার জন্ত কাজি নজরুল ইসলাম একটি গান রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। আজ যখন দেশ খাদ্যাভাব ও বস্ত্রাভাবের তাড়নায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, তখন ব্যাপকভাবে খাদ্য-উৎপাদনের পরিকল্পনার বিস্তার-কল্পে এরূপ অনুপ্রেরণার প্রয়োজন আছে। দেশের গবর্মেণ্ট খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় নানাভাবে জড়িত হইয়া পড়িতেছেন; দেশের চাষীর দ্বারে নূতন করিয়া রাষ্ট্রকে উপস্থিত হইতে হইতেছে, চাষীকে উৎসাহিত করিয়া খাদ্য-উৎপাদন-বৃদ্ধিদ্বারা দেশকে খাদ্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করিবার প্রতিজ্ঞা দিকে দিকে প্রচারিত হইতেছে। প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে খাদ্যশস্তের জন্ত আমাদের দরিদ্র দেশের রিক্ত ভাণ্ডার হইতে ১০০।১২৫ কোটি টাকা বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে। এই টাকা ভারতরাষ্ট্রের ২৫ কোটি চাষী ও তাহাদের পরিবারবর্গের হাতে বিলাইয়া দিতে পারিলে দেশের আর্থিক চেহারা ফিরিয়া যাইবে। সেই চেষ্টায় চাষীর পরিশ্রমের প্রয়োজন, কবির অনুপ্রেরণার প্রয়োজন। কাজি নজরুল ইসলামের গান সেই অনুপ্রেরণা দেশের লোকের মনে জাগাইতে পারিলে দেশ বাঁচিয়া যাইবে।

আবার জাগ্ রে হলধর

গান

[কাজী নজরুল ইসলাম]

আবার জাগ্ রে হলধর, লাঙল কসে ধর।
ধরার মত ধরলে লাঙল, হবে তোদের সোনার ঘর॥
মাঠকে তোরা সার দিস নে, অসার হয়ে আছিস তাই।
খেত যদি গায় খেতে, তবে তোদের খাওয়ার অভাব নাই॥
মাঠের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে, মাঠ উর্ব্বর কর্।
লাখ কোটি মণ ধান লুকিয়ে আছে রে তোর মাঠে,
কেন তোদের দুঃখে জীবন কাটে?
মাঠকে শূন্য রাখিস নে ভাই, ফল-ফসলে শ্যামল কর।
এই মাঠ আর মাটি তোদের হবেন্ কপিল গাই,
মাটি তোদের মা; আর মাঠ আমাদের ভাই।
কাপাস বুনে এই মাটিতে
দেশের কাপড় পর॥

বাংলা ভাষার প্রসার চিন্তা

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

১। প্রথম কর্তব্য।

এককালে আশা ছিল, বাংলা ভাষা ভারতরাষ্ট্র-ভাষা হইতে পারিবে। ক্রমশঃ সে আশা নির্মূল হইয়াছে। বাঙ্গালী উদাসীন না হইলে হিন্দীর বিরুদ্ধে লড়িতে পারিত। হিন্দী-ভাষীর সংখ্যাধিক্য, এই একটি গুণ ছিল। বাংলা-ভাষী দ্বিতীয় স্থান পাইত। আর, বাংলার রাষ্ট্রভাষা হইবার বহু যোগ্যতা ছিল। ইহার সোজা ব্যাকরণ, ইহার প্রচুর সংস্কৃতসম শব্দ, ইহার বিপুল সমৃদ্ধ সাহিত্য হিন্দী-ভাষার নাই। অনেক বাংলা পুস্তক হিন্দী ভাষান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দীর তুলসীদাসী রামায়ণ ব্যতীত আর কোন পুস্তক বাংলা ভাষান্তরিত হয় নাই।

বাংলা অক্ষরশিক্ষা কঠিন না হইলে ভাল ভাল বাংলা বই অন্য প্রদেশে প্রচারিত হইতে পারিত। শুনিতেছি, "বিশ্বভারতী" রবীন্দ্রনাথের পুস্তক নাগরাক্ষরে প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহা উত্তম কল্পনা। যদি কোন বঙ্গভাষা-হিতৈষী গ্রন্থপ্রকাশক বাংলা উত্তম সাহিত্যের অন্যান্য বই নাগরাক্ষরে মুদ্রিত করেন, বাংলা ভাষার প্রসার হইতে পারিবে। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও বিষবৃক্ষ, মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস, স্বামী বিবেকানন্দের "যোগ" ও বক্তৃতা, শরৎচন্দ্রের দুই-একখানা বই নাগরাক্ষরে প্রচার করিতে পারিলে ভারতের অন্য প্রদেশবাসীর পড়িবার সুবিধা হইবে। এই সকল বই সংক্ষেপ করিয়া লইতে হইবে এবং আবশ্যকস্থলে বাংলা শব্দের অর্থ লিখিয়া দিতে হইবে। বাংলা ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত পুস্তক আছে কিনা জানি না। পাঠশালার নিমিত্ত পুস্তক চলিবে না। যিনি সংস্কৃত, হিন্দী, মরাঠী, তামিল, তেলেগু কিংবা ইংরেজী জানেন তিনি বই পড়িয়া যাহাতে নিজে নিজে বাংলা শিখিতে পারেন, সেই অভিপ্রায়ে বই লিখিতে হইবে। বাংলা অক্ষর পরিচয়, বাংলা পাঠ ও বাংলা ব্যাকরণের শব্দরূপ ও ধাতুরূপ, এই কয়েকটি বিষয় লইয়া একখানি বই, আর, সংস্কৃত শব্দ না দিয়া কেবল বাংলা শব্দের একখানি ছোট কোশ চাই। আমি জানি, বর্তমানে এইরূপ পুস্তক না থাকিলেও অন্যপ্রদেশবাসী বাংলা শিখিয়া বাংলা বই পড়িয়া থাকেন। প্রবাসী বাঙালীর পক্ষেও এইরূপ পুস্তকের প্রয়োজন আছে। দুঃখের বিষয়, বাংলা মুদ্রাকরেরা এখনও সেই পুরাতন যুক্ত-ব্যঞ্জনাক্ষর চালাইতেছেন। কলিকাতায় বাংলা-প্রসার-সমিতি আছেন। তাঁহারা সচেষ্ট হইলে বাংলা ভাষা-প্রচার কঠিন হইবে না। অন্যপ্রদেশবাসী দেখিলে বাঙ্গালী হিন্দীতে কথা কহিতে চেষ্টা করেন। এই ব্যবহারের দোষ আছে। ইহা দ্বারা বাংলা-প্রচার ব্যাহত হইতেছে। অন্যপ্রদেশবাসীর সহিত বাংলায় কথা কহা উচিত।

২। বাংলা ভাষার স্বরূপ-রক্ষা।

ইহার পর অন্য কর্তব্য আছে। যে যে গুণ হেতু ভারতে বাংলা ভাষার আদর হইয়াছে, যাহাতে সে সে গুণ অক্ষুণ্ণ থাকে, যাহাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে বাংলা লেখকদিগের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। যাহাতে বাংলা ভাষার স্বরূপ পরিবর্তিত না হয়, সে বিষয়ে বাংলা লেখকদিগের সর্বদা অবহিত থাকা উচিত। এক্ষণে বাঙ্গালী দুর্বল, অন্যপ্রদেশে নগণ্য। একমাত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্বারা বাঙ্গালীর পূর্বগৌরব রক্ষিত হইতে পারিবে।

বর্ষে বর্ষে নানাবিধ বাংলা পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র, বারমাসিক পুস্তক (Magazine) ও সামিতিক পুস্তক, এই ত্রিবিধ পত্র ও পুস্তক বর্তমানে ৩৬৯ খানি প্রচারিত হইতেছে। ভারত-পরিষদের এক প্রশ্নের উত্তর হইতে এই সংখ্যা জানিতেছি। বোধহয় বর্তমানে বাংলা-লেখক দেড় হাজার, দুই হাজার হইবেন। সমিতি-বিশেষ দ্বারা প্রচারিত পুস্তক অতি অল্প। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বিজ্ঞান পরিষদ-কর্তৃক প্রকাশিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক পুস্তক ও এইরূপ অন্যান্য পুস্তককে আমি সামিতিক পুস্তক বলিতেছি। ইহাদের পাঠক সংখ্যা অল্প। সংবাদ-পত্র অবশ্য পত্র, বাঁধা পুস্তক নয়। বারমাসিক পুস্তক (সংবার—সমূহ; সমূহের নিমিত্ত মাসিক পুস্তক) বদ্ধ পত্র। এই কারণে আমি ইহাকে পুস্তক বলিতেছি। সংবাদপত্র ও বারমাসিক পুস্তক দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রচারিত হইতেছে। এমন বিষয় নাই যাহা বাংলা ভাষা দ্বারা জন-সাধারণের নিকট প্রচারিত হয় না। বাংলা গল্পের বই অগণ্য। প্রতি বৎসর নূতন নূতন গল্পের বই ছাপা হইতেছে।

বর্তমান লেখকেরা ইংরেজী-শিক্ষিত। কেহ কেহ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে প্রবীণ, কেহ বা সর্বদা ইংরেজী সাহিত্য, সংবাদপত্র, বারমাসিক ইত্যাদি পড়িয়া থাকেন। ইহাদের বাংলা শিক্ষার অবসর হয় না। কেহ বা বাল্যকালে সংস্কৃত ভাষা অল্প শিখিয়াছিলেন, এখন ভুলিয়া গিয়াছেন। কেহ বা বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন ভাবেন নাই।

এইরূপ স্থলে তাঁহাদের রচনায় ইংরেজীর অনুকরণ আসা বিচিত্র নয়। শব্দ বাংলা, কিন্তু প্রকাশ বাংলা নয়। উদাহরণ দিতেছি।

ভদ্রতা শিক্ষার উপর 'নির্ভর করে'। পরিশ্রমের উপর সাফল্য 'নির্ভর করে'।

আপনার উপস্থিতি 'প্রার্থনীয়'।

বৌদ্ধ যুগে নারীর 'স্থান'। শিশুশিক্ষায় শিল্পের 'স্থান'। এম-এ পরীক্ষায় প্রথম 'স্থান' অধিকার করিয়াছে।

হিন্দুধর্মে বৌদ্ধধর্মের 'দান'। বাংলা সাহিত্যে ইসলাম সংস্কৃতির 'দান'।

সভার কার্য 'সাফল্যমণ্ডিত করিবেন'।

'ভাষার কার্য হইতেছে মনের ভাব প্রকাশ করা'।

আচার্য যদুনাথ সরকারের বয়স ৭৮ বৎসর 'পূর্ণ হওয়ায়' বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 'পক্ষ হইতে' তাঁহাকে সম্বর্ধনা করা হইয়াছে। 'এই উপলক্ষ্যে' আমরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমরা 'সমবেদনা জানাইতেছি'।

মাতৃভাষার 'মাধ্যমে' শিক্ষা দান।

'দৃষ্টিকোণ' পরিবর্তন করিতে হইবে। মাতৃভাষা শিক্ষার 'বাহন'।

'কাজে যোগদান, গানে যোগদান, প্রার্থনায় যোগদান'। ইত্যাদি।

মনে মনে এই সকল বাক্যের ইংরেজী অনুবাদ না করিলে অর্থবোধ হয় না। এই সকল উদাহরণের বাক্যের ভাব বাংলা ভাষায় অক্লেশে প্রকাশ করিতে পারা যায়। এইরূপ বাক্য বাংলা ভাষার প্রকৃতির সহিত মিশিতে পারে না।

কেহ কেহ ঋজু পথে চলিতে পারেন না। ঋজু ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। তাঁহাদের ভাষা জটিল হইয়া পড়ে। কেহ বা বাগ ভঙ্গি না করিয়া, কেহ বা একই বিষয় ঘুরাইয়া পাঠককে অকারণ কষ্ট না দিয়া লিখিতে পারেন না। ইংরেজী সংবাদপত্রের ভাষা ফাঁপা। বাংলা সংবাদপত্রেও তাহার অনুকরণ ঘটিতেছে। কিন্তু যিনি যাহাই লিখুন রচনায় প্রসাদগুণ ও মাধুর্য না থাকিলে পাঠক পড়িতে ইচ্ছা করেন না।

"সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি॥"

বাংলা ভাষার প্রকৃত রূপ এখানে স্পষ্ট হইয়াছে। কবিকঙ্কন চণ্ডীতেও এইরূপ। আরও পুরাতন বড়ুচণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনের ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, তেমন মধুর। ইংরেজী আমলেও প্রথম প্রথম বাংলা ভাষার প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ ছিল। কেবল পদ্যের ভাষা নয়, গদ্যের ভাষাও বাংলা ছিল। সেকালের সংবাদপত্রের ও পত্রপ্রেরকদিগের ভাষা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় বাংলা ভাষার স্বরূপ রক্ষিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল 'সীতার বনবাস' লেখেন নাই। তিনি 'কথামালা' লিখিয়াছিলেন। বালপাঠ্য পুস্তকে কথামালার ভাষার লালিত্য কদাচিৎ লক্ষিত হয়। বাংলা ভাষায় নানাবিধ ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কয়খানি ইতিহাসের ভাষায় মাধুর্য আছে? কালীসিংহের মহাভারত পড়ুন, তাঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্য ও লালিত্য কয়খানা বাংলা ইতিহাসের বইতে আছে?

কেহ কেহ মনে করেন, রচনায় মৌখিক ভাষার সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিলে বর্ণনার বিষয় অতিশয় সুবোধ্য হয়। ইহা এক বিষম ভ্রম। হইতেছে স্থানে হচ্ছে, করিতেছে স্থানে কচ্ছে, দেখিয়াছিলাম স্থানে দেখেছিলাম, লিখিলে বাক্য সুগম হয় না। বাক্য ছোট ছোট হইলে কচ্ছে হচ্ছে কটু শোনায়, পড়িতে ইচ্ছা হয় না। "মহান্ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে"—এখানে 'গড়ে' পীড়িত করিতেছে। তদুপরি 'মহান্' প্রতিষ্ঠান শুনিলে হতাশ হইতে হয়। কেহ কেহ 'বলে চলে গেল' লিখিয়া মনে করেন ভারি সোজা ভাষা লিখিলেন। কিন্তু এই ভাষা পড়িয়া বুঝিতে হইলে অন্ততঃ দুইবার পড়িতে হয়। কেহ কেহ 'ব'লে চ'লে গেল' লিখিয়া পাঠককে সাবধান করিয়া দেন, "বলে চলে' নয়, 'বলিয়া চলিয়া' বুঝিতে হইবে। ব ও চএর পরে উৎকলা (') লেখার কোনও যুক্তি নাই। হইত স্থানে হ'ত, হইল স্থানে হ'ল; উৎকলা হএর পরে ঠিক বসিয়াছে। তদ্দ্বারা বুঝিতে হয়, একটি ই লুপ্ত বা গ্রস্ত। সেই নিয়মে "চ'লে ব'লে" পড়িতে হয় "চইলে বইলে"। ইহা কি পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিতের "চইল্যা বইল্যা"? করিয়া, সংক্ষেপে আমরা বলি কর্যে, 'কইর্যে' বলি না। এখানে করে' লিখিলে বুঝি য়-ফলা গ্রস্ত হইয়াছে। কবিকঙ্কণে 'ব্রান্ধ্যা বাড়্যা' আছে। তখনকার উচ্চারণে ঠিক বানান হইয়াছে। এখন আমরা বলি, 'রেঁধে বেড়ে'। উচ্চারণ অনুযায়ী ঠিক বানান করি।

সেদিন "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ কর্তৃক বিতরিত" একখানা 'কথাবার্তা' নামক পত্রে 'খাদ্য পরিস্থিতি' পড়িতেছিলাম (১৯শে জানুয়ারী)। "অসামরিক সরবরাহ সচিব প্রদেশের খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেন, মাথাপিছু দু সের চালের বরাদ্দ যদি চালিয়ে যেতে

হয় তবে সরকার এ বৎসর যে পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করতে মনস্থ করেছেন তাহলেও পঞ্চাশ হাজার টন চাল ও গম ঘাটতি পড়বে।" আর একখানি 'কথাবার্তা'য় (১৬ই ফেব্রুয়ারী) পড়িলাম, "সৌন্দর্য্য জিনিসটা স্বাস্থ্যের ওপরই বেশী করে নির্ভর করে। আয়ত টানা টানা দুটি চোখ, সুঠাম টিকোলো একটি নাক এবং ফ্যাকাশে রকমের ফর্সা রঙের অধিকারী মানুষটিকেও ঠিক সুন্দর বলা চল্‌বে না—জ্যোতিহীন চোখের গড়ন যত ভালোই হোক সে চোখ, স্বাস্থ্যের লক্ষণযুক্ত উজ্জ্বল চোখের তুলনায় কম সুন্দর", ইত্যাদি। এইরূপ ইংরেজী-বাংলা ভাষার পাঠক সহজে পাওয়া যাইবে না। মুসলিম-লীগ-মন্ত্রিত্বকালে "জানবার কথা" নামে একখানা পত্র বিতরিত হইত। তাহার ভাষা মন্দ ছিল না; পড়িতে ও বুঝিতে পারা যাইত। তাহাতে চিত্রে একজন গ্রামবাসী স্বাস্থ্যতত্ত্ব, প্রসূতিতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব ইত্যাদি নানা জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইত। কিন্তু লোকটিকে মেলেরিয়া-ভোগী, প্লীহারোগী দেখাইত। 'কথাবার্তা'য় একখানি চিত্র আছে; সে চিত্রের মর্ম কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। এক ঘরের উঠানে এক বৈঠক হইয়াছে। এক কথক এক মুসলমানকে কি বলিতেছে। একজন উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছে। একজন উর্ধ্বজানু হইয়া বসিয়াছে। আর, দুইজন মারোআড়ীর একজন গা ভাঙ্গিতেছে, আর একজন বোধ হয় তাহার নিজের ধন্দা ভাবিতেছে। এক দ্বারপিণ্ডে দণ্ডায়মানা নারীও শুনিতেছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে কথাবার্তার শ্রোতা পাওয়া যাইবে কি? এমন অশিষ্ট বাঙ্গালী আছে কি যে এক ভদ্রলোকের পাশে উর্ধ্ব-জানু হইয়া বসে? এখানে ভাষা দেখিতেছি, সৌন্দর্য-বিশ্লেষণ ছাড়িয়া দিলাম।

অনেকদিন পূর্বে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় একবার বিজ্ঞাপনের সঙ্গে এক গল্প পড়িয়াছিলাম। বাস্তবিক গল্প নয়। গবর্মেণ্টের এক বিষয়ে কত খরচ হইয়াছে, কেন তত খরচ হইয়াছে, তাহার যুক্তি দেখান হইয়াছে। প্রচারক ঠিকই বুঝিয়াছেন, গল্প না হইলে কেহ পড়িবে না। ঔষধ তিক্ত, মধুমিশ্রিত না হইলে কেহ সেবন করিবে না। কিন্তু ব্যাপারটি হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে। এই গল্পের পরে স্বাস্থ্য-বিভাগের এক বিজ্ঞাপন আছে। অনাড়ম্বর বিজ্ঞাপন, কিন্তু কাজের হইয়াছে। "স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে অমুক ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।" কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বেঙ্গল গবর্মেণ্টের নাম গন্ধও নাই।

দুরূহ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখুন, জ্ঞানপ্রচার করুন, কিন্তু জ্যেঠামি করিবেন না। কেহ কাহারও জ্যেঠামি সহিতে পারে না। দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা, ভাষার ভঙ্গিমা, গল্পের ছলনা পাঠকের বিরক্তি সঞ্চার করে। পাঠককে মূর্খ, নির্বোধ না ভাবিলে কেহ জ্যেঠামি করে না।

এতদিন বাংলা ভাষার বাগ্‌রীতি প্রসন্না ছিল। যথা—একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। কিছুকাল হইতে আর দুই রীতি আবির্ভূত হইয়াছে। (১) প্রচণ্ডা। যেমন জ্বর-বিকারে রোগীর হাত-পায়ের আক্ষেপ হয়, ইহা সেইরূপ। যথা—ফুটেছিল হাড় একদা এক বাঘের গলায়। (২) প্রলীনা। যেমন অবসন্ন দেহে ক্লান্তি আসে, দেহ সোজা থাকে না, এলাইয়া পড়ে, ইহা সেইরূপ। যথা—এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল, একদা।

প্রচণ্ডা ও প্রলীনা রীতির প্রয়োজন আছে, কিন্তু যেখানে সেখানে প্রচণ্ডা রীতি দেখিলে রঙ্গমঞ্চে ভীমসেনের গর্জন মনে হয়। কেহ কেহ প্রলীনা রীতিতে কবিত্ব দেখিতে পান। বাস্তবিক, কবিত্ব নয়, জ্যেঠামি। যথাস্থানে যথাযোগ্য শব্দ বিন্যাস দ্বারা চিন্তা ও মনের ভাব সম্যকরূপে প্রকাশ করিতে না পারিলে রচনা সার্থক হয় না। বাঙ্গালা দেশকে গল্পরূপ ভূত পাইয়া বসিয়াছে। গল্প নয়, কিন্তু বহির নাম গল্প রাখা হইতেছে। গীতার গল্প, চণ্ডীর গল্প, রামায়ণের গল্প, কালিদাসের গল্প, শরীরের গল্প ইত্যাদি নাম হইতে বিষয় বুঝিতে পারা যায় না। বাঙ্গালী পাঠক গল্প পড়িয়া পড়িয়া তরলমতি হইয়া পড়িতেছে। যে রচনা বুঝিতে হইলে ধীরে ধীরে পড়িতে হয়, প্রত্যেক শব্দ বুঝিয়া যাইতে হয়, তাহা পাঠকের প্রীতিকর হয় না। প্রত্যহ লঘু আহার করিলে দেহের পরিপাক-শক্তির হ্রাস হয়, গল্প পড়িয়া পড়িয়া পাঠকের চিত্তও তরল হয়। পরে গল্প পড়িতেও তাহার ধৈর্য থাকে না। গল্পলেখক কত স্থানে কত অলঙ্কার আনিয়াছেন, মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়াছেন, ভাষার বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন। কিন্তু পাঠক এ সকল বিষয় লক্ষ্য করেন না। তিনি গল্পের বহির পাতা উল্টাইতে থাকেন; আর, তারপর কি, তারপর কি, খুজিতে থাকেন। এক বিশেষ কারণে আমাকে এক গল্পের বই পড়িতে হইয়াছিল। লেখক মহাশয় ভাষার চাতুর্যে ও ইতিহাসজ্ঞানে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। ৪।৫টি গল্পের সমষ্টি; পড়িতে দুই দিনে চারি ঘণ্টা লাগিয়াছিল। সেই বই এক বি-এ পাস তরুণ দুই ঘণ্টায় শেষ করিয়াছিল। গল্পের এই পরিণাম লেখক মহাশয়েরা অবগত আছেন কিনা জানি না।

বিষয় যাহাই হউক, ভাষায় ভুল থাকিলে পাঠক বিরক্ত হন। ভুল অনেক প্রকার হইতে পারে। শব্দের বানান ভুল, প্রয়োগ ভুল, অর্থ ভুল এবং বাক্যের ব্যাকরণ ভুল, বারমাসিক পুস্তকে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় সে রকম ভুল লেখকের পুস্তকেও ঘটে। দুই-এক খানা

বারমাসিকের পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে কতকগুলি ভুল দেখিয়াছি। উদাহরণ দিতেছি।

সংবাদপত্র-প্রচার ও শিক্ষা-বিস্তার দ্বারা বঙ্গের সর্বত্র লৈখিক ভাষার সমতা আসিয়াছে। শব্দের বানান দ্বারা শব্দের রূপ স্থির থাকে। উচ্চারণ সর্বত্র সমান নয়, হইতে পারে না। কোথাও অনুনাসিক চন্দ্রবিন্দু-উচ্চারণ প্রচুর, কোথাও নাই। কোথাও ড় ঢ় অক্লেশে উচ্চারিত হয়, কোথাও হয় না। সামাজিক ব্যবস্থা সর্বদা পরিবর্তনশীল হইলে সমাজের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ভাষা এক সামাজিক উপায়। ইহার একরূপতা রক্ষা না হইলে ইহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। কালান্তরে অল্পে অল্পে পরিবর্তন হইলে সামাজিক অপর ব্যবস্থার তুল্য ভাষা-ব্যবস্থাও সমাজের হিতকর হয়। শব্দের বানান হঠাৎ পরিবর্তন করিলে কিম্বা কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর বা গণের উচ্চারণ অনুসারে শব্দের বানান পরিবর্তন করিলে ভাষা-বিপ্লব ঘটে। যেমন জীবজাতির পরিণাম শ্রেয়স্কর, কারণ তদ্দ্বারা সে দেশ ও কালের পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তেমন ভাষার হয়, ভাষার যাবতীয় অঙ্গেরও হয়। ব্যাকরণ ভাষার পরিণাম স্বীকার করিবেন, কিন্তু বিবর্তন স্বীকার করিবেন না। ব্যাকরণ পরিণামের সূত্র রচনা করিবেন, ভাষার রূপ বাঁধিয়া দিবেন, কোশে সে সূত্র অনুযায়ী শব্দের বানান, অর্থ, প্রয়োগ পাওয়া যাইবে। কদাচিৎ বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া এই তিনেরই ব্যতিক্রম ঘটে। কিন্তু সাধারণতঃ ভাষাকে রক্ষণশীল হইতেই হইবে।

এতকাল জানিতাম, ক বর্গের অনুনাসিক ঙ, চ বর্গের ঞ, ট বর্গের ণ, ত বর্গের ন, প বর্গের ম, এবং য র ল ব শ স ষ হ, এই আট অবর্গ বর্ণের অনুনাসিক ং (অনুস্বার)। এখন দেখিতেছি, অনুনাসিক ঙ স্থানে ং লেখা হইতেছে। পূর্বে সম্ উপসর্গের ম্ স্থানে কোন কোন শব্দে ং লেখা হইত। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে আমি একখানা বইতে 'সংখ্যক' লিখিয়াছিলাম। মুদ্রাকর আমার বানান কাটিয়া 'সঙ্খ্যক' করিয়াছিলেন। তৎকালে সংখ্যা, সংগ্রাম, সংগ্রহ, সংক্ষেপ বা সংক্রান্তি ইত্যাদি মাত্র কয়েকটি শব্দে ং দেখা যাইত। সংস্কৃত পুস্তকে ক বর্গের পূর্বে একটা শব্দেও থাকিত না। এখনও থাকে না। পাঁচ-সাত বৎসর হইতে নব্য লেখকেরা অনুনাসিক ঙ বর্জন করিয়া সকল শব্দেই ং লিখিতেছেন। শংকা, কলংক, মংগল, সংগীত, সংঘ ইত্যাদি শব্দের বহু প্রচলিত ঙ স্থানচ্যুত হইতেছে। ইহার একটা কারণ, কএর মস্তকে শয়ান ঙ অক্ষর স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না এবং সকলে লিখিতেও পারেন না। গ অক্ষরের মস্তকে ঙ পরস্পর যুক্ত হইয়া গিয়াছে। সকলে ঙ্গ লিখিতেও পারেন না। তাঁহারা স্পষ্ট ঙ লিখিয়া পাশে ক কিম্বা গ স্বচ্ছন্দে লিখিতে পারেন। ঙ্খ, ঙ্ঘ, সেইরূপই লেখা হইয়া থাকে। দিঙ নির্ণয়, দিঙ মুখ শব্দেও ঙ স্পষ্ট। এইরূপ ঙ্ক, ঙ্গ লিখিলে ং লিখিবার কোন হেতু থাকে না। সংস্কৃত ব্যাকরণে, কিম্বা বাংলা ব্যাকরণে ঙ স্থানে ং, এই বিকল্প বিধি নাই। বিকল্প বিধির দোষ এই, লেখককে অকারণ ভাবনায় পড়িতে হয়। কেহ দিল্লী যাইতেছেন; কিছুদুর গিয়া দেখিলেন, দিল্লী যাইবার আর এক পথ আছে। তখন তাঁহাকে ভাবিতে হয়, তিনি কোন্ পথে যাইবেন। বুদ্ধিমান্ হইলে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ", অর্থাৎ বহুজন যে পথে গিয়াছে সেই পথই পথ, ধরিবেন। 'বাংলা', এই বানান ঠিক। কিন্তু বাঙলা লিখিবার কি যুক্তি আছে? বঙ্গ হইতে বঙ্গাল, বঙ্গালা, বঙ্গালী। অপর প্রদেশে আমরা বঙ্গালী নামে পরিচিত। তাঁহারা বাঙালী জানেন না। প্রায় সাত কোটি বাংলাভাষীর কয় জন 'বাঙলা বাঙালী' উচ্চারণ করিতে পারেন? সত্য কথা বলিতে কি, 'বাঙালী' দেখিলে আমি 'বাঙআলী' পড়ি। কারণ, বাঙন (বামন), শাঙন (শ্রাবণ), কুঙার (কুমার), কাঙ্‌র (কামরূপ), "পাখীজাতি যদি হঙ, পিয়াপাশে উড়ি যাঙ", "ধামসা ধাঙ ধাঙ" ইত্যাদি উদাহরণে ঙ অক্ষরের উচ্চারণ স্পষ্ট হইয়াছে। সুখের বিষয়, সকলে "বাঙলা বাঙালী" লেখেন না।

সংস্কৃত যে সকল শব্দে অনুনাসিক আছে, বাংলা রূপান্তরে সে সকল শব্দে চন্দ্রবিন্দু লেখাই বিধি। যেমন, দন্ত দাঁত, অঙ্ক আঁক। দুই-একটা ব্যতিক্রম আছে। যেমন, লম্ফ লাঁফ নয়, লাফ। কিন্তু দেখি, বিমান'ঘাঁটি'। ঘট্ট হইতে ঘাট, ঘাটি, ঘাটিয়াল বা ঘেটেল, ঘাটোয়াল শব্দ আসিয়াছে, একটাতেও চন্দ্রবিন্দু নাই। নূতন কলসীতে জল চুইয়া পড়ে, 'চুঁইয়া' পড়ে না। ভাত চুঁইয়া যাইতে পারে। জোয়ার-'ভাঁটা' নয় জোয়ার-ভাটা। সংস্কৃত খুজধাতু হইতে বাংলা খুজধাতু। পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য লোক 'খুজি, খোজাখুজি' বলে, 'খুঁজি, খোঁজাখুঁজি' বলে না। বোঝার উপরে শাকের আঁটি হইবে 'বোঝার উপরে শাগের আটি' (বাংলা শাগ ও সংস্কৃত শাক এক দ্রব্য নয়)। কিন্তু, আমের আঁঠি, পায়ের আঁঠু।

অন্তঃস্থ-ব (ৱ) পরে থাকিলে সম্ উপসর্গের ম্ স্থানে অনুস্বার হয়। কারণ ং অবর্গবর্ণের অনুনাসিক। এইরূপে সংস্কৃতে 'কিংবা', 'বশংবদ', 'সংবাদ' লিখিত হয়। কিন্তু বাংলায় অন্তঃস্থ-ব উচ্চারিত হয় না। আমরা বর্গীয়-ব জানি। ম ইহার অনুনাসিক। সেই হেতু লিখি, সম্বৎসর, সম্বরণ, সম্বলিত, সম্বাদী, সম্বর্ধনা। পূর্বে 'সংবাদ' ছিল না,

সম্বাদ ছিল। কিম্বা, বশম্বদ এখনও আছে। কিংবা, বশংবদ লেখা পাণ্ডিত্যমাত্র।

ইংরেজী andএর নানারকম বাংলা বানান দেখিতে পাই। এগু, বানান প্রচলিত আছে। কিন্তু atom শব্দের বাংলা বানান য়্যাটম, অ্যাটম, এ্যাটম, এইরূপ দেখি। আমি এাটম লেখা সঙ্গত মনে করি। কিছুদিন হইতে 'মাস্টার', 'স্টেশন' দেখিতেছি। কিন্তু আমরা বলি মাষ্টার, এষ্টেশন, ষ্ট্রীট; এই বানানই ঠিক। ইংরেজী কি অপর ভাষার শব্দের উচ্চারণ আমরা সে সে ভাষা অনুযায়ী করি না। আমরা ইস্তেহার, গোমস্তা, খোসামোদ, তমশুক, নোটিশ, পুলিশ ইত্যাদি বলি ও লিখি। এ পর্যন্ত কেহ আমাদের উচ্চারণ-দোষ ধরেন নাই।

সেদিন দেখিতেছিলাম, কেহ লিখিয়াছেন, 'তাদেরকে পাচ টাকা দিও'। 'তাদেরকে' 'আমাদেরকে' ইত্যাদি স্থানবিশেষের গ্রাম্য প্রয়োগ শুদ্ধ ভাষায় চলিতে পারে না। 'তাদের বলে ধরে এনো'। এই বাক্যের কি অর্থ হইবে কে জানে? সে বল্লো, আমি যাবো, দেখবো, সে যেতো, দেখতো; দেখলো, হলো, ইত্যাদি বারমাসিকের পৃষ্ঠায় দেখিয়াছি। 'মশারা জলে ডিম পাড়ে', 'গাছেরা রোদে পাতা মেলিয়া দেয়', এইরূপ ভাষা দেখিলে মনে হয় বাংলা প্রেসে প্রুফ-রীডার অর্থাৎ প্রুফ-শোধকও নাই। থাকিলে, সাধু ভাষায় ওপর, ভেতর, বের ইত্যাদি স্থান বিশেষের ভাষা দেখিতাম না। "তাদের ভেতর কেহ সাহসী ছিল না," "দশ দিনের ভিতর দেখা করিবে", "ছোট বেলায় দেখিয়াছি", অনেকগুলি বই পড়িতে হয়", "সব কিছু বাকি আছে", "অনেক কিছু করিবার আছে", "তাদেরকে ডাক" ইত্যাদি প্রয়োগ স্থানবিশেষের ভাষা বাংলা নয়। "একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন" "একটা ভয় বোধ করিলেন" ইত্যাদি প্রয়োগ ইংরেজী না বাংলা, বুঝিতে পারা যায় না। হাজার হাজার ছাত্র পরীক্ষা 'দিতেছে'। কেহ পাস 'করে', কেহ ফেল 'করে'। কেহ ট্রেন মিস 'করে'। কাহারও হাট ফেল 'করে'। এইরূপ ভাষা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, লেখকেরা চিন্তা করেন না। ছাত্রেরা পরীক্ষা 'দেয়' না নেয়? ছাত্রেরা আপনাদিকে পাস করে ফেল করে, না পরীক্ষক করেন? বাংলা ভাষায় ইংরেজী ক্রিয়াপদ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। হাট ফেল হয়, ট্রেন মিস হয়, কেহ পাস হয়, কেহ ফেল হয়, ইত্যাদি। পরীক্ষকেরা পরীক্ষা দেন, ছাত্রেরা তাহা গ্রহণ করে।

আমরা বাংলা ভাষার গৌরব করি। যাহাতে সে ভাষা স্বকীয় রূপ পরিত্যগ না করে, লেখকমাত্রেরই দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। নূতন শব্দ আসুক, দেশী বিদেশী শব্দ ও ভাব আসুক, তদ্দ্বারা বাংলা-সাহিত্য পুষ্ট হইবে। কিন্তু দেখিতে হইবে, বাংলা ভাষার ধাতুর সহিত, বাংলা ভাষার ঐতিহ্যের সহিত মিশিতেছে। নচেৎ অন্যপ্রদেশের পাঠকের নিকট বাংলা ভাষা অপাঠ্য হইয়া থাকিবে।

৩। ইংরেজীর বাংলা।

বঙ্গের দৈনিক সংবাদপত্রের বিস্ময়কর ক্ষমতা জন্মিয়াছে। কেহ সন্ধ্যাবেলায় ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলেন, পরদিন সকাল বেলায় দেখি, দৈনিক সংবাদ পত্রে তাহার বাংলা ভাষান্তর বাহির হইয়াছে। বক্তৃতার পরেই বাংলা অনুবাদ হইয়াছে, রাত্রে রাত্রে ছাপা হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ, কেহ সন্ধ্যাবেলা বাংলায় বক্তৃতা করিলেন, পরদিন প্রাতে সে বক্তৃতা ইংরেজীতে পড়িতেছি। ইংরেজী যেমন তেমন ভাষা নয়, আর, বক্তৃতাও এক বিষয়ে নয়। অনুবাদে কোথাও কোথাও ভুল থাকিতে পারে। কিন্তু তদ্দ্বারা অনুবাদকের ক্ষমতার লঘুতা হয় না।

দৈনিক পত্রের সম্পাদক ও বাংলা অনুবাদক ভাবিবার সময় পান না। অনেক ইংরেজী শব্দ বাংলা অক্ষরে লিখিতেছেন। অনেক ইংরেজী শব্দের বাংলা অনুবাদ করিতেছেন, ভ্রমক্রমে সংস্কৃত শব্দের অর্থান্তর ঘটাইতেছেন। দেখি, গণ-পরিষদ্, গণতন্ত্র, গণশিক্ষা, গণসমিতি। 'গণ' শব্দ সংস্কৃত এবং ইহার সংস্কৃত অর্থ বাংলা ভাষায় বহু প্রচলিত আছে। যেমন, বালকগণ, অর্থাৎ বালক নামে যে গণ-(group বা genus) আছে তাহাকে বুঝায়। অতএব 'জন' শব্দের পরিবর্তে 'গণ' বলিতে পারি না। লৈখিক ভাষায় ভ্রম একবার প্রবেশ করিলে তাহার সংশোধন অতিশয় দুঃসাধ্য হয়। যাঁহারা পুস্তক রচনা করেন ও বারমাসিক পুস্তকে প্রবন্ধ লেখেন তাঁহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিবার অবকাশ পান। তাঁহাদের ভুল নিন্দনীয়, স্বীকার করিতে হইবে।

ইংরেজী ভাষা অতিশয় সমৃদ্ধ। তাহার তুলনায় বাংলা কিছুই নয়। দ্রব্যের বৈজ্ঞানিক নাম ও পরিভাষা ছাড়িয়া দিলেও সামান্য সংসার-যাত্রা-নির্বাহের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নাম এবং দ্রব্যের গুণ ও ক্রিয়ার ভেদবাচক শব্দ এত আছে যে, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় তাহার শতাংশও নাই। Plan, scheme, design, project শব্দগুলির অর্থ এক নয়। কিন্তু বাংলায় এক 'পরিকল্পনা' আশ্রয় হইয়াছে। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষার শব্দ অল্পে অল্পে বাড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা সে সুযোগ পাইতেছি না। হঠাৎ নদীর বন্যার মত নানাজাতীয় ভাব ও ক্রিয়াবাচক শব্দ আসিয়া পড়িয়াছে। বাংলা ভাষার প্রসার করিতে হইলে নূতন

নূতন শব্দ সঙ্কলন ও রচনা করিতে হইবে। কয়েকজন বিজ্ঞ এই কর্মে রত থাকিলে অল্পে অল্পে বাংলাভাষার বর্তমান দৈন্য দূরীভূত হইতে পারিবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ বাংলাভাষার পুষ্টিসাধনে ব্রতী হইতে পারেন।

ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দুই প্রকারে রচনা করিতে পারা যায়। (১) শব্দান্তর; (২) শব্দের ভাবানুবাদ। যে শব্দ দ্বারা ইংরেজী শব্দের ভাব রক্ষিত হয় সেই শব্দই শুদ্ধ। ইংরেজী Use শব্দের বহু অর্থ আছে। বাংলায় সবত্র 'ব্যবহার' লিখিলে বাংলা ভাষার স্বরূপ রক্ষিত হয় না। আমরা ভাত খাই, কাপড় ও জুতা পরি, চশমা পরি, গাড়ীতে চড়ি ইত্যাদি স্থলে 'ব্যবহার' লিখিলে বাংলা হয় না। এইরূপ প্রত্যেক শব্দের ভাবানুবাদ করিয়া লইতে হয়। এখানে কয়েকটা ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বিচার করিতেছি।

॥ Situation পরিস্থিতি ॥ শব্দটি মন্দ নয়, কিন্তু অনাবশ্যক। অবস্থা শব্দ বহু প্রচলিত। Food Situation খাদ্য পরিস্থিতি ॥ অর্থাৎ বলিতেছি, খাদ্যের অবস্থা। কিন্তু বলিতে চাই, অন্নকষ্ট।

॥ Damodar Valley Project দামোদর বাঁধ পরিকল্পনা ॥ ইহা অপেক্ষা 'দামোদরের আড়বাঁধ প্রযুক্তি' ভাল মনে হয়। Plan উপায়-কল্পনা, উপায়-সন্ধান। Ten year Plan দশ বৎসরের উপায় নির্দেশ। Scheme, আমি প্রকল্প করিয়াছি।

॥ Inflation মুদ্রাস্ফীতি ॥ মুদ্রা স্ফীত হইবে কেমন করিয়া? মুদ্রা শূন্যগর্ভ হইলে স্ফীত হইতে পারিত। Inflation মুদ্রাবাহুল্য। কলিকাতায় হিন্দীভাষী বাংলা-ভাষার রূপান্তর ঘটাইতেছেন। কাপড় ধোলাই, মদ চোলাই, কাগজওয়ালা, মিঠাইওয়ালা, পাহারাওয়ালা ইত্যাদি বাংলা শব্দ নয়। 'চাহিদা' কোথা হইতে আসিল? শব্দটির বাংলা রূপ দিলে চাহ (প্রার্থনা)+তি=চাহতি, বা চাহতা হইতে পারে। Demand and Supply, চাহতি ও যোগানি, চলিতে পারে।

॥ Vitamin খাদ্যপ্রাণ ॥ ইহা এক অদ্ভুত আবিষ্কার। খাদ্যের প্রাণ, না খাদ্য-রূপ প্রাণ, না আর কিছু? আশ্চর্যের বিষয়, বালকের পাঠ্যপুস্তকেও বহুকাল হইতে 'খাদ্যপ্রাণ' চলিয়াছে। কে এই শব্দের জনক, জানি না। নিশ্চয়, তিনি ডাক্তার নহেন। তিনি জানেন, প্রাণ সুলভ নয়, দুই এক আনায় কিনিতে পাওয়া যায় না। বহুকাল পূর্বে আমি পললীয়• (পলল হইতে পালো, carbo-hydrate), পলীয় (পল মাংস, protein), স্নেহ (fat), পার্থিব (mineral), এই নাম চতুষ্টয় প্রস্তাব করিয়াছিলাম। এইরূপ শব্দের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ভাইটামিন শব্দের 'পোষ', এই নাম রাখা যাইতে পারে।

॥ Basic Education বুনিয়াদী শিক্ষা ॥ ইহা আর এক আশ্চর্য শব্দ। বনিয়াদী ঘর জানি, বনিয়াদী ঠাট জানি। বনিয়াদী (বাংলায় বুনিয়াদী নয়) সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু Basic Education সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা নয়। বনিয়াদী শিক্ষা বলিলে বুঝি যে শিক্ষার বনিয়াদ বা মূল আছে। কিন্তু Basic Education তাহা নহে। যে শিক্ষা প্রথম বা আদ্য, যাহার পরে অন্য শিক্ষা আসে, সেই শিক্ষা বুঝায়। অতএব Basic Education প্রাথমিক শিক্ষা বা আদ্যশিক্ষা। এই শিক্ষার রূপ কি হইবে, বিদ্যাশ্রয়ী অথবা কলাশ্রয়ী হইবে, সে কথা ভিন্ন। গান্ধীজির শিক্ষাপ্রকল্পে এই প্রশ্নের একটা উত্তর ছিল। তিনি চাহিতেন, শিশুকে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্মাণ শিক্ষা দিতে হইবে এবং তাহাকে আধার করিয়া শিশুকে সুশীল ও জ্ঞানবান্ করিতে হইবে। শিশু বুঝিবে, সে এমন দ্রব্য নির্মাণ করিতেছে যাহা লোকে চায় ও কেনে। অর্থাৎ, তাহার মনে এমন ভাব জাগাইতে হইবে যে সে মানুষ হইয়াছে। সে চরকায় সুতা কাটিবে কি শাগপালা রুইবে তাহা শিক্ষক বিবেচনা করিবেন। ছাত্রছাত্রীদের নির্মিত দ্রব্য বিক্রয়দ্বারা বিদ্যালয়ের আংশিক ব্যয় নির্বাহ হইতে পারিবে। তাঁহার প্রকল্পে ইহাও উদ্দেশ্য ছিল।

॥ Scheduled Caste তপশীলী জাতি ॥ 'অনুন্নত জাতি' এই সংজ্ঞায় উদ্দিষ্ট জাতি বুঝিতে অসুবিধা হইত না। ব্রিটিশরাজ Scheduled Caste বলিয়া এই নূতন জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। 'অনুন্নত' সংজ্ঞা অপেক্ষা 'তপশীলী' আরও অবজ্ঞা-জনক। এই নামে বুঝায়, এই জাতি হিন্দুসমাজের বহির্ভূত। মহাত্মা গান্ধীর "হরিজন" সংজ্ঞা করুণা প্রকাশ করে। বঙ্গদেশে ইহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। মহানির্বাণ তন্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য, এই পাঁচ জাতিতে হিন্দুসমাজ বিভক্ত। 'সামান্য জাতি' common people; এই সংজ্ঞা নির্দোষ মনে হয়।

॥ Chief guest of a meeting সভার প্রধান অতিথি ॥ দশ বার বৎসর হইতে সভায় বক্তৃতা করিবার নিমিত্ত Chief guest বা G est-in-chief নামক এক নূতন পদের আবির্ভাব হইয়াছে। সভা করিতে গেলে একজন উদ্‌বোধক চাই। তিনি সভাপতি নহেন। আর একজন Guest চাই, তিনি সভার উদ্দেশ্যের ও কৃতকার্যের প্রশংসা করিবেন। বোধ হয় পূর্বকালে মাগধ সূত বা ভাটেরা এই কর্ম করিতেন। তাঁহারা বৃত্তিভোগী ছিলেন। Chief guest বৃত্তিভোগী নহেন; তিনি ভাটক পান না, তিনি

অবৈতনিক বক্তা। তিনি যাহাই হউন, অতিথি নহেন। যত দিন বঙ্গদেশে অতিথিশালা, অতিথিসেবার নিমিত্ত ভূমি আছে, তত দিন সভার প্রধান বক্তা অতিথি হইতে পারেন না। আমি জানি, পূর্ববঙ্গে গৃহে অভ্যাগত, আগন্তুক, নিমন্ত্রিত, কুটুম্ব, বন্ধু ইত্যাদি সকলকেই অতিথি বলা হয়। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে ইঁহাদিগকে অতিথি বলিলে ইঁহারা ক্ষিপ্ত-প্রায় হইবেন। Chief guest আমন্ত্রিত।

॥ Pre-historic প্রাগৈতিহাসিক ॥ পণ্ডিত শ্রীচিন্তা-হরণ চক্রবর্তী প্রবাসীতে এই প্রাক্ শব্দের অপপ্রয়োগ দেখাইয়াছিলেন। তিনি আরও কতকগুলি শব্দের ভুল ধরিয়াছিলেন। যেমন, অর্ধবাৎসরিক। কিন্তু কার কথা কে শুনে? ইতিহাসের পূর্ব যুগে, চৈতন্যদেবের পূর্বে, লেখাই ঠিক।

গঠনমূলক কর্ম, বাধ্যতামূলক শিক্ষা, ইত্যাদির 'মূলক' বর্জন না করিলে বাংলা পুষ্ট হয় না। গঠনমূলক কর্ম, গঠন কর্ম ভিন্ন আর কি? বাধ্যতামূলক শিক্ষা, Compulsory Education, আমার মতে অবশ্যক শিক্ষা বলা ভাল।

বস্তুতান্ত্রিক, এই নবনির্মিত শব্দটির অর্থ বুঝিতে পারি নাই। রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র বুঝি। চরক আয়ুর্বেদ তন্ত্র, আযভট জ্যোতিষতন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। শাক্ততন্ত্র প্রসিদ্ধ। তন্ত্র শব্দের প্রথম অর্থ তাঁতের টানা। তাঁতে যেমন টানা পড়িয়ান দিয়া বস্ত্র নির্মিত হয়, সেইরূপ, যে শাস্ত্রে সূত্রের পরস্পর যোগদ্বারা কোন বিদ্যা সম্পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় সে শাস্ত্রের নাম তন্ত্র। তন্ত্র Systematic knowledge. System না থাকিলে তন্ত্র বলা চলে না। এই মূল অর্থ হইতে তন্ত্র শব্দের বহুবিধ অর্থ আসিয়াছিল। কিন্তু সেখানেও system অন্তর্নিহিত আছে। বস্তুতন্ত্র বলিলে কি অর্থ দাঁড়ায়, বুঝিতে পারি না।

এইরূপ নূতন নূতন অসংখ্য শব্দ রচিত হইতেছে। ইংরেজী শব্দের ভাবার্থ লক্ষ্য রাখিয়া নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হইবে। শব্দান্তররীতি গ্রহণ করিলে বহু শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। ইংরেজীতে অনুবাদ না করিয়া যে নবরচিত শব্দ বুঝিতে পারা যায় সেই শব্দই টিকিবে। যেমন, প্রতিক্রিয়াশীল যে অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে শব্দ হইতে সে অর্থ আসে না। নৈতিক জীবন, সাহিত্যিক জীবন, পাঠ্যজীবন, কর্মজীবন, কবিজীবন, জাতীয় জীবন, ইত্যাদি এক জীবনে কত অতিদেশ করা যাইবে? অনুকরণদ্বারা কোন ভাষা শক্তিশালী হইতে পারে না।

৪। সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা।

ভারত স্বাধীন হইবার পর পশ্চিমবঙ্গরাজ ঘোষণা করিয়াছিলেন, অতঃপর বাংলাভাষায় রাজকার্য পরিচালনা করিতে হইবে। কিন্তু এই আদেশ পালন করা সোজা নয়। অসংখ্য রাজকর্মচারী, অসংখ্য পদ, এ যাবৎ আমরা ইংরেজীতে শুনিয়া আসিতেছি। এখন হঠাৎ বাংলা শব্দ কোথায় পাওয়া যাইবে? এক পরিভাষাসংসদ আবশ্যক পরিভাষা নির্মাণ করিয়াছেন। তাহার প্রথম স্তবক দেড় বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। অধিকাংশ শব্দ উত্তম হইয়াছে। সংসদের বিদ্যাবত্তা, ধৈর্য ও বিচক্ষণতা প্রশংসনীয়।

এই স্তবকে প্রায় আট শত শব্দ আছে। তন্মধ্যে প্রায় চল্লিশটি ফার্সী ও চল্লিশটি ইংরেজী। অর্থাৎ সাত শতের অধিক শব্দ সংস্কৃত। পরিভাষা যে সংস্কৃত হইবে, ইহাতে নূতন কিছুই নাই। বাংলা ভাষাই ত সংস্কৃত ভাষার এক প্রাকৃত রূপ। কিন্তু প্রথম চিন্তা আসিতেছে, এত যত্নের পরিভাষা টিকিতে পারিবে কি? দেখিতেছি, ভারতরাষ্ট্র ভাষা হিন্দুস্থানী অথবা উর্দু-হিন্দী হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়াছে। তখন মন্ত্রী মহাশয় উজীর হইবেন কি আর কিছু হইবেন, গবর্ণর থাকিবেন, কি সুবেদার হইবেন, কিছুই জানিতে পারিতেছি না। দ্বিতীয়তঃ সকল প্রদেশে Judge, Magistrate, Commissioner, Superintendent of Police ইত্যাদি অসংখ্য পদ থাকিবে। উচ্চ পদের একই নাম না থাকিলে এক প্রদেশের বার্তা অন্য প্রদেশে বুঝিতে পারা যাইবে না। কথাটা দাঁড়াইতেছে, পদের নামের অথবা অধিকৃতের নামের সমতা কে রক্ষা করিবে? এই ক্ষমতা ভারতরাষ্ট্রের আছে, রাষ্ট্রের অধীন রাজ্যের নাই। সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হইলে পরিভাষার যে আকার হইত, হিন্দুস্থানী বা উর্দু-হিন্দী হইলে সে আকার থাকিবে না। তৃতীয়তঃ, ইংরেজ রাজত্ব গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার প্রভাব ও লক্ষণ আমাদের অন্তরে বাহিরে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। উচ্চ শিক্ষিতেরা আধা-ইংরেজ, বাংলায় ভাবিতে পারেন না। বাংলায় কিছু লিখিতে হইলে প্রথমে ইংরেজীতে লেখেন। শিক্ষিত মহিলা ইংরেজী শব্দ অন্তঃপুরে লইয়া গিয়াছেন। তাহার বেশে, তাহার ভূষণে ইংরেজের প্রভুত্ব প্রকটিত আছে। ফলে কি দাঁড়াইবে, বুঝিতে পারা যাইতেছে না। তথাপি সংসদ-কৃত পরিভাষা সম্বন্ধে দুই পাঁচটা টিপ্পনী করিতেছি।

সপ্তশতাধিক সংস্কৃত শব্দের মধ্যে 'সরকার' শব্দ 'হংস-মধ্যে কাকো যথা' হইয়াছে। বহুকাল হইতে 'সরকারী' শুনিয়া আসিতেছি, যেমন, সরকারী রাস্তা, সরকারী উকীল, সরকারী ডাক্তার ইত্যাদি। কিন্তু সরকার যে

কে, তাহা অব্যক্ত থাকিত। গ্রামে পাঠশালার গুরুমশায় সরকার, কলিকাতায় বাজার সরকার, শিপ সরকার ইত্যাদি আছে। পরিভাষাসংসদ রোক সরকার, আদায় সরকার, করিয়াছেন। ইহাদের সহিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিরূপ মানাইবে?

অনেক কাল পূর্বে অসহযোগ আন্দোলনের সময় অনেক ভদ্রলোকের ছেলে কারারুদ্ধ হইয়াছিল। কারার এক বিধি ছিল, কর্তাকে দেখিলে কয়েদীকে দাঁড়াইয়া "সরকার সেলাম" বলিতে হইত। ছেলেরা বিদ্রোহী হইয়াছিল। এখানে 'সরকার' অর্থে প্রভু, এবং তাহাই সরকার শব্দের মূল অর্থ। আর এক অর্থ প্রদেশ; যেমন, ভারতের উত্তর সরকার। গ্রামবাসী গবর্মেণ্ট জানে বুঝে, কিন্তু সরকার অদ্যাপি শুনে নাই। কোন কোন সংবাদপত্রে সরকার শব্দ দেখিয়াছি, এই পরিভাষা প্রকাশের পর হইতে এই ব্যবহার দেখিতেছি। পূর্বে গবর্মেণ্ট (গবর্ণমেণ্ট নয়) লেখাই রীতি ছিল। সরকার শব্দে আর এক গুরুতর আপত্তি আছে। এই শব্দের সহিত Govern, Governor, Governing body ইত্যাদির কোন সংশ্রয় নাই। রাজকার্যে সরকার শব্দ একক থাকিবে, অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইতে পারিবে না।

মহামহিম (His Excellency) গবর্ণরকে 'দেশপাল' বলিলে তাঁহাকে অপর নানাবিধ 'পালে'র এক পাল, অর্থাৎ রক্ষক মনে হয়। কোট্টপাল (কোতোয়াল), দিকপাল (দিগার, বর্তমান চৌকীদার), ঘট্টপাল (ঘাটোয়াল) ইত্যাদি শব্দের পাল অর্থে রক্ষক। আর, পরিভাষা-সংসদও অনেক প্রকার 'পাল' আনিয়াছেন। পরিষৎপাল Speaker of an Assembly, নগরপাল Commissioner of Police, বনপাল Conservator of forests, ইত্যাদি। ভূপাল নৃপাল শব্দে রাজা বুঝি, কিন্তু নামে তাঁহারা একটা ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা নহেন। গবর্ণরকে রাজা না বলিলে কাহার মন্ত্রী, কাহার রাজস্ব, রাজপুরুষ, রাজকর্মচারী, রাজভৃত্য, রাজমার্গ, রাজকোষ ইত্যাদি? স্বরাজ, রামরাজ, ব্রিটিশরাজ, রাজনীতি, রাজভাষা ইত্যাদি শব্দ কোথায় পাই? রাজা বলিতে না পারিলে দেশপালক বা রাজ্যপালক বলা যাইতে পারে। কলিকাতা কি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী নয়? নগর অনেক আছে, কলিকাতাকে শুধু নগর বলিলে চলিবে না। Police Commissioner নগরপাল, না রাজধানী পাল? Government রাজ, স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি। রাজকার্য, রাজকীয় কার্য Official business Non-official business লৌকিক কার্য। সরকারী শব্দ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু অন্য অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহার ক্রমশঃ হ্রাস হইবে।

Minister মন্ত্রী, ঠিক। কিন্তু secretary সচিব না হইয়া 'কর্মসচিব' কেন হইল, তাহা বুঝিতে পারি না। সচিব সহায়, তিনি নিশ্চয় কোন কর্মের নিমিত্ত নিযুক্ত। কেহ অকর্মসচিব থাকিলে অন্যকে কর্মসচিব বলিতে পারা যাইত। বাংলা ভাষায় সাচিব্য শব্দও গ্রামে প্রচলিত আছে। সেখানে অর্থ, ক্রেতার সাহায্য। যেমন, গুড় সাচিব্য হইয়াছে, অর্থাৎ গুড়ের দাম কমিয়াছে।

॥ Home Department স্বরাষ্ট্র বিভাগ ॥ কিরূপে হইল? রাষ্ট্র বলিলে ভারতরাষ্ট্রই বুঝিতেছি। যেমন, রাষ্ট্রভাষা। পশ্চিমবঙ্গ কি একটি রাষ্ট্র, না রাজ্য? Home Minister কি করেন জানি না, বোধ হয় দেশশাসন তাঁহার মুখ্য কর্ম। অতএব Home Department শাসন-বিভাগ বলা সঙ্গত।

॥ Engineer (Civil and Irrigation) বাস্তুকার ॥ ইহা চলিতে পারে না, ভুলও হইয়াছে। বাস্তুশাস্ত্রে সূত্রগ্রাহী Engineer. তিনি 'সর্বকর্মবিশারদ, সূত্রদণ্ড-প্রপাতজ্ঞ, মানোন্মানপ্রমাণবিৎ' ইত্যাদি। যাহাতে লোকে বাস করে তাহা বস্তু বা বাস্তু। যে ভূমিখণ্ডে বাস করে তাহা বাস্তু। তদুপরি নির্মিত যাহা কিছু, সে সব বস্তু, Structures. এইরূপে কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে বাস্তু শব্দের অর্থ গৃহ, ক্ষেত্র, আরাম, সেতুবন্ধ, তড়াগ ও আধার করিয়াছেন। এই সকলের নির্মাণের নাম শিল্প ছিল। তদনুসারে শ্রীকুমার শিল্পরত্ন নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। যাহারা নির্মাণ করে তাহারা শিল্পী। শিল্পী চতুর্বিধ,—স্থপতি, সূত্রগ্রাহী, তক্ষক ও বর্ধকী। প্রতিমা নির্মাণ ও চিত্রকলাও শিল্প। শুক্রনীতি সারেও সেই অর্থ। যথা—"প্রাসাদ প্রতিমারামগৃহবাপ্যাদি সৎকৃতিঃ," যে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে তাহার নাম শিল্পশাস্ত্র। কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে, যেমন বঙ্গদেশীয় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে, শিল্পজীবী নয় জন,—কর্মকার, স্বর্ণকার, কাংসকার, চিত্রকার ইত্যাদি। উত্তর-ভারতে, যেমন আলমোড়ায় শিল্পকার শব্দ প্রচলিত আছে। সেখানে শিল্পকার অর্থে বঙ্গদেশের ছুতার। অতএব Engineer শিল্পবিৎ বা শিল্পজ্ঞ। Engineer নানাপ্রকার আছেন। Mechanical Engineer Chemical Engineer, Electrical Engineer ইত্যাদি সকল Engineerই শিল্পবিৎ বা শিল্পজ্ঞ। বাস্তুকার নামে আর এক আপত্তি আছে। বাস্তু শব্দের প্রচলিত অর্থ, গৃহ নির্মাণযোগ্য ভূমি। এই অর্থ অমরকোশে আছে, অন্য অর্থ নাই। বাস্তুকার বলিলে বুঝাইবে, যিনি গৃহনির্মাণযোগ্য ভূমি প্রস্তুত করেন।

এই সঙ্গে Industry শব্দেরও একটা প্রতিশব্দ চাই।

Industry কেবল শিল্প নহে। Agricultural Industry, Fishing Industry, Mining Industry প্রভৃতিকে শিল্প বলিতে পারি না। শিল্প বস্তুনির্মাণে। কিন্তু কৃষিকর্মে শিল্প কোথায়? Industry কেবল manufacture নয়, occupation, business বা tradeও বুঝায়। সংস্কৃতে অবিকল 'ব্যবসায়'। ব্যবসায় কেবল বাণিজ্য নয়। আমরা Trade অর্থে ব্যবসা বা ব্যবসায় বলি বটে, কিন্তু manufactureও বুঝি। Manufacture অর্থে কলা শব্দ প্রচলিত ছিল। প্রকৃতিদত্ত পদার্থের রূপান্তর-করণের নাম কলা। শুক্রনীতিসারে কলা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কলা অসংখ্য। যেমন, কাচ-কলা glass manufacture, বস্ত্রবয়ন কলা textile industry ইত্যাদি। Cottage Industry শব্দের সংস্কৃত নাম কৌটকলা। পাণিনিতে কৌট শব্দ আছে। কৌটতক্ষ স্বাধীন ছুতার। কলা art Manufacture মাত্রেই art. সমুদ্র জল শুকাইয়া লবণ পৃথক করা একটা art, শিল্প নয়। নৃত্যগীত বাদ্য শিল্প নয়, কলা। Fine arts ললিতকলা না বলিয়া কান্তকলা বলিলে ভাল হয়।

॥ Labour শ্রম ॥ এখানে Labour শব্দ দ্বারা নিশ্চয় Labourer বা Labouring class উদ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা সকলেই শ্রম করি, আমরা সকলেই শ্রমিক, কিন্তু labourer নই। বাংলায় বেরুনিয়া শব্দ প্রচলিত ছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে, অদ্যাপি বাঁকুড়ায় আছে। ভরণীয় শব্দ হইতে বেরুনিয়া, wages ভরণ। কাজেই যে ভরণ করে সে ভর্তা, Employer, ধনিক ও ভৃতিক, দুইটি শব্দ একত্র না পাইলে, ভৃতিক যে labourer, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ভৃতি, ভাতা pension, allowance ইত্যাদি। ভূমি, ভর্তা, ভৃতিক বা ভরণীয়, এই তিন ভ কার পণ্য-উৎপাদনের ত্রিপাদ। ইহাদের সহিত সমাযোগ (organization) পাইলেই পণ্য-উৎপাদন চলিতে থাকে। কিন্তু বাংলায় ভর্তা শব্দ চলিবে না। অতএব ধনিক ও ভৃতিক, অথবা ধনিক ও শ্রমিক, রাখাই ঠিক হইবে। কর্মী worker, কার্মিক workman, কারু Artisan.

॥ Librarian গ্রন্থাগারিক ॥ গ্রন্থপাল বলা ভাল।

৬০।৭০ বৎসর পূর্বে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীবাণু ইত্যাদি নাম চলিতে পারিত। কিন্তু বিজ্ঞান দ্রুত বাড়িয়াছে। এখন এ সকল শব্দ আমাদের জ্ঞানের অনুগামী হইতেছে না। রাজাজ্ঞা দ্বারা এইরূপ নাম বাঁধিয়া রাখা কর্তব্য হইবে না। ॥ chemist প্রাণরসায়নী॥ ॥ পড়িলে প্রাণরসায়নী বটিকা মনে আসিবে। শ্রুতিরসায়নী ভাষা, নেত্ররসায়নী শোভা বলা অপ্রচলিত নয়। শুধু রসায়ন বলিলে আয়ুর্বেদের রসায়ন মনে হয়। রসায়নবিদ্যা বলিলে রস (পারদ) হইতে কোন রকমে টানিয়া chemisry বুঝাইতেছে। তেমনই পদার্থবিদ্যা না বলিয়া শুধু পদার্থ বলিলে অন্য অর্থ হইয়া যায়। তখন Physicist অর্থে পদার্থী বলাও চলে না। প্রাণ কি কোন বস্তু যে তাহার রসায়ন থাকিবে?

॥ Pathology বিকারতত্ত্ব ॥ ঠিক মনে হইতেছে না। কিসের বিকার? বোধ হয় রোগতত্ত্ব। Pathogenic রোগজনক।

॥ Profes or অধ্যাপক ॥ অধ্যাপক টোলের। তাঁহারা ধনবানের শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রিত হন। তাঁহাদের এই সামান্য সম্মান ক্ষুণ্ণ করা উচিত হইবে না। এতকাল Professor শব্দে অধ্যাপক চলিতেছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে রাজানুমোদিত হইয়া উপাধিস্বরূপ হইতেছে। অমুক কলেজের অধ্যাপক বলা যে কথা, অধ্যাপক অমুক বলা সে কথা নয়। Profe sor অধিশিক্ষক।

॥ Lecturer উপাধ্যায় ॥ উপাধ্যায় বৃত্তিভোগী ছিলেন, কিন্তু তিনি শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি ম্লেচ্ছভাষা শিখাইতেন না। Lecturer বরং অনুশিক্ষক। Secondary school teacher মধ্যশিক্ষক, Primary school teacher আদ্যশিক্ষক।

॥ Post and Telegraph প্রৈষ ও তার ॥ Post-master General মহাপ্রৈষাধিকারিক, বড় ডাক কর্তা ॥ প্রৈষ শব্দ চলিবে না, ঠিকও হয় নাই। ডাক শব্দ রাখিতেই হইবে। কিন্তু Post office, Post-master কই? Post office ডাকঘর; Post-master ডাক কর্তা, Post-master General ডাকের অধিকর্তা।

দেখিতেছি কয়েকটা সামান্য শব্দও পারিভাষিক হইয়াছে। যেমন, ॥ Bearer বাহক, বেয়ারা ॥ Bearer বাহক বটে, কিন্তু বেয়ারা নয়, বেহারা। ॥ Peon পিয়ন, চাপরাশী ॥ সকল পিয়ন চাপরাশ রাখে না। যাহারা চাপরাশ রাখে, তাহারাও পিয়ন নামে তুষ্ট হয়। Bottle washer বোতল ধাবক; কুপী ধাবক ॥ এই শব্দে সংস্কৃত-প্রীতির আতিশয্য হইয়াছে। আমি বলি, বোতল-ধুইয়ে। ॥ Telegraphic তারিক ॥ এখানে বাংলা শব্দে সংস্কৃত ইক প্রত্যয় হইয়াছে। যদি এইরূপ শব্দ রচিতে বাধা না হয়, তবে Constable পাহারাওয়ালা না হইয়া পাহারী (প্রহরী) হইতে পারে। Gasman গ্যাসী। যেমন, দপ্তরী, কাগজী ইত্যাদি।

॥ Officer আধিকারিক ॥ কিন্তু office কই? বোধ হয় এই শব্দের প্রতিশব্দ অধিকার। যদি তাহাই হয়, তবে

officer অধিকারী করিলে দোষ কি ? কিন্তু অধিকার শব্দ এত অধিক প্রচলিত যে তদ্দ্বারা office বুঝাইবে না। Government office রাজকার্য, রাজকার্যালয়। Officer কার্যচারী। কর্মচারী শব্দ বহু প্রচলিত। Clerk করণিক না করিয়া করণী করিলে ভাল হয়। সংস্কৃতে করণ—কায়স্থ—clerk আছে।

এইরূপে তালিকার শব্দ বিচার করিবার অবসর নাই, স্থানও নাই। সামন্তরাজ্যে অনুসন্ধান করিলে অনেক রাজকর্মচারীর নাম পাওয়া যাইবে। ওড়িয়ায় দেখিয়াছি রাজার বাবহর্তা, চলিত ভাষায় বেঅর্তা, আছেন। তিনি রাজার Secretary। ছামুকরণ অর্থাৎ সম্মুখকরণ, রাজার জমা খরচ লেখেন। গেঁতাঘর Treasure house; সংস্কৃত গ্রন্থ (ধন) শব্দ হইতে গেঁতা। বাঁকুড়ায় গোতাইত রাজার Storekeeper, ইত্যাদি।

পরিভাষাসংসদ সংস্কৃত শব্দ বাছিয়া মনে মনে আশা করিয়াছেন, ভারতরাষ্ট্রভাষা সংস্কৃত হইবে। কিন্তু বহু-প্রচলিত কোন কোন ইংরেজী নাম রাখিতেই হইবে। বিশেষতঃ, যে-সকল সংস্কৃত শব্দ হ্রস্ব নয়, সুখোচ্চার্য নয়, সুবোধ্য নয়, সে সকল শব্দ চলিবে না।

বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈশাখ-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে আমি গত শতাব্দীর মহিলা-পরিচালিত সাময়িক-পত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আমার প্রবন্ধে যে সকল পত্র-পত্রিকার উল্লেখ ছিল, সেগুলি পাক্ষিক ও মাসিক, তখন অবধি কোন সাপ্তাহিক পত্রিকার সন্ধান পাই নাই। সম্প্রতি মহিলা-পরিচালিত একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার অস্তিত্বের কথা জানিতে পারিয়াছি; উহার নাম—'বঙ্গবাসিনী,' ১৮৮৩ সনের শেষ ভাগে কলিকাতার টাঁলা অঞ্চল হইতে প্রকাশিত হয়।

১২ আশ্বিন ১২৯০ (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩) তারিখে ভূদেব মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয়:—

'বঙ্গবাসিনী

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা

ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ১৸০ টাকা, মফস্বলে ২।০। আকার দুই ফরমা, ডিমাই এক সিট, উত্তম ছাপা, উত্তম কাগজ। প্রতি মঙ্গলবার প্রাতে প্রকাশিত হইবে, নগদ মূল্য দুই পয়সা মাত্র।

লেখিকাগণ।—শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী রায়, সরোজিনী গুপ্ত, নিস্তারিণী দেবী, শিবসুন্দরী দে, কৃষ্ণকামিনী মিত্র, খাকমণি ঘোষ, সৌদামিনী গুপ্ত, আমোদিনী ঘোষ, অনুপমা দেবী, কুসুমকামিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদমুখী দেবী, তরঙ্গিণী ঘোষ।

এই সকল বঙ্গমহিলাগণ কর্তৃক লিখিত বঙ্গবাসিনী আগামী আশ্বিন [কার্ত্তিক ?] মাস হইতে সাধারণের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইবে। ইহাতে সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং দেশীয় বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও বিলাতী ভাল ভাল সংবাদ-পত্র হইতে নানাবিধ সংবাদ ও প্রবন্ধের সারভাগ উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করা হইবে। জ্ঞানী, মানী, ধনী, শিক্ষক, কৃষক, অজ্ঞান, বালক বালিকা, ব্যবসায়ী, স্ত্রী, পুরুষ, সকল শ্রেণীর লোকের জন্য লিখিত এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য দেশসমূহে বামাগণের লিখিত, নানা প্রকার সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্রিকার বিশেষ আদর হইয়া থাকে। তবে বঙ্গে আদর না হইবে কেন ? বঙ্গ-বাসিনীর প্রধান উদ্দেশ্য অশিক্ষিত লোকশিক্ষার প্রধান উপায়, আরও ইহাতে কয়েক জন সুশিক্ষিতা রমণী লিখিবেন, নানা কারণ বশতঃ তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা হইল না।···শ্রীগিরীন্দ্রলাল দাস ঘোষ। বঙ্গবাসিনী কার্য্যাধ্যক্ষ। কলিকাতা মধ্য সুবার্ব্বণ টাঁলা, ২ নং বঙ্গ-বাসিনী কার্য্যালয়।"

পরবর্তী ১৫ই অগ্রহায়ণ (৩০ নবেম্বর) তারিখে 'বঙ্গ-বাসিনী'র ১ম সংখ্যার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' এইরূপ লেখেন:—

"বঙ্গবাসিনী (১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা) সাপ্তাহিক পত্রিকা, স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক বঙ্গবাসিনীগণের হিতোদ্দেশে সম্পাদিত। কলিকাতা হইতে প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া ইহার ভাষাদিগত কোন দোষ নাই। বস্তুতঃ সকল বিষয়েই উত্তম হইয়াছে।"

রাজপুত্তুর

(নাটিকা)

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

কামারের কামারশালা। একদিকে আগুনের কুণ্ড, তার পাশে হাপর, আর একদিকে নেহাই, অনেকগুলো ছোট বড় হাতুড়ি ও সাঁড়াশি—কামারশালার পিছনে অন্দরে ঢোকবার একটা আধখোলা দরজা। আগুনের কুণ্ডে লোহা গরম হচ্ছে, বাঁ হাতের সাঁড়াশি দিয়ে একখণ্ড লোহা নেহাইয়ের উপর ধরে কর্মকার ডান হাতের হাতুড়ি দিয়ে পিটে যাচ্ছে, বেলা অপরাহ্ন। খাকি হাফসার্ট ও সর্ট পরিহিত অজয়ের প্রবেশ।

কর্মকার—(হাতুড়ি পেটা বন্ধ করে) কি চাই ?

অজয়—চাই তোমার আশ্রয়।

কর্মকার—বাবু, তোমার হয়েছে কি ?

অজয়— হয়েছে বিপদ।

কর্মকার—নেশা করেছ ?

অজয়—না, ও বস্তু সঙ্গে নেই।

কর্মকার—তবে হয়েছে কি ?

অজয়—ধরতে পারলে না ? বই-টই কিছু পড়নি বুঝি, নাটক নভেল ?

কর্মকার— না বাবু, লেখাপড়া জানি নে, হাতুড়ি পিটতে জানি।

অজয়—(হতাশ ভাবে) তবে শোনো কি হয়েছে। ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্র বেরিয়েছিলেন শিকারে, সঙ্গে ছিল লোকলস্কর, সৈন্যসামন্ত। গভীর বনে রাজপুত্র দেখেন এক হরিণ, ঘোড়া ছুটিয়ে দেন বায়ুবেগে, ছুটে চলে হরিণ, ছুটে চলে রাজপুত্রের ঘোড়া, পিছনে পড়ে থাকে লোকলস্কর, সৈন্যসামন্ত। ছুটতে ছুটতে নিবিড় অরণ্যে হরিণ হয় অদৃশ্য, রাজপুত্রের ক্লান্ত ঘোড়া হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে। রাজপুত্র ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেখেন ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে কোন দিকেই নেই পথ। দুই চোখ যেদিকে যায় সেই দিকে রাজপুত্র চলতে থাকেন, চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে আসে, এমন সময় সামনে দেখেন একখানি কুটীর। সেই কুটীরের দরজায় দাঁড়িয়ে রাজপুত্র হাঁকেন,'কে আছো, দয়া করে আশ্রয় দাও'—এখন বুঝলে ব্যাপারটা।

কর্মকার—বাবু, আমার রূপকথা শোনবার সময় নেই (দু'তিনবার হাতুড়ি পিটিয়ে) হাতে অনেক কাজ।

অজয়—কিন্তু প্রথম কাজ হচ্ছে অতিথি-সেবা।

কর্মকার—অতিথি কোথায় !

অজয়—(বুকের উপর হাত রেখে) এই রাজপুত্র অতিথি।

কর্মকার—(অবাক হয়ে) রাজপুত্তুর ! রাজপুত্তুর কে ! তুমি !

অজয়—(হেসে) কাব্য মাঠে মারা গেল ! তবে চাঁচা-ছোলা দোকানদারী ভাষায় ব্যাপার বলি শোনো ; এই যে আমি—আমি হচ্ছি মোহনপুরের বিখ্যাত জমিদার রাজা রাজচন্দ্র রায়ের পুত্র কুমার অজয়চন্দ্র রায়, জিপে চড়ে শিকারে বেরিয়েছিলাম—পথিমধ্যে জিপ উল্টে খানায় পড়ে, আমি অনেকটা পথ পদব্রজে পাড়ি দিয়ে নিতান্ত অসহায় ভাবে তোমার দোকানে এসে উপস্থিত হই—এর পরে যা যা ঘটে তা তুমি জান।

কর্মকার—(বিস্ময়ের আধিক্যে উঠে দাঁড়িয়ে) এ্যা, তুমি··· আপনি রাজার ছেলে !

অজয়—নিঃসন্দেহে, দেখেই এতক্ষণ চেনা উচিত ছিল।

কর্মকার—(চেঁচিয়ে ডাকে) ওরে ও বুলি, ও রুলি, দেখে যা রাজপুত্তুর এসেছে, ছুটে আয়। (কতিপয় পায়ের ছুটে আসার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। তারপরে দোকানের পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে বুলি ও রুলি—দুটি মেয়ে। বুলির বয়স তের চৌদ্দ—শ্যামবর্ণা, নাক একটু খাঁদা,চোখ দুটি বড় বড়, সবাঙ্গে যৌবনের জোয়ার এসে গেছে, আর রুলি হচ্ছে নয় বছরের নাবালিকা)

বুলি—(বড় বড় চোখ দুটি আরো বড় করে) কই বাবা রাজপুত্তুর !

কর্মকার—(অজয়কে দেখিয়ে) ঐ যে দাঁড়িয়ে রে, চিনতে পারছিস নে ? দেখেই এতক্ষণ চেনা উচিত ছিল।

(অজয় অলস দৃষ্টিতে বুলি রুলির দিকে তাকায়, তারপরে পকেট থেকে সিগারেটের টিন বার করে শেষ সিগারেটটি ধরিয়ে টিনটি ফেলে দেয়)

বুলি—(কিছুক্ষণ অজয়ের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে)

অজয়—(আস্তে আস্তে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে থাকে)

কর্মকার—(ধমক দিয়ে) হাসছিস্ কেন ?

বুলি—এ বুঝি রাজপুত্তুর।

কর্মকার—হ্যাঁ রে, রাজপুত্তুর—বাবু বলেছেন।

বুলি—(ঠোঁট বাঁকিয়ে) বললেই হ'ল—কে না কে বাস-ড্রাইভার···(আবার হেসে ওঠে)।

অজয়—বাস-ড্রাইভার—কে বললে আমি বাস-ড্রাইভার ?

বুলি—বাস-ড্রাইভার না তো কি ! হৃদয়গঞ্জের বাসগুলো তো যায় আমাদেরই বাড়ীর সামনে দিয়ে, কত বাস-ড্রাইভার আমি দেখি, অমনি হাতকাটা জামা আর প্যান্ট পরে, অমনি মুখে বাঁকা করে সিগারেট ধরে।

অজয়—(মুখ থেকে সিগারেটটা হাতে নিয়ে) অকাট্য যুক্তি ! কখনো রাজপুত্র দেখেছ ?

কর্মকার—কামারের মেয়ে, ও কোথায় রাজপুত্তুর, দেখবে বাবু।

বুলি—নাই-বা দেখলুম রাজপুত্তুর, আসল রাজপুত্তুর দেখলেই আমি চিনতে পারব।

কর্মকার—বুলি, তুই চুপ কর। ওরে ও রুলি, ভেতর থেকে আমার মোড়াটা এনে বাবুকে বসতে দে।

(রুলি মোড়া নিয়ে আসে)

অজয়—(মোড়াতে বসে) বাস না হলেও গাড়ী আমি চালাই, কিন্তু সেটা আমার পেশা নয়।

কর্মকার—আজ্ঞে না, তা কি কখনো হয়! বড়মানুষ কাজ করে সখ করে, যেমন আমাদের জমিদার মধু দত্ত মাটি কোপাত সখ করে, হাতে হাতঘড়ি বাঁধা থাকত, সকাল সাড়ে সাতটায় কোদাল হাতে বাগানে গিয়ে মাটি কোপাতে সুরু করত, মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখত, যেই আটটা বাজত অমনি কোদাল ফেলে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে চলে যেত।

অজয়—সখ করে মাটি কোপাত বলে মধু দত্তকে যেমন কুলি বলা চলে না, তেমনি কদাচিৎ মোটর চালাই বলে আমাকে ড্রাইভার বলতে পার না।

কর্মকার—আজ্ঞে না, ও সব একটু আধটু করা হজম-শক্তি বাড়াবার জন্যে।

অজয়—(হেসে) ঠিক কথা বলেছ ভাই।

কর্মকার—হজমশক্তির দোষ কি কর্তা, রোজ রাজভোগ চর্ব্যচুষ্য।

অজয়—(মাথা নেড়ে) বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লেহ্য এবং পেয়, মাগুর মাছের ঝোলভাত, না হয় স্রেফ বার্লি।

কর্মকার—(গালে হাত দিয়ে) বলেন কি কর্তা, তবে আর রাজরাজড়ার খরচটা কি? ও খেলে যে আমাদের *প্রাণও বাঁচে না।*

অজয়—আমাদের সমস্তা প্রাণ বাঁচানো নয়, আমাদের সমস্তা হচ্ছে মান বাঁচানো। আমার বাপ-ঠাকুরদা মামলা-মোকদ্দমায় হাতী ঘোড়ায় বাড়ীতে গাড়ীতে, পূজাপার্বণে নেশায় এবং (চাপা গলায়) নারীতে যে খরচটা করে গেছেন সেই খরচটা আমাকেও বজায় রাখতে হবে।

কর্মকার—তা, আপনাদের অনেক আয় অনেক ব্যয়।

অজয়—অর্থনীতির গোড়ার কথাটাই জান না দেখছি, কথাটা হচ্ছে—অনেক আয়, অনেক অনেক ব্যয়। দেনা না করলে সংসার চলে না।

কর্মকার—(অবাক হয়ে) দেনা তো করি আমরা বাবু।

।—হ্যাঁ, তা করো বই কি, তবে একটু তফাৎ আছে, তোমরা দেনা শোধ দাও, আমরা দিই না।

(কর্মকার হাতুড়ি তুলে নিয়ে লোহা পিটতে থাকে)

অজয়—কেতাবে পড়েছি হাতের কাজে নাকি ভারি আনন্দ, অথচ তোমার মূর্তি খুব আনন্দময় মনে হচ্ছে না।

কর্মকার—হাতুড়ি পিটে আনন্দ—এ কি কখনো হয় বাবু!

অজয়—একদা হয় তো আমাকেও ঐ কাজ করতে হবে, কিন্তু তুমি তো খুব উৎসাহ দিচ্ছ না বাপু।

কর্মকার—রাজপুত্তুর হয়ে কামারের কর্ম! কি যে বলেন আপনি!

অজয়—রাজপুত্র হয়েই তো বিপদে পড়েছি ভাই, শোনো নি বুঝি, যত রাজা আর রাজপুত্রদের ধরে কুমোর কামার চাষী আর চামার করা হবে!

কর্মকার—(অবাক হয়ে) আর যারা কুমোর কামার চাষী আর চামার আছে তারা?

বুলি—তারা হবে রাজা আর রাজপুত্তুর।

অজয়—এবং রাজকন্যা। কিন্তু তখনো রাজকন্যাকে দেখে কামার-কন্যা বলে মনে করবার সম্ভাবনা যোল আনাই থাকবে।

কর্মকার—(কপালে করাঘাত করে) রাজা হব সে কপাল কি করেছি বাবু, রাজা হতে চাই নে। যদি সাঁঝ-সকালে হাতুড়ি পিটতে না হয়, পেট ভরে ভাত আর যদি পরণের বস্ত্র পাই তা হলেই খুশী হই।

অজয়—হাতুড়ি না পিটে যদি তোমার খাওয়া-পরা জুটে যায় তা হলে ঐ যে সেটা সম্বন্ধে কি হবে ভেবে দেখেছ?

কর্মকার—সেটা কোন্‌টা বাবু?

অজয়—ঐ যে অবসরটা। সকাল বেলা একবার খেলে, দুপুর বেলা একবার খেলে, আবার রাত্তিরে আর একবার খেলে, কিন্তু হাতুড়ি পেটা না থাকায় খাওয়ার মাঝে মাঝে অনেকখানি করে সময়ের ফাঁক ছুটে যাচ্ছে—সেগুলো কি *ফাঁকই থেকে যাবে? না হয় দু-চার বার তামাকই খেলে,* তবুও তো অনেক সময় থেকে যাচ্ছে।

কর্মকার—(হেসে) বাবু ঠিক ধরেছেন, তা, আমার একটা সখ ছিল কর্তা, একটু গান-বাজনার, ছেলেবেলায় যাত্রার দলে ছিলাম কিছুদিন।

অজয়—অবসর কাটাবার ওটা একটা চমৎকার উপায়। রাজা নাই বা হলে, ভাত কাপড়ের উপর আর কিছু টাকা যদি পাও তা হলে একটা গোপীযন্ত্র বা বেহালা তো কিনতে পার।

কর্মকার—(এক গাল হেসে) একটা বেহালা কেনবার ইচ্ছে আমার অনেক কালের।

অজয়—বেহালা তো কিনলে, কিন্তু বাজনা শিখবে

কার কাছে ? অবিশ্যি একজন ওস্তাদ রাখতে পার, খুব বেশী টাকা তাতে লাগবে না।

কর্মকার—তা যা বলেছেন বাবু, ওস্তাদ না হলে বেহালাই বৃথা।

অজয়—(কামারশালার চারদিকে তাকিয়ে, মাথা নেড়ে) কিন্তু একটা মস্ত বড় সমস্যা উপস্থিত হচ্ছে, এক গাদা সাঁড়াশি, হাতুড়ি, লোহালক্কড়, কয়লা আর কালি—এর মধ্যে বসে বেহালা বাজালে কি সে বেহালা ঠিকমত বাজবে ?

বুলি—বাবা, তোমার টাকা হলে মিস্তিরদের মত কোঠা-বাড়ী কোরো।

অজয়—(উৎসাহিত ভাবে) অবসর, বেহালা, ওস্তাদ, কোঠাবাড়ী—এই তো ভাই, কয়েক ধাপ বেশ উঠেছ। এর পরেধাপে ধাপে উঠে যাও—দাসদাসী, পূজা-পার্বণ, দোল-দুর্গোৎসব, নেশা এবং···।

কর্মকার—মিছে কথা বলবো না কর্তা, রাজা হলে একবার চুটিয়ে মজা করে নেই।

বুলি—বাবা, তুমি কবে রাজা হবে ?

অজয়—(চিন্তিত ভাবে) এদেশে রাজপাট তো বেশী নেই, অথচ কুমোর কামার, চাষী আর চামারের সংখ্যা হবে···এই ধর (হিসেব করবার চেষ্টা)

কর্মকার—(হতাশভাবে) ও বুলি, হাপরটা জোরে জোরে টানো তো মা, আজ আর হাতের কাজ এগোচ্ছে না। (দু' চার বার হাতুড়ি ঠুকে) কই, রসিক তো এখনও এলো না, হাতুড়ি মারবে কে ? কাজকর্ম চলে কি করে ? দোকান-পাট এবার তুলে ফেলি।

অজয়—রসিকটি কে ?

কর্মকার—রসিক আমার শাগরেদ, ও আজ আর এলো না, তাই ভাবছি হাতুড়ি মারবে কে ?

অজয়—রস-জ্ঞান বোধ হয় আমারও আছে, বলো তো আমি একবার চেষ্টা করি।

কর্মকার—(আশ্চর্য্য হয়ে) আপনি ! রাজপুত্তুর ! বাবু বেশ রঙ্গ করতে পারেন।

অজয়—তা একটু পারি বৈ কি, তবে কাজের সময় রঙ্গ পরিত্যাজ্য। (উঠে এসে একটা বড় হাতুড়ি নিয়ে বীরত্বব্যঞ্জক ভাবে) বলো, কোথায় মারতে হবে।

কর্মকার—(কিঞ্চিৎ হেসে) আজ্ঞে কর্তা, ও হাতুড়িটা আপনি তুলতেই পারবেন না ; যদি সত্যিই একটু আমোদ করতে চান তা হলে ঐ ছোট হাতুড়িটা নেন।

অজয়—(বড়টা রেখে ছোটটা নিয়ে) এবার এস।

কর্মকার—(এক খণ্ড লাল লোহা আগুন থেকে তুলে সাঁড়াশি দিয়ে নেহাইয়ের উপর ধরে) মারুন এটাতে, দেখবেন, আমার মাথায় মারবেন না যেন।

অজয়—(একখানা পা সামনে এগিয়ে দিয়ে হাঁটুটা একটু ভাঙে, পেছনের পা সোজা করে রাখে, কোমর থেকে শরীরটা সামান্য পেছন দিকে হেলিয়ে দেয়, দক্ষিণ স্কন্ধ উঁচু করে, সেই অনুপাতে বাম স্কন্ধ নীচু করে ঘাড়টা বাঁকায়, তার পরে হাতুড়ি সাবলীল ভঙ্গীতে উঁচু করে ধরে। কর্মকার ও বুলি অবাক হয়ে অজয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে)

কর্মকার—(আশ্চর্য হয়ে) ও কি করছেন কর্তা ?

অজয়—হাতুড়ি পিটবার ব্যবস্থা করছি।

(কর্মকার ও বুলি হেসে ওঠে)

অজয়—(বিরক্ত ভাবে) হাসবার হেতুটা জানতে পারি কি ?

কর্মকার—অমন ভঙ্গিমে করে কি হাতুড়ি পেটা যায় ?

অজয়—(বিরক্ত ভাবে) ছবিটবি কখনো দেখেছ ? এঞ্জেলো থেকে এপষ্টিন পর্য্যন্ত যত বড় বড় শিল্পী সবই শ্রমিকের সুঠাম ভঙ্গি এই ভাবেই গড়েছেন। আমার মৌলিকত্ব এতে কিছু নাই—সবটাই নকল।

কর্মকার—(মাথা নেড়ে) হাতুড়ি পেটা কি অত সহজ ? আপনি পারবেন না বাবু।

অজয়—নিশ্চয় পারব। তুমি আমার ভুলটা দেখিয়ে দাও।

কর্মকার—অমন ভঙ্গি করে দাঁড়ালে পারবেন কেন ?

অজয়—(হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে) বুঝেছি, বুঝেছি, ঠিক ধরেছ ভাই, ভয়ানক ভুল করেছিলাম। পাশ্চাত্য শিল্প এদেশে অচল, চাই ওরিয়েন্টাল আর্ট, গান্ধার অজন্তা অমরাবতী সাঁচি কোনারক কালিঘাট—এবার ঠিক পারব। (প্রাচ্য-কলাসম্মত ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়ায়)

(কর্মকার ও বুলি আবার হেসে ওঠে)

অজয়—(হতাশ ভাবে) আবার ভুল ?

বুলি—বাবা, তুমি একবার দেখিয়ে দাও না।

কর্মকার—(উঠে দাঁড়িয়ে) দেন হাতুড়িটা, এই দেখুন, *এমনি করে পিটতে হয়। (হাতুড়ি মাথার উপর তুলে ধরে)*

অজয়—(ব্যস্ত হয়ে) দাঁড়াও, একটুখানি, এক মিনিট ঐ অপূর্ব ভঙ্গিটা বজায় রাখ, আমাকে ভাল করে দেখতে দাও —পা দুখানার এমন বিষম সংস্থান, যেন তারা দেহের ভার-সমতা রাখতে অনিচ্ছুক ; পিঠটা কুঁজো, গলার দু'পাশে দুটো রগ ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে আর দু'পাটি অনাবৃত দাঁত কোন এক অদৃশ্য বস্তুকে সজোরে কামড়ে ধরেছে, হায়, শিল্পের সঙ্গে বাস্তবের কি ভয়ানক গরমিল !

(কর্মকার হাতুড়ি পেটে)

অজয়—বুলি, তুমি হাসলে না ?

বুলি—হাসব কেন ! অমনি করেই তো হাতুড়ি পেটে।

অজয়—তোমার বাবাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ?

বুলি—দেখাচ্ছে বই কি।

অজয়—তবে দাও হাতুড়িটা (কর্মকারের হাত থেকে হাতুড়ি নিয়ে) আশা করি অমন সৌন্দর্যসৃষ্টি আমিও করতে পারব। (থপাথপ হাতুড়ি পেটে আর কবিতা আওড়ায়)

চাষা ক্ষেত চাষ করে গলা ছেড়ে গান ধরে

ফসলের আশা তার বুকে;

(হাতুড়ির ঘা)

—কুমোর গড়িছে হাঁড়ি কি সুন্দর বলিহারি

কামার পেটায় লোহা সুখে।

(হাতুড়ির ঘা)

কুমোর গড়িছে হাঁড়ি কি সুন্দর বলিহারি—

কামার পেটায় লোহা সুখে

(হাতুড়ির ঘা)

কামার পেটায় লোহা সুখে

(হাতুড়ির ঘা শিথিল হয়ে আসে)

কামার পেটায় লোহা সুখে

(হাতুড়ির ঘা আরো শিথিল হয়ে আসে)

কামার পেটায় লোহা সুখে।

(দাঁতে দাঁত চেপে কোনমতে আর এক ঘা, তার পরে বাঁ হাতে কপালের ঘাম মুছে)

কর্মকার!

কর্মকার—আজ্ঞে।

অজয়—তুমি যদি কবি হতে তা হলে?

কর্মকার—তা হলে কর্তা?

অজয়—তা হলে?

কর্মকার—(অবাক হয়ে) তা হলে?

অজয়—(হাতুড়ি আন্দোলিত করে) কল্পনা করতে পারছ না?

কর্মকার—আজ্ঞে পারছি না।

অজয়—(হাতুড়ি ফেলে দিয়ে বসে পড়ে) পারছ না সে ভালই।

কর্মকার—আর পিটে কাজ নেই বাবু, দেখলেন তো, যত কঠিন ভেবেছিলেন তত কঠিন নয়।

অজয়—(রুমালে মুখ মুছতে মুছতে) হাঁ। দেখলাম বৈ কি, যত সহজ ভেবেছিলাম তত সহজ নয়।

কর্মকার—দু'চার দিন অভ্যাস করলেই খাওলো ঠিক ঠিক পড়বে।

অজয়—(হাতঘড়ি দেখে) জয়নগঞ্জের বাস ক'টায় আসে?

কর্মকার—তা, এখন অনেক দেরী।

অজয়—(সভয়ে) দু'চার দিন?

কর্মকার—(হেসে) আজ্ঞে না, এই ঘণ্টাখানেক পরেই আসবে।

অজয়—(হাঁক ছেড়ে) বেশ, বেশ, (পকেট হাতড়ে) কর্মকার, একটা সিগারেট দিতে পার?

কর্মকার—সিগারেট পাব কোথা বাবু!

অজয়—তা হলে একটা বিড়ি।

কর্মকার—তামাক খাবেন? আজ্ঞা করেন তো তামাক সেজে আনি।

অজয়—(উৎসাহিত হয়ে) খাব বৈ কি, তুমি খুব ভাল লোক হে।

(কর্মকার পিছনের দরজা দিয়ে অন্দরে প্রবেশ করে, বুলি হাপরের দড়ি ধরে টানতে থাকে)

অজয়—কি যেন তোমার নাম, চম্পা, নন্দিতা না-ছন্দিতা?

বুলি—আমার নাম বুলি।

অজয়—বুলি, ভারি সুন্দর নাম, খুব সুন্দর নাম, কিন্তু—

বুলি—(সলজ্জভাবে তাকিয়ে) কিন্তু কি?

অজয়—নাম খুব সুন্দর কিন্তু নামের চেয়েও তুমি সুন্দর।

বুলি—(লজ্জায় মুখ নীচু করে দড়ি টানতে থাকে)

অজয়—বুলি!

বুলি—(চকিত দৃষ্টিপাত করে) কি?

অজয়—তোমার চোখ দুটি একবার দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছে হয় কেন?

বুলি—(আবার চকিত দৃষ্টিপাত)

অজয়—(কাছে এসে) তোমার আঙুলগুলো নিশ্চয়ই ব্যথা করছে, দড়িটা আমাকে দাও, আমি টানি (বুলির হাত ধরে)।

বুলি—হাত ছাড়ুন, আপনি পারবেন না।

অজয়—নিশ্চয় পারব—এ কাজে আমি খুব পটু, অনেক রাজত্ব উড়িয়ে দিয়েছি, অনেক কাল ধরে অভ্যাস করছি—তা ছাড়া, এটা বংশগত।

বুলি—(হাত ছাড়িয়ে নেয়)

অজয়—কি নরম হাতখানি তোমার।

বুলি—(দড়ি ধরে তাড়াতাড়ি টানতে থাকে, কাঁচের চুড়িগুলো রুনুঝুনু বাজতে থাকে)

অজয়—এমন মিষ্টি চুড়ির আওয়াজ আমি আর কখনো শুনি নি।

(নেপথ্যে কর্মকারের পদশব্দ)

অজয়—বুলি, তুমি খুব সুন্দর।

(পদশব্দ এগিয়ে আসে)

অজয়—বুলি, তুমি খুব, খুব সুন্দর।

(কর্মকার সজ্জিত হুঁকো-কল্কে নিয়ে প্রবেশ করে, এক খণ্ড জলন্ত কয়লা কল্কের উপর চাপিয়ে)

কর্মকার—এই নিন কর্তা, বেশ কড়া তামাক।

অজয়—(হুঁকো নিয়ে) একটা কড়া কিছুর দরকার হয়ে

পড়েছে (হুঁকো টানতে থাকে, খানিকক্ষণ টেনে) কর্মকার !

কর্মকার—আজ্ঞে করুন।

অজয়—তুমি লোহার কাজ ছেড়ে দিয়ে সোনার কাজ সুরু কর।

কর্মকার—(হেসে) আমার তামাকের গুণ আছে কর্তা।

অজয়—নেশাটা লেগেছে আগেই।—আমি বলি ভারি ভারি হাতুড়িগুলো বিদেয় করে ছোট ছোট হাতুড়ি আন, আর আমাকে রাখ তোমার শাগরেদ।

কর্মকার—সোনা দিয়ে কুড়ুল আর কোদাল গড়াব ?

অজয়—না, গড়াব চাঁপার কলির মত আঙুলের জন্যে আংটি, সুডৌল নরম হাতের জন্যে চুড়ি।

বুলি—(অজয়ের দিকে কটাক্ষপাত করে)

অজয়—আর তুমি যখন খেটেখুটে ক্লান্ত হয়ে ঘরে বসে বেহালা বাজাবে, আমি তখন বুলির সঙ্গে—

(বুলি তীব্র কটাক্ষপাত করে, অজয় থেমে যায়—নেপথ্যে মোটর-হর্ণের আওয়াজ হয়)

কর্মকার—ঐ কর্তা, হৃদয়গঞ্জের বাস আসছে।

অজয়—(হুঁকো কর্মকারের হাতে দিয়ে) দু'চার দিন পরে এলেও ক্ষতি ছিল না।

(মোটর হর্ণের আওয়াজ কাছে আসে, অন্দর থেকে রুলি ছুটে প্রবেশ করে, কর্মকার হুঁকো হাতে এগিয়ে যায়—অজয় তাকে অনুসরণ করে)

অজয়—(যেতে যেতে বুলির দিকে তাকিয়ে) হৃদয়গঞ্জের বাস কি হৃদয়হীন। (প্রস্থান, নেপথ্যে মোটরের আওয়াজ, যাত্রীদের কোলাহল)

বুলি—(রুলিকে) ও সত্যিই রাজপুত্তুর।

রুলি—ইস্, তুই তো বললি ও রাজপুত্তুর নয়, বাস-ড্রাইভার।

বুলি—না না, সত্যিই রাজপুত্তুর—ও আমাকে সুন্দর বলেছে।

(পটক্ষেপ)

পয়লা বৈশাখ ১৩৫৬

শ্রীজীবনময় রায়

আজিকে প্রভাতে নয়ন মেলিয়া নভে
 পেয়েছি মা তব বিভূতির পরসাদ,
হে দেশজননি, আবার মা ভৈঃ রবে
 জাগাও ভারতে, দূর হোক পরমাদ।
 দুর্ভাগা নহে আমার জন্মভূমি,
 ত্রিংশতি-কোটি সন্তানবতী তুমি,
 ঘুচাও তাদের মৃত্যুর অবসাদ।

নব বরষের নবীন প্রভাতে আজি
 উঠ, জাগো মাগো, শ্মশান-আসন ছাড়ি ;
দিকে দিকে শোনো উঠিল শঙ্খ বাজি—
 ঝঞ্ঝা-মথন সাগরে কে দিবে পাড়ি !
 অযুত যুগের শব-সাধনার পারে,
 জাগো গো জননি—ডাকো সবে হুঙ্কারে—
 জাগো মহামায়া, উঠ শবাসন ছাড়ি।

তোমারে দেখেছি ছিন্নমস্তা রূপে
 আপন হস্তে আপন মুণ্ড ছেদি'
করিতেছ স্নান তপ্ত রক্তকূপে ;
 উঠিছে শোণিত-উৎস হৃদয় ভেদি' ;
 ছিন্ন মুণ্ড করিছে রক্ত পান,
 বিদারিয়া দিশি উঠে ক্রন্দন-তান ;
 শ্মশানে-মশানে রচিতেছ শব-বেদী।

দেখেছি তোমারে মহাকাল-রুদ্রাণী
 নিজ সন্তানে হানিছ তীক্ষ্ণ অসি ;
নৃ-মুণ্ডমালা বক্ষে, আয়ুধ-পাণি,
 কুন্তল ভেদি' নাগিনীরা উঠে শ্বসি,
 প্রলয়ঙ্করী ঝঞ্ঝা-রজনী-রূপা,
 নিজ মন্দলে দলিছ দাপায়ে দু'পা
 সর্ব্বনাশের অতল পাতালে পশি।

আবার দেখেছি তোমার বিরাট কোলে
 পালিছ সবারে—ভুলিয়া আপন-পর ;
ক্ষমা ও পুণ্যে বিশ্বভুবন তোলে
 হিংসা-দ্বন্দ্ব। তব কল্যাণ-কর
 বিশ্বে বিতরে মহাশান্তির বাণী ;
 থেমে যায় যত নিঠুর হানাহানি,
 ভুবনে ভুবনে প্রেমের দুয়ার খোলে।

জাগো ভৈরবি, রুদ্র আলোক মাঝে—
 কহ ডাকি সবে—ওঠ নিদ্রিত জাগো,
দুর্জ্জয় প্রাণে সাজো সাজো বীর-সাজে
 আগত লগ্ন—ভুবন বিজয়ে লাগো ;
 প্রেমে ও বীর্য্যে করো ত্রিভুবন জয়,
 রটাও জগতে অমৃত-পরিচয়,
 জাগো ভৈরবি, রুদ্র আলোকে জাগো।

অস্তরাগের পথে

শ্রীচিত্রিতা দেবী

অবশেষে যাত্রা হ'ল সুরু। যাবার সময় যতই এগিয়ে আসে, ততই এক একটি বিপুল বাধা দাঁড়ায় পথ আগলে। কি করে তাদের এড়িয়ে যাব ভেবে পাই নে। যুদ্ধকালীন 'বিফল দেয়ালে'র মত, তাদের অলিগলির ভেতর দিয়ে কোনমতে বেরিয়ে পড়ে একেবারে ট্রেনে চড়ে বসলুম। কিন্তু মনটা বাঁধা পড়ে রইল। আমাদের দেশে খেতে শুতে চলতে ফিরতে নানা ধরণের অসংখ্য বাধা পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে পথ আটকে রাখে, স্বচ্ছন্দে চলা বিষম দায়। দেহটাকে কোন মতে বের করে আনলেও মনটাকে অত সহজে মুক্ত করা যায় না— সে তার পুরনো কেন্দ্রকে পাক দিয়ে দিয়ে ঘুরতে থাকে। নূতন জিনিষকে চেয়ে দেখার দৃষ্টি হয়ে যায় ঘোলাটে। কলকাতা থেকে বোম্বে এই পথটুকু তেমনি একটা কুয়াসাচ্ছন্ন ঝাপসা আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে কাটল।

বোম্বাইয়ে এসে পৌঁছলাম যখন সকাল আটটা—ঝকঝকে নূতন শহরটি সমুদ্রের কোলে ছবির মত জেগে উঠল। বড় বড় ষ্টেশন সব পার হয়ে ট্রেন এসে থামল একেবারে ষ্টীমার-ঘাটের সামনে। সাড়ে দশটায় ডাক্তারি পরীক্ষা হবে, এর মধ্যে খুঁটিনাটি অনেক কাজ সেরে নিতে হ'ল। ডকের উপর-তলায় প্রকাণ্ড হলঘরে গাদাগাদি করে বসে আছে মেয়ের দল—ছেলেপেলে, কাচ্চাবাচ্চা সামলাতে ব্যতিব্যস্ত। চুপচাপ বসে আছি অপেক্ষা করে। সমস্ত পরিবেশের মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত আচ্ছন্নতা মনটাকে ছেয়ে ফেলেছে। খুকু কিন্তু দিব্যি মজায় আছে। সকালবেলা জ্বর ছেড়ে যাওয়ায় ওকে সুস্থ সুন্দর লাগছে—কুতূহলী দৃষ্টি দিয়ে বাচ্চা-দের কাণ্ডকারখানা দেখছে। ডাক্তারকে দেখে মনটা হঠাৎ খুশী হয়ে উঠল—ও মা এ যে আমাদেরই একজন। দলে দলে সাদা সাদা রং-করা মুখের মাঝখানে, ভারতের শ্যামল আভা মেশানো পার্শী একটি মেয়ে এসে বসল ডাক্তারের আসনে এবং জাহাজী নীতির একটুও ব্যতিক্রম হতে দিলে না। মেয়েরা যখনই মাঝে মাঝে ভিড় করে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে, ভারতীয় মেয়ের তর্জনী হেলনে তখনই তাদের ফিরে যেতে হয় নিজের যায়গায়।

কাষ্টমসের কাছে মাল ছাড়ানো, টিকিট সংগ্রহ ইত্যাদি করে যখন জাহাজে এসে উঠলুম তখন গরমে এবং ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন। জাহাজটাকে একটা বিরাট খাঁচার মত মনে হচ্ছে—হাওয়া নেই কোথাও। লম্বা লম্বা ডেক জাহাজটাকে ঘিরে রয়েছে—কিন্তু শান্তি নেই সেখানেও। মঙ্গলবার সারাদিন কাটল ভ্যাপসা গরমের মধ্যে—যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে একটা পুরো দিন-রাত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এই চিন্তাই মনের মধ্যে একটা বিরূপ ভাব সঞ্চার করে—তার উপরে হাওয়া নেই। জাহাজ না ছাড়া পর্য্যন্ত স্নান করা চলবে না। গুমট গরমে সিদ্ধ হতে হতে বিলাতযাত্রার সখকে ধিক্কার দিলাম।

জাহাজটাকে চৌরঙ্গির প্রকাণ্ড যে-কোন বড় হোটেলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। তিন হাজার যাত্রী নিয়ে চলেছে। তার মধ্যে অর্দ্ধেক অবশ্য সৈন্যদল। আধখানা ডেক তাঁরা দখল করে বসে আছেন, সেদিকে একটু উঁকি মারতে যাও ইউনিফর্ম্ম পরা কেউ এসে বলবেন—Sorry Madam, out of bounds—এখানে ওখানে কত যে 'out of bounds' তার ঠিক নেই। সৈন্য চলেছে যুদ্ধনীতির অনুশাসনে আবদ্ধ হয়ে। আমাদের মত যে সব অজ্ঞ নাগরিকেরা চলেছে এই জাহাজে, তারা সকলেই এই নিয়মে পড়েছে বাঁধা। থেকে থেকে বিভিন্ন মাইকে ধ্বনিত হচ্ছে গর্জ্জন—অমুক সৈন্যদল অমুক যায়গায় যাও—পয়লা নম্বরের নাগরিকদল অমুক ঘরে খেতে যাও, ইত্যাদি। মাইকের জ্বালায় মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে উঠতে হয়। আমার কেবিনে একটি মেয়ের দুটি দুরন্ত ছেলে আছে। তারা অনবরত হারিয়ে যায়, আর সেই খবর ধ্বনিত হয় মাইকে। ছেলে দুটি হারিয়ে হারিয়ে বিখ্যাত হয়ে উঠল। বড়দের এই সুবিধা নেই, নইলে আমরা সবাই ঠিক করেছিলাম একবার করে হারিয়ে যাব। জাহাজটা শুনছি আগে ছিল বিলাস-তরণী। যে কেবিনে আগে দুটি মাত্র বার্থ ছিল, সঙ্গে ছিল স্নানের ঘর—সেই কেবিনে আজ আটটি বার্থ হয়েছে এবং স্নানের ঘরের চিহ্ন নেই। মেয়েদের জন্যে দুটি মাত্র স্নানের ঘর নির্দ্দিষ্ট। এ যেন বোর্ডিঙে বাস—তবে বোর্ডিঙে এত ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতে হয় না। জাহাজ-ভর্ত্তি কত যে কাচ্চাবাচ্চা তার সংখ্যা নেই। বাচ্চা-গুলো কি যে করে বেড়াচ্ছে তার ঠিক নেই। দৌড়ো-দৌড়ি, হুড়োহুড়ির অন্ত নেই। লুকোচুরি খেলছে, ডেকের ওপরে দোলনায় দুলছে, ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে, ময়লা জল ফেলে দেবার নর্দ্দমা থেকে জল এনে পুতুল খেলছে—সমস্ত ডেকটা বসে বসে ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে চলে চমৎকার রঙীন পোশাকগুলো কাদামাখা করছে, কেউ কিছু বারণ করছে না। তাদের মায়েরা হয়ত চেয়ারে বসে উল বুনছে, বা লাউঞ্জে গিয়ে তাস খেলছে, কিম্বা 'বারে' গিয়ে মদ খাচ্ছে, অথবা ছাতে গিয়ে রিং খেলছে। ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তা তাদের কাবু করতে পারে না। যদি রেলিং বেয়ে উঠে জলে পড়ে যায়,

জলযানে শিশুগণ

যদি ছুলতে গিয়ে হঠাৎ অসাবধানে চলে যায় ঢেউয়ের দেশে, যদি নোংরা ঘেঁটে অসুখ করে, এই সব যদির বোঝা তাদের মনকে ব্যাকুল করে না। তারা নিশ্চিন্তে নিজের কাজ ও আমোদ প্রমোদ করে এবং শিশুরাও ছোটবেলা থেকে স্বাধীনতার আস্বাদে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এরা স্বাধীন দেশের মানুষ, এরা স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়ে। শিশুকাল থেকে স্বাধীনতার হাওয়ায় এরা বর্দ্ধিত। আশ্চর্য্য এই যে, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও স্বাধীনতাকে এরা শিশুকাল থেকে একসঙ্গেই গ্রহণ করে। খাবার ঘণ্টাটি বাজলে ঠিক সময়ে গিয়ে সবাইকে খাবার টেবিলে হাজির হতে হয়, সন্ধ্যা সাতটায় বিছানায় যেতে হবেই, সে তুমি ঘুমোও, চাই না ঘুমোও। তোমার এলাকায় তুমি যা খুশী কর, কিন্তু যেখানে বড় বড় হরফে লেখা আছে—'শিশুদের প্রবেশ নিষেধ'—সেখানে বড়রা ফিস্‌ফিস্ করে ছোটদের বুঝিয়ে দিচ্ছে ওখানে যাওয়া চলবে না, কেউ আর পা বাড়াচ্ছে না। একেবারে অপোগণ্ড শিশুরাও সম্পূর্ণ স্বাধীন, তবে তাদের স্বাধীনতার পরিধিটা খুবই সঙ্কীর্ণ। ৭।৮ মাস থেকে প্রায় দু' বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের জন্তে প্রায়ই খোঁয়াড়ের ব্যবস্থা। রঙীন কাঠের উঁচু বেড়া দেওয়া খোঁয়াড়ের ভেতরে সতরঞ্চি বিছিয়ে তারা বসে থাকে নিজেদের সম্পত্তি চার দিকে ছড়িয়ে—পরনে থাকে মোটা তোয়ালের ওপরে রবার অথবা প্ল্যাষ্টিকের পাজামা—ব্যস্, ৩।৪ ঘণ্টার মত সেও নিশ্চিন্ত, তার মাও তাই। শ্রীমতী টি. বললেন—বাবাঃ, আমার একটিই যথেষ্ট, আর সখ নেই—বিশেষতঃ, দেশে এখন চাকর-বাকর পাওয়া যাবে না—বড় ঝঞ্চাট। শ্রীমতী কে তিন মাসের খোকার ছোট দোলনাটি দু'বছরের খুকীর খোঁয়াড়ের পাশে রাখতে রাখতে বললেন—তা বললে কি হবে, ঝঞ্চাট আছে বলে ছেলে-পিলে হবে না? আমি বললাম, সত্যিই তো, কিন্তু তোমাদের কাজের কিংবা আমোদ-প্রমোদের অসুবিধে হয় না?

সে বললে, কেন শিশুদের নার্সারীতে দিয়ে আমরা কাজে যাই। আমি তো চুল সাজাবার দোকানে ন'টা থেকে বারটা আবার দুটো থেকে পাঁচটা অবধি কাজ করি। আর মজুর ইত্যাদির জন্তে কত যে 'ক্রেসে'র ব্যবস্থা হয়েছে। কাজ সেরে ফিরে এসে ওদের খাইয়ে-দাইয়ে শুইয়ে দিয়ে ৭টার সময় অনায়াসে তুমি সেজেগুজে সিনেমায় যেতে পার, কিংবা নাচে। ছেলেপিলে হ'ল বলেই দাম্পত্য-জীবনের মাধুর্য্য ক্ষুণ্ণ হতে দেব কেন? শিশুদের যা দরকার তাদের জন্তে তা করব বটে, তাই বলে আমাদের জীবনের পক্ষে যা প্রয়োজনীয় তাকেও তো বাদ দিলে চলবে না। আমার স্বামী খবরের কাগজের আপিসে কেরাণী—সারাদিন আমরা যে-যার কাজে ঘুরি, সন্ধ্যা হলে দু'জনে এক সঙ্গে একটু আমোদ-প্রমোদ না
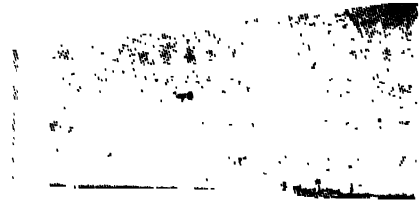
একটি ভাসমান জাহাজ

করলে আমাদের জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠবে। কিন্তু তাই বলে স্বাস্থ্যবান সবল ছেলেমেয়ের মা হয়ে জাতির বা দেশের উপকার করব না কেন? অর্থাৎ এক কথায় ছেলেমেয়ে খুব ভাল কিন্তু তাদের মাথায় চড়তে দিতে নেই। সন্তানদের প্রতি কর্ত্তব্যে এবং নিজেদের প্রতি কর্ত্তব্যে খুব বেশী সম্বন্ধ বাধবার সম্ভাবনা নেই।

আমাদের দেশের মেয়েরা ষোল-সতের বছর বয়স থেকেই মাতৃত্বের ভারে নুয়ে পড়ে। এক দিকে দুরে-পড়া মায়ের বাঁকা চলন, অন্ত দিকে 'বাড়ির কর্ত্তা'র সদম্ভ পদচারণ এবং মা ও চাকরবাকরদের প্রতি বীরবিক্রম দেখে দেখে তারা এক দিকে অতি সহনশীল ও অন্ত দিকে বদমেজাজী হয়ে ওঠে। সবলের কাছে অত্যন্ত নিরীহ ও দুর্ব্বলের কাছে কঠোর প্রভু হয়ে বসে। 'এই জুতো ওখানে যাসনি, করলি কি, ও যে মেথরের ছেলে, ছুঁয়ে দিলি? ছি ছি', 'এই মেয়ো, কেন এসেছিস, শীগ্‌গির যা এখান থেকে', 'আঃ পেঁচো, আবার কোথায় গেলি, তোকে যে দেখতেই পাওয়া যায় না'

নাবিক-জাহাজের আগমন

ইত্যাদি বিচিত্র এবং বিপরীত শাসনের তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনতে শুনতে আমাদের ভুতো, বেঁধো, পেঁচোর দল এক দিকে যেমন অন্যায় শাসনের অত্যাচার সইতে অভ্যস্ত হয়, অন্য দিকে তেমনি অনুশাসনকে ফাঁকি দিতে ওস্তাদ হয়ে ওঠে। সব সময়েই যে শিশুকে সহস্র বিধিনিষেধের মধ্যে দিয়ে বড় হয়ে উঠতে হচ্ছে, জীবনে কোন্ নিষেধের সে সত্য মূল্য দেবে একথা ঠিক করা তার পক্ষে বড় কঠিন হয়ে পড়ে। 'মিথ্যা কথা বলা' বেশী খারাপ, না, পক্ষীবিশেষ খাওয়া বেশী, তা সে ঠিক করতে পারে না, ফলে শেষ পর্য্যন্ত সে কোন নিষেধই মানে না—অর্থাৎ নিষিদ্ধ পক্ষীও খায়, মিথ্যাও বলে। কিন্তু একজে তাকে তো দোষ দেওয়া চলে না; দোষ আমাদের প্রচলিত সমাজের শিক্ষাব্যবস্থার যা আমাদের মনে প্রাণে একান্ত পরমুখাপেক্ষী করে তুলছে। এই পরমুখাপেক্ষিতা আমাদের মজ্জায় মজ্জায় তার শিকড়জাল বিস্তার করেছে, ভয় ও নিষেধের পাক দিয়ে দিয়ে আমাদের বুদ্ধিকে করেছে আবিল, হৃদয়কে করেছে পঙ্কিল। যে-লোক অহোরাত্র সহস্র বন্ধনের অধীন, স্বাধীনতার অর্থ সে কি জানে? আমাদের দেশে বয়স্ক লোকেরাও বাপমায়ের প্রত্যেকটি ইচ্ছার অধীন, স্ত্রী স্বামীর অধীন, ছেলেমেয়েরা পান থেকে চুন খসলেই 'চোরের মার' খাচ্ছে, আবার আবদেরে শিশুর জবরদস্ত কান্নায় মায়েরা সম্পূর্ণ তাঁদের অধীন। স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিকভাবে নিজের পথচলাকে সহজ ও পরের পথকে সরল করে তোলা আমাদের ধাতে নেই। খেতে শুতে চলতে ফিরতে বাধার অন্ত নেই। এই প্রতিবন্ধকের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করে জীবনের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। পৃথিবীর অন্য জাতির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে জীবনের অমৃতকে আহরণ করে আনব, এমন শক্তির সম্বল কোথায়? এখানে একসঙ্গে চলেছে তিন হাজার যাত্রী। কোথাও একটুকু ঘিরিঘিরি খাম নেই—চেয়ার পেতে সব বসে আছে পাশাপাশি। যার চেয়ার নেই, ওরি মধ্যে মাটিতে একটু জায়গা করে বসে পড়েছে, তবু দেখবে, তোমার চেয়ারখানির মধ্যে তুমি নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীন। তোমার নিজের জায়গায় সভ্যজীবন-সম্মত (ওদের মতে) যা খুশি করবার স্বাধীনতা তোমার আছে। কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে কেউ তোমায় বিঁধবে না, বরং স্বাধীনতার বাড়াবাড়ি যদি কোথাও ঘটে চোখ ফিরিয়ে চলে যাওয়াটাই ভদ্রতা। এরা স্বাধীন বটে, তবে স্বতন্ত্র নয়। সাধারণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা আছে এদের মজ্জায়। সকলেই সাধারণের পক্ষে খাটে এমন যে-কোন একটা ব্যবস্থা মেনে চলায় পক্ষপাতী। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে এত গোছালো স্বভাব বলেই এরা ঐশ্বর্য্যকে সকস করে রাখতে পারে। এই যে বিরাট কারখানা, এর কোথাও একটু গোঁজামিলের ঝোঁক নেই। সব যেন কলে চলেছে। যেমন বন্দোবস্ত—তেমনি ঐশ্বর্য্যও বটে। বিশাল খাবার ঘর শ্বেতপাথরের, তার ওপরে নরম কার্পেট মোড়া, ফুল দিয়ে সাজানো—প্রকাণ্ড লাউঞ্জ,'বার', নাপিতের দোকান, মেয়েদের চুল সাজাবার ঘর, বাচ্চাদের নার্সারী, ডাক্তারখানা, লাইব্রেরি, মনিহারী দোকান, কিছু বাকী নেই। সভ্যজীবনযাত্রার যত কিছু উপকরণ, সব নিয়ে চলেছে। আগেকার দিনে যাত্রীর সম্বল ছিল, লাঠি এবং পুঁটলী। গৃহের সুখাশ্রয়কে বহুদিনের জন্যে বর্জ্জন করে নূতন দেশের নূতন পরিবেশের অসংখ্য দুঃখ-অসুবিধার মধ্যে দিয়ে চলতে হ'ত বলেই আমাদের আরামপ্রিয় ভীরু মন যাত্রার জন্যে অত বাধা-নিষেধের সৃষ্টি করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান গৃহ ও পথের মধ্যে কোন ভেদ রাখে নি। আধুনিক গৃহের হাজার রকম খুঁটিনাটির একটি উপকরণও বাদ পড়ে নি,ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ আর একটি ছোট দ্বীপ যেন ভেসে চলেছে। তবু লোকের মুখে শুনছি জাহাজে নাকি এত কষ্ট করে কেউ এর আগে কখনও আসে নি। মনে পড়ছে আমাদের দেশের নদী পার হবার ষ্টীমারগুলোর কথা। সেখানে আমাদের সাধারণ লোক হাজারে হাজারে কেমন ভাবে আসা-যাওয়া করে, সেকথা এই বিলাসোপকরণবহুল জাহাজের আরামকোচে বসে কল্পনা করাও যায় না, যে পৃথিবীতে এক দলের জন্যে এমন চমৎকার ব্যবস্থা, সেই পৃথিবীতেই অন্য দলের এত দুর্দ্দশা কেন। তবু থেকে থেকে নানা অভিযোগের আভাস পাওয়া যায়—চাকর-বাকর কমে গেছে, জুতো পালিস করে দিতে কেউ আসে না—খাবারের 'মেনু' বিশেষ রকমারি নয় ইত্যাদি নালিশের মৃদু গুঞ্জন নানাদিকে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। এত আরামের ব্যবস্থার মধ্যেও ছোটখাটো অসুবিধা মাথা তুলে দাঁড়ায়। একটি প্রধান অসুবিধা এত লোকের একসঙ্গে বাস, বিশেষতঃ আমাদের মত গৃহবদ্ধ জীবের পক্ষে। যত বড়ই জাহাজ হোক, এত লোককে জায়গা দেবার মত যথেষ্ট স্থান

এতে নেই। খুব কম হলেও সাধারণতঃ মানুষ চায় তার নিজের ছোট একটি নিরালা কোণ, যেখানে দিনের শেষে সে তার নিজের সংসারের মধ্যে বিশ্রাম করতে পারে। কিন্তু এ যেন হাটের মধ্যে আছি—এত বড় জাহাজে কোথাও একটু ফাঁক নেই। কোন রকম গোপনতার অবকাশ নেই। তার মধ্যে আবার প্রেমিক-প্রেমিকার ছড়াছড়ি—এত ভিড়, লোকজন, কাচ্চাবাচ্চা গিস্ গিস্ করছে. তবু তাদের প্রণয়-লীলার ব্যতিক্রম হবার যো নেই। ওরই মধ্যে দেখতে পাবে কোথাও একটু কোণায়, একটু নিভৃত স্থানে যুগলের লীলা—সঙ্কুচিত হয়ে চলে আসতে হয়, তাদের কোন সঙ্কোচ নেই। এরা সভ্য হতে হতে এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে, যেখান থেকে সভ্যতার আবরণ অনায়াসে খুলে ফেলা যায়—অর্থাৎ সভ্যতা যেন রক্তের সঙ্গে মিশে মজ্জায় মজ্জায় গ্রন্থি ফেলে এদের সত্তাকে আচ্ছন্ন করে নি। সভ্যতাকে এরা যেন বকমকে চাদরের মত গায়ে জড়িয়ে রেখেছে। চাদরটা একটু সরিয়ে দিলেই আদিম ব্রিটনের আভাস পাওয়া যায়।

এই নিয়ে খুব কষে রাগ করতে গিয়ে মনে পড়ল সেকালের কথা—মেঘদূত আর কুমারসম্ভবের পাতায় পাতায় এদেরই কি বর্ণনা নেই অন্যভাবে। সংস্কৃত কবিদের বর্ণনায়, অজন্তার ছবিতে যেসব মেয়েকে দেখতে পাই তাদের শালীনতার চেয়ে ভূষণের বাহুল্য ছিল বেশী। দেহটা ঢাকা দেওয়ার চেয়ে তাকে সাজিয়ে তোলাই ছিল উদ্দেশ্য। তখনও তাঁদের ঠোঁট ছিল রাঙা, চোখে ছিল অঞ্জন—বাঁকা হাসি হেসে, কাজল চোখের কুটিল কটাক্ষে তারাও চালাত প্রেমের ছলাকলা। এরাও আজকে সেই জীবনই বয়ে চলেছে, জীবনযাত্রা-পদ্ধতির ধরণটা বদলেছে মাত্র। তখনকার মেয়েদের ছিল দুকূল বসন—এদেরও তাই। গরমে এরা হাঁপিয়ে উঠছে। কোমর থেকে ছোট্ট একটা ঘোরানো পাজামা হাঁটুর আধহাত ওপর পর্য্যন্ত নেমে পায়ের তালে তালে নাচছে—রঙীন কাপড়ের টুকরোয় বক্ষ ঢেকে ফিতে দিয়ে বেঁধে দিয়েছে ঘাড়ের ওপরে এবং পিঠের প্রান্তে। বাকী সমস্ত অঙ্গে শুভ্র মসৃণ নিরাবরণতা। এই সাজে রোদ্দুরে বসে বসে গল্প হচ্ছে পা ছড়িয়ে, হৈ হৈ করে ফ্ল্যাশ চলছে, 'বার'-এ গিয়ে মদ চলছে—দেখে দেখে এক এক সময় গা সির সির করে উঠছে, মনে হচ্ছে এই অসভ্যদের দেশে চলেছি কেন। জুলু দ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে এদের তফাৎ কোথায় ?

কিন্তু তবু বলব, এদের প্রাণচঞ্চল প্রবল জীবনস্রোত দেখে চমক লাগে। যেমন অজস্রধারায় জীবনকে ভোগ করছে, তেমনি পুষিয়ে দিচ্ছে তার দাম। আয়ার্ল্যান্ড থেকে যে তিনটি মেয়ে চলেছে, তাদের কথাই ধরা যাক না। তারপরে ডাকতে যাওয়া মনে বলব না—এখানে মোট চৌপদের মোট

নোঙর-ফেলা জাহাজ
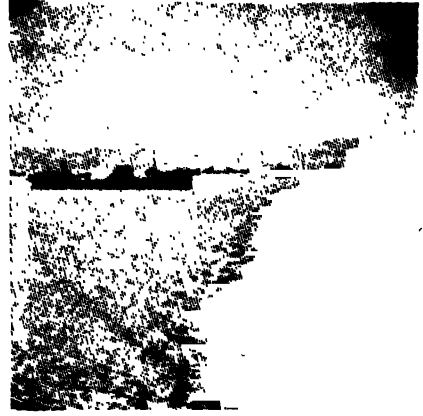
বেসিনে যেমন ফূর্ত্তির সঙ্গে তারা কাপড়চোপড় কাচছে, ইস্ত্রিঘরে গিয়ে ইস্ত্রি করে আনছে, ছেলেপিলের জুতো ছিঁড়ে গেলে জুতো সেলাই করে ফেলছে চটপট, আবার তেমনি ফূর্ত্তির সঙ্গে 'বার'-এ গিয়ে মদ খেয়ে আসছে। পারিপাট্যের এতটুকু ব্যতিক্রম হবার যো নেই—যাহোক করে চালিয়ে নেব—এমনতর মনোভাব কোথাও দেখা যায় না। যত অসুবিধাই হোক প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সব সময়ে চালিয়ে নিতে হবে—এটাই তারা জানে এবং এ চালিয়ে নেবার যোগ্যতাও এদের আছে। এটা যে এই মেয়েদেরই কোন একটা বিশেষ গুণ তা বলতে পারি না, এটা ওদের ছোটবেলার শিক্ষার গুণ। আমাদের দেশের মেয়েরা বিদ্যাবুদ্ধিতে কোন অংশেই এদের চেয়ে হীন নয়, তবু সংসারের প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজেকে চালিয়ে নেবার মত বিশেষ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা তাদের জন্যে নেই। পড়াশুনার বিষয়ে তাদের খুব বেশী একটা যে আগ্রহ আছে তা নয়, তবু বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা সকল শিশুকেই পাঁচ বছর বয়সে স্কুলে দিতে বাধ্য করে। স্কুলে মোটামুটি লিখতে পড়তে শেখে সকলেই, কিন্তু যার ভেতরে জ্ঞানের পিপাসা আছে সেই উঠে যায় ধাপে ধাপে ; যার নেই, তাকে কেউ হুইস্কির মত জ্ঞানের বড়ি গিলিয়ে দিতে যায় না। আর অর্থ উপায়ের এত রকম পদ্ধতি এরা জানে যে, সকলকেই পড়াশুনোয় ভীষণ রকম ভাল হয়ে আই-সি-এস হবার জন্যে প্রাণপণ করতে হয় না। আগে এরা মানুষ হয়, তারপরে হয় পণ্ডিত। টাকার জন্যে পণ্ডিত হবার এদের দরকার হয় না। আমাদের দেশে স্কুলে যাবার সময় থেকে আরম্ভ হয় ছেলেদের দুঃখের দিন। বাড়ীতে গুরুজনেরা দেখলেই বলছেন—'যা, পড়তে বোস গিয়ে।' ইস্কুলে মাষ্টাররা খাচ্ছে জলের মত গড়িয়ে—যত বড় হয় তত এর জের থাকতে পারে। কলেজে এলে আর উপায় থাকে

সমুদ্র হইতে এডেনের দৃশ্য

না। যে বেচারার বুদ্ধির প্রদীপে বেশী তেল পড়ে নি, তার কপালে হরিমটর। কিন্তু কেন? বিদ্যাবুদ্ধি বেশী না থাকলেও ভালভাবে বাঁচবার দাবি কারো কমে না। আমাদের দেশেও আগে এর দরকার ছিল না। মানুষ মানুষের মতই বাঁচত, বিদগ্ধ মনের আনন্দে বিদ্যাচর্চ্চায় মগ্ন থাকত। তাই আশ্চর্য্য লাগে যখন দেখি, নিজের দেশের মানুষের ভালভাবে বাঁচবার দাবি যারা এত বেশী করে জানে, তারা কি করে আমাদের সমস্ত দেশটাকে একটা কেরাণী তৈরীর কারখানা করে তুলেছে। কোথাও যদি প্রাণের কোন লক্ষণ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে তাকে ছিন্নভিন্ন দলিত পিষ্ট করে ফেলেছে।

পরদেশের রক্ত শোষণ করে এরা নিজেদের দেশের বিলাসের উপকরণ সংগ্রহ করে। আমাদের দেশে কখনো এ আদর্শ বড় হয়ে ওঠে নি। সংসারের প্রত্যেক কর্ম্মে পরের জন্যে স্বার্থত্যাগই আমাদের দেশের গৃহীর আদর্শ। অতিথি গৃহে এসে গৃহীকেই কৃতার্থ করেন। এই আদর্শ আমাদের জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। সেজন্যে বাইরের দিক দিয়ে আমাদের কত যে ক্ষতি হয়েছে সে কথা সকলেই জানেন। আমরা জীবনসংগ্রামে বরাবর হেরেই এসেছি, আমরা চটপট করে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতে পারি নি—অন্য দেশের লোকের চাকায় নিজেদের বলি দিয়েছি হতাশভাবে, তবু সকল মানুষের চেয়ে যে বিশেষ ভাবে আমাদেরই বাঁচবার দাবি বেশী এ কথা কখনো মনে করি নি। তাই এখনো যখন দিগন্ত আচ্ছন্ন করে বিশ্বের লোভ, আমাদের নিঃশেষ করে দিতে তার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে মুখব্যাদান করে দাঁড়াল, যখন দেশপ্রেমের নবীন বাণীতে আমাদের দেশের মানুষকে নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ল, তখনো নূতন ভারতের নবযুগের ঋষিরা সাবধানতার বাণী উচ্চারণ করেছেন। দেশপ্রেমের নবনব প্রেরণার বাণীতে দেশকে প্লাবিত করে দিলেও তাঁরা বিশ্বকে বিস্মৃত হন নি। তাঁরা বলেছেন—'হে আমার দেশের মানুষ, তোমরা বড় হও, উচ্চে তোল শির, কিন্তু ভুলো না তোমাদের ঐতিহ্যকে। যে অতীত ভারতের চিত্তের ঐশ্বর্য্য পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল সেই ভারতের আদর্শ তোমরা গ্রহণ কর।' আজকের দিনে যখন উগ্র জাতীয়তাবাদের বন্যায় সমস্ত পৃথিবী ভেসে চলেছে, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর গৃহের প্রান্তে বিশ্বের জন্যে আসন পাতলেন, রচনা করলেন বিশ্বভারতী। হিংসাবিক্ষুব্ধ জনতার মাঝখানে একাকী দাঁড়িয়ে কটিবাস পরিহিত মহাত্মা প্রচার করলেন মানবতার বাণী। প্রাচীন ভারতের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই মহাপুরুষদের কথা মনে হলে আশা হয় যে, বাঁচবার জন্যে পশ্চিমের এই সভ্যতাকে অনেকাংশে গ্রহণ করতে হলেও আমরা হয়ত এদের মত শোষক সম্প্রদায়ে পরিণত হব না। মানুষের মত বেঁচে ওঠবার যে নূতন প্রেরণা আমাদের সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছে, সে আমাদের মানুষ করেই গড়ে তুলবে, দানব করে নয়। পুরাকালের দানবের এই রকমই তো বর্ণনা পড়া যায়। কত তাদের সুখসমৃদ্ধি, কত তাদের বিলাস-আয়োজন, রাবণের সুবর্ণ লঙ্কাপুরীর ঝকমকানি, ময়দানবের কত কলাকৌশল। কিন্তু তপোবনের ঋষি এদের ঘৃণাভরে বলেছেন দানবীমায়া—বলেছেন, এদের দেখে ভুলো না, এদের চোখ-ধাঁধাঁনো আয়োজনে আত্মার ঐশ্বর্য্যের সন্ধান মেলে না।

কিন্তু তপোবনের ঋষি যে অর্থে বাহ্য আড়ম্বরের নিন্দা করেছিলেন, তা আজ আমাদের কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে। আমরা যে এদের মত জাঁকজমকে রঙচঙে উজ্জ্বল হয়ে নেই সে আমাদের ইচ্ছার অভাব বলে নয়, সে আমাদের অক্ষমতা। আমরা যদি আজ সবল হস্তে নিজের দেশকে উচ্চে তুলে ধরতে পারতাম, যদি মুমূর্ষু দেশবাসীকে ক্ষুধার অন্ন জুগিয়ে, চরিত্রে ও কর্ম্মে তাদের দৃঢ় করে তুলতে পারতাম তবেই আজ জোরগলায় ইউরোপের প্রতিবাদ করা চলত। আজ আমরা ভিখারীর মত দীনবেশে তাদের জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বারে এসে হাত পেতে দাঁড়াই। অত্যন্ত অবহেলাভরে, কুড়োনো-কাচানো উচ্ছিষ্ট কিছু তারা তুলে দেয় আমাদের হাতে। বড় বড় কথা বলার দিন আজ নয়।

বুধবার দিন এগারটার সময় জাহাজের লৌহবক্ষে যন্ত্রদানবের গর্জ্জন সুরু হয়—বিশাল প্রাসাদ জলের ওপর দুলে ওঠে। বন্দরে দাঁড়িয়ে বহুলোক রুমাল নাড়ে, কমলালেবু ছুঁড়ে দেয়, হাসে, লাফায়, নৌকা থেকেও ফিরে যায় তার প্রতিদান। ওদিকে মধ্যে আবার একদল গান ধরে

ওঠে—বিদায়কালীন সজল চোখের ছলছলানি বিশেষ কোথাও দেখা যায় না। ধীরে ধীরে ভাসমান দ্বীপটি এগিয়ে চলে, মুক্ত সাগরের পূর্ণরূপ ভেসে ওঠে। ভারতের উপকূল ছায়ার মত চোখের সামনে মিলিয়ে যায়, মিলিয়ে যায় নারকেল গাছের পাড়ঘেরা সবুজ তটপ্রান্ত, মিলিয়ে যায় সাদা সাদা বাড়ীগুলোর গম্বুজওয়ালা চূড়াসমূহ। ঐ যে লোকটা কমলা-লেবু ফিরি করছিল তাকে আর দেখা যায় না, কুলীদের ধূলি-মাখা মলিন মূর্তিগুলি অস্পষ্ট হয়ে আসে—ভারতবর্ষ তার সমস্ত চেঁচামেচি, হট্টগোল, তার ছিন্নবসনলাঞ্ছিত গোপন ঐশ্বর্য্য-সমেত চোখের সামনে থেকে সরে যায়। সেই মুহূর্ত্তে বুকের ভেতরটা টনটন করে ওঠে। ঐ যে ঝাঁকা মাথায় কমলালেবু-ওয়ালা, ঐ যে বিনুনীতে ফুল গোঁজা, কাছা দিয়ে শাড়ী পরা মারাঠী মেয়ে চলেছে খালি পায়ে, ঐ যে ছেলেটা খালি গায়ে হাফ প্যান্ট পরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, ঐ যে বৃদ্ধ মুসলমান, দাড়ি নেড়ে হাত দুলিয়ে গল্প করছে, আর ঐ যে রাঙা বালির প্রান্ত ঘিরে সমুদ্রের সীমানা—এদের সকলের সঙ্গে একটা গভীর আত্মীয়তা-বোধ শিরায় উপশিরায় ঝিন্‌ঝিন্ করে ওঠে। যতই মনে করতে চাই, এ যাওয়া তো নিতান্তই সাময়িক তবু কেমন একটা বিষণ্ণতার সুর সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ধরে—যেন বহুদিনের একটা যোগসূত্র ছিন্ন হতে চলেছে। ক্ষণিক বৈরাগ্যের মোহমাখা চোখে তাকিয়ে থাকি। চারদিকে শুধু জল, আর জল, শুধু নীল, আর সবুজ, আর ঘন নীলের ঢেউ কুঞ্চিত হয়ে ধকধকে সাদায় ফেটে পড়ে। এই সমুদ্র কতকাল ধরে, কত কবিকে দিয়েছে প্রেরণা, কত মনীষীর চিন্তা উদ্দীপিত করেছে, আবার কত সাধারণ লোকের চোখের সামনেও মেলে ধরেছে বিরা-টের ছবি। তাদের সে বহুবিচিত্র মনোভাবকে বুঝতে চেষ্টা করি, কিন্তু দুর্ব্বল হৃদয় যে বিচিত্রকে অনুভূতির গোচর করতে পারে না। হাল ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। ঢেউখেলানো নীল জল অবিশ্রান্ত ছুটে চলে, অথচ নদীর মত এর বিশেষ কোন লক্ষ্য নেই—বিশাল বিরাট একটা স্থিতির মধ্যেই অনুক্ষণ এর উদ্দাম গতির লীলা। ‘অনন্ত’, ‘অসীম’, এই সব কথাগুলি আমরা মুখে খুব ব্যবহার করি বটে, কিন্তু যথার্থ মানে বুঝতে গেলে বিহ্বল হতে হয়। সমুদ্রের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে যেন অসীমের একটা আভাস পাওয়া যায়। একটার পর একটা ছোট ঢেউ ওঠে পড়ে, ছোট ছোট ফেণার ঝিকিমিকি বিকীর্ণ করতে করতে ছুটে চলে—তার কোন লক্ষ্য নেই, তার চলায় সে কোন কিছুকেই অতিক্রম করে না—তবু তার অন্তহীন চলার শেষও তো দেখতে পাই না। দু'দিন ধরে তরঙ্গিত নীল জল মাঝে মাঝে সাদায় ছিটে নিয়ে অনবরত ঘুরছে। নিজের মধ্যেই পূর্ণ এর গতি, অনন্তের ছোট একটি ছবি।

এডেন বন্দর

অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে—এইবারে স্নান করতে যাওয়া যাক। ছোট ছোট টব ভর্ত্তি সমুদ্রের জল—পরিচারিকার মেজাজ ভাল থাকলে তার কাছ থেকে এক জগ পরিষ্কার জল হয়ত আদায় করা যায়। এরা এত পরিচ্ছন্ন পরিপাটি, এত সাজানো গোছানো, সুন্দর, ঝকমকে, তবু আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এদের অত্যন্ত নোংরা লাগে। মনে হয় সেই বর্ব্বর জাতির অভ্যাসগুলো, এদের পালিশ-করা মুখোসের অন্তরালে আজও আছে লুকিয়ে। আমরা যে মাংস খাই মসলার গন্ধে তার চেহারা যায় বদলে। এদের খাবার পুরোপুরি মাংসের মতই দেখতে—সেই আদিকালে যেমন ভাবে মাংস খেত, আধসেদ্ধ করে কিম্বা পুড়িয়ে--খেতে বসলে, নিহত পশুটার কথা মনে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। সব জিনিষ জলে ধুয়ে পরিষ্কার না করলে আমাদের ভাল লাগে না। এদের সে বালাই নেই। সাড়ে আটটার জল চলে যায়, ন'টার সময়ে ষ্টুয়ার্ডেস এসে একটা ভিজে ও একটা শুকনো ঝাড়ন দিয়ে কাঁচের গেলাস ও জগগুলো পুছে পুছে চকচকে করে রেখে যায়; জুতোগুলো ঝেড়েঝুড়ে যার যার বিছানার কোণে বেশ করে সাজিয়ে রেখে দেয়, এখানে ওখানে পড়ে থেকে পাঁচ জনের অসুবিধা, তার চেয়ে যার যার বিছানায় থাকা ভাল। ঐ ভয়ে আমি এক জোড়ার বেশী জুতোই বার করলাম না। কিন্তু ভারী কিটকাট এদের অভ্যাস। এত লোকে এক বেসিনে মুখ ধুচ্ছে, অথচ মেঝেতে এক ফোঁটা জল পড়ছে না। একসঙ্গে বাস করতে হলে যে সহিষ্ণুতা থাকা দরকার তা এদের আছে। এক-জনের মুখধোয়া সম্পূর্ণ শেষ হলে তবে আর একজন তাকে জিজ্ঞেস করে এগোয়, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এদের সব কাজ করা অভ্যাস যে, বিশেষ কিছু অসুবিধা হয় না। ওদের চরিত্রের মধ্যে যে একটা সতেজ স্বচ্ছন্দ সাবলীলতা আছে, সেটা ঈর্ষার বিষয়। এদের এই গুণটি আমাদের গ্রহণ করতেই হবে, তাই বলেই যে হুবহু এদের মতই হয়ে উঠতে হবে, তার কোন মানে নেই।

ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙল, তখনই বেশ আলো হয়েছে। স্নান সেরে বেরোতেই হাস্যমুখী সুন্দরী পরিচারিকা সাগরের মত নীল পোশাকে সাদা ফেণার মত টুপি পরে জানিয়ে গেল ব্রেকফাষ্ট তৈরি। এখানে ঝি-চাকরদের বড় কদর—কথায় কথায় তাদের ধন্যবাদ দেওয়া হয়। কোন কিছু করতে বললে, 'অনুগ্রহ করে' কথাটি বলাই রীতি।

আমাদের কেবিনে যে চারটি ইংরেজ মেয়ে চলেছে, তাদের ভারতীয় নাম অর্থাৎ তাঁরা বৈবাহিক সম্পর্কে ভারতীয়। ভারতের এই বধূরা একটু ফাঁক পেলেই তাঁদের ভারতীয় ঐশ্বর্য্যের কথা জানাতে ভোলেন না। এঁরা সকলেই কিছু দিনের জন্যে পিতৃগৃহে চলেছেন, আত্মীয়স্বজন যে তাঁদের সুখসমৃদ্ধি, তাঁদের ভৃত্যপ্রভুলতা, তাঁদের আসল হীরা-মোতি বসানো সোনার গয়না দেখে কি রকম চমৎকৃত হয়ে যাবেন একথা তাঁরা প্রায়ই আলোচনা করেন। অর্থাৎ পতিগরবিণী না হলেও এঁরা পতিগৃহগরবিণী বটে। একজন বললেন—আমি ইণ্ডিয়াতেই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কাটাব, আর একজন বললেন—ইণ্ডিয়াতে আরো বহুদিন পর্য্যন্ত বিদেশীদের থাকতেই হবে, ভারতেরই ভালোর জন্যে। বিদেশীদের কাছে তাদের অনেক কিছু শেখবার আছে। বললাম—"ওগো বিদেশিনী, বিদেশের কাছে অবশ্যই ভারতের কিছু শিক্ষা এখনো বাকী আছে, তবে ভারতের কাছেও অন্যান্য দেশের বহু শিক্ষা নেবার আছে। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে যদি বিদেশকে এসে ভারতের ঘাড়ে চাপতে হয়, তবে ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই ভারতকেও অদূরবর্ত্তী কালে হয়ত গিয়ে অন্য দেশের ঘাড়ে চাপতে হতে পারে।" ভারতে দুর্বিনীত ভৃত্যের সংখ্যা কি রকম বেড়ে উঠেছে সে বিষয়ে বর্ণনা করতে করতে, এক দিন এঁদের মধ্যে একজন (যিনি নিজেকে বাঙালী বলে পরিচয় দেন অথচ বাংলা ভাষা জানেন না) বললেন, সেদিন এক পুরোনো ভৃত্যকে মুখে মুখে উত্তর দেওয়ার অপরাধে তিনি তাড়িয়ে দিয়েছেন, যদিও জানেন বিশ্বাসী লোক পাওয়া সহজ নয় তবু কি করবেন—চাকরদের কাছ থেকে দুর্বিনীত ব্যবহার তো সহ্য করা যায় না। গল্প করতে করতে আমরা খাবার টেবিলে এসে বসি। ভারতের গল্প ক্ষণেকের জন্যে মেমসাহেবকে ভারতীয় মেজাজ এনে দেয়। ষ্টুয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে রুক্ষকণ্ঠে তিনি বললেন—'এত ময়লা গেলাসে জল খাওয়া আমার অভ্যেস নেই।' বলতে বলতে বোধ হয় মনে পড়ে যায়, তিনি এখন ইউরোপের পথে এবং ভৃত্য হচ্ছে একজন পুরোপুরি লালমুখ ইংরেজ, চকচকে কালো প্যান্টের ওপরে ধবধবে সাদা কোট পরে যে তাদের খাবার বহন করে আনছে। তক্ষুনি শুধরে নিয়ে মেমসাহেব বললেন—'অনুগ্রহ করে গেলাসটা বদলে দাও।' কিন্তু এত সহজে এদের পার পাওয়া যায় না। ষ্টুয়ার্ড একটু গর্ব্ব করার ভঙ্গী করে বললে—'কি করব ম্যাডাম, তুমি এত শীঘ্র সকলের আগে এসে টেবিল দখল করো যে টেবিল সাজাবার সময় আমরা পাই না। সাদা মুখ লাল করে বুড়ীকে কথাগুলো হজম করতে হয়। হাসি গোপন করে, বলি,—'দেখ তো আস্পর্দ্ধা, ভারত হলে, তুমি নিশ্চয় কর্ত্তাকে বলে ওকে তাড়াবার চেষ্টা করতে।' মুখ গোঁজ করে বুড়ী বললে, 'সে আমি এখনো পারি, তবে থাক গরীব বেচারার সর্ব্বনাশ করে আর লাভ কি?' বস্তুত ষ্টুয়ার্ডের অভিযোগ সত্য। বুড়ী দু'জন সবার আগে টেবিলে বসে ভাল ভাল জিনিষ যথা, জাম মাখন চিনি সব নিজেদের কাছে জড়ো করে রাখত; সেইজন্যে কেউই ওদের বিশেষ পছন্দ করত না।

আমাদের খাবার ঘরে দুটো বৈঠক বসে। প্রথম একজন ইংরেজ পুলিস অফিসার আমাদের টেবিলে বসেন।—মোটা-সোটা ভারিক্কী চেহারা—ভারতের ঘি দুধের প্রভাব এঁর দেহের মধ্যভাগ পূর্ণ করে রেখেছে। সে বিষয়ে এঁর দৃষ্টিও খুব প্রখর অর্থাৎ ইনি নিমকহারাম নন—ভারতের জয়গান সব সময়ে এঁর কণ্ঠে। এই ভদ্রলোক উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একজন অফিসার—অনর্গল পুশত বলেন, সঙ্গে একটি ভারতীয় বন্ধুর ছেলেকে নিয়ে চলেছেন—বিলেত দেশটা দেখাতে। ছেলেটি বয়সে তরুণ, ধর্ম্মে মুসলমান, এক অক্ষরও ইংরিজী বলতে পারে না—চুপচাপ সলজ্জ ভাবে থাকে, সব সময়ে সায়েবের ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। কখনো বা ডেকের এক কোণায় বসে কোন পুশত ভাষার বই পড়ে, কিম্বা লেখে ডায়েরী। সায়েবের মনোগত ভাব কি জানা নেই, কিন্তু সুযোগ পেলেই আমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে খুব কষে ইংরেজদের গাল পাড়েন এবং বলেন ভারতীয়েরা সব বিষয়ে ইংরেজদের চেয়ে অনেক ভাল।

বৈঠক বসে দু'টোর সময়ে। ছোট ছেলেমেয়ে ও তাদের মা-বাবার জন্যে নির্দিষ্ট এই বৈঠক। কিন্তু দু'টোর সময়েই রাত্রির আহারপর্ব্ব শেষ করে নেবার কথা ভাবতে আমাদের কি রকম লাগে। তাই একটু চেষ্টা করে দ্বিতীয় বৈঠকে আমাদের স্থান করে নিয়েছিলাম। এ বৈঠকে খুকুই একমাত্র ছোট তরফের প্রতিনিধি। তাই সকলের দৃষ্টি ওর ওপরে পড়ে। ষ্টুয়ার্ড তো রীতিমত ওর মায়ায় বাঁধা পড়েছে। নানা জিনিষ যা ওর ভালো লাগতে পারে, আগে থেকে সংগ্রহ করে রাখে, এবং 'খুকুর স্পেশাল' বলে ওর সামনে রেখে দেয়। বুড়ী দু'জনও খুকুর এই আদর-যত্নে খুশী হবার ভাণ করে, আত্মীয়তা দেখিয়ে বলে, 'আমাদের যে হিংসে হচ্ছে খুকুর এত আদর দেখে।' কিন্তু টেবিলের অন্য সকলে কথাটার মধ্যে কিছু সত্যতা দেখতে পায় এবং বলে যে খুকুকে ওদের সামনে খেতে দেওয়া ঠিক নয়।

চট্টগ্রাম বিপ্লব-কাহিনী

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী

প্রীতিলতা, বি-এ পরীক্ষা অন্তে ১৯৩২ সনের এপ্রিল মাসে কলিকাতা হইতে চট্টগ্রামে ফিরিয়া যান। মাষ্টারদার (সূর্য্য সেন) সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত প্রীতিলতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। ঐ সময় সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেন পৃথক পৃথক স্থানে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। প্রীতিলতা কল্পনা দত্তের সাহায্যে প্রথমে নির্ম্মল সেনের সহিত মাত্র অল্প সময়ের জন্ত সাক্ষাৎ করেন। পরে মে মাসের শেষদিকে সূর্য্য সেনের অনুমতি লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তখন সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেন উভয়েই ধলঘাট গ্রামে এক বিধবার বাটীতে গোপনে অবস্থান করিতেছিলেন। একটি টিনের ঘরে নীচের তলায় ঐ বিধবা তাঁহার নাবালিকা কন্যাসহ বাস করিতেন, সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেন ঐ ঘরের উপর-তলায় থাকিতেন। প্রীতিলতা এবার ঐ বিধবার বাটীতে নির্ম্মল সেনের ভগ্নী বলিয়া পরিচয় দিয়া ২।৩ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন এবং পরে চট্টগ্রামে ফিরিয়া যান। প্রীতিলতা পুনরায় ১১ই জুন ঐ স্থানে গমন করেন। তখন অপূর্ব্ব (ভোলা) নামক একটি বিপ্লবী বালকও ঐ স্থানে ছিল। ১৩ই জুন রাত্রে পুলিশ ও সৈন্তবাহিনী ক্যাপ্টেন ক্যামেরণের নেতৃত্বে ঐ বাড়ী ঘেরাও করে এবং উভয় পক্ষে সংঘর্ষ হয়।

নির্ম্মল সেনের গুলিতে ক্যাপ্টেন ক্যামেরন নিহত হন এবং সৈন্তদের গুলিতে নির্ম্মল সেনও মারা যান। সূর্য্য সেন প্রীতিলতা ও অপূর্ব্বকে লইয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করেন। তখন সৈন্তদের গুলিতে অপূর্ব্ব নিহত হন। সূর্য্য সেন ও প্রীতিলতা অক্ষত অবস্থায় ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন।

প্রীতিলতা একটি প্রবন্ধে নির্ম্মল সেনের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইতে ধলঘাটের সংঘর্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার একটি মর্ম্মস্পর্শী বিবরণী লিখিয়াছিলেন। পরে সূর্য্য সেন ধরা পড়িবার সময় ঐ প্রবন্ধ তাঁহার নিকট পাওয়া যায়। প্রীতিলতার উক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইল। এই প্রবন্ধে কল্পনা দত্তকে রমণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। রমণ ছদ্ম নাম মাত্র।

প্রীতিলতার প্রবন্ধ।

কণ্টক-মুকুট শিরে
পরেছিলে বলে
আজ কত কোহিনুর
তব পদতলে।

সেই যে গভীর নিশীথে পল্লীর কোন এক অন্ধকার জীর্ণ-কুটীরে বহু পুণ্যবলে নির্ম্মলদার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, জীবনের সে শুভ মুহূর্ত্তটিকে শত ক্রন্দনেও আর ফিরিয়ে আনতে পারব না। কেননা আজও সেই সবই তেমনি ভাবে আছে। আমিও আছি, আমার জীবনে আরও কত রজনীই এসে গেল কিন্তু নাই কেবল সেই মহিমান্বিত তেজস্বী মানুষটি যাঁর উপস্থিতি সেই দিন সেই পর্ণকুটীর আলো করে দিয়েছিল। বিপ্লবীর কি মনোহর রূপই না সেদিন দেখেছিলাম। অন্ধকারে চোখ দুটো জলেছিল ও মনে হচ্ছিল যেন বিদ্রোহীর মনের আগুন দুই চোখ ফেটে বেরিয়ে আস্‌ছে। তাঁর মুখের কথার চাইতে আমার ঐ তেজোময় চোখের চাহনিই অনেক বেশী মনে হয়েছিল। বিদ্রোহীর বাণী কেবল ঐ চোখ দুটোই যেন প্রচার করে দিচ্ছিল। পেছনে মেশিনের ব্যাগটা ঝুলছে, সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল বৃহৎ চক্ষু, কথাবার্ত্তা বলার পরে যখন উঠে দাঁড়ালেন মনে হ'ল যেন বংশীবাদক পদ্মপলাশলোচন কদমতলা ছেড়ে সুদর্শন চক্র হস্তে সমর-প্রাঙ্গণে এসে পাঞ্চজন্তে ফুৎকার দিয়ে সপ্তকোটি বীর সন্তানকে মুক্তির জন্তে মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান করছে।

নির্ম্মলদা আমায় প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমার কি কি বলেছে। বললাম সবটুকু গুছিয়ে এইটুকু সময়ের মধ্যে কি করে বলব? যা যা মনে আসবে তাই বলে যাচ্ছি। রামকৃষ্ণদা যে বলেছিল...Nirmalda is the last man to be captured. He is very intelligent—এই কথাটাই প্রথমে বললাম, তার পর রামকৃষ্ণদার আরও কয়েকটি কথা হড় হড় করে বলে গেলাম, কি কি বলেছিলাম ঠিক মনে নাই। তবে এই দুটো কথা বলেছিলাম "No revolutionary can die with satisfaction." আমি যদি এখন বের হই তবে "I shall declare equal right to brothers and sisters."

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন family-র প্রতি আমার কিরূপ টান আছে। বললাম টান আছে কিন্তু duty to family-কে duty to country-র কাছে বলি দিতে পারব।

পরীক্ষা কেমন দিয়েছি, পাশ করব কিনা সব জানতে চাইলেন। বললাম পাশ করব বলেই ত মনে হচ্ছে।

সেদিন যখন পাশের খবরটা পেলাম মনে পড়ে গেল নির্ম্মলদা প্রথম দিনই আমাকে পাশ করার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমার ত বিশ্বাস যে যার সে একেবারে

চলে যায় না। আমাদের অন্তরে বেঁচে থাকে এবং প্রাণের যা কিছু নিবেদন সবই তার কাছে পৌঁছায়। তাই মনে মনে খবরটা নির্ম্মলদার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু তবুও হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশ থেকে একটা গভীর বিচ্ছেদব্যথার সুর বেজে ওঠে। মানবহৃদয়ের এই সব অতি সাধারণ সুখ-দুঃখের কাহিনী যুগযুগান্তর ধরেই চলেছে। কিন্তু আমরা এ সবের যথার্থ অর্থ গ্রহণ করতে পারি না বলেই বিশ্বের বুকে এত হাহাকার, হা-হুতাশ আর ক্রন্দন। আমরা ভুলে যাই, যে শুভ প্রভাতে দুঃখের সঙ্গে একান্ত বোঝাপড়া করে নিতে পারব সেই দিনই অমৃতের সন্ধান পাব।

তার পর আমি যখন বললাম যে পাশ করতে পারব তখন বললেন, তোমার কাছ থেকে আমার extreme sucess demand করি, আগামী convocation-এ একটা attempt দিতে পারবে ত?

আনন্দে আমার অন্তর ভরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্জ্জয় অভিমান এসে মনটা জুড়ে বসল এই ভেবে যে, এতদিন মনের ইচ্ছাটা জানবার সুযোগ মিলল, তাই নির্ম্মলদার এই প্রশ্নের উত্তরে বলে বসলাম পারব না কেন? আপনারা তো আর বোনদের আমল দেন না। আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন, কেবল তোমাকে একথা বললাম—আমি অনেক দিন থেকেই জানি। আমার সঙ্গে যে উনি দেখা করেছেন সেই আনন্দেই তখন বিভোর ছিলাম। অথচ সেই সময় একথা বলার কারণ আর কিছুই নয়, অভিমান। তারপর আমাকে এই কথাগুলো বললেন; পাশ করবার পর যে কোন district-এ একটা কাজ নেবার চেষ্টা করো। যেমন ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাঁকুড়া ইত্যাদি, সেখানকার magistrate, commissioner সবার নাম একেবারে মুখস্থ করে বসবে। কখন কোথায় meeting হয় সব খবর রাখবে এবং opportunity খুঁজে বেড়াবে।

একটা Code বলে দিলেন, এবং জিজ্ঞেস করলেন আগে রমেনের throughতে যে code বলে পাঠিয়েছিলেন তা সে বলেছে কিনা এবং কি বলেছে?

তারপর বললেন আমাদের ইচ্ছা যাবার আগে আর একটা কিছু করে যাই। এবার আমরা চাই যে একটা fight between intelligent and intelligent হোক।

যত তাড়াতাড়ি পারি করে যাব কারণ কখন ধরা পড়ি ঠিক নাই। এত কিছুর মধ্যেও যে এতদিন ধরা পড়িনি সেজন্ত আমাদের thanks দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয় বার যখন দেখা হয় তখনও বলেছিলেন চাঁটগা শহরের উপর এক দিন আগুন জ্বালিয়ে দিব। হঠাৎ এক দিন শুনতে পাবে যে পৃথিবীর বুকের উপর থেকে কয়েকজন revolutionist crushed হয়ে গেছে।

যখন এসব কথা বলতেন ভাবতাম এমন ছেলে থাকতে ভারতের আজ এ দুর্দ্দশা কেন? যে দেশের সন্তান এমন করে মুক্তির জন্ত মরণকে তুচ্ছ করতে পারে সেই দেশে আবার কিসের দৈন্ত। কবি সত্যই গাহিয়াছেন—

কে বলে তোমায় কাঙালিনী
ওগো আমার ভারত রাণী

তারপর বললেন আমাদের সাথে যদি আর কোন দিন দেখা না হয় তবে চিরদিন আমাদের কথা মনে রেখ। আমি বললাম, "সে কথা কি আজ আমাদের বলে দিতে হবে?"

মেশিনটা বের করে বললেন, "আর কোন দিন দেখেছ কি? খুব ছোট একটি মেশিন একবার দেখেছিলাম, তাই বললাম। মেশিনের কোন্ part-কে কি বলে, কি করে গুলি ভরতে হয় সব দেখিয়ে দিলেন। আমি বললাম,"আমি ত এখন পর্য্যন্ত একটুখানি training-ও পেলাম না, কাজ করব কি করে? বললেন, বাড়ী থেকে আর কোথাও যাচ্ছ বলে চলে আসতে পারবে তো? পারব বললাম। ওরকম করে এসেই তো training নিতে হবে। সেদিন আর বেশী কথা হয় নি। আমি যখন রমেনকে ডেকে দিতে আসছি তখন বললাম, "তোমাকে তো ভাল করে দেখলাম না, আচ্ছা আমি একবার ঐ ঘরে যাব তুমি আমায় চিনতে পারবে ত? বললাম চিনব। অন্ধকারে যতখানি পারা যায় নির্ম্মলদাকে দেখে নিয়েছিলাম, এবং যখন একথা জিজ্ঞাসা করলেন মনে মনে বললাম, "আর কিছু দেখে না চিনি চোখ দুটো দেখে ত চিনবই।"

এই ভাবে প্রথম দিনের সাক্ষাৎ শেষ হ'ল। কি অনুভূতি নিয়ে যে সেদিন ফিরে গেলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এ সব জনের সঙ্গে যখন দেখা হ'ল, এবার মাষ্টারদার দেখাও পাব এ আশা নিয়ে সেদিন ফিরেছিলাম। তিন সপ্তাহ পরে আবার দেখা করতে যাবার ঠিক হ'ল, এবার কেবলই মনে হচ্ছিল যে, মাষ্টারদার সঙ্গেও নিশ্চয়ই দেখা হবে।

চাঁদের আলোতে যখন আমাদের নৌকাখানি স্রোতের উপর দিয়া ভেসে চলেছিল মনে পড়ল রামকৃষ্ণদার কথা। আমার কাছেও এক দিন কি উৎসাহভরেই না বন্ধুদের সঙ্গে এক নৌ-অভিযানের গল্প করেছিল। নৌকা ভেসে চলেছে। চারদিকের গাছপালা মাঠ ঘাট সব দেখে মনে হচ্ছিল চট্টল মায়ের প্রতিটি অঙ্গে বিপ্লবী ভাইদের কত ইতিহাসই না লেখা রয়েছে। নৌকা করে যখন মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করে চলেছি, মনে হ'ল আমার এতদিনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে, আমি কতদিন জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখেছি—এমনি করে দেবতা দর্শনে চলেছি।

একটা ছোট কুটির-অঙ্গনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম নির্ম্মলদা একটা লুঙী পরে উঠানে পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই এগিয়ে এলেন এবং বললেন খুব ক্লান্ত হয়েছ বুঝি? এতক্ষণ দেরী দেখে আমি ত ভাবছি মাঝি তোমাকে মেরে গয়নাপত্র সব চুরি করে নিল; দু'জনেই হাসলাম, আমাকে সিঁড়ির পাশে ডেকে নিয়ে বিধবা মহিলাটিকে কি বলব সব বলে দিলেন। তারপর নিতান্ত শিশুটির মত হাসতে হাসতে বললেন, তোমার তো হাতে শাঁখা নাই, কপালে সিঁদুর নাই, মহিলা যদি সন্দেহ করে। কথাগুলো বলবার ভঙ্গি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। শিশুর মত উদার প্রাণ না হলে কি এরা এত সহজে পরকে এতখানি আপন করে নিতে পারে।

আমার আশা বিফল হ'ল না। নির্ম্মলদা বললেন মাষ্টারদা এখানে আছেন। আনন্দে প্রাণ ভরে গেল।

নির্ম্মলদা পুকুর থেকে এক হাঁড়ি জল এনে দিয়ে বললেন "হাত পা ধোও", আমি শুধু মুখ ধুয়ে যখন ঘরে গেলাম তখন বলছিলেন "পা ধুলে না কেন?" এমন লক্ষ্মীছাড়ামি করলে চলে না। নির্ম্মলদা যখন এরূপ ধরণের কথাগুলো বলতেন, আমার ভারি চমৎকার লাগত। তারপর মাষ্টারদা ঘরের ভিতর এলেন। পরে নির্ম্মলদা আস্তে আস্তে বললেন "প্রণাম কর।" সেই রাত্রিতে নির্ম্মলদার সঙ্গে বেশী কথা বলি নি, মাষ্টারদার সঙ্গেই বলছিলাম। নির্ম্মলদা শুধু বলেছিলেন বাড়ীতে কি বলে এলে? কয়দিন থাকবে? ইত্যাদি।

তারপর বললেন মাষ্টারদার সঙ্গে কথা বল। এই মানুষটি অতল, এর তল পাবে না। আমাদের মত মানুষ ঢের পাবে কিন্তু এঁর মত পাবে না। আমি উঁহাকে বলেছি তুমি খুব intelligent, দেখি তাঁকে কতখানি move করতে পার। আমার ভয়ানক লজ্জা করতে লাগল, কারণ আমি ভাল করেই জানি যে আমি intelligent নই। কিন্তু উল্টা চাপ দিয়ে বললাম intelligent দেখাবার এমন কি একটা সুযোগ দিয়েছেন যে বলছেন। তা ছাড়া আমি একটা আস্ত বোকা। মাষ্টারদা যখন এমনি আমার সঙ্গে কথা বলে বলবেন যে আমার বুদ্ধি নেই, তখন আপনি খুব জব্দ হবেন। শুনে হাসতে লাগলেন। তারপর মাষ্টারদার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে খেতে গেলাম। আমি নির্ম্মলদার সঙ্গে গেলাম।

খুব ভোরে নির্ম্মলদা এসে আমাকে দোতলায় ডেকে নিয়ে গেলেন। সামান্য বাজে কথাবার্ত্তা বলার পর আমার হাতে মেশিনটা দিলেন। Trigger টিপতে পারছি না দেখে মুখে হতাশ হলেন না, বরং আমাকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছিল আর বললাম একেই ত মেয়েলোক লক্ষ্মীছাড়া তারপর হাতটা আরও লক্ষ্মীছাড়া—আমার আঙুলটাকে পিটিয়ে ঠিক করে দিন। আমাকে নিরুৎসাহ হতে দেখে বললেন নিরাশ হয়ো না, তিন দিনে সব ঠিক করে দেব। যদি আরও আগে তোমাদের পেতাম তবে অনন্তলালের হাতে তুলে দিতাম। এই বলে অনন্তলালের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। বললেন অনন্ত একজন Born revolutionist—ভারি সুন্দর, সুখেন্দুর মৃত্যুর পর যখন আমরা meeting করি তখন একেবারে চটে গিয়ে বলছিল এ সব করে কি হবে। বুকের রক্ত যেদিন দিতে পারব সেদিনই এর প্রতিকার হবে। তারপর বললেন তোমাদের অনন্তলালকে ভাল লাগত না। খুব আশ্চর্য্য লাগল। বিশেষ কিছু না বলে শুধু বললাম কে বলল আপনাকে। আমি ত বহুদিন ধরেই তাঁকে Indian Nepoleon ভেবে শ্রদ্ধা করে আসছি। আরও কিছুদিন মেশিনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম কয়েকটা যুযুৎসুও শিখিয়ে দিলেন।

এক একটা সাধারণ কথা শুনে নির্ম্মলদা কি রকম প্রাণ খুলে হাসতেন আমি দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। ভাবতাম এদের দুঃখ সইবার শক্তি যেমন অসীম তেমনি সত্যিকার আনন্দ উপভোগ করতে কেবল এরাই জানে।

নির্ম্মলদার মধ্যে আমি এ জিনিষটা এত বেশী দেখতাম যে অবাক হয়ে যেতাম। আমি আর রমণ ঘোমটা দিয়ে কি ভাবে এসেছিলাম, একটা মুসলমানী মেয়েলোককে কি কি বলেছিলাম এ সব গল্প বলছিলাম আর মহোৎসাহে শুনছিলেন। একবার বলছিলেন, তোমরা দু'জনকে একসঙ্গে দেখার বড় ইচ্ছা ছিল, দেখ তারে তোমরা কি কর, কিন্তু দেখলাম না। যাঁদের ভেতরটা সুন্দর তারাই এমনি করে জগতের সব কিছুর থেকেই সৌন্দর্য্য গ্রহণ করে থাকে, তার পর আমাকে রামকৃষ্ণদার কথা বলতে বললেন আর আমি অনর্গল বলে যেতে লাগলাম। বললেন, তুমি যখন রামকৃষ্ণের কথা বল তখন মনে হয় যেন গল্প শুনছি—আমার প্রতি রামকৃষ্ণের খুব বেশী regard ছিল, আমি যে ধূর্ত্ত তা সে জানত তাই বলছিল যে সবার শেষে ধরা পড়বে, সত্যি ও যে এত বড় আগে বুঝিনি। একটি জিনিষ আমি লক্ষ্য করতাম যে, ও যখন কাউকে প্রণাম করত মাথাটা খাড়া থাকত, বলতে বলতে নির্ম্মলদার চোখের কোণে জল দেখা দিল, দেখে আমার বুক ফেটে কান্না এল, এদের চোখের জল দেখা সেও বহু জন্মের পুণ্যের কথা, কেন না এ অশ্রুজল মর্ত্ত্যের নয়—স্বর্গের। তার পর আমি নির্ম্মলদার মুখে রামকৃষ্ণদার কথা শুনতে লাগলাম, ওর নাকি নিরামিষ খেতে একটুও ভাল লাগত না। রোজই খেয়ে উঠে কাশত আর নির্ম্মলদা বলতেন কি যে খেয়ে উঠেই কাশতে আরম্ভ কর। ... ... এর পর থেকে খেয়ে উঠেই নাকি রামকৃষ্ণদা বলত নির্ম্মলদা একবার কাশব, শুধু একটিবার। নির্ম্মলদার মুখে রামকৃষ্ণদার কথা শুনতে আমার বড়ই ভাল লাগত, উনিও খুব আগ্রহভরে বলতেন।

রামকৃষ্ণদাকে কয়েদী বেশে কারাগারে প্রথম দেখেছিলাম এবং সেখান থেকেই সে বিদায় নিল। ওর জীবনের এদিকটা আমার কাছে নিতান্তই অজানা ছিল। নির্ম্মলদার কথা শুনতে শুনতে আমি রামকৃষ্ণদাকে আমাদের মাঝখানে কল্পনা করতাম আর মনটি ব্যথার ভরে উঠত। খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই নীচে একটু ঘোরা-ফেরা করতে লাগলাম। নির্ম্মলদা একটু পরে উপরে যেতে বলে চলে গেলেন—আমি গিয়ে দেখি দু'তিনটা মনি-ব্যাগ খুলে টাকা গুনতে বসেছেন। আমাকে পাশে বসতে বললেন, মাষ্টারদার ব্যাগ থেকে কতকগুলি সিকি আর সিকি দেখিয়ে বললেন—এই দেখ এইগুলি হারালে অমঙ্গল হবে। বলে খুব হাসতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম —আপনাদের টাকা আলাদা আলাদা থাকে বুঝি? হাঁ নিশ্চয়ই, মাষ্টারদার চেয়ে আমার বেশী টাকা আছে। আমি চেয়ে নিতে পারি কিন্তু মাষ্টারদা কারো কাছে চান না। মাষ্টারদার কাছে সব সময় এক হাজার টাকা থাকা দরকার। ওঁকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এক এক সময় টাকা-পয়সার চিন্তায় আমার ঘুম পায় না—অথচ মাষ্টারদা শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়েন। ঠিক একটি ছোট ছেলের মত, আমার ভারি চমৎকার লাগে।

এ সব কথা হচ্ছে এমন সময় মাষ্টারদা নীচের থেকে এলেন, ওরা দু'জনে অন্য ঘরে গিয়ে কথা বলতে লাগলেন। একটু পরে দেখি নির্ম্মলদা ঐ দিন দুপুরে বের হবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন, আমাকে বললেন—দেখ আমাদের সাহস কম নয়, দিনের বেলা বের হচ্ছি। বললাম তা ত দেখছিই, দুনিয়াতে আপনারা কিই বা না পারেন। কিন্তু আমার তো ভয় করছে। কোমরে মেশিন ও যুদ্ধ belt টি বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন চোখে খুব সুন্দর লেগেছিল, বাঙালী বীরের এই সাধারণ যোদ্ধার বেশ ভারি নূতন লাগল।

সন্ধ্যার একটু আগে নির্ম্মলদা ফিরে এলেন—তখন জালালবাগের কাহিনীর একটু বর্ণনা দিয়ে বললেন—স্বর্গের দেবতাগণ হয়ত সেই দিন এই লীলা দেখবার জন্য একত্র হয়ে গিয়েছিলেন। রাত্রিবেলা targetting-এ বের হলাম, জ্যোৎস্না দেবী অতি সন্তর্পণে তার রূপালী আঁচলখানি পৃথিবীর বক্ষে পেতে রেখেছিলেন। আমি যখন male dress নিয়ে নির্ম্মলদার সামনে এসে দাঁড়ালাম—কি ভীষণ হাসতে লাগলেন, আর বললেন—তোমাকে দেখে মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে না। একটি ছোট ছেলের মত লাগছে। আমি বললাম, তাই নাকি? তবে আমি আপনার ছোট ভাই। হাসতে হাসতে বললেন —আমার তো তাই মনে হচ্ছে। আমরা পাঁচ জন ছিলাম কে যেন বললে—পঞ্চ পাণ্ডবের মত লাগছে। নির্ম্মলদা আমাকে বললেন—তুমি সহদেব। না আমার অর্জ্জুন হতে ইচ্ছে হচ্ছে আর আপনি ত ভীম। যখন মাঠের উপর দিয়ে চলেছি নির্ম্মলদা বলছিলেন Absconding life-এ এরকম অভিযান আর হয় নি। আজকের তারিখটা লিখে রেখো। মনে হচ্ছে যেন যাবার আগে দুনিয়ার সব সুখ লুটে নিয়ে যাচ্ছি। এ কথাটা আমার বড়ই লেগেছিল।

ফিরবার পথে মাঠের মাঝখানে দু'জনে বসলাম। আমাকে একটা গান করবার জন্য খুব সাধাসাধি করতে লাগলেন, বললাম "পারব না। যা তা হবে। লক্ষীটি, আমাকে সাধবেন না, শেষকালে আমার কষ্ট হবে।"—লক্ষীটি বললাম বলে খুব হাসতে লাগলেন। তার পর বললেন আচ্ছা দেখি তুমি কেমন দৌড়াতে পার। একটা দৌড় দাও তো, আমার খুব মজা লাগল কারণ দৌড়াতে খুব ভালই পারি। দৌড়ে অনেকখানি গিয়ে যখন ফিরে এলাম বললেন—বাঃ, বেশ ত দৌড়াতে পার। Action করার সময় এ রকম দৌড়াতে পারবে তো? তার পর বললেন তুমি আত্মীয়স্বজন সবাইকে ছেড়ে কোথায় চলে এসেছ! আমরা এখন তোমাকে মেরে ফেললে ত কেউ টের পাবে না। বললাম "সে অধিকার ত আপনাদের আছেই। আপনাদের কাছে ত নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আপনারাই তো নিচ্ছেন না। কেবল আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে চান।"

বললেন, তোদের কিসের জন্য মারব। মারব না। যখন ফিরলাম তখন প্রায় ভোর হয়ে গেছে। সেদিনকার সেই অভিযান আমার জীবন-খাতার একটি বৃহৎ শূন্য পাতা পূর্ণ করে দিয়েছে যদিও একটি মাত্র গুলি লাগাতে পেরেছিলাম বলে। এক একবার খুব খারাপ লাগছিল তবুও গুলি করলাম বলেই খুব মজা লাগছিল। আজও যখনি সেদিনের কথা মনে হয় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি নির্ম্মলদার সঙ্গে targetting-এ যাওয়ার যে সৌভাগ্য আমার হয়েছিল আমি যেন তার যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারি।

পরের দিন সকাল বেলা অনেকক্ষণ মাষ্টারদার সঙ্গে কথা বললাম। দুপুর বেলা নির্ম্মলদার কাছে গেলাম। তখন বলেছিলেন, No revolutionary can die with satisfaction। ওটা খুব ঠিক কথা, অনেক কিছু করা হ'ল না, ভেবেই তারা সারা।

সেদিন বিকেলেই আমার চলে আসবার কথা। নির্ম্মলদা বললেন, "তুমি চলে যাবে বলে আমার খারাপ লাগছে। আমিও এখান থেকে চলে যাব। মাষ্টারদাকে একা একা রেখে যেতেও প্রাণ কাঁদছে। বললাম, একেবারে রেখে দিন না। আমারও যেতে ইচ্ছে করছে না।" হাসতে হাসতে বললেন, "আমি মত দিলাম এবার মাষ্টারদার মত লও।"

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এস সোনার বরণী রাণী গো"—গানটা জানিস? আমাদের দলে তিনটি রাণী আছে of which you are the eldest.

আমি বললাম of which আমি হলাম লোহার রাণী আর রমণ হল সোনার বরণী রাণী।

শুনে কি প্রাণমাতানো হাসিই না হেসেছিলেন। বললেন লোহার বরণী রাণীকেই তো আমার বেশী সুন্দর লাগে। আমি ভীষণ হাসতে লাগলাম। নির্ম্মলদাও হাসলেন।

তার পর বললেন—"একদিন হয় তো দেখবি যে দোকান সাজিয়ে দোকানদার হয়ে বসে আছি। যেখানেই থাকি না কেন তোদের খবর নেব। আর যদি ধরা পড়ি তবে তুই আর রমণ মাঝে মাঝে লালদীঘির পাড়ে একটু দেখা দিস।"

অদৃষ্টের গতি একেবারে অন্য দিকে গেল। নির্ম্মলদার আমাদের খবর নিতে হ'ল না, আমাদেরও দেখা দিতে হ'ল না।

সেদিন বলেছিলেন এখন আমাদের অবস্থা হচ্ছে one foot in grave পৃথিবীর উপর সবাই এমনি ভাবেই চলবে থাকব না কেবল আমরা।

নির্ম্মলদার কথাগুলো হৃদয়ের সবটুকু দরদ দিয়ে অনুভব করেছিলাম। কিন্তু সেদিন ত ভাবিনি যে তাঁর কথামত এত শীঘ্রই তিনি যাবেন। সত্যই তো আজ পৃথিবীর উপর জীবনের স্পন্দন তেমনি ভাবেই হচ্ছে—কর্ম্মের অবিরাম প্রবাহ বিশ্বের বুকে বিচিত্র ভঙ্গিমায় তেমনি ভাবেই চলেছে—কিন্তু নির্ম্মলদা তাঁর কাজ শেষ করে চলে গেছেন।

ক্রমে আমার আসার সময় হ'ল। আসবার সময় যখন নির্ম্মলদাকে প্রণাম করতে গেলাম, বললেন—তোমাকে একটা কথা বলব—আমাকে আর কোন দিনও প্রণাম করো না। বললাম—"আচ্ছা আপনি এমনি প্রণাম করতে না দিলে কি হবে? মনে মনে করলে ত আর আটকাতে পারবেন না।

একটা কাগজে বেঁধে আমাকে একটা আশীর্ব্বাদ দিলেন। মাষ্টারদা বললেন—"এগুলো preserve করো।" কি আনন্দের সঙ্গেই না এই আদেশ মাথা পেতে নিয়েছিলাম।

ওদের আশীর্ব্বাদ করে ও ওঁদের দেওয়া শক্তি বুকে ধরে সেদিন ঘরে ফিরলাম। কিছু দিন পর আবার আমার ডাক পড়ল। সেদিন রওনা হওয়ার কথা। সকাল থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। সকাল বেলা আমার কাছে একবার খবর দেবার কথা ছিল। কিন্তু কোন খবর না পেয়ে ভয়ানক ব্যস্ত হলাম, ভাবলাম—যদি বৃষ্টির জন্য আমাকে না নেন—তবে খুব করে বকে দেব। আবার ভাবলাম হয় তো situation খুব খারাপ হয়ে গেছে। বাসায় বলে রেখেছিলাম সীতাকুণ্ড যাব। মাকে বললাম—বন্ধুদের জন্য কিছু খাবার করে দাও। দুপুর শেষ হয়ে গেল, তবুও কেউ যাচ্ছে না দেখে মাকে বললাম—নষ্ট হয়ে যেতে পারে এরূপ কিছু করো না। কাপড়-চোপড় ঠিক করে রাখলাম—তার পর কেবল ঘর-বার করতে লাগলাম।

প্রায় ৫টার সময় লোক গেল, কি উৎসাহ নিয়েই না সে দিন রওনা হয়েছিলাম—নির্ম্মলদার সঙ্গে সেই শেষ দেখা করতে আসছি বলেই হয় তো সে দিন এত উৎসাহ নিয়ে এসেছিলাম। উৎসাহ সব সময়ই ত থাকে কিন্তু এবার যেন একটা অভিনব অনুভূতিতে মনটা ভরে গিয়েছিল।

সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় যখন কর্দ্দমাক্ত গ্রাম্য পথ বেয়ে চলেছি ভাবলাম এরকম কাদা মাড়াবার সুযোগ জীবনে আর কখন মিলবে কে জানে?

গন্তব্য স্থানে যখন গিয়ে পৌঁছালাম—একটা অফুরন্ত উজ্জ্বল হাসির শব্দ আমার কানে গেল। নির্ম্মলদা বললেন—এই হ'ল অপূর্ব্ব সেন, যার সঙ্গে রামকৃষ্ণ তোমাকে আলাপ করতে বলেছিল। চোখে দেখলাম একখানা সহাস্য কচিমুখ, অন্তরের সরলতা যেন মুখখানাতে ফুটে উঠছিল।

আমি যে খাবারের টিনটা নিয়েছিলাম, মাষ্টারদা সেটা থেকে একটা নারকেলের সন্দেশ বের করে খেলেন। দেখে আমার খুব আনন্দ হ'ল।

আমি ঘরের ভিতর রইলাম, আর সবাই বারান্দায় খেতে বসে গেলেন। নির্ম্মলদা এক একবার ভিতরে ঢুকে আমার ভাগেরটা নিয়ে আসতে লাগলেন। ওঁনার কাছে যে আশীর্ব্বাদ ছিল আমার মাথায় যখন তা সস্নেহে বুলিয়ে দিচ্ছিলেন—ভাবলাম স্নেহ বিলাতেও বুঝি কেবল এঁরাই জানেন।

রাত্তিরে আর বেশী কথাবার্ত্তা হ'ল না। মাষ্টারদা, নির্ম্মলদা দুজনেই বের হয়ে গেলেন। নির্ম্মলদাকে বললাম আমাকে নিয়ে যাবেন না? বললেন আর একদিন নেব।

আমি নীচে মহিলার পাশে শুয়ে রইলাম, ছাদে কেবলই মচমচ শব্দ হচ্ছিল আর হাসির ফোয়ারা ছুটছিল। মহিলা আমার কাছে নালিশ করল একটা ছেলে এসেছে কেবলই হাসে আর 'ভাল লাগে' বলে এমন একটা টান দেয় যে আর থামে না। শুনে ভোলার প্রতি গভীর স্নেহে আমার মনটা ভরে গেল।

সকাল বেলা ভোলা নীচের থেকে খাবারের টিনটা নিয়ে এল। আমি তখন অন্য ঘরে নির্ম্মলদার কাছে বসেছিলাম। টিনটা হাতে নিয়ে ভোলা খুব হাসছিল, তারপর কি মাতামাতি করেই না সবাই মিলে খেতে লাগলেন। এঁদেরই খাইয়ে তৃপ্তি আছে।

নির্ম্মলদাকে বললাম আমি এসে অবধি কেবল ওর হাসিই শুনছি, হাসিটা আমার ভারি সুন্দর লাগছে। উনি তখন বললেন ছেলেটা ভারি Jolly আর Sincere—Comic করতে জানে। ওর কাছে থাকলে আমিও হাসি থামাতে পারি না। সম্প্রতি absconder-দের মধ্যে ও হ'ল best production—এ রকমের ছেলে দু-একটা থাকলে বেশ আলো করে রাখতে পারবে।

নির্ম্মলদার কথা শুনে কেবলই মনে হচ্ছিল এই সেই অপূর্ব্ব সেন। রামকৃষ্ণ আমার কাছে শুধু তার নামটী করেছিল। ভাবলাম নির্ম্মলদাকে বলি ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে, কারণ রামকৃষ্ণদা বলে দিয়েছে—বলা আর হ'ল না।

সেদিন সারাটা দুপুর নির্ম্মলদা আমাকে machine of training দিলেন। কি করে কাপড়ের মধ্যে লুকাব, হঠাৎ বের করব—aiming ইত্যাদি সব শিখিয়ে দিতে লাগলেন। এবার নির্ম্মলদা আমাকে মধ্যের আঙুলী দিয়েই Practice করালেন আর বললেন, তোকে এই আঙুল দিয়েই active করাব। Secretটি কাউকে বলে দিস না, শুধু আমরা জানব। তারপর action হয়ে গেলে সবাই জানবে। আমার খুব আনন্দ হ'ল, বললাম আগের বার যখন আমি পারছিলাম না তখন কেন এই আঙুল দিয়ে practice করালেন না। নির্ম্মলদা হাসতে হাসতে বললেন তখন তো মাথায় আসে নি।

তারপর দু'জনে গল্প করতে বসলাম, তখন বিকাল হয়ে গেছে। নির্ম্মলদা কয়েকজন ছেলের নাম করে বললেন এরা সব সময় একসঙ্গে চলত, সদরঘাট এরাই আলো করে রেখেছিল। আনন্দ, রজত, ত্রিপুরা ও টেরারাকে আমরা টেগরা, টুলু, টাক্টু, টুম বলে ডাকতাম। এতগুলোকে মেরে ফেলেছি আর ভাল লাগছে না। ভগবান বোধ হয় অন্তরীক্ষ থেকে এই কথা শুনেছিলেন তাই আর দেরী না করে নির্ম্মলদাকে কোলে তুলে নিলেন।

নির্ম্মলদা যখন এই সব ছেলের কথা বলেছিলেন আমি বললাম, সত্যি চাটগাঁর উপর যে কাণ্ডটা হয়ে গেল তার পিছনে যে কত সুন্দর ইতিহাস রয়ে গেছে তার খবর কয়জনে রাখে? আমার কথা শুনে বললেন—তোমার কাছে পাণ্ডিত্য ও ছেলেমানুষি দুটোই আছে, এটা আমার খুব চমৎকার লাগে। নির্ম্মলদার এই চমৎকার কথাটি চিরদিন আমার মনে থাকবে। কথায় কথায় শুধু চমৎকার বলতেন আর ভাবতাম, যে নিজে চমৎকার তার কাছে সবই চমৎকার লাগে। ওখানে খুব smart চেহারার একটি ছোট ছেলে আসত, আমি নির্ম্মলদাকে বললাম এই ছেলেটাকে আমার খুব ভাল লাগে। তখন বললেন মাষ্টারদা ওকে খুব আদর করেন—আমাকে আজকাল আদর করেন না। আমি বড় হয়ে গেছি, আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি সে কথা আমার মনেই থাকে না, আয়না দেখলে মনে পড়ে শিশুর মত সরল ও পবিত্র প্রাণ যাদের তাদের আবার কিসের বার্দ্ধক্য? ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল বলে খিচুড়ী রান্নার প্রস্তাব হ'ল এবং রান্নার ভার আমার উপর পড়ল। শুধু খিচুড়ীটা রান্না হলেই সবাই মিলে একটা থালা করে খেতে বসে গেল। মহিলাটি বলছিল বেশী করে দেবার জন্যে। ভাজাগুলো তখনও হয় নি বলে আমি দিতে নিষেধ করলাম, খাবার সময় ভোলার হাসি তেমন ভাবেই চলছিল। নির্ম্মলদা খিচুড়ী খেয়ে এসে আমাকে বললেন খিচুড়ীটা বেশ ভালই হয়েছে। রান্না করতে কবে শিখলে? তোমাদের হাতে নিশ্চয়ই অন্নপূর্ণা আছেন। বললাম হাঁ আমাদের হাতে অন্নপূর্ণা আর আপনাদের হাতে বিশ্বকর্ম্মা। খুব হাসতে লাগলেন।

আমি যখন আলুভাজা করছি ভোলা এক টুকরা কাগজ নিয়ে আমার কাছে বসে রইল আর বলল "দিদি I must take আলুভাজা"। অল্প করে দিলাম। আরও চাইলে পর বললাম "আর দেব না", খিচুড়ী খাওয়া হবে কি দিয়ে? আলুভাজা খেয়ে পেঁয়াজভাজা খাওয়ার জন্য বসে রইল। আমাকে ডিমভাজার জন্য কাঁচালঙ্কা কেটে দিল।

নির্ম্মলদা দূর থেকে এসব লক্ষ্য করছিলেন। রাত্রিবেলা আমাকে বলছিলেন—"ভোলা যখন তোমার সাথে কথা বলছিল আমার দেখে খুব ভাল লাগছিল।" আজ ভাবছি যাবার আগে নির্ম্মলদা পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণার সৌন্দর্য্য উপভোগ করে গেলেন। দু'জনে একসঙ্গে যাবে বলেই হয়ত এমনি করে একজন আর একজনকে প্রাণ ভরে দেখে নিল।

রান্না হবার পর সবাই মিলে খেতে বসলাম। কেউ বেশী খেতে পারল না। পাতেই অনেক রয়ে গেল, ভোলা মহোৎসাহে বলতে লাগল, "আমি কাগজে বেঁধে সব রেখে দেব আর কাল সকালবেলা খাব। excellent হবে, খাওয়া-দাওয়ার পর নির্ম্মলদা নিজের ঘরের ভিতর শুয়ে রইলেন, ঝুম-ঝুম বৃষ্টি পড়ছিল। আমাকে ডেকে বললেন, "একটা গান—সঙ্গে ভাত খেলাম—তোর রান্না খেলাম, রইল তোর একটা গান শোনা।"

চির অভ্যাসমত আমি কিছুতেই করলাম না। যদি জানতাম যে নির্ম্মলদা এ জীবনে আমাকে আর সাধতে আসবেন না তবে সে দিন যা হয় একটা গেয়ে দিতাম। আমি জানতামই যে মৃত্যু প্রতি মুহূর্ত্তেই এদের জন্য অপেক্ষা করছে—সেজন্য গান করছি না বলে আমার খুব খারাপ লাগত আর বলতাম—"দোহাই আপনার, আমাকে সাধবেন না।" ইতি-মধ্যে বের হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে মাষ্টারদা ওপর থেকে নেমে এলেন। নির্ম্মলদাও উঠে কাপড়-চোপড় পরে নিলেন। অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল। নির্ম্মলদা যখন একটা ছাতা মাথায় দিয়ে উঠানে দাঁড়িয়েছেন আমি বললাম—আমাকে ফেলে রোজ চলে যান। আজ এই বৃষ্টিতে একবার বের হতে বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে—আমাকে নিয়ে যান। বললেন—"আচ্ছা চল, এস আমার ছাতার নীচে এসে দাঁড়াও।" বললাম—"দাঁড়ালে কি হবে? শেষকালে ত তাড়িয়ে দেবেন।"

রাত্রির অন্ধকারে বারিধারা মাথায় করে রওনা হলেন। আমি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে দুজনেকে দেখতে লাগলাম।

কবি নিশ্চয়ই এই আপনভোলা ছন্নছাড়া বিপ্লবীদের হয়েই বলেছেন :

"কেবল তব মুখপানে চাহিয়া
বাহির হ'নু তিমির রাতে
তরণীখানি বাহিয়া।"

পরের দিন সকালবেলা (অর্থাৎ ১৩ই জুন সোমবার) আমি যখন গেলাম সবাই তখন ঘুমাচ্ছেন। মাষ্টারদা আমাকে নির্ম্মলদা যেই ঘরে ঘুমিয়েছিলেন সেখানে গিয়ে বসতে বললেন। নির্ম্মলদা ঘুমচ্ছিলেন, আমি চুপ করে বসে রইলাম। অনেকক্ষণ পর নির্ম্মলদা ঘুম থেকে জেগে বললেন—তুমি যে কখন গোপনে এসে বসে আছ টেরই পাই নি। তারপর বলতে লাগলেন—

সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগি নি—
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী।

শুনে আমি খুব হাসতে লাগলাম। নির্ম্মলদা হাসতে লাগলেন, আমি বললাম—"বাঃ poetry-তে কথা বলতে আরম্ভ করলেন দেখছি, আমরা ক্লাসে বসে কি রকম poetry লিখতাম জানেন ?—

রাগ করেছিল ছেলেমানুষ
দেখবি ফিরে উড়ছে ফানুস
কিম্বা খাবি লজেঞ্জুস্।"

হাসতে হাসতে বললেন—"তোমরা তো ভয়ানক দুষ্টু দেখছি। মেয়েরা যে এত দুষ্টু হয় তা জানতাম না। আমার বড় দুঃখ রইল তোমাকে আর রমণকে একসঙ্গে দেখলাম না।"

সেদিন যে সমস্ত কথা বলেছিলেন মনে হয় যেন নির্ম্মলদা বুঝতে পেরেছিলেন যে তার যা কিছু বলার আছে সেই দিনই বলে দিতে হবে, আর বলা হবে না।

বললেন—রমণের সঙ্গে আর দেখা হবে না। ওকে বলো আমার ওপর রাগ না করতে। তুমি আর ও প্রায়ই একত্র হয়ে, তোমরা দু'জনের কথা দু'জনকে সব বলতে পার। আমার কোন আপত্তি নেই। আমার মনে হচ্ছে Destiny-র against-এ কেউ যেতে পারে না। আমরা যতই করি না কেন অবশেষে Destinyর কাছে হার মানতেই হয়।"

তার পর বললেন—রামকৃষ্ণের একটা কথা আজ তোকে বলব। আমাদের absconding life-এ কত রকম ইতিহাস যে নিহিত রয়েছে তা কেউ জানে না। রামকৃষ্ণদার organise করা একটি ছেলে absconding life-এ কি ভাবে মারা গেল —কি ভাবে ওর সৎকার করা—রামকৃষ্ণদার মনে কি রকম লেগেছিল—

একটি মহাপ্রাণ এমনি করে গোপনে ঝরে গেল। একই পথের পথিক প্রিয় বন্ধুগণ ছাড়া আর কেউ জানল না।

তখন বললেন—"রামকৃষ্ণ যখনই খুব গম্ভীর হয়ে থাকত আমরা ওকে ফুটব্যাদার কাছে পাঠিয়ে দিতাম। ও দিছে কিছুই বলত না। ফুটব্যাদাকে ও ভালবাসত এবং খুব respect করত।

রামকৃষ্ণদাকে planchet-এ ডাকার কথা বলে বললেন, "তুই আর মাষ্টারদা জানিস—আমি নয়; আমার ভয় করে যদি কিছু না করে বসে আছি বলে বকে দেয়।"

আশ্চর্য্য, এবার মাষ্টারদার সঙ্গে এই দুই দিন ধরে মোটেই কথা বলি নি। সারাক্ষণই কেবল নির্ম্মলদার কাছে বসেছিলাম। নির্ম্মলদার সঙ্গে এই জীবনে আর কথা বলতে হবে না বলেই হয়ত এ রকম হয়েছিল। সেদিন সকালবেলা ভোলার জ্বর এসেছিল। জ্বরসুদ্ধ সারাদিন comic করেছে। এই আনন্দের উৎসটিকে যতই দেখছিলাম ততই যেন মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম।

নির্ম্মলদা বললেন—ভোলা হ'ল মাষ্টাদার assistant ও বেশ ইংলিশ জানে। যা কিছু লেখা হয় মাষ্টারদা ওকে দিয়ে পড়ান। তার পর বকে যেতে লাগলেন যে ভোলা এর মধ্যে এক দিন বাড়ী গিয়েছিল—

বাড়ীতে ওর সাত জন বৌদি আছে। বাড়ী গিয়ে বৌদিদের বলেছিল তোমরা সবাই fall in কর, আমি command করছি। ছোট ছেলেপিলে সবগুলোকে জাগিয়ে দিয়েছিল। শুনে আমার ভারি সুন্দর লাগল। আজ ভাবছি এ রকম করে বিদায় নেওয়াটা কেবল ওকেই সাজে, যাবার আগে একবার বাড়ী গিয়ে সবাইকে চমক লাগিয়ে দিয়ে এল।

নির্ম্মলদা আর একটু ঘুমিয়ে নিলেন। জেগে উঠে বললেন—দেখ আগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করতে পারতাম। এখন যেন brainএ কিছুই নেই বলেই মনে হয়। মাঝে মাঝে ক্রমাগত তিন-চার দিন শুয়ে থাকতাম আর কাঁদতাম। লোকে বলত এটা'র হ'ল কি ?

এই কথাগুলো যে নির্ম্মলদার কতখানি পরিচয় দিচ্ছিল শুধু তাই ভাবছিলাম। জগতের লোকে মনে করে বিপ্লবীরা একটা নেশার ঝোঁকে কেবল মারামারি কাটাকাটিই করতে জানে কিন্তু এদের ভিতর যে কি বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার আছে তার খোঁজ পাওয়ার সৌভাগ্য কয়জনেরই বা হয় ? আর নির্ম্মলদার উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের বিশ্বকবির সেই গানটাই কেবল মনে হচ্ছিল—

"কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস।
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো, ধরায় আস।"

আমাকে একবার একটু অন্যমনস্ক দেখে বলেছিলেন—

তুমি এখন জীবননদীর এপারে না ওপারে ? জান আমরা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করতাম—"এই জীবন-নদীর এপারে থাকবি না ওপারে যাবি ? আজ ভাবছি ইহলোক থেকে বিদায় নেবার আগে বুঝি লোকের মুখ দিয়ে এ রকম কথাই বের হয়। আমি বলেছিলাম—"আপনারা যাবার আগে আমাদের দিয়ে কিছু করিয়ে যান। বললেন—আমরা চলে গেলেও করতে পারবে। কিন্তু আমরাও মাঝে মাঝে স্বার্থপরের মত মনে করি যে আমরা না করলে চলবে না। মাষ্টারদার শেষ কাজটা বাকী রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে female action। আমি বললাম—"আমার বড় মরতে ইচ্ছে করছে। চন্দননগরে সুহাসিনীদি একটা great chance হারিয়েছেন। এখানে যদি পুলিশ আসে আমি আপনার কাছ থেকে নড়ব না।" নির্ম্মলদা বললেন—"কিসের জন্ত মরবি ?" কে জানত যে কয়েক ঘণ্টা পরেই মৃত্যু এসে হাজির হবে আর নির্ম্মলদাকে কোলে তুলে নেবে,—আমাকে স্পর্শও করবে না।

তারপর আমাকে বললেন—"আমার পিঠে হাত বুলিয়ে আমায় শান্তি দে।" আমি পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম—শান্তি দেব ত না, নেব। বললেন—"আমি আর এক জন্মে তোমার বোন হয়ে জন্মাব।" আমি বললাম—"আমি আর এক জন্মে কিছুতেই লক্ষীছাড়া মেয়েলোক হব না।"

এমনি করেই নির্ম্মলদা যাবার আগে সব কিছুই বলে গেলেন।

আমাকে ভোলার জন্ত সাগু জাল দিতে নীচেয় পাঠিয়ে দিলেন। আমি যখন সাগু রান্না করছি ভোলা তখন ঘরের ভিতর গুন গুন করে গান করছিল। সাগুটা ঠাণ্ডা করে লেবু আর চিনি মিশিয়ে ভোলাকে খাওয়ালাম। জীবনের খাওয়া খেয়ে নিল।

ভগবান আমাকে অনেক দিয়েছেন। স্মৃতির বোঝা আর ভারি না করলে খুশীই হব এবং করলেও অনুযোগ দেব না। তারপর ভাত খাওয়ার ডাক পড়ল। নির্ম্মলদা ভাত খাবেন না বলে দিয়েছিলেন। আমি বরাবর নির্ম্মলদার সঙ্গে খেতাম। মাষ্টারদার সঙ্গে ভাত দিয়েছে দেখে এক দৌড়ে উপরে চলে গেলাম। নির্ম্মলদা একা চুপ করে শুয়েছিলেন, না জানি তিনি তখন কোন্ অমরলোকের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন।

আমি বললাম—মাষ্টারদার সঙ্গে খেতে লজ্জা করছে বলে আমি পালিয়েছি, পালিয়েছি বলে আরও লজ্জা করছে। মাষ্টারদা নিশ্চয়ই টের পেয়েছেন। নির্ম্মলদা হাসতে হাসতে বললেন—তাতে কিছু হবে না। এমন সময় নীচে থেকে মাষ্টারদা বিদ্যুদ্বেগে ছুটে এসে বললেন—"পুলিশ এসেছে, পুলিশ এসেছে।" ভাবলাম এই মুহূর্ত্তেই ত সব শেষ হয়ে যাবে। ওঁদের বললাম—"আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব।" কিন্তু আমায় থাকতে দিলেন না—মই বেয়ে নীচে নেমে যেতে বললেন। কথামত নেমে গেলাম।

দুই দিক থেকে গুলি চালাচালি হতে লাগল। দুই একটা জয়ধ্বনিও আমার কানে গেল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ হবার পর নির্ম্মলদার আর্ত্তনাদ শুনতে পেলাম। শোনা মাত্র উপরে উঠে গেলাম আর তিন জনে মিলে আমাকে চেপে ধরল। ওদিকে কি করুণ সুরেই না আমার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। উপরে ওঠার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। ওদের কত ভয় দেখালাম—চোখ রাঙালাম। ছোট মেয়েটিকে একটি ঘুষি দিলাম। কিছুতেই আমায় ছাড়ল না। তারপর বললাম—"আচ্ছা, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাব না।" তবু ছাড়ল না। একবার মইয়ের প্রায় অর্দ্ধেক যেতে পেরেছিলাম—টান্ দিয়ে আমাকে ফেলে দিল। নির্ম্মলদার ডাক আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। নির্ম্মলদার কাছে যদি একটিবার যেতে পারতাম, জানি না আমায় কি বলতেন কিন্তু আমার নাম ধরে যে এতবার ডাকলেন এর চাইতে বেশী আর কি চাই ? ভগবান আমায় একটিবার নির্ম্মলদাকে দেখে আসতে দিলেন না। এই ব্যর্থতা আমার বুকে প্রতিনিয়ত শেলের মত বেঁধে—ধৈর্য্যের বাঁধ একেবারে ভেঙে দিতে চায়। এমন সময় মাষ্টারদা ও ভোলা নীচে নেমে এলেন। দেখে বড়ই আনন্দ হ'ল। এতক্ষণ ওঁদের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে একবার মনে হয়েছিল তাঁরাও নেই। মাষ্টারদা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—"তোকে এখন কোথায় নিয়ে যাব—তোর life-টাও নষ্ট করলাম। মাষ্টারদার পায়ে ধরে বললাম—"আমি আপনাদের সঙ্গে যাব।" আমি তখন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ যে মাষ্টারদার সঙ্গ ছাড়ব না। চোখের একটি মাত্র পলকে ভোলাকে একবার দেখেছিলাম। কি চমৎকার লেগে-ছিল। মুখে এতটুকু চাঞ্চল্যের ভাব নেই। বীরের মত বুক ফুলিয়ে মাষ্টারদার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তিন জনে রওনা হলাম। ভোলা আগে আগে ছিল। সম্মুখে মৃত্যু—এই বীর ভাইটিকে গ্রাস করবার জন্ত তার লেলিহান জিহ্বা বের করে-ছিল। আর সে বীরদর্পে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুভদ্রার অভিমন্যুর প্রতি শত্রুর দল সপ্তভেদী বাণ নিক্ষেপ করেছিল। আমাদের অভিমন্যু সহস্রভেদী বাণ খেয়ে নিঃশেষে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল।

মাষ্টারদা দুটি রত্ন হারিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন। মাষ্টারদার সঙ্গে আমি চলে এলাম। আমার জীবন ধন্ত হ'ল। না—মাষ্টারদার নাম উল্লেখ করে আর কাজ নাই। মাষ্টারদার যে পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম এখন তা লিখতে বসে আমি তাঁকে ছোট করে দেব না।

রামকৃষ্ণদা বলেছিলেন ভোলার সঙ্গে আলাপ করতে।

আলাপের চূড়ান্ত হয়ে গেল। দু'দিন ধরে কেবল ওর হাসিই শুনেছিলাম। শবশেষে আমারই দু'চোখের সামনে সে মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নির্ম্মলদা অতি অল্পদিনেই অনেকখানি আপন করে নিয়েছিলেন আমাকে। কেবলই মনে হয় যে নির্ম্মলদা সব বুঝেছিলেন তাই একটুও দেরী না করে যা কিছু বলবার বলে দিলেন। যতই মনে পড়ে যে নির্ম্মলদা বলেছিলেন চাঁটগাঁ শহরের বুকে আগুন জালিয়ে দেবেন, যাবার আগে একটা কিছু করে যাবেন ততই মন বলে ওঠে—

মরমেই মরে গেল, মুকুলেই—
ঝরে গেল প্রাণভরা আশা
সমাধি-পাশে।

প্রবাহ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

২৪

রাজাবাবু মৃন্ময়কে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি তখন তাঁর পাঠাগারেই ছিলেন। মৃন্ময় বারকয়েক বাহির হইতে ভিতরে দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া শেষে জুতা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

মৃন্ময় কেমন যেন অভিভূতের মত নিজের অজ্ঞাতেই এ কাজ করিল। ইহাকে পাঠাগার না বলিয়া পবিত্র দেবমন্দির বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই ঘরে কত জ্ঞানীগুণী মনীষীর চিন্তাধারা যেন স্তব্ধ হইয়া আছে। তাঁদের ভাবনা, তাঁদের মনের ঐশ্বর্য্য, আনন্দ-বেদনা, সুদীর্ঘকালের সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল—এই ঘরের আবহাওয়ার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া আছে। এখানে বসিয়া চরম সত্যের উপলব্ধি করা যায়, মানুষের মনের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সহিত পরিচিত হওয়া চলে। যাহা ভাবিয়া দেখা হয় নাই, এক সময় যাহা মনের মধ্যে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে নাই; অসম্ভব, অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত, এখানে বসিয়া নীরবে চিন্তা করিলে তাহাই সুন্দর এবং সত্য-রূপে মনকে আকৃষ্ট করে। এখানে হিংসাবিদ্বেষের নীচতা নাই, যুগযুগান্তের দেশবিদেশের মনীষীরা এই অনতিবৃহৎ কক্ষে যেন অমর হইয়া পাশাপাশি বিরাজ করিতেছেন। পুস্তকস্তূপের অন্তরালে এই পাঠাগারের যে রূপ মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হয় তা বিচিত্র। কখনও তাহা বাল্মীকির চোখের জলে করুণ, কখনও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার রশ্মিচ্ছটায় প্রদীপ্ত, কখনও বায়রণের ভোগবিলাসের বর্ণনায় মুখর, কখনও টলস্টয়ের উদার আদর্শবাদের মহিমামণ্ডিত। মানুষের মন যে ভাবে ইহাকে চায় সেই ভাবেই পাইতে পারে।

মৃন্ময়ের হঠাৎ মনে হইল যে, এমনি একখানি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে গভীর চিন্তাধারার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারিলে বেশ হয়। দৈনন্দিন সঙ্গী হিসাবে ইহার শ্রেষ্ঠত্বে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

রাজাবাবু মৃন্ময়ের এই তন্ময়তায় মনে মনে খুশী হইয়া উঠিলেন। এত বড় শ্রদ্ধা প্রদর্শন তার পাঠাগারকে আজ পর্য্যন্ত কেহ করে নাই। ইতিপূর্ব্বে যাঁরা আসিয়াছেন তাঁরা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন পুস্তকাধারগুলির অপূর্ব্ব কারু-কার্য্যে, বিস্মিত হইয়াছেন অজস্র পুস্তকের একত্র সমাবেশ দেখিয়া। পুলকিত চিত্তে বাহবা দিয়াছেন তাঁর অর্থব্যয়ের বহর দেখিয়া। সকলেই রাজাবাবুর অর্থব্যয়ের দিকটায় ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু যেখানে তাঁর মনের গভীর যোগ রহিয়াছে সে স্থানটা কারুর দৃষ্টিতে পড়ে নাই।

মৃন্ময় এতক্ষণে কথা কহিল, টাকা অনেকেরই আছে। খরচও সকলেই করে থাকেন। কিন্তু আপনার অর্থব্যয় সার্থক রাজাবাবু।

রাজাবাবু খুশীর সুরে কহিলেন, বড় আনন্দ দিলেন আজ আপনি। আপনার চোখে যে প্রকৃত সত্য ধরা পড়েছে এতে আমি কত যে আনন্দিত হয়েছি সে আপনি বুঝবেন না মৃন্ময়বাবু।

মৃন্ময় পুনরায় কহিল, কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি।

রাজাবাবু কহিলেন, বিলক্ষণ—

মৃন্ময় কহিল, আপনার এ পাঠাগার কি সাধারণের জন্য খোলা থাকে, না নিতান্তই এ আপনার ব্যক্তিগত।

রাজাবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, আপনি কি বলতে চান তা আমি বুঝেছি। দেখুন আমাদের দেশ এখনও এ জিনিষটির পুরো মর্য্যাদা দিতে শেখে নি। তাই যা কল্পনা করি বাস্তবে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ভয় হয় পাছে কেউ অনাদর করে। কিন্তু যে যথার্থ অনুরাগী তার জন্য আমার পাঠাগারের দ্বার সব সময় খোলা থাকে। সাধনার মূল্য যাঁরা দিতে জানেন, তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি।

রাজাবাবু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মৃন্ময়কে গ্রন্থাগারটি দেখাইতে লাগিলেন। এইটেতে ফরাসী সাহিত্য, এইটেতে রাশিয়ান, এখানে পাবেন ইংরেজী, এপাশে আছে জাপানী সাহিত্য আর

এই দেখুন সংস্কৃত সাহিত্যের বহু পুরাতন গ্রন্থ ও কাব্য। আমাদের বাংলা সাহিত্যও তুচ্ছ নয়। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এঁরা যে-কোন দেশের গৌরব।

রাজাবাবু একটু থামিয়া পুনরায় কহিলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বই আমি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছি। এর পিছনে বহু অর্থব্যয় আমাকে করতে হয়েছে। অনেকে বলেন এ আমার এক ধরণের বিলাস। শুধু আপনার বেলায়ই দেখলাম তার ব্যতিক্রম।

রাজাবাবু থামিলেন। কয়েক মুহূর্ত কি চিন্তা করিয়া কহিলেন, আপনার বয়স কম। আমার মহীপালের চেয়ে সামান্য বড় হবেন হয়তো, কিন্তু তবুও আপনি শ্রদ্ধার পাত্র।

মৃন্ময় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। আর মহীপাল তার স্বল্পভাষী পিতার মুখে অনর্গল এত কথা ইতিপূর্ব্বে আর শুনিয়াছে কিনা মনে মনে তাহারই হিসাব করিতেছিল।

মৃন্ময় লজ্জিত কণ্ঠে কহিল, কত অল্প আমরা জানি, আর জানবার যে কত আমাদের বাকী আছে তা এমন করে এর আগে টের পাই নি।

রাজাবাবু নিঃশব্দে হাসিতে লাগিলেন।

মৃন্ময় পুনরায় কহিল, প্রশ্নটা অসঙ্গত হলেও কৌতূহল দমন করতে পারছি না। যতগুলো ভাষার বই এখানে রয়েছে এর সব কয়টিই কি আপনার জানা?

রাজাবাবু তেমনি হাসিমুখেই জবাব দিলেন, সব ভাষা জানা না থাকলেও তেমন ক্ষতি হয় না। তবে মূল গ্রন্থের রসাস্বাদন কিছুটা ব্যাহত হয় মাত্র।

তিনি প্রশ্নের জবাবটা এড়াইয়া গেলেন। মৃন্ময় বুঝিয়াই নীরব রহিল। কিন্তু জবাব দিল মহীপাল, বাবার প্রায় সব কয়টি ভাষাই জানা আছে।

রাজাবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। কহিলেন, অল্প-স্বল্প জানা আছে। করবার মত হাতে কিছু না থাকলে ঐ নিয়েই নাড়াচাড়া করি।

মৃন্ময় বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

২৫

সূর্য্য ওঠে অস্ত যায়। গতি তার নিয়মে বাঁধা। দিন এক আসে আর যায়। দিনের সমষ্টিতে মাস। মাসের সমষ্টিতে বৎসর—তাহাও ঘুরিয়া আসে।

মৃন্ময়ের বয়স আরও বছর তিনেক বাড়িয়া গিয়াছে, রাজাবাবুর পাঠাগারেই তার বেশীর ভাগ সময় কাটে। ও যেন আর আগের মানুষ নাই। অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গিয়াছে, যেটা এই বয়সের পক্ষে নিতান্ত বেমানান। কথা সে হিসাব করিয়া বলে। যেন বলিতে না হইলেই বাঁচিয়া যায়।

লিলি অনুযোগ দিতে চায়, কিন্তু কোথা হইতে একটা সঙ্কোচ আসিয়া তার কণ্ঠরোধ করে। লিলি এখন মা। সুনির্ম্মলের ছেলের গর্ভধারিণী। বছর তিনেক প্রায় বয়স হইয়াছে ছেলেটির। এটি সুনির্ম্মলের স্মৃতি। ভাবিতে গিয়া মন তিক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু নিরপরাধ শিশুর প্রতি চোখ তুলিয়া চাহিতেই তার মন এক অনির্ব্বচনীয় মধুর রসে সিক্ত হইয়া যায়; শিশুকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলে। মুখে হাসি দেখা দেয়। মায়ের কণ্ঠলগ্ন হইয়া আধো আধো স্বরে শিশু ডাকে—মা—

মৃন্ময় কতদিন চাহিয়া চাহিয়া এই দৃশ্য উপভোগ করিয়াছে। বুক তার ভরিয়া উঠিয়াছে। অথচ ঐ ছোট্ট শিশুকে কিছুতেই সে সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না যে, উহাকেই কেন্দ্র করিয়া তার জীবনে এত বড় বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে।

অবোধ শিশু—মৃন্ময়ের কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইবার সাহস রাখ তুমি। আবার কচি দুখানা হাত বাড়াইয়া কোলে আসিতে চাও। মৃন্ময় করুণ দৃষ্টিতে শিশুর পানে খানিক চাহিয়া থাকিয়া নিজের হাত দুখানা বাড়াইয়া দেয়। শিশু তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ওর নিষ্কলঙ্ক সারল্যকে সে কেমন করিয়া বার বার উপেক্ষা করিবে। কিন্তু যুক্তি ও আচরণের মধ্যে অনেকটা পার্থক্য থাকিয়া যায়। মৃন্ময় সহজ ও স্বচ্ছন্দ হইতে পারে না এবং এই না পারার জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয়, অন্তরে বেদনা অনুভব করে। কিন্তু মৃন্ময় তখনও টের পায় নাই যে, নিজেরই অজ্ঞাতে ঐ শিশুর প্রতি অন্তরে অন্তরে তার কতখানি স্নেহ জমিয়া উঠিয়াছে।

মৃন্ময়ের আজ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। এখনও সে পাঠাগারে যায় নাই। ইহা তার এই চার বছরের জীবন-যাত্রার অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। লিলি আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। মৃদুকণ্ঠে কহিল, এ জায়গাটা তোমার বোধ হয় সহ্য হচ্ছে না মিনুদা?

মৃন্ময় তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া কহিল, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন লিলি। আমি ত বেশ ভালই আছি। তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো? আমার তো কোন দিকেই তেমন খেয়াল থাকে না।

লিলি একটু চমকাইয়া উঠিল। অনুযোগ দিয়া কহিল, তুমি আমায় কি ভাব মিনুদা! তা ছাড়া তোমার জন্য আমায় কতটুকুই বা করতে হয়। তোমার জন্যই এ কথা আমায় বলতে হচ্ছে। দিন দিন তোমার চেহারা যে কি হয়ে যাচ্ছে তা তুমি না দেখলেও আমার তো চোখ এড়ায় না।

একটু থামিয়া শান্ত কণ্ঠে পুনরায় লিলি কহিল, এমন করে নিজের ক্ষতি করবার কোন অধিকার তোমার নেই। তোমায় দিন কয়েকের জন্য অন্য কোথাও গিয়ে হাওয়া বদল করে আসতে হবে।

মৃন্ময় তেমনি হাসিমুখে কহিল, এ সব তোমার বাড়িয়ে

বলা। এখানে আমি বেশ আছি। আর শরীরও আমার খুব ভালই আছে।

লিলি কহিল, তাহলে পরিষ্কার ভাবেই বলছি। মোট কথা এখানে থাকতে হলে তোমার নিয়ম মেনে চলতে হবে।

মৃন্ময় একটু হাসিয়া প্রতিবাদ করিল, তোমার অনিয়মটাই যে আজ আমার কাছে নিয়ম হয়ে উঠেছে লিলি।

লিলি একটু উষ্ণ কণ্ঠে কহিল, তোমার যুক্তি আমি শুনতে চাই না মিনুদা। দিনের পর দিন আমার চোখের সামনেই নিজের এত বড় সর্ব্বনাশ তুমি করবে সে আমি হতে দেব না।

মৃন্ময় ছেলেমানুষের মত হাসিতে লাগিল—তুমি পাগল লিলি…তুমি পাগল…

সহসা লিলির দু'চোখ সজল হইয়া উঠিল। মৃদু কণ্ঠে কহিল, তোমার দিকে চাইলেই নিজেকে আমার সব চেয়ে বড় অপরাধী বলে মনে হয়। আমায় একথা ভাববার অবকাশ দিও না মিনুদা। নিজের কাছে নিজে বড় ছোট হয়ে যাই।…একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, তুমি আমায় এড়িয়ে চলো—কিন্তু সংসারে আর আমারও কেউ নেই যে!

মৃন্ময় শান্ত কণ্ঠে কহিল, তুমি অত বোকা হয়ো না লিলি। অযথা ভুল বুঝে নিজেও দুঃখ পাবে, আমাকেও দেবে।

লিলি কহিল, আমায় তুমি ক্ষমা করো। কিন্তু কিছুতেই এ সব কথা আমি ভুলতে পারছি না। এগুলো দিনরাত আমার মনের উপর বোঝার মত চেপে বসে আছে।

মৃন্ময় পুনরায় বলিল, তুমি পাগল লিলি।…

লিলি আর কথা বাড়ায় না। ধীরে ধীরে চলিয়া যায়।…

দিন চলিতে থাকে। লিলির ছেলেকে মৃন্ময় ইদানীং অনেকটা স্নেহের চক্ষে দেখিতে সুরু করিয়াছে। অবোধ শিশু যখন কাঙালের মত ভয়ে ভয়ে তার পানে চোখ তুলিয়া তাকায় মৃন্ময়ের বুকের সবচেয়ে কোমল স্থানটি তখন যেন ব্যথায় মোচড় দিয়া উঠে। মানুষের বুকের চিরন্তন স্নেহ-বুভুক্ষা তার অন্তরের অন্তস্তলে জাগিয়া উঠে।

বাঙলো-সংলগ্ন ছোট লনে ইদানীং মৃন্ময়কে প্রায় প্রত্যহই লিলির ছেলেকে লইয়া খেলা করিতে দেখা যায়। শিশুর মত উল্লাসে মৃন্ময় অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, দুয়ো হেরে গেলে তুমি। পঙ্কজ-বাবু হেরে গেছ।

শিশু পঙ্কজ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে। মৃন্ময়কে অনুকরণ করিতে গিয়া অর্দ্ধোচ্চারিত কণ্ঠে এমন এক ভাষার সৃষ্টি করে যে মৃন্ময় পর্য্যন্ত না হাসিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু এই হাসির তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া পঙ্কজ দ্বিগুণ উৎসাহে একই কথার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে।

মৃন্ময় বলে এদিকে বলটা ছুঁড়ে দাও পঙ্কজবাবু।

পঙ্কজ প্রাণপণ শক্তিতে বলটি ছুঁড়িয়া দেয়, সম্মুখের দিকে না যাইয়া বলটি পিছনের দিকে চলিয়া যায়।

মৃন্ময় বলে, এলো না পঙ্কজ। আবার মারো।

পঙ্কজের উৎসাহ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে এবং শেষ পর্য্যন্ত সে কৃতকার্য্য হয়।

রাজাবাবুর ছেলে উপঢৌকন পাঠাইয়াছে একজোড়া খরগোস। খবরটা লিলি দিতেই পঙ্কজ মায়ের অনুসরণ করিল এবং অনতিকাল মধ্যেই একটা খরগোসের কান ধরিয়া টানিতে টানিতে মৃন্ময়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। খুশীর সুরে কহিল, খরগোস।

মৃন্ময় কহিল, হ্যাঁ খরগোস।

কিন্তু এর পরেও যে পঙ্কজ বহুক্ষণ ধরিয়া তার নিজস্ব ভাষায় কি বকিয়া গেল তাহার এক বর্ণও মৃন্ময়ের কানে গেল না। মন তার তখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। ছেলেবেলার একটি অতি তুচ্ছ ঘটনা যে আজ আবার এমনি করিয়া মনে পড়িবে তা কে জানিত। সংসার-অনভিজ্ঞ দুটি বালক-বালিকা তখন তারা—মৃন্ময় আর মঞ্জুষা। তার পরে কতদিন চলিয়া গেল, কত ঘটনার সূচনা এবং সমাপ্তি ঘটিল, কিন্তু অতীতের অতি তুচ্ছ একটি ঘটনা আজও যেন জীবন্ত হইয়া তার চেতনার সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া আছে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আজ তার অস্তিত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

পঙ্কজ বকিয়া বকিয়া সমর্থনের অভাবে কখন যে চলিয়া গিয়াছে মৃন্ময়ের হুঁস নাই। কখন যে পাহাড়ের আড়ালে সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে তাহাও সে জানে না। তার চোখের সুমুখ হইতে বর্ত্তমান একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। বিক্ষুব্ধ মৃন্ময় তার বাল্য জীবনের প্রাণবন্ত পরিবেশের মধ্যে নিজের সত্তাকে খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। মঞ্জুষার মৃদু গুঞ্জন যেন তার কানের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মৃন্ময় ভোলে নাই—ভুলিতে সে পারে না। চৈতন্যের সঙ্গে বড় নিবিড় সম্বন্ধ তার।

লিলি আসিয়া মৃন্ময়ের কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, বাইরে হিম পড়ছে, ভেতরে চলো মিনুদা। সন্ধ্যা বহুক্ষণ হয়ে গেছে। শরীরটা কি তেমন ভাল ঠেকছে না?

মৃন্ময় উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, খেয়াল ছিল না। চল যাই। চলিতে চলিতে মৃন্ময় পুনরায় কহিল, রাজাবাবুর ছেলে বুঝি খরগোস দুটো পাঠিয়ে দিলে? পঙ্কজ খুব খুশী হয়েছে বুঝি?

লিলি সংক্ষেপে উত্তর দিল, হ্যাঁ সেই থেকেই ঐ দুটো নিয়ে আছে।

মৃন্ময় কহিল, ছেলেমানুষ কিনা অল্পেতেই খুশী। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় কহিল, মঞ্জুষার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনেও এমনি দুটো খরগোসকে নিয়ে আমাদের মধ্যে কত দুখ তার কান্না…কথা বন্ধ…শেষ পর্য্যন্ত ঝগড়াটা মিটে অবশ্য গিয়েছিল, কিন্তু সে দিনের সে তুচ্ছ

ঘটনাগুলোই আজ আমার জীবনে একটা বড় রকমের ঝড় তুলেছে। মনের ভিৎ পর্য্যন্ত নাড়া দিয়েছে।

লিলি সবই বোঝে, কিন্তু কথা বাড়াইতে চাহে না। নীরবে চলিতে থাকে।

মৃন্ময় পুনরায় কহিল, জীবনে খুব বড় আশা ছিল, একটা মস্ত আত্মাভিমানও ছিল। তাই হয়তো সব দিক দিয়ে এত বড়....

অকস্মাৎ থামিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, কহিল, আজকাল বজ্ড বাজে বকি। কথাটা আমায় স্মরণ করিয়ে দাও না কেন লিলি।

লিলি কহিল, এবার থেকে দেব।

মৃন্ময় কহিল, তাই দিও লিলি। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার গোটাকয়েক কথা ছিল।

লিলি কহিল, ঘরে গিয়ে বললে কি তোমার কোন অসুবিধা হবে? না হয় খেতে বসেই বলো।

মৃন্ময় কহিল, তাই না হয় বলব। কিন্তু কি জান, জীবনটার বড় অপচয় করেছি আমি। হয়ত নিজের অপূরণীয় ক্ষতি করেছি।

লিলি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, তাল করো নি মিনুদা।...

মৃন্ময় কহিল, তা করি নি হয় তো। একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, দিনকয়েকের জন্ত আমি অন্ত কোথাও যাব ভাবছি।

লিলি মৃন্ময়ের মুখের পানে চোখ তুলিয়া চাহিল, কোন জবাব দিল না।

মৃন্ময় অন্ত প্রসঙ্গে উপস্থিত হইল, কহিল, তোমাকে কোন দিন আমার নাকুদার গল্প করেছি লিলি? আমাদের ক্লাশের ডাকসাইটে মনিটার নাকু...

একবার নয় বহুবার। কিন্তু আর একবার শোনাবার ইচ্ছে যদি থাকে তবে সে অন্ত সময়; ভেতরে চলো।

পঙ্কজ তখনও খরগোস দুইটা লইয়া মাতিয়া রহিয়াছে। লিলি তাহাকে ধমক দিতেই নিতান্ত অপরাধীর মত জড়সড় ভাবে ঘরের এক কোণে গিয়া দাঁড়াইল। মৃন্ময় তাহাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিল, কহিল, এখন ঘুমাও পঙ্কজ। কাল সকালে উঠে আবার খেলা করো। পঙ্কজ কেমন এক প্রকার দুষ্ট লাজুক হাসি হাসিয়া বাধ্য ছেলের মত শুইয়া পড়িল।

মৃন্ময়কে আজ যেন কথায় পাইয়াছে। আহারে বসিয়াও সে পূর্ব্বকথার জের টানিয়া বলিল, নাকু এক সময় আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। তখন আমরা নিতান্ত ছেলেমানুষ, সেই সময় থেকেই আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা।

লিলি মৃদুকণ্ঠে কহিল, শুনেছি—তারপর...

মৃন্ময় কহিল, এখানে আসা অবধি পরস্পরের খবর আমরা রাখি নি। আমি রাখি নে ইচ্ছে করে, আর সে রাখে নি বাধ্য হয়ে। কিন্তু দিনকয়েক ধরেই দেখছি নানা ভাবে সে আমার খোঁজ নিচ্ছে। মনটা বড় দুর্ব্বল। কত আজগুবি চিন্তা এসে মনকে নাড়া দেয়। কল্পনায় কত স্বপ্ন দেখি!

লিলি নীরব।

মৃন্ময় বলিয়া চলিয়াছে, যার বেঁচে উঠার কোন আশা নেই সেও যেমন একবার শেষ চেষ্টা করে দেখে আমারও হয়েছে তাই।

লিলি কহিল, খাওয়া-দাওয়ার পরে তোমার সব কথা শুনব মিনুদা। সারা দিন বড় খাটুনি গেছে। বড় ক্লান্ত আমি। তুমি আমায় মাপ কর।

মৃন্ময় একটু বিস্মিত ভাবেই লক্ষ্য করিল লিলির সারা মুখে কে যেন এক ছোপ কালি মাখাইয়া দিয়াছে। মুখে তাহার লেশমাত্র কোমলতা নাই। কিছুক্ষণ বোকার মত তার মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মৃন্ময় কহিল, তোমাকে কোন রূঢ় কথা বলেছি কি আমি? তোমার মুখ অত শুকনো কেন? কোন অসুখ-বিসুখ করেনি তো? মৃন্ময় একসঙ্গে বহু প্রশ্ন করিল এবং অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

লিলি একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ও কিছু নয় মিনুদা। বুকে হঠাৎ একটা ব্যথা বোধ করেছি, তাই। কিন্তু তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন! খাও।

বিস্ময়ের ঘোর তখনও মৃন্ময়ের কাটে নাই। সে কহিল, বুকের ব্যথা তা আমায় এতক্ষণ বল নি কেন? আমি এখুনি ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি। তুমি দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ লিলি।

লিলি যে দিন দিন কি হইয়া যাইতেছে তাহা সে ভাল করিয়াই জানে, কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিয়া লাভ কি। সে চুপ করিয়া থাকিতে ভালবাসে, তাই নীরবই আছে।

মৃন্ময় ততক্ষণে উঠিয়া পড়িয়াছে। লিলি বাধা দিতে গিয়াও পারিল না। মৃন্ময় তার জন্ত ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছে। তার কথা সে ভাবে। কিন্তু ও চলিয়া যাইবার জন্ত অমন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে কেন? নিজের অজ্ঞাতে লিলির একটি নিঃশ্বাস পড়িল।

২৬

কথাটা এমন কিছুই নয়।...

মৃন্ময় এখানে চিরদিন কাটাইবে এমন কিছু দাসখৎ লিখিয়া দেয় নাই, কিন্তু তার এখানে অবস্থিতিটাই যেন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাই অকস্মাৎ মৃন্ময়ের চলিয়া যাইবার প্রস্তাবে লিলি চমকিত হইল। চলিয়া যাইবেই এমন কথা খোলাখুলি এখনও মৃন্ময় বলে নাই বটে, কিন্তু তার একান্ত মনের কথাটি লিলির জানিতে ত বাকী নাই। অবশ্য মনে হইতে পারে লিলির এই ব্যাপার লইয়া অতটা উতলা হইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু লিলি হঠাৎ

যেন নিজেকে আবিষ্কার করিল। দীর্ঘ চার বৎসরের সাহচর্য্যের ভিতর দিয়া—স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার অন্তরালে অত যে বস্তুটি লিলির অন্তরে লোকচক্ষুর অগোচরে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার কোন সন্ধানই সে এতদিন পায় নাই। তাই নিজের সম্বন্ধে হঠাৎ যখন তার সত্যোপলব্ধি হইল তখন সে অভিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

মৃন্ময়ের কাছে তার কিছুই কাম্য নাই। শুধু চোখের সম্মুখে তাকে ধরিয়া রাখা। স্নেহে ও মৌন সেবায় তার শ্রীহীন জীবনকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলা।

মৃন্ময় কহিল, সেই থেকেই ভাবছি যে, একবার নান্টুর সঙ্গে দেখা করব কিনা! কি জানি হয়তো আমার জন্য আরও কোন গভীর বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে। হয়তো···

মৃন্ময় থামিল। কিছুক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিবার পর যখন সে মুখ তুলিয়া চাহিল তখন লিলির মনে হইল সে মুখে যেন রক্তের লেশমাত্রও নাই। লিলি ভয় পাইয়া গেল। দৃঢ় মুষ্টিতে মৃন্ময়ের একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে শুধু বার বার বলিতে লাগিল, কি হয়েছে মিনুদা—তোমার হ'ল কি!

মৃন্ময় এক বিচিত্র হাসি হাসিয়া ক্লিষ্ট কণ্ঠে কহিল, একটা অসম্ভব কথা মনে হয়েছিল তাই···মৃন্ময় পুনরায় হাসিল। এ হাসির রূপ আলাদা। লিলি ইহাতে ভয় পায়, মৃন্ময়কে আর বেশী কথা বাড়াইতে দিতে চায় না। মৃন্ময়ের কথাটা সে কতকটা অনুমান করিয়া লইয়াছে। এবং হয়তো পাছে নূতন করিয়া আঘাত পায় এই আশঙ্কায় লিলি নিজের হৃদয়াবেগকে চাপিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত যেন মুখে মৃন্ময়ের মনের কথাটারই প্রতিধ্বনি করিল। কহিল, যাবে বৈ কি মিনুদা। নিশ্চয় যাবে। আমার মন বলছে নান্টুবাবুর এই খোঁজ নেওয়ার পিছনে কোনো নিগূঢ় কারণ আছে।

মৃন্ময় কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, মানুষ আশা নিয়েই বেঁচে থাকে। তুমি হয়তো আমার মনের কথাটাই প্রকাশ করেছ। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমার মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি বুঝি মরে গেছে।

লিলি বড় করুণ একটুখানি হাসিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, তা হতে পারে। কিন্তু তবুও যে মানুষ দুঃখবেদনায় মুষড়ে পড়ে সেও আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মরা গাঙেও জোয়ার আসে মিনুদা।

মৃন্ময় কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে লিলির মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কহিল, হয়তো তোমার কথাই সত্য লিলি। নইলে মনের মাঝে একটা নূতন আগ্রহ আজ জেগে উঠেছে কেন?

মৃন্ময় একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাটাও মনে হয় যে, ভুল করে মঞ্জু দুঃখ পেতে পারে—দুঃখটাকে [illegible] খাটো করে দেখছি না। কিন্তু জানবার প্রয়োজনই যদি হয়েছিল মঞ্জু নিজেও তো সে কাজ করতে পারত।

বাধা দিয়া গভীর সুরে লিলি কহিল, তা সব সময় হয় না মিনুদা। মানুষের মনের কাছে প্রয়োজনের মূল্য কিছুই নয়। তুমি নিজে কেন মঞ্জুর ভুল ভাঙিয়ে দেবার চেষ্টা করো নি? যা সত্য সেকথা তাকে বুঝবার সুযোগ দাও নি কেন? তুমি নিজে যা পার নি, তা অপরের কাছ থেকে আশা করো কোন্ হিসেবে।

মৃন্ময় বিহ্বল কণ্ঠে কহিল, তাকে আমি কাছে পেলাম কোথায়।

লিলি কহিল, তাকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা কোন দিন করেছ কি?

মৃন্ময় কহিল, তা করি নি।

লিলি কহিল, কেন করনি? আমার বিশ্বাস তুমি একটু চেষ্টা করলেই তার সন্ধান পেতে।

মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল, হয়তো পেতাম। কিন্তু তারপর···

লিলি শান্ত কণ্ঠে বলিয়া চলিল, তার পরের যা অতি অল্পেই তার পরিসমাপ্তি হ'ত। চারদিক দিয়ে এমনি করে জট পাকিয়ে উঠত না। কিন্তু তা তুমি পার নি। তোমার মধ্যে অভিমানটাই সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, অথচ এই অভিমান যে তার মনেও সমানভাবে জাগতে পারে এ কথাটা একবারও তুমি তলিয়ে দেখ নি। একবার···

মৃন্ময় এতক্ষণ নতমুখে শুনিতেছিল, সহসা বাধা দিয়া কহিল, তুমি হয়তো অনেক বোঝ; বিশেষ করে মেয়েদের ব্যাপারে তোমার বোঝাটা ভুল না হওয়ারই কথা। কিন্তু আমিও তো সংসারে চোখ বুজে চলি না লিলি।

লিলি কহিল, তোমাদের ঐ দম্ভই সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে।

মৃন্ময় লিলির এই উক্তির প্রতিবাদ করিল না। সে তার পূর্ব্বকথার সূত্র ধরিয়া বলিয়া চলিল, অভিমান করে দু'দিন কথা বন্ধ করে থাকা চলে, সাময়িক ঝগড়াঝাঁটিও হতে পারে, কিন্তু এ তা নয় লিলি। এর পেছনে রয়েছে নিদারুণ ঘৃণা। নইলে মঞ্জু আমার জন্য অপেক্ষা করত, আমাকে একবার জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজন বোধ করত এবং কান্নাকাটি করে শেষ পর্য্যন্ত নিজেই একটা মীমাংসা করে নিত। ওকে জানবার সুযোগ তোমার হয় নি, তাই এ কথা তুমি বলতে পারছ লিলি।

লিলি শান্ত মৃদু কণ্ঠে কহিল, তা হলেও আমি এই কথাই বলতাম মিনুদা। সে যে মেয়ে এবং এই বাংলাদেশেরই মেয়ে! কিন্তু মঞ্জু সত্যিই কৃপার পাত্রী। আমার চেয়েও অদৃষ্ট তার মন্দ।

লিলি থামিল।

কাছাকাছি কোথাও মাদল বাজিয়া উঠিয়াছে। সম্ভবত পাহাড়ীদের নৃত্য সুরু হইয়াছে। কাছেই সাঁওতাল পল্লী। ওরা আছে বেশ। ওদের সুখ-দুঃখের মানদণ্ড আলাদা।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিবার পর লিলি পুনরায় কহিয়া উঠিল, একের ভুল যে অপরের জীবনে কত মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে সে তো অহরহই দেখতে পাচ্ছি।

মৃন্ময় হয়তো তাহাদের কথার মোড় ফিরাইবার জন্যই অন্য প্রসঙ্গ টানিয়া আনিল, কহিল, আমি এখান থেকে চলে গেলে তুমি দুঃখ পাবে সে আমি জানি। আমার কথা আলাদা, নইলে এই চার বছর ধরে তুমি আমার জন্য যা করেছ সেটা ভুলবার নয়। নিজের মায়ের পেটের বোনও বোধ হয়, তার দাদার জন্য এর চেয়ে বেশী করতে পারত না।

লিলির মুখ শুকাইয়া উঠিতেছিল। সে মৃদু কণ্ঠে কহিল, কতকগুলো বাজে কথা তুলে তুমি কি আমায় সাজা দিতে চাও মিনুদা? তোমার যত বড় ক্ষতি আমার দ্বারা হয়েছে তার জন্য আমি দায়ী হলেও, আমি যে অপরাধী নয় এ কথা তুমি নিজেও জান, তবু কেন যে এ সব কথা তুলে আমায় ব্যথা দিচ্ছ বলতে পারি নে।

মৃন্ময় নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। কোন প্রতিবাদ করিল না।

মানুষ মানুষের মনের ভিতরটা দেখিতে পায় না, তাই এত ভুল বোঝাবুঝি। মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত চলিয়াছে—অবিরাম নানা রূপে নানা ভঙ্গীতে।

লিলি ভাবিতেছিল, মানুষের যদি এই অন্তর্দৃষ্টি থাকিত তাহা হইলে কেমন হইত? ভুল করা কিংবা ভুল বোঝা সংসার হইতে উঠিয়া যাইত কি? কিন্তু তাহা হইলে জীবনে বৈচিত্র্য দেখা দিত কোন্ পথে? একটা দম দেওয়া ঘড়ি আর মানুষে কতটুকু তফাৎ থাকিত।

মৃন্ময় লিলির চিন্তাকুল মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া শেষে কহিল, তুমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছ। তোমায় ব্যথা দেবার ইচ্ছে নিয়ে ওকথা আমি বলি নি লিলি।

লিলি ক্ষণকালের জন্য মুখ তুলিয়া চাহিয়া পুনরায় দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ করিল।

মৃন্ময় বলিয়া চলিল, মেয়েরা প্রয়োজন হলে যে সব অবস্থার সঙ্গেই নিজেদের মানিয়ে চলতে পারে সেটা তোমায় দেখলে যেমন করে বুঝতে পারি আর কিছুতেই তেমন নয়।

লিলি তথাপি নীরব।

মৃন্ময় বলিয়া চলিল, আমার জীবনের পথে তোমার আবির্ভাব কতকটা দুষ্টগ্রহের মত একথা তুমিই আমায় বলেছ, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাটাও ভাবতে পার না কেন যে, আমার জীবনের গতি পরিবর্তিত হবে বলেই তোমার আবির্ভাব। আমাকে বিশ্বাস করো লিলি।

লিলি চুপ করিয়া শুনিতেছিল।

মৃন্ময় তেমনি ভাবেই বলিয়া চলিল, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না কেন তুমি আমার সব কথা সহজভাবে নিতে পার না। আমার আচরণে কোথাও কি কোন ত্রুটি আছে লিলি? অবশ্য একথা ঠিক যে, নানা কারণে তোমার সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল, কিন্তু তা মাত্র ততদিন পর্য্যন্ত যত দিন তোমার সম্বন্ধে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ভুল ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিজেকে শাসন করেছি।

লিলি কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। অথচ জোর করিয়া মৃন্ময়কে সে থামাইয়া দিতেও পারিতেছিল না।

মৃন্ময় আপন খেয়ালে বলিয়া চলিয়াছে, লোকে আমার কথা শুনলে পাগল বলবে। কিন্তু তারা শুধু উপহাস করতেই জানে। তা বলে তুমি আমায় ভুল বুঝো না। সে হবে আমার কাছে সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক।

লিলির এসব আলোচনা আর ভাল লাগিতেছিল না। সে ঘড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। কহিল, রাত অনেক হ'ল।

'সে আমি জানি' মৃন্ময় কহিল, 'কিন্তু জোর করে আমার মুখ বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করো না লিলি। হয়তো জীবনে এমন সময় এবং সুযোগ আর নাও আসতে পারে।'

'আঃ!' লিলি মুখে একপ্রকার বিরক্তিসূচক শব্দ করিল। কহিল, তুমি কি কিছুতেই থামবে না? না আমায় এসব কথা শোনাবার জন্যে তুমি একেবারে কোমর বেঁধে এসেছ! তুমি বুঝি চিরদিনের জন্যে চলে যাবার মতলব এঁটেছ? ভাবছ কি তা তুমি পারবে? কক্ষনো না—আমি যে কত বড় অসহায় একথা তোমার চেয়ে বেশী ত আর কেউ জানে না মিনুদা।

মৃন্ময় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না।

লিলি কহিল, তোমার ঐ অদ্ভুত হাসিকেই আমার সব চেয়ে বেশী ভয় মিনুদা...

মৃন্ময় ইহারও কোন জবাব দিল না। তেমনি স্মিতমুখেই লিলির মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

ক্রমশঃ

বেথুন বালিকা বিদ্যালয়

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

কলিকাতায় বেথুন বালিকা বিদ্যালয় ১৮৪৯ সনের ৭ই মে ভারতের তৎকালীন ব্যবস্থার-সচিব জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ইহা একটি সামান্যমাত্র স্কুল ছিল। পরে ১৮৭৯ সনে ইহার সঙ্গে একটি কলেজ বিভাগও খোলা হইল। স্কুল এবং কলেজ উভয়ই বেথুনের নামের সঙ্গে যুক্ত হইয়া তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। বেথুন স্কুল এবং বেথুন কলেজ একই স্থানে অধিষ্ঠিত র'হিলেও স্কুলটি ইহার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার শতবর্ষ পূর্ত্তিতে কর্তৃপক্ষ এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তিগণ একটি উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। কাজেই ইহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চারি দশকে বঙ্গদেশে—কলিকাতায় এবং মফস্বলে খ্রীষ্টান মিশনরীদের তত্ত্বাবধানে ইউরোপীয় মহিলাগণ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলিকাতায় রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা বৈদ্যনাথ রায় প্রমুখ বাঙালী প্রধানগণ অর্থ ও উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগকে নানা ভাবে সাহায্য করিতেন। মফস্বলেও নেতৃস্থানীয় বাঙালীরা তাঁহাদের সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। কিন্তু তখন এই সকল বিদ্যালয় মোটেই জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে সম্ভ্রান্ত ভদ্র হিন্দুগণের নিজ নিজ কন্যাদের পাঠাইতে বিশেষ আপত্তি ছিল। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়গুলিতে খ্রীষ্টতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইত বলিয়াও তাঁহারা তাঁহাদের বালিকাদের এখানে পাঠাইতে চাহিতেন না। বস্তুতঃ এ সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল ভারতবাসীর অন্তঃপুরেও খ্রীষ্টবাণী প্রচার। কাজেই তাঁহাদের স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।*

রাধাকান্ত দেবের আগ্রহাতিশয়ে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" নামে একখানি স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক লেখেন। পূর্ব্বকালে হিন্দু নারীগণ শিক্ষাব্যাপারে কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন সেই সব তথ্য ইহাতে সংকলিত করিয়া দেওয়া হয়। স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধেও দুই-একটি অধ্যায় পরে ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে।

প্রাচীনপন্থী রাধাকান্ত দেবের মত হিন্দু কলেজের নব্য শিক্ষিত যুবকগণও স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়া লেখনী পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। নব্যবঙ্গের নেতা রামগোপাল ঘোষ বরং নানা ভাবে ইহাতে উৎসাহ দিতে অগ্রসর হইলেন। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির মারফত স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একটি পরিকল্পনাও তৎকর্ত্তৃক রচিত হয়। কলিকাতার অদূরে বারাসতে এবং উত্তরপাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন হইল। প্রথমোক্ত স্থলে একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিতও
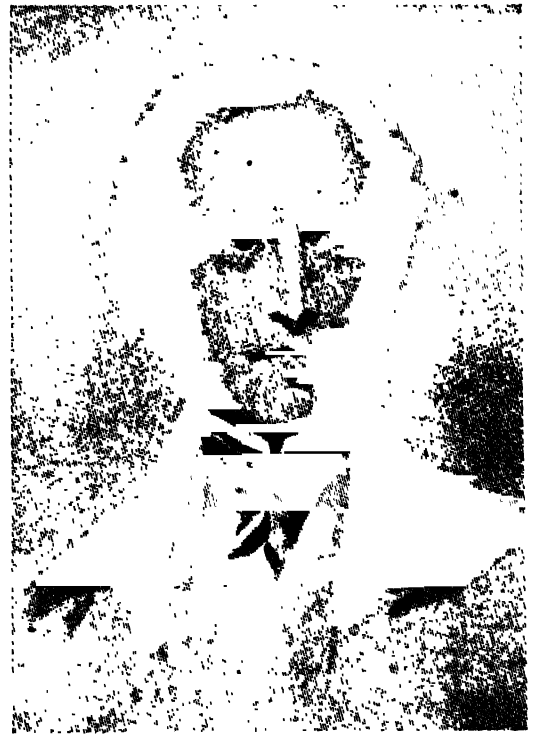
জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন

হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতায় বেথুন কর্তৃক স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়টিই সর্ব্বপ্রথম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ভদ্র পরিবারের কন্যাগণ এখানে বিদ্যাভ্যাস করিতে সুরু করেন। এই দিক দিয়া বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ই বঙ্গদেশে প্রথম আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের গৌরব দাবি করে। এই সময়ে বোম্বাইয়ে দাদাভাই নৌরজির চেষ্টায় এবং মাদ্রাজেও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সেকথা এখানে বলিবার প্রয়োজন বোধ করি না।

* বর্ত্তমান লেখকের *Beginnings of Modern Education in Bengal : Women's Education* পুস্তকে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বেথুন সাহেব কেমব্রিজের একজন প্রখ্যাত ছাত্র। ব্যবহার-শাস্ত্র অধ্যয়নান্তে তিনি আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেন। বিলাতের হোম আপিসের উকীলরূপে তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। ভারতের বড়লাটের শাসন-পরিষদে ব্যবহার-সচিবের কার্য্যে নিয়োগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। বেথুন ছিলেন চিরকুমার। তাঁহার অবসর সময় পড়াশুনায় অতিবাহিত হইত। তিনি কবি বলিয়াও সে যুগে পরিচিত হন। বিলাতে অবস্থানকালেই ভারতবর্ষের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা কিরূপ দ্রুত প্রচারিত হইয়া বঙ্গসমাজকে সেই ভাবে ভাবুক করিয়া তুলিতেছিল, সরকারী শিক্ষা রিপোর্ট এবং অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকা পাঠে তিনি তাহা অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমাজের অর্দ্ধেক লোকের মনে তখনও শিক্ষার আলোক প্রবেশ করে নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন—ভারতের নারীজাতিকে শিক্ষিত করিয়া না তুলিলে এদেশবাসীর মঙ্গল নাই।

রামগোপাল ঘোষ

বেথুন ১৮৪৮ সনের এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষে আগমন করেন। স্বীয় পদাধিকার বলে তিনি Council of Education বা শিক্ষা-সমাজেরও সভাপতি হইলেন। নব্য বঙ্গের মুখপাত্র রামগোপাল ঘোষও এই বৎসরে শিক্ষা-সমাজের সদস্য-পদে নিযুক্ত হন। বেথুন কলিকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের অভিপ্রায় রামগোপালের নিকট সর্ব্বপ্রথম ব্যক্ত করেন। ইহার পর এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে যে সব আয়োজন সুরু হয় তৎসম্পর্কে প্রগতিশীল মতামতের সমর্থক এবং নব্য দলের অন্তরঙ্গ পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য নিজ 'সম্বাদ ভাস্কর' ১৮৪৯, ১০ই মে সংখ্যায় লেখেন,—

"বুদ্ধিনিপুণ বেথুন সাহেব ১২ বৈশাখ [২৩ এপ্রিল] সোমবারে তথায় সাধারণ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন ঘোষবাবু স্বদেশস্থ বান্ধবদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এই বিষয়ের সহায়তা করেন, তাহাতে বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয় আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ-পূর্ব্বক স্বীকৃত হইলেন তাহারদিগের বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন এবং তৎপর সোমবারে [৩০ এপ্রিল] ঐ সকল আত্মীয়গণকে লইয়া বেথুন সাহেবের সাক্ষাতেও বান্ধবগণকে এই বিষয়ে স্বীকার করাইলেন, তৎসময়ে শ্রীযুত বেথুন সাহেব ঐ সকল ব্যক্তিকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইকালে পরামর্শ ধার্য্য করিয়া গত সোমবার বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে দিয়াছেন···।"

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বেথুন সাহেবের এই কার্য্যে বিশেষ সহায় হইলেন। 'সম্বাদ ভাস্কর' ১২ মে ১৮৪৯ তারিখে লেখেন,—

"দক্ষিণ বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলেন হিন্দু বালিকাদিগের বিদ্যালয় করণার্থ বেথুন সাহেব বাবু রামগোপাল ঘোষের সহিত একত্র হইয়া আসিয়া তাঁহার সিমলার বৈঠকখানা দেখিয়া গিয়াছেন, ইহাতেই নির্ম্মলহৃদয় দক্ষিণ বাবুর মনে উদয় হইল তাঁহার সংস্বভাব প্রকাশের উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সময় গেলে আর আসিবেক না, অতএব আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বেথুন সাহেবের নিকট গমন করিলেন, এবং বেথুন সাহেব যে এতদ্দেশীয় হিন্দু বালিকাগণকে বিদ্যাদানের উদ্যোগ করিয়াছেন তদর্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিলেন তাঁহার বাগানের বৈঠকখানা অমনি দিলেন, বালিকাদিগের উপযুক্ত শিক্ষালয় যতকালে প্রস্তুত না হয় ততকাল বালিকারা ঐ বৈঠকখানায় বিদ্যাভ্যাস করিবে তিনি লইবেন না, এবং ১০০০ সহস্র টাকায় মৃজাপুরে যে ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়াছেন বালিকাদিগের বিদ্যালয় করণার্থ তাহা দান করিলেন, এতদ্ভিন্ন বিদ্যালয় প্রস্তুত করণকালে এক সহস্র টাকা দিলেন, আর ঐ বিদ্যাগারের জন্য পুস্তক যাহার মূল্য ৫০০০ সহস্র টাকার ন্যূন নহে তাহাও দিতে স্বীকার করিলেন···সাহেবের সহিত কথোপকথনান্তর বাটীতে আসিয়া এক পত্র মধ্যে এই সকল বিষয় লিখিয়া বেথুন সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং সাহেবও লিখিয়াছেন তিনি সন্তোষপূর্ব্বক এই সকল দান গ্রহণ করিলেন।"

বিভালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইল। 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও বেথুন সাহেবের বিভালয় স্থাপন প্রচেষ্টার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বিভালয় সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া সংবাদ প্রভাকর ৭ মে, ১৮৪৯ তারিখে বিভালয়ের কার্য্যারম্ভ দিবসেই লিখিলেন,—

"স্ত্রীবিদ্যা।...ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক তথা বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের অধিপতি করুণাময় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথিউনি সাহেব বাঙ্গালি জাতির বালিকাবর্গের বঙ্গভাষায় অনুশীলন নিমিত্ত বিপুল বিত্ত ব্যয় ব্যসনপূর্ব্বক 'বিক্টরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়' নামক এক অভিনব স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, অদ্য প্রাতে তাহার কর্ম্মারম্ভ হইবেক। আপাততঃ সিমুলার অন্তঃপাতি সুকিএস্ ষ্ট্রীট মধ্যে দয়ার্দ্রচিত্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানাবাটীতে কর্ম্মসম্পন্ন হইবেক, পরে তাহার জন্য স্বতন্ত্র স্থানে এক স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণ করা যাইবেক...।

"উক্ত 'বিক্টরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে' আপাততঃ অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্র বংশের প্রায় বিংশতি বালিকা অধ্যয়নার্থ নিযুক্তা হইয়াছে, একজন সুপণ্ডিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহারদিগকে বঙ্গভাষায় উপদেশ এবং একজন সুনিপুণ বিবি সূচের কর্ম্মাদি শিল্পবিদ্যার শিক্ষা প্রদান করিবেন, প্রাতে সাত ঘণ্টা অবধি নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত পাঠশালার কর্ম্ম চলিবেক, বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে যাঁহারা সঙ্গতিশূন্য, তাঁহারদিগের কন্যাগণের গমনাগমনার্থ ইহার পর গাড়ী নিয়োজিত হইবেক এমত কল্পনা আছে...।"

'সংবাদ প্রভাকর' হইতে জানা যাইতেছে, বেথুন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে 'ভিক্টোরিয়া'র নামের সংযোগ সাধনের প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু ইহা কেন কার্য্যে পরিণত হয় নাই পরে আমরা তাহা জানিতে পারিব।

৩

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ৯ই মে দিবসে 'সংবাদ প্রভাকর' পুনরায় লিখেন,—

"প্রথম দিবসে একবিংশতি বালিকা শিক্ষার্থে নিযুক্তা হইয়াছে। এইক্ষণে ক্রমে২ তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। ইহার স্থাপনকর্ত্তা মহাত্মাবর শ্রীযুত ড্রিঙ্ক-ওয়াটার বেথিউনি সাহেব গত সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটকার সময়ে পাঠশালার কর্ম্মারম্ভ সূত্রে আপনার উদার চিত্তের ভাণ্ডার খুলিয়া সদভিপ্রায় সম্বলিত সদ্বক্তৃতা রূপ অমূল্য রত্ন সকল বিতরণকরত সকলকে সন্তোষ সলিলে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তৎকালীন তচ্ছ্রবণে তাবতেই তুষ্ট হইয়াছিলেন...।

"আমারদিগের ব্যবস্থাপক সাহেব অতি সুপণ্ডিত এবং উচ্চপদস্থ, সুতরাং ইহাতে তাঁহার নিকট অধিক সুখের প্রত্যাশা করিতে হইবেক, আমরা বিশিষ্ট রূপে অবগত হইলাম, ইনি বর্ত্তমান বিষয়ে সাধ্যমতে ধনব্যয় এবং কায়িক মানসিক যত্ন ও পরিশ্রম করণে কখনই ক্রুটি করিবেন না...।"

বেথুন দীর্ঘ বক্তৃতায় এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁহার মনোযোগের হেতু, পুরাকালে হিন্দু নারীদের পরা ও অপরা বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি এবং আধুনিক শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে নব্য শিক্ষিতদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রথমেই উল্লেখ করেন। তিনি বিদ্যালয় পরিচালনের ব্যয়ভার নিজেই বহন করিতে উদ্যত হইয়াছেন কেন সে সম্পর্কে বলেন যে, ভারত-সরকার তথা কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অসম্ভবরকম বিলম্ব ঘটিত এবং শেষ পর্য্যন্ত নিজ ইচ্ছানুরূপ পরিচালনা-কার্য্য সম্ভব হইত কিনা তাহাও সন্দেহ-

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

স্থল। তিনি প্রাচীনপন্থী অথচ স্ত্রীবিদ্যানুরাগী রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ সমাজপতিদেরও আহ্বান করেন নাই বা পূর্ব্বাহ্ণে তাঁহাদের মতামত লয়েন নাই। তিনি বলেন, ইহা করিতে গেলেও নানারূপ বিঘ্নের হয়ত সৃষ্টি হইত। ইউরোপীয় বন্ধুদেরও তিনি নিমন্ত্রণ করেন নাই, কারণ তাহাতে বিশেষ সমারোহ হইবার সম্ভাবনা ছিল। বিদ্যালয়ে পঠিতব্য বিষয়াদি সম্বন্ধে অতঃপর বেথুন যাহা বলেন তাহার মর্ম্ম 'সম্বাদ ভাস্কর' (১০ মে ১৮৪৯) হইতে এখানে দেওয়া গেল,—

"প্রস্তাব সমাপন পূর্ব্বে এখানে কি প্রকার বিদ্যাশিক্ষা হইবে আমার তাহাও প্রকাশ করা উচিত, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত স্কুল সকলে যেমত কোন ধর্ম্মচর্চ্চা হয় না এখানেও সেই প্রথা প্রচলিত হইবেক, আমি জানি অনেকে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা-শিক্ষা উপলক্ষে উপহাস করিবেন, বিশেষ তাঁহারা এখানে কিরূপ শিক্ষা হইবেক তাহা অনুমান করিয়া কৌতুক করিতে পারেন, এবং তাহা আমার উপহাস্যজনক হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গদেশীয় বালকগণের বিদ্যাভ্যাস বিষয় যাহা আমি সর্ব্বদা বলিয়া থাকি তাহা যদি তোমরা কেহ শ্রবণ করিয়া থাক তবেই বুঝিবে দেশীয় ভাষানুশীলনে বালকগণের অধিক যত্নকরণ আমার নিতান্ত মানস তবে ইংরাজী বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা বিধায় তাহার

চর্চা কর্ত্তব্য বলি এবং ইহাও প্রত্যাশা করি অবিলম্ব কালে বিত্তাধিবর্গ আমারদিগের ভাষাতে যাহা শিক্ষা করিয়াছেন তাহা স্বভাষায় অনুবাদ করেন, অতএব অঙ্গনাগণ যাহা কেবল আপন পরিবারে শিক্ষা প্রদান করিতে পারিবে তাহারদিগের প্রতি তদ্বক্তার আমি উক্ত বিদ্রূপকারীগণের অপেক্ষাও অধিক বৈরক্ত্য প্রকাশ করিব, বঙ্গভাষানুশীলনই এখানকার মূল শিক্ষা হইবেক তবে গরিষ্ঠ গুণ বিবেচনায় বিশেষতঃ পিতা-মাতার সম্মতিক্রমে ইহার পর ইংরেজী শিক্ষা হইতে পারিবেক এতদ্ভিন্ন অন্ত সহস্র প্রকার শিল্পবিত্তাদি যাহা আমা অপেক্ষা আমার বন্ধু বিবি'রিড সভেল ব্যাখ্যা করিতে পারেন তিনিই তত্তাবত্তের উপদেশ দিবেন এই বিত্তাশিক্ষায় তোমারদিগের বালিকাগণ আপনারদিগের গৃহ শোভা এবং উত্তমরূপে কাল সম্বরণ করিতে পারিবেন, প্রাচীন বাণী আছে 'আলস্ত সকল পাপের জননী' কিন্তু প্রকৃত আলস্ত পৃথিবী মধ্যে অত্যল্প আছে তবে প্রয়োজনীয় ও সৎকার্য্যে সতত প্রবর্ত্ত না থাকিলে অসৎ কর্ম্মে রত হইতে হয়।"

এখানে বেথুন সাহেব বালিকাদের বাংলা শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি বরাবর এদেশীয়দের মাতৃ-ভাষা চর্চ্চায় বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন। শিক্ষা-সমাজের সভাপতিরূপে তিনি হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ, ঢাকা কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজ পরিদর্শনে গিয়া ছাত্রদের বাংলা ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। তাঁহারই উপদেশে কবিবর মধুসূদন দত্ত ইংরেজী কাব্যের পরিবর্ত্তে বাংলা কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত হন। সুতরাং বেথুন বালিকাদের বাংলা শিক্ষার যে বিশেষ পক্ষপাতী হইবেন তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি।

৪

বালিকা বিত্তালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ছাত্রীদের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইত না। পুস্তকাদিও তাহাদিগকে বিনা-মূল্যে দেওয়া হইত। বেথুন স্বয়ং বিত্তালয় পরিচালনার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতেন। ইহাতে প্রতি মাসে তাঁহার আট শত টাকা করিয়া ব্যয় হইত। তিনি স্বয়ং বিত্তালয়ে যাইতেন এবং মেয়েদের পড়াশুনা পরীক্ষা করিতেন। বেথুনকে বালিকা বিত্তালয় প্রতিষ্ঠায় যাঁহারা বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ এবং দক্ষিণা-রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বিষয় আমরা জানিতে পারিয়াছি। আর একজনও তাঁহাকে অনুরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন—তিনি হইলেন সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক পণ্ডিতবর মদনমোহন তর্কালঙ্কার। বিত্তালয় খোলার দিনে যে একুশটি বালিকা উপস্থিত হন তাঁহাদের মধ্যে ভুবনমালা ও কুন্দমালা নাম্নী দুই জন ছাত্রী মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা। মদন-মোহন বিত্তালয়ে কন্যাদের প্রেরণ করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। তিনি কিছুকাল যাবৎ রীতিমত বিত্তালয়ে গিয়া মেয়েদের পড়াইতেন। তাঁহাদের পাঠোপযোগী বাংলা পাঠ্য পুস্তকও রচনা করিতে আরম্ভ করেন।* প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত গৌরমোহন বিত্তালঙ্কার স্ত্রীশিক্ষাকে জনপ্রিয় করিবার জন্ত যেমন পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, মদনমোহনও সমসময়ের পত্রিকার মাধ্যমে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন।†

বিত্তালয়ের কার্য্য সুরু হইল বটে, কিন্তু সমাজের এক দল গোঁড়া লোক ইহার বিরুদ্ধে এমন প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল যে, শীঘ্রই ছাত্রীসংখ্যা একুশ হইতে কমিয়া মাত্র সাত জনে দাঁড়াইল। কিন্তু এই বিরুদ্ধাচরণ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। প্রথম বৎসরের শেষে দেখা গেল ছাত্রীসংখ্যা পুনরায় বাড়িয়া চৌত্রিশ জনে দাঁড়াইয়াছে। বেথুনের বিত্তালয় প্রতিষ্ঠার পনর দিনের মধ্যেই স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী রাজা রাধাকান্ত দেব নিজ ভবনে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বারাসতের বালিকা বিত্তালয়টি কলিকাতার বিত্তালয়টির আদর্শে পুনর্গঠিত হইল। উত্তরপাড়া, নিবধুই, সুখসাগর প্রভৃতি স্থানে বালিকা বিত্তালয় স্থাপিত হইল। কিন্তু সরকার কোন বিত্তালয়েই কপর্দ্দকমাত্রও অর্থসাহায্য করিতেন না। প্রত্যেক স্থলেই বালিকাদের প্রকাশ্য বিত্তালয়ে প্রেরণের বিরোধী এক দল লোক ছিল। সরকারের ঔদাসীন্য দেখিয়া তাহারা প্রচার করিতে লাগিল যে, শাসন-কর্ত্তৃপক্ষও এরূপ বিত্তালয়ের বিরোধী। বারাসতের বালিকা বিত্তালয়ের পরিচালকগণের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নও হইতে থাকে। এসব অত্যাচার-উৎপীড়ন ও বিরোধিতা লক্ষ্য করিয়া বেথুনের অনুরোধে ভারত-সরকার বাংলা-সরকারকে দিয়া এই মর্ম্মে একটি বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রচার করাইলেন যে, গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী আদৌ নহেন, তাঁহারা ইহার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং যেখানেই এরূপ প্রচেষ্টা হইতেছে সেখানেই ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমুখ স্থানীয় শাসকবর্গ আর্থিক ঝুঁকি না লইয়া ইহাকে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন এবং শিক্ষা-সমাজ এ সকলের পর্য্যবেক্ষণের ভার লইবেন। চক্রান্তকারীদের বিরোধিতা ইহার পর অনেকটা কমিয়া গেল।

৫

বিত্তালয়ের স্থায়ী বাসগৃহের জন্ত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়-প্রদত্ত মির্জ্জাপুরের ভূমিখণ্ডের কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি। বেথুন সাহেব স্বয়ং দশ হাজার টাকা ব্যয়ে ইহার সংলগ্ন আর

* লর্ড ডালহৌসীকে লেখা বেথুনের পত্র। *Cf. Beginnings of Modern Education in Bengal : Women's Education,* Appendix, পৃ. ৭৩-৮।

† 'জয়গোপাল তর্কালঙ্কার,' 'মদনমোহন তর্কালঙ্কার'—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
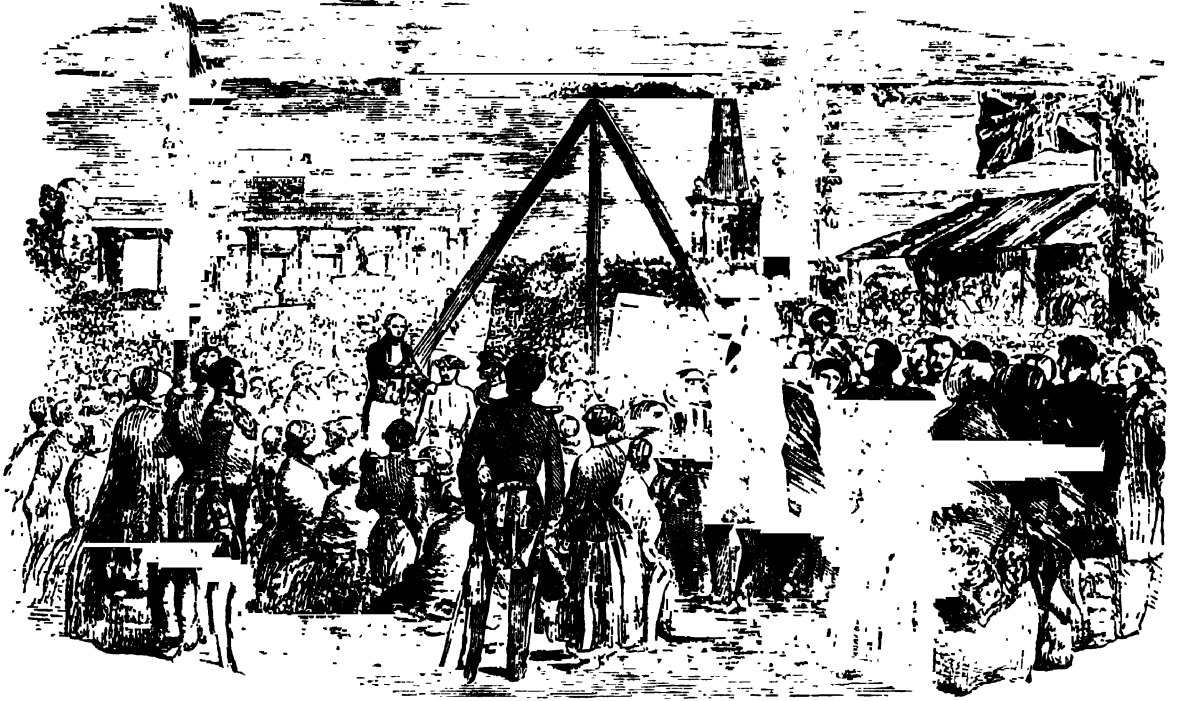
কলিকাতাস্থ হেদুয়া পুষ্করিণীর পশ্চিম পার্শ্বের ভূমিখণ্ডে বেথুনের হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন-উৎসব।
বক্তৃতারত বেথুনের বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
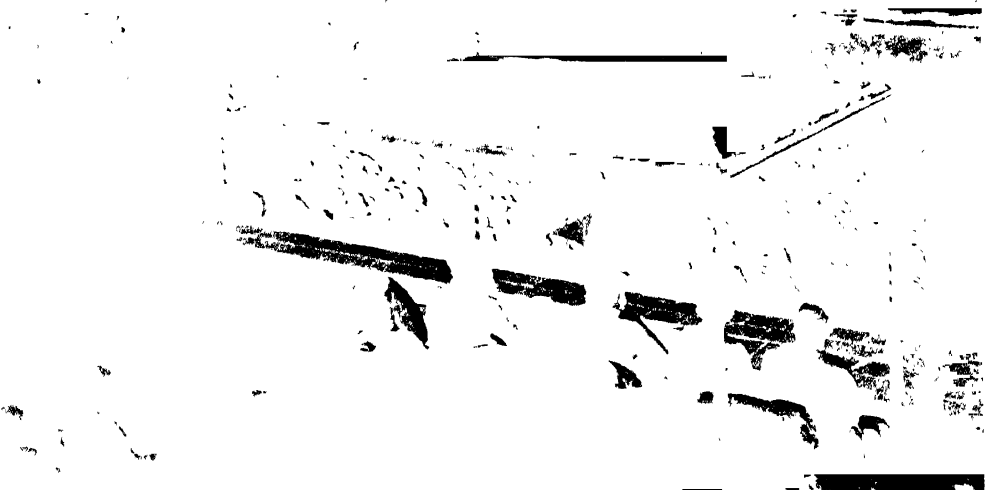
ইন্দোরে জনসভায় বক্তৃতা প্রদানরত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

দানব-নৃত্য
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাল

প্রেরণা
প্রদোষ

একখণ্ড ভূমি ক্রয় করেন। কিন্তু মির্জাপুর তখন নগরীর প্রান্তভাগে অবস্থিত ছিল। ভদ্রঘরের মেয়েদের সেখানে গিয়া পড়াশুনা করার অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা ছিল। তখন হেদুয়া পুষ্করিণীর পশ্চিম পার্শ্বে বাংলা-সরকারের জমি ছিল। বেথুনের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে মির্জাপুরের জমির পরিবর্ত্তে এই ভূমিখণ্ড দিতে তাঁহারা সম্মত হইলেন। এই ভূমিখণ্ড পূর্ব্বোক্ত জমির চেয়ে আয়তনে বড় এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

প্রারম্ভিক উদ্যোগ-আয়োজনের পর ১৮৫০ সনের ৬ই নবেম্বর এই ভূমির উপর বিদ্যালয় ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনোৎসব সম্পন্ন হইল। এই দিনে প্রকাশ্য ভাবে সাধারণের সমক্ষে ভূমি হস্তান্তর-কার্য্যও সমাধা হয়। এ কথা পরে বলা হইতেছে। বঙ্গের ডেপুটি গবর্ণর স্যার জন হার্বার্ট লিটলার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনোৎসবে পৌরোহিত্য করেন। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বেথুন-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে রাণী ভিক্টোরিয়ার নাম জড়িত করার প্রস্তাব হয়, ইহার আভাস আমরা পাইয়াছি। বেথুন কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের নিকট ভিক্টোরিয়ার নাম যুক্ত করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি গ্রহণের অনুরোধ জানাইলেন। কোর্ট এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। বিদ্যালয়টি অতঃপর 'Hindu Female School' বা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত হইতে থাকে। ভিত্তি-প্রস্তরের সঙ্গে যে তাম্র-ফলক প্রোথিত করা হয় এবং যে রৌপ্য কর্ণিকের সাহায্যে ভিত্তি-প্রস্তর গাঁথা হয় তাহার উপরে অন্যান্য কথার মধ্যে 'Hindu Female School" কথাটিও উৎকীর্ণ হইয়া ছিল। সুতরাং বেথুনের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির যে এই নামই মান্য হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সে যুগে ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন উৎসব 'মেসন' (Masson) সম্প্রদায়ের সহায়তায় পাশ্চাত্ত্য মতে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইত। হিন্দু (বা সংস্কৃত) কলেজ, হিন্দু কলেজ পাঠশালা, মিশনরীদের সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল বা অনুরূপ সাধারণ প্রতিষ্ঠানাদির বাটির ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন একটা মহা সমারোহের ব্যাপার ছিল। হিন্দু ফিমেল স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইল। বঙ্গের ডেপুটি গবর্ণর লিটলার গ্র্যাণ্ড মেসনের সাহায্যে ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিলেন। গ্র্যাণ্ড মেসন, স্যার জন লিটলার এবং বেথুন সাহেব স্বয়ং পর পর বক্তৃতা করেন। এই ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনোৎসবের একখানি চিত্র অন্যত্র দেওয়া হইল।

৬

এতিমকার উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল উক্ত ভূমিখণ্ড আদান-প্রদান। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এটর্নি ভূমি হস্তান্তর সম্পর্কিত একখানি দলিল বেথুন এবং দক্ষিণারঞ্জনের হস্তে অর্পণ করিলেন। ভূমি হস্তান্তর কার্য্যের প্রতীক-স্বরূপ একটি অশোক বৃক্ষও দলিলের সঙ্গে প্রদত্ত হইল। বেথুনের অনুরোধে ডেপুটি গবর্ণর-পত্নী লেডী লিটলার এই ভূমিখণ্ডের প্রান্তভাগে অশোক বৃক্ষটি রোপণ করেন। বেথুন এই উৎসবে

সৌদামিনী দেবী
বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষার ছাত্রী

যে বক্তৃতা করেন তাহার একটি প্রধান অংশই ছিল ভূমি হস্তান্তর সম্পর্কে। তিনি এই প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন,—

"For myself and for my friend Duckinarunjun Mookerjia, I make answer before these witnesses, that we accept the gift and assurance of this land according to the form and tenure of this same deed: and further for myself I promise and undertake in the presence of this company, that, if life and ability be granted to me, I will build upon this spot a school for the education of Hindu girls, which with the blessings of God, I trust may be destined hereafter to produce effects worthily entitling it to have a name in the annals of the land.

"It is probable, Sir, that there are many persons present who do not know that the ceremony through which we have just gone, for giving us the ownership

of this land, is the most ancient and honorable form of conveyance of land known to the English law. It has been selected on this occasion, not merely for that reason, not merely because of the remarkable analogy which it bears to the simple forms that have been immemorially used in Eastern countries, but also, and especially, because it has given me opportunity of publicly associating with myself, and enables me openly to proclaim my gratitude to, the enlightened man who stands near me, to whom jointly with myself, the land has been conveyed. Duckinarunjun Mookerjia was an utter stranger to me : I had never before heard his name, when he introduced himself to me a year and a half ago, for the purpose of letting me know that he had heard of my intention of founding a female school for the benefit of his country : that he could not bear the thought that it should be said hereafter of his countrymen that they had all stood idly looking on, without offering any help in furtherance of the good work : and in short without further preface, that he was the proprietor of a piece of ground in Calcutta, valued, as I have since learned, at about twelve thousand rupees, which he placed freely and unconditionally at my disposal for the use of the school. It was a noble gift, and nobly given. I subsequently was enabled to possess myself of some adjoining slips of land, until at last we became proprietors of the whole of that which by the munificent liberality of the Government of Bengal, exercised, and was in substance told, in the letter announcing their decision, expressly to testify their approval of my design, we were permitted to exchange for this more valuable and far more eligible site on which we are now met. It is due to Duckinarunjun Mookerjia that his name should be had in perpetual remembrance in connexion with the foundation of the school."*

বেথুন গৃহ নির্মাণের ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করিবেন, প্রথমে এই মর্মে বলিয়া, দক্ষিণারঞ্জনের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়, তাঁহার ভূমিদান, ইহার পার্শ্বে বেথুন কর্ত্তৃক ভূমিক্রয়, পরে এই উভয় ভূমিখণ্ডের বিনিময়ে বাংলা-সরকারের হেদুয়া সংলগ্ন প্রশস্ততর ভূমিখণ্ড দানে সম্মতি প্রভৃতির বিষয় পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করেন। তিনি ইহার পর ভূমি হস্তান্তর কার্য্যের প্রতীক্-স্বরূপ অশোক বৃক্ষ দান-প্রসঙ্গে বলেন যে, এরূপ স্থলে প্রতীক্-স্বরূপ তরু-দান হিন্দুদের চিরাচরিত প্রথা। এ ক্ষেত্রে অশোক-তরু মনোনীত করার কারণ হিন্দু নারীগণ ইহার প্রতি বড়ই অনুরাগী। তাঁহাদের বিশ্বাস, ইহার ফুল ভক্ষণ করিলে সন্তানের কল্যাণ হয়। অতঃপর অশোক-তরুকে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতীকরূপে সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হউক বেথুন এই প্রার্থনা জানাইলেন।

উৎসবান্তে মাননীয় ব্যক্তিগণ দক্ষিণারঞ্জনের সুকীয়া ষ্ট্রীট ভবনে গমন করেন। সেখানে তাঁহারা প্রীতিভোজে আপ্যায়িত হন।

৭

বিদ্যালয় সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে লাগিল। রক্ষণশীল সমাজের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব বিরোধী দলের নিন্দাবাদে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এতাদৃশ মহৎ কার্য্য অনুশীলন করিতে বেথুনকে পত্রদ্বারা অনুরোধ জানাইলেন। এরূপ একটি মহোপকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিন্দাচর্চ্চাকে রাধাকান্ত দেব কলুষিত মনের ঘৃণিত অভিব্যক্তি বলিয়া আখ্যাত করেন।* শিক্ষা-সমাজের সভাপতিরূপে বেথুন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরও সংস্পর্শে আসেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ১৮৫০ সনের ডিসেম্বর মাসে বালিকা বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত করেন।* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুজ এবং তদীয় জীবনীকার পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলেন, বিদ্যাসাগর বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নিজ নিজ কন্যাদের এই বিদ্যালয়ে পাঠাইতে সম্মত করান। বিদ্যারত্ন আরও বলেন যে, হেদুয়ার পশ্চিম পার্শ্বে নব-নির্ম্মিত নিজ গৃহে বিদ্যালয়টি উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে কিছুকাল গোলদীঘির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একটি বাড়ীতে ইহা স্থানান্তরিত হয়।† এই বাড়ীতে পূর্ব্বে হেয়ার সাহেবের স্কুল বসিত।

হিন্দু ফিমেল স্কুল ক্রমে অল্পকাল মধ্যে অন্যান্য বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরও সমর্থন লাভ করে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার প্রথমা কন্যা সৌদামিনী দেবীকে ১৮৫১ সনের জুলাই মাসে এখানে ভর্ত্তি করিয়া দেন। তিনি ১৮৫১, ৮ই জুলাই মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লেখেন, "আমি বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়।"‡ বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা এই সময়ে আশী জনে দাঁড়ায়। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর বিদ্যালয়ের পরিচালক-সভার সভাপতি পদে এই সময়ে বৃত হইলেন। ১৮৫১, আগষ্ট সংখ্যা *The Calcutta Christian Observer* মাসিক (পৃ. ৩৭৪) এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া লেখেন,—

"One of the most influential natives of Calcutta, Debendranath Tagore, has added his own daughter to the long list of eighty female children already receiving instruction in this Institution, and the Raja Kali Krishna Bahadur, who occupies the most prominent position in Hindu Society in the metropolis has accepted the office of its president."

বেথুন বিদ্যালয়-ভবন নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হওয়া দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি ১৮৫১ সনের ১২ই আগষ্ট ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি উইল বা চরম ইচ্ছাপত্রে বিদ্যালয়ের জন্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়া যান। তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডালহৌসী এবং তদীয় পত্নী লেডী

* *The Bengal Hurkaru and India Gazette*, Nov. 9, 1850.

* *Beginnings of Modern Education in Bengal : Women's Education*, Appendix, পৃ. ৬৯, ৭০।

* *Journal of the Asiatic Society of Bengal, N.S.* XXIII, 1927, No. 3 : "Ishwarchandra Vidyasagar as a Promoter of Female Education of Bengal," by Brajendranath Banerjee.

† বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত, পৃ. ৮৫-৬

‡ পত্রাবলী, ৩০ নং পত্র, পৃ. ৪০

ডালহৌসী বিদ্যালয়টির প্রতি বিশেষ সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। লেডী ডালহৌসী স্বেচ্ছায় মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করিতে যাইতেন। বেথুনের মৃত্যুর পর বড়লাট স্বয়ং ইহার ব্যয় ভার বহন করিতে আরম্ভ করেন। প্রতি মাসে ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাঁহাকে সাত শত টাকা খরচ করিতে হইত। ডালহৌসীর সুপারিশে কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স ১৮৫৩, ৯ই নবেম্বর একখানি পত্রে বিদ্যালয় পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীদের নিকট হইতে বেতন আদায়ের কথাও বলেন।* ডালহৌসী শেষোক্ত প্রস্তাব সমীচীন বোধ করেন নাই। তিনি ইহার পর যত দিন ভারতবর্ষে ছিলেন নিজেই ইহার ব্যয়ভার বহন করেন। ডালহৌসী ১৮৫৬, ৬ই মার্চ্চ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। ইহার পর পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী বেথুন-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনা-ভার গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ করেন।

* *Selections from Educational Records*, Part II, by J. A. Richie, p. 61.

ক্যালকাটা গ্রুপ" ও তার প্রদর্শনী

শ্রীশানু মজুমদার

১৯৪৩ সনে এক দিকে যখন ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হয়েছিল অন্য দিকে তখন সৃষ্টির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেরণাও জেগেছিল। এই সময় হ'ল 'ক্যালকাটা গ্রুপে'র সৃষ্টি। কয়েকজন শিল্পীর সম্মিলিত চেষ্টায় কলকাতায় গড়ে উঠল এই শিল্পী-সঙ্ঘ। যুদ্ধের সময় যেমন সব দেশে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিবিধ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছিল এদেশেও তেমনি পরিবর্ত্তন এসেছিল শিল্পজগতে। সেই পরিবর্ত্তনের ফল ক্যালকাটা গ্রুপ।

এই শিল্পীগোষ্ঠী অনুভব করলেন, গতানুগতিক পদ্ধতিতে আঁকা ছবি আর তাঁদের শিল্পী-মনের খোরাক যোগাচ্ছে না। তাই তাঁদের প্রচলিত প্রথা থেকে সরে আসতে হ'ল। এই গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক শিল্পীরই মনোভাব একই ধরণের ছিল। তাঁদের রূপ-ভাবনার মধ্যেও সাদৃশ্য ছিল। এই সমধর্ম্মী শিল্পীরা স্থির করলেন যে, তাঁরা নিজেদের আঁকা ছবি নিয়ে একটা আলাদা গ্রুপ করবেন ও প্রতি বৎসর তাঁদের চিত্র-প্রদর্শনী হবে। এই গ্রুপের প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হ'ল ১৯৪৩ সনে। এই গ্রুপ শুধু কলিকাতায় নয়, সারা ভারতে শিল্পজগতে প্রগতির হাওয়া বইয়ে দিলেন। যে ভাবে প্যারিস কমিউনের পর ১৮৭৪ সনে ইম্প্রেশনিষ্ট গ্রুপের সৃষ্টি হয়েছিল সেই ভাবেই কলিকাতায়ও ক্যালকাটা গ্রুপের গোড়াপত্তন হ'ল। এর সভ্য হলেন প্রদোষ দাসগুপ্ত, নীরদ মজুমদার, রথীন মৈত্র, পরিতোষ সেন, প্রাণকৃষ্ণ পাল, গোপাল ঘোষ, কমলা দাসগুপ্ত, সুভো ঠাকুর প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। প্রতি বৎসর এঁদের ছবির প্রদর্শনী হতে লাগল। গোড়া থেকেই এঁদের প্রত্যেক প্রদর্শনী শিল্পী, শিল্প-রসিক ও শিল্প-সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। এবারকার প্রদর্শনীও শিল্পরসিকদের খুশী করেছে।

এবারকার ক্যালকাটা গ্রুপের প্রদর্শনী শিল্পী ও শিল্প-রসিক উভয়েরই মনকে বেশ একটু নাড়া দিয়েছে। এই প্রদর্শনীর ছবিগুলোতে বর্ণপ্রয়োগের একঘেয়েমি নেই। উপযুক্ত বর্ণ-সমাবেশে ছবি যে কিরূপ মাধুর্য্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে, রং যে চিত্রজগতের কত বড় সম্পদ তা এই প্রদর্শনীতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেল। প্রথমেই প্রদর্শনীর ভাস্কর্য্যের

ছুটির দিনে —শ্রীপরিতোষ সেন

কাজগুলো ধরে সমালোচনা আরম্ভ করা যাক। আমাদের দেশে খুব কম লোকই ভাস্কর্য্য-শিল্পের উপযুক্ত সমঝদার। সেজন্যে ভাস্কর্য্য-শিল্পের যথাযথ সমালোচনা আমাদের দেশে বড় একটা হয় না। কিন্তু একথা সত্য যে, প্রদোষ দাসগুপ্তের কাজ দেখে শিল্পরসিক মাত্রেরই মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। এঁকে আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর বলা যেতে পারে। এঁর এবারকার কাজের মধ্যে 'উমুন মায়া' মূর্ত্তিটি খুবই ভাল লেগেছে। এই ছবিটিতে চমৎকার একটি নম্রলতা

(simplicity) আছে। হাত দুটি এত স্বাভাবিকভাবে ও সহজ ভঙ্গীতে পড়ে আছে যে মনে হয় যেন ঐ ভঙ্গীটুকুর ভেতর দিয়েই ছবির আসল কথাটি ফুটে উঠেছে। তা ছাড়া এটির কম্পোজিশন বা রচনা-রীতিও অনবদ্য। এঁর গড়া

যুদ্ধজীর্ণ —শ্রীঅবনী সেন

“প্রসাধন” মূর্তিটি বিরাট, দেখবামাত্রই হৃদয় যুগপৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়। ওটি খালি জায়গাতে রাখলেই বেশী শোভা পেত। শিল্পীর সবল হাতের বিরাট শিল্পকর্ম উন্মুক্ত আকাশের নীচেই মানাত ভাল। প্রদোষ-বাবুর এই কাজটিতে বিকৃতীকরণ (distortion) আছে, কিন্তু বিকৃতীকরণ সত্ত্বেও শিল্পীর অনন্যসাধারণ রসবোধের জন্য এটি কুৎসিত বা দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে নি। কারণ বিকৃতি বলতে যা বোঝায়, যেমন—আঙ্গিক ব্যঞ্জনার আতিশয্য, (intense expressiveness of form) কতকটা পরিবর্তন (modification) ইত্যাদি সবকিছুই এতে আছে, কিন্তু এই সমস্ত বিকৃতীকরণ মূর্তিটির শিল্পসুষমাকেই বিশেষ ভাবে ফুটিয়ে তুলে এটিকে সৃষ্টি হিসাবে সার্থক করেছে। এই ভাস্কর-শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিক পরিকল্পনাটিও (abstract design) ভাল লাগল। ভাস্করের কোন সুবিধা নেই প্রাকৃতিক দৃশ্যকে শিল্পকর্মে রূপায়িত করবার, তাই মাঝে মাঝে তাদের এই ভাবকল্পনা দিয়েই প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাতে হয়। যেমন—

“Debussy introduces the perfume of gardens into the sound of drops of rain, sways the brilliant pollen to the murmur of the trees and wishpers with the confession on trembling lips, with memory and secrecy. The universe turns to a more and more precipitous rhythm. The dance and music transposed into painting.”—Elie Faure.

কমলা দাশগুপ্তর মাত্র দুটি কাজ প্রদর্শনীতে নজরে পড়ল। এঁর গড়া প্রতিকৃতিটি খুব নিপুণ হাতের পরিচায়ক। ‘উমার’ প্রতিকৃতিটিও খুব ভাল লাগল।

প্রাণকৃষ্ণ পাল অন্যান্য বছরের মতই এবারও কোমল অনতিস্ফুট রং দিয়ে এঁকেছেন। ভারতীয় চিত্র-পদ্ধতির মধ্যে ইনি নূতন ধারা আনবার চেষ্টা করছেন, তাই এঁর অঙ্কনরীতি এবং বর্ণপ্রয়োগ-প্রণালী অন্যান্য শিল্পীদের থেকে একটু আলাদা। এঁর ‘দানব-নৃত্য’ ছবিটি ভাল লেগেছে। তবে এই ছবিটি যদি আরও বড় করে দেখানো হ’ত তা হলে এটির বিকৃতীকরণ খুব ভাল ভাবে বোঝা যেত। ‘ম্যাডোনা ও শিশু’ নামক ছবিটিতে এমন চমৎকারিত্ব এবং বর্ণের মধ্যে এরূপ স্নিগ্ধতা আছে যে, বহু ছবি দর্শনে ক্লান্ত চোখ যেন সেই স্নিগ্ধতায় অবগাহন করে পরিতৃপ্ত হয় এবং বিশ্রাম লাভ করে। অনেকে মনে করেন এঁর ছবি অত্যন্ত নীরস, নিষ্প্রাণ (dull)। কিন্তু ইনি প্রাচ্য চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা বজায় রেখে ভারতীয় পদ্ধতিতেই বর্ণপ্রয়োগ ও রেখা-বিন্যাস দ্বারা ছবি এঁকে থাকেন। এঁর ছবিতে আলো-ছায়ার খেলা নেই—একটা সাদামাটা রং দিয়েই ছবিগুলো আঁকা। গত বারের প্রদর্শনীতে এঁর ছবিগুলো অপেক্ষাকৃত ভাল হয়েছিল।

পরিতোষ সেনের অন্যান্য বারের ছবি থেকে এ বছরকার ছবিগুলো অনেক ভাল লাগল। এবারের প্রদর্শনীতে নানা ধরণে নানা ভঙ্গীতে আঁকা এঁর কতকগুলো ছবি চোখে পড়ল, প্রায় সব ছবিই টেম্পারাতে কলম ও কালি দিয়ে শেষ করা হয়েছে। ‘ছুটির দিনে’ ছবিটিতে বেশ একটি রসানুভূতির আমেজ পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্রে বিখ্যাত শিল্পী Cloud Monet-এর ছবিতে যেন আলোবাতাসের স্পর্শ অনুভব করা যায়। পরিতোষ সেনের এই ছবিটি উক্ত শিল্পীর ছবির কথাই মনে করিয়ে দেয়। ‘সিঁড়িতে বুড়ি আর বোকন’ ছবির রং ও তার প্রয়োগপদ্ধতি বেশ লাগল। ছবিটিতে বেশ চমৎকার ঘনত্ব (solidity) ফুটে উঠেছে। শিল্পী আলাদা করে কোন ম্যানারিজমের সাহায্য না নিলেও শুধু রেখার দৌলতেই চিত্রের গভীরতা, ঘনত্ব, গুরুত্ব ইত্যাদি সুপরিস্ফুট হয়েছে।

‘কুমুদ’ প্রতিকৃতিটি খুবই উঁচুদরের হলেও মুখের ট্রিটমেন্টের সঙ্গে হাতের ট্রিটমেন্টের কোন মিল নেই। ‘সিঁড়ির চেতনা’ ছবিটিতে রঙের ব্যঞ্জনা অতি চমৎকার। বাইরে থেকে আলো এসে পড়েছে টেবিলের উপর, তার পাশ দিয়ে প্যাটার্ণ-করা সিঁড়ি এবং তার

ব্যবহার ইত্যাদির সমাবেশে ছবিটি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছে। এ ছাড়া 'মনিবের অনুপস্থিতিতে' ছবিটির রঙের ঔজ্জ্বল্য ও প্রখরতা নয়নানন্দকর। নীল জমির উপর লাল চেয়ার, তার উপর বিড়াল, সব মিলিয়ে ছবিটি চমৎকার হয়েছে।

রথীন মৈত্রের এবারের কাজের থেকে গত বারের কাজই ভাল লেগেছিল। এঁর গতবারের কাজে রঙের ঔজ্জ্বল্য এবং ছবির ব্যঞ্জনা আর প্যাটার্ণের চমৎকারিত্ব দেখে মনে যতটা আশা জেগেছিল এবার ততটা পরিতৃপ্ত হওয়া গেল না।

এবার এঁর আঁকা 'ছুমকার রাস্তা' ছবিটি বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে। ডাষ্টবিনে বসা কাকের রঙের মধ্যে এমনি একটা বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে যে তা মনকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করে। এঁর অন্যান্য কাজের মধ্যে 'কাশ্মীরের বেদনা' ও 'সমাজ' ছবি দুখানি উল্লেখযোগ্য।

শিল্পী অবনী সেন পশু-পক্ষীর ছবি অঙ্কনে খুবই নিপুণ হাতের পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রদর্শনীতে এঁর তিনটি ছবি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি রং একটু বেশী পরিমাণে ব্যবহার করেন বলতে হবে। 'বুট জুতা' ছবিটিতে বেশ রঙের ঔজ্জ্বল্য ও বাস্তবনিষ্ঠ কল্পনার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। 'সবুজ ও লালে আঁকা' গরু তার বাছুর ছবিটিও বেশ ভাল লেগেছে। তা ছাড়া 'রক্তশোষক' ছবিটিও খুব আকর্ষণীয় হয়েছে।

গোপাল ঘোষ একজন বিশিষ্ট জনপ্রিয় শিল্পী। তাঁর ছবিতে প্রথমেই যা নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করে সে হচ্ছে তাঁর রেখা ও রঙের বৈশিষ্ট্য। যেমন তাঁর রঙের ঔজ্জ্বল্য তেমনি তাঁর তুলির জোর—তাঁর তুলিতে রং ও রেখা সমান তালে চলে, কেউ কারো চেয়ে ন্যূন নয়—একটি অপরটির ভারসাম্য বজায় রেখে চলে। এঁর ছবিতে বর্ণ-সৌসামঞ্জস্য অপূর্ব্ব। এর আঁকা ছবি 'বাঁশঝাড়ে' খুব জোরালো তুলির টানের পরিচয় পাওয়া যায়। তা ছাড়া 'সোনালী প্রভাত', 'সুখী দম্পতি', 'চায়ের আসর'—উচ্চাঙ্গের অঙ্কন-কৌশলের পরিচায়ক।

'দেলাক্রোয়া'-র 'colour is the main thing' কথাটা খুব মনে পড়ে গোপালবাবুর ছবি দেখলে। 'অরণ্যে সন্ধ্যা' ছবিটি আয়তনে খুব ছোট হলেও সন্ধ্যার আমেজের যে মনোরম দৃশ্য হয় তা সুসমঞ্জস স্বল্প বর্ণবিন্যাসেই ফুটে উঠেছে। কালো কালো গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের উজ্জ্বল লাল রঙের আলো রাস্তার উপর এসে পড়েছে। সব মিলিয়ে ছবিটি মনে এক অপূর্ব্ব রসানুভূতির সঞ্চার করে।

সার্থক ছবি আঁকা যেমন সাধনাসাপেক্ষ, ছবির রস উপলব্ধি করাও তেমনি কঠিন। অনেকে প্রদর্শনীতে ছবি দেখে প্রশ্ন করেন—"এ ছবির উদ্দেশ্য কি? এর মানে কি?" তাদের একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, প্রকৃতির বুঝতে না পারলে ছবির তাৎপর্য্যও হৃদয়ঙ্গম হতে পারে না। যাঁরা এ ধরণের প্রশ্ন করেন তাঁদের জনৈক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নিম্নোক্ত কয়টি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—"Why do you always try to understand painting, why

কাশ্মীরের বেদনা　　—শ্রীরথীন মৈত্র

not understand the song of a bird."—Pablo Picaso." অর্থাৎ, "সকল সময় তোমরা কেবল ছবির মানে বুঝবার চেষ্টা কর কেন? তা না করে একটি পাখীর গানের আসল তাৎপর্য্য উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলেই ত পার।"

জলদস্যুদের কথা

শ্রীশিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

বাংলায় পর্তুগীজ ও আরাকান জলদস্যুর অত্যাচারের কথা অনেকের জানা আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এই শ্রেণীর দস্যু ও ইহাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

জলপথে এই দস্যুবৃত্তি কোন্ সময় হইতে যে আরম্ভ হইয়াছে তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু প্রাচীন কাল হইতেই জলদস্যুর অস্তিত্বের কথা জানিতে পারা যায়; এমন কি খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে রোমক সাম্রাজ্যের যুগেও ইহারা বিদ্যমান ছিল; ইহারা ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন উপকূল অঞ্চলে অত্যাচার করিত। ইহারও পূর্ব্বে খ্রী: পূ: অষ্টম শতাব্দীতে ফিনিসীয় জলদস্যুরা গ্রীস ও রোমের উপকূল-ভাগের অধিবাসিগণের যথেষ্ট ভীতির কারণ হইয়া উঠে।

পৃথিবীর প্রায় সমুদয় প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে জলদস্যুদের উল্লেখ আছে। প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন পৌরাণিক কাহিনীগুলির মধ্যেও ইহাদের উল্লেখ রহিয়াছে। আমাদের দেশেও পুরাণ ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থগুলিতে এবং প্রাচীন ইতিহাসে এই দস্যুদের সম্বন্ধে বহু তথ্য ছড়াইয়া আছে। তাম্রলিপ্ত, বিশাখা-পত্তম (আধুনিক ভিজাগাপটম), ভৃগুকচ্ছ (বর্ত্তমান ব্রোচ), সুরাট ও ক্যাম্বে প্রভৃতি বন্দরের বণিকেরা ইহাদের বহুকাল-ব্যাপী অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। জলদস্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ভারতীয় বণিকেরা যথেষ্ট অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দলবদ্ধ ভাবে সমুদ্রে যাতায়াত করিতেন। এডেন ও লোহিত সমুদ্রে, পারস্য উপসাগরে, আন্দামান নিকোবর ও মারগুই দ্বীপমালা এবং লাক্ষা ও মাল দ্বীপপুঞ্জের দুর্গম, অজ্ঞাত প্রবাল-শৈলমালার অন্তরালে এই সকল দস্যু লুকাইয়া থাকিত, কোন বাণিজ্য ও যাত্রী জাহাজের সন্ধান পাইলেই সুযোগ বুঝিয়া অতর্কিত আক্রমণে যাবতীয় পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করিত এবং যাত্রী ও নাবিকগণকে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিত।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মক্কা শরিফের পথে ভারতবর্ষ ও জেদ্দা বন্দরের মধ্যে তীর্থযাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল আরম্ভ হয়। জেদ্দার পথে এই সমস্ত যাত্রীজাহাজ প্রায়ই লুণ্ঠিত হইত এবং *নর-নারী ও শিশু-নির্ব্বিশেষে যাত্রীদের হত্যা করা হইত* অথবা আলেকজান্দ্রিয়া, দামাস্কাস্, ডেলস্ এবং জেনোয়ার বাজারে প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগকে ক্রীতদাস রূপে বিক্রয় করা হইত।

পারস্য, মিশর ও ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে ভারতীয় ক্রীতদাসের অসম্ভব রকম চাহিদার ফলে আরব, মিশরীয় এবং সুদানীয় দাস-ব্যবসায়ীরা এই ব্যবসায়ে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিত। ইতিহাসে আরব ও লোহিত সমুদ্রে এইরূপ অনেক দস্যুবৃত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। পর্তুগাল হইতে ভারতে আসিবার পথে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা কর্ত্তৃক এক যাত্রীজাহাজ লুণ্ঠনের কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রথমে রক্তপাত এড়াইবার জন্য সমস্ত যাত্রীর জীবনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়া জাহাজখানি লুণ্ঠন করা হয়, কিন্তু তাহার পরই কামানের মুখে নরনারী-নির্ব্বিশেষে সকল যাত্রীকে হত্যা করিয়া জাহাজটিকে আরব-সাগরের জলে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। কথিত আছে, মৃত্যুপথযাত্রী আবালবৃদ্ধবনিতার হাহাকার পৈশাচিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ভাস্কো ডা-গামা তাহার নিজের কেবিনের জানালা হইতে উপভোগ করিয়াছিল। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জন আভেরি নামক আর একজন ইংরেজ জলদস্যুর অপকীর্ত্তির কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এই দস্যুও জেদ্দার পথে এইরূপ আর একখানি যাত্রীজাহাজ লুণ্ঠন করে। এই জাহাজে তদানীন্তন মুঘল সম্রাটের কন্যা ও অন্যান্য অন্ত:পুরবাসিনীগণ ছিলেন। লুণ্ঠনের পর আভেরি এই পুরমহিলাদের তখনকার দিনে ভারত মহাসাগরের জলদস্যুদের প্রধান কেন্দ্র মাদাগাস্কারে লইয়া যায়; পরে প্রকাশ্য বাজারে তাঁহাদিগকে ক্রীতদাসী রূপে বিক্রয় করা হয়। ভারতবর্ষে ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রথম যুগে ভাস্কো-ডা-গামা, পেড্রো ডি কভিলহাম, আলবুকার্ক, বার্থলমিউ গারাস্ প্রভৃতি পর্তুগীজ নাবিকগণ দুর্দ্ধর্ষ জলদস্যু রূপে কুখ্যাত ছিল।

হোমর তাঁহার দুইখানি কাব্য-গ্রন্থেই জলদস্যুদের উল্লেখ করিয়াছেন এবং থুসিডাইডিস্ও ইহাদের কথা লিখিয়া গিয়া-ছেন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে প্রধানত: বহি:সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি দ্বারাই নরনারী ও স্বাস্থ্যবান বালক ও শিশু ক্রীতদাসের আমদানী করা হইত। রোমে স্বাস্থ্যবান বালক-ক্রীতদাসের বিশেষ চাহিদা ছিল। রোমক ধনী-সম্প্রদায় এই সকল বালক ও শিশুকে তাঁহাদের নিজস্ব মল্ল (Gladiators) হিসাবে তৈয়ারী করিতেন। ফিনিসীয় গ্রীক ও রোমক জলদস্যু এবং *দাসব্যবসায়ীরা এইরূপ ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত।* গ্রীস ও রোমীয় উপকূল হইতেও প্রতি বৎসর হাজার হাজার নরনারী অপহৃত হইত। তদানীন্তন রোম সাম্রাজ্যে ডেলস্ দাস-ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে এবং ডেলসের বাজারে ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের দস্যু ও ব্যবসায়ীরা প্রকাশ্য

ভাবে তাহাদের পণ্য বিক্রয় আরম্ভ করে। ইউরোপীয় উপকূলভাগ ছাড়া এই সকল ক্রীতদাস আফ্রিকার উত্তর ও পূর্ব্ব উপকূল, স্পেন, গল এবং বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষ, বাইথিনিয়া, গ্যালিসিয়া, ক্যাপাডোসিয়া এবং সিরিয়া হইতে সংগ্রহ করা হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন গ্রীসে ফিনিসীয়রা দুর্দ্ধর্ষ জলদস্যু হিসাবে কুখ্যাতি অর্জ্জন করে। খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীতে ইহাদের পতনের পর গ্রীক জলদস্যুরা তাহাদের স্থান গ্রহণ করে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পর পশ্চিম ইউরোপের ভাইকিংগণ দুর্দ্ধর্ষ জলদস্যু রূপে পরিচিত হইয়া উঠে। এই সময় হইতে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, জার্ম্মানী ও ভূমধ্যসাগরের সমগ্র উপকূলব্যাপী বিরাট ভূভাগে ইহারা অবাধে দস্যুবৃত্তি করিত। ভূমধ্যসাগরীয় অন্যান্য জলদস্যুদের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ভাইকিংদের কার্য্যকলাপের যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। দুর্দ্ধর্ষতায় ও নিষ্ঠুরতায় ইহাদের কেহ কাহারও অপেক্ষা কম নহে। অবাধ লুণ্ঠন, নির্ব্বিচারে হত্যা, জনপদ জ্বালাইয়া দেওয়া ও ক্রীতদাস সংগ্রহে তাহারা ছিল সমান পারদর্শী। কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় দস্যুরা যেমন প্রায়শঃই একক বা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া উপকূলভাগে লুঠতরাজ করিত এবং কদাচিৎ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিত, ভাইকিংরা সাধারণতঃ সেরূপ পন্থা অনুসরণ করিত না। ইহারা প্রায়ই দলবদ্ধ ভাবে অত্যাচার করিত এবং অনেক ক্ষেত্রেই উপকূল-ভাগ ছাড়িয়া দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিত। ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট সামরিক শৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল। ভাইকিংদের আক্রমণ-পদ্ধতিকে অনেকটা আধুনিক যুগের ঝটিকা-বাহিনীর আক্রমণের সহিত তুলনা করা চলে। ইহারা কোন গ্রাম বা জনপদের উপর চড়াও হইয়া নির্ম্মম ভাবে হত্যাকাণ্ড ও গৃহদাহ চালাইয়া যাইত এবং ক্রীতদাস ও বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া চক্ষের নিমিষে অন্তর্হিত হইত। কেহই বলিতে পারিত না, ইহারা পঙ্গপালের ন্যায় কখন কোন্ জনপদের উপর আসিয়া পড়িবে। লুণ্ঠনের প্রাক্কালে তাহারা নিজেরাই স্থির করিত কখন কোন্ দল কোন্ দেশ আক্রমণ করিবে। মূল ভূভাগ আক্রমণের পূর্ব্বে ইহারা প্রায়ই উপকূলভাগের নিকটবর্ত্তী কোন দ্বীপ অধিকার করিত এবং এই দ্বীপকে ঘাঁটি করিয়া পরবর্ত্তী আক্রমণ পরিচালনা করিত। ভাইকিংদের আর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, ইহারা কেবল লুণ্ঠনই করিত না, জলদস্যু হইলেও ইহারা সাম্রাজ্য বিস্তার ও নিজেদের স্থায়ী বাসভূমি সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রাখিত। এইরূপ একজন ভাইকিং দস্যু, টুর্গেসিয়াস খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি আয়ার্লণ্ডের অর্দ্ধেক স্থলভাগ অধিকার করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করে। আয়ার্লণ্ড অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই ভাইকিংরা ইংলণ্ড আক্রমণ শুরু করে ও ৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই নর্দাম্ব্রিয়া, মার্সিয়া ও পূর্ব্ব-এ্যাংলিয়া অধিকার করিয়া লয়। একমাত্র ওয়েসেক্সেই ইহাদের আক্রমণ প্রতিহত হয়; এখানে আলফ্রেড এই দস্যুদলকে পরাস্ত করেন।

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ভাইকিংরা অত্যাচার করিত। নবম শতাব্দীর প্রথম দিক হইতেই ফ্রান্সের সমগ্র উপকূল ব্যাপিয়া ইহারা অবাধ লুণ্ঠন ও নরহত্যা আরম্ভ করে এবং অন্ততঃ দুই বার রাজধানী প্যারিস আক্রমণ করে। জার্ম্মানীতে ইহারা হামবুর্গ অবধি ধাওয়া করে ও এই নগরটি জ্বালাইয়া দেয়। দক্ষিণ জলপথে ভাইকিংরা প্রথমতঃ স্পেনীয় উপকূলভাগ লুণ্ঠন করিবার চেষ্টা করে। স্পেন তখন আরবের খলিফার অধীন—এই স্থানেই ভাইকিংরা সর্ব্বপ্রথম বড় রকম বাধা প্রাপ্ত হয়। কয়েকটি স্থানে অল্পস্বল্প লুণ্ঠন ব্যতীত স্পেনে ইহারা বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু স্পেনে ইহাদের অত্যাচার বন্ধ হইলেও জিব্রাল্টার হইয়া ইহাদের ভূমধ্যসাগরের যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ হয় নাই। এই পথে তাহারা কনষ্টান্টিনোপল পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ উপকূল অবাধে লুণ্ঠন করে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আফ্রিকার উত্তর ও পূর্ব্ব উপকূলে নূতন এক শ্রেণীর জলদস্যুর উদ্ভব হয়। ইতিহাসে ইহারা Barbary Pirates অথবা মুর নামে পরিচিত। এই সময় হইতে প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর ইউরোপ ও এশিয়ার সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশগুলি ও ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের অধিবাসীরা ইহাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। ইহারা ছিল একাধারে ব্যবসায়ী ও দস্যু। ভারতীয় কার্পাস, মসলিন, মসলা, গজদন্ত, চন্দনকাষ্ঠ ইত্যাদির ব্যবসায়ে ইহারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিত। ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার উপকূলে ইহাদের বহু কুঠি ছিল ও সেখানে এই সমস্ত পণ্যদ্রব্যের লেনদেন হইত। বহিঃসমুদ্রেও ইহারা বাণিজ্য ও যাত্রীজাহাজ লুণ্ঠন করিত এবং যাত্রী ও নাবিকগণকে হত্যা করিত অথবা ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে সম্রাট নেপোলিয়ন তাঁহার বিশ্ববিজয়ী সৈন্যদল লইয়াও উহাদের উচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে ১৮৩০ সালে ফরাসী বাহিনী যখন উত্তর-আফ্রিকা আক্রমণ করে তখন এই মুর দস্যুরা ধ্বংস হয়।

আলজিয়ার্স ও টিউনিসে মুর-দস্যুদের প্রধান ঘাঁটি ছিল। এই দেশ দুইটি নামে তুরস্কের সুলতানের অধীন হইলেও কার্য্যতঃ ছিল স্বাধীন স্বৈরতন্ত্র রাষ্ট্র এবং শাসিত হইত সামরিক নিয়মানুসারে। আশ্চর্য্যের বিষয় দুইটি রাষ্ট্রই পরোক্ষভাবে মুর-দস্যুদের সাহায্য করিত এবং বিনিময়ে লুণ্ঠিত সম্পত্তির এক দশমাংশ কর হিসাবে সরকারী কোষাগারে জমা হইত। প্রথম প্রথম মুরগণ বড় বড় নৌকা লইয়া উপকূলভাগে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ

করে ; পরবর্ত্তী কালে সাইমন ডানসের নামক এক ফ্লেমিশ জলদস্যু ইহাদের মধ্যে জাহাজের ব্যবহার প্রচলিত করে। ইহার পর মুরেরা আরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। ক্ষিপ্রগতি ও নৃশংসতায় তাহাদের সমকক্ষ জলদস্যু মধ্যযুগে পৃথিবীতে আর ছিল না।

সপ্তদশ শতাব্দীর সুরু হইতেই পৃথিবীতে নূতন নূতন দেশ আবিষ্কৃত হয়। এই সময় হইতে আমেরিকা এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলি পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমার ভিতর আসিতে আরম্ভ করে। নূতন দেশ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যপথও ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে এবং জলদস্যুদের দস্যুবৃত্তির কেন্দ্র আরও ছড়াইয়া পড়ে। বিভিন্ন দেশে এই সময় হইতেই সভ্যতার অভিশাপ-স্বরূপ এই দস্যুদের সম্পূর্ণভাবে দমন করিবার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় এবং এইরূপ দস্যুবৃত্তি আন্তর্জাতিক অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয়।

তখনও পর্য্যন্ত দস্যুবৃত্তি বিভিন্ন দেশের উপকূল-ভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল। দস্যুরা কদাচিৎ বহিঃসমুদ্রে অত্যাচার করিত। স্বভাবতই অন্যান্য যে-কোনও শ্রেণীর দস্যুদের ন্যায় জলদস্যুদেরও এমন কয়েকটি স্থানের প্রয়োজন হয় যে সকল স্থানে তাহারা তাহাদের লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়, বণ্টন বা সঞ্চয় করিতে পারে। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র সমবেত চেষ্টা দ্বারা এই সমস্ত ঘাটি খুঁজিয়া বাহির করে ও আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই সেইগুলি ধ্বংস করিয়া দেয়। অর্কেনী, সেটল্যাণ্ড, হেব্রাইডিস, আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি দ্বীপসমূহে এবং আয়ার্লণ্ড, স্কটলণ্ড ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সমুদ্রের খাঁড়ির মধ্যবর্ত্তী বহু বন্দরে এইরূপ অসংখ্য ঘাটি ও জলদস্যুদের আশ্রয়-স্থল বাহির হইয়া পড়ে। এই সব আশ্রয়কেন্দ্র ধ্বংস হইবার পর জলদস্যুদের কার্য্যক্ষেত্র স্বভাবতই বহিঃসমুদ্রে ছড়াইয়া পড়ে এবং পরবর্ত্তী শতাব্দীতে নিউ ইংলণ্ড, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, মাদাগাস্কার, আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের বহুদূরবর্ত্তী দ্বীপসমূহ এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলি অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল জলদস্যুদের ঘাটি হইয়া উঠে। সভ্যজগতের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ হইবার পর অনেক জলদস্যু মাদাগাস্কার এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। ইহারা স্থানীয় অধিবাসীদের মেয়েদিগকে বিবাহ করিত ও প্রচুর অর্থ এবং বহু ক্রীতদাস যৌতুকস্বরূপ লইয়া বিস্তীর্ণ জমিদারীর মালিক হইয়া বসিত। কোন বাণিজ্য অথবা যাত্রীজাহাজ তাহাদের এলাকার মধ্যে আসিয়া পড়িলেই তাহারা সুযোগমত নিশ্চিহ্ন লুণ্ঠন করিত ও নিজেদের কুকর্ম্মের সমস্ত প্রমাণ লোপ করিবার জন্য যাত্রীগণকে নির্ব্বিচারে হত্যা করিত।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতেই পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপসমূহে এবং এই সকল দ্বীপ হইতে ইউরোপে আসিবার পথে জলদস্যুদের অত্যাচার চরমে উঠে। ইহার অনতিকাল পূর্ব্বেই স্পেনীয় বণিকগণ আমেরিকার প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং প্রচুর অর্থের অধিকারী হন। স্পেনীয়দের আগমনের পরই ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও দিনেমার প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোকেরা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ইহার পরই আরম্ভ হয় অর্থলোভে দস্যুবৃত্তি ও বিভিন্ন জাতীয় ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে সংঘর্ষ। ১৬২৫ সালে সেণ্ট ক্রীষ্টোফার দ্বীপে ইংরেজগণ উপনিবেশ স্থাপন করে এবং পরবর্ত্তী একশত বৎসরের মধ্যেই সেণ্ট ইউষ্টেশিয়াস্, বারবাডস্, টোবাগো, সেণ্টক্রোয়া, নেভিস্, এ্যাণ্টিগুয়া, মণ্টসেরট, বাহামা, জামাইকা, কাইকস্ এবং টার্ক প্রভৃতি দ্বীপগুলিতে ইংরেজদের উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। ইংরেজদের পরই ফরাসীরাও আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেণ্ট ক্রীষ্টোফার, সেণ্ট ইউষ্টেশিয়াস, গ্রেনাডা, ডোমিনিকা, মার্টিনিক, গুয়াদেলা, সেণ্ট বার্থলমিউ, সেণ্ট মার্টিন, হাইতি এবং আরও কয়েকটি দ্বীপে ফরাসী-উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে স্পেনীয়রাই প্রথম দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করে। ইহাদের পর ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিক এবং ঔপনিবেশিকদের দস্যুবৃত্তি অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে ক্যারিবিয়ান সাগরের উপকূলভাগ ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলসমূহে ব্যাপক লুণ্ঠন ও নৃশংস অত্যাচার আরম্ভ হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই দস্যুদের ভিতর দুইটি দল গড়িয়া উঠে ; এক দিকে কেবলমাত্র স্পেনীয় জলদস্যু আর অন্য দিকে ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ জলদস্যুরা। তবে ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ দস্যুরা যে কেবলমাত্র স্পেনীয় জাহাজই লুণ্ঠন করিত বা স্পেনীয় উপনিবেশসমূহে অত্যাচার করিত তাহা নহে, তাহারা সুযোগ বুঝিয়া যে-কোন বাণিজ্য অথবা যাত্রী জাহাজের উপর চড়াও হইয়া তন্মধ্যস্থ যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। প্রায়ই এক জলদস্যু অপর জলদস্যুর জাহাজ লুণ্ঠন করিত অথবা তাহার স্বজাতীয় বণিককেই নৃশংসভাবে হত্যা করিত। এইরূপ অবাধ লুণ্ঠনের ফলে শত শত বণিক সর্ব্বস্বান্ত হইত এবং বহু লোকের প্রাণহানি ঘটিত। সভ্যজগৎ হইতে বহুদূরে অবস্থিত, আইন ও শৃঙ্খলাবর্জ্জিত এই সব স্থানে বিধি-নিষেধের কোন বালাই ছিল না। সমুদ্রের খাঁড়ি যেখানে গভীর ভাবে স্থলভাগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—সেখানে, বহু অনাবিষ্কৃত দ্বীপে, ছোট ছোট উপসাগর ও শৈলমালার অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক দস্যুঘাটি স্থাপিত হয় এবং টার্টল দ্বীপপুঞ্জ, হিস্পানিওলা, নিউ ইংলণ্ড, জামাইকা এবং নিউ প্রভিডেন্স দ্বীপে প্রকাশ্যভাবে দস্যু-উপনিবেশ গড়িয়া উঠে।

আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঞ্চিত ধনসম্পদই আটলান্টিক মহাসাগরে দস্যুবৃত্তির মূল কারণ। ইহা ছাড়া আফ্রিকা মহাদেশ হইতে এই সকল দ্বীপ ও ইউরোপে অত্যন্ত লাভজনক দাস-ব্যবসায় এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতীয়

দ্বীপপুঞ্জের মশলার ব্যবসায় অনেক ইউরোপীয় অভিজাত-সম্প্রদায়কেও দস্যুবৃত্তিতে প্ররোচিত করিত।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপগুলিতে কুখ্যাত "ব্যবসায় আইন" প্রচলিত হয় এবং এই আইন প্রচলনের ফলেও বহু ব্যবসায়ী ও ঔপনিবেশিক দস্যু-বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন জাতীয় ব্যবসায়ী ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির সর্ব্বগ্রাসী লোভের ফলে এই আইনের উদ্ভব হয় এবং সর্ব্বপ্রথম স্পেনীয়, পরে ইংরেজ ও ফরাসীগণ তাহাদের স্ব-স্ব উপনিবেশগুলির মধ্যে এই আইন প্রবর্ত্তন করে। ব্যবসায়-আইন প্রচলিত হইবার পর কোন ঔপনিবেশিক তাহার নিজের দেশের ব্যবসায়ী ছাড়া আর কাহারও সহিত কোন পণ্য বেচাকেনা করিতে অথবা বিদেশীয় কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিত না। কি স্পেনীয়, কি ইংরেজ অথবা ফরাসী কোন ব্যবসায়ীই তাহার স্বজাতীয়দের সমস্ত চাহিদা কখনই মিটাইতে পারিত না, ফলে স্থানীয় অধিবাসীরা অন্য জাতীয় বণিকদের নিকট হইতে লুকাইয়া অনেক জিনিষ ক্রয় করিতে বাধ্য হইত। ইহার পরিণাম-স্বরূপ ব্যাপকভাবে চোরাকারবার সুরু হয় এবং প্রায় প্রত্যেক ব্যবসায়ীই ক্রেতাদের সমস্ত চাহিদা মিটাইয়া তাহাদিগকে হাতে রাখিবার জন্য দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে। তাহারা যে সমস্ত পণ্য নিজেদের দেশ হইতে আনিতে পারিত না, তাহা সমুদ্রে অন্য দেশীয় বণিকদের নিকট হইতে লুণ্ঠন করিত এবং এই সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য জলের দামে বিক্রয় করিত। আধুনিক যুগের চোরাকারবারীদের সহিত এই সমস্ত চোরাকারবারীর পার্থক্য ছিল। আধুনিক চোরাকারবারীরা উচ্চমূল্যে নিষিদ্ধ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তাহা উচ্চতর মূল্যে বিক্রয় করে, কিন্তু আটলান্টিকের চোরাকারবারী জলদস্যুরা বিনা মূল্যে, কেবলমাত্র দস্যুবৃত্তির দ্বারাই পণ্য সংগ্রহ করিয়া জলের দামে তাহা বিক্রয় করিত। এইরূপ সস্তাদরের লোভে ক্রেতারাও তাহাদের স্বজাতীয়দের কাছ হইতে জিনিষ-পত্র ক্রয় না করিয়া অন্যদেশীয় বণিকদের নিকট হইতেই সংগ্রহ করিত। জলদস্যুরা গভীর সমুদ্রে একক বা দলবদ্ধ ভাবে বিহার করিত এবং কোন বাণিজ্য অথবা যাত্রী জাহাজ দেখিলেই তাহা স্বদেশীয় বা ভিন্ন দেশীয় যাহাই হউক না কেন, লুণ্ঠন করিত ও যাত্রীদের নির্ব্বিচারে হত্যা করিত।

সমাজের ছত্রচ্ছায়ায়, রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের গণ্ডীর মধ্যে যাহারা বাস করিতে চাহিত না, প্রধানতঃ তাহারাই দস্যুবৃত্তি দ্বারা সমুদ্রে বিপৎসঙ্কুল জীবিকা অর্জ্জন করিত। অনায়াসে হঠাৎ প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের নেশা, স্বাভাবিক মন্থর জীবনযাত্রার অভ্যস্ত মানুষের রক্তধারায় যে স্পন্দন তুলিত তাহা অনেককেই ভবিষ্যতের বিপদ ও ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া দিত এবং সমস্ত বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া স্বাভাবিক মানুষ দস্যুবৃত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক রোমাঞ্চকর জীবনকে বরণ করিয়া লইত। জলদস্যুর নিকট স্বাভাবিক শান্তিময় জীবন, জন্মভূমি, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির কোন আকর্ষণ ছিল না এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, এইরূপ দস্যুবৃত্তিতে অভ্যস্ত মানুষ কখনও আইন ও শৃঙ্খলার চাপে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় উন্মাদ হইয়া যাইত অথবা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত।

অর্থের এই সর্ব্বনাশা মোহ ছাড়া আরও নানাবিধ কারণে মানুষ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ অবধি প্রায় সব দেশেই নিয়মিত বেতনভোগী সৈন্য ছিল নিতান্ত অল্পসংখ্যক। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা যুদ্ধের সময় অর্থের বিনিময়ে সৈন্যসংগ্রহ করা হইত এবং যুদ্ধ সমাপ্ত হইলেই তাহাদের বিদায় দেওয়া হইত। ইহার ফলে ইউরোপে যে-কোন যুদ্ধের পরেই হঠাৎ বহু-সংখ্যক সৈন্য ও নাবিক বেকার হইয়া পড়িত ও অনন্যোপায় হইয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিত। অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত সাধারণ কৃষক সাময়িক উত্তেজনার মোহে এবং ভাল খাবার ও পোশাকের লোভে সৈন্যদলে যোগ দিত, কিন্তু যুদ্ধের অবসানে আর কৃষক-জীবনে ফিরিতে চাহিত না। তাহাকে পাইয়া বসিত সৈনিক-জীবনের রহস্য, রোমাঞ্চ ও নিয়মিত বেতনের মোহ এবং যুদ্ধের পর জীবিকার্জ্জনের অন্য কোন উপায়ের অভাবে জলদস্যুর জীবন আরম্ভ করিত। সৈন্যদলে—বিশেষ করিয়া যাহারা নৌবহরে কাজ করিত তাহারা, সমুদ্রে নূতন জীবনের আস্বাদ পাইয়া যুদ্ধের শেষে অধিক সংখ্যায় জল-দস্যু হইত। দূর সমুদ্রে অনেক সময় বাণিজ্য ও যাত্রী জাহাজের মাল্লা ও লস্করেরা কর্ত্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া জাহাজের কাপ্তেন ও যাত্রীগণকে নির্ব্বিচারে হত্যা করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিত, কিন্তু ক্ষণিক উন্মাদনা কাটিয়া যাইবার পর দেখা যাইত এই সব হতভাগ্যের এক-মাত্র দস্যুবৃত্তি অবলম্বন ছাড়া আর কোন রাস্তাই খোলা নাই। দেশে ফিরিবার পথ বন্ধ, সেখানে রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের অমোঘ বিধান তাহাদের জন্য উদ্যত হইয়া আছে। রাষ্ট্রীয় ছাড়পত্রের অভাবে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিবারও উপায় নাই; বিদ্রোহী-দের কোন সভ্যদেশই আশ্রয় দিবে না, বিশেষতঃ ইহাতে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা যথেষ্ট; কাজেই আর কোন উপায় না দেখিয়া ইহারা জলদস্যু হইত। জলদস্যুরা যে সমস্ত জাহাজ লুণ্ঠন করিত, সেই সমস্ত জাহাজের নাবিকেরাও অনেক সময় প্রাণ বাঁচাইবার জন্য দস্যুদলে যোগ দিতে বাধ্য হইত।

জলদস্যুদের নৃশংসতাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ। সমুদ্রের বুকে কোন জাহাজ ইহাদের কবলে পড়িলে দস্যুতার সমস্ত নিদর্শন বিলুপ্ত করিবার জন্য যাত্রীদের নির্ব্বিচারে হত্যা করা হইত এবং সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের পর জাহাজটির আর কোন প্রয়োজন

না থাকিলে সমুদ্রে ডুবাইয়া দেওয়া হইত। সঞ্চিত অর্থের সন্ধান জানিবার জন্য নরনারী-নির্বিশেষে নিরীহ ঔপনিবেশিকগণের উপর যে ভয়াবহ পৈশাচিক অত্যাচার করা হইত তাহার নিকট মধ্যযুগের যাজকীয় অত্যাচার-পদ্ধতিও (Inquisition) ম্লান হইয়া যায়। সাধারণ জলদস্যুদের যে-কোন উপায়েই হউক অর্থলাভ ছাড়া আর কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না। জাতি, ধর্ম্ম, দেশ, আত্মীয়, বন্ধু বলিয়া এদের কিছুই ছিল না। ইহারা সমস্ত মনুষ্য-সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিত। ইহারা সভ্য মানুষের সর্ব্বপ্রকার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত ছিল। ধরা পড়িলে ইহাদের বিচারের প্রহসন তখনই শেষ হইত এবং দোষ প্রমাণিত হইবার পর ফাঁসি-কাঠে, গিলোটিনের আঘাতে অথবা বন্দুকের গুলিতে ইহাদের জীবনান্ত হইত।

পৃথিবীর বহু ভাষায় ইতিহাস, গ্রাম্য ও লোক-সাহিত্য, প্রাচীন সঙ্গীত, কাব্য-সাহিত্য ও কিংবদন্তীর মধ্যে জলদস্যুদের কাহিনীর অনেক উপাদান ছড়াইয়া আছে। আমাদের দেশের প্রাচীন গীতি-কাব্য, মঙ্গল-কাব্য ও পূর্ব্ববঙ্গের বহু গ্রাম্য কবিতা ও লোক-সঙ্গীতের মধ্যে পর্ত্তুগীজ এবং আরাকান জলদস্যুদের সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। এই জলদস্যুরা এক সময় নদীবহুল পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে এবং বঙ্গোপসাগরে ভয়াবহ অত্যাচার করিত। ইহাদের দ্বারা প্রতি বৎসর হাজার হাজার নরনারী ও শিশু অপহৃত হইয়া ক্রীতদাসরূপে পৃথিবীর বহু স্থানে প্রকাশ্যে বিক্রীত হইত। মধ্যযুগে ইউরোপে ভারতীয় ক্রীতদাসের বিশেষ চাহিদা ছিল।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লবের সমসাময়িক ফরাসী অভিজাত সমাজের কুখ্যাত মাদাম দ্য বারির জারোম নামে এইরূপ এক হতভাগ্য বাঙালী ক্রীতদাসের নাম পাওয়া যায়। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর ইতিহাসে অনেকের সহিত জারোমের নামও অমর হইয়া আছে। ক্রীতদাস জারোমের বৈচিত্র্যময় জীবনকাহিনী পরম চিত্তাকর্ষক।

'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা'র এক অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই, পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ বহু বাঙালী নরনারীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। এই সকল হতভাগ্যের হাতের তালুতে ছিদ্র করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে জাহাজের অন্ধকার গর্ভে ঠাসাঠাসি করিয়া বন্দীকৃত অবস্থায় রাখা হইয়াছে। অনেক সময় তদানীন্তন বাংলার শক্তিশালী জমিদার ভূঁইঞারা ঘোরতর সংঘর্ষের পর পর্ত্তুগীজ ও আরাকান দস্যুদের হাত হইতে এই সব বন্দীকে উদ্ধার করিতেন। চাঁদ রায় ও কেদার রায়, মহারাজ লক্ষ্মণমাণিক্য, মসনদ আলী, ঈশা খাঁ, ফজলগাজী এবং মহারাজ কন্দর্পনারায়ণ প্রভৃতি ভূঁইঞারা এইরূপ অনেক বন্দীর উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন।

জলদস্যুরা ব্যাপক লুণ্ঠনের দ্বারা প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিত, কিন্তু কোন সময়েই তাহারা শান্তিতে সেই অর্থ ভোগ করিতে পারে নাই। আইনের ভয়ে সেই বিপুল ধনরত্ন কোন নিরাপদ স্থানেও বহিয়া আনা সম্ভবপর হইত না। ইহার ফলে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের বহু অজ্ঞাত দ্বীপে জলদস্যুরা এই বিপুল অর্থ লুকাইয়া রাখিত। ইহাদের মৃত্যুর সঙ্গে এই ধনরত্নাদির শেষ চিহ্নও বিলুপ্ত হইয়াছে। জলদস্যুগণের সঞ্চিত অর্থসংক্রান্ত কিংবদন্তীতে নির্ভর করিয়া পরবর্ত্তী কালে ইংরেজ, ফরাসী ও মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট কতবার এই সব ধনরত্ন উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই।

সাধারণ সৈন্যদল বা নৌবাহিনীর মত জলদস্যুরাও নিজেদের সৈনিক বলিয়া মনে করিত এবং অন্যান্য সৈন্যদলের মত তাহাদেরও নিজস্ব পতাকা থাকিত। সাধারণ যাত্রী ও নাবিকগণের মনে ভীতি জন্মাইবার জন্য যতদূর সম্ভব ভয়ঙ্কর করিয়া এই পতাকার পরিকল্পনা করা হইত। কোন গাঢ় রঙের পটভূমিকার উপর অঙ্কিত করোটি ও তাহার নীচে ক্রসের আকার দুইখানি অস্থি—এই ছিল সাধারণ জলদস্যুর পতাকার পরিকল্পনা। অনেক সময় করোটির পরিবর্ত্তে থাকিত একটি আস্ত নরকঙ্কাল, তাহার এক হাতে দীর্ঘ ছুরিকা, অপর হাতে সুরাপাত্র।

ইতিহাসে বিভিন্ন দেশের অনেক জলদস্যুর নামের উল্লেখ রহিয়াছে। ভাস্কো-ডা-গামা ও আভেরির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহাদের নৃশংসতার তুলনা নাই। আভেরি "লংবেন," "আর্চ্চ পাইরেট" ইত্যাদি বহু নামে পরিচিত ছিল। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, গিনি উপকূল, মাদাগাস্কার এবং লোহিত সমুদ্রের ঔপনিবেশিক ও যাত্রীরা এক সময়ে আভেরির নামে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত। এই দস্যু বহু জাহাজ লুণ্ঠনপূর্ব্বক প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করে। আভেরির জীবনের সমাপ্তি শোচনীয়। অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে পথের ভিক্ষুকরূপে তাহার জীবনান্ত হয়। এই আভেরির বিচিত্র জীবনকাহিনী অবলম্বন করিয়া ইংরেজ নাট্যকার চার্লস জনসন তাঁহার বিখ্যাত নাটক "সাক্সেস্-ফুল পাইরেট" রচনা করেন। ১৭১৩ সনে ড্রুরি লেন থিয়েটারে এই নাটক প্রথম অভিনীত হয়। বার্থলমিউ রবার্টস্ আর একজন দুর্দ্দান্ত ইংরেজ জলদস্যু। ১৬৮২ সনে ওয়েল্‌স্-এ ইহার জন্ম হয় এবং ১৭২২ সনে যুদ্ধ করিতে করিতে ইহার জীবনান্ত হয়। রবার্টস্ তাহার জীবনে প্রায় চারি শত জাহাজ লুণ্ঠন করে এবং বহু ধনরত্নের অধিকারী হয়। ঐ বিপুল ঐশ্বর্য্য যে পৃথিবীর কোথায় লুক্কায়িত আছে তাহা কেহ জানে না, তাহার সকল হদিস রবার্টসের মৃত্যুর সহিত লোপ পাইয়াছে। ক্যাপ্টেন মিসন্ নামে এক ফরাসী জলদস্যু

মাদাগাস্কার অঞ্চলে বহু জাহাজ লুণ্ঠন করিয়া অনেক অর্থ লাভ করে। ইহার জীবনও শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে সমাপ্ত হয়। ইতিহাসে অ্যানি বোনি ও মেরী রীড নামে দুই জন নারী জলদস্যুরও উল্লেখ আছে।

ক্রমে সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয় এবং আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে যে-কোন দেশের বিচারালয় ইহাদের বিচার করিতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বিভিন্ন দেশে এই দস্যুদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিবার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডে ১৭০০ সনের পর তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বকালে আইন করিয়া তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় এবং ইউরোপের প্রত্যেক রাষ্ট্রই ইহাদের বিরুদ্ধে নৌবহর প্রেরণ করে।

কিন্তু এই সমস্ত ব্যবস্থা সত্ত্বেও জলদস্যুরা সহজেই আইনকে ফাঁকি দিত এবং অবাধে দস্যুবৃত্তি চালাইয়া যাইত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দস্যুবৃত্তির মোহ এমনই ছিল যে, যাহাদের জলদস্যু-দের দমন করিবার জন্য সমুদ্রে প্রেরণ করা হইত, সুযোগ পাইলে তাহারা নিজেরাই দস্যুতা করিত। সভ্যজগৎ হইতে বহুদূরবর্ত্তী বিশাল সমুদ্রে লোকচক্ষুর অন্তরালে বহু অজ্ঞাত দ্বীপে ইহাদের আশ্রয়-স্থল থাকায় কদাচিৎ কোন দস্যু ধরা পড়িলেও অনেক সময় প্রমাণের অভাবে তাহাদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হইত না। অবশেষে বহুদূরবর্ত্তী উপনিবেশসমূহে বাণিজ্যপথ নিরাপদ রাখিবার জন্য প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে এই আইন বিধিবদ্ধ হয় যে, কোন জলদস্যু স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিলে তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করা হইবে ও স্বাধীন নাগরিকের অধিকার দেওয়া হইবে। প্রথম চার্লসের রাজত্ব-কাল হইতে প্রথম জর্জ্জের রাজত্ব-কাল অবধি এই আইন বলবৎ ছিল। এই আইনের ফলে প্রথম প্রথম বহু জলদস্যু আত্ম-সমর্পণ করিত, কিন্তু পরে ইহাও আর কার্য্যকরী হয় নাই এবং কোন জলদস্যু আত্মসমর্পণ করিলেও লুণ্ঠিত ধনরত্ন নিরাপদে রক্ষার ব্যবস্থা করিবার পর অথবা ভোগ করিবার ফলে বিত্ত নিঃশেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও তাহার পরবর্ত্তী শতাব্দীর প্রথমে এই দস্যুবৃত্তি চরমে উঠে। তখন ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রবল জনমত গড়িয়া উঠে যে, যে-কোন উপায়ে হউক, ইহাকে ধ্বংস করিতেই হইবে। দস্যুবৃত্তি ধ্বংস করিবার পক্ষে উপযোগী এক অপ্রত্যাশিত উপায় এই সময় উপস্থিত হয়। তখন হইতে আফ্রিকা, প্রায় গোটা ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে লাভজনক দাস-ব্যবসায় সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। আফ্রিকা হইতে নিগ্রো ক্রীতদাস আমদানীর ফলে দাস-ব্যবসায়ীগণের প্রচুর লাভ হইত এবং বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের সহিত জলদস্যুরাও এই লাভজনক ব্যবসায় করিত অথবা সমুদ্রে ক্রীতদাসদের জাহাজ লুণ্ঠন করিত। দাস-ব্যবসায় বন্ধ হইবার পর দস্যুদের বিপুল ক্ষতি হয় এবং ক্রমশঃ দস্যুবৃত্তি কমিয়া আসে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি সমুদ্রে ইহাদের অল্প-বিস্তর কার্য্যকলাপ দেখা যাইত, কিন্তু এই সময় হইতে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সম্মিলিত নৌবহর ইহাদের ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর হয় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই দস্যুবৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়।

একমাত্র চীন-সমুদ্রে ও চীনের পূর্ব্ব-উপকূলে এখনও মধ্যে মধ্যে জলদস্যুদের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণ যাত্রী ও কুলির বেশে ছোট ছোট যাত্রী বা বাণিজ্য জাহাজে আরোহণ করে এবং কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে বা সময়ে হঠাৎ স্বরূপপ্রকাশ করিয়া লুণ্ঠন ও যাত্রীদের হত্যা করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাষ্ট্র-গুলি ইহাদের ধ্বংস করিবার চেষ্টায় যথেষ্ট সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল। ইহাদের সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে।

পৃথিবীতে জলদস্যুর নির্দ্দিষ্ট কোন ইতিহাস নাই। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ এবং শিক্ষা ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে সপ্তদশ শতাব্দী হইতে যে বৃহত্তর মানব-সমাজ গড়িয়া উঠে সেখানে ইহাদের কোন ক্রমেই স্থান হইতে পারে নাই। সভ্য জগৎ ইহাদের মর্ম্মান্তিক ঘৃণা করিয়াছে, নির্ম্মম ভাবে অভিশাপ দিয়াছে এবং ইহাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবার জন্য সর্ব্ব-প্রকার চেষ্টা করিয়াছে। সাধারণ মনুষ্য-সমাজের গণ্ডীর বাহিরে রোমাঞ্চকর জীবনের নেশা ও অর্থের সর্ব্বনাশা লোভের মধ্যে ইহাদের অভ্যুদয় এবং তাহাতেই ইহাদের ধ্বংস। ইহাদের জাতি নাই, সমাজ, ধর্ম্ম,দেশ, আত্মীয়স্বজন কিছুই নাই। সাতগাঁ, তাম্রলিপ্তের বণিকদল ডিঙ্গা সাজাইয়া বাণিজ্যে চলিয়াছে যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ, সিংহলে ; বঙ্গোপসাগরে কোন এক সন্ধ্যায় হার্ম্মাদ কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। অস্তগামী সূর্য্যের আভায় রঞ্জিত সাগর বাঙালী বণিকের রক্তে রাঙা হইয়া উঠিল। পশ্চিম ভারতের বণিক নৌবহর সাজাইয়া বাণিজ্য করিতে চলিয়াছে—দামাস্কাস্, এডেন, জেদ্দা, আলেকজান্দ্রিয়া, রোম, নেপল্‌স্, জেনোয়া অভিমুখে ; সঙ্গে ভারতীয় পণ্যসম্ভার—সমস্ত ইউরোপ যাহার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে—মসলিন, গজদন্ত, স্বর্ণ ও কাঠের কারুশিল্প, ভারতের মসলা, এলাচ, জায়ফল, লবণ। আরব-সমুদ্রে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ, জার্ম্মান জলদস্যু ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। দস্যুর তরবারির আঘাতে ভারতীয় বণিকের দ্বিখণ্ডিত দেহ সমুদ্রের নীল জলে ভাসিয়া গেল অথবা বণিক ও পণ্য একই সঙ্গে দামাস্কাস, রোম, জেনোয়া অথবা ভেনিসের বন্দরে বিক্রয় হইয়া গেল। অতলান্তিকের অতল-গর্ভে কত হাজার ইউরোপীয় বণিক ঔপনিবেশিক নরনারীর সলিল-সমাধি হইয়াছে কে তাহার খোঁজ রাখে ?

প্রাচীন বঙ্গে ধর্ম্মপূজা

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বসু পুষ্করিণী সংস্কারকালে দুইখানি কচ্ছপের পিঠের খোল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। খোল দুইখানির উপর প্রাচীন অক্ষরে লিপি উৎকীর্ণ ছিল। বসু মহাশয় কুতূহলী হইয়া ঐ লিপির পাঠোদ্ধারের জন্য ঢাকা মিউজিয়মের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বর্গীয় পুরাতত্ত্ববেত্তা নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের সাহায্যপ্রার্থী হন এবং খোল দুইটি ঢাকা মিউজিয়মে দান করেন। ১৯৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দের ঢাকা মিউজিয়ম কার্য্যবিবরণীর ৭-৮ পৃষ্ঠায় ভট্টশালী মহাশয় উল্লিখিত লিপিদ্বয়ের পাঠ এবং ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তদীয় মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পক্ষে লিপি দুইটি অত্যন্ত মূল্যবান্। দুঃখের বিষয়, ভট্টশালী মহাশয় ইহার যথার্থ মূল্য বিচার করিতে পারেন নাই। আমরা এস্থলে সংক্ষেপে লিপিদ্বয়ের ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করিব।

আলোচ্য লিপিদ্বয় দশম-একাদশ শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। প্রথম লিপিটি অসম্পূর্ণ। ইহার প্রকৃত পাঠ নিম্নরূপ :—

[সিদ্ধম্ ॥] স্বস্তি-[নি] শ্রেয়সায়াস্তু জিনো জনানাং ॥
[সিদ্ধম্ ॥] ন

ইহার দুইটি পংক্তিই একটি সুপরিচিত মাঙ্গলিক চিহ্ন দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে। এই চিহ্নের উচ্চারণ "সিদ্ধম্" অর্থাৎ "সিদ্ধিরস্তু"। প্রথম পংক্তির "নি" বর্ণটি প্রথমে বাদ গিয়াছিল বলিয়া পংক্তির উপরে উৎকীর্ণ হইয়াছে। দ্বিতীয় পংক্তিটি অসমাপ্ত। দ্বিতীয় লিপিটি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, এই পংক্তিতে "নমো ভগবতে বাসুদেবায়" উৎকীর্ণ করা হইতেছিল, কিন্তু প্রথম অক্ষরটি লিখিবার পরেই লিপিকার খোলটি পরিত্যাগ করে। যে ভুলের জন্য এই খোলটি পরিত্যক্ত হয়, তাহা দ্বিতীয় লিপিতে সংশোধন করা হইয়াছিল। যাহা হউক, প্রথম লিপিতে যে একটি সম্পূর্ণ বাক্য আছে, তাহার অর্থ: "জিন (অর্থাৎ বুদ্ধ) লোকের মঙ্গল এবং মুক্তির কারণ হউন।"

দ্বিতীয় লিপিটির যথার্থ পাঠ নিম্নরূপ :

[সিদ্ধম্।] [শ্রী] নমো ভগবতে বাসুদেবায়। নমো বুদ্ধায়।

স্বস্তি-নিশ্রেয়সায়াস্ত জিনো জনানাং ॥ শ্রী
ম নমো ভগবতে [॥]
মধুংরসর্ম্মকারীত ধর্ম্ম। শ্রী

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

এই লিপিটিও "সিদ্ধম্" বোধক মঙ্গলচিহ্ন দ্বারা আরম্ভ করা হইয়াছে। প্রথম পংক্তির উপরে "১ শ্রী" উৎকীর্ণ দেখা যায়। ইহার অর্থ এই যে, প্রথম পংক্তিতে "শ্রী" শব্দটি বাদ গিয়াছিল বলিয়া উহা পংক্তির উপরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পরেও দুই

কচ্ছপের খোলের উপর উৎকীর্ণ লিপি
(ঢাকা মিউজিয়মের ১৯৩৯-৪০এর বার্ষিক রিপোর্ট হইতে গৃহীত ফটোগ্রাফের প্রতিলিপি)

বার "নমো" শব্দের পূর্ব্বে "শ্রী" লিখিত হইয়াছে। এই লিপিতে বিরামসূচক দণ্ডচিহ্নের পূর্ব্বে যে বিসর্গ দেখা যায়, উহা ঐ চিহ্নেরই অংশ। তৃতীয় পংক্তির প্রথম অক্ষর "ম" ভ্রমক্রমে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। চতুর্থ পংক্তিটিতে ভাষাগত ত্রুটি দেখা যায়। ইহার সংশোধিত পাঠ হইবে "মধুংরশর্ম্ম-কারিত ধর্ম্মঃ ॥ শ্রীঃ" ইহার অর্থ এই যে, মধুংরশর্ম্মা নামক এক ব্যক্তি "ধর্ম্ম" নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই ব্যক্তি অবশ্যই একজন বিষ্ণুভক্ত বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহার "ধর্ম্ম" কচ্ছপের পিঠের খোলের সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বহুসংখ্যক বৌদ্ধ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সংখ্যাপুষ্টি ভগবান্ বুদ্ধের বিষ্ণু-অবতাররূপে কল্পিত হইবার অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই "ধর্ম্ম" বস্তুটি কি? আমাদের বিবেচনায় ইনি আমাদের সুপরিচিত ধর্ম্মঠাকুর ব্যতীত অপর কেহ নহেন। কচ্ছপের পিঠের খোলের ব্যবহার এই ধারণা সমর্থন করিতেছে; কারণ কচ্ছপ ধর্ম্মঠাকুরের প্রতীক। আজকাল প্রস্তরনির্ম্মিত কূর্ম্মমূর্ত্তিকে ধর্ম্মঠাকুর রূপে পূজা করা হয়; কিন্তু আলোচ্য লিপি হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন কালে কূর্ম্মপৃষ্ঠ অথবা কূর্ম্মপৃষ্ঠ দ্বারা আবৃত মৃন্ময় কূর্ম্মমূর্ত্তি ধর্ম্ম নামে পূজিত হইত। বর্ত্তমান কালে কেবলমাত্র বাংলার পশ্চিমাংশেই ধর্ম্মপূজা প্রচলিত আছে। কিন্তু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল তাঁহাদের "রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গলে"র ভূমিকায় দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্বে পূর্ব্ব এবং উত্তর বাংলাতেও ধর্ম্মঠাকুর-পূজার প্রচলন ছিল। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত আলোচ্য লিপি দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম্মঠাকুরের পূজাতে বাংলা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ পরিণতি অনুমান করিয়াছিলেন। আমাদের লিপি হইতে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মপূজার সংস্রব প্রমাণিত হইলেও, শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্তটিকে অভ্রান্ত মনে করা সম্ভব নহে। কারণ বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্তর্গত ধর্ম্মের রূপ কল্পনার সহিত কূর্ম্ম-মূর্ত্তির কোন সম্পর্ক নাই। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, পঞ্চানন মণ্ডল প্রমুখ যাঁহারা ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিমত সমর্থন করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মতে অনার্য্য জাতিবিশেষের মধ্যে প্রচলিত কূর্ম্মপূজার সুপ্রাচীন অনুষ্ঠান হইতে ধর্ম্মপূজার উদ্ভব হইয়াছে। ধর্ম্মঠাকুরের কল্পনায় তাঁহারা আর্য্যানার্য্য নানা দেবতার (বিশেষতঃ বৈদিক সূর্য্য এবং বরুণের) প্রভাব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে ধর্ম্মপূজার ব্যাপকতার প্রশ্নও তাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত ধর্ম্মরাজ পূজার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশ্য এই ধর্ম্মরাজ জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির, এবং তিনি কূর্ম্মমূর্ত্তি নহেন। এলাহাবাদে আবিষ্কৃত জেড-পাথরে নির্ম্মিত একটি প্রাচীন কূর্ম্ম-মূর্ত্তি অধুনা লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। ধর্ম্মপূজার প্রাচীনতা এবং ব্যাপকতার সূত্রে তাহার আলোচনাও সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক নহে। যাহা হউক, কূর্ম্মরূপী ধর্ম্মঠাকুরের পূজা যে মূলতঃ কচ্ছপ-টোটেম-পূজক অনার্য্য জাতির সংস্কৃতি হইতে গৃহীত, তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই।

ধর্ম্মঠাকুর প্রধানতঃ বিষ্ণুর সহিত অভিন্নরূপে কল্পিত হইয়া থাকেন। আলোচ্য লিপি হইতেও ধর্ম্মের বৈষ্ণব সংস্রব সূচিত হয়। বিষ্ণুর কূর্ম্ম অবতারের সূত্রে এই দেবতার সহিত কূর্ম্মরূপী ধর্ম্মঠাকুরের সম্পর্ক সহজেই স্থাপিত হইতে পারে। প্রথমে প্রজাপতির কূর্ম্মরূপ কল্পিত হইয়াছিল; পরে কূর্ম্মাবতার বিষ্ণুতে আরোপিত হয়। বিষ্ণুর সমুদয় অবতারই মূলতঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্য ছিলেন; পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর সহিত সম্পর্কিত করা হইয়াছে। বিষ্ণুর অ-মানব অবতারগুলি টোটেম-পূজক জাতিবিশেষের উপাস্য বস্তু এবং সুন্দরবনের আধুনিক ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণরায়ের ন্যায় অলৌকিক দেবতার কল্পনা হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উপরে আমরা সংক্ষেপে ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত কচ্ছপের খোলের উপর লিখিত লিপির ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করিলাম। দেখা গেল, এই লিপি প্রাচীন বাংলার ধর্ম্ম-জীবনের উপর অনেকখানি আলোকপাত করিতেছে। প্রথমতঃ প্রমাণিত হইল যে, কূর্ম্ম দেবতার ধর্ম্ম নাম এবং তাঁহার পূজা খ্রীষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে পূর্ব্ব বাংলার ঢাকা অঞ্চলে সুপ্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, জানা গেল যে, বিষ্ণুভক্ত বৌদ্ধেরা অনেক সময় ধর্ম্ম-দেবতার পূজা করিতেন। ইহা হইতে কেবল যে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মপূজার সম্পর্ক প্রমাণিত হইল, তাহা নহে; কোন্ কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া বাংলায় হিন্দু ধর্ম্মে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলুপ্তি ঘটিয়াছিল, তাহারও একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল। তৃতীয়তঃ, দেখিলাম যে, প্রাচীন বাংলায় কচ্ছপের খোলের দ্বারা ধর্ম্মমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইত। পরবর্ত্তী কালে এই প্রথা লুপ্ত হইয়াছে। এইরূপে পূর্ব্ব বাংলা হইতে ধর্ম্মঠাকুরের নামও লোপ পাইয়াছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যে মতামত ব্যক্ত করিলাম, সে সম্বন্ধে "প্রবাসী"র পাঠকগণের মধ্যে কাহারও কোন বক্তব্য থাকিলে তিনি দয়া করিয়া বর্ত্তমান লেখককে তাহা জানাইবেন।

'ডু য়্যাজ ইউ লাইক্'

শ্রীতারাপদ রাহা

সুকুমার বাবু—

এই দেখুন গোড়াতেই কেমন ভুল করে বসছিলাম আমি ; নিজের নামের সঙ্গে বাবু সংযোগ করলে চটে যান তিনি, বলতে হবে তাঁকে মিঃ এস্ চক্রোভর্টি অথবা প্রফেসার চক্রোভর্টি—নিম্নতন লোকের কাছ থেকে অবশ্য শুনতে চান তিনি—'স্যার'। সে আশা অবশ্য তাঁর আংশিক পূর্ণও হয়েছে—কিন্তু সে কথা এখন থাক—

মিঃ চক্রোভর্টি শুক্রবার সন্ধ্যার পর বাড়ী এসে গিন্নীকে ডাকলেন, হ্যালো—মিসেস চক্রোভর্টি, এদিকে আসুন একবার।

মিসেস চক্রোভর্টি, ওরফে সাবিত্রী দেবী তাঁর চার বৎসরের কন্যার জন্য একটা ফ্রক্ সেলাই করছিলেন—সেটা মেশিনের উপর রেখে—কৃত্রিম ক্রোধ-হেতু—ঈষৎ কুঞ্চিত ললাটে ধীরপদে স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ালেন : কি এত রঙ্গ কিসের—ব্যাপার কি ?

মিঃ চক্রোভর্টি পকেট থেকে একখানা 'পাক্কা'-খাম বের করে মিসেসের হাতে দিলেন, এই নাও তোমার চিঠি।

কিসের চিঠি ?

দেখই না একবার কিসের চিঠি ?

সাবিত্রী স্বামীর অনুরোধে তাকিয়ে দেখলেন—খামখানার উপর লেখা রয়েছে—মিষ্টার য়্যাণ্ড মিসেস এস্. চক্রোভর্টি।

মিসেসের দৃষ্টি পড়েছে দেখে খুশি হয়ে উঠল মিষ্টারের মুখ।

'কোত্থেকে এল' বলে স্বামীর হাত থেকে চিঠিখানা সাবিত্রী নিজের হাতে তুলে নিলেন : 'কোন বিয়েটিয়ের নিমন্ত্রণ নয় ত ?'

হেসে উঠলেন মিঃ চক্রোভর্টি : পাগল—বিয়ের চিঠি কখনও সাদা হয়—পরন্তু আমাদের স্কুলে প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশান—হেড মাষ্টার নিমন্ত্রণ করেছেন তোমায়—

হুঃ—ঠোঁট উল্টালেন সাবিত্রী।

হুঃ কি—যেতে হবে তোমায়—নইলে খুবই ক্ষুণ্ণ হবেন ওঁরা, কমিটির আর আর মেম্বারদের স্ত্রীরাও আসছেন যে—পরিচয় হবে সবার সঙ্গে, তুমি না গেলে তাঁরাও ক্ষুণ্ণ হবেন।

সাবিত্রী মৃদু হেসে উত্তর দিলেন—তাঁদের ক্ষোভের কি কারণ থাকতে পারে—তাঁদের কারো সঙ্গেই ত আমার পরিচয় নেই।

উত্তরটা তখনই জুয়ালো না মিষ্টারের মুখে—কারণ সাবিত্রী দেবী না গেলে আসলে ক্ষুণ্ণ হবেন তিনি নিজে। আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন—কেন ? সে কথা শুনাচ্ছি আপনাদের—

দক্ষিণ-কলকাতার যে পাড়ায় তিনি থাকেন সে পাড়ার গিন্নীরা স্বামীর গর্ব্বে বড় বেশী গরবিণী। স্বামীর কৃতিত্বে কোন নারী আর গর্ব্ববোধ না করে—কিন্তু এ পাড়ায় যেন একটু বেশী—আসলে হয়ত বেশী নয়, কিন্তু শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দেবী মনে করেন এ পাড়ায় যেন একটু বেশী। আর সত্যি বলতে কি গিন্নীদেরও দোষ দেওয়া যায় না—গর্ব্ব করবার মত স্বামীর সংখ্যাও যেন এ পাড়ায় একটু বেশী—

মিঃ চক্রোভর্টির সামনের বাড়ী একজন উঁচুদরের সাহিত্যিকের। দিনরাত সেখানে বন্ধুশ্রেণীর, ভক্তশ্রেণীর, এবং থিয়েটার, সিনেমা প্রভৃতি ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক আসে। ভদ্রলোকের খাতির দেখে ঈর্ষায় জ্বলে যায় সাবিত্রীর মন। সেদিন দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনি সাহিত্যিক-পত্নী গৌরীর সঙ্গে—গৌরী তখন প্রসাধনরতা।

কি ভাই, কোথায় যাওয়া হচ্ছে অমন সেজেগুজে ?

গৌরী আয়নার সামনে কি রকম মুখ ঘুরিয়ে (সাবিত্রী দেবী অবশ্য নিজের মনে ব্যাখ্যা করে নিলেন স্বামীর দেমাকেই অমনি করলে সে) বললেন, আরে ভাই বলবেন না, যেতে হবে ওঁর সঙ্গে উত্তরপাড়া, সেখানকার কি এক সাহিত্য-সমিতি ওঁর জন্মদিন উপলক্ষে ওঁকে সম্বর্দ্ধনা জানাবে,—আর পেরে উঠছি না ভাই—আজ এখানে, কাল ওখানে, কাঁহাতক চরকীর মত ঘোরা যায় বলুন—আর দেখতেই ত পাচ্ছেন দিন-রাত লোকের উপদ্রব, দলের পর দল লোক আসছে কি কম ! তাদের চায়ের ব্যবস্থা কর—জলখাবার !

গৌরীর দেমাক সইতে পারলেন না সাবিত্রী দেবী—কি একটা অসহ্য জ্বালায় জ্বলতে লাগল তাঁর মন। ঠাট বজায় রাখতে আত্মসংবরণ করে মাত্র দু-একটা কথা বলে ফিরে এলেন তিনি। না, পারতপক্ষে এ বাড়ীমুখো আর তিনি হবেন না।

মনে ভাবলেন বটে এ বাড়ীমুখো হব না, কিন্তু কোন্ বাড়ীমুখো তিনি হবেন ? ডাইনে যাঁর বাড়ি তিনি মস্ত বড় এক গাইয়ে, সেখানেও লোক আসছে দিনরাত—সিনেমা, রেকর্ড কোম্পানীর লোক, বন্ধু আর ভক্ত শিষ্যের দল, সাধারণ শ্রোতার দল, সভাসমিতিতে নিমন্ত্রণকারীর দল। নানা জাতীয় লোকে তাঁর বসবার ঘর সারাক্ষণ একেবারে গমগম করে। আর কি খাতির পান ভদ্রলোক লোকের কাছে—সাবিত্রী দেবী এসব নিজের চোখে তাকিয়ে দেখেছেন। এঁর গিন্নীরও কি কম গুমোর ! না, ও বাড়ীতেও যাওয়া চলে না।

তার পরের বাড়ী একজন সাহেবের, সেখানেও যাওয়া চলে না—ও বাড়ীর গিন্নী সাবিত্রীকে যেন কৃপার চক্ষে দেখেন, কারণ স্বামীর পদমর্য্যাদার জন্ত নিজেও সেলাম পান তিনি প্রতিদিন অসংখ্য, সুতরাং সাবিত্রীকে তিনি যে চক্ষে দেখেন তাতে সাবিত্রীর মন খুশি হয়ে ওঠবার কথা নয়, বিশেষ করে প্রতিবাসী গিন্নীদের আচরণ দেখে দেখে তার মনে এক 'কমপ্লেক্স' গড়ে উঠেছে।

খানচারেক বাড়ী পরে সাবিত্রীর বাল্যবন্ধু কমলার বাড়ী, সেখানেও যেতে তাঁর মন চায় না,—কমলার স্বামী কিছুদিন আগে ডি-লিট হয়েছেন—সত্যিই খুব পণ্ডিত লোক, আরও উচ্চতর গবেষণার জন্ত সম্প্রতি বিলেত গিয়েছেন তিনি, কমলা সেই দেমাকেই বাঁচে না।

কোথায় যাবেন সাবিত্রী! আর এক প্রতিবাসী অভিনেতা, আর একজন ব্যবসায়ী, লোকের কাছ থেকে খাতির আর সেলাম তারাও বড় কম পান না, ব্যবসায়ীর বাড়ীর সামনেও মোটর আসছে দিনরাতই। বাবা কি বিয়েই তাঁর দিয়েছেন! স্বামীকে অবশ্য ভালবাসেন তিনি কম নয়,—কিন্তু ভালবাসাই ত জীবনের সব নয়—লোকে এসে স্বামীকে খাতিরই যদি না করল—সেলামই যদি না করল—তবে আর হ'ল কি? জীবন যেন কেমন বিস্বাদ হয়ে যায় সাবিত্রী দেবীর।

স্বামীকে তিনি মাঝে মাঝ খোঁচাও দেন নিজের জালায়: ওগো, তুমি গান গাইতে পার না?

হো হো করে হেসে ওঠেন মিঃ চক্রোত্তি: পারি তবে সেটাকে চতুষ্পদ জীববিশেষের কণ্ঠনিঃসৃত রাগিণী আখ্যা দেবে লোকে।

তোমার কবিত্ব রাখ—অভিনয় কর নি কোন দিন—এ-সব কলেজটলেজ ছেড়ে দিয়ে সিনেমা থিয়েটার করলেও ঢের ভাল ছিল।

এমনি করে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে, লোকের কাছে মান-সম্মান পাবার যত রকম পন্থা আছে তা অবলম্বন করার যোগ্যতা আছে কিনা স্বামীর একে একে যাচাই করে নেন সাবিত্রী।

মিঃ চক্রোত্তি সহধর্ম্মিণীর প্রশ্ন শুনে শুনে তাঁর মনোগত অভিলাষ সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করে নেন নিজের মনে এবং অপর কোন উপায়ে মানব-মনের এই অতি প্রবল কণ্ডুয়নের নিবৃত্তি করতে না পেরে অনেক কষ্টে যোগাড় করে দিয়েছেন স্বামীর স্কুলের সেক্রেটারীর পদটি,—খাতির ও সেলাম করবে তবু কতকগুলি লোক এবং সব চেয়ে আনন্দের কথা তাদের মধ্যে কতকগুলি দরিদ্র হলেও শিক্ষিত গুণী।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে—সাবিত্রী ত দেখতে পান না—স্বামীর খাতির—স্কুলের দারোয়ান আর বেয়ারা ছাড়া আর কারো সেলাম তো চোখে পড়ে না তাঁর; কতকগুলি শিক্ষিত ভদ্রলোক তাঁকে দেখে কেমন নম্র হয়ে অভিবাদন করে তা ত দেখতে পান না সাবিত্রী! দেখলে বুঝতেন তাঁর স্বামীও তার প্রতিবাসীদের চেয়ে কোন অংশে কম নন। মিঃ চক্রোত্তি অনেক সময়—মেজাজ যখন ভাল থাকে—নিজের মনে মনেই আওড়ান; সত্যিই teachers are dear fellows নিজের মনের অতি প্রবল একটি আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি দিয়েছে তারা।

কেবল একটি শিক্ষককে তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। লোকটা তাঁর কাছে দুশমন—নাম সুব্রত চৌধুরী। লোকটা এসেছে মাষ্টারি করতে, অথচ বাতিক হচ্ছে তার লেখার। লোকটা সেক্রেটারীর নামে কি এক পত্র লিখেছে না কি কাগজে। কমিটি থেকে অবশ্য তাকে একবার ডেকে বলা হয়েছে—লেখাতেই যদি তার এত ঝোঁক, স্কুল তবে সে ছেড়ে দিলেই ত পারে! কিন্তু লোকটা বলে, না—স্কুল সে ছাড়বে না, এখান থেকে লেখার উপাদান সংগ্রহ করতে এসেছে সে।

মিঃ চক্রোত্তির চোখে ঐ লোকটা কেবল মহাপাজী, কিন্তু দেখা হলে সেলাম সে-ও দেয়—অবশ্য কি রকম একটু হাসি লেগে থাকে তার মুখে, মিঃ চক্রোত্তির সে হাসিটা বড় সুবিধের মনে হয় না, কিন্তু মনকে প্রবোধ দেন তিনি, যাক—অত বুঝতে পারবে না সাবিত্রী—সেলাম ত সে-ও করবে!

স্পোর্টসের প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশান উৎসবে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে মিঃ চক্রোত্তির তাই এত উল্লাস, এবং তাই বলছিলাম সাবিত্রী দেবী এই অনুষ্ঠানে যোগদান না করলে অপরে না হলেও ক্ষুণ্ণ হবেন তিনি নিজে, শুধু ক্ষুণ্ণ বললেও ঠিক বলা হবে না—হবেন তিনি একেবারে হতাশ।

কিন্তু হতাশ হতে হ'ল না তাঁকে: সাবিত্রী দেবী সহজেই রাজী হয়ে গেলেন—বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন সফল হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে কোন মূর্খ তাকে অনাদরে প্রত্যাখ্যান করে!

নির্দ্দিষ্ট দিনে সাবিত্রী দেবী স-স্বামী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চললেন, এবং রীতিমত সেজেগুজেই চললেন। বড় ছেলে তার এম্, এ দেবে এবার, বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে ছেলেপিলে হয়ে গেছে, তবু পর পর তিনখানা শাড়ী পালটে চতুর্থখানার মন উঠল তাঁর, মুখের পাউডার ঘষে ঘষে স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করে, না পেরে, বার বার পাঁচ বার লাগালেন, পাঁচ বার তুললেন, শেষে বিরক্ত হয়ে—'দুত্তোর' বলে একটু বেশী লাগিয়ে রেখেই মনের তৃপ্তি হ'ল তাঁর। এর পর সাজানোর পালা ছোট মেয়ে রেবাকে। আধ ঘণ্টা কাটল তাতে।

এদিকে মিঃ চক্রোত্তি পরলেন সরু কালোপেড়ে তাঁতের ধুতি, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, ওপরে মুগাপেড়ে উড়ানি।

অর্দ্ধেক টাকপড়া মাথাটাকে বেশ করে ব্রাশ লাগালেন তিনি। তারপর চললেন তাঁরা স্কুলের পয়সায় ভাড়া-করা ট্যাক্সিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

গাড়ি স্কুলের গেটের সামনে আসতেই দারোয়ান সেলাম করে সরে দাঁড়াল। হেডমাষ্টার ও আর একজন শিক্ষক বিশিষ্টদের অভ্যর্থনা করে নিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন—তাঁরাও সসম্ভ্রমে নমস্কার জানিয়ে স্মিত হাস্যে অভ্যর্থনা করে নিলেন সস্ত্রীক এবং সহৃহিতা সেক্রেটারী মহোদয়কে। মাঠে এদিক ওদিক দাঁড়িয়েছিলেন আরও অনেক শিক্ষক, সেক্রেটারীকে দেখে তাঁদের অনেকেই ছুটে এলেন, তাঁর কাছে এসে অভিবাদন জানালেন—শুধু সেক্রেটারীকে নয়,—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রীকেও। সাবিত্রী লক্ষ্য করলেন—স্বামী তাঁর এদের অভিবাদনের উত্তরে প্রত্যভিবাদন জানালেন না—করলেন শুধু একটু 'নড'।

দেখে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সাবিত্রী দেবীর অন্তর: এই ত তিনি চেয়েছিলেন মনেপ্রাণে। থাকত যদি আজ প্রতিবাসীদের গিন্নীরা সব। বিশিষ্ট ভদ্রলোক অবশ্য অনেকে এসেছেন—স্কুলের ছেলেদের সব অভিভাবক। ছুটির দিন—অনেকেই বাড়ী ছিলেন আজ। ওঁরা ত দেখছেন, তা হলেই হ'ল। মহিলাও এসেছেন কয়েকজন, এরা দেখাতেই সাবিত্রীর আনন্দ বেশী: প্রতিযোগিনী।

প্যাণ্ডেল সাজানো হয়েছে দিব্যি খদ্দরের রঙীন কাপড় দিয়ে, তার মাঝে সব ভাড়া করা ফোল্ডিং চেয়ার। প্রেসিডেণ্ট সেক্রেটারী, কমিটির মেম্বার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য স্কুলের ভাল চেয়ারগুলি পাতা হয়েছে—একটা লম্বা টেবিলে পুরস্কারের জিনিসপত্র সাজানো।

সভাপতি করা হয়েছে স্থানীয় একজন উচ্চপদের রাজ-কর্ম্মচারীকে। লোক হিসাবে তিনি সত্যিই বড় ভাল। সরকারী কর্ম্মভার তিনি সম্প্রতি গ্রহণ করেছেন,—এর আগে তিনি দেশের জন্য জেল খেটেছেন, নানা ভাবে লোকসেবা করেছেন, পড়াশুনা করেছেন অনেক এবং সকলের উপর বড় কথা—মনটি তাঁর সত্যসন্ধ, নিরপেক্ষ, উদার।

স্পোর্টসের কয়েকটি ভাল ভাল আইটেম রেখে দেওয়া হয়েছিল এই সব বিশিষ্ট লোকদের দেখাবার জন্য। সেগুলি একে একে শেষ হয়ে গেল। বাকী রইল শুধু একটি আইটেম 'ডু য়্যাজ ইউ লাইক'—

সভাপতি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি ব্যাপার?

হেডমাষ্টার বুঝিয়ে দিলেন, এটা হচ্ছে ছেলেরা নিজের নিজের খুশীমত সেজেগুজে এসে আপনাদের তাক্ লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করবে, এর মাঝে সব চেয়ে যে তিন দফা ভাল হবে, তারই জন্য প্রাইজ দেওয়া হবে—

ঠিক তখনই স্কুলের ভিতর থেকে খবর এল—ছেলেদের মেক্-আপ এখনও শেষ হয় নি, আরও আধঘণ্টা দেরী হবে—সভার আর আর কাজ এর মাঝে সেরে নিলে ভাল হয়।

সভাপতির নির্দ্দেশে সেক্রেটারী তখন তাঁর রিপোর্ট পড়া সুরু করলেন। আর আর দশ কথার পর তিনি হিসাব দিলেন—স্কুল তাঁর হাতে আসবার পর স্কুলের উন্নতিকল্পে তিনি কি কি কাজ করেছেন। তিনি পড়ে শুনালেন—

আমি এর কর্ম্মনির্ব্বাহ-ভার গ্রহণ করবার আগে এর জমা তহবিলে টাকা ছিল মাত্র ৫৬৩৫॥/৬ পাই, সম্প্রতি গত মাসের শেষ দিনে যে হিসাব নেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে—স্কুলের তহবিলে জমেছে এখন ৫৭২০৫৸৶। পূর্ব্ব-পাকিস্থান থেকে এখানে লোক আসায় ছাত্রসংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে বারো শ'য়েরও উপর, তা ছাড়া মুদ্রাস্ফীতির জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে প্রাপ্য বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে মাথা পিছু দেড় টাকা। স্কুলের আয়বৃদ্ধির অবশ্য মূল কারণ এই—তবে খরচ সম্বন্ধে আমি সাধ্যমত সতর্কতা অবলম্বন করেছি, সেটাও উপেক্ষা করবার নয়।

খরচ সম্বন্ধে কড়াকড়ি করা সত্ত্বেও স্কুলের আসবাবপত্র বাড়ানো হয়েছে প্রচুর। নূতন বেঞ্চ আর হাইবেঞ্চ করা হয়েছে পঞ্চাশখানা, পাখা চলত প্রায় ধরে দুখানা, এখন চলে তিন খানা। স্কুলের ঘরে চুনকাম করা হয় বছরে দু'বার। তা ছাড়া স্কুলের সামনে একটা ভাল ফুল-বাগান করা হয়েছে, তার জন্য মালী রাখা হয়েছে একটি।

এই স্কুলে অন্তত দশ জন মাষ্টার এখন বেতন পান আশী থেকে এক শ টাকার মধ্যে। হেড মাষ্টার এবং এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টারকে দেওয়া হয় এখন পূর্ব্বের চেয়ে আরও বিশ এবং পনর টাকা বেশী। শিক্ষকেরা এর চেয়ে বেশী বেতন আর কোন দিন পান নি—একথা আমি জোর করে বলতে পারি—

সেক্রেটারী তাঁর রিপোর্ট পড়া শেষ করে বসলেন। স্বামীর কৃতিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সাবিত্রীর মুখ, অনুমোদন প্রত্যাশা করে নিজের অজ্ঞাতেই চাইলেন তিনি সমাগত আর আর মহিলাদের মুখের দিকে।

ছেলেদের 'মেক্-আপ' শেষ হতে আরও মিনিট পনর দেরী।

সভাপতি এবার আগেকার দফার পারিতোষিক বিতরণ করতে সুরু করলেন, 'ডু য়্যাজ ইউ লাইক'-এর প্রাইজ আলাদা করে রাখা হ'ল, পরে দেওয়া হবে।

ছেলেরা সব একে একে এসে সভাপতিকে অভিবাদন করে নিজের নিজের প্রাইজ নিয়ে গেল।...

ছেলেদের মেক-আপ শেষ হয়ে গেছে, এইবার ডু য়্যাজ্ ইউ লাইকের পালা:

স্বেচ্ছাসেবকেরা এসে প্যাণ্ডেলের সামনের খানিকটা জায়গা ফাঁকা করে দিল: এইখানে দেখাবে ছেলেরা তাদের

অভিনয়। অভিনেতাদের আগমন নির্গমন পথের দু' ধারে, স্বেচ্ছাসেবকেরা হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে একটা বেষ্টনীর সৃষ্টি করল। সুরু হ'ল 'ডু য়্যাজ ইউ লাইক্'—

একটি কুষ্ঠরোগী আসছে। হাত-পা তার খসে গিয়েছে তাতে ছেঁড়া নেকড়া বাঁধা, দেহের নানাস্থানে কাঁজি আর গলিত মাংসের বীভৎস চিহ্ন, এক বিকৃত কণ্ঠের কাতর আর্তনাদ আর আবেদনের ধ্বনি বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে। হাঁটতে পারছে না সে, ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে এক রকম গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে সে মঞ্চের সামনে।

চারদিক থেকে ঘন করতালি পড়ল।

এর পর এল একটি টিনের হাতলহীন একটা মগ হাতে পঞ্চাশের মন্বন্তরের এক বুভুক্ষু ভিখারী: একটু ফেন! তিন দিন কিছু খেতে পাই নি বাবু! ছেলেটির চোখ দুটি অনাহারের জ্বালায় হয়ে উঠেছে অতীব করুণ।

এর পর এল এক পাগল: রাজ্যের যত ছেঁড়া ন্যাকড়া গহনা করে পরেছে গায়ে,—ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের এক পুঁটলীতে বাঁধা নোংরা যত তার সম্পদ—গায়ে সাত পরদা মাটি—দুই গাল বেয়ে পড়ছে অজস্র পানের রস। পাগল হাসছে। শুধু হাসলে অবশ্য কথা ছিল না—কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে সে মঞ্চাসীন মাননীয় ব্যক্তিদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করছে, আর হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। ওখানকার সবারই বুক উঠছে কেঁপে, প্রত্যেকেই ভাবছেন তাঁকেই বুঝি বিদ্রূপ করছে পাগলে। সেক্রেটারীর ভ্রূ এবং ললাটের রেখা কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে,—আঁধার হয়ে উঠেছে তাঁর মুখ।

পাগল যেন মঞ্চের দিকে কটাক্ষ করেই অট্টহাসি হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। ছাত্রদের ঘন করতালির শব্দ আর থামতে চায় না।

এর পর দেখা দিল এক সেলাইবুরুশ—অর্থাৎ মুচী। দিব্যি মোটাসোটা চেহারা, গায়ে একটা রঙীন ফতুয়া, কাঁধে একখানা লাল গামছা, মাথায় এত তেল মেখেছে যে চুল থেকে যেন তা গড়িয়ে পড়ছে, বাঁ বগলের নীচে ঝুলানো জুতো সেলাই ও মেরামতের যাবতীয় সরঞ্জাম—পায়ে বেশ টনকো চকচকে এক জোড়া নিউকাট। সেলাই বুরুশ মঞ্চের সামনে ঘুরে ঘুরে হিন্দুস্থানী ঢঙে হাঁকতে লাগল—সেলাই বুরুশ—

সবাই ভাবছিল ছেলেটি মুচীর পার্টই অভিনয় করছে—মন্দ হয়নি মেক-আপ: মুচীর এ সাজসরঞ্জাম জোগাড় করল কোত্থেকে আশ্চর্য্য! কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল—এই সব নয়। মুচীর হাঁকডাক শুনে দেখা দিলেন এক রোগা ভদ্রলোক: কোটরগত চক্ষুর চারপাশে দারিদ্র্যের কালিমা, গায়ে একটা ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি, মুখে পাঁচ-ছয় দিনের জমানো দাড়ি, হাতে করে এলেন তিনি অতি পুরানো এক জোড়া ছেঁড়া জুতো; এই দেখ ত,—কত নেবে এটা সারাতে?

মুচী বার একবার ওর দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্য ভরে বললে, ও আর কি সারাবে বাবু—উস্‌মে আর কুছু নেই আছে!

কিছু নেই কি হে,—সারালে এখনও এ ছ' মাস যাবে—

মুচী হেসে জুতো নিতে হাত বাড়িয়ে বললে,—আউর ছ' মাস। আচ্ছা—দিজিয়ে পাঁচ্‌সিকা পয়সা লাগেগা—হাঁ, হাফ সোলবি দেনে পড়েগা!

জুতো জোড়া হাতে তুলে নিলে মুচী,—কিন্তু ভদ্রলোক মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, পাঁচসিকে দেওয়া কি সহজ কথা বাবা!

বলেই একটু করুণ হাসি হাসলেন; একটু কমটম করে নাও বাপু—আর একটু ভাল করে সেরো যেন মাস ছয়েক যায়!

কেতনা দেনে মাঙতা?

যতটা কম দিয়ে পার তুমি বাপু—তোমার ধর্ম্মেকর্ম্মে যা বলে দামটাম আর আমি কিছু করব না,—তোম্ ইমানসে যো বোলেগা ঐ দেগা—

—বলে মুচীর সামনেই উবু হয়ে বসলেন ভদ্রলোক: একটু ভাল চামড়া—মানে নতুন চামড়াটামড়া দিও বাপু—

মুচী জুতো সারানোর ভঙ্গী করতে করতে বললে, নয়া জুতি এক জোড়া কিন লিজিয়ে বাবু—

এই পুরানোটাই ভালো করে সারিয়ে দাও বাবা।

কোন কাম করছেন আপনি বাবু—নকরি?

স্কুল জান ত,—লেড়কা লোক সব পড়তা?

হাঁ—হাঁ—ইস্কুল।

হাঁ—ঐ ইস্কুলমে মাষ্টারী করি আমি—সমঝা?

হাঁ হাঁ—ও কাম ত খুব আচ্ছা আছে—তলব কেতনা মিলতা বাবু?

দুঃখের হাসি হেসে উঠলেন ভদ্রলোক, এই ত মুশকিলে ফেললে, মিছে কথাই বা বলি কি করে,—তা তেমন কিছু নয় বাবা।

আঃ হা—বালবাচ্চা কঠো হৈ—

তা ভগবানের আশীর্ব্বাদে ছ'টি—ছটো লেড়কা-লেড়কী আর স্বামী-স্ত্রী এই আটটি প্রাণী সংসারে—বুঝছই ত সংসার চালানো কত কঠিন—বলেই একটুখানি ম্লান হাসি হাসলেন।

বহুৎ আপশোষ কা বাত,—বহুৎ আপশোষ কা বাত—মুখ ভার করে বার বার আওড়াতে লাগল মুচী।

এবার ভদ্রলোকের প্রশ্নের পালা। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি রোজ কেতনা কামাও—

মুচী শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে—বাবুজী রাম কৃপাসে হামি

১৯।৫ সাত আট টাকা কামাছে—কোভি কোভি দশ এগার রূপেয়া ভি হোতা।

বেশ বেশ শুনে খুব খুশী হলাম।

জুতো সারা হয়ে গেল। মুচী জুতো জোড়া একটু এগিয়ে রেখে বললে, বাবু আপনার জন্তে আমার বড় আপশোষ লাগছে—আপনি গুরুজী আছেন,—বাজারকো বগলমে আমার ঘর আছে—নয়া জুতি বি হাম বানাতা, আপকো ওয়াস্তে এক জোড়া নয়া জুতি বানায়গা হাম—

বলেই উঠতে যাচ্ছিল মুচী। ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—পয়সা না নিয়ে যাচ্ছ কি হে—দাঁড়াও দাঁড়াও পয়সা এনে দিচ্ছি আমি—

মুচী প্রত্যাখ্যান করে বললে—নেহি বাবু আপকো পাসসে পয়সা হাম নেহি লেগা. আপনি গুরুজী আছেন—হামার নাম রামদাস আছে—রামদাস মিস্ত্রী বাজারকা বগলমে দুপা করকে—পরনাম বাবু—

বলে হাতজোড় করে ভদ্রলোককে নমস্কার করে মুচী পয়সা না নিয়েই চলে গেল, ভদ্রলোক জুতো হাতে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন তার গমনপথের দিকে।

অভিনয়টি এমনি চমৎকার হ'ল যে, দারিদ্র্যপীড়িত শিক্ষকের শোচনীয় দুরবস্থার ছবি যেন দর্শকদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল।

ছাত্র থেকে সুরু করে—সমাগত ভদ্রমণ্ডলী সবাই চুপ। অভিভাবকেরা ভাবলেন—এতে তাঁদের প্রতিও কটাক্ষ করা হয়েছে—তাই তাঁরাও কিছু উচ্চবাচ্য করলেন না, কিন্তু ক্ষেপে উঠলেন মিঃ চকরোভটি। স্থান কাল পাত্র ভুলে উন্মত্তের মত চীৎকার করে তিনি বলে উঠলেন,—এ সুব্রতবাবুর কীর্ত্তি, কই সুব্রতবাবু কই?··· দরোয়ান, সুব্রত বাবুকো সেলাম দেও।

সুব্রত মঞ্চ থেকে একটু দূরে স্কুল-ঘরের দেয়াল ঠেসান দিয়ে সহকর্মী এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিল, সেক্রেটারীর হুকারে গল্প বন্ধ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সেক্রেটারীর সামনে। নমস্কার করবারই নিয়ম, দেখা হলে করেও থাকে সে, কিন্তু আজ এত লোকের সামনে সেক্রেটারীর অমন তর্জ্জনের পর তা আর পারলে না সে। যথাসাধ্য স্থিরকণ্ঠে সে বললে, আপনার গলা শুনতে পেয়েছি আমি, দারোয়ান পাঠাবার দরকার ছিল না।

আবার বিদ্রূপ!—ক্রোধে বিকট হয়ে উঠল সেক্রেটারীর মুখ: ছেলে ক্ষেপিয়েছেন কেন?

ছেলে ক্ষেপাই নি আমি।

তবে ওদের এ মতলব দিলে কে,—আপনি ছাড়া আর কেউ না!

আমার উত্তর আমি দিয়েছি।

সুব্রতের শান্তকণ্ঠে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন সেক্রেটারী—একবার আপনি স্কুলের স্বার্থের বিরুদ্ধে গল্প লিখেছিলেন, সেবার কিছু বলিনি আপনাকে আমি।

স্কুলের স্বার্থের বিরুদ্ধে আমি কিছু লিখি নি, লিখেছি এখানকার এক শ্রেণীর লোকের দুর্নীতির বিরুদ্ধে—দ্বিতীয়তঃ আপনি নিজে কিছু বলেন নি বটে, কিন্তু অন্ত লোকের মারফত আমায় স্কুল ছেড়ে দিতে বলেছেন, আমি রাজী হই নি—

আমায় মিথ্যাবাদী বলতে চান আপনি?—রাগে গর্জ্জে উঠলেন সেক্রেটারী।

না, কিছুই বলি নি আপনাকে আমি। সত্যি সত্যি যা ঘটেছিল তাই শুধু বলছি।

আপনি অনেক অনর্থের সৃষ্টি করছেন এখানে, রিজাইন দিতে হবে আপনাকে, ছেলেদের ক্ষেপাতে আমি দেব না আপনাকে।

রিজাইন আমি দেব না, সেকথা এর আগের বারই জানিয়ে দিয়েছি আমি, আর ছেলেদের সম্বন্ধে যা বলছেন ওকথা একেবারেই ঠিক নয়, ওরা নিজেরাই নিজেদের খুশিমত পরিকল্পনা করেছে: ওরা সব খবরই রাখে।

সব খবর মানে?—দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠলেন সেক্রেটারী: সব খবর মানে—কি বলতে চান আপনি?

এইবার মৃদু হেসে সুব্রত বললে, এইখানেই শুনতে চান সব? কিন্তু তা বিশেষ প্রীতিপ্রদ হবে না।

বিকট ব্যঙ্গের সুরে সেক্রেটারী উত্তর দিলেন—সব না হোক অন্তত দু-চারটেই শুনি।

যাক শুনবেনই যখন তখন দু-একটা কথাই মাত্র বলছি: আচ্ছা, মাষ্টারদের অভাব ঘুচানোর জন্ত ছেলেদের বেতনবৃদ্ধি করা হলেও কেন সে টাকা তাদের দেওয়া হয় না—এ কথার কি জবাব আপনার আছে বলুন দেখি?

হুমকি দিয়ে উঠলেন সেক্রেটারী, মিথ্যে কথা, দেওয়া হয়েছে তাদের টাকা।

সুব্রত মৃদু হেসেই উত্তর দিলে, অতি সামান্ত। যাক তর্ক করতে চাই নে আমি। শিক্ষকেরা জানেন স্কুলের কোন্ ফাঁক দিয়ে শনি ঢুকেছে, মাষ্টারদের রক্ত-জল-করা টাকা কি ভাবে অপব্যয়িত হচ্ছে, কেন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও দু'বেলা পেট ভরে দুটি খেতে পায় না তারা।

বলতে বলতে হাসি আর চাপতে পারল না সুব্রত, আরও শুনতে চান?

সেক্রেটারী আর আত্মসম্বরণ করতে না পেরে উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন, আপনাকে 'স্যাক' করব আমি।

সুব্রত হাসতে হাসতেই বললে, সাহস পাবেন না আপনি।

কারণ?

কারণ অনেক রহস্ত তা হলে বড়

পেয়ে যাবে। তা ছাড়া যে ভয় আপনি দেখাচ্ছেন তাতে মাষ্টারদের ভয়ই বা কি আছে—যে চাকরীর দুরবস্থা দেখে সবাই করুণার চক্ষে দেখে তা খোয়াতেই বা এত ভয় কিসের, আচ্ছা আসি, নমস্কার—

বলে সুব্রত সেখান থেকে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

স্কুল-প্রাঙ্গণ থেকে বেরুবার সময় সেক্রেটারী রুদ্ধ আক্রোশে রোষকষায়িত চক্ষে নিরীক্ষণ করলেন—সুব্রত চৌধুরী যদিও বলে গেল ছেলেদের শেষ অভিনয়টির পরিকল্পনা তার দেওয়া নয়, তবু অনেকগুলি ঢেঙা ঢেঙা ছেলে তাকেই ঘিরে উত্তেজিত কণ্ঠে কি যেন বলাবলি করছে। রাগে মিঃ চক্রবর্ত্তীর নিজের গা নিজে কামড়ে খেতে ইচ্ছে করছিল: আমারই স্কুলে কাজ করে নাম আর খাতির পেল ও আমারই চেয়ে বেশী।

সাবিত্রী দেবীর মুখের একটি রেখা কাঁপছে না, যেন পাষাণ-প্রতিমা।

এর পর কয়েক হপ্তা কেটে গেছে। সাবিত্রী দেবী দিনরাত বিষণ্ণ বিরক্ত মুখে কি যেন ভাবেন, কারো সঙ্গে ভাল করে কথা বলেন না, স্বামীর সঙ্গে ত এক রকম একেবারেই না বললেই হয়।

মিঃ চক্রবর্ত্তী যে এত বড় স্ত্রৈণ এ কথা তিনি আগে এমন করে আর কোনদিন বোঝেন নি। স্ত্রীর এই অবস্থা দেখে তিনি প্রায় উন্মাদের মত হয়ে গেছেন। শহরের যত বড় বড় মনোবিজ্ঞানী, প্রায় সবাইকেই 'কল' দিয়েছেন তিনি বাড়ীতে। সবাই বলেছেন—Frustration—কোন এক বিপুল আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত রয়ে গেছে, নিদারুণ কোন আশা হয়েছে ভঙ্গ।

মিঃ চক্রবর্ত্তী বুঝছেন সবই, কিন্তু কি আর তিনি করতে পারেন: খেটেখুটে এম-এ পাস করে কলেজের প্রফেসার হয়েছেন তিনি, স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের ক্ষমতাও তিনি রাখেন, মানুষের কাছ থেকে খাতির সম্মান নাম পাবার মত 'স্পেশাল এবিলিটি' যদি নাই থাকে, তাতে স্ত্রীর এমনি অসুখই হয়ে যাবে, এই বা কি কথা।

আষাঢ়ের বার্ত্তা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ঘন ঘোর মেঘ যদি ঘনাইয়া আসে এ আকাশে,
লুপ্ত করি মর্ত্ত্য-চিহ্ন নেমে যদি আসে অন্ধকার,
চমকে বিদ্যুৎ যদি বক্ষ তার চিরি বারবার,
দিগ্বিদিক থেকে থেকে কেঁপে যদি ওঠে অট্টহাসে,
কোরো না কোরো না ভয় প্রকৃতির প্রমত্ত উল্লাসে;
বাজুক গগনতলে ক্ষিপ্র, তীব্র ঝড়ের ঝঙ্কার,
বিপ্লাবিত হোক তবে পৃথিবীর এ-পার ও-পার,
একাকার হোক ধরা প্রলয়-প্রবল জলোচ্ছ্বাসে।

নেমেছে আষাঢ়, বন্ধু, ঊষরে সে করিবে উর্ব্বর,
ধুয়ে যাবে সব গ্লানি, মুছে যাবে সব মলিনতা,
ধূসর ধরণী হবে আবার যে নির্ম্মল সুন্দর,
মৃত্তিকা কোমল হবে, ঘুচে যাবে কাঠিন্যের ব্যথা।
এসেছে আষাঢ়, বন্ধু, নিদারুণ নিদাঘের পর,
স্নিগ্ধ নব-জীবনের এনেছে সে আনন্দ-বারতা।

মৃত্যু ও জীবন

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

পরশিয়া কেশ মোর কহিল মরণ স্নেহমাখা স্বরে,
"ওরে বাছা ব্যথাতুর, সর্ব্ব দুঃখ হতে মুক্তি দিব তোরে,
নবীন আনন্দ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্ত করে এ জগৎ মাঝে
ফিরায়ে আনিব তোরে পূর্ণ করি পুনঃ নব রূপে, সাজে
বিহগী মধুরস্বরা, পঙ্কজ-প্রেমিক মত্ত মধুকর,
অথবা আসিবে হয়ে নব বাদলের রূপালী নির্ঝর,
শিরীষ ফুলের গন্ধ শ্যামল প্রান্তরে আকুল অধীর,
উন্মত্ত ঝড়ের ভাষা, মধু-কল-গীতি শুভ্র লহরীর?"

কহিলাম "হে মরণ, কৃপা-বাক্যে তব মরি আমি লাজে,
এতই কি লক্ষ্যহীন জীবন আমার ধরাতল মাঝে?
কম্পিত হবে কি চিত্ত, শঙ্কিত হবে কি এই দেহ মোর
দুঃখ-তাপদগ্ধ দিন আসিবে যখন একান্ত কঠোর,
বিফল হব কি আমি, সাধিবার আগে মোর কর্ত্তব্যভার
গান দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, স্বদেশের তরে অর্ঘ্য রচিবার?"

পরলোকগতা সরোজিনী নাইডু-রচিত "Death and Life" কবিতার ভাবানুবাদ।

পদার্থের পরিবর্ত্তন ও অন্তর্গঠন

শ্রীসমীর ঘোষ

বিশ্বজগতের যত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুই হোক না কেন, যারই ওজন আছে এবং যাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় তাকেই পদার্থ বলা যায়। পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন অবস্থায় থাকতে পারে এবং এই অবস্থাবিশেষ চাপ ও তাপের উপর নির্ভর করে। তাপ বা চাপের পরিবর্ত্তন হলে পদার্থের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। সাধারণ তাপে যে পদার্থ কঠিন বা তরল অবস্থায় থাকে, তাপ বাড়ালে সেই পদার্থই তরল বা গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয় এবং তাপ অত্যধিক হলে সমস্ত পদার্থই গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয়। অপর ক্ষেত্রে, তাপ কমালে গ্যাসীয় পদার্থ তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং অধিক কমালে তরল ও গ্যাসীয় উভয় পদার্থই কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়। একটি সাধারণ উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝান যেতে পারে। তাপ বাড়ালে বরফকে জলে এবং জলকে জলীয় বাষ্পে পরিণত করা যায় এবং তাপ কমালে জলীয় বাষ্পকে জলে ও জলকে পুনরায় বরফে রূপান্তরিত করা যায়।

তাপের পরিবর্ত্তনে পদার্থের আয়তনও পরিবর্ত্তিত হয়। যতটা তাপ প্রয়োগ করলে পদার্থের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হতে আরম্ভ হয়, তার চেয়ে কম তাপে পদার্থের এই আয়তনের পরিবর্ত্তন চলতে থাকে। অল্প তাপের পরিবর্ত্তনে কঠিন ও তরল পদার্থের এই আয়তনিক সঙ্কোচন বা প্রসারণ সাধারণ দৃষ্টিতে বড় একটা ধরা পড়ে না, কিন্তু তাপ যত সামান্যই হোক বায়বীয় পদার্থের এই পরিবর্ত্তন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আবার তাপ বাড়ালে দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ মিলিত হয়ে এক বা ততোধিক যৌগিক পদার্থও সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, তাপ বাড়ালে পারদ ও বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন মিলিত হয়ে মারকিউরিক্ অক্সাইড অথবা মারকিউরাস্ অক্সাইড তৈরি করতে পারে। আবার তাপ কোন কোন যৌগিক পদার্থকে তার সংগঠক মৌলিক পদার্থে বিশ্লেষিত করতে পারে। যেমন—সিলভার অক্সাইডকে তাপ দিলে তা রৌপ্য ও অক্সিজেনে বিভক্ত হয়।

অনেক ক্ষেত্রে তাপের সাহায্যে পদার্থের অণুধ্যস্থিত পরমাণুর গঠনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন হয় এবং নূতন পদার্থ সৃষ্ট হয়। যেমন, এমোনিয়াম্ সায়ানাইটকে তাপ দিলে তা ইউরিয়াতে (Urea) পরিবর্ত্তিত হয়। সময় সময় এই পরিবর্ত্তনের মুখে প্রচণ্ড তাপশক্তিও উৎপন্ন হয়। কয়লা, কাঠ ইত্যাদি জ্বাললে আমরা তাপ পাই এবং তৎসঙ্গে ছাই ও নানাপ্রকার গ্যাসীয় পদার্থও পেয়ে থাকি। এক পাউণ্ড ওজনের একটি কয়লাখণ্ডকে যদি এমনভাবে পোড়ান যায় যে, এতটুকুও ছাই বা কোন গ্যাস অবশিষ্ট না থাকে, সমস্ত পদার্থটুকুই শুধুমাত্র তাপ-শক্তিতে পরিণত হয়, তা হলে আমরা প্রায় ৯০ লক্ষ টন কয়লা পুড়িয়ে যে তাপ-শক্তি পেতে পারি, এই কয়লাখণ্ডটুকু হতেও সেই পরিমাণে তাপ-শক্তি পাওয়া যেতে পারে। এরূপ প্রণালীতে তাপ উৎপন্ন করার জন্ত বর্ত্তমান বিজ্ঞান উৎসুক। আইনষ্টাইনের মতে কোটি কোটি বৎসর ধরে সূর্য্যের এই অদ্ভুত তাপ বিকিরণের মূলে রয়েছে তাপ উৎপত্তির এই অদ্ভুততর প্রণালী।

চাপের পরিবর্ত্তনেও পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রূপান্তরিত হয়। যেমন: (১) বাতাসকে যদি ২০০ গুণ বায়ুমণ্ডলের চাপে ক্রমাগত ঠাণ্ডা করা যায়, তা হলে তা তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়; (২) কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইডকে ফ্রিজিং মিক্চারে (বরফ ও লবণের মিশ্রণ) রেখে চাপ বাড়ালে কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইডই ড্রাই আইসে পরিণত হয়। এ ধরণের পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত বিজ্ঞানে অনেক পাওয়া যায়।

কোন বহিঃশক্তির প্রয়োগে সহসা যদি বিশ্বজগতের বায়ুমণ্ডলের চাপ কতকটা পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বর্ত্তমান রূপও পরিবর্ত্তিত হতে বাধ্য। বায়ুমণ্ডল সর্ব্বদাই আমাদের দেহের উপর প্রায় ১৫ টন অর্থাৎ প্রায় ৪০৮ মণ (প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে ১৫ পাউণ্ড) ওজনের চাপ দিচ্ছে। এই বিরাট বোঝা বয়ে নিয়েও কেমন করে যে আমরা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে বেড়াতে পারি সে এক বিস্ময়ের বিষয়। তবুও যে পারি তার কারণ হচ্ছে এই যে, আমাদের জন্মের প্রথম থেকেই আমরা বায়ুমণ্ডলের মাঝে বাস করে এই ভার বহন করতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে আসছি। যদি বায়ুমণ্ডলের এই চাপ কোন কারণে খানিকটা কমে তবে আমাদের গা কেটে রক্ত বের হবে। এরোপ্লেনে করে বেশ উপরে উঠলে বায়ুর চাপের অল্পতার দরুন এরকম ঘটতে দেখা যায়। আবার যদি এই চাপ বাড়ে তা হলে আমাদের দেহ সঙ্কুচিত হয়ে একেবারে চেপ্টে যাবে।

বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যেও পদার্থের অবস্থান্তর ঘটে থাকে। দ্রবীভূত (Fused) সোডিয়াম ক্লোরাইডকে বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা সোডিয়াম ও ক্লোরিনে বিভক্ত করা যায়। আবার হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণকে বৈদ্যুতিক অগ্নিকণার (Spark) দ্বারা জলে পরিণত করা যায়। তা ছাড়া বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা বায়ুমণ্ডলেও নানা রকম পরিবর্ত্তন ঘটে। বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন বৈদ্যুতিক অতি-বেগনি রশ্মির (Ultra-violet rays) দ্বারা ওজনে

(Ozone) রূপান্তরিত হয় এবং নাইট্রোজেনও বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা বিভিন্ন অক্সাইডে পরিবর্তিত হয়। বৈদ্যুতিক শক্তি এক খণ্ড সাধারণ লোহাকে শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত করতে পারে। এই বৈদ্যুতিক চুম্বক পৃথিবীর অতি প্রয়োজনীয় অনেক কাজে লাগছে। এ ধরণের পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে।

আবার আলোর সাহায্যেও পদার্থের পরিবর্তন হয়ে থাকে। হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের মিশ্রণকে সূর্য্যালোকে আনলে পরস্পর মিলিত হয়ে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড নামক গ্যাস তৈরি করে। আলোক যদি না থাকত তা হলে পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্বই থাকত না।

এক খণ্ড চুম্বকের সাহায্যে এক টুকরা ইস্পাতকে স্থায়ী চুম্বকে পরিণত করা যেতে পারে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে তাপ, চাপ, আলো, বৈদ্যুতিক শক্তি, চুম্বক প্রভৃতির ক্রিয়ার ফলে পদার্থের নিয়তই বিবিধ পরিবর্তন হচ্ছে।

কঠিন, তরল ও বায়বীয়—প্রত্যেক পদার্থই বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু ও পরমাণুর দ্বারা গঠিত। কোন একটি বিশেষ পদার্থের অণুগুলি আকার, পরিমাণ ও গুণাবলীর দিক থেকে সমধর্মী; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের অণু ভিন্ন ভিন্ন রকমের। সেইজন্ত কোন একটি পদার্থের ধর্ম্ম তার অণুর ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা—যে-কোন পদার্থের প্রতি দুইটি অণুর মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শূন্যস্থান আছে। এই শূন্যস্থানগুলিকে অণু-মধ্যস্থ স্থান (Inter-molecular spaces) বলে এবং এই অণুমধ্যস্থ স্থানগুলি ঈথার দ্বারা পূর্ণ থাকে বলে বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস।

বৈজ্ঞানিকেরা আরও কল্পনা করেন যে, পদার্থের এই অণু-গুলি সর্ব্বদাই এই অণুমধ্যস্থ স্থানগুলিতে প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণমান। এই ঘূর্ণমান অবস্থার দরুন স্বভাবতঃই অণুগুলির পরস্পরের পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার প্রবণতা থাকে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন হবার প্রবণতাকে প্রতিহত করবার উপযুক্ত এক আকর্ষণ-শক্তি পদার্থস্থিত অণুগুলির মধ্যে আছে। এই শক্তিকে আভ্যন্তরীণ আণবিক শক্তি (Inter-molecular force) বলে।

অণুমধ্যস্থ এই আকর্ষণ-শক্তির উপরেই পদার্থের কোন এক বিশেষ আকার গ্রহণের কারণ নির্ভর করে। কঠিন পদার্থে এই আকর্ষণ খুব শক্তিশালী থাকার দরুন পদার্থটি নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ আকার ও আয়তন লাভ করে। তরল পদার্থে এই আকর্ষণ-শক্তি খুব মৃদু। সেইজন্তই তরল পদার্থের নির্দ্দিষ্ট আয়তন থাকলেও আকার নাই। গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে অণুগুলি পরস্পরের নিকট থেকে যথেষ্ট দূরে থাকে এবং তার আকর্ষণ-শক্তিও প্রায় নেই বললেই চলে। সেইজন্ত গ্যাসীয় পদার্থের নির্দ্দিষ্ট আকার-আয়তন কিছুই নেই এবং তা ইচ্ছামত যে-কোন দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের অণুতে বিভিন্নসংখ্যক পরমাণু থাকে এবং এই পরমাণুর উপর পদার্থের আণবিক ওজন (Molecular weight) নির্ভর করে। একই ধরণের অণুর মধ্যে পরমাণুগুলি একই বিশেষ নিয়মে সজ্জিত থাকে। কোন একটি মৌলিক পদার্থের অণুতে পরমাণুগুলি সমধর্ম্মী হয়, কিন্তু যৌগিক পদার্থের অণুতে পরমাণুগুলি বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। কোন পদার্থের অণুগুলি মুক্ত এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে এবং তাদের পরমাণুতে বিভক্ত করা যায়।

পদার্থের অণুমধ্যস্থিত পরমাণু অণু অপেক্ষা বহুগুণ ক্ষুদ্র; এমন কি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও তাদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। পরমাণুদের বিভক্ত করাও চলে না। পরমাণু যে কত ক্ষুদ্র তা একটা সাধারণ মটর দানার মোট পরমাণু সংখ্যা থেকে বুঝা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাবটা এইভাবে দিয়েছেন—একটা বইয়ে এক হাজার পৃষ্ঠা আছে এবং তার প্রতি পৃষ্ঠায় এক হাজার করে অক্ষর আছে; এরকম ১০ হাজার বই নিয়ে এক লাইব্রেরী; এ ধরণের ১০ লক্ষ লাই-ব্রেরীর মোট বইয়ের মোট পৃষ্ঠায় যতগুলি অক্ষর আছে, এক মটরদানার পরমাণু-সংখ্যাও ঠিক তত এবং এ গণনা যে অভ্রান্ত তারও প্রমাণ বৈজ্ঞানিকেরা দিয়েছেন। পরমাণুর ব্যাসার্দ্ধ প্রায় $১০^{-৮}$ সেঃ। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন রকমের।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকদের মতে পরমাণুও পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ নয়, ইহা নানারকমের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কল্পনাতীত কণিকার (Particle) সমষ্টি। অতি ক্ষুদ্র পরমাণু সম্বন্ধেই মানুষের কল্পনা এক প্রকার অচল, তারপর আবার তাও কতকগুলি ধারণা-বহির্ভূত কণিকার দ্বারা গঠিত—এটা সাধারণতঃ অসম্ভব বলেই মনে হতে পারে এবং বাস্তবিক এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করে দেখাবারও কোন উপায় নেই। তথাপি এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেই বর্ত্তমান বিজ্ঞান উন্নত থেকে উন্নততর স্তরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

ইলেকট্রন্‌, প্রোটন্‌, নিউট্রন্‌, পজিট্রন্‌ ইত্যাদির দ্বারা পরমাণু গঠিত। বৈজ্ঞানিক টম্‌সন সর্ব্বপ্রথম ইলেকট্রনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন। পদার্থের ইলেকট্রনগুলি ঋণাত্মক কণিকা (Negative particle) এবং প্রত্যেক ইলেকট্রন্‌ $৪\cdot৭৭৬ \times ১০^{-১০}$ ইলেকট্রোষ্টাটিক ইউনিট (একক) পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তিবিশিষ্ট। ইলেকট্রন্‌গুলি অণুর ভার নিজ নিজ কক্ষে প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণমান এবং প্রত্যেকটির ভর (Mass) প্রায় $৯\cdot০ \times ১০^{-২৮}$ গ্রাম। ইলেকট্রন্‌ বিশ্বজগতে সর্ব্বাপেক্ষা হাল্‌কা কণিকা এবং তার ব্যাসার্দ্ধ প্রায় $১\cdot৯ \times ১০^{-১৩}$ সেঃ। বৈজ্ঞানিক এডিংটন অঙ্কশাস্ত্র-সাহায্যে সমগ্র

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মোট ১০^{৭৯}, অর্থাৎ দশের পর উনআশিটি শূন্য ইলেকট্রন্ আছে, তা বের করেন। পদার্থের পাতলা আবরণের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রন সহজেই যাতায়াত করতে পারে।

পদার্থমধ্যস্থিত প্রোটন্ ধনাত্মক কণিকা (Positive particle) এবং তার ভর প্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের সমান। প্রত্যেক প্রোটন্ ইলেকট্রনের সমান বিপরীত বৈদ্যুতিক শক্তিবিশিষ্ট এবং তার ঘূর্ণন-ক্ষমতা ইলেকট্রনের চেয়ে অনেক কম।

নিউট্রনের ভর প্রোটনের ভরের সমান, কিন্তু নিউট্রন্ কোন বৈদ্যুতিক শক্তিবিশিষ্ট নয়। এর গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে ভাল করে জানা যায় নি। অনুমান করা হয়, একটা প্রোটন্ থেকে একটা পজিট্রন্ বাদ দিলে কিংবা একটা প্রোটনের সঙ্গে একটা ইলেকট্রন যুক্ত করলে একটা নিউট্রন গঠিত হতে পারে।

পজিট্রন ইলেকট্রনের সমান ভরবিশিষ্ট, এবং ইলেকট্রনের তুল্য বৈদ্যুতিক শক্তিবিশিষ্ট। কিন্তু প্রভেদের মধ্যে পজিট্রন ধনাত্মক বৈদ্যুতিক কণিকা। বৈজ্ঞানিক এণ্ডারসন পজিট্রন সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন।

পদার্থের মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রন একত্রে একটি নিউক্লিয়াস গঠন করে। প্রোটনের (ধনাত্মক কণিকা) দরুন নিউক্লিয়াস্ ধন-বৈদ্যুতিক শক্তিবিশিষ্ট হয়। নিউক্লিয়াসের ওজনের উপর পদার্থের পরমাণবিক ওজন (Atomic weight) নির্ভর করে। নিউক্লিয়াসে যতগুলি প্রোটন থাকে তার চতুষ্পার্শ্বস্থ কক্ষে ঠিক ততগুলি ইলেকট্রন থাকে। সাধারণ অবস্থায় পদার্থ-মধ্যস্থিত ইলেকট্রনের মোট-ঋণাত্মক শক্তি এবং নিউক্লিয়াসের মোট-ধনাত্মক শক্তি পরস্পর সমান; এইজন্য পদার্থ মধ্যে সাধারণ অবস্থায় কোন বৈদ্যুতিক শক্তির অস্তিত্ব থাকে না। সূর্য্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ-উপগ্রহ যেমন একটি নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ঘূর্ণমান, সেইরূপ নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলিও নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ঘূর্ণমান। সূর্য্য যেমন তার আকর্ষণ-শক্তির দ্বারা সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহকে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখে, সেইরূপ নিউক্লিয়াসও আকর্ষণ-শক্তির দ্বারা ইলেকট্রনগুলোকে নিজ নিজ কক্ষে রাখে। কোন উপায়ে কোন পদার্থের ইলেকট্রন-সংখ্যা কমালে পদার্থটি ধনশক্তিবিশিষ্ট এবং ইলেকট্রন-সংখ্যা বাড়ালে পদার্থটি ঋণশক্তি বিশিষ্ট হবে।

পরমাণু মধ্যে এ সমস্ত কণিকা ছাড়াও আরও অনেক কিছুই আছে বলে ধারণা করা হয় এবং বর্ত্তমানে এদের ভিত্তিতে বহু বৈজ্ঞানিক কার্য্যও সাধিত হচ্ছে।

পদার্থের পরিবর্ত্তন এবং গঠন-প্রণালী বিশ্লেষণ করলে এমন সব বিস্ময়কর সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হতে হয় যাতে করে এই কথাই মনে জাগে যে সৃষ্টি এক বিস্ময়কর রহস্য। আজকার এই পরমাণবিক যুগে বিজ্ঞানের যে বিস্ময়কর অগ্রগতি, তার মূলে রয়েছে পদার্থের গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে কতকগুলি অপ্রামাণ্য ধারণা। এর চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে?

বাংলা বর্ণমালা ও বাংলা টাইপ রাইটার

শ্রীনীরদেন্দু সান্যাল

ইদানীং সমাজের নানা স্তরে একটা নূতন কিছু করার আগ্রহ দেখা দিয়াছে। এই আগ্রহ স্থলবিশেষে অসংযম রূপেও আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে যেন বাংলা-বর্ণমালার সংস্কার আন্দোলনের মূলে এই জাতীয় অহেতুক আগ্রহ বা অসংযম না থাকে।

আমাদের ব্রাহ্মী বর্ণমালা বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও যথাসম্ভব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বর্ণমালা। ইহাতে ইংরেজীর Z-এর মত বর্ণের অনুরূপ ধ্বনিসম্পন্ন কোন বর্ণ নাই, ইহাও যেমন সত্য, আমাদের ভাষাতে ঐ সকল ধ্বনি উচ্চারণের প্রয়োজন নাই, তাহাও তেমনি সত্য। ইংরেজী বর্ণমালায় "ত" নাই, আরবী বর্ণমালাতেও নাকি "প" নাই। কিন্তু ঐ সকল বর্ণমালার সংস্কার-আন্দোলনের কথা শুনা যায় না। আমাদের ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণের মাপকাঠিতে বিচার করিলে বাংলা বর্ণমালায় কয়েকটি অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় বর্ণ আছে, একথা সত্য, কিন্তু ইংরেজীর বহু অসম্পূর্ণতাযুক্ত বর্ণমালাতেও এ জাতীয় অপ্রয়োজনীয় বর্ণ আছে। বাংলা বানানকে যথাসম্ভব সংস্কৃতানুগ রূপ দেওয়ার চেষ্টা আমাদের করা উচিত। তাহা করিতে হইলে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বর্ণিত এই বর্ণগুলি ত্যাগ করা চলে না।

প্রচলিত বাংলা বর্ণমালার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ এই যে, ইহাতে যুক্তাক্ষর লইয়া মোট অক্ষরসংখ্যা খুব বেশী হওয়ায় ইহা দুরূহ জটিল। এইজন্য শিশুদের বর্ণপরিচয় করাইতে খুব কষ্ট হয় এবং ছাপাখানার কম্পোজিটারদের কাজও কষ্টকর হইয়া উঠে। কিন্তু বর্ণমালার জটিলতার জন্য কোন শিশুর পক্ষে বর্ণপরিচয় লাভ করা অসম্ভব হইয়াছে—এরূপ কথা শুনা যায় নাই। ছাপাখানা হইতে নিত্য নূতন ছোট বড় বাংলা পুস্তকও বাহির হইতেছে।

ব্রাহ্মী বর্ণমালা যথাসম্ভব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া ইহাতে কিছু

জটিলতাও অপরিহার্য্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে যে জিনিষ যত উচ্চ স্তরের তাহাতে জটিলতাও তত বেশী। গণিত, দর্শন ও বিজ্ঞানে জটিলতা আছে বলিয়া আমরা ধারাপাত ও বোধোদয়ের শ্রেণীতে নামিয়া আসিতে পারিব না। রেল-গাড়ী ও ব্যোমযানে জটিলতা আছে বলিয়া আমরা কেবল গোযান লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব না।

আমাদের বর্ণমালার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ এই যে, এতগুলি বর্ণ লইয়া টাইপরাইটার যন্ত্র নির্ম্মাণ ও তাহা ব্যবহার করা খুব কঠিন। আমার মনে হয় ইহাই প্রধান অভিযোগ এবং বর্ণমালার সংস্কারের নামে নানারূপ অদ্ভুত ও অযৌক্তিক প্রস্তাবের মূল। কোন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিও ব্রাহ্মী বর্ণমালার পরিবর্ত্তে বাংলা ভাষার জন্ত রোমক বর্ণমালা প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করিয়াছেন।

বাংলা ভাষা শীঘ্রই অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে আপিস আদালতের ভাষায় পরিণত হইবে। তখন বাংলা টাইপরাইটার যন্ত্র না হইলে চলিবে না। বর্ণমালার গুরুতর পরিবর্ত্তন না করিয়াও যাহাতে ব্যবহারযোগ্য বাংলা টাইপরাইটার তৈয়ারি হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। টাইপরাইটারের জন্ত বর্ণমালার গুরুতর পরিবর্ত্তন সমীচীন হইবে না। বর্ণমালার বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য্য যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া টাইপরাইটার তৈয়ারি করিতে পারিলেই শিল্পীর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইবে। বৈদেশিক পুরাণে বর্ণিত প্রোক্রাষ্টিসের মত আমরা যেন বিছানার মাপের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্ত মানুষকে টানিয়া বড় বা কাটিয়া ছোট না করি।

বাংলা টাইপরাইটারের কী-বোর্ডের একটি পরিকল্পনা দিয়ে দিলাম। ইহাকে কাজে লাগান যায় কি না তাহা বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

এই পরিকল্পনা অনুসারে টাইপরাইটার প্রস্তুত হইলে মৌলিকত্ব নষ্ট না করিয়া যুক্তাক্ষর সহ যাবতীয় বাংলা অক্ষর, কমা প্রভৃতি ছেদচিহ্ন, কয়েকটি গাণিতিক চিহ্ন, টাকা আনার অঙ্ক প্রভৃতি ছাপা যায় কিনা বিশেষজ্ঞগণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। প্রচলিত ইংরেজী টাইপরাইটারের কী-বোর্ডে যতগুলি চাবি আছে আমার পরিকল্পিত বাংলা কী-বোর্ডেও ততগুলি চাবিই থাকিবে। তবে একটি shift-এর স্থানে দুইটি shift-এর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে টাইপরাইটার সংক্রান্ত কয়েকটি ইংরেজী কথার নিম্নলিখিত বাংলা প্রতিশব্দগুলি গ্রহণযোগ্য হইতে পারে কি-না তাহা পরিভাষা-সংসদের সদস্তগণকে বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

Typewriter—বর্ণাঙ্কিকা লিপিযন্ত্র
Key-boord—বর্ণবীথি
Key—চাবি
Carriage—বাহন
Roller—আবৃত্তা
Space—অবকাশ, ফাঁক
Spacer—অবকাশী
Back spacer—প্রতীপগা
Back space—প্রতীপ অবকাশ
Shift—উন্নমন
Typewriting—বর্ণাঙ্কন
Typist—বর্ণাঙ্কক, লিপিযন্ত্রী
Type (*verb*)—ছাপা
Typed—বর্ণাঙ্কিত
Carbon paper—অনুলেখনী
Carbon copy—অনুলেখ

১					৬		৮		১০
*					?		(		'
১				৫	ক	৬	গ	৭	ঙ
অ				ও	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
॥	া	ি	ী	ে	ু	ৃ	ৎ		
চ	৮	জ	৯	০	+		×	ণ	
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ঠ		ট	ণ	ড
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
						ত্র	ত্ত্র	হ্	ড
÷		/	ন	প্	৴	ব		ম	ঢ
থ		ধ	ন	প	ফ	ব		ম	য
৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০
ভ	‹	খ		ক্ষ					
ল	শ	ষ	স	হ	\				
ল	শ	ষ	স	হ	ৎ				

১। তারকা চিহ্ন, ১, অ
২। পূর্ণচ্ছেদ, ২, ই
৩। কমা, ৩, ঋ
৪। সেমিকোলন, ৪, এ
৫। সমচিহ্ন, ৫, ও
৬। জিজ্ঞাসার চিহ্ন, ছোট অর্থাৎ যুক্তাক্ষরের পূর্ব্বাংশে ব্যবহার্য্য ক, ক
৭। বিস্ময়ের চিহ্ন, ৬, খ
৮। বামের ব্রাকেট, ছোট গ, গ
৯। দক্ষিণের ব্রাকেট, ৭, ঘ
১০। ঊর্দ্ধকমা, ছোট ঙ, ঙ

১১। ডবল ঊর্দ্ধকমা, ছোট চ, চ

১২। আকার, ৮, ছ

১৩। ইকার, ছোট জ, জ

১৪। ঈকার, ৯, ঝ

৯ অঙ্কটির দ্বারা স্বরবর্ণ ঌকারের কাজও হইবে।

১৫। একার, শূন্য, ঞ

১৬। যফলা, যোগচিহ্ন, ঠ

১৭। লুপ্ত অ, বিয়োগচিহ্ন এবং হাইফেন, ড

(ড-এর সহিত ৩৭ নং চাবির মধ্যের চিহ্ন যোগ করিলে উ এবং উহার সহিত ৪০ নং চাবির মধ্যের চিহ্ন যোগ করিলে ঊ হইবে।)

১৮। অনুস্বার, গুণচিহ্ন, ঢ

(ঢ-এর সহিত ৩৭ নং চাবির মধ্যের চিহ্ন যোগ করিলে ট হইবে।)

১৯। বিসর্গ এবং কোলন, ছোট ণ, ণ

২০। ক্ত, ছোট ত, ত

২১। ক্ক, ভাগচিহ্ন, থ

২২। ক্ষ, ছোট দ, দ

২৩। হু, এক আনার অঙ্ক, ধ

২৪। ঙ্গ, ছোট ন, ন

২৫। ঞ্জ, প, প

২৬। জ, দুই আনার অঙ্ক, ফ

২৭। ত্র, ছোট ব, ব

২৮। ত্ত, তিন আনার অঙ্ক, ভ

২৯। হু, ছোট ম, ম

৩০। ঞ্জ, তিন চৌকের অঙ্ক, য

৩১। ন্ত, ছোট ল, ল

৩২। ইলেক, ছোট শ, শ

৩৩। ষ্ণ, ছোট ষ, ষ

৩৪। স্ত, ছোট স, স

৩৫। হ্ন, ছোট হ, হ

৩৬। অধোরেখা, টাকার অঙ্ক, ৎ

৩৭। চন্দ্রবিন্দু, একটি চিহ্ন যাহার সাহায্যে হ, ড, ঢ, এ, ও, একার ওকার যথাক্রমে ই, উ, ট, ঐ, ঔ, ঐকার, ঔকার হইবে। উকার

৩৮। রফলা, রেফ, ঊকার

৩৯। বফলা, হস্‌চিহ্ন, ঋকার

৪০। অধোবিন্দু (ইহার সাহায্যে ব, য, ড, ঢ যথাক্রমে র, য়, ড়, ঢ় হইবে। হিন্দীর ন্যায় ইংরেজী Z, F, V প্রভৃতির উচ্চারণের জন্য জ়, ফ়, ভ়, প্রভৃতিও হইতে পারে।) দ্বিতীয় চিহ্নটির সাহায্যে ট্ট, ড্ড, ঊ হইবে। ঋ-ফলা।

৩৭, ৩৮, ৩৯ ৪০ নং চাবি টিপিলে space পড়িবে না। ঐকার ছাপার অসুবিধা হইলে হ্ব বা হকে বাদ দিয়া ঐকারের স্থান করিয়া লইতে হইবে।

দামোদর

শ্রীকালিদাস রায়

দামোদর, তুমি ধ্বংসই করো শুধু,
 ছোট নাগপুরী তৈমুরলঙ তুমি।
দুই তীর তব করিতেছে তাই ধু ধু
 তব অভিযানে কাঁপে এ বঙ্গভূমি।
করে বরাকর আপনারে নিবেদন,
 জনপদ যায় পিছাইয়া তব ডরে,
তব বরাভয়ে বাঁচে রূপনারায়ণ
 আর কারো প্রতি কৃপা নাই ক্ষণতরে।
এতদিন তুমি শাসন করিয়া গেলে
 আসুক এবার পালনের মহাযোগ,
শক্তি তোমার বয়ে যায় অবহেলে
 কল্যাণব্রতে হোক তার বিনিয়োগ।
রুদ্র, তোমারে প্রসন্ন করিবার
 তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র ছিল না জানা।
দক্ষিণ হও, বাম রয়োনাক আর,
 ভুলাইব তব বন্যা আঘাত হানা।

কঙ্করভীর শ্যামসুন্দর হোক,
 নিঃস্ব এদেশ কমলার কৃপা পাক,
নয়নে তোমার কল্যাণ-ধারা বোক
 শয়নে তোমার শতদল ফুটে থাক।
ভাঙনের পালা শেষ হয়ে যাক তব
 গড়নের পালা সুরু হোক এই বার।
চলুক এবার শিবলীলা অভিনব,
 তাণ্ডব নাচ কতই নাচিবে আর?
ধনজনপদে তব কূল যাক ভ'রে,
 হোক তব তেজ বিদ্যুতে পরিণত।
তোল তুমি পুনঃ নবীন বঙ্গ গ'ড়ে,
 আনো শত তরী রাজহংসের মত।
রুদ্র, তোমারে ভয় করিনাক আর,
 জানি কে তোমারে শান্ত করিতে পারে,
প্রসাদমন্ত্র জেনেছি অর্চ্চনার,
 বাম পাশে তব বসাব অন্নদারে।

হরিণঘাটা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বি-এ, এম-এস-এ

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে "হরিণঘাটা" গোশালা সম্পর্কে এক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র প্রসঙ্গক্রমে গোপালন বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণের জ্ঞাতার্থে এ বিষয় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ১৯১৩ সনে তৎকালীন বাংলা-সরকার আমার পরামর্শমত রংপুরে বাংলার প্রথম গোশালা স্থাপন করেন। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ উত্তর বঙ্গের সাধারণ গৃহস্থদের উপযোগী উন্নত ধরণের গোজাতি সৃষ্টি (breed) করা। রংপুরের প্রচেষ্টা সফল হইলে অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ গোশালা স্থাপিত হইবে এইরূপ অভিপ্রায় ছিল, কেননা একমাত্র রংপুর গোশালাদ্বারা সমগ্র বাংলার প্রয়োজন সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। কতকগুলি বিশেষ সুবিধার জন্য রংপুরে প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ হয়। উন্নত ধরণের সুস্থ ষাঁড় প্রজনন ও নির্ব্বাচন, যথোচিত খাদ্য ও প্রতিপালনের ব্যবস্থাদ্বারা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করা হয়। গোজাতির উন্নতিকল্পে ইহার কোনটিকেই অবহেলা করা চলে না। বিদেশী ষাঁড় অথবা গবাদি ব্যবহার উক্ত উদ্দেশ্য-সাধনের অনুকূল বিবেচিত হয় নাই, এবং ইহা এই নীতির বহির্ভূত ছিল। কৃষি বিভাগের সৃষ্টি হইতেই ইহার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এই যে, ইহার আদর্শ ক্ষেত্রসমূহ প্রতিষ্ঠা বহু ব্যয়সাধ্য ও ইহার পরিচালনা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের আয়ত্তের বাহিরে। রংপুর কৃষিক্ষেত্রের এক অংশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করা যে লাভজনক তাহা প্রমাণ করাও ইহার একটি গৌণ উদ্দেশ্য ছিল।

জমি সংগ্রহ, বিভিন্ন স্থান হইতে গাভী ক্রয় ও অন্যান্য প্রাথমিক কার্য্যে প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত হয়। তাহার পর প্রায় তিন বৎসর উক্ত নীতি অনুসারে কাজ চলে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, প্রজনন ও নির্ব্বাচনদ্বারা গো-জাতির উন্নতিসাধন সময়সাপেক্ষ ; কিন্তু এই অল্প সময়ের ভিতরেই যথেষ্ট সুফল পরিলক্ষিত হয় এবং লাভেরও সম্ভাবনা দেখা যায়।

এই সময় একজন ইংরেজ কৃষি-বিশেষজ্ঞ বাংলার কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হন ; ইনি পূর্ব্বে পঞ্জাবে ছিলেন। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই তিনি উক্ত উভয় নীতিরই আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া প্রজনন-কার্য্যে পঞ্জাবী ষাঁড় ব্যবহারে চেষ্টিত হন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত আমার মতভেদ ঘটে—শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটি সরকারের গোচরীভূত হয়। তাঁহারা স্থির করেন মূলনীতির পরিবর্ত্তন না করিয়া, দেশী ষাঁড়ের পাশাপাশি পঞ্জাবী ষাঁড়ের পরীক্ষাও চলিতে পারিবে। কেবল দেশী গাভীর ব্যবহারই বলবৎ থাকে। তবে লাভজনক চাষের পরীক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, ফলে ব্যয়ভার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, একজন দেশীয় কর্ম্মচারী পরিচালিত একটি কৃষি-ক্ষেত্রেও যদি উপরোক্ত নীতি (commercial Farming) সাফল্যলাভ করিত তবে সমুদয় বিভাগের উপর তাহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। ইংরেজ অধ্যক্ষের সহিত অধস্তন দেশীয় কর্ম্মচারীর মতান্তরের পরিণাম উপলব্ধি করিতেও আমার বিশেষ বিলম্ব হয় নাই। ইহার অল্পকাল পরেই আমাকে স্থানান্তরে বদলি করা হয়, এবং যে সকল অধস্তন কর্ম্মচারীকে আমি হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়াছিলাম—তাহাদিগকেও ক্রমে ক্রমে অপসারিত করা হয়। কিছুকাল নানা অসুবিধা ভোগের পর আমি স্বেচ্ছায় আসামে বদলি হই। শুনিতে পাই, ইহার পর নানা স্থান হইতে বিভিন্ন জাতীয় ষাঁড় ও গাভী আনিয়া রংপুরে পরীক্ষা চালানো হয়। তাহা সত্ত্বেও কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই গোশালা উঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহার হেতু কি তাহা অবগত নহি। এই গোশালায় বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা-কার্য্যে সরকারের বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত পরীক্ষার ফল সুশৃঙ্খল ভাবে কোথাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে কি না তাহা সাধারণের জানিবার উপায় নাই।

আমার আসামের অভিজ্ঞতাও অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন ; এই উপলক্ষ্যে মোটামুটি সে সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আসামে ১৯২৫ সনে প্রথম গোশালা (খানাপাড়া কার্ম—গৌহাটি) স্থাপিত হয়। জমি ইত্যাদি সংগ্রহ হইবার অল্পকাল পরেই আমি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া দুই বৎসরেরও অধিককাল ছুটি লইতে বাধ্য হই। ফিরিয়া আসিয়া দেখি ভারত-সরকারের নবনিযুক্ত, মিলিটারী কার্য্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত, ইম্পিরিয়াল ডেয়ারী এক্সপার্টের পরামর্শ অনুসারে আসামের তৎকালীন গবর্ণর এই গোশালার মূল নীতি অগ্রাহ্য করিয়া সরাসরি সিন্ধী ষাঁড় ও গাভী আমদানী করিয়াছেন। সিন্ধুর শুষ্ক আবহাওয়ায় পুষ্ট জন্তুসমূহের অধিকাংশই ভারতের একেবারে অপর প্রান্ত আসামের আর্দ্র আবহাওয়ায় গুরুতর পীড়াগ্রস্ত হয়। ছুটি শেষ হইবার পর ফিরিয়া আসিয়া আমি অনেক যত্নে ও অর্থব্যয়ে রোগাক্রান্ত পশুগুলিকে বাঁচাইয়া তুলি। ইহাদের নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হইতে বহু সময় লাগে ও প্রচুর অর্থব্যয় হয়। এই পরীক্ষাও পরিণামে সম্পূর্ণ সুফলপ্রসূ না হইলেও একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। পরে প্রজনন-কার্য্যে দেশী ষাঁড় এবং গাভীর ব্যবহারও প্রচলন হয় ; কিছু বেশী সময় লাগিলেও ইহার দ্বারা পরিণামে অধিকতর স্থায়ী উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

শিলং কার্মেও দেশী, বিদেশী নানা জাতীয় ষাঁড় ও গাভীর প্রজনন-কার্য্যের পরীক্ষা দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতেছে। মোটামুটি দেখা গিয়াছে, উৎকৃষ্ট জাতের বিদেশী ষাঁড় ও দেশী গাভীর সম্মিলন-জাত গাভীর দুধের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু দুই-তিন পুরুষ পরই আবার ইহাদের অবনতি ঘটিতে থাকে ; ইহাদের লালনপালনও বিশেষ যত্ন ও ব্যয়সাপেক্ষ, সাধারণ গৃহস্থের বর্ত্তমান অবস্থায় এই সব পশু সহজেই নানাবিধ ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আমার অভিজ্ঞতার ফল নিয়ে মোটামুটি ভাবে ব্যক্ত করিতেছি; অবশ্য কোনও নিয়মই সকল ক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য নহে; স্থান এবং পারিপার্শ্বিক অনুযায়ী ব্যতিক্রম বিধেয়।

(ক) বাংলা ও আসামের সাধারণ গৃহস্থ ও চাষীর উপযোগী গোজাতির উন্নতিসাধনের জন্য নির্ব্বাচিত দেশী ষাঁড় ও গাভী ব্যবহারই প্রকৃষ্ট। তবে সম অবস্থাযুক্ত প্রদেশের জন্তুও ব্যবহৃত হইতে পারে।

(খ) উৎকৃষ্ট জাতীয় জন্তুর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে যথোচিত খাদ্যের ব্যবস্থাও আবশ্যক। নতুবা উন্নতি স্থায়ী হওয়া সম্ভব নহে।

(গ) যেখানে অল্পকালের মধ্যে অধিক দুগ্ধ উৎপাদনই প্রধান উদ্দেশ্য এবং বিশেষ খাদ্য ও যত্নের ব্যবস্থা হইতে পারে সেখানে অধিকতর উন্নত, ভিন্নজাতীয় ষাঁড় ব্যবহারই প্রকৃষ্ট। তবে ইহার ফলে গোজাতির স্থায়ী উন্নতি বিশেষ সাধিত হয় না। এই সব পরীক্ষা প্রধানতঃ শহর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত এবং 'ডেয়ারী' ব্যতীত অন্যত্র ইহার প্রচলন বাঞ্ছনীয় নহে।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষিবিভাগ গো-জাতির উন্নতিকল্পে কি নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, সর্ব্বসাধারণের তাহা জানিবার কোন সুযোগ নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, হরিণঘাটাতে শীঘ্রই পঞ্জাবী গবাদি আমদানী করা হইতেছে। শুধু দুগ্ধসরবরাহের জন্য হয়ত ইহার কিছু সার্থকতা থাকিতে পারে, কিন্তু কেবল সরকারী গোশালা হইতে কলিকাতার দুগ্ধের চাহিদা মিটান অসম্ভব এবং সরকার-পরিচালিত গোশালাতে লোকসান হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। বেসরকারী গোশালা (ডেয়ারীর) সহিত সহযোগিতা দ্বারা স্বল্প ব্যয়ে অধিক ফল পাওয়ার আশা করা যাইতে পারে। যাহাতে সাধারণ গো-জাতির উন্নতি হয় এবং সাধারণ গৃহস্থের উপযোগী গবাদি উৎপাদন সম্ভব হয় লোকায়ত্ত সরকারের তাহাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিদেশী ষাঁড় ও গাভীর আমদানী ইহার অনুকূল নহে। বাংলা, বিহার ও আসামে গত ৩৫ বৎসরের উপর এই বিষয়ে যে সকল পরীক্ষা হইয়াছে, আশা করি বাংলার কৃষি বিভাগ বিশেষ ভাবে তাহার পর্য্যালোচনা করিয়াই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা স্থির করিয়াছেন। নতুবা পরীক্ষিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তিতে করদাতাগণের অর্থের অধিকতর অপচয় ঘটিবে মাত্র।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর পত্র

(পরলোকগত সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী পুষ্প দেবীকে লিখিত)

কল্যাণীয়াসু,

পুষ্প, তোমার পাঠানো বন্ধুবর ৺সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী শ্রীযুত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী মারফত পেয়েছি। বইটি পড়ে বড় আনন্দ অনুভব করলাম। আমি তোমার পিতৃদেবের সহিত খুবই পরিচিত ছিলাম—আমাদের দু'জনে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং তিনি আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। শিল্প বিষয়ে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতাম। সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ দখল থাকায় শিল্প-কলা বিষয়ে ও সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর অনেক তত্ত্ব জানা ছিল। গ্রাম উন্নয়ন কাজে যখনই যা করতেন—সব আমায় বলতেন ও পরামর্শ করতেন। গ্রামে কোথাও পুরাতন শিল্প-নিদর্শন দেখতে পেলে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন এবং ঐ সব দেখাবার কাজে সারা দিন এক সঙ্গে থেকে তাঁর সাহচর্য্য লাভ করেছি। শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক প্রদর্শনীতে গ্রামের কারু-শিল্পীদের এনে তাঁদের দ্বারা কারু-শিল্পের demonstration করাতেন এবং তাতে গ্রামের লোকের ও সাধারণ শিক্ষিত লোকের বিশেষ উপকার হয়েছিল। এখন প্রদর্শনীতে যে ব্যবস্থা করা হয় তার সূত্রপাত করেছিলেন তিনিই।

গ্রামের লোকের কিসে কিছু আয় বাড়ে, কিসে তারা ভালো থাকে, কি করে তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হয় এই সব নিয়ে একেবারে পাগল হয়ে যেতেন।

বইখানিতে তাঁর মধুর শিবতুল্য স্বভাবের কথা সকলেই বলেছেন—এতে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর সংসঙ্গ লাভে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করতাম এবং নিজের জীবন গড়ার কাজে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। আগে যখন তুমি ওঁর জীবনী-বিষয়ে কিছু লিখতে বলেছিলে, তখন, আমি ভালো লিখতে পারি না বলে, সঙ্কোচ বোধে কিছু লিখি নি।
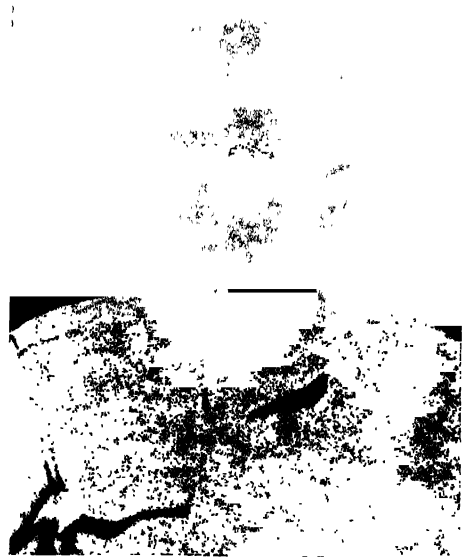
সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

এখানে থাকাকালীন তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্ব কখনো ক্ষুণ্ণ হয় নি এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবার নয় জানবে। তাঁর উন্নত ও সৌম্য মূর্ত্তি এখনও হৃদয়-পটে আঁকা আছে। শিব শিবের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। আঃ নন্দলাল বসু

হিন্দী ভাষার মুসলমান কবি

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

হিন্দী ভাষার সাহিত্যভাণ্ডার বহু মুসলমান কবির অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। দেবনাগর অক্ষরে লিখিত সুললিত ছন্দে রচিত, বাণীলাবণ্যমণ্ডিত এই কবিতারাজি আজও সমাদৃত হয়ে থাকে। এই মুসলমান কবিরা বিশেষ প্রতিভা-শালী ছিলেন। ভাবে, ভাষায়, শব্দসম্পদে এঁদের কবিতা স্বকীয় মহিমায় গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে।

এঁদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হলেন আব্দুর রহীম খান্-খানা—তাঁর কথা পূর্ব্বে প্রবাসীতে আলোচিত হয়েছে। আমীর খুসরুর কথাও পূর্ব্বে বলা হয়েছে।

রহীমের কৃষ্ণভক্তিমূলক কবিতাবলী ও খুসরুর হাসির কবিতা ও গান হিন্দী সাহিত্য-রসিকদের সমাদর লাভ করেছে।

এঁদের পরেই জায়সীর নাম উল্লেখযোগ্য। মালিক মুহম্মদ জায়সী হিন্দী সাহিত্যের একজন মহাকবি ছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ সুফী ফকির শেখ সহী উদ্দীনের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। ইনি 'জায়স' নামক স্থানে বাস করতেন বলে এঁর নামের শেষে 'জায়সী' শব্দটি যোগ করা হয়ে থাকে। তিনি অনেকগুলি কাব্য-গ্রন্থ রচনা করে গেছেন—তন্মধ্যে 'পদ্মাবত' একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে সুধীজন কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।

অনেকের মতে জায়সী বাদশা শেরশাহের সমসাময়িক কবি—অবশ্য এ বিষয়ে মতদ্বৈধ রয়েছে। বহুপূর্ব্বে আরাকান-রাজের প্রধান মন্ত্রী মাগন ঠাকুর আলো উজ্জল নামক এক কবি দ্বারা পদ্মাবত কাব্যের বাংলা অনুবাদ করিয়েছিলেন।

ইনি অতুলনীয় প্রতিভাশালী কবি হলেও দেখতে কদাকার ছিলেন। কথিত আছে, একবার শেরশাহ তাঁর দরবারে এই কুরূপ কবিকে দেখে হাস্য করেছিলেন, তাতে কবি রুষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—

সোঁ হি কা হঁসিস্ কী কৌহর হি

আমার আকৃতি দেখে হেসেছেন, না কুম্ভকারকে (অর্থাৎ আমাকে যিনি সৃজন করেছেন সেই বিধাতা-পুরুষকে, অবজ্ঞা
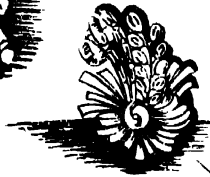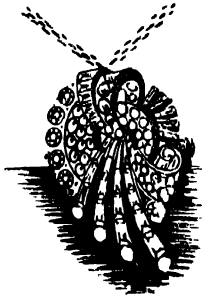
-য়েছেন? বলা বাহুল্য, কবির এই স্পষ্ট উক্তিতে বাদশা অপ্রতিভ হয়েছিলেন।

পদ্মাবত ছাড়া জায়সী আরও দুখানি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। 'অখরাবট' ও 'আখিরী কলাম'। পদ্মাবত সম্বন্ধে 'প্রবাসী'তে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। 'অখরাবট' কাব্যে বর্ণমালার এক একটি অক্ষর নিয়ে বিভিন্ন তত্ত্বের মূল-সিদ্ধান্তসমূহের বিশ্লেষণ করা হয়েছে—এগুলি রচয়িতার কবি-প্রতিভা ও গভীর জ্ঞান উভয়েরই পরিচয়ে সমুজ্জ্বল। ঈশ্বর, সৃষ্টি, জীবতত্ত্ব এই সব জটিল বিষয়ের আলোচনায় তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

'আখিরী কলাম' গীতি কবিতার বই। জায়সীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি হ'ল পদ্মাবত কাব্য।

আমঠীর রাজা জায়সীকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। জায়সী একজন সিদ্ধ ফকিরও ছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি আমঠীর সন্নিকটে এক জঙ্গলে অতিবাহিত করেন। এখানেই ইনি দেহত্যাগ করেন।

হিন্দী ভাষার আর একজন শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি হলেন উস্‌মান। তাঁর রচিত 'চিত্রাবলী' কাব্য খুবই বিখ্যাত। বলা বাহুল্য, এই সব কবি হিন্দী ভাষায় রচিত কাব্যে সংস্কৃত ও ফারসী শব্দাবলী এমন সুষ্ঠু ভাবে ব্যবহার করেছেন যে, পড়লে মনে হয় ঐ সব শব্দ হিন্দী ভাষায় মোটেই বেমানান নয়—সেগুলো যেন অনায়াসে ঐ ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্—

'ঋতু বসন্ত নৌতুন বন ফুলা;
জহঁা তহঁা ভৌঁর কুসুম রং ভুলা।'

—বসন্ত ঋতুর আগমনে সারা বন কুসুম-ভূষণে শোভমান—বিচিত্র বর্ণের ফুলে ফুলে মধুমত্ত ভ্রমর মুগ্ধ হয়ে বসে আছে। কবিতাটির সুন্দর, সাবলীল প্রকাশ-ভঙ্গী মনকে মুগ্ধ করে।

জৌনপুরের শেখ নবী ছিলেন হিন্দী ভাষার আর একজন খ্যাতনামা কবি। তাঁর রচিত 'জ্ঞানদীপ' নামক আখ্যান-কাব্য খুবই প্রসিদ্ধ। রাজা জ্ঞানদীপ ও রাণী দেবযানীর বিচিত্র কাহিনী নিয়ে এই কাব্য রচিত হয়েছে।

সুফী যুগের অবসানের প্রাক্কালে কবির অভ্যুদয়; সুতরাং তাঁর রচনাকেই পূর্ব্ব-প্রচলিত রীতির শেষ নিদর্শন বলা যেতে পারে। প্রেমমূলক গীতি-কবিতা এই সময় পর্য্যন্ত লোকের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিত, কিন্তু এর পরেই নবযুগের প্রভাব ও নূতন প্রকাশভঙ্গী পুরাতন পদ্ধতিকে বিলুপ্ত করে নব-ধারার প্রবর্ত্তন করে।

শেখ নবীর রচিত 'জ্ঞানদীপ' কাব্যের এখনও কদর আছে।

দরিয়াবাদের কাশিম শাহ্ হিন্দীভাষার অপর একজন বড় কবি। তিনি 'হংস জবাহর' নামক কাব্যের রচয়িতারূপে খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। ইনি জায়সীর পদাবলী অনুসরণ করে কাব্য রচনা করেন।

নূর মহম্মদ হিন্দী ও ফারসী উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপন্ন এবং বিদ্বান বলে বিখ্যাত ছিলেন। হিন্দী ভাষায় 'ইন্দ্রাবতী' নামক অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ রচনা করে তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করে গেছেন। কালিঞ্জরের রাজকুমার ও আগমপুরের রাজকুমারী ইন্দ্রাবতীর প্রেমকাহিনী অবলম্বনে এই কাব্য রচিত হয়েছে। সুফী কবিদের মধ্যে এই কবির বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে।

এঁর কবিতার ভাষা অতি সরল। যেমন—

আগমপুর ইন্দ্রাবতী কুঁওর কালিঞ্জর রায়,
প্রেম হুঁতে দোমুহ, কহঁা দীন্হা অলখ বতায়।

অলখ (নিরাকার পরম ব্রহ্ম) কালিঞ্জরের রাজকুমার ও আগমপুরের রাজকুমারীকে প্রেমের সূত্রে বেঁধে দিলেন।...

এঁর রচিত একখানি ফারসী গ্রন্থের নাম 'অনুরাগ বাঁশরী'। প্রথমে তিনি ফারসী ভাষাতেই কবিতা রচনা করতেন। পরে হিন্দী ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং উক্ত ভাষায় কবিতা-রচনা আরম্ভ করেন।

ফারসী ছেড়ে যখন কবি হিন্দী লিখতে আরম্ভ করলেন তখন বলছেন—

কাময়াব কহঁা কৌন জগায়া, ফির হিন্দী ভাষা পর আয়া,
ছাঁড়ি ফারসী কন্দ নবাতে, অন্‌জানা হিন্দী রসবাতে।

—কেমন করে মনের কথা প্রকাশ করতে ফারসী ভাষা ছেড়ে হিন্দী ভাষার শরণাপন্ন হলাম—কে এই পরিবর্ত্তন ঘটালে?

আর এক জায়গায় কবি বলছেন—

এহ বাঁশুরী শুনে গোঁ কোই,
হৃদয়-স্রোত খুল সেঁহি হোই,
নিসরৎ নাদ বারুণী যা মা
শুনি সুধি-সেত রহে কেহি খামা।

—এই বাঁশীর মধুর তান 'বারুণী'-ধারার ন্যায় যুগপৎ আনন্দ ও শীতলতা আনয়ন করে।

এই সব মুসলমান কবির কাব্য ও গীতিকবিতাসমূহ অনুধাবন করলে মনে হয় তাঁরা হিন্দী ও সংস্কৃত এই উভয় ভাষায়ই সমভাবে ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

তাঁদের রচনায় অল্পস্বল্প ফারসী শব্দ থাকলেও তা যেমন সুনির্ব্বাচিত ও সুপ্রযুক্ত তেমনি শ্রুতিসুখকর এবং অর্থ-গৌরবপূর্ণ। কবিতাগুলি পড়লে মনে হয়, অন্য কোনো শব্দ-প্রয়োগে বা অন্য রকম প্রকাশভঙ্গীর দ্বারা বুঝি তাঁদের মনের ভাব এমন সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত হ'ত না।

মুবারক কবির পুরো নাম হচ্ছে সৈয়দ মুবারক আলি বিলগ্রামী। ইনি আরবী, ফারসী, হিন্দী ও সংস্কৃত এই কয়টি ভাষাতেই পরম ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

এঁর রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হ'ল 'অলক শতক' ও 'তিল শতক।'

এঁর লেখার নমুনা দেওয়া যাচ্ছে—

কনক বরণ বাল, নগন লসত্ ভাল, মোতিন কে'মাল
উর সোহেঁ ভলী ভাঁতি হয়,
চন্দন চঢ়াই চারু কৌমুদী মোহিনী সী প্রাত হী
অন্থাই পওধারে মুসকাতি হয়।

—কবি এখানে সুন্দরীর রূপ বর্ণনা করছেন—অলকদামে শোভিতা, চন্দনচর্চ্চিতললাট, দন্তরুচিকৌমুদীযুক্তা চারু-হাসিনী মোহিনী-মূর্ত্তি সহাস্যমুখে দণ্ডায়মানা। এটি শ্রুতিমধুর শব্দপ্রয়োগে সুললিত সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে রচিত অপরূপ কবিতা।

কবি রসখান্ ছিলেন দিল্লীর অধিবাসী একজন পাঠান। ইনি বাদশাহী 'খানদান' বংশসম্ভূত ছিলেন।

বৈষ্ণব কবিদের কবিতা শুনে এঁর হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির সঞ্চার হয় এবং ইনি গোস্বামী বিঠ্ঠলনাথজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর দীক্ষাগ্রহণ সার্থক হয়েছিল এবং ২৫২ জন প্রধান বৈষ্ণবের মধ্যে তিনি একজন বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। প্রকৃত বৈষ্ণব হতে হলে যে সব গুণের অধিকারী হওয়া আবশ্যক তাঁর মধ্যে সে সব গুণ পূর্ণমাত্রায় ছিল। অন্ধ গোঁড়ামি তাঁকে কখনও স্পর্শ করতে পারে নি।

এঁকে অনেকে প্রেমিক কবি বলে উল্লেখ করেছেন। এঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'প্রেম বাটিকা' খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। প্রেমের মাধুর্য্য ও মাহাত্ম্য নিয়েই ইনি বেশীর ভাগ কবিতা রচনা করেছেন।

বাদশাহী বংশসম্ভূত হওয়া সত্ত্বেও ইনি ভোগবিলাসে চিরদিনই বীতরাগ ছিলেন। জীবনে তাঁর এমন একদিন এসেছিল যখন তিনি সংসারের মোহমায়া ত্যাগ করে গোবর্দ্ধনধামে এসে অবস্থান করেছিলেন। সেখানেই তিনি অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দিল্লী ত্যাগ করার সময় তিনি লিখেছিলেন—

দেখি গদর হিত সাহিকে দিল্লী নগর মশান।
ছিন্‌হি বাদশা বংশ কো, ঠসক ছোঁড়ি রসখান্।
প্রেম-নিকেতন শ্রীবন হি, আয় গোবর্দ্ধনধাম,
লহে ও শরণ চিত্ চাহিকে, যুগল স্বরূপ ললাম।

সম্রাটের বংশের বিলাস-বাসন তুচ্ছ করে, দিল্লীর বাহ্যিক দৃশ্য রমণীয় হলেও তা শ্মশান মনে করে—রসখান্ তা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীবন গোবর্দ্ধনধামে যুগল মূর্ত্তি রাধাশ্যামের পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়েছি…

এঁর আর একখানি গ্রন্থের নাম হল 'সুজান রসখান্'।

কবি সৈয়দ গুলাম আলি বিলগ্রামী 'রসলীন' এই ছদ্ম-নামেই সর্ব্বত্র পরিচিতি লাভ করেন। এঁর রচিত 'অঙ্গদর্পণ' ও 'রসপ্রবোধ' গ্রন্থ দুখানি বিখ্যাত। এই মুসলমান কবি ব্রজভাষা হিন্দীতে কবিতা রচনা করে যে প্রতিভার পরিচয়

দিয়ে গেছেন তা বিস্ময়কর। ইনি যেমন সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন তেমনই ফারসী ও আরবী ভাষাতেও ছিলেন ব্যুৎপন্ন।

কৃষ্ণভক্তির রসে অভিসিঞ্চিত তাঁর কবিতাবলী মনকে সহজেই মুগ্ধ করে।

এক জায়গায় কবি লিখেছেন—

মুখশশি নিরখি চকোর সরু তনু পানিপ লখি মীন,
পদ-পঙ্কজ দেখত নয়ন, হোত মগন রসলীন্।

চন্দ্রমার মুখ দর্শন করে যেমন চকোর জলস্পর্শ করে, যেমন মীন মুগ্ধ হয়, 'রসলীন' তেমনি আরাধ্যের পদ-কমল দর্শন করে মৌন, মুগ্ধ হয়েছে ও তারি ধ্যানে তন্ময় হয়ে আছে।

কবি উস্মানের কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। তাঁর রচনায় দেশবিদেশের কাহিনী এবং বিভিন্ন স্থানের অধিবাসী ও তাদের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতির বিশদ বিবরণ পরম উপভোগ্য। বর্ণনা এত সুন্দর ও নিখুঁত যে তা পাঠকের চিত্তকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। তখনকার দিনে বিদেশে যাওয়া সহজ ছিল না। জাহাজে চড়ে কবি বিলাত যান। সে প্রসঙ্গে বলেছেন—

বলন্দীপ দেখা অংরেজা, যহাঁ যায় নর কঠিন কলেজা।
উচঁ, নীচ, ধন, সম্পত্তি, হেরা, মদ, বরাহ ভোজন জিন কেরা।
যহাঁ যাই তহাঁ বন্দর সাজা, লগা সদ চঢ়ি গয়েউ জহাজ।

জাহাজে চড়ে ইংলণ্ডে (বলন্দীপে) গেলাম; সেখানে—উচ্চ, নীচ (ধনী দরিদ্র) সবাইকে এবং তথাকার বিপুল সমৃদ্ধি দেখলাম। সেখানকার লোক বেশীর ভাগ মদ ও বরাহ-মাংস ভক্ষণ করে। ভারি সুন্দর, বড় বড় সুসজ্জিত সব বন্দর দেখলাম যা সর্ব্বদা জাঁকজমকে পরিপূর্ণ। দীর্ঘপথ জাহাজে করে যাওয়া অতি কষ্টসাধ্য—এই পথে সাহসী লোকেরাই গিয়ে থাকে।

বইখানিতে আরো নানা দেশের বিবরণ আছে। কবির বর্ণনায় মক্কা মদিনার চাইতে গুজরাতের নরনারী ও দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্য্য অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়ে ফুটে উঠেছে। অনুসন্ধান করলে এমনই আরো বহু মুসলমান কবির রচিত হিন্দী কবিতা আবিষ্কৃত হতে পারে যা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক মিলনের পরিচায়করূপে সমাদৃত হবে।

শুধু
রসনার তৃপ্তির
জন্যই নয়
খাদ্যপ্রাণে
দিয়ে রান্না করুন
RASOI
VANASPATI
বনস্পতি
২, ৫, ১০ ও ৩৭ পাউণ্ড
টিনে পাওয়া যায়
HDX 14
হিন্দুস্থান ডিভেলপমেণ্ট
কর্পোরেশন লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্ :
চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা
ম্যানেজিং এজেণ্ট :
এন আর সরকার অ্যাণ্ড কোং লিঃ

আলোর ফুলকি—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

পাহাড়তলির দিনরাত্রির আবর্ত্তনে পশু এবং পক্ষী-জগতের জীবন-রহস্যের নানাদিক কাহিনীর বিষয়-বস্তু। লেখকের ভাষায়: "পাহাড়তলির পুরোনো গোলাবাড়িতে নানা জাতীয় পাখির সঙ্গে বাস করে মোরগ-ফুল-মাথায়-গোঁজা কুঁকড়ো—সে এমন কুঁকড়ো যে সবার আগে চোখ খোলে, সবার শেষে ঘুমে ঢোলে। আর তাদের সঙ্গে বাস করে পাখিদের বন্ধু পাহাড়ি-কুত্তানি জিম্মা। এই কুঁকড়োর চার বউ—বুড়ো মা আর অসংখ্য ছেলেপুলে। এই কুঁকড়োর উপর ভার পড়েছে সূর্য্যের রথ টেনে আনবার। তাই প্রতিদিন ভোর-বেলায় সে গান গেয়ে ওঠে আনন্দে—'আলোর ফুলকি'। তার ডাকে অন্ধকার তরল হয়ে আলো জাগে—বনের ওপার থেকে আসে সূর্য্যের রথ পাহাড়তলিতে আসে দিন—ঝলমলে আলোয়-ভরা দিন।"······

প্রকৃতির সঙ্গে স্বভাবকে নিখুঁত ভাবে মিলাইয়া কাহিনীর সূত্রটিতে কথার ফুল গাঁথিয়াছেন শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ। আর তুলির মতই তাঁর লেখনীর সৌন্দর্য্যও অপরূপ। পরিচ্ছন্ন রুচির মাধ্যমে গল্পটিকে রসিকচিত্তে পৌঁছাইয়া দিবার আয়োজনে ত্রুটি কোথাও নাই। আলোর মধ্যে যে ছন্দ, যে সুর, কোমল ভাষায় তাহাই যেন কবিতার মত মধুর হইয়া ফুটিয়াছে—অথচ অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে বহির্দৃষ্টের যোগাযোগ কোথাও বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সুদূর প্রসারী কল্পনার সঙ্গে বাস্তব জ্ঞানের পরিমিত প্রয়োগ কাহিনীর কৌতূহলকে পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় রাখিয়াছে—এমন দুর্লভ যোগাযোগ কদাচিৎ ঘটে। চিরকালের অবজ্ঞেয় পাখী শিল্পীর তুলিকায় অপূর্ব্ব হইয়া ফুটিয়াছে, তার সঙ্গে ফুটিয়াছে চিনিদিদি, পেরু, সোনালি, চড়াই, পায়রা, জিম্মা, স্বপনপাখী, বেঙ ও পেঁচার দল। শুধু কিশোর-চিত্ত নহে, সকল বয়সের রসিক-চিত্ত আকর্ষণের বস্তু 'আলোর ফুলকি'তে আছে।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত প্রচ্ছদ ও অন্তঃপট এবং বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের অনুচ্ছেদ পুস্তকের অন্যতম আকর্ষণ।

মাত্র চার দিন—শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বসু। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

রোমাঞ্চকর ঘটনা আলোচ্য উপন্যাসখানির বিষয়বস্তু হইলেও সস্তা রোমাঞ্চকর ডিটেক্টিভ উপন্যাস হইতে ইহা পৃথক। যদিও একটি হত্যাকে কেন্দ্র করিয়া ইহার গল্প আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রকৃত খুনীকে কৌশলে গোপন করিয়া রহস্যজাল বুনিবার প্রয়াস ইহার মধ্যে আছে, কিন্তু বাস্তব-

সাঁওতাল মেয়ে : বিহার। মুদ্রিত ছবির মাপ : ১১"×৮½"
পরিকুটির আলো করা...
পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মেয়েদেরই বহু বিচিত্র ছবি তাদের দেশবাসীরা বিশ্বের দরবারে সগর্বে তুলে ধরেছে, পিছিয়ে ছিল শুধু ভারতবর্ষ। বিখ্যাত ফটোগ্রাফার সুনীল জানার বই 'সেকেণ্ড ক্রিচার' সে-অভাব দূর করল এতদিনে। ৬৪ খানা অসামান্য আলোকচিত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা জাতীয় মেয়েদের চিরন্তন রূপটিকে সাধারণ সমক্ষে এনেছেন সুনীল জানা, এজন্য তাঁকে সুদীর্ঘকাল ভারত পরিভ্রমণ করতে হয়েছে। দেশের মাটির মতো খাঁটি এই মেয়েরা : কেউ চাষা, কেউ মজুর, কেউ মেছুনী, কেউ বেদেনী, কেউ বা সাধারণ ঘরনী। কারো জীর্ণবাস, কারো কটিবাস — তা হোক, তবু দারিদ্র্য এদের স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্যকে বিন্দুমাত্র ম্লান করতে পারেনি। অভাব, অনটন এবং অশিক্ষার মাঝে থেকেও মুখে এদের অনাবিল অকলঙ্ক হাসি : ইন্দ্রাণীর মহিমা ; চোখে চঞ্চলা উর্বশীর সম্মোহনী শক্তি।
সানডে স্টেটসম্যান বলেছেন—*এ-বই রত্নসামগ্রীর মতো আহরণীয়*। দাম ১২৲
দি সেকেণ্ড ক্রিচার
সুনীল জানা
সিগনেট প্রেস : ১০/২ এলগিন রোড, কলিকাতা ২০

-বর্জ্জিত কতকগুলি অবিশ্বাস্ত ঘটনা সাজাইয়া পাঠক ভুলাইবার কৌশল ইহাতে নাই। লেখক রহস্তের সঙ্গে রোমান্সের জাল বুনিয়া রস-সৃষ্টির প্রয়াস করিয়াছেন এবং সাবলীল প্রকাশভঙ্গীর জন্ত পাঠকের কৌতূহল শেষ পর্য্যন্ত সজীব রাখিতে সমর্থও হইয়াছেন। হত্যার হেতু ও রহস্ত উন্মোচনে মানব-মনের যে সূক্ষ্ম ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় তাহা সুন্দর ভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। উপন্যাসখানি ফিলিপ ম্যাকডোনাল্ডের 'দি-র‍্যাস্‌প' পুস্তকের অনুসরণে লিখিত। এ ভাবে বিদেশী গল্পকে দেশী ছাঁচে ঢালিয়া কৌতূহল বজায় রাখা কৃতিত্বের পরিচায়ক।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মহাত্মা গান্ধী—রোমাঁ রোলাঁ। অনুবাদক—শ্রীঋষি দাস। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি; ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা। দাম আড়াই টাকা।

গান্ধীজীর যে কয়খানি জীবনী লেখা হইয়াছে তাহার মধ্যে রোলাঁর লেখা জীবনী নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, ইহা রোলাঁর মত মনীষীর লেখা। দ্বিতীয়ত, ভারতের দুই জন দিকপাল, রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজীর তুলনা করিয়া যেমন একদিকে রোলাঁ নিজে ভারতীয় সভ্যতাকে এই পুস্তকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তেমনই তাঁহার আরও এক উদ্দেশ্য ছিল, ইহার সাহায্যে দুই বিরাট পুরুষের সহিত পরিচয় ঘটাইয়া বর্তমান ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপীয় পাঠকবর্গকে সুপরিচিত করিবেন।

বইখানি পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইলেও আজও তাহার সার্থকতা কমে নাই। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। অনুবাদ ভাল হইয়াছে।

বিনা চশমায় ক্ষীণদৃষ্টির প্রতিকার—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। প্রবর্তক পাবলিশার্স। ৬১, বহুবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা। পৃঃ ৵০+৭৬।

আমেরিকায় ডাক্তার বেট্‌স্‌ নামক জনৈক চিকিৎসক চক্ষু-চিকিৎসার এক বিশেষ প্রণালী আবিষ্কার করেন। ইহার ফলে চশমার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া যে-কেহ স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইতে পারেন। আমাদের দেশেও এ চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু সকলে ইহার বিষয়ে জানেন না। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সহজ বাংলা ভাষায় উক্ত প্রণালীটি বর্ণনা করিয়াছেন। বইখানিতে চিকিৎসা-প্রণালীর তত্ত্বাংশ এবং সাধন, উভয়ই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা অভ্যাস করিয়া সাধারণ পাঠক লাভবান হইলে বইখানির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

উপনিষদ্—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ—৫৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় অতি সংক্ষেপে সরল ভাষায় উপনিষদের পরিচয় ও সারমর্ম্ম উপনিবদ্ধ হইয়াছে। 'প্রস্তাবনা', 'আত্মবিচার', 'ব্রহ্মতত্ত্ব' ও 'ব্রহ্ম-সাধনা' এই চার অধ্যায়ে বক্তব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনেক স্থলে উপনিষদের কথাগুলিই হুবহু অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে উপনিষদের রচনাভঙ্গীর সহিত পরিচয়লাভের সুযোগ হইবে। শেষ অধ্যায়ে উপনিষদের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট উপদেশ সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যেই হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব নিহিত। সব দিক দিয়া পুস্তিকাখানি সাধারণ পাঠকের বিশেষ কাজে লাগিবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

কৃষ্ণনগর কলেজের শতবর্ষোৎসব স্মারকগ্রন্থ—শ্রীপরেশনাথ ঘোষ এবং শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। ৯৫, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯৪৮। মূল্য পাঁচ টাকা।

বিগত শত বর্ষ জাতির পুনরুত্থানের কাল। এই সময়ের মধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করিয়াছে জাতির পুনর্গঠনে তাহাদের দান অল্প নয়। কৃষ্ণনগর কলেজ এমনি একটি প্রধান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। দেশের স্বাধীনতা লাভের কিছু পূর্ব্বেই তাহার জীবনের শতবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। শতবর্ষপূর্ত্তির উৎসব আনন্দময়। এই স্মারকগ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ ইংরেজী, দ্বিতীয় ভাগ বাংলা। ইংরেজী বিভাগে কৃষ্ণনগর কলেজের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কয়েকটি বক্তৃতা এবং স্মৃতিকথা ব্যতীত চৌদ্দটি প্রবন্ধ আছে। বাংলাতে দুইটি স্মৃতিকথা ছাড়া নয়টি প্রবন্ধ আছে। ইংরেজীতে লিখিয়াছেন ডব্লু এ জেঙ্কিন্স, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিন্সিপাল জে এম সেন, ডক্টর এস এন সেন, ডক্টর বিনয়কুমার সরকার, টি এন তালুকদার, জেমস্ বুকানন, ডক্টর এস. কে. দে, কে এন. রায়, ডক্টর এইচ কে মুখোপাধ্যায়, নির্ম্মলকান্তি মজুমদার, রমেশচন্দ্র ঘোষ, পি. এন ঘোষ এবং ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রাচ্য বিদ্যা সম্পর্কিত শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ে ডক্টর সুশীলকুমার দে যে সব সমস্যা উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাদের সমাধান কল্পে যথেষ্ট চিন্তা ও চেষ্টার প্রয়োজন। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা" শীর্ষক প্রবন্ধটি চিত্তাকর্ষক।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের "বাংলায় ধ্রুববাদ", অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের "আমাদের বিজ্ঞান চর্চ্চা", ডাক্তার অমিয়নাথ সান্যালের "বাংলা গানের দিগ্দর্শনী" অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল্লা হাইয়ের "বাংলার ধর্ম্মান্দোলন ও উনবিংশ শতাব্দী", অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তীর "উনবিংশ শতাব্দী ও বাংলা ভাষা", শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালীর শিক্ষা সমস্যা", শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের "শতবর্ষ পূর্ব্বে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রচেষ্টা", কাজী আবদুল ওদুদের "কালীদাস ও রবীন্দ্রনাথ", অধ্যক্ষ খাঁ বাহাদুর ইব্রাহিম খাঁর "অধ্যাপকের অভিজ্ঞতা"—এই নয়টি প্রবন্ধে বাংলা বিভাগ সম্পূর্ণ। অনেকগুলি প্রবন্ধই উনবিংশ শতাব্দীর এক এক অংশে আলোকপাত করিয়া উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলি নানা তথ্যপূর্ণ। অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও হৃদয়গ্রাহী। গানের দিগ্দর্শনীতে শতবর্ষের বাংলা গানের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাইয়া পাঠক আনন্দলাভ করিবে। স্মারকগ্রন্থখানি সুমুদ্রিত, সুলিখিত এবং সুসম্পাদিত।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

মুহূর্ত্তের মূল্য—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ। ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বাংলা কথাসাহিত্যে রামপদবাবু একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। জীবনকে দরদের সহিত দেখিয়াছেন বলিয়া ঘটনাকে বাঁকাইয়া-চুরাইয়া গল্প বানাইবার প্রয়োজন তাঁহার হয় না। সাধারণ সুখদুঃখের বিচিত্র বর্ণে তিনি সুন্দর জীবন-চিত্র আঁকিতে পারেন। 'মুহূর্ত্তের মূল্যে' তিনি মানব-মনের পরিবর্ত্তনশীলতার মনোরম ছবি আঁকিয়াছেন। দুই বন্ধু বাল্যকালে ছাড়াছাড়ির দিনে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল, ছুরি দিয়া কাটিয়া পরস্পরের হাতে নিজ নিজ নামের আদ্যক্ষর লিখিয়া দিয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে তাহাদেরই এক জন এক দিন আপিস হইতে বাড়ী ফিরিবার আগ্রহে স্ত্রী-পুত্রের সহিত মিলিত হইবার প্রবলতর আকাঙ্ক্ষায়, অপর বন্ধুর

সহিত ভালো করিয়া কথা বলিল না—তাহার গৃহে যাওয়ার আমন্ত্রণ এড়াইয়া চলিয়া গেল। এমন তো কতই হয়। কিন্তু এই ছোটখাটো ব্যাপারগুলিকে সরস করিয়া প্রকাশ করা সহজ নয়। রামপদবাবুর সে ক্ষমতা আছে। অন্তরের সূক্ষ্ম কম্পনগুলি তাঁহার কলমে বেশ ধরা দেয়। অশ্রু আর হাসি তাঁহার গল্পগুলিতে পাশাপাশি ঝলকিয়া উঠিয়াছে। প্রথম গল্পের নামে বইয়ের নাম। তাহা ছাড়া, 'বিভীষণ', 'প্রিয়তর', 'বহুমৃত্যু', 'সেকালের গল্প', 'রহস্যময়ী' এবং 'ত্যাগ'—এই কয়টি গল্প আছে। প্রত্যেকটিই উপভোগ্য। পুস্তকখানিতে একটি সূচীপত্র থাকিলে ভাল হইত। আর, 'বিভীষণ' গল্পের শেষ দিকে 'হরিদ্রাবর্ণ' অর্থে লেখক 'হরিদ্বর্ণ' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার সংশোধন বাঞ্ছনীয়।

গুচ্ছ—৺মহাদেব মুখোপাধ্যায়। ইখড়া, বর্দ্ধমান। মূল্য ১।০।

কয়েকটি গীতিকবিতা। রচনাভঙ্গী সরল ও প্রাঞ্জল। কবি অল্প বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন, ক্ষমতার পূর্ণ পরিচয় দিয়া যাইতে পারেন নাই। এই কবিতাগুলিতে অনুভূতিশীল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

ছন্দোবিজ্ঞান—শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য। বি-জি প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ। ৮০।৬ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৪৲।

ছন্দ সৃষ্টির ক্ষমতা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের পক্ষেও বৈজ্ঞানিকভাবে এ বিষয়টির আলোচনা করা সহজ নয়, তাহার প্রমাণ অনেক সময়ে পাই। তারাপদবাবু কবি নহেন, বিচার-প্রবণ সমালোচক। তাঁহার আলোচনা যুক্তি-নিষ্ঠ, মতামত সুচিন্তিত। তাঁহার পূর্ব্বগামীদের মধ্যে, মনে হয়, ছন্দ-বিজ্ঞান সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের আলোচনাই সরস, প্রাঞ্জল এবং মোটের উপর বিচার-সহ। অবশ্য তারাপদবাবু প্রবোধবাবু-কৃত ছন্দের শ্রেণী বিভাগ স্বীকার করিলেও ছন্দ-নিরূপণের বিভিন্ন মাপকাঠি (unit) মানেন নাই। মোহিতলাল মজুমদার, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এবং দিলীপকুমার রায়ের যে সকল মত তাঁহার নিকট অযৌক্তিক মনে হইয়াছে, অকুণ্ঠিত ভাবে তিনি তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখায় অকারণ উষ্মা বা আত্মাভিমান নাই। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-সংক্রান্ত মত তিনি অনেক স্থলে উল্লেখ ও সমর্থন করিয়াছেন। আলোচনায় গদ্য-ছন্দকেও তিনি বাদ দেন নাই। ব্যাকরণের মত সূত্রাকারে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া তিনি ছন্দের গঠন-কৌশল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসু, তাঁহারা বইখানি পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা ১ম ভাগ—শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত। মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১০, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ।৶০ আনা।

প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বড় বড় অক্ষরে বর্ণমালা এবং সহজ বাংলায় ব্যাকরণের প্রধান নিয়মগুলি দেওয়া হইয়াছে।

রসসাহিত্য—শ্রীনবেন্দু বসু। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ। ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাময়িক পত্রের পাঠকগণের নিকট গ্রন্থকার সুপরিচিত। পড়াশুনা এবং চিন্তা তিনি করিয়া থাকেন, কাজেই তাঁহার কথা মন দিয়া শুনিতে হয়। 'সাহিত্য ও রসসাহিত্য', 'রসসাহিত্যের অনুবাদ', 'ভঙ্গী ও রীতি', 'গদ্যে রস-রচনা', 'সৃষ্টি ও সমালোচনা' এই পাঁচটি প্রবন্ধ লইয়া বর্ত্তমান পুস্তক। পরিবেশন-নৈপুণ্য ও রসানুভূতি গুণে পুস্তকখানি আদরণীয়। লেখক যে যুগের হুজুগে বিভ্রান্ত নহেন, অনুসন্ধিৎসু ও বিচারশীল—বিশেষ করিয়া 'রাসসুন্দরী' এবং 'বলেন্দ্রনাথ' সম্পর্কিত আলোচনায় তাহার প্রমাণ পাই।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মানবিক ও পরমাণবিক—শ্রীবিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়, ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১২৭, মূল্য ২।০ টাকা।

গ্রন্থখানির আলোচ্য বিষয়, বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা—মানুষ কর্ত্তৃক মানুষের শোষণ, এবং শক্তিমান জাতি কর্ত্তৃক দুর্ব্বল জাতিসমূহের শোষণ। জগৎ আজ জ্ঞানে, বিজ্ঞানে এবং বিবিধ সম্পদে সমৃদ্ধ, কিন্তু সেই পুরাতন মনোভাব আজও বিশ্বসভ্যতাকে কলঙ্কিত করিতেছে। যে সভ্যতার অন্যতম আবিষ্কার আণবিক বোমা হিরোশিমা ও নাগাসাকির লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ লোককে অতি দ্রুত ধ্বংস করিতে পারে সে সভ্যতা লইয়া গৌরববোধ করা অপেক্ষা লজ্জিত হওয়াই অধিকতর সমীচীন। এটম বোমা ব্যবহারের বহু পূর্ব্বেই জাপানের যুদ্ধজয়ের আশা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছিল তবুও ইহার ব্যবহার সোভিয়েটকে ভয় দেখান ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আর 'এটম বোমা' আবিষ্কারক জার্ম্মানী নহে, ইহা নিছক মার্কিনী গবেষণা ও বিপুল অর্থব্যয়ের ফল এবং আজ পর্য্যন্ত ইহা মার্কিনের অধিকারে আছে, অন্য কাহারও অধিকারে নাই। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইহাই লক্ষণ। এটম বোমার রহস্য তাই অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রকাশ করিতে সাম্রাজ্য-বাদী রাষ্ট্রসমূহ নারাজ। শেষ পর্য্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়াকে পঙ্গু ও ধ্বংস করার জন্য এটম বোমার আবশ্যকতা হইবে বলিয়া ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদীর বিশ্বাস। লেখকের মতে একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়াই জনগণের বন্ধু ও মানবহিতৈষী এবং সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী দেশসমূহের বিরোধী। লেখকের আলোচনায় সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্ত পরিস্ফুট হইয়াছে, কিন্তু সোভিয়েটের মানবহিতৈষণার সদিচ্ছা প্রমাণিত হইতে এখনও বাকী আছে। তবে ইঙ্গ-মার্কিন এবং সোভিয়েট সম্পর্ক যে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের নহে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

লেখকের সরস রচনাভঙ্গীতে সুযুক্তিপূর্ণ জটিল বৈজ্ঞানিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ের আলোচনা সাধারণ পাঠকের পক্ষেও অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হইয়াছে। কিন্তু অতিমাত্রায় ইঙ্গ-মার্কিন নিন্দা ও সোভিয়েটের প্রশংসা তাঁহার যুক্তি ও বক্তব্যের মূল্য কমাইয়া দিয়াছে। যাহা হউক, সুধী-সমাজে এরূপ গ্রন্থের প্রচার হইবে বলিয়া আশা করি।

প্রাচীন-ভারতে হিন্দুদের রাজ্যশাসন প্রণালী—শ্রীশিশিরকুমার বসাক। ঢাকা সাহিত্য-বাসর, ২৩৬।১, নবাবপুর রোড, ঢাকা। পৃষ্ঠা ৭২। মূল্য ৸০ আনা।

গ্রন্থকার অতি সংক্ষেপে প্রাচীন-ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের একটি অধ্যায় উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। তেরটি অধ্যায়ে আর্য্যদের সামাজিক জীবন ও সভ্যতা, রাজ্যশাসনের বিভিন্ন ধারা, রাজনৈতিক বিভাগ, সভা ও সমিতি, রাজা, মন্ত্রী, বিচার, পুলিশ, গোয়েন্দা, দূত, সামরিক ব্যাপার, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, রাজস্ব বিভাগ ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও সুখপাঠ্য হইয়াছে। যে সকল পাঠকের পক্ষে বৃহৎ গ্রন্থাদি পড়ার সময় ও সুযোগের অভাব তাঁহারা এই পুস্তিকা পড়িয়া প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। এই পুস্তিকা সাধারণ্যে সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা—শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৫।০।

"এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা" উপন্যাসখানি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীতে "শৃঙ্খল" নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট আসন দাবি করিতে পারেন। অল্প কয়েকটি পাত্রপাত্রীর কাহিনী লইয়া উপন্যাসটি রচিত। উহার স্বচ্ছ, সরল ও সাবলীল গতি মনকে নাড়া দেয়, চিন্তার খোরাক যোগায়, পাঠশেষে মনের উপর একটি সুস্পষ্ট ছাপ রাখিয়া যায়। পাঠকের

মনকে উপরের দিকে টানিয়া তোলে, এমন উপন্যাস আজকাল বিরল। এই দিক দিয়া বইখানি আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। এটি পুরাদস্তুর রোমান্টিক উপন্যাস, কিন্তু একটি স্থানেও মনকে আঘাত করে না, বা পীড়া দেয় না। নীতিকথার বাহুল্য নাই, কিন্তু এক একটি ক্ষুদ্র ইঙ্গিত মনকে উর্দ্ধগামী করে। "পৃথিবীতে যে কাজের থেকে আমি অন্ন আহরণ করব, তাকে মায়ের মত করে আমায় ভালবাসতে হবে। তা যদি না পারি, সে-কাজের প্রতিও অবিচার করব, নিজের প্রতিও সুবিচার করা হবে না।" "আমাদের সমস্ত রকম বুদ্ধি বিবেক চিন্তাশক্তি চারদিককার পাহাড়প্রমাণ কৃত্রিমতায় চাপা পড়ে দুর্ব্বল ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে।··· এদেশের মানুষের সত্যিকারের যেটা মন তার চারদিকে কত রকমের আড়াল তা আপনি জানেন না। সেখানকার প্রত্যেকটি দরজা জানালা বন্ধ।···আমাদের সত্যিকার সমস্যাগুলি ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ থাকে, সেখানে আমাদের দৃষ্টি পৌছায় না।" "আমরা সভাসমিতিতে যাই, নিজের জায়গাটিতে 'বসে বক্তৃতা শুনি।···সামাজিক মিলনের ক্ষেত্রেও নিজের জায়গাটিতে বসে বক্তৃতা দিই বা শুনি। নিজের আশেপাশের মানুষগুলির মনের মধ্যে তাকিয়ে দেখি না।" গল্পাংশও কবি-ঔপন্যাসিকের হাতে সুন্দর ফুটিয়াছে।

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

সুরসপ্তক—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান :— কাত্যায়নী বুক ষ্টল, ২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ২।০।

এখানি লেখকের দ্বিতীয় গল্প-গ্রন্থ। ইহাতে মোট সাতটি গল্প আছে। প্রায় সব কয়টি গল্পই রসসৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াসের নিদর্শন। ইতিপূর্ব্বে লেখকের শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলেও আলোচ্য পুস্তকখানি আমাদের নিরাশ করিয়াছে। কতকগুলি শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধেও আমাদের আপত্তি আছে। যথা—কত্তে (করতে) ভিক্ষা অমিল (অর্থাৎ মেলে না) ইত্যাদি। ইহা ছাড়া বানান ভুলও অত্যন্ত বেশী—যেমন, আজ্ঞা করুণ, ব্যাঙ্গের সুরে ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে, ইনি বিখ্যাত কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় নহেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

জনগণের রবীন্দ্রনাথ—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। সিগনেট প্রেস, কলিকাতা—২০। মূল্য ২।০।

এই বিশ্বব্যাপী জন-জাগরণের দিনে আমাদের বিশ্বকবি জনসাধারণের সম্বন্ধে কি ভাবিয়াছিলেন ও কি করিয়াছিলেন তাহার আলোচনা রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট দিকের উপর আলোকপাত করিবে। জনগণের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত মতামতের সঙ্গে পরিচিত হওয়া রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকের একান্ত প্রয়োজন, অথচ এই দিকটার আলোচনা বা গবেষণা যথেষ্ট হয় নাই। গ্রন্থকার এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটক প্রবন্ধ ও গল্প উপন্যাসের মধ্যে যেখানে যত ইঙ্গিত ও পরিচয় পাইয়াছেন, কয়েকটি সুলিখিত অধ্যায়ে তৎসমুদয় রবীন্দ্ররচনার উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করিয়া সাধারণ পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থকার দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে কাটাইয়া কবির মর্ম্মবাণী বুঝিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও অন্যান্য রচনাদি সম্বন্ধে অনেকের ধারণা, তিনি অভিজাত ঐশ্বর্য্যশালী জমিদার-গৃহে বিপুল ভোগসুখের মধ্যে জীবন কাটাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কাব্য ও সাহিত্য কল্পলোকের বর্ণনায় পরিপূর্ণ, ধূলার ধরণীর সাধারণ মানুষের সহিত তাঁহার নিবিড় পরিচয় নাই, জনসাধারণের আন্তরিক দুঃখবেদনা বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। এই ধারণা যে কত ভুল ও মারাত্মক, এই গ্রন্থে লেখক তাহা বুঝাইতে আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছেন। যুগোপযোগী বইখানি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

দশাননের গল্প—শ্রীযতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'দশানন' এই ছদ্মনামে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে লেখকের যে সব গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল—বর্ত্তমান পুস্তকে তাহাই সংকলিত হইয়াছে।

দশাননের এই সব গল্পে "উচ্ছল আনন্দের রস আছে; মর্ম্মস্পর্শী রোমান্স আছে, আর আছে অবকাশের মুহূর্ত্তগুলি কাটাবার অফুরন্ত মনের খোরাক।" আলোচ্য পুস্তকের প্রতিটি গল্পেই লেখকের 'স্যাটায়ার'-ধর্ম্মী রসাত্মক গল্প লিখিবার ক্ষমতার প্রমাণ রহিয়াছে।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

শিবরাত্রি-পূজা ও কথা—শ্রীউমেশ চক্রবর্ত্তী। প্রাপ্তিস্থান —"শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালী মন্দির" ৮৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯। মূল্য দশ পয়সা।

ভক্তিতীর্থ মহাশয় ইতিপূর্ব্বে শ্রীশ্রীমনসা পূজা ও কথা, মঙ্গলচণ্ডী পূজা ও কথা ইত্যাদি পুস্তক প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নর-নারীর বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান পুস্তকখানিও গৃহস্থের বিশেষ কাজে আসিবে। ইহাতে শিবের ব্রতকথা এবং সংস্কৃত স্তব ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে শিবরাত্রি ও শিবপূজা সম্বন্ধে লেখক যে তত্ত্বালোচনা করিয়াছেন তাহা সারগর্ভ ও গভীর চিন্তাপ্রসূত।

গোস্ট্‌স্—হেনরিক ইবসেন। অনুবাদিকা—শ্রীশিউলি মজুমদার। প্রাপ্তিস্থান ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

'গোস্টস্' বিশ্ববিখ্যাত নরওয়েজীয়ান নাট্যকার ইবসেনের প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। এই নাটকটিতে মানুষের চিরন্তন বেদনার স্বরূপ একান্তভাবে সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ইহা পৃথিবীর সকল দেশের নাট্যরসিক নরনারীর আনন্দ বিধান করিয়া আসিতেছে। শ্রীমতী শিউলি মজুমদার বিশ্বসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ মাতৃভাষার মাধ্যমে বাঙালী পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগতা। এই অনুবাদ তাঁহার প্রথম প্রয়াস হইলেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। 'ইবসেনের নাটকের' মর্ম্মকথাটি যে তিনি অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন তাহার পরিচয় এই অনুবাদে পাওয়া যায়। অনুবাদ-সাহিত্যের ভিতর দিয়া যাঁহারা মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

সাহারার অজানা রহস্য—রত্নাকর পাবলিশিং হাউস। ১৬৬-এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। দাম এক টাকা আট আনা।

বইখানি একটি শিশুপাঠ্য সস্তা ডিটেকটিভ উপন্যাস। নামকরণে লেখকের চমক লাগাইবার চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। নাম দেখিয়া মনে হইতে পারে ইহাতে সাহারা মরুভূমিতে অজানা রহস্য আবিষ্কারের কথা বর্ণিত আছে। আসলে কিন্তু তাহা নয়। এই সাহারা বালিগঞ্জ হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্ত্তী এক পল্লীগ্রাম। সেখানে 'অজানা' নামক এক বাড়ীতে অনুষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কতকগুলি রহস্যপূর্ণ মৃত্যু, গোয়েন্দা তুফান বোস আর তার সহকর্ম্মী তড়িতের বুদ্ধি-কৌশলে ঐ বাড়ীর রহস্য উদ্ঘাটন ইত্যাদি নানা আজগুবি ঘটনার সমাবেশ পুস্তকখানিতে করা হইয়াছে। এই বইয়ের লেখকের আসল পরিচয়টি কিন্তু পাওয়া গেল না। টাইটেল পেজে লেখা আছে ডিটেকটিভ বিশু। এই ডিটেকটিভ বিশু যিনিই হউন তাঁহার লিখিবার হাত আছে। শক্তির অপব্যবহার না করিলেই তিনি বুদ্ধিমানের কাজ করিবেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

শ্রীঅরবিন্দের চিত্র উন্মোচন

আলিপুর জজ কোর্টের বারান্দায় হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে শ্রীঅরবিন্দের বোমার মামলা হইতে মুক্তির ৪০শ বার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁহার তাৎকালিক এক চিত্র উন্মোচিত হইয়াছে। উন্মোচন করিয়াছেন শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম সহকর্মী ও বোমার মামলার বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অরবিন্দ কাটগড়া হইতে খালাস পাইলে পুলিস কোর্টের দেওয়ালের পার্শ্বে তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া যে ফটো তোলা হইয়াছিল সেই ফটো শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত সংগ্রহ করিয়া দেন। পরে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের খরচায় এই ফটো বড় করিয়া বাঁধাইয় রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিকৃতি উন্মোচন উপলক্ষে আমরা এক পত্র পাইয়াছি তাহার কিয়দংশ প্রকাশিত হইল।

"গত ৬ই মে শ্রীঅরবিন্দের চত্বারিংশৎ মুক্তি দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে উক্ত দিবসে তাঁহার প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করা হইল সেই জজ আদালতে যেখানে তিনি বিচারাধীন আসামীর কাঠগড়ায় দিনের পর দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সেই গৃহটী এবং আসামীদের জন্য গঠিত লোহার খাঁচাটি আজও সেইরূপই আছে কিন্তু, বিচার-কর্ত্তা, উদ্ভোক্তা ইংরেজ আজ এই দেশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনন্ত কালের তুলনায় এই চল্লিশটি বৎসর অতীব ক্ষুদ্র—কিন্তু এই কয়েকটি বছর বাংলার বুকে যে দাগ কাটিয়া গিয়াছে সেই দাগই বাংলাকে পৃথিবীর চোখে অমর করিয়া রাখিবে। কে জানিত যে আজন্ম ইংরেজী পরিবেশে লালিত, পালিত এবং শিক্ষিত শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ আজ যোগী, ভারত-সংস্কৃতির প্রতীক রূপে বিশ্বের মুক্তিমন্ত্রের প্রচার করিবেন। সেদিন সেই অগ্নিযুগের যাঁহারা ছিলেন পুরোভাগে, যাঁহারা ছিলেন হোতা, তাঁহাদের অনেকেই আজ কালস্রোতে এই পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু বাঙালী তথা ভারতের বড়ই সৌভাগ্য যে শ্রীঅরবিন্দ আজও বর্ত্তমান। এই মুক্তি-দিবসের সহিত তাঁহার পরবর্ত্তী সমস্ত জীবনের ঘটনানিচয় নিবিড় ভাবে জড়িত।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

ইংরাজের সন্দেহেই তিনি বিচারপ্রার্থী হইয়া আলিপুর জেলে দীর্ঘকাল বাস করেন এবং সেইখানেই তাঁহার যোগদৃষ্টির উন্মোচন হয়—তিনি বিচার-কক্ষে "বাসুদেবঃ সর্ব্বং" এই উপলব্ধি করেন। আসামী, বিচারক, কৌঁসুলি সাক্ষী সকলের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করেন যে তাঁহার প্রিয় বাসুদেবই কাজ করিতেছেন। এই কথা তিনি মুক্তির পরে উত্তরপাড়া অভিভাষণে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। ইহার পরে তিনি শ্রীবাসুদেবের আদেশে পণ্ডিচেরী রওনা হন এবং সেখানে

চারি বৎসর কাল-যোগ সাধনার পরে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট যোগের পথ প্রাপ্ত হন। আলিপুর জেলে অবস্থান-কালেই স্বামী বিবেকানন্দ প্রকট হইয়া তাঁহাকে অতিমানস শক্তির অবতরণের বিষয় জানান এবং পরবর্ত্তীকালে ত্রিশ বৎসরব্যাপী কঠিন সাধনার ফলে তিনি যে ঊর্দ্ধের আলো পান তাহাই এখনও তাঁহার জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এই আলো, শক্তিকে তিনি অতিমানস শক্তি বলিয়াছেন। তাঁহার উপলব্ধি হইতেছে যে এই পৃথিবীতে জড় হইতে প্রাণ এবং প্রাণ হইতে মন যেরূপে সংবৃত অবস্থা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, সেইরূপ বর্ত্তমানে মন হইতে অতিমানসের প্রকাশ হইবে।"

চৈতন্য লাইব্রেরীর হীরক জয়ন্তী উৎসব

গত ৯ই এপ্রিল স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ-ভবনে চৈতন্য লাইব্রেরী ও বিডন স্কোয়ার সাহিত্য-সমাজের হীরক জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম বঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

প্রথমেই চৈতন্য লাইব্রেরী ও বিডন স্কোয়ার সাহিত্য-সমাজের অধ্যক্ষ ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহামান্য অতিথিগণকে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

তারপর ডাঃ কালিদাস নাগ বক্তৃতা-প্রসঙ্গে চৈতন্য লাইব্রেরীর গৌরবময় ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং ইহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্র, সার গুরুদাস, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বাঙালীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে চৈতন্য লাইব্রেরীতে তাঁহার রচনা পাঠ করিতেন এবং এখানে তিনি তাঁহার সাহিত্য-জীবনের প্রেরণা প্রভূত পরিমাণে লাভ করেন। ডক্টর নাগ এরূপ আরও অনেক ভারতীয় ও ইউরোপীয় জ্ঞানতপস্বীর নাম উল্লেখ করেন যাঁহাদের স্মৃতি এই গ্রন্থাগারের সহিত বিজড়িত আছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই গ্রন্থাগারের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

সর্ব্বশেষে সভাপতি, ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু কলিকাতা শহরের শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে চৈতন্য লাইব্রেরীর কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়া এক সারগর্ভ ও সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করেন।

শীতাংশুশেখর বাগচি, ডি-লিট

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক শ্রীশীতাংশুশেখর বাগচি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট উপাধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল, "ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে তর্কের স্বরূপ ও উপযোগ।" এই থীসিসে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা, মাধ্ব রামানুজ, জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন দার্শনিক মত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে এবং ভারতীয় আর্য্য দার্শনিকদের চিন্তাধারা কত সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের বিশ্লেষণ করিয়াছিল তাহার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার পরীক্ষক ছিলেন সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ অনুকূল মুখোপাধ্যায়। তিন-জন পরীক্ষকই ডক্টর বাগচির থীসিসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

অধ্যাপক বাগচির পিতা মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক।

মণীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

বিগত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ প্রাণাচার্য্য কবিরাজ মণীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু হইয়াছে। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বিদগাঁ গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি হরিদ্বারের ঋষিকুল আয়ুর্ব্বেদ কলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন এবং তিন বার (১৯৪৬, ৪৭, ৪৮) নিখিলভারত আয়ুর্ব্বেদ মহাসম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদের প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংগঠনক্ষমতা ও কর্ম্মশক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁহার মৃত্যুতে আয়ুর্ব্বেদজগতের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। ব্যক্তিগত জীবনে মণীন্দ্রবাবু ছিলেন অত্যন্ত মিষ্টভাষী ও অমায়িক প্রকৃতির লোক। নিঃসন্তান ছিলেন।

জ্যোৎস্নাকুমার সেনগুপ্ত

গত ১৭ই জুন বঙ্গবাসী কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক জ্যোৎস্নাকুমার সেনগুপ্ত জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কৃতিত্বের সহিত আই-এস-সি, বি-এস-সি ও এম-এস-সি পাস করেন। মাত্র পাঁচ বৎসর হইল তিনি বঙ্গবাসী কলেজে যোগদান করেন এবং অধ্যাপনা-কার্য্যে দক্ষতা দেখাইয়া ছাত্রসমাজে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ২৬ বৎসর। অধ্যাপক সেনগুপ্ত অবিবাহিত ছিলেন। ইঁহার পিতা শ্রীপ্রমোদচন্দ্র সেনগুপ্ত বঙ্গবাসী কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।
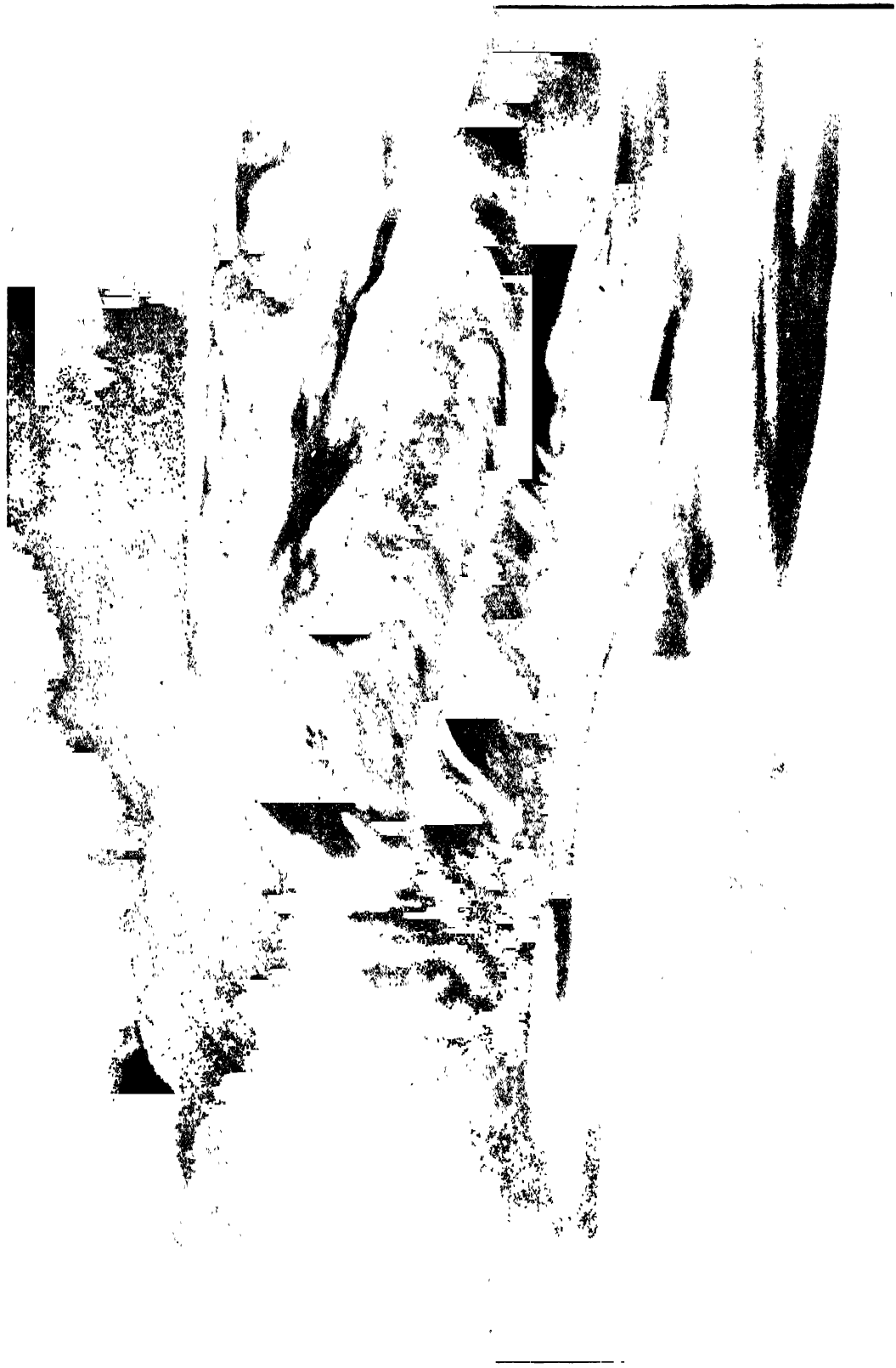
জোয়ার

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিক

কাশ্মীরের অমরনাথের পথে চন্দনবাড়ী

শালিমার উদ্যান—কাশ্মীর
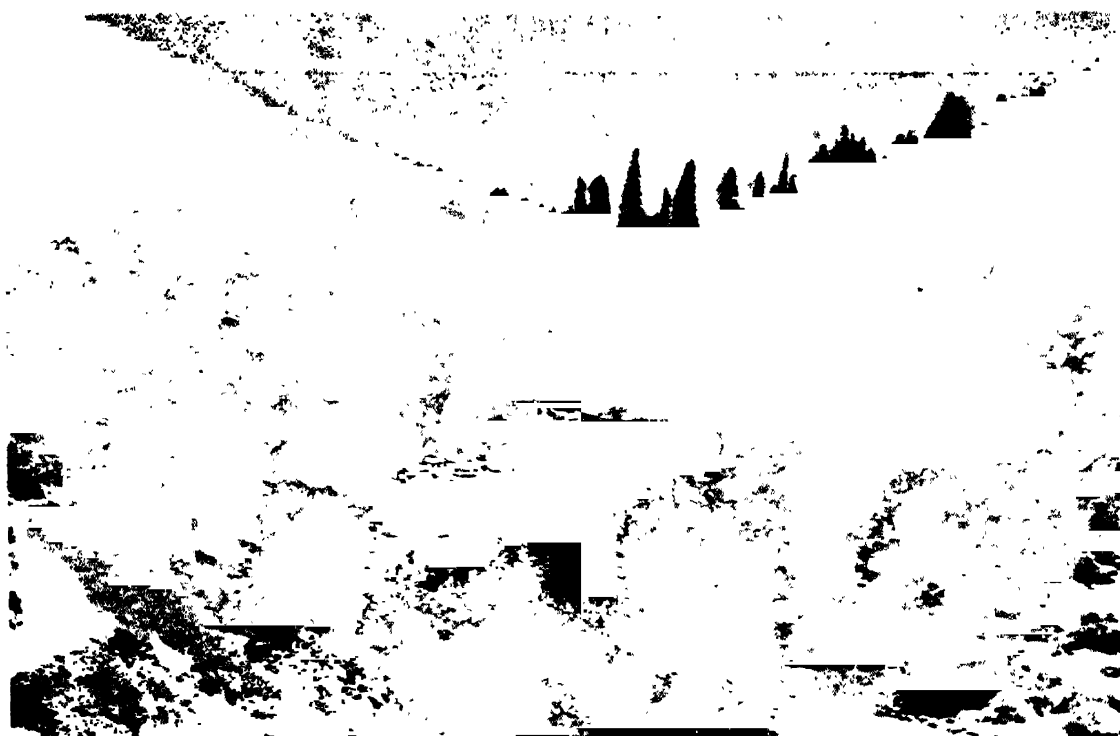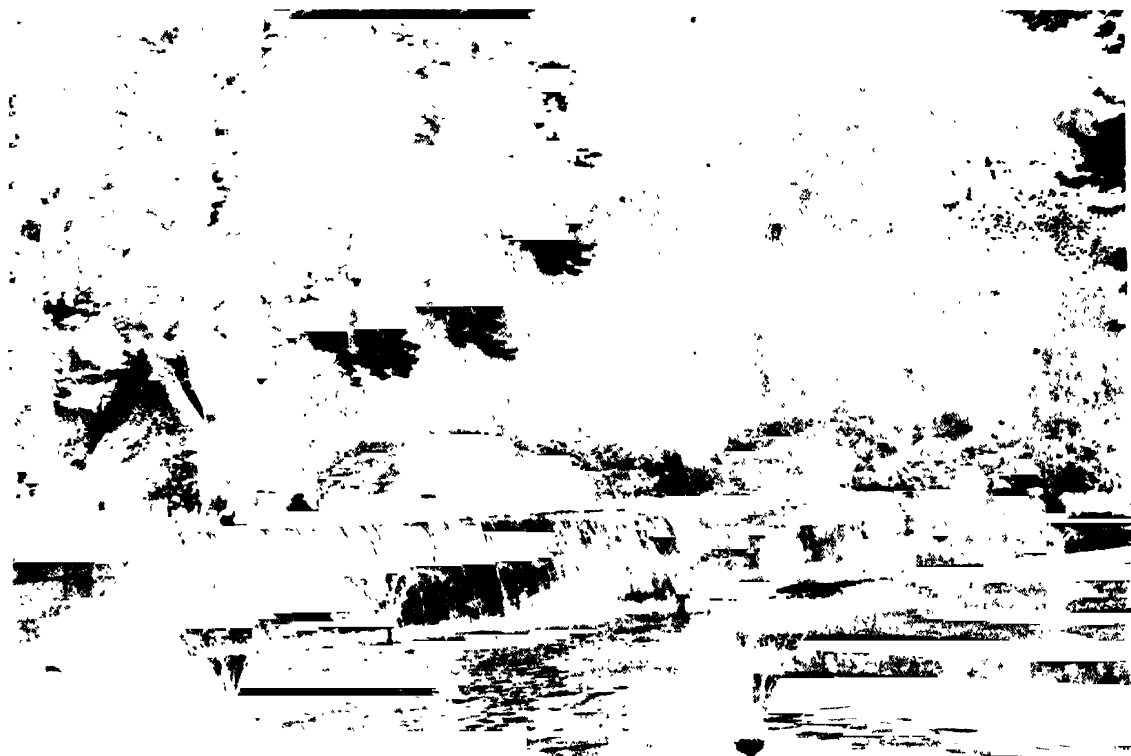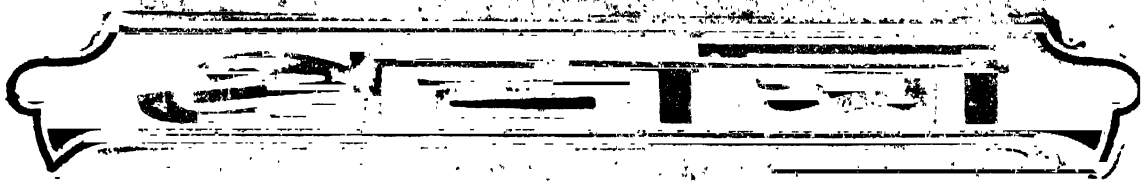
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৯শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৫৬

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পণ্ডিত নেহরুর আগমনের ফল

পণ্ডিত নেহরুর সাহস ও জনসাধারণের সহিত আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের ফল পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক চৌর-চক্রের মধ্যে কি হইয়াছে? কিছুই না, সোনার বাংলা জ্বলে জ্বলুক, পিশাচবর্গের কুক্ষিপূরণ হওয়া চাইই।

বি-পি-সি-সির রিকুইজিশন্ মিটিং সম্পর্কে আমাদের এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন, "বি-পি-সি-সির তিন শতাধিক সভ্যের মধ্যে কি তিন জনও সৎ ও নিঃস্বার্থ লোক ছিলেন না যাঁহারা বলিতে পারিতেন যে 'আমরা পার্টি'র স্বার্থ দেখিতে চাই না, আমরা চাই দেশের ও দশের উপকার?"

পণ্ডিত নেহরু সুস্পষ্টভাবে বলিয়া গিয়াছেন যে, বাংলার কংগ্রেস দেশের লোকের শ্রদ্ধা হারাইয়া "পর্দানসিন" অবস্থায় রহিয়াছে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, গত বিশ বৎসরের মধ্যে কয়েকবার জেলে গিয়াছে এই বলিয়াই যদি কেহ দেশ-সেবার বদলে আত্মসেবার ও স্বার্থপূরণের দাবি করে তবে সে বিতাড়নেরই যোগ্য। তিনি ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, যত শীঘ্র বি-পি-সি-সি ও বাংলার শাসন-পরিষদে নূতন নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হয় ততই দেশের মঙ্গল।

ইংরেজীতে এক সাধুর উক্তি আছে "*Plague on both your camps*" অর্থাৎ বিরোধী দুই দলই যখন অসৎ তখন দুই দলেরই মহামারীতে নিপাত বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমানে বাংলার রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্র সম্পর্কে স্থিরবুদ্ধি লোক মাত্রেরই বলা উচিত "*Plague on all your camps*"। সাধু এখানে কেহই নাই, প্রায় সকলেই স্বার্থান্ধ ও লালসার দহনে অমানুষ, যে সামান্য দুই-একজন পরম সততার ভেক ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহাদেরও দলগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত ক্ষমতা লাভের লালসায় চরম অধঃপতন হইয়াছে। আজ বাংলায় চরম দুর্দশার কারণ সে এই ঠকের দলকে মাথায় লইয়া এতদিন সকল দুঃখ বরণ করিয়া আসিয়াছে। ইহাদের বদলে অনভিজ্ঞ ও "ত্যাগের" ভেক বিবর্জ্জিত নূতন চোরের দল আসিলেও ভাল।

তাহার পর "সাম্য" গণতন্ত্রবাদের ধ্বজাধারী তথাকথিত "কমুানিষ্ট পার্টির" কথা। যুদ্ধের মধ্যেই ইহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর নিকট হইতে দুই হাতে টাকা লওয়ার অকাট্য প্রমাণ পাইয়া আমরা লিখিয়াছিলাম ইহারা "চাঁদিকে চক্তুকুরে পর দেশকো বেচনে ওয়ালে।" তখন অক্রের "কমুানিষ্ট" পার্টি বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা পাইতেছে কৃষি বিভাগ হইতে, ও বাংলার দল টাকা মারিতেছেন বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের জুটমিল লেবার বিভাগ হইতে। পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন বিগত ছয় বৎসরের মধ্যে এই পার্টি বিলাতী শোষকবর্গের কোনও চটকলে ক'দিনের জন্য ধর্ম্মঘট করিয়াছে? অথচ চটকলের মজুর এখনও অন্য সকল শ্রমিক অপেক্ষা অধিক নয়, বরঞ্চ বিশেষ কমই পায়। পণ্ডিত নেহরু ঠিকই বলিয়াছেন যুদ্ধের মধ্যে ইহাদের প্রধান পোষক ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী। ব্রিটিশ গিয়াছে, সুতরাং ইহারা আজ রুশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল। কোন্ কালাবাজারে ইহারা কবে হানা দিয়াছে? কালাবাজারীরাই তো ইহাদের দুগ্ধবতী গাভী। দেশে অন্নাভাব, অশান্তি ও অরাজকতা আসিলেই তো ইহাদের পঞ্চমবাহিনীর কার্য্য ঠিকমত চলিবে। নেতাজীকে ইহারা অকথ্য ভাষায় বিশ্বাসঘাতক বলিয়া গালি দিয়াছে, সোস্যালিষ্ট পার্টিকে শত্রুর পঞ্চমবাহিনী বলিয়া আক্রমণ করিয়াছে। ইহারাই জয়প্রকাশকে ধরাইল, আসামে সোস্যালিষ্ট পার্টির ষোল জনকে ফাঁসী দেওয়াইল, অথচ আজ সেই সোস্যালিষ্ট পার্টির বাংলার দলবল ছুটিয়াছেন ইহাদের পিছনে অনুচররূপে। বলিহারি বুদ্ধি-বিবেচনা বাংলার সোস্যালিষ্ট দলের!

বুঝহ বাঙালী ভাই! যদি বাঁচিবারে চাহো, তবে বুঝো, "ইয়ে সব্ ঝুটা হয়।" দলগত স্বার্থনীতি,—যাহার বিলাতি নাম Party-politics—সকল ক্ষেত্রেই একই অসার মাকাল ফল। এই রঙীন ফল দেখাইয়া, তোমার আমার মাথায় হাত বুলাইয়া, যে যার স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টাতেই আছে, কেহবা নিজস্ব স্বার্থের, কেহবা দলগত স্বার্থের।

পণ্ডিত নেহরুর ভাষণ

প্রায় দশ লক্ষ লোকের জনতার সম্মুখে গত ১৪ই জুলাই অপরাহ্নে এই ভাষণ হয়। ইহার সম্পূর্ণ ও সঠিক বিবরণী কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। আশা করি বেতারবার্তা বিভাগ ইহার পূর্ণ রেকর্ড রাখিয়াছেন, কেননা, এরূপ অকপট আলোচনা বাংলার বর্ত্তমান রাজনীতির ক্ষেত্রে এক অভিনব ব্যাপার। সংবাদপত্রে বক্তৃতার সারাংশ নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

পণ্ডিত নেহরু তাঁহার ভাষণে বলেন যে, ছয় মাস পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ইঁহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে কলিকাতা তথা বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। এখানে যাহা কিছু ঘটে, সারা দেশে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বড়ই দুঃখের বিষয়, এখানে বারবার গুলিবর্ষণ ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। অনেকে মনে করিতে পারেন—বক্তা বুঝি তাহা সমর্থন করিতে আসিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু স্পষ্টভাবে জানাইতে চাহেন যে, তিনি কাহারও পক্ষ সমর্থন করিতে এখানে আসেন নাই, তিনি আসিয়াছেন বাংলার পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করিতে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, দেশ বিভাগের ফলে যে অনিশ্চিত ও শান্তির বিঘ্নকর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তজ্জন্য বাংলার জনগণের দুঃখকষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কংগ্রেস যখন দেশের শাসনভার গ্রহণ করে, তখন দেশবিভাগজনিত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন তাহাদিগকে হইতে হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু স্বীকার করেন যে, দেশবিভাগের দরুন পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষভাবে কলিকাতায় বিশেষ কতকগুলি সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। এখানে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহু আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে। তাহারা বেকার হইয়া আছে। সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, দুঃখকষ্টের ফলে দেশে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু অসন্তোষকে ধুমায়িত করিলে কাহারও কোন লাভ হইবে না। বরং জনগণের দুঃখকষ্ট যাহাতে লাঘব হয়, তাহার চেষ্টা করা সকলের কর্ত্তব্য।

পণ্ডিত নেহরু বলেন, অন্যত্র অনেক জরুরী কাজ থাকা সত্ত্বেও কলিকাতা পরিদর্শনের প্রথম সুযোগ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ তিনি মনে করেন—তীব্র হতাশা বাংলা দেশকে অভিভূত করিয়াছে। একথা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধেও কতকাংশে সত্য বলা যাইতে পারে। যুদ্ধোত্তর সমস্যা, দেশ বিভাগজনিত অসুবিধা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা কারণে সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সঙ্কটজনক অবস্থায় যদি তাঁহারা ভুল পথ অনুসরণ করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতেও তাঁহারা ভুলের মধ্যেই বিচরণ করিবেন।' তাহার পরিণতি হইবে—অবশ্যম্ভাবী দুঃখকষ্ট। বক্তা ৩৫ বৎসর যাবৎ রাজনীতি ক্ষেত্রে কাজ করিতেছেন। স্বভাবতঃই তিনি ও ডাঃ কাটজু এখন পেন্সন উপভোগের দাবি করিতে পারেন। প্রশ্ন হইতেছে—তাঁহাদের পর দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে কে? আগ্রহের সহিত তিনি দেশের চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপে দেখিতেছেন—যুব সম্প্রদায় ভবিষ্যতের দায়িত্ব সম্বন্ধে নিজদিগকে কিভাবে প্রস্তুত করিতেছে।

প্রধান মন্ত্রী বলেন, সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া তাঁহারা ভুলভ্রান্তি করিবেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিচার করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য নহে, দেশসেবার বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া তাঁহাদিগকে সকল বিষয়ের বিচার করিতে হইবে।

যে সকল সমস্যা আজ দেশের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, ভারতের পক্ষেই তাহা যে বিশেষ সমস্যা তাহা নহে। আজ সারা বিশ্বে জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই বহু জটিল সমস্যার সম্মুখীন আমাদিগকে হইতে হইয়াছে। তিনি বলেন, 'আপনারা অন্ততঃ এইটুকু সম্মান আমাদিগকে দিবেন যে, আমরা দায়িত্ব এড়াইতে বা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে চাহি নাই। সকল জটিল সমস্যার সমাধান করিতে আমরা চেষ্টা করিয়াছি।'

বাংলার পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, সম্প্রতি দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইয়াছেন। ঘটনা হিসাবে ইহা যে খুব বড় ব্যাপার তাহা নহে। কিন্তু দেশের অপরাপর ব্যাপারের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে—ইহার গুরুত্ব আছে। পণ্ডিত নেহরু বলেন, আরও আগে কলিকাতায় আসিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁহাকে লাডক যাইতে হইয়াছিল। এই দেশটি তুষারাবৃত হিমালয় ও কারাকোরাম পর্ব্বতমালার মধ্যে অবস্থিত এবং তিব্বত, চীন ও রাশিয়ার সীমানার অতি নিকট। ভারতীয় সেনাবাহিনী সেখানে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে তাহাতে আজ সমস্ত ভারত গর্ব্ব অনুভব করিতেছে। দেশটির কথা ভাবিয়া দেখা এখানকার জনসাধারণেরও কর্ত্তব্য।

এখানে তিন দিন অবস্থান করিয়া তিনি প্রায় পাঁচ শত লোকের সঙ্গে সমষ্টিগত ও পৃথকভাবে দেখাসাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনি বিশেষভাবে একথা জানাইতে চাহেন যে, তিনি আসিয়াছেন প্রধানতঃ এখানকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে। অবশ্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলে তাঁহার সহকর্ম্মীদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁহার কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে। জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া তখন বলিবার সময় আসিবে। এখানে তিনি কংগ্রেসকর্ম্মী ও তাঁহাদের বিরোধী দল, শ্রমিক প্রতিনিধি, ছাত্র, মহিলা ও বাস্তুহারাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ তিনি শুনিয়াছেন। তিনি দুঃখের সহিত স্বীকার করেন যে, আজ কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে বিরোধ দেখা

দিয়াছে। দীর্ঘকাল যাবৎ কংগ্রেস দেশের সেবা করিয়াছে—আত্মবলিদান করিয়াছে, তাহার ফলে কংগ্রেস জনসাধারণের হৃদয়ে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। যতদিন ইহা দেশের সেবা করিবে, ততদিন কংগ্রেস জনগণের হৃদয়ের আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। যে মুহূর্তে ইহা জনসেবার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে, সেই মুহূর্তে জনগণের শ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিত হইবে। গণতন্ত্র হিসাবে জনসাধারণের সহিত তাঁহাদিগকে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করিতে হইবে।

পণ্ডিত নেহরু বলেন, প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে তিনি অনেক অভিযোগ শুনিয়াছেন। দেশে দুর্নীতি প্রসারলাভ করিয়াছে—একথাও তিনি শুনিয়াছেন। স্ত্রীলোকের উপর গুলীবর্ষণের কাহিনীও তিনি শুনিয়াছেন বাস্তুহারাগণের দুঃখকষ্ট এবং তাহাদের সাহায্যদানে কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্যের কথাও তিনি শুনিয়াছেন। ঔদাসীন্যের অনুযোগে তিনি শুধু এই কথাই বলিতে চাহেন যে, দেশসেবক হিসাবে ৩৫ বৎসরকাল তাঁহাকে জানা সত্ত্বেও যদি এখনও তাঁহারা তাঁহাকে না চিনিয়া থাকেন, তবে তাঁহার (পণ্ডিত নেহরুর) কথা আজ তাঁহাদিগকে বুঝাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই।

ইহা নিশ্চিত যে, দেশে দুর্নীতি বর্ত্তমান আছে। কেবল গবর্ণমেণ্টের মধ্যেই এই দুর্নীতি সীমাবদ্ধ নহে। অন্যত্রও ইহা বিস্তীর্ণ আছে। ইহার আরম্ভ ও বৃদ্ধি যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর লক্ষণ। দুর্ভিক্ষে যখন লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়াছিল, তখনও চোরাকারবারীরা লাভ করিয়াছে। তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা যখন কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন এবং হাজার হাজার সাহসী দেশপ্রেমিক যখন নির্যাতিত হইতেছিলেন তখন ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি মস্তক উত্তোলন করে। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের সক্রিয় সহযোগিতায় যুদ্ধের সময় তাহারা নিজদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। আজ জনসাধারণ সেকথা ভুলিয়া গিয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, আমেদাবাদ জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি বাংলার দুর্ভিক্ষের বিবরণ প্রাপ্ত হন। বিশ-ত্রিশ লক্ষ লোক যখন মৃত্যুর কবলে পতিত হয়, তখন চোরাকারবারীরা বিপুল লাভ করে। তখন তিনি বলিয়াছিলেন—মানুষের জীবনের বিনিময়ে যাহারা অর্থ সঞ্চয় করে, ফাঁসির চেয়ে বড় শাস্তি তাহাদের যোগ্য প্রাপ্য। ফাঁসি তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট সাজা নহে। এখন বক্তাকে বলা হইতেছে—তিনি চোরাকরিবারীদের বন্ধু—অতীতের কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু বলেন, তিনি শপথ করিয়া বলিতে পারেন—তাহা সত্য নহে। আজ নৈতিক মান নিয়ের দিকে নামিয়াছে। অপরাধীকে অবশ্যই সাজা দিতে হইবে। আজ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ ইত্যাদি নানা অভিযোগ তাঁহার কাছে আসিয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রমাণের জন্য যখন প্রশ্ন করা হয় তখন কেহই অভিযোগ প্রমাণ করিতে পারে না। তিনি বলেন, দায়িত্বহীন আলোচনায় যোগ না দেওয়া সকলের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। সকলে যখন চোর চোর বলিয়া চীৎকার করে তখন প্রকৃত চোর ধরা না পড়ার সম্ভাবনাই বেশী হয়। অতিশয়োক্তি দ্বারা সমস্যার সমাধান হওয়া কঠিন। তিনি জোরের সহিত বলেন যে, বিগত দুই মাস যাবৎ দুর্নীতি হ্রাস পাইতেছে। প্রত্যেককে দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া যদি দায়ী করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চিত ক্ষতি করা হইবে।

সরকারের পক্ষ হইতে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, অপরাধী যত বড়ই হউক না কেন, তাঁহার কাছে তাহার ক্ষমা নাই। তিনি জানান যে, এ সম্পর্কে জনসাধারণের সহযোগিতা তিনি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবেন।

কলিকাতায় গুলীচালনার ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া প্রধান মন্ত্রী বলেন, গুলীচালনার ব্যাপার যে অতীব দুঃখজনক সেই সম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বিমত হইতে পারে না। বিশেষ করিয়া একটি সাম্প্রতিক ঘটনায় যে কয়েকজন নারী নিহত হইয়াছে তাহাপেক্ষা দুঃখের ব্যাপার আর কি হইতে পারে। অবশ্য তিনি এই কথাও বলিতে পারেন না যে, কোন ক্ষেত্রেই গুলীচালনা হওয়া উচিত নহে। দেশের বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর স্বার্থের জন্য শান্তি ও শৃঙ্খলা অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। কলিকাতার বর্ত্তমান সময়কার অবস্থা এক মুহূর্ত্তের জন্য জনসাধারণ একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। কলিকাতায় এক্ষণে কিছু লোক আছে যাহারা বোমা ও এসিড বাল্‌ব ব্যবহার করিয়া থাকে। গবর্মেণ্টের হাতে এমন সব প্রমাণ আছে যে, এসব ঘটনা মূলতঃ কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়ার দ্বারাই হইতেছে এবং উহা কেবলমাত্র কতিপয় ভ্রান্তপথে পরিচালিত যুবক ও যুবতীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির একটা সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চলিতেছে। ইহা কিছুতেই বরদাস্ত করা যাইতে পারে না

জনসাধারণ এই সব গুণ্ডামী সহ্য করিতেছে ইহা ভাবিয়া পণ্ডিতজী বিস্ময়বোধ করেন। জনগণ যদি ক্রমাগত এই সব দুষ্কার্য্য নীরবে সহ্য করে তাহা হইলে কলিকাতার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল হইয়া পড়িবে। দেশের অবশিষ্ট অংশে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে এবং ক্রমশঃ উহা সর্ব্বত্র বিস্তারলাভ করিবে। একদল দুর্বৃত্ত ভাবিতে পারে যে, নির্ভয়ে তাহারা এই দুষ্কার্য্য করিয়া যাইতে পারিবে। ইহার ফলে কাহারও জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা থাকিবে না। প্রশ্ন হইতেছে, এই সম্বন্ধে কলিকাতার ৫০।৬০ লক্ষ লোক কি ভাবে চিন্তা করে। কলিকাতার জনসাধারণের ঔদাসীন্যের ফলে সমস্যা আরও জটিল হইতেছে। পণ্ডিতজী বলেন, "আমি বলিতে পারি কেবল পুলিস এবং মিলিটারীর সাহায্যে দেশে

শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। প্রধানতঃ জনসাধারণের সহযোগিতার দ্বারাই শান্তিরক্ষা সম্ভব হইতে পারে। জনসাধারণের সহযোগিতা ব্যতীত পুলিস বা মিলিটারী শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে পারে না।

প্রধান মন্ত্রী বলেন, তিনি কমিউনিষ্ট মতবাদ পড়িয়াছেন এবং বুঝিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। তিনি অন্ততঃ উহার কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াও নিজেকে মনে করেন। সাম্যবাদের নামে কলিকাতায় যাহা ঘটিয়াছে, এমন ধরণের কিছুই তিনি ঐ মতবাদের কোথাও পান নাই। তাহাদের অবিলম্বে উপলব্ধি করা উচিত যে, হিংসার দ্বারা কোন উন্নতিই হইতে পারে না। শান্তিপূর্ণ উপায়ে কি ভাবে স্বাধীনতা অর্জিত হইতে পারে এই সম্পর্কে দৃষ্টান্ত তাহাদের সম্মুখে আছে। তাঁহার এইটুকু বলিতে কোন দ্বিধা নাই যে, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিই হইতেছে কমিউনিজমের পরম শত্রু। বর্তমানে যাহা হইতেছে, ইহা যদি ক্রমাগত চলিতে থাকে, তাহা হইলে হিংসার মধ্যেই উহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে এবং তখন একমাত্র ধ্বনি উত্থিত হইবে "হয় অরাজকতা সমর্থন কর, নয় মৃত্যুবরণ কর।"

পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, তাঁহারা সকলেই জীবনধারণের উচ্চ মান বাড়ানোর জন্ত চেষ্টা করিতেছেন। বেশী পরিমাণে উৎপাদন করিলেই জীবনধারণের মানের উন্নতি সম্ভব। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টি ইহার বিরোধী। তাহারা দারিদ্র্যই বেশী পছন্দ করে এবং চায় যে, উৎপাদন কম হউক। ইহা হইলেই শ্রমিকরা বিদ্রোহ করিবে।

(এই সময় শ্রোতাদের এক অংশের মধ্যে কিছু গোলমালের সৃষ্টি হয়। ঐ সময় প্রচারপত্র উড়িতে দেখা যায়।) পণ্ডিত নেহরু বলেন, ইহা কি বিচিত্র বলিয়া মনে হয় না, যাহারা ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে চীৎকার করে, তাহারাই হইতেছে স্বাধীনতার প্রধান শত্রু? তিনি এই সব বাধা বা গোলমালে নিরস্ত হইবেন না। এবং ইহাও ঠিক যে সাফল্যের সহিত সভার সমাপ্তি হইবে। তিনি চাহেন না যে পুলিস এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুক এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনিষ্টকারীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করুক। যে বিপুল সংখ্যক লোক সভায় বক্তব্য শুনিবার জন্ত সমবেত হইয়াছে, তাহারাই এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে। পণ্ডিত নেহরু পুলিসকে নিরস্ত থাকিতে নির্দেশ দান করেন।

পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণ, বিশেষ করিয়া বিহার ও কুচবিহার রাজ্যের উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত নেহরু বলেন, একটা অভিযোগ উঠিয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার দাবী উপেক্ষা করিয়াছে। তিনি বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের এইরূপ দাবী করিবার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে সমালোচনা করিবার নিশ্চিতই অধিকার আছে।

এই প্রশ্ন সম্পর্কে তিনি তাঁহার পূর্ব্বেকার ঘোষণার উল্লেখ করেন। এই বিষয় সম্পর্কে যদি এক্ষণেই হস্তক্ষেপ করা হয়, তাহা হইলে একটা অশোভন ঝগড়ার সৃষ্টি হইবে। তিনি তাঁহাদের এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে, উপযুক্ত সময়ে এই সব সমস্তার অবশ্যই মীমাংসা হইবে। আগামী তিন-চার বৎসর তাঁহাদিগকে অন্তান্ত এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্তার প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে। স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর ভারতবর্ষের মানচিত্র বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং হয়ত আরও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। বহুসংখ্যক দেশীয় রাজ্য আজ অন্ত প্রদেশ বা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে অথবা সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে, দেশীয় রাজ্যগুলির এখন আর পৃথক সত্তা নাই। তাঁহার একান্ত বিশ্বাস, বাংলার সীমানা নির্দ্ধারণের প্রশ্নটি যদি একটা শান্ত পরিবেশের মধ্যে এবং উপযুক্ত সময়ে বিবেচনা করা হয় তাহা হইলে ইহার সমাধান হইবে। এই ভাবে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। সমগ্র দেশকে একটা আন্তঃপ্রাদেশিক বিরোধের মধ্যে টানিয়া ফেলা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গ যে খুব ঘনবসতিসম্পন্ন এবং পরে উহার উপর যে চাপ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা তিনি উপলব্ধি করেন। কিন্তু এই সমস্তা কেবল বাংলারই নহে। ইহা সর্ব্বভারতীয় সমস্তা। কুচবিহারের সমস্তা সম্পর্কে তিনি বলিতে পারেন যে, ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের ইচ্ছা অনুযায়ীই ঐ প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে। এক্ষণে বর্ত্তমান ব্যবস্থাই অক্ষুন্ন থাকিবে।

প্রধান মন্ত্রী দৃঢ়তার সহিত বলেন, কংগ্রেস দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্ব্বাচনে পরাজিত হইয়াছে বলিয়া তিনি এখানে আসেন নাই। তিনি শুধু জানিতে আসিয়াছেন, বাংলা দেশে এত লোক আজ বিরূপ হইয়া পড়িল কেন? কংগ্রেস যদি উহার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া থাকে, তবে জনসাধারণ কংগ্রেস ত্যাগ করিবে। কিন্তু তাঁহার জানিতে ইচ্ছা হয়, কংগ্রেস ছাড়া আর কোন্ শক্তি আছে, যে শক্তি দেশের সংহতি রক্ষা করিতে পারে। তাঁহার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, ইংরেজের ভারত ত্যাগকালে কংগ্রেস না থাকিলে ভারতবর্ষ খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যাইত। কংগ্রেসের যদি অবনতি ঘটে এবং উহা বিশৃঙ্খল হইয়া যায় তবে ছোট ছোট বিভেদকারী দলের উদ্ভব হইবে এবং দেশে কোন শক্তিশালী সরকার গঠনই সম্ভব হইবে না। দেশের শত্রুগণ ইহার সুযোগ লইবে মাত্র। তখন ভিতর ও বাহির হইতে বিপদ দেখা দিবে। প্রধান মন্ত্রী হিসাবে তাঁহাকে অবশ্যই নিরপেক্ষ থাকিতে হইবে এবং কংগ্রেস বিভ্রান্ত হইলে কংগ্রেসকর্ম্মিগণকেও তিনি ভর্ৎসনা করিবেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার মনোবেদনার কারণ হইয়াছে যে, এই দেশের অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে এবং ইহার প্রধান কারণ কংগ্রেসকর্ম্মিগণের মধ্যে অনৈক্য। তিনি বলেন, উপর

হইতে কিছু চাপানো যায় না। স্থানীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের স্বীয় প্রচেষ্টায় উন্নতি না ঘটিলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কিম্বা কেন্দ্রীয় সরকার সে বিষয়ে কোন সহায়তা করিতে পারেন না। এই সব সমস্তার সমাধান প্রকৃতপক্ষে এই প্রদেশের অধিবাসীরাই করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার যাহা করিবেন, তাহা সাময়িক হইবে মাত্র।

পণ্ডিতজী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের এই হতাশা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে যে, বয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আগামী আঠারো মাসের মধ্যে নির্ব্বাচন হইতে যাইতেছে। নির্ব্বাচনের পর প্রদেশবাসিগণ তাহাদের পছন্দমত সরকার গঠন করিতে পারিবে। কিন্তু একথা কাহারও কল্পনা করা উচিত নহে যে, এসিড বাল্ব বা বোমা দ্বারা এই সরকারের অপসারণ সম্ভব। তিনি কংগ্রেস-কর্ম্মিগণকেও দেশের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিতে চাহেন। তাঁহারা এতকাল সরকারের মন্ত্রী অথবা চাকুরিয়া না হইয়াই জনগণের সেবা করিয়াছেন। তিনি মনে করেন, কংগ্রেসকে উন্নত করিতেই হইবে এবং এখানে যথাসম্ভব শীঘ্র নূতন নির্ব্বাচন হওয়া প্রয়োজন। বাঙালীরা যত শীঘ্র তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা সরকার গঠন করিতে পারে, ততই তাহাদের পক্ষে মঙ্গল।

এগারো বৎসর পূর্ব্বে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু গঠিত জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির কথা উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত নেহরু বলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই দেশে ভীষণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সুতরাং সরকারকে কিছুকালের জন্য এই পরিকল্পনা স্থগিত রাখিতে হয়। তিনি মনে করেন, এখন সকল প্রাদেশিক সরকারের প্রথম কর্ত্তব্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। বুদ্ধি এবং শিক্ষার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আজ তদপেক্ষা বেশী প্রয়োজন সাধুতা ও সত্য-সন্ধিৎসার; তিনি তাঁহাদিগকে এই ভরসা দিতে পারেন যে, দুর্নীতির অভিযোগ মাত্রই বিচার করিয়া দেখা হইবে।

পণ্ডিতজী এরূপ আশা ব্যক্ত করেন যে, কলিকাতার সকল হাঙ্গামা শীঘ্রই চুকিয়া যাইবে। তিনি পুলিসকে জনগণের সহযোগিতা করিতে ও সেবাবুদ্ধি লইয়া কাজ করিতে বলেন। তিনি জনগণকেও পুলিসকে আপনজন বলিয়া মনে করিতে অনুরোধ জানান।

পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুগণ সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী বলেন, অনেকের ধারণা, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তুগণ অপেক্ষা পশ্চিম পাকিস্থানের উদ্বাস্তুগণ বাবদ অধিক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তিনি এই আশ্বাস দিতে পারেন যে, এ বিষয়ে কোন বৈষম্য প্রদর্শন করা হয় নাই। প্রকৃত ঘটনা এই যে, পশ্চিম পাকিস্থানে জনগণের সমূহ উচ্ছেদসাধন হইয়াছে। পক্ষান্তরে সৌভাগ্যবশতঃ পূর্ব্ব পাকিস্থানে লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে থাকাই স্থির করিয়াছে। সুতরাং এখানকার সমস্তাটা এত বড় আকারে দেখা দেয় নাই। তথাপি পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে যাহারা আসিয়াছে, তাহারা পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত ব্যক্তিদের মতই সকল সুবিধা পাইবে। কিন্তু এ কথা তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিবেন যে, সত্তর লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্ব্বসতি সহজ কাজ নহে। তাঁহারা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ হইতে কোন সাহায্য পান নাই। তাঁহারা নিজেরাই যথাসাধ্য এই সমস্তার সমাধান করিয়াছেন। পণ্ডিতজী বলেন, এই সম্পর্কে কেহ কেহ স্বায়ত্তাধীন মণ্ডলী গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তিনি ইহা সমর্থন করেন। এই কাজ উদ্বাস্তুগণকেই লইতে হইবে। তিনি স্বীকার করেন যে, সরকারী ফাইলের গোলকধাঁধায় কাজে কতকটা দেরী হইয়া যায়। সুতরাং উদ্বাস্তুগণ নিজেরাই যদি কাজ সুরু করে, তবে উহা ভালই হইবে। যাদবপুর এবং নদীয়া জেলার শক্তিনগরে উদ্বাস্তুগণ নিজেরাই এই ধরণের ভাল কাজ করিয়াছে শুনিয়া তিনি আনন্দলাভ করিয়াছেন।

উপসংহারে তিনি দেশের খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে একটি কথা বলিতে চাহেন। যুদ্ধকালে দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তদুপরি দেশ বিভাগোত্তর কালে খাদ্যোৎপাদনে অসুবিধা দেখা দিয়াছে। বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীতে তাঁহাদের বহু অর্থ ব্যয় হয়। দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহারা যাহাতে খাদ্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কর্ত্তব্য সরকারের সহিত সহযোগিতা করা। তিনি ইহা জানিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বয়স্ক ব্যক্তিগণের বরাদ্দ খাদ্য দৈনিক ৯ আউন্স হইতে ১২ আউন্স পরিমাণে বৃদ্ধি করিতেছেন।

বাংলার রেশনিং

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সুইজারল্যাণ্ড যাত্রার প্রাক্কালে প্রদত্ত বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের রেশনিং ইউরোপের যে কোন দেশের রেশনিং হইতে শ্রেষ্ঠ একথা তিনি আসানসোলের এক বিদেশী পাদ্রীর নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছেন। কলিকাতার রেশনের পরিমাণ যে অসম্ভব রকমে কম ছিল এবং তাহা বাড়ানো যে কঠিন ছিল না একথা এখন কার্য্যের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে; দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্ব্বাচনের পর রেশনের পরিমাণ একবারে এক-তৃতীয়াংশ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

তার পর দোষ গুণের কথা। এখানে রেশনে শুধু চাউল ও আটা দেওয়া হয়। চাউল দুই প্রকার দেওয়ার কথা, কিন্তু নিকৃষ্ট চাউলই সাধারণতঃ পাওয়া যায়। চাউলের সঙ্গে মিশিয়া যায় এরূপ কাঁকড়ে প্রত্যেক দফার চাউলে মিশান থাকে, উহাতে খানিকটা বাদ পড়ে। কোন কোন চাউল হইতে সাদা হাড়ের টুকরা বাহির হইয়াছে। আটার সঙ্গে

ভুষির গুঁড়া হইতে সুরু করিয়া কত জিনিষ যে ভেজাল চলিতেছে তাহার অন্ত নাই। 'শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াইবে তাই সয়'—এই মহাবাক্যও সরকারী রেশনের চাউল ও আটা ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। পেটের বিভিন্নপ্রকার অসুখ এখন ঘরে ঘরে। রেশনের চাউল, আটা, আর বাজারের শিয়াকুল কাঁটা ভেজাল দেওয়া সরিষার তেল—আর কয়েক বৎসর এভাবে চলিলে বাঙালী জাতির অস্তিত্ব রক্ষা দুরূহ হইয়া উঠিবে।

ডাঃ রায় বলিয়াছেন, আমাদের রেশন ব্যবস্থা ইউরোপের সব দেশের চেয়ে ভাল। সুতরাং এই প্রসঙ্গে ব্রিটেনের রেশনের কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

যুদ্ধারম্ভের ৩।৪ মাস পর ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে ইংলণ্ডে রেশন প্রথার প্রবর্ত্তন হয়। প্রথমে মাখন, বেকন (শুকরের মাংস) ও চিনি এই তিনটি জিনিষের রেশনিং হয় এবং ক্রমে ক্রমে চীজ, চর্ব্বি, মাংস, ডিম, চা, ময়দা, চকোলেট, সন্দেশ, বিস্কুট, কলা, দুধ ইত্যাদি যাবতীয় খাদ্যবস্তুর উপর ইহা প্রযুক্ত হয়। ইংলণ্ড আহার্য্যদ্রব্য বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে, স্বাভাবিক অবস্থায়ও বিদেশ হইতে তাহাকে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিতে হয়। যুদ্ধের সময়ে জাহাজের অভাব ও সামুদ্রিক বাণিজ্য বিপৎসঙ্কুল হইয়া পড়িলেও ইংলণ্ড বিদেশ হইতে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী আমদানি করিয়াছিল। যুদ্ধের পর এখন পর্য্যন্ত সেখানে রেশনিং ও কন্ট্রোল প্রথা চালু আছে। পরমাশ্চর্য্যের কথা, রেশনিং ও কন্ট্রোলের এই নয় বৎসরে সে দেশে লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, প্রাক্-রেশনিং কাল হইতে সাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়াছে বলিয়া সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ।

এই বিস্ময়কর সাফল্যের প্রধান কারণ রেশনিং প্রথা প্রবর্ত্তনের প্রথম হইতেই ইংলণ্ডের গবর্মেণ্টের বিশেষ লক্ষ্য ছিল জাতীয় স্বাস্থ্যের যাহাতে কোনরূপ অবনতি না ঘটে তার ব্যবস্থা করা। একজ গবর্মেণ্ট প্রথমেই ঘোষণা করেন যে স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু সরবরাহের দায়িত্ব তাহারা গ্রহণ করিলেন এবং যাহাতে সকলে উচিত মূল্যে খাদ্যদ্রব্য পায় এবং পুষ্টিকর আহার্য্য দ্বারা জাতির স্বাস্থ্য যাহাতে উন্নত হয় সেই ব্যবস্থা তাঁহারা করিবেন। বালক-বালিকা, সন্তান-সম্ভবা স্ত্রীলোক, প্রসূতি, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও কলকারখানার শ্রমিকদের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা করা হইল। আহার্য্যবস্তুর উৎপাদক ও ব্যবহারক উভয়ের স্বার্থ যাহাতে সমভাবে রক্ষিত হয় তৎপ্রতিও গবর্মেণ্ট দৃষ্টি রাখিলেন। সরকারী সাহায্য দিয়া প্রধান প্রধান খাদ্যবস্তুর মূল্য হ্রাস করা হইল—যাহাতে দরিদ্ররাও কোনরূপ বঞ্চিত না হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে খাদ্য-বস্তুর দর কমাইবার জন্ত ইংলণ্ডের রাজকোষ হইতে ৩৯২০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে।

১৯৪৯ সালের ২৭শে মার্চ্চ তারিখের ইংলণ্ডের রেশন বিবরণীতে নিম্নলিখিত বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ আছে:

১। সন্তানসম্ভবা স্ত্রীলোক: অতিরিক্ত মাংস, ডিম, রুটি, আলু, কলা, কমলালেবুর রস, কডলিভার অয়েল অথবা ভাইটামিন ট্যাবলেট এবং দুধ। যাহাদের কিনিবার সামর্থ্য নাই তাহাদের দুধ, কমলালেবুর রস ও ভাইটামিন ট্যাবলেট সরকার হইতে বিনামূল্যে দেওয়া হইয়া থাকে। দুধ প্রত্যহ আধ সের করিয়া দেড় পেনি মূল্যে পাওয়া যায়। এই মূল্য চলতি বাজার দরের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র।

২। প্রসূতি: সন্তান জন্মের পর ১২ মাস পর্য্যন্ত অতিরিক্ত দুধ দৈনিক আধ সের ও ভাইটামিন ট্যাবলেট (বিনা মূল্যে)।

৩। শিশু ও বালক-বালিকা: দুধ, কমলালেবুর রস, কডলিভার অয়েল বা ভাইটামিন ট্যাবলেট, শুষ্ক দুগ্ধ (dried milk), ডিম, রুটি ও কলা। বয়সের অনুপাতে জিনিষের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হয় এবং দরিদ্রদের বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

৪। শ্রমিক: অতিরিক্ত রুটি, মাংস ও চীজ, কোকো।

৫। রুগ্নদের জন্ত অতিরিক্ত দুধ ও ডিমের ব্যবস্থা আছে।

৬। বৃদ্ধদের অতিরিক্ত চা ও কলা দেওয়া হয়।

কয়েকটি বিশেষ স্থলে দুধ দেওয়া বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হিসাবে সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন, সন্তানসম্ভবা স্ত্রীলোকদের দৈনিক আধ সের, এক বৎসর পর্য্যন্ত শিশুদের সপ্তাহে ৬ সের এবং তদূর্দ্ধ হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত দৈনিক আধ সের, সন্তান জন্মের পর ১২ মাস পর্য্যন্ত প্রসূতিকে দৈনিক আধ সের, পাঁচ বৎসরের উর্দ্ধ ১৮ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের সপ্তাহে পৌনে দুই সের, রুগ্নদের সপ্তাহে ৭ সের পর্য্যন্ত দুধ দিবার ব্যবস্থা আছে। স্কুলে ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে দুধ ও খাবার দিবার ব্যবস্থা ১৯৪৪ সালের এডুকেশন এ্যাক্ট অনুসারে বাধ্যতামূলক এবং রেশনিং প্রথায়ও ইহা বলবৎ রহিয়াছে। দৈনিক প্রায় ২৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে এইভাবে ফ্রি খাবার দেওয়া হয়।

যাহারা কায়িক পরিশ্রম করে, যেমন খনি ও ফ্যাক্টরীর মজুর, তাহাদের শ্রমের তারতম্য অনুসারে অতিরিক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তা ছাড়া শিল্প প্রতিষ্ঠান, স্কুল, নার্শারি ও যুবপ্রতিষ্ঠানসমূহে অতিরিক্ত হারে খাদ্যবস্তুর বরাদ্দ রেশনিঙে দেওয়া হইয়াছে। রেশনিং-নির্দ্দিষ্ট হারে ও নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্ত প্রয়োজন মত সরকারী রেস্তোঁরা প্রতিষ্ঠা করার জন্ত ১৯৪৭ সালে এক আইন করা হইয়াছে।

শ্রেণী, বৃত্তি ও শারীরিক প্রয়োজন অনুসারে পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবহারের ফলে রেশনিং প্রথা ব্রিটেনের লোকদের কল্যাণ করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের হিসাব

বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ প্রধান মন্ত্রী বেঞ্জামিন ডিজরেলি সংখ্যা-শাস্ত্রকে (statistics) মিথ্যার সমপর্য্যায়ে ফেলিয়াছিলেন। কারণ এই সংখ্যা-সমষ্টি দ্বারা সত্যমিথ্যার ব্যবধান দূর করা কঠিন নয়। পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ মন্ত্রীর মুখে অনেক সময়েই আমাদের খাদ্যশস্যের প্রয়োজন সম্বন্ধে নানা হিসাব শুনিতে পাই। সম্প্রতি তিনি যে হিসাব দিয়াছেন, "যুগবাণী" পত্রিকায় তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। নিম্নে তাহা তুলিয়া দিলাম :

> পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি-প্রস্পেক্টাসে বলা হইয়াছে এক একরে গড়ে ১২'১৭ মণ চাউল পাওয়া যায়। ইহা ফ্লাউড কমিশন রিপোর্ট এবং সাধারণ জ্ঞান উভয়ের সঙ্গেই মেলে। এই হিসাবে একর প্রতি ১২ মণ ধরিয়া ৯৩,২০,০০০ একরে চাউল পাওয়ার কথা বৎসরে ১১,১৮,৪০,০০০ মণ। ঐ প্রস্পেক্টাসেই ১৬ পৃষ্ঠা পরে বলা হইতেছে পাঁচ বছরে গড়ে বার্ষিক নীট চাউল পাওয়া গিয়াছে ৩১,৮৬,০০০ টন, অর্থাৎ ৮,৬০,২২,০০০ মণ। অথচ ইশাক রিপোর্ট এবং ফ্লাউড কমিশন রিপোর্টে পাওয়ার কথা ১১ কোটি টনের উপর। ইশাক রিপোর্ট অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এইজন্য যে মাঠে মাঠে লোক পাঠাইয়া প্রত্যেকটি ক্ষেতের হিসাব লইয়া ঐ রিপোর্ট প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রস্পেক্টাসের নীট চাউলের গড়পড়তা হিসাব কোন্ তথ্যের উপর করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ নাই। উপরোক্ত দুইটি হিসাবের তুলনাতেই উহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ভাবে কম। এই হিসাবেও কিন্তু ভয়ের কারণ নাই ; উহাতে পাওয়া যাইতেছে—
>
> | | | |
> |---|---|---|
> | চাউল | ৮,৬০,২২,০০০ | মণ |
> | গম | ৬,৭৫,০০০ | " |
> | ভারত-সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত চাউল ও গম ... (২,৮০,০০০ টন) | ৭৫,৬০,০০০ | " |
> | মোট | ৯,৪২,৫৭,০০০ | " |
>
> এই হিসাবে খুব খারাপ বৎসরেও ৫০ লক্ষ মণের বেশী ঘাটতি হইতে পারে না ; মন্ত্রী মহাশয় যে দেড় কোটি মণ ঘাটতির ভয় দেখাইয়া থাকেন তাহা কিছুতেই হয় না। পশ্চিমবঙ্গের চাউল আজ পূর্ব্ববঙ্গে যাইতেছে না, গড়পড়তা উৎপাদনও সাড়ে আট কোটি স্থলে ১০ বা ১১ কোটি হওয়ার কথা। তিনটি সরকারী রিপোর্টের মধ্যে নির্ভরযোগ্য দুইটিতে পাওয়া যায় ১১ কোটি মণ। সেন মহাশয় গড়পড়তা উৎপাদন সাড়ে আট কোটি মণ কোথায় পাইলেন তাহা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

এই সমস্তা সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন হওয়া উচিত পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্য অপ্রচুর কিনা, বা যতটা অপ্রচুর বলিয়া ঘোষণা করা হয়, তার মধ্যে কোন সত্যবস্তু আছে কিনা। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এরূপ প্রশ্ন কখনও নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। অথচ অপর দিকে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের অভাব আছে, এই কথাটার উপরই সেন মহাশয়ের বিভাগটা দাঁড়াইয়া আছে। অভাব ত নাই-ই, বরং প্রাচুর্য্য আছে, সেই কথাটাই এখন শুনিতেছি। "হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড" পত্রিকার বাণিজ্য-সচিব বলিতেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে ২১ লক্ষ মন খাদ্যশস্য বাড়তি হওয়া উচিত—জন প্রতি দৈনিক অর্দ্ধ সের খাদ্য শস্যের ব্যয় ধরিয়া। এই কথা সত্য হইলে সেন মহাশয়ের বিভাগকে ত তুলিয়া দিতে হয়। কৃত্রিম অভাবের উপর তাঁহার ঠাট বজায় আছে। সেন মহাশয় যে তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের নানা উপদেশ দেন, তার ভিত্তিই যে সরিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

বাংলায় রেশন-বহির্ভূত খাদ্য

সরবরাহ সচিব শ্রীপ্রফুল্ল সেন রেশন দ্রব্যের ঘাটতি মিটাইবার জন্ত সকলকে রেশন-বহির্ভূত দ্রব্য বেশী খাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। ইহা করিবার পক্ষে বাধা দুইটি—রেশন-বহির্ভূত দ্রব্যাদির উচ্চমূল্য ও উহাদের অভাব। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, তরকারি প্রভৃতির এত বেশী চড়া দাম থাকিতেছে যে স্বাভাবিক অবস্থায় লোকে ঐগুলি যে পরিমাণে ক্রয় করিত এখন তার অর্দ্ধেক বা এক-চতুর্থাংশের বেশী কিনিতে পারে না। বাজার দরের নিম্নলিখিত হিসাব দেখিলেই উহা ভাল ভাবে বুঝা যাইবে—

বাজার দর

	১৯৪১ সের	১৯৪৯, জুন মাস সের
রুই মাছ	॥৶০	৩॥০
ইলিশ	॥০	৩৲
বাগদা চিংড়ি	॥৶০	৩।০
কুচো চিংড়ী	।০	২৲
মৌরলা	।০	২॥০
আলু	⁄১০	॥৶০
পেঁয়াজ	৶০	॥০
বেগুন	৶০	৸০
ঢেঁড়স	⁄১০	॥৶০
পটল	৵০	৸০
দুধ	।০	১৲
চিনি	।৫	৸৶০
মসুর ডাল	৶১০	॥৵০
মুগ ডাল	।০	১৶০
ঘি (নামে পাওয়া)	১॥০	৯।০

এই তো গেল খাদ্যদ্রব্য। ঐ সঙ্গে কয়লা, তেল প্রভৃতির মূল্যবৃদ্ধি নিম্নোক্তরূপ :

কয়লা	।।০	১।।৶০ + কুলি ভাড়া ।০

(এক-তৃতীয়াংশ গুঁড়া সহ এই দাম। বাছিয়া লইলে ২।০ + ।০ কুলি ভাড়া।)

সরিষার তেল	।।৶০	২।০
নারিকেল তেল	।।০	২।০

এবার ভাত রুটি ভিন্ন অন্য খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের অবস্থা দেখা যাক। এই হিসাব বাংলার সরকারী কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা Prospectus for Agriculture in West Bengal হইতে গৃহীত। উহার ২৭ পৃষ্ঠায় ২২নং তালিকায় পশ্চিমবঙ্গে ভাত রুটি ভিন্ন অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন, আমদানী, মোট সরবরাহ এবং ঘাটতির পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে।

	পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদন	বাহিরের আমদানী	মোট প্রয়োজন	ঘাটতি
	টন	টন	টন	টন
মাছ	২৭,০০০	২৬,০০০		
মাংস	৩০,০০০	৬,০০০	৬,৩৮,৯০০	৫,৪৮,৮০০
মুরগী	৩,০০০	১,১০০		
আলু	৩৪৭,৩০০	১২০,০০০	১,২৭৭,৮০০	৮৪৫,২০০
তরকারি	জানা নাই	জানা নাই	জানা নাই	জানা নাই
ঘি এবং মাখন	৭৬০০	৬০০০	৪,২৬,০০০	৩,৬৬,২০০
সরিষার তেল	১১,০০০	৩৭,০০০		
ডাল	২,৬৬,৮০০	১,০০,০০০	৬,৩৮,৯০০	২,৯৮,৮০০
চিনি ও গুড়	১,০২,২০০	১,৮৬,৫০০	৪,২৬,০০০	১,৫৭,৫০০
দুধ	৩,৯২,৮০০		২১,২৯,৯০০	১৭,৭৬,৪০০
ডিম, সংখ্যা—	৫ কোটি ৫৩ লক্ষ	৮ কোটি	৭৬৩ কোটি ৩৫ লক্ষ	৭৫০ কোটি ৫৬ লক্ষ

এই হিসাবে বীজ এবং চারার জন্য উৎপাদন হইতে শতকরা দশ ভাগ বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং আমদানীর মোট হিসাব ধরা হইয়াছে।

প্রয়োজন হিসাব হইয়াছে ডাঃ আয়ক্রয়েডের তালিকানুসারে; শ্রীপ্রফুল্ল সেন ঐ তালিকানুসারেই আমাদের পুষ্টিকর খাদ্য খাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু টাকা এবং জিনিষ দুইটিরই যদি এত অভাব থাকে তবে তাঁহার পরামর্শানুসারে চলিবার উপায় কি ?

বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দিরের নানা গবেষণার পরিচয় সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। সাধারণ পাঠকের বোধগম্য ভাষায় এই গবেষণার ফলাফল বুঝাইবার চেষ্টাও দেখি নাই। "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিবরণটি সাধারণের শিক্ষাপ্রদ :

বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডাঃ কে. টি. জেকব পাটের বীজে বিভিন্ন পরিমাণের এক্স-রে প্রয়োগ করে সাড়ে বাইশ ফুট লম্বা এবং আড়াই ইঞ্চি মোটা বিরাট আকারের পাটগাছ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। সাধারণভাবে ওই বীজ থেকে প্রায় ১৫ ফুট লম্বা এবং ১ ইঞ্চি মোটা সবচেয়ে ভাল পাটগাছ পাওয়া গেছে। সাধারণ ক্ষেতে পাটগাছ উৎপাদনে প্রায় ১৭ সপ্তাহ সময় লাগে; কিন্তু এক্স-রে প্রয়োগে আট সপ্তাহের মধ্যেই পাট উৎপন্ন করা যায়।

কলকাতা থেকে সাতাশ মাইল দূরবর্ত্তী বিজ্ঞান-মন্দিরের কৃষি পরীক্ষা ক্ষেত্রে পাট ও তুলা সম্পর্কে গবেষণা করে তিনি এই ফল পেয়েছেন। গবেষণাগারে এক্স-রে প্রয়োগের পর সাধারণতঃ কৃষিক্ষেত্রে যে ভাবে রোপণ করা হয়, বীজগুলোকে সে ভাবেই রোপণ করা হয়েছিল।

মিশ্র-প্রজনন এবং এক্স-রে প্রয়োগে ডাঃ জেকব ১'৪ ইঞ্চি দীর্ঘ লিন্টের কার্পাস উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন; লায়ালপুর এবং মাদ্রাজের কার্পাসের লিন্টের দৈর্ঘ্য সর্ব্বাধিক ১'১ ইঞ্চির বেশী হয় না। উৎপাদন-পরিমাণও মাদ্রাজের উৎপাদনের চেয়ে আড়াই গুণ বেশী। এ প্রদেশের জমির উর্ব্বরতাই উৎপাদন বৃদ্ধির শতকরা নব্বই ভাগ কারণ বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। ডাঃ জেকবের গবেষণায় সাধারণ ক্ষেত্রে ৮৮ থেকে ৯০ দিনের স্থলে মাত্র ৫৪ দিনেই গাছে ফুল ধরেছে।

১৯২৭ সালে মুলারের এক্স-রে প্রয়োগ সম্পর্কিত গবেষণার বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর এক্স-রে প্রয়োগের গবেষণা সুরু হয়; ১৯৩৯ সালের পূর্ব্বে এ বিষয়ে কেবল মৌলিক তথ্য সম্পর্কে গবেষণা হ'ত। যুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানতঃ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা কৃষিকার্য্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের উপর এই প্রথা প্রয়োগ করেন। ১৯৪০ সালে শ্রীরঞ্জন এবং ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে স্বামীরা ভারতে এ বিষয়ে চেষ্টা করেন। বর্ত্তমানে বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে পাট ও তুলার উপর নিয়মিতভাবে কাজ আরম্ভ হয়েছে। পাট ও তুলা সম্পর্কে শ্রীকান্তিলাল চৌধুরী এবং শ্রীঅমিয়কুমার অধিকারী ডাঃ জেকবকে সাহায্য করছেন। ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটি পাট এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার তুলা সম্পর্কে অর্থ সাহায্য করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই

যে উক্ত সাহায্য অতি অল্প। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগ গবেষণামূলক কার্য্য নিয়ে কিছুই করেন না ও অন্যের কার্য্যে সহায়তার বিষয়ে কার্পণ্য ও শৈথিল্য প্রদর্শনই এতাবৎ তাঁহারা করিয়া আসিয়াছেন।

পানাগড়ের উদ্বাস্তু ও বর্দ্ধমানের পতিত জমি

গত যুদ্ধের সময় সামরিক কারণে আসানসোল মহকুমার পানাগড় অঞ্চলের দশ সহস্রাধিক নরনারীকে তাহাদের গ্রাম ও কৃষিজমি হইতে উৎখাত করা হইয়াছিল। কথা ছিল ইহার জন্য তাহাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে, যুদ্ধশেষে তাহারা আবার জমি ফেরত পাইবে। এইভাবে বাস্তুহারা প্রায় দশ হাজার লোক নিজেদের ভিটায় ফিরিবার জন্য আগ্রহশীল। বর্দ্ধমানের এক সংবাদে প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট পানাগড়ের সামরিক ঘাঁটি বজায় রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়া ঐ লোকদের জানাইয়া দিয়াছেন যে পূর্ব্বের জমি তাহারা আর পাইবে না ; তাহাদিগকে জমির দাম দিয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে এখন সমস্যা দেখা দিয়াছে, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং এই লোকদের পুনর্ব্বসতি। গবর্ণমেণ্ট জমির দাম স্থির করিয়াছেন ২০০৲ টাকা বিঘা। ঐ অঞ্চলের জমির ফাটকা বাজীর ফলে দাম চড়িয়া এখন যাহা হইয়াছে ইহারা সেই দাম অর্থাৎ বিঘা প্রতি ৭৫০৲ হইতে ২০০০৲ টাকা চাহিতেছে। ধানজমির দাম গ্রামাঞ্চলে কোথাও এত বেশী আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই ; পূর্ব্ববঙ্গের লোকদের বসতির জন্য প্লটে ভাগ করিয়া বিক্রয়ের দ্বারা অতিরিক্ত লাভের লোভে এক শ্রেণীর মাড়োয়ারী এবং বাঙালী ফাটকাবাজ এই ভাবে জমির দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। পানাগড়ের সংলগ্ন রেল-লাইনের অপর পারে বিরাট অনাবাদী ক্ষেত পড়িয়া রহিয়াছে, উহা সরকার কর্তৃক ল্যাণ্ড একুইজিশন আইনে দখলীকৃত হইলে বিঘা প্রতি দুই টাকাও দাম পড়িবার কথা নয়। বিঘা প্রতি ২০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ হাতে পাইয়া উদ্বাস্তুরা যদি ২৲ টাকা বিঘায় জমি পায় তবে তাহাদের আপত্তি করিবার কথা নহে। তা ছাড়া পানাগড়ের সামরিক ঘাঁটির জন্য যে জমি দখল করা হইয়াছে তাহার মাত্র এক-তৃতীয়াংশে ঘাঁটি তৈরী হইয়াছে, বাকী দুই-তৃতীয়াংশ পতিত রহিয়াছে। ইংরেজ এক বিঘা জমি দরকার হইলে তিন বিঘার লোকের ভিটামাটি উচ্ছেদ করিয়াছে, ঐ নিয়ম বজায় রাখার পরিবর্ত্তে প্রকৃতই এত জমি লাগে কি না তাহা দেখা উচিত এবং যতটা না লাগে ততটা পুরনো কৃষকদের ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী অঞ্চলে প্রায় ৩০ হাজার পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুর পুনর্ব্বসতি হইয়াছে। 'বর্দ্ধমানের ডাক' পত্রিকা লিখিতেছেন, "বর্দ্ধমানের রাঙামাটিতে আজ তাঁহারা সোনা ফলাইতেছে।" অবশ্য ইহারা সরকারী পুনর্ব্বসতি বিভাগের অপেক্ষায় না থাকিয়া নিজেদের চেষ্টাতেই এই কাজ করিয়াছে। ঐ পত্রিকাই লিখিতেছেন, "অজয়, দামোদর এবং গঙ্গার তটভূমে যে বহু বিস্তৃত পতিত অনাবাদী উর্ব্বর জমি অনাবিষ্কৃত স্বর্ণখনির ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদের উদ্ধারের কোন কার্য্যকরী পরিকল্পনা নাই। সরকারী কর্তৃপক্ষ ও জেলার নেতৃসমাজ এ বিষয়ে সজাগ হইবার পূর্ব্বেই পূর্ব্ববঙ্গের ৩০ হাজার উদ্বাস্তু পূর্ব্বস্থলী থানায় গঙ্গাতটে কয়েক শত একর পতিত জমিতে বর্ত্তমানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন করিয়া বর্দ্ধমানের এই উপেক্ষিত সম্পদের প্রতি জেলাবাসীর নূতন করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বর্দ্ধমান শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, কালনা, কাটোয়া মহকুমা ও পশ্চিম বর্দ্ধমানের বিস্তৃত অঞ্চলে যে সহস্র সহস্র একর অনাবাদী পতিত জমি রহিয়াছে সেগুলির উদ্ধার সম্পর্কে কংগ্রেসী মহলে কোনরূপ চিন্তা বা উদ্বেগ আছে বলিয়া মনে হয় না ; এই জেলারই যে সহস্র সহস্র ভূমিহীন দিনমজুর ও কৃষক, যে ১০ হাজার পানাগড়ের উদ্বাস্তু এবং যে বেকার ও দরিদ্র মধ্যবিত্ত যুবকের দল অন্নের জন্য, কাজের জন্য এবং ভূমির জন্য আকাশপাতাল ভাবিয়া কোন কূলকিনারা পাইতেছে না—এই মূল্যবান পতিত জমি-সম্পদ উদ্ধারের কাজে তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া পথ দেখাইতে কংগ্রেসী-নেতারা পারেন নাই। ব্যক্তিস্বার্থের পূজারী, ক্ষমতার নেশায় মশগুল, কায়েমী স্বার্থের দালাল, কংগ্রেসী পাণ্ডারা কংগ্রেসী-স্বাধীনতার দুই বৎসরের মধ্যেও এই জেলার সামগ্রিক ভূমি ও জলসম্পদের একটা হিসাব লইবারও সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অথচ তাঁহারা ঢাকঢোল পিটাইয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে ও সরকারের সহিত জনসাধারণকে সহযোগিতা করিতে উপদেশ দিতে কসুর করিতেছেন না।"

আন্তরিকতার সহিত একমাত্র বর্দ্ধমান জেলার পতিত জমিগুলিকে উদ্বাস্তুদের সাহায্যে চাষে আনিলে খাদ্যসমস্যার কতটা সমাধান হয় তাহারও হিসাব ঐ পত্রিকা দিয়াছেন। উহার সম্পাদক জেলার একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস-সেবী এবং পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির সদস্য।

"বর্দ্ধমানের মোট জমির পরিমাণ প্রায় ১৭ লক্ষ ২৯ হাজার একর ; ইহা হইতে পতিত ও অনাবাদী জমি বাদ দিলে কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৭৫০০০০ সাড়ে সাত লক্ষ একর। তন্মধ্যে মাত্র ৫০০০০ একর পরিমিত জমিতে রবিশস্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই জেলায় প্রায় ১০ লক্ষ একর জমি পতিত অনাবাদী রহিয়াছে ; অর্থাৎ আবাদী জমি অপেক্ষা অনাবাদী জমির পরিমাণ বেশী। জেলার ১০ লক্ষ একর অনাবাদী পতিত জমির মধ্যে চাষযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ সাত লক্ষাধিক একর। বর্দ্ধমানে কৃষি-যোগ্য অনাবাদী ৭ লক্ষ একর জমিকে ৭,৫০,০০০ একর আবাদী জমির সহিত যোগ করিলে আমরা সর্ব্বসমেত

১৪৫০০০০ একর জমি পাই। বর্দ্ধমান জেলার গত জনসংখ্যা ২০ লক্ষের মধ্যে এই জমি ভাগ করিয়া দিলে প্রতি লোক ২'১৮ বিঘা জমি পাইতে পারে। বর্দ্ধমানের উৎপন্ন শস্যের গড় হার বিঘা প্রতি ৭ মণ ধরিলে বৎসরে মাথাপিছু ১৫ মণ শস্য পাওয়া যায়। বৎসরে একজন লোকের পক্ষে সাধারণতঃ ৯ মণ খাদ্যশস্যই যথেষ্ট; সে জায়গায় আমরা পাইতেছি মাথাপিছু ১৫ মণ খাদ্যশস্য। সুতরাং দেখা যায় যে বর্দ্ধমানের আবাদযোগ্য ও অনাবাদী সমস্ত জমির যথাযথ চাষ হইলে, বর্দ্ধমানের প্রত্যেকটি লোক পেট পুরিয়া খাইয়াও পশ্চিম বাংলা সরকারের খাদ্যশস্য ভাণ্ডারে প্রায় ৭০ লক্ষ লোকের জন্য উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য পাঠাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক চাষ-আবাদ দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি ও একাধিক ফসল উৎপাদনের কথা ধরিলে জেলা হইতে উদ্বৃত্ত ফসলের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। বস্তুতঃ সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বর্দ্ধমান একদা রাঢ়বঙ্গের শস্যভাণ্ডাররূপে গণ্য হইত।"

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা

১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাস হইতে, নোয়াখালি জেলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের তাণ্ডব আরম্ভ হওয়ার সময় হইতে, পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু ব্যাপক ভাবে পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন। তার পর ১৯৪৭ সালের ৩রা জুনের মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে বঙ্গবিভাগের যে ব্যবস্থা হয় তার ফলে এই গৃহত্যাগ বন্যার জলের মত দুর্ব্বার হইয়া উঠে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী হিসাব মতে প্রায় ১৫।১৬ লক্ষ পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের বসবাসের ও জীবিকা উপার্জ্জনের সুব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের একটা দায় হইয়া পড়িয়াছে।

এই দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট কি ভাবে প্রতিপালন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রীমণ্ডলী এই বিষয়ে কিছুই করিতে ইচ্ছুক ছিল না। ডাঃ রায়ের মন্ত্রীমণ্ডলী কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়াছেন। কিন্তু উদ্বাস্তু সম্পর্কিত কার্য্যের ভার অযোগ্য মন্ত্রী ও ততোধিক অযোগ্য কর্ম্মচারীবৃন্দের হাতে থাকায় সমস্ত কাজই দায়সারা ভাবে হইয়াছে। অপব্যয় এবং অপচয়ও হইয়াছে বিস্তর। সেই টাকা লইয়া সরকারী বেসরকারী নানা লোক ছিনিমিনি খেলিয়াছেন, তাহার প্রমাণ খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন নয়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ইউরোপ যাইবার পূর্ব্বে একটি নূতন বোর্ড স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শুনিতেছি এই বোর্ডের ক্ষমতা সম্বন্ধে লিখিত-পঠিত ভাবে কোন নির্দ্দেশ নাই বলিয়া এই বিষয়ে বোর্ডের সভ্যবৃন্দ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আছেন। এই সময়ে মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহের দুর্ব্বলতার সুযোগে একটা চেষ্টা হইয়াছিল। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরুর হস্তক্ষেপে তাহা নাকি ব্যর্থ হইয়াছে। উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানকল্পে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট প্রায় ৪।৫ কোটি টাকা নাকি এবারও পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্টের হাতে তুলিয়া দিতেছেন এবং ডাঃ রায় এই টাকার সদ্ব্যবহারের ভার এই বোর্ডের হাতে দিয়া গিয়াছেন। তিনিই এই বোর্ডের স্থায়ী সভাপতি, তাঁহার অনুপস্থিতিতে মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিবেন। গত ১৫ই আষাঢ় (২৯শে জুন) বোর্ডের নূতন সভাপতি বেতারযোগে এই বোর্ডের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। সংবাদপত্রে তাহার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া এই সমস্যার প্রকৃতি ও সমাধানের উপায় সম্বন্ধে সরকারী ধারণার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব:

> শরণার্থীদের মধ্যে নানা ধরণের লোক আছেন। কেউ বা চাষী, কেউ বা মধ্যবিত্ত, কেউ বা কারিগর, কেউ বা ব্যবসায়ী, কেউ শিক্ষক, কেউ ডাক্তার, কেউ বা অন্য কিছু। এঁদের সকলের সমস্যা এক নয়। প্রত্যেকটি শ্রেণীর প্রয়োজন বিভিন্ন। মেয়েদের সমস্যা, ছাত্রদের সমস্যা আলাদা করে ভাববার প্রয়োজন আছে, কারণ তাদের সমস্যা একটা বিশেষ ধরণের। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এইরকম নানাধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁরা এই সমস্যা সমাধানের জন্যে কতকগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। যারা চাষী তাদের বসবাসের জন্যে চাষের জমির সন্ধান করা হচ্ছে এবং হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে চাষীদের সেই সমস্ত জায়গায় বসবাস করিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা যাতে চাষের সুবিধা পায়, তার জন্য আর্থিক সাহায্য এবং জিনিষপত্রের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁদের সাহায্যের জন্যে সরকার আর্থিক সাহায্য এবং জিনিষপত্র দিয়ে সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন। জেলার কালেক্টরদের বলে দেওয়া হয়েছে যে, পাঁচশ' টাকা অবধি জেলা কালেক্টরগণ কতকগুলি সর্ত্তাধীনে দিতে পারবেন। যাদের প্রয়োজন পাঁচশ' থেকে পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে অথবা যারা সহরে ব্যবসা করতে চায়, তাদের টাকা ধার দেবার জন্য একটা ব্যবসায়ী পুনর্বসতি বোর্ড গঠিত হয়েছে, যার সভাপতি হলেন কলিকাতার ভূতপূর্ব শেরীফ শ্রীযুক্ত ডি. এন. সেন। এঁরা সমস্ত দরখাস্ত বিবেচনা করে কতকগুলি নিয়ম অনুসারে ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। শরণার্থী ছাত্রদের জন্যে এপর্য্যন্ত ৪৯টি শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ৫০টি স্কুলে দুই বার পড়ানোর ব্যবস্থা করে অনেক ছাত্রের পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন স্কুলে এই সব শরণার্থী ছাত্রের শিক্ষার জন্যে মাহিনা হিসাবে সাহায্য, বই কেনার সাহায্য এবং পরীক্ষার

দিয়ের সাহায্যের জন্যে মোট সাতে সাত লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। তা ছাড়া পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যে, শরণার্থীদের জন্যে কিছু বাড়ী তৈরি করা হবে। যে রকম বাড়ীর মালমসলা সংগ্রহ করা যাবে, সেই অনুসারে বাড়ী তৈরী করতে আরম্ভ করা হবে। যেখানে সরকার নিজে বাড়ী তৈরি করতে পারবেন না সেখানেই বিভিন্ন শরণার্থীদের যাতে বাড়ীর মালমসলা পাওয়ার সুবিধা হয় তার জন্যে সরকার চেষ্টা করবেন। বাড়ীর মালমসলার অত্যন্ত অভাব থাকায় প্রয়োজনানুরূপ অগ্রসর হতে পারা যায় নি। আশা করা যাচ্ছে এবিষয়েও শীঘ্র অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব হবে। এছাড়া কতকগুলি জমি সরকার পথঘাট করে উন্নয়ন করার ব্যবস্থা করছেন, সেখানে বসবাসের উপযোগী জমি পাওয়া যাবে এবং সেই সব জমিতে ছোট ছোট সহর শরণার্থীদের জন্যে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সে রকম পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।

মন্ত্রী-মহাশয়ের এই বিবৃতিতে ভবিষ্যতে সফলতার সদুপায় সম্বন্ধে কোন আভাস পাইলাম না। একটা সংবাদ আমাদের মনে সংশয় জাগাইয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে আগামী ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে, আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসের মধ্যে, "পুনর্বসতির ব্যবস্থা করতে হবে।" এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন হইবে কি?—এই প্রশ্ন অনেককে চিন্তিত করিয়াছে। শুনিয়াছি যে ডাঃ রায় কর্তৃক মনোনীত বোর্ড এক সভায় স্থির করিয়াছেন যে তাহা সম্ভব নয়; এবং তাহা কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে জানাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পুনর্বসতি করিতে হইলে তাহার জন্ত জমি চাই; ঘর-দুয়ার নির্ম্মাণ করিবার প্রচুর সরঞ্জাম চাই। এই দুইটি বস্তু পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্টের অধিকারের মধ্যে আছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। যাহা আছে তাহা লক্ষ লক্ষ লোকের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর, অকিঞ্চিৎকর। এই অভাবের মধ্যে পুনর্বসতির দায় সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত, তাহা গবর্মেণ্টকে বিবেচনা করিতে হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গে খাদ্যের অবস্থা

ঢাকার নবাব হবিবুল্লার সভাপতিত্বে ঢাকা মুসলিম লীগের এক সভায় এক প্রস্তাব পাশ করা হয়; খাদ্যাভাবের তাড়নায় ঢাকা জেলা হইতে দলে দলে মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা আসামে চলিয়া যাইতেছে—এই কথায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। এই সংবাদের পাশাপাশি পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর একটি বিবৃতি বিসদৃশ ঠেকে। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, যে কাশ্মীরের দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট জনগণের সাহায্যার্থ তিনি খাদ্যশস্য পাঠাইতে প্রস্তুত আছেন; ভারতরাষ্ট্র নাকি হিংসার প্রণোদিত হইয়া সেই সাহায্য গ্রহণে সম্মতি দিতেছে না।

খাদ্যশস্যকে রাজনীতিক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিবার কৌশল পাকিস্থান রাষ্ট্রের পরিচালকবৃন্দ শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু নিজের ঘর তবুও সামলাইতে পারিতেছেন না কেন; কেন তাঁহাদের নাগরিকগণ পররাষ্ট্রে খাদ্যের সন্ধানে যাইতেছে? এই বিষয়ে "আজাদ" পত্রিকার মন্তব্য লক্ষণীয়:

> কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক বারই প্রচুর খাদ্য পাঠান। প্রাদেশিক সরকারের ভাণ্ডার কখনও খালি হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। তাঁদের সংগ্রহনীতিও ভাল চলে। কিন্তু তবু কেন আজ পর্য্যন্ত খাদ্যের ব্যাপারে দেশের লোক সুদিনের মুখ দেখিতে পাইল না? দেশে মুনাফাখোর ও মজুতদার আছে ও দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্ম্মচারীও আছে। এসব সায়েস্তা করিবার দায়িত্ব তাঁহারা যদি পালন করিতে না পারেন তবে সমস্যার সমাধান হইবে না।

পল্লীবাসী মুসলমানের মতিগতি

নিম্নলিখিত পত্রখানি বনগাঁও-বসিরহাট মহকুমার মুখপত্র "সংগঠনী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে; ইহার লেখক "জনৈক চাষী মুসলমান।" এই পত্রের মধ্যে মুসলিম সমাজের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা রূপান্তরিত করিবার জন্ত লেখক কংগ্রেসের নিকট আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা মনে করি যে এই অবস্থার প্রতিকারের উপায় মুসলিম সমাজেরই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; এবং মৌলানা-মৌলবীবৃন্দ বর্ত্তমান যুগের উপযোগী মনোভাব সৃষ্টি করিতে সাহায্য না করিলে "সাদী-মেজমানী-খানা" হইতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মনকে সরাইতে পারা যাইবে না। ভারতরাষ্ট্র যখন ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ সংগঠনের আদর্শ গ্রহণ করিয়া তাহা রূপদান করিতে চেষ্টা করিতেছে, তখন এই রাষ্ট্রের যে কোন কার্য্যকলাপ ধর্ম্ম ও সমাজের উপর হস্তক্ষেপ বলিয়া মুসলিম সম্প্রদায় নালিশ করিতে পারেন, সেই পথ বন্ধ হওয়া উচিত। ধর্ম্ম ও সমাজের সংস্কার স্ব-স্ব সমাজকেই করিতে হইবে। এ-কথাটা ভারতরাষ্ট্রের মুসলিম সম্প্রদায় মনে রাখিলে সকলের মঙ্গল:

> আমরা পশ্চিম বাংলার অধিবাসী মোসলমান। রাষ্ট্রের প্রতি আমরা অনুগত বলিয়াই এখানে আছি। যাহারা তাঁহা নয়, তাহারা পাকিস্তানে পলাইয়াছে। যাহারা সুবিধাবাদী তাহারা ছুটাছুটি করিতেছে। কংগ্রেসের দুয়ারে ধর্ণা দিতেছে। স্ত্রীর কপালে সিন্দুর পরাইয়া এবং নিজে খদ্দর পরিয়া নেতাদের দরজায় সস্ত্রীক মাথা খুঁড়িতেছে।
>
> আমরা পল্লীর চাষী মোসলমান। চাকুরীর ভাগ আমরা

চাই না। যে শতকরা কুড়িটি চাকুরী দেওয়া হইবে বলা হইতেছে, তাহা কবে লইতে পারিব খোদায় জানেন। অনকয়েক শেখ-সৈয়দের ছেলেরা তাহা পাইবে তাহাও জানি। আমাদের ঘরে এখন পয়লা হইয়াছে, কি করিয়া তাহা জুয়াইব সেই চিন্তায়ই মশগুল।

সরকার ৫০ জনের বেশী ভোজ দিতে নিষেধ করিয়াছেন। অমান্য করিলে জেল-জরিমানা হইবে তাহাও শুনিয়াছি। কিন্তু কৈ? ঐ দেখুন মূর্খ ছেলেমেয়ের বিয়েতে ৫০০।৭০০।১০০০ হাজার লোকের ভোজ। যার ছেলেমেয়ে ২।৩ বৎসরের বেশী বয়সের নয়, তারা আবার নূতন উৎসবে মাতিয়াছে। ছেলের 'খৎনা' নুনু কাটা উৎসব। অন্ততঃ দুই শত লোকের ভোজ। সরকার যদি এই সব ফুর্তিবাজদের ভোজের উপর আবগারীর অপেক্ষা ভোজ ট্যাক্স বসাইয়া সেই ট্যাক্স দিয়া স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন করিতে পারেন তবেই পল্লীর মঙ্গল।

ইউনিয়ন বোর্ডের চারি আনা ট্যাক্স বাড়িলে যাঁরা হৈ-চৈ করেন, ছেলেকে ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি করিলে ফ্রি, হাফ ফ্রীর দরখাস্ত লইয়া স্কুলের মেম্বরগণের বাটীতে যাইয়া দশ বার আনা-গোনা করেন, তাঁহাদের নূতন করে তাহাদের নূতন কুটুম্বিতার ধুম দেখিয়াছেন কি?

ভাইয়ের মাথায় লাঠি, আইন লইয়া ঝগড়া, মামলা-বাজী, জারী-যাত্রা, জুয়া ইত্যাদির কথা না হয় নাই বলিলাম। হে ভাই কংগ্রেসী! পার কি তোমার প্রতিবেশী ভাইকে 'সাদী-মেজমানী খানা' হইতে সরাইয়া আনিতে?

পাকিস্থানে পরিত্যক্ত উদ্বাস্তুদের সম্পত্তি

গত মাসের "প্রবাসী"তে আমরা করাচী নগরী হইতে প্রেরিত একটি সংবাদ প্রকাশ করিয়া পাকিস্থান রাষ্ট্রের শাসকবর্গের মতিগতির একটা পরিচয় দিয়াছি। প্রায় ৬০ লক্ষ হিন্দু ও শিখ পশ্চিম-পঞ্জাব, সিন্ধু দেশ, বেলুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও ভাওয়ালপুর রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহারা প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে; ভারতরাষ্ট্র হইতে বিতাড়িত উদ্বাস্তু ৬৫ লক্ষ মুস্লিম সম্প্রদায়ের সম্পত্তির মূল্য তাহার এক পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না।

বর্তমানে আমাদের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট পশ্চিম পাকিস্থানে পরিত্যক্ত সম্পত্তির একটা গতি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু "ভবী" ত ভুলিতেছে না। ভারতরাষ্ট্র কি করিয়া এই টাকা উশুল করিবে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভারতরাষ্ট্র যে কিছুই করিতে পারিতেছে না, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় দিল্লী হইতে প্রকাশিত ১৪ই আষাঢ় (২৮শে জুন) তারিখের বিবৃতিতে। ইহা পাঠ করিয়া পাকিস্থান খুশী হইবে। দিল্লী হইতে প্রচারিত "পিপ্‌ল" (People) সাপ্তাহিকে একজন লেখক এই পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে যুদ্ধের ব্যয়ের সঙ্গে তুলনা করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। অনুরোধের উদ্দেশ্য স্পষ্ট।

দিল্লীর বিবৃতিটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা পাঠ করিলে পাকিস্থান রাষ্ট্রের গড়িমসি নীতির অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায় এবং এই বিষয়ে সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠিবে বলিয়া মনে হয় না:

(১) যে সমস্ত ক্ষেত্রে চুক্তি ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া পাকিস্থান প্রতিনিধিমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে তাহার একটি হইতেছে এই যে, ১৯৪৯ সালের ৩১শে মার্চ উক্ত গবর্মেণ্টের পুনর্বসতি সচিব তারযোগে জেকোবাবাদের ডেপুটি কমিশনার ও সমস্ত কালেক্টরের নিকট একখানি সার্কুলার প্রেরণ করেন। উহাতে বলা হয় "যে সমস্ত অ-মুসলমানের জমি পরিত্যক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছে এবং কিষাণদিগের মধ্যে বিলি করা হইয়াছে এবং যে সমস্ত অ-মুসলমান—তাহারা উদ্বাস্তু নহে অথচ তাহারা স্থায়ীভাবে পাকিস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে—এই কথা বলিয়া তাহাদের জমি ফিরিয়া পাইবার জন্য দাবী করে তাহাদিগকে ঐ সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের নিকট হাজির হওয়ার জন্য বলিতে হইবে। যে সমস্ত জমি বা সম্পত্তি একবার বিলি করা হইয়াছে তাহা আর ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না। তত্ত্বাবধায়কের সিদ্ধান্ত প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিলি অবশ্যই চলিতে থাকিবে। প্রত্যর্পণ আদেশ জারী করা হইলে তাহা বাতিল করিতে হইবে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি পুনর্বসতির জন্য ব্যবহার করিতে হইবে।"

এই আদেশ স্বভাবতঃই অ-মুসলমান সম্পত্তির মালিকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। কারণ তাহারা উদ্বাস্তু নহে, অথচ তাহাদের সম্পত্তি উদ্বাস্তু সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

কয়েকটি ক্ষেত্রে পাকিস্থানে অবস্থানকারী অ-মুসলমানদের সম্পত্তি লইয়া উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিলি করা হইয়াছে। এই সমস্ত সম্পত্তির মালিকরা কোন প্রতিবিধান পান না, কারণ কোন তত্ত্বাবধায়ক নাই।

(২) দীর্ঘকাল যাবৎ রেশনিং কর্তৃপক্ষ হিন্দুদিগকে স্থায়ী রেশন কার্ড দিতেছেন না। এমন কি অস্থায়ী রেশন কার্ডও যথেষ্ট হয়রানির পর দেওয়া হয়। উহা দিতে না চাওয়ার কারণ হইতেছে এই যে, স্থায়ী রেশন কার্ড ডোমিসাইল্ডের প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়।

(৩) পশ্চিম-পঞ্জাবে অন্যান্যরূপ অসুবিধা সৃষ্টি করা হয়। সেখানে উদ্বাস্তু সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক আছেন। কোন্ সম্পত্তির বিক্রয় ও বিনিময় রেজিষ্টারী করার পূর্ব্বে

উহার উপর অন্য কাহারও কোনও দাবী আছে কি না তাহার সন্ধান লইতে হয়। সিমলার শ্রীঅমর সিং গ্রোভারের বিষয়টি অদ্ভুত (অনুরূপ বহু ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়)। তিনি ১৯৪৯ সালের মে মাসে লাহোরের মলে অবস্থিত একটি নবনির্মিত ত্রিতল বাড়ী ৮০ হাজার টাকায় বিক্রয় করেন। তাঁহাকে সম্পত্তি ১৯৪৯ সালের মে মাসে হস্তান্তরিত করা সত্ত্বেও ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত সম্পত্তি-কর দিতে বাধ্য করা হয়।

লাহোরের মেসার্স বক্স এণ্ড কটন কোম্পানী লিঃ ও ডাঃ এম এইচ মীরচন্দানীর ক্ষেত্রেও গুরুতর চুক্তিভঙ্গ করা হইয়াছে। মেসার্স বক্স এণ্ড কটন কোং লিঃ-র কারখানার যখন কাজ চলিতেছিল তত্ত্বাবধায়ক উহা সিল করিয়া দেন। ডাঃ মীরচন্দানী অনুমতি লইয়া স্বল্প কালের জন্য ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ক্লিনিকটিকে উদ্বাস্তু সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং উহা দিল্লীর বিখ্যাত যোশী-হত্যা মামলার ডাঃ কুরেশীকে দেওয়া হয়।

(৪) গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্থান সরকারের উদ্বাস্তু ও পুনর্ব্বসতি দপ্তর এক আদেশ জারী করিয়া অ-মুসলমানদের সহরের সম্পত্তির ভাড়া হ্রাস করেন। এই আদেশ অনুসারে ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত সময়ের শতকরা ৮০ ভাগ ভাড়া বাদ দেওয়া হয়। ভাড়াটিয়ারা যাহাতে তাড়াতাড়ি ভাড়া পরিশোধ করে তজ্জন্য অবশিষ্ট ভাড়া হইতেও শতকরা আরও ১০ টাকা ছাড়িতে হয়। তত্ত্বাবধায়ককে তত্ত্বাবধান ব্যয় বাবদ শতকরা আরও ১০ টাকা বাদ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এইরূপে উদ্বাস্তু মালিকেরা মূল ভাড়ার শতকরা মাত্র ১৪।১৫ টাকা পাওয়ার অধিকারী হন। ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগষ্টের পর ভাড়া শতকরা আরও ৩৩ টাকা পাঁচ আনা হ্রাস করা হয়। এই সমস্তের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অ-মুসলমান সম্পত্তির মূল্য গুরুতরভাবে হ্রাস পায়।

(৫) হিন্দুদের প্রত্যেক সম্পত্তি উদ্বাস্তু সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা রেওয়াজ হইয়া উঠে। পুনর্ব্বসতি কর্ত্তৃপক্ষ—পাকিস্থানে এখনও আছেন—এইরূপ প্রায় ৬০ জন জমিদারের ভূমি বিলি করিয়া দেন। তাহাদিগকে এমন কি ভূমির তখনকার শস্য হইতেও বঞ্চিত করা হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহাদিগকে তত্ত্বাবধায়কের নিকট প্রতিবিধান চাহিতে বলা হয়। কিন্তু করাচী ও সিন্ধুতে কোন তত্ত্বাবধায়ক নাই।

করাচী চুক্তি ভঙ্গ হিসাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা হয়:

(ক) করাচী চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার অব্যবহিত পর আয়-কর অভিযান জারী করা হয়। উহাতে পাকিস্থান গমনেচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তিকে আয়-কর পরিশোধ সার্টিফিকেট লইতে হয়।

(খ) পাকিস্থানে উদ্বাস্তু সম্পত্তির ভাড়া হ্রাস করা পাকিস্থানের একতরফা কার্য। তাঁহারা এখন বলেন যে কৃষি সম্পত্তি সম্পর্কে তাঁহারা কোন খাজনা আদায় করিতে পারেন না। এই উভয় ব্যবস্থাই প্রত্যক্ষভাবে করাচী চুক্তির বিরোধী।

(গ) পশ্চিম পঞ্জাবের আয়-কর কমিশনার উভয় ডোমিনিয়ন কর্ত্তৃক আয়-কর দেওয়া সম্পর্কে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহা মানেন না। ঐ চুক্তিতে বলা হইয়াছে যে, দেনার টাকা তত্ত্বাবধায়কের নিকট পাওনা টাকা হইতে দেওয়া যাইতে পারে। পশ্চিম-পঞ্জাবের আয়-কর কমিশনার ও তত্ত্বাবধায়কের মধ্যে কেহই ঐ চুক্তির বিধান অনুযায়ী কাজ করিতেছেন না।"

(ঘ) অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে উভয় ডোমিনিয়ন কর্ত্তৃক এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল যে, উহা রিকুইজিশন করা না হইলে মালিককে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। বহু ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুরা এই সম্পর্কে পাকিস্থান কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিলে তাঁহারা উদ্বাস্তুদিগকে তাহাদের সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়ার পরিবর্ত্তে উহা রিকুইজিশন করিয়াছেন।

(ঙ) যদিও এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল যে, একটি আধা-সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ তত্ত্বাবধায়কের হস্তক্ষেপ ব্যতীত কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে সরাসরি পরিশোধ করিবেন, কিন্তু তাহা করা হইতেছে না। কয়েকটি ক্ষেত্রে পশ্চিম-পঞ্জাবের তত্ত্বাবধায়কের নিকট যে টাকা জমা রাখা হইয়াছিল সংশ্লিষ্ট পক্ষকে তাহা ফেরত দেওয়া হয় নাই।

(চ) পশ্চিম-পঞ্জাবের ৫টি জেলায় উদ্বাস্তুদের প্রবেশ বন্ধ আছে এবং কেহই তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ফিরাইয়া পাইতেছে না। এই ৫টি জেলায় প্রবেশ বন্ধ করার ফলে উদ্বাস্তুদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(ছ) গত জানুয়ারী মাসে উভয় ডোমিনিয়ন সম্মেলনের প্রথম বৈঠকে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে রেল-যোগে প্রেরিত মাল সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হইয়াছিল। উহাতে বলা হইয়াছিল যে, ঐ সমস্ত মালকে উহার গন্তব্যস্থলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত। কয়েকখানি স্মারকপত্র দেওয়া সত্ত্বেও ঐ সমস্ত মাল এখনও পাকিস্থানে আটকা পড়িয়া আছে।

চন্দননগরের ভারতভুক্তি

গত ৫ই আষাঢ় (১৯শে জুন) চন্দননগরের গণভোটে ভারতরাষ্ট্রে যোগদান করিবার পক্ষে লোকের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। ৫২,০০০ লোকবসতিপূর্ণ এই নগরীর ১২,১৯৪ জন নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে ৭,৪৭৩ জন ভারতের পক্ষে ভোট দিয়াছেন, মাত্র ১১৪ জন ফরাসীর পক্ষে। এই বিপুল সাফল্যের পিছনে বাঙালী বিপ্লবী জীবনের ইতিহাস বিদ্যমান। সেই কথার একাংশ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় ১৩ই আষাঢ়ের "নবসঙ্ঘ" পত্রিকার স্তম্ভে বিবৃত করিয়াছেন এবং জীবিত ও মৃত বিপ্লবী বীরবৃন্দের কর্ম্মগাথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন :

> ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার দিন হইতেই চন্দননগরের রাজপথে সে দিন শুনা গিয়াছিল—'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, জগৎ জনের শ্রবণ জুড়াক।'
>
> গানে গানে তরুণের প্রাণ মাতিয়া উঠিল।...
>
> কানাইলাল জড় করিল এক দল তরুণকে তাহার গৃহ-প্রাঙ্গণে। ঘুষোঘুষি, লাঠি খেলা, ছোরা খেলার ধুম আরম্ভ হইল তাহার উদ্যান-ভূমিতে। চন্দননগরের স্থানে স্থানে ছড়াইয়া পড়িল শরীর-চর্চ্চার অসংখ্য আখড়া। তারপর বাছিয়া বাছিয়া কয়েকজন তরুণের কর্ণে ৺চারুচন্দ্র রায় ভারতের স্বাধীনতা-মন্ত্র ফুঁকিয়া দিলেন। ৺কানাইলাল প্রমুখ কয়েকজন তরুণ হইল এই নবগঠিত বিপ্লব-সমিতির অগ্রদূত।
>
> তারপর বাংলার সর্ব্বপ্রধান বিপ্লবকেন্দ্র মাণিকতলার সহিত চন্দননগরের যুক্তি। এই কেন্দ্র হইতে ডাক আসিল কানাইলালের। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই কানাই লাল কলিকাতার কেন্দ্র সমিতিতে যোগদান করিল। তারপর চন্দননগর বিপ্লব-সমিতির সর্ব্ব প্রকার পৃষ্ঠ-পোষকতায় অগ্রসর হইল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মাণিকতলা বাগানের মঙ্গল-ঘট রাক্ষসে ভাঙিল। সেই ভাঙা ঘট পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিল চন্দননগর। ভারতের স্বাধীনতা-মন্ত্রে চন্দননগরের দীক্ষা এই দিন হইতে। মাণিকতলার স্বাধীনতার-যজ্ঞ পণ্ড হইলে ফরাসী চন্দন-নগর স্বাধীনতা মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিল। ফরাসী গবর্মেণ্ট ৺চারুচন্দ্র রায়কে ব্রিটিশের হাতে অর্পণ করিয়াছিলেন।
>
> ৺চারুচন্দ্র রায় আলিপুর জেলে বসিয়াই ৺কানাইলালের কীর্ত্তি সন্দর্শন করিলেন। বাংলার প্রথম বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাই ৺কানাইলাল ও ৺সত্যেন্দ্রনাথের হস্তে গুলিবিদ্ধ হইয়া নিহত হইলেন। স্বাধীনতার আততায়ী নিধনের এই সংবাদ সমগ্র ভারতে উৎসবের সাড়া তুলিল। অতিবড় মধ্যপন্থী ৺সুরেন্দ্রনাথও সেদিন 'বেঙ্গলী' অফিসে বসিয়া মিষ্টান্ন বিতরণের উৎসবে পরমোৎসাহে যোগদানে বিরত হন নাই।
>
> তারপর ৺আশুতোষের বিচারে ৺চারুচন্দ্রের মুক্তি। তিনি বিপ্লব-সংহতি হইতেই মুক্তি লইলেন। চন্দন-নগরের বিপ্লব-সংহতি কয়েকজন তরুণই বহন করিল। ৺শ্রীশচন্দ্র ঘোষকে তাহার অগ্রপুরোহিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজ পরলোকগত আশুতোষ নিয়োগীর কথা চন্দননগরবাসী যদি ভুলিয়া যায়, স্বাধীনতার পূজার অধিকার হইতে সে অবধারিত বঞ্চিত হইবে।
>
> তারপর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের কথা—চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দের আগমন। চন্দননগরে অবস্থানকালে ভারতের স্বাধীনতা আনয়নের সকল ভারই চন্দননগরের বিপ্লব-সমিতির উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি পণ্ডিচারী প্রয়াণ করিলেন। তাঁহারই প্রেরণায় চন্দননগরে আগুন জ্বলিল বিপ্লবের। সে অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষা লইল বাংলার তরুণ। পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ একত্র হইয়া চন্দননগরে নির্ম্মাণ করিল বিপ্লবের কেন্দ্রতীর্থ। ৺রাসবিহারী সেই তীর্থে দাঁড়াইয়া ভারত-স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা লইলেন।
>
> বাংলার সর্ব্বপ্রধান আগ্নেয়াস্ত্র বোমা তৈয়ারীর কারখানা চন্দননগরেই স্থাপিত হইল। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ নায়েক হইল তাহার অধিনায়ক।

দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায়

গুজরাট সৌরাষ্ট্রের কোন কোন অঞ্চলে এবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে; বোম্বাই ও সৌরাষ্ট্র গবর্মেণ্টের তৎপরতায় তার ক্ষতি ও দুঃখ কথঞ্চিৎ নিবারিত হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, লার্ড কার্জ্জনের আমলে একটা দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়াছিল; যে দুর্ভিক্ষ এই অঞ্চল হইতে যুক্তপ্রদেশের কোন কোন অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; তার ফলে প্রায় দুই কোটি লোক রোগ ও অনাহারে মারা যা'য়।

বর্ত্তমান বিপর্য্যয়ে এই অঞ্চলে এইরূপ বিপদের চূড়ান্ত প্রতিকার সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করিতেছেন অনেকেই। কচ্ছ দেশের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ বুবণ্ডি তার মধ্যে একজন। তিনি কচ্ছ-সৌরাষ্ট্রের এই দুর্দশার কারণ সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন কথা শুনাইয়াছেন। আহ্‌মদাবাদের এক জনসভায় তিনি বলিয়াছেন যে, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্বে গুজরাটের জীবনে কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই; ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্বে কচ্ছ দেশ এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্বে কাথিবাড় কখনও এরূপ বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয় নাই।

১৭৯০ সন ও ১৮১৯ সনের ভূমিকম্পের ফলে কচ্ছ দেশের পাঁচটি নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হয়; কচ্ছ উপসাগর হইতে তাদের মুখ আরব সাগরের দিকে ফিরিয়া যায়, এবং প্রায় ৮,০০০ বর্গ মাইলের একটি মরুভূমির সৃষ্টি হয়। এই

মরুভূমি হইতে উত্থিত বায়ুপ্রবাহ মৌসুমি বায়ুপ্রবাহকে তাড়াইয়া দিয়া অনাবৃষ্টির সৃষ্টি করে। এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের গতি ফিরাইতে হইবে। উপরোক্ত পাঁচটি নদীকে বাঁধিয়া ৮,০০০ বর্গমাইল ব্যাপী হ্রদের জলে সিঞ্চিত ক্ষেত্রের সৃষ্টি করিতে পারিলে গুজরাট, কচ্ছ ও কাথিবাড়ের অতীত সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিবে।

সংযুক্ত প্রদেশে খাদির উন্নতি

লক্ষ্ণৌ নগরী হইতে প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ যে, সংযুক্ত প্রদেশের গবর্মেণ্ট খাদির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত প্রায় ২৫ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা সাহায্য করিতে স্বীকার করিয়াছেন; বর্ত্তমানে ১০ লক্ষ ৬ হাজার টাকা তাহাদের সাহায্যের পরিমাণ। নূতন সাহায্যের বেশীর ভাগই ব্যয় হইবে খাদি-শিল্পের যন্ত্র ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ে; এবং খাদির উৎপাদনের উপর বেশী জোর দেওয়া হইবে।

বর্ত্তমানে যে ৫০টি খাদিকেন্দ্র আছে, তাহার প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা করিয়া খাদি উৎপাদনের মূলধনরূপে দেওয়া হইবে; প্রায় ৬০,০০০ গ্রাম্য কাটুনির শিক্ষার জন্ত ব্যয় করা হইবে ৫ লক্ষ টাকা; এবং ৪০,০০০ খাদি কর্ম্মী সংগঠন করা হইবে।

খাদি-শিল্প সম্বন্ধে গবেষণার কার্য্যে উৎসর্গীকৃত ছয়টি কেন্দ্র আছে; বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহও গবর্মেণ্টের সাহায্য পাইয়া থাকে। শিক্ষার্থীদের এই সর্ত্তে বৃত্তি দেওয়া হয় যে, তাঁহারা শিক্ষান্তে গ্রাম্য লোকের মধ্যে তাঁহাদের কর্ম্মকেন্দ্র গড়িয়া তুলিবেন।

পশ্চিমবঙ্গে একটি খাদি বোর্ড আছে। শুনিতে পাই ইহার সাহায্যে নানা অঞ্চলে খাদি-শিল্পের কাজ প্রসারলাভ করিতেছে। গত পনর-ষোল মাসে সেই কাজ কত দূর উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহার কোন বিবরণ দেখি নাই। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা আড়াই কোটি; সংযুক্তপ্রদেশের সওয়া পাঁচ কোটি। আমাদের জনসংখ্যার অনুপাতে কি কর্ম্মপ্রচেষ্টা চলিতেছে?

পররাষ্ট্র-সচিব চতুষ্টয়ের সম্মেলন

গত ২০শে জুন পররাষ্ট্র-সচিব চতুষ্টয়ের সম্মেলন শেষ হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট ইউনিয়নের চারি জন পররাষ্ট্র-সচিব প্যারী নগরীতে প্রায় এক মাস তর্ক-বিতর্ক করিয়া জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা গোঁজামিল ব্যবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। এ কথা শুনিয়া অনেকেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছেন এই ভাবিয়া যে, ইউরোপ খণ্ডের অবস্থা আরও জটিল হয় নাই। সোভিয়েট কর্ত্তৃক বার্লিন নগরীর অবরোধ উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে; বিমান-যোগে বার্লিনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বহন করিবার যে ব্যয় যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন করিতেছিল—মাসে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা—তাহার দায় হইতে জার্ম্মান প্রীতি বৃত্তিলাভ করিল, এই কথা ভাবিয়া অনেকেই আনন্দিত হইবেন।

এই সম্মেলনের অভাব অনটন সম্বন্ধে সোভিয়েট প্রচার-পত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নে তাহা তুলিয়া দিলাম। দিল্লী হইতে প্রচারিত "সোভিয়েটের সংবাদ ও অভিমত" নামক প্রচার-পত্রের স্তম্ভে কদাচিৎ এরূপ শান্তিপূর্ণ বিবরণ পাঠ করিবার অবসর হয়; এই পত্রের লেখা পড়িয়া মনে হয় যে পরিচালকবর্গ ঝগড়া পাকাইবার জন্তই জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং উত্তাপ ও উচ্ছ্বাসবিহীন এই বিবরণে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। এরূপ মনোভাব স্থায়ী হইলে পৃথিবীতে শান্তি আসিতে পারে:

> হাঁ, প্রধান সমস্যা সম্পর্কে অর্থাৎ জার্ম্মানীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পররাষ্ট্র-সচিব বৈঠকে মতৈক্যলাভ সম্ভব হয় নাই। এ সম্পর্কে সোভিয়েট প্রতিনিধিদের প্রত্যেকটি গঠনমূলক প্রস্তাবকে পাশ্চাত্য প্রতিনিধিবর্গ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু সকলেই এ বিষয়ে একমত হন যে, জার্ম্মানীর ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন লইয়া ভবিষ্যতেও আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকিবে, মতামত বিনিময় চলিতে থাকিবে। সেপ্টেম্বর মাসে কবে বিশ্ব-সভার সাধারণ পরিষদের অধিবেশন সুরু হইবে, পরবর্ত্তী পররাষ্ট্র-সচিব বৈঠক কবে এবং কি কি সর্ত্তে বসিবে এ সকল বিষয়েও মতৈক্য হইয়াছে। পশ্চিম ও পূর্ব্ব জার্ম্মানীর মধ্যে, পশ্চিম ও পূর্ব্ব বার্লিনের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের আদান-প্রদান ও আর্থিক সম্পর্ক স্থাপন সম্পর্কে সম্পূর্ণ মতৈক্য হইয়াছে। আরও একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতৈক্য হইয়াছে। দখলকারী কর্তৃ-পক্ষেরা জার্ম্মানী ও বার্লিন সম্পর্কে যখন কোন যৌথ আলোচনা বৈঠক ডাকিবেন সেই বৈঠকে তাঁহাদের এলাকার জার্ম্মান জন-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ডাকা হইবে এবং জার্ম্মান বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ করা হইবে।
>
> অষ্ট্রিয়া সম্পর্কিত চুক্তি সম্পর্কে সম্মেলনে মতৈক্য হইয়াছে। উপরাষ্ট্র সচিবদের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আগামী ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে খসড়া চুক্তি সম্পর্কে এক-মত হওয়া চাই। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ জার্ম্মানীতে যে ব্যবচ্ছেদ ঘটাইয়াছেন প্যারী বৈঠকে তাহার কোন সমাধান হয় নাই সত্য, জার্ম্মানীর সহিত শান্তি চুক্তিরও কোন ব্যবস্থা হয় নাই। তথাপি বৈঠকে সাফল্যের পথে কিছু দূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কিছুটা সাফল্য লাভ হইয়াছে।

ভারত সম্বন্ধে ব্রিটেনের মনোভাব

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের কাশ্মীর কমিশনের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে

চলিয়াছে। এ বিষয়ে দোষ কাহার বেশী তাহার আলোচনা করিয়া লাভ নাই। এই কথা জানিয়াও বিলাতের "টাইম্‌স্‌" পত্রিকা ও উদারনৈতিক "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়েন" পত্রিকা যেরূপ ভাবে ভারতরাষ্ট্রের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়ার উদ্যোগ করিয়াছে, তাহার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা আমাদের করিতে হইবে। ভারত-রাষ্ট্র জোর করিয়া কাশ্মীর রাজ্যে ঢুকে নাই; পাকিস্থান তাহা করিয়াছিল, এবং তাহার জন্ত কাশ্মীরের রাজা শ্রীহরি সিং প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লার অনুমোদনক্রমে ভারতরাষ্ট্রের সাহায্য চাহিয়াছিলেন এবং সাময়িকভাবে ভারতরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আছেন। এই দুই ঘটনা সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। বিলাতী শাসকশ্রেণীর মুখপত্রগুলি যেমন করিয়া ভারতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রচার চালায়, তাহা দেখিয়া অনেক সময় মনে প্রশ্ন জাগে—ব্রিটিশ রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্বন্ধ অটুট রাখিয়া ভারতরাষ্ট্রের কি লাভ হইল?

"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়েনের" মত বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছি। গত এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান মন্ত্রী-অষ্টকের সম্মেলনের অব্যবহিত পরে "অক্‌স্‌ফোর্ড মেল" পত্রিকায় পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলীর কোভের সপক্ষে ওকালতী করিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়. প্রবন্ধের শিরোনামা ছিল—"পাছে আমরা ভুলিয়া যাই"। কলিকাতার পাকিস্থানি দৈনিক "ইত্তেহাদ" পত্রিকায় সম্প্রতি এই প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের সহযোগী এই প্রবন্ধকে "গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সেইজন্ত আমাদের পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থ তাহা উদ্ধৃত করিলাম:

> স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী ভাবিতেছেন যে তাঁহার প্রতিবেশী ভারতই এই সপ্তাহের কমন্‌ওয়েল্‌থ সম্মেলনে যা কিছু দ্রষ্টব্য তার সবগুলিই কাড়িয়া লইয়াছে। ভারত যখন আমাদের রাজাকে নিজের বলিয়া সম্মান করিবে না, তখন উহাকে লইয়া আমরা এত মাথা ঘামাইব কেন, এবং পাকিস্থান যখন রাজার প্রতি এখন সম্মান দেখাইতেছেন তখন তার প্রতি বা এত কম মনোযোগ দিব কেন? ইহার একটা উত্তর হয় ত এই—এই প্রকার অবস্থায় ইহাই আমাদের প্রাচীন নিয়ম; আর একটা জওয়াব এই যে পাক ভারত যমজ ভগিনী-দ্বয়ের মধ্যে ভারত অনেক বড় এবং অতকায় আয়োজনের সেই প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এ কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে…তার (পাকিস্থানের) সেনাদের নিকট আমরা ঋণী। এক দিক দিয়া পাকিস্থানই ইউরোপ ও খোদ এশিয়ার মধ্যকার সমস্তাসমূহের সমাধানের ব্যাপারে নেতৃত্ব করিতে পারে বা সেরূপ নেতৃত্ব করিতেছে।…আমরা তাকে সাহায্য করিয়া নিজেদেরই উপকার করিতে পারি।

পাকিস্থান কমনওয়েলথের তল্পিবাহক হইয়া থাকিবে না বলিয়া প্রধানমন্ত্রী যে উক্তি করিয়াছেন, পাকিস্থানকে সাহায্য দানের সময় আমাদের সে কথা মনে রাখিয়া যথেষ্ট সমীহ করিয়াই তবে সাহায্য দান করিতে হইবে। উপরে উদ্ধৃত কথার মধ্যে আমরা পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পক্ষে ব্রিটিশের যুক্তি একটা পাই—মধ্য-প্রাচীতে ব্রিটিশ স্বার্থ-রক্ষার জন্ত পাকিস্থানের সাহায্য পাওয়া যাইবে, মিঃ জিন্নার নিকট হইতে এইরূপ একটা ভরসা পাইয়াই ব্রিটিশ কূটনীতি-বিদগণ এই বিষয়ে এত আগ্রহ সহকারে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

পাকিস্থানের সেনা সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহা পুরানো মিথ্যা কথার পুনরাবৃত্তি। চার্চিল একবার বলিয়াছিলেন যে ভারতীয় সেনার শতকরা ৭৫ জন মুসলমান, এবং তাহার পর হইতে ঐ মিথ্যার প্রচলন চলিয়াছে। চার্চিলের মন্তব্যের পরই লিনলিথগোও গঠিত কাউন্সিলের মেম্বার সর্দার যোগেন্দ্র সিং ঐ মিথ্যার প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে ভারতীয় সেনার শতকরা ৭০ জন অমুসলমান। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের শেষে ভারতীয় সেনাদলে শতকরা ৮০ জন অমুসলমান ছিল।

গ্রাহক, সেলিংএজেণ্টস্‌, বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপনের এজেণ্টদের প্রতি

আগামী পূজার ছুটির জন্য প্রবাসী ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা প্রকাশিত হইবার সাধারণ নির্দ্দিষ্ট তারিখের কিছু কিছু আগে যথাক্রমে ২৫শে শ্রাবণ, ১৯শে ভাদ্র এবং ৭ই আশ্বিন প্রকাশিত হইবে। তদনুসারে ঐ সব সংখ্যার বুকপোষ্ট গ্রহণ ও ভিঃ পিঃ সংরক্ষণাদি গ্রাহকগণ যথাকালে করিবেন। সেলিং এজেণ্টগণ প্রয়োজনীয় সংখ্যার টাকা পূর্ব্বোক্ত প্রকাশ-তারিখের পূর্ব্বে পৌছাইবার ব্যবস্থা করিবেন। বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপনের এজেণ্টগণ ভাদ্র সংখ্যার জন্য ৫—১৫ই শ্রাবণের ভিতর, আশ্বিন সংখ্যার জন্য ১—১০ই ভাদ্রের ভিতর এবং কার্ত্তিক সংখ্যার জন্য ২০—৩১শে ভাদ্রের ভিতর সব বিজ্ঞাপনাদি পৌছাইবার ব্যবস্থা অতি অবশ্য করিবেন। ইতি—

প্রবাসীর কর্ম্মাধ্যক্ষ

সিন্ধুধর্মে পুরুষ দেবতার উপাসনা

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

সিন্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা প্রসঙ্গে আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা ও বেলুচীস্থানে প্রাপ্ত কতকগুলি স্ত্রীমূর্তি সম্বন্ধে স্যর জন মার্শালের ব্যাখ্যা। সিন্ধুধর্মে পুরুষ দেবতার উপাসনার প্রসঙ্গে প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে মোহেঞ্জোদারোতে ডাঃ ম্যাকের আবিষ্কৃত একটি সীলে খোদিত একটি পুরুষমূর্তি সম্বন্ধে স্যর জন মার্শালের ব্যাখ্যা। এই মূর্তির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য হইতে মার্শাল এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে মূর্তিটি শিবের প্রোটোটাইপ। বেলুচীস্থানের এক শ্রেণীর স্ত্রীমূর্তিকে তিনি কালীর প্রোটোটাইপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এখন তাহার সঙ্গে শিবের প্রোটোটাইপ পাওয়া যাইতেছে।

মার্শালের এই ব্যাখ্যা পণ্ডিতগণ মানিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা মানিয়া লইয়াছেন তাঁহাদের অনেকে এই মূর্তিটির বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে মার্শালের ব্যাখ্যার সমর্থনে পুরাণাদি হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে শিব প্রাক্-আর্য আমলের দেবতা, এই প্রাক্-আর্য বা অনার্য দেবতা হিন্দু ধর্মে গৃহীত হইয়াছেন। একজন পণ্ডিত একটু ভিন্ন পথে গিয়াছেন। তাঁহার মতে এই মোহেঞ্জোদারোর দেবতা বেদে রুদ্ররূপে গৃহীত হইয়াছেন। অনার্য বা প্রাক্-আর্য সিন্ধুধর্ম ও আর্য বৈদিক ধর্মের মধ্যে এই মিলন ঘটাইবার প্রয়াস, প্রমাণ-প্রয়োগের প্রয়াসের অভাব থাকিলেও, অভিনবত্বের জন্য উল্লেখযোগ্য। সে যাহা হউক, সাধারণ মত এই যে সিন্ধু উপত্যকার এই প্রাক্-আর্য দেবতা পরবর্তীকালের শিবের প্রোটোটাইপ বা আদিপুরুষ।

মার্শালের এই ব্যাখ্যা পণ্ডিতসমাজে সহজে গৃহীত হইবার কারণ মোহেঞ্জোদারোর সীলের মূর্তিটির বৈশিষ্ট্যগুলির পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা নহে, এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলি যে পৌরাণিক শিবের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যায় বা যায় না তাহাও নহে, ইহার কারণ মার্শালের সিদ্ধান্ত শিবের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত মতের সমর্থন করে। বৈদেশিক পণ্ডিত সমাজ ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত কয়েকটি কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া এই মত প্রচার করিয়াছেন যে শিব গোড়ায় আর্যদিগের দেবতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন অনার্য আদিবাসীদিগের উপাস্য দেবতা, সুতরাং জাতিতে অনার্য। কোন কোন পণ্ডিত পোষাক-পরিচ্ছদে শিবের অমার্জিত রুচির পরিচয়, শিবের গণদিগের কৃষ্ণবর্ণ, বিকৃত মুখ ও নাসিকার বর্ণনা, তাঁহার সর্পপ্রীতি প্রভৃতি হইতে তাঁহাকে জিপসী বা বেদিয়াদিগের উপাস্য দেবতা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। শিব যে আর্যদেবতার গোষ্ঠীভুক্ত নহেন এই মতের সমর্থনে যে সকল কিম্বদন্তী ও শাস্ত্রীয় উক্তির সাহায্য লওয়া হইয়াছে সেগুলির সামান্য উল্লেখ করা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। মোহেঞ্জোদারোর মূর্তিটির যে সকল বৈশিষ্ট্য হইতে মার্শাল মূর্তিটিকে শিবের প্রোটোটাইপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার কতকগুলি পৌরাণিক শিবের বৈশিষ্ট্য নহে, বৈদিক রুদ্রের বৈশিষ্ট্য; এবং যে সকল প্রাচীন কিম্বদন্তীর বলে শিবকে অনার্য দেবতা বলা হয় সেগুলির সঙ্গে পৌরাণিক শিবের কোন সম্পর্ক নাই, সেগুলি বৈদিক রুদ্রের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। বৈদিক রুদ্র পৌরাণিক শিব কিনা এ বিচার বাহুল্য। দুই-একজন ছাড়া পরবর্তীকালের রুদ্র-শিব যে বৈদিক রুদ্রের পরিবর্তিত রূপ ইহা কেহ অস্বীকার করেন না। এখানে এ সকল আলোচনা অনাবশ্যক। ঋগ্বেদে রুদ্রকে মঙ্গলময় অর্থে শিব বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অবশ্য অন্য দেবতা সম্পর্কেও এই পদের প্রয়োগ দেখা যায়। অন্য বেদগুলিতে রুদ্রের সম্পর্কে 'শিব' পদের প্রয়োগ অধিক দেখা যায়, কিন্তু অথর্ববেদের সময় পর্যন্ত শিব কেবল রুদ্রের নাম হইয়া দাঁড়ায় নাই। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে শিব পদ কেবল রুদ্রের সম্বন্ধে প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। ব্রাহ্মণগুলিতে শিবের মহাদেব নামও ব্যবহার হইতে দেখা যায়।

সে যাহা হউক, ঐতরেয় ও শতপথব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে রুদ্রের সম্বন্ধে কয়েকটি কিম্বদন্তীর উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে যজ্ঞের শেষে রুদ্র আবির্ভূত হন এবং যজ্ঞভাগের অবশিষ্ট নিজস্ব বলিয়া দাবী করেন। রুদ্রের 'পশুপতি' নাম কি ভাবে আসিল ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাহার কাহিনী আছে। ঋগ্বেদে রুদ্রকে "পশুপ" বলা হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে যে দেবগণ যখন স্বর্গে প্রস্থান করিলেন রুদ্র পশ্চাতে রহিয়া গেলেন। গোভিল গৃহ্যসূত্রে দেখা যায় যে যজ্ঞস্থানে রুদ্রকে অপর দেবতাগণ হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। যজ্ঞের শেষে চরুর অংশ তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রদান করিবার বিধি আছে।

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে আহার্য্যের পরিত্যক্ত অংশ উত্তর দিকে একটি স্থানে তাঁহার জন্ম রক্ষা করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যজুর্বেদের শতরুদ্রীয় স্তোত্রে রুদ্রকে দস্যু, বঞ্চক, তস্কর প্রভৃতির প্রিয় দেবতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হিরণ্যকেশিন গৃহ্যসূত্রে পশুযূথের এবং সর্পগণের মধ্যে রুদ্র বাস করেন বলা হইয়াছে। তিনি পশুচর্ম্মধারী ও পর্বতবাসী। শিব কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের কাহিনী রামায়ণে পাওয়া যায়। তাঁহার গণ ও ভূতদিগের উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়।

বৈদিক রুদ্র সম্বন্ধে প্রাচীন কিংবদন্তী ও অন্য দেবগণ হইতে পার্থক্যসূচক ব্যবস্থার নির্দেশ, দক্ষপ্রজাপতি কর্ত্তৃক অকুলীন দেবতা বিধায় যজ্ঞে শিবকে নিমন্ত্রণ করিতে অস্বীকার করিবার কাহিনী, শ্মশান, ভূত, সর্প, অরণ্য, পর্বত প্রভৃতির সঙ্গে শিবের সম্পর্কের উল্লেখ, মহাভারতে লিঙ্গোপাসনার সঙ্গে মহাদেবের সম্বন্ধ, শিবপূজায় জাতিবিচারের তীক্ষ্ণতার অভাব এবং আদিবাসীদিগের মধ্যে মহাদেব নামধারী দেবতার উপাসনার অধিক প্রচলন,—এই সকল কারণে শিব অনার্য দেবতা এইরূপ কথা উঠিয়াছে।

আর একটি কারণের উল্লেখ করিতে হয়। ঋগ্বেদে রুদ্রকে বভ্রুবর্ণ (brown) বলা হইয়াছে। যজুর্বেদেও তিনি তাম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ বলিয়া বর্ণিত। কীথ বলিতেছেন,

"Rudra's name Siva has been brought into connection with Tamil *Sivan* 'red man'."

একথা পূর্বে বলা হইয়াছে যে বেদে শিব রুদ্রের নাম নহে, বিশেষণ মাত্র এবং এই বিশেষণ অন্য কয়েকজন দেবতার সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা হইয়াছে দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? রুদ্রের বভ্রুবর্ণের উল্লেখ এবং তামিল শিবান অর্থে red man এই জোর প্রমাণের বলে শিব অনার্য দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কেহ কেহ এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে যোগসাধন—মহাভারতে মহাদেব যোগী ও তপস্বী বলিয়া বর্ণিত—দ্রাবিড়গণের নিকট হইতে আর্যগণ পাইয়াছেন। উপনিষদগুলির উৎপত্তিও দ্রাবিড়ীয়, একথাও উঠিয়াছে আমেরিকান পণ্ডিত হপকীন্স একটু আপত্তি তুলিয়াছেন, "That Rudra—Siva is mainly an aboriginal deity is rather a guess based on the belief that the name denotes 'red' than an ascertained fact (এখানে 'no certained factএর অর্থ কি?) and we have no assurance on the strength of which we could claim that the use of trance and asceticism or caste were Dravidian elements appropriated by the Aryans."

কিন্তু আপত্তি যতই হউক খ্রীষ্টান পাদরী মহোদয়গণের বর্ণিত mad snake-charmer শিবের অনার্য খ্যাতি এ দেশের বহু শিক্ষিত ব্যক্তিও সরল অন্তঃকরণে বিশ্বাস করেন, বিদেশীয়দিগের কথা বলা বাহুল্য।

মোহেঞ্জোদারো সীলের এই মূর্তিটির সম্বন্ধে স্যর জন মার্শালের সিদ্ধান্ত শিবের প্রাক্-আর্যত্ব বা অনার্যত্ব সম্বন্ধে অনেকের এই প্রকার ধারণা বা বিশ্বাসের সঙ্গে এমন সুন্দর মিলিয়া গিয়াছে এবং এই মূর্তিটির বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাখ্যা এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও ঐ ধারণা বা বিশ্বাসের পক্ষে এরূপ অনুকূল হইয়াছে যে যেন সর্বসম্মতিক্রমে এই মূর্তিটির প্রকৃত তাৎপর্য দৃষ্টি এড়াইবার সুযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

বর্তমান প্রবন্ধে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে মোহেঞ্জোদারোর এই সীলটিতে মূর্তিটির আনুষঙ্গিক যে সকল জিনিস পাওয়া যায় সমগ্র ভাবে তাহার বিচার করিলে এবং পুরুষ-দেবতার মূর্তিসহ আর কয়েকটি সীলের সাক্ষ্য এই সঙ্গে বিচার করিলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হইবে না যে মোহেঞ্জোদারোর এই পুরুষ দেবতা শিবের প্রোটোটাইপ নহেন, ইনি ধ্যানী বুদ্ধমূর্তির প্রোটোটাইপ। এই সীলের সকল অংশের বিচার করিলে ইহাই মনে হইবে যে শৈবধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সীলের পুরুষ-দেবতাকে সংযুক্ত করা অধিকতর বিচারসহ।

বর্তমান প্রবন্ধে যে চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা আংশিক ভাবে সফল হইলেও তাম্রযুগের মোহেঞ্জোদারোর এই মূর্তি ও ঐতিহাসিক যুগের ধ্যানী জীন ও বুদ্ধমূর্তির মধ্যে যে দুই সহস্র বৎসরের মত ব্যবধান বর্তমান বলিয়া মনে করা হয় সেই ব্যবধানের জন্য চিন্তিত হইবার কারণ নাই। সিন্ধুধর্ম ও শৈবধর্মের মধ্যে ব্যবধানও ইহার কম নহে।

প্রথমতঃ পৌরাণিক শিব যে অনার্য বা প্রাক্-আর্য আদিবাসীয় দেবতা এই ভ্রমপূর্ণ ধারণা বর্জন করা প্রয়োজন। পৌরাণিক বা মহাকাব্যের শিব বা মহাদেব, উপনিষদ, সূত্র ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের রুদ্র ও বৈদিক রুদ্র যে একই দেবতা ধীরভাবে যাহারা রুদ্রের ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহাদের সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিবার কথা নহে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে যাঁহারা ধর্মের ক্রমবিকাশের পর্যায়ের আলোচনা করেন তাঁহাদের চোখে এ সত্য সহজে ধরা পড়ে যে বৈদিক রুদ্রের কল্পনাতে যে সকল পরস্পরবিরোধী, সামঞ্জস্যহীন বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ দেখা যায় তাহার কারণ রুদ্রের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন, এরূপ একাধিক দেবতার কল্পনা রুদ্রের কল্পনায় স্থান পাইয়াছে। রুদ্রের মধ্যে যাঁহারা লয় পাইয়াছেন সেই সকল দেবতার বৈশিষ্ট্য রুদ্রে আরোপিত হইয়াছে, তাঁহাদের নাম রুদ্রের

নাম হইয়াছে। এই ব্যাপারকে পণ্ডিতগণ Syncretism নাম দিয়াছেন। বৈদিক রুদ্রকে এজন্য syncretic deity বলা যায়। অর্থাৎ বৈদিক যুগের রুদ্রের কল্পনায় বহু দেবতার কল্পনার সমন্বয় হইয়াছে। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় বৈদিক রুদ্রের উপাসনার সঙ্গে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এবং মহাকাব্যের যুগে একাধিক স্বতন্ত্র, নূতন ও পুরাতন উপাসনা সংযুক্ত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এইরূপ দুটি উপাসনা বা Cultএর উল্লেখ করা যাইতেছে। মহাভারতে দেখা যায় মহাদেব (the great god) যোগী, তপস্বী প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত হইয়াছেন। যোগসাধনার সঙ্গে শিবের সম্পর্ক মহাভারত অপেক্ষা খুব বেশী প্রাচীন নহে। অনুমান করিয়া লইতে হয় যে পূর্ব হইতে যোগসাধনার একটা স্বতন্ত্র ধারার অস্তিত্ব ছিল। মহাভারতেই আবার লিঙ্গোপাসনার সঙ্গে শিবকে যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই লিঙ্গোপাসনার প্রবর্তক উপমন্যু। মহাভারতে প্রসিদ্ধ ধৌম্য তাঁহার ভ্রাতা। তাঁহাদের পিতার নাম ব্যাঘ্রপাদ। সম্ভবতঃ উপমন্যু কাম্বোজ দেশীয় ছিলেন, কারণ তাঁহার একজন অধস্তন পুরুষকে কাম্বোজ ঔপমান্যব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উপমন্যু তাঁহার মাতার নিকট এই উপাসনায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। প্রজ্বলিত অগ্নিস্তম্ভরূপী লিঙ্গের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা হইতে লিঙ্গোপাসনাকে ঋগ্বেদের সময় পর্যন্ত টানিয়া লওয়া সম্ভব। (লেখকের Linga-Worship in the Mahabharata, *Indian Historical Quarterly*, December, 1948 দ্রষ্টব্য) অনুমান করিয়া লওয়া যায় যে মহাভারতের যুগের পূর্বে লিঙ্গোপাসনার একটি স্বতন্ত্র Cult রূপে অস্তিত্ব ছিল। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে যে-সময় হইতে লিঙ্গোপাসনা রুদ্র-শিবের উপাসনার সঙ্গে যুক্ত হইল ঠিক সেই সময় হইতে রুদ্র-শিব বা মহাদেব যোগী, তপস্বী, মহাযোগী ইত্যাদি নাম ধারণ করিলেন। ইহার অর্থ স্বতন্ত্র লিঙ্গোপাসনা ও যোগসাধনা প্রায় এক সময়ে প্রাচীন রুদ্র-শিবের উপাসনার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল।

সিন্ধুধর্মের পুরুষ দেবতার মূর্তি আছে এরূপ কয়েকটি সীলে দেখা যায় যোগসাধনার পরিচিত ভঙ্গী পুরুষ-দেবতার মূর্তিগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

সিন্ধুধর্মে পুরুষ দেবতা যেরূপে কল্পিত হইতেন তাহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পুরুষ দেবতার মূর্তিগুলির এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে দেবত্বের পরিচায়ক বিশেষ চিহ্ন হিসাবে গ্রহণ করিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইতে হইবে।

যোগসাধনার এই বিশিষ্ট ভঙ্গীটি সিন্ধুধর্মের পুরুষ দেবতার দেবত্বের চিহ্ন বলিয়া গৃহীত হইলে অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাইবে যে ভারতবর্ষের বাহিরে কোন প্রাচীন ধর্মে দেবত্বের এই চিহ্ন পরিজ্ঞাত ছিল না এবং ব্যবহৃত হয় নাই।

"This posture is not met with in the figure sculptures, whether pre-historic or historic, of any people outside India." (রমাপ্রসাদ চন্দ)

এই একমাত্র তথ্য পণ্ডিত সমাজে গৃহীত এবং বহুল প্রচারিত অনেক সিদ্ধান্তকে ভিত্তিশূন্য বলিয়া প্রমাণ করিবার পক্ষে এবং এই একমাত্র তথ্য সিন্ধুধর্মের সহিত পরবর্তীযুগের ভারতবর্ষীয় ধর্মসমূহের সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা পরিবর্তন করিবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইতেছে। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ নিজস্ব দেবত্বের পরিচায়ক এই বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করিতেছে যে সিন্ধুধর্মের তথা সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত মত, যাহার আলোচনা পূর্বের কয়েকটি প্রবন্ধে করা হইয়াছে, তাহার কোন ভিত্তি নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই তথ্যের সাহায্যে সহজেই বুঝা যায় যে সিন্ধুধর্মের যে স্তরের পরিচয় আবিষ্কৃত নিদর্শনসমূহ হইতে পাওয়া যাইতেছে তাহা উন্নত স্তরের ধর্মের। কদাকার, বিকৃতনাসা, পক্ষীচঞ্চুর মত মুখের কতকগুলি পুতুলকে সিন্ধুধর্মে পূজিত মহাদেবীর প্রতিমা বলিয়া গ্রহণ করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। তারপর এই তথ্য হইতে অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে যে সিন্ধুধর্মের সহিত ঔপনিষদিক ধর্মের একটা যোগসূত্র বর্তমান ছিল এবং এই যোগসূত্র ঋক ও অন্যান্য বেদে একেবারে অস্পষ্ট নহে। ইহা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে এই তথ্যের সাহায্যে সিন্ধুধর্মের সহিত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সম্পর্কের উপর বিশেষ আলোকপাত হইতেছে। অন্যান্য যে সকল নিদর্শনের সাহায্যে এই সম্পর্ক কতখানি ঘনিষ্ঠ ছিল বুঝা যায় পরে সেগুলির বিস্তারিত উল্লেখ করা হইবে।

তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে যে স্যর জন মার্শালের প্রচারিত দুইটি মতবাদ,—সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রীমূর্তিগুলি দেবী প্রতিমা এবং মোহেঞ্জোদারোর সীলের পুরুষ দেবতার মূর্তিটি পৌরাণিক শিবের প্রোটোটাইপ—ভিত্তিশূন্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিলে সিন্ধুধর্মের সহিত পরবর্তী যুগের ভারতবর্ষীয় ধর্মসমূহের যোগসূত্র লুপ্ত হয় না, বরং ভারতবর্ষীয় ধর্মের ধারাবাহিকতার একটা যুক্তিসঙ্গত ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা পাইবার সম্ভাবনা দেখা যায়। তারপর ধর্মের এই ধারাবাহিকতা হইতে সিন্ধুসভ্যতার বাহকদিগের

মধ্যে জাতি সংমিশ্রণের প্রশ্নের উপর নূতন আলোকপাত হইতেছে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গ এখানে আলোচিত হইতেছে না।

এখন মোহেঞ্জোদারোর সীলের পুরুষ দেবতার মূর্তি সম্বন্ধে স্যর জন মার্শালের সিদ্ধান্তের ভিত্তি কি প্রকারের দেখা আবশ্যক।

দেবমূর্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে এরূপ যোগাসনে উপবিষ্ট দুই শ্রেণীর পুরুষমূর্তি সিন্ধুউপত্যকার সীলসমূহে দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীর একটি মাত্র মূর্তির উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ইহা ডাঃ ম্যাকের আবিষ্কৃত মোহেঞ্জোদারোর তিনটি মুখবিশিষ্ট পুরুষমূর্তি। দ্বিতীয় শ্রেণীর মূর্তিগুলি একটি মুখবিশিষ্ট পুরুষ মূর্তি। কয়েকটি মোহেঞ্জোদারোর সীলে এবং হরাপ্পার দুইটি সীলিঙে (Triangular terra cotta prism sealing and oblong terra cotta sealing desoibed by Vats, Excavations at Harappa, Vol. I, p. 129, Vol. Pt. M,XCIII, 310, 303) এই এক বক্ত্র মূর্তি পাওয়া যায়। দুই শ্রেণীর মূর্তির একমাত্র সাধারণ বৈশিষ্ট্য বসিবার ভঙ্গী যাহা যোগশাস্ত্রে কুমারাসন নামে পরিচিত। শস্ত্রধারী বা পশুবাহন কোন দেবমূর্তি পাওয়া যায় নাই। কুমারাসনে উপবিষ্ট কোন স্ত্রীমূর্তিও পাওয়া যায় নাই। এক বক্ত্র মূর্তিগুলি নানা আবেষ্টনের মধ্যে দেখা যায়। তিনটি সীলে দেখা যায় মূর্তি যোগাসনে উপবিষ্ট, মস্তকাবরণের উপর দুইটি শাখা বা পল্লব (plant motif)। মার্শাল ইহাকে শৃঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ডাঃ ম্যাকের মতে ইহা শৃঙ্গ নহে, শাখা বা পল্লব। মোহেঞ্জোদারো সীলের ত্রিবক্ত্র মূর্তিতে যাহা ঊর্দ্ধলিঙ্গ বলিয়া মার্শাল বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কয়েকটি মূর্তিতে দেখা যায় না। একটি মোহেঞ্জোদারো সীলে দেখা যায় এক বক্ত্র যোগাসনে উপবিষ্ট দেবমূর্তির পার্শ্বে একটি নাগমূর্তি ও একটি মনুষ্যমূর্তি, তাহার দুই বাহু প্রার্থনার ভঙ্গীতে উত্থিত। ভাটসের বর্ণিত সীলে দেখা যায় যোগাসনে উপবিষ্ট দেবমূর্তির দক্ষিণে একটি মনুষ্যমূর্তি জানু পাতিয়া উপবিষ্ট। আর একটি সীলিঙে দেখা যায় একটি নীচু সিংহাসনের উপর যোগাসনে উপবিষ্ট দেবমূর্তি, দক্ষিণে কয়েকটি পশুর মূর্তি এবং একটি লোক একটি ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিতেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর এই এক বক্ত্র যোগাসনে উপবিষ্ট মূর্তিগুলি হইতে প্রথম শ্রেণীর ত্রিবক্ত্র মূর্তির কিছু পার্থক্য আছে। মার্শাল এই মূর্তিটির নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা দিয়াছেন :

"The God is three-faced, seated on a low throne in a typical attitude of *yoga*. . . . round his waist a double band. The lower limbs are bart and the phallus seemingly exposed. To either side of the god are four animals, an elephant and a tiger on his proper side and a rhinoceros and a buffalo on his left. Beneath the throne are two deer standing with heads regardant. Crowning his head is a pair of horns meeting in a tall headdress."

তিন বক্ত্র, যোগাসন, ঊর্দ্ধলিঙ্গ, পশুযূথ ও শৃঙ্গদ্বয়, এই কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হইতে মার্শাল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই দেবমূর্তিটি শিবের প্রোটোটাইপ।

তিন বক্ত্র মূর্তিটি যে শিবের প্রোটোটাইপ তাহা প্রমাণ করিবার জন্য মার্শাল গোপীনাথ রাওয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (T A.G. Rao, *Elements of Hindu Iconography* Vol. II Part I) হইতে ত্রিবক্ত্র শিবের কয়েকটি মূর্তির নমুনার উল্লেখ করিয়াছেন। এই মূর্তিগুলি মধ্যযুগীয়। মহাভারতে শিবকে এক হইতে ষড়ানন বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শিবের বিভিন্ন রূপের মধ্যযুগীয় মূর্তিগুলি সাধারণত ত্রিবক্ত্র নহে। শিব ত্রিবক্ত্র নহে, ত্রিনয়নের জন্য প্রসিদ্ধ। মার্শাল ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে তিনটি মুখ "may be a syncretic form of three deities rolled into one", এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ ত্রিমূর্তির কল্পনার উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ দেবদত্ত ভাণ্ডারকর এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া রুদ্রের ঋগ্বেদীয় ত্র্যম্বক নামের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ত্র্যম্বক পদের অর্থ ত্রিবক্ত্র। কিন্তু ঋগ্বেদে যেভাবে এই পদের উল্লেখ দেখা যায় (ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্) তাহা হইতে এই ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় না। অন্যান্য পণ্ডিতগণ ত্র্যম্বক অর্থে তিন ঋতু, তিন লোক, তিন মাতা প্রভৃতি অর্থ করিয়াছেন। অধিকন্তু ত্রিমূর্তির কল্পনা মহাকাব্য ও পৌরাণিক যুগের, এবং ইহার অর্থ মার্শাল বা ডাঃ ভাণ্ডারকরের ব্যাখ্যা হইতে ভিন্ন। ত্রিমূর্তি তিনটি ভিন্ন দেবতার সমন্বয় নহে, ব্রহ্মের তিনটি গুণের পৃথকভাবে প্রকাশ ত্রিমূর্তির কল্পনায় রূপ লইয়াছে।

"In Tri-murti we have merely separate hypostatisation of the three attributes of the Supre Being."

পুরাণাদিতে ত্রি বা বহু বক্ত্রতা কোন একজন বিশেষ দেবতার বৈশিষ্ট্য নহে, স্কন্দ, ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি সকলেই বহু বক্ত্রের অধিকারী।

সীলের ত্রিবক্ত্র মূর্তিটি যোগাসনে (কুমারাসনে) উপবিষ্ট। সম্ভবতঃ বসিবার এই পরিচিত ভঙ্গীটি মার্শালের সিদ্ধান্তকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবিত করিয়াছে। প্রাচীন দেবতাগণের মধ্যে একমাত্র রুদ্র-শিবকে মহাভারতে যোগী, তপস্বী

রূপে দেখা যায়। ঘোরতপা, যোগেশ্বর, মহাযোগী ইত্যাদি নামে তিনি অভিহিত। পূর্বে বলা হইয়াছে যে শিবের যোগিত্ব মহাভারত অপেক্ষা বেশী প্রাচীন নহে। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে সিন্ধুধর্মের এক বক্তু শ্রেণীর দেব-মূর্তিগুলি সকলেই কুমারাসনে উপবিষ্ট। এইগুলিকেও শিবের প্রোটোটাইপ মনে করিলে আলোচ্য সীলের মূর্তিটির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মার্শাল যে তাৎপর্য দিতেছেন তাহা বাহুল্য হইয়া দাঁড়ায়। তারপর দেখা যায় যে শিল্পরত্নের মতে শিবের উপবিষ্ট মূতি রচনায় (সুখাসীন মূর্তি) প্রতিমা ভদ্রপীঠের উপর ঋজুভাবে বসিয়া থাকিবে, বামপদ বাঁকিয়া আসনের উপর রক্ষিত ও দক্ষিণ পদ আসনের নিম্নে ঝুলিয়া থাকিবে। শিবের যোগদ দক্ষিণা মূর্তির কয়েকটি ভঙ্গীর মধ্যে মাত্র একটি ভঙ্গীতে শিব পদ্মাসনে, কুমারাসনে নহে—উপবিষ্ট, অপর কয়েকটি ভঙ্গী অনুসারে বামপদ উৎকিতাসনে ও দক্ষিণপদ নিম্নে প্রলম্বিত। অর্থাৎ যোগাসনে বসিবার ভঙ্গী হইতে হিন্দু দেবমূর্তি রচনার প্রচলিত নিয়ম-কানুন অনুযায়ী ত্রিবক্তু বা একবক্তু সিন্ধু দেবতাকে শিবের মূর্তি বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। মার্শাল তাঁহার সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইবার জন্য কয়েকটি মধ্যযুগীয় শিবমূর্তির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এই মূর্তির সাক্ষ্যে তাঁহার সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিতে হয়।

ঊর্দ্ধলিঙ্গ বলিয়া যাহা বর্ণনা করিয়া ত্রিবক্তু মূর্তিটিকে শিবের প্রোটোটাইপ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে মার্শালের নিজের সন্দেহ রহিয়াছে। "It is possible that what appears to be the pha'lus is in reality the end of the waistband." তবু তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে শিবের লাকুলিশ মূর্তিতে ঊর্দ্ধমেঢ্র দেখা যায়। ডাঃ ম্যাকের তালিকায় উল্লিখিত দুইটি সীলের মূর্তির বর্ণনা করিয়া তিনি বলিতেছেন মূর্তি দুইটি খাট কটিবাস পরিহিত মনে হয়। সম্ভবতঃ লিঙ্গ বলিয়া যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে সেইরূপ কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড পাওয়াতে মার্শালের মনে ঊর্দ্ধলিঙ্গের কথার উদয় হইয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে হিন্দুধর্মে লিঙ্গোপাসনায় লিঙ্গমূর্তিকেই শিব বলিয়া পূজা করা হয়; শিবের প্রতিমার পূজা করা হয় না। শিবের মূর্তির বিশেষতঃ ভৈরবরূপে, দিগম্বর প্রতিমা দেখা যায়। ভৈরব সাধারণতঃ দ্বারপাল বা অনুচররূপে পূজিত হন, প্রধান দেবতারূপে পূজিত হন না। মহাভারতে শিব যোগী ও তপস্বী, ঊর্দ্ধলিঙ্গ, ঊর্দ্ধরেতস নাম যোগীর সংযমের পরিচায়ক, ithyphallicism-এর পরিচায়ক নহে। শিবকে যাঁহারা ithyphallic দেবতার পর্যায়ে ফেলিতে চাহেন তাঁহারা গ্রীক ও রোমান পুরাণ পড়িয়াছেন, হিন্দুপুরাণ সম্বন্ধে অজ্ঞ।

ত্রিবক্তু সিন্ধু দেবতার দুই পার্শ্বে হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, মহিষ এবং সিংহাসনের নিম্নে দুইটি হরিণ স্যর জন মার্শালকে শিবের পশুপতি নাম স্মরণ করাইয়া দিয়াছে এবং এই পশুযূথের উপস্থিতিকে তাঁহার মতবাদের সপক্ষে একটা বড় প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত রুদ্রের পশুপতি নাম পাইবার কাহিনীর উল্লেখ করা হইয়াছে। পূষা বৈদিক পশুপালক, বৈদিক রুদ্র পশুপালক নহেন, পশুসংহারক। গৃহ্যসূত্রে তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য ষণ্ড বলির বিধান আছে। পৌরাণিক শিবের বাহন ষণ্ড, উল্লিখিত পশুগুলির কোনটির সহিত মহাভারতে বা পুরাণগুলিতে শিবের কোন সম্পর্ক দেখা যায় না। মহাভারতে শিবকে মাত্র ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। মধ্যযুগীয় শিবের চন্দ্রশেখর, উমাসহিত চন্দ্রশেখর প্রভৃতি মূর্তিতে একটি কৃষ্ণসার তাঁহার হস্তে ধৃত অবস্থায় দেখা যায়। কোন কোন দক্ষিণ মূর্তিতে দেখা যায় দুইটি হরিণ সিংহাসনের নিম্নে দাঁড়াইয়া তাঁহার ধর্ম-ব্যাখ্যা শুনিতেছে। মাত্র এইখানে সিন্ধু দেবতার সঙ্গে শিবের সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। কিন্তু বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতে শিবের এই মধ্যযুগীয় দক্ষিণ মূর্তি বুদ্ধমূর্তির আংশিক অনুকরণ মাত্র। সাঁচী, অমরাবতী ও ভারহুতের বৌদ্ধ শিল্পে উপাসনার দৃশ্যে অনেক ক্ষেত্রে হস্তী ও হরিণের উপস্থিতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হস্তীচালনার অঙ্কুশ, ত্রিশূল, পদ্ম, চক্র প্রভৃতির ন্যায় একটি পবিত্র প্রতীক। একটি দৃশ্যে দেখা যায় পঞ্চমুখ নাগের মন্দিরে মনুষ্য-উপাসকের সঙ্গে হস্তী, মহিষ, হরিণ ও মেষ সমবেত হইয়াছে। ভারহুত স্তূপের বিভিন্ন দৃশ্যে হস্তী ও হরিণের উপস্থিতি, ধর্ম ব্যাখ্যায় রত বুদ্ধদেবের আসনের নিম্নে মনুষ্যভক্তের পাশে অভিনিবিষ্ট হইয়া শ্রবণের ভঙ্গীতে (regardant) হরিণের উপস্থিতিও দেখা যায়। ত্রিশূল ও চক্র উপাসনার দৃশ্যে হরিণের উপস্থিতি দেখা যায়। ভিলসার স্তূপে একটি উপাসনার দৃশ্যে সিংহ, হরিণ, মেষ, মহিষ, ষণ্ড, উষ্ট্র প্রভৃতিকে সমবেত দেখা যায়। (মিগসমাদিকা চেতিয়, আম্বোদ চেতিয়, কানিংহামের গ্রন্থের, *The Stupa of Bharhut*, pl. XLIII Fig 2. pl. XLVIII nos. 9, III, pl. XXV Fig. 2 এবং ফারগুসনের গ্রন্থের—*Tree and serpent worship*—pl. XXIX Fig. 2, pl. XLIV Fig, 1. বুদ্ধমূর্তি দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং একথা বলা যায় যে মোহেঞ্জোদারো সীলের ত্রিবক্তু মূর্তির সঙ্গে পশুযূথের উপস্থিতি সিন্ধুদেবতার পৌরাণিক শিব বা বৈদিক রুদ্রের সঙ্গে সাদৃশ্য অপেক্ষা প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পে কল্পিত বুদ্ধ মূর্তির সঙ্গে সাদৃশ্য স্মরণ করাইয়া দেয়।

মার্শালের শেষ প্রমাণ মোহেঞ্জোদারোর ত্রিবক্ত্র মূর্তির মস্তকে শৃঙ্গদ্বয়। এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমতের মধ্যে দুইটি কথা আছে। প্রথম কথা এই যে মূর্তিটির মস্তকে এই জোড়া শৃঙ্গের দ্বারা প্রমাণ হয় যে উহা দেবমূর্তি। মেসোপটেমিয়ার, বিশেষ করিয়া মিশরীয় ধর্মে শৃঙ্গ symbol of divinity, দেবত্বের প্রতীক বা চিহ্ন। রাজা ও পুরোহিতের মত সম্মানীয় ব্যক্তিগণের মস্তকাবরণ শৃঙ্গ ভূষিত হইত। সুতরাং সিন্ধু উপত্যকার এই মূর্তিটির মস্তকে শৃঙ্গ থাকায় উহা যে দেবতার মূর্তি তাহা প্রমাণ হয়। সিন্ধু উপত্যকার অন্য কয়েকটি মূর্তির মস্তকে শৃঙ্গ দেখা যায়। কয়েকটি মুখোসেও শৃঙ্গ আছে। মার্শালের ব্যাখ্যা এই যে শৃঙ্গধারী কয়েকটি মূর্তি পুরোহিতের বা ভক্তের হইতে পারে। তাঁহার দ্বিতীয় মত এই যে এই শৃঙ্গ পরবর্তীকালে ত্রিশূলে পরিবর্তিত হইয়া শিবের নিজস্ব অস্ত্র হইয়াছে। মার্শালের প্রথম যুক্তি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে ডাঃ ম্যাকের মতে যাহাকে শৃঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা শৃঙ্গ কিনা সন্দেহ। এক বক্ত্র দুইটি মূর্তির মস্তকাবরণের বর্ণনায় তিনি বলিতেছেন—

"Surrounded by a plant motif with three branches in one case and only a single branch in the other."

ত্রিবক্ত্র মূর্তি মস্তকাবরণ সম্বন্ধে তাঁহার মত,

"Lacks the spray of foliage but has instead the fan-shaped ornament commonly associated with the pottery of female figurines."

সিন্ধু উপত্যকার মূর্তিগুলির মস্তকাবরণের বৈচিত্র্যের কথা স্ত্রীদেবতার আলোচনা প্রসঙ্গে একবার উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে সাঁচী, ভারহুত, অমরাবতী প্রভৃতির প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পের মূর্তিগুলির মস্তকাবরণের বৈচিত্র্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। স্ত্রী ও পুরুষ মূর্তির শৃঙ্গযুক্ত মস্তকাবরণ সাঁচীর শিল্পে যথেষ্ট দেখা যায়। এই সকল মূর্তিকে দেবতা, পুরোহিত বা রাজার মূর্তি বলিয়া ভ্রম করিবার কারণ নাই, রাজা ও পুরোহিতের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক পরিচ্ছদে রাজা ও পুরোহিতকে দেখান হইয়াছে। জেনারেল মেইজী প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পের শৃঙ্গযুক্ত মস্তকাবরণ সম্বন্ধে বলেন,

"Horn seems to have been formed sometimes by the top-knot of the hair twisted up with the folds of turban." (Gen. F. C. Maisey, *Sanchi and its Remains* pl. xii. 1 ; xiv. 2 ; pl. xviii ; pl. xxii এবং ফারগুসনের গ্রন্থে pl. xxvi ও pl. xxxvi, Fig. 1 দ্রষ্টব্য)

উপরের আলোচনা হইতে বলা যাইতে পারে যে মার্শাল ত্রিবক্ত্র মূর্তির মস্তকাবরণে যাহা শৃঙ্গ বলেন তাহা বিশিষ্ট এক ধরণের মস্তকাবরণ মাত্র এবং ধর্মীয় তাৎপর্যহীন।

মার্শালের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে ত্রিবক্ত্র মূর্তির মস্তকাবরণের শৃঙ্গ হইতে ত্রিশূলের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পে এক সঙ্গে ত্রিশূল ও শৃঙ্গের ন্যায় মস্তকাবরণ দেখা যাইতেছে। বৌদ্ধ শিল্পে ত্রিরত্ন প্রতীকের সঙ্গে ও পৃথকভাবে ত্রিশূল দেখা যায়। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের কতকগুলি মুদ্রায় মালব, কানৌজ, মগধ, সৌরাষ্ট্রের গুপ্ত আমলের মুদ্রায়, ইন্দো-সাসানীয় রাজাদের মুদ্রায় ত্রিশূল দেখা যায়। আরও প্রাচীনযুগে নন্দরাজা ক্রনন্দের মুদ্রায় ত্রিশূল দেখা যায়। সিন্ধুধর্মে যে ত্রিশূল অপরিচিত ছিল না অন্ততঃপক্ষে দুইটি সীল হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হরাপ্পার একটি সীলিঙের উল্লেখ করা হইয়াছে। (pl. XCIII. 303) ভাটস ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। Reverse—humpless bull standing by a trident-headed post with his head bent down a little। একটি সীলে (No 279) ত্রিশূল লইয়া মহিষকে আক্রমণ করিবার দৃশ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম সীলিংটিতে যোগাসনে উপবিষ্ট একবক্ত্র দেবতার মূর্তি দেখা যায়। সুতরাং ত্রিশূল সাধারণ অস্ত্র হইতে পারে, অথবা ইহার কোনরূপ ধর্মীয় তাৎপর্য থাকাও অসম্ভব নহে। সে যাহা হউক, ত্রিবক্ত্র মূর্তিটার মস্তকাবরণের শৃঙ্গ হইতে পরবর্তীকালে শিবের ত্রিশূলের উৎপত্তির যুক্তি এবং এই যুক্তির বলে মূর্তিটিকে শিবের প্রোটোটাইপ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা, সিন্ধুযুগে ত্রিশূল অপরিচিত ছিল না এই প্রমাণের বলে অগ্রাহ্য করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিবার আছে। বৈদিক রুদ্রের অস্ত্র তীর ধনুক, বজ্র ও বিদ্যুৎ। মহাভারতে গদী, খট্টাঙ্গী, ঝঝরী প্রভৃতি মহাদেবের বিশেষণ। প্রাচীন ইন্দো-সিথিয়ান, কুনিন্দ ও অন্য কতকগুলি মুদ্রায় এবং গুপ্ত আমলের কতকগুলি পোড়ামাটির সীলে শিবের অস্ত্র এক সঙ্গে যুক্ত ত্রিশূল ও পরশু বা কেবল পরশু।

মোহেঞ্জোদারোর ত্রিবক্ত্র মূর্তিটির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে স্যর জন মার্শালের ব্যাখ্যার যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে এই ব্যাখ্যা হইতে মূর্তিটিকে শিবের প্রোটোটাইপ বা আদিপুরুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে শিবের প্রোটোটাইপ কথার কোন অর্থ হয় না; কারণ বৈদিক রুদ্রের ক্ষেত্রে দেখান হইয়াছে এবং সকল প্রাচীন দেবতার ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পরবর্তী বিভিন্ন যুগে নূতন নূতন বৈশিষ্ট্য একজন দেবতার মূল বা প্রধান কল্পনার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে, পৌরাণিক আমলের শিব তাঁহার সকল বৈশিষ্ট্য লইয়া তাম্রযুগের সিন্ধুধর্মে বর্তমান ছিলেন, মার্শাল বাস্তবিক পক্ষে

ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যদিও সতর্কতা হিসাবে প্রোটোটাইপ কথাটি তিনি ব্যবহার করিয়াছেন।

এখন মোহেঞ্জোদারোর এই ত্রিবক্ত্র মূর্তি যদি শিবের প্রোটোটাইপ না হন তবে তিনি কে? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার যোগাসনে উপবিষ্ট এক বক্ত্র মূর্তিগুলির কথা বিবেচনা করিতে হইবে এবং সম্ভবতঃ মোহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত একটি আবক্ষ পুরুষ মূর্তি যাহার বর্ণনায় মার্শাল বলিতেছেন "with eyes concentrated on the tip of the nose i.e. in an attitude of yoga" (M. I. C. pl. XCVIII), তাহার কথাও বিবেচনা করিতে হইবে। বৈশিষ্ট্যবর্জিত দণ্ডায়মান পুরুষ মূর্তি কয়েকটি সীলে দেখা যায়। এইগুলির সম্বন্ধে এখানে কিছু না বলিয়া আলোচ্য মূর্তিগুলির প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা হইতেছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে এই মূর্তিগুলির এক মাত্র সাধারণ বৈশিষ্ট্য বসিবার ভঙ্গী। এই ভঙ্গী অসাধারণ, ভারতবর্ষের নিজস্ব, ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ, বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অতি পরিচিত। সুতরাং সহজে অনুমান করা যায় যে এই যোগাসনে বসিবার ভঙ্গীর মধ্যে সমস্যা সমাধানের সূত্র রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদ চন্দের মতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি মোহেঞ্জোদারোর মূর্তির সম্বন্ধে (statuette, A.R. of A.S.I. for 1926-27 pl XIX) এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে ব্রাত্য ও যতিদিগের সম্বন্ধে প্রাচীন কিম্বদন্তী (ব্রাত্য-অথর্ববেদ, যতি-ঋগ্বেদ) হইতে অনুমান করা যায় যে অলৌকিক শক্তি বা বিভূতি বা সিদ্ধাই লাভ করিবার জন্য প্রাগৈতিহাসিক যুগের উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রাক-আর্য অধিবাসীদিগের মধ্যে যোগ সাধনার চর্চা ছিল। এই চর্চা করিতেন প্রাক্-আর্য যুগের অধিবাসীদিগের পুরোহিত শ্রেণী যাহারা বৈদিক যুগে যতি নামে পরিচিত ছিলেন। চন্দের মত এই যে মোহেঞ্জোদারোর statuettes যতি পুরোহিতের মূর্তি। এই যতিদিগের মধ্যে যে যোগ সাধনার ধারা প্রবাহিত ছিল বৈদিক ধর্মের প্রভাবে তাহা লুপ্ত হইয়া যায় এবং যতি ব্রাত্যরূপে পরিণত হয়। ইহার পরে জন্মান্তরবাদ ও আত্মাবাদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে যখন আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান মুক্তির উপায় রূপে বিবেচিত হইতে আরম্ভ হইল তখন আবার যতিদিগের যোগসাধনার লুপ্ত ধারা প্রবল হইয়া উঠিল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মে সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ্যেতর ধর্মে শাকপুত্রিয়, নিরগ্রন্থ, আজিবক প্রভৃতি শ্রমণ শ্রেণীর প্রাদুর্ভাব হইল।

রমাপ্রসাদ চন্দের এই ব্যাখ্যা বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। ইহার একটি ত্রুটি এই যে এই প্রবন্ধের আলোচ্য ত্রিবক্ত্র ও এক বক্ত্র মূর্তিগুলি ও তাহাদের বিভিন্ন আবেষ্টনের সঙ্গত অর্থ ইহা হইতে পাওয়া যাইতেছে না। বৌদ্ধ ধর্মীয় শিল্পের সঙ্গে যে সাদৃশ্য উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতে এগুলিকে দেবমূর্তি বলিয়া অনুমান করিতে হয়, পুরোহিত মূর্তি বলা চলে না।

উপরে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে মার্শালের ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে অগ্রাহ্য করা চলে। যে অনুমানের কথা বলা হইল তাহার অতিরিক্ত কোন সিদ্ধান্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের বর্তমান অবস্থায় এবং সিন্ধুধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা আরও অগ্রসর না হইলে দৃঢ়তার সঙ্গে করা সম্ভব নয়। রমাপ্রসাদ চন্দের উপরের মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করিয়া এই পর্যন্ত বলা যায় যে যোগ-সাধনা সিন্ধু ধর্মে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। সিন্ধু ধর্মে ইহা দেবতার attribute এবং দেবত্বের পরিচায়ক ছিল এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। এই যোগসাধনার ধারণার উৎপত্তি প্রাক্-বৈদিক যুগের, ইহাকে প্রাক্-আর্য যুগের বলিবার কোন কারণ নাই ইহা সিন্ধু জাতির সম্বন্ধে আলোচনার কালে দেখা যাইবে। বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সিন্ধুধর্মের সাদৃশ্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যার কালেও ইহা দেখা যাইবে।

একলা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

প্রফুল্লর বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হ'ল। সে বিখ্যাত লোক নয়—'জয়ন্তী'গোছের একটা কিছু অনুষ্ঠানে ঘটা করে বয়সটা বিঘোষিত হবে—সে আশা সে রাখে না। তবু পঞ্চাশের হিসাবটা খতিয়ে দেখবার বাসনা হ'ল তার। দেওয়াল-পাঁজীর পাতায় তার জন্মদিনটির পানে চেয়ে সে ভাবতে বসল—আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে পৃথিবীর চেহারাটা কেমন ছিল।

পৃথিবী বলতে ভূগোলের বর্ণনা মনে হ'ল না, তার ছোট গ্রামের চারপাশের জলা-জঙ্গল, সঙ্গী-সাথী এই সবের ছবিই ভেসে উঠল স্মৃতির পটে। সে ছবি খুব স্পষ্ট নয়, স্বপ্নে-দেখা দৃশ্যের মত একটার সঙ্গে আর একটা সংলগ্ন, সেই কারণে ঝাপসাও। আদিঅন্তহীন ঘটনাগুলিকে তবু একটি সূত্রে গাঁথতে চেষ্টা করলে সে। কতকটা গাঁথা হলে দেখলে, পঞ্চাশ বছরের সময়ের স্রোত পার হয়ে যেখানে এসে সে দাঁড়িয়েছে—সেখানকার দৃশ্যটাই আলাদা। বাইরের চেয়ে মনের পরিবর্তনই বেশী করে অনুভব করছে সে আজ। পৃথিবীর জনতায় আত্ম-নিমজ্জন করে এতকাল যেভাবে কেটেছে—আজ পঞ্চাশ বছরের সূক্ষ্ম সীমায় এসে তা যেন থমকে দাঁড়াল। আশ্চর্য্য—জনতার তালে তাল রেখে—তার কোলাহলে কণ্ঠ মিশিয়ে চলতে চলতে কখন সে এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছে। তার কণ্ঠের সুর পাখীর কাকলীর মত অকারণে ঝরে পড়ছে না—তার অহেতুক আনন্দ আজ হেতুকে আশ্রয় করে রহস্যময় কিছুকে অন্বেষণ করতে চায়। আনন্দ আর দুঃখের উদ্বেগ, বেদনা আর প্রকাশ-ব্যাকুলতার ছোট-বড় ঢেউগুলি ক্রমশঃ শান্ত মন্থর হয়ে মিলিয়ে আসছে—মন অভ্যাসের খুঁটিতে বাঁধা মেষের মত এই সবের তালে তাল ঠুকছে বটে—তেমন উদ্দীপনায় দুলে দুলে উঠছে না। একটি পরিণাম-ধ্রুব সত্যকে জানবার জন্ত আকুল হয়ে উঠেছে সে। লোকের কাছে এই সব কারণে সে আখ্যা পেয়েছে স্বামীজী—অথচ স্বামিত্বের অহঙ্কার মোচনের জন্ত সে হাঁপিয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে বড় একলা—অসহায়। যারা আছে চার পাশে তাদের নিয়ে আনন্দের মেলা জমে—কিন্তু কয়-দণ্ডের জন্তই বা সে মেলা! ভাঙা হাটে মনের শূন্যতা—আকাশ অতিক্রম করতে চায়।

ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল—শ্যামলের কথা। যতীন, অনাথ, শ্যামাপদর কথাও সেই সঙ্গে মনে পড়ছে। কিন্তু শ্যামলের কাছে তারা নিষ্প্রভ। একই দিনে একই ক্লাসে পাশাপাশি বসে ওরা পরিচিত হয়—সে পরিচয় ইস্কুলের শেষপ্রান্তে ও কলেজের খানিকটা পর্য্যন্ত প্রগাঢ় সখ্যের কাহিনীতে পরিপূর্ণ ছিল। তারপর সংসারের তাড়নায় কে কোথায় ছিটকে পড়ল।

শ্যামলের মধ্যে একটি জিনিস তাকে মুগ্ধ করত আশ্চর্য্য ভাবে। বন্ধুত্বের বন্ধন সেই সূত্রেই দৃঢ় হয়েছিল হয়ত; ওর চেহারার মত বেশভূষারও বাহুল্য ছিল না। ওর মনের সঙ্গে পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদের অদ্ভুত সামঞ্জস্য ছিল। ওর মখের কোণে ময়লা কালো দাগ কিংবা দাঁতের গোড়ায় তাওলা-রঙের ছোপ কোন দিন দেখেনি প্রফুল্ল। কাপড় জামা জুতোর মালিন্য, তাও দেখেনি।—আজও সেটা মনে পড়ছে এই কারণে যে, শ্যামল বলতে যে চেহারাটা ভেসে ওঠে তা রঙে—গঠন-পারিপাট্যে হাসিতে কথায় ভঙ্গিতে সম্পূর্ণ নয়—এই বাহুল্যহীন সজ্জাও যে মূর্তির অন্যতম অংশ! ওর খাতার প্রথম পাতে লেখা থাকত, পরিচ্ছন্নতাই পবিত্রতা। গোটা হরপের লেখা—ও বলত, বাবা লিখে দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে ওর বাবাকেও মনে পড়ছে, মনে পড়ছে ওর মা-কে। ওর বাবা এমন হাসি হাসতেন যা মনে হয় দুর্লভ—আর মায়ের মিষ্ট স্বভাব আপন-পর সবাইকে কাছে টানত। সবাই বলত—ওঁরা ধার্ম্মিক লোক। ধর্ম্ম বলতে সে সময়ে প্রফুল্ল যা বুঝত আজ তার অর্থ বদলে গেছে। তখন ভাবত, সব মানুষকে সৃষ্টি করে সব মানুষের উপরে তিনি রাজত্ব করছেন—তাঁর ভজনাই হ'ল ধর্ম্ম। আজ ভাবে মানুষের মাথার উপরে নয়, হৃদয়েই তাঁর সিংহাসন পাতা। সমুদ্রের ঢেউ যেমন সমুদ্রের শোভা ও মহিমাকে প্রকাশ করে, তেমনি মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতিতে তিনি উপলব্ধ হন। সমগ্র রূপটি তাঁর একটি দৃষ্টিপাতে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কালে অংশে মহিমায় তাঁকে জানতে হয়। একটা প্রত্যক্ষীভূত হলে অন্যটা থাকে নেপথ্যে—অথচ নেপথ্য ও মঞ্চ সবটাই স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তির মত প্রত্যক্ষ। সমুদ্রের ধ্বনিতে যেমন তার গভীরত্বের পরিমাপ।

শেষ পর্য্যন্ত শ্যামলকে কল্পনার মত সুন্দর দেখেছিল ও। কলেজ ছেড়ে দিয়ে শ্যামল গ্রহণ করলে দেশ-সেবাব্রত। ঘটল কারাবাস। সেখান থেকে ফিরল ফুলের মালা গলায় ধারণ করে। লোকের মুখে মুখে ওর নাম। বন্ধুত্বের গৌরবে স্ফীত হ'ল প্রফুল্ল। সেই শ্যামলই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার কিছু দিন পরে অলুপ্ত হয়ে গেল স্বদেশহিতব্রতীর তালিকা থেকে, সুতরাং মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে গেল। প্রফুল্ল এইটুকু মাত্র খবর পেয়েছিল ও ব্যবসা করছে। কিসের ব্যবসা

সে খোঁজ নেয় নি—তবে অভিজাত সমাজে ওর প্রতিপত্তি বাড়ছে সেটা শুনেছিল লোক-মুখে। তারপর যে খবর এল তাতে আদর্শ ও স্বপ্ন গেল ভেঙে। অভিজাত-সমাজের নারী-ঘটিত একটা ব্যাপারে শ্যামলের নামটা জড়িয়ে সংবাদপত্রের শিরোনামায় আবার জ্বল জ্বল করে উঠল। বেশ মনে আছে, প্রফুল্ল অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। শ্যামলের মূর্তি বিকৃত হয়ে উঠল বলে নয়—ওদের অকৃত্রিম প্রণয়কে পৃথিবী যেন নিষ্ঠুর পীড়নে লাঞ্ছিত করলে। কিন্তু না—বর্ত্তমানের শ্যামল যতই মুছে যেতে লাগল—অতীতের শ্যামল ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠল মনে। প্রণয় যেন নূতন শাখায় নূতন পাতায় ও মুকুলে ভরে উঠল। তাতেই চিরজীবী হয়ে আছে শৈশবের শ্যামল নখে-দাঁতে যার ময়লা নেই, সাদা পোশাকে যে পরিচ্ছন্ন, সমগ্র ভঙ্গিতে যার পবিত্রতা।

কিন্তু এই আঘাতে একটা উপকার হ'ল। আকাশ-আশ্রয়ী চিত্ত মাটির বাসায় ফিরে এল। বেলুড় মঠে যাতায়াতটা কমে গেল—পুরোপুরি সংসারী হ'ল প্রফুল্ল।

যতীন বললে, খুব সামলেছিস ধাক্কাটা—আর একটু হলেই শূন্য-মণ্ডলের অথৈ শূন্যে গিয়ে পড়তিস। এবার চাকরি কর।

যতীনের যত্নে চাকরি একটা পেলে। সেই চাকরিতেই সংসার পুষ্ট হয়েছে। আর ক'টি বছর বাদে কর্ম্মক্ষেত্র থেকে মিলবে অবসর। এখন ভাবতেও আনন্দ হচ্ছে—যেন মুক্তি পাওয়া যাবে।

এই মুক্তি-সম্ভাবনায় এমন আনন্দ হয় কেন? সংসারের অতলে তলিয়ে যাওয়ার তৃপ্তি আজ নেই বলে? যারা একান্ত আপনার তাদের ছেড়ে কোথায় গিয়ে আরম্ভ করবে ও মুক্তির তপস্যা?

পিছিয়ে এল প্রফুল্ল।

নতুন বিয়ে, বন্ধুত্বের স্বাদে যথেষ্ট বৈচিত্র্য। তাসপাশা ফুটবল ক্রিকেট পিকনিক সিনেমা—জীবন হাল্কা ফানুসের মত উড়ছে। এরই মধ্যে জন্মের আনন্দে ও মৃত্যুর বেদনায় মনের ভারকেন্দ্র বিচলিত হচ্ছে। কিন্তু বিয়োগ স্থায়ী নয়—দুঃখ বা আনন্দ দুটিই বিচিত্র স্বাদে জীবনকে বড় করছে। আর পাঁচ জন সংসারীর মত পাঁচটা প্রবচন—গীতার শ্লোক ও উপনিষদের দু'এক টুকরো ভাসাভাসা ভাবে স্রোতের মুখে শেওলার মত ভেসে আসছে—তাই নিয়ে কাটছে দিন। মাঝে মাঝে মনে হয় দিনগুলি ভারী হয়েছে—মন্থরও হয়েছে খানিকটা।

এক দিন কথক ঠাকুর রত্নাকরের কথা বলছিলেন। দস্যু ব্রাহ্মণবেশী নারদকে হত্যা করতে উদ্যত হলে তিনি যে প্রশ্ন করেছিলেন—সেটি সোজাসুজি এসে বুকের মধ্যে বাসা বাঁধল।

তুমি যে এই মহাপাপ করছ—এর ফলভাগী আর কেউ নয় তা কি ভেবেছ?

কেন ঠাকুর, যাদের ভরণপোষণের জন্যে এই বৃত্তি নিয়েছি তারা সবাই এর অংশভাগী—বাপ, মা, স্ত্রী, পুত্র।

কেউ নয়—তোমার কর্ম্মফলের জন্য তুমিই শুধু দায়ী।

এই প্রশ্নোত্তর নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। স্ত্রী বলেছিল, রত্নাকর বাল্মিকী হবেন বলেই মুনি ওই ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন।

তুমি কি নিতে পার আমার পাপের ভাগ?—হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল প্রফুল্ল।

স্ত্রী হেসে বলেছিল, পাপ কাকে বলে?

এই ধর—কাউকে খুন করা—

শুধু শুধু খুনই বা করতে যাবে কেন?—স্ত্রীর হাসিটা শব্দমুখর হয়েছিল।

বিরক্ত হয়ে প্রফুল্ল বলেছিল, খুন কি কেউ করে না পৃথিবীতে?

করে নিশ্চয়—কিন্তু এ নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। ইহলোকে শাস্তির ব্যবস্থাটা আলই আছে কিনা।

প্রফুল্ল সঙ্কুচিত হয়েছিল আলোচনা চালাতে। এই পৃথিবীতে যস্কৃত অপরাধের দণ্ড নিজেকেই বহন করতে হয়, আর একটা পৃথিবীতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে কেন! সংসারে প্রত্যেকের সত্তাই আলাদা—তবু কোন্ সূত্রে এতগুলি প্রাণী কেন্দ্রলগ্ন হ'ল—এই চিন্তা মাঝে মাঝে জট পাকায় সংসার-যাত্রার ছন্দে।

তারপর যতই বয়স বাড়ে—তাস-পাশার আড্ডায় নিজের সংসার ছায়া ফেলে নিবিড় ভাবে।

বন্ধুকে যদি বলে, চল না ছবিটা দেখে আসি। বন্ধু বলে, পয়সাটা থাকলে একদিন বাজার-খরচ হবে। ছবি দেখলে পেট ভরবে না ভাই।

এক দিন অবস্থা ছিল—পেট না ভরলেও দুঃখ হ'ত না।

বন্ধুর কাছে যত বার দুঃখের কথা আনন্দের কথা বলতে এসেছে—তত বারই মনে হয়েছে, কোথায় যেন প্রাচীর উঠে গেছে। দেওয়ালের এপারের কথা ওপারে পৌঁছায় না—ওপারের ধ্বনি তো এপারে অর্থহীন।

যদি প্রফুল্ল বলে, কাল রাত্তির থেকে ছেলেটার একশো পাঁচ জ্বর।

বন্ধু বলে, তোমার একটি—আমার বাড়ী তো হাসপাতাল। মেজ মেয়েটার টাইফয়েড—সে সেরে উঠতে না উঠতে বড় ছেলেটা বিছানা নিলে। সঙ্গে সঙ্গে ছোটটার পেটের অসুখ। বাচ্চা মেয়েটার তো সর্দ্দিকাশি লেগেই আছে। নিজের পেটে মাঝে মাঝে এমন ব্যথা ওঠে—

বন্ধুর কথা অর্থ হারিয়ে ধ্বনিময় হয়ে ওঠে।

যদি কোনদিন আনন্দের বার্ত্তা দিতে আসে, ওহে ছেলেটা এবার ভাল রেজাল্ট করেছে ভাই, এ।

বন্ধু সহাস্তে বলে, ভাল—ভাল। আমার ছেলেটাও স্কলারশিপ পাবে শুনছি। সেদিন প্রোফেসার মিত্র বলছিলেন—কলেজের মধ্যে এমন ছেলে নাকি—

প্রাচীর একটু একটু করে উঠছে—এর ভিৎপত্তন বাড়ীতে।

মণ্টু বলছিল—তুমি নাকি ওকে আর পড়াতে চাও না?

মানে চাকরি যখন করতেই হবে—এই বেলা ঢুকে পড়া ভাল নয় কি?

কিন্তু তাই বলে পড়ার যার অত ঝোঁক—

যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় নি—তাদের মত গৃহস্থের ঘরে বিদ্যাটা অর্থকরী ছাড়া আর কি হতে পারে। বিদ্যার জন্ত দারিদ্র্যবরণ সেকালের আদর্শ—একালের পাঠ্যপুস্তকে সেটা গল্পের আকারে পাওয়া যাবে—কিন্তু এ কালের নীতিতে সে আদর্শের স্থান কোথায়। কতকগুলি পয়সা নষ্ট করিয়ে ছেলে কেরাণীগিরিতে বহাল হয়েছে—তবু স্ত্রীর জাঁক কমাতে পারেনি প্রফুল্ল।

সে সমানে তর্ক করে। লাভ হয়নি? বি-এ পাশ না করলে তোমার ছেলেকে দিত কেউ সাত হাজার—খাট পালঙ্ আসবাবপত্তর? আর ও টাকা না পেলে পার করতে পারতে মেয়েকে?

ছেলে আর মেয়ে দু'জনেই প্রাচীরের ওপিঠে। একজন চোখের আড়াল বলেই কিছু সান্ত্বনা—অন্তজন দৃষ্টিতে থেকেও স্পর্শবঞ্চিত; যেমন মাথার উপরে ওই আকাশ। প্রফুল্লর মনে পড়ে অনেক ঘটনা—তুচ্ছ সব ঘটনা অথচ তাতেই বুঝতে পারে প্রাচীরের উচ্চতা বাড়ছে—প্রসার বাড়ছে।

পরিচ্ছদের পারিপাট্য ওর বহুদিন ঘুচেছে। ফরসা কাপড় পরে আধময়লা জামাটাই টেনে নিতে হয়। কালিহীন জুতো ঝাড়বার জন্ত ব্রাশটাও হাতের নাগালে পাওয়া যায় না। আস্ত মাছ এলে মুড়োটা কোথায় মিলিয়ে যায় আর কাটা মাছের পেটিও পাতের শোভাবর্দ্ধন করে না। এক একদিন দুধের স্বপ্ন দেখে, কাঁকুরে চালে আলগা দাঁতের গোড়াগুলি আহত হয় গুরুতর ভাবে। অথচ তার প্রতি স্নেহ কি কারো কম—তাকে নিয়ে উদ্বেগ যে কেউ ভোগ করে না তা নয়। একটু মাথা ধরলে স্ত্রী অডিকলোনের শিশি নিয়ে শিয়রে বসে—বুকে সর্দ্দি বসলে ডাক্তার আসেন ছুটে। নিমোনিয়ার পূর্ব্বাভাস কিম্বা এবং ক'লক পেনিসিলিনে রোগীকে চাঙ্গা করে তোলা যায় তার হিসাব দিতেও ভোলেন না।

এক একদিন তন্দ্রা তিথিতে স্ত্রী বলে, চল ছাদে গিয়ে বসি।

জ্যোৎস্না ভালই লাগে—তবে বড় বেশী সাদা—বড় বেশী ফাঁকা—মনটা হু হু করে ওঠে। এই জ্যোৎস্নায় যা পাওয়ার কথা সে যেন হাজার চেষ্টা করলেও আর পাওয়া যাবে না—এই আলোয় যা ফুটে ওঠে তা বুঝি রক্তেরই ফুল। বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে বহুদূরব্যাপী সাদা আস্তরণে দৃষ্টি ক্লান্ত হয়।

মাছ মাংস ছাড়লেন কি এই কারণে? না দাঁতের বাঁধন আলগা হয়েছে বলে। ডাক্তার অবশ্য বিধান দিয়েছিলেন বয়স চল্লিশের ওদিকে হেললে রক্তের চাপ দ্রুত হয়—এ সময়ে পথ্য-বিধি সাবধানে পালন না করে গত্যন্তর নেই। তা মেনে চলতেই হয়। গল্পে বুড়ী যমকে ডেকে এনে কাঠের বোঝা মাথায় তুলে দেবার অনুরোধ করেছিল—ওটা রসিকতা নয়—বেঁচে থাকার খাঁটি সত্য ঘোষণা।

পায়ের তলায় স্রোতের টান বড় বেশী—বালুরাশি জমছে সেখানে। ইচ্ছা খানিক দাঁড়ায়—কিন্তু গভীরের ডাকের অর্থ না বুঝেও পা বাড়িয়ে দিতে হয় সেদিকে। তীরের মানুষ কুয়াসা-লুপ্ত—একটা ঝাপসা পরদার মত দুলছে…

জীবনে অনেক কিছুই তো দেখা গেল—পর পর দুটি মহাযুদ্ধ। ইতিহাসের চর্চ্চা না করেও মোটামুটি বোঝা যায় পৃথিবীর অর্থনৈতিক কাঠামোটা আমূল বদলে গেছে—সব দেশই কাহিল হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলে শান্তির বৈঠক বসল। শান্তির বৈঠক—না তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি! বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন—হিরোশিমার পুনরাবৃত্তি হলে সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য্য। কিন্তু সে হিসাব অনেক দূরের। সবচেয়ে বড় কথা ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে বিনা রক্তপাতে। চিরাচরিত ইতিহাসে নূতন একটি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু পঞ্চাশের কোঠায় পা দিয়ে এই স্বাধীনতাকে তেমন চিত্ত-উত্তেজক বোধ হচ্ছে না। মন সংসার থেকে মুখ ফেরাতে চায়—এবং সব রকমের ঘটনার থেকেও। কিছুতে যেন রস নেই—উদ্দীপনা নেই। পঞ্চাশোর্দ্ধে ঋষি-বাক্যকে অত্যন্ত সত্য বলে মনে হচ্ছে।

ভাবতে ভাবতে প্রফুল্ল ফিরে এল বর্ত্তমানে। টং করে একটা শব্দ হতেই চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। সাড়ে আটটা। এখনই নেয়ে খেয়ে ছুটতে হবে আপিসে। এ মাসে ক'টা লেট হয়েছে—আর লেট হলে শাস্তিভোগ করতে হবে। পায়ের কাছে খবরের কাগজখানা পড়ে রয়েছে—ওতে চোখ বুলোবার সময় নেই। মেঝেয় চায়ের কাপ বসানো—চা জুড়িয়ে বিস্বাদ হয়েছে—চুমুক দেওয়া চলবে না। কুড়ি বছরের অভ্যাসগুলি অতীতের স্মৃতি-রোমন্থনের বিপাকে পড়ে স্বধর্মচ্যুত হ'ল।

ওমা—তুমি বসে বসে এখনও ধ্যান করছ বুঝি? আপিস নেই?

আপিস!—আজ আর আপিসে যাব না। খবরের কাগজখানা কোলের কাছে টেনে নিলে প্রফুল্ল। আজ পঞ্চাশের প্রবেশ-মুখে কোন নিয়মই মানবে না সে।

তবে ওঠ—কাগজ নিয়ে বসলে চলবে না। একবার বাজারে যাও দেখি। ভাল দেখে একটা মাছ আনবে—মাছ না পাও একটা মুড়ো অন্তত। পো'টাক মিষ্টি দই আর গোটা চারেক সন্দেশ।

মনটা প্রফুল্লর ভরে উঠল। সে বুঝলে—কিসের জন্ত আজকের এই বিশেষ আয়োজন। পৃথিবীর কেউ না জানুক সংসারের একটি প্রাণীর অন্তরে তার বয়সের হিসাবটা অভ্রান্ত ভাবেই লেখা রয়েছে।

খুশী-উপচানো স্বরে প্রফুল্ল বললে, আচ্ছা একটু পরে—ঠিক পনেরো মিনিট—হেডিংগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নিই।

স্ত্রী হাত থেকে কাগজখানা কেড়ে নিয়ে বললে, না—এখুনি উঠতে হবে। ভটচাজ্জি মশায় আসবেন ঠিক দশটায়। একটু পায়েস আর মাছের কালিয়া তৈরী করে সাজিয়ে না দিলে চলবে কেন। অবিশ্যি যে দিনকাল পড়েছে না হলে নমো নমো করে এ কাজ কিছুতেই সারতাম না।

প্রফুল্ল যেন আকাশ থেকে পড়ল।

স্ত্রী বললে, তুমি তো সাধু-সন্ন্যেসী মানুষ—সংসারের কোন্ খবরই বা রাখ! দু' চাঁদ পূর্ণ হয়েছে—খোকার মুখে ভাত দেওয়া উচিত সে কথাটাও ভুলে বসে আছ! তোমার মত মানুষ কেন যে সংসারে থাকে—তাই আশ্চর্য্য!

প্রফুল্লর বিস্ময় ততক্ষণে কেটে গেছে। তড়াক করে উঠে আলনা থেকে আধময়লা কতুয়াটা টেনে নিয়ে গায়ে দিলে। তারপর চটিটার পা গলাতে গলাতে বললে, চট করে বাজারটা সেরেই নেয়ে নেব। হঠাৎ মনে পড়ল আজ আপিসে যেতেই হবে। আরে—ভাত না হয় কিছু জল-টল খেয়ে নেব'খন—ভারি তো একটা দিন! থলিটা হাতে নিয়ে সে এক রকম ছুটে বেরিয়ে গেল।

যাবার সময় শুনলে স্ত্রী বলছে, ওঁর জন্তে ভেবে তো আমার ঘুম হচ্ছে না! কিন্তু কি আক্কেল বল তো, একটা দিন আর আপিসে ছুটি নেয়া যেত না—সবই কি আদিখ্যেতা মানুষের!

কৃষি-শিক্ষা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষি-শিক্ষা প্রচলনের ও শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণকে কৃষিকার্য্যে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা বহু দিন হইতে চলিতেছে এবং এই চেষ্টা বহু রকমে হইয়াছে ও এখনও হইতেছে:—যথা কৃষি-মহাবিদ্যালয়, কৃষি-বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন, উন্নত কৃষিশিক্ষার জন্ত বিদেশে ছাত্র প্রেরণ ইত্যাদি। স্থানে স্থানে এই উদ্দেশ্যে কিছু কিছু বেসরকারী চেষ্টাও হইয়াছে। এই সম্পর্কে শিব-পুর কৃষি-মহাবিদ্যালয়, সাবোর কৃষি-মহাবিদ্যালয়, চুঁচুড়া কৃষি-বিদ্যালয়, ঢাকা কৃষিবিদ্যালয়, দৌলতপুর কৃষি-মহাবিদ্যালয়, রাজসাহী কৃষিবিদ্যালয়, বারাকপুর কৃষিবিদ্যালয়, যাদবপুর কৃষিবিদ্যালয় প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে পশ্চিম বাংলায় চুঁচুড়া কৃষিবিদ্যালয় ব্যতীত সম্ভবতঃ আর কোন কৃষিবিদ্যালয় নাই। শোনা যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক হরিণঘাটায় একটি উচ্চাঙ্গের কৃষি-মহাবিদ্যালয় শীঘ্রই স্থাপিত হইবে। ইহা ব্যতীত সম্প্রতি ঝাড়গ্রামের রাজা নরসিংহ মল্লদেব ঝাড়গ্রামে একটি কৃষি-মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রায় ৪০০ বিঘা জমি এবং এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই ইহার জন্ত একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। ঝাড়গ্রামের রাজার প্রধান কর্ম্মসচিব শ্রীদেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এই কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী ও অগ্রণী। গত ৮ই মে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ঝাড়-গ্রাম কৃষি-মহাবিদ্যালয়ের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে।

বিনা দ্বিধায় অতি স্পষ্ট ভাবে বলা যায় যে, অতীতে প্রচুর অর্থব্যয়ে প্রধানতঃ যে উদ্দেশ্যে কৃষি-মহাবিদ্যালয়, কৃষিবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল এবং উন্নত কৃষি-শিক্ষার জন্ত বিদেশে ছাত্র প্রেরিত হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই; অর্থাৎ এই সকল বিদ্যালয়ে বা মহাবিদ্যালয়ে অথবা বিদেশে কৃষিশিক্ষার ফলে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র ও যুবকগণ কৃষিকে প্রধান বৃত্তিরূপে গ্রহণ করেন নাই, দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকগণের কৃষি-শিক্ষার প্রতি উৎসাহ বাড়ে নাই ও পেশারূপে কৃষি-কর্ম্ম গ্রহণের প্রতি তাঁহাদের তেমন কোন আগ্রহেরও সৃষ্টি হয় নাই, কৃষি বা কৃষকের প্রতি সাধারণের সম্মান এবং শ্রদ্ধাও বর্দ্ধিত হয় নাই; দেশে ব্যাপকভাবে বিশেষ কোনো উন্নত কৃষি-প্রণালীর বিস্তারও হয় নাই। প্রধানতঃ চাকুরীলাভের সুবিধার জন্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবকগণ কৃষিশিক্ষা পাইবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। চাকুরীর সুবিধার হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অভাববশতঃ কৃষিবিদ্যা-লয় বা কৃষি মহাবিদ্যালয় লোপ পাইয়াছিল। সরকারী ও বে-সরকারী বৃত্তির সাহায্যে উচ্চতর কৃষি-শিক্ষালাভের জন্ত যাহারা বিদেশে গিয়াছিলেন তাঁহাদের বেলায়ও এই কথা

প্রযোজ্য ; এই সম্বন্ধে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয়ের উক্তি দিয়ে উদ্ধৃত করিলাম—"আমি গত ৬০ বছরের বাংলার কৃষি-

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ঝাড়গ্রাম কৃষি মহাবিদ্যালয়ের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন

বিভাগের ইতিহাস আজ নখদর্পণে দেখছি। সার এসলি ইডেন যখন বাংলার ছোটলাট ছিলেন তখন তিনি বৎসরে ৫০০ পাউণ্ড খরচ করে ২টি কৃষি-বৃত্তির প্রবর্তন করেন। এই বৃত্তির দ্বারা বৎসরে দুই জন মেধাবী ছাত্রকে বৈজ্ঞানিক কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠানো হ'ত। ইঁহাদের জন্য সরকারের কম টাকা ব্যয় হয় নাই। বৎসরে এক একজনের পেছনে খরচ হ'ত ২৫০ পাউণ্ড ; তখনকার দিনের এক শত পাউণ্ডের মূল্য এখনকার তিন শত পাউণ্ডের সমান ; প্রথমবার যান একজন মুসলমান ও একজন হিন্দু ; মুসলমান ভদ্রলোক বেহারের সৈয়দ মহম্মদ হোসেন। হিন্দু ভদ্রলোকটির নাম অম্বিকাচরণ সেন। তাঁরা শিক্ষালাভ করে যখন এদেশে ফিরে এলেন, তখন তাঁহাদের অর্জ্জিত কৃষিবিদ্যা কাযে লাগাবার সুযোগ হ'ল না। তাঁরা হলেন তখন ষ্ট্যাটুটরী সিবিলিয়ান—জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। তার পর ক্রমে ক্রমে গেলেন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মিঃ অতুল রায়, নৃত্যগোপাল মুখার্জ্জী, ভূপালচন্দ্র বোস। এঁরা আমার সমসাময়িক। ফিরে এসে এদের অধিকাংশেরই করতে হ'ল ডেপুটিগিরি ব্যোমকেশ বাবু হলেন ব্যারিষ্টার, আর গিরিশবাবু স্কুল-মাষ্টারির দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করতে লাগলেন। সুতরাং দেখতে পাচ্ছেন যে এতগুলো টাকা গেল 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়'।"*

অতীতের কৃষি-শিক্ষার বিষাদপূর্ণ কাহিনী ও চেষ্টার বিফলতা স্মরণ করিয়া আমাদের হাত পা গুটাইয়া নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বর্ত্তমানে সকলেই ইহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিতেছেন। অতীতে কৃষির প্রতি অমনোযোগ ও অবহেলা এক মুঠা অন্নের জন্য আমাদের পরের দুয়ারে ভিখারী করিয়াছে ; আমাদের জীবনীশক্তিকে ধীরে ধীরে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে এবং আমাদের বিপুল অর্থের অপচয়ের কারণ হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি যে, গত ৫।৬ বৎসরে আমাদের অর্দ্ধাশনে এমন কি অনশনে থাকিয়াও যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য আহরণের জন্য প্রায় ৬।৭ শত কোটি টাকা বিদেশে প্রেরণ করিতে হইয়াছে।

কি কি কারণে অতীতের প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে তাহা বিশেষরূপে অনুসন্ধান ও দূর করিয়া বর্ত্তমানে আমাদিগকে এমন একটি পরিকল্পনা ও কার্য্য-পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে যাহা দ্বারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকগণের কৃষির প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বাড়ে, তাঁহারা কৃষি-শিক্ষার প্রতি উৎসাহান্বিত হন এবং কৃষিকার্য্যকে প্রধান পেশারূপে গ্রহণ করিতে পারেন।

অতীতের ব্যর্থতার কারণগুলির মধ্যে আমার ধারণায় নিম্নলিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য :

(১) বিদেশী শাসন, বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের অভিপ্রায়, রুচি, প্রয়োজন অনুসারে বিদেশী ছাঁচে পরিকল্পনা ও কার্য্যপদ্ধতি প্রস্তুত এবং বিদেশীর কর্ত্তৃত্বে কৃষিশিক্ষার পরিচালনা। (২) কৃষিকার্য্যের প্রতি ভদ্র ও শিক্ষিতশ্রেণীর অশ্রদ্ধা ও অননুরাগ অর্থাৎ কৃষিকার্য্য সম্মানজনক পেশা নহে এই মনোভাব। (৩) সরকারী চাকুরী ও অন্যান্য বৃত্তির প্রতি অধিকতর মোহ। (৪) কৃষিকার্য্যে কঠোর পরিশ্রম। (৫) কৃষিকার্য্যের জন্য পল্লী-অঞ্চলে বাস করার অসুবিধা। (৬) শ্রম-বিমুখতা। (৭) শ্রমের মর্য্যাদার প্রতি উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব। (৮) শিক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি। (৯) কৃষিশিক্ষার অনুপযোগী পরিবেশ। (১০) অনুপযুক্ত ও অনভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী। (১১) অনুপযুক্ত শিক্ষার্থী নির্ব্বাচন। (১২) পেশারূপে কৃষিকার্য্য গ্রহণ করিবার পথে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণের অন্তরায় ; উপযুক্ত মূলধন এবং যথাযোগ্য স্থানে উপযুক্ত জমি সংগ্রহে অসুবিধা। (১৩) ভদ্রশ্রেণী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের

* কৃষি-ব্যবসা ও বাঙালী যুবকের অন্ন-সংস্থান।

যুবকগণের পক্ষে কৃষি যে লাভজনক পেশা তাহার উদাহরণের অভাব।

উপরোক্ত কারণগুলির মধ্যে বর্তমান সময়ে অনেকগুলি তিরোহিত হইয়াছে। এখন আর বিদেশী শাসন ও কর্তৃত্ব নাই, আমাদের দেশের শাসনভার ও কর্তৃত্ব এখন সম্পূর্ণরূপে আমাদের উপরেই ন্যস্ত হইয়াছে; আমাদের দেশের সকল প্রকার উন্নতির জন্য যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা আমাদের উপরই নির্ভর করিতেছে; আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আমাদের দেশের জলবায়ু, মাটি ও "মানুষের" উপযোগী সকল প্রকার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে ও তদনুযায়ী কর্মপদ্ধতি স্থির করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারি; এ পথে আর কোন অন্তরায় নাই। পূর্ব্বে কৃষিকার্য্যের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যতটা অশ্রদ্ধা ও অননুরাগ দেখা যাইত এখন তাহা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমানে ভদ্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বহু যুবক স্থানে স্থানে পুরাতন প্রণালী অনুযায়ী কৃষি বা কৃষিসংক্রান্ত অনেক কাজে লিপ্ত আছেন এবং অনেকেই সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই কৃষিকে প্রধান পেশারূপে গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত আছেন। সরকারী চাকুরী ও অন্যান্য বৃত্তির প্রতি পূর্ব্বেকার মোহ ও আকর্ষণ বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। বর্তমানে বাঙালী যুবকগণকে দু' মুঠা অন্নসংস্থানের জন্য যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতে হইতেছে এবং ইহার জন্য যে সকল পেশা গ্রহণ করিতে হইতেছে তাহাতে অনায়াসে বলিতে পারা যায় যে, ভদ্রশ্রেণীর বাঙালী যুবকগণ কঠোর পরিশ্রমকে আর ভয় করেন না এবং তাঁহাদিগকে আর শ্রমবিমুখতা দোষেও দোষী করা চলে না—তাঁহারা শ্রমের মর্য্যাদাও উপলব্ধি করিতেছেন। সুতরাং অন্যান্য কারণগুলি দূর করিতে পারিলেই খুব সম্ভব কৃষি-শিক্ষাকে অতি শীঘ্রই এবং অতি সহজেই কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারা যায়। তবে ইহা করিতে হইলে পূর্ব্বতন দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন হওয়া দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এখনও সেই পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পুরাতন ছাঁচেই সকল পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে। দেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেশের উপযোগী কোন পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে না। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীকে সোজা করিতে পারা যাইতেছে না। এই সম্পর্কে ৩রা এপ্রিল তারিখের "হরিজন" পত্রিকায় প্রকাশিত "মানাইয়া লওয়া" প্রবন্ধটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এ সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে কয়েকটি কথা বলিতেছি। প্রধান কথা এই যে, বিদেশের হুবহু অনুকরণে বা ছাঁচে আমাদের দেশের কৃষিশিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বন করিলে উহা পুনরায় ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে; আমাদের দেশের উপযোগী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে; সেই পরিকল্পনার মধ্যে অবশ্যই বিদেশের পদ্ধতি যতটা সম্ভব স্থান পাইবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, কয়েকজন
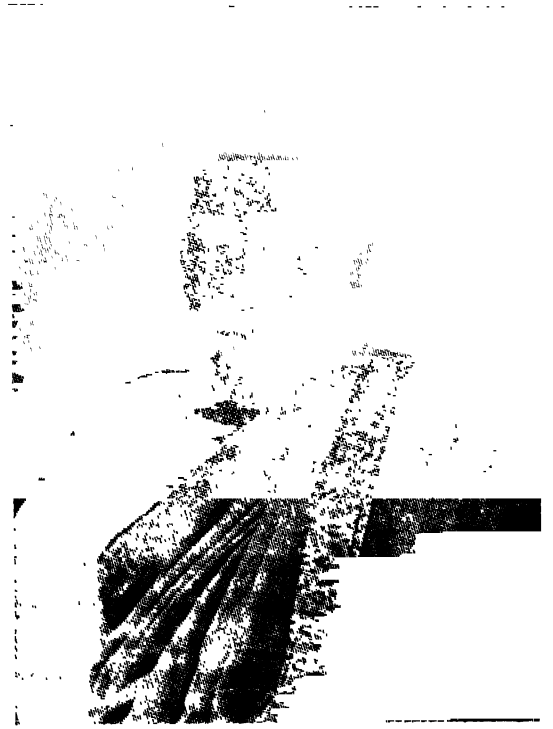
রাজা নরসিংহ মল্লদেব

ভদ্র-শ্রেণীর শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন যুবককে উন্নত কৃষিশিক্ষা দেওয়াই আমাদের চরম উদ্দেশ্য নহে; তাঁহারা হয়ত উন্নত কৃষিশিক্ষা লাভ করিয়া বিস্তীর্ণ জমি ও মূলধন সংগ্রহপূর্ব্বক অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিতে পারেন; কিন্তু ইহাতে দেশের কৃষির উন্নতি সাধিত হইবে না; ইঁহাদের কৃষিক্ষেত্রগুলি সরকারী কৃষি-ক্ষেত্রের ন্যায় সাধারণের, বিশেষত: কৃষকসম্প্রদায়ের নিকট 'আজব' ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইবে। সুতরাং আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত যে, কৃষিবিদ্যালয়ে বা কৃষি মহাবিদ্যালয়ে যে সকল উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা যেন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকগণ অল্প মূলধনের সাহায্যে গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহা যেন কৃষকদের মধ্যেও অতি সহজে বিস্তারলাভ করিতে পারে। এই সম্পর্কে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের উক্তি আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। তিনি বলিয়াছিলেন:—"বিলাতে শিক্ষালাভ ক'রে সে শিক্ষা দ্বারা এ দেশের কৃষির কোন উন্নতি করা চলে না। বিলাতে প্রত্যেক ভদ্রলোক কৃষক ১০০ কিম্বা ২০০ একর জমি নিয়ে

চাষবাস করে থাকেন। তাঁহারা শিক্ষিত ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বন করে চাষ করেন। আমাদের দেশের

ঝাড়গ্রামের রাজা নরসিংহ মল্লদেব বাগানে কোদাল চালাইতেছেন

চাষীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড জমি; এবং তাহারা নিরক্ষর। এজন্য বিলাতী চাষের প্রণালী ও আদর্শ এখানে চালান যায় না; দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা না করে কেবল বিলাতী শিক্ষা আমদানী করলে তাহা ফলবতী হয় না।" কৃষি-বিদ্যালয় বা কৃষি মহাবিদ্যালয় পরিচালনার জন্য আমাদের দেশের কৃষিসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কেবল বিদেশী উপাধিযুক্ত শিক্ষকগণের প্রতি বর্ত্তমানে যে অহেতুক মোহ আছে তাহা আমাদের বর্জ্জন করিতেই হইবে। লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এমন অনেক উদাহরণ দিতে পারেন যে, বিদেশপ্রত্যাগত উচ্চ কৃষি-উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের উপদেশ ও নির্দ্দেশ অপেক্ষা স্থানীয় কৃষি-অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের ও কৃষকদিগের পরামর্শ অনেক-ক্ষেত্রে অধিকতর ফলপ্রসূ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আচার্য্য প্রফুল্ল-চন্দ্রের উক্তিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। "...কৃষি শিক্ষা দিবার জন্য বিলাত যাওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই, এখন এদেশেই রসায়ন-শাস্ত্র, উদ্ভিদ-বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রকৃষ্ট বন্দোবস্ত আছে, এখানকার কৃষি শিক্ষা দিবার জন্য ও কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য এখানেই লোক পাওয়া যায়।" অবশ্য কৃষির উন্নতিসাধনের জন্য যাঁহারা বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা করিবেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; তাঁহারা এদেশে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া উচ্চতর বা উচ্চতম শিক্ষার জন্য বিদেশে যান ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকা উচিত নহে।

কৃষিশিক্ষালয়ের পরিবেশও কৃষির উপযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়; পল্লীর আবেষ্টনীতে কৃষকদের মধ্যে কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াই উচিত; এবং কৃষি-বিদ্যালয়ের জন্য বিরাট অট্টালিকাদিরও কোন প্রয়োজন নাই। এই প্রসঙ্গে সর্ব্বাগ্রে মনে রাখা দরকার যে, কৃষিবিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস এবং তাহার পরিবেশও যেন জাঁকজমকপূর্ণ ও "সৌখীন" না হয়। কৃষিশিক্ষার্থিগণকে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পল্লীগ্রামে বাস করিতে হইবে; সুতরাং শিক্ষাকালে তাঁহাদিগকে এমন পারিপার্শ্বিকে রাখা দরকার যাহাতে তাঁহারা পল্লীগ্রামের পরিবেশেও স্বচ্ছন্দে আরামে থাকিতে পারেন।

বলা বাহুল্য, শিক্ষার্থীনির্ব্বাচনের উপরেই কৃষিশিক্ষার সফলতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে; সুতরাং শিক্ষার্থী নির্ব্বাচনের পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া যে সকল শিক্ষার্থীর সহিত পল্লীগ্রামের এবং কৃষিকার্য্যের সংযোগ আছে ও যে সকল শিক্ষার্থী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কৃষি-কার্য্যকে প্রধান পেশারূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকেই নির্ব্বাচনের সময়ে প্রাধান্য দেওয়া দরকার। ইহার জন্য যদি প্রথম অবস্থায় উপযুক্তসংখ্যক শিক্ষার্থী না পাওয়া যায় তাহাতেও বিচলিত হইবার কারণ নাই। কৃষিশিক্ষা কার্য্যকরী হইলে অর্থাৎ উহা জীবনসংগ্রামে সহায়তা করিলেই শিক্ষার্থীর অভাব হইবে না। শ্রীমতী মীরা বেন লিখিয়াছেন, "বড়ই দুঃখের কথা যে বর্ত্তমানে আমাদের দেশের শিক্ষিত ও ধনী-সম্প্রদায় নিজেদের জীবনধারণের প্রাণ-মূল অর্থাৎ ধরিত্রী মাতা ও তাহার বক্ষপালিত প্রাণী বা উদ্ভিদসমূহের সহিত কোন সংযোগ রক্ষা করেন না।" ভবিষ্যৎ কৃষিশিক্ষালয় যদি এই সংযোগ পুনঃস্থাপিত করিতে পারে, তবেই উহার উদ্দেশ্য সফল হইবে। কৃষিশিক্ষাপ্রাপ্ত বহু যুবক উপযুক্ত মূলধন ও উপযুক্ত জমি সংগ্রহে অক্ষম হওয়ায় কৃষিকার্য্যকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইহার বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। এখানে কেবলমাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিব। একটি সরকারী পরিকল্পনা অনুসারে ফরিদপুর সরকারী কৃষি-ক্ষেত্রে লেখকের তত্ত্বাবধানে যে সকল ভদ্রশ্রেণীর যুবক কৃষি-শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে শহর হইতে বহুদূরে নূতন চর অঞ্চলে এইরূপ জমি দেওয়া হইয়াছিল যে, সে জমিতে কেবল বর্ষাকালের ফসল (গভীর জলের ধান ও পাট) উৎপাদন করা যাইত; সেই জমিতে শীতকালের কোন ফসলই চাষ করা সম্ভবপর ছিল না। এইরূপ জমিতে চরের মধ্যে কৃষক-সম্প্রদায়ের সহিত একত্রে বাস করিয়া ভদ্রযুবকগণ কি কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করিয়াছেন তাহা যাঁহারা না দেখিয়াছেন তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। কিন্তু এইরূপ এক-ফসলী জমিতে ভদ্রশ্রেণীর শিক্ষিত যুবকগণ কোন ক্রমেই কৃষিকাজ করিয়া লাভবান হইতে পারেন না। সুতরাং এই অন্তরায় দূর করা একান্ত আবশ্যক।

আমার মতে শেষোক্ত কারণটিই সর্ব্বপ্রধান। মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকগণের পক্ষে কৃষি যে লাভজনক বৃত্তি বা পেশা হইতে পারে তাহার তেমন কোন উদাহরণ আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে নাই। অবিভক্ত বাংলার সরকারী কৃষিবিভাগের কৃষিক্ষেত্রগুলি কস্মিনকালেও লাভের অঙ্ক দেখাইতে পারে নাই। পরন্তু এই সকল কৃষিক্ষেত্রের কার্য্যাবলী, পরিচালনা প্রভৃতি শিক্ষিত শ্রেণীর মনোযোগ মোটেই আকর্ষণ করে নাই। এই সকল কৃষিক্ষেত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকটে সরকারী "সখের বস্তু" এবং "প্রমোদ বিহারের" স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। পূর্ব্বতন প্রথা ও পদ্ধতি অনুসারে বর্ত্তমানেও এই সকল কৃষিক্ষেত্র পরিচালিত হইতেছে। এই সকল কৃষিক্ষেত্রের কার্য্যাবলীর প্রতি দেশের জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য কোনও পরিবর্ত্তনই আজ পর্য্যন্ত চোখে পড়ে না।

সরকারী ও বেসরকারী মহলের অনেক ব্যক্তির মুখেই শোনা যায় Go back to the Land। কিন্তু জমিতে ফিরিয়া গিয়া কত পরিমাণ জমি কি প্রণালীতে চাষ করিলে কি পরিমাণ আয় হয় তাহার কোন ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত তাঁহারা দিতে পারেন না। অবশ্য কাগজে কলমে একটা হিসাব দেখাইতে পারেন। পল্লী অঞ্চলে ৩০।৩৫ বিঘা জমি সহজসাধ্য উন্নত প্রণালীতে চাষবাস করিলে যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একজন যুবক একটি ছোটখাটো সংসার প্রতিপালন করিতে পারেন এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবার জন্য লেখক ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত রাজবাড়ীতে তদানীন্তন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় অমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে ৩০ বিঘা জমির মূল্য সংগ্রহ করিয়া কৃষিবিভাগের হস্তে দিয়াছিলেন এবং লেখকের পরিকল্পনা অনুযায়ী সেখানে একটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু লেখক ফরিদপুর ত্যাগ করিবার পরেই উক্ত পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। ভদ্রশ্রেণীর যুবকগণকে কৃষিকার্য্যের দিকে আকৃষ্ট করিবার প্রধান উপায় হইতেছে স্থানে স্থানে এইরূপ ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্র স্থাপন এবং উহা যে লাভজনক তাহা হাতে কলমে দেখানো। এইরূপ ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্রের একটি পরিকল্পনা অনায়াসেই প্রস্তুত করা যায়। সকল পেশা বা ব্যবসায়ের প্রতিই আমাদের যুবকগণ আকৃষ্ট হন, কারণ সমুদয় পেশা বা ব্যবসায়ে ব্যর্থতা যেমন আছে সার্থকতাও তেমনই আছে। কিন্তু কৃষি-পেশায় সেই রকম কোনো উদাহরণ নাই। সুতরাং এই রকম দৃষ্টান্ত যতদিন না দেখাইতে পারা যাইবে ততদিন পর্য্যন্ত কৃষি-শিক্ষা বিস্তারের কোনো চেষ্টাই ফলবতী হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। এই চেষ্টাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য দেওয়া দরকার। এই ক্ষেত্রে ইহাও মনে রাখা বিশেষ আবশ্যক যে, শিক্ষিতশ্রেণীর যুবকগণকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে দেশে উন্নততর কৃষিপ্রণালীর বিস্তার দ্রুততর ঘটিতে হইবে। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় যে, কৃষির উন্নতিকল্পে কত বড় বড় ব্যয়বহুল পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে অথচ

বাম হইতে—শ্রীদেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, ডাঃ সি. কে. সেন (খয়রা অধ্যাপক) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র, রাজকুমার, ডাঃ বি. বি. দত্ত (কলেজসমূহের ইন্‌স্‌পেক্টর), শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (আসাম কৃষিবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর)

এই অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়টি অদ্যাবধি কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। দেশে উন্নত ধরণের কৃষিপ্রণালীর প্রচলন সম্পর্কে লেখক ১৯৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পশ্চিম বাংলার তদানীন্তন গবর্ণরকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন; এই পত্রের একটি নকলও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহোদয়ের নিকট পাঠানো হইয়াছিল। পত্রের অংশ বিশেষ এই—

We should in the first instance demonstrate that agriculture is a paying proposition to a young man of the middle class family and it is unfortunate that in spite of the tall talks of our Agricultural department it has not yet been able to demonstrate it sufficiently widely to attract the attention of our young men towards this vocation of life. If there are a few examples of our young men living comfortably in the countryside by pursuit of agriculture many will follow suit. This is the case in every other vocation and there is no reason why it will be otherwise in case of agriculture.

কিন্তু দুঃখের বিষয় "অরণ্যে রোদনের মত" ইহার কোনো ফলই হয় নাই।

যাহা হউক খুবই সুখের বিষয় ও আশার কথা এই যে কাজগ্রামে কৃষি মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে ভাষণ দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, তিনি এই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন এবং কৃষিবৃত্তিকে যে লাভজনক করা যায় তাহা শিক্ষাকালীন অবস্থায় ছাত্রদের চোখের সামনে দেখাইবার প্রয়োজনীয়তাকেও প্রাধান্য দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "মামুলি কৈফিয়ৎ আছে, যে সকল কৃষিক্ষেত্রে

গবেষণামূলক কাজ চলিতেছে সেখান হইতে লাভ হইতে পারে না। আমি বিশেষজ্ঞ নই, তবু এ বিষয় আমার কিছু বলিবার আছে। আমার উপদেশ এই যে, কলেজসংশ্লিষ্ট প্রত্যেক কৃষিক্ষেত্রের কিয়দংশ পরীক্ষা ও গবেষণা-কার্য্যের জন্য ব্যবহার করা হইবে, কিন্তু ইহার বৃহত্তর অংশকে নিয়োজিত করিতে হইবে অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে। এইরূপ করিলে দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, প্রথমতঃ কৃষিকলেজের ব্যয়ভার কিছুটা লঘু হইবে, দ্বিতীয়তঃ ছাত্রদের মনে আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত হইবে, তাহারা অনুভব করিতে পারিবে যে, কৃষিকর্ম্ম বৃত্তি-হিসাবে লাভজনক, সুতরাং গ্রহণযোগ্য। আমার বিশ্বাস, এই আত্মপ্রত্যয় জাগরিত করার প্রয়োজনই বর্ত্তমানে সর্ব্বাধিক।"

জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসী" ঝাড়গ্রাম কৃষি মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পর্কে লিখিয়াছেন—"আমরা আশা করি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগের এতদিনের অভ্যস্ত পথ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইবেন, ভদ্রলোক-শ্রেণীর মধ্য হইতে নূতন চাষীর সৃষ্টি করিতে পারিবেন।"

রাজা নরসিংহ মল্লদেব ধনী হইয়াও ঝাড়গ্রামেই স্থায়ীভাবে বাস করেন; স্থানীয় সকল সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার অবাধ মেলামেশা আছে; দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিমূলক কাজে তিনি ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মসচিব ও পরামর্শদাতা শ্রীদেবেন্দ্র-মোহন ভট্টাচার্য্য সম্পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন। সর্ব্বাপেক্ষা আশা ও আনন্দের কথা এই যে, তিনি কৃষির প্রতি অনুরক্ত এবং নিজহস্তে বাগানে তরিতরকারী উৎপাদন করেন। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে তিনি পশ্চিমবঙ্গে কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রণী হইলেন সেই উদ্দেশ্য যাহাতে সাধিত হয় তাহার জন্য তিনি সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন ইহা আমরা আশা করিতে পারি। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কৃষি মহাবিদ্যালয় হইতে ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে নূতন চাষীর সৃষ্টি হউক—ইহাই প্রার্থনা।

মৃত্যু-বাসর

এ, এন, এম, বজলুর রশীদ

আমার মৃত্যু-বাসরে তোমরা করো না শোক,
সে প্রিয়তমের ইচ্ছাই আজি পূর্ণ হোক্।
শুনেছি কত না বর্ষণ-রাতে তাঁহার গান
লতা-পল্লবে নদী-নির্ঝরে—অনির্বাণ।
তাঁহার জ্যোতির শিখায় জ্বলিছে তারকাদল
জ্বলে লুব্ধক উজ্জ্বলতম অচঞ্চল,
সন্ধানে তার চির-চলমান সঙ্গীহীন
ধূমকেতু দূর মহাশূন্যের বক্ষে লীন।
আসে বন-বুকে কালবৈশাখী ঝঞ্ঝাঝড়,
তপ্ত দিনের পুঞ্জিত মেঘ মন্থর;
হানে বিদ্যুৎ, বজ্রের ধ্বনি সুগম্ভীর
মহৎ ভয়ের উদ্যত অসি, ত্রস্তনীড়
পাখী উড়ে যায়, শঙ্কায় কাঁপে অরুজন,
তবু জাগে প্রাণ উষ্ণ কোমল জীবন-মন।
তবু বুভুক্ষু মুষ্টি-ভিক্ষা মাগিয়া যায়,
মৃত্তিকা-বুকে আশ্রয় খোঁজে নিঃসহায়।

দেখেছি অত্যাচারীর খড়্গ হানিছে ঘাত
অর্থলোলুপ, পৃথ্বীরে করে ধূলিসাৎ।
মৃত্যুর লীলা—তবু তার বুকে দেখেছি প্রাণ—
ধ্বংসের বুকে নতুন দিনের জীবন-দান।
প্রশ্ন করেছি, "ব্যথাতুরে কেন দুঃখ দাও,
এত অবিচার ভেদবিদ্বেষ—তুমি কি চাও
পশুর মতন বাঁচিবে মানুষ বরষ-মাস
আঘাতে আঘাতে শোক-জর্জর ফেলিবে শ্বাস?"
হায়, বুঝি নাই সৃষ্টির তরে স্রষ্টা তার
কত যে মমতা পলে পলে কত চিন্তাভার।
আজি মৃত্যুর বাসরে মিলন—সে অজানার,
দেখিব কেমনে বক্ষ আমার দলিয়া যায়।
আঘাত তাহার হবে যে মধুর ভরসা তাই,
বন্ধু আমার সুন্দর, তার দোসর নাই।

লিপিকার সত্যেন্দ্রনাথ

[১৩৪৯ সালে প্রবাসীর পৃষ্ঠায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখিত তেরখানি চিঠি কবিবন্ধু স্বর্গত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে মৎ-কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথের আরও তিনখানি চিঠি প্রকাশিত হইল। এই চিঠি তিনখানি কবি তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা কনকলতা দত্তকে ১৩১৫ সালে লিখিয়াছিলেন। এই চিঠিগুলি লেখার পর বহু বৎসর অতীত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের ভাবধারার কিছু পরিবর্ত্তনও হয়ত হইয়াছে। কিন্তু চিঠিগুলির অন্তর্নিহিত সংযম, শালীনতা ও সৌন্দর্য্যবোধ তেমনি অটুট রহিয়াছে। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে কবির বয়স তখন ২৭ বৎসর ছিল এবং কবিপত্নী ছিলেন সপ্তদশ-বর্ষীয়া। কিন্তু এ চিঠিগুলিতে কোনও যৌবন সুলভ উচ্ছ্বাস নাই, সৌন্দর্য্য আছে—শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়।]

বৈশাখ—১৩১৫

হে আমাদের একজন !

নব বৎসর আমাদিগকে নূতন শক্তি প্রদান করুক। আমরা যেন সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা পরিহার করিতে পারি। নূতন বৎসর আমাদিগকে নূতন পথে লইয়া যাক্ আমরা যেন বেদনা বিস্মৃত হইতে পারি। ভারতবর্ষে দুইটি আদর্শ প্রধান। বৈদিক আদর্শ ও বৌদ্ধ আদর্শ। গার্হস্থ্য আদর্শ ও সন্ন্যাসের আদর্শ। আমরা দু'য়ের সামঞ্জস্য করিতে চাই। আমরা সংসারে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে চাই। আমাদের অন্য পন্থা নাই। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য আমাদের একান্ত পালনীয়। ব্রহ্মচর্য্য-ভ্রষ্ট হইলে কি হয়? সমাজ স্বতঃ পরতঃ নানা উপায়ে তাহার দণ্ড বিধান করে। তা ছাড়া ব্যভিচারীর বার্দ্ধক্য একান্ত অবজ্ঞার জিনিষ। পূজার ফুল শুকাইলেও নির্ম্মাল্যে পরিণত হয়। বিলাসীর উপভোগের ফুল রাত্রিশেষে পথের পঙ্কে পচিয়া থাকে। আমরা যেন শারীরিক সুখকেই চরম সুখ মনে না করি। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকারের দ্বারা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঙ্গল কার্য্যের দ্বারা যেন আমাদের এই সামান্য জীবনকে ধন্য করিয়া তুলিতে পারি। আমরা যেন মনকে শুদ্ধ শান্ত করিতে পারি। যেন বিচলিত বিক্ষুব্ধ না হই। যেন অভিমান না করি। যেন দুর্ব্বলতাকে সবলে পরিহার করিতে সমর্থ হই। মনুষ্যত্বের মহৎ আদর্শ যেন উজ্জ্বল রাখিতে পারি। স্নেহ, প্রেম, মমতা ইহা পরমুখাপেক্ষী নহে—ইহা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, সন্তুষ্ট; একথা যেন মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিয়া না যাই। বিলাসী বা বিলাসিনীদের হেয় আদর্শ যেন ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিতে পারি; তাহাদের প্ররোচনায় যেন আত্মবিস্মৃত না হই। আমাদের শরীর অপটু হইলেও যেন আমরা মনের শক্তি দ্বারা সকল বিঘ্ন-বিপত্তি দূর করিতে সমর্থ হই। হে নূতন বৎসর, তুমি আমাদিগকে নূতন জীবন প্রদান কর। ইতি

আমাদের আর একজন।

কবিপত্নী শ্রীকনকলতা দত্ত

২

লুইস্ জুবিলী স্যানিটোরিয়াম, দার্জ্জিলিং*

সুচরিতাসু !

আমি দার্জ্জিলিং এসে অবধি অনেকটা ভাল আছি। এখানে ভাল না থাকিয়া উপায় নাই। কারণ পৃথিবীর মধ্যে যাহা উচ্চ তাহাই চোখের সম্মুখে। প্রভাতে উঠিয়া পারদ-

* এ চিঠিতে তারিখ না থাকিলেও সত্যেন্দ্র-বন্ধু ৺ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে দার্জ্জিলিং হইতে অনবদ্য কবিতায় যে চিঠি কবি লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে জানিতে পারি কবি ১৩১৫ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে দার্জ্জিলিংয়ে ছিলেন। —স-চ-র,

মসৃণ তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘার অরুণসজ্জা দেখিয়া পবিত্র আনন্দরসে হৃদয় অভিষিক্ত হইতে থাকে। মনে হয় যদি দেবতা থাকেন আর যদি তাঁহারা মর্ত্যলোকে কখনও পদার্পণ করেন তবে ওই মৌন, শান্ত, শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক উচ্চ হইতেও উচ্চ কাঞ্চনজঙ্ঘাই তাঁহাদের উপযুক্ত পাদপীঠ। কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছে দার্জ্জিলিং যেন সমুদ্রগামী সুবৃহৎ জাহাজের কাছে পানসী। ত্রিতলহর্ম্ম্যের কাছে পর্ণকুটীর। শ্বেতহস্তীর কাছে মেষের দল। অথচ এই দার্জ্জিলিং সাত হাজার ফুট অর্থাৎ সাতশো তলার বাড়ীর মত উচ্চ।* এই দার্জ্জিলিং পাহাড়ে উঠিতে রেলগাড়ীতেই ছয়-সাত ঘণ্টা লাগে। কাঞ্চনজঙ্ঘা দার্জ্জিলিঙের চতুর্গুণ উচ্চ।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এমন চমৎকার স্থানের আদিম অধিবাসীরা কুৎসিত হইতেও কুৎসিত। কে যেন সযত্নে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া কক্ষে কক্ষে কতকগুলো কুৎসিত ব্যাং ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহারা অত্যন্ত অপরিষ্কার ও অত্যন্ত চুরুটপ্রিয়। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই চুরুট খায়। ইহারা "মুড়ো ঝাঁটা"-র মত এক প্রকার জিনিষ দিয়া চুল আঁচড়ায়। কলসীর পরিবর্ত্তে মোটা মোটা বাঁশের চোঙায় দুধ লইয়া বিক্রয় করিতে আসে।

ইতি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৩

বিজয়া দশমী†

সুচরিতাসু !

বিজয়ার সম্ভাষণ গ্রহণ কর। দুঃখকে বিজয় কর। আনন্দ লাভ কর। পবিত্রতাকে জীবনের সঙ্গী কর। আপনাকে জান।

ইতি—শ্রীসত্যেন্দ্র

* স্বর্গত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে কবি যে চিঠি কবিতায় লিখিয়াছিলেন (২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫) তাহা ১৩৪৯ সালে মাঘ সংখ্যায় মৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। সেই কবিতায় চিঠির প্রায় দুই ছত্র "আমি এখন বসে আছি সাত'শ তলার ঘরে, বাতাস হেথা মলিন বেশে পশিতে ভয় করে" কবিপত্নীকে লিখিত কবির এই চিঠির এই অংশ স্মরণ করাইয়া দেয়। —স চ-র

† ইহা ছাড়া কোন্ বছর, কি তারিখ উল্লেখ নাই।—স-চ-র

প্রবাহ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

২৭

পরদিন প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙিতেই পাশে পঙ্কজকে না দেখিয়া লিলি শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িল। বড় দুরন্ত হইয়াছে ছেলেটা। কিন্তু বাহির হইতে যাইয়া পুনরায় সে আড়ালে সরিয়া গেল। মৃন্ময়ের ভাবগতিক দেখিয়া লিলির কেমন ভয় হয়। স্বভাবতঃ গম্ভীর মৃন্ময় হঠাৎ কেমন যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। পঙ্কজকে সে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে—আর দুরন্ত ছেলেটা মৃন্ময়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতেছে। কিন্তু মৃন্ময়ের দু' চোখ ছাপাইয়া তখন জল গড়াইয়া পড়িতেছে। মৃন্ময়ের অন্তরের গোপন কথা হয় তো লিলি জানিলও না, কিন্তু সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, উপভোগ করিতেছিল এই দুই অসমবয়সীর অপূর্ব্ব মিলন।

লিলির এই লুকাইয়া দেখা অকস্মাৎ মৃন্ময়ের চোখে পড়িয়া গেল। সে একটু হাসিয়া কতকটা কৈফিয়ৎ দিবার ভঙ্গীতে কহিল, কি জানি যদি আর কোন দিন দেখা না হয়। প্রাণ ভ'রে ওকে এক দিনও আদর করি নি, তাই।

মৃন্ময়ের রকম দেখিয়া লিলির চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাই গোপন করিতে সে স্থানান্তরে চলিয়া গেল। নিজের কথা লিলি আর ভাবে না—ভাবিতে চায়ও না সে। বরং এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে সে মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু তাহাকে কেন্দ্র করিয়া মৃন্ময়ের জীবনে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পূরণ হয় তো আর এ জীবনে হইবে না।

কথাটা ছড়াইয়া পড়িতে বিলম্ব হইল না। রাজাবাবুর বাড়ী হইতে মৃন্ময়ের নিকট আহ্বান আসিল—টি পার্টিতে যোগদান করিতেও হইল। কত দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছে এ প্রশ্নটা সে এড়াইয়া গেল, কহিল, কত আর দেরী হবে—

ফিরিয়া আসা সম্বন্ধে সে নিজেও সঠিক কিছু জানে না, আসিবে কিনা তাহাও বলা কঠিন। নাড়ু তার খোঁজ করিয়াছে—তাই সে যাইতেছে। ভবিষ্যৎই তার পথ নির্দ্দেশ করিবে।

রাজাবাবু কিন্তু কথাটা অন্য ভাবে গ্রহণ করিলেন, খুশী হইয়া কহিলেন, তা বটে কত দিন আর আপনাকে বাইরে থাকতে হবে। তা ছাড়া আপনার পক্ষে বেশী দিন অন্যত্র থাকা ত সম্ভবও নয়। তিনি হাসিলেন। মৃন্ময়ও সে হাসিতে যোগ দিল।

আজ মৃন্ময় কলিকাতা যাত্রা করিবে। বাংলোর পরিবেশ

কেমন যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছে। লিলি মাঝে মাঝে এমন এক একটা কথা কহিতেছে যাহা মৃন্ময়ের কাছে অর্থহীন। লিলিকে এক নাগাড়ে দশ মিনিট কোথাও দেখা যাইতেছে না। কেমন একটা অস্থিরতা তার প্রতিটি কাজে এবং কথায় প্রকাশ পাইতেছে।

মৃন্ময় তাহাকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শরীরটা কি তেমন ভাল ঠেকছে না?

লিলি উত্তর দেয় নাই, কেবল হাসিয়াছে। এ হাসির মধ্যে মৃন্ময় শুধু আসন্ন বিদায়ের সাময়িক বেদনাই প্রচ্ছন্ন দেখিল। ইহা ছাড়া অন্য কোন কথা তার মনে স্থান পায় নাই—সে দৃষ্টি তার নাই। মেয়েদের জটিল মনস্তত্বের কথা ভাবিতে সে অনভ্যস্ত। তেমন সুযোগ তার জীবনে কোন দিন দেখা দেয় নাই। সোজা জিনিষটাকে ঠিক সোজা ভাবেই সে দেখে। কিন্তু তাই বলিয়া যে তার অনুভূতির কিছুমাত্র অভাব আছে তা নয়। ত' ছাড়া এই মুহূর্তে তার নিজের মন এমন বিপর্যাস্ত অবস্থায় আছে যে কোন কথা গভীর ভাবে তলাইয়া দেখিবার ধৈর্য্য তার নাই।

সকাল হইতেই পঙ্কজ মৃন্ময়ের পিছু লইয়াছে। শিশু-মনের রহস্য সে জানে না। হাসিয়া বলে, তোমার জন্ত একটা রেলগাড়ী আনব পঙ্কজবাবু!

মৃন্ময় আজ যাইবে এ কথাটা শিশু পঙ্কজ পর্য্যন্ত জানে। সে রেলগাড়ীর জন্ত আগ্রহ না দেখাইয়া তার সঙ্গে যাইবার বায়না ধরিল, তোমার সঙ্গে আমি যাব মামা!

মৃন্ময় নিজের কথাই বলিয়া চলিল, আর একটা মস্ত মোটর গাড়ী, একটা সাইকেল···পঙ্কজের ঐ সকল লোভনীয় দ্রব্যের জন্ত কোন আগ্রহ নাই। সে সবেগে মাথা নাড়িতে লাগিল এবং আপন মনে সুর করিয়া বলিতে লাগিল, আমি যাব··· আমি যাব।

লিলি আসিয়া ধমক দেয়।

মৃন্ময় বলিল, ওকে তুমি মিছিমিছি বকছ লিলি। ছেলে-মানুষ—

মৃন্ময়কে কথাটা শেষ করিতেও লিলি দিল না। কথার মাঝখানেই অকস্মাৎ চলিয়া গেল।

মৃন্ময় একটু বিস্মিত হইলেও সেদিকে মনোযোগ দিতে পারিল না, পুনরায় পঙ্কজকে লইয়া মাতিয়া উঠিল।

মৃন্ময় কহিল, তোমার জন্ত কি কি আনতে হবে আমায় লিখে দাও ত পঙ্কজ। হাতী, ঘোড়া, রেলগাড়ী, সাইকেল সব···

এত বড় প্রলোভন। পঙ্কজকে রীতিমত চিন্তিত দেখা গেল।

মৃন্ময় পরম উৎসাহে বলিতে লাগিল, সবগুলো তোমার হবে। হাতী, ঘোড়া, গাড়ী সব···

পঙ্কজ কহিল, আর ময়ূর···আর পাখী···

মৃন্ময় চমকাইয়া উঠিল। বুকের ভিতরটা যেন মোচড় দিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মুহূর্তে সে সহজ হইয়া উঠিল। পঙ্কজকে সাদরে কাছে টানিয়া তার কচি গালের উপর নিজের মুখ রাখিয়া কহিল, তাও এনে দেব তোমায়।

পঙ্কজ এতক্ষণে ফর্দ করিতে বসিল এবং কতকগুলি সোজা ও বাঁকা রেখার সাহায্যে তাহা সমাপ্ত করিয়া খুশী-মনে মৃন্ময়ের হাতে দিল। কহিল, লিখে দিয়েছি।

মৃন্ময় সযত্নে তাহা ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিল।

পঙ্কজ গোঁ ছাড়িয়াছে। ছেলেটা যেন মৃন্ময়কে পাইয়া বসিয়াছে। তারও একটা কেমন যেন মায়া পড়িয়া গিয়াছে।

লিলি পুনরায় দেখা দিল।

মৃন্ময় ডাকিল, শোন লিলি।

লিলি দাঁড়াইল। মৃন্ময় একদৃষ্টে তার পানে কিয়ৎকাল চাহিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, তুমি ভাবছ আমি কিছু বুঝি নি? আসলে তোমরা মেয়ে-জাত, তোমাদের মন একই ছাঁচে গড়া। কলেজে পড়াশুনো করেই থাক, আর নিজেদের সংস্কারমুক্ত বলে যতই প্রচার করো তোমাদের ভিতরের ইন্‌স্‌টিংট্‌ যাবে কোথায়? তোমরা কল্যাণী—

লিলির দু'চোখ সজল হইয়া উঠিল।

মৃন্ময় পুনরায় বলিল, আমার দুঃখ হয় সুনির্ম্মলের কথা ভেবে। সে আমার চেয়েও দুর্ভাগা। তোমায় চিনলে না।

মৃন্ময়ের কথার ধরণে লিলি কেমন আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অথচ শেষটুকু না শুনিয়াও নড়িতে পারিতেছিল না। এতক্ষণে সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। কিন্তু তথাপি সে খুশী হইতে পারিল না, মনটা গভীর বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল কেন? মৃন্ময় যে তার অন্তরের প্রকৃত সত্য জানিতে পারে নাই ইহাতে মন তার বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে কিসের জন্ত? এমনি করিয়া সে নিজেকে বহুদিন প্রশ্ন করিয়াছে, উত্তরও সে পাইয়াছে—তবুও প্রশ্নের তাহার বিরাম নাই। এই আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যে যেন তার অনেকখানি আত্ম-তৃপ্তি লুকাইয়া আছে।···

যাত্রার সময় ঘনাইয়া আসিল কিন্তু আশ্চর্য্য—লিলির দেখা নাই। লিলি ইচ্ছা করিয়াই অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। কথাটা হয়তো মৃন্ময়ের তেমন ভাবনার উদ্রেক করিত না, কিন্তু বিস্ময় তার সীমা অতিক্রম করিল যখন বিদায়ের মুহূর্তেও লিলি অথবা তার ছেলের দেখা পাওয়া গেল না। পঙ্কজের আয়া আসিয়া জানাইল; মাইজী খোকাবাবুকে লইয়া রাজাবাবুর বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছে। কিন্তু এই কি বেড়াইতে বাহির হইবার সময়!

মৃন্ময় নিজের মনকে প্রশ্ন করিল এবং এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে গিয়া কতকটা যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল, আঃ··· বোকা মেয়ে···পরমুহূর্তে নিজেকে শাসন করিল, এ ভুল···এ

অসম্ভব! লিলি সম্বন্ধে এ চিন্তা মনে আনাও তার অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু ন্যায় হউক আর অন্যায় হউক চিন্তাটা তার মন হইতে একেবারে দূর হইল না। অন্য পাঁচটা চিন্তার আড়ালে ঢাকা পড়িয়া রহিল মাত্র।

২৮

প্রায় দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে মৃন্ময় পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতার একটি বিখ্যাত হোটেলে সে আশ্রয় লইয়াছে।

আবার সেই কোলাহলমুখরিত মহানগরীর জনপ্রবাহ। কিন্তু আজিকার কোলাহল যেন প্রেতলোকের আর্তনাদের মত কানে আসিয়া বাজে। একদিন এখানে সে তার ভবিষ্যৎ গড়িতে আসিয়াছিল। গড়িতে পারে নাই, নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে তার স্বপ্নসৌধ ভাঙিয়া গিয়াছে। এই পাঁচ বৎসরে শহরে কতই না পরিবর্তন ঘটিয়াছে!

হোটেল হইতে মৃন্ময় বড় একটা বাহির হয় না—ভালও লাগে না। শুধু দিনান্তে একবার করিয়া নান্টুর খোঁজ লইয়া আসে। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সে কাশী গিয়াছে। যে-কোন দিন আসিয়া পড়িতে পারে।

নান্টু আজকাল ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের একজন হইয়াছে। তার মস্ত বাড়ী—গ্যারাজে গাড়ী। মন কৌতূহল-ক্রান্ত হইলেও অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি তার নাই।

লিলির কথা আজকাল তার সারাক্ষণ মনে পড়ে। তার স্নেহ ও সেবার স্পর্শ যেন মৃন্ময়ের সর্ব্বাঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। হোটেলের রুটিন বাঁধা পারিপাট্যের মধ্যে সে আনন্দ খুঁজিয়া পায় না বরং একটা অভাববোধ যেন তার বুকের ভিতরে বাসা বাঁধিয়া আছে। ইহার উপর আবার আছে পঙ্কজের স্মৃতি। সে যেন হাসিমুখে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, আমার মোটর···ময়ূর আর রেলগাড়ী···ছেলেটা হুবহু লিলির ছাঁচে গড়া। হয়তো সেইজন্যই সে তাকে এমন ভাবে মায়া-ডোরে বাঁধিতে সক্ষম হইয়াছে।

লিলির কাছে মৃন্ময় ঋণী। সে যদি এমনি করিয়া চতুর্দ্দিক দিয়া তাহাকে আড়াল করিয়া না রাখিত, স্নেহে সেবায় তার হৃদয়ের শূন্যতা ঘুচাইবার চেষ্টা না করিত তাহা হইলে হয়তো এতদিনে মৃন্ময় পাগল হইয়া যাইত। মঞ্জুষা আর লিলি। তার জীবনপথের দুই-বাঁকে দু'জনের আবির্ভাব! এরা তার জীবনে আনিয়াছে ব্যথা, আনন্দ দুই-ই।

মৃন্ময় জানে না মঞ্জুষা আজ কোথায় এবং কেমন আছে। তার জীবনের এই ক'টা বছরের মধ্যে অদৃষ্টের কোন্ লীলা চলিয়াছে। আজ যদি মঞ্জুষা আসিয়া তাহার সম্মুখে ত্রুটি স্বীকার করিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে, 'আমারই ভুল হয়েছিল, তার শাস্তিও আমার যথেষ্ট হয়েছে মিনুদা' তাহা হইলে কি করিবে সে।

হায়রে দুর্ব্বল মানুষ। মৃন্ময় মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিল। জীবনের মধ্যাহ্ন বেলায় আবার নূতন করিয়া এ রঙীন স্বপ্ন কেন! কিন্তু এই শাসন মন তো মানিয়া লয় না। যখন একটু আলগা হইতেই বন্যার জলের মত যত রাজ্যের চিন্তা আসিয়া তার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

এখানে আসিয়া দিন যাপন তার এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ওখানে বরং সে ভালই ছিল। কখনও লিলির সহিত গল্প-গাছা করিয়া, কখনও পঙ্কজের সহিত খেলা-ধুলায় মাতিয়া কখনও বা রাজাবাবুর নির্জ্জন পাঠাগারে বইয়ের স্তূপে নিমগ্ন হইয়া দিনগুলা তাহার এক রকম কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু এখানে এই নিরালা প্রকোষ্ঠে বসিয়া থাকাও যেমন কষ্টকর, বাহিরের কোলাহলও তেমনি বিরক্তিকর। নান্টু যে কবে পর্য্যন্ত ফিরিবে তাহারও স্থিরতা নাই। এদিকে মন তার সম্ভব অসম্ভব নানা চিন্তা-ভাবনার দোলায় আন্দোলিত হইতেছে।

নান্টু সংসারী হইয়াছে, বড়লোক হইয়াছে। অথচ তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা-ভরসা সকলেই ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিন্তু ছন্নছাড়া ভবঘুরে নান্টুর উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল গতির আজ বিরাম হইয়াছে। তাই ত মৃন্ময় আজ ভাবিতেছে যে, কোন্ দুর্ব্বার নিয়তি মানুষের অদৃষ্টকে লইয়া ভাঙা-গড়ার খেলা খেলিতেছে। নইলে তার জীবনের প্রবাহই বা আজ এই বাঁকা পথে মোড় ফিরিবে কেন? এম-এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে সে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার আকাঙ্ক্ষা ছিল, কোন কলেজে প্রোফেসারি লইয়া ছাত্রদের শিক্ষাদান ও চরিত্রগঠনে নিজের সময় ও শক্তি ব্যয় করিবে। কিন্তু নিয়তির বিধান আজ তাহাকে কোথায় লইয়া চলিয়াছে। অদৃষ্টের পরিহাস আর কাহাকে বলে!

তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার হৃদয়ের গভীর প্রেম চরিতার্থতা লাভ করিবার অবকাশ পাইল না। প্রচণ্ড ভূমি-কম্পে তাহা ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। মৃন্ময় নিজের জীবনের ঘটনাগুলি মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখে আর ভাবে, কি সে হইতে পারিত, আর কি সে হইয়াছে।

বিগত পাঁচ বৎসরের জীবনে বৃদ্ধ পিতা-মাতার কথা যে মৃন্ময়ের স্মৃতিপথে উদিত হয় নাই তেমন নহে কিন্তু মৃন্ময় সেদিকে দৃষ্টি দেয় নাই। নিজের মনের উপর বহু রকম উপদ্রবই সে করিয়াছে। বাপমায়ের কথা সে জোর করিয়া মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে, নিজেকে প্রিয়জনের সকল সম্পর্ক হইতে সে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ইহাতে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা তাহার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে। কিন্তু নিজেকে আঘাতের পর আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া সে যেন কেমন এক ধরণের আনন্দ পাইয়াছে—এও যেন এক প্রকারের সান্ত্বনা।

কিন্তু আজ বহুকাল পরে পুরাতন পরিচিত স্থানে ফিরিয়া আসিয়া মনটা সত্যই তার আকুল হইয়া পড়িয়াছে। বাপমায়ের সংবাদ জানিতেও সে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে এবং এই ঔৎসুক্যের অন্তিতম কারণ যে বিশেষ কোনো প্রিয়জনের দর্শনলাভের সম্ভাবনা এ কথাও সে নিজের কাছে অস্বীকার করিতে পারিল না।

আজ কয়েকদিন ধরিয়া বিকালের দিকে মৃন্ময় বেড়াইতে বাহির হইতেছে। হয় ইডেন গার্ডেনে নতুবা গড়ের মাঠের কোন একটা নির্জন স্থানে গিয়া সে চুপচাপ বসিয়া থাকে। এবার সুরু হইয়াছে তার জীবনের চমৎকার এক অধ্যায়। নিজের বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনকে এমনি ভাবে রিক্ত করিবার তার কতটুকু অধিকার ছিল। প্রশ্নটা আজ কয়দিন ধরিয়াই সে নিজের মনকে করিতেছে।

নান্তু আজও ফিরিয়া আসিল না। মৃন্ময় নিজের ঠিকানা রাখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কোনো খবর নাই। মৃন্ময়ের উৎকণ্ঠা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। এমনি সময়ে একদিন রাজাবাবুর এক টেলিগ্রাম লিলির ছেলের মৃত্যুসংবাদ বহন করিয়া আনিল। সংবাদটা যেমন আকস্মিক তেমনি মর্ম্মান্তিক।

মৃন্ময়ের সমস্ত অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল অথচ এই ছেলেটিরই উপর এক সময় তাহার মন বিরূপ হইয়াছিল।··· কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ছেলেটি তার মন জিতিয়া লইয়াছিল। টেলিগ্রাম পাইবার মুহূর্ত্তেও মৃন্ময়ের বুক-পকেটে ছেলেটির হাতের লেখাটুকু সযত্নে রক্ষিত আছে। মৃন্ময় একবার পকেট হইতে তাহা বাহির করিয়া দেখিল, দেখিল বালকের হাতের গুটিকয়েক সরল ও বক্ররেখা। তাহার দু'চোখ সজল হইয়া উঠিল।

রাজাবাবু টেলিগ্রামে তাহাকে যথাসম্ভব সত্বর ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছেন। লিলি নাকি অত্যন্ত কান্নাকাটি করিতেছে। কিন্তু ওখানে ফিরিয়া যাইতে মৃন্ময়ের আর ইচ্ছা নাই। বিশেষ করিয়া লিলিকে হয়তো আজ তার এড়াইয়া চলাই উচিত। তা ছাড়া ঐ নিরানন্দ পুরীর মধ্যে সে কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইবে। পঙ্কজের অভাবটা সে যে এখান হইতেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। এখনও মৃন্ময়ের কানে পঙ্কজের শেষ কথাগুলি রহিয়া রহিয়া ধ্বনিয়া উঠিতেছে, আমি যাব···আমি যাব···কিন্তু সেই যাওয়া যে এই যাওয়া তখন কে তাহা ভাবিতে পারিয়াছিল।

দিনকতক আগেই মৃন্ময় তাহার প্রতিশ্রুতিমত খেলনাগুলি কিনিয়া আনিয়াছিল। ঘরের কোণে সেগুলি সাজান আছে। নান্তুর বিলম্ব দেখিয়া সে ঐগুলি পার্শেলে পাঠাইবে মনস্থ করিয়াছিল। কিন্তু সে প্রয়োজনও ফুরাইয়া গেল।

এক দিক হইতে দেখিতে গেলে শিশুটি মরিয়া বাঁচিয়াছে। বড় হইলে পর কত সমস্যা আসিয়া দেখা দিত তার জীবনে— তার নিজের ও তার মায়ের জীবনকে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিত। কিন্তু এই প্রচণ্ড আঘাত হয়তো লিলির জীবনের আর একটা নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। পঙ্কজের চিন্তা আজ সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও মন হইতে দূর করিতে পারিতেছে না। ছেলেটাকে শেষ পর্য্যন্ত সে সত্যই ভালবাসিয়াছিল।

মৃন্ময় স্তব্ধভাবে বসিয়া আছে। হোটেল ম্যানেজারকে জানাইয়া দিয়াছে যে আজ আর তার আহারের প্রয়োজন নাই।

মৃন্ময় ভাবিতেছিল যে, ভাল আর সে কাহাকেও বাসিবে না। তার ভালবাসায় অভিশাপ আছে।

মৃন্ময় সহসা অতিমাত্রায় চমকাইয়া উঠিল। তার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। মৃন্ময়ের সুখ-দুঃখের অনুভূতি চিন্তাশক্তি সব যেন অসাড় হইয়া আসিতেছে। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল যে, হঠাৎ বিকট অট্টহাস্যে এই হোটেলের প্রকোষ্ঠখানাকে প্রকম্পিত করিয়া তোলে, অথবা সম্মুখের ঐ বড় আয়নাটিকে আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে অথবা মারাত্মক রকমের একটা কিছু করিয়া বসে, কিন্তু অতিকষ্টে সে তার অস্বাভাবিক মনোভাবকে দমন করিল। প্রকাশ্যে তার কোন ভাবান্তর পরিলক্ষিত হইল না। শুধু তাহাকে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় গম্ভীর মনে হইল।

মৃন্ময় এই মুহূর্ত্তে কি করিবে? কোন্‌টা কর্ত্তব্য এবং কোন্‌টা অকর্ত্তব্য তার হিসাব নিকাশ করিবার সময় এবং মানসিক অবস্থা কোনোটাই এখন তার নাই—যাহা কিছুই করিতেছে তার মধ্যে কোন যুক্তিবিচারের প্রবণতা নাই। ধৈর্য্যের বাঁধন তার শিথিল হইয়া গিয়াছে, মন হইয়া পড়িয়াছে নিতান্ত দুর্ব্বল।

সে রাতটা মৃন্ময়ের যেন একটা অভিনব অনুভূতির ভিতর দিয়া আধ ঘুমে আধ জাগরণে কাটিয়া গেল। দিনের পরিপূর্ণ আলোকেও তার মনের আনাচে কানাচে, তার জাগ্রত চৈতন্যে শিশু পঙ্কজ যেন ঘোরাফেরা করিতে লাগিল। কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে প্রথম সে ঐ শিশুকে এতখানি ভালবাসিতে সুরু করিয়াছিল এ কথাটা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, কিন্তু এই অনুভূতির মধ্যে যে বিন্দুমাত্র মিথ্যা অথবা কৃত্রিমতা নাই এ কথা একান্ত সত্য।

বেয়ারা অনেকক্ষণ চা দিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ মৃন্ময়ের সেদিকে হুঁস ছিল না। এতক্ষণে খেয়াল হইল, সে এক চুমুকে সবটুকু চা শেষ করিয়া কহিল, নিয়ে যাও আর কিছুর দরকার নেই। বেয়ারা একটু বিস্মিত ভাবে প্রস্থান করিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নান্তু আসিয়া তার ঘরে প্রবেশ করিল। মৃন্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল, নান্তু নিজেই একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল, কহিল, ঘণ্টাখানেক আগে ফিরেছি, কিন্তু খবর পেয়ে আর একমুহূর্ত্ত দেরী করি নি।

নাস্থু একটু দম লইয়া পুনরায় কহিল, এসে যখন পড়েছি তখন এখানে আর তোর থাকা হবে না। আমার সঙ্গে যেতে হবে।

মৃন্ময় এতক্ষণে কতকটা আত্মস্থ হইয়াছে। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় ?

নাস্থু কহিল, আমার ওখানে। হোটেলের পাওনা চুকিয়ে দিতে গিয়ে জানলাম কোথাকার কোন রাজাবাবুর নির্দ্দেশে বিলটা তার কাছেই পাঠাতে হবে। কিন্তু জিনিষ-পত্র কোথায়।

মৃন্ময় আঙুল দিয়া ঘরের কোণে একটি চামড়ার সুটকেস দেখাইয়া দিল।

নাস্থু পঙ্কজের জন্য কেনা খেলনাগুলির প্রতি মৃন্ময়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিল, ওগুলো ?

মৃন্ময়ের বুকের মাঝখানটা যেন ব্যথায় মোচড় দিয়া উঠিল, চোখ দুটিও সজল হইয়া উঠিল। নাস্থু পুনরায় প্রশ্ন করিতে মৃন্ময় জানাইল, ওগুলো আমার সম্পত্তি নয়। এখানেই থাকবে।

নাস্থু কহিল, তা হলে মিথ্যে দেরী করে লাভ নেই। কাপড় জামা বদলে নে।

মৃন্ময় ক্লান্তির সুরে কহিল, তার দরকার হবে না। সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

নাস্থু নিজেই সুটকেশটি বহিয়া লইয়া চলিল। মৃন্ময় একবার পিছন ফিরিয়া খেলনাগুলির পানে দৃষ্টিপাত করিয়া দ্রুতপদে নাস্থুকে অনুসরণ করিল।

বাহিরে গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। নাস্থু সোজা গিয়া গাড়ীতে উঠিল, মৃন্ময়কে কহিল, আয়। গাড়ী চলিতে লাগিল মৃন্ময় অথবা নাস্থু কেহই একটি কথাও কহিল না। উভয়ের মধ্যে যেন একটা অভ্রভেদী প্রাচীর দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া আছে। উভয়ে পাশাপাশি নিঃশব্দে বসিয়া আছে। আজ কত বৎসর পরে তারা মিলিত হইয়াছে—কত কথা তাদের মনে জমা হইয়া আছে, অথচ এতটুকু আবেগ উচ্ছ্বাস কাহারও বাক্যে বা ব্যবহারে প্রকাশ পাইতেছে না।

গাড়ী অল্পক্ষণের মধ্যেই আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। নাস্থু কহিল, ওঠ মিনু।

মৃন্ময় কলের পুতুলের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বাহিরের ঘরে পা দিয়াই সে নাস্থুকে প্রশ্ন করিল, খবরের কাগজে তোমার দেওয়া একটা বিজ্ঞাপন দেখেই আমি ছুটে এসেছি নাস্থুদা। কিন্তু কেন যে আমার খোঁজ করেছ সে কথা তো এখনো আমায় বললে না।

নাস্থু কয়েক মুহূর্ত্ত মৃন্ময়ের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ম্লান হাসিয়া কহিল, সে কথা এখুনি না বললে কি তুই ভিতরে আসবি নে ?

মৃন্ময় একটু লজ্জিত হইল এবং আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। কিন্তু মুখে কোন প্রশ্ন না করিলেও ভিতরের চাঞ্চল্য সে গোপন করিতে পারিতেছিল না। একটা অধীর আগ্রহ তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

নাস্থু কহিল, হঠাৎ লীলার কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেয়ে বোম্বাই চলে গিয়েছিলাম। তুই কত দিন কলকাতায় এসেছিস ?

মৃন্ময় বলিল, প্রায় দশ বার দিন হবে।

নাস্থু কহিল,গত পাঁচ বৎসর যাবৎ ক্রমাগত কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি—তোর নজরে পড়লো তা এতদিন পরে।

মৃন্ময় বলিল, এই কয় বছর খবরের কাগজের মুখ আমি এক রকম দেখি নি বললেই চলে। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই একটায় আমার নজর পড়েছে। তারপরে আর দেরি করি নি। মোটামুটি ওদিককার একটা ব্যবস্থা করে বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু কি তোমার প্রয়োজন নাস্থুদা, যার জন্যে আজ পাঁচ বছর ধরে আমার খোঁজ করে ধৈর্য্যের চরম পরীক্ষা দিচ্ছ।

নাস্থু চুপ করিয়া রহিল। মনে মনে হয়তো তার বক্তব্যটাকে গুছাইয়া লইতেছিল।

মৃন্ময় পুনরায় বলিল, চুপ করে আছ কেন নাস্থুদা ?

নাস্থু সহসা সচেতন হইয়া উঠিল, না চুপ করে থাকব কেন ? শুধু ভাবছিলাম কথাটা তোকে কি ভাবে বলা যায়। অথচ না বললেও আমার কর্ত্তব্যে অবহেলা করা হবে এবং নিজের কাছেও করতে হবে আজীবন জবাবদিহি।

মৃন্ময় অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। কহিল, তুমি বলতে চাইছ কি নাস্থুদা ?

নাস্থু কহিল, অন্যায় সব সময়েই অন্যায়—তা সে জেনে শুনেই করি, আর না জেনেই করি। নইলে এই পাঁচ বছর ধরে এই দুর্ব্বিষহ বোঝা আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে কিসের জন্য। আমি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছি মিনু।...

'তোকে মিথ্যে বলছি না'—নাস্থু বলিয়া চলিল, 'আমার এ কথাটা সব সময় বিশ্বাস করিস যে, তোর উপর আমি যে অন্যায় করেছি তাতে বাস্তবিকই আমার কোন হাত ছিল না। আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই তা ঘটেছে।'

মৃন্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। নাস্থু ক্রমশই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিতেছে।

নাস্থু বলিতে লাগিল, মঞ্জুর অনুরোধকে আমি অনুরাগ বলে ভুল করেছিলাম। তারই প্রায়শ্চিত্ত এখনও চলেছে।

নাস্থুর দুই চোখ সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া পরমুহূর্ত্তেই নিভিয়া গেল। শুষ্ক কণ্ঠে সে বলিল, মঞ্জুকে বরাবরই আমার ভাল লাগত। ছেলেবেলা থেকেই ওর প্রতি আমার একটা বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিন্তু সেটাকে অনুরাগই বলিস আর দুর্ব্বলতাই বলিস তার চরম দণ্ড পেলাম মঞ্জুকে বিয়ে করে

মৃন্ময় সহসা অস্বাভাবিক রকম চমকাইয়া উঠিল। তার এতখানি আগ্রহ ও আশা লইয়া ছুটিয়া আসা যেন একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। শূন্য দৃষ্টিতে সে নান্টুর পানে চাহিয়া আছে। নান্টুর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, সে আপন মনে বলিয়া চলিয়াছে, দশচক্রে ভগবানকে পর্য্যন্ত ভূত হতে হয়, আমরা তো সামান্য মানুষ। আমারও হয়েছিল সেই দশা। নইলে এতবড় দুর্ব্বুদ্ধি আমার হ'ত না। আর একটু হিসেব করে চোখ চেয়ে অগ্রসর হতাম। সাউথ ইণ্ডিয়ার বাস আমি তুলে দিলাম। দেহ মন আমার সুস্থ ছিল না। তার উপর লীলা আর এক কাণ্ড করে বসল। সে যোগ দিলে চিত্র-জগতে। আমি বাধা দিতে সে হেসে বললে, 'তুমি আজও দেখছি এইটিন্থ সেঞ্চুরিতে রয়ে গেছ।' উদ্বেগ বোধ করলাম। তার করে লীলার দাদাকে খবর পাঠালাম। সেখান থেকে বাধার পরিবর্ত্তে এল অকুণ্ঠ সম্মতি। ভেবে দেখলাম এদের এই দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সমান তালে চলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই শেষ পর্য্যন্ত আমিই চলে এলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে চলে না এলেই বুঝি ভাল হ'ত। অন্তত এমনি ভাবে সর্ব্বক্ষণ নিজেকে অপরাধী মনে করতে হ'ত না। কত বড় ভুলই না আমি করলাম, ফলে না হলাম নিজে সুখী, না পারলাম অপরকে সুখী করতে। মাঝখান থেকে এক গুরু দায়িত্ব এসে কাঁধে চাপল।

মৃন্ময় স্থির হইয়া বসিয়া আছে। নান্টুর সব কথা তার কানে পৌঁছিতেছে কিনা তাহাও ওর মুখ দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। সে যেন জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। অতীতের বহু ঘটনা যেন তার চোখের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। নান্টু মৃন্ময়ের স্থির নির্ব্বাক মূর্ত্তির পানে খানিক একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ বলিতে আরম্ভ করিল, মঞ্জুর সঙ্গে আমার দেখা হ'ল পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে। সে পুজো দিয়ে ফিরছিল। মঞ্জুই প্রথমে আমায় চিনতে পেরে আলাপ করে। নইলে আমার পক্ষে তা সম্ভব হ'ত না। মঞ্জু আগ্রহভরে আমায় তাদের বাড়ীতে থাকবার আমন্ত্রণ জানালে। সে আহ্বানকে আমি উপেক্ষা করতে পারি নি। বিশেষ করে এত দীর্ঘকাল প্রবাস-বাসের ফলে মনটাও অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। তার পরের ঘটনাগুলো কতকটা নাটকীয় দ্রুত গতিতে শেষ হয়ে গেল। আমি নিজের সম্বন্ধে খুব বেশী ভেবে দেখবার অবকাশও পেলাম না। মঞ্জুষার একান্ত আগ্রহে আমি তাকে বিয়ে করতে সম্মত হলাম। মঞ্জু আমায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও বুঝতে দেয়নি যে, সে আমাকে আশ্রয় ক'রে তোকে চরম দণ্ড দেবার ব্যবস্থা করেছে। বোকা মেয়েটা একবারও ভেবে দেখলে না যে তারই দেওয়া আঘাত কিরূপ প্রচণ্ড হয়ে তাকেই আবার প্রত্যাঘাত করতে পারে। হ'লও তাই।...

নান্টু একটু দম লইয়া পুনরায় বলিতে সুরু করিল, এত দুঃখের মধ্যেও এইটেই আমার মস্তবড় সান্ত্বনা যে, মঞ্জুষার চূড়ান্ত সর্ব্বনাশ আমার দ্বারা হয় নি। একটা রাতের ব্যবধানেই চরম সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে রাধুর একখানা বিস্তারিত চিঠিতে। সেখানা পড়ে আমার সংসার-ধর্ম্মের স্বপ্ন এক নিমিষে টুটে গেল। ভাবলাম যা হ'ল তা বোধ হয় ভালই হ'ল। কিন্তু অনিচ্ছাসত্বে অথবা অজ্ঞাতে আগুনে হাত দিলেও জ্বালা ভোগ করতে হবে বৈ কি। তাই আজও কাঁধের বোঝা নামিয়ে ফেলতে পারি নি। তার উপর সেই থেকেই মঞ্জুর বাবা যেন কেমন হয়ে গেছেন। এক রকম পাগলও বলা চলে।

মৃন্ময় ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া নির্জ্জীব কণ্ঠে কহিল, কাকাবাবু পাগল হয়ে গেছেন!

এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাসিয়া উঠিল নান্টু, কহিল, হ্যাঁ পাগল —তাঁকে আজ পাগলই বলা চলে। মানুষ কত সহ্য করতে পারে বলতে পার মৃন্ময়। সকলে তো আর আমার মত হৃদয়-হীন, অথবা মঞ্জুষার মত ইস্পাত দিয়ে তৈরি নয়। মঞ্জু বলে, এক দিনের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আজীবন আর কতগুলো ভুলকে প্রশ্রয় দিয়ে আমি করতে পারব না। যা সত্য তা বাবাকেও জানাতে হবে। রাধুর চিঠিখানা তাঁকে দেওয়া হ'ল। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের তখনকার অবস্থা যদি তুমি দেখতে মৃন্ময়। আমার মত পাষণ্ডকেও তখনকার মত তাঁর কাছ থেকে সরে যেতে হয়েছিল। কিন্তু মঞ্জু গোড়া থেকেই তার সঙ্কল্পে অবিচলিত রইল। বিয়ে আমাদের হয়েছিল, কিন্তু সিন্দুর-দান আজও অসমাপ্ত আছে। সেই থেকেই তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—আমার অসমাপ্ত কাজের ভার আমি তোরই হাতে তুলে দিয়ে মুক্তি পেতে চাই।

মৃন্ময়ের চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীটা দুলিতেছে। তার অতীত আজ মৃত। বর্ত্তমান এক জটিল সমস্যায় সমাচ্ছন্ন। এই অন্ধকারাবৃত বর্ত্তমানের কালো আবরণ ভেদ করিয়া তার ভবিষ্যৎ জীবনে আলোর প্রকাশ ঘটিবে কেমন করিয়া?...

নান্টু অধীর কণ্ঠে কহিল, চুপ করে থাকিস নে, একটা জবাব দে মিনু।

মৃন্ময় উদাস কণ্ঠে কহিল, এ কেমন করে সম্ভব হবে...তা ছাড়া তুমি...

নান্টু তাহাকে কথার মাঝখানে থামাইয়া দিল। তার মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে শান্ত গভীর কণ্ঠে কহিল, যুক্তিতর্ক দিয়ে ওজন করতে যাসনে মিনু—তাতে লোকসানের ঘরই পূর্ণ হয়ে উঠবে। এই অসম্ভবকে সম্ভব তোকে করতেই হবে। ভুল মঞ্জুও যেমন করেছে তুমিও তেমনি কিছু কম কর নি। তাই বলে সেই মিথ্যে ভুলটাই চিরদিন সত্য হয়ে বেঁচে থাকবে! না, এত বড় অন্যায়

তোকে আমি কিছুতেই করতে দেব না। সত্যের মর্য্যাদা তোকে দিতেই হবে।...

মান্তু থামিল। মৃন্ময়ের একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার কথা দিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। ঘর আমার জন্য নয়। আমার সামনে অনন্ত পথ খোলা পড়ে আছে। সেখানে কাজের অন্ত নেই। মিথ্যে কতকগুলো বাজে তর্ক তুলে আমার পথ-চলার বিঘ্ন ঘটাস নি মিনু। আজ আমার কত যে আনন্দ সে তুই বুঝবি নে। আজ সারা দেহ মন যেন আমার হাল্কা হয়ে গেছে। "এই পাঁচ বছরের গুরু-দায়িত্বতার আমার মনকে একেবারে নিষ্পিষ্ট করে ফেলেছিল। আজ আমি মুক্ত। রইলো মন্টু—রইল তার বাবা—তোকে রেখে গেলাম তাদের পাশে। আমি ত নিশ্চিন্ত মনে পা বাড়াচ্ছি—এর পরের দায়িত্ব তোর। আমি যাই... মন্টুখাকে খবর দেওয়া হয়েছে।...

মৃন্ময় এতক্ষণে কতকটা আত্মস্থ হইয়াছে। শান্ত কণ্ঠে সে কহিল, তুমি কি ইচ্ছে করলেই এত সহজে চলে যেতে পার মান্তু-দা ?...

মান্তু মন্টুমুখের তার থমকাইয়া দাঁড়াইল। বড় করুণ চোখে মৃন্ময়ের মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, এত সহজে কি নিজেকে মুক্ত বলে মনে করা সম্ভব হ'ত যদি না আমি নিশ্চয় করে জানতাম যে, আমার বিশ্বাসের অমর্য্যাদা তোর দ্বারা হবে না।...

মান্তু আর দাঁড়াইল না। তার গতি দ্রুত হইয়া উঠিল। সম্মুখে এখনও তার অনন্ত পথ পড়িয়া আছে। সে পথ তাহাকে অতিক্রম করিতে হইবে, বৃথা নষ্ট করিবার মত সময় তার নাই। মাঝের কয়টা বৎসরের ইতিহাস তার কাছে আজ নিছক দুঃস্বপ্ন—বাস্তব জগতে যার কোন অস্তিত্বই নাই।... দ্রুত আরও দ্রুত সে অগ্রসর হইয়া চলিল।...

মৃন্ময় পলকহীন চোখে তার গমন-পথের পানে চাহিয়া রহিল। আগাগোড়া ব্যাপারটা এখনও তার কাছে স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। সমাপ্ত

ইউরোপীয় চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

এবার শীতকালে জার্মানী, সুইট্জারল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডে কয়েক মাস কাটাবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তখন ঐ সব স্থানের অধিবাসীদের চরিত্রগত যে সব বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করেছি বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ওদেশের লোকেদের পরিচ্ছন্নতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বাড়ীতে প্রত্যেকটি জিনিষ এত সুরুচিসম্মত ভাবে ওরা সাজিয়ে রাখে যে তা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। জার্মানীর হোয়েক্স্ট শহরের আই. জি. কারবেন ইনডাষ্ট্রি নামক রাসায়নিক কারখানার পেনিসিলিন বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর ওয়েপিজারের বাসভবনে এবং জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর সোয়াইটজারের বাড়ীতে অতিথিরূপে অবস্থানকালে এর যাথার্থ্য উপলব্ধি করেছি।

ওদেশে পথেঘাটে ট্রামে বাসে কুত্রাপি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আবর্জ্জনা দেখতে পাওয়া যায় না। রাস্তার মোড়ে, ষ্টেশনে এবং ট্রামের মধ্যে পর্য্যন্ত ছেঁড়া কাগজ, ব্যবহৃত টিকিট প্রভৃতি ফেলবার পাত্র রাখা আছে—লোকেরা যাবতীয় জঞ্জাল সেগুলোর মধ্যেই ফেলে।

নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে চলা ওদের মজ্জাগত। রেলগাড়ী ও ট্রামে যে সব কামরায় লেখা থাকে "ধূমপান নিষেধ" সেখানে কাউকে কখনও ধূমপান করতে দেখিনি। ট্রামে, বাসে, টিউবে, ট্রেনে "কিউ" দিয়ে ওঠা নিয়ম বলে ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি নেই। বিদেশীর প্রতি ওদের সৌজন্যসূচক আচরণও প্রশংসনীয়।

হাতের কাজ বা শারীরিক পরিশ্রমকে ওদেশে কেউ অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন না। ডক্টর ওয়েপিজারের মত মনীষীকে ছেঁড়া জামা, জুতো পরে বাগানে মাটি কোপাতে স্বচক্ষে দেখেছি। শুনলাম নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত অধ্যাপক কারারও জুরিখের স্পাইরিষ্টাইগে অবস্থিত তাঁর গৃহসংলগ্ন বাগানে প্রত্যহ কাজ করেন। এতে এঁদের অবসরবিনোদন এবং স্বাস্থ্যরক্ষা দুটিই যুগপৎ সুষ্ঠুভাবে হয়ে থাকে। উপরন্তু সর্ব্বদা হাতের কাজে লিপ্ত থাকার অভ্যাসের দরুন ল্যাবরেটরিতেও এঁরা শেষ বয়স পর্য্যন্ত হাতে কলমে কাজ করে নূতন নূতন আবিষ্কার করতে পারেন। ওদেশে এতটুকু জমি কেউ ফেলে রাখে না। যার বাড়ীতে যতটুকু জায়গা থাকে তাতে তিনি ফুলের বাগান করেন এবং শাকসব্জি ও ফলের চাষ করেন। এমন কি রেলরাস্তার ধারে ঢালু জায়গাটুকুতে পর্য্যন্ত আলু, কপি ইত্যাদি তরীতরকারী এবং বিবিধ ফুলের চাষ হচ্ছে। টিলবেরি জাহাজঘাট থেকে ট্রেনে লণ্ডন যাবার পথে এটা নজরে পড়ল।

সাধারণ লোকের কর্তব্যজ্ঞানও প্রশংসনীয়। লণ্ডনে রাস্তার মোড়ে খবরের কাগজ বিক্রেতারা গাদা করে কাগজ রেখে চলে যায়, লোকেরা পয়সা রেখে কাগজ নিয়ে যায়। জুরিখে দোকানীরা দোকানের সামনে খোলা জায়গায় আঙুর, আপেল, পিচ প্রভৃতি সুমিষ্ট ফল রেখে দুপুরে খেতে যায়, কিন্তু শিশুরা পর্য্যন্ত দোকানীর অনুপস্থিতিতে সে ফল ছোঁয় না, অথচ রাস্তায় পুলিশ পাহারাও কখনও চোখে পড়ে নি। কাজে ফাঁকি দেওয়া ওদের স্বভাববিরুদ্ধ। পূর্ব্বে না জানিয়েই আমি বহু কারখানার বিভিন্ন বিভাগ দেখতে গিয়েছি—অনেক স্থলেই কোন তদারককারী (সুপারভাইজার) নেই অথচ সর্ব্বত্রই কর্ম্মীদের একাগ্রচিত্তে কর্ম্মরত অবস্থায় দেখেছি।

এখন এদের খাদ্য-বিষয়ে দু'একটি কথা বলতে চাই। ইউরোপের লোকেরা সিদ্ধ বা ভাজা গোল আলু, সিদ্ধ করা ফুলকপি বা বাঁধাকপি, সিদ্ধ কড়াইশুঁটি সিম প্রভৃতি বেশী খায় বলে রুটি বা ভাত ওদের অনেক কম হলেই চলে। বর্ত্তমানে আমাদের যখন চাল আটার বেজায় অনটন তখন খাদ্য সম্বন্ধে আমাদেরও এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা সমীচীন। ফলতঃ দেশে যে পরিমাণ ভাত বা রুটি খেতাম ওদেশে তার চার ভাগের এক ভাগই যথেষ্ট মনে হ'ত। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ধান, গম ইত্যাদি খাদ্যবস্তু যেরূপ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হচ্ছে তাতে দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় গোল-আলু, রাঙা আলু, পেঁপে, কাঁচকলা, গাজর, ডুমুর, সিম শাক-সব্জী প্রভৃতির পরিমাণ বাড়াতে পারলে দেশের অনেক টাকা যে বিদেশে না গিয়ে দেশেই থাকত তা সহজেই বুঝা যায়। আমাদের সহরতলী এবং গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ গৃহস্থের বাড়ীতেই যে পোড়ো জায়গা আছে তাতে অল্প আয়াসেই হরেক রকমের শাকসব্জি উৎপন্ন করা যেতে পারে এবং মামুলী খাদ্য-পদ্ধতির একটু সংস্কার করলে আমাদের অভাবের মাত্রা যে অনেকটা কমতে পারে এ ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছে। অবশ্য চাল, আটার চেয়ে—গোল-আলু, রাঙা-আলু, পেঁপে, কাঁচকলা প্রভৃতির দাম বেশী হলে যাদের এ সকল তরী-তরকারী কিনতে হয় তারা স্বভাবতই প্রস্তাবিত সংস্কারের পক্ষপাতী হবে না। লণ্ডন শহরে গোলআলুর সের তিন আনা, কাজেই সেখানে লোকে সামান্য দু'এক খণ্ড রুটির সঙ্গে প্রচুর গোলআলু খেয়ে শরীরের চাহিদামত শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যোপাদান পেয়ে থাকে। আমাদের দেশে রাঙা-আলু, গোলআলু, পেঁপে, মানকচু, কাঁচকলা, মেটে আলু যদি সস্তায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হয় এবং লোকে সংস্কার-প্রয়াসী হয় তবে চাউল আটার বরাদ্দ অনেকটা কমাতে পারে। স্কুল কলেজের হোষ্টেলে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত অথচ মুখরোচক ভাবে প্রস্তুত—খাদ্য-তালিকার প্রবর্ত্তন করলে দেশের প্রভূত উপকার হবে বলে মনে করি।

খাদ্যবিষয়ক আলোচনা অত্যন্ত জটিল। শরীরপুষ্টির উপযোগী বহুবিধ উপাদান খাদ্যের মধ্যে থাকা আবশ্যক এবং তার একটির অভাব অপরটির দ্বারা সাধারণতঃ পূরণ করা চলে না। সুতরাং খাদ্য-পদ্ধতির সংস্কারসাধন বিশেষ বিবেচনা-সাপেক্ষ। আমাদের পক্ষে ওদেশের খাদ্যপদ্ধতির হুবহু অনুকরণ কখনও যুক্তিযুক্ত নয়। প্রথমতঃ ওদেশের লোকেরা প্রায় সবাই প্রত্যহ বেশ খানিকটা মাখন বা মার্গারিন খায়—কাজেই সিদ্ধ গোল আলুতে শ্বেতসার পেলেও ওদের তৈলজাতীয় পদার্থের তেমন ঘাট্‌তি পড়ে না। আমরা যদি সিদ্ধ রাঙা বা গোল আলু খেতে চাই তবে তার সঙ্গে অন্ততঃ কিছু তৈলজাতীয় পদার্থ খেতে হবে—সে সরিষা তেল বা বাদাম তেল যাই হোক না কেন। তার ওপর ওরা প্রত্যহ যথেষ্ট আমিষ খাদ্য গ্রহণ করে। লণ্ডন ও হামবুর্গ শহরে পর্য্যাপ্ত মাছ পাওয়া যায় দেখলাম। এতে খাদ্যের আমিষ-জাতীয় উপাদান বা প্রোটিন ব্যতীত তৈলজাতীয় পদার্থও প্রচুর থাকে। ওদেশে দুধ বা দুগ্ধজাতীয় খাদ্য এবং ফল প্রত্যহই লোকে খেয়ে থাকে। উপযুক্ত ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হলে আমাদের দেশের আম, জাম প্রভৃতি ফল, এমন কি দুগ্ধজাত বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যাদিও যে অনেকেরই সহজলভ্য হ'ত ও তা খেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় বিধান হ'ত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অনেকের ধারণা ওদেশে কাঁচা শাকপাতা খায় বলে ওদের স্বাস্থ্য ভাল। কিন্তু ওদের শীতপ্রধান দেশে ব্যাধি ও রোগ-বীজাণুর আধিক্য না থাকায় এবং ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকেরই স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি থাকায় কাঁচা শাকপাতা তাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হয় না। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ব্যাধিবীজের যেমন প্রাবল্য, লোকের স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞানের অভাবও তেমনি বেশী। এরূপ ক্ষেত্রে কাঁচা শাক প্রভৃতি না খাওয়াই সমীচীন। তারপর ওদের স্বাস্থ্যের উন্নতির মূলে রয়েছে মুখ্যতঃ খাদ্যদ্রব্যে বিবিধ পুষ্টিকর উপাদানের সমাবেশ, শুধু কাঁচা শাকপাতার এদের অটুট স্বাস্থ্যের হেতু নয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কাঁচা শাকপাতা খেতেন না, কিন্তু তাই বলে তাঁদের স্বাস্থ্য তো খারাপ ছিল না। তাই বলি বর্ত্তমানে যে আমাদের স্বাস্থ্যহানি হয়েছে তার জন্য দায়ী উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও দুষ্প্রাপ্যতা এবং খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের পরিমাণবৃদ্ধি।

বাংলাদেশের মধ্যে সুজলা নদীমাতৃক পূর্ব্ববঙ্গেই মৎস্যের প্রাচুর্য্য। কিন্তু বঙ্গবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে মাছের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। এরূপ অবস্থায় পশ্চিম বাংলার জলাশয়গুলির সংস্কারসাধন এবং নূতন নূতন জলাশয় খননের ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। কলিকাতার উপকণ্ঠে ভেরী নামক অগভীর জলা জায়গায় প্রচুর মাছ জন্মাত, কিন্তু

হোগলা ও কচুরীপানায় তা ক্রমশ: আচ্ছন্ন হওয়ায় ওখানকার মৎস্যসম্পদ দিন দিন হ্রাস পেতে চলেছে। এদিকে জাতীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরবার ও কলিকাতার বাজারে সেই মাছ সরবরাহের ব্যবস্থাও অগৌণে অবলম্বন করা উচিত। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চিকিৎসাবিদ্যার কলেজ ও গবেষণাগার স্থাপনের চেয়ে জনগণের স্বাস্থ্য অটুট রাখবার জন্য সুলভে প্রচুর প্রোটিনপ্রধান খাদ্য—মাছ, মাংস, ডিম ও দুধের ব্যবস্থা যাতে হয় তাই সর্ব্বাগ্রে করণীয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, যখন দেশে দুধ মাছ পর্য্যাপ্ত ছিল তখন যে সব চাষী-পরিবারে ৫৫।৬০ বৎসরে লোক মারা যেত, ঐ সব খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরই বংশধরেরা মাত্র ৩৫।৪০ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ম্যালেরিয়ার আক্রমণও প্রবল এবং ব্যাপক হয়, এটাও জানা কথা। আজকাল গ্রাম সহর সর্ব্বত্রই দুধ, মাছের এক দর। এরূপ ক্ষেত্রে দেশের প্রকৃত ও স্থায়ী কল্যাণ সাধন করতে হলে জাতীয় সরকারকে কতদূর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে সজাগ এবং সক্রিয় হতে হবে তা সহজেই অনুমেয়। খাদ্যের সঙ্গে জাতীয় জীবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত বলে কিঞ্চিৎ অবান্তর হলেও বিষয়টির উল্লেখ করতে হ'ল।

ওদেশে বড় বড় সহরের মিউজিয়মে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়-বস্তুর সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দেবার সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। লণ্ডনে সাউথ কেনসিংটন সায়েন্স মিউজিয়মে দেখেছি ছুটির দিনে (এমন কি অন্য দিনেও) সারাদিন দলে দলে স্কুলের ছেলে-মেয়েরা মিউজিয়মে আসছে ও প্রত্যেক বিভাগ তন্ন তন্ন করে দেখছে। সঙ্গে একজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী আছেন। তিনি প্রত্যেকটি বিষয় ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। দৃষ্টান্তও হাতের কাছে রয়েছে—যেমন, ধরা যাক, শিক্ষক ছাত্রদের বাষ্প সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলছেন, মিউজিয়মের কক্ষে সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত ষ্টিম এঞ্জিন থেকে আরম্ভ করে অতিআধুনিক এঞ্জিনও রক্ষিত আছে। কল টিপলে চাকা ঘুরছে ও অন্যান্য অনেক অংশের ক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। এতে দৃষ্টান্তের সাহায্যে বক্তব্য বিষয়টি সহজবোধ্য হচ্ছে। বিচক্রযান, মোটর এঞ্জিন ও মোটরগাড়ীর ক্রমোন্নতিও অতি সুন্দর ভাবে দেখান হয়েছে। তার পর নানা জাতির ফড়িং, প্রজাপতি, বাদুড়, উড়ুক্কু মাছ ও উড্ডয় অবস্থায় রক্ষিত ঈগল পাখী, বিভিন্ন প্রকারের ঘুড়ি, বেলুন এবং প্রথম থেকে আরম্ভ করে অতিআধুনিক বিমানপোত ও তার এঞ্জিন পর পর সাজানো আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-কালে জার্ম্মানদের আবিষ্কৃত ও ইংলণ্ডের ধ্বংসসাধনোদ্দেশ্যে নিয়োজিত একটি ভি-২ও এই মিউজিয়মে রাখা হয়েছে। ভি-২এর বিভিন্ন অংশের গঠনকৌশল ও ক্রিয়া সম্বন্ধে নির্দ্দেশ লিখিত আছে দেখলাম। কল টিপে দেওয়ায় বিমানপোতের মোটর ও ফ্যান কি ভাবে ঘোরে দর্শকদের তাও স্বচক্ষে দেখবার সুবিধা হচ্ছে। এঞ্জিনিয়র ছাত্রেরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সবকিছু পর্য্যবেক্ষণ করছে এবং যন্ত্রপাতির দোষ-গুণ লক্ষ্য করে হয় ত নূতন ডিজাইনের কথাও ভাবছে। কবে কোন্ শ্রেণীর বিমান ঐ সময়ে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে উড়েছিল তারও তালিকা আছে। গ্রামোফোন, রঞ্জনরশ্মি থেকে সুরু করে রেডিও ও রাডার প্রভৃতি সবই দেখান হচ্ছে। প্রকাণ্ড একটি ঘরে পৃথিবীতে যত রকমের নৌকা এবং পর পর যত উন্নত ধরণের জাহাজ, সাবমেরিন প্রভৃতি তৈরী হয়েছে তার নমুনা রয়েছে। এদের ক্রমোন্নতি সুন্দর ভাবে দেখান হয়েছে। কি করে বরফ তৈরী হয়, কি প্রণালীতে বাতাসকে তরল অর্থাৎ জলের মত করা হয়, সেগুলিও বাদ যায় নাই। রসায়ন বিভাগে বিভিন্ন রং, ঔষধ, কৃত্রিম রবার বিবিধ প্লাসটিক এমন কি পাথুরে কয়লা থেকে প্রস্তুত সুতো ও তা দিয়ে তৈরি কাপড় পর্য্যন্ত দেখান হয়েছে। আধুনিক সভ্যতার উপকরণগুলি কতকাল ধরে কত মনীষীর অক্লান্ত সাধনায় যে বর্ত্তমান রূপ পেয়েছে তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ হতে হয়। জাতীয় চরিত্র গঠনে এরূপ মিউজিয়ম যে কিরূপ অনুপ্রেরণা দান করে তা বলাই বাহুল্য। আমাদের বড় বড় সহরে এরূপ মিউজিয়ম স্থাপিত হলে সর্ব্বসাধারণের মনে যে আধুনিক সভ্যতার নিত্য-ব্যবহার্য্য বহু দ্রব্যাদি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাবে তাতে সন্দেহ নেই। ছোটরাও যে এ ধরণের মিউজিয়মে আনাগোনা করলে, শৈশব থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি সত্যিকারের অনুরাগ পোষণ করতে শিখবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অস্তরাগের পথে

শ্রীচিত্রিতা দেবী

তিন দিন ধরে জাহাজ ছুটে চলেছে—দিনে ৫০০ মাইল করে পার হয়ে যাচ্ছে। অনেকেই বলছে সমুদ্র দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠছে—আমাদের কিন্তু এত ভাল লাগছে! সারাদিন ডেকের রেলিঙে ভর দিয়ে শুনছি অসীমের কলরোল—
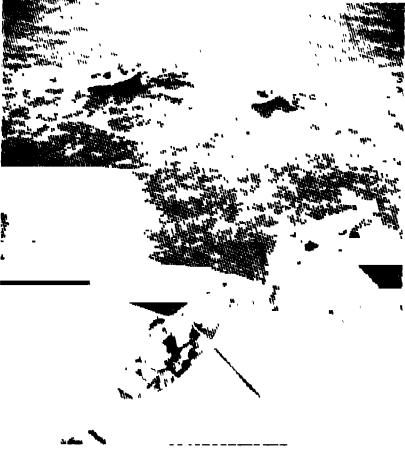
পোর্ট সৈয়দ—বিক্রেয় দ্রব্যসহ নৌকাসমূহের আগমন

নেশার মত লাগে যেন, ডেক ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলে না। ছোট খুকু লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে—সমুদ্রের বেগ ওরও কল্পনায় দিয়েছে দোলা—খালি বলছে, আমি এই জলের নীচে চলে গিয়ে, ঢেউয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে, ফেনার সঙ্গে লাফিয়ে উঠি। সারাদিন সমুদ্র শান্ত—হাওয়ার বেগ কমে এসেছে, তরঙ্গিত কালো জলে সাদার ঝিকিমিকি মিলিয়ে এসেছে—কিন্তু আজ সকাল থেকে আমাদের এই ছোট দ্বীপটি কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে—চাকর-বাকরদের মধ্যে একটা সন্ত্রস্ত চকিত ভাব—মাঝে মাঝে এক জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পরস্পরে চুপি চুপি কথা কইছে। হঠাৎ মাইকে অনুরোধ শোনা গেল—জাহাজে যদি কেউ সেবিকা থাক তবে তোমাদের সেবা আমাদের প্রয়োজন। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল জাহাজে দু'জন অসুস্থ। একটি দেড় বছরের শিশুকে ওপরের বার্থে রেখে তার মা মুখ ধুচ্ছিল, ইতিমধ্যে শিশুটি পড়ে গেল, তার ক্ষত থেকে এখনো রক্ত ঝরছে। তাকে বোধ হয় বাঁচানো যাবে না। সৈন্তদের মধ্যে একজন মারাত্মক রকম অসুস্থ—তার জন্তে হাওয়ায় লোহার 'লাঙ্স্' ও অক্সিজেন পাঠাবার জন্তে, হাওয়ায় খবর গেছে এডেনে। সৈন্তদের থাকবার জায়গার কথা মনে পড়ছে—জাহাজের নিম্নতম অংশগুলিতে তারা থাকে দড়ির ঝুলিতে শুয়ে—আমাদের মালপত্রের গুদাম-ঘরে বাক্স পরীক্ষা করতে গিয়ে তাদের দেখেছি—মানুষ কি অমন ভাবে থাকতে পারে? যদিও দিনের বেলায় ডেকের অর্দ্ধেকটা তাদের দখলে থাকে—রাত কিন্তু কাটাতে হয় ঐখানেই।···দুপুরবেলায় শোনা গেল শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। দেড় বছর আগে তার জন্মদিনে কে ভাবতে পেরেছিল যে, লোহিত সাগরের জলরাশি চিরতরে তাকে গ্রহণ করবার জন্তে উদ্যত হয়ে আছে। বেলা দুটোর সময় জাহাজ থামল দু' মিনিটের জন্তে। শিশুটিকে সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিয়ে তিন বার বাঁশী বাজে জাহাজে, তার পরে আবার ছুটে চলে। মুহূর্ত্তের উত্তেজনা মিলিয়ে যায়, আবার যে যার কাজে মন দেয়, শুধু একটি মায়ের জীবন শূন্য হয়ে যায়।

পোর্ট সৈয়দ

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি রেলিঙে ভর দিয়ে—গাঢ় নীল জল তেমনি শান্ত স্থির—মায়ের বেদনার ছায়ামাত্র কোথাও পড়ে নি। প্রখর সূর্য্যের আলো জ্বলছে জলের ওপরে রূপোর চাদরের মত। মনটা এখনো পর্য্যন্ত শ্মশান-বৈরাগ্যের ভাবকে মুছে ফেলতে পারে নি। হঠাৎ আবার একটা উত্তেজনার ঢেউ শূন্য ডেককে প্লাবিত করে দেয়—দলে দলে লোক এসে দাঁড়াচ্ছে রেলিঙে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে, এ ওর মাথা টপকে দেখতে চায়—খুকুকে খুঁজতে যাব ভেবে ঘুরেই দেখি একটু দূরে ওর এক ভক্তের কাঁধে চড়ে দেখছে।

কি এত ব্যাপার সবাই বললে—ঐ দেখ, ঐ দেখ—বড় বড় মাছ লাফাচ্ছে জলের ওপরে—এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি খেয়া'লই করি নি—বাচ্চাগুলো মাছ দেখে ওদেরই মত লাফাতে লাগল। এদিকে কেউ একটা দেখল তো, ওদিকে আবার কে চেঁচিয়ে উঠল দেখ দেখ করে। এতক্ষণের বিষণ্ণতার ছায়া যেন এক নিমেষে সরিয়ে ফেলতে চায়। জাহাজের গতি অত্যন্ত ধীর—

সুয়েজ খালের প্রবেশমুখ

সেই জন্যেই এত মাছের লাফালাফি দেখা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে জাহাজ থামল। দুপুরবেলার ঘুমের মায়া ত্যাগ করে যারা মাছ দেখতে এসেছিল, বিধাতা তাদের জন্যে আরও একটু উত্তেজনার খোরাক রেখেছিলেন জুটিয়ে। নাবিকেরা নেমে দাঁড়িয়েছে জাহাজের পাশে—একটা ছোট লাইফ বোট বা জীবন-তরী জলে নামিয়ে দিলে—জলের দিকে তাকানো যায় না—প্রচণ্ড সূর্য্য ছুরির ফলার মত জ্বলছে—দূর থেকে গর্জ্জন করে আসে একটা উড়ো জাহাজ—লাইফ বোটের মাথার ওপরে ঘুরতে ঘুরতে গুমরাতে থাকে, প্যারাস্যুটে করে নেমে আসে লোহার ফুসফুস, নেমে আসে থলিভর্ত্তি বিশুদ্ধ হাওয়া। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে—আহা, সৈন্যটি হয়ত বাঁচবে। জিনিষ দিয়ে ফিরে যায় বিমান, লাইফ বোট তুলে নিয়ে বেঁধে রাখে এরা জাহাজের পাশে—সন্ধ্যাবেলা জানা যায় সৈন্যটির মৃত্যু হয়েছে। মানুষের বুদ্ধি এত চেষ্টা করেও তাকে রাখতে পারে না—যাবার দিকের পথিক যে তাকে চলে যেতেই হয়। আবার জাহাজ থামে— আবার বাঁশী বাজে—তারপরে আবার ছুটে চলে নিজের লক্ষ্যপথে—সৈন্যেরা মেতে ওঠে নিজেদের খেলা আর গানে।

লোহিত সাগরের জল তেমনি সাদার ছিটে মেশানো গলিত সবুজ। ইকোয়েটারের (বিষুবরেখার) কাছাকাছি—সূর্য্যকে বড় বেশী প্রখর লাগে। কোথাও ঢেউয়ের সঙ্গে দুলছে সহস্র ছোট ছোট সূর্য্য—কোথাও রোদ যেন গলে গিয়ে বয়ে যাচ্ছে—কি আশ্চর্য্য একটা মিশ্র রং ফুলে ফুলে ছুটছে—আর প্রত্যেকটা কিরণরেখা বিভিন্ন রঙে জ্বলে উঠছে—কি আশ্চর্য্য এত রঙের সমারোহ অথচ কল খুললে সেই জল বেরোবে অত্যন্ত শ্রীহীন—ফ্যাকাশে সাদা পানসে। খুকু অবাক হয়ে গেছে—'রেড সী' জল কেন লাল নয়—কেউ বললে এখানে নাকি আগে অনেক লাল মাছ ছিল—তাই এর নাম লাল সাগর, কেউ বা বললে—এর দুই তীরের বালির রং লাল—দূর থেকে ছায়ার মত অস্পষ্ট তীরের আভাস দেখা যাচ্ছে সকাল থেকে। দুপুরের দিকে সমুদ্রটা সরু হয়ে এল—একেই বোধ হয় বলে সুয়েজ উপসাগর দু'-দিক থেকে তটরেখা ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে আসছে—রোদের আলোয় ও রৌদ্রপ্রতিফলিত বালির আভায় লালচে পাহাড়গুলো মিশে গেছে কুয়াশাঢাকা আকাশে। একদিকে আফ্রিকা ও অন্য দিকে আরবের মরুভূমি—এত দূর থেকে বোঝা যায় না—মানুষের নিবিড় বসতি ওখানে আছে কি নেই। শুধু বালি-ঢাকা নীচু পাহাড়ের চূড়োগুলো ইসারা করে আফ্রিকার দুর্ভেদ্য অরণ্যের নিবিড় রহস্যের দিকে। কোন্ আদিকালে আরবের সঙ্গে যুক্ত ছিল আফ্রিকা—কোন্ প্রলয়ের উদ্দাম উত্তালে কবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এশিয়ার অঙ্গ থেকে। সভ্যতার সর্ব্বপ্রথম হাটে, আফ্রিকার যেদিক তুলে ধরেছিল নিজের পণ্য—এ সেই ঈজিপ্ট, এর বিশাল মহাদেশের বক্ষ ঢাকা আছে তমসাচ্ছন্ন অরণ্যের রহস্যে—আজো তার কিছুই জানা হয় নি। সেখানে মানুষ আজও করছে আদিম জীবনধারার অনুবর্ত্তন। সভ্য মানুষের লুব্ধ দৃষ্টি সেখানে আজো কেবল ধনমুষ্টিরই সন্ধান করে।

মঙ্গলবার দশটা নাগাদ সুয়েজে পৌঁছানো গেল। দূর থেকে শহরটা ছবির মত লাগছে। খেজুর গাছের ফাঁকে ফাঁকে সাদা সাদা বাড়ি—মসজিদের চূড়া। এইখানে জাহাজ থামে অনেকক্ষণ—সবুজ জলের ওপরে অসংখ্য ছোট ছোট সাদা পাল-তোলা নৌকা ছড়িয়ে রয়েছে—মাঝে মাঝে পাশ দিয়ে চলেছে ছোট ছোট মোটর-বোট—তাতে যারা বসে আছে তাদের গায়ের রং আমাদেরই মত—মাথায় লাল উঁচু টুপী—কারো বা পরনে সাদা আলখাল্লা, মাথায় সাদা আঁটসাট টুপী। তারা ভুস করে জল কেটে একেবারে জাহাজের পাশে এসে দাঁড়ায় আবার ছুটে চলে যায়। জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে পাইলটের আশায়। বেলা দুটো নাগাদ পাইলট এসে পৌঁছায়। লোহিত সাগরের সীমা পেরিয়ে সুয়েজ খালের মধ্যে জাহাজ প্রবেশ করে। মানুষের বুদ্ধিকে অভিনন্দন জানাই—প্রকৃতির কতদিকের বাধাকে সে কতরকম ভাবে অতিক্রম করেছে। একদা দুই সমুদ্রের মাঝখানে ছিল আশী মাইল দীর্ঘ মরুভূমি। বালির নীচে সমুদ্র পড়েছিল চাপা। পুরাকালে রামচন্দ্র

সমুদ্রশাসন করে রচনা করেছিলেন সেতুবন্ধ, এ কালের মানুষ সমুদ্রকে উদ্ধার করলে বালির স্তূপ থেকে। দুপক্ষেই ফল এক—মানুষের সুবিধা।

সুয়েজ

খালটি কিন্তু নিতান্তই সাধারণ—এতবড় তরণীকে কি করে বহন করে নিয়ে যায়—এ আশ্চর্য্য। খালের একদিকে এখনো চলছে আফ্রিকার উপকূল—অন্যদিকে আরব। এক দিকে খেজুর গাছের ছায়ায় ঘেরা ছোট ছোট শহর—সেখানে ছেলেরা মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়ছে। জলের ধার দিয়ে পরিষ্কার কালো পীচের রাস্তা চলে গেছে দূরে—হুস হুস করে যাচ্ছে মোটর গাড়ি, যাত্রী বোঝাই বাস চলেছে ধেয়ে—কিম্বা মিলিটারী লরি; দূর থেকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলেছে ট্রেন—কোথাও সৈন্যদল জাহাজের সঙ্গীদের প্রতি ইঙ্গিত করে হাত নেড়ে গান ধরেছে—কোথাও একদল মিশরীয় সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে—জাহাজের গোরাদের দেখে তারা হাততালি দিয়ে লাফিয়ে ওঠে। অন্যদিকে আরবের শুষ্ক রিক্ত মরুভূমি—ধূ ধূ করা কঠিন ধূসরতা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কাঁটাঝোপ—আর কিছু নেই, কিছু নেই। কোথাও উঁচু হয়ে উঠেছে বালির পাড়—দূর থেকে লালচে পাহাড়ের ছায়া দেখা যাচ্ছে—কোথাও মাঝে মাঝে এখনো রয়েছে সৈন্যদের ছাউনি। আর দুই তীর ভর্ত্তি করে পড়ে রয়েছে রাশি রাশি এরোপ্লেন ও জাহাজের ভাঙা টুক্‌রো। যুদ্ধে ইংরেজদের কত জাহাজ যে এখানে নষ্ট হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। দূর থেকে দেখা যায় বালির স্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি নিঃসঙ্গ উট। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি—ধীরে ধীরে সরে যায় কালের যবনিকা—ঐ যে উঁচু বালিয়াড়ির পাশ দিয়ে সারি সারি আসছে উটের দল—তাদের কুঁজগুলি মখমলের কার্পেটে ঢাকা—জরির আলখাল্লা পরে মাথায় নানা রঙের পাগড়ী বেঁধে ও কারা বসে আছে তাদের পিঠে; পেছন পেছন আসছে আরো উটের দল—তাদের পিঠে পণ্যসম্ভার। ওরা আরব-ব্যবসায়ী, ওরা চলেছে পূর্ব্বদেশে বাণিজ্যের সন্ধানে—ওরা এসিয়ার সর্ব্বত্র চালাবে ব্যবসা—আর বাণিজ্যের সূত্র ধরে ওদের আচ্ছন্ন করবে প্রভুত্বের লোভ—ওদের নিষ্ঠুর লোভের চাকায় একদিন এশিয়াকে আত্মবলি দিতে হবে। ইরান থেকে ভারত এবং চীন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র উড়বে ওদের জয়ধ্বজা। ওরা তরণী বোঝাই করে নিয়ে যাবে পশ্চিমের দরজায় পূর্ব্বদেশীয় পণ্য—জিব্রালটারের পাশ দিয়ে স্পেনের উপকূলে পৌঁছুবে। ধর্ম্মদানের নামে চালাবে অত্যাচার—দিনে দিনে ওরা বড় হয়ে উঠবে—ঘিরে ফেলতে চাইবে সমগ্র ইউরোপকে।

ওরা আরব-ব্যবসায়ী, কঠিন রিক্ত মরুভূমিতে ওদের বাস—তেমনি কঠিন শুষ্ক নিষ্ঠুর—ওদের কানে এখনো পৌঁছয় নি ধর্ম্মের বাণী। মানুষের তৈরি ভণ্ডামির নীতি ওরা বিশ্বাস করে না—ওরা জানে ওদের কোথাও বাধা নেই। হঠাৎ ওদের মধ্যে ওই কে জেগে ওঠে নূতন ধর্ম্মের বাণী নিয়ে—ডেকে বলে ঈশ্বর এক, বলে সর্ব্ব মানুষের সৌভ্রাত্রে রাখো বিশ্বাস। ওরা বিশ্বাস করে না নূতন উপদেশ—বার করে দেয় তাকে দেশ থেকে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তলোয়ারের বাণীকে তারা উপেক্ষা করতে পারে না, নবীন ধর্ম্মের

পোর্ট সৈয়দের প্রবেশমুখ

উত্তেজনায় তারা এক হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে সভ্যতার প্রথম স্তরের সোপানগুলির সবশেষ ধাপের চূড়োয় তারা উঠে যায়। বড় হয় দৈহিক শক্তিতে, বড় হয় অর্থে, রাজত্বে এবং শিল্পে। কিন্তু তারা ভুলে যায়, কেবল বিলাসবৈভবের সমৃদ্ধির মধ্যেই মানুষের চরম সার্থকতা নেই। মানুষের যে বুদ্ধি সর্ব্বরকম ত্যাগের পথে বিশ্ব ও আত্মার রহস্য সন্ধানে ব্যস্ত, সকল মানুষকে শান্তিদানের উপায় উদ্ভাবনে মগ্ন, সেই বুদ্ধি তাদের মধ্যে গড়ে ওঠার সুযোগ পায় না। তাই তারা চলতে চলতে পিছিয়ে পড়ে—সেই পুরোনো ধর্ম্মকে কেন্দ্র করে

তারই চারদিকে ঘুরতে থাকে। তাকে ফেলে রেখে তারা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে যায়। যাকে তারা একদিন বাঁধতে চেয়েছিল আজ তারই জালে নিজেরা ধরা পড়ে। একদিকে যেমন সে উঠে যায় ধনসমৃদ্ধি বিলাস-

সুয়েজ খালের পার্শ্বে যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ

বৈভবের সৌধচূড়ায়, ছুটে যায় হিংসা, দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা ও প্রভুত্বের চরম সীমায়, অন্যদিকে তেমনি মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে অজস্রধারে বিলিয়ে দেয় আপন বুদ্ধি। একদিকে যেমন লোলুপ ইউরোপের নিষ্ঠুর বুদ্ধির তাড়নায় এশিয়াকে দিতে হয় আত্মবলি, অন্য দিকে বিজ্ঞানী ইউরোপের কল্যাণবুদ্ধি থেকে থেকে বিদ্রোহ করে ওঠে। ইউরোপ থেকেই আসে সর্ব্বপ্রথম এশিয়ার মুক্তির দাবি।

তীব্র আলোয় আয়নার মত জলছে খালের জলরেখা। আরবের মরুভূমি ও আফ্রিকার তটদেশকে ঘিরে ঘিরে আরব্য উপন্যাসের ছবিগুলো যেন ফুটে উঠতে চায়। কোথায় গেল সেই দিন, যেদিন ক্লিয়োপেট্রার রাজধানীকে ঘিরে ধরেছিল সীজারের সৈন্যদল, সেদিন যে ঘটনা সবচেয়ে সত্য ছিল, আজ কি করে তা এমন শূন্য হয়ে মিলিয়ে গেল। এই সমুদ্র সেদিনও ছিল এমনি তরঙ্গসঙ্কুল—সেদিনের সেই মরুভূমির নিষ্ঠুরতা আজও তেমনি করেই ঘিরে আছে মানুষের পৃথিবীকে। ছোটবেলায় একদিন বসে বসে ইতি-হাস ও ভূগোলের পাতা উল্টে যেতে হয়েছে—আজ চলেছি সেই ভূগোলের পাতাগুলি আর একবার খুলে খুলে—কিন্তু ইতিহাসের পাতাগুলি একেবারে বন্ধ—তাকে চোখের সামনে মেলে ধরব কেমন করে—কল্পনায় যে ছবিগুলি ভেসে ওঠে তার সঙ্গে সেদিনের বাস্তব ছবির সত্য কোন মিল আছে কি?

বেলা পড়ে আসে—মরুভূমির দিগন্ত রঙীন করে সূর্য্য অস্ত যায়। আজ রাত ১২টার পরে ১ ঘণ্টা সময় আরও পিছিয়ে দিতে হবে। এদিকে যতই এগোচ্ছি, ততই ঘড়ির সময় বদলাতে বদলাতে চলেছি। পরদিন সকাল হতে দেরী হয়—ঘুম ভেঙে উঠে দেখি বেলা হয়েছে, নৌকো থেমেছে পোর্ট সৈয়দে। নৌকার পরে নৌকা করে ব্যাপারীরা এসেছে জিনিষপত্র বিক্রী করতে। জাহাজে ওঠার নিয়ম নেই—নৌকা থেকে দড়ি দিচ্ছে ছুঁড়ে, তাই দিয়ে ঝুড়ি করে করে এরা টেনে নিচ্ছে ডেকের ওপর থেকে। এত জিনিষে ভর্ত্তি সকলের মালপত্র, তবু লোভের অন্ত নেই—এ ওটা কিনছে সস্তায়, অমনি সে ছুটল সেটার সন্ধানে—আবার ওরি মধ্যে পরস্পরকে সতর্ক করে দিচ্ছে—দেখে শুনে কিনো, আগেই যেন টাকা দিয়ে বোসো না 'এরা দারুণ চোর'—আর একজন বললে—'পূর্ব্ব-দেশের সর্ব্বত্রই honesty জিনিষটার বড় অভাব।' মনে হ'ল, চেঁচিয়ে বলি, 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে'। পথের মধ্যে 'এ' সাহেব ছুটতে ছুটতে এলেন—ওঃ ভীষণ মজা, কি ব্যাপার—বুড়ীর একটা ব্যাগ দারুণ পছন্দ হয়েছে—'এ' সাহেব বলেছেন—ভাবনা কি, এখানে বড় বেশী দাম বলে, আমি আমার কেবিনের পোর্ট হোল্ড থেকে দড়ি টেনে কিনে নিচ্ছি। তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে থাক, বুড়ীকে উপরে ডেকে ব্যাগের আশায় দাঁড় করিয়ে রেখে ভদ্রলোক নীচের ডেকে এসে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন—আমরা বললাম, যাচ্ছি আমরা ওপরে সব বলে দিচ্ছি, তোমার কারসাজী—সে বললে, ওঃ সে তোমরা পারবে না। এমন সব কথা বলব যে আমার ওপরে দৃঢ় বিশ্বাস হবে—তা ছাড়া চোখ টিপে 'এ' সাহেব বললেন—ও যে আমাকে দেখে একেবারে মজে এসেছে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি—'চ' বুড়ী নীচে থেকে ছুটে আসছে—দু'হাতে দুটো ব্যাগ—'এ' সাহেব লাফিয়ে উঠলেন একি তুমি কেন ব্যাগ কিনতে গিয়েছিলে—এই তো আমি তোমার জন্তে একটা কিনলাম—'চ' বুড়ি বললে—আমার বয়স তোমার দ্বিগুণ—যদি সত্যি ব্যাগ কিনে থাক, তবে তোমার বান্ধবীর জন্তে কিনেছ, আমার জন্তে কেন কিনতে যাবে—'এ' সাহেব আমতা আমতা করে বললে—বাঃ তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না। বুড়ী হেসে চলে গেল—'তুমি বোকা, তাই মনে কর আমিও বোকা।' এমনি জিনিষ কেনাবেচা চলে বেলা চারটে অবধি—পাঁচটা নাগাদ জাহাজ ছাড়ে। প্রখর দিনের আলো—তবু শুক্ল পক্ষের বাঁকা চাঁদ মাথার ওপরে ভেসে ওঠে। নৌকা চলে এগিয়ে। লোহিত সাগরের সীমানা ছাড়িয়ে ভূমধ্য-সাগরের অসীম বিস্তারের মধ্যে প্রবেশ করি। সেই এক জল, এক ঢেউ, সেই এক গম্ভীর গর্জ্জন—তবু দেখে দেখে চোখ কখনও ক্লান্ত হয় না।

বৃহস্পতিবার স্নান সেরে ডেকে এসে দাঁড়ালাম—কি আশ্চর্য্য, সমুদ্র কোথায় গেছে হারিয়ে, তার বদলে একটা নরম পাতলা ধূসর রঙের চাদর বিছানো, ধূসর আকাশের সঙ্গে এক হয়ে মিলে গেছে। ভূমধ্যসাগর যখন শান্ত তখন নাকি এমনি শান্ত সব সময়, শুধু যখন মেঘে মেঘে

চারদিক কালো হয়ে ওঠে তখন একেও চেনা যায় না, উদ্দাম নৃত্যে এও তখন মেতে ওঠে। কিন্তু এখন—

অকূল শান্তি সেথায় বিপুল বিরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী
ধীর গম্ভীর গভীর মৌনমহিমা,
স্বচ্ছ অতল স্নিগ্ধ নয়ন নীলিমা—

নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে একটা শান্ত পরিবেশ। এদিকে সকাল হচ্ছে অন্ধকার থাকতে, ওদিকের সীমারেখা বেড়ে যাচ্ছে
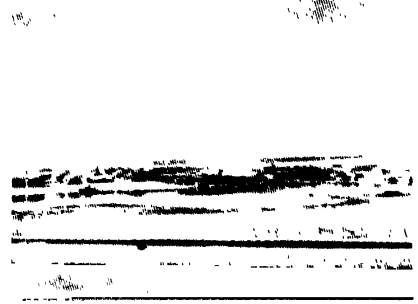
সুয়েজ খালের উপরে ভগ্ন জাহাজ

সন্ধ্যে ছাড়িয়ে। ৮টার সময়ও যথেষ্ট আলো। জাহাজে কোথায় আজ সিনেমা হচ্ছে, কাল নাচ চলেছিল—যাত্রীদের আনন্দ পরিবেশন করবার বহুবিধ উপায় রয়েছে। চোখের সামনের এমন সুন্দর দৃশ্য ছেড়ে সবাই নীচে গিয়ে সিনেমা দেখছে। ঘড়িতে সময় যতই এগিয়ে যাক—আজকে দেখতেই হবে ভূমধ্যসাগরের বুকের ওপরে কেমন করে নেমে আসে রাত্রি—১১টা বেজে না গেলে রাতকে বোঝবার যো নেই। প্রায় ১০টা অবধি দিনের আলো থাকে। পরিষ্কার আকাশ—মেঘশূন্য নির্মল-নীলকে উজ্জ্বল করে হেসে ওঠে চাঁদ, ক'দিনের সমুদ্রের হাওয়ায় ওর শীর্ণতা গেছে ঘুচে—অদ্ভুত আলোয় অতল রহস্যে ডুবে যায় সমুদ্র—দিনে যাকে পরিষ্কার দেখা গেছে চাঁদের রূপোর কাঠির ছোঁয়ায় এক মুহূর্তে বদলে যায় তার মূর্ত্তি। গলিত রূপোর মত দূর থেকে জলজল করে জলছে ভূমধ্যসাগর—আর মাথার ওপরে অসংখ্য হীরের কুচির মত তারা—এত তারা খুব কম দেখা যায়—এমন কি ভারতের আকাশেও। ডেক খালি হয়ে আসছে। চুপ করে বসে থাকি—শুক্লপক্ষের রাত্রি সমুদ্রের ওপর দিয়ে ছল ছল করে বয়ে যায়। দূর থেকে একটা জাহাজের আলো দেখা যায়, ওরা আলো দিয়ে ইঙ্গিত করে—আমাদের জাহাজ থেকে ফিরে যায় উত্তর—সবটা মিলিয়ে যে আবহাওয়া তৈরি হয়েছে তার একটি মাত্র নাম মনে পড়ছে—রোমান্টিক।

সুয়েজ খালের তীরবর্ত্তী একটি অঞ্চলের দৃশ্য

আজ ভোর থেকে হাওয়া ছুটেছে জোরে—নীল জল গর্জ্জন করে ছুটে চলে। সমস্ত দিন চলে এমনি হাওয়ার মাতামাতি—সন্ধ্যের দিকে হাওয়া ছোটে আরো জোরে, শীতে হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে যায়—ভাগ্যক্রমে খাবার ঘণ্টা বাজে, নইলে বাইরে টেকা দায় হ'ত। অথচ ঘরে বসবার যো নেই—সব চেয়ার অন্যের দখলে। শনিবার দিন অন্ধকার থাকতে পরিচারিকা এসে দরজায় টোকা মারে—"সাতটা বেজেছে মহিলারা"—অবাক কাণ্ড, এই রাত্রে উঠবে কে। তবু উঠতেই হয়, নইলে উপোসভাঙার খাওয়া জুটবে না কপালে। কিন্তু উঃ! ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে শরীর—ইউরোপীয় আবহাওয়া দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জানিয়ে দিচ্ছে তার উপস্থিতি। দুলছে নৌকা—খাঁচার ভেতর থেকে বেরোনো দায়। ডেকে লোক কমে এসেছে, কিন্তু বসবার ঘরগুলো একেবারে ভর্ত্তি। খাওয়ার সময় খালি হয় একবার করে। তারপরে কে কত তাড়াতাড়ি এসে চেয়ার দখল করবে তাই নিয়ে চলে রেষারেষি। আবার বদান্যতাও চলে ওরই মধ্যে। 'তোমার বাচ্চার সর্দ্দি হয়েছে—আচ্ছা, আমার কাছে ওষুধ আছে বাছা।' এক বুড়ী মেমকে খুকু পেয়ে বসেছে—সমস্তক্ষণ বসে বসে তাকে খুকুর পুতুল ও পুতুলের জিনিষপত্তর তৈরি করে দিতে হচ্ছে। বুড়ী বলছে খুকুর জন্যে তার খুব মন কেমন করবে। জাহাজের এই সরাইখানায়, অল্পকালের জন্যে যাদের এত কাছাকাছি আসতে হয়, তাদের মধ্যে সহজেই কেমন একটা বন্ধুত্বের সূত্র গড়ে ওঠে। ভূমিস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই যে সূত্রটি ছিঁড়ে যাবে, একথা মনে করতে কষ্ট হয়। বয়স্কদের জীবন বহু অভিজ্ঞতায় জীর্ণ, তারা জাহাজের বন্ধুত্বকে—জাহাজের বন্ধুত্ব বলেই জানে, কিন্তু ছোটরা মত্ত হয়ে ওঠে। খুকু তার ছোট সাদা বন্ধুর সঙ্গে গলা জড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়। ছোট দুটি সাদা কালো হাত আজীবন বন্ধুত্বের প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়বদ্ধ। ওদের দু'জনের

হাতে ছোট্ট দুটি খাতা—তাতে রাজ্যের লোকের ঠিকানা জড় করেছে। তাদের সকলকে নাকি আবার চিঠি লিখতে হবে। হায় রে ভালবাসা—শিশুকাল থেকে মানুষের নাড়ীতে নাড়ীতে আগায় আঁকড়ে ধরার প্রবণতা। তরুণতরুণীর মধ্যেই অবশ্য ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশী সাংঘাতিক। তারায় ভরা আকাশের জ্যোৎস্নালুণ্ঠিত আঁচলের তলায় কালো জলের

ভূমধ্যসাগরে সূর্য্যাস্ত

কলকল গর্জ্জনের মাঝে, ঐ যে কিশোরী দাঁড়িয়ে আছে, ঝাঁকড়া সোনালী চুলে রিবন বেঁধে, রক্তনখর কোমল করপল্লব, পাশের তরুণের হাতের ওপরে রেখে, সেকি জানে, তার দেহমনের এ স্বপ্নাবেশ, ঐ তারকাখচিত মায়াপুরীর মতই মিথ্যা। দিনের আলোয় জলে উঠবে নীল জল, ঝকঝক করবে ফেনা, রাত্রির রহস্য যাবে ঘুচে। জাহাজ থামবে—হারিয়ে যাবে যে যার আপন কাজে, আজকের এই মুহূর্ত্তটি কি তখনও থাকবে বেঁচে ?

রবিবার দিন ৮টার সময় রোদ বেশ ফুটে উঠেছে—চারটের বেশী তাকে কে বলবে। খুকু তো কোনমতেই শুতে যাবে না। বিকেলবেলায় সে শোবে না, এই তার মত এবং দিনের বেলায় রাত কেন হবে, এই তার জিজ্ঞাস্য। অনেক কষ্টে তাকে শুইয়ে রেখে আসা গেল। এখন রাত দশটা তবু বই পড়া যায় এমন আলো। কলকাতায় এখন বোধ হয় রাত দুটো—আশা করা যাচ্ছে নিশ্চিন্ত আরামে সবাই নিদ্রামগ্ন—যে যার নিজের ঘরে শান্তিতে একটু ঘুমুতে পারছে। এখানে দিন চলছে, কেমন একটা অদ্ভুত বিচ্ছিন্নতার মধ্যে দিয়ে—পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে কে তার খবর রাখে—তিন হাজার যাত্রীর সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ—তীরের বন্ধনচ্যুত হয়ে সব ভাবনাগুলোও যেন খসে এসেছে মন থেকে। তবু যখন দুটোর সময় রেডিওতে বলে, আজকের খবর বলছি, তখন মনটা কেমন করে ওঠে—তাড়াতাড়ি ছুটে এসে শুনতে পাই, নেহরু কি বক্তৃতা দিয়েছেন, কোন্ প্রাসাদে গিয়া নেমন্তন্ন খেয়েছেন। এসব কথা শুনে কি হবে, আপন কুটিরের নিভৃত ছায়ায় ভারতবর্ষ কেমন আছে সেই কথাটি জানতে চাই। ভারতবর্ষ কি কোন দিন আবার তার সেই তপোবনের ছায়ায় ঘেরা জ্ঞানের প্রভায় দীপ্তি ও আত্মার জ্যোতিতে উজ্জ্বল শান্ত জীবনের মধ্যে ফিরতে পারবে—না আজকের পৃথিবীর দারুণ ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যেই তাকে ঘুরে ঘুরে মরতে হবে ? কিন্তু মানুষ যে পথ দিয়ে চলে আসে, সেই পথে আর কি ফেরে ? নবীন ভারত যে পথে চলবে, সে পথ প্রাচীন ভারতের পথের অনুরূপ হবে না সত্য, কিন্তু প্রাচীন ভারতের উত্তরাধিকার থেকে সে যেন বঞ্চিত না হয়, আজকের দিনের পঙ্গু ভারতের সকল দুর্বিষহ বোঝা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নবীন ভারত প্রাচীনের রসে পুষ্ট হয়ে নতুন পথে যেন ছুটে যায়।

এদিকে জাহাজ এক এক দিনে ৫০০ মাইল পেরিয়ে যায়—১৪ দিনের মধ্যে আমাদের ইংলণ্ডে পৌঁছে দেবেই, এই তার প্রতিজ্ঞা। সকালবেলা, এখানে ওখানে ডাঙার আভাস দেখা যায়—নীল জলের ওপরে দলে দলে সীগাল উড়ে চলে—মাঝে মাঝে জলের ওপরে সারি দিয়ে বসে ঢেউয়ের সঙ্গে মালার মত দুলে দুলে ভেসে যায়। ডাঙা দেখে খুকুর মন পাখীর মত উড়ছে—ওর কিচিরমিচিরের জ্বালায় অস্থির হয়ে একেবারে তিনতলার ডেকে চলে আসি। এক দল বুড়ী ওকে ঘিরে ধরে ওর প্রশ্নের জবাব দিতে থাকে—জিব্রালটারের রঙীন উপকূল চূড়ার মত জলের ওপরে ভেসে ওঠে। কতদিনের কত ইতিহাস, কত লড়াইয়ের, কত রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী এই পাথরে আছে লেখা—দেখি, দেখি আরো একটু দেখে নিই, কিন্তু জাহাজ চলেছে ছুটে—কোথাও তার গতিবেগ কমে না। স্পেনকে পাশে রেখে, আমরা এগিয়ে চলি—দূর থেকে নীল পাহাড়ের ছায়া বরফের সাদা আভাস মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নির্ব্বাক্ ইতিহাসের ইঙ্গিত মেলে ধরে।

আটলান্টিক পার হয়ে ভোর রাত্রে কোন্ সময় যে অফ বিস্কেতে প্রবেশ করেছি জানি না—কিন্তু সমস্ত রাত অসহ্য দুলুনিতে ঘুম হয় নি একটুও। সকালবেলা উঠতে গিয়ে পড়ে গেলাম, কি হ'ল—ব্যাপার কি, একটি মেয়ে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে চলে গেল বাথ-রুমে। পোর্ট-হোল দিয়ে তাকিয়ে দেখি, আকাশের চিহ্ন নেই, জল উঠছে ফুলে, পরক্ষণেই কোথায় মিলিয়ে গিয়ে আকাশ উঠেছে ভেসে। এ কি ব্যাপার, বহুকষ্টে জোর করে উঠে গেলাম মুখ ধুতে, দাঁড়াতে না দাঁড়াতে সমস্ত উঠে এল, বুঝলাম একেই বলে সমুদ্রপীড়া। অনেক চেষ্টায় নিজেকে পরিষ্কার করে ফিরে এলাম। মাথা ঘুরছে, উঠে দাঁড়াতে গেলেই পড়ে যেতে হয়। খুকুর বাবা এসে কেবিনের দরজায় টোকা দিলেন, স্নান

সাদা হয়ে গেছে—পরিষ্কার ফিটফাট দেখে হিংসে হল—"খেতে এস"। পাগল নাকি, খেতে যাবে কে? খুকুকে পাঠিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম, বুড়ী দু'জনের একজন গোঙাতে গোঙাতে খেতে গেল, আর একজন বিছানায় পড়ে রইল—প্রায় সবাই রইল বিছানায় মুখ গুঁজে পেটের ভেতরের সবকিছু যেন একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায়—তার ওপরে বদ্ধ গুমট ঘর—কিন্তু তবু ওপরে ওঠবার শক্তি নেই। ডেক একেবারে খালি, শুধু ছোট ছেলেমেয়েরা নেচে বেড়াচ্ছে। সমস্ত দিন উপোস দিয়ে পড়ে রইলুম। শিরায় শিরায় স্পষ্ট অনুভব করি ঢেউয়ের উদ্দাম গতি—শুয়ে থাকলেও তার হাত থেকে নিস্তার নেই; কিছু ভাববার, কিছু মনে করবার শক্তি নেই।

ভোরের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না—সকালে উঠে দেখি বেলা হয়েছে। প্রসন্ন সূর্য্যালোকের ঝলমলানি নিয়ে হাসছে সাগর।

দূরে দেখা যায় তটভূমির নীল আভা—হালকা শরীর ও মন নিয়ে ওপরে উঠে এলাম। আজ সমস্ত দিন ধরে চলে আলো-ছায়ার লুকোচুরি। দলে দলে লোক রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে—ভুলে গেছে দুপুর বেলার বিশ্রামের কথা। বোধ হয় দেশের কাছাকাছি এসে উতলা হয়েছে মন—যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, এক গাল হেসে বলছে—কেমন সুন্দর দিন নয় কি? "কে" দম্পতির সঙ্গে একটি ১৮ বছরের তরুণী কন্যা আছে। সে নীল সাগরের রহস্য-ঘেরা চোখের দৃষ্টি সুদূরে বিস্তার করে বললে '—একটা দিন এমন সুন্দর আর একটা দিন এমন বিশ্রী হয় কেন?' এই তরুণীর মত কমবয়সী সুন্দরী মেয়ে জাহাজে খুব কম আছে—সবাই এর সঙ্গে একটু কথার প্রসাদ লাভ করবার জন্যে উৎকণ্ঠ হয়ে থাকে। আমাদের "এ" সাহেব বলেন, ও তো আমার হাঁটুর বয়সী, তা ছাড়া যেমন বোকা তেমনি ন্যাকা—আমার তো দেখলেই হাসি পায়। কিন্তু "এ"র ব্যবহারে তার কথার সঙ্গতি পাওয়া যায় না।

খুকু বুড়ী-বন্ধুর সঙ্গে ছুটে আসছে—'দেখ দেখ ইংলণ্ড দেখা যাচ্ছে।' দূরে ওই কি ইংলণ্ড—ওই যে বহু দূর থেকে ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট জমির ছায়া। তাকিয়ে দেখি জল এসেছে ঘোলা হয়ে—সমুদ্রের সীমানা প্রায় পেরিয়ে এসেছি। পাখীরা আসছে উড়ে—তাদের ডানায় তীরের সঙ্কেত। পরিষ্কার নীল আকাশে শরৎকালের স্ফূর্তি ছড়ানো—সাধারণত ইংলণ্ড সূর্য্যের প্রসাদবঞ্চিত—কিন্তু আজ নির্ম্মল সূর্য্যালোকে, সূর্য্যোদয়ের দেশের পথিককে সে অভ্যর্থনা জানায়—ধীরে ধীরে জাহাজের গতি মন্থর হয়ে এসে থামে মার্সি নদীর মুখে। বন্দরে ঢোকার উপায় নেই।

সারারাত অপেক্ষার পরে পর দিন ভোরবেলা, নৌকা বাঁধা হ'ল বন্দরে—পাতলা একটা কুয়াশার আবরণ, চিমনীর ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে লিভারপুলের কালো কালো বিরাট বাড়ীগুলোর ওপরে জমাট বেঁধে চেপে আছে যেন। সেই কলকারখানা, সেই চিমনীর ধোঁয়া—সেই হাওড়ার গঙ্গার মত ঘোলা মার্সি নদীর জল, শুধু বাড়ীগুলো, কালো কালো—আর সবার ওপরে ধোঁয়া ও কুয়াশার মিলিত আবরণী। কলকাতারই যেন একটা মলিনতর বিষণ্ণ ছবি—এই কি সেই ইংলণ্ড। ছোটবেলা থেকে যে দেশ আমাদের কল্পনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে—প্রায় দু'শ বছর ধরে যে দেশের সঙ্গে আমাদের এত ঘনিষ্ঠ অথচ এত কঠিন সম্পর্ক। একি সেই দেশ—এমন মলিন—অন্ধকার ছায়া-ঢাকা। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। সামনে পেছনে দেড় হাজার যাত্রীর কিউ—সব ছাড়পত্রের আশায় আছে দাঁড়িয়ে—হঠাৎ পাশের লাইনের কিউ থেকে মুখ বাড়িয়ে সরে এসে বন্ধু বললেন—কেমন লাগছে? তাঁকে বলি বেশ খারাপ—এমন অদ্ভুত ভোঁতা জায়গা কখনো দেখিনি—এই নাকি ইংলণ্ড। হাসিমুখে বন্ধু বলেন—খোলসটা দেখেই অত দমে যেও না, ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা কর, তবে না রসের সন্ধান পাবে। চারদিকে হৈ হৈ ব্যস্ততা—কিন্তু তেমন গোলমাল নেই—হুড়মুড় করে কাজ চলেছে, কিন্তু আওয়াজ নেই। বিষম একটা তাড়া সবাইকে যেন ঠেলে নিয়ে চলেছে—এই মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছে এরা আর আমরা সম্পূর্ণ দুই আলাদা জগতের লোক—আমাদের পরস্পরের ধমনীতে বইছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রক্তস্রোত। কেমন যেন লাগছে মনের মধ্যে—কে জানে কেমন এই দেশ—কেমন এর লোকজন। সূর্য্যোদয়ের দেশ থেকে আসে যারা সায়াহ্নের রক্তিমা তাদের কেমন লাগে কে জানে?

"মর্নিং গ্লোরী"

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দাদা বিদেশে চাকুরী করিতেন।

বিদেশ বলিতে বেরিলী, লক্ষ্ণৌ, সিমলা প্রভৃতি স্থানে, এবং চাকুরীটা ছিল মিলিটারী হিসাবরক্ষা বিভাগে। দীর্ঘদিন এইরূপ সাহেবী চাকুরী করিয়া তাঁহার কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছিল। বাড়ীতে আসিয়া আমাদের গ্রাম্য অপরিচ্ছন্নতা দর্শনে সর্ব্বদাই খিচ্‌খিচ্‌ করিতেন এবং বলিতেন, সাহেবরা এ বিষয়ে খুব ভাল, যেখানেই থাকুক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে।

অর্থাৎ সাহেবদের আদর্শে এই গ্রাম্য বাড়ীখানি কেন গড়িয়া উঠে না এই ছিল তাঁর অভিযোগ। আমি বাড়ীতে থাকি এবং ভ্রাতৃগণের সম্পত্তি ভোগ করি। নিজের উপার্জ্জন নাই, এক্ষেত্রে তাঁহারা বাড়ীতে আসিলে আনন্দিত না হইয়া আতঙ্কিত হইতাম, যেহেতু প্রথমতঃ আমি ছোট ভাই, দ্বিতীয়তঃ নিজস্ব উপার্জ্জন নাই, তৃতীয়তঃ তাহাদের সম্পত্তি ভোগ করি, অতএব আমি অত্যন্ত অলস, অপরিচ্ছন্ন, গেঁয়ো ইত্যাদি।

সেজদা বাড়ীতে আসিলেন ছয় মাসের ছুটি লইয়া। আমি প্রমাদ গণিলেও যথাসাধ্য হুকুমমত কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি করিতে চেষ্টিত হইলাম, কিন্তু আমার গ্রাম্য বুদ্ধি, চালচলন লইয়া সাহেবী দাদার মনকে খুশী করা সম্ভব নয়। বৌদি অবশ্য মেমসাহেব জাতীয়া তথাপি পশ্চিমে জন্ম ও বাস হেতু তিনি বাড়ীর গরু, গোবর, কুমড়া যাহাই দেখিতেন তাহাকেই আনুমাসিক ভাবে বলিতেন—বিউটিফুল।

সেদিন চাকরটা হাটে গিয়াছিল তাই মাঠ হইতে আমিই গরু লইয়া আসিয়া গোয়ালে বাঁধিতেছিলাম। লক্ষ্য করিলাম সেজদা দালানের বারান্দায় বসিয়া চা-পর্ব্ব সমাপ্ত করিয়াছেন এবং একটা সিগারেটের সদ্ব্যবহার করিতেছেন—তাহার ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া বারান্দায় বাতাসটাকে অস্বচ্ছ করিয়া তুলিয়াছে। তিনি বজ্রনির্ঘোষে ডাকিলেন—খোকা।

তাঁহার ডাকিবার ভঙ্গী দেখিয়া ত্রাসে প্রাণ উড়িয়া গেল। অবশ্য আমার নাম খোকা, কিন্তু ভগবৎকৃপায় আমারও পাঁচটি খোকাখুকু হইয়াছে। অতএব আমি "খোকা" বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা নই।

সভয়ে যাইয়া বারান্দায় দাঁড়াইলাম। তিনি প্রশ্ন করিলেন, বাড়ীতে থেকে কি করিস ?

প্রশ্নের মাঝেই অর্থটা পরিষ্কার অর্থাৎ আমি কাজকর্ম্ম কিছুই করি না, তাই চুপ করিয়া রহিলাম।

দাদা বলিলেন, দিবারাত্রি ঘুমোবি আর পাড়ার আড্ডা দিবি। বাড়ীটার অবস্থা কি করেছিস ? একজন ভদ্রলোক এলে এ নোংরামি দেখে পালিয়ে যাবে।

আমি শুধু সবিস্ময়ে কহিলাম, নোংরা ?

—তা ছাড়া কি ? ফুলবাগানটা করেছিস কি ? পাতাবাহারের গাছগুলো মহীরুহ হয়েছে। ওটা কিসের গাছ গগন স্পর্শ করেছে ?

—ওটা স্থলপদ্ম।

—ও কি একটা ফুল। কাঠটগর, শিউলি দিয়ে বাগানটায় একটা অরণ্য সৃষ্টি করেছিস।

আমি একটু ভয়ে ভয়ে বলিলাম, পুজোর ফুল তাই কাটি নি, জবা, শিউলি।

—পুজোর ফুল। সেটা ত বারমাস লাগে না। যেখানে-সেখানে দুটো ফুলের গাছ পুঁতলেই হয়। তাই বলে বাড়ীর সামনে, পুবের দিকে এমন জঙ্গল করাটা অত্যন্ত ইন্‌ডিসেণ্ট। বুঝলি খোকা, তুই অত্যন্ত গেঁয়ো—

—গাঁয়েই ত থাকি।

—সেইজন্যে ডিসেন্‌সিটা সম্বন্ধে জ্ঞান কম। আমি একটা স্কিম করেছি, কতকগুলো ফুলের বীজ আনতে দিয়েছি, সেগুলো দিয়ে বাগানটা সাজিয়ে দিয়ে যাব।

আমি সোৎসাহে বলিলাম, সে ত ভালই। ও গাছগুলো কেটে ফেলতে হবে।

—দাঁড়া—আয় ত আমার সঙ্গে—

আমি অগ্রজের অনুগামী হইয়া বাগানে প্রবেশ করিলাম। দাদা বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন, শিউলি, জবাগুলো পাশে আছে থাক, কিন্তু তোমার ও স্থলপদ্মের দুইসেল্ড কাটতেই হবে। কয়েকটা বেড় করে মরসুমী ফুলের গাছ করবি আর এইখানে থাকবে একটা গেট, তাতে ফুটবে মর্নিং গ্লোরী—সুন্দর ফুল, সুন্দর লতা।

—ভালই ত হবে তা হলে।

—ভাল হবে মানে ? আমাদের ওখানে ক্যাপ্টেন স্কট এই মর্নিং গ্লোরী বলতে অজ্ঞান। তাঁর কুঠিতে একদিন যখন গেলাম—

দাদা সবিস্তারে যে কাহিনী বলিলেন তাহার সারাংশ এই যে উক্ত নামধেয় সাহেব তাঁহাকে প্রায়শঃই ডাকিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার ফুলবাগান দেখাইতেন এবং ঐ ফুলের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন, এবং দাদাও সে ফুলের রং ও আকার দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন—এমন ফুল গ্রামাঞ্চলে কেহ দেখে

নাই। ফুল ফুটিলে দিগরগ্রামের লোকেরা দেখিতে আসিবে।

সাহেব যে ফুলকে এত ভাল বলিতেন এবং আমার শিক্ষিত চাকুরে অগ্রজ যাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহার জন্ত আমার মত গ্রাম্য লোকের পক্ষে উদ্‌গ্রীব না হওয়া অশোভন, তাই যথেষ্ট আগ্রহে বলিলাম,—নিয়ে এস, জল সার কিছুরই অভাব হবে না।

দাদা হাসিয়া বলিলেন, এটা বেগুন মরিচ নয় ভায়া, এর সারও তৈরি করতে হয়। তার জন্তেও কেতাব আনতে দিয়েছি।

ফুলটার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা হইয়াছিল—তখনও ভারত স্বাধীন হয় নাই, কাজেই শ্রদ্ধাটা বেশী হইয়া থাকিবে। স্বাধীন ভারতে হইলেও যে শ্রদ্ধাটা কিছু কম হইত তাহা বলা যায় না। ক্যাপ্টেন স্কট যে ফুল বলিতে অজ্ঞান তাহার জন্ত অন্ততঃ আমার অজ্ঞান না হওয়া সাজে না।

দাদা বলিলেন, তার পোর্টিকোতে যখন ফুলময় ডগাগুলি ঝুলতে থাকে! উঃ সে কি বিউটি, কল্পনাতীত!

দাদার তারিফ শুনিয়া আমিও সবিস্ময়ে তারিফ করিলাম।

কিছু দিন পরে দশ-বার রকমের ফুলের বীজ আসিয়া পৌঁছিল—সঙ্গে আসিয়াছে একখানা ইংরেজী কেতাব। তাহাতে সম্ভবতঃ গাছ-পালন, সার ইত্যাদি সম্বন্ধে সারগর্ভ নানা প্রবন্ধ লিখিত আছে। বীজের প্যাকেটের উপর মর্নিং গ্লোরীর যে ছবি ছিল তাহা দেখিয়া উৎসাহ একটু যেন মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল, দাদা প্যাকেটটিকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন—দেখেছিস কি সুন্দর ফুল! যখন ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় তখন দেখতে কি সুন্দর, কি টেকশ্চার কি ব্রিলিয়েন্ট কালার

আমিও বলিলাম, সুন্দর!

পর দিন অভাস্ত সারমাটিতে, প্যাকিং বাক্সে বীজ বপন করা হইল এবং ওদিকে আমি ও আমার চাকর যষ্ঠিচরণ পৈতৃককালের স্থলপদ্ম ও কাঠটগরের গাছ কাটিয়া শিকড় পর্য্যন্ত তুলিয়া জমি সরস করিয়া ফেলিলাম। যষ্ঠিরও যথেষ্ট উৎসাহ ছিল,—বাঁশের বাখারি ও বেত দিয়া সে চমৎকার গেট তৈয়ারী করিয়া বাগানের প্রবেশদ্বারে লাগাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে উঠানের পূর্ব্বপ্রান্ত ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল।

দাদা বলিলেন, এবার ফুল ফুটলে দেখবি কি সুন্দর হয়! চারাগুলি চার-পাঁচ দিনেই লাগাবার মত হবে:

ফুলবাগানের আয়োজন সাড়ম্বরে চলিতে লাগিল—

দাদা আজকাল আমার কৃর্ম্মদক্ষতায় কিছু প্রসন্ন হইয়াছিলেন। সেদিন দ্বিপ্রহরে পূর্ব্বোক্ত লাল কেতাব পড়িতে পড়িতে বলিলেন—চারা ত হয়েছে খোকা!

তোমার বেড তৈরী হয়েছে।

—হ্যাঁ।

—কি করে তৈরী হয়েছে?

—গোবর-সারের মাটি, খোল পচান দিয়ে পাঁচ ছ'বার কুপিয়েছি, অন্ততঃ ১৬ ইঞ্চি মাটির মাঝে কাঁকরটিও নেই, ঘাস ত দূরের কথা!

—তবেই ফুলবাগান করেছ!

আমি অবাক হইলাম, ইহা হইতে ভাল আর কিছু আমার জানা ছিল না। তাই বলিলাম,—কি করতে হবে তা হলে?

—কেমিক্যাল সার ত মেলে না, তার অভাবে সার তৈরী করতে হবে। তাতে কি লাগবে শোন—

দাদা কেতাব হইতে বাংলায় তর্জ্জমা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। লিফ্ ময়েল্ড তৃতীয়াংশ, তৃতীয়াংশ কবুতর পুরীষ, ও বাকী তৃতীয়াংশ সারমাটি একত্রে ২০ দিন পচাইয়া কিছু বালির সহিত ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিয়া তবে বৃক্ষ রোপণ করিতে হইবে, তাহা হইলে ফুলের রং ও আকার লোভনীয় হইবে।

—মর্নিং গ্লোরী গাছটা খুব বাবু-গাছ, ওকে বিশেষ যত্ন না করলে বাঁচে না, তাই লিখেছে। কাজেই এসব যোগাড় করতে হবে। লিফ্ ময়েল্ড মানে জানিস্?

—না।

—পাতার পচানি অর্থাৎ ঝরা-পাতার থেকে তৈরী যে মাটি তাই সংগ্রহ করতে হবে—

—সে পারব, বাঁশঝাড়ের নীচের মাটি চেঁচে আনলেই হবে—

দাদা গম্ভীর ভাবে বলিলেন—তবে তাই কর্। আমার ছুটি ফুরিয়ে যাবার আগেই সব গাছে ফুল এসে যাবে, দেখিস্ কি সুন্দর হয় বাড়ীখানা।

মরসুমী ফুল! তা তিন মাসেই ফুল দেবে বৈ কি!

তা হলে সার তৈরী করে কেন—

কল্পনার ব্যাপারটা আমার নিকটও মধুর হইয়া উঠিয়াছিল। আমিও প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলাম—অন্ত কারণও ছিল, দাদা যদি বিরক্ত হইয়া মাসিক ২০্ টাকার মাসোহারা বন্ধ করেন তবে আমি নিরুপায়।

কিন্তু কবুতর আমাদের গ্রামে নাই, সন্ধান লইয়া জানিলাম বিলের ওপারে মজুমদারদের বাড়ীতে বহু কবুতর বিনা খাজনায় বাস করে। অতএব একদিন দ্বিপ্রহরের পরে যষ্ঠিচরণকে সঙ্গে করিয়া যাওয়া গেল, দু'ধামা মূল্যবান সার সংগ্রহ করিয়া ফিরিলাম—যষ্ঠিচরণ লিফ ময়েল্ড তথা পাতা পচা লইয়া আসিল। সার প্রস্তুত হইতে লাগিল।

সে দিন একটু ক্লান্ত ভাবে আসিয়া বাড়ীর ভিতরে বসিলাম। বৌদি বলিলেন—ছোট্ট ঠাকুরপো বাগানে নাকি মর্নিং-গ্লোরী দিচ্ছেন—

হ্যাঁ, সেইজন্যেই ত পেট করেছি—

চমৎকার! বিউটিফুল হবে। মিসেস স্কটের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে যখন মর্নিং-গ্লোরী দেখতাম তখন মনে হ'ত কি লাভলি ফুলগুলি।

বৌদি ম্যাট্রিক পাস, আর আমি গ্রামের মাইনর স্কুলে পাস, তাই তাঁহাকে সব দিক দিয়াই সমীহ করিতাম। সংক্ষেপে বলিলাম—ফুল আমাদেরও হবে!

হবে ত! মিসেস স্কটকে ত আর দেখাতে পারবো না।

আমি সহানুভূতির সঙ্গে কহিলাম—সেখানে করবেন ফুল!

হুঁ, মালীতে ত আর তোমার মত যত্ন করে করবে না।

আজ্ঞে না—আমার প্রাণের দায়। আর তাদের চাকুরী—

বৌদি হি হি করিয়া অনেকক্ষণ হাসিলেন, তার পর হাসির বেগটা কমিলে বলিলেন, যা বলেছ ঠাকুরপো!

যাহাই হোক কথাটা গ্রামেও রাষ্ট্র হইল।

গ্রামের ভট্টাচার্য্যদের চণ্ডীমণ্ডপে, গুরুচরণের দাওয়ায়, মজুমদারদের বৈঠকখানায় আলোচনা হইতে লাগিল যে, আমার দাদা যতীশবাবু নাকি একরকম অপূর্ব্ব ফুলের আবাদ করিতেছেন যাহা এদিকের কেহ দেখে নাই; যাহা দেখিয়া সাহেবেরা অজ্ঞান হয় এবং যাহার নাম মর্নিং গ্লোরী। উহা চাষীমহলে গিয়া মর্ণিং গেলারী নাম গ্রহণ করিল। মোট কথা একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল—

পাড়ার দুই-এক জন আমাকে প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা নন্দী, ফুলটি কি রকম হবে বল ত! খুব বড় ধামার মত দেখতে, ভয়ানক গন্ধ না কি, কেমন অপরূপ—একটু বুঝিয়ে বল—

আমি বলিলাম—আমি দেখিনি ত, তবে দাদাদের স্কট সাহেব খুব পছন্দ করেন। ফুলের চমকলাগা রং, দেখতে সিল্কের ফুলের মত চিক্ মিক্ করে—

নবীন ভট্টাচার্য্য হুকা নামাইয়া বলেন—বটে! এমন ত শুনিনি, চিক্ মিক্ করে, মানে কাঁচ বা সোনার মত জ্বলজ্বলে রং! আশ্চর্য্য! দেখতে হবে।

ধরণী খুড়া বলেন, ভায়া, যতীশ জ্ঞানমান ছেলে, শিক্ষিত, দিল্লী দিল্লী মেরে টাকা রোজগার করছে কাঁড়ি কাঁড়ি। সে ত তোমার আমার মত নয় যে জবা ফুল আর টগর দেখে মজবে। নিশ্চয়ই একটা সাংঘাতিক কিছু, চালাক ছেলে, সায়েবের কাছ থেকে আবাদ পর্য্যন্ত শিখে নিয়েছে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলেন, যা বলেছ ধরণী। ওরা গ্রামে বাস করলে এর চংই বদলে যায়। সায়েব-সুবোদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, আর আমরা সায়েব দেখলে ত শত হস্তেন।...

আলোচনা শুনিতে শুনিতে বিস্ময় মিশ্রিত গর্ব্ব অনুভব করি। ধরণী খুড়ো বলেন, চাষটা তুমি করছো কেমন?

হ্যাঁ খুড়ো।

যতীশ ত আর মাটি কাটি নিয়ে কাজ করতে পারে না। সে বোধ হয় সিগারেট খেতে খেতে দেখিয়ে দেয়?

হ্যাঁ।

—তবে আর কি? আমরা তোমার কাছ থেকে তুকতাক শিখে রাখবো—ফুলের বাতিকটা আমারও আছে কি না?

যথাসময়ে কিছু কিছু চারা ছাপরে রাখিয়া বাকী চারা লাগাইয়া দেওয়া হইল। তখন চৈত্রের শেষ, মাটিতে একটু রস নাই। নিত্য সকালে বৈকালে ঝাঁঝরা করিয়া জল দেওয়া আরম্ভ হইল, কিন্তু ষষ্ঠীচরণ নিয়মিত ঐ সময়টিতে অনুপস্থিত থাকায় ১০।১২ বালতি জল টানিবার ভার আমার উপরই পড়িত। দাদা বাগানের শুকনো ঘাসের উপর চেয়ার রাখিয়া কখনও বসিতেন, কখনও সিগারেট খাইতে খাইতে পায়চারি করিয়া দেখাইয়া দিতেন। মাঝে মাঝে বলিতেন, কাজ করলে ত করতে পারিস, তবে কেন বাজে আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করিস?

কিন্তু আশ্চর্য্য, ৫।৭ দিন পরেই সমস্ত চারা শুকাইয়া মরিয়া গেল। দাদা পুঁথি খুলিয়া "কেন মরিল" তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, আমি দু'চারজন বৃদ্ধ চাষীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা বলিল, গাছ জ্বলে গেছে, বেশী সার হয়ে গেছে।

দাদা প্রথমে এই গ্রাম্য কৃষকদের কথা মানিলেন না; কিন্তু কেতাবে কোনরূপ হদিস না পাইয়া শেষে বলিলেন, তবে এক কাজ কর, অর্দ্ধেক মাটি ফেলে দিয়ে নতুন মাটি মিশিয়ে আবার চারা লাগিয়ে দে।

অতএব তাহাই হইল, এবং পুনরায় চারা লাগান হইল—এবারে গাছ ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল।

দুই মাস পরে পাড়ায় সোরগোল পড়িয়া গেল, মর্নিং গ্লোরী! মর্নিং গ্লোরী! গাছে গেট ছাইয়া গিয়াছে, সুন্দর পাতায় যেন ভেলভেট বুনিয়াছে। ধরণী খুড়ো বলেন—ফুল ফুটলেই বলবে বাবা, আমি ছুটে যাব দেখতে—

হাটে মাঠে লোকে প্রশ্ন করে, মর্নিং গ্লোরী ফুটলো?

দাদা বলেন, কি চমৎকার গাছটি হয়েছে!

বৌদি বলেন, বিউটিফুল। লাভলি—

আমি নিত্য প্রত্যূষে উঠিয়া দেখি কুঁড়ি আসিল কি না। প্রথম সংবাদটি অন্ততঃ আমি দাদাকে দিব।

আমার শ্রমের ফল দেখিবার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা

করি। দাদা নিত্য পর্য্যবেক্ষণ করেন—বলেন, কুঁড়ির সময় হয়েছে ত!

তার পর একদিন দেখিলাম লিকলিকে ডগাগুলিতে সত্যই অসংখ্য কুঁড়ি আসিয়াছে! কুঁড়ি ফুটনোন্মুখ হইল।

দাদা সেদিন সন্ধ্যায় বলিলেন, দেখিস, কাল সকালে যখন রোদ এসে পড়বে তখন কি সুন্দর দেখায়, রঙের প্লাবন, সিল্কের ফুলগুলি ঝিল ঝিল করছে—

বৌদি বলিলেন, কাল ক'টা ফুল ফুটবে গো?

দাদা নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, তা গোটা তিরিশ ত ফুটবেই, আর গোটা পঁচিশ আধফোটা হবে—

—বিউটিফুল। মর্নিং গ্লোরী এ্যাট লাষ্ট—মিসেস স্কটকে ডেকে দেখাতুম, এমনটি তাঁর বাগানেও হয় নি—

একটা আকুল আগ্রহ লইয়া সেদিন শুইলাম, সুর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিয়া দেখিতেই হইবে আমার মর্নিং গ্লোরী। তিন মাস কত শ্রমে জল দিয়াছি, কত আয়াসে সার সংগ্রহ করিয়াছি।

সকালে উঠিয়া চোখে মুখে জল না দিয়াই বাহিরে গেলাম। ত্রিশ না হউক অন্ততঃ গোটা পনর ফুল ফুটিয়াছে; কিন্তু তাহার রং ও আকার দেখিয়া যেন একটু দমিয়া গেলাম। দাদা যেমনটি বলিয়াছিলেন তেমন চমৎকার বলিয়া মনে হইল না।

ফুল দেখিতেছি, এমন সময় দাদা উঠিয়া আসিলেন। তিনি দেখিয়াই সোৎসাহে বলিলেন, কি সুন্দর! মারভেল! ওগো ওঠো, ওঠো, শুনছো ওগো—

বৌদি দাদার খুশীভরা কণ্ঠের আহ্বানে বাহির হইয়া আসিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিলেন, ফুটেছে! ফুটেছে—লাভলি মর্নিং গ্লোরী—

দাদা বলিলেন, সি, সি, গ্লাড অব গ্লোরী—

যাহা হউক, দাদা ও বৌদি খুসী হইয়াছেন ইহাই পরম লাভ!

অকস্মাৎ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিলেন, বাড়ীতে কি একটা পূজা ছিল! সম্ভবতঃ শুভচুনী, নইলে এত ভোরে আসিবেন কেন?

তিনি তাড়াতাড়িই চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু আমাদের এমনি ভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া থামিলেন। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক চাহিয়া তাঁর যেন কিরূপ সন্দেহ হইল। তিনি বৃদ্ধ লোক, পিতার আমলের পুরোহিত, বলিলেন, কি যতীশ, কি?

দাদা বলিলেন, কি সুন্দর ফুল ফুটেছে তাই দেখছি—

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবার গাছটির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, এ অলুক্ষণে গাছ বাড়ীতে পুঁতিছিস, কেটে ফেল এক্ষুনি—

দাদা বলিলেন, কি গাছ বলে মনে হয়? এ বিলিতী গাছ, বহু কষ্টে এদেশে জন্মায়, এমন ফুল দেখেছেন কখনও—

ঠাকুর মশায় ভাল করিয়া দেখিলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। দাদা বলিলেন, এ ফুল দেখেন নি ত। এর নাম মর্নিং গ্লোরী।

ঠাকুর মশায় বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন, ছাই, এ ঢোল কলমির গাছ, কেটে ফেল—

—ঢোল কলমি? বলেন কি?

—হ্যাঁ! বুড়ো হলাম আর ঢোল কলমি চিনি নে?

আমি প্রশ্ন করিলাম—ঢোল কলমি?

—হ্যাঁ হে বাপু হ্যাঁ। না বিশ্বেস হয়, মল্লিক-বাড়ীর পেছনের বাঁশঝাড়ে দেখ গিয়ে রাশি রাশি ফুল ফুটে আছে—

ঠাকুর মশায় চলিয়া গেলেন। আমি ছল ছল চোখে দাদার দিকে চাহিলাম। দাদা বলিলেন, ভীমরতিতে ধরেছে—ঢোল কলমি? চল্ত দেখে আসি কোথায় বাঁশ-বাগানে মর্নিং গ্লোরী।

উভয়ে ছুটিয়া মল্লিক-বাড়ীর পিছনের বাঁশবাগানে আসিলাম—কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া গাছে উঠিয়া একটা লতা হিড় হিড় করিয়া টানিয়া নামাইলাম। দাদার সম্মুখে সপুষ্প লতাটিকে মেলিয়া ধরিলাম—হুবহু এক ফুল, এক পাতা!

দাদা নির্ব্বাক!

আমার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল—হায়, ঢোল কলমি, তুমি মর্নিং গ্লোরী সাজিয়া আমাকে এত জল টানাইয়াছ। মজুমদার বাড়ীর কবুতরের···

চাঁদ-জাগা রাতে

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্ম্মকার

সেদিন নিশীথে উঠেছিল চাঁদ—উঠেছিল মৃদু চাঁদ,
স্নিগ্ধ তাহার আলো-ছায়া কাঁপে রজনীগন্ধা-বনে।
বাতায়ন সেথা শিহরণ দিয়ে পেতে চায় মায়া-ফাঁদ
চাঁদিনীর কোলে, কত স্মৃতি ভাসে, জাগে আজি তাই মনে।
ঝাউবনে যেন মর্ম্মর-স্বনে করে খেলা হিম-বায়ু
শিশিরের কণা ঝরে ঝর ঝর খুলে দেয় আবরণ।
গহন রাতের ফুলবনে আজ পূর্ণ চাঁদের আয়ু,
জোনাকিরা গাঁথে আলোকের মালা—ঝলমল আভরণ।

বহুদিন পরে মালতীর বনে ভরে ওঠে সৌরভ,
মনোবনে যেন এঁকে দিল ভাষা, গগনের তারা কাঁপে।
বহুদিন পরে মরমেতে দোলে পুঞ্জিত গৌরব,
তৃণ-পল্লবসঞ্চরি ফেরে মধু-মাস গানে যাপে।

পুলকিত রাতে জ্যোছনায় ভেজা মায়াময় নীলাকাশে,
মধু-যামিনীর মধু-স্মৃতিটুকু ঢেকে রাখে ফুল-বাসে।
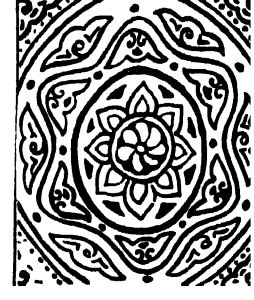
বাল্যকালে পূর্ব্ববঙ্গে গ্রাম্য জীবনের এক রূপ দেখিয়াছি। তাহা হইতে আমরা ক্রমশঃ দূরে সরিয়া আসিতেছি। আমাদের এই আধুনিক জীবন ভাল, কি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার জীবন ভাল ছিল তাহা লইয়া তর্ক তুলিতেছি না; কিন্তু একথা সত্য যে, তখনকার কালে জীবন ছিল সহজ অনাড়ম্বর। এই সহজ সরল গ্রাম্য জীবনের ছাপ রহিয়াছে বাংলার ব্রতকথা-গুলিতে। এই সকল ব্রতকথা গ্রাম্য ভাষায় রচিত। বাংলার পটচিত্রের মতই তাহাতে একটা নিরলঙ্কৃত স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে। আজকাল শিল্পরসপিপাসুরা পট কিংবা পাটাচিত্রে যে রস আস্বাদন করিয়া থাকেন এই ব্রতকথার ভিতরেও সেই রসের স্বাদ পাওয়া যাইবে। এই সকল ব্রতকথার ছড়ায় সাহিত্যরস ওতঃপ্রোত হইয়া আছে। এগুলি খাঁটি গণ-সাহিত্য। বাংলার Folk culture বা লোকসংস্কৃতি বলিতে কি বুঝায়, এই ব্রতকথাগুলি তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

নারীজীবনের সুখদুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনা ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। বিশ্বের নানা জটিল সমস্যা বা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত ইহাতে নাই, আছে নারীহৃদয়ের আকুল আকুতির প্রকাশ। এই বিরাট সংসারে নারী তাহার ঘরকন্না এবং সন্তান-সন্ততিকে আপনাদের মধ্যেই নিজ জীবনের সার্থকতা খুঁজিতেছে। গৃহের কল্যাণই তাহার একান্ত কাম্য। একটি অভাববিহীন আনন্দপূর্ণ সংসারে পুত্র-কন্যা পরিবৃত হইয়া সে চায় প্রতিষ্ঠিত হইতে। ভোগবিলাস তাহার কাম্য নয়, একান্ত মনে সে শুধু চাহিয়াছে "বাপের বাড়ী দুধভাত" এবং "স্বামীর বাড়ী ঘি ভাত।" প্রতি ব্রতেই দেখা যায় ব্রতচারিণীর একাগ্র প্রার্থনা, স্বামী ও পুত্র কন্যা শুধু নিজের জন্য নহে, তিন কুলের জন্য "ভাইরা উঠুক আমার তিন কুল।" ৫।৬ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই ছোট ছোট মেয়েদের এই সকল ব্রতের ভিতর দিয়া ধর্ম্মপরায়ণতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, গুরুজনদের প্রতি ভক্তি ইত্যাদি সুশিক্ষা লাভ হয়। ছোট ছোট মেয়েরা মায়ের নির্দ্দেশ অনুসারে খুব আনন্দের সঙ্গেই এই সকল ব্রত পালন করিয়া থাকে। তারার ব্রতে আছে, গৌরী তারার ব্রত করিয়া কি পাইয়াছেন সেই প্রশ্নের উত্তরে শিবকে বলিতেছেন,

"শঙ্কর হেন সোয়ামী পাইলাম, কার্ত্তিক গণেশ পুত্র পাইলাম।
লক্ষ্মী সরস্বতী কন্যা পাইলাম, জয়া বিজয়া দাসী পাইলাম।"

ছোটবেলায় বাড়ীর ছোট ছোট মেয়েদের নানা ব্রত করিতে দেখিয়াছি। ছেলেবেলায় মা ঠাকুরমার মুখে অনেক ব্রতকথাও শুনিয়াছি। আমাদের বৃদ্ধা পিতামহী এবং প্রপিতামহীদের গল্প বলার একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি ছিল এবং তাহা পরম উপভোগ্য হইত। ঠাকুরমা দিদিমার মুখের গল্পে যে রস পাওয়া যাইত আজ তাহা বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। ব্রতের ছড়া বা কাহিনী বংশপরম্পরায় মুখে মুখে অবিকৃত অবস্থায় চলিয়া আসিতেছে। আমি আমার এক বৃদ্ধা আত্মীয়ার প্রমুখাৎ মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা যেমনটি শুনিয়াছি হুবহু তেমনটিই লিপিবদ্ধ করিলাম। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বাল্য-কালে যাহা শুনিয়াছি, এখনও তাহার সঙ্গে কোনরূপ পার্থক্য দেখিতে পাই নাই। এই সকল কথা কত পুরাতন তাহা বলিতে পারি না।

সকল ব্রতের মধ্যে মাঘমণ্ডলের ব্রত শ্রেষ্ঠ, সমস্ত মাঘ মাস ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয় এবং একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর আচরণ করিবার পর এই ব্রতের পরিসমাপ্তি হয়, শেষের বৎসরের অনুষ্ঠানকে ব্রতসাঙ্গ বলে—এই সময় খাওয়ানো দাওয়ানো ইত্যাদিরও আয়োজন করিতে হয়। উঠানে মণ্ডলাকার আলপনা আঁকিয়া পূজা করিতে হয়, সেজন্য এই ব্রতকে মাঘমণ্ডল বলে। মণ্ডলের দুই দিকে চন্দ্র সূর্য্য অঙ্কিত থাকে। বিশিষ্ট পদ্ধতিতে হাতী, ঘোড়া, আয়না, চিরুণী, ইত্যাদি আঁকা হয়। আলপনা হয় গুঁড়া রং দ্বারা। সাধারণতঃ এই কয়টি রং ব্যবহৃত হয়: (১) খড়ির গুঁড়া (সাদা), (২) হলদি গুঁড়া (হলুদ), (৩) আবীর (লাল), (৪) শুকনা বেলপাতার গুঁড়া (সবুজ), (৫) কাঠ কয়লার গুঁড়া (কালো)। সারাটা মাঘ মাস ভরিয়া নিত্য নূতন আলপনা অঙ্কিত হয়। সুপরিকল্পিত বর্ণ-সমাবেশের দরুন আলপনাটি উজ্জ্বল গালিচার মত প্রতিভাত হয়।

শেষরাত্রে উঠিয়া পুকুর-পাড়ে বসিয়া মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা আবৃত্তি করিতে হয়। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রতকথা সাঙ্গ

করিতে হয়, সেজন্য অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করা প্রয়োজন। পুকুরের চারিধারে দলে দলে বসিয়া মেয়েরা একসঙ্গে আবৃত্তি করিতে থাকে ; মাঘের প্রচণ্ড শীতে তাদের হাড়ের ভিতরে পর্য্যন্ত যেন কাঁপুনি ধরিয়া যায়। কুয়াশা কুণ্ডলী পাকাইয়া পুকুর হইতে উপরে উঠিতে থাকে। সূর্যদেবের আবাহন করা হয় এই বলিয়া "উঠ উঠ সূর্য্য ঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া।" সূর্য্য ঠাকুর জবাব দেন—"না উঠিতে পারি আমি ইয়লের লাইগ্যা।" ক্রমে রাত্রি প্রভাত হয় কাকের ধ্বনিতে—"কাউয়ায় বলে কা, রাত পোহাইয়া যা।" ছোট ছোট মেয়েদের মধুর কণ্ঠের আবৃত্তি শ্রবণের পরিতৃপ্তি সাধন করে।

আবৃত্তিশেষে মোচার খোলায় "লাউল" ভাসান হয়। লাউল হইল ফুলে সাজানো কোণাকৃতি শঙ্কু—মাটির জিনিষ। প্রত্যেক মেয়েরই একটি করিয়া লাউল থাকে। কুয়াশা-ঢাকা পুকুরে ফুলের পসরা বুকে লইয়া বহু মোচার খোলা ভাসিতে থাকে। হলুদ রঙের সরিষাফুলই মোচার খোলার রূপসজ্জায় মুখ্য স্থান অধিকার করে, কেননা মাঘ মাসেই সরিষাফুলে বিক্রমপুরের ক্ষেত ভরিয়া যায়। কে কত সুন্দর করিয়া লাউল সাজাইতে পারে তাহা লইয়া ছোট ছোট বালিকাদের ভিতর প্রতিযোগিতা সুরু হয়। আবৃত্তিশেষে বাড়ীর উঠানে আসিয়া আলপনার উপর ফুল দিয়া পূজা করিতে হয়।

এই ব্রতকথার স্থানে স্থানে রচয়িতার কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

"মাইলানী হেমরিকে" ফুলের 'ঠালা' নিতে বলা হইলে সে উত্তর দিতেছে :—

> "উত্তর রায়ের মালীলো, ফুলের ঠালা নবিলো,
> হাতে কলসী কাখে পোলা,
> কেমনে লইমু ফুলের ঠালা।"

কেমন একটি বাস্তব চিত্র!

দুঃখিনী নারীর দুঃখের চিত্রও আছে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী সকলের জন্য ভাল জিনিষ আনা হইয়াছে, কিন্তু বৌয়ের জন্য আনিয়াছে "কুইয়া (পচা) পুটী"। বৌ রুষ্ট হইয়াছে। সে পচা পুটী "খাইব না ছুইব না, শিয়রে থুইব, রাত পোহাইলে কাকেরে দিব।" বৌ কাককে 'কুইয়া পুটী' দিবে, তাহার সঙ্গে কাকের মিত্রতা আছে, কেননা "রাত পোহাইলে, (কাক) বাসি কাজ করে। অর্থাৎ গৃহস্থ-ঘরের বধূদের প্রাতঃকালে করণীয় উঠান ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা ইত্যাদি কার্য্য কাক বৌয়ের জন্য করিয়া থাকে।

কবিরা ময়ূর, কোকিল, দোয়েল লইয়া কবিত্ব করেন ; কাকের স্থান কাব্যে তো দেখিতে পাই না। কিন্তু ব্রতকথার কবি কল্পনা করিতেছেন প্রভাত আসিতেছে কাক হাতে করিয়া। "ঐ তো আসে রাত পোহানী কাক হাতে কইরা।" এই উপমাকে বলিতে পারি courageous conception বা সাহসিক কল্পনা। ঘৃণ্য কাককে ইহাতে মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে। অভিজাত ময়ূর, কোকিলের স্থান এখানে নাই। অতিআধুনিক কবি, চিত্রকর যাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নূতনত্ব আছে তাঁহারাই এই ধরণের অভিনব এবং বলিষ্ঠ কল্পনা করিতে পারেন।

ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহাদের দেশ বরিশালে এরূপ মাঘমণ্ডলের ব্রত প্রচলিত আছে। ব্রতকথা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং আমাদের অঞ্চলে প্রচলিত কথার সঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ পার্থক্যও আছে। তাহাতে সূর্য্যের বিবাহের উল্লেখ আছে। সূর্য্য ব্রাহ্মণকন্যা গৌরীকে (শিবের পত্নী নহে) বিবাহ করেন। সূর্য্য ব্রাহ্মণকন্যার পায়ের খারু দেখিয়া বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দক্ষিণে গাণপত্যদের কাছে গৌরী শিবের পত্নী নহে, গণেশের পত্নী।

বিক্রমপুরের ব্রতকথায় লাউলের পুত্রের সঙ্গে গৌরীর বিবাহের উল্লেখ আছে—"লাউলের বেটা সদাগর বিয়া করতে সাজে।" "ঘরে আছে পার্ব্বতী তারে দিমু বিয়া।" পাঠান্তরে লাউলের সঙ্গেও বিবাহের উল্লেখ আছে।

> "নাপিত ভাই, নাপিত ভাই, ধইরা তোল ছাতি,
> ধরমরাজেরে দিব বিয়া হর আর পার্ব্বতী।"

লাউলকে ধর্ম্মরাজ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ; ধর্ম্মরাজ তো বুদ্ধ। লাউলের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে কি ? সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দু লৌকিক আচারে প্রবেশ করিয়াছে।

মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা

> চোখে মুখে পানি দিতে কি কি ফুল লাগে,
> রাম লক্ষ্মণ দুটি ফুল লাগে।
> সেই ফুলে খান কি ? মল ভাইঙা জল খান,
> পুকুরের চারি পাড়ে ছকুলা[১] খেলায়।
> দুপুর দুপুর সরেশ্বতী লড়ে না চড়ে,
> লইড়া চইড়া কি বর মাগে,
> রাজার দুয়ারে পাশা মাগে।

পাশা নায়ে নন্দপুরী,
ভাই গিয়াছেন বিক্রমপুরী।
মার লাইগা আনছেন কি?
পাখা শাড়ী।
বাপের লাইগা আনছেন কি?
দোলা২ ঘোড়া।
বইনের লাইগা আনছেন কি?
খেলার সাজু৩।
বৌর লাইগা আনছেন কি?
কুইয়া৪ পুটি।
খাইব না ছুইব না, শিয়রে থুইব,
রাত পোহাইলে কাকেরে দিব।
সেই কাকে তোমার কি কাজ করে?
রাত পোহাইলে বাসিকাজ করে।
বাসিকাজ করিতে কুটিল কাটা,
এই হইল আমার জন্মের খোটা।
ধুয়া৬ ভাকে ধুয়ানী এচলার৭ আগে,
সকল ধুয়া গেল বড়ই গাছটির তলে।
দে দে বড়ই গাছ ঝুমুই৮ দে,
ছয় কুড়ি ছয়টা বড়ই লিখিয়া দে।
লিখিতে পড়িতে গোটে হইল না,
কাইটা কুইটা ফেলিলাম শিবের কানের সোনা।
শিবের কানের সোনা নালো, নরিয়ার৯ পিতল,
এই ব্রত করি আমরা মাঘের ভিতর।
মাঘের জলখানি টলমল করে,
উইড়া যাইতে পক্ষীটি পইড়া পইড়া মরে,
হাতে নিলে কটিক জলে।
বামন ঝি লো সই,
মাঘমণ্ডলের বরত করতে ঘাট পাইমু কই?
আছে, আছে লো ঘাট, বামুনবাড়ীর ঘাট,
রাত পোহাইলে বামুনরা পৈতা ধোয় তাত।
পৈতার গোতলাইনা জল পুখইরেতে ভাসে,
তা দেইখা মাইলানী১০ খট খটাইয়া হাসে।
হাসিচ নালো মাইলানী তুইতো আমার সই,
মাঘমণ্ডলের বরত করতে ঘাট পাইমু কই?
আছে আছে লো বৈষ্ণবাড়ীর ঘাট,
রাত পোহাইলে বৈষ্ণরা সন্ধ্যাপূজা করে তাত।
পূজার গোতলাইনা জল পুখইরেতে ভাসে,
তা দেইখা মাইলানী খট খটাইয়া হাসে।
হাসিচ নালো মাইলানী তুইতো আমার সই,
মাঘমণ্ডলের বরত করতে ঘাট পাইমু কই?

লাউলের ভাসানর ও বিবাহের কথা

আলা চাউলে কাচা দুধে লাউলে স্নান করে।
শ্বশুরবাড়ী বৌ থুইয়া লাউলে ভাতে মরে।
লাউল ভাত খাও আইসা ঘরে
তোমার শাশুরী বাইন্ধা থুইছে কদম গাছের তলে।
মটকা কদমের ঠালা ভাইঙ্গা পড়ে মাথায়।
এপারে ওপারে কিসের বাইগু বাজে,
লাউলের বেটা সদাগর বিয়া করতে সাজে,
সাজাও সাজাও রে লাউল মাথায় মুকুট দিয়া,
ঘরে আছে সুন্দরী কন্যা তারে দিমু বিয়া।
না দিমু না দিমু এমন গোদের দেন১১
হাতে পায়ে চারিটা গোদ দেইখা পরাণ যায়
ঘর আছে পার্ব্বতী তারে দিমু বিয়া।
পার্ব্বতীর মাথায় নাই চুল,
ঘোড়ার মাথায় লম্বা লম্বা,
হস্তীর মাথায় খোপা খোপা,
তা দিয়া বান্ধুম লাউলের বৌর খোপা।
লাউলের বৌ লো সাধভি কি কি সাধ খালি
আদা, গুর কুচি, কড়া কড়া ভাত,
লাউলে দিয়া পাঠাইয়াছে ক্ষীরার পাত
ক্ষীরার পালো পেক পেক,
খামুনা ছুমুনা শিয়তে থুইমু।
রাত পোহাইলে কাকেরে দিমু,
সে কাক তোমার কি কাজ করে
রাত পোহাইলে বাসি কাজ করে
বাসি কাজ করিতে কুটি লো কাটা
এই হইল আমার জন্মের খোটা।
আজ যারে লাউল কাল আইস
বছর বছর ভুলনি১২ লইও।

শব্দার্থ—

(১) দুকুল অথবা রেশম বস্ত্র, (২) দোলাই, শাল, (৩) সজ্জাদ্রব্য, (৪) পচা, (৫) ভোরে উঠিয়া মেয়েদের কর্তব্য কর্ম—উঠান ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা ইত্যাদি, (৬) কুয়াশা, (৭) জলের ছাঁট, (৮) ঝাঁকি দেওয়া, (৯) খারাপ, (১০) মালিনী, (১১) কাছে, (১২) ফিরিয়া আসা।

ব্যাঙ্ককের বৌদ্ধমন্দির-গাত্রে রামায়ণ-চিত্রাবলী—

১। সীতাহরণ

২। সসৈন্য রামচন্দ্রকে হনুমানের আশ্রয়দান

৩। সিংহিকা রাক্ষসী ও হনুমান
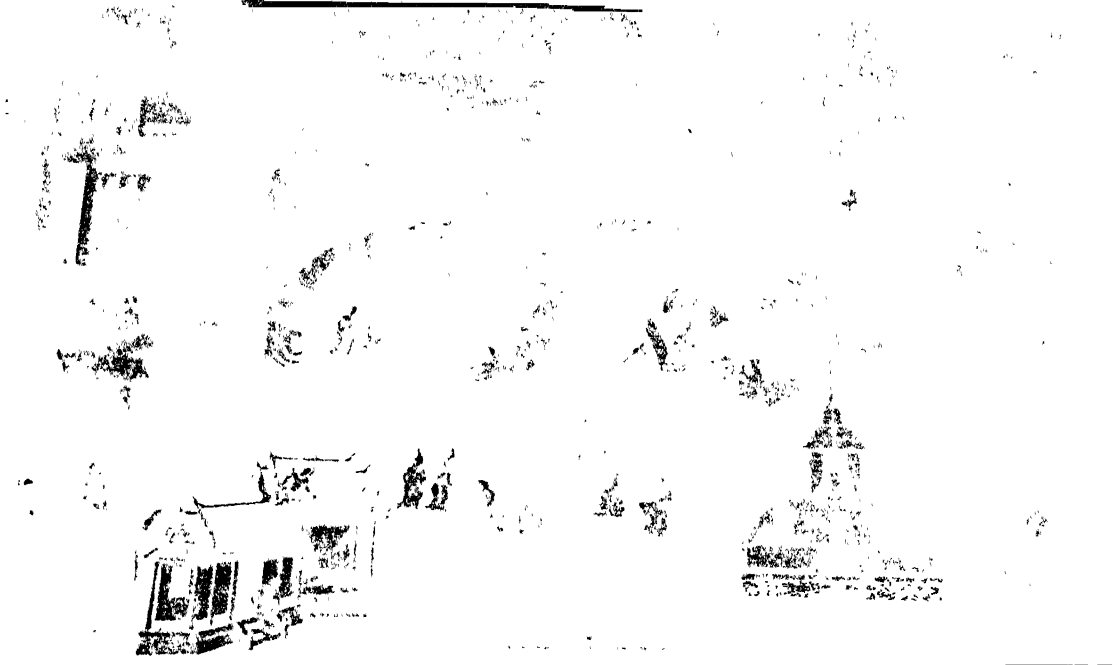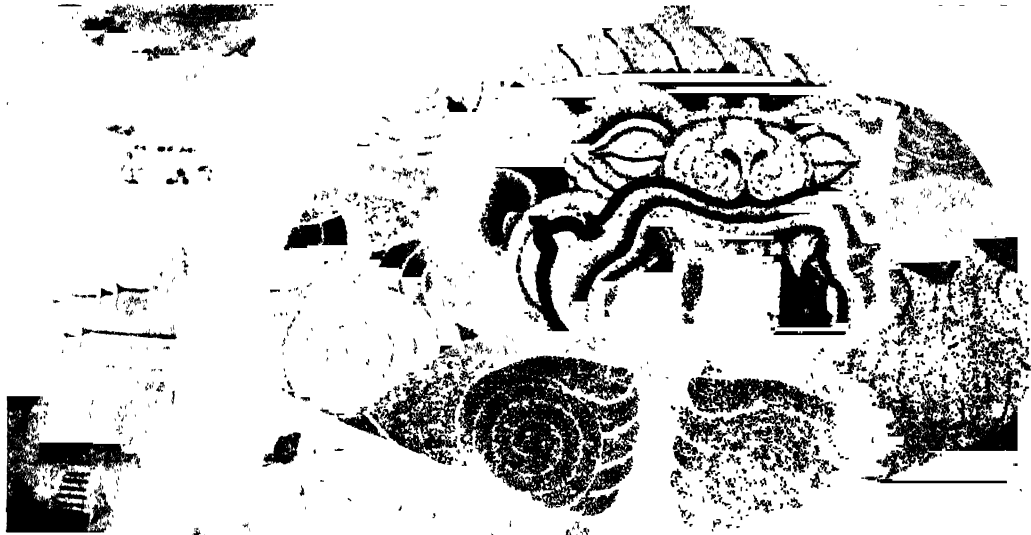
৪। দৈত্য-জিহ্বা আচ্ছাদিত লঙ্কাপুরী

[চিত্র-পরিচয় দেশ-বিদেশের কথায় দ্রষ্টব্য]

ভারতের জনসম্পদ

জন্ম ও মৃত্যুহার

শ্রীকস্তুরচাঁদ লালওয়ানী

বর্তমান প্রবন্ধে জন্ম ও মৃত্যুর হারের কথা বলব। আমাদের দেশের জন্ম ও মৃত্যুর হারের কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নীচের সংখ্যা থেকে বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে :—

প্রতি হাজারে জন্ম ও মৃত্যুর হার

দেশ	১৯১১-১৩		১৯২১-২৫		১৯৩১-৩৫		১৯৪১-৪৩	
	জন্ম	মৃত্যু	জন্ম	মৃত্যু	জন্ম	মৃত্যু	জন্ম	মৃত্যু
ইংলণ্ড ও ওয়েলস্	২৪·১	১৩·৯	১৯·৯	১২·২	১৫·০	১২·০	১৬·৩	১২·১
ফ্রান্স	১৮·১	১৯·০	১৯·৩	১৭·২	১৬·৫	১৫·৭	১৫·৯	১৬·৪
জার্মানী	—	—	২২·১	১৩·৩	১৫·৯	১১·০	১৬·২	১২·৬
বেলজিয়াম	২২·৭	১৫·৩	২০·৪	১৩·৪	১৬·৮	১২·৯	১৪·৮	১৩·৫
হল্যাণ্ড	২৮·১	১৩·১	২৫·৭	১০·৪	২১·২	৮·৯	২৩·০	১০·১
স্পেন	৩১·২	২২·২	২৯·৮	২০·২	২৭·১	১৬·৪	২২·৮	১৩·২
নরওয়ে	২৫·৪	১৩·৩	২২·২	১১·৫	১৫·২	১১·৪	১৫·৭	—
সুইডেন	২৩·৬	১৩·৯	১৯·১	১২·১	১৪·১	১১·৬	১৯·৩	১০·২
ডেনমার্ক	২৬·৩	১৩·০	২২·৩	১১·৩	১৭·৮	১০·৯	২১·৪	৯·৬
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	—	—	২৪·৬	১৪·২	১৮·৪	১২·২	২২·৬	১১·৭
কানাডা	—	—	২৭·৪	১১·২	২১·৪	৯·৭	২৪·০	১০·০
জাপান	৩৪·১	২০·২	৩৪·৬	২১·৮	৩১·৬	১৭·৯	—	—
অষ্ট্রেলিয়া	২৮·০	১০·৯	২৩·৯	৯·৫	১৬·৯	৯·০	২০·৭	১০·৩
ইটালী	৩১·৭	১৯·৩	২৯·৮	১৭·৪	২৩·৮	১৪·১	২০·৫	১৪·২
ভারতবর্ষ	৩৮·৬	২৯·৯	৩২·৭	২৬·০	৩৪·৪	২৩·৫	৩২·০	২২·০

উপরের তুলনামূলক সংখ্যা থেকে একথা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ভারতবর্ষে জন্মের হার পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। আমাদের দেশে জন্মের সংখ্যা হ'ল প্রতি হাজারে ৩২ জন। পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ জন্মের হার হ'ল হল্যাণ্ড ও স্পেনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায়। তবু ত প্রতি হাজারে এই সব দেশে জন্মের হার ২২ থেকে ২৪ জন। ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে জন্মের হার আরও কম। আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল এই যে, গত ৪০ বৎসরে অন্যান্য দেশে জন্মের হার দ্রুত কমে চলেছে, অথচ মৃত্যুর হার সে অনুপাতে কমে নি—কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদৌ কমে নি। তাই পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বিভিন্ন জাতি চলেছে ক্ষয়িষ্ণুতার পথে। যে হারে লোক কমছে, সে হারে বাড়ছে না। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তা হলে পাশ্চাত্যের অনেকগুলি দেশই কালে জনশূন্য হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা ঠিক বিপরীত। অবশ্য গত ৪০ বৎসরে এদেশে জন্ম এবং মৃত্যু এই উভয় হারেই খানিকটা ক্ষতি হয়েছে; এ দুয়ের ব্যবধান প্রায় ঠিকই আছে। গত ৪০ বৎসরে এদেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধবিগ্রহ, গৃহবিবাদ এ সমস্তই হয়েছে, কিন্তু তাতে জন্ম ও মৃত্যুর হারের পার্থক্যে পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে নি। সেই সঙ্গে দেশব্যাপী দারিদ্র্যের তাণ্ডবলীলা চলেছে। আহার, বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্রের অভাবে মানুষের আধিব্যাধি প্রভৃতির প্রতিরোধ-শক্তি হ্রাসপ্রাপ্তই হয়েছে। এই যে শোচনীয় পরিস্থিতি এদেশে চলেছে এর কারণ কি? অর্থনৈতিক কারণগুলি ত আছেই। দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা অধিকাংশ স্থলে মানুষের পশু-প্রবৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক যারা তারা ভাবে যে, তাদের সন্তানসন্ততি যদি বেশী হয় তা হলে স্বল্প আয়ে তাদের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা কঠিন হয়ে উঠবে। তা ছাড়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও তাদের লক্ষ্য থাকে। শিক্ষাদীক্ষা তাদের রুচিকে করে মার্জ্জিত; পশুপ্রবৃত্তিগুলি তাতে অনেকখানি চাপা পড়ে যায়। কিন্তু গরীব যারা তাদের ত জীবনযাত্রার মানের কোন বালাই নাই। তাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যরকম। তাদের শ্রেণীর শিশুরা পর্য্যন্ত কিছু না কিছু রোজগার করে। তারা ভাবে, ভগবান যদি একটি 'মুখ' পৃথিবীতে পাঠান তা হলে সেই সঙ্গে দুই হাতেরও ব্যবস্থা করেন খেটে খাবার জন্য—ফলে জীবনের যে সময়টুকু মধ্যবিত্ত বা অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষাদীক্ষায় অতিবাহিত করে সে সময়েও গরীবের ঘরের ছেলে হয়ত তাদেরই দোরে খাটছে। তাই লোক-সংখ্যাবৃদ্ধির আতঙ্ক গরীবদের নাই; কারণ তাদের যে সে বোধই জন্মায় নি। এই ভাবে প্রতিদিন যে সব শিশুর জন্ম হচ্ছে আমাদের দেশে তাদের সংখ্যা খুব বেশী; অথচ অন্নবস্ত্রের অভাবে এরাই সবচেয়ে বেশী দুর্গত, রোগ-প্রতিরোধ শক্তিহীন। তাই এদের মধ্যে মৃত্যুর হারও খুব বেশী। এটা প্রকৃতির বিধানও বটে। যে গাছে যত বেশী ফল ধরে সে গাছের ফল নষ্টও হয় ততই বেশী। ঝড়-ঝাপটা প্রতিরোধ করবার শক্তি সে গাছের ফলের খুব বেশী থাকে না; কারণ তারা যে সে শক্তি আহরণ করবার সুযোগই পায় না। সেই সঙ্গে ভিতরে ভিতরে কাজ করছে সামাজিক বিধি ব্যবস্থাগুলি। অল্প বয়সে বিবাহের প্রথা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই আছে সব সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলে এদেশে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের যৌবন আরম্ভ হয়

অপেক্ষাকৃত কম বয়সে ; কিন্তু বাল্যবিবাহে যেন এর গতি-বেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, অপরিণত বয়সে যৌবনের আবির্ভাব হওয়ায় তা অল্প দিনই স্থায়ী হয় এবং শীঘ্রই প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্যের আবির্ভাব হয়। অপরিণত বয়সে যেসব সন্তান-সন্ততির জন্ম হয় তাদের স্বাস্থ্য যে স্বভাবতই খারাপ হবে তাতে আর সন্দেহ কি! এ কারণ এদেশে জন্মের হার যেমন বেশী মৃত্যুর হারও তেমনি অধিক।

স্ত্রী ও শিশুমৃত্যু

এদেশের মৃত্যুহারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, এদেশে স্ত্রী ও শিশু-মৃত্যু খুবই বেশী। স্ত্রীলোকদের জীবনী শক্তি কি ভাবে ক্ষয় হয় সেকথা আগেই বলেছি। যে জমির উর্ব্বরতা-শক্তি কম সে জমির ফসলও ভাল হবে না এটা স্বাভাবিক। গত কয়েক বছরে এ বিষয়ে খানিকটা উন্নতি দেখা যাচ্ছে। ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত এদেশে স্ত্রীলোকের মৃত্যুর সংখ্যা যা ছিল, ১৯২২ থেকে যেন সেই সংখ্যা কিছু কমে যায়। তারপর থেকে আমরা যে সংখ্যা পাই তাতে দেখা যায় যে, স্ত্রীলোকদের মৃত্যুর হার যেটুকু কমেছিল তার পর আর হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নি। নীচে কয়েক বৎসরের সংখ্যা দেওয়া হ'ল :

১৯২১-৩২ সালে বিভিন্ন বয়স্কা স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার

বয়স	১৯২১	১৯২২	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩২
৫-১০	১৩·৮১	৯·৬২	১২·১৩	৯·৫৬	১০·১৬	৯·৫৬	৯·৫৬	৯·৯৬	৮·৯
১০-১৫	১০·৩৪	৮·৬১	১০·৯৮	৮·২৮	৮·৯৭	৮·২০	৭·৭৫	৭·৫৪	৫·৫
১৫-২০	১৫·৩৬	১২·২৩	১৫·৫৮	১২·৮৮	১৪·০৫	১৩·৭৪	১৩·১৬	১৩·১৩	—
২০-৩০	১৭·১৫	১৩·২০	১৫·৬৮	১৩·৭৫	১৪·২৪	১৪·৫০	১৪·০৩	১৪·০৫	—
৩০-৪০	১৯·০২	১৪·৫৬	১৬·৮৯	১৪·০৯	১৫·০৩	১৫·০০	১৪·৬৭	১৪·৭৯	—

সমুদয় সভ্যদেশের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, শিশুমৃত্যুর সংখ্যাও এ দেশেই সবচেয়ে বেশী। এদেশে যত শিশুর জন্ম হয় তাদের এক-পঞ্চমাংশ জন্মের এক বৎসরের মধ্যেই মারা যায় এবং দেশে মোট মৃত্যু সংখ্যা যত তার এক-পঞ্চমাংশ হ'ল শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা। এই বিরাট অপচয়কে যে নিবারণ করা যায় না তা নয়। কেন না, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশই এই বিরাট অপচয়ের জন্ত দায়ী। কি শহরে, কি গ্রামে, আমাদের দেশে প্রসবকার্য্য সম্পন্ন হয় বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর গৃহে। ফলে সূতিকাগারেই বহু শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও ১০০ বৎসর আগে শিশুমৃত্যুর হার নেহাত কম ছিল না। কিন্তু স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় সে সব দেশে শিশুমৃত্যু আপনা থেকেই কমে গেছে। ১৮৫০-৫৫ সালে ইংলণ্ড ও ওয়েলসে এক বৎসরের কম বয়স্কদের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রতি হাজারে ১৫৬; ১৯৩২ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াল ৬০-এ; অথচ এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার যে বিশেষ কমে নি তা নীচের সংখ্যা থেকেই বোঝা যায় :

প্রতি হাজারে এক বৎসরের কম বয়সের শিশুর মৃত্যুহার

সাল	পুরুষ	স্ত্রী
১৯১১	২১৪	১৯৬
১৯১৪	২১৯	২০৪
১৯১৮	২৭৪	২৬০
১৯২০	২০১	১৮৮
১৯২২	১৮৩	১৬৬
১৯২৫	১৮১	১৬৭
১৯২৮	১৮১	১৬৪
১৯৩১	১৮৮	১৭০

শিশুমৃত্যু বিষয়ে আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল এই যে, গ্রামের চেয়েও শহরে শিশুমৃত্যু অনেক বেশী, বিশেষ করে সেই সব শহরে যেখানে জনসংখ্যার চাপ খুব বেশী। শহরে যারা বাস করে তারা গ্রামের লোকের চেয়ে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বেশী জ্ঞান রাখে একথা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা চলে। তবুও শিশুমৃত্যু যে শহরে বেশী তার প্রধান কারণ হ'ল ভাল দুধের অভাব এবং মায়েদের অজ্ঞানতা। শহরে যাদের অবস্থা একটু ভাল তারাই শিশুর লালনপালনের ভার ন্যস্ত করে ভাড়া করা লোকের উপর। বেতনভুক্ অশিক্ষিত লোক কেনই বা শিশুর উপযুক্ত যত্ন করবে ; আর তার সে জ্ঞানই বা কোথায়? তা ছাড়া শিশুপালন বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত পরিবারের মেয়েদের জ্ঞানও খুব অল্প। স্ত্রী ও পুরুষের একই ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা সাম্যের দিক থেকে খুবই সমীচীন মনে হতে পারে ; কিন্তু প্রকৃতিগত বৈষম্যের ফলে তথাকথিত কৃত্রিম সাম্য যে আমাদের স্ত্রী-জাতিকে সমাজের উন্নয়নের পরিপন্থী করে তুলছে, তা বোধ করবে কে? এই কারণে কি মধ্যবিত্ত, কি ধনিক, প্রায় সব পরিবারেই শিশুদের অযত্ন হয়। তাই স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিষয়ে শহরবাসীদের বেশী জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যেই শিশুমৃত্যু সবচেয়ে বেশী। এ দেশের কয়েকটি শহরের শিশুমৃত্যুর সংখ্যা নীচে দেওয়া গেল :

প্রতি হাজারে শিশুমৃত্যু

শহর	১৯৩৫	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১
বোম্বাই	১৪৮	২৫০'২	২৪৬·৩	২৬৭'৯	২১২'২	২০১·৫	২১১·৪
কলিকাতা	২৩৯	২৪১·৬	২৫২'৭	২১৮·৬	২০৫·৪	২১২·৫	—
মান্দ্রাজ	২২৭	২১৮·০	২২৩·৮	২২২·১	২৪১·৬	২০৫·৭	২০৮·৯
লক্ষ্ণৌ	২২৪	২২৪'৪	২২৩·৫	২২৬'৪	২১২'২	২১৪'৪	১৩৪'৩
নাগপুর	২৬১	২৮৩'৫	২৩৪'৬	২৬৪'২	২২৬'২	২৯৪'৬	২১৮'৮
দিল্লী	১৯৬	১৭০'০	১৮৭'৪	১৫৬'০	১৬৯'৯	১৭৩'৮	১৮৫'৯
করাচী	১৫১	১৬৭'০	১৪২'২	১৪৯'৬	১৩৫'৭	১৩৬'৮	১২৭'৮
আমেদাবাদ	২৮০	৩০৩'৪	২৮০'২	২৮৩'০	২৬৭'৪	৩১০'২	১৩৩'২

শিশুমৃত্যুর কয়েকটি কারণের কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। মাতাপিতার ভগ্নস্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ শিশুকে রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতাহীন করে তোলে। এবং তার জীবনীশক্তিও কমে যায়। মায়ের ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য শিশু মায়ের দুধ প্রায়ই পায় না; সেই সঙ্গে গরু ও ছাগলের দুধের দুষ্প্রাপ্যতা, দুর্মূল্যতা এবং ভেজালের সংমিশ্রণ শিশুদের অবস্থাকে আরও শোচনীয় করে তুলেছে। সেই সঙ্গে দারিদ্র্য ত আছেই। গরীব ঘরের স্ত্রীলোকদেরও পুরুষদের মতই পরিশ্রম করতে হয় টাকা রোজগারের জন্যে। তাই অনেক ক্ষেত্রে শিশুকে আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে গরীব মা চলে যায় গতর খাটানোর কাজে। বাল্যকাল থেকে যে শিশুর শরীরে এই ভাবে বিষ প্রবেশ করছে সে শিশু স্বাস্থ্যবান হবে কি করে?

গড় পরমায়ু

এই সব কারণে এদেশে গড় পরমায়ু অন্য দেশের তুলনায় অনেক কম। শুধু তাই নয়; পাশ্চাত্য দেশগুলিতে গড়পড়তা পরমায়ু আগের চেয়ে অনেকখানি বেড়েছে; আর আমাদের দেশে গড় পরমায়ু মোটের উপর অপরিবর্ত্তিতই রয়ে গেছে। একজন খ্যাতনামা অর্থশাস্ত্রীর হিসাব অনুসারে ইংলণ্ডে পুরুষদের গড় পরমায়ু ৫৫'৬২ বৎসর; এদেশে পুরুষদের গড় পরমায়ু ২৬'৯১ বা ইংলণ্ডের চেয়ে অর্দ্ধেকেরও কম। মেয়েদের গড় পরমায়ু ইংলণ্ডে ৫৯'৫৮ এবং ভারতে ২৬'৫৬। ১৮৯১ সালে যখন একজন ইংরেজের গড় পরমায়ু ছিল ৪৪'১৩, একজন ভারতবাসীর গড় পরমায়ু তখন ছিল ২৫'৫৪। ১৯২০-২২ সালে ইংরেজের গড় পরমায়ু দাঁড়াল ৫৫'৬২; আর ভারতবর্ষে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে ১৯২১ সালে গড় পরমায়ু দাঁড়াল ২৬'৯৬। তা হলে বেশ দেখা যাচ্ছে যে, গত ৩০ বৎসরে একজন ইংরেজ তার গড় পরমায়ু বাড়িয়ে ফেলেছে ১১½ বৎসর; সে স্থলে গত ৪০ বৎসরে ভারতবাসীর পরমায়ু বেড়েছে মাত্র এক বৎসর। এ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, মানুষের পরমায়ু বিধিলিপির উপর নির্ভর করে না; এ নির্ভর করে মানুষের নিজের উপর। আগেকার দিনে নাকি লোকে হাজার বছর বাঁচত আমাদেরই দেশে। সে সব কথা আমরা মনে করি গাল-গল্প। তাই যখন কারও ৬০ বা ৭০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয় তাকে আমরা অকালমৃত্যু বলে মনে করি না। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ৭০।৮০ বৎসর পর্য্যন্ত অনেকেই বাঁচে। সংযম ও স্বাস্থ্যরক্ষা এই দুটি বিষয়ের উপর যদি মানুষ লক্ষ্য রাখতে শেখে তা হলে গড় পরমায়ু বাড়বেই বাড়বে; আমাদের দেশে গড় পরমায়ু কম বলে জনসম্পদের এক বিরাট অপচয় চলেছে। যে বয়সে মানুষ বহুদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দেশ ও দশের কাজে আত্ম-নিয়োগ করতে পারে সেই সময়ই কালগ্রাসে সে পতিত হয়।

লোকসংখ্যার বৃদ্ধি

এত ক্ষয় ও অপচয়ের ভিতর দিয়েও এদেশের লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে। এই বাড়তি নীচের হিসাবে দেখান হয়েছে:

লোকগণনার বৎসর	জনসংখ্যা '০০০০০	পূর্ব্ববর্ত্তী লোকগণনার উপর শতকরা বৃদ্ধি
১৮৭২	২০৬১'৬	—
১৮৮১	২৫৩৮'৯	+২৩'২
১৮৯১	২৮৭৩'১	+১৩'২
১৯০১	২৯৪৩'৬	+ ২'৫
১৯১১	৩১৫১'৫	+ ৭'১
১৯২১	৩১৮৯'৪	+ ১'২
১৯৩১	৩৫২৮'০	+১০'৬
১৯৪১	৩৩৮১'০	+১৫'০

এ থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে যে, গত ৭০ বৎসরে লোকসংখ্যা দেড় গুণেরও বেশী বেড়েছে। কিন্তু অন্য দেশের সঙ্গে যদি তুলনা করা যায় তা হলে বেশ বোঝা যাবে যে, আমাদের দেশে লোকসংখ্যার বাড়তি তেমন গুরুতর কিছুই নয়। আমাদের সম্পদের পূর্ণতম ব্যবহার হতে পারে নি বলেই এই বাড়তিও গুরুতর রকমের মনে হয়েছে। আর জনসংখ্যা বিষয়ে আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, এদেশে জন্মের হার যেমন বেশী, মৃত্যুর হারও ঠিক তেমনি অধিক। প্রতি বৎসর ভারতে যত শিশুর জন্ম হয় তাদের মধ্যে বিপুল-

সংখ্যক শিশুর অকালমৃত্যু হয়। এ বিষয়ে অন্যান্য দেশের অবস্থা এত শোচনীয় নয়। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে যত শিশু বেঁচে থাকে তাদের সংখ্যা আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বেশী। উপরের হিসাবে আরও দেখা যাচ্ছে যে ১৯১১—২১ এই দশকে এদেশে লোকসংখ্যা সামান্যই বেড়েছে। ১৯১৮ সালের অনাবৃষ্টির পর ইনফ্লুয়েঞ্জা যে ব্যাপক ভাবে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে তাতে মৃত্যুর হার পূর্ব্বতন সাত বৎসরের লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির পরিমাণকে ছাড়িয়ে যায়। এই বৎসরের মৃত্যু-সংখ্যা প্রায় ১৪০ লক্ষ।

উপরে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি বিষয়ে যে বিচার করা হ'ল তা খুব বিজ্ঞানসম্মত নয়। কারণ এতে লোকসংখ্যার মোট বৃদ্ধির হিসাব পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কোন দেশের লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি ত নৈসর্গিক কারণেই হয় না; দেশের আয়তন-বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা কারণেও লোকসংখ্যা খানিকটা বাড়ে। এগুলি বাদ দিয়ে যা থাকে সেইটাই হ'ল লোকসংখ্যার সত্যিকারের বৃদ্ধি। উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করলে লোকসংখ্যার সত্যিকারের বৃদ্ধি দাঁড়াচ্ছে নিম্নলিখিত প্রকার:

বৎসর	দেশের আয়তনের বৃদ্ধিজনিত বাড়তি ('০০০০০)	লোকগণনা পদ্ধতির উৎকর্ষ-জনিত বাড়তি ('০০০০০)	সত্যিকারের বাড়তি ('০০০০০)	মোট ('০০০০০)	সত্যিকারের বাড়তির শতকরা হার
১৮৭২-৮১	৩৩০	১২০	৩০	৪৮০	১'৫
১৮৮১-৯১	৫৭	৩৫	২৪৩	৩৩৫	৯'৬
১৮৯১-১৯০১	২৭	২	৪১	৭০	১'৪
১৯০১-১৯১১	১৮	—	১৮৭	২০৫	৬'৪
১৯১১-১৯২১	১	—	৩৭	৩৮	১'২
১৯২১-১৯৩১	—	—	৩৪০	৩৪০	১০'৬
মোট—	৪৩'৩	১৫'৭	৮৭৮	১৪৬৮	৩০'৭

উপরের হিসাব থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ১৮৭০ থেকে ১৯১০ পর্য্যন্ত ৪০ বৎসরে এদেশে লোকসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ১৯-এরও কিছু কম। অথচ এই সময়ে ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৫৮'২, ডেনমার্কে ৫৩'২ এবং সমগ্র ইউরোপে ৪৭। ইউরোপে লোকসংখ্যা যখন এই হারে বাড়ছে তখনও একদল পণ্ডিত বলছেন যে, ইউরোপের জাতি-গুলো ক্ষয়ের দিকে চলেছে অর্থাৎ আগে ইউরোপে যে হারে লোক বাড়ছিল সে হারে আর সেখানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। সে অনুপাতে আমরা অধিকতর ক্ষয়ের দিকে চলেছি। আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এখনও অনেকখানি পিছিয়ে আছে বলে এই ক্ষয় সাদা চোখে ধরা পড়ছে না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমাদেরও বাড়তির হার কমে আসছে। এদেশে যে সব প্রদেশে লোকসংখ্যা বেশী সে সব প্রদেশে এই ক্ষয় খুবই প্রকট। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশে এই ক্ষয় খুবই সুস্পষ্ট। এ বিষয়ে জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি আমাদের নিম্নলিখিত হিসাব দিয়েছেন:

কয়েকটি প্রদেশে জন্মহারে হ্রাস

বৎসর	যুক্তপ্রদেশ	বিহার ও উড়িষ্যা	বাংলাদেশ
১৯০১-১০	৪১'৪	৪১'০	৩৫'৫
১৯১১-২০	৪২'৩	৩৯'০	৩২'৫
১৯২১-৩০	৩৫'১	৩৬'৫	২৮'৫
১৯২৯-৩৫	৩৫	৩৩	২৯'৬

এখন কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশে জন্মহার কমে চলেছে কেন? এই কেন'র কারণ অনেক। কিন্তু এর প্রধান কারণই হচ্ছে অপর্য্যাপ্ত ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্যবস্তু। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, খাদ্যের সঙ্গে প্রজনন-শক্তির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। খাদ্যপরিস্থিতি যদি কোন কারণে খারাপ হয়ে পড়ে তা হলে লোকের প্রজননশক্তি আপনা থেকেই কমে যাবে। যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের সময় এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু যে খাদ্যবস্তুর পরিমাণের অভাবেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা নয়, খাদ্যে যদি সার ভাগ কম থাকে অথবা পাক-প্রণালীর জন্য যদি খাদ্যের সার ভাগ নষ্ট হয়ে যায় তা হলেও একই অবস্থা ঘটে। এই প্রসঙ্গে একথা বলা বাহুল্য যে, আমাদের দেশে একদিকে যেমন যথেষ্ট খাবার ঠিকমত অনেকেরই জোটে না, অন্যদিকে তেমনি আবার সারহীন খাদ্য ও অবৈজ্ঞানিক রন্ধন-প্রণালীর জন্য খাদ্য-বস্তু কুখাদ্য হয়ে ওঠে। অপর্য্যাপ্ত আহারে শুধু যে প্রজননশক্তিই হ্রাস পায় তা নয়, সেই সঙ্গে শিশুমৃত্যুও বাড়ে। এদেশে এমনিতেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব; তার ওপরে যেটুকুও বা জোটে তাও মেয়েরা নিজেদের বঞ্চিত করে পুরুষদেরই পরিবেশন করে। এই ভাবে মেয়েদের জীবনী-শক্তি নিজেদের অবহেলায় এবং পুরুষদের ঔদাসীন্যে ক্রমশঃ ক্ষয়েরই পথে চলেছে। আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যার অনুপাত। এই অনুপাতে যদি পরিবর্ত্তন হয়, অর্থাৎ মেয়েদের সংখ্যা যদি কমে যায় তা হলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির দিক থেকে তার প্রভাবও শুভ হবে না। এ দিক থেকে বিচার করলেও

দেখা যায় যে, আমাদের দেশে জনসংখ্যা চলেছে ক্ষয়ের দিকে। কেবলমাত্র বিহার ও উড়িষ্যা ছাড়া অন্য সব প্রদেশেই পুরুষদের অনুপাতে মেয়েদের সংখ্যা কমে চলেছে। বিহার উড়িষ্যার এই হার যে কমে নি তার কারণ হ'ল এই যে, এই দুই প্রদেশে বহু পাহাড়িয়া জাতির বাস এবং এদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। বোম্বাইয়ে স্ত্রীলোকের অনুপাত মোটামুটি ঠিকই আছে। এ ছাড়া অন্য সমস্ত প্রদেশেই যে স্ত্রীলোকদের অনুপাতিক সংখ্যা কমতির পথে চলেছে তা নীচের সংখ্যাগুলি দেখলেই বোঝা যায় :

প্রতি হাজার পুরুষ-শিশুতে স্ত্রী-শিশুর জন্মসংখ্যা

প্রদেশ	১৮৯১-১৯০১	১৯০১-১১	১৯১১-২১	১৯২৪-২৮	১৯২৯-৩৩
বাংলা	৯৩৬	৯৪১	৯৩৩	৯২৬	৯২৬
বিহার ও উড়িষ্যা	৯৪২	৯৫৫	৯৫০	৯৬০	৯৬০
বোম্বাই	৯২৬	৯২৬	৯২৫	৯২৬	৯২৬
মধ্য প্রদেশ	৯৪১	৯৫৪	৯৫৫	৯৫০	৯৫০
মাদ্রাজ	৯৫৯	৯১৮	৯৫৬	৯৬০	৯১০
সীমান্ত প্রদেশ	৮১৬	৮১৯	৮০৫	৭৭০	৭৭০
পঞ্জাব	৯০৬	৯০৯	৯০৬	৮৯০	৮৯০
যুক্ত প্রদেশ	৯১৮	৯২৪	৯১৯	৮৯০	৮৯০

স্ত্রী ও পুরুষদের সংখ্যার অনুপাতের তারতম্য যে সব বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাদের মধ্যে তিনটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। সেগুলো হ'ল বংশগত পরিবেশ ও খাদ্য-ব্যবস্থা। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে সব জায়গায় আর্য্য ও সেমিটিক বংশীয় লোকের বাস সে সব জায়গায় পুরুষদের অনুপাতে স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা কম; অপর পক্ষে, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী। কিন্তু বংশই এই অনুপাতের একমাত্র নির্দ্ধারক নয়। উত্তর-ভারতের প্রায় সব যায়গাতেই একই রক্তের লোক দেখা যায়; কিন্তু এ সত্ত্বেও উত্তর-ভারতের এক এক প্রান্তে, এই অনুপাত এক এক রকম। পূর্ব্ব প্রান্ত থেকে আমরা যতই পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অগ্রসর হব, ততই আবহাওয়া শুষ্ক হয়ে আসবে এবং দেখা যাবে যে, পশ্চিমের প্রদেশগুলিতে স্ত্রীলোক-দের সংখ্যা কম। যে সব জায়গায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, যে সব জায়গায় প্রকৃতি অকুরন্ত সম্পদ নিয়ে মানুষের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে সাহায্য করে না, সে সব যায়গাতেও স্ত্রীলোকদের সংখ্যা কম। এই অবস্থা আমরা দেখতে পাই রাজপুতানা, সিন্ধু, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে। অন্যান্য প্রদেশে জীবিকা অর্জ্জন অনেকটা সহজসাধ্য হলেও লোকসংখ্যার বৃদ্ধিতে এবং অর্থনৈতিক অব্যবস্থায় লোকেদের জীবনযাত্রা বেশ অসচ্ছল হয়ে উঠছে এবং সম্ভবত এই কারণে স্ত্রীলোকদের অনুপাত কমে যাচ্ছে।

পেশানুক্রমিক জনসংখ্যা

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লোক-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির সমস্যার কথা আলোচনা করা হ'ল। এবারে দেখতে হবে যে আমা-দের জনসমষ্টির কতজন কি ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের কাজে নিযুক্ত। কারণ এর থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে লোকসমস্যার কথা এবং এতেই সূচিত হবে সমাধানের পথ। এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা করেছি তা থেকে এই কথাই স্পষ্টীকৃত হচ্ছে যে, এদেশে লোক-সমস্যার চাপ যেমন কম অন্য দিকে তেমনি আবার আমরা চলেছি দ্রুত ক্ষয়ের পথে। তবুও লোকসংখ্যার আতঙ্ক ত কমছে না। বরং নানা দিক থেকে মনে হচ্ছে ঠিক বিপরীত। এর কারণ হচ্ছে এই যে, যেটুকু লোকসংখ্যা বাড়ছে উপযুক্ত আর্থিক সংস্থানের অভাবে তাও আমাদের পক্ষে বোঝা হয়ে উঠছে। তা ছাড়া আমাদের বর্ত্তমান খাদ্য-পরিস্থিতি যা তাতে আমরা স্থায়ী দুর্ভিক্ষ ও অনশনের করালছায়া এখন থেকেই সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সে যাই হোক প্রথমেই আমাদের বিচার করে দেখতে হবে যে,এ দেশে কি পরিমাণ লোক কোন্ কোন্ কাজ থেকে জীবিকা অর্জ্জন করে। এ বিষয়টি নীচের তালিকা থেকে বেশ বোঝা যায় :

প্রতি দশ হাজার লোকে জনসংখ্যার পেশানুক্রমিক অনুপাত

পেশা	মুখ্য কাজে রোজগারীদের অনুপাত	গৌণ কাজে রোজগারীদের অনুপাত
নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা—	৫৬০৯	
বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত	৪৩৯১	৪২৫
(ক) কাঁচা মালের উৎপাদনে নিযুক্ত	২৯৫৭	২১৫
১। প্রাণী ও উদ্ভিদ বিষয়ক	২৯৪৭	২১৩
গোচারণ ও কৃষি	২৯২৩	২০৮
কর্ষণ	২৭৬৬	১৮৫
বিশেষ ফসল উৎপাদন	৪৭	৭
অরণ্য	৯	৩
গো-মেষ পালন	১০০	১২
ক্ষুদ্র প্রাণী বা পোকামাকড় পালন	১	১
মাছ ধরা ও শিকার	২৪	৫
২। খনিজ পদার্থ আহরণে নিযুক্ত	১০	২
(খ) শিল্পোপকরণ সংগ্রহে নিযুক্ত	৭৩১	১১৫
৩। শিল্প	৪৩৮	৬২
বস্ত্রবয়ন	১১৭	১২
চর্ম্ম সংগ্রহ	৯	১
কাঠ	৪৭	১০
ধাতু	২০	১৪
মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ	২৯	৫
রাসায়নিক সামগ্রী	১৭	৪

প্রস্তুত খাদ্য	৪২	৫
পোশাক ও প্রসাধন	৯৬	১৫
গৃহনির্ম্মাণ	১৮	২
পথ ঘাট নির্ম্মাণ	১	—
দৈহিক শক্তি উৎপাদন ও বিকিরণ	১	—
বিবিধ	৪০	৪
৪। যানবাহন—	৬৭	১২
বিমান—	—	—
জলযান—	১০	১
স্থলযান (রেলপথ ছাড়া)—	৩৬	১০
রেলপথ—	১৮	১
ডাক, তার ও ফোন—	৩	—
৫। ব্যবসায় বাণিজ্য—	২৬	৪১
ব্যাঙ্ক, অন্যান্য টাকাকর্জ্জদাতা প্রতিষ্ঠান, মুদ্রাবিনিময় প্রতিষ্ঠান ও বীমা কারবারী—	৯	
দালালী, দস্তরী ও রপ্তানী—	২	
বস্ত্র-ব্যবসায়—	১৩	২
চামড়া ও লোমের ব্যবসায়—	৩	১
খাদ্যবস্তুর ব্যবসায়—	১১০	২০
(গ) সরকারী চাকুরী ও অন্য পেশা—	১১৮	১৯
৬। দেশরক্ষা—	২৪	
৭। সরকারী চাকুরী—	২৮	
৮। ওকালতি, ডাক্তারী প্রভৃতি পেশা	৬৬	১২
৯। আয়ের উপর নির্ভরশীল লোক—	৬	২
১০। গৃহস্থালির কাজ—	৩১১	৫১
১১। ছোটখাটো কাজ—	২২২	২০
১২। কতিকর কাজ—	৪৬	৩

উপরের সংখ্যাগুলি ১৯৩১ সালের। ১৯৪১ সালের লোকগণনায় লোকসংখ্যার পেশানুক্রমিক হিসাব ধরা হয় নি। ধরা না হলেও বিভিন্ন জেলায় জনসংখ্যার বিতরণ বিষয়ে মৌলিক কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। উপরের হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, এদেশে শতকরা ৫৬ জন লোক কোন কাজ করে না। এরা নির্ভর করে অন্যের আয়ের উপর। আমাদের দেশে যারা খেটে খেতে পারে তাদের সংখ্যা শতকরা ৪৪ জন মাত্র। আমরা যে ক্ষয়ের পথে চলেছি এও তার একটা বড় প্রমাণ। এদেশে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, ২০ বৎসরের কমবয়স্ক লোকের সংখ্যাই খুব বেশী। আর যারা পঞ্চাশের কোঠায় পা দিয়েছে তারা প্রায়ই কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে। এই ভাবে ½ অংশ লোক বাদ পড়ে যায় খেটে খাবার লোকেদের তালিকা থেকে। তা ছাড়া এদেশে গড় পরমায়ু কম বলে উপার্জ্জনক্ষম এবং সন্তান উৎপাদনক্ষম লোকের সংখ্যা কম। এই বিষয়টি নীচের সংখ্যা থেকে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে:

প্রতি দশ হাজারে

বৎসর	১৯২১		১৯৩১	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
০-১০	২৬৭৩	২৮১০	২৮০২	২৮৮৯
১০-২০	২০৮৭	১৮৯৬	২০৮৬	২০৬২
২০-৩০	১৬৪০	১৭৬৬	১৭৬৮	১৮৫৬
৩০-৪০	১৪৬১	১৩৯৮	১৪৩১	১৩৫১
৪০-৫০	১০১৩	৯৬৭	৯৬৮	৮৯১
৫০-৬০	৬১৯	৬০৬	৫৬১	৫৪৫
৬০-৭০	৩৪৭	৩৭৭	২৫৯	২৮১
৭০ ও তদূর্দ্ধ	১৬০	১৮০	১১৫	১২৫
গড় আয়ু	২৪ ৮	২৪.৭	২৩.২	২২.৪

যে ৪৪ জন লোক এদেশে খেটে খায় তাদের মধ্যে শতকরা ৬৭ জন কাজ করে—কৃষি, গোপালন ও কাঁচামাল উৎপাদনে। শিল্পে আছে শতকরা ১০ জনেরও কম লোক; যানবাহন ব্যবস্থায় ১½ জন; ব্যবসায়ে ৫ জন; সরকারী চাকুরীতে ২½ জন; গৃহকর্ম্মে ৭ জন; বিভিন্ন কাজে ৫ জন; এবং ক্ষতিকর কাজে ১ জন। যদিও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কৃষির উপযোগিতার মাত্রা সমান নয়, তা হলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ভারতের যে কোন প্রান্তেই, প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক, কৃষিই হ'ল প্রধানতম পেশা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় যথেষ্ট শিল্পসম্পদ গড়ে উঠেছে; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা এই তিনটি প্রদেশে খুব কম। শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের সবচেয়ে বেশী সংখ্যা পাওয়া যাবে বোম্বাই, পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে, কিন্তু বোম্বাইয়ে শিল্প কয়েকটি স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকায় অন্য প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলগুলি আজও কৃষিপ্রধান। পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের শ্রমিকদের অধিকাংশই কুটির-শিল্পের কাজ করে এবং এই সব কুটির-শিল্প অনেক ক্ষেত্রেই কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত, অর্থাৎ এই সব শ্রমিক শিল্পী হলেও মূলতঃ কৃষক। কেবলমাত্র কৃষির মত এত বড় একটা অনিশ্চয়তাপূর্ণ পেশার উপর নির্ভর করে থাকতে পৃথিবীর অন্য কোন দেশকেই দেখা যায় না। পাশ্চাত্যের যে সব দেশ কৃষি-প্রধান সে সব দেশে লোকসংখ্যার চাপ আমাদের দেশের চেয়ে অনেক কম। শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে লোকসংখ্যার চাপ বেশী বটে, কিন্তু সে সকল দেশে কৃষির উপর নির্ভর করে যৎসামান্য লোক। নীচের সংখ্যা থেকে বিষয়টি বুঝা যাবে:

দেশ ও লোকগণনার বৎসর	কৃষি ও প্রাণী পালন	খনি ও শিল্প	ব্যবসা বাণিজ্য ও যানবাহন
জার্মানী (১৯০৭)	২৮.৬	৪২ ২	১৩.৪
অষ্ট্রিয়া (১৯১০)	৪৮.৪	২৬.৫	১২.৪
ইটালী (১৯১১)	৩৪.২	১৬.৯	৫.০
স্পেন (১৯১০)	২১.১	৫.২	১.৫
ফ্রান্স (১৯১১)	৪০.৭	৩৫.৮	৯.৮
নেদারল্যাণ্ড (১৯০৯)	১০.৯	১৩.৫	৭.৫
ডেনমার্ক (১৯১১)	৩৬.৪	২৭.৩	১৬.৬
সুইজারল্যাণ্ড (১৯১০)	২৭.৭	৪২.৭	১৬.৪
গ্রেট বৃটেন ও আয়ারল্যাণ্ড (শুধু শ্রমিক) (১৯১১)	১১.৬	৫৬.৮	১৩.১
যুক্তরাষ্ট্র (১০ বৎসরের বেশী বয়স্ক শ্রমিক) (১৯২০)	২৬.৩	৩৩.৪	১৭.৯
ভারতবর্ষ (১৯৩১)	৬৬.৪	৯.৯৫	৭.০

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের ন্যায় পৃথিবীর কোন দেশের অধিবাসীরাই শুধু কৃষির মুখাপেক্ষী নয়। তা ছাড়া তাদের দেশে কৃষি আমাদের দেশের মত অনিশ্চিত নয়। কারণ বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ কৃষিকে অনেকখানি প্রকৃতির দাসত্বমুক্ত করতে পেরেছে। আর আমরা দু'শ বছর আগে যেখানে ছিলাম আজও প্রায় তারই কাছাকাছি স্তরেই রয়ে গেছি। একথা ঠিক যে, শিল্প-বিপ্লবের আগে পাশ্চাত্য দেশ-গুলিতেও কৃষিই ছিল প্রধান পেশা এবং সে কৃষিও ছিল সেকেলে ধরণের। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, তৎকালীন পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে লোকসংখ্যার চাপও ছিল কম। শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে লোকসংখ্যা বেড়েছে অতি দ্রুত গতিতে; কিন্তু সেই সঙ্গে ঘড়ির কাঁটাও ঘুরে গেছে। কৃষি আজ সে সব দেশে গৌণ পেশা হয়ে পড়েছে। এই যে বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটেছে পাশ্চাত্য দেশগুলির পেশানুক্রমিক জনসংখ্যায় তা সূচিত হচ্ছে কলিনক্লার্ক সংগৃহীত নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলিতে :

দেশ	প্রাথমিক শিল্প— কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি	মাধ্যমিক শিল্প— খনি, শিল্প ও গৃহনির্ম্মাণ	অন্তিম শিল্প— ব্যবসায়, বাণিজ্য যানবাহন ইত্যাদি
যুক্তরাষ্ট্র	১৯.৩	৩১.১	৪৯.৬
কানাডা	৩৪.৫	২৩.২	৪২.৩
গ্রেটবৃটেন	.৬.৪	৪৩.৯	৪৯.৭
জার্ম্মানী	২৪.৩	৩৮.৫	৩৭.২
জাপান	৫০.৩	১৯.৫	৩০.২
রুশিয়া	৭৪.১	১৫.৪	১০.৫
ভারতবর্ষ	৬২.৪	১৪ ৪	২৩.২

এই পরিবর্ত্তন ঘটেছে অতি দ্রুত গতিতে। আমাদের দেশে লোকসংখ্যা বেড়েছে বটে, কিন্তু পেশানুক্রমিক কোন পরিবর্ত্তন হয় নি বলে লোকসংখ্যার সামান্য বৃদ্ধিও বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করছে—যেন এদেশে ম্যালথাসের ভবিষ্যদ্বাণীই বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। তাই জীবনযাত্রার মান এদেশে অসম্ভবরকম নেমে গেছে।

কৃষি-উন্নয়ন প্রচেষ্টায় কাজিরাখল গান্ধী-ক্যাম্প

শ্রীরঞ্জনকুমার দত্ত

নোয়াখালির গান্ধী-ক্যাম্পের কর্ম্মীদের উদ্যোগে বিভিন্ন ক্যাম্প-সংলগ্ন জমিতে কৃষি-উন্নয়নের পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা কিছু কিছু চলছে। এই প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে স্বাবলম্বনের ইচ্ছা ও নিজেদের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গ্রামবাসীদের ভেতরেও স্বাবলম্বনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা। অবস্থা বিবেচনায় এই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়েছে।

গান্ধী-ক্যাম্পের কর্ম্মীরা ১৯৪৬-এর নবেম্বর মাস থেকেই নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় কাজ করে আসছেন। দাঙ্গার অব্যবহিত পরেই গান্ধীজী নোয়াখালির মাটিতে পদার্পণ করেন। সে হ'ল ১৯৪৬-এর ৭ই নবেম্বর তারিখে। দাঙ্গার যে বীভৎস পরিণতি তিনি এখানে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়, তবে যে পরিস্থিতির দরুন এ অঞ্চলে জনকল্যাণ-কর্ম্মের সূত্রপাত হয়েছিল গোড়ায় সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

দাঙ্গাকারী সম্প্রদায়ের পৈশাচিক নির্ম্মমতা ও অত্যা-চরিতদের শোচনীয় দুরবস্থার প্রতিকারের আশায় গান্ধীজী নোয়াখালিতেই অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বসবাসের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভীতচকিত, নৈরাশ্যগ্রস্ত হিন্দুদের মনে আত্মবিশ্বাস ও সাহস ফিরিয়ে আনবার জন্য এবং সাম্প্র-দায়িক মৈত্রী ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত পূর্ব্ববঙ্গে থাকার ইচ্ছা পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করেন।

৬ই ডিসেম্বর (১৯৪৬) গান্ধীজী শ্রীরামপুরে প্রসঙ্গক্রমে বলেন, "আমি জ্বলন্ত আগুনের ভিতর রহিয়াছি, এই আগুন যতদিন না নির্ব্বাপিত হয় ততদিন আমি এই স্থান ত্যাগ করিব না।"

তিনি একথাও বলেছিলেন, "শূন্য হস্তে আমি বাংলাদেশ ত্যাগ করিব না।" গান্ধীজী ২০শে নবেম্বর হইতে ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত শ্রীরামপুরে অবস্থান করেন। এই সময় গোড়ার দিকে তাঁর মনে কতকটা হতাশার ভাব দেখা দেয়। তিনি (২০শে ডিসেম্বর শ্রীরামপুর) বলেন, "আজ আমার সম্মুখে যে সমস্যা রহিয়াছে, জীবনে আমি কখনও এরূপ সমস্যার সম্মুখীন হই নাই। অন্য কোনো সমস্যাই আমার কাছে এত দুরূহ বোধ হয় নাই। আমার অহিংসার আজ যাচাই হইতেছে।...

কিন্তু সাময়িকভাবে হতাশ হলেও মহাত্মাজী মুহূর্ত্তের জন্যও হাল ছেড়ে দেন নি। দিনকয়েক পরেই তিনি যে আশার আলোকের সন্ধান পেয়েছেন সে কথার উল্লেখ করেন এবং জনৈক বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "কাম্যবস্তু যত দিন না লাভ লাভ হয় ততদিন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি বলিতে পারিব না। এ কথা সত্য যে প্রভাতের আলোর পূর্ব্বভাগেই রাত্রির অন্ধকার।" (২৮।১২।৪৬ শ্রীরামপুর)

২রা জানুয়ারী সকালে (১৯৪৭) গান্ধীজী শ্রীরামপুর ছেড়ে চণ্ডীপুর রওনা হন। তিনি যে একটা পথের সন্ধানলাভ করেছেন তা তাঁর পূর্ব্বদিনের সান্ধ্য প্রার্থনার ভাষণ থেকে বেশ বুঝতে পারা যায়। ঐ ভাষণে তিনি বলেন :

"আগামী কাল সকালবেলা আমি শ্রীরামপুর ছাড়িয়া যাইতেছি, কর্ত্তব্যের আহ্বানেই আমাকে অন্যত্র যাইতে হইতেছে। এখন আমি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইব, ঘরে ঘরে মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের কাছে প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যের বাণী বহন করিব। আমার অন্তরের প্রার্থনা এই যে যখন যে স্থান ছাড়িয়া যাইব, তখন সেই স্থানের লোকেরা যেন এই কথা বলে যে আজ যে চলিয়া গেল সে আমাদের বন্ধু, শত্রু নহে।"

ক্রমে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে একক ভাবে ভ্রমণকালে তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাবের কিছু কিছু প্রত্যক্ষ পরিচয় পান এবং নিজের অন্তরে সেজন্য গভীর তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করতে থাকেন।

৮।২।৪৭ তারিখে নন্দীগ্রামে জনৈক বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "নোয়াখালিতে তিন মাস আছি। উহা বৃথা যায় নাই—একথা মনে করিতে আমার ভাল লাগে। পরে কি হইবে জানি না, এখন তো দেখিতেছি, হিন্দুরা ভয় অনেকটা পরিহার করিয়াছেন।" (শান্তিমিশন দিনলিপি)

বস্তুত এখানকার পরস্পরের প্রতিবেশী জনসাধারণের মধ্যে তখন সদ্ভাব ও প্রীতির নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিল। ঠিক ঐ সময় গান্ধীজীর সঙ্গী ও সহকর্ম্মীরা দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চলে রচনাত্মক কর্ম্মপদ্ধতির একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনার আবশ্যকতা অনুভব করেন—আলোচনা হয়েও ছিল। এ সম্পর্কে তখন কর্ম্মীদের নিকট গান্ধীজী যে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন তা সংক্ষেপে এইরূপ :

"গান্ধী ক্যাম্পের কর্ম্মীরা গ্রামে বুদ্ধি যোগাইবে, শিল্পজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক বিচার যাহা তাহাদের আছে, তাহা গ্রামবাসীকে দিবে ও গ্রামের লোকের জড়ত্ব দূর করিয়া তাহাদের ভিতর ব্যক্তিগত ও সামূহিক শ্রম করার ইচ্ছা জাগাইয়া গ্রামের শুভ নিষ্পন্ন করিবে।

"এই পরিকল্পনায় বাইরের অর্থের প্রয়োজন নাই। চাই গ্রামের লোকের নিজশক্তি উদ্বুদ্ধ করা। যতই প্রচুর হউক না কেন, অর্থ বা দ্রব্য দান করিয়া একাজ কদাচ করা যাইবে না।

"আরম্ভের সময় ক্ষেত্র বুঝিয়া কিছু দ্রব্যমূল্য ঋণ-স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পরে গ্রামের লোককেই উহা পরিশোধ করিতে হইবে। ইহাই গ্রামসেবা সম্পর্কে অপরিবর্ত্তনীয় নীতি।" (শান্তিমিশন দিনলিপি—১৫ ২ ৪৭)

বিহার যাবার প্রাক্কালে হাইমচরে এক কর্ম্মীসভায় গান্ধীজী দাঙ্গাপীড়িত গ্রামগুলিকে স্বাবলম্বী করে তোলার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "গ্রামোদ্যোগ দ্বারা গ্রাম স্বাবলম্বী করা মানে গ্রামেই যথাসম্ভব গ্রামের প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপন্ন করা। সাধন গ্রামের, শ্রমও গ্রামের জন্য প্রয়োগ করা। যদি এমন করিতে পার তবে তাহা আলোক-শিখার মত হইবে এবং আমিও ধন্য হইব।"

"পথ আমাদিগকেই দেখাইতে হইবে।"

বস্তুত গান্ধীজীর এই নির্দ্দেশ ও উপদেশ অনুসারেই শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় নোয়াখালী এবং ত্রিপুরাতে প্রতিষ্ঠিত গান্ধী ক্যাম্পগুলি পরিচালনা করার চেষ্টা করে আসছেন এবং গ্রামবাসীদের স্বাবলম্বনের পথপ্রদর্শনের জন্যেই নিজের পরিচালিত ক্যাম্পগুলিতে কৃষি ও চরকা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারিক শিক্ষাদানের আয়োজন করেছেন। গোড়ার দিকে চরকা ও চরকার বিবিধ সরঞ্জাম প্রস্তুত ও ব্যবহার সম্বন্ধে গ্রামবাসীকে শিক্ষাদানের জোর চেষ্টা করা হয়। এতাবৎ নোয়াখালি ও ত্রিপুরার ২০।২৪টি গান্ধী-ক্যাম্পের কর্ম্মকেন্দ্র হইতেই এই শিক্ষাদানকার্য্য পরিচালিত হয়ে এসেছে। নোয়াখালির রামগঞ্জ, রায়পুর, বেগমগঞ্জ থানার বিভিন্ন গ্রামে ও ত্রিপুরার চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত কতকগুলি গ্রামে কয়েক সহস্র চরকার প্রচলন হয়েছিল। তখন গ্রামবাসীর মধ্যে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। গত বৎসরের দুর্ভিক্ষে তারা সুতা কেটেই বহু টাকা উপার্জ্জন করেছে। আজ আর সে চরকা সকল গ্রামে তেমন উদ্যমে চলে না। মজুরী পায় না বলে, সুতার ক্রেতা নাই বলে প্রায় বন্ধ হবার মত। তাঁতী কিন্তু আছে। এক দুই জন নয়, সহস্র সহস্র। এই তিনটি জেলার

তাঁতিদের সংখ্যা প্রচুর। এত তাঁতি বাংলাদেশের আর কোনো জেলায়ই নেই। কিন্তু খাদি কেউ বুনে না।

কাটুনীর অভিযোগ, সে সুতা কেটে বুনাতে পারে না, সুতা বেচতেও পারে না। তবে সুতা কাটার সার্থকতা কি? তাঁতির অভিযোগ, চরকার সুতা বুনতে কষ্ট, কমজোর ইত্যাদি। তার তৈরী খাদির কাপড় কেউ কিনতে চায় না। মিলের কাপড়ের দিকেই লোকের নজর। তবে খাদি বোনায় তার লাভ কি?

তবে গান্ধীক্যাম্পের কর্ম্মীরা চেষ্টার ক্রটি করেন নি। গ্রামের তাঁতীদের খাদিবয়নের কলা-কৌশল শেখানোর জন্যে এবং দো'বটা সুতা উৎপাদনের জন্য নূতন ধরণের দো'বটা চরকা সরবরাহের জন্যে অনেক অর্থব্যয় ও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা তাঁরা করেছেন। কিন্তু জনসাধারণ এতে আকৃষ্ট হয় নি। এর দ্বারা অল্প আয়াসে অধিক রোজগারের সুবিধা নেই। চরকা বা খাদি, সে তো মিতাচারের সাধন। এ সাধন কারো কাম্য বলে পরিচয় পাচ্ছি না। চরকার মধ্যে ফাঁকি নেই, তাই বস্ত্রশিল্পের এই হাতিয়ারটি পরিত্যক্ত, এখনকার তথাকথিত সভ্য সমাজে ওর আদর নেই।

গান্ধীক্যাম্পের কর্ম্মীরা কেবল বাক্‌সর্ব্বস্ব নন। তাঁরা লোককে যা বলেন, নিজেরা তা করেন। তাঁরা নিজেদের জীবনে গান্ধীজীর আদর্শকে, সুতাকাটা ও প্রার্থনাকে ওতপ্রোত করে নিয়েছেন। অপরকেও তাঁরা সেই পথে আহ্বান করেন।

এখন এ জেলার কৃষি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই। এ জেলায়, বিশেষ করে সদর মহকুমা অঞ্চলে প্রচুর সুপারি ও নারিকেল উৎপন্ন হয় এবং বিদেশে রপ্তানি হয়। কিন্তু যত্নের অভাবে ও অজ্ঞতার দরুন এই দুটি জিনিষের বিপুল লাভ থেকে দেশবাসী বঞ্চিত হচ্ছে। শ্রমবিমুখতা ও আলস্যপরায়ণতাই যে একন্ত দায়ী তাতে সংশয় নেই।

একটি গাছে পূর্ব্বে যা সুপারি—ফলত আজ তা অনেক কমে গেছে, নারিকেলের অবস্থাও তাই। কেন?—এ প্রশ্নের উত্তর—মাটির উৎপাদিকা শক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে বলে। কোন্ সারে কোন্ উপাদানে গাছের সেই শক্তি পুনরুজ্জীবিত হতে পারে, গাছের ফলদান-ক্ষমতা বহুগুণ বাড়তে পারে—এসব লোকে ভুলে গেছে। গান্ধীক্যাম্প পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে এ বিষয়ে গ্রামবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। নারিকেলের উন্নতি, প্রসার ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলেন:

"নোয়াখালির দক্ষিণ ভাগে নারিকেল ও সুপারির অজস্র সম্পদ রহিয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে যতটা লাভবান হওয়া চাই নোয়াখালি তাহা হইতে পারে নাই। এতাবৎ নারিকেল কেবল রপ্তানী হইয়াই চলিয়া যাইতেছে। নারিকেল হইতেই নোয়াখালিকে কতকটা অধিকতর সম্পৎশালী করা যায়, যদি আস্ত নারিকেল রপ্তানি না করিয়া উহার তৈল, শাঁস, খোল ও ছোবড়ার শিল্প গড়িয়া তোলা যায়।

"নারিকেল হইতে এখানে যেভাবে তৈল প্রস্তুত হয় তাহা হইতেছে নারিকেল কোরাইয়া উহা গরম জলে চটকাইয়া দুধ করা। দুধটা ছাঁকিয়া লইলে যাহা থাকে তাহাকে 'ছোবা' বলে। দুই বার গরম জলে ঐ 'ছোবা' ধুইয়া লইলে তৈলটা দুধ আকারে জলের সহিত বাহির হইয়া যায়। জল জ্বাল দিয়া শুকাইয়া ফেলিলে তৈলটা থাকে, আর দুধের সহিত যে মিশান 'ছোবা' আসিয়াছিল উহা গাদ হইয়া পড়িয়া থাকে। গাদকে মচকা বলে। মচকা সুস্বাদু। উহা লোকে খায়। তিন বার ধোয়া 'ছোবা' অখাদ্য বলিয়া ফেলিয়া দেয় বা গরুকে দেয়। এই রীতির পরিবর্ত্তন করিয়া ছোবা ও মচকা একত্র মিলাইয়া আগুনের তাপে অল্প ভাজিলে উত্তম সুস্বাদু খাদ্য হয়। একটু লবণ মিশাইতে হয়। ১০টা নারিকেলের ছোবায় এক ছটাক লবণ দিয়া ভাজিয়া লইয়া উহা সংরক্ষিত করার জন্য চাপিয়া ঠোঙ্গায় ভর্ত্তি করিয়া প্যারাফিনে ডুবাইয়া হাওয়া-প্রবেশ-পথ বন্ধ করিয়া দীর্ঘ দিন রাখা যাইতে পারে বলিয়া সম্ভব। উহা খুব শ্রেষ্ঠ প্রোটিন খাদ্য। অতিরিক্ত তৈলটা বাদ যায় বলিয়া নারিকেলের চাইতেও খাদ্য হিসাবে মূল্যবান।

"কাজিরখিল ক্যাম্পে উহার জন্য আবশ্যক সরঞ্জাম পরীক্ষা-মূলকভাবে তৈরী হইয়াছে। নারিকেলের ছোবড়া হইতে রশি হয়। রশি হইতে মেঝের পাতার মাদুর হয়। রশি ও ছোবড়া হইতে পাপোষ হয়। এই সমস্তই গবর্ণমেণ্ট শিল্প-বিভাগ হইতে গ্রামে প্রস্তুত করিয়া দেখান হয়। রামগঞ্জ থানায় বিঘা গ্রামে গবর্ণমেণ্টের একটি প্রদর্শনী কেন্দ্র আছে। কিন্তু এ'দিকে লোকের দৃষ্টি নাই। ছোবড়া সম্পর্কে একটা কথা এই যে উহা দেড় মাস হইতে দুয় মাস জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। অন্য জিনিস পচিয়া গিয়া কেবল আঁশ থাকে। তখন পরিষ্কার ছোবড়া তৈরী করা সহজ হয়।

"নারিকেলের মালা হইতে পেয়ালা মায় হাতল খুরা হয়। কাজিরখিলে নমুনা-স্বরূপ তৈরী হইয়াছে। ইহা হইতে বড় ব্যবসা গড়িয়া উঠিতে পারে। নারিকেলের মালা হইতে বোতামও হয়।

"নারিকেলের খোল কালো করার একটা কৌশল ত্রিপুরার কয়েকটি পরিবারই মাত্রি জানে। অপর কেহ জানে না, তাহারা কাহাকেও শিখায় না এবং বংশানুক্রমে তাহারা এই বিদ্যা গোপন রাখিয়াছে বলিয়া রটনা। কাজিরখিল ক্যাম্পে নিজস্ব উপায়ে নারিকেল খোল কালো করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার উপর আরও পরীক্ষা চলিতেছে। এই কৌশল আর যাহাতে গুপ্ত না থাকে কাজিরখিল হইতে সেই চেষ্টাই চলিতেছে। নারিকেল খোল হইতে কালো

হুঁকা মাত্রি এক ত্রিপুরাতেই হয় ও বেশী দামে বিক্রয় হয়। কালো না করা হুঁকার দাম কম।

"খোল হইতে পেয়ালা তৈরী করিয়া উহাতে হাতল জোড়া একটা সমস্যা ছিল। একটা পথ এখন আবিষ্কৃত হইয়াছে। রূপার তার বা খিল দ্বারা জোড়ার চেষ্টা চলিতেছে।

"নারিকেলের দুধ হইতে জ্বাল দিয়া তৈল না করিয়া ক্রীম সেপারেটার দ্বারা ক্রীম তোলা যায় কিনা দেখার যোগ্য। উহা হইলে জ্বালানী ব্যয় অনেক কমিবে।

"নিষ্কাশিত ছোবার জল ঝরানো, সেপ্টি_কুজে ভাল হইতে পারে, শেষ দুধটুকু প্রেস করিয়া বাহির করা যাইতে পারে। এই সমস্ত পরীক্ষণীয় বিষয় আছে।

"কিন্তু আসল কথা উহাকে ব্যবসিক রূপ দেওয়া। বস্তুত পদ্ধতি নির্দ্দেশ করার মূল্য খুব কম। উহাকে কার্য্যকরী করাতেই চৌদ্দ আনা সফলতা বা বিফলতা নির্ভর করে। গবর্ণমেণ্ট সৎ উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে ছোবড়া হইতে রশি, পাপোষ ও জাজিম করা শিক্ষা দেওয়ার জন্য সাময়িক বিদ্যালয় চালান। তাহার ফলে এই ব্যবসা কিন্তু গড়িয়া উঠিতেছে না।

"যদি নারিকেলের সমস্ত অংশ ব্যবহার করার মতো সংস্থান কোঅপারেটিভ ভিত্তিতে দাঁড় করান যাইত তবে কোটি টাকার আয় এই সদর মহকুমার ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িতে পারিত বলিয়া মনে করি।" (শান্তিমিশন দিনলিপি—৫ই জুন ১৯৪৭)।

নারিকেল ও সুপারি ছাড়া পাট এবং মরিচও এ জেলা থেকে প্রচুর পরিমাণে বাইরে রপ্তানি হয়। ধানচালের দিক দিয়ে এ জেলা ঘাটতি এলাকা বলে গণ্য। তা হলেও যে ধানচাল এই জেলাতে উৎপন্ন হয় তা যদি এ জেলারই মধ্যে বিলিবণ্টনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় তবে এ জেলাবাসীর জীবিকানির্ব্বাহে কখনো সঙ্কট দেখা দিতে পারে না। কিন্তু এখান থেকেও ধানচাল কালোবাজারের সুড়ঙ্গ-পথে বাইরে চলে যায়। গ্রাম-ওয়ারি বা ইউনিয়ন-ওয়ারি সমবায়-নিয়ন্ত্রণাধীনেই শুধু এ অবস্থার প্রতিকার সম্ভব।

সমবায় ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণাধীনে গ্রামবাসীদের মৎস্যের চাষ, কৃষি, গোপালন, লৌহযন্ত্রাদি নির্ম্মাণ ও বয়ন-শিল্পের কাজে গান্ধীক্যাম্প উৎসাহিত করে আসছে। কর্ম্মকার, ধীবর ও তাঁতী সম্প্রদায়ের মধ্যে গঠনমূলক বিবিধ কার্য্যে বেশ আশা-জনক সাড়া পাওয়া গেছে। দুইটি সমিতি ইতিমধ্যেই সংগঠিত হয়েছে—একটি কর্ম্মকার সমবায় সমিতি ও একটি তন্তুবায় সমবায় সমিতি। দুই সহস্রাধিক সভ্য এই তন্তুবায় সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করছে। এই তো কাজের আরম্ভ মাত্র। আইন অনুসারে এটিকে রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে।

কৃষিকার্য্যের ব্যাপারে গ্রামের চাষী তো অনভিজ্ঞ নয়। চাষের রীতি, জমির তদ্বির, সারপ্রয়োগ ইত্যাদি সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান তো তাদের আছেই, তবে বর্ত্তমান কৃষিবিজ্ঞানের উন্নততর আবিষ্কারাদি সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই। অধিকাংশ চাষীই গতানুগতিক পথে চলে থাকে। তাদের উদ্যমের একান্ত অভাব। সেজন্য তাদের বংশপরম্পরা-লব্ধ জ্ঞানও দিন দিন লুপ্ত হয়ে আসছে। আজ দেশহিতৈষীরা দেশের ব্যাপক খাদ্যসঙ্কট লক্ষ্য করছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্যা ও তার সমাধানের খবর রাখছেন এবং তাঁরা স্বদেশের কৃষক-সমাজকে সেই জ্ঞানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে তোলার প্রয়াস পাচ্ছেন।

এদিকের লোকেরা মাছেরই অনুরাগী। মাছ পাওয়াও যায় প্রচুর, শাকসব্জীর প্রতি লোকের অনুরাগ কম। তরকারীর চাষ লোকে কমই করে। এদিকে তরি-তরকারী দুর্লভ বলা চলে। বর্ষাকালে আরও দুষ্প্রাপ্য। তরকারী চাষের উপযোগী উঁচু জমিরও অভাব আছে। তা হলেও, মাটির গুণেই কিছু কিছু হয়। একটু দৃষ্টি দিলে, একটু তদ্বির করলে যা ফলে তার বহু গুণ লোকে পেতে পারে।

গান্ধীক্যাম্পের কাজিরখিল কেন্দ্রের কৃষি-গবেষণা-ক্ষেত্রে কতকগুলো ফসলের চাষ করে দেখা গেছে যে ফসল আশাতীত পাওয়া যায় যদি সেচ-ব্যবস্থার ও সারপ্রয়োগের উন্নতিবিধান করা যায় এবং বৈজ্ঞানিক উপায় অনুসৃত হয়। এতদঞ্চলে এক কানি (৪ বিঘা) জমিতে ধান ফলে সাধারণতঃ ১০।১২ মণ, হয়তো কোন কোন জমিতে ১২।১৪ মণও হয়। কাজিরখিল ক্যাম্পের কৃষি গবেষণাক্ষেত্রের এক ফালি জমিতে পরীক্ষামূলক-ভাবে চাষ করে দেখা গেছে এক কানিতে ২০ মণ অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ ধান জন্মানো সম্ভব হয়েছে। সেই অনুপাতে গো-খাদ্যেরও উৎপাদন বেড়েছে। জমিতে ধানের পূর্ব্বে বেগুনের চাষ দেওয়া হয়। বেগুনের চাষে কম্পোষ্টসার প্রয়োগ করা হয়। বেগুনের পরেই সেই জমিতে ধান দেওয়া হয়। দেখা যায়, কম্পোষ্ট সারের গুণেই আশাতীত ধান পাওয়া সম্ভব হয়েছিল, পাটও যা হয়েছিল তা বাজারের সব চাইতে সেরা শ্রেণীর একটি বেগুন গাছ বছরে ৪৷৷০ টাকার বেগুন দিয়েছে, মুলার ওজন এক একটি এক সের সোয়া সের, টোমাটো এক একটি এক পোয়া দেড় পোয়ার বেশী ওজনের। তা ছাড়া ফুলকপি, বাঁধাকপি, বীট, গাজর, শালগম, পালং, ফ্রেঞ্চবীণ, সয়াবীন, আলু প্রভৃতিরও চাষের পরীক্ষা চলে। ফলনও মন্দ হয় নি। কাজেই গ্রামের লোকের মধ্যে এই সব কৃষিসংক্রান্ত পরীক্ষা বেশ উৎসাহের সঞ্চার করে।

দূরের ও নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা প্রত্যহই দলে দলে কাজিরখিলের এই কৃষি-গবেষণা-ক্ষেত্র দেখতে আসে এবং সব্জী উৎপাদন ও বিভিন্ন সার-প্রয়োগ-ব্যবস্থা দেখে নিজেদের জমিতে অনুরূপ চাষের চেষ্টায় তৎপর হয়।

কাজিরখিলের কচুরী-কম্পোষ্ট সার, পাতা কম্পোষ্ট সার, স্যানিটারী পায়খানার ময়লা-জল-সার, প্রভৃতির প্রয়োগ ও পরীক্ষা, এদিকের গ্রামবাসীদের কাছে অভিনব। এই গবেষণা ও পরীক্ষার প্রতি দিন দিন তাদের অনুরাগ বাড়ছে।

মিস্‌টিক কবিতা ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত

বাংলায় 'মিস্‌টিক' অথবা 'মিস্‌টিসিজ্‌ম' কথাটির বহলপ্রচলিত কোন প্রতিশব্দ আছে বলে মনে হয় না। অবশ্য তার কারণ একটা নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। ভারতে মিস্‌টিকদের অভ্যুদয়—সে অতি প্রাচীন কালের কথা; বাংলা ভাষার তখন জন্মও হয়নি। প্রাচীনতম সংস্কৃতই ছিল তাদের ভাবপ্রকাশের বাহন। বঙ্গভাষার যখন প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি হ'ল, বিশ্বমানব-সমাজের বিদগ্ধজনসভায় লাভ হ'ল সম্মানের আসন, তখন এই মিস্‌টিক সাধনা লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্ম-গোপন করেছে। বহির্ম্মুখী সমাজ-জীবন থেকে যে উপলব্ধি এমনি ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল সাহিত্যভূমি থেকেও তা এতকাল বিযুক্ত হয়েছিল। বৈষ্ণবপদাবলীর মধ্যে আবার একটা অনুরূপ অনুভূতির পুনরুজ্জীবন দেখতে পাই অবশ্য বলতে চাই না পদাবলীর আর বৈদিক কাব্যের সুর একই—সমান মাত্রায় তারা অতলসঞ্চারী, পেয়েছে সমান মাত্রায় বাগ্‌-মাহাত্ম্য। উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য আছে। ক্রমে সেই প্রসঙ্গের আলোচনা করছি। বাংলায় রবীন্দ্রনাথ আধুনিক আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও মিস্‌টিক কবিতার কিছু চমৎকার নিদর্শন দিয়েছেন:

> গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
> দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
> ভরা পালে চলে যায় কোন দিকে না'হি চায়
> ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দু'ধারে,
> দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে!

মিস্‌টিক কবিতার প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে সাধারণের ধারণা হতে পারে যে, সন্ধ্যাবেলার আলোক-অন্ধকারে মিশ্রিত অস্পষ্টতার মায়াময় কুহেলিকাই তার যথার্থ রূপ, সে যে-দুর্গ্রাহ্যতার আবরণ দিয়ে আত্মগোপন করেছে তা এক দুর্ব্বোধ্য ভাষা—দিনের প্রখর সূর্য্যালোকের মত তাতে সব স্বচ্ছ দেখা দেয় না, দেখা যায় না। এই মত গ্রহণ করলে সমস্ত মিস্‌টিক সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যকে এক মুহূর্ত্তে নস্যাৎ করে দিতে হয়। কিন্তু এই কবিরা যে ক্ষীণদৃষ্টি বা অপটু শিল্পী ছিলেন ইতিহাসে তার প্রমাণ নেই, একথারও প্রমাণ নেই যে তাঁরা ছিলেন অজ্ঞান বালখিল্যের দল আর তাঁদের ভাষা হ'ল অপরিণত শিশুর অর্দ্ধস্ফুট কাকলী। সমস্যার সমাধান তবে অন্যদিকে। অজ্ঞানতার যে মেঘ আমাদের চিত্তাকাশে কালবৈশাখীর হাওয়ার বেগে উঠে আসছিল তারই ছায়ায় স্বচ্ছকে অস্পষ্ট দেখতে আরম্ভ করেছিলাম, ধূলির ঝড়ে দৃষ্টি হয়েছিল বিভ্রান্ত। ঋগ্বেদের কাব্য শ্রেষ্ঠ কাব্য, তার প্রধান অংশ মিস্‌টিক ত বটেই; কিন্তু সেখানে অন্ধকারের অস্পষ্টতা কোথায়? পরাশর বলেছেন—

> অজো ন ক্ষাং দাধার পৃথিবীং
> তস্তম্ভ দ্যাং মন্ত্রেভিঃ সত্যৈঃ।
> প্রিয়া পদানি পশ্বো নি পাহি
> বিশ্বায়ুরগ্নে গুহা গুহং গাঃ॥ (১।৬৭)

অজন্ম থেকে বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে ধরে রেখেছে সে (অগ্নি), সত্যের মন্ত্র দিয়ে স্তম্ভের মত দ্যৌ-কে ধারণ করেছে উর্দ্ধে। দিব্যদর্শন গাভীর প্রিয় পদচিহ্নগুলিকে (দিব্যদৃষ্টিময় জ্যোতির পদচিহ্নগুলিকে) রক্ষা করো, হে অগ্নি, তুমি বিশ্বায়ু, প্রবেশ করো গুহার গহনদেশে (অন্ধকারের মধ্যে, অজ্ঞানের নিকষকেন্দ্রের অভ্যন্তরে)।

তা হলে অস্পষ্টতা মিস্‌টিক কবিতার রূপ-নির্দ্দেশক হতে পারে না। হলে জনৈক আধুনিক কবির—

> অগ্নিগ্রন্থি শোণিত-শিরায়,—
> নির্ব্বাসিত অভীপ্সার দ্বীপপুঞ্জে সাম্রাজ্য-শপথ।
> যমজ দ্বীপের মত দুটি চোখে দ্বিখণ্ডিত
> দ্বিধার জগৎ।...

এই অর্থহীন কাব্যাংশটিও মিস্‌টিক কবিতার নিদর্শন বলে স্বীকার করতে হয়। সুতরাং এখন প্রশ্ন উঠছে মিস্‌টিক কাব্যের প্রকৃত স্বভাব কি, ধর্ম্ম কি?

একটু ভূমিকার প্রয়োজন। মানুষের সৃষ্ট শিল্পের রস-বিচার করতে গিয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসুকে শিল্পী-মানুষের অন্তর্জগতে দৃষ্টি দিতে হয়েছে। কারণ অন্তরে সে যা বাইরে ত তারই সৃষ্টি: যে-প্রেম, যে-সৌন্দর্য্য, যে-আনন্দ, যে-নিবিড় অনুভূতি তার অন্তরে, বাইরে তাদেরই ত সে ফুটিয়ে তোলে বর্ণে ও অক্ষরব্যূহে—ম্যাডোনার চিত্রে কি ইলিয়ড মহাকাব্যে, পাথরের উপাদানে—এপোলো ও অমিতাভ বুদ্ধের মূর্ত্তিতে, সুরবিন্যাসে—বেটোফেনের সোনাটায়। আপাততঃ আমরা বাণীশিল্পের বিষয়-সম্পৃক্ত আলোচনায় ব্যাপৃত, আমাদের বিশ্লেষণ তাই যথোচিত ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। ইতিহাসের অতি প্রত্যূষে ভারতবর্ষে এমন এক সময় এসেছিল যখন আমাদের কবিরা শুধুমাত্র বাক্যবিন্যাসী না হয়ে অর্জ্জন করেছিলেন মহত্তর ধর্ম্ম। তাঁরা শুধু সুন্দরকেই প্রকাশ করেন নি, সত্যেরও সেবক ছিলেন—জীবনের গভীরতম সত্যসমূহ, বিশ্বরহস্যের গোপনতম সকল' সত্য, ভাগবত সত্যগুলির সন্ধান ও আবিষ্কার করেছিলেন তাঁরা। অর্থাৎ এক কথায় প্রাচীন কালের মিস্‌টিক কবিরা যুগপৎ হয়েছিলেন

অধ্যাত্মধর্মী, ভাগবত অন্বেষী সাধক এবং দিব্যসুন্দরের পূজারী, স্রষ্টা এবং বেদোক্ত 'ঋভু'—দিব্যরূপকার দেবশিল্পী। এই একটা পরমসুন্দরের প্রকাশ যার মধ্যে থেকে ফুটে উঠছে—রয়েছে একটা লোকোত্তর ধ্বনির সূক্ষ্ম আবেগ এবং আবেশ—মিস্টিক কবিতার সেখান থেকেই সূত্রপাত। এ হ'ল মিস্টিক কবির অন্তশ্চেতনার কথা, তার ভাবজগতের কথা। এখন দেখতে চাই তার প্রকাশভঙ্গীর দিক। মিস্টিক কবিকে বলতে হয়েছিল—ঋগ্বেদের কবির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই বলছি—গভীরতম দুজ্ঞে'য় সত্যের কথা। এই দুজ্ঞে'য়কে জ্ঞানগোচর, দুর্নিরীক্ষ্যকে দৃষ্টিগোচর করে তুলতে কবিকে আশ্রয় করতে হয়েছিল পার্থিব সামগ্রীই কিন্তু সেই সঙ্গে তার মধ্যে ভরে দেওয়া হয়েছে যেন একটা মন্ত্রের স্পর্শ যার ফলে পরিচিত অপরিচিতের ইঙ্গিত হয়ে উঠেছে, স্থূল হয়ে উঠেছে সূক্ষ্মের প্রতীক, প্রকট অপ্রকটের বাহক, স্থূল ঘটনাবলী নিভৃত বিশ্বজগৎ ও অন্তর্জীবনের নানা উপলব্ধির জীবন্ত প্রতিমূর্তি, এমন কি অনেক স্থলে দুই মিলেমিশে প্রায় এক হয়ে গিয়েছে। তাই বলা হয় মিস্টিক কবি ইঙ্গিতপ্রিয় প্রতীকপ্রিয় সঙ্কেতভাষী কবি—তাঁর আপাতসরল ভাষার অন্তরালে থাকে ভিন্নতর অর্থ। ঋষিকবিদের এদিক দিয়ে তুলনা হয় না—

স মাহিন ইন্দ্রো অর্ণো অপাং
প্রৈরয়দ হি বৃচ্ছা সমুদ্রম্।
অজনয়ৎ সূর্যং বিদদ্ গা
অক্তুনাহ্নাং বয়ুনানি সাধ্য॥ (২।১৯।৩)

পূজনীয় অহিহন্তা (চৈতন্য আবরক নিশ্চেতনা নাশক) ইন্দ্র জলধারাকে (চিৎপ্রবাহকে) সমুদ্রের দিকে (অসীম চৈতন্যের দিকে) প্রবাহিত করলেন, সূর্যের (দিব্যচেতনার) জন্ম দিলেন তিনি, ফিরে পেলেন গোরাজি (জ্যোতির সমষ্টি) রাত্রির মধ্য থেকে দিনের প্রকাশ ঘটিয়ে।

ঋগ্বেদের মিস্টিক কবিতার ছিল একটা বৈশিষ্ট্য; প্রাচীন ভারতের এই জ্ঞানসমৃদ্ধ কবিরা যেন ঊর্দ্ধলোকের স্বচ্ছদৃষ্টি নিয়ে নেমে এসেছিলেন, আনন্দের সোমরস পান করে অমৃতময় জীবনের আস্বাদ পেয়েছিলেন তাঁরা—তারই সৌরভে সকলকিছুকে দিয়েছিলেন অপার্থিব মহিমা। উপনিষদেও দেখি অনুরূপ ধর্ম্ম কতখানি প্রকাশ পেয়েছে—কবির অনুভবে এবং ভাষার মধ্যে সাক্ষাৎদর্শনের কতখানি অমোঘ নিশ্চয়তা,—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্ নেমা বিদ্যুতো
ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং
বিভাতি॥২-২-১৫

সূর্য্য সেখানে আলো দেয় না, দেয় না চন্দ্র তারা, এই সব বিদ্যুতের আলো পর্য্যন্ত নাই সেখানে, পার্থিব অগ্নিই বা কোথায়? সে জ্বলে, তাই সকলে জ্বলে; তারই আলোকে এই সমস্ত আলোকিত।

মিস্টিক কবিতার শ্রেষ্ঠতম শ্রেণীর পর্য্যায়ে এগুলির স্থান। এগুলিকে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক কবিতা বলতে হয়। যে মূল প্রেরণা এখানে বাণীতে অর্থ দিয়েছে ও ধ্বনিকে প্রাণবন্ত করে তুলছে, তা এসেছে মনের অপর লোক থেকে।

আধুনিক কবিরা পৃথক এক পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছেন। তাঁরা যাত্রা আরম্ভ করেছেন বিপরীত প্রান্ত থেকে—চলেছেন তুচ্ছ পার্থিব নশ্বর শ্রীহীনকে ধরেই অনন্তের দিকে, বিশ্বাতীতের সৌন্দর্য্যের দিকে। ফরাসী কবি বোদেলের (Boudelaire) আরম্ভ করেছেন বিকৃত বীভৎস দৃশ্য ও বস্তু দিয়েই, তবে অনুভূতির নিষ্ঠার যে গাঢ়তা, দৃষ্টির যে তন্ময়তা ও দূরগামিতা, যতখানি আন্তরিকতা তাঁর উপলব্ধির মধ্যে, তারই সহায়ে তিনি কুৎসিত কদর্য্যতাকেও ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন, এরই মধ্যে যে এক অপরূপত্ব রয়েছে তুলে ধরেছেন সে জিনিষটিকে; বস্তুতঃ এক দিকে এই আপাতপ্রতীয়মান ও অপর দিকে গভীরতর সত্য—সৌন্দর্য্য সত্যের নিত্যসঙ্গী—আবার এই উভয়কে আশ্রয় করে এই সূত্র ধরে গড়ে উঠেছে মিস্টিক কবিতার অন্য দুই শ্রেণী। যেখানে অন্তর্লোক সম্পূর্ণ অনাবৃত হয়নি, হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ দিয়ে যখন তার মুখাবয়ব আচ্ছাদিত, একটা ভাবের ইন্দ্রজাল রচনা হয়েছে সত্য-সুন্দরকে ঘিরে—এক অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন যেখানে এই রহস্য ভেদ করে যেতে—সেখানেই Occult poetry-র সৃষ্টি। ইংরেজী কাব্যে ব্লেক এর চমৎকার নিদর্শন। ইয়েট্সও এ ধরণের কি অপরূপ সৃষ্টি করেছেন!

Throne above throne where in half sleep,
Their swords upon their iron knees,
Brood her high lonely mysteries.

রবীন্দ্রনাথেও এর পরিচয় পাই, যখন শুনি—

তৃণদল
মাটির আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

বৈষ্ণব পদাবলীর কবিরা এই রহস্যেরই দিয়েছেন অন্য এক নূতন রূপ অন্য এক গুণ যা দিয়ে রচিত—আমরা যাকে বলেছি 'গুহ্যাত্মিক কাব্য'—psychic poetry. মানুষী ভাব, মানুষী অনুভূতি, অনুরাগ দিয়ে এমন সযত্নে সম্পূর্ণরূপে তাঁরা ঢেকে দিয়েছেন তাঁদের ভিতরকার দিব্যভাব যে সাধারণ দৃষ্টিতে সেই অপরূপ বিশেষত্বটি লক্ষ্যই হয় না। বৈষ্ণব কবিরা তাঁদের সাধনার এই অমূল্য সম্পদ 'অশিক্ষিত' সাধারণের সম্পত্তি করে তুলতে চান নি—কেবল যারা তার

বহিরাবরণের মাধুর্য্যে তৃপ্ত না হয়ে চলবে আরো গভীরে শুধু সেই মর্ম্মজনের জন্যই, রেখেছিলেন পরম প্রেমের সুধা :

আননম সুখে, হাসি বিধুমুখে
কভু না হেরিয়ে আন।
আজু কেন বল, কান্দিয়া বাকুল,
কেমন করিছে প্রাণ ॥—(চণ্ডীদাস)

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিতেও এই তত্তাত্বিক কাব্যের স্নিগ্ধ-মধুর সুর অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে—

হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে
খুঁজে না পাই কূল ;...

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রয়েছে আর এক রীতি—সেটিও তাঁর নিজস্ব রীতি। কবি বলেছেন, পৃথিবীর উপর তাঁর গভীর আকর্ষণ, এই মৃত্তিকায় ধরণীকে তিনি ভালবেসেছেন—একে ছেড়ে কোথাও যেতে চান না। অবশ্য এইটুকুই যদি কবির মনোজগতের সবখানি সত্য হ'ত তা হলে তাঁকে মর্ত্ত্যবিলাসী স্থূলের উপাসক (পাশ্চাত্যের ভাষায় 'sensuous poet'—ইন্দ্রিয়সেবী কবি) বলেই অভিহিত করা যেত, আর তাতে মিস্টিক ভাবের কিছুমাত্র ছায়াপাত হ'ত না। প্রকৃত পক্ষে রবীন্দ্রনাথ হলেন তাঁদেরই উত্তরাধিকারী যাঁরা এক দিন বলেছিলেন : যা দিয়ে অমর হতে পারব না, তা দিয়ে আমি কি করব ? অথবা, অল্পে সুখ নেই—ভূমাতেই সুখ।*

আমি বলতে চাই রবীন্দ্রনাথের মিস্টিসিজ্‌ম্‌ সসীমতা আর আনন্ত্য, বিশ্ব এবং বিশ্বাতীত, রূপ ও অরূপের সম্বন্ধ নিয়ে গড়ে উঠেছে। এখন প্রশ্ন হ'ল, কি রকমের সম্পর্ক রচনা করেছেন কবি এদের মধ্যে ? প্রাসঙ্গিক একটা কথার উল্লেখ করা যেতে পারে। ঋগ্বেদের কবিও বলেছেন স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যের বিষয় নিয়ে। মর্ত্ত্যের জিনিষ তাঁরা বলেছেন, কিন্তু এমন একটা চেতনার সংযোগে, ভাষার এমন অত্যাশ্চর্য্য সাদৃশ্যে যে তা স্বর্গের জিনিষের পাশে স্বর্গীয় হয়েই উঠেছে। এরকম একটা রূপান্তর ঘটেছিল তাঁদের হাতে—তাঁদের শিল্পে। রবীন্দ্রনাথ সসীমকে সসীমই দেখেছেন, পার্থিবকে পার্থিব বলেই মেনে নিয়েছেন—কোন রূপান্তরের প্রশ্ন ওঠে নি তাঁর কবিচেতনায়। তবে একথার অর্থ এ নয় যে, কবি সসীমকে খণ্ডকে তাচ্ছিল্য করেছেন। আদৌ তা নয়। যা সসীম তা অসীমেরই অংশ, যা প্রত্যক্ষ বিশ্বগত তা অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাতীত থেকেই অনুপ্রাণিত। কবির কাছে তাই দুই-ই সমান সত্য—একটি সর্ব্বাংশে সত্য, অন্যটি একান্ত মায়া নয়। তবে দুটি দুই স্তরের সত্য। সান্তকে রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন তাকে ধরে বৃহতে উত্তীর্ণ হবার জন্য—তার মূল্য ততখানি যতখানি সে অনির্ব্বচনীয়কে মূর্ত্ত অবয়বী করে তোলে। তাই ত তিনি বলতে পেরেছেন—

সীমার মাঝে, অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।

রবীন্দ্রনাথ যে অসীমের এই স্বরূপ গ্রহণ করেছেন, সত্য দর্শন করেছেন তা তত্ত্বজিজ্ঞাসার মুমুক্ষুর জ্ঞানের পথ ধরে নয়—তা তিনি পেয়েছেন নিজস্ব স্বভাবগত সৌন্দর্য্যবোধের পথ দিয়েই। তাঁর নিজের কথা হ'ল : "সেই সোজা কথা সেই আমার নিজের কথার মধ্যে এমন একটা সুর আসিয়া পড়ে, যাহাতে তাহা বড় হইয়া ওঠে...সেই যে সুরটা সেটা ত আমার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না।" স্বেচ্ছায় হোক, অথবা কবিদৃষ্টির অন্তঃপ্রেরণাবশেই হোক রবীন্দ্রনাথ এসে পড়েছেন সীমা আর অ-সীমার সংযোগ লোকে : তাদের মধ্যে একটা লুকোচুরির রহস্য তাঁকে দিয়েছে মিস্টিকের মর্য্যাদা। শুধু তত্ত্বের দিক দিয়ে নয়, যখন কবির প্রকৃতি তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগে প্রকাশ পেয়েছে, অন্তঃশ্রুতি যখন অন্তরতম দেশে আপনার বাণীকে সার্থক করেছে অমিশ্র পূর্ণতায়, যখন বহিঃসত্তা ডুবে গিয়েছে নিভৃত দেবতার ধ্যানে তখন এই যে ভাষায় বাণীর অর্ঘ্য রচনা করেছেন তার অঙ্গে অঙ্গে ফুটে উঠেছে মিস্টিক কবিত্বেরই চমৎকারিত্ব—

জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তা'র নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে ;

* "কিন্তু মানুষের দূরে যাওয়া চাই। মানুষের মন এত বড় যে কেবল কাছটুকুর মধ্যে তার চলাফেরা বাধা পায়, জোর করে সেটুকুর মধ্যে ধরে রাখতে গেলেই তার অনেকখানি বাদ পড়ে। মানুষের মধ্যে যারা দূরে যেতে পেরেছে তারাই আপনাকে পূর্ণ করতে পেরেছে।"— পথের সঞ্চয় : 'জলস্থল'।

মৃত্যু-কর

শ্রীমনকুমার সেন

১৯৪৬ সনে ভারতের কেন্দ্রীয় পরিষদে 'মৃত্যুকর' প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে একটি বিল উত্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু নানা রাজনৈতিক গোলযোগ, রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন ও দেশ বিভাগজনিত সমস্যার ফলে দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত উক্ত বিলের আলোচনা স্থগিত থাকে। স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইবার পর ভারত-সরকার 'মৃত্যুকর' বিলটিকে 'সম্পত্তিকর, বিল' নামকরণপূর্ব্বক পুনরুত্থাপন করেন এবং তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবার নিমিত্ত একটি সিলেক্ট কমিটি গঠন করেন। সম্প্রতি এই সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটি মোটামুটি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সম্পত্তিকর বিলটিকে অগৌণে আইনে পরিণত করা কর্ত্তব্য। মৃত্যুকরের প্রস্তাব ভারতের মৌলিক আবিষ্কার নহে। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ভারত ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকল সভ্য দেশেই মৃত্যুকর অর্থাৎ মৃতের সম্পত্তির উপর ন্যায্য হারে কর আদায়ের ব্যবস্থা আছে। প্রস্তাবিত ভারতীয় বিলটি 'সম্পত্তিকর বিল' নামে অভিহিত হইলেও 'মৃত্যুকর' কথাটি অধিকতর প্রচলিত বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহাই গ্রহণ করিয়াছি। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে 'মৃত্যুকর' এবং 'সম্পত্তিকর' মূলতঃ একই জিনিষ। যে-কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে সামাজিক নিরাপত্তা বিধান। রাজস্ববাবদ রাষ্ট্রের আয় পর্য্যাপ্ত না হইলে সামাজিক নিরাপত্তার পূর্ণ ব্যবস্থা করা কখনই সম্ভব নহে। শুধু তাহাই নহে, সমাজে বর্ত্তমানে যে গুরুতর আর্থিক বৈষম্য বিদ্যমান রহিয়াছে, সুসম অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা তাহার অবসান না ঘটাইতে পারিলে মানুষে মানুষে সদ্ভাব ও প্রীতি, দেশ-দেশান্তরের মধ্যে আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা—এক কথায় মানুষের পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার আশা করা নিরর্থক। আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণ, সমাজের অধিকতর সুখ-সুবিধার প্রবর্ত্তন ও রাষ্ট্রের রাজস্ববৃদ্ধি—বিজ্ঞানসম্মত ও সুপরিকল্পিত কর-নীতির উপরেই অনেকাংশে নির্ভর করে। মৃত্যুকর আদায়ের ব্যবস্থা অর্থাৎ মৃতের অতিরিক্ত সম্পত্তির উপর করনির্দ্ধারণের ব্যবস্থাকে এইরূপ কর-নীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে আমরা গণ্য করিতে পারি।

পাশ্চাত্যের অর্থশাস্ত্রের জনক এডাম স্মিথ সর্ব্বপ্রথম তাঁহার 'ওয়েলথ অব নেশনস্' নামক সুবিখ্যাত পুস্তকে মৃত্যু-কর সম্পর্কে আলোচনা করেন। যেহেতু মৃতের সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর উপরেই এই করপ্রদানের দায় বর্ত্তাইবে, সেই হেতু 'ability' বা করপ্রদানের সামর্থ্য বিবেচনা করিয়াই মৃত্যুকর নির্দ্ধারণের ক্ষেত্র নির্দ্দেশ করার প্রস্তাব তিনি করিয়াছিলেন।

১৯২৪-২৫ সনে 'ভারতীয় কর তদন্ত কমিটি' (Indian Taxation Enquiry Committee) মৃত্যুকর প্রবর্ত্তনের সপক্ষে অত্যন্ত জোরালো যুক্তিসহ সুপারিশ করেন। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারের পর ভারতের প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সমূহ এই বিষয়ে নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করেন। ১৯৪৪-৪৫ সনে কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারতের তৎকালীন অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইজম্যান ভারত সরকারের মৃত্যুকর প্রবর্ত্তনের অভিপ্রায়ের কথা প্রকাশ করেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় আইন-সভার এইরূপ কর প্রবর্ত্তনের ক্ষমতা আছে কিনা সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইবার নিমিত্ত বিষয়টি ফেডারেল কোর্টে প্রেরণ করা হয়। ফেডারেল কোর্ট এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, 'ইংলিশ ল' অর্থাৎ বিলাতের আইনে মৃত্যুকর বা সম্পত্তিকর আদায়ের যে সমস্ত বিধিবিধান রহিয়াছে ভারতে তাহা প্রবর্ত্তন করিবার কোন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের নাই। ইতিমধ্যে লণ্ডনে উপ-ভারতসচিব (Under-Secretary of State for India) লর্ড লিষ্টওয়েল ভারতে মৃত্যুকর প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে একটি বিল 'হাউস্ অব লর্ডস্'-এ উত্থাপন করেন। এই কর বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বণ্টনের সম্বন্ধেও বিলে সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব করা হয়। এই নূতন বিলে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী ভারত-সরকার স্যার বি. এন. রাওকে "সম্পত্তিকর বিল" প্রণয়নের জন্য নিযুক্ত করেন। তৎপরবর্ত্তী পর্য্যায় সম্পর্কে প্রবন্ধের সূচনায় উল্লেখ করিয়াছি।

'প্রত্যক্ষ কর' (Direct Tax) এবং 'পরোক্ষ কর' (Indirect Tax) এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি বিধান নিখুঁত কর-নীতির বৈশিষ্ট্য। শুধু বৈশিষ্ট্য বলা ঠিক হইবে না, কর-নীতির সাফল্য ও সার্থকতাই অনেকাংশে এইরূপ সঙ্গতির উপর নির্ভরশীল। গ্লাডষ্টোন এই দুই শ্রেণীর করকে দুইটি রূপলাবণ্যময়ী ভগিনীর সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং উভয়ের প্রতিই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ("perfectly impartial") দৃষ্টিপাতের নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ করের বেলায় যেমন আয় অনুযায়ী ধনী অধিক কর প্রদান করে, দরিদ্র প্রদান করে কম; পরোক্ষ করের বেলায় তেমনি দরিদ্রের দেয় কর ধনীর অপেক্ষা অধিক। ১৯৩৮-৩৯ সনের মোট আদায়ীকৃত রাজস্বে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ২২ এবং ৭৮। ১৯৪৩-৪৪ সালে প্রত্যক্ষ কর ছিল মোট রাজস্বের শতকরা ৫৮

ভাগ এবং পরোক্ষ কর ৪২ ভাগ। এইরূপে প্রত্যক্ষ করের হারবৃদ্ধি বিবেচনা করিলে স্বতঃই মনে হয় যে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে করনির্দ্ধারণের একটা অধিকতর সুসঙ্গত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য ইহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৩৮-৪৪ সনের মধ্যে পরোক্ষ করের হারও প্রভূত বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট রাজস্বের অনুপাতে প্রত্যক্ষ করের এই ক্রমবর্দ্ধমান হার বজায় রাখিতে হইলে মৃত্যুকর বা সম্পত্তিকর আদায় করা একান্ত আবশ্যক। যুদ্ধের বৎসরগুলিতে 'অতিরিক্ত মুনাফাকর' (Excess Profit Tax) বাবদ গবর্ণমেন্টের যে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হইয়াছিল, বর্ত্তমানে আর সে সুযোগ নাই। ১৯৪৪-৪৫ সনে উক্ত কর বাবদ গবর্ণমেন্টের প্রায় ৬২ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হইয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধকালীন বাজেটের তুলনায় ঘাটতি স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদুপরি বহু অপ্রত্যাশিত সমস্যা ও সঙ্কট গবর্ণমেন্টকে বিব্রত রাখিয়াছে। আয়ের সীমা সঙ্কীর্ণতর হইয়াছে অথচ ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তা ছাড়া ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি করিয়া ধনী এবং দরিদ্র নাগরিকদের নিকট হইতে সামর্থ্য অনুযায়ী ও ন্যায্য হারে কর আদায়ের নীতি প্রবর্ত্তন করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে 'আয়কর' (Income Tax) হইতেছে একমাত্র প্রত্যক্ষ কর। ইহার পরিধি যে অচিরে ব্যাপকতর করা কর্ত্তব্য তাহাতে মতানৈক্য থাকিতে পারে না। মৃত্যুকর আদায়ের আইনসঙ্গত যুক্তিও সামান্য নহে; সমাজে ব্যক্তির ধনসম্পত্তি সংরক্ষণের একটা মৌলিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর রহিয়াছে। ব্যক্তির জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারীর হস্তে উক্ত সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে বহন করিতে হয়। সুতরাং এই দিক হইতেও রাষ্ট্রকে সম্পত্তিকর প্রদান করা উত্তরাধিকারীর অবশ্য কর্ত্তব্য। গ্ল্যাডষ্টোন যথার্থই বলিয়াছেন,

"I conceive nothing more rational than that, if taxes are to be raised at all, the State shall be at liberty to step in and take from him who is thenceforward to enjoy the whole in security that portion which may be *bona fide* necessary for the public purpose."

বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর কর শুধু ধনিক শ্রেণীকেই দিতে হইবে, সমাজের বৃহত্তর অংশ দরিদ্র জনসাধারণের এই করের বোঝা বহন করিতে হইবে না এবং ধনিকশ্রেণীর নিকট হইতে, তাহাদের উত্তরাধিকারিগণের অনায়াসলব্ধ সম্পত্তি হইতে উচ্চতর হারে এবং অধিকতর পরিমাণে কর আদায় করাই যে সমাজের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক বৈষম্য ও তজ্জনিত অশান্তি-প্রতিকারের একমাত্র পন্থা তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

মৃত্যুকরের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ দুইটি যুক্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, এইরূপ কর বাবদ প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ অনিশ্চিত। দ্বিতীয়তঃ, প্রায়শঃ সম্পত্তি হস্তান্তরের বিষয়টি যথাযোগ্য বিবেচনা লাভ না করার ফলে 'এষ্টেটগুলির' পরস্পরের মধ্যে অসমতার (inequality) সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে ডাঃ বেনহাম মন্তব্য করিয়াছেন,

"A chancellor of the Exchequer cannot estimate their yield at all accurately for he does not know which rich men will die during the coming year. Over, say, fifty years, due estate may not change hands at all and so may yield nothing in death duties, while another may change hands several times."

অর্থাৎ, আগামী বৎসরে ধনীদের কে কে মারা যাইবেন তাহা জানেন না বলিয়া কোন অর্থসচিবের পক্ষেই সেই বৎসরের মৃত্যুকর-জনিত আয় সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভব নহে। কোন এষ্টেট হয়ত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেও একবার হস্তান্তরিত হইবে না, সুতরাং তাহা হইতে কোন মৃত্যুকরও আদায় হওয়া সম্ভব নয়, আবার কোন এষ্টেটের হয়ত ঐ সময়ের মধ্যে কয়েকবার হস্তান্তর ঘটিতে পারে।

যুক্তি হিসাবে এই বিষয়টি যতই অকাট্য হউক, বাস্তবক্ষেত্রে ইহা যে প্রকৃতই কোন বিরাট সমস্যা নহে, পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য দেশে কর-ব্যবস্থায় মৃত্যুকরের অস্তিত্ব হইতেই তাহা উপলব্ধি করা যায়।

মৃত্যুকরের আসল সমস্যা হইতেছে কর ফাঁকি দেওয়ার (tax evasion) সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করা। আইন বাঁচাইয়া ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়াকে অনেক ক্ষেত্রে 'জীবন-নীতি ও ব্যবসা-নীতির অংশরূপে' (a part of private morals and business ethics) মনে করা হইয়া থাকে। একটা মজার উক্তি আছে যে,

"The man who can show us how to avoid our taxes and still keep within the limits of the law is looked upon as a public benefactor."

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আইনের সীমা লঙ্ঘন না করিয়াও ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার পথ বাৎলাইয়া দিতে পারেন তিনি তো একজন পরম জনহিতৈষী। সম্পত্তিকর বিল আইনে পরিণত করার পর এই শ্রেণীর জনহিতৈষীর হাত হইতে জনসাধারণ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করাই যে একটা প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

চট্টগ্রাম বিপ্লব-কাহিনী

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী

"Female organisation" সম্বন্ধে সূর্য্য সেনের একটি অসমাপ্ত রচনা এইবার প্রকাশিত হইল। ধৃত হইবার সময়ে তাঁহার নিকট ইহা পাওয়া যায়। এই রচনায় উল্লিখিত "অসীমের" কোন পরিচয় জানা যায় নাই; তবে ইহাকেই প্রীতিলতার "মনিদা" বলিয়া মনে হয়। "অনিতা" কল্পনা দত্তের ছদ্মনাম।

সূর্য্য সেনের রচনা

Act, act in the living present,
Heart within and God overhead.

১৯২৯ সালে তার নাম আমি প্রথম শুনি, তখন আমরা female organisation-এর জন্য মনোযোগ দিই নাই, মেয়েদের সমিতির মধ্যে এনে বিপ্লবের কাজের জন্য তাদিগকে তৈয়ের করে তোলা সম্ভব হবে বলে মনে করি নি কারণ আমাদের সমাজের যেরূপ রীতিনীতি তার মধ্যে থেকে মেয়েদের পক্ষে পূর্ণভাবে সমিতির কাজে যোগ দেওয়া খুবই শক্ত, মেয়েদের সঙ্গে organiser-দের মেশার পক্ষেই যথেষ্ট বাধা, তাই আমরা মনে করতাম মেয়েরা ত খুব কমই বিপ্লব সমিতিতে আসতে পারবে আর এলেও তাদিগকে ছোটখাট কাজের helper হিসাবে রাখা চলবে—practical action-এ অর্থাৎ হত্যা, আক্রমণ প্রভৃতি কাজে পাঠান যাবে না।

গ্রীষ্মের ছুটিতে এক দিন অসীম আমায় বলল যে তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দুই তিন জন মেয়ের সঙ্গে মিশে তাদিগকে ধীরে ধীরে বিপ্লব সমিতিতে আনবার চেষ্টা করেছে এবং অনেকটা কৃতকার্য্যও হয়েছে। অসীম আমাদের সমিতির এক জন সদস্য। সে আমায় খুব মেনে চলত এবং চট্টগ্রামে থাকলে এক দিনও আমার সঙ্গে না মিশে থাকতে পারত না, আমার অন্যান্য সহকর্ম্মীদের সঙ্গেও মিশত কিন্তু আমার সঙ্গেই তার মেশাটা খুব বেশী ছিল। এমন অন্যের কাছে যা বলতে সাহস করত না, আমার কাছে তার সব প্রাণ খুলে বলত। আমার সহকর্ম্মী নির্ম্মল, অনন্তলাল, গণেশ প্রভৃতি female organisation-এর কথা শুনলেই রেগে উঠত এবং কেউ মেয়েদের সমিতিতে আনবার চেষ্টা করছে শুনলে তাকে সমালোচনা করে নাস্তানাবুদ করত। তাই আর কাউকে কথাটা না বলে আমাকেই বলেছিল। আমি যদিও মেয়েদের সমিতিতে আনবার কোন চেষ্টা তখনও করি নি, এবং চেষ্টা করবার জন্য কাউকে বলিও নি তবু সে চেষ্টা করছে শুনে খুশীই হলাম। তাকে বললাম "চেষ্টা কর, অন্ততঃ নানা বিষয়ে সাহায্যও করতে পারবে," সে বলল, "যাদের চেষ্টা করেছি তাদের মধ্যে আমার নিকট আত্মীয় জগবন্ধু ওয়াদ্দারের মেয়ে রাণীই সবচেয়ে ভাল। সে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, সম্পর্কে আমার বোন, তাই তার সঙ্গে মিশতে আমার কোন অসুবিধে নেই। সে আমার কথা খুব মেনে চলে, পড়াশুনায় ভাল। খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করে এখন ঢাকা ইউনিভারসিটিতে আই-এ, পড়ছে।" তখনও মেয়েদের সমিতিতে আনবার বিশেষ আগ্রহ আমার হয় নি। তবু helper হিসাবে পাওয়া গেলে মন্দ কি, এই ভেবে তাকে উৎসাহ দিলাম। চেষ্টা করতে বললাম, কিন্তু মেয়েদের উপর তেমন কোন আশা তখনও করি নি।

অসীম রাণী নামই বলেছিল—স্কুলে অথবা কলেজে তার যে অন্য কোন নাম আছে তা বোধ হয় বলে নি। তাই সুদীর্ঘ তিন বছর ধরে তার আসল নাম "রাণী" বলেই আমার ধারণা ছিল। তিন বছর পরে তার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার কয়েক মাস আগে জানলাম যে তার নাম প্রীতি। তখন মনে করেছিলাম, ওর নাম বোধ হয় প্রীতিরাণী, তাই সংক্ষেপ করে বাড়ীতে রাণী ডাকে। কিন্তু রাণীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর রাণীকে জিজ্ঞেস করে জানলাম তার স্কুলের নাম হচ্ছে প্রীতিলতা—আর বাড়ীর ডাকনাম রাণী, প্রীতির সঙ্গে রাণীর কোন সম্পর্ক নেই।

অসীম তখন কলকাতায় পড়ত। কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে রাণীর কাছে চিঠি দিয়ে দেশের কাজের প্রতি তার মন আকৃষ্ট করত। রাণী অসীমের চিঠিগুলি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে পড়ত, আর দেশের স্বাধীনতার বেদীমূলে উৎসর্গ করার জন্য নিজেকে তৈয়ের করছিল। অসীমের কাছে প্রথম বারেই শুনলাম খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়ে class X-এ পড়ার সময়ই রাণীকে সে প্রথম বিপ্লব সমিতির idea দিয়েছিল এবং আমার নাম করে আমাকে সমিতির চালক বলে প্রথম দিনেই তাকে বলেছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সম্বন্ধে কত প্রশংসা তার কাছে করেছিল। রাণীর কাছে শেষে শুনেছি যে সেইদিন থেকেই আমাকে তার হৃদয়ের মধ্যে খুব বড় শ্রদ্ধার আসন দিয়ে রেখেছিল এবং সুদীর্ঘ চার বৎসর আমার সঙ্গে দেখা করার উপযুক্ত করে নিজেকে তৈরি করেছিল।

অসীমের কাছ থেকে রাণীর কথা শুনে তার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা আমার মোটেই হয় নাই, কারণ আমার সঙ্গে দেখা করার মত উপযুক্ত সে তখনও হয় নি বলে আমার

ধারণা ছিল; আর দরকারও মনে করি নি। অসীমেরও তখনও এই ধারণা হয় নি যে মেয়েদের helper হওয়া ছাড়া আর কোন বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করা যাবে। অসীম তাদিগকে sympathiser হিসাবে তৈয়েরী করছিল, তাই অসীমও রাণীর সঙ্গে দেখা করার কথা তখনও আমাকে বলেনি। দেখা করার মত উপযুক্ত হয়েছে বলেও মনে করে নি। রাণী ছাড়া আর দুটি মেয়েকে সে তখন সমিতির সদস্য করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাদের সম্বন্ধে বেশী আশা সে দিতে পারল না, আমি অসীমকে বললাম "কতদূর সহানুভূতি তাদের দু'জনের কাছ থেকে পাবে সেটা পরীক্ষা করে দেখ না।"

ওরা কলেজে পড়ে অভিভাবকদের কাছ থেকে যথেষ্ট টাকা পায়, সমিতির জন্য মাসে মাসে কিছু অর্থসাহায্য ত অনায়াসে করতে পারে, এটা পারে কি না দেখ না। অসীম তাদের কাছ থেকে টাকা চাইতে খুব লজ্জা বোধ করত। তবুও আমার কথা মত সসঙ্কোচে দু'একবার চেষ্টা করে বিশেষ কৃতকার্য্য হতে পারে নি, তখন থেকেই ঐ দুই মেয়ের সম্বন্ধে আমার ভাল ধারণা হয় নি, কিন্তু অসীম ঐ দুই জনের মধ্যে ছোটটির উপর কিছু আশা করত।

ঐ গ্রীষ্মের ছুটিতে অসীমের কাছ থেকে রাণীর কথা আরও দু-তিন বার শুনলাম। ছুটির পর অসীম কলকাতায় চলে গেল, রাণীও ঢাকা চলে গেল। ৺পূজার ছুটিতে অসীম বাড়ী এসে আমার সঙ্গে দেখা করল, এই কয় মাসের মধ্যে আমি মেয়েদের সম্বন্ধে মোটেই চিন্তা করি নি, কারণ আগেই বলেছি আমি মেয়েদের সম্বন্ধে বিশেষ কোন আশা করি নি, তবে এই মনে করেছিলাম যে, Sympathiser হিসাবে কয়েকজনকে পেলে মন্দ কি? এই ছুটিতেও অসীম রাণীর এবং অন্যান্য মেয়েদের কথা কয়েকবার বলেছিল, ওর কথায় বুঝলাম রাণী ক্রমে উন্নতি করছে। এই ছুটিতে শেষের দিকে সে আমায় বলল যে আর একটি মেয়েকে সে recruit করার চেষ্টা করছে, তার নাম অনীতা, কলকাতায় 1st year class-এ পড়ে (রাণী তখন 2nd year-এ পড়ে)

অসীম বলল অনীতা তার নিকট আত্মীয় নয়। তাই তার বাসায় ওর নিজের বেশী যেতে লজ্জা করে, তাই অনীতার একজন নিকট আত্মীয়কে (অসীমের বন্ধু) দিয়ে তার কাছে বই পাঠাতে হয়। আমি বিশেষ আগ্রহান্বিত না হলেও অসীমকে উৎসাহ দিতে কৃপণতা করলাম না। আমার এই সামান্য উৎসাহটুকুও না পেলে সে female organisation ছেড়েই দিত।

১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে আমরা বিপ্লব সমিতির সদস্যেরা চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেস কমিটি হাতে নিই এবং ইহার পুনর্গঠন করি। ১৯২২ সালের পর থেকে চট্টগ্রাম কংগ্রেস কমিটির অবস্থা একেবারে শোচনীয় হয়ে পড়েছিল, কংগ্রেস সদস্যের সংখ্যা ২৫।৩০ জনের বেশী থাকত না, কংগ্রেসের কোন কাজই ছিল না, ১৯২৮ সালের শেষ দিকে অন্তরীণ থেকে মুক্ত হয়ে আমরা কংগ্রেস পুনর্গঠন করে আমি তার সেক্রেটারীর পদে মনোনীত হই এবং আমাদের বিপ্লব-সমিতির অনেক সদস্য কার্য্যকরী সমিতির সদস্য হন। কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনবার জন্য মে মাসে জিলা কন্‌ফারেন্স, ছাত্র কন্‌ফারেন্স, যুব কন্‌ফারেন্স প্রভৃতির আয়োজন করি। মহিলা কন্‌ফারেন্স করবার জন্য কোন আয়োজন বা ইচ্ছা তখনও করি নি এমন সময় অসীম কলকাতা থেকে এল, সে এসে তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে মহিলা কন্‌ফারেন্স করবার জন্য আমাদিগকে খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আমি বললাম, "তোমরা যদি পার আয়োজন কর, আমার কোন আপত্তি নাই।" খুব উৎসাহের সহিত আয়োজন করতে লেগে গেল। এ বিষয় নিয়ে একদিন সে গণেশ, অনন্তলা'ল প্রভৃতির নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করতেই গণেশ তাকে মেয়েদের সঙ্গে মিশে বলে খুব একচোট তীব্র সমালোচনা করলে। অনন্তলালও অসীমের উপর খুব চটে গেল। মোটের উপর আমাদের সহকর্ম্মীদের মধ্যে কারও কাছ থেকে সে সহানুভূতি পেল না। এতে তার মন খুব দমে গেল। আমি তাকে নিরুৎসাহ করলাম না, যদি পারে চেষ্টা করতে বললাম। তার কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে সে মহিলা কন্‌ফারেন্সের আয়োজন করতে লাগল এবং কংগ্রেসের সভাপতি সম্পাদক এবং অন্যান্য নেতাদের মত করিয়ে নিল। কন্‌ফারেন্সগুলি খুব সফলতার সহিত শেষ হয়ে গেল। মহিলা কন্‌ফারেন্সের সভাপতি হলেন মিসেস লতিকা বোস।

এই কন্‌ফারেন্স উপলক্ষে মেয়েদের organise করা সম্বন্ধে যে তীব্র বিরুদ্ধ মন্তব্য অনন্তলাল—গণেশ প্রভৃতির কাছ থেকে শুনেছে তারপর আমার কাছে ছাড়া আর কারো কাছে বলার সাহস সে কি করে পাবে। সে যে-সব মেয়ের সঙ্গে মিশত, তাদিগকে সব কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত থাকতে বলেছিল, তারাও সব তার কথামত কন্‌ফারেন্সে যোগ দিয়েছিল। তখনও রাণীকে চিনতাম না কাজেই সে কন্‌-ফারেন্সে গেলেও চিনি নাই, চিনবার চেষ্টাও করি নাই, খেয়ালও করিনি কারণ তখনও ভাবি নি যে রাণী একদিন মায়ের কাজে নিজেকে নিঃশেষে বলি দেওয়ার জন্য আমার শরণ নেবে, এবং আমার কাছে আপনাকে পূর্ণভাবে সঁপে দেবে।

এই ৺পূজার ছুটির কয়েকদিন আগে চট্টগ্রাম কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। কমিটির কার্য্যকরী সমিতি দখল করা নিয়ে আমাদের মধ্যে এবং প্রবীণ দলের মহিমবাবুদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হয়। মহিমবাবুদের দল

অনেক গুণ্ডা ভাড়া করে সভা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করে, ফলে আমি এবং আমাদের পক্ষের কয়েকজন আহত হই, এ সব গুণ্ডামি। আমরা সভার কার্য্যকরী সমিতি গঠন করে যখন বাসায় ফিরছিলাম তখন উক্ত গুণ্ডারা রাস্তায় আমাদের পক্ষের ছেলেদের আক্রমণ করে লাঠি, ছোরা ইত্যাদি দ্বারা প্রহার করে। ইহাতে আমাদের পক্ষের কয়েকজন বালক ও যুবক গুরুতর আহত হয়। সুখেন্দু দত্ত নামে একটি কলেজিয়েট স্কুলের Class X-এর ছাত্র ছোরার আঘাতে গুরুতর ভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে প্রেরিত হয়। চট্টগ্রামে তার আরোগ্য হওয়ার আশা নাই দেখে তাকে কলিকাতা বেলগেছিয়া মেডিকেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই। পূজার ছুটির মধ্যেই সে সেখানে সকলকে কাঁদিয়ে ইহলোকের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে। ছোট ছেলে হলেও সে আমাদের বিপ্লব সমিতির একজন খুব ভাল সদস্যই ছিল। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক—সব দিকেই সে একটি আদর্শ ছাত্র ছিল, এই বয়সের মধ্যেই সে তার জীবনের আদর্শটি খুব ভালরূপেই বুঝেছিল এবং সেই আদর্শের জন্য নিজেকে সুন্দর ভাবেই তৈরি করেছিল। তার অকাল-মৃত্যুতে আমরা কংগ্রেসের কাজে যেতে গিয়ে যে অন্যায় করেছি তা বুঝতে পারলাম। বাজে কর্তৃত্বের জন্য দলাদলি করে এমন একটি সুন্দর পবিত্র মহৎ প্রাণ অকালে বিনষ্ট হয়ে গেল এই ভেবে আমরা কংগ্রেসের অসার কাজে না যেতে বিপ্লবের কাজের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে কৃতসংকল্প হলাম। আমাদের সদস্যেরা অনেকেই গুণ্ডাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে গেল। আমরা ছেলেদের এই বলে থামালাম যে আমাদের জীবনের লক্ষ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দেশের স্বাধীনতার চেষ্টা করা, আমরা যদি সাধারণ গুণ্ডাদের মেরে জেলে, ফাঁসিতে যাই তা হলে আমাদের আদর্শই নষ্ট হয়ে যাবে, সমিতিই ভেঙে যাবে, মোটের উপর সুখেন্দুর মৃত্যু আমাদিগকে শীগগির বড় রকমের একটা action-এ নেমে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে তুলল।

এ অবস্থায় রাণীর কথা, female organisation-এর কথা আমার মনোযোগ বিশেষ আকর্ষণ করতে পারল না, তবু অসীমকে আমি উৎসাহ দিতে ত্রুটি করলাম না। আমরা শীগগির action-এ নামতে চাই, একথা অসীমকে জানালাম না। ৺পূজার ছুটির পর সে কলকাতা চলে গেল। রাণীও ঢাকা চলে গেল। তার কয়েক মাস পরে রাণীর I. A. পরীক্ষা, পূজার ছুটির পর আমি এবং আমার চট্টগ্রামের সহকর্মীরা action-এর আয়োজনে যে ভাবে লেগে গেলাম তার মধ্যে কি রাণীর কথা কোথায় ডুবে গেল কে জানে? প্রায় ছয় মাস বিপুল আয়োজনের পর ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে, নেতারা সকলেই action-এ যোগ দেয়। ২২শে এপ্রিল জালালাবাদে ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত প্রায় আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী তুমুল যুদ্ধ হয় এবং অবশেষে ব্রিটিশ সৈন্য পালিয়ে যায়। সম্মুখ যুদ্ধে আমাদের ১২ জন নিহত হয়। জালালাবাদ যুদ্ধের পর পাহাড় থেকে সরে এসে আত্মগোপন করে থাকি।

প্রথম প্রথম মনে করেছিলাম এতগুলি সহকর্মী নিয়ে আত্মগোপন করা অসম্ভব, কিন্তু ধীরে ধীরে একটু একটু করে সম্ভব করে তুলতে লাগলাম। ইতিমধ্যে কালার পোল সংঘর্ষ হয়ে গেল। বাকী যারা রইলাম তারা সংগোপনে থেকে নিয়মিতভাবে সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করে সমিতির কাজ চালাতে লাগলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও action-এর বন্দোবস্ত করতে চেষ্টা করলাম, এভাবে কয়েক মাস থাকার পর এক দিন অপ্রত্যাশিতভাবে অনীতার খবর এসে পৌঁছাল, সে আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে যে আমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করতে চায়। আর action করবার জন্য তার প্রাণ খুব ব্যাকুল হয়েছে, তখন সে ৺পূজার ছুটিতে বাড়ী এসেছে, কয়েক দিন পর পর সে খুব তাগিদ দিয়ে পাঠাতে লাগল যে কোন রকমে আমার সঙ্গে তার দেখা না করলেই নয়। তখন আমরা চারদিকে সুন্দরভাবে communication established করে ফেলেছি। কাজেই খবর পাঠাতে বেশী অসুবিধা হচ্ছে না। তার কাছে কেউ যাওয়ার আগে সে নিজে তালাস করে link বের করেছে। বার বার খবর পেয়ে বুঝলাম অনীতা action করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে এবং সেজন্যই আমার সঙ্গে দেখা করে action-এর permission নিতে চায়। তার ধারণা ছিল যে আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকে সে convince করাতে পারবেই। এত খবর পেয়েও দেখা করার বন্দোবস্ত করলাম না। মনে করলাম শহর থেকে একজন মেয়ে অভিভাবকদের ফাঁকি দিয়ে কি করে গ্রামে এসে দেখা করবে, আর আসবার সময় যদি কোন spy টের পেয়ে অনুসরণ করে তা হলে নিজেরাও হয়ত ধরা পড়ে যাব। তা ছাড়া অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়া যদি আসে তা হলে মেয়ের খোঁজে শহরটা হয়ত তোলপাড় করবে। এসব নানা কথা ভেবে দেখা করার চেষ্টা করলাম না, তবে তাকে আশ্বাস দিয়ে খবর পাঠালাম যে সুযোগ পেলেই দেখা করব। সে যেন অস্থির হয়ে মাথা খারাপ না করে, ধীরে ধীরে action-এর জন্য নিজকে তৈরি করে। শহরে তার সঙ্গে সমিতির নিয়মিত link যেন থাকে তার ব্যবস্থা করে দিলাম। সে কতকগুলি সোনার অলঙ্কার এবং টাকা সমিতির জন্য চাঁদা-স্বরূপ পাঠিয়ে দিল। আমার সঙ্গে তার দেখা করার প্রবল আকাঙ্ক্ষার কথা জেনে মুগ্ধ হলাম। মনে হ'ল মেয়েটি নিজের জোরেই

নিজে অনেক এগিয়ে এসেছে। কারও সাহায্যের বিশেষ দরকার হয়নি। এ যে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ফল তা বুঝতে পারলাম। দেখা করতে খুবই ইচ্ছা হ'ল কিন্তু নানা অসুবিধার কথা ভেবে তখন করলাম না, শহরে তার সঙ্গে যাদের link করে দিলাম তাদের দিয়ে জেলের ভিতর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামীদের কাছেও তার খবর গেল। তারা তার আগ্রহের কথা শুনে তার সাহায্য নিয়ে কলকাতা থেকে Dynamite Conspiracy-র জন্য অনেক জিনিষ আনাবার ব্যবস্থা করল। সে একটুও বিরক্তি না করে সম্মত হয়ে গেল। জেলের ভিতরের সহকর্মীরা অনীতার সাহায্য নেওয়া বিষয়ে আমার মত চাহিলে আমি ইতস্তত: না করেই মত দিলাম। অনীতা কলকাতা গিয়ে দরকারী জিনিষ সব কৃতকার্য্যতার সহিত নিয়ে এল, এদের তার ওপর বিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। জেলের ভিতর পাঠাবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র টাকা শহরে তার charge-তেই রাখলাম। ওর কাছ থেকে জিনিষ নিয়ে ভিতরে পাঠাবার বন্দোবস্ত হ'ল।

১৯৩১ সালে অনীতা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী এল, আবার আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। অনীতার আকুল আগ্রহ দেখে আমার রাণীর কথা মনে হ'ত, ভাবতাম অসীম আমাকে রাণীই যে তার Recruit-দের মধ্যে সবচেয়ে ভাল বলে বলেছিল, অথচ তার সবচেয়ে পরের Recruit এত এগিয়ে এসেছে অথচ রাণী কোথায় গেল, রাণীর কোন খবর পাচ্ছি না। অবশ্য রাণীর কোন খবর নিতে একটুও মিই নি কারণ female-দের উপর তখনও বেশী আশা করি নি আর খবরই বা নেব কি করে ?

গ্রীষ্মের ছুটির শেষ দিকে আমার খেয়াল হ'ল যে অনীতার সঙ্গে পরিচয় করে আমাদের (অর্থাৎ absconder-দের) সঙ্গে তার পরিষ্কার link করে রাখা দরকার। কারণ তার কাছে machine ও টাকা রয়েছে। Link না থাকলে জিনিষগুলো আমাদের দরকারের সময় আনাব কি করে ? বিশেষত: ইতিমধ্যে অনীতাকে I. B.-রা খুব সন্দেহের চোখে দেখছে, তাকে চোখে চোখে রেখেছে, খুব সম্ভবত: তখন চট্টগ্রাম জেলের মধ্যে রিভলবার, বোমা, ইলেকট্রিক তার, guncotton, ছোরা প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষ অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আসামীরা বার থেকে নিয়ে স্তূপীকৃত করেছিল, Jail outbreak-এর উদ্দেশ্যে তা সব হঠাৎ জেল কর্তৃপক্ষ আবিষ্কার করে ফেলেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেন্ট বাইরের যে সব ছেলের through-তে আমাদের সঙ্গে অনীতার communication চলত তাদের সবকে ordinance-এ গ্রেপ্তার করে জেলে বন্দী করেছে। এ অবস্থায় অনীতার সঙ্গে আমার দেখা করা খুবই দরকার বলে মনে হ'ল। তাই নির্ম্মলবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে খুব সাবধানে তার সঙ্গে দেখা করার বন্দোবস্ত করলাম। সে ত খবর পাওয়া মাত্রই উড়ে আসতে রাজী, কিন্তু তার মত rash হলে ত আমাদের চলবে না, তাই যতদূর সম্ভব নিরাপদভাবে তার সঙ্গে দেখার বন্দোবস্ত করলাম। এই প্রথম মেয়ে সদস্যের সঙ্গে আমার দেখা করা।

বর্ষাকাল, সারাদিন মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। পথঘাট জলে কাদায় ভরা। রাত প্রায় ৯টার সময় দু'জন ছেলে অনীতাকে গ্রামের পথ ঘুরিয়ে প্রায় দুই মাইল পথ হাঁটিয়ে একটি বাড়ীতে নিয়ে এল। কি জল কাদার ভিতর দিয়েই না তাকে আসতে হয়েছে। আমি আর নির্ম্মলবাবু তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সে যখন এল তখনও ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ছিল। এসে আমাকে আর নির্ম্মলবাবুকে প্রণাম করে সে বসল। দেখলাম কাপড়চোপড় জলে ভিজে গেছে। কিন্তু মুখে একটুও ক্লান্তির চিহ্ন নাই। আমাদের সঙ্গে দেখা হবে সেই আনন্দেই সে বিভোর ছিল। আমি আর নির্ম্মলবাবু তার সঙ্গে সব দরকারী কথাগুলি বললাম। কিভাবে কার through-তে আমাদের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ থাকবে বললাম, machine কেমন handle করতে পারে পরীক্ষা করলাম ইত্যাদি। তাকে আবার শেষ রাত্রেই বিদায় দিতে হবে। কাজেই আমাদের যা বলার সব শেষ করে তাকে আবার ছেলেদের সঙ্গে করে শহরে পাঠিয়ে দিলাম যাতে সে ৯টা ১০টার ভিতরেই শহরে পৌঁছতে পারে। যাওয়ার সময় আরও জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। যাওয়া-আসার সময় এত কাদায় মধ্যে সে একটা আছাড়ও খায় নি। এক দিনেই তার মনের জোর, শরীরের জোর, action করবার প্রবল ইচ্ছা ও ত্যাগ-স্বীকার, কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা, অভিভাবক অগ্রাহ্য করে যখনই ডাক পড়বে তখনই চলে আসা ইত্যাদি গুণগুলি আমাদের চোখে ভেসে উঠল। অনীতার সঙ্গে কথায় কথায় রাণীর কথা জিজ্ঞাসা করলাম, সে বলল রাণীর সঙ্গে তার খুবই পরিচয় আছে। সে পড়াশুনায় খুব ভাল, পড়া নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে এবং মা বাপের খুব বাধ্য। সমিতির প্রতি রাণীর টান কি পর্য্যন্ত আছে তা সে জানে না, ওর কথা শুনে আমি রাণী সম্বন্ধে একটু নিরাশ হয়ে গেলাম। অনীতার এত উন্নতি দেখে এক একবার মনে হচ্ছিল রাণী ত আরও এগিয়ে আসার কথা। কারণ অসীম তাকে সব মেয়ের চেয়ে ভাল বলে আমাকে বলেছিল। অনীতার কথায় মনে হয়, বোধ হয় guidance-এর অভাবে রাণী পেছিয়ে পড়েছে। অনীতারই যে রাণীকে বুঝতে ভুল হয়েছে একথা একবারও মনে হ'ল না। কিন্তু রাণীর সঙ্গে মিলে শেষে বুঝেছি যে অনীতা বাহিরের থেকে দেখে রাণীর ভিতরের ভাব মোটেই ধরতে পারে নি। সে সমিতির কাজ করার জন্য কত ব্যাকুল

হয়েছিল মোটেই বুঝতে পারে নি। যখন অনীতা রাণী সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য দিচ্ছিল তার বহু আগে থেকে রাণী আমার সঙ্গে দেখা করার জন্ত অতি ব্যগ্র হয়েছিল।

যাক্ অনীতা সেই ঝড়ের রাতে কলকাতা ভেঙে আবার বাড়ী ফিরে গেল। তার পরে অন্ত ছুটিতেও তার সঙ্গে আরও দু-এক বার দেখা হয়েছে। তখন অনীতা চট্টগ্রাম কলেজে পড়ছিল। রাণীর খবর আগের চেয়ে ভাল কিছুই বলল না। কাজেই রাণীর সঙ্গে আমার দেখা করার ইচ্ছা হওয়ারও কোন কারণ ঘটল না। রাণী অনীতার প্রায় দু'বছর আগে বিপ্লব সমিতির idea পেয়েছে এবং নিজকে ক্রমেই উপযুক্ত করে তোলবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। অনীতার সঙ্গে আমাদের যেবার প্রথম দেখা হয় তখন রাণীও চট্টগ্রামে ছিল। রাণীর সঙ্গে অনীতার বেশ বন্ধুত্ব ছিল। রাণী বুঝতে পারছিল যে অনীতার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে। বুঝে সে মরমে মরে যাচ্ছিল। তার ভিতরে দেখা করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অথচ তার সঙ্গে কারও proper link নেই সে কি করে আমাদের কাছে খবর পাঠাবে? তার আগে যখন অনীতা বিপ্লবের কাজের অনেক জিনিষ আনতে কলকাতা গিয়েছিল তখন রাণীর হোষ্টেলে গিয়ে রাণীর একজন মেয়ে-বন্ধুর সাহায্য নিয়েছিল এবং একা এত জিনিষ নিয়ে আসা অসম্ভব বলে তাকে সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রাম এসেছিল, এই মেয়েটিকেও অসীম দলভুক্ত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু একটু-আধটু sympathise করা ছাড়া আর কোন কিছু করতে সে রাজী নয়। এত backward একটি মেয়েকে অনীতা সাহায্যকারিণী হিসাবে নিল অথচ রাণীকে বললই না দেখে রাণীর মনে খুব দুঃখ হ'ল। অনীতার সঙ্গে তার introduction-ও নেই, তাই মুখ বুজে দুঃখ সহ্য করা ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না।

১৯৩১ সালের ৺পূজার ছুটিতে রাণী বাড়ী এসে অনীতার সঙ্গে দেখা করে। এবার রাণী সঙ্কল্প করে এসেছিল যে অনীতাকে প্রাণ খুলে সব বলে আমার (মাষ্টারদার) সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করবে। রামকৃষ্ণের ফাঁসির আগে তার সঙ্গে জেলে যে একবার দেখা করেছে, একথা এবার প্রথম অনীতাকে বলল। এবারও অনীতা ভুল করল, অনীতার ধারণা হ'ল রাণী মাষ্টারদা ছাড়া আর কারও সঙ্গে দেখা করবে না। ৺পূজার ছুটির সময় আমি নির্ম্মলবাবুকে এক জায়গায় রেখে অন্ত জায়গায় চলে গেলাম। সেই বন্ধে আমি অনীতার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। নির্ম্মলবাবুর সঙ্গে ওর দু'-তিন বার দেখা হ'ল। অনীতা নির্ম্মলবাবুকে বলল, "প্রীতি রামকৃষ্ণদার সঙ্গে জেলে অনেক বার দেখা করেছে। সে ভালই আছে। তবে রামকৃষ্ণদা তাকে বলেছে মাষ্টারদা ছাড়া আর কারও সঙ্গে দেখা না করার জন্ত। তাই সে মাষ্টারদার সঙ্গেই দেখা করতে চায়। একথা শুনে নির্ম্মলবাবু আর রাণীর সঙ্গে দেখা করার বন্দোবস্ত করল না। অনীতা বাস্তবিক রাণীর কথা ভুল বুঝেছিল। রাণী চার বৎসর আগে যেদিন প্রথম বিপ্লব সমিতির idea পায় সেদিনই আমার নাম শুনেছিল এবং আমাকেই সমিতির leader বলে জানত। তাই স্বভাবতঃই সে আমার সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছিল। কিন্তু তাই বলে অন্ত absconder-এর সঙ্গে সে যে দেখা করবে না এই ধারণা তার ছিল না। অনীতার ভুল representation-এর জন্ত এবারও সে আমাদের কাহারও সঙ্গে দেখা করতে পারল না।

১৯৩১ সালের ১লা ডিসেম্বর যখন চট্টগ্রামে প্রায় এক হাজার অতিরিক্ত সৈন্তের আমদানী হ'ল, গ্রামে গ্রামে যখন সাঁজ-বাতির অ'দেশ দেওয়া হ'ল, গ্রামে গ্রামে যখন অতিরিক্ত সৈন্ত আমদানী হতে লাগল তখন নির্ম্মলবাবু যেখানে ছিলেন সেই জায়গা ছেড়ে আমার সঙ্গে এসে একত্র হলেন। এসে আমাকে বললেন, রাণী বলেছে সে আপনার সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গে দেখা করবে না। আমি তার সঙ্গে দেখা করিনি। আমি বললাম বোধ হয় সে কথা ঠিক নয়। রাণী হয়ত আমার কথাই অসীমের কাছ থেকে শুনে এসেছে সেজন্ত আমার কথাটি বলেছে। তা বলে আপনার সঙ্গে যে সে দেখা করতে চাইবে না তা ত আমার মনে হয় না। আপনার দেখা করে নেওয়াই উচিত ছিল, বিশেষতঃ সে যখন ফাঁসির আগে জেলে রামকৃষ্ণর সঙ্গে দেখা করেছে তখন তার সমিতির কাজের প্রতি নিশ্চয়ই খুব টান বেড়েছে। নির্ম্মলবাবু বললেন, "সে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্ত বড়দিনের বন্ধে নিশ্চয়ই চট্টগ্রাম আসবে। তখন আপনি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবেন।" আমি বললাম দেখা করবার খুব ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু চারদিকে পুলিস ও সৈন্তের যা তোড়জোড় এ অবস্থায় নড়াচড়াই ত অসম্ভব। কাজেই ইচ্ছা থাকলেও দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নাই, বাস্তবিক তাই হ'ল, ১৯৩২ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত না নড়েচড়ে এক জায়গায়ই থেকে যেতে হ'ল। রাণী এসেছে কি না এসেছে সে খবর পর্য্যন্ত পেলাম না। খবর পেলে এত অসুবিধার মধ্যে দেখা করতে পারতাম কিনা তা এখন ঠিক বলতে পারছি না। অথচ শেষে জানলাম, test পরীক্ষার পর পুরোপুরি জানুয়ারী মাসটা সে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য চট্টগ্রামেই কাটিয়ে গেছে। অনীতাকে কত অনুরোধ করেছে। কিন্তু অনীতাও তখন আর আমাদের কোন খোঁজ পায় নি। কাজেই রাণী ক্ষুণ্ণ মনে কলকাতা ফিরে গেছে। মার্চ্চ মাসে সাঁজ-বাতির আদেশ শিথিল হয়ে গেলে, সৈন্যের তোড়জোড় একটু কমে গেলে আমি আর নির্ম্মলবাবু একটু নড়তে চড়তে আরম্ভ করলাম, সমিতির খোঁজখবর নেওয়া, বিশৃঙ্খলা দূর করে আবার শৃঙ্খলা করা ইত্যাদি

কাজের জন্য খুব দ্রুত একটা tour দিয়ে নির্মলবাবুকে এক জায়গায় রেখে আমি অন্য জায়গায় চলে গেলাম। এপ্রিলের শেষের দিকে অথবা মে মাসের প্রথম দিকে রাণী বি. এ. পরীক্ষা শেষ করে চট্টগ্রাম নিজেদের বাসায় এল, এসেই অনীতাকে আরও পরিষ্কার করে বলল। যে কোন absconder-এর সঙ্গে সে দেখা করতে চায়। এবার অনীতা রাণীর আগ্রহ বুঝতে পেরে তাকে সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ একদিন রাত্রে গ্রামে এসে উপস্থিত হয়ে link-এর throughতে তাদের আসার খবর জানিয়েছে। আমি কাছে ছিলাম না। নির্মলবাবু রাত একটায় সে খবর পেয়ে অনেক পথ হেঁটে তাদের সঙ্গে শেষ রাত্রে আধ ঘণ্টার জন্য দেখা করে। কারণ দেখা করে বুঝল যে, তারা বিশেষতঃ অনীতা বাসার situation খুব খারাপ করে চলে এসেছে। পরদিন সকালবেলা ফিরে না গেলে একটা ভীষণ গোলমাল হতে পারে। তাই নির্মলবাবু আধ ঘণ্টা মাত্র কথা বলে তাদের শহরে ফিরে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিল। রাণী আমার সঙ্গে দেখা করার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করাতে নির্মলবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করল, "এক সপ্তাহের জন্য সে বাসা থেকে আসতে পারবে কি? তা হলে মাষ্টারদার সঙ্গে দেখা করতে পারবে।" যাক্ অল্পক্ষণ দেখা করার পর অনীতা ও রাণী চলে গেল।

অল্প কয়েকদিন পরেই নির্মলবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হতেই নির্মলবাবু আমায় বলল, "আমি রাণীকে কথা দিয়েছি আপনার সঙ্গে দেখা করাব, সে এক সপ্তাহের জন্য যে কোন জায়গায় আসতে রাজী আছে। রামকৃষ্ণের সঙ্গে সে ফাঁসির আগে দেখা করেছে শুনেই তার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা হয়েছিল। তার দেখা করার ব্যাকুলতা শুনে রাজী হলাম এবং কয়েক দিনের মধ্যে (মে মাসের শেষের দিকে) তাকে আনবার ব্যবস্থা করলাম।

পরীক্ষা সংস্কার

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষা-পদ্ধতি যে উৎকৃষ্ট নয়, এ ত মামুলি কথা। আমাদের প্রচলিত পরীক্ষার ফলাফল থেকে ছেলেদের বুদ্ধিবৃত্তির সঠিক পরিমাপ যে হয় না, এ কথাও বহুদিন থেকে শুনে আসছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রতিকারের উপায় কিছু স্থির হয়নি।

প্রাচীন আমলে পরীক্ষা শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ হয়ে থাকলেও এমন একটা কিছু বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না যাতে করে পরীক্ষাকেই তখন শিক্ষার শ্রেষ্ঠ অংশ বলে গণ্য করা হ'ত। এখন কিন্তু পরীক্ষাই আমাদের শিক্ষার প্রধান অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা পরীক্ষা পাস করার জন্যই ব্যস্ত, জ্ঞান অর্জ্জন যাই হোক না কেন। আমাদের আজকালকার ছেলেরা মুখ্য (Important) অংশগুলি দাগ দিয়ে পাঠ্য বই পড়ে। এমন কি যে শিক্ষক মুখ্য অংশগুলি দাগিয়ে না দেন, তিনি সাধারণতঃ ছেলেদের নিকটও উৎকৃষ্ট শিক্ষক বলে গণ্য হন না। ছেলেরা এ কথা বলে গর্ব্ব করে, 'অমুক মাষ্টারমশায় যা দাগিয়ে দেন, তা পরীক্ষায় আসবেই।' তাঁর পাঠন-নৈপুণ্যের প্রশংসা তাদের মুখে ধরে না। এতে এইটুকুই প্রমাণ হয় যে, ছাত্রেরা প্রকৃত শিক্ষা চায় না, চায় পরীক্ষা পাস করতে। অবশ্য যাঁরা পড়ার ক্রম নির্দ্দেশ করে দেন, ছাত্রদের এই মনোবৃত্তির জন্যে তাঁরাও কম দায়ী নন। এত বেশী পাঠ্য জিনিষ ছেলেদের গলাধঃকরণ হয় যে সেগুলো তারা সহজে হজম করে উঠতে পারে না। এতে করে তাদের স্বাধীন চিন্তা করার ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। তারা বাজারে প্রচলিত বোধিনী বা অর্থপুস্তক-প্রণেতাদের তৈরি 'জ্ঞাতব্য-বটিকা' নির্ব্বিচারে গিলতে বাধ্য হয়, কিন্তু তা না করেও তাদের উপায় নেই। স্কুলের নববর্ষ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাসিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষার চাপে ছেলেদের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পাঠ্য-বিষয়ের সঙ্গে ভাল করে পরিচয় হতে না হতেই অমনি সুরু হয় পরীক্ষার ঠেলা। ফলে পরীক্ষাটা ছেলেদের কাছে একটা রীতিমত ভীতির জিনিষ হয়ে দাঁড়ায়।

এই পরীক্ষা-বিভীষিকা ছাত্রসমাজের উৎসাহ ও উদ্যমকে দমিয়ে দিচ্ছে। তারা শিক্ষার মধ্যে কোন আনন্দ পাচ্ছে না, বরং অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুন প্রতি পরীক্ষাতে প্রত্যেক ছাত্রের শরীরের রক্ত জল হচ্ছে। পরীক্ষার চাপে ও আতঙ্কে ছাত্রদের, বিশেষ করে ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক অবসাদ ও গ্লানি ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং এক শ্রেণীর ছাত্র এই পরীক্ষা পাসের জন্য অসাধু উপায়ও অবলম্বন করছে, আবার কারও কারও মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু এই পরীক্ষা পাস করেই বা লাভ হয় কি? ছাত্রেরা পরীক্ষা পাস করতে করতে প্রবেশিকার দ্বারে প্রবেশলাভের

সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষীণদৃষ্টি, ভগ্নস্বাস্থ্য ও উৎসাহ-উদ্যমহীন হয়ে পড়ে। ফলে বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া আমাদের ছেলেরা বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারছে না। একদা লর্ড হার্ডিঞ্জ সরকারী চাকরিতে প্রবেশাধিকারের নিমিত্ত ছাত্রদের যে পরীক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেছিলেন, আজ তাই দেশে অগণিত বেকারের সৃষ্টি করছে। আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির মূলে ছিল প্রয়োজনের তাগিদ—প্রয়োজন অবশ্য দেশের নয়, বিদেশের। দেশ এখন স্বাধীন। আশা করা যায়, অচিরেই দেশের সংস্কৃতি, অতীত সভ্যতা ও আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার-সাধন করা হবে, তখন পরীক্ষার ধারাও নিশ্চয়ই বদলে যাবে।

এখন পরীক্ষা যদি এত অনর্থের সৃষ্টি করে থাকে, তা হলে ত পরীক্ষা-পদ্ধতি উঠিয়ে দেওয়াই ভাল, কেউ কেউ হয় ত বলবেন যে সত্যি কথাই ত, পরীক্ষা যদি উপকারেই না এল, তা হলে তার প্রয়োজন কি? একেই ত জীবনে পরীক্ষার অন্ত নেই;—তার উপর জীবনের প্রারম্ভকালেই ছাত্রদের কাঁধে দুর্ব্বহ পরীক্ষার বোঝা চাপিয়ে লাভ কি? আমাদের স্কুলের ছোট-খাটো পরীক্ষাগুলিকে জীবনের বড় পরীক্ষাগুলির সমপর্য্যায়ভুক্ত করা যায় কি না তা নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজন নেই। কিন্তু নানা কারণে স্কুলের পরীক্ষা যে উঠিয়ে দেওয়া চলে না একথা আমাদের মেনে নিতেই হবে। যে শিক্ষকমশায় সারা বছর প্রাণপাত পরিশ্রম করে পড়ালেন ছাত্রেরা তার দ্বারা লাভবান হ'ল কিনা, এটা পরখ করার অধিকার তাঁর নিশ্চয়ই আছে। ছাত্রের দিক থেকেও সারা বছর অধ্যয়নের পর তার বুদ্ধিবৃত্তির কিছু উৎকর্ষসাধন হ'ল কিনা, বিষয়বস্তু সে ঠিকমত অধিগত করতে পারলে কিনা, ভালমন্দের বিচারশক্তি তার বাড়ল কিনা, রসবোধ কতটুকু হ'ল ইত্যাদি যাচাই করে দেখারও প্রয়োজনীয়তা আছে।

তা ছাড়া বর্ত্তমান হুজুগের যুগে পড়াশুনায় ছেলেদের বিশেষ গাফিলতি দেখা যাচ্ছে। আজ 'অমুক দিবস' প্রতিপালন, কাল অমুকের উপর অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতিবাদে মিছিল, পরশু ছাত্র-কংগ্রেসের সভা,—এ তো লেগেই আছে। অবশ্য ছাত্র-জাগরণ যে দোষের, এমন কথা বলছি না। ছাত্রদের দেশের সকল সমস্যা সম্বন্ধেই সজাগ ও সতর্ক থাকা সত্যিকারের প্রয়োজন। যাই হোক, তাই বলে পড়াশুনায় তাদের অমনোযোগী হওয়াও কাজের কথা নয়। এটা মন্দের ভাল যে পরীক্ষার চাপে অন্ততঃ কতকগুলি ছাত্রকে রীতিমত পড়াশুনার দিকে মন দিতে হয়, একটা সুস্থ প্রতিযোগিতার ভাবও যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে না জেগে উঠে তা নয়। পরীক্ষায় ফেল হলে বা উপযুক্ত সাফল্যলাভ না করলে আত্মসম্মানের হানি হয়, বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে হয়, মাতাপিতার বিরাগভাজন হতে হয়—এসব কারণে অন্ততঃ কিছু না কিছু পড়াশুনা না করলে ছাত্রদের চলে না।

কাজেই পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মতানৈক্য থাকতে পারে না। কিন্তু এই পরীক্ষা-প্রণালী কিরূপ হবে সেইটেই হচ্ছে সমস্যা। আমাদের পরীক্ষাতে সচরাচর যে ধরণের প্রশ্নপত্র দেওয়া হয় তার উদ্দেশ্য হ'ল ছাত্রেরা কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যা জানে তার কিছু কিছু লিখবে—এতে লেখার অভ্যাস বাড়ে, ভাষাশিক্ষারও সহায়তা হয়। কিন্তু ছেলেরা ভাষা সুষ্ঠুরূপে বলতে পারে কিনা সে বিষয়ে পরখ করা হয় না। ক্লাসের দিকের নীচের oral examination বা মৌখিক পরীক্ষা থাকে বটে, কিন্তু তার পদ্ধতি উচ্চাঙ্গের নহে, আর উপরের ক্লাসের তো সে ব্যবস্থা আদৌ নেই। কাজেই প্রচলিত শিক্ষায় ছেলেদের সুষ্ঠুভাবে এবং শুদ্ধভাবে ভাষা 'বলা'র ক্ষমতা কতখানি বাড়ল তা বুঝবার কোনও উপায় নেই। অথচ মজা এই যে, প্রতিযোগিতামূলক প্রাদেশিক পরীক্ষাগুলিতে এ পর্য্যন্ত মৌখিক ও লৈখিক দুই প্রকারের পরীক্ষা-পদ্ধতিই অনুসৃত হচ্ছে। মৌখিক পরীক্ষাতে (*viva voce*) আমাদের ছাত্রেরা আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারছে না। এজন্যও দায়ী আমাদের পরীক্ষা-পদ্ধতি।

বর্ত্তমানে পরীক্ষা-গ্রহণের যে ব্যবস্থা প্রচলিত তাতে করে শিক্ষাদ্বারা ছাত্রের মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির কতটুকু বিকাশসাধন হ'ল তা প্রকৃতভাবে পরিমাপ করা যায় না, ফলতঃ এই পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রকৃত শিক্ষার পরিপন্থী। আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যাতে তার দ্বারা প্রত্যেকটি ছাত্রের শুদ্ধভাবে ভাষা লিখন ও কথনের ক্ষমতার কতখানি উৎকর্ষসাধন হয়েছে তা বুঝতে পারা যায়; কারণ ভাষা-শিক্ষা এরূপ হওয়া উচিত যেন ছেলেরা প্রাঞ্জল ভাবে লিখতেও যেমন পারে, কথার ভিতর দিয়েও তেমনি যেন সুষ্ঠুভাবে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করতে পারে।

আমাদের প্রশ্নপত্র সম্বন্ধে আলোচনা করলে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, সামগ্রিকভাবে বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন আমরা করি না। কাজেই দেখা যায়, কতক বাদসাদ দিয়ে পড়ে যখন এক ছেলের পক্ষে পরীক্ষায় ভাল ফল করা সম্ভবপর হয়, তখন আর একজন সমস্ত বিষয়বস্তু অধিগত করেও পরীক্ষাতে ভাল করতে পারে না। পরীক্ষাটা যেন কতকটা লটারীর মত। ছাত্রেরা বাদসাদ দিয়ে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর চোস্ত করে মুখস্থ করে রাখলে আর তন্মধ্যে দু'চারটি পরীক্ষার উত্তরপত্রে উদ্গীরণ করতে পারলেই ব্যস—অমনি কেল্লা ফতে।

তার পর খাতা দেখার সময় বিভিন্ন পরীক্ষক একই বিষয়ের পরীক্ষার খাতার বিভিন্ন রকমের নম্বর দেন। এমন কি এক

পরীক্ষককেও বিভিন্ন সময়ে একই খাতার উপরে ভিন্ন রকমের নম্বর দিতে দেখা যায়, কাজেই নম্বর দেওয়ারও কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই।

প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক নির্ব্বাচনও ঠিকমত হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কলেজের অধ্যাপকেরাই প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক নিযুক্ত হন। অধ্যাপকবৃন্দের বিদ্যাবত্তা এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে স্কুলের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকায় সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি যে ঠিক কতটুকু তা তারা বুঝে উঠতে পারেন না। মনে হয়, স্কুলের শিক্ষকদের মধ্য থেকে কিছু কিছু প্রশ্নকর্তা এবং অধিকসংখ্যক পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হলে এ সমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হতে পারে। তা ছাড়া বর্ত্তমান পরীক্ষাবিধিতে পাস ও ফেলের মধ্যে যে সীমারেখা বিদ্যমান তা এত অযৌক্তিক যে বিচারবুদ্ধির দ্বারা তা সমর্থন করা যায় না। যেখানে একটি ছাত্র শতকরা ৩০ নম্বর পেয়ে পাস করে, সেখানে আর একটি ছাত্র কেন যে শতকরা ২৯·৫ বা ততোধিক নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও ফেল করে এ রহস্য বুদ্ধির অগম্য। পাস-ফেলের এই সূক্ষ্ম গাণিতিক হিসাবের তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন। পরীক্ষার বেদীমূলে কি ভাবে যে ছাত্রদের সময় ও শক্তির অপচয় হচ্ছে এটা তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এই সব ত্রুটি দূর করার জন্তে আমাদের পরীক্ষাতে Intelligence Test বা বুদ্ধিবৃত্তি-পরিমাপ-পদ্ধতির প্রচলন করা প্রয়োজন। এতে প্রশ্নের সংখ্যা থাকবে বেশী—যা আংশিক ভাবে নয়, সমগ্র বিষয়বস্তু থেকে দেওয়া হবে এবং নম্বর দেওয়ার জন্তে পরীক্ষককেও বেগ পেতে হবে না। কারণ 'হাঁ' কিংবা 'না'—এই হবে উত্তর। যদি প্রশ্ন করা যায় শরৎ চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের আগে না পরে। মাত্র একটি উত্তরই সম্ভবপর। উত্তর ঠিক হলে পরীক্ষককে পুরা নম্বরই দিতে হবে এবং উত্তর ভুল হলে ছাত্র আদৌ নম্বর পাবে না। তা ছাড়া প্রশ্নপত্র এমন ভাবে তৈরি করা উচিত যার সুষ্ঠু উত্তর দিতে হলে পরীক্ষার্থীদের মূল বইগুলিকে ভাল ভাবে পড়তে হবে আর তাদের মৌলিক চিন্তাশক্তিকে বৃদ্ধি করার প্রয়াস পেতে হবে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে অধিকাংশ ছাত্রের মূল পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় পর্য্যন্ত থাকে না, তারা পড়ে নোটবুক। তারা অধ্যয়ন করে না, করে গলাধঃকরণ এবং পরীক্ষার খাতায় তা উদ্গীরণ করে নিশ্চিন্ত হয়। শিক্ষক মশায়দেরও বড় বেশী দোষ দেওয়া যায় না। পাঠ্যতালিকা ও কারিকুলামের বহর এত বেশী যে তাঁদেরও ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে বিষয়বস্তু নিয়ে দৌড়-দৌড় চালাতে হয়, কারণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁদের স্ব-স্ব কোর্স শেষ করতেই হবে, ছাত্রেরা কিছু বুঝুক আর নাই বুঝুক। একে ত অধিকাংশ স্কুলেই বছরে তিনটে করে পরীক্ষা। তার জন্য প্রস্তুতি-ছুটি (Preparatory Leave) Revision Class ইত্যাদিতে বছরে তিন মাস কাটে। পাঁচ মাস গেল বন্ধ, বাকী থাকে ৪ মাস। এই চার মাসের ভেতর শিক্ষক মশায়কে তাঁর নিজের বিষয় শেষ করতেই হবে, নচেৎ প্রধান শিক্ষক এবং কমিটির নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

পরীক্ষা-সংস্কার করতে হলে সর্ব্বাগ্রে পাঠ্য পুস্তকের চাপ কমান দরকার। তার পর কিছু বাদসাদ না দিয়ে সমগ্র পঠিতব্য বিষয়-বস্তু থেকে প্রশ্ন দেওয়া উচিত। প্রশ্নের ধারা এমন হওয়া উচিত যাতে তার একটি মাত্র উত্তর হতে পারে। উত্তর এ-ও হয়, তা-ও হয় এমন ধরণের প্রশ্ন দেওয়া উচিত নয়। উপযুক্ত পরীক্ষক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অবহিত হওয়াও বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। সম্ভবপর হলে পরীক্ষাতে কিছু কিছু মৌখিক পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করা দরকার। পরীক্ষাতে যাতে ছেলেরা কেবলমাত্র মুখস্থ-বিদ্যার দ্বারাই পার না পেতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। তা হলে কিছু মৌলিক চিন্তা এবং কিছু নিজস্ব লেখার অভ্যাস হতে পারে। তা ছাড়া সর্ব্বোপরি এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে,

"Examination is a bad master but a good servant."

মেষ্টা পাট

শ্রীনীলিমা সিংহ

মেষ্টা পাট বিভিন্ন রঙের হয়—সাদা, সবুজ ও লাল। ইহার গাছ উচ্চতায় জবা গাছের মত হয়। পাতাগুলি একটু লম্বাটে ধরণের। এগুলির ফল লাল রঙের, ডাঁটাগুলি ঈষৎ লালচে। ইহার বহু নাম চলতি আছে—চুকো ফল, মেষ্টা পাট, লালঅম্বরী, বেতাল পাট (বাঁকুড়ার)। এই গাছ সাধারণতঃ একটু শুকনা জমিতে জন্মে। মানভূম, সিংভূম, ছোট নাগপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার কঙ্করময় অঞ্চলে ঈষৎ শুষ্ক জমিতে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ফলগুলি শীতের সময় পরিপক্ব হয়।

এই মেষ্টা পাটের গাছ আমাদের বিশেষ উপকারী। ইহা হইতে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা যায়। মেষ্টা পাট হইতে জেলি প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিতেছি

দেড় সের আন্দাজ মেষ্টা পাটের লাল পাপড়ি ছাড়াইয়া একটি কড়াইয়ে সের দেড়েক জল দিয়া উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। মেষ্টা যাহাতে গলিয়া না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। জ্বাল দেওয়া জল লাল হইলে ছাঁকা বাঁধিবার মত করিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া দিতে হয়। পরে দেড় সের চিনি তাহাতে দিয়া গলাইয়া লইতে হয়। ভালরূপে চিনি গলিয়া মিশিয়া গেলে উনুনে কড়াই সমেত চড়াইয়া নাড়িতে নাড়িতে যখন একটু একটু ঘন হয় তখন আঁচ হইতে নামাইয়া কাগজী বা পাতি লেবুর রস মিশাইয়া নাড়িতে হয়। সুগন্ধের জন্য এসেন্স (of vanilla or oranges) কয়েক ফোঁটা দিতে হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা চমৎকার জেলি তৈরি হয়। ঠাণ্ডা হইলে এই জেলি জমিয়া যায়। এই জেলি দেখিতে টকটকে লাল রঙের হয়, বিলাতী জেলিকেও হার মানায়। রুটি, লুচি বিস্কুট, টোষ্ট ইহার দ্বারা মাখিয়া খাইতে বেশ সুস্বাদু লাগে। গৃহস্থ-ঘরের বধূ ও কন্যারা এই জেলি তৈরি করিয়া দেখিতে পারেন। কলিকাতার বাজারে এই লাল রঙের মেষ্টা পাট কিনিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা আচারও তৈরি করা যায়। প্রথমে ইহা জলে সিদ্ধ করিয়া লাল রঙের জলটুকু ফেলিয়া দিতে হয়। তার পর কুলের আচারের মত ছিবড়েগুলোর সহিত সরিষার তৈল, লঙ্কা, ভাজা মশলার গুঁড়া, আখের গুড় ও পরিমাণমত লবণ মিশাইয়া রৌদ্রপক্ব করিয়া লইলে চমৎকার আচার প্রস্তুত হয়। মেষ্টা গাছের আর একটি উপকারিতা আছে—ইহা হইতে পাট হয়। ইহার তন্তু খুব শক্ত ও উজ্জ্বল সাদা রঙের, সেজন্য ইহার একটি নাম বেতাল পাট। এই পাট বাহির করিবার নিয়ম লিপিবদ্ধ করা হইল। গাছগুলি কাটিয়া আঁটি বাঁধিয়া জলাশয়ে জাগ দিতে হয়। পরে পাটকাচার মত কাচিয়া লইলেই ইহার পাট নির্গত হয়। ইহার সুতা খুব দৃঢ়। তাহা দ্বারা বস্ত্র ও দড়ি প্রস্তুত হয়। ব্যাপকভাবে ইহার চাষ সুরু হইলে দেশবাসীর লাভবান হইবারই সম্ভাবনা।

তুমি কেন এসেছিলে কবিতার সম

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কি জানি কি ভেবে বসি সুরে মালা গাঁথি
সেদিন হারালে তুমি প্রথম সরম,
যৌবন ফুলবনে আহ্বান পাতি
সেদিনের সমীরণে পেয়েছি পরম।
ত্রস্ত কপোতীসম দুরু দুরু বুকে
বিস্মিত আবেগের দিলে পরিচয়
কুসুমকপোল তব মোর অভিমুখে
প্রভাতী আলোর মত রাঙা মধুময়।
বিহান বেলায় কবে মোর ভীরু আশা
আশাবরী সুরে তব দিয়েছিল ধরা,
তুমি তারে বলেছিলে এই ভালোবাসা
প্রাণময়ী ভাষা নব আবেশেতে ভরা।
গেয়েছিলে গানখানি মোরে কাছে পেয়ে
নীড়ে নীড়ে বুলায়েছ মরমের মায়',
সেদিন দু'জনে বসে দূরপানে চেয়ে
দেখেছিনু অনাগত দিবসের ছায়া।

বঙ্কিম-কথা তব সর্পিল ভাবে
সুন্দর উপমায় অঙ্কন করি
ভাবি নাই কানে মোর তুমি যে শোনাবে
দুলায়ে দুলায়ে পথে প্রীতি-মঞ্জরী।
মোদের সমুখে ছিল বাঁকা প্রবাহিণী
সীমা নাই, শেষ নাই, উদাস উদার,
ভাঙাগড়া মন তার বহে একাকিনী
শ্যামায়িত প্রান্তরে প্রবাহ সুধার।
তখন কূজন করি গেয়েছিল পাখী
ঊষার উদয়-রাগে রাতের আড়ালে,
বাঁধিবারে অনুরাগে পুষ্পিত রাখী
চপল চরণপাতে দুবাহু বাড়ালে।

তুমি কেন এসেছিলে কবিতার সম
খেলা করিবার ছলে কত যুগ পরে!
স্বপনখোরার ধারা নেমে এলো মম
মিলনের মোহানায় ক্ষণ অবসরে।
হারাতে হারাতে দিন কত চলে যায়
কত যাওয়া কত আসা হেথা বারে বারে,
বিজলীর মত কেন ঘন আঁধিয়ায়
দেখা দিয়ে গেছ আজ দুরাশার পারে!
কেমনে ভুলিলে শেষে মোরে অনায়াসে
কত কথা ঘুমায়েছে বেদনায় ছেয়ে!
কুড়াতে কুড়াতে স্মৃতি চোখে জল আসে
শূন্য কুটীর পানে শুধু থাকি চেয়ে।
দুইটি হৃদয় যেন তরণীর মত
এ পারের ঘাটে মোর, ওপারে তোমার!
কালের বহিছে ঢেউ মাঝে অবিরত
ফিরে কি আসিবে কভু মিলন দোঁহার।

নওচণ্ডী বা নবচণ্ডী

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

ক'দিন থেকে সবার মুখে একই কথা শুনছি। "নওচণ্ডী আয়েগী তো হামলোগ ঘর যায়েঙ্গে।" ঝি-চাকরের মুখে একই কথা। যদি জিজ্ঞেস করি, "নৌচণ্ডী কিস্‌কা হ্যায়?" তবে বলবে, "মা-জী, ও ত নচণ্ডী হ্যায়, বহৎ তাজ্জব চীজ, বহৎ বড়ীয়া।" কাজেই একদিন এক প্রতিবেশিনীকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমাদের দেশের নচণ্ডী কি বল দিকিন।" তখন তিনি বললেন, "আহা নচণ্ডী কি তাও জান না? তবে বলি শোন। এই মীরাট শহর ছাড়িয়ে শহরের বাইরে হাপুরের দিকে যে রাস্তাটা গিয়েছে সেখানে প্রায় মাইল দুয়েক খোলা মাঠ পড়ে আছে। সেই বিস্তীর্ণ মাঠের সামনেই একদিকে একটি ছোট মন্দির, তাতে চণ্ডীদেবী স্থাপিত আছেন।" চণ্ডী-দেবীর মন্দিরের প্রায় বিশ-পঁচিশ হাত দূরেই মুসলমানদের বালমিঞার মসজিদ। মন্দিরে বলিদানের প্রথা নেই—মসজিদেও জবাই করা হয় না। ধর্ম্মঘটিত ব্যাপার নিয়ে কোন রকম বাদবিসম্বাদও চলে না। এই যে প্রকাণ্ড মাঠ তা দেবোত্তর সম্পত্তি। প্রতি বৎসর খুব ধুমধামের সহিত মেলা হয়—দোকান-পাট বসে। তাকেই বলে নওচণ্ডী।

হিন্দুরা বলে আমাদের চণ্ডীদেবীর জন্ত এই মেলা। মুসলমানরা বলে বালমিঞার জন্ত—তা যে কারণেই হোক মেলাটি দেখবার মত। দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ মন্দিরে যাচ্ছে, ফুল-বাতাসা নিবেদন করছে, আর প্রায় অষ্টপ্রহর চলছে ভজন। ২৫শে মার্চ্চ নচণ্ডী মেলা সুরু হ'ল। সকাল থেকে মাঝরাত পর্য্যন্ত রাস্তায় সাইকেল-রিক্সা, মোটর-টাঙ্গা অনবরত চলছেই। সাইকেল-রিক্সার আওয়াজ ও বিবিধ যানবাহনের শব্দে রাস্তা-ঘাট সারাক্ষণ মুখরিত। রাস্তায় অনবরত চলেছে যাত্রীর পর যাত্রী। নিকটবর্ত্তী শহর ও বিভিন্ন গ্রাম থেকে অতিথি-অভ্যাগত আত্মীয়-কুটুম্বেরা এসে গেছে নচণ্ডী দেখতে। এক সন্ধ্যায় আমরাও বেরিয়ে পড়লাম নচণ্ডীর উদ্দেশে। শহর ছাড়িয়ে টাঙ্গা বাইরের পথ ধরলে, এবার পিচের রাস্তা ছেড়ে বালুময় রাস্তা সুরু হ'ল। যাত্রী আর মোটরবাসের জন্ত পথ চলা দায়। দূর থেকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত ফটক দেখে বুঝা গেল নচণ্ডী এসে গেছি। অবারিত তোরণ-দ্বার দিয়ে দলে দলে লোক ভিতরে প্রবেশ করল। ঢোকবামাত্র প্রথমেই দু'ধারে নানা রকম ভাঁড়ামি ও পুতুলনাচ দেখা গেল। প্রত্যেকে যে যার তাঁবুর উপর বড় বড় ছবিওয়ালা প্ল্যাকার্ড লাগিয়েছে, প্রত্যেক তাঁবুতেই প্রচণ্ড শব্দে করতাল, ঢোল বাজছে, আর এক এক জন লোক মুখে চোঙা লাগিয়ে বলছে, "অরর অরর দু দু আনা টিকেট—আ যাও আ যাও" করতালের ঝমাঝম্ আওয়াজে কান ঝালাপালা। দু-তিনটে তাঁবুতে প্রমাণসাইজ নানারকম মূর্ত্তি গড়ে পুতুলের খেলা দেখানো হচ্ছিল। কোথাও বা মুখোস পরে লোকেরা নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে নাচছিল।

এই বিস্তৃত ময়দানে অসংখ্য দোকানপাট বসে গেছে—চারদিকে বৃত্তাকারে সারি সারি দোকান মাঝখানে চওড়া রাস্তা। সরকার নাকি এই মেলাতে বিশেষ লাভবান হন। যারা গরীব লোক, দোকান ভাড়া করবার সঙ্গতি যাদের নেই, তারা দু'ধারে মাটির উপরই বস্ত্রখণ্ড বিছিয়ে টুকিটাকি জিনিষ-পত্র নিয়ে বসে গেছে। বহুদূরস্থিত অঞ্চল থেকেও ব্যবসায়ীরা দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যসম্ভার নিয়ে এসে দোকান বসিয়েছে এবং বেশ পয়সা কামাচ্ছে। বোম্বাই, দিল্লী, বারাণসী, কলিকাতা, মাদ্রাজ, মহীশূর প্রভৃতি বহু স্থানের বিশিষ্ট পণ্যদ্রব্যের সমাবেশ হয়েছে এই নওচণ্ডীর মেলায়। দোকানগুলিতে আলোর খুব রোশনাই, বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত দোকানগুলির অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে—এ যেন ইন্দ্রপুরী, উজ্জ্বল নীল স্নিগ্ধ কিরণে ঝলমল করছে।

যাত্রীতে যাত্রীতে নওচণ্ডীর মেলাক্ষেত্র ভরে গেছে। যে দিকে চাওয়া যায় সেই দিকেই অগণিত নরমুণ্ড। ধনী, দরিদ্র, ছেলেবুড়ো, স্ত্রীপুরুষ কেউ বাদ যায় নি। লোকের ভিড়ে পথচলা দায়। কারুর মাথায় সাদা পাগড়ী, পরনে নোংরা ধুতি; কেউ পরেছে সাদা পাজামা, গায়ে রঙীন সার্ট; কেউ বা একেবারে পুরোদস্তুর সাহেবী পোশাকে সজ্জিত; কেউ বা পরেছে ধুতি পাঞ্জাবী; কারো বা পরণে ইরাণী ইজার, গায়ে লম্বা কোট; কারো মাথায় টুপী, কারো মাথায় পাগড়ী, কারো বা মাথা খালি। মেয়েদের মধ্যেও কত বৈচিত্র্য। কত রকমের, কত বয়সের বউ-ঝি, বালিকা, তরুণী, প্রৌঢ়া বৃদ্ধা, এখানে এসে জড়ো হয়েছে। তাদের বেশভূষারই বা বাহার কত! কেউ শাড়ী পরেছে সামনে কুঁচি দিয়ে অনেকটা ঘাঘরার মত। তার আঁচল সামনের দিকে। আলো পড়ে বারাণসীর জরীর আঁচল ঝিকমিক করে উঠছে। কেউ পরেছে হাল-ফ্যাসানের শাড়ী, পেছনে তার রেশমী আঁচল হাওয়ায় উড়ছে। কারও গায়ে কমলারঙের অথবা গোলাপী রঙের সালওয়ার পাঞ্জাবী, তার নীচে সরু জরীর পাড় বসানো। সুন্দর ফুর-ফুরে রঙীন বা সাদা ওড়না কালোচুল অর্দ্ধেক ঢেকে রেখেছে, তারই নীচে একবেণী বা দু'বেণী রেশমী ফিতায় আবদ্ধ হয়ে ঝুলছে, চোখে সুর্ম্মা আঁকা, ঠোঁটে টকটকে রং। কেউ বা পরেছে একেবারে সাদা শালওয়ার পাঞ্জাবী। মাথায় রেশমী ওড়না। অধিকাংশের কানেই লম্বা লম্বা সোনার দুল ঝুলছে।

দু-এক জনের কপালে শুধু সিন্দুরের কৌটা নতুবা বেশীর ভাগ মহিলারই কপাল নানা রঙের উজ্জ্বল টিপে সুশোভিত। আপাদ-মস্তক সাদা বোরখায় ঢাকা মহিলারও অভাব ছিল না—শুধু তাদের দু'চোখের সামনে জালিকাটা। তারই ফাঁকে বাইরের দৃশ্য দেখে দেখে তারা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কোন কোন মহিলা তাদের পোশাকের উপর কালো আলখেল্লা চড়িয়ে দিয়েছেন। মুখের উপর একটা কালো পর্দা ঝুলানো আছে, সময় সময় সেটা তাঁরা মাথার উপর তুলে রাখেন, আবার দরকারমত তাই দিয়ে মুখ ঢাকেন। তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ অনেকটা আরবদেশীয় বেদুইন মেয়েদের মত। গাঁয়ের মেয়েরা পরে এসেছে লাল কালো রঙের চুনট-করা ঘাঘরা। এদের কোনটার রং টকটকে লাল, কোনটা বা কুচকুচে কালো। ঘাঘরার নীচে চওড়া জরীর পাড় বা রেশমের পাড় বসানো। পায়ে মল, গায়ে রঙীন কুর্ত্তা আর ওড়না দিয়ে মাথা ঢাকা। তাদের চলার তালে তালে মল বাজছে ঝমাঝম্ আর চুনট-করা ভারী ঘাঘরার পাড় ঝিকমিক করছে, ভাঁজে ভাঁজে পাড়গুলো ঢেউ খেলে উঠছে নামছে। দেখতে বড় ভাল লাগছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরই বা পোশাকের কত রকমারি। এত ভিড়েও এটা লক্ষণীয় যে ধনী গরীব সকল শ্রেণীর মেয়েদের পোশাকই শালীনতা ও সুরুচির পরিচায়ক ছিল। সবার মুখেই বেশ একটা প্রসন্নতা। গৃহস্থ-পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ আর বালক-বালিকা-দের জীবনের সহজ আনন্দ ও তৃপ্তির ভাবটা বড় সুন্দর, বড় পবিত্র বোধ হচ্ছিল। লোকের এই ভিড়, সুন্দর মুখ, অসুন্দর মুখ, রকমারি পোশাক, বিচিত্র ভাষা —শুধু এসব দেখলেও নওচণ্ডীতে আসার পরিশ্রম সার্থক হয়। দোকান-পাট যেখান থেকে সুরু হয়েছে সেখানে প্রথমেই দেখা গেল গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য্য দরকারী জিনিষপত্র—রাশি রাশি কড়াই স্তূপীকৃত করা হয়েছে, দু'মণ তিন মণ জল বা অন্ন জিনিষ ধরে এমনি রাক্ষুসে কড়াই। তার আশেপাশে ছোট-বড়-মাঝারি বহু আকারের কড়াই। রাক্ষুসে কড়াইগুলির পাশে খুব ছোট খেলনা-কড়াই মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। হাতা, বেড়ি, খুন্তি, চালনি, ঝাঁঝরি, তালা-চাবি, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি যাবতীয় দরকারী লোহার জিনিষই দোকানে ছিল। পাশের দোকানে ছোট-বড়-মাঝারি নানা ধরণের বালতি, স্নানের টব, জল ধরে রাখবার বড় বড় পিপা—নানা ধরণের বিরাট বাক্স থেকে আরম্ভ করে অতি ক্ষুদ্র বাক্স পর্য্যন্ত ছিল। সেগুলো নানা রঙের ও সেগুলোর গায়ে বিচিত্র নক্সা তোলা।

চীনে মাটির দোকানে রাশি রাশি বৈয়াম, কোনটা গোল, কোনটা চেপ্টা, কোনটা লম্বা। দু'হাত উঁচু বৈয়ামের পাশে চার ইঞ্চি উঁচু বৈয়ামও স্থান পেয়েছে। ছোট বড় নানা ধরণের কত বাটি। এগুলো নাকি চুনারে তৈরি হয়।

আর একটা দোকানে আছে বেশ সুন্দর সুন্দর রং-করা ব্যাগ, ঝুড়ি, বাক্স, পুতুলের ছোট ছোট টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি। খেজুরপাতা দিয়ে জিনিষগুলি বোনা ও সুন্দর রং-করা। সাধারণ জিনিষ, অথচ কত সুদৃশ্য। এগুলি মাদ্রাজের কুটির শিল্পের নিদর্শন।

দূর থেকে এলুমিনিয়ামের বাসনগুলি রূপার মত ঝক্ ঝক্ করছিল। বড় সসপ্যানের উপর ছোট সসপ্যান সাজানো। এ রকম একটির উপর আর একটি বসিয়ে ঠিক মুকুটের মত করে রেখেছে। তার পর নজরে পড়ল লাঠি ও বাঁশীর দোকান। ওকের লাঠি, সেগুনের লাঠি। কোনটা সোজা হাতার, কোনটা বাঁকা হাতাওয়ালা, কোনটাতে নানা রকম নক্সা-করা। সাহারানপুরের কালো কাঠের কারুকার্য্যখচিত জিনিষগুলো বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তা ছাড়া জুতার দোকান, রূপার বাসন-কোসন, অলঙ্কার, খেলনা, চামড়ার জিনিষ ইত্যাদি কত জিনিষের দোকান যে খোলা হয়েছিল তার আর অন্ত নেই। বেশীর ভাগ মেয়েই শাড়ী কাপড়ের দোকানে ভিড় করেছিল। দোকানদারেরা রেশমী শাড়ী, জরীর শাড়ী, বেনারস ক্রেপ, কাশ্মীরী শাড়ী, সুরাটী শাড়ী, মাদ্রাজী, মারাঠী শাড়ী ইত্যাদি রকমারি বহুমূল্য শাড়ীর আঁচলগুলো বের করে নানা কায়দায় সাজিয়ে রেখেছিল। ফুল তার সুগন্ধ ছড়িয়ে যেমন ভ্রমরকে আকর্ষণ করে, তেমনি করে এই শাড়ী কাপড়ের দোকানগুলি রং-বেরঙের শাড়ীর সৌন্দর্য্য ও চাকচিক্যে মহিলাদিগকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করছিল। শাড়ী-কাপড়ের দোকানগুলির অপর পাশে সুসজ্জিত রেষ্টুরেণ্ট। সুসজ্জিত তরুণ-তরুণীরা ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে রেষ্টুরেণ্টে ঢুকে চেয়ারে, সোফায় আরাম করে বসছে, পরিবেশনকারীরা অর্ডার অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য সুন্দর সুন্দর প্লেটে সাজিয়ে রাখছে। তরুণ-তরুণীদের মৃদু গুঞ্জনে, হাসি তামাশায় রেষ্টুরেণ্ট প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে। খেলার দোকানগুলি পাশাপাশি সাজানো রয়েছে। ওগুলি দেখে শিশুদের মাথা গুলিয়ে যায়। কোন শিশু বলে উঠে "মা এই বাঁশী হাতে বড় কৃষ্ণ নেব।" কেউ বলে, "আমি এই সাদা ধবধবে সুভাষ বোসের মূর্ত্তি নেব।" কোন খোকা বলে উঠে, "বাবা, আমার এ এরোপ্লেনটা চাই-ই চাই।" কোন মেয়ে বলে উঠল, "মাতাজী মুঝে ও বড়ী চিড়িয়া চাহিয়ে।" সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে বললে, "নেহী নেহী—ম্যয় এঞ্জিন মাংগতা হুঁ।" এমনি নানা ভাষায় নানা জাতির শিশুদের আবদার শুনতে বেশ লাগছিল। ওরা কোন জিনিষটা পেলে খুশী হবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না। কত খেলার উপকরণ—হকিষ্টিক, ব্যাটবল, রিং, কেরম, লুডো, স্নেক, কোন কিছুর অভাব ছিল না, আর দোকান-ভরা ত অজস্র রকমারি পুতুল, পাখী, মোটর, রেল, বন্দুক, ড্রাম এসব ছিলই। এই বস্তুপুঞ্জের মধ্যে শিশুদের লোভ যদি প্রবল হয়ে ওঠে তবে

তাদের দোষ দেওয়া চলে না! মনোহারী দোকানগুলির এক পাশে বড় বড় ময়রার দোকান বসে গেছে। কত রকম মণ্ডা-মিঠাই, খাজাগজা পুরী কচৌরী, কুলপী, চিঁড়া। অসংখ্য মাছি এগুলোর চারদিকে ভন্ ভন্ করে উড়ছে। কাছে দোকানে দোকানে দু'একখানা চেয়ার টেবিলও পাতা আছে। গাঁয়ের লোকেরা চারদিকে এই দ্রব্যসম্ভারের প্রাচুর্যের মধ্যে দিশেহারা হয়ে যায়। বিশেষ কিছু কেনাকাটা না করে তারা ময়রার দোকানেই বেশী ভিড় করে এবং তাদের জীবনে যা প্রায়ই সম্ভব ব্যাপার বললেই চলে এখানে তাই হয়—টেবিল চেয়ারে বসে মিঠাই-মণ্ডা ফরমায়েস দিয়ে খাবার দুর্লভ সৌভাগ্য তারা লাভ করে। বরফ-ওয়ালারা বরফের গাড়ী নিয়ে ফিরছে, কাঁচের গ্লাসে জল ভরে এগিয়ে দেয়; অপরিসীম আনন্দে নিরীহ সরল গ্রাম্য লোকগুলির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে, তৃপ্তির হাসি হেসে কোমরের গেঁজিয়া থেকে টাকাপয়সা বের করে গুনে গুনে দেয়। তার পর যেদিকে সব আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা আছে সেদিকে চলে মন্থর গতিতে।

উপরের ভারী শিকল থেকে নাগরদোলার চেয়ারগুলো ঝুলছে। টিকেট কিনে ধাক্কাধাক্কি করে এক এক দল লোক তাতে উঠছে। বোঁ বোঁ করে আরোহীদের নিয়ে নাগর-দোলা প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে। শিশু ও বুড়োদের মুখে তখন কি হাসি! কোথাও ছোট ছোট খুপরি ঘর, তাতে লেখা আছে জীবন্ত জল-পরী—জল-পরীর রঙীন ছবি দর্শকের মনকে আকর্ষণ করছে। রঙ্গস্থলগুলি আলোকমালায় উদ্ভাসিত হয়ে ঝলমল করছে। ব্যাণ্ড বাজছে, সার্কাস সুরু হয়ে গেল। সার্কাস-মেয়েরা ফ্রিল বসানো নাচের পোশাক হাঁটুর উপর অবধি পরেছে। মাথায় রেশমী রিবন দিয়ে চুল আটকে রাখা, কালো মুখে এত প্রচুর পাউডার মেখেছে যে মুখগুলোকে যেন চুণ-কালি মাখা বলে মনে হচ্ছে। হাতে লাল নীল রেশমী ছাতা নিয়ে, পায়ে সাদা জুতো পরে তারের উপর দিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল, দর্শকদের হাততালিতে সার্কাস-প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠল। বাঘের হালুম হালুম ডাকে ছেলেমেয়েরা সচকিত হয়ে বাপমায়ের হাত ধরলে।

অন্যদিকে হঠাৎ মিঠা গলায় গান সুরু হয়ে গেল—"বহুৎ দূর যানেওয়ালা হ্যায়;" সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতকারিণীদের পায়ের ঘুঙুর তালে তালে রুমুঝুমু রবে বাজতে লাগল। সিনেমা সুরু হয়ে গেছে। ক্রমে রাত গভীর হয়, আমোদ-প্রমোদ থেমে যায়। দোকানীরা দোকানপাট বন্ধ করে দেয়, দলে দলে লোকেরা যে যার ঘরে ফিরে যায়। আবার সুরু হয় সেই নিয়মবাঁধা জীবনযাত্রা। এক সপ্তাহের নওচণ্ডীর স্মৃতি মাঝে মাঝে মনকে দোলা দিয়ে যায়।

সতী

সরোজিনী নাইডু

অনুবাদক: শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

আমার প্রাণের দীপ, মরণের তুহিন অধর
তোমারে নিভিয়ে দিল চকিতের দুরন্ত নিশ্বাসে
তোমার জ্বলন্ত জ্যোতি অস্ত গেল—ফিরিবে না আর
প্রিয়, মোরে রহিতে কি হবে এই গহন তিমিরে?

আমার প্রাণের তরু, মরণের নিঠুর চরণ
দলিত করিয়া গেল তোমার ললিত লতিকারে
মিলাল মহিমা তব—কোনমতে ফিরিবে না আর
ফুল কি বাঁচিয়া রবে, মূল যবে হ'ল প্রাণহীন?

আমার প্রাণের প্রাণ, মরণের খরতরবার
আমাদের ছিন্ন করে অশ্রুপ্লুত রুদ্ধবাক্যসম
আমরা অভিন্ন আত্মা—বিদীর্ণ হব কি তবে আজ··
জীবন বিদায় নিল—দেহ কি পড়িয়া রবে হায়?

আলোচনা

বাংলালিপির সংস্কার

শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়

গত বর্ষের আষাঢ় সংখ্যা "প্রবাসী"তে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এবং কার্ত্তিক সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরী বাংলালিপি সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আমি এখানে এই দুটি প্রবন্ধ সম্বন্ধেই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

বাংলালিপি সংস্কারের উদ্দেশ্য যোগেশবাবু খুব সুষ্ঠুভাবেই বিবৃত করেছেন। বাংলা অক্ষর-সংখ্যা অত্যন্ত বেশী; সেইজন্য প্রথম-শিক্ষার্থী ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাংলা লিখন-পঠন শিখতে অনেক সময় লাগে; এটা ভাষা-শিক্ষার একটি বিশেষ অন্তরায়। এই অক্ষরাধিক্য ছাপাখানারও একটি প্রধান ও জটিল সমস্যা। এই কারণেই যন্ত্রের সাহায্যে বাংলা লেখা একরূপ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের দৃষ্টি এই বিষয়ে অনেক দিন আকর্ষিত হলেও বিশেষ কোন সুফল ফলে নাই।

রোমান অক্ষরের সাহায্যে, ধ্বনিপ্রকাশের পদ্ধতি অনুসারে বাংলা ভাষারও যদি একটির পর একটি অক্ষর সাজিয়ে ভাষার ধ্বনিগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হয়, তা হলেই বাংলালিপি-সংস্কারের প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে এবং যোগেশবাবু ও সুধীরবাবু উভয়েই এই প্রণালীই অবলম্বন করা সমীচীন বলে মনে করেন। এই সংস্কার-চেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মেনে চলা আবশ্যক হবে।

বাংলার ধ্বনিপ্রকাশক অক্ষরগুলির আকার ও গঠনের পরিবর্ত্তন না হওয়াই ভাল। কারণ উপরি-উক্ত প্রণালী দ্বারা বাংলা ভাষার বহুসংখ্যক যুক্তাক্ষর বাদ দেওয়া সম্ভব হলেও ছোট ছোট ছেলেমেয়ের শিক্ষা কিছুদূর অগ্রসর হলেই তারা যাতে প্রচলিত পদ্ধতিতে ছাপা পুস্তক পাঠ করতে পারে তা সম্ভব না হলে দেশের পক্ষে তথা শিক্ষার পক্ষে শুভ হবে না। কারণ বহুদিন পর্য্যন্ত বাংলা ভাষার সমুদয় পুস্তক নূতন পদ্ধতিতে ছাপা সম্ভব হবে না। যদি লিখন-প্রণালী ও অক্ষরগুলির কোন পরিবর্ত্তন নিতান্তই আবশ্যক হয়, উপরি-উক্ত নীতি

যতদূর সম্ভব মেনে চলতে হবে। অনাবশ্যক পরিবর্ত্তন কোন কারণেই বাঞ্ছনীয় হবে না। আর একটি কথা: লিখন ও মুদ্রণ উভয় দিকের সুবিধা ও অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলালিপির পরিবর্ত্তনসাধনে ব্রতী হতে হবে। সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে, বর্ত্তমান লিপি-সংস্কারের প্রধানতম উদ্দেশ্য উচ্চারণ-সংস্কার নয়; একটি জীবন্ত মৌখিক ভাষার গতি একটি প্রবহমান খরস্রোতা নদীর মত, ইহাকে বাঁধ বেঁধে একটি সুনির্দ্দিষ্ট খাতে চালানো সহজ ব্যাপার নয়। মৌখিক ভাষার উচ্চারণ পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য এবং তা লেখ্য সাধু ভাষাকে প্রভাবান্বিত করবেই। এই পরিবর্ত্তন-প্রকাশক নূতন নূতন চিহ্ন ও নূতন নূতন অক্ষর উদ্ভাবন, বর্ত্তমান লিপি-সংস্কার প্রচেষ্টাকে জটিলতর করে তুলবে বলে মনে হয়।

এখন যোগেশবাবু ও সুধীরবাবুর প্রস্তাবগুলি একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। যোগেশবাবুর ঈ, ৃ, য, র, অন্তঃস্থ য ড়, এবং ঢ় এই সাতটি অক্ষরের রূপ পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন কেন অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হচ্ছে? র, ড়, ঢ় ও য়-র রূপের পরিবর্ত্তনের কারণ আমার মোটেই বোধগম্য হ'ল না। এক একটি ফুটকি কি এত অনর্থের কারণ? ছাপায় ত কোন অসুবিধা হবার কথা নয় এবং লেখায় কলম তুলে ফুটকি দিতে বিশেষ যে অসুবিধা হয় তাও ত মনে হয় না। ঈ, ৃ, এবং য় সম্বন্ধে উচ্চারণের উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং উচ্চারণের সৌকর্য্যসাধন এর দ্বারা সম্ভব হবে—এই যদি পরিবর্ত্তনের কারণ হয়, তবে এটাকে খুব জোরাল যুক্তি বলে মনে হয় না। বাংলা ভাষার দীর্ঘ ও হ্রস্ব ধ্বনির এত পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ব-কারের ধ্বনিসাম্য এত অধিক যে ব্যাকরণ ও অক্ষরের রূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা তাকে ঠেকান মোটেই সম্ভব নয়। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে মৌখিক ভাষার এই রূপ পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। য-ফলার জন্য য়-র রূপ পরিবর্ত্তন এবং ব-ফলার জন্য সংস্কৃত ব ব্যবহার করলেও প্রথম শিক্ষার্থীদের যখন বর্ত্তমানের মত প্রচলিত উচ্চারণ শিক্ষা দিতেই হবে তখন অক্ষরের রূপ পরিবর্ত্তনের সার্থকতা কোথায়? উচ্চারণ-সংশোধন শিক্ষা-দান-পদ্ধতির সহিত সংযুক্ত, সেটা লিপি-সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ের অন্তর্গত নয়; এই সব কারণে আমার মনে হয় এই সকল পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক। তবে স্বরধ্বনিগুলি ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত হয়ে যে রূপ পরিগ্রহ করে সেগুলি ব্যঞ্জনাক্ষরের মত বড় হওয়া এবং তাদের কোন কোনটির ভোল ফেরানো খুবই প্রয়োজন।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। যদিও আমি মনে করি লিপি-সংস্কারে লিখন ও মুদ্রণের জন্য স্বরধ্বনির ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হওয়ার দরুন উদ্ভূত রূপগুলি অত্যাবশ্যক নয়, তথাপি এই রূপগুলি পরিত্যাগ না করলেই ভাল হয়। এর কারণ আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। ভবিষ্যতে মুদ্রিত পুস্তক পাঠে এগুলির সঙ্গে পরিচয় অত্যাবশ্যক হবে; এবং যোগেশ বাবুর প্রণালীতে ঊর্দ্ধগত হস্ চিহ্নের (যাহাকে তিনি পাতী বলেছেন) ব্যবহার অনেক কম হবে।

নূতন অক্ষর ও স্বর সংযোগের পর আসে যুক্তাক্ষরের কথা। যোগেশবাবু লিখেছেন, "সংস্কৃত ও সংস্কৃতমূলক ভাষায় একটি চৎমকার সঙ্কেত চলিয়া আসিতেছে; ব্যঞ্জনাক্ষর নিয়ত অকারান্ত। কিন্তু অন্ত স্বরাক্ষর ব্যাকরণঘটিত কিম্বা কোন ব্যঞ্জনাক্ষরযুক্ত হইলে সে অক্ষর হসন্ত হয়।" এ তথ্যটি কি সুধীরবাবু চিন্তা করে দেখেন নাই? তিনি এর ঠিক বিপরীত নীতি অনুসরণ করেছেন, সমস্ত ব্যঞ্জনেরই হসন্ত উচ্চারণ এবং তাদের স্বরান্ত করতে অ-ধ্বনি জ্ঞাপক একটি নূতন্ চিহ্নের আবশ্যক। যোগেশবাবুর পাতী এবং সুধীরবাবুর ইংরেজী V পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বী। এখন বাংলা লিখনে পাতীর সংখ্যা বেশী হবে কিম্বা অ-ধ্বনিজ্ঞাপক নূতন চিহ্নটির, তাই বিচার্য্য। আমার মনে হয় নূতন V চিহ্ন চক্ষুর পীড়া উপস্থিত করবে, যোগেশবাবুর উদ্ভাবিত পন্থাটি চিরপ্রচলিত পন্থারই অনুসারী এবং তা পরিত্যাগ করে কি সুফল লাভ হবে বুঝা গেল না। যোগেশবাবুর পাতী সুধীরবাবুর প্রস্তাবমত মধ্য স্তরেই থাকবে এবং একটি পৃথক চিহ্ন মুদ্রণরূপেই ব্যবহৃত হবে। একদিক দিয়ে—উভয়ের যুক্তাক্ষর-বর্জ্জন-পন্থার মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য থাকলেও যোগেশবাবুর প্রণালীই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

যোগেশবাবু স্বরসংযোগের এই হস্ চিহ্নটির অস্তিত্ব কল্পনা করলেও, স্বর-সংযোগে এই হস্ চিহ্ন প্রদর্শন করেন নাই। স্বর-সংযোগের পৃথক অক্ষরগুলি ব্যবহার করলে তাদের

সাঁওতাল মেয়ে : বিহার। মুদ্রিত ছবির মাপ : ১১"×৮½"
পর্ণকুটির আলো করা…
পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মেয়েদেরই বহু বিচিত্র ছবি তাদের দেশবাসীরা বিশ্বের দরবারে সগর্বে তুলে ধরেছে, পিছিয়ে ছিল শুধু ভারতবর্ষ। বিখ্যাত ফটোগ্রাফার সুনীল জানার বই 'সেকেণ্ড ক্রিচার' সে-অভাব দূর করল এতদিনে। ৬৪ খানা অসামান্য আলোকচিত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা জাতীয় মেয়েদের চিরন্তন রূপটিকে সাধারণ সমক্ষে এনেছেন সুনীল জানা, এজন্য তাঁকে সুদীর্ঘকাল ভারত পরিভ্রমণ করতে হয়েছে। দেশের মাটির মতো খাঁটি এই মেয়েরা : কেউ চাষা, কেউ মজুর, কেউ মেছুনী, কেউ বেদেনী, কেউ বা সাধারণ ঘরনী। কারো জীর্ণবাস, কারো কটিবাস — তা হোক, তবু দারিদ্র্য এদের স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্যকে বিন্দুমাত্র ম্লান করতে পারেনি। অভাব, অনটন এবং অশিক্ষার মাঝে থেকেও মুখে এদের অনাবিল অকলঙ্ক হাসি ; ইন্দ্রাণীর মহিমা ; চোখে চঞ্চলা উর্বশীর সম্মোহনী শক্তি।
সানডে স্টেটসম্যান বলেছেন—'এ-বই রত্নসামগ্রীর মতো আহরণীয়'। দাম ১২,
সিগনেট প্রেস : ১০/২ এলগিন রোড, কলিকাতা ২০

দ্বারাই স্বর-সংযোগ বুঝাবে, এবং ঊর্দ্ধগ হস্ চিহ্ন অনাবশ্যক হবে। কিন্তু স্বর-সংযোগের পৃথক অক্ষরগুলি, অর্থাৎ, া ি ইত্যাদি পরিত্যাগ করলে, স্বর-সংযোগ প্রদর্শনের নিমিত্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনবর্ণগুলিতে ঊর্দ্ধগ হস্ চিহ্নের প্রয়োজন হবে। এইরূপে হস্-চিহ্নের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যাবে এবং সেই কারণেই স্বর-সংযোগের প্রচলিত রূপগুলি ত্যাগ করা বোধ হয় উচিত হবে না। যোগেশবাবু এই নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করলেও নিজেই কেন অ-ধ্বনিজ্ঞাপনের জন্য ফুটকি এবং শব্দান্তের হসন্ত উচ্চারণের জন্য প্রচলিত হস্‌চিহ্ন ব্যবহার করেছেন—তা বুঝা গেল না। সুধীরবাবু তৃতীয় স্তরে কোন অক্ষর বা চিহ্ন রাখার পক্ষপাতী নন। যোগেশবাবুর প্রণালীতেও তা সম্ভব, কারণ ফুটকি ও হস্ চিহ্ন তিনিই অনাবশ্যক মনে করেছেন।

সুধীরবাবুর স্বরধ্বনিজ্ঞাপক অক্ষরগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। তাঁর প্রবন্ধে তাঁর উদ্ভাবিত প্রণালীর একটিও আদর্শ প্রদত্ত হয় নাই। সেইজন্য তাঁর মত স্থানে স্থানে বেশ একটু দুর্ব্বোধ্য। তাঁর স্বরধ্বনিজ্ঞাপক প্রথম সারের অক্ষরগুলি প্রচলিত অক্ষরের অবাঞ্ছনীয় জটিল সংস্করণ বললেও অত্যুক্তি হবে না। অ-অক্ষরের সঙ্গে-কয়েকটি স্বর-সংযোগের চিহ্ন এবং কয়েকটি মূল স্বরাক্ষর মিলিত হয়ে, কতকগুলি অত্যন্ত জটিল যুক্ত স্বরাক্ষর সৃষ্ট হয়েছে। যুক্তবর্ণ বর্জ্জন করতে বসে, লিপির উপর যুক্ত স্বরাক্ষর চাপান কি রূপ ব্যবস্থা? অবশ্য যোগেশবাবুর ঐ এবং ঔ সম্বন্ধেও বলতে পারা যায় যে, এরা পাশাপাশি বসানো যুক্ত স্বরাক্ষর। কিন্তু সুধীরবাবুর যুক্ত স্বরাক্ষর একেবারে অচল এবং অনাবশ্যক। এগুলিকে যদি চালাতে হয় তা হলে মৌলিক স্বরাক্ষরগুলি কি দোষ করল! অবশ্য ঘাড় বাঁকান পেট বাঁকান ঋটা একটু কেমন কেমন। কিন্তু উপায় কি? এস্থলে যে-কোন নূতন অক্ষর অচল।

যোগেশবাবু তিনটি যুক্তাক্ষর রাখার পক্ষপাতী। ক্ষ ও জ্ঞ-তে কারো আপত্তি হবে না। কিন্তু ক্ষ-এ ট-ধ্বনির আগম হলেও, এই ট-কে পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। সেই জন্য ষ্‌ণ দ্বারা এর কাজ চলে যেতে পারে, এবং তাই সমীচীন। যুক্তাক্ষরে নূতন ধ্বনির উদ্ভবের জন্য যদি এই তিনটিকে পৃথক সত্তা দিতে হয়, তা বলে ম-ফলা ধ্বনি কি দোষ করল? এই ধ্বনিগুলিও বিশেষ ভাবে বিকৃত হয়েছে। কিন্তু ম-ফলাকে আমল দিলে, অনেকগুলি যুক্ত অক্ষরকে আসন দিতে হয়। সেটা কিন্তু বাঞ্ছনীয় নহে। ম-ফলার উদ্ভূত নূতন ধ্বনি শিক্ষাসাপেক্ষ করলে, ষকেও সমান ব্যবহার করা উচিত নয় কি? এই দিক দিয়া শ্র-র সপক্ষে সুধীরবাবুর ওকালতির মানেও বুঝা যায় না; কারণ শ্র ত পৃথক অক্ষরে ধ্বনিবহির্ভূত নূতন ধ্বনির দাবি করে না—সুধীরবাবু কেন একে রাখতে চান তা বুঝা যায় না। তাঁর ম-ফলার ভাঙা

য-ও অচল। তেড়ে লেখার প্রয়োজন কি? অনুরূপ কারণে য-ফলার চিহ্নটিও পরিত্যাজ্য।

যোগেশবাবুর বহুকালের সেই পুরাতন প্রস্তাবের নূতন রূপটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। আমার ব্যাকরণের জ্ঞান সম্পূর্ণ, এ দাবি আমি করি না, এমনও হতে পারে আমি তাঁর বক্তব্য ও সিদ্ধান্তসমূহ ঠিকমত বুঝতে পারি নাই। এই আলোচনা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমার ভ্রম নিরসনের চেষ্টা যদি তিনি করেন তা হলে আমি পরিশ্রম সার্থক মনে করব। আমি তাঁর ঈষৎ-ই বা শূন্য চিহ্নের কথা বলছি। 'কলিকাতা'র মৌখিকরূপে সংবৃত ই-ধ্বনি, না সংবৃত ও-ধ্বনি? পূর্ব্ববঙ্গে অবশ্য এই সংবৃত ই-ধ্বনি খুবই শোনা যায়; কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিজের দেশ দক্ষিণ রাঢ়ে? আমিও দক্ষিণ রাঢ়ের লোক, এবং বোধ হয় তাঁর বাসস্থান থেকে আমার নিবাস খুবই নিকট-বর্ত্তী। এখানেও সংবৃত ই-ধ্বনির পরিবর্ত্তে সংবৃত ও-ধ্বনিই শুনতে পাই। তার পর চাউল, দাইল, ধাতু, মারি-ধরি—মৌখিকরূপেই বা সংবৃত ই-ধ্বনি কোথায়? চাল, দাল (ডাল), ধাত, মার-ধর—এগুলিতে দীর্ঘ অ বা দীর্ঘ আ-ধ্বনিই পাই, এবং সেইজন্ত এই ধ্বনি প্রকাশ করার নিমিত্ত শূন্য-র মত একটি নূতন চিহ্ন কেন ব্যবহার করব? বাংলা স্বরধ্বনির মধ্যে ই-ধ্বনি ব্যঞ্জন-ধ্বনির খুব কাছাকাছি। কারণ ইহাতে বাগ্‌যন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা কম উন্মুক্ত থাকে। সেই কারণে অ- বা আ ধ্বনির, এমন কি লঘু সংবৃত ই-ধ্বনিতে পরিবর্ত্তন খুব সহজ নয়; সংবৃত ও-ধ্বনিতে পরিবর্ত্তনই খুব স্বাভাবিক। তার পর চলিয়া, করিয়া, খাইয়া ইত্যাদিতে য়-ধ্বনি থাকলেও এদের মৌখিকরূপ বলে, করে, খেয়ে ইত্যাদিতে অন্ত্য ধ্বনি হিসাবে য-ফলার কথা কিরূপে আসে? যাঁরা ব'লে ক'রে ইত্যাদি লিখেন, তাঁরা যে কোন ধ্বনিলোপের জন্তই ঊর্দ্ধ কমা লিখেন, তা মনে হয় না। ধ্বনি লোপের কথা, বোধ হয় তাঁরা ততটা চিন্তাই করেন না, যতটা করেন ঐ ঊর্দ্ধ কমাটিকে সংবৃত ও-ধ্বনির প্রকাশক চিহ্নরূপে। যোগেশবাবু বলেন, 'ব'লে-তে কোন ধ্বনি লোপ পায় নাই;' কিন্তু সেটা কি ঠিক? লিখনে সংবৃত ও-ধ্বনি লোপ পায় নাই কি? অবশ্য আমি ঊর্দ্ধ-কমা বা নূতন নূতন চিহ্নের পক্ষপাতী নই এবং তার কারণ প্রথমেই উল্লেখ করেছি।

ইংরেজী বিরাম চিহ্নগুলির নামের বাংলা অনুবাদ সম্বন্ধে দু-চারটি কথা লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। অনেক দিন থেকেই এই বিরাম-চিহ্নগুলির বাংলা নাম প্রচলিত রয়েছে। শ্বাস বা পাদচ্ছেদ, অর্দ্ধচ্ছেদ, ছেদ, পূর্ণচ্ছেদ ইত্যাদি বেশ প্রচলিত। সেই কারণে নূতন নামের প্রয়োজন কি?

হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর—শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। আর. এইচ. শ্রীমানী এণ্ড সন্স, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯৪৮। ছয় টাকা।

সুপরিচিত শিল্পী ও লেখক শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৯১৮ সালে মানস সরোবর দর্শন করিয়া ফেরেন। ভ্রমণ-কাহিনী রচনা শেষ হয় ১৯১৯ সালে। সংক্ষিপ্ত আকারে প্রবাসীতে বাহির হইতে আরম্ভ হয় তাহার দশ বৎসর পরে; তাহারও ৫ বৎসর পরে উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়—সেও আজ প্রায় চৌদ্দ বৎসর হইল। এতদিন পরে পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত রূপে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রকৃতিপ্রীতি ও মনুষ্যপ্রীতি, প্রমোদবাবুর ভ্রমণ-কাহিনীতে উভয়েরই যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, প্রয়োজনীয় তথ্যের তো কথাই নাই। যাওয়া-আসার ব্যবস্থা ও খরচপত্র, দেশের রীতিনীতি, পথের যানবাহন, লোকের আচার-ব্যবহার—সকল দিকেই তাঁহার দৃষ্টি আছে। পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত এই দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি পাঠককে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর দিয়াছেন, আর যাহা দিয়াছেন তাহা বড়ই উপাদেয়। রেখাচিত্রের সংখ্যা বড় কম নয়-সাতাশীটি, চিত্রগুলি ভ্রমণবৃত্তান্তকে পাঠকের চোখের সামনে জীবন্ত করিয়া ধরিয়াছে। লেখকের দানে কোথাও কুণ্ঠা নাই।

ইতিমধ্যে জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের চেষ্টায় নেপালের ইতিহাস নূতন করিয়া জানা গিয়াছে, ১৩৯ পৃঃ সেনাপতি জারাওয়ার সিংহের অভিধানে অনেক কিছু নূতন বলিয়া সন্নিবেশিত করা উচিত ছিল কিনা লেখক মহাশয় অবশ্য বিচার করিয়াছেন।

বাঙালী পাঠকসমাজে এই পুস্তকের যথেষ্ট সমাদর হওয়া উচিত।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ষষ্ঠ খণ্ড। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, ১৩৫৪।

ইতিপূর্ব্বে বর্ত্তমান গ্রন্থমালার অন্যান্য খণ্ডগুলি এই পত্রিকায় আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথের সুপরিচিত রচনা পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। এই গ্রন্থমালায় ঊনবিংশ শতাব্দীর ছোট বড় শতাধিক লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও বিস্তৃত গ্রন্থসূচী সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু কেবল সঙ্কলন মাত্র নহে; তথ্য-নির্ব্বাচন, বিন্যাস-নৈপুণ্য ও সাহিত্য-ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপকরণ সংগ্রহ হিসাবে যে একাগ্র অনুসন্ধিৎসা ও নিখুঁত তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বিরল বলিয়াই এই অপরিহার্য্য পুস্তিকাগুলি যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান খণ্ডে সেই প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় নাই। ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে উনিশটি গ্রন্থকারের পরিচিতি। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—রামকমল সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি স্বনামখ্যাত লেখকদের বৃত্তান্ত।

যোগ্য ব্যক্তির উপরই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ এই গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন। পূর্ব্বখণ্ডগুলির মত আমরা বর্ত্তমান খণ্ডেরও বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুশীলকুমার দে

সঞ্চারিণী—শ্রীউমা দেবী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পাঁচ টাকা।

"সঞ্চারিণী" কাব্যগ্রন্থ। নামটি শুনিলেই কালিদাসের বিখ্যাত শ্লোকটির কথা মনে পড়ে। গ্রন্থখানির দুটি ভাগ—ঝঙ্কার ও মর্ম্মর। 'ঝঙ্কারে'র প্রথম কবিতাতেই আছে,

"আমি কি চেয়েছি শুধু চোখের দর্শন ?
হয়ত চেয়েছি আমি যা সত্য হ'ল না—
প্রাণের প্রোজ্জ্বল জ্যোতি দেহের প্রদীপে।"

এই চাওয়াই কাব্যের চাওয়া—যে প্রার্থনা পৃথিবীতে সফল হয় না কিন্তু প্রকাশের মধ্য দিয়াই যার সার্থকতা। 'ঝঙ্কারে' এক-শ ছেচল্লিশটি কবিতা আছে। কতকগুলি চতুর্দ্দশপদী, কতকগুলি অন্যান্য ছন্দে লেখা। সব চতুর্দ্দশপদীই কিন্তু সনেট নয়। 'মর্ম্মরে'র কবিতাগুলি শিরোনামযুক্ত এবং বিভিন্ন ছন্দে রচিত। 'চন্দ্রালোকে' দেখি,

"কেলিকুঞ্জের শূন্য ছায়ায় কাঁদে হংসপদী
চন্দ্রাপীড়ের দৌত্য বাঁধন বাঁধা পত্রলেখা,
জাগর মলিন চন্দ্রাবলীর দোলে অশ্রুনদী,
মিডিয়ার হায় মায়াতন্ত্রর মায়া মিথ্যে লেখা।"

কবিতাগুলির মধ্যে কবিত্বের প্রকৃত সুর শুনিতে পাই। ছন্দে, ভঙ্গীতে, চাতুর্য্যে, ভাবমাধুর্য্যে এবং প্রকাশের সাহসে "সঞ্চারিণী" কাব্য-রসিকের মনোগ্রাহ্য হইবে।

"মূর্ত্ত দেহের মোহময় রূপে এস কাছে,
জড়-জীবনের তপ্ত অধর যেও চুমি
শীতের প্রভাতে মৃতের স্বপন দেখি পাছে।"

শ্রীদিলীপকুমার রায় কাব্য-গ্রন্থখানির একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছেন। উমা দেবীর কবিতায় আবেগ এবং শক্তি দুই আছে। কবিতাগুলি পাঠকের আনন্দবিধান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত—শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র সেন; শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের পক্ষে "পূর্ব্বাশা" লিমিটেড পি ১৩ নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা। ৭০ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা মাত্র।

ভারত রাষ্ট্রের "জাতীয় সঙ্গীত" সম্বন্ধে একটা বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে কোন ভাবুক ও চিন্তাশীল বাঙালী সুখী হইতে পারেন না। কারণ "বন্দেমাতরম" সঙ্গীত ১৯০৫ সাল হইতে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে। ১৯১১ সালে "জন-গণ-মন-অধিনায়ক" গানটি কলিকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে গীত হয়, "বন্দেমাতরম" গান রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৮৬) গীত হয়। এই ঐতিহ্য মনে রাখিলে এই বিতর্কের প্রয়োজন হইত না। এই বাদবিতণ্ডার ফলে এই হইবে যে, উক্ত দুইটি গানই সরকারী ভাবে জাতীয় সঙ্গীতের মর্য্যাদা পাইবে না, কোন একটা অর্ব্বাচীন গান সেই মর্য্যাদালাভ করিবে। বিহারের শ্রীআনন্দমোহন সহায়ের যে মন্তব্য এই পুস্তিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এরূপ পরিণতির ইঙ্গিত দেখিতে পাই। মধ্যপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী ত দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্রের "বন্দেমাতরম" ও "জন-গণ-মন-অধিনায়ক" গান দুইটির ব্যর্থ অনুকরণ-চেষ্টার পক্ষে ওকালতী করিয়াছেন।

বর্ত্তমান পুস্তিকায় অন্য উদ্দেশ্যও আছে। ব্রিটিশ সংবাদপত্রে ১৯১১ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের যে বিবরণী প্রকাশিত হয়, তাহাতে "জন গণ-অধিনায়ক" গানটি সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য লিখিত হইয়াছিল এরূপ একটা ধারণার সৃষ্টি হয়। এই পুস্তিকায় সেই ধারণার মূল উৎপাটিত হইয়াছে। লেখক যে-সব প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তারপর কেহ যদি রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে এরূপ ভ্রান্ত ধারণার প্রচার করেন, তবে বলিতে হইবে যে তাহার মন সুস্থ নয়, তাহা অপরিমিত মূঢ়তায় পূর্ণ। পুস্তিকার প্রথম ৩৫ পৃষ্ঠায় এই অপবাদ নিরসনের চেষ্টা করা হইয়াছে এবং তাহা উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথের ভাব-জগতের যে পরিচয় সংগৃহীত হইয়াছে তাহার জন্য বাঙালা পাঠক লেখকের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

পুণ্য-কাহিনী—শ্রীপুষ্প দেবী। ১৯৩, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। ৩১৮ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা মাত্র।

এই পুস্তকখানি ৺সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কীর্ত্তি-কথায় পূর্ণ। শ্রীমতী পুষ্প দেবী তাঁর কন্যা। এই পুস্তক প্রণয়নে তিনি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সাধারণতঃ কোন জীবনীতেই ব্যক্তির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান পুস্তকেও সেই অভাবের প্রমাণ আছে। বাস্তবতার মধ্যে এই পুস্তক প্রকাশিত করিতে গিয়া নানা জনের নানা বিবরণ ও মত এরূপভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে যে ইহা হইতে সুকুমারবাবুর বহুমুখী প্রতিভা ও কর্ম্মজীবনের একটি অসম্পূর্ণ ধারণামাত্র আমরা করিতে পারি।

লেখিকা অনেক স্থলে নিজের দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন; এই বিষয়ে একটু সংযত হইলে ভাল করিতেন। পিতা-পুত্রের বিচ্ছেদের কাহিনী সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার প্রয়োজন ছিল না।

যে ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রেরণায় এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে তাহা প্রশংসনীয়, কিন্তু লেখিকার কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই। আমরা তাঁহার নিকট সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-কথা প্রত্যাশা করি।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা—শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার। বিশ্ব-বিদ্যাসংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন অংশে উদ্ভিদ্ বিষয়ে যে সমস্ত প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় মুখ্যতঃ তাহাদের সারমর্ম্ম বিষয়ানুক্রমে এই পুস্তিকায় বিবৃত হইয়াছে। বৈদিক যুগের পূর্ব্বেও ভারতীয় জীবনে গাছপালার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয় ঐতিহাসিকের আবিষ্কৃত তৎকালিক বিভিন্ন নিদর্শন অবলম্বনে আলোচিত হইয়াছে। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সম্বন্ধে প্রাচীন কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ পাওয়া না গেলেও প্রাচীন ভারতে এই বিষয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য যে জানা ছিল তাহার প্রমাণ বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আলোচ্য পুস্তিকা পাঠে তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই পুস্তিকা হইতে অনেক নূতন কথা জানা যায় এবং আরও

জানার আগ্রহ জাগরিত হয়। তবে উদ্ধৃত সংস্কৃত অংশে এবং অন্যত্রও অজস্র বর্ণাশুদ্ধি পদে পদে পাঠককে বিক্ষুব্ধ করে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

১৫ই আগষ্ট—১৯৪৭—পৃষ্ঠা ১৩, মূল্য—।০

ভারতের স্বাধীনতালাভ উপলক্ষ্যে ভাষণ।

ম্যাজারিক—শ্রীত্রিলোচন দাশ এম-এ। লেখক কর্ত্তৃক চন্দন-নগর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১১—মূল্য—৴০

এই পুস্তিকায় চেক্ নেতা, সাহিত্যিক, মনীষী এবং চেকোশ্লাভোকিয়ার রাষ্ট্রনায়ক ম্যাজারিকের জীবনী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনের সহিত তুলনামূলক ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

দেশের দুঃখী—শ্রীনিশাপতি মাঝি। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২, মোহন বাগান রো, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১১৭, মূল্য ২৲।

লেখক একজন দরদী সমাজ-সেবাব্রতী, বর্ত্তমানে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলনে লেখক বিশেষ উৎসাহী, ইঁহারই চেষ্টায় কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় আইন-পরিষদ অস্পৃশ্যতা দুরীকরণের জন্য একটি আইন পাস করিয়াছেন। কিন্তু লেখক যে আইন অপেক্ষা সেবা-দ্বারাই সমাজ-সংস্কারে বিশ্বাসী তাঁহার লেখায় ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে। বর্ত্তমান বাংলার সমাজ-সংস্কার আন্দোলন এবং তৎসম্বন্ধে লেখকের মতামত ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার হদিস এই গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যাইবে।

প্রাথমিক কৃষি পাঠ—পৃষ্ঠা ৬৮, মূল্য ।৶০।

সরল কৃষি কথা—ডক্টর যামিনীরঞ্জন মজুমদার। প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স। ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৭৮, মূল্য ৷৹

প্রথম পুস্তকখানিতে সরল ভাষায় বাংলাদেশের মাটি, গাছ, সার, খাদ্যশস্য, তৈলবীজ, চাষ-আবাদের কথা বলা হইয়াছে। এরূপ পুস্তক প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পাঠ্য হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় পুস্তকখানি বড়দের জন্য লেখা। বর্ত্তমানে পুস্তকখানির দ্বাবিংশ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে—ইহা হইতেই বুঝা যায় ইহা কতদূর জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। ইহাতে বাংলাদেশের মাটির উপযোগী নানা ফসল ও চাষের কথা আলোচিত হইয়াছে। লেখকের নির্দ্দেশ অনুযায়ী চলিলে অনেক গৃহস্থ স্বাবলম্বী হইতে পারিবেন এবং পরিণামে দেশেরও খাদ্যসম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং ইহার সমাধানে প্রত্যেক ব্যক্তির এবং সমষ্টিগত ভাবে সরকার ও জাতির শক্তি নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা কিন্তু কৃষির জন্য বিশেষ কিছু করিতেছি বলিয়া মনে হয় না। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা প্রত্যেক গৃহস্থের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলেই খাদ্য-সঙ্কট দূর হইতে পারে। এইরূপ প্রয়োজনীয় গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

দেশে বিদেশে—ডাঃ সৈয়দ মুজতবা আলী। নিউ এজ পাবলিশার্স লিঃ, ২২ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১। ৩৯৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫৲।

সাহিত্যিক বিচারে এই গ্রন্থখানিকে নিঃসন্দেহে একটি শ্রেষ্ঠ রসরচনা বলা যাইতে পারে এবং বাংলা সাহিত্যে ইহা একটি বিশিষ্ট আসনও দাবি করিতে পারে। অধ্যাপক ডাঃ মুজতবা আলী রসালাপী গুণী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তিনি যে এমন চমৎকার রসসাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারেন এই বইখানি না পড়িলে তাহা আমরা জানিতে পারিতাম না। আরবী, ফার্সী উর্দ্দু ও বাংলা ভাষার রসাত্মক বচনসকল প্রসঙ্গতঃ উদ্ধৃত করিয়া, সুষ্ঠু চলিত বাংলায় বর্ণনাকে সরস ও মনোজ্ঞ করিয়া বক্তব্য বিষয় পাঠকের নিকট পরিবেশনে গ্রন্থকার যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। আমানুল্লা ও বাচ্চাই সাকোর সময়কার আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুলের রাস্তাঘাট, হাটবাজার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, শিক্ষা ও সমাজ, শাসকসম্প্রদায় ও জনসাধারণের রীতি-নীতি, আদবকায়দা ও আইনকানুন, কাবুলে স্থাপিত বিভিন্ন দূতাবাস ও কাবুলের পথের বর্ণনা এবং কাবুলের সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ গ্রন্থকার সুনিপুণ শিল্পীর মত পরিবেশন করিয়াছেন। পড়িলে মনে হয় লেখক যেন সম্মুখে বসিয়া রসালাপের ছলে এই সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ (২য় সং)—শ্রীকমলকৃষ্ণ মিত্র। ৬৯ কাঁসারিপাড়া রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২৭০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৷০।

এই গ্রন্থ শ্রীম' প্রণীত 'রামকৃষ্ণ-কথামৃতের' ছাঁচে রচিত হইয়াছে এবং উহার পরিশিষ্ট-স্বরূপ ইহাও এই সঙ্গে পড়িলে পাঠক শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে পারিবেন। ঠাকুরের 'ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত ও 'রামকৃষ্ণ-কথামৃত' প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের প্রমুখাৎ গ্রন্থকার ঠাকুরের সম্বন্ধে যে সকল নূতন কথা ও ঘটনাদি শুনিতেন সেই সমুদয় সন তারিখ সহ নোট করিয়া রাখিতেন, তাহারই ফলে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থপাঠে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁহার প্রধান শিষ্যগণের সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারা যাইবে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

হারিয়ে যারে জগৎ কাঁদে—শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী। ষ্টাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী, ২১৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩৲।

জাতির জনকের বিচিত্র কর্ম্মবহুল জীবনের ঘটনাবলী অবলম্বনে আলোচ্য গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। লেখক অতি প্রাঞ্জল ভাষায় গান্ধীজীর জীবনী ও জীবন-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি (২য় সং)—শ্রীকমলকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও ৬৯ নং কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে সঙ্গীতকলার আলোচনা, শতাধিক গান, স্তব, কীর্ত্তন, অধিকাংশের স্বরলিপিসহ সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রকাশক স্বয়ং ভক্ত-গায়ক, তাঁর ভক্তিভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে এই সব ভাগবত স্তব-গানাদির নিত্য-সাধনায়। ভাগবত-সঙ্গীতে অনুরাগী মাত্রেই এ গ্রন্থদ্বারা উপকৃত ও আনন্দিত হইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শিক্ষা-প্রসঙ্গ—শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বি-এ, বি-টি। ভারতী বুক ষ্টল, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷০।

দুনিয়ার অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় শিক্ষার দিক দিয়া ভারতবাসী আমরা যে অনেক পিছাইয়া রহিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করার পর গঠনমূলক কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই গঠনমূলক কার্য্য-তালিকায় মুখ্য স্থান দেওয়া উচিত শিক্ষাকে। মহাত্মা গান্ধী ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়া বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তনে এতটা উৎসাহী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান পুস্তকে প্রাচীন মিশর, গ্রীস ও রোমের শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৫ সালে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত "নয়া তালিমী" পর্য্যন্ত দেশ-বিদেশের বিবিধ শিক্ষাবিধির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে ইউরোপের প্রাক্-মধ্যযুগ ও মধ্যযুগে

শিক্ষার অবস্থা, ইলিয়ট, লক, রুশো প্রমুখ ইউরোপীয় লোক শিক্ষকদের শিক্ষা-নীতির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। তা ছাড়া লেখক জার্মানী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ ও রাষ্ট্রের শিক্ষা-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি, জাপান পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা গ্রহণ করিয়াও কি ভাবে নিজের জাতীয় ঐতিহ্যের ধারাকে বজায় রাখিয়াছে, ভারতবাসীর শিক্ষায় অনগ্রসরতার মূল কারণ কি ক ইত্যাদি নানা বিষয় যুক্তিতর্কসহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা শিক্ষা সংক্রান্ত বিবিধ তথ্যের আকর-স্বরূপ। লেখকের সিদ্ধান্তগুলির সহিত সকলে একমত না হইতে পারেন, কিন্তু একথা স্বীকার করিতে হইবে যে পুস্তকখানির প্রত্যেকটি অধ্যায় সারগর্ভ এবং গভীর অধ্যয়ন ও চিন্তা-প্রসূত। শিক্ষাব্রতী, শিক্ষাবিদ্, শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষার্থী সকলেই এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে লাভবান হইবেন।

ছোটদের জওহরলাল—শ্রীশ্রীবিদাস সাহা রায়। প্রাচী পাবলিশিং ১৬।১৭ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চার আনা।

পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর জীবনী হইতে লেখক সেই ঘটনাগুলিকে নির্ব্বাচন করিয়াছেন যাহা ছোটদের ভালো লাগিবে এবং তাহাদের হৃদয়ে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করিবে। বইয়ের আরম্ভটি ঠিক যেন একটি উপন্যাস অথবা ছোট গল্পের মত, আর সেই গল্পের ধারাটি আগাগোড়া অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। লেখক জওয়াহর লালের আত্মচরিত হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও কল্পনার রং চড়াইয়া সত্যকে বিকৃত বা অতিরঞ্জিত করেন নাই। পণ্ডিতজীর কর্ম্মবহুল জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী যাহাতে বাদ না পড়ে, তিনি সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন।

সব হারানোর দেশে—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু। ফিনিক্স প্রেস লিমিটেড। ৫৬, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট। কলিকাতা—১। দাম আড়াই টাকা।

পুস্তকের নামকরণ হইতে মনে হইয়াছিল ইহা উপন্যাস, কিন্তু পড়িয়া দেখিলাম ইহা যুদ্ধোত্তর বিলাত সম্বন্ধে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক একখানি পুস্তক। কিন্তু ভ্রমণবৃত্তান্ত হইলেও সরস রচনাশৈলীর দরুন ইহা উপন্যাসের চেয়ে কম চিত্তাকর্ষক হয় নাই। ১৯৩৯-এর ইংলণ্ডে আর আজকের ইংলণ্ডে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। লেখকের ভাষায়—(তখনকার দিনে বিলাতের) "অভাব ছিল না কিছুরই।...ছিল সাম্রাজ্য, ছিল ডলার, ছিল জাহাজ। এখন এসবের কোনটাই নেই যথেষ্ট পরিমাণে। এসেছে দুঃখের দিন।" এই দুঃখদুর্গতিক্লিষ্ট অভাবজর্জ্জরিত বিলাতের একটি নিপুণ আলেখ্য এই পুস্তকে আঁকা হইয়াছে।

বইখানিতে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক আজিকার বিলাতের সমাজকে বাহির হইতে ভাসা ভাসা রূপে দেখেন নাই। গভীর অনুসন্ধিৎসা দ্বারা একদিকে যেমন তিনি বিলাতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মর্ম্মমূলে প্রবেশ করিয়াছেন অন্যদিকে তেমনি বিলাতী বান্ধবীর অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া সেখানকার একেবারে হাঁড়ির খবর পর্য্যন্ত টানিয়া বাহির করিয়াছেন এবং সে খবরটি হইতেছে এই যে, সে দেশে আজ সাধারণ ভদ্র গৃহস্থেরও প্রয়োজনের উপযুক্ত খাবার নাই। কিন্তু বিলাতের স্ত্রী-পুরুষের চারিত্রগত বৈশিষ্ট্য এই যে, দুর্ভাগ্যের কাছে ইহারা হার মানিতেছে না। উপকরণের অভাব থাকিলেও বিলাতী গৃহিণীর অন্তঃপুরে অনুষ্ঠান-আয়োজনকে ত্রুটিশূন্য করিবার জন্য চেষ্টার অন্ত নাই। ইহার মধ্যে যে একটি হৃদয়স্পর্শী কারুণ্য আছে তাহা লেখককে বিচলিত করিয়াছে, এবং এমন দরদ দিয়া ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন যে পাঠকচিত্তে তাহা একটি বেদনাপূর্ণ অনুভূতির সৃষ্টি করে। এমন ভাবে বিলাতের ঘরোয়া কথা এবং ঘরকন্নার কথা আর কোনো বাঙালী লেখক লিখিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

পুস্তকখানিতে মননশীলতা, বর্ণনা-কৌশল, ইংরেজের জাতীয় চরিত্র বিশ্লেষণ ইত্যাদি অনেক কিছুই আছে। কিন্তু সেগুলি ইহার বহিরঙ্গ মাত্র, আসলে ইহাতে পাওয়া যায় গল্পের স্বাদ। রচনাভঙ্গীর এমনি একটি স্বকীয়তা ও সরসতা আছে যে পড়িতে পড়িতে বার বার এই কথাই মনে হইতেছিল যে বলিবার কৌশলটি আয়ত্ত থাকিলে নিতান্ত তুচ্ছ কথাও কত সুন্দর করিয়া বলা যায়। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় যাহাকে বলিতেন 'ফুর্তি করে লেখা', বইখানি আসলে তাহাই। ইহা বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বিনা টিকিটে—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সংকেত ভবন। ৩নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা—২০। মূল্য ৩্।

গল্প-গ্রন্থ। আঠারটি গল্প ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। লেখক সাহিত্যের আসরে নবাগত হইলেও তাঁর ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়, যদিও তাঁর গল্প নির্ব্বাচনের আমরা প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। নিজের লেখার প্রতি স্নেহান্ধ হওয়া সমীচীন নয়।

'পথের পাশে', 'আবির্ভাব' এবং 'বন্ধনহীন গ্রন্থি' এই তিনটিই প্রথম শ্রেণীর গল্প। এগুলি স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল—বলার ভঙ্গী, বিষয় নির্ব্বাচন ও পরিবেশসৃষ্টিতে অনবদ্য। "পথের পাশে"র পাঁচুর মৃত্যুর দৃশ্যটি, 'আবির্ভাবে'র যেখানে বুড়ী আবিষ্কার করিল তার পুত্রবধূর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কথা—মনকে মুগ্ধ করে। 'বন্ধনহীন গ্রন্থি'তে লেখক আঁকিয়াছেন কামাখ্যার এক কুমারীর জীবনালেখ্য। তার দুটি রূপ—বাহিরে সে সন্ন্যাসিনী, অন্তরে তার চিরন্তনী নারী। অন্তরের সত্যকে সে গ্রহণ করিতেও পারে না, তাকে অস্বীকার করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে শুধু একটা "চাপা গুমরে ওঠা কান্নায় বায়ময় হয়ে উঠে অন্ধকার, অশরীরী আকৃতিতে আকুল উদাস।" "অন্যায় যে করে, অন্যায় যে সহে" গল্পটিতে অতি-নাটকীয়তা আছে। "শুধুই পটে লিখা" অস্বাভাবিক। "যারা মা হ'ল না" গল্পে শেষ রক্ষা হয় নাই। অন্যান্য গল্পগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

ইহা ছাড়া লেখকের ভাষা সম্বন্ধেও আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। অনেক ক্ষেত্রেই সহজ প্রকাশভঙ্গীর পরিবর্ত্তে তিনি অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ধরণের শব্দের ঝঙ্কারে চমক লাগাইবার লোভ শক্তিমান লেখকের সংবরণ করাই বাঞ্ছনীয়।

মহাযুদ্ধের পরে মালয়—শ্রীগৌরমোহন দাস দে। ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগের ভূমিকা সম্বলিত। অগ্রণী বুক ক্লাব, ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য আড়াই টাকা।

বিগত মহাযুদ্ধে গ্রন্থকার মালয় ও শ্যামের কোন কোন অঞ্চলে মিত্র বাহিনীর পক্ষে চিকিৎসকরূপে গমন করেন। সে-সব স্থলে তিনি শুধু রোগীর চিকিৎসাতেই রত ছিলেন না, তিনি অবসর পাইলেই কর্ম্মস্থলের নিকটে ও দূরে মালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণে বাহির হইতেন। দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও তিনি এইরূপে অর্জ্জন করেন। আলোচ্য পুস্তকখানিতে ইহার কিয়দংশ মাত্র বিবৃত হইয়াছে। বিষয়-বস্তুগুলি এই কয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত—টপ সিক্রেট, মালাক্কার পথে একদিন, কোয়ালালমপুরের অভিজ্ঞতা, টাইপিং-এ ক'দিন, কুলিমে এক রাত্রি, পাহাড়ের পথে, মালয়ের কথা, মালয়ের আদিবাসীদের কথা, প্রবাসী ভারতীয়ের চক্ষে মালয়। মালয় দেশ এবং সেখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়, 'মালয়ের কথা' এবং 'মালয়ের অধিবাসীদের কথা' অধ্যায় দুইটিতে আলোচিত হইয়াছে। যুদ্ধের মধ্যেও একজন বাঙালী যুবক স্বকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও ভ্রমণচ্ছলে কিরূপ জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা চরিতার্থ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন পুস্তকখানি তাহারই একটি সুন্দর নিদর্শন। প্রায় প্রত্যেকটি অধ্যায়ই চিত্র-সংযুক্ত। পুস্তকখানি পাঠককে তৃপ্তিদান করিবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দেশ-বিদেশের কথা

বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতি

গত ৫ই আষাঢ় কলিকাতার ২৩ ওয়েলিংটন স্ট্রীটে বিশিষ্ট সুধী, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে নবপরিকল্পিত বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতির কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। ডক্টর কালিদাস নাগ এই সমিতির স্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সমগ্র বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে সাহিত্যের আলোচনা ও প্রসারের উদ্দেশ্যে এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। বাংলার বহু বিশিষ্ট শিল্পী ও সাহিত্যিকবৃন্দ এই সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহার প্রতিষ্ঠা-সভায় ডক্টর নাগ পৌরোহিত্য করেন। ইহার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি বলেন,—

"যে বাংলাকে আমরা এতদিন ধরে দেখে এসেছি, হঠাৎ একদিন দেখলাম তার রূপ বদলে গেছে। ভৌগোলিক বাংলা আমাদের মনে যে দাগ কেটেছে তা সত্য নয়। তাই বৃহত্তর বাংলায় আজ আমাদের সংস্কৃতির বাণী বহন করে নিয়ে যেতে হবে। বর্ত্তমান সীমাবদ্ধ বাংলার পরিবর্ত্তে আসল বাংলার প্রত্যেকটি জেলার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করাই হবে এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। আমি আজকের এই খণ্ডিত বাংলাকে স্বীকার করি না। বাংলার যে চিরন্তন সত্তা তাকে পুনরায় জাগিয়ে তুলবার জন্য এবং খণ্ডিত নয়, বৃহত্তর বঙ্গের আত্মাকে সবার মনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই আজকে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা।" ডাক্তার নাগের বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিক কয়েকটি সঙ্গীতদ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করেন।

ঝাড়গ্রাম সেবায়তন

১৯৪৪-এর ডিসেম্বর মাসে শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ গিরিজীর পৌরোহিত্যে ঝাড়গ্রাম সেবায়তন আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করা হয়। পল্লীবাসীর সেবার উদ্দেশ্যে বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। চিকিৎসা বিভাগটি ইতিমধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং একটি হাসপাতাল নির্ম্মাণের কার্য্যও সুরু হইয়া গিয়াছে। কৃষি ও গোপালন বিষয়েও আশ্রমের কর্ম্মীগণ বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন।

অন্যান্য কাজের মধ্যে সুতাকাটা, সেলাই (দর্জ্জির কাজ) ও পুস্তক বাঁধানোর কাজেরও সূত্রপাত হইয়াছে। আশ্রমে প্রবেশিকা মান পর্য্যন্ত একটি বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং "শ্রীযুক্তেশ্বর ছাত্রাবাস" নামে একটি ছাত্রাবাসও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আশ্রমে ও নিকটস্থ পল্লীতে নৈশবিদ্যালয়-সমূহের কার্য্যপরিচালনাও সুষ্ঠুভাবে হইতেছে। সেবায়তনের কলিকাতা-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, ৬ বি, ব্রড স্ট্রীটে।

কুমুদবিহারী রায়

নীরব পল্লীসেবক কুমুদবিহারী রায় সম্প্রতি হৃদরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইনি ১৯১৬ সালে কলিকাতা হইতে ৩৬ মাইল দূরে গোবরডাঙা গ্রামে নিজ কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া লন ও আশপাশের পল্লীসমূহের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গোবরডাঙা তখন একটি অত্যন্ত অনগ্রসর গ্রাম ছিল। ৩৩ বৎসর যাবৎ বহু প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অক্লান্ত ভাবে সংগ্রাম করিয়া কুমুদবাবু এই গ্রামটির এবং পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। পল্লী-উন্নয়ন এবং সমাজ-সেবাই ছিল তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র।

কুমুদবিহারী ছিলেন নিরাসক্ত কর্ম্মী। ফলকামনারহিত হইয়া তিনি সর্ব্বদা কল্যাণকর্ম্মে রত থাকিতেন।

চিত্র পরিচয়

ব্যাঙ্ককের বৌদ্ধ মন্দিরগাত্রে রামায়ণ-চিত্রাবলী

শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্ককের একটি বৌদ্ধ মন্দিরে ১৭৮টি প্রাচীর-চিত্রের সাহায্যে রামায়ণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের রামায়ণ-কাহিনীর সঙ্গে ইহার কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। রাক্ষস-রাজা 'দশকণ্ঠ' সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে পর রাম এবং তাঁহার অনুজ কি ভাবে শ্বেত বানররাজ হনুমানের সাহায্যলাভ করিয়া রাক্ষসরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন তাহাই এই চিত্রগুলির বিষয়বস্তু।

প্রথম চিত্রটি সীতাহরণ-সম্পর্কিত। ইহাতে অরণ্যকুটিরে সীতাহারা রামের শোক, সীতাকে অপহরণ করিয়া রাক্ষস-রাজের প্রস্থান, জটায়ুর সহিত যুদ্ধ ইত্যাদি উপাখ্যানের অঙ্গীভূত আটটি বিষয় দেখানো হইয়াছে।

দ্বিতীয় চিত্র :—সীতা অপহৃতা হইবার পর বানররাজের সহিত রামচন্দ্রের বন্ধুত্ব হয়। নৈশ আক্রমণের হাত হইতে রামচন্দ্র এবং তাঁহার সৈন্যদলকে রক্ষা করিবার জন্য হনুমান বিরাট আকার ধারণপূর্ব্বক নিজের দেহটিকে প্রাসাদের মত করিয়া তাঁহাদিগকে তন্মধ্যে আশ্রয় দেন। বানররাজ স্বাভাবিক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে পর শত্রুরা অতর্কিতে রাম-চন্দ্রের সৈন্যদের উপর চড়াও হয় এবং রামকে বন্দী করে।

তৃতীয় চিত্র :—সীতা উদ্ধারের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে হনুমান যখন সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিতেছেন তখন সিংহিকা নামে সাগরবাসিনী এক রাক্ষসী তাহার ছায়া আকর্ষণ করিয়া তাহাকে বন্দী করিবার চেষ্টা করে। হনুমান ক্ষুদ্র আকার ধারণ করিয়া তাহার মুখের ভিতরে ঢুকিয়া পড়েন এবং তাহার পিঠ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হন। সঙ্গে সঙ্গেই রাক্ষসীর মৃত্যু হয়।

চতুর্থ চিত্র :—প্রহরায় রত এক দৈত্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হইলে পর রামচন্দ্রের আক্রমণের হাত হইতে লঙ্কাকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের বিরাট জিহ্বা মেলিয়া দিয়া তাহার নীচে সমগ্র লঙ্কাপুরীকে ঢাকিয়া রাখে। রাত্রিকালে রাক্ষসরাজ নগরীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন, কিন্তু বিরাট দৈত্য-জিহ্বাদ্বারা আচ্ছাদিত নগরীকে চিনিতে পারেন না। (প্লেটের চিত্র দ্রষ্টব্য)

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

ভারতের গণপরিষদে কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত জম্মু এবং কাশ্মীরের চারি জন প্রতিনিধি। দক্ষিণে—প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লা

যুদ্ধবিরতির পরে কাশ্মীরের স্বাভাবিক অবস্থা
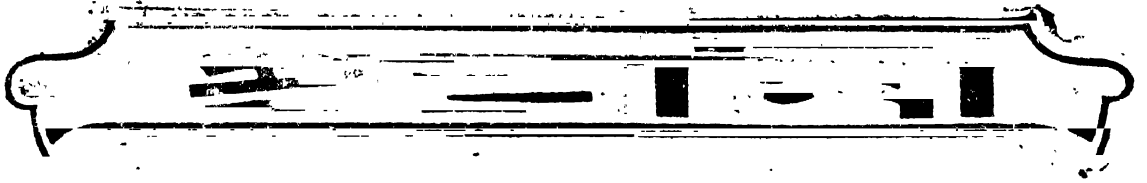
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা-বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৯শ ভাগ
১ম খণ্ড | ভাদ্র, ১৩৫৬ | ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা দিবস

স্বাধীনতা দিবস আগতপ্রায়। ঐ দিন কি ভাবে উদ্‌যাপিত হইবে তাহার জন্ম বিভিন্ন পন্থাবলম্বী নানা জনে নানা মত দিয়াছেন। ৯ই আগষ্ট বিগত হইয়াছে, কিন্তু কাহারও মনে সেই যুগসন্ধিক্ষণের কথা পূর্ণরূপে উদিত হইয়াছিল কি? আজ আমরা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছি, যদিও তর্কের খাতিরে বা দুঃখ-কষ্টের ঝোঁকে যখন কেহ বলে যে এই স্বাধীনতা "ভুয়া" বা "ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যয়" তখন আমরা অনেকেই তাতে সায় দিই। আমাদের সায় দেওয়ার প্রধান কারণ এই যে, আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ ভুলিয়াছি প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে। এখন স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতেও আমাদের লাগিবে অন্ততঃ সাত বৎসর। ইতিমধ্যে অনেক পণ্ডিতমূর্খ, অনেক অর্ব্বাচীন স্বৈরাচারীর কথায় আমরা টলিব, ভুল পথে লক্ষ বা কোটির পর্য্যায়ে লোকে চালবে এবং দেশে অশান্তি ও অরাজকতার বন্যা বহিবে। ইহার কারণ আজ দেশের শীর্ষ স্থানের আসন শূন্য।

বাংলায় এখন ঘোর দুর্দ্দিন চলিতেছে। বাংলার আকাশ জ্যোতিষ্কবিহীন ও তমসাচ্ছন্ন। সেই তমিস্রার আড়ালে গণ-দেবতার আসনে অপদেবতার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে। স্বাধীনতার প্রথম উদ্বোধন হইতে দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের আরম্ভকাল পর্য্যন্ত যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির ন্যায় দেশকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন সেই কবিগুরু আজ নাই, তাঁহার প্রিয়বন্ধু ও শিষ্য, যিনি নিদারুণ মাৎস্যন্যায়ের স্রোতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নোয়াখালির হিন্দু আর্ত্তগণের পরিত্রাণের চেষ্টা করিয়া-ছিলেন সেই মহাত্মাও চলিয়া গিয়াছেন। বাংলার স্বাধীনতার যজ্ঞে তাই হইয়াছে ভূতপ্রেতের আবির্ভাব।

বাংলার গৃহবিবাদ

বাংলার গৃহবিবাদের পালা চরমে উঠিয়াছে। যাঁহারা মন্ত্রীসভার আসন অধিকার করিয়া আছেন তাঁহাদের প্রাদেশিক কংগ্রেসের (?) "গদী" হইতে সরান হইয়াছে, এখন কোঁদল চলিয়াছে মন্ত্রিত্ব অধিকার লইয়া। দেশের ও দশের কথা এখানে অবান্তর, কেননা ইহা জমীদারী দখলের "সরিকানা লড়াই," প্রজা মরে কি বাঁচে তাহাতে কাহার কি আসে যায়? প্রজা তো প্রবাদ-কথিত উলুখড়, সুতরাং বাঘ ও মহিষের লড়াইয়ে তাহার প্রাণ যাইবেই ও শেষে জয়লাভ করিবে—বাঘও নয়, মহিষও নয়—সেই ফেরুপাল, যাহাদের চীৎকারে বাংলার আকাশ এখনই ফাটিয়া পড়িতেছে। সে যাই হোক, দুই পক্ষই উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন ও সেখানে মীমাংসাও হইয়াছে এইরূপে:

"তিন দিন কলিকাতায় অবস্থানকালে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন এবং সেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত তিনি যে সব আলোচনা করেন, পণ্ডিত নেহরু ওয়ার্কিং কমিটিতে তাহার বিবরণ দিয়াছেন এবং পশ্চিম বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটি পণ্ডিত নেহরুর বিবরণ ও রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিস্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মীদের সহিত আলোচনা করিয়া এই অভিমত পোষণ করেন যে, পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণ যাহাতে তাহাদের পছন্দসই প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে পারে তজ্জন্য যত শীঘ্র সম্ভব পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নূতন নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এবং বয়স্কদের ভোটাধি-কারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্ব্বাচন ১৯৫০ সালের শেষভাগে অথবা ১৯৫১ সালের প্রথমভাগে ছাড়া সম্ভবপর হইবে না বলিয়া জানা গিয়াছে। ১৯৫০ সালের শেষভাগের পূর্ব্বে নূতন ভোটার তালিকা প্রস্তুত হইবে না বলিয়া তৎপূর্ব্বে সাধারণ নির্ব্বাচনের অনুষ্ঠানও সম্ভবপর নহে। এই নূতন ভোটার তালিকা প্রস্তুতের পূর্ব্বে যদি কোন নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তবে তাহা ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এবং বর্ত্তমান ভোটার তালিকার ভিত্তিতেই করিতে হইবে।

নূতন ভোটার তালিকা প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাথমিক কমিটি হইতে সুরু করিয়া সর্ব্বোচ্চ কমিটি পর্য্যন্ত কংগ্রেসের বিভিন্ন পর্য্যায়ের পূর্ণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানও সম্ভবপর নহে।

পুরাতন ভোটার তালিকা অতিশয় পুরাতন এবং তাহার অনেকগুলি এখন পাওয়াও সম্ভবপর নহে।

(১) এই কারণে ওয়ার্কিং কমিটি সুপারিশ করিতেছে যে:—(ক) এখন হইতে ছয় মাসের মধ্যে ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের নূতন নির্ব্বাচনের অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সময়ে বর্ত্তমান ব্যবস্থা-পরিষদ বাতিল করিতে হইবে।

(খ) যদি সম্ভব হয় তবে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থাসহ যৌথ নির্ব্বাচনের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যদি ইহা সম্ভবপর না হয় বা এই ব্যবস্থার যদি বিলম্ব ঘটে, তবে নির্ব্বাচনে বর্ত্তমান ব্যবস্থাই অনুসৃত হইবে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত যে সব শরণার্থী পূর্ব্ববঙ্গেও ভোটার ছিলেন কিন্তু এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গে বসতি স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা অন্ততঃ ছয় মাস পশ্চিমবঙ্গে বাস করিতেছেন বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে তাঁহাদিগকেও যতদূর সম্ভব ভোটার তালিকাভুক্ত করা হইবে এবং বর্ত্তমান ভোটার তালিকা সংশোধন করা হইবে।

(গ) পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাজ চালাইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি অন্তর্ব্বর্ত্তী মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়া দরকার। এই মন্ত্রিসভা প্রদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের লইয়া গঠন করিতে হইবে। যাঁহারা বর্ত্তমানে ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নহেন, তাঁহাদিগকেও এই মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা যাইবে। পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেসী দল এই সম্পর্কিত যে কোন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিবেন।

শীঘ্রই সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া ইতিমধ্যে পরিষদের শূন্যপদ পূরণের জন্য কোন উপনির্ব্বাচনের প্রয়োজন নাই।

কমিটি আরও মনে করেন—(১) পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতি পুনর্গঠন করা দরকার। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিভিন্ন দলভুক্ত ব্যক্তিকে এই কার্য্যকরী সমিতিতে স্থান দিতে হইবে। এই কার্য্যকরী সমিতির আবার একটি ক্ষুদ্রায়তন ওয়ার্কিং কমিটি থাকিবে এবং এই ওয়ার্কিং কমিটিতেও বিভিন্ন দলের কর্ম্মীদের স্থান দিতে হইবে।

(২) পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির পুনর্গঠন যদি সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে নিঃ-ভাঃ কংগ্রেস কমিটির পশ্চিমবঙ্গীয় সদস্যগণ প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিবেন।

(৩) পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনায় যদি কোন অসুবিধা দেখা দেয় তবে ওয়ার্কিং কমিটি প্রয়োজনমত অপর যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন।

(৪) প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সাধারণ নির্ব্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের চূড়ান্ত দায়িত্ব থাকিবে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের হাতে।

(৫) পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটিতে পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকজন সদস্যকে কো-অপ্ট করা বিধিসম্মত হয় নাই বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি অবিলম্বে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের নির্দ্দেশ প্রদান করিতেছে। এই সম্পর্কিত বিধান ভঙ্গ করা হয় নাই বলিয়া যে সব সদস্য প্রমাণ করিতে পারিবেন না বা যে সব ক্ষেত্রে বিধান লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইবে সেই সব সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করা হইবে।"

ওয়ার্কিং কমিটির উক্ত নির্দ্ধারণে বোধ হয় মন্ত্রিত্ব অধিকার প্রার্থীদের মন উঠে নাই, কেননা প্রাদেশিক কংগ্রেসের নামে বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে যে সতেরো দফায় অভিযোগ তাঁহারা করিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ ফিরিস্তি উত্তর-ভারতের নানা সাময়িক পত্রিকায় দেওয়া হইয়াছে, এবং একটি পত্রিকা তাহার প্রায় সমস্তটাই ছাপাইয়াছে। ঐ অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয় করা বা বিচার করা এখানে সম্ভব নহে, যদিও ঐরূপ প্রচারের উদ্দেশ্যই তাই। অভিযোগের বিচার যদি কখনও হয় তবে দুই দলেরই বিচার হওয়া প্রার্থনীয়, কেননা যাঁহারা মহাসাধু সাজিয়া এখন বিচার প্রার্থনা করিতেছেন তাঁহাদের বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ ওয়ার্কিং কমিটির কাছে গিয়াছে আমরা জানি।

২২শে শ্রাবণ

আট বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এমনি দিনটিতে বর্ষাবিধুর আকাশের নীচে রবীন্দ্রনাথ শেষ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। এই দিনের স্মৃতি দেশের লোকের মনে একটা বেদনা ও আকুলতা জাগায়। পঞ্জাবের উপর অসহ্য অপমানের জ্বালায় অস্থির হইয়া তিনি ইংরেজ-রাজ প্রদত্ত উপাধি ত্যাগ করেন, এই কথা সুবিদিত। কিন্তু তত সুবিদিত নয় সেই কথা যে ১৯১৯ সনের মার্চ-এপ্রিল মাস হইতেই গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের প্রতি তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। আমাদের পাঠকবর্গের অবগতির জন্য ১০ই জুলাইয়ের "হরিজন" হইতে তাঁহার পত্রের অংশ তুলিয়া দিলাম:

প্রিয় মহাত্মাজী,

শক্তির সকল রূপই যুক্তিবিরোধী—ঠিক যেন এক অশ্বের ন্যায়, চক্ষুতে আবরণ দেওয়া হইয়াছে, রথ টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে নৈতিক গুণ শুধু সারথিরই থাকিতে পারে, যিনি অশ্বকে পরিচালনা করেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের শক্তির মধ্যে নৈতিক কিছু থাকিতেই হইবে এমন কথা নয়; ইহা সত্যের অনুকূলে প্রযুক্ত হইতে পারে, সত্যের প্রতিকূলেও পারে। সকল শক্তির মধ্যে

যে বিপদের সম্ভাবনা আছে, শক্তি সিদ্ধির নিকটবর্ত্তী হইলেই তাহা বাড়িয়া উঠে, কারণ তাহা হইলে ইহা গিয়া লোভে দাঁড়ায়।

আমি জানি, আপনার শিক্ষা হইল কল্যাণের সাহায্যে অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। কিন্তু এরূপ সংগ্রাম বীরের জন্য, ক্ষণিক উত্তেজনার অধীন মানুষের জন্য নয়। একদিকে অকল্যাণ স্বভাবতই অকল্যাণের সৃষ্টি করে, অবিচারের ফলে হয় অত্যাচার, অপমানের ফলে জিঘাংসা। দুর্ভাগ্যবশত এরূপ শক্তির সৃষ্টি ইতিমধ্যে হইয়া গিয়াছে, এবং হয় ভয়ে নয়ত ক্রোধে আমাদের কর্ত্তারা তাঁহাদের নখদন্ত বাহির করিয়াছেন। তাহার মিশ্রিত ফল হইল আমাদের কাহাকে কাহাকেও প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় গোপন পথে চালিত করা, অন্য সকলকে একেবারে মূঢ় ও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলা।

এই সঙ্কটে আপনি মহান্ লোকনায়ক রূপে আমাদের মধ্যে সেই আদর্শে বিশ্বাস ঘোষণা করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছেন যে আদর্শকে আপনি ভারতের বলিয়া জানেন—যে আদর্শ গোপন প্রতিশোধের ভীরুতা ও ভীতত্রস্তের নতশিরে আনুগত্য উভয়েরই বিরুদ্ধে। ভগবান বুদ্ধদেব যেমন তাঁহার সময়ে এবং অনাগত সকল কালের জন্য বলিয়া গিয়াছেন :

অক্রোধেন জিনে ক্রোধম্ অসাধুং সাধুনা জিনে—
অক্রোধের দ্বারা ক্রোধ জয় করিবে, সাধুতার দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবে—

আপনিও তেমনই বলিয়াছেন।

এই হিতসাধনী ক্ষমতার শক্তি ও সত্য রূপ প্রমাণ করিতে হইবে তাহার অন্তরের দ্বারা এবং ভীতিউৎপাদনের শক্তির উপর যাহার সাফল্য নির্ভর করে ও যাহা সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্রীকৃত দেশবাসীকে ভীতিসংমূঢ় করিবার জন্য ধ্বংসের যন্ত্র প্রয়োগ করিতে সংকুচিত হয় না এমন কোনও বাহিরের শক্তির সুযোগ গ্রহণে অস্বীকারের দ্বারা। আমাদের বুঝিতে হইবে যে, নৈতিক জয় বাহিরের সফলতার মধ্যে নাই। ব্যর্থতা তাহার মূল বা মর্য্যাদা কাড়িয়া লইতে পারে না। যাহারা ধর্ম্মজীবনে বিশ্বাসী তাহারা জানে যে, অন্যায়ের পিছনে যখন ব্যাপক বাস্তব শক্তি থাকে তখন অন্যায়ের প্রতিরোধে দাঁড়ানোই জয়—সে জয় স্পষ্ট পরাজয়ের সম্মুখে আদর্শের প্রতি জীবন্ত বিশ্বাসের জয়।

আমি সর্ব্বদাই অনুভব করিয়াছি, আর তাহা বলিয়াছিও যে, স্বাধীনতার মত মহাবস্তু দান হিসাবে কোনও জাতি পাইতে পারে না। তাহা পাইবার আগে আমাদের তাহা জিতিয়া লইতে হইবে। ভারতবর্ষ যখন প্রমাণ করিতে পারিবে যে, যে জাতি অধিকার করিয়াছে বলিয়াই শাসন করিতেছে তাহার অপেক্ষা ভারতবর্ষ নৈতিক হিসাবে উন্নত তখনই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা জিতিয়া লইবার সুযোগ আসিবে। দুঃখকষ্টের প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে স্বেচ্ছায় বরণ করিতে হইবে। সে দুঃখকষ্ট মহৎ লোকের মাথার মণি, কল্যাণবুদ্ধিতে তাহার বিশ্বাস অটল। অধ্যাত্মশক্তিকে যাহারা বিদ্রূপ করে সেই ঔদ্ধত্যের সামনে তাহাকে অকুণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইতে হইবে।

আপনার দেশজননীর প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে আপনি আসিয়াছেন তাঁহাকে তাঁহার লক্ষ্যের কথা মনে করাইয়া দিতে, বিজয়ের সত্যপথে তাঁহাকে লইয়া যাইতে, তাঁহার বর্ত্তমান যুগের রাজনীতির দুর্ব্বলতা দূর করিতে—সেই দুর্ব্বলতা মনে করে যে, কূটনীতির মিথ্যাচরণে অন্যের পোষাক পরিয়া ভড়ং করিলেই বুঝি কাজ হইবে।

তাই আমি অন্তরের সকল আবেগ দিয়া প্রার্থনা করি যে, আমাদের আত্মার স্বাধীনতা যাহাতে খর্ব হইতে পারে এমন কিছু যেন আপনার অগ্রগতির পথে না আসিয়া পড়ে ; সত্যের জন্য আত্মবলি যেন শুধু কথার মারপ্যাঁচের জন্য উন্মাদনার বিকারে দেখা না দেয় ; বড় বড় নামের পিছনে যে আত্মপ্রবঞ্চনা লুকাইয়া থাকে তাহার স্তরে যেন তাহা না নামে।

আপনার অকপট বন্ধু—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতায় অবাঙালীদের কার্য্যকলাপ

কলিকাতায় অবাঙালীদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে একটি নূতন বিষয় কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করা যাইতেছে। পুলিশ কনেষ্টবল পদে বাঙালী নিয়োগ আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু লোক বাছাইয়ের পদ্ধতি ভাল নহে বলিয়া সুপারিশে অনেক বাজে লোক ঢুকিতে থাকে। হেড কনেষ্টবলেরা হিন্দুস্থানী ; ইহারা এতদিন নিজেদের আত্মীয়স্বজন ভর্ত্তি করিয়া কনেষ্টবল শ্রেণীটিকে প্রধানতঃ বিহারের একটি বড় উপার্জ্জন ক্ষেত্র করিয়া রাখিয়াছিল। হেড কনেষ্টবলেরা বাঙালী কনেষ্টবলদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে তিলকে তাল করিয়া উপরওয়ালাদের নিকট উপস্থিত করিয়াও তাহাদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে থাকে। ফলে আবার বিহারী নিয়োগ আরম্ভ হয় এবং কিছুদিন আগে সংবাদ বাহির হয় যে, কলিকাতার পুলিস কনেষ্টবলে সাঁওতাল আমদানীর চেষ্টা চলিতেছে। কনেষ্টবল পদে বিশেষ ভাবে ট্রাফিক পুলিসে বাঙালী ও বিহারীর তাৎপর্য্য কি তাহা যাঁহাদের রাস্তায় চোখ মেলিয়া চলা অভ্যাস তাঁহারা প্রতিদিন দেখিতে পাইবেন। রিক্সা, মহিষ এবং ঠেলা গাড়ী কলিকাতার রাস্তার অতি অসুবিধাজনক বস্তু, ইহারা ট্রাফিকের কোন নিয়মকানুন মানে না, অনেক দুর্ঘটনার জন্য ইহারা দায়ী এবং বহু বাস ও গাড়ী চালককে ইহারা হঠাৎ পাশ কাটাইতে

গিয়া বা ষ্ট্যাণ্ডে আটকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অত্যন্ত বিপদে ফেলে। বিহারী ট্রাফিক পুলিস এদের কিছু বলে না। অথচ কোন বাঙালী গাড়ী চালকের সামান্যতম ক্রটিবিচ্যুতি দেখিলেই ইহারা ভয়ানক ভাবে কর্ত্তব্যতৎপর হইয়া উঠে। সম্প্রতি আরও একটি বিপদ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। আগে পুলিসকে লাঠি চার্জ্জ করিতে বলিলে রাস্তায় লাঠি ঠুকিয়া এবং লাঠি ঘুরাইয়া তাহারা ভয় দেখাইয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিত, পারত পক্ষে গায়ে লাগাইত না। এখন দেখা যায় ইহারা উপরওয়ালার হুকুমের অপেক্ষায় ছটফট করিতে থাকে। সশস্ত্র পুলিসের ব্যবহারেও এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

কলিকাতায় ষ্টেট বাস হওয়ায় রিক্সার খুব অসুবিধা হইয়াছে, বাঙালী হকার হওয়ায় বিহারী হকারদের পসার কমিয়াছে। সম্প্রতি গড়িয়াহাটার মোড়ে একটি রিক্সা উপলক্ষ্য করিয়া যে ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা গবর্ন্মেণ্টের এবং বাঙালী জনসাধারণের পক্ষে উপেক্ষা করা কোনমতেই উচিত নহে। পাঞ্জাবী বাসের এখন দুইটি প্রতিযোগী—ট্রাম ও ষ্টেট বাস, এই দুইটির সামনে পথ আটকাইয়া দাঁড়াইয়া অতিষ্ঠ করিয়া তোলা ইহাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ট্রাফিক পুলিসের ভারপ্রাপ্ত হেড কোয়ার্টার্সের ডেপুটি কমিশনার মহাশয় সম্প্রতি সরকারের টাকায় বিলাত হইতে ট্রাফিক বিষয়ে "জ্ঞান" অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু শহরের ট্রাফিকের মূল গলদ ও দুর্ঘটনার সর্ব্বপ্রধান কারণগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার তাঁহার সময় এখনও হয় নাই। ঘটনার দিন গড়িয়াহাট বাস ষ্ট্যাণ্ডে একটি পাঞ্জাবী বাস ষ্টেট বাসের পথ আটকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, উহাকে পাশ কাটাইয়া বাহির হইতে গিয়া ষ্টেট বাসটির একটি রিক্সার সঙ্গে ধাক্কা লাগে, রিক্সাটি উল্টাইয়া যায়। কাছেই রিক্সা ষ্ট্যাণ্ড এবং ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড। রিক্সাটি যথাস্থানে না থাকিয়া বাস ষ্ট্যাণ্ডের গায়ে ছিল এবং তাহাও নিয়মমত না দাঁড়াইয়া আড়াআড়িভাবে ছিল; পাঞ্জাবী বাসের আড়াল হইতে উহা দেখা যায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্ত মধ্যে স্থানীয় বিহারীরা দল বাঁধিয়া আসিয়া বাসের ড্রাইভারকে আক্রমণ করে এবং শিখ ট্যাক্সিওয়ালারা দাঁড়াইয়া মজা দেখে, কারণ ষ্টেট বাস উভয়েরই শত্রু। সুখের বিষয়, কয়েকজন নাগরিক-কর্ত্তব্যবোধ সম্পন্ন বাঙালী অগ্রসর হইয়া বিহারীদের বাধা দেন, বাসটি যাদবপুর চলিয়া যাইতে পারে। যাদবপুর হইতে আধঘণ্টাখানেক পরে বাসটি ফিরিলে আবার বিহারীরা দলবদ্ধভাবে উহা আক্রমণ করে। এবারও স্থানীয় বাঙালীরা আক্রমণ প্রতিহত করেন। বাসটি রাসবিহারী এভিনিউ দিয়া অগ্রসর হয়। কিন্তু এই সময়ে একটি খালি লরী ধরিয়া উত্তেজিত বিহারীরা আবার বাসটিকে তাড়া করে এবং পণ্ডিতিয়া রোডের মোড়ে যাত্রী নামাইবার জন্য বাস থামিলে উহাকে ধরে ও ড্রাইভারকে আক্রমণ করে। স্থানীয় লোকেরা তিনটা গুণ্ডাকে ধরিয়া পুলিসের হাতে সমর্পণ করে। এই ঘটনাটি অতি সামান্য ভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা ইহাকে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া মনে করি।

গড়িয়াহাটার লটঘার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শিয়ালদহের ঘটনা ঘটে। রেল ষ্টেশনে কুলিদের অত্যাচার যুদ্ধের সময় হইতে অসহ্য হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের ন্যায্য মজুরী ছয় গুণ বাড়াইয়া দেওয়া সত্ত্বেও ইহারা সন্তুষ্ট নহে, যাত্রীদের বেকায়দায় ফেলিয়া অসম্ভব চড়া হারে ইহারা মুটে ভাড়া আদায় করিয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহা লইয়া গোলযোগ হইয়াছিল এবং ষ্টেশনে উপযুক্ত লোক রাখিয়া প্রতিকারের আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যত: এই অত্যাচার বন্ধ হয় নাই। শিয়ালদহ ষ্টেশনে এইরূপ একজন কুলির অতিরিক্ত পয়সা আদায়ের জবরদস্তি হইতে বচসা হয়। বচসা হাতাহাতিতে পরিণত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দলবদ্ধভাবে লাঠিসোটা লইয়া বিহারী প্রভৃতি অ-বাঙালী কুলিরা যাত্রীদের আক্রমণ করে। গড়িয়াহাটের মোড়ে বাঙালীদের কর্ত্তব্যবোধ জাগরণের যে সামান্য পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল এখানে তাহা আরও পরিস্ফুট হয়, এবং বিহারীদের মার ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ষ্টেশনের বাহিরে রাস্তায় কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল ইতর লোক লুঠপাট প্রভৃতি করে, ইহা সর্ব্বথা নিন্দনীয়। শিয়ালদহের ব্যাপারে বাঙালী যে তৎপরতা ও দৃঢ়তা দেখাইয়াছে তাহার সুফল ফলিয়াছে, উদ্ধত বিহারী প্রভৃতি কতকটা সংযত হইয়াছে। গবর্ন্মেণ্ট অবশ্য এখানেও দু'পক্ষ বাঁচাইয়া অর্থহীন বিবৃতি দেওয়া ছাড়া আর কোন কিছু করেন নাই। তবে মহরমের গত গোলযোগের ন্যায় সমস্ত দায়িত্ব বাঙালীর ঘাড়ে না চাপাইয়া বিহারীদের প্রথম আক্রমণের কথাটা যে সাহস করিয়া প্রেস নোটে বলিতে পারিয়াছেন, অন্তত: এইজন্যও তাঁহাদের ধন্যবাদ দিতে হয়।

বাঙালী শুধু চাকুরি করিতেই পারে, চাকুরি ছাড়া আর কিছু তারা করিতে রাজী নয় এই ধরণের কথা সেদিনও জবাহরলাল কলিকাতায় বলিয়া গিয়াছেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় বাঙালী প্রবীণেরা উহা নীরবে শুনিয়াই আসিলেন, একটা জবাবও দিতে পারিলেন না। বাঙালী ডেস্ক-ওয়ার্ক ছাড়া আর কিছু করিবার উপযুক্ত নহে, করিতে চাহেও না, এই ধরণের একটা সূক্ষ্ম প্রচারকার্য্য ইংরেজ মাড়োয়ারী স্বার্থচক্র দীর্ঘকাল যাবৎ চালাইয়া আসিয়াছে, যাহার ফলে বহু বাঙালী নিজেও ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন কিন্তু এ কথা একদম ভুল। সামরিক বিভাগে পাইলট এবং আর্টিলারিতে বাঙালী দক্ষতা দেখাইয়াছে। সৈন্য বিভাগে বাঙালীর দক্ষতা প্রমাণিত হওয়ার পর ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট উহাতে বাঙালীর প্রবেশ কমাইয়া দেন। আবার এ দিকে সুযোগ পাওয়া মাত্র বাঙালী নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। এ বিষয়ে প্রধান সমস্যা এই যে, গবর্ন্মেণ্টের সহায়তা ভিন্ন জীবনের কোন ক্ষেত্রেই এখন আর প্রদেশের লোকের পক্ষেও সম্পূর্ণ

ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য নহে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্ব্ব-স্তরে, মুটেমজুর, গয়লা প্রভৃতির কাজে পর্য্যন্ত এখানে এমন একটা অসম প্রতিযোগিতা রহিয়াছে যে, গবর্মেন্টের সাহায্য ছাড়া বাঙালীর পক্ষে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। মুসলিম লীগ আমলে মুসলমানেরা অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি করিতে পারিয়াছিল কারণ গবর্মেন্ট তাহাদের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছিল। গবর্মেন্ট এখন আর পুলিস-রাষ্ট্র নহে, সমাজ কল্যাণ-রাষ্ট্র (Social Service State) হিসাবে উহা এখন জনগণের জীবনযাত্রার সকল স্তরে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। এই কারণেই গবর্মেন্টের সহায়তা এবং উৎসাহ ভিন্ন কোন সামাজিক কাজ ও উন্নতি এখন আর সম্ভব নহে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ ভাবে এই কথা চিন্তা করা দরকার। আমরা আবারও বলিতেছি, ইহা প্রাদেশিকতা নহে, বাঙালীর জন্মগত অধিকার ও আত্মরক্ষার জন্য ইহা আবশ্যক।

কলিকাতায় বিদেশী ও অবাঙালী

ইউনাইটেড কিংডম সিটিজেন্স এসোসিয়েশনের সরকারী মুখপত্র "মান্থলি রিভিউ"এর গত জুন সংখ্যায় কলিকাতা শহরে বিদেশীদের নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে :

আফগান	১০০০	মিশরীয়	৩০
আমেরিকান	৮৫০	নরওয়েজিয়ান	১৪০
আর্জেন্টিন	১৫	পর্টুগীজ	৭
আরব	১২	রুমানিয়ান	৬
বুলগেরিয়ান	১	রাশিয়ান	১২০
চেক	৯০	শ্যামী	৩০
ডাচ	২২০	সুইডিশ	৬৫
দিনেমার	৫৫	সুইস	১০৫
বেলজিয়াম	১১০	স্পানিয়ার্ড	২০
ফরাসী	২০০	ইরাণী	১৭০
ফিন	১৬	ইরাকী	২৫০
গ্রীক	৩০	ইটালীয়ান	৯০
জর্ম্মান ও অষ্ট্রিয়ান	১৮০	পোল	৭৫
জাপানী	৫০	তুর্কী	২০
হাঙ্গেরিয়ান	৪৫	চীনা	১০,০০০

ইংরেজ এবং পাকিস্থানীর সংখ্যা এই তালিকায় নাই। তা ছাড়া অন্যান্য ডোমিনিয়নের কত লোক কলিকাতায় আছে তাহাও জানা থাকা উচিত।

কলিকাতায় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসীদের সংখ্যা কত তাহাও এখন জানা দরকার হইয়া পড়িতেছে। ভারতের যে কোন শহর অপেক্ষা এক কলিকাতাতে হিন্দী ভাষা-ভাষীর সংখ্যা বেশী ইহা জানা যায়, কিন্তু এই সংখ্যাটি কত তাহা সঠিক পাওয়া যায় না। মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, গুজরাটি, দিল্লীওয়ালা, সিন্ধী প্রভৃতির সংখ্যাও জানা প্রয়োজন। এ কাজ এখন আদৌ কঠিন নয়, রেশন কার্ড ধরিয়া একটু চেষ্টা করিলে এক মাসের মধ্যেই এই অত্যাবশ্যক তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান

ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্বসীমান্ত প্রদেশ তিনটি—পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য। তাহার পূর্ব্বে ও দক্ষিণে পাকিস্থান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্ববঙ্গ। সুতরাং এই সীমান্ত প্রদেশসমূহের জনগণের মন সদাই জাগ্রত ও সতর্ক থাকিবে এই মনোভাব আমরা প্রত্যাশা করি। গত দুই বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হাজার হাজার মুসলমান স্ত্রী-পুত্র লইয়া পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে আসিয়াছে, তাহার প্রমাণ আছে। পূর্ব্ববঙ্গের গবর্মেন্ট এরূপ গমনাগমনের সংবাদ মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের লোক ত তাহাদের চক্ষুর সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিতে পারে না, এবং পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-বিভাগ যে সদা সত্য কথা কহিয়া থাকেন, তাহার প্রমাণও আমাদের নিকট বেশী নাই।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্ত অঞ্চলের মুখপত্র "সংগঠনী" পত্রিকার ১লা শ্রাবণের সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপ্রতি আমরা পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই :

> বিভিন্ন সংবাদপত্রে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে যে, পাকিস্থানে খাদ্য এবং জীবনধারণের অন্যান্য ক্ষেত্রে সঙ্কট উপস্থিত হওয়ায় মুসলমানরাও বাধ্য হইয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। এই কথা হয়তো সত্য, কিন্তু পাকিস্থানে সঙ্কট উপস্থিত হইলেও মুসলমানদের এই আগমন সমর্থন করা যায় না। কারণ একে ত রাজনৈতিক এবং কতকাংশে অর্থনৈতিক কারণে বাধ্য হইয়া হিন্দুরা চলিয়া আসিতেছে...তাহার উপর যদি মুসলমানরাও আসিতে সুরু করে তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গেও সঙ্কট সৃষ্টি হইবে এবং খাদ্যসঙ্কট দেখা দিবে। সুতরাং এই আগমন রোধ করা সরকারের কর্ত্তব্য। পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তাও হইবে বিপন্ন। কারণ ইহা লক্ষ্য করা উচিত যে, যে সমস্ত মুসলমান পরিবার এখানে চলিয়া আসিতেছে তাহারা সকলেই সীমান্ত অঞ্চলেই স্থান সংগ্রহ করিয়া বসবাস করিতেছে এবং সীমান্তবর্ত্তী মুসলমানপ্রধান এলাকা আরও মুসলমানপ্রধান করিয়া তুলিতেছে। ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসীদের এইভাবে সীমান্ত অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে শুভ লক্ষণ নহে। ইহাতে যে কোন মুহূর্ত্তে ইহার নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে আর ভিন্ন

রাষ্ট্রের অধিবাসীরা এইভাবে সীমান্তে বসবাস সুরু করিলে চোরাব্যবসায়েরও সুবিধা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন

গত মাসের "প্রবাসী"তে আমরা সরবরাহ মন্ত্রী মহাশয়ের একটি বিবৃতির সারবত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনে আমদানী করিতে হয়। "যুগবাণী" (সাপ্তাহিক) হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই হিসাব ভুল; পশ্চিমবঙ্গে যে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়, সরকারী দপ্তরে তাহার যে হিসাব আছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় যে ৫০ লক্ষ মণ খাদ্যশস্যের ঘাটতি হইতে পারে।

"হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকার বাণিজ্য সম্পাদক বলিতেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের ঘাটতি ত নাই-ই; বরং ২১ লক্ষ মণ বাড়তি হওয়া উচিত। সংখ্যাশাস্ত্রের এই পরস্পর বিরোধী উক্তিতে দেশের জনমত বিভ্রান্ত হইতেছে। কেন্দ্রীয় আইন-সভার সভ্য শ্রীযুক্ত সিধের এক প্রবন্ধে এই কথা বলা হইয়াছে যে, সারা ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের ঘাটতি আছে—এই কথা ভুল। এই সব প্রতিবাদের উত্তর প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে পাওয়া যায় নাই। ভারতরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের খাদ্য মন্ত্রীবর্গের এক সম্মেলন গত ১৮ই শ্রাবণ শেষ হইয়াছে; তাহার যে বিবরণ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই সন্দেহ ও প্রতিবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন মনে হয় নাই। অথচ ভারত-রাষ্ট্রে খাদ্যশস্য বাড়তি না ঘাটতি তাহা নির্ণয়ের উপর বিরাট সরবরাহ বিভাগের কাঠামো দাঁড়াইয়া আছে। এই বিষয়ে আন্দোলন না হইলে কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙ্গিবে বলিয়া মনে হয় না।

ব্যাপারটা কিন্তু ঘোলাটে হইয়া উঠিতেছে। গত ১৭ই শ্রাবণ পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-মন্ত্রীমহাশয় এক সাংবাদিক সম্মেলনে যে আলোচনা করেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই অবস্থাটা বুঝা যায়। কেন্দ্রীয় সরকার বলিতেছেন যে, ১৯৫১ সালের মধ্যে দেশকে খাদ্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করিতে হইবে; বিদেশ হইতে তারপর কোন খাদ্যশস্যের আমদানী হইবে না। শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা বলিতেছেন, "১৯৫১ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে, তাহা মনে হয় না।" তিনি আমাদের প্রয়োজনের এক হিসাবও দিয়াছেন। দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণী হইতে তাহা তুলিয়া দিলাম:

মোট প্রয়োজন

পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ২ কোটি ৫০ লক্ষ। ইহার মধ্যে শতকরা ৮০ জনকে পূর্ণবয়স্ক হিসাবে গণ্য করিলে মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। দৈনিক ১৬ আউন্স হিসাবে পূর্ণবয়স্কের খাদ্যের প্রয়োজন। এই হিসাবে দৈনিক খাদ্যের প্রয়োজন ৯ হাজার টন এবং বার্ষিক ৩২,৮৫০০০ টন। কিন্তু বার্ষিক গড়পড়তা উৎপাদনের হার প্রায় ৩২,০৯০০০ হাজার টন অর্থাৎ মোট ঘাটতির পরিমাণ ৭৬,০০০ হাজার টন।

তিনি আরও বলেন যে, কলিকাতা এবং শিল্প এলাকার অধিবাসীর সংখ্যা রেশন কার্ডের ভিত্তিতে ৫৫ লক্ষ। অতএব দৈনিক ১৬ আউন্স হিসাবে বৎসরে ৭,১৭,০০০ টন খাদ্যের প্রয়োজন।

মোট উৎপাদন

১৯৪৮-৪৯ সালের উৎপাদন :— আমন—২৮'৮ লক্ষ টন; আউস—৪'০ লক্ষ টন এবং বোরো ১ লক্ষ টন অর্থাৎ প্রায় ৩৩ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন হয়। ইহা হইতে বীজ ও অন্যান্য কারণে নষ্ট বাবদ শতকরা ১০ ভাগ হিসাবে বাদ দিলে মোট উৎপাদন হইতেছে ৩০ লক্ষ টন। মোট ২,৭৯,০০০ হাজার টন খাদ্য আমদানী করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ ৩৬ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। গত তিন বৎসরে গড়পড়তা ৩৪ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের এই বিবৃতি যাদব বাবুর হিসাবকে সমর্থন করে না।

এই বিতর্কের শেষ হইবে কবে? সরকারী হিসাবে যে ভুল ধরা হইতেছে, তৎসম্বন্ধে নীরবতাই কি এই প্রশ্নের উত্তর?

খাদ্য উৎপাদন

পুরুলিয়ার 'মুক্তি' স্থানীয় খাদ্য পরিস্থিতি আলোচনা করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা শুধু মানভূমে প্রযোজ্য নহে, দেশের সর্বস্থানেই ঐ অবস্থা এবং খাদ্যাভাব হইতে পরিত্রাণ লাভের যে পথ তাঁহারা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহাও সর্বত্র সমভাবে প্রযোজ্য। "মুক্তির" বক্তব্যের সারমর্ম এইরূপ :

চাষীর ঘরে যদি কিছু শস্য থাকে তবে দুর্দিন আসিলেও কোন রকমে সে চালাইয়া লয়। কিন্তু বৎসরে যে ধান উৎপন্ন হয় বেশীর ভাগ চাষীকেই তাহার উপরেও কর্জ করিয়া চালাইতে হয়। চাষের আগে বা চাষের সময় তাহাকে মহাজনের কাছে বা মহাজনের ইচ্ছামত সুদে ধান কর্জ করিতে হয় এবং ফসল হইলে তাহা শোধ করিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহাও নানাভাবে বাধ্য হইয়া বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়। জমিদারের খাজনা তো আছেই, তাহা ছাড়া বর্তমান সময়ে পুলিস, ফরেষ্ট গার্ড, ওয়েলফেয়ার অফিসার, প্রকিউরমেণ্ট অফিসার, এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স অফিসার প্রভৃতি ও অন্যান্য সরকারী বেসরকারী কর্তা ও

অনুচরদের সেলামী, জবরদস্তি আদায়, বে-আইনি জরিমানা প্রভৃতি ব্যাপারেও তাহাকে ধান বা থালা ঘটি বাটি বিক্রয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। জমির উপর স্বত্ব সাব্যস্ত লইয়া মাঝে মাঝে মামলা-মোকদ্দমার খরচও যোগাইতে হয়। বর্ত্তমানে আবার এক অভিনব পন্থার আবিষ্কার হইয়াছে, বিহারে ইহা সুরু হইয়াছে, বাংলায় হয়ত শীঘ্রই হইবে। জমিদার জমিদারী উচ্ছেদের বাহানাতে আমীন দিয়া সমস্ত ক্ষেত খামার মাপ করাইতেছে। যদি কাহারও কোন ক্ষেত্রে এক ছটাক বা এক কাঠা জমি বাড়তি বাহির হইয়া পড়ে তবে ক্ষেতের মাথায় জমি অন্ত লোককে বন্দোবস্ত করিবার ভয় দেখাইয়া এক'শ দুই'শ টাকা সেলামী লইয়া দুই টাকার রসিদ দিয়া ছাড়িয়া দেয়।

ইহা প্রকৃত অবস্থার একটা আংশিক ছবি মাত্র। বড়লাট কর্তৃক হালচাষের ছবি অথবা লাট-প্রাসাদের উঠান চাষের খবর সংবাদপত্রে ছাপাইয়া ফসল বৃদ্ধি করা যাইবে কিনা সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে। আসলে ফসল বৃদ্ধি করিতে হইলে চাষীর দুরবস্থা দূর করা আবশ্যক। গবর্মেণ্ট ঠিক এই কাজটি বাদ দিয়া বাকী সবকিছু করিতেছেন, জলের মত টাকা খরচ হইতেছে। চাষীদের এইরূপ অবস্থা বিচার করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে যে, তাহাদের চাষ বা চাষের উন্নতির পথে বাধা ও অসুবিধা কোথায় রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিতে হইবে এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা সুগম করিয়া দিতে হইবে। শস্যের ফলন তখন তাহারা আপনিই বাড়াইবে। 'মুক্তি' মানভূম জেলার দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন—বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে জলসেচের জন্য এমন অনেক বাঁধ হইয়াছে গ্রামের লোক সেগুলি সম্বন্ধে ঠাট্টা করিয়া বলে—ব্যাঙও ডোবে না। চাকলতার নিকট প্রায় ১১০ একর 'নিঠা টাঁড়' লইয়া হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়া যে পতিত জমি উদ্ধার করা হইতেছে তাহাতে কয় মণ ফসল ফলিতেছে তাহা যে কেহ সেই স্থানে গেলেই দেখিতে পাইবেন। চাষী যদি পতিত অনাবাদী জমি কাটিয়া ক্ষেত করে তবে জমিদার আসিয়া দখল করিয়া লয়। হালের জন্য একটি কাঠ যোগাড় করিতে হইলে ফরেষ্ট গার্ডের প্রণামী দিতে তাহাকে থালা ঘটি বেচিতে হয়। গোচারণ ভূমির অভাবে জঙ্গলের ধারে গরু চরাইলে জঙ্গল গার্ডকে গরু পিছু এক টাকা বেসরকারী জরিমানা দিতে হয়, হালের গরু রোগাক্রান্ত হইলে বা মরিয়া গেলে চাষ বন্ধ করিয়া তাহাকে পাগল হইতে হয়। বাঁধের জন্য মজুরী পাইতে হইলে তাহাকে হিন্দী প্রচার করিতে হয়। যে হিন্দী প্রচারক বাঁধ পায় সে মাটি না কাটিয়াই পুকুর তৈরি করে। চাষের ক্ষেতে বাঁধের বদলে চোখের জলে আকর 'বাঁড়ি' হইয়া যায়।

সহজ পথ আছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিবেন না। গ্রামের ষোল আনার পঞ্চায়েতের কাছে গিয়া বল কোথায় বাঁধ হইলে অথবা কোন্ কোন্ সংস্কার হইলে জলশূন্য স্থানে জল হইবে। ষোল আনার পঞ্চায়েতের উপর ছাড়িয়া দাও। তাহারাই হিসাব করিয়া বলিবে কত টাকা লাগিবে, টাকা তাহাদের হাতে দাও, তাহারা করিয়া লইবে। নিজেদের পরিশ্রম দ্বারা তাহারা যাহা কম পড়ে তাহা পূরণ করিবে। বাংলাদেশে খাসমহলগুলিতে এ বিষয়ে প্রচুর সতর্কতার অবসর রহিয়াছে। চাষের সময় তাহাকে অল্প সুদে ধান কর্জ্জ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বহু জমি পতিত পড়িয়া আছে। বলিয়া দাও, যে নিজের পরিশ্রমে মাটি কাটিয়া জমি তৈরি করিবে বিনা সেলামীতে তাহাকেই সেই জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না। চাষীকে উপলব্ধি করিতে দাও তাহার পিছনে গবর্মেণ্ট সমস্ত শক্তি লইয়া তাহার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে—তাহার ঘাড়ে সরকারী অফিসার, মহাজন ও চোরাকারবারী চাপাইয়া তাহাকে পঙ্গু করিয়া রাখিলে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যাভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে গবর্মেণ্ট ১৯৪৮ সালে কয়েকটি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, উহাদের মধ্যে কোন কোনটির কাজ আরম্ভও হইয়াছে। প্রত্যেকটি স্কীমের জন্যই বিপুল অর্থ বরাদ্দ হইয়াছে এবং কাজ বলিতে ঐ বাবদ অর্থব্যয় বুঝাইবে। মাছ বাজারে আসিয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। একমাত্র কাঁথি উপকূলে বৎসরে দশ হাজার মণ মৎস্যপ্রাপ্তির আশায় যে বিরাট খরচের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং উহার যে বিরাট অংশ ইতিমধ্যেই ব্যয় হইয়া গিয়াছে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। কাঁথি উপকূলে মাছ ধরা পরিকল্পনাটি গত অক্টোবরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী হওয়ার কথা ছিল এবং তদনুসারেই খরচপত্র হইয়াছে। বাংলার রাজস্ব ক্রমশ: সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। অথচ এ দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের সংখ্যা ও বেতন বৃদ্ধি হইতেছে এবং পরিকল্পনার নামে দুই হাতে জলে টাকা ঢালা হইতেছে। যে কাজ অতি অল্প ব্যয়ে সমবায় সমিতি দ্বারা হইতে পারে তাহা সরকারের নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া নূতন বিভাগ সৃষ্টি বা পুরানো বিভাগের আয়তন বৃদ্ধির কোনই সার্থকতা নাই। ইহাতে ব্যয় বাড়া ছাড়া আর কোন কাজই হইতেছে না। সুন্দরবনের মাছ কলিকাতায় আনিয়া মৎস্যাভাব দূরীকরণ যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় তবে তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় সমবায় সমিতি মারফত ধীবরদের জাল প্রভৃতি দেওয়া এবং ধৃত মৎস্য কলিকাতায় দ্রুত আনিবার জন্য লঞ্চ, বরফ প্রভৃতি সহজলভ্য করা। কৃষক বা ধীবর কোন বস্তু বিনামূল্যে চাহে না, তাহারা পয়সা

দিয়াই লইতে প্রস্তুত। খয়রাতী ভক্তানুধায়ী না হইয়া গবর্মেণ্ট যদি তাহাদের কাজের বাধাগুলি জানিয়া লয়েন এবং সেইগুলি দূর করিবার ব্যবস্থা করেন তবেই প্রকৃত কাজ হইবে। ভাত কাপড় মাছ ডিম দুধ প্রভৃতি গবর্মেণ্ট নামক একটি প্রাণহীন যন্ত্র সরবরাহ করিবে আর দেশের লোক বসিয়া বসিয়া খাইবে ইহা কোন সমাজের পক্ষেই মঙ্গলজনক নহে। গবর্মেণ্ট সংকাজে উৎসাহ দিবেন, অসৎ কাজে বাধা দিবেন, সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টা যাহাতে কল্যাণপ্রদ হয় তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন তবেই তো সমাজ গড়িয়া উঠিবে।

কাঁথি উপকূল পরিকল্পনাটি এইরূপ :

কাঁথি উপকূলে বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি স্থান হইতে আগত ধীবরদের মাছ ধরায় নিযুক্ত করা হইবে, তাহাদিগকে নৌকা, জাল প্রভৃতি দেওয়া হইবে এবং ধৃত মৎস্যের অর্দ্ধেক তাহারা পাইবে, বাকি অর্দ্ধেক গবর্মেণ্টের। মাছ লঞ্চে ডায়মণ্ডহারবার এবং তথা হইতে লরীতে কলিকাতা আনা হইবে। মৎস্য বিভাগে পাঁচটি লঞ্চ আছে, তাহার মধ্যে কয়টি এখন কার্য্যক্ষম তাহা বলা হয় নাই।

দশ জন এক্সপার্ট ধীবরকে বেতন দিয়া রাখা হইবে। তাহারা ধৃত মাছগুলি সংগ্রহ করা, বরফ দেওয়া, প্যাক করা প্রভৃতি কাজ খবরদারী করিবে।

প্রথম বৎসর দশ হাজার মণ মাছ পাওয়া যাইবে। তন্মধ্যে ৫০০০ মণ গবর্মেণ্টের। এই পরিমাণ মাছ ধরিতে নিম্নলিখিত লোক লাগিবে :

৩০ জন ধীবর ও পাঁচটি নৌকা লইয়া এক একটি দল গঠিত হইবে, এরূপ তিনটি দল থাকিবে, তাহারা তিনটি সাইনে জাল দিয়া মাছ ধরিবে। এক এক দলে ২০ জন ধীবর ও দুইটি নৌকা লইয়া গঠিত আর দুইটি দল ত্রিশটি গিল জাল দিয়া মাছ ধরিবে। ২০ জন ধীবর ও দুইটি নৌকা লইয়া গঠিত আর একটি দল ডেনিশ সাইনে এবং ড্রাগবীচ সাইনে দিয়া মাছ ধরিবে। পরিকল্পনা পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিলে এতগুলি লোক এইসব বৈজ্ঞানিক জাল লইয়া নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে এবং নদীর মোহানায় মাছ ধরিতে থাকিবে। কাঁথি অঞ্চলে হিসাব করিয়া সরকারী কর্ত্তারা দেখিয়াছেন যে, একজন লোক দৈনিক ১৫ সের মাছ ধরিতে পারে, সুতরাং বৎসরে মাত্র ১৮০ দিন কাজ করিলেই দশ হাজার মণ মাছ ধরা পড়িবে।

এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া স্থির হইল কাঁথি উপকূলের সমুদ্রে এবং ২৪ পরগণার সুন্দরবনের মোহানায় অবিলম্বে কাজ সুরু হইবে। ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক কার্য্য শেষ হইবে, ১৫ই অক্টোবর মধ্যে কাজ আরম্ভ হইবে এবং তারপর দুই মাস অর্থাৎ ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালের মধ্যে সমগ্র পরিকল্পনা কার্য্যে প্রযুক্ত হইবে। ইহার পর সাড়ে সাত মাস কাটিয়া গিয়াছে, পরিকল্পনা অনুসারে অন্তত: ৬৬৭২ মণ মাছ এই সময়ের মধ্যে কলিকাতায় আসিবার কথা।

কত মাছ প্রকৃতপক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছে তাহা জানাইয়া দেওয়া উচিত। এই দশ হাজার মণ মাছ ধরিবার জন্য নিম্নলিখিত টাকা ক্যাপিটাল খরচ ও কর্ম্মচারীদের জন্য চলতি খরচ বরাদ্দ হইয়াছে :

কর্ম্মচারীর পদ	বেতন	স্পেশাল এলাউন্স	এক বৎসরের ব্যয় টাকা
১জন টেকনিক্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ফিল্ড অফিসার (মেরিন)	স্বয়ং করিবেন	স্পেশাল বেতন মাসিক ৭৫৲	৯০০
১জন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার	বেতন ৬০০৲, মাগ্‌গি ভাতা ১০৫৲	...	৮৪৬০
১জন প্রাকউরমেণ্ট জেলা ফিসারি অফিসার	(মেরিন) অফি:	স্পেশাল বেতন ৫০৲	৬০০
৪ জন ফিসারি ওভারসিয়ার	মেরিন বিভাগের লোক	স্পেশাল বেতন ২৫৲	১২০০
৬ জন ঐ	৫০৲ টাকা বেতন ও প্রচলিত ভাতায় নবনিযুক্ত	ঐ	৪৭৫২
২ পিয়ন	বেতন ৪০৲ টাকা		৯৬০
২০ জন সেবক (Attendant)	বেতন ৫০৲	...	১২,০০০
১০ জন এক্সপার্ট ধীবর	বেতন ১০০৲	...	১২,০০০
২ জন প্রহরী	বেতন ৭৫৲	...	১৮০০
৪ জন সারেং	বেতন ৭৫৲ ও ইণ্টেরিম পে	...	৬৮১৬
৪ জন ইঞ্জিন ড্রাইভার	ইণ্টেরিম পে		৬৮১৬
৬ জন লস্কর	বেতন ৩০৲ ও ভাতা		৫৪৭২
২ জন তৈলদাতা	বেতন ৬০৲ ও ভাতা		২৮৫৬
২ জন মাঝি	বেতন ৪৫৲		১০৮০
৪ জন লরী ড্রাইভার	বেতন ৬০৲ ও ভাতা		৫৭১২
২ জন লরী পরিষ্কারক	বেতন ৫০৲		১২০০
১ জন একাউণ্ট ক্লার্ক	বেতন ৪৫৲ ও ইণ্টেরিম পে		১২১২
১ জন টাইপিষ্ট	ঐ		১২১২
১ জন ষ্টোর-কীপার	বেতন ৭৫৲ ও ভাতা		১৭০৪
১ জন আর্দ্দালী	বেতন ১৩৲, মাগ্‌গী ভাতা ও ২৲ কলিকাতা এলাউন্স		৫৫২
কর্ম্মচারীদের বাড়ী ভাড়ার জন্য থোক বরাদ্দ			২০০০
			৭৯,৩০৪

এই গেল ট্রাকের হিসাব ; এবার প্রথম বৎসরের ১০ হাজার মণ মাছ ধরার বাজেট—

	টাকা
ক্যাপিটাল খরচ (বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে আছে)	
	১,১১,৩২০॥০
চল্তি খরচ—	
কর্ম্মচারীদের বেতন (উপরি-উক্ত হিসাবে)	৭৯,৩০৪
লঞ্চ এবং লরী চালাইবার পেট্রল	২৪,০০০
বরফ, লবণ, প্যাকিং প্রভৃতির খরচ	২৪,০০০
লঞ্চ, লরী প্রভৃতি মেরামত	১৫,০০০
উহাদের জন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র	৩০০০
বিবিধ ব্যয়	১০০০
	১,৪৬,৩০৪
মোট	২,৫৭,৬২৪॥০

এবার ক্যাপিটাল খরচের নমুনা—

		টাকা
২টি ক্রুজার	অর্ডার দেওয়া হইয়াছে শীঘ্র পাওয়া যাইবে	দাম ২৯,১১৩
২টি মোটর ইঞ্জিনযুক্ত ডিঙ্গী—রডা কোম্পানী হইতে	শীঘ্রই কেনা হইবে	৮৮৮০
১টি ২ টন লরী—এলেনবেরী কোম্পানী হইতে	শীঘ্রই কেনা হইবে	৮০০০
সাইকেল—কেনা হইয়াছে		৩০০
সরঞ্জাম সমেত ১টি অফিসার তাঁবু, ২টি সৈন্তের তাঁবু	কেনা হইয়াছে	৯৮৮৯॥০
লণ্ঠন, টর্চ্চ প্রভৃতি	ঐ	১১৭॥০
বালতি এবং মাছ হ্যাণ্ডলিং যন্ত্র	ঐ	১০০০
ডায়মণ্ডহারবারে জেটি তৈরী শীঘ্রই করা হইবে		১৬,০০০
ডায়মণ্ডহারবার, কাঁথি ও জলদায় মাছের অস্থায়ী গুদাম		৮০০০
নৌকা	তৈরি হইয়াছে	১০,০০০
জাল	..	২০,০০০
		১,১১,৩২০॥০

এই হিসাবে এক মণ সরকারী মাছে খরচ পড়িবে নিম্নোক্ত রূপ এবং এই ভাবে ব্যবসা কতদিন চলিতে পারিবে তাহা বুঝা কঠিন—

ক্যাপিটাল খরচ	১১৲
কর্ম্মচারী খরচ	৮৲
লরী ও লঞ্চ খরচ	৪৲
বরফ প্রভৃতির খরচ	২॥০
	২৫॥০

যে সুন্দরবনে মাছ ধরার জন্ত এই খরচ হইবে সেখানে মাছের বাজার দর ২০৲ টাকা থাকে কিনা সন্দেহ।

হরিণঘাটার পরিকল্পনা

হরিণঘাটার "দুগ্ধনগরী" নির্ম্মাণে সরকারের যে অব্যবস্থিত-চিত্ততার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আমরা নিরাশ হইয়াছি। হরিণঘাটার পরিকল্পনা ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর কেসি সাহেবের কীর্ত্তি ; তিনি বিদায় লইবার পূর্ব্বেই প্রায় ৪০।৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা নাকি করা হইয়াছিল ; তারপর এই চার বৎসরে আরও ১৫।২০ লক্ষ টাকা দণ্ড দিতে হইয়াছে। এই অবস্থায় কৃষি-বিভাগ একটু বেকায়দায় পড়েন। কি করিয়া ইহার একটা সদ্গতি করা যায়, তাহার ভাবনা ভাবিতে হয়। এত টাকা ব্যয় করিয়া এক ফোঁটাও দুধ হরিণঘাটা হইতে আসিল না, একটিও ভাল ষাঁড় বা গাভী হরিণঘাটার ছাপ পাইয়া দেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের নিকট আসিল না, এই অবস্থায় আমাদের গতার-চর্ম্মী কৃষি-বিভাগও অস্থির হইলেন।

তাহার প্রতিকারের জন্ত বিশেষজ্ঞবৃন্দকে জড় করা হইল। তাঁহাদের চিন্তার ফলে স্থির হইল যে, কলিকাতার ৩০ হাজার গাভী ও মহিষ হরিণঘাটায় সরাইয়া লওয়া হইবে ; সেই স্থান হইতে দুধ সরবরাহ করা হইবে কলিকাতা নগরীকে। এই সিদ্ধান্ত নাকি উল্টাইয়া গিয়াছে। কলিকাতার 'খাটাল' অক্ষয় হইয়া থাকিবে ; ভারতরাষ্ট্রের নানা প্রদেশ হইতে উন্নততর গরু, মহিষ আমদানী করিয়া পশ্চিমবঙ্গে নূতন দুগ্ধবতী গাভী ও ভারবাহী বলদের সৃষ্টি হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত একটি "দুগ্ধ (milk) কমিশনারের" পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে ; এই বিভাগেরই একজন পুরাতন "বিশেষজ্ঞ" এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এখন দ্রষ্টব্য মাত্র রহিল ফলাফল।

পশ্চিমবঙ্গে খাল ইত্যাদির অবস্থা

খাদ্য-উৎপাদনের নূতন পরিকল্পনা সম্বন্ধে কৃষিমন্ত্রী যাদব-বাবু যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহার পরিপূরকরূপে কলিকাতার বাহিরের সংবাদপত্রে যে সব প্রয়োজনের কথা বলা হয় তাহা জানিয়া রাখা ভাল। প্রথম মন্তব্য বাঁকুড়ার "হিন্দুবাণী" হইতে, দ্বিতীয়টি বালির (হাওড়া) "সাধারণী" হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে :

> গত ১৩২২ সালে দুর্ভিক্ষের সময় তদানীন্তন সরকার পলাশবনী গ্রামে একটি খালের মুখে বাঁধ দিয়ে এই খালের জল ক্যানেল কেটে জয়নগর পর্য্যন্ত আনার ব্যবস্থা করে-ছিলেন। ক্যানেলটি যত দিন ভাল ছিল তত দিন উভয় পার্শ্বের প্রায় ২০০ মৌজাতে ধান, ইক্ষু, আলু, গম প্রভৃতি চাষ হচ্ছিল এবং বহু পতিত জমিও চাষের উপযোগী হয়ে-ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল উহা সংস্কার না হওয়ায় দশ বৎসর আগে বাঁধ ভেঙে গেছে এবং খালের জল পূর্ব্ববৎ নদীতে গিয়ে পড়ছে। এই ক্যানেল স্থানীয় দরিদ্র কৃষিজীবী-

গণের পক্ষে সংস্কার করা সম্ভবপর নয়। জেলা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি খালের প্রতি বহুবার আকৃষ্ট করা হয়েছে; জেলা শাসক, সেচবিভাগীয় কর্ত্তা প্রভৃতিদের এনে দেখানও হয়েছে; কিন্তু বহু অর্থব্যয় হবে, এই অজুহাতে কোন কিছুই করা হয় নি।

ডাওডাপোতা খাল

হাওড়া ও হুগলী জেলার সীমান্ত রচনা করে ভাগীরথী হতে পশ্চিম দিকে গিয়েছে বালি খাল—তারই শাখা এই ডাওডাপোতা খাল। এই খাল বালি, জগদীশপুর ও কিছু লিলুয়া ইউনিয়নের মধ্যে। বিখ্যাত দস্যু রতন পাখীর 'ছিপ' এই খালে যাতায়াত করত…তাই আজও খালের এই অংশকে 'পাখীর খাল' আর পাশের বৃহৎ বাগানটিকে 'পাখীর বাগান' বলে। এই খালটি দিয়ে প্রয়োজনমত জল নিকাশ ও জল সেচনের ব্যবস্থা হ'ত বলে কত রকমের রবিশস্য, ধান, পাট প্রভৃতি যে মাঠে মাঠে হ'ত তার শেষ নেই। কিন্তু হাওড়া-বর্দ্ধমান ও পরে কলকাতা-কর্ড রেলপথ নির্ম্মিত হওয়ায় ১২টি গ্রামের লক্ষ্মীস্বরূপা এই খালের সরল গতি অবরুদ্ধ হয়ে গেল। তার পর অন্ধ গ্রামবাসী স্বার্থের মোহে খালের জমি আত্মসাৎ করতে লাগল। কয়েক বৎসরেই খাল মজে গেল…নৌকা অচল হ'ল…কচুরী পানা বাসা বাঁধল, আর উপবাসী কৃষকের শূন্য উদর প্লীহায় স্ফীত হ'ল।

১৯৩৭ সালে জনহিতব্রতীদের এক প্রচেষ্টা হ'ল এই খালটিকে সংস্কার করার। কিন্তু রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য, ভূস্বামিগণের নিষ্ক্রিয়তা আর তদানীন্তন সরকারের অতি কৃপণের ন্যায় মাত্র ৬০০৲ টাকা দানে তাঁহাদের আশা সফল হ'ল না। খালের গতি একটু সরল হ'ল বটে, কিন্তু সঙ্কীর্ণ সাঁকোর পেষণে জলের প্রবাহ আর ঠিকমত হ'ল না। বর্ত্তমান বৎসরে সরকারী বিভাগ হতে হাওড়া জিলায় ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০০টি খাল কাটবার পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত বিলম্বে এই পরিকল্পনা হওয়ায়, আর বৈশাখেই প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় অধিকাংশ পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়েছে। স্থানীয় সমবায় সমিতির মাধ্যমে আর ইউনিয়ন বোর্ড ও কংগ্রেস কমিটির সহযোগিতায় এই খালের সংস্কার কার্য্যও গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু সরকারী পক্ষে একটি সর্ত্ত ছিল যে, সাহায্যপ্রাপ্ত কৃষকেরা তিন বৎসরের মধ্যে ব্যয়িত অর্থ খাজনা স্বরূপ পরিশোধ করতে বাধ্য হবে। শহরের শিক্ষা ও সুবিধার জন্য বিনা সর্ত্তে বছর বছর বহুলক্ষ টাকা ব্যয়িত হচ্ছে কিন্তু জাতির মেরুদণ্ড এই সব গ্রামের সমৃদ্ধির জন্য আজ সরকার মাত্র ২ লক্ষ টাকা বিনা সর্ত্তে ব্যয় করতে পারেন না?

পশ্চিমবঙ্গে খাদি প্রস্তুত

গত মাসের "প্রবাসীর" সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমরা যুক্ত-প্রদেশের খাদি উৎপাদনের বিরাট ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে তৎসম্বন্ধে কি চেষ্টা চলিতেছে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। ১৯৪৮ সালের প্রারম্ভে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মন্ত্রিমণ্ডলী কর্ত্তৃক নিযুক্ত "খাদি বোর্ডের" অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীপঞ্চানন বসু এই প্রশ্নের উত্তরে একটি বিবরণ পাঠাইয়াছেন। সরকারী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য—গ্রামবাসীকে বস্ত্রে স্বাবলম্বী করা, খাদি-ব্যবসায় নয়; এবং অহিংস সমাজ সংগঠনের পথ পরিষ্কার করা।

এই উদ্দেশ্য অনুযায়ী ছয়টি জেলায় ১২টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং প্রত্যেক কেন্দ্রে কর্ম্মী নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদিগকে চরকা ও গ্রামসেবার কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক কেন্দ্রের এলাকা সাধারণতঃ ১৪ হইতে ২০টি গ্রাম লইয়া গঠিত হয় এবং কর্ম্মীদের শিক্ষাকাল ৩ হইতে ৪ মাস সময় নির্দ্দিষ্ট হয়। এই ভাবে ১২টি কেন্দ্রে ১২টি খাদি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ১৮২ জন পুরুষ এবং স্ত্রী কর্ম্মীকে অভিজ্ঞ খাদি-শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষান্তে প্রত্যেক কর্ম্মীকে ১৫০-২০০ পরিবারের ভার গ্রহণ করিয়া গ্রামাঞ্চলে কাজ করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। স্থানীয় অবস্থানুযায়ী কর্ম্মিগণ একাকী অথবা দলবদ্ধভাবে গ্রামবাসীদের সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া খাদির কাজ করিয়া আসিতেছেন। গ্রামবাসীদিগের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে পরিবর্ত্তন আনিবার জন্য কর্ম্মীরা তূলা ধোনা ও সুতাকাটা শিক্ষা দিয়া ব্যাপক চরকা প্রচলনের চেষ্টা করা ছাড়াও তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের সেবাকার্য্য করিতেছেন। গ্রাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, হরিজন সেবা, গো-ময় সারের উপযুক্ত ব্যবহার, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি এই সেবাকার্য্যের অন্তর্ভুক্ত।

কর্ম্মীরা শিক্ষা পাইবার পর ১৯৪৮ সাল হইতে গ্রামে কাজ আরম্ভ করেন। নিম্নে জুন, ১৯৪৮ হইতে মে, ১৯৪৯ পর্য্যন্ত খাদী কার্য্যের বিবরণী চুম্বক আকারে দেওয়া হইল।

১।	কেন্দ্র সংখ্যা	১২
২।	গ্রাম সংখ্যা	৪০০
৩।	পরিবার সংখ্যা	৩০,০০০
৪।	শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মীর সংখ্যা	১৬৭
৫।	তূলা ধোনা ও সুতা কাটা-শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রামবাসীর সংখ্যা	৬৫২৬
৬।	প্রচলিত চরকা সংখ্যা	৬০৭১
৭।	প্রচলিত তকলী সংখ্যা	৪৩১৮
৮।	কাটুনী কর্ত্তৃক উৎপন্ন সুতার পরিমাণ	১৭৭/০ মণ
৯।	উৎপন্ন সুতার মজুরী বা বাণী	৩৫০০০৲ টাকা

১০। উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ

	(ক) ওজন	১০১/০ মণ
	(খ) বর্গগজ	৩০৬১০ বর্গগজ
১১।	তাঁতীর প্রাপ্ত মজুরী	১২,৫০০৲ টাকা
১২।	উৎপন্ন বস্ত্রের মূল্য	৪২,০০০৲ টাকা

তাঁতীর অসুবিধার জন্য সমস্ত সুতা বুনাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। সমস্ত উৎপন্ন সুতা বুনাইতে পারিলে তাঁতী ২০,৬০০৲ টাকা উপার্জন করিতে পারিত এবং উৎপন্ন বস্ত্রের মূল্য ৭০,৮০০৲ টাকা হইত। খাদি-পরিকল্পনাটি বস্ত্র-স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে গঠিত; খাদি-উৎপাদন ব্যবসায়ের ভিত্তিতে নয়। এই কারণে উৎপন্ন সমস্ত বস্ত্রই কাটুনীরা নিজে নিজে ব্যবহার করিয়াছে।

প্রারম্ভ হইতে মার্চ ১৯৪৯ পর্য্যন্ত মোট ১,৬৭,২৩১ টাকা খরচ হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬৭,২৮৯ টাকা তুলা, চরকা, আসবাব ও গৃহনির্ম্মাণ কাজে ব্যয়িত হইয়াছে এবং ৯৯,৯৪২ টাকা কর্ম্মীর শিক্ষা, কর্ম্মীর ভাতা, সংস্থার খরচ প্রভৃতি খাতে খরচ হইয়াছে।

পঞ্চানন বাবুর বিবরণীতে কয়েকটি অসুবিধার কথার উল্লেখ দেখিতে পাই। নিয়ন্ত্রণের জন্য সময়মত তুলা সরবরাহ হয় নাই; পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথাসময়ে ও প্রয়োজন মত আর্থিক সাহায্য করেন নাই; তাঁতিরা মিলের সুতা 'কালো'-বাজারে বেচিয়া অধিক লাভ করে; এই উদাহরণ দেশের নৈতিক জীবন বিষাক্ত করিয়াছে। পঞ্চানন বাবুর চেষ্টায় ও কর্ম্মীদের কর্ম্মের ফলে যদি দেশের আবহাওয়া কথঞ্চিৎও বিশুদ্ধ হয়, তবেই খাদি-উৎপাদনের সার্থকতা আছে বলিয়া গণ্য করিব।

আসামে বাঙালী উদ্বাস্তু

গত ৬ই শ্রাবণ কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি শহরে ভারত-সরকারের পূর্ব্বাঞ্চলিক উদ্বাস্তু সমস্যা সম্বন্ধে উপদেষ্টা শ্রীরোহিণীকুমার চৌধুরী যেসব উক্তি করিয়াছেন, তার গুরুত্ব ভারত-সরকার উপলব্ধি করিবেন, এই আশা আমরা এখনও করিতেছি। চৌধুরী মহাশয় ইংরেজ আমলে আসামের মন্ত্রী ছিলেন; বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য। তাঁহার পক্ষে আসাম গবর্মেণ্ট ও কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের নিন্দা করা সহজ নয়। তবুও তাঁহাকে এই কার্য্য করিতে হইয়াছে। করিমগঞ্জ, শিলচর ও শিলঙেও চৌধুরী মহাশয় এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার বক্তৃতার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইল:

আমি ইহা স্বীকার করি যে, ভারত-সরকার ও আসাম সরকার উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য এ দিকের উদ্বাস্তুদিগের কোন সাহায্য করেন নাই। রিলিফের দরকারের জন্য ভারত-সরকার আসাম সরকারকে এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উহা হইতে এক পয়সাও খরচ হয় নাই।

এই উদ্বাস্তুগণ আপনাদের কোনরকম ক্ষতি করিবে—ইহা যেন আপনারা মনে না করেন। মানুষই মানুষকে সাহায্য করে। লোকের বসতি বাড়িলে স্থানের উন্নতি হয়। আসামে অন্যান্য দেশের তুলনায় জায়গার অনুপাতে লোকসংখ্যা কম। আমি নিজে আসামী হইয়াও বলি যে, আসামী ও বাঙালীদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই—আচার, ব্যবহার, শিক্ষা, দীক্ষা ইত্যাদি সব বিষয়েই ভারতে একমাত্র বাঙালী ও আসামী এক। আমি ইহা খুব ভাল করিয়া দেখিয়াছি—ভারতের অন্যান্যরা বাঙালী ও আসামীদের কোন বিষয়েই আমল দিতে চায় না। দিল্লীতে আমাদের কোন মর্য্যাদা নাই। চাকুরী, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে আমরা বাঙালী ও আসামীরা সর্ব্ববিষয়ে অসুবিধা ভোগ করিতেছি। ভারত-সরকার হইতে আমরা এই সমস্ত বিষয়ে কোন সাহায্যই পাই নাই। আসামে প্রায় ২।৩ লক্ষ উদ্বাস্তু আছে—ইহা মোটেই বেশী নহে।

আমি অন্নাভাবে শীর্ণ ৪০।৫০ জন ব্যক্তিকে দেখিয়াছি; ইঁহাদের মধ্যে শিশু এবং মহিলাও আছেন। সরকারী সাহায্য আসিয়া না পৌঁছান পর্য্যন্ত স্থানীয় সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় এই সকল ব্যক্তিকে বাঁচাইয়া রাখিবার নিমিত্ত আমি হাইলাকান্দির মহকুমা হাকিম ও কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনারকে অনুরোধ করিয়াছি।

জরুরী অবস্থায় এই সকল উদ্বাস্তুকে সাহায্য দিবার মত কোন অর্থ কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার কিংবা হাইলাকান্দির মহকুমা হাকিম কাহারও কাছেই নাই। উদ্বাস্তুদের সাহায্যার্থ কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট আসাম গবর্মেণ্টকে যে এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাদের হাতে কিছু টাকা দিবার জন্য কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার ইতিমধ্যেই গবর্মেণ্টের নিকট লিখিয়াছেন।

সৌভাগ্যবশতঃ করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ও শিলচরের ভিতর এবং চতুর্দ্দিকে অস্থায়ী বাসগৃহ নির্ম্মাণের উপযুক্ত যথেষ্ট স্থান আছে। এই জরুরী কার্য্যের প্রয়োজনীয় ব্যয়-সঙ্কুলান করিবার জন্য কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনারের হাতে যথোচিত অর্থ দিবার নিমিত্ত আমি ভারত গবর্মেণ্টের সাহায্য ও পুনর্বসতি মন্ত্রীর নিকট তার করিয়াছি।

শিলঙে এক সাংবাদিক সম্মেলনে চৌধুরী মহাশয় এই সমস্যাকে "রাজনীতি" হইতে দূরে রাখিতে আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু আসাম গবর্মেণ্ট তাহাই করিতেছেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীগোপীনাথ বরদলৈ বলিয়াছেন যে আসামে

বাড়তি জমি নাই। চৌধুরী মহাশয় বলিতেছেন ২।৩ লক্ষ উদ্বাস্তুর প্রয়োজনের উপযুক্ত জমি আছে। এই দুই উক্তির মধ্যে কোন্‌টি সত্য তাহা সকলেই জানে। বড়দলৈ মহাশয় "রাজনীতি" আনিয়াছেন এই সমস্যার মধ্যে, কারণ বর্ত্তমানে আসামে বাঙালী ও আসামী ভাষা-ভাষীর সংখ্যা প্রায় সমান —২০।২৬ লক্ষ। বাঙালী উদ্বাস্তুকে আসিতে দিলে এই সমতা রক্ষা সহজ হইবে না, হয়ত ভোটের জোরে বাঙালী আসামীকে হারাইয়া দিতে পারে। এই আশঙ্কাই "ব'ঙাল খেদা" আন্দোলনের প্রেরণা জোগাইতেছে।

এই আশঙ্কা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজিতে হইবে। ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকের—সকল হিন্দুরই—এই অধিকার আছে; ভারতরাষ্ট্রের যে কোন প্রদেশে প্রবেশ করিবার ও অন্ন-জীবন যাপন করিবার অধিকার কেহই কাড়িয়া লইতে পারে না। আসাম গবর্মেণ্ট তাহাই করিতেছেন; এবং কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট এই অনাচারের প্রশ্রয় দিয়াছেন। দুই বৎসর হইতে এই অনাচার চলিতেছে।

কাশ্মীর

গত ১১ই শ্রাবণ (২৭শে জুলাই) ভারতরাষ্ট্র ও "পাকিস্থান" রাষ্ট্রের সামরিক প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে একটা চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ২০শে শ্রাবণ নূতন দিল্লীতে পণ্ডিত জবাহর লাল নেহেরু সাংবাদিক সম্মেলনের সমক্ষে যে বক্তৃতা দান করেন, তদুপলক্ষে তিনি বলিয়াছেন—"ইহা নিতান্তই সামরিক ব্যাপার। গত ১লা জানুয়ারি যখন যুদ্ধ-বিরতি হয়, তখন কোন্ পক্ষের সৈন্যদল কোথায় ছিল, বর্ত্তমান চুক্তিতে তাহাই দেখান হইয়াছে।" কিন্তু আমাদের মনে হয় যে ব্যাপারটা যত সহজ ও লঘু করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা হইতেছে, তাহা তত সহজ নয়। বর্ত্তমান চুক্তিতে "আজাদ কাশ্মীর গবর্মেণ্টের" সৈন্যদলের অধিকৃত স্থান স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে; তাহারা কাশ্মীর-জম্মু রাজ্য হইতে সরিয়া যায় নাই যদিও এই বিষয়ে আমাদের প্রধান মন্ত্রী অনেক সময় অনেক বড় বড় কথা বলিয়াছেন। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় যে, এই বিষয়ে আমাদের রাষ্ট্রচালকগণ সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের প্রেরিত কমিশনের নানারূপ চাপে হেলিয়া পড়িতেছেন।

বর্ত্তমান চুক্তিতে কিন্তু কাশ্মীর সমস্যার কোনরূপ মীমাংসা হইল না। পণ্ডিত জবাহরলাল "দিনগত পাপক্ষয়" করিয়া যাইতেছেন; বিবৃতি-বক্তৃতায় এক কথা বলেন; কার্য্য-কালে দেখা যায় যে অবস্থার তাড়নায় অন্যরূপ ব্যবস্থা মানিয়া লইতেছেন। ইহা সম্ভব হইতেছে এইজন্য যে, কাশ্মীর সম্বন্ধে কোন স্থির নীতি গৃহীত হয় নাই। "পাকিস্থান" জানে সে কি চায়; সুতরাং সে যোগ-বিয়োগ করিয়া কিছু না কিছু পায় বা পাইতে পারে। কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু জানেন না কাশ্মীর সম্বন্ধে তিনি কি চান বা কি পাওয়া সম্ভব।

সুতরাং কাশ্মীরের সমস্যার সুমীমাংসার জন্য ভারতরাষ্ট্রের আরও অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে। সেই অবসরে সোভিয়েট রাষ্ট্র একটু হাত সাফাই দেখাইতে চেষ্টা করিবে। মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁর নিমন্ত্রণ তাহার প্রমাণ।

ভারতরাষ্ট্রে শিক্ষার ব্যবস্থা

গত ৮ই শ্রাবণ কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী ডাঃ তারাচাঁদ ভারতরাষ্ট্রের শিক্ষার নানাবিধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে বেতারযোগে একটি বিবৃতি দেন করেন। বুনিয়াদি শিক্ষা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্য্যন্ত সরকারী নানা পরিকল্পনা সম্বন্ধে এই বিবৃতি হইতে কিছু কিছু ধারণা করা যায়; পাঠক-বর্গের অবগতির জন্য তাহা তুলিয়া দিলাম:

> প্রত্যেক প্রদেশই নির্দিষ্ট এলাকায় এবং নির্দিষ্ট বয়সের ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। ১৬ বৎসর সময়ের মধ্যে ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তন, এই পরিকল্পনার চরম লক্ষ্য। ভারত গবর্মেণ্ট এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ব্যয়ের শতকরা ৩০ ভাগ বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন।
>
> গবর্মেণ্ট প্রাপ্তবয়স্কগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যগ্র। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইতি-মধ্যে কয়েকটি প্রদেশে ও কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্গত এলাকাসমূহে সামাজিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের এক পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এজন্য যে অর্থ ব্যয় হইবে, কেন্দ্রীয় সরকার তাহার অর্দ্ধেক বহন করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

যে সকল কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হইয়াছে, কমিশন কি কি বিষয় অনুসন্ধান করিবেন এবং কমিশনের অধিকার প্রভৃতি সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ তারাচাঁদ বলেন:

> নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার ও প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া শিক্ষাপদ্ধতির অবশ্যই পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। স্বাধীনতা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, স্বাধীনতা লাভের যে পদ্ধতি ভারতের পক্ষে উপযোগী এবং অবস্থার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, এখন আর তাহা স্বাধীন ভারতের প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ নহে।
>
> প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্ব্বজনীন এবং উন্নত ধরণের শিক্ষার প্রয়োজন। চরিত্রের এবং বোধ ও চিন্তা শক্তির মান যাহাতে উন্নত হয় এবং জাতীয় কর্ম্মক্ষেত্রের সকল বিভাগে জাতি যাহাতে যথার্থ নেতা পাইতে পারে, তজ্জন্যই ইহা

আবশ্যক। উন্নত ধরণের জীবনযাপনের নূতন পথ আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে। সুতরাং শিক্ষার সকল স্তরের ও সকল পর্য্যায়ের ক্ষেত্রের নূতন পরীক্ষা প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার এবং উচ্চ শ্রেণীর গবেষণার সকল দিক পরীক্ষা করিয়া কমিশনকে সুপারিশ করিতে বলা হইয়াছে।

বিদেশে শিক্ষালাভের জন্য এবং নানা দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগ রক্ষার জন্য সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের কল্যাণে যে সকল নূতন পথ খুলিয়াছে তৎসম্বন্ধেও ডাঃ তারাচাঁদ কিছু বলিয়াছেন :

জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা-সমাজ ও সংস্কৃতি-পরিষদ ভারতীয়দিগের সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য বহুসংখ্যক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন : তদুপরি জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদের মারফতে বৈজ্ঞানিক বিষয় শিক্ষার জন্য আরও কতকগুলি বৃত্তি প্রদান করেন। দুর্লভ মুদ্রা এলাকা হইতে ভারতের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়। বর্ত্তমান বৎসরে জাতিসঙ্ঘের সংস্কৃতি-পরিষদ দুর্লভ মুদ্রা এলাকাসমূহ হইতে ভারতে পুস্তকাদি সরবরাহের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়াছেন। তথ্যাদি সরবরাহ, মৌলিক শিক্ষা, শিল্প-কৌশল ও প্রাপ্তবয়স্কদিগের শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা, মিউজিয়মে চারুকলা প্রবর্ত্তন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উক্ত সংস্কৃতি-পরিষদ আমাদিগকে সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-কৌশল বিষয়ে এবং জনশিক্ষা সম্পর্কে কার্য্যকরী বিষয় সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সরবরাহে তাঁহারা সাহায্য করিতে পারেন। ইহা অবশ্যই স্মরণীয় যে, জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি-পরিষদের বিভিন্ন সম্মেলন ও সভা-সমিতিতে যোগদানের ফলে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক তৎপরতার বিষয় বিশ্বের সম্মুখে আনা সম্ভব হইয়াছে।

সম্প্রতি ১৬ই শ্রাবণ তারিখে, "প্রাপ্ত-বয়স্কগণের" শিক্ষা বিস্তারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের "পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা" সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আমরা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-বিভাগের অনেক ভুলত্রুটি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করিয়াছি। নূতন আয়োজনের প্রারম্ভে সেইরূপ আলোচনা করিব না। আগামী ৩০শে শ্রাবণ (১৫ই আগষ্ট) হইতে এই পরিকল্পনার রূপদান করা হইবে। নিম্নলিখিত কার্য্যক্রম স্থির হইয়াছে। যথা—(১) নিরক্ষরতা দূর করার জন্য (প্রাপ্তবয়স্কগণের) সমাজ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ; (২) সংস্কৃতিবিষয়ক শিক্ষার জন্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, যেমন লাইব্রেরি, প্রকাশ্য থিয়েটার, অবসরকালীন কার্য্যকলাপ ইত্যাদি ; (৩) শুনিয়া ও দেখিয়া শিক্ষা এবং অবসরকালীন শিক্ষা ; (৪) নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্রের জন্য শিক্ষাব্রতীদের শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সমাজসেবা ; (৫) স্বেচ্ছাব্রতী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থানুযায়ী অতিরিক্ত কার্য্যক্রম এবং (৬) কার্য্য সম্পাদনকল্পে গঠিত ইউনিট ও কার্য্যপরিচালনার ব্যবস্থা।

বর্ত্তমান বৎসরে ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যাল্পতা হেতু সরাসরি গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে পাঁচ শত কেন্দ্রের বেশী খোলা সম্ভবপর হইবে না। এই কার্য্যক্রমের সারাংশ এক শত পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা আরম্ভ হইবে। প্রথম বৎসরে চারি শত কেন্দ্রের প্রধান কাজ হইবে—নিরক্ষরতা দূর করার ট্রেনিং, তারপর পরবর্ত্তী প্রত্যেক বৎসরে অন্ততঃ তিন শত করিয়া নূতন কেন্দ্র খোলা হইবে। এই সকল সংখ্যার সহিত যুক্ত হইবে—গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে স্বেচ্ছামূলক এজেন্সীসমূহ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অতিরিক্ত কেন্দ্রসমূহ এবং ঐ সকল এজেন্সী অতিরিক্ত যে সকল কেন্দ্র খুলিবে, জেলাসমূহের লোকসংখ্যার অনুপাতে এই সকল কেন্দ্র যত দূর সম্ভব সমানভাবে বণ্টন করা হইবে। তবে পল্লীর এবং এলাকার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে মিটান হইবে। পল্লী এলাকার প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্র এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাধিক নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেকটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র দুই জন শিক্ষক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে ; তন্মধ্যে একজন নিরক্ষরতা দূরীকরণে ট্রেনিং-প্রাপ্ত এবং অন্য একজন সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক শিক্ষায় ট্রেনিং-প্রাপ্ত।

বর্ত্তমান সময়ের জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্রে সমাজ শিক্ষা প্রদানের জন্য আংশিক সময়ে কাজ করার একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে। শিক্ষার সময় দুই মাস হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইবে এবং বৎসরে এইরূপ তিনটি 'সেসন' হইবে। প্রতি বৎসর প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে যাহাতে এক শতের কম শিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক বাহির না হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক কেন্দ্রে চল্লিশ জন করিয়া প্রাপ্তবয়স্ককে ভর্ত্তি করা হইবে। অপরাহ্নে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইবে এবং পুরুষেরা সাধারণতঃ অপরাহ্নে শিক্ষা লাভ করিবে। এই 'কোর্স' শেষ হইলে পূর্ণ বয়স্কগণকে আরও নয় মাসকাল নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্রে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। সেখানে তাহাদিগকে উপযুক্ত সাহিত্য দেওয়া হইবে। সম্পূর্ণ 'কোর্সটি' এমনভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যে, প্রাপ্তবয়স্কগণ এক বৎসরের মধ্যে সংবাদপত্র ও সহজ ভাষায় পুস্তকাদি পাঠ করিবার যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে।

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সফল হউক ইহা আমাদের কাম্য। যে উপায় অবলম্বিত হইতেছে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও আজ তাহা ব্যক্ত করিব না। কেবল একটা কথা বলিতে চাই। গতানুগতিকভাবে সরকারী পরিকল্পনা চলিবে, চলিতে থাকুক। কিন্তু যে সব প্রতিষ্ঠান ১০।১২ বৎসর হইতে এই শিক্ষাদান ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদেরও "পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা"

করিয়া কার্য্যারম্ভের শক্তি জোগান পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য; পাঁচ বৎসরের জন্য কার্য্যোপযোগী অর্থ সাহায্য করা হইবে এরূপ প্রতিশ্রুতি পাইলে এসব প্রতিষ্ঠান নূতন উদ্যমে অগ্রসর হইতে পারিবে। বর্ত্তমানে সরকারী শিক্ষা-বিভাগ নিক্তির ওজন করিয়া সাহায্য বিতরণ করিতেছে, এবং নারীশিক্ষা সমিতি ও বঙ্গীয় বয়স্ক শিক্ষা সমিতির মত প্রতিষ্ঠানও তাহাদের শক্তি ও প্রয়োজন উপযোগী সাহায্য পাইতেছে না। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে পরিমাণ সরকারী সাহায্য ছিল, আজও তাহাই আছে যখন সর্ব্ববিষয়ে ব্যয় চারি গুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট "স্বেচ্ছামূলক এজেন্সির" কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের সহযোগিতা চাহিয়াছেন। কিন্তু প্রতিদানে বার্ষিক ২.৩ হাজার টাকার বেশী সাহায্য দান করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের হয় নাই। এ অবস্থায় তাঁহারা এরূপ নানা প্রতিষ্ঠানের অকুণ্ঠ সাহায্য প্রত্যাশা করিতে পারেন কিরূপে? ফাইল হইতে চোখ তুলিয়া এই প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালকবর্গের সঙ্গে মন খুলিয়া একটু মিশিতে শিখুন; তবেই ইহাদের অসুবিধা বুঝিতে পারিবেন, এবং তাহার প্রতিকার করিতে পারিলে ইহাদের সাহায্যে দেশের শিক্ষাসমস্যা সহজ হইয়া যাইবে।

রাষ্ট্রভাষা সমস্যা

আমাদের রাষ্ট্রভাষা লইয়া বিশেষ বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষের ১৪।১৫ কোটি লোক হিন্দি ভাষায় কথা বলেন এবং ভারতরাষ্ট্রের রাজধানী দিল্লী নগরী তাঁহাদের বাসস্থানের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া তাঁহারা আমাদের শাসকবর্গের উপর বিশেষ চাপ দিতে পারেন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার তাঁহারা করিতেছেন। বর্ত্তমানে দিল্লী নগরীতে ঘটা করিয়া তাঁহারা একটা সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন—উদ্দেশ্য সর্ব্ব-ভারতীয় বিদ্বদ্বর্গের উপস্থিতিতে হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকার করাইয়া লওয়া। এই স্বীকৃতির সঙ্গে ভারত-রাষ্ট্রের জনমত মন খুলিয়া যোগদান করিতে পারিবে কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে বলিয়া কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ হিন্দীর উপর বিরূপভাব সংযত করিবার মানসে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। আগামী এক মাসের মধ্যে ভারতবর্ষের গঠন-বিধি ও ব্যবস্থা একটা চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করিবে। এইজন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের এই প্রস্তাব সময়োপযোগী হইয়াছে। ইহাতে বিতণ্ডার শেষ না হইলেও তাহা শান্ত হইবে। নিম্নে তাহা তুলিয়া দিলাম:

> ভাষা সমস্যা জনসাধারণের চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটি তাই মনে করেন যে এই সম্পর্কে কয়েকটি মূলনীতি নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া উচিত। বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া এই নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রশ্নটাকে দুই দিক হইতে বিবেচনা করা হইয়াছে, যথা—শিক্ষা ও শাসন। ইহা ছাড়া সমগ্র দেশের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নও রহিয়াছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী এলাকার মধ্যে আদানপ্রদানে এই রাষ্ট্রভাষাই মাধ্যম হইবে।
>
> বর্ত্তমানে এমন কতকগুলি প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য আছে যেখানে একাধিক ভাষা প্রচলিত। এইরূপ বহুভাষা অতি সমৃদ্ধ এবং মূল্যবান সাহিত্য সম্পদে পুষ্ট। এই সমস্ত ভাষা শুধু রক্ষা করাই যথেষ্ট নয়, এইগুলির উন্নয়ন সাধন করিতে হইবে এবং এমন কিছু করা উচিত নয় যাহাতে ইহাদের উন্নতি ব্যাহত করা হয়।
>
> যে সকল প্রদেশে বা দেশীয় রাজ্যে একাধিক ভাষা প্রচলিত সেখানে এক একটি এলাকায় সন্দেহাতীত ভাবে এক একটি ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া প্রতি দেশে একটি ভাষা ক্রমশঃ আর একটি ভাষাকে আসন ছাড়িয়া দেয়—এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্যে সেই এলাকাগুলিকে দ্বিভাষী এলাকা বলা হইবে।
>
> কোন প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যের ভাষা কি তাহা সেই প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যই স্থির করিবে। বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রদেশসমূহের এক একটি ভাষার নির্দ্দিষ্ট এলাকায় এবং দ্বিভাষী এলাকায় বিভক্ত করিয়া লইতে হইবে। প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য এইরূপ প্রতিটি বিভাগের ভাষা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।
>
> শাসনকার্য্যের উদ্দেশ্যে প্রদেশ বা নির্দ্দিষ্ট এলাকায় ভাষা ব্যবহৃত হইবে। প্রাদেশ বা দ্বিভাষী এলাকায় সংখ্যাল্প সম্প্রদায় যদি পর্য্যাপ্ত সংখ্যক জনবহুল হয় অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা কুড়ি ভাগ লোক সংখ্যাল্প সম্প্রদায়-ভুক্ত হয় তাহা হইলে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দলিল-পত্র, যথা—সরকারী নোটিশ, ভোটার তালিকা, রেশন-কার্ড প্রভৃতি উভয় ভাষাতেই লিখিতে হইবে। আদালত ও শাসনকার্য্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারী আপিসে দেশ বা এলাকা বিশেষের ভাষা ব্যবহৃত হইবে। তবে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে নিজ ভাষায় এবং সেই ভাষা সরকারীভাবে স্বীকৃত হইলে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।
>
> নিখিল-ভারতীয় উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের কার্য্য পরিচালনার জন্য একটি রাষ্ট্রভাষা থাকিবে। প্রাদেশিক বা দেশীয় রাজ্য সরকারের সহিত চিঠিপত্র আদান-প্রদানে সেই ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সমস্ত রেকর্ড সেই ভাষাতেই রক্ষিত হইবে, বিভিন্ন প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যের মধ্যে আদান-প্রদান ও চিঠিপত্র লেখালেখির জন্যও এই ভাষাই ব্যবহৃত হইবে। পরিবর্ত্তন-

কালে কেন্দ্র ও আন্তঃপ্রাদেশিক ব্যাপারে ১৫ বৎসরের অনধিক কালের জন্য ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই সময় ক্রমশঃ ইংরেজীর স্থলে রাষ্ট্রভাষার সমধিক ব্যবহারদ্বারা ইংরেজীর পরিবর্তে রাষ্ট্রভাষাকে কায়েম করিতে হইবে।

শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রতি শিশু মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিবে শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবকের ইচ্ছানুযায়ী এই ভাষা স্থিরীকৃত হইবে। সাধারণতঃ ইহা এলাকা বা প্রদেশের ভাষা হইবে। তবে অন্যান্য স্থানে বিশেষতঃ প্রান্তিক এলাকায় এবং বড় বড় শহরে যেখানে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক বাস করে সেখানে সংখ্যাল্পের ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে কিংবা অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যদি উপযুক্তসংখ্যক যথা ১৫ জন ছাত্র দাবী করে তাহা হইলে সংখ্যাল্পের ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য বিভাগ খুলিতে হইবে। তবে এই সকল বিদ্যালয়ে মধ্যস্তরে সংখ্যাল্প ছাত্রদের জন্যও প্রাদেশিক ভাষা প্রবর্তন করা হইবে।

মাধ্যমিক স্তরে সাধারণতঃ প্রাদেশিক ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হইবে। তবে উপযুক্তসংখ্যক ছাত্র যদি দাবী করে তাহা হইলে সংখ্যাল্পের ভাষাতে শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন বা বিভাগ খোলা যাইতে পারে। স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করিবার—যথা, সেখানে সরকারী বা বেসরকারী এরূপ কোন বিদ্যালয় আছে কিনা, প্রাদেশিক তহবিল এইরূপ স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের ব্যয় বহন করিতে পারে কিনা। এই মাধ্যমিক স্তরে নিখিল-ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা করা যাইতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাগ্রহণ করিতে হইবে।

উর্দ্দুকেও এই ব্যাপারে একটি স্থান দিতে হইবে।

রাষ্ট্র-ভাষা সম্বন্ধে এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, তাহা "একটি" মাত্র হইবে। এই নীতি ও সিদ্ধান্তটাই অনেকের মনঃপূত হইবে না; তাঁহারা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে সুইজারল্যাণ্ডের মত ভারতরাষ্ট্রেও ৪।৫টি রাষ্ট্র-ভাষা থাকিবে। গত ১লা শ্রাবণের "হরিজন" পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত কথাগুলি জানিয়া রাখা ভাল:

> সুইজারল্যাণ্ড সুসংহত একটি জাতীয় সত্তা। চারটি জাতি লইয়া ইহা গঠিত—জার্ম্মান, ফরাসী, ইতালীয় ও রোমক। তাহাদের প্রত্যেকেই নিজের নিজের জাতীয় ভাষা ব্যবহার করে।
>
> সুইসদের ফেডারেল বিধানতন্ত্রের ১১৬ ধারাতে আছে: জার্ম্মান, ফরাসী, ইতালীয় ও রোমক এই চারটি সুইজারল্যাণ্ডের জাতীয় ভাষা।
>
> জার্ম্মান, ফরাসী ও ইতালীয় এই কয়েকটি সুইস্-কন্‌ফেডারেশনের সরকারী-দফ্‌তরের ভাষা।

প্রবন্ধের লেখক মিঃ ডোনাল্ড টাউনসেণ্ড আমেরিকাবাসী, তিনি অনেক দিন ভারতে আছেন এবং এখানেই বসবাস করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে তিনি যে-সব কথা বলিয়াছেন, তাহা মানিয়া লইতে পারিলে আমাদের সকলের মঙ্গল:

> আমরা যদি প্রাচীনদের প্রতিযোগিতা পরিহার করি, দেশ জাতি ও জাতের গর্ব্ব ছাড়িতে পারি এবং আমরা যদি নিজেদের প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় এবং গৌণভাবে মাদ্রাজী, বাঙালী বা মারাঠী বলিয়া মনে করি তাহা হইলেই ভারতে সুইস্-পদ্ধতির প্রয়োগ করিতে পারা যায়।
>
> এখানকার ঔদার্য্য এবং পরমতসহিষ্ণুতা মনোমুগ্ধকর... কত ব্যাপারই না এখানে মানিয়া লওয়া হয়। এখানে অনেক সময়ে আইনের বদলে প্রচলিত রীতিই গ্রাহ্য হয়। ধর্ম্ম ও ভাষার সম্বন্ধে সুইস্-বিধানতন্ত্রে বিধিনিষেধ কতই কম। অথচ আপন শ্রেষ্ঠত্ব, অগ্রগণ্যতা বা বিশুদ্ধতার কোন বোধই নাই।...

এই মনোভাবের অনুশীলন করিতে কতদিন লাগিবে, তাহা জানি না। এই "ঔদার্য্য" আমাদের জাতীয় চরিত্রে বদ্ধমূল না হইলে দেশের অকল্যাণ কেহই ঠেকাইতে পারিবে না; আজ যাঁহারা হিন্দী ভাষা লইয়া লাফালাফি করিতেছেন তাঁহাদের এই কথাটা মনে রাখিতে বলি।

পশ্চিম ইউরোপের বিপদ

বার্লিন নগরী সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও ইউরোপখণ্ডে নিশ্চিন্ততা আসে নাই। এই আশঙ্কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী ডিন এচিশনের একটা উক্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গত ১২ই শ্রাবণ তাহাদের ব্যবস্থাপক সভার বৈদেশিক কমিটির সমক্ষে তিনি এই কথা বলেন: "পশ্চিম ইউরোপের স্বাধীন জাতিগুলির নিরাপত্তার উপর আমাদের নিজেদের নিরাপত্তা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। কিন্তু তাহারা বড় রকমের সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম।" এই আক্রমণ কোথা হইতে আসিবে, তাহার প্রতিও এচিশনের সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে—"সোভিয়েট ইউনিয়নে বর্ত্তমানে যে সৈন্যবাহিনী আছে বিশ্বের ইতিহাসে শান্তির সময়ে এরূপ বিরাট বাহিনী আর কোন দিন কাহারও ছিল না।"

এইরূপ আশঙ্কা দূর করিবার জন্যই ইউরোপের ১২টি রাষ্ট্র মার্কিনী-রাষ্ট্রের সঙ্গে গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে এবং ইহা ছাড়া মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৬টি ইউরোপীয় রাষ্ট্রকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৭ সাল হইতে আর্থিক সাহায্য করিতেছে; এই সাহায্যকে আশ্রয়

করিয়া এই দেশগুলি যুদ্ধবিধ্বস্ত জীবনযাত্রা পুনর্গঠন করিতে সক্ষম হইবে। সম্প্রতি মার্কিন ব্যবস্থাপক সভায় ১৯৪৯ সালের জন্য প্রায় এক হাজার কোটি টাকা এতদর্থে মঞ্জুর করিয়াছে, যদিও দুইটি রাজনৈতিক দল এ বিষয়ে এখনও তর্ক করিতেছে।

"নিউ ইয়র্ক টাইমস" পত্রিকা এই মতবিরোধের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছে:

> বিতর্কে প্রকাশ পাইয়াছে যাঁহারা উহার বিরোধিতা করিতেছেন তাঁহাদেরও অনেকে চুক্তিটির নীতি সমর্থন করেন; পশ্চিম ইউরোপ আক্রান্ত হইলে উহার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।
>
> কিন্তু মতভেদ ঘটিয়াছে এই প্রশ্ন লইয়া যে কবে এবং কিভাবে সমবেত আত্মরক্ষা ব্যবস্থায় আমরা যোগদান করিব—ফলে চুক্তিটির অন্তর্গত যে সামরিক সাহায্যদানের বিধান রহিয়াছে তাহাই এখন প্রধানত: তর্কের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে।
>
> সেনেটের অধিকাংশ সদস্য শুধু যে অতলান্তিক চুক্তিটিই সমর্থন করেন তাহা নহে, কোন প্রকারের আক্রমণ আসিবার পূর্ব্বেই ইউরোপের জাতিগুলি যাহাতে আত্মরক্ষার জন্য সুসংহত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে সেজন্য তাহাদের সাহায্য করিতেও তাঁহারা ইচ্ছুক। উহার উদ্দেশ্য যাহাতে ঐরূপ একটা আক্রমণ না আসিতে পারে এবং নূতন একটা মহাযুদ্ধ সংঘটিত না হয়।
>
> অন্যদিকে বিরোধী দলের অধিকাংশ সদস্য বলেন আক্রমণের পূর্ব্বে নহে—আক্রমণ সুরু হইবার পরেই মাত্র ঐরূপ সাহায্য দেওয়া উচিত। ব্যয় সঙ্কোচ, অথবা রাশিয়াকে না "খোঁচাইবার" ইচ্ছা অথবা মিত্ররাষ্ট্রগুলির প্রতি সংশয় প্রভৃতি কারণেই তাঁহারা এই কথা বলেন; তাঁহাদের মতে পশ্চিম ইউরোপের শান্তি রক্ষার জন্য যে আমেরিকাও যোগদান করিবে এই প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট। এইজন্যই সামরিক সাহায্যদান ব্যবস্থাকে তাঁহারা শৃঙ্খলিত করিতে চাহেন। কিন্তু উহাতে মূল চুক্তির কোন মূল্য থাকিবে না; বিরোধী দলের উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইবার সম্ভাবনা কম।

এই সব বিতর্কের উত্তরে সোভিয়েট বেতারে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে কোন নূতনত্ব নাই: "যুদ্ধের বাতিক উস্কাইয়া দেওয়া ও দুর্ব্বলচেতাদের ভয় দেখানো"—ইহাই হইল এই "সাজ সাজ" ডাকের উদ্দেশ্য। গণতন্ত্র ও এক-নায়কত্বের এই বিতর্কে দুনিয়ার লোকসমষ্টি কতটা উপকৃত হইবে সেই সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ আছে। আমরা বুঝিতেছি না যে, এই বিরোধের প্রয়োজন কি। গণতন্ত্রের পক্ষে বলা হয় যে তার আক্রমণের কোন উদ্দেশ্য নাই। আত্মরক্ষার জন্যই সে সব আয়োজন-উদ্যোগ করিতেছে, এক-নায়কত্বের প্রতিভূ ইহা বলিতেছে সেই কথা। এবং এক ভাব পোষণ করিয়া ও এক বুলি উচ্চারণ করিয়া তবুও তাহারা একাগ্র মন হইতে পারিতেছে না। মনুষ্য জাতির দুর্ভাগ্য।

এই বিরোধে ভারতরাষ্ট্রের স্থান কোথায়, তৎসম্বন্ধে আমাদের জনমত গঠিত হয় নাই। আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ বলিতেছেন যে আমরা দূরে দাঁড়াইয়া এই বিরোধ দেখিব; কোন পক্ষে যোগদান করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। কিন্তু পৃথিবীর শক্তিপুঞ্জ যেরূপভাবে দলবদ্ধ হইতেছে তাহাতে নিরপেক্ষ ও নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভব হইবে কিনা তৎসম্বন্ধে অবিশ্বাসের ভাবই প্রবল। সোভিয়েট রাষ্ট্র ত ধরিয়া লইয়াছে যে, ভারতরাষ্ট্র ইংলণ্ড ও মার্কিনের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছে। এই বিশ্বাসের প্রেরণায়ই তাহার প্রবল প্রচার-যন্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ঘুরাইয়া লইয়াছে।

রামেন্দ্র-রচনাবলী

আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলীর প্রথম খণ্ড পাইয়া সুখী হইলাম। বাংলা ভাষার বর্ত্তমান সংস্কৃতির প্রবর্ত্তক ও ধারকবৃন্দের রচনাবলী প্রকাশ করিবার ব্রত গ্রহণ করা হইয়াছে; এই গ্রন্থাবলী এই ব্রত উদ্‌যাপনের অংশ মাত্র।

বর্ত্তমান যুগের বাঙালীকে নূতন করিয়া তাহাদের স্বকীয় ইতিহাস শুনাইতে হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন; সেই কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ় সংকল্প থাকিলে আমাদের জাতি উপকৃত হইবে। রামেন্দ্রসুন্দর দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় সম্পাদকদ্বয় "সাহিত্য সাধকমালার" ৭০ নং গ্রন্থে—("রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী") বিবৃত করিয়াছেন।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে দেশে যে জাগরণ বাঙালীকে নূতন করিয়া গঠন করিয়াছিল তাহার ভাব ও চিন্তানায়কবৃন্দের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরের নাম জাতির স্মৃতিতে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। সাহিত্য-পরিষৎ সেই ভাব ও চিন্তা সহজলভ্য করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া আমাদের সম্মুখে কর্ত্তব্য পালনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত দশ সহস্র মুদ্রার দানে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদকদ্বয়ের অনুমান যে, আরও পাঁচ খণ্ডে "রামেন্দ্র রচনাবলীর" প্রকাশ তাঁহারা সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন। এতদর্থে বাঙালী সমাজের মুক্তহস্তে দান করিতে হইবে। সেই দানের পরিমাণ ২৫ হাজার টাকা মাত্র। ১০০০ লোক পঁচিশ টাকা এককালীন অগ্রিম দান করিলে এই দায় সহজে মুক্ত করা যায়। বাঙালী শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এক হাজার লোকের অভাব এই কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। সংগঠনের যে দায়িত্ব তাহা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙালী তাঁহাদের নিজের কর্ত্তব্য পালন করুন।

বুনিয়াদী শিক্ষার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী

শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত

প্রায় সকল দেশের শিক্ষাবিদেরা স্বীকার করিয়াছেন যে, শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য শিশুকে দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিক তৈয়ারী করা। আর এক কথায় বলা যাইতে পারে, শিশু যে সমাজে আছে সেই সমাজের একজন সভ্য হইয়া যাহাতে ইহার উন্নতি বিধান করিতে পারে তাহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে একটা কথা আমরা ভুল করিয়া থাকি। আমরা ধরিয়া লই যে, সমাজব্যবস্থা ঠিকই আছে। শিশুকে এই প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় খাপ খাওয়াইতে পারিলেই হইবে। সমাজের ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা এবং সমাজের কোনও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে কিনা এই প্রশ্নও শিক্ষাবিদ্‌দের মনে আসা উচিত ছিল। আমার মনে হয় এতাবৎকাল শিক্ষার উন্নতিবিধানের যে চেষ্টা হইয়াছে তাহা ফলবতী না হওয়ার কারণ আমরা শিক্ষার একটা দিকের উপরই জোর দিয়াছি এবং আর একটা দিককে ছাড়িয়া দিয়াছি।

প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে কিরূপ সমাজ তিনি গড়িতে চান। শিশুকে সেই আদর্শ-সমাজের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। আদর্শ ভবিষ্যৎ সমাজের উপযোগী করিয়া শিশুকে গড়িয়া তোলাই শিক্ষার কাজ। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার এই দোষ, গান্ধীজীর চোখে পড়িয়াছিল তাই তিনি বুনিয়াদী শিক্ষাকে শিক্ষাপদ্ধতি (system of education) না বলিয়া জীবন-ধারণ-পদ্ধতি (way of life) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মহাত্মাজী কিরূপ সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন এবং শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা তাহা কতটা সম্ভব ইহাই এখন আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত।

আজ পৃথিবীময় সাড়া পড়িয়াছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। কিন্তু সত্যিকার গণতন্ত্র কি কোনও দেশে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে? সত্যিকার গণতন্ত্র তাহাকেই বলিব যেখানে সকল ব্যক্তিকে সমান সুযোগ দেওয়া হয়। আমার মনে হয় প্রত্যেক মানুষেই কোন না কোন বিষয়ে অন্যাপেক্ষা কিছু বেশী ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার বিশেষ ক্ষমতা বিকাশ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহাকেই বলে গণতন্ত্র। কিন্তু আজ পৃথিবীর কোন্ দেশে এইরূপ সুযোগ দেওয়া হইতেছে? যখন যে দল বিশেষ ক্ষমতালাভ করিতেছে তখন তাহাদের বিরুদ্ধমতবাদীদের মুখ জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। পরিণত বয়সে কিরূপে আমরা আমাদের বাল্য ও কৈশোরের অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারি?

শৈশব হইতে দেখিয়া আসিতেছি পরিবারে বাপ, মা আত্মীয়-স্বজন তাঁহাদের ইচ্ছা আমাদের উপর চাপাইয়া দিতেছেন, আমাদের নিজস্ব কোন মত থাকিতে পারে কিনা তাহা ভাবিয়াও দেখেন না। আমরা কেমন করিয়া আশা করিতে পারি যে, গণতন্ত্রবিরোধী পরিবেশের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া আমরা হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইব এবং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিব? তাই গান্ধীজী বলেন, প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যা-লয়কে একটি ছোট-খাটো গণতান্ত্রিক 'রাষ্ট্রে' পরিণত করিতে হইবে। এই শিশুরাষ্ট্রে থাকিবে নানা বিভাগ ও নানা কাজ। প্রত্যেকটি কাজের ভার পড়িবে শিশুদের দ্বারা মনোনীত এক একজন মন্ত্রীর উপর। যদি সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রতিযোগিতামূলক প্রচার বাদ দিতে পারি তাহা হইলে এই শিশুরাষ্ট্রে মন্ত্রীরূপে নির্ব্বাচিত হইবে তাহারাই যাহাদের বিশেষ বিশেষ দিকে দক্ষতা আছে। এমনিভাবে সারা দেশময় প্রত্যেক বিদ্যালয়কে যদি একটি করিয়া শিশুরাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারি তাহা হইলে আমরা জগতে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব।

কোন্ সুদূর অতীতে ভারতবর্ষে গুণকর্ম্মের বিচার করিয়া জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। পুরুষপরম্পরায় একই কাজ করিলে সেই কাজের উত্তরোত্তর উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। তাঁতীর ছেলে জন্মাবধি তাঁতের কাজ দেখার দরুন যত সহজে তাহার তাঁত বোনা শিখিবার সম্ভাবনা আছে অপরের সেরূপ নাই। সভ্যতার প্রথম যুগে সমাজের কাজের বিশৃঙ্খলা যাহাতে না হয় তাহার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে এই কর্ম্মবিভাগের ভাল দিকটা না লইয়া আমরা তাহার খারাপ দিকটাই লইলাম। কর্ম্মবিভাগ হইতে উৎপত্তি হইল জাতিভেদ প্রথা। আর একটা সব চেয়ে দুঃখের কথা এই যে যাহার কাজ সমাজে যত বেশী শক্ত ও প্রয়োজনীয় সমাজব্যবস্থার দৌলতে তাহার স্থান হইল তত নিম্নে। এই জাতিভেদ ভারতবাসী—বিশেষ করিয়া হিন্দুদের মধ্যে হিংসাদ্বেষ ও হানাহানির প্রধান কারণ। জগতের ও মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য আমাদের প্রয়োজন হইয়াছে জাতিহীন ও শ্রেণীহীন সমাজ গড়িয়া তোলা। এইরূপ সমাজগঠন বক্তৃতা দ্বারা হইতে পারে

না। বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে একটি ছোট-খাটো জাতিহীন ও শ্রেণীহীন সমাজে পরিণত করিতে হইবে। সমাজের সমস্ত কাজই এখানে থাকিবে, কিন্তু থাকিবে না জাতিভেদ। চলতি কথায় যাহাকে বলে 'জুতো সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত'—সমস্ত কাজ এই ছোট সমাজের সভ্যেরা পর্য্যায়ক্রমে করিবে। পালাক্রমে সকলকেই হইতে হইবে মেথর এবং পাচক, চাষা ও তাঁতী, নেতা ও আদেশপালক। এখন আছে রাজকুমারদের স্কুল ও সাধারণের স্কুল, বর্ণহিন্দুদের ও হরিজনদের স্কুল, মুসলমানদের স্কুল বা খ্রীষ্টান স্কুল। এগুলি উঠাইয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে গড়িয়া তুলিতে হইবে সব শ্রেণীর ছোট ছোট সমাজ।

আজ সারাবিশ্বে জ্বলিতেছে অশান্তির আগুন। এই অশান্তির আগুন নিবাইতে না পারিলে বিশ্বগ্রাসী তৃতীয় মহাসমর যে অবশ্যম্ভাবী তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই আগুনের উৎস কোথায় তাহার সন্ধান করিলে দেখিতে পাইব যে, জগতে গড়িয়া উঠিয়াছে দুইটি শ্রেণী—সব-পাওয়া ও সব-হারা। জগতের একদল লোক বিনা পরিশ্রমে বা অল্প পরিশ্রমে পাইতেছে জগতের সব সুখ ও সম্পদ, আর এক দল লোক সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া দু'বেলা দু'মুঠা অন্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে না। জগতের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অর্থনৈতিক 'গ্রাফ' (graph) সমরেখায় পরিণত হইয়াছে। ম্যাক্‌ডোনাল্ড দু'একজন হইলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখিতে পাই যে ধনী ও শিল্পপতিদের ছেলেরা সমাজের উপরের স্তরে রহিয়া গিয়াছে এবং শ্রমিক ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতি বিশেষ হয় নাই বলিলেই চলে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে এমন এক সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে প্রত্যেক সভ্যই সমাজকে কিছু না কিছু দান করিবে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কিছু না কিছু উৎপাদন করিতে হইবে। সমাজের জন্য প্রত্যেকের কিছু না কিছু উৎপাদন করিবার প্রবৃত্তি জাগরিত করিতে হইবে বিদ্যালয়ে। তাই মহাত্মাজী প্রবর্ত্তিত বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইয়া উঠিয়াছে কর্ম্মকেন্দ্রিক। মহাত্মাজী উৎপাদনের দিকে জোর দিয়াছেন—কারণ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সমাজে শিশু শিখিবে সমাজের প্রয়োজনীয় কিছু না কিছু উৎপাদন করিতে।

শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবনে নাগরিক হিসাবে সমাজে স্ব-স্ব স্থান গ্রহণ করিবার উপযুক্ত করিয়া তোলা শিক্ষার যে একটা উদ্দেশ্য সেই বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই। কিন্তু এখন কথা হইতেছে এই যে, সমাজে নিজের স্থান লইবার পূর্ব্বে প্রত্যেকের মধ্যে থাকা দরকার সমাজ-সেবার প্রবৃত্তি। বিদ্যালয়ে থাকিবার সময়েই সমাজের প্রধান প্রধান সমস্যার সহিত পরিচিত হইতে হইবে এবং সঞ্চয় করিতে হইবে ভবিষ্যৎ জীবনে পাথেয় হিসাবে সমাজ-সেবার অভিজ্ঞতা। বুনিয়াদী বিদ্যালয় এই বিষয়ে কতটা অগ্রসর হইয়াছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখা দরকার। ভারতবর্ষে বর্ত্তমান প্রধান সমস্যা অন্ন ও বস্ত্রের। প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সুতা-কাটা ও কৃষিকার্য্যকে আধারিক (basic) শিল্পরূপে গ্রহণ করিয়া সমাজের প্রধান দুইটি সমস্যা সম্বন্ধে শিশুদের অবহিত করা হইতেছে। আমাদের আর একটি সমস্যা হইতেছে 'সাফাই' বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। ব্যক্তিগত 'সাফাইয়ে'র দিক দিয়া দেখিতে গেলে জগতের মধ্যে ভারতবাসীদের শীর্ষস্থান বোধ হয় নিঃসন্দেহে দেওয়া যায়, কিন্তু সামাজিক 'সাফাইয়ে'র দৃষ্টিতে আমাদের স্থান অনেক নিম্নে। আমরা বাড়ীর ময়লা লইয়া গিয়া জমা করি রাস্তার মাঝখানে এবং প্রতিবেশীদের বাড়ীর সম্মুখে। বাড়ীর ময়লা আমরা পরিষ্কার করি, কিন্তু রাস্তার অপরিচ্ছন্নতা আমাদের চোখে পড়ে না। এইজন্যই গান্ধীজী বলিয়াছেন নয়া তালিম বা বুনিয়াদী শিক্ষার আরম্ভ 'সাফাই' হইতে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সাফাই বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ। নিত্য সাফাই ছাড়াও প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে মধ্যে মধ্যে গ্রাম সাফাই ও সামগ্রিক সাফাই ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়।

আধুনিক সমাজের প্রধান গলদ হইতেছে সহযোগিতা-মূলক মনোভাবের অভাব। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজের মতামত প্রতিনিয়ত আমাদের মনে প্রতিযোগিতার স্পৃহা জাগাইতেছে। বিদ্যালয়ে শিশুকে বলা হইতেছে, যে-কোন প্রকারে অন্যান্য শিশু অপেক্ষা কয়েকটা বিষয়ে বেশী নম্বর পাইয়া ভাল ছেলের পর্য্যায়ে যাইতে। খেলার মাঠে শিশু চেষ্টা করিতেছে কেমন করিয়া অন্য সকলের চেয়ে ভাল খেলিতে পারে বলিয়া সুনাম অর্জ্জন করিবে। জগতের চিন্তাশীল মনীষিগণ আজ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, যদি প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব দূর করিতে না পারা যায় তবে মানব-সভ্যতার ঘোর দুর্দ্দিন অচিরে উপস্থিত হইবে। সহযোগিতাপূর্ণ সমাজব্যবস্থায় সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে। গান্ধীজী চাহিয়াছেন প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয় এক একটি ছোট ছোট প্রতিযোগিতাহীন, সহযোগিতামূলক সমাজে পরিণত হউক। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রথম দ্বিতীয় স্থান নির্দ্ধারিত করিবার জন্য কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা থাকিবে না। তাহার পরিবর্ত্তে থাকিবে সুচিন্তিত কর্ম্মপদ্ধতি যাহাতে প্রত্যেক শিশুরই কিছু না কিছু অংশ থাকিবে। যে কাজের পরিকল্পনা

শিশুরা করিবে, তাহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিবার সুযোগ তাহাদের দিতে হইবে এবং তাহাতে যেন প্রত্যেক শিশুরই কিছু না কিছু অংশ থাকে সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সমাজ-জীবন সুষ্ঠুভাবে চালাইতে হইলে কতকগুলি নিয়ম কানুন মানিয়া চলিতে হয়। ইহার নৈতিক গুরুত্ব ততটা না থাকিলেও ব্যবহারিক সার্থকতা আছে। আজ আমরা যে দিকে তাকাই দেখিতে পাই জাতীয় জীবনে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার অভাব। রেলষ্টেশনে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় টিকিট-ঘরের সম্মুখে লোকের ভিড়। বাসে ও ট্রামে লোক যাইতেছে ঝুলন্ত অবস্থায়। একের পর একজন দাঁড়াইয়া নিজের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করার অভ্যাস আমাদের এখনও হয় নাই। কোন সভা-সমিতিতে মাঝখান হইতে অনেককে উঠিয়া চলিয়া যাইতে দেখা যায়, পরিচিত অপরিচিত, অতিথি, আত্মীয়, ছোট বড় ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা সমাজের সকলেরই জানা উচিত। মুখে বলিলেও এতদিন আমরা সামাজিক শিষ্টাচারকে শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া গণ্য করি নাই। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে সামাজিক সৌজন্যকে শিক্ষার একটি মূল অঙ্গ বলিয়া ধরা হইয়াছে। বিদ্যালয়ে শিশু তাহার শিক্ষার্থী জীবনে যাহাতে সামাজিক আচার-ব্যবহারগুলি পালন করিতে পারে সেই বিষয়ে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি এবং চলিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান পার্থক্য এই যে, চলিত শিক্ষাপদ্ধতি একমুখী, কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি দ্বিমুখী। চলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থা ঠিকই আছে; শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুদের সমাজে নিজ নিজ স্থান করিয়া লইতে শিক্ষা দেওয়া। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, প্রতিযোগিতামূলক বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে। শিশুদের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে থাকিবার সময় এই ভাবেই নূতন সমাজের পূর্ব্বাভাস দিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে বুনিয়াদী শিক্ষায় সমাজ ও নাগরিক উভয়ই গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা রহিয়াছে।

কবির প্রতি

শ্রীকালিদাস রায়

কালকে সে দেশ স্বাধীন হবে আজ যে পরাধীন,
কাল সে হবে ধনকুবের আজ যে দীনহীন।
কাল তা হবে মস্ত শহর আজ যা বুনো গ্রাম,
কাল তা হয়ত সস্তা হবে যার আজ চড়া দাম।
আজকে মজুর মরছে খেটে মিটছে না তার দাবি,
কাল সে পাবে সারা দেশের ভাঁড়ার-ঘরের চাবি।
আজ যে শিলং দার্জিলিঙে কাটায় গরম কাল,
কালকে রোদে তার ছেলেরে ধরতে হবে হাল।
আজ যে প্রভু কালকে হবে একশ' জনার দাস
অলস ভোগীর বংশধরে খাটবে বারমাস।
আজকে যারা লড়াই করে জলে স্থলে ব্যোমে
কালকে হয়ত দোস্তি তাদের উঠবে বেজায় জমে।
এই দুনিয়ার এ সব ব্যাপার চিরদিনের নয়
আজকে যাহা সত্য তাহা কালকে মায়াময়।
এসব নিয়ে লিখবে দেশে যতেক পাঠ্যকার,
রাজনীতিবিদ্ বার্ত্তাজীবী কিংবা নাট্যকার।

মা চিরদিন প্রাণ-দুলালে টানবে নিজের বুকে,
ঘুম পাড়াবে চুমা খাবে তাহার সোনামুখে।
প্রিয়তম প্রিয়ার লাগি ভুলবে এ ভুবন
মিলনে সে মাতবে, হবে বিরহে উন্মন।
আর্ত্তে দেখে দরদীরা ফেলবে আঁখিনীর,
মহত্তমের চরণে লোক লুটাবে তার শির।
জীবনে আর ভুবনে সার, যা কিছু সুন্দর
চিরদিন তা নরনারীর ভুলাবে অন্তর।
যতই তুমি মুখটি বাঁকাও ব্যঙ্গনায়ক হানো,
জ্যোছ্‌না, ফুল, উষার হাসি হবে না পুরানো।
চিরদিনই অনুতাপে কলুষ ধুয়ে যাবে,
আর্ত্ত জ্ঞানী ভক্ত সাধক চিরন্তনেই চাবে।
সীমার নিবিড় সঙ্গ চাবে অসীম চিরদিন,
অসীমাতে সসীম হবে বন্ধনবাধাহীন।
চিরদিনের এই ত রীতি দু'চার দিনের নয়'।
সেই সৃষ্টির শিখর হতে একই ধারা বয়।
যে তোলে সে তুলুক এসব, করুক আস্ফালন,
কবি তুমি ভুল না তাই, চিরদিনের ধন।

মাণিক

শ্রীকালীপদ ঘটক

নাঃ, মাণিকের আর লেখাপড়া কিছুতেই হ'ল না। দিনরাত খালি কাজ আর কাজ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এতটুকু ফুরসত নেই মাণিকের, লেখাপড়া সে করবে কখন। তিন মাসের মাইনে দিতে পারে নি বলে নাম কেটে ওরা স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে মাণিককে। মাষ্টারগুলো ভয়ানক পাজী, মাণিকের গায়ে আর একটু জোর হলে এক হাত সে দেখে নেবে ওদের, নাম এমনি কেটে দিলেই হ'ল। এই নিয়ে সেদিন খুব একচোট বচসা হয়ে গেছে মাণিকের নিধিরাম পণ্ডিতের সঙ্গে; ক্লাস থেকে সে কোনমতেই বেরুতে চায় নি, পণ্ডিত তাকে বেত মারতে মারতে স্কুল থেকে বের করে দিয়েছে। লিকলিকে বেতখানের ছড়ি, সপাং সপাং—মাণিকের পিঠটা সেদিন ফুলে উঠেছিল, এ কি সে সহজে ভুলবে! যেমন করে হোক নিধিরাম পণ্ডিতকে জব্দ না করে ছাড়বে না মাণিক। কিন্তু সে যে এখনও ছোট, আর একটুখানি বড় হোক—তার পর সে দেখে নেবে একবার নিধিরাম পণ্ডিতকে।

কিন্তু বাড়ী বসেও ত লেখাপড়া হতে পারে মনে মনে ভাবতে থাকে মাণিক, নাই-বা গেল সে নিধিরাম পণ্ডিতের ইস্কুলে। বই-পুঁথি যে ক'খানা কেনা হয়েছে—বাড়ী বসেই তা শেষ করে ফেলবে মাণিক। তার শুধু শক্ত লাগে অঙ্কটা, মণকষা সেরকষা বিঘাকালি কাঠাকালির আর্য্যা তার মুখস্থ, কিন্তু আর্য্যা মিলিয়ে অঙ্ক কষতে গেলেই কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়, উত্তর কিছুতেই মেলে না। মাণিকের বাবা অঙ্ক জানে খুব ভাল, অসুখটা তার সেরে গেলেই বিলকুল শিখে নেবে সে। তারপর আর পায় কে মাণিককে, সিধে একেবারে চলে যাবে সে মামার বাড়ী—অজয় নদীর পারে; সেখানে যে মস্তবড় হাই স্কুল, মাণিক গিয়ে ভর্ত্তি হবে সেই স্কুলে, বিস্তর সে লেখাপড়া শিখবে, তারপর বড় হয়ে চাকরি একটা যোগাড় করে নেবে কোলিয়ারীতে। মাণিকের মেজমামা কোলিয়ারীর খাদ-সরকার, বড়সাহেবকে বলে কয়ে চাকরি একটা সে যোগাড় করে দেবেই। মাসে মাসে টাকা আসবে পকেটে বিস্তর, সে জামাজুতো কাপড়-চোপড় কিনে ফেলবে, কোনো-কিছুই আটকাবে না। চাই কি সে মাঝে মাঝে কিছু বাড়ী পাঠাতেও পারে, হাঁ—টাকা ত মাণিককে পাঠাতেই হবে, বাড়ীতে যে ভয়ানক অভাব।

মাণিক সবে দশ পার হয়ে এগারোয় পড়েছে। বয়স তার কুড়িই না, তরুণমতি বালক, সেও কিন্তু বোঝে অভাবের কি তাড়না। ছোটমত একটা মুদির দোকান ছিল মাণিকের বাবার, বেশ চলত দোকান, খেয়ে পরে নির্ভাবনায় দিন চলে যেত। দোকানটা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উঠে গেল, মাণিকের বাবার যে অসুখ, দোকান আর চালাবে কে। যে কয় বিঘা ধানজমির চাষ ছিল মাণিকদের—সামান্য কিছু দেনার দায়ে তাও নিলে মহাজনেরা নিলাম করে। ঠেকাতে পারলে না মানিকের বাবা, জমিগুলো গেল। বড় হয়ে সবকিছু আবার করে নেবে সে, আটকাবে না, শুধু মাণিকের যা একটু বড় হতেই দেরি। কিন্তু তার আগে কিছু লেখাপড়া শিখতে হবে মাণিককে, তা না হলে হাই স্কুলে ভর্ত্তি হবে কেমন করে; লেখাপড়া তাকে শিখতেই হবে।

সকাল সন্ধ্যা নিজের মনেই পড়াগুলো আওড়ে যায় মাণিক। কিন্তু বাধা যে তার পদে পদে, লেখাপড়া করবার কি ফুরসত আছে—সংসারের ফাইফরমাস খাটতে খাটতেই সারাটা দিন কেটে যায় মাণিকের। কবরেজবাড়ী থেকে তিনবেলা ওষুধ বইতে বইতেই পড়ার সময়টুকু কাবার হয়ে যায়। কিন্তু উপায় কি, বাপের যে তার ভয়ানক অসুখ, দেড় বছর ধরে বিছানায় পড়ে আছে মাণিকের বাবা, রোগ কিন্তু কোনোমতেই সারছে না। মানিকের মা সব সময়ই রুগী নিয়ে ব্যস্ত, একা মানুষ, সবদিক সে গুছিয়ে উঠতে পারে না, মাণিককে তাই বাধ্য হয়ে সাহায্য করতে হয় সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্মে।

মাঝে মাঝে মাণিক হাঁপিয়ে ওঠে। কাজকর্ম্মের চাপে পড়ে খেলাধুলো পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে তার। কিন্তু উপায় কি—মা যে একা, বাপ শয্যাগত, মাণিক ছাড়া আর যে তাদের কেউ নেই এই দুঃসময়ে সাহায্য করতে। পাড়ার লোক কেউ ফিরেও তাকায় না, গাঁয়ের লোক সব ভয় করে মাণিকদের বাড়ী আসতে; মাণিকের বাবার ব্যারামটা নাকি খুব শক্ত, সবাই বলে—মাণিক কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না। মাণিকের মা বলে হাঁপানি, লোকে বলে যক্ষা; নিমু কবরেজ আবার লোকের কাছে ব্যাখ্যা করে বলে রাজরোগ। মাণিকের মায়ের কথাই হয়ত ঠিক—হাঁপানি, এর মানে কতকটা বুঝতে পারে সে, কিন্তু যক্ষা—যক্ষা আবার কাকে বলে, যক্ষা মানে কি হাঁপানি? হবে হয়ত। সে যাই হোক, কবরেজের কথা শুনে কিন্তু হাসি পায় মানিকের, সে আবার বলে কি না রাজরোগ। রাজরোগ মানেই হয়ত জানে না কবরেজ, রাজরোগ—রাজে

মাথার রোগ, কিন্তু মাণিকের বাবা ত রাজা নয়, কবরেজ কি তা হলে ঠাট্টা করে ওকথা বলে ? নিধু কবরেজ লোকটা সুবিধের নয়, মাণিক ওকে চিনে নিয়েছে। বিনি পয়সায় একফোঁটা ওষুধ দিতে চায় না, বলে ধারে কারবার বন্ধ। মাণিকের মা টাকা দিতে পারে নি বলে কবরেজ আজ ক'দিন থেকে রুগী দেখতে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। মাণিক কি আর সাধে ওর ওপর চটা ! কবরেজের টেকো মাথা, ফোকলা দাঁত, আর বাংলা পাঁচের মত মুখখানা দেখলেই ভয়ানক গা-জ্বালা করে মাণিকের। ও বেটা রাজরোগ মানেই জানে না—তার আবার পসার দেখলে কি হয়, মাণিক ওর বিদ্যের দৌড় বুঝে নিয়েছে।

বিছানায় পড়ে পড়ে ধুঁকছে করালী মুখুজ্যে। এক মাস নয় দু'মাস নয়—দীর্ঘ দেড় বৎসর কাল বিছানা আঁকড়ে পড়ে আছে সে, ব্যারাম সারবার কোন লক্ষণ নাই। চব্বিশ ঘণ্টা ঘুষঘুষে জ্বর আর খক্ খক্ কাশি, কাশতে কাশতে দম যেন বন্ধ হয়ে আসে করালীর ; এ রোগ কি সহজে সারে ! জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছে করালী, টাকাপয়সা হাতে যে ক'দিন ছিল—ওষুধ-পথ্যের ত্রুটি করা হয় নি, একে একে দেখা গেল অনেক কিছু, ফল আদৌ হ'ল না। ও কি হয়—এ রোগ যে শিবের অসাধ্য, ওষুধ খাওয়া তাই ছেড়ে দিয়েছে করালী, সব বাজে, খালি পয়সার শ্রাদ্ধ। পয়সাই বা আসবে কোত্থেকে, অমন সুন্দর চালু দোকানটা বন্ধ হয়ে গেল করালীর, রোগের পিছনেই সব গেল তার ; একটা কানা-কড়ির সংস্থান নাই, করালী আজ নিঃসম্বল। সবই ত যাবে, দুনিয়াটাই হয় ত সৃষ্টির বুক থেকে মুছে যাবে এক দিন, কাল পূর্ণ হতে শুধু যতটুকু দেরি। করালীর কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে, এবার তাকেও যেতে হবে, হয়ত খুবই শীগ্‌গির—দিনক্ষণটা শুধু জানা নাই তার। কিন্তু পৃথিবীর মায়া যে কোন মতেই কাটাতে পারছে না করালী, সত্যি কি সে বাঁচবে না ? করালীর ডান হাতে বাঁধা ধর্ম্মরাজের অক্ষয় কবচ, দৈব মহৌষধ। এতেই নাকি এ রোগ সারে, করালী নিজে বিশ্বাস করে না, কিন্তু গৃহিণীর অগাধ বিশ্বাস ; কয়েক দিন আগে পাঁচকুড়ি থেকে ধর্ম্মরাজের নির্ম্মাল্য আনিয়ে তামার একটা মাদুলী করে করালীর হাতে বেঁধে দিয়েছে তার স্ত্রী। লোকে বলে এ কবচ নাকি অব্যর্থ, করালীর মত হাজার হাজার রুগী এর আগে নাকি চাঙ্গা হয়ে গেছে এই ওষুধের গুণে। হবে হয়ত, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু—বিশ্বাসই আসল। করালীর কিন্তু বিশ্বাস হয় না, শুধু গিন্নীর মনস্তুষ্টির জন্যই কবচটা সে ধারণ করেছে। এতে করে তার হাতের নোয়া সিঁথির সিন্দুর যদি অক্ষয় হয়—করালী তাতে খুশীই হবে, মরতে ত সে চায় না, জীবনটা যে করালীর কাছে প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু তার চেয়েও বিরাট সত্য মানুষের এই জঠর পেট, করালী একথা আবিষ্কার করেছে। খেয়ে করালীর আশ মিটে না, মনে হয় আরও খাই—আরও খাই—কি যে খাই ; বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা কিছুতেই যেন মিটতে চায় না। তিন বেলা যদি পেট পুরে খেতে পেত করালী যে ক'টা দিন বেঁচে আছে, মরেও হয়ত সে তৃপ্তি পেত ; জীবনের মায়া আর করে না করালী, কিন্তু ক্ষুধার তাড়না অসহ্য, মনে হয় শুধু কি খাই—কি খাই—কি যে খাই।

বড়ঘরের চালায় এক প্রান্তে বিছানায় পড়ে পড়ে ধুঁকছে করালী, নিজের মনেই ভাবছে সে আকাশপাতাল। এবার কিন্তু খেতে হবে তাকে, খিদে পেয়েছে। সেই কোন্ সকাল বেলা ছটাক খানেক চা খেয়েছে করালী, তার সঙ্গে একটুখানি পালো ঘাঁটা, ছাই—শুধু ময়দার ভুষি, না কোন মিষ্টি—না কোন আস্বাদ, এও কখনো খেতে পারে মানুষে। ভাত চাট্টি খেতে হবে করালীকে, জ্বরটা হয়ত ছাড়ল।

লেপখানা একটু সরিয়ে দিয়ে উঁকি মেরে রান্না ঘরের দিকে একবার তাকাল করালী। রান্না তা হলে চড়েছে, তবে আর চিন্তা কি, জুটবেই দুটো যা হোক কিছু।

কোটরগত চোখ দুটো মেলে বাইরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে করালী। কি সুন্দর রোদ উঠেছে সারা উঠান জুড়ে, আকাশ যেন ঝলমল করছে রৌদ্রের বন্যায়। বাইরে গিয়ে একটু বসবে নাকি করালী। শীতকালের রোদ্দুর, বসলে হয়ত একটু আরাম হ'ত।

উঠতে গিয়ে কিন্তু হাঁপিয়ে পড়ল করালী, খক্ খক্ করে কাশতে আরম্ভ করলে, কাশির মধ্যে ঘং ঘং করে কেমন যেন একটা আওয়াজ হচ্ছে। রক্তটা আজ আবার উঠছে নাকি ? করালী চেয়ে দেখে মাটির পাত্রটার দিকে, রক্তের কোন চিহ্ন নাই। দৈব ঔষধ কি কাজ করছে ? বলা যায় না, করালী হয়ত একটু একটু করে সেরেও উঠতে পারে। শির-দাঁড়ায় কিন্তু ভয়ানক ব্যথা, টন্ টন্ করছে পাঁজরাগুলো। করালী পিতলের কাঁসিটায় কাঠি দিয়ে ঝন্ ঝন্ শব্দে আওয়াজ করে দিলে একবার, ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ—।

গলাটা একদম বসে গেছে করালীর, জোরে তাই সে কথা কইতে পারে না, তার শিয়রের পাশে তাই এই কাঁসির ব্যবস্থা। দূর থেকে কাউকে ডাকতে হলেই কাঁসিটায় একবার ঝন্ ঝন্ আওয়াজ করে দেয় করালী, এই তার সঙ্কেত।

উঠানের এক পাশে তালপাতার একটা চাটাই পেতে বই-পুঁথি খুলে পড়তে বসেছে মাণিক। নিজের মনেই সে আউড়ে যাচ্ছে সাহিত্য-পাঠ, ইতিহাস, ভূগোল, ছোটদের রামায়ণ, জ্ঞানবিজ্ঞানের মধুভাণ্ড ; অনেক কিছুই পড়তে হবে তাকে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ করছে মাণিক—

"জল স্পর্শ করবো না আর, চিতোর রাণার পণ,
বুঁদির কেল্লা মাটির 'পরে থাকবে যতক্ষণ।"

ও ঘর থেকে কাঁসির আওয়াজ, ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ...। রান্না-ঘর থেকে মাণিকের মা হরিমতি ডাক দিলে—মাণিক! তারপর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে মাণিকের দিকে চেয়ে বললে—উনুনটায় একটু পাখা করো বাবা, শিগ্গীর আসছি আমি।

বই-পুঁথি বন্ধ করে ধীরে ধীরে উঠে পড়ল মাণিক। কাঁচা কয়লার ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে রান্নাঘরের ভিতরটা, উনুনের মুখে ধীরে ধীরে মাণিক পাখা করতে লাগল। এ সব কাজ অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে তার। কিন্তু সব চেয়ে মুশকিল হয় মাণিকের বাবা যখন পরের বাড়ী তাকে জিনিষ চাইতে পাঠায়। এর বাড়ী বেগুন, ওর বাড়ী পালং শাক, এর মাঠে মূলো, ওর ক্ষেতে পেঁয়াজ,—রোজ রোজ লোকে দেবে কেন! মাণিককে দেখে বিরক্ত হয় ওরা, কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কেউ ভাল করে কথাই কয় না। মাণিকের পক্ষে এ অসহ্য, এ যে ঘোরতর অপমান।

বড়ঘরের চালার এক পাশে উঠানের দিকে দরমার ঘেরা দিয়ে করালীর শোবার জন্য একটু ঠাঁই করা হয়েছে। মাটির উপর পুরু করে খড় বিছানো, তারি উপর করালীর বিছানা। শুয়ে শুয়ে খাওয়ার কথাই ভাবছে করালী। ভয়ানক খিদে পেয়েছে, হ্যাঁ রাক্ষসী ক্ষুধা, এটাকে কিন্তু কোনমতেই জয় করতে পারলে না করালী, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও নয়।

করালী পিতলের কাঁসিটায় আর একবার ঝন্‌ঝন্ করে আওয়াজ করে দিলে। গৃহিণী হরিমতি ধীরে ধীরে বসল এসে করালীর বিছানাটা চেপে, কপালে তার হাত রেখে বললে—জ্বরটা কি ছাড়ল?

করালী মাথাটা একটু কাত করে হরিমতির মুখের দিকে শুধু তাকাল একটিবার। হরিমতি বললে, এ জ্বর কি ছাড়ে, এ কি ছাড়বার! করালী সুর টেনে জবাব দিলে—কমেছে।

কি বিদ্ঘুটে বিকৃত কণ্ঠস্বর! করালীর নিজের কানেই যেন কর্কশ ঠেকে। দেখতে দেখতে গলাটা একেবারে বসে গেল করালীর, এ কি আর সারবে! করালী একটু দম নিয়ে বললে, খিদে পেয়েছে, দেবে কিছু খেতে?

হরিমতি করালীর কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাতে লাগল, বললে, বাইরে একটু বসবে চল, তেল মাখিয়ে গা-টা একটু মুছিয়ে দিই। তারপর ঠাকুরের চরণামৃত খেয়ে গরম গরম একটু চা খাবে, কেমন?

চা ত একটু খাবেই করালী, ভয়ানক ঠাণ্ডা লাগছে। তেলিগুড়ের চা—চিনি নাই—গুড় দিয়েই এখন চা খেতে হয়; বেশ লাগে করালীর, তেলিগুড়ের চা তার অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু দেবতার ফুল-জল—ঠাকুরের চরণামৃত—এ সব আর কি কাজে লাগবে! হরিমতির বিশ্বাস—অগাধ বিশ্বাস তার দেবতার উপর, তিন বেলা ঠাকুরের দোরে মাথা খুঁড়ে—ধর্ম্মরাজের ফুলজল আর সবচেয়ে জোরেই করালীকে সে সারিয়ে তুলতে চায়। কতখানি অন্ধ বিশ্বাস—মনে মনে হাসি পায় করালীর। আর একবার সে চোখ মেলে তাকাল হরিমতির দিকে, মুখখানা যেন শুকিয়ে গেছে, রুখু মাথায় তেল পড়েনি কত দিন, সিঁথির সামনে টুকটুকে সিঁদুরের রেখাটি কিন্তু জল্ জল্ করছে, ভাগ্যবতী এয়োতীর চিহ্ন—মনে মনে আর একবার হাসল করালী, হরিমতির মুখের দিকে চেয়ে। বয়স ওর কতই বা, তিরিশ এখনও পার হয় নি, করালীর চেয়ে ও যে অনেক ছোট।

করালীর মনের মধ্যে হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে গেল তার বিগত জীবনের বিচ্ছিন্ন কয়েকটা অধ্যায়। লুপ্ত যৌবনের উদ্দীপ্ত জয়-গান করালীও শুনেছিল এক দিন, রেশটুকু আজও তার মিলিয়ে যায় নি। কত কথা—কত ছন্দ—কত হাসি—কত গান—বিগত জীবনের কত মধুময় স্বপ্ন আজও যেন জড়িয়ে রয়েছে করালীর সুপ্ত হৃদয়তন্ত্রীতে। হরিমতির মুখের দিকে চেয়ে করালী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লে।

হরিমতি করালীর দুর্ব্বল দেহখানা ধরে ধীরে ধীরে তাকে নিয়ে গিয়ে বসাল উঠানের মাঝখানে একটা খাটিয়ার উপর। করালী হাঁপাতে লাগল, খাটিয়ার উপর একটা বালিশ ঠেস দিয়ে কোন রকমে বসে পড়ল করালী। শীতের সকাল, রোদ্দুরটা বেশ লাগছে, বেলা প্রায় প্রহর দেড়েক হ'ল। করালী হরিমতির দিকে চেয়ে বললে, মানকে গেল কোথায়?

মাণিক তখন রান্নাঘরের পিছন দিকে কুয়োতলায় বসে বসে দূর্ব্বাঘাস ছিঁড়ছে। বাড়ীর বকনা বাছুরটা—মাণিকের বুধি—রোদ্দুরে গা মেলে চুপচাপ বসে আছে কুয়োতলার পাশে। কচি দূর্ব্বাঘাস ছিঁড়ে বাছুরটার মুখে গোছা গোছা করে ধরে দিচ্ছে মাণিক। বুধির উপর মাণিকের গভীর টান, বুধির সেবা-যত্ন বা আরাম-বিরামের এতটুকু ত্রুটি হবার উপায় নাই, সেদিকে মাণিকের কড়া নজর। বুধি যেন ওর খেলার সঙ্গী।

করালী আবার জিজ্ঞাসা করলে, মানকে কোথাও বেরিয়ে গেছে নাক?

রান্নাঘরের পিছন দিকে চেয়ে হরিমতি একটা ডাক দিলে, মাণক!

পাঁচিলের ওপাশ থেকে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে মাণিকের বন্ধু কানিকুড়ো হাতছানি দিয়ে ডাকছে মাণিককে, গুলিডাণ্ডা খেলবার সময় হয়েছে। হাতের দূর্ব্বাঘাস ক'টা বুধির মুখে তুলে দিয়ে পাঁচিল টপকাবার যোগাড় করছে মাণিক। বাড়ীর ভিতর থেকে হঠাৎ ডাক পড়ল—মাণিক!

মনটা ভয়ানক খিঁচড়ে উঠল মাণিকের। গুলিডাণ্ডা আরম্ভ হয়ে গেছে উপর বাথানে, এ সময় কি বাড়ীর মধ্যে থাকা চলে।

মাণিকের বন্ধু কানিকুচো এসে দাঁড়িয়ে আছে কখন থেকে। বাইরের দিক থেকেই কানিকুচো একটা শিস্ দিয়ে ইসারা করে বললে, পাঁচিল টপ্‌কে চলে আয় না, ভাবছিস কি ?

মাণিকের মনটাও যাই যাই করছে, এ সময় একটু গুলিডাণ্ডা না খেললে কি চলে। পাঁচিলের উপর উঠে পড়েছে মাণিক, বাইরের দিকে এবার ঝপাং করে একটা লাফ দিতে পারলেই হয়; পিছন দিক থেকে হঠাৎ আর একটা ডাক এল—মাণিক।

হরিমতি গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রান্নাঘরের পিছন দিকটায়।

মাণিকের আর যাওয়া হ'ল না, দূর থেকে মায়ের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যেতেই ধীরে ধীরে পাঁচিল থেকে নেমে এল মাণিক। কে জানে—তাকে আবার কবরেজবাড়ী যেতে বলবে নাকি! নিমু কবরেজ লোকটা ভয়ানক পাজী। নিধিরাম পণ্ডিত আর নিমু কবরেজ—এ দুজনের জোড়া নাই গাঁয়ে, ওদের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখতে চায় না মাণিক।

করালীর শরীরটা মোটে ভাল যাচ্ছে না—ক্রমশঃই খারাপের দিকে। হরিমতি বুঝতে পারছে সবই। কবচ আর ঠাকুরের চরণামৃতের উপর শ্রদ্ধা আজও অটুট আছে হরিমতির, কিন্তু এই সঙ্গে একটু কবেরজী ওষুধের ব্যবস্থা হলে ফল হয়ত তার ভালই হ'ত, সেই ব্যবস্থাই করে এসেছে হরিমতি। মাণিক কাছে এসে দাঁড়াতেই বললে, কবরেজ মশায়ের কাছ থেকে একটু ওষুধ নিয়ে আয় বাবা!

মাণিক যা ভাবছিল তাই।

করালী উঠান থেকে একটা ডাক দিলে বিকৃত-কণ্ঠে; মাণিক!

মাণিকের বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। করালীর ওই দাবাগলার আওয়াজ, মাণিক যেন সহ্য করতে পারে না, বাপের এই দুরারোগ্য ব্যাধির কথা চিন্তা করে অত্যন্ত কষ্ট হয় মাণিকের।

হরিমতি বললে, যা বাবা—আর দাঁড়িয়ে থাকিস না, ওষুধটা শিগ্‌গির নিয়ে আয়, যা।

মাণিক একটু ইতস্ততঃ করে বললে, পয়সা ?

হরিমতি বললে, পয়সা এখন দিতে হবে না, কবরেজ মশায়কে আমি বলে এসেছি।

করালী রোদ্দুরে গা এলিয়ে চুপচাপ বসে আছে খাটিয়ার উপর, বালিসে হেলান দিয়ে। দূর থেকেই মাণিক তাকাল উঠানের দিকে। তারপর সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল, সোজা গিয়ে হাজির হ'ল সে নিমু কবরেজের বৈঠকখানায়।

নিমু কবরেজ চাটাইয়ের উপর বসে বসে কতকগুলো গাছগাছড়া আর শিকড়-বাকড় মিলিয়ে পাঁচনের পুরিয়া বাঁধছিল। মাণিককে দেখে কবরেজ একটু গম্ভীর হয়ে উঠল, বললে, কি হে, মাণিকচন্দর যে, ওষুধ চাই বুঝি ?

মাণিক ঘাড় নেড়ে জানালে ওষুধ নিতেই এসেছে সে।

নিমু কবরেজ একটু ভারিক্কি চালে বললে, তা বেশ—ওষুধ নিয়ে যাও, কিন্তু দামটা যেন শিগ্‌গির মিটিয়ে দিতে বল। বলো তোমার মাকে—বিনি পয়সায় ওষুধ আর আমি যোগাতে পারব না, বুঝলে ?

মাণিক কোন জবাব দিলে না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নিমু কবরেজ বললে, এইখানে একটু দাঁড়া, ওষুধটা আমি নিয়ে আসি বাড়ীর ভিতর থেকে।

এই বলে সে মাঝের দরজাটা ঠেলে ভিতর দিকে ঢুকে পড়ল। কয়েক পা গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এসে বললে, আর হ্যাঁ—আমার এই আলমারিটিতে হাত দিয়ো না যেন, বুঝলে? তোমাদের আবার সব রকমই অভ্যাস আছে কিনা!

বাড়ীর ভিতর ঢুকল গিয়ে কবরেজ। মাণিকের মনটা হঠাৎ বিষিয়ে উঠল। কি সাংঘাতিক এই লোকগুলো! পদে পদে এরা বিনা কারণে যাকে-তাকে সন্দেহ করে যখন-তখন। এইজন্যই ত মাণিক দু'চক্ষে দেখতে পারে না নিমু কবরেজকে—লোকটা কি ইতর।

বাড়ীর মধ্যে গিন্নীর সঙ্গে কথা হচ্ছে নিমু কবরেজের, মাণিকের বাপের সম্বন্ধেই কথা হচ্ছে। স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছে মাণিক, কবরেজ-গিন্নী একটু সুর টেনে বলছেন, বল কি গো—বাঁচবে না।

কবরেজ জবাব দিলে, ও কি আর বাঁচে, বড় জোর দু'চার দিন।

মাণিকের বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল, কবরেজ বলে কি, বাবা তার বাঁচবে না। নিশ্চয়ই বাঁচবে, কবরেজ হয়ত রোগই ধরতে পারে নি, কিম্বা হয়ত হিংসে করে বলছে সে এমন কথা।

মাণিকের বুকের ভিতরটা গুরগুর করতে লাগল কবরেজের কথা শুনে। কাগজের একটা পুরিয়া এনে মাণিকের হাতে দিলে কবরেজ, বললে—সকাল সন্ধ্যে দুটো করে বড়ি, তুলসী পাতার রস দিয়ে, বুঝলে? যাও এখন—দামটা যেন কাল সকালেই পাঠিয়ে দিতে বলো।

মাণিক তবু ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। ওষুধের পুরিয়াটা কাপড়ের খুঁটে বেঁধে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকাল সে কবরেজের দিকে।

কবরেজ ভ্রূ কুঁচকে বললে, কি—এখনও দাঁড়িয়ে আছিস যে ?

মাণিক একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, আপনি কি বলছিলেন বাড়ীর মধ্যে, বাবা নাকি বাঁচবে না ?

কবরেজ একটু ইতস্ততঃ করে বললে, কে—কে বললে? বাঁচতে পারে বৈ কি—নিশ্চয়ই বাঁচতে পারে, তা নৈলে এত কষ্ট করে ওষুধ দিচ্ছি কি জন্তে

মাণিক একটু জোর দিয়ে বললে, তবে আপনি কেন বললেন এমন কথা। আপনি কি জানগুরু নাকি, হাত গুনে সব বলে দিতে পারেন?

কবরেজ এবার ভয়ানক চটে উঠল, গরম হয়ে বললে—মাঝে মাঝে এবার বিদেয় হও দেখি, জ্যাঠামি করবার আর জায়গা পাও নি!

মাণিক জোর গলায় বলে উঠল—ফের যদি কোন দিন আমার বাবার সম্বন্ধে আপনি ওরকম কথা বলেন, তা হলে কিন্তু ভাল হবে না।

কবরেজ চোখ পাকিয়ে বললে—কি করবি কি শুনি?

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল মাণিক—ঢিল মেরে দেব আপনার ওষুধের ওই আলমারিটি গুঁড়ো করে।

কবরেজ খাপ্পা হয়ে উঠল, বললে—কি—এত বড় কথা, এক চড়ে দাঁতগুলো ফেলে দেব, জানিস। বেরো হারামজাদা এখান থেকে।

কবরেজ খানিক এগিয়ে গিয়ে মাণিককে একটা ধাক্কা দিলে। মাণিক আবার রুখে দাঁড়াল, বললে—খবরদার, গায়ে হাত দেবেন না।

নিধু কবরেজ থর থর করে কাঁপতে লাগল রাগে। ঘরের কোণ থেকে হাত দেড়েক একটা বাঁশের লাঠি তুলে নিয়ে মাণিককে সে তাড়া করে যাচ্ছিল, কবরেজ-গিন্নী এসে হঠাৎ বাধা দিলেন, বললেন—এ তুমি কি করছ বল ত!

নিধু কবরেজ দাঁত খিঁচিয়ে বললে—মুখের উপর কি রকম চোপা করছে দেখ না।

কবরেজ-গিন্নী মাণিককে মৃদু একটা ধমক দিয়ে বললেন—মাণিক!

মাণিক একটু শান্ত ভাবে বললে—দেখুন না—উনি বলেন বাবা নাকি বাঁচবে না, বাঁচা-মরার মালিক নাকি উনি!

কবরেজ মুখ খিঁচিয়ে তর্জন করে বলে উঠল—পয়সা নেই, কড়ি নেই—মিন্ পয়সায় ওষুধ দিচ্ছি, তার ওপর আবার তেজ দেখ! ঘুষিয়ে বেটার মুখ ভেঙে দেব!

কবরেজ-গিন্নী একটু উগ্র কণ্ঠে বললেন—তুমি থাম দেখি, সাধে কি আর লোকে বলে উমপকাশী!

কবরেজ রাগে গর গর করতে লাগল। মাণিক উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল—ওষুধ নিতে আর আমি আসব না কবরেজ, কিন্তু ফের যদি কোন দিন আমার বাবার মরণ সম্বন্ধে কথা কয়েছ, তোমার টেকো মাথাটি গুলতি দিয়ে ফুটিয়ে দিয়ে যাব।

এই বলে দুম্ দুম্ করে বেরিয়ে গেল মাণিক। কবরেজ লাঠিখানা উচিয়ে ধরে ধাওয়া করলে পিছু পিছু, বললে—তবে রে—

কবরেজ-গিন্নী তাড়াতাড়ি ধরে ফেললেন কবরেজকে। নিধু কবরেজ রাগের মাথায় বোঁ করে ছুঁড়ে দিলে লাঠিটা মাণিকের দিকে লক্ষ্য করে।...

হরিমতির রান্না প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। করালীর সর্বাঙ্গে তেল মালিশ করে ভিজে গামছা দিয়ে গা-টা একবার ভাল করে মুছে দিলে হরিমতি। সরু একখানা চিরুনি দিয়ে তার উস্কো-খুস্কো চুলগুলো আঁচড়ে দিলে। দেবতার নির্মাল্য করালীর মাথায় ঠেকিয়ে চরণামৃতের পাত্রটা তার মুখের সামনে তুলে ধরলে হরিমতি। করালী ঠোঁটদুটো একটু বিস্ফারিত করে নির্বিকার ভাবে তাকাল একবার হরিমতির দিকে। হরিমতি মনে মনে ঠাকুরের নাম স্মরণ করে চরণামৃতটুকু ঢেলে দিলে তার মুখের মধ্যে।

খাবার ঠাঁই করে ধীরে ধীরে করালীকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে হরিমতি ছেঁড়া ক্যাম্বিশের একটা আসন পেতে। আহারে রুচি নাই করালীর, ক্ষুধা আছে—রুচিকর খাদ্যেরও একান্ত অভাব। টসটসে বিরি কলাইয়ের ঝোল, আর মুলো বেগুনের ঘ্যাঁট, এই দিয়ে কি রোজ রোজ খাওয়া পোষায়। মনে হয় যেন এক এক গ্রাসে গিলে ফেলি এক একটা কাঁড়ি, কিন্তু গলা দিয়ে গলতে চায় না। এই সব কি রুগীর খাদ্য, এই খেয়ে কি মানুষ বাঁচে!

ক্ষুধার মুখে কয়েকটা গ্রাস কোন রকমে উদরস্থ করে ভাতের থালাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল করালী। করুণ ভাবে তাকাল সে একবার হরিমতির দিকে, বললে—মাছওয়ালী কি আসে না আজকাল এদিক দিয়ে?

হরিমতি বললে—আসবে—মাছ পেলেই দিয়ে যাবে, বদে কেওটের মাকে আমি বলে রেখেছি। ভাল তরকারি আনব কিছু?

করালী কোন জবাব দিলে না, অবান্তর—অনাবশ্যক। মাছওয়ালী যে কেন আসে না করালী তা জানে, পয়সা ফেললে মাছের অভাব কি, গোলমাল ত ওখানেই। কিন্তু তা বলে কি শেষ পর্যন্ত না খেয়ে মরে যাবে করালী! যথেষ্ট মাছ রয়েছে গাঁয়ের পুকুরগুলোতে, জলে মাছে প্রায় সমান সমান, পোকা পড়ছে বেটাদের মাছে, অথচ সময় বুঝে একটা কেউ ঠেকায় না আজ করালী মুখুজ্যেকে। দুনিয়াটাই স্বার্থপর, কে কার কথা ভাবে—কে কার দিকে চায়!

কবরেজ-বাড়ী থেকে ওষুধ নিয়ে বাড়ী ফিরল মাণিক। কাপড়ের খুঁট থেকে পুরিয়া ক'টা বের করে হরিমতির হাতে দিলে। হরিমতি একটু আশ্বস্ত হ'ল, ওষুধ তা হলে দিয়ে

মাণিকের মনটা বড় মুষড়ে আছে। একটু অনুযোগের সুরে বলে উঠল মাণিক আর যেন তাকে কোন দিন নিমু কবরেজের বাড়ী ওষুধ আনতে না পাঠানো হয়। নিমু কবরেজ লোকটা মোটে ভাল নয়, মাণিক আর ওর দোর মাড়াবে না।

করালী খেতে খেতেই একটা ডাক দিলে, মাণিক!

মাণিক ধীরে ধীরে এগিয়ে এল তার সামনে। করালী ভাঙা গলায় বললে—নায়েকদের গড়ে থেকে গোটাকয়েক মাছ ধরে আনতে পারিস, বাবা! ছিপ কাঁটা ঠিক আছে ত?

মাণিক সমস্যায় পড়ল। এই সেদিন সে একবার পরের পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে তাড়া খেয়ে এসেছে, আজ আবার ছিপ নিয়ে বেরুলে লোকে তাকে ছ্যাঁচড় বলবে যে—মাণিক একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল।

করালী একটু মিনতির সুরে বললে, যা বাবা—যা, দেখ্ যদি পাস গোটাকতক।

করালীর এ আদেশ নয়—অনুরোধ, নিতান্তই অনুরোধ; এর বেশী কিছু নয়।

মাণিকের মনটা হঠাৎ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। ভাববার আর অবকাশ নাই তার, ধীরে ধীরে বেরুল সে পোনা মাছের ছিপগাছটা হাতে নিয়ে।

হরিমতি পিছন থেকে ডাক দিয়ে বললে, দুটো খেয়ে গেলি না কেন বাবা, ভাত নিয়ে আমি বসে থাকব কতক্ষণ!

মাণিক আর ফিরল না, যেতে যেতেই বলে উঠল, ফিরে এসে খাব।

করালী একটু খুশীই হ'ল, মাছধরার তাকবতর ঠিক জানা আছে মাণিকের, খালি হাতে সে ফিরবে না কিছুতেই।

খেয়ে উঠে আঁচাল করালী। হরিমতি আবার ধরাধরি করে বিছানার উপর নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে তাকে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা পান চিবুতে লাগল করালী। কেবলই তার মনে হতে লাগল কিছুই যেন আজ খাওয়া হ'ল না। চাদর একখানা মুড়ি দিয়ে করালী আবার পাশ ফিরে শুল।

পান চিবুতে চিবুতে করালী হঠাৎ থেমে উঠল কেন? বুকটার মধ্যে কেমন যেন আনচান করছে, করালী ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, পিতলের কাঁসিটায় সে কাঠি দিয়ে আওয়াজ করে দিলে একবার—ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ—।

হরিমতি হাতের কাজ ফেলে ছুটে এল তাড়াতাড়ি। করালী একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। তালপাতার একটা পাখা নিয়ে হরিমতি বাতাস করতে লাগল। করালী হরিমতির ডান হাতটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললে,—ডলে দাও—ডলে দাও এই জায়গাটা, বুকটা যেন চেপে ধরেছে।

ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল হরিমতি। করালী মাথাটা কাত করে বিছানার পাশের দিকে মুখটা একটু বাড়াল, সে খক্ খক্ করে কাশল কিছুক্ষণ। রক্তটা আজ আবার উঠছে নাকি? আবার সেই উপসর্গ। কিছুক্ষণের মধ্যেই নেতিয়ে পড়ল করালী। হরিমতি তার মুখখানা বেশ পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে দিয়ে আঁচলে মুছে দিলে। তার গায়ের উপর লেপখানা টেনে দিতেই ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠল করালী,—থাক্—থাক্—বড় গরম, একটু হাওয়া করে দাও।

হরিমতি খানিক পাখা করে দিতেই কতকটা যেন শান্ত হ'ল করালী। হরিমতি একদৃষ্টে চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। কানের কাছে তার মুখ রেখে জিজ্ঞাসা করলে, কেমন লাগছে এখন?

করালী ক্ষীণকণ্ঠে বললে,—ভাল।

হরিমতি বললে,—ওষুধ দিই?

করালী চোখ বুজেই ঘাড় নাড়ল, বললে,—না—না—থাক, ভাল আছি আমি।—

হরিমতি করালীর মাথার কাছে ধীরে ধীরে পাখা করতে লাগল। তার শ্রান্ত চোখ দুটো যেন বুজে এল ঘুমের ঘোরে, নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ল করালী।

হরিমতি উঠে গিয়ে রান্নাঘরটা বন্ধ করে দিয়ে এল। মানুকে যে কতক্ষণে ফিরবে!

পাড়ার রসিকদাস 'জয় রাধে কৃষ্ণ' বলে দাঁড়াল এসে হরিমতির সামনে। হরিমতি রসিককে অভ্যর্থনা করে বললে,—আয় বাবা—আয়, আজ ক'দিন থেকে আসিস নি যে?

রসিক বললে,—গাঁয়ে ক'দিন ছিলুম না খুড়ীমা-ঠাকরুণ, বাইরে গিয়েছিলুম। খুড়ো ঠাকুর এখন আছেন কেমন?

হরিমতি চালার উপর রসিককে একটা আসন এগিয়ে দিয়ে বললে, বস্ বাবা বস্, আছেন ভালই।

রসিক চালার ওপর ধীরে ধীরে বসল একধারে। রসিক দাস—লোকটি বড় ভাল, গান গেয়ে ভিক্ষে করে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়, সাতে পাঁচে থাকে না; সাধ্য থাকলে প্রাণ দিয়েও পরের উপকার করতে চায় রসিক। করালীর সঙ্গে রসিকের মেলামেশা বহু দিনের, করালীকে সে ভক্তি করে গুরুর মত। আর্থিক সাহায্য করা রসিকের সামর্থ্যের বাইরে, কিন্তু মাঝে মাঝে এসে এঁদের খোঁজ-খবরটা অন্ততঃ নিয়ে যায়। করালীর এই দুর্দিনে পাড়া-প্রতিবেশী ভুলেও কেউ ফিরে তাকায় না, সংক্রামক ব্যাধির ভয়ে করালীর বাড়ীর দিকে পা বাড়ায় না কেউ। রসিক কিন্তু আসে, সময় পেলেই খোঁজ-খবরটা নেয় এসে, খুড়ীঠাকরুণের সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কয়ে যায়।

গামছার খুঁট থেকে গোটাকয়েক বেগুন, গোটা দুই কয়েত বেল, আর গোটা চারেক কাগজী নেবু বের করে হরিমতির সামনে নামিয়ে দিলে রসিক, বললে, এ ক'টা তুলে রাখ ত মা-ঠাকরুণ।

রসিকের এই শ্রদ্ধার দাম—ভালবাসার দাম—মাঝে মাঝে এ নিতে হয় হরিমতিকে, রসিক তাদের অন্তরঙ্গ আপনজনের মতই। হরিমতি তরকারির চুপড়ির মধ্যে ওগুলো রেখে দিয়ে এল রান্নাঘরে। রসিকের সামনে এসে আবার বসল হরিমতি, বললে, এদ্দি ভালই হ'ল, ওঁর হাতটা একবার দেখে যা দেখি বাবা, আমি ভাবছিলাম।

রসিক একটু হাত দেখতেও জানে, পাড়ায় ঘরে ঘরে মাঝে মাঝে হাত দেখতে ওর ডাক পড়ে। করালীর নাড়ী টিপে চুপচাপ ঠায় খানিকক্ষণ বসে রইল রসিক, তারপর হরিমতির দিকে চেয়ে বললে, নাড়ী ত বেশ ভালই দেখছি খুড়ীমা-ঠাকরুণ, কোন বিঘ্নিজ্ নাই।

হরিমতি বললে, ভাল বুঝছিস ?

রসিক নিজের মনেই যেন একটুখানি কি ভেবে নিলে, বললে, ভাল বুঝছি বৈ কি, ওসব তুমি ভেবো না খুড়ীমা-ঠাকরুণ, কিছু ভেবো না।

রসিক ঘুমন্ত করালীর দিকে আর একটি বার তাকাল, আপাদমস্তক তার নিরীক্ষণ করে নিলে একবার। ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস রসিকের অজ্ঞাতেই যেন বেরিয়ে এল। রসিক হরিমতির দিকে চেয়ে বলে উঠল, এক কাজ করলে হয় না খুড়ীমা-ঠাকরুণ, খুড়োঠাকুরের অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্তিটা এর মধ্যে একদিন সেরে ফেললে হ'ত না।

হরিমতিও ক'দিন থেকে ভাবছে অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তের কথা। কিন্তু খরচার অভাবে এ কাজে সে এগোতে পারে নি। রসিকের কথায় হরিমতি আরও একটু সজাগ হয়ে উঠল, বললে, রসিক, একটা কাজ করবি বাবা, গোটা কয়েক টাকার যোগাড় করে দিতে পারিস ?

নিঃসম্বল রসিক একটু বিস্মিত ভাবে তাকাল একবার হরিমতির দিকে, বললে, টাকা—কত টাকা বল দেখি ?

হরিমতি বললে, টাকা দশেক, বক্‌না বাছুরটা বিক্রী করলে পাওয়া যাবে না গোটা দশেক টাকা ?

রসিক মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, তা হয়ত পাওয়া যাবে, কিন্তু মাণিক যে ভয়ানক রাগ করবে খুড়ীমা-ঠাকরুণ।

হরিমতি বললে, তা হোক, ওকে আমি বুঝিয়ে নেব, পাইকারদি'কে তুই খবর দিয়ে আয় দেখি। ওঁর এ কাজটুকু আমি বাকি রাখব না রসিক, অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত একটা করতেই হবে।

রসিকও সায় দিয়ে বললে, করা খুবই দরকার।

মাণিক খুব পাকা ডেঁপেল। ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে সে ছোটবেলা থেকেই সিদ্ধহস্ত। বাপের কাছ থেকে মাছ-ধরা বিদ্যেটা উত্তরাধিকারসূত্রে বেশ ভাল রকমই আয়ত্ত করেছে মাণিক। পুঁটি মাছের ডাঁড়ি দিয়ে ছোট-খাটো পোনা মাছ সে অনায়াসে খেলিয়ে তুলতে পারে। মাণিকের সঙ্গী-সাথীরা পাল্লা দিয়ে মাছ ধরায় সহজে কেউ পেরে ওঠে না তার সঙ্গে, তাকতুক তার জানা আছে খুব ভাল। কিন্তু পরের পুকুরে চুরি করে মাছ ধরতে মাণিকের প্রবৃত্তি হয় না, সামনে পেলে ওরা অপমান করে, কেওট বেটারা দেখতে পেলে আবার ডাঁড়ি কেড়ে নেয়। মাণিক তাই কিছু দিন থেকে মাছ ধরা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। আজ কিন্তু একবার ছিপ হাতে করে আসতেই হ'ল মাণিককে, গোটাকয়েক মাছ আজ তাকে ধরতেই হবে।

পাড়ার লাগাও উদয়গড়ে বলে একটা ছোট্ট পুকুরে গিয়ে চার করেছে মাণিক। পুকুরের চারদিকে বাসক আর কালকাসিন্দার ঝোপ। পুব পাড়ে একটা ঝোপের মধ্যে সঙ্গী কানিকুড়োকে পাহারা দেবার জন্য বসিয়ে রেখেছে মাণিক, কেওট এলে দূর থেকে ঠায় দেখতে পাওয়া যাবে। একান্ত যদি এসেও পড়ে—একটুখানি শুধু সঙ্কেতের অপেক্ষা, তাড়াতাড়ি ছিপ গুটিয়ে পশ্চিম পাড়ের আগাছার জঙ্গল দিয়ে সরে পড়তে বিশেষ সময় লাগবে না। অদ্বিসন্ধি সব ঠিক করা আছে মাণিকের, পুব পাড়ে বসে কানিকুড়ো ঠায় পাহারা দিচ্ছে; চিন্তার কোন কারণ নাই। কেওটরা এসে পড়লে কিন্তু ভয়ানক অসুবিধার কথা, রীতিমত হুজ্জৎ করে বেটারা; বিশেষ ক'রে বদে কেওট, পুকুরে কাউকে ছিপ ফেলতে দেখলে গাঁয়ের সীমানা পর্য্যন্ত পিছু পিছু সে তাড়া করে যায়, ধরতে পারলে অপমান করে ভয়ানক। ওই বেটাকেই যা একটু ভয়, সেইজন্যই ত বাসকঝোপে কানিকুড়োকে বসিয়ে রেখেছে মাণিক।

চারে প্রচুর মাছ জমে গেছে। মেয়তার টোপ দিয়ে ফেলবামাত্র চোঁ চোঁ করে ফাৎনা ডোবাতে আরম্ভ করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই টপ্ টপ গোটা পাঁচ-ছয় হালি পোনা মেরে ফেললে মাণিক, প্রত্যেকটাই রুই মাছের বাচ্চা, এক একটার ওজন প্রায় আধপোয়া তিন ছটাকের কাছাকাছি। এভাবে হালি পোনা মারার যে কি অপূর্ব্ব আনন্দ—তা পল্লীগ্রামের ডেঁপেল ছেলেদের খুব ভাল রকমই জানা আছে। এ এক নেশা, মৎস্যশিকারের আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল মাণিক। তার বড় ভুল হয়ে গেছে, আসবার সময় একটা গামছা আনলে ভাল হ'ত, মাছগুলো গামছায় বেঁধে বাসক-ঝোপে লুকিয়ে ফেলতে পারলে কেউ টের পেত না। বুদ্ধি একটা ঠাউরে নিলে মাণিক—মাছ-গুলোকে জলের ধারে পাঁকের মধ্যে পুঁতে ফেললে এক একটা করে, যাবার সময় উঠিয়ে নিলেই চলবে।

আর একটা টোপ গেঁথে ফাৎনার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে মাণিক, আরও দু' একটা মেরে নিয়ে তাড়াতাড়ি এবার সরে পড়তে হবে। কানিকুড়ো হঠাৎ দূর থেকে চাপা গলায় একটা ডাক দিলে—মাণিক।

মাণিকের যে এখন অবসর নাই, অনেক মাছ জমে গেছে

ঘাটে। টক্‌টক্ করে আবার কাৎনা নড়ে উঠল, টো করে হঠাৎ ডুবে গেল কাৎনাটা; খ্যাচ্ করে মারলে এক খাই, চড়চড় করে মাছটাকে টেনে তুললে; পোয়াখানেক এক কালবাউশ। মাছটাকে দেখে মাণিকের মুখে চোখে ফুটে উঠল আনন্দের দীপ্তি, খুশির আমেজে সে মশগুল হয়ে উঠল। কানিকুত্তো উচ্চকণ্ঠে আর একটা ডাক দিলে—মাণিক!

মাছটার মুখ থেকে মাণিক বঁড়শী ছাড়াচ্ছে। মাটিতে পড়ে ছটফট করছে মাছটা। হঠাৎ পাহাড়ের উপর পিছন দিক থেকে কার গলার আওয়াজ—কে ডাঁড়ি ফেলছ হে?

মাণিক চমকে উঠল, পিছন ফিরে চেয়ে দেখে জাল কাঁধে পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে বদে কেওট স্বয়ং, কোমরের পাশ দিয়ে তার মস্তবড় একটা খারুই ঝুলছে।

বদে কেওট এগিয়ে এসে মাণিকের ডান হাতটা চেপে ধরলে, বললে—কার হুকুমে মাছ ধরতে এসেছিস শুনি?

মাণিক কারো হুকুম নেয় নি, হুকুম এমনিতে পাওয়াও যায় না, কিন্তু মাছ যে তার চাই। মাণিক কোন জবাব দিলে না, ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু চেয়ে রইল।

বদে কেওট মাণিকের হাত থেকে জ্যান্ত মাছটা কেড়ে নিয়ে টান মেরে ফেলে দিলে পুকুরের জলে। জলচারী কালবাউশের পো মহানন্দে পাখনা নাড়তে নাড়তে এক লহমায় মিলিয়ে গেল আবার জলের মধ্যে। মাণিকের বুকের ভিতরটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল। বদে কেওট দাঁত খিঁচিয়ে বললে, ঘাড়টি মুচড়ে যদি পাঁকে পুঁতে দি'—কোন্ বাপ তোর রক্ষে করবে শুনি! কতগুলো মাছ মারলি?

ভয়ে মাণিকের মুখ শুকিয়ে গেছে, রাগে তার শরীরটা রি রি করতে লাগল।

বদে কেওট, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাইতে লাগল, হঠাৎ সে আবিষ্কার করে ফেললে—জলের ধারে খানিকটা ভিজে মাটি উঁচু হয়ে রয়েছে, উপরে কিছু পাঁক লেপা। মাণিকের রাখা মাছগুলো মাটি খুঁড়ে বের করে ফেললে বদে কেওট—গোটা কয়েক রুই মাছের বাচ্চা। কপালের ওপর চোখ তুলে বলে উঠল বদে—এই সব হালি পোনা মারতে কে হুকুম দিয়েছে শুনি? এ কি তোর বাবার পুকুর?

মাণিক হঠাৎ ফেটে পড়ল রাগে, তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলে উঠল, খবরদার বলছি, বাপ তুলে কথা বলিস না।

বদে কেওট মাছগুলো ধুয়ে খারুয়ের মধ্যে ভরে নিলে। মাণিকের দিকে সে দাঁত খিঁচিয়ে তাড়া করে এল, বললে—চুরি করে মাছ ধরতে লজ্জা করে না, বেহায়া বামুন কোথাকার!

এই বলে সে মাণিকের ছিপটা হঠাৎ চেপে ধরলে, বললে, ছাড়্ ছাড়—ছেড়ে দে ডাঁড়ি।

মাণিকের আত্মসম্মানে প্রচণ্ড ঘা পড়ল, তার হাত থেকে ছিপ কেড়ে নিয়ে যাবে বদে কেওট—অসহ্য।

ছিপটা মাণিক দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে বলে উঠল—খবরদার।

বদে কেওট চোখ পাকিয়ে বললে—মেরে এখুনি লুৎ করে দেব, ভাল চাস ত ছেড়ে দে ডাঁড়ি।

মাণিকের হাত থেকে টান মেরে ছিপটা কেড়ে নিলে বদে কেওট। মাণিক তার পিছু পিছু গিয়ে দাঁড়াল পাহাড়ের উপর। বদে কেওট আর ফিরেও তাকাল না, পুকুরপাড় থেকে নেমে তিন্‌গাঁয়ের সুঁড়ি পথ ধরে সে জাল কাঁধে হন্ হন্ করে এগিয়ে যেতে লাগল, হাতে তার মাণিকের ছিপগাছটা।

মাণিক পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে দূর থেকেই ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল বদে কেওটের দিকে। মাছগুলো বেটা নিয়ে গেল খারুয়ে ভরে, হয়ত কোথাও বেচে দেবে, মাণিকের এত কষ্ট করে ধরা মাছ, খদ্দের পেলে হয়ত বিক্রী করেই ফেলবে। কিন্তু ছিপটা—ছিপটা যে মাণিকের নিজের, ছিপটা সুদ্ধ বেটা কেড়ে নিয়ে গেল যে। এ দুঃখ যে সে আর সইতে পারছে না।

পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিন্‌গাঁ পানে এক-দৃষ্টে চেয়ে রইল মাণিক, ভাবতে ভাবতে মনটা তার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, ভয়ানক কান্না পাচ্ছে মাণিকের।

পুবপাড়ের ঝোপ-ঝাপগুলো লক্ষ্য করে এদিক ওদিক চাইতে লাগল মাণিক, একটা ডাক দিলে—কানিকুত্তো!

কানিকুত্তোর সাড়াশব্দ নাই, কোন্ সময় সে সরে পড়েছে; হয়ত বদে কেওটকে দেখেই।

ছিপটা কিন্তু মাণিকের কেড়ে নিয়ে গেল। ওপথ দিয়ে কোথায় যাচ্ছে বদে কেওট? হয়ত তিন্ গাঁয়ে মাছ ধরবার ডাক পড়েছে, হয়ত সালকোর মাজিদের পুকুরে মাছ ধরতে যাচ্ছে জাল কাঁধে করে। কিন্তু ছিপটা ত এমন ভাবে ছেড়ে দেওয়া ভাল হ'ল না, মাণিক গিয়ে ছিপটা ফিরিয়ে আনবে নাকি? ফিরিয়ে আনাই দরকার, অমন সুন্দর ছিপগাছটা জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে বেটা কেওট! মাণিকের পক্ষে এ যে ভয়ানক অপমান। ছিপটা তাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে, যেমন করে হোক।

মাণিক পাহাড় থেকে নেমে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করলে তিন্ গাঁয়ের সেই সুঁড়ি পথটা ধরে। বদে কেওট বহু-দূর এগিয়ে পড়েছে, পিছন পিছন ছুটতে লাগল মাণিক; যত দূরেই হোক ধরতে হবে ওকে, ছিপ না নিয়ে কিছুতেই মাণিক বাড়ী ফিরবে না।

শীতকালের বেলা পড়ে আসছে। মাণিকের কোন দিকে

ভ্রূক্ষেপ নাই, সে হন্ হন্ করে এগিয়ে চলল—ছিপ তার চাই-ই।

হাত চারেক একটা বাঁশের কঞ্চি, কয়েক গজ সুতো, আর গেঁয়ো কামারের তৈরি একটা এক পয়সা দামের পোনা মাছের কাঁটা, সবসুদ্ধ ক'টা পয়সাই বা এর দাম! মাণিকের কাছে কিন্তু মূল্য এর বড় কম নয়, এ যে তার সখের জিনিস। তার কাছ থেকে ওটা কেড়ে নেওয়া, আর তার হাতের একটা আঙুল কেটে নেওয়া—এ যে সমান কথা, এ দুঃখ তার বুঝবে না কেউ। ভিন্‌গাঁ পানে দৃষ্টি রেখে দ্রুতপদে এগিয়ে চলল মাণিক।...

ক্রোশ আড়াই পথ ভেঙে সালকো গ্রামের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে মাণিক। বদে কেওটকে এর মধ্যে সে ধরতে পারে নি, মাণিককে তাই এগিয়ে আসতে হ'ল বরাবর সালকো পর্য্যন্তই। শীতকালের বেলা, দেখতে দেখতে সূর্য্য ডুবে গেল, মাণিক একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল।

সালকো ঢুকবার মুখে নিজ গাঁয়ের প্রতিবেশী রঞ্জন মোড়লের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল মাণিকের। মোড়ল তাকে দেখেই বলে উঠল—ওই মাণিক যে রে, পরব দেখতে যাবি নাকি সালকো?

অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে কয়েকদিন ধরে সালকো গ্রামে বেশ একটু ধুমধাম হয়। কাল থেকে এখানে যাত্রাগান আরম্ভ হয়েছে, মেলাও বসেছে একটা ছোটখাটো; খবরটা আগেই শোনা আছে মাণিকের। কিন্তু সেজন্য ত মাণিক আসে নি এখানে, রঞ্জন মোড়লের কথার কোন জবাব না দিয়েই বললে—'রঞ্জু কাকা, মায়ের সঙ্গে দেখা হলে একটু বলে দিও যেন—আজ আর আমি বাড়ী ফিরতে পারব না।

রঞ্জন মোড়ল ঘাড় নেড়ে বললে—আচ্ছা!

পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল মাণিক। সালকোর অন্নপূর্ণাতলায় সন্ধ্যারতির বাজনা বেজে উঠল. ঢাক ঢোল আর কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজে মুখর হয়ে উঠল ছোট গ্রামখানা। মাণিক গিয়ে চুপচাপ ঢুকে পড়ল গাঁয়ের মধ্যে, চারদিকে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে গাঁয়ের ভিতরে বাজার বসেছে। বারোয়ারিতলা গিস্‌গিস্ করছে লোকের ভিড়ে। খানিকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে বাজার দেখে বেড়াল মাণিক, কত রকমারি লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল তার. কিন্তু কৈ—বদে কেওট ত একটি বারও মাণিকের চোখে পড়ল না। আছে ঠিক সে এই গাঁয়েই, সকাল না হলে আর হয়ত তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, রাত্রিটা আজ এইখানেই কাটাতে হবে মাণিককে —বাড়ী ফিরবার যে আর কোন উপায় নাই।

মেলার এক পাশে রাস্তার ধারে একটা চৌকির ওপর হতাশ ভাবে বসে পড়ল মাণিক। এতখানা পথ হেঁটে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ক্ষুধাও পেয়েছে বেজায়, পয়সা থাকলে বাজার থেকে কিছু খেয়ে নিতে পারত, কিন্তু পয়সা ত নাই। একটা রাত কোন রকমে কাটিয়ে দিতে পারবে মাণিক, না খেয়েও কাটানো যাবে। কিন্তু বাড়ীর জন্য মাণিকের বড় মন কেমন করছে, কোন দিনই তার বাড়ী ছেড়ে বাইরে থাকা অভ্যাস নাই। মা হয়ত ভেবে সারা হবে, কাজটা কি ভাল করল মাণিক?

ভাবতে ভাবতে মাণিকের মনটা ভারি চঞ্চল হয়ে উঠল। সঙ্গী পেলে এই মুহূর্ত্তে মাণিক বাড়ী ফিরে যেত, কিন্তু উপায় নাই, রাত হয়ে গেছে—এ সময় আর কোন উপায় নাই। মা কি এতক্ষণ পাড়ায় খোঁজ করে বেড়াচ্ছে মাণিকের? মাণিককে ত সে খুঁজে পাবে না, মাণিক যে এখানে। কে জানে রঞ্জন মোড়ল গিয়ে খবরটা তাকে দিলে কি না! মা যদি মাণিককে দেখতে না পেয়ে কাঁদে! এতক্ষণ হয়ত কাঁদছে—নিশ্চয়ই কাঁদছে। এমন কাজ কেন করল মাণিক—ছিঃ!

অন্ধকারে মুখ গুঁজে সেই খালি চৌকিটার উপর চুপচাপ একধারে শুয়ে পড়ল মাণিক। বাড়ীর কথা—বাপ-মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে মাণিকের হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল, চাপা গলায় নিজের মনেই সে বলে উঠল একবার—মা—মাগো—মা!

বাড়ীর কথা কোনমতেই ভুলতে পারছে না মাণিক। মেলাখেলার হৈ-হল্লোড় উৎসব আনন্দ কিছুই তার ভাল লাগছে না। সেই চৌকির উপর মুখ গুঁজে কিছুক্ষণ পড়েই রইল মাণিক। পান-বিড়ির এক দোকানদার ডালায় করে কতকগুলি জিনিসপত্র সাজিয়ে চৌকির উপর নামাল এসে। মাণিককে দেখে লোকটা তাড়া দিয়ে বললে—কে এইখানে ঘুম মারছ হে, ওঠ ওঠ—ওঠে যাও ইখান থেকে, চৌকির ওপর দোকান পাতব।

মাণিক তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে মুছতে উঠে পড়ল। মেলার মধ্যে গিয়ে লোকের ভিড়ে সে মিশে গেল আবার। ভয়ানক শীত করছে মাণিকের, অঘ্রাণ মাসের রাত, মাণিকের পরনে শুধু-একটা হাফপ্যান্ট আর গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি; এমন জানলে মাণিক পুরনো কোটটা আজ গায়ে দিয়ে আসত। ঝোঁকের মাথায় কাজটা কিন্তু সে ভাল করে নি, এমন করে না আসাই তার উচিত ছিল।

প্রহরখানেক রাত্রে যাত্রা আরম্ভ হ'ল অন্নপূর্ণাতলায়। কালীয়দমন যাত্রা, প্রহ্লাদ সিং-এর নামকরা দল; ভিন গাঁ থেকে যাত্রা শুনতে লোক জমেছে প্রচুর। মাণিকও একধারে ঠেলাঠেলি করে বসে পড়ল। আসর সাজান হয়েছে খুব চমৎকার, আটচালার চারদিকে চার চারটে ডে-লাইট জেলে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে; লোকজনের সমারোহ

আর যাত্রাপার্টির বাজনার জমকে গম্ গম্ করছে অন্নপূর্ণাতলা। এই সমস্ত দেখে শুনে মাণিকের মনটা একটু হালকা হয়ে এল, আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল মাণিক; চিন্তার কোন কারণ নাই —সকালবেলা বাড়ী ফিরলেই চলবে।

যাত্রা শুনতে শুনতে মশ্‌গুল হয়ে উঠল মাণিক। কৃষ্ণযাত্রা সে এর আগে কখনও শোনে নি, এই প্রথম। রাধা আর কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করছে দুটি কিশোর-বয়স্ক বালক। তাদের সুললিত কণ্ঠের একাবলী গান, উচ্ছ্বসিত মান-অভিমান, বৃন্দাদূতীর অপূর্ব্ব দূতীয়ালি—শ্রীদাম সুদাম মধুমঙ্গল আদি রাখাল বালকদের হেলেবাড়ি হাতে নৃত্য,—এ সমস্তই খুব ভাল লাগছে মাণিককে। কালীয়দমন যাত্রা যে এত সুন্দর, মাণিকের তা জানা ছিল না। কি সুন্দর রাধা আর কেষ্ট সেজেছে ওই ছেলে দুটো, কি সুন্দর ওদের ভাবভঙ্গী, কি চমৎকার গলা; বৃন্দাদূতীর গানে আসরসুদ্ধ একেবারে মাত হয়ে গেছে। মাণিক অবাক বিস্ময়ে শুনে যাচ্ছে পালার গোড়া থেকেই। ধড়াচূড়া পরে বনমালা গলায় ঝুলিয়ে বাঁশী হাতে যে ছেলেটা কেষ্ট সেজেছে বয়স ত তার এমন কিছু বেশী নয়; মাণিকের চেয়ে হয়ত কিছু বড় হবে। ছেলেটাকে মানিয়েছে খুব চমৎকার। যাত্রার দলে একটা চাকরি যোগাড় করে নেবে নাকি মাণিক? পারবে না সে কেষ্ট সাজতে? খুব পারবে, ইচ্ছা করলে মাণিক নিশ্চয়ই পারে। সে যদি কেষ্ট সেজে ওই ভাবে একবার আসরে দাঁড়ায়—সে কি সম্ভব, মাণিকের পক্ষে এ যে আশাতীত সৌভাগ্য।

কল্পনার বিচিত্র বর্ণে মাণিকের মনটা রঙিন হয়ে উঠল। মাণিক যেন স্বপ্ন দেখছে জেগে জেগে।

রাধিকার উন্মাদিনী বেশ। 'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' বলে হাপুসনয়নে রোদন করছে রাধা, বৃন্দাদূতী তাকে গানের ছলে সান্ত্বনা দিচ্ছে।···

প্রভাসতীর্থে যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। নন্দ মহারাজ কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছেন ছেলের অদর্শনে। রাণী যশোমতী যজ্ঞশালার দ্বারপ্রান্তে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনপ্রার্থিনী। দ্বারী তাকে কিছুতেই দ্বার ছেড়ে দেবে না—আলুলায়িত-কেশা মলিনবসনা অর্দ্ধোন্মাদিনী এক ভিখারিণী এসে বলে কিনা সে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মা! প্রকাণ্ড এক ভোজপুরী দ্বাররক্ষক, লাঠিহাতে নির্ম্মমভাবে যশোদাকে তাড়না করছে মুখ ভেংচে তাকে বিদ্রূপ করছে। দ্বারীর আধা খোট্টাই কথাবার্ত্তা আর উৎকট ভাবভঙ্গি দেখে আসরসুদ্ধ লোক হেসে আকুল। কিন্তু মাণিকের ত কৈ হাসি পাচ্ছে না, লোকটা যে যশোদার অপমান করছে, শ্রীকৃষ্ণের কাছে কোন মতেই যেতে দিচ্ছে না তাকে। যশোমতী দ্বারীর পায়ে ধরে সাধতে লাগল, শুধু একটি বার—একটি বার সে কৃষ্ণচন্দ্রের চাঁদমুখখানি দেখে আসবে, একটি বার তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে উত্তপ্ত বুকখানি তার একটুখানি জুড়িয়ে নেবে। দ্বারী কিন্তু নির্ব্বিকার, পাষাণ প্রাণ তার গলল না কোন মতেই; যশোদাকে একটা ধাক্কা দিয়ে দ্বিগুণতর পরুষকণ্ঠে সে বলে উঠল, ভাগো—ভাগো—নিকালো হিঁয়াসে।

সন্তানবিচ্ছেদকাতরা রাণী যশোমতী অঝোর নয়নে কেঁদে উঠল, যজ্ঞশালার দ্বারপ্রান্ত থেকেই আকুল কণ্ঠে সে ডাকতে লাগল তার প্রাণের দুলালকে—হা কৃষ্ণ—হা প্রাণধন—ওরে আমার সাগরছেঁচা মাণিক, কৈ—কৈ বাপ—কোথায় তুই?

মাণিকের হৃদয়ের তন্ত্রীতে কে যেন ঘা দিয়ে উঠল। যশোদার মূর্ত্তি ধরে আসরে দাঁড়িয়ে কে ওই পাগলিনীপ্রায় নারী! ও যে মাণিকের মা, মাণিককে যে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে; মাণিকের কাছে সে যেতে পারছে না, তাই দূর থেকে কাতর-কণ্ঠে ডাক দিচ্ছে—মাণিক—মাণিক!

নির্ম্মম দ্বাররক্ষক তবু তাকে দ্বার ছেড়ে দিল না, যশোদা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ল, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল সে যজ্ঞশালার দ্বারপ্রান্তে।

ফুঁপিয়ে হঠাৎ কেঁদে উঠল মাণিক, যশোমতীর এ লাঞ্ছনা যে অসহ্য। মায়ের কথা স্মরণ করে নিজের মনেই হঠাৎ চীৎকার করে উঠল মাণিক,—মা—মা—গো!

যশোদার করুণ রসের অভিনয় ছোটবড় সকলকেই মুগ্ধ করেছে, মাণিক কিন্তু একেবারে উদ্বেল হয়ে উঠল। পাশ থেকে একজন বয়োবৃদ্ধ শ্রোতা মাণিকের দিকে চেয়ে সস্নেহে বললে, কি হ'ল কি খোকা, অমন করে কাঁদছ কেন?

মাণিক বিক্ষুব্ধভাবে উঠে দাঁড়াল, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল সে দ্বারীর দিকে চেয়ে, ওকে তোমরা বের করে দাও এখান থেকে, আসর থেকে ওকে দূর করে দাও।

বৃদ্ধলোকটি মাণিকের পিঠ চাপড়ে বললে, বসো বাবা বসো, ও আপনিই চলে যাবে এখন।

অভিনয় যে কতখানি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে মাণিকের এই স্বতস্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাসেই তার নিদর্শন। আসর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারী মাণিকের মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে একটু আদর করে গেল। মাণিকের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে সে বলে উঠল, বাহবা রে বুড়রু, জিতা রহো—জিতা রহো বাচ্চা।

পরবর্ত্তী দৃশ্যে জটিলা বুড়ীর ব্যঙ্গাত্মক কথাবার্ত্তা, আর ননদিনী কুটিলার ভাবভঙ্গী দেখে শুনে অবাক হয়ে গেল মাণিক। কুটিলাকে লক্ষ্য করে বৃন্দাদূতী গান ধরেছে—

দারুণ ননদিনী
তুই যে লো পরম সন্ধানী।

দারুণ ননদিনী।
হাতালে হাতে না লো শেয়াকুলের কাঁটা লো
রজপুতের লেঠা—
দারুণ ননদিনী।

গান শুনে মাণিকের মনটা আবার হালকা হয়ে গেল। এতক্ষণে সে বুঝতে পারছে এ সব কিছু সত্যি নয়—যাত্রার অভিনয়। আসরে বসে মাণিক যাত্রা শুনছে। তবে মনের ভুলে হঠাৎ চীৎকার করে উঠেছিল কেন মাণিক! কোথায় যেন তার ভুল হয়ে গেছে, হাঁ—ভুলই ত, সে হয়ত বুঝতে কোথায় ভুল করেছে।

যাত্রার শেষের দিকে চোগাচাপকান-পরা জুড়ির গানের রাগরাগিণী শুনতে শুনতে ঢুলতে লাগল মাণিক, ভয়ানক তার ঘুম পাচ্ছে। তার আশে-পাশে কয়েকটি অল্পবয়সী ছেলে এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে শতরঞ্চির উপর। ঢুলতে ঢুলতে মাণিকও হঠাৎ গড়িয়ে পড়ল, গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল।

কখন যে যাত্রা ভেঙেছে কিছুমাত্র আর মনে নাই মাণিকের। যখন তার ঘুম ভাঙল—চারদিক তখন ফরসা হয়ে গেছে। লোকজন সব বাড়ী চলে গেছে, যাত্রা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক ফাঁকা।

মাণিক তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। সামনের পুকুর থেকে মুখ-হাত ধুয়ে এসে মেলার একটা চায়ের দোকানে উনামের পাশে জড়সড় হয়ে বসে পড়ল মাণিক। আগুনের তাতে হাত-পা বেশ করে সেঁকে নিলে একবার, এতক্ষণে যেন শীতটা কিছু কাটল। চারদিক রোদে ভরে গেছে, শীতের জন্ত আর কোন চিন্তা নাই মাণিকের। এবার কিন্তু মাণিককে বাড়ী ফিরতে হবে, বাড়ীর জন্ত তার মন ছট্‌ফট্‌ করছে। কিন্তু বদে কেওটের ত দেখা পাওয়া গেল না, ছিপটা কি তা হলে মারা গেল মাণিকের?

মাণিক উঠে গাঁয়ের প্রান্ত দিয়ে এদিক ওদিক খানিক পায়চারি করে বেড়াল। দূর থেকে মাণিকের চোখে পড়ল হঠাৎ—গাঁয়ের প্রান্তসীমায় অশথ গাছের সামনে কয়েকটা লোক ধরাধরি করে জাল গুটাচ্ছে। ওদেরি মধ্যে আছে নাকি বদে কেওট? ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল মাণিক সেইদিকে মুখ করে। বদে কেওট তখন সালকোর বাঁধে মাছ ধরতে যাবার জন্ত তৈরি হচ্ছে। মাণিক গিয়ে দাঁড়াল একেবারে তার সামনে। রাগে মাণিকের বুকের ভিতরটা যেন জ্বালা করছে, বদে কেওটের দিকে চেয়ে উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে উঠল মাণিক—আমার ছিপ—কোথায় রেখেছিস আমার ছিপ? ভাল চাস ত ফিরিয়ে দে বলছি।

মাণিককে দেখে অবাক হয়ে গেল বদে কেওট, বললে, সে কি ঠাকুর, এদ্দূর পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছ তুমি, কি ভয়ানক ছেলে রে বাবা!

মাণিক দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠল, ছিপ না নিয়ে কোনমতেই ফিরব না আমি, ভাল চাস ত ফিরিয়ে দে আমার ছিপ।

বদে কেওট জাল গুটাতে গুটাতে বললে, ঘাট হয়েছে বাবা—ঘাট হয়েছে, আমি মানে কি আমার চোদ্দ-পুরুষ তোমার ছিপ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য। কি বিচ্ছু ছেলে রে বাবা!

এই বলে সে বাগ্দীদের একটা ছেলের দিকে চেয়ে বললে, ওরে, স্কুলঘরের আড়াছে একটা পুঁটি মাছের ডাঁড়ি তোলা আছে, ডাঁড়িটা একে দিয়ে দে'গা ত।

তারপর সে মাণিকের দিকে চেয়ে বললে, যাও ঠাকুর—যাও, লাওগা তোমার ছিপ, ক্ষুরে ক্ষুরে তোমার দণ্ডবৎ বাবা!

দলবল সঙ্গে নিয়ে মাছ ধরতে চলে গেল বদে কেওট। বাগ্দীদের ছেলেটার পিছু পিছু মাণিক উঠল গিয়ে গাঁ-মুড়ায় স্কুলঘরের সামনে। স্কুল-ঘরে তালা দেওয়া, বাগ্দীদের ছেলেটি বললে, তুমি এইখানে দাঁড়াও ঠাকুর, কাঠিটা আমি নিয়ে আসি।

এই ঘরেই পাঠশালা বসে গাঁয়ের ছেলেদের। অন্নপূর্ণা-পূজা উপলক্ষে পাঠশালা বন্ধ, কেওটদের এ ঘরে বাসা দেওয়া হয়েছে।

স্কুলঘরের বারান্দায় মাণিক অপেক্ষা করতে লাগল। ছেলেটি চাবি নিয়ে ফিরে এল কিছুক্ষণ পরে। চাবি খুলে স্কুলঘরের আড়াচ থেকে ছিপটা পেড়ে এনে মাণিকের হাতে দিলে, তারপর বাইরে এসে তালাটা আবার বন্ধ করে দিলে।

মাণিক ছিপটা পেয়ে এতক্ষণে আশ্বস্ত হ'ল, বদে কেওটের পাল্লায় পড়ে এমন সুন্দর ছিপটা তার যেতে বসেছিল। কিন্তু একি—বঁড়শীটা কৈ, বঁড়শীটা কেউ ছিঁড়ে নিলে নাকি?

মাণিক ছেলেটির দিকে চেয়ে হতাশভাবে বলে উঠল, আমার বঁড়শী?

ছেলেটি পরিষ্কার বললে, আমি তোমার ছিপও দেখি নাই—বঁড়শীও দেখি নাই, আমি কি করে জানব?

ছিপটার দিকে একবার করুণভাবে তাকাল মাণিক, ময়ূর-পাখার ফাৎনাটাও যে কে খুলে নিয়েছে। এ বদে কেওটের শয়তানী। ছিপটা হাতে নিয়ে হন্ হন্ করে ছুটল মাণিক বাঁধের দিকে মুখ করে। বদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া না করে সে বাড়ী ফিরবে না।

প্রকাণ্ড সালকোর বাঁধ, বাঁচ ফিরিয়ে মাছ ধরা হচ্ছে। অন্নপূর্ণাপূজা উপলক্ষে মাজিদের বাড়ী কুটুম্ব-ভোজনের বরাদ্দ আছে, গাঁ-গাঁওয়ালী ষোল আনা সমেত। গাঁয়ের মোড়ল কালী মাজি নিজে পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে থেকে মাছ ধরা দেখা-শোনা করছে। ছিপ হাতে করে মাণিক গিয়ে হাজির হ'ল বাঁধের পাড়ে। বদে কেওট জাল থেকে মাছ ঝেড়ে ঝেড়ে খারুইয়ের মধ্যে ভরছিল, মাণিক গিয়ে তাড়াতাড়ি তার

সামনে দাঁড়িয়ে বলে উঠল—আমার বঁড়শী—বঁড়শীটা কেন ছিঁড়ে নিয়েছিস!

বদে কেওট মাণিকের দিকে একবার তাকাল, বললে—বঁড়শী আমি নিতে যাব কেনে ঠাকুর, গোলেমালে নিয়েছে হয়ত কেউ ছিঁড়ে।

মাণিক বললে—সে আমি জানি না: বঁড়শী তোকে কিনে দিতে হবে—এক্ষুনি গিয়ে কিনে দিতে হবে।

বদে কেওট নিজের মনেই আবার জাল ভাঁজতে লাগল, বললে—যাও ঠাকুর—যাও, সকাল থেকে আর বিরক্ত কর না, সরে পড় ইখান থেকে।

মাণিক কিন্তু কোনমতেই যাবে না, বদে কেওটের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলে মাণিক।

কালী মাজি এগিয়ে এসে বললে—এইটা কাদের ছেলে রে, কাঁদছে কেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

বদে কেওট মাণিকের পরিচয়টা দিয়ে দিলে। কালী মাজি ব্যাপারটা শুনে শশব্যস্তে বলে উঠল—বলিস কি রে, কি সর্ব্বনাশ? একলা বাড়ী থেকে চলে এসেছে?

বদে কেওট ঘাড় নেড়ে বললে, ছেলেটা কি সোজা!

মাণিক একবার ভুরু কুঁচকে তাকাল বদে কেওটের দিকে। কালী মাজি বললে—কিছু খাবে ঠাকুর, খিদে পেয়েছে? চল আমার সঙ্গে।

মাণিক বললে—না—বাড়ী যাব আমি।

বদে কেওট বলে উঠল—যাও না ভাই মাজি মশায়ের সঙ্গে, চিঁড়ে ফলার করবে ত করে লাওগা।

মাণিক দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল—না।

কালী মাজি বললে—দে—দে—একটা মাছ দে ঠাকুরকে খালি হাতে কি ফেরাতে আছে বামুনের ছেলেকে।

এই বলে কালী মাজি নিজেই খারুই থেকে একটা সের তিনেক রুই মাছ বের করে কানকোর কাছটায় দড়ি দিয়ে বেশ শক্ত করে বেঁধে দিলে, হাত দিয়ে যেন ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

মাণিক একটু ইতস্তত: করতে লাগল। মাণিকের হাতে মাছটা জোর করে গুঁজে দিলে কালী মাজি, বললে—তোমার বাবার কাছে আমার কথা বল, করালী ঠাকুর যে আমাদের খুব চেনা লোক।

মাণিক রুই মাছটা হাতে ঝুলিয়ে এগিয়ে চলল আবার গাঁয়ের পথ ধরে। এত বড় মাছটা ওরা দিয়ে দিলে মাণিককে—এমনিতেই দিয়ে দিলে! তার মা বাবা মাছটা দেখে কি খুশীই না হবে। বাড়ীর দিকে মুখ করে জোরে জোরে পা চালিয়ে দিলে মাণিক।

দেখতে দেখতে বেলা হয়ে গেল অনেকখানি। কাল থেকে মাণিক বাড়ী ফিরে নি, মেলা দেখে আর যাত্রা শুনেই সারাটা রাত সে কাটিয়ে দিলে। মাণিকের মা হয়ত খুব ভাবছে এতক্ষণ, হয়ত কেন নিশ্চয়ই, এতক্ষণ হয়ত সে ঘরবার করছে মাণিকের পথ চেয়ে; ছেলের জন্যে হয়ত সে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিয়েছে। মাণিকের বাবার যে শক্ত অসুখ, হঠাৎ যদি ওষুধ আনতে যেতে হয়, একা ঘর ফেলে মাণিকের মা বেরুবে কেমন করে। মাণিক কিন্তু এভাবে চলে এসে কাজটা ভাল করে নি, না বুঝে খুব ভুল করেছে মাণিক।

ঝড়ের বেগে মাণিক এগিয়ে চলল। ক্রোশ দুই-আড়াই পথ মনে হচ্ছে যেন কতদূর—মনে হচ্ছে যেন কতদিন বাড়ী ছাড়া মাণিক। আরও বেগে—আরও জোরে সে পা চালিয়ে দিলে, যতদূর তার শক্তিতে কুলোয়।

হাঁটতে হাঁটতে শ্রান্ত হয়ে গাঁয়ের ধারে এসে পৌঁছল মাণিক, প্রহর দেড়েক প্রায় বেলা হয়ে গেছে।

এত বড় রুই মাছটা বয়ে আনতে আনতে হাত দুটো মাণকের লাল হয়ে গেছে দড়ির টানে। তা হোক, তাতে কিছু এসে যায় না, মাছ ধরতেই ত বেরিয়েছিল মাণিক। মাণিকের বাবা মাছ খেতে চেয়েছে, কাল তাকে মাছ ধরে খাওয়াতে পারে নি মাণিক, আজ খাবে—যত খুশি খাবে। মাছটা হাতে ঝুলিয়ে ত্বরিতপদে এগিয়ে চলল মাণিক, মন তার পড়ে আছে বাড়ীর দিকে।

গাঁয়ে ঢুকতেই মাণিকের চোখে পড়ল কে একটা লোক খয়রা রঙের একটা বাছুরের গলায় দড়ি বেঁধে হেট্ হেট্ করে নিয়ে যাচ্ছে গাঁয়ের সরান দিয়ে। কে লোকটা, পাইকার রহমৎ মিঞা না? রহমৎকে ভাল রকমই চেনে মাণিক, এ গাঁয়ের সকলেই চিনে। কিন্তু ও বাছুরটা যে মাণিকদের, সেই বকনা বাছুরটা—মাণিকের সেই বুধি। রহমৎ কি ওটাকে খোঁয়াড়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছে? মাণিকের মনটা একটু খিঁচড়ে গেল।

তাড়াতাড়ি মাণিক এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে একটা ডাক দিলে,—রহমৎ মিঞা—ওহে ও রহমৎ মিঞা!

রহমৎ একটু থমকে দাঁড়াল, পিছন ফিরে তাকাল সে মাণিকের দিকে। মাণিক খানিক এগিয়ে গিয়ে বললে, বাছুরটাকে অমন করে টেনে নিয়ে যাচ্ছ কোথায়?

রহমৎ বললে,—বেচতে যাব, লালগঞ্জের হাটে।

মাণিক অবাক হয়ে গেল, একটু ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল—আমাদের বাছুর তুমি বেচতে যাবে কি রকম, কে তোমাকে হুকুম দিয়েছে?

আরও খানিক এগিয়ে বাছুরের গলার দড়িটা হঠাৎ টেনে ধরলে মাণিক। রহমৎ মিঞা বলে উঠল, বাছুরটা আমি কিনে এনেছি ঠাকুর, শুধোও গে তোমার মাকে, কড়কড়ে দশটা টাকা দাম দিয়েছি।

মাণিক রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল, বাছুর আমি বেচব না, কিছুতেই না ; চল তুমি আমার সঙ্গে, টাকা তোমার এক্ষুনি ফিরিয়ে দেব আমি।

রহমৎ বললে, সে আর হয় না ঠাকুর, যাও যাও আর গোলমাল করো না।

বুধির গলার দড়িটা ধরে টানাটানি করতে আরম্ভ করলে মাণিক, বললে—আমার বাছুর আমি বেচব না, আমার খুশি, ভাল চাও ত ছেড়ে দাও বলছি।

দড়িটা বেশ শক্ত করে টেনে ধরে রুখে দাঁড়াল মাণিক।

রহমৎ মিঞা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, আরে যা যা ছটেক বিক্ষেপ করিস না, বাপ ওদিকে মরতে বসেছে আর ছেলের তেজ দেখ, ভাগ্।

বলেই রহমৎ মিঞা মাণিকের হাত থেকে দড়িগাছটা ছিনিয়ে নিয়ে বাছুরের গায়ে সপাসপ কয়েক ঘা বসিয়ে দিলে বোয়ানের একটা ছড়ি দিয়ে। বাছুরটা মার খেয়ে হঠাৎ ছুটতে আরম্ভ করলে রহমৎ মিঞার সঙ্গে সঙ্গে। মাণিক আর দ্বিরুক্তি করলে না, সেইখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে গেল। বাপ যে তার অসুস্থ, খরচায় হয়ত টান পড়েছে, সেইজন্যই কি মাণিকের মা বেচে ফেলল বাছুরটাকে ? অসম্ভব নয়। দূর থেকে বুধির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে অতি করুণভাবে চেয়ে রইল মাণিক। সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে একেবারেই চলে গেল বুধি !

মাণিকের চোখ বেয়ে টস্ টস্ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

পাড়ার নিকুঞ্জ চক্রবর্ত্তী টেকো মাথায় গামছা ঢাকা দিয়ে ক্ষেত তদারক করতে যাচ্ছে হাতে একটা লাঠি নিয়ে। মাণিককে দেখেই নিকুঞ্জ বলে উঠল, কে রে মাণিক নাকি—ফিরলি ? তোর মা যে কত ভাবছে, যা- যা—শিগ্‌গীর বাড়ী চলে যা।

মাণিক আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াল না, ছুটল সে বাড়ীর দিকে। বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি গিয়ে দূর থেকে চোখে পড়ল মাণিকের—ও পাড়ার ভটচায্যি মশায়—মাণিকদের কুলপুরোহিত—তাদেরই সদর দোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন নতুন একখানা গামছায় কতকগুলো কি জিনিষপত্র বেঁধে নিয়ে। মাণিক আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই ভটচায্যি মশায় হাটতলার বাঁকে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন দক্ষিণ পাড়ার গলিপথটা ধরে। মাণিকের বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে মাণিক। পাড়ার কয়েকজন মুরুব্বি লোক থেলো হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে জটলা করছেন রাস্তার ধারে একটা দাওয়ার উপর বসে। মাণিককে দেখে ওঁদেরি একজন বলে উঠলেন, মাণিক—ফিরলি নাকি রে ? যাক—বৈতরণীটা খুব পার হয়ে গেছে। যা—যা—আর দাঁড়াস নে, শীগ্‌গির বাড়ী চলে যা।

মাণিক এদের ভাবগতিক কিছু বুঝতে পারছে না। বৈতরণী পার হয়ে গেল কে ! কি এ কথার অর্থ ?

ঝড়ের বেগে মাণিক টলতে টলতে বাড়ী গিয়ে ঢুকল। সদর দোর থেকেই মাণিক শুনতে পাচ্ছে মায়ের গলার আওয়াজ। জোরে জোরে আওড়াচ্ছে মাণিকের মা—হরি নারায়ণ ব্রহ্ম ! হরি নারায়ণ ব্রহ্ম ! গয়া গঙ্গা গদাধর হরি !

মাণিক গিয়ে দাঁড়াল বড়ঘরের বারান্দার সামনে। মাণিককে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল মাণিকের মা।

মাণিক চেয়ে দেখে তার বাবাকে শোয়ান হয়েছে বারান্দার ঠিক সামনে, একটা ভুঁই-বিছানা পেতে। কপালে তার গঙ্গামৃত্তিকার তিলক, বিছানার পাশে কতকগুলো তিল-তুলসী ছড়ান। গলা ঘড় ঘড় করছে মাণিকের বাবার, চৈতন্যের লেশমাত্র নাই।

হাত-পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে মাণিকের। হরিমতি তার মুখের দিকে চেয়ে ভাঙা গলায় ডুকরে উঠল—মাণিক ?

মাণিকের হাত থেকে দড়িবাঁধা রুই মাছটা হঠাৎ ছিটকে পড়ল উঠানের উপর। মুমূর্ষু করালীর শয্যাপ্রান্তে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল মাণিক, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাক দিলে, বাবা—বাবাগো !

মাণিকের মা মাণিককে একবার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে কেঁদে উঠল, মাণিক—মাণিক রে !

কাঞ্চনজঙ্ঘা

প্রকৃতির লীলাভূমি সিকিম

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

নগাধিরাজ হিমালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত, প্রাকৃতিক পরিবেশে পরম রমণীয় দেশ এই সিকিম। তার অরণ্যানীর শ্যামলিমা, চিরতুষারাবৃত অভ্রভেদী পর্ব্বতশৃঙ্গের শুভ্র মহিমা, বিসর্পিত গিরি নির্ঝরিণীর ফেনিলতা, প্রকৃতিজাত পুষ্পস্তবকের সুষমার সমারোহ, দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর অরুণোদয়ে ও সন্ধ্যায় আলোকপাতে অপরূপ লীলাবৈচিত্র্য দর্শকের নয়নমন পরিতৃপ্ত ও সার্থক করে তোলে। প্রকৃতি যেমন একদিকে তার অকৃপণ হস্তে সিকিমের ওপর স্বাস্থ্য ও সম্পদ, সৌন্দর্য্য ও সুষমা উজাড় করে দিয়ে তাকে সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি করে তুলেছে অপর দিকে তেমনি এই দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশকে মানব-সভ্যতার সকল ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ হতে বঞ্চিত করে রেখেছে। একমাত্র বৈদ্যুতিক আলো ব্যতীত এখানে আধুনিক সভ্যতার আর কোন নিদর্শন নেই। ট্রাম, বাস, ট্রেন, এরোপ্লেন, হোটেল, সিনেমা, সংবাদপত্র সবই এখানে দুর্লভ। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার নিত্যপ্রয়োজনীয় এই সমস্ত বস্তুর অভাবে এদেশবাসীর মুখের হাসি ম্লান হয় নি, অন্তরের আনন্দের অভাব হয় নি।

পূর্ব্ব-হিমালয়ের অভ্যন্তরভাগে যে তিনটি দেশ পৃথিবীর দৃষ্টির বাইরে আত্মগোপন করে আছে, যে সব দুর্গম দেশের সংবাদ আমাদের নিকট এসে পৌঁছায় না সেগুলিই এই নেপাল, ভুটান ও সিকিম। যুদ্ধোত্তর কালে স্বাধীনতার প্রবল উচ্ছ্বাসে যখন ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল প্লাবিত হয়ে গেল, সেই উচ্ছ্বাসেরই প্রবাহ এই দুরধিগম্য হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত নেপাল, ভুটান ও সিকিমেও দেখা দিল। নেপালে তার প্রতিক্রিয়া পূর্ণমাত্রায় প্রতীয়মান হয় এবং সিকিমে যে সে মাত্রা অতিক্রম করে গিয়েছিল, বহির্জগতের সে সংবাদ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। গত ৭ই জুন যখন সংবাদপত্রে দেখা গেল যে, সিকিমের মহারাজা সার তাসি তামগিল এবং রাজ্যের তিনটি রাজনৈতিক দল—সিকিম ষ্টেট কংগ্রেস, সিকিম ন্যাশনালিষ্টস্ ও প্রজা সম্মেলন পার্টির মধ্যে বিরোধের ফলে রাজ্যে যে রক্তপাত ও বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয়েছে, তা বন্ধ করবার জন্য জরুরি ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারত গবর্ণমেণ্ট এই দিন হতে যখন অর্দ্ধস্বাধীন রাজ্য সিকিমের শাসনভার গ্রহণ করেছেন তখনই দেশের লোকের দৃষ্টি পড়ল এই সিকিমের ওপর।

অতি ক্ষুদ্র দেশ এই সিকিম। এর আয়তন মাত্র ২৮১৮ বর্গ মাইল—অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলার মত ক্ষুদ্র। লোকসংখ্যা আরও অল্প—১ লক্ষ ২১ হাজার ৫ শত। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের বার্ষিক আয় কিঞ্চিদধিক পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র। এখানকার অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর। এখানে বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র দুটি। একটি ছেলেদের জন্য, অপরটি মেয়েদের। এখানে কোন কলেজ নেই। এদেশের লোকের নাম লেপচা। এখানকার প্রচলিত ভাষার নাম গুর্খালি।

সিকিমের প্রথম অধিবাসী কারা ছিল সে ইতিহাস এখনও অজ্ঞাত। পূর্ব্বে ভোট অর্থাৎ তিব্বতের অধিবাসীরা এই সিকিমে বাস করত—তাদের নাম ছিল ভোটিয়া। এরা ভুটানের অধিবাসী ভুটিয়া নয়।

বর্ত্তমান নেপালের অধিবাসী গুর্খারা রাজপুতানা থেকে এসে

যখন নেপাল-সিংহাসনের অধিকারী নেওয়ার বংশের হাত থেকে সিংহাসন কেড়ে নিলেন তখন এই ভোটেরা নিজে-দের দেশ সিকিম ত্যাগ করে ভয়ে তিব্বতের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গুর্থারা বিনা বাধায় নেপালের সিংহাসন অধিকার করে। সিকিম অতিক্রম করার পর তারা এই অনধিকৃত দেশের দিকে আর দৃষ্টিপাত করে নি। প্রচুর ফলমূল এবং খাদ্যে সমৃদ্ধ ও অপূর্ব্ব পরি-শোভিত পুষ্পসুষমায় এই অপরূপ দেশ তারা অধিকার করে বসল। বর্ত্তমান দার্জ্জিলিং জেলাও তখন সিকিমের অন্তর্গত ছিল।

আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে তিব্বতবাসীরা এই সিকিম অধিকার করে পূর্ব্বেকার অধিবাসিগণকে রণজিৎ নদীর তীরে হিমালয়ের সানুদেশে বিতাড়িত করে। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিস্তা নদীর পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত সমস্ত দেশ ভুটানের অধিবাসী ভুটিয়ারা অধিকার করে। সিকিমবাসীদের এই হ'ল প্রাচীন ইতিহাস। সিকিমের বর্ত্তমান অধিবাসীরা এক অতি শান্তিপ্রিয় জাতি।

যখন সিকিমের ওপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্নেহদৃষ্টি পড়ল তখন সিকিমরাজ গুর্থাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। গুর্থারা সিকিম রাজ্য প্রায় কবলিত করবার উপক্রম করেছে সেই সময় কৌশলী ইংরেজ ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল সিকিম-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধের শেষে সিকিম-রাজ স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিতালিয়া নামক স্থানে ইংরেজের সঙ্গে তাঁর এক সন্ধি হ'ল। তাতে সিকিমরাজ তাঁর ৪০০০ বর্গ মাইল রাজ্য ফিরে পেলেন বটে, তবে তাঁকে ইংরেজের অধীন হয়ে থাকতে হ'ল। দশ বৎসর পরে নেপাল ও সিকিমের মধ্যে সীমারেখা নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হ'ল। সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল এই বিবাদ মিটাবার জন্য ক্যাপ্টেন লয়েডকে নির্দ্দেশ দিলেন। ক্যাপ্টেন লয়েড মালদহের কমার্সিয়াল রেসিডেন্ট জে. ডবলিউ. গ্রাণ্টকে সঙ্গে নিয়ে হিমালয়ের বৃক্ষাদিপরিপূর্ণ দুর্ভেদ্য বনানী ভেদ করে উত্তর-পশ্চিম সিকিমের রিনচিন পং নামক গ্রামে পর্য্যন্ত এসে উপস্থিত হলেন। ক্যাপ্টেন লয়েড ও গ্রাণ্ট দার্জ্জিলিং জেলার দৃশ্যে মুগ্ধ হলেন। কালনেমির লঙ্কাভাগে'র ফলে দার্জ্জিলিং জেলা এসে পড়ল ইংরেজের অধিকারে। তার পর নির্জ্জন ও নিবিড় কানন-কান্তার সমাকীর্ণ এই বনস্থলী, জনাকীর্ণ গ্রীষ্মাবাসে পরিণত হ'ল। দার্জ্জিলিঙের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আকর কাঞ্চনজঙ্ঘাও সিকিমেই অবস্থিত।

ভারত-সরকারের আশ্রিত রাজ্যরূপে পরিণত হবার পর থেকে সিকিমের রাজদরবারে একজন পলিটিক্যাল অফিসার নিযুক্ত হতেন। ভারতবর্ষ আত্মকর্তৃত্বলাভ করবার পূর্ব্বে সিকিমে পলিটিক্যাল অফিসার ছিলেন এ. জে. হপকিন্স।

প্রদেশপাল কাটজুর অভ্যর্থনায় সিকিমের দেশীয় বাদ্য

১৯৪৮ সালে আগষ্ট মাসে মিঃ হপকিন্স অবসর গ্রহণ করেন। তখন স্বাধীন ভারত-সরকার তাঁর স্থলে শ্রীহরীশ্বর দয়ালকে নিযুক্ত করেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত সিকিম রাজ্য ইংরেজ সরকারের অধীন ছিল। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য লাভের পর ভারত গবর্ণমেণ্ট এই রাজ্যের সঙ্গে নূতন পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য এক কমিটি নিয়োগ করেন। এই আলোচনা চলবার সময় তখনকার মত এই রাজ্যের সঙ্গে এক স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদিত হয়।

ভারতবর্ষ থেকে তিব্বত যেতে হলে সিকিমের ভিতর দিয়ে ছাড়া আর কোন পথ নেই। এই স্থিতাবস্থা চুক্তি অনুসারে ভারতের সঙ্গে তিব্বতের যে দুটি বাণিজ্যপথ এই রাজ্যের ভিতর দিয়ে গিয়েছে তার পরিচালনভার ভারত-সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং তিব্বত, ভুটান ও সিকিমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার দায়িত্ব সিকিমস্থিত ভারতীয় পলিটিক্যাল অফিসারের উপর ন্যস্ত হয়।

সিকিমে উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে গম, ধান, জোয়ার, কমলা-লেবু, দারচিনি ও আপেল প্রধান। এখানকার শিল্পদ্রব্যের উল্লেখযোগ্য পশুলোমজাত পশম ও পশমী দ্রব্য। এখানকার কলের বাগান পরিচালনা করেন স্থানীয় সরকার। সিকিম হতে এবং সিকিমের মধ্য দিয়ে তিব্বত থেকে বাংলাদেশে আমদানী হয় ধান, গম, ডাল, পশম, তামাক, সরিষা, তিসি, গো ও ছাগচর্ম্ম, চমরীপুচ্ছ প্রভৃতি দ্রব্য। আর ভারতবর্ষ থেকে সিকিম এবং সিকিমের মধ্য দিয়ে বাণিজ্য-পথে তিব্বতে রপ্তানী হয় ধান, গম, বস্ত্র, সুতা, লৌহ ও ইস্পাত নির্ম্মিত যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন দ্রব্য, পেট্রোল, রং, লবণ, চিনি, চা, তামাক,
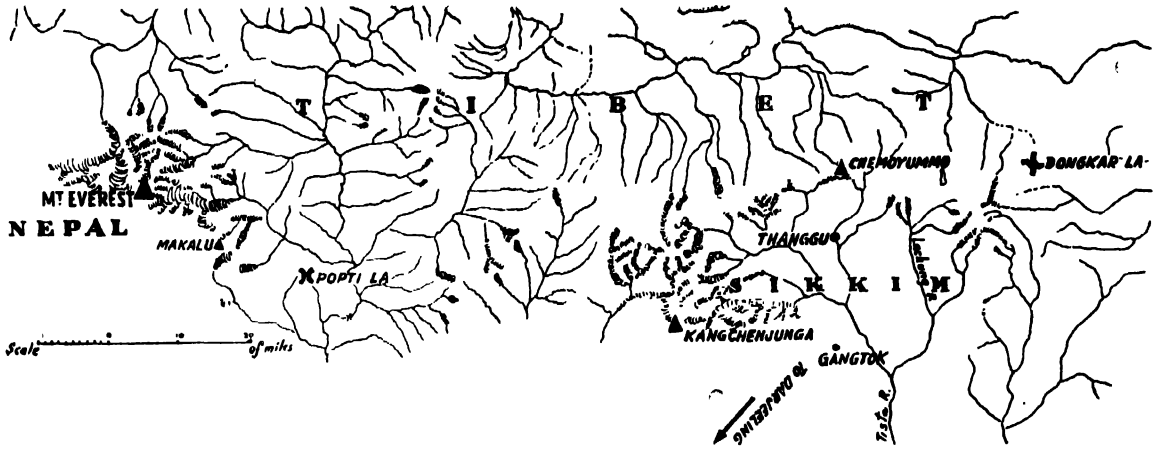
সিকিমের মানচিত্র

সুপারি, পিতল ও তামার দ্রব্য, স্বর্ণ ও রৌপ্য। কালিম্পং, গাংলি, ঘোলা প্রভৃতি কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে এই সমস্ত দ্রব্যাদি আমদানি ও রপ্তানি হয়।

বাংলাদেশ থেকে সিকিম যাবার দুটি পথ আছে। শিলিগুড়ি হতে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর সামনে পড়ে তিস্তা নদী। তিস্তা নদীর পুল অতিক্রম করার অর্দ্ধ মাইল পরে দক্ষিণ দিকে সিকিমে যাবার পথ। এই পথের মোড় থেকে সিকিম ৩২ মাইল, কালিম্পং ১০ মাইল এবং সিকিমের রাজধানী গংটক ৩৯ মাইল। এই পথের ধার দিয়ে বরাবর চলে গিয়েছে তিস্তা নদী। কখনও এই পথ নদী হতে শত শত ফুট উপরে পাহাড়ের গা দিয়ে চলেছে, কখনও বা নেমে এসে নদীর ধার দিয়েও চলেছে। নদীর ধারেই কোথাও বা শ্যামল বনানী মণ্ডিত পর্ব্বত, কোথাও বা পর্ব্বতের গভীর খাদের ভিতর দিয়ে নদীটি কলকল নাদে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এক মাইল উপরে রণজিৎ নদী এসে এই তিস্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পার্ব্বত্য পথ অতিশয় সঙ্কীর্ণ। তিস্তা নদী হতে ১৪ মাইল পথ অতিক্রম করে পথটি এসে পৌঁছয় রংপুতে। এই রংপু হ'ল সিকিম প্রবেশের প্রথম ঘাঁটি। রংপু নদীর উপর একটি সঙ্কীর্ণ সেতু আছে। এই সেতু অতিক্রম করে সিকিমে প্রবেশ করতে হয়। খরস্রোতা তিস্তা নদীর তীরে আরও সাত মাইল এই মনোরম পার্ব্বত্য পথে অগ্রসর হয়ে সিংটমে এসে উপস্থিত হতে হয়। এখানে পুলিশ গাড়ী অবরোধ করে। দর্শকগণের সই করবার একখানা পুস্তকে সকলকেই এখানে সই করতে হয়। কারণ নবাগতদের সন্ধান রাখা এ রাজ্যের এক প্রধান কাজ। রংপু হতে চার মাইল দূরে ভালিং নামে স্থানে কমলালেবুর এক সুন্দর বাগান আছে।

তিস্তা নদী এখানে শেষ হয়ে গেল। তার পরিবর্ত্তে পথের ধারে ধারে প্রবাহিত হয়েছে ক্ষুদ্রকায়া কিন্তু খরস্রোতা রংনী চু। এখান হতে পথ পর্ব্বতের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। পথের ধারে ধারে শস্যের ক্ষেত। এখানে প্রচুর শস্য জন্মায়। আরও ২ ঘণ্টা পরে ৬০০০ হতে ৬৫০০ ফুট উপরে গংটকে এসে উপস্থিত হওয়া যায়। পথে চোখে পড়ে কোথাও বা ফার্ণ, অর্কিড ও পাহের অপ্রাচুর্য্য, কোথাও বা ম্যাগনোলিয়া ও রডোডেনড্রন পুষ্প-স্তবকের অপরূপ লোহিত আভা। এই নয়নাভিরাম দৃশ্যে চক্ষু ও মন অপার আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ে।

গংটকে দ্রষ্টব্য স্থান মহারাজার রঙীন প্রাসাদ, ডাকবাংলো, বাজার এবং সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতিমন্দির। গংটকের বাজারে লেপচা, তিব্বতী, ভুটিয়া ও নেপালী—একসঙ্গে সকলকেই দেখতে পাওয়া যায়। শহরটি অতি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর। সর্ব্বোপরি এখান হতে কাঞ্চনজঙ্ঘার পরিবর্ত্তনশীল রক্তিম রাগ-রেখা পরিদৃষ্ট হয় ও নয়নমন পুলকিত করে। কাঞ্চনজঙ্ঘার পার্শ্ববর্ত্তী প্যান্ডিম, নার্সিং ও সিনোল চু পর্ব্বতশৃঙ্গগুলিও অপরূপ।

সিকিমের পূর্ব্বপার্শ্বে ভুটান এবং পশ্চিমে নেপাল অবস্থিত। ইহার উত্তরে তিব্বত এবং দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ। ভারতের উত্তর ভাগ রক্ষা করে আসছে—নেপাল, ভুটান ও সিকিম। সুতরাং ভারতবর্ষকে এই তিনটি দেশের উপর সর্ব্বদা সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের বোমা বর্ষণকেন্দ্র নেপাল, ভুটান ও সিকিম হতে মাত্র ৩০০০ মাইল দূর। সুতরাং উত্তর-ভারতের সীমারেখায় অবস্থিত এই দেশত্রয়ের গুরুত্ব সমধিক। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এই দেশগুলির রক্ষাব্যবস্থা এবং বৈদেশিক নীতি স্বহস্তে গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নেই।

১৮১৭ সাল হতে ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত

সিকিমের মহারাজা কর্তৃক প্রদেশপাল ডাঃ কাটজুর অভ্যর্থনা। প্রদেশপালের বামপার্শ্বে সিকিমের মহারাজা। তাঁহার বামে পলিটিক্যাল এজেন্ট শ্রীহরীশ্বর দয়াল

ভারতের সঙ্গে সিকিমের স্থিতাবস্থা চুক্তি ছিল। দার্জিলিং ভারত গবর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়ায় ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৮৩৫ সাল হতে সিকিম গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক ১২ হাজার টাকা কর দিয়ে আসছেন। সম্প্রতি সেই কর আরও কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। সিকিমের সঙ্গে সৌহার্দ্যের বন্ধন দৃঢ় করবার জন্ত কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলার প্রদেশপাল কৈলাসনাথ কাটজু চার দিনের জন্ত সিকিম-রাজ সার তাসি নামগিলের আতিথ্য স্বীকার করেন। ফলে সিকিমের সঙ্গে ভারতরাষ্ট্রের সম্পর্ক অধিকতর দৃঢ় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়েছে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনাবসানের পর থেকে তিনটি রাজনৈতিক দল সিকিমে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এখানেও নেপাল প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যের মত ক্ষমতা হস্তগত করবার আন্দোলন চলতে থাকে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে গংটকে অশান্তি দেখা দেয়। এই সময় রংপুতে ষ্টেট কংগ্রেসের অধিবেশনের পর কয়েকজন নেতাকে কারারুদ্ধ করা হয়। সেই নেতাদের অনুগামিগণ গংটকে এসে এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করে এবং রাজপ্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে জনপ্রিয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের দাবি করে। ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধির হস্তক্ষেপের ফলে কংগ্রেস-নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং মহারাজা ও কংগ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

সিকিম রাজ্যে ইতিমধ্যে কিছু শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়। ষ্টেট কংগ্রেসের নেতাদের নিয়ে গত মে মাসে এক মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হয়। তাতে ষ্টেট কংগ্রেস দলের নেতা তাসি সেরিং প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজ্যের শৃঙ্খলা তা সত্ত্বেও ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। সিকিমের অবস্থা জটিল ও বিশৃঙ্খল হয়ে উঠছে দেখে উক্ত প্রতিনিধি ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানান যে, মহারাজা অথবা ষ্টেট কংগ্রেস রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সমর্থ হবেন না। অবস্থা প্রত্যক্ষ করবার জন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট বৈদেশিক দপ্তরের সহকারী সচিব ডাঃ বালকৃষ্ণ কেশকারকে অবিলম্বে গ্যাংটকে প্রেরণ করেন। ডাঃ কেশকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে জানালেন যে মন্ত্রিমণ্ডল ও মহারাজের মধ্যে বিরোধ বিদ্যমান রয়েছে। এই অবস্থায় বিশৃঙ্খলা এবং রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী। শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়বার পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্টের একজন দেওয়ান নিযুক্ত করে তাঁর হাতে সিকিমের রাজ্যভার অর্পণ করা উচিত। ডাঃ কেশকার অবিলম্বে গ্যাংটকে কিছু সৈন্ত প্রেরণের জন্তও সুপারিশ করেন। তদনুসারে ২রা জুন এক-দল সৈন্ত সেখানে প্রেরিত হয়। ইতিমধ্যে অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। পলিটিক্যাল অফিসার ৩রা জুন জানান, ভারত গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে শাসনভার গ্রহণ না করলে রাজ্যে অশান্তি ও রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী।

এদিকে গত ৬ই জুন সিকিমের মহারাজা পলিটিক্যাল অফিসারকে জানান যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত শাসনকার্য্য পরিচালনা করা অসম্ভব। তিনি অনুরোধ করেন ভারত গবর্ণমেণ্ট যতদিন দেওয়ান নিযুক্ত না করেন তত দিন যেন পলিটিক্যাল অফিসারই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। সিকিমের মহারাজার অনুরোধে ভারত গবর্ণমেণ্ট ৭ই জুন হতে রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করেছেন।

গবর্ণমেণ্ট প্রচার করছেন যে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্তই তারা এই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। মহারাজের অনুরোধ অনুযায়ী যথাসম্ভব শীঘ্র একজন দেওয়ান প্রেরণ করা হবে। রাজ্যে আইনসম্মত কার্য্যকলাপ বন্ধ করবার এবং শাসনকার্য্যে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের গ্রহণ না করবার কোন ইচ্ছাই ভারত গবর্ণমেণ্টের নাই। ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহে যে শান্তিপূর্ণ ও প্রগতিশীল নীতি অনুসরণ করা হয়েছে সিকিমেও তা অনুসৃত হবে বলে গবর্ণমেণ্ট আশা প্রকাশ করেছেন।

আফ্রিকায় চীনাবাদামের চাষ

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়েছে—তা শুধু আমাদের দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। গত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই সমস্যা এশিয়া ও ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই অল্পাধিক পরিমাণে প্রকট হয়েছে। সমস্যা সমাধানের জন্য সকলেই আজ নানাদিক থেকে নানাভাবে চিন্তা করছেন। অনেকেই ভাবছেন কি করে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা ভিন্ন এই সমস্যা সমাধানের আর কোন পন্থা আছে বলে মনে হয় না। সম্প্রতি ইংলণ্ডের শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট আফ্রিকা মহাদেশে খাদ্যোৎপাদনের যে একটি পরিকল্পনা রচনা করেছেন তা শুধু আমাদের দেশের পক্ষেই নয় পৃথিবীর সকল দেশের লোকের পক্ষেই অনুকরণীয়।

এই পরিকল্পনাটি রচিত হয়েছে আফ্রিকায় তৈলবীজ চীনাবাদাম চাষের জন্য। খাদ্যের সঙ্গে মাথাপিছু যে পরিমাণ স্নেহজাতীয় পদার্থের প্রয়োজন ইংলণ্ডের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তার ঘাটতি পড়েছে অনেকখানি। হিসাব করে দেখা গেছে এই ঘাটতি পূরণের জন্য বৎসরে অন্ততঃ পক্ষে ১০ লক্ষ টন পরিমাণ চীনাবাদামের প্রয়োজন। পূর্ব্বে এই ঘাটতির বৃহৎ অংশ পূরণ হ'ত ভারতে উৎপন্ন চীনাবাদাম থেকে। কিন্তু লোকবৃদ্ধির দরুন ভারতবর্ষ বিদেশে চীনাবাদাম চালান দিতে এখন অসমর্থ। সুতরাং ইংলণ্ডের নিজের এই অভাব পূরণের জন্য চীনাবাদাম উৎপাদনের কোন ব্যবস্থা করতে না পারলে সুদূর ভবিষ্যতেও তা পূরণ হবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই অভাব হতেই পরিকল্পনাটির সৃষ্টি।

প্রথম এই পরিকল্পনাটি যাঁর মাথায় আসে তিনি শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের লোক নন, তিনি ইংলণ্ডের একটি বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। তাঁর নাম ফ্র্যাঙ্ক স্যামুয়েল। দু'বৎসর পূর্ব্বে (১৯৪৬ খ্রীঃ) গ্রীষ্মের এক অপরাহ্ণে আফ্রিকার টাঙ্গানাইকা প্রদেশের উপর দিয়ে তিনি শূন্যপথে উড়োজাহাজে করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল নীচের জনবিরল উর্ব্বর ভূমির দিকে। যতদূর দৃষ্টি যায় নানা জাতীয় তৃণগুল্মে আচ্ছাদিত বনভূমি ভিন্ন তিনি আর কিছুই দেখতে পেলেন না। দেখামাত্রই চীনাবাদাম চাষের পরিকল্পনাটি তাঁর মনে উদয় হ'ল। তখনকার মনের অবস্থা সম্বন্ধে পরে তাঁর একজন বন্ধুকে তিনি বলেছিলেন—"আমার মনে তখন সে কি আনন্দ? হাজার হাজার যোজন বিস্তৃত বালুময় উর্ব্বর ভূমি আমার চোখের সামনে পড়ে আছে। আমার মনে হ'ল ভগবান নিজেই যেন চীনাবাদাম চাষের জন্য এই জমি তৈরি করে রেখেছেন। একবার শুধু জঙ্গল পরিষ্কার করে নিতে পারলেই হ'ল…।"

অদূরবর্তী সমুদ্রতীরস্থ বন্দর দার-এস-সালামে এসে উড়োজাহাজ হতে নেমে হোটেলে গিয়েই তিনি সরকারী কাগজ নথিপত্র নিয়ে বসলেন। সারা রাত ধরে তিনি
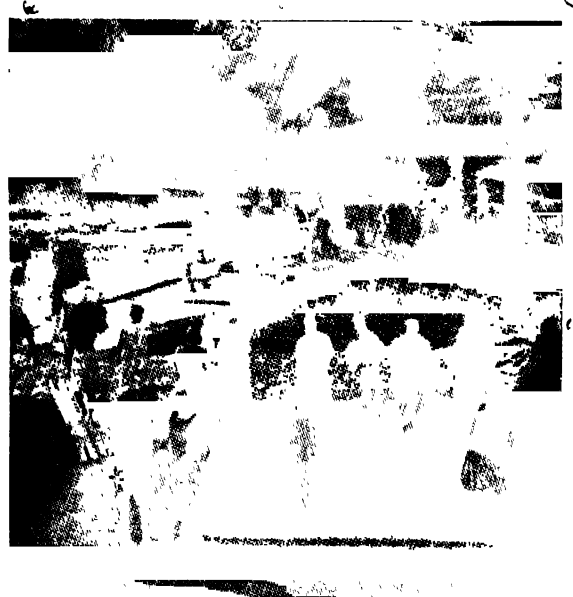
সমুদ্র-পথে চালান দিবার জন্য আফ্রিকার একটি নদীতে চীনাবাদাম নৌকা বোঝাই করা হইতেছে।

সমুদয় কাগজপত্র ঘেঁটে স্থানীয় বারিপাতের পরিমাণ, সে প্রদেশবাসী স্থানীয় মজুরের অবস্থা ও জমির গুণাগুণ ইত্যাদি তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন।

সেখান হতে ইংলণ্ডে ফিরেই তিনি তাঁর ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীর নিকট তাঁর নূতন পরিকল্পনাটি পেশ করলেন। সেই সভায় আলোচনার পর সমুদয় পরিকল্পনাটি গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করা হ'ল। কারণ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ একটি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্ভব নয়। সভায় আলোচনা থেকে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলী সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন এই পরিকল্পনাটি কার্য্যে পরিণত হলে তাঁদের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানটিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান হবে। কারণ এঁরাই পৃথিবীর মধ্যে স্নেহজাতীয় দ্রব্যের (oil and fats) সর্ব্বাপেক্ষা বড় ক্রেতা।

সভায় বসেই গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণের জন্য একটি স্মারকলিপিও রচনা করা হ'ল। স্তামুয়েল সাহেব সেই স্মারক-লিপিতে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করলেন যে বর্ত্তমান সময়ের খাদ্যে ব্যবহার্য্য স্নেহজাতীয় দ্রব্যের ঘাটতি সাময়িক নয়। সমগ্র পৃথিবীর মাথা গুনতি হিসাবে প্রকাশ গত দশ বৎসরের মধ্যে লোকসংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোন দেশ এই ঘাটতি পূরণের জন্য অগ্রসর না হয় তা হলে সুদূর ভবিষ্যতেও এ ঘাটতি পূরণের কোন সম্ভাবনা নেই।

স্মারকলিপিটি পাওয়া মাত্র গবর্ণমেণ্ট বিবেচনার্থ সেটি প্রেরণ করলেন খাদ্য-সরবরাহ মন্ত্রীর দপ্তরে। তিন জন বিশেষজ্ঞের বিচারে পরিকল্পনাটি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবার পর কাজ আরম্ভ ও তার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ পার্লামেণ্ট হতে ২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মঞ্জুর করা হ'ল।

কাজ আরম্ভ করতে গিয়ে দেখা গেল বাধা অনেক। প্রথমতঃ জমির জঙ্গল পরিষ্কার করতে হবে—তার জন্য যন্ত্রের প্রয়োজন। যন্ত্র কিনতে গিয়ে দেখা গেল যন্ত্রের অভাব খুব বেশী। আমেরিকায় খোঁজ নিয়ে দেখা গেল সেখানকার যন্ত্র তৈরির কারখানাগুলিতে এক বৎসর আগে থেকেই মালক্রয়ের চুক্তি হয়ে গেছে। কিন্তু নূতন যন্ত্রের জন্য এঁদের বসে থাকা চলে না। এঁদের প্রয়োজন দ্রুত উৎপাদন। সুতরাং যুদ্ধে ব্যবহৃত পুরানো যন্ত্রের জন্য দেশ-বিদেশে লোক প্রেরণ করা হ'ল। মধ্যপ্রাচ্য, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধের উদ্বৃত্ত মালের গুদামে খোঁজ হতে লাগল পুরানো যন্ত্রের। নিউগিনি থেকে খবর পাওয়া গেল চৌদ্দটি বৃহদায়তন কলের লাঙ্গল আছে, কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যবহারে কলকব্জা তাদের অনেক ক্ষয় পেয়ে গেছে, অনেক হারিয়েও গেছে। তন্মধ্যে কতকগুলি একেবারে অচল। অমনি প্রত্যুত্তরে টেলিগ্রাফে খবর চলে গেল "অবিলম্বে ক্রয় করে জাহাজে করে মাল পাঠাও।" মিশর দেশের যুদ্ধক্ষেত্রের মরুপ্রান্তরে খোঁজ করে পাওয়া গেল কতকগুলি হাল্কা ধরণের কলের লাঙ্গল। সেখানে কিছু রাস্তা নির্ম্মাণের যন্ত্রও পাওয়া গেল। ফিলিপাইন দ্বীপ থেকে যুদ্ধে ব্যবহৃত উদ্বৃত্ত মালের গুদাম হতে এল জঙ্গল পরিষ্কার করবার, রাস্তা তৈরি করবা, চাষের ও অন্যান্য নানা জাতীয় শতাধিক যন্ত্র। এই সব পুরাতন যন্ত্র মেরামত করে কাজ আরম্ভ করে দেওয়া হ'ল। টাঙ্গানাইকার কঙ্গোয়া প্রদেশে পুরা দমে কাজ চলল, সপ্তাহে ২০০০ একর করে আবাদের জন্য জমি পরিষ্কার হতে লাগল কিন্তু যন্ত্র সবই পুরাতন, তিন শত যন্ত্রের মধ্যে এক শতের অধিক একসঙ্গে ব্যবহার করা যাচ্ছিল না। কাজ করতে করতে যে সব যন্ত্রের অধিকাংশই অচল হয়ে যাচ্ছিল সেগুলিকে কারখানায় নিয়ে বারংবার মেরামত করে দিতে হচ্ছিল।

অন্য এক বাধা এল বড় বড় গাছের বেলায়। যে সব যন্ত্র পাওয়া গিয়েছিল তা দিয়ে বড় বড় গাছের মূল উৎপাটন করা যাচ্ছিল না। অথচ সেরূপ গাছের সংখ্যাও নগণ্য নয়। প্রতি একর জমিতে মাটির গভীরে শিকড় প্রোথিত করে দাঁড়িয়ে আছে ১০০।১৫০ বড় বড় গাছ। এদের মূলোৎপাটনের জন্য নূতন ধরণের যন্ত্রের প্রয়োজন। পুরাতন যন্ত্রের নানা অংশ দিয়ে এবং তাদেরই রূপান্তরিত করে তৈরি করা হ'ল শারমেন্‌ট্যাঙ্ক (Shermentank)। মূলসমেত বৃক্ষ উৎপাটনের আর বাধা রইল না। একজন এঞ্জিনীয়ার এই যন্ত্রটি সম্বন্ধে বলেছিলেন "অসির ফলায় লাঙ্গল তৈরির ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।"

এ যেমন যন্ত্রের দিকের প্রতিবন্ধক তেমনি মজুর সংগ্রহের বাধাও কম ছিল না। সেই প্রদেশের নিগ্রো অধিবাসী ওয়াগগো (Wagogo) জাতির মধ্যে সভ্যতার আলোক আজও পর্য্যন্ত কিছুমাত্র প্রবেশ করে নি। তারা সেই আদিম যুগের কৃষি-কার্য্যেই অভ্যস্ত। প্রয়োজনমত কুড়ুল দিয়ে জঙ্গল কেটে হাত-লাঙ্গল দিয়ে মাটি খুঁড়ে তাতে ওরা শস্যের বীজ বপন করে। বন্য জন্তু শিকারের অস্ত্র এখনও তাদের সেই সাবেক কালের তীর ধনুক বর্শা। যন্ত্র ওরা কোন দিনই ব্যবহার করে নি, সে সম্বন্ধে তাদের কোন অভিজ্ঞতাই নেই। অথচ এদেরই লাগাতে হবে যন্ত্রের কাজে। হাতেকলমে শিক্ষা পেয়ে এই অল্প সময়ের মধ্যেই এরা যন্ত্র চালাতে দক্ষ হয়ে উঠেছে। প্রায় ৭০০ কলের লাঙ্গল, জঙ্গল পরিষ্কার করবার যন্ত্র এখন এরাই চালাচ্ছে। তাদের ভিতর থেকে দিন দিনই যন্ত্রীর (mechanics) সংখ্যা বাড়ছে, শিখছেও এরা খুব দ্রুত।

ইংলণ্ড হতে শ্বেতাঙ্গ মজুর-যন্ত্রীও এসেছে অনেক। পরিকল্পনাটির কথা কাগজে প্রচারিত হতে না হতেই প্রায় লক্ষাধিক আরজি পড়েছিল কাজে যোগ দেবার জন্য। তন্মধ্যে অধিকাংশই ৩৫ বৎসরের নিম্নবয়স্ক যুবক। গ্রীষ্ম-প্রধান অঞ্চলের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ওদের কোন অভিজ্ঞতা নেই। যারা চিরদিন শীত-প্রধান দেশে কাজ করায় অভ্যস্ত আফ্রিকায় এসে তাদের গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে খোলা প্রান্তরে কাজ করতে হবে। কিন্তু তাদের মনোভাব ছিল সৈনিকের ন্যায়। সৈনিক-জীবনের কঠোরতার সঙ্গেও ওরা অপরিচিত ছিল না। কারণ ওদের অধিকাংশই ছিল যুদ্ধক্ষেত্র-প্রত্যাগত সৈনিক।

পরিকল্পনাটি কার্য্যে পরিণত করবার পথে প্রথম যে সব অন্তরায় দেখা দিয়েছিল তা প্রায় অবসান হয়ে গেছে। ১৯৪৬-এর গ্রীষ্মের শেষের দিকে প্রায় ৭৫০০ একর জমি থেকে ফসল তোলা হয়েছে। ১৯৪৭-এর শেষভাগের মধ্যে এক লক্ষ একর জমি পরিষ্কার করে তাতে চীনা-বাদামের চাষ হবে। যদি এইভাবে কাজ চলতে থাকে ও দৈবচক্রে কাজে কোন বাধা না জন্মে তা হলে আগামী

তিন বৎসরের মধ্যে হিসাব অনুসারে প্রায় ৩২ লক্ষ একর জমি আবাদ হতে পারবে।

দু'বৎসর পূর্ব্বেও যে জনবিরল অরণ্যানী ছিল নানাজাতীয় হিংস্র বন্যজন্তুর বিচরণভূমি, নানাজাতীয় রোগবীজাণুবাহী কীট-পতঙ্গ মশা-মাছি প্রভৃতিতে ছিল পরিপূর্ণ, আজ সেখানে গড়ে উঠছে জনবহুল শহর। কলের লাঙ্গল, ট্রাক্টর প্রভৃতি যন্ত্রের গর্জ্জনে হিংস্র জন্তু সব বন ছেড়ে পালাচ্ছে। বন পরিষ্কার হওয়ায় মাছি-মশা প্রভৃতি অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গের দলও বংশবৃদ্ধির উপযুক্ত স্থানের অভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। কঙ্গোয়াতে ইতিমধ্যেই ছোটখাটো একটি প্রি-ফেব্রিকেটেড বাড়ীতে পূর্ণ শহর গড়ে উঠেছে। তাতে বৈদ্যুতিক শক্তিগৃহ (Power House) স্থাপিত হয়েছে, পানীয় জলের জন্য খোঁড়া হয়েছে নলকূপ, দোকানপাট বসেছে, ছেলেদের জন্য স্থাপিত হয়েছে স্কুল। বড় বড় পাকা রাস্তা তৈরি হয়েছে, উড়োজাহাজে করে যাত্রীদের যাতায়াত চলছে শূন্য পথে, তার জন্য তৈরি হয়েছে অবতরণ-ভূমি। অদূরবর্ত্তী সমুদ্রতীরের বন্দর দার-এস-সালেমে যাবার জন্য পূর্ব্বে এক লাইনের যে ছোট একটি রেলপথ ছিল তাতে আর একটি লাইন যোগ করে রেলপথটির পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে। বহু দিন পূর্ব্বে এই দার-এস-সালেম ছিল আফ্রিকার দাস-ব্যবসায়ের একটি বৃহৎ কেন্দ্র। বহু দিন পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার পর আজ আবার সে স্থানটি কোলাহলমুখরিত বন্দরে পরিণত হয়েছে। চীনাবাদামের চাষকে উপলক্ষ্য করে আজ সেখানে আসছে দলে দলে এঞ্জিনীয়ার, বাড়ী তৈরির কারিগর, ব্যবসায়ী, বিগত বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যাগত বেকার সৈন্যদল।

এই সব বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের এক জায়গায় এসে বাস করবার সমস্যাও নিতান্ত কম জটিল নয়। এদের অনেকেই হয়ত এক জায়গায় এসে এক সমাজভুক্ত হয়ে বাস করতে চাইবে না, সকলেই হয়ত চাইবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতে। কর্ম্মের অবসরে আনন্দপূর্ণ জীবনযাপন করবার জন্য প্রতি পরিবারে কিছু জমি দেওয়া হয়েছে সব্জী চাষের জন্য। তা ছাড়া শিশুদের শিক্ষারও বন্দোবস্ত করতে হবে। বড় হলে ওরা যাতে বেকার অবস্থায় বসে না থাকে, সকলে কাজ পায় তারও বন্দোবস্ত করতে হবে। ইতিমধ্যেই রুগ্ন ব্যক্তিদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের জন্য স্থানে স্থানে হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট বাংলা ও পঞ্জাব হতে যে সকল বাস্তুহারা-দের আন্দামানে নিয়ে গেছেন তাদের জন্যও এরূপ একটি ক্ষুদ্র আকারে হলেও ব্যাপক ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজন। প্রথমে এর জন্য গবর্ণমেণ্টকে কিছু ব্যয় করতে হলেও পরিণামে ক্ষতি অপেক্ষা লাভের অঙ্কই হয়ত বেশী দেখতে পাওয়া যাবে। ইংলণ্ডের শ্রমিক গবর্ণমেণ্টও পরিণামে লাভের আশায়ই আফ্রিকায় চীনাবাদাম চাষের পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করেছেন। তাঁরা আশা করেন ১৯৫২ সনের পর হতে ৬ লক্ষ টন চীনাবাদাম উৎপন্ন হলে (হবার সম্ভাবনাই বেশী) বৎসরে রাজকোষের ১ কোটি পাউণ্ড ব্যয় লাঘব হবে।

সাহিত্যের সমস্যা

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

ছাত্রাবস্থায় সাহিত্যে আমার হাতেখড়ি হয় আত্মীয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকটে এবং আমার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় সবুজপত্রে। সবুজপত্র বন্ধ হইলে আমার পড়াশুনা সাহিত্যের পথ ছাড়িয়া অন্যপথে চলিতে থাকে। সাধারণ ভাবে সাহিত্যের সঙ্গে এবং সবুজপত্রের আমলের দুই-চারি জন শ্রদ্ধেয় বন্ধুবান্ধব ছাড়া সাহিত্যিকদের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বহুদিন পরে আবার সাহিত্যের পথে ফিরিতে গিয়া সম্মুখে বিপুল বাধা দেখিয়া নিরুৎসাহ বোধ করিতেছি।

কিন্তু কেমন সন্দেহ হইতেছে যে, যে বাধা আমাকে নিরুৎসাহ করিতেছে তাহার প্রভাব আজকালকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের উপরেও যেন দেখা যাইতেছে। অগ্রসর হইবার পথ যে সমস্তায় কণ্টকিত মনে হইতেছে তাহা যেন কোন বিশেষ সাহিত্যিকের বা আমার মত সাহিত্যসেবা-প্রয়াসীর ব্যক্তিগত সমস্যা নহে, তাহা এদেশের সকল সাহিত্যিকের সাধারণ সমস্যা। মসীকৃষ্ণ মেঘের আবরণ নামাইয়া দিয়া উহা সম্মুখের পথ অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। নিজের জ্ঞানবুদ্ধি-মত বিচার করিয়া সাহিত্যের পথে এই প্রতিবন্ধকের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। ঈষৎ সংকোচের সঙ্গে সেই কথাই আজ বলিতেছি।

প্রথমেই দৃষ্টিপাত করিতে হয় মোটামুটি গত দশ বৎসরের ইতিহাসের পানে। কালবৈশাখীর প্রচণ্ডতা লইয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের অগ্রগতি, মালয় ও ব্রহ্মদেশে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সর্বনাশ, অবর্ণনীয় বিপদ ও ক্লেশের মধ্য দিয়া কুখ্যাত 'কালা'পথে অগণিত ভারতবাসীর ব্রহ্মদেশ হইতে

প্রত্যাবর্তন, বাংলার মন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশুর অন্নাভাবে চোখের সম্মুখে বীভৎস মৃত্যু, আজাদ হিন্দ ফৌজের অভ্যুদয়, হিরোশিমা ও নাগাসাকির অচিন্তনীয়, বর্বর ধ্বংসলীলা ও জাপানের পতন, বলদর্পিত মুসোলিনী ও জার্মান ফুয়েরের জীবনাবসান, চোখের সম্মুখে কত কি ঘটিয়া গেল। যুদ্ধ উপলক্ষে এদেশে অগণিত বিদেশীয়ের আগমন, তাহাদের কার্যকলাপের ফলে সমাজের স্তরে স্তরে বিপুল পরিবর্তন, অলক্ষ্য ও সর্পিল গতিতে লোভ, অনাচার ও নীতিহীনতার প্রসার চোখের সম্মুখে ঘটিল। ১৯৪২ সনের ভারতব্যাপী বিদ্রোহ-অগ্নির প্রজ্বলন চোখের সম্মুখে সংঘটিত হইল, ঘরে ঘরে এই অগ্নির উত্তাপ অনুভূত হইল।

তারপর এই সকল ঘটনার ফলে সমাজে ও লোকের মনে কোথায় কি ফাটল ধরিল তাহার সংবাদ লইবার অবকাশ হইতে না হইতে অতর্কিতে একদিন ভূপৃষ্ঠ ফাটিয়া অন্ধকার ভূ-গহ্বর হইতে অগ্নিময় ধ্বংসের স্রোত উৎক্ষিপ্ত হইয়া দেশকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ১৯৪৬-৪৭ সনের ভারত-ব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাবানলের কথা বলা হইতেছে। অবশেষে সেই স্রোতে বাহিত হইয়া চিরদিনের পোষিত আদর্শ ও আশা বিনষ্ট করিয়া আসিল দ্বিধা-বিভক্ত দেশের স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার আবাহন করিয়া উৎসব করিলাম আমরা। উৎসবের আনন্দ-কোলাহলে খেয়াল হইল না যে অপরের তাগিদে ও অবস্থার ফেরে দ্রুতগতিতে যে স্বাধীনতা আসিল তাহা আসিল একটা বৈরাগ্য ও বেদনার রূপ লইয়া। এ কথা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা নিরর্থক।

একটার পর একটা এতগুলি প্রচণ্ড বিপর্যয়ে দেশের লোকের গুরুতর মানসিক ও চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটিবার কথা। সে পরিবর্তন সাহিত্যিকের সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মনের মুকুরে স্পষ্ট ধরা পড়িবার কথা। কিন্তু সমসাময়িক কালের সংবাদপত্র ছাড়া অন্যত্র অনুসন্ধান করিলে মনে হয় যে, কোন আশ্চর্য আঘাত-নিরোধক ব্যবস্থার সাহায্যে অধিকাংশ বাঙালী সাহিত্যিক মনের অবিচলিত সাম্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সমসাময়িক ঘটনা লইয়া অনেক রচনা প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এক মহা নাটকের এই সকল দ্রুত পরিবর্তনশীল দৃশ্য সম্বন্ধে সামগ্রিক অনুভূতির অভাব এই সাময়িক রচনাগুলিতে স্পষ্ট।

আগেকার দিনের বাংলা সাহিত্যের প্রতি একটু দৃষ্টি ফিরান যাউক। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা, তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা হইবার পরে বাংলা সাহিত্যে রেনেসাঁসের যুগ আরম্ভ হয়। আজকার দিনে অনেক ত্রুটি চোখে পড়িলেও যে নব নব সৃজনীশক্তির পরিচয় সে যুগের বাংলা সাহিত্যে মিলে তাহা আমাদের গৌরবের বস্তু। সে যুগের বিভিন্নমুখী ধারা ১৯০৫-এর দিকে একমুখী হইয়া নূতন স্বাধীনতা আন্দোলনকে আশ্রয় করিয়া জাতির জীবনে জোয়ার আনিয়া দিল। ইহার পরে দেখা যায় যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ক্রমে ক্রমে বাংলা সাহিত্যে পলায়নী মনোবৃত্তির অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে যদিও ১৯১৪-১৫ হইতে ১৯২১, ১৯২১ হইতে ১৯৩০-এর মধ্যে একসঙ্গে হিংসা ও অহিংসার পথে দেশ-মুক্তির আন্দোলন চলিতেছিল। সাহিত্যের এক অংশে এই পলায়নী মনোবৃত্তির অনুশীলন এখনও চলিতেছে বলিয়া মনে হয়। কোন কোন সাহিত্যিকের রচনায় ইহার প্রভাব দেখা যায় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপর্যয়কর যুগ পর্যন্ত, মুক্তি আন্দোলনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত কেহ কেহ অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তারপর যেন সাহিত্যের প্রবাহ ব্যাহত হইয়া নানা আবর্তের সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে ঘুরিতেছে, প্রবাহের বাহিকাশক্তি বিলুপ্তপ্রায়। আজ আবার তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতেছে।

একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক সেদিন বলিলেন, সাহিত্যিকগণ এক বিভ্রান্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারা পথ দেখিতে পাইতেছেন না। আজিকার দিনে এই কথা একজন সাহিত্যিক কেন বলেন? নানা দেশের সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় দেশে যুগ-পরিবর্তনের মুখে ও পরে সাহিত্য সে পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছে, হৃত স্বাধীনতার উদ্ধার বা সঙ্কুচিত স্বাধীনতার প্রসার দেশে নূতন, বিচিত্র সাহিত্যসৃষ্টির প্লাবন আনিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে য়ুরোপের বড় বড় দেশে ইহা ঘটিয়াছে। য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব এদেশে প্রসারিত হইলে মানসিক দৈন্য ও সংকীর্ণতা হইতে মুক্তির আস্বাদ পাইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে যে নূতন বাংলা সাহিত্য গড়িয়া উঠে তাহার বেলায় ইহা দেখা গিয়াছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ও পরে বাংলায়, মহারাষ্ট্রে, পঞ্জাবে নূতন ভাবের বন্যা আসিয়াছিল। সেই প্লাবনের যুগে ইহা পরিলক্ষিত হইয়াছে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে আশ্রয় করিয়া দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন নূতন রূপ লইল। দেশী ও বিদেশী নানা ধারা হইতে রস সংগ্রহপূর্বক পুষ্টিলাভ করিয়া, ১৯৪৭ হইতে বিয়াল্লিশ বৎসর আগে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্য করিয়া ভারতবর্ষে স্বাধীনতা লাভের যে সম্মিলিত অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল ১৯০৫-এর বিয়াল্লিশ বৎসর পরে তাহা পরিণতি লাভ করিল ভারত-বিভাগে ও ইংরেজের বিভক্ত ভারতবর্ষ পরিত্যাগে।

ইংরেজ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়াছে। প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থে দেশবাসীর প্রতিনিধিরা আজ শাসনযন্ত্রের চালক। আজিকার দিনে সাহিত্যিক বিভ্রান্ত কেন, পথ চিনিয়া এই অক্ষমতা কেন? আনন্দের প্রাচুর্য, প্রাণের বেগে সাহিত্য ত আজ সহস্র দল মেলিয়া ফুটিয়া উঠিবে। বড় রকমের গলদ যে ঘটিয়াছে

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
ভাস্কর—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়

জাতীয় রক্ষীবাহিনীর মহিলা বিভাগের দুই জন শিক্ষার্থিনী বেতারে সংবাদ আদান প্রদান অভ্যাস করিতেছেন

মেজর জেনারেল জে. এন. চৌধুরী

কোথাও তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশ পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছে কিন্তু সে মুক্তির উল্লাস কই? হাজার বৎসর পরে হিন্দুভারত আজ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে, আত্মকর্তৃত্ব পাইয়াছে। কোথায় এত বড় সৌভাগ্যলাভের আনন্দ উচ্ছ্বাস, কোথায় নবজীবনের স্ফুরণ? কেন স্বাধীনতা লাভের পর নূতন প্রাণের জোয়ার আসিতে না আসিতে ভাটার টানে নদীগর্ভের অবশিষ্ট জলটুকু সরিয়া গিয়া পুঞ্জীভূত কর্দম ও জঞ্জালের কদর্যতা দৃষ্টি ও মনকে পীড়িত করিতেছে?

তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্টের পরে দেশে যে মহা পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বন্ধ্যা? আনন্দহীন, প্রেরণাহীন স্বাধীনতার বন্ধ্যাত্ব কি সাহিত্যিক যে সংকটের সম্মুখীন হইয়া বিমূঢ় বোধ করিতেছেন তাহার জন্য দায়ী? এই চিন্তাও যে হতবুদ্ধিকর। ব্যক্তিগত ভাবে যে বাধার কথা বলিয়াছি, তাহার মুল কোথায় আজ সতর্ক অনুসন্ধান করিতে হইবে। সন্ধান করিতে হইবে বিচিত্র পত্র-পুষ্প-ফলের ঐশ্বর্য মণ্ডিত হইয়া যে নবযুগের আবির্ভাবের কথা, কি কারণে আজ তাহা শ্রীহীন মনে হইতেছে।

আজ দিকে দিকে বিক্ষোভ। লোকচিত্ত স্বপ্নভঙ্গের ব্যথায় পীড়িত, ক্ষুদ্রচিত্ততা, নির্লজ্জ লোলুপতার গ্লানিতে অভিভূত, আদর্শভ্রষ্ট রাজনৈতিক নেতার সদ্য পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত পদের তাড়নায় জর্জরিত। ক্ষমতার অধিকারী আজ দেশের শুধু বর্ত্তমান নহে, ভবিষ্যৎকেও নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে অভিলাষী। যে স্বাধীনতার আলোক-স্পর্শে জন-মানস-পদ্ম বিকশিত হইল না, কি আশ্রয় করিয়া তাহা আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিবে? কি আশ্রয় করিয়া সাহিত্য নব সৃষ্টিতে জীবন্ত ও সমৃদ্ধ হইবে?

সাহিত্যের পথে ফিরিতে গিয়া নিরুৎসাহ বোধ করিতেছি এইজন্য। যে সকল অভিজ্ঞতা শতাব্দীকালের মধ্যে পরিপাক করা সম্ভব, অল্প কয়েকটি বৎসরের মধ্যে পর পর আসিয়া তাহা বিপর্যয় ঘটাইয়াছে, লোকের চিত্তের স্থৈর্য, স্বভাবের সংযম, চিন্তার প্রখরতা হরণ করিয়াছে। দীর্ঘ দিনের নিপীড়িত মনকে সুস্থ ও উদ্দীপ্ত করিবার কথা যাহার, ভাগ্যদোষে তাহা হইয়াছে অস্বাস্থ্যকর, উদ্দীপনাহীন।

আজিকার এই গ্লানিকর, হতবুদ্ধিকর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যে আদর্শের প্রতি সত্যকার নিষ্ঠা নাই তাহার ঢকানিনাদ অতিক্রম করিয়া যে শক্তিমান সাহিত্যিক নবযুগের কথা নবযুগের ভাষায় বলিবেন সাগ্রহে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছি। তাঁহার আবির্ভাবের পথ বাধামুক্ত হউক কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি। বিমুখ জনমানসকে তিনি সৃষ্টির সৌন্দর্য ও প্রাণবত্তার দ্বারা অনুকূল করুন।

বঙ্গ ও আসামের দ্রাবিড় জাতি

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী

এক সময়ে বঙ্গদেশ ও আসামে দ্রাবিড়জাতির বিলক্ষণ প্রভাব ছিল। তাহারা উভয় দেশের সমাজেই অনেক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল। এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ রহিয়াছে তাহা হইতে একটি মোটামুটি ইতিহাস এ প্রবন্ধে দিতে চেষ্টা করিব।

বঙ্গদেশে আর্য্যগণ প্রথমে কখন আগমন করিয়াছিলেন তাহা জানা কঠিন হইলেও স্থূলভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব নহে। বঙ্গ যে আর্য্যভূমি তাহার সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় জৈন ধর্ম্মগ্রন্থে। জৈন ধর্ম্মগ্রন্থসকল জৈনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা মহাবীরের মৃত্যুর পরে রচিত হইয়াছে। মহাবীরের মৃত্যু হয় ৫২৭ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে। অতএব স্থূলভাবে বলা যাইতে পারে যে, আর্য্যগণ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন প্রায় ৫০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে। তখন গৌতম বুদ্ধ জীবিত ছিলেন এবং মগধে বিম্বিসার রাজা ছিলেন। ইহার বহু পূর্ব্বে আর্য্যগণ বিদেহ ও মগধ অধিকার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সেখানে দ্রাবিড়গণ বাস করিত। আর্য্যদের বিদেহ ও মগধ আক্রমণে পরাজিত হইয়া তাহারা বঙ্গদেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। দ্রাবিড়গণের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কাহারা বাস করিত তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ কিয়দংশে কোলীয় ও মোঙ্গোলীয় জাতি বাস করিত এবং তাহারা দ্রাবিড়দিগের নিকট পরাজিত হইয়া পর্ব্বতে ও জঙ্গলে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিল।

আর্য্যগণ কর্তৃক বিদেহ ও মগধ অধিকার এবং দ্রাবিড়গণের বঙ্গদেশে আগমন প্রায় একই সময়ে হইয়াছিল। দ্রাবিড়গণ যে অন্ততঃ সমগ্র উত্তরবঙ্গ অধিকার করিয়াছিল, ইহার অনেক প্রমাণ আছে। 'গুড়ি', 'মারা' বা 'মারি', 'পেটা', 'বাড়া' ইত্যাদি প্রত্যয়গুলি দ্রাবিড় শব্দ বা দ্রাবিড় নগর বুঝায়।

'গুড়ি' অর্থ বসতি; 'মারা' বা 'মারি' অর্থ প্রাদুর্ভাব (হত্যা নহে); 'পেটা' অর্থ পণ্যবীথি; 'বান্ধা' অর্থ ক্রয়বিক্রয় স্থান। উত্তরবঙ্গে 'শিলিগুড়ি'—শিলনামক দ্রাবিড় শাখার বসতি, 'ময়নাগুড়ি'—দ্রাবিড় ময়ন শাখার বসতি; 'লাটা-গুড়ি'—লাটা শাখার বসতি বা নগর; 'জলপাইগুড়ি' নদীর অপর তীর হইতে আগত দ্রাবিড়দিগের বসতি (পরে 'জলপাই' একটি ফলের নাম হইয়াছে, কারণ ইহা এদেশে ছিল না, স্পেন বা ইটালী হইতে সমুদ্র পার হইয়া জাহাজ-যোগে আসিত, জলের সহিত ইহার আর কোন সম্বন্ধ নাই); 'শালমারা' (আসামের একটি স্থান)—যেখানে শালবৃক্ষের প্রাদুর্ভাব; 'ভেড়ামারা' যেখানে ভেড়া বা মেষ বহু পাওয়া যায়; 'ঘোড়ামারা' যেখানে ঘোড়ার প্রাদুর্ভাব; 'বোয়াল-মারী' যেখানে বোয়াল মাছের প্রাদুর্ভাব, 'বাঘমারী' যেখানে বাঘের প্রাদুর্ভাব। 'পেটা' শব্দ এখনও বহরমপুরে ব্যবহৃত হয়, যেমন 'মঙ্গলবারমপেটা' মঙ্গলবারে যেখানে বাজার হয়। আসামে 'পেটা' শব্দযুক্ত অন্ততঃ দুইটি শহর পাই বঙ্গদেশের সীমান্তে—'বড়পেটা' ও 'সরুপেটা'। 'বান্ধা' শব্দ 'হাতীবাঁধা' ও 'গাইবাঁধা' দুইটি উত্তরবঙ্গীয় নগরের নাম—প্রাচীন দ্রাবিড় অধিকার বুঝাইতেছে। আসামে বহু স্থানের নাম 'গুড়ি' শব্দযুক্ত, ইহাতে বুঝা যায় পূর্বে সে সকল স্থানে দ্রাবিড় বসতি ছিল। কিন্তু আসামে যে এককালে সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া দ্রাবিড়গণের বসতি ছিল, তাহার আরও অনেক প্রমাণ আছে।

পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে শিলিগুড়ি নগরে দ্রাবিড় শিলগণ বাস করিতেন। ইঁহারাই তৎকালে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিলেন। বলিতে গেলে ইঁহারাই বঙ্গদেশের দ্রাবিড়গণের নেতৃত্ব করিতেন। বহুকাল এইভাবে থাকিবার পরে যখন আর্য্যগণ উত্তরবঙ্গে রাজ্য স্থাপনা করিতে আসিয়াছিলেন, তখন দ্রাবিড়গণ তাঁহাদিগকে প্রবল বাধা দিয়াছিল। উত্তর-বঙ্গে কোথাও রাজ্যস্থাপন করিতে না পারিয়া তাঁহারা আসামের তেজপুরে গিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। শিলগণ সেখানে গিয়া প্রাগজ্যোতিষপুর আক্রমণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহারা ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া আসামে চলিয়া যান। কামরূপে (গৌহাটিতে) রাজ্য স্থাপন করিয়া ইঁহারা খাসিয়া পর্বতের শিলং চূড়ায় গিয়া বসবাস করেন। খাসিয়াগণ ইঁহাদের অনেক পরে খাসিয়া পর্বতে বাস করিবার জন্য আসিয়াছিল। শিলগণ ক্রমে শক্তি সংগ্রহ করিয়া পাহাড়ের অপরদিকে সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া দুইটি বৃহৎ ভূখণ্ড অধিকার করিয়া নিজেদের নামে পরিচিত করিলেন। এই দুইটি স্থান 'শিলহট' ও 'শিলচর'—প্রথমটি তাঁহাদের বাণিজ্য-স্থান, দ্বিতীয়টি তাঁহাদের বসতিস্থান। ক্রমে তাঁহারা আসামের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তেজ-পুরের অপর দিকে ব্রহ্মপুত্রের তীরে 'শিলঘাট' পর্য্যন্ত তাহাদের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মপুত্র পুনরায় পার হইতে পারেন নাই।

কেবল শিলগণই আসামে আসেন নাই। অন্যান্য বহু দ্রাবিড় শাখা তাহাদের সহিত অথবা তাহাদের রাজ্য স্থাপনের পরে আসামে আসিয়াছিল। বঙ্গদেশে যাহারা রহিয়া গেল তাহা-দের সংখ্যাও কম নহে, তাঁহারা একই দ্রাবিড় জাতি। পরে আর্য্যগণ কামরূপ ও আসাম জয় করেন। তাঁহারা সেখানকার অনার্য্যদিগের নাম দিলেন 'কামচারী' যাহা হইতে 'কাছাড়ী' শব্দের উৎপত্তি। তাহারা আর্য্যবিধি প্রতি-পালন করিত না বলিয়া তাহাদিগকে স্বেচ্ছাচারী মনে করিয়া এই নাম দেওয়া হইয়াছিল। নওগাঁ জেলায় কামপুর ইহাদের নগর, কামরূপ বা গৌহাটি জেলায় ইহাদের আচার-ব্যবহার প্রচলিত ছিল এবং সেখানে ইহারা বাস করিত বলিয়া 'কাম-রূপ' নাম দেওয়া হইয়াছিল। আসামের দেবী 'কামাখ্যা' অনার্য্যদিগেরই দেবী। পরে পশ্চিম হইতে পূজারী ব্রাহ্মণ আনাইয়া এই দেবীকে হিন্দু দেবীতে পরিণত করা হইয়াছে।

কিন্তু অনার্য্যগণ কতকগুলি নাম দ্বারা আপনাদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীকে অভিহিত করিত, যেমন বড বা বড়; 'মেচ' 'মেল চাই' অর্থ 'মেল' বা জাতীয় সভার মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে; 'রাজবংশী' রাজার বংশীয়, রাজবংশীয় বলিয়া সকলেই এ উপাধি গ্রহণ করিতে পারে। কোচবিহারের কাছাড়ীগণ সম্ভবতঃ বাঙালীদিগের সহিত মেলামেশা করায় অন্যান্য কাছাড়ীগণ তাহা-দের ঘৃণা করিত, সে অপবাদ দূর করিবার জন্য তাহারা নাম লইলেন 'কুল-চাই' কুচ বা কোচ অর্থাৎ কাছাড়ী কুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যখন তাঁহারা কোচবিহারে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন, তখন কাছাড়ীগণ স্বভাবতঃই তাঁহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিত। আসাম ও বাংলার কাছাড়ী, মেচ, বড (বড়), রাজবংশী ও কোচ—সকলেই একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

ইহা ব্যতীত আর একটি আদিম জাতির আমরা পরিচয় পাই—ইহাদের নাম 'মাণ'। মানভূম ও পূর্ব্ব দিকে মণিহারী ঘাটে আসিয়া ইহারা কিছুদিন বাস করিয়াছিল। পরে গঙ্গা পার হইয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া কলিঙ্গ দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। পূর্বে কলিঙ্গদেশের নারীগণ সুন্দরী বলিয়া খ্যাত ছিল, সম্ভবতঃ মণিপুরের নারীগণও ইহার মধ্যে পড়ে। ইহাদের আর একটি শাখা পূর্ব্ব দিকে আসামে গিয়া একটি স্বাধীন রাজ্য—মণিপুর—স্থাপন করে। সম্ভবতঃ আসামের শিলগণ ইহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

ডিমাপুরে কাছাড়ীদিগের এক দুর্গ ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়।

এককালে দ্রাবিড়গণই প্রায় সমগ্র আসামের অধিপতি ছিল। তাহারা মোঙ্গোলীয়দের পরাজিত করিয়া পর্ব্বত ও জঙ্গলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিল। এইরূপে তাহারা পরবর্ত্তী কালের আর্য্য অধিকারের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিল।

কিন্তু আসামের আর্য্যগণ অনার্য্যদের চিরকাল স্বাধীন থাকিবার সুযোগ দেন নাই। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর সম্বন্ধে কিছু রহস্য আছে, তাহা না জানিলে পরবর্ত্তী কালের আসামের সামাজিক ইতিহাস সম্যক্‌রূপে বুঝা যাইবে না। এ বিষয়ে প্রচলিত ইতিহাসের বাহিরে যে সকল প্রমাণ আছে, তাহা বর্ণনা করিলে পাঠকদের বিরক্তির উদ্রেক হইতে পারে। সেইজন্য পূর্ব্বাপর ঘটনাগুলিই আমরা বলিতে চেষ্টা করিব। এই ইতিহাস দুইটি বিষয়ের মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে। প্রথমতঃ এই নূতন রাজ্যের নাম প্রাক্‌ বা পূর্ব্বজ্যোতিষপুর কেন হইল? পূর্ব্বজ্যোতিষপুর থাকিলেও ভারতবর্ষে কোথাও পশ্চিম জ্যোতিষপুরের নাম পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, অসমীয়া ভাষা ও বাংলা ভাষা একই মাগধী প্রাকৃত ভাষা, বলিতে গেলে অসমীয়া ভাষা বাংলাভাষা হইতেই উৎপন্ন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে উচ্চারণের কিছু পার্থক্য আছে। অসমীয়গণ চ বর্গ উচ্চারণ করিতে পারেন না, তাহার স্থানে স্পর্শবর্ণ উচ্চারণ করেন, ত বর্গকে ট বর্গে পরিণত করিয়াছেন এবং স্পর্শবর্ণের স্থানে বিশেষতঃ 'শ' ও 'স'এর স্থানে 'হ' উচ্চারণ করেন। এই পার্থক্য কিরূপে আসিল? এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাদিগকে অতীত ইতিহাসের কথা কিছু বলিতে হইবে।

পারস্যদেশে একশ্রেণীর পুরোহিত ছিলেন, তাঁহারা ভারতে আসিয়া আপনাদিগকে সৌর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা গ্রহাচার্য্য দৈবজ্ঞ বা জ্যোতিষী। জেন্দ-আবেস্তা বা পারসিক ধর্ম্মগ্রন্থে 'অথর্ব্বণ' পুরোহিত বলিয়া ইহাদের উল্লেখ আছে এবং ইহাদিগকে ঘৃণা করা হইত। হয়ত বা ইহারা নানা গ্রাম্য দেবতারও পূজা করিত এবং মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা অশিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। জরথুস্ত্র-প্রচারিত ধর্ম্মে ইহারা যে অতি হীন বলিয়া গণ্য হইত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ দিকে পারস্যভাষায় স্পর্শবর্ণ 'হ' রূপে উচ্চারিত হইত, যেমন বৈদিক 'সপ্তসিন্ধবঃ' পারস্য ভাষায় 'হপ্ত হিন্দব' এবং চ কে 'স' রূপে উচ্চারণ করা হইত, যেমন বৈদিক 'চতুরঙ্গ' পারসিক ভাষায় 'সতরঞ্জ'। 'ত' স্থানে 'ট' ব্যবহার ইহাও অসম্ভব নহে, কারণ কোন কোন আর্য্যজাতিই যেমন ইংরেজ 'ত' উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহার স্থানে 'ট' উচ্চারণ করে। যাহা হউক, এই সৌর ব্রাহ্মণগণ পারস্য দেশে অনেকটা দীনহীন জীবন যাপন করিত। বৈদিক ভাষা শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে পারিত না বলিয়া ইহারা বৈদিক ধর্ম্মে ও বেদে অজ্ঞ ছিল সেজন্য আর্য্যগণও ইহাদিগকে ব্রাহ্মণের সম্মান দেন নাই।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে বা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে পারস্য হইতে পারদগণ (Parthians) আসিয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। সৌর ব্রাহ্মণগণ তাহাদের সহিত আসিয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিমে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এখনও কাশ্মীরের দক্ষিণে ও পঞ্জাবে ইহাদের বংশধরেরা আছে, কিন্তু তাহাদের ভাষা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক, তাহারা তথায় আর্য্যগণের নিকট যে সম্মান পান নাই ইহা প্রায় নিশ্চিত। এ দিকে পারদগণের রাজ্য বহিরাগত শকেরা অধিকার করিল, এবং তাহাদের নিকট হইতে রাজ্য অপর বহিরাগত জাতি কুষাণগণ কাড়িয়া লইলেন। কুষাণদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্‌ কণিষ্ক। তিনি বারাণসী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং পাটলিপুত্রের রাজা তাঁহার শাসন স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। যখন পূর্ব্বের রাজ্যগুলি এক সম্রাটের অধীন থাকায় যাতায়াত নিরাপদ হইল, তখন সৌর ব্রাহ্মণগণ ক্রমাগত পূর্ব্ব দিকে গমন করিয়া বিদেহের পথে বা মগধের পথে পৌণ্ড্র-রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পৌণ্ড্ররাজ্য উত্তরবঙ্গকে বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা উত্তরবঙ্গের পশ্চিমাংশ, অপর অংশ দ্রাবিড়দের অধিকারে ছিল। পৌণ্ড্ররাজ ইহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া স্বরাজ্যে বাস করিতে দিয়াছিলেন।

পৌণ্ড্ররাজ্য বিহারের পূর্ব্বসীমান্তে অবস্থিত এবং ইহার রাজা ও অধিবাসীগণ সকলেই বাঙালী। গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে পৌণ্ড্ররাজ্যে গোলযোগ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। রাজবংশের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ হইতেই হউক অথবা নূতন রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা হতেই হউক রাজবংশীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনেক সেনা-সামন্ত লইয়া পূর্ব্বদিকে নূতন রাজ্য স্থাপনের জন্য অভিযান করিলেন দেশের সৌর ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদানের ও নিরাপদে বাস করিবার আশা দিয়া অনেককেই সঙ্গে লইলেন। ইহার কারণ এই যে, নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে গেলে যে তাহার একাংশ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পূর্ণ করা প্রয়োজন, তাহার অন্য উপায় করিতে পারিলেন না। কারণ আর্য্য ব্রাহ্মণগণ একেই বঙ্গদেশে অল্প ছিল, এবং যাহারা ছিল তাহারাও এই অনিশ্চিত অভিযানের সঙ্গী হইতে চাহিল না। এই রাজার নাম কি তাহা জানা যায় নাই।

যাহা হউক, এই পৌণ্ড্ররাজার পূর্ব্ব দিক অভিযানে উত্তরবঙ্গের দ্রাবিড়গণ প্রবল বাধা দিয়াছিল। সেইজন্য তিনি কোথায়ও রাজ্যস্থাপন করিতে পারিলেন না। অবশেষে তেজপুরে গিয়া

রাজধানী স্থাপন করিলেন। তেজপুরের সন্নিকটে খোদিত প্রস্তরস্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে, ইহার নিকটে জঙ্গলের মধ্যে প্রস্তর-নির্ম্মিত নগরীরও ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের আর্য্যগণ এই ব্রাহ্মণদিগকে সঙ্গে লইয়া পরে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া কামরূপ আক্রমণ করেন এবং ক্রমে আসামের প্রায় সমগ্র উত্তরাংশ অধিকার করেন। কিন্তু দেখা যায় যে, তাঁহারা সিলং পাহাড় অতিক্রম করিয়া অথবা আসামের গভীর জঙ্গলের পথ দিয়া কাছাড়ের সিলচর ও সিলহট্ট অথবা মণিপুর আক্রমণ করেন নাই; সিলগণ ও মণিপুরীগণ ততদেশে স্বাধীন ছিলেন।

অতএব গণনা করিলে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশে যখন প্রথম আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার অন্ততঃ ৮০০ বৎসর পরে আসামে আর্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশ হইতে আগত আর্য্যজাতির ভাষাই অসমীয়া ভাষা; কিন্তু সৌরব্রাহ্মণদিগের দ্বারা তাহা বিস্তৃত হইয়াছে। সেজন্য আসামে পারসীকসুলভ উচ্চারণ দেখা যায়, ইহা ব্যতীত ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মা পার হইয়া বঙ্গদেশে যাতায়াত সহজ ছিল না বলিয়া ভাষা আরও কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

যদিও দ্রাবিড়গণ আর্য্যগণের প্রভাবে রাজ্য হারাইয়াছিল, তথাপি তাহাদের জাতিগত স্বাধীনতা আজ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতেছে। আর্য্যগণও ইহাদিগকে স্বকীয় সমাজ ও রীতিনীতি লইয়া থাকিতে দিয়াছেন। দ্রাবিড়গণ আপন আপন ভাষা রক্ষা করিয়াছে, যদিও তাহারা প্রাকৃত ভাষাও শিখিয়াছে।

কিন্তু দ্রাবিড় ও আর্য্যজাতির মধ্যে যে বহুল পরিমাণে মিশ্রণ হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। আসামে ব্রাহ্মণগণের বহু নারী দ্রাবিড়দিগকে বিবাহ করিয়াছিল এবং তাহাদের সন্তান আর্য্য-দ্রাবিড়-সম্ভূত। অসমীয়াগণ ইহাদিগকে সুতকুলিহা (সুতবংশীয়) বলিয়া ঘৃণা করেন আর বলিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল বলিয়া যেসকল বিধবা পুনরায় বিবাহ করিয়াছে, তাহাদের সন্তানগণ ঐ শ্রেণীর। কিন্তু ইহা প্রকৃত কারণ নহে। প্রাচীন আর্য্যসমাজে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, ইহার কোন অবিসম্বাদী প্রমাণ নাই। যখন বঙ্গদেশ হইতে কায়-বর্ত্তগণ আসামে আসিয়াছিল, তখন হইতে ইহারা আপনাদিগকে কায়-বর্ত্ত (বা কেওট) নামে পরিচয় দিত। প্রকৃতপক্ষে অনেক ব্রাহ্মণজাতীয়া নারীই স্বেচ্ছাক্রমে দ্রাবিড় বিবাহ করিয়াছিল কিন্তু মিশ্রণ এখানেই শেষ নহে। মুষ্টিমেয় আর্য্য-জাতি দ্রাবিড়গণের মধ্যে আসিয়া দ্রাবিড়সংমিশ্রণবিমুক্ত ছিলেন, ইহা আশা করা যাইতে পারে না। অনেকে দ্রাবিড়-কন্যা বিবাহ করিয়াছে এবং তাহাদের সন্তানগণ নামে আর্য্য হইলেও তাহাদের মধ্যে দ্রাবিড় ও আর্য্য এই উভয় রক্তই প্রবাহিত। ইহার জন্য দ্রাবিড়দিগের সহিত কোন বাদবিসম্বাদ হয় নাই। কারণ আর্য্যপ্রভাবমুক্ত দ্রাবিড়গণ স্ত্রীপ্রধান জাতি এবং তাহাদের মধ্যে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। কোন কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া তাহাদের নৈতিক ও সামাজিক বিধির প্রতিকূল। আর্য্য-অনার্য্য উভয় জাতির মিশ্রণের আর একটি রূপ দেখা যায়। মণিপুরীগণ হিন্দু বৈষ্ণব হইয়া এখন জাতিভেদ বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটি প্রথা আছে, কোন ব্যক্তি সর্ব্বজাতীয়া কন্যাকেই বিবাহ করিতে পারে. কেবল যাহারা সমজাতীয়া নহে, তাহাদের সঙ্গে আহার চলে না। এ প্রথা দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কিছুকাল পূর্ব্বেও ছিল। দ্রাবিড়-গণের মধ্যে জাতিভেদ নাই, তাহা হইলে মণিপুরীগণ কোথা হইতে এ রীতি পাইল? ইহা তাহারা অসমীয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল, ইহাই অনুমান হয়। ব্রাহ্মণগণকে যেখানে তাহাদের সংখ্যা অল্প সেখানে এই প্রথা বাধ্য হইয়া প্রচলন করিতে হইয়াছে। ইহাদ্বারাও আর্য্য ও দ্রাবিড় অনেক মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু দ্রাবিড়গণ যে একেবারে হিন্দুসমাজভুক্ত হয় নাই, ইহা বলা যায় না। আসামের গোস্বামীগণ অর্থের বিনিময়ে অনার্য্য-জাতিকে হিন্দু রাজবংশী সমাজভুক্ত করেন। কিন্তু বঙ্গদেশ হইতে আগত কায়-বর্ত্তগণ ইহাদের অপেক্ষাও সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে।

মোঙ্গোলীয়দিগকে সমতলভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়া কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গ ও আসাম দেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছে। আর্য্যগণের নিকট পরাজিত হইয়াও আর্য্যসমাজের সমকক্ষরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আপনা-দের স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই। আর্য্যগণের পরে ব্রহ্মদেশীয় আহোমগণ আসাম অধিকার করিয়াছিল, তখনও ইহারা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই। আহোমগণ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্রাবিড়গণ হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া শূদ্র ও দাস হইয়া থাকিবে এ কল্পনা সহ্য করিতে পারে নাই। ইহারা প্রভূত উন্নতি করিতে পারিত, কিন্তু একটি দোষই ইহাদিগকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করিয়া রাখি-য়াছে। ইহা অত্যধিক মদ্যপান। যদি ইহারা মদ্যপান পরিত্যাগ করিয়া উন্নতির চেষ্টা করে তবে ইহাদের উন্নতির বাধা দূর হইয়া যায়। এই দ্রাবিড়দিগের ধর্ম্ম কি ছিল? ঋগ্‌বেদে ইহারা লিঙ্গোপাসকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। লিঙ্গোপাসনা শৈবধর্ম্মের অন্তর্গত। এখন ইহারা নানা আকার হইয়াছে, তাহাতে শৈবধর্ম্ম ঠিক আছে কিনা বলা কঠিন। ইহারা দেবী উপাসনাও করিত, পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'কামাখ্যা' দেবী মূলে আসামের অনার্য্যদিগের দেবী। আহোমগণ যখন আসাম অধিকার করিয়াছিল এবং বহু দিন

প্রবল প্রতাপে আসাম শাসন করিয়াছিল তখন তাহারাও শিব ও শক্তির উপাসনা গ্রহণ করিয়া আসামে প্রচলন করিয়াছিল। কিন্তু এ ধর্ম্ম তাহারা কাছাড়ীদিগের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ-ভাবে গ্রহণ করে নাই, হিন্দুদিগের মধ্য দিয়া গ্রহণ করিয়া-ছিল। বৈদিক ধর্ম্মের কিছুই আসামে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কারণ ব্রাহ্মণগণ ছিলেন বেদে অজ্ঞ। যখন বাংলাদেশ হইতে বৌদ্ধ-ঘোষগণ গোয়ালপাড়ায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত বৌদ্ধাচার্য্যগণকেও লইয়া আসিয়াছিলেন। গোয়াল-পাড়ার সন্নিকটে পঞ্চরত্ন পাহাড়ে তাঁহারা বিহারও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার অনেক চিহ্ন আজও দেখা যায়। কিন্তু অনুমান হয় পর্ব্বত হইতে গারোগণ নামিয়া আসিয়া তাহা ধ্বংস করে এবং ঘোষগণের গোসম্পদ অপহরণ করিতে থাকে। ঘোষগণ এ অবস্থায় মেচগণের শরণাপন্ন হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করে। শঙ্করদেব আসামে ভাগবৎ ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি বিষ্ণুর অবতারত্ব ও দাস্য ভক্তি স্বীকার করিতেন। পরবর্ত্তীকালে অনার্য্যদিগকে আর্য্যদের সমাজে (রাজবংশী নামে) স্থান দিয়া গোস্বামীগণ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন, কিন্তু অর্থের সম্বন্ধ থাকায় ইহা ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। নবদ্বীপ ও শ্রীহট্টের গোস্বামীগণ চৈতন্যপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম মণিপুরে প্রচার করেন। ইহার ফলে সমগ্র মণিপুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হইয়া গিয়াছে।

এই সকল আলোচনা করিয়া মনে হয় অসমীয়া সমাজে দ্রাবিড় সভ্যতা ও দ্রাবিড় রক্ত প্রভূত পরিমাণে রহিয়াছে।

হিন্দু আমলে নারীর স্থান

শ্রীরঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ

আজকাল আমাদের দেশে আইনের সাহায্যে নারীর নানা অধিকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে। এই ধরণের সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা যে খুবই বেশী তা সবাই স্বীকার করবেন। এ সমস্যার মূল কথা হ'ল সাম্যের ভিত্তিতে পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধকে সহজভাবে মেনে নেওয়া। পাশ্চাত্য সমাজে এই নীতি কিছুদিন থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত, আমাদের সমাজে অবস্থাটা প্রায় উল্টো। বর্ত্তমানের বৈষম্যমূলক ও জটিল এই সমস্যা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করতে গেলে অতীতের নারী-সমাজ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

হিন্দু আমলের প্রথম যে যুগ তা হ'ল বেদ, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদের যুগ। একমাত্র এই সময়েই নারীর অবস্থা ছিল আদর্শস্থানীয়। তখনকার সমাজ ছিল সরল, স্বাভাবিক এবং জটিলতাবিহীন। কৃষিজীবী আর্য্যপুরুষেরা জীবনের সব ক্ষেত্রেই নারীর সহযোগিতা নিয়ে চলত এবং যুদ্ধবিগ্রহে তাদেরকে অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকতে হ'ত বলে নারীকে স্বাধীনতা দিয়েছিল তাদের ইচ্ছামত ঘরসংসার ও শিল্পকর্ম্মাদি গড়ে তুলতে। তা ছাড়া তখনকার যে-কোন ধর্ম্মকার্য্যে পুরুষ এবং নারীকে সমানভাবে যোগদান করতে হ'ত; কাজে কাজেই কুড়ি-বাইশ বছরের পূর্ব্বে নারীর বিবাহ হ'ত না। শিক্ষিতা নারী তার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকত; ফলে সমাজে অবাধ মেলামেশা, বিবাহের আগে যুবক-যুবতীর প্রণয়, বিধবার বিবাহ—এগুলিকে সহজভাবেই নেওয়া হ'ত। পর্দ্দার প্রচলন অথবা সতীপ্রথার কথা তখন কেউ ভাবতেও পারত না। স্বয়ংবর প্রথায় যেমন বিয়ে হ'ত, তেমনি বিবাহ-বিচ্ছেদও খুব সহজে ঘটতে পারত। স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল খুবই সন্তোষজনক এবং পুরুষদের মত নারীদেরও উপনয়নের পর থেকে নিয়মিত পাঠাভ্যাস করতে হ'ত। তার ফলে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গার্গী, মৈত্রেয়ীর মত বিদুষী মহিলার আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছিল। কেবলমাত্র একটি বিষয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি, সে হ'ল সম্পত্তিতে; নিজের বিয়ের যৌতুকাদি ছাড়া সমুদয়ই এমন কি প্রতিদিনের রোজগার পর্য্যন্ত পুরুষের হাতে তুলে দিতে হ'ত।

পরবর্ত্তী মহাকাব্য, সূত্র এবং স্মৃতির যুগে অবস্থার যথেষ্ট অবনতি ঘটল। এতদিনে আর্য্য-অনার্য্য সংমিশ্রণ অনেক দূর এগিয়েছে। আর্য্য-পরিবারে অনার্য্য স্ত্রী প্রবেশ করে এক মহা অনর্থের সৃষ্টি করল। অনার্য্য স্ত্রীরা যথেষ্ট শিক্ষাদীক্ষার অভাবে ধর্ম্মকার্য্যে পুরুষের সহায় হতে না পারায় তাদের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য-স্ত্রীরাও তাদের সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'ল। তা ছাড়া যাগযজ্ঞ, পূজা এই সময় এত বেশী জটিল আকার ধারণ করল যে, নারীদের পক্ষে পুরুষের সঙ্গে তাল রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। ক্রমশঃ যাজক সম্প্রদায় ধর্ম্মকার্য্যে নারীকে নামেমাত্র সহযোগিনী রেখে তার এতদিনকার অধিকার খর্ব্ব করল। তার ফলে নারীর শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজনীয়তা বহুল অংশে কমে গেল এবং উপনয়ন-প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হ'ল। শিক্ষার অভাবে নারীর অধিকার সম্বন্ধে চেতনা কমে গেল এবং তার বিয়ের বয়স কুড়ি-বাইশ থেকে নেমে এল ষোল, চৌদ্দ কিংবা বারোতে। আবার এতদিনে আর্য্যদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা পূর্ণ হবে উঠেছে, শান্তি সুখ দা'র

মধ্যে তাদের ভোগস্পৃহা বেড়ে যাওয়ার জন্যে তারা অল্প বয়সেই বিয়ে করা সুরু করল। অল্প বয়সে সংসারে ঢোকার ফলে নারী স্বভাবতই পুরুষের অধীন হয়ে পড়ল। বহুবিবাহ আরম্ভ হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্দাও এসে পড়ল। এ যুগে সন্ন্যাসধর্মের বহুল প্রচারের ফলে সতীপ্রথা ও আজীবন বৈধব্যের আদর্শও প্রসারলাভ করল। এইভাবে কুপ্রথাগুলি ক্রমে ক্রমে এসে জুটল এবং পুরুষের নিকট নারীর অধীনতার গোড়াপত্তন হয়ে গেল। কেবলমাত্র সম্পত্তিতে নারীর অধিকার এ যুগে কতকটা এগিয়েছিল, কেননা উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া সম্পত্তিতে সে জীবনস্বত্ব লাভ করল।

এর পর এল মৌর্য্য আমল। মেগাস্থিনিসের বিবরণী এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে যা জানা যায় তাতে দেখি অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। বাল্য-বিবাহ ও বহু-বিবাহ দুই-ই সমানে চলতে লাগল; ফলে নারী শোচনীয় ভাবে পরাধীন হয়ে পড়ল। শিক্ষাব্যবস্থা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকল উচ্চবংশীয়াদের মধ্যে এবং তাতে ফল এই হ'ল যে, সাধারণ নারী হয়ে পড়ল বড় বেশী আচারপরায়ণা এবং সংস্কারাচ্ছন্না। মহারাজা অশোক তাঁর এক শিলাশাসনে আক্ষেপ করেছেন যে, নারীরা অযথা কতকগুলি তথাকথিত মঙ্গল আচরণে ব্যস্ত থাকে যার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সংশ্রব নাই। তখনও বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রচলন ছিল এবং বিধবাদের বিয়েও কিছু কিছু হ'ত। তা সত্ত্বেও দুর্নীতির প্রশ্রয় এযুগে এসে পড়ল এবং আইন করে পতিতালয়গুলি নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা করতে হ'ল। তবে সম্পত্তিতে অধিকার আগের মতই বজায় রইল এবং মোটামুটিভাবে নারীর সম্মান অক্ষুন্ন থাকল। কৌটিল্য লিখে রাখলেন তাঁর অর্থশাস্ত্রে—যেখানে নারীর অসম্মান করা হয় সেখানে দেবতারা অসন্তুষ্ট হন।

পরবর্ত্তী যুগে বা হিন্দু আমলের শেষ পর্ব্বে নারীর স্থান পূর্ণভাবে পুরুষের অধীন হয়ে পড়ল। গ্রীক-কুষাণ ও গুপ্তযুগে সংহিতা লেখকেরা ও ব্যাখ্যাকারেরা নারীকে পুরোপুরিভাবে পুরুষের কর্ত্তৃত্বের মুঠোর ভিতর এনে দিল। বিয়ের বয়স কমিয়ে করা হ'ল আট কিংবা নয়। অশিক্ষিতা বধূ হিসাবে নারী পুরুষের সহকর্ম্মিণী অথবা সহধর্ম্মিণী হবার অনুপযুক্ত হয়ে রইল। জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত ভাণ্ডার তার কাছে বন্ধ হয়ে রইল—গাথা, গল্প, পুরাণ বা উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে অতীতের শ্রুতিরোচক কাহিনীই হ'ল তার মনের এক-মাত্র উপজীব্য। তাতে অন্ধভক্তি, ভাবকতা ও কুসংস্কার বাড়তে থাকল। বিধবা-বিবাহ নিষেধ ও বহুবিবাহের বহুল প্রচলন নারী-সমাজকে ঠেলে দিল নানা অনাচারের পিচ্ছিল পথে। এর উপর মনু প্রমুখ কয়েকজন শাস্ত্রকার নারী-পুরুষের সম্বন্ধকে বিকৃত করে দেখালেন। তাঁরা জোর গলায় ঘোষণা করলেন যে নারীর স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা থাকা উচিত নয়—সে বাল্যে থাকবে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের। স্ত্রী স্বামীকে দেবতার মত পূজা করবে, তার সমস্ত কথা শুনবে ও মেনে চলবে এবং স্বামীর মৃত্যুর পর সহমরণে প্রাণত্যাগ করবে—এই হ'ল নারীর জন্য ব্যবস্থা। কোন স্ত্রীর সন্তান না হলে অথবা সব সন্তান মরে গেলে এমন কি তার শুধু কন্যা হলেও তাকে ত্যাগ করে তার স্বামী আবার বিয়ে করতে পাবে, পুরুষকে সে অধিকার দেওয়া হ'ল। যদিও মনু নারীর সম্মানকে অতি উচ্চে স্থান দিলেন তবু স্পষ্ট ভাবেই তাকে পুরোপুরি পুরুষের করতলগত করে দেওয়া হ'ল।

একথা আজকাল সবাই স্বীকার করবেন যে, যে সমাজে নারীর স্থান যথাযোগ্য নয় সে সমাজ-ব্যবস্থা ক্রমাবনতিশীল এবং ক্ষয়িষ্ণু। হিন্দু আমলের শেষ পর্ব্বে এই ভাবে নারীর স্থানকে হেয় করার জন্যই হিন্দুর জাতীয় শক্তি দুর্ব্বল হয়ে পড়ে এবং মুসলমানদের ভারত-বিজয় সহজেই সম্ভব হয়। বৃটিশ শাসনের যুগে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা বুঝেছি যে একমাত্র শিক্ষা ও সংযমের গভীর ভিতরে নারীকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে গেলে তার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে পুরুষ ও নারীর সহযোগিতায়, নারী সেখানে থাকবে পুরুষের সহকর্ম্মিণী ও সহধর্ম্মিণী হিসাবে,—তার অনুগতা কৃপাপাত্রী হয়ে নয়। জগতের প্রগতিশীল সব দেশেই তাই হচ্ছে, আমাদের দেশেও যথাশীঘ্র তাই হওয়া উচিত।

বাসি ফুল

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

আজ দিনকয়েক হইল সুধীর বাড়ী আসিয়াছে। সেদিন বিকালবেলা তাহার মা তাহার কাছে আসিয়া বলিলেন—আমার বড় ইচ্ছে হয়েছে সুধীর—আমাকে যদি একবার বাবা এই পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর ঘুরিয়ে আনতিস। সুধীর উৎসাহিত হইয়া বলিল—বেশ ত চল মা। আমারও ভারি ইচ্ছে—সাগর তো কখনও দেখি নি—এবার দেখে আসা যাবে। তাহার মা বলিলেন—তা হলে তো আর দিন নেই—আজ হ'ল দশমী, পরশুই যাত্রা করতে হবে।

—বেশ, তুমি গোছগাছ কর—বেশী কিছু কিন্তু নিয়ো না—যে ভিড় শুনেছি, পথে খুব কষ্ট হবে। আর দেখ মা, তুমি কিন্তু আগে থাকতে কারু কাছে গল্প করো না—তা হলে এবারও সেই কাশী যাবার বারের মত বার-চোদ্দ জন মেয়েছেলে এসে জুটবে।

সুধীরের মা বলিলেন—না বাবা, গল্প আবার করব কাকে? তুই নিশ্চিন্দি থাক।

কিন্তু সন্ধ্যার আগে বোসেদের বাড়ীর নিস্তারিণী ঠাকুরাণী বেড়াইতে আসিলে তাঁহাকে বলিলেন—শুনেছ ঠাকুরঝি, সুধীর আমাকে গঙ্গাসাগরে নিয়ে যাচ্ছে—এই তো পরশু আমরা রওনা হচ্ছি। মৈত্রবাড়ীর বড়বউ ঘাটে যাইতেছিল—তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—কি বউ একেবারে যে ভরসন্ধ্যে বেলা ঘাটে যাচ্ছ। বড়বউ কি যেন বলিতে যাইতেছিল—তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—এবার বুঝি বাবা কপিলমুনি দয়া করেছেন—পরশু আমি আর সুধীর সাগরস্নানে যাচ্ছি।

পরের দিন পাড়াময় কাহারও আর খবরটা জানিতে বাকী রহিল না। বিকালবেলা তারিণী মাঝির স্ত্রী আসিয়া ধরিয়া বসিল—দিদি ঠাকরোন, এবার আমাকে আর সহকে সঙ্গে নিতে হবে—তা নইলে কিছুতেই ছাড়ব না। সেবার আপনারা কাশী গেলেন—আমার ভাগ্যে ঘটল না। এবার কিন্তু মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতেই হবে।

সুধীরের মা বলিলেন—তাই তো সহর মা—সুধীর রাজী হলে ত হয়। আচ্ছা যাও এখন, দেখি বলে কয়ে—সন্ধ্যেবেলা এস। বিকালবেলা সুধীর বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিলে বলিলেন, বুঝলি সুধীর, তারিণী মাঝির বউ এসে কত করে ধরেছে—তাকে আর তার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আমি কিছু বলি নি বাবা—তুই যা বলিস তাই হবে।

সুধীর বিরক্ত হইয়া বলিল—তোমাকে ত আগেই নিষেধ করেছিলাম মা, যে আগে থাকতে কাউকে কিছু বলো না। আজ দেখি সারা গাঁময় সব্বাই জেনে ফেলেছে। মিত্তির-বাড়ীর পিসি, রমেনের মা বাবা যাবেন বলে ধরেছেন। এখন কাকে রেখে কাকে নেওয়া যাবে। চলুক সবাই—শেষটায় ভুগে মরতে হবে আমাকেই। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু তার মেয়ে যাবে বললে মা—তার মেয়ে তো—তার মেয়ে সৌদামিনী—সে যে আজ বছর দুই হ'ল বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী এসেছে।

পরের দিন বিকাল বেলা সুধীর জন ছয়েক যাত্রী সঙ্গে করিয়া কলিকাতার গাড়ীতে চাপিয়া বসিল।

২

পনর বছর বয়সে ভাল ঘর দেখিয়া সৌদামিনীকে তার বাবা বিবাহ দিয়াছিল। কিন্তু কয়টা মাস যাইতে না যাইতেই প্রকাশ পাইল সৌদামিনীর স্বামী সুবলের মূর্চ্ছা রোগ আছে। হঠাৎ সে কখনও কখনও অজ্ঞান হইয়া পড়ে—মুখ দিয়া ফেনা উঠে, সারা শরীর খিঁচাইতে থাকে।

সংবাদ পাইয়া তারিণী মাথায় হাত দিয়া বসিল—অনেক খরচপত্র করিয়া একমাত্র মেয়েকে বিবাহ দিয়াছিল, শেষে তাহার অদৃষ্টে এই হইল! মাস দুই পরে হঠাৎ এক দিন ভেদবমি হইয়া তারিণী ইহলোক ত্যাগ করিল। আরও কিছুদিন পরে তাহাদের বাড়ীর পাশের নদীটিতে সুবল নৌকা করিয়া কোথায় যেন যাইতেছিল—আর ফিরিয়া আসিল না। পরের দিন নদীর বাঁকের চড়ায় তাহার মৃতদেহ ভাসিতে দেখা গেল। ইহার মাস তিনেক পরে সৌদামিনী তাহার মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে—আর শ্বশুরবাড়ী যায় নাই। তারিণীর অবস্থা বেশ ভালই ছিল—খান দুই মাছ ধরার নৌকা—বেড়াজাল যাহা ছিল, তাহা খাটাইয়া সৌদামিনী আর তার মায়ের বেশ সচ্ছল ভাবেই দিন চলিয়া যাইত। তা ছাড়া তারিণী নগদ টাকাও কিছু রাখিয়া গিয়াছিল।

কলিকাতার গঙ্গার ঘাট হইতে তাহারা শেষ রাত্রে ষ্টীমারে চড়িল। সে কি ভিড়। সকলের আগে সুধীর, তাহার পিছনে পিছনে এক এক জন অন্যের কোমরের কাপড় ধরিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে ষ্টীমারের দিকে অগ্রসর হইল। ষ্টীমারটির দুই পাশে দুইখানি গাধাবোট জুড়িয়া দেওয়া, তাহারই একটিতে সুধীর জায়গা করিয়া লইল।

সৌদামিনী কখনও শহর দেখে নাই। কলিকাতা নগরী প্রথমেই তাহাকে একেবারে অবাক করিয়া দিল—তারপর ষ্টীমারে চড়িয়া গঙ্গার উপর দিয়া এই যে গাদা গাদা লোক যাইতেছে—ইহা আরও আশ্চর্য্য! ডায়মণ্ড হারবারের পরে সে ভাবিল এই কি সমুদ্র? কোন দিকেই কূলকিনারা ত

চোখে পড়ে না। সব চাইতে বিস্ময় তাহার কাছে সুধীর দাদাবাবু। এত সবও জানে দাদাবাবু—কোথা হইতে কি সুবিধা আদায় করিতে হয়, কেমন করিয়া টিকেট কাটিতে হয়, জাহাজে চড়িতে হয়, আরও সব নানা প্রকারের ব্যবস্থা—সব যেন একেবারে দাদাবাবুর মুখস্থ। সৌদামিনী ভাবে—আচ্ছা হঠাৎ যদি দাদাবাবু এখন তাহাদের ফেলিয়া কোথাও চলিয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের এই ছয়টি প্রাণীর কি গতিই না হইবে। তাহারা সকলে মিলিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির হওয়া ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিবে না। ষ্টীমারের ভিতর চলিবার সময় পাশের এক যাত্রীর একটা পোঁটলায় বাঁধিয়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল সৌদামিনী—সঙ্গে সঙ্গে সুধীরের ধমক খাইয়াছিল সে। লজ্জায় মরিয়া গিয়াছিল সৌদামিনী। পরে খুব মিষ্টি করিয়া দাদাবাবু বলিয়াছিলেন, পথ দেখে চলতে হয়—এমনি করে কি পথে-ঘাটে চলা যায়, এখনই তো হাত পা ভাঙতে পারত। ধমক দিলে কি হইবে—সৌদামিনীর কোন দুঃখ হয় নাই। দাদাবাবুর সকলের উপরে কি সতর্ক দৃষ্টি!

সারারাত্রি ডায়মণ্ড হারবারের কাছে ষ্টীমার নোঙর করিয়া থাকিয়া সকালে আবার চলিতে আরম্ভ করিল। বেলা গোটা বারোর কাছাকাছি গঙ্গাসাগরে আসিয়া পৌঁছিল। ষ্টীমার হইতে নামা এখন এক সমস্যা! ষ্টীমার তো একেবারে কূলের কাছে যাইতে পারে না, কাজেই ষ্টীমারের গায়ে অসংখ্য ভাড়াটে নৌকা আসিয়া লাগে, সেই নৌকায় চড়িয়া তীরে যাইতে হয়। এদিকে সমুদ্রের ঢেউয়ে ষ্টীমারের ডেকের তিন-চার হাত নীচের নৌকাগুলি কলার খোলার মত অনবরত দুলিতে থাকে—তাকাইলেই ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যায়। কেমন করিয়া নামিবে সকলে! সুধীর ধরাধরি করিয়া সকলকে নামাইয়া দিল—অবশেষে সৌদামিনীর পালা—সুধীর চট্ করিয়া তাহার দুইখানি হাত ধরিয়া ঝুপ করিয়া নৌকার উপরে ছাড়িয়া দিল। কি নরম অথচ জোরালো হাত দাদাবাবুর। সে একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল।

সাগরসঙ্গমের চড়ার উপরে নামিয়া—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! শুধু বালি আর বালি। এই বালির চড়ার উপরে কত যে যাত্রী আসিয়া হাজির হইয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে! এই বালির উপরে দুইখানা করিয়া হোগলার দরমা ফেলিয়া দিব্যি একটি কুঁড়েঘরের মত করিয়া যাত্রীরা তাহারই তলায় দুই এক দিনের জন্য সংসার পাতিয়া বসিয়াছে। এক একটি এমনি ঘরে বড়জোর দুই জন করিয়া লোক শুইতে পারে—হামাগুড়ি মারিয়া ভিতরে ঢুকিতে হয়। সৌদামিনী যে দিকে তাকায় সে দিকেই এমনি অগুনতি হোগলার ঘর। সুধীর কতকগুলি হোগলার দরমা কিনিয়া আনিল—তাহাদের চারখানা এমনি ঘর তৈরি হইল। একখানায় দাদাবাবু আর তার মা, অন্য দুইখানায় আর কয়জন, আর একখানা সৌদামিনী আর তার মায়ের জন্য ঠিক হইল। বালির উপরে বিছানা করিয়া শুইতে দিব্যি ভাল লাগিতেছিল সৌদামিনীর। তাহাদের সামনের ঘরটিতেই দাদাবাবু আর তাঁর মা থাকেন—একেবারে পাশাপাশি, হাত দুই দূর মাত্র। আগামী কল্য শেষ রাত্রি হইতে স্নান আরম্ভ হইবে, স্নান সারিয়া কপিলমুনি দর্শন, তারপর সারা মেলা ঘুরিয়া নানাপ্রকারের মূর্ত্তি দেখা—শত শত সাধু, কেহ বা লম্বা জটাওয়ালা—গায়ে ছাই মাখা, কেহ সামনে ধুনী জ্বালিয়া, কেহ চিৎ হইয়া চোখ বুঁজিয়া এই বালির উপরে পড়িয়া আছে—তাঁহাদের দর্শন করা আর দুই একটি করিয়া পয়সা দেওয়া। বালির উপরে উনুন খুঁড়িয়া, সঙ্গে আনা খাপরাতে চাল-ডাল মিশাইয়া খিচুড়ী পাক করিয়া লইল তাহারা। সুধীর শালপাতা কিনিয়া আনিল, সেই শালপাতা বালির উপরে পাতিয়া লইয়া তাহাতে খিচুড়ী ঢালিয়া খাইতে হইল। একেবারে বালির রাজত্ব—জামায়, কাপড়ে, গায়ে, ভাতে সব জিনিষেই কেবল বালি। শালপাতা ফুঁড়িয়া বালি উঠিয়া পাতের ভাত সব একাকার করিয়া দিতে চায়। বেশ মজা লাগিতেছিল সৌদামিনীর।

পরের দিন এক কাণ্ড করিয়া বসিল সে। শেষ রাত্রে উঠিয়া সকলে সাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া কপিলমুনি দর্শন করিতে গেল। কপিলমুনির ঘরটির কাছাকাছি সে কি ভিড়! সেই ভিড়ের ভিতরে সৌদামিনী হঠাৎ এক সময় বুঝিতে পারিল সে হারাইয়া গিয়াছে। সে তাহার মায়ের কাপড় ধরিয়া ছিল—কখন কাপড় ছাড়িয়া দিয়াছে, কখন তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহা জানিতেও পারে নাই। প্রথমে সেই জনসমুদ্র ঠেলিয়া যে দিকে খুশী ছুটাছুটি করিল—চীৎকার করিয়া ডাকাডাকি করিল, শেষে কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া ক্রমে ক্রমে এক-পাশে, যেখানে একটু ভিড় কম সেখানে দাঁড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কোথায় যাইবে সে? তাহাদের হোগলার ঘরগুলা যে কোন্ দিকে—সে কোন-মতেই তাহা ঠাহর করিতে পারিল না। তাহাদের দল যে কতদূর অগ্রসর হইয়া গেল তাহাও বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ এমনি কাটিবার পর একজন লোক তাহার নিকটে আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, আপনি কি হারিয়ে গেছেন? সৌদামিনী কোনক্রমে জবাব দিল—হাঁ।

—আমার সঙ্গে আসুন—আমাদের আপিসে যেতে হবে, সেখান থেকে খোঁজ করে আপনার ঠিকানায় পৌঁছে দেব। সৌদামিনী লোকটির কথা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিল না—অনেক দ্বিধা ও সঙ্কোচের পর তাহার সহিত চলিতে লাগিল। কাছেই তাহাদের আপিস। কয়েকজন মিলিয়া তাহাকে প্রশ্ন

করিতে লাগিল—সঙ্গে কে কে আছে? কেমন করে হারিয়ে গেলেন? আপনাদের বাসা কোন্ দিকে কিছু ঠাহর করতে পারেন? পুষ্করিণীর কোন্ দিকে ছিলেন? ঐ যে লাল নিশান উঠছে ঐ দিকে কি আপনাদের বাসা? সৌদামিনী কোন প্রশ্নেরই ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারিল না।

অবশেষে একজন স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে তাহাকে দিয়া আপিস হইতে বলিয়া দিল—এর সঙ্গে যান, সারা মেলা ঘুরে ঘুরে ঠিক করুন কোথায় আপনাদের বাসা। সেই স্বেচ্ছাসেবকটির সহিত সৌদামিনী আপিস হইতে বাহির হইতেছে এমন সময় সে চেঁচাইয়া উঠিল—ঐ যে দাদাবাবু—ঐ—। ততক্ষণে সুধীর আগাইয়া আসিল। সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল, তুমি তারি অসাবধান সৌদামিনী, তোমার জন্যে সকলে তো মহা চিন্তিত, তোমার মা তো একেবারে কেঁদে-কেটে অস্থির। কেমন করে হারিয়ে গেলে বল ত? সৌদামিনী জবাব দিল, যা ভিড়, হাতের কাপড় কখন ছুটে গেল ঠিক পাই নি। আবার সেই কপিলমুনির মন্দিরের কাছ দিয়া ভিড়ের মধ্যে সৌদামিনী ক্রমাগত পিছাইয়া পড়িতেছে দেখিয়া, সুধীর ডান হাত দিয়া তাহার একখানি হাত শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া পথ করিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ভিড় অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিয়া সুধীর যখন তাহার হাত ছাড়িয়া দিল, তখন সে লজ্জা ও সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গিয়াছে।

তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই—আকাশের পশ্চিম প্রান্তে পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতেছে। সমুদ্রের একেবারে তীর ঘেঁষিয়া চলিয়াছিল তাহারা—সমুদ্রের অশ্রান্ত গর্জ্জন আর যাত্রীদের কোলাহলে সারাটা জায়গা মুখরিত হইতেছিল। সুধীর বলিল, তোমার মত আনাড়ী লোককে কি কখনও তীর্থস্থানে আনতে হয়! তীর্থে এসে এত লজ্জা আর সঙ্কোচ করলে পায়ে পায়ে বিপদ।

সৌদামিনী হাসিয়া বলিল, আনাড়ী লোক বলেই ত আপনার সঙ্গে এসেছি, অন্য কেউ হলে কি মা আমাকে নিয়ে আসত?

নিজেদের বাসার কাছে আসিয়া সুধীর ডাকিয়া বলিল, এই যে সৌদামিনীর মা, তোমার মেয়েকে ফিরিয়ে এনেছি দেখ।

সাগরস্নান সারিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া সৌদামিনীর মনে হইল—আহা, এ যেন সাতটা দিনের একটা মধুর স্বপ্ন! সারাটা জীবন ধরিয়াই যদি এমনি সাগরস্নান চলিত!

৩

কয়েক দিন পরে সুধীর কলিকাতায় চলিয়া গেল। সৌদামিনীর কিন্তু আর কিছুতেই মন টিকিতেছিল না। নিজেদের বাড়ীর দাওয়ায় বসিয়া ক্ষণে ক্ষণে তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল সাগরসঙ্গমের সেই দৃশ্য। সেই উন্মুক্ত আকাশতলে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল জল আর জল—সেই সমুদ্রের অশ্রান্ত গর্জ্জন—সেই জনসমুদ্রের কোলাহল, সেই বালির উপরে বাসা বাঁধিয়া দাদাবাবুদের সহিত এক সঙ্গে থাকা, ষ্টীমার রেলগাড়ীতে ঠেলাঠেলি করিয়া স্থান করিয়া লওয়া। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া সে যেন অন্ধকূপের ভিতরে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমে বাঁশের ঝোপ, দক্ষিণে কলাবাগান, পূর্ব্বে সুপারি বাগান-ঘেরা এই সুন্দর বাড়ীখানি যেন তাহার নিকট আজ একেবারে বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সময় সময় সে সুধীরের মায়ের নিকটে গিয়া বিনা কারণে বসিয়া থাকে। সেদিন বলিতেছিল, আবার যদি কোথাও তীর্থ করতে যান খুড়ীমা, আমাকে আর মাকে কিন্তু সঙ্গে নিতে হবে। সুধীরের মা বলিলেন, সুধীরের ত ইচ্ছে একবার পুরী যায়—গঙ্গাসাগরের সমুদ্র দেখে নাকি তার মন ভরে নি। দেখি, মহাপ্রভু যদি টানেন তবে আষাঢ় মাসে শ্রীক্ষেত্র যাব ইচ্ছে আছে। সেইদিন হইতে সৌদামিনী দিন গুনিতে থাকে কবে আষাঢ় মাস আসিবে, কবে দাদাবাবুদের সঙ্গে আবার শ্রীক্ষেত্রে যাইতে পারিবে।

মাস দুই পরে হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে সৌদামিনীর মা ইহলোক ছাড়িয়া গেল। সৌদামিনী এবার একেবারে একা। নিকটেই দূরসম্পর্কের তাহার এক মাসির বাড়ী। মাসির আর কেহ ছিল না, তাহাকেই সৌদামিনী নিজের বাড়ী আনিয়া রাখিল।

সৌদামিনীর বয়স এই সবে উনিশ। সুন্দরী বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। সেদিন তাহার মাসি কথায় কথায় বলিতেছিল, বুঝলি সদু, এমনি করে আর কত কাল থাকবি, সারাটা জীবনই ত পড়ে আছে। বিধবার বিয়ে ত আজকাল আমাদের সমাজে চলছে, যদি মত করিস—বল। ও পাড়ার কেষ্ট মাঝির ছেলে ত এক পায়ে খাড়া। তুই কেবল মত করলেই হয়। তার অবস্থাও ত ভগবানের ইচ্ছেয় খারাপ নয়—দুই-এক'শ খরচ করতেও রাজী আছে।

সৌদামিনী চোখ পাকাইয়া জবাব দিয়াছিল, এইজন্যে বুঝি তোমার রোজ রোজ ঐ পাড়ায় যাওয়া হয় মাসি। সে দিন যে এতগুলো তামাকপাতা আর পান নিয়ে এলে, ওগুলো কেষ্ট মাঝির ছেলে ঘুষ দিয়েছিল বুঝি। অমনি যদি কর, আমার বাড়ীতে তা হলে আর জায়গা হবে না কিন্তু মনে রেখ।

মাসি আর কোন কথা বলে নাই, ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া গিয়াছিল।

বিকালবেলা সুধীরের মায়ের কাছে দাওয়ার উপরে সৌদামিনী বসিয়াছিল—এমন সময় ডাকপিয়ন আসিয়া একখানা চিঠি দিয়া গেল। খামখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া সুধীরের মা বলিলেন—সুধীর লিখেছে। খামখানা খুলিতেই তাহার ভিতর হইতে খানকয়েক ছোট ছোট ছবি বাহির হইয়া পড়িল! তাড়াতাড়ি সুধীরের মা ছবিগুলি তুলিয়া লইয়া বলিলেন—সুধীরের ফটো, দেখবি সদু—বলিয়া তাহার হাতে ফটো কয়খানি দিয়া চিঠি পড়িতে মন দিলেন। সৌদামিনী সতৃষ্ণ নয়নে ফটোগুলি দেখিতে লাগিল—চারখানা চার ধরণের ছবি—কোনখানিতে সে হাসিতেছে—কোনখানিতে ডাক্তারী কোট প্যাণ্ট পরিয়া ষ্টেথেস্কোপ হাতে করিয়া, কোনখানিতে খালি গায়ে দাঁড়াইয়া আছে। সুধীরের মা ফটোকয়খানি তাহার হাত হইতে লইয়া খামের ভিতরে পুরিয়া পঞ্জিকার ভাঁজের মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিয়া বলিলেন—তুই একটু বোস সদু—আমি দুধের কড়াটা তুলে রেখে আসি।

সৌদামিনীর হঠাৎ কি বুদ্ধি হইল—তাড়াতাড়ি পঞ্জিকাখানা খুলিয়া খামের ভিতর হইতে একখানি ফটো বাহির করিয়া নিজের বুকের কাপড়ের ভিতরে লুকাইয়া ফেলিয়া—আবার তেমনি করিয়া খামখানা পঞ্জিকার ভিতরে রাখিয়া দিল।

আষাঢ় মাসে কিন্তু সুধীর বাড়ী আসিল না—তাহার মাও নানা কাজের চাপে শ্রীক্ষেত্রে যাইবার কথা ভুলিয়া গেলেন। শুধু ভুলিল না সৌদামিনী। সুধীরের মাকে অনেকবার স্মরণ করাইয়া দিয়া—অনেক তাগিদ দিয়া অবশেষে রথযাত্রা বাহির হইয়া গেলে নিরস্ত হইল।

পূজার সময় সুধীর বাড়ী আসিবে। তাহাদের গ্রাম রেল ষ্টেশন হইতে মাইল দেড়েক পথ। এই পথেরই আধ মাইলটাক জায়গা এমনই খারাপ হইয়া গিয়াছে যে, কার্তিক মাস পর্য্যন্ত সেখানে এক হাঁটু জল আর কাদা জমিয়া থাকে—সকলেরই আসিতে যাইতে বড় কষ্ট হয়—তবু কেহ মেরামত করিবার নামটি পর্য্যন্ত করে না। সুধীরেরও আসিতে খুব কষ্ট হইবে—তাহাই সুধীরের মা বলিতেছিলেন। সুধীর ষ্টেশনে আসিতে যাইতে কষ্ট পাইবে—এই কথাটা বারে বারে, ঘুরিয়া ফিরিয়া সৌদামিনীর মনে বিঁধিতেছিল। পরের দিন সুধীরের মায়ের নিকটে গিয়া বলিল—একটা কথা খুড়ীমা—কাল আপনি পথের কথা বলছিলেন না—আমার ইচ্ছে যদি তিন-চারশ' টাকার ভিতরে হয় তা হলে পথটা আমিই মেরামত করে দেই। দাদাবাবু এলে আপনি শুনে রাখবেন—কত টাকা লাগবে। শুনিয়া সুধীরের মা একেবারে অবাক হইয়া গেলেন, বলিলেন—এত টাকা তুই পাবি কোথায় সদু—আর কেনই বা দিতে যাবি? সৌদামিনী বলিল—টাকা আমার আছে খুড়ীমা—মা মারা গেলে গুনে দেখলাম আটশ' টাকা তার বাক্সে ছিল। কি হবে আমার টাকা দিয়ে—কার জন্যে রেখে যাব। তবু তো একটা ভাল কাজে খরচ হবে। সুধীরের মা দুঃখের সঙ্গে বলিলেন—তোর কথা শুনে কষ্ট হয় মা—এই কাঁচ বয়স অথচ সব সাধ-আহ্লাদই তোর শেষ হয়ে গেছে। সুধীর বাড়ী আসিয়া শুনিয়া বলিল—তুমি বল কি মা, একটা অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে মেয়ে—তার এত বড় হৃদয়! গ্রামে কিন্তু কত বড় বড় লোক রয়েছে তারা কেউ কথাটি বলে না।

সুধীরের মা বলিলেন—মেয়েটি বড় ভাল বাবা!

সেবার তিনশ' টাকা খরচ করিয়া রাস্তাটি মেরামত হইয়া গেল।

৪

বৎসরখানেক পরের কথা। সুধীর ডাক্তারী পাস করিয়া গ্রামে আসিয়া বসিয়াছে। এবার আত্মীয়স্বজন তোড়জোড় করিয়া তাহার বিবাহের জন্য লাগিল। কয়েক স্থানে মেয়ে দেখার পর অবশেষে একস্থানে পাকা কথা হইয়া গেল। শহুরে মেয়ে। বৈশাখ মাসেই বিবাহ। সুধীরের মা সে দিন সৌদামিনীকে বলিলেন—বিয়ের সব বাইরের কাজের ভার কিন্তু তোর ওপরে রইল সদু—একা মানুষ নইলে তো আমি পারব না, মা। সৌদামিনী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। বিবাহের পর সুধীর বউ লইয়া বাড়ী আসিয়াছে। লোকের মুখে মুখে বউয়ের খুব সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল—খুব ভাল বউ—খুব সুন্দরী বউ। আজ বউভাত—বাহিরের উঠানে ব্রাহ্মণভোজন চলিতেছে। সৌদামিনী একগাদা বাসনকোসন লইয়া উঠানের এক পাশে মাজিতে বসিয়াছিল—কি কাজে যেন বউয়ের ঘরের দিকে আসিয়াছে—বউয়ের কাছে তখন কেউ ছিল না। সেদিকে নজর পড়িতেই সৌদামিনী দেখিল—নূতন বউ তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। সৌদামিনী আগাইয়া গেলে ব'লল—তুমি বুঝি এ বাড়ীর ঝি। দেখ আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। আমার ঐ জুতোজোড়াটা যদি জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিতে পার—কাল কাদায় পড়ে দামী জুতোজোড়া একেবারে বিশ্রী হয়ে গেছে। সৌদামিনী কোন জবাব না দিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল—নূতন বউ পুনরায় ডাকিয়া বলিল—শোন, রাগ করলে? কেন, আমাদের বাড়ীতে তো ঝি চাকরে এমনি সব কাজ করে থাকে। সৌদামিনী আর দাঁড়াইল না। পুনরায় বাসনে হাত দিয়া সে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সকলের অলক্ষ্যে হাত ধুইয়া নিজের বাড়ী চলিয়া আসিল। রাত্রে সুধীরের মা তাহাকে আহারের জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন—কিন্তু সে শরীর খারাপ করিয়াছে বলিয়া গেল

মা—সেই যে সুধীরদের বাড়ী হইতে আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল আর উঠিল না, সারা রাত্রির ভিতরে জলটুকু স্পর্শ করিল না।

৫

সৌদামিনীর দিন আর কাটিতে চাহে না। সংসার তাহার নিকটে একেবারে নিরর্থক হইয়া গিয়াছে—এখানে সে এতটুকু আনন্দ খুঁজিয়া পাইতেছে না। এ জীবনে তাহার মূল্য কি? কি হইবে এমনি করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া।

একবার সৌদামিনীর মাসির খুব জ্বর হইল। কয়েক দিন ধরিয়া সুধীর তাহাকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল। হাত দেখিয়া, বুক দেখিয়া ইনজেক্‌শান দিতে প্রতিবারেই সুধীরের প্রায় ঘণ্টাখানেক করিয়া সময় লাগিত। সৌদামিনী মহা উৎসাহে ইনজেক্‌শানের জন্য জল গরম করিয়া দিত, হাত ধুইবার জল দিত—পথ্যাপথ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিত। কয়েকদিনের মধ্যে তাহার মাসি ভাল হইয়া উঠিল। সুধীরের আর আসিবার প্রয়োজন নাই—সৌদামিনীর দিন আবার আগের মত বিস্বাদ হইয়া গেল। হঠাৎ কোন কোন সময় তাহার অজ্ঞাতে মনে হইত—এত তাড়াতাড়ি তাহার মাসি ভাল হইয়া উঠিল কেন?

কয়েক দিন ভাবিয়া ভাবিয়া এক দুর্বুদ্ধি আসিল সৌদামিনীর মাথায়। কার্ত্তিক মাসের দিনে সে প্রত্যহ তিন-চার বার করিয়া স্নান করিতে লাগিল—রাত্রে অনেকক্ষণ ধরিয়া হিমের ভিতরে পাটি পাতিয়া শুইয়া থাকিত। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিকে কয়েক দিন অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল—সমস্তটা বৃষ্টি তাহার মাথার উপর দিয়া গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই ইহার ফল ফলিল। সৌদামিনীর বুকে পিঠে বেদনা হইয়া জ্বর হইল। সুধীর তাহার বুক পরীক্ষা করিয়া বলিল—"প্লুরিসি"। খুব খারাপ অসুখ। কয়েক দিন ধরিয়া অসহ্য বুকের বেদনার সঙ্গে জ্বর চলিতে লাগিল। সুধীর রোজ দুই বেলা করিয়া আসে-- হাত দেখে, বুক পরীক্ষা করে, ইনজেক্‌শান দেয়। দিন পনর পরে সৌদামিনী অনেকটা সারিয়া উঠিল বটে, কিন্তু একেবারে ভাল হইল না। মাঝে মাঝে নিশ্বাস লইতে তাহার বুকের ভিতরে বেদনা করিত। সুধীর তাহাকে খাইবার জন্য একটা পেটেণ্ট ঔষধ দিয়াছিল। ঔষধ কিন্তু সৌদামিনী খাইত না—সকলের অলক্ষ্যে প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া ঢালিয়া ফেলিয়া দিত। সে ভাবিত কি হইবে বাঁচিয়া—এ জীবন কোন্ কাজে লাগিবে? কোন রকমে প্রতিদিন স্নান আহার করা—নিজের জন্য সামান্য যা কিছু কাজ করা, প্রতিদিন এই এক-ঘেয়েমি কাজ ছাড়া সংসারে তাহার আর কিই বা করিবার আছে? ইহার জন্য তাহাকে এমনি করিয়াই বঞ্চিত জীবনের বোঝা বহন করিয়া বেড়াইতে হইবে?...

মাস দুই এমনি চলিবার পর পুনরায় সুধীর এক দিন তাহার বুক পরীক্ষা করিয়া রীতিমত চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাগ করিয়া বলিল—এত দিন করছিলে কি—এক বার এসে আমাকে দেখাতে পার নাই!

সুধীরের মা নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন—সৌদামিনী চলিয়া গেলে বলিলেন—কেমন দেখলি সুধীর? সুধীর চিন্তিত মুখে বলিল—আমার ত মনে হয়—শক্ত অসুখ, বাঁচা কঠিন।

—তাইতো বাবা, মেয়েটা কি শেষে এমনি করে মারা পড়বে?...

মাসখানেক পরে, সৌদামিনী একদিন শুনিতে পাইল—সুধীর চাকুরী লইয়া কলিকাতায় যাইতেছে। ইহার দিন তিনেক পরে সত্য সত্যই সুধীর তাহার ডিস্‌পেন্সারী বন্ধ করিয়া বিছানা বাক্স লইয়া কলিকাতায় রওনা হইয়া গেল।

সৌদামিনীর আর কোন আশা নাই—আকাঙ্ক্ষা নাই। এবার মরিতে পারিলেই হয়। সে বারে বারে মনে মনে নিজের মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল। তাহাদের গ্রাম হইতে মাইলখানেক দূরে পঞ্চাননতলা—পঞ্চাননতলার শিব ঠাকুর জাগ্রত দেবতা—যে যা কামনা করিয়া পূজা দেয় তাই ফলে। সেদিন সুধীরের মা বলিলেন—কাল পঞ্চানন-তলায় পুজো দিতে যাব সদু—তোর হয়ে পুজো দিয়ে আসব—যাতে ভাল হয়ে উঠিস।

—ভাল আর আমি হতে চাই নে খুড়ীমা—ঠাকুরের কাছে সে প্রার্থনা আপনি করবেন না। তবে যদি পরজন্মে মানুষ হই—ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবেন এমন কপাল করে যেন আর না আসি। বলিতে বলিতে সৌদামিনী ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।...

ধীরে ধীরে অসুখ মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল। রাত্রে ঘুম হয় না—প্রথম দিকে একটু তন্দ্রার মত হয়—সারাটা রাত্রি জাগিয়া কাটে। তাহার ঘরের পশ্চিমের জানালাটি খুলিয়া দিয়া সে একদৃষ্টে আকাশের পানে তাকাইয়া থাকে।...

সেদিন বিকাল হইতেই শ্রাবণের ধারা অঝোরে ঝরিয়া পড়িতেছিল। সন্ধ্যা হইতে না হইতেই ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ঝিঁ ঝিঁ শব্দ একেবারে যেন কানের ভিতরে আসিয়া বিঁধিতেছিল। সৌদামিনীর বাড়ীর পাশের মরা গাঙে বানের জল আসিয়াছে—সেখান হইতে অসংখ্য কোলা ব্যাঙের ডাক কানে ভাসিয়া আসিতেছে। সন্ধ্যাবেলা বিছানায় শুইয়া সে যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে অতিকষ্টে বিছানার নীচে হাতড়াইয়া কি যেন বাহির করিল, তারপর শিয়রের বাতিটি একটু উস্কাইয়া দিয়া সেই চুরি-করিয়া আনা সুধীরের ফটোখানার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিল। পরে ছবিখানি বুকের কাপড়ের ভাঁজের ভিতরে রাখিয়া

দিয়া চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। শেষরাত্রির দিকে অবস্থা তাহার অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। কয়েক বার বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিল, ভয় পাইয়া কাহাকে যেন ডাকিতে চাহিল, কিন্তু কথা ফুটিল না···কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া চিরদিনের মত একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। রাত্রি তখন একেবারে শেষ হইয়া আসিয়াছে— পশ্চিম আকাশে শুকতারাটি তখনও জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছিল।

সোমনাথ মন্দির দর্শনে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

[সম্ভবতঃ ৩০৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের সভায় গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস্ প্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন]

দেউল কি? মা না এ বিস্ময়!
আবির্ভাব সুন্দরের,
নরের এ হাতে গড়া নয়।
তুঙ্গ মন্দিরের শ্রেণী
মি'শয়াছে আকাশের নীলে,
ভূমাকে আনন্দ করি
পাষাণেতে এ কি রূপ দিলে?
স্বরগের শিল্পী হেথা
রেখে গেছে তার পরিচয়।

২

চূড়াগুলি সব স্বর্ণময়,
সুবর্ণ-পদ্ম ঊর্দ্ধে,
'ক্রেসন' কি করেছে সঞ্চয়?
সঙ্গীত অশ্রুতপূর্ব্ব
সুধাস্যন্দী, গম্ভীর, মহান্,
পাষাণ ভিতরে যেন,
'অর্ফিউস্' গাহিতেছে গান
অনন্ত অম্বরে উঠি
স্বর্গ মর্ত্ত্যে করে সমন্বয়।

৩

স্নাত ভক্ত পূজারীর দল—
বিবিধ নৈবেদ্য বহি'
অবিশ্রান্ত করে চলাচল।
বিনীত বিচিত্র-বেশ
বর্ণের কি সমারোহ তায়,
পুণ্য গন্ধ পরিবেশে
মানুষ সংসার ভুলে যায়,
আছেন যে ভগবান
মনে আর থাকে না সংশয়।

৪

দেবতা কি করে হেথা বাস?
জানি নাকো দেখে কিন্তু
জাগে বুকে বিপুল উল্লাস।
হিন্দুর এ প্রাণকেন্দ্রে
পাওয়া যায় জীবনের সাড়া;
সুদূর যুগের গন্ধ
সুপ্রাচীন সাধনার ধারা,
হেথা আমি প্রজ্ঞানের
সর্ব্বাঙ্গীণ হেরি অভ্যুদয়।

৫

সুঠাম পেশল দৌবারিক
যেন শত 'হার্কুলিস'
দাঁড়ায়ে রয়েছে নির্নিমিখ।
বিরাট তোরণদ্বার
সুবিশাল সুন্দর কবাট
ভিতরেতে অফুরন্ত
অপার্থিব আনন্দের হাট।
ধ্যানমগ্ন যোগীজন
প্রেমানন্দে পূর্ণ হয়ে রয়।

৬

এ যে দেশ-জাতির গৌরব!
সাধু, যাত্রী, পর্য্যটক
সবাকার চিত্ত মেত্রোৎসব।
এ মহা বৈরাগ্য-ক্ষেত্রে
বিস্ময়েতে হয়ে যাই মূক,
ধর্ম্মের অমৃত-সত্রে
অপাংক্তেয় আমি আগন্তুক—
তবু অবনত শিরে
দেবতার গেয়ে যাই জয়।

বিশ্বের খাদ্য-সঙ্কট

শ্রীসারথিনাথ শেঠ, এম্-এ

যুদ্ধোত্তর বিশ্বে আজ যে সমস্তাগুলি পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন এনেছে, তার মধ্যে বোধ হয় খাদ্য-সঙ্কট সমস্তা অন্যতম। এই সমস্তার সমাধানের জন্য বহু গবেষক, রাষ্ট্র নেতা, চিন্তানায়ক নানাভাবে বিভিন্ন দেশ থেকে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতি বৎসর সমবেত হন এবং পৃথিবীর ছোট ও বড় রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতায় কি ভাবে এর সমাধান করা যায় সে বিষয়ে বহু পন্থা নির্দ্ধারণ করেন। ১৯৪৬ সালে ২রা এপ্রিল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিশ্বের খাদ্য-পরিস্থিতির বিষয় একটি মন্তব্যালিপি প্রকাশ করেন। তা থেকে জানা যায়— ইউরোপ মহাদেশের উৎপাদিত গম-শস্যাদির পরিমাণ ১৯৪৫ সালের হেমন্তে মাত্র ৩ কোটি ১০ লক্ষ টন ছিল, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে এর পরিমাণ ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টন এবং যুদ্ধের পূর্ব্বে স্বাভাবিক অবস্থায় ৫ কোটি ৯০ লক্ষ টন পাওয়া যেত। অবশ্য রুশিয়ার হিসাব এতে দেওয়া হয় নি। ১৯৪৫-৪৬ সালে হেমন্তে ইউরোপের উৎপাদিত শস্যাদির অতিরিক্ত চাহিদার পরিমাণ ১৫°৬ লক্ষ টন ছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে মাত্র ৩°৭ লক্ষ টন ছিল। ভারতবর্ষ, চীন, ফ্রান্স, উত্তর-আফ্রিকা, দক্ষিণ-আফ্রিকা এবং আরও অন্যান্য দেশের যুদ্ধের পূর্ব্বে চাহিদার পরিমাণ মাত্র ২°৪ লক্ষ টন ছিল, কিন্তু তা বেড়ে গিয়ে ১০°৭ লক্ষ টনে দাঁড়ায়।

ব্রহ্ম ও শ্যাম প্রধান ছুটি চাউল রপ্তানীকারী দেশে ১৯৪৬ সালের উৎপাদন মাত্র ৪°৯ লক্ষ টনে দাঁড়ায়, সেখানে যুদ্ধের পূর্ব্বে উৎপাদনের পরিমাণ স্বভাবত: ৮°৪ লক্ষ টন পাওয়া যেত। বর্ত্তমানে আমাদের মাথাপিছু ক্যালোরীর পরিমাণ এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। নিম্ন-তালিকায় তা প্রদর্শিত হ'ল।

	সমগ্র লোকসংখ্যায় জন্য ১৯৪৫ সালের মাথাপিছু ক্যালোরীর হিসাব	যুদ্ধের পরে শতকরা পরিবর্ত্তনের হার
যুক্তরাষ্ট্র	৩,১৫০	১০২
কানাডা	৩,০০০	১০০
অষ্ট্রেলিয়া	২,৯০০	৯৭
ডেনমার্ক, সুইডেন	২,৮৫০।২,৯০০	৯০।৯৫
যুক্তরাজ্য	২,৮৫০,	৯৫
ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে	২,৩০০।২,৫০০	৭৫।৮৫
গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইটালী	১,৮০০।২,২০০	৭০।৭৫
জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া	১,৬০০।১,৮০০	৫০।৬০
ভারতবর্ষ, চীন ও অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলি	১,৫০০।২,০০০ কোনও কোনও স্থানে ৫০০,	

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, উত্তর-আমেরিকায় উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ক্যালোরীর পরিমাণ যুদ্ধের পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং দক্ষিণ-আমেরিকায় শতকরা ১৭ ভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু পরাজিত জাতিসমূহের মধ্যে জার্ম্মানীতে তা কমে গিয়ে অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে

যবদ্বীপের একজন চাষী তার পুকুরের মাছগুলিকে খাবার দিচ্ছে

জনসাধারণের ভাগ্যে যে পরিমাণ খাদ্য জোটে তা অল্পমাত্র কমে গেলেই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। চীনদেশেও এই খাদ্যাভাব স্থায়ীরূপে বিদ্যমান আছে এবং সময়ে সময়ে তা দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করে। জাপানে যুদ্ধের পূর্ব্বে পাশ্চাত্যের উন্নত জাতিসমূহের পর্য্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য জোটে নি।

খাদ্যাভাবের দরুন যে ভীষণ অবস্থায় আমরা পড়েছি তার বেশীর ভাগ অঞ্চলে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ বা অভাব যুদ্ধের পূর্ব্বেও

যবদ্বীপের একটি কৃষক পরিবার

সমিতি গঠন করা যায় এবং সমগ্র খাদ্যাভাব-পীড়িত অঞ্চলে অত্যন্ত পর্য্যাপ্ত উৎপাদনকারী দেশগুলি থেকে খাদ্যের আমদানীর ব্যবস্থা করার চেষ্টা হয়।

১৯৪৬ সালে ২রা সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় অধিবেশনের সময় খাদ্য ও কৃষিপ্রতিষ্ঠানের কর্মাধ্যক্ষ জানান যে, কোনও দিনই পৃথিবীতে যথেষ্ট খাদ্যের সংস্থান ছিল না। যুদ্ধের পূর্ব্বে দশ কোটি লোকের মাথাপিছু ২,২৫০ ক্যালোরী পরিমাণ খাদ্যও জুটত না। অথচ ব্রিটেনের বর্ত্তমান সঙ্কটপূর্ণ অবস্থাতেও মাথাপিছু ২,৭৫০ ক্যালোরীর ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট করতে পেরেছেন। পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জন যে সত্তরটি দেশে বাস করে সেগুলির বিষয় আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যদি ১৯৬০ সালের লোকসংখ্যা বর্ত্তমান সময় থেকে শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় তবে আমাদের বাঁচবার জন্য অন্ততঃ আট রকম নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যের শতকরা উৎপাদন-বৃদ্ধি নিম্নলিখিতরূপ হওয়া চাই—

	শতকরা পরিমাণ
খাদ্যশস্যাদি	২১
কন্দমূলাদি	২৭
চিনি	১২
স্নেহপদার্থ জাতীয়	৩৪
ডাল	৮০
ফল ও তরি-তরকারি	১৬৩
আমিষাদি	৪৬
দুধ	১০০

ছিল। যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন ও কানাডার চেষ্টায় সম্মিলিত খাদ্যবোর্ড সংগঠিত হয়। তার দ্বারা সমস্যার সমাধান বিশেষ কিছুই হয় নি। ১৯৪৩ সালে ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের হট স্প্রীংসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তরফ থেকে খাদ্য-কৃষি-বিষয়ক সম্মেলন আহূত হয় এবং সেখানে প্রচারিত হয় যে, সকলের প্রয়োজনীয় আহারের সংস্থান করতে গেলে সমগ্র পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি রেখে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হওয়া উচিত। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাদ্য এবং কৃষি প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধিবেশন হয় কানাডার কুইবেক শহরে ১৯৪৫ সালে ১৬ই অক্টোবর থেকে ১লা নবেম্বর পর্য্যন্ত। সভাপতি মিঃ লিষ্টার বি. পিয়ারসন (ওয়াশিংটনস্থ কানাডার মন্ত্রী) বিশ্বের সকল জাতির সতর্ক হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এই জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠানের প্রতি সকল রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ সহযোগিতাই হবে বিশ্বব্যাপী খাদ্যাভাব বিদূরণের অন্যতম পন্থা। ১৯৪৬ সালের ২০শে মে থেকে ২৭শে মে তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিসচিব মিঃ ক্লিটন এণ্ডারসনের সভাপতিত্বে আর একটি জরুরী অধিবেশনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদ্দ্বারা খাদ্য-কৃষি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ স্যার জন্ বয়েড অরকে ভারার্পণ করা হয় যাতে শীঘ্রই স্থায়ীভাবে বিশ্বের খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞদের এক পরামর্শ

তিনি আরও বলেন যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক লোকের প্রয়োজনমত খাদ্যের সংস্থান ছিল না। শিশুদের শরীর পোষণ উপযোগী বা শরীরকে স্বাভাবিক কর্ম্মঠ রাখবার জন্য যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে পারা যেত না। ১৯৪৬ সালের হেমন্তকালে যে বৎসর শেষ হয়েছে সেই সময় খাদ্যশস্যাদির উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৪ কোটি টন, কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতি বৎসর ৪১ কোটি টন পাওয়া যেত। সেই বৎসর খাদ্যের জন্য প্রয়োজন ছিল ৩৫.৫ কোটি টন। ১৯৪৭ সালে হেমন্তে যে বৎসর শেষ হয়েছে সেই বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটি টন, তা সমগ্র পৃথিবীর চাহিদার চেয়ে শতকরা ১২.৪ ভাগ কম।

১৯৪৭ সালের প্রথমার্দ্ধে উৎপন্ন চাউল বণ্টনের বিবরণ

২রা জানুয়ারী (১৯৪৭ সালে) ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক জরুরী খাদ্য-সভার ঘোষণা করা হয়। তাতে প্রকাশ—

ভারতবর্ষ	৪'১	লক্ষ	টন
চীন	২'৪৫		
মালয়	২'২৫		
সিংহল	২'০০		
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, মধ্যপ্রাচ্য ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ কোরিয়া	·০৮৭		
দক্ষিণ-আফ্রিকা	·০৭		

এই সভা বিশেষ করে জানান যে, পৃথিবীতে যে কয়েকটি জাতি শুধুমাত্র চাউলের দ্বারা জীবনধারণ করে, তাদের চাহিদার জন্ত যথেষ্ট পরিমাণ চাউল নেই, কেননা মাত্র ১৬'৮২৬ লক্ষ টন চাউল বণ্টনের জন্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে, কিন্তু সমগ্র দেশগুলির প্রয়োজন মিটাতে এর দ্বিগুণ পরিমাণ শস্ত সরবরাহ হওয়া দরকার।

১৯৪৭ সালে ৯ই জুলাই থেকে ১৩ই জুলাই পর্য্যন্ত প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক খাদ্যশস্ত সম্মিলনে সভার কর্ম্মসচিব ডঃ ফিটজেরাল্ড বিশেষভাবে বলেন, ১৯৪৭-৪৮ সালের হিসাবে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে—অভাব রয়েছে মোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ টন পরিমাণ, শস্তাদির অতিরিক্ত চাহিদার পরিমাণ ৫ কোটি টন, কিন্তু পাবার সম্ভাবনা মাত্র ৩ কোটি ২০ লক্ষ টন ছিল অর্থাৎ অভাবের পরিমাণ ১ কোটি ৮০ লক্ষ টন।

এর পর ১৯৪৭ সালে ২৫শে আগষ্ট থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ডঃ এফ্. টি. ওয়াহলেনের (সুইটজ্যারল্যাণ্ড) অধিনায়কত্বে জেনেভাতে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় অধিবেশনে প্রায় ৩৯টি জাতির প্রতিনিধি যোগদান করেন। খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মাধ্যক্ষ স্যর জন্ বয়েড্ অর্ সকলকে সতর্ক করে বলেন—পর বৎসর শীত ও বসন্তের মধ্যে ইউরোপে লক্ষ লক্ষ লোককে অনাহারে কাটাতে হবে। এশিয়ার জনসংখ্যার অধিকাংশকে খাদ্যাভাবের মধ্যে কাটাতে হয় এবং এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের আয়োজন না করতে পারলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাতেই খাদ্যাভাবের হাহাকার পড়ে যাবে।

১৯৪৮ সালের ১৫ই নবেম্বর থেকে ১৯শে নবেম্বর পর্য্যন্ত এই সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে নূতন কর্ম্মাধ্যক্ষ মিঃ নরিস্ ই. ডড্ বলেন যে, ১৯৪৮ সালে যদিও উৎপাদিত শস্তাদির ফলে পৃথিবীর খাদ্যসঙ্কটের পরিমাণ লাঘব হয়েছে, তথাপি আমরা এখনও সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারি নি, কেবলমাত্র উত্তর-আমেরিকার উৎপাদনের উপর নির্ভর করলে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যার ফলে সমগ্র পৃথিবী বিপন্ন হবে। যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমানে পৃথিবীর খাদ্যশস্তের মোট চাহিদার মাত্র ১/১০ অংশ উৎপাদিত হচ্ছে এবং পর্য্যাপ্ত উৎপাদনের দেশ থেকে অভাবগ্রস্ত দেশে রপ্তানীর পরিমাণ মাত্র ১/৪ অংশে দাঁড়িয়েছে। মিঃ ডড্ জোর দিয়ে বলেন, পুনর্ব্বসতির চেষ্টা কিয়দংশে সাফল্য লাভ করলেও যুদ্ধের পূর্ব্বের ন্যায় খাদ্যশস্ত উৎপাদিত হলেও তা প্রয়োজনের পক্ষে অপর্য্যাপ্ত হবে। বিশেষতঃ আমাদের মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে প্রতিদিন ৫৫ হাজার নূতন মুখে অন্ন জোগাবার প্রয়োজন, কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। যুদ্ধজনিত লোকক্ষয় সত্ত্বেও গত দশ বৎসরেই পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় ২০ কোটি বেড়েছে।

লাঙল দ্বারা ধানজমি কর্ষণরত একজন চীনা চাষী। এই সমস্ত ধানগাছ সংক্রামক ব্যাধির বীজাণুবাহী একরকম কীটে পরিপূর্ণ থাকে

১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকে এশিয়া ও প্রাচ্য দেশসমূহে এ বিষয়ে গভীরতর আলোচনার জন্ত স্থানে স্থানে কতকগুলি সভার অধিবেশন হয়। এর মধ্যে ব্যাঙ্ককে আন্তর্জাতিক চাউল কমিশনে, ব্রহ্ম, সিংহল, কিউবা, ইকোয়েডর, ইজিপ্ট, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ, ইটালী, মেক্সিকো, হল্যাণ্ড, পাকিস্থান, ফিলিপাইন, শ্যাম, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি ১৫টি দেশের প্রতিনিধি যোগদান করেন। এই সকল অধিবেশনে চাউলের উৎপাদন,

চীনা কৃষকেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টুপী মাথায় পরিয়া জ । জমি হইতে ধানের চারা তুলিয়া আঁটি বাঁধিতেছে

নাই। তবে আমার কথা এই যে, ব্রহ্ম ও শ্যামে ধানচাষ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যাচ্ছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ব্রহ্মদেশে চাউল উৎপাদনের পরিমাণ ৫৪ লক্ষ টন ছিল, যুদ্ধের পূর্ব্বে সাধারণতঃ ৭০ লক্ষ টন পাওয়া যেত। ব্রহ্মদেশে চাউলের চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ায় রপ্তানীর পরিমাণ যুদ্ধের সময়কার তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগই আছে। শ্যামের অবস্থা ব্রহ্মদেশের মত। তবে ১৯৪৮-৪৯ সালে আশা করা যায়, রপ্তানীর পরিমাণ দশ লক্ষ টন হতে পারে। ইন্দো-চীনে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার দরুন আজও রপ্তানী হওয়ার মত শস্যাদি পাওয়া যাচ্ছে না। ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধের পূর্ব্বের

সংরক্ষণ, বণ্টন আহার গ্রহণ সম্বন্ধে সম্মিলিত ভাবে কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা নির্দ্ধারণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক প্রচার-পত্রে বলা আছে, যুদ্ধোত্তর বিশ্বে প্রায় চার বৎসর ধরে পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোকের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের অভাব রয়েছে এবং কোটি কোটি লোক, বিশেষতঃ চাউলভোজী জনগণ প্রায় অনাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।

১৯৪৯ সালের ২৪শে মার্চ্চ সিঙ্গাপুরে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৎস্যচাষের গবেষণা সম্মেলনে কর্ম্মাধ্যক্ষ মরিস্ ই. ডড্ জানান যে, সমুদ্র থেকে যে পরিমাণ মৎস্য পাওয়া যেতে পারে তা সংগ্রহ করবার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করা হয় নি অথচ এই মৎস্য থেকে বহুল পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব মোচন হতে পারে।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যে খাদ্যাভাব দেখা যাচ্ছে তার জন্য চাই পৃথিবীব্যাপী এক নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসরণ। ১৯৪৮ সালের খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বিবরণে আমরা জানতে পারি যে, পৃথিবীর অনুন্নত দেশসমূহের জন্য বর্ত্তমান উৎপাদন প্রচেষ্টা যথেষ্ট হয় নি। প্রাচ্যে পৃথিবীর ½ অংশে সমগ্র লোকসংখ্যার অর্দ্ধেক প্রায়ই অনাহারে থাকে। একথা ঠিক যে, এই অঞ্চলের কর্ষিত জমি লোকসংখ্যার তুলনায় কম হলেও এগুলিকে যতদূর সম্ভব নিজস্ব উৎপাদনের উপর নির্ভর করতে হবে। আমদানী দ্বারা চীন এবং ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় খাদ্যের কিয়দংশ মাত্র পূরণ করা যায়। ব্রহ্ম, চীন, ইন্দো-চীন এবং ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধের পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী শস্য উৎপন্ন হলেও ধান উৎপাদন সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়

তুলনায় শতকরা ৭০।৮০ ভাগ আজও স্থানীয় চাহিদার জন্য মজুত থাকে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে চাউল আমদানী সমেত স্থানীয় উৎপাদন দ্বারা সরবরাহ স্বাভাবিক স্তরে ছিল।

এ থেকে বোঝা যায় পাঁচটি প্রধান চাউল রপ্তানীকারী দেশে কৃষিসমস্যার সমাধান কিছু কিছু হলেও রপ্তানীর জন্য আশানুরূপ খাদ্যশস্য উৎপাদন হচ্ছে না। চাউল আমদানীকারী দেশগুলির মধ্যে সিংহল ও মালয়ের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। যুদ্ধের পূর্ব্বে সিংহলে মোট চাহিদার শতকরা ৭০ ভাগ চাউল আমদানী হ'ত। যুদ্ধের সময় ও পরে চাউল আমদানীর পরিবর্ত্তে সিংহলে গমের প্রচলন হয়। প্রাচ্যের অন্যান্য স্থানের ন্যায়, এখানেও মূল খাদ্যশস্যাদি, তরিতরকারী এবং ফলমূলাদির উৎপাদন বৃদ্ধি লাভ করেছে। মালয়ে মোট প্রয়োজনীয় চাউলের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ বাইরে থেকে আমদানী হ'ত। কিন্তু যুদ্ধের পরে গমের প্রচলন বেশী হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি চারিটি প্রধান গমরপ্তানীকারী দেশের কৃষিসমস্যা বিপরীত ধরণের। সেখানে যাতে দেশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন ও রপ্তানীর প্রয়োজন অপেক্ষা উৎপাদন অত্যধিক না হয়ে পড়ে, তজ্জন্য কৃষিজীবিগণ ও গবর্ণমেণ্ট সচেষ্ট থাকেন। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন ব্যাপারে খুব তৎপর হলেও অনুকূল অবস্থায় তাদের উৎপাদন বৃদ্ধির এখনও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আফ্রিকা এবং লাটিন আমেরিকা প্রভৃতি অনুন্নত অঞ্চলের একমাত্র সমস্যা নানা উপায়ে খাদ্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এ সমস্ত অঞ্চলে উন্নতির পথে অর্থ এবং উপযুক্ত

কৃষিবিদের অভাব বিশেষ অন্তরায়। অন্যদিকে ইউরোপের একমাত্র সমস্যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার। সেই সঙ্গে শিল্প ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধি দ্বারা খাদ্যসম্ভার ও কাঁচামালের আদানপ্রদানও তার প্রয়োজন। যদি ইউরোপের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারলাভ না করে তবে সম্ভবতঃ অল্পমাত্র খাদ্যমানের দ্বারা কৃষি-বিষয়ক আত্মনির্ভরতার পথে সে চেষ্টা করতে পারে। সুখের বিষয়, ১৯৪৮-৪৯ সালে পৃথিবীর মোট রপ্তানী খাদ্যের পরিমাণ হবে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন। গত বৎসর ছিল ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টন এবং তার পূর্ব্বে ছিল ২ কোটি ৯০ লক্ষ টন। ১৯৩০-৩১ সালের পর এ পরিমাণ রপ্তানী আর হয় নাই।

চীনের ধানক্ষেতের অভিমুখে চীনা পুরুষ এবং শিশুসন্তানসহ সাদা কামিজ পরা একজন স্ত্রীলোক

বলা বাহুলা, বিশ্বের সর্ব্বত্র খাদ্য-সঙ্কট বিষয়ে যথেষ্ট সাড়া পড়েছে। ভারতবর্ষে গত ১৯৪৩ সালের পর থেকে খাদ্য-দ্রব্যাদি একটা বাঁধাধরা নিয়মে সরবরাহ, বণ্টন, ও চাহিদার জন্য মজুত রাখা হচ্ছে। দেশবিভাগের পর অবশ্য এ সঙ্কটের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষে বাৎসরিক প্রয়োজনীয় সকল প্রকার খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নলিখিত রূপ :

খাদ্যশস্য	৬০০ লক্ষ টন
ডাল	৭৫ „ „
স্নেহপদার্থ	১৯ „ „
ফলমূল	৬০ „ „
তরিতরকারী	৯০ „ „
দুধ	২৩১ „ „
আমিষ দ্রব্য	১৫ „ „

হিসাব করে দেখা যায় যেটুকু শতকরা বাড়ান দরকার, তা হচ্ছে

খাদ্যশস্য	১০ ভাগ
ডাল	২০
স্নেহপদার্থ	২৫০
ফলমূল	১৫০
তরিতরকারী	১০০
দুধ	৩০০
আমিষ	৩০০

এর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার অবস্থার তুলনা করা যেতে পারে—১৯৩৫-৩৯ সালের পর্য্যায় শতকরা বৃদ্ধির পরিমাণ হচ্ছে নিম্নরূপ :

খাদ্যশস্য	১০৬
ফল ও তরকারী	১০৯
স্নেহপদার্থ	১২৩
চিনি	১০৫

সাধারণতঃ নানাদেশে প্রতি একর জমিতে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় নীচের তালিকা থেকে তা বোঝা যেতে পারে—

চাউল—	ভারতবর্ষ	৬০০ পাউণ্ড
	চীন	১,৪০০ „
	যুক্তরাষ্ট্র	১,৪৫০ „
	মিশর	২,০০০ „
	জাপান	২,৩০০ „
	ইটালী	৩,০০০ „
গম—	ভারতবর্ষ	৮০০ পাউণ্ড
	জার্ম্মানী	২,২০০ „
	ইটালী	১,৩৫০ „

ভারতে কৃষিপদ্ধতির পরিবর্ত্তন আজ একান্ত প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে কৃষি-বিজ্ঞানের আলোচনার ফলে জানা গেছে উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত উপায়সমূহ অবলম্বিত হতে পারে—ক্ষেত্র সংরক্ষণ, বনসম্পদ বৃদ্ধি, জলসেচ, উন্নততর বীজ ও যন্ত্রাদি, জৈব এবং অজৈব সারের প্রয়োগ, গোমেষাদি পালনের উন্নততর ব্যবস্থা এবং পরিবর্দ্ধিত হারে ঋণদানের আয়োজন। ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের কৃষিসমস্যার সমাধানের উপায়—যতদূর সম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধি করা, কারণ নূতন শিল্পের

প্রসার হলেও বহুলোকের ভরণপোষণের পন্থা কেবলমাত্র কৃষিকার্য্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং ক্রমবর্দ্ধমান কৃষিকার্য্যের দ্বারা তাদের আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। এটুকু জেনে রাখা দরকার—সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শতকরা ৮১টি পরিবারের আয়ের পরিমাণ প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলারেরও কম এবং তাদের মধ্যে আবার শতকরা ৫৩টি পরিবারের আয়ের পরিমাণ প্রতি সপ্তাহের চার ডলারেরও কম। কেবলমাত্র আর্জ্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, গ্রেট ব্রিটেন, নিউজিল্যাণ্ড, সুইটজারল্যাণ্ড এবং যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে মাত্র মোট পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগের বাস সেখানে প্রতি সপ্তাহে আয়ের পরিমাণ ২০ ডলার হওয়ার ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহে আয়ের পরিমাণ যথেষ্ট কম। যা হোক, ভারতবর্ষে আজ কৃষি পুনর্গঠন ব্যাপারে বিশেষ সাড়া পড়েছে। বিগত মহাযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী দারুণ সঙ্কটের প্রভাব থেকে ভারতবর্ষ আজও সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারছে না। ১৯৪৫-৪৬ সালে প্রায় ৮০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। ১৯৪৬-৪৭ সালে ১০০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানী হয় অথচ ভারতবাসীদের মাথাপিছু দৈনিক খাদ্য আজও ১০ আঃ বা কোথাও কোথাও ৮ আউন্সের অধিক জোটে না। কিন্তু সম্মিলিত যুক্তরাষ্ট্রের পুষ্টিকর খাদ্য কমিটির মতে খাদ্যশস্য মাথাপিছু ১৪ আঃ না হলে স্বাস্থ্য অটুট রাখা যায় না। এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য আমাদের কৃষিসচিব একটি খাদ্যশস্য কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একটি জাতীয় খাদ্যনীতিবিষয়ক রিপোর্ট গবর্ণমেন্টের নিকট দাখিল করেন। রিপোর্টে প্রকাশ যে, ব্যাপক উদ্দেশ্য সাধনের উপায়-স্বরূপ দেশে বহুমুখী জলশক্তির পরিকল্পনা চাই এবং বড় বড় বাঁধ-নির্ম্মাণ-কার্য্য শীঘ্র আরম্ভ করা প্রয়োজন। বড় বাঁধের দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা করা যাবে এবং বৎসরে মোট ১ কোটি টন উৎপাদনবৃদ্ধির আশা করা যেতে পারে। তা ছাড়া সারপ্রয়োগ ও উৎকৃষ্টতর বীজ বপন দ্বারা পতিত জমিগুলিকে চাষবাসের উপযোগী করা চাই। বিরাট পরিকল্পনা দ্বারা প্রায় ৪০ লক্ষ টন শস্য পাওয়া যাবে। আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিতে যে খাদ্যনীতি অবলম্বিত হবে তার দ্বারা প্রায় ৩০ লক্ষ টন উৎপাদন বৃদ্ধি হবে এবং পতিত জমিগুলির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি দ্বারা বাকীটা পাওয়া যাবে। কিন্তু ভারতবর্ষ আত্মনির্ভরতার পথে আরও দ্রুতগতিতে চলতে পারে। তার জন্য এই বৎসরে গত ১৯শে মার্চ্চ তারিখে আমাদের কৃষিসচিব একটি পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তিনি মনে করেন, ১৯৫১ সালের পর ভারতবর্ষে খাদ্যশস্য আমদানী করা দরকার হবে না। প্রায় ৮ লক্ষ একর পতিত জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে নলকূপ প্রতিষ্ঠা দ্বারা এবং অপ্রয়োজনীয় শস্যাদি বপন বন্ধ করে আরও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। যেখানে স্থায়ী জলসেচের ব্যবস্থা আছে, সেখানে উন্নত বীজ, জৈব সার এবং কৃত্রিম সারপ্রয়োগ দ্বারা চাষবাস করা একান্ত দরকার হবে। কৃষিসচিব বলেছেন, যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা মনে করে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৪৮ সালে মোট আমদানী খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৮৪ লক্ষ টন এবং এতে খরচ হয় ১৩০ কোটি টাকা। এ সম্বন্ধে এ বৎসরে প্রায় আটটি চুক্তিপত্র ভারতবর্ষ স্বাক্ষর করেছে—পাকিস্থানের সহিত তিনটি, অষ্ট্রেলিয়া এবং আর্জ্জেন্টিনার সঙ্গে দুটি, রাশিয়া ও যুগোশ্লেভিয়া প্রত্যেকের সহিত একটি। এই বৎসরে আমদানীর পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়েছে মোট ৪০ লক্ষ টন।

আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, পৃথিবীর কৃষির উন্নতিসাধনের একমাত্র উপায় হচ্ছে আন্তর্জ্জাতিক খাদ্যনীতির প্রচার। ১৯৪৭ সালে ৪ঠা থেকে ১১ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ওয়াশিংটনে বিশ্বের খাদ্য-পরিষদে সার জন বয়েড অর্ সকলকে সতর্ক করে বলেছিলেন— এখনও যদি আমরা বিশ্বের খাদ্য-সঙ্কটের সমাধান করতে না পারি তা হলে ভবিষ্যতে মানব-জাতির অস্তিত্ব হয়ত লোপ পাবে। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন যে, যদি পৃথিবীর সকল জাতি কৃষির উন্নতির দিকে ঝোঁকে এবং যুদ্ধের জন্য যতটা উৎসাহ ও উদ্যম দেখায় অন্ততঃ সেই পরিমাণে উৎসাহ ও উদ্যম যদি খাদ্য উৎপাদনে প্রয়োগ করে তা হলে পাঁচ বছরের মধ্যে প্রচুর খাদ্যসম্ভার পাওয়া যাবে। বর্ত্তমান অবস্থায় এইটুকু জেনে রাখা দরকার যে, এখনও কয়েক বৎসর ধরে আমাদের খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালাতে হবে। আরও একটা বিষয়ে অবহিত হওয়া খুবই দরকার। বিশ্বের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে, শান্তির পথে চলতে হলে সৌভাগ্যবশতঃ যে সমস্ত দেশে আজ প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হচ্ছে, সেই সমস্ত দেশের খাদ্যশস্যাদিতে অবাধ অধিকার এবং খাদ্যাভাব থেকে মুক্তি যদি আমরা সত্যই চাই, তা হলে একটি উন্নততর বৈদেশিক বাণিজ্য-প্রসারের নীতি অনুসরণ করতে হবে। বিশ্বের অর্থনীতির ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের আন্তর্জ্জাতিক আদানপ্রদান ব্যবস্থার প্রধান অন্তরায় প্রত্যেকটি জাতির অর্থনীতিগত স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণবাদ। এই নীতিতে আস্থা সমগ্র মার্কিন জাতি ও পাশ্চাত্যের উন্নত জাতিগুলির মজ্জাগত হয়ে রয়েছে।

লর্ড বয়েড অর্ বলেছেন, পৃথিবী থেকে অনাহার-মুক্তি আন্দোলন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাদ্য এবং কৃষি-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে চালানো যেতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানেই সকল দেশের স্বার্থরক্ষা করা যাবে এবং খাদ্যশস্যবিষয়ক পরিকল্পনা

কার্য্যকরী হবে। খুবই দুঃখের বিষয়, আজও পৃথিবীতে কতকগুলি জাতি নিজেদের স্বার্থের জন্ত অপর কতকগুলি জাতির সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে পারছে না এবং এর ফলে এশিয়া মহাদেশের তথাকথিত অনুন্নত দেশগুলি, যথা—ভারতবর্ষ, চীন, পাকিস্থান প্রভৃতি আন্তর্জাতিক দলাদলির দরুন আত্মনির্ভরতার পথে বিশেষ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। আজ বর্ত্তমান অবস্থায় হয়ত আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি কার্যকরী করা সম্ভবপর হচ্ছে না, কিন্তু যত শীঘ্র সম্ভব এই বিষয়ে একটা সুনির্দিষ্ট নীতি নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক এবং সেটা সফল হবে একমাত্র ধনী, দরিদ্র, ছোট বড় সকল জাতির খাদ্যনীতি সমন্বয়ের দিকে অগ্রসর হলে।

যে সমস্ত শক্তিশালী জাতি আজও কেবলমাত্র জাতীয় স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত এবং আগামী যুদ্ধের আশঙ্কায় কেবলমাত্র নিজেদের খাদ্যব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে সকলের চেয়ে বড় করে দেখছে, তারাই আজ আন্তর্জাতিক খাদ্যশস্য পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করার প্রধান অন্তরায়। এই উদ্দেশে শক্তিশালী জাতিদেরই এগিয়ে আসতে হবে। এই বিশ্বব্যাপী খাদ্য-সঙ্কটের দিনে শক্তিশালী জাতিদের নিকট যে সুবর্ণ সুযোগ দেখা দিয়েছে, সমগ্র বিশ্বের স্থায়ী কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ভিত্তিতে খাদ্যসমস্যা মীমাংসার চেষ্টা যাতে হয়, সে বিষয়ে তাঁদের আলোচনা চালাতে হবে। তাঁরা কি এই যুগোপযোগী দায়িত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবেন না পিছিয়ে থাকবেন, এটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

প্রস্থানভেদ

(অনুবাদ)

শ্রীবাসনা সেন, এম-এ, কাব্যতীর্থ

(সুপ্রসিদ্ধ মহিম্নস্তোত্রের "ত্রয়ীসাংখ্যং যোগঃ"---এই সপ্তম শ্লোকের টীকাতে মধুসূদন সরস্বতী ভারতীয় আর্য্যশাস্ত্রসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মহিম্নস্তোত্রের টীকার এই অংশ পৃথকভাবে "প্রস্থানভেদঃ" নামে পণ্ডিত-সমাজে প্রসিদ্ধ। ইহা পাঠ করিলে অতি সহজেই ভারতীয় শাস্ত্রের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। ইহা বাংলায় ইতঃপূর্ব্বে অনূদিত হয় নাই)।

সমুদয় শাস্ত্রই পরমেশ্বর প্রতিপাদক, ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধের দ্বারাই হউক অথবা পরম্পরা সম্বন্ধের দ্বারাই হউক সংক্ষেপতঃ এই ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রস্থানভেদ এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইবে।

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিটি বেদ এবং শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ ও কল্প এই ছয়টি বেদাঙ্গ। পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা এবং ধর্ম্মশাস্ত্র এই চারিটি উপাঙ্গ। উপপুরাণসকল পুরাণেরই অন্তর্ভুক্ত; বৈশেষিকশাস্ত্র ন্যায়শাস্ত্রের অন্তর্গত; বেদান্তশাস্ত্র মীমাংসার অন্তর্গত, রামায়ণ, মহাভারত, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত, বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত, এই সকল লইয়া চতুর্দ্দশবিদ্যা। অতএব যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—(যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি আচারাধ্যায়—৩ শ্লোক) পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, অঙ্গসহিত ধর্ম্মশাস্ত্র, অঙ্গসহিত চারি বেদ এবং ছয়টি বেদাঙ্গ, এই চতুর্দ্দশটা ধর্ম্ম ও বিদ্যার স্থান। এইরূপে চারি উপবেদ লইয়া অষ্টাদশ বিদ্যা হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ এবং অর্থশাস্ত্র এই চারিটি উপবেদ। সকল আস্তিকের অর্থাৎ যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন তাঁহাদের এই পর্য্যন্ত শাস্ত্রপ্রস্থান; অপর একদেশিগণের অর্থাৎ শাক্ত, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতির প্রস্থানও ইহারই অন্তর্গত। যাঁহারা বেদ প্রামাণ্য স্বীকার করেন না তাঁহাদের পৃথক প্রস্থান আছে, সেই সকল প্রস্থান ইহাতে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তাহা পৃথকরূপে গণনা করা হইয়া থাকে। অতএব শূন্যবাদ লইয়া মাধ্যমিকগণের প্রস্থান প্রবৃত্ত হইয়াছে, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদমাত্র লইয়া যোগাচার প্রস্থান প্রবৃত্ত হইয়াছে; জ্ঞানাকারানুমেয় ক্ষণিকবাহ্যার্থবাদ লইয়া সৌত্রান্তিক প্রস্থান প্রবৃত্ত হইয়াছে; প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধ বাহ্যবলক্ষণক্ষণিকবাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া বৈভাষিক প্রস্থান প্রবৃত্ত হইয়াছে। এইরূপে সৌগত অর্থাৎ বৌদ্ধগণের চারিটি প্রস্থান * চার্ব্বাকগণের দেহাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রস্থান আছে। জৈনগণের দেহের অতিরিক্ত দেহ সম-পরিমাণ আত্মা আর একটি প্রস্থান। এইরূপে যাঁহারা বেদপ্রামাণ্য স্বীকার করেন না তাঁহাদের ছয়টি প্রস্থান। এই ছয়টি প্রস্থান বেদবাহ্য অর্থাৎ ইঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না এবং ইহা পুরুষার্থের উপযোগী

* সর্ব্বাস্তিত্ব অর্থাৎ বাহ্য ও আন্তর এই উভয়বিধ বস্তুর অস্তিত্ববাদী। এজন্য তাহাদের সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বলে। বৈভাষিকগণ সর্ব্বাস্তিত্ববাদী। সৌত্রান্তিকগণও সর্ব্বাস্তিত্ববাদী। এই উভয় প্রস্থানেই বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। সৌত্রান্তিকগণ বাহ্যবস্তুমাত্রকে অনুমেয় বলেন। বৈভাষিকগণ বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক ত্রিবিধ প্রস্থানেই বস্তুর ক্ষণিকত্ব স্বীকার করা হয়।

নহে বলিয়া আমরা ইহার উল্লেখ করিলাম না। আমরা এস্থলে যে যে প্রস্থান সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে পুরুষার্থের উপযোগী ও বেদানুকূল সেই প্রস্থানগুলির ভেদ প্রদর্শন করিব। বাহ্য প্রস্থানের উল্লেখ না করায় আমাদের কোন ন্যূনতা হইল না। কারণ আমরা বেদানুকূল প্রস্থান প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বেদানুকূল প্রস্থানসকল সাক্ষাৎভাবে বা পরম্পরাভাবে পুরুষার্থের উপযোগী হইয়া থাকে।

অনন্তর অল্পজ্ঞগণের ব্যুৎপত্তির নিমিত্ত এই সকল প্রস্থানের স্বরূপ সংক্ষেপে প্রদর্শন করিব; কারণ প্রয়োজনভেদেই প্রস্থানগুলির স্বরূপভেদ ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম-প্রতিপাদক অপৌরুষেয় প্রমাণবাক্যই বেদ নামে অভি-হিত হয়। বেদ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণে বিভক্ত। এই মন্ত্রসকল অনুষ্ঠান-উপযোগী দ্রব্য ও দেবতা-প্রকাশক * এবং প্রায়শঃ ইহারা অনুষ্ঠানের করণকারক হইয়া থাকে। এই মন্ত্র-সকলও ত্রিবিধ—ঋক্, যজুঃ, সাম। গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দবিশিষ্ট পাদবদ্ধ ঋকমন্ত্রসকল—অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্, ইত্যাদি। এই ঋকমন্ত্র গীতিযুক্ত হইলে সামমন্ত্র—'অগ্ন আয়াহি বিতয়ে' ইত্যাদি। এই উভয় লক্ষণবিযুক্ত অর্থাৎ যাহা পাদবদ্ধ নহে এবং প্রগীতও নহে তাদৃশ মন্ত্রই যজুর্মন্ত্রসকল—'ঈষেত্বা' ইত্যাদি। 'অগ্নাদগ্নীন্বিহর—এই সম্বোধন রূপ বেদমন্ত্র-সকলও যজুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা নিগদমন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। এইরূপে মন্ত্রসকল নিরূপিত হইয়াছে।†

ব্রাহ্মণও ত্রিবিধ—যথা (১) বিধিরূপ, (২) অর্থবাদরূপ, (৩) এই উভয় বিলক্ষণরূপ অর্থাৎ যাহা বিধিও নহে অর্থবাদও নহে। ভট্টগণের মতে শব্দভাবনাই বিধি। প্রাভাকরগণের মতে নিয়োগই বিধি। সকল তার্কিকের মতে ইষ্টসাধনতাই বিধি। উৎপত্তি, অধিকার, বিনিয়োগ ও প্রয়োগভেদে বিধি চারি প্রকারও হইয়া থাকে। যাহা দ্বারা কর্ম্মের স্বরূপমাত্র জানা যায় অর্থাৎ কর্ম্মস্বরূপমাত্র বোধক, যে বিধি তাহা উৎপত্তি বিধি—'আগ্নেয়োঽষ্টাকপালো ভবতি' ইত্যাদি। যাহাদ্বারা যজ্ঞাদির ইতিকর্ত্তব্যতা সমন্বিত যাগাদিকরণের ফলসম্বন্ধ জানা যায় তাহা অধিকারবিধি—'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদি। যাহাদ্বারা অঙ্গের সহিত অঙ্গীর সম্বন্ধ জানা যায় তাহা বিনিয়োগ* বিধি—যথা 'ব্রীহিভির্যজেত, সমিধো যজতি' ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিধি মিলিয়া সাঙ্গপ্রধান কর্ম্মপ্রয়োগের ঐক্য বুঝায় তাহা প্রয়োগবিধি।† এই প্রয়োগবিধি শ্রৌত, ইহা ভাটগণ বলেন, এবং প্রাভাকর বলেন, ইহা কল্প্য। কর্ম্মের স্বরূপ দ্বিবিধ, যথা—গুণকর্ম্ম ও অর্থকর্ম্ম। ক্রতুব কর্ম্মকারকাদিকে আশ্রয় করিয়া বিহিত কর্ম্মই গুণকর্ম্ম। এই গুণকর্ম্ম চারি প্রকার যথা—(১) উৎপত্তি (২) আপ্তি, (৩) বিকৃতি, (৪) সংস্কৃতি। 'বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নীনাদধীত, যূপং তক্ষতি—ইত্যাদি আধান ও তক্ষণের দ্বারা সংস্কারবিশেষাবশিষ্ট অগ্নি ও যূপ প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য' 'গাং পয়ো দোগ্ধি' ইত্যাদি অধ্যয়ন ও দোহনাদিদ্বারা যে স্বাধ্যায় ও পয়ঃ প্রভৃতি বিদ্যমানই ছিল তাহাদেরই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। 'সোমমভিষুণোতি', 'ব্রীহিনবহন্তি, আজ্যং বিলাপয়তি' ইত্যাদি অভিষব, অবঘাত ও বিলাপনের দ্বারা সোমাদির বিকার হইয়া থাকে। 'ব্রীহীনপ্রোক্ষতি, 'পত্ন্যাবেক্ষতে, ইত্যাদি প্রোক্ষণ, অবেক্ষণের দ্বারা ব্রীহি প্রভৃতি দ্রব্যের সংস্কার। এই চারিটি অঙ্গ হইয়া থাকে। ক্রতুর কারকসকল আশ্রয় করিয়া বিহিত কর্ম্মই অর্থকর্ম্ম।

অর্থকর্ম্ম দুই প্রকার—(১) অঙ্গ, (২) প্রধান। অন্যার্থ হইল অঙ্গ এবং অনন্যার্থ হইল প্রধান। পুনরায় অঙ্গ দ্বিবিধ যথা—(১) সংনিপত্যোপকারক, (২) আরাদুপকারক—প্রথমটি প্রধানের স্বরূপনির্ব্বাহক, দ্বিতীয়টি ফলোপকারি। সম্পূর্ণাঙ্গ-যুক্ত বিধিই প্রকৃতি, এবং বিকলাঙ্গ বিধিই বিকৃতি। এই উভয় বিলক্ষণ বিধি, অর্থাৎ যাহা প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে, তাহা দর্বিহোম। এইরূপে সমস্ত কর্ম্মে প্রকৃতি বিকৃতি

* মন্ত্র অনেক প্রকার হইলেও প্রধানতঃ চারি প্রকার বলা যাইতে পারে।

(১) করণমন্ত্র, (২) ক্রিয়মাণানুবাদিমন্ত্র (৩) অনুমন্ত্রণমন্ত্র, (৪) জপমন্ত্র।

১। করণমন্ত্র :—এই করণমন্ত্র পুরোঽনুবাক্যা, যাজ্যা প্রভৃতি। যে দেবতার উদ্দেশ্যে হবিঃ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে হইবে, সেই দেবতার প্রতিপাদক পুরোঽনুবাক্যা, যাজ্যা পাঠের পরে হবিঃ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। পুরোঽনুবাক্যা, যাজ্যা যাগের পূর্ব্বে পাঠ করিতে হয় বলিয়াই যাজ্যা, পুরোঽনুবাক্যা প্রভৃতি করণমন্ত্র। করণ ক্রিয়ার পূর্ব্বে হইয়া থাকে।

২। ক্রিয়মাণানুবাদিমন্ত্র :—কর্ম্মের সমানকালে যে সকল মন্ত্র পাঠ করা হয় তাহাকে ক্রিয়মাণানুবাদিমন্ত্র বলে। মন্ত্রোচ্চারণকালেই কর্ম্মটি করিতে হইবে। যেমন যূপপরীব্যাণ মন্ত্র (যুবাসুবাসাপরিবীতাগাৎ (৩।১।৩ ঋক্‌সংহিতা)।

৩। অনুমন্ত্রণমন্ত্র হবিঃ প্রক্ষেপের অনন্তর যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয় তাহাকে অনুমন্ত্রণমন্ত্র বলে। অধ্বর্যু যখন হবির প্রক্ষেপ করিবেন, অনন্তর যজমান স্বত্ব ত্যাগ করিবেন, অনন্তর অনুমন্ত্রণমন্ত্র পঠিত হইবে। যেমন 'একো মম একা তস্য'—ইত্যাদি যজুর্মন্ত্র।

৪। জপমন্ত্র—কেবলমাত্র অদৃষ্টলাভের জন্য যে সকল মন্ত্র পাঠ করা হয় তাহাকে জপমন্ত্র বলে।

† আথর্ব্বমন্ত্রসমূহ প্রায়শঃ ঋক্‌মন্ত্র। কোনও স্থলে যজুর্মন্ত্র আছে; সুতরাং আথর্ব্বমন্ত্র আর পৃথকভাবে পরিগণিত হইল না। যদিও সাম-মন্ত্রগুলি সমস্তই ঋক্‌মন্ত্র, তথাপি প্রগীত ঋক্‌মন্ত্রকে সামমন্ত্র বলা হইয়া থাকে। ইহাই ঋক্‌মন্ত্র ও সামমন্ত্রের প্রভেদ।

* অঙ্গকলাপ সমন্বিত অঙ্গীপ্রধানকর্ম্মের অনুষ্ঠানবোধক বিধিকে বিনিয়োগবিধি বলে।

† প্রয়োগবিধি পূর্ব্বোক্ত উৎপত্তি, অধিকার ও বিনিয়োগ এই ত্রিবিধ বিধির মিলিতরূপ। পূর্ব্বোক্ত বিধিত্রয়ের সম্মেলনাত্মক বিধিই প্রয়োগবিধি।

বিভাগ বুঝিতে হইবে। এই প্রকারে বিধিভাগ নিরূপিত হইয়াছে। প্রাশস্ত্য ও নিন্দা প্রভৃতি লক্ষণের দ্বারা বিধিশেষ ভূতবাক্যই অর্থবাদ,* তাহা ত্রিবিধ, যথা—গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ। যাহা অন্য প্রমাণবিরুদ্ধ অর্থ বুঝায় তাহা গুণবাদ, যথা—'আদিত্য যূপঃ' ইত্যাদি। যাহা অন্য প্রমাণ প্রাপ্ত্য অর্থের বোধক হয় তাহা অনুবাদ, যথা—'অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্,' ইত্যাদি। প্রমাণান্তর বিরোধ ও প্রমাণান্তরের প্রাপ্তি-রহিত অর্থের বোধককে অর্থাৎ যে অর্থবাদবাক্য প্রমাণান্তর-বিরুদ্ধ অর্থের বোধক নহে এবং প্রমাণান্তর প্রাপ্তেরও বোধক নহে তাহা ভূতার্থবাদ—যথা ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছৎ ইত্যাদি। এজন্য বলা হইয়াছে বিরোধে গুণবাদ, অবধারণে অনুবাদ, এবং বিরোধ ও অনুবাদ ভিন্ন যে অর্থবাদ তাহা ভূতার্থবাদ, অতএব অর্থবাদ ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ অর্থবাদ বিধিস্তুতিতে সমান হইলেও দেবতা অধিকরণন্যায়ের † দ্বারা ভূতার্থবাদের স্বার্থেও প্রামাণ্য দেখা যায়। যাহা অবাধিত ও অজ্ঞাতের জ্ঞাপক তাহাই প্রমাণ ‡। কিন্তু বাধিত বিষয়ত্ব এবং জ্ঞাতজ্ঞাপকত্ব রহিয়াছে বলিয়া গুণবাদ ও অনুবাদের প্রামাণ্য নাই। যদিও অর্থবাদ-বাক্য বিধিস্তাবক বলিয়া স্বার্থে তাৎপর্য নাই তথাপি অর্থবাদ বাক্য স্বার্থতাৎপর্য্য-রহিত হইলেও প্রামাণ্যের অপবাদক কেহ না থাকায় অর্থবাদবাক্যের ঔৎসর্গিক প্রামাণ্য সুস্থিতই থাকে**। এইরূপে অর্থবাদভাগ নিরূপিত হইল। বিধি এবং অর্থবাদ উভয় বিলক্ষণ বেদান্তবাক্য। বেদান্তবাক্য অজ্ঞাতজ্ঞাপক হইয়াও অনুষ্ঠাপক নহে বলিয়া তাহা বিধি হইতে পারে না। ব্রহ্ম প্রতিপাদক উপনিষদবাক্যই একমাত্র শেষী অর্থাৎ অঙ্গী, অপর সমস্ত বিধিবাক্যই ইহার অঙ্গ। বিধিসমূহ দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মরাশি পুরুষের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া ব্রহ্ম-প্রতিপাদক উপনিষদ্ বাক্যেরই অঙ্গ হইয়া থাকে। সুতরাং উপনিষদ্ বাক্য অন্যের অঙ্গ নহে বলিয়া অর্থবাদ হইতে পারে না। কিন্তু বেদান্ত-বাক্য এই উভয় বিলক্ষণ। অতএব কখনও কখনও বেদান্ত-বাক্য অজ্ঞাতজ্ঞাপক বলিয়া বিধিরূপে ব্যবহার করা হয়, কখনও ভূতার্থবাদরূপে ব্যবহৃত হয়; ইহাতে কোন দোষ নাই। এইরূপে ত্রিবিধ ব্রাহ্মণ নিরূপিত হইয়াছে। অতএব বেদ কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ডাত্মক এবং তাহাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রতিপাদক।

বেদ পুনরায় যজ্ঞনির্ব্বাহের নিমিত্ত ত্রিবিধ প্রয়োগের দ্বারা ঋক্, যজুঃ, সাম ভেদে ত্রিবিধ হইয়াছে। ঋগ্বেদের দ্বারা হোত্র প্রয়োগ, যজুর্ব্বেদের দ্বারা আধ্বর্য্যব প্রয়োগ, সামবেদের দ্বারা ঔদ্গাত্র প্রয়োগ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।* ব্রহ্মারূপ ঋত্বিক্, যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাহা এই বেদত্রয়েরই অন্তর্গত এবং যজ্ঞের অধিকারী যজমানেরও যে সমস্ত কর্ম্ম তাহাও এই বেদত্রয়ের অন্তর্গত। কিন্তু অথর্ব্ববেদ † যজ্ঞের অনুপযুক্ত, শান্তি, পৌষ্টিক, অভিচারের প্রতিপাদক, সেইজন্য অন্য বেদ হইতে ভিন্ন। এইরূপ প্রবচন ভেদ নিবন্ধন প্রতি বেদেই বহু শাখা ও ভিন্ন ভিন্ন; অতএব কর্ম্মকাণ্ডে ঋত্বিকগণের ‡ কর্ম্ম-ভেদ নিবন্ধন কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিপাদ্য বস্তু ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ব্রহ্মকাণ্ডে বেদের সকল শাখারই একরূপত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে প্রয়োজন ভেদে চতুর্ব্বেদের বিভাগ প্রদর্শিত হইল।

অনন্তর বেদাঙ্গসকল বলা যাইবে। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত প্রভৃতি বিশিষ্ট স্বরব্যঞ্জনাত্মক যে বর্ণোচ্চারণ বিশেষ জ্ঞান তাহাই শিক্ষারূপ অঙ্গের প্রয়োজন। বেদের উচ্চারণ-জ্ঞান শিক্ষার অধীন। উচ্চারণ-জ্ঞানের অভাবে বেদমন্ত্রসমূহের আনর্থক্য হইয়া থাকে। অতএব ইহা বলা হইয়াছে—'মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ—(মহাভাষ্য) ইত্যাদি। সর্ব্ববেদসাধারণী শিক্ষা—'অনন্তর শিক্ষা কি তাহা বলিব'—ইত্যাদি পঞ্চখণ্ডাত্মিকা পাণিনিকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বেদের প্রতি শাখার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রাতিশাখ্য অন্যান্য মনীষিগণ কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে।

এইরূপ বৈদিক পদের সাধুত্বজ্ঞানের দ্বারা উহ প্রভৃতি ব্যাকরণের প্রয়োজন। 'বৃদ্ধিরাদৈচ্'**—ইত্যাদি ভগবান পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কাত্যায়ন মুনি পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিক রচনা করিয়াছিলেন। তারপর সেই পাণিনিসূত্রের ও বার্ত্তিক সূত্রের উপর ভগবান পতঞ্জলি মহাভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং এই ত্রিমুনি ব্যাকরণকে বেদাঙ্গ বলা হয়। ইহার অপর নাম মাহেশ্বর ব্যাকরণ। কৌমার প্রভৃতি ব্যাকরণসকল বেদাঙ্গ নহে, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগ মাত্র, জ্ঞানের জন্য প্রণীত হইয়াছে।

---

* অর্থবাদ দ্বিবিধ—১। প্রশংসার্থবাদ, (২) নিন্দার্থবাদ। যে অর্থবাদবাক্য লক্ষণার দ্বারা প্রাশস্ত্যের বোধক হইয়া থাকে তাহাকে প্রশংসার্থবাদ বলে। আর যে অর্থবাদবাক্য লক্ষণার দ্বারা নিন্দার্থবাদক হইয়া থাকে তাহাকে নিন্দার্থবাদ বলে।

† অধিকরণন্যায়—'তদুপর্য্যপিবাদরায়ণ সম্ভবাৎ' ব্রহ্মসূত্রম্।

‡ যাহা যাহা প্রসঙ্গ তাহা প্রমাণ।

** মীমাংসকমতে প্রামাণ্যের স্বতঃ প্রামাণ্য অপবাদকবশতঃই প্রসক্তপ্রামাণ্যের অপবাদ হইয়া থাকে। ভূতার্থবাদের অপবাদ কেহ নাই বলিয়া ঔৎসর্গিক প্রমাণের হানি হয় না।

* যজ্ঞে চারি জন ঋত্বিক থাকে, যথা—হোতা উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা।

† অথর্ব্ববেদ সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে ঋক্, যজুঃ, সামকে ত্রয়ী বলা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদকে বেদ বলা হইয়াছে। মনুসংহিতার ৩১ শ্লোকে ভাষ্যকার মেধাতিথি অথর্ব্ববেদের বেদত্ব আছে কিনা এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে জয়ন্ত ভট্ট অথর্ব্ববেদের সর্ব্ববেদ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। (ন্যায়মঞ্জরী কাশীসংস্করণ পৃঃ ২৩৮)

‡ ঋগ্বেদে ঋত্বিকের হোত্রপ্রয়োগ, সামবেদে ঋত্বিকের ঔদ্গাত্রপ্রয়োগ এবং যজুর্ব্বেদে ঋত্বিকের আধ্বর্য্যব প্রয়োগ।

** বৃদ্ধিরাদৈচ্—ইহা পাণিনি ব্যাকরণের প্রথম সূত্র।

এইরূপ শিক্ষা, ব্যাকরণ দ্বারা বর্ণের উচ্চারণ এবং পদসাধুত্ব-জ্ঞান হইলে বৈদিকমন্ত্রসমূহের অর্থ জানিবার ইচ্ছায় ভগবান যাস্ক 'সমাম্নায়ঃ সমাম্নাত'—স 'ব্যাখ্যাতব্য'—ইত্যাদি ত্রয়োদশ অধ্যায়াত্মক নিরুক্ত রচনা করিয়াছিলেন। এই নিরুক্ত শাস্ত্রে নাম, আখ্যাত, নিপাত ও উপসর্গ ভেদে চারি প্রকার পদ নিরূপণ করিয়া বৈদিক মন্ত্র পদসকলের অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদের মন্ত্রসমূহ বাক্যরূপ। এই মন্ত্রবাক্য যজ্ঞে অনুষ্ঠেয় অর্থের প্রকাশন দ্বারা অনুষ্ঠানের করণ হইয়া থাকে। মন্ত্রবাক্য করণ। পদসমষ্টিই বাক্য। পদের অর্থজ্ঞান হইলে বাক্যের অর্থ জ্ঞাত হওয়া যায়। সুতরাং মন্ত্র-বাক্যের অর্থ জানিতে হইলে মন্ত্রের অন্তর্গত পদগুলির অর্থ জানিতে হইবে। মন্ত্রবাক্যের অন্তর্গত পদগুলির অর্থ নিরূপণ করিবার জন্য নিরুক্ত শাস্ত্র অত্যন্ত অপেক্ষিত। অন্যথা মন্ত্রার্থ সম্ভব নহে।

অগ্নের্বর্ত্তী [illegible] (ঋক্সংহিতা [illegible]) ইত্যাদি দুরূহ পদসকলের [illegible] নিরুক্ত [illegible] অর্থজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। এইরূপ [illegible] পদার্থের সম্যগ্জ্ঞান [illegible] নিরুক্তেরই প্রয়োজন *। তাহার মধ্যে পাঁচটি অধ্যায় [illegible] সঙ্কলন গ্রন্থ [illegible] প্রণয়ন করিয়াছেন।

এইরূপ ঋক্মন্ত্রসকল পাদবদ্ধ ছন্দোবিশিষ্ট বলিয়া এবং ছন্দ না জানিলে বেদে তাহার নিন্দা আছে বলিয়া ছন্দোবিশেষ নিমিত্ত অনুষ্ঠানবিশেষেরও বিধানবশতঃ, ছন্দ জানিবার আকাঙ্ক্ষায় ও ছন্দের প্রকাশের নিমিত্ত—ধী, শ্রী, স্ত্রীম ইত্যাদি অষ্টাধ্যায়ী 'ছন্দবিবৃতি' ভগবান পিঙ্গল কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। 'তত্রাপ্যলৌকিকম্' ইত্যাদি ত্রিবিধ অধ্যায় দ্বারা গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুভ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ, জগতী এই সাতটি ছন্দ ও তাহাদের অবান্তরভেদ নিরূপিত হইয়াছে। ব্যাকরণে যেরূপ লৌকিক পদনিরূপণ সেইরূপ 'অথ লৌকিকম্' ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা আরম্ভ করিয়া পাঁচটি অধ্যায়ে ইতিহাস, পুরাণাদির উপযোগী লৌকিক ছন্দসকল প্রসঙ্গত নিরূপিত হইয়াছে।

এইরূপ বৈদিক কর্ম্মের জন্য অমাবস্যা প্রভৃতি জানিবার নিমিত্ত ভগবান আদিত্য কর্ত্তৃক জ্যোতিষশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল। ইহাই সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামে প্রসিদ্ধ। গর্গ প্রভৃতি ঋষিগণও বহুবিধ জ্যোতিষশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।

শাখান্তরে পরিপঠিত সকলন দ্বারা বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের ক্রমবিশেষ জানিবার জন্যই কল্পসূত্রসমূহ প্রণীত হইয়াছে। তাহা পুনরায় ত্রিবিধ প্রয়োগভেদে তিনপ্রকার হোত্রপ্রয়োগ প্রতিপাদনের জন্য আশ্বলায়ন, শাখায়ন প্রভৃতি ঋষিকর্ত্তৃক কল্পসূত্র প্রণীত হইয়াছে, আধ্বর্য্যবপ্রয়োগ প্রতিপাদক কল্পসূত্র বোধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন প্রভৃতি প্রণীত; উদ্গাত্রপ্রয়োগ প্রতিপাদক কল্পসূত্র লাট্যায়ন, দ্রাহ্যায়ণ প্রভৃতি প্রণীত।

এইরূপে ছয়টি অঙ্গের প্রয়োজনভেদ নিরূপিত হইল। বেদের চারি উপাঙ্গের প্রয়োজনবিশেষ এখন বলা হইবে। ভগবান বাদরায়ণ কর্ত্তৃক (১) সর্গ, (২) প্রতিসর্গ, (৩) বংশ, (৪) মন্বন্তর, (৫) বংশ্যানুচরিত প্রতিপাদক পুরাণ রচিত হইয়াছিল। সেই সকল পুরাণ—(১) ব্রাহ্ম, (২) পাদ্ম, (৩) বৈষ্ণব, (৪) শৈব, (৫) ভাগবত, (৬) নারদীয়, (৭) মার্কণ্ডেয়, (৮) আগ্নেয়, (৯) ভবিষ্য, (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, (১১) লৈঙ্গ, (১২) বারাহ, (১৩) স্কান্দ, (১৪) বামন, (১৫) কৌর্ম্ম, (১৬) মাৎস্য, (১৭) গারুড, (১৮) ব্রহ্মাণ্ড, এইরূপে সংখ্যায় অষ্টাদশটি। প্রথমটি সনৎকুমার প্রোক্ত পুরাণ, দ্বিতীয়টি নারসিংহ নামে প্রসিদ্ধ, তৃতীয় নান্দ, চতুর্থ শিবধর্ম্ম, পঞ্চম দৌর্ব্বাসস, ষষ্ঠ নারদীয়, সপ্তম কাপিল, অষ্টম মানব উপপুরাণ, নবম ঔশনস, দশম ব্রহ্মাণ্ড, একাদশ বারুণ-পুরাণ, দ্বাদশ কালীপুরাণ, ত্রয়োদশ বাশিষ্ঠ, চতুর্দ্দশ মাহেশ্বর পুরাণ, পঞ্চদশ বাশিষ্ঠলৈঙ্গপুরাণ, ষোড়শ সাম্বপুরাণ, সপ্তদশ সৌরপুরাণ, অষ্টাদশ পারাশর, ঊনবিংশ মারীচপুরাণ, বিংশ সর্ব্বধর্ম্মার্থসাধক ভার্গবপুরাণ। এইরূপে বিংশতি উপপুরাণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

পাঁচটি অধ্যায়সমন্বিত আন্বীক্ষিকী ন্যায় গৌতম (গোতম) কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান এই ষোলটি পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানই ন্যায়ের প্রয়োজন। এইরূপ কণাদ প্রণীত দশাধ্যায়াত্মক বৈশেষিক শাস্ত্র। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সপ্ত পদার্থের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য দ্বারা ব্যুৎপাদনই বৈশেষিক শাস্ত্রের প্রয়োজন। ইহাও ন্যায়পদের দ্বারা উক্ত হইয়াছে।

এইরূপ মীমাংসাও দ্বিবিধ—(১) কর্ম্মমীমাংসা ও (২) শারীরকমীমাংসা। 'অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' এই সূত্রদ্বারা আরব্ধ হইয়া 'অন্বাহার্য্যে চ দর্শনাৎ' এই সূত্রদ্বারা সমাপ্ত দ্বাদশাধ্যায় সমন্বিত কর্ম্মমীমাংসা ভগবান জৈমিনি কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। (১) ধর্ম্মের প্রমাণ, (২) ধর্ম্মভেদাভেদ, (৩) শেষ শেষিভাব (অঙ্গাঙ্গিভাব), (৪) ক্রত্বর্থপ্রযুক্তি ও পুরুষার্থ-প্রযুক্তি, (৫) শ্রুত্যর্থপাঠের দ্বারা ক্রমভেদ, (৬) অধিকার-বিশেষ, (৭) সামান্যাতিদেশ, (৮) বিশেষাতিদেশ, (৯) উহ, (১০) বাধ, (১১) তন্ত্র, (১২) প্রসঙ্গ ইত্যাদি ক্রমে দ্বাদশ অধ্যায়ের অর্থ। সঙ্কর্ষণকাণ্ডও চারি অধ্যায়ে জৈমিনি কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। দেবতাকাণ্ডরূপে প্রসিদ্ধ উপাসনারূপ কর্ম্ম যাহা সঙ্কর্ষণকাণ্ডে প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা কর্ম্মমীমাংসারই

* নিরুক্ত গ্রন্থ তিনটি কাণ্ডে বিভক্ত। যথা—(১) নৈঘণ্টু, (২ নৈগম, (৩) দৈবত।

অন্তর্গত।* তারপর 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা আরব্ধ হইয়া 'অনাবৃত্তি শব্দাৎ' ইহা দ্বারা পরিসমাপ্ত চারি অধ্যায়ে শারীরকমীমাংসা, যাহা জীব ব্রহ্মের একত্ব সাক্ষাৎকারের হেতু এবং শ্রবণ প্রভৃতি বিচার প্রতিপাদক ভায় প্রদর্শন করে, তাহা ভগবান বাদরায়ণ কর্তৃক রচিত হইয়াছে। সকল বেদান্ত বাক্যের সাক্ষাৎসম্বন্ধে বা পরম্পরাসম্বন্ধে প্রত্যক্, অভিন্ন, অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাৎপর্য্য, এই সমন্বয় প্রথম অধ্যায়ে প্রদর্শিত। বেদান্তশাস্ত্রের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের ৪টি পাদ আছে। সেখানে প্রথম পাদে স্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গযুক্ত বেদান্ত বাক্যসকল বিচারিত হইয়াছে। দ্বিতীয়পাদে অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গ বেদান্তবাক্যসকল যাহা উপাস্যব্রহ্মের প্রতিপাদক তাহা আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয়পাদে অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গ বেদান্তবাক্য প্রায়ই জ্ঞেয় ব্রহ্মের বিষয়ক তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে তিনটি পাদে বেদান্তবাক্যবিচার সমাপ্ত হইয়াছে। চতুর্থপাদে যে সমস্ত পদ সাংখ্যসম্মত প্রধান বিষয়ক বলিয়া সন্দেহ উৎপাদন হয়, তাহাতে 'অজ' প্রভৃতি পদের বিচার সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে প্রথম অধ্যায়ে বেদান্ত বাক্য সকলের অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সমন্বয় সিদ্ধ হইলে, সেখানে স্মৃতি, তর্ক প্রভৃতি বিরোধ সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে সাংখ্য, যোগ, কাণাদ প্রভৃতি স্মৃতির সহিত এবং সাংখ্যাদিপ্রযুক্ত তর্কের সহিত বেদান্ত সমন্বয়ে উদ্ভাবিত বিরোধের পরিহার বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যাদি মতের দুষ্টত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষনিরাকরণরূপ বিচার পরিদৃষ্ট হয়।† তৃতীয়পাদের পূর্ব্বভাগে মহাভূত সৃষ্টি প্রভৃতি শ্রুতির পরস্পর-বিরোধ পরিহৃত হইয়াছে; এবং উত্তরভাগে জীববিষয়ক পরস্পরবিরুদ্ধ শ্রুতির পরিহার বলা হইয়াছে। চতুর্থ পাদে ইন্দ্রিয়বিষয় শ্রুতিসকলের পরস্পর বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সাধন নিরূপিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবের পরলোক গমনাগমন নিরূপণের দ্বারা বৈরাগ্য নিরূপিত হইয়াছে। এইজন্য এই পাদের নাম বৈরাগ্য পাদ। দ্বিতীয় পাদে পূর্ব্বভাগের দ্বারা 'ত্বং' পদার্থ শোধিত হইয়াছে উত্তর ভাগের দ্বারা 'তৎ' পদার্থের শোধন প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে নানা শাখায় পঠিত পুনরুক্ত পদের নির্গুণ ব্রহ্মে উপসংহার করা হইয়াছে এবং প্রসঙ্গতঃ সগুণনির্গুণ বিদ্যায় অন্য শাখাস্থিত গুণের উপসংহার এবং অনুপসংহার নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থ পাদে নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার বহিরঙ্গসাধন আশ্রমকর্ম্ম ও যজ্ঞসকল এবং অন্তরঙ্গসাধন, শমদমাদি ও শ্রবণমননিদিধ্যাসন প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সগুণনির্গুণবিদ্যার ফলবিশেষ নির্ণীত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমপাদে শ্রবণাদির পুনঃপুনঃ আবৃত্তির দ্বারা নির্গুণব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়া জীবন্মুক্ত পুরুষের পাপপুণ্যের দ্বারা নির্লেপতারূপ জীবন্মুক্তির কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে মৃতের উৎক্রান্তির প্রকার উক্ত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে সগুণব্রহ্মবিদের উত্তরমার্গে গমন বলা হইয়াছে। চতুর্থ পাদের পূর্ব্বভাগে নির্গুণব্রহ্মবিদের বিদেহকৈবল্যপ্রাপ্তি উক্ত হইয়াছে। উত্তরভাগে সগুণব্রহ্মবিদের ব্রহ্মলোকস্থিতি কথিত হইয়াছে। এই বেদান্তশাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রের মুকুট। অন্য শাস্ত্রসকল ইহারই অঙ্গস্বরূপ, সেইজন্য ইহাই মুমুক্ষুগণের আদরণীয় এবং ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রদর্শিত রীতিতে ইহাই রহস্য।

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, আঙ্গির, বশিষ্ঠ, দক্ষ, সংবর্ত্ত, শাতাতপ, পরাশর, গৌতম, শঙ্খ, লিখিত, হারীত, আপস্তম্ব, উশনো, ব্যাস, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, দেবল, নারদ, পৈঠীনসি প্রভৃতি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক রচিত ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারা বর্ণাশ্রমবিশেষের বিভাগ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ ব্যাসকৃত মহাভারত এবং বাল্মীকিকৃত রামায়ণ ধর্ম্মশাস্ত্রেরই অন্তর্গত এবং তাহারা ইতিহাসরূপে প্রসিদ্ধ।*

সাংখ্য প্রভৃতিও ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সাংখ্যাদিশব্দের দ্বারা পৃথক নির্দিষ্ট হওয়াতে ইহাদের সঙ্গতি পৃথকভাবে বলা উচিত।

অনন্তর চারি বেদের ক্রমশঃ চারিটি উপবেদ। আয়ুর্ব্বেদের আটটি স্থান যথা—(১) সূত্র, (২) শারীর, (৩) ঐন্দ্রিয়, (৪) চিকিৎসা, (৫) নিদান, (৬) বিমান, (৭) কল্প, (৮) সিদ্ধি। ব্রহ্মা, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমার, ধন্বন্তরী ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয়, অগ্নিবেশ প্রভৃতি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সঙ্কলিত হইয়াছে।† আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পঞ্চস্থানাত্মক অষ্টস্থান সুশ্রুত রচনা করিয়াছিলেন।‡ এইরূপ বাগ্ভটাদি কর্ত্তৃক রচিত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পৃথক প্রস্থান নহে। কামশাস্ত্রও আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্গত। আয়ুর্ব্বেদে বাজীকরণনামক কামশাস্ত্র সুশ্রুতকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে। বাৎস্যায়ন পাঁচটি অধ্যায়ে কামশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রোক্তপথে বিষয়ভোগ দুঃখমাত্রেই

---

* এই সর্ব্বকাণ্ড কাহার রচিত, এই বিষয়ে বহু মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন ইহা কাশকৃৎস্ন রচিত; কেহ কেহ বলেন জৈমিনি রচিত, আবার কেহ বলেন ইহা বাদরায়ণ রচিত।

† বিচার স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষনিরাকরণ এই দুইটি অংশে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

* আগমশাস্ত্রে পাঁচখানা ইতিহাস প্রসিদ্ধ আছে। যথা—মহাভারত রামায়ণ শিবরহস্য বিদ্যার্ণব ও ব্রহ্মবিদ্যাভ্যুদয়। "ভারাশিবিব্রা পঞ্চেতিহাস।"

† ঋগ্বেদের উপবেদ আয়ুর্ব্বেদ। সুশ্রুত সংহিতাতে আয়ুর্ব্বেদকে অথর্ব্ববেদের উপবেদ বলা হইয়াছে। অথর্ব্বসংহিতা ঋক্‌ময়াত্মক বলিয়া অথর্ব্ববেদের উপবেদ আয়ুর্ব্বেদও ঋগ্বেদেরই উপবেদ।

‡ চরকসংহিতায় কায়চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে। সুশ্রুতসংহিতা অস্ত্রচিকিৎসা প্রধান।

পর্য্যবসিত হয়, সুতরাং বিষয়বৈরাগ্যই কামশাস্ত্রের প্রয়োজন। শাস্ত্রোপদিষ্ট মার্গে বিষয়ভোগ করিলেও দুঃখে পর্য্যবসায় হইবে। রোগ, রোগের কারণ, রোগের নিবৃত্তি ও তাহার সাধনজ্ঞান চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রয়োজন।

এইরূপ বিশ্বামিত্র কর্তৃক রচিত চারি পাদে ধনুর্ব্বেদশাস্ত্র। (১) দীক্ষাপাদ, (২) সংগ্রহপাদ, (৩) সিদ্ধিপাদ, (৪) প্রয়োগপাদ। প্রথম পাদে—ধনুর লক্ষণ ও অধিকারী নিরূপণ করা হইয়াছে। এখানে ধনুঃ শব্দের সাধারণতঃ চাপ অর্থে নিরূঢ় প্রয়োগ থাকিলেও এখানে অস্ত্রমাত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই অস্ত্র চতুর্ব্বিধ যথা—মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও যন্ত্রমুক্ত। মুক্ত অর্থাৎ চক্র প্রভৃতি, অমুক্ত খড়্গ প্রভৃতি; মুক্তামুক্ত—শল্য এবং শল্যেরই নানাপ্রকার ভেদ ইত্যাদি, যন্ত্রমুক্ত—শর প্রভৃতি। মুক্তকেই অস্ত্রনামে অভিহিত করা হয়। অমুক্তকে শস্ত্র বলা হয়। তাহাও ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, পাশুপত, প্রাজাপতি, আগ্নেয় প্রভৃতি ভেদে বহুবিধ।

এইরূপ অধিদৈবত মন্ত্রে চতুর্ব্বিধ অস্ত্রের কথা বলা হইল। এই চতুর্ব্বিধ আয়ুধের মন্ত্র ও দেবতা পৃথক আছে। মন্ত্র ও দেবতাযুক্ত আয়ুধে ক্ষত্রিয় ও তদনুযায়ীগণের অধিকার বুঝিতে হইবে। ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়ানুযায়ীগণ চারি ভাগে বিভক্ত; যথা—পদাতি, রথারূঢ়, অশ্বারূঢ়, গজারূঢ়। ধনুর্ব্বেদে দীক্ষা, অভিষেক, শকুন,* মঙ্গলকরণ প্রভৃতি সকলই প্রথম পাদে নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে সকল শাস্ত্রজ্ঞ ও আচার্য্যদের লক্ষণ বলা হইয়াছে ও তাহার সংগ্রহণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে গুরুসম্প্রদায়সিদ্ধ শস্ত্রবিশেষজ্ঞগণের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস, মন্ত্রসিদ্ধি ও দেবতাসিদ্ধিকরণ নিরূপিত হইয়াছে। এইরূপ চতুর্থ পাদে শস্ত্রের দেবতার্চ্চনা, শস্ত্রের অভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধ অস্ত্রবিশেষের প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে। যুদ্ধাচরণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; দুষ্টের দণ্ড ও প্রজাপালনে ধনুর্ব্বেদের প্রয়োজন। এইরূপ ব্রহ্মা প্রণীত, প্রজাপতি প্রণীত শাস্ত্রক্রমে বিশ্বামিত্র প্রণীত ধনুর্ব্বেদশাস্ত্র।

ভগবান ভরতকর্তৃক গান্ধর্ব্বশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। গীত, বাদ্য, নৃত্য প্রভৃতি ভেদে ইহার অর্থ বহুবিধ। দেবতার আরাধনা, নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রভৃতি এবং সিদ্ধি গান্ধর্ব্ববেদের প্রয়োজন।

এই প্রকার অর্থশাস্ত্রও বহুবিধ, যথা—নীতিশাস্ত্র, অশ্বশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, সূপকারশাস্ত্র, চতুঃষষ্টিকলাশাস্ত্র। তাহা নানা মুনিকর্তৃক প্রণীত। এই সমস্ত শাস্ত্রের লোকব্যবহারানুসারে প্রয়োজনভেদ বুঝিতে হইবে।

এইরূপ অষ্টাদশবিদ্যা ঋষীগণের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। অতএব একটি বিদ্যাও কম হইলে ঋষীর ন্যূনতা হইবে।

* শুভাশুভসূচক পশুপক্ষীর বিচরণ ও শব্দকে শকুন বলে।

সাংখ্যশাস্ত্র ভগবান কপিলকর্তৃক রচিত হইয়াছিল* 'অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ—ইত্যাদিরূপে। সাংখ্যশাস্ত্র ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে বিষয় নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রধানের কার্য্যসকল নিরূপিত হইয়াছে; তৃতীয় অধ্যায়ে বিষয়ের বৈরাগ্য এবং চতুর্থ অধ্যায়ে বিরক্ত, পিঙ্গল ও আকুবগণের আখ্যায়িকা নিরূপিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে পরপক্ষখণ্ডন প্রদর্শিত হইয়াছে, ষষ্ঠে সমস্ত শাস্ত্রের সংক্ষেপ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানই সাংখ্যশাস্ত্রের প্রয়োজন।

পতঞ্জলি প্রণীত যোগশাস্ত্র—'অথ যোগানুশাসনম্' ইত্যাদি রূপে চারি পাদে যোগশাস্ত্র নিরূপিত হইয়াছে। প্রথম পাদে চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ সমাধি এবং সমাধির সাধন, অভ্যাস, বৈরাগ্য নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে বিক্ষিপ্ত চিত্তের সমাধিসিদ্ধির নিমিত্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এইরূপ আটটি অঙ্গ নিরূপিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে যোগবিভূতি সকল; চতুর্থ পাদে কৈবল্য নিরূপিত হইয়াছে। বিজাতীয় প্রত্যয়নিরোধ দ্বারা নিদিধ্যাসন সিদ্ধি-যোগের প্রয়োজন।

এইরূপে পশুপতিমতকে পাশুপতশাস্ত্র বলা হয়—পশুর পাশমুক্তির জন্য পশুপতি কর্তৃক রচিত—'অথাতঃ পাশুপতং যোগবিধিং ব্যাখ্যাস্যাম'† ইত্যাদি রূপে পাঁচটি অধ্যায়ে পাশুপত শাস্ত্র বিভক্ত। এই পাঁচটি অধ্যায় দ্বারা কার্য্যরূপ জীব—সে পশু, কারণ ঈশ্বরকে পতি বলা হয়; পশুপতিতে চিত্তসমাধানই যোগ, ভস্ম দ্বারা ত্রিষবন স্নানকে বিধি বলা হয়, তাহা নিরূপিত হইয়াছে। মোক্ষই এই শাস্ত্রের প্রয়োজন—তাহাকে 'দুঃখান্ত বলা হয়। এইরূপে (১) কার্য্য, (২) কারণ, (৩) যোগ, (৪) বিধি, (৫) দুঃখান্ত এই পাঁচটী নিরূপিত হইয়াছে।

নারদ প্রভৃতি পঞ্চরাত্ররূপ বৈষ্ণবশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। এই বৈষ্ণবশাস্ত্রে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিটি পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। ভগবান বাসুদেব সকল কারণরূপ পরমেশ্বর। তাহা হইতে উৎপন্ন সঙ্কর্ষণ নামক জীব। তাহা হইতে মনরূপ প্রদ্যুম্ন, তাহা হইতে অনিরুদ্ধরূপ অহঙ্কার। এই সকল ভগবান বাসুদেবের অংশসম্ভূত, সুতরাং বাসুদেবের সহিত অভিন্ন; ভগবান বাসুদেবের কায় মন বাক্য প্রভৃতি বৃত্তি দ্বারা আরাধনা করিয়া কৃতকৃত্য হওয়া যায় ইত্যাদি নিরূপিত হইয়াছে।

এইরূপে শাস্ত্রের প্রধান ভেদ নিরূপিত হইল। এই শাস্ত্রসমূহ সংক্ষেপতঃ তিন প্রস্থানে বিভক্ত, যথা—আরম্ভবাদ

* যদিও বর্ত্তমান সময়ে আমরা এই সাংখ্যসূত্রই দেখিতে পাই, তথাপি ইহা মূল সাংখ্যশাস্ত্র নহে। এই সূত্রগুলি পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়াছে। এই সাংখ্যসূত্র কোন প্রাচীনগ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই।

† পাশুপতশাস্ত্রের প্রথম সূত্র—'অথাতঃ পাশুপতং যোগবিধিং ব্যাখ্যাস্যাম।'

প্রথম, দ্বিতীয় পরিণামবাদ, তৃতীয় বিবর্ত্তবাদ। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু দ্ব্যণুকাদিক্রমে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত জগতের আরম্ভক হইয়া থাকে। তার্কিক ও মীমাংসকগণের মতে এই আরম্ভবাদে কার্য্য অসৎ এবং কার্য্যকারকবাদে উৎপন্ন হইয়া থাকে; সত্ত্ব-রজ-তম গুণাত্মক তত্ত্বকে প্রধান বলা হয়; এই প্রধান অহঙ্কারাদিক্রমে জগৎরূপে পরিণত হয়; সাংখ্য, যোগ, পাতঞ্জল, পাশুপত মতে সৎকার্য্যই সুক্ষ্মরূপে কারণ ব্যাপার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়—ইহা দ্বিতীয় পক্ষ।* বৈষ্ণব মতে † পরমানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম স্বীয় মায়াবশতঃ মিথ্যা জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইয়াছে—এই বিবর্ত্তবাদই তৃতীয় পক্ষ। সকল প্রস্থান প্রণেতা মুনিগণের সিদ্ধান্ত আপাততঃ ভিন্ন হইলেও বিবর্ত্তবাদে পর্য্যবসান দ্বারা অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই তাঁহাদের মুখ্য প্রতিপাদ্য ইহাই তাৎপর্য্য। বিভিন্ন প্রস্থানের মুনিগণ সর্ব্বজ্ঞত্ববশতঃ ভ্রান্ত নহেন। কিন্তু যাঁহারা বাহ্য বিষয়ে আসক্তচিত্ত তাঁহাদের আপাততঃ পরমপুরুষার্থে প্রবেশ সম্ভব নহে, তাঁহাদের নাস্তিক্যমাত্র প্রতিষেধের জন্য এই সকল প্রকারভেদ প্রদর্শিত হইল। নাস্তিক্যমাত্র প্রতিষেধের জন্য যে সমস্ত প্রস্থান রচিত হইয়াছে তাহাদেরও পরম তাৎপর্য্য অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই বটে। কিন্তু প্রস্থান-প্রণেতৃগণের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বেদবিরুদ্ধ অর্থেও তাহাদের তাৎপর্য্য আছে এইরূপ উৎপ্রেক্ষাপূর্ব্বক সমস্ত মতই উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিয়া জনগণ নানা পথানুসারী হইয়া থাকে।

* এই সিদ্ধান্তে কার্য্য সৎ এবং উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ কার্য্যে অবস্থিত এবং কারণ, ব্যাপারদ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তে অসতের উৎপত্তি স্বীকার করা হয় না।

† বৈষ্ণবগণও পরিণামবাদী। পরিণামবাদ দুইটি (১) জড়পরিণাম (২) চিৎপরিণাম।

লোটা নাগা

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

আও নাগাদের দেশের দক্ষিণে দয়াং নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী অঞ্চলে লোটা নাগাদের বাস। লোটাদের লোকসংখ্যা কুড়ি হাজারের বেশী নয়। যাবতীয় নাগা-সম্প্রদায়ের মধ্যে লোটাদের ভিতরেই খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার হয়েছে সবচেয়ে বেশী। পাহাড়ের পাদদেশে যে-সমস্ত লোটা বাস করে তারা প্রতিবেশী অসমীয়া হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, পূজা-পার্ব্বণ ইত্যাদি বহুল পরিমাণে গ্রহণ করেছে। লোটাদের দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে কোনও কোনও গ্রামে খুব ধুমধাম করে লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে—এই পূজাকে এরা বলে রংসিকাম। এরা যে ভাবে নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠানাদি বর্জ্জন করতে সুরু করেছে তাতে মনে হয় যে, ভবিষ্যতে এদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বলতে কিছু থাকবে না।

লোটাদের গায়ের বর্ণ পীত, মাথার চুল সাধারণতঃ খাড়া। লোটা যুবকেরা প্রায় সকলেই গোঁফদাড়ি নখ দিয়ে টেনে তুলে ফেলে। লোটাদের চক্ষু পিঙ্গল এবং ঈষৎ তির্য্যক। পুরুষেরা মাথার চার পাশ ক্ষুর দিয়ে চেঁচে কামিয়ে ফেলে। ছোট ছোট মেয়েদের মাথা কামিয়ে একদম নেড়া করে ফেলা হয়—সাত বছরের পর থেকে তারা লম্বা চুল রাখতে পারে।

পোশাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার

লোটাদের পরিধেয় বস্ত্রের নাম 'লেংটা'। (কথাটা অসমীয়া ভাষা থেকে ধার করা—মানে নেংটি)। এই অপরিসর বস্ত্রখণ্ড সাদা অথবা নীল রঙের এবং লাল ডোরা-কাটা ঝালরযুক্ত। মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড (সুরহাম) বাইশ ইঞ্চি চওড়া। এটি তারা কোমরে গেরো দিয়ে পরে। সুরহামের ফুল-পাতা ইত্যাদির নক্সা-তোলা পাড়ের বাহার চমৎকার।

লোটারা যখন ক্ষেতে কাজ করে কিংবা গ্রীষ্মকালে বাড়ীতে বিনা কাজে সময় কাটায় তখন লেংটা ছাড়া আর কিছুই পরে না। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে যাবার সময় কিংবা গ্রাম থেকে স্থানান্তর গমনকালে আন্দাজ আড়াই হাত লম্বা একটি চাদর গায়ে দিয়ে থাকে। তবে সাধারণতঃ মেয়ে পুরুষ সকলেরই উর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত থাকে। উত্তর অঞ্চলের অবিবাহিতা লোটা মেয়েরা ঘন নীল রঙের যে বস্ত্রখণ্ডটি পরিধান করে তার নাম মুকসু। বিয়ের দিন রাত্রিবেলা পতিগৃহে যাত্রাকালে নববধূ 'লরম্নেসু' নামে সাদা এবং লাল রঙের বর্ডার দিয়ে চতুষ্কোণ নক্সা-তোলা যে বস্ত্রখণ্ডটি পরিধান করে সেটি অত্যন্ত নয়নাভিরাম।

লোটা মেয়েদের চেয়ে পুরুষদেরই গয়নাগাঁটির প্রতি আসক্তি বেশী। ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলেই সাধ্যমত অলঙ্কারাদি দ্বারা অঙ্গশোভা বর্দ্ধনের চেষ্টা করে। কানের তেলোয় ফুটো করে তারা পরে পেতলের আংটি, আর তাতে সুতোর গোছা গুঁজে রাখে। সেমা এবং আও নাগাদের মত

তাঁত বোনা

লোটারাও কনুইয়ের উপর হাতীর দাঁতে তৈরি বাজুবন্ধের মত আকৃতিবিশিষ্ট এক প্রকার গয়না (করো) পরে। আসল গজদন্তের 'করো' কিনবার ক্ষমতা যাদের নেই, তারা বাহুতে কাঠের তৈরি এক ধরণের সাদাটে মসৃণ এবং গোলাকার বাজুবন্ধ ধারণ করে। আগেকার দিনে নরমুণ্ড শিকার করে যে একটি বিশেষ উৎসব সম্পন্ন করত সে-ই কেবল কব্জীতে সারি সারি কড়ি দিয়ে তৈরি চুড়ি (খেকাপ) পরতে পারত।

বুনো কলার বীচি দিয়ে তৈরি এক ধরণের পাঁচ-ছয় নরী কণ্ঠহার লোটাদের অতি প্রিয় অলঙ্কার। এই হারে মাঝে মাঝে এক একটি কুচো করা শাঁখের টুকরো বসানো থাকে। লোটা মেয়েদের গয়না-গাঁটির বালাই কম। এদের নিরাবরণ দেহ প্রায় নিরাভরণ বললেই চলে। কানের ভেলোয় তারা লাল পশমী সুতো দিয়ে এক রকম পাখীর পালক জড়িয়ে রাখে। গলায় তাদের কলার বীচির মালা। কনুইয়ের উপর গোলাকার মোটা রূপ-দস্তার তৈরি বালা—কব্জীতে চার-পাঁচ গাছা করে ছোট ছোট চেপ্টা পিতলের চুড়ি।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :—লোটাদের প্রকৃতিতে অনেক সদ্‌গুণ আছে, কিন্তু এরা মনোভাব গোপন করতে সুপটু বলে বিদেশীর পক্ষে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশবার সুযোগ না হলে এদের স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া কঠিন। এরা রঙ্গরস করতে খুব ভালবাসে এবং প্রাণ খুলে হাসতে পারে। সততা এদের স্বভাবসিদ্ধ। চৌর্য্যবৃত্তির কথা এদের সমাজে বড় একটা শোনা যায় না। লড়াইয়ে লোটারা যথেষ্ট বীরপনা দেখিয়ে থাকে। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু শিকার করবার সময় লক্ষ্যভেদে তাদের অসাধারণ দক্ষতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। দাম্পত্য ব্যাপারে লোটা পুরুষদের একনিষ্ঠতা আছে। লোটাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা অত্যধিক। আত্মহত্যার প্রধান হেতু হচ্ছে প্রণয়ঘটিত ব্যাপার।

পল্লী ও বাসগৃহ

লোটা গ্রামগুলো সাধারণতঃ পাহাড়ের সানুদেশে কোনও ঝর্ণার নিকটে প্রতিষ্ঠিত হয়। আগেকার দিনে বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করবার জন্যে লোটারা গ্রামের বাইরে পরিখা খনন করে তার তলদেশে এবং দুই পাড়ে 'পঞ্জী' (সুক্ষ্মাগ্র বংশখণ্ডসমূহ) পুঁতে রাখত। পারাপারের সুবিধার জন্যে এই পরিখার উপরে একটি তক্তা বিছানো থাকত, শত্রুর আক্রমণের আভাস পেলে সেটিকে সরিয়ে ফেলা হ'ত। গ্রামের ভিতরেও চারদিক মজবুত বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে মাঝে মাঝে পঞ্জী পুঁতে রাখা হ'ত।

প্রত্যেক লোটা গ্রামের প্রবেশপথের মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষসমূহ নজরে পড়ে। আগেকার দিনে এই সমস্ত গাছের শীর্ষদেশে আরোহণ করে গ্রামরক্ষী দল শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করত।

লোটা গ্রামে ছোট ছোট কুঁড়েঘরের সংখ্যাই বেশী। ধনী লোকদের বাসভবনগুলিও অতিসাধারণ—আও সেমা প্রভৃতি অন্যান্য নাগাগোষ্ঠীর সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাসগৃহের মত বিরাট আকারের নহে। লোটারা ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলেই অত্যন্ত মিতব্যয়ী। জাঁকজমক দেখানোর জন্যে প্রচুর টাকা খরচ করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহনির্ম্মাণ এদের নিকট নেহাত অপব্যয় বলে বিবেচিত হয়।

মোরাং—প্রত্যেক নাগা গ্রাম দুই বা ততোধিক 'খেল' অর্থাৎ পাড়ায় বিভক্ত। প্রত্যেক খেলে অবিবাহিত যুবকদের একটি আড্ডাঘর বা মোরাং আছে। লোটাদের সমাজ-জীবনে এই মোরাং-এর প্রভাব খুব বেশী। মোরাং-এ বা চাম্পুতে স্ত্রীলোকদের প্রবেশাধিকার নাই। আগেকার দিনে যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হবার আগে এই চাম্পুতেই সর্দারদের বৈঠক বসত এবং নিহত শত্রুর ছিন্নমুণ্ড এখানেই প্রথম নিয়ে আসা হ'ত। সামাজিক বিধান অনুসারে বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গাঁয়ের প্রত্যেক যুবক রাত্রে মোরাং-এ শয়ন করতে বাধ্য। মোরাংগুলো সাধারণতঃ নির্ম্মিত হয় গ্রামপথের একেবারে শেষপ্রান্তে। লোটাদের স্থাপত্যশিল্পে দক্ষতার পরাকাষ্ঠা হচ্ছে এই মোরাং বা যুবকদের যৌথ শয়নাগারসমূহ। সাধারণতঃ এগুলো দৈর্ঘ্যে চল্লিশ ফুট এবং প্রস্থে পনর ফুট। কোনো কোনো মোরাং মাটির উপর এবং কোনো কোনোটি মাটি থেকে দুই ফুট উঁচু মাচার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

খাদ্য : ভাতই লোটাদের প্রধান খাদ্য। যাবতীয় গৃহ-পালিত জন্তু এবং অধিকাংশ বুনো জানোয়ারের মাংসই এরা খেয়ে থাকে। তা ছাড়া সব রকম পাখী, মৌমাছি, ভীমরুলের চাক, এবং বড় বড় মাকড়, শাদা পিঁপড়ে ইত্যাদি হরেক রকমের কীটপতঙ্গও এদের খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। বন্যজন্তুর মধ্যে বাঘ আর চিতা বাঘ মনুষ্যভুক্ বলে কেবলমাত্র এদের

মাংস লোটারা খায় না। মাছমাংস বাসি এবং পচা অবস্থায় খেতেই এরা বেশী পছন্দ করে। পশুর নাড়ীভুঁড়ি, রক্ত, চামড়া এক কথায় লোম ছাড়া আর সবকিছুই এরা অবলীলাক্রমে উদরস্থ করে।

'মধু' বা 'সোকো' (খেনো মদ) হচ্ছে লোটাদের প্রধান পানীয়। যখন মধু পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠে তখনই শুধু লোটারা জলপান করে। ভাত খাবার সময় লোটাদের মধু চাই-ই।

গ্রাম্য সংসদ : আগেকার দিনে লোটাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। বহিঃশত্রুরা প্রায়ই এসে গাঁয়ের উপর হানা দিত। এই অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্তে কয়েকটি গ্রামের মাতব্বরদের নিয়ে এক একটি গ্রাম্য সংসদ গঠিত হ'ত এবং যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে সব চেয়ে প্রতিপত্তিশালী গ্রামের মাতব্বরদের পরামর্শই সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য হ'ত। অন্তান্ত ব্যাপারে কিন্তু এক গ্রাম অন্ত গ্রামের কর্তৃত্ব স্বীকার করত না। আগেকার দিনে প্রত্যেকটি গ্রাম শাসিত হ'ত একজন সর্দ্দার বা একিয়ুং দ্বারা। বয়োবৃদ্ধদের নিয়ে গঠিত এক পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় তিনি যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করতেন। যে ব্যক্তি প্রথম গিরিগাত্রস্থ জঙ্গল কেটে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করতেন তাঁকেই সর্দ্দার নির্ব্বাচিত করা হ'ত। উত্তরাধিকারসূত্রে সর্দ্দারের পদ তাঁর পরিবারের লোকেদের ভাগ্যেই জুটত। সকল ক্ষেত্রে পুত্রই যে পিতার স্থলাভিষিক্ত হ'ত তা নয়. পরিবারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিই নিজের ক্ষমতায় ও চরিত্রবলে সর্দ্দারের পদ লাভ করতেন। যুদ্ধে অধিনায়কত্ব করাই ছিল তাঁর সর্ব্বপ্রধান কাজ।

ইদানীং গ্রামের বিবাদ-বিসংবাদ ইত্যাদির মীমাংসা এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি নির্ব্বাহিত হয় প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী গ্রামবৃদ্ধদের নিয়ে গঠিত এক পরিষদদ্বারা। এই গ্রাম্য সংসদের প্রধান বা মোড়ল নির্ব্বাচিত হয় সরকার কর্তৃক।

গরুবাছুর বাড়ীঘর এ সকল হ'ল লোটাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কিন্তু জমির মালিক যে সর্ব্বক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষই হবে এমন কোনও কথা নেই। অবস্থাভেদে কোন কোন ভূমিখণ্ড গোটা গ্রামের, কোনও বিশেষ মোরাং-এর বা বিশেষ গোষ্ঠীর সম্পত্তি হতে পারে। গ্রামের সন্নিহিত যে সকল পোড়ো জমি আছে তাও সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। প্রত্যেক মোরাং-এর নিজস্ব জমি আছে—তা সমষ্টিগত ভাবে মোরাং-এরই সম্পত্তি, তদন্তর্গত কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়। এতে মোরাং-এর যুবকেরা সকলে মিলে চাষবাস করে, ফসল ফলায় এবং সেই ফসলের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা মোরাং পুনর্নির্ম্মাণ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত উৎসবের জন্ত মাংসাদি ক্রয় করে। বিয়ের পর কোনও যুবক যখন মোরাং ছেড়ে নিজ

পাঙটি গ্রামের মোরাং বা চাম্পু

বাড়ীতে গিয়ে ঘর-সংসার পাতে তখন নিজের নিরন্তর সাহচর্য্য এবং শ্রমের ফল থেকে সঙ্গীসাথীদের বঞ্চিত করায় ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ মোরাং-এর ছেলেদের তাকে কিছু মাংস দিতে হয়।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমি বিক্রয় করবার অধিকার লোটাদের নাই। কোনও ব্যক্তির উত্তরাধিকারী না থাকলে তার জমি গোষ্ঠীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

মুণ্ডশিকার : অন্তান্ত নাগাদের মত আগেকার দিনে লোটাদের মধ্যেও নরমুণ্ড শিকার ও সংগ্রহের প্রথা ছিল। এই কুপ্রথা লোপ পাওয়াতে তাদের জীবনের ধারাই বদলে গেছে। তখনকার দিনে এদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহই ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার আর শান্তিপূর্ণ অবস্থা ছিল স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। সাধারণতঃ এরা যখন স্ত্রীপুরুষ একত্রে ক্ষেতে কাজে রত থাকত তখন সময় সময় শত্রুরা অতর্কিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের একেবারে কচুকাটা করে ফেলত। মাঝে মাঝে ভিন্ন গ্রামের জনকতক নরমুণ্ডশিকারী একজোট হয়ে লোটাদের গাঁয়ে এসে ঝরণার নিকটে জঙ্গলের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে বসে থাকত এবং কোনও স্ত্রীলোক যখন ঝরণাতলায় জল নিতে আসত তখন অতর্কিত আক্রমণে তাকে হত্যা করে তার মুণ্ডটি কেটে নিত। নির্জ্জন পথে কোনও পথচারী হয় ত একাকী চলেছে হঠাৎ আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটত।
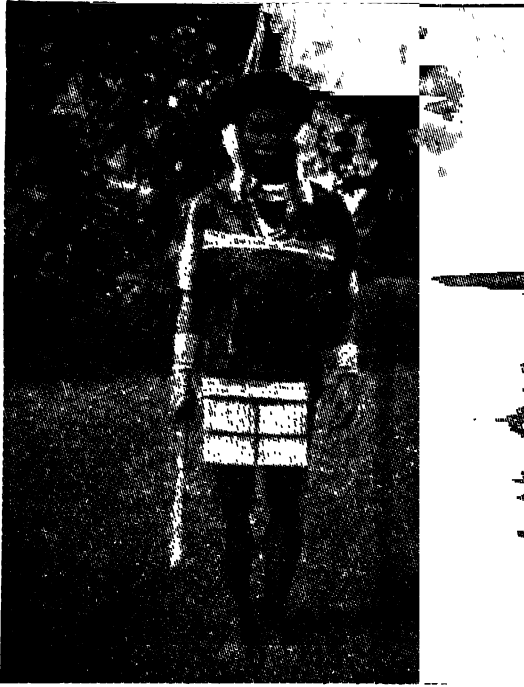
রণসজ্জায় লোটা যোদ্ধা

লোটারাও এমনি ভাবে সময় সময় ভিন্ন গ্রামে হানা দিয়ে নরমুণ্ড শিকার করত। ভিন্ন গোষ্ঠীর স্ত্রী-পুরুষ-যুবা-বৃদ্ধ-শিশু নির্ব্বিশেষে সবাইকে তারা হত্যা করত। যে সকল শিশুর দন্তোদ্গম হয় নি তাদের মুণ্ডগুলো তারা পথের পাশেই ফেলে দিয়ে চলে যেত, কেননা, অদন্ত শিশুর মুণ্ড তার নৃমুণ্ডমালায় স্থান পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হ'ত না। পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের মুণ্ডকেই তারা অধিকতর মূল্যবান বলে মনে করত। সাধারণতঃ নিহত ব্যক্তির মাথা এবং হাত-পায়ের আঙুলগুলো কেটে নেওয়া হ'ত। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে মাথা কাটা সম্ভব না হলে, কানটিমাত্র কেটে নিয়ে আসা হ'ত।

তখনকার দিনে লোটারা যুদ্ধে জয়লাভ করে শত্রুর কর্ত্তিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বস্ত্রখণ্ডে জড়িয়ে নিয়ে নিজেদের গৃহাভিমুখে রওনা হ'ত। এই বিজয়ীদল স্ব-গ্রামের প্রান্ত-সীমায় পৌঁছে তারস্বরে চীৎকার করে বলে উঠত—"ও শামাসারি।" অর্থাৎ—"আমরা দুশমনদের নিকাশ করেছি"। এই প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি শুনে গাঁয়ের স্ত্রীপুরুষ সকলের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হ'ত, বহুকণ্ঠের সম্মিলিত বিকট অট্টরোলে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠত—গ্রামপ্রত্যাগত বিজয়ী বীরবৃন্দের অভ্যর্থনা করবার জন্যে তারা "ও ইমাইইয়ালি" (আমরা খুশী হয়েছি) একথা বলতে বলতে ত্বরিতপদে ছুটে আসত। তখন মুণ্ডশিকারীরা এক শোভাযাত্রা গঠন করে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মোরাং-এ উপস্থিত হয়ে মদ্যপানে রত হ'ত।

নারীর মূল্য : লোটাদের সমাজে নারীর বিশেষ মর্য্যাদা আছে। ঘরে বাইরে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে লোটা স্বামী তার স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে। লোটাদের সমাজে স্ত্রী স্বামীর দাসী নয়; স্বামী তাকে অস্থাবর সম্পত্তিবিশেষ বলেও মনে করে না—স্ত্রী হচ্ছে তার প্রকৃত কর্ম্মসঙ্গিনী। স্ত্রীকে পরিবারের সকলের জন্যে রান্নাবান্না করতে হয়, ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করতে হয়, জঙ্গল থেকে জ্বালানি এবং ঝরণা থেকে জল বয়ে নিয়ে আসতে হয়। ক্ষেতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কাজ করে পাশাপাশি উপবেশন করে, অতিথি অভ্যাগতেরা এলে সবাইকে যথোচিত ভাবে মধু পরিবেশন করা হয়েছে কিনা গৃহিণীকেই সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

ধর্ম্মবিশ্বাস : লোটারা প্রেতোপাসক। যে সমস্ত উপদেবতার পূজা তারা করে তন্মধ্যে কেউ কেউ উপযুক্ত উপচার পেয়ে যদি খোশ মেজাজে থাকেন তা হলে মানুষের কোনও অনিষ্ট করেন না। কেউ কেউ আবার কিন্তু রীতিমত দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন। আমাদের দেবকল্পনার সঙ্গে লোটাদের পটসু নামক দেবতাবৃন্দের কিঞ্চিৎ সারূপ্য আছে: তাঁরা আমাদের পৃথিবীর মতই এক লোকে বাস করেন। আমাদের আকাশ হচ্ছে তাঁদের অধ্যুষিত দেবলোকের তলদেশ। 'নরবপুই' এই দেবতাদের 'স্বরূপ'। পটসুদের ভাষা কিন্তু মনুষ্যভাষার অনুরূপ নহে। এসবোই গোষ্ঠীর কোনও কোনও লোক নাকি তাঁদের ভাষা বুঝতে পারে। লোটাদের বিশ্বাস যে, পটসুরা সময় সময় জোড় বেঁধে অনুচরবর্গপরিবৃত হয়ে মাঙ্গল্য দ্রব্য সহ পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিদের (রেটসেন) সঙ্গে আলাপাদি করে থাকেন।

লোটারা মনে করে যে প্রত্যেক মানুষের দুটো করে আত্মা আছে—ওমোন এবং মুঙ্গি। ওমোনকে দেখা যায় মানুষের ছায়ারূপে। আকাশ যখন মেঘাচ্ছন্ন হয়, বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয় ওমোন তখন মানুষের দেহাভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে সুবুদ্ধির পরিচয় দেন।

লোটারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। এদের একটি সিদ্ধান্ত এই যে, মৃত্যুর পর মানুষ মৃতের দেশে গিয়ে নির্দ্দিষ্টকাল বাস করে। সেখানে আবার তার মৃত্যু হয় এবং পুনরায় মর্ত্যলোকে সে মাছি হয়ে জন্মায়। আর একটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে—মানুষ পর পর নয় বার জন্মগ্রহণ করে। তার পর তার 'পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে'।

লোটার ধর্ম্ম তাকে কোন নীতিশিক্ষা দেয় না। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে নয়, কিন্তু ঐহিক সুখভোগের জন্যেই সে পূজা, বলিদান ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে। তা সত্ত্বেও কিন্তু বহু লোটা পাপকে ঘৃণা করে এবং সৎপথে থেকে জীবন কাটায়।

লোটাদের মধ্যে সিরোসি, পিকুচাক, রাঙ্কেনড়ি, টুকু প্রভৃতি বিবিধ সার্ব্বজনীন গ্রামীণ উৎসব প্রচলিত আছে। এদের সমাজে 'রেটসেন' নামক এক শ্রেণীর গুণী লোকের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে। রেটসেনরা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন, এদের নাকি ভবিষ্যৎ কথনের শক্তি আছে।

বিবাহ: লোটা ছেলেরা সাধারণতঃ সতেরো থেকে বাইশ বৎসরের মধ্যে বিয়ে করে থাকে, মেয়েদের বিবাহের বয়স চৌদ্দ থেকে আঠার। উত্তর অঞ্চলের লোটাদের বিবাহপ্রথা নিম্নলিখিত রূপ:—

কোনও যুবক যদি কোনও যুবতীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়, তা হলে সে তার পিতা-মাতাকে সেকথা বলে। তখন হয় তার মা, আর নয়তো অন্য কোনও বর্ষীয়সী আত্মীয়া কনের বাপের বাড়ী গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করে। বিয়েতে কনের বাপমায়ের মত থাকলে বরের মা বা আত্মীয়া দিনকতক পরে পুনরায় এক চোঙা ভরতি 'রোহি মধু' সহ কনের বাড়ীতে যায়—কনের বাপ মা সেই মদ্য পান করে। তার পর উভয় পক্ষের মধ্যে কথাবার্তা হয়ে কন্যাপণ স্থিরীকৃত হলে পর বর কনেকে বাঁশ ও বেতের তৈরি একটি বর্ষাতি (কুচিও) একটা ছোট ঝুড়ি আর একটা দায়ের হাতল উপহার দেয়।

দিনকতক পরে বিবাহের আনুষঙ্গিক ৎসইয়ুটা উৎসবের আয়োজন হয়। এতদুপলক্ষ্যে বর একটি মোরগ মেরে নিজেই রান্না করে এবং এই রান্না করা মাংস আর কিয়ৎ পরিমাণ মদ্যমিশ্রিত অন্ন সহ এক বুড়োকে সঙ্গে নিয়ে কনের বাপের বাড়ীতে যায়। বরের সহযাত্রী এই বৃদ্ধকে বলে হাণ্টসেন। হাণ্টসেন মদ্যমিশ্রিত অন্নের পাত্রটি কনের বাপের হাতে অর্পণ করে। কনের পিতা তখন কনেকে রান্নাঘর থেকে কিছু মদে ভেজানো ভাত নিয়ে আসতে বলে। কনে তখন দুই পরিবারের মদ্যসিক্ত অন্ন একত্রে মিশিয়ে তা চুইয়ে এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত করে। বর-কনে ছাড়া আর সবাই এই পানীয়ের সদ্ব্যবহার করে থাকে। মদ্যপানের পালা শেষ হলে বরকনে গৃহমধ্যে শয্যার উপর পাশাপাশি উপবিষ্ট হয় আর হাণ্টসেন বরের আনা মুরগীটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে হাতে নিয়ে তাদের বিপরীত দিকে বসে। কিছুক্ষণ পরে সে তার বাহুদ্বয় বারকয়েক সুমুখের এবং পেছনের দিকে দোলায়িত করতে করতে প্রার্থনা করে, বরকনে দুটিতে যেন চিরকাল সুখে শান্তিতে একত্রে বাস করে। এই অনুষ্ঠানের পর বরকে প্রায় এক বৎসরকাল শ্বশুরালয়ে থেকে জন খাটতে হয়। ক্ষেতের সমুদয় ফসল কাটা হলে পর বরের আত্মীয়-কুটুম্বেরা জঙ্গলে গিয়ে কাষ্ঠসংগ্রহে রত হয় এবং প্রত্যেকে এক এক বোঝা করে কাঠ কনের বাপের বাড়ীতে বয়ে নিয়ে আসে। এই

'টুকু' উৎসবের জন্য চাল সংগ্রহে রত দু'জন 'পুঠি' বা পুরোহিত

শ্রমসাধ্য কাজের জন্যে তাদের প্রচুর মধু (মদ্য) পান করিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। এর দিন পাঁচেক পরে হয় লাণ্টসোয়া উৎসবের অনুষ্ঠান। বরের নিজ-গোষ্ঠীর মেয়েরা এবং তাদের স্বামীরা জঙ্গলে যে উদ্বৃত্ত কাষ্ঠখণ্ডসমূহ পড়ে ছিল তা নিঃশেষে আহরণ করে নিয়ে এসে বরের শ্বশুরবাড়ীর সুমুখে গাদা করে রাখে। সেদিন রাত্রে কনের বাপের বাড়ীতে হাণ্টসেন (গুণী) একটা কুক্কুট-শাবককে গলা টিপে মেরে তার নাড়ীভুঁড়ি বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা পরীক্ষাপূর্ব্বক দম্পতির মধ্যে কে আগে মরবে, প্রথম সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে ইত্যাদি নানা বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে।

বৎসরান্তে বর শ্বশুরের ঋণমুক্ত হয়ে জনখাটার হাত থেকে রেহাই পেয়ে নিজের স্বতন্ত্র বাসগৃহ নির্ম্মাণে ব্যাপৃত হয়—অবশ্য সে তখন শ্বশুরবাড়ীতেই অবস্থান করে। গৃহ-নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হলে পর সুরু হয় হালাম উৎসবের উদ্যোগ-আয়োজন। নির্দ্দিষ্ট দিনে রাত্রিবেলায় বরপক্ষের লোকেরা বরকনে উভয়কে বরের নবনির্ম্মিত বাসগৃহে (কিথাওু) নিয়ে যাবার জন্যে কনের পিত্রালয়ে এসে হাজির হয়। বর-পক্ষীয়দের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই কনের বাপের বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণে সুরু হয় উভয়পক্ষের লোকেদের মদ্যপানের পালা। বরকনে দু'জনেই তখন থাকে অন্দরমহলে। মদের পাত্রগুলো নিঃশেষিত হলে বরপক্ষের লোকেরা কতকগুলো

বিবাহিতা লোটা তরুণী

গাছের পাতায় মুড়ে কিছু মাংস এবং মদপূর্ণ একটি বাঁশের চোঙা ভিতর-বাড়ীতে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং কন্যাপক্ষীয়দের উদ্দেশ্যে সমস্বরে চেঁচিয়ে বলে ওঠে—"ওদের আসতে দাও। কথাবার্ত্তা যা বাকী আছে তা কাল হতে পারে, পরশুও হতে পারে। রাত যদি পোহায়ে যায়, শোনা যায় মোরগের ডাক, তা হলে তো বরকনেকে তাদের নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হবে না। ভালয় ভালয় যদি না তাদের আসতে দাও, তা হলে আমরা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেব তোমাদের ঘরবাড়ী।" এমনি ভাবে কিছুক্ষণ তারা চেঁচামেচি করলে পর বর কনেকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসা হয়। তারপর স্ত্রী-পুরুষের এক সম্মিলিত শোভাযাত্রা রওনা হয় বরের বাড়ীর দিকে। এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকে বরের নিজ-গোষ্ঠির একটি বিবাহিতা স্ত্রীলোক। শোভাযাত্রা বরের বাড়ীতে পৌঁছলে পর বরের কয়েকজন কুটুম্ব বর-কনেকে কিথাঙ্‌্রোতে নিয়ে যায়, শোভাযাত্রীরাও তাদের অনুগমন করে। বর-কনে কিথাঙ্‌্রোতে গিয়ে দেখে গৃহপ্রাঙ্গণে হাণ্ট-সেন তাদের প্রতীক্ষা করছে। হাণ্টসেন বরের বর্শাটি তার হাত থেকে নিয়ে সেটিকে খাড়া অবস্থায় কিথাঙ্‌্রোর বহিঃ-প্রাঙ্গণে মাটিতে প্রোথিত করে, তারপর বর-কনের হাতে কিছু জল ছিটিয়ে দিয়ে তাদের গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে যায়। গৃহ-প্রবেশ করে বর-কনে তার দু'পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। কিছু-ক্ষণ পরে তাদের সেখানে রেখে সে স্থানান্তরে চলে যায়।

স্বামী স্ত্রী কিথাঙ্‌্রোতে সে রাত্রি যাপন করে। বরের গোষ্ঠির দুটি বালক সেদিন তাদের সঙ্গে শোয়। দুই দিন পরে স্ত্রীকে নিয়ে স্বামী মাংসাদি সহ শ্বশুরবাড়ীতে যায়।

আরও তিন-চার দিন পরে পনিরটসেন উৎসব উদ্‌যাপিত হলে পর বিবাহসংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া : কারও মৃত্যু হলে পর তার অন্তিম শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত আত্মীয়-স্বজনেরা প্রথমে তার চোখ দুটি ঢেকে দিয়ে মুখমণ্ডলে জলের ছিটা দেয়। এক বুড়ো একটি কুক্কুট-শাবকের পায়ে একটি কড়ি বেঁধে দিয়ে সেটিকে কিছুক্ষণের জন্যে মৃতের হাতের উপরে রাখে। তারপর মৃতব্যক্তির সঙ্গে মৃতের দেশে গিয়ে যাতে সে কক কক শব্দ করে সেখান-কার অধিবাসীদের নবাগতের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে পারে সে উদ্দেশ্যে সেটিকে মেরে ফেলে। এই নিহত কুক্কুট-শাবকটিকে মৃতের ঘাড়ের উপর দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

অতঃপর যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত মৃতের বাড়ীর সুমুখে আন্দাজ চার হাত গভীর একটি গর্ত্ত খনন করা হয় এবং মৃত-দেহকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করে তন্মধ্যে শুইয়ে রাখা হয়। মৃতের কব্জীতে বেঁধে দেওয়া হয় একটি সচ্ছিদ্র কাচের মালা। • মৃত্যুসরণী অতিক্রমণ কালে এছিলিতান থামো নামে এক বিদ্‌ঘুটে নামওয়ালা ভূতের সঙ্গে নাকি মৃতের মোলাকাত হয় এবং এই মালাটির বদলে উক্ত ভূত নাকি তাকে পান করবার জন্যে জল দান করে।

শবদেহটিকে কবরে রাখবার পর তদুপরি আড়াআড়ি ভাবে কতকগুলো ছোট ছোট বংশখণ্ড এবং মৃতের খাটিয়ার দুটো তক্তা স্থাপন করা হয় এবং কবরটিকে একটি বাঁশের চাটাই দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। কুকুর এবং শূকরের পাল যাতে কবরের মাটি না খুঁড়তে পারে সেজন্যে সমাধির উপরি-ভাগে পাথরের টুকরো এবং বুনো কাঁটা স্তূপাকার করে রাখা হয় এবং কবরটির চতুষ্পার্শ্বে একটি অনতিউচ্চ বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। সর্ব্বশেষে দুটো বাঁশের খুঁটি মাটিতে পোঁতা হয়—একটি মৃতের মাথার দিকে, আর একটি তার পায়ের দিকে। এই খুঁটি দুটোর উপরে এড়ো ভাবে রাখা হয় একটি লম্বা বাঁশ। আর তাতে মৃতের (পুরুষ হলে) দায়ের হাতল, কাপড়-চোপড়, কড়িখচিত লেংটী, গজদন্ত-নির্ম্মিত বাজুবন্ধ প্রভৃতি ঝুলিয়ে রাখা হয়, আর তার বর্শা-গুলো খাড়া অবস্থায় কবরের উপর পুঁতে রাখা হয়। স্ত্রী-লোকের বেলায় শিয়রের দিকের বাঁশের খুঁটিতে কেবল তার ঝুড়িটি এবং পাঁচ টুকরো মাংস ঝুলানো হয়।

এ সকল কৃত্য শেষ হলে পর কবরের ওপর জ্বালিয়ে দেওয়া হয় একটি মশাল। পুরুষের মৃত্যুর পরে ছয় দিন এবং স্ত্রীলোকের মৃত্যুর পরে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত মৃতের পরিবারের

কারও ভিন্‌দেশীর সঙ্গে কথা বলা কিংবা কোন জীবহত্যা করা নিষিদ্ধ।

পরবর্ত্তী টুকা এমুং উৎসবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কবরের উপর অগ্নি অনির্ব্বাণ রাখা হয় এবং প্রত্যহ মৃতের উদ্দেশ্যে সমাধিক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্যাদি নিবেদন করা হয়। টুকা এমুদের পর মৃতব্যক্তির আত্মা নাকি মর্ত্ত্যলোক ছেড়ে মৃতের দেশে প্রয়াণ করে। তখন থেকে কবরের উপর দিয়ে আবার সুরু হয় লোক চলাচল।

সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রসম্বলিত মহাবিশ্বের বিরাটত্ব এই আদিম জাতির লোকেদের হৃদয়ে বিস্ময়মিশ্র ভীতির উদ্রেক করে। ভূমিকম্প, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সম্বন্ধে তারা অদ্ভুত ধারণা পোষণ করে। তারা মনে করে, পৃথিবী সমতল এবং তার শেষ প্রান্ত যে কোথায় তা জানা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ভূমিকম্প সম্বন্ধে এদের ধারণা অনেকটা হিন্দু পৌরাণিক বর্ণনারই অনুরূপ। তারা বলে, পশ্চিম দিকে অন্তরবির দেশে যেখানে আকাশ আর ধরণী পরস্পরের সহিত মিলিত হয়েছে সেখানে নাকি বাস করে এক বিরাটকায় বিষধর—সে যখন গা ঝাড়া দেয় তখনই সারা পৃথিবী কেঁপে ওঠে।

শিলাবৃষ্টি সম্বন্ধে লোটাদের ধারণা আজব। তারা বলে, যে-পটসুরা আকাশে বাস করে, তাদের মাথার উপরে আছে আর একটি পটসু-লোক। সেখানকার পটসুরা অত্যন্ত দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন। তারা সময় সময় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের টুকরো নিক্ষেপ করে নীচেকার পটসুদের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করে। কিন্তু যখনই উপর থেকে প্রচণ্ড করকাপাত সুরু হয় তখন নীচেকার পটসুরা সাবধান হয়ে তাদের বাসগৃহের দরজাগুলি বর্ষাতির মত পিঠের ওপর বহন করে বাইরে বেরিয়ে যায়। বরফের বিরাট স্তূপসমূহ এই বর্ষাতির উপর আপতিত হয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় এবং তারই মধ্য থেকে যে সকল ছোট ছোট টুকরো পৃথিবীতে ছিটকে পড়ে মর্ত্ত্যবাসীরা তাকেই বলে শিলাবৃষ্টি।*

প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবিগুলি J. P. Mills-এর *The Lhota Nagas* নামক পুস্তক থেকে গৃহীত।

বাঙালী ও মুষ্টিযুদ্ধ

শ্রীরাধিকারঞ্জন ঘোষাল

বর্ত্তমান বাংলার ক্রীড়াজগতে কিছুকাল যাবৎ মুষ্টিযুদ্ধের প্রসার বিশেষ লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশ এই দিক দিয়াও ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতেছে। গাদী, হাডুডু প্রভৃতি বাংলার যে সকল জাতীয় ক্রীড়া বহুদিন যাবৎ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া আসিতেছিল। সেগুলি আধুনিক জগতে নিত্যনূতন পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সমপদক্ষেপে অগ্রসর হইতে পারে নাই। কাজেই সেগুলি এক প্রকার লোপ পাইতে বসিয়াছে। অবশ্য বিদেশের আমদানী ক্রীড়াদির মধ্যে বর্ত্তমান কালে ফুটবলকে বাঙালী একরূপ নিজস্ব করিয়াই লইয়াছে এবং ঐ ক্রীড়ায় বাংলার কিছু খ্যাতিও আছে। কিন্তু যে ভাবে বাহিরের খেলোয়াড় আমদানীর দিকে ইদানীং কর্ত্তৃপক্ষের নজর পড়িয়াছে তাহাতে ফুটবল ক্রীড়াজগতে বাঙালী খেলোয়াড়ের নাম আর কিছুকাল পরে শোনা যাইবে কিনা সে বিষয়ে মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সঙ্কট-সময়ে বাংলার কয়েকটি ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠান বাঙালী যুবকদিগকে মুষ্টিযুদ্ধে নিপুণ করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, ইহা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয়। বাংলা তথা ভারতের মুষ্টিযুদ্ধ উৎকর্ষের কথা চিন্তা করিলে প্রথমেই যাঁহার কথা মনে পড়ে তাঁহার নাম পি. এল. রায়—তিনিই ভারতে মুষ্টিযুদ্ধের প্রথম প্রবর্ত্তক।

তবে সাধারণ ভাবে বিচার করিতে হইলে প্রথমেই মনে জাগে মুষ্টিযুদ্ধ কি? ইহা আমাদের শিক্ষা করার সার্থকতা কি? ইহা কি শুধুই খেলাধুলার পর্য্যায়ভুক্ত?

স্থির ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের নিত্য-পরিচিত খেলাধুলার সহিত মুষ্টিযুদ্ধের কিছু পার্থক্য আছে। বর্ত্তমানে আমরা ফুটবল খেলি, ক্রিকেট খেলি, হকি খেলি কিন্তু এগুলি দ্বারা সমাজগঠনমূলক কার্য্যের সহায়তা আদৌ হয় কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। কিন্তু যদি আমরা পঞ্চাশ বা ষাট বৎসর পূর্ব্বের কথা স্মরণ করি তবে দেখি তখনকার দিনে খেলাধুলার দ্বারা শুধু যে ব্যক্তিগত ভাবে লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইত তাহা নয়, সমাজও সর্ব্বতোভাবে উপকৃত হইত। গাদী, হাডুডু প্রভৃতি খেলাধুলার মধ্য দিয়া তখনকার বাঙালীর স্বাস্থ্য যে ভাবে গড়িয়া উঠিত তাহা আজি-কার দিনে বিরল। তখন কুস্তির ব্যাপক প্রচলন ছিল—তাহাদ্বারা কুস্তিগীররা মনে আনন্দ লাভ করিত, তাহাদের শরীরগঠন হইত এবং তাহাদের হৃদয়ে সাহস ও শক্তি সঞ্চারিত হইত। কুস্তির চর্চ্চা প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। কাজেই ইহাদের জায়গায় এমন একটি খেলা চালু হওয়ার প্রয়োজন যাহা দ্বারা শরীর-গঠন হইবে, মনে সাহস আসিবে অথচ যাহার মধ্যে ক্রীড়ার আনন্দও সমপরিমাণে বর্ত্তমান থাকিবে। মুষ্টি-

যুদ্ধের মধ্যে এগুলি আমরা পাই। ইহা মুষ্টিকের শক্তি-বর্দ্ধন করে, মনে একাগ্রতা আনয়ন করে, সাহস বৃদ্ধি করে, মুষ্টিককে যোদ্ধার অদম্য উৎসাহ এবং স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য দান করে অথচ ইহার মধ্যে আনন্দও কম পাওয়া যায় না। কাজেই

বাঁদিক থেকে—এইচ পাল, সন্তোষ দে (বি বি-এর শিক্ষক) ও কমী সুর

মুষ্টিযুদ্ধ এমন একটি ক্রীড়া যাহার মধ্য দিয়া যোদ্ধার এবং খেলোয়াড়ের মনোবৃত্তি একই সঙ্গে পাশাপাশি গড়িয়া উঠে।

মুষ্টিকের প্রথম প্রয়োজন উপস্থিতবুদ্ধি এবং তারপরই ধৈর্য্য। যে যত বেশী উপস্থিতবুদ্ধির সাহায্য লইতে শিক্ষা করিবে সে মুষ্টিযুদ্ধে তত বেশী সাফল্যলাভ করিবে। বিচার এবং বিবেচনা মুষ্টিযুদ্ধের অপরিহার্য্য অঙ্গ। প্রতিপক্ষের অবস্থান কিরূপ, এই অবস্থায় নিজ ভারসাম্য রক্ষা করিয়া কত অল্প শক্তির অপচয়ে কত প্রচণ্ড আঘাত হানিতে পারা যায়—এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া তবে বিচক্ষণ মুষ্টিক একটি আঘাত করে এবং এতগুলি চিন্তা প্রায় একই সঙ্গে তার মনের মধ্যে আনাগোনা করিতে থাকে। মুষ্টিককে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এতগুলি বিষয় বিচার-বিবেচনা করিয়া তৈরি হইয়া লইতে হইবে। মুহূর্ত্তের বিলম্বে তাহার ধরাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা, কাজেই মুষ্টিকমাত্রেরই বিচার-বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ যে মুষ্টিক মণ্ডলীর (Arena) মধ্যে ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলে সে মুষ্টিকের পরাজয় অনিবার্য্য। সুতরাং ধৈর্য্য মুষ্টিকের একটি অবশ্যশিক্ষণীয় গুণ। তার পর আসে শরীরগঠনের কথা। মুষ্টিকের পেশীগুলি স্থিতিস্থাপক (elastic) হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। রবার যেমন টানিয়া ছাড়িয়া দিলে নিমেষমধ্যে তাহার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে তেমনি মুষ্টিকের পেশীগুলিও এমনই হওয়া প্রয়োজন যেন সেগুলি প্রতিপক্ষকে আঘাত হানিয়া আবার মুহূর্ত্তমধ্যে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া আত্মরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে। মুষ্টিকের দৃষ্টি সব সময় সজাগ ও সতর্ক থাকা প্রয়োজন, চিত্তের স্থৈর্য্যও তার পক্ষে অত্যাবশ্যক। অতএব দেখা যাইতেছে, যে খেলার মধ্য দিয়া মানসিক ও শারীরিক বিভিন্ন বৃত্তির অনুশীলন একই সঙ্গে সম্ভব তাহার ব্যাপক প্রচলন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বর্ত্তমানে ধীরে ধীরে মুষ্টিযুদ্ধ বেশ প্রসারলাভ করিতেছে। জেলায় জেলায় মাননির্ণায়ক (Championship) মুষ্টিযুদ্ধ-প্রতিযোগিতা হইতেছে। সম্প্রতি আন্তঃস্কুল ও কলেজ মুষ্টি-যুদ্ধ প্রতিযোগিতায় বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে এই প্রতিযোগিতায় শতাধিক মুষ্টিক যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে তরুণ মুষ্টিযোদ্ধা পূর্ণ তালুকদার, শচীন চক্রবর্ত্তী, সুখেন্দু মুখুজ্যে, অরুণ মৌলিক, চিত্ত দাস প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের শিক্ষাদান সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ অবহিত হইলে ভবিষ্যতে ইঁহারা পুরাতন খ্যাতনামা মুষ্টিকদিগের ন্যায় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারিবেন। শুধু শহর বা শহরতলীতে নয়, বাংলার গ্রামাঞ্চলেও আজ কিছু কিছু মুষ্টিযুদ্ধের প্রসার হইয়াছে। আজ বাংলার শহরে ও গ্রামে ব্যাপকভাবে মুষ্টিযুদ্ধের প্রচলন হইয়াছে। শ্রীসন্তোষ-কুমার দে মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশন"ই দস্তানার সহিত বাঙালী ছেলেদের পরিচয় ঘটাইয়াছেন। যে বাঙালী এতদিন দস্তানাকে পরিহার করিয়া চলিত আজ তাহারা তাহা লইয়াই খেলিতে শিখিয়াছে। দে মহাশয়ের শিক্ষাগুণে বাঙালী মুষ্টিকদল সম্মিলিত ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক দলকে পরাজিত করিয়াছে। ভারতের মুষ্টিযুদ্ধ-ক্ষেত্রে যে ইঙ্গ-ভারতীয় মুষ্টিকদের একাধিপত্য ছিল আজ বাংলার মাননির্ণায়ক মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় তাঁহাদিগকে হিমাংশু পাল ও কমী সুর প্রভৃতি মুষ্টিকদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। বহু বার তাঁহাদিগকে পরিতোষ দে, ভবানী দাস, প্রদ্যোৎ বসু, নবীন ভট্টাচার্য্য ও বিশু ঘোষ প্রভৃতি বাঙালী মুষ্টিকের নিকট হার মানিতে হইয়াছে।

একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে আজ মুষ্টিযুদ্ধে বাঙালী খানিকটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। অনেকে কিয়ৎপরিমাণে

সাফল্যলাভ করিবার পরই নিষ্ঠার সহিত অনুশীলন ছাড়িয়া দিতেছেন, ফলে পরিপূর্ণ কৃতিত্বলাভ তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। কেবল চ্যাম্পিয়ান-শিপ মুষ্টিযুদ্ধে দশ জনের মধ্যে মাত্র হিমাংশু পাল ও ফণী সুর বাঙালী মুষ্টিকদিগের মান রক্ষা করিয়াছেন। বাঙালী নিপুণ মুষ্টিকের সংখ্যা আরও বাড়া দরকার, তাই দ্বিগুণ উৎসাহে আমাদের নূতন করিয়া মুষ্টিযুদ্ধের অনুশীলনে ব্রতী হইতে হইবে। সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন দলীয় প্রাধান্য স্থাপনের মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করা। বাহির হইতে নামকরা মুষ্টিক আমদানী করিয়া নিজ নিজ সমিতির সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস প্রশংসনীয় নহে। এই প্রসঙ্গে আসে পুরাতন ও নূতন মুষ্টিকদের কথা। অধিকাংশ শিক্ষকই পুরাতন মুষ্টিকদের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেন, নূতন মুষ্টিক তৈয়ারীর দিকে তাঁদের তেমন লক্ষ্য নাই। এই মনোভাব সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়। ইহার পরেই প্রয়োজন গণ্ডীর সম্প্রসারণ। মুষ্টিযুদ্ধের অনুশীলনকে শুধুমাত্র শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে কলিকাতাই সমগ্র বাংলাদেশ নয়। বাংলার পল্লীবাসীদের মুষ্টিযুদ্ধের চর্চ্চা হইতে বঞ্চিত রাখিলে অন্যায় করা হইবে। আজকাল সন্তোষকুমার দে মহাশয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রসারের উদ্দেশ্যে গ্রামে-গ্রামে যাইতেছেন—ইহা খুবই আশার কথা। তবে এই কাজ একলা কাহারও চেষ্টায় হইবার নয়। তাই প্রথম শ্রেণীর মুষ্টিকদের মধ্যে বাছাই-করা কয়েকজনকে তাঁহার সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। এইরূপ নিপুণ মুষ্টিকদের একটি দল থাকিবে—গ্রামে গ্রামে শিক্ষা দেওয়াই হইবে যাঁহাদের কাজ। প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। ইদানীং অনুকরণ-প্রিয়তা যেভাবে ছোট বড় সকল শ্রেণীর বাঙালী মুষ্টিককেই পাইয়া বসিয়াছে তাহা সর্ব্বথা নিন্দনীয়। ইঁহারা স্বকীয়তা হারাইয়া ফেলিয়া চালচলন, বেশভূষা, ভাবভঙ্গী ইত্যাদি সব দিক দিয়াই বিজাতীয় আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিদেশী মুষ্টিযোদ্ধাদিগের মধ্যে যে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ইঁহাদের মধ্যে বিরল।

অরবিন্দ

শ্রীনীলরতন দাশ

মাতৃপূজার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যবে দেশ,
অগ্নিসাধক! সেদিন তোমায় হেরিনু রুদ্রবেশ।
বন্দিনী মা'র বন্ধনদশা ঘুচাতে বীরের সাজে,
ঝাঁপ দিলে তুমি মুক্তিসমর-মৃত্যুসাগর মাঝে।
সে সাগর মথি' অমৃত আনিয়া বিলালে ভারতময়,
হিমাচল হতে কন্যাকুমারী গাহিল তোমার জয়।
নব নব ভাব-ধারায় ভরিল তব অন্তরখানি,
রচিয়া নূতন গীতার ভাষ্য শুনালে অমর বাণী।
কর্ম্মের সাথে ধর্ম্ম মিলালে, ভক্তির সাথে জ্ঞান;
জড়বাদ সাথে মিতালি পাতালো দর্শন-বেদ-গান।
যে সাধনা কভু অত্যাচারীর দর্পে করে না ভয়,
বিজ্ঞানীদের শক্তিও মানে যার কাছে পরাজয়,—
ঐশী এবং অতিমানব সে শক্তির সাধনায়
সমাহিত তুমি, হে যোগিপ্রবর! তোমারি তপস্যায়
বিস্মিত হবে বিশ্ববাসীরা, নূতন মন্ত্র তব
দেখাবে জগতে মুক্তির পথ অপূর্ব্ব অভিনব।

তুমি

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

মনের গবাক্ষ-পথে উঁকি দেয় সাতরঙা পরী-কল্পনারা,
শ্যামলিম দেওদার কাণ্ডের সমীরণে কেঁপে হয় সারা;
দিবসের শেষ আলো সুনিবিড় নীলিম আকাশে
কি এক আবেশভরা ধ্যানলীন মত্ততায় ঘুরা ফিরে আসে।

এখনো দিগন্ত ঘিরে সন্ধ্যারাণী বিছায় নি আঁচল সে কালো,
এখনো তারকা-বধূ সাজায় নি নীলগেহে মিটি মিটি আলো,
হয়নি এখনো শেষ নীলনভে বিহগের ডানা-সন্তরণ;
আরো কাছে সরে এসো লঘু পদে মন্থরায় হোক সঞ্চরণ।
হাতখানি হাতে দাও, তারপর স্তব্ধতার যবনিকা টানো,
কথার বিদুষী থাক—সে তো সুললিত ভাষায় সাজানো!
এই ভালো—না-বলার মাঝখানে কত কি যে বলা হয়ে যায়,
কেবল হৃদয় তারে গেঁথে রাখে সযতনে মণির কোঠায়!

কঠিন বাস্তব এসে কাছে যবে জীবনের অমৃত-ভৃঙ্গার,
অবিরাম প্রত্যাঘাতে ভেঙে পড়ে ধূলিতলে শিখর-মন্দার—
তখন আসিও তুমি—কল্পলোক হতে এনো বর্ণ রাশি রাশি,
হবে সে ক্ষণিক জানি, তবু পাবো আশা-আলো-
অনুভূতি-হাসি!

চট্টগ্রাম বিপ্লব কাহিনী

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী

গত সংখ্যা প্রবাসীতে সূর্য্য সেনের "Female organisation"—নারী সংগঠন বিষয়ে একটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। "প্রথম দর্শন" শীর্ষক একটি পৃথক প্রবন্ধ ঐ সকল কাগজপত্রের সহিত পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধটি "নারী সংগঠন" প্রবন্ধের পরিশিষ্ট বলিয়াই মনে হয়। ইহাও অসমাপ্ত। এই অসমাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইল।

২। সূর্য্য সেনের লিখিত "অন্তরীণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ গৈরিলায় অন্য কাগজপত্রের সহিত পাওয়া যায়। ১৯২৬ সালে আত্মগোপন করিয়া থাকা কালে সূর্য্য সেন পুলিসের হাতে ধরা পড়েন। তাঁহাকে ইলিসিয়াম রোডে আই. বি. আপিসে লইয়া যাওয়া হয়। এই বিষয়ের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সরস ভাষায় লিখিত তাঁহার প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইল।

৩। কল্পনা দত্তের একখানি চিঠি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। চিঠিখানির তারিখ ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী। কল্পনা তাহার "কায়া" নামক শিশু ভ্রাতার উদ্দেশ্যে এই চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন। ঐ সময় কল্পনা গৈরিলায় সূর্য্য সেনের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। চিঠিখানি আর যথাস্থানে পাঠানো হয় নাই। পর দিন ১৭ই ফেব্রুয়ারী ঐ আবাসস্থল পুলিস ও সৈন্যবাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় এবং সূর্য্য সেন ধরা পড়েন। কল্পনা ও তাঁহার সঙ্গীরা কোনমতে ঐ স্থান হইতে চলিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই চিঠিখানিতে একটি মর্ম্মস্পর্শী অনুভূতি প্রকাশ পাইতেছে।

৪। ঐ স্থানে (গৈরিলায়) সূর্য্য সেনের নিকট লিখিত প্রীতিলতার একখানি পত্র পাওয়া যায়। পত্রখানির তারিখ নির্ণয় করিবার উপায় নাই। এই সময় প্রীতিলতা কোন স্থানে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন এবং চিঠিতে নিজের নাম গোপন করিয়া "ফুলতার" নামক একটি ছদ্ম নাম ব্যবহার করিয়াছেন। চিঠিখানি প্রীতিলতার স্বহস্তে লেখা প্রমাণিত হয়।

৫। "The Chittagong Brigade" শীর্ষক একটি ইংরেজী কবিতা দলঘাটে পাওয়া যায়। হাতের লেখা কাহার প্রমাণিত হয় নাই। কবিতাটির নিম্নে "Ganeshda" লেখা আছে। অনুমান হয় কবিতাটি গণেশ ঘোষের রচনা। ইংরেজী কবিতা "Charge of Light Brigade"-এর অনুকরণে ওজস্বিনী ভাষায় কবিতাটি লিখিত হইয়াছে।

সূর্য্য সেনের রচনা

প্রথম দর্শন

একটি বাড়ীতে তাকে আনবার ঠিক হ'ল। আমরা ২।৩ দিন আগে Messenger পাঠিয়ে জানলাম যে আসতে পারবে কিনা এবং কখন আসতে পারবে। তার কাছ থেকে উত্তর এল "আপনি নেওয়ার জন্য লোক পাঠাবেন সেই দিন আসতে পারব; কোন বাধাই আমাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।" Messenger একটি দিন ঠিক করে তাঁকে বলে এল। নির্দিষ্ট দিনে Messenger-কে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে তাঁকে আনতে পাঠিয়ে দিলাম। তাঁদের আসতে প্রায় রাত ৯টার কম হবে না। Messenger-কে পাঠিয়ে ভাবলাম একটি মেয়ে তার মা বাপ প্রভৃতি অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে থাকে। এ অবস্থায় তার আসার পক্ষে কত বাধাই ত হতে পারে। বাপ মা যদি নিষেধ করে সে কি করে আসবে। সে ত আর স্বাধীন নয় যে তার নিজের ইচ্ছায় যেখানে সেখানে যেতে পারবে। অন্য যায়গায় যাচ্ছে বলে ফাঁকি দিয়ে ত তার আসতে হবে। যদি একা তাকে না যেতে দেয় তা হলে তার করবার কি আছে। সে ত ছেলে নয় যে স্বাধীনভাবে মা বাপকে না মেনে হলেও চলে আসবে। আমাদের হিন্দুর ঘরের মেয়ে সমাজের চাপে নানা দিক দিয়েই অধীন। এ অবস্থায় আজ আনতে গেছে বলেই সে যে আসতে পারবে তার স্থিরতা কি? সন্ধ্যা হয়ে এল, ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হ'ল, ভাত খাওয়ার জন্য shelter পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আমি আর নির্ম্মলবাবু সঙ্গে আছি। আরও দুই জনের ভাত রাঁধবার জন্য বাড়ীর মালিককে বলে দিয়েছিলাম আর বলেছিলাম যে নির্ম্মলবাবুর বোন তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। গৃহস্থ তাই বিশ্বাস করেছিল। আমরা ভাত না খেয়ে ওদের আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ক্রমে ৯টা বেজে গেল তখনও আমরা খাই নে। ১০টার একটু পরে আমরা উঠানে বসে আছি তখন দেখলাম Messenger রাণীকে সঙ্গে নিয়ে আসছে। নির্ম্মলবাবু উঠান থেকে উঠে তাদের কাছে গেল, আমি ত রাণীর সঙ্গে এখনও পরিচিত হই নাই তাই আমি ২।৪ মিনিট পরে ঘরের মধ্যে গেলাম, নির্ম্মলবাবু রাণীকে বলল "মাষ্টারদা এসেছেন"। রাণী এসে আমায় প্রণাম করে পায়ের ধুলা মাথায় নিল, বাতির সামনে তার আপাদমস্তক দেখলাম। প্রথম দর্শনে সে আমার মনের মধ্যে কি impression create করল ঠিক ভাষা দিয়ে বুঝাতে পারব না। দেখেই তাকে বেশ smart, cheerful, intelligent এবং cultured বলে মনে হ'ল। তার চোখেমুখে একটা আনন্দের আভাস দেখলাম। এতদূর পথ হেঁটে এসেছে, তার জন্য তার চেহারায় ক্লান্তির কোন চিহ্নই লক্ষ্য করলাম না।

দেখেই বুঝলাম আমার দেখা পেয়ে সে খুব আনন্দই পাচ্ছে। যে আনন্দের আভা তার চোখে মুখে দেখলাম, তার মধ্যে আতিশয্য নেই, Fickleness নেই, Sincerity শ্রদ্ধার ভাবই তার মধ্যে ফুটে উঠছে। একজন উচ্চশিক্ষিত Cultured Lady একটি পর্ণকুটীরের মধ্যে আমার সামনে এসে আমাকে প্রণাম করে উঠে বিনীত ভাবে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মাথায় হাত দিয়ে নীরবে তাকে আশীর্ব্বাদ করলাম—কি আশীর্ব্বাদ করলাম জানি না, আজ মনে হচ্ছে বোধ হয় দীপ্তির মরণেই তাকে অজ্ঞাতসারে আশীর্ব্বাদ করেছিলাম। দেখলাম তার মধ্যে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই। মনে হ'ল একজন ভক্তিমতী হিন্দুর মেয়ে হাতে প্রদীপ নিয়ে আরতি দেবার জন্য দেবতার মন্দিরে ভক্তিভরে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে কোন দুঃখ নাই, ক্ষোভ নাই, মুখে একটু নির্ম্মল আনন্দের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। একটা পবিত্র নিঃসঙ্কোচ ভাব। আমার সঙ্গে এই প্রথম বার দেখা করার কথা লিখতে গিয়ে সে নিজেই লিখেছে, যখন গ্রামের পথে, মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল যেন দেবদর্শনে যাচ্ছি। পরে তার কাছেও সেদিন তার হৃদয়ে দেবতার আসন সে আমার কাছে এনেছিল। কিন্তু ওর কাছ থেকে শোনার আগেই প্রথম দর্শনেই মনে হ'ল পূজারিণী ভক্তি-অর্ঘ্য সাজিয়ে দেবতার পূজা করতে এসেছে। চোখে মুখে পবিত্র আনন্দের ভাব। নীরবে আশীর্ব্বাদ করে ওকে বারান্দায় রেখে কাজের ছলে রান্নাঘরের দিকে গেলাম। কিছুই বলতে পারলাম না। আমি সাধারণতঃ লাজুক। কোন নূতন ছেলের সঙ্গে দেখা হলে তৎক্ষণাৎ কিছু বলতে পারি না। মেয়েদের সঙ্গে ত সে লজ্জা বেশী হওয়ারই কথা। আমি জীবনে বাড়ীর অথবা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গেও খুব কম কথাই বলেছি। কাজেই একটি অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে কথা বলতেও প্রথম বাধ বাধ ঠেকবেই। রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল তাই আমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। রাণীকে নির্ম্মলবাবুর বোন বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। তাই সে তার সঙ্গে খেতে বসল। খেয়ে উঠে নির্ম্মলবাবু অল্পক্ষণ তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে একটি ছেলের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বেরিয়ে গেল। তখন আমি রাণীর কাছে গিয়ে বসে একটু সঙ্কোচ করে কথা আরম্ভ করলাম। মনে হ'ল নিঃসঙ্কোচে তার সঙ্গে কইতেই পারব না। বাড়ীতে তার নাম বললাম খুকী। রাণী বলে সেখানে কেউ তাকে ডাকে নি। উদ্দেশ্য সেখানে তার নাম গোপন রাখা। কথার প্রারম্ভেই তাকে রামকৃষ্ণের সঙ্গে কথা কি ভাবে দেখা হয়, কি কথাবার্ত্তা হয় ইত্যাদি জিজ্ঞেস করলাম। এই কথা তোলায় যেন ভালই হ'ল। সে নিঃসঙ্কোচে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার ইতিবৃত্ত সবিস্তারে খুব fluently এবং sweetly বলে যেতে লাগল।

তার নিঃসঙ্কোচ সহজ স্বচ্ছন্দভাব দেখে আমার সঙ্কোচ একেবারেই কেটে গেল। রাত্রে প্রায় দুই ঘণ্টা খুব freely তার সঙ্গে কথা বললাম। আমি ত বেশী কিছুই বললাম না। তাঁর কাছ থেকে কেবল শুনলামই। রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা, কথাবার্ত্তা, রামকৃষ্ণের প্রতি তার শ্রদ্ধা, রামকৃষ্ণের গুণগুলির সম্বন্ধে তার ধারণা খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করে যেতে লাগল। তার একজন মানুষের গুণ গ্রহণ করবার, সুন্দর স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবার এবং নিঃসঙ্কোচে (fluenly) কথা বলে যাওয়ার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হলাম। কি সহজ সরল ভাবেই না সে কথা বলে যেতে লাগল। ঐ রাত্রের দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার কথায়ই তার উপর আমার খুব ভাল ধারণা হয়ে গেল। সে বাড়ী থেকে প্রায় এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এসেছিল। মনে করেছিলাম তার বাড়ীর অবস্থাও খুব ভাল, তা ছাড়া এত দিন স্কুল কলেজে পড়েছে, হোষ্টেলে রয়েছে, কত decently চলেছে, কত ভাল decently মেয়েও দেখেছে যে এই বাড়ীর খারাপ খাওয়া খেতে তার হয়ত খুব কষ্ট হবে, তা ছাড়া যে কয়দিন আমাদের ওখানে, সে কয়দিন ত তাকে পলাতকদের মত ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে। এ সব কষ্ট তার মত একজন মেয়ের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হবে কিনা? দেখলাম এত decently brought up সত্বেও সেভাবে একটুও কষ্ট বোধ করছে না। আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলেছে এবং কাছে থেকে তার যা জানবার জেনে নিচ্ছে—এতেই তার আনন্দ। তার aetion করার আগ্রহ সে পরিষ্কার ভাবেই জানাল। বসে বসে যে মেয়েদের organise করা, organisation চালান প্রভৃতি কাজের দিকে তার প্রবৃত্তি নেই, ইচ্ছাও নেই বলে।

সূর্য্য সেনের রচনা

অন্তরীণ

কলকাতার রাস্তায়

১৯২৬ সালের ৮ই অক্টোবর। প্রায় দু'বছর হ'ল abscond করেছি। ঐ দিন সকালবেলা ৮টার সময় shelter থেকে বেরিয়ে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের উপর খানিকদূর গিয়ে একটি লেনে ঢুকতে যাব এমন সময় দেখলাম একজন লোক গলির মাথায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টান্‌ছে, তার হাবভাব দেখে spy বলে সন্দেহ হ'ল। মনে করলাম কলকাতার spy আমাকে কি করে চিনবে। সে গলির মাথায় দাঁড়িয়ে রইল, আমি গলির ভিতর ঢুকে পড়লাম, কিছু দূর গিয়ে আমার প্রয়োজনীয় বাসায় ঢুকে কথাবার্ত্তা শেষ করে shelter-এ ফিরবার সময় ঐ গলিটা দিয়ে না ফিরে ঘুরে আর একটা গলির মধ্য দিয়ে shelter-এ ফিরলাম, কারণ ভাবলাম যদি আগের গলিটা দিয়ে ফিরি তা হলে ঐ spyটা আমার আবার

mark করতে পারে। খেয়ে দেয়ে দুপুরবেলা আবার সেই বাসায় যাওয়ার কথা, তাই স্নান করে খেয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ পরে পৃথক আর একটা গলি দিয়ে উক্ত বাসায় গেলাম, পথে সন্দেহজনক কিছুই দেখলাম না, সেখানে ঘরের মধ্যে বসে কথাবার্তা বলছি—এমন সময় দেখলাম একজন যুবক বাসার সামনে blind laneটা দিয়ে বাসাটা pass করে চলে যাচ্ছে, দেখেই সন্দেহ হ'ল। কারণ blind lane দিয়ে সে যাবে কোথায়? বাসাটির পরেই laneটা বন্ধ হয়ে গেছে, তাই বাসা pass করে তাকে এগিয়ে যেতে দেখে spy বলে সন্দেহ হ'ল, ২।১ মিনিট পরেই দেখি সে আবার ফিরে আমরা যে room-এ বসেছি তার জানালার ধারে এসে একজন লোকের নাম করে সে ওই বাসায় থাকে কিনা জিজ্ঞাসা করল, ও নামের কোন লোক সে বাসায় থাকত না—আমরা "না" উত্তর দিলে সে চলে গেল। তার জিজ্ঞেস করার ভঙ্গী দেখে আমাদের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হ'ল, একটু পরে আমি বাসার একটি ছেলেকে বাইরে রাস্তাটা দেখে আসতে বললাম, সে দেখে এসে বলল "রাস্তার ২।৩ জায়গায় দু'তিন batch plain dress পরা লোক দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছে—I. B.র লোক বলে মনে হচ্ছে"—শুনে মনে করলাম বাসার পর যেখানে laneটা শেষ হয়েছে সেখানকার ছাদ দেওয়াল টপকে বেরিয়ে চলে যাব, দেরী না করে দেওয়াল টপকে অন্য ধারের রাস্তায় পড়ে ছাতাটা খুলতে যাচ্ছি, দেখি যে লোকটি জানালার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল সেই লোকটি আমার ৩০।৪০ হাত পেছনে, সে ইতিমধ্যে বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে ঘুরে পেছনের রাস্তায় এসে পড়েছে। আমি ছাতাটা খুলে চলতে লাগলাম, ঐ লোকটি এক পা দু'পা করে আমার ঠিক পিছনে এসে বলল। "দাঁড়ান মশায়", আমি তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে সাধারণ গতিতে চলতে লাগলাম, সে আবার আমাকে দাঁড়াতে বলল, আমি কেন দাঁড়াব জিজ্ঞেস করলে সে কোন জবাব দিল না এবং হঠাৎ আমার একটা হাত জোরে ধরে ফেলল, আমি হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা করছি এমন সময় সে চেঁচিয়ে রাস্তার পাশের লোকদের বলল, "এ একজন ডাকাত, একে ধরুন", আর কেউ তাকে সাহায্য করল না, কিন্তু তার হাত আমি কিছুতেই ছাড়াতে পারলাম না। ইতিমধ্যে সে হাত নেড়ে কি একটা ইসারা করলে, আর ৪ ৫ জন plain dress পরা লোক এসে আমায় ভালরূপে ধরে ফেলল। ঠিক সে-সময় রাস্তা দিয়ে একটা মোটর যাচ্ছিল, তারা মোটর ডেকে আমায় তার উপর তুলল, বুঝতে পারলাম তারা সবাই I. B. department-এর লোক। মোটরে তুলে তারা দুইজনে আমার দুটি হাত ধরে রেখে কোমর এবং পকেট search করল, বলা বাহুল্য, আমার সঙ্গে incriminating কিছুই ছিল না, পকেটে কয়খানা Forward পত্রিকার cuttings আর একটি ক্ষুদ্র slip-এ ২।৩টি রেলওয়ে ষ্টেশনের time table লেখা ছিল। দু' হাত ধরে Search করবার সময়, তাদের অভদ্র, ইতর ইত্যাদি ডেকে খুব গাল দিলাম, তারা বিনা বাক্যব্যয়ে Search করে নিল। আমি গাল দিতে দিতে বললাম, "তোমরা যে পুলিসের লোক তারই বা নিদর্শন কি? শুধু শুধু একজন ভদ্রলোককে পথের মধ্যে অপমান করছ কেন? এর উত্তরে তাদের মধ্যে একজন একটু অবহেলা এবং গর্ব্বের ভাব দেখিয়ে শার্টের নীচে কোমরে ঝুলান revolver caseটা চাপড়ে বলল, "এই পুলিসের নিদর্শন।" বললাম, "পুলিস হলেই কি পথের মধ্যে লোককে অপমান করতে হয়।" Elysium Rowতে নিয়ে বড় officerদের সামনে Search করলেই ত হ'ত, আমি সেখানে তোমাদের against-এ নিশ্চয় Complain করব। তারা চুপ করে রইল। পরে আমার নাম জিজ্ঞাসা করল। বললাম, তোমাদের মত অভদ্রকে আমি নাম বলব না।—নাম না বলার ইচ্ছাটা আগে থেকেই ছিল। এখন তাদের অভদ্রতার সুযোগটাকে না বলার কারণ করে নিলাম।

সঙ্গে যে incriminating কিছু ছিল না তার কারণ তখন আমি ordinance (B. C. L. A. Act.)-এর absconders, শুধু শুধু firearms সঙ্গে রেখে Conviction টেনে লাভ কি? আর incriminating কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে না চলার অভ্যাস আমার চিরকালই আছে। বরাবরই আমি খুব careful থাকি। Carelessness-এর দোষে সমিতির secret পুলিসের হাতে গিয়ে যাতে না পড়ে এই চেষ্টা আমার সর্ব্বদাই থাকত। আজকালকার দিনের চেয়ে তখন আরও careful থাকতাম, এখন যেন একটু careless হয়ে পড়েছি, তার কারণ যারা আমার সাথী তারা বিশেষ careful থাকে না। কাজেই carelessnessটা contagious হিসাবে আমার উপরও কিছু আধিপত্য বিস্তার করেছে। আর careful থাকতে থাকতে মানুষ যেন ক্রমশঃ হাঁপিয়ে উঠে এবং carelessness-এর ভিতর একটু relief খুঁজে পায়। তাই চিরদিন careful থেকেও আজকাল যেন একটু careless হয়ে পড়েছি। যদিও আমার সাথীদের তুলনায় এখনও অনেক careful আছি। এত careful থাকি বলেই এখনও কোন কাগজপত্র পেয়ে পুলিস আমাদের চট্টগ্রাম বিপ্লব সমিতির বিশেষ ক্ষতি করতে পারে নি। আমার নিজের ভুলের দরুন বিশেষ কোন ক্ষতি এ পর্য্যন্ত হয় নি। যদি বেশী ক্ষতি হয়ে থাকে তা আমার ভুলের জন্য হয় নি। আমার comradeদের carelessness-এর দরুন হয়েছে।

দেখতে দেখতে মোটর Elysium Rowতে অবস্থিত Cen-

tral I. B. আপিসের (13 Elysium Row) গেটের ভিতর ঢুকে পড়ল। উঠানে মোটর থেমে গেল, আমি এবং I. B.-র লোকেরা নেমে গেলাম। উঠানে নামামাত্র আমার সঙ্গের একজন I. B.-র কর্মচারী একজনকে ডেকে বলল, "রায় সাহেবকে ডেকে আন।" একটু পরে দেখি রায় সাহেব ব্রজবিহারী বর্মণ আপিসের দোতালা থেকে নেমে উঠানে এসে দাঁড়াল, এবং আমার দিকে ভালরূপে ঠাহর করে দেখে বলল, "Oh! my friend Surjya Babu, I see."

একে একে অনেক অফিসার এসে আমার নাম জিজ্ঞাসা করল। আমি কিছুতেই বললাম না। তারা বলল, "অপনাকে আমরাও চিনেছি, শুধু শুধু নাম ধাম গোপন করে লাভ কি?" আমি বললাম, "আপনারা যদি চিনেই থাকেন তবে আমাকে আর জিজ্ঞেস করছেন কেন?" তবু তারা আমার নাম, আমি গত দুই বছর কোথায় ছিলাম ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করতে থাকল, আমি একটা কথারও জবাব না দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। শেষে আর থাকতে না পেরে প্রশ্নকারীদের সম্বোধন করে বললাম, "I wont reply to any of your questions." একজন বলল, "Why." আমি উত্তর দিলাম, "Because I think it unnecessary." কোন সুবিধা করতে না পেরে তারা শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে উঠানে একটা চেয়ারে আমাকে বসিয়ে আমার ২।৩টা ফটো তুলে নিল, তারপর আমাকে escort করে দোতলায় নিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় I. B.-র যে লোকগুলি আমাকে নিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে দুই জন সিঁড়ির নীচে আমাকে অনুরোধ করল, আমি যেন তারা যে মোটরের মধ্যে আমাকে জোর করে Search করেছে এর জন্য কোন Complain না করি। তখনকার দিনে detenuesদের পক্ষে সমস্ত জাতীয় সংবাদপত্র খুব জোরে লিখত এবং কোন detenue-র উপর পুলিস অথবা জেল-কর্তৃপক্ষ কোন খারাপ ব্যবহার করলে তার জন্য খুব জোরে প্রতিবাদ চলত। Assembly ও Council-এ তা নিয়ে খুব আন্দোলন চলত। বোধ হয় সেজন্যই I. B.-র ঐ লোক-গুলি আমাকে Complain না করার জন্য এবং তাদের উপর কোন রাগ না রাখার জন্য অনুরোধ করল। যাক, আমি তাদের কথার কোন উত্তর দিলাম না, উপরে গিয়ে দেখি একটা টেবিলের চারিদিকে চেয়ার রয়েছে এবং একটা চেয়ারে I. B.-র Special Superintendent নলিনী মজুমদার আসীন। কৃষ্ণবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট শরীর, তাঁকে আগে কোন দিন দেখি নি, ওদিন প্রথম দেখলাম। মজুমদার মহাশয় একখানা চেয়ারে আমাকে বসতে বললেন, এবং আমার নাম এবং এতদিন কোথায় ছিলাম ইত্যাদি প্রশ্ন করলেন। আমি এসব প্রশ্নের কোন জবাব দিলাম না, ইতিমধ্যে আরও ২।১ জন officer এসে আমার আশেপাশে বসে গেছেন, তন্মধ্যে রায়-সাহেব ব্রজবিহারী বর্মণ স্নেহমিশ্রিত মিহি মিহি সুরে আমাকে বুঝাতে লাগলেন "এতদিন পথে ঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, কত অসুবিধা ভোগ করছিলেন 'এখন আর কোন অসুবিধা ভোগ করতে হবে না—জেলের ভিতর বেশ ভাল থাকবেন" ইত্যাদি। শুনে রাগ হ'ল, জবাব দিলাম, 'You need not bother yourself about that. I am wise enough to think of myself." কথা কয়টি শুনে তিনি থেমে গেলেন। তখন মজুমদার মহাশয় উঠে Tele-phone ধরে কার সঙ্গে বাংলাতে কথা বললেন, আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে এই কথাগুলি বললেন, "চাটগার বিপ্লবী নেতা সূর্য্য সেন ধরা পড়েছে। মনে করেছিলাম এত বড় একজন নামজাদা লোক boldly নিজের গৌরবের কাজগুলি এবং আদর্শের কথা বলে যাবে। কিন্তু দেখছি তিনি তাঁর নামটা পর্য্যন্ত বলছেন না।"...তারপর টেলিফোনে আরও কি কি কথা বলল mark করলাম না। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য আমাকে একটু শ্লেষ দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে boldly সব বলে ফেলার জন্য আমাকে excite করা। যাক, তাঁর কোন উদ্দেশ্য সফল হ'ল না, কিছুক্ষণ পর কলিকাতার পুলিস কমিশনার Mr. Armstrong এল (খুব সম্ভবতঃ তখন Tegart সাহেব ছুটিতে ছিল)। সেও এসে দু'চার কথা জিজ্ঞাসা করল এবং বলা বাহুল্য আমিও আগের মতই জবাব দিলাম। Armstrong চলে গেল। তখন আমাকে D. I. G Mr. Lowman-এর ঘরে নিয়ে গেল। দেখি সে বেশ ভদ্রভাবে smilingly আমাকে একখানা চেয়ারে বসাল। তারপর জিজ্ঞেস করল এদিন কোথায় কি ভাবে abscond করে ছিলাম, আমি উত্তরে বললাম, "I was not absconding I was leading peaceful life." শুনে সে মৃদু হেসে বলল, "We have declared Rs. 1000 for your arrest in last December and you say that you were not absconding. Well, I don't like to give you any pressure, you will have no troubles, you are arrested under Bengal Ordinance." আমি তাকে জেলে কোন অসুবিধা হবে কি না জিজ্ঞাসা করলে সে "না" বলল এবং বলল কোন অসুবিধা হলে Additional Deputy Secretary, Political Department, Govt. of Bengal অথবা আমাকে জানাবে। Addressগুলি এক টুকরা কাগজে লিখে দিল। মোটের উপর খুব ভদ্র ব্যবহারই Lowman করল। আবার নলিনী মজুমদারের আপিসে ফিরে গেলাম।

কল্পনা দত্তের চিঠি

১৬ই ফেব্রুয়ারী
১৯৩৩ ইং

To
My dearest brother "Phaiya"

আজ আমার বার বার কেবল তোর কথাই মনে হচ্ছে, অনেকদিনই ত তোদের স্মৃতি আমার প্রাণে ব্যথার মধ্যেও আনন্দ দিয়েছে, কিন্তু আজ যেন সেই ব্যথাটুকুর মধ্যে আনন্দের ঢেউ দিচ্ছে। তোর সেই আধ আধ কথা, মিষ্টি হাসি, আমায় বার বার এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে যাদের আমি কত ভালবাসি, যাদের কথা বললে আমি আনন্দ পাই, তারাই পরে যখন জানবে যে তাদের মেজদি না বলে চলে গেছে—তুই যখন বড় হবি তখন হয়ত কারও কাছে শুনবি মেজদির কথা কিন্তু তখন কি বুঝতে পারবি যে আমি তোকে কত ভালবাসতাম। এই পলাতক জীবনে তোর কথা অন্যদের কাছে শুনে কত আনন্দ পেতাম! আসবার দিন তোকে যে একবারটি দেখে আসতে পারিনি, এইটাই খালি খালি মনে হচ্ছে। তুই ত ভাই কত জনের এখন আদর পাচ্ছিস, হয়ত কত জনের মধ্যে আমার আদরটুকুর অভাব অনুভব করতে পারছিস্ না। কিন্তু আমার ত মনে করতেই কষ্ট হয় যে আমার কথা বড় হলে তোদের মনে থাকবে না, হয়ত বা আবছায়ার মত মনের কোণায় একটু উঁকি মেরেই চলে যাবে। ওপার থেকে যদি দেখি যে আমার প্রাণের টান অনুভব করতে পেরেছিস্, তা হলে যে আমি অনেক আনন্দ পাব। আমার এ প্রাণের ডাকটুকু তোর কাছে পৌঁছবে কিনা ভগবান জানেন।

জীবনে কোনদিন কাউকেই আনন্দ দিতে পারিনি, তাই বলে কি সকলকে ব্যথাই দিয়ে যেতে হবে? আগে কোন দিন কে আমার কথায় ব্যথা পেল কিনা, কে সুখী হ'ল ভেবে দেখিনি, কিন্তু এখন কেন আমার প্রতি কথায় মনে হয়, কাউকে ব্যথা দিলাম নাকি! কেন এমন হয়? বোধ হয় যাবার দিন ঘনিয়েছে বলেই। যাবার আগে কারো প্রাণে ব্যথা দিতে চাই না, কিন্তু যা চাওয়া যায়, সকল সময় তা ত হয় না। কারো প্রাণে ব্যথা দিতে চাই না বলেই যেন আরো বেশী করেই আমার প্রতি কথায় কাজে সকলে ব্যথা পায়। আর এটাই যে আমার প্রাণে বেশী বাজে। আমি কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে পারি না। বুঝি আমার স্বভাবদোষেই এসব হয়ে থাকে। আমি যে ভুলে যাই, আমি আর এখন সেই সকলেরই আদরের তুলুটি নই। আমার অত্যাচার সহ্য করবার মত ধৈর্য্য এখানে সকলেরই নেই। তাই ত শত চেষ্টা সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে আমি নিজেকে check করতে পারি না।

আমি যখন একদিনের জন্যও কোথাও যেতাম তখন ত তোমরা বলতে আমি না থাকাতে বাড়ীটা খালি খালি মনে হ'ত, আচ্ছা মা! আমি তোমাদের ছেড়ে এসেছি আজ তিন মাসেরও উপর হ'ল, এখন তোমাদের কি রকম লাগে? তোমরা কি আমাদের জন্য কাঁদ? তোমরা কি আমায় ভুলে যেতে পার না? আমার কি মনে হয়, জান মা! আমার মনে হয় তোমরা আমার জন্য খুব কাঁদ। আর দুপুরবেলায় এবং রাত্তিরে যখন শুতে যাও, তখন আমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়, কিছুই টের পাও না। সত্যি নয় কি? আমিও যে তোমাদের ভুলতে চেষ্টা করি। ভাবি যাদের ছেড়ে চলে এসেছি অন্য একটা কাজের জন্য তাদের জন্য আবার কিসের চিন্তা, কিন্তু তা পারি না যে, মা! আমার জন্য তোমরা আর চিন্তা করো না। মনে করো যে আমি মরে গেছি। আমায় ফিরে পাবে না। তোমার ত অনেক আছে, দেশের জন্য কি একটাকেও উৎসর্গ করতে পার না।

প্রীতিলতার চিঠি

(৪)

শ্রীচরণেষু—

দাদা, ভেবেছিলাম আবোল-তাবোল অনেক কিছু লিখে আমার দাদার নিরালা জীবনে একটুখানি আনন্দ দেবার চেষ্টা করব কিন্তু ভগবান হঠাৎ যেন সব উল্টে দিলেন। ছুটাছুটি করে সবাইকে চলে আসতে হ'ল—তারপর যেন নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করাটাই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেননা একান্ত মনে যা চেয়েছি তার পথে এত বাধা আমার মনে যে বড়ই ব্যথা দিচ্ছে দাদা। অনেক কিছুই মনে হচ্ছে, যাক্ আপনার আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হবে না কখনও আমি জানি। আমার উদ্দেশ্য সফল হবেই, নইলে যে আমি একেবারে মরিয়া হয়ে যাব। যাক্, এসব লিখব তা তো ভাবিনি।

আজ আপনার কাছে চিঠি লিখতে বসে ভাবছি আমি কার কাছে চিঠি লিখব? আমি যে তাঁর উপযুক্ত বোন হতে পারলাম না, তাঁর অগাধ স্নেহের মর্য্যাদা আমি যে রক্ষা করতে পারলাম না। কত অবাধ্যতা করেছি, কত মনে কষ্ট দিয়েছি, বুঝি নি যে ভগবান্ আমাকে অমূল্য সম্পদই দিয়েছেন। যাক্।

সোনাদা ও মেজদা এসেছিল। খুব ভাল লাগল তাদের সঙ্গে কথা বলতে—তারা আমাকে দেখে খুব খুশী—একেবারে জড়িয়ে ধরে বসেছিল। মা নাকি খুব কাঁদেন—কাঁদতে কাঁদতে হয়রান হয়ে যান্। রোজই কাঁদেন। বাবা কিছু শান্ত হয়ে গেছেন, তবে বাবার খুব লেগেছে। আমার কাপড়-চোপড়গুলো গুছিয়ে রেখে দেবার জন্য বলে দিয়েছেন, তা কেউ ব্যবহার করলে বকুনি দেন। মঞ্জুটির খুব অসুখ। গাল ফুলে

গেছে কিছু খেতে পারে না। এবং অন্যও হয়েছে—রাত দুপুরে উঠে নাকি আমাকে ডাকে।

দাদা! আমার মনে আজ বড়ই ব্যথা। আমি কি মানুষকে কষ্ট দিতেই শুধু সংসারে এসেছিলাম। আমি যে তা চাই না। লক্ষ্মীটি দাদা এ হতভাগা বোনটিকে ভুলে যাবার চেষ্টা করুন। আমি স্নেহের বোনটিকে ভুলবেন না কিন্তু আমার সে কথাই বলতে ইচ্ছা করছে—আমার স্মৃতি যে আপনাকে ব্যথা দিচ্ছে।

আমার জন্য চিন্তা করবেন না। শরীর ভাল আছে। আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি—স্নেহের কুলতার

THE CHITTAGONG BRIGADE

1

Slowly, slowly, mile by mile,
Marched forward to the grave,
To the dale of death, to the field of fame
Marched the five dozen youths brave.
'ONWARD' the Chittagong Brigade
To the yonder hills, cried the Captain brave
To the dale of death, to the field of fame
Marched the five dozen youths brave.

2

ONWARD the Chittagong Brigade;
Was anybody a bit afraid?
Not though all the soldiers knew
Survive of them will but few
But the pain of bondage
Robbed them of their peaceful age.
And it was freedom they did crave
To the dale of death, to the field of fame
Marched the five dozen youths brave.

3

HUNGER to them was constant mate
DRINK they did not find to taste
SUMMER did its cruelty best
Fried them in its hot air's wave,
Cheerfully did they take them all,
Slowly all their force did fall,
But alive they were to the motherland's call
For the cause, her to save.
To the dale of death, to the field of fame
Marched the five dozen youths brave.

4

Towards beaming they found at last
The holy 'Jalalabad' off mournful past
Where the army settled them at first
In wait for the enemy fiendish knave.
The sun poured molten fire on them
The rifles turned up hot as flame
With hunger and thirst the delusion came
Only the *carrie* clinking broke the solitude grave
To the dale of death, to the field of fame
Kept in wait the five dozen youths brave.

5

At last when the sun did bend
And the painful day was at an end
On April 'mid twenty-second
The enemy was in sight.
'Halt' shouted the Captain dare
'Comrade fire' came the next order
When the sixty guns boomed together
And before rolled down night
To the dale of death, to the field of fame
Fought grave the five dozen youths brave.

6

Screened off the midst off dust and smoke
The guns sent the humble stroke
And put to fight the enemy's folk
While some amidst them fell down rolled
"Segra" opened the martyrdom's gate
And was followed by ELEVEN in haste
While the fight ceased in the evening late
They marched down lest their comrades cold
To the dale of death, to the field of fame
Came down the fifty-eight bold.

7

When can their glory ceased to be said
Oh: the wild fight they made
All the people astound
Honour the attempt they made
Blessed the Chittagong Brigade
NOBLE ONE DOZEN DEAD.

"Ganesh-da"

শাহ্ আবদুল লতীফের কবিতা

এ. এন. এম. বজলুর রশীদ

সুফীসাধনার যে মূল সুর ও তত্ত্ব 'ফানাফিল্লাহ্' অর্থাৎ জীবনের একমাত্র আনন্দস্বরূপ আল্লার উপর পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ এবং সর্ব্বানুভূতি ও আত্মজ্ঞান—যে জ্ঞানের দ্বারা সাধক আপনার আত্মাকে পরমাত্মার একটি অংশ বলে অনুভব করেন এবং পরম একের বৃহত্তম ও সুন্দরতম সত্তার মধ্যে যে আত্মার সুমধুর অবসান, তাই হ'ল সিন্ধুর সুফীসাধক শাহ্ লতীফের কবিতার বিষয়বস্তু। প্রেমের মহৎ ও কণ্টকাকীর্ণ পথের ভেতর দিয়েই তাঁর যাত্রা সুরু, দুঃখকেই তিনি বরণ করেছেন, কারণ যে কাছে থেকেও নেই, বুকের ভিতর যে আছে, তথাপি যে সুদূর, তার প্রতি কবির যে অনির্ব্বচনীয় প্রেম, সেই প্রেম কবির অন্তরে সঞ্চারিত করেছে বিরহের তীব্র দাহ ও আনন্দ-আবেগ।

অন্যান্য সুফী কবিদের মত আবদুল লতীফও প্রচুর শব্দ-প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার করেছেন। 'সুর সুহিনী'তে কবি বলছেন—

সুহিনী, ভাল করে জানো সেই গুপ্ত নিয়ম
কেমন করে রহস্যের পথ দিয়ে
বিচারের সত্যতা হয় গতিশীল।
সত্যকার জ্ঞান তাদেরই আনন্দের ভেতরে
যারা ভালবাসে তাঁকে আপনার ভাবসত্তাকে বিলীন করে'।

আর এক জায়গায়—

আত্মচেতনাকে ধ্বংস কর এবং আমিত্ব থেকে
তোমাকে দাও বাদ। সত্যকার জীবনে থাকবে না
এই আমিত্ব-বোধ—
অন্যথায় সে জীবন হবে নিরর্থক ও ভারপীড়িত।
তারা বোকা যাদের কথায় 'আমি' বলে কথা।

বস্তুজগতের কপচারী দৃশ্যাবরণ ও মরীচিকার জাল ছিন্ন করবার জন্য সুফী সাধকগণ সর্ব্বদা সচেষ্ট। বাইরের ছায়া-ছবি, আপাতসুন্দর রূপরস, কামনা ও বাসনা সাধনপথের অন্তরায়, কারণ তা সত্যকে আবৃত করে রাখে—ক্ষণায়ু হলেও তার আবরণে চিরসুন্দর ও মধুর যে সত্তা তা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এই আবরণের বেদনা সুফী কবি রুমীর ভাষায় অপূর্ব্ব ভাবরূপ লাভ করেছে। রুমী বলছেন—

আমার চক্ষু থেকে অপসারিত কর
অজ্ঞানতার আবরণ—
প্রতি জিনিসের যা সত্যরূপ
অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বকে আর দেখিয়ো না—
যা নেই তার আচ্ছাদনে যা আছে
তার রূপকে করো না আচ্ছন্ন—
এই মৃত্তময় জগৎকে কর আরশির মত
তার বুকে প্রতিফলিত হবে তোমার রূপের প্রকাশ।
তোমার আমার ভেতরে আর রেখ না বন্ধু,
ব্যবধানের দূরত্ব ও অন্তরাল।

শাহ্ লতীফের কবিতাতেও এই ব্যবধানের বেদনা ও দূরত্বের দুঃখ ফুটে উঠেছে। তাঁর মতে, মানুষের বিপথগামী ও উচ্ছৃঙ্খল হৃদয় সেই আবরণ-জালকে ছিন্ন করবার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়, সে আবরণ মানুষকে আল্লার সান্নিধ্য থেকে বহুদূরে সরিয়ে রেখেছে। শাহ্ লতীফ এই ভ্রান্তপথচারী হৃদয়কে অর্ব্বাচীন এবং স্থূলবুদ্ধিচালিত উন্মার্গগামী উটের সঙ্গে তুলনা করেছেন। রুমীর একটি বিখ্যাত কবিতায় সুফী-সাধকদের এ ধরণের ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দ ও ভাবপ্রতীক সুন্দর ভাবে একত্রে রূপ পেয়েছে। 'মসনভীতে' রুমী বলছেন—

(প্রেমের) সুরা উৎসারিত হয় সেই জগৎ থেকে
পাত্র তার এই জগতের—
পাত্র দৃশ্য কিন্তু সুরা থাকে অদৃশ্য হয়ে—
অদৃশ্য থাকে উটের দৃষ্টিপথ থেকে—
কিন্তু মুক্ত ও প্রকাশিত হয়
সাধনপথের ভক্তের নিকট।
আল্লাহ্, আমাদের চক্ষু আছে অন্ধ হয়ে।

শাহ্ লতীফ সিন্ধুদেশের পাহাড়, পর্ব্বত, উচ্চ বালুকাস্তূপ, নদনদী ও মহিষের পাল, রাখাল, কুমোর ইত্যাদির অতি সুপরিচিত বস্তুজগৎ থেকে প্রতীক ও রূপক আহরণ করেছেন। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত রূপক-গাথা 'সুহিনী ও মেহারে' বিরহের বেদনার্ত্ত চিত্তের আবেদন ও ব্যাকুলতা শব্দ-প্রতীকের ভিতর অপূর্ব্বতা লাভ করেছে। অনির্ব্বচনীয়কে প্রকাশ করবার জন্য কবি গ্রামের অতি সাধারণ ও সহজ দৃশ্যাবলী এবং জীবন-যাত্রা থেকে ভাবরস গ্রহণ করেছেন। সুহিনী ও মেহার নামক রূপক গাথাটির কথাই এখানে বলা যাক। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সঙ্গীতে যে মরমীবাদ ফুটে উঠেছে তার মূল বিষয়বস্তু হ'ল, সেই আত্মা যে আমাদের ভাবপ্রবাহের অন্তঃশীলায় বাস করে। মনের গহনে যার সর্ব্বদা অভিসার চলে, সে আত্মা দেহের সীমাবদ্ধতা ও তার বিকৃত কামনা-বাসনার নিষ্পেষণে নিপীড়িত হয়ে কাঁদে—প্রিয়তমের দেখা সে পায় না—বিরহের মর্ম্মান্তিক বেদনা তাকে অশেষ পীড়া দেয়, সে আত্মা বিরহে কাতর। কবি অনুভব করেন—তাঁর

বিরহিণী হৃদয়ের গভীর নির্জনতার অন্ধকারে প্রিয়জনের অভিসারে চলে। রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছে :

মম মনউপবনে চলে অভিসারে
আঁধার রাতে বিরহিণী।

কবি তাঁর বিখ্যাত রূপকনাট্য 'অরূপ রতনে'র মধ্যে এই ক্রন্দনরতা বিরহিণী আত্মাকে 'সুদর্শনা'র রূপক চরিত্রের ভিতর তার সকল ব্যর্থতা, বেদনা ও ব্যাকুলতার মধ্যে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজাকে সে চায়—কিন্তু বাধার অন্ত নেই। শেষে চরম দুঃখের ভিতর দিয়ে রাজা অর্থাৎ অদৃষ্ট পরম-সুন্দর প্রিয়তমের সঙ্গে সুদর্শনা অর্থাৎ সত্যসন্ধ মানবাত্মার মিলন হ'ল। পরিবেশ ও প্রকাশভঙ্গী পৃথক হলেও শাহ্‌ লতীফের 'সুহিনী ও মেহারের' মূল বিষয়বস্তু ও ভাবরসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'অরূপ-রতনের' আশ্চর্য্য ঐক্য আছে। বস্তুতঃ সুফী ও বাউল কবিদের ভাবধারার মধ্যে প্রিয়তমের বিরহবেদনা ও মিলনের আশা-আনন্দ স্ফূর্তিলাভ করে।

'সুহিনী ও মেহার' রূপক গাথার গল্পটি সংক্ষেপে বলছি। নদীর তীরে এক সঙ্গতিপন্ন কুমোর বাস করে। ইজ্জত বেগ এক ধনী মোগল বণিকের পুত্র, একদিন পথ দিয়ে চলতে অকস্মাৎ সুহিনীকে দেখে তার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হ'ল। ইজ্জত বেগ প্রত্যেকদিন হাঁড়ি-কুড়ি কিনতে আসে, আসল উদ্দেশ্য সুহিনীর দর্শনলাভ। সুহিনীও ক্রমে তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ল।

এদিকে হাঁড়ি-কুড়ি কিনতে কিনতে ইজ্জত বেগের পুঁজি ফুরিয়ে এল। পথের ফকির হয়ে সে সুহিনীর পিতার নিকট চাকরি ভিক্ষা করলে। কুমোরের মহিষদলের রক্ষক রূপে ইজ্জত বেগ নিযুক্ত হ'ল।' এখন থেকে ইজ্জত বেগ 'মেহার' নামে পরিচিত হতে লাগল। সুহিনী ও মেহারের ভালবাসার বন্ধন ক্রমে নিবিড় ও সুদৃঢ় হয়ে উঠল। পিতামাতা কিন্তু কন্যার এই গোপন প্রেমের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল, উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেবার জন্য তারা সুহিনীকে 'দাম' নামে এক কুমোরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলে। মেহার বিতাড়িত হ'ল।

নদীর অপর তীরে মেহের ওরফে ইজ্জত বেগ মহিষের পাল চরায়—এপার থেকে প্রতি রাত্রে সুহিনী আগুনে-পোড়া মাটির গামলায় নদী পার হয়ে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হয়। এই উপায়ও বন্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যে পিতামাতা এক দিন আগুনে পোড়া গামলার বদলে কাঁচা মাটির গামলা রেখে এল এই বিশ্বাসে যে, তাতে চড়ে নদী পার হবার সাহস সুহিনীর হবে না। কিন্তু রাত গভীর হয়ে আসতেই সেই গামলায় চড়ে সুহিনী অকূলে ভাসল। নদীর তরঙ্গ মালার আঘাতে গামলার কাঁচামাটি খসে পড়ল। প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে আকুল আর্তনাদ করে সুহিনী নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে গেল। সুহিনীর আর্তনাদ শুনে মেহার ছুটে এল এবং তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে সেও অতলে তলিয়ে গেল।

'সুহিনী ও মেহারে'র কবিতাগুলির মধ্যে প্রেমাস্পদের সঙ্গে সুহিনীর ঐকান্তিক ও ব্যগ্র মিলনাকাঙ্ক্ষার বর্ণনা অপূর্ব্ব কাব্যরস ও মর্য্যাদা লাভ করেছে। অভিসারিণী প্রেমিকার আকুল আহ্বানে প্রেমাস্পদ প্রেমের আবর্তে আপনি নিমজ্জিত হয়ে প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা করলেন।

সুহিনীর ব্যাকুল কণ্ঠে প্রেমার্ত সাধকের বেদনাই যেন ফুটে উঠেছে :

বন্যার আতঙ্ক আর শত শঙ্কা ভয়—
হিংস্র শত কুম্ভীরের সহস্র আলয় ;
আমার এ তনু বন্ধু, অতুর দুর্ব্বল,
প্রতিরোধ করিবার নাহি তার বল—
তোমার সাহায্য বিনা তরঙ্গের মাঝ,
বন্ধু কাছে এস মোর রাজ-অধিরাজ।
তরঙ্গে আতঙ্ক জাগে কেনে কেনময়,
আমার হৃদয় পদ্ম—জাগিছে সংশয়
ঢেউয়ের নির্ম্মম ঘাতে—আমি নিঃসহায়
প্রভু তব ভিখারিণী ডাকিছে তোমায়।

প্রেম ও বিরহের দহন সুহিনীকে আকুল করেছে, তার তৃষ্ণার যেন শেষ নেই, অনন্ত সমুদ্রের বুকে সে বসে আছে, একবিন্দু জলকণার সন্ধান তবু কোথাও মিলছে না :

দেহ আমার জলে যায়—সুতীব্র সে
অগ্নির দহন জ্বালা,
আমি পুড়ে খাক হয়েছি—কিন্তু সন্ধান
আমার চলছে।
পান করে' তৃষ্ণা মিটছে না—
সমগ্র সাগর সেঁচে ফেলেছি।
কিন্তু এক ঢোক জলেও তৃপ্তি পেলাম না।
রাত্রি নিকষকালো, আর এই কাঁচা মাটির পাত্র,
শঙ্কার কথা—বৃষ্টি এল নেমে
এখানে পথহীন জলরাশি—সেখানে সিংহ
করছে বিচরণ।
আমার প্রেমের নেশা যেন ভেঙে না যায়, বন্ধু
এ জীবনকে বৃথা জেনে যখন প্রবেশ
করব তোমার দ্বারে।

অনন্ত প্রেমের আবর্তে সুহিনী তলিয়ে গেল—এমনি করে তলিয়ে যায় কত সাধক, ভক্ত সুফী ও প্রেমিক—কিন্তু তারা একা নন্‌, তাদের সঙ্গে থাকেন তিনি জীবন-মরণের প্রভু যিনি—মানবের চিরকালের প্রেমাস্পদ যিনি সেই জীবনদেবতা।

বামদিক হইতে : দক্ষিণ আমেরিকা—মিসেস রোমেরো ব্রেট্ (আর্জেন্টিনা), ডেনমার্কের শিক্ষা-মন্ত্রী মিঃ জার্টভিগ ক্রিস্ক, এশিয়া—শ্রীমতী লীলা রায় (ভারতবর্ষ), ইউরোপ—মেরীথেরেসি আইকুইম (ফ্রান্স)

প্রথম আন্তর্জাতিক নারী শারীর শিক্ষা কংগ্রেস

কোপেনহেগেন : ডেনমার্ক

গত ১৮ই জুলাই (১৯৪৯) ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন নগরীতে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী শারীর শিক্ষা কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ছয় দিন ধরিয়া এই অধিবেশন চলে। বিশ্বদূত পি. টি. আই—রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, এই কংগ্রেসে ২৩টি দেশের ২০০ মহিলা-প্রতিনিধি যোগদান করেন। পাঁচটি মহাদেশের পক্ষ হইতে পাঁচ জন মহিলা উক্ত কংগ্রেসের প্রতি শুভেচ্ছা ও আনুগত্য জানাইয়া বাণী দেন। কলিকাতার শ্রীমতী লীলা রায় ভারত তথা এশিয়ার প্রতিনিধিরূপে এই বাণী দিবার পর যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের শুভেচ্ছা পাঠ করেন।

মাদাম বারট্রাম (ডেনমার্ক) কংগ্রেসের উদ্বোধন করিতে গিয়া প্রতিনিধিগণকে ধন্যবাদ দেন। বিভিন্ন দেশ হইতে যে অভাবনীয় সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সাধনা ও সিদ্ধি সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

ডেনমার্কের শিক্ষাসচিব ডাঃ জার্টভিগ ক্রীস্ক এবং কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর অধ্যাপক ডাঃ জান সেন প্রতিনিধিদের .অভ্যর্থনা জানাইয়া বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলিতে নারীদের শারীর শিক্ষাক্ষেত্রে এই কংগ্রেস যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া নারীজাতির শক্তি ও কল্যাণ বৃদ্ধি করিবে ইহা আশা ও আনন্দের কথা।

'কলেজ ছাত্রী শারীরিক শিক্ষা সঙ্ঘে'র সভাপতি মিস্ হ্যালেন হ্যাজেলটন সঙ্ঘের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বলেন, এই কংগ্রেস বিশ্বের নারীকল্যাণের যোগসূত্র হইল।

অতঃপর পাঁচটি মহাদেশের পক্ষ হইতে এই কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। মিস জেন হিউগ্ স (দক্ষিণ-আফ্রিকা) জানান যে, দক্ষিণ-আফ্রিকায় শারীর শিক্ষা ক্রমশঃ বাধ্যতামূলক শিক্ষারূপে গৃহীত হইতেছে। মিস্ মেরি আইকুইমের (ফ্রান্স) বাণীতে ইউরোপীয় নারীকে পুরুষের উপর নির্ভরপরায়ণ না হইয়া শারীর শিক্ষা গ্রহণে শক্তি অর্জন করিয়া পুরুষের দোসর হইতে হইবে—এই বলিষ্ঠ মতবাদ ধ্বনিত হয়। মিস্ ডেরিস প্রিউইস (কানাডা) বলেন, বিভিন্ন ভাষাভাষী হইলেও শারীর শিক্ষার মধ্য দিয়া যে শক্তি ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইবে সর্ব্ব দেশ ও জাতি তাহা একযোগে উপভোগ করিয়া পরস্পরের নিকটতর হইবে। মাদাম্ রোমেরো ব্রেট (আর্জেন্টিনা) দক্ষিণ-আমেরিকার পক্ষ হইতে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি সাধনার জয় ঘোষণা করেন। এশিয়ার পক্ষ হইতে শ্রীমতী লীলা রায় (ভারতবর্ষ) বলেন—"কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ এবং গান্ধীর স্মৃতিপূত এশিয়ার কথা আনি। 'শান্তির জন্ত শক্তি সাধনা'ই এশিয়ার বাণী। তমসাচ্ছন্ন পৃথিবী এশিয়ার তপোবন-

উদ্ভূত 'সত্যম্ শিবম সুন্দরম্' বাণীতেই জাগ্রত হয়। এশিয়ার নারী যুগযুগান্তর ধরিয়া শত দুঃখ দুর্যোগে, সহস্র বঞ্চনার মধ্যেও জীবনের এই পরম বোধ বিস্মৃত হয় নাই ; আজও নয়।"

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করিয়া যে বাণী প্রেরণ করেন শ্রীমতী লীলা রায় এই কংগ্রেসে তাহা পাঠ করেন :

"আমি শ্রীমতী লীলা রায়ের নিকট হইতে নারীদের শারীর শিক্ষার প্রথম আন্তর্জাতিক কংগ্রেস সম্পর্কে সবিশেষ

কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষিকা মার্গিট কার্কিআইড (ডেনমার্ক)

অবগত হইয়া বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছি। ভারত এই কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছে জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম।

"আমরা মেয়েদের শরীর গঠনে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেছি—যাহাতে তাহারা ভারত এবং সমগ্র বিশ্বের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে। আমি এই কংগ্রেসের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করিতেছি।"

পরিচিতি

শ্রীমতী লীলা রায়, বি-এ, বি-টি, বাংলা-সরকারের অধুনালুপ্ত 'কলেজ অব ফিজিকাল এডুকেশন ফর উইমেন' হইতে শারীর শিক্ষায় ডিপ্লোমা পান। ইহার পর কলিকাতার 'উইমেন্স কলেজ' এবং 'স্কটিশচার্চ কলেজে'র ব্যায়াম শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত থাকাকালে বাংলা-সরকারের পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া তিনি উচ্চ শারীর শিক্ষার বৈদেশিক বৃত্তি লাভ করেন এবং প্রথমে কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে ও তদনন্তর যুক্তরাষ্ট্রের ইউটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষালাভ সমাপন করিয়া ১৯৪৮ সালে ইউটা হইতে অনার্স সহ এম্-এস্ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের শারীর শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং ভারতের শক্তিসাধনা সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা দিয়াছেন। শ্রীমতী লীলা হলিউড রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি সেখানে আলডুস হাক্সলীর মত বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদের সংস্রবে আসিবারও সৌভাগ্যলাভ করেন। উক্ত আশ্রমে অনুষ্ঠিত আমেরিকার সর্বপ্রথম কালীপূজায় তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমতী লীলা রায় সম্প্রতি কোপেনহেগেনে আন্তর্জাতিক শারীর শিক্ষা কংগ্রেসে এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করিয়া ইউরোপের শারীর শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ পরিদর্শনে রত আছেন। শ্রীমতী লীলা সুপরিচিত নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের কনিষ্ঠা ভগিনী।

শ্রীমতী লীলা রায়

যামিনীকান্ত সেন

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আমরা পূর্ব্বদেশের মানুষ—আমাদের একটা অপবাদ আছে যে স্থানে অস্থানে আমরা কথা কইতে সুরু করলেই অতিশয়োক্তি করে থাকি। পাশ্চাত্য দেশের মানুষেরা আমাদের এই অপবাদ দিয়ে থাকেন যে, আমরা যেসব কথা বলে থাকি তা বেশীর ভাগ "পূর্ব্বদেশসুলভ অত্যুক্তি ও অতিবাদে" অর্থাৎ oriental exaggeration-এ দুষ্ট। জানি না এই অপবাদের মধ্যে কতটা সত্য আছে,—এই অপবাদটাই অত্যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা তারও বিচার করতে হয়। আমরা স্বভাবতই অত্যুক্তির ভক্ত কিনা তার বিচার না করেও বলা যায় যে, অন্ততঃ বন্ধুর শোক-সভায় কিছু অত্যুক্তি করবার অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু আমি যামিনীকান্ত সেনের শোক-সভায় কোনও অত্যুক্তি করতে চাই না। তাঁর কর্ম্মজীবনের একটা সহজ, সরল, আড়ম্বরহীন কিছিছি দিলেই যথেষ্ট হবে।

যামিনীবাবু আমার সহপাঠী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজে (১৮৯৭ থেকে ১৯০০ সন পর্য্যন্ত) একাদিক্রমে ৪ বৎসর এক ক্লাশে আমি পড়েছিলাম এবং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের আমার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছিল। মানুষটি কেমন তা জানবার প্রচুর সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। কলেজ ছাড়বার পর সপ্তাহে অন্ততঃ দু'দিন আমাদের দেখা হ'ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে তিনি ১৯০১ সালে হাইকোর্টে আপীল বিভাগে নাম লিখিয়ে ব্যবহারাজীবের বৃত্তি আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু আইনের ব্যবসায় তাঁর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় নাই। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী মানুষ, ব্যবহারিক জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জীবনসংগ্রামে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব তিনি মেনে নিতে পারেন নাই। জীবনের প্রারম্ভে তিনি পলিটিক্সে একবার জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯১২ সালে চট্টগ্রামের পলিটিক্যাল কনফারেন্সে তাঁকে সম্পাদকের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই তাঁর প্রথম কাজ, এবং এই তাঁর শেষ কাজ।

কিছুদিন পরেই তিনি অন্য পথ বেছে নিয়েছিলেন—সেটি হ'ল সাহিত্য-সাধনার পথ। রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসার পরেই সাহিত্যের সাধনা তাঁকে প্রথম আকর্ষণ করেছিল। এখন সাহিত্যের জগৎ হ'ল একটা অতি বিস্তৃত জগৎ,—এই সাহিত্যের মহাপ্রদেশে তিনি আপনার স্থান বেছে নিলেন—ভারতের কৃষ্টির ও ভারতের রূপশিল্পের সমালোচনার পথ। তিনি খুব চিন্তাশীল লোক ছিলেন, যে-কোনও বিষয়ের তত্ত্বাংশ নিয়ে তিনি আলোচনা করতে ভালবাসতেন। সুতরাং তাঁর লেখার মধ্যে এই চিন্তাশীলতা ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রচুর পরিচয় আমরা পাই। লঘু সাহিত্য, গল্প বা উপন্যাস লেখা তাঁর দ্বারা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু রূপবিদ্যার নানা দিক তিনি নিপুণভাবে আলোচনা করে গিয়েছেন। তিনি যখন সাহিত্যের আসরে নামলেন, তখন আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পে নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেছেন এবং দেশে ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের আলোচনা ও সমালোচনার তুমুল কোলাহল সুরু হয়েছে। তিনি এই আলোচনায় আত্মনিয়োজিত হয়েছিলেন—নানা প্রবন্ধে ও নিবন্ধে তিনি ভারত-শিল্পের দার্শনিক অংশের ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। তার জন্য তিনি গভীর গবেষণাও পড়াশুনা আরম্ভ করলেন। প্রায়ই দেখতে পেতাম, তিনি ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে অনেক বই নিয়ে গভীর গবেষণায় নিমগ্ন রয়েছেন। তাঁর ভারত-শিল্পের আলোচনার ফলস্বরূপ আমরা পেলাম তাঁর বিরাট গ্রন্থ "আর্ট ও আহিতাগ্নি"। কলাবিদ্যা সম্বন্ধে এত বড় বই বাংলাভাষায় আর লিখিত হয় নাই। এই গ্রন্থে রূপতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা জটিল ও দুরূহ বিষয় তিনি আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক তাঁকে সুলভ জনপ্রিয়তা দিতে পারে নাই—কারণ এই সব বিষয়ের পাঠক ও সমঝদার অত্যন্ত কম। দু'চার জন মাত্র এই সব দুরূহ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। সুতরাং এই সব আলোচনার দ্বারা সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করা যায় না।

যা হোক, এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক প্রকাশের পর সাহিত্য-জগতে তাঁর কৃতিত্ব ও সুনাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই পুস্তকের প্রকাশের পর বিভিন্ন মাসিক ও সাময়িক পত্রের সম্পাদক মহাশয়দের কাছ থেকে তাঁহার উপর দাবি সুরু হ'ল। এই দাবি তিনি হাস্যমুখে স্বীকার করে নিয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখতে সুরু করলেন, ভারত-শিল্পের নানা তত্ত্ব সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিয়ে বিষয়টিকে জনপ্রিয় করবার চেষ্টায় রত হলেন—কতদূর তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ভবিষ্যতের পাঠকেরা তার বিচার করবেন। তিনি অক্লান্ত ভাবে ক্রমাগত প্রবন্ধ লিখেছেন। বোধ হয়, বাংলাদেশে বাংলা কি ইংরেজী এমন কাগজ নাই যাতে তিনি প্রবন্ধ লেখেন নি। তাঁর লিখিত প্রবন্ধের সংখ্যা পাঁচ শতের বেশী বলে মনে হয়।

অনেকে মনে করেন যে, সাময়িক পত্রে ছোট ছোট প্রবন্ধ
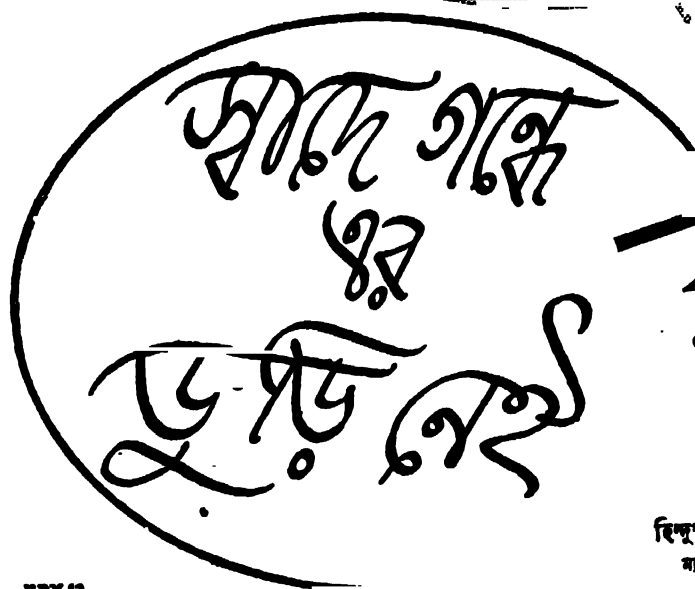
স্বাদে গন্ধে
এর
জুড়ি নেই
বনস্পতি
২, ৫, ১০ ও ৩৭ পাউণ্ড
টিনে পাওয়া যায়
হিন্দুস্থান ডিভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিমিটেড, কলিকাতা
ম্যানেজিং এজেণ্ট : এন্. আর. সরকার অ্যাণ্ড কোং লিঃ
HDX 13

লিখে সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থায়ী ইমারত নির্ম্মাণ করা যায় না। কিন্তু আমার মনে হয়, ভারতের বিবিধ কৃষ্টি সম্বন্ধে লিখিত এই অক্লান্ত সাধকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ যদি একত্র সংগৃহীত হয় তা হলে বহুমূল্য এবং নানা তথ্যপূর্ণ এমন একটি বিরাট গ্রন্থ রচিত হবে যার দ্বারা বাংলা সাহিত্য বিশেষরূপে পুষ্ট এবং সমৃদ্ধিশালী হবে।

কিন্তু কেবল ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখেই তিনি নিজের কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। বৌদ্ধ মহাযান-ধর্ম্মের দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি গভীর গবেষণা করে অনেক নূতন তথ্য উদ্ধার করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নেপালে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কিছুদিন থেকে অনেক প্রাচীন অপরিচিত এবং অপ্রকাশিত দেব-প্রতিমার ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করেছিলেন। এই সব নূতন উপকরণ অবলম্বন করে তিনি ভারতের প্রতিমাতত্ত্বের একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনার সঙ্কল্প করেছিলেন। কিছু কিছু লিখেও ছিলেন, কিন্তু গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নাই। তাঁর মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে এই গ্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তিনি পরামর্শ করেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত এই সব নূতন উপকরণ প্রকাশ করতে পারলে ভারতের প্রতিমা-তত্ত্বের উপর নূতন আলোকসম্পাত হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ একবার এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে, যে মানুষকে আমরা হারাই তাঁকেই আমরা বেশী করে পাই। যামিনীকান্তকে হারিয়ে আজ আমরা তাঁকে বেশী করে পাব—একথাই মনে হচ্ছে। তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মূল্য সম্বন্ধে আমাদের চেতনা আজ জেগে উঠেছে। এই সুযোগে তাঁর সাহিত্য-রচনার একটি স্থায়ী সঙ্কলন প্রকাশ করা আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য বলে মনে করি।

যামিনীকান্তের মৃত্যুতে বাংলার কৃষ্টির জগতে যে স্থানটি শূন্য হ'ল সেই শূন্য স্থানটি পূর্ণ করবার যোগ্য ব্যক্তি আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ভগবান তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন এই প্রার্থনাই করি।

আলোচনা

বাংলা লিপির সংস্কার

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

বিগত বৎসরের কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত বাংলা লিপি-বিষয়ক আমার প্রবন্ধটি বাংলার সুধীদের একজনেরও যে নজরে পড়েছে এতে আমি খুশী। আরও খুশী হতাম যদি গত শ্রাবণের প্রবাসীতে সে-সম্পর্কে আলোচনা করবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায় আমার প্রস্তাবটির সঙ্গে আরও একটু ভাল করে পরিচিত হয়ে নেবার চেষ্টা করতেন।

পাঁচ বৎসরেরও অধিককাল লিপি-সংস্কার বিষয়ে আমি ভাবছি ও লিখছি। সেই-সব লেখার বেশীর ভাগ ছাপা হয়েছে বিশ্বভারতী পত্রিকাতে, অন্যত্রও কিছু কিছু ছাপা হয়েছে। সেই লেখাগুলির সারাংশ একটি প্রবন্ধের আকারে প্রবাসীতে পাঠাবার সময় এটা আমি ভেবেই ছিলাম যে, স্বল্প-পরিসরের মধ্যে আমার সমস্ত বক্তব্যকে খুব সুপরিস্ফুট আমি করতে পারব না; সেই কারণেই পূর্ব্বপ্রকাশিত অন্য লেখা-গুলির কয়েকটির নাম ঠিকানা সেই প্রবন্ধের পাদটীকায় আমি দিয়েছিলাম। একটু শ্রম-স্বীকার ক'রে সেই লেখাগুলি মণীন্দ্র বাবু যদি পড়তেন ত আমার প্রস্তাবিত লিপি-সংস্কারের সূত্র-গুলি তাঁর এতটা দুর্ব্বোধ্য মনে হ'ত না এবং তিনি এও দেখতে পেতেন যে, যে-সমস্ত বিরুদ্ধ যুক্তির কথা তাঁর মনে এসেছে তার প্রত্যেকটিকেই ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার বিচার-বিতর্কসহ-যোগে আমি খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু পাদটীকার উল্লিখিত লেখাগুলি পড়া দূরে থাক, প্রবাসীর যে প্রবন্ধটি নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, সেটিও আদ্যোপান্ত পড়বার তাঁর সময় হয়েছে বলে মনে হ'ল না। বিষয়টি গুরুতর, দায়সারা আলোচনা এ রকম বিষয় নিয়ে করা উচিত নয়।

"...সংস্কৃত ভাষায়...ব্যঞ্জনাক্ষর নিয়ত অকারান্ত", আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়ের লেখা থেকে এই কথা উদ্ধৃত করে মণীন্দ্র বাবু প্রশ্ন করেছেন,"এ তথ্যটি কি সুধীরবাবু চিন্তা ক'রে দেখেন নাই?" চিন্তা যে করেছি তার প্রমাণ আমার আলোচ্য প্রবন্ধটির ভিতরেই রয়েছে। তা ছাড়া, অন্যত্র আরও বিশদভাবে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা যে আমি করেছি সে কথারও স্পষ্ট উল্লেখ আমার প্রবন্ধটিতে আছে।

অবশ্য "...সংস্কৃত গোষ্ঠীর ভাষায়...ব্যঞ্জনাক্ষর নিয়ত

অকারান্ত" এই 'তথ্য'টি নিয়ে আমি চিন্তা করিনি, কেননা, বাংলা এবং অন্য অধিকাংশ সংস্কৃত গোষ্ঠীর ভাষা সম্পর্কে তথ্যটি নিতান্তই অমূলক।

প্রসঙ্গক্রমে মণীন্দ্রবাবু বলছেন, "পাতীর সংখ্যা বেশী হবে কিনা অ-ধ্বনিজ্ঞাপক নূতন চিহ্নটি তাই বিচার্য্য।" বিচার্য্য বিষয়টিকে মণীন্দ্রবাবু যতটা সহজ মনে করেছেন, মোটেই সেটা যে তা নয়, আমার প্রবন্ধটির মধ্যেই স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে সে-কথার, তাঁর চোখে পড়েনি। সহজ যে নয় তার প্রমাণ ভাল করে যদি পেতে চান ত মণীন্দ্রবাবু ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকাতে "বাংলা বানানে অ এবং অকার" নামীয় আমার প্রবন্ধটির "অকারান্ত-হসন্ত-হসন্তবৎ-ওকারান্ত" শীর্ষক অধ্যায়টি পড়ে দেখতে পারেন। সপ্তমবর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকাতে "অকার বনাম হস্‌চিহ্ন" প্রবন্ধটিও তাঁকে পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

আমার প্রস্তাবিত অকার পূর্ণাবয়ব অক্ষরগুলির সমান মাত্রার ইংরেজী বড় হাতের V নয়। অক্ষর সমাবেশের মধ্যে এই নূতন ধ্বনিচিহ্নটির স্থান কোথায় এবং কতটুকু হবে, আলোচ্য প্রবন্ধটিতে সে-কথাও আমি স্পষ্ট করেই বলেছি। সে যেমনই হোক, সূক্ষ্ম-কোণ-সম্বলিত ত্রিভুজ বাংলার বহু অক্ষরের মূলীভূত উপাদান; তা ছাড়া, ধকারের যে চিহ্নটি এখন মূল অক্ষরের পায়ের নীচে কাত হয়ে বসে, সেইটেকেই উপরের সারে চিত করে বসালে আমার প্রস্তাবিত অকার হয়ে যাবে। নীচের দিকে কাত হয়ে বসলে পীড়াদায়ক হয় না, উপরের সারে চিত হয়ে বসলে চক্ষুর পীড়া উপস্থিত হয়, এ কেমনতর চক্ষুপীড়া?

আমার উদ্ভাবিত প্রণালীর একটিও আদর্শ আমার প্রবন্ধটির সঙ্গে আমি দিই নি বলে মণীন্দ্রবাবু অভিযোগ করেছেন। এ অভিযোগ তাঁকে করতে হ'ত না, যদি প্রবন্ধের পাদটীকায় উল্লিখিত "নূতন বাংলার বর্ণমালা' বিষয়ক আমার লেখাটিতে একবার তিনি চোখ বুলিয়ে নিতেন।

আমার প্রস্তাবিত "যুক্তস্বরাক্ষর"গুলি মণীন্দ্রবাবুর বিবেচনায় "অত্যন্ত জটিল", "একেবারে অচল" এবং তদুপরি "অনাবশ্যক।"

অ-এ আকার দিয়ে আ (বাংলায় ও দেবনাগরীতে) এবং অ-এ ওকার ঔকার দিয়ে ও ঔ (দেবনাগরীতে) আবহমান-কাল লেখা হচ্ছে। সেগুলি যদি জটিল না হয় ত, অ-এ ইকার উকার ইত্যাদি যোগ করে ই উ ইত্যাদি লিখিলে কি জটিলতার সৃষ্টি যে হতে পারে তা আমার বুদ্ধির অগম্য। তা ছাড়া, "যুক্ত স্বরাক্ষরে"র ব্যবহার বস্তুতই খুব বেশী হবে না, কারণ ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হলেই স্বরধ্বনির বাহন 'অ' লোপ পাবে, সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনিচিহ্নটি কেবল অবশিষ্ট থাকবে। আমার আলোচ্য

প্রবন্ধটিতে একথাও আমি বলেছি যে, সেবাগ্রামে basic হিন্দীর পাঠ্যপুস্তক কিছুকাল যাবৎ এই রীতি অনুসরণ করে ছাপা হচ্ছে। ভারতবর্ষের সর্বত্র বিনা বাধায় যা চলছে মণীন্দ্রবাবু তাকে "একেবারে অচল" আখ্যা দিলেই তার অচলতা সাব্যস্ত হয়ে যাবে না। একথাও হয়ত বলা প্রয়োজন যে, মণীন্দ্রবাবু যে বস্তুকে "অনাবশ্যক" মনে করছেন, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীযুক্ত বিনায়ক সাতাবকর, আচার্য্য বিনোবা ভাবে প্রমুখ মনীষীরা তাকে অত্যাবশ্যক বলেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

"যৌলিক স্বরাক্ষর"গুলি কি দোষ করল সে কথার আলোচনা, এবং এ ঐ ও ঔকে ছোট করে লিখে একার ঐকার ওকার ঔকারের কাজে কি যুক্তিতে লাগানো যেতে পারে তারও উল্লেখ আমার প্রবন্ধে আছে, মণীন্দ্রবাবু লক্ষ্য করেন নি। বেশী বলতে গেলে অনেক কথার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকাতে এবং অন্যত্র এবিষয়ে আমার বক্তব্য পরিষ্কার করেই আমি বলেছি।

মণীন্দ্রবাবু জানতে চাইছেন, "যুক্তবর্ণ বর্জন করতে বসে লিপির উপর যুক্তস্বরাক্ষর চাপান কিরূপ ব্যবস্থা?" ব্যবস্থাটা এইরূপ: যুক্তাক্ষরগুলির হঠাৎ কোনোও কারণে ব্রাত্যতা দোষ ঘটেছে বলে সেগুলিকে যে আমরা বর্জন করতে চাইছি তা ত নয়? যুক্তাক্ষর ছাড়তে চাইছি অক্ষর-সংখ্যা কমাবার জন্যে। আমার কল্পিত স্বরধ্বনিচিহ্নগুলিও অক্ষর সংখ্যা বাড়াবে না, কমাবে, এই সহজ কথাটা মণীন্দ্রবাবু ভেবে দেখেন নি।

কিন্তু এ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমার কল্পিত স্বরবর্ণগুলিকে "যুক্তস্বরাক্ষর" মনে করা এবং বলা একেবারেই ভুল। আ কি একটা যুক্তস্বরাক্ষর? কিম্বা যোগেশবাবুর এা অথবা ওা এবং আমার অী, অু, অূ, অৃ প্রভৃতি কি সমজাতীয়? মণীন্দ্রবাবু আমার স্বরবর্ণমালার অ-কে একটা স্বতন্ত্র অক্ষর ভাবছেন, আসলে সেটা তা নয়, যেমন ক, খ, ধ, ঘ, এদের মধ্যেকার ব একটা স্বতন্ত্র অক্ষর নয়। বস্তুত: যোগেশবাবুর এা এবং ওা যুগ্মস্বরধ্বনি হওয়া সত্ত্বেও যুক্তস্বরাক্ষর নয়। একাধিক অক্ষর পরস্পর মিলিত হয়ে নূতন চেহারার অক্ষরের উদ্ভব না হলে যুক্তাক্ষর হয় না।

ত্র-র পক্ষ হয়ে আমার "ওকালতির" অর্থ মণীন্দ্রবাবু বুঝতে পারবেন, যদি একটু অবহিত হয়ে বাঙালীর ত্র উচ্চারণ তিনি শোনেন, তবে ত্র-এর মধ্যেকার র উচ্চারণ বাঙালীর রসনায় আমি যে বিশেষ শুনিনি, সেটা আমার শ্রবণশক্তির দোষের জন্যেও হয়ে থাকতে পারে।

আমার ম-ফলার "ভাঙা ম" এবং য-ফলাও মণীন্দ্রবাবুর মতে "অচল"। সচলতা অচলতা বিষয়ে মণীন্দ্রবাবু কোনোও রকা-নিষ্পত্তিতে বিশ্বাস করেন না, যদিও বর্তমানে যে মফলা ও যফলা বাংলায় চলছে সেই দুটিকেই রক্ষা করবার প্রস্তাব আমি করেছি। আমার প্রবন্ধটি দয়া করে আর একবার পড়ে মণীন্দ্র-বাবু জানাবেন কি, ম ফলা ও য ফলা না রাখলে, সর্বত্র সমভাবে ম এবং য দিয়ে বানান করলে, স্মাটস্ এবং বিস্ময়, সহ্য এবং হ্যাঁ-য় হ্ম এবং হ্য-এর উচ্চারণ বৈষম্য কি উপায়ে আমরা নির্দেশ করব?

আলোচনার গোড়ার দিকে মণীন্দ্রবাবু সাধারণ ভাবে যে কথাগুলি বলেছেন সেগুলির সঙ্গে আমার প্রস্তাবিত লিপি-সংস্কারের কোনও বিরোধ নেই। আমিও অনাবশ্যক পরি-বর্তনের পক্ষপাতী নই, লিখন এবং মুদ্রণ উভয় দিকেরই সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন বলে আমিও মনে করি, এবং লিপি-সংস্কারের "প্রধানতম" ছেড়ে অন্যতম উদ্দেশ্যও যে উচ্চারণ-সংস্কার নয় তাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। তা ছাড়া, "প্রচলিত পদ্ধতিতে ছাপা পুস্তক পাঠ করতে" নব পদ্ধতিতে শিক্ষিত লোকদের কেন যে বিশেষ কিছু অসুবিধা হবে না, এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষিত জনগণ আমার প্রস্তাবিত অক্ষর চিহ্নটি একবার দেখে নিলেই যে প্রস্তাবিত নূতন লিপি অনর্গল পড়তে পারবেন তারও উল্লেখ "প্রবাসী"তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধটির মধ্যেই রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, দু'রকম লিপিই পাশাপাশি চলতে পারে; এবং বেশ কিছুকাল তাই তাদের চলতেও হবে; চিরকাল চলতেও বাধা নেই। লিপিসংস্কার বিষয়ে আমার প্রথম প্রবন্ধটিতে সেই প্রস্তাবই আমি করেছিলাম।

সাম্প্রদায়িকতার গ্লানি—শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ডেমোক্রাটিক ভ্যানগার্ড, ১৮, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩০ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

স্বদেশীযুগে যে কিশোর ঘরের বাহির হইয়াছিল মাতৃভূমির স্বাধীনতা-উদ্ধারের আহ্বানে, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি নানা পথঘাট ঘুরিয়া প্রৌঢ় বয়সেও সে স্বস্তিলাভ করিতে পারে নাই। ইংরেজ শাসনের অপসারণে দেশের যে মুক্তি আসিয়াছে, লেখকের নিকট তাহা গ্রাহ্য নয়; স্বাধীনতার নূতন আদর্শ তাঁর চক্ষের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে; যুগ-যুগান্তের বঞ্চিতের সেবায় শেষ বয়সের দিন কয়টি নিয়োগ করিবার আকূতি তাঁর লেখায় দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পুস্তকখানির আলোচ্য বিষয়—হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ। আমাদের বক্তব্য এই যে, লেখক এখনও তাঁর স্বীয় সমাজের গণ-মনের স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই; মুসলমান সমাজের গণ-মানসের ভাব এবং প্রেরণা সম্বন্ধেও তাঁর কোন ধারণাই নাই। অর্থনীতিক ব্যাখ্যায় এই মনের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যুগে যুগে মানুষ ভাব ও বিশ্বাসের বেদীমূলে তার অর্থনীতিক স্বার্থ বলি দিয়াছে। এ কথাটা মনে রাখিলে লেখক সমস্যা-সমাধানের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তাঁর মনে নানা প্রশ্নের উদয় হইত।

ছয়-সাত শত বৎসর ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান একত্র বাস করিতেছে। তবুও এক-মন এক-প্রাণ হইতে পারে নাই। কেন? সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধিই তার একমাত্র কারণ নয়। অর্থনীতিক ক্ষেত্রে সমস্বার্থবোধ যদি ভাব ও কর্ম্মের নিয়ামক হইত তবে "পাকিস্থানে"র আকাঙ্ক্ষা মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে জাগিত না, এবং প্রতিবেশীর বুকে ছুরি বসাইয়া তাহা আদায় করা হইত না। নোয়াখালি ও বিহারে "পঞ্চায়েতি" ভাব ছিল না, একথা বলা চলে না; তবুও সে ব্যবস্থা ভাবের দাপটে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই ভাবের প্রকৃতি কি তা বুঝিতে না পারিলে "সাম্প্রদায়িকতার গ্লানি" আমাদের জীবনকে সর্ব্বদা বিপন্ন করিবে।

অতি অল্পসংখ্যক লেখকই এই ভাবের প্রকৃত পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। সেইজন্য তাদের সদিচ্ছা এবং আগ্রহও ব্যর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমান পুস্তকখানিও সেই পর্য্যায়ভুক্ত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

গীতা বোধ (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার তাৎপর্য্য)—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। অনুবাদক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকুমারচন্দ্র জানা। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী। ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯৪৭। দাম বার আনা মাত্র; বিশেষ সংস্করণ, এক টাকা। পৃঃ ।৶০ + ১১০।

১৯৩০ সালে জেলে থাকার সময়ে গান্ধীজী গীতার প্রতি অধ্যায়ের

সারকথা অতি সহজ ভাষায়, অল্পশিক্ষিত মানুষও যাহাতে বুঝিতে পারে, সেইজন্য লিখিয়াছিলেন। মূল লেখা গুজরাটী ভাষায় ঐ সময়ে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি তাহার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদের ভাষাও সহজ, সরল। অল্পশিক্ষিত পাঠক-পাঠিকার পক্ষেও ইহা দ্বারা গীতার গান্ধী-ব্যাখ্যাত তাৎপর্য্য বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা লিমিটেড। পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভিনু্য, কলিকাতা ১৩। মূল্য ।০। পৃষ্ঠা ৩২।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লেখক সাম্যবাদী বহু নেতার লেখা হইতে মত সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নহে। বর্ত্তমান রুশদেশেও গত ত্রিশ বৎসরের চেষ্টা সত্বেও তাহা সম্ভব হয় নাই। "যৌথ কৃষিতে কৃষকদের তৃপ্তি নেই, তাদের মন জমি বা পশুর ব্যক্তিগত মালিকানার দিকে সদা জাগ্রত।" "সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্র কৃষকশ্রেণী বা শ্রমিক-শ্রেণীর করায়ত্ত নয়—রাষ্ট্র সেখানে আমলাতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, শ্রমিক কৃষকের সম্বন্ধে ভাওন ধরে থাকলেও তাই তা উগ্র হয়ে বাইরে প্রকাশিত হ'তে পারে না।" বিগত মহাযুদ্ধের অংশীরূপে এবং বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় কার্য্যকলাপের পর সোভিয়েট রাষ্ট্রকে আজ অন্যান্য ধনতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হইতে পৃথক করিয়া লওয়া শক্ত যদিও রুশদেশের ভিতরকার আর্থিক ও সামাজিক কাঠামো বাহিরের লোককে সাম্যবাদী আদর্শে গঠিত বলিয়াই জানানো হয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠকের অনেক চিন্তার খোরাক যোগাইবে।

আওরঙ্গজেব—মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এম-এ কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১১০, মূল্যের উল্লেখ নাই।

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি শামসুল উলামা শিবলী নোমানী প্রণীত "আলমগীর আওরঙ্গজেব পর একনজর" নামক উর্দ্দু গ্রন্থের অনুবাদ। আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে সাধারণতঃ ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে যে মতামত পাঠ করা যায় এই গ্রন্থের মতামত তাহা হইতে ভিন্ন। অবশ্য গ্রন্থকার অপরের মত খণ্ডন করিয়াই তাঁহার নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থখানির নাম 'আওরঙ্গজেবকে সমর্থন' (Defence of Auranzeb) দেওয়া চলে, কিন্তু গ্রন্থকারের তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে ; কারণ তিনি বলিতে চান যে, কেবল সত্যের ও ন্যায়ের খাতিরেই তিনি উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, নিছক আওরঙ্গজেবের পক্ষে ওকালতি করার জন্য লেখেন নাই। কিন্তু এই পুস্তক দ্বারা পাঠকদের মধ্যে আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে। মারাঠাযুদ্ধ, দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্য ধ্বংস, ভ্রাতৃগণের সহিত যুদ্ধ, দারার প্রাণদণ্ড, সাজাহানের বন্দীদশা, হিন্দুদিগের উপর জিজিয়া কর স্থাপন ইত্যাদি যে সকল অন্যায় কার্য্য আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল লেখক তৎসমুদয় হইতে সম্রাটকে অব্যাহতি দিয়াছেন। জিজিয়া কর সম্বন্ধে লেখক বলেন—"জিজিয়া প্রকৃতপক্ষে আদৌ অপকারী কর নহে বরং অমুসলমানের পক্ষে ইহা একটি ঈশ্বরানুগ্রহ বলিলেও হয়" (৫৫ পৃষ্ঠা)। তাঁহার বক্তব্য এই যে, সম্রাট একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন, এইজন্য তাঁহাকে অনেক নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে হইয়াছে। একমাত্র ঐসলামিক নীতির মানদণ্ড দিয়াই তাঁহার কার্য্যের বিচার করিতে হইবে এবং নিরপেক্ষ

ভারতবর্ষের আত্মাকে দীর্ঘকাল ধরে সন্ধান করেছেন জওহরলাল। এই বই সেই তীর্থযাত্রার আদ্যন্ত ইতিহাস। ধূসর অতীত থেকে রক্তিম বর্তমান পর্যন্ত সেই অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস পূর্ণপটে প্রসারিত। ভারতবর্ষের আত্মার সঙ্গে সমগ্র এশিয়ার কী নিবিড় যোগ, দূর ইওরোপের উপরেই বা কী তার প্রভাব, তারই প্রদীপ্ত বিশ্লেষণ। আর, একি শুধু সন্ধান? না, এ আবিষ্কার—এ পরা প্রাপ্তি। আগামী পৃথিবীর জন্মদাত্রী এই ভারতবর্ষ। তাই এই বই শুধু জিজ্ঞাসা নয়, এ উত্তর—শুধু যাত্রা নয়, উত্তরণ। শুধু ইতিহাসের ব্যাখ্যাতা নন জওহরলাল, তিনি ইতিহাসের নির্মাতা। তাই ভারতবর্ষের আত্মার সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তাঁর নিজের আত্মার সন্ধান—একটি বিচিত্র ব্যক্তিত্বের উদ্ঘাটন। আত্মসন্ধানের এমন গভীর নিদর্শন তাঁর অন্য কোন বইএ প্রকাশিত হয়নি। অতীত বা বর্তমানের ভারতবর্ষের চেয়েও ভবিষ্যমান ভারতবর্ষ যে মহত্তর, বিপুলতর, তারই মর্মকথা এই বইএর প্রতি পৃষ্ঠায় স্পষ্ট হয়ে আছে

এই প্রথম
বাংলা ভাষায়

প্রথম খণ্ড

সম্পাদনা : প্রেমেন্দ্র মিত্র
দাম ৩৷৹ টাকা
অন্নদাশঙ্কর বলেছেন : শ'র অনুবাদ পড়ে এ-দেশ সংস্কারমুক্ত হবে। মধ্যযুগের যূপে বন্দী থাকবে না।
সিগনেট প্রেস : কলিকাতা ২০

আয়ারল্যাণ্ড অনেকদিন ধরে ইংলণ্ডের পদানত ছিল। সেই অবমাননার শোধ সে নিয়েছে বুঝি বার্নার্ড শ'র ভিতর দিয়ে সাহিত্যের চাবুকে ইংলণ্ডকে শায়েস্তা করে। শ' অবিশ্যি শুধু ইংরেজ সমাজকেই তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপের বেতের ডগায় তটস্থ করে রাখেননি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত মানবসমাজ ও সভ্যতার উপরই তাঁর বক্রোক্তির বেত্রদণ্ড মুহুর্মুহুঃ আস্ফালিত হয়েছে।

মানবজীবনের যে-সমস্ত সমস্যায় সমস্ত বিশ্বসভ্যতা আজ আলোড়িত, তারই প্রাঞ্জল সমাধানের পথ দেখিয়েছেন বার্নার্ড শ' তাঁর নাটকে। তাঁর নাটক সমগ্র মানবজীবনের বিপুল বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে নিংড়ে নেওয়া সত্যের নির্যাস, সর্বরসের সমন্বয়ে অমৃতের মতো উপাদেয়। শ'র মতো ভাষার যাদুকরের মুখে সত্যের বাণী হাসির সুর হয়ে উছলে পড়ে। তাঁর কঠিনতম সমস্যামূলক নাটক তাই কৌতুককাহিনীর চেয়ে রসাল, তাঁর গভীরতম বক্তব্য চটুল পরিহাসের চেয়ে চমৎকার।

প্রথম খণ্ডের নাটকগুলিকে শ' নিজে নামকরণ করেছেন: 'বিরস নাটক'। এই 'বিরস নাটক' দিয়েই বর্তমান যুগের সবচেয়ে সরস নাট্যকারের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় শুরু হোক। ভাবীযুগের মানুষ হয়ে বার্নার্ড শ' যদি ভুল করে আমাদের মাঝে এগিয়ে এসে থাকেন, তাঁর লেখা না-পড়লে তেমনি ভুল করে এ-যুগ থেকে পিছিয়ে থাকা হবে।

ঐতিহাসিকের বিচারে আলমগীর শাস্তি না পাইয়া পুরস্কারই পাইবেন। তাঁহার পূত চরিত্রের বিপক্ষে শত্রুরও কিছু বলিবার নাই। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও লেখক আওরঙ্গজেবের কার্য্যসমূহ নির্ভুল ও সময়োপযোগী মনে করেন এবং তাঁহাকে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসকর্ত্তা না বলিয়া শ্রেষ্ঠ নির্ম্মাতা বলিতে চাহেন। অবশ্য প্রত্যেক যুক্তির সম্পর্কেই লেখক ইতিহাসের নজীর উপস্থাপিত করিতে ও ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের যুক্তি খণ্ডনে ত্রুটি করেন নাই। তবুও অনেক সময় লেখকের যুক্তিকে আওরঙ্গজেবের ওকালতি বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। যাহা হউক, আওরঙ্গজেব-চরিত্রের ভাল দিক পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিলেও লেখক তাঁহার যাবতীয় কার্য্যকে সমর্থন করিতে গিয়া ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

অস্তরাগ—শ্রীরাইহরণ চক্রবর্ত্তী। মোগলটুলী, চুঁচুড়া। মূল্য ১৲।

বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় কবিতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। ভাষা ও ছন্দের পারিপাট্য নাই, কিন্তু সরলতা ও আন্তরিকতার জন্য পড়িতে মন্দ লাগে না।

পূজারিণী চন্দ্রাবতী—শ্রীনীলাপদ ভট্টাচার্য্য। প্রবর্ত্তক পাব্লিশার্স, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

'ময়মনসিংহ গীতিকায়' চন্দ্রাবতীর পালা যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা এই মহিলা-কবির করুণ জীবন-কথা ভুলিতে পারিবেন না। সরল ভাষায় ও ছন্দে লেখক কাহিনীটি নূতন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

দস্তা-পরিচিতি—শ্রীসচ্চিদানন্দ পাঠক। ইউনিভার্সাল পাব্লিশার্স। ২২১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ১৲।

'নিবেদনে' লেখক প্রথমেই বলিয়াছেন: "সাহিত্য-সমালোচনা বেশ শক্ত ব্যাপার।" তিনি সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করিয়াছেন বলা চলে না, তবে সমালোচকের গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন বলিয়া যথাসাধ্য প্রযত্ন করিয়াছেন। চরিত্র-বিশ্লেষণে তাঁহার নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

ধূপ—শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক। মূল্য ৸৵০।

দৈনন্দিন জীবনে রোমাণ্টিক স্বপ্ন—উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে সুষ্ঠু সঙ্গতি। প্রকাশভঙ্গীতে আছে ঈষৎ আধুনিকতার আমেজ। কিন্তু আধুনিকতা বলিলেই যে দুর্বোধ্যতা বা অর্থহীনতার কথা মনে আসে, তাহার লেশমাত্র নাই। অনুভূতি সত্য, রচনাও সাবলীল, মনোরম। প্রথম কবিতা 'ধূপ'। কবি বসিয়া আছেন—"ধূপ" জ্বলিতেছে।

* * * বাহিরের কাঁচের উপর
শিশিরেরা জমিছে আসিয়া।"

ধূপ নিবিয়া গেল। "শূন্যস্থানে তার, পড়ে আছে শুধু
এক ফালি ছাই।
আমরাও তাই।"

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ব্লু এঞ্জেল—অনুবাদক শ্রীশৈলবিহারী ঘোষ। বুক ষ্টাণ্ড, ১।১।১-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৩।০ টাকা।

হাইনরিখ্ ম্যানের নামকরা উপন্যাস ব্লু এঞ্জেল পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ছায়াচিত্রে সাফল্য কাহিনীটির জনপ্রিয়তার অন্যতম

হেতু। একটি সুন্দরী নটী ও বিগতযৌবন এক অধ্যাপকের ভালবাসার আকর্ষণ-বিকর্ষণে কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে। আপাত বৈষম্যমূলক আচরণের মধ্যে মানব-মনের চিরন্তনী বৃত্তিগুলির ক্রমবিকাশ কাহিনীকে সুষ্ঠু পরিণতির দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে করুণ একটি সুর মনকে বেদনারসে অভিষিক্ত করিয়া দেয়। এই ধরণের সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রধান কাহিনীর অনুবাদ দুরূহ।

আলোচ্য অনুবাদটি তেমন সাবলীল না হওয়ায় ইহাতে মূল পুস্তকের রস তেমন জমে নাই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ইরাবতী—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। দিগন্ত পাবলিশার্স লিমিটেড। পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা। দাম চার টাকা।

রাজনৈতিক বিষয়বস্তু লইয়া লিখিত একখানি উপন্যাস। নায়ক সীমাচলম মাদ্রাজের এক শিক্ষিত যুবক—শুভলক্ষ্মী নামে একটি মেয়েকে সে ভালবাসে, কিন্তু শুভলক্ষ্মীর বাবা এই ভালবাসাকে অগ্রাহ্য করিয়া অপরের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া দেন। ফলে সীমাচলমের জীবনের ধারা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইতে সুরু করে। সীমাচলম খুড়ার মোটা টাকা আত্মসাৎ করিয়া ব্রহ্মদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপরে নানা চিত্তাকর্ষক ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে তার পরিচয় ঘটে মা-পানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ক্তিমার, হামিদার, রাংগাম্মার সহিত। নিজেকে সে গভীর ভাবে জড়াইয়া ফেলে আকো, আঠুন ও থাকিন্ মিয়ার দেশকে স্বাধীন করিবার প্রচেষ্টার সহিত।

ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকায় উপন্যাসটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হইয়াছে। সহজ স্বচ্ছন্দ ভাষা এই বইয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন চরিত্রের নরনারী আপন আপন বিশেষত্বে উজ্জ্বল। তাহাদের কাহিনী মনে আনন্দ, বেদনা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। ভারতীয়দের প্রতি ব্রহ্মবাসীদের মন কেন যে এতটা বিরূপ প্রসঙ্গক্রমে সে সম্বন্ধেও লেখক আলোকপাত করিয়াছেন।

হামিদাকে বড় ভাল লাগিল। আর ভাল লাগিল বালকবেশা একটি কিশোরী বালিকাকে যাহার সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য, কিন্তু এই স্বল্পস্থায়ী পরিচয় মনে গভীর রেখাপাত করে। সীমাচলমের নারীপ্রীতির বর্ণনায় লেখকের আর একটু সংযত হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

যারা ভালবেসেছে—শ্রীইন্দিরা দেবী। পূর্ণিমা সাহিত্য মন্দির। ৪৭, হালদারপাড়া রোড, কলিকাতা—২৬। মূল্য দুই টাকা।

এই বইয়ের 'নিবেদনে' লেখিকা বলিয়াছেন "বাস্তবের পটভূমিকায় যাদের দেখা আমরা অহরহ পাই এই লেখাতে তাদেরই ছায়া, তাদেরই ছবি।...সাধারণ মানুষের ভিড় ঠেলে যারা আমার চোখে অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে তাদের কথায় সেই সব অসাধারণ সাধারণ মানুষের কথায় আমার এই রচনা মুখর।" সাধারণ মানুষকে বিপুল মর্যাদা দিয়া অসাধারণ করিয়া তোলে প্রেম। যাহারা ভালোবাসে প্রণয়-দেবতা তাহাদের ললাটে জয়টীকা পরাইয়া দিয়া তাহাদিগকে বিপুল মহিমার অধিকারী করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই অসাধারণত্ব আবিষ্কার করিবার মত অন্তর্দৃষ্টি লেখিকার আছে। তাই তো এই পুস্তকের সাধারণ নরনারীর ভালোবাসা এবং ভালোলাগায় কাহিনীগুলি এমন স্নিগ্ধমাধুর্যে মণ্ডিত এবং সত্য ও সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। কাহিনীগুলি স্বতন্ত্র, কিন্তু তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে একটা অচ্ছেদ্য যোগসূত্র। একই মূল সুর প্রত্যেকটি কাহিনীর মধ্যে অনুস্যূত—তাহা এই যে, স্ত্রী-পুরুষের ভালোবাসা যেমন সত্য, সেই ভালোবাসার পরিবর্তনও তেমনি সত্য। সাময়িক ভাবে বিশেষ কোনও কারণে একনিষ্ঠতার অভাব যদি হয় তাহা হইলেও ভালোবাসার মূল্য বা মর্যাদা তাহাতে কমিয়া যায় না। মানুষের জীবনে আসে বহুবিচিত্র প্রেমের ধারা। সুরুচির প্রতি শ্যামলের প্রেমে ফাঁকি নাই, কিন্তু কি এক দুর্নিবার শক্তি প্রণতির প্রতি আকৃষ্ট করিয়া পত্নীর নিকট হইতে তাহাকে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়; প্রবীরের জন্য দীর্ঘকাল প্রতীক্ষমাণা শ্রীপর্ণা ষ্টেশনে গিয়া দেখা পায় প্রিয়তমের পাশে সীমন্তে সিন্দুরবিন্দুশোভিত তাহার নবপরিণীতা পত্নীর। পত্নীপ্রেমিক সুধীর রাণীর সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া রুগ্না স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য ভুলিয়া যায়। লেখিকার সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে একেবারে জীবন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং তাহাদের ভালবাসিবার অনন্ত শক্তি যেমন হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে তেমনি পাত্রান্তরে তাহাদের ভালবাসার পরিবর্তন এবং সাময়িক নিষ্ঠার অভাবকেও স্বাভাবিক ও ক্ষমার্হ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পুস্তকের সবগুলি কাহিনীই সমান উতরায় নাই। বিশেষতঃ ষষ্ঠ কাহিনীটি হইয়াছে অত্যন্ত ওঁচা এবং সস্তাদরের, বইয়ের মূল সুরের সঙ্গে তাহার যেন তাল কাটিয়া গিয়াছে।

লেখিকার ক্ষমতা আছে, কিন্তু স্থানে স্থানে উচ্ছ্বাসের আতিশয্য এবং ভাবপ্রবণতার আধিক্য রসসৃষ্টিকে ব্যাহত করিয়াছে। কিন্তু এ সকল ত্রুটি উপেক্ষণীয়। যে সকল গুণ থাকিলে রচনা সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত হয় এই পুস্তকে তার অসদ্ভাব নাই।

সকল দেশের সেরা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড। ৩০, চৌরঙ্গী রোড। কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা চার আনা।

আমাদের দেশের কিশোর-কিশোরীদের হৃদয়ে দেশপ্রেম জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে লেখক এই বহু তথ্যসম্বলিত পুস্তকখানি লিখিয়া-

হেন। আজ যাহারা কিশোর, বড় হইয়া ভবিষ্যতে তাহারাই দেশকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে। কাজেই দেশের নর-নারী, জলবায়ু এবং প্রকৃতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই পুস্তকে লেখক শুধু যে দেশের অতীত গৌরবের কাহিনী শুনাইয়াছেন তাহা নয়, গৃহশত্রুর চক্রান্তে কি ভাবে আমাদের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল, ইংরেজ-বণিকের শোষণের ফলে কেমন করিয়া এদেশবাসীর দুর্গতি চরমে পৌছিল, এ সকল কথা সহজ সরল ভাষায় অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও ইহাতে গল্পের মত চিত্তাকর্ষক করিয়া বলা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নাই। আমাদের দেশে যে কি পরিমাণ কাঁচা মালের ছড়াছড়ি, 'সব পেয়েছির দেশে' নামক অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। দেশে এই সমস্ত দ্রব্যের উপযুক্ত ব্যবহার হইলে আজিকার স্বাধীন ভারত যে অদূর ভবিষ্যতে 'সোনার ভারতে' পরিণত হইবে, উপরি-উক্ত অধ্যায়টি মনোযোগ দিয়া পড়িলে কিশোরদের মনে সে ধারণা বদ্ধমূল হইবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

পরম আত্মদর্শন— শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন। ভবানীপুর ৫৫, সুবরবন স্কুল রোড হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ।৵০+১২৪ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

সমালোচ্য গ্রন্থে 'আত্মার দার্শনিক তত্ত্ব' 'আত্মরমণ বা ব্রহ্মানন্দ-রস সাধন' ইত্যাদি একাদশটি প্রবন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। যে-কোন সম্প্রদায়ের প্রকৃত সাধক এই গ্রন্থ পাঠে আধ্যাত্মিক উন্নতির খোরাক যথাসম্ভব পাইবেন। গ্রন্থে সাধনসময়ের সত্যসিদ্ধান্তের সম্যক আভাস পাওয়া যায়।

জাগরণ—স্বামী অচ্যুতানন্দ। হিন্দুস্থান বুক ডিপো, ১২, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৮৪ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য কাব্য-গ্রন্থের তিনটি ক্ষুদ্র এবং চারিটি বৃহৎ কবিতা গীতা উপনিষদের উদার ভাবে ভারতীয় যুবকযুবতীদের উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। 'যুবকযুবতীর প্রতি' এবং 'ভারতললনার প্রতি' কবিতাদ্বয়ে যে সব উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে সেগুলি বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দেশ-বিদেশের কথা

কালিম্পং 'ইন্‌ষ্টিটিউট অব কালচার'

শ্রীযুক্ত দাশরথি রায়ের উদ্যোগে কালিম্পঙে স্থানীয় উৎসাহী বাঙালী ও গোরখাদের সম্মিলিত চেষ্টায় সম্প্রতি 'কালিম্পং ইন্‌ষ্টিটিউট অব কালচার' নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। বাঙালী, গোরখা, মাড়োয়ারী, বিহারী, এংলো-ইণ্ডিয়ান, লেপচা, নেপালী, তিব্বতী, চীনা প্রভৃতি নানা জাতির নানা ধর্ম্মের বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য। সাংস্কৃতিক প্রচারকার্য্য এবং পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান এই সঙ্ঘের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রতি রবিবার বৈকালে ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন বসে। এই সকল অধিবেশনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তৃতা প্রদান করিয়া থাকেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে এবং জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করিতেছে।

উমাশঙ্কর নন্দী

শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর নন্দী বর্ত্তমান বৎসরে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়ন-শাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

গ্রাহক, সেলিংএজেণ্টস্‌, বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপনের এজেণ্টদের প্রতি

আগামী পূজার ছুটির জন্য প্রবাসী প্রকাশিত হইবার সাধারণ নির্দ্দিষ্ট তারিখের কিছু কিছু আগে যথাক্রমে ১৯শে ভাদ্র, আশ্বিন সংখ্যা এবং ৭ই আশ্বিন, কার্ত্তিক সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। তদনুসারে ঐ সব সংখ্যার বুকপোষ্ট গ্রহণ ও ভিঃ পিঃ সংরক্ষণাদি গ্রাহকগণ যথাকালে করিবেন। সেলিং এজেণ্টগণ প্রয়োজনীয় সংখ্যার টাকা পূর্ব্বোক্ত প্রকাশ-তারিখের পূর্ব্বে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিবেন। বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপনের এজেণ্টগণ আশ্বিন সংখ্যার জন্য ১—১০ই ভাদ্রের ভিতর এবং কার্ত্তিক সংখ্যার জন্য ২০—৩১শে ভাদ্রের ভিতর সব বিজ্ঞাপনাদি পৌঁছাইবার ব্যবস্থা অতি অবশ্য করিবেন। ইতি—

প্রবাসীর কর্ম্মাধ্যক্ষ

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০৷২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

নববধূর পতিগৃহ-যাত্রা
শ্রীইন্দ্র দুগার

[চিত্রাধিকারী শ্রীযুত মিহিরকুমার মিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

দেরাছুনের চেট্উড হল একাডেমির সম্মুখে মিলিটারী প্যারেড
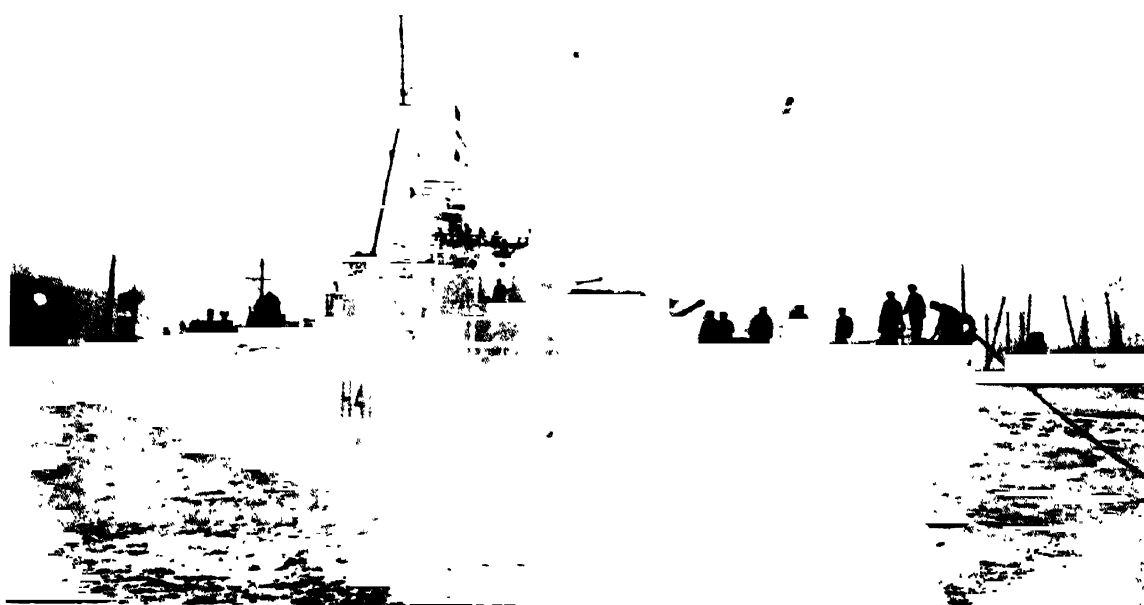
'ব্রিটিশ নেভি'র নিকট হইতে ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সভক্রীত 'ডেক্লয়ার'

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৯শ ভাগ, ১ম খণ্ড } আশ্বিন, ১৩৫৬ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা
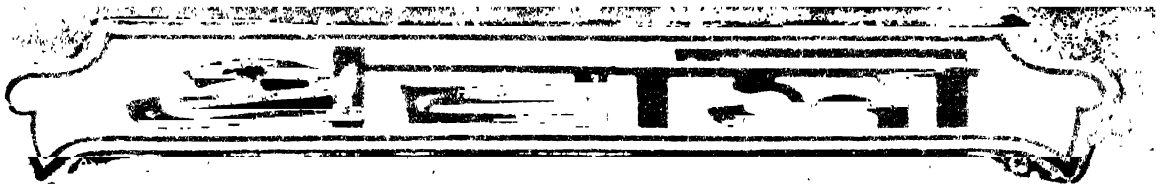
বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ও ব্যবস্থা

বাংলার অবস্থার উন্নতি করিতে গিয়া ওয়ার্কিং কমিটি বোধ হয় হিতে বিপরীত করিয়াছেন। সমগ্র ভারতের ভবিষ্যতের যে সমুজ্জ্বল ছবি কয়দিন পূর্ব্বে পণ্ডিত নেহরু দেখাইয়াছিলেন তাহাতে বাংলার উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে বিশেষ কোন সাহায্য পাওয়া যাইবে তাহা আশা করা বৃথা। কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাভাবে বিব্রত এবং কাশ্মীরের ব্যাপারে নিতান্তই উদ্বিগ্ন, অন্য দিকে প্রত্যেকটি প্রদেশের পরিচালকবর্গ ব্যক্তিগত, দলগত এবং প্রাদেশিক প্রান্তিক স্বার্থান্বেষণে ব্যস্ত—এইরূপ অবস্থায় বাংলার ঘরের কোঁদল যাহারা বাজারে লইয়া গিয়াছে তাহাদের উদ্দেশ্য যে কেবলমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর অনিষ্টসাধনমাত্র, বাংলার ইষ্টসাধনের ইচ্ছা যে তাহাতে বিন্দুমাত্রও নাই, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

ডাঃ রায়ের মন্ত্রীদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ কংগ্রেসের উচ্চতম অধিকারীবর্গের সম্মুখে স্থাপন করিয়া যদি প্রতিপক্ষ দল ক্ষান্ত থাকিতেন তবে হয়ত এই অশোভন ব্যাপারে কিছু কিনারা হইতে পারিত, কিন্তু তাঁহারা সমস্ত উত্তর-ভারতে বাঙালীর মুখে চুণকালি লেপন করিয়া এখন আকাশকুসুম চয়নে ব্যস্ত আছেন; পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তা করার অবকাশই তাঁহাদের নাই।

ডাঃ রায়ের মন্ত্রীদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তো সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রচার করা হইয়াছিল, যদিও কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন। ফলে সেই ১৭ দফার অভিযোগের ফিরিস্তি এবং পরে পণ্ডিত নেহরুর রায় এখন সাময়িক পত্রের মারফত সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করা হইয়া গিয়াছে। অন্য দিকে প্রতিপক্ষ দলের কয়েকজন ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিয়াছিলেন তাহা এবং ডাঃ ঘোষের জবাব কলিকাতার একটি অ-কংগ্রেসী দৈনিকে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এখন হাটে বাজারে এই গৃহকলহ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইতেছে, যাহার ফলে কংগ্রেসের সমস্ত প্রতিষ্ঠানই জনসাধারণের আস্থা হারাইতে চলিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ঐ দুই পক্ষের অভিযোগ-অনুযোগের বিস্তারিত বিচার করা বৃথা, কেননা কোন পক্ষেরই অভিযোগ বা জবাব যথাযথ ও সন্তোষজনক হয় নাই।

বাংলার কংগ্রেসের দুর্ভাগ্য যে তাহা অযোগ্য ও স্বার্থান্ধ নেতৃবর্গের এই কুৎসিত কলহের মধ্যে পড়িয়া এইভাবে হীন প্রতিপন্ন হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে কি এমন কেহই নাই যে উঠিয়া বলিতে পারে "আমি চাই পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি, আমি চাই বাঙালীর ও বাংলার প্রগতি।"

দেশের অপকার হইতেছে বলিয়া ডাঃ ঘোষের দল যে চীৎকার তুলিয়াছেন তাহা যদি সদুদ্দেশ্যে হইত তবে তাঁহার দল প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইতেন যে, এই অপকারের গোড়াপত্তন স্বয়ং ডাঃ ঘোষ এবং তাঁহার বিবেক-রক্ষক এই দুই জনে করিয়া গিয়াছেন। দেশের লোকের অভিযোগ প্রধানতঃ পুলিস ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের উপর। এ ছাড়াও অন্যান্য অনেক অভিযোগ আছে দেশের শাসন ও পরিচালন পদ্ধতির বিষয়ে। আমরা এ বিষয়ে প্রতি সংখ্যায় তীব্র সমালোচনা করিয়াছি এবং যতদিন ক্ষমতা থাকিবে করিব। কিন্তু এ সকল অব্যবস্থা ও অনাচারের মূলে যে ডাঃ ঘোষেরই নির্বুদ্ধিতা, দলগত স্বার্থান্ধতা, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর উপর বিদ্বেষভাব-পোষণ এবং শাসন-পরিচালন সম্বন্ধে জ্ঞান-বুদ্ধি ও কার্য্যক্ষমতার একান্ত অভাব, সে কথা তাঁহার দল অস্বীকার করেন কিরূপে?

পুলিসের বর্ত্তমান কাঠামো গঠন ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের কীর্ত্তি। তিনি তাঁহার যে পেটোয়াবর্গকে এবং তাহাদের অনুচরবৃন্দকে ঐ বিভাগের উচ্চতম অধিকারীর আসনে বসাইয়াছিলেন তাহারাই এখনও সেখানে আছে। কিরণশঙ্কর চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তিনি বিচারের অতীত; কিন্তু যদি তাঁহার কোনও দোষ হইয়াছিল তবে তাহা ছিল ডাঃ ঘোষের ঐ অপরূপ ব্যবস্থা কায়েম রাখায়। সরবরাহ বিভাগের কাজে কংগ্রেসের দলবন্ধুকে নামাইয়া সমস্ত কংগ্রেসকে কলুষিত করার পত্তন করেন ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও তাঁহার সহকর্মী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী। তাঁহাদেরই নির্দ্দেশে প্রথমে চব্বিশ-পরগণায়, তাহার পর মেদিনীপুরে এবং পরে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী দল [illegible]

পাপের পথে নামিয়াছিল। এমন কি যে সুকুমার দত্তকে লইয়া এখন ঘোষগোষ্ঠী আস্ফালন করিতেছেন তাঁহাকে স্বদেশ-শিল্প বিভাগের প্রধান পরামর্শদাতার পদে প্রতিষ্ঠিত করেন ডাঃ ঘোষই স্বয়ং। অন্য সকল বিভাগে, বিশেষতঃ বাংলার অব্যবস্থার আকর লালদীঘির "মহাকরণে" ডাঃ ঘোষের অযোগ্য প্রিয়পাত্র দলই তো এখনও বিরাজ করিতেছেন।

সুতরাং ডাঃ ঘোষ বড়জোর বলিতে পারেন যে তিনি যে উদ্দেশ্যে ঐরূপ অপরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার ফলভোগ করিতেছে বিপক্ষ দল, তাঁহার দলকে বঞ্চিত করিয়া। বাংলার দেশের বা দলের নাম করিয়া রহস্যের সৃষ্টি করা কিসের জন্য? এন্‌ফোর্সমেন্ট বিভাগ হইতে সত্যেন মুখার্জীকে ও সরবরাহ বিভাগ হইতে সত্যেন রায়কে যখন তিনি সরাইয়াছিলেন তখনই আমরা লিখিয়াছিলাম যে এবার চুরির পথ প্রশস্ত করা হইল। কৈ, তখন তো তাঁহাদের অনাচার দমন সম্বন্ধে কোনও আগ্রহ দেখি নাই। সমস্ত কংগ্রেসকে পাপের পথে নামাইয়া ভক্তিকণ্ঠক ছোট কারবারে তৈঁতুলের বীজ ধরিয়া লক্ষঝম্প করিলেই যদি দেশ উদ্ধার হইত তবে বাংলার ভাবনা ছিল না।

দিল্লীর হুজুরগণের তিন দফায় আদেশ ও পরে নির্দ্দেশও প্রকাশিত হইয়াছে। মন্ত্রীদল পুনর্গঠন করিতে হইবে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নূতন নির্ব্বাচন করিতে হইবে অবিলম্বে এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সংস্কার ও পুনর্গঠন করিতে হইবে এই তো তাঁহাদের আদেশ, এবং তাঁহাদের ধারণা এই তিন দফা যথাযথভাবে কার্য্যে পরিণত হইলেই দেশের হাওয়া বদলাইয়া যাইবে ও সোনার বাংলার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বন্যা বহিবে। উত্তম কথা!

কিন্তু কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে এবং কিভাবে ও কাহারা ঐ সকল কাজের ব্যবস্থা করিবেন তাহার কোনও আদেশ বা নির্দ্দেশ কর্ত্তাব্যক্তিগণ দিতে ভুলিয়াছিলেন। এত দিনে তাঁহাদের সে বিষয়ে হুঁস হইয়াছে এবং বোধ হয় ডাঃ রায় দিল্লীতে গেলেই সে সকল বিষয়ে নূতন নূতন ফতোয়া জারীও হইবে। তাহার পর "ফলেন পরিচীয়তে"।

যদি অবিলম্বে নূতন নির্ব্বাচনই মূল উদ্দেশ্য ছিল তবে মন্ত্রীসভার পুনর্গঠনের কথা আসিল কিসে? নূতন ব্যবস্থাপক সভা তো নিজের ইচ্ছামত মন্ত্রীদল নির্ব্বাচন করিতে পারিত। অন্য দিকে নূতন মন্ত্রীসভা কাজকর্ম্ম বুঝিয়া লইবার পূর্ব্বেই যদি নির্ব্বাচনের পালা আসিয়া পড়ে তবে নূতন মন্ত্রীদল কোন্ দিক সামলাইবেন? মন্ত্রীদলের মধ্যে অব্যবস্থা থাকিলে নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের কি অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা কি কংগ্রেসের মহাশয় ব্যক্তিগণ ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

যদি মন্ত্রীসভার পুনর্গঠনই কর্ত্তাব্যক্তিদের অভিপ্রেত ছিল তবে নির্ব্বাচনটা এত আগাইয়া আনিবার কি প্রয়োজন ছিল? শিয়রে নির্ব্বাচনরূপ সংক্রান্তি দেখিয়া কোন্ মন্ত্রী দেশের মঙ্গল চিন্তা করিতে পারিবে? দেশোদ্ধারের পূর্ব্বেকার পথ—অর্থাৎ ঢাক-ঢোল পিটাইয়া, বিজ্ঞাপন বাঁধিয়া, আচার-ব্যবহার, তেল-তামাকের প্রচুর ব্যবস্থা করিয়া যেনরূপ সরকারী চেষ্টার ব্যবস্থা—তো এখন নাই। নির্ব্বাচন এখন কঠিন ব্যাপার, এবং মন্ত্রীসভার দল নির্ব্বাচিত হওয়ার আশা যদি একেবারেই ছাড়িয়া দিতে পারেন তবেই তাঁহাদেরই কাছে কিছু প্রত্যাশা করিতে পারা যায়।

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সংস্কারের নির্দ্দেশ তো আরো অদ্ভুত। ইহা প্রকৃতরূপে ও যথাযথ ভাবে করিতে হইলে সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের—আমরা নিখিল-ভারতের সকল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কথা বলিতেছি—আমূল সংস্কার প্রয়োজন। যত দিন বাংলার কংগ্রেস পরমুখাপেক্ষী থাকিবে তত দিন বাংলা ও বাঙালী ভিন্ন প্রদেশীয় কংগ্রেসমণ্ডলীর নিকট অবজ্ঞা ও কৃপার পাত্রই থাকিয়া যাইবে এবং বর্ত্তমানে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটি যে ভাবে গঠিত তাহাতে কংগ্রেসের উচ্চতম অধিকরণে বাংলাদেশে ভিন্ন প্রদেশীয়ের স্বার্থ বাঙালীর স্বার্থ অপেক্ষা উচ্চে স্থান পাইবেই। ডাঃ ঘোষ প্রধান মন্ত্রী থাকাকালে এই নিয়ম তাঁহা দ্বারাই সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছে। তিনি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে চটাইবার ভয়ে মানভূমের প্রশ্ন একেবারে অতলে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন এবং বিহার, আসাম ও কেন্দ্রীয় সরকারের সন্তুষ্টির জন্য বিনা বাক্যব্যয়ে পাটশুল্ক ও আয়করে বাংলার প্রাপ্য অংশের প্রায় পাঁচ কোটি টাকা জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, যাহা হইতে মাত্র দুই কোটি টাকা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন।

দেশে অনাচারের স্রোত বহিতেছে এবং অসন্তোষের কারণ চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে—এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু তাহার প্রতিকার একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ চেষ্টিত হইলে হইতে পারে, নতুবা এ রোগের উপশম স্বয়ং শিবেরও অসাধ্য।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসকর্ম্মী সম্মেলন

হাওড়া টাউন হলে গত ২১শে আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসকর্ম্মী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি ছিলেন শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। সভাপতির অভিভাষণে শ্রীবিপিন-বিহারী গাঙ্গুলী কয়েকটি ভাল কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা তিনি কতটা করিয়াছেন তাহা আমরা অবগত নহি। তিনি বলেন, "বাংলা ও বাঙালী কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের কাছে অবজ্ঞাত ও অবহেলিত—এই মনোভাব যে কেহই বাঙালীর সংস্পর্শে আসিবে সে-ই বুঝিতে পারিবে। এই মনোভাব বৃদ্ধি হইতে দিলে হয়ত এক দিন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের হাত ছাড়া হইয়া যাইবে।" কথাটা খুব জোরের সঙ্গে কংগ্রেসের উচ্চতম অধিকারীদের কানে পৌঁছাইয়া দেওয়া উচিত। তার পর তিনি বলেন, "ইহার পর যখন পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসে কোন প্রকার নীতির জন্য নয় শুধু ক্ষমতা ও মন্ত্রিত্ব হস্তগত করিবার জন্য উপদলীয় হানাহানি বিশ্রীভাবে জন-সাধারণের সম্মুখে ধরা পড়ে তখন কংগ্রেসের প্রতি যে আস্থা ছিল তাহা হারাইয়া যায়।...মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে

দেশের কাজ করা যায় না। গান্ধী ও লেনিন কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অনেক লোক যাঁহারা নিজেদের লেনিনবাদ এবং গান্ধীবাদের অনুগামী বলিয়া প্রচার করেন তাঁহারা এত মিথ্যা কথা বলেন কেন?...চলচ্চিত্র, জুয়াখেলা ও ফাটকা বাড়িতেছে। দরিদ্র জনসাধারণের অর্থ শোষিত হইয়া বিপ্লববিরোধী ধনশক্তির সৃষ্টি হইতেছে। শোষণনীতির ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হইয়া পড়িতেছে। পশ্চিম বাংলার সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং পূর্ব্ব বাংলার সাধারণ মধ্যবিত্ত কায়িক পরিশ্রমে মন না দিয়া গ্রামাঞ্চল হইতে চলিয়া আসিয়া শহরের ভিড় বর্দ্ধিত করিয়াছে। উত্তর বাংলার যুবকগণ শহরে জমা হইয়া ভিজে সঁ্যাৎসেঁতে বাড়ীতে ও বস্তীতে মাথা গুঁজিয়া মরণাপন্ন হইয়া অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে। অনেক গ্রাম প্রায় যুবকশূন্য। গ্রাম হইতে চলিয়া আসিয়া কারখানার মালিক ও আপিসের মালিকের দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছে। মালিকদের কর্ণ বধির; তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন না। জাতীয় সরকার পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী কাঠামো হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতেছে না।"

গাঙ্গুলী মহাশয়ের প্রত্যেকটি কথা মূল্যবান এবং খাঁটি সত্য ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, গ্রামকে পঙ্গু করিয়া কলিকাতায় দেশশুদ্ধ লোক আনিয়া ঠাসিবার এবং শহরের রাস্তার উপর দিয়া যাতায়াত অসুবিধাজনক হইয়া ওঠায় পাতালে প্রবেশ করাইবার জন্য যে সব অপচয়ের আয়োজন চলিতেছে সেই সব নিবারণের জন্য তিনি সরকার দলের সদস্য হিসাবে কিছু করিয়াছেন কি? কলিকাতা শহরই এখন যেন পশ্চিম বাংলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; গবর্ণমেণ্টের যাহা কিছু কার্য্যকলাপ সবই এই কলিকাতার উপর নিবদ্ধ। দিন দিন এখানেই চাকুরি বাড়িতেছে, ব্যয় বাড়িতেছে, ভীড় বাড়িতেছে, আগামী বাজেটে যে ভয়াবহ ঘাটতি হাঁ করিয়া রহিয়াছে তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। কেন্দ্রীয় সরকারে ৪৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত স্থলে ৪৫ কোটি টাকা ঘাটতি ধরা পড়িয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বাংলার ভার নির্ভরশীল কেহ নহে। পশ্চিম বাংলার নিজের রাজস্ব কম, কেন্দ্রীয় সরকারের আয়কর আদায় কম হইলে বাংলাকে পথে বসিতে হইবে। কলিকাতাকে 'মডার্ণ সিটি'র সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিতে গিয়া বোঝার উপর আরও বিশ ত্রিশ কোটি টাকার বোঝা চাপাইবার কোন সার্থকতা আছে কি? এদিকে শহরের পানীয় জল সরবরাহ, ময়লা নিকাশ প্রভৃতির ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক সঙ্কীর্ণ, লোক অসম্ভব বাড়িয়াছে কিন্তু শহরের জলসরবরাহ বা ময়লা নিকাশের ব্যবস্থা তদনুসারে বাড়ে নাই। গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল কলিকাতার ভীড় যথাসাধ্য কমাইয়া ফেলা। মেদিনীপুরে শিক্ষাবিভাগ, বাঁকুড়ায় চিকিৎসা বিভাগ, চুঁচুড়ায় বা নদীয়ায় কৃষিবিভাগ, বর্দ্ধমানে মৎস্য বিভাগ, সিউড়ীতে সমবায় বিভাগ, মুর্শিদাবাদে শিক্ষাবিভাগ প্রভৃতির দপ্তরের কিছু অংশ সরাইয়া দিলে কলিকাতার ভীড় অনেক কমিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব জেলা সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। বর্ত্তমান টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, জীপগাড়ীর যুগে ইহা করিতে কোন অসুবিধা নাই। এই সব বিভাগ এমন নয় যে, কলিকাতার সঙ্গে মিনিটে মিনিটে যোগাযোগের অভাবে উহাদের কাজ ব্যাহত হইবে। ইহার ফলে জেলায় জেলায় যাতায়াতের পথঘাট ভাল করিবারও তাগিদ পড়িবে। তাহা না করিয়া কলিকাতা শহরে মৎস্য কৃষি বা সমবায় বিভাগের নামাঙ্কিত জীপ গাড়ী দৌড়াইয়া কোন্ কাজ হইবে? শুধু শাসন ও পুলিস বিভাগগুলি কলিকাতায় সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত থাকিলেই যথেষ্ট। মফস্বলের উপর গবর্ণমেণ্টের নজর পড়িয়াছে, সরকারী বিভাগীয় আপিস জেলার প্রধান শহরে রহিয়াছে ইহাই কলিকাতা হইতে গ্রামে ও মফস্বল শহরে লোক টানিবার পক্ষে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করিবে।

হাওড়া সম্মেলন ও ভাষা-সমস্যা

হাওড়া সম্মেলনের সভাপতি বলিয়াছেন, "ভাষার সমস্যার সমাধান করিতেই হইবে। সমস্যা জটিল বলিয়া ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। দেশে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে তাহার প্রমাণ আমরা মানভূম জেলায় পাইয়াছি। যদি এই ভাষা সমস্যার শীঘ্র সমাধান করিতে পারা না যায় তাহা হইলে প্রাদেশিক বিদ্বেষ ও হিংসাকে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না।

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সর্ব্বভারতীয় কাজকারবারের জন্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ চালানোর জন্য একটি সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা থাকিবে। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে প্রদেশের ভাষা ও অন্য ভাষা অল্প বা বিস্তর প্রচলিত। যে সব অঞ্চলে সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের সংখ্যা বহু সেখানে শাসনতন্ত্রগত দলিলপত্রাদি তাহাদের মাতৃভাষাতেও প্রকাশিত হওয়ার ব্যবস্থা হওয়াতে ভাষাগত অত্যাচার ও জুলুমবাজীর হাত হইতে তাহারা অনেকাংশে নিষ্কৃতি পাইবে; কিন্তু ইহাতেও কি সমস্যার মীমাংসা হইবে? কোন্ অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের ভাষা একান্তভাবে প্রচলিত এবং কোন্ অঞ্চলে প্রাদেশিক ও সংখ্যালঘুদের ভাষা উভয়ই প্রচলিত তাহা স্থির করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে প্রত্যেক প্রদেশের উপর। ইহাতে সংখ্যালঘু ভাষাভাষীরা কি সব সময় সুবিচার পাইবে? নিজের প্রাদেশিক ভাষার বিস্তার ও প্রসারের জন্য সত্যিকারের ভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলকেও তাঁহারা অন্য ভাষাভাষী বলিয়া স্বীকার করিবেন না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মানভূমের কথা উল্লেখ করিয়াছি। মানভূম সম্বন্ধে যাঁহার সামান্য

জান আছে তিনি জানেন মানভূমে শতকরা ৮০ জন লোক বাংলা ভাষাভাষী, অথচ এই নিছক সত্যকে বিহার গবর্ণমেন্ট অস্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা প্রচার করিতেছেন যে, মানভূম হিন্দীভাষাভাষী। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মানভূম বিহার সরকারের নিকট সুবিচার পাইবে কি ? অন্যান্য প্রদেশের সংখ্যালঘু ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহের এই দুর্দশাই হইবে। ফলে সমস্যার সমাধান হইবে না। প্রাদেশিক বিদ্বেষ ও হিংসা প্রচণ্ড হইয়া উঠিবে। এই সমস্যার সমাধান একমাত্র হইতে পারে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন দ্বারা। অহেতুক ভয় ও দ্বিধা ত্যাগ করিয়া নেতৃবৃন্দের পক্ষে সেইরূপ প্রদেশ পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমীচীন হইবে। যে প্রাদেশিকতার ভয়ে কোনও কোনও নেতা ভাষাগত প্রদেশ পুনর্গঠন এড়াইয়া বর্তমান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এই সিদ্ধান্তের ফলে সেই প্রাদেশিকতার বিষ বরং আরও উগ্র হইয়া দেখা দিবে। মানভূম, কুচবিহার বা পূর্ব্বাচল কেন পশ্চিমবঙ্গের সহিত সংযুক্ত করা হইবে না তাহা বুঝা কঠিন নহে। কোনও কোনও নেতারা বাঙালীদিগকে বিভক্ত রাখাই তাঁহাদের পক্ষে শ্রেয় বলিয়া মনে করেন। বাঙালীরা যদি ভয়ে ভয়ে থাকে এবং নিজেদের সিদ্ধান্ত সাগরগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া তাহাদের অহঙ্কারের দাপটের কাছে নতি স্বীকার করে তাহাতে বাঙালী জাতির সংগঠন বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। বাঙালীরা কখনও সংবাদপত্রের মারফতে বক্তৃতা ও আবেদন-নিবেদন করিয়া নেতাদের কর্ণে তাহাদের দাবির কঠিন সুর প্রবেশ করাইয়া দিতে পারেন নাই। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে ঐ সকল দাবির আন্দোলন ঘনীভূত করা যায় না। পৃথিবীর সকল বিপ্লবী পণ্ডিত নিজের নিজের ভাষার দাবির আন্দোলন স্তিমিত করিতে দেন নাই। Ireland-এর স্বনামখ্যাত বিপ্লবী নেতা ইমেন ডি-ভেলেরা এ কথা বলিয়াছিলেন :—One can barter away his freedom but one cannot barter away his language—মানুষ তাহার স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে পারে কিন্তু তাহার ভাষা বিক্রয় করিতে পারে না।

কুচবিহার এবং মানভূম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি গৃহীত হইয়াছে :

"পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কর্মিগণের এই সম্মেলন কুচবিহারের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তি দাবি করিতেছে। কুচবিহারের সহিত বাংলার ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কারগত সাদৃশ্যের কথা বিবেচনা করিলে ইহার অন্য কোন শাসন-ব্যবস্থার কথা কল্পনা করা যায় না। কুচবিহারের আদালতসমূহেও বাংলা ভাষাই ব্যবহৃত হয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হিসাবে কুচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধীনে জিলা কমিটির মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং শাসন-ব্যবস্থায় ইহার অন্য কোনও ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। এই সম্মেলন কুচবিহারের রাজার সাম্প্রতিক বিবৃতির এবং তিনি বাংলার অন্তর্ভুক্তি বিরোধী যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ও রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশের অধিকারকে যে ভাবে খর্ব্ব করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছে। এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের এই ন্যায্য দাবির প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল হইয়া অচিরে যাহাতে এই দাবি পূরণ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে অনুরোধ জানাইতেছে।

"কংগ্রেসের গৃহীত ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগঠনের নীতিকে কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের সন্নিহিত বঙ্গ ভাষাভাষী মানভূম ও অন্যান্য অঞ্চলগুলিকে যথাশীঘ্র সম্ভব পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবিকে স্বীকার করিয়া লইবার জন্য এই সম্মেলন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে। মানভূম সত্যাগ্রহ ব্যাপারে যে কলঙ্কজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল উহা জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। যাহাতে ইহার পুনরাবৃত্তি না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকার ও ভারত সরকারের কর্ত্তব্য। অবশ্য অনতিবিলম্বেই প্রদেশগুলির পুনর্গঠনের অসুবিধার কথা এই সম্মেলন অবগত আছে, কিন্তু তথাপি যাহাতে যথাসম্ভব সত্বর এই নীতি কার্য্যে পরিণত হয় এই সম্মেলন সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।"

আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সমস্যা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে এই শ্রেণীর "পবিত্র ইচ্ছা" প্রকাশ আগেও ত করা হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যতঃ কি করা হইয়াছে ? মন্ত্রীরা প্রায়ই দিল্লী যাইয়া থাকেন, তাঁহারা সেখানে এ বিষয়ে তদ্বিরাদি কতটা কি করিয়াছেন ? বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা দেড় বৎসরের অধিককাল গদীনশীন আছেন, ইহার মধ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অনেকগুলি অধিবেশনও হইয়া গিয়াছে ? তার একটিতে এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল না কেন ? গত অধিবেশনে জনৈক মুসলমান সদস্য মানভূম বাংলায় ফিরাইবার দাবী জানাইয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছিলেন, উহাই বা তুলিতে দেওয়া হইল না কেন ? বিহার গবর্ণমেন্ট এক প্রকার জোর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারে দরবারের দ্বারা উড়িষ্যার হাত হইতে সরাইকলা ও খরসোয়ান আদায় করিয়া লইল, পশ্চিম বাংলা-সরকার সেইরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে মানভূম, কুচবিহার, সাঁওতাল-পরগণা ও ধলভূমের উপর দাবী জানাইতে পারিলেন না কেন ? সরাসরি ভাবে চাপ দিলে কাজ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী, সেই রাস্তা এড়াইয়া কর্মী সম্মেলনে তীব্র ভাষায় প্রস্তাব পাস করিলে ফল লাভ হইবে এ কথা প্রস্তাব উত্থাপকগণও বিশ্বাস করেন কি না আমরা জানি না। হাওড়া সম্মেলনের সভাপতি শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী সরকারী দলের বিশিষ্ট সদস্য

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীসুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় পার্লামেণ্ট-টারি সেক্রেটারী, পাঁচ-ছয় জন পশ্চিমবঙ্গীয় মন্ত্রীও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, ইঁহারা যদি সত্যই মানভূম, কুচবিহার, ধলভূম ইত্যাদি বাংলায় আসা উচিত বলিয়া মনে করেন তবে সরাসরি ভাবে সেই চেষ্টা করিতে অগ্রসর হন না কেন? বাংলার কংগ্রেসে দুইটি বিবদমান দল জীয়াইয়া রাখিয়া উভয়কেই কংগ্রেসের উচ্চতম অধিকারীবৃন্দের উপর নির্ভরশীল রাখার প্যাঁচ বহুদিন ধরিয়া চলিতেছে, স্বাধীনতা আসিবার পর ইহা আরও দৃঢ় করিবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে মন্ত্রিদের ভাগ্যনির্ণয় দিল্লীর হাতে রাখিবার জন্য। এই অবস্থায় কুচবিহার গেল, ত্রিপুরা, মণিপুরও গেল। মানভূম তো ইংরেজই কাটিয়া দিয়া গিয়াছে। বাংলা কংগ্রেসের একটি দল দিল্লী হইতে মুখ ফিরাইয়া বাংলার স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের সমগ্র ও সম্পূর্ণ ভাবে জড়িত করিয়া আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল হইতে পারিলে তবেই বাংলার সমস্যার সমাধান এবং বাংলার ন্যায্য দাবি পূরণ সম্ভব হইবে। পশ্চিমবঙ্গীয় দলের এই কথাটাই বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত।

হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ

ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্যবাদ চলিতে দেওয়া হইল না কারণ ভারতবর্ষ "সেক্যুলার ষ্টেট"। এ বিষয়ে আমাদের আপত্তি নাই যদিচ ঐ বিষয়ে যে সকল যুক্তি ক্রমাগত সাধারণের সমক্ষে ধরা হয় তাহার মধ্যে বাস্তব ও অবাস্তব বিচারের বিশেষ পরিচয় আমরা পাই নাই। সম্প্রতি "হিন্দুরাষ্ট্র" ছাড়িয়া যে "হিন্দীরাষ্ট্র" স্থাপনের অপচেষ্টা চলিতেছে, সে বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন হইয়াছে।

হিন্দীকে গায়ের জোরে রাষ্ট্রভাষার স্থলে অভিষিক্ত করিবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদের বাস্তব পরিচয় আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম বিহারে, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের বক্তৃতায়। মানভূমের বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন আন্দোলনে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, মানভূম এখনও যে হিন্দীভাষী এলাকায় পরিণত হয় নাই ইহা হিন্দী প্রচারকদের পক্ষে নিন্দনীয়। ইহার পর হইতে স্পষ্ট দেখা গেল হিন্দী-প্রচারকেরা তৎপর হইয়াছেন, মানভূমের নিজস্ব প্রাচীন বাংলা মাতৃভাষা আদালত স্কুল কলেজ দোকানের সাইনবোর্ড প্রভৃতি হইতে দূরীভূত হইতেছে, হিন্দী তাহার স্থান গ্রহণ করিতেছে। আগামী সেন্সাসে মানভূমবাসীদের মাতৃভাষা হিন্দী বলিয়া লিখাইয়া লইতে বিশেষ অসুবিধা থাকিবে না।

হিন্দীকে নিখিল-ভারতীয় রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করিবার চেষ্টার পিছনেও এই একই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় সরকারে হিন্দীভাষী দুই প্রদেশ বিহার ও যুক্তপ্রদেশের প্রাধান্য ও ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিবার পক্ষে ইহার চেয়ে বড় অস্ত্র আর নাই। হিন্দী হইবে রাষ্ট্রভাষা, কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী ভাষা; উহা থাকিবে দুইটি প্রদেশের মাতৃভাষা, অপর সকলকে উহা শিখিয়া লইতে হইবে। একের মাতৃভাষা এবং অপরের শেখা ভাষা—দুইয়ের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান, তাহার তাৎপর্য্য যাঁহারা বুঝিতে পারেন না তাঁহারা একবার কংগ্রেসে হিন্দী প্রচলনের পূর্ব্বের কথা ভাবিয়া দেখুন। কংগ্রেসে যত দিন সকলের শেখা ভাষা (acquired tongue) ইংরেজীতে বক্তৃতা হইত তত দিন বাংলা, মাদ্রাজ ও মারাঠা কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে; দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা কংগ্রেসে আসন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। হিন্দী ভাষাভাষী বিহার, যুক্তপ্রদেশ বেশী দূর তাল রাখিতে পারে নাই। যেদিন হইতে কংগ্রেসে রাষ্ট্রভাষার ধুয়া ধরিয়া হিন্দী চালু হইল সেই দিন হইতে বাংলা, মাদ্রাজ ও মারাঠার শ্রেষ্ঠ সেবকেরা কংগ্রেস ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। সুভাষচন্দ্র হিন্দী বক্তৃতা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে তাড়ানো সম্ভব হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকারে এখন বুদ্ধিবৃত্তি, বিদ্যাবত্তা ও কর্ম্মশক্তিতে হিন্দী প্রদেশবাসীরা বাংলা, মাদ্রাজ ও মারাঠার অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে, সেখানে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিতেছে না। তাই হিন্দীকে অতি দ্রুত রাষ্ট্রভাষারূপে কেন্দ্রীয় দরবারে স্থাপন করিবার জন্য তাঁহাদের এই ব্যাকুল আগ্রহ।

ভাষা হিসাবে বর্ত্তমানে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযুক্ত নয়, ইহা হিন্দী চ্যাম্পিয়নরাও স্বীকার করিতেছেন এবং ১৫ বৎসর ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা রাখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু এক দল হিন্দী-উৎসাহী ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা ভাবিতেছেন যদি এই সময়ের মধ্যে অপর প্রদেশের লোকেরা হিন্দী শিখিয়া তাহাদের সমকক্ষ হইয়া উঠে তবে তাহাদের কেন্দ্রীয় সরকার দখলের আসল মতলব ফাঁসিয়া যাইবে, তাই এখনই তাহারা হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে চালু করিবার পক্ষপাতী। তাঁহাদের একমাত্র যুক্তি হিন্দী ভারতবর্ষের সর্ব্বাধিক প্রচলিত কথ্য ভাষা, ১৫ হইতে ১৮ কোটি লোক নাকি হিন্দীতে কথা বলে। এই হিসাব একেবারে মিথ্যা। হিন্দী একটা ভাষা নয় এবং বিহারের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে যুক্তপ্রদেশের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত হিন্দী ভাষা প্রচলিত এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পূর্ব্বী হিন্দী, আবধি, খড়ি বোলী, ব্রজভাষা, উর্দু প্রভৃতি বহু ভাষা এই এলাকায় প্রচলিত এবং ইহার একটি অপর এলাকার লোকে বোঝে না, লেখাও সহজে পড়িতে পারে না। খাঁটি হিন্দীভাষীর সংখ্যা যাহা, বাংলা মারাঠি বা তামিলের সংখ্যা তার তুলনায় খুব কম নয়। ব্যাপক অর্থে ডাঃ রঘুবীর বা শ্রীযুক্ত ফিরোজ চাঁদের হিন্দী সংজ্ঞা ধরিলেও উহার পরিমাণ দশ বারো কোটির বেশী নহে। অপর পক্ষে হিন্দীর এক বর্ণ যাহারা বুঝে না তাহাদের সংখ্যা কম পক্ষে ২০ হইতে ২৫ কোটি।

এই বিপুল জনসমষ্টির উপর একটা অবাঞ্ছিত এবং ঐতিহ্য-বর্জ্জিত কতকগুলি লোকের কথ্য ভাষা রাষ্ট্রভাষা রূপে চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা চূড়ান্ত সাম্রাজ্যবাদী জবরদস্তি ভিন্ন আর কিছু নয়। হিন্দী এলাকার বাহিরে শহরে কিছু কিছু লোকমাত্র হিন্দী ভাষা কোনরূপে বুঝিতে পারে; গ্রামের লোক উহার একটি বর্ণও বুঝে না। সাঁওতাল পরগণা এমন কি উড়িষ্যাতেও পরিষ্কার ভাবে বাংলা বলিলে বুঝে, হিন্দী বুঝে না।

কথ্য ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে হয় এই অপূর্ব্ব যুক্তি একমাত্র আমাদের দেশেই দেওয়া হইল। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই শ্রেষ্ঠ মার্জ্জিত ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশেও বৈদেশিক ফার্সী ও ইংরেজী কথ্য ভাষা না হইয়াও রাষ্ট্রভাষা রূপে চলিয়াছে; তৎপূর্ব্বে কথ্য ভাষা ছিল পালি ও প্রাকৃত কিন্তু রাষ্ট্রভাষা, আইনের ভাষা ছিল মার্জ্জিত সংস্কৃত। যে ভাষার নিখুঁত প্রকাশভঙ্গী নাই, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ নাই, বিরাট সাহিত্য নাই—সে ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গায়ের জোরে তুলিয়া ধরিলেও সে দাঁড়াইতে পারে না—গড়াইয়া পড়িয়া যায়, হিন্দীর বেলায় ইহাই দেখা যাইতেছে। উর্দ্দু ব্যাকরণের কাঠামোতে গ্রীয়ারসন যে শব্দের ছক কাটিয়া দিয়া গিয়াছেন তাহার পক্ষে রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে এখনও বহু যুগ দরকার। পনর বৎসরে ডাঃ রঘুবীরের চেষ্টায় ইহা হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।

রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারটা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। এ বিষয়ে যতটা আলোচনা হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই।

হিন্দী ভারতের বৃহত্তম গোষ্ঠীর ভাষা এবং উহার অমার্জ্জিত নানা সংস্করণ অল্পবিস্তর বুঝিতে পারে বহু লোকে। সেই কারণে উহাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার চেষ্টা আমরা সমর্থন করিলেও করিতে পারি। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে উহার ভাষার ও ব্যাকরণের পরিবর্ত্তন এবং নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইবে। সাহিত্যের ও শব্দের ঐশ্বর্য্যে হিন্দী বাংলার সহস্র যোজন পিছনে পড়িয়া আছে এবং উর্দ্দু, গুজরাটি ও মারাঠি উহা অপেক্ষা বহু আগে চলিয়া গিয়াছে। ভাষা সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের চেষ্টা না করিয়া উহাকে রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন

৬ই ভাদ্র (১৩ই আগষ্ট) তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের বিষয় পুনরায় আলোচনা হয়। এই সংবাদ পড়িয়া মনে হয় নেহরু-প্যাটেল-সিতারামিয়া—কংগ্রেসের এই তিন দিকপালের নির্দ্দেশ, দার কমিশনের আপত্তি সবই ব্যর্থ হইয়াছে। কংগ্রেসের সভাপতির নিজের প্রদেশ—অন্ধ্র প্রদেশ পর্য্যন্ত—ত্রি-মূর্ত্তির সাবধান বাণী শুনিতে রাজি নয়। এতদিন পরে জনমতের নিকট কংগ্রেস নেতৃবর্গের নতি স্বীকার করিতে হইল, এই সংবাদে আমরা খুশী হইয়াছি।

ভাবিতেছি, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের আগে বা পরে কংগ্রেসের যুগব্যাপী প্রতিশ্রুতি পালনের উদ্দেশ্যে যদি ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইত, তবে কত তিক্ততা নিবারণ হইত! তখন পশ্চিম পঞ্জাব হইতে বিতাড়িত হিন্দু-শিখের সমস্যা একটু শান্ত হইয়াছে; কাশ্মীর যুদ্ধ গতানুগতিকতার পর্য্যায়ে চলিয়া গিয়াছে। কিসের ভয়ে ও কোন্ যুক্তির প্রেরণায় কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ—"অসময়োপযোগী" বলিয়া ধুয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা আজও আমরা জানি না। জনমতের চাপে তাঁহারা যে অন্ধ্র ও কর্ণাটক প্রদেশ গঠনের কথা নূতন করিয়া ভাবিতেছেন তাহা সু-সংবাদ।

এক বৎসর দেড় বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেসের যে প্রভাব ছিল, তাহা আজ হয়ত নাই। তাহার জন্য দায়ী কংগ্রেস নেতৃবর্গের দীর্ঘসূত্রিতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততা। আজ এই সব দোষ ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য পালনে আগ্রহশীল হইলে কংগ্রেসের প্রভাব ফিরিয়া আসিবে। এই সম্বন্ধে দক্ষিণ-ভারত ও পূর্ব্ব-ভারতের সমস্যা এক প্রকৃতির; এক সময়েই তাহা মীমাংসা করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের দাবী অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ দৃঢ় মনে ন্যায় ও যুক্তির নির্দ্দেশে চলুন। জনমত তাঁহাদের অনুসরণ করিবে। প্লেবিসাইট প্রভৃতি নূতন ঢং অবলম্বন করিয়া ব্যাপারটা জটিল করিবার প্রয়োজন নাই।

এই প্রসঙ্গে বাঙালী পাঠকবর্গের একটা কথা জানিয়া রাখা ভাল। অন্ধ্র, কর্ণাটকের নেতৃবর্গ কেবল ওয়ার্কিং কমিটির খোস মেজাজের উপর নির্ভর করিয়া নাই, তাঁহারা ক্রমাগতই নেহরু গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিতেছেন; ডাঃ পট্টভি সিতারামিয়ার উপরও অন্ধ্র নেতৃবর্গ একান্ত নির্ভর করিয়া আছেন, এই নিঃসহায় অবস্থা দেখি না। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটি স্পীকার অনন্তসয়নম আয়েঙ্গার, অন্ধ্র কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও সেই পদাধিকার বলে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডাঃ রঙ্গ, স্যার এস্ ভি রামমূর্ত্তি প্রভৃতি বাঘা সিভিলিয়ান পর্য্যন্ত পণ্ডিত নেহরুর নিকট দরবার করিতেছেন। ডাঃ পট্টভি মাদ্রাজ নগরী ছাড়িয়া দিতে রাজী; অন্য অন্ধ্র নেতৃবর্গ এই নগরীকে দুই ভাগ করিয়া কুয়াম নদীর উত্তর ভাগে স্থিত মাদ্রাজ নগরীর অংশকে অন্ধ্র প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করিতে চান। কর্ণাটক নেতারা অবিলম্বে কর্ণাটক প্রদেশ গঠন করিলে কর্ণাট-ভাষাভাষী মহীশূর রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির দাবী বর্ত্তমানের জন্য স্থগিত রাখিতে রাজী হইয়াছেন।

আর, পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসী নেতৃবর্গ গোপনে ও প্রকাশ্যে এই বিষয়ে কি করিতেছেন, তাহা বাঙালী জানিতেও পারে না। বাংলার জনসাধারণের কি এখনও চেতনা হইবে

না ? এই মূক বধিরের ন্যায় আত্মগ্লানি ও অদৃষ্ট চিন্তা বা বৃথা অবসাদ ভার রসাল পরনিন্দার পরিতৃপ্তিই কি শেষে বাঙালীর সর্ব্বনাশের মূল কারণ হইবে ।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি দমন

দুর্নীতি দমন বিভাগের নিয়ামক শ্রীরবীন্দ্র মিত্র প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) শহরে গিয়াছেন । স্থানীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে এক ঘরোয়া বৈঠকে তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করেন, জেলার দুর্নীতি দমন ব্যাপারে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনেন । "গণরাজ" পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীর পক্ষ হইতে বলা হয় : "গণরাজে" গত দেড় বৎসর যাবৎ বিভিন্ন সরকারী বিভাগে ও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে, বিশেষ করিয়া পুলিস কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছিল সে সমস্তই কৌশলে কোথাও কোন তদন্তই না করিয়া এবং কোথাও বা তদন্তের প্রহসন করিয়া সমস্তই ধামাচাপা দেওয়া হইয়াছে । যত দিন ঐ সকল দুর্নীতির যথাযথ প্রকাশ্য তদন্তের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদিগকে পুলিস ও ঊর্দ্ধতন সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণ করিবার অধিকার ও সুযোগদানপূর্ব্বক উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করা হইবে তত দিন জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে আর কোন অভিযোগ উত্থাপন করিয়া তাঁহারা আর বিভাগীয় সরকারী তদন্ত নামক প্রহসনের সম্মুখীন হইয়া অকারণে লাঞ্ছিত হইবার কোন সুযোগ দান করিবেন না ।

এই আলোচনার ফলে কি পাওয়া গিয়াছে গত ১লা ভাদ্রের "গণরাজে"র ভাষায় তাহা বর্ণনা করিব :

> সেদিন শ্রীযুক্ত মিত্র আসিলেন, কনফারেন্স করিলেন, সরকারী বেসরকারী মাতব্বরদের মতামত শুনিলেন । অনেক নোট লওয়া হইল, কিন্তু 'কি লাভ হইল ইথে' ? আমরা আগাম তাহা বলিতে পারিব না, বলা সম্ভবও নয় । আশা করিতে পারেন অবশ্যই যে কিছু হইলেও হইতে পারে । তবে হইলেও আপনারা অর্থাৎ জনসাধারণ তাহার কিছুই জানিতে পারিবেন না । সরকারী ব্যাপার বেসরকারী জনতাকে না জানাইবার ব্রিটিশ পলিসি গত দুই বৎসরে বদলায় নাই । কারণ যাঁহারা ব্রিটিশ সরকার চালাইতেন, তাঁহারাই স্বাধীন ভারতকেও চালাইতেছেন ।
>
> আমাদের পত্রিকায় বিবিধ ঘটনাবলী সম্বন্ধে বৎসরাধিক কাল ধরিয়া যাহা শুধাইলাম, তাহার উত্তর কে দিবে ? কৃষি বিভাগ সম্বন্ধে কিছু দিন পূর্ব্বে যাহা আমরা লিখিয়াছিলাম, স্বয়ং ডিরেক্টার তাহার অনুসন্ধান লইয়াছেন এবং আমরা যাহাকে গুজব বলিয়াছিলাম, তাহার প্রত্যেকটি প্রমাণিত হইয়াছে । তবে সবই Bonafide mistake ছাড়া আর কিছু নয় । যে কর্ম্মচারীর বেশন বিল বা টি-এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম, তাহা সত্য হইলেও যে Bonafide, তাহা ডিরেক্টার বলিয়াছেন । হাকিমদের পেটোয়া-প্রীতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, সত্য হইলেও তাহা এমন কিছু গর্হিত নয় ! নহিলে আজও সেই পেটোয়ারা হাকিমদের পিছন ছাড়ে নাই কেন ? হাসপাতাল সম্বন্ধে অভিযোগের উচ্চবাচ্য হয় নাই । লক্ষীমণি ধর্ষণ মামলার কথা ভুলিব না, কারণ সে মামলা দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে । অথচ পুলিস সেই মামলায় সাক্ষী নাই বলিয়া একদা খতেমী রিপোর্ট দিয়াছিল । এমন ঘটনা আরও কত আছে, যাহা জন-স্বার্থের খাতিরে আমরা পত্রস্থ করিয়াছি এবং যাহা ব্যক্তি স্বার্থের অজুহাতে ফাইল চাপা পড়িয়াছে—এ সম্বন্ধে আর কত ঘাঁটাইব ?

পশ্চিমবঙ্গে সেচ পরিকল্পনা

গত ২৮শে শ্রাবণ পশ্চিমবঙ্গে সেচ বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁহার অধীনস্থ বিভাগের কার্য্য সম্বন্ধে যে বিবৃতি দান করেন, তাহা বাঙালীর পক্ষে কলঙ্কের কথা । বাঙালী শ্রমিকের অভাব হয় কেন ? শ্রম-বিমুখ হইলে কে বাঙালীকে বাঁচাইবে ?

কল্পনায় আছে যে ১৯৫৫ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৬ লক্ষ একর (৪৮ লক্ষ বিঘা) জমি সেচব্যবস্থার কল্যাণে সুজলা-সুফলা হইবে ; ইহার ফলে প্রায় ৭ লক্ষ টন (১,৮৯, ০০,০০০ মণ) শস্য (পাট, ধান, গম) উৎপন্ন হইবে । এই আশার সম্মুখে একটা বিরাট "কিন্তু" বাধা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—এই আশা ফলিতে পারে যদি খাল কাটিবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক শ্রমিক পাওয়া যায় । ভূপতিবাবু সেই বিষয়ে আশা-নিরাশা দুই কথাই শুনাইয়াছেন :

> তাঁহাদের বিভিন্ন সেচ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে বিভিন্ন স্থানে ২০ হাজারেরও অধিক শ্রমিক প্রয়োজন । কিন্তু গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় শ্রমিক পাওয়া যাইতেছে না । অনেক লোক মাটি কাটার কাজ তাহাদের নহে—এরূপ বলিয়া সেচ-পরিকল্পনাগুলিতে কাজ করিতে আসে না । তারপর যে সব শ্রমিক পাওয়া যায় তাহাদের মজুরীর হারও অত্যধিক । অনেক সময় শ্রমিকের মজুরীর হার প্রতি হাজার বর্গফুট মাটি কাটিতে ৬০৲ টাকা করিয়া দিতে হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত বড় বড় সেচ-পরিকল্পনার ব্যাপারে প্রধানতঃ শ্রমিক সমস্যার দরুন অনেক সময় কণ্ট্রাক্টারও পাওয়া সহজ হয় না । ছোট-খাট রকমের সেচ পরিকল্পনাগুলির জন্য গবর্ণমেণ্ট সমবায় সমিতিগুলির মারফত স্থানীয় উদ্যম ও উদ্যোগ উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে স্থানীয় লোকেরাই ঐসব পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে পারে ; কারণ ঐসব পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে জটিল টেক্‌নিক্যাল সমস্যাদির প্রশ্ন নাই । এই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কিছু সাড়া পাওয়া

গিয়াছে এবং আগামী শীতকালের দিকে এইরূপ বহু ছোটখাট পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

শিয়ালী নদীর সংস্কার উপলক্ষে আমরা দৈনিক সংবাদ-পত্রে স্থানীয় উৎসাহের বিষয়ে অনেক কথা পড়িয়াছি। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে উদ্যোগীদের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হয়; স্থানীয় শ্রমিক যোগানোর ব্যাপারে দর কষাকষির বহর দেখিয়া মেছো-হাটার কথা মনে হইয়াছিল। ভূপতিবাবু ইচ্ছা করিলে আরও অনেক কথা কহিতে পারেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি পশ্চিম-বঙ্গের সমক্ষে দুইটি পথের নির্দ্দেশ দিয়াছেন:

> যদি ন্যায়সঙ্গত মজুরীতে যথেষ্ট সংখ্যায় এই সব শ্রমিক পাওয়া না যায় তাহা হইলে জনসাধারণের সম্মুখে হয় ঐ পরিকল্পনাগুলি একেবারে ত্যাগ করা অথবা বাধ্যতামূলক ভাবে শ্রমিক সংগ্রহের পরিকল্পনা সমর্থন করা।

আমাদের মনে হয় এই দুই সমস্যাই কাটাইয়া যাওয়া যাইবে। ভূপতিবাবুর ভাষণের মধ্যেই উপায়ের ইঙ্গিত আছে। বৃহৎ বৃহৎ সেচ-পরিকল্পনার কথা না ভাবিয়া ছোটখাট রকমের সেচ-পরিকল্পনাগুলির জন্য দিকে দিকে সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারিলে সমস্ত ব্যাপারটি সহজ হইয়া পড়িবে। এই বিষয়ে পাক্ষিক "খাদ্য উৎপাদন" পত্রিকায় ১লা শ্রাবণ সংখ্যায় একজন পল্লিবাসী, শ্রীসন্তোষকুমার চক্রবর্ত্তী যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বিশেষ করিয়া বর্দ্ধমান বিভাগের নদী-নালার কথাই বলিয়াছেন। আমরা মনে করি, তাঁহার কথাগুলি সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে প্রযোজ্য:

> গবর্ণমেণ্ট যদি পশ্চিমবঙ্গের শীর্ণকায়া নদীগুলিতে ২।৩ মাইল অন্তর anicut (বাঁধ) নির্ম্মাণ করাইয়া যাহাতে ঐ সকল নদীর জল ধানচাষের সময় মাঠে পৌঁছায় তাহার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলেই Irrigation সমস্যার সমাধান হয়। পূর্ব্বে তাহাই হইত। আপনি যদি প্রমাণ চাহেন আমি তাহাও দিতে পারি। বর্দ্ধমান বিভাগের যে কোন জেলায় যাইয়া দেখুন কোনও অঞ্চলের মধ্য দিয়া যে ক্ষুদ্র-কায়া নদীটি চলিয়াছে তাহাতে বরাবর উভয় পার্শ্বের মাঠের সঙ্গে কাওনা বা হানার দ্বারা যোগসূত্র স্থাপিত করা রহিয়াছে। ঐ সকল কাওনা বা হানার এখন আর বিশেষ কোন কার্য্যকারিতা নাই, তবে সেগুলির চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। আমি যে গ্রামের বাসিন্দা, একটি ক্ষুদ্র নদী সেই গ্রামটিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়া আছে; আর উহা হইতে তিন স্থানে তিনটি কাওনা মাঠের দিকে রহিয়াছে।

এতৎ-সম্পর্কে আর একটা সমস্যার উল্লেখ করিতে চাই। গত ৩২শে আষাঢ় এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে একটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই আলোচনা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সেচ-বিভাগীয় সেক্রেটারী বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে সেচকার্য্যের জন্য যে ব্যয় হয়, চাষীর জমিতে জল লইয়া যাইতে গবর্ণমেণ্টের যে ব্যয় হয়, তার অংশ ভাগ করিয়া লইবার প্রবৃত্তি বাঙালীর মধ্যে নাই; গবর্ণমেণ্টের পরিচালনায় চাষের জমিতে যে জল-সরবরাহ করা যায় সেই ব্যবস্থা ব্যাহত হইতেছে জমির মালিক বা চাষীর বিরোধিতায়; যাহারা তাহাদের ক্ষেতে এই জল পায় তাহারা এই জলের মূল্য দিতে চায় না। (As regards extension of Government's irrigation service……the programme was meeting with increasing resistance as the users were less and less less prepared to pay for the service) এই আলোচনা-সভার বিবরণী আগষ্ট মাসের (Science & Culture) নামক ইংরেজী মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই মনোভাবের কারণ কি? বাঙালী সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়কেই এই অস্বাভাবিক মনোভাবের নিদান খুঁজিতে হইবে। অন্যান্য প্রদেশে এইরূপ মনোভাবের কথা ত শুনি নাই। বাঙালী কি আত্মঘাতী হইতে বদ্ধপরিকর?

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য-বিভাগ

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিম বাংলার স্বাস্থ্য-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। কিন্তু তাঁহার আমলে এমন কথা কেন শুনিতে হয়? ২০শে ফাল্গুনের বর্দ্ধমানের "দামোদর" পত্রিকায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে:

> বর্দ্ধমানের ইউনিয়নে ও থানায় সরকার পরিকল্পিত বহু-ঘোষিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা পল্লী হাসপাতালের জন্য পল্লী-বাসীরা কয়েক লক্ষ টাকা সরকারের তহবিলে জমা দিয়াছেন। টাকা জমা পড়িয়াছে প্রায় এক বৎসরের উপর হইল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইল না।…তাড়াতাড়ি যাহাতে দুই-চারিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ আরম্ভ হয় তাহার জন্য স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বহু দূর অগ্রসর হইয়াও নিরাশ হইয়াছেন। তাঁহারা এতটা অগ্রসর হইলেন কেন তাহার জন্যও নাকি পরোক্ষভাবে কৈফিয়ত চাওয়া হইয়াছে।

এইরূপ বিবৃতির পর জন-স্বাস্থ্যবিভাগ এই বিষয়ে কি করিয়াছেন, তাহা জানিবার অধিকার দেশের লোকের আছে। যখন এই কেলেঙ্কারি ঘটিতেছিল তখন ডাঃ অমিল চাটার্জ্জি জন-স্বাস্থ্যবিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন, তাঁহার বিভাগ ইহা নিবারণ করিতে পারিল না কেন? বর্ত্তমানে এই বিষয়ে কি হইয়াছে বা হইতেছে, আমরা তাহা জানিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

কোচবিহার, ত্রিপুরা, মণিপুর

২৬শে ভাদ্র হইতে কোচবিহার রাজ্য কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের শাসনাধীনে চলিয়া যাইতেছে। সম্প্রতি ইহাও ঘোষিত হইয়াছে ত্রিপুরা রাজ্য ও মণিপুর রাজ্য সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থার প্রবর্তন হইবে। এই ব্যবস্থা সাময়িক। স্বাভাবিক অবস্থায় কোচবিহার রাজ্যের পশ্চিমবঙ্গের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইত। মহারাজা এই ব্যবস্থার বিরোধী; রাজ্যে একদল লোক আছে যাহারা আসামের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে চায়; মহারাজাও তাহাতে সায় দিয়াছেন।

ত্রিপুরা রাজ্যও বাংলা-ভাষাভাষী; বঙ্গ বিভাগের পর ইহা পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তত্যাগী হিন্দুদের অনেকেই ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় পাইয়াছেন; রাজ্যের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে; আরও বাড়িবে।

এই সম্ভাবনার কথা মনে করিয়াই "পূর্ব্বাচল প্রদেশ" গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। প্রায় ২০।২৫ লক্ষ পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দু এই প্রদেশ গঠন করিয়া নিজের সার্থকতালাভ করিতে পারিতেন। মণিপুরী জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই নূতন প্রদেশগঠনে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এই প্রদেশের সঙ্গে মণিপুর রাজ্যের সংযোগসাধন করিয়া। তাঁহাদের একটা মাত্র সর্ত্ত ছিল—প্রদেশের রাষ্ট্র ভাষা ব্যবস্থায় মণিপুরী ভাষার স্থান থাকিবে; পূর্ব্বাচল প্রদেশ দ্বি-ভাষী হইবে।

কংগ্রেসের অব্যবস্থিতচিত্ততার ফলে তাহা হইল না। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন—"পূর্ব্বাচল প্রদেশ" গঠিত হইবে; এক সপ্তাহ পরে বদলে গেল 'মতটা'। কেন তার কোন উত্তর দেওয়া কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলেন না। আসামের আপত্তির কথা বুঝিতে পারি; কাছাড় জেলা ও ত্রিপুরার কোন কোন শ্রেণীর আপত্তির কথাও শুনিয়াছি। কিন্তু কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ পূর্ব্ববঙ্গের ২০।২৫ লক্ষ লোকের কথা ভাবিলেন না কেন, তাহা বুঝিলাম না।

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় প্রায় দেড় মাস পূর্ব্বে চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের মুখপত্র "নব-সঙ্ঘ" পত্রিকায় ১৬ই শ্রাবণ সংখ্যায় পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুর মনোভাব সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা তাঁহার অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত এই কথা মনে করিতে পারা যায়:

> পাকিস্থানীয় কার্য্যকলাপ দূর হইতে যতই মন্দ বলিয়া ধারণা করা হউক—উহা যে ক্রমেই ভাল হইতে আরও ভালর পথেই চলিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী অনায়াসেই বলিবে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য পূর্ব্ব হইতে সত্যই হ্রাস হইতেছে। যে সকল মুসলমান পাকিস্থান হইতে পশ্চিমবঙ্গে অথবা আসামে আসিয়া জড় হইতেছে তাহার মূলে আছে প্রকৃতির একটি সুস্পষ্ট সঙ্কেত। পেটের দায়ের চেয়ে ভারত সাম্রাজ্যে এইরূপ মুসলমানের ভিড় উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া আমাদের ধারণা। পাকিস্থানের হিন্দুরাই ক্রমেই বলিতে সুরু করিয়াছে আমরা পাকিস্থানের উন্নতি চাই, হিন্দুস্থানের নহে। এই সকল হিন্দু পাকিস্থানেই বসবাসের সুযোগ পাইতেছেন। যাঁহারা বাস্তত্যাগী তাঁহাদের দুঃখের কথা অবধারণ করিয়া পাকিস্থানের হিন্দু অধিবাসীবর্গ ক্রমেই সতর্ক হইয়া বাস্তত্যাগে আর ইচ্ছুক নহেন।
>
> ইহা ব্যতীত পাকিস্থানের নীতি অতিশয় সুস্পষ্ট। যখন ইহা পাকিস্থান তখন ইহাকে ইসলামধর্ম্মীর দেশরূপেই গণ্য করিতে হইবে। সেই দিকে ইসলামধর্ম্মী রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষগণের মতদ্বৈধ নাই। বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র হইতে বিচারালয়ে রাষ্ট্র-সংক্রান্ত সকল ব্যাপারেই ইসলামের নীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে। হিন্দুদের ইসলাম প্রীতি লইয়া এই ক্ষেত্রে বসবাসের বাধা যে ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে, তাহা স্পষ্টই প্রত্যক্ষ হয়। ইসলাম-জগৎ গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা সুচারুরূপেই পাকিস্থানে চলিয়াছে। স্কুলের ছাত্রগণ উর্দ্দু শিক্ষা করিয়া ইসলাম প্রীতি দেখাইতেছে। পাঠ্যপুস্তকগুলি ইসলামী সংস্কৃতিপূর্ণ। যখন আমাদের রাষ্ট্র-ধুরন্ধরগণ ইসলামধর্ম্মীদের জন্য ভারতের এক খণ্ড বিসর্জ্জন দিয়াছেন, সেই খণ্ডে ইসলামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা যে দৃঢ় করিতে হইবে, সে দিকে প্রত্যেক মুসলমান দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়াই চলিয়াছে। পাকিস্থানের হিন্দু অধিবাসীদের বুঝিতে হইবে তাঁহারা আর ভারতবাসী নহেন, মুসলমান রাজ্যের প্রজা। এই চেতনা ক্রমেই পাকিস্থানী হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে জন্মিতেছে।...

ভারতরাষ্ট্রের রেল-সমূহ

স্বাধীনতার দ্বিতীয় বার্ষিক উপলক্ষে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের প্রচার বিভাগ ভারতরাষ্ট্রের রেলসমূহের একটি কার্য্যবিবরণী বিলি করিয়াছেন। দেশবিভাগের পর রেলযাত্রীর সংখ্যা কমিয়া যায়; নিয়মনিষ্ঠ ট্রেনের সংখ্যা শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস পায়। এই বিবরণীর হিসাবে দেখা যায় যে, নিয়মনিষ্ঠা ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই হিসাবটা তুলিয়া দিলাম:

"সময়ানুবর্ত্তী" ট্রেনের শতকরা হিসাব

ব্রড গেজ

		১৯৪৮	১৯৪৯
১।	মেল ট্রেন	৪৫·৯	৭৫·১
২।	মিশ্রত ট্রেন	৬৩·৮	৭৫·৮
৩।	দুরাগমন ট্রেন	৭১·৫	৮৩·৭
৪।	প্যাসেঞ্জার ট্রেন	৫৪·৪	৭০·৫

আর একটা সংবাদে আমরা সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইব—

> ১৯৪৮-৪৯ সনে ভারতে রেলযাত্রিগণ ৩,৭০০ কোটি মাইল ভ্রমণ করেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই সংখ্যা ছিল ৮০ লক্ষ মাইল।

রেলে ভ্রমণ করিবার প্রয়োজন ও স্পৃহা কেন এরূপভাবে বাড়িয়া গিয়াছে, এই বিষয়ে গবেষণা করিলে আমাদের জীবন-যাত্রার নূতন পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যাইবে।

মাল চলাচলের পরিমাণ-বৃদ্ধির একটা হিসাব এই বিবরণীতে দেখিলাম। ১৯৪৮ সনের জুলাই হইতে ১৯৪৯ সনের জুন পর্য্যন্ত প্রতি মাসে গড়পড়তা মাল বোঝাই ওয়াগনের সংখ্যা বাড়িয়া ৩,১৫,২৩৪ হয়। ঐ সময়ে মিটার গেজ লাইনে গড়পড়তা ওয়াগনের সংখ্যা ১,৫১,২৭৮ হইতে বাড়িয়া ১,৮৩,৬৮৫ হয়। ১৯৪৯ সালের মার্চ্চ মাসে ব্রড গেজ লাইনে ৩,৫৫,৩৫৯ খানি এবং মিটার গেজ লাইনে ২,০৩,৮৯৮ খানি ওয়াগন ভর্ত্তি করা হয়।

দেশ বিভাগের পূর্ব্বে ১৯৪০-৪১ সনে প্রতিমাসে ব্রড গেজ লাইনে গড়পড়তা ৪,২৩,৮৮৯ খানি এবং ২,০৮,৫৮৫ খানি ওয়াগনে মাল বোঝাই করা হইত। দেশের ব্যবসায়ীশ্রেণী কিন্তু এই হিসাবে সন্তুষ্ট নয়। যখন রেল বিভাগের অসাধুতা কমে নাই তখন অবস্থার স্থায়ী উন্নতি হইয়াছে এই কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই। রেল বিভাগের কর্ত্তারা কিন্তু আমাদের ভরসা দিতেছেন :

> রেল চলাচল ব্যবস্থার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্ত বিদেশে যে সকল সাজসরঞ্জামাদির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে সেগুলি আসিয়া পৌঁছিলে এবং নূতন লাইন প্রতিষ্ঠা ও ষ্টেশন সম্প্রসারণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে অবস্থার আরও উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বিদেশে মোট ৭৬০ খানি ব্রড গেজের ও ২০৩ খানি মিটার গেজের ইঞ্জিন প্রস্তুতের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। উহার ভিতর বর্ত্তমান বৎসরের জুন মাসের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ২২০ খানি ব্রড গেজ ও ৩৩ খানি মিটার গেজ ইঞ্জিন ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

বাংলা ও আসাম রেলওয়ে

ভারত বিভাগের পর বাংলা ও আসামের রেল লাইনগুলির নূতন ভাবে যে বিলি-বন্দোবস্ত হইয়াছিল এখন দেখা যাইতেছে তাহা ভারতীয় স্বার্থের অনুকূল হয় নাই। আসাম রেলওয়ে আলাদা করিয়া গৌহাটিতে উহার হেড কোয়ার্টার্স করিবার সময়েই এখানে প্রতিবাদ হইয়াছিল যে, কলিকাতা হইতে হেড-কোয়ার্টার্স সরানো রেলের পক্ষে পরিণামে অসুবিধাজনক এবং অযথা অর্থব্যয়সাপেক্ষ হইবে। ইহা লইয়া সংবাদপত্রে আলোচনাও হইয়াছিল। আসাম রেল আলাদা করিবার পক্ষে এই যুক্তি দেওয়া হইয়াছিল যে, ভারত বিভাগের ফলে আসামের সহিত ভারতীয় ইউনিয়নের রেল-সংযোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রতিবাদে বলা হয় যে, ঐ সংযোগ স্থাপনের কাজ ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, দুই বৎসরের মধ্যেই উহা সম্পূর্ণ হইবে, সুতরাং কলিকাতা হইতে হেড-কোয়ার্টার্স সরাইবার প্রয়োজন নাই। তাহা ছাড়া আসাম রেলের একাউণ্টস এবং কমাসি-য়াল বিভাগ কলিকাতায় থাকিয়া যায়, সুতরাং অল্প আর কয়টি বিভাগের জন্ত হেড কোয়ার্টার্স গৌহাটিতে টানিয়া না লইয়া গিয়া আসাম রেলকে একটি রেলওয়ে ডিষ্ট্রিক্টে পরিণত করিলেই চলে। এই যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব কয়েকজন প্রাদেশিক স্বার্থকামী এবং ব্যক্তিগত স্বার্থপর লোকের চেষ্টায় ব্যর্থ হয় এবং আসাম রেল একটি স্বতন্ত্র রেলওয়ে ইউনিট হিসাবে গঠিত হয়। আসাম রেল ঘাটতি রেল, বহু কোটি টাকা উহাতে লোকসান হয়। কলিকাতা হেড কোয়ার্টার্সে উহার স্থান রহিয়াছে তৎসত্ত্বেও গৌহাটিতে বহু কোটি টাকা ব্যয়ে নূতন হেড কোয়ার্টার্স নির্ম্মাণের চেষ্টা আরম্ভ হয়। বনগাইগাঁওয়ে প্রায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নূতন ওয়ার্কশপ নির্ম্মাণেরও আয়োজন চলিতে থাকে।

এখন আসাম রেল সংযোগ সম্পূর্ণ হইয়াছে, আসাম এখন আর ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে রেল সংযোগে বিচ্ছিন্ন নহে। সুতরাং দুই বৎসর পূর্ব্বে যে যুক্তিতে আসাম রেল আলাদা করা হইয়াছিল এখন তাহার কোন প্রয়োজন নাই।

এই বন্দোবস্তের ফলে বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ে তিন টুকরা হইয়া যায়। এক অংশ যায় আসাম রেলে, দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের মালদহ, দিনাজপুর লাইনগুলি যায় অযোধ্যা-ত্রিহুত রেলের অধীনে এবং শিয়ালদহ এলাকা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলকে দেওয়া হয়। এই বন্দোবস্তের ফলে ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তের রেল লাইনগুলি তিন টুকরা হইয়া তিন কর্ত্তার অধীনে যাওয়ায় সামরিক দিক দিয়াও ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। প্রদেশ হিসাবে বাংলার ক্ষতি হইয়াছে অপূরণীয়। আসাম রেল আলাদা হইয়া গৌহাটিতে হেড অফিস যাওয়ার পরে সেখানে বাঙালী কর্ম্মচারীরা আক্রান্ত হন এবং অল্প দিনের মধ্যেই উচ্চপদস্থ প্রায় সমস্ত বাঙালী কর্ম্মচারী বদলী হন। আসাম রেলের জন্ত একটি পৃথক রেল সার্ভিস কমিশন গঠিত হয় এবং একজন বাঙালী বিরোধী অসমীয়কে উহার চেয়ারম্যান করা হয়। নিম্ন পদেও এই ভাবে বাঙালীর প্রবেশ রোধ করিবার ব্যবস্থা হয়।

কাঁচড়াপাড়ায় রেলের একটি বৃহৎ ওয়ার্কশপ আছে। তৎ-সত্ত্বেও আসামে বনগাইগাঁওয়ে প্রায় ১৫কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নূতন ওয়ার্কশপ নির্ম্মাণের আয়োজন হইতেছে। ইহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ব্যয়। আসাম সংযোগ লাইন সম্পূর্ণ হওয়ার

পর আসাম রেলের গাড়ী ইঞ্জিন এখন কাঁচড়াপাড়ায় আনা যায়। ব্রড গেজ লাইনের উপর মিটার গেজ মাপের একটি মাত্র লাইন পাতিলেই সরাসরি কাঁচড়াপাড়ায় গাড়ী আনা যায়। সৈদপুর ওয়ার্কশপে মিটার গেজ গাড়ী পাঠানোর এই বন্দোবস্তই আছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি।

সামরিক গুরুত্বের দিক দিয়াও ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তের রেল লাইনগুলি একটিমাত্র কণ্ট্রোলের অধীনে থাকা উচিত। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তিনটি আলাদা কণ্ট্রোল আছে—গৌহাটি, গোরক্ষপুর এবং কলিকাতা। ইহার ফলে যুদ্ধের সময় সামরিক গাড়ী যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটিতে পারে। সাধারণ এবং স্পেশাল ট্রেন টাইম-টেবিলের ভিন্ন কণ্ট্রোলের জন্য বাধা পাইতে পারে; সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ইহা নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়।

আসাম সংযোগ লাইন সম্পূর্ণ হওয়ার পর বেঙ্গল আসাম রেলকে পুনরায় পূর্ব্ববৎ এক কণ্ট্রোলের অধীনে কলিকাতা হেড অফিসে রাখিবার পক্ষে কোন বাধা নাই এবং সর্ব্ব সময়ের জন্য ইহাই সুবিধাজনক ও বাঞ্ছনীয়।

কলিকাতা হাইকোর্ট সংস্কার

কলিকাতা হাইকোর্ট বহুকাল পূর্ব্বে ইংরেজের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গঠিত হইয়াছিল। উহার আকারও সেই হিসাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এখন কলিকাতা হাইকোর্টের এলাকা কমিয়া আগের এক ষষ্ঠাংশে পরিণত হইয়াছে এবং বিচার পদ্ধতির পুরনো নিয়ম মানিয়া চলিবার দিনও শেষ হইয়াছে। উহার আমূল সংস্কার এখন আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সুখের বিষয়, ডাঃ বিধান রায় এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন এবং একটি বিলের খসড়া প্রস্তুত হইয়া উহা বিবেচনাধীন রহিয়াছে। এই সংস্কারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে এখন আর দ্বি-মত নাই বলিয়াই আমাদের মনে হয়। পত্রান্তরে হাইকোর্টের ব্যয়বাহুল্য সম্বন্ধে একটি হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। উহা এখানে উদ্ধৃত হইল :

কলিকাতা হাইকোর্টের এলাকা আগে ছিল সমগ্র বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ। একে একে সবই গিয়াছে, এখন বাকী আছে শুধু এক-তৃতীয়াংশ বাংলা। ইহার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় বৃহৎ হাইকোর্টের প্রয়োজন আর আছে কিনা খরচের দিক দিয়া এটা যেমন দেখা দরকার, তেমনি হাই-কোর্টের যে গঠনপ্রণালীর ফলে এতদিন সেখানে বড়-লোকদের সুবিধা এবং গরীবদের অসুবিধা হইয়াছে তাহারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক; হাইকোর্টের 'অরিজিনাল জুরিসডিকশন' একেবারে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজা দরকার। পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসাম চলিয়া যাওয়ায় আপীল বিভাগের কাজও অনেক কমিয়া গিয়াছে, সেখানেও ব্যয়সঙ্কোচের ক্ষেত্র যথেষ্ট আছে।

কলিকাতা হাইকোর্টে বর্ত্তমানে ১৭ জন জজ আছেন, গত বছরও ছিলেন ১৫ জন। চীফ জাষ্টিসের মাসিক বেতন ৬০০০৲ টাকা, জজদের ৪০০০৲ টাকা; মোট বেতন ৮,১২,০০০৲ টাকা। ইহার উপর সাহেব জজদের বিলাত যাওয়ার খরচ আছে ৪০০০৲ টাকা। আদিম বিভাগে গত বছর ছিলেন ১১ জন রেজিষ্ট্রার, ডেপুটি রেজিষ্ট্রার প্রভৃতি; এলাকা এবং কাজ কমিবার পরও ইঁহাদের সংখ্যা আর এক জন বাড়িয়াছে। ইঁহাদের বেতন ২০০০৲ টাকা ও তন্নিম্নে; মোট বেতন ৯৫০০০৲ হাজার টাকা। ইহার উপর আছেন এক জন ১৮০০৲ টাকা বেতনের অফিসিয়াল রেফারি এবং তাঁর এক জন ৭৬০-১০০০৲ বেতনের সহকারী। এই দুই জনের বেতন বাবদ বছরে খরচ ৩১,০০০ টাকা। এই বিভাগে গত বৎসর ছিল ৫ জন দোভাষী ও অনুবাদক, এবার হইয়াছে ১০ জন। ইঁহাদের মোট বেতন ৪১,০০০ টাকা। ১৭০ জন সহকারী কর্ম্মচারীর মোট বেতন ২,৪৫,০০০ টাকা। (গত বৎসর অপেক্ষা ১ জন কম)। ৬৯ জন চাপরাশী (গত বৎসর অপেক্ষা ২ জন বেশী)। এর উপর অস্থায়ী কর্ম্মচারীদের জন্য বরাদ্দ ২৯,০০০ টাকা। এই বিভাগের কর্ম্মচারীদের বাড়ীভাড়া ৩৯,০০০ টাকা; মাগ্‌গি ভাতা ১,৪৫,০০০ টাকা, রেশন না দিলে নগদ ভাতা ১৩,০০০ টাকা, মফস্বলবিশদের পারিশ্রমিক ১২,০০০ টাকা এবং ইহাদের মাগ্‌গি বোনাস ১২,০০০ টাকা ইত্যাদি। আদিম বিভাগের রেজিষ্ট্রারের আপিসের মোট খরচ ৮,২০,৭৮০ টাকা। এই বিভাগে কলিকাতার হাইকোর্ট-এলাকার অন্তর্ভুক্ত যত দেওয়ানী মামলা হয়, তার কোর্ট ফী বাবদ আয় কত হয় তাহা বাজেটে আলাদা দেখানো হয় না। আমরা যত দূর জানি তাহাতে মনে হয় ইহার আয় খুব কম, কারণ হাইকোর্টে আদিম বিভাগে যত টাকার মামলাই হউক না কেন কোর্ট ফী বড় জোর ৩০৲ টাকা লাগে। সার্কুলার রোডের বা মারাঠা ডিচের অপর পারের মামলা যায় আলিপুরে, সেখানে যত টাকার মামলা তার উপর ফী লাগে, তাহার পরিমাণ যথেষ্ট বেশী। হাইকোর্টের আদিম বিভাগে কোর্ট ফী বাবদ যে টাকা সরকারে আসিবার কথা, প্রকৃতপক্ষে সেই টাকাটা যায় সলিসিটরদের পকেটে। একদিকে গঙ্গা ও মারাঠা ডিচ্, বাকী তিন দিকে সার্কুলার রোড—শুধু মাত্র এই চত্বরটুকুর জন্য এত টাকা ব্যয়ে একটা আদিম বিভাগ রাখিবার আবশ্যকতা কি? কলিকাতা কর্পোরেশনের সমগ্র এলাকাকে আদিম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহাতে সিটি কোর্ট গঠন করা যাইতে পারে।

হাইকোর্টে একটি 'ইংলিশ ল' অফিসার' বিভাগ আছে। ১ জন এডভোকেট জেনারেল, বেতন ২,০০০ টাকা, ২ জন ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেল, বেতন দুই জনের বছরে ১৮,০০০ টাকা, ১ জন গবর্মেণ্ট সলিসিটর, বেতন বছরে ২২,০০০ টাকা। এই বিভাগটির মোট খরচ ৭৪,১০০ টাকা।

হাইকোর্টের আদিম বিভাগের এই সমস্ত অনাবশ্যক ব্যয়-বাহুল্য এখন আর কেন থাকিবে? বোম্বাইয়ের মত সিটি কোর্ট করিয়া দিলে অনেক খরচ কমিয়া যায়, সাধারণের সুবিধা হয় এবং সরকারের আয় ৫০.৬০ লক্ষ টাকা বাড়িয়া যায়। জমিদারী উচ্ছেদের জন্য অনেক আন্দোলন চলিতেছে, অথচ এটর্নী সলিসিটার প্রথার অবসান যে তার চেয়ে কিছু মাত্র কম কাম্য নয়, একথাটা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি কেন? লালগোপাল মুখার্জি, প্রমথচরণ ব্যানার্জি, বিচারপতি রাণাডে প্রথম জীবনে সাব-জজ ছিলেন। এখনও এমন অনেক সাব-জজ আছেন যাঁহারা সুযোগ পাইলে হাইকোর্টের জজরূপে খ্যাতি অর্জন করিতে পারেন। সুতরাং সাব-জজদের লইয়া সিটি কোর্ট গঠন করা তো যায়ই, হাইকোর্টের জজীয়তীতে এখন আর ব্যারিষ্টার ও আই. সি. এস. না দিয়া সেখানেও পুরনো অভিজ্ঞ সাব-জজ, জেলা জজ প্রভৃতিকে লওয়া যাইতে পারে। ডাঃ বিধান রায়ের আমলে তিন জন আই-সি-এসকে হাইকোর্টের জজ করা হইয়াছে, ইহার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া এখন আর লোকে মনে করে না। ব্যারিষ্টার এবং এডভোকেট এই দুই কৃত্রিম শ্রেণী ইংরেজ গবর্মেণ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাহা একেবারে দূর হওয়া আবশ্যক এবং তাঁহাদের ফী এখনকার মত লক্ষপতি এবং ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের উপযুক্ত আকাশচুম্বী না হইয়া মানুষের দেয় ক্ষমতার সীমার মধ্যে নামিয়া আসা উচিত।

কলিকাতার ইংরেজ ব্যারিষ্টারদের সম্বন্ধেও আমাদের নিয়ম বদলাইবার সময় আসিয়াছে। লণ্ডনে এখানকার কোন এডভোকেট গিয়া প্র্যাকটিস করতে পারেন না, তাঁহাকে ব্যারিষ্টারি পাস করিতে হয়। এইটুকু মাত্র সুবিধা তাঁহাকে দেওয়া হয় যে, তিন বৎসরের বদলে তিনি দুই বৎসরে পরীক্ষা দিতে পারেন। আমাদের এডভোকেটদের বিলাতে প্র্যাকটিসের অবাধ অধিকার যদি না দেওয়া হয় তবে বিলাতে পাস ব্যারিষ্টারদেরও এখানে অবাধ প্র্যাকটিসের সুবিধা বন্ধ করিয়া দেওয়া দরকার। চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্টস আইনে একাউণ্ট্যাণ্টদের সম্বন্ধে এই পারস্পরিক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এ বিষয়ে হায়দরাবাদ যে দৃঢ়তা দেখাইয়াছে তাহা আমাদের অনুসরণযোগ্য। আমাদের দেশ হইতে অতঃপর বিলাতে ব্যারিষ্টারি পড়িতে পাঠানো একদম বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত, ইহাতে ষ্টার্লিং অপচয়ও অনেক কমিবে।

কলিকাতা হাইকোর্টে একটি ফৌজদারী বিভাগ আছে। হাইকোর্টের এলাকায় সেসন-সোপর্দ মামলার বিচার সেখানে হয়। তার জন্য ৪০০০ টাকা বেতনের একজন জজ, ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেল, জুনিয়ার ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেল, পাবলিক প্রসিকিউটার প্রভৃতি ব্যয়বাহুল্যের কি প্রয়োজন আছে? আলিপুরে সেসন জজ বা অতিরিক্ত সেসন জজের আদালতে একজন পাবলিক প্রসিকিউটার যদি বড় বড় ফৌজদারী মামলা চালাইতে পারেন, তবে শহরেই বা চলিবে না কেন? শিয়ালদহ ষ্টেশনে খুন হইলে বিচার হইবে আলিপুরে, আর একশ' গজ দূরে বৌবাজারে খুন হইলে তাহার জন্য হাইকোর্টে যাইতে হইবে ইহার মধ্যে কোন যুক্তি নাই। এই বৈষম্য এবং অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য যত শীঘ্র দূর হয় ততই ভাল। শুধু জুরীদের টিফিনের পয়সা বন্ধ করিয়া আর কতটা ব্যয় সঙ্কোচ হইবে?

কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিস ইংরেজ; ভারতবর্ষে আর কোন হাইকোর্টে ইংরেজ চীফ জাষ্টিস নাই। এই কলঙ্ক বাংলা একা বহন করিবে কেন?

জাহাজের ব্যবসায় ও নাবিক বৃত্তি

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা নগরীর জাহাজ-ঘাটার কোন জাহাজী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুষ্ঠিত এক সভায় ভারতরাষ্ট্রের জাহাজী ব্যবসায়ের নানা অসুবিধার কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। বিদেশী জাহাজী প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ অন্যায় প্রতিযোগিতা ও তাঁহাদের যুগ-যুগ-ব্যাপী একচেটিয়া ক্ষমতার অপব্যবহারের উল্লেখ করেন। প্রতি বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের শিল্প, বিজ্ঞান ও কৌশলের নিকট আমাদের হাতধরা হইয়া থাকিতে হইতেছে; এই অস্বাভাবিক অবস্থার কথারও তিনি উল্লেখ করেন। ভারতরাষ্ট্র করিৎকর্ম্মা ও তৎপর হইলে অদূর ভবিষ্যতে এই অবস্থার প্রতিকার হইবে।

ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দকে নাবিক-বৃত্তিতে পটু করিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে ডাঃ মুখোপাধ্যায় কিছুই বলেন নাই। কলিকাতার বন্দর ও জাহাজ-ঘাটায় সামান্য একটু চলাফেরা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক ভারতরাষ্ট্রের জাহাজী ব্যবসায় চালাইতেছে; ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক "খালাসী"রূপে ভারতরাষ্ট্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দরের শ্রমবহুল সব কাজ চালাইতেছে; তাহারা হাত গুটাইলে কলিকাতার বন্দরের সব কাজই অচল হইয়া থাকিবে। এই অস্বাভাবিক অবস্থা বুঝিবার জন্য কোন বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় না।

দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেকার সমস্যা বিরাটরূপে দেখা দিতেছে; জমিহীন মজুরের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই কোটি কোটি বেকার লোককে ভারতরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ নাবিক-বৃত্তির নূতন উপায়ের পথে দ্রুত পরিচালিত করিতে পারিতেছেন না—এই প্রশ্ন আমরা করিতে চাই। সম্প্রতি "Inland Water Transport" নামক একটি কমিটি সরকারী ভাবে গঠিত হইয়াছে আমরা জানি। কিন্তু তাহার কার্য্যক্রম সম্পর্কে কোনও বিবরণ আমরা পাই নাই।

এই প্রসঙ্গে বিলাতের একখানি সচিত্র পত্রিকার একটি ছবিতে ঐ দেশের জাহাজী ব্যবসায়ীদের উদ্যোগ-আয়োজন দেখিয়া নিজেদের অবস্থার কথা না ভাবিয়া পারিলাম না। জাহাজ কোম্পানীর নিজেরা উদ্যোগী হইয়া ১৫ হইতে ১৮½ বৎসরের কিশোরকে নাবিক-বৃত্তিতে শিক্ষা দিয়া থাকে।

পঞ্চায়েৎ-রাজ

যুক্তপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েৎ-রাজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন-উদ্যোগ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ১৯৪৭ সালে এতদুদ্দেশ্যে আইন পাস হয়। গত ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভ্য নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। এই প্রদেশে ১,১৪,২১৫টি গ্রাম আছে; প্রদেশের লোকসংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লক্ষ। তিন-চারিটি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া একটি গাঁও সভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; তার সংখ্যা প্রায় ৩৫,০০০; প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই তাহাদের সভ্য; এইরূপ সভ্যের সংখ্যা ২ কোটি ৭০ লক্ষ ২০ হাজারের উপর। গাঁও-সভার দৈনন্দিন কার্য্য চালাইবার জন্য গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; তাহাদের সংখ্যা ৩৪,৭৫৫; প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতের সভ্য-সংখ্যা ৩০ জন হইতে ৫১ জন। এই গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভ্য-সংখ্যা ১৩ লক্ষ।

বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রামকে একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। বাঙালী, মাদ্রাজী, মারাঠীদের মধ্যে এই শহরমুখী ভাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল; কারণ তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথমে ইংরেজী শিক্ষা উৎসাহের সহিত গ্রহণ করেন। অন্যান্য লোকসমষ্টির মধ্যে গ্রাম-পঞ্চায়েতের পরীক্ষা চলিবার পর কি ইহাদের মধ্যে এই ব্যবস্থা চালু হইবে? বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখপাত্ররূপে ডা: ভীমরাও আম্বেদকারের নাম করা যায়। তিনি গণ-পরিষদের এক অধিবেশনে প্রাচীন ভারতের গ্রাম্য-সমাজ-ব্যবস্থার অকুণ্ঠ নিন্দা করিয়াছিলেন। প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই ব্যবস্থার প্রশংসা করিয়া সেই আদর্শ ফিরাইয়া আনিবার প্রস্তাব তাঁহার "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে করিয়াছিলেন। সেই সভার সভাপতি ছিলেন ৺রমেশচন্দ্র দত্ত। তারপর গান্ধীজী এই ব্যবস্থাই তাঁহার স্বরাজের আদর্শের ভিত্তি করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। যুক্তপ্রদেশে পঞ্চায়েৎ-রাজ প্রতিষ্ঠার সময়ে তাহা একান্ত প্রাসঙ্গিক:

> আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য্য রাজা করিয়াছেন; কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্য্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল, তবু আমাদের সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্ম্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জে, আমাদের আম-কাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভঙ্করী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডী-মণ্ডপে রামায়ণ-পাঠ হইতেছে এবং কীর্ত্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রী-ভ্রষ্ট হয় নাই।

মার্কিনী সংবাদপত্রে বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা

"নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স" পত্রিকার ৪ঠা জুনের বিশেষ সংখ্যায় এক জন মার্কিন পর্য্যটক মি: মার্টিন বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের গতি-পরিণতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার কিয়দংশের অনুবাদ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তুলিয়া দিলাম:

> "গত বিশ বৎসর যাবৎ বাংলা ভাষার মধ্যেই ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।
>
> "বর্ত্তমানে ভারতীয় সাহিত্যের উপর দুইটি বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক প্রবাহের আঘাত পড়িয়া ইহাকে বেশ খানিকটা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে। একদিকে কম্যুনিষ্টরা চায় সাহিত্যকে তাহাদের নিজেদের আদর্শের ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে; অন্যদিকে কংগ্রেসপন্থীরা চায় সাহিত্যের মধ্যে অতিমাত্রায় দেশপ্রেমের রং চড়াইতে। ইহাতে কবিতা, গল্প এবং সমালোচনা—সব কিছুতেই আজকাল যেন কোন-না-কোন রাজনৈতিক মতবাদের ছাপ লাগিতে দেখা যায়।
>
> "ভারতীয় সাহিত্যে ভারতের পুরাতন বিষয়বস্তুসমূহ বর্জ্জন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে এলিয়ট, প্রাউষ্ট এবং জয়েস প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের অনুকরণ প্রচেষ্টার মাঝে মাঝে যে বাধার সৃষ্টি হয় তাহা নেহাতই একটা সাময়িক ব্যাপার।
>
> "আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অদূর ভবিষ্যতে এমন এক দিন আসিবে যখন আর এইরূপ ঘটিবে না এবং যখন ভারতীয় এবং পাশ্চাত্যের সাহিত্যিক ঐতিহ্যগুলি সবই এক ছাঁচে ঢালাই হইয়া পারস্পরিক সংগঠনের কাজে নিযুক্ত হইবে।"

এই "এক ছাঁচে ঢালাই" সাহিত্য কি বস্তু হইবে, তাহা দেখিবার বিষয়। বিশ্ব-বোধের নূতন অনুভূতি ভারতীয় মনের উপর কি ছাপ ফেলিবে, এবং তার প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় সাহিত্য কি রূপ ধারণ করিবে, তৎসম্বন্ধে কল্পনা করা কঠিন।

ভিয়েটনামে যুদ্ধ

ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটা "গতি" হইতেছে। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তার সঙ্গে ডাচ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ প্রায় ২৮ মাস চলার পর সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘ এই সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে, এবং ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্রের সত্তা

স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু ইন্দো-চায়নায় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম ১৯৪৫ সালের আগষ্ট হইতে আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টি দিবার প্রবৃত্তি কাহারও হইল না দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। রাষ্ট্রনায়ক হো-চি-মিন্‌হ-এর নেতৃত্বে এই যুদ্ধ চলিতেছে। ফরাসী গবর্মেণ্ট কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়াও, লক্ষ লক্ষ ফরাসী সৈন্য নিযুক্ত করিয়াও অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনিতে পারিতেছে না। গত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কাম্বোডিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ বাও-ডাই অনেক ধস্তাধস্তির পর ফরাসীর পক্ষ হইয়া শেষ চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হন। সেই চেষ্টা বিফল হইতেছে। সাইগন প্রভৃতি কয়েকটি শহর ছাড়া কোথাও ফরাসী শাসন-যন্ত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। মার্কিন মুলুকের প্রতিষ্ঠাবান সংবাদ পত্রসমূহ পর্য্যন্ত বাও-ডাই-এর উপস্থিতির সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ ও বিরুদ্ধ মত পোষণ করে দেখিতেছি। তবুও সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘের নেতৃবৃন্দ নীরব, নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছেন। এই নিশ্চেষ্টতা জাতি-সঙ্ঘের মুখে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিতেছে।

চীনের অদূর ভবিষ্যৎ

চীনের বিপর্য্যয়ের পর এশিয়া-খণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মার্কিনী সংবাদপত্রে অনেক আলোচনা হইতেছে। এটা স্বাভাবিক, কারণ প্রায় গত সাত বৎসর হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সাহায্যের জন্য তার কুবেরের ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছে। এত সাহায্যের পরও চীনের জাতীয়তাবাদী শাসক-সম্প্রদায় তাঁহাদের শাসন-ব্যবস্থা অটুট রাখিতে পারিলেন না। ইহার ফলে মার্কিনের সম্মুখে কর্ত্তব্য গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। জেনারেলিসিমো চিয়াং-কাই-শেককে দোষী সাব্যস্ত করিলেও সান্ত্বনা পাওয়া যাইতেছে না। ওয়াশিংটনস্থ "ওয়াশিংটন ষ্টার" পত্রিকায় মার্কিন মনোভাবের একটা পরিচয় পাওয়া যায়:

> বর্ত্তমানে পরিস্থিতি যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে বহু বৎসর ধ'রয়া সমরনায়কবৃন্দ, জাপানী এবং কম্যুনিষ্টদের সহিত যুঝিবার পর চীন আজ অন্ততঃ সাময়িকভাবেও আভ্যন্তরীণ শান্তি, ঐক্য এবং স্বাধীনতা লাভের সুযোগ হারাইয়াছে। এখন এই বিরাট দেশটির ভাগ্যে বোধ হয় ক্রেমলিনের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া ছাড়া উপায় নাই। আর ইহার ফলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যাহা দাঁড়াইতেছে তাহা এইরূপ: জাতিসঙ্ঘে হয়তো এখন হইতে চীনদেশ রাশিয়ার পক্ষ সমর্থন করিবে; হয়তো বা চীনের প্রতিবেশী দেশগুলিতে রক্তপতাকাবাহীদের অত্যাচার সুরু হইতে পারে; হয়তো প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন এলাকায় একটা অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে; সেখানকার রাজনৈতিক ভারসাম্য পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

এই অবস্থায় ভারতরাষ্ট্রের মনোভাব সম্বন্ধে কৌতূহলের অন্ত নাই; এরূপ আলোচনাও মার্কিনে দেখা যাইতেছে। একজন মার্কিনী সাংবাদিক শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—চীনের বিপর্য্যয়ের পর ভারতরাষ্ট্রের উপরই কি এশিয়াখণ্ডের নেতৃত্বের ভার আসিয়া পড়িবে না? ভারতরাষ্ট্রের দূত অতি সাবধানে উত্তরটি এড়াইয়া গেলেন। চীনের বিপর্য্যয়ে ভারতরাষ্ট্রের নীতির সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে কি করিতে হইবে বা না করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে স্থির করিয়া কেহই কিছু বলিতে পারে না। কারণ ৪৫ কোটি লোকের চিন্তা ও কর্ম্মের প্রভাব দুনিয়ার রাষ্ট্রিক ব্যাপারে অঘটন ঘটাইতে পারে।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের উত্তর সাবধানী হইতে পারে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রের তেত্রিশ কোটি নর-নারীর মনোভাব এই বিষয়ে সজাগ করিয়া তুলিতে না পারিলে, আমরা শান্তিতে থাকিতে পারিব না। বহুদিন পূর্ব্বে মার্কিনরাষ্ট্রে শিক্ষিত শ্রীকৃষ্ণলাল শ্রীধরণী একটা উক্তি করিয়াছিলেন; বর্ত্তমানে তাহা স্মরণীয়। ভারতবর্ষের মন দোটানায় পড়িয়াছে—এক দিকে ভারতবর্ষের নয় কোটি মুসলমানের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাকে মধ্য-প্রাচ্যের কর্ম্মধারার সঙ্গে জড়াইয়া ফেলিতেছে; অপর দিকে তার ত্রিশ কোটি নর-নারীর হিন্দু-বৌদ্ধ ঐতিহ্য তাকে প্রাচ্যের দিকে টানিয়া লইতেছে।

"পাকিস্থান" প্রতিষ্ঠার পর ভারতরাষ্ট্রে মুসলমানের প্রভাব কমিয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির আকর্ষণ বর্ত্তমান জগতে কতটা দুর্ব্বল তাহা সুবিদিত। প্রাচ্য দেশসমূহের অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এই কথা মনে রাখিয়া ভারতরাষ্ট্রকে চলিতে হইবে। বিলাতের এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে ইতিমধ্যেই প্রচার আরম্ভ হইয়াছে যে, ভারতরাষ্ট্র এশিয়ার নেতৃত্ব পদের জন্য কাঙাল; পাকিস্থানীরাও ইহাতে পোঁ ধরিয়াছে।

সোভিয়েটরাষ্ট্রে দাসত্ব প্রথা

সম্প্রতি আমেরিকার দুইটি বৃহত্তম শ্রমিকসংগঠন—আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার এবং কংগ্রেস অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অর্গানিজেশন্‌স্—পৃথক পৃথক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জাতি-সঙ্ঘের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে রাশিয়ার দাস-শ্রমিক প্রথা সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করেন। এ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে তথ্যপূর্ণ দলিলটি প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার দ্বারাই এই শ্রমিক প্রতিষ্ঠান দুইটি জাতিসঙ্ঘের নিকট উপরোক্ত অনুরোধ জানাইতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন।

উভয় সংগঠন হইতেই বলা হইয়াছে যে, কোনও দেশে যদি শ্রমিকদের উপর এই ধরণের অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তবে সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিকরাই তাহার দ্বারা আহত হন। ইহাতে মনুষ্যত্বের যে অবমাননা হয় তাহাতে জগতের সমস্ত শ্রমিক-শ্রেণীই নিজদিগকে অপমানিত বোধ করেন।

আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার-এর সরকারী মুখপত্র "আমেরিকান ফেডারেশনিষ্ট"-এর চলতি সংখ্যায় ইহার আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্পর্ক কমিটির সদস্য ম্যাথু ওল-এর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবৃতিতে মিঃ ওল বলেন :

যত দিন পর্য্যন্ত রুশ সাম্রাজ্যের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বিংশ-শতাব্দীর নয়া দাস-শ্রমিক প্রথার পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে তাহাদের দুর্ব্বহ জীবনভার বহিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন তত দিন পর্য্যন্ত মানবসমাজ নিজেকে স্বাধীন ভাবিতে পারিবে না।

রাশিয়ার দাসশ্রমিক প্রথার ইতিহাস প্রকাশিত হইবার পর কংগ্রেস অব্ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানিজেশন্‌স্-এর কর্ম্মসচিব ও কোষাধ্যক্ষ জেম্‌স্ বি, ক্যারী বলেন :

আজিকার দুনিয়ায় দাস-প্রথা অচল। কিন্তু যদি কোথাও সত্য সত্যই সামন্ততান্ত্রিক আমলের এই কু-প্রথার অস্তিত্ব এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া থাকে তবে সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান হওয়া অত্যাবশ্যক। আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে, জগতের কোন অংশে যদি দাস-প্রথার অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে, তবে তাহার ফলে সমগ্র জগতের স্বাধীনতা ব্যাহত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

এই অভিযোগের উত্তরে সোভিয়েটের "প্রাভদা" বলেন :

এই সকল সংশোধনী শিবিরে যে সকল নাগরিক অন্তরীণ হইয়া থাকে তাহারা এরূপ অধিকার ভোগ করিয়া থাকে যাহাতে পুঁজিবাদী দেশসমূহের তথাকথিত স্বাধীন নাগরিকগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিতে পারে।

জেনেভায় জাতিসঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সম্মুখে দাস-শ্রমিক শিবির সম্পর্কিত বিষয়টি প্রথম উপস্থিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে ব্রিটেনের প্রতিনিধি রাশিয়ার এই বাধ্যতামূলক শ্রম আইন সম্পর্কিত একটি প্রামাণ্য দলিল দাখিল করেন।

এই বিতর্কে যোগদান না করিয়াও এ কথা বলা যায় আনুষ্ঠানিক ভাবে দাস-শ্রমিক প্রথা প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রে বাতিল হইলেও অভাবের তাড়নায় বাধ্যতামূলক শ্রমকেও বর্ত্তমান জগতের মনোভাব দাসত্ব-প্রথার সমপর্য্যায়ে ফেলিয়াছে। এমন কোন দেশ নাই, যেখানে এই অভাব নাই ; অভাবের তাড়নায় পরিশ্রম নাই। সুতরাং সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের অর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদে সোভিয়েটরাষ্ট্রে "এক কোটি" দাস-শ্রমিক সম্বন্ধে যে-অভিযোগ আনা হইয়াছে, তৎ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ১১ জন সভ্য লইয়া এরূপ একটা অনুসন্ধানের প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রায় অনুরূপ একটা প্রস্তাব সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে করা হইয়াছিল ; পার্থক্য কেবল যে, শেষোক্ত প্রস্তাবানুসারে কেবল "ট্রেড ইউনিয়ন"-সমূহ হইতে এই আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানের জন্য সভ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে। সোভিয়েট প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। দুই বিরোধী রাষ্ট্র-গোষ্ঠির মধ্যে হয়ত কেবল গালাগালিই চলিতে থাকিবে।

ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য জাতি

এই মর্ম্মের শিরোনামে একখানি ইংরেজী পুস্তক পাঠ করিতেছিলাম। প্রায় ৪৩ লক্ষ লোকের এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র শিল্প ও শিক্ষা সম্বন্ধে কি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহা ঐ পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। ইউরোপের তিনটি ভাষাভাষী ফরাসী, জার্ম্মান ও ইটালীয়ান লোক এই রাষ্ট্রে বাস করে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভাষা লইয়া কোন বিরোধ নাই। তিনটি ভাষাই রাষ্ট্রের ভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এরূপ ঔদার্য্য বর্ত্তমান যুগে বিরল। এই ঔদার্য্যের কল্যাণেই সুইজারল্যাণ্ড খণ্ড-বিখণ্ড ইউরোপের মধ্যে আপনার সত্তা বজায় রাখিয়াছে ; বাস্তব জীবনে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রয়োগে এইরূপ উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই কথাটাই বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস নূতন করিয়া আমাদের শুনাইয়াছেন। গত ৪ঠা ভাদ্রের আনন্দবাজার পত্রিকায়—"শিক্ষা ও শিল্পের মিলন—সুইজারল্যাণ্ড" এই শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্র দেশের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন :

কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংও জুরিখে খুব ভাল পড়ান হয়। এই বিভাগের একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হ'ল। সে ফারমেনটেশন বিষয়টি বিশেষভাবে শিক্ষা করছে। তার সঙ্গে আলাপে বুঝলাম—তাদের এই শিক্ষা শিল্পোন্নয়নে বিশেষ উপকারী। আমাদের দেশের ছেলেরা যদি জুরিখে এই বিষয় শিক্ষা করতে যায় তবে তারা দেশে ফিরে তাদের অর্জ্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা দেশের প্রভূত মঙ্গল করতে পারবে বলে আমার দৃঢ় ধারণা। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার আমেরিকায় সব ছাত্র না পাঠিয়ে জুরিখে কয়েকজনকে পাঠালে ভাল হয়। তবে শিক্ষার্থীদের এখন থেকেই জার্ম্মান ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করে যাওয়া উচিত। আশা করি দেশের শিল্পোন্নতিকামী কেন্দ্রীয় সরকার ও উচ্চাভিলাষী ছাত্রগণ এ বিষয়ে অবহিত হবেন।

এতদিন বিলাত যাইবার হুজুগ ছিল ; বর্ত্তমানে মার্কিন দেশে যাওয়া ফ্যাশন হইয়াছে। আমাদের নূতন শাসকশ্রেণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশে ছাত্র পাঠাইলে অধিক লাভবান হইবেন।

পুলিনবিহারী দাস

স্বদেশী যুগের স্মৃতিপূত আর একজন লোক-নেতার তিরোভাব হইল ; ঢাকা অনুশীলন সমিতির সংগঠক, বাংলা দেশে কাত্রবৃত্তির পুনরুদ্ধারক পুলিনবিহারী দাস গত ৩২শে শ্রাবণ দেহত্যাগ করিয়াছেন।

পুলিনবিহারী যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেন সেই সময়ে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ পাশ্চাত্য সভ্যতা সাধনার মোহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা রামকৃষ্ণ-কেশব সেনের যুগ; বঙ্কিমচন্দ্র, দয়ানন্দ সরস্বতী, থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটি ও সার সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে মুসলিম জাগরণের কাল।

পুলিনবিহারীর যৌবনে ভাবরাজ্য হইতে কর্ম্মরাজ্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে; রাজনীতিক্ষেত্রে আবেদন-নিবেদনের ডালী বহিবার হীনতাবোধ জাগ্রত হইয়াছে। মুদ্ররা পর্য্যন্ত বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন: ইংরেজ আমাদের তাড়া করিয়া মারিবে ইঁদুরের মত; তা সহ্য করিব না।

ভাব-জগতের এই বিপ্লব কর্ম্মজগতে মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে বিলম্ব হইল না। এক বাঙালী খ্রীষ্টান, প্রমথ মিত্র (ব্যারিষ্টার পি. মিত্র) এই বিপ্লবের একজন ধারকরূপে দেখা দিলেন, অন্যদিকে আসিলেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। এই দুই জনের প্রেরণায় বাঙালী যুবকবৃন্দ বিপ্লব-ধর্ম্মী হইয়া উঠিল। পুলিনবিহারী ইঁহাদের অগ্রগণ্য একজন; ঢাকা নগরী তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল; কলিকাতায় ৺সতীশ বসুর উপর অনুশীলন সমিতি সংগঠনের ভার পড়িয়াছিল। পুলিনবিহারীর নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির ৫০০।৬০০টি শাখা বাংলাদেশ ও আসামে বিস্তার লাভ করে। ব্রিটিশ নীতি এই সংগঠন সহ্য করিল না; তাহাদের রাজ্য যে ধ্বংস করিবে তাহাকে বাড়িতে দেওয়া রাজনীতি নয়। সুতরাং পুলিনবিহারী অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা প্রভৃতির সঙ্গে অন্তরিত হইলেন।

তাঁহারা ১৯০৯ সালে এই বন্দী অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু পরে পুলিনবিহারী ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়াইয়া পড়িলেন। সাত বৎসর আন্দামান দ্বীপে থাকিয়া ১৯২১ সালে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তখন গান্ধী-যুগের আরম্ভ; দেশের গণ-মন উৎসাহ-উদ্দীপনায় উচ্ছসিত। গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় জাতীয় মহাসমিতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় রূপে অহিংসা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। পুলিনবিহারী কখনও কংগ্রেসী রাজনীতি গ্রহণ করেন নাই; এখনও গ্রহণ করিতে পারিলেন না। গান্ধীবাদ ও গান্ধী নীতির বিরোধিতা করিলেন। এই বিরোধিতা দেশের মন সহজে গ্রহণ করিবে না বুঝিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন তাঁহার যৌবনের ব্রতে—দেশের মধ্যে ক্ষত্রিয় ভাবের ও বৃত্তির পুনরুজ্জীবনে। ১৯৪৬-৪৭ সালে, কলিকাতায় সাংঘাতিক প্রলয়ের মধ্যে ঐ শিক্ষার ফল দেখা যায়। তিনি শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন—এই ব্রত জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। বাঙালীর দুর্ভাগ্য যে দেশের নূতন শাসক-শ্রেণী তাঁহার শক্তি ও সাধনার সদ্ব্যবহার করিতে পারিল না।

নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বদেশী যুগের আবহাওয়ার মানুষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, "ডন সোসাইটির" প্রতিষ্ঠাতা ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাহচর্য্যে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নৃপেন্দ্রচন্দ্র জীবনের যাত্রাপথ আরম্ভ করেন। বাংলাদেশের সরকারী কলেজে জীবিকার্জ্জনের জন্য অধ্যাপনা অবলম্বন করিলেও স্বদেশী যুগের প্রভাব তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে নানাভাবে পরিস্ফুট হইত। সেইজন্য মনে হয় যে তিনি ইংরেজ আমলাতন্ত্রের নিকট অনেকটা হেঁয়ালি থাকিয়া গিয়াছিলেন।

এই ভ্রম ভাঙিতে কিন্তু বেশী দিন লাগিল না। ১৯২০ সালে রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীজীর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহার ডাকে দেশের লোক নূতন শক্তি ও প্রেরণা লাভ করিয়াছে। নৃপেন্দ্রচন্দ্র তখন চট্টগ্রাম কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ। তিনি সেই পদত্যাগ করিতে দ্বিধা করিলেন না। দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তার পথে পা দিলেন; আর কখনও ফিরিতে পারিলেন না। গতানুগতিক রাজনীতি তাঁহার ধাতে আসিত না; সাংবাদিক-রূপে লোক-শিক্ষকের কাজ তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল। "সার্ভেণ্ট" ও "রেঙ্গুন মেল" পত্রিকার সম্পাদকরূপে তিনি কাজ করেন। স্বরাজ পার্টির রাজনীতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারেন নাই বলিয়া তিনি রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

কোন্ডা ভেঙ্কটপ্পিয়া

তেলুগু ভাষা-ভাষী অঞ্চলের একজন নেতা দেহত্যাগ করিলেন। ৮৩ বৎসর বয়সে অন্ধ্র মহাসভার একজন প্রতিষ্ঠাতা কোন্ডা ভেঙ্কটপ্পিয়া ৫০ বৎসর পূর্ব্বে অন্ধ্র প্রদেশের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃতির যে সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা অপূর্ণ রাখিয়াই তাঁহার প্রার্থিত লোকে চলিয়া গেলেন।

নীরব কর্ম্মী ছিলেন তিনি; রাজনীতির নানা কোলাহল ও কৌশল হইতে দূরে থাকিয়া তিনি দেশসেবা করিয়া গিয়াছেন। গান্ধী-যুগেই ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা তাঁহার নাম প্রথমে শুনিতে পাইল। তিনি এই ভাব ও কর্ম্মের মধ্যে যে অনুপ্রেরণা পাইলেন, তাহা ১৯২১ সন হইতে আজীবন তাঁহাকে চালিত করিয়াছে। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক রাজনীতির রাজসিকতার মধ্যে আনন্দ পাইতেন না বলিয়াই তিনি দেশের লোকের নিকট বিশেষ পরিচয় লাভ করেন নাই। তিনি সর্ব্ব-ভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক পরিষদের সভ্যপদও তিনি লাভ করেন। কিন্তু যে গুণের অধিকারী হইলে রাজনীতি ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করা যায় তাহা তাঁহার ছিল না; অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা মানিয়া লইবার কৌশল তাঁহার অজানা ছিল। সেইজন্য তিনি শেষ জীবনে কংগ্রেসী দলের মধ্যে অসাধুতার বিস্তারে মনোবেদনা পাইয়া গিয়াছেন।

মানুষের জীবন

শ্রীবিমলাচরণ দেব

আজ সংক্রান্তি। মাসের আয়ু ফুরাইল।

মানুষের আয়ুর কথা মনে হইল। প্রতীচ্যে বলে তিন কুড়ি দশ। এ দেশে "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" খুব জানা কথা। আমাদের জ্যোতিষে বলে অষ্টোত্তরী, বিংশোত্তরী—অর্থাৎ মানুষের পূর্ণ আয়ু এক মতে ১০৮, অপর মতে ১২০ বৎসর। এ দেশে চল্‌তি কথাতেও বলে "নরা গজা বিশে শয়"—অর্থাৎ মানুষ ও হাতীর পূর্ণ আয়ু ১২০ বৎসর

বাৎস্যায়নের কামসূত্রের জয়মঙ্গল টীকাতেও পাই—ষোল বৎসর পর্য্যন্ত "বাল", তাহার পর সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত "মধ্যম", সত্তরের পর "বৃদ্ধ"।

এই সমস্ততে "বৎসর-সংখ্যা" মাত্র পাইতেছি। সমগ্র জীবন বা তাহার কোনও অংশের স্বরূপবর্ণন পাইতেছি না।

জীবনের স্বরূপবর্ণন আমি প্রথম পাই পুরাতন শিশু-পাঠ্য মাসিকপত্র "সখা ও সাথী"তে। শিশুপাঠ্য জার্মান গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত "দুরাকাঙ্ক্ষার পরিণাম" শীর্ষক একটি গল্প তাহাতে পড়ি। গল্পটি মোটামুটি এই—সৃষ্টির পর সৃষ্ট জীব-গণের নিজ নিজ আয়ু ভগবানের নিকট জানিবার কৌতূহল হইল। প্রথমে গাধা গেল ভগবানের নিকট। ভগবান বলিলেন, "তোমার আয়ু ত্রিশ বৎসর"। গাধা কান্নাকাটি করিল যে, তাহার কষ্টের জীবন যেন অত দীর্ঘ না হয়। ভগবান দয়া করিয়া কমাইয়া দিয়া বলিলেন, "১৮ বৎসর"। তাহার পর গেল কুকুর। ভগবান তাহাকেও বলিলেন, ত্রিশ বৎসর। সেও কষ্টের জীবন কমাইবার প্রার্থনা করিলে ভগবান বলিলেন, "আচ্ছা, ১২ বৎসর"। তাহার পর গেল বাঁদর। তাহার আয়ু ঐরূপে ত্রিশ হইতে কমিয়া ১০ বৎসর হইল। তাহার পর গেল মানুষ। তাহাকে ভগবান "ত্রিশ বৎসর" বলায় সে অত্যন্ত অ-খুশী—বড় কম হইল বলিয়া। তখন ভগবান তাহাকে আরও ১৮ বৎসর দিলেন। কিন্তু তাহাতেও সে খুশী নয়। তখন ভগবান আরও ১২ বৎসর দিলেন। মোট হইল ৬০ বৎসর। তখনও মানুষ অসন্তুষ্ট। তখন ভগবান তাহাকে আরও ১০ বৎসর দিয়া বলিলেন, "যাও, আর চাহিও না"। মোট হইল ৭০ বৎসর। Three score & ten.

এইরূপে জীবন চারি ভাগে বিভক্ত। ভগবানের নিজ ইচ্ছায় দেওয়া প্রথম ৩০ বৎসর। বেশ জোরের সঙ্গে, আনন্দে কাটে। তাহার পরই গোলমাল আরম্ভ। "বল বুদ্ধি ভরসা, তিন দশকে ফরসা"। ইহার পরই গাধার ১৮ বৎসর। সংসারের জন্য গাধার খাটুনি, all kicks & no half-pence ;—তাহার পর কুকুরের ১২ বৎসর। একেবারে কুকুরের অবস্থা, সংসারের গলগ্রহ, পর-প্রসাদাকাঙ্ক্ষী। তাহার পর বাঁদরের ১০ বৎসর—সকলের তামাসার পাত্র।

গল্পটি সুন্দর বটে, কিন্তু তেমন তৃপ্ত হইতে পারি নাই। পরে যখন ছান্দোগ্য উপনিষৎ পড়িলাম, তখন নিজ মনের অনুকূল একটি দৃষ্টিকোণ পাইলাম। সেখানে (৩.১৬.১-৭) সমগ্র জীবনকে একটি "যজ্ঞ" বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং তাহাকে তিন অংশে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম অংশ, "প্রাতঃসবন", জীবনের প্রথম ২৪ বৎসর। দ্বিতীয় অংশ, "মাধ্যন্দিন সবন", প্রথম অংশের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ৪৪ বৎসর। তৃতীয় ও শেষ অংশ, "তৃতীয় সবন", জীবনের শেষ ৪৮ বৎসর। মোট ১১৬ বৎসর মানুষের পূর্ণ আয়ু।

সমগ্র জীবনের দেবতা "প্রাণগণ"। কিন্তু তাঁহারা সমগ্র জীবন একই রূপে থাকেন না। জীবনের প্রথম অংশে "বসুগণ"-এর রূপে, দ্বিতীয় অংশে "রুদ্রগণ"-এর রূপে, এবং তৃতীয় অংশে "আদিত্যগণ"-এর রূপে তাঁহাদের প্রকাশ।

ঐ রূপেই জীবনের তিন অংশে তিনটি ছন্দ। প্রথম অংশে "গায়ত্রী" (২৪ অক্ষর), দ্বিতীয় অংশে "ত্রিষ্টুভ্" (৪৪ অক্ষর), এবং তৃতীয় অংশে "জগতী" (৪৮ অক্ষর)। ছন্দের অক্ষর-সংখ্যা ও সবনের বৎসর-সংখ্যায় মিল।

স্বভাবতঃ প্রথমেই লক্ষ্য করিবার জিনিষ—জীবনের প্রথম ২৪ বৎসর। সাধারণ অভিজ্ঞতা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান উভয়েই বলে যে, এই প্রথম ২৪ বৎসর সর্বাঙ্গীণভাবে জীবনের আরোহণী দশা, অর্থাৎ এই সময়েই মানুষের সমস্ত সত্তা, শারীরিক ও মানসিক শক্তির উন্নতি, বৃদ্ধি, স্ফুরণ ক্রম-বর্দ্ধমান ভাবে হইয়া থাকে।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই সময়ে দেবতা "প্রাণগণ" "বসুগণ" রূপে প্রকাশ হন। জীবনের প্রারম্ভে অর্থাৎ শৈশবে মানুষের সমস্ত শক্তি, বৃত্তি প্রভৃতি অনবস্থিত, অপরিস্ফুট-ভাবে থাকে। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত স্থিতভাব ধারণ করে। স্থিতভাব না আসিলে উন্নতি অসম্ভব। প্রাণগণ এই সময়ে সকলকে "বাসয়ন্তি", অর্থাৎ এই স্থিতভাব আনিয়া দেন ও তদ্দ্বারা সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব করেন। তাই তাঁহারা এই সময়ে "বসু"।

এই সময়ের ছন্দ হইতেছে গায়ত্রী। নিশ্চিতভাবে স্থিত হইলেই জীবনে এই ছন্দ আসে। "গায়তি চ ত্রায়তে চ"

(ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৩. ১২. ১)। গান ও ত্রাণ যুগপৎ। এখানে শাঙ্কর ভাষ্য বলিতেছেন "গানাৎ ত্রাণাচ্চ গায়ত্র্যা গায়ত্রীত্বম্"। এই সময়ে সত্যই জীবন গানে ভরপুর, অতি সাধারণ কথাও গানের মত সাবলীল ও মধুর। শুধু তাই নয়, তাহার সর্বসাফল্যের স্ফূর্তি এরূপ যে, ভয় ভয়ে তাহার কাছে আসিতে পারে না। "বাল্যাদ্ দর্পাচ্চ নির্ভয়"। এখনও সংসারে ধাক্কা খায় নাই, তাই "দর্প", অর্থাৎ গভীর আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্ভাবিত ভাব (superiority complex) পূর্ণমাত্রায়। মনে এরূপ বিশ্বাস যে, "যমের জাঙ্গাল" হইতে দূরতম তারকা উপড়াইয়া লইয়া আসিতে পারে। শত বাধাবিপত্তি তাহাকে ঘিরিলেও শ্যেনের ন্যায় সাবলীল বেগে সে সমস্ত ভেদ করিয়া নিজেকে ত্রাণ করে। এই "দর্প"ই তাহাকে ত্রাণ করে ও আনন্দ দেয়। এই আনন্দ গানে মূর্ত্ত হয়।

গায়ত্রীর এই গায়ত্রীত্ব সম্বন্ধে সুন্দর গল্প পাই তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬.১.৬-এ, কদ্রু-সুপর্ণী উপাখ্যানে। এই উপাখ্যান পড়িয়া বেশ মনে হইল যে, এইটি মহাভারতের কদ্রু-বিনতা উপাখ্যানের মূল রূপ। মোটামুটি গল্পটি এই—কদ্রু ও সুপর্ণীর মধ্যে খুব রেষারেষি—কে বেশী সুন্দরী। [কদ্রু কি brunetta, তাঁহার রং-এর অহঙ্কার? সুপর্ণীর কি "পর্ণ" (কেশ) খুব সুন্দর, ঘন ও লম্বা ছিল? তাঁহার কি কেশের অহঙ্কার?] শেষে বাজি রাখা হইল। মধ্যস্থ বলিলেন, "কদ্রু বেশী সুন্দরী"। কাজেই সুপর্ণী হইয়া গেলেন কদ্রুর দাসী। তাহার পর দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবার কথায় কদ্রু বলিলেন, "তুমি যদি সোম আনিয়া দিতে পার, মুক্তি পাইবে"। এখন, সুপর্ণীর তিন ছেলে, তিন ছন্দ, জ্যেষ্ঠানুক্রমে জগতী, ত্রিষ্টুভ্ ও গায়ত্রী। সুপর্ণীর পুত্র, এইজন্য ইঁহাদের নাম "সৌপর্ণেয়াঃ"

সুপর্ণী তাঁহার পুত্রদের বলিলেন, "তোমরা যদি সোম আনিয়া দিতে পার, আমি দাসত্ব হইতে মুক্তি পাই।" তখন সর্বজ্যেষ্ঠ জগতী গেলেন সোম আনিতে। তিনি নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর মধ্যম পুত্র ত্রিষ্টুভ্ গেলেন। তিনিও নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবারে কনিষ্ঠ পুত্র গায়ত্রীর পালা। গায়ত্রী শ্যেনরূপ ধারণ করিয়া গেলেন এবং সোম আহরণ করিয়া আনিলেন। এই কারণে গায়ত্রী ছন্দগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন।

এখন, গায়ত্রী মোট তিন খণ্ড সোম আনিয়াছিলেন, দুই পায়ে দুই খণ্ড ও মুখে এক খণ্ড ধরিয়া। মুখে যে খণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা চুষিতে চুষিতে আসিয়াছিলেন। যখন আসিয়া পৌছিলেন, তখন এই খণ্ড "ছোবড়া" হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃসবন ও মাধ্যন্দিন সবনে পাদধৃত খণ্ড দুইটি এবং তৃতীয় সবনে মুখধৃত খণ্ডটি ব্যবহার হয়, অর্থাৎ প্রথম দুই সবনে সরস সোমলতা ও তৃতীয় সবনে "ছোবড়া"।

এই জয়ী গায়ত্রী জীবনের প্রাতঃসবনের ছন্দঃ। তাহাতে ব্যবহার হয় সরস সোমলতার রস। আনন্দ, স্ফূর্তি, পূর্ণমাত্রায়। স্বপ্নে পর্য্যন্ত জয়ের উল্লাস। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, সর্বাবস্থায় মানুষ জিতকাশী। জীবনের শ্রেষ্ঠতম, সর্বসাফল্যের, সর্ব আনন্দের সময়।

ইহার পরই জীবনের মাধ্যন্দিন সবন, ২৫ হইতে ৬৮ বৎসর পর্য্যন্ত। এই সবনেও সরস সোমলতার রস। মাদকতা এখনও বেশ আছে। কিন্তু এখনকার ছন্দঃ ত্রিষ্টুভ্। অঙ্গহীন, "হেরো", কাজেই মাদকতার ভাবটা বেশ দমিয়া আসে। "প্রাণগণ"-এরও রূপ বদলাইয়াছে। এখন তাঁহারা "রুদ্র"। "প্রাণা বাব রুদ্রা এতে হীদং সর্বং রোদয়ন্তি"। সংসারের গুরুভার ও তজ্জন্য খাটুনি, এই সময়ের বিশেষত্ব। কত অভাব-অভিযোগ, সংসারের জন্য, হয় ত নিজের জন্য, কত মাথা নীচু, কত লাঞ্ছনা, নাকের জলে চোখের জলে কাঁদাইয়া ছাড়ে। এইরূপে চলে ৬৮ বৎসর পর্য্যন্ত।

ইহার পরই জীবনের তৃতীয় সবন বা অংশ। ইহার ব্যাপ্তি ৪৮ বৎসর। জীবনের এই শেষ ৪৮ বৎসর সাঙ্ঘাতিক। এখন ভোগ্য হইল সরস সোমলতা নহে, "ছোবড়া"। জীবন হইতে সব রস নিঙড়াইয়া চুষিয়া খাইয়া লইয়াছে। জীবনে আর "রসকস" নাই। বাকি আছে "ছোবড়া"। এখনকার ছন্দঃও অঙ্গহীন, "হেরো", জগতী। এই দুই কারণে ভাবটা আরও দমিয়া যায়। আত্মপরাভূত মনোভাব (inferiority complex) উঁকি-ঝুঁকি মারিয়াছিল মাধ্যন্দিন সবনে। এখন জাঁকিয়া বসে। কোথায় অন্তর্হিত হয় প্রাতঃসবনের আত্মসম্ভাবিত ভাব।

প্রাণগণের রূপ আবার বদলাইয়াছে। এখন তাঁহারা "আদিত্য"। "প্রাণা বাবাঽঽদিত্যা এতে হীদং সর্বমাদদতে"। প্রাণগণ এখন আদিত্য হইয়া সবকিছু নিজেদের মধ্যে গুটাইয়া লইতেছেন। কাজেই চোখ যতদূর দেখিত, এখন আর ততদূর দেখে না। কাণ যতদূর শুনিত, এখন আর তত দূর শুনে না। সমস্তই এইরূপ গুটাইয়া আসে। সেদিন যাহাকে দিগন্তপ্রসারী দেখিয়াছি, আজ তাহা গুটাইয়া গুটাইয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

এই জীবনের শেষ।

শিক্ষা ও সাহিত্য

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

স্মরণের অতীত যুগ থেকে মানুষ দেহের সৌন্দর্যবৃদ্ধি-মানসে অলঙ্কার ব্যবহার আরম্ভ করেছে। যুগে যুগে এই অলঙ্কারের উপাদান এবং আকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। আদিম মানব ব্যবহার করেছে পাখীর রঙিন পালক কিম্বা পশু-পক্ষীর হাড়। সভ্যতার পথে এগিয়ে আসতে অন্যেরা হয়ত অন্য প্রকার অলঙ্কার তৈরি করে নিয়েছে। রঙিন পাথর, তামা রূপা, সোনা লোহা এই ভাবে ক্রমে মানুষের রূপচর্চার উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রকৃতির কাননে রূপসজ্জার যে উপকরণ বৈচিত্র্যময় প্রাচুর্যে উপচে পড়ে, সেই ফুলপল্লবদল মানুষের স্বাভাবিক রূপ-স্পৃহাকে প্রবল করে তুলেছে, প্রসাধনে সহায়তা করেছে। সুন্দরের আরাধনা মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির চরিতার্থতা শুধু নিজের এবং প্রিয়জনের সৌন্দর্য-বিধানেই সীমাবদ্ধ নয়; রূপসৃষ্টিতেও তার আনন্দ। মানব-মনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ, নবসৃষ্টির বাসনা নানা পথে আত্ম-প্রকাশ করেছে। গুহাবাসী মানুষও অবসরকালে তার সৃষ্টি-ধর্মী প্রতিভাকে শিল্পকর্মে নিযুক্ত করেছে; তার পরিচয় গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ জীবজন্তুর ছবি। চিত্র, ভাস্কর্য, সাহিত্য, ললিতকলা মানুষের অন্তরের সৃজনশীল, সুন্দরের আরাধনা-উন্মুখ মনের এবং শক্তিরই পরিচয় বহন করে।

জীবধাত্রী বসুন্ধরার কোলে মানুষের আগমন সকল প্রাণীর পরে। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করে দেখেছেন, পৃথিবীর জন্ম থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সময়কে ২৪ ঘণ্টা কল্পনা করে নিয়ে এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর বুকে যে সব নৈসর্গিক ঘটনা ঘটেছে, যত সব প্রাণীর উৎপত্তি-বিলয় ঘটেছে এবং সর্বশেষে জীবসৃষ্টির লীলায় একমাত্র মানুষই টিকে রয়েছে—এ কাহিনী সারাদিনব্যাপী একটি চলচ্চিত্রে দেখাতে গেলে ছবির পর্দায় মানুষের আবির্ভাব দেখা যাবে চিত্র শেষ হবার মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পূর্বে। পৃথিবীর বয়সের অনুপাতে দেখতে গেলে মানুষের বয়স বেশী নয়, কিন্তু এরই মধ্যে সে প্রাণীজগতে একাধিপত্য স্থাপন করেছে। এর কারণ তার প্রধান সহায় স্মৃতিশক্তি, তার হৃদয়, তার উদ্যমশীল মন। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে তার পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, পূর্বপুরুষের আরব্ধ কর্মপ্রবাহকে সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, অন্তর দিয়ে অতীতকে উপলব্ধি করে আবার ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি তার প্রসারিত হয়। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে আত্মোন্নতির জন্য, জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার জন্য, সুখসমৃদ্ধির নিমিত্ত শিক্ষা-প্রণালীর ব্যবস্থা করেছে।

শিক্ষার সঙ্গে এবং সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের সত্যি-কারের কি সম্বন্ধ সেই কথাটিই বলতে চাই। দেহসজ্জায় বহিরঙ্গের উপকরণ যেমন অলঙ্কার, শিক্ষাকে তেমন ভাবে মানুষের অলঙ্কার বলে গ্রহণ করা চলে না। শিক্ষা মানুষের আত্মবিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তি ও হৃদয়-মনের বৃত্তিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে তাকে মানসিক সম্পদে সমৃদ্ধ করে তোলা। জাগতিক জীবনের উপযোগী করে শিশুকে ভবিষ্যতে অর্থোপার্জনকারী যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তোলাও শিক্ষার একটি অঙ্গ। সাধারণতঃ শিক্ষার দুটি দিক আমাদের নজরে পড়ে—একটি অর্থকরী, উপার্জন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করার দিক, অন্যটি জ্ঞানকরী অর্থাৎ শিশুকে ভাবরাজ্যে বিচরণের ক্ষমতা দান করার দিক। এই দুই দিকের সামঞ্জস্য বিধানে শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হয়, একটির উপর গুরুত্ব আরোপ করে অন্যটিকে অবহেলা করলে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হয় না।

আমাদের দেশে ইংরেজ আমলে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল তা এ দুটির কোনটির উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে নি। ফলে—অর্থকরী বিদ্যার সাহায্যে ধনোৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে দেশকে ধনধান্যে সমৃদ্ধ করে তোলা সম্ভব হয় নি। আবার তেমনি মানুষের হৃদয়-মন-মস্তিষ্কের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশ সাধন করে জ্ঞানী, গুণী, চিন্তানায়ক তৈরি করে দেশের ভাব-সম্পদ অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি করতেও এই শিক্ষা-প্রণালী সহায়তা করে নি। ব্যতিক্রম অবশ্য ঘটেছে; পরাধীন দেশে, প্রতিকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছে এবং তাঁদের অবদানে দেশ ধন্য হয়েছে। কিন্তু সাধারণের অবস্থা বিচার করতে গেলে বলতে হয়, জাতীয় শিক্ষার আদর্শবিহীন, আড়ষ্ট পরিবেশে জনসাধারণের মননশক্তির উপযুক্ত বিকাশ হয় নি। বাংলাদেশে শাশ্বতের পর্যায়ে পড়ে এমন সাহিত্যও সৃষ্ট হয়েছে—যদিও পরিমাণে তা কম—কিন্তু তার রসোপলব্ধির আনন্দে পরিপ্লুত পাঠকের সংখ্যা আশানুরূপ বাড়ে নি। সাহিত্যসৃষ্টি বিশেষ শক্তি ও সাধনাসাপেক্ষ; সকলের জন্য ইহা নয়—এ কথা অবশ্য-স্বীকার্য, কিন্তু সাহিত্যপাঠে আনন্দলাভে সমর্থ পাঠকের

সংখ্যা এত কম কেন? নদীর উৎপত্তিস্থান উচ্চ গিরিশিখরের নিভৃত কোন উৎসে কিন্তু সুশীতল বারিপ্রবাহ কেবল গিরিগাত্রই সিক্ত করে না, সমগ্র দেশ করে স্নিগ্ধ, শস্যশ্যামল। সাহিত্যশিল্পের রসধারা তেমনি সমগ্র ভাবে আমাদের জীবনকে অনুভূতির আনন্দে অনুরঞ্জিত করে নি কেন? এর কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির মধ্যে এর প্রধান কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। মাতৃভাষাকে অবহেলার ভিতর দিয়ে যে শিক্ষা-প্রণালীর সূত্রপাত তার পরিবেশ জাতীয় সাহিত্যের এবং সাহিত্যানুরাগ সৃষ্টির অনুকূল নয়। বিদেশী ভাষাকে বাহন করে বিদেশী পদ্ধতিতে শিক্ষাবিস্তারের যে চেষ্টা চলেছিল আমাদের দেশে, তা সার্থক হয় নি কারণ তা অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'দেশী খাপে বিলাতী তলোয়ার ভরার কসরৎ।' মাতৃভাষা যেখানে বিদ্যামন্দিরে, রাষ্ট্রপরিচালনা ক্ষেত্রে পূর্ণ মর্যাদা পায় না, মাতৃভাষাকে আশ্রয় করে যেখানে মানুষের মন জ্ঞানে, ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে না সেখানে সর্বসাধারণের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ আশা করা যায় না। শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প আমাদের জীবনের পক্ষে অপরিহার্য বলে গণ্য হয় নি, তাই দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমাধারী অনেক শিক্ষিত লোকও এর আস্বাদে বঞ্চিত। পাঠ্য পুস্তকের বুলি মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় উদ্গীরণ করে দিয়ে পাস করে এসেছেন, কিন্তু সজীব মনের খোরাক যোগাবার উপযুক্ত অভ্যাস বা শিক্ষা হয় নি। মানুষের মনের সৃজন-ক্ষমতা এবং রসোপলব্ধির শিক্ষাই যদি না হ'ল, তবে সে শিক্ষায় একটা মস্ত বড় ফাঁকি থেকে যায়। আমাদেরও হয়েছে তাই, ফলে আমাদের অধিকাংশ তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরই নিকট সাহিত্য-চর্চা করা নিছক বিলাস। এর জন্য অর্থব্যয় করাকে মনে করে অপব্যয়। সাহিত্যই জাতির প্রাণশক্তির পরিচায়ক; যে জাতি যত উন্নত তার সাহিত্য তত সমৃদ্ধ।

অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে সৎ-সাহিত্যের পাঠকসংখ্যা নগণ্য। এর প্রধান কারণ সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত সাধারণের অনুরাগের অভাব। পরীক্ষার দায় না থাকলেও ইতিহাস-পুস্তক আনন্দের সঙ্গে পড়েন এমন লোক আমাদের দেশে খুব কম, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে পাঠযোগ্য পুস্তকমাত্রেরই উপযুক্ত সমাদর। গিবন, মেকলে, গ্রীন, ট্রেভেলিয়ান ইংলণ্ডের শুধু বিখ্যাত ঐতিহাসিক নন, সাহিত্যিকও। জার্মান ঐতিহাসিক মমসেন রোমের ইতিহাস লিখে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-হিংসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা-নৈরাশ্য, মানুষের জীবনে অহর্নিশ যে আলো-ছায়ার জাল বুনে চলেছে সাহিত্যে তাকেই প্রতিফলিত করেন শিল্পী। সাহিত্যিক তাই জীবনশিল্পী।

এতদিন শিক্ষার সঙ্গে আমাদের প্রাণের সংযোগ ছিল না। হৃদয়-মনের উৎকর্ষসাধন স্কুল কলেজের পাঠ্য-তালিকার মধ্যে পড়ে নি, তাই শিক্ষা হয়েছে অসম্পূর্ণ। স্বাধীন দেশে, নবজীবনের প্রভাতে আমাদের এই ত্রুটি সংশোধনে অগ্রণী হতে হবে। মনের উৎকর্ষ সাধন, সুরুচিবোধ, সাহিত্যশিল্পে অনুরাগ সঞ্চার, মানুষের প্রতি দরদ ব্যতীত কোন শিক্ষার্থীর শিক্ষাই সম্পূর্ণ হতে পারে না। এ কথা শিক্ষক এবং অভিভাবক সকলেরই মনে রাখতে হবে। সুরুচি ও সাহিত্যানুরাগের অনুকূল গৃহের পরিবেশ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন উপযুক্ত বিদ্যায়তনে মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া।

আমার দিদিমা—নিস্তারিণী বসু

(রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পত্নী)

শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী

আমার দাদামহাশয় তাঁহার কর্ম্মস্থান মেদিনীপুর হইতে বিদায় লইয়া ভগ্ন স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রথমে কলিকাতায় ও পরে দেওঘরে নিজ বাড়ীতে স্থায়ী ভাবে বাস করিতেন।

প্রতি বৎসর পূজার ছুটির সময় আমরা দেওঘরে দিদিমা ও দাদামহাশয়ের কাছে যাইতাম। কলিকাতায় মাসের পর মাস এক বাড়ীতে বদ্ধ হইয়া থাকার পর খোলা স্বাস্থ্যকর ও পাহাড়ে ঘেরা প্রকৃতির রম্য নিকেতন দেওঘরে যাইতে আমাদের যে কি আনন্দ হইত!

দেওঘর সহরের পুরন্দহ অঞ্চলের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া একটু দূরে রেলগাড়ী যাইতেছে দেখিয়া আমাদের যে কি উৎসাহ হইত! পাহাড়ে নদী দাড়োয়ারের স্বচ্ছ শীতল জলের ধারে ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতে কি তৃপ্তিই লাগিত! আর সারাদিন নানারকম সুগন্ধি ফুলে ভরা বাগানে খেলাধুলা ও বেড়ানোর পর সন্ধ্যার সময় আমরা, ভাইবোনেরা দক্ষিণের লম্বা বারান্দায় বসিতাম—বারান্দার দুই পাশে গোলাপফুলের গাছ, সম্মুখে উঠানেও কত ফুলের গাছ—আর দিদিমা আমাদের মাঝখানে বসিতেন। তিনি আমাদের গান শুনিতেন, পরে তাঁহার বাপের বাড়ীর গল্প বলিতেন—আমরা সে সব কাহিনী অবাক হইয়া শুনিতাম।

দিদিমা হাটখোলার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী দত্তবংশের কন্যা। তাঁহার বাবার নাম অভয়চরণ দত্ত। দত্তদের সমুদ্রগামী জাহাজ ছিল। তাঁহারা ইংলণ্ড ও আমেরিকায় নানাপ্রকার ভারতীয় পণ্যদ্রব্য চালান দিতেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহারা খুব ধনী ছিলেন। দিদিমার ঠাকুরদাদার কর্ম্মচারী বিখ্যাত দানশীল রামদুলাল সরকারের সততার কথা ছোটবেলা হইতে আমরা পাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছি।

একবার দিদিমার ঠাকুরদাদা খবর পাইলেন যে একটা জাহাজ জলে ডুবিয়া গিয়াছে; উহা নীলামে বিক্রী হইবে। তখন তিনি রামদুলাল সরকারকে সেই জাহাজটি কিনিতে পাঠাইলেন। সরকার মহাশয় সেটি ১৪,০০০ হাজার টাকায় কিনিলেন। তাহার কিছুক্ষণ পরেই একজন ইংরেজ আবার সেই জাহাজটি বেশী দাম দিয়া কিনিতে চাহিলেন। সরকার মহাশয় দেখিলেন ইহাতে বেশ লাভ হইবে। তিনি আবার সেটি ইংরেজের নিকট বিক্রয় করিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার মনিবকে জাহাজ বিক্রয়ের টাকা দিয়া দিলেন। যে টাকাটা লাভ হইয়াছিল সে সামান্য দু'চার টাকা নয়, কয়েক হাজার টাকা—তিনি নিজে সে সব রাখিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করেন নাই। মনিব তাঁহার সততায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন। যে কয়েক হাজার টাকা লাভ হইয়াছিল সে সব তিনি রামদুলালকে পুরস্কারস্বরূপ দিলেন। সেই টাকার সাহায্যে ব্যবসা করিয়া রামদুলাল পরে লক্ষপতি হইয়াছিলেন, কিন্তু মনিব-বাড়ীতে সব সময়েই খালি পায়ে ঢুকিতেন এবং সর্ব্বদা বলিতেন, "আমি আপনাদের সেই পাঁচ টাকা মাহিনার চাকর।" তাঁহার বিনয়ও কম ছিল না। ধনী হইয়াও তিনি গরীবের দুঃখ কষ্টের কথা ভুলেন নাই। প্রতি মাসে অনেক টাকা গরীবদের দান করিতেন। এ ছাড়া কত সৎকার্য্যে যে দান করিয়া গিয়াছেন তা বলিয়া শেষ করা যায় না।

দিদিমা বলিতেন—তাঁহার বাবার জমিদারীর টাকা থলে ভরিয়া গাড়ী বোঝাই হইয়া আসিত। তোশাখানায় টাকা তুলিবার আগে তাঁহার বাবা বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের ডাকিয়া বলিতেন—"তোদের যত ইচ্ছা টাকা আগে নে, তারপরে টাকা তোশাখানায় যাবে।" তিনি মেয়েদের বিশেষ স্নেহ করিতেন।

দিদিমাদের প্রত্যেক বোনের সঙ্গে একটি করিয়া ঝি থাকিত। দিদিমা তাঁহার বাবার ডাকে গাড়ী হইতে ছোট মুঠি ভরিয়া চকচকে সিকি, দু'আনি তুলিয়া লইতেন। বড় বড় টাকাগুলি তাঁহাদের পছন্দ হইত না। আর যাহা লইতেন সে সব ঝিদের দিয়া দিতেন। ঝিরা বলিত—"তোমরা বড় বড় চকচকেগুলি নিতে পার না। ছোটগুলি নাও কেন।"

দিদিমার হাতে দু'গাছা হীরার বালা ছিল। তাঁহার গহনা ভাল লাগিত না—বিরক্ত হইয়া এক এক সময় সেই হীরার বালা তিনি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। তাঁহার মনে বাল্যকাল হইতে সাজসজ্জার স্পৃহা ছিল না এইজন্যই কি যে তিনি ভবিষ্যতে একজন দরিদ্র সাধুর সহধর্ম্মিণী হইবেন!

দিদিমা সুন্দরী ছিলেন ও বলিতেন তাঁহার ভাইয়েরা দীর্ঘকায়, সুস্থ, সবল সুপুরুষ ছিলেন। এখন সে রকম বাঙ্গালী যুবক কদাচিৎ দেখা যায়। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় যখন চারিদিকে আতঙ্ক সে সময়ে দিদিমা যদি কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে যাইতেন তখন তাঁহার সঙ্গে দুই ভাই থাকিতেন—তাঁহারা কোন ভয় করিতেন না। তখন পাল্কির চলন ছিল, এ-বাড়ী ও-বাড়ী পাল্কি করিয়া যাতায়াত করিতে হইত।

বড় বড় ধনীর ঘরে দিদিমার বড় বোনদের বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা সুখী হন নাই। দিদিমার দাদা

দিদিমাকে খুবই স্নেহ করিতেন। তিনি দিদিমার জন্য একজন ধার্ম্মিক ও বিদ্বান বর খুঁজিতে লাগিলেন।

দিদিমার সেই দাদার একটি পুত্র অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পিতা সেই সুকোমল সরলপ্রাণ সুন্দর কিশোরকে হারাইয়া শোকে পাগলের মত হন। তিনি কোথাও সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইলেন না--বলিতেন, 'মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ত সব শেষ, সব অন্ধকার—আর ত প্রাণের গোপালের সঙ্গে দেখা হইবে না—জন্মের মত ত তাকে হারাইলাম।' ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার চক্ষে ঘুম নাই, কেবল বলিতেন—'সে যে অন্ধকারে মিশে গেল—কোথায় ওগো, সে কোথায়।'

একদিন তিনি খবর পাইলেন, রাজনারায়ণ বসু নামে কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক যুবক ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন। তিনি সে বক্তৃতা শুনিতে গেলেন। তিনি যখন শুনিলেন যুবকটি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাসভরা কণ্ঠে বলিতেছেন যে, মানবাত্মা অবিনাশী, মৃত্যুর পরও তার বিনাশ নাই। আত্মা অমর, অজর, ইহলোকেও ভগবান যেমন আমাদের লালন-পালনকর্ত্তা, পরলোকেও তিনি সকলের সঙ্গেই থাকেন—সেই অমরলোকে আত্মায় আত্মায় আবার মিলন হয়—বিদেহী আত্মা দেহী আত্মাকে ভুলেন না—স্নেহ, প্রেম চিরকাল অটুট থাকে—এই অমৃতবাণী তাঁহার শোক-দগ্ধ প্রাণে কি যে শান্তি ও সান্ত্বনার প্রলেপ আনিয়া দিল! বক্তৃতার পর তিনি দাদা-মশায়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিলেন এবং তাঁহার ধর্ম্মভাব ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

বাড়ীতে আসিয়া বলিলেন যে, ঐ সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক ও বিদ্বান যুবকের সঙ্গে তাঁহার ছোট বোন নিস্তারিণীর বিবাহ দিবেন। ধনীদের উপর তাঁহার আর শ্রদ্ধা নাই। ধার্ম্মিক ও বিদ্বান রাজনারায়ণ বসুর সহিত নিস্তারিণীর বিবাহ হইল।

দিদিমা বিবাহের পর তাঁহার শ্বশুরালয় বোড়াল গ্রামে আসিলেন। বোড়াল গ্রাম কলিকাতার নিকটে, দক্ষিণ দিকে। পাড়াগাঁ তিনি কখনও দেখেন নাই—এই তাঁহার গ্রাম্য জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। কলিকাতায় তাঁহার বাবার বাড়ী কি বিরাট! সে বাড়ীর দুই মহল—অন্দর ও বাহির—কত দালান কত ঘর—আর এ তো ছোট্ট বাড়ী।

নতুন বউ আসিয়াছে, সঙ্গে বাপের বাড়ীর দাসীও আসিয়াছে। দিদিমাকে তাঁহার শাশুড়ীঠাকুরাণী সকালে জল খাবার খাইতে দিয়াছেন, মুড়ি ও নারিকেলের নাড়ু। কিছু-ক্ষণ পরে শাশুড়ীঠাকুরাণী দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বউমা খেয়েছে? দাসী বলিল, মা দিদিমণি কাঁদছে। মুড়ি ও নারিকেলনাড়ু খেতে চায় না—বাপের বাড়ীতে ত মুড়ি খেত না—সে বলে "লুচি আর রাভির সন্দেশ কই?"

ভীম নাগের সন্দেশ যেমন এযুগে কলিকাতায় প্রসিদ্ধ—তখনকার কালে রাভির সন্দেশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। দিদিমা তাঁহার বাপের বাড়ীতে জলপান করিতেন—লুচির উপরের ফুলকা ও রাভির সন্দেশ। তাঁহাদের বাড়ীতে বামুনঠাকুর ছাড়াও ভিয়ান ঠাকুর ছিল রোজ মিষ্টি তৈয়ারী করিবার জন্য।

তিনি বলিতেন—ছোটবেলায় মুড়ি দেখিলে কান্না পাইত, এখন আমি সব রকম খাবারই খাইতে পারি।

আমরা দেখিয়াছি তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার সংসার চালাই তেন। আমাদের জন্য নিজ হস্তে কি সুন্দর সুস্বাদু সব খাবার তৈরি করিয়া দিতেন। তাঁর খাবারের বাক্সটি খুলিয়া যখন আমাদের ডাকিতেন, আমরা ছুটিয়া যাইতাম আর তিনি প্রত্যেককে খাবার ভাগ করিয়া দিতেন। এমন ধনীর দুলালী হইয়া কি করিয়া এত কাজকর্ম্ম শিখিলেন? নিজের ঘর-দুয়ার নিজেই ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিতেন—কোন কাজে তাঁহার আলস্য ছিল না।

তাঁহার শুইবার ঘরখানি একটা প্রকাণ্ড হল ছিল। তাহার মেঝেটা চকচক্ ঝকঝক্ করিত। আমাদের কাহারও সে ঘরে যাইবার হুকুম ছিল না। কিন্তু সেই সুসজ্জিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তকতকে ঘরে ঢুকিতে আমাদের এত লোভ হইত। যখন দেখিতাম দিদিমা কোন কাজে অন্যত্র ব্যস্ত আছেন, তখন আমরা এক ছুটে সে ঘরটা পার হইয়া যাইতাম—তাতেই কি আনন্দ!

দেখিয়াছি শুধু দাদামশায় রাত্রে সে ঘরে শুইতে যাইতে পারিতেন। সে ঘরে ঢুকিবার আগে বেশ করিয়া পা ধুইয়া মুছিয়া লইতে হইত। হায়! পরে সে শুভ্র ঘর ধূলিতে মলিন ও অপরিষ্কার দেখিয়া আগের কথা মনে করিয়া খুব দুঃখ হইত।

আমার চারি মাসিমা ও তিন জন মামা ছিলেন। বড় মাসিমা স্বর্ণলতা—ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয়ের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদেরই পুত্র—বিনয়ভূষণ, মনমোহন, অরবিন্দ, বারীন্দ্র ও কন্যা সরোজিনী। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র—বিনয় ও মনমোহন পরলোকে।

বিনয়, মনমোহন ও অরবিন্দ (৬ বৎসর বয়স হইতে ২০।২১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত) ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করেন।

আমার বড় মাসিমা পুত্রকন্যাসহ বিলাতে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বারীন্দ্রের জন্ম হয়। তখনকার কালে কোন বঙ্গ মহিলার বিলাত যাওয়ার কথা কেহ ভাবিতে পারিতেন না। আজকাল মেয়েরা বিলাতে শাড়ী পরিয়া থাকেন, তখন কিন্তু ইংরেজদের পোশাকই কি নারী কি পুরুষ সকলেই পরিতেন।

তখন ধনীরা এমন ইংরেজী ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন যে বাঙালীর নিজস্ব পরিচ্ছদকে তাঁহারা উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতেন

না। বাহিরে ইডেন উদ্যানে বেড়াইতে যাইবার সময় বড় মাসিমা ইংরেজ রমণীর সকল পোশাক-পরিচ্ছদ পরিতেন।

বড় মেসোমহাশয় যখন রংপুরে সিভিল সার্জ্জন ছিলেন তখন ইংরাজ রমণীদের মত বড় মাসিমা ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেন। তাঁর রং খুব ফর্সা ছিল, সেখানকার ইংরেজেরা তাঁহাকে "Rose of Rungpore" বলিতেন।

বড় মেসোমহাশয় বিনা পয়সায় গরীবদের চিকিৎসা করিতেন। তাঁর মনটি খুব কোমল এবং মায়া, মমতা ও দয়ায় পূর্ণ ছিল। সেদেশের লোকেরা সকলে তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করিত ও ভালবাসিত। রংপুরে জলাভাবের জন্য একটি ক্যানাল কাটা হয়, সেটির নাম রাখা হয়, কে, ডি, ক্যানাল। সে খালটি এখনও আছে। সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ ক্যানালটির ঐ নাম রাখা হয়—খালটি এখনও ঐ নামেই পরিচিত।

সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষের পত্নীর সহিত বড় মাসিমার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। তাঁহারা নিজেদের এক পরিবারভুক্ত মনে করিতেন। দুজনে "গোলাপ" পাতাইয়া ছিলেন। একে অপরকে গোলাপ বলিয়া ডাকিতেন। বিকালে দু'জনে নিজেদের খোলা ব্রুহাম ঘোড়ার গাড়ী করিয়া, বিলাতী পরিচ্ছদ পরিয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন। বড় মেসোমহাশয় ইংরেজদের ন্যায় খাওয়া-পরা ও তাদের হালচাল পছন্দ করিতেন। তখন ধনীদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

বড় মাসিমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনয় বিলাত হইতে শিক্ষালাভ করিয়া কুচবিহারের রাজার ছেলেদের শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে তিনি রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র মনমোহন প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক হন। তিনি ইংরেজীতে কবিতা লিখিতেন। তাঁহার কবিতার বই বিলাতে প্রশংসিত হয় এবং এখনও তাঁহার কবিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অধ্যাপনায় ছাত্রেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত ও তাঁহার প্রশংসা করিত। তৃতীয় পুত্র পণ্ডিচারী আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা অগ্নিযুগের শ্রীঅরবিন্দ ও কনিষ্ঠ পুত্র বোমার যুগের বারীন্দ্র। ইঁহাদের কথা আপনারা জানেন।

অরদাদা ১৯ বৎসর বয়সে বিলাতে সিভিল সার্বিস পরীক্ষা পাস করেন। কিন্তু ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় পাস না করাতে তিনি সিভিল সার্বিসভুক্ত হইতে পারেন নাই। বিলাতে বরোদার মহারাজার সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তিনি তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া আকৃষ্ট হন এবং বরোদায় নিজ কলেজে তাঁহাকে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। পরে তিনি মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীরও কাজ করেন। বরোদায় আসিয়া তিনি সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার বয়স ২১ বৎসর। তিনি যেমন ইংরেজীতে সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন, পরে বাংলাতেও সেইরূপ পারিতেন।

আমার মেজ মাসিমার বিবাহ হয় সিটি কলেজের পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতা দীননাথ দত্ত মহাশয়ের সহিত।

সুবিখ্যাত উকিল রাসবিহারী ঘোষের সহিত আমার সেজ মাসিমার বিবাহ-সম্বন্ধ হয়, কিন্তু দাদামহাশয় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, কেননা রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় তখন ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন না। পরে যাঁহার সঙ্গে সেজ মাসিমার বিবাহ হয় তাঁর স্বভাব-চরিত্র ভাল ছিল না। সেজ মাসিমা একটি পুত্র ও কন্যা লইয়া বিধবা অবস্থায় দাদামহাশয়ের কাছেই থাকিতেন—বহুকাল ধরিয়া তিনি রোগে কষ্ট পাইয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে সেজ মেসোমহাশয় যখন দাদামশায়ের সঙ্গে উপাসনায় বসিতেন তখন তাঁর চক্ষু দিয়া জল পড়িত। দাদামশায় তাহা দেখিয়া ভাবিলেন যে, এ যুবকটি ঈশ্বরপ্রেমে ব্যাকুল হইয়া তাঁর দর্শনলাভের জন্য চোখের জল ফেলিতেছে। সে যে সত্য নয় কে জানিত?

আমার মা লীলাবতী মিত্র দাদামহাশয়ের চতুর্থ কন্যা। তিনি বালিকা বয়সে সেজ মাসিমার দুঃখের জীবন দেখিয়া ভগবানের কাছে নিয়ত এই প্রার্থনা করিতেন যে, তাঁহার স্বামী যেন প্রকৃত ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র হন। সরলা বালিকার অন্তরের আকুল প্রার্থনা ভগবান শুনিয়াছিলেন। আমার পিতৃদেব কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় নির্ভীক, ধর্ম্মপ্রাণ, ঈশ্বরভক্ত ছিলেন এবং সৎকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

আমার ছোট মাসিমা লজ্জাবতী বসু বিবাহ করেন নাই। চিরকুমারী থাকিয়া আমৃত্যু লেখাপড়া লইয়া দিন কাটাইয়া গিয়াছেন। দাদামহাশয়ের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি সেক্সপিয়ারের "টেম্পেষ্ট" নামক নাটক ও হোমারের ইলিয়ড বাংলা পদ্যে তর্জ্জমা করেন। তাঁর লেখা স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরিচালিত বামাবোধিনীতে ছাপা হইত। তিনি কবি ছিলেন। তাঁহার কবিতা মাঝে মাঝে প্রবাসীতেও বাহির হইত। 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে তাঁর ইংরেজী প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমার বড় মামা যোগীন্দ্রনাথ বসু খুব সুন্দর ইংরেজী লিখিতে পারিতেন। তিনি বিলাতের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্র, জিতেন্দ্রিয়, সেবাপরায়ণ ও সদালাপী ছিলেন। তাঁহার মনটি শিশুর মত সরল ও নির্ম্মল ছিল। আমরা কত ছোট ছিলাম, কিন্তু আমাদের সঙ্গে তিনি এমন ভাবে মিশিতেন যে, তাঁহার সঙ্গ আমরা ছাড়িতে চাহিতাম না। কত যে হাসি গল্প তাঁহার সঙ্গে হইত—কে বলিবে যে তিনি আমাদের চেয়ে এত বড়।

হাসি ও গল্পে ঘর যেন কাটিয়া যাইত। এজন্ত দেওঘর আমাদের এত প্রিয় ছিল। বড় মামা বিবাহ করেন নাই। এক ধনীর একমাত্র কন্তার সহিত তাঁহার বিবাহ-প্রস্তাব আসে। কন্তার পিতা সমস্ত খরচ দিয়া তাঁহাকে বিলাত পাঠাইতে ইচ্ছুক। একথা শুনিয়া তখন বড় মামা বলিয়া উঠিলেন—"ছিঃ, শ্বশুর মশায়ের টাকা নিয়ে বিলাত যাব? শুধু এই লোভের বশ তাঁর কন্তাকে বিয়ে করব! এ কখনও হবে না। আমি নিজের টাকায় যা পারি করব। তাঁর কাছ থেকে টাকা নেব কেন? আমি কি পুরুষ নই?"

দেওঘর হইতে তিনি আমেরিকা ও বিলাতের কাগজে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লিখিয়া মাসে মাসে ২০০ হইতে ৬০০ শত পর্য্যন্ত টাকা উপার্জ্জন করিতেন।

দাদামহাশয় অনেক দিন পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হইয়া শয্যা-শায়ী ছিলেন, তখন বড় মামা তাঁহার খুব সেবা-যত্ন করিতেন। বড় মামা তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতেন, কাপড় পরাইয়া দিতেন, তাঁহার ময়লা কাপড়চোপড়ও দরকার হইলে পরিষ্কার করিয়া দিতেন। তাঁহার পিতৃ-মাতৃ-সেবা দেখিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিতেন—"তুমি যে ভীষ্মের মত পিতৃ-মাতৃভক্তিপরায়ণ সৎপুত্র দেখছি।"

তিনি আত্মীয়স্বজন সকলকেই স্নেহ করিতেন। "অরদাদা" তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন, তাঁর কত কথা বড় মামাকে বলিতেন ও তাঁহার কাছে জীবনের ছোটখাটো ঘটনা চিঠিতে লিখিতেন।

বড়মামা তাঁহার মাকে ছাড়িয়া কোথাও বেশী দিন থাকিতে চাহিতেন না। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র (রাজা) মহাশয় বড় মামাকে খুব স্নেহ করিতেন। তিনি দাদামহাশয়ের কাছে বলিতেন—"আপনার বড় ছেলে রামচন্দ্রের মত অটলচিত্ত সন্দেহ নাই।" দাদামশায়ের বন্ধুরা বলিতেন—যোগীনের মত এমন বিলাসহীন, সচ্চরিত্র ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ যুবক খুব কমই দেখেছি। "যুবাকালে ধর্ম্মশীল হইবে"—এই শাস্ত্রবাক্য বড় মামার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।

হায়! মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সেই তাঁহার জীবন শেষ হয়—স্নেহশীলা বৃদ্ধা মাতাকে শোকসাগরে ডুবাইয়া দিয়া তিনি পরলোকে চলিয়া যান।

যে পুত্র মাতাকে সুখে রাখিবার জন্ত সর্ব্বসুখ ত্যাগ করিয়াছিলেন সেই প্রাণাধিক পুত্র যোগীন্দ্র যেদিন তাঁহাকে রাখিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন তখন সকলে চিন্তাকুল হইলেন কি করিয়া দিদিমা এ তীব্র শোক সহ করিবেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দেখা গেল মঙ্গলময় ভগবানের বিধানের উপর দিদিমার কি দৃঢ় বিশ্বাস। অমন স্নেহশীল কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রের মৃত্যুদিনে তাঁহার মৃতদেহের পাশে বসিয়া কি আকুল প্রার্থনাই করিলেন—"একি যোগীন্দ্রের মৃত্যু, না যোগসাধনা। হে মঙ্গলময়, তুমি তোমার প্রিয় সন্তানকে নিয়ে গেলে, আমি আর কি বলব। আমার এই একমাত্র সান্ত্বনা যে, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি আমার যোগীন তোমার চরণতলে বসে যোগীর মত ধ্যানে মগ্ন হয়ে রয়েছে।" ধর্ম্মপ্রাণ ভগবদ্ভক্ত রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে থেকে তিনিও এমনই ঈশ্বরভক্তি-পরায়ণা ও ধার্ম্মিকা হইয়াছিলেন।

দেওঘরে পূজার ছুটিতে আমরা সব আত্মীয়-স্বজন একত্র হইতাম। কত আনন্দে দিন কাটিত। অরদাদা তাঁহার কর্ম্মস্থল বরোদা হইতে আসিতেন দুই ট্রাঙ্ক ভরা বই লইয়া—আর মনদাদাও (মনমোহন ঘোষ) তাঁর কর্ম্মস্থল হইতে আসিতেন—বাড়ীতে আনন্দস্রোত বহিয়া যাইত।

দিদিমা আমাদের আহারের তত্ত্বাবধারণ ও যোগাড় করিতেন—সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিতেন। সব সময়ে তিনি নানা কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। সেই সব কথা মনে হয়।

তিনি ৮০ বৎসর অবধি জীবিতা ছিলেন। তাঁহাকে আরও কত শোক সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার প্রিয় নাতি নাতনী—সেজ মাসিমার একমাত্র পুত্র ও কন্তার মৃত্যুতে প্রাণে ব্যথা পাইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ও ছোট পুত্রবধূ (ঢাকার নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চতুর্থ কন্তা) একটি পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। শেষ-জীবনে কত শোকের ঝড় তাঁহার উপর দিয়া বহিয়া গেল।

ছোটবেলায় ঐশ্বর্য্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াও দিদিমা দরিদ্র স্বামীর ঘরে আসিয়া হাসিমুখে নিষ্ঠার সঙ্গে সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর রাখিয়া করিয়া গিয়াছেন। সে কথা ভাবিয়া অবাক হই। ভগবানের মঙ্গল বিধানে বিশ্বাস থাকাতে শোকের তীব্র জ্বালা অবিচল ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করিয়া গিয়াছেন।

তাঁর জীবনের কথা যেন কবিগুরুর এই দুইটি ছত্রে ব্যক্ত হইয়াছে—

"এই সংসার পথ সঙ্কট অতি কণ্টকময় হে,
আমি নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে প্রেম
মুরতি তব
আমি কি আর কব।"

পশ্চিম হিমালয়ের পথে

শ্রীপরিমল গোস্বামী

যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবের লোকেরা বাংলাদেশ থেকে বহু টাকা উপার্জন করে নিয়ে যায়, কিন্তু বাঙালীরা তাদের দেশ থেকে কিছুই আনতে পারে না, এই বেদনাদায়ক ক্ষতি কি ভাবে পূরণ করা যায় সে ভাবনা হয় ত বাঙালী মাত্রেরই মনে আছে। আমার মনেও ছিল, এবং একটু উগ্রভাবেই ছিল। হঠাৎ মনে হ'ল আমার পক্ষে একটিমাত্র উপায় আছে। আমি ওদের দেশে গিয়ে ওদের সম্পর্কে আমার ধারণা নিয়ে ফিরে আসব। পশ্চিম অঞ্চল থেকে এই একটি জিনিসও যদি নিয়ে আসতে পারি তা হলেও হয় ত কতকটা সান্ত্বনা পাওয়া যাবে। আটলান্টিক পারের এক লেখক ইংরেজদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা বিক্রি করেছিলেন আমেরিকায়, আমি তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করব বলে স্থির করলাম।

উক্ত লেখকের ভাষায় এই ধারণা হচ্ছে ইম্প্রেশন। ভেবে দেখা গেল কথাটি তুচ্ছ নয়। চকিতে চোখে দেখা জিনিস মনের পাকস্থলীতে হজম হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যা, তাকে ইম্প্রেশন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এই ইম্প্রেশনই ইউরোপীয় চিত্রশিল্পজগতে এক বিরাট বিপ্লব ঘটিয়েছিল। শিল্পী মোনে, মানে, দেগা, র'নোয়া প্রভৃতি ইম্প্রেশনিষ্টের ইঙ্গিতে উত্তর-ইম্প্রেশনিষ্ট দেখা দিলেন আরও মারাত্মক আকারে। গখ, গোগাঁ, সেজান প্রভৃতি এই বিপ্লবকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিলেন, শিল্পজগতে এঁদের আসন স্থায়ী হ'ল। চিন্তাপথে সাহিত্যের সঙ্গে ইম্প্রেশনিজমের কথা মনে এল। প্রসঙ্গত সে কথাটাও বলে নিই। আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথকে ইম্প্রেশনিষ্ট বলা চলে। ইম্প্রেশনিষ্টদের মতে একটা দৃশ্য, বিশেষ একটা মুহূর্তে যে ভাবে আলোকিত হ'ল, সেই বিশেষ আলোকিত মুহূর্তটিকেই বিশেষ রঙে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সেই দৃশ্য আসলে কেমন সে প্রশ্ন তাঁরা তোলেন না, সেই দৃশ্য, বিশেষ আলোকপাতে কি রূপ ধরল সেটাই তাঁদের কাছে বড়। চিত্রকরের সঙ্গে কবির পার্থক্য এই যে, কবির দৃষ্টি বাইরের চোখের নয়, মনের চোখের চকিত দৃষ্টি। তাই রবীন্দ্রনাথকে ইম্প্রেশনিষ্ট মন মনে করে অনেকে ভুল করেন। বলেন তিনি আরণ্যক সভ্যতার কবি, কারণ কোনো কবিতায় তিনি বলেছেন, ফিরে দাও সে অরণ্য। এই যুক্তি অনুসারে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ আরব বেদুইনের জীবনকেই আদর্শ জীবন মনে করেন, অথবা মাতাল হয়ে পাতালপানে ধাওয়াই একমাত্র সত্য বলে মনে করেন। একজন বলবেন কবি সন্ধ্যাকে প্রশুবর্ণাঞ্চলা দীপশিখাধারিণীরূপে দেখেন, আর একজন বলবেন তা নয় স্বর্ণবপ্রদর্শনকারিণী পশ্চিম দিগ্বধূরূপে দেখেন, আর একজন বলবেন তিনি সন্ধ্যাকে নদীরূপে দেখেন যে নদীর কূলে মৃত দিনের চিতা জ্বলছে।

ল্যান্সডাউন বাজারের একটি দৃশ্য

সবই আংশিক সত্য। তাই আংশিক সত্যই আমাদের পক্ষে পরম সত্য, পূর্ণ সত্য কি তা একমাত্র ভগবানই জানেন। যাঁরা মনে করেন পূর্ণ সত্যের সঙ্গে কারবার চালাচ্ছেন তাঁরা বিভ্রান্ত। সুতরাং পনের দিন ধরে আমি যদি আড়াই হাজার মাইল ভ্রমণ শেষ করে এসে আমার ধারণাসমূহ বিবৃত করি তা হলে তার মধ্যে পাঠকেরা কিছু পান বা না পান আমার এই সান্ত্বনা থাকবে যে আমি ইম্প্রেশনিষ্টদের কেউ না হলেও একজন উত্তর-ইম্প্রেশনিষ্ট তো বটেই। তা না হলে ঘোর গ্রীষ্মে—১৫ জুন ১৯৪৯—যখন পশ্চিম অঞ্চলের উত্তাপ ১১২ ডিগ্রীর উপরে সে সময় কেউ ইউ পি বা পঞ্জাব ভ্রমণে যায় না।

শিল্পীবন্ধু কালীকিঙ্করের সঙ্গে যাত্রা, সুতরাং এর মধ্যে যে একটু অনিশ্চয়তার অংশ ছিল সে কেবল তার জন্যেই। তার প্রমাণ প্রথম যেদিন যাবার তারিখ ঠিক করা গেল সে তারিখটি তারই হাতে উল্টে গেল। পরবর্তী তারিখে একেবারে টিকিট কিনে তাকে খবর দেওয়া হ'ল।

আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ল্যান্সডাউন। কিন্তু সেখানে যেতে হলে ডেরাডুনের পথে নজিবাবাদ ষ্টেশনে নামতে হয়। হাবড়া থেকে ডুন এক্সপ্রেস ছাড়ে ৭টায়। কথা হ'ল কালীকিঙ্কর সন্ধ্যা ৫টায় আমাদের বাড়িতে আসবে, আমরা একসঙ্গে হাওড়া যাব। কিন্তু ৫টা বেজে গেল, ক্রমে ৫॥টা বাজল, তখনও তার দেখা নেই। হঠাৎ পৌনে ছটায় অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় কালীকিঙ্কর এসে নিশ্চিন্ত সুরে বলল, আজই যাবেন?

আমি তখন সব বেঁধেছেঁদে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি। কালীকিঙ্কর বলল, আজ বড্ড দেরি হয়ে গেল এক জায়গা থেকে ফিরতে, হঠাৎ শুনলাম প্রিন্সিপ্যাল (দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী) এসেছেন, তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।

বারো বছরের জানসিং। তিন দিনের পথ একা হেঁটে এসেছিল ল্যান্সডাউনে চাকুরির খোঁজে। অসাধারণ পরিশ্রমী—সর্ব্বদা কাজ করে হাসিমুখে

বললাম এখুনি বাড়ি গিয়ে ষ্টেশনে রওনা হও, আমি তোমার জন্তে অপেক্ষা করব। অগত্যা তাই ঠিক হ'ল। ষ্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করছি আমি, কিন্তু কোথায় কালীকিঙ্কর? গাড়ি ছাড়তে তখন আর মাত্র সাত মিনিট আছে, আমি ফিরে আসব বলে প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময় খবর পাওয়া গেল শিল্পী অপেক্ষা করছে প্ল্যাটফর্মের মুখে। শোনামাত্র কুলিসহ ছুটতে ছুটতে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। আমাদের বসার আসন এবং ঘুমোবার বার্থ রিজার্ভ করা ছিল, সুতরাং গাড়িতে উঠতে কোন রকম অসুবিধা হ'ল না। তখন মনে পড়ল শিল্পীকে বলা হয়েছিল ষ্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করব, কিন্তু কোথায় তা বলা হয় নি, তাই এই বিভ্রাট। এই সম্পর্কে মনে পড়ল আরও একটি মজার ঘটনা। বহুদিন আগে 'বনফুল' যখন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র তখন তার সঙ্গে হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ে অবস্থিত ওরিয়েন্টাল সোসাইটির প্রদর্শনী দেখতে যাওয়া ঠিক হয়। কথা হয়েছিল সে গেটে অপেক্ষা করবে আমার জন্তে। আমি গিয়ে দেখি কেউ নেই, সুতরাং আমিই ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করলাম তার জন্তে। তার পর রাত্রে দেখা হলে শুনলাম সেও এক ঘণ্টা গেটে অপেক্ষা করেছিল। পরস্পর সত্য গোপন করছি ধারণায় তর্ক প্রায় বেধে ওঠে এমন সময় আবিষ্কার করা গেল সে অপেক্ষা করছিল মেডিক্যাল কলেজের গেটে আর আমি ওরিয়েন্টাল সোসাইটির গেটে। প্রথম-প্রস্তাব সময়ে অপেক্ষা-করার জায়গা ঠিক করে না নিলে পরে এই রকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

হাবড়ার গাড়িতে যথেষ্ট ভিড় হ'ল, কারণ ঘুমের গাড়ি হলেও ঘুমের 'অফিশিয়াল টাইম' এর পূর্ব পর্যন্ত তাতে অন্ত যাত্রীকে স্থান দিতে হবে। তার পর ঘুমের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে, যারা ঘুমের মাশুল দেয় নি, তাদের নেমে যেতে হয়, অর্থাৎ রেলওয়ের কর্মচারী এসে তাদের নামিয়ে দেন। আমাদের কামরা বর্তমানে প্রায় খালি হয়ে গেল, তখন হিসেব করে দেখলাম উপর নীচে দিয়ে মোট ২৮টি শোবার জায়গা আছে সে কামরায়, কিন্তু ঘুমের যাত্রী আমরা মোট আট জন। এই আট জনের মধ্যে আমরা দু'জন ভিন্ন আরও দু'জন বাঙালী সহযাত্রী পাওয়া গেল এবং সৌভাগ্যবশতঃ তাঁদের আসনও আমাদের সঙ্গেই সংলগ্ন। তাঁরা দু'জনেই ডেরাডুন যাচ্ছেন এবং সেখান থেকে দু'জনেই মুসুরীতে যাবেন। যিনি আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি আমাদের পরস্পর পরিচিত হবার পূর্বেই আলাপ শুরু করে দিলেন। প্রথম কথা পাড়লেন রেলওয়ের বিরুদ্ধে। ঘুমের জন্তে অতিরিক্ত মাশুল নেওয়া অত্যন্ত অন্যায়, একে তো ইন্টার ক্লাসকে সেকেণ্ড ক্লাস নাম দিয়ে মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে, তার উপর আবার ঘুমের মাশুল কেন? আমাদের সমর্থন পেয়ে তিনি প্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

অথচ অবিলম্বে এ বিষয়ে আমাদের কিছুই করবার নেই, কিছু করতে হলে রেলওয়ের অনেকগুলো মূলনীতি পরিবর্তন করা আবশ্যক। কিন্তু অবিলম্বে কিছু করবার নেই বলেই সকল বিষয়েরই মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা জমে ভাল। এক জায়গায় ঠায় বসে উত্তেজিত হওয়া চলে, এক পা কোথায়ও যেতে হয় না, দৈহিক পরিশ্রম কিছুমাত্র নেই। কিন্তু যদি এমন হ'ত যে আমরা চার জন তৎক্ষণাৎ গার্ডের কাছে গিয়ে অভিযোগ করলেই গার্ড আমাদের ঘুমের দরুন অতিরিক্ত মাশুল ফেরত দিতে বাধ্য হবেন, তা হলে আমরা আমাদের সুখশয্যা ছেড়ে অতটা কষ্ট স্বীকার করতাম কি না সন্দেহ।

অতঃপর আলোচনা শুরু হ'ল সরকারী হালচাল সম্পর্কে। আলোচনা অন্তে দেখা গেল, ব্রিটিশ আমলে যেমন, দেশী আমলেও তেমনি 'লালফিতা' রীতি সমান চলছে, সরকারী

সনাতন শৈথিল্য সকল আপিসে একই ভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে, এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ নেই।

যাই হোক, রেলওয়ের অতিরিক্ত ঘুমের মাশুল আদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের মনে যে ক্ষোভ জাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে কিছু ভায্যতা ছিল, কারণ উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনায় রাত বারোটার আগে কেউ শুতে পারিনি, সুতরাং সাড়ে দশ টাকার মধ্যে পাঁচ টাকা চার আনা যে বৃথা গেল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা ভিন্ন আমার নিজের বিষয়ে আরও কিছু স্বাতন্ত্র্য ছিল, কারণ সামান্য অসুবিধা হলেও আমি ভাল করে ঘুমোতে পারি না। একটু একটু ঘুমের আভাস চোখ দুটি ছুঁয়ে যাচ্ছিল এবং প্রতি পনের মিনিট অন্তর জেগে উঠছিলাম। আমাদের গাড়িখানা যেমন অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলছিল, তেমনি ভাবে আমার সঙ্গীরাও ঘুমের অন্ধকার ভেদ করে চলছিলেন বাধাহীন নিশ্চিন্ততার সঙ্গে।

দিনের আলো বোধ করি গয়া থেকেই শুরু হ'ল। আমি আগেই জেগে বসে দু'চোখ ভরে বাইরের দৃশ্য দেখছিলাম। এই ভাবে চুপচাপ বসে থাকতে আমার ভাল লাগে। সমস্ত অন্তর দিয়ে নতুন দেশকে অনুভব করতে না পারলে মনে হয় বাইরের ভ্রমণ অনেকখানি বৃথা হয়ে গেল। যাবার অবশ্য লক্ষ্য থাকে একটি বিশেষ জায়গা, কিন্তু সমস্ত পথ এবং আশপাশের সমস্ত মিলিয়ে তবে সেই বিশেষ লক্ষ্যস্থলটি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, তাই আপাতশূন্য পথ আমার কাছে লক্ষ্যের অপরিহার্য অঙ্গ, উপলক্ষ্য মাত্র নয়।

তার পর সঙ্গীরা যখন জাগলেন তখন দেখা গেল রাত্রের প্রথমার্ধে, আমরা বহু উত্তেজনাপূর্ণ আলাপে, অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, দিনের আলোতে সেই অন্তরঙ্গ ভাবটি আর নেই। দিনের আলোয় কেউ কাউকে যেন আর চিনি না এই রকম ভাব। কোনো একটা ষ্টেশনে চা ইত্যাদি যে যার মত নীরবেই খেলাম, এবং সবাই আত্মস্থ ভাবে চুপচাপ বসে রইলাম। প্রথম কথা শুরু হ'ল বারাণসীর আগে গঙ্গা পার হবার সময়। দূর থেকে বারাণসীর রূপ দেখার যে সুযোগ পাওয়া যায় ট্রেনের মধ্যে বসে, অন্য কোনো বড় শহরের রূপ সেভাবে দেখার সুযোগ নেই, সেই রূপও অন্য কোনো শহরের নেই।

গঙ্গার জল তখনও সবুজ আভাবিশিষ্ট, অন্তত সেতুর উপর থেকে সেই রকমই মনে হচ্ছিল। বর্ষার জল তখনও এসে পৌঁছয় নি। এই সব উপলক্ষ্য করে আমাদের দিনের আলোয় নতুন করে পরিচয় শুরু হ'ল, এবং হঠাৎ আলাপ এত জমে উঠল যে শেষে খাওয়াদাওয়া পালা করে এক এক জনের খরচে চলতে লাগল। অবশ্য বয়ঃকনিষ্ঠের উৎসাহ এবং খরচই বেশি হ'ল। বঙ্কিমবাবু রায়বংশের কাছে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে ডেয়ারি করেছেন, দুধ ও দুধের থেকে উৎপন্ন নানা জিনিষের কারবার চালাবেন এই তাঁর উদ্দেশ্য।

কালকা ষ্টেশনের পাঞ্জাবী ভিখারিণী। রেল যাত্রীদের কাছ থেকে ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা চালায়

ডাক্তার ভাদুড়ী তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে কাজের কথা আলোচনা শুরু করলেন। ন্যাশনাল ইনফার্মারির রোগীদের জন্যে সুবিধায় দুধ পাওয়া যেতে পারে কি না তাঁর মাথায় ঘুরছে এই ভাবনা। ন্যাশনাল ইনফার্মারি যে কয়টি যক্ষ্মারোগীকে আশ্রয় দিয়েছে তাদের জন্যে তিনি খুবই চিন্তিত বোঝা গেল তাঁর কথায়। হাসপাতালটি উঠে যেতে পারে এমন আশঙ্কা নাকি দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের অনেক আলোচনা হ'ল এবং কি করে এই পুরাতন অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হাসপাতালটি সম্বন্ধে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় সে সম্পর্কেও অনেক আলোচনা হ'ল।

গাড়ির ভিতরেই স্নান খাওয়া শেষ করে নিলাম সাড়ে এগারোটার মধ্যে। দুপুরের পরে গরম ক্রমশঃ বাড়তে লাগল এবং এর পর আর জানালা খুলে রাখার উপায় রইল না। বাইরের হাওয়া আগুন হয়ে উঠেছে, কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখতে লাগলাম দিগন্তব্যাপী মাঠ—অথচ সবুজের চিহ্নমাত্র নেই, সব যেন পুড়ে গেছে, গরমে বাইরের রোদ যেন কাঁপছে, আর মাঠের মাঝে মাঝে চক্রাকারে ধুলো উড়ে উড়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে, বহু দূরের গাছপালা সে ধুলোর মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ট্রেনের দু-পাশে মাটিতে ছোট ছোট কাশগুচ্ছ সেই শুকনো মাটি ভেদ করে

একটু করে সবুজ চিহ্ন এঁকে গেছে। আর মাঝে মাঝে আসছে আমগাছের সারি। প্রকাণ্ড এক একটা গাছ,
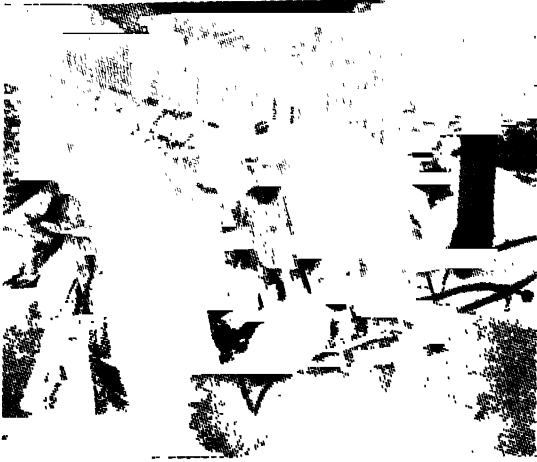
সিমলা ষ্টেশনের রিকশাওয়ালা

ডালগুলো হাজার হাজার হলুদ রঙের ছোট ছোট আমের ভারে যেন কাতর হয়ে পড়েছে। এই অতিক্ষুদ্র দেশী আম এমন অজস্র ফলে' আছে, অথচ মনে হ'ল সেগুলো খাবার লোক নেই। আমগুলো প্রায় সবই পেকে উঠেছে, তখনও জানি না এ আম সুখাদ্য কি না, কিন্তু যাই হোক অখাদ্য যে নয় তা বোঝা যায় গাছের সংখ্যা দেখে। অখাদ্য হলে এত বড় বড় গাছ এরকম সারিবদ্ধভাবে এতগুলো কেউ পালন করত কি না সন্দেহ।

মাঝে মাঝে এক একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকখানি মাটির ঘর একই রকমের, বাইরের দিকে কোনো দরজা বা জানালা নেই এবং গ্রামের মধ্যে যতগুলি বাড়ি আছে তা একসঙ্গে একটি গুচ্ছের মতো ঘনসন্নিবিষ্ট ভাবে সাজানো। দূর থেকে একএকটি গ্রাম এক একটি দুর্গের মত দেখায়। কোন কোন গ্রামের কাছে ছোট দু-একটা জলাশয় দেখা গেল, আর যেখানেই এ রকম জলাশয় অথবা অন্য কোন কৃত্রিম উপায়ে জলসেচের ব্যবস্থা আছে সেখানেই সামান্য কিছু চাষের ব্যবস্থাও আছে, এবং দু-এক খণ্ড জমিতে সবুজ শস্যেরও চিহ্ন দেখা গেল। কিন্তু দু-ধারের সেই দিকচক্ররেখা ব্যাপী পতিত ক্ষেতের মধ্যে তার পরিমাণ মরুভূমির এক এক বিন্দু ওয়েসিসের মত। এমন বিরাট প্রান্তর জলের অভাবে যেন হাহাকার করছে। অল্প কিছু দিন আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, মাটির দিকে তাকালে বোঝা যায় কিন্তু সে বৃষ্টিতে কোথাও জল জমে নি, ফাটা মাটি যেমন ছিল তেমনি আছে, ধুলো যেমন ছিল তেমনি আছে, বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের তৃষ্ণার্ত মাটি সব জল শুষে নিয়েছে।

ভাবছিলাম খাদ্যবিষয়ে দু-এক বছরের মধ্যেই আমাদের দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এ রকম কথা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু সমস্যার বিরাটত্বের দিকে চেয়ে সমস্ত ব্যাপারটাই অসম্ভব মনে হচ্ছিল। কলের লাঙল দিয়ে এই বিস্তীর্ণ মরুভূমির মতো জায়গার সমস্ত খণ্ড জমি একসঙ্গে চাষ না করলে এবং জলের যথেষ্ট বন্দোবস্ত না করলে ফসল ফলবে কি করে? এ রকম পরিবর্তন সাধন করতে পারলে সে হবে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সমান। কনষ্টিটিউশনাল উপায়ে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন চলতে পারে, কিন্তু কনষ্টিটিউশনাল উপায়ে ফসল ফলানো এ অবস্থায় সম্ভব মনে হল না। অবশ্য ভারতবর্ষে যত জমি পতিত পড়ে আছে তার হয় তো সামান্য একটা অংশ চাষের উপযোগী করতে পারলেই ভারতীয় খাদ্যসমস্যা মিটে যেতে পারে, জমির পরিমাণের দিকে চেয়ে দেখলে সেটা কল্পনা করা যায়।

ট্রেন মাঠের পর মাঠ পার হয়ে ছুটে চলেছে। শিল্পী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে স্থলদৃশ্যের বর্ণের দিকে—সবুজহীন এমন মাঠের দৃশ্য বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাই না। অন্য সঙ্গীরা গরমের ঘায়ে একেবারে শুয়ে পড়েছেন। আমরা যে রাত্রিটি বিহারের সীমানায় কাটিয়েছি সে রাত্রিতে এমন ঠাণ্ডা হাওয়া ছিল যে শীতে দু'একটি জানালা বন্ধ করে দিতে হয়েছিল, তার পরেই যে যুক্তপ্রদেশে এসে এমন আগুনের মধ্যে পড়তে হবে কল্পনা করা যায় নি। আমরা যে উত্তাপ অনুভব করছিলাম তা ১১২ ডিগ্রী ফারেনহাইটের নীচে নয়। বিকেল হয়ে এল তবু গরম হাওয়া কিছুমাত্র ঠাণ্ডা হ'ল না।

একটা ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ট্রেন যাত্রীদের কাছে সেই দেশী আম বিক্রি করতে এনেছে দেখে কিছু আম কেনা গেল—পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। কৌতূহল ছিল এই আমের স্বাদ কেমন জানতে, কারণ এই ঘাটতি খাদ্যের দিনেও কেন এত পাকা আম গাছে ঝুলে আছে, পেড়ে নেবার লোক নেই, তা জানা দরকার। আম দু'টির দাম চার পয়সা মিল এবং ঐ সঙ্গে কালো জামও কেনা গেল কিছু, স্বাদ পরীক্ষার জন্যে নয়, খাওয়ার জন্যে। জামগুলি অত্যন্ত সুস্বাদু, কিন্তু আমগুলি নিতান্তই সাধারণ, তবে টক নয়, অথচ খুব মিষ্টিও নয়, আঁশ-হীন নিরেট সার—লোভনীয় নয়, নিতান্ত অখাদ্যও নয়। জাম কুড়িটি করে এক এক ঠোঙা দু'পয়সা, এতই ভাল লাগল যে সবাই প্রায় কাড়াকাড়ি করে খেলাম, আরও পাওয়া গেলে আরও কেনা যেত।

সন্ধ্যার পূর্বে রোদের তেজ কমে এলেও হাওয়ার তাপ খুব বেশী কমেছে বলে মনে হ'ল না। রেলের ধারের একটি

জলাশয়ে দূর থেকে মনে হ'ল অনেকগুলো ছোট ছেলে খেলা করছে, কিন্তু কাছে আসতেই দেখি সেগুলো নর নয়, বানর। সে এক অদ্ভুত খেলা। তারা তিন-চারটি দলে বিভক্ত হয়েছে, এক এক দলে চার-পাঁচটি করে। তারা ঠিক মানুষের মতো এক জন আর একজনকে টেনে চিৎ করে ফেলছে জলের মধ্যে আবার সে উঠে আক্রমণ চালাচ্ছে, কখন ক্রমাগত জল ছিটিয়ে দিচ্ছে এক দল আর এক দলের গায়ে। দেখে মনে হ'ল রাম রাজত্বে এসে পড়েছি।

সিমলার চারদিকে যত পাহাড়—সর্বত্র লোকের বসতি

সন্ধ্যায় এসে পৌঁছলাম লক্ষ্ণৌতে। সেখানে দিনের যাত্রীরা সব নেমে গেলেন এবং শোবার যাত্রী দু-এক জন নতুন উঠলেন। আমরা ছিলাম মাঝামাঝি জায়গায়। আমার সম্মুখের প্রান্তসীমায় এক বৃদ্ধা মহিলা বহু জিনিষপত্র নিয়ে উঠেছিলেন হাওড়া থেকে, তাঁর ভারসাম্য রক্ষার জন্যে লক্ষ্ণৌ থেকে উঠলেন এক বৃদ্ধা এংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলা, দু'জনে দুই চরম প্রান্তে শুয়ে আছেন, আমরা মধ্যপন্থীরা মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত কখনও একটু শুয়ে কখনও একটু বসে আলাপ আলোচনায় কাটাচ্ছি। আমরা লক্ষ্ণৌ থেকে নৈশাহারের অর্ডার দিয়ে ছিলাম, হর্দোয়া ষ্টেশনে খাবার দিতে। এই খাবারের কথা মনে থাকবে। অত্যন্ত বাজে ভাত ও মাংসের ঝোল, ডালের শ্রাদ্ধ। তার আগে ফয়জাবাদ ষ্টেশনে চা ও সামান্য কিছু খাবার খেয়ে অত্যন্ত অস্বস্তিকর বোধ হচ্ছিল, কারণ 'খাস্তা' নামক কলকাতায় প্রাপ্তব্য দু'পয়সা দামের কচুরি প্রত্যেকখানা চার আনা করে এবং পচা অখাদ্য কেক তিন আনা করে। কেক ফেলে দিতে হ'ল, কিন্তু দাম দিতে গিয়ে দেখলাম গলা কাটার ব্যবস্থা খুব ভালই এখানে। শুধু এখানে নয়, রেলের প্রায় সর্বত্রই বহু বিষয়ে অমনোযোগিতা এবং শৈথিল্যের রাজত্ব। ট্রেন-যাত্রীরা দলে দলে প্ল্যাটফর্মের বিপরীত দিক দিয়ে নেমে চলে যাচ্ছে, টিকিট দেওয়া বা রেলের লোকের টিকিট আদায় করা যে একটা প্রয়োজনীয় জিনিষ তা মনে হ'ল না সব দেখে শুনে। যাত্রীদের জন্যে খাদ্য সরবরাহ ভার যাদের উপর, তারা সামান্য জিনিষ দিয়ে যা দাম নেয় এ দুর্মূল্যের বাজারেও তা দৃষ্টিকটু। তদুপরি খাদ্যবস্তু প্রকৃতই খাদ্য কিনা তা পরীক্ষার হয় তো কোন ব্যবস্থাই নেই। অনেক সময় তার চেহারাই অরুচিকর। অথচ এই সব অসাধু ব্যবসায়ীকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ ভার দেওয়া হয়েছে, এ ব্যাপারটি অত্যন্ত গ্লানিকর, লজ্জাকর এবং দেশবাসীর পক্ষে অপমানকর।

রাত্রে সবাই শুয়ে আছি। গাড়ির পাখাগুলি শেষ শক্তি দিয়ে ঘুরে চলেছে কিন্তু আবহাওয়া এতই গরম যে তাতে কোন ফল হচ্ছে না। দ্বিতীয় রাত্রির শোয়াটা তাই খুব আরামপ্রদ বোধ হ'ল না। তবু প্রথম অবস্থায় কিছু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম, সামান্য একটু নিদ্রার আবেশ এসেও ছিল, এমন সময় কোন্ একটা ষ্টেশনে গাড়ি ছাড়বার পর (গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছাড়াবার আগে) একটা শব্দ শুনে হঠাৎ জেগে দেখি দুটি সন্দেহজনক চেহারার লোক জানালা দিয়ে আমাদের কামরায় ঢুকছে। এক জনের হাতে ছোট একটা টিনের সুটকেস্, অপর জনের মুখে বিড়ি, খালি পা এবং দু'-জনেরই পোশাক খুব ভদ্র নয়। কামরার অনেকগুলো আসনই খালি ছিল, তারা নিশ্চিন্ত মনে একটায় বসে পড়ল। আমার মন দেশের বৃহত্তর স্বার্থের বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠল। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম তোমরা কোথায় যাবে? তোমাদের টিকিট আছে তো? আমার কথায় তাদের একজন চট্ করে উঠে এল আমার কাছে তার টিকিটখানা নিয়ে। দেখি থার্ড ক্লাসের টিকিট। সে নিজেই বলল, অল্প দূরের যাত্রী তারা, যে ষ্টেশন থেকে উঠেছে সেখানে কোন টিকিটই ছিল না থার্ড ক্লাস টিকিট ছাড়া, বাধ্য হয়ে তাই কিনতে হয়েছে এবং ঐ টিকিট নিয়ে তারা থার্ড ক্লাসে ওঠার চেষ্টা করেও উঠতে পারে নি, দরজা জানালা সব বন্ধ ছিল, তাই শেষ মুহূর্তে সেকেণ্ড ক্লাসের জানালা দিয়ে উঠে পড়েছে এই কামরায়। প্রথম শ্রেণীর টিকিট দেখে এবং ওদের কথা শুনে ওদের প্রতি সহানুভূতি জাগল, তাই ঘুমের গাড়িতে উঠে অপরাধ করলেও, আমার আর তাতে কিছু মনে করবার ছিল না। তারা মোরাদাবাদ ষ্টেশনে নেমে গেল।
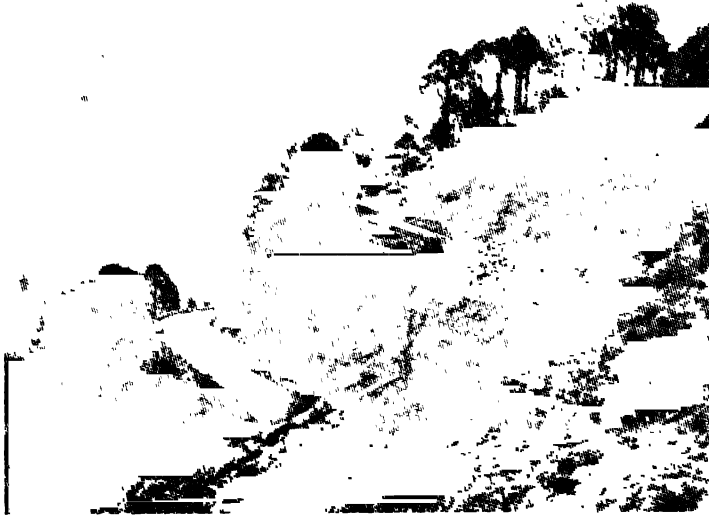
ল্যান্সডাউন পাহাড়ী মোটর পথ—দূরের পাহাড় কুয়াসায় ঢাকা

আমার আর ঘুম হ'ল না, প্রথমতঃ চোরের ভয়ে, কারণ গাড়িতে সবাই ঘুমে অর্দ্ধমৃত, এবং জানালা খোলা। দ্বিতীয়তঃ নজিবাবাদে ভোর পাঁচটায় নামতে হবে, এবং ৮০০ মাইল পশ্চিমে ভোর পাঁচটায় বেশ অন্ধকার থাকবে, সুতরাং ঘুমিয়ে বেশী দূর চলে যাওয়ার ভয় ছিল। তাই আমি সেই গভীর সুষুপ্তির পরিবেশে একা জেগে বসে রইলাম জানালার ধারে। হাওয়া এতক্ষণে কিছু ঠাণ্ডা হয়েছে, বাইরে পশ্চিম আকাশে একটুখানি চাঁদ দিগন্তবিস্তৃত মাঠকে রহস্যময় করে তুলেছে। হঠাৎ চেয়ে দেখি আমি একা জাগ্রত নই। কর্মচঞ্চল পৃথিবী জেগে উঠেছে আমারই সঙ্গে। রাত তখন প্রায় চারটে হবে, তখন দেখি কৃষকেরা মাঠে চাষ শুরু করে দিয়েছে। রেলের ধারে ছোট ছোট গ্রাম পার হয়ে চলেছি, তার প্রত্যেকটি বাড়িতে সবাই জেগেছে। স্ত্রীপুরুষ ছেলে-মেয়ে বাইরে খাটিয়ার উপর বসে আছে। মনে হ'ল, দিনের দুর্দান্ত গরমে এরা যে কাজ করতে কষ্টবোধ করে, সে কাজ এরা রাত্রে শুরু করে দেয়।

নজিবাবাদ ষ্টেশনটি ছোট হলেও এখানে বহু যাত্রী ওঠানামা করে, কারণ এটি একটি জংশন। এখানে সকালে এসেই আমরা কোটদ্বার যাবার গাড়ি পেয়ে গেলাম। ট্রেনে মাত্র প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণী। ষোল মাইল পথ যেতে ঘণ্টা-খানেক লাগল, গাড়ি খুবই আস্তে চলছিল। আমরা আটটা আন্দাজ সময়ে কোটদ্বারে পৌঁছে গবর্মেণ্ট রোডওয়েজ-এর টিকিট কিনে বাস-এ উঠে বসলাম। এখান থেকে তিনখানা বাস পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে পর পর ছাড়ে। হিমালয়ের দৃশ্য এইখান থেকে বেশ দেখা যায়।

আমরা চলছি শেষ বাসখানিতে। ল্যান্সডাউন এখান থেকে ছাব্বিশ মাইল, এই ছাব্বিশ মাইল যেতে বাস প্রায় ৬০০০ ফুট উপরে উঠে যাবে। পাহাড়ের পাশ কেটে কেটে ক্রমাগত পাক খেয়ে খেয়ে রাস্তা উর্দ্ধমুখে যাত্রা করেছে, সব পাহাড় পথেরই চেহারা প্রায় এক। প্রথম ঘণ্টাখানেক বেশ প্রশস্ত পথ পাওয়া গেল, একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ী নদীর প্রায়-শুকনো উঁচু তীরভূমির পাশ দিয়ে চলেছি, নদীর বুকে প্রকাণ্ড বড় বড় প্রস্তরখণ্ড বর্ষায় পাহাড় থেকে নেমে এসে আটকা পড়েছে। ওপারে শাল গাছ এবং অন্যান্য গাছের ঝোপ। শুকনো নদীটির দৃশ্য এমনই চমৎকার যে শিল্পী বার বার বলছিল এইখানেই নামা যাক। আমি আশ্বাস দিচ্ছিলাম—যেখানে যাচ্ছি সেখানেও অবশ্য অনেক ভাল ভাল দৃশ্য পাওয়া যাবে।

দোগাড্ডা নামক একটি দু'পথের সঙ্গমে এসে বাস থেমে গেল। আমাদের পূর্ব্বগামী বাসগুলোও এখানে থেমে আছে দেখা গেল। আরও অন্যান্য পথের অনেকগুলো বাস। পূর্ব্বগামীরা একে একে ছেড়ে গেল, তারপর মিনিট পনেরো পরে আমরাও চলতে শুরু করলাম। ল্যান্সডাউনের পথে সরকারী বাস ছাড়া অন্য কোন বাস বা গাড়ি চলে না। শোনা গেল প্রাইভেট সার্ভিস থাকাকালীন পর পর দুখানা যাত্রী বাস পাহাড় থেকে নিচে পড়ে যাত্রী অনেক মারা পড়েছে, তাই এই নূতন ব্যবস্থা। পাহাড়পথ সত্যই খুব বিপজ্জনক বোধ হ'ল বাস-এর পক্ষে। পথ ক্রমাগত ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। যেখানে মোড় ঘুরবে সেখানে অবস্থা এমনি হয় যে দু' তিন ইঞ্চি একটু বেশি গেলেই অধঃপতন অনিবার্য্য। যদিও মোড় ঘোরার কোণগুলো বৈজ্ঞানিক হিসাব মতো এমন ভাবে একদিকে হেলিয়ে তৈরি যাতে পথ যেন আপনা থেকেই গাড়িগুলোকে ঘুরিয়ে দেয়, কিন্তু তবু সে সময় গাড়িকে পথের এক পাশে এত বেশি যেতে হয় যে আত্মরক্ষার জন্য উদ্বৃত্ত জমি দু' ইঞ্চিও থাকে কি না সন্দেহ। এমনি অবস্থায় ঠিক মুহূর্ত্তে ষ্টিয়ারিং ঘোরাতে না পারলে গাড়ির পক্ষে পতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। পথও এমন এলোমেলো যে ডান দিকের মোড় ঘুরতে না ঘুরতে তৎক্ষণাৎ বাঁ দিকে ঘুরতে হয়, আবার সে দিক থেকেও সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকে, সে সময় বাস প্রায় লাফাতে থাকে। কিন্তু তবু ভরসার কথা এই যে আমরা ত জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই ঠিক এমনি করেই বেঁচে আছি, এক চুল এদিক ওদিক হলে কুমায়ুন

পর্বতমালার চক্রপথেই হোক অথবা কলকাতার সমতল রাজপথেই হোক সর্বত্রই ঐ একই পরিণাম।

ল্যান্সডাউনের আর একটি দৃশ্য

দৃশ্য ক্রমশ বদলে যাচ্ছে—যত উপরের দিকে উঠছি। ছোট ছোট শাল গাছ যা পিছনে ফেলে এসেছি তা আর নেই, এখন পাহাড়ী গাছের মধ্যে চিড় পাইন বা চিরপাইনের আতিশয্যই বেশি। পাহাড়ের চেহারা অভিনব, কারণ চার হাজার সাড়ে চার হাজার ফুট একএকটা পাহাড় মাথা থেকে তলদেশ পর্যন্ত চতুর্দিকে শত সহস্র সিঁড়ির বেষ্টনীতে ঘেরা। চাষের জন্যে এইভাবে পাহাড়ের গায়ে ক্ষেত তৈরি হয়েছে, ইংরেজীতে ষ্টেপ বা টেরাস কালটিভেশন বলে। কতদিনের কত পরিশ্রমে এক একটা আস্ত পাহাড়কেটে কেটে এইভাবে চাষের জমি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে তা ভাবতে বিস্ময় বোধ হয়। উপত্যকাগুলি সবই পাতলা কুয়াসার আবরণে ছাওয়া। দূরের পাহাড় কুয়াসায় প্রায় অদৃশ্য।

প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা ব্যাপী দৃশ্যসমুদ্র পার হয়ে আমরা পৌঁছলাম অরণ্যগর্ভের ল্যান্সডাউন শহরে। এটি একটি ক্যান্টনমেন্ট বা 'ছাউনি'। ছোট্ট জায়গাটি যেন কেবলমাত্র গড়বালি রেজিমেন্টের জন্যেই তৈরি, সুতরাং সেনানিবাসের আয়োজনটাই সেখানে সব চেয়ে বেশি। ওখানকার বাসিন্দারাও সেনানিবাস সংক্রান্ত চাকরি উপলক্ষে সেখানে আছেন—সুতরাং ছোটখাটো একটি বাজারও আছে। বাইরের কোনো লোক এখানকার দৃশ্য উপভোগের জন্যে আসে না, বোধ হয় এ বিষয়ে আমরাই প্রথম। তাই হয় তো সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকব।

এখানে চাকরি উপলক্ষ্যে কয়েক ঘর বাঙালী আছেন। হরিধন মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার অফিসের কর্মী, তার বাড়িতেই আমরা উঠেছি। এই উপলক্ষে এই দূর দেশের বাঙালী গৃহস্থালীর চেহারাটাও কিছু দেখা গেল। রান্না ঘরের ব্যাপারটি অনেকটা সরল, কেন না এখানে মাছ দুর্লভ এবং মাংস যা পাওয়া যায় তা প্রায় অখাদ্য। সুতরাং ডিম ও ডাল এবং কিছু তরকারী এখানকার দৈনন্দিন আহার। তবু এই সরল ব্যাপারেও শ্রীমতী ইলা, শ্রীমতী ছায়া ও বালক জ্ঞান সিং প্রভৃতি বেলা তিন চার ঘণ্টা প্রাণান্ত পরিশ্রম কেন করছে কৌতূহল বশতঃ তার সন্ধান নেওয়া গেল। দেখলাম আস্ত কাঠ জ্বালান হচ্ছে উনুনে, একটা পুড়তে না পুড়তে আর একটা দিতে হচ্ছে —তদুপরি যাদের উপর মূল বিষয়ের দায়িত্ব তারা দু'জনেই সদ্য কলেজ উত্তীর্ণ, মনে হ'ল শেখা এবং কাজ একই সঙ্গে চলছে।
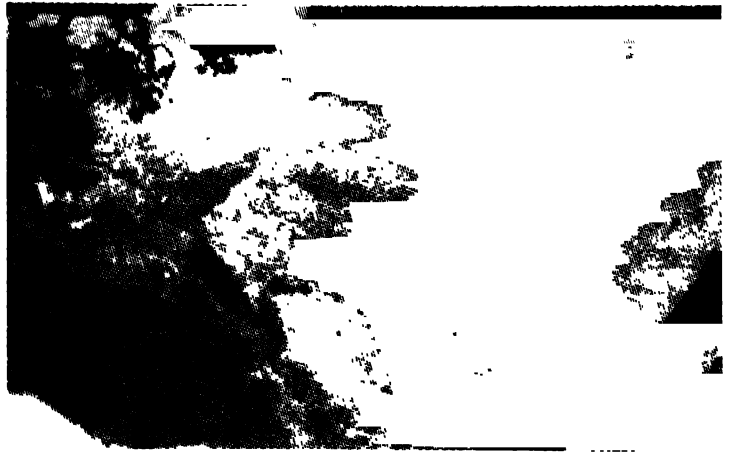
এই বাড়ির সম্মুখে একটি পাহাড়ে কুচকাওয়াজের মাঠ। এইখানে দরবান সিং নেগি নামক গড়বাল সিপাই নায়কের স্মৃতিফলক আছে। যে সকল ভারতীয় সিপাই প্রথম মহাযুদ্ধে সর্ব প্রথম ভিক্টোরিয়া ক্রস্ পায় তার মধ্যে সে একজন, সুতরাং দরবান্ সিং নেগি গড়বালদের কাছে বিশেষ সম্মানীয়।

পথে আসতে সিঁড়ি পথের যে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য কাছাকাছি দেখেছিলাম এবং যা দেখে আমার অনেকবার মনে হয়েছিল সেখানেই নেমে পড়ি—ছ' হাজার ফুট উপরে এসে সে সব দৃশ্য অনেক নীচে পড়ে গেছে। মন বড় খারাপ হয়ে গেল। দূর থেকে ছবি নেওয়ার অসুবিধা, কারণ সর্বদা পাহাড়ের গায়ে গায়ে যে কুয়াসার আবরণ আছে তা যত দূরে যাওয়া যায় ততই গভীর দেখায় এবং তা ভেদ করে দূর পাহাড়ের দৃশ্য দেখা যায় না। তাই ল্যান্সডাউনের উচ্চতা থেকে, সম্মুখস্থ একটি পাহাড় সীমা পর্যন্ত, দুই এবং তিন নম্বর হলুদ ফিলটারের সাহায্যে ছবিতে তোলা গেছে, কিন্তু তারও পিছনে যে সব বড় পাহাড় আছে তার চিহ্নমাত্র ছবিতে নেই। একমাত্র লাল ফিলটার বা ইনফ্রা-রেড ব্যবস্থা থাকলে তবেই সেই কুয়াসা ভেদ করা চলত।

শহরের পথ ঘাট নির্জন, চারদিকে বড় বড় গাছ, তার ভিতরের পাহাড়ী উঁচু নীচু পথগুলিকে ঘিরে একটা গভীর প্রশান্তি। ঘন ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে পথের উপর এখানে-সেখানে রোদের খেলা। শিল্পী বেরিয়ে গেছে রং তুলি কাগজের ব্যাগ হাতে নিয়ে। এক এক বেলা এক একখানি রঙীন ছবি আঁকা শেষ করে ফিরছে। আকাশে এক বিন্দু মেঘ নেই, দিনে অস্বাভাবিক গরম, পাহাড় পথ অত্যন্ত উঁচু নীচু, একটু হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়ি—অথচ সে

পরিশ্রমের সার্থকতা সেই ক্যামেরার কাছে। তদুপরি পথে পথে সৈন্যদের কৃত্রিম যুদ্ধ মহড়া চলছে, নির্জন মনে করে যেখানেই যাই সেইখানেই দেখি সৈন্যদের অতর্কিত আক্রমণের খেলা। শিল্পী এখানে বেমানান, ক্যামেরা যাতে এদের মধ্যে খোয়া সন্দেহজনক, নিজেরই কাছে অবাঞ্ছিত মনে হয়। তদুপরি প্রবাসী প্রবাসিনীরা হু'জন বাঙালী অতিথি পেয়ে আতিথেয়তা যেমন উচ্ছ্বাসের সঙ্গে শুরু করে দিলেন তাও আমাদের পক্ষে সঙ্কোচের কারণ হয়ে দাঁড়াল। বাইরের প্রকৃতি প্রতিকূল, ঘরে যত্নের আতিশয্য, এ দুই-ই আমাদের মত দুই ঘরছাড়ার পক্ষে লজ্জাকর। দু'জন গোপনে পরামর্শ করলাম এবারে বিদায় হওয়া দরকার। ঠিক হ'ল এখান থেকে হরিদ্বার ও হৃষিকেশ যাব এবং সেখান থেকে সোজা কলকাতা ফিরব।

এমন সময় সিমলা থেকে হঠাৎ এল এক পোষ্টকার্ড—"বর্ষার মেঘ অপূর্ব্ব শোভা নিয়ে তোমার ক্যামেরার অপেক্ষা করছে—সমস্ত সিমলা-প্রকৃতি বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত হয়েছে কালীকিঙ্করের জন্তে।"

কলকাতা ছাড়বার আগে বন্ধু কিরণকুমার রায়কে ল্যান্সডাউনের ঠিকানা দিয়ে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম—তারই জবাব ওটা। এর পর কি করে কি হয়ে গেল ঠিক মনে নেই, যখন অবস্থাটা প্রথম উপলব্ধি করলাম তখন দেখি আমরা নজিবাবাদ ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে বসে আছি। সিমলা যাবার ট্রেন কখন জানি না, কি পরিমাণ দুঃখভোগ অদৃষ্টে আছে তাও জানি না, কিন্তু আমরা ছ' হাজার ফুট নেমে এসেছি সমতল ক্ষেত্রে। ল্যান্সডাউনে থাকতে যত রকমে সম্ভব সিমলা যাবার সুবিধাজনক সময়-তালিকার সন্ধান নিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ দিতে পারেন নি। পাঞ্জাবী শিখ, পাঞ্জাবী হিন্দু, যুক্ত প্রদেশের লোক, বাঙালী, কেউ জানেন না কোন্ গাড়িতে কোথায় গিয়ে প্রথম নামতে হবে। তবে একটা বিষয়ে সবাই একমত হয়েছিলেন এই যে আম্বালায় গিয়ে সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, কালকা যাবার গাড়ির জন্তে।

নজিবাবাদে এসে শুনলাম রাত প্রায় ১১টায় একখানা গাড়ি আছে, সাহারানপুরে গিয়ে গাড়ি বদল করতে হবে। কিন্তু চিন্তা করে দেখা গেল সে গাড়িতে গিয়ে লাভ কি? অপেক্ষা যদি করতেই হয় তবে নজিবাবাদেই ভাল। অতএব রাত প্রায় ১টার গাড়িতে যেতে হবে। টিকিট করতে গিয়ে জানা গেল ১২টার পর তারিখ বদল হবে, অতএব টিকিটও ১২টার পরেই পাওয়া যাবে। কিন্তু রেলওয়ের যে লোকটি ১২টার পূর্বে একথা বলেছিলেন তিনি ১২টার পর মত পরিবর্তন করলেন। অর্থাৎ পুনরায় টিকিট কিনতে গেলে তিনি বললেন অল্প দূরের টিকিট এ গাড়িতে বিক্রি করা হয় না। দেখা গেল রেলওয়ের লোকদের গাড়ির সময়-তালিকা এবং কোন্ গাড়িতে কোথায় যাওয়া সুবিধা সে বিষয়ে প্রত্যেকেরই একটি করে বিশেষ মত আছে এবং এই ব্যাপারটিতে তাঁরা কেউ কাউকে প্রভাবান্বিত করতে পারেন নি। তাঁদের যখন যা ধারণা, হয় তো তাই বলে দেন, হয় তো তাঁরাও ইম্প্রেশনিষ্ট। ট্রেনের সময়-তালিকা ইত্যাদি খুঁটিনাটি তথ্য একমাত্র কুলিরাই ঠিক বলতে পারে। কুলিরা প্রি-র‍্যাফেলাইট।

অতএব পরদিন সকাল পর্যন্ত নজিবাবাদ ওয়েটিং রুমেই কাটিয়ে সকাল সাতটা আন্দাজ সময়ে সাহারানপুরগামী একখানা গাড়িতে চেপে বসা গেল। সকাল বেলা গরম বেশি ছিল না, গাড়িও প্রায় খালি ছিল। কিন্তু দশ-বারো বছরের দুটি নোংরা ছেলে ক্রমাগত আম খেয়ে খেয়ে গাড়ির একটা ধার জঞ্জালে পূর্ণ করতে লাগল। তারা বিনা ভাড়ায় সেকেণ্ড ক্লাসে যাচ্ছে নিশ্চিন্ত মনে। তারা বলল পুলিসে ধরুক এই তারা চায়, তা হলে খেতে পাবে। অত্যন্ত অকালপক্ব চালিয়াত বস্তির ছোকরা। কিন্তু পুলিসে তাদের ধরল না, কেউ তাদের কিছু বলল না, কারোই এ বিষয়ে কোন গরজ নেই। আমাদেরও টিকিট হাবড়া থেকে ছাড়বার পর কাউকে কোথাও দিতে হয় নি। টিকিট কেনাই অর্থহীন বলে মনে হয়েছে অনেক সময়। বিনা টিকিটে ভ্রমণের এমন সুযোগ চোখে না দেখলে কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল। এ সুযোগ দেশের অধিকাংশ লোক গ্রহণ করছে নির্বিকার ভাবে।

রুড়কির পথে সাহারানপুর এসে পৌঁছলাম কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। আবার ওয়েটিং রুম, আবার অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা। এখানে কুলিদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখা গেল সন্ধ্যার পূর্বে একটা গাড়ি ছাড়ে সেটাতেই আম্বালা গেলে তার কিছু পরেই কালকার গাড়ি পাওয়া যায়। সুতরাং পূর্বের কোনো গাড়িতে না যাওয়াই স্থির করলাম। এখানে অসহ্য গরম, কিন্তু সব বন্ধ করে ওয়েটিং রুমে থাকতে ততটা কষ্ট নেই। দুপুরে স্নান করে ওখানে বসেই ভাত, মাছের কাটলেট এবং ডাল খাওয়া গেল। ট্রেনে বা ওয়েটিং রুমে এর চেয়ে ভাল খাওয়া আর কোথাও জোটে নি। রুচিকর ডিশ প্লেট, উৎকৃষ্ট চালের ভাত, সুমিষ্ট ডাল ও মাছ এবং পরিবেশনের পারিপাট্য—সব মিলিয়ে অত্যন্ত তৃপ্তিকর। এ রকম বিশেষ যত্ন পেলাম তার একটি কারণ অনুমান করি এই যে ওয়েটিং রুমের রক্ষক ফকির চাঁদের সুনজরে পড়েছিলাম আমরা আগেই। বৃদ্ধ ফকির চাঁদের চেহারাটি ছিল লোভনীয়, আমি তার ছবি তুলে নিয়েছিলাম এবং কালীকিঙ্কর ব্রাউন পেন্সিলে তার একখানি চমৎকার প্রতিকৃতি এঁকেছিল। আঁকা ছবিখানা তাকে তখনই দিয়ে দেওয়া হ'ল, এবং তাতে তার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। বোধ হয় এই কারণেই ফকির চাঁদ আমাদের

ক্যাম্পতাঁবু থেকে ছিটি-চাব বা ক্লেশ কাল্চিচেৎগয়ের দৃশ্য—পিছনের বড় পাহাড় কুয়াশায় ঢাকা

বাঁশী
শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

সন্ধ্যাপ্রদীপ
শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ
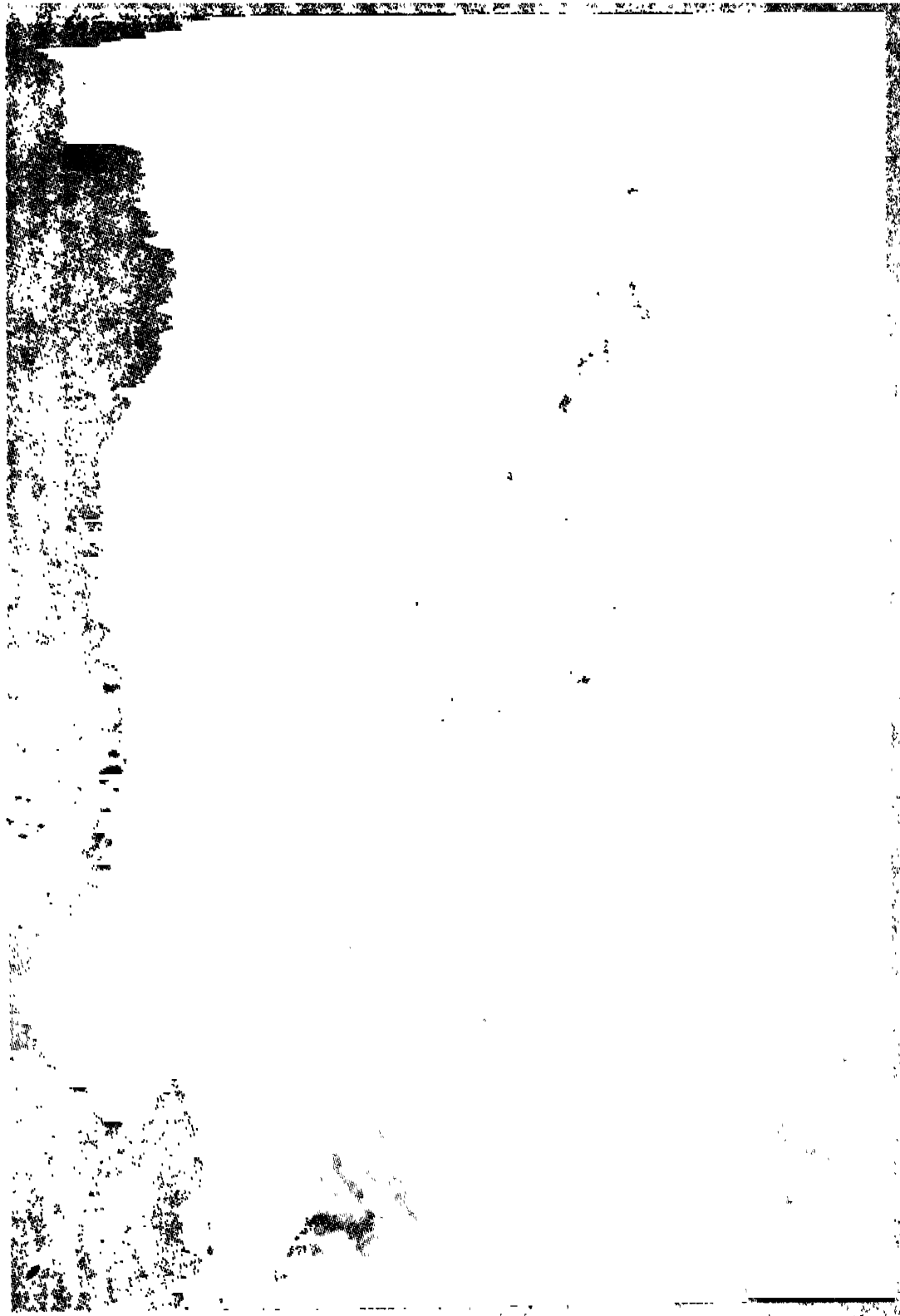
আহারের ভয়াবধান করেছিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল মজিবাবাদের একটি কাহিনী। ল্যান্সডাউন থেকে ফিরে আমরা ঐ ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করার সময়ে শিল্পী শহর দেখতে বেরিয়ে যায়। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে যে কাহিনীটি বলল তা এই। সে একটি বাড়িতে মসজিদ দেখে তার স্কেচ এঁকে নিচ্ছিল পেন্সিলের সাহায্যে, সেই বাড়ির মালিক তা দেখে শিল্পীর প্রতি এমন সশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন যে তাকে বাড়িতে নিয়ে খাইয়ে তবে ছাড়লেন, এবং শুধু তাই নয় ভবিষ্যতে এদিকে এলে তাঁর বাড়িতে অতিথি হতেই হবে, অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এই কথা তিনি বার বার তাকে বললেন। শিল্পী বিস্মিত হয়েছিল তাঁর সৌজন্য দেখে।

সন্ধ্যার পরে আম্বালা পৌঁছলাম। সেখানে রাত্রের আহারের সন্ধানে গিয়ে দেখি ভাত কোথাও নেই। ষ্টেশনের খাবার ঘরে ভাত ছাড়া আর সবই আছে। বোঝা গেল খাঁটি পঞ্জাবে এসে পড়েছি। ঘণ্টা দুই পরেই কালকার গাড়ি পাওয়া গেল। গাড়িতে ভিড় ছিল না আদৌ, আমরা দু'জন আর এক জন সুট পরা পাঞ্জাবী হিন্দু যুবক। বেশ স্বাস্থ্যবান। কিন্তু সে তার কথায় এবং ভাবভঙ্গীতে যে অশিক্ষা এবং অমার্জিত ভাবের পরিচয় দিল তাতে স্তম্ভিত হতে হয়। বাংলায় গোবর গণেশ বলতে যা বোঝায় তাই, কিন্তু সে যে কোনো সরকারী বড়কর্তার আত্মীয় সে কথাটি বার বার উচ্চারণ না করে থাকতে পারল না। বাংলাদেশের কোনো ভদ্র যুবক সম্পর্কে কিন্তু এতখানি অজ্ঞতা ও রুচিহীনতা কল্পনা করা যায় না, কিন্তু পরে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, ওদেশে আমরা যাকে সংস্কৃতি বলে জানি, তা তথাকথিত শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে নেই, তা যে থাকা উচিত সে ধারণাও বোধ করি কারও নেই।

আমাদের দ্বিতীয় রাত্রিবাস হ'ল কালকার ওয়েটিং রুমে। পর দিন সকালে সিমলার গাড়ি। গাড়িতে গিয়ে উঠতে না উঠতে এমন ভিড় হতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত অনেকেই দাঁড়িয়ে বা নীচে বসে বসে চললেন। বারো জনের জায়গায় প্রায় ত্রিশ জন যাত্রী, তবে সুবিধা এই যে রেলওয়ের ওতে আয় বেশি হয়, যাত্রীদের অসুবিধা যেটুকু হয়, তা স্বদেশী রেলওয়ের জন্যে আত্মত্যাগ হিসাবে ধরে নিলে মনে আর কোনো গ্লানি থাকে না।

কিন্তু আমাদের মনের গ্লানি আরও সহজে দূর হ'ল। পাহাড়ের এলোমেলো পথের দু'ধারে প্রতিমুহূর্তে নতুন দৃশ্য, প্রতি পাকে এক একখানা নিখুঁৎ ছবি, ছবির পর ছবি বদল হচ্ছে চলচ্চিত্রের মত। একই জায়গায় বসে এক একটা পাহাড় বেষ্টন করে চলেছি চারদিকের অপরূপ শোভার ভিতর দিয়ে। কখনো উপরে উঠতে এঞ্জিন হাঁপিয়ে উঠছে, কখনো দ্রুত গতিতে কিছু নীচে নেমে যাচ্ছে, কিছু সোজা পথে, বহু বাঁকা পথে, বহু টানেলের অন্ধকার পথে ছুটে চলেছি আট হাজার মাইলের উচ্চ লক্ষ্যে।

জেমস্ ওয়াট বাষ্পশক্তি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন দু'শো বছর আগে, সেই শক্তি কি নিষ্ঠার সঙ্গে আজ দুটি বাঙালী সন্তানকে সৌন্দর্যের স্বর্গে টেনে নিয়ে চলেছে সে কথাটি হঠাৎ মনে এল। আর ঐ সঙ্গে মনে এল বন্ধুর পোষ্টকার্ডের দুটি লাইন—তার ক্ষমতাও এই বাষ্পীয় শকটের অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নয়। এক শক্তি দেহকে টানছে, আর এক শক্তি মনকে। একই কথা বহু বিস্তারিত করে মুখে উচ্চারণ করলে কথার শক্তি অনেক কমে যায়। কিন্তু সংক্ষেপে সেই কথাটি লেখা হলে তার শক্তি তখন অসম্ভব রকমে বেড়ে যায়। উচ্চারিত কথার ইঙ্গিত যায় হাওয়ায় মিলিয়ে, কিন্তু লিখিত কথা রেডিয়ামের মত তেজ বিকিরণ করতে থাকে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পাহাড়ের যে একটি নতুন রূপ দেখলাম তা হিমালয় পর্বত শ্রেণীতে কল্পনার অতীত ছিল। কোথায়ও এ রকম উলঙ্গ পর্বতের অপূর্ব শোভা দেখি নি। আমরা তখন তার উপর দিয়ে চলছিলাম। নীচের দিকে অন্ততঃ পাঁচ হাজার ফুট পর্যন্ত একটি উদ্ভিদের চিহ্ন নেই। সেই সব পাহাড়ের ব্রাউন রঙের ঢেউ খেলানো ঢালু গায়ের উপর রোদ পড়ে সমস্ত পাহাড় আর তলভূমি আশ্চর্য শোভা ধারণ করেছে। শিল্পী বলে, আর এগিয়ে কাজ নেই, এইখানেই নামা যাক। বুঝতে পারছিলাম এর অপেক্ষা অভিনব সুন্দর দৃশ্য এ পথে আর পাব না। কারণ এ রকম অভিজ্ঞতা সর্বত্রই হয়েছে। সুন্দরতম জায়গা সব সময়েই লক্ষ্যস্থলের মাঝপথে ফেলে যেতে হয়।

সিমলায় পৌঁছলাম আমরা প্রায় আড়াইটায় সময়। ষ্টেশন থেকে উপরে উঠেই শহরের বিরাটত্ব উপলব্ধি করলাম। এখানে চারদিকে যত লোকালয়ের চিহ্ন দেখলাম, কাছের দূরের সমস্ত পাহাড়ের মাথায় মাথায় যত বাড়ি দেখলাম, তাতে দার্জিলিং শহর এর কাছে শিশু।

(আগামী বারে সমাপ্য)

বঙ্গভাষা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শত বর্ষের আশা
জগৎবাসীর বরণীয় হবে
আমার বঙ্গভাষা।
কি উন্মাদনা! তোর আরাধনা
শ্রেষ্ঠ সাধনা গণি'
কাননে পুষ্প চয়ন করেছি
খনিতে খুঁজেছি মণি,
সপ্ত সাগরে মুক্তা তুলিতে
ডুবেছি অতল তলে,
এনেছি দহের সলিল মথিয়া
সুবর্ণ শতদলে,
তোমার প্রতিমা সাজাব বলিয়া
শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারে
যুগ যুগ ধরি আহরণ করি
রত্নের সম্ভারে।
হে মোর বঙ্গভাষা,
ব্যর্থ হবে কি এত ভক্তের
এত দিবসের আশা?

জ্বালিল যজ্ঞানল
কত ঋষি, আর কত কবি, আর
কত ঋত্বিকদল।
উঠিল গগনে কত না মন্ত্র
আগুনে ঢালিল হবি।
এল কি নূতন যাজ্ঞবল্ক্য
এল কি বাচক্নবী?
সহস্র প্রাণে জাগিল প্রেরণা,
পৃথিবীর বিস্ময়,
শত প্রতিভার দীপ্ত আলোকে
সে বাক্ জ্যোতির্ম্ময়।
সে বাণী একদা শুনেছি বাজিতে
ছন্দ মন্ত্র ঘিরে
উষা সন্ধ্যায় তপোবনভূমে
সরস্বতীর তীরে।
পড়েনি পড়েনি ছেদ,
গঙ্গার কূলে উচ্চারিত সে
নবজীবনের বেদ।

শুনেছি সে আহ্বান,
যা-কিছু পেয়েছি, যা-কিছু চেয়েছি
শ্রেষ্ঠ তোমার দান।
অতীতে তাহারা অমর হইল
তোমার প্রসাদ লভি।
শুনি সেই ডাক ঘরে ফিরে এল
শ্রীমধুসূদন কবি।
ঋষি বঙ্কিম গাহিয়া উঠিল
মার বন্দনা-গান,
দেশের বক্ষ প্লাবিয়া বহিল
দেশপ্রেমের বান।
তারপর হ'ল বিশ্ব ধন্য
পেয়ে তব পরিচয়,
তব স্নেহাশিস্ লভিয়া রবি যে
জগৎ করিল জয়।
জননী বঙ্গবাণী,
এই ভারতের ভারতীর মাঝে
তুমি যে রাজেন্দ্রাণী।

তোমার তুলনা নাই,
হৃদয় আকূতি ব্যক্ত করিতে
যার কাছে ফিরে যাই।
শ্রেষ্ঠ বলিতে কুণ্ঠা যে করে
সে তোমারে নাহি জানে,
শ্রদ্ধা দিয়া সে পূজেনি তোমারে,
ক্ষম সেই অজ্ঞানে।
দেখেনি তোমার অপূর্ব্ব রূপ,
কই সে ভক্তি, তারা
সকল ভুলিয়া তোমার মাঝারে
হয়নি আত্মহারা।
প্রচারে মুখর আকাশ-বাতাস,
কোথা বিচারের স্থান!
ঢক্কানিনাদে ঢাকা পড়ে গেল
বীণাযন্ত্রের গান।
হে দেবী বঙ্গভাষা,
জানি জানি জানি ব্যর্থ হবে না
শত বর্ষের আশা।

দুর্ঘটনা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

অনন্ত দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে। বয়স তার চব্বিশ। শোকটা এ বয়সে কালবৈশাখীর ঝড়ের মতই বৃত্তিগুলিকে নাড়া দেয়। মনের মাটি শক্ত না হলে সব কিছুকে উপড়ে নিশ্চিহ্ন করে মানুষটাকে সংসারের বাইরে টেনে আনে—সেই টানে সন্ন্যাসীও হন কেউ কেউ। কিন্তু শোককে জয় করলে অনন্ত—আবার সংসার পাতলে। আঠারো বছরের শ্যামাঙ্গিনী মতি সংসারে এলে অনন্তের মনে হ'ল পুরাতনই নূতন রূপে ও সজ্জায় ফিরে এসেছে। তাদের প্রণয়গুঞ্জনে দোতলার ঘরখানি আবার মুখরিত হ'ল—মতির সঙ্গে অনন্তও মেতে উঠল প্রথম প্রণয়-স্বাদ-লোলুপ তরুণের মত।

প্রথম পক্ষের···বছরখানেকের ছেলেটিকে নিয়ে একটুও অসুবিধা হল না। মতি তাকে কোলে নিয়ে চুমুতে চুমুতে আচ্ছন্ন করে দেয়—কোল থেকে এক দণ্ডের জন্য নামাতে চায় না—পোশাক-পরিচ্ছদের নূতন ফ্যাশান চোখে পড়লেই অনন্তকে তাগিদ দেয় তৈরি করে দিতে—ভাল ভাল খাবার নিজে না খেয়ে খোকার হাতে তুলে দেয়। অন্য ভাড়াটেরা ভেবে পায় না কি করে এমনটা সম্ভব হয়। চিরপ্রচলিত প্রবাদটি মিথ্যা প্রমাণিত করে মতি দিন দিন তাদের চোখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

অনন্তর মনও জল দিয়ে মোছা শ্লেটের মত পুরাতন লেখার অস্পষ্ট চিহ্নও কারো চোখে পড়ে না।

কিছু দিন ভাল ভাবেই কাটল।

কিন্তু অভ্যাসের দোষে অনন্তর জীবনে নয়তা আর অশান্তি দেখা দিল।

প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যাওয়ার ইতিহাসটুকু সংগ্রহ করেই দ্বিতীয় পক্ষের আগমনে কোন বাধা ঘটে নি। প্রসবান্তে রক্তহীন হয়ে প্রথম পক্ষ দেহ রাখে হাসপাতালে। তেমন ব্যাপার প্রায়ই ঘটে। এতে অনন্তের দায় দোষ কিছু ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ এক সময়ে আবিষ্কার করলে—প্রথম পক্ষের মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষে না হোক পরোক্ষে অনন্তই দায়ী। অনন্তের অভ্যাসের দোষটুকু সে এক দিন ধরে ফেললে।

বললে, তোমার মুখে গন্ধ কিসের?

অনন্ত মাথা চুলকে উত্তর দিল, আজ বড্ড খাটুনি হয়েছে, শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে তাই ডাক্তার বললে—

কি খেয়েছ—ঠিক করে বল?

একটু ব্র্যাণ্ডি। এতে ঘাবড়াচ্ছ কেন—ওষুধের সঙ্গে ডাক্তাররা দেয়—জান না?

জানি। মুখখানা গম্ভীর করে মতি মেঝেতে মাদুর পেতে নিলে।

ওকি—খাটে শোবে না?

না—ওসব গন্ধ আমি সইতে পারি না, বমি আসে।

অনন্ত তার একখানি হাত ধরে নরম গলায় বললে, ছিঃ মতি—আমি কষ্ট পাই এইটাই তুমি চাও। আমার গায়ে হাতে ব্যথা—

তা আমায় বল নি কেন—টিপে দিতাম।

অনন্ত হাসলে, এ কি খাটুনির ব্যথা—এযে রোগের ব্যথা, ওষুধ না খেলে যায় কখনও!

অনেক কষ্টে বিরাগ দমন করলে মতি। মাদুরটা মেঝে থেকে উঠিয়ে নিতে নিতে বললে, বাবা চিরটাকাল জ্বালিয়েছেন—ভাইয়েদের নিয়ে জ্বলছেন না। আবার তুমিও যদি—

মতি কেঁদে ফেলতেই তাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে অনন্ত বললে, তোকে ছুঁয়ে বলছি মাইরি আর যদি কোন দিন এ জিনিস ছুঁই—

৩

ক্রমে মতিও বুঝলে—বাপের সংসারের অভিশাপ এ সংসারেও ছায়া ফেলছে। এই ভবিতব্যকে রোধ করা মতির সাধ্য নয়। যারা নাকি কারখানায় কাজ করে—লোহা লক্কড় হাতুড়ি আগুন নিয়ে যুদ্ধ করে আট ঘণ্টা—তাদের দেহকে সক্রিয় ও মনকে তাজা রাখতে ডাক্তারের বিধান না মেনে উপায় নাই। কর্ম-ক্লান্তিতে ও জিনিষকে সুরা না বলে সুধা বলাই ঠিক। অনন্ত তো মাত্রা বাড়িয়ে হৈ-হল্লা করে পয়সা উড়োচ্ছে না!

মতি অভিযোগ করে—চোখের জল ফেলে না আর। চোখের জলে যে মাটি নরম হয় সে বুঝি তার ভাগ্যের পাওনা নয়। ছোট ছেলেটাকে নিয়ে সে মনের ক্ষোভ দূর করতে চায়। সে প্রার্থনা করে, ও যেন বাপের মত না হয়—ও যেন কারখানার মিস্ত্রিও না হয়। যেন লেখাপড়া শিখে বাবুদের মত দশটা পাঁচটায় আপিস করে। ফরসা কাপড় জামা পরে খবরের কাগজে মোড়া খাবারের কৌটো ও পানের ডিবে নিয়ে মা-কালীর পটে মাথা ঠেকিয়ে সওয়া ন'টার ট্রাম-বাস ধরবার জন্য ছুটে ছুটেই বার হয়ে যায় বাড়ি থেকে। ছ'টায় সময় বাড়লে আবারপাতি, কোন দিন বা আম, আনারস,

কোন দিন বা বিস্কুট সন্দেশ বেঁধে ধীর মন্থর গতিতে ফিরে আসে। পাশের ঘরের সুরপতি বাবুর মতই সাতচড়ে কথা বার না হওয়া নিরীহ মানুষ তার মনের আয়নায় দিন দিন উজ্জ্বল হতে থাকে।

৪

ভাগ্যের কাছে ঋণের বোঝাটা মতির ভারীই ছিল—এক দিন তা প্রকাশ পেল।

শনিবার—আধা খাটুনির দিন। সকাল সকাল ছুটি হয়, খাটুনিও যথাসম্ভব কম। সেই দিনই কিন্তু ডাক্তারী দাওয়াই-এর প্রয়োগটা বেশী মাত্রায় চলে। কৈফিয়তটা এই রকম: হপ্তায় একটি দিন একটু আমোদ-ফুর্তি না করলে দেহের খোরাক যেমন তেমন—মনের খোরাক না দিয়েছ কি ব্যস্—

অবশ্য দেহের খোরাক ঐ দিনে ভাল মত জোগাড় হয়। খানিকটা মাংস, কখনও একটা ইলিস কখনও বা ঠোঙা ভর্ত্তি খাবার। অনন্তের পাতে মতিও প্রসাদ পায়—কিন্তু প্রসাদ পেয়ে বর্ত্ত হওয়ার কৃতজ্ঞতা তার চোখের তারায় জ্বলে না।

সে শনিবারেও মতি বসে আছে অনন্তের প্রতীক্ষায়। মাংস কিংবা মাছ যাই আসুক—আয়োজনটা তাকেই করতে হবে। দু'দিন থেকে বর্ষা পড়াতে ঘরে ঘুঁটের টানাটানি—কোনমতে কাঠকুটা কাগজ যোগাড় করে দু'বেলার উনুন জ্বলছে। এ বেলা যে দুখানি ঘুঁটে আছে তা শেষ হয়ে গেলে কাল কি দিয়ে উনুন ধরাবে এই ভাবনাও ভাবছে মতি। তবে আশ্বাসের কথা কাল ছুটির দিন অনন্ত বাজার থেকে ঘুঁটে কিনে আনতে পারবে আর দেরিতে উনুন জ্বললেও ক্ষতি হবে না।

আকাশের ঘোরটা কাটে নি—মাঝে মাঝে ফিস্‌ফিসানি বৃষ্টি হচ্ছে। আজ মাংস না এনে কি ছাড়বে অনন্ত?

কিন্তু এত দেরি হচ্ছে কেন? এমন তো কোন দিন হয় না!

সাঁঝের পিদীম জ্বেলে মতি খোকাকে বললে, হাঁরে—বাপি আসছে না কেন?

দেড় বছরের শিশু মায়ের নাক ধরবার চেষ্টা করে উত্তর দিলে, হাম—বা—বাব্বা—

কই তোর বাবা?

উ—উ—, খোকা আঙুল দিয়ে কার্ণিসে বসা শালিখ পাখীটাকে দেখিয়ে দিলে।

এমনি করে মায়ে ছেলেয় যখন অনুপস্থিত মানুষটির আলোচনা চলছে তখন বাইরের কড়া নেড়ে এক জন বললে, একখানা চিঠি আছে—মতিবালা ঘোষ সাত নম্বর বাড়ি।

মতি লেখাপড়া জানে না। পাশের ঘরের সুরপতি বাবুর স্ত্রী বললে, অনন্ত আজ আসবে না। কোথায় তার বন্ধুর বিয়েতে হঠাৎ বরযাত্রী যেতে হ'ল—বন্ধু ছাড়লে না, তাই—

মতি উনুনের পাড় থেকে ঘুঁটে ক'খানা কয়লার পেতের তুলে কেরোসিনের কুপিটা হাত দিয়ে নিভেয়ে দিলে। বিয়ের পর এ রকমের ঘটনা এই প্রথম। মদের গন্ধ সে সইতে পারে না সত্য কিন্তু একলা সঙ্গীহীন হয়ে রাত কাটাবে কি করে। বাড়িতে উপর নীচেয় অনেক লোক রয়েছে কিন্তু ঘরের মধ্যে দুয়োর বন্ধ করে একটা দেড় বছরের অবোধ ঘুমন্ত শিশুকে নিয়ে একলা রাত কাটানোর ভয়েতে মতি যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠল। না-ঘুমে না-জাগরণে সে রাত অবশ্য কাটল, কিন্তু তেমন দুঃসহ রাত মতির জীবনে ইতি-পূর্ব্বে আসে নি।

৫

রবিবারের সন্ধ্যায় অনন্ত ফিরল। তার সহসা অন্তর্দ্ধানের গল্পটা মতি শুনলে। সে নাকি শহরের প্রান্তে কোন্ অজ পাড়া গাঁ। সেখানে যেমন মশা তেমনি বিয়ের গোলমাল। সারারাত ঘুমোতে পারে নি অনন্ত। চোখ মুখ বসা—চুল উস্কোখুস্কো—কাপড়ে জামায় ঝোলের হলদে দাগ—মুখে মদের গন্ধ। কি করবে—বন্ধুরা ছাড়লে না! আসবার সময় সে খাবে না—ওরাও ছাড়বে না, বললে, এ অনুরোধটা না রাখিস তো মাইরি—তোর সঙ্গে চিরজীবনের মত···। খপ করে মতির হাত ধরে অনন্ত কেঁদে ফেললে, তোর দিব্যি—মাইরি বলছি—আর যদি বেচাল দেখিস।

কারও কান্না সইতে পারে না মতি। বললে, ঘরে এস।

পরের শনিবারেও অনুরূপ ঘটনা ঘটল। যথাসময়ে কড়া নড়ে উঠল। একখানা চিরকুটে না-আসার কৈফিয়তটা সুর-পতি বাবুর স্ত্রীর মারফত জানতে পারলে মতি। এবার বন্ধুর বিয়ে নয়—কারখানার কে একজন হাসপাতালে দেহ রেখেছে তাকে দাহ করবার জন্য···।

রবিবার বিকেলে ফিরে অনন্ত বললে, শুধু কি দাহ করেই রেহাই পেলাম—আমরা দু'জনে মিলে গেলাম তার বাড়ি। বউটার সে কি কান্না। বলে, আমাকে ওর চিতের তুলে দিয়ে এলেন না কেন—কেউ যে নেই আমার। সব জ্ঞাত শত্তুর। আপনারা পাঁচ জন ভদ্দর লোক থেকে একটা বিলিব্যবস্থা যদি না করেন—এই কচি-কাঁচাগুলো নিয়ে পথে বসব। সেই ব্যবস্থা করতেই···

মতি কঠিন স্বরে বলল, আবার মদ খেয়েছ তো?

অনন্ত একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বললে, মদ না খেয়ে কোন্ শালা সারা রাত জেগে মড়া পোড়াতে পারে—পারুক দিকি! একে এই গুমোটে মানুষ সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছে—তার ওপর চিলুর গন্‌গনে আগুন—

গম্ভীর হয়ে মতি বললে, হুঁ।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অনন্ত একটু থামতে গেল—কিন্তু সেই সঙ্গে সুরার ক্রিয়া তার পৌরুষকে উদ্দীপ্ত করে তুললে।

কর্কশ কণ্ঠে সে বললে—এ্যাইও—বাস কোথায়? হুঁ—বলে বাস কোথায়? সারাদিন যে না খেয়ে এলাম—

মতি বিদ্যুৎ গতিতে ফিরে দাঁড়াল। স্বরে শ্লেষ মিশিয়ে বললে, খাও নি? এক পেট মদ গিলে আবার খিদে। লজ্জাও করে না?

তবে রে হারামজাদী—তোর বাবার পয়সায় গিলেছি মদ? অনন্ত উগ্র হয়ে উঠল। রোজগার করি—খাই—কোন মিঞার তোয়াক্কা রাখি!

সুরপতি বাবু বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, নিজের পয়সায় যা খুশী করুন গে—পাঁচ জনের সঙ্গে বাস করতে গেলে বেলেল্লাগিরি চলবে না।

অনন্ত রুখে উঠল, আপনার ঘরে গিয়ে তো—

শাট আপ্। চীৎকার করে উঠলেন সুরপতি বাবু। সঙ্গে সঙ্গে উপর নীচ থেকে আরও পাঁচ-সাত জন বেরিয়ে এসে সুরপতি বাবুর দল পুষ্ট করলেন।

নিরীহ সুরপতি বাবু সতেজে বললেন, এ বাড়িতে বেলেল্লাগিরী করেছ কি—ঘাড় ধরে বিদেয় করে দেব। এটি ভদ্রলোকের বাড়ি—তাড়িখানা নয়।

মতির ক্রোধ অভিমান অকস্মাৎ আশঙ্কায় রূপান্তরিত হ'ল। সে তাড়াতাড়ি অনন্তর হাত ধরে টানতে টানতে নিজের ঘরে এসে পৌঁছল। ঘরের মধ্যে আসতেই দু'চোখ ছাপিয়ে জল নেমে এল হু হু করে। বললে, তোমার জন্তে আমি কি গলায় দড়ি দেব! তোমার পায়ে পড়ি, আর কেলেঙ্কারি বাড়িও না।

অনন্ত অনেকক্ষণ ধরে আস্ফালন করে শ্রান্ত হয়ে বিছানা নিলে।

দেওয়ালে টাঙানো মা-কালীর পটের সামনে দাঁড়িয়ে মতি করজোড়ে প্রার্থনা করলে, হে মা কালী—সুমতি দাও—সুমতি দাও।

৬

ঘটনা অনিবার্য্য গতিতে বয়ে চলল। আজকাল শনিবারে না আসার কৈফিয়ত পাঠায় না অনন্ত। মদ খাওয়ার কৈফিয়ত তো নাই! পৃথিবীতে এইটাই যেন নিয়ম—এর চেয়ে ধ্রুব সত্য মতির জীবনে বুঝি আর নাই। এমনি করে কখনও অভাব, কখনও প্রাচুর্য্য, কখনও অপর্য্যাপ্ত আদর—কখনও বা লজ্জাকর লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে তার দিন কাটতে লাগল। যে ঘর সে মনের সাধে গড়তে চায়—উচ্ছৃঙ্খলতার দমকা বাতাসে তা গুছিয়ে রাখা বুঝি সম্ভব নয়। নীতির মানদণ্ড থেকে স্খলিত হয়ে পড়লেই গভীর লজ্জাবোধে মানুষের কাছে মানুষ খাটো হয়ে যায়। মতি মুখ তুলে কারও সঙ্গে কথা কইতে পারে না। ওর শিক্ষাহীন মনে এই সংস্কার দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে—ভদ্র জীবন যাপনের আশা বুঝি শেষ হয়ে গেল। তার প্রতিবেশীদের করুণা-দৃষ্টিতলে হেঁট হয়ে তাকে দিন যাপন করতে হবে। দিন যাপনের এই গ্লানি—এমন দুর্বিষহ—এ ধারণা তার পিতৃগৃহে তো ছিল না।

বাইরের জ্বালা যতই বাড়তে লাগল ততই মতি আশ্রয় করলে—দু বছরের অবোধ শিশুটির উপর। তাকে নিয়ে ও নতুন সংসার গড়ে তুলবে—নতুন ভাবে শিক্ষা দেবে—নতুন আশায় অপেক্ষা করবে দীর্ঘ দিন।

আর যাই করুক, ছেলের ওপর অনন্তর বেশ টান আছে। সকালে উঠেই দুটো রসগোল্লা ওর বরাদ্দ, ফলের সময় আম লিচু কমলা লেবু। লজেঞ্চ বিস্কুট পাঁউরুটি—এ সব তো যখন তখন আসচেই। দুধের বরাদ্দও ঠিকমত চলছে। আর সবে টানাটানি চললেও ছেলের খাওয়ায় বা পোশাক-পরিচ্ছদে অনন্তর কার্পণ্য নাই। উপার্জ্জনে আর ব্যয়ে সমতা না থাকায় একটু একটু করে জমছে ঋণের দায়, কিন্তু সে কথা মতির জানবার নয়—মতি জানেও না সব।

এক দিন এক বন্ধু এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চড়া কথা বলেছিল। এক দিন এক কাবুলী এসে লাঠি ঠুকে জানতে চেয়েছিল—এ বাড়িতে অনন্ত বলে কেউ বাস করে কিনা?

সুরপতি বাবুর স্ত্রী বলেন, মতি, একটু শক্ত হ'। এ সব তো ভাল লক্ষণ নয়—শেষ পরে কি ডুববি?

মতি ম্লান হেসে উত্তর দেয়, কপালে যা আছে—কে খণ্ডাবে দিদি!

সুরপতি বাবুর স্ত্রী বলেন, তোর কথা না হয় ছেড়েই দিই—ওই একটি সতীনপো রয়েছে আর তোর নিজের পেটে যেটা আসছে—

মতি মাথা নামিয়ে বলে, না দিদি—আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার ছেলে না হয়।

সুরপতিবাবুর স্ত্রী হেসে বলেন, সবই ভগবানের দয়া। তিনি যদি দেন—সে তো তোর জন্ম-জন্মান্তরের ভাগ্যি।

এ সৌভাগ্যে মতি রোমাঞ্চিত হ'ল না। মা-কালীর পটের সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে কেঁদে বললে, মাগো, আমি চাই নি—তবু তুমি কেন কৃপা করলে—

কিন্তু ওর ভয়কে ছাপিয়ে কি যেন মধুর আবেশে ভরে উঠছে দেহ। ঐশ্বর্য্য কোন কালে কারও পক্ষে অবাঞ্ছিত নয় বলেই মতির সারা দেহের সুষমায় মনের খুশী বাঁধা পড়ল। পৃথিবী ঘন বর্ষার দিনে সুনীল আকাশের স্বপ্ন দেখে কিনা মতি জানে না; দুঃখ লাঞ্ছনা ক্রমশঃ সরে আসার জন্তই হউক কিংবা সম্পদ পাওয়ার পুলকে দারিদ্র্যকে বিস্মৃত হওয়ার আশাতেই হউক—মতি ভাবলে এমন দিন তার থাকবে না।

চিরদিন দুঃখে যায় না কারও—এক দিন সুখের মুখ সে দেখবেই।

অনন্তকে একদিন বললে কথাটা।

শুনে অনন্তের মুখ গম্ভীর হ'ল। বললে, পুষ্যি বাড়লে সংসারের কষ্ট। একে দিন চলছে না—

তা বলে ভগবানের দেওয়া—

অনন্ত হাসলে, হাঁ—ভগবানই দেয় বটে!

মতি রাগ করে মুখ ফেরালে।

অনন্ত নরম সুরে বললে, শোন—ভগবানের হাত কিছুতে নেই, মানুষ ইচ্ছে করলে সব পারে।

কি পারে?

কি না পারে! মুখের কাছে মুখ নামিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে অনন্ত যা বলে গেল তাতে মতির মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। আর্তস্বরে সে বললে, না—না এমন কথা বল না—

শুধু আমি কি বলি—বড় বড় সায়েব মেম্‌রা পর্য্যন্ত এই কাজ করছে! তাদের কিসের অভাব তবু এক পাল ছেলে-মেয়ে নিয়ে তারা জড়িয়ে পড়তে চায় না। তারা বলে গরীব হওয়া না হওয়া মানুষের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে।

বড় বড় দৃষ্টান্তেও মতি আশ্বস্ত হয় না—অনন্তর কাছ থেকে সরে ছেলেদের কাছে গিয়ে বসে। তাদের দু'জনের মাঝখানে আজ আড়ালের দরকার হয়েছে। এ রকম সর্ব্বনেশে আলোচনা ও বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে না—ওর দম ফুরিয়ে আসে।

পরের দিন অনন্ত আবার সেই প্রসঙ্গ তোলে। বলে, তোর ভাবনা কি? সোনার চাঁদের মত ছেলে রয়েছে তাকে বুকে জড়িয়ে আদর সোহাগ কর, বুক জুড়িয়ে যাবে। ভাল-বাসার ভাগাভাগি ভাল নয়। একজনকে সবটা দিলে যা সুখ—

সেদিনও কাজের অছিলায় মতি সরে যায়। পরের দিন আবার সেই কথা। ও কথা ছাড়া অনন্ত বুঝি আর কোন কথাই বলবে না! পৃথিবীতে গল্প করার আর বস্তু নাই। অনন্ত কেন বুঝতে চায় না, মতির জীবনে যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তা শুধু স্নেহের ঐশ্বর্য্যে বড় নয়, প্রেমের ব্যাপকতায় সর্ব্বগ্রাসী নয়, তার কোন একটি বৃত্তিকে সজাগ করে অপরূপ আনন্দে তা বিকশিত হয়ে উঠছে না। সে যা লাভ করছে তা সমস্ত বৃত্তি থেকে আহৃত হয়ে পরিপূর্ণ একটি শতদলের মহিমায় অপরূপ হয়ে উঠবে। তার আবেশমত্ত বৃত্তির দলে আলোকলুপ্ত ফুলের কুঁড়ির মতই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সে জিনিষ—তার মহিমাতেই জীবন। সে মহিমা নষ্ট হলে জীবনের অর্থও অস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে!

ক্রমে অনন্তের অনুরোধ কঠিন জিদে পরিণত হ'ল। অসহায় মতি তার আঘাতে অল্প অল্প করে ভেঙে পড়তে লাগল। তবু সে স্থির করলে জীবন যায় সেও স্বীকার এ আদেশ কিছুতেই মানবে না। জীবন পণ—সে বিদ্রোহ করবে।

ব্যর্থ আক্রোশে অনন্ত আরও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল। শুধু শনিবার নয় সপ্তাহের প্রায় সব ক'টি দিনই সে কারখানা-ফেরত অন্যত্র চলে যায়—কোন দিন গভীর রাত্রিতে ফিরে আসে, কোন দিন আসে না। কৈফিয়ত দেওয়ার চক্ষুলজ্জা সে রাখে না, বাড়ীর কাউকে গ্রাহ্যও করে না সে। তার দুর্নাম যা রটবার রটে গেছে—কাকেই বা আর ভয়!

সুরপতি বাবুর স্ত্রী বলেন, তুমি তো আজকাল ওর বার-টাম হয়েছে। উনি বলছিলেন, একটা মাগীর সঙ্গে নাকি—

চুপ কর দিদি। মতি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

তোর যেমন কপাল! আহা—পেটে একটি এল প্রথম সন্তান কত সাধ-আহ্লাদের জিনিষ···তা ভাবিসনে বোন ভালই হবে তোর—ভগবান ভালই করবেন।

আশ্বাসে মন প্রবোধ মানে না। যে নিষ্ঠুর সংসারের বাঁধন কাটবার জন্য তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের সন্ধান করছে—তারই জন্য দোতলার বারান্দায় গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে বসে থাকে মতি। সে কখন আসে ঠিকঠিকানা নাই। নিদ্রামগ্ন এতগুলি লোক কেনই বা তার হয়ে সদর দরজা খুলতে যাবে। আর যে ছুট্‌-বেছুট্ বার হয় অনন্তর মুখ থেকে, তাও সামলে নেবার ভার না নিলে চলে না। সবাই দিনের বেলায় পরিশ্রম করে। রাত্রির বিশ্রামে ব্যাঘাত পেলে ওরা যদি হিংস্র হয়ে ওঠে—সে দোষ তো ওদের নয়। মতির অদৃষ্টের সঙ্গে জড়িয়ে ওরা কেন কষ্ট ভোগ করবে।

সদর দরজার কড়া নড়লেই ওপর থেকে ছুটে নেমে আসে মতি। সদর দরজার খিল খুলে এক পাশে সরে দাঁড়ায়। অনন্ত গুন্ গুন্ করে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে উপরে উঠে যায়, মতি তাকে জিজ্ঞাসা করে না এত দেরী হ'ল কেন?

ক্রমে শ্রাবণ মাস এল। সারা দিন ধরে বৃষ্টি পড়ছে সেদিন। খানিক চেপে আসে—খানিক বা রিমিঝিমি ধারা বর্ষণের বিরাম নাই। রাত গভীর না হলেও বাড়ীর লোকেরা ঘুমিয়ে পড়েছে। দুধ খেয়ে খোকাটাও বিছানা নিয়েছে অনেক-ক্ষণ। বাইরে লোক চলাচল বিরল। বৃষ্টির শব্দ আর ব্যাঙের ডাক ছাড়া পৃথিবীর ভাষা যেন ফুরিয়েছে। আকাশে বিদ্যুৎ আর মেঘের ডাকের সঙ্গে অবিশ্রান্ত ভাবে ঝরে পড়ছে জলের ধারা। মতির বুকে জমা-করা দুঃখের মতই সে যেন লক্ষ লক্ষ কোঁটায় অবিরল ধারা রচনা করে চলেছে। পথে গ্যাসের আলোটা নিবে গেছে—দত্তবাড়ির আম গাছের ছায়াটা ঘন হয়ে এ বাড়ির বারান্দায় পড়েছে। পৃথিবী থমথমে গাম্ভীর্য্যে বুকের কাঁপন বাড়িয়ে তুলছে—তবু বারান্দা থেকে সরে যেতে পারে নি মতি। এ দুর্য্যোগে অনন্ত আসবে না সে জানে—তবু যদি আসে! শুন্য ঘরে ,আজ একলা থাকতে ভয় করছে কেমন—একলা থাকার বেদনা বুকের মাঝে চেপে

বসছে তেমনি। সব কোলাহল থেকে সরিয়ে রাখা মুহূর্তগুলি বাদল রাত্রির নির্জ্জনতায় মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে—এদের ফিরিয়ে দেবার শক্তি নাই মতির। বুক ওর ফেটে যাচ্ছে। বহুদিন আগে শোনা পদকীর্ত্তনের একটা কলি শূন্য বুকের মাঝে বেজে উঠছে বারে বারে :

কৈসে গোঙাইবি হরি বিনা দিন রাতিয়া।

এমন বাদল দিনে তার হরি যদি না আসেন—সে বাঁচবে কোন্ আশায়।

কড়া নাড়ার শব্দ না : হাঁ—একখানা মোটরের আওয়াজ। মোটরের জোরালো আলো বর্ষার চিক ভেদ করে গলিটার বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। ছুটে নেমে এল মতি।

দুয়ার খুলে একপাশে দাঁড়াল সে। কিছুক্ষণ গেল। কেউ তাকে অতিক্রম করে উপরে উঠল না। মতি অবাক হয়ে বাইরের দিকে চাইলে।

এই শোন—আমার শালখানা এনে দে তো।

তুমি আসবে না?

না। এনে দে শালখানা।

কেন আসবে না? ব্যথিত স্বরে প্রশ্ন করে মতি। ওর চোখে মেঘমেদুর আকাশের আকৃতি মোটরের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠল।

আমার খুশী। কর্কশ কণ্ঠে অনন্ত হেসে ওঠে।

না—না—তুমি এস— ওগো তোমার পায়ে পড়ি।

ওর বুকফাটা আর্ত্তিতে নেশাগ্রস্ত অনন্তও চমকে ওঠে। বর্ষণসিক্ত আলোটা মতির মুখে এসে পড়েছে। আশ্চর্য্য কোমল সে মুখ—আশ্চর্য্য উজ্জ্বল সে চোখের দৃষ্টি। কামনা-বিহ্বল মুহূর্তে এমনই উজ্জ্বল দীপ্তি দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে।...

মোটর থেকে নেমে এল অনন্ত। মতির কাছে এসে নরম গলায় বললে, আসতে পারি যদি তুই আমার কথা রাখিস।

কি কথা? মতি দু'চোখে আগ্রহ ঢেলে শুধাল।

যা বলেছি তোকে কত বার—

ওগো—না—না—এ কথা তুমি বলো না। মতি সমস্ত আবেগ দিয়ে অনন্তর একখানা হাত চেপে ধরে।

অনন্ত কঠিন হয়ে ওঠে মুহূর্তে।

ইঃ—একটা কথা শোনবার মুরোদ নেই—আবার ন্যাকাপনা! তোর ঢং আমি বুঝি না—না? নচ্ছার মেয়ে-মানুষ কোথাকার? তারপর যে ইতর গালিগালাজ সুরু করলে তারই প্রহারে মতি বজ্রাহত হয়ে রইল।

শব্দ করে মোটরটা কখন চলে গেছে—বৃষ্টির ছাটে ওর সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেছে—চুল থেকে টস্ টস্ করে জলের ফোঁটা ঝরছে—অন্ধকার মাথা রাজপথের মুখোমুখি কতক্ষণ ও দাঁড়িয়ে আছে একলা—এ খেয়ালই ওর নেই। একটা দমকা বাতাসে শীত শীত করতেই মতির চৈতন্য ফিরে এল। ও বুঝলে—যে আশায় মানুষ জগতের দুঃখকষ্ট ঝঞ্ঝাকেও জয় করে সে আশার আলো এইমাত্র নিবে গেল, আর জ্বলবে না। এ জগৎ আর কোনমতেই মতিকে আশ্রয় দিতে পারবে না।

দুয়োর বন্ধ করে ও নিজের ঘরে ফিরে এল।...

আশা নাই : আছে ক্ষোভ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

শোকাতুর শিশুসম কেঁদে কেঁদে দিন চলে যায়
অবসন্ন গ্রাম্যপথে ছায়াচ্ছন্ন বনবীথি মাঝে :
অতীতের চিতাভস্মে ঐতিহ্যের অস্থিখণ্ড রাজে
শৈবাল দীঘির কোলে জীর্ণভগ্ন মন্দির সোপানে।
স্মৃতির কঙ্কালে ঘেরা বৃদ্ধ বট পান্থপানে চায়,
মরণ মূর্চ্ছার মত পরিবেশে তৃণ-গুল্ম-লতা
লোকালয় সমাহিত ভগ্নস্তূপে—ইতিবৃত্ত কথা
মৃত্তিকা বহনে মৃত ; শতাব্দীর কেহ নাহি জানে।
বিহঙ্গের শ্রান্ত স্বর ওঠে শীর্ণাবক্র নদীকূলে
তন্দ্রালস প্রান্তরের পারে শোভে পর্ণাবৃত গ্রাম :
সে গ্রাম ঘুমায়ে কেন মুষ্টিমেয় কৃষিজীবী সাথে!
সভ্যতার দুঃস্বপ্নের বেদনার সংঘাতের শূলে
বিদ্ধ আজ দৈন্যাহত দুঃস্থযাত্রী, অশ্রু অবিরাম
ঝরিতেছে। আশা নাই, আছে ক্ষোভ নিরানন্দ প্রাতে।

ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়

শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশের মধ্যে সম্পর্ক অতি প্রাচীন। শোন এবং উত্তর নামক দুইজন শ্রমণকে সম্রাট্ অশোক প্রিয়দর্শীর কপিলাবস্তুর সর্ব্বত্যাগী রাজপুত্রের প্রেম ও মৈত্রীর বাণী প্রচার ব্যপদেশে ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করিবার কথা দীপবংশ এবং মহাবংশে উল্লিখিত হইয়াছে। শোন এবং উত্তরের ব্রহ্মদেশে গমন সম্বন্ধে পণ্ডিতসমাজ একমত না হইলেও সকলেই স্বীকার করেন যে, খ্রীষ্টোত্তর যুগের গোড়ার দিকেই ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

যদি সম্রাট্ অশোক-প্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারকগণ ব্রহ্মদেশে গমন না করিয়া থাকেন তাহা হইলে দক্ষিণ-ভারত হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম ব্রহ্মদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের পূর্ব্বেই ব্রহ্মদেশের কোন কোন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রাজা অনরত (১০৪৪-৭৭) যখন নিম্নব্রহ্মের তাটনের 'মন'রাজ্য অধিকার করেন, তখন তাটনে থেরবাদ (হীনযান) বৌদ্ধমত অতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল। থেরবাদ ব্যতীত সর্ব্বাস্তিবাদ (হীনযান), মহাযান বৌদ্ধমতবাদ এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মও এক সময় ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র না হইলেও কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত হইয়াছিল। রাজা অনরত সর্ব্বপ্রথম উত্তর ব্রহ্মে হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। বর্ত্তমানে ইহাই ব্রহ্মদেশবাসীর জাতীয় ধর্ম্ম।

ব্রহ্ম-সভ্যতা এবং সংস্কৃতিও ভারতীয় প্রভাবে প্রভাবিত। তবে সেখানে এই সভ্যতার ভারতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহের এমন রূপান্তর ঘটিয়াছে যে আজ তাহাদের চেনাই দায়।

খ্রীষ্টোত্তর যুগের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ এবং ভারতবর্ষের মধ্যে যোগাযোগ কোনদিনই বিচ্ছিন্ন হয় নাই। পূর্ব্বে ভারতীয়গণ প্রধানতঃ মাদ্রাজ উপকূল হইতেই ব্রহ্মদেশে যাতায়াত করিত। তখনও বাষ্পীয় পোত আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের জন্য মাদ্রাজ হইতে ব্রহ্মদেশে যাতায়াত অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এবং সহজসাধ্য ছিল। বঙ্গদেশ হইতে আরাকানের পথে ব্রহ্মদেশে গমনাগমনের রাস্তা থাকিলেও ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে অবস্থিত পর্ব্বতমালার জন্য এই পথে যাতায়াত অতিশয় কষ্টকর, বিপৎসঙ্কুল এবং সময়সাপেক্ষ ছিল।

১৮২৬ সালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্রহ্মদেশ অভিযান আরম্ভ করিবার পর হইতে ভারতীয়গণ ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় সেদেশে যাইতে আরম্ভ করে। ১৮৫২ সালে নিম্নব্রহ্মের মৌলমিনের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রায় ২৫০০০ ছিল ভারতীয়। ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ-ব্রহ্মের পুলিস কনেষ্টবলদিগের মধ্যে বেশীর ভাগই ভারতবর্ষীয় ছিল। ১৮৬১ সাল হইতে '৭২ সালের মধ্যে ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়গণের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়া ১৩১,০০০ জনে দাঁড়ায়। এই শেষোক্ত বৎসরে ব্রহ্মদেশের মোট অধিবাসীর শতকরা ৫·৫ জন বহিরাগত ছিল। এই অনুপাত ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে ৬·৯৭ জন এবং বিগত ১৯৩১ সালে ৯·৭৪ জন অর্থাৎ প্রায় এক-দশমাংশ হইয়াছিল। এই সমস্ত বহিরাগত প্রধানতঃ শহর অঞ্চলেই বাস করিত। ১৯৩১ সালে ব্রহ্মদেশে শহরের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৪০ জন ছিল ভারতীয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও সমগ্র দেশের বাণিজ্যিক এবং শ্রম-শিল্পগত অর্থনৈতিক জীবন বিদেশীয় ভাগ্যান্বেষীর অঙ্গুলি-সঙ্কেতে পরিচালিত হইত।

ব্রহ্মদেশে বহিরাগতদিগের মধ্যে ভারতীয়গণই সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ১৮৭২ সালেও ব্রহ্মদেশীয় বন্দরসমূহের বিশেষতঃ মৌলমিন এবং আকিয়াবের অধিকাংশ বাসিন্দাই ভারতবর্ষীয় ছিল। সেযুগে ব্রহ্মদেশীয় শ্রমিকও ভারতীয় শ্রমিকের পাশাপাশি বিবিধ শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু ভারতীয় শ্রমিকের সহিত প্রতিযোগিতায় ব্রহ্মদেশীয় শ্রমিক ক্রমশঃই হটিয়া যাইতে থাকে এবং শীঘ্রই অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ১৮৮৪-৮৫ সালের সরকারী বিবরণীতে দেখা যায় যে, ভারতীয় শ্রমিক কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশীয় শ্রমিক প্রায় সর্ব্বপ্রকার লাভজনক কায়িক শ্রমের ক্ষেত্র হইতে বিদূরিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশীয় বহু শ্রমিক জাহাজের কারখানায় কাজ করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিত। টেনাসেরিমের সেগুন কাঠের বন হইতে জাহাজ নির্ম্মাণের উপযোগী কাষ্ঠ-সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর এবং কলের জাহাজের প্রচলনের ফলে ব্রহ্মদেশে জাহাজ নির্ম্মাণ লোপ পাইয়া যায়। ইহার ফলে বহু ব্রহ্মদেশীয় শ্রমিক জীবিকার উপায় হইতে বঞ্চিত হয়। ১৮৫২ সালেও মৌলমিনের ছুতারদের রেঙ্গুনে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইবার কথা শোনা যায়। কিন্তু ইহার পর তাহারা বৃত্তিহীন হইয়া পড়ে।

১৮৬১ সালে ব্রহ্মদেশে প্রথম চালের কল স্থাপিত হয়। ১৮৬৭ এবং ১৮৭২ সালে সেখানে যথাক্রমে তিনটি এবং ২৬টি চালের কল ছিল। এই সমস্ত কলের শ্রমিকগণ সকলেই ছিল ভারতীয়। যেখানে যেখানে চালের কল স্থাপিত হইল

সেই সেই স্থানে বাসস্থানের সমস্যা উৎকট হইয়া দাঁড়াইল। এই সমস্ত অঞ্চলে দিনের পর দিন জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতে লাগিল। এদিকে বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ার ফলে ক্রমেই অধিক-সংখ্যক ভারতীয় শ্রমিক ব্রহ্মদেশের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ১৯১৮ সাল এবং তাহার পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর গড়ে ৩০০,০০০ ভারতীয় শ্রমিক প্রতিবৎসর ব্রহ্মদেশে গমন করিয়াছিল। ভারতীয় সমাজের যে স্তর হইতে শ্রমিক সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে তাহার স্বাস্থ্য এবং নৈতিক চরিত্রের মান কোনদিনই খুব উচ্চাঙ্গের নহে। যদি ভারত (এবং পাকিস্তান) সরকার এই বিষয়ে অবহিত না হন, তবে বিপত্তি অবশ্যম্ভাবী। অধিকসংখ্যক ভারতীয় শ্রমিকের ব্রহ্মদেশে গমনের সঙ্গে সঙ্গে সে দেশে মৃত্যুর হার এবং ব্যাধির প্রকোপ পূর্ব্বের তুলনায় বাড়িয়া গেল। ভারতীয় শ্রমিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত ব্রহ্মদেশীয় শ্রমিক শহর হইতে গ্রামে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। ফলে আধুনিক শ্রমশিল্পের সহিত ব্রহ্মদেশীয় শ্রমিকের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ব্রহ্মদেশীয় শ্রমিকগণের ন্যায় বণিকগণও দিনের পর দিন কোণঠাসা হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এবং তাহার অর্থনৈতিক শোষণের সহকারী ও সহযোগীরূপেই বর্ত্তমান যুগে ভারতীয়গণ প্রধানতঃ ব্রহ্মদেশে গমন করিয়াছে। আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের সহিত কি করিয়া লেনদেন করিতে হয় ভারতীয়গণ অনেক দিন হইতেই তাহা জানিতেন। ব্রহ্মদেশস্থ ভারতীয় ব্যবসায়ীগণই ইউরোপীয় বণিকদের দালালের কার্য্য করিয়াছেন। ভারতীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ব্যতীত ব্রহ্মদেশে ইংরেজ-রাজের নোকরশাহী শাসনব্যবস্থা সক্রিয় থাকিত কিনা সন্দেহ। ইংরেজদের ব্রহ্মদেশে আগমনের বহু পূর্ব্বেই ভারতীয় বণিকগণ ইউরোপীয় বণিকদিগের সহিত বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশীয়গণের এসম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। তাহারা ইউরোপীয়গণের ব্যবসায়ের রীতি-প্রকৃতি এবং তাহাদের ভাষা সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ ছিল। ভারতীয়গণের জীবনযাত্রার মানের আপেক্ষিক নিম্নতার জন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে স্ব-স্ব পণ্য বিক্রয় করিতে পারিতেন। এই সমস্ত নানাবিধ কারণে ব্রহ্মদেশীয়গণ বাণিজ্যক্ষেত্রে ক্রমেই পিছনে পড়িয়া যাইতে লাগিল।

বিলাতী কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতায় ব্রহ্মদেশীয় বস্ত্র-শিল্প ধ্বংস হইয়া যাওয়ার পর বস্ত্রব্যবসায় প্রধানতঃ ভারতীয়-গণের হাতে গিয়া পড়িল। ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ বিলাতী কাপড় আমদানি করিয়া ব্রহ্মদেশের বস্ত্রশিল্প ধ্বংস করিতে সহায়তা করিয়াছেন। কেবল বস্ত্র-ব্যবসায়ে নহে, দেশের সমগ্র বাণিজ্যক্ষেত্রেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য বিশেষ ভাবে চোখে পড়িত। ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে বোম্বাই প্রদেশের পারসী, মাদ্রাজের চেট্টীয়ার, মালয়ালমের কাকা মুসলমান, গুজরাটের মেমন, খোজা এবং বোরা মুসলমান, মাদ্রাজের চুলিয়া মুসলমান এবং উত্তর-ভারতের হিন্দু স্বর্ণকার ও রত্নব্যবসায়ীগণ ব্রহ্মদেশের বাণিজ্যক্ষেত্রে আধিপত্য করিতেন। মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে আগত তেলুগু এবং তামিলগণকে কুলি বলা হয়—ইহারা শ্রমিকের কার্য্য বহুদিন পর্য্যন্ত প্রায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল। ১৯৩১ সালে রাজধানী রেঙ্গুনের বিভিন্ন জাতীয় অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক কর্পোরেশনকে প্রদত্ত করের অনুপাত নিম্নলিখিত প্রকার ছিল।

সম্প্রদায়	প্রদত্ত করের শতকরা অনুপাত
ভারতীয়	৫৫·৪৯
ইউরোপীয়, ইঙ্গব্রহ্ম, এবং ইঙ্গভারতীয়	১৫·৩৪
ব্রহ্মদেশীয়	১১·২৭
চীনা এবং অন্যান্য	১৭·৯০

ব্রহ্ম-ইউরোপীয় বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই ইউরোপীয় বণিকগণ চীন এবং ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। চীনা এবং ভারতীয় কর্মচারী-গণের ইউরোপীয় প্রণালীতে হিসাবপত্র রাখিবার এবং সওদাগরী দপ্তরের অন্যান্য কাজকর্ম্ম চালাইবার অভিজ্ঞতা ছিল। এইজন্য ইউরোপীয় বণিকগণ স্বভাবতঃ ব্রহ্মদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিবার এবং অধিবাসীদিগকে কাজকর্ম্ম শিখাইবার কষ্ট স্বীকার করিতে চাহিতেন না। সুতরাং তাঁহারা নিজেদের প্রয়োজনে প্রধানতঃ চীনা এবং ভারতীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন। ইহাতে কাজের সুবিধা হইত এবং চীনা ও ভারতীয় কর্ম্ম-চারিগণ অল্প বেতনে সন্তুষ্ট থাকিতেন বলিয়া ব্যয়েরও লাঘব হইত। অনেকে বলেন যে, ব্রহ্মবাসীর যোগ্যতার অভাব ও ঔদাসীন্যের জন্যই তাহারা জীবিকার এই ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের (survival of the fittest) স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই ইহা ঘটিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মদেশীয়গণের অযোগ্যতা ও অমনো-যোগের দোহাই যাঁহারা দেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ব্রহ্ম-দেশে উৎপন্ন সমস্ত পণ্যদ্রব্যের পাইকারী এবং খুচরা ব্যবসায় আজ পর্য্যন্ত প্রায় পুরাপুরি ব্রহ্মদেশীয়গণের হস্তেই রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্রহ্মদেশীয়গণের জীবন-সংগ্রামে হটিয়া যাওয়ার মধ্যে ভারতীয়দের কোন পূর্ব্ব-পরিকল্পনা নাই। শ্রমের ক্ষেত্রে সুলভতমের উদ্বর্ত্তন (survival of the cheapest) এবং জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন এই দুই স্বাভাবিক নিয়মের জন্যই ব্রহ্মবাসীদের জীবিকার প্রায় সমুদয় ক্ষেত্র হইতে হটিয়া যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু

যাঁহারা "শ্বেতাঙ্গের বোঝা" (Whiteman's burden) বহন করিবার জন্য সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইয়া ব্রহ্মদেশে আসিয়াছিল, তাহারা ব্রহ্মদেশ তথা ব্রহ্মবাসীর স্বার্থ রক্ষার কি ব্যবস্থা করিয়াছিল ?

কেবলমাত্র বাণিজ্যক্ষেত্রই নহে, চাকুরী এবং অর্থকরী অন্যান্য যাবতীয় বৃত্তি হইতেও ব্রহ্মবাসী প্রায় সম্পূর্ণভাবে হটিয়া গিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সরকারী চিকিৎসা বিভাগের উচ্চতর পদগুলিতে শ্বেতাঙ্গ এবং নিম্নতর পদগুলিতে ভারতীয় চিকিৎসকগণের প্রায় একচ্ছত্র অধিকার বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে ডাক্তারি পড়িবার জন্য যে সমস্ত সরকারী বৃত্তি দেওয়া হইত তাহার অধিকাংশই ভারতীয় এবং ইঙ্গ-ভারতীয় ছাত্রগণ পাইত। ব্রহ্মদেশীয় ছাত্রগণের ভাগ্যে এই বৃত্তি কালেভদ্রে জুটিত। ১৯০৭ সালে রেঙ্গুন "মেডিকেল স্কুল" স্থাপিত হইবার পর হইতে ব্রহ্মদেশীয় ছাত্রগণের পক্ষে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিবার পথ অধিকতর সুগম হয়। কিন্তু ইহার পরও বহু বৎসর পর্য্যন্ত সরকারী চিকিৎসাবিভাগে নিম্নতম পদেও ব্রহ্মদেশীয় প্রার্থীর নিয়োগ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল। এদিকে সরকারী অবহেলার দরুন দিনের পর দিন দেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের দ্রুত অবনতি ঘটিতেছিল।

চিকিৎসা বিভাগের চাকুরির মত অন্যান্য চাকুরিতেও ব্রহ্মদেশীয় প্রার্থীদের ঘোরতর প্রতিকূলতা এবং পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইত।

ডাক এবং তার বিভাগের কর্ম্মচারিগণের অধিকাংশই ভারতীয় ছিলেন। অথচ রাজা মিণ্ডনের রাজত্বকাল হইতে ব্রহ্মদেশে তারে যোগ্যতাসম্পন্ন সংবাদপ্রেরক ও গ্রাহকের অভাব ছিল না। তবে ইঁহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মভাষায় তার প্রেরণ এবং গ্রহণ করিতে পারিতেন। ১৯৩০ সালে, এমন কি তাহার পরেও রেঙ্গুনের টেলিফোন বিভাগের ভারতীয় কর্ম্মচারীর সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, হিন্দুস্থানী না জানিলে টেলিফোন ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব ছিল। সরকারী এঞ্জিনিয়ারিং এবং পূর্ত্ত বিভাগেও ভারতীয়গণেরই প্রাধান্য ছিল। অল্প খরচে এবং বিনা ঝঞ্ঝাটে ভারতীয় কর্ম্মচারী আর শ্রমিকের দ্বারা ব্রহ্মদেশীয় শ্রমিক এবং কর্ম্মচারীর তুলনায় অনেক বেশী কাজ পাওয়া যাইত। ব্রহ্মদেশে রেলপথ নির্ম্মিত হইবার পর ভারতবর্ষে অবস্থিত রেলের কারখানাসমূহে হাতেকলমে কাজ শিখিবার জন্য সরকারী ব্যয়ে শিক্ষানবীশ পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক ব্রহ্মবাসীই এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। ১৮৯৫ সালে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মদেশে এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথম প্রথম ভারতীয় অথবা ইঙ্গ-ভারতীয় ছাত্রগণই প্রধানতঃ এই বিদ্যালয়ে পড়িতে আসিত। ইংরেজ শাসনের একেবারে শেষভাগেও ব্রহ্মদেশীয় যন্ত্রশিল্পীদিগের অসুবিধার অন্ত ছিল না। অথচ "বার্মা রেলওয়ের" ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানীর কারখানা, জাহাজ মেরামতের কারখানা, ট্রাম কোম্পানী প্রভৃতিতে কাজ শিখিবার জন্য ইউরোপীয় এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের শিক্ষানবীশদিগের জন্য সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। সরকার মুখে ব্রহ্মদেশীয়দিগের প্রতি দরদ দেখাইলেও কাজে কিছুই করেন নাই।

ইংরেজ আমলে ব্রহ্মদেশীয়দিগের জীবিকার ক্ষেত্র এইভাবে প্রায় সকল দিকেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার উপর ১৯২৯-৩০ সাল হইতে সমগ্র জগতের বাণিজ্যক্ষেত্রে যে বিপর্য্যয় সুরু হইল, তাহার ফলে ব্রহ্মদেশের প্রধান সম্পদ ধানের বাজার একেবারে নামিয়া গেল। ফলে অনেক কৃষকই মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাহাদিগের জমি হস্তান্তরিত হইয়া যাইতে লাগিল। বহু কৃষকের জমি চেট্টিয়ার মহাজনদিগের হস্তগত হইল। এদিকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই ব্রহ্মদেশে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটিয়াছিল। এই জাগরণ প্রধানতঃ শিক্ষিতসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষিতসম্প্রদায়ের প্রথমেই চোখে পড়িল যে, প্রবাসী ভারতীয়গণ ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র জাঁকিয়া বসিয়াছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে জীবিকার ক্ষেত্রে শিক্ষিত ভারতীয়দের সহিত কঠোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইতে হইত। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক সময়ই ব্রহ্মদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয় ঘটিত। ইহারই ফলে তাহার মনে ভারতীয় বিদ্বেষের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। স্বার্থে আঘাত লাগিলে মানুষের সভ্যতার মুখোস খসিয়া পড়ে এবং সত্যমিথ্যা বোধ লোপ পায়। প্রবাসী ভারতীয়দের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাজিত ব্রহ্মদেশীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ভারতীয় বিদ্বেষ প্রচার করিতে লাগিল। সেই প্রচারে সত্য অপেক্ষা মিথ্যার পরিমাণ কম ছিল না। সকল অনিষ্টের মূল ইংরেজ তখন অলক্ষ্যে মুখ টিপিয়া হাসিল।

প্রবাসী ভারতীয়গণ যে শ্বেতকায় প্রভুদের করধৃত পুত্তলিকা মাত্র একথা ভাবিয়া দেখিবার মত ধৈর্য্য ভারতীয়বিদ্বেষ মন্ত্রের উদ্গাতা এই যুগের জাতীয়তাবাদী ব্রহ্মনেতৃবৃন্দের ছিল না। তখন পর্য্যন্ত ইংরেজ এত শক্তিশালী এবং তাহার মর্য্যাদা এত অধিক যে, ব্রহ্মনেতৃবৃন্দ তাহার বিরোধিতা করিবার কল্পনা করিতেও সাহস পাইতেন কিনা সন্দেহ। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়কে জব্দ করা সহজ। সুতরাং ভারতীয় বিদ্বেষ সহজেই সমাজদেহের সর্ব্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হইল। প্রবাসী ভারতীয়গণের প্রতি বিরূপ মনোভাব মূলতঃ শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের বিক্ষোভ। ইংরেজ শাসকের কূটকৌশলে গণমানসের উত্তপ্ত রোষ বিপথে চালিত হইয়াছিল। ভারতীয়-

গণ সম্পূর্ণ দোষমুক্ত একথা কেহ বলে না। প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের কোন কোন শ্রেণী নির্মম ভাবে ব্রহ্মদেশের রক্ত শোষণ করিয়াছে। কেহ কেহ বা আবার ইংরেজ প্রভুর উচ্ছিষ্ট কুড়াইয়া নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিয়াছে। ইহাদিগের পাপে বহু নিরীহ ভারতীয় নরনারী এবং শিশুকে উন্মত্ত ব্রহ্মজনতার রোষাগ্নিতে প্রাণ আহুতি দিতে হইয়াছে। আজ ইহারাই ব্রহ্মদেশ তথা ব্রহ্মবাসীর নিন্দায় পঞ্চমুখ এবং অত্যুগ্র স্বদেশপ্রেমিক। ইহাদিগকে দেখিলে স্বতঃই ভারতবর্ষের কথা মনে পড়ে। সেদিন পর্য্যন্তও যাহারা ইংরেজ প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য সর্ব্বপ্রকারে জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছে, খদ্দরের কাপড় ও গান্ধী টুপীর তোল এবং 'জয় হিন্দ' বোলের জোরে তাহারাই আজ স্বদেশপ্রেম এবং দেশসেবার প্রধান ধ্বজাধারী।

১৯৩১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী* ব্রহ্মদেশে ভারতীয়ের সংখ্যা ছিল ১,০১৭,৮২৫। ইহার মধ্যে ৫৬৫,৬০৯ জন হিন্দু এবং ৩৯৬,৫৯৪ জন মুসলমান; অন্যেরা খ্রীষ্টান, শিখ প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী। ১৯৩৭ সালে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর প্রবাসী ভারতীয়গণের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িল। অনেকেই ব্রহ্মদেশে তাঁহাদের যে ভূ-সম্পত্তি ছিল, তাহা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সমস্ত সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থের বেশীর ভাগই ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে একমাত্র মনিঅর্ডারের যোগেই ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে ৩২,৫০০,০০০৲ টাকা প্রেরিত হইয়াছিল। ব্যাঙ্কগুলির সহায়তায় কত টাকা প্রেরিত হইয়াছিল জানা যায় না। ১৯২৮ সালে মোট ৩২৪,০০০ জন ভারতীয় ব্রহ্মদেশে গমন করিয়াছিল। ১৯৩৭ সালে এই সংখ্যা কমিয়া ১৯৯,০০০ জনে দাঁড়াইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে বর্ম্মী-মুসলিম দাঙ্গার পর এই সংখ্যা আরও কমিয়া যায়। ১৯৪৮ সালে ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা লাভ করিবার পর অতি অল্পসংখ্যক ভারতবাসীই সেদেশে গিয়াছে।

ভারতীয় পুঁজি এবং শ্রম যে ব্রহ্মদেশের উন্নতির সহায়ক হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সত্যের খাতিরে ভুলিলে চলিবে না যে, ভারতীয়গণ জীবিকার সন্ধানে এবং প্রধানতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়করূপেই ব্রহ্মদেশে গিয়াছে। উদ্বৃত্ত পুঁজির নিয়োগ এবং বৃত্তিহীন শ্রমিকের জীবিকার ক্ষেত্ররূপেই আধুনিক যুগে ব্রহ্মদেশ ভারতীয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় খুব কম ক্ষেত্রেই ব্রহ্মবাসীর সহিত সামাজিক ভাবে মেলামেশা করিয়াছে। ভারতীয়গণ প্রথমাবধি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি সম্প্রদায় হিসাবে রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান লেখক এমন কোনো কোনো প্রবাসী ভারতীয়কে দেখিয়াছেন যাঁহারা প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বৎসর যাবৎ ব্রহ্মদেশে বাস করিতেছেন অথচ সে দেশবাসীর প্রতি দারুণ ঘৃণা এবং বিদ্বেষের ভাব পোষণ করেন। ইঁহারা সকলেই উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বলা বাহুল্য, এই মনোভাব ব্রহ্মদেশীয় এবং প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে ইঁহারা একে অন্যকে বিশ্বাস করিতে পারে না। লেখকের একাধিক ছাত্র ভারতীয় অধ্যাপকগণ তাহাদের সহিত প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করিবার কোন চেষ্টাই করেন না বলিয়া দুঃখ করিয়াছে। এই অভিযোগ সত্য হইলে আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।

সাধারণ কাজকর্ম্মের পক্ষে যতটা প্রয়োজন বর্ম্মীভাষায় তাহার অধিক জ্ঞান অতি অল্পসংখ্যক প্রবাসী ভারতীয়েরই আছে। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ভারতীয় অধ্যাপক আছেন যিনি এখান হইতে ডিগ্রী লাভ করিবার পর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে মাথার চুল পাকাইয়াছেন অথচ বর্ম্মীভাষা মোটেই জানেন না। যাঁহাদিগের পক্ষে ব্রহ্মদেশীয় ভাষা শিক্ষা করা বাধ্যতামূলক, যেমন উকিল, সরকারী চাকুরে প্রভৃতি, তাঁহারাও প্রায় সকলেই নিজ নিজ বিভাগীয় পরীক্ষা পাস করিবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তদতিরিক্ত শিখেন নাই। ভারতীয় শ্রমিকগণ সাধারণতঃ বর্ম্মীভাষার কয়েকটি কথা মাত্র জানে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও বড় বড় শহরের প্রায় প্রত্যেক ব্রহ্মদেশীয় অধিবাসীই অল্পবিস্তর হিন্দুস্থানী জানিত।

ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে মাদ্রাজ প্রদেশাগত চেট্টিয়ার সম্প্রদায়ের কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মহাজনী ব্যবসায় করিতে ইঁহারা প্রথম ব্রহ্মদেশে গমন করিয়াছিলেন। আজ ব্রহ্মদেশের যাবতীয় আবাদী জমির একটা বড় অংশ ইঁহাদের দখলে।

ব্রহ্মদেশের উন্নতির জন্য চেট্টিয়ার ক্রোড়পতি ডাঃ রাজা রেড্ডিয়ার কর্তৃক রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারের জন্য ২০০,০০০৲ এবং চেট্টিয়ার সম্প্রদায় কর্তৃক রেঙ্গুন বিদ্যালয়ের জন্য ১৫২,০০০৲ দান চেট্টিয়ার সম্প্রদায়ের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিগত ভাবে সৎকার্য্যের জন্য চেট্টিয়ারদিগের আরও ছোটখাটো দানের দৃষ্টান্ত না আছে এমন নহে। রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতাল প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের আর একটি প্রধান কীর্ত্তি। ভারতীয় সম্প্রদায় কর্তৃক রেঙ্গুনে একাধিক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। কিন্তু ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং অন্যান্য ভারতীয়গণ ব্রহ্মদেশে যে কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহার কতটা সেদেশের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিয়াছে?

---

* বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশে প্রায় ৭০০,০০০ ভারতীয় আছে। ইহাদিগের মধ্যে প্রায় ২০০,০০০ জন রাজধানী রেঙ্গুনে বাস করে।

উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণের মধ্যে কোনদিনই প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। জাপ আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাধারণভাবে বলিতে গেলে ভারতীয় চেট্টিয়ার সম্প্রদায় উত্তমর্ণ এবং ব্রহ্ম-দেশীয়গণ অধমর্ণ ছিল। চেট্টিয়ার সম্প্রদায়ের প্রতি কৃষককুলের বিরূপ মনোভাবের সুযোগ গ্রহণ করিয়াই সুযোগসন্ধানী তৃতীয় পক্ষ এবং সুবিধাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনকারিগণ ভারতীয় বিদ্বেষ প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৯২৫ হইতে ১৯৩৩ সালের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মদেশীয় আইন-সভায় মন্ত্রিত্বের গদি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই নির্ব্বাচিত সাধারণ সদস্যবৃন্দের আস্থাভাজন ছিলেন না। সরকার-মনোনীত সদস্য এবং কারেন, ভারতীয়, ইঙ্গ-ব্রহ্ম এবং ইউরোপীয় সদস্যগণের সহায়তায় মন্ত্রিগণ চাকুরী বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফলে আইন-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলি এই সমস্ত প্রতিনিধির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। এই সদস্যগণ যে যে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ক্রমে ইহাদের আক্রোশ তাহাদের উপর পড়িল। শাসক-গণের পরোক্ষ প্রশ্রয় এবং নিজেদের দুর্ব্বলতাহেতু প্রবাসী ভারতীয়গণকেই ইহার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভুগিতে হইয়াছে। আজও ইহার জের মেটে নাই।

যেমন ভারতবর্ষে তেমনই ব্রহ্মদেশে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া চতুর ইংরেজ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কায়েম রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের দুর্ভাগ্যক্রমে তৎকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত আইন-সভার সদস্যগণ নিজেদের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর স্বার্থরক্ষার জন্য প্রায় কিছুই করেন নাই। ১৯৩০ এবং ১৯৩৮-এর দাঙ্গার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয়দিগের জন্য তাঁহারা কিছু করিয়া-ছিলেন কি? সরকারী নীতির বিরুদ্ধে একটি কথা বলিবার মত সৎসাহসও তাঁহাদিগের হয় নাই।

ভারতীয় পুরুষকর্ত্তৃক ব্রহ্ম-রমণীর পাণিগ্রহণ এবং পরে তাহাকে পরিত্যাগ করিবার ফলেও ব্রহ্মদেশে ভারতীয় বিরোধী মনোভাব বদ্ধমূল হইয়াছে। প্রবাসী ভারতীয়গণ অনেকে বৎসরের পর বৎসর ব্রহ্ম-নারীর সহিত ঘর করি-য়াছে, সন্তান উৎপাদন করিয়াছে কিন্তু পরে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহার ফলে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে সমাজ খুব সচেতন ছিল না। তবে কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি যে এই সমস্ত সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়াছিল এমন নহে। কোন হিন্দু যখন ব্রহ্মদেশীয় পত্নী গ্রহণ করে, তখনই অধিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। আইনের দৃষ্টিতে হিন্দু পতির অ-হিন্দুপত্নী ঠিক ধর্ম্মপত্নীর মর্য্যাদালাভ করে না। হিন্দু স্বামীর সম্পত্তিতে তাহার অ-হিন্দু স্ত্রী বা তাহার গর্ভজাত সন্তানগণের কোন অধিকার নাই। মুসল-মানের ব্রহ্মদেশীয়া পত্নী সহজেই তাহার স্বামীর ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারে। স্বামী আইনতঃ তাহার এবং তাহার সন্তানগণের ভরণপোষণ করিতে বাধ্য। দেশের লোক-সঙ্গীত সমাজ-মনের আলেখ্য-স্বরূপ। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে লোকের মুখে মুখে একটি গান শোনা যাইত। তাহার একটি কলি এই,—

"আমিয়োতা কোয়েকো মায়ুচা-পা মে, মিয়ান্‌মা মেইন্‌মা ডোয়ে"—অর্থাৎ 'হে ব্রহ্ম-রমণীগণ! বিদেশীকে পতিত্বে বরণ করিও না।'

ব্রহ্মদেশে ভারতীয় বিদ্বেষের জন্য শ্বেতাঙ্গ শাসক এবং প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের দায়িত্ব অবশ্যই আছে, কিন্তু ব্রহ্মবাসী নিজেও ইহার জন্য কম দোষী নহে। ব্রহ্মবাসী-দিগের মধ্যে আবার ব্রহ্ম-জাতীয়গণের দায়িত্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহারা উদ্ধত প্রকৃতির। অনেক সময় ইহারা অকারণে বৈদেশিকগণের প্রতি অনুচিত উদ্ধত আচরণ করিয়া থাকে। স্বদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রতিও ব্রহ্ম-জাতীয়গণ চিরকাল অসদ্ব্যবহার করিয়াছে। কারেনগণের এই সম্বন্ধে বিশেষ তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। বর্ত্তমানে কারেন বিদ্রোহের পশ্চাতে হয়ত তৃতীয় পক্ষের উস্কানি আছে, কিন্তু একথা সত্য যে ব্রহ্মরাজগণের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-জাতীয়গণ কর্ত্তৃক ক্রমাগত অবজ্ঞা এবং উৎপীড়নের ফলে কারেনগণ আজ আর কিছুতেই তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

ব্রহ্মদেশ এবং ভারতবর্ষ পরস্পরের প্রতিবেশী। ইহা-দিগের পারস্পরিক সম্পর্কও বহু প্রাচীন। স্ব-স্ব স্বার্থের খাতিরেই ইহাদিগকে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। একের সহায়তা ব্যতীত অপরের অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর তৃতীয় বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৯-৪০ সালেও ভারতবর্ষই ব্রহ্মদেশে উৎপন্ন পণ্যের প্রধান ক্রেতা ছিল। ঐ বৎসর ব্রহ্মদেশ হইতে মোট রপ্তানী দ্রব্যের শতকরা ৬০·৫ একা ভারতবর্ষ ক্রয় করিয়াছিল। এই ১৯৩৯-৪০ সালেই ব্রহ্মদেশে মোট যত পণ্য আমদানী হইয়াছিল, তাহার শতকরা ৫৫·৬ ভাগ ভারতবর্ষ সরবরাহ করিয়াছিল।

ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে ইংরেজ ব্রহ্মদেশ এবং ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। উভয় দেশেই আজ বিজাতীয় শাসনের অবসান ঘটিয়াছে। উভয়ের ইতিহাসেই ইহার ফলে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। ব্রহ্ম-জননায়ক এবং প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে আজ ব্রহ্ম-জনসাধারণ এবং প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে অপরিচয়ের দূরত্ব আর অবিশ্বাস দূর করিয়া প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করিবার গুরু কর্ত্তব্য-ভার গ্রহণ করিতে হইবে। বিগত যুগের অপ্রীতিকর বেদনাদায়ক স্মৃতি বিস্মৃত হইয়া নূতন করিয়া পথ চলা সুরু

করিতে হইবে। ব্রহ্মদেশ স্বাধীন সত্য ; কিন্তু সবল এবং শক্তিমান স্বাধীন ব্রহ্মরাষ্ট্র গঠন করিবার জন্ত বহুদিন পর্য্যন্ত জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে তাহার বাহিরের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। ব্রহ্ম-নেতৃবৃন্দের মনে রাখা উচিত যে, একমাত্র ভারতবর্ষই নিঃস্বার্থভাবে ব্রহ্মদেশকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। পররাজ্য গ্রাস এবং তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শোষণ ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যবিরুদ্ধ। ব্রহ্মদেশকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করিবার মত সামর্থ্যও ভারতবর্ষের আছে। কিন্তু পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস এই সাহায্য দিবার এবং পাইবার পথে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিবন্ধক। যেভাবেই হউক, এই বাধা দূর করিতে হইবে।

বিরহী বাউল

শ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা দেখিতে পাই যে, এক জীবনদেবতা নটরাজরূপে মানুষের চিত্তের ভাবধারার বিচিত্র ছন্দে ও প্রকৃতির নানা ঋতুবিহারের বিচিত্র সৌন্দর্য্য-লীলার মধ্যে চঞ্চল পদক্ষেপে নৃত্য করিয়া ফিরিতেছেন। মানুষের মধ্যে যে লীলা প্রকৃতির মধ্যেও সেই লীলা। উভয়ের মধ্য দিয়া এক চৈতন্তময় পুরুষ আপনাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন, তাই প্রকৃতির মধ্যে সুন্দর বা ভয়াল যা' কিছুর সহিত আমাদের সংস্পর্শ ঘটে তাহাতেই আমরা আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে সেই পরম দেবতা বা বাউলের ভাষায় সাঁইয়েরই স্পর্শ পাই এবং তাহারই আস্বাদে স্পন্দিত হইয়া আমাদের চিত্ত তাহাকে পাইবার জন্ত বিরহে ব্যাকুল হইয়া উঠে,—

> আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
> পরাণ সখা হে বন্ধু আমার।
> আকাশ কাঁদে হতাশ সম,
> নাই যে ঘুম নয়নে মম
> দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম
> চাই যে বারে বার ;
> পরাণ সখা হে বন্ধু আমার।

প্রকৃতির সহিত গভীর মিলনে বাউল-চিত্তে যেন নিত্যই নবতর বিরহের আর্ত্তি জাগিয়া উঠে। এই প্রেম ও বিরহ লইয়াই জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত। জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য যেমন মানুষের মনকে দর্শন ও বিজ্ঞানের চিন্তায় নিয়োজিত করিয়াছে তেমনই প্রেম ও বিরহ মানুষকে দিয়াছে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা। লয়লা-মজনুর কথা কিংবা মেঘদূতের বিরহী যক্ষের কাহিনী প্রেম ও বিরহের পটভূমিতে রচিত বলিয়াই চিরন্তন ও চির নূতন। মানুষের মনের এই দুইটি ভাব লইয়াই সুফী, বাউল অর্থাৎ ভাবোন্মাদ বৈরাগীসম্প্রদায় যে সমস্ত কবিতা ও গান রচনা করিয়া গিয়াছেন সেগুলি অনায়াসে মানব-হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অপর একটি বাউল গানে মানব-হৃদয়ের আশা-নিরাশার কথা সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল :

> তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
> তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
> তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,
> হয়তো রে ফল ফলবে না ;
> তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
>
> আসবে পথে আঁধার নেমে,
> তাই বলে কি রইবি থেমে ?
> ও তুই বারে বারে জালবি বাতি
> হয়তো বাতি জ্বলবে না ;
> তা বলে ভাবনা করা চলবে না॥

শরৎ চন্দ্রের পথ-নির্দেশ গল্পটির উপসংহারে গুণী হেমকে বলিলেন, "অতৃপ্ত বাসনাই মহৎ প্রেমের প্রাণ, ইহার দ্বারাই সে অমরত্ব লাভ করিয়া যুগ যুগ কত কাব্য, কত আনন্দরস, কত অমূল্য অশ্রু সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া যায়···রাধার শতবর্ষব্যাপী বিরহ বাউলের প্রাণে সাড়া জাগায়, সে প্রেম মিলনের অভাবেও সুসম্পূর্ণ, ব্যথাতেই মধুর।"

শরৎ চন্দ্রের অমর লেখনীতে বিরহের নিগূঢ় তাৎপর্য্যটি যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিরহ না থাকিলে প্রেম সার্থক ও সুসম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে না। বিরহ আছে বলিয়াই সত্যকারের প্রেমিকের বা ভক্তের প্রেমাস্পদের সহিত মিলনে এত আনন্দ। তাই বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন, "শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলল ঘরে রাধিকার অন্তরে উল্লাস।" যাহাতে মন-প্রাণ সবই সমর্পণ করা যায়, যাহা 'সজে বাটিল হিয়া'—তাহার ক্ষণিক অদর্শনেই মনে বিরহব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে। যে জন পরম বন্ধু সে যদি চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যায় তবেই হৃদয় ভরিয়া উঠে গভীর বেদনায়। প্রেম যেখানে ক্ষণিকের

মোহ, যে প্রেমে গভীরতা নাই বিরহের অনুভূতিও সেখানে জাগে না। "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু"—তবুও যে হিয়া জুড়াইল না; যুগ যুগ ধরিয়া সেই পরম দয়িতের রূপ নিরীক্ষণ করিয়াও যে নয়ন অতৃপ্ত রহিয়া গেল—এই অনুভূতির নামই তো বিরহ। 'নয়ন অন্ধায়নু পিয়া পথ পেখি,' 'জনম গোঁয়ায়নু রোহ'—প্রিয়ের পথ চাহিয়া চাহিয়া নয়ন আমার অন্ধ হইল, তাহার জন্ত কাঁদিয়া জনম গেল, তবুও তাহার জন্ত ব্যাকুল প্রতীক্ষার অবসান হইল না—এ কি সহজসাধ্য? এমনি ভাবে প্রিয়তমের পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা, এইরূপ প্রতীক্ষার জন্ত যে ধৈর্য্যের প্রয়োজন অনাবিল, অকৃত্রিম প্রেমই তার উৎস। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইহাকেই বলিয়াছেন, "প্রেমের অপরাজেয় শক্তি।"

সাধকশ্রেষ্ঠ বাউল লালন ফকিরের বহু সঙ্গীতে বিরহের সুরটি যুগপৎ কারুণ্যে এবং মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ বিরহ পার্থিব ভালবাসা হইতে উদ্ভূত নহে; ভক্তহৃদয়ের অতলস্পর্শ ভগবৎপ্রেমের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। তাই লালন গাহিয়াছেন,

"আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার দেহের মাঝে আর্শিনগর
তাতে এক পড়শী বসত করে।"

বাউলের সাধনায় দেহের একটি বিশেষ মর্য্যাদা আছে। দেহতত্ত্ব আলোচনার স্থান ইহা নহে। তবে দেহের মধ্যে যে পড়শীটি বাস করেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি স্বয়ং ভগবান। তাঁহাকে না-দেখার, না-পাওয়ার যে দুঃখ তাহা বাউলের হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে। অনুরূপ আকুতি তাঁহার আরও অনেক গানে ব্যক্ত হইয়াছে,

"আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে
আমি জনম ভরে একদিন দেখলাম নারে।"

এ ঘরখানা বলিতে লালন আপন দেহখানাকেই বুঝাইয়াছেন এবং সেখানে যিনি বিরাজ করেন তিনিই পরম গুরু, সাঁই বা পরমেশ্বর। যেমন—

"কে কথা কয় রে দেখা দেয় না
নড়ে-চড়ে হাতের কাছে,
খুঁজলে জনম ভোর মেলে না।"

তাঁহাকে সারা জনম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও ধরা যায় না, তাই তো তিনি অধর চাঁদ—বৈষ্ণবের যেমন কালাচাঁদ, যে "অধর কালাচাঁদ রয়েছে তোমার হৃদয়ে জাগিয়া":

"আমি আর সে অচিন একজন,
এ জগতে থাকি দু'জন,
কাঁক লক্ষ যোজন চাইলে ধরিতে।"

তিনি এইখানেই আছেন, ভক্তের 'মনের কানের কাছে' 'নিয়তই তাঁর বাঁশী বাজে' তবু তিনি নাগালের বাইরে। এ যেন লুকোচুরি খেলা। তাই লালন বলিতেছেন,

"সাঁই,
খেলচ আমার সাথে পলান-টুকটুক,
থেকে থেকে দিচ্ছ যে টুক্,
শুধু দেখতে পাইনে তোমার ও মুখ,
তাই দেলে ব্যথা বাজে।"

গ্রাম্য কবি যাহাকে বলিয়াছেন পলান-টুকটুক তাহার অর্থই লুকোচুরি খেলা, আর টুক্ দেওয়ার মানে হইল সঙ্কেত-সূচক শব্দ করিয়া আপন অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানান দেওয়া। ভগবান যে ভক্তের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিয়া তাহাকে 'নিরবধি বিরহ-পয়োনিধি'তে ফেলিয়া রাখেন এ ভাবের কথা যেমন আমাদের বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে ও বাউল সঙ্গীতে পাওয়া যায় তেমনি পারস্যের হাফেজ, রুমী প্রমুখ সুফী কবিদের কাব্যেও দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সংস্কৃতি ঐতিহ্যবিষয়ক রচনা-সংগ্রহে অধ্যক্ষ নারায়ণ বালচাঁদ বুভানী সুফী কবিদের সম্বন্ধে সরস ও সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন—সুফী ও বাউলদের বিষয়-বস্তু একই কেন্দ্রাভিমুখী।

সারাজীবন বিরহের অনলে দগ্ধ হইয়াও শেষ পর্য্যন্ত মিলন চাই, কারণ তাঁহার সহিত মিলন না হইলে মুক্তির আশা নাই—

"পাপীকে তরাইতে পতিতপাবন নাম,
তাইতো তোমায় ডাকি গুণধাম,
তুমি আমার বেলায় কেন হলে বাম,
আমি আর কত কাল ভাসব দুঃখের সায়রে?

* * *

আমায় যদি না তরাও গোসাঁই,
তোমার দয়াল নামের দৈন্ত রবে সংসারে।"

লালন আবার গাহিলেন,

"পাপী যদি তুমি না তরাইবে
অধম-তারণ নাম কে নিবে?
জীবের দ্বারা কলঙ্ক হবে
নামের ভরম যাবে তোমারি!

* * *

লালন বলে এ সংসারে
আমি কি তোমার কেহই নই?"

বিদ্যাপতির কবিতায় দেখি অভিমানিনী রাধা এইরূপ উক্তিই করিয়াছেন,

"আদি অনাদিক নাথ কহায়সি
অবতারণ ভার তোহারা।
*   *   *   *
তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহি মুঞি ছার।"

শ্রীমতী কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন,

"তুয়াপদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু।"

লালনের আকাঙ্ক্ষাও প্রেমাস্পদের পদতলে আশ্রয়লাভ—এর বেশী আর কিছু তিনি চান না, কোন পার্থিব সম্পদ তাঁর কাম্য নয়। তিনি বলিতেছেন,—

"চরণ ধনের যার আশা, অন্ত ধনের নাই লালসা।"

বৈষ্ণব কবির মত তিনিও উপলব্ধি করিয়াছিলেন,—

"যেহন বিরহ হো তেহন সিনেহ।"

লালনের নৈরাশ্য নাই। তাঁহার ভক্তি ছিল প্রগাঢ়, 'প্রেম-পরশমণি'র ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল তাঁহার অন্তরে, বিরহ অবসানে মিলন সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নিঃসংশয়, কাজেই মৃত্যু-কালে শিষ্যদের ডাকিয়া তিনি হাসিমুখে বলিয়াছিলেন,—

"ওরে,
আমি চলিলাম তাঁহারই কাছে,
আমার মনের মানুষ যেখানে আছে।"

সেই মানুষটিকে পাইবার জন্ত বিরহী বাউলের মনের যে ব্যাকুলতা তাহারই অভিব্যক্তি নিম্নোদ্ধৃত বাউল গানটিতে—

"এ যে কোন্ কর্মনাশা,
এ যে কোন্ কর্মনাশা গানের ভ্রমর
মর্মেতে মোর বাঁধল বাসা।
সে যে গো দিনে রাতে সকাল-সাঁঝে
গান করে আর আমায় গাওয়ায়
থামায় না গান থামে না যে।
তারি সেই সুর শুনে মোর মন বসে না
এ সংসারের কোনই কাজে।
বুঝি বা বিফল হবে,
বুঝি বা বিফল হবে এই তোমাদের
কাজের ভবে
আমার এ গান গাইতে আসা।
করি না বেচা-কেনা,
করি না বেচা-কেনা কোন হাটে
কোন বাটে কাল কাটে না।
শুনি না কারো কথা, শুধু শুনি
অন্তরে গুন গুন করে গো
কোন্ উদাসী, কোন্ সে গুণী।
তারি সেই গুঞ্জনে মোর জীবন হলো
তারি সুরের সুরধুনী।

এই বাউল গানটি ভক্ত গায়কের কণ্ঠে শুনিতে শুনিতে এক অপূর্ব্ব অনুভূতিতে হৃদয় ভরিয়া উঠে। এই গানটি কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া এমন এক লোকে লইয়া যায় যে, সব কিছুই এক অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, পরমতত্ত্বের প্রতিচ্ছায়া হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় এবং যেন মহান্ ও সুন্দর এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া যায়।

বাউলদের হৃদয় শরদভ্রের ন্যায় নির্ম্মল ও শরৎ শেফালির ন্যায় পবিত্র; প্রকৃতির হর্ষময় লীলামাধুরী তাহাদের প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। এই নির্ম্মল ও পবিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশে তাহাদের সরল ভক্তি কিরূপ অনায়াসে ফুটিয়া উঠে তাহারই প্রকাশ তাহাদের ভাবমধুর গানের মধ্যে।

এই যে অনিত্য সংসার—ইহার বন্ধন—মায়াপাশ ছেদন করাতেই মানুষের মনুষ্যত্বের প্রকৃত পরিচয়। কোন্ সুদূর অতীতে মানব-জীবনের এই দুঃখের স্বরূপ, সংসারের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক হিন্দুর চোখে পড়িয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভক্ত রামপ্রসাদ এই দুঃখের সুরটি পুনরায় জাগরিত করিলেন, তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া অসংখ্য ফকির, বাউল আবার এই দুঃখবাদের সুরে বঙ্গসমাজকে সংসার-বিমুখ করিয়া তুলিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর রামপ্রসাদের সুর অনুরণিত হইয়া উঠিল উনবিংশ শতাব্দীতে বাউল ফিকির চাঁদের গানে:

"বাঁশের দোলাতে চড়ে কে হে বটে শ্মশানঘাটে যাচ্ছে চলে
ঘুরে যে ঢাকার শহর, দিল্লী লাহোর, টাকা-মোহর নিয়ে এলে,
খেলে না পয়সা, সিকি, কওনা দেখি, তার কি কিছু সঙ্গে
নিলে।"

বাউলের গানে দুঃখবাদ ও রামপ্রসাদের গানে দুঃখবাদে প্রভেদ এই যে, বাউল মানুষকে জীবনের প্রতিপদে শত দুঃখের চিত্র দেখাইয়া শ্মশানে নির্ব্বাণকে শেষ আশ্রয়স্বরূপ মনে করিয়াছে আর রামপ্রসাদের দুঃখবাদে সংসারের শত দুঃখের প্রতি ইঙ্গিত থাকিলেও তাহা যে মাতৃপাদপদ্মে শরণ লইলে দূর হয় তাহা জোরের সহিত বলা হইয়াছে। কিন্তু বাউলের মধ্যে যে মনের মানুষটি বিদ্যমান তাহা সত্য, শিব ও সুন্দর। এইরূপ ভাবোন্মাদনাময় সঙ্গীত এককালে সমস্ত বঙ্গে এক মহা প্লাবন আনিয়া দিয়াছিল। আশ্বিন মাসের শিউলি ফুলের উপর ঝরিয়া-পড়া শিশির-কণার মত এই যে পরম মিলনের প্রত্যাশায় বাউল কবিদের চক্ষু-জল দিনরাত্রি ঝরিত তাহাই বাউলদের মনে সঙ্গীত রচনার প্রেরণা জোগাইয়াছিল। এই সকল ভাবোন্মাদ বৈরাগীসম্প্রদায়ের মনোহারী সঙ্গীত যে অশ্রুরচিত হার; ঐগুলি তাৎকালিক বঙ্গ-জীবনের জীবনরসে পুষ্ট। ঐ সঙ্গীত-রচয়িতারা মানবের হৃদয়ে চিরকাল অমর হইয়া জাগিয়া থাকিবেন।

চাক্মা জাতির ধর্ম্মকাম

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএইচ-ডি.

প্রবাসীর বিগত আষাঢ় সংখ্যায় আমি "প্রাচীন বঙ্গে ধর্ম্ম-পূজা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। উহার উপসংহারে লেখা হইয়াছিল, "বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যে মতামত ব্যক্ত করিলাম, সে সম্বন্ধে প্রবাসীর পাঠকগণের মধ্যে কাহারও কোন বক্তব্য থাকিলে তিনি দয়া করিয়া লেখককে তাহা জানাইবেন।" সুখের বিষয়, এই আবেদনের ফল ফলিয়াছে। সম্প্রতি ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত কটিকরায় ডাকঘরের অধীন ময়নামা কমলাবাগান গ্রামের শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চাক্মা মাষ্টার মহাশয় একখানি পত্রে ধর্ম্মপূজা সম্পর্কে তদীয় মতামত আমাকে জানাইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার চিঠির মূল অংশ উদ্ধৃত করিয়া পরে তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য প্রকাশ করিব।

মাষ্টার মহাশয় লিখিয়াছেন, "আমাদের চাক্মা সম্প্রদায়ের মধ্যেও ধর্ম্মপূজার বিধান রহিয়াছে। বিভিন্ন গ্রন্থে ধর্ম্মপূজার যেরূপ বিভিন্ন বিধান রহিয়াছে, ধর্ম্মপূজার উৎপত্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ পণ্ডিতগণের ভিন্ন ভিন্ন মতামত দৃষ্ট হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমত এই যে, ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ পরিণতি। এই মত যে একবারে অমূলক, তাহা নহে। বরং অনার্য্য জাতিবিশেষের মধ্যে প্রচলিত কূর্ম্মপূজার প্রাচীন অনুষ্ঠান হইতে ধর্ম্মপূজার উদ্ভব হইয়াছে, ইহা বলিলে একটু অসঙ্গত বোধ হয়। ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ক্ষীণাবশেষ বর্ত্তমান চাক্মা জাতির মধ্যে ধর্ম্মপূজার যে বিধান রহিয়াছে তদৃষ্টে বুঝা যাইবে যে, কেবল অনার্য্যজাতির অনুষ্ঠান হইতে এই পূজার উদ্ভব হয় নাই, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে অর্থাৎ উন্নত আর্য্য সংস্কৃতি হইতেই ইহার উৎপত্তি।

"এই অনুষ্ঠানকে চাক্মা ভাষায় ধর্ম্মকাম বলে। ইহার অন্য নাম সিদ্ধি পূজা, শিবপূজা বা আদি পূজা। চাক্মা সম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক সকল পূজার মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ। ইহা বহুব্যয়সাধ্য বলিয়া বিত্তবান্ গৃহী ব্যতীত অন্যের সাধ্য নহে। এই ধর্ম্মপূজা প্রাচীনকালে চাক্মা বৌদ্ধ মাত্রেরই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। রাজা, দেওয়ান, তালুকদার প্রভৃতি সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ প্রতিবৎসর হিন্দুদিগের দুর্গোৎসবের ন্যায় মহাসমারোহে এই পূজা সম্পন্ন করিতেন। ইহার অনুষ্ঠান ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের কারণ বলিয়া লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অনেকে বিপদে পতিত হইয়া ইহা মানত করিত। বর্ত্তমানে চাক্মা সমাজে আধুনিক শিক্ষার বিস্তারে ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়াছে। এখন কচিৎ কোথাও ইহা অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। ভবিষ্যতে বোধ হয় ইহা সম্পূর্ণই বিলুপ্ত হইবে।

"শ্রদ্ধাবান্ গৃহী সমস্ত ঘর-দ্বার পরিষ্কার করিয়া সস্ত্রীক স্নাত শুচি হইয়া পূর্ব্বাহ্ণে আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করেন এবং বৌদ্ধ পুরোহিতগণকে অর্থাৎ রাউলি ব্রাহ্মণের ও ভিক্ষুগণকে আহ্বান করেন। পূজার উপকরণ সমস্ত সংগ্রহ করিয়া একটি পৃথক নূতন গৃহ প্রস্তুত করা হয় এবং উহার পশ্চিম কোণে আর একটি ছোট ঘর তৈরী করা হয়। তথায় উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদুপরি চন্দ্রাতপতলে বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করিতে হয়। বৈকালে ধূপ, দীপ, পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা ঘণ্টাধ্বনি সহকারে সস্ত্রীক গৃহী আত্মীয়বন্ধুগণসহ বুদ্ধের অর্চনা করেন। কতকগুলি আনুষ্ঠানিক কার্য্য সমাপনের পর বৌদ্ধ পুরোহিতকে স্নান করাইয়া পূজার পৌরোহিত্যে বরণ করা হয়। অতঃপর বিকৃত পালি ভাষায় লিখিত চাক্মা বৌদ্ধ শাস্ত্র 'সাহসপুদুত্তারা' এবং 'মালেমতারা' পাঠ করা হয়। মৎপ্রণীত 'চাক্মা জাতির ইতিহাস' পৃ. ৫৪ এবং সতীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'চাক্মা জাতি' পৃ. ২০০ দ্রষ্টব্য। রাত্রিতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে নানা প্রকার পিষ্টক দিয়া পরিতৃপ্ত করা হয়।

"বৈকালে কোন নির্জ্জন জঙ্গলে পূজার স্থান পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হয়। প্রত্যূষে তথায় সমস্ত পূজোপকরণ লইয়া মুখ বাঁধিয়া ভাত, তরকারী ও মিষ্টান্ন পাক করিতে হয়, যেন কোন দ্রব্য উচ্ছিষ্ট না হয়। পাক শেষ হইলে পূজাস্থানে জল ছিটাইয়া কদলীপত্র স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি সমস্ত ভাত ঢালিতে হয়। তারপর ভাত মর্দ্দনপূর্ব্বক প্রথমে সূচ্যগ্র বৃহৎ ভাতের পিণ্ড স্থাপন করিয়া চতুর্দ্দিকে ভাত বিস্তার করিতে হয় এবং চতুর্দ্বারবিশিষ্ট একটি চক্রমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৃঙ্গযুক্ত ভাতের পিণ্ড সাজাইতে হয়। উহার সহিত যথাক্রমে কদলী, পিষ্টক, বাতাসা, ঘৃত, চিনি, মিশ্রী, গুড় ও মিষ্টান্ন দিতে হয়। বিশেষভাবে নির্ম্মিত একটি পতাকা বংশদণ্ডের সাহায্যে পশ্চিম দিকে টাঙাইয়া পুরোহিত তথায় আসন গ্রহণ করেন। ইহার পর ধূপ পোড়াইয়া ও প্রদীপ জ্বালিয়া গৃহী সস্ত্রীক আরতি করিবার পর পুরোহিত 'দশপারমিমন্ত্র' পাঠ করিতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে গৃহী পূজা প্রদক্ষিণ এবং অনবরত ঘণ্টাধ্বনি করিতে থাকেন। তিন বার পূজাপ্রদক্ষিণ শেষ হইলে পুরোহিত ধর্ম্মরাজ বুদ্ধকে আহ্বান করেন। আহ্বান-মন্ত্র যথা—

> 'ওং সিদ্ধং বুদ্ধং ত্রিগুণং নাথং
> নায়কং জিনং গুরুং জিনং গুরুং
> ঘোরং ঘোরং কিস্‌স ঘোরং কর্ম্মঘোরং
> সব্ব পুদগলা সব্বসু অগ্‌গ পুঞঞ খেওং
> আগচ্ছ আগচ্ছ॥' (তিন বার পঠিতব্য)

"তারপর পূজার জীবনদান করা হয়। ইহার মন্ত্র 'ধম্মপদ' জরাবগ্গের অষ্টম ও নবম শ্লোক (তিন বার পঠিতব্য)। পূজাকে জীবনদান করা হইলে যেন অভীষ্ট দেবতার আবির্ভাব হয়। এই সময়ে অকস্মাৎ একটি মাকড়সা আসিয়া পূজার স্থানে জাল বিস্তার করিতে থাকে। ঐ জালের অবস্থান হইতে গৃহস্থ ও পুরোহিতের মঙ্গলামঙ্গল এবং পূজার

সাফল্য জানা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, পূজা সকল হইলে পূজার কোন দ্রব্য কাক, কুকুর ইত্যাদি কখনও স্পর্শ করে না। পূজার পর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া গৃহী নিমন্ত্রিতগণকে ভোজন করান এবং পুরোহিতকে খাদ্য ও দক্ষিণা দান করেন। পুরোহিত পুনরায় 'মালেমতারার' শেষভাগ পাঠ করেন এবং আর্য্য আষ্টাঙ্গিকমার্গের ব্যাখ্যা শেষ করেন। গৃহী বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে প্রদীপ জ্বালাইয়া সবান্ধবে মনস্কামনার পূর্ণতাজ্ঞাপন করেন এবং ব'লতে থাকেন,—

'সিদ্ধিপূজা পার গেল
সিদ্ধিপূজা পার গেল
সিদ্ধিপূজা পার গেল।'

"ধর্ম্মপ্রাণ ভারতীয়গণ আর্য্য হউক, অনার্য্য হউক, হিন্দু বৌদ্ধ জৈন নির্ব্বিশেষে এক মহতী সংস্কৃতির ধারায় সঞ্জীবিত, অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত। আদৌ হিন্দু আর্য্যগণ ধর্ম্মের পূজা যে কোন প্রতীক লইয়া আরম্ভ ক'রয়াছিলেন; পরে উহা বৌদ্ধগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ত্রিরত্ন যেরূপ কালক্রমে পুরীধামে সুভদ্রা, বলরাম ও জগন্নাথরূপে পূজিত হইয়াছেন, সেইরূপ ধর্ম্মঠাকুর নিরঞ্জন ও অন্যান্য আকারে রূপান্তরিত হইয়াছেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম্মকে চতুরঙ্গহিসাবে চতুষ্পদ গোরূপে, কখনও বা জগদ্ধারণকারী কূর্ম্মরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। অতএব অনার্য্য জাতির স্কন্ধে ধর্ম্মপূজার উৎপত্তি চাপাইবার কারণ নাই। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার ধর্ম্মকায় স্বীকার করিয়াছেন। ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন-সূত্রানুসারে ধর্ম্ম চক্রাকার। আবার সপ্তত্রিংশৎ বোধিপাক্ষিক ধর্ম্মানুসারে সপ্তসোপানবিশিষ্ট মঞ্চ ধর্ম্মের প্রতীক। এ সম্বন্ধে আরও বলিবার আছে; বাহুল্য ভয়ে নিরস্ত হইলাম।"

উপরে উদ্ধৃত চাক্‌মা বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্মকাম সংজ্ঞক অনুষ্ঠানের বিবরণ এবং তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চাক্‌মা মহাশয়ের মন্তব্য সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে কেবলমাত্র দুইটি কথা বলিতে চাই। প্রথম কথা এই যে, চাক্‌মাদিগের ধর্ম্মকাম প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা নহে। ধর্ম্মকাম শব্দটি ধর্ম্মকার্য্যবোধক সংস্কৃত ধর্ম্মকর্ম্ম শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার সহিত ধর্ম্মঠাকুরের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। তাহা থাকিলে, অবশ্যই পূজার মন্ত্রাদিতে 'ধর্ম্ম' নামটির উল্লেখ থাকিত। প্রকৃতপক্ষে ইহা বুদ্ধপূজাব্যতীত অপর কিছু নহে। চাক্‌মাদিগের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মক্রিয়া বলিয়া এই অনুষ্ঠানের নাম ধর্ম্মকাম হইয়াছে। ইহার উপর প্রাচীন ধর্ম্মঠাকুর পূজার কোন প্রভাব পড়িয়াছে কিনা, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। কারণ এই অনুষ্ঠানে কচ্ছপের বা উহার মূর্ত্তির কোন স্থান দেখা যাইতেছে না। মধ্যবাংলায় ধর্ম্মঠাকুর গোধাকৃতি পাটঠাকুর রূপে পূজিত হন। কিন্তু চাক্‌মাজাতির ধর্ম্মকামে গোধারও কোন স্থান নাই। অবশ্য ধর্ম্মকামের উপলক্ষ্যে একটি মাকড়সার জালবিস্তারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উহার সহিত অনুষ্ঠানের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। মাকড়সা ধর্ম্মঠাকুরের প্রতীক হইলে ধর্ম্মকাম অনুষ্ঠানের কোন অঙ্গে ইহার বিশিষ্ট স্থান থাকিত।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, আমাদের দেশের অনেকে আর্য্য এবং অনার্য্য সংস্কৃতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন, অনার্য্য সংস্কৃতির অর্থ অসভ্যতা ব্যতীত আর কিছু নহে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, প্রাচীন ভারতের সমুদয় অনার্য্যজাতি অসভ্য ছিল না। সিন্ধুদেশের অন্তর্গত মোহেন্‌-জো-দড়ো এবং পঞ্জাবের অন্তঃপাতী হরপ্পা ইত্যাদি স্থানে ইতিহাসপূর্ব্ব যুগের যে সকল সাংস্কৃতিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে উহা হইতে জানা যায় যে, সুপ্রাচীন সিন্ধু-উপত্যকাবাসী অনার্য্য নাগরিকগণ আদি বৈদিক যুগের যাযাবরপ্রকৃতি আর্য্যগণ অপেক্ষা অধিকতর সভ্য ছিলেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার স্থান ইহা নহে। সংক্ষেপে বলিতে পারি যে, ভারতীয় সংস্কৃতিকে অবিমিশ্র আর্য্য সংস্কৃতি বলা চলে না। ইহা আর্য্যানার্য্যের মিশ্র সংস্কৃতি। অনেক আধুনিক পণ্ডিত মনে করেন যে, যোগাভ্যাস, ভক্তিবাদ, শিব ও জগন্মাতার উপাসনা, উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, অহিংসা প্রভৃতি বিষয়ের জন্য ভারতীয় সংস্কৃতি অনার্য্যগণের নিকট ঋণী। এমন কি ভগবান্ বুদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মকে প্রকৃতপক্ষে আর্য্যধর্ম্ম বলা চলে না। যাঁহারা মনে করেন যে ভগবান্ বুদ্ধ অনার্য্য মোঙ্গোলজাতীয় ছিলেন, আমি তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য মনে করি। জৈনধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাবীরও মোঙ্গোল জাতীয় ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ভারতবাসীর ধমনীতে প্রধানতঃ অনার্য্য শোণিত প্রবাহিত এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে অনার্য্য সভ্যতার দান অপরিমেয়; ইহা আমাদের অগৌরবের বিষয় নহে।

প্রসঙ্গক্রমে আর দুই-একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মনে করিতেন যে, ধর্ম্মঠাকুরের পূজা বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ পরিণতি। চাক্‌মা মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের সমর্থক। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্র এবং মূর্ত্তিবিদ্যা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্তর্গত ধর্ম্ম মনুষ্যমূর্ত্তিতে পূজিত হইতেন, কূর্ম্মাদির মূর্ত্তিতে নহে। আবার কচ্ছপ টোটেম-পূজক অনেক জাতি এখনও ভারতে রহিয়াছে। এ অবস্থায় শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত কিরূপে সমর্থন করা যাইতে পারে? পুরীধামের সুভদ্রা, বলরাম ও জগন্নাথকে পূর্ব্বে কেহ কেহ বৌদ্ধ ত্রিরত্ন অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের সহিত অভিন্ন মনে করিতেন। আধুনিক পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তটিকেও ভ্রান্ত মনে করেন। মাদুরার মীনাক্ষী, তিরুপতির বালাজী, বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতির ন্যায় এখানেও আদিম জাতির পূজিত কতিপয় দেবদেবীকে পরবর্ত্তীকালে পৌরাণিক দেবদেবীর সহিত অভিন্ন কল্পনা করা হইয়াছে।

বৈশাখের বসুন্ধরা
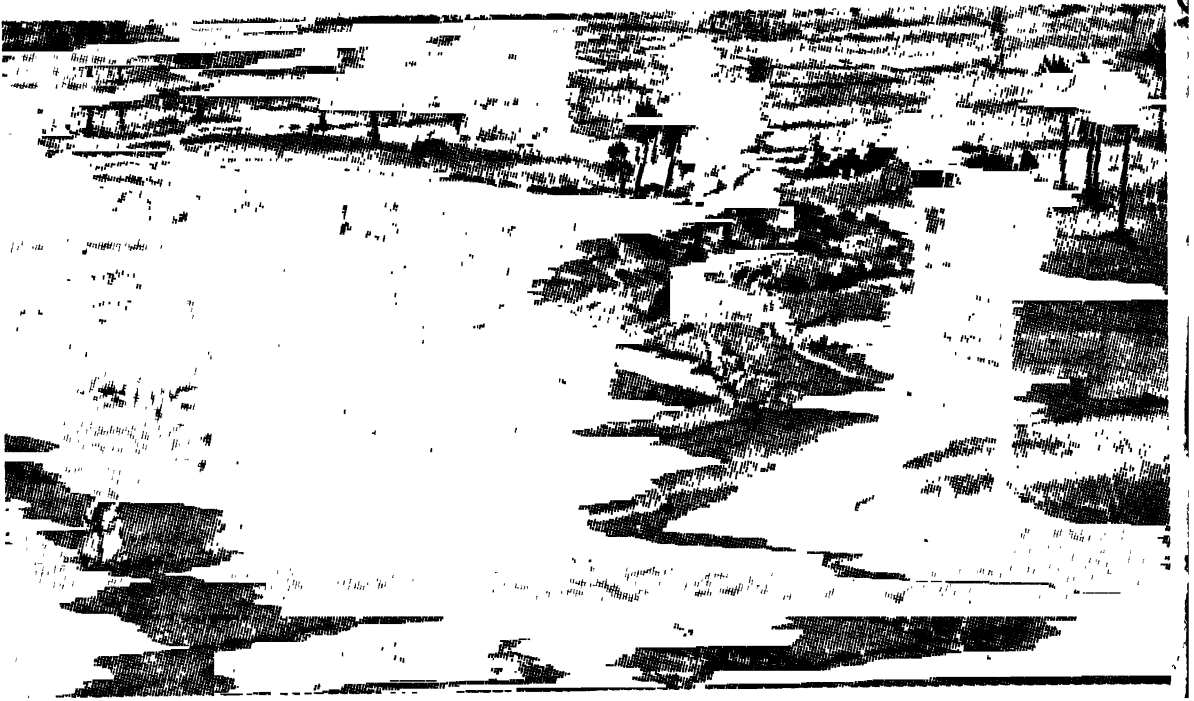
চিত্রশিল্পী ইন্দ্র দুগার

শ্রীবিপ্ররাজ মিত্র

একথা সত্য যে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শিল্পকলা একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। নিত্যনূতন ভাবধারায় ও মতবাদে রসিকচিত্ত আজ আন্দোলিত ও সময়বিশেষে বিভ্রান্ত—তার আভাস দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশেরও শিল্পীদের শিল্পকর্মে। সাম্প্রতিক শিল্পকলায় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

এই অস্থিরতার মধ্যেও যখন দেখি কোন শিল্পী সহজ রসোপলব্ধি ও স্বকীয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেই উপজীব্য করে শিল্পরচনা করে চলেছেন তখন বিস্মিত হতে হয়। শিল্পী ইন্দ্র দুগার এই সহজ রূপবোধের শিল্পী। অর্থাৎ তাঁর শিল্প-রচনা রূপতত্ত্বের নূতন মতবাদ সৃজন করে কোথাও আমাদের চমক লাগিয়ে দিতে চায় নি। তিনি শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে যতখানি দেখেছেন ও মন দিয়ে যতখানি উপলব্ধি করেছেন তাকে রূপদান করে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। চোখ খুলে তিনি শিল্পের উপকরণ আহরণ করেছেন বলেই তাঁর শিল্প দৃষ্টিগ্রাহী। তাঁর শিল্পের স্বকীয়তার এবং উৎকর্ষের মূল কারণও এইখানে।

ইন্দ্র দুগারের বাল্যকাল কাটে শান্তিনিকেতনে এবং তিনি শিল্পশিক্ষা লাভ করেন একান্ত ভাবে তার পিতা বিখ্যাত শিল্পী হীরাচাঁদের কাছে। হীরাচাঁদের নাম এ যুগের শিল্প-রসিকদের অজ্ঞাত, কিন্তু তাঁর শিল্পপ্রতিভা ছিল উঁচুদরের। শিল্পাচার্য্য নন্দলালের প্রথম যুগের ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। শৈশবে এই আওতায় বেড়ে ওঠায় ইন্দ্র দুগারের শিল্পেও শান্তিনিকেতনের প্রচ্ছন্ন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সেটি তাঁর শিল্পের একটি দিক মাত্র। শান্তিনিকেতনের প্রভাব তাঁকে ড্রইং ও বর্ণপ্রয়োগ বিষয়ে সতর্ক করেছে। শিল্পের জগতে অতি-আধুনিক শিল্পীদের উন্মার্গগামিতার প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় ড্রইং-এ অপটুতা ও বর্ণপ্রয়োগের যথেচ্ছাচারে। অতি-আধুনিক শিল্পে এই লক্ষণটি প্রায় সর্ব্বত্র এত সুপরিস্ফুট যে, শিল্পকলার ও শিল্পশিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তা এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। নিত্যনূতন শিল্পপদ্ধতির আমদানীর ফলে শিল্প-কলার চিরন্তন পদ্ধতিগুলি, এমন কি ক্লাসিক আর্ট বা শাশ্বত শিল্পকলা পর্য্যন্ত আজ নিরর্থক ও মূল্যহীন বলে গণ্য হচ্ছে। *Artists' International Association's Bulletin*

রাজপুত রমণী

ছাপ পায় নি। ভাবপ্রকাশের পরিপূর্ণতা আনতে গিয়ে তাঁর শিল্পে অজ্ঞাতসারেই বিভিন্ন রীতির ছাপ পড়েছে—এটা হ'ল শিল্পীর অবচেতন মনের লীলা। কিন্তু তা নিছক ছায়া-মাত্র, কোন ক্ষেত্রেই কোন রীতিবিশেষ একান্তভাবে এই শিল্পীকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। কোন কোন সমালোচক দুগারের আঁকা ছবিতে ইউরোপীয় ইম্‌প্রেসনিষ্ট পন্থা ও চীনা চিত্রের রচনাশৈলীর প্রভাব কল্পনা করে উল্লসিত হয়েছেন। কিন্তু এ কল্পনা অজ্ঞতাপ্রসূত নিছক কষ্টকল্পনা। কারণ ইম্‌প্রেসনিষ্ট রীতির বর্ণ-প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইন্দ্র কোথাও সে পদ্ধতি অনুসরণ করেন নি। আর চীনা শৈলীর কলমের ব্যবহার, তারসামা সৃজন ও বর্ণপ্রলেপের বৈশিষ্ট্য ইন্দ্রের চিত্রে লক্ষ্য করা যায় না।

কিন্তু শিল্পী হিসাবে ইন্দ্রের আসল কৃতিত্ব অন্য দিকে। বাংলাদেশে তাঁর শিল্পের মধ্যেই বিশেষ ভাবে প্রকৃতিকে

(No. 90 for August 1946) থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি, তাতে এই সমস্যার ব্যাপকতা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করা যাবে।

"Among students today there is some uncertainty about the relationship between objective study from nature or from 'the life' and subjective expression, a failure to appreciate that the most imaginative ideas require for their expression a concrete basis of knowledge and craftsmanship. This may be due to the fact that in recent art-teaching there has been too much emphasis on aesthetics and not enough on good workmanship and that the relationship between form and content in art has not always been clearly explained."

বাংলাদেশের আধুনিক যুগের শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্র দুগার আধুনিকতার এ দিকটা গ্রহণ করেন নি।

ইন্দ্র দুগারের শিল্প সম্বন্ধে একটি কথা প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, শিল্পের রীতি ও পদ্ধতিগত প্রশ্ন কোন সময়েই এই শিল্পীকে দ্বিধাগ্রস্ত করে নি। অর্থাৎ পাশ্চাত্য কি প্রাচ্য কোন্ শিল্পরীতিতে প্রকাশিত হলে শিল্পের শুদ্ধ রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এ সমস্যা তাঁর মনে বিন্দুমাত্র

তীর্থযাত্রীর বিশ্রাম

পল্লীপ্রান্তে

আপন ঐশ্বর্য্য ও মহিমায় উদ্ঘাটিত হতে দেখা গেল। নিসর্গ-শোভা কোনদিনই আমাদের শিল্পীদের মনকে তেমন ভাবে আকর্ষণ করে নি। যে আদর্শবাদের প্রতি অনুরাগ ও সাজাত্যাভিমানের ফলে বর্ত্তমান যুগে প্রাচ্য শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন হয়েছিল এবং শিল্পীদের মনে প্রাচ্য শিল্পকলার প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হয়েছিল তারই সহজ পরিণতি হিসাবে আমাদের চিত্রশিল্পের ভাণ্ডার একান্ত ভাবে দেবদেবী ও মানবদেহের রূপে ভারাক্রান্ত হয়েছে। প্রকৃতির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা চিরদিনই আমাদের শিল্পীদের দৃষ্টির বাইরে থেকে গিয়েছে। আমাদের প্রাচীন শিল্পে তার পরিচয় যতটুকু তা সম্পূর্ণরূপে ভাবপ্রকাশের পটভূমিকা হিসাবে—তা স্বকীয় সত্তার গৌরবে সমুজ্জ্বল নয়। নিসর্গের এই স্বকীয়তা দেখা গেল শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের রচনায়। কিন্তু সেখানেও প্রকৃতিকে প্রধানতঃ ভাবকল্পনার আধার হয়েই ব্যক্ত হতে হয়েছে। আধুনিক কালে একমাত্র নন্দলালই প্রকৃতিকে শিল্পীর এই ভাবদৃষ্টি থেকে মুক্ত করে তার আসল স্বরূপে আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

শিল্পী হুগারের নিসর্গ-চিত্রের মূল্য এই দিক থেকে অপরিসীম। তাঁর ছবি দেখলে একথাই মনে হয়, শিল্পীর মন শিল্পীর দৃষ্টিকে কোথাও আচ্ছন্ন করে নি। অথচ সে দৃষ্টি বাস্তববাদীর দৃষ্টি নয়—যা রাস্কিনের মতবাদে প্রভাবিত—"go to Nature in all singleness of heart,…rejecting nothing, selecting nothing and scorning nothing." শিল্পীর দৃষ্টির মধ্যে যে সামগ্রিক বোধ আছে, সেই চেতনাই তাকে বাস্তববাদের প্রলোভন থেকে মুক্ত করে সাদৃশ্যবাদীর পর্য্যায়ে উত্তীর্ণ করেছে। সাধারণতঃ বাস্তবাদী (naturalistic) ও সাদৃশ্যবাদী (representational) কথা দুটিতে যে দুইটি বিভিন্ন শিল্পরীতির নির্দ্দেশ দেয় তার পার্থক্য আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। বস্তুরূপের হুবহু অনুকৃতিই হচ্ছে বাস্তববাদী শিল্প, যার বিপুল প্রভাব দেখা যায়

উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় শিল্পে। সাদৃশ্যবাদী আঙ্গিকে শিল্পীর বস্তুর অনুভূতিসঞ্জাত রসকল্পনার স্বরূপটি প্রকাশিত হতে দেখি। এই কারণেই সাদৃশ্যবাদী শিল্প কতকটা রূপকধর্মী। রুপারের শিল্পে প্রকৃতির হুবহু প্রতিচ্ছবি পাই না, তা নিছক ফটোগ্রাফি নয়। আসলে শিল্পী প্রকৃতির রূপদর্শনসঞ্জাত স্বীয় অনুভূতিকে চিত্রে রূপায়িত করেছেন, তার ফলে তাঁর ছবিতে প্রকৃতি অনেকাংশে মার্জিত হয়ে প্রকাশিত। আঁকবার সময় তাঁকে প্রকৃতির অনেক কিছু বর্জ্জনও করতে হয়েছে। সেই বর্জ্জনের মধ্যে একদিকে যেমন শিল্পীমনের আনন্দানুভূতি ব্যক্ত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি প্রকৃতির সামগ্রিক রূপের রূপক আভাসও প্রতিফলিত হয়েছে। রাজশীরের দৃশ্যচিত্রাবলীতে শিল্পীর মানসলোকের এই রহস্য বিশেষভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

উপসংহারে শিল্পীর অঙ্কিত স্কেচগুলির কথা বলতে চাই।

যাত্রী

রাজপুত মেয়েদের সাজ-সজ্জা, বিশেষ করে তার বর্ণ-বৈচিত্র্য ও সুষমা শিল্পীর তুলিতে নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে। হয়তো ভবিষ্যতে রাজপুতানীর এই দেহসজ্জা পরিবর্ত্তিত হবে মিলের সাদা ও মোটা রঙের বস্ত্রে। সেই রূপান্তরের আগে শিল্পীর তুলিতে তা রূপায়িত হ'ল। এটাই পরম লাভ।

পুষ্পহীন তরু

শ্রীকালিদাস রায়

ফুলের আশায় চাঁপাগাছ এক রোপিলাম আঙিনায়
দোতলা সমান উঁচু হ'ল তবু ফুল না ফুটিল তায়।
বন্ধু বলিল—"বাড়ীর উঠানে চাঁপা কি কখনো রাখে?
তা ছাড়া এখনো ফুল যে দিল না কি হবে বাঁচায়ে তাকে?
ওগাছ অপয়া কেটে ফেল ওরে কি হবে অমন গাছে?"
শিহরি উঠিনু, সাতটি বছর বেড়েছে বুকের কাছে,
সে যে দিনে দিনে সন্তানসম করেছে হৃদয় জয়।
আমার আশিস্ অমায়িত যেন উহার অঙ্গময়।
ফুলের কথাটা ভুলে গেছি কবে। কি তাহার প্রয়োজন?
শ্যামসুন্দর সতেজ রূপটি ভুলায় আমার মন।
ঘনপল্লব আবরণে তার হৃদয় স্পন্দমান।
ঝঞ্ঝায় করে টলমল, মোর দুরু-দুরু করে প্রাণ।
তারে দেখা মোর ফুরায় না, রূপে জুড়ায় আমার আঁখি
হাতে কাজ যবে থাকে না কিছুই তার পানে চেয়ে থাকি।
প্রাণ ভ'রে দেখি উহার অবাধ জীবনের উৎসার।
মম ম্রিয়মাণ জীবনে সে করে নববল সঞ্চার;
ছায়াটি তাহার দুপুরবেলায় চরণের 'পরে পড়ে।
ছায়ার মায়ায় নীরবে আমায় কি যে নিবেদন করে।
ফুল ফুটাইতে পারে নাই বলি' যে বেদনা প্রাণে রয়।
ছায়ার ভাষায় সে কথাই সে কি মিনতি করিয়া কয়?
ফুল ফুটাতে সে পারে নাই বলি তিনটি বছর ধরি'
মউচাকখানি রচেছে পরের ফুলমধু বার করি'।
সারা দিনটি সে কলগুঞ্জনে কি মন্ত্র করে জপ?
কিসের লাগিয়া তপনের পানে চেয়ে চেয়ে করে তপ!
সাধনা তাহার সার্থক হবে একদা ফুটিবে ফুল,
হেম গৌরবে ভরিবে অঙ্গ সৌরভে সমাকুল।
হয়ত তখন রহিব না আমি, নাই ক্ষতি, নাই ক্ষোভ,
শ্যামরূপে মোর জুড়ায়েছে আঁখি, হেমরূপে নাই লোভ।

তিলকীর খোকা

মারলাল দাশগুপ্ত

ঘন অরণ্যসঙ্কুল পাহাড়ের পাশ দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ উপলময় নদী বহিয়া গিয়াছে, নদীর ওপারে আবার অরণ্য। এ যেন এক স্বাধীন অরণ্যলোক। ইহার মধ্যে নদীর এপারে পাহাড়ের কোল ঘেঁষিয়া একখানি মাত্র ছোট মাটির ঘর—সামনে পরিষ্কৃত একটুখানি আঙিনা, বাঁশের উঁচু বেড়া দিয়া ঘেরা।

তখন সবেমাত্র ভোর হইয়াছে, শালগাছের মাথায় মাথায় পাখীরা ডাকাডাকি সুরু করিয়াছে, সেই ছোট ঘরের ঝাঁপের দরজা খুলিয়া মিটকা মাঝি আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ায়। মিটকা সাঁওতাল, কালো রং, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, শালগাছের মত বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ। বড় বড় চুলগুলা চোখের উপর হইতে সরাইয়া মিটকা ভাল করিয়া চারি দিক দেখিয়া লয়, তার পরে ডাকে 'কৈলী, ও কৈলী'। ঘরের ভিতর হইতে সারা আসে 'কি'—এবং একটু পরে বাহিরে আসে একটি যুবতী—গায়ের রং কষ্টিপাথরের মত কালো হইলে কি হয়, অপূর্ব্ব স্বাস্থ্য এবং নবীন যৌবনশ্রী তাহার প্রত্যেকটি অঙ্গে টলমল করিতেছে। তাহার পরনের মোটা শাড়ী নীচের দিকে হাঁটু ছাড়াইয়া আর বেশী দূর নামিতে পারে নাই, উপরের দিকে কোনমতে বুক ঢাকিয়া কাঁধের কাছেই শেষ হইয়া গিয়াছে, অথচ এই সঙ্কীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত আবরু তাহার শালীনতার একটুও হানি ঘটাইতে পারে নাই। কৈলী বাহিরে আসিয়া কোঁকড়া চুলের খোঁপাটা আঁট করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বলে 'কি ডাকছিস্ কেন?' মিটকা বলে 'আজ একলা জল আনতে যাস নে।' কৈলী প্রথমটা ভুরু কুঁচকাইয়া মিটকার দিকে তাকায়, প্রশ্ন করে "কেন, কি হয়েছে—গেলামই বা জলের ধারে একা"। তার পরে হাসিয়া আবার কহে—'তিলকী বুঝি রাত্রে খুব হাঁকডাক করেছে।' মিটকা বলে 'হ্যাঁ, যেদিন ওর মেজাজ ঠিক থাকে না সেদিন বেজায় হাঁকাহাঁকি করে, রাতে শুনতে পাস নি বুঝি?" কৈলী বলে—'শুনেছি',—তার পরে ঘরে ঢুকিয়া একটা মাটির কলসী লইয়া বাহিরে আসে, বলে 'তবে চল'। হাতে টাঙীখানা (১) লইয়া মিটকা আগে যায়, কলসী মাথায় বসাইয়া কৈলী পিছনে আসে।

যে সরু অরণ্যপথ ধরিয়া তাহারা নদীর দিকে যায় সেটা অরণ্যলোকের সরকারী পথ। এই পথ ধরিয়া রাত্রে এবং অনেক সময় দিনেও জঙ্গলের ছোট-বড় অধিবাসীরা সর্ব্বদাই যাতায়াত করে। চলিতে চলিতে মিটকা কহে, 'ঝুমরারা ঘরে ফিরে গেছে'। পথের ধূলাবালির উপর ছোট শিশুর পায়ের মত কতিপয় ছাপ নদীর দিকে চলিয়া গিয়াছে। সেটা লক্ষ্য করিয়া কৈলী জবাব দেয়, 'হুঁ, হয়তো নদীতেই দেখতে পাব।' ঝুমরারা হইতেছে ভালুক দম্পতি, ইহাদের প্রতিবেশী, নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে বড় বড় খানকয়েক পাথরের আড়ালে বহুকাল হইতে বসবাস করে। সরু পথটা বনের মধ্য দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া নদীতে গিয়া নামিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ, বালুকাময় শুষ্ক নদী, কেবল বাঁকের মুখে একটুখানি জল চিক চিক করিতেছে। নদীতে নামিয়া দুই জনে বালির উপর দিয়া সেই দিকে অগ্রসর হয়। ওপারে পাহাড়ের কোল হইতে বহুবিচিত্র গাছপালা নদীর মধ্যে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহারই একটা গাছে গোছা গোছা সাদা ফুল ফুটিতে দেখিয়া কৈলী আনন্দে চেঁচাইয়া বলে, 'দেখ্, কেমন ফুল ফুটে আছে নিয়ে আয়না আমার জন্যে তুলে।' মিটকা টাঙীগাছা কাঁধে ফেলিয়া ফুল তুলিতে নদীর ওপারে যায়, কৈলী যায় জলের দিকে। ফুল তুলিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে মিটকা দেখে কৈলী জলের ধারে কলসী নামাইয়া রাখিয়া দাঁড়াইয়া নিজের মনে হাসিতেছে। মিটকাকে আসিতে দেখিয়া কৈলীর হাসি বাড়িয়া যায়। মিটকা ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া ডাকিয়া বলে 'অত হাসছিস্ কেন, হয়েছে কি?' কৈলী জবাব দেয় না—হাসিতেই থাকে। এবার মিটকা চটিয়া যায়, বলে 'ভূতে পেয়েছে নাকি তোকে? কি হয়েছে বল না।' তবুও কৈলী কথা কয় না, হাসিও থামে না তার। মিটকা বলে 'দাঁড়া, এসে এক ঘা পিঠে কষিয়ে না দিলে তুই কথা কবি নে।' শুনিয়া কৈলীর খুশীর মাত্রা যেন আরও বাড়িয়া যায়। ছোট্ট আঁচলটুকু কোমরে জড়াইয়া এক পাক নাচিয়া লয়। ইতিমধ্যে মিটকা কাছে আসিয়া পড়ে, বলে 'কি হয়েছে?' কৈলী বাক্যব্যয় না করিয়া জলের ধারে ভিজা বালির দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয়। নীচের দিকে তাকাইয়া মুহূর্ত্তে মিটকা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠে, হাসিয়া বলে, 'ওরে ভাই তো, বড় মজা হয়েছে তো, আমি বলছি এক মাসের হয়েছে নিশ্চয়।' দুই জনে মিলিয়া পরমোৎসাহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখে ভিজা বালির উপরে বড় বড় বাঘের পায়ের ছাপের আশেপাশে ছোট ছোট পায়ের দাগ। মিটকা বলে 'আগে তো দেখি নি, আজকেই প্রথম সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে।' কৈলী মিটকার হাতখানা ধরিয়া বলে 'কত বড় হয়েছে বল না?' মিটকা একটু ভাবিয়া বলে 'মাসখানেকের হবে।' আর এক প্রতিবেশিনীর সন্তান

(১) ছোট কুড়ুল

হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এটা একটা উৎসব করিবার মত মস্তবড় খবর। বুঝিতে পারা গেল এই ব্যাঘ্রশিশুর আগমন তাহারা কিছুদিন হইতে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

জল লইয়া ফিরিতে ফিরিতে কৈলী বারে বারে বলিতে থাকে। আমি আজ বিকেলবেলা তিলকীর খোকাকে 'দেখতে আসব।' মিটকারও উৎসাহ তাহাতে কম নয়—বলে 'দেখতে তো আসবি, কিন্তু জল খেতে আজ নাও; আসতে পারে।' কৈলী আগ্রহের আধিক্যে কথাটা উড়াইয়া দেয়, বলে, 'আসবে নিশ্চয় আসবে, আমি বলছি আসবে।'

ঘরে আসিয়া কৈলী জলভরা কলসী রাখিয়া দিয়া ঘর ও আঙিনা ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করে, তারপরে পান্তাভাত সমেত একটা হাঁড়ি ও দুখানা মাটির শরা আনিয়া হাঁক দেয়—'কোথায়, জলপান খেয়ে যা।' মিটকা এক টুকরা ধনুকের বাঁশ পরীক্ষা করিতেছিল, হাঁক শুনিয়া আসিয়া খাইতে বসে। কিঞ্চিৎ নুন ও গোটাকয়েক কাঁচামরিচ সংযোগে স্বামিস্ত্রীতে হাসি-গল্পের মধ্য দিয়া জলযোগ করিতে থাকে। বেলা তখন অনেকখানি বাড়িয়াছে, শালের ঘন ডালপালার ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলো এখানে ওখানে বিচিত্র চকল নক্সা কাটিতে সুরু করিয়াছে, পলাশ গাছের ডালে অনেকগুলা শালিক একযোগে ডাকিতেছে, ঘন বনান্তরাল হইতে মাঝে মাঝে দুই-একটা তিতির বা ময়ূরের মত বড় পাখীর উড়িয়া যাওয়া-আসার আওয়াজ আসিতেছে।

কাঁধে এক বোঝা খেরা (২) ধরিবার জাল ও হাতে ধনুক বিজর (৩) লইয়া মিটকা শিকারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়, ঘরের দরজায় ঝাঁপ আঁটিয়া কৈলীও একটা ঝুড়ি লইয়া আসে। দুই জনে আবার বনপথ ধরিয়া চলে। এবার তাহারা পাহাড়ের বিপরীত দিকে অগ্রসর হয়, নিবিড় বনের মধ্য দিয়া সতর্ক ভাবে চলিতে থাকে। এখানে পথ বলিয়া কিছু নাই, তবে অরণ্যলোকের অচিহ্নিত অলিগলির সঙ্গে বাঘ, ভালুক, হায়না, হরিণের মতই ইহাদের পরিচয়। অনেকক্ষণ চলিবার পর বন হালকা হইয়া আসে, তার পরে সুরু হয় পলাশফুলের ছোট ছোট ঝোপঝাড়, উঁচু নীচু কাঁকরময় মাঠ আর শুকনো নালা। ইহারই মধ্যে এমন এক একটা নীচু জায়গা আছে যেখানে সামান্য বৃষ্টি হইলেই জল জমে, দারুণ গ্রীষ্মেও যেখানে দুই-চারিটা কচি সবুজ ঘাস চোখে পড়ে। এই রকম একটা নীচু জায়গায় আসিয়া দুই জনে দাঁড়ায়, তৃণময় স্থানটুকু ভাল করিয়া লক্ষ্য করে, তার পরে বাক্যব্যয় না করিয়া জাল পাতিতে সুরু করে। দুই প্রান্তে দুইটি মজবুত খুঁটা গাড়িয়া হাতদেড়েক চওড়া, লম্বা জালখানা টানাইয়া দেয়, জালের এক প্রান্তে কৈলী কোন একটা ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া বসে, মিটকা আশপাশের ঝোপের ভিতর ঢিল মারিয়া মুখ দিয়া এক রকম অদ্ভুত আওয়াজ করিতে থাকে। একটু বাদেই দুইটা বড় বড় খরগোস ছুটিয়া বাহির হয়, কিন্তু কি জানি কি ভাবিয়া সামনের দিকে না গিয়া পাশ কাটাইয়া দ্রুত সরিয়া পড়ে। কৈলী ত্রস্তপদে উঠিয়া দাঁড়ায়, মিটকা পলাতক খরগোসকে সম্বোধন করিয়া বাছা বাছা গালিবর্ষণ করে। জাল গুটাইয়া আবার আর এক জায়গায় যায়, আবার জাল পাতে, মিটকা পুনরায় ঝোঁপের ভিতর ঢিল মারিয়া খরগোস-বহিষ্করণ মন্ত্র আওড়ায়। এবারেও একজোড়া খরগোস বাহির হয়, বোকাটা ভয়ে থতমত খাইয়া ইতস্তত: করে, বুদ্ধিমানটা বেগে ছুটিয়া গিয়া একেবারে জালে জড়াইয়া পড়ে। কৈলী মিটকা দৌড়াইয়া গিয়া জালসমেত সেটাকে চাপিয়া ধরে, তার পরে অল্প সময়ের মধ্যেই বন্দীদশায় সেটি কৈলীর ঝুড়িতে স্থান পায়। এইবার তারা বাড়ীর দিকে ফেরে। পথে দুই একটা হরতকীগাছে হরতকী দেখিয়া কৈলী তাহা সংগ্রহ করিয়া লয়।

ঘরে ফিরিতে দুপুর পার হইয়া যায়। আঙিনার এক পাশে একটি চুলা, কৈলী তাহাতে ভাত চাপাইয়া দেয়, এক-ধারে বসিয়া মিটকা মৃদুস্বরে গান ধরে, মাঝে মাঝে কৈলীও তাহাতে যোগ দেয়। ক্লান্ত ঘুঘুর ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।

একটা বড় মহুয়াগাছের ছায়া আসিয়া আঙিনা জুড়িয়া পড়ে, সেই শীতল ছায়ায় বসিয়া দুই জনে নুন দিয়া মাড়ভাত খায়। ভোজনান্তে কিছু ভাত সমেত হাঁড়িটা ঘরে তুলিয়া রাখে, কেন না তাহাদের চুলায় আর আঁচ পড়িবে না, ঐ অবশিষ্ট ভাতেই বিয়ারী (৪) এবং সকলের জলপান হইবে।

ঘরের ভিতে ঠেস দিয়া বসিয়া মিটকা ধনুকের জন্য টাকো দিয়াএকখণ্ড বাঁশ চাঁচে, কৈলী বাঁশের মোটা কাঁকইয়া (৫) দিয়া তাহার কোঁকড়ানো চুল আঁচড়ায়। গাছের দীর্ঘ ছায়া দীর্ঘতর হয়, কৈলী বলে বেলা পড়ে এল। মিটকা কোন উত্তর করে না, বাঁশ চাঁচিতে থাকে। খানিক পরে কৈলী আবার বলে, "বেলা যে পড়ে এল—হাতের কাজ রেখে দে।" মিটকা বলে, "কেন, কি হবে?" কৈলী বলে,"কি আর হবে—জলের ধারে যেতে হবে।" মুখ তুলিয়া মিটকা কৈলীর দিকে তাকায়, তার পরে হাসিয়া বলে, "তোর কেন একটা ছেলে হয় না, বাঘ ভালুকের ছানা দেখে কি হবে?" শুনিয়া কৈলীর মুখখানা ভারী হইয়া ওঠে, তার পরে হঠাৎ বড় বড় চোখ দুইটি জলে ভরিয়া যায়। মিটকা কেমন অপ্রস্তুত হইয়া পড়ে, তার পরে হাতের বাঁশ ফেলিয়া দিয়া কৈলীকে কাছে টানিয়া লয়, বলে "এই দেখ, আবার কাঁদে। ছেলে হয় নি, হবে—তার জন্য আবার কান্না কেন?" কৈলী করুণ ভাবে. বলে, "আমি জানি, আমার ছেলে হয় না বলে তুই আর আমাকে

(২) খরগোস (৩) তীর

(৪) রাত্রের খাওয়া (৫) চিরুনি

কেমন ভালবাসিস যে।' মিটকা আদর করিয়া তাহার গালে ছোট একটি চড় বসাইয়া দেয়, বলে 'তুই এমন কথা বললি ?' এইবার কৈলী হাসিয়া ওঠে—দেখিয়া মিটকা খুশী হয়, বলে 'তবে চল, বেলা সত্যিই পড়ে এল।'

দুই জনে নদীর দিকে যায়, জলের কাছাকাছি নদীর উঁচু পাড়ের উপর গাছপালার আড়ালে উভয়ে চুপ করিয়া বসে। সূর্য্য অস্ত যাইতে তখনও দেরী আছে, কিন্তু নদী ও বনের অনেকাংশ ডুবিয়া পাহাড়ের নিবিড় ছায়া পড়িয়াছে। পাখীর ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। ক্রমে ছায়া নিবিড়তর হয়, একটা ঝিরঝিরে বাতাস বহিতে সুরু করে, বনের মধ্যে মাঝে মাঝে ময়ূর ডাকিতে থাকে। দুই-একটা বন-মুরগী নিঃশব্দে আসিয়া জল খায়। এমন সময় পাহাড়ের ঢালু গায়ে একটু যেন আওয়াজ হয়, যেন শুকনো পাতা খস্‌খস্ করিয়া উঠে, দুই জনে সেই দিকে উদ্‌গ্রীব হইয়া তাকাইয়া থাকে। একটু পরে পাহাড়ের গা বাহিয়া ধীরে ধীরে অতি সাবধানে কি যেন নামিয়া আসে। ক্রমে সেটা কাছে আসিয়া পড়ে, নদীর ধারের পাতলা জঙ্গলে এইবার তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়—বিরাটকায় এক বাঘিনী, সঙ্গে তাহার নধরকান্তি একটি বাচ্চা। কৈলী মিটকার গা টিপিয়া দেয়। বাঘিনী বাচ্চা সঙ্গে লইয়া সন্তর্পণে জলের ধারে নামিয়া আসে, সাবলীল ভঙ্গীতে মাথা উঁচু করিয়া চারি দিকে তাকায়, তাহার চিক্কণ দেহের উপর হলুদে-কালো ডোরাগুলি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠে। চঞ্চল বাচ্চাটা বালির উপর এদিক ওদিক লাফালাফি করে—কৈলী উৎসাহে মিটকার হাত চাপিয়া ধরে। বাঘিনী জল খায় আর ঘাড় ফিরাইয়া বাচ্চাটাকে দেখে, অন্তরালে বসিয়া কৈলী আর মিটকা সেই দৃশ্য উপভোগ করে।

হঠাৎ পাহাড়ের দিক হইতে একটা ঝুমুর ঝুমুর আওয়াজ পাওয়া যায়, মনে হয় কে একজন নূপুর পরিয়া বনের পথ ধরিয়া চলিয়া আসে। বাঘিনী চঞ্চল হইয়া উঠে, মিটকা কৈলীর কানে কানে বলে, 'ঝুমরারা আসছে।' অদূরে ভালুক-দম্পতিকে দেখিতে পাওয়া যায়, বাঘিনী মন্থর গতিতে নদী ছাড়িয়া পাড়ের জঙ্গলে গিয়া উঠে, বাচ্চাটি পিছনে পিছনে লাফাইয়া লাফাইয়া চলে, অবিলম্বে দুটিতে বনের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া যায়।

মিটকা উঠিয়া বলে, 'এইবার ঘরে চল—দেখলি তো তিলকীর খোকা।' কৈলীর আনন্দ আর ধরে না, মিটকার হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে বলে, 'আহা, কত বড়, কি সুন্দর। মিটকা ঘাড় নাড়িয়া সায় দেয় ; কৈলী হাসিতে হাসিতে বলে, 'কেমন লাফ দিয়ে দিয়ে পড়ছিল, ভারি দুষ্টু, ভারি দুষ্টু।' মিটকা বলে, 'ছোটবেলা সবাই দুষ্টু থাকে।' শুনিয়া কৈলী হাসে।

সন্ধ্যার অন্ধকার বনের মধ্যে গাঢ়তর হইয়া আসে, দুই জনে দ্রুতপদে চলিতে থাকে, সাড়া পাইয়া দুই একটা ছোট জানোয়ার পথ ছাড়িয়া পালায়।

মিটকা-কৈলীর সংসারে রাত্রে আলো জ্বলে না, তাই একেবারে অন্ধকার হইবার আগেই তাহারা রাত্রের খাওয়াটা শেষ করিয়া লয়। একটি সরাতে কিছু ভাতের মাড় লইয়া আঙিনার প্রান্তে আসিয়া কৈলী চেঁচাইয়া ডাকে 'আয় বুধনা আয়—আয়, আয়।' বনের অন্ধকার হইতে একটা ছায়ামূর্ত্তি আগাইয়া আসে—কৈলী আবার ডাকে 'আয়-আয়।' ছায়া-মূর্ত্তি কাছে আসিয়া দাঁড়ায়—ছয় ডালের শিংওয়ালা সে এক মস্তবড় হরিণ। কৈলী সরাটা আগাইয়া ধরে, হরিণ মাড়টুকু চাটিয়া খাইয়া ফেলে। কোন এক বুধবার জঙ্গলের মধ্যে মাতৃহারা এই হরিণটিকে শিশু অবস্থায় কুড়াইয়া পাইয়া কৈলী ইহাকে পালন করে এবং নাম দেয় 'বুধনা'। ইদানীং বুধনা বড় হইয়া জঙ্গল আশ্রয় করিলেও সন্ধ্যাবেলা কৈলীর হাত হইতে এই মাড়টুকু খাইবার জন্য প্রতিদিনই আসে। কৈলী তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আদর করে, সারাগায়ে হাত বুলাইয়া দেয়—বুধনা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। হঠাৎ শিংসমেত মাথাটায় ঝাঁকানি দিয়া বুধনা দুই পা পিছনে সরিয়া যায়—বার দুই বাতাস আঘ্রাণ করে, তারপরে বিদ্যুদ্বেগে লাফ মারিয়া মুহূর্ত্তে উধাও হইয়া যায়। কৈলী পিছনে ছুটিয়া আসিয়া বলে 'ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।' মিটকা পাশেই দাঁড়াইয়াছিল, বনের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলে 'ঐ দেখ।' কৈলী দেখে ঘনবনের অন্ধকারে বড় বড় দুইটি চোখ জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। বিরক্ত হইয়া বলে, 'ওটা আবার কে ?' মিটকা বলে 'লাকড়াটা (৬)।' একটা ঢিল তুলিয়া মিটকা সেই দিকে নিক্ষেপ করে, চোখ দুইটা অদৃশ্য হইয়া যায়।

রাত্রির নিবিড় অন্ধকার বনের মধ্যে নিবিড়তর হয়—কৈলী-মিটকার ঘরে ঝাঁপের দরজা পড়ে। বাহিরে অরণ্যলোক বিপৎসঙ্কুল হইয়া উঠে।

আজ রবিবার, তিন ক্রোশ দূরে একটা হাট বসে, কৈলী-মিটকা হাটে যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়। আশ-পাশের অরণ্যবাসী যত সাঁওতাল এই হাটটিতে সপ্তাহে এক দিন কেনা-বেচা করিতে আসে। কেহ একটা খরগোস, এক জোড়া তিতির, কেহ এক ঝুড়ি হরিতকী, বা বনজাত ফলমূল বেচিয়া প্রয়োজনীয় চাল ডাল মারুয়া মকাই (৭), কাপড়-চোপড় কিনিয়া লয়। এই সুযোগে পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও হইয়া যায়। কৈলী-মিটকা সপ্তাহের সংগৃহীত বেসাত—একটা খরগোস, এক ঝুড়ি হরিতকী লইয়া সকাল সকাল হাটের দিকে রওনা হয়। পথ চলিতে চলিতে বনফুল তুলিয়া কৈলী তাহার যত্নে বাঁধা খোপায় গোঁজে।

---

(৬) হায়না (৭) ভূট্টা

কেনা-বেচা গালগল্পের মাঝে মাঝে কৈলী মিটকাকে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিবার কথা মনে করাইয়া দেয়। মিটকা বলে, 'তোর মন পড়ে আছে কোথায় বল তো?' কৈলী সে প্রশ্নের জবাব দেয় না—কেবল হাসে। দেখা যায় ঘরে ফিরিবার তাগিদ একা কৈলীর নয়—দুপুরের মধ্যেই সওদা-পত্তর করিয়া দুই জনে ঘরের পথ ধরে।

অনেকটা বেলা থাকিতেই তাহারা ঘরে পৌঁছায়। জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিয়া আঙিনায় বসিয়া দুই জনে বিশ্রাম করে। বেলা ক্রমে পড়িয়া আসে, কৈলী উসখুস করে, তার পরে কলসীটা তুলিয়া লইয়া বলে 'জল নাই এক ফোঁটাও—জল আনতে হবে।' মিটকাও উঠিয়া পড়ে, বলে, 'সেই সঙ্গে তিলকীর খোকাটিকেও দেখতে হবে।'

গত দিনের মত আজকেও তাহারা জলের ধারে লুকাইয়া বসে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাচ্চাটাকে সঙ্গে লইয়া তিলকী পাহাড়ের ঢালু গা বাহিয়া নদীতে নামিয়া আসে, নিশ্চিন্ত মনে জল খায়, বাচ্চাটা বালির উপর ছুটাছুটি করে, এক একবার তাহাদের খুব কাছে আসিয়া পড়ে। কৈলী আর মনের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারে না, মিটকার কানে কানে বলে 'আমার ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে ওটাকে কোলে নি।' মিটকা কৈলীর হাতে খুব জোরে একটা চিমটি কাটে।

বাচ্চা লইয়া তিলকী চলিয়া গেলে কলসীতে জল ভরিয়া কৈলী আর মিটকা ঘরে ফেরে।

এমনি করিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তাহারা তিলকীর খোকাটিকে দেখিতে যায়—একদিন না দেখিলে কৈলীর মন খারাপ হয়।

অনেক রাত্তিরে কৈলী ঠেলিয়া মিটকাকে জাগাইয়া দেয়, বলে 'শুনছিস?' মিটকা উঠিয়া বসে, বলে 'কি?' কৈলী বলে 'ঐ শোন্।' মিটকা এবার শুনিতে পায় তিলকী ডাকিতেছে। কিন্তু এ ডাক তো তিলকীর স্বাভাবিক ডাক নয়! তিলকীর ডাকহাঁক দিনে রাত্রে তাহারা শুনিতে অভ্যস্ত; ডাক শুনিলেই তিলকীর মেজাজ তাহারা বুঝিতে পারে। মিটকা কান পাতিয়া বহুক্ষণ তিলকীর অস্বচ্ছ কণ্ঠের গর্জন শোনে, তারপরে কৈলীকে বলে, 'কাতরাচ্ছে—চোট খেয়েছে মনে হচ্ছে।' কৈলী চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করে, 'চোট খাবে কেমন করে?' মিটকা বলে 'না খেলে কি তিলকী অমন ভাবে কাতরায় রে। মাঝে মাঝে সাহেব লোক এদিকে শিকার খেলতে আসে—হয় তো কেউ কাড়ুয়া(৮) বেঁধেছিল, তিলকী লোভ সামলাতে পারে নি।' কৈলী ভীতকণ্ঠে বলে, 'গোলী?' মিটকা বলে 'বোধ হয়।'

বাকি রাতটুকু তাহারা আর ঘুমাইতে পারে না—জাগিয়া জাগিয়া তিলকীর অস্বচ্ছ কণ্ঠের গর্জন শোনে।

ভোর হইতেই তাহারা তাড়াতাড়ি নদীতে যায়, জলের ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখে, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই দেখিতে পায় না। মিটকা নদীর ওপারে যায়, যেখানে বহুদিন ধরিয়া বহু জানোয়ারের আসা-যাওয়ায় নদীর ঢালু পাড়ে একটা অস্পষ্ট পথের দাগ পড়িয়াছে সেখানে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়, কৈলীকে ইশারা করিয়া ডাকে। কৈলী ছুটিয়া গিয়া দেখে বালি ও কাঁকরের উপর জায়গায় জায়গায় রক্ত জমিয়া আছে। মিটকা ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'চোট খেয়েছে—আমি ওর ডাক শুনেই বুঝেছিলাম।'

সারাদিন আর তাহারা তিলকীর কোন সাড়া পায় না, সন্ধ্যাবেলায় জলের ধারে গিয়া দুই জনে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকে, কিন্তু তিলকীর দেখা পায় না। দুই জনের মনেই একটা সন্দেহ ঘনাইয়া আসে।

রাত্রেও তিলকীর কোন সাড়া আসে না—কৈলী বলে, 'কেমন যেন লাগছে আমার, কিছু কি বুঝতে পারছিস?' মিটকা বলে, 'হয় জেরা হেড়ে পালিয়ে গেছে, নয় তো...।' কৈলী বাধা দিয়া বলে, 'থাম—অমন কথা বলিস নে।' সকাল-বেলা মিটকা তার ধারালো টাঙ্গীখানা কাঁধে লয়, তারপরে কৈলীকে সঙ্গে লইয়া নদীর দিকে যায়। জলের ধারে খানিকটা খোঁজাখোঁজি করিয়াই বুঝিতে পারে রাত্রে তিলকী সেদিকে আসে নাই। পাহাড়ের ঢালু গা বাহিয়া তাহারা সাবধানে উপরে উঠিতে থাকে, মাঝে মাঝে থামিয়া কান পাতিয়া শোনে। এমনি ভাবে খানিকটা পথ গেলে তারা দেখিতে পায় প্রকাণ্ড একখানা পাথর পাহাড়ের গায়ে আড় হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার নীচেটা খোলা। সেইখানে তাহারা নিঃশব্দে দাঁড়ায়, কিছু একটা শুনিবে বলিয়া আশা করে, কিন্তু কিছুই শুনিতে পায় না। মিটকা একখণ্ড পাথর তুলিয়া সেই দিকে ফেলে, তবুও কোন সাড়া আসে না। তাহারা আবার আর একটু আগাইয়া যায়, আবার একটা ঢিল মারে, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় না। এইবার তাহারা একে-বারে পাথরের গায়ে গায়ে আসিয়া দাঁড়ায়, মিটকা হেঁট হইয়া উঁকি মারিয়া দেখে, তারপরে কৈলীকে বলে 'যা ভেবেছিলাম তাই—চেয়ে দেখ।' কৈলী রুদ্ধনিঃশ্বাসে হেঁট হইয়া দেখে গর্তের এখানে-ওখানে রক্ত আর তিলকী সামনের দুই থাবার মধ্যে তার প্রকাণ্ড মাথাটা গুঁজিয়া নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে। দুই জনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে, হঠাৎ কৈলী চেঁচাইয়া উঠে 'ওর বাচ্চা, ওর বাচ্চাটা কোথায়?' সাড়া পাইয়া তিলকীর বিরাট দেহটার অন্তরাল হইতে কি যেন গোঙাইয়া উঠে—কৈলী ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকিতে থাকে 'আয়—আয়'। ডাক শুনিয়া একটি নধরকান্তি ব্যাঘ্রশিশু লাফাইয়া আসিয়া তাহাদের সামনে পড়ে, কৈলী ছোঁ মারিয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরে। মিটকার মুখে ধীরে ধীরে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠে।

(৮) মহিষের বাচ্চা

ঝাড়গ্রাম কৃষি মহাবিদ্যালয়

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

ঝাড়গ্রামের রাজা শ্রীনরসিংহ মল্ল দেব মহোদয়ের বদান্যতায় এবং তাঁহার প্রধান সচিব শ্রীদেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উৎসাহে ও আগ্রহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুসারে ঝাড়গ্রামে যে কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইবে তাহার উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে "কৃষি-শিক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধে করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, শিক্ষা-প্রণালী, কর্ম্মধারা, পরিচালনা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

ঝাড়গ্রামের রাজপ্রাসাদ

ঝাড়গ্রাম কৃষি মহাবিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে ভাষণ দিয়াছেন তাহার মধ্যে ইহার শিক্ষা-প্রণালী, পরিচালনা প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষণের এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, "কৃষি-পদ্ধতির কিরূপ সংস্কারসাধন বাঞ্ছনীয়, এতটুকু সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে এতগুলি মানুষের অন্ন-সংস্থানের সহজ উপায় কি, ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার শিল্প-বাণিজ্যের স্নায়ুকেন্দ্র এই কলিকাতা মহানগরীর রক্ষণ ও পরিচালনার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক—এইরূপ বহুতর সমস্যার সম্মুখীন হইয়া আমরা নিয়ত বিভ্রান্ত হইতেছি ; কিন্তু পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। বস্তুতঃ প্রদেশে কৃষি-বিদ্যার যথোচিত অনুশীলনের দিকে দৃষ্টি না দিলে ঐ সকল সমস্যার সমাধান অসম্ভব।" তাঁহার ভাষণের আর এক স্থানে আছে : "খাদ্য সম্বন্ধে দেশকে স্বতঃসম্পূর্ণ করিবার জন্য দেশকে প্রস্তুত করিতে হইবে ; দেশবাসীর অন্তরে প্রেরণা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। কেবলমাত্র কৃষি-প্রদর্শনী বিষয়ক প্রচার-কার্য্যের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইবার নয়। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উন্নততর গবেষণার দ্বারাও বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাইবে না।" সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, কৃষি মহাবিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য হইতেছে :

১। দেশে কৃষি-বিদ্যার যথোচিত অনুশীলনে সাহায্য করা।

২। কৃষির প্রতি দেশবাসীর উৎসাহ ও উদ্যম বৃদ্ধি করা।

৩। উন্নত কৃষিপ্রণালী প্রচলনের দ্বারা অধিকতর খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করা।

৪। উন্নততর গবেষণার ফল ব্যাপকভাবে কৃষির উৎকর্ষবিধানে প্রয়োগ করা।

অর্থাৎ, কৃষি মহাবিদ্যালয়সমূহে এমন কৃষিশিক্ষার প্রবর্ত্তন করা উচিত যাহার ফলে কার্য্যকরীভাবে কৃষিশিক্ষার ব্যাপক প্রচার হইবে, কৃষিশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণ কৃষিকে প্রধান বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিবে এবং উন্নত কৃষিপ্রণালী অবলম্বন করিয়া দেশের কৃষির উন্নতিসাধনে বিশেষতঃ অধিকতর খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করিবে।

ঝাড়গ্রাম কৃষি মহাবিদ্যালয়ের পরিচালনা, কর্ম্মধারা, শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে উপাধ্যক্ষ মহাশয় বলিয়াছেন, "কৃষিশিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে উন্নীত করিতে হইবে। কলা, বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎসা এবং ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে অনুমোদিত অন্যান্য ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের ন্যায় প্রস্তাবিত কলেজটিও একটি অনুমোদিত ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের মর্য্যাদা লাভ করিবে। যে সকল ছাত্র ভবিষ্যতে কৃষিবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়া উপাধি পাইতে চায় তাহাদের জন্য এই কলেজে কৃষি-বিষয়ক শিক্ষাদানের যথোচিত ব্যবস্থা করা হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর (Post-graduate) শিক্ষা ও গবেষণার সার্থকতার পথে ঝাড়গ্রাম কৃষি কলেজকে একটি অত্যাবশ্যক সোপান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।"

আমাদের দেশের কৃষিশিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে উন্নীত করা নূতন প্রস্তাব বা কল্পনা নহে। অবিভক্ত বাংলার ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুসারে একটি কৃষি মহাবিদ্যালয় পরিচালিত হইত। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মতন্ত্র অনুসারে ও পরিচালনায় কৃষি মহাবিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু এই সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মতন্ত্র অনুসারে পরিচালিত কৃষি মহাবিদ্যালয়গুলি উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ সাধনে কতদূর সফলকাম হইয়াছে।

উপাধ্যক্ষ মহাশয়' বলিয়াছেন, "যুক্তপ্রদেশে কৃষিশিক্ষা বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছে। সেখানে পাঁচটি প্রথম শ্রেণীর কৃষি-কলেজে ডিগ্রি কোর্স পর্য্যন্ত কৃষি-বিষয়ক শিক্ষাদান করা হইতেছে। এই সমস্ত কলেজ হইতে যে সকল সুযোগ্য স্নাতক (graduates) বাহির হইতেছেন তাঁহাদের সাহায্যে যুক্তপ্রদেশের কৃষি বিভাগ আধুনিক কৃষিশালা এবং গো-শালাসমূহ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্যোগে কৃষিজাত দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় সহজসাধ্য করিবার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া তাঁহারা ফলমূল সংরক্ষণ ও অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার দিকেও মনোযোগী হইয়াছেন।" এই উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় না প্রধানতঃ কি কারণে যুক্তপ্রদেশে কৃষিশিক্ষা বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। মনে হয়, যুক্তপ্রদেশের কৃষি-বিভাগের সম্প্রসারণ হেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও উপাধিপ্রাপ্ত যুবকগণের চাকুরীর অভাব হইতেছে না। যাহা হউক, কৃষি-উপাধিপ্রাপ্ত যুবকগণের মধ্যে শতকরা কত জন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন, শতকরা কত জন আসল কৃষিকে (agriculture proper) প্রধান বৃত্তি বা পেশারূপে গ্রহণ করিয়া উন্নততর প্রণালীতে কত পরিমাণ জমিতে কৃষি-কার্য্যের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং শতকরা কত জন কৃষির সহিত সম্পর্কিত কোন-না-কোন কাজ (যথা ফলোৎপাদন, গো-পালন, মুরগী-পালন, ইত্যাদি) প্রধান বা আনুষঙ্গিক বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইত্যাদি তথ্য সঠিকভাবে জানিতে পারিলে প্রধানতঃ কি কি কারণে যুক্তপ্রদেশে কৃষি-শিক্ষার এরূপ প্রসার হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে এবং তাহা হইতে যুক্তপ্রদেশের পাঁচটি কৃষি কলেজের দ্বারা কৃষিশিক্ষা-দানের ও কৃষি-গবেষণার আসল উদ্দেশ্য কি পরিমাণ সাধিত হইয়াছে তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এ সম্বন্ধে আমার নিজের সঠিক জ্ঞান নাই। তবে সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের কৃষি বিভাগের জনৈক অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে জানিতে পারিয়াছি যে, তথাকার কৃষি কলেজসমূহ হইতে উত্তীর্ণ ও উপাধি-প্রাপ্ত ছাত্রগণের অধিকাংশই সরকারী ও বেসরকারী নানা প্রতিষ্ঠানের নানা বিভাগে চাকুরীতে স্থান পাইতেছেন। অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র কৃষিবিষয়ক কোন পেশাকে প্রধান বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। তবে ফলোৎপাদনকে কেহ কেহ আনুষঙ্গিক পেশারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে ইহাও শুনিয়াছি যে, অন্যান্য বিষয়ের (কলা-বিজ্ঞান প্রভৃতি) স্নাতকগণের ন্যায় কৃষি স্নাতকগণের মধ্যেও অনেকে 'বেকার' অবস্থায় আছেন। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, প্রধানতঃ চাকুরী পাইবার সুবিধা হয় বলিয়াই যুক্তপ্রদেশের পাঁচটি কৃষি-কলেজে এখন পর্য্যন্ত ছাত্রের অভাব দেখা যায় নাই এবং চাকুরী পাইবার সুবিধা কমিয়া গেলেই ছাত্র-সংখ্যাও হ্রাসপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে।
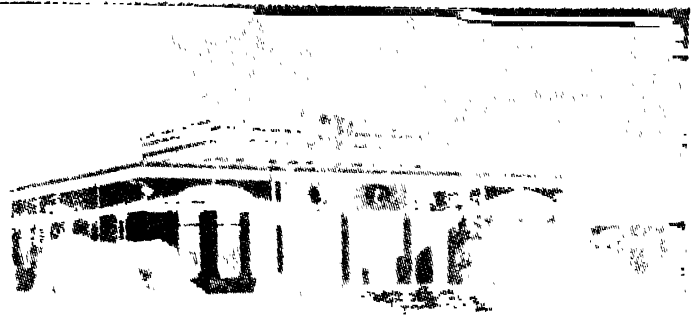
কাড়গ্রামের রাজার অতিথিশালা

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনিও কৃষি-উপাধিপ্রাপ্ত যুবকদের চাকুরীলাভের ও অন্যান্য পেশা অবলম্বনের সুবিধা-দানের পক্ষপাতী। তিনি বলিয়াছেন, "কৃষি-বিভাগ স্নাতকগণও যাহাতে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সমান মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে।" এই মর্য্যাদার অর্থ এই যে, একজন বি-এ বা বি-এস্-সি বা বি-কম্ যে সকল সরকারী বা বেসরকারী চাকুরীর জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হন একজন কৃষি-স্নাতকও সেই সকল চাকুরী পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইবেন এবং একজন বি-এ বা বি-এস্‌সি বা বি-কম্ যে সকল বিষয় অধ্যয়ন করিবার সুবিধা পান একজন কৃষি-স্নাতককেও সেই সকল বিষয় অধ্যয়ন করিবার সুবিধা দিতে হইবে। যদি এই সকল সুবিধা দেওয়া

বাম দিক হইতে—শ্রীদেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, ডাঃ পবিত্রকুমার সেন, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র, রাজা নরসিংহ মল্ল দেব, ডাঃ বিনোদবিহারী দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

হয় তাহা হইলে একজন কৃষি-স্নাতক আইন অধ্যয়ন করিয়া আইন ব্যবসায়ী হইতে পারেন ; অপর একজন চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসক হইতে পারেন। অর্থাৎ ইহার দরুন সব রকম পেশার দ্বার একজন কৃষি-স্নাতকের নিকট উন্মুক্ত থাকিবে। ফলে কৃষি-স্নাতকগণের মর্য্যাদা অবশ্যই বাড়িবে এবং কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক কলেজগুলির ন্যায় কৃষি-কলেজগুলিও চালু অবস্থায় থাকিবে, কিন্তু ইহার দ্বারা কৃষি মহাবিদ্যালয়ের আসল উদ্দেশ্য সাধিত হইবে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

আসাম কৃষি-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর রায় বাহাদুর যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কাঁথিগ্রাম কৃষি মহাবিদ্যালয় সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট যে মন্তব্য পাঠাইয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন,—

"There is absolutely no reason why agricultural graduates should not be employed in any capacity where other graduates are employed. . . . If a Science graduate proves an efficient administrator there is no reason why an agricultural graduate should not prove equally so, if not more. . . . Provided the students are drawn from rural environments there will be few agricultural graduates who will not have a few bighas of land where he could grow some fruits or vegetables or maintain a cow to the advantage of his own family and perhaps that of some of his neighbours. His hard earned knowledge will not be all thrown away."

অন্যান্য বিষয়ের স্নাতকগণের ন্যায় কৃষি-স্নাতকগণ সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নানা বিভাগে চাকুরিতে নিযুক্ত হইবার সুবিধা লাভ করুন বা তাঁহারা শাসন-বিভাগে কর্ম্মে নিযুক্ত হউন—সে বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার কোন মতভেদ নাই, কিন্তু ইহার ফলে কৃষি মহাবিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইবে সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাই হোক্ তাঁহার ইচ্ছা কবে কার্য্যে পরিণত হইবে তাহা বলা খুবই কঠিন। কারণ ইংরেজ আমলের ন্যায় এখনও অন্য বিভাগের কথা দূরে থাকুক, শিক্ষাপ্রাপ্ত বা কৃষি-উপাধিযুক্ত ব্যক্তিগণের উপর কৃষি বিভাগের পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয় নাই। কৃষি বিভাগের সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি, এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারি প্রভৃতির পদে এখনও আই-সি-এস ; বি-সি-এস প্রভৃতি নিযুক্ত আছেন। পশ্চিমবঙ্গ এ বিষয়ে ইংরেজ শাসনের নীতিকেও হার মানাইয়াছে। ইংরেজ আমলে কৃষি-শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই কৃষি-বিভাগের সর্ব্বাধিনায়কের (Director) পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর হইতেছেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ভবিষ্যতে এইরূপ বিসদৃশ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় মনে করেন যে, কৃষি-শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণ অন্য কাজে বা চাকুরিতে নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহারা গ্রামের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবেন না, গ্রামের ৩।৪ বিঘা জমিতে ফলমূল বা শাকসব্জী উৎপাদন করিবেন কিংবা ২১টা গরু রাখিবেন, সুতরাং তাঁহাদের কষ্টার্জ্জিত কৃষি-বিষয়ক জ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হইবে না। এ ক্ষেত্রে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রকৃত তথ্যকে একেবারে উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। অতীতে এ দেশের ও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভূত ও অন্তর্ভুক্ত কৃষি-শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু ব্যক্তি কৃষি ও অন্যান্য বিভাগে ছোট বড় অনেক পদে কাজ করিয়াছেন। অন্যান্য বিভাগে যাঁহারা কাজ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলাম। কৃষি বিভাগে যাঁহারা দীর্ঘকাল কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদের কথাই বলিব। তাঁহারা কাজে নিযুক্ত থাকাকালীন দেশের কৃষির উন্নতিমূলক অনেক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, শতমুখে কৃষির জয়গান গাহিয়াছেন, দেশের যুবক-সম্প্রদায়কে কৃষিকার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন এবং আরও অনেক কিছু করিয়াছেন। কিন্তু এমন কোন দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না যে, তাঁহাদের মধ্যে একজনও চাকরিতে নিযুক্ত থাকাকালীন, কিংবা অবসর গ্রহণের

পর নিজের ঝুঁকিতে উন্নত কৃষি-বিষয়ক কোন প্রকার উল্লেখ-যোগ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। যাঁহারা উক্তপদে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা অবসর গ্রহণের পর শহরেই বাস করিতেছেন। তাঁহাদের সহিত পল্লীগ্রামের বা কৃষির কোন সম্পর্ক নাই। যাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া পল্লীগ্রামে থাকিতে হইতেছে তাঁহারা অত সকলের ন্যায় কিছু কিছু শাকসজী, ফলমূল উৎপাদন করিয়া থাকেন। অনেকের আবার এ সব বালাই নাই।

এই প্রসঙ্গে অতি দুঃখের সহিত ইহাও উল্লেখ করিতেছি যে, আমাদের দেশে ছোট বড় যে কয়েকটি কৃষি-প্রতিষ্ঠান, নার্শারি প্রভৃতি আছে তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ম্মিগণ তেমন কোন বিখ্যাত কৃষি কলেজে শিক্ষা পান নাই। তাঁহারা হাতে-কলমে কৃষি-শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। স্থানীয় কৃষকেরাই তাঁহাদের শিক্ষাদাতা।

সুতরাং ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে, আমাদের এতদিনকার কৃষিশিক্ষা-পদ্ধতি (বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত বা বহির্ভূত) আমাদের মনে কৃষির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মাইতে পারে নাই। সেই শিক্ষা আমা-দিগকে চাকরির উপযোগী করিয়াছে, কৃষিকার্য্য গ্রহণের উপযোগী করে নাই। এখন আর ভাবালুতার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া বা বিদেশী কৃষিশিক্ষার 'কুলীনত্বের' মোহে আচ্ছন্ন থাকিয়া বিদেশী কৃষিশিক্ষার ছাঁচে কোন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। যাঁহারা কৃষি-কলেজে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা বা গবেষণা করিয়া দীর্ঘদিন কৃষিবিভাগে কৃষির উন্নতিমূলক নানাবিধ কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারাই তাঁহাদের স্ব স্ব অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারিবেন কি কি কারণে বা শিক্ষার কি কি গলদ ও ত্রুটির জন্য কৃষির প্রতি তাঁহাদের স্থায়ী ও আন্তরিক অনুরাগ জন্মায় নাই, কৃষিকে তাঁহারা অর্থকরী পেশারূপে গণ্য করিতে পারেন নাই। অভিজ্ঞতার মূল্য খুবই বেশী এবং নিঃসঙ্কোচে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত—তাহা বর্ত্তমান কৃষিশিক্ষা-পদ্ধতির বা পরিকল্পনার যতই বিরোধী হউক না কেন। আশা করি কৃষিশিক্ষা ও গবেষণার নূতন পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবার পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সকল ব্যক্তির মতামত সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবেন।

অনেক কৃষি-বিশেষজ্ঞ এই মত পোষণ করেন যে, ব্যাপক কৃষি কার্য্যের (large-scale farming) প্রবর্ত্তন ব্যতীত কৃষি লাভজনক হইতে পারে না। এইরূপ কৃষি-কার্য্যের জন্য বিস্তীর্ণ জমি, প্রচুর মূলধন প্রভৃতির দরকার এবং এইরূপ কৃষিকার্য্য পরিচালনার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকাও দরকার। এইরূপ বৃহদায়তন কৃষিক্ষেত্র যৌথ বা সমবায় প্রথায় স্থাপন করাই বাঞ্ছনীয়। আমাদের মনে হয় আমাদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত এইরূপ কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করা যাহাতে আমাদের দেশের যুবকেরা অল্প জমিতে, অল্প মূলধনে কৃষি-বিষয়ক কোন কাজ পেশারূপে গ্রহণ করিয়া মোটামুটি সচ্ছল অবস্থায় দিনাতিপাত করিতে পারেন। প্রধানতঃ ফলোৎপাদন, শাকসজী উৎপাদন, কৃষির আনুষঙ্গিক ছাগল, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পালন, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত প্রভৃতি পেশা আমাদের দেশের যুবকেরা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন। ইহার সহিত উন্নত প্রণালীতে মৎস্য-চাষের শিক্ষা দেওয়াও বাঞ্ছনীয়। এই সকল পেশা যে লাভজনক শিক্ষাকালীন অবস্থায় তাহা ছাত্রদের হাতেকলমে দেখান আবশ্যক।

সুতরাং ইহা বিশেষ বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত যে, ঝাড়গ্রাম কৃষি মহাবিদ্যালয়ে কি উদ্দেশ্যে কি কি বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইবে। উদ্দেশ্য ও বিষয় স্থির করিয়াই তদুপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং উপযুক্ত শিক্ষক নির্ব্বাচন করিতে হইবে। ঝাড়গ্রাম রাজার কর্ম্মসচিব শ্রীদেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত এ সম্বন্ধে যাহা আলোচনা হইয়াছে তাহাতে জানিতে পারিয়াছি যে, দেশের যুবকগণকে কৃষি-কার্য্যে উৎসাহিত ও ব্রতী করিবার উপযোগী কৃষিশিক্ষা দানই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, চাকুরির উপযোগী পুঁথিগত বিদ্যাদান করা তাঁহাদের অভিপ্রায় নহে। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইলে ঝাড়গ্রাম রাজার নামে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজ দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে।

প্রবাসী বাঙালীর কয়েকটি সমস্যা

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু

(১)

"প্রবাসী বাঙালী" সংজ্ঞাটা দুই অর্থে ব্যবহার করতে হয়। প্রথম অর্থে "প্রবাসী বাঙালী" বলতে বুঝি যে সকল বাঙালী কার্য্যোপলক্ষে, বিশেষতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরি নিয়ে, বাংলার বাইরে বাস করছেন। তাঁরা তাঁদের কার্য্যকাল ফুরিয়ে গেলে বাংলায় ফিরে যাবেন। তাঁদের যে সমস্যা তাঁদের সহকর্মী অন্য প্রদেশীয় লোকেদেরও তাই—ইংরেজের ভারত-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাবিভ্রাট। এতকাল ইংরেজী সর্ব্বভারতের এবং ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের সরকারী ও উচ্চশিক্ষার ভাষা ছিল, তার সাহায্যে তাঁদের ছেলেরা নিজেদের প্রদেশের বাইরে যে শিক্ষা পেত সে শিক্ষা দ্বারা স্বপ্রদেশেও সরকারী এবং বে-সরকারী চাকরি করবার যোগ্যতা অর্জন করত। কিন্তু বর্ত্তমানে ইংরেজী উঠে গিয়ে প্রাদেশিক ভাষাগুলি সরকারী ভাষা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রদেশের বাইরে থেকে প্রাদেশিক ভাষায় উপযুক্ত শিক্ষালাভের সুযোগ খুব কম। ফলে একটি সম্পূর্ণ নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি নিয়ে দীর্ঘকাল সুদূর প্রবাসে বাস করবেন তাঁদের ছেলেদের হয়ত স্থায়ী ভাবে প্রবাসী হয়েই জীবনযাপন করতে হবে। কারণ স্বপ্রদেশের ভাষার সঙ্গে যথাযোগ্য সংযোগের অভাবে তারা তাদের অভিভাবকদের কার্য্যবিরতি ও স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তনের পর নিজেদের মাতৃভূমিতে সহজে স্থান করে নিতে পারবে না। দু'চার জন বড় চাকুরে হয়ত নিজ প্রদেশে বোর্ডিং স্কুলে বা অন্যত্র কোনও ব্যবস্থা করে ছেলেদের মাতৃভাষার শিক্ষা দিলেন, কিন্তু সাধারণের পক্ষে তা সম্ভব হবে না।

বাঙালীরা যদি এ সমস্যার সমাধান না করেন তবে তাঁদের ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। হয়ত সে অনিশ্চয়তার কথা ভেবে ভবিষ্যতে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির প্রতি আকৃষ্ট হবেন না, নয়ত কালস্রোতের উপর নিজেদের এবং বংশধরদের ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন। যদি এই দুই পথ ছেড়ে একটা তৃতীয় পন্থা খুঁজে নিতে হয় এবং এ সমস্যার একটা সমাধান করতে হয়, তবে বাঙালীদের সমবেত ভাবে এমন কোন ব্যবস্থা করতে হবে যার ফলে বাংলার বাইরে কয়েকটি উচ্চ স্তরের বাংলা শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। সে কেন্দ্রগুলিতে ভারতের রাষ্ট্রভাষার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষা পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে, যেন সেখানকার ছাত্রেরা কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাংলা-সরকার উভয়ের কাজের জন্যই যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

অন্য প্রদেশের লোকেদেরও এভাবে ভাষা-সমস্যার সমাধান করতে হবে। এতে যেটুকু প্রাদেশিকতা আছে তা প্রদেশ এবং কেন্দ্র উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক। কারণ প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন কত লোকের ব্যবস্থা কেন্দ্র করতে পারবে? যেখানে কেন্দ্রের সরকারী ভাষা এবং প্রদেশের সরকারী ভাষা বিভিন্ন, সেখানে এরূপ ব্যবস্থা ছাড়া গত্যন্তর কি?

(২)

এবার অন্য শ্রেণীর "প্রবাসী বাঙালীর" কথা বিবেচনা করা যাক। এখানে আমরা সেই শ্রেণীর প্রবাসী বাঙালীদের কথা বলছি যাঁরা বাংলার বাইরে চলে এসেছেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে রয়ে গেছেন। তাঁদের ঠিক "প্রবাসী" বলা চলে না, কেননা তাঁরা অন্য প্রদেশে স্থায়ী বাসিন্দা (ডোমিসাইল্ড) হয়ে গেছেন, রাষ্ট্রীয় ভাবে সে প্রদেশবাসীর সমস্ত নাগরিক অধিকারই তাঁদের প্রাপ্য। কিন্তু ভারতবর্ষে দেখা যায়, এক প্রদেশের লোক অপর প্রদেশে রাষ্ট্রীয় ভাবে ডোমিসাইল্ড হলেও তাঁদের সামাজিক ভাবে মিলিত হবার পথে কতকগুলি বাধা থেকে যায়। এতকাল দেখা গিয়েছে ভাষার বৈষম্য ও কতকটা কৃষ্টিগত পার্থক্যের দরুন প্রবাসী বাঙালীরা সর্ব্বত্র স্থানীয় সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন নি। বর্ত্তমান যুগে প্রাদেশিক ভাষা অবশ্য-শিক্ষণীয় হওয়াতে ভাষার বিভিন্নতার দরুন যে বৈষম্যের সৃষ্টি হ'ত তার অবসান হয়েছে এবং সামাজিক মেলামেশার দিক দিয়ে একটা বড় অন্তরায় দূর হয়েছে। কিন্তু অন্যবিধ অন্তরায়ের কথা ভুললে চলবে না। সামাজিক সম্বন্ধের মধ্যে যেটা সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সেটা হ'ল বৈবাহিক সম্বন্ধ। কিন্তু ভারতের হিন্দুদের মধ্যে বিবাহের ব্যাপারটা জাত পর্য্যায় অনুযায়ী হয়ে থাকে। এ পর্য্যন্ত তাতে অতি সামান্যই ব্যত্যয় দেখা গিয়েছে। আমেরিকায় দেখা যায়, এক ষ্টেটের লোক অপর ষ্টেটে গিয়ে বসবাস করছে এবং পরিপূর্ণ ভাবে সে ষ্টেটেরই বাসিন্দা হয়ে পড়ছে। কিন্তু ভারতবর্ষে তা হয় না। ভারতের এক প্রদেশের লোক অপর প্রদেশে গিয়ে যত দীর্ঘকালই বাস করুন, বিবাহসংক্রান্ত ব্যাপারে নিজের নিজের স্থানে ফিরে যেতে হয়। যে মাড়ওয়ারী কয়েক পুরুষ যাবৎ বাংলায় বাস করছেন, ছেলেমেয়ের বিবাহের ব্যাপারে দেখা যায় তাঁকে আবার মাড়োয়ারের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হয়। সে রকম বাঙালী যদিও অন্য প্রদেশে পুরুষানুক্রমে বাস করেন, তথাপি বিবাহ ব্যাপারে বাংলাদেশ থেকে বৌ আনতে হয় এবং বাংলাদেশে মেয়ের

বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করতে হয়। এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে বিবাহ খুব সামান্যই হয়েছে। শতকরা হার ধরলে সে সংখ্যা অতি অকিঞ্চিৎকর মনে হবে। সুতরাং বিবাহ ব্যাপারে যে ব্যবস্থা চলে এসেছে, তাতে কোনো গুরুতর পরিবর্তন সম্ভব হতে পারবে বলে মনে হয় না।

অবাঙালীর সঙ্গে বাঙালীর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন তো দূরের কথা, প্রবাসী বাঙালীরা নিজেদের মধ্যেও জাতিপর্য্যায়-গত ভেদবুদ্ধি দূর করতে পারেন নি। তাঁদের প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষিত। শুধু তাই নয়, সকলেই উচ্চবর্ণের ভদ্রলোক শ্রেণীর। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক গভীর সাম্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাঁরা বর্ণভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেন নি। যেমন—বাংলা থেকে হাজার মাইল দূরে কোন শহরে মুখুজ্জে ও মিত্র পরিবার বাস করছে, বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের আর্থিক বা রাজনৈতিক সম্বন্ধ নেই। তাদের ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্ম, কৃষ্টি—সব এক। কিন্তু বিবাহের বেলা দেখা যাবে, মুখুজ্জের উপযুক্ত পুত্রের সঙ্গে মিত্রের যোগ্য কন্যার বিবাহ হতে পারছে না; মুখুজ্জে বধূ আনছেন সুদূর, বাংলার সমাজের চাটুজ্জে বংশ থেকে, আর মিত্র মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন যে বাংলা তার নিকট প্রায় অপরিচিত সেখানকার গুহ বংশে। এর ফল এই দাঁড়াচ্ছে যে, প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে বংশানুক্রমে যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল, বিবাহ-ব্যাপারে তা সব ভেঙেচুরে যাচ্ছে। যেমন, মেয়েদের স্বাধীনতা। যে মেয়ে লক্ষ্ণৌ বা দিল্লী অথবা পুনাতে মুক্ত ভাবে চলাফেরা করে অভ্যস্ত হ'ল সে বিবাহের ফলে সুদূর বাংলায় ফিরে হয়ত এমন সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পড়ল যেখানে পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি তার মনের উপর বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে।

এক্ষেত্রে সংস্কারবর্জিত হয়ে পিতামাতার পক্ষে প্রবাসে ভিন্নজাতির উপযুক্ত বরের হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করাই সমীচীন।

অনেকে বলে থাকেন বাঙালীর মধ্যে জাতিভেদ উঠে যাচ্ছে। বিবাহ-ব্যাপারে সেটা কত দূর সত্য সে বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। আমরা যা দেখছি, তাতে মনে হয়, জাতি-ভেদ লোপ পাওয়া দূরে থাক্, কোন কোন ক্ষেত্রে তা বেড়ে যাচ্ছে। যেমন পূর্ববঙ্গের কতকগুলি জেলায় বৈদ্য কায়স্থে বিনা বাধায় বৈবাহিক সম্বন্ধ হয়ে থাকে; কিন্তু তাঁরা যখন নিজ স্থান ছেড়ে বাইরে আসেন তখন দেখা যায় নিজের জাতের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভেতরেই আবদ্ধ হয়ে পড়েন। ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যে বিশেষ করে উচ্চবর্ণের বাঙালীদের মধ্যে অসবর্ণ বৈবাহিক সম্বন্ধ হ'ত, কিন্তু এখন তাও খুব সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

এই বিবাহ-ব্যাপার নিয়ে বাঙালীর বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করতে না পারলে ভবিষ্যতে প্রবাসী বাঙালীর বিবাহিত জীবনের সমস্যা অধিকতর জটিল হয়ে উঠবে এবং তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কারণ ঘটবে। যে সকল প্রবাসী বাঙালীর মেয়েদের বাংলাদেশে বিয়ে দেওয়া হবে তারা যদি বাংলা মোটেই না শেখে অথবা বংলাভাষা শেখে, তবে বাংলার বধূ হবার পরিপূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না। সে রকম প্রবাসী বাঙালী যদি পুত্রবধূ বাংলাদেশ থেকে আনেন অথচ তিনি কিংবা তাঁর পুত্রকন্যারা বাংলা ভাষা ও কৃষ্টির সঙ্গে সুপরিচিত না থাকেন, তবে তাঁর ঘরে মেয়ে দেওয়ায় নানারকম জটিলতার উদ্ভব হবে এবং এরূপ স্থলে বিবাহ দেওয়া বাংলার বাঙালীরা ভবিষ্যতে অবাঞ্ছনীয় মনে করবেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ক্ষেত্রে মেয়েকে বধূ হয়ে বাংলা-দেশে যেতে হবে এবং পুত্রবধূ বাংলাদেশ থেকে আসবে, সে-ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ও কৃষ্টির সহিত যোগ রক্ষা একান্ত আবশ্যক। সে ভাষা ও কৃষ্টি প্রচারের জন্য উপযুক্ত শিক্ষায়তন চাই।

(৩)

বাঙালীকে নূতন করে উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে আন্দামানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমাজ ও ধর্মগত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলতে চাই। যে পর্যন্ত হিন্দুরা জাতিভেদ ত্যাগ না করছে, সে পর্য্যন্ত যদি নিজেদের সমাজের বাইরে এমন কোনো স্থানে তাদের বসানো হয় যেখানে তাদের স্বজাতি, স্বভাষা ও জাতিগত কৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে, তবে তাদের মধ্যে বহু জাতের লোক না দিয়ে এক জাতের বহুসংখ্যক স্ত্রী-পুরুষ নেওয়া উচিত। তা না হলে বর্তমান প্রবাসী বাঙালী-দের যে সমস্যা তাদেরও সে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, পাঁচশো লোকের মধ্যে যদি দু'ঘর নাপিত নেওয়া হয় আর তারা নাপিত সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কোনো জাতের লোকেদের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করতে নারাজ হয় বা দেশের সঙ্গে যোগ রাখতে না পারে তবে তাদের বংশলোপ বা স্বধর্মত্যাগ অনিবার্য। সুতরাং ভারতের হিন্দুদের জীবনের বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি রেখে নূতন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করতে হবে, শুধু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করলে চলবে না। যুগোপযোগী ব্যবস্থা না করলে ফল হবে চূড়ান্ত রকম শোচনীয়। তাতে জাতির অবনতি ঘটবে ও কৃষ্টির দিক দিয়ে হবে তার চরম দুর্গতি। যে সকল ভারত-বাসী প্রাচীন যুগে ভারতের বাইরে উপনিবেশ স্থাপন করে-ছিলেন, তাঁদের সকলেই উন্নতির পথে চলেন নি, অনেকেই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন। যাঁরা কোনো যুদ্ধের

বিরাট মন্দির রচনা করেছিলেন তাঁদের বর্ত্তমান পুরুষেরা বাঁশের ঘর ভিন্ন অন্য প্রকার গৃহনির্ম্মাণের কৌশল জানেন না। শুধু তাই নয়, নিজেদের ধর্ম্ম ও কৃষ্টি রক্ষার সুব্যবস্থা না থাকাতে তাদের প্রায় সকলেই পরধর্ম্মে আশ্রয় নিয়েছেন। আধুনিক যুগেও দেখা যায়, মরিশাস্‌, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি স্থানে যে সব হিন্দু গিয়েছিল তাদের অনেকে ধর্ম্মত্যাগ করেছে ও করছে। প্রবাসে হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষার অব্যবস্থাই তার মূল কারণ।

(৪)

বাঙালীরা—প্রবাসী হোন আর স্বদেশবাসী হোন—যদি সামাজিক ও ধর্ম্মীয় আন্দোলন দ্বারা এমন মনোভাবের সৃষ্টি করতে পারেন যার ফলে বাঙালীতে বাঙালীতে ও বাঙালীতে অবাঙালীতে সর্ব্বপ্রকার সামাজিক পার্থক্য দূর হবে অর্থাৎ বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারবে, তবেই প্রবাসী বাঙালীদের যথার্থ কল্যাণ হবে এবং অবাঙালীদের সঙ্গে বাঙালীদের প্রকৃত প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠবে। কিন্তু তা যতদিন না হচ্ছে, ততদিন তাঁদের বিশেষ নিষ্ঠা ও তৎপরতার সহিত নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে, যেন প্রবাসবাসের কারণে তাদের বংশধরদের মধ্যে জীবনযুদ্ধে অক্ষমতা না আসে, বা পারিবারিক জীবনে অনাবশ্যক বাধার সৃষ্টি না হয়।

ভালোবেসেছিনু

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

ওগো, ভালো'বেসেছিনু
শুধু এই কথা বিদায়ের ব্যথা
সাথে মিশাইয়া আকাশে সঁপিয়া
তোমা তরে রেখে দিনু।
ওগো, ভালোবেসেছিনু।

ওগো, দখিন পবনে অলস স্বপনে
রামধনু রাঙা সুখে ঘুমে ভাঙা
নহে ত জীবন মোর,
উত্তাল ঝড়ে নভ ভেঙে পড়ে,
আছাড়ি পিছাড়ি' হুহু হুঙ্কারি'
বিমান নাচয়ে ঘোর।

ওগো, হৃদয় লক্ষ্মী, এ নহে পক্ষী
বায়ু সকারে আনন্দ ভারে
অনন্তে ভাসমান;
মৃত্যু বরণ সাথে মহারণ,
টানে অহরহ মাটির বিরহ,
উন্মাদ ব্যোমযান।

ওগো, বজ্র নিনাদে গুরু পরমাদে
বায়ু পশ্চিমা রক্তিম ভীমা
প্রলয় ডাকিছে আজি;
দিগ্বধূ হায় মু'খানি লুকায়
ভৈরবী বালা বিদ্যুৎ বালা
নৃত্য চটুলা সাজি।

ওগো, নীচে পৃথ্বীরে কে যেন মথি'রে
ঝঞ্ঝা মথনে বন্যার সনে
ভয়ঙ্করীর প্রায়;
মাটি অক্ষমা নাহি নাহি ক্ষমা
তলহীন নীরে আবর্ত্তে ঘিরে
মগ্ন করিতে চায়।

ওগো, তিমির রাত্রি অকূলে যাত্রী
মৃত্যুর সাথে পরাণ মিশাতে
উল্লসি' উঠিয়াছি;
বক্ষের মাঝে লক্ষ বিরাজে
উৎসাহ গাথা, নাহি ভয় ব্যথা
তুমি আমি কাছাকাছি।

ওগো, প্রলয়ের তীরে অসীমের নীড়ে
উত্তাল প্রাণে শিবের বিষাণে
আত্মা বিকশি' দিনু
লভিতে বঁধুরে বিপদ মধুরে,
জানানু তোমারে ঝড়ের মাঝারে
শুধু ভালোবেসেছিনু।

[ঝড়ের মধ্যে বিমানপথে রচিত।

পতঙ্গ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

খ্যাতি জিনিষটা যে সর্ব্বদাই লাভজনক নয় এ কথা মানুষ সাধারণতঃ বুঝিতে চায় না। শচীনবাবুর জীবনকাহিনী সম্বন্ধে যাঁহারা অবহিত তাঁহারা এ কথা স্বীকার করিবেন—খ্যাতি একদিকে যেমন কতকগুলি লোকের অকৃত্রিম স্নেহ ও সহায়তায় অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া দেয় অন্যদিকে আর কতকগুলি লোকের অকারণ অসূয়াও জীবনকে প্রতি ক্ষেত্রে কণ্টকিত করিয়া তুলে।

শচীনবাবু সামান্য মাষ্টার। বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্ম্মশক্তি, সাহিত্য-প্রতিভা প্রভৃতি অনেক কিছুই তাঁহার মধ্যে ছিল, কিন্তু তবুও কেন যে তাঁহার জীবনে সামান্য ১০৲ টাকার মাষ্টারী ব্যতীত আর কিছুই জুটিল না এ বড়ই বিস্ময়কর। সকলেই একবাক্যে বলে, শচীনবাবুর মত লোকের পক্ষে এ চাকুরী আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি সহাস্যে বলেন, গুণ আমার অনেকই ছিল সত্য সেটা আমিও বুঝি, কিন্তু একটা দোষে সবকিছুই নষ্ট হয়ে গেছে।

—সেটা কি?

—অন্যায়কে অন্যায় বলতে আমার মুখে আটকায় না, আর জেনে শুনে কোন নির্ব্বোধকে বুদ্ধিমান্ বলতে বাধে—এই দোষেই জীবনে উন্নতি হয় নি।

বর্ত্তমানে এ দুটি ভয়াবহ দোষ—এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। শচীনবাবুর কথায় তাই জবাব মিলে না।

বড় রাস্তার পাশে, ছোট গলির মধ্যে তাঁহার বাসা। বাসায় তাঁহার স্ত্রী ও একটি পুত্রমাত্র। সংসার একরূপ চলিয়া যায়, ১০৲ টাকার উপরেও ছেলে পড়াইয়া কিছু জোটে। বয়স তাঁহার ত্রিশ—যদিও চাকুরীর বর্ণ্ণগুণে প্রৌঢ় বলিয়াই মনে হয়। চার বছরের পুত্র নাটু যথেচ্ছ খেলিয়া বেড়ায়, পতিব্রতা পত্নী মীরা সেবাযত্নে স্বামীকে খুশী করিয়াছে বলা চলে। ছোট্ট গৃহে শান্তিপ্রিয় প্রাণীগুলি পাখীর মত আনন্দে দিন কাটাইয়া দেয়—কিন্তু জগতের নিয়ম যে নীড় ঝড়ে ছিন্নভিন্ন হয়, পক্ষিণী, পক্ষীশাবক মাটিতে পড়িয়া যন্ত্রণায় ডানা ঝাপটায় দিগন্ত বেদনার্ত্ত করিয়া দেয়—ঝড়ের মুখে নীড়ের কুটা ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। এ ঝড় কখন কোন্ দিক দিয়া কেমন করিয়া আসে তাহা ধারণাতীত, কিন্তু তবু তাহা আসে অনিবার্য্য ভাবে।

ভারতের ভাগ্যাকাশেও এমনি ঝড় উঠিয়াছে—অত্যাচারির উল্লাসে কত গৃহ কত প্রাণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—নীরবে নিভৃতে লোকচক্ষুর অগোচরে কত অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছে তাহার ইতিহাস কে জানে, কে বা জানিতে পারে। কিন্তু নির্ম্মম বিধাতার রুদ্ররোষ শান্ত হয় নাই—আরও কত প্রাণ আহুতি পাইলে সে রোষাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে কে জানে। শচীনবাবু বিশ্বাস করিতেন, ত্যাগ সহিষ্ণুতাই সফলতার পরিপোষক—তাই নীরবে এই আত্মাহুতি দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু এই অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িবার মত সাহস তাঁহার মধ্যে আর অবশিষ্ট ছিল না। তাঁহার ছাত্র নয় এরূপ অনেকেই শচীনবাবুকে শিক্ষকরূপে সমীহ ও শ্রদ্ধা করিত, এই ক্ষুদ্র মহকুমা শহরেও তাহার সংখ্যা নেহাত কম নয়। সত্যদাস তাহাদেরই একজন, অত্যন্ত বিনয়ী, গোবেচারী—যাহাকে আধুনিক ভাষায় নেহাত ভাল মানুষ বলা যায়।

রবিবারে ঘুম হইতে উঠিতে স্বভাবতঃই বিলম্ব হয়। শচীনবাবু তাই দেরী করিয়া উঠিয়া, দেরী করিয়াই চা খাইতেছিলেন। সত্য প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। শচীনবাবু বলিলেন, বসো সত্য। একটু চা খাবে ত?

—থাকে দিন। তৈরী করবার দরকার নেই স্যার। এই মাত্র খেয়েই বেরিয়েছি আপনাকে সংবাদটা দিতে।

—কি?

—আমি পাশ করেছি, ডিষ্টিংসন পেয়েছি। এমন হবে কল্পনাও করি নি। শচীনবাবু পরিহাস করিলেন, এমন সংবাদটি খালি হাতে আনতে হয়। যাক আমিই মিষ্টিমুখ করাই।

অন্দর হইতে কয়েকটি মিষ্টি ও সিঙাড়া সহ চা আসিল। সত্য খাইতে খাইতে প্রশ্ন করিল, এখন কি করব স্যার?

—চাকুরী। বিবাহ এবং সংসার করা—

—সে ত, সকলেই করে। চাকুরী করতে ইচ্ছে করে না—

—তবে ব্যবসা কর। এ সব উপদেশ রোজই দু'দশবার দিয়ে থাকি, ওসব মুখস্থই আছে। ব্যবসা কিসের তাও বলতে হবে—

—না স্যার। সত্য একটু হাসিয়া কহিল, আমার এমন ত অভাব নেই, ১০৲ টাকার জন্য কেন বৃথা শ্রম করব?

শচীনবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, বিয়ে করবে না, চাকুরি করবে না, ব্যবসা করবে না, টাকা রোজগার করবে না, তবে করবে কি বলতে চাও?

সত্য একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, একটু লিখতে চাই, আপনি যদি আমাকে একটু দেখিয়ে দেন।

শচীনবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া কহিলেন, সাহিত্যিক হতে চাও? বেশ, বড় চমৎকার পথ বা'লেছ, অর্থাৎ পেট ভরে খেয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা একেবারেই নেই। না থাক—কিন্তু আর যাই কর এমন দুর্ম্মতি যেন না হয়। নেহাত ওটা বাবুদেরর ব্যবসা, তবে সখ করে দু'দিন লিখলে—সে ভাল।

সত্য বলিবার একটা কিছু পাইয়াছে এমনি ভাবে বলিল, তা ছাড়া কি আর? শরৎ চন্দ্র কি রবীন্দ্রনাথ হতে চাওয়ার ধৃষ্টতা নেই।

শচীনবাবু বলিলেন, বেশ তা লেখো, দেখে দেবো। যখন অবসর আছে—

সত্য একটু চিন্তা করিয়া কহিল, ঠিক তা বলছিনে সার। যদি একটা সাহিত্য-সমিতি করা যায় তবে সেখানকার আলাপ-আলোচনা শুনে আমরা শিখব। ধরুন আমাদের শিক্ষকগণ আছেন, গার্লস্কুলের ওঁরা আছেন, উকিলদের অনেকে আছেন এবং অফিসারদেরও অনেকে আছেন। সাহিত্যসেবী না হলেও সাহিত্যরসিক লোকের অভাব নেই। আপনি যদি একদিন ডাকেন তবে একটা সমিতি গঠিত হতে পারে।

—আমি ডাকলে তাঁরা আসবেন কেন?

—আসবেন। আপনাকে সকলেই মনে মনে শ্রদ্ধা করেন।

—যদি না আসেন তবে অপমানটা তো হবে।

—হয় হবে। চুরি ত করেন নি—এটুকু আপনি না করলে কে করবে?

শচীনবাবু হাসিলেন, অর্থাৎ অপমানটুকু আমি ছাড়া আর কে সয়ে নেবে?

সত্য বিব্রত হইয়া চুপ করিল। শেষে সাহস সঞ্চয় ক'রয়া কহিল, তা নয় সার, যদি কেউ এ সমিতি গঠন করতে পারে ত আপনিই পারবেন, অতএব আপনাকেই মান অপমান যা হয় মাথা পেতে নিতে হবে—

—যদি না করি।

—কারও কোন ক্ষতি নেই, কেবল আমাদের মত কয়েক জন লোক আপনারা থাকতেও বঞ্চিত হব।

—অর্থাৎ তোমাদের সুবিধার জন্যে আমাকে অপমানিত হতে হবে।

সত্য হাসিয়া কহিল, নিজের জন্যে ত নয়, পরের জন্যে। ওরূপ ত আপনি বহুবারই জীবনে হয়েছেন।

শচীনবাবু প্রশংসাবাদে একটু বিচলিত হইয়া বলিলেন, এটা একটা কথার মত কথা বলেছ। পরের জন্যে অপমানিত হওয়া চলে। যাক, ভেবে দেখি, আমাদের মহলে কথাটা ফেলে দেখি কি বলেন সকলে, যদি সম্ভব হয় তবে করবই।

—হাঁ, এর জন্যে আমরা ছেলেদের একটা পাঠাগারও করেছি। সেখানে কিন্তু আপনাকে মাঝে মাঝে যেতে হবে কিছু বলতে।

শচীনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, অর্থাৎ বি-এ পাশ করার পর তোমার খেয়াল হয়েছে যে আমাকে সুস্থ চিত্তে আর থাকতে দেবে না এই ত। রবিবারটা বিশ্রাম ছিল সেটা যাতে আর না থাকে এর জন্যে উঠে পড়ে লেগেছ।

—সত্যি তাই। আপনার অনেক কাজ আছে, আপনার ঘুমোবার পর্য্যন্ত সময় নেই।

শচীনবাবু স্বভাবসুলভ হাসিতে কথাটার গুরুত্ব কমাইয়া দিয়া কহিলেন,—হাঁা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলেই ঘুমোবে, আর আমাকে রেসের ঘোড়ার মত ছুটতে হবে।

সত্য হাসিল। একটু চিন্তা করিয়া কহিল, তা হলে কবে সভা ডাকছেন?

—ডাকব, দেখি ভেবে চিন্তে।

—সবাইকে ডাকবেন কিন্তু। হাকিম মহল, উকিল মহল, গার্লস্কুল—

শচীনবাবু কহিলেন, মেয়েরটা ডাকতে পারব না, তাঁরা আসবেনও না। তা ছাড়া শুনেছি হেড মিষ্ট্রেস বড্ড বদরাগী। না এলে খামকা অপমান, দরকার কি?

সত্য কহিল, না সার। আপনি ডাকলে আসবেনই।

—তোমরা যে চোখে দেখ, সে চোখে তিনি ত দেখেন না। বিশেষতঃ আমি সামান্য মাষ্টারমাত্র, তিনি হেড মিষ্ট্রেস, আমার আহ্বানটা কি স্পর্দ্ধা বলে বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

শচীনবাবু তবুও ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, অকারণ একটি ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে করিয়া লাভ কি? জগতেরই বা কি উপকারে আসিবে?

কিন্তু সত্য ফেউয়ের মত পিছনে লাগিয়া আছে, অবশেষে এক দিন নিরুপায় হইয়াই শচীনবাবু একটা বিজ্ঞপ্তি দিলেন এবং ইস্কুলে দপ্তরী মারফত তাহা প্রচারিতও হইল। সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু শচীনবাবুর মনটা শঙ্কাকুল হইয়া উঠিল, অন্ত কেহ আসুক আর নাই আসুক গার্লস্কুলের কেহ যদি না আসে তবে এ প্রত্যাখ্যানের কত কদর্থ অপব্যাখ্যা হইবে কে জানে। মাষ্টারী জীবনের একঘেয়ে গড্ডলিকা ধারার মাঝে তাঁহার মনটা যেন শুকাইয়া উঠিয়াছিল, অন্ততঃ কয়েক জন আধুনিক শিক্ষিতা তরুণীর সঙ্গে আলাপ হইতে পারে এ আশাটাও অন্তরকে অকস্মাৎ যেন রঙীন করিয়া তুলিয়াছিল। অতীত যৌবন, সেই হাস্যোজ্জ্বল দিনগুলির ভুলে যাওয়া স্বাদ হয়ত আর একবার পাওয়া যাইতে পারে।

সেদিন সভার দিন।

শচীনবাবু শূন্য স্কুলের একখানা চেয়ারে বসিয়া সভাস্থলের চেহারাটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, বিশদ তেমন কিছু নয় তথাপি ভদ্রস্থ বলা যাইতে পারে। টেবিলে বনাত দেওয়া, চেয়ারগুলিও হুশাম চেয়ার। হেড মিস্ট্রেস্ মিস্ রায় যদিই আসেন তবে—

শচীনবাবু সন্দেহে বার বার দোদুল্যমান চিত্তে রাস্তার দিকে চাহিতেছিলেন। একখানি লাল শাড়ীতে ঢাকা শুভ্র একখানি দেহ ধীরে ধীরে সেই দিকেই আসিতেছে—

শচীনবাবু উঠিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া নমস্কার করিলেন, আসুন।

—অনেক আগে এসে পড়েছি নাকি, আর কেউ আসেন নি?

—বসুন, বাঙালীর সভা ত? আধঘণ্টা বাড়তি ধরে রাখাই হয়।

মিস্ রায় বসিয়া দপ্তরীকে বলিলেন, তুমি যেয়ো না কোথাও।

শচীনবাবু কহিলেন, ধন্যবাদ আপনাকে। আমার মত ব্যক্তির আমন্ত্রণে আপনি এসেছেন এটাকে সৌভাগ্য বলে মনে করি।

—আপনার বিনয় প্রশংসাযোগ্য, তবে আসব না মনে করে যদি নিমন্ত্রণ করে থাকেন সেটাও ত ভাল নয়।

শচীনবাবু পরিহাস করিলেন, সে ত সত্যিই, আসবেন ভাবলেও ভাল হ'ত না, আসবেন না ভাবলেও ভাল হয় না।

মিস্ রায় হাসিলেন, অতিথিগণ একে একে আসিতেছিলেন। শচীনবাবু বারান্দায় দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এক বার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখেন, মিস্ রায়ের বর্ণটা জাপানী মেয়েদের মত ফর্সা। কিন্তু দূর হইতে যেমন সুন্দর দেখায় কাছে যেন ততটা নয়। নাক, মুখ, চোখ সবগুলি যেন ঠিক মানানসই নয়, তবুও সুন্দর তন্বী ক্ষীণ দেহ। শাড়ীর আভায় মুখখানা গোলাপী হইয়া উঠিয়াছে, অজানা একটা সৌরভ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

একে একে সভাস্থল পূর্ণ হইয়া উঠিল—

তিন জন মহিলা, এক জন অফিসার অর্থাৎ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কয়েকজন উকিল, বাকী সবই মাষ্টার। আর এক জন উৎসাহী স্কুল ইনস্‌পেক্টরও আসিয়াছেন। বৃদ্ধ উকীল বরদাবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভ্যও তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে সভায় উপস্থিত ছিল; কিন্তু কোন আলোচনায় যোগ দেয় নাই।

সমিতির উদ্দেশ্য প্রভৃতি লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। বরদাবাবু হঠাৎ বলিলেন, যিনি আমাদের ডেকেছেন তাঁর নিশ্চয়ই একটা পরিকল্পনা আছে, তাঁর পরিকল্পনাটি শুনে তার আলোচনা করলেই বোধ হয় ভাল হয়।

সকলের অনুরোধে শচীনবাবু কহিলেন—হ্যাঁ, আমি একটু ভেবে রেখেছি। আদর্শ হবে—আমরা সকলেই কিছু কিছু হয়ত জানি, সভায় পরস্পর সেই ভাববিনিময় হবে। এক জন কোন বিষয় সম্বন্ধে লিখলেন বা বললেন তাই নিয়ে আলোচনা হ'ল—শেষে চা ও জলযোগান্তে সভা ভঙ্গ হ'ল। এ ছাড়া মাঝে মাঝে উৎসব হবে সেদিন একটু গান বাজনা আবৃত্তি হ'ল। তবে আমার মতে সভ্য-সংখ্যা বিশেষ বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ যা উচ্চাঙ্গের তা কোন দিন সকলের জন্য নয়। তা ছাড়া সমিতির অধিবেশন কেউ নিজের বাসায়ও আহ্বান করতে পারেন, সেখানে বিশেষ বেশী সভ্য হলে নিমন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। সমিতির একটা খরচা আছে—পিওন ও জলযোগের। আট আনা চাঁদা হলেই চলতে পারে আশা করা যায়। এই মোটামুটি আমার পরিকল্পনা।

আলোচনা চলিতেছিল—সভ্য কাহারা হইতে পারে?

শচীনবাবু বলিলেন—সমবেত সকলের মতে যাঁরা উপযুক্ত তাঁরাই হবেন।

যাহাই হউক, সমিতি প্রতিষ্ঠা হইল এবং শচীনবাবুকেই সম্পাদকতা গ্রহণ করিতে হইল। স্থির হইল—আগামী শনিবারেই প্রথম অধিবেশন হইবে। স্কুল ইনস্পেক্টর হরেনবাবু প্রথম প্রবন্ধপাঠের ভার গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে ইচ্ছুক সভ্য ও সভ্যাদের নাম সম্পাদককে জানাইতে হইবে যাহাতে শনিবারে তিনি সকলকেই সংবাদ দিতে পারেন। প্রাথমিক ব্যয়ের জন্য সভাক্ষেত্রেই দশ টাকা চাঁদা উঠিয়া গেল।

শচীনবাবু একা একাই বাড়ী ফিরিতেছিলেন—

মনটা আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল—প্রথমতঃ তিনি অকৃতকার্য্য হন নাই, দ্বিতীয়তঃ জীবনের কোন অতীতের একটা রোমাঞ্চকর অধ্যায় যেন আবার ফিরিয়া আসিতে চাহিতেছে অনুমান করিলেন। মিস্ রায় তাঁহার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন নাই, অধিকন্তু তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়াছেন। মাষ্টারীর জীর্ণতার মাঝে যৌবনশ্রীর স্পর্শ তাঁহাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল, মনে হইতেছিল মৃত প্রাণে যেন স্পন্দন ফিরিয়া আসিতেছে। যষ্টিভারাক্রান্ত জীর্ণ বৃদ্ধ তরুণ-তরুণীর প্রগল্ভ ক্রীড়া সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়া যেমন একটা অব্যক্ত আনন্দ পায় শচীনবাবুর মনও যেন তেমনি একটা অনুভূতি লাভ করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বাসায় ফিরিয়া শচীনবাবু স্ত্রী মীরার উদ্দেশে কহিলেন—একটু চা খাও ত গো?

—এখন খাবে না?

—না।

মীরা চা লইয়া উপস্থিত হইল। শচীন বাবু বলিলেন—ব'সো।

চা পান করিতে করিতে শচীনবাবু মীরাকে দেখিতেছিলেন—সে যৌবনের শ্রী যেন চলিয়া গিয়াছে। দেহের সে সুঠাম সৌষ্ঠব নাই, মাতৃত্বে দেহ যেন যৌবনকে হারাইয়াছে। যৌবনের প্রসাধনের রেশও আজ নাই। সংসারের মাঝে মীরা যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

মীরা কহিল—অমন করে কি দেখছ?

শচীনবাবু হাসিয়া কহিলেন—তোমার কি হয়েছে বল ত? চুল বাঁধা নেই, একটু ভাল কাপড় পরা নেই, মুখে একটু পাউডার দেওয়া নেই—

—থাক্, বুড়ো বয়সে তোমার আর রঙ্গ করতে হবে না।

—বুড়ো হয়ে গেছ নাকি?

—তা ছাড়া কি? এখন সেজে গুজে বেড়ালে লোকে হাসবে না?

শচীনবাবু পরিহাসের সুরে কহিলেন—আমার মনটা ত বুড়ো হয় নি। তোমাকে যে তেমনি করেই দেখতে ইচ্ছে করে—

মীরা হাসিল। হয়ত তা বয়া থাকিবে তাহার স্বামীর ছেলেমানুষি যায় নাই। কহিল—চুল কি বাঁধবার যো আছে, তোমার ছেলে অমনি বায়না ধরবে বেড়াতে চল। চুল বাঁধলেই ভাবে বেড়াতে যাবো।

—লাটুকে ফাঁকি দিতে গিয়ে আমাকেও দিচ্ছ যে!

মীরা সহাস্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—ভীমরতি হয়েছে তোমার। হঠাৎ এমন হ'ল কেন? কোথায় গিয়েছিলে আজ?

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই মীরা চলিয়া গেল।

শচীনবাবু একটা সিগারেট ধরাইয়া বসিয়া রহিলেন—চোখের সামনে যেন স্বপ্নের রঙীন ছবি ভাসিয়া উঠে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে, জ্যোৎস্না রাত্রে নদীর ধার দিয়া তরুণীরা বেড়াইয়া বেড়ায়—ওপারের দিগন্তে পাণ্ডুর চাঁদ আঁখি মেলিয়া চাহিয়া থাকে। মিস্ রায়ও মাঝে মাঝে বেড়াইতে যান—প্রশান্ত নদীতীরে চন্দ্রালোকে বসিয়া কেহ বা গান ধরে—সুদূরের আকাশপটে ভাসিয়া উঠে কত স্বপ্ন।

মীরা ডাক দিল—খেতে এস, ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

শচীনবাবু উঠিয়া গেলেন। খাইতে বসিয়া দেখিলেন উঠানে চাঁদের আলো পড়িয়াছে। কহিলেন—মীরা, বর্ষায় নদী থৈ থৈ করছে, চল আমরা বেড়িয়ে আসি।

মীরা হাসিয়া কহিল—লাটু যদি ওঠে—

—ও ঘুমুলে ত আর সহজে ওঠে না।

মীরা পুনরায় কহিল—যদি তোমার ছাত্রেরা দেখে ফেলে।

—ফেলুক! কি হবে তাতে।

—তুমি কি কিছু খেয়েছ আজকে? তোমার হ'ল কি?

শচীনবাবু হাসিলেন। কোন জবাব দিলেন না—কে যেন আজ যৌবনের রসসুধা তাঁহাকে আকণ্ঠ পান করাইয়া দিয়াছে।

শনিবার। শচীনবাবু পূর্ব্বেই সভ্যকে লইয়া সভাস্থলে অপেক্ষা করিতেছিলেন। একে একে সকলেই আসিলেন। মিস্ রায় দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া কহিলেন, নমস্কার শচীনবাবু। দেরী হয়েছে বলে আগেই মাপ চাচ্ছি—

প্রাথমিক পরিচয় ও আলাপ-আলোচনা হইবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। হরেনবাবুর লিখিত "শরৎ সাহিত্যের উপকরণ" প্রবন্ধ পঠিত হইবার পরে সেই প্রসঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হইল—

মিস্ রায় সহসা বলিলেন, আমাদের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট থেকে এ সম্বন্ধে আমরা কিছু শুনতে চাই।

শচীনবাবু পরিহাস করিলেন, আপনারা চাইবেন তা জানি, কিন্তু আমার শক্তিতে কুলোবে কি?

যাহা হউক, শচীনবাবু সংক্ষিপ্ত একটু আলোচনা করিলেন, কিন্তু উপস্থিত সকলেই তাঁহার দৃষ্টির গভীরতা ও তীক্ষ্ণ সাহিত্য-বোধের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইল, লোকটি কেন মাষ্টারী করিয়া জীবনটার অপচয় করিতেছে!

মিঃ সেন তারিফ করিবার জন্যই ব্যঙ্গ করিলেন, শচীনবাবুর কথা শুনে এইটুকু বুঝলাম শরৎ-সাহিত্যটা আমরা বুঝি নি।

শচীনবাবু জবাব দিলেন, অর্থাৎ আমার জবাবের দোষে সোজা জিনিষ কঠিন হয়ে গেল, এই ত! মাষ্টারীটা আর থাকবে না দেখছি। মিঃ সেনকে সেজন্য দায়ী করা চলবে, অন্ততঃ আংশিক ভাবে ত বটেই।

চা আসিল। সভাতে জলযোগপর্ব্ব আরম্ভ হইতেই শচীনবাবু উঠিয়া বলিলেন, রবীন্দ্র-মৃত্যুবার্ষিকী আগতপ্রায়। সামনের অধিবেশনে আমরা কবিগুরুর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে চাই। এ সম্বন্ধে সকলে অবহিত হোন, আমার প্রস্তাব সেদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীত, কবিতা-আবৃত্তি ও কাব্যালোচনা হবে।

আমাদের সভ্য ও সভ্যাদের অনেকেরই বদান্যতা ও অতিথিবাৎসল্যের খ্যাতি আছে। একথা সকলেই জানেন, তার মধ্যে বিশেষ করে মিষ্টার সেনের বৈঠকখানায় ও মিস্ রায়ের ঘুলে অতিথিবাৎসল্য দেখাবার মত যথেষ্ট স্থান আছে। অতএব আমরা আশা করি তাঁদের দানশীলতা ও মহানুভবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁরা সভার অন্য সকলকে অনুপ্রাণিত

মিস্ রায় হাসিয়া কহিলেন, প্রথমেই আমাকে।

—জগতে বহুলোক আছে যারা এখন স্থান অধিকার

করবার জন্যেই প্রাণপাত করছে, কিন্তু যেজন্যে সে শ্রেষ্ঠত্ব হাতছাড়া করাটা—

মিষ্টার সেন বাক্যের শেষাংশ পূরণ করিলেন, কোনক্রমেই উচিত হবে না। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নয়।

অনেকেই হাসিয়া উঠিলেন।

মিস্ রায় কহিলেন, ব্যাপারটা ব্যয়সাপেক্ষ বলেই ভয়। যা হোক্ আমাকে সাহায্য করতে হবে কিন্তু শচীনবাবু।

শচীনবাবু কহিলেন, সর্ব্ববিধ উপায়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত, কেবল ব্যয়সাপেক্ষতা ব্যতিরেকে।

হরেনবাবু কহিলেন, বলা বাহুল্য মাত্র। অতএব আগামী অধিবেশন মিস্ রায়ের ওখানে হইবে, স্থির রইল।

সেদিনের মত সভাভঙ্গ হইল। সভার আবহাওয়ায় সকলে সন্তুষ্ট মনেই ফিরিয়া আসিলেন।

পরের শনিবার সন্ধ্যায় লাল স্কুলের বেয়ারা আসিয়া একখানা পত্র দিয়া গেল—

প্রিয় শচীনবাবু

জানি আপনি আটটায় ঘুম থেকে ওঠেন, বিশেষতঃ রবিবারে, কিন্তু রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে হলে রবিবার সকালে আমার এখানে সাতটায় সময় আসা দরকার। সভ্যর মুখে শুনলাম আপনার নাকি আমাদের গেট-ভীতি আছে, যাহা হউক রবিবারে গেট উন্মুক্ত থাকবে। নির্ভয়ে আসবেন। নমস্কার ইতি— বিনীত

শ্রীঅণিমা রায়

শচীনবাবু কয়েকবার চিঠিখানা পড়িলেন—তাঁহার আটটায় ঘুম হইতে উঠিবার সংবাদটা যেমন করিয়াই হউক হেড মিস্ট্রেস অবগত আছেন। গেট-ভীতিটা সত্যই তাঁহার আছে। গেটের সামনে অপেক্ষা করাটা তাঁহার যেন বড় হীনতা ও অপমানকর বলিয়া মনে হয়। মিস্ রায় তাঁহা সম্বন্ধে এ সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন এ একটু গৌরবেরই। শচীনবাবু মনে মনে খুশী হইয়াছিলেন।

রবিবারে সকালে উঠিবেন মনস্থ করিয়াই শচীনবাবু শুইয়াছিলেন, কিন্তু উঠিয়া দেখেন আটটা বাজিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন—

মীরা বলিল—বেশ, ছেলের ঘটি মাছের খালুই দিলে না।

—এসে বাজার করব। যাচ্ছি মিস্ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে, তার ঘটি-খালুই দিয়ে কি করব ?

• তবে বাজার আজ হবে না !

—হবে, ফিরে এসে—

শচীনবাবু রওনা হইলেন। গেট-দরজা সত্যই খোলা ছিল, মিস্ রায় আপিস ঘরেই ছিলেন। শচীনবাবু তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—নমস্কার।

—নমস্কার। মিস্ রায় মণিবন্ধের ক্ষুদ্রতম ঘড়িটা দেখিয়া কহিলেন—সাড়ে আটটা বেজেছে। আপনার সময়জ্ঞানের প্রশংসা করি। এক ঘণ্টা বসে আছি হাঁ করে—

—অপরাধ ক্ষমাযোগ্য। তবে ওরকম কথাটা আপনার না বলাই ভাল—

—যাক্, আসন পরিগ্রহ করুন। একটু চা খাবেন ত ? দাঁড়ান বলে আসি।

মিস্ রায় চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ বাদে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—আপনার ছেলেটিকে নিয়ে এলেন না কেন ?

—সে রকম আদেশ ছিল না।...

একটি হোস্টেলের মেয়ে চা ও কিছু জলখাবার লইয়া আসিতেছিল। মিস্ রায় কহিলেন—এই ঘরটায় আমাদের সভা হবে ত ?

—হ্যাঁ, এতে কুড়িখানা চেয়ার পড়বেই। তা ছাড়া ঐ ঘরের টেবিলটা জুড়ে দিলেই হবে।

—চা খেয়ে নিন, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। খাবার বাজারের নয় এখানেই তৈরী—

শচীনবাবু খাইতে খাইতে কহিলেন—যাক্, সমিতির সম্পাদকতা একেবারে আপখোরাকী নয় তা হলে।

মেয়েটি চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তায় হাস্যপরিহাসে কাটিয়া গেল। স্কুলের ঘড়িতে ৯৷০টা বাজিয়া গেল। শচীনবাবু বলিলেন—যথাসম্ভব উপদেশ বোধ হয় দেওয়া হয়েছে এখন উঠি।

—বসুন না, এত তাড়াতাড়ি কি ?

—বাজার করতে হবে যে !

মিস রায় বলিলেন—তা হোক্, একটু পরে বাজারে গেলেও চলবে।

—তা চলবে, তবে অহেতুক একটা গৃহবিবাদের সৃষ্টি হয়।

—হোক, অত ভীতু হলে সংসার চলে না।

শচীনবাবু মৃদু হাসিয়া নমস্কারান্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ফিরিবার পথে ভাবিলেন এই প্রসন্ন মেয়েটির রূঢ়-ভাষী, বদমেজাজী প্রভৃতি বদনাম রাষ্ট্র হইল কেমন করিয়া। তাহার সঙ্গে যেটুকু পরিচয় তাহার কোথাও আড়ষ্টতা নেই, জড়তা নেই, সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতির মত সুষ্ঠু সংযত—মানুষের দেখিবার শক্তি, বুঝিবার বুদ্ধি কি এতই কম ! শিক্ষিত অনেক মহিলার সঙ্গেই তাহার পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু এমন উদার মন ও স্বচ্ছন্দগতি মেয়ে সত্যই দুর্লভ—অকারণ স্পর্দ্ধা নাই অথচ আভিজাত্যবোধ আছে, অবান্তর কথার সম্মোহন নাই—অথচ কথা বলিবার ভঙ্গীতে রুচিজ্ঞান ও তীক্ষ্ণতা আছে। অন্তরের স্বাধীনতা আছে, অন্তর রুদ্ধ ভাবনার বিকারে মূঢ় নয়।

শচীনবাবু মনে মনে তাঁহার প্রশংসাই করিলেন। সাধারণের মতটা যে কত বড় ভুল তাহা দেখিয়া হাসিলেনও।

সত্য আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, সভার সমস্ত ব্যবস্থা করে এলাম। আপনি কেবল একটু আগে গিয়ে সব দেখে দেবেন।

শচীনবাবু কহিলেন, ব'স। এমনি হলে সম্পাদকতা করতে পারি। সত্যকথা বলতে কি সত্য মাঝে মাঝে মনে হয় তোমরা আমাকে বাঁদর নাচাচ্ছ এবং তোমাদের প্রতি দুর্ব্বলতা বশতঃ আমিও অকুণ্ঠচিত্তে নাচ্ছি।

সত্য চোখ মেলিয়া ঘুরিয়া কহিল, সে কি মাষ্টারমশায় ?

—শহরের লোকে ত অখ্যাতি রটনা করতে পারে, তারা ত এটা ভাল চোখে নাও দেখতে পারে।

—সবই হতে পারে কিন্তু হয় নি। কতজন সমিতির সভ্য হবার জন্যে ব্যাকুল, আমাকে বলেছে, কিন্তু আমি আপনার জন্যে রাজী হইনি।

—আমার জন্যে ?

—হাঁ, আপনি বলেছেন যোগ্যতা থাকা চাই, তা ছাড়া কুড়ির বেশী সভ্য-সংখ্যা হবে না। কিছুক্ষণ অবান্তর আলাপের পর সত্য বলিল, রবিবার বৈকালে ছেলেদের একটা সভায় সাহিত্য সম্বন্ধে আপনাকে একটা বক্তৃতা দিতে হবে।

—বক্তৃতা ?

—হাঁ, শহরে আর কে বলবে বলুন। ছেলেরা শুনতে চায়।

—আমিই তা হলে শহরের একমাত্র বক্তা। কিন্তু সত্য তোমার মুখ চেয়ে অনেক করেছি এসব ত আমার সাধ্যাতীত।

—যাই বলেন, আপনাকে যেতেই হবে।

শচীনবাবু সত্যর এই আব্দারে হাসিলেন, এমন জোর করিয়া অকৃত্রিম দাবি ত কেহ জানাইতে পারে নাই। শচীনবাবু সত্যর মুখের পানে চাহিয়া তাহাই ভাবিতেছিলেন। সত্য তাহাকে বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করে—

সত্য আবেদনের সুরে কহিল, আমাদের মুখ চেয়ে অনেক করেছেন এবং আরও অনেক করতে হবে। বিপদে-আপদে আপনারা বুদ্ধি দেবেন, আদেশ দেবেন তবেই ত আমরা চলতে পারব—আপনার শিক্ষা ও চালনা ব্যতীত আমরা নিরুপায়।

—বিপদ-আপদ ত হচ্ছে না।

সত্য হাসিয়া কহিল, বিপদ হতে কতক্ষণ।

—সাহিত্যের বক্তৃতায় তার আর কি হবে ?

—হবে ! আমরা যা জানতে চাই তা জানতে দেবেন না ? শহরের খবর জানেন ? আজ দশ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। কংগ্রেসের কাজে বা বিপ্লবাত্মক কাজে যাদের পূর্ব্বে জেল হয়েছে একে একে তাদের সকলকেই বন্দী করা হ'ল। এই নিরপরাধ লোকেদের কেন ধরেছে ? সত্যি বড় কষ্ট হয়—ভাঁটুদা দশ বছর জেলখেটে এসে দোকান করে খাচ্ছিল, তাকে নিয়ে গেল।' তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে তাকিয়ে রইল, তারা কি করে দিন কাটাবে। দোকান দেখবার কে আছে ? আর ভাঁটুদা ত কোন কাজেই ছিলেন না, পাকা সংসারী তবুও তাকে ছাড়লে না—কিন্তু ভাঁটুদা হাসছে, যাবার সময় কি বললে জানেন ?

—কি ?

—ভগবান আছেন, তিনিই দেখবেন, আমি নিমিত্ত মাত্র। তোমাদের ভয় নেই। তাঁর স্ত্রী চোখে আঁচল দিলেন। ভাঁটুদা আবার হেসে বললেন, কোন ভয় নেই, ভগবান রক্ষা করবেন। নিজেই পুলিশকে বললেন, চলুন আর দেরী নয়।

শচীনবাবু একটু উন্মনা হইয়া গিয়াছিলেন। সত্যই এঁরা দেশের জন্য জীবনকে তুচ্ছ করিয়াছেন, কিন্তু বিনিময়ে পাইয়াছেন লাঞ্ছনা এই অসহায় পরিবারটি কেমন করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিবে ?

অকস্মাৎ তাকাইয়া দেখেন সত্য তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতেছে। স্মিতহাস্যে বলিল, দুঃখ পেলেন স্যর ? শুধু কি ভাঁটুদা—সমগ্র ভারতে এমনি কত সহস্র ভাঁটুদা যে সামনে জেলে যাচ্ছে তার লেখাজোখা নেই। সকলেই নিঃস্ব—ভগবানের করুণার উপরেই ছেড়ে দিয়েছে স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে। তাদের বাঁচিয়ে রাখা কি আমাদের ধর্ম্ম নয় !

—অবশ্যই ! কিন্তু আজ আমরা যে নিজেরাই বাঁচতে অক্ষম।

সত্য হাসিয়া কহিল, সেও ত সত্যি।

সত্য চলিয়া গেল। শচীনবাবু বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, সত্য কি বলিতে চায় ? সে কি বলিতে আসিয়া কি বলিয়া গেল ? কি যেন একটা কথা সে বলিতে চায়, কিন্তু বলিতে পারে না, নানা কথার ছলে কথাটাকে চাপা দিতে চায়। শচীনবাবু বুঝিতে পারেন না, সত্য ভাঁটুদার কথা বলিতে বলিতে এমন করিয়া হাসিল কেন ? তাহার বিদায়-মুহূর্তটিও হাস্যকর নয়, শুনিলে কান্না পায়।

কাল মহাসমারোহে রবীন্দ্র মৃত্যু-বার্ষিকী প্রতিপালিত হইয়াছে—

সকালবেলা শচীনবাবু একটা সিগারেটের ধূমপান করিতে করিতে গত রাত্রির উৎসবের আনন্দটাকে স্বপ্নলোকে নূতন করিয়া ভোগ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। একটা কথা বার বার তাঁহার কানে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। কথা প্রসঙ্গে মিস্ রায় বলিয়াছিলেন, বসে বসে করেন কি ? মাঝে মাঝে এলেও ত পারেন, গল্প করা যায়। একাকী বন্দীজীবন যাপন করি।

অকারণ অনির্দিষ্ট একটা আকর্ষণ বার বার তাহার

মনটাকে শ্রীমতী অণিমার দিকে দুর্বার বেগে টানিতেছিল এবং তিনি মনে মনে যাইবার একটা অজুহাত খুঁজিতেছিলেন কিন্ত বার বারই মনে হইতেছিল—লাভ নাই।...হয়ত তাঁহার দুর্বলতা আছে, হয়ত নেই তবুও—

মীরা চা লইয়া আসিয়া টিপ্পনী করিল, কার ধ্যান করছো গো ?

—সুন্দরী বিদুষীদের ধ্যান করছি।

মীরা স্মিতহাস্তে কহিল, ধ্যান করো, উনুনে তেল রয়েছে—মীরা চলিয়া গেল। শচীনবাবু যেন একটু স্বস্তি বোধ করিলেন, সত্য কথা বলিয়া এমনি একটা পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়। মীরা হয়ত মনে করিয়াছে তাঁহাকে উত্যক্ত করিবার জন্যই একথা বলা হইয়াছে।

শচীনবাবু আবার আনুপূর্বিক ভাবিয়া সভার রসাস্বাদন করিতেছিলেন—সত্য আসিয়া নমস্কার করিল—

শচীনবাবু কহিলেন, বসো। কালকার সভাটা বেশ জমেছিল, না ?

—হ্যাঁ, সার খুব জমেছিল। খবরের কাগজ পড়েছেন সার ?

—নিশ্চয়ই।

—কি মনে হয় ?

—নেতৃবৃন্দ জেলে যাবেন, দেশে একটা বিক্ষোভ হবে, অনেকে জেলে যাবে। অনেকে বন্দুকের গুলিতে প্রাণ দেবে, তার পর আবার যেমনটি ছিল তেমনিই হবে...

—না সার। এবার স্বাধীনতা আসবে, এখন ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া ওদের গত্যন্তর নেই।

শচীনবাবু কহিলেন, যক্ষ্মারোগীও স্যানাটোরিয়ামে যায়—অথচ জানে যে সে বাঁচবে না। তাই ক্ষমতা যতক্ষণ রাখা যায় ততক্ষণ সঙীন দিয়েই হোক, ব্রেণ গান দিয়েই হোক তা তারা রাখবেই।

—কিন্ত আমাদের কি কোন কর্তব্যই নেই।

—কিছু না। যে দেশের লোক ভাইকে ধরিয়ে দিয়ে চাকুরীর উন্নতি করে, দশটা টাকা দিলে গোপন তথ্য প্রকাশ করে, পঁচিশ টাকায় মত বদলাতে পারে সেদেশে কোনও কর্তব্য নেই। রোজগার কর, খাও,...

—সকলেরই—

—হ্যাঁ স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে।

—কিন্ত তারত এবার ওদের ছাড়তেই হবে যে।

—প্রাণ থাকতে ছাড়বে না। হাত পা সবল থাকতে কেউ বুকে ছুরি মারতে দেয় ?

সত্য হাসিয়া বলিল, আমাদেরও কি কিছুই করণীয় নেই ?

—কি করবে। দুঃখ-লাঞ্ছনা সহ্য করতে পার তবে তা সবই নিষ্ফল হবে—দেশ তৈরি না হলে বিপ্লব হয় না। দেশ তৈরী করে তবে বিপ্লব করতে হয়—এ দেশ ভেড়ের দেশ, যুদ্ধের দেশ তা জানো না—

সত্য হাসিল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, আপনি বড় নিরাশাবাদী। ভাল কথা, আপনি কি দিদিমণির ওখানে যাবেন ?

—যেতে পারি।

—তবে এই টাকা দুটো তাঁকে দেবেন। ধার নিয়েছিলাম, আর বলবেন তাঁর টাকা যখন দরকার হবে তখন চেয়ে পাঠাব, এখন টাকা দুটো তাঁকে নিতেই হবে।

শচীনবাবু কহিলেন, বলব।

—আসি সার, নমস্কার। জরুরী কাজ আছে, রবিবারে বক্তৃতাটা দিতেই হবে—বাইরের অনেক স্কুল ও কলেজের ছাত্র আসবে।

সত্য চলিয়া গেলে শচীনবাবুর সহসা মনে হইল যে দুইটি টাকা সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গেল তাহা যেন রহস্যপূর্ণ। কিন্তু কি রহস্য থাকিতে পারে তাহা ভাবিয়া পাইলেন না, তবে মনে মনে শ্রীমতী রায়ের ওখানে যাইবার মত একটা অজুহাত পাইয়াছেন দেখিয়া খুশীই হইলেন। বৈকালে যে অবশ্যই যাওয়া দরকার তাহা মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিলেন।

দুইটি মহিলা অকুণ্ঠ পদক্ষেপে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিল। শচীনবাবু একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনারা ?

এক জন হাসিয়া কহিল, আপনারা নয় তোমরা। আমরা আপনার ছাত্রীই। আমার নাম গীতা আর ওর নাম অঞ্জলি। আমরা এবার বি-এ পরীক্ষা দিয়েছিলাম। আপনার নাম শুনে আলাপ করতে এলাম—

—আমার নাম ?

—হ্যাঁ, আপনার কথা শুনে, শুনেছি, আপনার লেখা পড়েছি। বৌদি কোথায়।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই গীতা অন্দরে প্রবেশ করিল। অঞ্জলি কহিল, সত্যদার মুখে আপনার এত প্রশংসা শুনেছি যে না এসে আর থাকা গেল না।

শচীনবাবু কহিলেন, সত্য মিথ্যাবাদীও বটে। আমারও প্রশংসা করে—সেটা নিশ্চয়ই মিথ্যাভাষণ।

—না মাষ্টারমশায়। সত্যদা মিথ্যা বলে না—আমরা সাহিত্য সমিতির সভ্যও হতে চাই, অবশ্য যদি যোগ্যতা থাকে।

—যোগ্যতার অভাব কি আপনাদের। আপনাদের মত সভ্য পাওয়া—

—'আপনি' বলছেন কেন ?

—হ্যাঁ, তোমরা আসবে সে ত ভাল কথা।

কিছুক্ষণ কথা বলিতে বলিতে গীতা ও মীরা তিন কাপ চা লইয়া ফিরিল।

গীতা বলিল, আমিই চা করে আনলুম। বৌদি ত ইস্কুলের ভাত রাঁধতেই ব্যস্ত।

মীরা চলিয়া যাইতেছিল, গীতা কহিল, দাঁড়াও বৌদি। আপনাকে সাহিত্য সমিতির সভ্য হতে হবে।

মীরা কহিল, সে কি আমি যে ও ছাই পাশ কিছু বুঝি না।

—বুঝবার দরকার কি? এমনিই বসে বসে শুনবেন।

—না না সে হয় না। আমি সভাসমিতিতে যেতে পারব না—রাঁধবে কে? উনুনে মাছ রয়েছে, আসি—

মীরা চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ অত্যন্ত প্রগল্ভ ও অবান্তর আলাপের পর গীতা এবং অঞ্জলি চলিয়া গেল।

শচীনবাবু বিস্মিত হইলেন, মেয়ে দুইটির অকুণ্ঠ ব্যবহার দেখিয়া। ইহাদের পিছনে সত্যর অবস্থিতি অনুমান করিয়া একটু যেন অস্বস্তি বোধ করিলেন। সত্যর কর্ম্মপদ্ধতি ও প্রচার বাস্তবিকই রহস্যময় মনে হইতে লাগিল—সত্য কি বিপ্লবী?

বৈকালের দিকে একটা অদম্য আকর্ষণ ও সত্যর দুইটি টাকার অজুহাত শচীনবাবুকে মিস্ রায়ের বাসার দিকে টানিতেছিল। কিন্তু কেন এই আকর্ষণ, কেন এই প্রলোভন তাহা বিচার করিবার সময় তাঁহার হয় নাই, মিস্ রায়ের সান্নিধ্য তাঁহার ভাল লাগে…।

শ্রীমতী অণিমা আন্তরিকতার সহিতই আলাপ করিলেন। শচীনবাবু বহু হাস্যপরিহাস ও কথাবার্ত্তা কহিয়া যখন বাহির হইয়া আসিলেন তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। মিস্ রায়ের কথাই ভাবিতেছিলেন, বাস্তবিকই তিনি দুর্ব্বোধ্য। অধুনা যে কয়টি মেয়ের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল সবই যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। স্ত্রীসুলভ লজ্জা, ভয়, নমনীয়তা নাই, এত স্পষ্টবাদী, এমন নির্ভয়, যে মুহূর্ত্তে পরকে আপনার করিয়া লয়। মনে হয় যেন জন্মজন্মান্তরের পরিচয়—গীতা ও অঞ্জলি আসিয়া কেমন মুহূর্ত্তে তাহাকে আপনার করিয়া লইল।

রাস্তার পাশে একটা দোকানে ভিড় জমিয়াছিল। শচীনবাবু শুনিলেন, উচ্চকণ্ঠে এক জন সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন, অন্য সকলে শুনিতেছে। সংবাদ গুরুতর, ভারতের নেতৃবৃন্দ একসঙ্গে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কংগ্রেস-পরিকল্পিত বিপ্লব সুরু হইবার পূর্ব্বেই তাহা দমনের জন্য এই প্রয়াস। শচীনবাবু ব্যথিত হইলেন, কেন তাহা বলা যায় না। নেতৃবৃন্দ ত জীবনের অর্দ্ধেকই কারাগারে কাটাইয়াছেন, কোন দিনও সেজন্য তিনি বেদনাবোধ করেন নাই। আজ কেন যেন রহিয়া রহিয়া অন্তরটা কাঁদিয়া উঠিতেছে—কোন্ অনাগত ভবিষ্যতের ইঙ্গিতে।

পরদিন সকালবেলা শচীনবাবু বিষণ্ণ মনেই বসিয়াছিলেন, সংবাদপত্রটি বার বার পড়িয়া ক্রমেই অধিকতর বিষণ্ণ হইতেছিলেন। যারা দেশপ্রেমের অপরাধে এদের বন্দী করিয়াছে তাহারাই ত দেশপ্রেমের জন্য ঢিঁঢোরা জুড়ে দেয়, তাহারা কি এই ত্যাগের মূল্য জানে না? এই নীরব নির্ভীক বীরদের কোন পুরস্কার দিবে না—

সত্য আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, আশীর্ব্বাদ করুন, সার।

—সে ত, সব সময়ই করছি।

—হ্যাঁ, আশীর্ব্বাদ করুন, যদি বেঁচে থাকি, স্বাধীন ভারতে আবার দেখা হবে। শচীনবাবু অবাক বিস্ময়ে সত্যর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার মুখে দৃঢ় সংকল্পের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, শক্তিদীপ্ত অন্তরের তেজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সরল সুন্দর নিরীহ মুখচ্ছবির মাঝে আজ এ দুর্জ্জয় সঙ্কল্পের ছবি কেমন করিয়া ভাসিয়া উঠিল।

সত্য হাসিয়া কহিল, আপনার আশীর্ব্বাদে আমরা জয়ী হব।

শচীনবাবু কথা বলিতে পারিলেন না। বার বার সত্যকে দেখিতে লাগিলেন—নিরীহ এই ছেলেটির অন্তরে এমনি দুর্জ্জয় সাহস কোথায় লুকাইয়া ছিল।

সত্য বলিল, আপনি কিছু বলছেন না?

—কি বলব তাই ভাবছি। তুমি তোমার বাবার কাছে শুনেছ?

—শুনেছি। তিনি বললেন, তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, এখন তোমরা যদি এই পথ বেছে নাও তবে আমার কি বলবার আছে। আপনার আশীর্ব্বাদ চাই আমরা—

শচীনবাবু বিষণ্ণ স্বরে কহিলেন, আশীর্ব্বাদ করি তোমরা জয়ী হও, কিন্তু তবুও কেন যেন মনে হয় সবই নিষ্ফল। নেতৃবৃন্দ কি চেয়েছিলেন তা তোমরা জান না, বিপ্লব কোন্ পথে চলবে তা জান না, তোমরা কি করবে?

সত্য কহিল, তাঁরা বন্দী, তাঁদের কণ্ঠরুদ্ধ, কিন্তু আমাদের ত একটা কিছু করতে হবে। নেতৃবৃন্দ বন্দী হলেন সমগ্র দেশ নির্ব্বাক ভাবে দেখলে, এতে কি গৌরব বৃদ্ধি হবে আমাদের? যা হয় কিছু করতে হবে।

—তুমি করবে?

—কারা করবে? শহরের ত সকলেই জেলে, কে করবে বলুন? আমার জ্ঞানবুদ্ধি মত যা পারি করব, কিন্তু যদি আপনাদের আশীর্ব্বাদ ও বুদ্ধি পেতাম, হয়ত কিছু কাজ হতে পারত। আপনি জানেন সার, শহরের সকলেই আপনাকে শ্রদ্ধা করে, আপনার ইঙ্গিত পেলে অনেকেই আজ কাজ করতে পারত—

শচীনবাবু ম্লান হাসিয়া কহিলেন, আমার ইঙ্গিত?

দলবিশেষের দ্বারা ঘরে বাইরে এই সংগ্রাম তোমরা ক'দিন চালাবে? সব দুঃখকষ্ট বিফল হয়ে যাবে যে...

—যায় যাক্, তবুও জাতির জীবনের এই সন্ধিক্ষণে কিরূপে ঘরে বসে থাকতে পারি? আপনি রইলেন, আশীর্ব্বাদ করবেন। ভগবানের নাম স্মরণ করে আজ চলেছি, দুঃখ-কষ্ট আমাদের যেন ব্যর্থ না হয়।

—আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের জয় হোক। তবে আমরা গতবিক্রম, নখদন্তহীন, আমরা দেখব ঘরে বসে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলব।

—আর সময় নেই আসি স্যর। সত্য শচীনবাবুর পদধূলি লইয়া চলিয়া গেল—

শচীনবাবুর মনটা বিষণ্ণ ছিল, সত্যর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আরও বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। সত্যদাসকে সহসা যেন বড় আপনার মনে হইল—তরুণ জীবনের সমস্ত স্বপ্নকে পিছনে ফেলিয়া আজ ও চলিয়াছে অপরিসীম লাঞ্ছনাকে বরণ করিতে। মনে মনে তিনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—

অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল সত্য কি এই কথাটাই জানাইবার জন্য এত দিন এমনি ভাবে নানা কথায় তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছে। সত্য ত চলিয়াছে—কোথায় কে জানে? হয়ত ফিরিবে, নয়ত ফিরিবে না।

আজ তাঁহার মনে পড়ে অতীতের একটি কাহিনী—বহু দিন আগে '৩০ সালের কথা। গ্রামের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের অক্লান্ত কর্ম্মী পাঠকদা'র বিদায়-দৃশ্যটি চোখের উপরে যেন ভাসিতেছে। লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের শেষভাগ—দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে, নিপীড়ন ও রাজরোষে কত লোক কত পরিবার নিঃসম্বল হইয়াছে। পাঠকদা এক দিন ম্লান হাসিয়া কহিলেন, আর ত বাইরে থাকা চলে না। যারা ছিল সব চলে গেছে, আর ত কর্ম্মী মেলে না, এখন আমার পালা। কাল সকালেই যাব। 'কোথায়'—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, শহরে, সেখানে গিয়ে গ্রেপ্তার হতে হবে। আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি এই সান্ত্বনা ত আমার থাকবে। এর চেয়ে বেশী পুরস্কার আর কি আশা করা যায়। স্বাধীন ভারতে যদি বেঁচে থাকি তবে মনে হবে, আমি সংগ্রাম করেছিলাম, আমি জয়ী হয়েছি। পাঠকদা বিপত্নীক, সংসারে দুই পুত্র ছাড়া কেহ নাই—

পর দিন সকালে সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করিয়া চাল-জল মুখে দিয়া তাঁহার ছোট দুটি ছেলেকে ডাকিলেন, তাহারা সামনে আসিয়া দাঁড়াইলে কহিলেন, পয়সা কি কিছু আছে রে?

পুত্রদ্বয় নীরবে একটি ছোট হাঁড়ি আনিয়া ধরিল। পাঠকদা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন, দুইটি পয়সা আছে।

—ঘরে চাল আছে রে?

—এ বেলার চাল আছে, তুমি যে তিন সের কাকে দিলে—

পাঠকদা তাঁহার কতুয়া গায়ে দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ছেলেদের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, চাল ক'টা এবেলা কেনা-ভাত রেঁধে খেয়ো। আর আমি একটি পয়সা নিয়ে গেলাম ঘাট পার হতে হবে। এই একটি পয়সা, আর উপরে ভগবানকে রেখে গেলাম, তোরা বেঁচে থাকিস। যদি ফিরি দেখা হবে—

পাঠকদা স্মিতহাস্যে শচীনবাবু ও পুত্রদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রওনা হইলেন। ছেলে দুইটি একটি পয়সা সম্বল সেই হাঁড়িটা কোলে করিয়া বসিয়া রহিল—যেন পৃথিবীর সমস্ত কালিমা কে তাহাদের মুখে মাখাইয়া দিয়াছে।

শচীনবাবুর চোখের সামনে আজও ভাসিয়া উঠে, জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম্য পথে পাঠকদা চলিয়া যাইতেছেন, একবারও বাস্তুভিটার দিকে, পুত্রদ্বয়ের পানে ফিরিয়া চাহিলেন না।

শচীনবাবুর অন্তর কাঁদিয়া উঠিল, এই ত্যাগ, এই সহিষ্ণুতা সবই ত ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। পাঠকদার সে বিদায়ের দৃশ্য মনে পড়িলে আজও চোখে জল আসে—

কিন্তু তাঁহার ছেলেরা বাঁচিয়া ছিল, পাঠকদা দুই বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। যে ভগবানের হাতে পুত্রদিগকে দিয়া গিয়াছিলেন তিনি তাহাদের রক্ষা করিয়াছেন। পাঠকদাও ফিরিয়াছিলেন, শচীনবাবু মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, যে ভগবান ঐ সাত বৎসরের নিরুপায় শিশু দুটিকে রক্ষা করিয়াছিলেন তিনিই যেন সত্যকেও রক্ষা করেন। সত্য জয়ী হোক, সত্য বেঁচে থাক্।

মীরা চা লইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, সত্য কি বলে গেল?

—কিছু না।

মীরা কাতরকণ্ঠে কহিল, না, আমার কাছে কিছু গোপন করো না। আমার মন বলছে কি যেন একটা অমঙ্গল হবে। সত্যি করে বল—

—সত্য স্বদেশী করতে যাচ্ছে, তাই প্রণাম করে গেল—

—তোমাকে কেন? ঐজন্যেই বুঝি তোমাদের সমিতি হয়েছে?

—না, সমিতি সাহিত্য আলোচনার জন্যে। তোমার ভয় নেই—

মীরা মিনতি করিয়া কহিল, না তুমি ওসবের মাঝে যেও না। আমি কেমন করে একা লাটুকে নিয়ে থাকব? সত্যি করে বল তুমি ওদের দলে নেই—

শচীনবাবু হাসিয়া বলিলেন, সত্যিই নেই। তোমাকে ছুঁয়ে বলতে পারি।

—মীরা চলিয়া গেল, কিন্তু শচীনবাবুর কথা বিশ্বাস করিয়াছে এমন মনে হইল না।

পরদিন শহরে হরতাল—সমস্ত হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের

কতক দোকানপাট বন্ধ। স্কুল বন্ধ, ছাত্রছাত্রী কেহ স্কুলে যায় নাই। শচীনবাবু সকাল সকাল স্কুল হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন।

তাহার পরদিনও স্কুলগুলিতে ছাত্রাভাব, কর্ত্তৃপক্ষ সাত দিন ছুটি দেওয়া স্থির করিয়া সেই মর্ম্মে বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন। শহরের সর্ব্বত্রই একটা উত্তেজনা চলিয়াছে, স্কুলের ছাত্র ও কয়েকজন যুবক নাকি পুলিশের মুখ হইতে সিগারেট কাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে, জনৈক দারোগার বিদেশী টুপী কাড়িয়া লইয়া চৌমাথা রাস্তার উপর বহ্ন্যুৎসব করা হইয়াছে। পুলিশই নাকি তাহাদের মতে দেশদ্রোহী, তাহাদের দেখিলে বিশ্বাসঘাতক, মীরজাফরের দল প্রভৃতি নানা বিশেষণে তাহাদিগকে নিরন্তর আপ্যায়িত করা হইতেছে।

স্কুল যখন হইলই না, তখন কিছু হিসাব-নিকাশের বাকী কাজগুলি সমাপ্ত করিয়াই যাইবেন স্থির করিয়া শচীনবাবু কাজে বসিয়া গেলেন। হিসাব মিলাইতে মিলাইতে বেলা প্রায় বারটা হইয়া গেল।—স্কুলের নয় অথচ মুখচেনা একটি যুবক আসিয়া প্রণাম করিল। শচীনবাবু কহিলেন, কি বাবা? কোন দরকার আছে—

—না, আপনাকে প্রণাম করতে এলাম।

—আমাকে কেন হঠাৎ—

—আমরা সত্যাগ্রহ করতে যাচ্ছি। মুন্সেফবাবুকে কাপড় পরে আদালতে যাবার কথা বলেছিলাম তিনি শুনলেন না, তাই রাস্তায় সত্যাগ্রহ করা স্থির হয়েছে। লাঠি চার্জ্জ হবে মনে হয়—তাই। আশীর্ব্বাদ করবেন, যেন সব সহ্য করতে পারি।

শচীনবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, কে কে?

—সত্যদা আর আমরা নয় জন।

শচীনবাবু কহিলেন, আশীর্ব্বাদ করি জয়ী হও।

ছেলেটির নাম নরেন, সে পুনরায় প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

শচীনবাবু বিমনা অবস্থায় পুনরায় কাজে মন দিবেন এমনি সময় বাহিরে সহসা কাহারা হাঁকিল—বন্দে মাতরম্।

শচীনবাবু কলম রাখিয়া বাহিরে আসিলেন এবং উৎসুক ভাবে মোড়ের নিকটে পোষ্টাপিসের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন। অদূরে মুনসেফবাবু আসিতেছেন, মোড়ের উপরে জনৈক দারোগা কয়েকজন কনেষ্টবল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

যুবকগণ জয়হাস্য ধ্বনি করিতেছে—বন্দে মাতরম্।

মুনসেফ বাবু আসিয়া পড়িলেন—এক জন কি যেন বলিল, তিনি না শুনিয়াই অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে দশ জন সত্যাগ্রহী রাস্তার উপর শুইয়া পড়িল। মুনসেফবাবু বিপদ গণিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন—

দেখিতে দেখিতে দারোগার আদেশে, পুলিশ লাঠি চালনা করিল। অসহায় নিরস্ত্র প্রতিবাদহীন দেহের উপর তীব্রবেগে লাঠি আসিয়া পড়িতেছে—সত্যাগ্রহীর দেহ তীব্র-তর, অসহনীয় বেদনায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে বুটের লাথি। আঘাত সহনাতীত হইয়া উঠিল, দেহগুলি যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া বুটের আঘাতে দুই ধারের নয়নজুলির পঙ্কিল জলের মধ্যে গিয়া পড়িল।

রাস্তা পরিষ্কার হইয়াছে—মুনসেফবাবু অন্য পথে চলিয়া গেলেন। কর্ম্মসমাপনান্তে পুলিশবাহিনীও একটু সরিয়া গেল—

সত্য তাহার সহচরগণসহ রক্তাপ্লুত কর্দ্দমাক্ত দেহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঁকিল—বন্দে মাতরম্।

সকলে হাঁকিল—বন্দে মাতরম্।

শচীনবাবু অশ্রুপূরিত চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন—কেমন করিয়া তরুণ প্রাণগুলি এই অত্যাচারকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল।

সামনে যাইতেছে সত্য। তাহার কপাল বাহিয়া তখনও ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়িতেছে, পিছনের কয়েকজনের জামা কাদায় ও রক্তে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

সত্য হাঁকিল—স্বাধীন ভারতে অত্যাচারীর···

সকলে হাঁকিল—বিচার হবে। বিশ্বাসঘাতকের···বিচার হবে। দেশদ্রোহীর···বিচার হবে—বন্দে—মাতরম্ বন্দে—মাতরম্।

শহরের রাস্তা বাহিয়া তাহারা উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি করিতে করিতে চলিয়া গেল।

শচীনবাবুর অন্তর থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল—সত্য তোমার এই রক্তক্ষরণ এ কি ব্যর্থ হইবে! না জানি কত বেদনায় উহারা হাঁকিতেছে,'বন্দে মাতরম্' এই দুঃখ, এই লাঞ্ছনা এর কি কোন পুরস্কার নেই—সশ্রমজীবন কারাবাস ব্যতীত?

শচীনবাবুর চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছিল, অশ্রু মুছিয়া তিনি পথ চলিতে লাগিলেন কিন্তু বার বার মনে পড়িতেছিল সত্যর রক্তাপ্লুত মুখখানি, আর বীর-কণ্ঠের ধ্বনি 'বন্দে মাতরম্' —দেশদ্রোহীর বিচার হবে···

ক্রমশঃ

পুলিনবিহারী দাস

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব-ভাবিতঃ॥

অদ্বিতীয় যষ্টি-পরিচালনদক্ষ বীর পুলিনবিহারী দাস গত ২রা ভাদ্র অপরাহ্নে ছাত্রদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে বকীয় ব্যায়াম শিক্ষাগারের দিকে যাচ্ছিলেন; অকস্মাৎ তাঁর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত হয়। ব্যায়াম-'শিক্ষাগারের কথা ভাবতে ভাবতে, আততায়ীদিগের হাত থেকে জনগণকে রক্ষার কল্পিতোচিত ভাব-ভাবিত হয়ে বীর পুলিনবিহারী পরলোকগমন করলেন। এতদিন যে শিষ্যদের আনুগত্য ও বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করে শৃঙ্খলায় কার্য্যনির্ব্বাহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাদের পরিত্যাগ করে লোকান্তরিত দেশমাতৃকার সেবকদের পার্শ্বে গিয়ে যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করলেন।

জীবের জীবনের পরিণতি মৃত্যুতে—এ বিশ্বাস আমার নাই। বীরাগ্রগণ্য পুলিনবিহারী নিশ্চয়ই নব প্রেরণা দেবার জন্য অশরীরী মূর্ত্তিতে ঘুরে বেড়াবেন তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছে। দুঃখের বিষয় আমার দর্শন হ'ল না তাঁর সজীব মূর্ত্তি। তিনি বিদেহ মূর্ত্তিতে উপস্থিত আছেন জেনে নিমতলা শ্মশানে গিয়েছিলাম।

"প্রেমের বন্ধন রহে চিরন্তন, এ দেহ হোলেও ভস্মসাৎ।
নবীন প্রেরণা দিবার বাসনা, তাই রহিবে হে সাথ সাথ॥"

পুলিন দাস একদিনে হন নাই বীর পুলিন দাস; দেশমাতৃকার সেবকদের প্রেরণা ছিল তাঁর অন্তরে। তিনি নিজে লিখেছেন: "যেদিন শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউশন প্রথম স্থাপিত হয়, সেই দিনই আমি বঙ্গবিদ্যালয় হইতে নাম কাটাইয়া সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে ভর্ত্তি হই।... লোকের মুখে 'সিপাহী বিদ্রোহের' কথা শুনিয়া মন উতলা হইত।...

"বঙ্কিমবাবুর 'অনুশীলন' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াই আমি অনুশীলন সমিতি নামকরণ করিয়াছি।"

তাঁর, বিশেষ শিক্ষা ও দীক্ষা বিপ্লবী ব্যারিষ্টার পি. মিত্রের নিকট। মিত্রের বিশেষ প্রভাব ছিল যুবসমাজে। ইংরেজের নিন্দনীয় নীতির প্ররোচনায় যখন পূর্ব্ববঙ্গে রমণীদের উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়, তখন আমি লিখি:

"ঐ শোন কোলাহল অতীব ভীষণ
কিবা শত শত ক্রুদ্ধ কণীর গর্জ্জন।
অথবা লাঞ্ছিত সতীর সরোষ ক্রন্দন।
ছিল দেশে ঐ এক সতীত্ব রতন
তাও আততায়ীচয় দিবসে কাড়িয়া লয়
তবু কি ধৈর্য্যের সীমা না হয় লঙ্ঘন?
ভাঙিং বন্ধন-ডুলে বসি অতি কুতূহলে
প্রতিসারী নোটমূল্য গোণ বারবার
অথবা দিবস শেষে চাতাল উপরে বসে
উঠাও সেতার-তারে মধুর ঝঙ্কার।
ছেঁড় সেতারের তার আলস কর পরিহার
রক্ষা কর সতীদেরে করি প্রাণপণ।
বীর মরে একবার স্বর্গেতে করে বিহার।
ভয়ে কাপুরুষ মরে ক্ষণে ক্ষণ-ক্ষণ॥

পুলিনবিহারী দাস

আততায়ীদের বিনাশের ব্যবস্থা করতে হবে—পি. মিত্র মশায় বললেন টাকা এনে দিতে। টাকা এনে দিই।

আততায়ীরা লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হবে কল্য প্রভাতে। কুমিল্লার রমণীবৃন্দ জড়ো হয়েছেন এক বাড়ীতে বঁটি-দা প্রভৃতি অস্ত্র সম্বল নিয়ে। প্রভাতে আরম্ভ হয় লুণ্ঠন। এক দ্বি-তলের উপর হতে শব্দ হয়—গুড়ুম। লুণ্ঠনকারীর সর্দ্দারের পতন; লুণ্ঠনকারীদের পলায়ন। সকলেই জানে কে গুলি করেছে; কেহই আদালতে সাক্ষ্য দেয় না। সেসন জজ পাঠান মোকদ্দমার কাগজপত্র কলিকাতার হাইকোর্টে। হত্যাকারী

হাইকোর্টে উপস্থিত ; যদি নির্দোষের শাস্তি হয়, আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু সাক্ষীর অভাবে বেকসুর খালাস।

আমাদের মন্ত্রণাগৃহ ছিল সুকিয়া ষ্ট্রীটের এক নিভৃত কক্ষে। পুলিশ কমিশনার সর্ব্বদাই খোঁজ নিত আমার—"How is that terrorist doctor?"—সন্ত্রাসবাদী ডাক্তারের বাড়ী ঘিরে থাকত ১০।১২ জন গোয়েন্দা। বাহির থেকে শুনত তারা কেবল কীর্ত্তন ও স্তোত্রের কোলাহল। সেই বাড়ীতে যেতেন রাত্রে বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি। দেশবন্ধুও মাঝে মাঝে যেতেন। বিপিনচন্দ্রের উপর ভার ছিল এসব ঘটনা গুছিয়ে প্রকাশ করবার।

একদিন আমার বাড়ীটা কেঁপে উঠে ভীষণ শব্দে। দোতলা থেকে নীচে গিয়ে দেখি শ্রীহট্টবাসী রাধাকিশোর সিংহকে। জিজ্ঞেস করি কিসের এ ভীষণ শব্দ। রাধাকিশোর বলে, দেশলাই প্রস্তুত করার সময় এই শব্দ হয়েছে। নিকটে ছিল শিবনারায়ণ দাসের গলিতে "সন্ধ্যা" পত্রিকার অফিস। এলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। সব যন্ত্র-পত্র নিয়ে গেলেন; আর রাধাকিশোরের মস্তকমুণ্ডনপূর্ব্বক বৈষ্ণব সাজিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেন শ্রীবৃন্দাবনে।

এটাই ছিল যুগধর্ম্ম। সেই যুগের এরূপ বহু ঘটনা স্মৃতিপথে উদয় হচ্ছে। সেই যুগেই পুলিনবিহারীর মত বিপ্লবী বীরের জন্ম সম্ভব হয়েছিল। যুগের প্রয়োজনে তিনি নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে, দুষ্টের দমনে, শিষ্টের পালন-ব্রতে। আজীবন তিনি সেই ব্রত পালন করে গিয়েছেন। ঢাকায় ছিলেন তিনি বিপ্লবী নেতা; কলিকাতায় ছিলেন তিনি অনেকটা অজ্ঞাতবাসে। তাঁর ব্রতের সফলতা তিনি দেখে গিয়েছেন আংশিক। তাঁর দেশবাসী তা সম্পূর্ণ করবে।*

* বিগত ২৪শে আগষ্ট কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে পরলোকগত পুলিনবিহারী দাসের স্মৃতি-সভায় সভাপতির বক্তৃতা।

বাংলার লোকসংস্কৃতি—ব্রত ও উৎসব

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলার সংস্কৃতির একটা নিজস্ব ধারা, একটা বিশিষ্ট রূপ আছে। বাংলার তান্ত্রিকতা, বাংলার নব্য-ন্যায়, বাংলার পটচিত্র, বাংলার কীর্ত্তন-গান সবকিছুর মধ্যে এমনি একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্যত্র বিরল। সারা ভারতে বাংলাদেশই যে সাহিত্য সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়ে আছে সেটা একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। এর পেছনে রয়েছে একটা জাতির যুগযুগান্তরের সাধনা। বাংলা-দেশের উর্ব্বরা মাটিতে ভাবের ফসল অনায়াসেই ফলে। এখানকার জলে-স্থলে আকাশে-বাতাসে মিশে রয়েছে উচ্চ ভাব ও উন্নত আদর্শের বীজ। ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে আমরা দেখব, এখানকার পলিমাটিতে স্মরণাতীত কাল থেকে চলছে ভাবের চাষ। বাংলার নিরক্ষর লোক-সাধারণ সুদূর অতীতকাল থেকে গড়ে তুলেছে এক উচ্চাঙ্গের লোক-সংস্কৃতি। বাংলার এই বিশিষ্ট সংস্কৃতিরই প্রকাশ তার লোক-সাহিত্যে, যাত্রাগানে, কথকতায়, কবিগানে, তার ছড়া-পাঁচালীতে, রায়বেঁশে প্রভৃতি লোক-নৃত্যে আর বারো মাসের তেরো পার্ব্বণে, বিবিধ ব্রত-উৎসবে।

বাংলার লোক-সংস্কৃতি যে কি অপরিমেয় ভাব-সম্পদে সমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোক-সাহিত্যে' সে বিষয়ে আমাদের সচেতন করবার প্রয়াস পেয়েছেন। বাংলার অশিক্ষিত আউল-বাউলের গানে দেহতত্ত্ব আর আত্মতত্ত্বের কথা কেমন সহজ সরল সাবলীল ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে সে বিষয়েও তিনি আমাদের চোখ ফুটিয়ে গেছেন। বস্তুতঃ বাংলার লোক-সাহিত্য বাঙালীর একান্ত নিজস্ব ও পরম গৌরব জিনিষ।

বাংলার খাঁটি প্রাণধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যাবে না শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রচিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে। এমন কি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর সংস্কৃত-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যেও বাংলার সেই প্রাণসত্তাকে সন্ধান করতে গেলে আমরা ব্যর্থ-মনোরথ হব। বাংলার প্রকৃত স্বরূপকে জানতে হলে, তার আত্মার পরিচয় পেতে হলে আমাদের জাতীয় জীবন-প্রবাহের আদি উৎসের সন্ধান করতে হবে। বাংলাদেশের লোক-সাহিত্যের ধারাটি অনুসরণ করে আমাদের পেছন ফিরে চলে যেতে হবে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে যখন সংস্কৃতের প্রভাবমুক্ত অল্পশিক্ষিত কবিগণ রচনা করেছিলেন ময়নামতীর গান, গোরক্ষবিজয়, শূন্যপুরাণ, চণ্ডী ও মনসাদেবীর আদিগান, রূপকথা, ডাক ও খনার বচন। এই সমস্ত গান গাথা এবং ছড়ার ভাষার সঙ্গে আজকের বাংলা সাহিত্যের ভাষার আকাশ-পাতাল পার্থক্য দাঁড়িয়ে গেছে সত্য, কিন্তু এই লোক-সাহিত্য তো ধার করা জিনিষ নয়। জাতির প্রাণকেন্দ্র থেকে স্বতঃ উৎসারিত এই সাহিত্য-রসধারা আজও দেশের মাটির বুকে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবহমান।

বাংলার লোক-সংস্কৃতির আর একটি বিশিষ্ট ধারার বিকাশ

দেখতে পাই তার ব্রত-উৎসবে। বাংলার ব্রত-উৎসব এক দিকে যেমন বাঙালীর জীবনকে আনন্দে মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ করে তুলেছে অন্যদিকে তেমনি বাংলা লোক-সাহিত্যকেও বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, চণ্ডী, পুণ্যিপুকুর, যমপুকুর, সেঁজুতি, তুষু, ইতু প্রভৃতি বিভিন্ন ব্রতকে উপলক্ষ্য করে লোকের মুখে মুখে রচিত হয়েছে কত সুন্দর সুন্দর ব্রতকথা, কত বিচিত্রমধুর ছড়া। এই ব্রতেরই অঙ্গ হিসাবে বাংলার মেয়েদের নিপুণ হাত দিয়ে বেরিয়েছে লোকশিল্পের অন্যতম নিদর্শন আলপনা-শিল্প। ব্রতকথার অন্তর্ভূত ছড়াগুলোর মধ্যে আমরা শুনতে পাই বাংলার মেয়েদের অন্তরের নিগূঢ় কথা। যেমন পুণ্যিপুকুর ব্রতে আছে :

এ পূজলে কি হয়,
নির্ধনীর ধন হয়,
সাবিত্রী সমান হয়
স্বামী আদরিণী হয় ;
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে
মরণ যেন গঙ্গাজলে।

সাবিত্রীতুল্য সতীলক্ষ্মী আর স্বামীসোহাগিনী হওয়া এবং স্বামী-পুত্র রেখে সধবা অবস্থায় মৃত্যুর চেয়ে বড় কাম্য যে বাংলার বধূর আর কিছুই নেই তারই আন্তরিকতাপূর্ণ অভিব্যক্তি এই ছড়াটিতে।

ধর্ম্মকে কেন্দ্র করেই যুগে যুগে ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নব নব রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাণ আধ্যাত্মিকতা। এদেশের লোক-মানস চিরকাল ধর্ম্মের আহ্বানে যে ভাবে সাড়া দিয়াছে, তেমনটি আর কিছুতেই দেয় নি। পরম তত্ত্বের সন্ধানে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন সেই সব মহাপুরুষের অমরবাণীই এদেশের আপামর সাধারণের মনকে বিচিত্র ভাবে আন্দোলিত করেছে। একথা ভুললে চলবে না যে, ভারতের জাতীয় জীবনের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত তার আধ্যাত্মিকতার মধ্যে।

এই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাই এক অভিনব রূপে, অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হয়েছে বাংলাদেশে। এই আধ্যাত্মিকতাই কখনো তন্ত্রোপাসনাকে আশ্রয় করে, কখনো বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভেতর দিয়ে, আর সহজিয়া ধর্ম্মকে অবলম্বন করে বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে সার্থকতালাভের প্রয়াস পেয়েছে। বাংলার প্রায় সমস্ত উৎসব ধর্ম্মানুষ্ঠানেরই অপরিহার্য্য অঙ্গ। ধর্ম্মকে মর্ম্মমূলে প্রতিষ্ঠিত না করলে এখানকার লোক-সাধারণ কোনো উৎসবকেই সার্থক বলে মনে করে না। উৎসবের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদির ভেতর দিয়ে উন্নত আধ্যাত্মিক আদর্শ সমাজের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়ে সমাজ-জীবনকে বিশোধিত এবং বাংলার লোক-সংস্কৃতিকে পুষ্ট করে আসছে।

আধুনিক নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতার মধ্যে বাংলার জাতীয় জীবনের মর্ম্মকোষে সঞ্চিত মধুর সন্ধান পাওয়া যাবে না। সভ্যতাভিমানী, শহরবাসী আমাদের অনেকের মনে চিরাচরিত ধর্ম্মানুষ্ঠান আর ব্রত-উৎসবকে কুসংস্কার বলে অবজ্ঞা করবার প্রবণতা বিদ্যমান। কিন্তু শহরের দূষিত আবহাওয়ায় তো জাতীয় সত্তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে না। জাতির ক্ষীণ হৃৎপিণ্ড আজও ধুকধুক করছে বাংলার শ্যামল পল্লীতে যেখানে গৃহস্থ-পরিবারে নিত্য অনুষ্ঠিত হয় গৃহ-দেবতার পূজা-অর্চনা, বিভিন্ন ব্রত-উৎসব উপলক্ষ্যে যেখানকার আকাশ-বাতাস আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে।

বঙ্গপল্লীর সম্পন্ন পরিবারে এই প্রাত্যহিক পূজানুষ্ঠানে সাত্ত্বিকতার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে একটা রাজসিক ভাব। সেখানে ঠাকুরঘরে স্বর্ণ-অথবা-রৌপ্য-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন প্রস্তর কিংবা ধাতুনির্ম্মিত দেব-বিগ্রহ। মাথার উপরে তাঁর হেমছত্র, পাদপীঠে পুষ্পপাত্র আর পঞ্চপ্রদীপ। কুল-পুরোহিত নিত্য সকাল-সন্ধ্যায় এসে দেবতার পূজা করেন—চাল, কলা, ফলমূল, মিষ্টদ্রব্য, দুধ ইত্যাদি দেবতাকে নৈবেদ্যস্বরূপ দেওয়া হয়। শঙ্খ বাজে, বাজে ঘণ্টা-কাঁসর, সঙ্গে সঙ্গে করতালের মধুর নিক্বণে পূজামণ্ডপ মুখরিত হয়ে ওঠে। সেই মিশ্র ধ্বনিতে ভক্তমণ্ডলীর হৃৎপিণ্ড দ্রুত তালে স্পন্দিত হতে থাকে। এই প্রাত্যহিক পূজারতি মনুষ্য-জীবনের চরম সার্থকতা যে ধর্ম্মানুষ্ঠানে সে কথাই গৃহস্থকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

গৃহদেবতার এই প্রাত্যহিক অর্চনা ছাড়া হিন্দু-সমাজে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতীপূজা, কার্ত্তিকপূজা, জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, ঝুলনযাত্রা প্রভৃতি কত যে পূজা-পার্ব্বণ এবং ব্রত-উৎসব প্রচলিত আছে তার আর অন্ত নেই। শেষোক্ত চারিটি বৈষ্ণব পরব—কৃষ্ণলীলার সহিত বিজড়িত আর দুর্গা এবং কালীর উপাসকেরা হচ্ছেন শাক্ত।

"বার মাসে তের পার্ব্বণ" বাঙালী হিন্দুর সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্য। সারা বৎসর ব্রত উৎসব বাংলাদেশে লেগেই আছে। বাংলার পল্লীর আজ দুঃখদুর্দ্দশার অন্ত নেই, তা সত্ত্বেও কিন্তু বাংলার লোক-সাধারণ তাদের জাতীয় জীবনের পরম সম্পদ ব্রত-উৎসবসমূহকে আঁকড়ে ধরে আছে। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে আজও বিপুল সমারোহে বিভিন্ন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবাদি উপলক্ষ্যে পল্লীলক্ষ্মীর ম্লান মুখখানি দিন কয়েকের জন্যে প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শহরেও উৎসবের অনুষ্ঠান আমরা করি বটে, কিন্তু 'এহ বাহ্য'—তাতে থাকে না স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের অভিব্যক্তি আর আন্তরিকতার স্পর্শ। বাহ্যিক জাঁকজমক প্রদর্শনই সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে।

বৈশাখে শুভ বর্ষারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য যখন মেষরাশিতে প্রবেশ করেন তখন থেকেই শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়েই সুরু হয় বিবিধ পুণ্যকর্ম্ম, পূজা-পার্ব্বণ আর

ব্রত-উৎসবের অনুষ্ঠান। বহু পুণ্যকৃত্যের স্মৃতিবিজড়িত গঙ্গা-যমুনা সরস্বতী গোদাবরী, ব্রহ্মপুত্র করতোয়া প্রভৃতি নদীতে পুণ্যকামীদের তীর্থস্নানের ধুম পড়ে যায়। বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে পল্লীবধূরা বৈশাখের শেষভাগে দেবতা-স্থান বলে পূজিত বটবৃক্ষতলে সমবেত হয়ে কতকগুলো ক্রিয়া-কর্মের অনুষ্ঠান করেন এবং বৈধব্যের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে উক্ত বৃক্ষের অধিষ্ঠাতা দেবতার নিকট আন্তরিকতার সহিত প্রার্থনা করেন।

আত্মীয়-কুটুম্বদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ়তর করবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এমন কতকগুলো উৎসব অনুষ্ঠিত হয় যার সঙ্গে পুরোহিত-সম্প্রদায়ের কোনো সম্বন্ধ নেই—যার মূলে নেই কোনো ধর্মগত সংস্কার। জামাই ষষ্ঠী সেগুলোর অন্যতম। জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে এই উৎসব প্রতিপালিত হয়। শাশুড়ীরা সেদিন নিজ-বাটিতে জামাতার আগমন প্রতীক্ষা করেন। বাঙালী শাশুড়ীর কাছে জামাইয়ের চেয়ে নিকটতর এবং প্রিয়তর আর কোন্ আত্মীয় আছে? জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে জামাতা যখন শ্বশুরালয়ে আগমন করেন তখন সে পরিবারে আনন্দের ফোয়ারা যেন সহস্রধারায় উৎসারিত হয়ে ওঠে।

আষাঢ় মাসের প্রধান উৎসব হ'ল রথযাত্রা। রথোপরি কৃষ্ণ বলরাম আর সুভদ্রার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করে শোভাযাত্রা সহকারে রথ টেনে নেওয়া হয়।

শ্রাবণ মাসের প্রধান উৎসব হচ্ছে নাগপঞ্চমী বা মনসা-পূজা। মনসার কোপে চাঁদ সওদাগরের ভাগ্যবিপর্য্যয়, সর্পাঘাতে চাঁদের পুত্র লক্ষীন্দরের মৃত্যু এবং সতীসাধ্বী বেহুলার চেষ্টায় তার পুনর্জ্জীবন লাভ, এই আখ্যান নিয়ে দ্বিজ বংশীদাস, বিজয় গুপ্ত প্রমুখ কবিদের রচিত পদ্মপুরাণ গোটা শ্রাবণ মাস জুড়ে পূর্ব্ববঙ্গের ঘরে ঘরে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সুর-তান-লয়ে গীত হয়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মনসার ভাসান উপলক্ষে বাচখেলার ধুম পড়ে যায়

ভাদ্রমাসের অষ্টমী তিথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব দিবস। জন্মাষ্টমী পরব উপলক্ষে বহু ভক্তিমতী বাঙালী নারী সারাদিনব্যাপী উপবাস করেন। দেবমন্দিরে বালগোপালের মূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে বাংলার মায়েরা সেদিন স্মরণ করেন মাতা যশোমতীর মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-ব্যাকুলতার কথা। কত নিঃসন্তান বাঙালী নারীর সন্তান-বাৎসল্য বালগোপালের মূর্ত্তিকে আশ্রয় করে সার্থকতালাভের প্রয়াস পায়।

গোপালের প্রতি যশোদার স্নেহকে উপলক্ষ্য করে রচিত পল্লীকবিদের কত গান বাংলা লোক-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলার বৈষ্ণবী যখন খঞ্জনী বাজিয়ে মধুর কণ্ঠে গান ধরে—"

"শুন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ—
দেখা দিয়ে গোপাল কোথায় লুকালে?

তখন বাংলার মায়েদের মর্ম্মস্থল যেন গভীর ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে—চোখে নামে তাঁদের অশ্রুর প্লাবন।

আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠিত হয় শুধু বাঙালীর নয়, সমগ্র-ভারতের হিন্দুজাতির সর্ব্বপ্রধান উৎসব দুর্গাপূজা। দেবীপক্ষে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিনটি তিথিতে পূজা হয়। আনন্দ-ময়ীর আগমনে দেশ আনন্দে ছেয়ে যায়। সারা বাংলার নরনারী এই তিন দিন আনন্দ-সায়রে অবগাহন করে ধন্য হয়। বিজয়া দশমীতে বিসর্জ্জনের পর বিষাদের কৃষ্ণ মেঘে বঙ্গপল্লীর সুনীল আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। পূর্ব্ববঙ্গের পল্লী-গ্রামে প্রতিমা বিসর্জ্জনান্তে—"মাকে ভাসাইয়া জলে কি লইয়া বঞ্চিব ঘরে, ছাইড়া যাইতে বিদরে পরাণ গো অভয়া—" এই করুণ সঙ্গীত গাইতে গাইতে সবাই ঘরে ফিরে আসে।

দশমীতে দেবীর বিসর্জ্জনের পর বাংলার ঘরে ঘরে যে বিষাদের ছায়া পড়ে তা কেটে যায় যখন সমাগত হয় কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা তিথি। পূর্ণচন্দ্রের বিমল কিরণে দশদিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পল্লীগ্রামে আবালবৃদ্ধবনিতা সেদিন পুণ্যসঞ্চয়ের আশায় সারা রাত জেগে কাটায়। ঘরে ঘরে হয় লক্ষ্মীদেবীর আবাহনের আয়োজন। গৃহের অন্দর-অঙ্গন শ্রীমণ্ডিত হয়ে ওঠে গৃহলক্ষ্মীদের সযত্ন-রচিত আলপনায়। বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে প্রতিবেশীর বাগান থেকে ফলমূল, ক্ষেত থেকে তরিতরকারি এবং বাড়ী থেকে হাঁস পায়রা ইত্যাদি চুরি করে এনে সকলে মিলে রেঁধে খাওয়ার রেওয়াজ আছে। এক দল ছেলে মুখোশ পরে সং সেজে বাড়ী বাড়ী রংতামাসা দেখিয়ে বেড়ায়। অন্যেরা নদীতীরে বা পল্লীপ্রান্তরে সমবেত হয়ে হৈ-হল্লায় জ্যোৎস্নাপুলকিত নৈশ আকাশকে মুখরিত করে তোলে। বৃক্ষনিবিড় শুনবিজন গ্রামপথে পড়ে পল্লী-লক্ষ্মীর স্বহস্তে আঁকা আলনার মত গাছপালার বিচিত্র রেখাঙ্কিত ছায়া। এই ছায়াঙ্কিত পল্লীপথ দিয়ে লক্ষ্মীদেবী নাকি বাংলার গৃহলক্ষ্মীদের কুটিরপ্রাঙ্গণে গিয়ে হাজির হন।

কার্ত্তিক মাস উৎসবের মাস। দুর্গাপূজার পর অমাবস্যা তিথিতে হয় কালীপূজা। এর সঙ্গেই আসে দীপালি উৎসব। রাত্রিবেলা মেয়েরা কলাগাছের খোলায় করে নদী অথবা পুকুরের জলে ভাসিয়ে দেয় জলন্ত মাটির প্রদীপ। ঘোর অন্ধকারের বুকে ঐ সকল ভাসমান দীপশিখা এক অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করে।

দীপালি উৎসবের পরবর্ত্তী দ্বিতীয়া তিথিতে হয় ভাইফোঁটা বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসবের আয়োজন। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান দ্বারা ভাইবোনের স্নেহবন্ধনকে দৃঢ়তর করা এই উৎসবের উদ্দেশ্য। হিন্দুদের বিশ্বাস যে, যমের বোন্ যমুনা যমকে এই তিথিতে ফোঁটা দিয়েছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে ভাইফোঁটার অনেক-

ভলো সুন্দর সুন্দর ছড়া প্রচলিত আছে। পিঁড়িতে উপবিষ্ট ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে বোন যখন বলে—

"স্বর্গে হুলুস্থুল মর্ত্তে (মর্ত্যে) জোকার (হুলুধ্বনি)
না যাইও ভাই যমদুয়ার,
যমদুয়ারে দিয়া কাঁটা
বোনে দেয় ভাইয়েরে ফোঁটা।"—তখন কি গভীর আন্তরিকতার সুরই না তার কণ্ঠে বেজে ওঠে। বাঙালীর উৎসব তো শুধু মর্ত্যের উৎসব নয়। স্বর্গে মর্ত্যে যে নিগূঢ় সম্বন্ধ বিদ্যমান সেকথা স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে বাংলাদেশের সকলের মনে বদ্ধমূল। সেজন্যে বাঙালীর ঘরে যখন উৎসবের সাড়া পড়ে। তখন শুধু যে মর্ত্যে হুলুধ্বনি হয় তা নয়, স্বর্গেও হুলস্থুল পড়ে যায়।

বাংলাদেশের আর একটি সর্ব্বজনীন প্রধান উৎসব হচ্ছে পৌষ মাসে অনুষ্ঠিত পৌষ পার্ব্বণ বা মকর সংক্রান্তি। এ উৎসব দুর্গাপূজার মত ব্যয়সাপেক্ষ নয়। চাষাভুষো মুটে মজুর থেকে লক্ষপতি পর্য্যন্ত সকল বাঙালীই এ উৎসব প্রতি-পালন করে। আসলে এটা হচ্ছে কৃষিকর্ম্মের সহিত সম্পর্কিত উৎসব। মনে হয় চাষীরাই প্রথম এ উৎসবের প্রবর্ত্তন করেছিল, ক্রমে এটা সর্ব্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে।

পৌষের শেষে চাষীদের ফসল কাটা শেষ হয়ে যায়। তাই পৌষের শেষ দিন এবং পরের মাসের দু'একটা দিনকে তারা উৎসবানন্দ উপভোগ দ্বারা মধুময় করে তোলে। সেদিন হরেকরকমের পিঠে খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। এই উৎসবেও পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না।

পূর্ব্ববঙ্গে এই উৎসবের আনুষঙ্গিক হিসাবে হয় 'ভেড়া ঘর পোড়া' নামক অনুষ্ঠান। পল্লীর ছেলেরা মাঠের মধ্যে খড় দিয়ে একটি ঘর (ভেড়াঘর) বানিয়ে সেখানে সারা রাত কাটায়। রাত্রে তারা নিজেদের গাঁয়ের এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের ক্ষেত থেকে আঁটি আঁটি ডগলো খড় সংগ্রহ করে সেই ঘরে এনে গাদা করে রাখে। মেয়েরা রাত জেগে তৈরি করেন হরেকরকমের পিঠে। পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পল্লীর ছেলেবুড়ো সকলে স্নান করে মাঠের মধ্যে ভেড়াঘরের নিকটে এসে জমায়েৎ হলে পর তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পৌষের প্রচণ্ড শীতে সদ্যস্নাতদের পক্ষে সেই অগ্নিসেবন বিশেষ আরামদায়ক। ভেড়াঘর ভস্মে পরিণত হলে পর সবাই নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যায়—তখন সুরু হয় ঘরে ঘরে পিঠে খাওয়ার পালা।

পিষ্টক ভোজনের পর গ্রামবাসীরা খোল-করতাল সহ-যোগে কীর্ত্তন গাইতে গাইতে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে।

মাঘ মাসে হয় সরস্বতী পূজা, ফাল্গুনে দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ছেলেবুড়ো সবাই মেতে উঠে রঙের খেলায়, চৈত্রে চড়কপূজায় বাংলার পল্লী নৃত্যগীতে আর আনন্দ-কলরবে মুখরিত হয়ে ওঠে—শিব আর পার্ব্বতীর নৃত্যে ফুটে ওঠে বাংলার লোকনৃত্যের একটি বিশিষ্ট রূপ।

বাংলাদেশের অধিকাংশ ব্রত-উৎসবই হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। বাংলার লোক-সংস্কৃতির একটা প্রধান দিক গড়ে উঠেছে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মকে আশ্রয় করে। কুসংস্কার মনে করে আমরা যদি আমাদের জাতীয় জীবনের প্রাণকেন্দ্র থেকে স্বতঃউৎসারিত এই সমস্ত ব্রত-উৎসবের উপর বিরূপ হয়ে উঠি তা হলে জাতির জীবন থেকে আনন্দের একটি অনাবিল ধারা হবে অবলুপ্ত এবং আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে এই অবজ্ঞা ও উপেক্ষা যে কত বড় অন্তরায়-স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে তা বলে শেষ করা যায় না।*

* অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো, কলিকাতা কেন্দ্রে কথিত এবং বেতার-কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত।

এই রাতে

শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়

আজও মায়া নামে নিকল চোখে রাতের বাতাসে ভেসে,
দেবতার রয় কঠিন প্রহরী স্বপ্নের দ্বারে দ্বারে,
আজও দেখি আমি কালো আঁখিতারা নির্জ্জন পরিবেশে
আপন জ্যোতিতে জ্বলে জ্বলে ওঠে কুণ্ঠিত অভিসারে।

দিনের পৃথিবী বোবা হয়ে যায় রাতের নিস্পেষণে
পাকস্থলীর আবেদন ফোটে বুকের বেদনা হয়ে;
লোলুপ কণ্ঠে সুর বেজে ওঠে মর্ম্মর-গুঞ্জনে
স্নায়ুর শ্রান্তি বিহ্বল রসে অলক্ষ্যে আসে বয়ে।

মনে পড়ে যায় আজও বেঁচে আছি, আমি আর তুমি প্রিয়ে,
যত সূর্য্য যতই পোড়াক দিনের কদর্য্যতায়—
আজও আসে রাত শিথিল বসনে অস্ত্র উত্তরীয়ে
আজও আছে প্রেম, ঘুমের বিলাস স্তব্ধ নির্জ্জনতায়।

যুদ্ধোত্তর জার্ম্মান চিন্তাধারার একটি দিক

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্ম্মানীর যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার সঠিক বিবরণ কখনও প্রকাশিত হবে কিনা তা বলা কঠিন। আমি সম্প্রতি ব্রিটিশ এবং মার্কিন অধিকৃত জার্ম্মানীর কয়েকটি মাত্র শহরেই যে ধ্বংসলীলার নিদর্শন দেখেছি তাতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, ঐ ক্ষতির পরিমাণ অঙ্ক কষে বার করা স্বয়ং আইনষ্টাইনের পক্ষেও সম্ভবপর নয়। ঐ ধ্বংসকাণ্ডে লোক যে কত মরেছিল তার ইয়ত্তা নাই। ১৯৪৩ সনের জুলাই মাসের শেষ ভাগে এক-মাত্র হামবুর্গ শহরেই প্রায় সপ্তাহব্যাপী যে অবিশ্রাম বোমা-বর্ষণ হয়েছিল তাতে ঐ শহরের হাজার হাজার বাড়ী ভেঙে পড়ে এবং ৪১ হাজারেরও অধিক লোক প্রাণ হারায়। অটো ক্রকমার নামক হামবুর্গের একজন জার্ম্মান রাসায়নিক দ্রব্য-ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা জন্মে। তিনি বললেন যে, তখন ২০ মাইল দূরে অবস্থিত তাঁর পল্লীভবনে গ্রীষ্মকালের আলোকোজ্জ্বল দ্বিপ্রহরেও আলো জ্বেলে তাঁদের ঘরকন্নার কাজ করতে হ'ত। কারণ শহর ও শহরতলীর ছাই ও ধোঁয়াতে সারা আকাশ অনেকদিন যাবৎ অমাবস্যার রাত্রির মত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে ছিল। অটো ক্রকমারের কুড়ি-বাইশ বৎসর-বয়স্ক পুত্র হানস পিতার আপিসেই কাজ করে। সেও আমার খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল। সে বলত স্কুলে পড়ার সময়েই তাকে যুদ্ধে যেতে হয়। মাঝে মাঝে হিটলার ও অন্যান্য নাৎসী নেতারা হামবুর্গে এসে গরম গরম বক্তৃতা দিতেন। হানস সে সব সভায় উপস্থিত থাকত। তার কাছে শুনলাম যে, হামবুর্গের ২০।২২ মাইলের মধ্যেই একটি 'কন-সেনট্রেশন ক্যাম্প' ছিল, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার আগে তারা আদৌ তার অস্তিত্বের কথা জানত না। শুধু ইহুদীদেরই নয়, যে সব জার্ম্মান যুদ্ধের বিপক্ষে বা হিটলারের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলত, নাৎসী গুপ্ত-চরেরা টের পেলেই তাদের ঐ সব ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে আটক রাখত। ঐ সব ক্যাম্পের বীভৎস নির্যাতন-কাহিনী অনেকেই শুনেছেন। যুদ্ধ শেষ হবার সময়ে অধ্যাপক লেভির এক আত্মীয় ঐরূপ একটি ক্যাম্প থেকে প্রাণে বেঁচে এসে এর যে বর্ণনা পাঠিয়েছিলেন শ্রীযুক্তা লেভি সে চিঠির প্রতিলিপি আমাকে দিয়েছিলেন। সেই বর্ণনা এত মর্ম্মস্পর্শী এবং হৃদয়বিদারক যে তা পড়তে পড়তে অশ্রু সংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এঁদের একজন আত্মীয় ডক্টর ওট্টোর বড় কেমিষ্ট। এঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বহু নির্যাতন সহ্য করে এঁর স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। ভদ্রলোক খুব মন-মরা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন দেখলাম। ওদেশে বড় বড় শহরের শতকরা ৫০ থেকে ৮০খানা বাড়ীই নষ্ট হয়ে যাওয়াতে শহরবাসীদের বাসস্থান-সমস্যা চরমে উঠেছে। বাডহোমবুর্গ থেকে ট্রামে ফ্রাঙ্ক-ফুর্ট যাবার সময় পথে এক দিন একজন জার্ম্মানের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি বললেন, শহরে তাঁর বাড়ী ভেঙে যাওয়াতে বহুদূরের এক গ্রাম থেকে এসে তিনি আপিস করছেন। হামবুর্গের ক্রকমার নামক যে ভদ্রলোকের কথা বললাম—তিনি তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কোথাও ঘর ভাড়া না পাওয়ায় জামাতা তাঁর বাড়ীতেই এক-খানি ঘর নিয়ে কায়ক্লেশে মাথা গুঁজে আছেন। অনেক স্থলে ভাঙা বাড়ীর নীচের তলায় কাটিল ধরা দেয়াল ও ভাঙা দরজা-জানালাযুক্ত একখানি মাত্র ঘরেই লোক রয়েছে দেখা গেল। আধ মাইলের মধ্যে একখানি বাড়ীও হয়ত নাই, সবই ধূলিসাৎ। হামবুর্গের শহরতলী, মানহাইম প্রভৃতি শহরে এরূপ দৃশ্য দেখেছি। বাড়ীঘর সারানোর চেষ্টা বিশেষ দেখা গেল না। বরং বড় রাস্তা ও ব্রিজ মেরামতের দিকে ব্রিটিশ এবং মার্কিন সরকারের অধিকতর তৎপরতা লক্ষিত হ'ল। খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট ভীষণ। সবই রেশন। মাথাপিছু মাসিক এক পাউণ্ড মাত্র মাংস বরাদ্দ। অবশ্য কালোবাজার আছে। মুদ্রার কালোবাজারও উল্লেখযোগ্য। মার্কিন সরকার ৩ মার্কে ১৬ ডলার দেন, কিন্তু চোরাবাজারে ১ ডলারের পরিবর্তে ১৫।২০ মার্ক মেলে। ব্রিটিশ এলাকায় মিলিটারী সরকার ১ পাউণ্ডের বদলে দেন ১৩ মার্ক, কিন্তু চোরাবাজারে ১ পাউণ্ডের বিনিময়ে ৪০ মার্ক পাওয়া যায়।

লোকেদের সর্ব্বত্রই রুক্ষ দীন বেশ। জার্ম্মান ট্রেনগুলিও দীনতার প্রতিচ্ছবি। কাঠের বেঞ্চ—না আছে আলো, না আছে কোনও সৌষ্ঠব। সর্ব্বত্রই কুশন গেছে ভেঙে। কারও মুখে সিগারেট নেই, মেয়েদের "ঠোঁটেও সিঁদুর" নেই। কেবল যে সব মেয়ে ব্রিটিশ বা মার্কিন মিলিটারী আপিসে বা তাদের হোটেলে কাজ করে তাদের মধ্যেই বেশ সজীবতা দেখা যায়।

জাতির এই চরম দুর্দশার জন্য হিটলারই দায়ী, জার্ম্মানরা এখন একথাই ভাবছে এবং তাকে দানব আখ্যা দিয়েছে। হামবুর্গে একটি ভাঙা বাড়ীর মধ্যে খাঁটি জার্ম্মানদের পরিচালিত অনাড়ম্বর একটি ষ্টেজে হানস ক্রকমারের সঙ্গে একদিন একটি অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম। অভিনয়ের নাম—Des Teu-fels General—(দেস টয়ফেল্‌স জেনারল)—বা দানবের সেনাপতি। বলা বাহুল্য, হিটলারের নাৎসী দলের কার্য্য-

কলাপ ও অনেক সেনাপতি এবং বিমানপোত নির্মাতা প্রধান ইঞ্জিনিয়রের কাহিনী নিয়েই এই অভিনয়। বহু সৈন্য ও সেনাপতিই যে হিটলারের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং ঐ ইঞ্জিনিয়র ইচ্ছা করেই যে বিমানপোতের ইঞ্জিনে গলদ রাখতেন যাতে আকাশে ওঠবার সময়েই সেটা পড়ে ভেঙে যায় তাই অভিনয়ের প্রতিপাদ্য। দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কোনও ইংরেজ বা মার্কিন ছিল না। বিদেশীর মধ্যে বোধ হয় আমিই একা। জার্মান ভাষাতে অভিনয় হ'ল। আভাসে ইঙ্গিতে অনেকটা বুঝা গেল। পুস্তিকা পড়ে আগেই মোটামুটি বুঝে গিয়েছিলাম। হাকনও পথে যেতে যেতে ব্যাপারটি আমাকে বুঝিয়ে বলেছিল। দর্শকেরা এই অভিনয় দেখে খুশীর ভাবই প্রদর্শন করছিল, মাঝে মাঝে তারা খুব উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করছিল। কালস্য কুটিলা গতি। যে হিটলারকে একদিন জার্মানরা ত্রাণকর্তা ভাবত, আজ তারাই তাঁকে দানব ভাবতে সুরু করেছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে এরূপ উদাহরণ বিরল নয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডক্টর এফ. ডব্লিউ. লেভির চিঠির কল্যাণে জার্মানীর মার্কিন এলাকায় হোয়েকস্‌ট শহরে অবস্থিত আই জি. ফারবেন ইন্‌ডাস্ট্রির পেনিসিলিন বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর ওয়েশিগারের সহিত আমার পরিচয় হয় ও ক্রমে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ২০।২৫ মাইল দূরে হোফহাইম নামক পল্লীতে তাঁর বাসায় আমি দু দিন গিয়েছিলাম। ওয়েশিগার-গৃহিণীও খুব শিক্ষিতা মহিলা। ডক্টর ওয়েশিগার শুধু রসায়নশাস্ত্রে সুপণ্ডিতই নন, কাব্য দর্শন প্রভৃতিতেও তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ। তাঁর পুস্তকাগারে জার্মান ভাষায় অনূদিত গীতাঞ্জলি, শকুন্তলা এবং বৌদ্ধ গ্রন্থাদি দেখে বিস্মিত হলাম। এগুলি যে তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন তারও পরিচয় পেলাম। আমি যুদ্ধোত্তর জার্মান সাহিত্যের ধারা সম্বন্ধে জানতে চাওয়ায় তাঁরা বললেন, বার্গেনগ্রুয়েনের (B-rgengruen) 'দেবতার রোষ' (Dies Irae-লাটিন) নামক ছোট্ট কবিতার বইয়ে এর অনেকটা আভাস মিলবে। বলা বাহুল্য, শ্রীযুক্তা ওয়েশিগারের সাহায্যে ফ্রাঙ্কফুর্টের একটি পুস্তকের দোকান থেকে ১৯৪৭ সালে মিউনিকে প্রকাশিত (১৯৪৪ সালে লিখিত) এ বইয়ের একখণ্ড সংগ্রহ করে এনে মোটামুটি ভাবে এর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করছি। এটা ইংরেজ বা মার্কিন মিলিটারী সরকারের প্ররোচনায় লিখিত বলে মনে হয় না। পরন্তু এই কবিতাগুলিতে অসহনীয় দুঃখজর্জ্জরিত জাতির মর্ম্মস্থল থেকে অপরিসীম ক্ষোভ, দুঃখ ও অনুশোচনা যেন গলিত লাভার মত উৎসারিত হয়েছে। কবিতাগুলির বাংলা নাম ও প্রত্যেকটির অন্তর্নিহিত ভাবের আভাসমাত্র এখানে দেওয়া হচ্ছে।

পুস্তকের নিবেদনে মহাকবি গ্যেটের ফাউষ্ট দ্বিতীয় খণ্ড থেকে নিম্নলিখিত বাণীটি উদ্ধৃত করা হয়েছে :—

অগ্নি প্রেমময়ী শিখা হও জ্যোতির্ম্ময় !
চির সত্য পুনরায় লভুক বিজয়।

প্রথম কবিতার নাম "অসত্য"। কবি বলছেন—বৎসরের পর বৎসর প্রতিদিন জীবনের প্রতিটি কাজে আমরা অসত্যের পূজা করে এসেছি। চরমতম ধ্বংসের নারকীয় আলোতে আমরা সত্যকে চাপা দিয়ে ফেলেছি।

দ্বিতীয় কবিতার নাম, "শেষ আবির্ভাব।" এই কবিতার মর্ম্মবাণী রবীন্দ্রনাথের "ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে, দয়াহীন সংসারে" এই বিখ্যাত পংক্তিগুলির অনুরূপ।..."আমি খ্রীষ্টরূপে আবির্ভূত হয়ে নিগৃহীত হয়েছি। আমি প্রাচ্যের অসহায় পিতৃমাতৃহীন বালকের বেশে তোমাদের দ্বারে অন্নের জন্য এসে মাথা কুটে মরেছি। আমি নির্য্যাতিত বন্দী ও বুভুক্ষু শ্রমিকের বেশে এসে অশেষ কষ্ট বরণ করেছি। এবার কিন্তু আমি বিচারকরূপে তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছি—তোমরা আমায় চিনবে কি ?"

তৃতীয় কবিতার নাম—"বহ্নি তুমি নেমে এস নীচে।" ইহাতে কবি যুদ্ধের ধ্বংসলীলার সংক্ষিপ্ত অথচ মর্ম্মস্পর্শী চিত্র উদ্‌ঘাটিত করে শেষে বলেছেন—যে অগ্নিতে শস্যশ্যামল মাঠ, ঘনশ্যাম বনানী ও সুদৃঢ় নগরী পুড়ে ছাই হয়েছে—সেই অগ্নি নীচে নেমে এসে আমাদের পুড়িয়ে খাঁটি করে তুলুক।

চতুর্থ কবিতা—"দান্তের প্রতি"। এতে দান্তের আত্মাকে আহ্বান করে কবি বলছেন, "তোমার আদর্শে নূতন শাসন, নূতন পন্থার নির্দ্দেশ লাভ করে দেশ শুভ ভবিষ্যতের সূচনা করুক।"

পঞ্চম ও ষষ্ঠ কবিতায় বাইবেলের আবেল ও কেনের নৃশংস কাহিনীর সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি, শঠতা, মিথ্যাচার প্রভৃতির তুলনামূলক চিত্র আঁকা হয়েছে।

সপ্তম কবিতা "এই সময়ে" ধ্বংসলীলার ভয়াবহতা ও সামাজিক বিপ্লবের বীভৎসতা প্রতিভাত হয়েছে।

"অন্তহীন রাত্রি"—অষ্টম কবিতা। হতাশার গভীর গহ্বরে নিমগ্ন কবি – কালরাত্রির যে অবসান হবে সে ধারণাই করতে পারছেন না।

পরবর্ত্তী কবিতা "প্রতীক্ষায়" রুদ্ধবাক, রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় কবি চরম দণ্ডের প্রতীক্ষা করছেন।

দশম কবিতা—"রুদ্রের আবির্ভাব।" যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা ও ধ্বংসের ছবি।

"খ্রীষ্টের বাণী"—একাদশ কবিতা। কবি বলছেন "আমরা পুণ্যাত্মাদের উপহাস করেছি—আমরা তাদের বাণী উপেক্ষা করেছি—আমরা ইস্পাতের বর্ম্ম নিয়ে চলেছি—ভগবানের কৃপাপ্রার্থী হই নি। আজ আমাদের লৌহসদৃশ দম্ভ চূর্ণ হয়েছে—চূর্ণ আজ ধূলিতে মিশেছে—জীবন অবসাদ জাতিকে

অভিভূত করে ফেলেছে। এখন আমরা কোন্ মুখে তোমার দয়া ভিক্ষা করব, হে ভগবান!"

"দূরের আশা"—দ্বাদশ কবিতা—কবি বলছেন, আমাদের ঘর-বাড়ী, আশা-উৎসাহ সবই গিয়েছে। প্রায়শ্চিত্ত করবারও কেউ নেই। আজ ধ্বংসাবশেষ ভাঙা ঘরের কোণে যে শিশু ঘুমাচ্ছে—আমরা যখন ধূলিতে মিশে যাব তখন সেই শিশুকেই হয়ত প্রায়শ্চিত্ত শেষ করতে হবে।

ত্রয়োদশ কবিতা—"পাপী ও নিষ্পাপদের কে পৃথক করবে?" শস্যকর্ত্তনের সময় তার সঙ্গে আগাছাও যেমন বাদ পড়ে না, এবারও সেরূপ হয়েছে। সকলের দরজাতেই প্রতিহিংসা যেন মূর্ত্তি ধরে দাঁড়িয়েছে এবং এই গরল সকলেই আকণ্ঠ পান করেছে। কবি প্রবল ক্ষোভে বলছেন—"হে ক্রুশ, আমাকে বিদ্ধ কর—নচেৎ আত্মার সদ্‌গতি নেই।"

"লবণ ও ভস্ম"—চতুর্দ্দশ কবিতা। লবণ ও ভস্ম আমাদের খাদ্য এবং কাঁটার কবর আমাদের শেষ আশ্রয় হবে। আঙুরের ক্ষেত আমরা ধ্বংস করেছি, খেতে হবে এখন শুধু ঝরণার জল। ধর্ম্মের বেদী, গির্জ্জা সব করেছি চূর্ণবিচূর্ণ—ধোঁয়া ও ভস্মে আকাশ ফেলেছি ঢেকে। লবণ ও ভস্মই আমাদের খেতে হবে—কারণ এ দুটিই সত্যিকারের খাঁটি জিনিষ!

পঞ্চদশ কবিতার নাম—"প্রতিকার।" কবি বলছেন সর্ব্বশেষ অভাব কখনও মোচন করা যাবে না। এ নিজেই নিজেকে মুক্ত করবে। সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি যখন ভেঙে পড়ছে তখন তার মধ্য থেকেই নূতন আলোক উঁকি দিচ্ছে। যদি আমরা অধঃপতিত ঘাতক-অনুচরদের মধ্যে দেবদূতের আবিষ্কার করতে পারি তবে সে-ই হবে আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা।

ষোড়শ কবিতা—"প্রায়শ্চিত্ত"। কত কালে আবার উষর ক্ষেত্র শস্য-শ্যামল হবে, অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ অপসারিত হবে এবং শেষ রক্তবিন্দুর প্রায়শ্চিত্ত হবে, কে জানে? এই প্রশ্নের কালের পরিমাপে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভবপর নয়। অনন্তকাল ধরে ভগবানের সমীপে হবে এ প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু তাঁর কাছে আমাদের সময় ত পাখীর গতির মত। এক দিন হাজার বছরের আর হাজার বছর এক দিনের সমান। এক বার সহসা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারলেই হয়ত আমরা দেখব যে আমরা আরম্ভ না করতেই প্রায়শ্চিত্তের সমাপ্তি হয়েছে। আমাদের জ্ঞানের পরিধি কতটুকুই বা!

সপ্তদশ তথা শেষ কবিতা হচ্ছে—"পৃথিবীর জনগণের প্রতি।" এই কবিতায় কবি গত বার বৎসরের (১৯৪৪ সালে লিখিত) অবর্ণনীয় নৃশংস কার্য্যকলাপের জীবন্ত চিত্র উপস্থাপিত করেছেন এবং মানবতার এই চরম লজ্জাকর অধোগতির জন্য সমগ্র পৃথিবীই যে দায়ী তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। যখন সামান্য অগ্নি-শিখা জ্বলে উঠেছিল তখন সহজেই তাকে নির্ব্বাপিত করা যেত। কিন্তু হে পৃথিবীর লোক, তখন তোমরা অনেকেই দূরে সাগরপারে দাঁড়িয়ে শুধু কৌতুক অনুভব করেছ—তখন তোমরা ভেবে দেখ নাই যে, যে আগুন একজনকে পোড়ায় সে আগুন অপরকেও পোড়াতে ছাড়ে না। সুতরাং পৃথিবীর সকল জাতিই এর জন্য দায়ী। সকলেই বিশ্বব্যাপী বিশ্বাসঘাতকতা ও ধ্বংসকাণ্ডের জন্য পরস্পরের উপর দোষারোপ করছি। হে জগৎবাসি! এস সকলেই আমরা একত্রে এখন ভগবানের বাণী শুনবার ও অধ্যাত্মদর্শনের মর্ম্ম উপলব্ধি করবার জন্য তৎপর হই। শান্তির দ্বিতীয় পথ নাই।

একে জার্ম্মান ভাষার মত কঠিন ভাষা—তারপর আধুনিক কবিতার দুরূহতা। সুতরাং সীমাবদ্ধ জার্ম্মান ভাষার জ্ঞান নিয়ে বার্গেনগ্রুয়েনের 'দেবতার রোষ' পুস্তকের কতটুকু পরিচয় দিতে পারলাম তা বলতে পারি নে। বর্ত্তমানে জার্ম্মান ভাষায় লিখিত এই ধরণের পুস্তকের এদেশে আসবার সম্ভাবনা অল্প।

শুধু
রসনার তৃপ্তির
জন্যই নয়
VANASPATI
খাদ্যপ্রাণে পরিপূর্ণ
করুন
দিয়ে রান্না
হিন্দুস্থান ডিভেলপমেন্ট
কর্পোরেশন লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্ঃ
চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা
ম্যানেজিং এজেন্ট ঃ
এন আর সরকার অ্যাণ্ড কোং লিঃ
২,৫,১০ ও ৩৭ পাউণ্ড
টিনে পাওয়া যায়
HDX 14

আরবী-হরফে বাংলা লিখন

মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন, সাহিত্যরত্ন

পাকিস্তানের শিক্ষাসচিব সাহেবের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব্বপাকিস্তান তথা বাংলার বাংলা ভাষাকে 'আরবী-হরফে' লিখিবার যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত খামখেয়ালী ও গণতন্ত্রবিরোধী বটে। ইহা যেমন মোটেই সমর্থন করা যায় না, তেমনই ঐ প্রস্তাবের নিন্দা না করিয়াও পারা যায় না। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ডে যাঁহারা পশ্চিম পাকিস্তানবাসী, তাঁহারা যাহাই মনে করেন না কেন, গণতন্ত্ররাষ্ট্র পাকিস্তানে বাঙালীই সংখ্যাগরিষ্ঠ। পশ্চিমা সদস্যেরা খেয়ালবশে উর্দু ও ফারসী অক্ষরের সহিত আরবী অক্ষরের সামঞ্জস্য আছে বলিয়া এরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকিলেও বাংলার সদস্যেরা এরূপ খামখেয়ালী প্রস্তাবে সহযোগিতা করিয়া বাঙালী মুসলমানের বিরাগভাজন ও নিন্দার পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

পরিসরের দিক দিয়া বাংলা আরবের চেয়ে ছোট হইলেও জনসংখ্যায় বড়। আরবী আরব উপদ্বীপের ভাষা। বাংলা বঙ্গপ্রদেশের ভাষা। ভারতে পাঠান ও মুঘল শাসনকালে যাঁহারা পশ্চিম হইতে বাংলায় আসিয়া বসবাস করিতেছিলেন, তাঁহারাও স্বেচ্ছায় বাঙালী বনিয়া গিয়াছিলেন। নবাব সুবাদার হইতে আরম্ভ করিয়া যাঁহারা স্বেচ্ছায় বাঙালী বনিয়াছিলেন, যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের সেবা ও উন্নতি করিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশধরদের কেহ এরূপ খামখেয়ালী মত প্রকাশ করিবেন তাহা কোন বাঙালীই আশা করেন না। যেসব পশ্চিমা মুসলমান বাংলায় আসিয়া বাঙালী বনিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণও আজ বাঙালী নামে পরিচিত ও এই পরিচয়ে গৌরবান্বিত। বাঙালী তথা বাংলার ভাষা বাংলা। বাঙালীর একটা সমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্য আছে, তাহা আরও গৌরবের বিষয়। আজ আরবী হরফে বাংলা লিখন আরম্ভ হইলে একদিকে যেমন জনসাধারণ বিষম ফাঁপরে পড়িবে, তেমনই এক সহজ সরল অক্ষরের পরিবর্তে আবার এক জটিল বৈদেশিক অক্ষরের ব্যবহার কিম্ভূতকিমাকার ঠেকিবে। এ ত গেল মুসলমানের কথা। আর হিন্দু? বাংলা যে শুধু মুসলমানের জন্মস্থান ও বাসভূমি নহে হিন্দুরও, তাহাও খতাইয়া দেখিতে হইবে। আরবী-হরফে যদি বাংলা লিখন আরম্ভ হয়, তাহা হইলে মুসলমানেরা একসময়ে ঠেকায় না পড়িলেও হিন্দুরা বিষম সঙ্কটে পড়িবেন। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি সভ্যতাও বিপন্ন হইবে। আজ বাংলা সাহিত্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত। এরূপ খেয়ালী পরিকল্পনায় এই বিরাট বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি হইবে এবং ঐ ক্ষতির উপর যে নূতন কাঠামো গড়িয়া উঠিবে মনে করা যায়, তাহা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতেও বহু শতাব্দী কাটিয়া যাইবে। অথচ সাহিত্য পূর্ব্ব রূপ ফিরিয়া পাইবে না। হিন্দুরা পাকিস্তানের সংখ্যালঘু জাতি। সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করা যেমন ইসলাম তথা কোরান-হদিসের নির্দ্দেশ নহে, তেমনই পাকিস্তান শাসনতন্ত্রের আদর্শও হইতে পারে না। জোর করিয়া আরবী-হরফে বাংলা লিখন প্রবর্ত্তন করিলে হিন্দুর উপর প্রকারান্তরে অত্যাচারই করা হইবে। তাঁহাদের বাধ্য হইয়া আরবী অক্ষর শিখিতে হইবে নতুবা পাকিস্তান পরিত্যাগ করিতে হইবে।

আবার সমগ্র বাংলাও পাকিস্তানভুক্ত নহে, অর্দ্ধেকের কিছু অধিক মাত্র পাকিস্তানভুক্ত হইয়াছে। বাংলার বাঙালী অধিবাসীদের ভাষা ও অক্ষর বাংলা। আজ ঐরূপ অবাঞ্ছনীয় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে, অর্দ্ধ বাংলা বাঙালী থাকিবে, বাংলা ভাষা ও অক্ষর ব্যবহার করিবে; আর অর্দ্ধ বাংলা একটা জগাখিচুড়ি বনিয়া যাইবে। অথচ একার্দ্ধের লোকের সহিত অপরার্দ্ধের লোকের গোষ্ঠী-কুটুম্বিতা, ব্যবসা ও সংস্কৃতিগত সম্পর্ক অবশ্যই থাকিয়া যাইবে। এই অবস্থায় এই যে একটা অচিন্ত্যপূর্ব্ব খিচুড়ি তৈয়ারের প্রয়াস, তাহার নিন্দা করিবার ভাষা কৈ? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যেখান হইতে কোটী-কণ্ঠের নিন্দা ও আপত্তি উঠিবার কথা, সেই স্থান আজ পর্য্যন্ত একপ্রকার নীরব; তাই বাঙালী মুসলমানের উপযুক্ত ক্ষেত্রেও নীরবতার অখ্যাতি আছে। কিন্তু পূর্ব্ব বাংলার সমুদয় মুসলমান নীরব থাকিবেন বলিয়া ত মনে হয় না। বরং এর পরিবর্ত্তে কালে একটি ঝড়ঝঞ্ঝার বা ভূমিকম্পের সৃষ্টি হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। কেননা পূর্ব্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা লইয়া ইতিপূর্ব্বে যে সব ঝড়ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নহে।

একদিন আরব, পারস্য ও তুর্কিস্তানের লোকেরা আসিয়াই ভারতে ও বাংলায় ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রচার ও রাজ্যপ্রতিষ্ঠাকালে তাঁহারা আরবী হরফে বাংলা লিখন কেন, বাংলা ভাষাকে উচ্ছেদ করিয়া আরবী ভাষারই প্রবর্ত্তন করিতে পারিতেন; কিন্তু দেশকালের অবস্থা বিবেচনায় তাহা মোটেই সম্ভব হইবে না বলিয়াই তাঁহারা তাহা করিতে যান নাই। তাঁহারা রাজ্য-প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম্মপ্রচারের দিক দিয়া সমগ্র দেশকে বা তাহার এক বিশাল অংশকে অধিকার করিয়া লইলেও স্থানীয় ভাষাকে গ্রাস করিতে পারেন নাই বরং স্থানীয় ভাষা ও সভ্যতাই

তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া লইয়াছিল, যাহার ফলে বাংলার মুসলমান নিজেদের বাঙালী মনে করিয়া আজ গৌরবান্বিত। · ভারতে বা বাংলায় মুসলমান-শাসন ছিল—রাজতন্ত্র শাসন। আর আজ হইতেছে গণতন্ত্রমূলক শাসনের প্রতিষ্ঠা। রাজতন্ত্র বা স্বেচ্ছাতন্ত্রে যাহা ৭।৮ শত বৎসরেও সম্ভব হয় নাই, আজ গণতন্ত্রে তাহা প্রবর্ত্তনের যে চেষ্টা ও কল্পনা তাহাকে বাতুলতা ও আকাশকুসুম ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিকয়েকের অবাস্তব অযৌক্তিক খেয়াল যে গোটা দেশ গ্রহণ করে না, করিতে পারে না বা করা সম্ভব নয় তাহাও ঐতিহাসিক সত্য। পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র। সুতরাং তথাকার অধিবাসীরা সর্ব্বপ্রকারের স্বাধীনতা ভোগ করিবে ইহাই বাঞ্ছনীয় ও স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় বাঙালী নিজের মাতৃভাষা লিখিতে যাইয়া বর্ণ বা হরফের পরাধীনতা অযথা মানিয়া লইবে কেন?

লেখকের পরমবন্ধু বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীহট্ট—সুনামগঞ্জ নিবাসী দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ চৌধুরী বি, এ, বিত্তাবিনোদ শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত 'আলফারুক' (সাবেকী যুগভেরী) পত্রিকায় ২০শ বর্ষের ৩৮শ ও ৩৯শ সংখ্যায় ঐ সম্পর্কে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন কর্ত্তব্যের খাতিরে তাহার উত্তরে কিছু আলোচনা না করিয়া পারা যায় না। তিনি বলিয়াছেন :—

(১) উজিরে তালিমকে মোবারকবাদ ও শিক্ষা বোর্ডের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করিতেছেন। (২) সংস্কৃত ও দেবনাগরীর যমজ ভগিনী বাংলা বর্ণমালা। (৩) ইহা হিন্দু সভ্যতার প্রতীক। (৪) ইহাকে দেবনাগরীর বাংলা সংস্কার (সংস্করণ?) বলা যাইতে পারে। (৫) বাংলা বর্ণমালায় লিখিত হিন্দুয়ানী বাংলা ভাষা বা সাহিত্যই বাংলার মুসলমানের তামদ্দুনিক পতনের একমাত্র প্রধান কারণ। (৬) এই হিন্দুয়ানী Cultural Conquest মুসলমানের পরাজয় ঘোষণা করিতেছে। (৭) এই গয়ের ইসলামী ও চিন্তাধারা সাহিত্য ও কালচারের মধ্যে মুসলমানেরা একেবারে আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলিয়াছেন। এই তামদ্দুনিক পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র পন্থা আরবী হরফের প্রচলন। (৮) বাংলার তরুণ মোসলেম সমাজের গয়ের ইসলামীয়তের জন্ত দায়ী এই হিন্দুয়ানী সাহিত্য। ৯। দেড় বৎসরের স্বাধীনতার মধ্যেও উচ্চ ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ ইংরেজী বোলচাল, হ্যাট, কোট, নেকটাই-এর মোহ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ১০। তরুণ সমাজ যাঁহারা পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ নেতা ও চালক হইবেন তাঁহারা হিন্দুয়ানী লেবাস পোশাক ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ১১। দুই শতাব্দীর পরে ইংরেজের রাজনৈতিক পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিলেও হিন্দুয়ানী কালচার শির্ক ভাবাপন্ন সাহিত্যের প্রভাবমুক্ত হইতে পারেন নাই। ১২। আল্লাহের কিতাবের (কোরাণ) ভাষা আরবী হরফে লিখিত ও আরবী ভাষায় অবতীর্ণ এবং আল্লাহ কোরানে আরবী ভাষার প্রশংসা করিয়াছেন। ১৩। হজরত রসুল করিম (দঃ), তিনি নিজে আরব, কোরানের ভাষা আরবী, ও বেহেস্তীগণের ভাষা আরবী, এইজন্ত আরবী ভাষা ভালবাসেন বলিয়া ফরমাইয়াছেন। ১৪। বাংলা ছাড়া ইরান, আফগানীস্থান, মালয়, জাভা, চীন, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি মুসলিম জাহানের সর্ব্বত্র আরবী হরফ প্রচলিত। ১৫। কবি আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্য আরবী হরফে লিখিত হয়। ১৬। চট্টগ্রাম, নোয়াখালিতে দলিল ও পুঁথি আরবী হরফে লিখিত হইত। পুঁথির ভাষা সহজে আরবী হরফে লিখা যায়। ১৭। মুসলমানদের পারিবারিক জীবনে ব্যবহার্য্য আরবী ফারসী শব্দগুলি উর্দ্দুর নিকট-প্রতিবেশী আরবী হরফে লিখিত হইয়া একটু অদলবদল করিলেই বেশ সুন্দর উর্দ্দু হইয়া যায় (!) ১৮। চট্টগ্রামের মওলানা জুলফেকার আলী আরবী হরফে বাংলাভাষায় 'আলকোরাণ' নামক এক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি লেখক আমার পরম সুহৃদ। কিন্তু সৌহৃদ, আত্মীয়তা খাতেরদারী অপেক্ষা কর্ত্তব্যই মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং কর্ত্তব্যের খাতিরে তাঁহার উল্লিখিত মতামতের আলোচনা করা আমার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

১। এবিষয়ে "উজিরে তালিম" সাহেব ব্যক্তিগত গোঁড়া মনোভাবের মোবারকবাদ পাইলেও সমষ্টির মোবারকবাদ পাইতে পারেন না। কমিটির প্রস্তাব সমর্থন সম্পর্কেও এই মত। ২। সংস্কৃত হিন্দুভাষা ও দেবনাগরী হিন্দুলিপি হইলেও সে বেচারী মুসলমানের কাছে এমন কোন অপরাধ করে নাই, যে কারণে তাহার যমজ ভগিনীকে অপরাধী হইতে হইবে। সংস্কৃত ভাষা বা অক্ষর জোর করিয়া ত কাহারও ঘাড়ে চাপে নাই বরং কেহ কেহ সখ করিয়া বা এলেম বৃদ্ধির জন্ত শিখিয়াছেন। আর বাংলা অক্ষর তাহার যমজ ভগিনী বলিয়া কল্পনা করা হইলেও বাংলার একটি নিজস্ব ভাষা আছে, বিরাট সাহিত্য আছে, যাহার জন্ত হিন্দু ও মুসলমান সকল বাঙালী নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং "মাছ ফেলিয়া সুরুয়া রাখা"র মত ভাষা রাখিয়া তাহার হরফ পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। ৩। বাংলা বর্ণমালা হিন্দুসভ্যতার প্রতীক সত্য; কিন্তু মুসলমানেরা স্বেচ্ছায়ই তাহাকে নিজেদের সংস্কৃতির অন্যতম প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; অক্ষরগুলি জোর করিয়া কাহারও সংস্কৃতি গ্রাস করিতে যায় নাই। সুতরাং নিরপরাধ। ৪। ইহা দেবনাগরীর বাংলা সংস্করণ হইলেও যুগযুগান্তর ধরিয়া

মুসলমানের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, সর্বভাবে ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। আরবী ভাষার মুষ্টিমেয় পণ্ডিত লোকের কম উপকার করিলেও অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত গোটা মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য রক্ষার এবং চর্চার সঞ্জীবনী-সুধা বিলাইয়া আসিয়াছে। কোন প্রকারেই কোন অনিষ্ট সাধন করে নাই।

৫। নিজে স্বস্থানে থাকিলে অন্য কেহ তাহাকে টলাইতে পারে না। সুতরাং বাংলা বর্ণমালায় লিখিত হিন্দুয়ানী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মুসলমানের সাংস্কৃতিক অবনতির কারণ হইতে পারে না। বরং এই অবনতির কারণ মুসলমানেরা নিজেরাই। নিজেরা বিদ্যাবুদ্ধির ধার ধারিলেন না, আর দোষ হইল হিন্দুয়ানীর যাহার দৌলতে বাঙালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষার হাতে খড়ি। মুসলমানেরা যদি নিজেদের তমদ্দুন গঠন ও রক্ষার অনুপাতে মুসলমানী বাংলা সাহিত্য গড়িয়া লইতে না পারিয়া থাকেন, সেজন্য "নেকড়ে-মেষশাবক" নীতিতে হিন্দুয়ানী ভাষা দায়ী হইতে পারে—বিচারে নহে। কোন কথা বলিতে হইলে গোঁড়ামি ছাড়িয়া নিজেদের দিক দেখিয়া বলা উচিত।

৬। হিন্দুয়ানী cultural conquest মুসলমানেরা গ্রহণ না করিলে তাহা তাঁহাদের পরাজয় ঘোষণা করিবে কিরূপে? এই যে 'নিজের দোষ পরকে দেওয়া' ইহা কি সঙ্গত ও বিচারসহ? আর যদিবা ঐ 'কাল্‌চার' মারপ্যাচের ভিতর দিয়া মুসলমানের পরাজয়ের পন্থা করিয়া থাকে, সে ত মুসলমানেরই অসাবধানতার দোষ। তজ্জন্য অন্যেরা দায়ী নহেন।

৭। পরের ইসলামী আদর্শ ও চিন্তাধারা, সাহিত্য ও কাল্‌চারের মধ্যে মুসলমানেরা যদি আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই আদর্শ, চিন্তা, সাহিত্য ও কালচারের দোষ কি? এই নিজের দোষ পরকে দেওয়া কেন? বাংলা ভাষায় আরবী হরফের প্রচলন তামদ্দুনিক পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভের উপায় হইবে কিরূপে? বরং বাংলা ভাষা ও বাংলা হরফে ইসলামী তামদ্দুনিক রূপ ফুটাইয়া তুলিলে ঐরূপ পরাধীনতা দূর হইতে পারে। আরবী হরফে বাংলাভাষায় তামদ্দুনিক পরাধীনতা দূর হইবে কি? তাহা বরং জাতির জন্য এক ধুম্রজাল সৃষ্টি করিবে মাত্র। জনকয়েক আরবী-শিক্ষিত ব্যক্তি তাহা কতকটা হজম করিতে পারিলেও প্রকৃত জাতি বলিতে যাহাদের বুঝায় তাহারা তাহা হজম করিতে পারিবে না। সুতরাং তামদ্দুনিক পুষ্টিও সম্ভব হইবে না। ফলে মুষ্টিমেয় আরবী শিক্ষিত লোকের হাতে রাষ্ট্রের সমুদয় শক্তি তুলিয়া দিয়া অপর সকলকে বিপন্ন হইতে হইবে।

৮। বাংলার তরুণ মুসলিমের পরের ইসলামীয়তের জন্য বাংলাভাষা দায়ী না হইয়া তরুণ মুসলিমের মুরুব্বীয়ানরা ও তাঁহাদের অভ্যাস বা চরিত্রই দায়ী হইবে। কথায় বলে:

"বাপ ভালা তার বেটা ভালা
মা ভালা তার ঝি,
গাই ভালা তার বাছুর ভালা
দুধ-ভালা তার ঘি।"

নিজে ভাল হইলে পরে কি তাহাকে মন্দ করিতে পারে? হিন্দুয়ানী সাহিত্য তরুণ মুসলিমের জন্য শিক্ষা, জ্ঞান ও আনন্দরস পরিবেশন করিতে পারে; কিন্তু জোর করিয়া ত পরের মুসলিমীয়ত শিক্ষা দিতে পারে না, যদি তাঁহারা ইসলামীয়তের পথে চলিতে অভ্যস্ত হন। সুতরাং ইহা ত "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" চাপানো মাত্র।

৯। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাঙালী মুসলমান ইংরেজী বোলচাল, হ্যাট, কোট, নেকটাই-এর মোহ ছাড়িতে পারেন নাই বলিয়া বাংলা অক্ষর দোষী সাব্যস্ত হইল কোন্ সাহিত্য-আদালতের বিচারে? যাঁহারা ঐ মোহ কাটাইতে পারেন নাই, তাহা তাঁহাদেরই অভ্যাসের দোষ। সেজন্য বাংলা অক্ষর বেচারীকে দায়ী করা যায় কোন্ যুক্তিতে? তাই জিজ্ঞাসা করিতে হয়—লেখকের মোবারকবাদ প্রাপ্ত উজির সাহেব কি ঐ মোহ কাটাইয়া লেবাস পোশাক ও চুল দাড়িতে আদর্শ মুসলমান শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন?

১০। পাকিস্থানের ভাবী পরিচালক ও সমাজনেতা তরুণ-সমাজ হিন্দুয়ানী লেবাস পোশাক ছাড়িয়া ইসলামী লেবাস পোশাক এক্তিয়ার করিতে পারেন নাই। সে ত তাঁহাদের মুরুব্বীদের দোষে ও নিজেদের খামখেয়ালী অহমিকাতে। এজন্য বাংলা অক্ষরকে দায়ী করা হইবে কেন?

১১। রাজনৈতিক পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইয়াও যেসব মুসলমান আত্মদুর্ব্বলতাবশতঃ হিন্দুয়ানী কাল্‌চার ও শির্ক ভাবাপন্ন সাহিত্যের প্রভাবমুক্ত হইতে পারেন না তাহাদের নিজেদের দোষের জন্য বাংলা অক্ষরকে দায়ী করার দৃঢ় যুক্তি থাকিতেই পারে না।

১২। আল্লাহ্ কোরানে আরবী ভাষার প্রশংসা করিয়াছেন, কোরান আরবী ভাষায় অবতীর্ণ ও আরবী অক্ষরে লিখিত। এজন্যই আরবী ভাষা ও অক্ষর মুসলমানের দৃষ্টিতে তসলিম যোগ্য সন্দেহ নাই। আর সেজন্যই দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মুসলমান আরবী ভাষা ও অক্ষরকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তসলিম করেন। এমতাবস্থায় শুধু পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানের কথা উঠিবে কেন? কোরানের মর্ম বুঝিবার জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় কোরানের তর্জমা লিখিত হইলেও সকল দেশের মুসলমানই নেকির জন্য আরবী ভাষায় কোরান তেলাওত করিয়া থাকেন? এজন্য তাঁহাদের নিজ নিজ ভাষাকে আরবী অক্ষরে লিখার দরকার হয় নাই বা সখ চাপে নাই। তবে পূর্ব্ববঙ্গের জন্য এ অবাঞ্ছিত কল্পনা কেন?

আমাদের কাছে তাঁহার আরবী ও বাঙালী বাদার প্রভেদ

থাকিতে পারে না। এইরূপ চীনা, জাপানী, জার্ম্মানী, সকল মুসলমানই খোদার কাছে সমান; যদি তাঁহারা আল্লাহের উপযুক্ত বান্দা হন ও বন্দেগী আদায় করেন। আল্লাহ্ যদি বাংলা দেশে ইসলামের পয়গাম পাঠাইতেন, তাহা হইলে কোরানের ভাষা হইত বাংলা। আবার কোরান নাজেল হওয়ার পূর্ব্বেও ত আরবের পৌত্তলিকদের ভাষা আরবীই ছিল—বাংলা বা ভারতীয় কোন ভাষা নহে। সুতরাং শুধু বাংলাই পৌত্তলিকদের ভাষা নহে, এককালে আরবী ভাষাও ছিল পৌত্তলিকদের ভাষা। কাজেই আরবী 'খাছ' করিয়া কোরানের ভাষা নহে বরং তাহা আরবেরই ভাষা। আর আরব দেশে কোরান নাজেল হওয়ার দরুনই তাহার ভাষা হইয়াছে আরবী।

কোরান নাজেল হইবার পূর্ব্বেকার আরবীয় পৌত্তলিকদের নাম যেমন আরবী ভাষায় ছিল, কোরান নাজেল অর্থাৎ ইসলাম প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরেও মুসলমানদের নাম সেই আরবী ভাষায় রাখা হইতেছে। যেহেতু আরবী মুসলমানের ধর্ম্মভাষা। কিন্তু কোরান-পূর্ব্ব যুগেও তাহা কোরানীয় ধর্ম্মভাষা ছিল না। সুতরাং বাংলা, চীন বা জাপানে কোরান নাজেল হইলে কোরানের ভাষা ও মুসলমানের নাম হইত সেই সেই ভাষায়।

আল্লাহ্ মানবমণ্ডলীকে সৃষ্টি করিয়া যার যার পারিপার্শ্বিক অনুযায়ী ভাষা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন বলিয়া ইমানদারগণকে মানিয়া লইতে হইবে। সবই আল্লাহের সৃষ্ট ভাষা। আল্লাহ্ আরবীকে শ্রেষ্ঠ মনে করিলেও অন্যান্য ভাষাকে দুনিয়ার বুক হইতে মুছিয়া ফেলিবার কোন আদেশ কোরান মারফতে দেন নাই, তেমনই কোন অক্ষরকেও নয়। যাঁহারা আরবে জন্মেন নাই, দুনিয়ার অন্যান্য জায়গায় সেই সব মুসলমান নিজ দেশের ভাষা ও অক্ষরে সাহিত্যচর্চ্চা করেন বলিয়া কি নবীর শাফায়েৎ খোদার দিদার ও নাজাত লাভে বঞ্চিত হইবেন, যদি তাঁহারা প্রকৃত মুসলমান ও বন্দেগান হন?

১৩। নিজে আরবী বলিয়া হজরত নবিয়ে করিম (দঃ) কোরানের ভাষা ও বেহেশ্‌তীগণের ভাষা আরবী বলিয়া আরবী ভাষা ভালবাসিবেন সন্দেহ নাই। আর সেই জন্যই ত মুসলমানেরাও (দুনিয়ার যে দেশেরই হউক) আরবী ভাষাকে শ্রদ্ধা করিয়াই চলিয়াছেন। আবার বাংলা অক্ষর আরবী অক্ষরের সিংহাসন দখল করার ধৃষ্টতাও প্রকাশ করিতেছে না। সে মাত্র নিজের দেশের ভাষায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ও থাকিতে চায়। সে কোরানের ভাষার অক্ষরের যোগ্যতা রাখে নাই, তাহা চাহিতেছেও না। এমতাবস্থায় ঐ সব বাহুল্য যুক্তি কেন?

১৪। লেখক শুধু বাংলাদেশ ব্যতীত ইরাণ, আফগানিস্তান, মালয়, জাভা, চীন, পঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্তে এবং "মুসলিম জাহানের সর্ব্বত্র আরবী হরফ প্রচলিত" বলিয়া দাবি করিয়াছেন। এ সম্পর্কে আমার কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। তবে দু'চার কথা না বলিয়াও পারিতেছি না। ইরাণের ভাষা ফার্সী। ফার্সী ভাষায় বিরাট সাহিত্যসম্ভারও রহিয়াছে। ফার্সী অক্ষরের সহিত আরবী অক্ষরের সাদৃশ্য থাকিলেও তাহা ফার্সী নামে পরিচিত। আফগানিস্তান, পঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত সম্পর্কে হয় ত ঐ কথা খাটে। কিন্তু মালয়, জাভা, চীনে আরবী অক্ষর বা তাহার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ কোন অক্ষর প্রচলিত আছে কিনা তাহা জানিতে হয়। ইরাণ ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ ও আরবীকে ধর্ম্মভাষা হিসাবে শ্রদ্ধা করিলেও আজ পর্য্যন্ত নিজেদের অক্ষর ফার্সী ছাড়ে নাই।

১৫। কবি আলাওলের 'পদ্মাবতে'র দুই-একখানা পুঁথি খেয়ালবশে আরবী অক্ষরে লেখা হইলেও তাহা স্থায়িত্ব লাভ করে নাই বা সেই প্রচেষ্টা বাংলা পুঁথিরচনার ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় নাই।

১৬। চট্টগ্রাম, নোয়াখালিতে এককালে কোন দলিল বা পুঁথি আরবী হরফে লেখা হইয়া থাকিলেও উপরোক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য।

১৭। মুসলমানদের পারিবারিক জীবনের ব্যবহার্য্য আরবী, ফার্সী শব্দ আরবীর নিকট-প্রতিবেশী বলিয়া আরবী হরফে লিখিত হইয়া একটু অদলবদল করিলে যদি উর্দ্দু হইয়াই যায়, তাহা হইলে বাংলাভাষা আরবী হরফে লেখার সার্থকতা কি?

১৮। উল্লিখিত এই উক্তিগুলি যেমন খেয়াল-প্রসূত; চট্টগ্রামের মওলানা জুলফিকার আলীর প্রয়াসও ছিল তেমন। তাই তাহা ব্যর্থ হইয়াছিল।

'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিপ্রাপ্ত বাঙালী সাহিত্যিকের মনে কেন যে এ ভাবের উদ্রেক হইল তাহা ভাবনার কথা। এরূপ খেয়ালী মনোবৃত্তি আরও কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে থাকিতে পারে। কিন্তু আমাদের সান্ত্বনার কথা যে এরূপ লোকের সংখ্যা আঙুলে গণা যাইবে। আরও সান্ত্বনা যে, ডাঃ শহীদুল্লাহ্, মওলবী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, ডাঃ এনামুল হক প্রমুখ সাহিত্যিকগণ সজাগ আছেন। কাজেই ব্যক্তি-বিশেষের খামখেয়ালীতে বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না। জনাব শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মত ইতিমধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। সময় থাকিতে অন্যান্য সাহিত্যিকের মতামত প্রকাশ পাওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলেই অনর্থপাতের আশঙ্কা কমিয়া যাইবে।

আবার ওদিকে জনাব মীজানুর রহমান এম-এ সাহেব ইসলামীতে বাংলাভাষা সংস্কার করিতে যাইয়া তাহাকে আরবী লেবাস পোশাক পরাইয়া খাস আরবীতে পরিণত করিতে অর্থাৎ প্রকারান্তরে বাংলাভাষাকে নির্ব্বাসিত করিতে প্রয়াসী। এই সব হইতেছে ব্যক্তিমনের খেয়ালী আচরণ। কাজেই তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। অতএব এদিকে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যিকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমাদের শিক্ষা—ডক্টর শ্রীক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ, এম-এ., ডি-লিট। এ, মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স, ২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৩০২। মূল্য ছয় টাকা।

শিক্ষা সকল সভ্যদেশেই জাতিগঠনের একটি প্রধান উপায় হিসাবে গৃহীত এবং আদৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ শিক্ষা ব্যতিরেকে জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষা এবং তাহার উৎকর্ষসাধন, জাতীয় সম্পদের পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার এবং জাতীয় শক্তির স্ফুরণ সম্ভবপর নয়। এতদিন নিজেদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের অধিকার আমাদের ছিল না। এখন ভারতের ইতিহাসের নূতন অধ্যায়ে, নবযুগের প্রারম্ভে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করার দিন আসিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শিক্ষাসচেতনতা আমাদের দেশে আশানুরূপ হয় নাই। জনসাধারণ, এমন কি শিক্ষিত অভিভাবকেরাও, শিক্ষাবিভাগ এবং শিক্ষকদিগের উপর বালক-বালিকাদের শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। এ বিষয়ে তাঁহাদেরও যে চিন্তা করার এবং কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা বড় একটা কেহ ভাবেন না। দেশবাসীর শিক্ষাসচেতনতা বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। এবিষয়ে ডক্টর ঘোষের পুস্তক যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

অধ্যক্ষ ঘোষ একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। আলোচ্য পুস্তকখানিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও সাফল্য, শিক্ষার সমস্যা, সহশিক্ষা, মেয়েদের উচ্চশিক্ষা, শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথের দান, ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা, ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা, জাতীয় শিক্ষার পুনর্গঠন (সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা), পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা, স্বল্পব্যয়ী শিক্ষা, স্বাধীন বাংলায় ইংরেজীর স্থান, বয়স্ক শিক্ষা, নার্সারি শিক্ষা ও ইংলণ্ডের শিক্ষা আইন (১৯৪৪) ও সমসাময়িক ব্যবস্থা—সবশুদ্ধ এই চৌদ্দটি অধ্যায়ে গ্রন্থকার গভীর পাণ্ডিত্য, বিস্তৃত অধ্যয়ন ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। শিক্ষাব্রতী এবং অভিভাবক সকলেই ইহাতে কার্য্যকরী পন্থার নির্দ্দেশ এবং চিন্তার খোরাক পাইবেন। শিল্পশিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা এবং সামরিক শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি অধ্যায় সন্নিবেশিত হইলে পুস্তকখানা অধিকতর আকর্ষণীয় হইত। পরবর্ত্তী সংস্করণে এ বিষয়ে কিছু সংযোজন করিতে আমরা গ্রন্থকারকে অনুরোধ করি। লেখক আদর্শবাদী এবং আশাবাদী; শিক্ষার ভিতর দিয়া জাতির পুনরুজ্জীবন তাঁহার কাম্য। আয়র্লণ্ডে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যেমন ষ্টেট লটারী দ্বারা অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল তেমনি এদেশে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে যে টাকার প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করার জন্য তিনি ষ্টেট লটারী প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য।

গ্রন্থকারের ভাষা সরস এবং প্রাঞ্জল; পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য পুস্তিকায় হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ নির্দ্ধারণের উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও আচারে যে বৈচিত্র্য, যে ঐক্য ও অনৈক্য দেখা যায় তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার ফলে অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। সেজন্য গ্রন্থকার এই দিকে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বিভিন্ন প্রান্তিক অঞ্চলের আচারব্যবহারের কিছু কিছু মিল ও অমিল দেখাইয়াছেন এবং বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রগ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমানে আমরা হিন্দুধর্ম্মের গৌরব করিলেও, হিন্দুধর্ম্ম বিশেষ করিয়া হিন্দু আচার ও বিভিন্ন প্রদেশের রীতিনীতি সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গেরও ধারণা অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত। অথচ এমন কোন গ্রন্থ নাই যাহা পাঠ করিয়া জনসাধারণ তৃপ্ত হইতে বা এ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। এই অভাব দূর করিবার জন্য চাই ব্যাপক ও সমবেত প্রচেষ্টা। বিভিন্ন প্রদেশের শাস্ত্রাভিজ্ঞ ও অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত-গণ কর্ত্তৃক স্ব স্ব প্রদেশের তথ্য সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হইলে তাহা অবলম্বন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের খাঁটি চিত্র অঙ্কিত হইতে পারিবে। এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচনা দিগ্‌দর্শন মাত্র হইলেও সময়োপযোগী ও মূল্যবান।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

শস্য বপন পঞ্জিকা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রাপ্তিস্থান ১৭৫।১, রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৮৬ পৃষ্ঠা মূল্য দেড় টাকা।

ফলের চাষের ক, খ, গ—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রাপ্তিস্থান ১৭৫।১, রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৬৮ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

দেশে খাদ্যাভাবের সময় এই দুইখানি পুস্তক খুব সময়োপযোগী হইয়াছে। গ্রন্থকার বাংলাদেশের কৃষি-বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; সেই কার্য্যের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি আমাদের "খাদ্যশস্য বাড়াও" আন্দোলন সম্বন্ধে দিক্-নির্ণয় করিয়া দিতে পারেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কল্যাণে "কত ধানে কত চাল হয়" সেই সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য দেশের লোকে আগ্রহান্বিত হইয়াছেন; খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই দুইখানি পুস্তকই এই বিষয়ে পাঠককে সাহায্য করিবে। এই পুস্তকদ্বয়ে জমির গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া যথাসময়ে উপযুক্ত বীজ বপন ইত্যাদি কৃষির আনুষঙ্গিক যাবতীয় জ্ঞানলাভ হইবে।

কৃষি আজ অর্থকরী বৃত্তি হইয়া পড়িয়াছে; ইহার কল্যাণে স্বাস্থ্য ও সম্পদলাভ করা যায়। শিক্ষিত সমাজকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই বৃত্তি সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলে চলিবে না। দেবেন্দ্রবাবুর পুস্তক দুইখানি এই বৃত্তির অলিগলির সন্ধান দিবে।

অনাগত সুদিনের তরে (১ম খণ্ড)—শ্রীহেম কানুনগো। ১৫ বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ২৷৹।

পুস্তকের লেখক অরবিন্দ-যুগের বিপ্লবী; বোমা নির্ম্মাণ বিশারদ-রূপে মাণিকতলা বোমার মামলায় দ্বীপান্তর দণ্ডলাভ করেন। সেই সময়েই তিনি বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত হন।

প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে এই সন্দেহের কারণসমূহ তিনি "বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা" নামক পুস্তকে বিবৃত করেন।

বর্ত্তমান পুস্তকের "নিবেদনে" তিনি তাঁর মানসিক পরিবর্ত্তন ও ভাবের রূপান্তর সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। আন্দামান দ্বীপে বন্দী অবস্থায় একজন ইংরেজ রক্ষীর নিকট হইতে সাম্যবাদের পুস্তকাদি প্রাপ্ত হন; সেগুলি পাঠ করিয়া সন্ত্রাসবাদের ব্যর্থতার কথা বুঝিতে পারেন এবং সেই নূতন জ্ঞানের প্রেরণায় এই পুস্তকে সোভিয়েট তন্ত্রের আদর্শে একটি কল্পিত রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। হিন্দুর "নববৃন্দাবন', মুসলমানের "বেহেস্ত" পাশ্চাত্য লেখকের "ইউটোপিয়া"(utopia), "নিউ অ্যাটলান্টিস" প্রভৃতি কল্পলোক এই পুস্তকের আদর্শ। এই আদর্শের আলোকে হিন্দু-সমাজের আদর্শ ও ব্যবস্থা ধিক্‌কৃত হইয়াছে।

লেখক কিন্তু তাঁর কল্পলোক ফুটাইতে পারেন নাই। ফলে পুস্তকখানি হইয়াছে প্রচারসর্ব্বস্ব।

বিপ্লবী বাঙালী বা স্বাধীনতার ইতিহাস—

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য। ষ্টুডেন্টস লাইব্রেরী, ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ৫৩৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ৫৲।

"বাঙালীর বল" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রবীন লেখক যে বার্দ্ধক্যে বিপ্লবী বাঙালীর ইতিকথা লিখিতে অগ্রসর হইয়াছেন তার জন্য বাঙালী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

তাঁর এই পুস্তকে বাঙালীর বিপ্লব-চেষ্টার একশত পঁচিশ বৎসরের খণ্ড-খণ্ড চিত্র আছে। রামমোহন রায় হইতে সুভাষচন্দ্র পর্য্যন্ত বাঙালী প্রধানদের কর্ম্ম-কাহিনীর পরিচয় দিয়া গ্রন্থকার দাবি করিয়াছেন যে, বাঙালী ভারতবর্ষে আদি বিপ্লবী; ইহা বিচারসহ কিনা, সেই প্রশ্ন স্বতই মনে জাগে। সুষুপ্ত জাতিকে ঘুম হইতে জাগাইতে হইলে এরূপ আত্মপ্রশংসার প্রয়োজন থাকিতে পারে। কিন্তু ১৯৪৯ সালে এরূপ আত্মপ্রশংসা মৃত্যুর সমান। বৈদিক যুগে তৎকালিক বঙ্গদেশবাসী আর্য্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকাশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই; নেতাজী গান্ধীজীর নেতৃত্ব মনেপ্রাণে স্বীকার করিতে পারেন নাই বলিয়া বাঙালী সদাই বিপ্লবী ছিল তাহা প্রমাণ করা সহজ নয়।
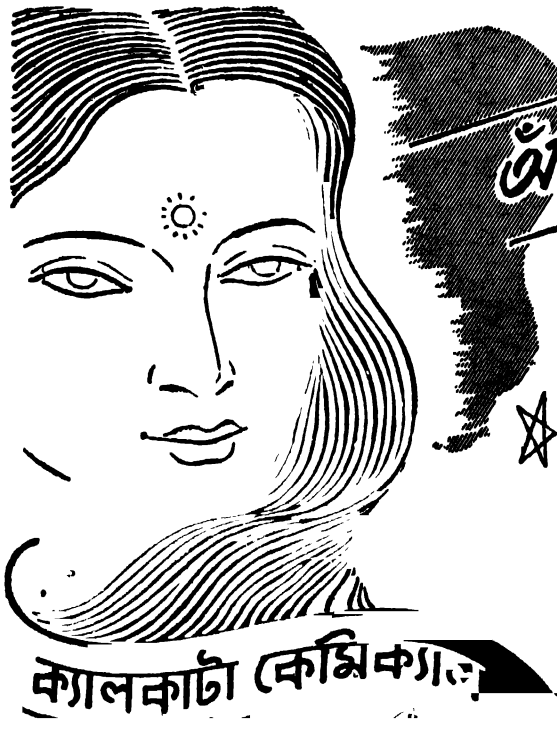
ব্রিটিশ আমলে ভাব-রাজ্যের বিপ্লবে বাঙালী পথ-প্রদর্শক ছিল; কিন্তু কর্ম্ম-জগতে, বিপ্লবী-কর্ম্মে, মারাঠি পথ দেখাইয়াছিল, তার প্রমাণ আছে। যে বৎসর বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হয় সেই বৎসরই বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলুনকারের "নিবন্ধমালা" পুণানগরীতে প্রকাশিত হয়। মারাঠি বন্ধুবর্গের নিকট শুনিয়াছি যে, বাঙালীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগপ্রবর্ত্তন করেন, মারাঠিদের মধ্যে বিষ্ণুশাস্ত্রীও ঠিক তাহাই করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসর এই যুগপ্রবর্ত্তনের সময়। আর্য্য-সমাজ, থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটি, স্যার সৈয়দ আহমেদের কার্য্যাদি এই নব জাগরণের সাক্ষী। দেশব্যাপী সেই জাগরণের মধ্যে কে প্রথম, কে দ্বিতীয় ও কে সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকার করিবে এইরূপ দাবি-দাওয়া অনাবশ্যক। আমরা, বাঙালীরা অন্যান্য প্রদেশের জাগৃতির ইতিহাস ঠিক ঠিক জানি না বলিয়াই আমাদের মধ্যে একটা অহমিকার সৃষ্টি হইয়াছে। এরূপ অহমিকা বাঞ্ছনীয় নয় বলিয়াই এই বইখানির সমালোচনার উপলক্ষ্যে এত কথা বলিতে হইল।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

সান্ত্বনা হোম—

শ্রীমতিলাল দাশ। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। ২১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসটির বিষয়বস্তু নূতন নহে, কিন্তু গল্প বলিবার ভঙ্গীতে অভিনবত্ব আছে। ভুল ঠিকানার একখানি পত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া তরুণ মনে যে তরঙ্গ উঠিয়াছে তাহা সাবলীল গতিতে পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত বহিয়া চলিয়াছে। ভাষা কাব্যধর্ম্মী হইলেও পরিবেশটি অবাস্তব নহে। নিজ

অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে, চারিপাশের চরিত্রগুলি সজীব হইয়া ফুটিয়াছে; কাহিনীর সঙ্গে তাহাদের সংযোগ কষ্টকল্পিত নহে। আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন নায়ক—সে সৌন্দর্য্য প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার বহু উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত। নায়কের জীবনে আর্থিক ক্ষতি ও পরম লাভের ইঙ্গিতটি চমৎকার। বইখানি ভাবুক মনে যথেষ্ট আনন্দদান করিবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

তাপিত-তারণ (নাটক)—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ। ইউ. এন. ধর এণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আদর্শ ভক্ত যবন শ্রীহরিদাসের জীবনের ঘটনা অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে। কঠোর নির্যাতন সহ্য করিয়াও যবন হরিদাস হরিনাম-গান হইতে নিবৃত্ত হন নাই। নাট্যকার অত্যন্ত কুশলতার সহিত যবন হরিদাসের আদর্শ মহিমা, ও নিষ্ঠার ছবি বিভিন্ন নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রসসৃষ্টি হিসাবে নাট্যকারের প্রচেষ্টা সার্থক হইয়াছে। ১৬৪ পৃষ্ঠার এই দীর্ঘ নাটক পড়িতে কৌতূহল বরাবর উদ্দীপ্ত থাকে। নাট্যকারের পক্ষে তাহা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

অধুনা বাংলা রঙ্গমঞ্চে বহু 'অ-নাটক' ও 'কু-নাটক' অভিনীত হইতেছে। আমরা এই সার্থক জীবনী-নাটকের প্রতি মঞ্চ-প্রযোজকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পলাশীর পর (নাটক)—শ্রীঅজয় দাশগুপ্ত। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য এক টাকা আট আনা।

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাশিমের জীবনের ঘটনা অবলম্বনে 'পলাশীর পর' নাটকখানি রচিত। প্রারম্ভ দৃশ্যে শ্রীযুক্ত শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের আঙ্গিক গ্রহণ করা হইয়াছে। নাটকের সর্ব্বত্র নাট্যকার দেশপ্রেম ও পরাধীনতার জ্বালা ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঘটনা-নিয়ন্ত্রণ ও চরিত্র-বিন্যাসে তিনি ইতিহাসকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নাট্যরস বহু স্থানে ব্যাহত হইয়াছে। সংলাপের ভাষা ওজস্বিনী, কিন্তু বক্তৃতাধর্ম্মী।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

মৃত্যু গহ্বরে—রচনা—"পল্লব" ও সম্পাদনা "ধূর্জ্জটি"।
যাদের করেছ অপমান:—শ্রীবামাপদ ঘোষ। কাত্যায়নী পাবলিশিং কোং। ২৬নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১।০ ও ২৲।

আলোচ্য পুস্তক দুইখানি অতি কষ্টে পড়িয়া শেষ করিতে হইল। ভাল এবং মন্দ লেখায় যেমন লেখকের একটা দায়িত্ব আছে, তেমনি পুস্তক প্রকাশ করায় প্রকাশকের দায়িত্বও কিছুমাত্র কম আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

প্রথম পুস্তক "মৃত্যু গহ্বরে" ত্রুটিপূর্ণ ভাষায়, অসম্ভব আর আজগুবি ঘটনা পরিবেশে রচিত একখানি রহস্যোপন্যাস। "যাদের করেছ অপমান" একখানি সামাজিক উপন্যাস। পুস্তকখানি আগাগোড়া সস্তা ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ। ছাপার ভুল এবং শব্দের অপপ্রয়োগ পীড়াদায়ক। প্রচ্ছদপট সুন্দর।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

মুক্তিপথের গান—শ্রীঅমরকুমার দত্ত। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।০

ভারতের মুক্তিযজ্ঞের পূজারী যে সকল সাধক, কর্মী ও তরুণের দল অশেষ নির্যাতন, কারাদণ্ড ও মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিয়া জাতির স্বাধীনতা লাভের স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিয়াছেন তাহাদের উদ্দেশে অভিনন্দন জানাইয়া এই কবিতাগুলিতে কবি দেশবাসীর অন্তরে স্বাধীন জীবনের জয়যাত্রার পথে প্রেরণা ও চেতনা জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মাত্র দশটি কবিতার সমষ্টি, কিন্তু প্রত্যেকটি কবিতায় যেন উদ্দীপনা ও উদ্বোধনের অগ্নিবীণা বাজিতেছে। সুরে ঝঙ্কারে ভাবে ভাষায় অনুপম কবিতাগুলি পাঠককে অনুপ্রাণিত করিবে।

প্যাগোডার দেশে—স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ। বীণা লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৩।০।

গ্রন্থখানি দুই বৎসর আগেকার লেখা। তখনও ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান হয় নাই বা ভারত দ্বিধাবিভক্ত হয় নাই এবং ব্রহ্মদেশও স্বাধীনতা লাভ করে নাই, সুতরাং গ্রন্থকার এই গ্রন্থে ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা সেই সময়কার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝিতে হইবে। স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের বাণী প্রচার ব্যপদেশে ব্রহ্মের প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি শিক্ষার্থী ও অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি লইয়া সে দেশবাসীদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম্ম ও সমাজ এবং বিভিন্ন গ্রাম-নগর প্রভৃতি পরিদর্শন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ব্রহ্মবাসীর সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমরা সাধারণতঃ ব্রহ্মবাসীকে অত্যন্ত অলস, আমোদপ্রিয় ও উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া জানি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্ম্মীদের মত এমন ধর্ম্মপ্রবণ ও স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি বিরল। ইহারা স্ত্রী-পুরুষে সমানভাবে স্বাধীনতা ভোগ করে, ধর্ম্মের জন্য ইহারা সঞ্চয়ের শেষ কপর্দকটুকুও ব্যয় করে। ইহাদের উৎসব পাল-পার্ব্বণ, ক্রিয়াকর্ম্মাদি ভাবে আলোচনা করিলে এই মতই যথার্থ বলিয়া মনে হয় যে ইহাদের সম্বন্ধে বিদেশীয়দের ধারণা একান্ত ভ্রান্ত ও একদেশদর্শী। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান বলিয়া ইহারা ভারতবর্ষকে পুণ্যস্থান রূপে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। ইহাদের গ্রাম-নগরে পর্ব্বত-কান্তারে প্যাগোডা বা ধর্ম্ম-মন্দিরের আধিক্য দেখিয়া ইহাদের প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রমের উদ্রেক হয়। তবে সকল জাতির লোকেদের চরিত্রেই ভালমন্দ, দোষগুণের সংমিশ্রণ আছে, যেমন ইহারা সময়ে সময়ে অত্যন্ত বদ্‌রাগী, উচ্ছৃঙ্খল ও আমোদপ্রিয় হয়। কয়েকটি অধ্যায়ে ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত দর্শনীয় স্থানগুলি ও তত্রস্থ অধিবাসীগণের জীবনযাপন প্রণালী মনোজ্ঞ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কয়েকটি চিত্র পুস্তকটিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করিয়াছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

বর্ষ দীপিতা—সম্পাদক শ্রীনেপাল শঙ্কর সরকার। বিশ্ব-সংস্কৃতি প্রকাশনী।১-সি লাইম ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৫। মূল্য দুই টাকা।

সংস্কৃতি বৈঠক বাংলা ভাষায় প্রথম ইয়ার বুক জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এখন প্রতি বৎসরই নূতন নূতন বাংলা ইয়ার বুক প্রকাশিত হইয়া বাংলা সাহিত্যের একটি দিককে সমৃদ্ধ করিতেছে। বর্ষ দীপিতা বর্ত্তমান বৎসরেই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহার উপদেষ্টা মণ্ডলীর মধ্যে বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিগণ আছেন এবং সম্পাদক ইহাতে কিছু নূতনত্ব সম্পাদনেরও চেষ্টা করিয়াছেন। 'প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয়' নামক তথ্যসমৃদ্ধ এবং সুলিখিত অধ্যায়টি এই পুস্তকের একটি বৈশিষ্ট্য। ইহাতে প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও ফলিত জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ ও রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে রচিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা পাঠকের মনে কৌতূহল ও অধিকতর জানিবার আগ্রহের সৃষ্টি করে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু লিখিত 'প্রাচীন ভারতে ললিতকলা' নামক অধ্যায়টিও শিল্পরসিকদের আনন্দ বিধান করিবে। ইহাতে প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য্য চিত্রকলা ও স্থাপত্য সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ভারতের রসায়ন শিল্প এবং কাষ্ঠ শিল্প সম্বন্ধে দুই জন বিশেষজ্ঞের লিখিত দুইটি প্রবন্ধ এই পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। সম্পাদক পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

শহীদ ক্ষুদিরাম—শ্রীঈশানচন্দ্র মহাপাত্র। বিদ্যাশ্রী পাব্লিকেশনস। ৩।৪ ভবানীপুর রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য ২।০।

লেখক ক্ষুদিরামের বর্ষীয়সী ভগিনী অপরূপা দেবী এবং এখনো জীবিত আছেন ক্ষুদিরামের এমন কয়েকজন সহকর্ম্মীর প্রমুখাৎ তাঁহার জীবনের ও বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপের যে সমস্ত বিবরণ শুনিয়াছেন তাহাই এই পুস্তকে প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় পরিবেশন করিয়াছেন। ক্ষুদিরাম জন্মগ্রহণ করেন মেদিনীপুর জেলার এক পল্লীগ্রামে। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল এই মেদিনীপুর। রাজনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুই মেদিনীপুরে প্রথম গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ এই সমিতির প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হন। মেদিনীপুর শহরে আসিয়া এই সত্যেন্দ্রনাথের নিকটেই ক্ষুদিরাম বৈপ্লবিক আদর্শে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯০৭ সনে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনে যে দক্ষযজ্ঞ হয় তাহার পূর্ব্বেই মেদিনীপুরে চরমপন্থী নেতৃবর্গ জেলা-রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনে নরমপন্থীদের তোষণ-নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভারতের বৈপ্লবিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে মেদিনীপুর যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা বলা বাহুল্য। এই মেদিনীপুরের মাটিই ক্ষুদিরামের মত বীর সন্তানের জন্মদান করিয়াছিল—আগষ্ট-আন্দোলনে বীর রমণী মাতঙ্গিনী বিপ্লবের অনলে আত্মাহুতি দিয়া মেদিনীপুরের গৌরবময় ঐতিহ্যকেই অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। মজঃফরপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে গিয়া ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি ভুলক্রমে মিসেস কেনেডি ও তাঁহার কন্যার উপর বোমা নিক্ষেপ করেন। রাউলাট কমিটির বিবরণী অনুসারে ভারতবর্ষে ইহাই প্রথম রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড। এই ঘটনায় সমগ্র ভারতে দারুণ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। লোকমান্য তিলক এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া পুনার কেশরী পত্রিকায় শাসক-সম্প্রদায়ের সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ লিখিয়া রাজদ্রোহের অভিযোগে ছয় বৎসরের জন্য দেশান্তরিত হন।

লেখক ক্ষুদিরামের বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনের সকল কাহিনীই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষাটি অপূর্ব্ব। পড়িতে পড়িতে জায়গায় জায়গায় শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। বইখানি জীবনবৃত্তান্ত হইলেও সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর।

ডাক্তার কালিদাস নাগের যে ভূমিকাটি ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও মূল্যবান্।

বিপ্লবের সপ্তশিখা—পদ্মনাভ। রীডাস কর্ণার। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা—৬। দাম দেড় টাকা।

আজকাল বাংলা ভাষায় বাংলা তথা ভারতের বিপ্লব-আন্দোলন সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে তন্মধ্যে প্রায় সবগুলি একই ছাঁচে ঢালা,—কতকগুলি ঘটনার ফিরিস্তি মাত্র। কিন্তু পদ্মনাভ রচিত 'বিপ্লবের সপ্তশিখা' সেগুলি হইতে স্বতন্ত্র ধরণের। বিপ্লব আন্দোলনের বাহ্যিক ব্যর্থতার রূপটাই আমাদের নিকট সুপরিস্ফুট, কিন্তু এই ব্যর্থতার পিছনে যে কত বড় সার্থকতার বীজ লুকানো রহিয়াছে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত হইতে বিপ্লবীদের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ ও বৈপ্লবিক পরিকল্পনা স্বাধীনতাকামী যুবমনে প্রেরণাসঞ্চারে এবং মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের পাশাপাশি পরোক্ষভাবে দেশে গণচেতনার উন্মেষে কতদূর কার্য্যকরী হইয়াছে তাহা বুঝিতে না পারিলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে দেখা সম্ভব হইবে না। লেখক এই পুস্তকের পূর্ব্বাভাষ অধ্যায়ে বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনের নিগূঢ় তাৎ-

ভারতবর্ষের আত্মাকে দীর্ঘকাল ধরে সন্ধান করেছেন জওহরলাল। এই বই সেই তীর্থযাত্রার আদ্যন্ত ইতিহাস। ধূসর অতীত থেকে রক্তিম বর্তমান পর্যন্ত সেই অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস পূর্ণপটে প্রসারিত। ভারতবর্ষের আত্মার সঙ্গে সমগ্র এশিয়ার কী নিবিড় যোগ, দূর ইওরোপের উপরেই বা কী তার প্রভাব, তারই প্রদীপ্ত বিশ্লেষণ। আর, একি শুধু সন্ধান? না, এ আবিষ্কার—এ পরা প্রাপ্তি। আগামী পৃথিবীর জন্মদাত্রী এই ভারতবর্ষ। তাই এই বই শুধু জিজ্ঞাসা নয়, এ উত্তর—শুধু যাত্রা নয়, উত্তরণ। শুধু ইতিহাসের ব্যাখ্যাতা নন জওহরলাল, তিনি ইতিহাসের নির্মাতা। তাই ভারতবর্ষের আত্মার সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তাঁর নিজের আত্মার সন্ধান—একটি বিচিত্র ব্যক্তিত্বের উদ্ঘাটন। আত্মসন্ধানের এমন গভীর নিদর্শন তাঁর অন্য কোন বইএ প্রকাশিত হয়নি। অতীত বা বর্তমানের ভারতবর্ষের চেয়েও ভবিষ্যমান ভারতবর্ষ যে মহত্তর, বিপুলতর, তারই মর্মকথা এই বইএর প্রতি পৃষ্ঠায় স্পষ্ট হয়ে আছে।

এই প্রথম
বাংলা ভাষায়

সম্পাদনা : প্রেমেন্দ্র মিত্র
দাম ৩।• টাকা
অন্নদাশঙ্কর বলেছেন : শ'র অনুবাদ পড়ে এ-দেশ সংস্কারমুক্ত হবে। মধ্যযুগের যূপে বন্দী থাকবে না।
সিগনেট প্রেস : কলিকাতা ২০

আয়ারল্যাণ্ড অনেকদিন ধরে ইংলণ্ডের পদানত ছিল। সেই অবমাননার শোধ সে নিয়েছে বুঝি বার্নার্ড শ'র ভিতর দিয়ে সাহিত্যের চাবুকে ইংলণ্ডকে শায়েস্তা করে। শ' অবিশ্যি শুধু ইংরেজ সমাজকেই তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপের বেতের ডগায় তটস্থ করে রাখেননি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত মানবসমাজ ও সভ্যতার উপরই তাঁর বক্রোক্তির বেত্রদণ্ড মুহুর্মুহুঃ আস্ফালিত হয়েছে।

মানবজীবনের যে-সমস্ত সমস্যায় সমস্ত বিশ্বসভ্যতা আজ আলোড়িত, তারই প্রাঞ্জল সমাধানের পথ দেখিয়েছেন বার্নার্ড শ' তাঁর নাটকে। তাঁর নাটক সমগ্র মানবজীবনের বিপুল বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে নিংড়ে নেওয়া সত্যের নির্যাস, সর্বরসের সমন্বয়ে অমৃতের মতো উপাদেয়। শ'র মতো ভাষার যাদুকরের মুখে সত্যের বাণী হাসির সুর হয়ে উছলে পড়ে। তাঁর কঠিনতম সমস্যামূলক নাটক তাই কৌতুককাহিনীর চেয়ে রসাল, তাঁর গভীরতম বক্তব্য চটুল পরিহাসের চেয়ে চমৎকার।

প্রথম খণ্ডের নাটকগুলিকে শ' নিজে নামকরণ করেছেন : 'বিরস নাটক'। এই 'বিরস নাটক' দিয়েই বর্তমান যুগের সবচেয়ে সরস নাট্যকারের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় শুরু হোক। ভাবীযুগের মানুষ হয়ে বার্নার্ড শ' যদি ভুল করে আমাদের মাঝে এগিয়ে এসে থাকেন, তাঁর লেখা না-পড়লে তেমনি ভুল করে এ-যুগ থেকে পিছিয়ে থাকা হবে।

পর্ব্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ অত্যন্ত নৈপুণ্যের সহিত করিয়াছেন। লেখক বাংলার বিপ্লব আন্দোলনকে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে যে একটা অচ্ছেদ্য যোগসূত্র রহিয়াছে তাহাই দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ক্ষুদিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যতীন দাস, বিনয় বসু, প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার, সূর্য্য সেন এই সাত জন বিপ্লবী শহীদের জীবনকাহিনী আদর্শনিষ্ঠা এবং কৃতির কথা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নেতৃত্বে বাংলায় যে বিপ্লব-আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তাহাতে আত্মাহুতি দিয়া উনিশ বৎসরের তরুণ ক্ষুদিরাম একদা সমগ্র ভারতবাসীর মনে চমক লাগাইয়া দিয়াছিলেন। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধিনায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—যিনি বালেশ্বরে বুড়া বালাঙের তীরে পরিখা খনন করিয়া সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। আর তৃতীয় অধ্যায়ের নেতা চট্টগ্রামের সূর্য্য সেন বা মাষ্টার-দা—অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের যুগে চট্টগ্রামে যিনি বিপ্লবের রক্তগঙ্গা বহাইয়া দিয়া অত্যাচারী শাসকজাতির হৃদয়ে নিদারুণ ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিপ্লবীর আত্মদানের গৌরবময় কাহিনী লেখক প্রাণ ঢালিয়া লিখিয়াছেন। বাংলার বহু অখ্যাত বা স্বল্পখ্যাত বিপ্লবী বীর শহীদের কাহিনী এখনও সাধারণের অজ্ঞাত। এই পুস্তকে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদের কাহারো কাহারো আত্মত্যাগের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল, বর্ণনা আবেগে উচ্ছ্বসিত কিন্তু বহুবার 'সাথে' শব্দটির প্রয়োগ বিসদৃশ ঠেকিল, 'আপ্রাণ চেষ্টাও' একাধিকবার আছে।

লঘু পারাশরী রহস্য—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী। সত্যব্রত লাইব্রেরী। ১৯৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

জ্যোতিষ-শাস্ত্রে উক্ত আছে "কলৌ পরাশর স্মৃতঃ" অর্থাৎ জ্যোতিষ বিষয়ে কলিতে মহামুনি পরাশরের মতই গ্রাহ্য। পরাশর-রচিত পারাশরী হোরা হিন্দু জ্যোতিষ-শাস্ত্রের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অনুকরণে বৃন্দাবনের জয়োয়া নামক স্থানের পরাশরগোত্র-সম্ভূত ভৈরবদত্ত পাণ্ডে নামক জনৈক জ্যোতিষী লঘু পারাশরী বা উড়ুদায় প্রদীপ নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন। অনেক জ্যোতির্ব্বিদ এই পুস্তিকাখানিকে পারাশরী হোরার শাখাস্বরূপ মনে করিয়া জ্যোতিষিক গণনাদির জন্য ইহার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, ফলে ইহা জ্যোতিষ শাস্ত্রের একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে পরিচিত।

কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, লঘু পারাশরীতে গ্রন্থকার প্রথম তিন অধ্যায়ে খোদার উপর খোদকারি করিতে গিয়া অর্থাৎ পরাশরের শ্লোকের আলোচনায় বিদ্যা ফলাইতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি এমন কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত শ্লোক জুড়িয়া দিয়াছেন যাহা হইয়া পড়িয়াছে পরাশর সংহিতার সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। লেখক বহু যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া এবং শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া ভৈরবদত্তের মতসমূহ খণ্ডন করিয়াছেন। অনেক বহুদর্শী সুপণ্ডিত জ্যোতির্ব্বিদ, "দশা বিংশোত্তরী চাত্র গ্রাহ্যা নাষ্টোত্তরী মতা" এই বচন অনুসারে অষ্টোত্তরী দশা বিচার একেবারে পরিহার করিয়া থাকেন। ইহা কিন্তু ভৈরবদত্তের মত, মহামুনি পরাশরের নহে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "দশা বিংশোত্তরী রাত্যা দশা চাষ্টোত্তরী মতা"। কাজেই দেখা যাইতেছে দশা-বিচারে পারাশরী হোরা এবং লঘু পারাশরীর মত সম্পূর্ণ ভিন্ন। আয়ুঃ বিচার-প্রণালী সম্বন্ধেও পারাশরী হোরা এবং লঘু পারাশরীর মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। লঘু পারাশরীর সিদ্ধান্তসমূহ যে দোষযুক্ত এবং "দূরতস্ত্যাজ্যমিতি বিষসংপৃক্তান্নবৎ" অর্থাৎ বিষসংপৃক্ত অন্নের মত দূরে পরিত্যাজ্য, সুপণ্ডিত গ্রন্থকার বহু প্রমাণ প্রয়োগে তাহা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। জ্যোতির্ব্বিদমহলে তাঁহার এই পুস্তকের বহুল প্রচলন হওয়া অত্যাবশ্যক।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্নের সম্মান

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন, এম-এ, মহাশয় সম্প্রতি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড আয়র্লণ্ড নামক প্রতিষ্ঠানের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। এদেশে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারকল্পে বিদ্যারত্ন মহাশয় সারা জীবন কঠোর সাধনায় রত আছেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরও তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন-বিষয়ক গবেষণা ব্যাহত হয় নাই। সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ লইয়া তিনি কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জৈন-ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধেও তাঁহার আলোচনা এবং গবেষণা মূল্যবান। তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত "জৈন ও হিন্দু" নামক গ্রন্থখানি ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিদগ্ধমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের জন্ম ২৪ পরগণার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

জেলে

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্যামদেশের একটি প্রাচীন খেমির মন্দির (লোপবুরি)

তরকারীর বাজার, সিমলা —শ্রীপরিমল গোস্বামীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য
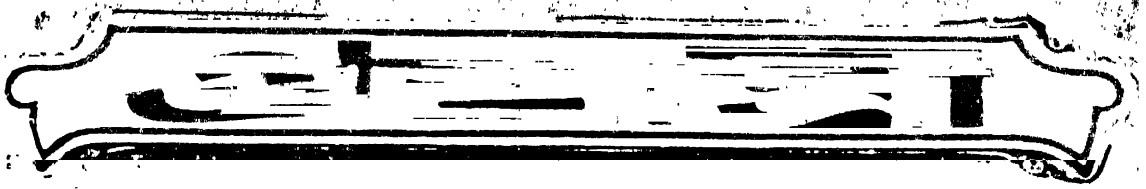
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৯শ ভাগ
২য় খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৫৬ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ছাত্র-আন্দোলন ও ছাত্র-বিক্ষোভ

বাংলার রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ছাত্র-আন্দোলন আরম্ভ হয় সম্ভবতঃ ডন সোসাইটির স্থাপনার সময় বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে। তাহার পর হইতে অদ্যাবধি এই অপরিণতমতিক ও তরলমতি তরুণ-তরুণীর দলসমষ্টি রাষ্ট্রনৈতিক দাবাখেলার ছকে ঘুটিরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যে সকল নেতা পথপ্রদর্শক রূপে ইহাদের রাজনৈতিক আন্দোলন বা রাষ্ট্র-বিক্ষোভের মধ্যে টানিয়াছিলেন বা টানিতেছেন তাঁহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর নেতৃগণ ইহাদিগকে দলে টানিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবিতেন ও তাহার উন্নতির চেষ্টাও যথাসাধ্য করিতেন। আন্দোলন ও বিক্ষোভের মধ্যে ছাত্রদল পড়িলে ঐ শ্রেণীর নেতৃবর্গ পুরোগামী হইয়া বজ্রবঞ্ঝা নিজেদের মাথায় লইয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এবং সুখে-দুঃখে তাহাদের কখনও ভুলিতেন না। যাদবপুর কলেজ, ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুল ইত্যাদি ঐ নেতৃবর্গই সহকর্মী ছাত্রগণের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া সূচনা ও স্থাপনা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতৃগণ ছাত্রবৃন্দকে "কামানের খোরাক" (cannon fodder) রূপেই ব্যবহার করিয়াছেন; আন্দোলন বা বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়া ছাত্রদলকে তাহাতে জড়াইয়া সমস্ত আপদ-বিপদ তাহাদেরই ঘাড়ে চাপাইয়া নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথমাত্র দেখিয়াছেন। ছাত্রদলকে সুশৃঙ্খলা বা সংগঠনের পথ প্রদর্শন করার বিষয় তাঁহারা চিন্তাই করেন নাই, বরঞ্চ বহু ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নামে স্বৈরাচার ও উচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টিতেই উৎসাহ দিয়াছেন; যাহার ফলে ছাত্রদল ক্রমেই বিশৃঙ্খল ও যথেচ্ছাচারী হইয়া দেশে অশান্তির আকর হইয়া পড়িয়াছে। বাংলার ঐ দুই প্রকার নেতৃবর্গের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অধিকাংশই দেশবন্ধু দাশের পূর্ব্বযুগের লোক এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রায় সকলেই তাঁহার পরবর্ত্তীকালের লোক। দেশবন্ধু দাশ ঐ দুই যুগের সন্ধিক্ষণে আসিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতা সৃষ্টি করেন। তিনি ফরিদপুরের সম্মেলনের পর নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহা সংশোধনের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন ও চেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অকালমৃত্যুতে তাঁহাকে ছাত্রদলের সর্ব্বনাশের দ্বার খুলিয়া রাখিয়াই চলিয়া যাইতে হয়।

তাহার পর পঁচিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই পঁচিশ বৎসরে অন্ততঃপক্ষে বাংলার পঞ্চাশ হাজার যুবক ও তরুণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চণ্ডনীতির অনলে দগ্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকশত দৃঢ়চিত্ত যুবক ও কয়েকটি তরুণী জীবন-মরণ পণ করিয়া ব্রিটিশ সরকারের সহিত চরম পরীক্ষায় মৃত্যুর সম্মুখীন হয়—বলা বাহুল্য, উহাদের ঐ চরম ব্রত নেতৃহীন নিরুদ্দেশ যাত্রার মতই ছিল—কয়েকশত গান্ধীজীর অহিংসপথের পথিক হইয়া আত্মোৎসর্গ করে। আরও কিছু ছেলে জেল ও অন্তরীণ অবস্থা হইতে মুক্তি পাওয়ার পর পুনর্ব্বার ছাত্রজীবন ও কর্ম্মজীবনের সূত্র ধরিয়া নূতন করিয়া জীবনযাত্রা আরম্ভ করে। কিন্তু বাকী সকলের অধিকাংশই দমননীতিতে জর্জ্জরিত, হতোদ্যম ও হতাশ্বাস হইয়া, উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে জীবনযাপন করিতে থাকে। এই শ্রেণীর যুবকই রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্যান্বেষীর প্রধান শিকার এবং উহাদেরই নিজেদের ক্ষমতা-লালসা'র ইন্ধনরূপে ব্যবহার করিয়া ঐ নীচ বুদ্ধিজীবিগণ ইষ্টসিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিতে থাকেন। নেতৃত্বপ্রার্থী ব্যক্তিদিগের এই হীন পন্থা অবলম্বনের ফলে বাংলার রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যুবকদিগের মধ্যে উদ্দামভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। সময় থাকিতে এই অবস্থার প্রতিকারের কোনও চেষ্টা হয় নাই। এক দিকে যেমন ব্রিটিশ দমননীতি উত্তরোত্তর চণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিল অন্যদিকে তেমনই ভাবপ্রবণ বাংলার জনসাধারণ ছেলেদের ভালমন্দ সকল আচরণই বিনাবিচারে সমর্থন করিয়া তাহাদিগকে স্বেচ্ছাচারের পথে আগাইয়া দিল। নেতৃগণ নিজের নিজের স্বার্থ পূরণ ও দলপুষ্টি করিবার জন্য ছাত্রসমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবাধ্যতার দ্বার সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া দিলেন। বাংলার যুবক উদ্দামভাবে চলার ফলে ধ্বংসকাতর ও কর্ম্মবিমুখ হইল এবং প্রতিপদে ভিন্ন প্রদেশের যুবকদিগের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়

-হইতে থাকিল। যুগ-যুগব্যাপী স্বাধীনতার সংগ্রামে সহস্র সহস্র লোকের আত্মাহুতি ও শোণিত-তর্পণে অর্জিত সম্পদ এইরূপ হঠকারিতার ফলে বাংলার যুবক খোয়াইতে বসিল।

আজ স্বাধীনতা দেশে আশার আলোক আনিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে জগতে ঘোর দুর্দিন। সেই দুর্দিনের ছায়া এদেশেও পড়িয়াছে ও তাহার আড়ালে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের ক্রীতদাসবর্গ বাংলার যুবকসমাজে পঞ্চমবাহিনী গঠনে ব্যস্ত রহিয়াছে। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির আশু প্রতিকার এখন অত্যন্ত প্রয়োজন। এখনও ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন অযথা বিক্ষোভ ও ষ্ট্রাইক করার বিপক্ষে। শতকরা ২০ জন অবুঝ ছাত্র কতকগুলি উন্মার্গগামী নিকর্মা যুবক-যুবতীর প্ররোচনায় সকলকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে; বলা বাহুল্য, ইহাদের পিছনে বিদেশী শত্রুর নির্দেশ ও অর্থ-সাহায্য রহিয়াছে। বাংলার ছাত্রকে পুলিস কখনও সামলাইতে পারে নাই ও পারিবে না, সুতরাং কর্তৃপক্ষের উচিত স্কুল ও কলেজ হইতে গুপ্ত-প্ররোচক সরাইয়া ছাত্র সংগঠনে ছাত্রদেরই সাহায্য ও উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করা।

প্রস্তাবিত যুব-কংগ্রেস

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত সাব কমিটি প্রস্তাবিত যুব-কংগ্রেসের যে গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে ছয় দফা উদ্দেশ্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য-গুলি নিম্নরূপ :

(১) সদস্যদের মধ্যে চরিত্রের বিকাশ সাধন, শৃঙ্খলাবোধ, কর্মদক্ষতা, ত্যাগ এবং সেবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধিকল্পে প্রচেষ্টা।

(২) দেশের সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সমস্যাসমূহের যথার্থ উপলব্ধির জন্য পাঠচক্র, ক্লাস, বিতর্ক, পাঠ-শিবির এবং গবেষণাকেন্দ্র গড়িয়া তোলা।

(৩) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহিত যুক্ত থাকিয়া অথবা কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত বা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে থাকিয়া জনসেবামূলক কার্য্য পরিচালনার জন্য শিক্ষাদান।

(৪) যুবকগণ যাহাতে খেলাধূলা, শরীর চর্চ্চার কেন্দ্র স্থাপন এবং অন্যান্য অনুশীলন-প্রচেষ্টার অধিক সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করা।

(৫) সাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক ও জাতিভেদ প্রচার, গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং গঠনমূলক ও সমাজ সেবামূলক কর্মপ্রচেষ্টায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করা এবং

(৬) কর্ম্মিদল গঠন, শহর ও পল্লী এলাকায় ভ্রমণের ব্যবস্থা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য যুবজনকে উৎসাহ দান।

সাব কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ১৫ জন মনোনীত সদস্য লইয়া ভারতীয় যুব-কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠিত হইবে এবং এই ১৫ জনের মধ্যে অন্ততঃ একজন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য থাকিবেন।

প্রাদেশিক এবং জেলা সংস্থাসমূহ গঠিত হইলে উক্ত সংস্থা-সমূহ কর্তৃক নির্ব্বাচিত সদস্যগণ কেন্দ্রীয় বোর্ডের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য বা সদস্যগণ ব্যতীত অপর সকল মনোনীত সদস্যের স্থলাভিষিক্ত হইবে।

প্রাদেশিক কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের লইয়া অনুরূপভাবে প্রাদেশিক বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশঙ্কররাও দেও সকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নিকট সার্কুলার প্রেরণ করিয়া বিশেষ জোরের সহিত বলিয়াছেন, এই বিষয়ে আর একটুও সময়ক্ষেপ করা উচিত নহে। যথাসম্ভব শীঘ্র যুব-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। একটি সুসংবদ্ধ যুব আন্দোলন কংগ্রেস তথা দেশের পক্ষে শক্তির উৎসস্বরূপ হইবে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। নৈরাশ্য এবং ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে দেশে যে সব সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সমাধানেও এই আন্দোলন যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

আম্বালাতে এক ছাত্র সভায় পণ্ডিত নেহরু, ছাত্র ও ছাত্রপ্রতিষ্ঠানের সহিত রাজনীতির সম্পর্ক সম্বন্ধে বলিয়াছেন "কোন ছাত্রপ্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির মধ্যে টানিয়া আনা সঙ্গত নহে, কারণ সেক্ষেত্রে দেশের বড় বড় রাজনৈতিক দল কর্তৃক স্বার্থসাধনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রগণ তাহাদের রুচি অনুযায়ী যে-কোন রাজনৈতিক আদর্শবাদের উপাসক হইতে পারে। প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে আসিয়া পড়িলে ছাত্রের পক্ষে রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নকে পরিণত হইবার আশঙ্কা আছে। পণ্ডিত নেহরু ছাত্রসমাজকে আর একটি বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন শিক্ষার্থী ছাত্র তাহার স্কুল কলেজের জীবনেই এমন যোগ্যতা অর্জন করে না যাহার দ্বারা রাজনীতি বা সমাজের অন্য কোন ব্যাপারে তাহারা নেতৃত্ব করিতে পারে। ছাত্রজীবনে নিষ্ঠার সহিত বিদ্যাশিক্ষার পর, স্কুল-কলেজের বাহিরে আসিয়াও দেশ জাতি ও পৃথিবী সম্বন্ধে বহু বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং আরও অধ্যয়ন ও কর্মসাধনের দ্বারা জ্ঞান অর্জন করিতে হয়, তবেই নেতৃত্ব করিবার দাবি এবং যোগ্যতা লাভ করা সম্ভব হয়। শিক্ষার্থী ছাত্রের জীবন প্রধানতঃ আত্মসংগঠনের জীবন, 'নেতৃত্ব' করিবার স্পৃহা তাঁহাদিগের থাকা উচিত নহে। এই বাস্তব সত্যটুকু স্মরণ রাখিয়া ছাত্রগণ যদি শিক্ষার্থীরূপে তাঁহাদের 'শিখিবার স্পৃহা' সবচেয়ে বেশী করিয়া পোষণ করেন তবেই তাঁহারা প্রতিভা ও কর্মশক্তির অধিকারী হইবে

পারিবেন।" আমরা আশা করি, যুব-কংগ্রেস গঠনকারীগণ পণ্ডিত নেহরুর এই উক্তি স্মরণ রাখিবেন।

ভারতীয় মুদ্রামূল্য হ্রাস

ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯শে সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলেন, ষ্টার্লিং ও ভারতীয় মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে জনসাধারণের নিজেদের নিকট অথবা ব্যাঙ্কে আমানত যে অর্থ রহিয়াছে, তাহার মূল্যের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না। কোন কোন মুদ্রা-ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়-মূল্যেরই ইহা দ্বারা কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র।

গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, যে সকল দ্রব্য বিশেষ ভাবে এখানে উৎপন্ন হয় এবং যাহার উপর জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় বিশেষভাবে নির্ভর করে, মুদ্রামূল্য হ্রাস সেই সকল দ্রব্যের মূল্যের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে না। এই বৎসরে ডলার অঞ্চল হইতে কোনরূপ খাদ্য-শস্য আমদানী হইবে না বলিয়া এই ব্যবস্থার ফলে মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না।

ভারত গবর্ণমেণ্ট আশা করেন, যাহাতে দেশের মঙ্গল হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহারা মুদ্রামূল্য হ্রাস সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন।

ফাট্‌কা কারবারের ফলে যে মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন এবং করিবেন।

ইস্তাহারের পূর্ণ বিবরণ এইরূপ: ষ্টার্লিং মূল্যের সমান অনুপাতে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস করার সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতীয় টাকা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রীয় ২১ সেণ্টের সমান হইবে। ইহার পূর্ব্বে মূল্য ছিল ৩০·২২৫ সেণ্ট। এই অবস্থায় এক টাকার মূল্য ·১৮৬৬২১ সেণ্ট গ্রাম স্বর্ণ মূল্যের সমান হইবে অথবা এক আউন্স স্বর্ণের মূল্য ১৬৬·৬৬৬৬ টাকা হইবে। এই মূল্য এখন হইতেই বলবৎ হইবে। ষ্টার্লিং এবং ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। টাকার মূল্য যথারীতি এক শিলিং ৬ পেন্স থাকিবে।

ডলার অঞ্চলে দেনা-পাওনা সংক্রান্ত অসুবিধার জন্ত কিছু দিন হইতেই এই মূল্য হ্রাস করিবার কথা বলা হইতেছিল। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা দ্বারা ভারতের পক্ষে ডলারের অভাব সমস্যার সমাধান হইবে না বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এ ব্যবস্থা সমর্থন করেন নাই। ভারতীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই মুদ্রা হ্রাসের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহা প্রয়োজনীয়ও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। ভারতের রপ্তানি সীমাবদ্ধ বলিয়া মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়া ইহা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

কিন্তু ষ্টার্লিং-এর মূল্য হ্রাস করা সম্পর্কে ইংলণ্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় এবং অন্যান্য দেশ এই ব্যবস্থা অনুসরণ করায় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যে, ভারতের পক্ষেও এই ব্যবস্থা অনুসরণ করাই একমাত্র পন্থা। ভারতের আমদানী রপ্তানি ব্যবসা অধিকাংশ ষ্টার্লিং অঞ্চলের সঙ্গে। সুতরাং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতের অসুবিধা না করিয়া ষ্টার্লিং-এর মূল্য অনুপাতে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য বেশী রাখা সম্ভব নয়। কারণ ইহার ফলে তথায় রপ্তানি বাজারেরও ক্ষতি হইবে, এবং আমদানীও আরও হ্রাস করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় ভারত মুদ্রাহ্রাস ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া পারিবে না। এই মনোভাবের ফলে পূর্ব্বতন বিনিময় হারে দেনা-পাওনা অসম্ভব হইয়া পড়িত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হইত। সুতরাং ভারতের পক্ষে এই ব্যবস্থা অবলম্বন ভিন্ন উপায় ছিল না।

মূল্য হ্রাসের পরিমাণ সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, ষ্টার্লিং-এর মূল্য যে হারে হ্রাস করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা কম হারে হ্রাস করিলে ভারতের সমস্যার সমাধান হইত না। ষ্টার্লিং অপেক্ষা অধিকতর মূল্য হ্রাসের কোন প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং বিশেষ বিবেচনার পর ভারত গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, দুই বৎসর পূর্ব্বে ষ্টার্লিং ও ভারতীয় মুদ্রার বর্ত্তমান হার অপরিবর্ত্তিত রাখা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, সেই অনুযায়ীই বর্ত্তমান ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

মুদ্রামূল্য হ্রাস সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ মহলের অভিমত

অভ কর্ত্তৃপক্ষ মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, ষ্টার্লিং ও ভারতীয় মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে ডলার অঞ্চল হইতে ভারতে মাল আমদানী বিশেষভাবে হ্রাস পাইবে।

এই সূত্র হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, ভারতকে ডলার অঞ্চল হইতে মাল আমদানী শতকরা ৩০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। কারণ এই জাতীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে এবং এই জাতীয় দ্রব্য আমদানীর জন্ত নির্দ্দিষ্ট বরাদ্দ টাকার পরিমাণ যদি বৃদ্ধি না হয়, তবে তাহাকে আমদানী আরও হ্রাস করিতে হইতে পারে।

ডলারের মূল্য হ্রাস না পাইলে ডলার আমদানী ধীরে ধীরে কমিয়া যাইবে। উপরোক্ত সূত্র বলে ডলার মূল্য হ্রাসের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

তাঁহারা বলেন, ষ্টার্লিং-এর মূল্য হ্রাসের ফলে ডলার অঞ্চল বিশেষভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে কাঁচা মাল পাইবে এবং এই সকল হইতে প্রস্তুত দ্রব্যের উৎপাদনেও কম ব্যয় হইবে। মুদ্রামূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত দেশসমূহে এই সকল দ্রব্য আবার সস্তা দামে পাওয়া যাইবে। চড়া দামে কেনা কাঁচা মাল হইতে যে সমস্ত দ্রব্য পূর্ব্বেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং পরে সস্তায় যে সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হইবে, তাহাদের মূল্যের সমতা হইবার পূর্ব্বে কিছু সময় অতিবাহিত হইবে।

এই মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে ষ্টার্লিং অঞ্চল হইতে ভারতে আমদানী মালের মূল্যের কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না।

এই মহল বলেন, এই মূল্য হ্রাস ভারতের বর্ত্তমান জীবিকানির্ব্বাহ ব্যয়ের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে না। কারণ ভারতের আমদানীর শতকরা ৭৫ ভাগ ষ্টার্লিং হইতে আসে এবং বর্ত্তমান ব্যবস্থার ফলে ইহার মূল্যের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবে না। অবশিষ্ট শতকরা ২৫ ভাগ আমদানী দ্রব্যের জন্য ভারতকে উচ্চতর মূল্য দিতে হইবে এবং কোন কোন দ্রব্যের মূল্য এই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে। ডলার অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি, ইস্পাত প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

এই মহল বলেন, খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে, ইহা সম্ভব নয়, কারণ ডলার অঞ্চল হইতে ভারতে খাদ্য আমদানী হইবে না। যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সম্পর্কে ভারত ইংলণ্ড হইতে এই সমস্ত দ্রব্য আমদানীর ব্যবস্থা করিবে এবং ইংলণ্ড হইতে এই সকল দ্রব্য পাইবার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দিক হইতে ব্রিটিশ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দ্রব্য আমদানী সম্পর্কে বিমুখতা হ্রাস পাইবে।

সোমবার ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে পাউণ্ড ষ্টার্লিং-এর মূল্য চার ডলার তিন সেণ্টের পরিবর্ত্তে দুই ডলার আশী সেণ্ট ধার্য্য হইয়াছে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় টাকার মূল্য ২১ মার্কিণ সেণ্ট ধার্য্য হইবে। ব্রিটেনে এক মার্কিণ ডলারের দাম পাঁচ শিলিং-এর কিছু কম হইতে সাত শিলিং দুই পেন্সিতে দাঁড়াইবে।

রবিবার রাত্রে ওয়াশিংটন হইতে লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস বেতারযোগে এই যুগান্তকারী ঘোষণা করেন। ১৯০১ সালে ব্রিটেন কর্ত্তৃক স্বর্ণমান ত্যাগের পর, অর্থনৈতিক জগতে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যকর ঘোষণা। ষ্টার্লিং-এর মূল্য শতকরা সাড়ে ত্রিশ ভাগ হ্রাস করার সিদ্ধান্তে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে ও টাকার বাজারে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ক্যামিল গাট ঘোষণা করেন যে, আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার পাউণ্ড ষ্টার্লিং, দক্ষিণ আফ্রিকার পাউণ্ড, অষ্ট্রেলিয়ার পাউণ্ড, নরওয়ের ক্রোনার, ডেনমার্কের ক্রোনার এবং ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাস অনুমোদন করিয়াছেন। মঃ ক্যামিল গাট বলেন, মুদ্রার মূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত যথাযথ হইয়াছে।

মুদ্রার মূল্য হ্রাসের ফলে স্বর্ণের দাম স্বতঃই বৃদ্ধি পাইবে। নিউ ইয়র্ক পৌহামি স্বর্ণের দাম প্রতি আউন্স ২৫০ শিলিং (ষ্টার্লিং)-এ দাঁড়াইবে। লণ্ডনের দর সম্ভবতঃ ২৪৮ শিলিং ৭ পেন্স হইবে। স্বর্ণের বর্ত্তমান দর ১৭২ শিলিং আছে।

মুদ্রামূল্য হ্রাস বিষয়ে সার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সের মন্তব্য

'সাধারণের বোধগম্য' সরল ও সুস্পষ্ট ভাষায় ষ্টার্লিং-এর মূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস ব্রিটেনের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "বর্ত্তমান ষ্টার্লিং-ডলার সমস্যার সমাধানের অন্য কোন পথ নাই বলিয়াই আমরা এই পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের ভবিষ্যতের সুখসমৃদ্ধি এবং আর্থিক নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, ষ্টার্লিং-এর স্থায়িত্ব এবং অধিক পরিমাণে ডলার উপার্জ্জনের জন্য আমাদের ব্যাপক এবং চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। বেকারদের সংখ্যাবৃদ্ধি অথবা সমাজসেবামূলক কার্য্যাবলীর সংক্ষেপসাধন প্রভৃতি দেশের পক্ষে অহিতকর কার্য্যে সম্মতি দিয়া, আমরা বর্ত্তমান ডলার সঙ্কট সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইতে পারি না।

আমরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি তাহা যে কোন দেশের পক্ষেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের গত্যন্তর ছিল না, একথা ব্রিটেনের অধিবাসীদের স্মরণ রাখিতে হইবে।"

স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস বলেন, "গত বৎসর বসন্তকালে নানারূপ গুজব প্রচারিত হয় যে, ষ্টার্লিং-এর বিনিময় হার অত্যন্ত বেশী। মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হইতে পারে এই আশঙ্কায় লোকে নানাবিধ উপায়ে পাউণ্ড ষ্টার্লিংকে ডলার এবং স্বর্ণে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করিতে থাকে। বৃটেনের মজুত ডলার এবং স্বর্ণের পরিমাণ কম থাকায়, এইরূপ লোকসান বন্ধ করার ব্যবস্থা আমাদের করিতে হইয়াছে। আসল কথা এই যে, নূতন দর এরূপভাবে বাঁধিয়া দিতে হইবে, যাহাতে দর কমিতে না পারে, অবস্থা উন্নত হইলে যে কোন সময়ে বিনিময়-হার বৃদ্ধি করা যাইবে

"ষ্টার্লিং-এলাকার খাজাঞ্চি হিসাবে বৃটেনের দায়িত্ব খুব বেশী। কিন্তু, ইহা কেবল ষ্টার্লিং এলাকার সমস্যা নহে, ইহা সমগ্র ডলার বহির্ভূত এলাকার সমস্যা। ইহার সমাধান করিতে হইলে সকলের সহযোগিতা চাই।

"আয় ব্যয়ের সমতা আনিতে হইলে, হয় আমাদের ডলার উপার্জ্জন বৃদ্ধি করিতে হইবে, নতুবা খরচ কমাইতে হইবে।

আয় বৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া খরচ কমাইবার চেষ্টা, অর্থনীতির অন্তিম নীতি কখনই সমর্থন করা যায় না। কারণ উহার ফলে আমরা কাঁচা মাল এবং অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি হইতে বহুলাংশে বঞ্চিত হইব। আমাদের জীবনযাত্রার মানের অবনতি ঘটিবে। ডলার এলাকা হইতে উপার্জ্জন বৃদ্ধির চেষ্টা আমাদের করিতে হইবে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ১৯৫২ সালে মার্শাল সাহায্য বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহার পূর্ব্বেই আমাদের স্বাবলম্বী হইতে

হইবে। বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মানের অবনতি যদি বন্ধ করিতে হয়, ১৯৫২ সালের মধ্যে আমাদের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ডলার উপার্জ্জন করিতে হইবে।" জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়া স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস বলেন, "মুদ্রার মূল্য হ্রাসের ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং সেই অজুহাতে বেতন বৃদ্ধির দাবী করা হইতে পারে। বেতন বৃদ্ধি করা হইলে উৎপাদনের ব্যয়ও বর্দ্ধিত হইবে। তাহার ফলে মুদ্রার মূল্য হ্রাসে আমাদের মূল নীতি, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে ডলার এলাকায় পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের অবস্থা ব্যাহত হইবে। জনসাধারণকে বেতন বৃদ্ধির দাবী না করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস আরও বলেন, ডলার এলাকায় আমাদের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। এ বিষয়ে আমরা কৃতকার্য্য হইলে, মুদ্রাস্ফীতির কারণে আমাদের দেশে দ্রব্যাদির আভ্যন্তরীণ মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। উহা বিশেষ বিপজ্জনক বলিয়া আমাদের সতর্ক থাকিতে হইবে।

মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফল

মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফল কি হইবে তাহা এখনও কেহই নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারিতেছেন না। ব্রিটেনের এবং ভারতবর্ষের এ বিষয়ে একই অবস্থা। পণ্ডিতজী নিজেও বলিয়াছেন যে ইহার সঠিক ফলাফল বুঝিতে কিছু সময় লাগিবে।

পণ্ডিত নেহরু একটি বেতার বক্তৃতায় মুদ্রামূল্য হ্রাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাতে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় কোন বাধা আসা উচিত নয়; দ্রব্যমূল্য বাড়িবারও কোন কারণই নাই, সুতরাং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াও উচিত নয়। ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য কমিয়াছে বটে, কিন্তু দেশের ভিতরের কেনা-বেচায় টাকার, দরের কোনরূপ তারতম্য হইবে না। পণ্ডিতজী বিশেষ জোরের সঙ্গে এই কথা বলেন যে, আমাদের জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্য আর বাড়িলে তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা কাহারও থাকিবে না। মূল্য বৃদ্ধির চেষ্টা কেহ করিলে গবর্ণমেণ্টকে তাহা নিবারণ করিতেই হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের উপায়ের উন্নতি বিধান করিয়া মূল্য-মান কমাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিতে থাকিবেন।

পণ্ডিতজী বলেন যে টাকার মূল্য হ্রাস ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ ভাবে নিজের ইচ্ছাতেই করিয়াছে। ব্রিটেনের পাউণ্ডের দাম কমাইয়া দেওয়াতেই এই মূল্য হ্রাসের প্রশ্ন উঠে। এই মূল্য হ্রাসের ফলে আমাদের সাময়িক একটু সুবিধা হইবে মাত্র, স্থায়ী সুবিধার জন্য আমাদের অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—ইহা লইয়া আমাদের উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই। টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে সমাজ-বিরোধী কার্য্যকলাপ যদি দেখা দেয় তবে আমাদিগকে তাহা নিবারণ করিবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে।

মুদ্রামূল্য হ্রাসের পক্ষে যুক্তি এই যে একটিন বাজারে টাকার বড় টানাটানি গিয়াছে। ব্যাঙ্কের সুদের যে সরকারী দর ঘোষণা করা হয় বাজারে সেই সুদে টাকা পাওয়া যায় না, তার চেয়ে অনেক বেশী সুদে শিল্প বাণিজ্যে প্রয়োজনীয় ঋণ সংগ্রহ করিতে হয়। ইহা দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইহার মধ্যে যত বার ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন, সরকারী ঋণের সুদ কম বলিয়া সেই চেষ্টা সফল হয় নাই, যাহাদের হাতে টাকা আছে তাহারা এত কম সুদে ধার দিতে অনিচ্ছুক বলিয়া গবর্ণমেণ্ট ঋণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাগুলিও অতি দ্রুত খরচ হইয়া যাইতেছে। বৈদেশিক বাণিজ্যেও আমাদের পাওনার পরিবর্ত্তে ঘোটা দেনা দাঁড়াইয়া যাইতেছে। আন্তর্জাতিক দেনা পাওনায় আমাদের কিছুতেই সুবিধা হইতেছে না। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে আমাদের ষ্টার্লিং ব্যালান্স উড়িয়া শূন্যে মিলিয়া যাইতে বেশী সময় লাগিবে না। এই অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায় মুদ্রামূল্য হ্রাস। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর যে সব সুবিধা হইয়াছিল তাহার অভিজ্ঞতা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। ১৯৩২-৩৩ সালে কারেন্সি কন্ট্রোলারের রিপোর্টে দেখা যায় যে মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে ব্যাঙ্কের জমা টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, টাকা সস্তা হইয়াছিল এবং গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির দাম বাড়িয়াছিল। মুদ্রামূল্য হ্রাসের যাঁহারা সপক্ষে তাঁহারা আশা করিতেছেন যে এবারও এইরূপই আমাদের টাকার বাজারের অবস্থা ভাল হইবে। এখন টাকার দরে প্রভেদ হইবে। ষ্টার্লিং ব্যালান্স কমা বন্ধ হইয়া উহা আবার বাড়িতে আরম্ভ করিবে। ষ্টার্লিং ব্যালান্স বাড়িলে নোট প্রচার বাড়িবে। নোট বাড়িলে টাকা সস্তা হইবে, অল্প সুদে টাকা পাওয়া যাইবে। টাকা সস্তা হইলে নূতন নূতন কোম্পানী গঠিত হইবে। মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে আমদানী দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের ফলে নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিবে। ইহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি হইবে। এই ভাবে মুদ্রামূল্য হ্রাস আমাদের ক্ষতির কারণ না হইয়া মঙ্গলেরই আকর হইয়া উঠিবে।

অপর পক্ষে আর একদল মুদ্রামূল্য হ্রাস আমাদের দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অশোক মেটা বলেন, মুদ্রামূল্য হ্রাস ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে আমাদের দেশকে বাঁধিয়া দেওয়ার অর্থনৈতিক পরিণাম। ইহাতে দেশের সাধারণ লোকের ক্ষতি হইবে কারণ মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যাইবে, কাজেই জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। ডলার অঞ্চল হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী বন্ধ হওয়ায় আমাদের শিল্প-প্রসার ব্যাহত হইবে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের দাম বাড়িবে। খাদ্য আমদানী যদি এই ভাবে চলিতে থাকে তবে তার দামও বেশী পড়িবে

এবং খাদ্যের দামও বাড়িবে। পাকিস্থান মুদ্রামূল্য হ্রাস না করিলে আমাদের চটকল অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। পাকিস্থানের টাকার দর বেশী থাকিলে পাকিস্থানের সহিত বাণিজ্যে ভারতবর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কারণ পাকিস্থানী দ্রব্যের দাম আমাদের দেশে বাড়িয়া যাইবে। পাকিস্থান হইতে আমরা তুলা, পাট ও গম আমদানী করি বলিয়া আমাদের অনেক ক্ষতি হইবে। কিন্তু পাটের দাম বাড়িলে তার চাপ আমাদের উপর এত বেশী পড়িবে যে তাহা আমাদের পক্ষে সামলানোই কঠিন হইবে। বাংলার অবস্থা হইবে সবচেয়ে সঙ্গীন। আমাদের কাপড়ের মিলের অবস্থা সামান্য ভাল হইতে পারে, কারণ বিদেশে কিছু বেশী কাপড় বিক্রয়ের আশা আছে। তবে এই প্রতিযোগিতা হইবে জাপানী কাপড়ের সঙ্গে, বিলাতী কাপড়ের সঙ্গে নয়।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক মিঃ সি. এন. ভকীল বলেন, আমাদের যন্ত্রপাতি এবং খাদ্যের জন্য আমেরিকার উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রভাব আমাদের আভ্যন্তরীণ মূল্যের উপরেও আসিয়া পড়িবে। আমাদের জিনিষের দাম আমেরিকার বাজারে সস্তা হইবে এটা ঠিক, কিন্তু আমাদের তাহাতে কতটা লাভ হইবে, কত মাল আমরা বেচিতে পারিব তাহার স্থিরতা নাই। ষ্টার্লিং ব্যালান্সের মূল্য ডলারের হিসাবে শতকরা ৩০ ভাগ কমিয়া গেল, উহা দ্বারা আমরা যে পরিমাণ ডলার কিনিতে পারিতাম এখন তার চেয়ে কম পাইব। আমাদের দেশের জিনিষপত্রের দাম বিলাতী এবং আমেরিকান জিনিষের চেয়ে বেশী। এই অবস্থায় অনায়াসে আমরা টাকার দর বাড়াইয়া জিনিষের দর কমাইবার কথা বলিতে পারিতাম। ইহা সম্ভব না হইলে অন্ততঃ মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়া মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি করা আমাদের পক্ষে উচিত কাজ হয় নাই। ইহা দ্বারা আমরা ডলারের অভাব ঘুচাইতে পারিব কিনা সন্দেহ। ভারতে ডলার আমদানী এবং আমেরিকান কোম্পানী স্থাপনের যে আলাপ চলিতেছে তাহার জন্য এতখানি ত্যাগস্বীকারের কোন প্রয়োজন ছিল না।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচারী বলেন, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই অত্যধিক মুদ্রামূল্য হ্রাসের পক্ষে কোন যুক্তি নাই। দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়া দাম বাড়িবে। মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিবার ক্ষমতা ভারত-সরকারের আছে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সাময়িক সামান্য লাভ ইহাতে হয়ত হইতে পারে কিন্তু আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় যে বিরাট ক্ষতি হইবে তাহার তুলনায় লাভ যাহা হইবে তাহা নগণ্য।

মুদ্রামূল্য হ্রাস বিষয়ে পাকিস্থানের সিদ্ধান্ত

পাকিস্থান সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের অনুপাতে পাকিস্থানের টাকার মূল্য হ্রাস করিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্য রাত্রে পাকিস্থান মন্ত্রিসভার পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী অধিবেশনের পর উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এতৎসম্পর্কে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণরত পাকিস্থানের অর্থসচিব জনাব গোলাম মহম্মদের সহিত আলাপ-আলোচনা করা হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। মন্ত্রিসভার অধিবেশনে 'পাকিস্থান ষ্টেট ব্যাঙ্কের' গভর্ণর এবং পাকিস্থান সরকারের জেনারেল সেক্রেটারী উপস্থিত ছিলেন।

পাকিস্থানের এই সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষের পক্ষে আপাততঃ অতিশয় ক্ষতিকর হইবে। শ্রীযুক্ত অশোক মেটা ও শ্রীযুক্ত ভকীল যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই দেখা দিয়াছে। আপাততঃ পাকিস্থান তুলা ও পাট বেচিয়া আমাদের নিকট হইতে বেশী দাম আদায়ের চেষ্টা করিবে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্থান মুদ্রামূল্য হ্রাস না করিয়া পারিবে কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। পাকিস্থানের সবচেয়ে বেশী বাণিজ্য ভারতবর্ষের সঙ্গে। ভারতবর্ষ তাহাকে পাল্টা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলে পাকিস্থানের পক্ষে সামলানো কঠিন হইবে সন্দেহ নাই। চটকলগুলি এখনই পাকিস্থানের পাটের অন্যায় মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে মাসে এক সপ্তাহ বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইতেছে এবং ইহাতে পাটের দর অনেক কমিয়াছে। পাকিস্থানের হাতে বহু পাট জমা পড়িয়া আছে। ডাণ্ডী এবং কলিকাতা পাট কম করিয়া কিনিলে পাকিস্থানের অতি লাভের স্বপ্ন হাওয়ায় মিলাইয়া যাইবে। পাকিস্থান মুদ্রামূল্য হ্রাস না করায় ডাণ্ডীকেও পাটের দাম বেশী দিতে হইবে, ইহাতে স্কটল্যাণ্ডের চটকলেরও প্রভূত ক্ষতি হইবে। সুতরাং তাহাদের পক্ষেও কলিকাতার পথ ধরা ব্যতীত গত্যন্তর থাকিবে না। পাটের দাম মুদ্রামূল্য হ্রাস না হওয়ায় টাকায় পাঁচ আনা বাড়িয়া যাইবে, ইহাতে উৎপাদন ব্যয় যাহা পড়িবে তাহার ফলে চট ও থলিয়া এত দুর্মূল্য হইয়া পড়িবে যে, আমেরিকাও উহা কিনিতে চাহিবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং এ বিষয়ে প্রথম হইতেই কঠোরতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। তুলার দামও এইভাবে টাকায় পাঁচ আনা বাড়িয়া যাওয়ায় ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির বিদেশে কাপড় বেচিয়া লাভ করিবার যেটুকু আশা ছিল তাহাও শেষ হইয়া গেল। ভারত সরকারের অতঃপর মিশর, পূর্ব্ব-আফ্রিকা প্রভৃতি ষ্টার্লিং এলাকা হইতে তুলা ক্রয়ের চেষ্টা করা আবশ্যক।

মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রধান কুফল মূল্যবৃদ্ধি আমাদের দেশে দেখা দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিবে বেশী ব্যবসায়ী ও মিল-মালিকদের সততা এবং অসাধু ব্যবসায়ী প্রভৃতির অতিলাভ দমনে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার উপর। পাকিস্থানের সিদ্ধান্ত ইহার উপর একটা অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টি করিয়া দিল; ইহা সরল করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেও দেশবাসী তাহা সমর্থন করিবে।

পশ্চিমবঙ্গে সামরিক বৃত্তি

"সামরিক শিক্ষালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ভর্ত্তি হইবার জন্য বাংলার যুবকদের নিকট যে আহ্বান জানান হইয়াছে, তাহাতে যুবসমাজ বিশেষ সাড়া দেয় নাই। যাহারা ভর্ত্তি হইবার জন্য এ পর্য্যন্ত আবেদন করিয়াছে তাহাদের যোগ্যতার মান খুব নীচু।

সামরিক শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি হইবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উৎসাহ দিবার জন্য এবং সকল প্রকার তথ্য সরবরাহ করিবার নিমিত্ত এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে—সামরিক অফিসারগণ বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ পরিদর্শন করিবেন এবং কলেজের অধ্যক্ষ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক, অভিভাবক এবং ভারতের সশস্ত্র বাহিনীতে লোক-সংগ্রহের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত ব্যক্তিদের সভায় বক্তৃতা দিবেন। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই সামরিক অফিসাররা সফর আরম্ভ করিবেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ পশ্চিমবঙ্গের দেশরক্ষা সমন্বয়সাধক অফিসারের নিকট আবেদন করিলে সামরিক শিক্ষালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পাঠ্য তালিকার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। যাহারা প্রার্থী হইতে ইচ্ছুক তাহাদের নিকট নিম্নলিখিত বিবরণগুলি প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে—সেনা বিভাগ, নৌ-বিভাগ ও বিমান বিভাগের প্রার্থীরা দুই বৎসর পর্য্যন্ত ষ্টাফ সার্ভিসেস্ উইং-এ যৌথভাবে প্রাক্-কমিশনে শিক্ষালাভ করিবে। সামরিক শিক্ষালয়ে সামরিক শিক্ষা ব্যতীত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য তালিকার সমুদয় পুস্তকও পড়ান হইবে। ঐ শিক্ষালয়ে ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, পৌর বিজ্ঞান, ভূগোল, আধুনিক ভাষা প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং যন্ত্র চালনা শিক্ষা, রণক্ষেত্রের ক্রিয়াকৌশল শিক্ষা, মানচিত্র দেখা এবং নৌ-বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই শিক্ষাদানের সময় গবর্ণমেণ্ট পাঠের ব্যয়, থাকা ও খাওয়ার ব্যয় বহন করিবেন। প্রার্থীদের হয়ত মাসে আনুমানিক ৩০৲ টাকা হাতখরচ লাগিতে পারে। দুই বৎসর শিক্ষা-লাভের পর কৃতী প্রার্থীদের যে বিষয়ের জন্য নির্ব্বাচিত করা হইবে তাহার জন্য বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। সেনাবিভাগের শিক্ষার্থীরা সামরিক বিভাগে চলিয়া যাইবে এবং নৌ ও বিমান বিভাগের শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ বিভাগের শিক্ষার জন্য স্ব স্ব বিভাগে যাইবে।

প্রত্যেক বৎসরে দুইটি ট্রেনিং কোর্স আছে। একটি জানুয়ারী মাসে ও অপরটি জুলাই মাসে। প্রত্যেকটি কোর্সের জন্য আনুমানিক দুই শতটি পদ খুব আছে। ষ্টাফ সার্ভিসেস্ উইং-এ ভর্ত্তি হইতে হইলে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরিচালিত একটি পরীক্ষা দিতে হয়। কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের লিখিত পরীক্ষায় যাহারা কৃতকার্য্য হইবে তাহাদের সার্ভিসেস্ সিলেকশন বোর্ডের নিকট হাজির হইতে হইবে। ঐ বোর্ড সামরিক শিক্ষালয়ে গ্রহণের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের চূড়ান্ত সুপারিশ করিবে।

প্রাথমিক পরীক্ষা যাহারা দিবে শিক্ষার কোর্স আরম্ভ হইবার মাসের প্রথম তারিখে অর্থাৎ ১লা জানুয়ারী এবং ১লা জুলাই তারিখে তাহাদের বয়স ১৫ বৎসরের কম অথবা ১৭ বৎসরের বেশী হইলে চলিবে না। সর্ব্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা হইতেছে ম্যাট্রিকুলেশন পাস অথবা অনুরূপ কোন পরীক্ষায় পাস।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপরে উদ্ধৃত বিবৃতিটি প্রকাশিত করিয়াছেন। এই বিবৃতির প্রথম অংশ পাঠ করিয়া আমরা লজ্জিত হইয়াছি; বাঙালী যুবকদের ততোধিক লজ্জিত হওয়া উচিত। তাহাদের পক্ষ হইয়া ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হইত যে ইংরেজের ভেদনীতির ফলে বাঙালী-যুবক সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে না। আজ সেই বাধা সরিয়া গিয়াছে; সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আহ্বান আসিয়াছে। কিন্তু এই আহ্বানে বাঙালী "যুব সমাজ বিশেষ সাড়া দেয় নাই।" কেন? ইহার উত্তর পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বাঙালী সমাজকেও এই কর্ত্তব্য-চ্যুতির কারণ সম্বন্ধে নীরব থাকিলে চলিবে না। যদি যুব-সমাজ এইভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রের সেবায় পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে, তবে সমাজ ধ্বংসের পথে যাইবে এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যদি এই বিষয়ে তৎপর না হন, তবে বাঙালী সমাজের বাঁচিবার অধিকার নষ্ট হইয়া যাইবে।

পশ্চিমবঙ্গে সেচকার্য্যের প্রসার

পশ্চিমবঙ্গের সেচমন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার বলিয়াছেন যে, প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খাল-বিল-নদী বুজিয়া গিয়াছে; কৃষির উন্নতির জন্য বদ্ধ জল-প্রবাহকে পুনরায় প্রবহমাণ করিবার পরিকল্পনা মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে স্থানীয় লোকের সাহায্য পাওয়া যাইবে; বাহির হইতে লোক আমদানী করিলে যে অত্যধিক ব্যয় হয় তাহা নিবারিত হইবে এবং আপাততঃ দামোদর বাঁধ ও ময়ূরাক্ষী বাঁধ প্রভৃতি বিরাট বিরাট পরিকল্পনার ভাবনায় অস্থির হইতে হইবে না। পশ্চিমবঙ্গের মত ক্ষয়িষ্ণু প্রদেশের পক্ষে ইহা কম আশার কথা নয়। এইরূপ স্থানীয় উন্নতির পরিপোষক রূপে আমরা স্থানীয় সংবাদপত্রের সাহায্যে প্রদেশের মজা খাল বিল নদীর দুরবস্থার খবর দিতেছি। বর্ত্তমান মাসে "সত্যাগ্রহ

পত্রিকা"র ২৬শে ভাদ্র তারিখের সংখ্যা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণটি উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-মন্ত্রী ও সেচমন্ত্রী এই বিষয়ে তৎপর হইবেন—

কলিকাতা হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূরে বাঁওবিল প্রায় পঁচাত্তর বর্গমাইল লইয়া বিস্তৃত। এই বিলের অধিকাংশ ব্যারাকপুর মহকুমায় ও অবশিষ্টাংশ বারাসত মহকুমায় অবস্থিত। ইছামতী খাল, সুবর্ণবতী বা সোনাই নদী এবং লাবণ্যবতী বা নোয়াই খালের দ্বারা ইহার জল নির্গত হইত। ইছামতী খাল ঐ বিলের জল বহিয়া লইয়া আসিয়া গঙ্গায় ঢালিত, কিন্তু এই খালকে ইহার পতন স্থানে উভয় পার্শ্বের ক্যাক্টরী ও মিলের দ্বারা সরু করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুবর্ণবতী ও লাবণ্যবতী এই বিলের জলকে বিদ্যাধরীতে ফেলিত। সুবর্ণবতী মজিয়া গিয়া জলের অভাবে তটবর্তী গৃহস্থের ছোট ছোট ডোবায় পরিণত হইয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঁওর জল সেই দিক দিয়া খুব কমই যায়। অথচ এই নদীই বাঁওর জল লইয়া যাওয়ার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পথ ছিল। লাবণ্যবতীকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করিয়া একটি ক্যানেলে পরিণত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার নীচের দিকে কচুরীপানাতে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া এই খাল দিয়া বাঁওর জল কখনও বেশী বাহির হইত না, এই কথা স্থানীয় ব্যক্তিদের অনেকেই বলেন। বাঁওর বিলকে উদ্ধার করিলে লক্ষ লক্ষ টাকার খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হইতে পারে। এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বিঘার জমিতে নয় লক্ষ মণ ফসল হয়। ইহা ছাড়া নানা প্রকারের রবি ফসল এবং মাছও হইতে পারে।

বৃহত্তর কলিকাতার সেচ ও জলনিকাশ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার দেরী থাকিলে অল্প-স্বল্প টাকা খরচ করিয়া ইছামতী পরিষ্কার, নোটিশ দিয়া সুবর্ণবতীর পুনরুদ্ধার ও সংস্কার করা এবং লাবণ্যবতীর নীচের দিক সাফ করিয়া দেওয়া কঠিন নয়। ব্যারাকপুর মহকুমার সমবায় সমিতিগুলির প্রতিনিধিবর্গের একটি কমিটিকে এই ভার দিলে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। তাহাতে তাঁহারা জনগণের ও তাঁহাদের নিজেদের অভীপ্সিত কর্ম্ম পাইবেন। শ্রমিক তাঁহারাই খুঁজিয়া বাহির করিবেন এবং সত্যকার একটি কর্ম্ম করিলেন বলিয়া মনে অসীম সন্তোষ পাইবেন।

শুধু বাঁওর বিল নয়, ব্যারাকপুর মহকুমায় আরও অনেকগুলি ছোট ছোট বিল বা জলাভূমি আছে। সেই সমস্ত স্থানের জনগণ ও কর্ম্মিবৃন্দ ঐগুলির উদ্ধার করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। সরকার ও কংগ্রেসকর্ম্মিগণ এই ব্যগ্রতাকে যদি ঐ কাজে অতি সত্বর লাগাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতের বহু বিপদ হইতে যে তাঁহারা মুক্ত হইবেন, তাহা নহে, দেশের খাদ্য উৎপাদন ও ধন-বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য করা হইবে।

এই সম্পর্কে সাধারণেরও চেতনা হওয়া উচিত। জনগণ ও কর্ম্মিবৃন্দ যদি সত্য সত্যই ব্যগ্র ও চেষ্টিত থাকেন তবে এ সকল কার্য্য অবিলম্বে হইয়া যায়। ইহা ভিন্ন প্রদেশে যথা— উড়িষ্যা ও যুক্ত প্রদেশে—নিত্যই হইতেছে আমরা দেখিতেছি এবং ঐ কারণে যুক্ত প্রদেশের চাষী ও কর্ম্মীদল বিশেষ লাভবান হইয়াছে। বাংলায় দুই-তিন স্থলে ঐরূপ চেষ্টার কথা শুনিয়া আমরা সরকারী বিভাগকে বিশেষ চাপ দেওয়ায় তাঁহারা টাকার ব্যবস্থা করেন কিন্তু পরে দেখা গেল যে কার্য্যোদ্ধার অপেক্ষা বিনাশ্রমে সরকারী টাকার অপচয়েই স্থানীয় কর্ম্মকর্ত্তাদিগের উৎসাহ অনেক বেশী, সুতরাং টাকার অপচয় বেশ কিছু হইল, সাধারণের উপকার কিছুই হইল না। ঐরূপ ঘটনা নিতান্ত লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য-বিভাগ

"যুগবাণী" পত্রিকার ১৭ই ভাদ্র তারিখের সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিবরণ ও মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। কর্ম্মচারী শ্রেণীর দুর্নীতি ও অক্ষমতা চলিতে দিলে কোন রাষ্ট্রই টিকিয়া থাকিতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রধারকগণ ইহা দমন করিতে পারিতেছেন না কেন, সে-রহস্য কে উদ্‌ঘাটন করিবে?—

বাংলা-সরকারের একটা ফিশারি এডভাইসরি বোর্ড আছে। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাইটার্স-বিল্ডিংস্-এ মৎস্য-মন্ত্রী শ্রীহেম নস্করের ঘরে ঐ বোর্ডের একটি সভা হয়। স্বয়ং মন্ত্রী মহাশয়, সেক্রেটারী শ্রীসুনীল দে, ফিশারি ডিরেক্টর, সহকারী ফিশারি ডিরেক্টর শ্রীকালী সাহা, ফিশারি বিভাগের এডিশনাল ডেপুটি-সেক্রেটারী প্রভৃতি সরকারী কর্ম্মকর্ত্তাগণ এবং ডাঃ বীরেশ গুহ, শ্রীকুবেরচন্দ্র হালদার, এম-এল-এ, প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। উপরোক্ত পরিকল্পনাটি বুঝাইয়া দিয়া ডাঃ কালী-সাহা বলেন যে ন্যায়সঙ্গত বিতরণ ও দুর্নীতি নিবারণের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। শ্রীকুবেরচন্দ্র হালদার কিন্তু প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, যে সব ডিষ্ট্রিবিউশন-কমিটির মারফত সুতা, নৌকা প্রভৃতি বিলি করার কথা তিনি তার একটির সদস্য এবং তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, জিনিষপত্র বিলি-ব্যবস্থার সময় তাঁহাদের প্রায়ই কিছু জানিতে দেওয়া হয় না। এসিষ্ট্যান্ট ফিশারি অফিসার বিলি করেন এবং সংশ্লিষ্ট লোকদের নিকট হইতে ঘুষ লইয়া ইহা করেন।...,

কৃষি-বিভাগ, মৎস্য-বিভাগ এবং সেচ-বিভাগে করদাতাদের বহু টাকা অবিবেচনা এবং অসাবধানতায় নষ্ট হইতেছে ইহার অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। উপরওয়ালারা অসাবধান বা অদূরদর্শী হইলে দুর্নীতিপরায়ণ

অসাধু কর্মচারীরা তাহার সুযোগ লইবেই। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র হালদার যে অভিযোগ করিয়াছিলেন মন্ত্রী মহাশয় এবং বিভাগীয় সেক্রেটারী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া উঁহার তদন্ত করিয়া সত্য নির্ণয়ে অগ্রসর হইলে লোকেও সন্তুষ্ট হইত, অসাধু কর্মচারীও ভয় পাইত। তাহা না করিয়া তাঁহারা দু'জনেই এমন ভাবে উত্তর দিলেন যাহা উঁহারা তাঁহাদের দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে করিবে এবং উহার ফলে পরোক্ষ সমর্থন পাইবে। যেখানে ডিষ্ট্রিবিউশন কমিটি গঠিত হইয়াছে সেখানে কমিটির ভিতর দিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে রিলিফব্যবস্থাগুলি হওয়া উচিত, সমবায় সমিতি মারফতেও ইহা হইতে পারিত। তাহাতে সকলে সাহায্যের দরখাস্ত করিবারও সুযোগ পাইত এবং সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ্যে নৌকা ও জাল দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় কাহারও ন্যায়সঙ্গত আপত্তি করিবার কারণ থাকিত না। তাহা না করিয়া একজন বিশেষ গবর্ণমেণ্ট অফিসারের হাতে টাকা দেওয়ার দায়িত্ব দিলে অসাধুতার সুযোগ ঘটিবেই এবং গবর্ণমেণ্টেরও বদনাম হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য-বিভাগের একজন বিশিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে পরামর্শ-সমিতির একজন সভ্য একটি গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন। এই অভিযোগ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা সকলেই প্রতীক্ষা করিবে।

"যুগবাণী" পত্রিকায় এই প্রবন্ধে একটি হিসাব দেখিলাম। তাহার মধ্যে সরকারী তত্ত্বাবধানে ৬০০ খানি নৌকা প্রস্তুতের আয়োজন দেখিলাম; প্রতি নৌকায় ব্যয় ধরা হইয়াছে ৬০০৲ টাকা হারে। মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্বের আমলে খাজা সাহাবুদ্দিনের কর্তৃত্বাধীনে নৌকা নির্মাণের জন্য যে প্রচণ্ড অপব্যয় হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি কি ইতিমধ্যেই বিলীন হইয়া গিয়াছে? সেই যুগের নৌকা-নির্মাণ-বিশারদগণের খোঁজ নিলে অনেককেই দেখা যাইবে যে শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর মহাশয়ের বিভাগের বিস্তৃত পক্ষ-পুটের ছায়ায় তাঁহারা বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারা ত সহজে ব্যবসা (occupation) ছাড়িবার লোক নন।

পশ্চিমবঙ্গে জন-শিক্ষা

গত ২০শে ভাদ্র কলিকাতায় রোটারি ক্লাবে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-বিভাগীয় ডিরেক্টর শ্রীস্নেহময় দত্ত এক বক্তৃতা উপলক্ষে আমাদের ভরসা দিয়াছেন যে আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৫০ জন লিখন-পঠনক্ষম হইবে। এই বিষয়ে গত ১৫ই আগষ্ট হইতে "প্রাপ্ত বয়স্কদের সামাজিক শিক্ষা" বিষয়ে যে প্রচেষ্টার আরম্ভ হইয়াছে তাহার সফলতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই তিনি এই আশার কথা শুনাইতে পারিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশানুসারে এই শিক্ষার গতি ও পরিণতি অনেকটা স্থির করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ডাঃ দত্ত এই সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন কিনা জানি না। দৈনিক সংবাদপত্রে তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন উল্লেখ দেখিলাম না। বক্তৃতার সূত্রপাতে তিনি বলিয়াছেন—"আমাদের দেশের সামাজিক শিক্ষা আধুনিক জগতের প্রগতিশীল দেশসমূহের শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতে পৃথক হইবে।" অন্যান্য দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আছে, আমাদের দেশে তাহা নাই; এইজন্য আমাদের শিক্ষাসমস্যা আরও ব্যাপক ও গুরুতর। ইহা'র প্রকৃতি বুঝাইতে গিয়া বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে ডাঃ দত্ত বলিয়াছেন:

> ভারতবর্ষে প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষাদান তিনটি পর্য্যায়ের হইবে; প্রথমতঃ জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা এবং এই সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ও বাস্তব প্রাথমিক জ্ঞান দান করা, দ্বিতীয়তঃ আমাদের চিরাচরিত ব্যবস্থা, যথা—যাত্রা, কথকতা, কবিগান প্রভৃতির মারফত তথ্য-বহুল সাংস্কৃতিক শিক্ষাদান; তৃতীয়তঃ যাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তোলা হইবে তাহাদিগকে আর অজ্ঞানান্ধকারে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

এই সামাজিক শিক্ষা প্রদানের জন্য কি উদ্যোগ-আয়োজন করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন:

> আমরা বিভিন্ন জেলায় প্রথম ৫ শত কেন্দ্র মনোনীত করিয়াছি। আমাদের পরিকল্পনানুসারে প্রতি বৎসর কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ান হইবে। তবে ইহা সম্পূর্ণ কেন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্যের উপর নির্ভর করে।
>
> যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষয়িত্রীর অভাব হেতু সরকার মহিলাদের জন্য ২৫টির বেশী কেন্দ্র খুলিতে সক্ষম হন নাই।

এই দুইটি উক্তির মধ্যে শেষোক্তটি সম্বন্ধে আমরা বলিতে চাই যে, ডাঃ দত্ত তাঁহার অসাফল্যের কারণ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করেন নাই। এই প্রদেশের বয়স্কা মহিলাবৃন্দের মধ্যে "সামাজিক শিক্ষা" বিস্তারের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১০০ জন শিক্ষয়িত্রীকে একত্র করা হয়; হেষ্টিংস হাউসে তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়; প্রায় দুই মাস এই শিক্ষাকার্য্য চলে। তার পর যে কি হইল তাহাই ডাঃ দত্ত চাপিয়া গিয়াছেন।

আমরা শুনিয়াছি যে বয়স্ক শিক্ষা কমিটি এই সম্বন্ধে যে-সব প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা নিজেদের খেয়াল মত উল্টাইয়া দিয়া ডাঃ দত্তের বিভাগ এমন এক বিরোধী ভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন যে, স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থাটা বানচাল হইতে চলিয়াছে। এই বিষয়ে আমাদের পত্রিকায় অনেক সমালোচনা হইয়াছে, ডাঃ দত্ত তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। এখন নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করিতেছেন। যে ১০০ জন

শিক্ষয়িত্রীকে বয়স্কা স্ত্রী-শিক্ষার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন সেই "যোগ্যতাসম্পন্না" শিক্ষয়িত্রীদের যোগ্যতার সদ্ব্যবহার করা হইল না কেন, সেই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর ডাঃ দত্তের উক্তির মধ্যে নাই।

তারপর ৫০০ শত কেন্দ্রের কথা। এইগুলির সহায়তায় দুই-তিন হাজার বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষকে "সামাজিক শিক্ষা" দেওয়া যাইতে পারে। আর পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ শিক্ষার উপযোগী লোকের সংখ্যা প্রায় ৯০ লক্ষ। সুতরাং কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। কিন্তু তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-বিভাগকে "কেন্দ্রীয়" সাহায্যের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে। সেই সম্বন্ধে কি প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে তাহা বলিলে ডাঃ দত্তের ভরসার উপর গুরুত্ব প্রদান করিতাম। সংবাদপত্রে দেখিলাম যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে শতকরা ২০ ভাগ খরচ কমাইতে হইবে। অনেক বড় বড় পরিকল্পনার উপর এইরূপে কুঠারাঘাত হইবে। বয়স্ক-শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা যে তার মধ্যে পড়িবে না তৎসম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই।

আর একটা কথা, ডাঃ দত্তের বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণমেণ্ট হইতে কি সাহায্য পাইবেন, তাহা প্রদেশবাসীকে বলেন নাই। শুনিয়াছি আড়াই লক্ষ টাকা নিজেদের আয়োজন উদ্যোগেই ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন; কলিকাতার নূতন আফিস ও অফিসার, আট নয়টি জেলায় নূতন অফিস ও অফিসার নিযুক্ত করিয়া তাহার খালি করিয়া ফেলিয়াছেন। অথচ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে এই আড়াই লক্ষ টাকা তুলিয়া দিলে চার-পাঁচ গুণ কাজ বেশী হইত। বয়স্ক শিক্ষা কমিটিতে এরূপ বেসরকারী স্বায়ত্ত-শাসিত (autonomus) প্রতিষ্ঠানের কথা উঠিয়াছিল; তাহাতে কর্ণপাত করা হয় নাই। এরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইলেও সরকারী বিভাগের হাতে তাহা পড়িলে শিব গড়িবার চেষ্টায় বানর গড়া হইত কিনা সেই বিষয়ে স্থির করিয়া কিছু বলা যায় না।

এই ত গেল বয়স্ক শিক্ষার কথা। এখন প্রাথমিক শিক্ষার কথা কিছু বলিতে হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রচার বিভাগের উদ্যোগে গত ২৪শে জানুয়ারী হইতে একটি বুনিয়াদি শিক্ষা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। এই উপলক্ষে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ভরসার কথা নাই। তিক্ত ঔষধ খাইতে হইলে লোকের মন যেরূপ বিরক্ত হইয়া যায় সেইরূপ মনই হরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। "বুনিয়াদি শিক্ষা"-ব্রতে উৎসর্গীকৃত কর্মী শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া হরেন্দ্রবাবু কয়েকবার বলেন, "বিজয়বাবু বলিয়াছেন যে কুড়ি বৎসরে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ বিস্তার হইতে পারে। এই কথা ত খুব আনন্দের কথা, ভরসার কথা।...বিলাতে প্রায় ৭০ বৎসর লাগিয়াছিল প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।" এই বক্তৃতা শুনিয়া মনে হয় যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর নয়, বিজয় বাবুর মতন লোকের।

বয়স্ক শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের উপর ভরসা রাখিয়া নিশ্চিন্ত। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় "বুনিয়াদি শিক্ষা"-ব্রতীদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিতেছেন। সেই বিভাগেরই একজন সেক্রেটারী "বুনিয়াদি শিক্ষা শিক্ষণ" কেন্দ্রে বক্তৃতা দেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্যের সপক্ষে। এই অভিজ্ঞতার পর পশ্চিমবঙ্গে জনশিক্ষার ভবিষ্যৎ কি হইবে, তৎসম্বন্ধে তর্কের অবকাশ আছে কি?

বাস্তুহারার সাহায্য-বিধান

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গত ২৩শে জুন ইউরোপখণ্ডে যাত্রা করেন নিজের চক্ষু চিকিৎসার জন্য ও পশ্চিমবঙ্গের নানা উন্নতির পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিদেশী বিশেষজ্ঞ-বৃন্দের পরামর্শ লাভের জন্য। তার ২।৩ দিন পূর্ব্বে তিনি বাস্তুহারাগণের সাহায্য-বিধান সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য একটি স্বায়ত্ত-শাসিত বোর্ড নিযুক্ত করিয়া যান। তাঁহার স্বদেশ ত্যাগের পরই এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হইল যে খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের মত বোর্ডের দু'একজন সভ্য অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে "প্রবাসীর" সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমরা এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়াছিলাম:

> শুনিতেছি এই বোর্ডের ক্ষমতা সম্বন্ধে লিখিত-পঠিত ভাবে কোন নির্দ্দেশ নাই বলিয়া এই বিষয়ে বোর্ডের সভ্যবৃন্দ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আছেন। এই সময়ে মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহের দুর্ব্বলতার সুযোগে নষ্টামির একটি চেষ্টা হইয়াছিল। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর হস্তক্ষেপে তাহা নাকি ব্যর্থ হইয়াছে।"

শ্রীমতী মৃদুলা সারাভাই গত জুলাই মাসের ১২-১৪ তারিখে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর কলিকাতা নগরীতে অবস্থান সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; তাহার মধ্যে এই স্বায়ত্ত-শাসিত বোর্ডের উল্লেখ আছে; তাঁহারই নির্দ্দেশে নাকি এইরূপ বোর্ড গঠন করিতে আরম্ভ করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই যে গণ্ডগোল আরম্ভ হইল তার শেষ হয় নাই। পশ্চিম-বঙ্গের বাস্তুহারা সাহায্যবিধান বোর্ড সূতিকাগারেই বিনষ্ট হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

খাদ্য-উৎপাদনের হিসাব

খাদ্য-সংগ্রহ জীবের প্রধান ও প্রথম বৃত্তি; এই বিষয়ে জীব একটা অশিক্ষিতপটুত্ব লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই বৃত্তির পরিচালনা তাহার পক্ষে একটা সহজ ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও খাদ্য-উৎপাদন একটা সমস্যার আকার ধারণ করিয়া রাষ্ট্র-নায়কগণকে বিভ্রান্ত করিতেছে। অন্য দেশের কথা নাই বলিলাম। আমাদের ভারতরাষ্ট্রে ত দেখিতেছি খাদ্যের সন্ধানে দিকে দিকে লোক ছুটিতেছে; নিজেদের অবস্থার অতিরিক্ত মূল্য দিয়া খাদ্য-সংগ্রহ করিতেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশসমূহ আমাদের প্রয়োজন বুঝিয়া আমাদের মত দরিদ্র দেশের কষ্টার্জ্জিত অপ্রচুর অর্থ দু'হাতে লুঠ করিতেছে। আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আমরা উৎপাদন করিতে পারিতেছি না কেন, এই প্রশ্নের সদুত্তর পাই না।

কৃষকেরা যথেষ্ট উৎপাদন করিতেছে না; কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প উৎপাদন করিয়া তাহারা অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্য পায়—এই যুক্তি অনেকেই দেখাইতেছেন। আর বেশী উৎপাদন করিয়া বেশী অর্থ ঘরে তুলিতে পারিলেও তাহারা সেই অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিতে পারে না; সেইজন্য খাদ্য উৎপাদনে তাহাদের উৎসাহ নাই—এরূপ কথাও অনেকে বলিতেছেন। অনুরূপ অনেক যুক্তি শুনিতে পাই। কিন্তু যুক্তির বাহুল্যে দেশের লোক দিশাহারা হইয়া পড়িতেছে; এবং কোন যুক্তির উপর ভরসা করিতে না পারিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছে।

ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু পর্য্যন্ত এই বিতর্কে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রায় এক মাস পূর্ব্বে এক বেতার বক্তৃতা উপলক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতরাষ্ট্রে শতকরা ১০ ভাগ খাদ্য শস্যের ঘাট্‌তি আছে। এর উত্তরে গণপরিষদের সভ্য শ্রী আর. কে. সিধ্ব বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশে খাদ্য-শস্যের ঘাট্‌তি নাই। তাহার প্রতি উত্তরে কেন্দ্রীয় খাদ্য-বিভাগের জনৈক "মুখপাত্র" গত ২৩শে ভাদ্র তারিখে মন্তব্য করেন যে "শ্রীসিধ্বের উক্তির ফলে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইবে।" এই মন্তব্যের একটি মাত্র অর্থ হইতে পারে—কেন্দ্রীয় খাদ্য-বিভাগ, তাহাদের উপদেষ্টা-গণ, অনেক অর্থনীতিক বিশেষজ্ঞ যখন বলিতেছেন যে দেশে খাদ্য-শস্যের ঘাট্‌তি আছে, তখন শ্রীসিধ্বর বিপরীত উক্তিতে দেশের লোক ও দুনিয়ার লোক ভুল বুঝিতে পারে এবং ভুল বুঝিয়া দেশের লোক খাদ্য উৎপাদনে যথোচিত উৎসাহিত হইবে না; দুনিয়ার লোকে ভারতরাষ্ট্রের খাদ্যের প্রয়োজন মিটাইতে উৎসাহ বোধ করিবে না।

শ্রীসিধ্ব এই মন্তব্যের যুক্তি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তিনি গত ২৫শে ভাদ্র তারিখে এক বিবৃতি দান করিয়াছেন। এই বিবৃতি পাঠ করিলে মনে হয় যে, কেন্দ্রীয় খাদ্য-বিভাগের খাদ্যশস্যের ঘাট্‌তির হিসাব ভুল এবং এই ভুলের তাড়নায় পড়িয়া আমরা ধনে-প্রাণে নষ্ট হইতেছি। দেশবাসীর সমস্ত ব্যাপারটা বুঝা উচিত। সেইজন্য আমরা শ্রীসিধ্বর বিবৃতিটি তুলিয়া দিলাম। ইহা "আনন্দবাজার পত্রিকায়" ২৬শে ভাদ্রের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল:

> শ্রীযুত সিধ্ব বলেন, উক্ত 'মুখপাত্র' যদি আমার বিবৃতি পড়েন, তিনি দেখিবেন যে, আমি ১৩,২২,০০০ টন উদ্বৃত্ত হইবে ইহাই বলিয়াছি, মন্ত্রিসভার কথিত ৪৩,২২,০০০ টন উদ্বৃত্ত ইহা আমি বলি নাই। ২৩শে জুলাই তারিখের প্রকাশিত প্রবন্ধে আমি আনুপূর্ব্বিক পরিসংখ্যান দিয়াছিলাম। মন্ত্রিসভা আমার সে সমস্ত তথ্যাদি ভুল প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। এই সম্পর্কে খাদ্য বিভাগ তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) আমার প্রদত্ত তথ্যাদি সরকারী পরিসংখ্যানের সঙ্গে মিলে না। (২) কারখানার প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমজীবীরা জনপ্রতি ১৬ আউন্স খাদ্য আহার করিয়া থাকে। (৩) খাদ্য রেশন প্রবর্তিত হইবার পূর্ব্বে ভারত ব্রহ্মদেশ হইতে ১৫লক্ষ টন চাউল আমদানী করিত।
>
> প্রথম বিষয় সম্পর্কে খাদ্যবিভাগ বলেন নাই যে, আমার প্রদত্ত পরিসংখ্যান ভুল। দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে বলা যায় যে, গবর্ণমেণ্ট রেশন অঞ্চলে প্রাপ্তবয়স্কের জন্য ১০-১২ আউন্স খাদ্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ১৬ আউন্স হিসাবে ধরিয়া এই পরিমাণ বর্ত্তমানে বৃদ্ধি করা উচিত নয়। খাদ্যবিভাগ শতকরা ৮৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক ধরিয়াছেন, কিন্তু এই গবর্ণমেণ্টই কয়দিন পূর্ব্বে প্রাপ্তবয়স্কের সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা শতকরা ৮০ জন বলিয়াছিলেন। এইভাবে প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেখান হইতেছে।
>
> তৃতীয় বিষয়, রেশনিং প্রবর্তিত হইবার পূর্ব্বেও ভারত ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী করিত সত্য। কিন্তু ইহা দ্বারা ভারতের খাদ্য উৎপাদনের কোন ক্ষতি হইত না। প্রকৃত ব্যাপারটি এই—উৎপন্ন খাদ্যের শতকরা ২ ভাগ মাত্র আমদানী করা হইত। এই ২ ভাগ আমদানী না করিলে আমাদের উপবাস করিতে হইত ইহা সম্ভব নয়। ব্রহ্মদেশের চাউলের মূল্য কম ছিল বলিয়াই ইহা আমদানী করা হইত। ১৯৪৪-৪৫ সালে যে পাঁচ বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ সময়ে ধান্যচাষের জমির পরিমাণ শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৫-৪০ এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রতি বৎসর গড়পড়তা ৭৩৫ লক্ষ একর জমিতে ধান্য চাষ হইত। ১৯৪৪-৪৫ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৮৩১ লক্ষ একর হয়। ব্রহ্মদেশের প্রতিযোগিতা নষ্ট হওয়ারই এই বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছিল।

এ সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী করা হইলেও, ভারত হইতেও বিদেশে চাউল ও গম রপ্তানি হইয়া থাকে।

১৯৩৬—৩৭, ৩৭—৩৮, ৩৮—৩৯ সালে ভারত হইতে যথাক্রমে ৩,১৩,০০০; ৫,৪০,০০০ এবং ৩,৬১,০০০ টন গম এবং ২,৫৭,০০০; ২,৫৬,০০০; ৩,০৬,০০০ টন চাউল রপ্তানি হইয়াছে। ইহা ছাড়া ৩৫,০০০ টন বজরাজাতীয় খাদ্যও রপ্তানী হইত। ইহার কারণ ভারত এজন্ত উচ্চ মূল্য পাইত। আমরা সস্তা দামের জিনিষ খাইতাম এবং অধিক মূল্যের খাদ্য রপ্তানি করিতাম।

এই সকল তথ্য হইতে বুঝা যাইবে যে, রেশনিং প্রবর্তনের পূর্ব্বে ভারতে চাউল আমদানী হইত বলিয়াই বর্ত্তমান খাদ্যশস্ত আমদানী সমর্থন করা যায় না। খাদ্য-বিভাগ এক একটি করিয়া এই সকল তথ্য ভুল প্রতিপন্ন করুন। গবর্মেণ্ট ১৯৫১ সাল হইতে আমদানী বন্ধ করিতে চান, কিন্তু আমি এখনই উহা বন্ধ করিতে চাই। ইহা দ্বারা দেশের প্রয়োজনের কোন হানি হইবে না বলিয়াই বিশ্বাস করি।

আমি বিশেষ জোরের সঙ্গে বলিতেছি যে দেশে খাদ্যাভাব নাই। এইজন্তই আমি আমদানী বন্ধ করিতে চাই। খাদ্যবিভাগ যদি এই আমদানী বন্ধ করা উচিত মনে করেন তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের তথ্যাদি আবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার মতাবলম্বী হইবেন।

আমার ঐ প্রবন্ধে আমি বলিয়াছিলাম যে, জোলাজাতীয় খাদ্য ভারতে সর্ব্বদাই উদ্বৃত্ত থাকে; কিন্তু তবুও বিদেশ হইতে জোলা আমদানী করা হয়। আশ্চর্য্যের কথা, এই বিষয় সম্পর্কে কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই। আমার ২৩শে জুলাই তারিখের প্রবন্ধ সম্পর্কেও কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই।

শ্রীসিদ্ধ কেন্দ্রীয় খাদ্যবিভাগকে তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন। আমরা তাহার ফলাফলের প্রতীক্ষায় রহিলাম। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতার "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের" বাণিজ্য সম্পাদক গত জুলাই মাসের ৭ই তারিখের সংখ্যায় একটা হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্তের ঘাটতি নাই, বরং ২১ লক্ষ মণ বাড়তি। গত শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে এই হিসাবের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ মন্ত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি নীরব। এই দুই মাসেও এই বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য শুনাইতে সময় পাইলেন না।

যুক্তপ্রদেশে জমীদারী প্রথার বিলোপ

যুক্তপ্রদেশে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করিয়া "কৃষক-রাজের" গোড়াপত্তন আরম্ভ করা হইতেছে। যে আইন পাস হইয়াছে, তাহার বিধান অনুসারে জমিদার শ্রেণীকে সম্পত্তি হস্তচ্যুতির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রায় ১৭০ কোটি টাকা দেওয়া হইবে। এই টাকা প্রদানের জন্ত একটা উপায় অবলম্বন করা হইতেছে। কৃষকশ্রেণী যদি থোকে ১০ বৎসরের খাজানা প্রদান করেন তবে তাঁহারা জমির মালিক হইবেন। এই ব্যবস্থায় নাকি আশাতীত সাড়া পাওয়া যাইতেছে; কৃষকেরা সাগ্রহে সরকারী তোষাখানায় ১০ বৎসরের খাজানা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বাংলাদেশে জমিদারী প্রথার বর্ত্তমান রূপ বড়লাট কর্ণওয়ালিস কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। এই প্রথার পক্ষে ও বিপক্ষে তখন (১৭৯৩ সন ও তাহার দশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে) নানারূপ তর্ক উঠিয়াছিল। তাহার পরে যে প্রায় ১৬০ বৎসর অতীত হইয়াছে সেই সময়েও এই তর্কের অবসান হয় নাই। রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে এই জমিদার শ্রেণীর আবির্ভাব কখন ও কি করিয়া ঘটিল তাহা গবেষণার বিষয়। হিন্দু যুগের সমাজ-ব্যবস্থায় পল্লীস্বরাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল; "পাঁচ-ই" ছিল পল্লীর জমির মালিক, পাঁচ-ই পল্লীর জমি কৃষকের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিত। কৃষকের শ্রমের ফলে যে ফসল উৎপন্ন হইত তাহার উপর তাহার অধিকার ছিল; পল্লীর জমির উপর নয়।

এই ব্যবস্থা—এই সাম্যবাদ—রূপান্তরিত হইয়া কখন ও কি করিয়া জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে তর্ক অনেক হইয়াছে। ইংরেজ ঐতিহাসিক হাণ্টার বলিয়াছেন যে, কর্ণওয়ালিসের বিধান প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে যে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তখন দেখা যায় জমিদারী প্রথাও আছে; পল্লীস্বরাজও আছে এবং দুই ব্যবস্থার মাঝামাঝি নানারূপ প্রথাও আছে। গত ১৬০ বৎসরে এই জমিদারী প্রথার সু ও কু অনেক রূপই দেখা গিয়াছে। আজ তাহার অবসান হইল যুক্তপ্রদেশে। অন্যান্য প্রদেশে তাহার অনুকরণ করা হইবে। ইহাই যুগ-ধর্ম।

এই বিষয়ে আর তর্কের অবসর নাই। এই সময়ের মধ্যে পাশ্চাত্য আদর্শে আমাদের সমাজের অনেক ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের পল্লীস্বরাজের আদর্শের উপর সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন আঘাত করে বিদেশী আদর্শ। কর্ণওয়ালিসী ব্যবস্থার ফলে জমিদার শ্রেণী গ্রাম ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্ব আদর্শের শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্ত পল্লীগ্রামে কেহই রহিল না। ইংরেজের পুলিস পল্লীগ্রামকে দৈ-রাজ্য হইতে রক্ষা করিল। আজ আবার পঞ্চায়েৎ-রাজের আবির্ভাব হইতেছে, দশে মিলিয়া আবার স্বাধীন ভারতের পুনর্গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। যুক্তপ্রদেশে জমিদারী প্রথার বিলোপ এই সম্ভাবনার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমাদের কর্ত্তব্যের কাঠামো প্রস্তুত করিতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গের গণ-বিক্ষোভ

বরিশাল শহরে মুসলমান বালকগণের "বুলবুল-কৌজের" দলে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ভাল ব্যবহার করেন নাই বলিয়া এক দল মুসলমান যুবক শহরের সকল স্কুলকে "ধর্ম্মঘট" করিতে প্ররোচিত বা বাধ্য করে। "একান্ত অনিচ্ছায়" হিন্দু বালকবালিকাগণও বাহির হইয়া আসে। শহরে ১৪৪ ধারা প্রবর্ত্তিত ছিল। শোভাযাত্রার উপরে চলিল "মৃদু" যষ্টিচালনা। এই ঘটনার পশ্চাতে নানা হস্ত কাঠি নাড়া-চাড়া করিতেছিল। স্থানীয় পত্রিকা "হেলালে পাকিস্থান" এই বিষয়ের উপর একটু আলোকপাত করিয়াছেন:

"আমরা জানি যখনই কোন জনকল্যাণকর আন্দোলন প্রদেশে এবং জিলায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে তখনই উপরোক্ত প্রতিক্রিয়াশীল দল পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করিয়া জনকল্যাণের পথ রোধ করিয়াছে। ইহাদের নগ্ন রূপ ধরা পড়িয়াছে—ভাষা আন্দোলন শুরু করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারে। ইহাদের দ্বারা রাজনীতির নামে প্রকাশ্য দিবালোকে রাহাজানি, গুণ্ডামি ও চোরাকারবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জিনাদ মাহফিল হইতে লীগ কর্ম্মী সাজাহানের মাইক্রোফোন লুঠ, লীগ কর্ম্মী ওহাব আলীর উপর অমানুষিক আক্রমণ ও রক্তপাত, ছাত্র লীগ কর্ম্মী হবিবর রহমানকে অতর্কিতে ছুরিকাঘাত, কেরোসিন তেলের চোরাকারবার, আরও কত কুকীর্ত্তি যাহাদের দ্বারা সাধিত হইল তাহারা সাধুজন, কোন আইনের আমলে আসে না, আইন তাহাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারে না। কারণ তাহাদের গায়ে সরকারী ছাপ রহিয়াছে, তাই মুকুলদের ব্যাপারে ইহারা যে "গাঁয় না মানে আপনি মোড়ল" সাজিবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? আমরা যতদূর জানি গোলমালের কারণ এবারকার আজাদী দিবসের কার্য্যসূচী। সরকারী কার্য্যসূচীকে বানচাল করিবার জন্য তথাকথিত ছাত্র লীগের তরফ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কার্য্যসূচী বাহির করা হয়। মুকুলদের কেন্দ্র করিয়া, তিলকে তাল করিয়া, মিথ্যাকে সত্য সাজাইয়া এক ব্যক্তিগত কলহকে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করিতে চেষ্টা করিলেন। ইঁহাদের খামখেয়াল ও খোষমেজাজ মাফিক জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট না চলিলে চলিবে কেন?

পূর্ব্ববঙ্গের মোসলেম লীগ বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেটের আচরণের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। আর "বরিশাল হিতৈষী" বলিতেছেন—সংখ্যালঘুদের এই সব ক্ষেত্রে 'সবচে ভালো চুপ' এই নীতি অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু "দুই দলের যুদ্ধে নলখাগড়ার" ক্ষয়ের কথা ভাবিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।

কম্যুনিষ্ট গৃহ-বিবাদ

যুগোশ্লাভিয়ার সর্ব্বাধিনায়ক মার্শাল টিটোকে লইয়া সোভিয়েট রাষ্ট্র-প্রধানগণ গলায় কাঁটা লাগার অবস্থায় পড়িয়াছেন; মার্শাল টিটোর নামের অনুকরণে ইংরেজী ভাষায় একটি নূতন শব্দ রচিত হইয়াছে—টিটোইজম—মার্কসপন্থী হইয়াও ষ্টালিন-বিরোধী। এই গৃহবিবাদ কম্যুনিষ্ট বিরোধী রাষ্ট্র-প্রধানগণের মনে আনন্দ উপচিয়া পড়িতেছে—যা' শত্রু পরে পরে, এই ভাবিয়া।

আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সংবাদপত্রগুলি প্রচার করিতেছিল যে, সোভিয়েট রাষ্ট্র যুগোশ্লাভিয়ার সীমান্ত অঞ্চলের দিকে সৈন্য সমাবেশ করিতেছে; ভয় দেখাইয়া যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রনায়কগণকে বাগে আনিবার উদ্দেশ্যেই এই সমরায়োজনের ব্যবস্থা হইতেছে। এমন কথা পর্য্যন্ত রটনা করা হয় যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের নির্দ্দেশে হাঙ্গারী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি আশ্রিত রাষ্ট্রসমূহ যুগোশ্লাভিয়াকে আক্রমণ করিবে।

কিন্তু ১লা সেপ্টেম্বর লণ্ডন হইতে একটি সংবাদ প্রচারিত হয় যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মনে করেন না, সোভিয়েট রাষ্ট্র যুগোশ্লাভিয়াকে আক্রমণ করিবে। তবে যদি সামরিক আয়োজন-উদ্যোগের মাধ্যমে মার্শাল টিটোকে নত করিবার চেষ্টা সফলকাম হইতেছে বলিয়া দেখা যায় তবে ত্রিশক্তি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স—একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দরবারে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে টানিয়া লওয়া হইবে।

এটা এমন ভীতিপ্রদ ব্যবস্থা নয়। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ এখনও এমন শক্তিমান হইতে পারে নাই যে, তাহার সভ্যবৃন্দের জুলুমবাজী সংযত করিতে পারিবে; অন্ততঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাষ্ট্র ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে কিছু করিবার শক্তি তাহার নাই। তাহার পক্ষ হইতে ইন্দোনেশিয়া, ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্থানকে লইয়া খেলা চলিতে পারে। তাও বেশী দিন চলিবে না।

ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় বরিশালে ধর্ম্মরক্ষিণী সভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করেন। তৃতীয় দিনে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার যোগ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতার প্রসঙ্গে ১৯০৯ সালে কলিকাতা হইতে অরবিন্দের নিরুদ্দেশের ইতিহাস বর্ণনা করেন। ইহা বাঙালীর বিপ্লবী জীবনের ইতিহাসের অঙ্গ বলিয়া দেশবাসীর জানিয়া রাখা ভাল। "বরিশাল হিতৈষীর" বিবরণ হইতে তাহা তুলিয়া দিলাম:

ডেপুটি ইন্স্পেক্টর জেনারেল সামসুল আলম বাংলার

বিপ্লবী কর্তৃক হত হইলে শ্রীঅরবিন্দকে ষড়যন্ত্রে জড়াইবার দুরভিসন্ধি সিষ্টার নিবেদিতা ও স্যার জগদীশ বসু জানিয়া অরবিন্দকে ম্যাজিনীর মত আত্মগোপন করিতে অনুরোধ করেন।

শ্রীঅরবিন্দের সহিত বাংলার বিপ্লবী চন্দননগরের ✓চারুচন্দ্র রায়ের পরিচয় ছিল, চন্দননগরে নৌকায় গিয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন; তিনি আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিলে উদাসীনের ন্যায় অরবিন্দ "রাণীঘাটে" তরী বাঁধিয়া ঈশ্বরের নির্দেশ প্রতীক্ষায় নির্বিকার চিত্তে অপেক্ষায় রহিলেন।

এই সংবাদ আমার বিপ্লবী বন্ধু ✓শ্রীশচন্দ্র ঘোষ আমায় জানাইল। অতি প্রত্যূষে এই ঘটনা হয়, তার পর বহু সময় অতিবাহিত হইয়াছে, শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যাখ্যাত হইয়া কোথায় প্রস্থান করিলেন, তাহা সে অবগত নহে, এই কথাও শ্রীশচন্দ্র জানাইল।

আমি চক্ষু নিমীলিত করিয়া কিছুক্ষণ ভাবিলাম। নীচের জাহ্নবী-কূলে অনেকখানি চড়া পড়িয়াছে। প্রাতঃভ্রমণের অভ্যাসবশতঃ সেই চরের উপর দিয়া যন্ত্রচালিতের ন্যায় দক্ষিণে না গিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইলাম।

নবকিশলয়যুক্ত বট-অশ্বত্থতলে বোট বাঁধা ছিল, আমি অনুমান করিলাম নিশ্চয় অরবিন্দ—জিজ্ঞাসা করিয়া নৌকায় উঠিলাম—দেখিলাম চুঁচুড়া কনকারেন্সের বীর-মস্তিষ্ক অরবিন্দ নলিনী গুপ্তের কোলে মাথা রাখিয়া নয়ন বিস্ফারিত করিয়া আছেন—চারি চক্ষুর মিলন হইল—এ যে যোগীর মিলন! কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—"তুমি আমায় নিতে এসেছ? চল—তোমার প্রতীক্ষায় আমি আছি।" দক্ষিণা বাতাসে পাল তুলিয়া দিলাম। বলিলেন—"আত্ম-গোপন করতে এসেছি।" আজ যেখানে প্রবর্তক আশ্রম, তখন ছিল শ্মশান—সর্প-ভয় প্রচুর। আমি সেই শ্মশানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। আমি শ্রীঅরবিন্দকে আমার বাটীর মধ্যে আনিলাম—নলিনী, বিজয়, সুরেশকে বলিলেন—"আমার বন্ধুকে পেয়েছি, তোমরা থাকলে নির্জন বাস হবে না।" তাহারা আমার ও অরবিন্দের মুখের দিকে চাহিয়া বিদায় লইলেন। তিনি দেড় মাস এখানে অবস্থান করেন। বাজারের খাবার খাওয়াইতাম। হাঁটিবার সময় তাঁহার পদশব্দ হইত না—তৃপ্তির সহিত বিহ্বল হইয়া খাই-তেন। দিবাভাগে কারখানার আমার গুদামে রাখিতাম। আমার স্ত্রীর ধর্ম ছিল—অপ্রশস্ত কাপড় পরিয়া, মাথায় চুল খোলা রাখিয়া, ঝাঁটা দিয়া ঘর পরিষ্কার করা। সেই অবস্থায় একজন পুরুষকে দেখিয়া জিহ্বা কাটিয়া অরবিন্দের দিকে চাহিলেন। অরবিন্দও চাহিলেন। স্ত্রী আমাকে বলিলেন—"ডাকাত-চোরকে আশ্রয় দিয়েছ?" আমি বলিলাম—"সুরেন বানার্জি—বিপিন পালের নাম শুনেছ—ইনিও তদ্রূপ একজন।" তিনি বলিলেন—"আমি তোমার স্ত্রী—তোমাকে খাওয়াই—তোমার দুয়ার সব সময় খোলা রাখি—কিন্তু অরবিন্দের কথা জানাও নাই কেন—তাঁকে খাওয়াও কোথায়?" তৎপর যুক্ত পরিবারের কেহ টের না পায় তাই তিনি নিজের অন্ন তাঁহাকে দিতেন। অরবিন্দ বলিলেন—"I have seen Kali-mata in her."

দেড় মাস পরে জানাজানি হইল। সুকুমার মিত্রের সাহায্যে পাসপোর্ট জোগাড় করিয়া পণ্ডিচেরীতে পাঠাই-লাম সৌমেন্দ্রঠাকুর নাম দিয়া। সেখান হইতে সুদর্শন চক্রবর্তীকে এক মাস পরে পাঠাইয়া খবর দিলেম। ৮০৲ টাকা মাসিক ভাড়ার বাড়ী পাওয়া গেল—সে খরচ আমাকে পাঠাইতে হইত—তিনি আমাকে গুরু বৈষ্ণবী জানের মন্ত্র—শাক্ত মন্ত্র দিয়া ১,০০৮ বার জপ করিতে বলিলেন। আমি মাদ্রাজে গেলাম—তথাকার অবস্থা খারাপ—অরবিন্দ বলিলেন—"যে ভাবে হউক আমাকে ২০০৲ টাকা পাঠাবে।" আমি মেয়ের পোশাকে ফিরিলাম—টাকা পাঠাইতে লাগিলাম।

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়

১৮৯০ খ্রীঃ ১৭ই মে তারিখে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়; আগামী ১৭ই মে তারিখে এই শিক্ষালয়ের "হীরক-জয়ন্তীর" তারিখ। "তত্ত্ব কৌমুদী" পত্রিকার ১লা ভাদ্রের (১৮ই আগষ্টের) সংখ্যায় শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় এই শিক্ষালয়ের ইতিকথা বিবৃত করিয়াছেন। এই বিবরণী হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় তুলিয়া দিলাম:

> সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আদর্শের যে সমস্ত ধারক ও বাহক "পৃথিবীময় এক মহা সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠার" প্রাথমিক স্তর হিসাবে এদেশে নিয়মতন্ত্রানুসারে পরিচালিত ধর্ম-সমাজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যে সমস্ত প্রগতিশীল ব্যক্তি নারী-স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিতে এবং নারীজাতির প্রগতি-পথের সকল অন্তরায় দূর করিবার ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেনের নারীবিভালয়ে মর্যাদা পর্যন্ত পঠনপাঠনের যে ব্যবস্থা ছিল তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিতে পারায় আরও উচ্চতর শিক্ষা প্রদান মানসে প্রথমে হিন্দু মহিলাবিভালয় ও তাহার অল্পদিন পরে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান প্রণালীর উৎকর্ষে মুগ্ধ হইয়া বাংলার ছোটলাট স্যার অ্যাসলি ইডেন ও বেথুন স্কুল পরিচালক সমিতির সভাপতি হাইকোর্টের বিচারপতি

লার রিচার্ড গার্থ বেথুন স্কুলের সহিত ঐ স্কুলের মিলন সাধনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। ব্যয়বহুল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সরকার ও দেশবাসীর সহায়তা ভিন্ন পরিচালনা করা যে কত কঠিন তাহা বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতাগণ অনুভব করিতেছিলেন। সেজন্য সহজেই উভয় প্রতিষ্ঠানের মিলন সম্ভবপর হইল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উভয় স্কুল মিলিত হইয়া এণ্ট্রান্স অবধি পড়াইবার ব্যবস্থা হইল।

এই ব্যাপারের ফলে সহজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার নারীজাতির জন্য উন্মুক্ত হইল বটে, কিন্তু এই মিলনের অল্পদিন পরেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষগণ সরকারী স্কুলের ধর্ম্ম ও নীতি বিবর্জ্জিত শিক্ষার কুফল বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্ম জীবনের উপযোগী একটি নারীশিক্ষা নিকেতন স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করিলেন। এই চাহিদারই পরিণতি ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় সম্পর্কে কয়েক বৎসর আলোচনা সভা আহূত হইয়া আলাপ-আলোচনা চলে কিন্তু ব্যয় বহন ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্থিরনিশ্চয় হইতে না পারায় সমাজের তরফ হইতে কিছু করা সম্ভবপর হয় না। এই অচল অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় নিজেদের দায়িত্বে ২১০।৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

দুই তিন বৎসর চলার পর নানাকারণে দ্বারকানাথ-শশীপদ-প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি উঠিয়া যায়। তাহার পর ১৮১১ শকের মাঘোৎসবের সময় (January 1890) ব্রাহ্মগণের এক আলোচনা সভায় স্থির হয় যে, ব্রাহ্ম বালিকাগণের শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য একটি স্কুল স্থাপন অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, কেননা সরকারী স্কুলে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা ব্রাহ্মজীবন প্রসারের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

এই বিদ্যালয় স্থাপনে প্রধান উদ্যোগী হইলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও অল্পদিনের মধ্যে প্রাথমিক ব্যয়াদি বাবদ বাইশ শত টাকা সংগৃহীত হইল এবং কিছু মাসিক সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন সকল সমাধা হইয়া স্কুল স্থাপন করা সম্ভব হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম তারিখে অর্থাৎ ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৮১২ শকে, ইংরেজী ১৭ই মে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। বর্ত্তমান সময়ে ৩০শে জানুয়ারী যে প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রধান উদ্যোক্তা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্মোৎসব। প্রকৃত প্রতিষ্ঠা দিবস ১৭ই মে।

স্মরণ রাখা উচিত যে, সে সময়ে বর্ত্তমান সময়ের তায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা, বিজ্ঞান, সূচীশিল্প, সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় নাই। সেজন্য অন্যান্য বিদ্যালয়ে এগুলি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ই এইগুলির পথপ্রদর্শক ও ব্রাহ্ম-সমাজই এইগুলির প্রবর্ত্তক।

ব্রিটিশ "কমনওয়েল্থভুক্ত" থাকার লাভ

সম্প্রতি কানাডার ওন্টেরিয়ো প্রদেশের নিয়াগারা-অন্‌-দি-লেক...

শহরে ব্রিটিশ রাষ্ট্র-গোষ্ঠির প্রতিনিধিবর্গের এক সভা হইতেছে। সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে—কম্যুনিজমের প্রসার রুদ্ধ করিবার জন্য আর্থিক উন্নতিমূলক ব্যবস্থা, না সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন, কোন্‌টি সমধিক আশু গুরুত্বপূর্ণ? এই সম্বন্ধে একটি বিতর্ক চলে। একজন কানাডীয় প্রতিনিধি বলেন যে, কম্যুনিষ্টদের আক্রমণাত্মক অভিযান প্রতিরোধের জন্য সামরিক ব্যবস্থাবলম্বন করা অধিকতর গুরুত্ব-পূর্ণ ব্যাপার।

একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি বলেন যে, পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ কম্যুনিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট-বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়াছে। কাজেই কে কোন্ দলে যোগ দিবে, সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় শীঘ্রই উপস্থিত হইবে।

ভারতীয় ও পাকিস্থানী প্রতিনিধি স্ব-স্ব দেশের জন-সাধারণের জীবনযাত্রার আয়োজন উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহারা বলেন যে, গণতান্ত্রিক জাতিসমূহের মর্য্যাদা দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার সর্ব্বোত্তম উপায় হিসাবে সাধারণের বৈষয়িক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। তাঁহারা আরও বলেন যে, তাঁহাদের দেশের জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান অধিকতর উন্নত করা না হইলে তাহারা অভাবে অসন্তোষ পোষণ করিবে এবং কম্যুনিজমের প্রচারে বিভ্রান্ত হইয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে যে, তাহারা কম্যুনিষ্ট সমাজ সংস্থারই অধিকতর সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

এত দূরে থাকিয়া এই বিতর্কের পক্ষে ও বিপক্ষে যে-সব যুক্তির পরিবেশন করা হইয়াছিল তাহার প্রকৃত মর্ম্মার্থ উদ্‌-ঘাটন করা সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধি কর্ত্তৃক উপস্থাপিত একটা যুক্তি এই ব্যাপারটাকে স্বচ্ছ করিয়া দিয়াছে; ব্রিটিশ রাষ্ট্র-গোষ্ঠির শ্বেতাঙ্গ দেশসমূহের মনোভাব তাহার আলোকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারা যায়। আমাদের প্রতিনিধির মন্তব্যটি সেইজন্য সর্ব্বদা মনে রাখা প্রয়োজন। নিয়াগারা-অন্‌-দি-লেক হইতে প্রেরিত সংবাদে বলা হইয়াছে:

> ভারতীয় প্রতিনিধিগণ ব্রিটিশ ও কানাডীয় অভিমত সমর্থন করিতে না পারিয়া বলেন যে, কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহকে সর্ব্বত্র যেন শুধু কম্যুনিজমের বিরোধিতার অজুহাতে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী শক্তিসমূহকে সমর্থন করিতে বাধ্য না করা হয়। ঐরূপ বাধ্যতামূলক কার্য্যে বিদেশ

যে স্থানে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সমর্থন করা হইবে তাহার ফলে কম্যুনিজমের প্রসার ঘটান হইবে। তাঁহারা মনে করেন, ইহার পরিবর্তে সামাজিক ও বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি যাহাতে হইতে পারে এরূপ ব্যবস্থার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা অধিকতর প্রয়োজন; কম্যুনিষ্টবিরোধী নীতিই যেন আমাদের পাইয়া না বসে।

ব্রিটিশ রাষ্ট্র-গোষ্ঠির অ-শ্বেতকায় দেশসমূহের উপর চাপ দেওয়া হইতেছে কোন এক দলে যোগ দিবার জন্য; এই বিবরণী পাঠ করিয়া এই কথা বুঝিতে কষ্ট হয় না। অন্য দিকে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বলিতেছেন যে, তাঁহার রাষ্ট্র কোন পক্ষেই যোগদান করিতে চায় না বা করিবে না।

ক্ষেত্রনাথ ঘোষ

রংপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের পিতা ক্ষেত্রনাথ ঘোষ পরিণত বয়সে (৮০ বৎসরের ঊর্দ্ধ) বরিশাল শহরে নিজ গৃহে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। প্রায় ৪৭ বৎসর পূর্ব্বে তিনি বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তিনি "নিউ ইণ্ডিয়া" সাপ্তাহিক পত্রিকায় লেখক রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। ইমার্সন সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধাবলী বিদ্বজ্জন সমাজে আদৃত হইয়াছিল। প্রাচীন আদর্শের শিক্ষক সম্প্রদায়ের নিস্পৃহ জীবনযাপন ও জ্ঞানানুশীলন করিয়া এই অজাতশত্রু মানুষটি তাঁহার পরিচিত সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

দেশের সকল প্রগতিমূলক প্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁহার মনের যোগ ছিল। আদর্শ গৃহী ও আদর্শ সামাজিক জীবনের কর্তব্য সম্পাদন করিয়া তিনি প্রার্থিত লোকে চলিয়া গেলেন।

গোপীনাথ শ্রীবাস্তব

গোপীনাথ শ্রীবাস্তব তাঁহার কর্ম্মজীবন মাত্র ৪৬ বৎসরে শেষ করিলেন; তাঁহার তিরোধানে যুক্তপ্রদেশ একজন চিন্তাশীল স্বদেশসেবকের সেবা হইতে বঞ্চিত হইল। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে রাজনীতিক জীবনে প্রবেশ করেন; তিনি গান্ধীযুগে প্রবর্ত্তিত সমস্ত আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন।

১৯৩৭ সনে যখন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা হয়, তখন গোপীনাথ শ্রীবাস্তব পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারীর পদে মনোনীত হন; ১৯৪৬ সনে যখন শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ আবার প্রধান মন্ত্রী পদে মনোনীত হন, তিনি তখন তাঁহার মন্ত্রিসভায় গোপীনাথ শ্রীবাস্তবের স্থান করিতে পারিলেন না; তাঁহাকে পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন।

তৎপূর্ব্বেই গোপীনাথ "হিন্দুস্থান" নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদনায় পত্রিকাখানি কংগ্রেসী দলের প্রগতিশীল অংশের মুখপত্ররূপে লোকপ্রিয় হইয়া উঠে।

পুলিনবিহারী দাসের স্মৃতিরক্ষা

বিগত ২৪শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতার এক জনসভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আমরা মনে করি এই প্রস্তাব জনসাধারণের সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণীয়:

"জাতীয় জাগরণের যুগসন্ধিক্ষণে ভারতের বৈপ্লবিক ক্ষেত্রে পুলিনবিহারীর আবির্ভাব এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা। তিনি তাঁহার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও অপূর্ব্ব সংগঠন শক্তি লইয়া জাতীয় যুবশক্তির পুরোভাগে আসিয়া দণ্ডায়মান হন এবং আত্ম-শক্তির সঞ্জীবন স্পর্শে মুমূর্ষু জাতির দেহে নবজীবনের জাগরণ আনয়ন করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার সেই অতুলনীয় অবদানের কথা স্মরণ করিয়া এই সভা পরলোকগত বিপ্লবী নেতার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে। এই সভা পুলিনবিহারীর স্মৃতিরক্ষার একান্ত প্রয়োজন অনুভব করিতেছে।"

স্মৃতিরক্ষা কমিটি আপাততঃ নিম্নলিখিত ভাবে পুলিন-বিহারী দাসের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব মনে করিয়াছেন:

(১) পুলিনবিহারীর আদর্শে যুবকগণকে শরীর চর্চ্চা'র এবং আত্মরক্ষার কৌশল ও শক্তি-সঞ্চয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য একটি আদর্শ ব্যায়ামাগার সংগঠন।

(২) দেশের যুবকগণের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা (ডিসিপ্লিন) আনয়ন, সামরিক বিদ্যা শিক্ষা এবং বৃত্তিহিসাবে সামরিক জীবন অবলম্বনে উৎসাহ ও প্রেরণা দানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠন। এই প্রতিষ্ঠানকেন্দ্র হইতে পুস্তিকা প্রচার, সভা ও বক্তৃতাদির ব্যবস্থা, কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট একটি অধ্যয়নাগার স্থাপন প্রভৃতি করা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপন।

(৩) কলিকাতায় নিমতলা শ্মশানে পুলিনবিহারীর নশ্বর দেহ দাহ করার স্থান সুনির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সেই স্থানটি ঘেরাও করিয়া সেখানে একটি প্রস্তরফলক স্থাপন। সেই স্মৃতিফলকে তাঁহার জীবনাদর্শ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা।

পুলিনবিহারী দাসের সুদৃঢ় চরিত্র, আদর্শ-কর্ম্মনিষ্ঠা, তাঁহার অসামান্য সংগঠন প্রতিভা এবং দেশের সম্মুখে কর্ম্মময় জীবনের আদর্শ স্থাপনের জন্য তাঁহার গৌরবময় মৃত্যু বরণ দেশবাসীকে আমরা স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করা আমরা জাতীয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

স্মৃতিরক্ষা তহবিলে যাহার যাহা সাধ্য চাঁদা প্রেরণ করিয়া এই আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করাইবেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

অর্থ সাহায্য প্রেরণের ঠিকানা—১। শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কোষাধ্যক্ষ, পুলিনবিহারী দাসের স্মৃতিরক্ষা কমিটি—১নং বর্দ্ধণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় ১১ই আশ্বিন (২৮শে সেপ্টেম্বর) হইতে ২৪শে আশ্বিন (১১ই অক্টোবর) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র-টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্য্যালয় খুলিবার পর করা হইবে।

রাজা ভোজ

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

[অদ্য "ধারা" নিরাধারা নিরালম্বা সরস্বতী।
পণ্ডিতাঃ খণ্ডিতাঃ সর্ব্বে ভোজরাজে দিবং গতে ॥]

১

প্রাচীন ভারতের বিক্রমাদিত্য এবং রাজা ভোজ সর্ব্বজন-পরিচিত হইলেও এই দুই মহাপুরুষের ভাস্বতী কীর্ত্তি-কৌমুদীর উপর অধুনাতন ঐতিহাসিক গবেষণা এক অনিশ্চয়তার কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্যগণ ইতিপূর্ব্বেই বিক্রমাদিত্যের "নবরত্ন সভা" লণ্ড-ভণ্ড করিয়া দিয়াছেন। কালিদাস, বররুচি প্রমুখ এক এক রত্নের মধ্যে কোথাও এক, কোথাও দুই শতাব্দীর ব্যবধান আবিষ্কার করিয়াছেন; অথচ স্বয়ং বিক্রমাদিত্য কোথায় কিংবা কোন্ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই।

সুদূর উজ্জয়িনী এবং ধারা নগরী হইতে বিক্রমাদিত্য এবং রাজা ভোজের শিপ্রা-চর্ম্মণ্বতী তুল্য উত্তরবাহিনী যশোধারা ইতিহাস-গঙ্গায় মিলিত হইয়া রূপকথার কথাসরিৎ-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে একাধিক বিক্রমাদিত্য এবং একাধিক ভোজদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালের ইতিহাস এবং সত্যের প্রতি উদাসীন কবি ও আলঙ্কারিকগণ সকলেই একাকার করিয়াছেন, কালিদাস এবং বররুচিকে একাদশ শতাব্দীর "সমরাঙ্গন"-বিলাসী, "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" পরমার-কুলতিলক ধারাধিপতি ভোজদেবের সভায় আনিয়া ফেলিয়াছেন। স্তাবকের স্তুতি ও দানমাহাত্ম্যেই কালপ্রভাবে তাঁহার কীর্ত্তি ম্লান না হইয়া বরং মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। যাঁহারা মালবপতি ভোজদেবের প্রকৃত ইতিহাস জানিবার জন্য উৎসুক তাঁহারা সুপণ্ডিত ডাঃ ধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কৃত *History of the Paramaras* নামক প্রামাণ্য গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক চরিত্রের "মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে উঠে কথায় কথায়"—এই কথা অনেক সময় সত্য। কালের জোয়ার-ভাটায় রামা-শ্যামার মিথ্যা খ্যাতি কিংবা অপযশের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। যাঁহাদের স্মৃতি জাতির হৃদয়ে জনশ্রুতির দ্বারা রূপায়িত হইয়া ঐতিহাসিক সত্যকে নিষ্প্রভ করিয়া থাকে তাঁহারাই অমরত্বের অধিকারী। এইজন্য কোন ঐতিহাসিক চরিত্রের যথাযথ বিচার করিতে হইলে উহার সম্বন্ধে সত্য এবং মিথ্যা, খাঁটি ইতিহাস এবং অলীক জনশ্রুতি দুইটাই জানা দরকার। এই প্রবন্ধে রাজা ভোজ সম্বন্ধে উত্তর-ভারতে প্রচলিত এবং সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত কিংবদন্তী—যাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই বাঙালী পাঠকের কাছে নিবেদন করিব, কোন কোন নৈষ্ঠিক ঐতিহাসিকের বৃথা ক্রোধ দেখিয়া হয়ত সাহিত্য-রসিক হাসিবার অবকাশ পাইবেন।

২

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে (১০১০ ইং) ভোজদেব মালব-রাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং আনুমানিক ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি গজনীর সুলতান মামুদ এবং তাঁহার পুত্র মাসুদের সমসাময়িক। সুলতান মাসুদের রাজত্বকালে আবুরিহান্ অল্-বেরুনী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা এবং হিন্দুর দর্শন-জ্যোতিষাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তহকীক-ই-হিন্দ্ নামক প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—মালবের রাজধানী ধারা নগরীতে তখন ভোজদেব রাজত্ব করিতেছিলেন।

ভারতের ভাগ্যাকাশে তখন কালরাত্রির ছায়া পড়িয়াছে। পেশওয়ার হইতে শতদ্রুতীর পর্য্যন্ত ইসলামের কুক্ষিগত। কনৌজ মথুরা সৌরাষ্ট্রের বুকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে মুসলমান আক্রমণের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা।

মামুদের কোষমুক্ত তরবারি সিন্ধুর পশ্চিম তীরে আর্য্যভূমিকে রাক্ষস-ভূমিতে পরিণত করিয়াছে। কাশ্মীর ব্যতীত সমগ্র উত্তরাপথে তীর্থস্থান কলুষিত, দেবতা ও দেবায়তন চূর্ণীকৃত, জনপদসমূহ বিধ্বস্ত, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে বৈশ্য-শূদ্র দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া গজনীর গোলাম-বাজারের পণ্যস্বরূপ হইয়াছে। ক্ষত্রিয় যোদ্ধার কঙ্কালে নির্ম্মিত হইয়াছে মুসলমান শহীদের বেহেস্ত-সোপান, গাজীর শৌর্য্যমিনার। কায়স্থগণ বিজেতার পদানত, উচ্ছিষ্টভুক-ভৃত্য; ব্রাহ্মণগণ ম্লেচ্ছ সান্নিধ্যে ভীত হইয়া সরস্বতীভাণ্ডার মস্তকে লইয়া কান্যকুব্জ, কাশী, অবন্তী, সৌরাষ্ট্রে আশ্রয়প্রার্থী। সুদূর অতীতে শক হূণ যাহা করে নাই, রাজা ভোজের রাজ্যসীমা চর্ম্মণ্বতীর অপর পারে উহার শতগুণ বীভৎস তাণ্ডবলীলা তখন অবাধে চলিতেছিল। রন্তিদেবের গোমেধ যজ্ঞে নিহত গোচর্ম্মস্তূপের কীর্ত্তি বহন করিয়া চর্ম্মণ্বতী (চম্বল) যমুনার নীল ধারায় আজিও আপন মুক্তি খুঁজিতেছে; মুসলমান অধিকারের পর রন্তিদেবের কীর্ত্তি

ম্লান হইয়া গিয়াছে, পঞ্চনদ প্রদেশের নদীপঞ্চক প্রত্যেকেই রক্তধারা চর্ম্মণ্বতী হইয়া সুলতান মামুদ ও তাঁহার অনুযাত্রীগণের ধর্ম্মান্ধতার বার্ত্তা নদ-রাজ সিন্ধুকে নিবেদন করিতেছে। মামুদের মৃত্যুর পরও মুসলমান প্রতাপ খর্ব্ব হয় নাই; অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল বটে। মামুদ বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। কাফের হিন্দুর বিশ্বস্ততা, "স্বামীধর্ম্ম" এবং শৌর্য্য ইসলামের পতাকাতলে "লামা" ধর্ম্মাবলম্বী রণদুর্ম্মদ তাতার জাতির বিরুদ্ধে খোরাসানের মরুপ্রান্তর এবং "অক্ষু" (Oxus) নদীতীরে পরীক্ষিত হইল। নেতৃত্ব ও একতার অভাবে যে আর্য্যজাতি মুসলমান অশ্বসাদীর গতিরোধ করিতে পারে নাই তাহারাই ভৃতিভুক যোদ্ধারূপে ততোধিক অপরাজেয় তাতার জাতিকে পরাজিত করিয়া গজনী-সাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমান্ত রক্ষা করিতে লাগিল। নাপিত-পুত্র জয়সেন মামুদের পুত্র মাসুদের রাজত্বকালে মুসলমানবাহিনীর অধিনায়করূপে আর্য্যাবর্ত্ত লুণ্ঠনে বাহাদুরী দেখাইয়া সুলতানের প্রীতিভাজন হইয়া উঠিয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে দ্বিতীয় "শকারি" বিক্রমাদিত্যের কর্ম্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। ভারতভূমি হইতে তখনও ক্ষত্রিয়-তেজ তিরোহিত হয় নাই; বাংলার পাল, দাক্ষিণাত্যের চোল-কর্ণাট, মধ্যপ্রদেশের হৈহয়-কলচুরী, মালবের পরমার, রাজপুতানার চৌহান, বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল, সৌরাষ্ট্রের চালুক্যগণ দুর্ব্বল-হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করিতেন না; অথচ সকলেই যেন মোহনিদ্রাগ্রস্ত, রাজনৈতিক চেতনাশূন্য। বিষ্ণুচক্রে সতী-দেহ ছাপ্পান্ন খণ্ডে বিভক্ত হওয়ার পর হইতে ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদের জন্য ব্যথা ও অনুভূতি নিবারক কোন ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না, ডান হাত কাটিয়া ফেলিলেও হিন্দুজাতির বাঁ হাত খবর পায় না। পঞ্চনদ প্রদেশ আর্য্য-ভূমি-বিচ্ছিন্ন হইয়া বিজাতির বিধর্ম্মীর কবলগ্রস্ত হইল; কাঠুরিয়ার কুঠারে একটি শাখা ভূপাতিত হইলে বৃক্ষের যতটুকু ব্যথা লাগে ততটুকু ব্যথা বাদবাকী ভারতের বুকে লাগিল না।

৩

ভোজদেব রাজা মুঞ্জের (দ্বিতীয় বাক্‌-পতিরাজ) ভ্রাতুষ্পুত্র। অপুত্রক রাজা তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা "মুঞ্জ" অত্যন্ত পরাক্রমী, সুপণ্ডিত এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি প্রত্যন্ত রাজ্যসমূহের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন। কর্ণাটরাজ দ্বিতীয় তৈলপ এবং গুজরাটের চালুক্যবংশীয় রাজা ভীম মালব-রাজ্য জয় করিবার জন্য একাধিক অভিযান করিয়াছিলেন। রাজা মুঞ্জ গুজরাটবাহিনীকে পরাজিত করিয়া মেবাড় ও রাজপুতানার পূর্ব্বার্দ্ধে আপন অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। হৈহয়-কলচুরি বংশীয় দ্বিতীয় যুবরাজদেবকে পর্য্যুদস্ত করিয়া তিনি হৈহয় রাজধানী ত্রিপুরী বিধ্বস্ত করেন। কর্ণাটক-অধিপতি সোলঙ্কী দ্বিতীয় তৈলপ মালব আক্রমণ করিয়া ছয় বার পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু নীতিনিপুণ মন্ত্রী রুদ্রাদিত্য প্রতিবার রাজমুঞ্জকে স্বীয় রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া কর্ণাটরাজের পশ্চাদ্ধাবন হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন। সপ্তম বার তিনি গোদাবরী পার হইয়া বিজয়োল্লাসে কর্ণাটরাজ্য লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অতঃপর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তৈলপের হস্তে বন্দীদশা প্রাপ্ত হইলেন। তৈলপ কুশতৃণের মত তীক্ষ্ণধার মুঞ্জ ঘাসের দড়ি দিয়া বাঁধিয়া মহারাজ মুঞ্জকে কিছুদিন কাঠের পিঁজরায় আবদ্ধ রাখিলেন। পরে নিতান্ত নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া তাঁহার ছিন্নমুণ্ড শূলে চড়াইয়া আপন ক্রোধ শান্ত করিলেন। কর্ণাট কারাগারে মুঞ্জের শোচনীয় মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সিন্ধুরাজ (সিন্ধুল) মালব-রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। সুলতান মামুদ যখন কনৌজ ও মথুরা আক্রমণ করেন তখন গুজরাট ও মালব আত্মবিগ্রহে উন্মত্ত। গুজরাটের রাজা সোলঙ্কী চামুণ্ডরায়ের সহিত এক যুদ্ধে ভোজদেবের পিতা সিন্ধুরাজ নিহত হইলেন।

মালবের রাজধানী রাজা মুঞ্জের রাজত্বকালেই বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী হইতে নবপ্রতিষ্ঠিত ধারানগরীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এই ধারানগরীতে কোন এক অজ্ঞাত দিবসে যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে কুমার ভোজদেব অনাথা মালব রাজলক্ষ্মীর আমন্ত্রণে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর ধারা শুভাধারা এবং সরস্বতী শুভাধিষ্ঠিতা হইলেন। কলচুরি, কর্ণাট এবং সৌরাষ্ট্রের সহিত তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের পুরুষপরম্পরা "বৈর" চলিয়া আসিতেছে; সুতরাং রাজ্যারোহণের পর রাজা ভোজের ত্রিশঙ্কু অবস্থা। রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পিতার মৃত্যুর পরিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য তিনি গুজরাট আক্রমণের সঙ্কল্প করিলেন। ধারানগরীর বাহিরে বিজয়স্কন্দাবার বিজয়-পতাকায় সুসজ্জিত এবং মালববাহিনী জয়যাত্রার উৎসবে মাতিয়া উঠিল। কবিগণ মালবরাজগণের যশোগীতি গাহিয়া এবং চিত্রকরগণ নির্জ্জিত শত্রু-রাজগণের ছবি দেখাইয়া সৈন্যদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার জন্য আদিষ্ট হইল। এই সময়ে রাজা ভোজের সভায় "ডামর" (দামোদর) নামক গুজরাটের দূত উপস্থিত। "ডামর" ছিল অতি কদাকার এবং অতি ধূর্ত্ত। তাহাকে জব্দ করিবার জন্য রাজা ভোজ একখানা ছবি দেখাইলেন; ইহা রাজা মুঞ্জের কারাগৃহের চিত্র—

কোণে কৌঙ্কনকঃ কপাটনিকটে লাট কলিঙ্গোহঙ্গনে।
ত্বং রে কোশল! নূতনো মম পিতাপ্যোঃহস্ত্রোষিতঃ স্বণ্ডিলে।
কারাগারের এক কোণে হতভাগা কোঙ্কণের (মহারাষ্ট্র) রাজা, কপাটের নিকটে "লাট", অঙ্গনে "কলিঙ্গ"। কর্ণাট-রাজ তৈলপ এক জায়গায় একটি পাকা বেদী দখল করিয়া আছেন দেখিয়া নবাগত কোশল-রাজের ঈর্ষা হইল। তিনি হাঁকিলেন, "হঠো"। তৈলপ তেলে-বেগুনে জলিয়া হুঙ্কার ছাড়িলেন, তুই বেটা "কোশল" নূতন আমদানী ; এই স্থণ্ডিল ছিল আমার বাপের, তারপর হইতে আছি আমি। এইভাবে জেলখানায় একটু মাথা গুঁজিবার জায়গার জন্য কারাবদ্ধ রাজগণের ঝগড়া, ধাক্কাধাক্কি ইত্যাদি।

গুজরাটের চর শিয়াল পণ্ডিত "ডামর" পটখানা দেখিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সে বলিল, অতি চমৎকার কল্পনা মহারাজ—প্রায় নিখুঁত ; তৈলপের হাতে আপনার জ্যেষ্ঠ-তাত প্রবলপ্রতাপ সম্রাট্ মুঞ্জের কাটা মুণ্ডটি চিত্রিত হয় নাই কেন? রোষে ক্ষোভে রাজা ভোজ তখনই হুকুম দিলেন, মালবসেনা প্রথমে কর্ণাটের দিকে কুচ করুক, সৌরাষ্ট্রের পালা আসিবে ইহার পরে। ডামরের চালে রাজা ভোজ মাৎ হইয়া গেলেন।

৪

রাজ্যারোহণের পর সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর (আনুমানিক) রাজা ভোজ তাঁহার প্রবল শত্রু চেদী, কর্ণাট এবং গুজরাট রাজন্যবর্গের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। যুদ্ধে জয়-পরাজয় অবশ্যই ছিল। ইহা ঐতিহাসিক ব্যাপার ; সুতরাং এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। এই ইতিহাস যেন কবির পান্টা, কে কাহাকে যুদ্ধে কখন হারাইয়াছিল কবিদের উৎপাতে জানিবার যো নাই। প্রত্যেক রাজার সভায় বিদ্যার সমাদর ছিল, বিচক্ষণ কবিগণ তাঁহাদিগের সভা অলঙ্কৃত করিতেন। বিজয়লব্ধ তিলকে তাল করিবার, হাত সাফাই কিংবা পরাজয়কে মহান্ বিজয়রূপে কাব্যে অমরত্ব দান করিবার নিঃসঙ্কোচ বিবেক, নিরঙ্কুশ কল্পনা এবং মুখর রসনার জন্য কবিগণ চিরকালই প্রসিদ্ধ। কাব্যে অন্য রকম ঐতিহাসিক মাল-মসলা বিস্তর পাওয়া যায় ; কিন্তু ইতিহাসের মেরুদণ্ড-স্বরূপ সময়ানুক্রম সন তারিখ, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা কাব্যে প্রত্যাশা করা মরীচিকাভ্রম। অমূলক কিংবা স্বকল্পিত জনশ্রুতিকে আশ্রয় করিয়া তথাকথিত "চরিত্র"-লেখকগণ ইতিহাস-উদ্যানের কণ্টকগুল্ম-স্বরূপ। রাজবল্লভ-রচিত "ভোজ-চরিত" পুস্তকে লিখিত আছে—"মহারাজ মুঞ্জের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য ভোজদেব কর্ণাটক অভিযান করিয়া তৈলপকে বন্দী করেন, এবং অনুরূপ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করেন। অথচ ঐতিহাসিকেরা প্রমাণ করিয়াছেন—দশম শতাব্দীর শেষপাদে ভোজের রাজ্যারোহণের ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে তৈলপ পরলোকগমন করিয়াছিলেন। এই যুগে প্রশস্তিকারগণ মিথ্যাকে কায়েমী ভাবে পাকা করিবার অনুশাসন রচনা করিয়াছেন ; পরবর্ত্তী-কালে মিথ্যাপ্রশস্তি এবং কূট তাম্রশাসনও প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রমাণ : (১) উদয়পুর (গোয়ালিয়র) প্রশস্তি :—

চেদীশ্বরেন্দ্ররথ [তোগ্গ] ল [ভীমমু] খ্যান্
কর্ণাটলাটপতি-গুর্জর-রাট্ তুরস্কান।

অর্থাৎ চেদীশ্বর [হৈহয় বংশী কলচুরী গাঙ্গেয় দেব], ইন্দ্ররথ, তোগ্গল [*Tughral* Turkish chief], ভীম [সোলঙ্কী ভীমদেব প্রথম ?] গুর্জররাষ্ট্র [গুর্জর প্রতীহার] এবং তুরস্ক [মুসলমান] দিগকে পরাজিত করেন।

আমরা অন্য প্রমাণ অনুসারে পাইতেছি এই সময়ে গুজরাটসেনা মালব সৈন্যকে পরাজিত করিয়াছিল, ভোজ-দেব কিছুদিন ভীমের কারাগারে বন্দী ছিলেন ইত্যাদি। একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কোন "তোগ্গল" দিল্লীর দক্ষিণে আসিয়াছিল প্রমাণ নাই। সুলতান সিহাবুদ্দীন ঘোরীর সেনাপতি বাহাউদ্দীন তোগ্রল সর্ব্বপ্রথম মালব জায়গীর পাইয়াছিলেন, গোয়ালিয়রের হিন্দুরাজার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল রাজা ভোজের মৃত্যুর চল্লিশ বৎসর পরে। তুরস্কদিগকে পরাজিত করিবার গৌরব অর্জ্জন করিতে পারিলে ভোজদেব প্রকৃতই দ্বিতীয় "শকারি" [রাজপুতানায় মুসলমানদিগকে "শক" বলা হইত] বিক্রমাদিত্য হইতেন, সুলতান মামুদের মৃত্যুর পরও উত্তর-ভারতের হিন্দুরাজগণ "তুরস্কদণ্ড" নামক কর আদায় করিতেন না। হিন্দুজাতির বিক্রম খর্ব্ব হইবার পরেই ইতিহাসে এই যুগে অবন্তীর যশঃস্পর্দ্ধী অন্যত্র একাধিক "বিক্রমাদিত্য" দেখা দিয়াছিল। রাজা ভোজের তাম্র-লিখিত এক দানপত্রে (১০৭৬ বিঃ সম্বৎ) কোঙ্কণবিজয় উৎসবে এক ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ ভূমিদান করিয়াছিলেন—খোট্টাই অনুমান, ইহার উপর "স্বয়ং ভোজদেবকে" হস্তাক্ষর আছে! কোঙ্কণ শব্দ যদি বম্বের অন্তর্গত মারাঠা "কোঁকণ" দেশ বুঝায় তাহা হইলে "কোঙ্কণ-বিজয়" হয় মিথ্যা আত্ম-প্রসাদ, না হয় দানপত্র কৃত্রিম।

আয়নায় দোষ থাকিলে চেহারা ছোট বড় দেখায়। ইতিহাসদর্পণেরও এই ধর্ম্ম। কোন প্রকার "প্রেম"—যথা দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম-কর্ত্তৃক যদি ইতিহাসমুকুর রূপায়িত হয় তাহা হইলে তিলকে তাল দেখায় ; রাজা ভোজ সম্রাট্ ভোজ হইয়া পড়েন, তাঁহার রাজ্যসীমা পূর্ব্বদিকে চেদি কনৌজ, কাশী, বঙ্গবিহার, উড়িষ্যা, আসাম ; দক্ষিণ দিকে বিদর্ভ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট-কাঞ্চী ; পশ্চিমে গুজরাট সৌরাষ্ট্র

লাট; উত্তরে চিতোর, সাম্ভর কাশ্মীর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া পড়ে—প্রায় আসমুদ্র-হিমাচল কিছুই বাদ থাকে না! এই দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ? ইতিহাসের "মুগ্ধবোধ" যাঁহারা আয়ত্ত করেন নাই তাঁহাদিগের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ পরবর্ত্তীকালের এক কবির অত্যুক্তি—

"কেদার-রামেশ্বর-সোমনাথ-সুণ্ডীর-কালানল-রুদ্রসক্কৈ"

ইহার উপর অনুমান চলিয়াছে সুণ্ডীর বাঙ্গালার "সুন্দরবন", "কালানল"টা ঠিক ঠাহর করিতে পারেন নাই—মনে হয় কাঙ্গরার জ্বালামুখী। এই সমস্ত স্থানে এক এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্রাট্ জগতীতলে নিজ নামের সার্থকতা প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার উপর জনশ্রুতিমূলক প্রমাণও পাওয়া যায়। রাজা ভোজ এক দিন খলিফা হারুন অল রশীদের মত ছদ্মবেশে শহরে বাহির হইয়াছিলেন। দৈবক্রমে এক "দিগম্বর" জৈন সাধুর সহিত রাজার বার্ত্তালাপ হইল। সাধু দুঃখ করিয়া বলিলেন, 'জন্মটা আমার বৃথাই গেল, না যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইতে পারিলাম, না গার্হস্থ্যসুখ কপালে জুটিল।' পরদিন প্রাতঃকালে রাজসভায় সাধুর ডাক পড়িল। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার শক্তি কত দূর? সাধু উত্তর দিলেন,

দেব! দীপোৎসবে জাতে প্রবৃত্তে দন্তিনাং মদে।
একচ্ছত্রং করোম্যহং সগৌড়ং দক্ষিণা-পথম্॥

[দীপমালিকা ব্রতারম্ভে এবং হস্তিগণ মদধারা ক্ষরণে প্রবৃত্ত হইলে অর্থাৎ শরৎ সমাগমে আমি গৌড়দেশ হইতে দক্ষিণাপথ অবধি সমস্ত ভূমি একচ্ছত্র করিতে পারি।]

সাধুর নাম ছিল কুলচন্দ্র। তিনি রাজা ভোজের সেনাপতি-পদ গ্রহণ করিয়া রাজা ভীমের রাজধানী পাটননগরী (অনহলওয়ারা পট্টন) বিধ্বস্ত করেন। বাদবাকী ভারতবিজয় বোধ হয় ইনিই করিয়াছিলেন; তবে সেনাপতি "কুলচন্দ্র" এই বৃহৎ ব্যাপারে কয়টি "অর্দ্ধচন্দ্র" খাইয়াছিলেন জানা নাই।

৫

রাজা ভোজের কীর্ত্তি কালপ্রভাবে ম্লান না হইয়া নিজ্জিত হিন্দুজাতির হৃদয়ে উজ্জ্বলতর অথচ অবাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যপুরাণে ভোজের এক চমৎকার বর্ণনা আছে। এই ভবিষ্যপুরাণ সাধারণ প্রচলিত পুঁথি হইতে স্বতন্ত্র—বোধ হয় খোট্টাই সংস্করণ; কোথাও "ভবিষ্যৎকালের" প্রয়োগ নাই; যাহা কিছু লেখা হইয়াছে সবই মহর্ষি সূত বলিয়া গিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণে আছে—

ভোজরাজ দশ হাজার সৈন্য এবং [কবি] কালিদাসকে লইয়া সিন্ধু নদী পার হইয়াছিলেন। তিনি গান্ধারবাসী ম্লেচ্ছ, কাশ্মীর, আরব এবং "শট" [পাঠান?]দিগকে পরাজিত করিলেন। ইহার পর তিনি "মরুস্থলনিবাসী" [মক্কাস্থিত?] মহাদেবকে পঞ্চগব্য সমন্বিত গঙ্গাজল দ্বারা স্নান এবং চন্দনাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া নিম্নোক্ত স্তব পাঠ করিলেন—

"নমস্তে গিরিজানাথায় মরুস্থলনিবাসিনে।
ত্রিপুরাসুরনাশায় বহুমায়া প্রবর্ত্তিনে॥
ম্লেচ্ছৈর্গুপ্তায় শুদ্ধায় সচ্চিদানন্দ-রূপিণে।
ত্বং মাং হি কিংকরং বিদ্ধি শরণার্থমুপাগতম্॥

ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক গুপ্ত দেবাদিদেব সন্তুষ্ট হইয়া রাজা ভোজকে বলিলেন, বাহীক দেশ [পঞ্জাব সিন্ধু এবং সিন্ধু নদীর পশ্চিম দেশসমূহ] ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক সুদূষিত হইয়াছে। এই দারুণ বাহীকদেশে আর্য্যধর্ম্ম কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। দৈত্যরাজ বলি কর্ত্তৃক প্রেরিত যে মায়াবী ত্রিপুরকে আমি এই স্থানে কোপানলে দগ্ধ করিয়াছিলাম সেই অসুর "দৈত্যকুলবর্দ্ধন" পৈশাচিক কার্য্যে তৎপর "মহামদ" নামে এই দেশে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। হে রাজন্! তুমি ধূর্ত্তগণ অধ্যুষিত, পিশাচকর্ম্মাগণের দেশে গমন করিও না। আমার প্রসাদে এই স্থানে আগমনজনিত পাপমুক্ত হইয়া তুমি শুদ্ধ হইবে।

এই কথা শুনিয়া রাজা ঐ স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সিন্ধুতীরে উপস্থিত হইলেন। রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ "মহামদ" চেলা-চামুণ্ডা লইয়া সিন্ধুতীরে আসিয়াছিল, "মায়ামদ-বিশারদ" মহামদ অতি প্রেমভরে রাজাকে বলিল, মহারাজ! তোমার দেবতা আমার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে। দেখ, সে আমার উচ্ছিষ্ট খাইতেছে। রাজা যে রকম শুনিলেন সেই রকমই [দেবতাকর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট ভোজন] চোখে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, দারুন ম্লেচ্ছধর্ম্ম গ্রহণে তাঁহার মতি হইল। ইহা শুনিয়া কালিদাস হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "রে বাহীকপুরুষাধম ধূর্ত্ত! তুই রাজাকে সম্মোহিত করিবার জন্য মায়া সৃষ্টি করিয়াছিস্। আমি তোকে বধ করিব।" অতঃপর কালিদাস কোন মন্ত্রবিশেষ দশ সহস্র বার জপ এবং যজ্ঞে এক হাজার বার হোম প্রদান করিলেন। মায়াবী মহামদ ভস্ম হইয়া ম্লেচ্ছ-সম্প্রদায়ের দেবতা হইয়া গেল। "মহামদের" শিষ্যগণ মদগর্ব্ব ত্যাগ করিয়া ঐ ভস্মরাশি সহ ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে "বাহীক" [আরব?] দেশে পলাইয়া গেল। ঐ স্থানে মরুভূমির মধ্যে ঐ ভস্ম প্রোথিত হইল এবং উহা ম্লেচ্ছদিগের তীর্থস্বরূপ "মদহীন" [মদিনা] শহর নামে বিখ্যাত হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই। সেই "বহুমায়াবিশারদ" পিশাচ-দেহ ধারণ করিয়া রাত্রিকালে ভোজরাজকে বলিতে লাগিল, "হে রাজন্! আপনার আর্য্যধর্ম্ম "সর্ব্ব-

ধর্ম্মোত্তম" বলিয়া পরিচিত। আমি ঈশ্বরের আদেশে দারুণ "পৈশাচধর্ম্ম" প্রচার করিব, আমার ধর্ম্মাবলম্বী জনগণ "লিঙ্গচ্ছেদী" [সুন্নত ক্রিয়াশীল], মস্তকে "শিখাহীন", "শ্মশ্রুধারী" স্বজনে ব্যভিচারী "উচ্চালাপী" এবং "সর্ব্বভক্ষী" হইবে। "কৌল" [বরাহ] ব্যতীত সমস্ত পশু তাহাদের ভক্ষ্য হইবে। "মুসল" দ্বারা তাহাদের সংস্কার হইবে এবং তাহারা কুশতৃণের ন্যায় [বহুবিস্তার] হইবে। এইরূপে "মুসলবন্ত" [মুষলধারী] "ধর্ম্মদূষক" জাতিগণের উৎপত্তি হইবে এবং আমার প্রতিষ্ঠিত "পৈশাচধর্ম্ম" বিস্তার লাভ করিবে।"

[ভবিষ্যপুরাণ, প্রতিসর্গ পর্ব্ব, খণ্ড ৩, অধ্যায় ৪ পৃঃ ২৮৩]

হিন্দুগণ রাজা ভোজকে "শৈব" কিংবা জৈনমতাবলম্বী বলিয়া দাবি করিলেও মুসলমানের দৃঢ় বিশ্বাস রাজা ভোজের মত ব্যক্তি কাফের হিন্দু হইতেই পারে না। ধারানগরীর আবদুল্লা শাহ চঙ্গাল নামক ফকিরের কবরের উপর হিঃ ৮২৯ সনে [১৪২২ খ্রীঃ] খোদাই-করা এক শিলালিপিতে উল্লেখ আছে, রাজা ভোজ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আবদুল্লাহ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। "গুলদস্তে অবর" (?) নামক এক উর্দ্দু-পুস্তিকায় লেখা আছে আবদুল্লাহ শাহ ফকিরের কেরামতী দেখিয়া রাজা ভোজ তাঁহার কাছে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। রাজা ভোজের সমসাময়িক অল বেরুণী কিংবা পরবর্ত্তী কালে ঐতিহাসিক আবুল ফজল-ফিরিশতা, কিংবা সম্রাট্ জাহাঙ্গীর এইরূপ উদ্ভট কথা লিখেন নাই। গায়ের এবং গলার জোরে মুসলমানেরা রাজগৃহে বুদ্ধদেবকে মকদুমশাহ, দেবদত্তকে ইবলিস করিয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্র এবং বিশেষতঃ বাংলাদেশে বহুপূর্ব্বে চিতারূঢ় হিন্দুপ্রধানগণকে পীর-ফকির বানাইয়াছে, সুতরাং রাজা ভোজ বাদ পড়িবেন কেন ?

দিল্লী এবং হরিদ্বারে ঐতিহাসিক স্বকর্ণে শুনিয়াছে "মক্কেশ্বর" শিব কাবাশরীফে আত্মগোপন করিয়া আছেন। ১৯২১ কিংবা ২২ সালে হরিদ্বারে অর্দ্ধকুম্ভ মেলায় এক নাগা সন্ন্যাসীর ধুনীর চারিপাশে লোকের ভিড় দেখিয়া আমিও দাঁড়াইলাম। তখন সন্ন্যাসী জোরগলায় মুসলমানভীত হিন্দুগণকে অভয়বাণী শুনাইতেছিলেন—"মুসলমানকে ভয় কি ? উহারা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত ; শিব তাহাদের ইষ্টদেবতা যিনি মক্কায় আছেন। ঐ শিবের মাথায় একবার জল-বিল্বপত্র চড়াইতে পারিলেই মুসলমানের সুবুদ্ধি ফিরিয়া আসিবে। আমরা ছাড়া ঐ কাজ অন্য কেহ করিতে পারিবে না।" হঠাৎ আমার মনে পড়িল এই নাগা-সন্ন্যাসীরাই নগদ চারি টাকা এবং দালরুটির খাতিরে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে গোঁসাই উমরাওগীর ও অনুপগীর বাবাজীর অধীনে আব্দালীর পক্ষে যুদ্ধ করিয়া বহু মারাঠা বধ করিয়াছিল। ইহাদের সুবুদ্ধি কখন উদয় হইবে ?

দিল্লীতে এক আর্য্যসমাজী বন্ধু বলিয়াছিলেন আফ্রিকা-প্রবাসী একজন আর্য্যসমাজী কাবাশরীফে বিল্বপত্র চড়াইবার জন্য কোমর বাঁধিয়াছে। পরে কি হইল শুনিবার পূর্ব্বেই দিল্লী ছাড়িয়া আসিয়াছি। আর্য্যসমাজীর যাঁহা কথা তাঁহা কাজ ; হয়ত বেলপাতা চড়াইয়া ফল বিপরীত হইয়াছে, আর্য্যসমাজীগণ লাহোর হইতে উৎখাত হইয়া দিল্লী আসিয়াছেন।

রাজা ভোজের বিদ্যা ও ভোজবাজীর উৎপত্তি-বিষয়ক আলোচনার পূর্ব্বে তাঁহার যশঃস্পর্দ্ধী বাঙ্গালী "গঙ্গারাম তেলী"র জন্মকথার উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ধারা বা বর্ত্তমান ধার নগরীতে একটি মসজিদ আছে, লোকে উহাকে "লাট মসজিদ" বলে। উহা প্রথমে রাজা ভোজ প্রতিষ্ঠিত একটি দেবমন্দির ছিল। উক্ত দেবমন্দির হিঃ ৮০৩ (১৪০৪ ইং) সালে মালবের প্রথম স্বাধীন মুসলমান শাসক দিলাবর খাঁ ঘোরী ঐ মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করেন। এই মসজিদের পাশেই লৌহনির্ম্মিত একটি স্তম্ভ পড়িয়া আছে এই জন্য উহা "লাট মসজিদ" নামে জনসাধারণের কাছে পরিচিত। এই "লাট" সম্বন্ধে এক অদ্ভুত গল্প আছে। এক সময়ে নাকি ধারানগরীতে গাংগলী বা গাংগী নামে এক তেলী-বৌ ছিল। সে আসলে ছিল রাক্ষসী। গাংগী-র এক বিরাট বাটখারা ছিল, লোহার ঐ লাটটি ছিল রাক্ষুসে বাটখারার মাঝখানের ডাণ্ডা। সরিষার বদলে সে প্রতি রাত্রে হস্তকণ্ডুয়ন নিবৃত্তির জন্য ঐ বাটখারাতে বড় বড় পাথর ওজন করিয়া স্তূপ করিত —ঐ সমস্ত পাথর এখনও পড়িয়া আছে। পরে কেমন করিয়া রাজা ভোজের নামের সহিত গাংগালী বা গাংগীর নাম জনশ্রুতি জুড়িয়া দিল কেহ বলিতে পারে না ; অথচ মালব তথা সমগ্র উত্তর-ভারতে লৌকিক কথা চলিয়া আসিতেছে, "কহাঁ রাজা ভোজ ঔর কহাঁ গাংগলী তেলন্"—ইহা একটি বিসদৃশ বস্তুর তুলনায় প্রতি ইঙ্গিত। বাংলাদেশে এই কথা কখন কি ভাবে ঘরে ঘরে "কোথা রাজা ভোজ, কোথা গঙ্গারাম তেলী" হইয়া গেল জানা যায় না। অবন্তী হইতে এই হিন্দুস্থানী লৌকিক বাক্য হয়ত বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছিল। যাহা হউক, "গাংগলী তেলন্" লিঙ্গপরিবর্ত্তন করিয়া "গঙ্গারাম তেলী" হইতে পারে কিনা ভাষা-তত্ত্ববিদ্গণ বিচার করিবেন। এই দেশেও ঐ জনশ্রুতির

ঐতিহাসিক রূপ আবিষ্কার করিবার জন্য গবেষণা চলিতেছে।

রাজা ভোজ ধারা নগরীতে সংস্কৃত ভাষার উন্নতিকল্পে এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। উহার আদি নাম ছিল "ভোজশালা"। ভোজের বংশধর অর্জ্জুন বর্মার সময়ে লিখিত "পারিজাত মঞ্জরী" নাটকে ইহার নামোল্লেখ হইয়াছে "শারদা-সদন"। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অংশে রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটার হল ছিল। এইখানে নাটিকাদির অভিনয় হইত। হিঃ ৮৬১ (১৪৫৭ ইং) মালবের সুলতান মামুদশাহ্ খিলজী "শারদা-সদন" হইতে সরস্বতীকে বিতাড়িত করিয়া উহাকে মসজিদে পরিণত করেন। এই মসজিদের প্রস্তরখণ্ডে খোদাই-করা সংস্কৃত নাটক ও কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মসজিদ এখন "কামাল মৌলার মসজিদ" বলিয়া পরিচিত। ডাঃ প্রাণনাথ শুক্ল একটি প্রবন্ধে এই স্থানে প্রাপ্ত একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভাবার্থ—যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ "গাঙ্গেয়" নামা শক্তিশালী রাক্ষসকে এবং অর্জ্জুন "গাঙ্গেয়" ভীষ্মকে বধ করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন সে প্রকার হে ভোজ! তুমিও ত্রিপুরীপতি "গাঙ্গেয়" (বিক্রমাদিত্যকে) এবং ত্রিকলিঙ্গের রাজধানী কল্যাণপুরের চালুক্য-নরপতিকে পরাজিত করিয়া যশস্বী হইয়াছ।

হিন্দী ভাষায় "রাজা ভোজ" রচয়িতা শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর নাথ রেউ অনুমান করিয়াছেন—পরবর্ত্তী কালে আসল ইতিহাস লুপ্ত হওয়ায় সাধারণ লোক "কঁহা রাজা ভোজ কঁহা গাঙ্গেয় ঔর তৈলপ"—এই পূর্ব্বপ্রচলিত লোককথায় উক্ত রাজাদের নামের জায়গায় "গাংগলী" গাংগী তেলেনী অথবা "গাঙ্গু তেলী"-র নাম ঢুকাইয়া দিয়াছে। তিনি আরও বলেন লাট মসজিদের লৌহস্তম্ভটি হয়ত রাজা ভোজ উক্ত দুই জন রাজাকে পরাজিত করিয়া বিজয়স্তম্ভ-স্বরূপ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় উহা মন্দির-প্রাঙ্গণের ধ্বজদণ্ড যেমন কুতব-মসজিদের লোহার লাট। ইহাও হইতে পারে কর্ণাটরাজ মহাপরাক্রমী দ্বিতীয় তৈলপের খ্যাতিকে ম্লান করিবার জন্য "তৈলপ"-কে পরাজিত মালববাসীরা তেলী করিয়াছে। হিন্দুস্থানী "গংগু তেলী" বাংলায় হয়ত প্রথমে "গঙ্গা তেলী" পরে "গঙ্গারাম তেলী" হইয়াছে।

৭

রাজা ভোজ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কিংবা করাইয়াছিলেন। তাঁহার সভা ছিল পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা-মণ্ডপ। তাঁহার রাজত্ব পণ্ডিত ও কবিগণেরই রাজ্য ছিল। ছয় শতের অধিক শাস্ত্রজ্ঞ এবং সুরসিক কবিকে তিনি রাজার হালেই রাখিয়াছিলেন। রাজা ভোজের ঐশ্বর্য্য এবং দানশীলতার পরিমাপ তাঁহার সভাপণ্ডিতগণের উঠানেই পাওয়া যাইত। পণ্ডিতের বাড়ী যেন এক একটা বাদশাহী মহল। স্ত্রী কয়টা ছিল বলা যায় না, তবে প্রতি রাত্রে নারীগণের ছিন্ন মুক্তাহার হইতে গলিত মুক্তার* দানাগুলি দাসীরা প্রাতঃকালে ঝাঁট দিয়া উঠানের এক কোণে স্তূপ করিয়া রাখিত; অলক্তরঞ্জিত তরুণীগণের মন্দাক্রান্তা পাদন্যাসে শ্বেত মুক্তারাজি অভিমানে লাল হইয়া উঠিত। কেলিসহচর শুকপক্ষী রক্তাভ মুক্তাকে দাড়িম্ব বীজ ভ্রমে চঞ্চুপুটে গ্রহণ করিয়া আশা-ভঙ্গ-জনিত ক্ষোভে ট্যাঁ ট্যাঁ করিত। কবি বিল্হন সুদূর কাশ্মীর হইতে শুনিয়াছিলেন গৃহবলিভুক্ পারাবতগণ রাজা ভোজের ইঙ্গিতে ধারানগরীর প্রাসাদ-অলিন্দ হইতে বকম বকম করিয়া তাঁহাকেই স্বাগত নিবেদন করিতেছে। কবি উর্দ্ধশ্বাসে কাশ্মীর হইতে ধারানগরীতে পৌছিয়া শুনিলেন, ধারানগরী নিরাধারা, সরস্বতী নিরালম্বা, পণ্ডিতগণ মহামহীরুহচ্যুত ব্রততীর ন্যায় ভূপাতিত, রাজা ভোজ দিব্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।

রাজা ভোজের রাজ্যে স্ত্রী ও শূদ্র ব্যতীত সকলেই সংস্কৃত ভাষায় বার্ত্তালাপ করিত। তাঁহার পোষা তোতা এবং রাখালের মহিষ পর্য্যন্ত সংস্কৃত ছন্দে মনের কথা প্রকাশ করিতে পারিত এইরূপ দৃষ্টান্তও আছে। দুঃখের বিষয় যাহার বিদগ্ধ পাণ্ডিত্য ও রসগ্রাহিতার প্রশংসায় সমগ্র ভারতবর্ষ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল সেই ভোজদেব এক দিন স্ত্রীর কাছে মূর্খ প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। বাহিরে যিনি যত বড় পণ্ডিত বাড়ীর ভিতরে পা বাড়াইলে তিনি তত বড় অজমূর্খ। ভোজরাজমহিষী এক দিন অন্দরমহলে সখীর সহিত বিশ্রম্ভরসালাপে মশগুল ছিলেন। এমন সময় সভা বিদায় করিয়া রাজা অন্তঃপুরে আসিলেন; একটা কাব্য-সমস্যা তাঁহার মাথায় ছিল, সুতরাং কিছু অন্যমনস্ক। তিনি হঠাৎ রাণীর সামনে আসিয়া পড়িলেন, সখী ঘোমটা টানিয়া অদৃশ্য হইল। এইভাবে রসভঙ্গ হওয়াতে রাণী কুপিতা হইয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "মূর্খ"। কথাটা রাজার মনে সূচীবৎ বিদ্ধ হইল, রাজা ভোজ মূর্খ? যথার্থ মূর্খ হইলে রাজা হয়ত রাণীকে একপ্রস্থ প্রহার করিতেন; কিন্তু "মূর্খ" কথাটাই তাঁহার কাছে হইল এক পণ্ডিতী সমস্যা। পরদিন সভায় পণ্ডিতগণ একে একে উপস্থিত হইবামাত্র রাজা কিঞ্চিৎ রুষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন,

* মুক্তাঃ কেলিবিসূত্রহার—গলিতাঃ সম্মার্জনীভির্হৃতাঃ।
প্রাতঃ প্রাঙ্গনসীম্নি মন্থরচলদ্ বালাঙ্ঘ্রি লাক্ষারুণাঃ॥
দূরাদাড়িম্ববীজশঙ্কিতধিয়ঃ কর্ষন্তি কেলিশুকাঃ।
[কাব্য-প্রকাশম্]

"মূর্খ"। সকলেই অবাক্ অথচ নিরুত্তর। এই সময় কালিদাস হাজির হইলেন এবং "মূর্খ" শব্দ দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইলেন। কালিদাস হাসিয়াই বলিলেন—

"খাদন্নগচ্ছামি হসন্ন জল্পে।
গতং ন শোচামি কৃতং ন মন্যে ॥
দ্বাভ্যাং তৃতীয়ো ন ভবামি রাজন্।
কিং কারণং ভোজ ভবামি মূর্খঃ ॥"

"হে রাজন! রাস্তায় চলিবার সময় আমি খাইতে খাইতে [যথা চানাচুর বাদামভাজা] চলি না; কথা বলিবার সময় অট্টহাস্য করি না; গত বিষয়ের জন্য অনুশোচনা কিংবা কৃতকার্য্যতা হেতু অহঙ্কারও আমার নাই। [বার্ত্তালাপে রত] দুই জনের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিও আমি হই না, তবে কি জন্য আমি মূর্খ হইব?"

বাঙালীমাত্রেরই অতঃপর সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

৮

কলহান্তরিতা ভোজরাজপ্রিয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ণিমার অদ্ধরাত্রে রাজার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চোখ মেলিয়া দেখিলেন শ্লথবসনা নিষ্কলঙ্ক শশীকলা গাঢ় সুষুপ্তির অঙ্কশায়িনী। গবাক্ষজাল বিচ্ছুরিত চন্দ্রিকা রাণীর বুকে মুখে পড়িয়াছে, জ্যোৎস্নার গায়ে ছায়ার কাটা দাগ। আত্মহারা হইয়া রাজা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কবিতার এক চরণ আবৃত্তি করিলেন—

"গবাক্ষমার্গ-প্রবিভক্ত-চন্দ্রিকো
বিরাজতে বক্ষসি সুভ্রু! তে শশী।"

দ্বিতীয় পাদ পূরণ করিতে না পারিয়া তিনি বার বার ঐ পদ আওড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ নেপথ্যে কেহ বলিয়া উঠিল—

"প্রদত্তঝম্পঃ স্তনসঙ্গবাঞ্ছয়া
বিদুরপাতাদিব খণ্ডতাং গতঃ ॥

রাজা বুঝিতে পারিলেন তৃতীয় ব্যক্তি আশেপাশে নিশ্চয়ই কোন মতলবে লুকাইয়া আছে। তারপর চোর ধরাধরির ব্যাপার। প্রতঃকালে চোর রাজসভায় আনীত হইল, রাজা সরাসরি প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন। চোর কিন্তু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া সুললিত ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় রাজাকে এক নিবেদন জানাইল। ভাবার্থ—

"মহারাজ! "ভ"-কার আদ্য নামের রাশিতে যমরাজ প্রবেশ' করিয়াছেন। ভট্টি, ভারবি, ভিক্ষু, এবং সুকবি ভীমসেন মরিয়াছেন, বাকী মাত্র আমরা দুই জন; একজন স্বয়ং ভূপতি ভোজ এবং দ্বিতীয় আমি—চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হতভাগা ভুকুণ্ড। এক জনের পরেই এই বার আর এক জনের পালা।"

এই কবি ভুকুণ্ড ছিলেন নবাগত প্রত্যর্থী। গতানুগতিকভাবে প্রশস্তি পাঠ করিয়া সভায় পরিচিত হইবার পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া তিনি এক মৌলিক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, অন্দর মহলে চুরি কিংবা অন্য কোন মতলব তাঁহার ছিল না। কেহ কেহ হয়ত সন্দেহ করিবেন কবি কি করিয়া চোর হয়? ইতিহাসে বহু প্রমাণ আছে কবি শুধু চোর নয়, ডাকাত হইয়া রাহাজানিও করিতে পারে। খলিফা হারুন্ অল্-রশীদের সভাকবি আবুনেবাস কবিতা রচনার ক্লান্তি অপনয়ন এবং আনুষঙ্গিক উপরি রোজগারের লোভে প্রতিরাত্রে শহরের বাহিরে ডাকাতি করিবার জন্য বাহির হইতেন এবং বেকায়দায় পড়িলে নিজের সঠিক পরিচয় দিয়া সরিয়া পড়িতেন।

৯

রাজা ভোজের রাজধানীতে এক দরিদ্র অথচ বিদ্বান্ সুরসিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। স্বভাব কিঞ্চিৎ কুঁড়ে ও ঘরকুণো ছিল। একদিন ব্রাহ্মণী অসহিষ্ণু হইয়া উৎপাত আরম্ভ করিলেন—তাঁহাকে রাজসভায় যাইতেই হইবে। ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণচিত্তে অগত্যা রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কুতো আগম্যতে বিপ্র!"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—আজ্ঞে, কৈলাস হইতে সম্প্রতি আসিলাম।

প্রশ্ন হইল, "দেবাদিদেবের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল ত?"

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন—"বহু পূর্ব্বেই তাঁহার অঙ্গহানি হইয়াছিল, শিব সম্প্রতি মারা গিয়াছেন! ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সভাসুদ্ধ লোক অবাক্। ব্রাহ্মণ শ্লোকদ্বারা বুঝাইয়া দিলেন—

মহাদেব "হরিহর" হইয়া অর্দ্ধ অঙ্গ হারাইয়াছিলেন, বাকী অর্দ্ধেক গিরিজায়াকে প্রদান করিয়া অর্দ্ধনারীশ্বর হইয়াছেন। তাঁহার বিভূতির কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। জটাচ্যুত হইয়া গঙ্গা সাগরগামিনী হইয়াছেন; কণ্ঠবিলগ্ন শেষনাগ পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন; মস্তকস্থিত শশীকলা আকাশে উঠিয়াছেন; শিবের সর্ব্বজ্ঞতা এবং ঈশ্বরত্ব আপনাকে আশ্রয় করিয়াছে। অবশিষ্ট ছিল ভিক্ষাবৃত্তি—উহা পড়িয়াছে আমার ভাগে।

রাজা খুশী হইয়া হুকুম দিলেন ব্রাহ্মণকে একটি "মহিষী" দান করা হউক; ছেলেমেয়ে দুধ খাইবে। ধূর্ত্ত রাজকর্মচারী একটি মহিষাসুর-গৃহিণীকে ব্রাহ্মণের কাছে হাজির করিল। ইহাকে লইয়া গৃহে ফিরিলে গৃহিণীর কাছে যে সম্বর্দ্ধনা পাইবেন ব্রাহ্মণের উহা বুঝিতে দেরী হইল না। তিনি মহিষের কাছে গিয়া হাতমুখ নাড়িয়া উহার

কানে বিড় বিড় করিতে লাগিলেন। রাজা ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ নিবেদন করিলেন, মহারাজ! "মহিষী" নারাজ, অধিকন্তু আমাকে গালি দিতেছে এবং বলিতেছে [সংস্কৃত ভাষায়]—ভাবার্থ

ভর্ত্তা মহিষাসুরকে দেবী ভবানী কৃতযুগে বধ করিয়াছেন। আমি বিধবা, স্তন শুকাইয়া গিয়াছে, দাঁত অবশিষ্ট নাই, শিং দুইটি ভাঙ্গা, এই অবস্থা দেখিয়াও জিজ্ঞাসা করিতেছ আমার সন্তান সম্ভাবনা আছে কি? তোমার লজ্জা হয় না?

১০

রাজা ভোজের সভায় কবি কালিদাসের প্রতিপত্তি দেখিয়া অন্য কবিগণ ঈর্ষায় পুড়িয়া মরিতেছিল। কালিদাস লোকচক্ষুর অন্তরালে মৎস্য ভোজন করিতেন, কিন্তু স্বয়ং রাজা ভোজও ইহা জানিতেন না। এক দিন কালিদাস পুঁথির মত বাঁধিয়া বগলে করিয়া জ্যান্ত একটি মাছ লইয়া চলিয়াছেন, হঠাৎ তাঁহার শত্রুরা রাজাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে আটকাইয়া ফেলিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কক্ষে কিং?"—বগলে ওটা কি? কালিদাস কথায় হার মানিবেন কেন? তিনি উদাসীন ভাবে বলিলেন, "মম পুস্তকং।" রাজা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, তোমার কিতাব হইতে জল পড়িতেছে কেন? কালিদাস হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ! এটা আমার কবিতার আসল বস্তু রস জলের মত টস্ টস্ করিয়া পড়িতেছে।" আঁশটে গন্ধটা রাজার নাকে গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, গন্ধঃ কিম্? কালিদাস বলিলেন, কিছুই নয় মহারাজ!

"নহু রামরাবণবধাৎ সংগ্রামগন্ধোৎকটঃ।"

অর্থাৎ কাব্যে বর্ণিত রামকর্ত্তৃক রাবণবধজনিত সংগ্রামের উৎকট গন্ধ। রাজা নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন; বস্তুটি অস্থির দেখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাব্যটা প্রাণবন্ত মনে হয়, কেন?" জীবঃ কিম্? কালিদাস হাসিয়া বলিলেন, এই পুথিতে আমার মৃতসঞ্জীবনী "গৌড়-মন্ত্র" লিখিত আছে, সুতরাং ইহা ছটফট না করিয়াই পারে না। আবার প্রশ্ন হইল, লেজটা কিসের? কালিদাস বলিলেন, "তালপাতায় লেখা পুঁথির।"

ইহার উপর তালাশীর প্রশ্নই উঠে না। কালিদাস বাহাদুর বটে!

মাতৃরূপ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দূর পল্লীতে গিয়াছিনু এক—রুক্ষ নীরস দেশ,
নাহিক কোথাও শ্যাম মমতার লেশ।
পিপাসু নয়ন পায় না খুঁজিয়া কোনোখানে কোমলতা,
কিসের অভাব লাগে—জাগে বুকে ব্যথা।
একটা বাড়ীতে উঠিলাম গিয়া—আশ্রয় দিল শুধু।
আতিথেয়তার নাহিক একটু মধু।
ছেলেমেয়েগুলা পরুষ স্বভাব কর্কশ আচরণ
বাৎসল্যের পায় নাই পরশন।

গৃহমাঝে রাজে গৃহস্বামীর জননীর ছায়াছবি
ফিকে হয়ে গেছে ভক্তির দাগ লভি।
পূজে সন্তান ও চিত্রপট—পদতলে মাথা লোটে
ছবিটি কিন্তু সুন্দর নয় মোটে।
সুন্দর নয়—দর্শনীয় তা বলা যায় না'ক কভু
আকৃষ্ট হ'ল মোর আঁখি মন তবু।
তনয়ের চোখে মাতৃমূর্ত্তি দেবীমূর্ত্তি যে ভাই,
এ মায়া ভুবনে সমান উহার নাই।
অতি অকিঞ্চন অপরূপ ছবি হায় মানে ওর কাছে,
কিছুতেই নাই ও ছবিতে যাহা আছে।
আমি যাহা দেখি প্রস্তর—তাহা পরশমণি যে তার
পৃথক চক্ষু চাই উহা দেখিবার।

দেখি আর ভাবি অনন্ত রূপে জননীর গতায়তি
কখনো ষোড়শী কখনো বা ধূমাবতী।
মা আমার তাই মিশালেন রূপ দশমহাবিদ্যায়
সুরূপা কুরূপা অপরূপ মহিমায়।
কভু কঙ্কালী, কখনো তারবী, কভু ভুবনেশ্বরী—
শুভঙ্করী মা কখনো ভয়ঙ্করী।
যে মাতা প্রসব করেছেন যাহা সুন্দর অসুন্দরে,
যে রূপেই দেখি তাহাতেই মন ভরে।
লাবণ্য যাঁর ভুবন ভুলানো কুৎসিতও নন কম
দুই সার্থক উভয়ই যে অনুপম।
কখনো ললিত, কখনো পূরবী, দীপক ও ভৈরবী
এক কণ্ঠের সঙ্গীত তাঁর সবই।
তীব্র আমিষগন্ধী কুবাস, কভু কস্তুরী-বাস—
গন্ধবহ যে তাঁরি এক নিঃশ্বাস।
যত অমৃত, ততই গরল, যত রূপ, তত ধ্বনি
জননী আমার কি সুধা-মন্দাকিনী।
মোর প্রগল্ভ আঁখি পায় নাকো কোনো রূপ যেথা খুঁজি
কত রূপ তিনি প্রসবিনী তা কি বুঝি?
চোখে এলো জল—বাক্ মন আঁখি হ'ল মোর সংযত
অনাদর হ'ল আদরেতে পরিণত।

রামায়ণী কারবার

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমি তখন পূর্ব্ব-উড়িষ্যার একটি করদ রাজ্যে অরণ্যবিভাগের একজন ওভারসিয়ারের পদে নিযুক্ত আছি। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অরণ্যে কাজ করিতেছিলাম, উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী মিষ্টার সেন ডাকিয়া পাঠাইলেন, তল্পিতল্পা সমেত; বলিলেন—"মিষ্টার মুখার্জ্জি, পূবের দিকের জঙ্গলে একটু পাকারকম বন্দোবস্ত করতে চাই, গড়-বিজুরি আর মহুয়ালি একটা এলাকার মধ্যে না রেখে আলাদা আলাদা করে দু'জন বিভিন্ন ওভারসিয়ারের অধীনে রাখতে চাই, মহুয়ালি অংশটার জন্যে আপনাকে ঠিক করেছি।"

উত্তরটার জন্য মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; যেন একটা প্রস্তাব, নিম্নস্থ কর্ম্মচারীর ওপর হুকুম নয়। মনে মনে মানচিত্রে জায়গাটার ধারণা করিয়া লইতে যে আধ মিনিটটাক দেরি হইল, তাহার পর বলিলাম—"বেশ যাব, সার।"

আদেশটাকে প্রস্তাবের আকার দেবার যে একটু হেতু আছে সেটা পরে প্রকাশ পাইবে। দ্বিধাহীন উত্তরে মিষ্টার সেন যেন একটু সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন—"কারণটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন। দেখেছি মহুয়ালি নিয়ে ঐ যে একটা অন্ধবিশ্বাস আছে, সেই জন্যে ও অংশটা বরাবরই নেগ্‌লেক্‌টেড হয়ে এসেছে। কিছু দরকার পড়লে, খোঁজ নিয়ে দেখেছি, অফিসার নিজে ওদিকে গিয়ে ক্যাম্প ফেলে থাকতে চায় না, হয় একটা দিন বা তারও কম সময়ের জন্যে লোক দেখানো এন্‌কোয়ারি করে রাত হবার আগেই পালিয়ে আসে, নয়তো নিজের মেটকে পাঠিয়ে দেয়। সেও প্রায় নিজে যায় না, একটা ছুটো কুলি পাঠিয়ে কোনখানে গা ঢাকা দিয়ে বসে থাকে, তারপর কুলির কথার ওপর অফিসারের কাছে রিপোর্ট দেয়; সেও তারই শোনা রিপোর্টের ওপর ডায়েরি করে এখানে হেড আপিসে পাঠিয়ে দেয়। কুলিটাও যে যায়ই একথা কেউ বলতে পারে না, তাই আমরা যে খবর পাই সেটা এক হিসেবে একেবারেই ভুয়ো। এই করে দেখছি ও অঞ্চলটাই যেন ক্রমে ক্রমে এক্তিয়ারের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থাটা করলাম, আর রিলায়েব্‌ল মনে করে আপনাকেই ডেকে পাঠিয়েছি। ষ্টেটের খানিকটা খরচ বাড়ল, কিন্তু এ পরীক্ষাটা দরকার হয়ে পড়েছে।"

যাত্রার দিন আরও খানিকটা উপদেশ-নির্দেশ দিয়া বিদায় করিলেন; একটু প্রচ্ছন্ন প্রলোভনও দেখাইলেন—"মহুয়ালির দিক থেকে একটু কিছুকিছু হলেই হেড আপিসে আমায় একজন এসিস্‌টেণ্টের জন্যে ওপরে লিখব; একা পেরে উঠছি না, তখন আপনারাও চেষ্টা করতে পারেন, আমি শুধু সিনিয়রিটিই দেখব না।"

২

জায়গাটা ষ্টেটের একেবারে প্রান্তভাগে, উত্তর-পূর্ব কোণে; তিনটি প্রদেশ এখানে একটি কেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, পশ্চিমে উড়িষ্যার এই করদ রাজ্য, উত্তরপূর্বে বিহার, দক্ষিণ-পূর্ব্বে বাংলা। এইরূপ সংস্থানের জন্যই মহুয়ালির অরণ্য-সম্পদ রক্ষা করা একটু দুষ্কর। জায়গাটা খুব সমৃদ্ধ; শাল, বাঁশ, মহুয়া, সাবুই-ঘাস, লাক্ষা, মধু প্রভৃতি জঙ্গলের সাধারণ উৎপন্ন দ্রব্যাদি তো আছেই, এ ছাড়া খনি-সম্পদও প্রচুর, বিশেষ করিয়া তামা ও লোহা। মৃত্তিকার উপরের ভাগে কোথাও কোথাও পাথরের সঙ্গে মেশান এই দুইয়ের কাঁচা আকর পাওয়া যায়, এবং এই সবই লইয়া তিনটি প্রদেশের সীমান্তবাসীদের মধ্যে বিপুল এক চোরাকারবার চলে। এটা দিন দিনই বাড়িয়া উঠিতেছে এবং ইহার কারণ সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। মহুয়ালি সম্বন্ধে রাজধানী পর্য্যন্ত অনেক লোকের একটা আশঙ্কা যে, জায়গাটায় একটা যাদু আছে, অধিক দিন (সাধারণের মতে ত্রিরাত্রির অধিক) যাপন করিলে এখান হইতে ফিরিয়া আসা আর সম্ভব নয়। কি হয় সেটা কেহ বলিতে পারে না; নূতন যখন চাকরি লই, একটা কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়—এই যে একটা সারা অঞ্চল 'কুক্ষিত পাষাণে'র রহস্য লইয়া পড়িয়া আছে ইহার কারণটা কি? কিছু অনুসন্ধান করি, এ-মুখে সে-মুখে শুনিয়া সমস্ত ব্যাপারটার যেটুকু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সংগ্রহ করিতে পারি তাহা এই যে, এই জায়গাটা সম্বন্ধে স্থানীয় লোকের বিশ্বাস মহুয়ালি পৃথিবীর সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত, কতকটা শিবের ত্রিশূলের ওপর বারাণসীর অবস্থানের মত—আর বহুদিন পূর্ব্বে এইখানে যদুপতি মোহান্তি নামে একজন ফরেষ্ট ওভারসিয়ার তত্ত্বাবধান করিতে আসিয়া চতুর্থ দিন হইতে একেবারে নিখোঁজ হন। জায়গাটি এই নূতন ব্যবস্থার পূর্ব্বে গড়-বিজুরি চাকলার অন্তর্গত ছিল। মোহান্তির পর ত্রিরাত্রি যেমন করিয়া আপনা-আপনিই মহুয়ালি-বাসের সীমানির্দ্দেশ হইয়া গিয়াছে, নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করিয়া কেহ একটা রাত্রিও আর কাটায় নাই এখানে, এবং এ রহস্যের ওপর আর আলোকসম্পাতও হয় নাই।

এই সঙ্কীর্ণ ভিত্তির ওপর আমি নিজে যে একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়া লই তাহা এই যে, সমস্তটাই চোরাকারবারীদের কৌশল—হয়ত স্থানীয় বন্য জাতিদের মধ্যে ছিল একটা বিশ্বাস,

নিজের নিজের ভূমিখণ্ড সম্বন্ধে সাধারণতঃ যেমন থাকেই ইহাদের ভিতর,—যাহাদের স্বার্থ তাহারা এইটাকে সুকৌশলে রাজধানী পর্য্যন্ত চালাইয়া দিয়াছে, তাহার পর হয়ত চক্রান্ত করিয়া দোহাতির প্রাণনাশ ঘটাইয়াই কাহিনীটাকে একটা বাস্তবের রূপ দিয়া নিজেদের কারবার নিষ্কণ্টক করিয়া লইয়াছে।

সদরে অল্পদিন থাকার পর আমি দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বদলি হই, সেটাও সীমান্ত প্রদেশ, বহু সমস্যা, গড়-বিদ্রুতি মহুয়ালি লইয়া আমার কৌতূহলটা ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া পড়ে।

তিন দিন গোযান এবং হস্তিপৃষ্ঠে অভিযানের পর চতুর্থ দিবস বৈকালে আমার নূতন কর্মস্থলে উপস্থিত হইলাম এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার পূর্ব্বধৃত সিদ্ধান্তে প্রথম আঘাত লাগিল।

মিষ্টার সেন বেশ সরলভাবেই মহুয়ালি সম্বন্ধে ব্যবস্থায় লাগিয়াছেন; কয়েক আপিসটা যে বসাইয়াছেন তাহা একেবারে সমস্ত অঞ্চলটার কেন্দ্রে, একটু পূর্ব্ব ঘেঁষিয়া এমন একটি জায়গা যেখান হইতে সমস্ত সীমান্তটার ওপর আধিপত্য থাকে, অথচ অন্তদিকে নিবিড় দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলটার ওপরেও দৃষ্টি রাখা যায়, কেননা স্টেটের অভ্যন্তরের যে চোরাকারবারী বুনো জাতের দল, তাড়া খাইলে তাহারা এই প্রাকৃতিক দুর্গের মধ্যেই আশ্রয় লয়।

কিন্তু আমি আপিসটার এই সুনির্দ্ধারিত সংস্থানের কথা বলিতেছি না, আমার সিদ্ধান্তে যাহা প্রথম আঘাত দিল, তাহা অনির্দ্দিষ্ট একটা কিছু—যাহা সমস্ত জায়গাটার মধ্যে ছিল প্রচ্ছন্ন। পশ্চিম দিকটা কতকটা যেন বুকচাপ, ঘনারণ্য পাহাড়ের স্তূপ—মনে হয় কোন্ সেই সুদূর বিন্ধ্য-সাতপুরা অমরকণ্টক থেকে পাহাড়ের ঢেউ গড়াইয়া গড়াইয়া আসিয়া এইখানে এককালি ক্রেসেণ্ট চাঁদের একটি নীল রেখায় থামিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিকটা মুক্ত, প্রথমতঃ সমস্ত জায়গাটাই ঢালু হইয়া, আপিসটাকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় দশ-পনর মাইলের একটা অর্দ্ধবৃত্ত সৃষ্টি করিয়াছে। মাঝে মাঝে ছাড়া ছাড়া ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণী, যেন পশ্চিমের বিক্ষুব্ধ ঊর্ম্মির এক-আধটা টুকরা ছিটকাইয়া কঠিন হইয়া গিয়াছে। এর পিছনেই প্রায় বিশ-পঁচিশ মাইল দূরে একটি দীর্ঘতর নীল পর্ব্বতরেখা, উত্তরের দিকে একটু আরত, মসিঘন, তাহার পর দক্ষিণের দিকে ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

কিসে যে কি হইল ঠিক বলিতে পারি না, তবে জায়গাটাতে পৌঁছানর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনের উপর একটা প্রান্ত ঔদাস্ত যেন ছায়া বিস্তার করিতে লাগিল। পরে ভাবিয়া দেখিয়াছি অন্তত তিনটি কারণ উপস্থিত ছিল; প্রথমতঃ মহুয়ালির আপন ঐতিহ্য, দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘ যাত্রা-পথের অবসান, অর্থাৎ স্পন্দমান সচল জীবনের একটা বিরতি; তৃতীয়ত, দিনের যে সময়টিতে পৌঁছিলাম আমি। হয়তো এই তিনের মিলিত প্রভাবেই আমার মনে হইল, সমস্ত জায়গাটাতেই যেন আছে কিছু একটা, একদিন বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে খোঁজ করিতে গিয়া যে সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিলাম সমস্ত ব্যাপারটা চোরাকারবারীদের কারসাজি, সেটাতে বেশ একটু সংশয় জাগিল।

অবশ্য তখন মনের এই বিলাস লইয়া পড়িয়া থাকার চেয়ে অনেক বড় কাজ হাতে। আবাস-স্থানটা একবার দেখিয়া লইয়া লোকজন দিয়া জিনিসপত্রগুলা সবই গুছাইয়া লইলাম। চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্নানাদি সারিয়া লইলাম; তাহার পর সঙ্গে যা আছে এবং এখানে যাহা অধীনস্থ লোকেরা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া পাচক ব্রাহ্মণকে রাত্রের আহার সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিয়া নবরচিত বাংলোর সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একটা ক্যাম্প-চেয়ারে গা এলাইয়া বসিলাম। মেট, কুলি, আর্দালি লইয়া জন কুড়ি লোক; কয়েকজন আমার সঙ্গেই স্থায়ীভাবে থাকিবে, কয়েক জন আশপাশের গ্রামের অধিবাসী, সকলেই চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল। পাচক একটা ক্যাম্প টেবিলে চা, জলখাবার রাখিয়া গেল, সেবন করিতে করিতে জায়গাটার সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রহ করিবার জন্ত লোকগুলার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিলাম।

যে ঔদাস্তটা মনকে স্পর্শ করিয়াছিল, সেটা ঠেলিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য যে ছিল না এ কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু সন্ধ্যা যতই আগাইয়া আসিতে লাগিল ততই ঐ অনুভূতিটা যেন মনকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। এমনি সন্ধ্যা সময়টাই নিঃসঙ্গতাপ্রিয়, সেদিন যেন আরও আত্মস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলাম; এক সময়ে আকাশলগ্ন এই পূরবী সুরের কাছে যেন আত্মসমর্পণ করিয়াই লোকগুলাকে সরাইয়া দিলাম।

সূর্য্যের রক্তিম আভা যতই গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই বেশী করিয়া আত্মলীন হইয়া উঠিতে লাগিলাম আমি। মনে হইল, দক্ষিণের বিস্তীর্ণ আতাম্র রুক্ষ ভূভাগ—এ যেন গৈরিকধারী উদাসী জীবন; তাহার সামনে ঐ মৃত্যু, পর্ব্বতের পুঞ্জীভূত তমিস্রার রহস্যময়রূপে, উভয়ে পরস্পরের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

পার্ব্বত্য অরণ্যের মধ্যে বহুদিন কাটিল বহু সর্ব্ব প্রতিবেশে, কিন্তু ঠিক এ ধরণের অনুভূতি কখনও হয় নাই। দেহটা সেদিন দুর্ব্বল ছিল, তাহার সঙ্গে নিশ্চয় মনটাও, দুর্ব্বল মনকে এ ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত ভাবিয়া সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই বাংলোর মধ্যে চলিয়া গেলাম। অস্বীকার করিব না

এদিকে মোহাজির রহস্যজনক পরিণামের কথাটাও মনের এক কোণে কোথায় জাগিয়া থাকিয়া মনটাকে অন্তভাবেও দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছিল। গ্রামের যে কুলিরা একত্র হইয়াছিল তাহাদেরও সে রাত্রে উপস্থিত থাকিবার হুকুম দিয়া আমি বাংলোর মধ্যস্থলে নিজের ঘরটিতে প্রবেশ করিলাম। ঠাকুরকে সকাল সকালই রন্ধন সমাধা করিতে বলিয়া দিয়াছিলাম, একটু রাত্রি হইতেই আহার শেষ করিয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম।

তাহার পরদিন উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কাজে লাগিয়া গেলাম—কতকটা যেন এই ভয়েও যে কালকের ভূত আবার ঘাড়ে আসিয়া না চাপিয়া বসে। সবাইকে জড়ো করিয়া ম্যাপ সামনে রাখিয়া সমস্ত এলাকার একটা হিসাব লইতে লাগিয়া গেলাম—কোথায় কি রকম পথ, কোন্ বনে কি কি উৎপন্ন হয়, কোন্ গ্রামে কি রকম মানুষ, আরও সব খুঁটিনাটি যাহা আমার প্রয়োজন। চোরাকারবারের গতিবিধি সাধারণতঃ কোন্ কোন্ পথ বাহিয়া তাহাও ইহাদের যতটা জানা আছে, এবং আমি জেরা করিয়া যতটা পারিলাম সংগ্রহ করিতে—জানিয়া লইলাম। ইহার পর এক সপ্তাহের একটা টুর-প্রোগ্রাম (পরিক্রমা-সূচী) ছকিয়া লইয়া লোকগুলিকে সেই দিন হইতেই প্রস্তুত হইতে বলিলাম। না, কাল যা নমুনা পাইয়াছি, খুব বেশী দিন এখানে থাকা চলিবে না। তা ছাড়া হেড আপিসে এসিষ্টান্ট পদের জন্ত লোভটাও আছে, তাড়াতাড়ি মহলটাকে সামলাইয়া দিয়া একটা সুনাম অর্জ্জনের দিকেও প্রবল ঝোঁক আছে। আহারের পর অল্প একটু বিশ্রাম লইয়াই ঘোড়ায় জিন কষিতে বলিলাম।

টুরই এ বিভাগের প্রধান কাজ, সে হিসাবে প্রথম দিনের সাফল্যে সন্তুষ্টই হইলাম। প্রায় মাইল ছ' সাতের একটা বৃত্ত শেষ করিয়াছি, নিজের প্ল্যান অনুযায়ী দুইটি নূতন ঘাঁটিও বসাইয়া দিলাম, গ্রামের মাতব্বরদের সহায়তায় চৌকি নিজের লোক চালাইবে। পরদিন জায়গাটার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার জন্ত আরও বেশী কাজ করিতে পারিলাম, চতুর্থ দিনে মাইল দশেক দূরে একটা ক্যাম্প ফেলিয়া দুই দিন কাটাইয়া বাংলোর দিকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত আগাইয়া গেলাম। বেশ অনেকগুলি কাজ হইল, খবর পাইতে লাগিলাম জিরাজি অতিক্রম করিয়াও মহালির হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া না যাওয়ায় চারিদিকে বেশ একটা বিস্ময়-গুঞ্জন তুলিয়াছি, চোরাকারবারী-মহলও চকিত-বিস্ময়ে চোখ রগড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। সাত দিন পরে বেশ একটি ভদ্ররকমের রিপোর্ট পাঠাইয়া দিলাম হেড আপিসে।

এদিককার খবরও দেওয়া দরকার। কাজকর্ম্ম সারিয়া প্রায় সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া আসিতাম, তাহার পর ক্লান্তির জন্তই সেই প্রথম দিনের রুটিনটাই আবার পুনরনুষ্ঠিত হইত। মনের দিক দিয়াও হইত একই ধরণের অভিজ্ঞতা। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তাভা আমার দক্ষিণের আরন্ত নৈসর্গিক প্রাঙ্গণ আর বাঁয়ের ধূম্র পর্ব্বত-স্তূপের উপর যখন শেষ স্পর্শ দিত, মনে হইত আমি যেন জীবন আর মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, মনটা কেমন যেন হইয়া যাইত—সেই কেমন হওয়ার বিশেষত্ব এই যে, জীবনের চেয়ে মৃত্যুটাকেই আমার পূর্ণতর সত্য বলিয়া মনে হইত।

একটা কথা বলা হয় নাই—বিশেষ করিয়া এই বৃহত্তর পটভূমির মধ্যে উপভোগ করিবার জন্ত—বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে গল্পগুলিকে রূপায়িত করিয়া লইবার জন্ত, রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গল্পের বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম—সন্ধ্যার পর সেইগুলি থেকে বাছিয়া বাছিয়া গল্প পড়া আমার নিত্য কর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছিল—বিশেষ ভাবে 'মণিহারা' আর 'ক্ষুধিত পাষাণ', তাহারও মধ্যে বিশেষ করিয়া 'ক্ষুধিত পাষাণ।' এ আমার ছিল যেন কল্পলোককে বাস্তবে নামাইয়া আনার জন্ত একটা মন্ত্র-সাধনা, ঠিক উপযোগী পরিবেশের মধ্যে কতকটা শ্মশানে আসন পাতিয়া শক্তি-সাধনার মতই। কিন্তু আশ্চর্য্য, অত করিয়াও ঠিক ও-ধরণের অনুভূতি জাগিল না আমার মনে। "ক্ষুধিত পাষাণে"র মধ্যে আছে একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার মর্ম্মভেদী সুর, মৃত্যুর পটভূমিকায় দাঁড়াইয়া…জীবনের দিকে লুব্ধ আতুর দৃষ্টি-ক্ষেপ ; আমার কিন্তু এ ছিল সম্পূর্ণ পূরবীর হতাশ—বৈরাগ্যের, আমার দক্ষিণের জীবন বাঁয়ের মৃত্যুর দিকে মুক্ত করে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার বিষণ্ণ আলোকে নিরন্ত আত্মনিবেদন করিত—হে বিলয়, হে মুক্তি, হে বন্ধু, তুমি আমার পরিপূর্ণ ভাবে তোমার মধ্যে গ্রহণ কর…

বেশ কিছু দিন গেল ; বাঁচিয়া আছি বলিয়া নিশ্চয় বহু-লোকের বিরাগভাজন হইতেছি—কিন্তু কাজ হইতেছে। আমার দিনের জীবন বিচিত্র, কিন্তু সন্ধ্যা আর রাত্রির জীবনটি সেই একই সুরে ঢালা। তাহার পরে হঠাৎ একদিন একটা কথা মনে হইল—যে দিন এখানে পদার্পণ করিয়াছি সেই দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত আমার মোটামুটি কর্ম্ম ও অবসরের সূচী প্রায় একই রকম। সেই উদয়াস্ত কাজ, অস্তাচলগামী সূর্য্যের সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া বসা, রাত্রে কিছু গল্প পাঠ, আহার, নিদ্রা।

এক দিন ইচ্ছা হইল, একটু ওলট-পালট করিয়া দিই। সমস্ত দিন একেবারে নিরঙ্কু কর্ম্মহীনতায় কাটাইয়া, বৈকালে ঘোড়ায় করিয়া নিতান্তই শুধু বেড়াইবার জন্তই বাহির হইয়া গেলাম। জায়গাটার সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় হইয়াছে, কোন লোক পাইলাম না, শুধু কার্তুজের বেল্ট আর স্ট্র্যাপবাঁধা বন্দুকটা ঝুলাইয়া লইলাম।

এক একটা চাদুর খাপ বাহিয়া আসিয়া গেলাম প্রায় মাইল

থেকেই দূরে বাঁকাই নদীর ধারে। এই স্থানটির উপর অনেক দিন থেকে আমার লোভ ছিল, কিন্তু কাজের ভিড়ে আসা হয় নাই। আজ কাজের ভিড় ঠেলিয়া সকাল থেকে এইটিকে লক্ষ্য করিয়া ছিলাম।

যখন পৌঁছিলাম তখন সূর্য্যাস্ত হইয়া গেছে। আমার আজকের প্রোগ্রামটা নিতান্তই আকস্মিক, অত তিথি দেখিয়া ঠিক করি নাই, তবু আকস্মিক ভাবেই আজ তিথিটা আমার অদৃষ্টে পূর্ণিমা দাঁড়াইয়া গেল। সন্ধ্যার ছায়া একটু গাঢ় হইবার আগেই পূর্ব্ব দিকচক্রে পূর্ণিমার চাঁদ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নদীর একটু তফাতে একটা বাবলা গাছ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার গুঁড়িতে ঘোড়াটাকে বাঁধিয়া আমি অল্প একটু নীচে নামিয়া বসিলাম। এ অঞ্চলটায় জানোয়ারের খুব বেশী উপদ্রব নাই, তবু বেশ নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

সেই দিন রাজধানীতে রচা আমার সেই বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে দ্বিতীয় আঘাত লাগিল :—

বালু আর অগভীর কয়েকটা জলরেখা লইয়া নদীটা এখানে প্রায় শ'তিনেক হাত চওড়া, বাঁয়ের তটরেখা ক্রমেই রুক্ষ হইয়া হইয়া দূরে পর্বতের উপর উঠিয়া গিয়াছে, আমার সামনে এটা একটা বাঁক, এর পরই দক্ষিণে তটরেখা দুইটা নামিয়া নামিয়া কয়েকটা বাঁকের পর অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

আমি কোন্ একটা অপার্থিব লোকে চলিয়া গিয়াছিলাম ; কখন, কোন্ পথে প্রবেশ করিয়াছি বলিতে পারিলাম না, যখন পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে খানিকটা চৈতন্য হইল তখন দেখি পূর্ণিমার চাঁদটা আকাশে বেশ খানিকটা উঠিয়া আসিয়াছে, আমার সামনে বিস্তৃত বালুচরের ওপর জ্যোৎস্না একটি সুন্দরী রমণীর মতই অলস-শায়িত, নদীর ঈষচ্চঞ্চল বিচ্ছিন্ন জলধারা-গুলা যেন তার শুভ্র শাড়ীর ভাঁজ—মৃদু হাওয়ায় দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। শরৎ কাল, এর পরেই সমস্তটা একটা গাঢ় কুয়াশায় ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আজ আমার মন্ত্র-সাধন সফল হইল। কিন্তু 'ক্ষুধিত পাষাণ'ই যে পূর্ণ সিদ্ধিতে রূপ লইয়া জাগিয়া উঠিল তাহা নয়। আমার অনুভূতির মধ্যে সন্ধ্যার পূরবী আর রজনীর বসন্ত-রাগ—বৈরাগ্য আর আবেগময় বাসনা মিলিয়া এক অপরূপ মিশ্র সুরের ক্রন্দনে জাগিয়া উঠিল। মনে হইল পাইতে চাই—শুধুই পাইতে চাই—কি বা কাহাকে সেটা শুধু এই জন্যই বলা যায় না, যেহেতু সীমাতীত সৌন্দর্য্যে তা অচিন্তনীয় ; কিন্তু তা ভোগেরই, সে ভোগের নাম নাই, যেহেতু তা শুধু তুরীয় নয়, আবার পার্থিবও নয়। দেহ মন-আত্মার যুক্ত আকাঙ্ক্ষা দিয়া, পঞ্চেন্দ্রিয়, তার পর ইন্দ্রিয়াতীত কোন ইন্দ্রিয় যদি থাকে সে-সবের নিবিড়তম আলিঙ্গন দিয়া তাহা পাইবার মত। আমার যে বৈরাগ্য তা এইজন্য নয় যে আমি কোনও তাপসবাঞ্ছিত মুক্তির অভিলাষী—এই পৃথিবী রূপ-রস-গন্ধাদির শত প্রলোভনেও নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তাই আমি চাই নিবৃত্তি।...হে অসীম সুন্দর! হে অসীম সুন্দরী, তুমি কে? তুমি কোথায়?—এই ত্রিদিবধন্বিত জ্যোৎস্না-রজনীর রহস্য-আলোকে আমি তোমার অস্তিত্বের ইঙ্গিত মাত্র পাইয়াছি—কি তপস্যা চাই বল—আমায় তোমার পূর্ণতার মধ্যে ডাকিয়া লও...

আমি তাহা হইবার নয়, তবু হায়, অন্তত কাহিনীটিও যদি এইখানে শেষ করিতে পারিতাম!...

৩

পূর্ব সীমান্তেই আমার কাজ বেশী, তখন বাকিও অনেক, কিন্তু, সেই রজনীর অভিজ্ঞতার পর বাঁকাই নদীটা কি একটা অদ্ভুত মোহে যেন পাইয়া বসিল আমায়, বিশেষ করিয়া এর কম অংশটা, সেটা বঙ্কিম গতিতে ধীরে ধীরে গিরিশ্রেণীর মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার একটা কারণ এই যে দক্ষিণে স্থানে স্থানে নদীটা দেখা আছে—সমতলের দিকে সৌন্দর্য্যও অনেকটা বিশেষত্ববর্জিত। এখানকার সৌন্দর্য্যটা সে রাত্রে এমন অভিভূত করিল যে মনে কেমন একটা বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গেল, বাড়িতে বাড়িতে পশ্চিমে এ সৌন্দর্য্য হয় তো এমনই হইয়া উঠিয়াছে যে দিবাভাগেও সেই রাত্রির অভিজ্ঞতার পুনরা-বর্ত্তন হইতে পারে। যাহাদের অভিজ্ঞতা নাই তাঁহারা এ কথাটা ঠিক বুঝিবেন না, কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের অতল রহস্য-গাম্ভীর্য্যের মধ্যে এই ধরণের এক একটা অদ্ভুত মোহ দাঁড়াইয়া যায় কখন কখনও—কোন একটা পাহাড় লইয়া, কোন একটা নদী লইয়া, এমন কি কখনও সামান্য কোন একটা বৃক্ষ লইয়াও ; অন্তত দেখিয়াছি আমার কয়েক ক্ষেত্রে হইয়াছে—আর এই বিশেষ ক্ষেত্রে তো একটা কারণ ছিলই—সেই রাত্রির অভিনব অনুভূতি।

পরদিন বৈকালে টুর হইতে ফিরিয়া সবাইকে একত্র করিয়া বলিলাম—"এদিককার কাজ আপাতত বন্ধ রৈল, কাল সকালে নদীর খাত বেয়ে পশ্চিম দিকে যাব, সেই মত তোয়ের থাকবে তোমরা।"

আশ্চর্য্য, কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সবার মুখ যেন শুকাইয়া গেল, কোন উত্তর না দিয়া সবাই চাপা আতঙ্কে পরস্পরের মুখের পানে চাহিতে লাগিল। এমনই একটা নূতন কাণ্ড যে আমি থমকিয়া গিয়া মেটকে প্রশ্ন করিলাম—"ব্যাপারখানা কি মহাপাত্র?"

মেট ঠোঁট দুইটা জিভে ভিজাইয়া লইয়া বলিল—"নদীর পথ ধরে ওদিকে খুব বেশীদূর যাওয়া...সে ঠিক হবে না হুজুর..."

হঠাৎ নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে মস্ত বড় একটা তথ্য আবিষ্কারে আমার সমস্ত মনটা সচকিত হইয়া উঠিল—"তা হলে ওদিকের নীচেই চোরাকারবারীদের আড্ডা! ঘোড়া

হইতে নামিয়া—বাংলোর দিকে যাইতে যাইতে হঠাৎটা ফির'-ছিলাম, বেশ ভালভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলাম—"কেন, বাবা বা আপত্তিটা কি ?"

উত্তর নাই, মাথা নীচু করিয়া আছে মুখ চাওয়া-চাওয়ির ঘটা একটু বাড়িয়া গেল মাত্র। সন্দেহ মিটিয়া যাওয়ায় বেশ খানিকটা জোরের সঙ্গেই আদেশ দিয়া আবার ফিরিয়াছি, মহাপাত্র দুই পা আগাইয়া পাশে আসিয়া বলিল—"ওদিকে তপস্যা করছেন..."

ঘুরিয়া দাঁড়াইতে হইল, মুখ দিয়া কোন প্রশ্ন বাহির করিতে পারার আগেই মহাপাত্র তাহার বক্তব্যটা পূরণ করিয়া দিল—

"পওহারী বাবা ওদিকে তপস্যা করছেন হুজুর—এখান থেকে প্রায় পো'টাক পথ দূরে নদীর ধারে। কথাটা কাউকে বলা মানা, আর গেলেই একটা না একটা অনিষ্ট হয় তাই হুজুরকে মানা করছিলাম।"

লোকটাকে ভাল বলিয়াই জানিতাম, একটু ব্যঙ্গের স্বরেই বলিলাম—"ও, বলা মানা ! শুধু বুঝি তোমরা এ ক'জনেই জানবে ?...তা গেলে অনিষ্টটা কার হয় সেটা এবার বুঝতে পারবে—তোমরা সকলেই...। আপাতত তোমার ওপর আমার হুকুম—তপস্বী কোন রকমে যেন খবর না পায় যে আমি আসছি। কাল আমি না বেরনো পর্যান্ত কোন লোক বাংলো ছাড়বে না, এ সত্ত্বেও যদি লোকটাকে কাল গিয়ে না দেখি তো দায়িত্ব তোমার। যাও।"

সেদিন সন্ধ্যার পর বাহিরে একটা ক্যাম্প-চেয়ার লইয়া বসিলাম। একাই। মনটা বড় চঞ্চল আজ, এক রকমের অনুভূতি নয়—ভেতরে একটা চাপা উল্লাস উঠিয়াছে, একটা খুব বড় সাফল্য সামনে, মহুয়ালির রহস্য এত দিনে ভেদ করিতে চলিয়াছি, আমিই !...এর পাশেই বেশ একটা ভয়—আজই হয় তো আমার শেষ রাত্রি, মিত্র-বেশে এতগুলো শত্রু আমায় ঘিরিয়া—রাজধানী থেকে আমার সঙ্গে আসিয়াছে মাত্র চার জন, কে জানে তাহারাও ভিতরে ভিতরে এদের দলে ভিড়িয়া গিয়াছে কিনা ; ইহারা আজ প্রাণপণে চেষ্টা করিবে আমায় এ জগৎ থেকে লুপ্ত করিয়া ওদের পথের এই নূতন কণ্টক অপসারিত করিবার ; মহুয়ালির রহস্য ভেদ করিব কি, আজ রাত্রে হয় তো মোহান্তিঘটিত ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হইয়া সে রহস্য আরও জটিল, আরও দুর্ভেদ্যই হইয়া উঠিবে...

এর পর ভয় আর উল্লাসের মাঝখানে ধীরে ধীরে আর একটা অনুভূতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল এবং হয় তো মহুয়ালির রাত্রির কুহকে সেইটাই আমার মনকে অধিকার করিয়া ফেলিতে লাগিল। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটা আবার সেই প্রথম দিনের উদাস সুরে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। দিনের পৃথিবী, কর্ম্মের পৃথিবী আমার কাছে হইয়া উঠিতে লাগিল নিতান্তই অসত্য। এর জন্য এত কেন ? ...হয় তো সত্যই কোনও জীবন্মুক্ত পুরুষ কোন নিগূঢ় সত্যের সন্ধানে করিয়াছেনই আত্মনিয়োগ, আমি বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াই কেন ? হয় তো মহুয়ালির বাতাস তাঁহার প্রভাবেই এই রকম উদাস, এই রকম জীবন-বিমুখ। আমি এঁর পুণ্যে যদি নাই পারি অভিসিঞ্চিত হইতে, তো আমার সঙ্কীর্ণ স্বার্থের মোহে সেই মহাপুরুষের তপোবিঘ্ন উৎপাদন করিয়া একে কলুষিতই বা করিতে যাই কেন ?

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া অনেক ভাবিলাম। এক সময় মহাপাত্রকে ডাকিয়া লইলাম এবং বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই প্রশ্ন করিয়া সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু জানিয়া লইলাম। সেও যে খুব বেশী জানে না, এইটেই আমার শ্রদ্ধা এবং প্রত্যয় দিল বাড়াইয়া। কিন্তু লোকে যখন তাঁহাকে দেখিয়াছে তখন দেখিবার কৌতূহলটা চাপিতে পারিলাম না। ঠিক হইল দলবল না লইয়া গিয়া শুধু আমি আর মহাপাত্র এই দুই জনে যাইব। সে বার দুই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছে, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারেরও ব্যবস্থা করিবে।

মহুয়ালির রাত্রির সঙ্গে দিবসের কোন মিল থাকে না। সকালে উঠিয়া আবার ঠিক করিয়া লইলাম সদলবলেই যাইতে হইবে। রাত্রির নির্দ্দেশ খানিকটা মানিয়া লইয়া মাঝামাঝি একটা এই ঠিক করিলাম যে দলটাকে কাছাকাছি ভালভাবে লুকাইয়া রাখিয়া একাই, অথবা নিতান্ত মনস্থির করিয়া উঠিতে না পারি তো মহাপাত্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়া প্রথম সাক্ষাৎ-কারটা সারিব। অর্থাৎ সন্ন্যাসী যেরূপেই দেখা দিতে চান প্রস্তুত থাকিব—মহর্ষি বাল্মীকি রূপেই হোক বা দস্যু রত্নাকর রূপেই হোক। রাতের সঙ্গে দিনের একটা রফা করিলাম।

৪

অদ্ভুত ব্যাপার !

একাই গিয়াছিলাম। জায়গাটা সত্যই অপূর্ব্ব। দুই দিকে গগনচুম্বী পাহাড়, তাহার মাঝখানে নদীটা সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়া খানিকটা অবসরের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারই একধারে পাহাড়ের কোলে বেশ বড়গোছের একটা চাতাল। একেবারে নিষ্পাদপ নয়, খানিকটা ঝোপঝাপ আছে, এবং তাহার মাঝখানে পাথরের উপর পাথর সাজাইয়া খানতিনেক ঘর লইয়া বেশ একটি বাড়ীর মত। নিতান্ত হেলা-ফেলা ভাবে সাজানো নয়, মশলা দিয়া বেশ ভাল করিয়া গাঁথা।

আশ্রমের রূপ দেখিয়াই আমার রাত্রির কুহক অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল, যেটুকু বা হয়তো অবশিষ্ট ছিল, পরের মুহূর্ত্তে একেবারে গেল ঘুচিয়া। একটি দীর্ঘ সবল পুরুষ, আমার দিকে পিছন ফিরিয়া, উঠানের মাঝখানে একটা বেলগাছের গুঁড়ি ধরিয়া প্রবল বেগে ওঠ-বোস করিতেছে, বেশমতে ঘর্ম্মাক্ত

শরীর বাহিয়া ঘাম ঝরিতেছে, পালোয়ানী ঢঙের একটা হিস্ হিস্ শব্দ হইতেছে নিঃশ্বাসের। এদিকে পালোয়ানের মতই একটা আঙিয়া পরা।

লুকাইবার প্রয়োজন নাই, বিস্ময়ের সঙ্গে শঙ্কিতও হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তখন মরিয়া হইয়া গিয়াছি, এদিকে হাতে রাইফেলটাও আছে ; গলা খাঁকারি দিলাম।

লোকটা ঘুরিয়া একেবারে প্রস্তরবৎ নিস্পন্দ হইয়া গেল ; দারুণ ভয় এবং বিস্ময়ে চোখ দুইটা যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। বুঝিলাম, পাপীর মন ; নিজের সাহস কতকটা ফিরিয়া আসিল। তবুও সন্দীদের জড়ো হইবার জন্য হুইসিলটা বাজাইয়া দিলাম, তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলাম—"আমি হচ্ছি এই জঙ্গলের ওভারসিয়ার। আপনি এখানে করেন কি ?"

বাঙালী নয়, তবে কি জাত ঠিক বোঝা যায় না। বয়স মনে হইল পঞ্চাশ-ছাপ্পান্ন, এইরকম। মাথাটা মুণ্ডিত। এমন লাস, তবু ভয়ে যেন কিম্ভূতকিমাকার হইয়া গিয়াছে। উত্তর না দিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল।

তখন আর আমার ভয় নাই। লোকগুলিও আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়াছে। বলিলাম—"উত্তরটা দিন। শুনছি এখানে নাকি কোন এক মহাপুরুষ তপস্যা করেন ? তাঁকে দেখতে চাই আমি।"

লোকটা আগাইয়া আসিল এতক্ষণে, কাঁচুমাচু করিয়া বলিল—"সো তপস্যা আমিই কোরে উরসিয়ার বাবু। মহা-পুরুষ কি হোবে ? মামুলি আদমি আছি—পাপের শোরীর..."

চোখটা একবার সমস্ত শরীরটার উপর বুলাইয়া লইলাম, বলিলাম—"ও ! আপনিই করেন তপস্যা ? তা বেশ, যেমন আছেন দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন, তপস্যার ফলপ্রাপ্তির সময় হয়েছে।"

এমন একটা দীন, করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল যে সে-দৃষ্টিতে একটা দুর্বৃত্তের এতটুকু হিংস্রতা বা এতটুকু লোলুপতা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বলিল—"কি বলছেন, উরসিয়ার বাবু, আমি একটুও সোমঝাতে পারছি না। আমি সোন্ন্যাসী মানুষ, ফল তো আমায় ভগবান দিবেন, যখন তাঁর মর্জ্জি হবে।"

বলিলাম—"তা হলে ভেঙেই বলি আপনাকে, যদিও না বললে চলত। মহুয়ালির জঙ্গলে আপনারা সবাই মিলে যে চোরাকারবারটা চালাচ্ছেন, সেটা বন্ধ করবার জন্যে দরবার আমায় মোতায়েন্ করেছেন এখানে। দলবল নিয়ে আমার সঙ্গে আপনাকে রাজধানীতে যেতে হবে।"

লোকটি একেবারে শিহরিয়া উঠিল ; কিছু বোধ হয় ভয় ছিল, কিন্তু তাহার চেয়ে ঢের বেশী ঘৃণায়, একবার দুইটা হাত দিয়া কান দুইটা স্পর্শ করিয়া বলিল—"আরে ছিঃ ছিঃ উরসিয়ার বাবু, আপনি একি কোথা বলছেন ! আমার সোহোরে সোহোরে অত বড় ব্যেবসা, আমি জঙ্গলে এসে লেকড়ি-লাহ্ চোরি করব !...আমার গৃহস্থ্ আশ্রমের নাম মংনিরাম, কানপুরে আমার অতবড় গল্লার ব্যেবসা—মংনিরাম গৌরীশঙ্কর নামে, কোলকাতায় আমার মংনিরাম গিরুমল নাম দিয়ে অত বড় কারখানা, উ'দিকে পাকিস্থানে..."

বিস্ময়ের সীমা হারাইয়া ফেলিতেছি, যা-বলিতেছে, এবং যেভাবে, সেটা যদি অভিনয়ই হয় তো লোকটার অভিনয়ে বাহাদুরি আছে, বলিলাম—"বেশ, এখানে তা হলে করছেন কি ?" তপস্যার জন্যে তো ডন-বৈঠক করার কথাও নয়, আর এ পাকা এমারৎও তপস্যার জায়গা নয়।"

মংনিরাম অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, যেন একটা কথা বলিবেন কি বলিবেন না, মনস্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তাহার পর বোধ হয় না বলিয়া উপায় নাই দেখিয়াই সেইরকম কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন—"না উরসিয়ার বাবু, আমার তপস্যার অলুহেদা একটা মঞ্চ্ আছে, জঙ্গলের একটু ভিতরে, এখান থেকে চার রশি দূরে...আওর..."

বলিলাম—"হ্যাঁ, বলুন।"

"আওর, আমি যে তপস্যা করি তাতে ডণ্ড্-বৈঠ্কির একটু জরুরৎ আছে উরসিয়ার বাবু...শরীরে একটু তাকৎ দরকার।"

—অদ্ভুতভাবে একটু হাসিলেন। সব গিয়া কৌতূহলটাই তীব্র হইয়া উঠিতেছে, প্রশ্ন করিলাম—"কি রকম ? তপস্যায় ডন-বৈঠকের কথা তো এপর্য্যন্ত কৈ..."

মংনিরামের সহজ ভাবটা ফিরিয়া আসিয়াছে, বলিলেন—"আসুন উরসিয়ারবাবু, আপনি আমার অভ্যাগৎ, একটু ঠণ্ডা হয়ে নিন, তারপর আপনাকে সোব বলছি, মঞ্চ্ভি দেখলাচ্ছি।...অরে ভিখুয়া, সরবৎ হাজির কর্—দো গিলাস।"

হু'জন বেশ তাগড়া গোছের লোক একটা ঘরে এতক্ষণ আত্মগোপন করিয়াছিল, বাহির হইয়া আসিল।

যা' আসিল একেবারে পালোয়ানী—পেস্তাবাদাম, শশাবীচি দেওয়া, ভিখুয়ার হাতে দুইটা বড় বড় গিলির গেলাস। আমি লইলাম না, মংনিরাম নিজেরটা গেলাসে গুলিয়া চোঁ চোঁ করিয়া পান করিয়া লইলেন। আমারটাও শেষ হইলে বলিলেন—"চলুন এবার মঞ্চ্টা দেখিয়ে আনি।"

মহুয়ালি এতদিন প্রাকৃতিক কুহকে যেমন ভাবে ভুলাইয়া-ছিল, তাহার মানুষ দিয়াও ঠিক সেই ভাবেই যেন মোহাবিষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। রশি চারেক দূরে ঘন অরণ্যের মধ্যে একটা উপরে আচ্ছাদন দেওয়া শ্বেত পাথরের বাঁধান চমৎকার বেদী। চারিদিকে মোটা লোহার ছড় দিয়া ঘেরা, মনে হইল যাহাতে তপস্যার সময় কোন জানোয়ার না আসিতে পারে।

একটা দরজা আছে, মোটা চেনের সঙ্গে একটা তালা ঝুলিতেছে।

বিস্ময়ে এবার আমারই বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে।

মংনিরাম আমার মুখের পানে চাহিয়া এবার একটু বড় করিয়া হাসিলেন; প্রশ্ন করিলেন—"দেখলেন আমার তপস্যার ঘর্?"

বিহ্বলভাবে বলিলাম—"তা তো দেখছি, কিন্তু কি তপস্যা করেন আপনি এর মধ্যে, ইন্দ্রলোকের জন্যে, কি চন্দ্রলোকের জন্যে, কি বিষ্ণুলোকের…"

মংনিরাম হাত দুইটা তুলিয়া বলিলেন—"কুছ্ নেহি, কুছ্ নেহি উরসিয়ার বাবু, আমি আপনাকে সোব বলছি, লেকিন আর কোই জান্‌বে না, অচ্ছা?"…বেশ, আসুন ঘরের ভিতর।"

ভিতরে গিয়া দুই জনে বসিলাম। মংনিরাম পদ্মাসন হইয়া বসিয়া, বাঁ হাত দিয়া আমার পিঠটা একবার স্পর্শ করিয়া চাপা গলায় আরম্ভ করিলেন—

"আসল বাৎ, বিলকুল ভিতরের বাৎ—যাকে ফিরিঙ্গীরা টিরেড সিক্‌রেট বোলে—এ আমার তপস্যা নয় উরসিয়ার বাবু, আমরা কারবারী জাত, এ আমার এক কারবারকা ফন্দি—আমি রামায়ণী ব্যেবসা করব উরসিয়ার বাবু…"

"রামায়ণী ব্যবসা!"

কিছুই ধারণা করিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। রামচন্দ্র তো ধান-চাল, কাপড়, সোনা-রূপা সুদ্ধ সারা লঙ্কাটা বিভীষণের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। আন্দাজের মধ্যে শুধু মনে পড়িল হনুমান আম খাইয়া আঁটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন—সেই সূত্রে আমের ব্যবসায়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই তো! কিন্তু তাহার সুযোগই বা কোথায়, এটা কোন্ সময়ই বা?

মংনিরাম বলিয়া চলিলেন—"দেখিয়ে উরসিয়ার বাবু, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে যোখোনই কোনও মনুষ্য কোনও তপস্যা করতে যাবে—ইন্দ্রের গদির জন্যে, কি চন্দ্রের গদির জন্যে, দেবতারা একটা না একটা বাধা পৌঁছাবে। রামায়ণ কা বাৎ খেয়াল করুন—বিশ্বামিত্র বেচারি, না খেয়ে, না ঘুমিয়ে তপস্যা করতে লাগল তো উদিকে ইন্দ্র মহারাজের আর চৈন্ রইল না, মেনকাকে বললেন…"

কহিলাম—"ও, আপনি মহাভারতের কথা বলছেন…"

"হাঁ তাই হোবে, আমাদের গদির একবারে মহারাজজি পাঠ করে—রামায়ণ চাহে মহাভারত, ও একই কথা।… ইন্দ্র মহারাজ মেনকাকে বললেন—যা বেটি ওর তপস্যা নষ্ট্ করে দিয়ে আয়।…এই রকম আরও কোতো তপস্বীর তপস্যা নষ্ট্ হোলো। এবার আমি এক মতলব বের করেছি…"

কহিলাম—"কি বলুন।"

"আমি দিন রাতের বিচমে সিরফ্ চার ঘণ্টা আরাম করি বাবু, বাকি সব ঘরে বসে তপস্যা আর তপস্যা। বেশ, চার ঘণ্টা বাদ গেল তো চার ছক্কা চৌবিশ, ছ' দিনে এক দিন বাদ গেল, বছরে হারাহারি দু'মাস। তা হলে উ সব মুনি ঋষিদের যেখানে বারো বছর লাগত, সেখানে আমার চৌদহ্ বছরে ফল হাঁসিল হবে। এইবার শুনুন, উরসিয়ার-বাবু, আমি বসে বসে তপস্যা করছে—ফল হাঁসিল হবে, ফল হাঁসিল হবে—এমন সময় ইন্দ্র মহারাজ মেনকা কি উর্ব্বশী, কি রম্ভা যাকে হোক হুকম করবে—"যা বেটি অমুক জঙ্গলে অমুক জায়গায় মংনিরাম তপস্যা করছে, আমার ইন্দ্রত্ব নিবে, তুই যা নষ্ট্ করে দিয়ে আয়…"

একটু হাসির সহিত বড় বড় চোখ করিয়া আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। আমি বিমূঢ় ভাবে নিরুত্তরই রহিলাম।

—"বেশ তো?…অচ্ছা, আব শুনিয়ে। আমি কিছু জানি না, চোখ বুজে আছি, এমন সময়, ঘুরতে ফিরতে, নাচতে, গান করতে, ভাব বাৎলাতে বাৎলাতে আমার ঘরের কাছে মেনকা কি উর্ব্বশী, কি রম্ভা, এসে পড়ল, তার পর আরও কাছে, তার পর বিলকুল ভিতরে। তার পর ধেয়ান ভাঙছে না দেখে সেই একেবারে কাছে এসে অস্পর্শ্ করতে যাবে কি এই এমনি করে শালীকে পাকড়ে…"

দেখাইবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া আমার দিকে ঝুঁকিতেই সভয়ে একটু সরিয়া গেলাম, মংনিরাম হাত দুইটা গুটাইয়া লইয়া সোজা বসিলেন, বলিলেন—"না না, ডরে না…কি হবে আমার শকুন্তলার মতন এক লেড়কি নিয়ে?… পরলোকমে কাম দিবে?…হিসাব কা বাৎ, আপনি শুনুন—স্বর্গ থেকে রম্ভা, কি উর্ব্বশী, কি মেনকা আসছে, তাও কি কাম?—না, ধেয়ান ভাঙতে হবে তপস্বীর—কিৎনা জেবর—জেবরাৎ—হীরা, মোতী, পান্না, চুন্নি, পোখরাজ; তাও কি এখানকার জিনিস উরসিয়ার বাবু?—খাস স্বর্গ্‌কা মাল, এক এক টুকরার দাম এক এক কড়োর, শাড়িটাই বা পরে থাকবে তার হিসাব দুনিয়ায় কে দিতে পারে?…ইরকম করে বাঁ হাতে ঝাপটে ধরে শাড়ি, চুড়ি, কঙ্গন্, তাগা, হাঁসুলি, হার, কণ্ঠি, কমরকা পেটি, পায়ের মোল, নাকের বেশর, কানের কুণ্ডল, মাথার মুকুট—সোব এক এক করে খুলে নিয়ে বলব—"যা শালী, তোর ইন্দ্র মহারাজকে বোল্ গিয়ে মংনিরামের ধেয়ান ভেঙে দিয়ে এসেছি!…এতো চুরি ইয়া ডকেতি বলতে পারবে না, উরসিয়ার বাবু—কে ডেকেছিল উকে গরীবের ধেয়ানটি ভাংতে?"

আমার মুখের ভাবটা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার জন্য দেহের ঊর্দ্ধ ভাগটা একটু পিছনে সরাইয়া লইয়া একমুখ হাসি লইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। নিজের বুদ্ধির সাফল্যে নিজেই বিস্মিত হইয়া গেছেন। আমার চেহারাটা নিশ্চয়

তখন ধর্মাতীত, সংশিয়ায় তাহার মধ্যে অত একটা কিছু সন্দেহ করিয়া একটু জোরেই হাসিয়া উঠিয়া আমার হাতে একটা মৃদু আঘাত করিয়া বলিলেন—"আর না, না, ঈশ্বরশিয়ার বাবু, সে রকম কিছু মতলব নেই—শাড়ি শিখিয়েই পাঠিয়ে দিব বেটিকে ...আরে বিচুয়া, পরীরাণীকে শাড়ি তো হাজির কর।"

দুটি অনুচরের মধ্যে একজন একটা শাড়ি লইয়া উপস্থিত হইল। হলুদের সোনার বোনানো একটি লালপাড়ের অতি সাধারণ সাঁওতালী শাড়ি। তাব হাতে তুলিয়া ধরিয়া মহারাজ হো-হো করিয়া দুলিয়া দুলিয়া হাসিতে লাগিলেন—ব্যবসায়-বুদ্ধির সঙ্গে নিজের রসিকতার কথাও ভাবিয়া নিশ্চয়—কোটি কোটি টাকার বসন-ভূষণ দণ্ড দিয়া পরীরাণীকে তো এই পরিয়া হেঁট মুখে ইন্দ্রমহারাজের সামনে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

শিল্পময় শ্যাম

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম-এ

শিল্পের দিক দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় শ্যামদেশ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তার ললিত-কলা সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত হৃদয়ের গোপন তন্ত্রীতে এমন এক অপূর্ব্ব অনুভূতি জাগায় যা সহজে বিস্মৃত হওয়া যায় না। সে যেন নির্ঝরের মত সদা আত্মপ্রকাশ করে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে সঙ্গীতে ও নৃত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে, স্থাপত্যে ও কারু-শিল্পে।

শ্যামদেশের চারুকলার মূলে রয়েছে বৌদ্ধধর্ম্ম। এই বিষয়ে চীনের সঙ্গে তার তুলনা চলে। সেখানেও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে সদাপ্রবহমাণ স্রোতস্বিনীর মত এক বিচিত্র প্রেরণা জুগিয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে দুঃখবাদ নিহিত বলে তার শিল্পে এর স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। এইখানেই শ্যামদেশীয় শিল্পের গৌরব। সে ভারতীয় শিল্পের মাধুর্য্যময় পথ অনুসরণ করে এই বিষাদকেই বড় করে দেখিয়েছে। সেখানে চীনা অথবা তিব্বতীয় চারুকলার পার্থিব ভাব খুব কমই আছে। তার বদলে আছে কেবল কারুণ্যপূর্ণ এক নীরব আত্মপ্রকাশ। সত্যিই এর তুলনা নেই।

সিংহলের পালি ধর্ম্মগ্রন্থ "মহাবংশ" থেকে জানা যায় যে, মৌর্য্য সম্রাট্ অশোক খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে "সুবর্ণভূমি"তে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকল্পে দুই জন প্রচারক পাঠান। এঁদের এক জনের নাম সোন এবং আর এক জনের নাম উত্তর। এই "সুবর্ণভূমি"র প্রকৃত ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে মতভেদ আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, এই দেশটি দক্ষিণ-ব্রহ্মের কোন স্থানে ছিল। অপর পক্ষে, এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই দেশ শ্যামের অন্তর্ভুক্ত হওয়াও বিচিত্র ছিল না। শ্যামদেশের বর্ত্তমান অধিবাসী "থাই"দের মধ্যে এক কিংবদন্তী আছে যে, অশোকের দ্বারা প্রেরিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মপ্রচারকেরা দক্ষিণ-শ্যামে সমুদ্রকূলে অবস্থিত প্রাচীন নাখন প্যাথোমে প্রথম জাহাজ থেকে অবতরণ করেন। নাখন প্যাথোম সংস্কৃত "নগর প্রথমে"রই ভুল উচ্চারণ।

এখন এই সুবর্ণ-ভূমির প্রকৃত অবস্থিতি যেখানেই হোক না কেন, মৌর্য্যযুগের (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩২৪-১৮৭) ভারতীয় ভিক্ষুরাই যে প্রথম শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন এটা অনুমান করা যেতে পারে। এই সময় থেকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম শ্যামদেশের সর্ব্ববিধ শিল্পে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে আসছে।

শ্যামদেশের শিল্পকে মোটামুটি ভাবে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, যথা, "মন-খেমির" (Mon-Khmer) যুগের এবং "থাই" যুগের শিল্প। প্রশান্ত মহাসাগরীয় "অষ্ট্রিক" গোষ্ঠী-ভুক্ত "মন্" ও "খেমির"রা শ্যামদেশে রাজত্ব করত খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-চীনে এমন এক বিরাট রাষ্ট্র-বিপ্লব হয়, যার ফলে শান্-মালভূমি এবং মেনাম-উপত্যকার ইতিহাস একেবারে ওলটপালট হয়ে যায়। চীন-দেশের "বর্গীয় সাম্রাজ্যের" অধিপতি কুব্লাই খান দক্ষিণ-চীনের ইয়াংসি নদীর উপত্যকা থেকে "থাই" জাতিকে তাঁর "মোঙ্গল" সেনাদের দ্বারা নির্দ্দয়ভাবে উৎসাদিত করেন। ফলে বিতাড়িত "থাই"রা পূর্ব্ব-ভারত (আসাম ও মণিপুর), ব্রহ্মদেশ এবং শ্যামদেশে প্রবেশ করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শ্যামদেশের শেষ খেমির সম্রাট্ অরুণাবতী রুদ্রাং "থাই"দের দ্বারা পরাজিত হন এবং এই সময় থেকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিজয়ী "থাই"-রাই শ্যামদেশে রাজত্ব করে আসছে।

"মন্" ও "খেমির" শিল্পের মূলে রয়েছে গাম্ভীর্য্য। তাদের নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি যেন দুঃখ ও মহিমার গৌরবময় প্রকাশ। এতে যেন বুদ্ধের চরমতম বাণীর আভাস আছে :

"সব্বে সংখারা দুঃখা,
সব্বে সংখারা অনিচ্চা,
সব্বে সংখারা অনত্তা।"

অর্থাৎ

"সমস্ত সংস্কারই দুঃখময়,
সমস্ত সংস্কারই অনিত্য,
(এবং) সমস্ত সংস্কারই আত্মহীন।"

কালীবাড়ীর সম্মুখস্থ পথের ধারের ঘরকন্না

সিমলার পথে কাশ্মীরী শ্রমিক।
কাজ চাই, কিন্তু কাজ নেই—অনাহারে শীর্ণ করুণ মূর্ত্তি
[শ্রীপবিত্র গোস্বামীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ব্যাঙ্কের "ওয়াট ক্রা কেও" মন্দিরের একটি শিখর

একটি আধুনিক থাই মন্দির (ওয়াট্ ক্রা কেও)

এই বৈরাগ্যের ছাপ "খেমির" বুদ্ধমূর্তিগুলির আননে অপরূপ ভাবে ফুটে উঠেছে।
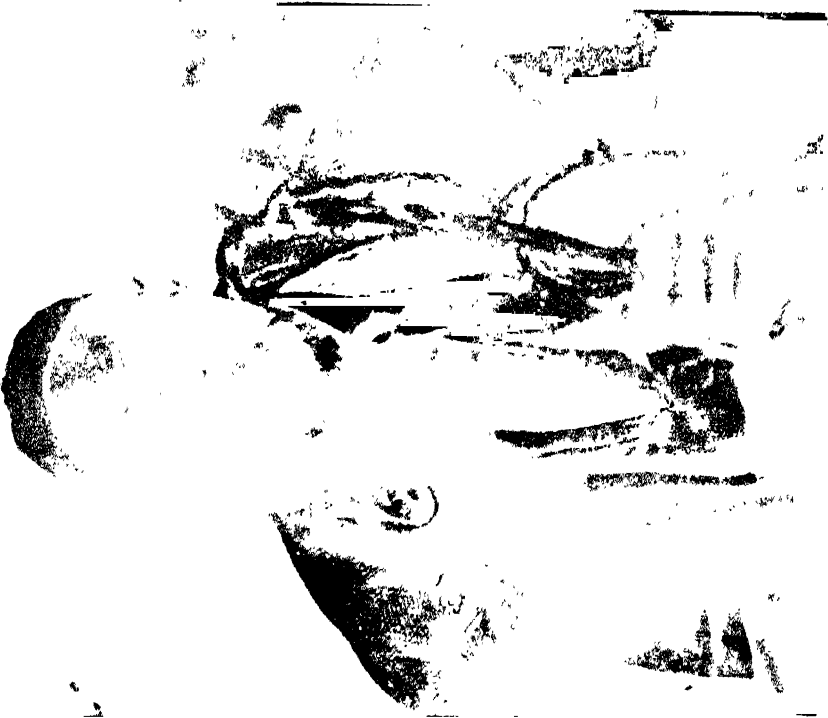
বৌদ্ধধর্মের পরেই শ্যামদেশের শিল্পে রয়েছে হিন্দুধর্মের প্রভাব। প্রাগৈতিহাসিক প্রশান্ত মহাসাগরীয় জাতিদের রহস্যময় ধর্ম-বিশ্বাসও একে কম প্রভাবান্বিত করে নি। এক কথায় বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম এবং প্রাগৈতিহাসিক ধর্ম-বিশ্বাসের মিশ্রণেই শ্যাম দেশের শিল্পের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ। চীনের প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ইন্দোচীনে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের পূর্ব্বে সেখানে নাগ-পূজার বিশেষ প্রচলন ছিল। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে হিন্দু ঋষি কৌণ্ডিন্য ইন্দোচীনে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন সোমা নাম্নী এক নাগরাজ-কন্যার পাণিগ্রহণ ক'রে।১ এই সময় এবং পরবর্ত্তী কালেও ইন্দোচীন, কম্বোজ এবং শ্যামে নাগপূজার প্রাধান্যের কথা জানতে পারি। এই নাগেরা সম্ভবতঃ "অষ্ট্রিক" গোষ্ঠিভুক্ত ছিল। এই সব কারণে বোধ হয় বৃহত্তর শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পরেও নাগপূজার প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকে। সেখানকার অধিবাসীরা ভাস্কর্য্যে ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে নাগকে যুক্ত করে। এইখানে বুদ্ধের বাহনরূপে নাগরাজকে কোদিত করা হয়। সুতরাং "মন্" ও "খেমির" জাতিদের দ্বারা সৃষ্ট অধিকাংশ বুদ্ধ মূর্ত্তির সঙ্গে ইন্দোচীনের প্রাগৈতিহাসিক সর্পপূজার সাদৃশ্য দেখতে পাই। প্রাচীন শ্যামদেশের ভাস্কর্য্যে গৌতম বুদ্ধের এই মানবরূপ (Anthropomorphic form) এবং জীবরূপের (Theriomorphic form) সমাবেশ সত্যই অপূর্ব্ব। প্রত্নতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে এর মূল্য অপরিমেয়।

"থাই"রা পূর্ব্ববর্ত্তী "খেমির" জাতির কাছ থেকে তাদের শিল্প গ্রহণ করে। তাদের দ্বারা নির্ম্মিত যে বৌদ্ধ শিল্প চিয়েং সেন, সুখোদয়, বর্গলোক এবং আযুধিয়ায় গড়ে ওঠে, তার মূল প্রেরণা আসে "খেমির" অথবা "খোম" শিল্প থেকে। ডাঃ কোদেস্ (C'oedes) "থাই"দের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন,—

" . . . inheriting as it did the succession of the Khmer Kingdom, which sank in part beneath the blows that it administered, it transmitted to the Siam of Ayudhya a good number of Cambodian art-forms and institutions which still subsist in the Siam of to-day." ২

উপরোক্ত নানা কারণে "থাই" শিল্পেও নাগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া, অষ্ট্রিক সভ্যতার প্রথম দিকের আরও নানা চিহ্ন থাইদের চারুকলার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তাদের বর্ত্তমান রাজধানী ব্যাংককের অনতিদূরে "মন"

বিষ্ণুলোক হইতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি
[কলিকাতা আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত

জাতির অধ্যুষিত পাক্লাটে একটি প্রাচীন ও ভগ্ন বৌদ্ধ বিহারে বর্ত্তমান বুদ্ধমূর্ত্তির পাদদেশে কুমীরের (থাই ভাষায় "চোরখে") মূর্ত্তি আছে। এই কুমীরের পূজা হয়ত শ্যামদেশে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে প্রচলিত।

শ্যামদেশে বহুকাল আগে থেকে "ফী" (Phi) নামে এক দেবতার পূজা চলে আসছে। এই দেবতার পূজা বহু বাড়ীর সামনে খেলা-ঘরের মত ছোট কাঠের দেবস্থান গড়া হয়ে থাকে। এখানকার মাটির পুতুলগুলির প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। কে বলতে পারে, হাজার হাজার বছর আগে প্রশান্ত মহাসাগরের পরস্পরবিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলিতে যে এক বিরাট সভ্যতা বিরাজ করত, হয়ত এই "ফী" পূজার মাটির অসংখ্য পুতুলগুলি তারই নিদর্শন। এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, এই পুতুলগুলি বাংলার "ষষ্ঠী" পূজা উপলক্ষে তৈরি মাটির পুতুলগুলির কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

শ্যামদেশের চারুকলায় হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবও বড় কম নয়।

১। R. C. Mazumdar—"*Campa*", Introduction, দ্রষ্টব্য।

২।" Origins of the Sukhodaya dynasty," *Journal of the Siam Society*, Vol. XIV.

আয়ুথিয়ার বিখ্যাত বুদ্ধমূর্ত্তি
"ফ্রা মোন্‌খলপোবিত" (মঙ্গলপবিত্র)

আনুমানিক, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে ইন্দোচীন ও শ্যামে কৌণ্ডিন্য ঋষির ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রচারের পর থেকে এই সব দেশের শিল্প হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে আসছে। খেমির রাজধানী লোপবুরি (লবপুরি), ফিমাই১ ও বজ্রপুরি ও জয়শ্রী এবং থাই রাজধানী সুখোদয় এবং আয়ুথিয়াতে মহাদেব, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, অর্দ্ধনারীশ্বর ইত্যাদি হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর অনেকগুলি মূর্ত্তি এখন ব্যাংককের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম্মের সংমিশ্রণের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বোধ হয়, বুদ্ধ অবলোকিতেশ্বরের কল্পনা। এই দেবতা অনন্ত করুণাময় এবং সর্ব্বজীব—পাপী পুণ্যবান-নির্ব্বিশেষে—তাঁর করুণার অধিকারী। এক কথায় অবলোকিতেশ্বরের কল্পনায় এমন এক অনন্ত গরিমা আছে যা আর কোনও দেবদেবীর মধ্যে কমই দেখা যায়। শ্যাম, চীন এবং জাপানে তাঁর পূজা অত্যধিক প্রচলিত। চীনদেশে তিনি "ক্যোয়ানিন্‌" এবং জাপানে তিনি "ক্যোয়ানন্‌" নামে পরিচিত।২ শ্যামের পার্শ্ববর্তী কম্বোজে অবস্থিত বেয়নের একটি সুপ্রাচীন মন্দির-শিখরের চতুষ্পার্শ্বে বুদ্ধ অবলোকিতেশ্বরের যে বিরাট মুখাবয়ব নির্ম্মিত আছে তা অপূর্ব্ব। বেয়নের এই বিখ্যাত অবলোকিতেশ্বরকে দেখলে মনে হয় যে তিনি যেন দূর প্রাচ্যের শ্যামল বনানী থেকে সর্ব্বজগতের সর্ব্বজীবকে অকৃপণ করুণা বিতরণ করছেন।

প্রাচীন শ্যামের স্থাপত্যেও হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। প্রাচীন "মন্‌ খেমির" এবং মধ্যযুগীয় "থাই"দের দ্বারা নির্ম্মিত অনেক বৌদ্ধ-বিহারের চূড়ায় ত্রিশূল গ্রথিত আছে। এ ছাড়া এই সব মন্দিরে শৈব ধর্ম্মের চিহ্নস্বরূপ বৃষমূর্ত্তি স্থাপিত দেখা যায়। প্রাচীন "মন্‌ খেমির" মন্দিরগুলি ভারতীয় হিন্দু স্থাপত্যের অনুকরণে নির্ম্মিত হ'ত। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে "থাই"দের আগমনের সঙ্গে এই হিন্দু স্থাপত্য-রীতির পরিবর্ত্তন ঘটে এবং মন্দিরের শিখরগুলি ("ক্রো চেদি" অথবা "প্রাং") সরু এবং লম্বা হতে থাকে। আধুনিক যুগে চীনা স্থাপত্যের প্রভাবে অনেক "থাই" মন্দির মঠের ছাদ ঢালু এবং বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত।

"থাই" যুগে "খেমির" ভাস্কর্য্যেরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। "খেমির"দের দ্বারা নির্ম্মিত বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলিতে ক্রমে এই যুগে এক অপূর্ব্ব সূক্ষ্মতার প্রবর্ত্তন হয়। এই সূক্ষ্মতাই "থাই" ভাস্কর্য্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে। পূর্ব্বতন খেমির ভাস্কর্য্যের পুরু ওষ্ঠ ও নাসিকা এবং নিমীলিত নয়ন আর প্রশস্ত ললাট থাইযুগে এক অপূর্ব্ব তীক্ষ্ণতা এবং সাবলীলতা লাভ করে। এই সময়ে উত্তর-শ্যামে চিয়েং সেন, সুখোদয় এবং বিষ্ণুলোকে নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তিগুলির মুখশ্রী পাতলা ঠোঁট, সরু নাসিকা এবং ভাবপূর্ণ নয়নের সামঞ্জস্যে এক অতি বিচিত্র রূপ ধারণ করে। এ ছাড়া, থাই বুদ্ধের দেহসৌষ্ঠবও অপূর্ব্ব। জনৈক শিল্প-বিশেষজ্ঞের মতে এই মূর্ত্তির আঙ্গিক রেখা যেন অনেকটা প্রজ্বলিত অগ্নি-শিখার কম্পিত ভঙ্গিমার মত।৩ ডাঃ কুমারস্বামী থাই ও খেমির ভাস্কর্য্যের তুলনা করে বলেছেন,—

"The Thai type evolved in the North is characterised by the curved elevated eye-brows, doubly curved upward sloping eye-lids (almond-eyes), acquiline and even hooked nose, and delicate sharply moulded lips and a general nervous refinement contrasting strongly

১। মূল নাম "জীবপুর।"

Cf. B. R. Chatterji—"*Indian Cultural Influence in Cambodia*", pp. 51, 224.

২। Binyon—"*The Paintings of the Far East.*" K. D. Nag—"*Indian and the Pacific World.*"

৩। Prof. Silpa Bhirasri—"Sculpture and Painting in Siam." *Mirror, Vol. 1, No. 9.*

with the straight brows and level eyes, large mouth and impassable serenity of the classic Khmer fonmula." *

এখন, প্রশ্ন এই যে, থাইরা দক্ষিণ-চীন থেকে এলেও তাদের প্রথম ভাস্কর্যে "মোঙ্গোল" প্রভাব কিছুমাত্রও প্রতিভাত হয় নি কেন? এর উত্তর দিতে হলে আমাদের প্রথমে জানা দরকার "থাই"দের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল। এ বিষয় আগেই বলা হয়েছে যে, দক্ষিণ-চীনে তারা প্রথমে বসবাস করত। তাদের আদি বাসভূমি "নান্ চাও" ও তার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এই সব অঞ্চলে সম্ভবতঃ বহু প্রাচীনকালেই বাংলার সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করে। বহু শতাব্দী যাবৎ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ধরে বাংলা ও দক্ষিণ-চীনের মধ্যে যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তার প্রমাণ আছে। নান্ চাওয়ের একটি প্রবাদ থেকে জানা যায় যে, মগধের সম্রাট্ প্রিয়দর্শী অশোকের তৃতীয় পুত্র নান্ চাওয়ের অধিবাসীদের আদিপুরুষ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রসিদুদ্দিন-লিখিত বিবরণ পাঠেও নান্ চাওয়ের উপর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের কথা জানতে পারি। এ ছাড়া, দক্ষিণ-চীনে থাইদের আদিবাসভূমির উপর বৃহত্তর বঙ্গের নানাবিধ ধর্ম্মগত এবং সংস্কৃতিগত প্রভাবের কথা ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে জানতে পারা যায়।[১] উপরোক্ত নানা কারণই থাই-শিল্পকলার স্বল্প মাধুর্য্যের উৎস। সম্ভবতঃ এইজন্যই উত্তর-শ্যামে অবস্থিত চিয়েং সেনের সর্ব্বপ্রাচীন "থাই" শিল্পকলায় পাল ও সেন যুগের বাংলার শিল্পের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ডাঃ লে মে'র (Dr. Le May) মতে এই শিল্পকলা বহুলাংশে পালযুগের শিল্পধারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। চিয়েং সেন এবং পরবর্ত্তী সুখোদয় যুগের অনেক বুদ্ধমূর্ত্তির ভঙ্গিমা আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেকটা পাল ও সেন যুগের বুদ্ধমূর্ত্তির মতই সুডৌল এবং লাবণ্যময়।

সুখোদয় যুগের পাষাণ এবং ব্রোঞ্জ প্রভৃতি মিশ্রধাতুর বুদ্ধমূর্ত্তিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল মাথার উপর প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা অথবা গোলাকৃতি কেশগুচ্ছের সমাবেশ। এই যুগের মূর্ত্তিগুলি সত্যই অপূর্ব্ব। তথাগতের দণ্ডায়মান মূর্ত্তিতে তার স্মিতহাস্য, তাঁর অগ্রগামী বাম পদ, বাম হস্তে অভয় মুদ্রা এবং শিরোপরি এক সুন্দর লেলিহান বহ্নিশিখা সবকিছুতে মিলে যেন এক অনির্ব্বচনীয় প্রেমের রূপ প্রতিষ্ঠা করেছে। বরাভয় যেন তাঁর অহিংসা এবং ব্যক্তিত্বের প্রকাশ আর অগ্নিশিখা তাঁর চরমতম প্রজ্ঞার বিকাশ যা দগ্ধ করে তৃষ্ণা ও মোহের ছলনা ও ইন্দ্রজালকে। এখানে

শ্যামদেশের রেভিনিউ ষ্ট্যাম্পের উপর অঙ্কিত বীণাবাদিনী সরস্বতী মূর্ত্তি
[শিল্পী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাল কর্ত্তৃক বৃহদাকারে অঙ্কিত

যেন বিষয়বিরাগী শাক্য-রাজপুত্র সকলকে সাহস দিয়ে বলছেন,

"ফেণূপমং কায়ম্ ইমং বিদিত্বা
মরীচিধম্মং অভিসম্বুধানো
ছেত্বান মারস্স পপুপ্ফকানি
অদস্সনং মচ্চুরাজস্স গচ্ছে।" ইত্যাদি।

অর্থাৎ,

"এ দেহকে ফেনসম জেনে
জেনে তার মরীচিকা-মতি
"মার" দুষ্ট পুষ্পশর নাশি
যাও চলি মৃত্যুরাজ দৃষ্টির বাহিরে।"[১] ইত্যাদি।

"উত্তিঠ্‌ঠে নপ্পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে,
ধম্মোচারি সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ।"

---

* *The History of the Indian and the Indonesian Art.*

১। R. C. Mazumdar—'*Campa*', introduction, pp. XIV—XV.

১। মৃত্যুরাজের দৃষ্টির বাহিরে যাওয়া, অর্থাৎ, "নির্ব্বাণ" (হিন্দুশাস্ত্রে "মোক্ষ") লাভ করা।
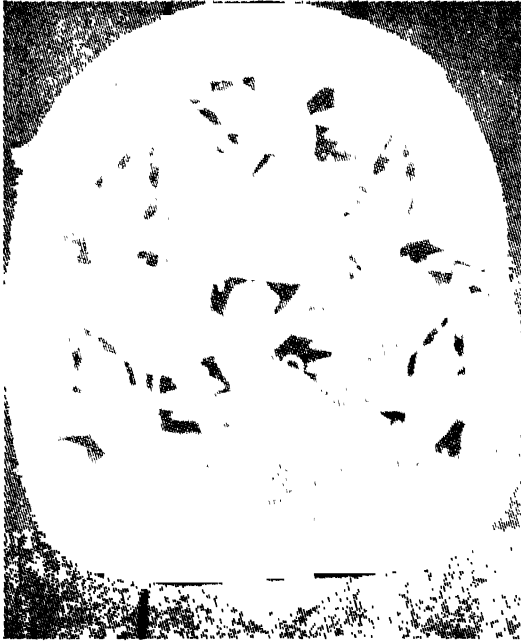
নৃত্যরত রাবণ ও তাঁহার যোদ্ধৃবৃন্দ—ছায়ানৃত্যে

অর্থাৎ,

"ওঠো, অলস হয়ে থেক না, ধর্মকার্য্য করে যাও; কারণ ধর্মচারী ইহলোক এবং পরলোকে সুখে থাকেন।"

সুখোদয় যুগ শেষ হলে আরম্ভ হ'ল আয়ুথীয় যুগ (খ্রীঃ ১৩৫০-১৭৬৭)। এই যুগে, বিশেষ করে ষোড়শ শতাব্দীতে শ্যামদেশ বারংবার ব্রহ্মদেশ দ্বারা আক্রান্ত হয়। ব্রহ্মদেশের পরাক্রান্ত নৃপতি বারিন্‌নাং (খ্রীঃ ১৫৫১-১৫৮১) এবং তৎপুত্র নন্দবারিন (খ্রীঃ ১৫৮১-১৫৯৯) মধ্য ও উত্তর-শ্যামে অবস্থিত লাফুন, বিষ্ণুলোক এবং লোপবুরি অধিকার করেন। ফলে থাই চারুকলায় ব্রহ্মদেশের শিল্পও ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এই সময় কোন কোন ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তির মাথায় মুকুট দেওয়ার রীতি হয়। এই মুকুট দেখতে হুবহু ব্রহ্মদেশীয় "প্যাগোডার" মত। এই মুকুটশোভিত ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি ("ভূমিস্পর্শ" ভঙ্গি) সত্যই ভাবমাধুর্য্যে অনিন্দ্যসুন্দর। এই রকম একটি ক্ষুদ্র পুরাতন মূর্ত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "আশুতোষ মিউজিয়ামে" রক্ষিত আছে। বর্ত্তমান লেখক এটি সংগ্রহ করেছিলেন উত্তর-শ্যামে অবস্থিত বিষ্ণুলোকের একটি প্রাচীন অর্দ্ধ-ভস্মীভূত মন্দির থেকে। এই মন্দিরটি ব্রহ্মদেশীয় অভিযাত্রী সৈন্যবাহিনীদ্বারা আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীতে বিধ্বস্ত হয়েছিল। বর্ত্তমান শ্যামের অধিকাংশ বুদ্ধমূর্ত্তিই সুখোদয়, বিষ্ণুলোক এবং আয়ুথীয়া যুগের মূর্ত্তিগুলির অনুকরণে গঠিত। আধুনিক ব্যাংককের (অথবা "ক্রুংথেপ"—দেবতাদের নগর) "ওয়াট্" অথবা মন্দিরগুলির মধ্যে প্রাচীন এবং মধ্যযুগের অনেক মূর্ত্তি সংরক্ষিত আছে। শ্যামের বর্ত্তমান "চক্রি" বংশের সম্রাট চুলালংকর্ণ বিষ্ণুলোকের বিখ্যাত প্রাচীন "বুদ্ধ জিনরাজ" মূর্ত্তির অনুকরণে ব্যাংককের ওয়াট বেঞ্চামা-পোবিতে (পঞ্চম-পবিত্র) একটি মূর্ত্তি তৈরি করিয়েছিলেন। এ ছাড়া ওয়াট প্রা কেওম (থাই উচ্চারণ "কেভুকোন" একটি অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু) অথবা ওয়াট ফো (Pho)-র শায়িত বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তিও প্রাচ্যের এক অপূর্ব্ব শিল্পনিদর্শন। এই মূর্ত্তিকে থাইরা "প্রা নন্" অথবা "বুদ্ধ ভগবান" আখ্যা দিয়েছে। "প্রা নন্" সম্রাট বজ্রিরুধের (Rama VI) তিরোধানের (১৯২৫ খ্রীঃ) পর বহুদিন শ্যামদেশে অবজ্ঞাত ছিল। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে মার্শাল পিবুল সোংগ্রাম (বিপুল সংগ্রাম) ব্যাংককের আরও অনেক মন্দিরের মত ওয়াট ফোরও জীর্ণসংস্কার সুরু করেন। এই সময় বর্ত্তমান লেখক এক দিন উক্ত শায়িত বুদ্ধমূর্ত্তি দেখতে যান তাঁর এক থাই বন্ধুর সঙ্গে।

শ্যামদেশের চিত্রকলাও অতুলনীয়। সম্ভবতঃ এর উৎপত্তি মধ্য যুগে এবং তা আয়ুথীয়া যুগের শেষদিকে পরিপূর্ণভাবে বিকাশলাভ করে। বৌদ্ধ জাতকের উপাখ্যানসমূহ, রামায়ণের গল্প এবং যবদ্বীপের পঞ্জিমহাকাব্য (Panji Epic)এর বিষয়-বস্তু। ওয়াট সি সুমের অপূর্ব্ব জাতক-আলেখ্য, সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে আয়ুথীয়ার সম্রাট্ মহাধর্ম্মরাজাধিরাজের সময় (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১৩৫৭-১৩৮৮) চিত্রিত করা হয়েছিল।[১] এই প্রাচীর-চিত্র সবচেয়ে আকর্ষণীয়। বোধ হয় এতে দেবধর্ম্ম-জাতকের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। ডাঃ কুমারস্বামীর মতে ওয়াট সি সুমের এই প্রাচী-চিত্রের উপর সিংহলের পোলন্নরোবার অনুরূপ শিল্পের যথেষ্ট প্রভাব আছে। তাঁর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দেহ করবার অবকাশ আছে। প্রথমতঃ পোলন্নরোবার চিত্রকলা থেকে যে ওয়াট সি সুমের চিত্রকলা অনুকরণ করা হয়েছিল এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের অজন্তা এবং সমসাময়িক চীনা চিত্রশিল্পের প্রভাবও শ্যামদেশের চিত্রকলায় বড় কম নয়।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে শ্যামদেশের চিত্রকলা সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিকাশ লাভ করে। এই সময় থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জাতক, রামায়ণ এবং যবদ্বীপের পঞ্জিমহাকাব্যই ঐ চিত্রকলায় মুখ্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রামায়ণকে শ্যামদেশে বলা হয়ে থাকে

১। বৌদ্ধ "ধর্ম্মচক্র" থেকে।

১। Coomaraswamy—*The History of th Indian and the Indoneshian Art*, p. 177.

"রামকীর্ত্তি" (উচ্চারণ,"রামকীয়েন")। এই "রামকীর্ত্তি" অথবা "রামকীয়েন" ভারতের মূল রামায়ণ থেকে গৃহীত হলেও তাতে বাংলার কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং তামিল রামায়ণের প্রভাবও বড় কম নয়। শ্যামদেশের রাজপুত্র ধানি নিবাতের মতে,—

"That original version (of the Ramayana) have come over to this side of the Bay of Bengal at about the same time as primitive Buddhism as early as the IIIrd Century of the Christian era. Mediaeval Indian versions such as the Tamil and the Bengali based upon the classical Ramayana came later to Java . . . . These and the primitive folk-tale (*i.e.*, the original Rama-story) combined to produce what we have now in Siam."*

এখানে অবশ্য একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, "থাই" রামায়ণের সবটাই সংস্কৃত, তামিল অথবা বাংলা রামায়ণ থেকে গৃহীত নয়। এর মধ্যে মূল কাহিনী ছাড়া থাই এবং কতকটা পূর্ব্বতন খেমিরদের ব্যবহারিক জীবনের আভাস পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, "রামকীর্ত্তি"তে সুন্দরী নারীদের প্রাধান্য খুবই বেশী। এ ছাড়া শ্যামদেশের চিত্রকলা এবং নৃত্যশিল্পে রামকীর্ত্তির যে চিত্র প্রতিফলিত হয়, তাতেও আয়ুথীয়া যুগ (খ্রীঃ ১৩৫০-১৭৬৭) এবং তার পরবর্তী ব্যাংকক যুগের (খ্রীঃ ১৭৬৯ অব্দ থেকে আধুনিককাল পর্য্যন্ত) প্রথম দিকের থাইদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়। এখানে যেন দশরথপুত্র রাম এবং দশকন্ধের সেনানীদের মধ্যে কঠোর সংগ্রাম শ্যাম এবং ব্রহ্মদেশের ঐতিহাসিক সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ব্যক্ত করছে। শ্যামদেশের "খোন" অথবা মুখোশ-নৃত্যে কোন কোন সময় রাক্ষস সেনাপতিদের অশ্বারোহী হিসাবে দেখানো হয়ে থাকে। এই সব জায়গায় রাক্ষস সমরনায়কের কোমরবন্ধনীতে একটি ছোট কাঠের ঘোড়া বাঁধা থাকে। এই সেনাপতিরা এমনভাবে নৃত্য করতে থাকেন যে, দেখে মনে হয় সত্যই তিনি একটি তেজী ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে আছেন। অপর পক্ষে রামচন্দ্র এবং তাঁর অনুগামী সেনাদের কদাচিৎ অশ্বপৃষ্ঠে দেখা যায়। এই নৃত্যের মধ্যে মধ্যযুগীয় শ্যাম-ব্রহ্ম বিরোধের ছাপ আছে বলে মনে হয়। বারংবার দেখা গিয়েছে যে, ব্রহ্মদেশীয় অশ্বারোহী সেনাবাহিনী শ্যামদেশ নির্ম্মমভাবে লুণ্ঠন করেছে।

"পঞ্জি"-মহাকাব্য কুরিপানের বীর রাজপুত্র রাদেন ইহুর সঙ্গে রাজকুমারী চন্দ্রকিরণের প্রেমকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই মহাকাব্য থাই ভাষায় অনূদিত হয়। এই থাই অনুবাদে রাদেন ইহুকে ইনাও এবং চন্দ্রকিরণকে বুসবা (পুষ্পা) নামে অভিহিত করা হয়েছে। শ্যামদেশের এই অনুবাদের নাম "ইনাও।" এই কাহিনীকে অবলম্বন করে থাই শিল্পীরা যে সব চিত্র অঙ্কিত করেছেন তা সত্যিই প্রেমের সূক্ষ্মতা এবং ভাবমাধুর্য্যে অতুলনীয়। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের বিচারে ইনাও-এর চিত্রকলা এক অপূর্ব্ব উৎকর্ষ লাভ করেছে।

নৃত্যরত ইনাও ও বুসবা

শ্যামদেশে এমন এক শ্রেণীর প্রাচীরচিত্র আছে যাকে ঐতিহাসিক চিত্র আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই সব চিত্র সাধারণতঃ শ্যামদেশের মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক ঘটনা-সমূহ অবলম্বনে অঙ্কিত। বিশেষ করে, এতে শ্যাম-দেশের সঙ্গে ব্রহ্ম এবং কম্বোজের রাজনৈতিক বিবাদই পরিস্ফুট হয়েছে। এই ধরণের চিত্রে পর্ত্তুগীজ এবং ফরাসী সৈন্যদের অনেক দৃশ্য আছে। এর প্রধান কারণ এই যে, ফিরিঙ্গীরা (থাই ভাষায়, "ফরাং") আয়ুথীয়া-যুগের শেষার্দ্ধে এবং পরবর্তী ব্যাংকক-যুগে থাইজাতির বেতনভোগী হয়ে অনেকবার ব্রহ্মদেশীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করে। ব্যাংককের বিখ্যাত "ন্যাশনাল মিউজিয়ামে" অনেক প্রাচীর-চিত্র আছে। ১৮৮৭ সালে চক্রিবংশের বিখ্যাত সম্রাট চুলালংকর্ণ (খ্রীঃ ১৮৬৮-১৯১০) অনেক ছবির বিষয়বস্তু নির্দ্ধারণ করে লেখলো দাঁড়িয়ে দেন। সম্রাটের আদেশে এই সব ছবির কাহিনীকে ভিত্তি করে কাব্যও রচিত হয়।

* "The shadow-play as a possible origin of the masked-play." *Journal of the Siam Society, October, 1948.*

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্যামদেশে এক নূতন চিত্র-শিল্পের প্রবর্তন হয়। তাকে নিঃসংশয়ে আধুনিক আখ্যা দিতে পারা যায়। এই শিল্পে মহত্ত্বাদ এবং "Symbo'ism"-এর মিশ্রণ ঘটেছে এবং ইউরোপীয় শিল্পের অনুকরণে এর বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়ে থাকে।

শ্যামদেশের পুতুলগুলি (থাই ভাষায়, "তুকতা") যেন সৌন্দর্য্যের প্রতীক। এই পুতুলগুলিকে শিল্পের দিক দিয়ে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—প্রাগৈতিহাসিক শিল্প দ্বারা প্রভাবিত কাঁচা অথবা পোড়ামাটির পুতুল এবং মধ্যযুগ ও বর্ত্তমান কালের "পৌত্তলিক কলার" অভিব্যক্তি মাটির অথবা জরির পুতুল।

প্রথম শ্রেণীর পুতুলের উৎপত্তি সম্ভবতঃ আর্য্য এবং দ্রাবিড়পূর্ব্ব "অষ্ট্রিক" সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে। এই পুতুলগুলি সাধারণতঃ "শ্রী" দেবতার পূজা উপলক্ষে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পুতুলগুলি "রামকিয়েন", ইনাও এবং বৌদ্ধ জাতক অবলম্বনে তৈরি হয়ে থাকে। সাধারণতঃ বর্ত্তমান ব্যাংককে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, রাবণ, বিভীষণ ('বিভেক') ইনাও এবং জাতক-বর্ণিত অর্দ্ধ পিপিনী কিন্নরী মনোহরার পুতুলগুলিই বেশী পাওয়া যায়। এই পুতুলগুলির জরির কাজ সুন্দর।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে শ্যামদেশের শিল্পের সৌন্দর্য্য এবং উৎকর্ষ সম্বন্ধে হয়ত কতকটা ধারণা করা যেতে পারে।

যে সংস্কৃতির আলো একদিন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা রেখে এসেছিলেন সমুদ্রের ওপারে এই সব দেশে, আজ আবার আমাদের সেই সম্পদ আহরণ করে আমাদের দেশে নিয়ে আসতে হবে।

কবি ও কাব্য

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

কোন্ এক পল্লীপ্রান্তে নিভৃত প্রাঙ্গণে
ঝিল্লিমন্দ্রমুখরিত ধূসর সন্ধ্যায়
যূথিপরিমলবাহী মেদুর পবনে
জুড়াইয়া তনুমন, স্নিগ্ধ দীপালোকে
পড়িতেছ এ আমার মর্ম্মের কাহিনী
ছন্দোময়,—হে অজ্ঞাত পাঠক আমার!
দুরন্ত আবেগ মোর—প্রাণের উচ্ছ্বাস
ওগো বন্ধু, তব চিত্ততটমূল 'পরে
পড়িছে কি আছাড়িয়া আজি এই ক্ষণে
কলোচ্ছল জাহ্নবীর বারিধারা-প্রায়
তুলিয়া হিল্লোল? মোর দুঃখ সুখ যত,
ক্ষুদ্র সাধ, ক্ষুদ্র আশা, আনন্দবেদনা,—
তব মনোবীণাতারে একটি ঝঙ্কার
তুলিছে কি জাগাইয়া? কুসুম সমান
বনবন-অন্তরালে কণ্টকশয্যায়
অনন্ত ক্ষুটন ব্যথা সহি' অবিশ্রাম
তোমাদেরি তরে করি সুরভি-বিথার!
ধূপের নীরব দাহ কে দেখেছে চোখে?—
চায় সবে নিত্য তার মধুর সুবাস!
আমার অন্তরে থাক্ বেদনা আমার,—
তোমার আনন্দ লাগি বচন-রচন
ক'রে যাই ছন্দোবন্ধে; যদি লাগে ভালো
তাই মোর এ জীবনে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার!
চাহি নি জীবনে কভু বাজার দরদর,
খ্যাতি, মান, নিন্দাস্তুতি করি নি ভ্রূক্ষেপ,
রচি নাই ছটাভরা কথার কুহক—
চমকিত করিবারে কভু বিশ্বজন!
আমার কবিতা—সে যে আমারি হিয়ার
অকৃত্রিম অনুভূতি সহজ সরল।
বাল্মীকি, রবীন্দ্র নই—নহি কালিদাস,—
নগণ্য যদিও তবু—তবু আমি কবি!
বেদনায় উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত আমার
সেদিন লাগিবে ভালো—যদি কোন দিন
কর্ম্মহীন আষাঢ়ের উতল সন্ধ্যায়
বহুদিন-ভুলে-যাওয়া একখানি মুখ
জেগে ওঠে স্মৃতিপটে; যদি এ সংসার
লাগে কভু জ্বালাময়, তিক্ত, রসহীন;
জীবনের খরতাপে কল্পনা-কুসুম
যায় যদি ঝলসিয়া কভু কোন দিন,—
সেদিন পড়িও তুমি কবিতা আমার!
পারিব না তোমাদের উৎসবের রাতি
করিবারে মধুময়, সরস, উজ্জ্বল
কৃত্রিম উল্লাস-রসে। বাসকশয়নে
মদির চম্পক-গন্ধে কোকিল কূজনে
প্রিয়াকণ্ঠলীন হয়ে থাক যদি সুখে—
সেথায় ডেকো না মোরে! শূন্য গৃহতলে
হু হু ক'রে কাঁদে যবে সাথীহারা প্রাণ—
নিশীথের মন্ত্রহীন সান্দ্র অন্ধকারে,—
সেদিন পড়িও তুমি কবিতা আমার!

বাঙ্গলা লিপি-সংস্কার

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

গত বৎসর আষাঢ়ের প্রবাসীতে "বাঙ্গলা নবলিপি" প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কথাটা এই, প্রচলিত লিপির দোষ আছে কি? সে দোষ অক্ষরের আকারে, না অক্ষর যোজনায়, না দুইতেই? আমি উক্ত প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, অক্ষরের আকারে ও অক্ষর যোজনায়, উভয়েই দোষ আছে।

কিন্তু এতকাল সে দোষ চলিয়া আসিতেছে, আমরা সে দোষ সংশোধন অর্থাৎ লিপি-সংস্কার করিবার প্রয়োজন অনুভব করি নাই। এখন এমন কি অবস্থা হইয়াছে, যে নিমিত্ত লিপি-সংস্কার করিতে বসিব?

বহুকাল হইতে আমরা দেশে শিক্ষা-বিস্তার করিতে বলিতেছি। দেশ অন্ধকারে ডুবিয়া আছে, দুঃখে দারিদ্র্যে রোগে কষ্ট পাইতেছে। জ্ঞানই ইহার একমাত্র প্রতিকার। কতজনকে কত বিষয় মুখে মুখে শিখাইবে? এক অদ্ভুত বিদ্যা আছে, সে বিদ্যা লিখন-পঠন বিদ্যা। সে বিদ্যা লাভ করিলে লোকে নিজে নিজে জ্ঞান অর্জন করিতে পারিবে। বিদ্যাগ্রহীতা যত অল্প সময়ে ও সহজে সে বিদ্যা গ্রহণ করিতে পারে, তত তাহার ও বিদ্যাদাতার সুবিধা। বিদ্যা-দাতা দানের পাত্র বাড়াইতে পারিবেন, বিদ্যাগ্রহীতা সংসারের আবশ্যক কর্ম করিতে সময় পাইবেন। কেবল বালক-বালিকা নয়, প্রাপ্ত বয়স্ককেও লিখন-পঠন বিদ্যা দান করিতে হইবে। মূল্য লইয়া নয়, বিদ্যা প্রদান। তাহারা কেহই নিষ্কর্মা বসিয়া থাকে না, পাঠশালায় দুই-তিন বৎসর আনা-গনা করিতে পারে না।

এইরূপ চিন্তা করিয়াই নবলিপি প্রস্তাব করিয়াছি। যে লিপি আছে, তাহা যথাসম্ভব রাখিব, আবশ্যক হইলে কোন কোন অক্ষরের আকার অল্প-স্বল্প পরিবর্তন করিব। কিন্তু দেখিব, পরিচিত লিপির সংস্কার করিতেছি, উহা বিসর্জন করিতেছি না।

আমাদের এই বহুদিনের কামনা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এতকাল শিশুশিক্ষা ইচ্ছাধীন ছিল। পশ্চিম-বঙ্গরাজ সে শিক্ষা নিজের হাতে লইতেছেন এবং দেশের যাবতীয় বালক-বালিকাকে শিক্ষা দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। শিশুকে পাঠশালায় না পাঠাইলে তাহার পিতা দণ্ডপ্রাপ্ত হইবেন। ব্যাপারটি ক্ষুদ্র নয়। শিক্ষামন্ত্রী প্রাপ্ত-বয়স্ক-দিগেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্যাপার আরও গুরুতর। পশ্চিমবঙ্গে আড়াই কোটি লোকের বাস, তাহাদের কেহই নিরক্ষর থাকিবে না। যদি দশ বৎসরের মধ্যেও এই সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলেও কি বিপুল আয়োজন ও অর্থব্যয় আবশ্যক হইবে, তাহা চিন্তা করুন। এই দরিদ্র দেশে, অন্নবস্ত্র কষ্টের দেশে, রোগশোক-ক্লিষ্ট দেশে, ইহা সুসাধ্য করিতে হইলে শিক্ষার পথ সুগম করিতে হইবে। শিশুদিগকে যত বৎসরই শিক্ষা দেওয়া হউক; আর যে পদ্ধতিতেই হউক, সকলকে লিখিতে পড়িতে গণিতে শিখাইতে হইবে। যত অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে বাঙ্গলা ভাষা লিখিতে ও পড়িতে শিখে দেশের নিরক্ষরতা তত সহজে দূর হইবে। বর্তমানে বাঙ্গলা অক্ষর পরিচয় করিতে, পড়িতে ও লিখিতে শিখিতে শিশুদের প্রায় দুই বৎসর লাগে। প্রাপ্ত-বয়স্কেরা ও সহজে পারে না। প্রচলিত সংযুক্ত স্বরাক্ষর ও ব্যঞ্জনাক্ষর কণ্টকস্বরূপ হইয়া আছে।

আমি নবলিপিতে দুইটি সূত্র গ্রহণ করিয়াছি। (১) যাবতীয় সংযোজ্য স্বরাক্ষর ব্যঞ্জনের পরে বসিবে। (২) যাবতীয় সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর স্ব স্ব আকারে পাশে পাশে বসিবে। একটি অন্তঃস্থ-ব অক্ষর কল্পনা করিতে হইয়াছে। ক্ষ, জ্ঞ ও হ্ম এই তিনটি সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্তমান আকারে রাখিতে হইয়াছে। এই দুই সূত্রের বহির্ভূত যাহা কিছু লিখিয়াছি, তাহা গ্রহণ করিলে ভাল হয়, না করিলে "নব-লিপি"র উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে না।

দশ-বার জন বিজ্ঞ ব্যক্তি নবলিপি সম্বন্ধে কেহ পত্রদ্বারা, কেহ মুখে মুখে তাঁহাদের মত জানাইয়াছেন। (১) কেহ বলিয়াছেন, নবলিপি চলিবে না, কারণ ইহা নূতন। (২) এক বিজ্ঞ বন্ধু মানুষের মনের গতি নির্ণয় করেন। তিনি নবলিপিতে আমায় এক পত্র লিখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, এই লিপি লিখিতে কাগজ ও সময় বেশী লাগে, এই লিপি চলিবে না। কিন্তু এই দুই কারণেই বাঙ্গলা যুক্তাক্ষর উপরে নীচে বসিয়াছে, ছোট-বড় ও ব্যঙ্গ হইয়াছে। এই দোষ সংশোধনের নিমিত্তই নবলিপির কল্পনা। এই লিপিতে সংযুক্তাক্ষর পাশে পাশে বসিয়া লিখন ও পঠন সুগম করিয়াছে। প্রচলিত লিপিতে র অক্ষরের উপরের ভুজ রেফ (ʹ) ও নীচের ভুজ র ফলা (্র) হইয়াছে। সেখানে অক্ষর নাই, নূতন চিহ্ন শিখিতে হইতেছে। ব অক্ষরের তলে বিন্দু দিলে র হয় কেন, ইহা শিশুকেও ভাবায়। এই কারণেই আমি বহুকাল হইতে বর্তমান র অক্ষর বর্জন করিতে বলিতেছি। নাগরী-র (र) অপর বাঙ্গলা অক্ষরের সহিত মিশিয়া যায়। (৩) কেহ বলিয়াছেন, বাঙ্গালী সংস্কার-

তীক। অদ্যাপি গুরু, শিশু, রূপ, হৃদয়, অর্চনা, কর্ম, ভক্তি, উদ্ধার ইত্যাদি শব্দের বৈধিক আকার অপরিবর্তিত রাখিয়াছে, আর তাহাদের পুত্র-কন্যাকেও শিখাইতেছে। (৪) কেহ কেহ কয়েকটি অক্ষরের আমার উপযুক্ত আকার অগ্রাহ্য মনে করিয়াছেন। আর, (৫) কেহ কেহ জানাইয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গরাজ নবলিপি গ্রহণ না করিলে ইহা চলিতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ সমালোচক বলিয়াছেন, নবলিপি চলিলে ছেলেরা বাঁচিয়া যাইবে। এইরূপ সমালোচনার মধ্যে একটিকে আমি সত্য বলিয়া মানি, রাজার অনুমোদন ব্যতীত কেহ নবলিপি পাঠশালায় ধরাইতে পারে না। কেবল অনুমোদন নয়, নবলিপিতে শিশুশিক্ষার ও প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষার নিমিত্ত বই ছাপাইতে হইবে। এক বালিকাকে আমি গুরু, শিশু, স্থান, ক্রম ইত্যাদি শব্দ আমার কল্পিত ও "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় প্রত্যহ মুদ্রিত আকারে লিখিতে শিখাইয়াছিলাম। সে বিদ্যালয়ে গেল; শিক্ষিকা বলিলেন, "এই বানান চলিবে না, তোমার বইতে যেমন আছে তেমন লিখিতে শিখ।" সে আবার পুটলী করিতেছে। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের বানান কিরূপ, তাহা দেখিবার লোক নাই।

আমার আশঙ্কা ছিল, সমালোচক মহাশয়েরা একটা বড় আপত্তি তুলিবেন, এই লিপি শিখিয়া কেহ বর্তমান মুদ্রিত পুস্তক পড়িতে পারিবে না। কিন্তু দেখিতেছি, কেহ সে তর্ক তুলেন নাই। আর, কোন্ মুখেই বা তুলিতেন? প্রত্যহ লক্ষাধিক পাঠক "আনন্দবাজার পত্রিকা" পড়িতেছেন; আর, তাঁহারাই প্রচলিত অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকও পড়িতেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর একটির নীচে আর একটি পূর্ণ আকারে থাকে; আর নবলিপিতে পাশে পাশে আছে। গুরুতর প্রভেদ নয়। এই কারণে মনে করি, নবলিপি চলিবার বাধা নাই। সংস্কর্তব্য আকার নবলিপির প্রধান অঙ্গ নয়, বাদ দিলেও ক্ষতি হইবে না।

কেহ কেহ নবলিপির উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া আমায় পত্র লিখিয়াছেন। কোন্নগরবাসী এক ভদ্রলোক নূতন স্বর ও ব্যঞ্জনাক্ষর বহু যত্নে ও বুদ্ধি প্রয়োগে উদ্ভাবন করিয়া আমায় দেখাইয়াছেন, তাঁহার কল্পিত অক্ষর কত অল্প, আর কত সহজে শিখিতে পারা যায়। তিনি ভুলিয়াছেন, বাঙ্গলা ভাষা নূতন নয়, ইহার অক্ষর আছে। লিপি-সংস্কার এক কথা, আর নূতন লিপির সৃষ্টি আর এক কথা। কালীঘাটবাসী আর এক ভদ্রলোক লিখিয়াছেন, আমরা শব্দ যেমন উচ্চারণ করি তেমন বানান করিলে অনেক অক্ষর কমিয়া যাইবে। হ্রস্ব ই ও দীর্ঘ ঈ স্থানে একটি ই, হ্রস্ব উ ও দীর্ঘ ঊ স্থানে একটি উ; ঞ, ণ, ন স্থানে একটি ন; শ, ষ, স স্থানে একটি শ, ইত্যাদি। আমি অন্য তর্ক না তুলিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কাহার উচ্চারণ প্রমাণ ধরিবেন? এক বারানসীবাসী লেখক লিখিয়াছেন, ইংরেজী শব্দ অতি দ্রুত হাতে লিখিতে পারা যায়। এইরূপ অক্ষর দ্বারা ভারতের যাবতীয় ভাষার শব্দ লিখিতে পারা যায়। এই কল্পনা করিয়া তিনি বাঁ দিকে হেলান অক্ষর উদ্ভাবন করিয়া সে লিপির নাম "লিপি-ভারতী" রাখিয়াছেন। সেই লিপিতে এক পৃষ্ঠা আদর্শ ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি কিন্তু বহু চেষ্টাতেও সে লিপির মধ্যে ক অক্ষর আবিষ্কার করিতে পারি নাই। সে আদর্শের মধ্যে প্রচলিত অক্ষরে কোথাও লিখিয়াছেন তামিল, কোথাও গুজরাটী, বাঙ্গলা, নাগরী ইত্যাদি। আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কে এই লিপি চায়?

শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে "লিপি সংস্কার" নাম দিয়া শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় নবলিপির সমালোচনা করিয়াছেন। আমি পড়িয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। তিনি বিস্তৃতভাবে নবলিপির দোষ দেখাইয়াছেন, গুণের দিকে তেমন দৃষ্টি করেন নাই। আমি একে একে তাঁহার আপত্তির খণ্ডন করিতেছি।

(১) অক্ষরের প্রচলিত আকার যথাসম্ভব রক্ষা করিতে হইবে। আমারও সেই মত। দোষ সংশোধনের নিমিত্ত অক্ষরের আকারে ও যোজনায় পরিবর্তন আবশ্যক হইলে সে পরিবর্তন স্বীকার করিতেই হইবে। এইরূপ পরিবর্তন নূতন নয়। নবলিপিতে যে পরিবর্তন করা হইয়াছে, তাহাতে প্রচলিত অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক পড়িতে অসুবিধা হইবে না। ঈ, ৃ, য, য়, ড়, ঢ় যেমন আছে তেমন থাক। তদ্দ্বারা নবলিপির সূত্র ছিন্ন হইবে না। কিন্তু আমি ব-এর পক্ষে নই। একটি অন্তঃস্থ-ব অক্ষরের অভাব মিটাইতে হইবে।

(২) আমিও বুঝি, লিপি-সংস্কার ও শব্দের উচ্চারণ সংস্কার এক কথা নয়। কিন্তু যদি লিপি দ্বারা উচ্চারণ সংস্কার হয়, তাহাতে আপত্তি কি?

(৩) এমন লিপি চাই যদ্দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার আবশ্যক ধ্বনি প্রকাশ করিতে পারা যায়। কোন ব্যঞ্জনাক্ষর অকারান্ত কিম্বা হসন্ত জানাইবার নিমিত্ত সে অক্ষরের পরে বিন্দু কিম্বা হস্ চিহ্ন দিলে ক্ষতি কি? 'কটমট ভাষা' আর 'কটমট চাহনি' এই দুই 'কটমট' এর উচ্চারণ এক নয়। প্রথমটির ট অকারান্ত, দ্বিতীয়টির ট হসন্ত। ইহা বুঝাইবার জন্য এই দুই চিহ্নের প্রয়োজন। সাবধান লেখক পাঠকের পাঠ ও বোধ সৌকর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

(৪) ঋ অক্ষরের উচ্চারণে এখনও লক্ষ লক্ষ লোক ঈ

বলে। রাধাকৃষ্ণ, অদ্যাপি 'রাধাকৃষ্‌ণ' শুনি নাই। কয়েক-জন নব্য 'কৃসন' বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা মূর্ধণ্য ষ ও মূর্ধণ্য ণ-এর উচ্চারণ বর্জন করিতেছেন। কৃষ্ট, এই উচ্চারণে মূর্ধণ্য ষ ও যৎকিঞ্চিৎ মূর্ধণ্য ণ-এর ধ্বনি আছে।

(৫) আমার জন্মস্থান দক্ষিণরাঢ়ে বটে। কিন্তু আমি আমার জন্মস্থানের উচ্চারণ প্রচার কামনায় কখনও কিছু লিখি নাই। সমগ্র বঙ্গদেশের উচ্চারণ আমার লক্ষ্য। কলিকাতা, মৌখিক ভাষায় কদাপি 'কলকাতা' নয়। কলিকাতার এক সম্ভ্রান্তবংশের বর্ষীয়সী নারীর মুখে আমি বহুবার 'কোলকেতা' শুনিতে পাই। তিনি কখনও 'কলকেতা' বলেন না। ক-এর পরে ই না থাকিলে কো হইতে পারে না। বাঙ্গলা শব্দ উচ্চারণের একটা প্রধান সূত্র এই যে ই উ স্বর পরে থাকিলে পূর্ববর্তী অ ঈষৎ ও হয়। যেমন, হরি, মধু। সেই কারণে কলিকাতা প্রায় 'কোলকাতা' শোনায়। কিন্তু ঈষৎ ও। এখানে ক-এর পর ই গ্রস্ত, লুপ্ত নয়। 'বলিবে, বলিল, বলিত' মৌখিক ভাষায় 'বলবে, বলল, বলত' নয়। এখানে ই ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে ভাষা অবোধ্য হইবে। এই গ্রস্ত ই ধ্বনি জ্ঞাপনের নিমিত্ত একটি চিহ্ন না দিলে পাঠক ঠিক উচ্চারণ করিতে পারিবেন না। পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে এই গ্রস্ত ই উচ্চারণ সাধারণ। রামশালি শব্দ হইতে রামশাইল; ই ঈষৎ। পূর্ব পশ্চিমে যেখানে যাইবেন, সেখানেই শুনিতে পাইবেন। কেহ 'রামশাল চাল' বলে না। কল্য অর্থে 'কাল' লিখিতে পারি না। কলিকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের মৌখিক ভাষার অনেক শব্দ দূরবর্তী স্থানের লোকের নিকট অবোধ্য। উপরি-উক্ত মহিলা 'ঘোনো দুধ', 'গোমের আটা', 'ওষ্টোমীর উপোস', 'ওসুখ সারা' ইত্যাদি বলেন। আমি হাসি; তিনি বলেন, "আমরা কোলকেতায় এই রকম বলি।"

(৬) সে বলিয়া চলিয়া গেল, সংক্ষেপে 'সে বলে চলে গেল' নয়। দুই একটা উদাহরণ দিলে আমার তর্ক সুবোধ্য হইবে। বাঙ্গলা উচ্চারণে কোন শব্দে ই পরে আ থাকিলে মৌখিক ভাষায় আ স্থানে এ হয়। যথা, পিঠা—পিঠে, তিনটা—তিনটে, চারিটা—চারটে; বেগুন+ইয়া=বেগু-নিয়া, ই পরে আ থাকাতে বেগুন্‌যে অথবা বেগুনে' (রং)। আগুনিয়া বোমা, 'আগুনে বোমা' নয়। আগুন্যে লিখিলেই ভাল, সংক্ষেপ করিতে হইলে আগুনে'। এই উৎকলা দ্বারা বুঝিতেছি, 'য়' লুপ্ত হইয়াছে। সেইরূপ, বলিয়া—বল্যে, সংক্ষেপে বলে'। পদ্যে ছন্দের অনুরোধে কবি করিয়া স্থানে করি', নিরখিয়া স্থানে নিরখি' লেখেন। অতএব উৎকলা থাকিলে বুঝি সেস্থানে শব্দের কোন অক্ষর গ্রস্ত বা লুপ্ত হইয়াছে। একটি চিহ্নের একটি অর্থ থাকিলেই ভাল। না পাইলে অগত্যা একটি চিহ্ন উৎকলা গ্রহণ করিতে হয়। তখন লিখিব, ক'লকাতা, চা'ল, ডা'ল, বলে', চলে' ইত্যাদি।

(৭) মণীন্দ্রনাথবাবু লিখিয়াছেন, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি চিহ্নের বাঙ্গলা নাম আছে। কিন্তু আমি সে সব নাম বলিতে শুনি নাই। পাদচ্ছেদ, অর্ধচ্ছেদ, পূর্ণচ্ছেদ, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়চিহ্ন ইত্যাদি নামের দ্বারা প্রয়োগ বুঝি, আকার বুঝিতে পারি না। ছেদনাস্ত্র বলিলে ছুরিকা, কর্তরী, খড়্গ, অসি ইত্যাদি বুঝায়, এ সকল অস্ত্রের আকার বলা হয় না।

উপরে যে বালিকার উল্লেখ করিয়াছি, সে বিদ্যালয়ে শিখিয়াছে, ৫+২=পাঁচ যুক্ত দুই, ৫−২=পাঁচ বিযুক্ত দুই, ⁵⁄₂=দুইয়ের পাঁচ। এইরূপ শব্দ ব্যবহার দ্বারা ভাষা বিকৃত হইতেছে। পূর্ববঙ্গে ৫+২=পাঁচ যোগ দুই, ৫−২=পাঁচ বিয়োগ দুই, ⁵⁄₂=পাঁচের দুই, চলিতেছে। আশ্চর্যের বিষয় এতকাল পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-বিভাগের একই কর্তা ছিলেন, কিন্তু দুই বঙ্গে দুই রীতি চলিয়াছিল!

মহারাষ্ট্রে রাঢ়ীয় তান্ত্রিক সম্প্রদায়

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের প্রসাদ-লব্ধ উপকরণ হইতে সুদূর মহারাষ্ট্রে শিবাজীর সময়ে বাঙালী এক তান্ত্রিক-গুরুর শিষ্য কি ভাবে তন্ত্রমত প্রচার করিয়াছিলেন তাহার বিস্ময়জনক বিবরণ বর্ত্তমান প্রবন্ধে সঙ্কলিত হইল। শ্রীযুত সরকার-রচিত *House of Shivaji* গ্রন্থের অভিনব সংস্করণে ২১ অধ্যায়ে শিবাজীর প্রিয় পার্ষদ রাজকবি কবীন্দ্র পরমানন্দের সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে (পৃ. ৩১০-২০ দ্রষ্টব্য)। পরমানন্দ "অণুপুরাণ সূর্য্যবংশম্" নামে শত-সর্গাত্মক এক বিরাট মহাকাব্য রচনা করিয়া শিবাজীর কীর্ত্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পুণার আনন্দাশ্রম হইতে এই মহাকাব্যের ৩২ সর্গাত্মক আবিষ্কৃতাংশ "শিবভারত" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। কবিত্বপূর্ণ মনোহর সংস্কৃত রচনা একশ্রেণীর নিকট বেদবাক্যবৎ প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইলেও শিবাজীর জীবনী বিষয়ে এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক অতি সামান্য অংশই পাওয়া যায়, অধিকাংশই কল্পনাপ্রসূত। ফলতঃ এ জাতীয় মহাকাব্য ইতিহাসগ্রন্থরূপে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

কবীন্দ্র পরমানন্দের পৌত্র কবীন্দ্র গোবিন্দ "অনুপুরাণ সূর্য্যবংশের" অন্তর্ভূত বলিয়া "অংশাবতরণম্" নামে বহু সর্গাত্মক অপর এক মহাকাব্য রচনা করিয়া শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর বৃত্তান্ত লিখিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহার অসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কিয়দংশ মুদ্রিতও হইয়াছে (*Annals, B. O. R. I,* XIX. pp. 49-60)। এই মুদ্রিতাংশ হইতে আমরা জানিতে পারি, কোঙ্কণদেশীয় "শিবযোগী" নামক এক "চিত্তপাবন" ব্রাহ্মণ "রাঢ়"দেশীয় এক পরমাদ্ভুতচরিত সিদ্ধপুরুষের কথা শুনিয়া দীর্ঘকাল "রাঢ়াপুরী"তে অবস্থান করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শিবযোগী দেশে ফিরিয়া গিয়া (বর্ত্তমান বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত রত্নগিরি জিলার অবস্থিত) "শৃঙ্গারপুরী"তে মঠনির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন :

> শ্রেয়া শৃঙ্গারপূর্ব্যাং ব্যরচয়দথ মঠং কোঙ্কণে জুরদেশে
> যত্নং যোগী প্রসিদ্ধস্তদনু সুতগুণং সন্নিবাসং চকার।

কালক্রমে এই শৃঙ্গারপুর হইতে তন্ত্রমত মহারাষ্ট্রে বহুল প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নিশ্চলপুরী নামক এক তান্ত্রিক গুরুর ক্রিয়াকলাপে মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং শিবাজী তন্ত্রমতে তাঁহার "অভিষেক" পুনঃসম্পাদন করিয়াছিলেন এবং তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষণ করেন। এই অভিষেকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনিরুদ্ধ সরস্বতীরচিত "শিবরাজ-রাজ্যাভিষেক কল্পতরু" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে (কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির ৩০৮৮ সংখ্যক পুথি দ্রষ্টব্য)।

শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার অমাত্যেরা চক্রান্ত করিয়া কনিষ্ঠপুত্র রাজারামকে সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শম্ভুজী ভাইকে সরাইয়া দিয়া সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হন। এই সময়ে পূর্ব্বতন অমাত্যদের পরিবর্ত্তে "কবিকলস" নামক উত্তর-ভারতীয় এক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ প্রধান অমাত্যপদে বৃত হইয়াছিলেন। কবিকলসের পরামর্শানুসারে উল্লিখিত শিবযোগীকে শম্ভুজী দীক্ষাগুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শম্ভুজীর ভাগ্য এই সময়ে অনেকটা সুপ্রসন্ন হইয়াছিল, কিন্তু অপুত্রক বলিয়া তাঁহার মনে দুঃখ ছিল। মহারাষ্ট্রের বৈদিক ব্রাহ্মণগণ পূজাদিদ্বারা শম্ভুজীর অপুত্রতা দূর করিতে সমর্থ হইল না। তখন শিবযোগী আসিয়া রাজাকে ৺কালীপূজা করিতে পরামর্শ দিলেন। এই তান্ত্রিক পূজানুষ্ঠানের ফলে শম্ভুজীর এক পুত্রসন্তান লাভ হয় (১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে) এবং কবিকলসপ্রমুখ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রভাব রাজভবনে এতটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে, মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ এই কারণেই শম্ভুজীর প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন।

মহারাষ্ট্রাধিপতির রাজভবনে অনুষ্ঠিত এই কালীপূজার কথা বিস্ময়জনক হইলেও ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। যাঁহার প্ররোচনায় ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেই তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ শিবযোগী রাঢ়াপুরীতে কাহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন—এই প্রশ্ন স্বতঃই অনেকের মনে উদিত হইবে। এ বিষয়ে আমাদের অনুমান বিবৃত করার পূর্ব্বেই কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। কবীন্দ্র গোবিন্দ শিবযোগীর দীক্ষাদি বিষয়ে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা প্রায় সমস্তই কল্পিত, অতিরঞ্জিত ও অপ্রামাণিক বলিয়া মনে হয়। শিবযোগীর দীক্ষাকাল ১৬৫০-৬৫ খ্রীষ্টাব্দ-মধ্যে নির্ণয় করা যায়। তৎকালে "রাঢ়া" নামক কোন "মহাপুরী"র অস্তিত্বই ছিল না! রাঢ়দেশে অবস্থিত কোন প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রামকেই কবি রাঢ়াপুরী বলিয়া ধরিয়াছেন এবং ঐ গ্রামের নাম নিঃসন্দেহে নির্ণয় করার কোন উপায় নাই। দশটি মনোহর শ্লোকে "ত্রিপথাতীরে" অবস্থিত রাঢ়াপুরীর যে বর্ণনা আছে তাহা সমস্তই কবিকল্পনামাত্র এবং বাস্তব পরিচয়ের সমাবেশ তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিদ্যমান নাই। উদাহরণ-স্বরূপ একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল :

হংসৈঃ পরমহংসৈশ্চ বালখিল্যৈঃ সমাবৃতা।
গন্ডবেরুণ্ডভিয়ুতা সিংহব্যাঘ্রমৃগাদিভিঃ॥ (৪ শ্লোক)

খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে রাঢ়দেশের কোন স্থানে "বালখিল্য" মুনিগণ ও সিংহাদি জন্তু বাস করিত, ইহা অতি উৎকট কবি-কল্পনা ছাড়া কিছুই নহে।

শিবযোগী রাঢ়দেশে আসিয়া যাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীযুত যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁহাকে "সিদ্ধযোগী" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পরিচয় মূল-গ্রন্থে এই ভাবে লিপিবদ্ধ আছে:

কশ্চিৎ সিদ্ধঃ শ্রীঃ স * * সর্বেষাং শ্রুতিমাগতঃ।
মহানির্ব্বাণপদবীং যুগপন্মিজলীলয়া।
আসীদাসীমধরণীবলয়ে লয়পণ্ডিতঃ॥ (৩১-২ শ্লোক)

এস্থলে রাঢ়ীয় সিদ্ধপুরুষের নামটি ত্রুটিত রহিয়াছে—তাঁহার স-কারাদি কোন নাম ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। বরোদার পুঁথিতে এস্থলে কি পাঠ আছে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। অতঃপর মূলগ্রন্থে শিবযোগীর দীক্ষা-গ্রহণের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিবরণটিও প্রামাণিক হইতে পারে না। তান্ত্রিক দীক্ষা অতি গোপনীয় অনুষ্ঠান—শিবযোগী দেশে ফিরিয়া গিয়া ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কবি গোবিন্দ তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, একথা কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। বস্তুতঃ তন্ত্রসারাদি বঙ্গদেশের প্রামাণিক তান্ত্রিক নিবন্ধে যে সকল দীক্ষাপদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে তাহার সহিত কবিবর্ণিত বিবরণের মিল নাই। "আম্নায়" ঘটিত বিভিন্ন ঘটের জলদ্বারা অভিষেক বঙ্গীয় পদ্ধতিতে নাই। দীক্ষাগুরুর দুইটি উপমানপদও—"গোরখো যথা (৪৩ শ্লোক) এবং দত্তাত্রেয় ইব" (৪৫ শ্লোক)—গৌড়ীয় তন্ত্রসম্প্রদায়ের অনুকূল নহে। গোরক্ষনাথ ও দত্তাত্রেয় কালীমন্ত্রের উপাসক ছিলেন না। আমাদের অনুমান কবি গোবিন্দ নিজদেশে প্রচলিত তন্ত্রদীক্ষার পদ্ধতিই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, রাঢ়দেশে শিবযোগীর দীক্ষার সহিত বস্তুতঃ তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। দীক্ষাগ্রহণের পর শিবযোগীকে নূতন নাম দেওয়া হইয়াছিল:

আত্তং তদ্-"বারনাথা"র্গং গৃহীত্বাতি মনোরমং।
শিষ্যস্য কল্পয়ামাস স সিদ্ধো নাম সংভ্রমাৎ॥ (৪৯ শ্লোক)

বোধ হয় "বীরনাথ" পাঠ হইবে (বরোদার পুঁথির পাঠ এস্থলেও গবেষণীয়)। অভিষেকের পর তান্ত্রিক সাধকদের নাথান্ত নাম দেওয়ার বিধান আছে।

কবি গোবিন্দ যেরূপ নিপুণভাবে তন্ত্র-ঘটিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ থাকে না যে তিনি বংশ পুরুষানুক্রমে তান্ত্রিক ও তন্ত্রশাস্ত্রে কৃতবিদ্য ছিলেন। এই রাজকবিবংশের তান্ত্রিকতার নিদর্শন তদাকথিত "শিবভারত" গ্রন্থমধ্যেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ গ্রন্থের প্রথম সর্গে লিখিত আছে গ্রন্থকার কবীন্দ্র পরমানন্দ বংশ ছিলেন:

"একবীরা" প্রসাদেন লব্ধবাক্‌সিদ্ধিবৈভবম্ (১৬ শ্লোক)

মঙ্গলাচরণ স্থলেও "একবীরাং ভগবতীং গণেশং চ সরস্বতীম্" (১২৬ শ্লোক) বলিয়া সর্ব্বাগ্রে কুলদেবতা ভগবতী একবীরার নামোল্লেখ আছে। অন্যত্র (১৩২ শ্লোক) এই কুলদেবতা "চতুর্ভুজা" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। একবীরা অপ্রধান শক্তিদেবতা। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে এই দেবতার ধ্যানাদি পাওয়া যায় না—বুঝা যায় বঙ্গদেশে এই দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণানন্দ একস্থলে (বঙ্গবাসী সং পৃ. ৬৪) "একবীরাকল্প" নামক গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। দেবীভাগবত প্রভৃতি পুরাণে ১০৮ শক্তিপীঠের তালিকা আছে—তন্মধ্যে পাওয়া যায় "সহ্যাদ্রাবেকবীরা তু"। অর্থাৎ একবীরা সহ্যাদ্রির অধিষ্ঠাত্রী শক্তিদেবতা। ইহার অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান আছে কিনা আমরা অবগত নহি। সহ্যাদ্রি অঞ্চল "কেরল" দেশের অন্তর্গত ছিল এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ন্যায় কেরল সম্প্রদায়ও তান্ত্রিকদের মধ্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে বিভাধরাচার্য্যধৃত একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে:

গৌড়াঃ শাল্বাঃ সুরাষ্ট্রৈশ্চ মাগধাঃ কেরলাস্তথা।
কোশলাশ্চ দশার্ণাশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ॥

এই বচনানুসারে কেরল তান্ত্রিকদের মর্য্যাদা গৌড়ীয়দের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। কবীন্দ্র পরমানন্দ ও তদীয় পৌত্র কেরল সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক ছিলেন সন্দেহ নাই। এক স্থলে কবি গোবিন্দ "অথ যন্ত্রং কেরলানাং" (*Annals l. c.*, p. 55) বলিয়া তাহা স্পষ্টাক্ষরেই সূচিত করিয়াছেন। সুতরাং শিবযোগীর দীক্ষাদি ব্যাপার কবি কেরলমতের গ্রন্থানুসারে কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন বলিয়া ধরিতে হইবে। তিনি রাঢ়ীয় এক গুরুর শিষ্য ছিলেন এবং রাঢ়দেশ হইতেই কালীপূজার অনুষ্ঠান শিখিয়া মহারাষ্ট্রে প্রচার করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন, এই দুইটি মাত্র তথ্য প্রামাণিক বলিয়া কবি গোবিন্দের কাব্যগ্রন্থ হইতে উদ্ধার করা যায়। বাংলার বাহিরে কালী-পূজার প্রচলন অত্যন্ত বিরল।

বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে প্রাচীনকাল হইতে কত শত সহস্র শক্তিশালী তান্ত্রিকসাধক ও সিদ্ধপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা দুরূহ এবং তাঁহাদের বিষয়ে বিন্দুমাত্রও গবেষণা হয় নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে রাঢ়-দেশের গঙ্গাতীরেও বহুতর অলৌকিক প্রভাবশালী শক্তি-সাধক বিদ্যমান ছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে শিবযোগীর গুরুকে চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব। তথাপি আমাদের একটা অনুমান এস্থলে বিবৃত হইল। দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত হুগলী জেলার অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ "গুপ্তপল্লী" (প্রকাশ গুপ্তিপাড়া) গ্রাম প্রাচীন

কাল হইতে একটি বিশিষ্ট সাধনক্ষেত্র রূপে পরিচিত ছিল। রাজা বিশ্বেশ্বর রায়ের গুরু সত্যদেব সরস্বতী ও তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরাদি অদ্যাপি এই গ্রামের প্রত্নসম্পদ্‌ নির্দেশ করিতেছে। কবি গোবিন্দের রাঢ়াপুরীতে যে সকল হংস পরমহংস বিদ্যমান ছিলেন স্বয়ং সত্যদেব তাঁহাদের অন্তর্ভূত হওয়া বিচিত্র নহে। আমাদের অনুমান কবি গোবিন্দ এই সমৃদ্ধ গুপ্তপল্লীকেই রাঢ়া মহাপুরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহার কারণ নির্দেশ করিব। রাঢ় বঙ্গের বহুগ্রামে রাঢ়ীয় কাশ্যপগোত্র চট্টবংশীয় শোভাকরের বংশ বিদ্যমান ছিল। বল্লালী কুলীন চট্টহলায়ুধের পৌত্র এই শোভাকর খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীতে, অর্থাৎ প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্বে, বিদ্যমান ছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার অন্যতম বংশধর সুবিখ্যাত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ১৬৬৬ শকাব্দে চৈত্র মাসে (১৭৪৫ খ্রীঃ) রচিত "চন্দ্রাভিষেক" নামক সপ্তাঙ্ক নাটকের প্রস্তাবনায় শোভাকরকে মন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রস্তাবনার শ্লোকটি উদ্ধারযোগ্য :

> শোভাকরো দ্বিজবরঃ প্রথিতঃ পৃথিব্যাং
> বিদ্যানবদ্যকবিতাদিগুণাম্বুরাশিঃ।
> যশ্চন্দ্রশেখরগিরৌ কৃতপুণ্যপুঞ্জঃ
> সিদ্ধিং জগাম পরমাং মনুসত্তমস্য ॥
>
> (অস্মদীয় পুথির ৩।২ পত্র)

অর্থাৎ, চট্টগ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রশেখর পর্বতে বহু সাধনা করিয়া শোভাকর শ্রেষ্ঠ মন্ত্রবিশেষে পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং শোভাকরকে বাংলার একজন প্রাচীনতম তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ বলিয়া ধরা যায়—কৃষ্ণানন্দ, পূর্ণানন্দ প্রভৃতি বাংলার শ্রেষ্ঠ শক্তিসাধকগণ শোভাকরের প্রায় ৩০০ বৎসর পরবর্তী। শোভাকরের অধস্তন অষ্টম পুরুষ সিদ্ধেশ্বর খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীতে গুপ্তিপাড়ায় বাস স্থাপন করেন। শোভাকর বংশের এই শাখায় বহু পণ্ডিত, কবি ও সাধক জন্মগ্রহণ করিয়া গুপ্তিপাড়ার খ্যাতি বাড়াইয়াছিলেন। উক্ত সিদ্ধেশ্বরের এক জন বৃদ্ধপ্রপৌত্র মথুরেশ (অথবা মথুরানাথ) বিদ্যালঙ্কার একজন মহাকবি ও সাধক ছিলেন। ১৫৯৪ শকাব্দে (১৬৭২ খ্রীঃ) তিনি "শ্যামাকল্পলতিকা" নামে ১০৮ শ্লোকে উৎকৃষ্ট কালিকাস্তুতি রচনা করিয়াছিলেন।

> বেদাঙ্কতিথিশাকেষু তুলাহে চণ্ডরোচিষি।
> অকারি মথুরেশেন শর্ম্মণা কালিকাস্তুতিঃ ॥

অর্থাৎ শিবযোগীর রাঢ়াপুরীতে অবস্থান কালে মথুরেশ জীবিত ছিলেন সন্দেহ নাই। এই স্তুতির প্রতিলিপি ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়। "বিদ্যোদয়" পত্রিকায় ইহা প্রথম সটীক মুদ্রিত হয় (১৮৯৯-১৯০১ খ্রীঃ) এবং পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। আমাদের নিকট ১৩ পাতায় সম্পূর্ণ স্তুতিটির একটি সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী আছে। পুষ্পিকা ("ইতি দেবীস্তুতি-টিপ্পনী রচিতা শ্রীমথুরানাথকবিনা") হইতে ইহা স্বয়ং মথুরেশের রচনা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই মথুরেশ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, পশ্চিম ভারতে জয়পুরের নিকটবর্তী "সাবিত্রীপর্বতে" সর্বানন্দ নামক সিদ্ধপুরুষের নিকট তিনি দীক্ষিত হইয়াছিলেন (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃ. ৯৪৪-৬)। সুদূর সাবিত্রী-পর্বতের সহিত গুপ্তিপাড়ার একজন বিশিষ্ট সাধকের এই সংযোগ লক্ষ্য করার বিষয়। এই ক্ষীণসূত্র ধরিয়াই আমরা অনুমান করিতে অগ্রসর হইতেছি যে কোঙ্কণের শিবযোগী রাঢ়ে আসিয়া থাকিলে গুপ্তপল্লীতেই আসিয়াছিলেন, যদিও বলা বাহুল্য, এসম্বন্ধে আরও প্রচুর গবেষণার অবকাশ রহিয়াছে।

জীবন-সন্ধ্যায়

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

যখন নামিবে সন্ধ্যা জীবনের সায়াহ্ন-বেলায়,
গৃহ-কোণে রবে বসি' নিদ্রাতুরা স্তব্ধ নিরালায়,
পুথিখানি লয়ে মোর ধীরে ধীরে পড়িও যতনে
আর ভেবো, ফেলে-আসা সেদিনের কথা আনমনে।

ভেবো মনে, একদিন তব আঁখিপল্লব প্রচ্ছায়
ছিল দুটি সুগভীর মধুর কোমল সুষমায়,
সৌন্দর্য্যপিপাসু হয়ে আসিয়াছে কত লুব্ধ জনা,
সত্য, মিথ্যা, প্রেম লয়ে তব প্রেম করিয়া কামনা।

ভেবো, ছিল একজন পরিপূর্ণ অন্তর যাহার
পথিক আত্মারে তব বেসেছিল ভালো অনিবার,
নিত্য রূপান্বিত তব আননের দুঃখ-রেখাগুলি
সযত্নে গভীর প্রেমে হৃদয়েতে রেখেছিল তুলি।

বসি' নিজ গৃহ-কোণে ভেবো মনে ব্যথিত সন্ধ্যায়,
জীবন হইতে প্রেম দিনে দিনে কেমনে বিদায়
নিয়ে যায় গিরিশিরে ; তারপর সুদূর-তিমিরে
নক্ষত্রের অন্তরালে গোপনে লুকায় ধীরে ধীরে।*

* কবি W. B. Yeats রচিত "When you are old" কবিতার অনুবাদ।

পতঙ্গ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিষণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে শচীনবাবু কত কি ভাবিতেছিলেন। পথের বাঁয়েই কেরাণীকুলের মেস। হরিদা ডাক দিলেন—শচীনবাবু তামাক খেয়ে যান।

শচীনবাবু ধূমপানের জন্য থামিলেন। একটা বেতের মোড়ায় বসিয়া সুগন্ধি তামাক টানিতেছিলেন—সত্যর জন্য মনটা তাঁর বার বার কাঁদিয়া উঠিতেছিল। হরিদা নীরবে বসিয়া আছেন।

শচীনবাবু কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করিলেন—সামনের চৌকিতে একটি কনষ্টেবল বসিয়া আছে। গালপাট্টা দাড়ি—ভোজপুরী না হয় পশ্চা মজঃফরপুরী হইবে। সে বাহিরের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া কি যেন ভাবিতেছে। সেও সম্ভবতঃ শচীনবাবুকে লক্ষ্য করে নাই—এমনি ভাবে চাহিয়া আছে…

শচীনবাবু হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন—তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু পুলিশের চোখে জল কেন সেকথা জিজ্ঞাসা করিবার মত মনোভাব তাঁহার ছিল না, তাই তিনি প্রশ্নও করিলেন না।

সে হঠাৎ কহিল—নোকরি ছোড় দেগা বাবুজী।

হরিদা কহিলেন—নকরী ছোড় দেগা—তেওয়ারী।

—জরুর দেগা, আবি ছোড় দেগা।

হরিদা প্রশ্ন করিলেন—কেন?—তেওয়ারী হিন্দীতে জবাব দিল—এমনি করে ছেলেছোকরাদের মারবার জন্যই কি চাকুরী? এ কাজ করতে পারব না, আমারও এমনি বেটা আছে। চোর নয়, ডাকাত নয়, বাবুলোক—এদের গায়ে লাঠি মারব পেটের দায়ে—এ নোকরি আমি করব না—

—বাড়ীর সব কি করবে?

—রামজী যা করাবেন।

—তোমার যে জেল হবে চাকরি ছাড়তে চাইলে—

— হবে হোক, বাবুরাও ত সব জেলেই যাবে—

শচীনবাবু নীরবে শুনিতেছিলেন—হরিদা চুপ করিলেন। তেওয়ারীর চোখ দিয়া তখনও জল পড়িতেছিল। সে অকস্মাৎ কাতর-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—এইসা নকরী হাম ক্যায়সে করেঙ্গে বাবুজী? ছোড় দেগা নকরী—এ নেমকহারামী হায়—

তেওয়ারী চোখের জল মুছিয়া উত্তেজিত ভাবে চলিয়া গেল। শচীনবাবুর মনটি যেন প্রসন্ন হইল—সত্য আঘাত পাইয়া নির্ভীক কণ্ঠে হাঁকিতেছে বন্দে মাতরম্, আর এই তেওয়ারী আঘাত দিয়া কাঁদিতেছে। তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন—সত্য, তোমার জয় হোক।

শচীনবাবু হুঁকা রাখিয়া আবার উঠিলেন—

মোড়ের মাথায় দাঁড়াইয়া দারোগা ও আর একজন পুলিশ কর্ম্মচারীর কথা হইতেছিল। দারোগা মামুদ হোসেন বলিতেছে—কায়দামত একটু আধটু বন্দুক চালাতে যদি পারতাম তা হলে হয়ত প্রমোশনটা তাড়াতাড়ি হ'ত। এমনিধারা লাঠি চালিয়ে কি কিছু হয়।—সিগারেটের একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া তিনি ঈষৎ হাসিলেন, যুদ্ধে জিতিয়া শিবিরে বসিয়া যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন।

অন্য ভদ্রলোক কহিলেন—বন্দুক ত চালাবে, কিন্তু মনে রেখো, মানুষ মারা যত সোজা ভাবো আসলে ততটা নয়।

—হ্যাঁ, কি হবে? ওতে আমার মন টলে না।

একটি ঢিল আসিয়া তাহার গায়ে পড়িল। ফিরিয়া চাহিতেই দেখেন একটা দশ বছরের বালক তাঁহার পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিতেছে—মিরজাফর—নেমকহারাম মামুদ হোসেন—। তাহাকে বেটন হাতে তাড়া করিয়া গেলেন, কিন্তু সে যেন নিমেষে ভোজবাজীর মত অদৃশ্য হইয়া গেল।

শচীনবাবু ভাবেন—তাদের স্কুলে ক্লাস থ্রিতে পড়ে ছেলেটি। তাহার হাসি পাইল—গণেশ সাধ্যমত প্রতিবাদ করিয়াছে বৈ কি?

বাসায় ফিরিতেই মীরা দরজা খুলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল—শহরে কিসের গোলমাল হচ্ছে গো?

—স্বদেশী গোলমাল।

—কি হয়েছে ভাল করে বল—

শচীনবাবু যাহা দেখিয়াছেন এবং যাহা শুনিয়াছেন তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। তখনও চোখের উপর ভাসিতেছে সত্যর দল রক্তাক্ত দেহে মাটিতে শুইয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিতেছে বন্দেমাতরম্—

মীরা সহানুভূতির সঙ্গে কহিল—সত্যর খুব লেগেছে না গো? অনেকটা কেটে গেছে? কেন এমন করে মারে?

—চাকরির উন্নতি হবে বলে—

—ছিঃ, ওরা এমন অমানুষ কেন? ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেই ত পারত, মারলে কেন? ওদের কি ছেলেপুলে নেই—

শচীনবাবু করুণ হাসি হাসিলেন—ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, এ ত সবে আরম্ভ, আরও কত কি হবে তা কে জানে।

—না না, সত্যকে বারণ কর, এমনি ক'রে মা'র খেয়ে কি হবে?

—সে ত মার খেয়ে মরবে বলেই মেয়েছে, তাকে বারণ করে কি হবে?

মীরা সভয়ে কম্পিত কণ্ঠে কহিল, বাট, বাট, অমন কথা বলো না। সত্যর মত ঠাণ্ডা ছেলে, তার এ কেমনতর জেদ!

শচীনবাবু জবাব দিলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, তিনটে মাত্র, তা হোক, একটু চা কর ত।

মীরা চা করিতে গেল। শচীনবাবুর চোখের সামনে লাঠি চালনার দৃশ্যটা বারবার ভাসিয়া উঠিতেছিল এবং মনটা বেদনার ভারাক্রান্তই শুধু নয় বিদ্রোহীও হইয়া উঠিতেছিল।

গার্ল স্কুলের দপ্তরী আসিয়া একখানি পত্র দিল, মিস্ রায় লিখিয়াছেন—

প্রিয় শচীনবাবু,

অবিলম্বে একবার দেখা করিবেন। পাঁচটা হইতে ছ'টা পর্য্যন্ত আপিসে আপনার জন্য অপেক্ষা করিব। যত কাজই থাক, নিশ্চয়ই আসিবেন। ইতি—

আপনাদের
অণিমা রায়।

মনটা বিষণ্ণ ছিল, মিস্ রায়ের জরুরী আহ্বানেও মেঘ কাটিল না, কিন্তু দেখা করার যে একান্ত প্রয়োজন তাহা শচীনবাবু ভাল করিয়াই বুঝিলেন।

বিকালে শচীনবাবু বাহির হইয়াছিলেন—

পথে সত্যর সহিত দেখা, সে চায়ের দোকানে চা খাইতেছিল, শচীনবাবু চা পান করিবার অজুহাতে দোকানে ঢুকিয়া সত্যর পাশেই বসিয়া পড়িলেন এবং দু'একটা কথা-বার্ত্তার পর তাহার আঘাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। সত্য সহাস্য মুখে জানাইল, না স্যার, সে রকম কিছু লাগে নি, সব ক'টাই হাতের উপর দিয়ে গেছে, একটা মাথায় লেগে সামান্য কেটেছে।

শচীনবাবু ক্ষত ও ফীতিগুলি ভালো করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সত্য কহিল, ও কিছু না স্যার। তবে বেশী দিন বোধ হয় বাইরে থাকতে পারব না এই যা দুঃখ। কাগজ পড়ছেন—কেমন সুরু হয়েছে সব।

শচীনবাবু চলিয়া আসিলেন দুঃখিত অন্তঃকরণে, কিন্তু হৃদয় তাহার একটা নূতন প্রেরণায় ভরিয়া উঠিল—যে মৃত্যুকে মানুষ এত ভয় করে প্রকৃতই অবস্থাবিশেষে তা এমন ভয়াবহ নয়, সত্য সে ভয়কে এড়াইয়াছে, সে যেমন করিয়াই হোক...

অণিমা রায় আপিসেই ছিলেন। শচীনবাবুকে দেখিয়া কহিলেন, এত দেরী করতে হয় ছিঃ। কতক্ষণ বসে আছি। সত্য কেমন আছে? খুব লেগেছে—

—তেমন নয়, তবে খানিকটা চোট লেগেছে।

শচীনবাবু তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া চুপ করিলেন। অণিমা কিছুক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, ওরা কেমন করে এমন ভয়শূন্য হয়েছে জানেন?

—আমি, তাদের ধ্রুব বিশ্বাস তারা ভারতের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনবে, সগর্ব্বে তখন তারা বলবে আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছি, আমরা দেশমাতৃকার সেবক। এই আকাঙ্ক্ষা তাদের মন থেকে সব দুর্ভাবনা দূর করেছে।

অণিমা কহিলেন, সত্যর অন্তরে যে এই সাহস ও শক্তি ছিল তা কোন দিন ভাবতে পেরেছেন?

—না। এটা বাস্তবিকই বিস্ময়কর—

অণিমা আরও ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, আমাদের কি কিছুই করবার নেই। আমরা কি কেবল দর্শক—

—হ্যাঁ, নিরপেক্ষ দর্শক।

অণিমা একটু বিচলিত ভাবে কহিলেন—সত্য আমার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল, প্রয়োজন হলেই চাইব তখন দিয়ে কুলোতে পারবেন না। সে কি এইজন্যেই? সে টাকা ত আপনি ফেরত দিয়ে যান।

—আমি জানি না। তবে এ কাজের জন্য হওয়া বিচিত্র নয়। টাকার তাদের প্রয়োজন হবেই—মানুষ, রক্ত ও অর্থ এ তিনটেই তাদের মূলধন।

অণিমা কহিলেন—আমার যথাসাধ্য আমি দেব, কিন্তু কেমন করে দেব, কাকে দেব তা ত আমি জানি না। আপনি প্রয়োজন হলে চাইবেন—

—আমি কে? আমি কেন চাইব?

অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিয়া মিস্ রায় কহিলেন—আমি মেয়েছেলে বটে, কিন্তু পেটে আমার কথা থাকে। আমাকে বিশ্বাস করুন—

—বিশ্বাস করি।

—তবে কেন ছেলেভুলানো কথা বলেন? আপনি সত্যদের সবকিছু জানেন—আমি জানি, সে যেরূপ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনার নাম করে তাতে আপনার আদেশ ব্যতীত সে নিশ্চয়ই কিছু করে নি। আপনি তাদের নেতা!

—আমি? অবাক করলেন! আমি আজ প্রথম শুনলাম যে সত্য এই ব্রতে ব্রতী।

অণিমা রায় হাসিলেন, কিন্তু মনে হইল তিনি শচীনবাবুর কোন কথা বিশ্বাস করিলেন না। সহাস্যে কহিলেন—যা হোক, একটা কথা বলি আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অকৃত্রিম তাতে আপনি সন্দেহ করবেন না, আর আমার অর্থ আপনার আদেশেই ব্যয়িত হবে।

শচীনবাবু বিস্মিত হইয়াছিলেন, স্মিতহাস্যে কহিলেন—

প্রভার বদলে যদি অন্য কোন কথার দ্বারা আপনার মনোভাব প্রকাশ হ'ত ?

—কি কথা··· ? মিস্ রায়ের যেন একটু ভাবান্তর দেখা গেল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া কহিলেন—দাঁড়ান চা নিয়ে আসি। বলিয়াই চলিয়া গেলেন।

শচীনবাবু স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছিলেন—চারি পাশের ঘটনা প্রবাহ তাঁহাকে কোথায় ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। এই মেয়েটির কথাগুলিও যেন হেঁয়ালিপূর্ণ···

চা আসিল। চা পান করিতে করিতে শচীনবাবু কহিলেন—আপনার ব্যাপার ক্রমেই রহস্যময় হয়ে উঠছে, মনে হচ্ছে আপনিও সত্যর মতই বিপ্লবী, মুখে অজ্ঞতার ভান করে আমাদের মত নিরীহ মানুষকে বিভ্রান্ত করেন।

—থাক ওসব কথা। কথায় কথা বাড়ে।

—আমার অনুরোধ সত্য কথাই বলবেন, সত্যের অভিনয় করবেন না।

—আপনার আসল লোভ কোথায় সে আমি জানি—তা আমার ক্যানবাসেরই প্রতি।

অণিমা রায়ের কথা শুনিয়া শচীনবাবু ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর বলিলেন—নমস্কার, এর পরে এ জায়গা ত্যাগ করাই বোধ হয় সমীচীন।

পরদিন শচীনবাবু মোড়ের মাথায় প্রেসে বসিয়া স্কুল ম্যাগাজিনের কাজ করিতেছিলেন হঠাৎ রাস্তায় একটা গোলমাল শুনিয়া তাকাইলেন—একটি শোভাযাত্রা যাইতেছে। সঙ্গে লিখিত বিজ্ঞপ্তি—পঞ্চমবাহিনী ধ্বংস হোক, জাপানকে রুখতে হবে। জনকয়েক তরুণ ও কয়েকটি দশ-এগার বৎসর বয়সের বালিকার শোভাযাত্রা। সর্ব্বসাকুল্যে জনকুড়ি হবে। জনৈক ভদ্রলোক মন্তব্য করিলেন—এ সব মেয়েরা রুখবে জাপানকে ? বড়সড় হলেও না হয় কোমরে আঁচল জড়িয়ে রুখে দাঁড়াতে পারত।

শচীনবাবু বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পথের লোক শোভাযাত্রার নমুনা দেখিয়া হাসিতেছে।

একজন কহিলেন—জাপানকে রুখতে হবে তা এখানে কি ? সিঙ্গাপুর যাও—

অপর ব্যক্তি কহিলেন—কম-অনিষ্ট পার্টির শোভাযাত্রা।

যাহাই হউক শচীনবাবুর আর কাজ করিতে ইচ্ছা ছিল না, তিনি বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে এক ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত, বলিলেন—আপনার নাম শুনে আলাপ করতে এলাম।

ভদ্রলোক মুখ-চেনা—নাম মণিবাবু। শচীনবাবু সাগ্রহে কহিলেন—বসুন, বসুন। আপনি দয়া করে এসেছেন সে পরম সৌভাগ্যের কথা।

চা পানের ফাঁকে ফাঁকে আলোচনা চলিতেছিল। মণিবাবু কহিলেন—ইস্কুল ত বন্ধই, আপনারও পড়াশুনোর এখন প্রচুর অবসর, আমাদের 'জনযুদ্ধ' এখন পড়ুন না, দু'চারখানা। এই যে শিক্ষার অবস্থা, স্কুল কলেজ বন্ধ করে বদেশী করা এর কি কোন মানে হয়—এর দ্বারা কি হবে ?

শচীনবাবু কহিলেন—ছুটি পেলাম, বেশ নিশ্চিন্তে দিনগুলো যাচ্ছে। এইটেই লাভ। ছেলেরাও একটু জিরিয়ে নিচ্ছে—

—একে কি বিপ্লব বলবেন ? এটা ত একটা হুজুগ।

—হুজুগ না হলে কি বিপ্লব হয় ? শান্ত মনে বিচার করে কাজ করে সবাই, কিন্তু বিপদের মধ্যে যেতে পারে ক'জন ?

—যুদ্ধটা আপনার কি বলে মনে হয় ? এটা···

—এটা অকৃত্রিম যুদ্ধ।

—এর কারণ ?

—ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধে নামা সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য, জাপানের সাম্রাজ্য অর্জ্জনের জন্য, আমেরিকার কিছু সুবিধে করে নেওয়ার জন্য, এমনি···

—এটা জনযুদ্ধ, যাকে বলে ক্লাস ষ্ট্রাগল। ফ্যাসিজম চায় শ্রমিক ও কৃষককে নিষ্পিষ্ট করে আপনার স্বার্থসিদ্ধি করতে, রাশিয়া তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এ যুদ্ধে যদি মিত্রশক্তি জিততে পারে তবে পৃথিবীর সকলেরই মুক্তি হবে—সকলেই স্বাধীন হবে, সুখী হবে।

শচীনবাবু হাসিয়া বলিলেন—তা হবে না। মানুষ সুখী কোন দিনই হবে না, ধনসম্পত্তির সমান ভাগের উপর সুখ দুঃখ নির্ভর করে না, তা হলে জগতে বড়লোকেরা অসুখী হ'ত না।

—আর যাই হোক রাশিয়া ত সাম্রাজ্যের জন্যে যুদ্ধ করছে না—it is for the people.

—নিজের লাভ না দেখলে কেউ যুদ্ধ করে না—এই আমার ধারণা।

—কিন্তু এই জনযুদ্ধের বিরুদ্ধে যারা পঞ্চমবাহিনীর কাজ করছে তারা কত বড় বিশ্বাসঘাতক।

—এটা জনযুদ্ধ নয়, এর বিরুদ্ধে কাজ করাটাও তাই বিশ্বাসঘাতকতা নয়। এটা সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধ, যারা এতে সহায়তা করবে তারা সাম্রাজ্যের ভিত পাকা করে দেবে। রাশিয়া যদি জনগণের জন্যই যুদ্ধ করে থাকে তা হলেও ভারতবাসীর সাহায্যের চৌদ্দ আনা যাবে সাম্রাজ্যবাদের খাতে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি যুদ্ধ-বিপ্লব এসব কিছুই পছন্দ করি না। খাও দাও পড়াশুনো করো এই চাই···

—তবে, আপনার ত শান্তির জন্যে চেষ্টা করা উচিত ?

—আমার ? তা হলেই ত অশান্তি ডেকে আনব, দরকার কি আবার অত শত দিয়ে।

—তবুও দেশের প্রতি আপনার একটা কর্তব্য রয়েছে।

—কিছু নয়। যেহেতু দেশ আমার প্রতি কোন কর্তব্য করে নি। নইলে...যাক সে কথা।

মণিবাবু হাসিয়া কহিলেন, ওটা অভিমানের কথা। আমি যতদূর জানি আপনার কথাই কেবল ছেলেরা শোনে, এ ক্ষেত্রে আপনারই উচিত তাদের এই সমস্ত বিপ্লবাত্মক ব্যাপার থেকে নিবৃত্ত করা। যাক্ আমি আমাদের পত্রিকা পাঠিয়ে দেব, বইও দেব কিছু কিছু পড়ে দেখবেন।

—তা দেবেন। সাম্যবাদ সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু পড়েছি, এবং মনে মনে লেনিন, ষ্ট্যালিন প্রভৃতিকে সত্যই শ্রদ্ধা করি—তাঁরা রাশিয়ার অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধন করেছেন।

মণিবাবু স্মিতহাস্যে কহিলেন, তা ত বটেই।

মণিবাবু প্রস্থান করিলেন।

পরদিন সকালে মীরা চা লইয়া আসিয়া শচীনবাবুর সামনের চেয়ারখানায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শচীনবাবু গত কয়দিনের ঘটনাগুলির কথা ভাবিতেছিলেন, ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার কি আর কোন কর্ত্তব্য নাই? তিনি কি শুধু নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র।

অকস্মাৎ মীরাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, কি বসে রইলে যে, কিছু বলবে?

—ওরা সকলে বলছে, সত্য তোমার এখানে যেরূপ আসা-যাওয়া করে তাতে তোমাকেই পুলিশ ধরতে পারে।

শচীনবাবু হাসিয়া কহিলেন, সত্য দোকানে চা খায়, দোকানীকেও ধরবে তা হলে।

—না, তোমাকে ধরবে বলছে সকলে।

—ধরলে কি করব, তুমি থেকো লাটুকে নিয়ে।

—সে কেমন করে হবে, আমি পারব না। তুমি এমনি ভাবে ভাসিয়ে দিয়ে যাবে—

সিঁড়িতে চটির শব্দ হইল—গীতা ও অঞ্জলি আসিতেছে।

তাহারা আসিয়াই কহিল, বৌদি আমাদের চা? চলুন চা নিয়ে আসি।

গীতা ও অঞ্জলি মীরাকে লইয়া অন্দরে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সত্য আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, সার, আজ আমাদের মিছিল বেরুবে, আর শহরে হরতাল তা তো জানেনই। চারটায় মিটিং হবে—যাবেন।

—হ্যাঁ যাবো বই কি?

সত্য হাসিয়া কহিল, আমি ত কয়েক দিনের মধ্যেই ডুব দিতে বাধ্য হচ্ছি। আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। বৃথা জড়াতে চাইনে আপনাকে, কিন্তু এ কাজ যে আপনি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে হবে না।

—আমি?

—হ্যাঁ, আপনি। আপনি ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না আমরা।

—কি কাজ?

—আমাদের টাকা পয়সা কিছু আছে এবং আরও আসবে। আপনার কাছে এগুলো গচ্ছিত রাখতে চাই।

সত্য কয়েকটি ছেলে ও মেয়ের নাম করিয়া কহিল, এরা টাকা চাইলে দেবেন এবং এনে দিলে রাখবেন। অন্য কেউ দিলেও রাখবেন—এই মাত্র। গীতা আর অঞ্জলি রইল তারা সাহায্য করতে পারবে—

শচীনবাবু স্মিতহাস্যে কহিলেন, হ্যাঁ শুনেছি এসব টাকা নিয়ে অনেকে কেঁপে গেছে, এবার যদি দুঃখ ঘোচে—

সত্য হাসিয়া কহিল, আপনি ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না।

তাহার পর চিঠিপত্রের সাঙ্কেতিক একটা পরিভাষা সে বুঝাইয়া দিয়া কহিল, আমরা এমনি ভাবে সংবাদ দেব, নইলে বিপদ আছে। পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া কহিল, এই ত নির্দ্দেশ। দু'চার জন মরবেই, অতএব সতর্কভাবে কাজ করতে হবে আমাদের। 'ডু অর ডাই' হচ্ছে নির্দ্দেশ—

গীতা ও অঞ্জলি আসিয়া কহিল, মিছিলের পুরোভাগে আমরা থাকব আজ সার, তাই আপনার পদধূলি মাথায় দিয়ে যাই।

তাহারা প্রণাম করিল।

—আশীর্ব্বাদ করবেন।

—শচীনবাবু মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলে চলিয়া গেল।

একটু পরে তিনি ভাবিয়া দেখিলেন—ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক তিনি সত্যর কথামত কাজ করিয়া যাইতেছেন এবং করিবার প্রতিশ্রুতি না দিলেও তাহারা বিশ্বাস করিয়া গিয়াছে যে তাহাদের কাজ তিনি করিবেনই। এত বড় বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে তিনি কেমন করিয়া আঘাত হানিবেন?

অপরাহ্নের দিকে মিছিল বাহির হইল—

পুরোভাগে গীতা ও অঞ্জলি জাতীয় পতাকা হস্তে—পিছনে শতাধিক মহিলা। তাহার পর দুই সহস্রাধিক লোক। কণ্ঠে তাহাদের তূর্য্যধ্বনির ন্যায় নিনাদিত হইতেছে—বন্দে মাতরম্, ভারত ছাড়ো—শচীনবাবুর সম্মুখ দিয়া শোভাযাত্রা চলিতে লাগিল, কিন্তু সত্য কোথায়। বহুক্ষণ খুঁজিয়া তিনি তাহাকে পাইলেন, পাশে পাশে যাইয়া শোভাযাত্রাকে সে পরিচালনা করিতেছে।

মোড়ের মাথায় পুলিশের বিরাট বাহিনী—শচীনবাবুর

বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিল বিরাট এই জনতার উপর গুলীবর্ষণ হইবে। গীতা অঞ্জলি এরা যে পুরোভাগে।

ধ্বনি হইতেছে—ভারত ছাড়—কিন্তু যাহারা এতদিন ভারতকে নিঃশেষে শোষণ করিয়া পুষ্ট হইয়াছে, তাহার কি সে মধুভাণ্ড স্বেচ্ছায় সুবোধ বালকের মত ত্যাগ করিবে? যদিই তাহারা যায় তবে সর্ব্বনাশ করিয়া দিয়া যাইবে।

শচীনবাবু শঙ্কাব্যাকুল চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। না জানি মোড়ের মাথায় কি বিপর্য্যয় ঘটিবে।

মিছিল ধীরে ধীরে মোড় অতিক্রম করিয়া চলিল, পুলিশ বাধা দিল না। মিছিলের একাংশ ধ্বনি তুলিল, 'স্বাধীন ভারতে বিশ্বাসঘাতকের'—অন্য অংশ প্রতিধ্বনি করিল—'বিচার হবে।'

পুলিসবাহিনীর অফিসারদের মুখে একটু হাসির রেখা খেলিয়া গেল।

মিছিল নির্ব্বিঘ্নে শহর পরিক্রমা করিয়া মাঠে সমবেত হইল। সভা আরম্ভ হইল। অনেকে বক্তৃতা দিলেন।

সকলের শেষে সভার প্রান্তে সত্য বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিল, তাহা যেমন আন্তরিকতাপূর্ণ তেমনি জ্বালাময়ী ভাষায় দৃপ্ত। তাহা জনগণের মনে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করিতে লাগিল। আজ দেশের সম্মুখে যে বিরাট কর্ত্তব্য রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া জীবনপণে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সে শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহ্বান করিল। বলুন আপনারা, বন্দেমাতরম্...বন্দেমাতরম্ ভারত ছাড়...ভারত ছাড়। জীবনপণে...স্বাধীনতা চাই—"

সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ইষ্টকখণ্ড সভাস্থলে পতিত হইল, সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই তাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজনকে আহত করিল। পরক্ষণেই একখানা ছোট ইট আসিয়া সত্যর কপালে লাগিল, দেখিতে দেখিতে তাহার দেহ রক্তাপ্লুত হইয়া গেল। সে পড়িয়া গেল।

একটা গোলমাল হইয়া সভা ভাঙিয়া গেল। কতকগুলি লোক ছুটিল—কম্যুনিষ্টরা ঢিল মারিয়াছে সভা পণ্ড করিতে—অদূরে বটবৃক্ষের তলায় কতকগুলি লোক লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা আক্রমণ করিল। একটা অনির্দ্দিষ্ট অনিয়ন্ত্রিত হট্টগোলের মাঝে মারামারি হইয়া গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঠ জনশূন্য হইয়া পড়িল।

শচীনবাবু ক্ষুব্ধমনে বাড়ী ফিরিতেছিলেন—এই জনসমুদ্রে কোথায় সত্য, কোথায় গীতা, কোথায় অঞ্জলি।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, রাস্তার মাঝে মাঝে অন্ধকার জমিয়া উঠিয়াছে, মিউনিসিপালিটির ক্ষীণ আলোকে তাহা গাঢ়তর বলিয়া মনে হইতেছে। অন্ধকারে হঠাৎ একটি ছেলে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শচীনবাবু কহিলেন—কে?

—আমি বিমল সার। সত্যদার তেমন লাগে নি, দিদিরা ভালই আছেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

—আর?

—কিছু কিছু জখম হয়েছে উভয় পক্ষে, তবে তা গুরুতর কিছু নয়—বিমল দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

শচীনবাবু আর একটু আগাইয়াই দেখেন লাঠি হাতে কয়েকটি যুবক উত্তেজিত ভাবে ছুটিতেছে। তাহারও প্রশ্নের উত্তরে একজন বলিল, দেখি ওদের একটাকে খুন করবই—

তাহারা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

একদল কনেষ্টবল বেটন হাতে দ্রুত মার্চ করিয়া চলিয়া গেল—শচীনবাবু ধীরে ধীরে বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

রাত্রি হইয়াছে, মীরা আলোর সামনে লাটুকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। শচীনবাবু আসিতেই মীরা কহিল, কোথায় ছিলে? এত গোলমাল, আমি ভেবে ভেবে সারা হচ্ছি—

শচীনবাবু কহিলেন, সকলে বেড়াচ্ছে আর আমি বেড়াতে বেরুলেই তোমার ভাবনা—

—মারামারি হচ্ছে যে?

—আমি কি মারামারি করতে গেছি? অত ব্যস্ত হলে চলবে কেন?

লাটু কহিল, বাবা আমাকে একটা নিশান বানিয়ে দেবে, আমি বন্দেমাতরম্ বলবো—

শচীনবাবু সস্নেহে তাহাকে কহিলেন, দেব বাবা। কাল সকালে বানিয়ে দেব।

মীরা খাবার আনিতে গেল। শচীনবাবু বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন—ইহা ত আরম্ভ মাত্র, কেবলমাত্র সরকার নয়, দেশের প্রতিক্রিয়াশীল লোকগুলির সঙ্গেও সমানে যুঝিতে হইবে। এঁরা সবাই ভারতীয়—কোথায় ইংরেজ, সমগ্র শহরে ত একটিও ইংরেজ নাই। এত শত্রু ঘরে বাহিরে এর মধ্যে সত্য ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, আজ তাহার কপালে দেশের ভাইদেরই দেওয়া রক্ততিলক।

...এই রক্ততিলকের ইতিহাস যেদিন লেখা হইবে সেদিন সত্যর স্থান কোথায় নির্দ্দিষ্ট হইবে? স্বাধীন ভারতের স্বপ্নই সে দেখিয়াছে কিন্তু তাহার বাস্তব রূপ কি দেখিতে পাইবে? দেশমাতৃকার চরণতলে আত্মবিসর্জ্জন দিবে কত কর্ম্মী, কত বীর, কত অজ্ঞাত অখ্যাত প্রাণ। তাহারা কি পাইবে, কি পাইয়াছে? শচীনবাবু তো নির্ব্বিকার দর্শকমাত্র।

মীরা খাবার লইয়া আসিয়া কহিল, কি ভাবছ? স্কুল ত বন্ধ আছে, চল আমরা দেশের বাড়ীতে যাই।

শচীনবাবু হাসিয়া কহিলেন, কোথায় যাবে? সর্ব্বত্রই এই গোলমাল।

মীরা ভীতভাবে কহিল, কিন্তু কি হবে? যদি তোমা'কে ধরে?—তুমি ওর মাঝে যেও না লক্ষ্মীটি।

—না না। আমি যাই নি, যাব না—তুমি বিশ্বাস কর। তোমাকে আর খোকাকে ফেলে আমি কোথায় যাব?

পরদিন সকালে সংবাদ পাওয়া গেল—

সত্যদের দলের বিশিষ্ট কর্ম্মী নগেন রায়ে বহিরাগত কতকগুলি লোককে নৌকায় তুলিয়া দিয়া ফিরিবার পথে নেতা মণিবাবুর ভ্রাতার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আহত হইয়াছে। তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, কিন্তু অবস্থা আশঙ্কাজনক। নগেন মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজের জবানবন্দীতে নাকি তাহার নাম করিয়াছে এবং সমস্ত ঘটনাই বলিয়াছে।

বিপ্লববিরোধী কর্ম্মীরা সকলে রাতারাতি শহর ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং সত্যদের দলের সব কয়জন বিশিষ্ট কর্ম্মীর নামেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে।

গীতা সংবাদগুলি দিয়া কহিল, তাই সত্যদার সঙ্গে আর দেখা হবে না, কিন্তু খবর পাবেন।

—তোমরা?

এখনও দেরী আছে বলে মনে হয়। গীতা হাসিয়া কহিল, বেশীক্ষণ থাকলে আপনার বিপদ আছে। আমি যাই—

গীতা চলিয়া যাওয়ার পরে শচীনবাবু কিছুক্ষণ ভাবিয়া ধীরে ধীরে অণিমা রায়ের ওখানেই রওনা হইলেন। অণিমা আপিস-ঘরেই একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, আসুন। অকস্মাৎ?

—হাঁা, সাহিত্য সমিতির একটা অধিবেশনের আয়োজন করা দরকার তাই এলাম।

শ্রীমতী রায় পরিচয় করাইয়া দিলেন, ইনি মিস্ বসু, স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রী।

—নমস্কার। আপনি নিশ্চয়ই সাহিত্য সমিতির সভ্য হয়ে সমিতির গৌরব বৃদ্ধি করবেন।

অবান্তর কিছুক্ষণ আলাপের পর মিস্ বসু বিদায় লইলেন। অণিমা রায় সকল সংবাদই পাইয়াছিলেন, শচীনবাবু তথাপি আদ্যোপান্ত জানাইলেন।

শ্রীমতী রায় একটু চায়ের যোগাড় করিয়া আসিয়া কহিলেন, এই গোলমালের মাঝে আবার সাহিত্য কেন?

মনটাকে চাপা দেবার জন্যে···। একটা কাজের ভার সত্য দিয়ে গেছে—আমার কাছে তাদের টাকাকড়ি সব গচ্ছিত রাখতে হবে এবং আমার উপরেই নাকি কেবল তারা আস্থা স্থাপন করতে পারে! ভাবছি এই সুযোগে যদি দারিদ্র্য ঘোচে, অনেকে ত বেশ গুছিয়ে নিচ্ছে।

শ্রীমতী রায় বলিলেন—ভাল পথই বেছে নিয়েছেন—আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হোক।

শচীনবাবু বলিলেন—কিন্তু একটা কথা বুঝিনি, সেটা হচ্ছে দাতাই বা কে গ্রহীতাই বা কে? যারা সব ছিল তারা তারা ত সব ফেরার? অবশ্য গ্রেপ্তারের ভয়ে নয়, কর্ম্মী আটকা পড়লে কাজ পণ্ড হবে এই জন্যেই ধরা পড়তে অনিচ্ছুক। শহর আপাততঃ নিষ্কণ্টক—কম্যুনিষ্টরা পলাতক, সত্যরা ফেরার।

শ্রীমতী রায় বললেন—তবে ত স্কুল খুলে দেওয়া যায়।

—হাঁা, আমাদের স্কুল বোধ হয় দু'চার দিনের মধ্যেই খোলা যেতে পারে।

—ধন্যবাদ।

কিছুক্ষণ অবান্তর আলাপ-আলোচনার পরে শ্রীমতী রায় বলিলেন—আপনাকে ভাল লোক বলেই জানতাম কিন্তু আপনার পেটে পেটে এত?

শচীনবাবু পরিহাস করিলেন—আমি নিরপরাধ—আমার পেটে কিছু নেই।

—আচ্ছা, টাকার বুঝি আপনার খুব বেশী প্রয়োজন হয়েছে।

—আমি—সরল মানুষ, আমাকে ব্যঙ্গ করবেন না।

সাহিত্য সমিতির সভার দিন নির্দ্ধারিত হইল, এবারের সভা হইবে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সেনের বাসায়। শচীন বাবু ফিরিয়া আসিলেন—এবার একটা জিনিষ তিনি লক্ষ্য করিলেন—মিস রায় আগেকার মত চঞ্চল হন নাই, আজ সম্ভবতঃ বুঝিয়াছেন যে ইহাই অনিবার্য্য পরিণতি।

বাসার সামনে একটি কনেষ্টবল দাঁড়াইয়া ছিল, ঢুকিতেই সে কহিল—মাষ্টার বাবু, দারোগাবাবু আপনাকে ডেকেছেন।

—কে?

—মামুদ হোসেন সাহেব, দরকার আছে।

শচীনবাবুর সমস্ত অন্তর মুহূর্ত্তে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ক্রোধ চাপিতে পারিলেন না, কহিলেন—সময় নেই আমার, দরকার হলে তাঁকে আসতে বলো। সকালের দিকে বাসায় থাকি—

কনেষ্টবল সেলাম জানাইয়া চলিয়া গেল—

ঘরের মাঝে অঞ্জলি বসিয়া ছিল। সে কহিল—দারোগার মেয়ের নাম রিজিয়া, তাকে পড়াতে বললে, না বলবেন না।

—না, আমি পড়াতে পারবো না।

অঞ্জলি কহিল—ওটা যে আমাদের দরকার সার।

—আচ্ছা ভেবে দেখব।

কিন্তু এই টিউশনি গ্রহণ করিতে মন কিছুতেই সায় দিতেছিল না। তাঁহার সমস্ত অন্তর আজ ইহাদের উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

ক্রমশঃ

ভারতের শিল্পোন্নয়ন কোন্ পথে ?

ডক্টর শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

[কেন্দ্রীয় শিল্প-সরবরাহ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা, প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউট অব সুগার টেকনলজি ও হারকোর্ট বাটলার টেকনলজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের যুগ্ম-সমাবর্ত্তন উৎসবোপলক্ষে প্রদত্ত পাণ্ডিত্য-পূর্ণ, মনোজ্ঞ বক্তৃতাটিতে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও রাশিয়ার শিল্পোন্নতির উজ্জ্বল ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় শিল্প-সম্প্রসারণে রাজনীতিক, শিল্প-গবেষক, শিল্পপতি এবং তরুণ শিল্প-বিজ্ঞার্থীর আশু-কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা স্বদেশহিতৈষী মাত্রেরই প্রেরণা-উদ্দীপক ও প্রণিধানযোগ্য।

এই অনুবাদটি ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব সুগার টেকনলজি (কাণপুর)-এর অধ্যক্ষ মহোদয়ের সৌজন্য ও অনুমতিক্রমে তৎপ্রকাশিত উক্ত ইংরেজী বক্তৃতা হইতে গৃহীত—অনুবাদক শ্রীহরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

আপনারা আমাকে এই সমাবর্ত্তন-উৎসবের পৌরোহিত্য করিতে আদেশ করিয়া সবিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন ; আমি ভাবিতেছিলাম, আমার প্রতি এই আহ্বান আসিল কেন ? আজ পূর্ব্বাহ্নে ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ-মহোদয়েরা আমাকে জানাইলেন যে, তার কারণ আপনারা এই উপলক্ষে সময় সময় এমন কাহারও কাহারও দ্বারা বক্তৃতা প্রদান করাইতে ইচ্ছা করেন, যাহার জীবনের অধিকাংশ সময় নেতৃত্বের খাতিরে অথবা সাধারণ্যের ইচ্ছার তাগিদে, ছাত্রদের মধ্যে কাটিয়াছে। এই পরিপূর্ণ উৎসব-গৃহটি সংযুক্ত প্রদেশ এবং এই নগরীর সমাজ-জীবন ও শিল্পক্ষেত্রে যাঁহারা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহাদের অনেকের উপস্থিতিতেই অলঙ্কৃত হইয়াছে। এই বিভালয় দুইটির বিভিন্ন প্রয়োগশালা আজ পূর্ব্বাহ্নে ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখার এবং তাহাতে পরিচালিত গবেষণার বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল ; অধিকাংশ বিষয়ই উদ্ভিজ পদার্থের প্রস্তুত-প্রণালী পরীক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট। যদি শিক্ষকগণ কোন কোন সময় মনে করেন যে, তাঁহাদের কর্ম্মোত্তম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উৎসাহোদ্দীপক অভিমত কিংবা বিত্তশালী ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে সতেজ না রাখিলে চলে না, তবে তাহা সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিকই বলা যাইতে পারে এবং এখানকার অনেকেই এই পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া আমার মনে হয়। ইহা অতি স্বাভাবিক যে, বর্ত্তমান গণ-তান্ত্রিকতার যুগে শিক্ষক ও ছাত্রগণ দেশসেবার জন্য বৃহত্তর সুযোগ ও অধিকতর সুবিধা পাওয়ার চেষ্টায় যত্নবান হইবেন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস—আমাদের দেশে প্রত্যেক শিক্ষক, গবেষক এবং ছাত্রের নিষ্ঠা ও কুশলতাপূর্ণ সেবার প্রয়োজন আজ যত বেশী, তত আর কখনও অনুভূত হয় নাই। দাসত্বের যুগ অতিক্রান্ত হইয়া স্বাধীনতার অরুণোদয়ে ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক যে, আমাদের দেশবাসী এই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়াছে—ভবিষ্যতে তাহারা পূর্ণতর জীবন উপভোগ করিতে পারিবে। তাহাদের ইহাও বিশ্বাস—যে বিশ্বাস

ডক্টর শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ সমাবর্ত্তন উৎসবে বক্তৃতা করিতেছেন। ডক্টর ঘোষের পার্শ্বে এস্, সি, রায়, (ডাইরেক্টর) মহাশয়কে উপবিষ্ট দেখা যাইতেছে

ব্যথায় সুর জাগাইয়া তোলেও বটে—জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে সব আপনাআপনি হইয়া যাইবে। আমাদের এই বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে ; আমাদের আত্মবিশ্বাস পোষণ করিতে হইবে, যাহার গভীরতায় আমরা আমাদের দুর্লভ লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারি। তবে, জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে, আর জ্ঞানের সহিত সম্পর্কহীন নিছক সাধু-ইচ্ছা কেবলই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়—এই দুইয়ের মধ্যে সুগভীর ব্যবধান বর্ত্তমান। এই জ্ঞানের ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ও শিল্প-শাস্ত্র এক বিশিষ্ট সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনাসমূহ যে সমস্ত সম্পদের উপর নির্ভর করে, তাহা যথাসম্ভব দূরপ্রসারী দৃষ্টি, উদ্যমশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত বিকাশ করিতে হইলে উত্তরোত্তর ক্রমবর্দ্ধমান হারে ব্যবহারিক শিক্ষার ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার জন্য গবেষণার ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক। সুতরাং আমাদের

বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান অধিকতর পরিমাণে সমস্তাসমূহ সমাধানের জন্ত প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে আমাদের ভূমি, বন ও খনি হইতে সম্পদসমূহ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে সমর্থ হই এবং শিল্পজ দ্রব্যসমূহ অধিকতর কুশলতার সহিত উৎপাদন করিতে পারি।

একটি প্রবচন আছে, নীতিকথার চেয়ে দৃষ্টান্ত অধিকতর কার্য্যকরী; তাই আমার মনে হয়, প্রাকৃতিক সম্পদ কার্য্যকরী করিয়া তোলার ব্যাপারে নূতনতর আগন্তুক হইলেও আজ যে দুইটি দেশ বিশ্বের মঞ্চে শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে আপন আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহাদের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্ততম মহান্ নেতা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন্ তাঁহার দেশবাসীর নিকট ক্রমাগতই প্রচার করিয়া বেড়াইতেন যে, মানুষের উন্নতির সুলভতম ও নিশ্চিত পন্থা হইতেছে—প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অনুশীলনে উৎকর্ষ সাধন করা। আমেরিকাবাসী তাঁহার এই উপদেশ অনুসরণ করিয়া লাভবান হইয়াছে এবং জগৎকে দেখাইতে পারিয়াছে যে, যে-কোন দেশই সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারী হইতে পারে, যদি সেই দেশ মাত্র দুইটি সর্ত্ত পরিপূরণ করিতে সমর্থ হয়; তার একটি হইতেছে—প্রাকৃতিক সম্পদ সেই দেশের থাকার দরকার; আর দ্বিতীয়টি হইতেছে, ঐ সম্পদ আহরণ করিয়া কাজে লাগাইবার মত প্রতিভাও ঐ দেশের অধিবাসীদের থাকা প্রয়োজন।

বহু বৎসর পূর্ব্বে হারবার্ট বিশ্ববিদ্যালয় ইহার প্রতিষ্ঠা-দিবসের ত্রিশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করিয়াছিল। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (Dean) আমাদিগকে ইহার ইয়ার্ডের (yard) চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখাইলেন—যাহাকে তিনি 'ইয়ার্ড' বলিয়া অভিহিত করেন, তাহা কতকগুলি সুপরিকল্পিত ও সুরক্ষিত ভূমি-সমষ্টি; যাহাকে বেষ্টন করিয়া বিশাল সৌধরাজি নির্ম্মিত হইয়াছে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,"আমেরিকার অন্তান্ত জায়গায় অনুরূপ ভূমিকে যেমন 'ক্যাম্পাস্' (Campus) বলে, আপনি তাহা না বলিয়া ইহাকে ইয়ার্ড বলিতেছেন কেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "তিন শতাব্দী পূর্ব্বে ধর্ম্মীয় স্বাধীনতাকামী ঔপনিবেশিকেরা (Pilgrim Fathers) বোষ্টন শহরে অবতরণ করেন; তখন তাঁহারাই চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাকারবেষ্টিত এই ইয়ার্ডটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা এখানেই রাত্রিতে বিশ্রাম করিতেন এবং নিজেদের গাভীগুলি রক্ষা করিতেন। এই ব্যবস্থার ফলে হিংস্র জন্তু বা রেড ইণ্ডিয়ান পশু-শিকারীরা উপদ্রব সৃষ্টি করিতে পারিত না। আর এই গাভীর দুগ্ধই এখানকার শিশুদিগকে পান করিতে দেওয়া হইত এবং তাহাতে এই 'ইয়ার্ডে' একটি শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ইহাই হারবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা করিল। একটি শিশু-বিদ্যালয় পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হওয়ার ব্যাপার সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক বিরাট উন্নয়নের প্রতীক-স্বরূপ। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ দেশের আদিম অধিবাসীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিক্ষেত্রের জন্ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে ক্রমাগত রক্ত-ক্ষয়ী সংগ্রাম ভিন্ন গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্তা সমাধানের অন্ত কোন উপায় ছিল বলিয়া জানিত না। আর সেই দেশ আজ পনর কোটি লোকের পুষ্টিরক্ষার উৎকর্ষে জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। দেশটিতে এখন খাদ্য-সামগ্রীর যেন বন্যা বহিয়া চলিয়াছে এবং জনসংখ্যার যে ২৫ ভাগ অধিবাসী কৃষিজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত। তাহারা শুধু সুষ্ঠুরূপে তাহাদের স্বদেশ-বাসীরই খাদ্য-সংস্থান করিয়া ক্ষান্ত নহে, পরন্ত আমাদের মত দরিদ্র দেশের লোকেদের জন্তও প্রচুর পরিমাণে খাদ্য-বস্তু উদ্বৃত্ত রাখিতে পারিতেছে এবং আমাদের কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারীরা যখন অন্নের জন্ত তাহাদের দ্বারে গিয়া করাঘাত করেন, তখন তাহার অত্যধিক মূল্যে উদ্বৃত্ত খাদ্য-শস্ত এই দেশে রপ্তানী করে। আমি আজ সকালবেলা সংবাদ-পত্রে পড়িলাম, তাহারা প্রতিবৎসর এক কোটি বিশ লক্ষ টন খাদ্যশস্ত রপ্তানী করিতে পারে। ঐ দেশের স্বাস্থ্য ও রোগ-নিরোধক ব্যবস্থা এত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যে, লোকের গড় পরমায়ু হইতেছে চৌষট্টি, যেখানে ভারতবাসীদের পরমায়ুর হার ত্রেইশে দাঁড়ায়। ইহা শুধু এইজন্ত সম্ভবপর হইয়াছে যে, ঐ দেশের জনগণের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে ক্রমশঃ অধিকতর আয়ত্তে আনার জন্ত অনবরত চেষ্টা চলিতেছে এবং আধুনিক পরিচালনা-পদ্ধতিতে উৎকৃষ্টতর নূতন নূতন দ্রব্য উৎপাদন, জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিকরণ এবং পশু ও গৃহপালিত পশুর উন্নতি-সাধন বিষয়ে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলিতেছে।

অবশ্য, এই যুক্তি দেখান যাইতে পারে যে, একটি ধীশক্তি-সম্পন্ন জাতির বহু বৎসরের ক্রমাগত চেষ্টার ফলে এই দৃষ্টি-আকর্ষণকারী অগ্রগতি সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু রাশিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করুন; সে জগৎকে দেখাইয়াছে যে সুবিবেচনা-প্রসূত জাতীয় পরিকল্পনা দ্বারা উন্নতির মন্দগতি ত্বরান্বিত এবং অর্থনৈতিক বিকাশ দ্রুততর করিয়া তোলা যায়। ১৯১৭ সনে যখন সেই দেশের রাজতন্ত্র বিপ্লবের বন্যায় ভাসিয়া গেল, তখন রাশিয়াতে সবেমাত্র শিল্পোন্নয়ন-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল এবং তখন তাহার অবস্থা ভারতবর্ষের মতই ছিল। রাশিয়ার জননায়ক বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক বিপ্লব চরম লক্ষ্য নহে; ইহার পর কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন ব্যাপারেও বিপ্লব আনিতে হইবে—যাহাতে প্রত্যেক নাগরিকের জীবনযাত্রার মান, উৎপাদনের নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত উন্নতির সুযোগ-সুবিধা ইউরোপের অধিবাসীদের সমপর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারে।

বিশ্লেষণ করিলে সর্ব্বশেষে এরূপ দাঁড়ায় যে, রাশিয়ার

অধিবাসীরা ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে—গৃহপালিত জন্তুর উপযুক্ত ব্যবহার এবং যন্ত্রপাতির প্রয়োগ দ্বারাই ধনের সৃষ্টি হয়—শুধু সদ্-ভাবনা দ্বারা ধন পাওয়া যায় না, কিংবা ভগবদ্ভক্তির ফলস্বরূপও ইহা আমাদের উপর বর্ষিত হয় না। আদিম যুগে কিরূপে ক্রীতদাসের শ্রমের উপর এবং পরবর্ত্তী যুগে দরিদ্রের সহিষ্ণুতার উপর ভিত্তি করিয়া সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল সে-কথা তাহারা বিস্মৃত হয় নাই; সেখানে আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল যে, বিজ্ঞানের অবদানে জগতের কোন কোন অংশে সভ্যতা জনসাধারণের সন্তোষবিধানের উপর ব্যাপক ভিত্তি স্থাপন করিয়া দাঁড়াইবার সকল প্রয়াস করিতেছে। এখন দেখা যাক, সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা কি?—সে চায়, শৈশবে উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইবার এবং বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা ও বয়স্থ হইলে তাহার দৈহিক এবং মানসিক গঠনের উপযোগী জীবিকা-সংস্থান; সে চায় সুন্দর বাসগৃহ, প্রচুর অন্নবস্ত্র তথা জীবনধারণের অন্যান্য সামগ্রী, রোগমুক্ত থাকার সঙ্গত ব্যবস্থা ও আয়ের কতক উদ্বৃত্তাংশ যাহা দ্বারা তাহার বিশ্রাম ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সুযোগ সম্ভবপর হইতে পারে। সমাজের এমন একটি চিত্র যাবতীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, মহাপুরুষ ও দার্শনিকদের স্বপ্নমাত্রই হইয়া রহিয়াছে, উপরিবর্ণিত স্বর্গরাজ্য মানব-ইতিহাসে কদাচিৎ রূপপরিগ্রহ করিয়াছে। ইহার প্রকৃত কারণ এই নহে যে, সর্ব্বকালেই মানুষের পাপের ফলে এরূপ হইয়া থাকে বরঞ্চ সত্য কথা এই যে, তাহার অবিগত উৎপাদন-পদ্ধতি ও করায়ত্ত যন্ত্রপাতি দ্বারা অতি অল্প দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পর্য্যাপ্ত পণ্যোৎপাদন করা মানুষের দৈহিক ক্ষমতার বাহিরে ছিল এবং কোন না কোন উপায়ে দুর্ব্বলকে তাহার শ্রমলব্ধ ফল হইতে বঞ্চিত করিয়া শুধু শক্তিশালী ব্যক্তিই উল্লিখিত জীবিকার মানে পৌঁছিতে পারিত।

শিল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ দেড় শতাব্দী পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহাতে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন, বণ্টন ও চলাচল বিষয়ে এক নীরব অথচ প্রচণ্ড শক্তি বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে। সভ্যতা গড়িয়া তুলিবার জন্য মানুষের দাসত্ব এখন একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। যন্ত্রই এখন অনায়াসে ক্রীতদাসের কাজ করিতে পারে এবং মানুষের আর সেই দুঃখকষ্ট সহ্য করিবার প্রয়োজন নাই। ইংলণ্ডে মাথাপিছু কর্ম্মক্ষমতার পরিমাণ মোটামুটি ততটুকু দাঁড়ায় যাহা ১৮০০ একক (Unit) বৈদ্যুতিক শক্তি নিষ্পন্ন করিতে পারে। এই কাজের শতকরা পাঁচ ভাগ মাত্র মানুষ বা গৃহপালিত জন্তুর দৈহিক শক্তিদ্বারা সাধিত হয় এবং বাকী সমস্তই গ্যাস, তৈল, বাষ্প ও বিদ্যুৎ-জাতীয় প্রাকৃতিক শক্তিদ্বারা সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। বৈদ্যুতিক শক্তির প্রতি একক দুই জন লোকের দৈনিক কাজ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। সুতরাং আমরা ইহা বলিতে পারি যে, ইংলণ্ডের প্রত্যেকটি অধিবাসীর জন্য দশটি যন্ত্র-ক্রীতদাস কাজ করিয়া থাকে। এই ক্রীতদাসগুলির কর্ত্তব্য কি? ইহারা নিপুণ প্রভুর সুবুদ্ধি-দ্বারা পরিচালিত হইয়া কাঁচামাল হইতে ব্যবহারোপযোগী মাল তৈয়ার করা, জমি চাষ করা, বীজ বপন করা, ফসল কাটা, লোক ও মাল চলাচলের ব্যবস্থা করা এবং কারখানায় নিজের জন্য বা বিদেশের সঙ্গে বিনিময়ের উদ্দেশ্যে দ্রব্য উৎপাদন করিবার কাজে লাগে। এখন মনে করুন, এই ক্রীতদাসগুলি ধর্ম্মঘট করিয়া বসিল এবং ইংলণ্ডের অধিবাসীরা সকল কাজ নিজের হাতে করিতে বাধ্য হইয়া পড়িল; তৎক্ষণাৎ কাজের পরিমাণ আগের তুলনায় বিশ ভাগের এক ভাগে নামিয়া আসিবে এবং দ্রব্যের উৎপাদনও সেই অনুপাতে হ্রাস পাইবে এবং যে 'বিস্তারিত' পরিকল্পনা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সর্ব্ববিষয়ক নিরাপত্তা-বিধানের জন্য পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। যেখানে রাশিয়ার প্রতি ছয় জন লোকের জন্য একটি যন্ত্র-ক্রীতদাস কাজ করিত, সেক্ষেত্রে ইংলণ্ডের প্রতিটি লোকের জন্য এইরূপ দশটি ক্রীতদাসকে কাজে খাটানো হইত। ইংলণ্ড কেন ধনী হইয়াছিল আর রাশিয়া কেন দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিল—ইহাই তাহার মূল কারণ।

ইহাতে রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, দেশের শিল্পোন্নতি একমাত্র সুলভ যন্ত্র-শক্তি, কাঁচামাল ও কুশলী শিল্পবিশারদের প্রচুর সরবরাহের উপরই নির্ভর করে এবং তজ্জন্য লেনিন সমগ্র রাশিয়ায় বিরাট আকারে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এতদ্বিষয়ে সহানুভূতিহীন বিদেশবাসীরা—যাঁহারা সেই গোঁড়া নীতিতে আস্থা রাখিতেন যে, শক্তি নিয়োজিত করার মত শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই শক্তি উৎপাদন করা দরকার—তাহারা লেনিনের এই 'বিদ্যুতীকরণ' পরিকল্পনাকে 'বৈদ্যুতিক হত্যাকরণ' পরিকল্পনা বলিয়া ব্যঙ্গ করিলেন। কিন্তু লেনিন ঠিকমতই আগের কাজ আগে করিয়া গেলেন এবং স্থির করিলেন যে, একবার সুলভে ও ব্যাপকভাবে শক্তি উৎপাদন করিয়া ফেলিতে পারিলে, শিল্পবিষয়ে অগ্রগতি অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে।

খনিজ পদার্থের জন্য অনুসন্ধান ও তথ্য-পরীক্ষা পরিকল্পনানুযায়ী যথারীতি আরম্ভ হইয়া গেল। যখন অস্মদ্দেশে ভূতত্ত্ববিদের সংখ্যা ছিল ১০০, তখন সোভিয়েট রাশিয়াতে ১০,০০০হাজার ভূতত্ত্ববিদ্ সমগ্র দেশে নিবিষ্ট মনে খনিজ পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ফলে, রাশিয়া তাহার ক্রমবর্দ্ধমান শিল্পসমূহের প্রয়োজনীয় যাবতীয় খনিজ পদার্থ ও খনিজ তৈল সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিল। দেশরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি খনিজ-দ্রব্য—যেমন, ক্রোম,

ম্যাগ্নেসিয়ম, ভেনাডিয়াম, অভ্র—এখন এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, রাশিয়া এইগুলি অনায়াসেই ইংলণ্ড ও আমেরিকায় রপ্তানী করিয়া থাকে।

রাশিয়ার শিল্প-বিশেষজ্ঞ গড়িয়া তুলিবার জন্য শিক্ষাদানের বিরাট ব্যবস্থা এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এমন একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অধ্যাপক জোফী লেনিনের আদেশক্রমে মাত্র তিন জন শিক্ষক লইয়া ফিজিকো-টেক্‌নিকেল্‌ ইন্‌ষ্টিটিউটের সূচনা করেন। রাশিয়ার সকল জায়গা হইতে মেধাবী ছাত্রগণকে ঐখানে আনিয়া একত্র করার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইল এবং জানাইয়া দেওয়া হইল, তাহাদের আহার ও শিক্ষার যাবতীয় ব্যয় রাষ্ট্র বহন করিবে। এই উদ্দেশ্যে বাঞ্ছিত অর্থের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করা হইল না, কারণ ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্যাবলী সমগুণ শ্রেণীর (Geometrical progression) হারে দ্রুত সম্প্রসারিত করিয়া যাইতেই হইবে। তাহাতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঐ বিভাগতনটি বিরাট আকারে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল—তখন ইহাতে ২০০০ হাজার শিক্ষক, ছাত্র ও শ্রমজীবী কাজ করিতেন। ঐস্থান হইতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন এমন নরনারীই ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে যে পঞ্চবার্ষিকী-পরিকল্পনাপরম্পরা কার্য্যে পরিণত করা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার পরিচালক ও কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। রাশিয়ার অধিবাসীরা জানিতেন যে, যে-কোন পরিকল্পনাকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে কর্ম্মনৈপুণ্যকে জপমন্ত্রের মত করিয়া লইতে হইবে। ফলে তাহাদের নিকট কয়লাখনির শ্রমিক ষ্টেখানভের দ্বারা, খনিতে নিযুক্ত শ্রমিকের উৎপাদন বহুপরিমাণ বৃদ্ধি করিবার কৌশলপূর্ণ উদ্ভাবনের সংবাদ, সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার সমগ্র স্থান জুড়িয়া পরিবেশন করার মত গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইল, অথচ ঠিক ঐ সময়ে সংঘটিত রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসনত্যাগের খবর সংবাদপত্রে সামান্যভাবে উল্লেখ করা হইল মাত্র।

এখন আমাদের অবস্থা কিরূপ দেখা যাক্‌। অর্থাৎ লেনিনগ্রাডের ফিজিকো-টেকনিকেল ইন্‌ষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার কিছু পূর্ব্বে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে এই ইন্‌ষ্টিটিউটের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই ইন্‌ষ্টিটিউট দুইটি ডি. ওয়াই. আর্থাওয়ালে, আর. সি. শ্রীবাস্তব, এস. সি. রায় এবং ডাঃ ডি. আর. মিত্রা ও তাঁহাদের সুযোগ্য সহকারিগণের পরিচালনায় ছাত্রদের শক্তির পূর্ণবিকাশের সুযোগ দিয়াছে এবং দেশের শর্করা ও তৈলশিল্পে বিভাগ দুইটির সেবাকে বিশিষ্ট অবদান বলা চলে। শিক্ষকমণ্ডলী তাঁহাদের কার্য্যাবলী শিল্পশিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে—যথা, চর্ম্ম ও পচাই (fermentation) শিল্প, কেমিক্যাল ইন্‌জিনিয়ারিং, ভারী রাসায়নিক দ্রব্য ও রংশিল্প, কাঁচ ও ভেষজদ্রব্য প্রস্তুত-প্রণালী শিল্প ইত্যাদিতে সম্প্রসারিত করিতে ইচ্ছা করেন।

১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে শিক্ষাক্ষেত্র বিষয়ে যে মান প্রচলিত ছিল তদনুযায়ী বিচার করিলে দেখা যাইবে, ইন্‌ষ্টিটিউট দুইটির কাজ খুবই ভাল হইয়াছে এবং কার্য্য-সম্প্রসারণের বিবেচনাধীন পরিকল্পনাগুলিও তথ্যানুমোদিত বলিয়াই মনে হইতেছে। তবে এই নবযুগে আমরা কি পুরাতন মাপকাঠিতেই নিজেদের পরিচালিত করিব? আমরা—যাহারা নাকি বিশ্বের জাতি-সমষ্টির মধ্যে যোগ্য স্থান অধিকার করার জন্য আজ পশ্চাতে পড়িয়া সংগ্রাম করিতেছি—এই সমস্ত অচল পরীক্ষাদ্বারা নিজেদের কাজের গুণাগুণ বিচার করিব? বরঞ্চ, আমি প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্মুখে অগ্রগতির মাপকাঠি হিসাবে এই প্রশ্নগুলি উপস্থাপিত করিব;—আমরা প্রত্যেক ভারতীয় কি প্রতিটি ইংলণ্ডবাসী বা আমেরিকাবাসীর মত সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, উদ্ভাবনক্ষম, সংস্কৃতিপ্রিয় ও স্বদেশহিতৈষী? আমরা প্রত্যেকে কি ব্যবহারিক শিল্পের পারদর্শিতায়, অর্থনৈতিক নৈপুণ্যে, সংগঠনক্ষমতা ও সমবেত প্রচেষ্টায় তাহাদের সমকক্ষ? যদি না হই, তবে কত শীঘ্র তা হওয়া সম্ভবপর?

যখন আমরা এইরূপ আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তখনই আপনাদের এই ইন্‌ষ্টিটিউটের মত বিদ্যালয়গুলি উজ্জ্বল হইয়া দৃষ্টিপথে পতিত হয়। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রাকৃতিক সম্পদের মতই বিপুল; অথচ আমাদের শতকরা ৮০ জন মধ্যযুগীয় কৃষকের মত নেহাত প্রাণধারণোপযোগী কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাপন করে; এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—মূর্খতা, ব্যাধি, অপুষ্টি ও সময় সময় দুর্ভিক্ষ। আজ আমার মনে পড়ে—একবার ওয়াশিংটনে বিদেশীয় অর্থনীতিক ব্যবস্থা-বিভাগের কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, যদি ভারতের চল্লিশ কোটি লোক এক বৎসরের জন্য আপন আপন কাজ হইতে ছুটি নেয়, তবে এতদুদ্দেশ্যে স্থানান্তরিত ৬০ লক্ষ আমেরিকাবাসী উৎপাদনের আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সমগ্র ভারতের লোকের খাদ্য ও কার্য্যের বর্ত্তমান প্রয়োজন মিটাইয়া দিতে পারিবে। ঠিক এই জায়গায়ই যে আমাদের অর্থনীতির দুর্ব্বলতা, ইহা সহজেই বুঝা যায়। এক জন লোক তাহার আদিম যুগীয় কলা-কৌশল ও পুরাতন যন্ত্রপাতি দ্বারা যে পরিমাণ ধনোৎপাদন করিতে পারে, তাহা একজন নিপুণ শ্রমিক আধুনিক যন্ত্রপাতিদ্বারা যে ধনোৎপাদন করিবে, তাহার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। যাহারা জানে, কিভাবে যন্ত্রকে ক্রীতদাসের মত খাটাইতে হয় এবং যাহারা দৈহিক পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে যান্ত্রিক শক্তি দ্বারা কার্য্য করিয়া যায় (যাহা আমি পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি) তাহাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অবধারিত। আমাদের স্ত্রী-পুরুষ পর্যন্তমিবে জন্মিয়াও স্বভাবতঃ যতটুকু বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হয়, তাহা একজন সাধারণ আমেরিকাবাসীর অপেক্ষা কম নহে।

যাহারা ২০০০ হাজার বৎসরেরও পূর্বে এই দেশে সেইদিনকার বিশ্বের বিস্ময়-উদ্রেককারী সভ্যতা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল, তাহদের আজিকার নরনারী তাদের ঐ সমস্ত পূর্বপুরুষের নিকট হইতেই এই উন্নত বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হইয়াছে। আপনাদের মত যে সমস্ত যুবক সাংস্কৃতিক ও শিল্প-শিক্ষার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপরই এই প্রধান কর্তব্য বর্তাইয়াছে—ভারতের শ্রমিকদিগকে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে বর্তমান সময়োপযোগী কুশলতা অর্জনে আপনাদিগকে এমনভাবে সাহায্য করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের কাজ, এখনকার মত যেন কাহারও সহনশীলতা কত বেশী তাহার প্রতিযোগিতা মাত্র না হইয়া—ইহা এক আনন্দময় উপজীব্যে পরিণত হইতে পারে। যে-দেশ প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ও বুদ্ধি-বৃত্তি-সম্পন্ন জনতার বাসভূমি সেই দেশ ব্যাপক ক্লেশ ও দারিদ্র্যের আবাসস্থল হইয়া থাকিবে, তাহা এক অসহনীয় সামঞ্জস্যহীনতার ব্যাপার;—ইহাতে আমাদের প্রত্যেকেরই লজ্জায় অভিভূত হওয়া উচিত এবং ইহা হইতে আমাদের জাতি যে বিশৃঙ্খল অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা দূর করার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হওয়া কর্তব্য।

যদি আমাদের জননায়কগণ ইহা উপলব্ধি না করিতে পারেন যে, আমাদের ভাবী কল্যাণ দেশরক্ষা ব্যতিরেকে অন্য যে সমস্ত সমস্যার সমাধানের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহার অধিকাংশই হইতেছে অর্থনৈতিক ও শিল্প-বিজ্ঞান বিষয়ক, তাহাতে এই বর্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থা দূরীভূত হইবে না। বিভিন্ন সমস্যা—যেমন, প্রাদেশিক সীমা নির্ধারণ, স্বয়ং-শাসিত অন্তঃরাষ্ট্র গঠন, প্রাপ্যপরিচয়েৎ সৃষ্টি, মাদকদ্রব্য বর্জন—এমনকি স্ত্রী-জাতির অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ও সন্তোষজনক সমাধানের জন্য আরও কিছু সময় অপেক্ষা করিতে পারে; কিন্তু যখন সমগ্র বিশ্ব অগ্রগতির দিকে চলিয়াছে, তখন ভারতের জনসাধারণ স্বভাবতঃই অধীর হইয়া, যে অর্থনৈতিক ক্লেশ তাহাদের সমূহ দুর্ভোগের কারণ হইয়াছে, তাহার আশু সমাধানের জন্য দাবি জানাইবে। তা ছাড়া আমাদের মধ্যে অনেকেই এই অশুভ আশঙ্কা করিতেছেন—যাহার অনেক নিদর্শন সুদূর প্রাচ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে—যদি আমরা ভারতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া না যাই, তবে সুব্যবস্থিত প্রগতি আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িবে। দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সেই পরিমাণ অর্থ সাধারণ ধনভাণ্ডার হইতে ব্যয় করিতে হইবে, যাহা পূর্বে কখনও সম্ভবপর বলিয়াই মনে করা হইত না। যখন এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য চাপ দেওয়া হয়, তখনই রক্ষণশীল অর্থনীতিকগণ ও অভিজ্ঞ শাসনকুশলীবৃন্দ অর্থাভাবের ধুয়া তুলিয়া থাকেন। আমি নিজে অর্থনীতিবিশারদ নহি; তবে, আজ আমার মনে পড়ে, লর্ড ওয়াভেল ভারতের বড়লাটের পদগ্রহণের পূর্বে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, কোন জাতিই অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, ব্যাধি প্রভৃতি শত্রুর রিপুকে রোধ করার জন্য সেই পরিমাণ অর্থোৎপাদনে সমর্থ হয় নাই, যে পরিমাণ অর্থ যুদ্ধবিগ্রহের জন্য ব্যয়িত হইতেছে। যে সকল শিল্পপতি বোম্বাই পরিকল্পনার প্রণেতা, তাঁহারা এক সুচিন্তিত মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, অর্থ দেশের অর্থনীতির পরিচালক নহে, তবু ইহার যন্ত্র ও পরিচারক মাত্র। দেশের প্রকৃত মূলধন দেশের দ্রব্য-সম্পদ ও গণশক্তি; আর অর্থ শুধু ঐ সম্পদকে কার্যোপযোগী করিয়া সুনির্দিষ্ট পন্থায় কোন বিশেষ কর্মপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করার উপায়-স্বরূপ। এই বিষয়ে আমরা সংযুক্ত রাজ্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া লাভবান হইতে পারি। যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে তাহাদের সাফল্যমণ্ডিত কার্যাবলী বিশ্বের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছে। তাহাদের জাতীয় আয় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ৫০০ কোটি পাউণ্ড হইতে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ৯০০ কোটি পাউণ্ডে বর্ধিত হইতে পারার মূলে আছে—তাহাদের প্রাকৃতিক সম্পদরাজিকে পূর্ণরূপে কার্যোপযোগী করিয়া তোলা এবং জনগণকে সম্পূর্ণরূপে কার্যে নিয়োজিত করিয়া রাখা। শ্রমিক-সরকার এই জাতীয় আয়ের শতকরা বিশ ভাগ অর্থাৎ ১৮০কোটি পাউণ্ড ভারী কলকব্জা, ছোট যন্ত্রপাতি, ইন্‌জিনিয়ারিং কারখানা, বিদ্যুৎ-সরবরাহ এবং শ্রমজীবীদের বাসগৃহ নির্মাণ ও কৃষি বিষয়ক উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন স্থির করিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের শিল্পবিশারদের সংখ্যা যথাসাধ্য বর্ধিত করার জন্যও চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, কৃতবিদ্য বিজ্ঞানীর সংখ্যা বর্তমানের ৫৫০০০ হইতে বাড়াইয়া ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ৯০০০০ হাজারে দাঁড় করান হইবে। এতদুদ্দেশ্যে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প-বিদ্যালয়ের প্রতি, যুদ্ধোত্তর কালের প্রথম দশকের ভিতরে সরকারী খরচে শিক্ষা শতকরা ৮০ গুণ সম্প্রসারিত করার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। যদি আমরা ভারতবর্ষেও জাতীয় আয়ের শতকরা ২০ ভাগ উৎপাদনক্ষম প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত করিয়া আমাদের জনগণের পুরাপুরি কাজ যোগাইতে পারি, তাহাদের শিল্প-নৈপুণ্য বিকাশের ব্যবস্থা করিতে পারি এবং ক্রমবর্ধমান পরিমাণে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্ভবপর করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে—একটি প্রাকৃতিক সম্পৎশালী দেশে দরিদ্র লোকের বাস—এই যে আপাতঃ অযোৎপাদক ব্যাপার আমাদের দেশে ঘটিয়া রহিয়াছে, তাহা আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এইরূপ নির্যাতিত, ক্ষুধার্ত, অশিক্ষিত এবং নিঃসহায় জনসাধারণকে একই স্বার্থ ও একই সংস্কৃতির ভাগিদে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত, সুখাদ্য-পরিপুষ্ট, শিক্ষিত, আত্মনির্ভরশীল ও ঐশ্বর্যশালী এক জাতিতে রূপান্তরিত করাই আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তরুণ সুধীবৃন্দ, আমরা আশা করি, আপনারা যাঁহারা এইবার উপাধিলাভ করিলেন তাঁহারা ঐরূপ লক্ষ্যে পৌঁছিবার কাজে নিজেদের উৎসর্গ করিবেন। আমরা ইহাও আশা করি, আমাদের জাতীয় সরকারের নেতৃত্বে ভারতে মানব-প্রকৃতি আত্মপ্রকাশের এক নূতন স্তরে পৌঁছিবে এবং ভাগ্যের কুটিল চক্রে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পিত নিষ্ক্রিয় আত্ম-সন্তুষ্টির পরিবর্তে জনগণের মধ্যে আনন্দ ও উন্নতির জন্য সবল প্রচেষ্টা দেখা দিবে। নবীন শিল্পবিজ্ঞানীরূপে আপনারা নিঃসন্দেহে ইহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে, শিল্পজগৎ আপনাদের শিল্পজ্ঞান কাজে খাটাইবে। যদি বুদ্ধিমত্তার সহিত চালিত না হয়, তবে আপনাদের কারিগরী নৈপুণ্য শ্রমজীবীর জীবন-বিকাশে কোন কাজেই আসিবে না। আপনারা যে প্রতিষ্ঠানের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন, তাহার নৈপুণ্য যেরূপ আপনাদের কাম্য, সেইরূপ যে সমস্ত লোক আপনাদের সঙ্গে অথবা আপনাদের অধীনে কাজ করিবে, তাহাদের সুখশান্তিও আপনাদের সবিশেষ বিবেচ্য বিষয় করিয়া লওয়া উচিত। আমার দৃঢ় ধারণা, আপনারা সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন, অনুকূল পারিপার্শ্বিকে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কার্য্য মনুষ্যত্ব-বিকাশের সহায়ক। আর চাপ দিয়া ভয়ের তাড়নে কাজ করাইয়া লইবার কাজ আদায় করা একরূপ ক্রীতদাস-চালানোর ব্যাপার।

আমার একান্ত বাসনা, আপনারা এই আদর্শের আলোক-বর্তিকা শিল্প, ব্যবসায় ও শাসন-ব্যাপার-সম্পৃক্ত বাস্তব জগতে বহিয়া লইয়া চলুন। আপনাদের ডিপ্লোমা বিদ্যায়তন দুইটির নিয়মপ্রণালী ও ঐতিহ্য অনুসারে অর্জিত জ্ঞানের চিহ্ন-স্বরূপ। তাহা এই বার্ত্তা বহন করিতেছে যে, এখন আপনারা সেই বিদগ্ধশ্রেণীর পর্য্যায়ে সমুন্নীত যাঁহারা আপন আপন জ্ঞানের শক্তিকে জগতের মহত্তর কল্যাণ কার্য্যে নিয়োজিত করেন। এই সৃষ্টি-স্পৃহা কিয়ৎপরিমাণে এখন আপনাদের জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। প্রার্থনা করি, আপনারা সানন্দচিত্তে এই সৃজনী প্রতিভা নিজেদের মধ্যে যথাশক্তি বিকশিত করিয়া তুলুন এবং আপনারা আমাদের সুখ ও সমৃদ্ধির অগ্রগতির পথে নেতৃত্ব করুন। যে জগৎ আপনারা গড়িয়া তুলিবেন, সেখানে কর্ম্ম-বিমুখতার পরিবর্তে কর্ম্মপ্রচেষ্টা, অজ্ঞতার পরিবর্তে জ্ঞান, অনৈক্যের পরিবর্তে ঐক্য, ঘৃণার পরিবর্তে প্রীতি বিরাজ করুক। আপনারা নবযুগের কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিয়া চলুন—

প্রভাতের জাগ্রত-জীবন পরমকল্যাণ
যৌবন-হিল্লোল আনে ত্রিদিব-সন্ধান।

দুর্দ্দিন

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

চুপ কর্ বীণ্‌কার সব গান সুর,
দুঃখের পাপ-দিন আজ ভরপুর
চারদিক ক্রন্দন বন্ধন ঘোর
চক্ষের লজ্জার নন্দন-দোর,
একদম ফাঁক ভাই ভূতপ্রেত দল,
কর্ম্মের সঙ্গী যে নেই মঙ্গল।
যাত্রার পথ কই? সৎ চিন্তার—
আজ সব সৎকার। সব নিন্দার
লজ্জার সব বোধ লাজ শূন্য
চিন্‌বার ভেদ্ নাই পাপ পুণ্য
দেশভর তস্কর বঞ্চক-দল,
দিন্‌রাত জন্‌গণ্ মন টলমল।
এর নাম গণরাজ? দুঃখের পুর,
কাব্যের নির্জ্জীব ছন্দের সুর।
লোহের ইঞ্জিন নেই তার প্রাণ,
গণরাজ মৃত্যুর নয় সন্ধান।
ভাইবোন সব্বাই আশ্রয়হীন,
মৃত্যুর পথ সব যায় রাতদিন।
বঞ্চিত জনগণ নিন্দায় ম্লান,
ইজ্জৎ যায় যায় নেই সংস্থান।

এক দিক অর্থের জৌলুষ লাল,
অন্যের দিক সব দীন কঙ্কাল।
চুপচাপ পিকশুক কণ্ঠের গীত
শিল্পীর চিত্তের নেই সম্বিৎ।
চারদিক ধর্ম্মের হিংসার ধূম,
সন্ধ্যায় ভণ্ডেরা গায় রামধুন।
স্বার্থের দাসরাজ নৈতিক দল,
কর্ম্মীর দল সব ঘুস্ চঞ্চল।
হুঁস্ নাই সেই সব লোকদের পায়,
চন্দন দেয় আর বন্দন গায়।
নেই লাজ কুণ্ঠাও ভয় গঞ্জন,
দেবরাজ রোষ-বাজ দাও বঞ্জন।
ষণ্ডার গুণ্ডার জয়জয়কার,
বর্ব্বর দন্তের নর-গণ্ডার,
উত্তাল গর্জিতে রোজ গর্জ্জায়,
বিদ্বান সজ্জন আজ লজ্জায়—
ভাস্কর নীচ শির নির্ব্বাক মুখ,
নির্ম্মম দৈবের এই কৌতুক!
চোখ বোজ সব লোক দেয় বিদায়,
গান রাখ্ বীণ রাখ্ আজ বীণ্‌কার!

গণেশ

বিদেশীয় চক্ষে হিন্দু দেব-দেবী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

শারদীয়া সমাগত। এ সময় হিন্দু-বাংলা জাতীয় উৎসবে মাতোয়ারা হইয়া উঠে। বস্তুতঃ হিন্দুর দুর্গোৎসব শুদ্ধমাত্র একটি পূজা-উৎসব নয়; ইহার সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিল্পসম্পৃক্ত এত সব বিষয় জড়িত হইয়া আছে যে, ইহাকে আমাদের জাতীয় উৎসব বলা আদৌ অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জন নহে। হিন্দুর দেব-দেবী সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা সময়োপযোগী, স্বাভাবিকও বটে। যে বিষয়টি আবহমান-কাল হিন্দুর জীবন-মূলে রস সঞ্চার করিয়া আসিতেছে, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে সেই পূজা-উৎসব সম্বন্ধে বিদগ্ধ জনের মনেও স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত আবশ্যক।

পৌত্তলিক বলিয়া হিন্দু-সমাজের এককালে বিশেষ নিন্দা হইয়াছিল। ইংরেজ আমলের প্রথম যুগে খ্রীষ্টানগণ হিন্দুর দেব-দেবীর উপর অযথা গালিবর্ষণ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। এই কার্য্যে যে শুধু খ্রীষ্টান পাদ্রীরাই লিপ্ত হইয়াছিল তাহা নহে, পাদ্রী ব্যতীত পদস্থ সরকারী, বেসরকারী ইংরেজেরাও সমস্বরে ইহার নিন্দাবাদ করিতে লাগিয়া যান। সার চার্লস গ্রাণ্ট, সার উইলবার ফোর্স প্রমুখ মানব-হিতৈষীরাও ইহা হইতে বাদ পড়েন না। তাঁহাদের মতে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তন দুই-ই তমসাচ্ছন্ন ভারত-বাসীর উদ্ধারের প্রকৃষ্ট পন্থা।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন এদেশে রাজ্য-বিস্তারে ও রাজ্য-সংরক্ষণে লিপ্ত। কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ ব্যক্তিগত ভাবে যাহাই ভাবুন, তাঁহারা তখন এই উভয় পন্থারই বিরোধী ছিলেন। ভয় পাছে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার এবং ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের দরুন ভারতবাসীরা কোম্পানীর শাসনের উপর বিদ্বিষ্ট হইয়া পড়ে। কোম্পানীর রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহাদের এ প্রকার ভীতির কারণও আর রহিল না। পাদ্রীদের খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচলনে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ তাঁহারা এ সকল বিষয়ে নানা ভাবে সাহায্যই করিতে থাকেন। ১৮৩৫ সনে বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কর্ত্তৃক ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন সরকারী ভাবে ধার্য্য করায় প্রথম আমলের দ্বিধা-সন্দেহের উপর পূর্ণচ্ছেদ পড়িল।

২

গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই হিন্দু দেব-দেবীর উপর পাদ্রীদের আক্রমণ অতিরিক্ত মাত্রায় আরম্ভ হয়। রামমোহন রায় হিন্দুদের মধ্যে একেশ্বরবাদ প্রচার দ্বারা সমাজে সংহতি স্থাপনের প্রয়াস পাইতেছিলেন। তিনি পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পাদ্রীদের অযথা নিন্দাবাদে তিনিও

ব্রহ্মা

নীরব থাকিতে পারেন নাই। তিনি পাল্টা খ্রীষ্টানী পৌত্তলিকতার উল্লেখ করিয়া ইহাই বুঝাইয়া দিলেন যে, সমাজে বিগ্রহ-পূজারও স্থান আছে। যাহারা উচ্চতম চিন্তাধারায় অভ্যস্ত হইতে পারে নাই এরূপ সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে বিগ্রহ-অর্চনার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট।

পাদ্রীরা কিন্তু ইহাতে নিরস্ত হইলেন না। তৃতীয় দশকে পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফের নেতৃত্বে তাঁহারা পুনরায় হিন্দু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করিয়া দেন। এখানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, পাদ্রী ডাফ বাংলাদেশে পদার্পণ করিয়া প্রথমে রাজা রামমোহন রায়ের নিকট হইতে বিশেষ সহায়তা লাভ করেন। একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁহাকে রামমোহনের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। রামমোহনের বিলাত গমনের পর তৎপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ও এই বিদ্যালয়টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। ডাফ, ডিয়ালট্রি প্রমুখ পাদ্রীরা খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে হিন্দুধর্ম্ম তথা হিন্দু দেব-দেবীর পূজার্চ্চনার নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা নব্যশিক্ষিত হিন্দু যুবকগণকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেও প্রয়াসী হইলেন। ক্রমে মফস্বলে গমনান্তর সাধারণ লোকদিগকেও নানা প্রলোভন দেখাইয়া খ্রীষ্টান করিতে তাঁহারা প্রবৃত্ত হন।

৩

পাদ্রীদের এই কার্য্যে প্রধান প্রতিবাদী হইলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের একেশ্বরবাদে গভীর বিশ্বাসী, দেশমধ্যে, বিশেষতঃ স্বদেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রচারকল্পে তিনি বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সকলই মূলতঃ এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও পরিপোষণের উদ্দেশ্যেও এই তিনটি উপায়ের মাধ্যমে কার্য্য চলিতে থাকে। কিন্তু একেশ্বরবাদে দৃঢ়বিশ্বাসী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও আলেকজাণ্ডার ডাফ প্রমুখ পাদ্রীদের হিন্দুধর্ম্মের উপর মিথ্যা আক্রমণের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করিতে বাধ্য হইলেন। ডাফ ১৮৩৫-৩৯ সনের মধ্যে বিলাতে ও আমেরিকায় মনের সাধে হিন্দুধর্ম্মের উপর গালিবর্ষণ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার এই সকল বক্তৃতা আবার *India and India Missions* নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। দেখিতে দেখিতে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণও বাহির হইয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় কয়েকটি প্রবন্ধে ইহার সমুচিত জবাব দিলেন। আবার ডাফ নিজ বিদ্যালয়ে কোমলমতি ছাত্রদের খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে অগ্রসর হইলে দেবেন্দ্রনাথ রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদী সমাজ-নেতাদের সম্মিলন ঘটাইয়া কিরূপে ইহার প্রতিরোধে অগ্রসর হইয়াছিলেন ঐ সময়কার সামাজিক ইতিহাসে ইহার সম্যক্ পরিচয় মিলিবে।

হিন্দু দেব-দেবী তথা হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ-গ্রাহ্য অংশের উপর এই যে বিদেশীয়, বিশেষ করিয়া ইউরোপীয় পাদ্রীদের আক্রমণ তাহার ফলে সমাজের শিক্ষিত লোকেরাও এ সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনান্তর ইহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন

বিষ্ণু

তেমন অনুভব করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাই সমাজের গভীরতম প্রদেশের সঙ্গে তাঁহাদের যোগাযোগ দৃঢ়ভাবে স্থাপিত

ঈশ্বর বা মহেশ্বর

কুবের
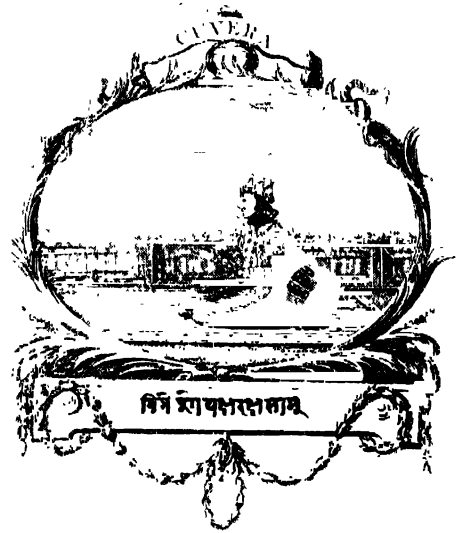
হইতে পারে নাই। বাঙালী-জীবনের সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে হইলে যে বস্তু হইতে তাহারা প্রাণরস আহরণ করিতেছে তাহার সহিত আমাদের যোগস্থাপন করিতে হইবে, এবং সহানুভূতি-পূর্ণ হইয়া তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। রাহুমুক্ত হইয়াও আজি আমরা যদি এরূপ আলোচনায় সানন্দে রত না হই তবে আর কবে হইব?

১

একটু আগে বলিয়াছি, মানবহিতৈষী ইংরেজগণও হিন্দুদের অধঃপতনের জন্য দেব-বিগ্রহার্চ্চনাকে সাক্ষাৎ-ভাবে এবং তাহাদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের অসদ্ভাবকে পরোক্ষভাবে দায়ী করিতেন।

বরুণ

সার উইলিয়ম জোন্‌সও এই শ্রেণীর ইংরেজ ছিলেন। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন এবং এদেশে ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হউক ইহাও কামনা করিতেন। মূর্ত্তিপূজক বলিয়া হিন্দুদের প্রতি কারুণ্যও প্রদর্শন করিয়াছেন। তথাপি মনে হয়, হিন্দুর দেব-দেবী সম্পর্কে নিরপেক্ষ এবং সহানুভূতিপূর্ণ আলোচনায় তিনিই প্রথম অগ্রণী হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদের ভ্রান্তপথগামী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও হিন্দু দেব-দেবীর মহিমা ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নিজ মনোভাব কবিতায় ব্যক্ত করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। কামদেব, প্রকৃতি, ইন্দ্র, সূর্য্য, নারায়ণ, গঙ্গা, লক্ষ্মী, ভবানী ও দুর্গার উপরে জোন্‌সের কয়েকটি কবিতা আছে। দুর্গা সম্বন্ধে তাঁহার কবিতাটির শেষ কয়েক পংক্তি এই:

"O Durga, thou hast deign'd to shield
Man's feeble [illegible] with celestial might,
Glid[illegible] f[illegible]om [illegible] on jasper field,
And, on [illegible] ho borne, hast brav'd the sight,
For, [illegible] the demon Vice thy realms defie[d]
And [illegible] with death each arched horn,
Thy golden lance, O Goddess mountain-born,
Touch but the pest—He roar'd and died."

কার্ত্তিকেয়

জোন্‌স-কৃত নারায়ণ ও লক্ষ্মীর কবিতাও উচ্চভাব ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সুললিত এবং মনোজ্ঞ। নারায়ণ সম্পর্কে তাঁহার কবিতার শেষাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল :

"Blue crystal vault, and elemental fires,
That in the ethereal fluid blaze and breathe,
Thou, tossing main, whose snaky branches wreathe
This pensile orb with intertwisted gyres;
Mountains, whose radiant spires
Presumptuous [illegible] their [illegible] the skies,
And blend their em'rald hue with sapphire light,
Smooth meads and lawns, that glow wi[illegible] [illegible]dyes
Of dew-bespangled leaves and blossoms bright,
Hence! [illegible]ish from my sight!
De[illegible] Pictures! unsubstantial shows!
My soul absorb'd One only Being knows,
Of all perceptions One abundant source
Whence every object [illegible]
Suns hence derive their fo[illegible]
Hence planets learn their course;
But suns and fading worlds I view no more;
God only I perceive; God only I adore."

৫

সার উইলিয়ম জোন্‌স কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের (বর্তমান হাইকোর্টের পূর্ব্বজ) বিচারপতি পদে নিযুক্ত হইয়া ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই প্রাচ্যবিদ্যা—সংস্কৃত, আরবি, ফারসিতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। কলিকাতায় আগমনান্তর প্রাচ্যবিদ্যা চর্চ্চায় রত অন্যান্য সুধীবর্গের সঙ্গে মিলিত হইয়া ১৭৮৪ সনের ১৫ই জানুয়ারী এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনিও হিন্দুদের বিগ্রহ-পূজার বিরোধী ছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কিরূপে সার্থকভাবে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করিতেন। তিনি উক্ত বৎসরেই "On the Gods of Greece, Italy and India" শীর্ষক গ্রীস, ইটালী এবং ভারতবর্ষের দেব-দেবীর উপরে একটি তুলনামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষে ১৭৮৮ সনে প্রকাশিত *Asiatick Researches* নামক প্রথম পুস্তকখণ্ডে এটি সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে চৌদ্দটি হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিচ্ছবিও প্রদত্ত হইয়াছে। সেকালে দেব-দেবীর যে ধরণের মূর্ত্তি প্রচলিত ছিল তৎসমুদয়ের মধ্যে তাহার ছাপ পড়িলেও ইহা হিন্দু শিল্পী বা মূর্ত্তিকারকের দ্বারা নির্ম্মিত বা খোদিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

এই সকল চিত্রে নাগরী অক্ষরে নির্দ্দিষ্ট দেবতার নামেরও প্রতিলিপি রহিয়াছে। তখন ভারতবর্ষে অক্ষর খোদাই সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। নাথানিয়েল হালহেডের বাংলা ভাষার ব্যাকরণের বাংলা অক্ষরগুলি কোম্পানীর পদস্থ কর্ম্মচারী প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌ সার চার্লস উইলকিন্‌স কর্তৃক খোদাই করা হয়। নাগরী অক্ষরেরও তিনি ছেনি কাটিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক একজন বাঙালীকে এই বিদ্যা শিখাইয়া যান। দেবতার প্রতিচ্ছবির নিম্নে নাগরী অক্ষরে যে সংস্কৃত লিপি রহিয়াছে তাহা সার চার্লস উইলকিন্‌সের খোদাই করা, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

কামদেব

৬

জোন্‌স সাহেব তাঁহার প্রবন্ধে এক একটি হিন্দু দেবতার উল্লেখ করিয়া তদনুরূপ গ্রীক ও ইটালীয় দেবতার উল্লেখ

করিয়াছেন। এই তিনটি দেশের কোথায় আগে কোন্ দেবতা পূজিত হইতেন তাহার কাল-নির্দ্দেশের মধ্যে তিনি যান নাই। প্রত্যেকটি দেশের দেবতার সাধারণ গুণ বা ক্ষমতার উল্লেখ করিয়া সাম্য বা বৈষম্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি আলোচ্য প্রবন্ধে যে-সব হিন্দু দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন এখানে তাহার প্রত্যেকটিরই উল্লেখের প্রয়োজন নাই, মাত্র কয়েকটির পরিচিতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। প্রবন্ধোক্ত ক্রম অনুযায়ী এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।—

গণেশ: প্রথমেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশের কথা জোন্স বলিয়াছেন। গণেশ রোমান দেবতা জেনাসের সমতুল। হিন্দুর সকল যাগযজ্ঞ,

গঙ্গা

উৎসব। গণেশ বা গণপতি-পন্থীরা সমাজে 'গাণপত্য' আখ্যা লাভ করিয়াছে।

ইন্দ্র: ইহার পর ইন্দ্র সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। ইন্দ্রের মধ্যে রোমান দেবতা জুপিটারের গুণাবলী কিছু কিছু বিদ্যমান। ইন্দ্র স্বর্গের রাজা, শচী তাঁহার সহধর্ম্মিণী। অমরাপুরী বা অমরাবতী তাঁহার রাজধানী। প্রাসাদের নাম বৈজয়ন্ত, প্রমোদ-উদ্যান—নন্দনকানন। তাঁহার ঐরাবত হস্তী, সারথি মাতলি, অস্ত্র বজ্র। ইন্দ্র বায়ু এবং বৃষ্টির দেবতা। তিনি অপরিসীম শক্তির অধিকারী।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ঈশ্বর বা মহেশ্বর: ইন্দ্র শক্তিশালী হইলেও এই তিন জন দেবতার শক্তির নিকট কিছুই নহেন।

রাম

কৃষ্ণ

পূজা-পার্ব্বণে সর্ব্বাগ্রে গণেশকে আবাহন করিতে হয়। যাবতীয় ঐহিক কর্ম্মের আরম্ভেও গণেশের নামোল্লেখ এবং পূজার্চনা প্রশস্ত। "গণেশায় নমঃ" এই উক্তি-দ্বারা গ্রন্থরচনা সুরু করা বিধেয়। দাক্ষিণাত্যে গণেশ 'গণপতি' নামে প্রসিদ্ধ। গণপতি-উৎসব সেখানকার জাতীয়

জিউসের সঙ্গে ইঁহাদের সাদৃশ্য আছে। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—এই তিন জন যথাক্রমে এই তিনটি গুণের অধিকারী। প্রত্যেকে পরস্পরের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্বদ্ধ। এইজন্য ইঁহাদের বলা হয়—একে তিন, তিনে এক। এক কথায় ব্রহ্মা সৃজনকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং ঈশ্বর বা মহেশ্বর ধ্বংসকর্ত্তা; অর্থাৎ, অভাবের

নারদ

ধ্বংস করিয়া তাহার স্থলে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি সদা নিরত। এ কারণ ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টি বা গঠনকার্য্যও নিহিত রহিয়াছে। ঈশ্বর বা মহেশ্বরকে গ্রীক দেবতা 'জোভ'-এর সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। তিনি ব্রহ্মাপ্রদত্ত অস্ত্রে দৈত্য-নিধনে লিপ্ত। তাঁহার আবাসস্থল কৈলাস পর্ব্বত। তিনি ত্রিলোচন, পত্নী দুর্গা, উমা বা হৈমবতী। তাঁহার বাহন শ্বেত ষাঁড়—সৃষ্টির চিহ্ন। 'ত্রিশূল' তাঁহার নিত্যসঙ্গী।

বরুণ: জলের দেবতা। রোমান প্রতিরূপ 'নেপচুন'। মহেশ্বর এবং দুর্গার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ। দুর্গোৎসব অন্তে দেবী জলে বিসর্জ্জিতা হন। জলের অন্য নাম জীবন। কাজেই জলের দেবতা মানুষের জীবন রক্ষা করেন। পদ-মর্য্যাদায় মহেশ্বর, এমন কি ইন্দ্রেরও নীচে তাঁহার স্থান।

কার্ত্তিকেয়: শিবপত্নী দুর্গার বহু নাম। পার্ব্বতী নামেও তিনি আখ্যাত। রোমান দেবতা 'জুনো'র গুণাবলী তাঁহার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার সঙ্গে পুত্র ষড়ানন কার্ত্তিকেয় নিত্য বিরাজমান। কার্ত্তিকেয়ের বাহন ময়ূর। কার্ত্তিকের রোমান দেবতা 'মার্গাস'-এর সমগুণসম্পন্ন। তিনি দেব-সেনাপতি। পুরাণে 'স্কন্দ' নামে বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাই পারসিক 'স্কন্দ' বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। তবে তাঁহাকে ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজাণ্ডার বলিয়া যে অনেকে মনে করেন তাহা একেবারেই ভ্রমাত্মক।

গঙ্গা: নদীর জলে দেবতা বিসর্জ্জন হিন্দুর পূজা-উৎসবের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। হিন্দুর নিকট তিনটি নদী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পবিত্র ও পূজ্য—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী। তিনটি নদী প্রয়াগে যে স্থানে মিলিত হইয়াছে তাহার নাম ত্রিবেণী বা ত্রিবেণীসঙ্গম। ঐ স্থানে সরস্বতী নদীর চিহ্নমাত্র নাই। সাধারণের বিশ্বাস—এখানকার সরস্বতী লুপ্ত হইয়া সঙ্গোপনে হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। এ কারণ ঐ স্থানটিরও এই নাম।

রাম ও কৃষ্ণ: ভগবানের দুই অবতার। রামের কীর্ত্তি-কথা রামায়ণে বর্ণিত। কৃষ্ণের পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকী। বৃন্দাবন এবং মথুরা তাঁহার বাল্য ও কৈশোরের লীলাভূমি। ভারত-যুদ্ধকালে তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন মহাভারতে তাহার বিবরণ পাওয়া যায়।

সূর্য্য: গ্রীক দেবতা এপোলো'র সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য বিদ্যমান। তিনি অশ্ব-রথে আরোহণপূর্ব্বক নানা দিক পরিক্রমা করেন। তাঁহার অশ্বিনীকুমার দুই যমজ সন্তান। চন্দ্র ঈশ্বরের আর একটি বিকাশ এবং পুরুষ-সন্তান। হিন্দুদের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে উদ্ভূত বলিয়া কোন কোন রাজবংশ যথাক্রমে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ বলিয়া কথিত হয়।

নারদ: ব্রহ্মার মানস পুত্র। রোমান দেবতা 'মার্কারী' বা গ্রীক-দেবতা 'হার্মিস'-এর অনুরূপ। সন্ধি-বিগ্রহে নারদ সুচতুর রাজনীতিক। সর্ব্বদা দৌত্য-কার্য্যে তিনি লিপ্ত। তিনি খুব উঁচুদরের সঙ্গীতজ্ঞ এবং বীণা-যন্ত্রের উদ্ভাবক। তিনি বীণা-সংযোগে সঙ্গীত দ্বারা ত্রিভুবন বিমোহিত করেন।

এ সকল ব্যতীত কামদেব, কালী, নারায়ণ, লক্ষ্মী

সান্নিধ্যলাভ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু তাঁহারা 'গস্‌পেলে'র সঙ্গে হিন্দু শাস্ত্রের সাদৃশ্যের কথাও বলেন। ঈশ্বরের অবতার বহু, তন্মধ্যে যীশুখ্রীষ্ট একটি।

বলা বাহুল্য, জোন্‌স এরূপ উক্তি সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে কোন মিশনরী বা পাদ্রী সম্প্রদায় দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে। এদেশীয় সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় 'মেসায়া' বা মানব-পরিত্রাতা যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব সম্পর্কে যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী হইয়াছে, তৎসম্বলিত পুস্তক রচিত ও প্রচারিত হইলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে। এতৎসত্ত্বেও যদি সাফল্যলাভ না করা যায় তাহা হইলে কুসংস্কার এবং মতিভ্রমতারই আধিপত্যের জন্য ক্ষোভপ্রকাশ করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করণীয় থাকিবে না। ("We could only lament more than ever the strength of prejudice and the weakness of unassisted reason".)

নরমুণ্ডোপরি গণেশ—নবদ্বীপ

প্রভৃতি সম্বন্ধেও জোন্‌স আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যে ধরণের আলোচনার পথ মাত্র দেখাইয়াছেন সে সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যানের বিশেষ অবকাশ রহিয়াছে। কোন কোন বাঙালী মনীষীও খণ্ডশঃ হিন্দু দেব-দেবীর সম্বন্ধে আলোচনায় ইতিপূর্ব্বে রত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

৭

জোন্‌স কর্ত্তৃক দেব-দেবী সম্পর্কিত আলোচনার নির্দেশ-মাত্র এখানে দেওয়া হইল। কিন্তু তিনি ইহার উপসংহারে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন এখানে তাহার উল্লেখ করাও কর্ত্তব্য। তাঁহার আলোচনা নিরপেক্ষ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সহানুভূতি-ব্যঞ্জক হইলেও তিনিও খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোকে হিন্দুদের অনুপ্রাণিত করাইতে প্রয়াসী ছিলেন। পূর্ব্বে ইহার আভাস আমরা পাইয়াছি। প্রবন্ধ-শেষে তিনি হিন্দু এবং মুসলমানদের কি ভাবে খ্রীষ্টধর্ম্মানুরাগী করা যায় তদ্বিষয়ে নিজ মত ব্যক্ত করেন। ইস্‌লাম ধর্ম্মের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্মের অনেকটা মিল থাকায়, মুসলমানদের খ্রীষ্টান হওয়া সম্পর্কে তিনি বিশেষ আশা পোষণ করিতে পারেন নাই। তবে হিন্দুদের সম্পর্কে তিনি নিরাশ ছিলেন না। তিনি লিখিয়াছেন—হিন্দুরা বলেন, ঈশ্বর এক, বিভিন্ন দেবতার মধ্যে তাঁহারই পূজা হয়। যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে যে দেবতারই পূজা করুন না কেন, তিনি ঈশ্বরেরই

মহিষমর্দ্দিনী—নবদ্বীপ

জোন্‌স হিন্দু দেব-দেবীর বিষয় আলোচনা করিতে গিয়াও খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের কথা ভুলিতে পারেন নাই। তথাপি হিন্দু দেব-দেবী সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত তুলনামূলক আলোচনার পথ-প্রদর্শক বলিয়া তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

কবিগুরু গ্যেটের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী

কাজী আবদুল ওদুদ

সুদীর্ঘ আয়ু গ্যেটের লাভ হয়েছিল। তাঁর সাহিত্যিক জীবন হয়েছিল যেমন দীর্ঘ তেমনি সমৃদ্ধ। কিন্তু এই দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ সাহিত্যিক জীবনে জাতির নিরবচ্ছিন্ন সমাদর তাঁর লাভ হয় নি। তাঁর তিরোধানের পরে বহু বৎসর পর্য্যন্ত জাতির অন্তরের পূজালাভ হয় তাঁর নয়, তাঁর বন্ধু শিলারের। তাঁর একালের ইংরেজ চরিতকার রবার্টসন বলেন: ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের পরে তার জাতি তাঁর প্রতিভার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাঁরসৃষ্ট সাহিত্য তাঁর স্বদেশে বিপুল ভাবে আলোচিত হয়। কিন্তু তা হলেও এ ব্যাপারটি দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে, তাঁর চিন্তা ও সাধনা আর তাঁর জাতির চিন্তা ও সাধনা প্রায় পরস্পর-বিরোধী হয়েছে। উগ্র জাতীয়তা সম্বন্ধে সুবিখ্যাত তাঁর এই উক্তি:

গোটের উপর বিজাতি বিদ্বেষ এক অদ্ভুত ব্যাপার। যেখানে চিত্তোৎকর্ষের যত অল্পতা সেখানে এর তীব্রতা তত বেশী। কিন্তু চিত্তোৎকর্ষের এমন স্তর আছে যেখানে এর সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে, ফলে অনুভাবকের স্থান লাভ হয় অনেকটা জাতীয়তার ঊর্দ্ধে, প্রতিবেশী জাতির দুঃখবিপত্তি তখন তার মনে হয় স্বজাতির দুঃখবিপত্তির মত।

কিন্তু উগ্র জাতীয়তা বহু সদ্গুণসম্পন্ন জার্ম্মান জাতির অবলম্বন হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতেই, আর বিংশ শতাব্দীতে তার পরিণতি যা হয়েছে তা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু শুধু জার্ম্মানী কেন, উগ্র জাতীয়তা, অল্প কথায় রক্তপিপাসু সংগ্রামমুখিতা, একালে মানুষের সমাজে ব্যাপকভাবে সক্রিয় হয়েছে—রাষ্ট্র, বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দল, সবারই সাধারণ পরিচয়-চিহ্ন হয়েছে এখন 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব—একথা বলা যেতে পারে। অবশ্য এ পথের ভয়াবহতা স্মরণ করিয়ে দেবার মত মনীষী একালে খুব কম জন্মগ্রহণ করেন নি। ইউরোপের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল জাতির এবং মানুষের প্রতি এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে লাঞ্ছিতও হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক জগতের প্রায় প্রতি জ্ঞান-কেন্দ্রে বর্ত্তমান সভ্যতার এই সঙ্কট সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছেন। আর মহাত্মা গান্ধী অহিংসা ও মৈত্রীর যে সম্ভাবনার ছবি জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা মূর্ত্ত করে গেছেন মানুষের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরেই লেখা থাকবে। কিন্তু তবু একথা অনস্বীকার্য্য যে, আজ মানুষের সাধারণ গতি অপ্রেম আর সংঘর্ষের দিকেই।

এই পরিবেশে উন্মাদনায় নিরানন্দ, ক্ষুদ্র-মহৎ পাপী-পুণ্যাত্মা নির্ব্বিশেষে মানুষের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টি, বিপ্লবে নয় অতন্দ্রিত প্রয়াসে ও বিকাশে আস্থাবান গ্যেটের প্রতি এ যুগের মানুষ, অর্থাৎ এ যুগের শিক্ষিত মানুষ, কোন্ দৃষ্টিতে তাকাবে? বহুবার বহু শক্তিধর তাঁর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছেন এই বলে যে তিনি প্রতিভাবান্ হলেও বুর্জ্জোয়া—সুখী দলের। আজকার প্রধান-দেরও কি তাঁর সম্বন্ধে তাই-ই বক্তব্য হবে? মনে হয়, তেমন নিঃশঙ্ক সিদ্ধান্তের পথে একালে এই বাধা উপস্থিত হয়েছে যে, 'উন্মাদনা', 'বিপ্লব' এ সবের দ্বারা ভাল যা সম্ভবপর তার সীমা আজ যেন মানুষ দেখতে পেয়েছে দেখতে পেয়েছে, উন্মাদনা আর বিপ্লব থেকে সংঘবদ্ধ হবার ক্ষমতা মানুষের মন্দ লাভ হয় না, বহুর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা যা সম্ভবপর হয় তাও প্রশংসনীয়, কিন্তু এই সব ভালর সঙ্গে মন্দ এই ঘটে যে ব্যক্তির স্বাধীনতা পায় লোপ, সাহিত্য, ইতিহাস হয়ে ওঠে শেখানো বুলি—বলা বাহুল্য এমন মন্দ ভয়াবহ মন্দ।

একালের ব্যাপক হানাহানি ও বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে এই একটি বড় সত্য অবশ্য মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে যে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ও মহৎ সম্ভাবনায় সব মানুষের অধিকার, জগতে নিরন্ন ও কর্ম্মহীন কেউ থাকতে পারে না। মূলত এ অতি প্রাচীন সত্য, প্রাচীন কালের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মনেতারা ও মনীষীরা এ সত্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ত্রুটি করেন নি, নিজেদের জীবনে এর যোগ্য দৃষ্টান্ত তাঁরা রেখে গেছেন। কিন্তু প্রাচীন সত্য হলেও এর যথাযোগ্য স্বীকৃতির দিকে মানুষের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করবার গৌরব একালেরই। অষ্টাদশ শতাব্দীর নব-মানবিকতা প্রচারের সময় থেকে এই একালের আরম্ভ বলা যেতে পারে।

গ্যেটের ঐতিহাসিক মর্য্যাদা সাধারণত এই অষ্টাদশ শতাব্দীর মানবিকতার এক ব্যাপক দৃষ্টান্ত হিসাবে। কিন্তু তাঁর সেই মানবিকতায় এমন সম্পদ আছে যার দিকে মানুষের দৃষ্টি তেমন আকৃষ্ট হয়েছে মনে হয় না, হলে তারা হয়ত এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হ'ত যে একালে মানবিকতার যে পর্য্যাপ্ত স্বীকৃতি লাভ হয়েছে গ্যেটেতে তার প্রাথমিক পরিচয় মাত্র নয় বরং এক পরম সার্থক বিকাশ—আজও যা অশেষ অর্থপূর্ণ। ভুলভ্রান্তি ও অক্ষমতাপূর্ণ মানুষের দিকে গ্যেটের দৃষ্টি শুধু ক্ষমাশীল ও সহানুভূতিশীল নয়, গভীর ভাবে শ্রদ্ধাশীল—মানুষ দেবতার অংশ এমন কোনো ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে নয়, কোন মানুষই সম্ভাবনাহীন নয়—এই চেতনা থেকে। এরই গুণে তরুণ বয়সে মানব-চরিত্রের কদর্য্যতার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত হলেও মানব-দ্বেষ অথবা সংস্কারকের অসহিষ্ণুতা তাতে দেখা দেয় নি; এরই গুণে বহুল পরিমাণে জাতির অনাদর পেয়েও অতি সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে এমন ধারণা পোষণ করতে তাঁর বাধে নি যে, এই উপেক্ষিত সাধারণ "সংযম, সন্তোষ, ঋজুতা, বিশ্বাস, সামান্য সাফল্যলাভে উৎফুল্লতা, সরলতা, অনন্ত কষ্টসহিষ্ণুতা" প্রভৃতি গুণের জন্য "ভগবানের সৃষ্টিতে যেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

সাধারণের প্রতি কারুণ্য ময় শ্রদ্ধা, আর উন্মাদনায় ও হিংস্রতায় অনাস্থা—গ্যেটের মানবিকতার এই দুই শ্রেষ্ঠ নির্দ্দেশ একালের সভ্যতার সঙ্কটে মানুষের পরম আশ্রয় হবারই যোগ্য।

২৮ আগষ্ট, ১৯৪৯।

সেদিন বাংলার জীবনে জোয়ার আসিয়াছে। বঙ্গভঙ্গের বেদনায় বাঙালী মর্ম্মাহত। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে সারা বাংলা তরঙ্গায়িত। সে তরঙ্গ ভারতের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। বাংলার কবি গাহিলেন,

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান।

রবীন্দ্রনাথের আশা কি সার্থক হইয়াছে? বাঙালীর ভাষা কি তাহার সত্তা বিস্তীর্ণ করিয়া, উপযুক্ত আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, সত্য হইয়া চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে?

গণপরিষদে প্রস্তাবরূপে এখনও পর্য্যন্ত গৃহীত না হইলেও রাষ্ট্রভাষার সমস্যা আত্যন্তিক উত্তেজনা, উষ্মা, আবেগ এবং বিতর্কের মধ্য দিয়া আসিয়া বর্ত্তমানে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে।— দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দীভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদালাভ করিবে বটে, তবে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের প্রথম পনের বৎসর ইংরেজীই রাজকার্য্য পরিচালনার ভাষা থাকিবে, সেই সঙ্গে প্রয়োজন হইলে হিন্দীও ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

বাধ্য হইয়া হিন্দীভাষা-ব্যবহারের আতঙ্ক পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতের অন্তরে একটা দারুণ দুঃস্বপ্নের মতই চাপিয়াছিল, পঞ্চদশ বর্ষের অবকাশ বুকের উপর এই অপ্রার্থিত বোঝার গুরুভারকে সাময়িকভাবে কতকটা লঘু করিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্যই কি নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইলাম?

হিন্দী যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইল। পনের বৎসর পরে ভারতরাজ্য তাহারই হইবে।

ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে আকাশ-বাতাস বাহ্যতঃ শান্ত থাকে। বর্ত্তমানের প্রশান্তির মধ্যে সমস্যাটিকে পুনর্ব্বিচার করা যাক।

১

রাষ্ট্রভাষাকে জাতীয় ভাষা নামে অভিহিত করা হয়। বলা হয়, সর্ব্ব প্রদেশের মধ্যে ভাববিনিময়ের জন্য একটি জাতীয় ভাষা না থাকিলে রাষ্ট্রের গৌরব থাকে না, কাজও চলে না। এতদিন ইংরেজীতে কাজ চলিতেছিল, কিন্তু ইংরেজী পরের ভাষা। অতএব জাতীয় ভাষার প্রয়োজন।

*সে আজ এগার বৎসরের কথা। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন প্রবলভাবে চলিতেছে। হিন্দী-প্রচারের জন্য [illegible] প্রদেশে প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি বাংলাদেশে [illegible]ন। তাঁহার সহিত বাক্যালাপ-কালে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করি। সন্তুষ্ট [illegible] সেই সূত্র ধরিয়া ১৩৪৫ সালের আষাঢ় মাসের [illegible] একটি প্রবন্ধ লিখি। আজ দেখিতেছি, তখনও [illegible] এখনও তেমনি জাতীয় ভাষা সম্বন্ধে নেতা ও পণ্ডিতদের চিন্তা ও ধারণার মধ্যে একটা অস্পষ্টতা রহিয়াছে। সেদিন লিখিয়াছিলাম।—

"রাষ্ট্রভাষার ইংরেজী নামকরণ হইয়াছে 'ন্যাশনাল ল্যাঙ্গোয়েজ'। রাষ্ট্র ও নেশন এক কি? নেশন কি? রাষ্ট্রই বা কি?

পূর্ব্বপুরুষ অভিন্ন বলিয়া যাহাদের ধারণা, ধর্ম্ম ও ইতিহাস এক, এবং সেই ঐক্যবোধের ফলে যাহাদের আচার ও মতের সাম্য ঘটিয়াছে, এমন একভাষাভাষী বহুতর মানবের সমষ্টিকে 'জাতি' বা people বলা চলে।

বহুসংখ্যক মানব যদি এক দেশে অবস্থান করে এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের ইচ্ছা বা অভিপ্রায় অনুসারে সাধারণ কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই একদেশবাসী মানবসমাজকে 'রাষ্ট্র' বা state নামে অভিহিত করিতে পারা যায়।

রাষ্ট্রে একটি মাত্র জাতি থাকা সম্ভব, আবার বহু জাতির সম্মিলনেও রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে। ফরাসী রাষ্ট্রে একটি জাতি। রুষ-রাষ্ট্রে বহু জাতি। যেখানে এক জাতি সেখানে এক ভাষা। যেখানে বহু জাতি সেখানে বহু ভাষা। একজাতিত্ব এবং একভাষিত্ব রাষ্ট্রের লক্ষণ নহে। রাষ্ট্রে বহু জাতি এবং বহু ভাষার স্থান আছে। 'পীপ্‌লে'র সহিত সমার্থক হইলেও আজকাল 'নেশন' শব্দটি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। রাষ্ট্রগত জাতি বা জাতিসমষ্টিকে নেশন বলিলে বিশেষ ভুল হইবে না। ভারতবর্ষে বহু জাতি-বর্ণ বাস করে।...ভারতবর্ষ যদি পরতন্ত্র না হইত তাহা হইলে বহুজাতিত্ব বা বহুভাষিত্ব হেতু তাহার একরাষ্ট্র হইতে বাধা ছিল না। একজাতিত্ব বাহ্যিক নিমিত্তমাত্র, অপরিহার্য্য গুণ নহে, হৃদয়ের মিলনে নেশন গঠিত হয়।

তাহা হইলে রাষ্ট্রভাষা প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য কি?...

লক্ষ্যের স্থিরতা থাকা চাই, উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা থাকা চাই। তাহা আছে কি? ভাবী রাষ্ট্রের কার্য্যসাধন-ব্যপদেশে রাষ্ট্রভাষা প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে, না দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বাক্যালাপের সুবিধার জন্য এই ভাষার প্রচলন-প্রচেষ্টা? অর্থাৎ ইহা রাষ্ট্রের ভাষা হইবে, না-সাধারণের ভাষা হইবে?

রাষ্ট্রের ভাষা সংস্কৃতির ভাষা, [illegible] বিনিময়ের ভাষা, রাজনীতি [illegible]

ভাষা। চিন্তাজগতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ সেই ভাষা হইবে তাহার বাহন। সে ভাষায় বাক্য ও অর্থের গৌরব থাকা চাই।

যাহা সাধারণের ভাষা তাহার ধর্ম্ম সুবোধ্যতা। তাহার মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা হইবার যোগ্যতা না থাকিতেও পারে। তাহা বাজারের ভাষা হইলেও চলে। তাহার মধ্যে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু আশা করিবার প্রয়োজন নাই।

হিন্দীভাষা-প্রচলনের উদ্দেশ্যের মধ্যে এইরূপ একটি অস্পষ্টতা আছে।...রাষ্ট্রের কার্য্যসৌকর্য্যার্থে ভাষার ব্যবহার এক কথা, সাধারণের বোধগম্য ভাষার প্রচলন আর এক কথা।"*

দারুণ দুর্দ্দৈবের বশে ভারতবর্ষ আজ বিভক্ত। তবুও ভারতবর্ষ অখণ্ড, অবিভাজ্য, এক, সমগ্রতার সুষমায় সমগ্রসীভূত।

এ কথা জানি। ভারতবর্ষের অপূর্ব্ব ঐক্যকে অন্তর দিয়া মানি।

ঐক্যকে মানি। তাই বলিয়া এই প্রকাণ্ড ভারতবর্ষের বিপুল বৈচিত্র্যকে লঘুভাবে অস্বীকার করিব কি করিয়া? চত্বারিংশ কোটি মানবের নিবাস মহাদেশপ্রায় এই বিশাল ভারতবর্ষ একটি রহস্যময় সংস্কৃতির সূত্রে বিধৃত। ছয় সহস্র বর্ষের ঐতিহ্যের উপর সে সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সিন্ধু-সভ্যতার ধারা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষা। তখনও ছিল, এখনও আছে। মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, শৌরসেনী প্রভৃতি বহু লৌকিক ভাষা দেশের বিভিন্ন বিভাগে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আজও বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, কানাড়ী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষা প্রদেশে প্রদেশে প্রচলিত। এ সকল ভাষায় লোকে কথা কহে। ইহাদের সাহিত্যও আছে। তন্মধ্যে দু-একটি ভাষার সাহিত্য কোন কোন পাশ্চাত্য জাতির সাহিত্যের সমতুল্য, কোন কোন বিষয়ে হয়ত শ্রেষ্ঠ।

ইহা বাস্তব সত্য। রাজনৈতিক ভাবনার বশে এই তথ্যকে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই।

ভারতভূমি এক ও বহুবিস্তৃত। এক দেশ, এক ভাষা এবং এক ধর্ম্মের দ্বারা বিধৃত হইলে তাহা শুধু আনন্দদায়ক নয়, অভূতপূর্ব্ব হইত। সেই এক এবং অবিচ্ছিন্ন ভাষার অতুলনীয় বিস্তৃতি হইত পৃথিবীর বিস্ময়। যাহা হয় নাই এবং যাহা হইবার নয় তাহা লইয়া পরিতাপের প্রয়োজন নাই।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের ন্যায় তাহার ভাষার বহুলতা প্রকৃতির দান। প্রকৃতির বিপর্য্যয় না ঘটিলে ভাষার বিপর্য্যয় ঘটিবে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শক্তির অপচয়। যাহা স্বাভাবিক তাহাকে অতিক্রম করিয়া অস্বাভাবিকের পশ্চাদ্ধাবন মরীচিকার পিছনে ছোটার মতই অসঙ্গত। কৃত্রিম ভাষার প্রচলনে ভাষার বহুত্ব ঘুচিবে না। রাজনৈতিক মস্তিষ্কসঞ্জাত হিন্দুস্থানী বা হিন্দী ভাষা স্বাভাবিকভাবে সমুদ্ভূত নয়। কৃত্রিম বলিয়াই তাহা পরিহার্য্য।

সত্য কথা বলিতে গেলে রাশিয়া-বর্জ্জিত ইউরোপ একটি অখণ্ড দেশ। খণ্ড ইউরোপকে এক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। যদি সে প্রয়াস সার্থক হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতের সেই অখণ্ড ইউরোপের রূপ কি হইবে, কে জানে? ভাষাই বা কি হইবে? তাহা কি ইংরেজী, তাহা কি ফরাসী, তাহা কি জার্ম্মান? তাহা কি ইতালীয়? তাহা ত সম্ভবপর নয়। সেই মহা-ইউরোপীয় রাষ্ট্রে মহাদেশভুক্ত সব দেশের ভাষাই রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা লাভ না করিলে মিলন বিরোধে পর্য্যবসিত হইবে।

ভারতবর্ষও ভবিষ্যতের সেই অখণ্ড ইউরোপের মত এক বৃহৎ দেশ—মহাদেশ না-ই বলিলাম। ভবিষ্যতের সেই মহা-মিলনের কল্পনা বর্ত্তমান ভারতবর্ষের পক্ষেও প্রযোজ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা এক জাতি, এক ধর্ম্ম, এক রাষ্ট্র, এক ভাষার স্বপ্ন দেখিতাম। তখনকার দিনে সে স্বপ্নের সার্থকতা ছিল। সে স্বপ্ন সেদিন সত্য ছিল বলিয়াই আমাদের প্রাণে প্রেরণা জোগাইয়াছে। তখন আমরা ভাবিতাম আমরাও বুঝি ইংরেজ বা ফরাসীর মত সম-উপাদানে গঠিত একটি জাতি। জাতির মধ্যে বিষম-উপকরণের কথা তখন আমরা ভাবি নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ন্যাশন্যালিজ্‌ম বা জাতীয়তার মাপ-কাঠি দিয়া আজিকার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ঐক্য এবং একরাষ্ট্রত্ব পরিমিত হইতে পারে না। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই আজিকার মিলনের মূলসূত্র। ইহাই বর্ত্তমানের ফেডারেলিজ্‌ম। আমেরিকার শতকরা আশি জন এংলো-স্যাক্সন। কাজেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাবে প্রভাবিত হইয়া সেখানে এক ধরণের ফেডারেশন সম্ভবপর হইয়াছে।

বিংশ শতাব্দী নূতনতর পরীক্ষার যুগ। অতীতে অপরিচিত নানা নূতন ভাব এবং নূতন প্রশ্নে আজিকার জীবন সমস্যা-সঙ্কুল। ভবিষ্যতের যে ইঙ্গিত আমরা পাইতেছি তাহারই আভাসে আজিকার নীতি নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

এক জাতি, এক ধর্ম্মের স্বপ্ন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে ভাঙিয়া গিয়াছে। প্রাদেশিক জীবনের সত্তা একান্তভাবে পিষ্ট করিয়া,

---

* প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৫: লেখক রচিত 'বঙ্গভাষা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শুদ্ধ অনুভূতিগুলিকে একত্রে তালগোল পাকাইয়া, একটিমাত্র ভাষাকে রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ভাষায় পরিণত করিবার চেষ্টা আজ না হয় না-ই করিলাম। আজ আমরা দেহের পরিমাপে গায়ের জামা তৈরি না করিয়া, জামার কাপড়ের পরিমাপে দেহকে সঙ্কুচিত করিবার অসম্ভব আয়োজনে লাগিয়া গিয়াছি। সুইজারল্যাণ্ডের মত ছোট দেশেও তিন ভাষায় রাষ্ট্রের কাজ চলে; কিন্তু আশ্চর্য্য এই, একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ হিন্দী ভাষার মধ্যে আমাদের বিরাট ভারতবর্ষকে পুরিতে হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভূদেব, রাজনারায়ণ অথবা কেশবচন্দ্র যদি হিন্দীর কথা বলিয়াই থাকেন তখনকার অবস্থায় সে যুক্তির হয়ত কতকটা সারবত্তা ছিল। আজ সে অবস্থাও নাই, সে মনোভাবও নাই। হিন্দী সে যুগ হইতে খুব বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই, সাহিত্য সম্পর্কে বাংলা আজ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা।

৪

হিন্দী মনোভাব যাহাদের পাইয়া বসিয়াছে তাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষের যেখানে যাও দেখিবে হিন্দী না জানিলে মুশকিলে পড়িতে হইবে। দিল্লী আগ্রা বেড়াইতে যাও দেখিবে হিন্দী ছাড়া চলে না, পঞ্জাবে যাও দেখিবে তাহা হিন্দীতে কাজ চলিয়া যাইবে। তাঁহাদের ধারণা উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষই যেন সমগ্র ভারতবর্ষ। বিশাল ভারতবর্ষের দক্ষিণ অর্দ্ধাংশ, পূর্ব্বেও ভারতবর্ষ আছে।

হিন্দীও আঞ্চলিক ভাষা, বাংলাও আঞ্চলিক ভাষা। এক আঞ্চলিক ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে আর এক আঞ্চলিক ভাষার অগ্রাধিকার অস্বীকার করিলাম। হিন্দীও সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা নয়, বাংলাও নয়, তামিলও নয়। শতকরা বিশ জন হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় না, শতকরা ত্রিশ জন হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় না। ইহা শুধু বিশ-ত্রিশের প্রভেদ, এই আধিক্য নিতান্তই আপেক্ষিক। অর্দ্ধাংশের উপর অর্থাৎ শতকরা ষাট হইলে, এমন কি পঞ্চান্ন হইলেও, সংখ্যাগুরুত্বের দাবী করা চলে। প্রচারের দ্বারা অভিভূত আমরা ত্রিশকে সংখ্যাগুরু বলিয়া ধরিলাম, বিশ-পঁচিশকে তাহাদের ভাষা পাওনা হইতে বঞ্চিত করিলাম।

জহরলাল বলিয়াছেন, হিন্দী জনপ্রিয় ভাষা—popular language। যাহা জনপ্রিয় তাহাকে সাধারণের ভাষা, common language অথবা lingua franca করা চলে, রাষ্ট্রভাষা নয়। যে ভাষা সর্ব্বোত্তম এবং মহত্তম তাহাই বরণীয়, তাহাই রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্য। স্বাধীনতা যখন পাই নাই, তখন পরীক্ষা করা চলিত। আজ পরীক্ষার দিন বিগত। দশ বা পনের বৎসরের চেষ্টার পর হিন্দীকে রাজাসন প্রদান করা হইবে। ভাষার মধ্যে যে রাণী তাহাকে বঞ্চিত করিব কেন? অকারণ সময়ক্ষেপ কেন? দশ বা পনের বৎসরে অন্য প্রদেশ বাংলা শিখিয়া লইতে পারে। শতকরা সত্তর বা পঁচাত্তর জনকে যদি হিন্দী শেখানো চলে, শতকরা আশী জনকে বর্ত্তমানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষা বাংলা শেখানো চলিবে না কেন? উত্তর-ভারতে হিন্দী চলে, উর্দু চলে। দক্ষিণ-ভারতে পূর্ব্ব-ভারতে তাহারা বোধ্য নয়, গ্রাহ্য নয়, জনপ্রিয় নয়। এক অঞ্চলের জনপ্রিয়তা অন্য অঞ্চল সম্পর্কে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

হিন্দী বা হিন্দুস্থানী একটি কৃত্রিম ভাষা, বিহার হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত লোকেরা কোনরূপে বুঝিতে পারে এমন একটি তৈরি-করা ভাষা। কাহারও অবলম্ব নয়, ইহা প্রস্তুত ভাষা। ইহাকে কোন বিশেষ অঞ্চলের ভাষা বলা চলে না। ইহা লেখ্য ভাষা, কথ্য নয়। দিল্লী বা লক্ষ্ণৌর অধিবাসী বারাণসী বা পাটনার অধিবাসীর মত কথা কহে না। অমৃতসরের অধিবাসী ভিন্নরূপ কথা বলে। ইহা বাংলার মত অখণ্ড ভাষা নয়। অতএব যাহা মূলতঃ লেখ্য ভাষা সেই হিন্দী-ভাষীর সংখ্যা নয় কোটি বা দশ কোটি ইহার অর্থ হয় না। এবং শতকরা ত্রিশ জনের ভাষা অতএব ইহা ভারতের সাধারণ ভাষা এই কথা বলিয়া লোকের উপর হিন্দী চাপানো চলে না। যাহা সাধারণ ভাষা, জাতীয় ভাষা বা lingua franca তাহা impose করা যায় না। সাধারণভাষা-গ্রহণ ব্যাপারটি সময়সাপেক্ষ। পারস্পরিক ভাববিনিময়ের সুবিধার জন্যই সাধারণ ভাষা। তাহা বাজারের ভাষা। রাষ্ট্রের কার্য্য পরিচালনার্থ যে ভাষার প্রয়োজন তাহা হইবে সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মক্ষম এবং সম্পদশালী।

বলিয়াছি, ভারতবর্ষ বিচিত্র হইয়াও এক। নানা খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়াও প্রাচীন ভারতবর্ষ এক ঐক্যসূত্রে বিধৃত ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি সমগ্রতা ছিল। রাজা যেখানে রাজত্ব করুক বা যে-ই রাজা হোক, একরূপ বিধি, একরূপ বিধান, একরূপ শাস্ত্রানুশাসনে সকলকে চলিতে হইত। ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত লোকে তীর্থযাত্রা করিত। রাজ্যভেদে বর্ণাশ্রমের প্রভেদ ছিল না। প্রাকৃত-জনে প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিত। তৎসত্ত্বেও সুদূরে তীর্থযাত্রা আটকাইত না, প্রবাসে ভাব-বিনিময়ের বাধা ঘটিত না। সর্ব্বত্র কিন্তু সকলেই সংস্কৃতে মন্ত্র পড়িত। রাজসভায় মন্ত্রণাপরিষদে রাজা এবং সভাসদেরা, বিদ্বৎসভায় পরিব্রাজক ও পণ্ডিতেরা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক ও ছাত্রেরা সংস্কৃতে কথা কহিত। সংস্কৃত ছিল স্মৃতির ভাষা, পুরাণেতিহাসের ভাষা, দর্শনের ভাষা, বিজ্ঞানের ভাষা, সাহিত্যের ভাষা। সংস্কৃত ছিল সংস্কৃতির ভাষা। এবং সংস্কৃতির ভাষা বলিয়াই সে সমস্ত খণ্ডত্ব অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

এই সংস্কৃত ভাষার উত্তরাধিকারী কে ?

ভাষার নিরিখ সাহিত্যে। সংস্কৃত সাহিত্য এত বিচিত্র, এমন ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়াই সংস্কৃত ভাষা এত নৈপুণ্য, এত যোগ্যতা লাভ করিয়াছে।

সুষ্ঠু প্রকাশের জন্যই ভাষা। যাহাতে পূর্ণ অভিব্যক্তি নাই সে ভাষা নিরর্থক। ভাষার অভিব্যক্তি সাহিত্যে। লোকগণনার দ্বারা নয়, সাহিত্যের দ্বারা আমরা ভাষার মূল্য নির্ণয় করি।

অভিধানের মধ্যে সব কথাই পাওয়া যায়। সেখানে শব্দগুলি স্থাণু, নিস্পন্দ। সাহিত্যে শব্দরাশি গতিশীল হয়। প্রতিভা সাহিত্যকে জীবন্ত করে। প্রতিভাবানের স্পর্শে শব্দ সচল, প্রাণবান, আবেগবান হয়। ভাষার অন্তর্নিহিত বিরাট সম্ভাবনাকে প্রতিভা সার্থক করে।

অতএব সাহিত্যের বিচারেই ভাষার বিচার করিব। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর চসারের প্রতিভা বহু dialect-এ বিভক্ত ইংরেজীকে এক করিল। তাঁহার ভাষাই ইংরেজী ভাষা বলিয়া গৃহীত হইল। দান্তের ভাষা সমগ্র ইটালীর ভাষা হইয়া উঠিল। হাই-জার্ম্মান লো-জার্ম্মানের প্রভেদ ঘুচাইয়া গ্যেটের ভাষা জার্ম্মানীর ভাষা বলিয়া গণ্য হইল।

সোনারূপার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। কিন্তু টাঁকশালের ছাপই তাহার মুদ্রামূল্য নির্দ্ধারিত করে। টাঁকশালের ছাপ পাইয়া ধাতু হয় প্রচলিত মুদ্রা—current coin। প্রতিভার ছাপ পাইয়া ভাষাও তেমনি current language হইয়া উঠে।

বাংলা ভাষার উপর প্রতিভার রাজকীয় ছাপ পড়িয়াছে। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—এমনি বহুতর প্রতিভার স্পর্শে বাংলাসাহিত্য উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময়। সে আজ তাই পৃথিবীর অন্যতম প্রচলিত ভাষা।

ভাষার মাপকাঠি প্রয়োগে, ব্যবহারে। জীবনযাত্রায় যত বিভাগ আছে সাহিত্যেও তত শ্রেণীবিভাগ। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, আইন, বিচারব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ক্রীড়া, অভিনয়, শিক্ষা, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি—এ সকলেরই প্রকাশ সাহিত্যে। সাহিত্য ভাষাগত। বাংলাভাষা জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

শতাধিক বর্ষ ধরিয়া আমরা ইংরেজীর চর্চ্চা করিয়া আসিতেছি। এই ভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন। জীবিকা-নির্ব্বাহের ভাষাও ইংরেজী। সেদিনের সংস্কৃতের মত জ্ঞানার্জ্জনের ভাষা আজ ইংরেজী। এই ভাষার মধ্য দিয়াই আমরা বিশ্বের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছি।

এক দিকে বঙ্গভাষা ইংরেজীর প্রাণশক্তি, প্রকাশ-কুশলতা, সাবলীলতা ও বৈচিত্র্যের অধিকারী হইয়াছে, আর এক দিকে সংস্কৃতের মহিমা, ভাবগৌরব, শব্দের অজস্রতা, শব্দগঠনের কৌশল, মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সে উত্তরাধিকারী। এই দুই সাহিত্যের সংস্পর্শে বঙ্গ-সাহিত্য ও ভাষা প্রাণবান, প্রবহমাণ, বেগবান, বর্দ্ধনশীল, বিবর্তনশীল, বশীকরণপটু, শোভাময়, বৈচিত্র্যপূর্ণ, নবনবরূপোল্লাসিত, এবং জগৎ ও জীবনের সর্ব্ব-ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইয়া উঠিয়াছে।

একদিন সংস্কৃত ছিল সংস্কৃতির ভাষা। ফার্সী সংস্কৃতকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। সংস্কৃতের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল ইংরেজী। এক বাংলা ছাড়া ইংরেজীর স্থান কে-ই বা গ্রহণ করিতে পারে ?

শতাধিক বর্ষের অক্লান্ত সাধনায় যে বঙ্গসাহিত্য জগৎসভায় স্থান পাইয়াছে সেই সাহিত্যের ভাষা কি ভারত-সভায় স্থান পাইবে না ?

৭

সে দিন লিখিয়াছিলাম—

"হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইতে চায়। স্পর্দ্ধার কথা বটে। স্বাধীন ভারতবর্ষে সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা ছিল। একদা মৃত্তিকাপ্রোথিত, অতীতের অপূর্ব্ব নিদর্শন, সুবর্ণখচিত এক সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিয়া তদুপরি আরোহণের উপক্রম করিলে ভোজরাজকে দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা বার বার প্রশ্ন করিয়াছিল—তাঁহার যোগ্যতা কি ? ভোজরাজ যোগ্যতা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য রূপী বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসনে বসিবার যোগ্যতা যদি কাহারও থাকে তাহা বাংলার। অন্যের নাম না-ই করিলাম – বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যে সাহিত্য কালিদাসের কাব্যে, ভাস-ভবভূতির রচনায়, পাণিনি ভাস্করাচার্য্যের তথ্যবিচারে ঐশ্বর্য্যশালী, সেই গৌরবময় সংস্কৃত সাহিত্যের অবিসম্বাদিত উত্তরাধিকারী এক-মাত্র বাংলা সাহিত্য।"*

সে দিন গর্ব্ব ছিল। আজ ভাবিতেছি, আমার সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডুবিয়া গেল। বিক্রমাদিত্যের শূন্য সিংহাসন সত্যই যে আজ ভোজরাজ দখল করিয়া বসিল। বাংলার শত বর্ষের সাধনা সার্থক হইল কই ?

৮

আজ দেশের একটা অংশকে হিন্দী মানসিকতায় পাইয়া বসিয়াছে। যাহা প্রতিভার দ্বারা লব্ধ হইল না, প্রচারকার্য্য ও দলবদ্ধতার সাহায্যে, কূট-কৌশলের বলে তাহা লাভ করিবার বণিকবুদ্ধিকেই আমি হিন্দী মানসিকতা আখ্যা দিতেছি। একদা যে বুদ্ধিতে কংগ্রেস-যন্ত্রটিকে আয়ত্তে আনিতে ইহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, সেই বুদ্ধি বিস্তার করিয়াই ইহারা হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার আসনে বসাইতে চায়। হিন্দী মানসিকতা হইতে মুক্ত না হইলে জীবন ও রাজনীতি নির্ম্মল হইবে না। ভাষা ও সাহিত্য জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

* "রাষ্ট্রভাষা", প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৫৫

বলিয়াছি, সাহিত্যের মূল্যেই ভাষার মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। ভাষার উপকরণে আমরা সাহিত্যের প্রতিমা গড়ি। প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে প্রতিভা।

কাহার রচনা দিয়া আমরা হিন্দী সাহিত্যের পরিমাপ করিব? প্রেমচাঁদের কথা শোনা যায়। প্রেমচাঁদ বাংলার বর্ত্তমান বহু লেখকের অপেক্ষা বড় নয়।

বিতর্কে তুলসীদাসের নাম প্রায়ই উচ্চারিত হয়। তুলসী-দাস মহৎ। কিন্তু তুলসীর রামচরিত লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে প্রচলিত আওয়াধি ভাষায় রচিত। সে হিন্দী আমাদের পরিচিত হিন্দী নয়। তা ছাড়া অতীতের দ্বারা বর্ত্তমানের পরিমাপ সম্ভব হইলে কৃত্তিবাস বা চণ্ডীদাসের মাপকাঠিতে আমরা বাংলা ভাষার পরিমাপ করিতে বসিতাম। চণ্ডীদাসকে দিয়া বাংলার, বিদ্যাপতিকে দিয়া মৈথিলের, তুকারামকে দিয়া মারাঠির, তিরুবল্লুবরকে দিয়া তামিলের পরিমাপ করিতে যাওয়া, তুলসীদাসকে দিয়া হিন্দী ভাষার মূল্য নির্ণয় করিতে যাওয়ার মতই বিচিত্র ব্যাপার।

কাব্য ভাষার প্রাণপ্রাবল্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। গদ্য প্রয়োজনের ভাষা, ব্যবহারের ভাষা, প্রাত্যহিকতার ভাষা। কোন ভাষা কতটা কর্ম্মক্ষম, তাহার নির্দ্দিষ্টতা, স্পষ্টতা, তাহার প্রকাশ-শক্তির পরিচয় গদ্যেই পাওয়া যায়।

বহু প্রতিভাবান লেখকের সাধনার ফলে শতবর্ষের মধ্যে বাংলা গদ্য যে-কোন শ্রেষ্ঠ ভাষার গদ্যের সমতুল্য হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দী গদ্যে কাহার সাধনাকে আমরা অভিনন্দিত করিব?

৯

মাতৃস্তন্যের সহিত আমরা মাতৃভাষা পান করিয়াছি। দেশের মাটির রসে আমাদের দেহ এবং ভাষার রসে আমাদের মন পুষ্ট হইয়াছে। অন্যতর ভাষার সে শক্তি থাকে না, থাকিতে পারে না। জীবনের সহিত বিযুক্ত যে ভাষা তাহা নির্জীব, বলহীন। শক্তিহীন ভাষা জাতিকে শক্তিহীন করে। বলহীনের দ্বারা জাতীয় চরিতার্থতা লভ্য নয়।

মাতৃভাষার মধ্যে যে প্রাণস্পর্শ লাভ করি শেখা-ভাষার মধ্যে সে প্রাণস্পর্শ পাই না বলিয়া তাহা সাধারণতঃ সাহিত্যে রূপান্তরিত হয় না। হিন্দী যদি রাষ্ট্রের ভাষাই হয় তবুও তাহা বাহিরের ভাষাই থাকিয়া যাইবে। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা।

ইংরেজীতে 'হ্যাণ্ডিক্যাপ' বলিয়া একটি কথা আছে। ঘোড়দৌড়ে নিকৃষ্টতর অশ্বগুলি অসমপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাহাতে একান্তভাবে পরাজিত না হয় এই উদ্দেশ্যে তেজস্বী ও দ্রুতগামী ঘোড়াগুলির পিঠে আনুপাতিক ভার চাপাইয়া দেওয়া হয়। Handicapped বাঙালীকেও এইরূপ হিন্দী রাষ্ট্রভাষার বোঝা বহন করিয়া রাজকার্য্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে।

যে সাহিত্য মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত গড়িয়া তুলিল তাহা রূপে রসে, ভাবে ভঙ্গিমায়, মার্দ্দবে কৌশলে, সৌষ্ঠবে নৈপুণ্যে অনুপম। সে সাহিত্য ভারতবর্ষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

ভারতবর্ষের অধিদেবতা ভারতীর করকমলে আমরা এই ভাষা ও এই সাহিত্য, এই অস্ত্র ও এই বীণা তুলিয়া দিয়াছি। ভারতবর্ষের জনসাধারণ যদি সেই অপূর্ব্বঝঙ্কৃত বীণাধ্বনি শুনিতে বিরত হয়, যদি তাহারা সেই অসাধারণ শক্তিশালী বজ্র ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয়, তাহা হইলে বলিব তাহা ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য। বলিব, হায়রে দুর্ভাগা দেশ, শতবর্ষের সার্থক সাধনাকে তুচ্ছ করিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করিলে; অতীত ঐশ্বর্য্যকে পায়ে ঠেলিয়া, হে দরিদ্র, তুমি নিজেকে চিরবঞ্চিত করিলে। বর্ত্তমান ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সাধনার পরিচয় বঙ্গ-সাহিত্যে নিবদ্ধ।

১০

বাংলা শুধু রসসাহিত্যে সমৃদ্ধ নয়, জ্ঞান-সাহিত্যেও সে গরীয়ান। পাশ্চাত্যের অগ্নিক্রাক্করকে যেমন সে অবলীলাক্রমে আপন করিয়া লইয়াছে, ম্যাক্সওয়েলের ভূতকেও সে তেমনি অনায়াসে আয়ত্ত করিয়াছে। ঋগ্বেদের অনুবাদ, রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ, ষড়দর্শনের ব্যাখ্যা ও আলোচনা, উপনিষদ্‌গুলির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, সংস্কৃত কাব্য ও নাটকসমূহের অনুবাদ বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। দার্শনিক গবেষণা, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, নৃতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা, বৈদিক ও পৌরাণিক অনুসন্ধান—বঙ্গসাহিত্যকে গরিমাময় করিয়াছে। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ধর্ম্মবাণী তাহার সম্পদ। বঙ্গভাষায় প্রবন্ধ-সাহিত্যের তুলনা নাই।

১১

বাঙালার মত এমন ভাষাপ্রীতি কাহারও নাই। তাহার মনে দেশপ্রেম ও ভাষাপ্রেম একই সঙ্গে জড়াইয়া আছে। সে যুগে নিধু গুপ্ত বলিয়াছেন, "বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা।" শতবর্ষ পূর্ব্বে ঈশ্বরগুপ্ত মাতৃভাষার বন্দনা করিয়াছেন,

"মাতৃসম মাতৃভাষা   পূরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে।"

কবি মধুসূদন বিদেশীর মোহমুক্ত হইয়া বঙ্গভাষাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,

"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?"

আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার এই, বাংলা সাহিত্যে বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষা একই জননীমূর্ত্তি রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছেন,

"জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে   চাহি না অর্থ, চাহি না মান,
যদি তুমি দাও, তোমার ও-দুটি   অমল কমল-চরণে স্থান।"

১২

দেশের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যাহা আবদ্ধ তাহাই প্রকৃত প্রাদেশিক। বাংলার বাতায়ন বাহিরে খোলা, বিশ্বের অভিমুখে তাহার দ্বার মুক্ত, বিশ্বের ভাব-কল্পনার মধ্যে তাহার প্রসার। যাহা দেশের গণ্ডী পার হইয়া পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভাব-কল্পনার মধ্যে প্রসারিত হইয়া পড়ে নাই, হিন্দীই হোক বা হিন্দুস্থানীই হোক তাহাই সত্যকার প্রাদেশিক। বাংলা বিশ্ব-ভাষার অন্যতম। বিশ্বসভায় যাহার আসন ভারতসভায় তাহার স্বীকৃতি নাই কেন?

কবি কামিনী রায়ের একটি কবিতা আছে, তাহার নাম "পাছে লোকে কিছু বলে।" আজ বাংলাদেশকে "পাছে লোকে কিছু বলে"-র ভীরুতায় পাইয়া বসিয়াছে। পাছে লোকে প্রাদেশিক বা প্রান্তিক বলে এই ভয়ে যাহা সত্য বলিয়া অন্তরে অনুভব করিতেছি তাহাও ব্যক্ত করিতে সঙ্কুচিত হই। একদা বাংলাদেশ একেলা চলিতে ভয় পায় নাই। "যদি আর কেউ না আসে, একলা চল, একলা চল, একলা চল রে।" আজ আমরা সেই উপলব্ধির দৃঢ়তা, অনুভূতিসঞ্জাত সাহস হারাইয়া ফেলিয়াছি। সকলের পুরোবর্ত্তী হইয়া বুকের উপর অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়া ভারতবর্ষের পতাকা আমরাই বহন করিয়াছি। আজ স্বাধীনতার মন্দিরদ্বারে আসিয়া আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিয়া দেশ-জননীর পূজা করিলে পাছে লোকে প্রাদেশিক মনে করে এই আশঙ্কায় আমরা কম্পিত। হিন্দীভাষীরা রাষ্ট্রভাষার আসনে হিন্দীকে বসাইবার জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে, তাহাদের চেষ্টাকে অন্য পরে কা কথা বাঙালী বিদ্বানেরাও প্রাদেশিক নামে আখ্যা দিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। অথচ যে ভাষা শ্রেষ্ঠ, যে ভাষা জগৎসভায় বরেণ্য, যে ভাষা সংস্কৃতের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে সংখ্যাহীন শব্দরাশি গ্রহণ করিয়াছে, সন্ধি-সমাসে, কৃৎ-তদ্ধিতে শব্দের নব নব রূপ দিয়াছে, ফার্সী আরবী হিন্দী দ্রাবিড় ইংরেজী হইতে শব্দগ্রহণ করিতে যে ভাষা এতটুকু দ্বিধা করে নাই, যে ভাষা শুধু সংস্কৃতের নয় ইংরেজী ফরাসী ও রুষ সাহিত্যের বহু আধুনিক গ্রন্থের অনুবাদ, আলোচনা ও পরিচয়ে সমৃদ্ধ, সেই সুপরীক্ষিত ভাষা, পাছে লোকে কিছু বলে এই ভয়ে, রাষ্ট্রভাষা হোক এই কথা বলিতে ভয় পাই।

'জয় হিন্দি' বলিয়া পাড়ি দিলে দিল্লী দূর না হইতেও পারে, কিন্তু জাতীয় চরিতার্থতায় সে পথ পৌঁছিবে না। উৎকৃষ্ট ত্যাগ করিয়া আমরা নিকৃষ্ট গ্রহণ করিব না। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে আজ বীর নাই। কেহ বুক ফুলাইয়া সাহস করিয়া প্রবলকণ্ঠে বাংলার দাবী জানাইতে পারিল না।

আমি যাহা এতক্ষণ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি তাহা এই। সাধারণ ভাষা বা জাতীয় ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা পৃথক বস্তু। ভারতবর্ষ বহুর মধ্য দিয়া এক। এই বিশাল দেশে সুইজারল্যাণ্ড, কানাডা বা রুষরাষ্ট্রের মত একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা করিলে চলে। রাজনৈতিক কারণে নয়, তাহার অন্তর্নিহিত গুণের জন্য রাশিয়ায় রুষভাষা প্রবল। যাহাকে মেজরিটি বলে হিন্দী সেরূপ সংখ্যাধিক্যের ভাষা নয়। সাহিত্য দিয়া ভাষা পরিমিত হয়। হিন্দীতে প্রতিভার আবির্ভাব হয় নাই। বঙ্গভাষায় হইয়াছে। সে-ই সংস্কৃতের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। বঙ্গভাষা জ্ঞান-সাহিত্যে সমৃদ্ধ। অতএব রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্য।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, উভয়েই সমান দোষে দোষী। মাতৃভাষাকে শ্রেষ্ঠ জানিয়াও রাষ্ট্রভাষার আসন দাবী করিতে যে বিরত থাকে সে অন্যায় করে। সে মাতৃভাষাদ্রোহী। মাতৃভাষাদ্রোহিতা শুধু অপরাধ নয়, তাহা পাপ। অবহেলা ও উদাসীনতার বশে আমরা যে পাপ করিলাম আমাদের উত্তরপুরুষকে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অগ্রণী বাংলা যখন সকলের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইবে, রাষ্ট্রে যখন হিন্দীভাষীরা সহজ আধিপত্য লাভ করিবে, আবেদন অনুযোগ ও অনুতাপ ছাড়া যখন আমাদের আর কোন উপায় থাকিবে না, তখন এই পাপের জ্বালা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিব। হেলায় মাতৃভাষাকে তাহার ন্যায্য আসন হইতে বঞ্চিত করিলাম। তিথি অনুকূল ছিল, সে তিথি বহিয়া গেল। অলীক জাতীয়তার অন্ধমোহে বাংলা ভাষাকে দূরে সরাইয়া দিলাম। যাহাকে বিদায় দিলাম নয়নজলেও তাহাকে আর ফিরাইতে পারা যাইবে না। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে ইহা ঘটিত না। উদ্যোগী হইলে বাংলাকে তাঁহার ন্যায্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতাম। রাষ্ট্রের শ্বেতশতদলে বঙ্গবাণীর আসন করিয়া লইতে পারিলে আমরা লক্ষ্মীও লাভ করিতে পারিতাম। আমরা উদ্যোগী নই, পুরুষসিংহ নই। উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পুরুষসিংহেরা অন্তর্হিত হইয়াছে। সিংহের গর্জ্জন আর শোনা যায় না। দেশ মূর্চ্ছিত। জীবন-মরণের প্রশ্নেও বঙ্গসাহিত্যের ঘুমন্ত পুরীতে আজ সাড়া জাগে না।

আমি জানি, হয়ত অরণ্যে রোদন করিতেছি। কিন্তু জানি, সে অরণ্য জনারণ্য। কোটি কোটি বঙ্গভাষীর রুদ্ধ-বেদনায় তাহা আজ স্তব্ধ; একদিন এই ভাষাহীন, মূক, মূর্চ্ছিত অরণ্য জাগিয়া উঠিবে। ঝড়ের ঝঙ্কারের সঙ্গে রুদ্ধরোষ অরণ্যের গর্জ্জন মিলিয়া প্রলয়-কলরোল সৃষ্টি করিবে। অরণ্যের জাগরণের প্রতীক্ষা করিয়া আছি।*

* রবি-বাসরে পঠিত।

সতী

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বিমলা হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে।

খবরের কাগজে ফলাও করে সংবাদ দিয়েছে :

—রাত্রির অন্ধকারে পঞ্চবিংশতি বর্ষ-বয়স্কা বিচারাধীন যুবতীর সরকারী হাসপাতালের আশ্রয় হইতে পলায়ন।—

এই খবরের উপর সম্পাদকীয়ও লিখেছে কোন কোন সম্পাদক। জাতীয় চরিত্রের ক্রমবর্দ্ধমান অধঃপতন নিয়ে ভাল ভাল কথার মালা গেঁথেছে তারা। আপনারাও পড়েছেন সকলে। এ সংবাদ কারও নজর এড়িয়ে যাবার নয়। আপিসের টিফিন রুমে, রেস্তোর্‌াঁয়, ট্রামে, বাসে বিমলাকে নিয়ে অনেক মুখরোচক আলোচনা আপনারা করেছেন জানি। কিন্তু খবরের কাগজের সংবাদ, হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষের বিবৃতি আর পুলিস কোর্টের নথিপত্রের কাহিনীতে চাপা পড়ে গেছে যে ইতিহাস, তাকেই আপনারা একেবারে গাল্‌গল্প বলে উড়িয়ে দেবেন। দিন উড়িয়ে, তবু সেই ইতিহাস বলছি, শুনুন।

বাগেরহাট লাইট রেলওয়ের একটি ছোট্ট ষ্টেশন। ষ্টেশনের কাছে বসে শুধু সপ্তাহের হাট। লোকজনের বসতি বিরল সেখানে। আসল গ্রামটি হ'ল নদীর ওপারে। নদী বলতে অবশ্য মাত্র কয়েক হাত চওড়া একটা খাল। লগি দিয়ে ঠেললে খেয়ানৌকা এপার থেকে ওপারে গিয়ে ঠেকবে।

নদীর পাড় থেকে বাড়ীর পথটা খুব বেশী নয়। তবু একটা লোক নিতে হ'ল হেমন্তর, সঙ্গে তার বিস্তর মালপত্র। প্রায় দু'তিন মাস দক্ষিণের সেই নোনা অঞ্চলে কাটিয়ে আসতে হয়েছে তাকে। কি বছরই ধান কাটবার সময় যেতে হয়, নইলে ন্যায্য পাওনা আদায় করা যায় না। এবারে ধান ফলেছে ভাল। পিছনে আসছে নৌকা-বোঝাই ধান। বাড়ীতে রয়েছে বড় ভাই বসন্ত। সে ত কুঁড়ের বাদশা। ধান ওঠাবার ব্যবস্থা করতে তাড়াতাড়ি তাই তাকে গাড়ীতে আসতে হয়েছে।

বিমলার বিয়ে হয়েছে সাত বছর। ছেলেমেয়ে হয় নি তার। নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ সে-ই আছে বাড়ীতে। কাজকর্ম সবই তাকে দেখতে হয়। ধান এলে প্রায় সবটাই ঝেড়ে-পুছে গোলায় তুলতে হবে তাকে। শাশুড়ী বুড়োমানুষ, বড় বউয়ের ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে। বড় বউ রোগের আড্ড। বিছানায় পড়েই আছে।

বাড়ীতে এসেই হেমন্ত ক্ষেপে গেল। গলা সপ্তমে চড়িয়ে বললে, ধান ত এসে গেল বলে, উঠানে গোবর পড়ে নি কেন এখনও?

ভাইয়ের মূর্ত্তি দেখে বসন্ত সুড় সুড় করে পালিয়ে গেল।

বড় বউ কাতরাতে লাগল।

হেমন্তর মা বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে বললে, বলি ও ছোট বৌ, উঠানটা এখনও নিকোতে পার নি—কোন কাজই কি তুমি তাড়াতাড়ি করতে পার না বাছা?

এতদিন এসেছে এ বাড়ীতে, কিন্তু ওদের ধরণ ধারণ বুঝতে পারে না বিমলা। সেই সকাল থেকেই শাশুড়ী বক বক সুরু করেছে : কাল বাড়ীতে পাঁচটা লোক খাবে। শেষে লজ্জায় পড়তে হবে সবাইকে। চাল বাটা হ'ল না এখনও, পিঠে হবে কিসে।

সেই চালই বাটতে বসেছিল বিমলা। একা আর কদিক সামলায়। সব কাজই করতে হবে তাকে অথচ সে যেন হয়েছে সকলের চোখের বিষ। বড় বউয়ের সাত মাসে সন্তান নষ্ট হ'ল। সবাই বললে—নতুন বউ অলক্ষুণে। সেবার অজন্মা হ'ল, তাও নাকি তার দোষে। বাছুর ম'ল একটা, গালাগাল খেল বিমলা। শুধু বিমলাই নয়, তার বাপ, মা, তাদের চৌদ্দ-পুরুষের শ্রাদ্ধ করলে এরা।

হেমন্তর কথার উত্তরে একটু রেগেই বললে বিমলা : ধান ত এখনও আসে নি। দিচ্ছি দু' মিনিটে গোবর লেপে।

মিষ্টি করে কথা বলতে শেখে নাই হেমন্ত। মুখটা বিকৃত করে বললে : তবেই হয়েছে আর কি। দু'মিনিটে আমার পিণ্ডি গেলাও হবে না; অলক্ষ্মী—বুঝেছ মা, অলক্ষ্মী ভর করেছে আমাকে।

উঠান ঝাঁট দিতে নিজেই লেগে গেল হেমন্ত।

শেষ পর্য্যন্ত বিমলাই কিন্তু উঠান নিকাল। ধান এলে ঝাড়পোছ করলে। কিন্তু বদনাম ছাড়া প্রশংসা জুটল না তার।

কিছু ধান গোলায় উঠল, কিছু হ'ল বিক্রি। ধানের বন্দোবস্ত শেষ হলেই হেমন্তর ছুটি। ব্যস, টিকিটিও আর তার দেখা যাবে না। বিশ্বাসদের জমিদারীতে কাজ করে সে। কখনও সেখানে থাকে, কখনও ঘোরে এখানে ওখানে। বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক তার নেই বললেও চলে। গাঁয়ের লোকেরা তার সম্বন্ধে ফিস্‌ফাস করে কত কথা বলে। বিমলাও যে কিছু কিছু না শুনেছে এমন নয়। দু' একবার সাহস করে বলেছেও হেমন্তকে, কিন্তু উত্তরে কেবল মার খেয়ে মরেছে হেমন্তর হাতে। হেমন্তর কেলেঙ্কারীর কথা শুনে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে বিমলা। ঘর বন্ধ করে আয়নায় মুখ দেখেছে, সে ত কুৎসিত নয়! আজও ত চেহারায় ভাঙন ধরে নি তার। আর রূপ না হয় নাই হ'ল, গুণও কি তার নেই?

পার্বতী বলে, যে মেয়েমানুষ পুরুষকে ধরে রাখতে না পারে তার মধ্যে আবার পদার্থ আছে না কি ?—বিমলা আর হাসে। ঘরে যার মন নাই, তাকে বৃথা ধরে রাখবে সে কোন্ ছলাকলা দেখিয়ে।

পাঞ্জাবীর উপর চাদর চড়িয়ে হেমন্ত বেরিয়ে যাচ্ছিল, বিমলা এসে বললে : কবে ফিরবে ?

হেমন্ত উত্তর দিলে না।

বিমলা পেছন পেছন সদর পর্য্যন্ত এল।

হেমন্ত মুখ ফিরিয়ে দেখলে। কিছু দূর গিয়ে ইসারায় কাছে ডাকল বিমলাকে।

বিমলা কাছে গেলে হেমন্ত বললে, ঘরে ধান রইল, খাবার ত ভাবনা নেই। আমাকে চাও না তুমি।

এমন ধরণের কথা হেমন্ত আগেও বলেছে। জবাবে বিমলা কিছুই বলে নি। অনেকক্ষণ মনে মনে আকাশপাতাল ভেবেছে। কি করেছে সে, কোথায় তার অপরাধ ? মনে-প্রাণে হেমন্তকে সে আপনার করে নিতে চেয়েছে, কিন্তু প্রতিদানে পেয়েছে কঠোর ব্যবহার। এমনি হেমন্ত থাকে বেশ, কিন্তু তাকে দেখলেই যেন সে ক্ষেপে যায়। আসলে বিমলাকে সে যেন স্ত্রী বলেই স্বীকার করতে চায় না।

আজও চুপ করে যেত বিমলা—ফিরেও যাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে : বিয়ে করেছিলে কেন তবে আমাকে ?

হেমন্ত হাসল—অত্যন্ত বিশ্রীভাবে হাসল।

—তোমাকে নয়, বিয়ে করেছিলাম দক্ষিণের ঐ কলন্ত জমিটাকে। আর ঐ জমিটার জন্তেই তোমাকে দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারি না।

বিয়ের সময় বিমলার বাবা জমিটা দিয়েছিল হেমন্তকে।

বিমলা বললে, তাও পার তুমি। আর সেও আমার ভাল। বাপের বাড়ীই পাঠিয়ে দাও আমাকে।

চলতে চলতে হেমন্ত বললে, মা, দাদা, রয়েছে, তাদের মত নাও।

হেমন্তর ভাবভঙ্গী অসহ্য মনে হ'ল বিমলার। বললে, তুমি কি কেউ নও ?

না না না। কত দিন বলতে হবে সে কথা।

হেমন্ত দাঁড়িয়ে গেল।

বিমলা যেন ক্ষেপে গেল। পাঁচ মুখের পাঁচ কথা আমারও কানে এড়ায় না।

হেমন্ত বিমলার কাছে এগিয়ে এসে বললে, ঠিকই বলে তারা। তুমি আমার কেউ নও। খাঁচায় আটকানো, পোষমানা তার বেশী কিছু নও তুমি আমার কাছে।

বিমলার মুখের লাগাম ছিঁড়ে গেছে। সেও বললে, চরিত্র [illegible] আর কাছে [illegible] কি মূল্য আর পাব।

খপ্ করে বিমলার হাতটা ধরে হেমন্ত কঠোর সুরে বললে, কি বললি ?

বিমলা পাগলের মত বকতে লাগল, আমাকে ঠকিয়েছ, আমার বাবাকে ঠকিয়েছ তুমি। তোমার কেলেঙ্কারীতে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হয় আমার। তুমি—তুমি মানুষ নও…

হেমন্ত বিমলার হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে আনতে আনতে বললে, আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা এবার।

উঠানে ছিল ধান নিড়োবার লাঠি। সেইটে টেনে নিয়ে হেমন্ত বিমলার আপাদমস্তক পেটাতে লাগল।

মার আগেও খেয়েছে, কিন্তু আজকে মার খেয়ে জ্ঞান ছিল না বিমলার। অনেকক্ষণ পরে যখন সম্বিৎ ফিরে পেল তখন সর্ব্বাঙ্গ যেন তার ব্যথায় টন টন করছে। হাতের পেশীতে, পিঠে কালসিটে দাগ পড়েছে। টলতে টলতে উঠে সে গিয়ে দাওয়ার উপর বসল। বাড়ীতে যেন জনপ্রাণী নেই। বিমলা জানে কেউ বেরিয়ে এসে দেখবে না তাকে।

দাওয়ার খুঁটি ধরে ধরে বিমলা গিয়ে ঘরে ঢুকল। জল গড়িয়ে খেল। বিমলা জানে এমনি করেই এক দিন মরবে সে। এতক্ষণ কাঁদবারও শক্তি ছিল না তার। এইবার চোখের জমা জল হু হু করে বেরিয়ে এল। হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল বিমলা।…

চিঠি পেয়ে ভাই এসে নিয়ে গেল বিমলাকে।

বিমলার বাবা বললে, মাটি নিয়েই ও হতচ্ছাড়া সন্তুষ্ট হোক, মেয়েকে ও বাড়ীতে আমি আর পাঠাচ্ছি না।

বিমলার ছোট বোনাই মোক্তার। সে বললে, খোরপোষের গিঁট ত আর আলগা হবে না। আলাদা থাকবার জন্তে মামলা করো তুমি সেজদি।

বিমলা হাসল—একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলে, —কি হবে ভাই নালিশ করে ?

পাড়াপ্রতিবেশী আর আত্মীয়-স্বজন এসে সদুপদেশ দিলে, জীবনটা ভগবানের দান। তাকে এমন ব্যর্থ হতে দেওয়া মহাপাপ বিমলা। লেখাপড়া শিখে স্বাবলম্বী হও।

অনেক ভেবেচিন্তে বিমলা শেষ পর্য্যন্ত পড়াশুনা করতে রাজী হয়ে গেল। বই সংগ্রহ হ'ল। ভায়েদের একজন স্কুলের মাষ্টার। সে তাকে পড়াশুনায় সাহায্য করতে পারবে।

মন স্থির করে পড়তে আরম্ভ করেছিল বিমলা। এমন সময় এক দুঃসংবাদ নিয়ে নিজে এল বসন্ত। কাছারীবাড়ী থেকে সাংঘাতিক রকম পীড়িত হয়ে ফিরেছে হেমন্ত। সেবা-শুশ্রূষা করবার লোক নেই তার।

—এ যাত্রা হেমন্ত বুঝি আর বাঁচে না বৌমা।

বসন্ত বিমলার সামনেই কেঁদে ফেলল।

বিমলার বাপ, ভাইয়েরা চোখের জল ফেলল না। বরং সুযোগ পেয়ে গালাগাল দিল বসন্তকে।

বিমলাও কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে।

বসন্ত ফিরে আসছিল। পথে নেমে হঠাৎ পেছন ফিরে দেখে, পুঁটলি হাতে বিমলাও আসছে।

বসন্ত বললে—থাক বৌমা, ফিরে যাও তুমি।

বিমলা নীরবে আঙুল বাড়িয়ে তাকে পথ চলতে ইঙ্গিত করলে।

পেছন থেকে বিমলার ভায়েরা চেঁচিয়ে বললে—কথা শোন্ বিমলা, নইলে বাপের বাড়ীর দরজা'ও তোর বন্ধ হবে।

বিমলা টলল না।

হেমন্তর অসুখের সত্যিই বাড়াবাড়ি চলছিল। ডাক্তার বলছে,—বুকে দোষ, লিভারে দোষ। খুব সাবধানে রাখতে হবে। প্রাণ দিয়ে করতে হবে সেবা। দামী ওষুধের ফিরিস্তিও বড় কম নয়।

বিমলা সেই যে এসে স্বামীর শিয়রে বসল আর উঠল না। চোখের কোলে কালি পড়ল, চেহারায় ভাঙন ধরল, গায়ের গয়নাও খসল একে একে।

পুরোপুরি ছুটি মাস পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠল হেমন্ত।

হেমন্তর ঘর থেকে দু'মাস পরে নিজের ছোট ঘরে উঠে এল বিমলা। সুস্থ হয়ে উঠেছে হেমন্ত, এবার সে তার স্বরূপ ধরবে। অসুখের ঘোরে যে অসহায়তা তাকে পেয়ে বসেছিল এখন তার চিহ্নমাত্র থাকবে না। আবার সে হয়ে উঠবে অকরুণ, নিষ্ঠুর।

বাইরে থেকে বেড়িয়ে ফিরল হেমন্ত। এসে আর নিজের ঘরে ঢুকল না। সরাসরি চলে এল বিমলার ঘরে। অত্যন্ত মোলায়েম সুরে বললে—আজকে কিন্তু একটু চা দিতে হবে আমাকে। কতদিন যে তোমার হাতে চা খাই নি।

হেমন্ত দিব্যি গড়িয়ে পড়ল বিছানার উপর।

বিমলা চা তৈরি করে তার হাতে দিতে দিতে বললে—ডাক্তারে বারণ করেছে, তবু নাও—একটু বেশী দুধ দিয়ে দিলাম।

চা খেতে খেতে হেমন্ত গল্প আরম্ভ করলে। কথা যেন তার আর শেষ হতে চায় না। রাতের খাবারও খেল সে ঐ বিছানায় বসে।

বিমলা তাড়া দিয়ে বললে—নাও ঢের হয়েছে। রাত অনেক হ'ল, এবার শুতে যাও।

আকাশ থেকে পড়ল যেন হেমন্ত—ঘর ছেড়ে শুতে যাব উঠানে নাকি?

প্রলাপ বকছে নাকি হেমন্ত। বিমলা স্তব্ধ হয়ে গেল।

হেমন্ত ছেলেমানুষের মত আবদার ধরলে—আমার যে বড্ড ঘুম পেয়েছে।

বিমলা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—বেশ ত থাক এ ঘরে আজ। আমি যাচ্ছি ও ঘরে।

হেমন্ত হঠাৎ উঠে খপ করে বিমলার আঁচলটা চেপে ধরলে, বললে—কোথায় যাবে?

তার চোখে মুখে যে ভাষা ফুটে উঠেছে বিমলার কাছে তা অভাবনীয়।

বিমলা বাধা দিলে না, প্রতিবাদ করে বললে না কিছু। দশ বছর বাদে কি বিয়ের মন্ত্র প্রাণ পেল?

মাঝে মাঝে বিমলার মনে হয়, যমের হাত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে বলেই কি হেমন্তর এই ভাবান্তর? হেমন্তর বাড়াবাড়ি দেখে ভয় হয় তার, একদিন রাশ ছিঁড়ে পালাবে না ত সে!

অপরাজিতকে জয় করবার আদিম লোভ বিমলাকেও পেয়ে বসল। পুরুষ-মানুষকে ঘরে রাখবার ক্ষমতা যে মেয়ের নেই তার মধ্যে পদার্থ আছে নাকি—শাশুড়ীর সেই কথাগুলো অহরহ মনে পড়ে বিমলার। সব আশঙ্কা দূরে ঠেলে এবার সে নিজেকে যাচাই করতে উঠে-পড়ে লেগে গেল।

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি বহু দিন পরে হেমন্তকে জমিদারের কাজে বাইরে যেতে হ'ল। পনের দিন কেটে গেল সে না বাড়ী ফিরল, না পাঠাল কোন খোঁজখবর। অবশ্য আগে ত এমন কতবার দু'তিন মাস সে বাইরে কাটিয়ে এসেছে। কিন্তু হেমন্তর অসুখের পর থেকে নবজীবন লাভ করেছে বিমলা। এখন তার অনুপস্থিতি একেবারেই সে সহ্য করতে পারে না। বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ল বিমলা।

শাশুড়ী রাগ করে বললে, পুরুষমানুষ বাইরে না গিয়ে কি চিরকাল তোমার আঁচল ধরে বসে থাকবে। অমন করে চোখের জল ফেললে সংসারের অকল্যাণ হবে ছোটবৌ।

দিনকতক পরে হেমন্ত ফিরে এল।

বিমলা বললে, এবার কিন্তু বড্ড দেরী করেছ বাড়ী ফিরতে। খোঁজখবর দিলে তবুও ত খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

হেমন্ত বললে, কত জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, খোঁজ-খবর দেব কি করে? অন্য কর্ম্মচারীটির অসুখ, সব কাজের চাপ পড়েছে আমার উপর।

বিমলা তার মুখের পানে চেয়ে চমকে উঠল, চেহারা অমন হয়েছে কেন? অসুখে পড়েছিলে নিশ্চয়ই। আমাকে লুকোবে না কিন্তু কিছু।

হেমন্ত বললে, আরে না—না। সময়মত খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই, চেহারার আর দোষ কি!

বিমলা তার হাত ধরে বললে, কিছুদিনের জন্যে ছুটি নাও এবার। এমন শরীর নিয়ে বাড়ী থেকে বেরুতে দেব না তোমাকে।

হেমন্ত বললে, এ কি আর কেরাণীর আপিস। এ সময়

কি ছুটি চাইলে দেবে। তবে বাইরে আর যেতে হবে না। এখান থেকেই কাছারি যাব। তুমি ভেব না।

বিমলা তবু খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'ল। সেবা-শুশ্রূষা করে হেমন্তর চেহারা আবার সে আগেকার মত করে দিতে পারবে।

কথা দিলেও হেমন্ত, কিন্তু তা ঠিকমত রাখতে পারল না। কোন দিন বাড়ী ফিরতে রাত হয়ে যায়, কোন দিন আবার একেবারেই ফেরে না। প্রশ্ন করলে বলে, নতুন বছর পড়েছে এখন কাজ বেশী। মনের প্রফুল্লতা যেন কমে এসেছে হেমন্তর। মেজাজ আবার তার খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে। বিমলা কিছু বলতে গেলে ধমকে ওঠে, এ কি দশটা পাঁচটার আপিস! সবাইকে পিণ্ডি গেলাতে হলে উদয়াস্ত এমনি পরিশ্রম করতে হয়।

নেহাৎ মিথ্যে বলে না হেমন্ত। মন না মানলেও চুপ করে যায় বিমলা।

হঠাৎ এক দিন কাজে গিয়ে সেদিন আর ফিরল না হেমন্ত। সাত দিন সাত দিন করে মাস ঘুরে গেল। কোন খবরই হেমন্ত দিলে না।

বিমলার ভাবনা চিন্তা চরমে উঠল। ধৈর্য্যের বাঁধ তার ভেঙে পড়ল। মনে জাগল একটা অবিশ্বাসের আশঙ্কা। এত-দিন বাদে সে যেন নিশ্চিতই বুঝতে পারল, জীবনটা তার ব্যর্থ হয়েছে। তবে কি হেমন্তর ভালোবাসা ভান মাত্র? নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে বিমলা কঠোর হয়ে উঠল। জীবনে এল তার ঘোরতর বিতৃষ্ণা।...

একদিন বাড়ীতে একখানা পাল্‌কি এসে পৌঁছল। সকলে ধরাধরি করে পালকি থেকে নামাল হেমন্তকে। বছরখানেক আগে যেমন হয়েছিল তেমনই দশা হয়েছে তার।

বিমলা ঘরের জানালা ধরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল, একজন বলছে, শহরের হাসপাতালে রাখতে আর চাইল না। হেমন্তকে কঠিন রোগে ধরেছে বসন্তদা।

হঠাৎ যেন একটা ভূমিকম্প হ'ল। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল বিমলা।

হেমন্তর মা হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠে বিমলাকে জড়িয়ে ধরে বললে, ঘরের লক্ষ্মী আমার, তুই ত একবার হেমন্তকে যমের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলি। আমার হেমন্তকে দেখ মা!

বিমলার হাতে কিছু টাকা ছিল। গহনা থেকে থালা-বাটি জমিজমা বেচে সে স্বামীর চিকিৎসার জন্য জলের মত অর্থ-ব্যয় করতে লাগল। স্নানাহার নেই, বিশ্রাম নেই, কলের পুতুলের মত বিমলা হেমন্তকে নিয়ে পড়ে রইল। বাইরে থেকে নামকরা একজন ডাক্তার এল।

ইনজেকশন দিয়ে ডাক্তার অপ্রসন্ন মুখে ফিরে যাচ্ছিলেন। স্বামীর পাশ ছেড়ে বিমলা তার পেছনে পেছনে উঠে এল।

মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে ডাক্তার দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রশ্ন করলেন, কিছু বলবেন?

বিমলা জিজ্ঞাসা করল, আমার স্বামীর কি অসুখ ডাক্তার-বাবু?

ডাক্তার কি যেন ভাবলেন। পরে বললেন, এদিকে আসুন বলছি!

বারান্দার এক কোণে এসে ডাক্তার প্রশ্ন করলেন, ছেলে-মেয়ে হয়েছে আপনার?

'না' - বলতে গলার স্বর কেঁপে গেল বিমলার।

তিন মাসের প্রাণ তার অতি ক্ষুদ্র অস্তিত্বের ক্ষীণ আভাস পাঠায় যে বিমলার সর্বাঙ্গে। ডাক্তারের কাছে মিথ্যা বলে সে কি তাকে চেপে রাখতে পারবে।

ডাক্তার বলতে লাগলেন—উত্তরাধিকারসূত্রে বংশধরেরা পায় ঐ কুৎসিত রোগ। কাণা, বোবা, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায় তারা। তাদের বড় দুঃখের জীবন।

বিমলা বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল। আর কোন প্রশ্ন সে করতে পারল না।

ডাক্তার গম্ভীর ভাবে চলে গেলেন।

স্বাভাবিক ভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না বিমলা। বিকলাঙ্গ, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, কাণা, বোবা—ভবিষ্যতের একটা দারুণ ভয়ে শিউরে উঠল বিমলা।

শাশুড়ীর সেই কথাটি বার বার মনে পড়তে লাগল তার—পুরুষমানুষকে যে ঘরে রাখতে পারে না তার মধ্যে আবার পদার্থ আছে নাকি? ঘরছাড়া অসংযমী স্বামীকে ঘরে রাখতে গিয়ে সে কি দিয়েছে শুধু দেহ আর মন। তার মাংসে, নাড়ীতে, মজ্জায়, রক্তে জড়িয়ে রয়েছে যে অনাগত জীব তার দেহও কি দেয় নি বিষিয়ে?...বুক চাপড়ে আর্তনাদ করে উঠল বিমলা। হেমন্ত তাকে চরম সাজা দিয়েছে।

বাইরে উদ্দাম স্রোতে ভাটা ধরেছে যখন, ব্যাধিতে দেহ আর মন হয়েছে পঙ্গু। যখন আশ্রয় নেই, সেবা করবার লোক নেই—তখন মনে পড়েছে ঘরকে।

ঘরের মধ্যে শুয়ে কাতরাচ্ছে হেমন্ত। সমস্ত দেহে তার দাহ, তীব্র যন্ত্রণা সারা অঙ্গে। হেমন্ত ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে।

বিকলাঙ্গ, বোবা, খোঁড়া—সমাজে আনে ঘৃণা আর অপযশ। ঘৃণায়, হিংসায়, গলার শিরা আর মুখের মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠল বিমলার। হাত দুটো নিশপিশ করতে লাগল তার।

ঘরে ঢুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বিমলা। বিছানার সঙ্গে মিশে রয়েছে যেন হেমন্তর প্রেতাত্মা। তার ক্ষীণ কণ্ঠনালীতে একটু চাপ দিতে বেশী পরিশ্রম করতে হবে না। বিমলার মধ্যে সত্যি পদার্থ আছে কিনা, এবার যদি

সে দেখিয়ে দেয়, যদি নিজের শক্তি সে যাচাই করে দেখতে চায়, মরবার আগে সে যদি জানিয়ে দেয় সেও নির্মম ভাবে প্রতিশোধ নিতে জানে, তা হলে ?

বিমলা পাগলের মত হেসে উঠল। সামনের আয়নায় নিজের মুখ দেখে কেঁপে উঠল সে। সে কি সত্যি তবে পাগল হয়েছে ? এসব পাপ চিন্তা মনে আনল কি করে সে !

বিমলার মনে পড়ল ঠাকুমার সেই গল্প। মনে পড়ল সেই সতী নারীর কথা মরণাপন্ন স্বামীকে যিনি নিজে পতিতালয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন—

হেমন্ত ক্ষীণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল : ওগো, অষুধ দাও আমাকে তাড়াতাড়ি, আর যে সহ্য হয় না।

বিমলা কি পাষাণ হয়ে গিয়েছে। সম্বিৎ ফিরে পেতেই সে ছুটল টেবিলের দিকে ঔষধ আনতে ?

ঔষধটা গেলাসে গড়িয়ে নিয়ে সে হেমন্তর মুখে ঢেলে দিতে দিতে বললে : ভয় কি, অষুধ খাও, সেরে যাবে।

ঔষধ গিলে মুখ বিকৃত করলে, হেমন্ত আরও যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল, উঃ, গলা যে জ্বলে গেল !

বিমলা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে : চুপ কর, অস্থির হয়ো না।

হেমন্ত কিন্তু থামল না ; আরও দ্বিগুণ জোরে চেঁচাতে লাগল : জ্বলে মলাম, আমাকে বিষ দিয়েছে, বিষ—

সবাই ছুটে এল।

বিমলা শিশিটা নিয়ে এল হাতের মুঠোয়। সবাই দেখল, ছোট অক্ষর হলেও স্পষ্ট বাংলা দুটি হরফ 'বিষ' জ্বল জ্বল করছে শিশির গায়ে।

হেমন্ত অস্পষ্ট সুরে আবার আর্তনাদ করলে···বিষ, বিষ বিষ দিয়েছে।

ডাক্তার এল, পুলিশ এল। মরবার আগে হেমন্ত শেষ জবানবন্দী দিয়ে গেল— বিমলা তাকে বিষ দিয়েছে। সাক্ষী-প্রমাণও জুটে গেল। বিমলাকে দড়ি দিয়ে বেধে নিয়ে গেল।

যেটুকু সন্দেহ ছিল, ময়না তদন্তের বিবরণী তার নিরসন করলে। খুনে বউটার ফাঁসি না হয়ে আর যায় কোথায় !

এই ক'টা দিন আর রাত, অনুক্ষণ বিমলা নিজের বিচার নিজে করেছে। আদালতের প্রয়োজন কি, সেখানে হার-জিত ত কথার মারপ্যাঁচে। সে নিজে যে খুনে নয় কে প্রমাণ করবে ? সেই মেরেছে হেমন্তকে। সেদিন ঔষধ দেবার এক মিনিট আগে যে চিন্তা সে করেছিল, তার অবচেতন মনের সেই চিন্তা নিজের অগোচরে খাবার ঔষধ আনতে গিয়ে মালিশের বিষ-তেল দুর্ব্বার হাতে টেনে এনেছে। বিমলা নিজেও অহোরাত্র ভেবে ভেবে এই-ই স্থির জেনেছে ; সে ত বাঁচতে পারে না। আদালত তার করবে কি ?

গারদে বসে বসে বিমলা ভাবত সেই সতী নারীর কথা, আর শূন্যে ভেসে উঠতে দেখত হেমন্তর সেই বিকৃত মুখ— আমাকে বিষ দিয়েছে—বিষ দিয়েছে আমার স্ত্রী বিমলা।

অমাবস্যার রাত। বিমলা পেছনের জানালা আর বাগানের বড় গাছের ডালটার দূরত্ব একবার বেশ করে দেখে নিলে।

আদালত আর হাসপাতালে তার প্রয়োজন কি ? সে ত নিজের বিচার নিজেই করে নিয়েছে। গভীর রাতে দুর্যোগ মাথায় নিয়ে বিমলা হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেল একদিন।

যদি

শ্রীনির্ম্মলেন্দু রায় চৌধুরী

প্রণয়ের নদীবুকে কোন এক আরক্ত সন্ধ্যায়
যত সব এলোমেলো সেতু বেঁধেছিলে,
তোমার আমার ব্যবধানে···
বাস্তবের করাঘাতে যদি কোন দিন
ভেঙেচুরে যায়।
কোন এক স্তিমিত সন্ধ্যায়···
তোমার চোখের তারা জ্বলে জ্বলে যদি নিভে যায়—
তোমার আমার যত সবুজ কামনা—
জীবনের তরু হতে খসে পড়ে যায়,
প্রেমের মুকুল যত—হাল্কা গোলাপী
অভিশপ্ত দাবানলে পুড়ে পুড়ে হয়ে যায় খাক !
ভবিষ্যের পানে চাহি ভয় হয় তাই—
বারংবার কেঁপে ওঠে বুক
এর মাঝে শান্তি কোথা—কোথা তবে সুখ ?
তার চেয়ে শোন প্রিয়া—সেই ভালো মোর
আমা হতে তুমি মোর দূরে দূরে থাক—
তোমার চোখের ঐ চটুল চাহনি
তোমার আবেগভরা রক্তের ঝলকে—
ডালিম ফুলের মত ফিকে ফিকে লাল
অধরের শত শত অজস্র চুম্বন
আমাদের নিরলস চোখের পাতায়
আজি হতে স্বপ্ন হয়ে থাক।
শীতের শিশির-ভেজা ঘন কুয়াশায়
পৃথিবীর সজীবতা যায় যদি যাক।

পশ্চিম হিমালয়ের পথে

শ্রীপরিমল গোস্বামী

কাইথু অঞ্চলটি সিমলার প্রধান কেন্দ্রস্থল থেকে অনেকটা নিচে। ষ্টেশন থেকে অনেকটা দূর আসার পর যখন সেই নিম্নগতি শুরু হ'ল তখন এ রকম প্রায়-খাড়া পথে নামায় অনভ্যস্ত আমার অসুবিধা হচ্ছিল খুবই। তা ভিন্ন পথের দীর্ঘ ক্লান্তি এ রকম পথে চলার পক্ষে অনুকূল নয়, সেজন্যে এক একবার বেশ ভয় হচ্ছিল যে, হয় তো এখানে আসাটা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যাবে, এ পথে একবার নেমে আর উপরে ওঠার প্রবৃত্তি থাকবে না। দুর্বল দেহে অনভ্যস্ত পথে এ ভাবে ওঠা-নামা করা সত্যই অত্যন্ত কষ্টদায়ক। অসম্ভব রকমের ঢালু পথ। অতি সন্তর্পণে এক পা এক পা করে নামছিলাম। অনেকটা দূর নেমে আসার পর বাঁয়ের দিকের বাঁক ঘুরে আরও নিচে নামছি এক ফুট প্রশস্ত অসমান পথে। কিছু দূর নেমে আবার ডান দিকের বাঁক ঘুরে চলছি। এরই শেষে দুর্গা-ভিলার দোতলা। চমৎকার ছোট্ট বাড়িটি। উপরের তলায় কিরণকুমার রায় ও ফণী চাটুজ্জের বাস। এরা একই সঙ্গে কলকাতায় কাজ করত এবং অফিস সিমলায় উঠে এলে এরাও সিমলায় এসেছে বছর তিনেক হ'ল। বাঙালী হিসাবে সাহসের পরিচয় দিয়েছে সন্দেহ নেই, কেননা, হঠাৎ এত দূরে আসতে হবে ভয়ে, অথবা অন্যান্য অসুবিধায়, অধিকাংশ বাঙালীই তখন কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। প্রবাসে বাঙালীর সংখ্যা কি এখন দ্রুত কমে যাচ্ছে? দেখলাম ল্যান্সডাউনে মাত্র দু'তিন ঘর বাঙালী আছে, এবং ল্যান্সডাউন থেকে সিমলা যাবার পথে কোটদ্বারে ট্রেনের মধ্যে মাত্র একজন বাঙালীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, তিনি রেলওয়ে এসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার, নজিবাবাদে আসছিলেন। এ ভিন্ন দু'দিনের পথে একটিও বাঙালী দেখিনি।

দুর্গা-ভিলায় এসে পৌঁছলাম তিনটের কিছু পরে। বাড়িটি ঢালু পাহাড়ের গায়ে, কাজেই পাহাড় পথে সোজা এসে দোতলায় নামা যায়, এক তলায় নামতে হলে অন্য পথে ঘুরে নামতে হবে। বাড়ির সম্মুখের উন্মুক্ত দৃশ্যে মুহূর্তে আমাদের পথের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল (তার সঙ্গে অবশ্য ভাল ভাল খাবারও ছিল)।

আমি বহুপূর্ব হতেই ঠিক করেছিলাম বিকেলে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করব, কোথায়ও বেরুব না, কিরণও বলল একবেলা বিশ্রাম করাই উচিত। কালীকিঙ্করেরও সেই মত। সুতরাং গৃহকর্ত্রী শ্রীমতী কমলাকে খাবার ঘরের পরবর্তী নৈশ বৈঠক তদ্বিরের ভার দিয়ে কিরণ আমাদের সঙ্গে আড্ডা জমাতে বসে গেল। দুর্গা-ভিলা থেকে সম্মুখস্থ দৃশ্য খুব সুন্দর। দুই পাশে একটার পর একটা পাহাড় দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে গেছে, মাঝখানে আঁকা-বাঁকা উপত্যকা, অনেকটা দূরে দূরে এক একটা বাড়ি, পুতুলের বাড়ির মত ছোট পাহাড়ের গায়ে লেগে

সিমলা বালিকা বিদ্যালয়ের বাঙালী ছাত্রী

আছে। দূরের মানুষগুলোকে প্রায় পিঁপড়ের মতো দেখাচ্ছে। আকাশে ভাঙা মেঘ, সুতরাং আকাশের নীলিমা এখানে উপভোগ্য। পাহাড়ের গায়ে গায়ে 'রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি খেলা' পরম রমণীয়। সব পাহাড়ে একসঙ্গে রোদ পড়লে এত সুন্দর দেখায় না। এক এক সময় রোদে এক একটি পাহাড় আলোকিত হয়ে উঠছে তাতে মনে হয় যেন সমস্ত দৃশ্যপট খুশীতে চঞ্চল হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। বাঁয়ের দিকে দীর্ঘ উঁচু পাহাড় হাজার হাজার দেওদার গাছের অরণ্যে ঢাকা। মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে, এমন কি লাট সাহেবের বাড়িটিও তার উচ্চ

স্থানের অসাধারণ গৌরব নিয়ে সাধারণ নিম্নতলবাসীর দৃষ্টিগোচর হয়ে আছে।

পায়ের নিচে চেয়ে দেখি টেনিস খেলার উপযুক্ত ছোট একটুখানি জায়গা সমতল করে তৈরি করা হয়েছে। সমস্ত সবুজ পরিবেশে ঐ একটুখানি সাদা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। শুনলাম ওটি টেনিস কোর্ট নয়, ঘোড়দৌড়ের মাঠ। মাঠটিকে যে অত ছোট দেখাচ্ছে তার কারণ ওটি আমার অবস্থান থেকে নিচের দিকে অনেক দূরে অবস্থিত, পার্বত্য অঞ্চলে সর্বত্রই পরিপ্রেক্ষিত বোধে এই রকম ভ্রান্তি ঘটে। এই ঘোড়দৌড়ের মাঠেই দৌড়ের দিন অনেকগুলো ঘোড়া দেখে প্রথমে সেগুলোকে পাখী মনে হয়েছিল। তার পর যখন তারা সেই ডিম্বাকৃতি মাঠে ছুটতে সুরু করল এবং শত শত লোকের চীৎকার চার দিকের পাহাড়ের প্রাচীরে বাধা পেয়ে উপরে উঠে এল তখন মনে হ'ল যে এটি ঘোড়দৌড়ই বটে। জায়গাটি যে অনেক দূরে অবস্থিত তার আর একটি প্রমাণ এই যে, সেই নির্জন আবহাওয়ায় অত লোকের সম্মিলিত চীৎকার অত্যন্ত ক্ষীণ ভাবে কানে এসে পৌঁছতে লাগল। কিন্তু সে হ'ল আরও ক'দিন পরের অভিজ্ঞতা, কারণ ওখানে রেস খেলা হয় রবিবারে।
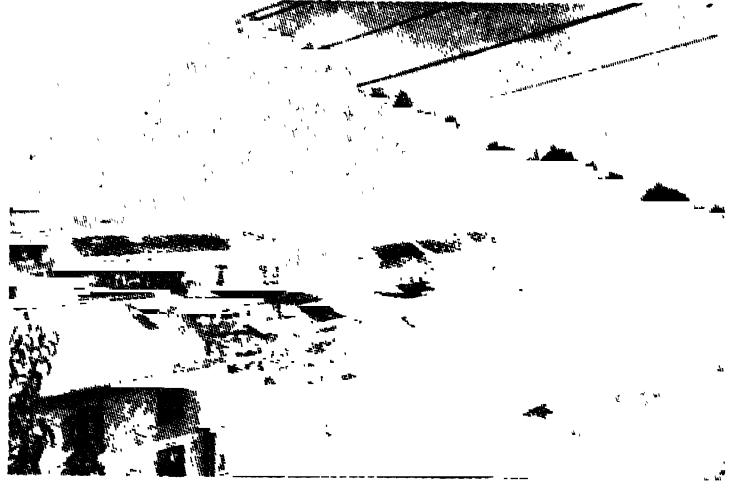
সিমলার এক অংশ

সন্ধ্যার কিছু পরেই কর্তার আবির্ভাব ঘটল এবং তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে সিমলা প্রবাসের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে নানা রকম আলোচনা চলতে লাগল। এখানে একটা বিষয়ে সবাই এক মত যে, এ রকম অপূর্ব সুন্দর পরিবেশে, এমন নির্জন আবহাওয়ায়, কিছুকাল থাকা অভ্যাস করলে কোলাহল ও জনতাপূর্ণ জায়গা আর ভাল লাগে না। কথাটা সত্য। কারণ জায়গাটা এতই উঁচু যে সর্বদা মনের মধ্যে এই চেতনাটি জাগ্রত থাকে যে, ধূলিধূসরিত প্রতিদিনের অতি পরিচিত একঘেয়ে পৃথিবী থেকে হঠাৎ যেন মেঘের রাজ্যে উঠে এসেছি। এই ধারণাটি বিশেষ করে বাঙালীদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। ইংরেজীতে একটি কথা আছে যার অর্থ হ'ল— সাদাসিধে জীবন, উচ্চ চিন্তা (প্লেন লিভিং অ্যাণ্ড হাই থিং-কিং)। ও দুটোর একটা হয় ত সম্ভব, কিন্তু দুটো এক সঙ্গে বোধ হয় কোন বাঙালীর পক্ষেই সম্ভব নয়। সাদাসিধে জীবন কাটিয়ে উচ্চ চিন্তায় মশগুল কোন বাঙালীকে আমি অন্তত দেখিনি। আমরা প্লেন লিভিং-এ অনেকেই অভ্যস্ত, কিন্তু হাই থিংকিং-এর পরিবর্তে হাইট থিংকিং করি। অর্থাৎ উচ্চ চিন্তার স্থলে উচ্চতার চিন্তা করি, এবং আমার মনে হয় প্লেন শব্দটিরও সমতল ভূমির সমার্থক অর্থটি ধরে নিলে আমাদের সম্পর্কে প্লেন লিভিং এণ্ড হাইট থিংকিং কথাটি সম্পূর্ণ খাটবে। আমরা সেটাই করে থাকি, অর্থাৎ সমতল ভূমিতে বাস করে উচ্চতার চিন্তা করি। সিমলা সেই হাইট থিংকিং-এর বিড়ম্বনার হাত থেকে সিমলা প্রবাসী বাঙালীদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। এই উচ্চতায় বসে নিজেকে নতুন করে পাওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ আছে; অবশ্য এর জন্যে মনের দিক দিয়ে পূর্ব প্রস্তুতি থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ মননশীল হওয়া আবশ্যক

বড় ডাকঘরের নিকটস্থ পথ

ম্যাল, সিমলা

এখানে বসে মনের প্রসারতা স্বভাবতই বৃদ্ধি পায়। দেশের কথা চকিতে যদি কখনও মনে পড়ে তখন একই সঙ্গে পঞ্জাব এবং বাংলা এই দুই দূরবিচ্ছিন্ন দেশ ও তার মধ্যবর্তী সমস্ত দেশের রূপ কি একই সঙ্গে মনে পড়ে না? কিন্তু এটি হ'ল ভাবের দিক, অর্থাৎ একটু চেপে ধরলে যার স্পষ্ট অর্থ হারিয়ে যায়, সুতরাং এই দিকটির কথা আর না বলাই ভাল। সিমলার উচ্চতায় আরও আকর্ষণ আছে এবং সেটি সেই দিনই রাত্রে খেতে বসে প্রত্যক্ষ করা গেল। চমৎকার চাল, সুমিষ্ট মাছ, সুস্বাদু দুধ এবং নানাজাতীয় তরকারি এখানে প্রচুর। এমন সুখাদ্য মাছ যে এখানে মেলে (এবং ল্যান্সডাউনে আদৌ মেলে না) এই তথ্যটি জানা না থাকায় জ্ঞান-জগতে একটা মস্ত বড় ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। ল্যান্সডাউনে ছিল জ্ঞান সিং, বালকমাত্র, হাসি মুখ, কোমল স্বভাব। এইখানে তার পরিপূরক রূপে দেখলাম কৃপারামকে। এ রকম অনমনীয় মেরুদণ্ডবিশিষ্ট মানুষ কমই দেখা যায়। যখন সে কাজ করে, যখন সে হাঁটে, যখন সে সামনে ঝুঁকে পড়ে, যখন সে ডাইনে বামে অথবা পিছনে ফেরে, তখন তার অন্য যা-কিছু পরিবর্তন ঘটুক মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে, কোনো দিকে এতটুকু বেঁকে যায় না, দেখে মনে হয় যেন একটি মাত্র নিরেট হাড়ে গড়া সেটি, বরঞ্চ একটুখানি পিছন দিকেই হেলানো; সম্মুখের দিকে কদাপি নয়। কিন্তু বিশ্বস্ত ভৃত্য, রান্না এবং বাজার করার কাজ সে একাই করে এবং উত্তমরূপেই করে।

দুর্গা-ভিলার নীচের তলায় শুনলাম এক মাতাজি আছেন এবং তিনি বাঙালী। সিমলা অঞ্চলে তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি আছে, এবং শিষ্যের সংখ্যাও কম নয়। দুর্গা-ভিলা বাড়িখানির যিনি মালিক তিনিও তাঁর শিষ্যদের অন্যতম, তাই মাতাজি দুর্গা-ভিলায় মাঝে মাঝে এসে বাস করেন। তাঁর বিশেষত্ব হচ্ছে তাঁর জটা, সেই জটা মাথা থেকে পা পর্যন্ত নেমে এসেছে।

আমরা যখন আলাপে ব্যস্ত ছিলাম কালীকিঙ্কর তখন তাতে যোগ না দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গিয়েছিল। কোথায় তা পরে বোঝা গেল। শ্রীমতী কমলার কাছ থেকে মাতাজি সম্পর্কে অনেক কাহিনী শুনে সে খুব কৌতূহলী হয়ে পড়েছিল এবং কমলাই তাকে মাতাজির কাছে নিয়ে গিয়েছিল আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। তারপর শিল্পী ও সন্ন্যাসিনীর অনেকক্ষণ কি আলাপ হয় তা জানি না, কিন্তু বোঝা গেল মাতাজি শিল্পীর সঙ্গে আলাপ করে তার প্রতি প্রীত হয়েছেন।

তার প্রমাণ পাওয়া গেল পর দিনই। দুর্গা-ভিলার দোতলা থেকে নিচে যেতে হলে ঘর থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে একটা বাঁক ঘুরে নিচে নামতে হয়। এই রকম এক দিকের বাঁকের কাছে ছাউনি সম্বলিত একখানি বেঞ্চি আছে। শিল্পী সেই জায়গাটাই তার দৈনন্দিন আহ্নিকাদির জন্যে বেছে নিয়েছিল। পর দিন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা আন্দাজ সময়ে শিল্পী ফিরে এসে বললে আহ্নিক শেষে চোখ খুলেই দেখে একটি পাত্রে উৎকৃষ্ট কয়েকটি মিষ্টান্ন ও এক গেলাস জল তার সম্মুখে রয়েছে। বলা বাহুল্য, মাতাজির স্নেহের ওটি মিষ্টান্ন রূপ। বললাম কাল সকালে তোমার সঙ্গে আমিও বসে যাব চোখ বুজে, কিন্তু বললাম নিতান্তই ঠাট্টাচ্ছলে। কারণ বস্তু-জগতের সৌন্দর্যের প্রতিই আমার লোভ বেশি। তাই যতক্ষণ সম্ভব চোখ খুলে রাখার চেষ্টা করি, জানি না হয় তো আধ্যাত্মিক জগতের সৌন্দর্যের স্বাদ পেলে সেই দিকেই ঝুঁকে পড়তাম কি না, হয় তো চোখ খোলারই দরকার হ'ত না আর।

কিরণ, কণী অনেক আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল তাদের কার্যস্থলে। আমরা দু'জনও বারোটার মধ্যে খাওয়াদাওয়া শেষ করে বেরিয়ে গেলাম দৃশ্য দেখতে। কিন্তু ঘর থেকে বেরুলেই ক্রমাগত উপরে উঠতে হয়, এবং আমার পক্ষে তা অত্যন্ত কষ্টকর মনে হতে লাগল। দু'এক মিনিট পরেই কিছু বিশ্রাম করলে এবং খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলে ততটা কষ্টকর হয় না। আপন গরজেই এই কৌশলটি আবিষ্কার করে নিলাম। দু'বছর আগে শেষ পাহাড়ে ওঠা-নামা করেছি কিন্তু এ রকম প্রাণান্তকর মনে হয় নি—যদিও বহুদূর হাঁটার

পর অসম্ভব ক্লান্তি অনুভব করেছিলাম। কিন্তু এখানে প্রতি মিনিটে এরকম ক্লান্ত হয়ে পড়তে হবে তা আগে কল্পনা করা যায় নি। পথ দীর্ঘ এবং গ্রেডিয়েন্ট বেশি। দীর্ঘ পথ এই জন্যে যে সিমলা বহু বিস্তৃত জায়গা, সুতরাং দুর্গা-ভিলা থেকে ঘুরে ঘুরে শুধু উপরে উঠেই নিষ্কৃতি পাচ্ছি না, অপেক্ষাকৃত সমতল পথের সন্ধানে অনেকটা দূরত্বও অতিক্রম করতে হচ্ছে। কিছুটা উপরে উঠে দেখি দুর্গা-ভিলা কত নিচে পড়ে আছে। পথের দিকে চেয়ে দেখি আরও তিন গুণ পরিমাণ উপরে উঠতে হবে। একটু একটু করে এগিয়ে এবং দু'এক মিনিট অন্তর বিশ্রাম করে চলতে লাগলাম। এই ভাবে চলতে চলতে বারবন্দের বাড়ি ছাড়িয়ে প্রশস্ত উৎকৃষ্ট পথ পাওয়া গেল, এবং সেই পথে যতদূর যাওয়া সম্ভব গেলাম। শিল্পী কোন্ কোন্ জায়গায় বসলে ছবি আঁকার সুবিধা হবে সেই সব জায়গা মনে মনে চিহ্নিত করে রাখছিল। এ পথে ক্যামেরা খোলার বিশেষ দরকারই হ'ল না, বিশেষত্ব কিছুই ছিল না।

ছড়ির বাজার

বিনা টিকিটে ভ্রমণের একটি বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত

ফিরে এলাম আমরা ঘণ্টা কয়েক ঘুরেই। শিল্পী যে-কোনো জায়গায় অবশ্য বসে যেতে পারত, কিন্তু আমি সঙ্গে থাকায় তা আর হ'ল না, কারণ যে সব পথে ঘোরা হ'ল সে সব পথে আমি সম্পূর্ণ বেকার। শিল্পীর পক্ষে একা বেরুনোই প্রশস্ত। আমার পক্ষেও তাই। আমি ফিরে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পরই শিল্পীর পা চঞ্চল হয়ে উঠল, সুতরাং আমি একা শয্যাশায়ী হয়ে রইলাম। আধঘণ্টা আন্দাজ কেটে গেছে, ইতিমধ্যে ভারী পায়ের শব্দে চেয়ে দেখি শিল্পী ফিরে এসেছে। কি ব্যাপার? বললে, জল নিতে ভুল হয়ে গেছে। ব্যাগে রং তুলি কাগজ সবই আছে জল নেই। সুতরাং ভুল যাত্রা সংশোধন করে সে আবার দুর্গা-ভিলা এবং সংলগ্ন পাহাড় কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল। তার আসা এবং যাওয়ার মধ্যে যে উত্তেজনা প্রকাশ পেল তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল তার উপযুক্ত উৎকৃষ্ট দৃশ্য সে পেয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে কন্যা এসে আসর জমিয়ে বসেছে। ভদ্রতার অবতার এবং মধুর চিত্তাকর্ষী কাহিনী রচনায় নিপুণ। একটা ভরসা হ'ল এই যে, সিমলা-বাসের পরিমিত ক'টা দিন আর যদি পাহাড়ে ওঠানামা নাই করতে পারি তা হলেও কোনো ক্ষতি হবে না, কন্যাকে পেলেই যথেষ্ট হবে। শুধু অফিসের কয়েক ঘণ্টা যা অসুবিধা। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে অসুবিধাও দূর হ'ল, পরদিন তার প্রবল জ্বর এসে গেল।

এদিকে সন্ধ্যা আটটা বেজে গেছে, সিমলায় তখনও অন্ধকার হয় নি (কলকাতা থেকে প্রায় এক ঘণ্টা পরে ওখানে সূর্যাস্ত হয়)—এমন সময় হঠাৎ যেন আকাশের আলো নিভে গেল, চেয়ে দেখি মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন, এবং আরও দেখি ঝম ঝম করে বৃষ্টি নেমে পড়েছে। শিল্পী তখনও ফেরে নি—কিন্তু ফিরতে দেরি হ'ল না, কিছুক্ষণের মধ্যেই শিল্পী ভিজে ভিজে ছবি নিয়ে এসে হাজির হ'ল এবং কালবিলম্ব না করে তুলি চালিয়ে জলের সঙ্গে রঙের সামঞ্জস্য করে ফেলল। ছবিখানি ভেজাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নি, কারণ খুব বেশি ভেজে নি। সন্ধ্যার অল্প আলোর চাপা রঙে মণ্ডিত পাহাড়গুলো যেন ঢেউয়ের মতো উদ্যত হয়ে উঠেছে। পর্বতমালার এ রকম প্রাণোচ্ছ্বসিত প্রকাশ একমাত্র শক্তিশালী তুলিতেই ফুটতে পারে।

তরকারী-বাজারের একটি দৃশ্য

কাছে আগে ছুটে গিয়ে নিজেদের হিন্দুত্বের পরিচয় দিতে থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যাত্রীদের মধ্যে এ বিষয়ে খুব গোঁড়ামি দেখা গেল না, যদিও কুলিদের অত্যাচারে হয় তো বাধ্য হয়েই 'হিন্দুত্বের' ধাড়ে বোঝা চাপাতে হয়। মনে হ'ল বিষয়টির দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সাম্প্রদায়িক মনোভাব জিইয়ে রাখছে এই সব কুলিরা, এটি অত্যন্ত অন্যায়, বরঞ্চ এই নিচের ধাপেই এর ঠিক উল্টোটা হওয়া উচিত ছিল। আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক নৃশংসতা ও বর্বরতার যুগ অতীত যুগ হিসাবে না মেনে নিলে রাষ্ট্রের বিশেষ ক্ষতি করা হবে এ কথাটা প্রত্যেকেরই এখন স্মরণ রাখা দরকার।

এই প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এলাম আমরা প্রায় বারোটার সময়। শিল্পী তখনও ফেরে নি। আমরা একটু বিশ্রাম করতেই কার পদধ্বনি শোনা গেল দরজার বাইরে। প্রবেশদ্বারে কাঠের পথ বেয়ে কেউ এলে আগে থাকতেই বেশ বোঝা যায়। শিল্পী ফিরেছে মনে করে দরজা খুলতে দেখি কণীর অফিসের এক পিওন, হাতে চিঠি। তাতে লেখা আছে জ্বর খুব প্রবল না হলে অফিসে একটি জরুরি কাজ ছিল, আসা প্রয়োজন। কিন্তু জ্বর তখন প্রায় এক'শ তিন ডিগ্রী, তাই চিঠির সাহায্যেই নির্দেশাদি দিয়ে কণী বিছানায় শুয়ে পড়ল, এবং আরও ঘণ্টাখানেক শিল্পীর জন্যে অপেক্ষা করেও যখন দেখলাম আপাততঃ তার ফিরে আসার কোন চিহ্ন নেই তখন আমরা স্নান এবং আহার শেষ করে স্থায়ী ভাবে শয্যাশায়ী হলাম।

সিমলার দৃশ্যে শিল্পী সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়ে বিশেষ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, এবং পরদিন সকালের খাওয়া শেষ করেই বেরিয়ে গেছে ব্যাগ ঘাড়ে নিয়ে। আমি পড়ে আছি একা কণীর সঙ্গে। কণীর প্রবল জ্বরের কথা পূর্বেই বলেছি, অতএব সেটি আমার সুযোগ। আমরাও কিছু পরেই বেরিয়ে গেলাম ঊর্ধ্বপথে। এই যাওয়ার উদ্দেশ্য, ক্রমশঃ পাহাড়পথে চলায় অভ্যস্ত হওয়া এবং ঐ সঙ্গে যদি দৈবাৎ কোনো ছবির বিষয়বস্তু পাওয়া যায় তা দেখা। দৃশ্য সম্পর্কে মোহ কেটে গিয়েছিল, কেননা, এ সব বিস্তৃত দৃশ্যে অসাধারণত্ব কিছুই ছিল না, তা ছাড়া চোখে যে বিস্তার তৃপ্তিকর, ক্যামেরার সাহায্যে একসঙ্গে ততটা বিস্তার ধরা পড়ে না, এবং যাকে প্যানোরামিক চিত্র বলে তাও এখানে অন্ততঃ আমাদের নির্দিষ্ট ভ্রমণ-সীমার মধ্যে কোথায়ও তোলার সুযোগ ছিল না। সুতরাং ঠিক করলাম বাজার, লোকজন ও পথঘাটের ছবিকেই প্রধান করতে হবে। কিন্তু সেই জনবহুল জায়গা তখনও আমাদের দৃষ্টির বাইরে ছিল, এবং সে দিকে যেতে হলে বিকেলের দিকে যাওয়াই ভাল। সুতরাং টানেল ভেদ করে ওপারের বড় রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে চার দিকের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। এই পথে বাস চলাচল করে এবং এখান থেকে শহরের খানিকটা অংশ বেশ দেখা যায়। বাস্-এর অবস্থা পৃথিবীর বোধ হয় সর্বত্রই সমান। ভিড়ের আতিশয্য সর্বত্র। টানেলের পাশে দু'দল কুলি বসে আছে যাত্রীদের মালপত্র বহনের আশায়। কুলিরা দুটি দলে বিভক্ত কেন সে বিষয়ে কণীর কাছ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেল। সিমলার মতো বড় জায়গার পক্ষে এটি অবশ্যই লজ্জাকর, এবং আরও বেশি লজ্জাকর হচ্ছে এই যে, বাস্ থামলে বড় দলটি বাস্-এর

শিল্পী ফিরল বেলা দু'টোয়, প্রকাণ্ড এক ছবি শেষ করে। দুপুর বেলার উজ্জ্বল রূপ, পাহাড়ে পাহাড়ে রঙের খেলা, ঘন নীল আকাশে ভাসা ভাসা সাদা মেঘ। শিল্পী পাহাড় দেশের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ করে ফেলেছে আর তাকে আটকায় কে? তাই সে এসে খাওয়াটা কোনো রকমে শেষ করেই আবার বেরিয়ে গেল ব্যাগ ঘাড়ে নিয়ে। সিমলার আপিস বা বাণিজ্য অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্রের বাইরে যত জায়গা আছে তা এমনই নির্জন এবং শান্ত যে শিল্পীর পক্ষে তাকে সম্পূর্ণ আদর্শ পরিবেশ বলা চলে। পথের ধারে বসে রঙীন ছবি আঁকছে অথচ অকারণ কৌতূহলীর ভিড় নেই। দু'একজন যারা একটু কাছে এসে দেখে গেছে তারা শিল্পীর প্রতি সম্মান রেখেই তা করেছে। বাজে লোক কেউ তাকে বিরক্ত করে নি।

বিকেলে আমাদের আর কোথাও বেরনো হ'ল না, যদিও আমার মনে হচ্ছিল, হাঁটতে খুব অসুবিধা হ'ত না। বাথার এলাকাটি দেখার জন্যে বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছি, আর ঐ সঙ্গে অভিজাত অঞ্চল। পরদিন শনিবার, অতএব কিরণ বিকেলে আমাদের সঙ্গী হবে এ রকম কথা হয়েছিল। অফিস থেকে ফিরবে ছুটোর পর, তারপর রওনা হব। ভয় হচ্ছিল শেষ বেলায় গিয়ে কতটুকু আর দেখা যাবে। তা ছাড়া আকাশের অবস্থা অনিশ্চিত, গত রাত্রেও খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। কিরণকে জিজ্ঞাসা করলাম আগামী কাল তার প্রবল জ্বর হবার সম্ভাবনা আছে কিনা। সে বললে আদৌ নেই। উল্টে তার এক মাসের পুজোর জ্বর হয়ে গেল।

এদিকে আমার পাহাড় পথে চলার সাহস অনেকটা বেড়ে গেছে, কৌশল ইতিমধ্যেই আয়ত্ত করে ফেলেছি, কাজেই পরদিন সকাল বেলাটা আর ঘরে বসে কাটাতে ইচ্ছা হ'ল না, ঠিক করলাম কালীকিঙ্করের সঙ্গে বেরিয়ে যাব। সে দৈনিক ছুখানা করে ছবি আঁকছে ছু'বেলা। সুতরাং আমার সঙ্গে যাওয়া মানে তার একখানা ছবি নষ্ট হওয়া। কিন্তু একটা রফা করা গেল। চলতে চলতে যদি ছবির জায়গা মিলে যায় তা হলে সে বসে যাবে সেখানেই।

কিন্তু আমরা দুর্গা-ভিলা ছেড়ে উপরের পথে একটুখানি নীচের দিকে নামতেই দেখি এক কাশ্মীরী মুসলমান উঠে আসছে উপরের দিকে। দেখতে প্রায় আবদুল গফফার খাঁয়ের মতো, তেমনি দীর্ঘদেহ এবং সুন্দর। হাতে দড়ি, পিঠে শূন্য থলে, শক্তিশালী পুরুষ, কিন্তু তবু অভাবের ছাপ তার সর্বাঙ্গে। তাকে দাঁড়াতে বললাম, অত্যন্ত অনুগতের মতো দাঁড়াল ক্যামেরার সম্মুখে। কালীকিঙ্করও একটা স্কেচ এঁকে নিল। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কাজ মেলে না, খেতে পায় না ভাল করে। তাকে কিছু পয়সা দিলাম, কিন্তু মনে হ'ল এটি তার পক্ষে একেবারেই আশাতীত। সে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে তার বহু দুঃখের কথা আমাদের শোনাল। মনে হ'ল যেন কত কাল সে মানুষের মুখ থেকে একটি অনুকম্পাপূর্ণ কথা শোনে নি।

এই একটি লোকের ছবি নিয়ে আমার এক বেলার কর্তব্য শেষ হ'ল এবং অল্প কিছু দূর ঘুরেই শিল্পীকে মুক্ত করে দিলাম। সিমলা-প্রকৃতি তাকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করছে, কিন্তু বিদ্যুতের শত শত তারের বন্ধনীতে নিজেকে জড়িয়ে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখছে অধিকাংশ জায়গাতেই। শিল্পীকে বললাম যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে, কারণ বিকেলে আমরা শহর অঞ্চলে যাব। কিন্তু তার আর ফেরা হ'ল না যথাসময়ে। ইতিমধ্যে বেলা সাড়ে তিনটে আন্দাজ সময়ে কিরণ ও আমি বেরিয়ে গেলাম। আমি জানতাম সিমলা ভ্রমণ আজ বিকেলেই শুরু এবং শেষ, এর পর সুযোগ বা উৎসাহ কিছুই থাকবে না। তাই আমি অনেকগুলো ছবি তোলার উপযুক্ত ফিল্ম নিলাম পকেটে। দুর্গা-ভিলা থেকে বেরিয়ে প্রথম কড় রাস্তা ধরতেই সামর্থ্য প্রায় অর্ধেক শেষ হয়ে গেল এবং সেখান থেকে ঘোরা পথ এড়াবার জন্যে কিরণ আমাকে যে পথে টেনে নিয়ে চলল সে পথে সিমলায় অন্তত ছ'মাস হাঁটা অভ্যাস করে তবে সেখানে উঠা উচিত। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাকে প্রথমেই উঠতে হ'ল সেই পথে। ছু'তিন মিনিট উঠেই মনে হ'ল সিমলায় অন্ধকার নেমে আসছে। অন্ধকার সত্যিই নামছিল আকাশ-পথে। বর্ষার মেঘ মাথার উপরে, ছু'এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে গায়ে। তখন যুদ্ধের সময়ের রেল-কর্তৃপক্ষ প্রচারিত করেকটি বিজ্ঞাপন আমার মানস চোখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার একটি হচ্ছে "ট্র্যাভেল হোয়েন ইউ মাষ্ট।" অর্থাৎ নিতান্ত জরুরি হলে তবেই ভ্রমণ করো। নিজেকে প্রশ্ন করলাম—এই অপরাহ্ণ ভ্রমণটা কি সত্যই জরুরি ছিল? মন বলল, শুধু এ ভ্রমণ নয়, ল্যান্সডাউন ভ্রমণ এবং সিমলা ভ্রমণ সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং উদ্দেশ্যহীন।

মনে হচ্ছিল যেন সমস্ত জীবনে এর মত অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ আর করি নি। পথের এক ধারে তারের বেড়া ছিল, সেই তার ধরে উঠতে পারলে কিঞ্চিৎ সুবিধা হ'ত, কিন্তু তা হ'ল না, কারণ উপরে ওঠার চেয়েও নিচে নামার যাত্রী বেশি ছিল এবং তার ছিল তাদের দখলে।

বৃষ্টি পড়ছিল টিপ টিপ করে, মনে হচ্ছিল যেন এক যুগ কেটে গেছে এরই মধ্যে। অবশেষে উঠে এলাম সমতল ক্ষেত্রে, কালীবাড়ির সীমানায়। ঐখানে একটুখানি ঘুরে এবং বিশ্রাম করে অনেকটা আরাম বোধ হ'ল। কালীবাড়ি থেকে নিচের দৃশ্য অত্যন্ত চমৎকার। কঠিন তারের বাধা না থাকলে এইখানে কিছু ভাল ছবির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দৃশ্যের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম, দুঃখ ছিল না। তাই ওখান থেকে বেরিয়েই পথের ও পথের পাশের মানুষের ছবি তোলা শুরু করে দিলাম। কাপড়-কাচা তরুণী থেকে ভারবাহী টানা বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা সবাই হাসি মুখে আমার উদ্দেশ্য সাধনে সহযোগিতা করল। আকাশে মেঘ বহু পূর্বেই কেটে গিয়ে চার দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আমরা এগিয়ে চলেছি ম্যালের দিকে। বাড়িগুলি পথের পাশে ছবির মত লাগছে। ক্রমে অভিজাত অঞ্চলের চিহ্ন ফুটে উঠছে। পুরুষেরা সাহেবী ও মেয়েরা মেম সাহেবী ভঙ্গীতে চলাফেরা করছে। মেয়েদের এবং মাথার বাড়াবাড়িটা অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই এংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের সমান পর্যায়ে উঠেছে। এটা খুব বেশি দিনের ঐতিহ্য বলে মনে হয় না দেখে। হয় তো মোগলাহেব-দের রাজত্বকালে ইচ্ছা ও অভ্যাসটা কিঞ্চিৎ চাপা ছিল, তাদের প্রভাব কেটে যাবার পর ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠেছে

কিন্তু অভ্যাসটা এখনও পাকা হয় নি। কিংবা "স্বাধীন ভারতে প্রথম রং মাখা" এই মনোভাব আছে এর মূলে—কাজেই বাড়াবাড়িটা সাময়িক বলে ধরা যেতে পারে। কিংবা হয় তো আমারই ভুল, পিছিয়ে-পড়া কলকাতা শহর থেকে এসে হঠাৎ এ সব নতুন মনে হচ্ছে। যারা আড়াই টাকায় তিন শিশি সুগন্ধ তেলের সঙ্গে উৎকৃষ্ট তিনটি হাতঘড়ি বাংলা দেশে বিক্রি করে ধনী হয়, অথবা সর্ব্বদুঃখবিনাশী ম্যাজিক আংটি বাঙালীর কাছে দু'টাকায় বিক্রি করে বাঙালীর দুঃখ দূর করার চেষ্টা করে, তারা বাঙালীর অপেক্ষা যে অনেক বেশি প্রগতিশীল এ বিষয়ে সন্দেহ কি? অতএব আর চিন্তা না করে বিষয়টি মেনে নিলাম। তার পর চলল ঘোরার পালা। যখন পা আর চলে না তখন ভ্রমণ শেষ করে এক-খানা ছড়ি কিনে তারই সাহায্যে ঘরে ফিরে এলাম। পঞ্জাব দেখা আমার প্রায় শেষ হয়েছে, আর অল্প কিছু বাকী, সেটুকু রেলপথে পাওয়া যাবে। এ দিকে শিল্পী দৈনিক দুখানা করে রঙীন ছবি শেষ করছে, আর আমি শুয়ে শুয়ে সময় কাটিয়ে দিচ্ছি।

২১ জুন রওনা হওয়া গেল। গাড়িতে আসন আমাদের রিজার্ভ করা ছিল এবং কালকার পর থেকে দু'রাত্রির ঘুমের মাশুলও অতিরিক্ত দেওয়া ছিল। আমাদের কামরায় আমরা দু'জন ভিন্ন আর চার জন স্থানীয় ব্যক্তি উঠলেন। তাঁদের তিন জন মিলিটারী ও এক জন সিভিল। তাঁরা গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাস খেলায় মন দিলেন। তার জন্যে দাবী হ'ল আমাদের উঠে অন্য দিকে যেতে হবে। এ দাবী পূরণ করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু তাঁরা মাঝখানের মালপত্রের উপর তাস বিছিয়ে চার জন এমন ভাবে বসলেন যাতে আমা-দের বেশ অসুবিধা হতে লাগল।

আরও দু'এক জন ভদ্রলোক উঠলেন, তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু এই চার জন বর্বরের মনে তাঁদের জন্যে কিছুমাত্র চিন্তা আছে বলে মনে হ'ল না। পাশের গাড়ি থেকে তাঁদেরই স্বদেশবাসী কয়েকজন মহিলা স্নানঘরে যাবার সময় তাঁদের পা এবং তাসের আসর ডিঙিয়ে যেতে বাধ্য হলেন, কিন্তু তাতেও তাঁদের অভিনব শিক্ষা এবং সংস্কৃতি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হ'ল না। আমার সম্মুখস্থ সাহেববেশী খেলোয়াড় আমার পাশে পা তুলে দিলেন। আমাকেও বাধ্য হয়ে তাঁর পাশে পা তুলতে হ'ল, কিন্তু তাতে তাঁর আপত্তি হ'ল না। দেখলাম যাঁর যেমন খুশি অন্যের গায়ে পা তুলে বসছেন। এর মধ্যে যে অভদ্রতা আছে সে বোধই তাঁদের নেই—এটি বেশ বোঝা গেল। মহিলাদের প্রতিও তাঁদের কিছুমাত্র সৌজন্য নেই। রূপোর কোদালের মতো ঝকঝকে দাঁত সর্বদা হাঁ-করা মুখ থেকে বেরিয়ে আছে। যুগান্তরের বর্বরতার ছাপ চোখে-মুখে। অতএব সাহেবী পোষাক তাঁদের নিতান্তই অনুকরণ মাত্র, মুখের ইংরেজী বুলিও প্রভুভক্তির নিদর্শন মাত্র। তাসের আড্ডার চার জন লোক পরস্পর খুব যে পরিচিত তা মনে হ'ল না, এক ধর্মীও নয়, তাই এঁদের সাধারণ পাঞ্জাবীদের প্রতিনিধি হিসাবে দেখলে খুব যে ভুল দেখা হবে তা মনে হয় না। অবশ্য পাঞ্জাবীদের মধ্যে সংস্কৃতিবান লোকেরও দেখা পেয়েছি ইতিপূর্বে, কিন্তু তাঁদের দেশে বসে সেই সব দৃষ্টান্তকে ব্যতিক্রম ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না।

কালকার গাড়িতে উঠে যেন মস্ত বড় একটা আরাম পেলাম। গাড়ির বাইরে আমাদের নামের কার্ড দেওয়া ছিল, অতএব সেটিকেই ঘুমের গাড়ি মনে করে আমরা শুয়ে পড়লাম। যতগুলো আসন তার অতিরিক্ত এক জন যাত্রীও ছিলেন না। আমার পাশে নীচে ছিলেন এক রেস্তোরেঁও। তাঁর সঙ্গে আলাপ শুরু হ'ল। যতদূর মনে পড়ে রেস্তোরেঁও মরিস্ তাঁর নাম। যুবক, এবং অত্যন্ত মধুরভাষী। পরস্পর পরিচয় প্রসঙ্গে শিল্পীর ছবিগুলি তাঁকে দেখালাম। হঠাৎ তাঁর হাত থেকে দু'একখানা ছবি পড়ে যাওয়াতে তিনি অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সেগুলি তুলে ক্রমাগত দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন যে যেভাবে সাজানো ছিল তা বোধ হয় নষ্ট হ'ল।

ভদ্রতা, সৌজন্য, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির একটা মধুর স্বাদ পেলাম সুদীর্ঘ দু'ঘণ্টা পরে, মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। তারপর ছবি সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে যে আলাপ হ'ল তাতে তাঁর এ সম্বন্ধে জ্ঞান দেখে বিস্মিত হলাম। রীতিমতো পণ্ডিত লোক, মুখে তাঁর প্রকৃত শিল্প-সমালোচকের ভাষা। আমি কথা তুললাম, চমৎকার ছবি আঁকতে পারেন এমন শিল্পী ইউরোপের সর্বত্রই সংখ্যায় অনেক বেশি। কি করে এটা সম্ভব হয়েছে। তিনি বললেন স্কুল থেকেই ছোটদের চিত্রবিদ্যার সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং ওসব দেশে সচিত্র সাময়িকপত্র এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ছবির চাহিদা খুব বেশি, সুতরাং শিল্পীদের মধ্যে প্রতি-যোগিতাও খুব বেশি। তা ভিন্ন ছবির গ্যালারিগুলিতে সবাই সবসময় ভাল ছবি দেখার সুযোগ পায়, কাজেই শিল্পীর চোখ এবং মন তৈরি হবার সুযোগ থাকে সবারই। তবে আজকাল যুদ্ধের পরে গোড়া থেকেই স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয় পৃথক করে দেওয়া হয়েছে, তাড়াতাড়ি কাজের লোক চাই দেশে এখন।

এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হ'ল তাঁর সঙ্গে। তিনি সকালে দিল্লী ষ্টেশনে নেমে গেলেন। দিল্লীর পর থেকে আবার বিনাটিকিটে ভ্রমণের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। একটি দশ বছরের মেয়ে আমাদের গাড়ির বাইরে পাদানির উপর দাঁড়িয়ে চলতে লাগল। ঘণ্টায় ৫৫ মাইল বেগে গাড়ি ছুটছে কিন্তু সে নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে আছে একটা পুঁটুলি হাতে নিয়ে।

তারপর আবিষ্কার করলাম (কানপুরে) যে আমাদের

গাড়িতে যে তিন জন মহিলা ও এক যুবক ছিলেন তাঁরাও ঐ পথের পথিক।

তারপর আবিষ্কার করলাম আরও ভয়ানক একটা জিনিস—মোগলসরাই ষ্টেশনে। আমরা দু'জনে ঘুমের গাড়ির জন্যে মোট চল্লিশ টাকা দেওয়া সত্ত্বেও ঘুমের গাড়ি আমাদের আদৌ দেওয়া হয় নি—শুধু বসার জায়গা রিজার্ভেশন মাত্র এবং তার জন্যও পৃথক টাকা দেওয়া ছিল। ফিরে এসে রেলকম্পানীকে চিঠি দিয়েছিলাম অভিযোগ করে, আজও (১৬-৯-৪৯) তার উত্তর পাই নি।

বাড়ি ফেরার সাত দিন পরে কিরণ লিখছে—সিমলা এখন অদ্ভুত সুন্দর হয়ে উঠেছে, রঙে রঙে ছেয়ে গেছে সব পাহাড়। কণী লিখছে—সমস্ত সিমলাই যেন সুপার-টার্পার।

ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন—১৯৪৯

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

এতদিনে ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কিং আইন পাশ হওয়ায় (১৯৪৯ সনের ১০নং আইন) প্রকৃতই দেশের একটা অভাব দূর হইল। ১৯১৩-১৭ সনের ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের বিপর্য্যয় হইতেই ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত আইনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ১৯৩১ সনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত আইনের সুপারিশ করেন। অবশ্য উক্ত কমিটির বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ কোম্পানী-আইনের সংশোধন করিয়া ব্যাঙ্কসম্পর্কীয় কয়েকটা ধারা সন্নিবেশিত করিলেই উহা কার্য্যকরী হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। তদনুযায়ী ১৯৩৬-৩৮ সনে ভারতীয় কোম্পানী-আইন সংশোধন করিয়া ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত কয়েকটি ধারা (২৭৭ এক হইতে ২৭৭ এন্) জুড়িয়া দেওয়া হয়। ১৯৩৪ সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন পাশ হয় এবং ১৯৩৫ সনের ১লা এপ্রিল হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্য আরম্ভ হয়। উক্ত আইন অনুযায়ী তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি কতকটা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আওতায় আসে, কিন্তু তাহাও এত গৌণভাবে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গোড়া হইতেই এদেশের জন্য একটি ব্যাঙ্ক আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কারণ ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্ব যথেষ্টই ছিল। এদেশের ব্যাঙ্ক উন্নয়ন বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অনেককিছু আশা করা গিয়াছিল। বিশেষতঃ কৃষিঋণ বিষয়ে ভারতবাসী মাত্রেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে, যথেষ্ট সাহায্য পাইবার আশা করিয়াছিল। যে দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষির উপর নির্ভরশীল সে দেশের আর্থিক কাঠামো মহাজন-মুদী-স্বর্ণকারের উপর কিছুতেই ছাড়িয়া দেওয়া যায় না—এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। অথচ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইতে দেখা গেল না। মুষ্টিমেয় তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক, উপরের স্তরের ব্যবসায়ী ও শিল্পীগণের সহায়ক হইলেও নিম্নস্তরের বিরাট কৃষক- ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পিকর্ম্মীগণ পূর্ব্বের ন্যায় অসহায় অবস্থাতেই পড়িয়া রহিল। এদিকে নানারকম লোকের হাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক নামীয় এক ধরণের প্রতিষ্ঠান দেশময় গজাইয়া উঠিল। এই সকল ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠাতাগণের ব্যাঙ্ক-সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা এবং ব্যবসায়ের সাধারণ সততা এ দুয়েরই যথেষ্ট অভাব ছিল। ফল যাহা দাঁড়াইল তাহা এদেশের ব্যাঙ্কের ইতিহাসের এক করুণ কাহিনী। বহু নব-প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়া দেশময় এক বিরাট বিপর্য্যয়ের এবং দেশবাসীর মনে অবিশ্বাসের সৃষ্টি করিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৩৯ সনে ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত আইনের একটি খসড়া গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করে, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সরকারকর্ত্তৃক কোন আইন প্রণয়ন করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কিন্তু সাময়িকভাবে বিশেষ ব্যবস্থা নিতান্তই দরকার বোধে ১৯৪২ এবং ১৯৪৪ সনে কোম্পানী আইনের সংশোধন করা হয়। কিন্তু দেশের সর্ব্বত্র ব্যাঙ্কের অবস্থার অবনতির দরুন গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৪ সনের নভেম্বর মাসে ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত আইনের খসড়া কেন্দ্রীয় আইন-সভায় উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ইতিমধ্যে আইন-সভা ভাঙিয়া দেওয়ায় ১৯৪৬ সনের মার্চ্চ মাসে আবার আইনের খসড়া উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু এই বিলটিও গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৮ সনের জানুয়ারী মাসে প্রত্যাহার করেন। ঘটনার ক্রমপরিবর্ত্তনের জন্যই এইরূপ করা দরকার হইয়াছিল। এই স্বল্পকালের মধ্যে ১৯৪৬ সনে (২৭ নং আইন) ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলির ব্রাঞ্চ বা শাখা খোলার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য, এবং এই সনেই (১৯৪৬ সনের ৪নং) ব্যাঙ্ক পরিদর্শন ও তদন্ত সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা বাড়াইয়া একটি অর্ডিনান্স জারি হয়। ১৯৪৭ সনে (১৯ নং) আর একটি অর্ডিনান্স দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ১৮ ধারা সংশোধন করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এই অধিকার দেওয়া হয় যে, উহা যে-কোন তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ককে যে-কোন বন্ধকী উপযুক্ত মনে করিলে উহার উপরে কর্জ্জ দিতে পারিবে। কয়েকটি তপশীল-

ভুক্ত ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহাদিগকে উপযুক্ত সময়ে অর্থসাহায্য করে নাই এবং ঐরূপ সাহায্য পাইলে ব্যাঙ্কগুলির কাজ হয়ত বন্ধ করিতে হইত না—এইরূপ অভিমত প্রকাশ পাওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট উক্ত অর্ডিনান্স জারি করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি সঙ্কটকালে যাহাতে আরও বেশী সাহায্য পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করেন।

১৯৪৮ সনের জানুয়ারী মাসে নূতন করিয়া আবার ভারতীয় আইন সভায় ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত আইনের খসড়া উপস্থাপিত করা হয়, এই বিল সম্বন্ধে জনমতও গ্রহণ করা হয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, গত ১৯৩৯-৪৭ এই কয় বৎসরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই খসড়া মূল খসড়া হইতে অনেক উন্নত ও ব্যাপক ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং ইতিমধ্যে সাময়িকভাবে কোম্পানী আইন বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন বা অর্ডিনান্স জারি করিয়া যেভাবে আইনের সংশোধন বা পরি-বর্ত্তন সাধন করা হইয়াছিল তৎসমুদয়ই এই নূতন আইনের খসড়ায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত ১৯৩৬-৩৮ সনের সংশোধিত কোম্পানী আইনের সকল ধারাই এই নূতন আইনে পুনঃসন্নিবেশিত হইয়াছিল। ১৯৪৯ ফেব্রুয়ারী মাসে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন ডোমিনিয়ান আইন-সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং ১০ই মার্চ্চ তারিখ গবর্ণর জেনারেলের সম্মতিক্রমে আইনে পরিণত হইয়াছে। এই আইন দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত বিধানগুলি একাধারে সন্নিবেশিত ও আবশ্যকমত সংশোধিত হইয়াছে।

এই নূতন আইনের ব্যবস্থাগুলি বিবেচনা করা যাক—

ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর সংজ্ঞা

এই আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী বা ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য। সুতরাং প্রথমেই 'ব্যাঙ্ক' কাহাকে বলে বা ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা কি তাহা জানা প্রয়োজন। কিন্তু ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দেওয়া কোন দেশের আইনের পক্ষেই সহজ হয় নাই, বিশেষতঃ আমা-দের দেশে ত' নয়ই। কারণ এখানে 'ব্যাঙ্ক'-এর নামে অনেকেই অনেক রকম ব্যবসা চালাইয়া থাকে। সুতরাং বাস্তবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই আইনে বলা হইয়াছে যে, যে সকল ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কিং বা লগ্নির জন্য কোন প্রকার চল্‌তি বা স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিবে তাহারাই এই আইনের আওতায় আসিবে। অবশ্য সমবায় প্রতিষ্ঠান বা ব্যাঙ্ক এই আইনের আওতায় পড়িবে না প্রথমেই তাহা বলা হইয়াছে (প্রথম অংশ—৩ ধারা)। যে সকল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতায় পড়িবে (অবশ্য সমবায় ব্যাঙ্ক' ব্যতীত) সেগুলি ছাড়া অপর কোন প্রতি-ষ্ঠান 'ব্যাঙ্ক' 'ব্যাঙ্কার' বা 'ব্যাঙ্কিং' শব্দ তাহাদের নামের অংশরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে না (৭ ধারা)। ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান কি প্রকারে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারিবে (দ্বিতীয় অংশ ৬ ধারা) তাহা বিশদভাবে দেওয়া হইয়াছে এবং স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে উহা 'ম্যানেজিং এজেণ্ট' রূপে কোন কোম্পানীর কার্য্য করিতে পারিবে না (৬ বি ধারা)। উল্লিখিত ৬ ধারার ১৫টি উপধারায় বর্ণিত কার্য্যাবলী ছাড়া ব্যাঙ্কিং কোম্পানী অপর কোন কার্য্য করিতে পারিবে না (৬ (২) ধারা)। আইনের ৮ ধারায় আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে 'প্রত্যক্ষে' বা 'পরোক্ষে' মালের কেনা-বেচা (যাহা অন্যান্য ব্যবসায়ীর কাজ) ব্যাঙ্ক করিতে পারিবে না। তবে সাময়িকভাবে ব্যাঙ্কের নিজ বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় সম্পর্কে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না। ইহার ব্যবস্থাও আছে। পুরাতন ব্যাঙ্কের পক্ষে এরূপ কার্য্য শেষ করিবার জন্য আইনে নির্দ্দিষ্টভাবে সময় (সাত বৎসর) বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই সময়ের মধ্যে উহা সম্ভব না হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আরও পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সময় বাড়াইয়া দিতে পারিবে।

কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম

নিয়ম হইয়াছে যে, ম্যানেজিং এজেণ্ট দ্বারা ব্যাঙ্ক পরি-চালিত হইতে পারিবে না এবং কোন ব্যাঙ্কও ম্যানেজিং এজেণ্টের কার্য্য করিতে পারিবে না। যিনি কখনও দেউলিয়া হইয়াছেন বা পাওনাদারগণের দেনা শোধ না করিতে পারিয়া রফা করিয়াছেন (Compounded with creditors) অথবা কোন আদালত কর্ত্তৃক দুর্নীতির (immoral torpitude) অপরাধে শাস্তি পাইয়াছেন তিনি ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী হইতে পারিবেন না। ব্যাঙ্কের কাজে কমিশন পাইবেন বা লাভের অংশীদার হইবেন, এ সর্ত্তেও কোন কর্ম্মচারী নিয়োগ চলিবে না। শুধু তাহাই নহে, ব্যাঙ্কের সাধ্যের অতিরিক্ত এবং সাধারণতঃ যে মাহিনা পাওয়া ও দেওয়া সম্ভব তাহা হইতে বেমানান বেশী মাহিনা দিয়া কর্ম্মচারী রাখা চলিবে না। কাহারও মাহিনা অসম্ভবরকম বেশী কিনা ইহার চরম বিচারের কর্ত্তা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। অপর কোন কোম্পানীর ডাইরেক্টর কিম্বা অপর কোন কার্য্যে নিযুক্ত বা ব্যাপৃত লোক কিম্বা ব্যাঙ্কের পরিচালনের জন্য পাঁচ বৎসরের অতিরিক্ত কালের জন্য নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকেই ব্যাঙ্কের কার্য্যে রাখা চলিবে না। কেহ ব্যাঙ্কের কার্য্যে ইতিমধ্যে নিযুক্ত হইয়া থাকিলে ১৯৪৪ সনের ১লা জুলাই হইতে তাঁহার কার্য্যকালের পাঁচ বৎসর গণনা করা হইবে। অবশ্য ঐ পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে ডিরেক্টারগণ কোন ব্যক্তিকে আবার অনধিক পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এই নিয়ম অধিকারিকগণের (officer) সম্বন্ধে প্রযোজ্য, সাধারণ করণিকের (clerk) উপর প্রযোজ্য নহে।

আইনের ১০ম ধারার উপরোক্ত বিধানসমূহ হইতে দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্মচারী নিয়োগ, তাহাদের গুণাগুণ বিচার,

রাহিনা ও কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাকালের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধেও গত তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুন কয়েকটি কঠোর বিধান করা হইয়াছে এবং এ বিষয়ের চরম বিচারের ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর বর্ত্তিয়াছে।

মূলধন

এদেশের অল্প মূলধনে স্থাপিত অনেক ব্যাঙ্কের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে—একজ যখন ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের প্রথম খসড়াটি প্রস্তুত হয় তখন হইতে এই বিষয়ে একটু কড়াকড়ি দেখা গিয়াছিল। সাধারণভাবে ইহার সমালোচনায় বলা হইয়াছিল যে, মূলধন সম্পর্কে দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একটু সুবিধা না দিলে উহাদের পক্ষে কাজ চালানো অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে এবং হয়ত আইনের কড়াকড়ির জন্য ইহাদের অনেককে কারবার গুটাইতে হইবে। ক্ষুদ্র সুপরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি—বিশেষতঃ যেগুলি পল্লী-অঞ্চলে কার্য্য করিতেছে, উঠিয়া যায় ইহা কাহারও অভিপ্রেত ছিল না—একজ শেষ পর্য্যন্ত যখন ব্যাঙ্ক আইন পাশ হইল তখন এই সকল ছোট ব্যাঙ্কগুলিও যাহাতে টিকিয়া থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে অথচ প্রথম প্রস্তাবের মূল নীতির কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই।

আইনের ১১ সংখ্যক ধারার বিধানগুলি এইরূপ—

অভারতীয় ব্যাঙ্ক

এই আইন কার্য্যকরী হইবার তিন বৎসরের মধ্যে বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতিসাপেক্ষ আরও এক বৎসর-মধ্যে, কোন অভারতীয় ব্যাঙ্কের মূলধন অন্তত পনর লক্ষ এবং ইহাদের কার্য্যস্থল বোম্বাই বা কলিকাতা শহরে হইলে কুড়ি লক্ষ টাকার কম হইলে চলিবে না। এই সমগ্র মূলধন নগদ বা অবন্ধকী গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে নিয়োজিত ভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিতে হইবে। কোন কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কারবার গুটাইলে পাওনাদারগণের প্রথম দাবি হইবে এই গচ্ছিত টাকার উপর। পুরাতন অভারতীয় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে উপরোক্ত নিয়ম প্রযোজ্য। কোন নূতন অভারতীয় ব্যাঙ্ককে উক্ত মূলধনের টাকা জমা দিয়া তবে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

ভারতীয় ব্যাঙ্ক

যে সকল ব্যাঙ্কের কার্য্যস্থল একটি মাত্র—আর তাহাও আবার কলিকাতা বা বোম্বাই শহরে নহে তাহাদের মূলধন ও রিজার্ভ মিলাইয়া (value) অন্ততঃ ৫০,০০০ টাকা হইবে।

যে সকল ব্যাঙ্কের কার্য্যস্থল একটি মাত্র, কিন্তু তাহা

কলিকাতা বা বোম্বাই সহরে অবস্থিত তাহাদের মূলধন এবং রিজার্ভ মিলাইয়া অন্ততঃ ৫,০০,০০০৲ টাকা হইবে।

যে সকল ব্যাঙ্কের কার্য্যালয় একাধিক প্রদেশে এবং কলিকাতা ও বোম্বাই এই দুইটি শহরেই যাহাদের কার্য্যালয় অবস্থিত তাহাদের মূলধন এবং রিজার্ভে মিলাইয়া অন্ততঃ ১০,০০,০০০৲ টাকা হইবে।

যে সকল ব্যাঙ্কের কার্য্যালয় একটি মাত্র প্রদেশে অবস্থিত অথচ তাহা কলিকাতা বা বোম্বাই সহরে নহে তাহাদের প্রধান কার্য্যালয়ের জন্ত মূলধন ও রিজার্ভ মিলাইয়া অন্ততঃ ১,০০,০০০৲ টাকা হইবে এবং জেলার মধ্যেকার অন্তান্ত প্রত্যেক শাখার জন্ত ১০,০০০৲ টাকা, জেলার বাহিরে, কিন্তু প্রদেশের অন্তর্গত প্রত্যেক শাখার জন্ত ২৫,০০০৲টাকা প্রয়োজন হইবে, তবে এরূপ ব্যাঙ্কের মোট মূলধন ৫,০০,০০০৲ টাকার বেশী প্রয়োজন হইবে না।

যে সকল ব্যাঙ্কের একটি বা একাধিক কার্য্যালয় একটি মাত্র প্রদেশে অবস্থিত, কিন্তু উহা কলিকাতা বা বোম্বাই শহরে স্থাপিত সেই সকল ব্যাঙ্কের মূলধন ও রিজার্ভ মিলাইয়া অন্ততঃ ৫,০০,০০০৲ টাকা হইবে এবং অতিরিক্ত প্রত্যেক শাখার জন্ত ২৫,০০০৲ মূলধনের প্রয়োজন হইবে, কিন্তু মোট মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ১০,০০,০০০৲ টাকার বেশী প্রয়োজন হইবে না।

এখানে বলা আবশ্যক যে, মূলধন বলিতে আদায়ীকৃত মূলধন (paid up capital) বুঝাইবে এবং যেখানে মূলধন সিকিউরিটিতে বা স্বর্ণে নিয়োজিত সেখানে মূল্য (value) বলিতে প্রকৃত অর্থাৎ বিনিময়যোগ্য (exchangeable value) মূল্য বুঝাইবে। অর্থাৎ যে মূল্য কেবল বইয়ের পাতায় লেখা আছে তাহাতেই চলিবে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাচাই করিয়া আদায়ী মূলধন এবং অবশিষ্ট লাভ বা রিজার্ভের প্রকৃত মূল্য যাহা নির্দ্ধারণ করিবে তাহাই গ্রহণীয় হইবে।

এই ব্যবস্থাদ্বারা ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলির অন্ততঃ সর্ব্বনিম্ন মূলধনের কাঠামো ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র অথচ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি (যাহাদের সংখ্যা সমগ্র ভারতের মোট ব্যাঙ্ক-সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ) যাহাতে রক্ষা পায় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এই বিষয়ে যে চরম নির্দ্ধারক করিয়া ভুল বা ভুয়া হিসাবরক্ষার পথ বন্ধ করা হইয়াছে তাহাও ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের পক্ষে কল্যাণজনক।

অনুমোদিত, বিক্রীত এবং আদায়ীকৃত মূলধন

আইনের ১২ সংখ্যক বিধান অনুযায়ী আদায়ীকৃত মূলধন (paid up capital) অন্ততঃ বিক্রীত (subscribed) মূলধনের অর্দ্ধেক এবং তাহা আবার অনুমোদিত (Authorized) মূলধনের অর্দ্ধেক হইতে হইবে, অন্যথা ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবে না। ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের অংশ (Share) কেবলমাত্র সাধারণ অংশ (ordinary Share) হইবে। ১৯৪৪ সনের ১লা জুলাই-এর পূর্ব্বে কোন প্রেফারেন্স সেয়ার বা সুদবাহী অংশ বিক্রয় হইয়া থাকিলে তাহা অবশ্য গ্রাহ্য হইবে। অংশ, সাধারণ বা সুদবাহী যাহাই হউক প্রত্যেক অংশীদারই দেয় মূলধনের অনুপাতে কোম্পানীতে ভোটের অধিকারী হইবেন। কিন্তু কোন একজন অংশীদারের ভোট মোট ভোটের শতকরা পাঁচ ভাগের বেশী হইবে না। যে সকল ব্যাঙ্ক ১৯৩৭ সনের ১৫ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে সম্মিতিভুক্ত হইয়াছে তাহাদিগকে এই ধারার ব্যবস্থা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

অংশ বিক্রয় প্রভৃতি

অংশ বিক্রয়ের উপরে শতকরা আড়াই টাকার অতিরিক্ত কমিশন দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্যাঙ্কের অনাদায়ী মূলধন রেহান বন্ধ করা বেআইনী হইয়াছে। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময়ে অংশ বিক্রয়ের কমিশন, দালালী, ক্ষয়ক্ষতি প্রভৃতি যে সকল প্রাথমিক ব্যয় হয়—যাহার জন্ত কোন পাওনা বা সম্পত্তি (Assets) নাই, তাহা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে অংশীদারকে লভ্যাংশ দেওয়া আইনবহির্ভূত। যিনি এক ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর আছেন তিনি অন্ত কোন ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর হইতে পারিবেন না ইহাও আইনের বিধান।

অবণ্টনীয় লভ্যাংশ

প্রত্যেক ব্যাঙ্কিং কোম্পানীকে একটা রিজার্ভ ফণ্ড রাখিতে হইবে এবং এই তহবিলে প্রত্যেক বৎসর নিট লাভ হইতে অন্ততঃ শতকরা কুড়ি ভাগ সরাইয়া রাখিতে হইবে এবং এইরূপ না করিয়া অংশীদারগণের মধ্যে কোন লভ্যাংশ বণ্টন করা যাইবে না। যতদিন না রিজার্ভ আদায়ী মূলধনের সমান হয় ততদিন এইরূপে রিজার্ভ গঠন চলিতে থাকিবে।

নগদ তহবিল

তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক ব্যতীত প্রত্যেক ব্যাঙ্ক নিজের তহবিলে বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অথবা উভয়ে মিলাইয়া চলতি ও স্থায়ী

নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে

ইউরোপীয় সাহিত্যজগতে 'লেডি চ্যাটার্লির লাভার'এর মতো আর কোনো উপন্যাস এতখানি চাঞ্চল্য সৃষ্টি বোধ হয় করেনি। ডি এইচ লরেন্সের এই উপন্যাসখানি নীতিবাদীদের কড়া শাসন সত্ত্বেও, আজো জীবন্ত হয়ে আছে, তার কারণ, বক্তব্য সম্বন্ধে যত মতভেদই থাক, লরেন্সের অসামান্য প্রতিভার বহ্নিদীপ্ত প্রকাশ এই বইএ কোনো মতেই অস্বীকার করবার নয়। লরেন্সের জীবনবেদ ইউরোপের কাছে যতটা দুর্বোধ আমাদের কাছে ততটা নাও হতে পারে, এই জন্যে যে আমাদের তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সংগে তার মিল বড় কম নয়। তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শনে তান্ত্রিক মতবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। জীবন সাধনার গভীরতম উপলব্ধিকেই 'লেডি চ্যাটার্লির প্রেম'এ লরেন্স রক্ত মাংসের রূপ দিয়েছেন। প্রচলিত সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা ছাড়িয়ে কাম ও কামনা এখানে অপরূপ এক রহস্যগভীর পূজানুষ্ঠানের উপকরণ হয়ে উঠেছে। দাম ৩৷৷৹

অনুবাদ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

অচিন্ত্যকুমারের

সহস্রের জনতায় কোথায় কে একজন সামান্য যুবক, আর কোথায় কে একটি সাধারণ মেয়ে। কী এক আশ্চর্য মুহূর্তে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে আর চকিতে হাজার বছরের অন্ধকার ঘর আলো হয়ে যায়। সেই সামান্য যুবক সম্রাট হয়ে ওঠে আর সেই সাধারণ মেয়ে হয়ে ওঠে রাজেশ্বরী। কিন্তু কতদিনের সেই স্বপ্ন রচনা, সেই আকাশচারণ ? আছে সংঘর্ষসঙ্কুল পৃথিবী, দৈনন্দিন প্রাণ ধারণের তিক্ততা। সেই সম্রাট যুবক তখন এক ভবঘুরে বেকার আর সেই রাজেশ্বরী মেয়ে এক শিক্ষয়িত্রী। আবার তারা বিচ্ছিন্ন, অপরিচিত। কিন্তু যে প্রদীপে একদিন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর আলো হয়েছিল, সে কি নেববার ? জীবিকার চেয়ে জীবন কি বড় নয় ? প্রয়োজনের চেয়ে বড় কি নয় প্রেম ? সেই অপরাভূত প্রেমের গরিমাময় কাহিনীই এই উপন্যাস। দাম ২৷৷৹

অচিন্ত্যকুমারের

সাধারণ পরিভ্রমণ দেশ থেকে দেশে, আর এই পরিব্রজ্যা হৃদয় থেকে হৃদয়ে। মানুষের অন্তরে যে একজন গৃহহীন বৈরাগী বাস করছে এ তারই ঘর খোঁজার কাহিনী। কাছের মানুষ হয়েও কোথায় সে দূরে বসে আছে — রূপে-রূপে সেই অপরূপার অনুসন্ধান। সংস্কারমুক্ত জীবনের অভিনব সংসার কামনা। য়ুরোপের সাহিত্যে যেমন নুট হামসুনের 'ওয়াণ্ডারার্স' বাংলা সাহিত্যে তেমনি এই 'বেদে'। বহু পৃথিবী পেরিয়েও যেমন আকাশ, তেমনি বহু প্রেম ও বহু প্রাপ্তি পেরিয়েও সেই অনির্দেশ্য আকাঙ্ক্ষা। বহু বাসনায় বিশ্বরমার উপাসনা। দাম ৩৷৷৹

শচীন্দ্র মজুমদারের

স্থান : এলাহাবাদ। কাল : ১৯৪২। পাত্রী : বহ্নিশিখার মতো এক বাঙালী মেয়ে। এ-মেয়ে বিজ্ঞানের ছাত্রী। দেশই তার দয়িত, দেশজোড়া আগুনের মধ্যে নিজের শিখাটুকুকে মিলিয়ে তার সার্থকতা। প্রয়োজনে কালভার্টের নিচে রাত কাটায়, পুরুষের ছদ্মবেশে ছাত্রাবাসে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু ছায়ার মতো অবিরাম তাকে অনুসরণ করে একদিকে গোয়েন্দা বাহিনীর পুলিশ, অপরদিকে লালসামত্ত এক পুরুষ। সেই তৃষ্ণার্ত আলিঙ্গন থেকে তার ঊর্ধ্বশ্বাস পলায়ন। শচীন্দ্র মজুমদারের রোমাঞ্চকর রসঘন রচনা। দাম ৩৲

১০।২ এলগিন রোড, কলিকাতা ২০

আমানতের যথাক্রমে শতকরা পাঁচ ও দুই ভাগ জমা রাখিবে এবং প্রত্যেক মাসের পনর তারিখের মধ্যে, পূর্ব্ব-মাসের প্রত্যেক শুক্রবার চলতি ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ কিরূপ ছিল ও তৎসম্পর্কিত ব্যাঙ্কের নগদ তহবিলের হিসাবের তিনখানি নকল রিজার্ভ ব্যাঙ্কে পাঠাইতে বাধ্য থাকিবে।

অপর প্রতিষ্ঠানে অর্থনিয়োগ

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি লইয়া ব্যাঙ্কিং কোম্পানী অছিরূপে (undertaking and executing trusts, undertaking of the administration of estates as executors, trustees or otherwise) বা নিরাপত্তার জন্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ (providing of safe deposit vaults) করিতে কিম্বা ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত অন্তান্ত আবশ্যক কার্য্য করিতে পারিবে। কিন্তু অপর কোন কোম্পানীর শতকরা ত্রিশ ভাগ বন্ধকী রাখিতে বা ক্রয় করিতে কিম্বা ব্যাঙ্কের নিজের আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভের শতকরা ত্রিশ ভাগ এভাবে নিয়োগ করিতে পারিবে না। যদি এই আইন বলবৎ হইবার পূর্ব্বে কোন ব্যাঙ্ক ঐরূপ করিয়া থাকে তবে অবিলম্বে তাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জানাইতে হইবে এবং উহার অনুমতি লইয়া অনধিক দুই বৎসরের মধ্যে আইন অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। এই আইন কার্য্যকরী হইবার এক বৎসরের পর কোন ব্যাঙ্কই উহার কোন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বা ম্যানেজারের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন কোম্পানীর অংশের বন্ধকগ্রহীতা, মর্টগেজগ্রহীতা বা মালিক হইতে পারিবে না।

এই বিধান দ্বারা যাহাতে অবাঞ্ছিত স্থানে ব্যাঙ্কের অর্থনিয়োগ না হয় এইরূপ ব্যবস্থাই করা হইয়াছে।

কর্জ্জ এবং অর্থনিয়োগে কড়াকড়ি

ব্যাঙ্ক নিজ অংশ বা শেয়ার বন্ধক রাখিয়া ধার দিবে না। কোন বন্ধক না রাখিয়া কোন ডিরেক্টারকে অথবা ডিরেক্টারের স্বার্থ রহিয়াছে এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান ও প্রাইভেট কোম্পানীকে ব্যাঙ্ক কর্জ্জ দিবে না। এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীতে কোন ডিরেক্টর অংশীদার ও অন্তভাবে স্বার্থসংযুক্ত, এমন কি জামিনদার হইলেও, ব্যাঙ্কের কর্জ্জ দেওয়া নিষেধ।

কোন ব্যাঙ্ক হইতে কোন প্রতিষ্ঠানকে বন্ধকী না রাখিয়া কর্জ্জ দিলে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে ব্যাঙ্কের কোন ডিরেক্টর, ম্যানেজিং এজেন্ট, জামিনদাতা বা ডিরেক্টররূপে সংশ্লিষ্ট থাকিলে যে মাসে ঐরূপ কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী মাসের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে তাহা রিটার্ণ (return) দ্বারা জানাইতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রিটার্ণ পরীক্ষা করিয়া উক্ত ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্ত, ঋণ আদায়ের বা অপর কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আদেশ দিবে এবং যে সময়ের মধ্যে তাহা সম্পন্ন করিতে বলিবে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক তাহা মান্ত করিতে বাধ্য থাকিবে।

শুধু তাহাই নহে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে ২১ সংখ্যক ধারার বলে যে-কোন ব্যাঙ্ককে ও ব্যাঙ্কগোষ্ঠীকে কি ভাবে কর্জ্জ দিতে হইবে সেই বিষয়ে নির্দ্দেশ দিতে পারেন এবং এই নির্দ্দেশ সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কসমষ্টি মানিতে বাধ্য। এমন কি কতটা কর্জ্জ দিতে হইবে, কি সুদ লইতে হইবে, কি বন্ধকী রাখিতে হইবে এবং কত মার্জ্জিন রাখিতে হইবে, এবিষয়েও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আদেশই চরম বলিয়া গ্রহণীয় হইবে। অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার্থই এই সকল বিধিব্যবস্থা করিবে।

ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর লাইসেন্স গ্রহণ

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে আদেশপত্র (লাইসেন্স) না পাইলে কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানী কাজ করিতে পারিবে না। যে সকল ব্যাঙ্ক আইন পাশ হইবার সময় ব্যবসা করিতেছিল তাহাদিগকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ছয় মাস মধ্যে অনুমতিপত্রের জন্ত দরখাস্ত করিতে হইবে। অবশ্য ইতিমধ্যে তাহারা ব্যবসা চালাইয়া যাইতে পারিবে।

ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আমানতকারীগণকে আবশ্যকমত জমার টাকা প্রত্যর্পণ করিতে সক্ষম কিনা অনুমতি দিবার পূর্ব্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহা দেখিবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এদিকেও লক্ষ্য রাখিবে যেন ব্যাঙ্কের পরিচালনে আমানতকারীগণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। এতদ্ব্যতীত অভারতীয়, বিদেশে সমিতিভুক্ত ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ইহাও দেখার প্রয়োজন হইবে যে, উক্ত ব্যাঙ্কের নিজদেশে ভারতীয় ব্যাঙ্কের ব্যবসা সম্পর্কে কোন বৈষম্যমূলক বিধান নাই এবং উক্ত ব্যাঙ্ক
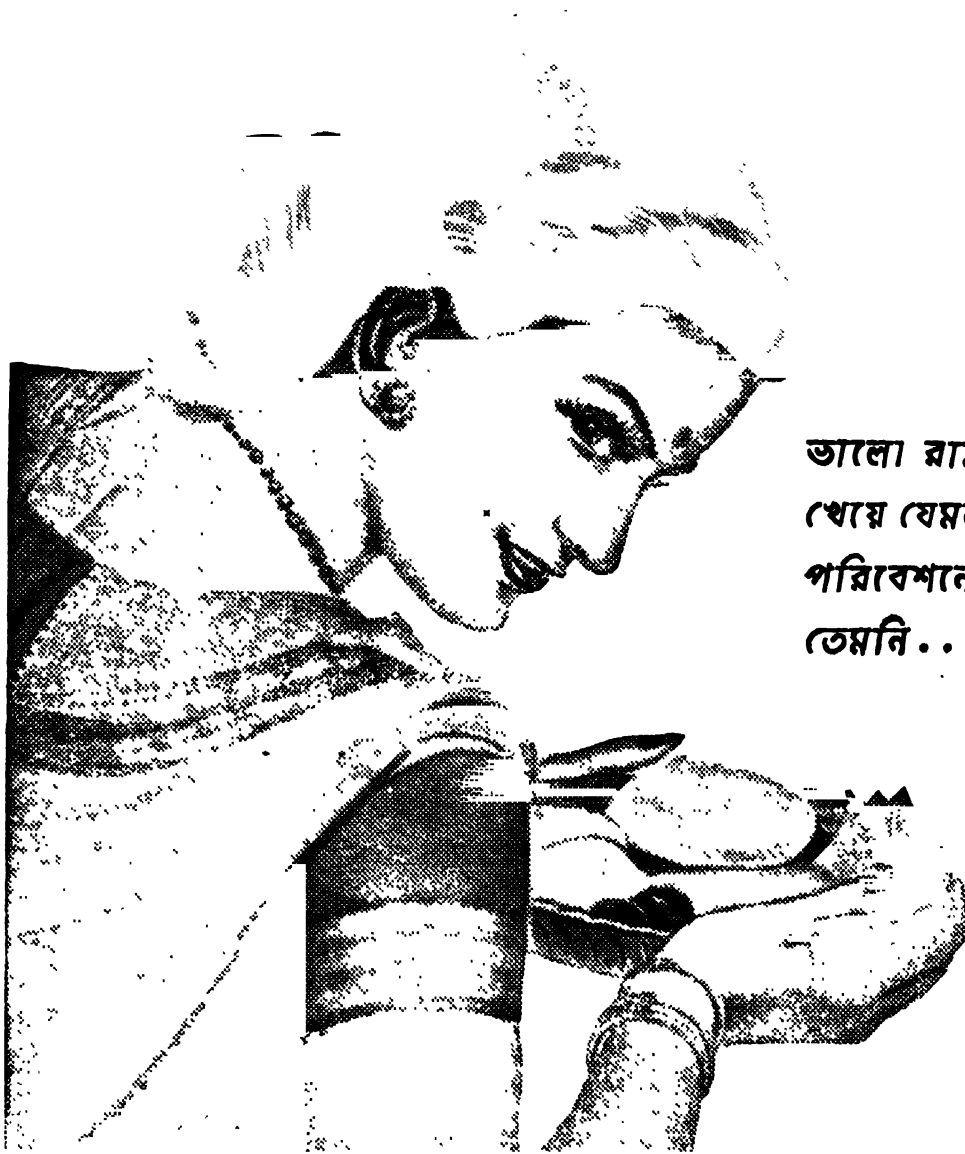
এদেশের ব্যাঙ্ক-আইন সম্পর্কীয় যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিধান পালন করিয়াছে।

অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশেষ সর্ত্তাধীনে আদেশপত্র বা লাইসেন্স দিতে পারিবে এবং সর্ত্তাদি পূরণ না হইলে লাইসেন্স বাতিল করিতেও পারিবে। ইহা ব্যতীত লাইসেন্সের নিয়মাদি ভঙ্গ করিলে লাইসেন্স বাতিল হইয়া যাইবে। যে সকল ব্যাঙ্ক এই আইন পাশ হইবার সময় হইতে ব্যবসা করিয়া আসিতেছে তাহাদিগকে লাইসেন্স দিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রস্তুত না থাকিলে অর্থাৎ তাহাদের আইনসম্মত-ভাবে মূলধন প্রভৃতি না থাকার দরুন তাহারা লাইসেন্স পাইবার যোগ্য বিবেচিত না হইলে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহাদিগকে অন্তত তিন বৎসর এবং দরকার মনে করিলে আরও বেশী সময় দিতে পারিবে এবং ঐ সময়ের মধ্যেও যোগ্যতা অর্জ্জন না করিলে পরে লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে।

কোন ব্যাঙ্কের লাইসেন্স বাতিল করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করিবার অধিকার থাকিবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের বিচারের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না।

এ স্থলে একটি বিষয় জানা প্রয়োজন যে, ভারতীয় বীমা-আইনে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স লওয়া ব্যতীত বার্ষিক একটা ফি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ব্যাঙ্ক আইনে তাহা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট সুব্যবস্থাই করিয়াছেন।

শাখা বা ব্রাঞ্চ খোলা সম্বন্ধে ব্যবস্থা

আইনের ২৩ ধারায় ব্যাঙ্কের কার্য্যস্থল পরিবর্ত্তন ও নূতন আপিস খোলা সম্বন্ধে বিধি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। একই সহর বা গ্রামে কার্য্যস্থল পরিবর্ত্তন করা যাইবে, কিন্তু কোন নূতন শাখা খুলিতে হইলে লিখিত ভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি দরকার হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এরূপ আদেশ দিবার পূর্ব্বে ব্যাঙ্কের অবস্থা ও ইতিহাস, পরিচালন-ব্যবস্থা, মূলধন ও আয়ের অঙ্ক এবং যেখানে নূতন আপিস খোলার প্রস্তাব হইয়াছে সেখানে আদৌ সর্ব্বসাধারণের দিক হইতে নূতন ব্যাঙ্কের চাহিদা আছে কিনা বিচার করিয়া দেখিবে। অবশ্য সাময়িক ভাবে অনধিক এক মাসের জন্য ব্রাঞ্চ খুলিলে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতির কোন প্রয়োজন হইবে না।

নগদে সম্পত্তি রাখার বিধান

এই আইন পাশ হইবার দুই বৎসর পরে প্রত্যেক ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান মেয়াদ-শেষে উহার চলতি ও স্থায়ী আমানতের অন্ততঃ কুড়ি ভাগ নগদে, সোনায় বা অবন্ধকী অনুমোদিত সিকিউরিটিতে (unencumbered approved security) নিয়োজিত রাখিতে বাধ্য থাকিবে। অবশ্য এই কুড়ি ভাগ সম্পত্তির মূল্য

বাজারের চলতি দামে ধার্য্য হইবে। আমানতের হিসাবে আদায়ী মূলধন বা লাভ-ক্ষতির হিসাবের উদ্বৃত্ত অংশ ধরা হইবে না, এবং তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আইন অনুযায়ী যাহা জমা রাখিবে তাহাও এই ধারা অনুযায়ী কুড়ি ভাগের মধ্যেই ধরা হইবে। প্রতিদিনের হিসাবের লেন-দেনের উপর কড়াকড়ি আমানতকারিগণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই করা হইয়াছে।

প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ মার্চ্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের শেষ দিনে প্রত্যেক প্রদেশে ব্যাঙ্কের সম্পত্তি (assets) এরূপ ভাবে নিয়োজিত রাখিতে হইবে যাহাতে উহা চলতি ও স্থায়ী আমানতের শতকরা পঁচাত্তর ভাগের কম না হয়। যাহাতে কোন ব্যাঙ্কের সম্পত্তি আমানতকারীগণের স্বার্থের প্রতিকূলে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরাইয়া না লওয়া যায় এই বিধান দ্বারা তাহাই করা হইয়াছে। ইহার অন্য উদ্দেশ্য প্রত্যেক প্রদেশের মূলধন অনেকটা স্থানীয় উন্নতির জন্য নিয়োগ করা।

হিসাব সম্পর্কিত বিধান

বৎসর শেষ হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে প্রতি বৎসর, দশ বৎসর পর্য্যন্ত লেন-দেন হয় নাই (inoperative) এরূপ হিসাবের তালিকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে দাখিল করিতে হইবে। স্থায়ী জমার প্রত্যর্পণের তারিখ হইতে উহার দশ বৎসর গণনা করিতে হইবে।

প্রত্যেক প্রদেশে কোন ব্যাঙ্কের সম্পত্তি কিরূপে জমা আছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে তাহার মাসিক বিবরণ (returns) প্রদান করিতে হইবে।

ইহা ব্যতীতও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে-কোন ব্যাঙ্কের ব্যবসা-সম্পর্কিত তথ্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাহিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক উহা দিতে বাধ্য থাকিবে। এই সমস্ত তথ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আবশ্যক মনে করিলে সাধারণের হিতার্থে প্রকাশিত করিতে পারিবে।

প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে আইনের নির্দ্দেশিত ভাবে বৎসরান্তে উদ্বৃত্ত পত্র (balance sheet) ও লাভ-ক্ষতির হিসাব (profit and loss account) প্রস্তুত করিয়া যথারীতি হিসাবপরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করাইতে হইবে। বৎসর শেষ হইবার তিন মাস মধ্যে হিসাব পরীক্ষা করাইতে হইবে এবং ইহার তিনখানি নকল রিজার্ভ ব্যাঙ্কে দাখিল করিতে হইবে। অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে হিসাব দাখিলের সময় আরও বাড়াইয়া দিতে পারিবে। এই পরীক্ষিত হিসাবের তিনখানি নকল জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীর রেজিষ্ট্রারের নিকটেও পাঠাইতে হইবে। বিদেশী ব্যাঙ্কিং কোম্পানীও প্রতিবৎসরের পরীক্ষিত হিসাব পরবর্ত্তী বৎসরের আগষ্ট মাসের প্রথম সোমবারের মধ্যে ভারতের

যে যে স্থানে উহার ব্যবসা চলিতেছে এরূপ প্রত্যেক আপিসে সাধারণের অবগতির জন্ত প্রকাশ্যভাবে রাখিতে বাধ্য হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক তদন্ত

কোম্পানী আইনের ১৩৮ ধারার ব্যবস্থার বাহিরেও কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে-কোন ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের বই, খাতাপত্র ও কার্য্যপ্রণালী এক বা একাধিক পরিদর্শক দ্বারা তদন্ত করাইতে পারিবে। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর কর্ম্মচারী মাত্রেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্তকারী পরিদর্শককে যাবতীয় সংবাদ ও তথ্য যোগাইতে বাধ্য থাকিবে। পরিদর্শনকারী (অনেকটা বিচারকের মত?) হলপ করাইয়া যে-কোন ডিরেক্টর বা কর্ম্মচারীকে মৌলিকভাবে পরীক্ষা করিতে পারিবেন। ব্যাঙ্কের কার্য্য ও পরিচালন আমানতকারিগণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করা হইতেছে কি না রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহাই দেখিবে ও সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাইবে। কেন্দ্রীয় সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া ব্যাঙ্কবিশেষের ভবিষ্যতে জমা গ্রহণ বন্ধ করিতে পারিবেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে উক্ত ব্যাঙ্ক গুটাইবার (liquidate) জন্ত আদেশ দিতে পারিবেন এবং এই সম্পর্কিত রিপোর্ট বা বিবরণী আবশ্যকবোধে সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

আইনের ৩৬ ধারায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা আরও ব্যাপক করা হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ ব্যতীতই যাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরাসরি যে-কোন ব্যাঙ্কের কার্য্যে হস্তক্ষেপ, উপদেশদান, অর্থসাহায্য, ডিরেক্টরগণ ব্যাঙ্কের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া যাহাতে সুব্যবস্থা করেন তাহার জন্ত সভা আহ্বান প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারে এরূপ বিধান করা হইয়াছে।

প্রতি বৎসর দেশের ব্যাঙ্কিং-এর ব্যবস্থা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করা ও উক্ত ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর কার্য্য বন্ধ ও গুটাইবার ব্যবস্থা

কোন ব্যাঙ্ক পাওনাদারের দেনা মিটাইতে অক্ষম হইলে সাময়িক ভাবে কোর্ট ঐ সম্পর্কে ব্যাঙ্কের অনুকূলে (অর্থাৎ দেনা পরিশোধের কার্য্য বন্ধ রাখিবার জন্ত) সাময়িক আদেশ দিতে পারেন। কিন্তু এই সম্পর্কে চরম আদেশ দিবার পূর্ব্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক তদন্ত ও রিপোর্ট দরকার হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট দেখিয়া কোর্ট পূর্ব্ব আদেশ বহাল, বাতিল বা সংশোধন করিতে পারেন।

ভবিষ্যতে একমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কই ব্যাঙ্কের কারবার গুটানোর ব্যাপারে সরকারী লিকুইডেটর হইবে এবং এই সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের একীকরণ

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুসন্ধান ও রিপোর্ট ব্যতীত কোন আদালতই ব্যাঙ্ক ও তাহার পাওনাদারগণের মধ্যে কোন আপোষ-রফা অনুমোদন করিবেন না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোন আপোষ-রফা আমানতকারিদের স্বার্থের প্রতিকূল বলিয়া রিপোর্ট দিলে কোর্ট তাহা গ্রাহ্য করিয়া রায় দিবেন।

অতঃপর কোন দুইটি বা ততোধিক ব্যাঙ্কিং কোম্পানী পরস্পর মিলিত হইতে চাহিলে সর্ব্বাগ্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লিখিত অনুমোদন দরকার হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন ব্যতীত ব্যাঙ্কের একীকরণ (amalgamation) আইনসম্মত হইবে না।

এই আইনের চতুর্থ ভাগে, উহার বিধান অমান্ত করিলে নানারূপ জরিমানা ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং প্রায় প্রত্যেক ব্যবস্থায়ই রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কোম্পানী আইনের যে সকল সুবিধা প্রাইভেট কোম্পানীগুলি ভোগ করে এই আইন দ্বারা প্রাইভেট ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলিকে সেই সকল সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে (৫১ ধারা)। এই আইন দ্বারা কতকাংশে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক আইন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন, ভারতীয় কোম্পানী আইন বাতিল বা সংশোধন করা হইয়াছে। এক কথায় বলা যায় যে, এই আইন পাশ হইবার পরে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ও বীমা-ব্যবসায়ের মত অনেকটা সরকারকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইল। তবে এই নিয়ন্ত্রণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায়—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে (১লা জানুয়ারী ১৯৪৯ হইতে) সরকারী ব্যাঙ্ক। যদি এই ব্যাঙ্ক-আইন দ্বারা ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের মোড় ফেরে তবে দেশের শিল্প, বাণিজ্যের শ্রী ফিরিবে। জনসাধারণ নিশ্চিন্ত ভাবে দেশী ব্যাঙ্কে নিজেদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ আমানত রাখিতে পারিবে। তবে জানিয়া রাখা ভাল যে, কেবল আইন দ্বারাই কোন দেশে শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হয় নাই। দেশের শিক্ষিত যুবকগণের মধ্য হইতে ভাল ব্যাঙ্কার তৈরি হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির মত আমাদের দেশীয় ব্যাঙ্কারগণ ততটা সজাগ বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ বাঙালী ব্যাঙ্কারগণ নিজেদের ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির মোহে এখনও আচ্ছন্ন। দেশে ভাল ব্যাঙ্ক সৃষ্টি করিতে হইলে এই মূল (key) ব্যবসায়কে দূরদর্শিতার সঙ্গে অনেকটা নিঃস্বার্থ ভাবে পরিচালন করা দরকার। অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ বিষয়ে ছোট-বড় সকল ব্যাঙ্ককেই সকল সময়ে সাহায্য ও নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রস্তুত থাকিবে। সর্ব্বসাধারণের টাকায় ব্যাঙ্ক চলে, সুতরাং তাহাদের আরও ব্যাঙ্ক-মনোভাবাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। ব্যাঙ্কের পরিচালক ও গ্রাহক উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় স্বাধীন ভারতের ব্যাঙ্ক ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে—ইহা আশা করা খুবই সমীচীন।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা—প্রথম খণ্ড ১৮১৮-১৮৩০। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ (১৩৫৬)। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১।০+৫৩০। মূল্য দশ টাকা।

১৩৩৯ সনে যখন এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ইহা বিদ্বজ্জন-সমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ১৭ বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থের আরও দুইটি সংস্করণ বাহির হওয়ায় প্রমাণিত হইল যে, বাঙ্গালী জনসাধারণও ইহার আদর করিতে শিখিয়াছে। যে-দেশে কবিতা ও গল্প-উপন্যাস ব্যতীত সাধারণতঃ অন্য কোন গ্রন্থ জনপ্রিয় হয় না, সে দেশে এই শ্রেণীর গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ গ্রন্থকারের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার বিষয়। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবু আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের জন্য যে সমুদয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, দেশবাসী যে তাহার মূল্য বুঝিয়াছে ইহা এ দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে বিশেষ আশার কথা।

বাংলার প্রাচীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' হইতে বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ ও বিষয় অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পুরাতন পত্রের পৃষ্ঠা ঘাঁটিয়া এইরূপ সঙ্কলন করা যে কিরূপ আয়াসসাধ্য ব্যাপার, ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। সংগ্রহ-কার্যেও গ্রন্থকার ঐতিহাসিকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে সমুদয় গুরুতর পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বঙ্গদেশ মধ্যযুগের সংস্কার ও সভ্যতা পরিহার করিয়া আধুনিক সভ্যতার অধিকারী হইয়াছে তাহার সম্যক পরিচয় লাভ করিতে হইলে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শিক্ষা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের খুঁটিনাটি এমন অনেক ব্যাপার জানা দরকার যাহা প্রচলিত ইতিহাসে পাওয়া যায় না, কেবল সাময়িক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তাহার অনুসন্ধান মেলে। কিন্তু প্রাচীন সংবাদপত্র অতিশয় দুষ্প্রাপ্য; এবং সুলভ হইলেও তাহা হইতে এই সমুদয় উদ্ধার করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। এই জন্য প্রকৃত ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে তথ্য সংকলন বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবু এই গুরুতর কার্য্যের পথ-প্রদর্শক, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কারণ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া কেহ কেহ তাঁহার পূর্ব্বেও কোন সংবাদপত্রের সার সঙ্কলন করিয়া থাকিলেও এরূপ ব্যাপকভাবে ইতিহাসের সর্ব্ববিধ উপকরণ সংগ্রহ-কার্য্যে আর কেহ ব্রজেন্দ্রবাবুর পূর্ব্বে রত হন নাই।

উনবিংশ শতাব্দী বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের একটি বিশেষ স্মরণীয় যুগ। মানুষের ন্যায় জাতীয় জীবনেও কেবল বৎসরই কালের মাপ নহে, ভাব ও অভাবই প্রকৃত কালের মাপ। এ কথা বলিলে কিছু মাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে ১৩০০ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ—এই পাঁচ শত বৎসরে বঙ্গদেশের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ১৮০০ হইতে ১৯০০ এই এক শত বৎসরের পরিবর্ত্তন

তাহার অপেক্ষা অনেক গুরুতর। পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাসে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে যে ব্যবধান, আমাদের দেশেও এই দুই যুগের মধ্যে ব্যবধান ঠিক তদ্রূপ। সুতরাং এই এক শত বৎসরের বিস্তৃত ইতিহাস না জানিলে আমাদের দেশের এই গুরুতর পরিবর্ত্তনের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা অত্যন্ত অধিক। কারণ এই যুগের প্রকৃত ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। এই ইতিহাস লিখিতে হইলে যে মালমশলার প্রয়োজন তাহাও সংগৃহীত হয় নাই। এই জন্যই শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবু এই বিষয়ে যাহা করিয়াছেন তাহার মূল্য অত্যন্ত বেশী। সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি যথাক্রমে শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম ও বিবিধ—এই কয়টি প্রধান ভাগে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। পরিশিষ্টে 'বঙ্গদূত' নামে সে যুগের আর একখানি সংবাদপত্র হইতে কিছু কিছু সংবাদ সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সমুদয় সংবাদ হইতে যে ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় ভূমিকায় গ্রন্থকার তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার দ্বারা উদ্ধৃত অংশের ঐতিহাসিক মূল্য বুঝিবার পক্ষে পাঠকগণের বিশেষ সুবিধা হইবে। পরিশেষে গ্রন্থোক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং যে সকল শব্দ বর্ত্তমান কালে সুপরিচিত নহে, অকারাদিক্রমে তাহার তালিকা ও অর্থ দেওয়া হইয়াছে। বিস্তৃত বিষয় সূচীটি গ্রন্থোক্ত নানা বিষয় সত্বর নির্ণয় করিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিবে। আমরা এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

গান্ধী পন্থায় গ্রাম-গঠন—শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার বসু। আই, এ, পি, কোং লিমিটেড, ৮নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১২৪ পৃষ্ঠা। মূল্য—দেড় টাকা মাত্র।

এই পুস্তকখানির লেখক ত্যাগব্রতী। দক্ষিণেশ্বর অন্নদা ঠাকুরের আশ্রমে তাঁহার কৈশোর কাটে; যৌবনে (১৩২৯-৩০ সনে) খাদি প্রতিষ্ঠানে গঠনমূলক কার্য্যে তাঁহার হাতেখড়ি হয়; তারপর তিনি প্রায় ১৫ বৎসর ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় পল্লী-সংগঠন কার্য্যে কাটাইয়াছেন। আজ প্রৌঢ় বয়সে তিনি গান্ধীজীর একজন নৈষ্ঠিক শিষ্য; তাঁহার গঠনমূলক কর্ম্মে দৃঢ়ব্রত। গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ তিনি জীবনের যাত্রাপথে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, লোক-সেবার যে সুযোগ পাইয়াছেন, তাহা তাঁহার জীবনে ব্যর্থ হয় নাই।

গান্ধী-পন্থায় তিনি বিশ্বাসী এবং পল্লীবাসীর বর্ত্তমান নিশ্চেষ্টতা দূর করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়া তাদের কাছে একজন "কেষ্ট-বিষ্টু" বলিয়া প্রতীয়মান হইবার কল্পনাকে দূরে রাখিয়াছেন; তাদের "একজন" হইতে চাহিতেছেন—এই সাধনার কথা পুস্তকে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমানে তিনি বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই পুস্তকে তার বিবরণ আছে। কর্ম্ম-মাহাত্ম্যে ও বর্ণনা-কৌশলে তাহা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

বিশ্ব-রহস্যে নিউটন ও আইনষ্টাইন—অধ্যাপক মোহম্মদ আবদুল জব্বার, এম, এস্‌সি। দি মালিক লাইব্রেরী, ৭৩, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা। পৃঃ ১৫০; মূল্য—২১০ টাকা।

আজকাল সাধারণ শিক্ষিতের মধ্যেও এমন লোক খুব কমই আছেন যাঁরা নিউটন ও আইনষ্টাইনের নাম শোনেন নি। তবে অনেকেই কেবল এটুকু জানেন যে, নিউটন মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আর আইনষ্টাইন আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু তাঁদের আবিষ্কারের প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে অনেকেই বিশেষ কোন খবর রাখেন না। আলোচ্য বইখানিতে লেখক উচ্চ গণিতের দুরূহ তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের খুঁটিনাটি এবং জটিলতা বাদ দিয়ে নিউটন ও আইনষ্টাইনের আবিষ্কৃত তত্ত্বের মূল রহস্য সাধারণের বোধগম্য করবার চেষ্টা করেছেন। লেখকের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

সম্পূর্ণ প্রাদেশিকতাবর্জ্জিত না হলেও লেখকের ভাষা সরল এবং স্বচ্ছন্দগতি। কিন্তু ভাষা সরল হলেও বইখানির প্রথমাংশের (নিউটন আবিষ্কৃত তত্ত্ব) মত দ্বিতীয়াংশের (অর্থাৎ আপেক্ষিকতাবাদের) আলোচনা সাধারণ পাঠকের পক্ষে আপেক্ষিকতাবাদের মূল রহস্য অনুধাবন করতে কতটা সহায়ক হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। লেখক Tensor Calculas, Space-time, Non-Euclidean Geometry (লোবাচেবস্কীয়, রীমানীয় জ্যামিতি), Tractrix প্রভৃতির উল্লেখ এবং কিছু কিছু আলোচনা করেছেন; কিন্তু সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে এসব বিষয়ে ব্যাখ্যাসহ বিশদ আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

Atomic Theory প্রসঙ্গে লেখক কয়েকস্থলে অণু কথাটি ব্যবহার করেছেন। বাংলা ভাষায় Molecule অর্থে অণু এবং Atom অর্থে পরমাণু এই কথা দুটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। লেখক কিন্তু এটম অর্থেই অণু কথাটি ব্যবহার করেছেন। বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনায় এরূপ ভুল মারাত্মক। এ ছাড়া বইখানিতে বানান ভুলও যথেষ্ট রয়ে গেছে। আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয়—লেখক যেন অতি সতর্কতার সঙ্গে 'জল' কথাটার পরিবর্তে 'পানি' কথাটা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে হামেশা ব্যবহৃত আশমান, জমিন, ইমারৎ প্রভৃতি শব্দগুলোকে বর্জন করে 'আকাশচুম্বী অট্টালিকা', 'পৃথিবীর মাটি'র প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন কেন—বোঝা গেল না।

ব্যাধির পরাজয়—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ৫১; মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য বইখানিতে লেখক বিভিন্ন রকমের রোগোৎপাদক জীবাণুর আবিষ্কার এবং ঐ সব জীবাণুঘটিত ব্যাধির প্রতীকারের উপায় নির্ধারণে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সুদীর্ঘ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। সংক্ষিপ্ত হলেও এতে বিষয়বস্তুর দৈন্য নেই। বিষয়বস্তু অবিকৃত রেখে সহজবোধ্য ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয় লিখতে চারুবাবু সিদ্ধহস্ত। এই বইখানিতেও তাঁর এ বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে লেখা হলেও সাধারণ পাঠক বইখানা পড়ে গল্প-উপন্যাস পড়ার মতই আনন্দ উপভোগ করবেন। এ ধরণের বইয়ের সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-প্রচারের উদ্দেশ্য সার্থক হবে বলেই মনে হয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মহাপ্রভু (নাটক)—শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত। জাহ্নবী সাহিত্য মন্দির। ১০।৩, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

অধুনা বাংলা-সাহিত্যে জীবনীমূলক নাটক রচনার দি-ক ঝোঁক দেখা যাইতেছে। সেই ধারা অনুসরণ করিয়া শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন পণ্ডিত মহাপ্রভুর অলৌকিক জীবনকাহিনী অবলম্বনে এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক ভক্তিমূলক নাটকের মত ইহাতেও ভক্তিরসের প্রাবল্যে নাট্য-রস আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহার রচনা নাটক হিসাবে সার্থক হইয়াছে—একথা বলা চলে না।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

১৪ই ডিসেম্বর: রচনা দমিত্রী মেরেঝকোবস্কী। অনুবাদক—চিত্তরঞ্জন রায় ও অশোক ঘোষ। রীডার্স কর্ণার (গ্রন্থবিহার), ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। দাম ৩৷৹

"রীডার্স কর্ণার" অনুবাদ-সাহিত্যের ভিতর দিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আলোচ্য উপন্যাসখানির মূল সুর হইল বৈপ্লবিক রহস্যবাদ। একদিকে রিয়েলিয়েবের নিরালম্ব নাস্তিক্য আর একদিকে পেস্তেলের দার্শনিক অজ্ঞেয়বাদ, এই দুইটি ভাবধারা এই কাহিনীর মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে।

পুস্তক নির্ব্বাচন এবং স্বচ্ছন্দ অনুবাদ সত্যই প্রশংসার যোগ্য, পরিচ্ছন্ন প্রচ্ছদপটটিও চিত্তাকর্ষক।

ইনি আর উনি—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। দিগন্ত পাবলিশার্স লিঃ, পি-৬ মিশন রো এক্সটেনসান, কলিকাতা। মূল্য ৩৲।

এই পুস্তকে লেখকের রচিত শৈল চক্রবর্ত্তী বিচিত্রিত পাঁচটি ব্যঙ্গচিত্র রচনা স্থান পাইয়াছে। মফঃস্বলে যাযাবর আপিসজীবনের সাময়িক আস্তানায় সরকারী কর্ম্মচারীগণের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঘরে ও বাইরে পরস্পরের পদমর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি লইয়া কৌতুকজনক আলোচনা ও বিতর্ক, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট নিম্নতন কর্ম্মচারীদের চাটুবৃত্তি ও অপরপক্ষে পদস্থগণের নিম্নতন কর্ম্মচারীদের প্রতি সানুগ্রহ আচরণ, প্রধানতঃ এই সকল বিষয় লইয়া গল্পগুলিতে কৌতুক ও ব্যঙ্গরসের সৃষ্টি করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের সুতীক্ষ্ণ ও শাণিত বাক্যরচনা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপের নির্ম্মম কশাঘাত বইটিকে উপভোগ্য করিয়াছে। ছোট গল্পরচনায় অচিন্ত্যবাবু ওস্তাদ ও কুশলী শিল্পী।

কাজল—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন। পুরবী পাবলিশার্স লিঃ। ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯। ৩৫৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৪৷৹।

'শতাব্দী', 'কুরপালা', 'করেকটি গল্প' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া লেখক স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের গুণে ইতিপূর্ব্বেই পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি গল্পের বর্ণনায় নিছক বস্তুতান্ত্রিক, নির্ভীক দুঃসাহসিকতা, চরিত্রসৃষ্টিতে অন্তর্দৃষ্টি বিশ্লেষণ ও পর্য্যবেক্ষণ, গভীর ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি কয়েকটি গুণে সভ্য সমাজের অপাঙ্‌ক্তেয় বিষয়বস্তুর অবতারণা ও আলোচনা করিয়াও সাহিত্যিকের মর্যাদা হইতে নামিয়া যান নাই। ইহাই এই গ্রন্থের একটি বৈশিষ্ট্য। সুদীর্ঘ উপন্যাসখানি একটি পতিতার জীবনকাহিনী, প্রসঙ্গতঃ সমগ্র গণিকাসমাজ ও একটি পল্লীবিশেষের কাহিনী। পল্লীর শ্যামল স্নেহশীতল বক্ষের মায়া কাটাইয়া একটি বালবিধবা কেমন করিয়া ধাপে ধাপে গণিকাসমাজের সর্ব্বোচ্চ শীর্ষে ও অধঃপতনের সর্ব্বনিম্নস্তরে উপনীত হইল, উর্ণনাভের জালে পড়িয়া মক্ষিকার মত আর তাহার বাহির হইয়া আসিবার কোনই উপায় রহিল না, গৃহস্থ, সমাজ ও সভ্যতার অন্যায় অনুশাসন ও পুরুষের শত প্রকার প্রলোভনের ফলে এইরূপ কত অনাথা অবমানিতা সমাজ-পরিত্যক্তা নারী গণিকাসমাজের সংখ্যাবৃদ্ধি করে, এই সমস্ত বিষয় আলোকচিত্রের মত নিপুণভাবে শিল্পী এই গ্রন্থে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পতিতাগণের অষ্টপ্রহরের জীবনযাত্রার ধারা ও গণিকাসমাজের বাস্তব জীবনের বর্ণনা পড়িয়া কেহ কেহ নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, কিন্তু মরমী পাঠকের চিত্তকে সমাজের একদিককার মর্ম্মস্পর্শী চিত্র ব্যথিত ও মথিত করিয়া তুলিবে। এই পুস্তকে এক দিকে যেমন আমরা বাড়ীওয়ালী, দালাল ও পাপ-ব্যবসায়ে লিপ্ত নরনারীর দেখা পাই অন্যদিকে তেমনি হতভাগিনীদের মধ্যে গৃহস্থঘরের বধূদের মত সখীত্ব, সহানুভূতি, পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বুঝিতে পারি, ইহারাও তাহাদের ঘৃণিত জীবনের মধ্যে একেবারে পশুত্বের স্তরে নামিয়া যায় নাই, মাত্র ব্যবসায়ের খাতিরে পশুত্বের অভিনয় করিয়া যায়। বইখানিতে সুধীগণ চিন্তার যথেষ্ট খোরাক পাইবেন।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

পথ যে বহুদূর—শ্রীপরেশ সাহা। জাতীয় গ্রন্থ-ঘর। ৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা আট আনা।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস একদা অখণ্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছিল। ১৯৪৭-এর আগষ্ট মাসের পর দেশ স্বাধীনতা লাভ করিল বটে, কিন্তু সে আংশিক স্বাধীনতা মাত্র—আর সে স্বাধীনতাও আসিল অখণ্ড ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া। এই তথাকথিত স্বাধীনতালাভের পর দেশে চোরাকারবারের বাহুল্য, আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা, ইত্যাদি যে সকল জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে সেগুলি এই ক্ষুদ্র নাটিকাখানিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই স্বাধীনতার প্রসাদে পুষ্ট হইতেছে ধনী আর পুঁজিপতি সম্প্রদায়, কিন্তু দেশের অগণিত মূঢ় মূক জনগণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়াছে, কিন্তু যতদিন না অর্থনৈতিক শোষণের সমাপ্তি হইতেছে ততদিন জাতির পূর্ণতালাভের পথ বহুদূরে—ইহাই হইল নাটিকাখানির প্রতিপাদ্য। সুগভীর দেশপ্রীতি এবং দেশের নিপীড়িত জনগণের প্রতি দরদ নাটিকাখানিতে প্রাণসঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছে তবে সংলাপে ভাবপ্রবণতা এবং উচ্ছ্বাসের একটু বাড়াবাড়ি হওয়ায় স্থানে স্থানে অতিনাটকীয়তার আমদানী হইয়াছে। পাত্রপাত্রীদের মুখে রাজনৈতিক মতবাদ এবং পরিস্থিতির বিশ্লেষণাত্মক দীর্ঘ বক্তৃতাও নাট্যরসকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। কিন্তু এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও লেখকের শক্তি আছে একথা স্বীকার করিতেছি। নাটিকখানি শুধু যে মনে ভাবাবেগের সঞ্চার করে তাহা নয়, দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা সম্বন্ধে ভাবনারও উদ্রেক করে।

ভারতের অমর প্রতিভা—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী। প্রাপ্তিস্থান—ক্যালকাটা বুক হাউস। কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

বহু মনীষীর প্রতিভার অমর অবদান নব্য ভারতের জাতীয় জীবনকে নানা দিক দিয়া পুষ্ট করিয়াছে। বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে এক বাংলা দেশে যত মনীষীর জন্ম হইয়াছে পৃথিবীর আর কোন দেশে এক শত বৎসরের মধ্যে সেরূপ হইয়াছে কিনা সন্দেহ। ভারতের জাতীয় জীবনের সর্ব্বতোমুখী বিকাশের মূলে রহিয়াছে বিশেষ ভাবে বাংলার মনীষীদের জীবনব্যাপী সাধনা। বর্ত্তমান পুস্তকে মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ছাড়া আর যে সকল প্রতিভাশালী পুরুষের জীবনকাহিনী ও কৃতিত্ব কথা বর্ণিত হইয়াছে তাঁহারা সকলেই বাঙালী। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ, রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানে প্রফুল্লচন্দ্র, সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষার ক্ষেত্রে আশুতোষ, স্বাধীনতা-সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র, সমগ্র ভারতবর্ষকে নূতন পথ প্রদর্শন করিয়া বিশ্বে ভারতের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। পুস্তকখানি তরুণদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বাংলার বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে 'শ্রেষ্ঠ বাঙালী' মনীষীদের গৌরবময় জীবনকাহিনী ও আদর্শনিষ্ঠার কথা বাংলার তরুণ-তরুণীদের শুনাইবার প্রয়োজন আছে। পুস্তকের ভাষা ওজস্বিনী এবং প্রতিভাধর পুরুষদের ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ বিশ্লেষণে লেখক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

তবলা শিক্ষা প্রণালী—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু। আর বি দাস, ৮-সি লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

যাবতীয় বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তবলা বাদ্য আয়ত্ত করা অত্যন্ত দুরূহ। অথচ ভারতীয় সঙ্গীতে একমাত্র ধ্রুপদ ছাড়া খেয়াল টপ্পা ঠুংরী সকল শ্রেণীর সঙ্গীতেই তবলা অপরিহার্য্য। বাংলা ভাষায় সঙ্গীত ও স্বরলিপি বিষয়ক পুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু তবলা বাজনা শিখিবার নির্ভরযোগ্য পুস্তক অতি বিরল। এ বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক হইতেছে ঢাকার প্রসিদ্ধ তবলাবাদক প্রসন্নকুমার বণিকা মহাশয়ের তবলা তরঙ্গিণী। কিন্তু তাহাতে তালঘটিত এত খুঁটিনাটি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, বইখানি প্রাথমিক তবলাবাদ্য-শিক্ষার্থীর ঠিক উপযোগী নহে। বর্ত্তমান পুস্তকের লেখক ওস্তাদ মসিদ খাঁর ছাত্র—তাল সম্বন্ধে উপপত্তিকসিদ্ধ এবং ক্রিয়াসিদ্ধ দুই-ই। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্যই এই বইখানি লিখিয়াছেন। এই বইয়ে তেতালা, একতালা, সুর-ফাঁক প্রভৃতি ২২টি তালের বোল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তালগুলির বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার জন্য মাঝে মাঝে লেখক যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন সেগুলি প্রণিধানযোগ্য। তবলায় হস্ত-সাধনে নৈপুণ্য অর্জ্জন আয়াস-সাধ্য। রবীন্দ্রবাবুর বইখানি শিক্ষার্থীদের বিশেষ কাজে আসিবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

সহজ যৌগিক ব্যায়াম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড—শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী। "উমাচল শাস্ত্র প্রকাশনী", ৫৮।১।১২ কে, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১ম খণ্ড ২৲ এবং ২য় খণ্ড ২।০ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থের ১ম খণ্ডে বিবিধ যৌগিক আসন, মুদ্রা, মানুষের আকৃতি ও স্বভাবের উপর গ্রন্থিক্রিয়ার প্রভাব, পথ্যাপথ্য প্রভৃতি বিষয়ে এবং ২য় খণ্ডে প্রাণায়াম, ষটকর্ম ও স্বরোদয় শাস্ত্র বিষয়ে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত বহু হিতকর মতের সহায়তায় বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। যোগ-বিদ্যার দ্বারা শুধু যে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয় তাহা নহে, দৈহিক উন্নতিসাধনও যথেষ্ট হইয়া থাকে। এই বিদ্যার বিলুপ্তি দীর্ঘ কাল ঘটিয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং যোগীপুরুষ—'আপনি আচরি ধর্ম্ম' জগতকে শিখাইবার জন্য বহু পরিশ্রমে নানা চিত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া এই লুপ্ত বিদ্যা জন-সমাজের দৈহিক কল্যাণে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বইখানি শিক্ষিত নরনারীদের কাজে লাগিবে আশা করা যায়।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূগোল—শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এইচ চাটার্জী এণ্ড কোং লিঃ, ১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য ৩।০।

ইদানীং আমাদের দেশে ভূগোল শিক্ষার উন্নতি হইয়াছে। ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। ভূগোল শিক্ষার যে বিভিন্ন দিক আছে এতদিন অনেকেরই হয়ত তাহা জানা ছিল না। আলোচ্য পুস্তকখানি এগারটি অধ্যায়ে পূর্ণ। প্রাকৃতিক পরিবেশ, কৃষি ও কৃষিজ দ্রব্য, প্রাণিজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, অরণ্য সম্পদ, শিল্প প্রভৃতি অধ্যায়গুলিতে আমাদের বিভিন্ন সম্পদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। নিজ সম্পদ সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। বিভিন্ন সম্পদ মানচিত্র সহযোগে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানির বহুল প্রচার হইবে নিশ্চয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

গান্ধারে প্রাপ্ত প্লাস্টার নির্মিত একটি তরণের মুখাবয়ব (খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী
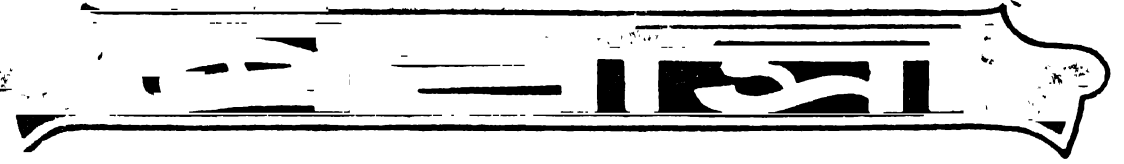
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৯শ ভাগ | অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ | ২য় সংখ্যা
২য় খণ্ড

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে অশান্তির ছায়া

পশ্চিমবঙ্গে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য নানা দিক হইতে বিশেষভাবে চেষ্টা চলিতেছে। কম্যুনিষ্ট, প্রচ্ছন্ন কম্যুনিষ্ট "লেবার লীডার" ও অধ্যাপক, কাণ্ডজ্ঞানবিহীন ছাত্র ও তরুণ-তরুণী, বিদেশীর ক্রীতদাস গুপ্তচর "পঞ্চমবাহিনী" সংগঠক, দায়িত্ববিহীন অর্থলোলুপ বা ক্ষমতালোভী "কংগ্রেসী" নেতা, তথাকথিত বাস্তুহারা—সকলেই দেশের শাসনব্যবস্থা বানচাল করিতে ব্যস্ত। অনেকের মনে ইতিমধ্যেই আশঙ্কা জন্মিয়াছে যে, দেশে অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায়ের প্লাবন আসিবেই, তাহার প্রতিরোধ অসম্ভব। বস্তুতঃ, এই সকল ভয়ই কাটিয়া যাইত যদি দেশের শাসন, সংস্কার ও পোষণ সবল ও যোগ্য ব্যক্তির হাতে থাকিত এবং দেশের প্রকৃত অধিবাসীবর্গের সহিত দেশের শাসন-শৃঙ্খলার উচ্চতম অধিকারীবর্গের—এক্ষেত্রে মন্ত্রিমণ্ডলী—সংযোগ ও সহানুভূতি থাকিত। দেশের প্রকৃত অধিবাসীবৃন্দ যদি উৎপীড়িত, অবহেলিত ও অসন্তুষ্ট হয় তবে দেশে অরাজকতা ও অশান্তি অনিবার্য্য। এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য বুঝিতে না পারায় "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" মোগল বাদশাহ্ সাম্রাজ্য খোয়াইয়াছিলেন এবং সসাগরা বসুন্ধরার প্রবলতম অধিকারী ব্রিটিশ সিংহও আজ নখদন্তবিহীন জরাগ্রস্ত অবস্থায় পতিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের অকস্মাৎলব্ধ-দৈবধন—স্বাধীনতার—অধিকারীবর্গও অনভ্যস্ত ক্ষমতা প্রাপ্তির মত্ততার কল্যাণে এই স্বল্পদিনের মধ্যেই সেই ভুল করিতে বসিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলের মধ্যে যোগ্য লোক মাত্র কয়েক-জন আছেন। সম্পূর্ণ অযোগ্য বা অকর্ম্মণ্য চারি জন আছেন এবং সামান্য যোগ্যতাযুক্ত বাকী কয়জন আছেন। ঐ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর লোক কোন কথা কোন দিনই বুঝিবেন না, কেননা তাঁহাদের বুদ্ধির ঘট প্রায় শূন্য বা একেবারেই শুষ্ক। কিন্তু যে কয়জন যোগ্য লোক আছেন তাঁহাদের এখন বুঝা উচিত যে, তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ নহেন। দেশের কথা বলিতে তাঁহারা এখনও বুঝিতেছেন কলিকাতা, যেন কলিকাতা বর্জ্জিত পশ্চিমবঙ্গ আর কিছুই নাই, এবং সমস্যা বুঝিতে তাঁহারা কেবল বুঝিতেছেন বাস্তুহারা সমস্যা বা কম্যুনিষ্ট সমস্যা। তাঁহাদের এখন জানা প্রয়োজন যে, চাটুকারের স্তুতিবাক্যই একমাত্র সৎপরামর্শ নহে। সময় থাকিতে কঠোর অপ্রিয় সত্য তাঁহাদের শুনিতে হইবে নহিলে দেশে নিদারুণ বিক্ষোভ ও তাঁহাদের চরম দুর্নাম হইবেই। দেশের যথাসর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিলেও প্রবঞ্চক নকল "বাস্তুহারা"দিগের কুক্ষিপূরণ অসম্ভব, প্রকৃত বাস্তুহারার তো দুঃখ ঘুচিবেই না, এবং দেশ-ব্যাপী অসন্তোষের প্লাবন বহিলে লক্ষ সশস্ত্র পুলিসে কম্যুনিষ্ট দমন হইবে না।

কম্যুনিষ্ট আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন অল্পে অল্পে ইতস্তত বিস্তার-লাভ করিতেছে। শুধু কলিকাতায় নহে, গ্রামাঞ্চলেও ইহা ক্রমেই বাড়িতেছে। লুঠপাট, পুলিসের সহিত খণ্ডযুদ্ধ, ডাকাতি প্রভৃতি বেশ বাড়িতেছে। ধৃত আসামীকে বলপ্রয়োগে উদ্ধারের চেষ্টাও হইতেছে। কলিকাতায় এই উপদ্রব প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৪৪ ধারা যখন শহরে বলবৎ ছিল তখন আন্দোলনের ধুয়া ছিল ১৪৪ ধারা তোল; উহা তুলিয়া দেওয়ার পর সভা ও শোভাযাত্রা হইতেছে কিন্তু শোভাযাত্রা হইতে পুলিসের উপর বোমা নিক্ষেপ হইতেছে আন্দোলনের নবতম বিশেষত্ব। ঐ সঙ্গে আছে ট্রেন্ট বাসে অগ্নি প্রদান।

এই স্থলে ইহা বলা প্রয়োজন যে, এখনও এই আন্দোলন কোনও সাংঘাতিক রূপ ধারণ করে নাই। কলিকাতার বাহিরে এই আন্দোলন সম্পর্কে যেরূপ ফলাও করিয়া সংবাদ প্রেরিত হইতেছে, এবং কলিকাতার সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে—বিশেষতঃ একটি দায়িত্ববিহীন ইংরেজী দৈনিকে—যেরূপ রংচং করিয়া সংবাদ সরবরাহ করা হইতেছে, তাহাতে বাহিরের লোকের মনে ধারণা জন্মিতেছে যে, কলিকাতায় বিস্তৃত অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায়ের স্রোত বহিতেছে। বলা বাহুল্য, ইহা সম্পূর্ণ ভুল, কেননা যেখানে ৮০ লক্ষ লোকের বসতি সেখানে সামান্য দুই পাঁচ শত লোকের আন্দোলন সেরূপ গুরুত্বপূর্ণ হইতেই পারে না। তবে প্লেগ মহামারী ইত্যাদি যেমন সময় থাকিতে প্রতিরোধ করা উচিত এইরূপ আন্দোলনেও সেরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

কলেজ ষ্ট্রীটে মেডিক্যাল কলেজ হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত আন্দোলনের প্রধানক্ষেত্র এবং প্রকৃতপক্ষে এই সীমানার মধ্যে এখন পর্য্যন্ত উহা সীমাবদ্ধ আছে। গত ১০ই নবেম্বর বিশেষ গোলযোগ হইয়াছে। ঐ দিনের একটি বাস আক্রমণের দৃশ্য আমাদের নিজেদের প্রত্যক্ষ দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান আন্দোলনের একটি বিশেষ রূপ ঐ দিন আমাদের চোখে পড়িয়াছে। কলেজ ষ্ট্রীট এবং মির্জ্জাপুরের মোড়ে ইঁট মারিয়া বাসটি থামানো হয়। তার পর উহার ব্যাটারিটি খুলিবার চেষ্টা চলে। অতঃপর ড্রাইভারের আসনের গদীটি বাহির করিয়া উহার ছোবড়াগুলির সাহায্যে আগুন ধরাইবার আয়োজন হইতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে দুইটি বিষয় বিশেষ-ভাবে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি; এই দলের উদ্দেশ্য ছিল নিছক আন্দোলন নয়, তাহার সঙ্গে লুঠ। শুধু বাসের ব্যাটারি নয়, ঐখানকার দরিদ্র ফেরীওয়ালাদের কাপড়, গামছা প্রভৃতিও লুঠ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যে লোকটি আগুন দেওয়ার বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল তাহার পোশাক এবং দাড়ি গোঁফের বিশেষত্ব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল সে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান। কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে পাকিস্থানীর যোগ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে এই দুইয়ের যোগ আদৌ বিচিত্র নয়; অন্ততঃ তার একটি চাক্ষুষ প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। বাস আক্রমণ আরম্ভ করায় একজন ২৫।২৬ বৎসর বয়স্ক হাফ-শার্ট ও সাদা ফুল প্যান্ট পরিহিত যুবক চীৎকার করিয়াই "কম্‌রেড্‌ কম্‌রেড্‌ বাস পোড়াও" বলিয়া আক্রমণ আরম্ভ করাইয়াই ছুটিয়া চলিয়া যায়। তাহার সহযোগী আট-দশ জনের মধ্যে ঐ মুসলমান যুবক ও তিন-চারি জন স্কুলের ছেলে, বাকী রাস্তার সাধারণ লোক যাহার মধ্যে অন্ততঃ আরও এক জন পূর্ব্ববঙ্গবাসী।

বাস আক্রমণ ও সরকারী প্রেসনোট

ষ্টেট বাস আক্রমণ সম্বন্ধে দুইটি সরকারী প্রেসনোট প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা বলিতে বাধ্য যে, দুইটিতেই শেষের দিকে সরকারী মন্তব্য যাহা হইয়াছে তাহা সুবিবেচিত হয় নাই। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১১ই নবেম্বর উহা এইরূপ :

"১০ই নবেম্বর, বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ছাত্র ফেডারেশন ও অন্যান্যদের আহুত একটি সভার পরে মহম্মদ আলি পার্কের আশেপাশে পুনরায় হাঙ্গামা ঘটিয়াছে। ছাত্রদের একটি শোভাযাত্রা (উহাতে কয়েকটি বালিকাও ছিল) হিংসাত্মক কার্য্যকলাপে আহ্বান জানাইয়া আপত্তিকর ধ্বনি করিতে করিতে পার্কের দিকে অগ্রসর হয়। সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনায় যেরূপ দেখা গিয়াছে, সেরূপ বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও কোন কোন শোভাযাত্রাকারীর হাতে রেশনের থলিয়া ছিল। এ সকল থলিয়ায় বোমা ও পটকা রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়। কার্য্যে নিযুক্ত দুই জন কনষ্টেবল দুই জন শোভাযাত্রাকারীকে ধরিয়া ফেলে। উহাদের রেশনের থলিয়ায় বাস্তবিকই বোমা ছিল। দুই জন শোভাযাত্রাকারীকে ধরিয়া ফেলা হইয়াছে দেখিতে পাইয়া অন্যান্য শোভাযাত্রাকারীরা ক্ষেপিয়া উঠে এবং কনষ্টেবল দুই জনকে আহত করিয়া উহাদিগকে মুক্ত করিয়া লয়। কর্ত্তব্যরত পুলিসের এসিষ্টান্ট কমিশনার এ সময় জনতা বেআইনী ঘোষণা করেন এবং তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলেন। জনতা ইট-পাটকেল ও সোডা-ওয়াটার বোতলের সাহায্যে পুলিসের উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালাইতে থাকিলে মৃদু লাঠিচালনা করিতে হইয়াছে। জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া দুই দিকে পলায়ন করে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা পুলিসের প্রতি ৪টি বোমা নিক্ষেপ করে। তাহারা দ্রুত প্যারী সরকার ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডে অবরোধ সৃষ্টি করে এবং অনেকক্ষণ যাবৎ নিকটবর্ত্তী অলি-গলি হইতে পুলিসের প্রতি ইটপাটকেল ও পটকা নিক্ষেপ করে। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। ৪৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; তন্মধ্যে দুই জনের চিকিৎসার প্রয়োজন হইয়াছে। বহু কম্যুনিষ্ট পুস্তিকাও পুলিসের হস্তগত হইয়াছে।

হাঙ্গামাকালে যানবাহনই হাঙ্গামাকারীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। উক্ত অঞ্চলে দুই ঘণ্টারও অধিক সময় ট্রাম চলাচল বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। হ্যারিসন রোড ও কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে একখানা ষ্টেট বাসে অগ্নিসংযোগ করিয়া উহার ক্ষতি করা হয়। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও কেশব সেন ষ্ট্রীটের মোড়ে আর একখানা ষ্টেট বাসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। কেশব সেন ষ্ট্রীট ও আপার সারকুলার রোডের মোড়ে অপর একখানা ষ্টেট বাসের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। এ সকল বিক্ষিপ্ত আক্রমণের ফলে সকল সেকসনেই ষ্টেট বাস চলাচল বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে।

গবর্মেণ্ট জনসাধারণকে এ কথাই জানাইতে চাহেন যে, সরকারী অর্থে এই সকল ষ্টেট বাস চালানো হইতেছে। জনসাধারণ যাহাতে যাতায়াতে সুবিধা পান তজ্জন্য জনসাধারণের স্বার্থেই এগুলি চালানো হইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলি জনসাধারণেরই সম্পত্তি। গভীর পরিতাপের কথা এই যে, দায়িত্বজ্ঞানহীন দুরন্ত লোকেরা যখন ঐ সকল বাস আক্রমণ করে তখন বাসের যাত্রীরা যাঁহাদের সংখ্যা ত্রিশের কম হইবে না—নিঃশব্দে উহা সহ্য করেন এবং তাঁহাদের নিজস্ব সম্পত্তিকে এ ভাবে নষ্ট হইতে দেন। জনসাধারণের মধ্যে যাঁহারা ঘটনাস্থলের নিকটে থাকেন, জনসাধারণের সম্পত্তি এভাবে নষ্ট হইতেছে দেখিয়া তাঁহারাও নিতান্ত নির্লিপ্ত থাকেন। যদি এ অবস্থাই চলিতে থাকে তবে জনসাধারণের ব্যবহার্য্য যানবাহন রক্ষা করা পুলিসের পক্ষে অসম্ভব না

হইলেও কঠিন হইবে এবং যে সকল অঞ্চলে এ ধরণের ব্যাপার পুন: পুন: ঘটিতে থাকিবে গবর্মেণ্ট সেই সকল অঞ্চলে ষ্টেট বাস চলাচল বন্ধ করিয়া দিতে হয়ত বাধ্য হইবেন। উহার ফলে যে জনসাধারণের খুবই অসুবিধা হইবে, গবর্মেণ্ট তাহা বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্তু উহা করা ছাড়া গবর্মেণ্টের গত্যন্তর নাই।"

দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হইয়াছে ১৩ই নবেম্বর। উহা এইরূপ :

"শনিবার বেলা প্রায় ৩টার সময় ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্যোগে অক্টারলোনী মনুমেণ্টের পাদদেশে এক সভার অধিবেশন হয়। সভায় প্রায় সাত শত জন লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। সভান্তে অপরাহ্ণ প্রায় ৫টার সময় প্রায় ১ শত মহিলা সমেত প্রায় ৫ শত জন লোকের এক শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। শোভাযাত্রাটি ধর্মতলা ষ্ট্রীট বরাবর অগ্রসর হইতে থাকে। 'পিপলস রিলিফ কমিটি'র একটি এম্বুলেন্সের গাড়ীও শোভাযাত্রার সঙ্গে ছিল। পথ চলিবার সময় শোভাযাত্রীরা ক্রমাগত হিংসাত্মক কার্য্যে প্ররোচনাদায়ক উত্তেজনাপূর্ণ নানারূপ ধ্বনি করিতে থাকে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উপনীত হইবার পর তাহারা অকস্মাৎ প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনের নিকট মোতায়েন পুলিস দলের নিকট বোমা নিক্ষেপ করিতে থাকে। শোভাযাত্রার অনুগমনকারী এম্বুলেন্স গাড়ীটি হইতে শোভাযাত্রীদের মধ্যে উক্ত বোমাগুলি বিতরণ করিতে দেখা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি আগুনে বোমা ও মারাত্মক ধরণের বোমাও ছিল। বোমার টুকরায় তিন জন কনষ্টেবল আহত হয়। অতঃপর পুলিস কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে এবং লাঠি চার্জ্জ করে। শোভাযাত্রীরা অতঃপর বোমাবর্ষণ করিতে করিতে পশ্চাদপসরণ করে। ঐ সময়ে সন্নিহিত এলাকার গৃহগুলির ছাদ হইতেও বোমা নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ফলে একটি ট্রাম গাড়ীতে আগুন লাগে এবং অপর একটি ট্রাম গাড়ীর ক্ষতি সাধিত হয়।

উক্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে পুলিস ছয় জন মহিলা সমেত ৭২ জনকে গ্রেপ্তার করে। এম্বুলেন্স গাড়ীটিও আটক করা হয় এবং ইহার ডাক্তার ও চালককে গ্রেপ্তার করা হয়।

ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনকে চিকিৎসার্থ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। শনিবার রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে কাহারও আহত হইবার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এম্বুলেন্স গাড়ীটিতে বহুসংখ্যক কম্যুনিষ্ট পুস্তিকা পাওয়া যায়। ঘটনাস্থলের নিকটবর্ত্তী যে সমস্ত গৃহ হইতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ঐগুলিতেও তল্লাসী চলিতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে গবর্মেণ্ট কলিকাতার শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহেন। এই নগরীর অধিকাংশ অধিবাসীই শান্তিকামী। গত কয়েকদিন যাবৎ এই সকল শোভাযাত্রী গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছে। তাহারা বিভিন্নরূপ অস্ত্রে সজ্জিত থাকে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অপরাধজনক কার্য্য করার উদ্দেশ্যে লইয়াই তাহারা শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। শনিবার অপরাহ্ণে অসদুদ্দেশ্যে গঠিত এক দল লোকই গৃহগুলির ছাদ হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে। দুষ্কৃতকারীরা এই ভাবে নূতন একটি কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। ইটপাটকেল এবং বোমা বহনের জন্য হাঙ্গামাকারীরা একটি এম্বুলেন্স গাড়ী সঙ্গে লইয়াছিল। ইহা আরও আপত্তিকর ঘটনা। 'পিপলস্ রিলিফ কমিটির" জনৈক চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ঘটনার সহিত (এম্বুলেন্স গাড়ীর) এইরূপ যোগাযোগ একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। এই সমস্ত ঘটনা বন্ধ করিবার জন্য গবর্মেণ্ট প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতেছেন। এতদ্দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে দৈনন্দিন কর্ত্তব্যাদি পালনে ইচ্ছুক নাগরিকদের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে আবেদন জানান যাইতেছে।"

প্রেসনোটের প্রধান বক্তব্য এই যে, বাসের যাত্রীরা ভীরুর ন্যায় বাস ছাড়িয়া নামিয়া যাওয়াতেই বাস নষ্ট করিবার সুযোগ আন্দোলনকারীরা পায়। যেহেতু যাত্রীরা বাস রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন না সেইহেতু সরকার গোলযোগের স্থান এড়াইয়া বাস চালাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং ষ্টেট বাস এখন ঐভাবেই চলিতেছে। এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, সরকারী পক্ষ কার্য্যত: যাহাই করুন তাঁহাদের এইরূপ ঘোষণা প্রকাশ্যভাবে করা উচিত হয় নাই, কেননা এটাকে কম্যুনিষ্টরা অনায়াসে জয়লাভ বলিয়া ধরিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে বিক্ষোভ চালাইবে।

এখন দেখা যাক, লোকে কেন কম্যুনিষ্ট কর্ত্তৃক ষ্টেট বাস আক্রমণে বাধা দিতে আসে না। ইহারও দুইটি কারণ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। প্রথমত: অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি সমস্ত প্রাথমিক সমস্যার সমাধানে গবর্মেণ্টের শোচনীয় অক্ষমতা। ট্যাক্স বৃদ্ধি, আশ্রিত বাৎসল্য, অপচয় বৃদ্ধি প্রভৃতির দোষে জনসাধারণের মনে গবর্মেণ্ট সম্বন্ধে একটা বিরূপ ভাব রহিয়াছে। এই গবর্মেণ্টকে নিজস্ব গবর্মেণ্ট বলিয়া লোকে মনে করিতে পারিতেছে না। লোকে যখন কাহাকেও আপন মনে না করিয়া কাঁটা ভাবে এবং নিজে তাহার বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারে না তখন অপরকে তাহার বিরুদ্ধে লড়িতে দেখিলে সে মনে কোন ব্যথা পায় না এবং অন্ততঃ পক্ষে নিষ্ক্রিয় থাকিয়া তাহাকে পরোক্ষে সহায়তা করে। ইহা মনোবিজ্ঞানের একটি মূল কথা। বাংলার জনসাধারণের চিত্ত ঠিক এইরূপ হইয়া রহিয়াছে এবং তাহা প্রতিবাদ ও সমালোচনা পর্য্যন্ত

কম্যুনিষ্ট কার্য্যকলাপ আখ্যা পাওয়াতে লোকের মন আরও তিক্ত হইয়াছে। এইজন্য বহু লোক আগাইয়া আসে না। তাহার উপর যখন তারা দেখে যে গোলযোগের সংবাদ পাই-লেও ঘটনাস্থলে কোন মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী বা কংগ্রেস-নেতা উপস্থিত হন না, অথচ আড়াল হইতে বেতার বক্তৃতা বা প্রেসনোট মারফত ইঁহারাই জনসাধারণের "কাপুরুষতার" তীব্র নিন্দা করেন তখন লোকে আরও অসন্তুষ্ট হয়। বাস আক্রমণ, রাস্তা ব্যারিকেড প্রভৃতি যেরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে বেশ বুঝা যায় বাস আক্রমণ প্রভৃতি থামাইতে যাওয়ার একমাত্র অর্থ মারামারি করা। নাগরিকতাবোধ সম্পন্ন কোন লোক বা সজ্ঘবদ্ধ দল আক্রমণ বন্ধ করিতে গেলে তাহার কি অবস্থা হয় তাহাও দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। শ্যামবাজারে ঐরূপ একটি সজ্ঘবদ্ধ দল ট্রাম আক্রমণকারীদের ঠেঙাইয়া সরাইয়া দিয়া যখন আগুন নিবাইতেছিল সেই সময়ে পুলিস আসে এবং এই ছেলেদের সাড়ম্বরে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। ইহাদিগকে পুলিসের কবল হইতে মুক্ত করিতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগে এবং কোন মন্ত্রী নিজে এই চেষ্টা করাতেই এত কম সময়ে ইহারা রেহাই পায়। গত বৎসর মহরমের সময় যাহারা বিশৃঙ্খলা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদের একজন বিশিষ্ট যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। সেই সাহসী যুবককে উদ্ধার করিতে আমাদেরই বিশেষ বেগ পাইতে হয়, যাহার ফলে ঐ অঞ্চলের সমস্ত যুবক গবর্মেণ্ট বিরোধী হইয়া গিয়াছে। এই বিরূপ অবস্থার জন্য দায়ী পুলিস ও মন্ত্রীমণ্ডলী। ঐরূপে ঐ সময়ে অন্য একজন নেতৃ-স্থানীয় যুবককে সামান্য কারণে দীর্ঘদিন আবদ্ধ রাখায় অন্য এক প্রধান অঞ্চলের যুবসঙ্ঘ নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছে। ইহারও দায়িত্ব সরকারের। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি কম্যুনিষ্ট বিরোধী যুবকেরা পুলিসের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। একটি তীব্র কম্যুনিষ্ট বিরোধী যুবককে পুলিস দীর্ঘ-কাল তাড়া করিয়া ফিরিয়াছে। এক রাত্রে কোথাও তাহার অবস্থিতির ভুল সংবাদ পাইয়া সেই বাড়ী ঘেরাও করিয়া তাহারা একটি যুবককে সম্পূর্ণ অকারণে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। যে পুলিস কর্ম্মচারী গুলি করিয়াছিল সে পরে পদোন্নতি লাভ করিয়াছে, অথচ যে পরিবারের নির্দ্দোষ ছেলে নিহত হইল তাহাদের জন্য গবর্মেণ্ট একটি সহানুভূতির কথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। এই তো কম্যুনিষ্ট বিরোধীদের প্রতি পুলিসের মনোভাব, সুতরাং শহরে এই শ্রেণীর পুলিস বিদ্যমান থাকিতে ইচ্ছা থাকিলেও কোন্ সৎ নাগরিক ষ্টেট বাসে অগ্নি প্রদান নিবারণে অগ্রসর হইতে সাহস পাইবে? যাত্রীরা যে ভয়ে বাস হইতে নামিয়া যায় তার কারণ এই দুইটিই—কম্যুনিষ্টদের বোমায় বা ঢিলে আহত হওয়ার আশঙ্কা এবং ততোধিকভাবে পুলিসের হাতে লাঞ্ছনার ভয়।

ষ্টেট বাস সরকারী সম্পত্তি। উহার ক্ষতি নিবারণ করিবার দায়িত্ব আগে সরকারের, পরে জনসাধারণের। ১০ই তারিখের গোলযোগের দিন দেখা গিয়াছে ঘটনাস্থলের অতি নিকটে, সেখান হইতে দেখা যায় এত কাছে, দারোগা কনেষ্টবল সশস্ত্র পুলিস প্রভৃতির এক একটি বিরাট বাহিনী এক ধনী অবাঙালীর দুইটি বাড়ী পাহারা দিতেছিল, তাহারা নাগরিক দায়িত্ব পর্য্যন্ত পালন করে নাই। বাস আক্রমণ বন্ধ করিতে আসে নাই। পুলিসের কোন্ কর্ত্তব্য আগে? সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস হইতে রক্ষা করা, না অবাঙালী ধনীর বাড়ী পাহারা দেওয়া?

শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার সরকারী দায়িত্ব

আমরা আগেও অনেকবার দেখাইয়াছি যে, মফস্বল ও কলিকাতার পুলিস একাকার করিলে শহরের নিরাপত্তা ধ্বংস হইবে; গ্রামের যে পুলিস লাউ চুরি, ছাগল চুরির মামলার তদন্তে এবং ঘুষ খাইয়া জীবন কাটাইয়াছে তাহারা কলিকাতায় আসিয়া কিছুই করিতে পারিবে না; বরঞ্চ শান্তিশৃঙ্খলার কার্য্য-ক্রম লণ্ডভণ্ড করায় সহায়তা করিবে। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ এই কার্য্যটি করিয়া গিয়াছেন এবং আমরা পরম বিস্ময়ের সহিত ভাবি ডাঃ বিধান রায় কেমন করিয়া ইহা কায়েম করিলেন এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীই বা কোন্ বুদ্ধিতে ইহার অনুমোদন করিলেন। কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখা হয় না, তাহাদের কোন কার্য্যের সংবাদ পুলিস আগে পায় না। আমরা অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে এক বিবাহের নিমন্ত্রণে দেখিয়াছিলাম যে, প্রকাশ্য দিবালোকে অল্প তফাতে একই সভায় পুলিসের দুই জন উচ্চতম অধিকারী ও কম্যুনিষ্ট পার্টির এক জন বিশিষ্ট নেতা—যিনি তখন "আণ্ডারগ্রাউণ্ড" অর্থাৎ অজ্ঞাতবাস করিতেছেন—বিরাজ ও বিহার করিতেছেন! পাকিস্থানীদের উপর কোনরূপ দৃষ্টি কলিকাতা পুলিস রাখে না ইহা গত বৎসর মহরমের সময়ই প্রমাণিত হইয়াছে, পরেও অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পণ্ডিত জবাহরলালের সভায় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বোমা ছোঁড়া হইল, একজন সশস্ত্র পুলিস নিহত হইল, কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হইল, কিন্তু সকলেই বেকসুর খালাস পাইয়াছে! এইরূপ অযোগ্য অপদার্থ নামসর্ব্বস্ব পুলিস-বাহিনী বাঙালী কেন পুষিবে? এই অপদার্থ পুলিসের উপর কম্যুনিষ্ট দলের ন্যায় বেপরোয়া, সুগঠিত এবং বৈদেশিক শক্তির অর্থে পুষ্ট সুকৌশলী দলের এবং পাকিস্থানীর ষড়যন্ত্র নিবারণের ভার দেওয়া কি বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয়? গবর্মেণ্ট জনসাধারণকে বলিতেছেন, ষ্টেট বাস আক্রমণ বন্ধ কর, লোকে তাহার জবাবে এই মাত্র বলিবে—

আক্রমণ নিবারণের একমাত্র অর্থ মারামারি, আক্রমণকারীদের ধরিয়া ঠেঙানো। তাহারা প্রথমেই ভাবিবে এই মারামারি বাঞ্ছনীয় কিনা এবং করিলে বাধাদানকারীদের পুলিসের হাতে লাঞ্ছিত হইতে হইবে কিনা। নাগরিক দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন নাগরিকদের রক্ষার ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করিয়া ষ্টেট বাস আক্রমণ নিবারণের দায়িত্ব তাঁহাদের উপর চাপাইবার অধিকার গবর্ন্মেণ্টের নাই।

নাগরিকের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের উচ্চতম অধিকারীবর্গের ধারণা কি তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ পায় নাই। তাঁহারা কি আশা করেন যে, সঙ্ঘবদ্ধ দুষ্কৃতকারীর বিরুদ্ধে এক জন বা দুই জন বা তিন জন নাগরিক দাঁড়াইবে? তাঁহারা কি জানেন না যে, একজন নেতৃত্ব লইলে অজানা অপরিচিত লোকসমষ্টির মধ্যে সহায়তা পাওয়ার আশা তাহার কতটুকু? তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলাকারীর প্রতিরোধে সেই লোকই সফল হইবে, যাহার পিছনে সঙ্ঘবদ্ধ সাহসী দল আছে। এইরূপ বাধা এক স্থলে হইলে অন্য স্থলের লোকের সাহস ও উৎসাহ বাড়ে এবং তাহাতে কার্য্যসিদ্ধি হয়। তাহার পর হইল নেতৃত্বের কথা, সৎসাহস প্রদর্শনের কথা। সাধারণকে না হয় উপদেশ যা দেওয়া হইয়াছে তাহা সমীচীন। কিন্তু যে মহাশয় ব্যক্তিগণ সাধারণের নেতা বা প্রতিনিধি সাজিয়া দেশের যথাসর্ব্বস্ব নিজের স্বার্থে ও নিজের সেবায় টানিয়া কুক্ষিগত করিতেছেন, সেই ত্যাগী মহাপুরুষদিগের কি "নিজের পাতে ঝোল টানা" বাদে কোনও দায়িত্ব নাই?

বাংলায় কমুনিষ্ট উপদ্রব নিবারণ অসম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি না। সর্ব্বপ্রথমে পুলিসকে ঢালিয়া সাজিতে হইবে। বর্ত্তমান পুলিস-কমিশনার যত টাকা যত লোক চাহিয়াছেন তাঁহাকে তাহা প্রায় সবই দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তিনি তৎপরতা দেখাইয়াছেন শুধু অবাঙালী ধনীদের বাড়ী পাহারায় এবং কলিকাতা পুলিসকে দলাদলির আবর্ত্তে ফেলিয়া সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধনে। আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ ইঁহাকে ও ইঁহার সহকারী ও সহযোগীবৃন্দকে পোষণ করিতে যদি চাহেন তবে তাহা করিতে পারেন। যেখানে কৃষি, মৎস্য চাষ, পূর্ব্ববঙ্গ আগত শরণার্থীর পুনর্ব্বসতি ইত্যাদিতে কোটি কোটি টাকার অপব্যয় ও অপচয় হইতেছে, সেখানে পুলিসের হিসাবে দশ-বিশ লক্ষ টাকা জলে ঢালিলে অভাগা পশ্চিমবঙ্গবাসীর বলিবার কি আছে? কিন্তু কলিকাতার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে ইঁহাদের অধিকার খর্ব্ব ও সীমাবদ্ধ করিয়া, কিছু মফস্বলের পুলিস মফস্বলে ফেরত দিয়া এবং উপযুক্ত লোকদের উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিয়া পুলিসবাহিনী পুনর্গঠন করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে সামরিক বিভাগ হইতে এবং উচ্চশিক্ষিত যুবকদিগের মধ্য হইতে বিশেষ দল গঠন করিয়া নূতন লোক ভর্ত্তি করিতে হইবে। কলিকাতা পুলিসকে এমন হইতে হইবে যাহাতে তাহারা স্থানীয় ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে পারিবে, কাহারা প্রকৃত কমুনিষ্ট বিরোধী তাহাদের পরিচয় জানিয়া তাহাদের সাহায্য লইতে পারিবে এবং অপরাধ নিবারণ, অপরাধী গ্রেপ্তার এবং ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে মামলা পরিচালনা করিয়া প্রকৃত পুলিসের পরিচয় দিতে পারিবে। অপদার্থ পুলিস পুষিয়া রাখিয়া জনসাধারণের ঘাড়ে কমুনিষ্ট আন্দোলন দমনের দায়িত্ব চাপাইয়া প্রেসনোট জাহির করিলে কোন কাজ হইবে না, অবস্থা ক্রমশঃ আরও খারাপ হইবে।

ন্যাশনাল লাইব্রেরী

ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পুস্তকসমূহ এসপ্লানেডের বাড়ী হইতে বেলভেডিয়ারে স্থানান্তরিত হইয়াছে। রিডিং রুমটি এখনও এসপ্লানেডে আছে এবং বই বাহিরে দেওয়ার বিভাগটিও আছে। আগের দিন স্লিপ দিলে পরের দিন বই আনাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা শুনিতে পাইতেছি যে, রিডিং রুম এবং লেণ্ডিং সেকসন ধীরে ধীরে তুলিয়া বেলভেডিয়ারে সরাইবার কথা চলিতেছে।

ন্যাশনাল লাইব্রেরী বেলভেডিয়ারে সরানোর সময়েই কথা ছিল যে, এসপ্লানেডের রিডিং রুমটি সেখানেই রাখা হইবে। বেলভেডিয়ারে লাইব্রেরী লওয়ার একমাত্র কারণ ছিল এসপ্লানেডের বাড়ীতে স্থানাভাব। এখানে বইগুলি ভাল ভাবে রাখিবার স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না বলিয়া মূল্যবান পুরানো গ্রন্থাদি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বেলভেডিয়ারে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য সেখানে লাইব্রেরী সরানোতে অনেকে আপত্তি করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ৩বি বাস হওয়ায় এই আপত্তি খানিকটা কমিয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ দূর হয় নাই এই জন্য যে দুপুরবেলা সরকারী বাস যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া আমরা জানিতে পারিলাম বেলভেডিয়ারে লাইব্রেরীর দ্বারে কার্ড দেখা লইয়া গোলযোগ হইতেছে, পুলিস কার্ড দেখিতে চাহিতেছে। জাতীয় লাইব্রেরীতে শিক্ষিত লোকমাত্রেরই প্রবেশাধিকার আছে, বেলভেডিয়ারে লাইব্রেরীর এলাকার মধ্যে পুলিসের খবরদারী সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়। অবিলম্বে ইহা দূর হওয়া উচিত। লাইব্রেরী এখন 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় আছে। বেলভেডিয়ারে যাওয়ার অসুবিধা, এসপ্লানেডে বই পাওয়ার অসুবিধা, এই দুই কারণে পাঠকসংখ্যা অসম্ভব কমিয়া গিয়াছে। এই লাইব্রেরীটিকে দিল্লী লইয়া যাওয়ার জন্য বহুবার চেষ্টা হইয়াছে। বর্ত্তমানে পাঠকদের লাইব্রেরী ব্যবহারের পথে নানারূপ বাধা সৃষ্টির দ্বারা পাঠকসংখ্যা কমাইতে যে ভাবে সাহায্য করা হইতেছে তাহা দেখিয়া অনেকেই সন্দেহ করিতেছেন যে, কিছুদিন বাদে বলা হইবে লাইব্রেরীতে আর লোকজন যায় না, সুতরাং উহা দিল্লী পাঠাইয়া দেওয়া হউক। এই আশঙ্কা অমূলক মনে করিবার কোন কারণ আমরা দেখিতেছি না।

ন্যাশনাল লাইব্রেরী যত বেশী লোকে ব্যবহার করে তার জন্য যেখানে সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, সেখানে বাধা-নিষেধ কড়াকড়ি এবং নানাবিধ অসুবিধার অজুহাতে বই দিতে বিলম্ব করিলে এই ধারণা লোকের মনে হইবেই।

এসপ্লানেডের রিডিং রুম হইতে বেলভেডিয়ারের দূরত্ব গাড়ীতে বড় জোর দশ মিনিট। সুতরাং রিডিং রুম এবং লেণ্ডিং সেকসন উভয়েরই পাঠক ও গ্রাহকদের অকারণ অসুবিধা করা হয়। লেণ্ডিং সেকসনের সংখ্যা আমাদের মতে অনেক বাড়ানো উচিত। শ্যামবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বেলেঘাটা, পার্ক সার্কাস, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, ভবানীপুর এবং হাওড়ায় কেন লেণ্ডিং সেকসন থাকিবে না? লাইব্রেরীর নিজস্ব মোটর ভ্যান থাকিলে তাহাতে অনায়াসে বই সরবরাহ করা যায়। বিদেশে প্রত্যেক নগরে নাগরিক প্রতিষ্ঠানরূপে লেণ্ডিং লাইব্রেরী থাকে। নিউইয়র্কে ঐরূপ লাইব্রেরীর বহু শাখা শহরের মধ্যেই আছে। এখানেও তাহা করা উচিত। অবশ্য মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বই কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে বসিয়া দেখিতে হইবে। অন্য বই একাধিক সংখ্যায় আনাইয়া রাখা যাইতে পারে।

আমরা যত দূর জানি ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বাংলা সরকার অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। সুতরাং উহার পরিচালনা সম্বন্ধে কথা বলিবার অধিকার তাঁহাদের আছে। এসপ্লানেডের রিডিং রুম এবং লেণ্ডিং সেকসন যাহাতে উঠিয়া না যায়, উভয়টিতে যাহাতে দিনে দুই তিন বার বই সরবরাহের ব্যবস্থা হয় এবং লেণ্ডিং সেকসনের সংখ্যা যাহাতে বাড়ে তৎপ্রতি তাঁহাদের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া উচিত। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ব্যবহারের সুযোগ দানের জন্য সামান্য অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্টের আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

পাকিস্থান ও আফগানিস্থান

পাকিস্থান শুধু যে নিজের দেশে ঐস্লামিক রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতেছে তাহা নহে, মিশর হইতে পাকিস্থান পর্য্যন্ত এক অখণ্ড ঐস্লামিক ব্লক গঠনের স্বপ্নও সে দেখিতেছে। কিছু দিন আগে চৌধুরী খালিকুজ্জমান এই উদ্দেশ্যে মিশর প্রভৃতি ভ্রমণ করিতেও গিয়াছিলেন। করাচীতে একটা ঐস্লামিক অর্থনৈতিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, আর একটার আয়োজন চলিতেছে। কিন্তু যে পাকিস্থান পশ্চিম এশিয়া-ব্যাপী ঐস্লামিক ব্লক গঠনে এত আগ্রহশীল এবং তৎপর, তার পার্শ্ববর্ত্তী দেশ আফগানিস্থানের সঙ্গে মিলনের বদলে তার শত্রুতা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে। পাকিস্থানের উপর দিয়া আফগানিস্থানে রেলে পেট্রল প্রেরণ সম্বন্ধে যে চুক্তি ছিল, সম্প্রতি পাকিস্থান তাহা ভঙ্গ করিয়াছে এবং এ বিষয়ে আফগান গবর্ণমেণ্ট যে সুবিধাভোগ করিতেছিল তাহা প্রত্যাহার করিয়াছে। ১৯০৮ সালে ভারত-সরকার এবং আফগান-সরকারের সঙ্গে এই মর্ম্মে এক চুক্তি হয় যে, আফগানিস্থানে পেট্রল প্রেরণের রেলভাড়া আফগানিস্থান সরকার অর্দ্ধেক দিলেই চলিবে। পাকিস্থান ঐ চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া পুরা ভাড়া চাহিতেছে। পাকিস্থান এখন স্বতন্ত্র দেশ, ভারত-সরকারের পুরানো চুক্তি তাহারা বাতিল করিতেছে। আফগানিস্থান বলিতেছে ইহা তাহারা পারে না, এই কার্য্য আন্তর্জাতিক রীতিবিরোধী। কাবুলের আধা-সরকারী সংবাদপত্র 'আনিস' এইজন্য পাকিস্থানের বিরুদ্ধে আফগান-সরকার কর্ত্তৃক উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানাইয়াছেন। "আনিস" লিখিয়াছেন যে, পাঠান উপজাতিদের সঙ্গে পাকিস্থানের বিরোধ চলিতেছে এবং বিশেষভাবে উহাদিগকে দমন করিবার জন্যই পাকিস্থান পেট্রল বন্ধ এবং অর্থনৈতিক অবরোধের আয়োজন করিতেছে। একই সঙ্গে আফগানিস্থানকে জব্দ করা এবং পাঠানিস্থান আন্দোলন ধ্বংস করা তার আসল অভিপ্রায়।

অধ্যাপক ধর্ম্মঘট

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহের এক দল কম্যুনিষ্ট অধ্যাপক ১৫ই ও ১৬ই নবেম্বর ধর্ম্মঘট করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যেভাবে ধর্ম্মঘটের সঙ্কল্প গ্রহণ করা হইয়াছে এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিতে সাহায্য করিবার জন্য ছাত্রদের উস্কানো হইতেছে তাহা আমাদের ভাল লাগে নাই।

বাংলা-সরকার বেসরকারী কলেজসমূহের অধ্যাপকদের জন্য মাসিক ১০৲ টাকা মাগ্‌গিভাতা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। অধ্যাপকেরা ইহা বাড়াইবার জন্য আন্দোলন করিয়া ব্যর্থ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ভাতার নগণ্যতার প্রতিবাদে উহা প্রত্যাখ্যান করেন। গবর্ণমেণ্টও ইহার পর চুপ করিয়া যান। ইহা লইয়া ধর্ম্মঘট করা হইবে কিনা সে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ অধ্যাপক সমিতি সমস্ত অধ্যাপকের গোপন ভোট গ্রহণ করেন, ভোটে ধর্ম্মঘটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। অতঃপর ২রা অক্টোবর এক দল কম্যুনিষ্ট অধ্যাপক একটি রিকুইজিশন সভার নোটিশ অধ্যাপক সমিতির সেক্রেটারীকে দেন। তদনুসারে এক মাসের মধ্যে সভা আহ্বান করিবার কথা। সেক্রেটারী বলেন যে, পূজার ছুটি উপলক্ষে সমিতির আপিসও বন্ধ, কলেজগুলিও ৪ঠা নবেম্বরের আগে খুলিবে না। সুতরাং তাঁহারা যেন নবেম্বরের গোড়ায় আপিস খুলিলে রিকুইজিশন দাখিল করেন। ইঁহারা তাহা না শুনিয়া অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে নিজেরাই সভা করেন এবং ৫৭ ভোটে ১৫ই ও ১৬ই নবেম্বরের ধর্ম্মঘটের প্রস্তাব পাস করেন।

এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। মোট প্রায় ১২০০ অধ্যাপকের মধ্যে মাত্র ৫৭ জন ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য যে সভা ডাকা হইয়াছিল তাহার তারিখ ফেলা হইয়াছে পূজার ছুটির মধ্যে, যখন অধিকাংশ অধ্যাপক কলিকাতার বাহিরে। সাতটা দিন দেরি করিয়াও যদি ইঁহারা নোটিশ দিতেন তাহা

হইলে ৬ই নবেম্বর সভা হইতে পারিত, তবে ইহাতে তাঁহাদের অসুবিধা হইত এই যে, অধিকাংশ সদস্য উপস্থিত হইতে পারিতেন। ব্যালট ভোটের পর অধ্যাপকদের মনের ভাব তাঁহাদের জানা হইয়া গিয়াছিল। ইঁহারা নিজেদের দ্বারা আহুত সভাকে 'কনষ্টিটিউশনাল' সভা বলিয়া দাবি করিতেছেন, কিন্তু অধিকাংশকে বাদ দিয়া নিজেদের মতলব হাসিল করিবার এই মোটা কৌশল যে immoral হইয়াছে সেদিকটা তাঁহারা দেখিতেছেন না। অধ্যাপক সমিতি আপিস খুলিবার পর যথারীতি তাঁহাদের নোটিশ গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং তাঁহাদের দাবি অনুসারে ২৭শে নবেম্বর রিকুইজিসন সভা আহ্বান করিয়াছেন। সুতরাং সেদিক দিয়াও তাঁহাদের বলিবার কোন পথ নাই।

ধর্ম্মঘট সফল করিবার জন্য কম্যুনিষ্ট অধ্যাপকেরা ছাত্রদের নিকট আবেদন করিয়াছেন এবং কম্যুনিষ্ট ছাত্র ফেডারেশনকে কাজে লাগাইতেছেন। ইহা আমরা অতিশয় গর্হিত কাজ বলিয়া মনে করি এবং বহু অধ্যাপক এ বিষয়ে ঘোর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপকদের সুগঠিত সমিতি রহিয়াছে, ধর্ম্মঘট করা হইবে কিনা তাহা প্রথমতঃ তাঁহারা নিজেরা মেজরিটি ভোটে স্থির করিবেন, ধর্ম্মঘট অপরিহার্য্য হইলে তাঁহারা নিজেরাই উহা চালাইবেন, ছাত্রদের ইহার সহিত জড়াইবেন না ইহা অবশ্যই আশা করা যাইতে পারে। অধিকাংশ অধ্যাপক ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায় তাঁহাদের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিয়া প্রচারপত্র প্রভৃতিও বিলি হইতেছে। ১২০০ অধ্যাপকের মধ্যে ৫৭ জন মাত্র এই সব কাজ করিতেছেন। অবশ্য কলেজ গেটে এক দল ছাত্র লইয়া দল পাকাইয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পক্ষে এই সংখ্যাই যথেষ্ট। কম্যুনিষ্ট স্লোগান "ছাত্র শ্রমিক অধ্যাপক এক হও" অনুসারে কলেজ গেটে পিকেটিং-এর জন্য কিছু চটকল শ্রমিক আমদানী করিলেও আমরা বিস্মিত হইব না।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কম্যুনিষ্ট

আজকাল রাস্তায় রাস্তায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কম্যুনিষ্ট দলের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাও খুব বাড়িতেছে। মেয়েরা এই সব কুশিক্ষা পাইয়া কোন্ স্তর হইতে পটু হইয়া উঠিতেছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া আমরা অন্ততঃ একটি দৃষ্টান্ত পাইয়াছি, যাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ না করিয়া আমরা শুধু প্রচারকার্য্যের কথা লিখিতেছি।

বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ের একটি প্রাতঃকালীন শাখা আছে। "ঊষা" নামে উহার একটি পত্রিকা আছে। শ্রাবণ ১৩৫৬-এ এই পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। উহার আশীর্ব্বাণীতে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী লিখিতেছেন —"আসন্ন এক ঝঞ্ঝাটের ছায়াপাতের সামনে প্রবীণ আমরা হতবুদ্ধি হয়ে কাঁপছি। আমাদের একমাত্র নির্ভর তোমাদের উপর—তোমরা সকল রকমেই কাঁচা বলে তোমাদের কোমল মনের কাঁচা মাটি দিয়ে গড়ে তুলবে নতুন পৃথিবী, যেখানে মানুষ ধরিত্রী-মায়ের সন্তান বলেই হবে মানুষের ভাই,—এতদিনকার মুখের কথায় বা ধর্ম্মের কথায় তাই নয়।... তোমরা প্রাণ খুলে যা খুসী তাই বলে জগতের সকল ছোটদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য শিখবে কি করে—আধ্যাত্মিক ভাবে নয়—অতি সাধারণ ভাবে সকলকে সমান ভাবে দেখা যায়।"

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী গোড়া হইতে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে, আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য সুরু করিয়াছেন। স্কুলটির এই বিভাগে কম্যুনিষ্ট কার্য্যকলাপ ও প্রভাবের কথা শুনিয়াই আমরা অনুসন্ধান করিয়া পত্রিকাটি হাতে পাই।

"পম্পার শিক্ষা সমস্যা" প্রবন্ধে দশম শ্রেণীর একটি ছাত্রী লিখিতেছে, "আমার বাবা একজন রেলের কেরাণী। তিনি যা মাইনা পান তাতে পনর দিনও যায় না। সেইজন্যই তারা তাদের দাবি জানিয়েছিল সরকারকে কিছু মাইনে বাড়িয়ে দিতে। বাঁচতে চায় তারা মানুষের মত খেয়ে পরে। কিন্তু সরকার তাদের সে বাঁচার দাবিকে ৪৫ হাজার মিলিটারীর বুটের তলায় চেপে মেরেছিল। আমার বাবা প্রথমে কাজে যেতে চান নি কিন্তু তাঁকে জোর করে পুলিস দিয়ে বাড়ী থেকে টেনে নিয়ে মিলিটারী গার্ড দিয়ে কাজ করাতে বাধ্য করা হয়েছিল। আমার ছোট ভাই বয়স কতই বা হবে, বড় জোর বার বৎসর। বেড়াতে গিয়েছিল যশোরে। তাই তাকে বুটের লাথি দিয়েছিল মিলিটারী। সে ঔদ্ধত্য সহ্য করতে না পেরে বলেছিল তোমাদের রাজত্ব আর ক'দিন, এর পর আসবে আমাদের রাজত্ব, তখন দেখে নেব তোমাদের। এই বুটের লাথিরও সমুচিত উত্তর দেব সেদিন। ...এই কথা বলার জন্য তাকে খুব মারধোর করা হয়, পরে ওকে নিরাপত্তা আইনে বন্দী করা হয়েছে বলা হয়। যেইমাত্র ও শুনল একথা ওমনি ও বলে উঠল তোমাদের নিরাপত্তা আইন কি তা আমরা অনেক দিন আগেই জেনে নিয়েছি। ওটা আমাদের সরকারের দমননীতির একটা উদাহরণ।... আচ্ছা বলতে পার যে সরকার আমাদের ইচ্ছাকে দেন দাবিয়ে সেই সরকার কি আমাদের?...এর পর ২৮শে মার্চ্চ বেরোল আমাদের এক মস্ত বড় প্রসেশন।...ভাত, কাপড়, শিক্ষা দাও নইলে গদী ছেড়ে দাও।"

ঐ মেয়েটি পত্রিকার ছাত্রী সম্পাদিকা। আর একটি প্রবন্ধে সে লিখিতেছে, "যে দেশে প্রয়োজন রাষ্ট্রগঠনের জন্য প্রচুর বৈজ্ঞানিক এবং ডাক্তারের এবং যে দেশের লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে—সেই দেশের ছাত্রদের কি করা উচিত?—এই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, না এই সরকারকেই মেনে নেওয়া?...বিদেশী আমলে শিক্ষার

উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের শোষণ চালু রাখার জন্য আর আমাদের দেশী সরকারের সে উদ্দেশ্য নেই, তাঁরা চান স্বদেশের লোক যাতে শিক্ষা পেয়ে তাদের স্বরূপ জানতে না পারে তাই দেশের লোকদের মুখ করে রাখতে।"

স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে যদি উহার শিক্ষয়িত্রীরা নিজেরাই ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য করেন, এবং কম্যুনিষ্ট ছাত্রীদের রাজনীতি চর্চ্চায় সাহায্য করেন, তবে ছেলেমেয়েদের বিপথগামী না হওয়াই অস্বাভাবিক। স্কুল-কলেজে এইরূপ ধ্বংসাত্মক রাজনীতি ও জাতীয় সংস্কৃতি বিরোধী প্রকাশ্য প্রচারকার্য্যের সুযোগ পৃথিবীর কোন দেশের গবর্মেণ্ট দেয় বলিয়া তো আমরা শুনি নাই। অন্ততঃ সোভিয়েট রাশিয়া যে এইরূপ বিদ্রোহ প্রচারকার্য্য চালাইয়া এক মিনিটে নিঃশেষ করিত তাহার সহস্র উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই আছে। আমাদের সরকার কি এইরূপ মিথ্যা প্রচারও বন্ধ করিতে অক্ষম? সময় মত ব্যবস্থা করিলে পরে বল প্রয়োগের প্রয়োজনও হয় না।

হত্যাকারী গ্রেপ্তারে পুলিসের অনিচ্ছা

ব্যারাকপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এন. এন. মজুমদারের এজলাসে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী এই মর্ম্মে এক অভিযোগ করেন যে, বিড়লার টেক্সম্যাকো কারখানার শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী এবং তাঁহার স্বামী সুবোধকুমার সরকারকে হত্যা করা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত করিয়া মহকুমা হাকিমকে এই রিপোর্ট দিয়াছেন যে, সুবোধ সরকারের মৃত্যু ঘটাইবার জন্য কারখানার হেড জমাদার গোরখ সিং এবং ঐ ঘটনায় জড়িত থাকার জন্য কারখানার প্রধান কর্ম্মচারী ম্যানেজার রামলাল রাজগড়িয়ার বিরুদ্ধে শমন জারী করা হউক। রিপোর্টে তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, কারখানার অন্যান্য দারোয়ানদেরও বেকসুর রেহাই পাওয়া উচিত নয়। সুবোধ সরকারের হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার না করায় পুলিসের বিরুদ্ধেও তিনি মন্তব্য করিয়াছেন। মহকুমা হাকিম ময়না তদন্তের এবং গুলিচালনার রিপোর্ট তলব করিয়াছেন। তদন্ত চলিতেছে। আদালতের এই রিপোর্ট ৩০শে অক্টোবর প্রকাশিত হইয়াছে, তার পর লিখিবার দিন (১২ই নবেম্বর) পর্য্যন্ত এ বিষয়ে আর কোন সংবাদ আমাদের চোখে পড়ে নাই।

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া আমরা মনে করি। কংগ্রেস রাজত্বে ক্যাপিটালিষ্টদের সাত খুন মাপ এমনি একটা ভ্রান্ত ধারণা জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হইতেছে। এই সময়ে যদি বিড়লার কারখানার দারোয়ানের গুলিতে মানুষ খুন হয়, কারখানার ম্যানেজার তাহা দাঁড়াইয়া দেখে এবং উভয়কেই যদি পুলিস গ্রেপ্তার না করে তবে লোকের মুখ চাপা দেওয়া যাইবে কি প্রকারে? হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করা পুলিসের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, আইনতঃ পুলিস এই কর্ত্তব্য পালনে বাধ্য। হত্যাকারী পলায়ন করিলে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য পুলিসের স্বতন্ত্র বিভাগ রহিয়াছে। এক্ষেত্রে হত্যাকারী বলিয়া যাহাদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ হইয়াছে পুলিস কেন তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবে না? জেলার পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং প্রদেশের ইন্সপেক্টর-জেনারেল অব পুলিস এ বিষয়ে কর্ত্তব্যচ্যুতির কারণে সাধারণের সন্দেহভাজন হইতেছেন একথা বলা প্রয়োজন। সুবোধ সরকার প্রকাশ্য দিবালোকে বন্দুকের গুলিতে নিহত হইয়াছে, তাহার বিধবা পত্নী এবং স্থানীয় লোকেরা হত্যাকারী বলিয়া কতকগুলি লোকের নাম করিতেছে, এক্ষেত্রে উহাদিগকে গ্রেপ্তার না করার কারণ অত্যন্ত রহস্যময় বলিয়া লোকে মনে করিবেই এবং ইহার নানারূপ বিকৃত ব্যাখ্যা হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যে দুই-একটি সংবাদপত্রে আমরা এই মামলার বিবরণ দেখিয়াছি তাহাতে লক্ষ্য করিয়াছি যে, কারখানাটি যে বিড়লার সে কথা চাপিয়া যাওয়া হইয়াছে এবং "বেলঘরিয়ার একটি কারখানা" মাত্র বলিয়া ঘটনাস্থলের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য পালনের পরিচায়ক নয়।

এই ঘটনাটির প্রতি আমরা প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তদন্ত শেষে ম্যাজিষ্ট্রেট যাহাদিগকে হত্যাকারী সন্দেহে তদন্তের আদেশ দিয়াছেন তাহাদিগকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা উচিত এবং সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত পুলিস কর্ম্মচারী এত প্রমাণ সত্ত্বেও উহাদিগকে গ্রেপ্তার করে নাই তাহাদের জবাবদিহি করানো উচিত, এরূপ ব্যাপারে আদালতের বিচার ব্যতীত কোনও লোক নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গে চাউলের ঘাটতি?

পশ্চিমবঙ্গে চাউলের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর। সরকারী এই তথ্যের উপরই প্রদেশের সরবরাহ বিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং এই তথ্য অসত্য হইলে এই "শ্বেতহস্তী" পুষিবার প্রয়োজনও ফুরাইয়া যায়। সেইজন্য এই বিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক যে, তাঁহারা প্রমাণিত করিবেন, পশ্চিমবঙ্গ ঘাটতি এলাকা; খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ না করিলে ১৩৫০ সনের মত দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রণের দৌলতে কলিকাতার শিল্পাঞ্চলে প্রায় ৬৪ লক্ষ লোকে ১৭ টাকা মূল্যে চাউল পাইয়া থাকেন, কিন্তু নিয়ন্ত্রণের বাহিরের এলাকায় চাউল বিক্রয় হয় প্রায় ২৫৲ টাকা মূল্যে।

কোন কোন বাঙালী সাংবাদিক বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে চাউলের প্রকৃত ঘাটতি নাই। কৃষিমন্ত্রী শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা কিন্তু বলিতেছেন, পশ্চিমবঙ্গে চার লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি। আর একজন মন্ত্রী, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতির

মুখপত্র—"সত্যাগ্রহ" পত্রিকার—১৪ই কার্ত্তিকের সংখ্যা পাঠ করিলে এই পুর্ব্বোক্ত ধারণা সত্য বলিয়া মনে করা যায়। বোরো ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্ত আবেদন করিতে গিয়া প্রবন্ধ-লেখক বলিতেছেন :

> পশ্চিমবঙ্গে ঘাটতি চাউলের পরিমাণ যে এ বৎসর এক লক্ষ টন তাহা পাঠকেরা অবগত আছেন। এই প্রদেশের বাৎসরিক মোট চাউল খরচের পরিমাণ ৩৬ লক্ষ টন। এখন পর্য্যন্ত আমন ধানের সম্বন্ধে যে আশা পাওয়া যাচ্ছে তাতে তার আগামী ফসলের দ্বারা ৩৫ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হবে বলে বিশেষজ্ঞেরা বলেন। তা হলে ঘাটতি পড়বে ১ লক্ষ টন বা ২৭ লক্ষ মণ, ধানের হিসাবে প্রায় ৪০ লক্ষ মণ ধান।
>
> এই ৪০ লক্ষ মণ ধান উৎপাদন করতে পারলে আগামী বৎসর চাউলের জন্ত আমাদের বাইরে যেতে হবে না। এটা কি আমরা করতে পারি না? আমাদের মনে হয় উত্তমের সহিত প্রযত্ন করলে আমরা কৃতকার্য্য হতে পারব।
>
> কারণ বোরো ও আউশ ধানের চাষ এখনও বাকী আছে। যে সকল জমিতে আমন হয় না, বোরো বা আউশ হয়, সেই সকল জায়গায় যদি বোরো বা আউশ হয় এবং সেজন্ত সবিশেষ উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হয় তা হলে আমরা এই ঘাটতি পূরণ করে উঠতে পারি।
>
> আমরা বর্ত্তমান বোরো চাষের কথাই আলোচনা করব। কারণ আউশের চাষ সুরু হতে এখনও অনেক বাকী। কিন্তু বোরো চাষের সময় অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী। এখনই এবিষয়ে উদ্যোগ ও আয়োজন সুরু করতে হয়।
>
> ১৯৪৬-৪৭ সালের যে হিসাব পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১ লক্ষ ৪৭ হাজার বিঘা জমিতে বোরো চাষ হয়েছিল। আমরা জানি বোরো ধানের উপযোগী বহু জমি জলাভাবে চাষ না হয়ে পতিত থেকে যায়। জল সংরক্ষণ করে সেই জমিগুলিতে বোরো চাষের ব্যবস্থা করতে হবে।
>
> যদি গড়ে বিঘা প্রতি ৫ মণ হিসাবে বোরো ধান হয় তা হলে ৮ লক্ষ বিঘা জমিতে বোরো চাষ করতে পারলে আমাদের ৪০ লক্ষ মণ ধান বা ২৭ লক্ষ মণ বা ১ লক্ষ টন চাউল কিনবার জন্ত ৬ কোটি টাকার উপর বাইরে পাঠিয়ে দিতে হবে না।

ম্যালেরিয়াগ্রস্ত পশ্চিমবঙ্গের কৃষকেরা ধানের দুইটি ফসল তুলিতে পারিবে কি, সেই প্রশ্ন করা যায়। বোরো ধানের চাষ সম্বন্ধে তাহাদের কৌশল ও অভিজ্ঞতা কম এবং পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে এমন কে আছেন যিনি প্রদেশের জনগণের এই নুতন ফসল উৎপাদনে পথপ্রদর্শক হইতে পারেন? তাঁহারাও সরকারী কৃষিবিভাগ ফাইলের উপর হইতে চক্ষু তুলিবার পরিশ্রমে ভয় পান।

ভারতরাষ্ট্রের খাদ্য-সমস্যা

ভারতরাষ্ট্রের খাদ্য-সমস্যা এখনও মিটে নাই। ১৯৫১ সালের মধ্যে মিটাইয়া ফেলিবার ব্রত লইয়া "খাদ্য-যুদ্ধের" জন্ত একজন সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রী এস. কে. পাটিল। তিনি মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার শক্তির কোন বিশেষ পরিচয় পাইয়া কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাকে এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। সম্প্রতি দুই দিনের জন্ত তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি কলিকাতার সাংবাদিক ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে এই সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই আলোচনায় অত্যন্ত ভাসা ভাসা ভাবে তাঁহার পরিকল্পনার বিবরণ দেন। ভদ্রলোক এত ব্যস্ত ছিলেন যে, সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়া সমস্তাটি আলোচনা হইতে পারে নাই। বক্তা বার বার হাত-ঘড়ির দিকে তাকাইলে কোন আলোচনা সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না। এই দুই দিনে তিনি সরকারী মহলের সঙ্গে কি আলোচনা করিয়াছেন, তাহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

"অধিক খাদ্যশস্য ফলাও" আন্দোলন কেন আশানুরূপ সাফল্যলাভ করে নাই, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত পাটিল তিনটি কারণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথম, কেন্দ্রীয় সরকার এতদিন সমস্তার প্রতি যথোপযুক্ত মনোযোগ দেন নাই; দ্বিতীয়, "নোকরসাহীর", আমলাতন্ত্রের, লাল-ফিতার প্রতি প্রীতি (red-tapism); তৃতীয়, দেশের জনগণের নিশ্চেষ্টতা। এই উত্তরে আমরা খুশী হইতে পারিতেছি না। জনগণের মনে উৎসাহ জাগাইতে পারা যায় না কেন, সেই প্রশ্ন অনুক্ত রহিয়া গিয়াছে। দেশের স্বাভাবিক চিন্তাধারা ও গতানুগতিক কর্ম্মপদ্ধতির পরিবর্ত্তন আশু প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই। কে এই শিক্ষা দিবে? গান্ধীজী তাঁহার গঠনমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে একটা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই শিক্ষা আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই এবং নেহরু গবর্মেণ্ট এই শিক্ষাদানে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। দুই বৎসরের অভিজ্ঞতার পর এইরূপ সিদ্ধান্তে আসা প্রীতিপদ হয় নাই।

শ্রীযুক্ত পাটিল মাত্র দুই দিনের জন্ত কেন কলিকাতায় আসিলেন তাহা বুঝিলাম না। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও সেচ বিভাগকে কর্ম্মতৎপর করিবার জন্ত আসিলে আমাদের বলিবার কিছু নাই। বেসরকারী বুদ্ধিজীবী ও কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গকে এমন কিছু তিনি দিয়া যাইতে পারেন নাই যাহার জন্ত তাঁহার আবির্ভাব স্মরণীয় হইবে। তাঁহার ব্যাপক পরিকল্পনাসমূহ কোন্ কোন্ প্রদেশে রূপ গ্রহণ করিয়াছে, একটি সরকারী

বিবৃতিতে তাহা দেখিতে পাইতেছি। ১০ই কার্ত্তিক যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতরাষ্ট্রের "খাদ্যাবস্থার" বিবরণ এইরূপ :

মধ্যভারত—সম্প্রতি ভিন্দে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় খাদ্য, জনসম্ভরণ ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব শ্রীরামেশ্বর দয়ালজী তোতলা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, মধ্যভারতে ইতিমধ্যেই ১ লক্ষ একর নূতন জমিতে চাষ সুরু করা হইয়াছে। উহা হইতে রবিশস্য পাওয়া যাইবে।

আসাম—আসাম সরকারের কৃষি বিভাগ ১৯৪৯-৫০ সালের জন্ত যান্ত্রিক চাষের একটি সংশোধিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত ১০ হাজার একর পতিত জমিতে চাষ করা হইবে। এই পরিকল্পনাটি ২ হাজার একর পরিমিত ৫টি জমিতে কার্য্যকরী করা হইবে।

বিহার—বিহারের রাজস্ব বিভাগ কর্ত্তৃক পরিচালিত সেচ অভিযানের ফলে গত এপ্রিল হইতে আগষ্ট মাসে ৩,৩২৭টি ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার কার্য্য সুরু করা হইয়াছে। ১৯৪৯-৫০ সালের জন্ত বরাদ্দকৃত ১ কোটি টাকা হইতে গত আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত এই সকল পরিকল্পনার জন্ত মোট ৪৯ লক্ষ ৭ হাজার ৮৭৬ টাকা ব্যয় হইয়াছে। গত আগষ্ট মাসেই বিহার প্রদেশে ৫০৬টি ছোট ছোট সেচ-পরিকল্পনার কার্য্য শেষ করা হয়। বর্ত্তমান বৎসরের এপ্রিল হইতে আগষ্ট মাসে সমগ্র প্রদেশে অনুরূপ ৫৫৭২টি পরিকল্পনার মঞ্জুর অথবা তাহার কার্য্য সুরু করা হয়।

যুক্তপ্রদেশ—কৃষি পুনর্গঠন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যুক্তপ্রাদেশিক সরকার কৃষি ডাইরেক্টরের সদর দপ্তরের একটি তথ্য সরবরাহ সংস্থা স্থাপনের বিষয় অনুমোদন করিয়াছেন। গবেষণা বা পরীক্ষাকার্য্য অব্যাহত রাখা এবং উহাদের ফল জনসমক্ষে উপস্থাপিত করাই এই সংস্থার মূল কার্য্য হইবে। প্রদেশের কৃষি-উন্নয়নের জন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই সংস্থা তাহার সদ্ব্যবহার করিবে।

পশ্চিমবঙ্গ—জলপাইগুড়িস্থিত কাটাপুকুরীর ১০ হাজার একর চাষযোগ্য পতিত জমির সংস্কার-কার্য্য শেষ হইয়াছে, এবং প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় ছোট ছোট সেচ-পরিকল্পনার কার্য্য সুরু করা হইয়াছে। কৃষকদিগের ভিতর চাষের উদ্দেশ্যে বণ্টনের জন্ত ৫ হাজার একর পতিত জমির সংস্কার-কার্য্য প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে।

এই বিবরণীর মধ্যে যে কর্ম্ম-প্রচেষ্টার একটা অসম্পূর্ণ পরিচয় পাই, তাহা সারা ভারতে বিস্তৃত হইলে, দেশের খাদ্য-সমস্যার সমাধান হইতে পারে। আগামী ২৪ মাসের প্রতি আমরা নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া থাকিব।

পৌর-প্রতিষ্ঠানে কর্ম্ম-বিরতি

ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় জাতীয় ট্রেড-ইউনিয়নের সভাপতি। তাঁহার নেতৃত্বে কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীবৃন্দ প্রায় ৯ দিন কর্ম্ম হইতে বিরত থাকেন। কেন্দ্রীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন এই কর্ম্ম-বিরতিকে নিন্দা করিয়াছেন। আমরা ইহাকে ধর্ম্মঘট আখ্যা দিতে পারিতেছি না। কারণ ইহার নৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রয়োজন ছিল না। এই কর্ম্ম-বিরতিতে চার-পাঁচ হাজার কেরাণী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। ৯ দিনের মাহিনা তাঁহাদের কাটা হইয়াছে। যে ৪৲ টাকা মাসিক লাভ হইবে তাহা এই মাহিনা কর্ত্তনের ক্ষতি পুরাইতে ১২ মাসেও পারিবে বলিয়া মনে হয় না। চৌদ্দ পনর হাজার শ্রমজীবী, মেথর, ধাঙর এই শ্রেণীর লাভ হইয়াছে। কারণ যদিও তাহারা ৯ দিনের মাহিনা হারাইয়াছে তবুও উপরি কাজ করিয়া আট নয় দিনেই তাহা পোষাইয়া লইতে পারিবে।

সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ নিজের স্বার্থে এইভাবে সমাজ-জীবন বিপন্ন করিতে পারে কিনা তাহা বিবেচ্য হইয়া পড়িয়াছে। সমাজ-মন এই বিষয়ে মোহাচ্ছন্ন বলিয়াই এই উপদ্রব সম্ভব হইতেছে। কলিকাতার যুবক শ্রেণী যেভাবে ইহাকে ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাতে মনে হয় এই বিষয়ে সমাজ-মন জাগ্রত হইতেছে। যেভাবে তাঁহারা অনভ্যস্ত কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং যে নিষ্ঠার সহিত তাঁহারা নাগরিক জীবনের একটা কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন তজ্জন্ত তাঁহাদের আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও আমরা তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু অবস্থা

পশ্চিম পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রভৃতি "পাকিস্তান" রাষ্ট্রের প্রদেশসমূহ হইতে প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি লক্ষ লোক পাকিস্তানী "সাম্যবাদের" কল্যাণে পিতৃভূমি ত্যাগ করিয়াছে। তাহারা ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের চক্ষের সামনে আসিয়া ভীড় করিতেছে; সুতরাং বাধ্য হইয়াই সেই গবর্ণমেণ্টকে তাহাদের পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে; না হইলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট শান্তিতে থাকিতে পারিবেন না। পূর্ব্ববঙ্গ "পাকিস্তান" রাষ্ট্রের অঙ্গ; সেখানেও "সরিয়ৎ বিধান" অনুসারে "কাফেরের" নাগরিক অধিকার মুসলমানের সমপর্য্যায়ের হইতে পারে না। সুতরাং লক্ষ লক্ষ ভয়ার্ত্ত পুরুষ-নারী-শিশু তাহাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়াছে। তাহারা পশ্চিমবঙ্গে ভিড় করিয়াছে। আসাম প্রদেশেও কয়েক লক্ষ গিয়াছে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট দূর হইতে ইহাদের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারিতেছেন না।

সুতরাং এই দুই গবর্ণমেণ্ট কি করিয়াছেন বা করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহার হিসাব পাওয়া প্রয়োজন। পশ্চিম-বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। সেই বিবৃতিটি তুলিয়া দিলাম,—

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তুত্যাগীদের পুনর্ব্বসতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমি দখল করিয়াছেন।

সরকার যে পুনর্ব্বসতি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যথা:—(১) পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা। কারিগর, ছোটখাট ব্যবসায়ী প্রভৃতির জন্য পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে; (২) শহর উন্নয়ন পরিকল্পনা। যাহারা শহর অঞ্চলে বসবাস করিতে চাহে, তাহাদের এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। (৩) চাষীদের জন্য পুনর্ব্বসতি পরিকল্পনা।

পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনানুযায়ী নিম্নলিখিত স্থানে কাজ অগ্রসর হইতেছে:—(১) হাবরা-বাইগাছি (পল্লী অঞ্চল)—৪৫২ একর জমি ১০ কাঠা করিয়া ১৩৮৪ প্লটে ভাগ করা হইয়াছে এবং ঐ সব জমির উন্নয়ন করা হইয়াছে। উহার মধ্যে ১২০০ প্লট বাস্তুত্যাগীদের মধ্যে ইতিমধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। ৭০০ পরিবারকে বাড়ী তৈয়ারির জন্য অগ্রিম ঋণ দেওয়া হইয়াছে। প্রায় ১০০ বাড়ী ইতিমধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে।

(২) কাঁচড়াপাড়া—৪০০ একর জমি ৪ কাঠা করিয়া ৩৫০ প্লটে ভাগ করা হইয়াছে। বাস্তুত্যাগীদের বাসের জন্য ঐ স্থানে অপসারণের যোগ্য কুটিরসমূহ (প্রি-ফেব্রিকেটেড) স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। প্রত্যেক কুটিরের জন্য মোট ১৫০০ টাকা লাগিবে।

(৩) গড়িয়া পরিকল্পনা—কলিকাতা হইতে ৪ মাইল দূরে ৮ শত একর জমি দখল করার প্রস্তাব হইয়াছে। ১০ কাঠা করিয়া ৩৬০০ প্লটে জমি ভাগ করা হইবে। প্রকাশ, সরকার এই সম্পর্কে নোটিশ জারী করিয়াছেন এবং জমির মাপের কাজ চলিতেছে।

(৪) চৌটা-রাজপুর পরিকল্পনা—২৫১ একর জমিতে ১০ কাঠা করিয়া ১০৮০ প্লটে জমি ভাগ করা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ শহর উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির কাজ অগ্রসর হইতেছে:—

(১) হাবরা-বাইগাছি শহর পরিকল্পনা:—১৫০০ একর জমি ৬ কাঠা করিয়া ৯ হাজার প্লটে ভাগ করার প্রস্তাব হইয়াছে! ৩০০০ প্লট কোঠাবাড়ী নির্ম্মাণের পর বিতরণ করা হইবে। প্রত্যেকখানা বাড়ীর মূল্য ৫০০০ টাকা লাগিবে। ৬ হাজার প্লট ৮ শত টাকা মূল্যে বিতরণ করা হইবে। জমির অধিকার ইতিমধ্যে লওয়া হইয়াছে। কিছু অংশ দখল করা হইয়াছে।

(২) পাণ্ডিপুকুর শহরতলী পরিকল্পনা—২৫ বিঘা জমিতে প্লট ভাগ করিয়া উহাতে বাড়ী তৈয়ারি করা হইবে।

(৩) বেহালা পরিকল্পনা—৯৫০ একর জমি এই পরিকল্পনার উন্নয়নের প্রস্তাব করা হইয়াছে। জমি দখলের জন্য নোটিশ জারী করা হইয়াছে। ৫ কাঠা করিয়া প্লট ভাগ করিয়া বিতরণ করা হইবে। কতকগুলি প্লট বাড়ী তৈয়ারীর পর বিতরণ করা হইবে। প্রতিটি বাড়ীর মূল্য মোট আট হাজার টাকা লাগিবে।

মফঃস্বল শহরের পরিকল্পনা:—(ক) মেদিনীপুর—৪৬০ একর ২,৪০০ প্লটে ভাগ করা হইবে; (খ) হুগলী—১৬৬ একর ৮০০ প্লটে ভাগ করা হইবে; (গ) বালুরঘাট—২০৪ একর ১,০০০ প্লটে ভাগ করা হইবে; (ঘ) জঙ্গীপুর—৬৫ একর ৩৫০ প্লটে ভাগ করা হইবে; (ঙ) কৃষ্ণনগর—৮৮ একর ৪৫০ প্লটে ভাগ করা হইবে; (চ) জলপাইগুড়ী—৬৫ একর ৩,০০০ প্লটে ভাগ করা হইবে; (ছ) তালুক-খের (জলপাইগুড়ী)—২০০ একর ৯০০ প্লটে ভাগ করা হইবে; (জ) আলিপুর-দুয়ার—৪২৩ একর ১,০০০ প্লটে ভাগ করা হইবে; (ঝ) শিলিগুড়ি—১০০ একর ৮০০ প্লটে ভাগ করা হইবে।

নিম্নলিখিত কৃষি পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে:—

(১) ফতেপুকুর পরিকল্পনা (জলপাইগুড়ী)—সরকারী ট্রাক্টরযোগে ১,৩০০ একর পতিত জমি উদ্ধার করা হইয়াছে এবং পরিবার পিছু ৫ বিঘা আবাদী জমি ও এক বিঘা ভিটা জমি দিয়া ২৫০টি পরিবারের পুনর্বসতির ব্যবস্থা হইয়াছে। এখানে পাট ও ধান জন্মে।

(২) শুকানপুর পরিকল্পনা (জলপাইগুড়ী জেলা)—১০০ একর পতিত জমি উদ্ধার করা হইয়াছে এবং ৩০টি পরিবারের পুনর্বসতির ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমান মরশুমে ধান হইয়াছে।

(৩) সুন্দরবনে মথুরাপুর খামা পরিকল্পনা—৮০০ একর খাস মহলের জমি দখলে আনা হইতেছে। ২৫০ পরিবার ইতিমধ্যেই সেখানে বসবাস করিতেছে।

(৪) কুলটি পরিকল্পনা—কুলটি খাল বরাবর করপোরেশনের ১,৪০০ বিঘা জমি ছাড়া হইতেছে। এখানে কলিকাতা বাজারের জন্য তরিতরকারী উৎপাদনক্ষম ২০০ চাষী বসবাস করিতে পারে।

(৫) বেথুয়াধারী পরিকল্পনা—৫,০০০ একর জমি জরীপ করা হইয়াছে এবং ট্রাক্টরযোগে আবাদযোগ্য করা হইয়াছে। কৃষিবিভাগের সহযোগিতায় একটি সংযুক্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইতেছে।

আসাম গবর্ণমেণ্ট চান না যে সেই প্রদেশে বাঙালী গিয়া তাহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বিঘ্ন ঘটায়। বর্ত্তমানে আসামের বঙ্গ-ভাষা-ভাষী লোকের সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ; অহম্-ভাষা-ভাষী লোকের সংখ্যাও এইরূপ। বাকী ২৫ লক্ষ লোক—খাসিয়া গারো, মণিপুরী, লুসাই, মিকির, কুকি প্রভৃতি নানা ভাষায় কথা বলেন। আসাম গবর্ণমেণ্ট কিছুই করিতেছে না; সুতরাং তাহাদের বিবৃতি দিবারও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আসামে উদ্বাস্তুদের অবস্থা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যায়। শিলঙ হইতে ১৪ই কার্ত্তিক ইহা প্রেরিত হয়; "আনন্দ-

বাজার” পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছে :—মণ্ডলী হইতে আসাম সরকারের উদ্বাস্তু উপদেষ্টা শ্রীরোহিণীকুমার চৌধুরীর নিকট প্রেরিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, লামডিং-এ প্রায় ১০ সহস্র উদ্বাস্তুকে এ পর্য্যন্ত সাহায্য হিসাবে কোন নগদ টাকাপয়সা বা দ্রব্যাদি দেওয়া হয় নাই। তাহারা অতিশয় কষ্টের মধ্যে দিনযাপন করিতেছে। ইতিমধ্যে অনশনের দরুন বলিয়া অনুমিত যে কয়েকটি মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে সরকারীভাবে উহা এখনও অস্বীকার করা হয় নাই।

জানা গিয়াছে যে, এই সমস্ত উদ্বাস্তুর অসহায় অবস্থা ভারত-সরকারের পুনর্বসতি দপ্তরকে জানান হইয়াছে। আরও জানান হইয়াছে যে, লামডিং অঞ্চলের জনসাধারণের জন্য কোন হাসপাতাল না থাকায় অসুস্থ উদ্বাস্তুরা কোন চিকিৎসার সাহায্য পাইতেছে না। জানা গিয়াছে যে, পুনর্বসতি সচিব শ্রীমোহনলাল শকসেনা রেলওয়ে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার ও শ্রীরোহিণীকুমার চৌধুরীর সহিত আলোচনাক্রমে স্থানীয় রেল হাসপাতালে উদ্বাস্তুদের চিকিৎসার জন্য আসাম রেল-কর্তৃপক্ষের সহিত ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই সমস্ত উদ্বাস্তুকে বর্ত্তমানে প্রধানতঃ সরকারী কর্ম্মচারী ও পথচারীদের দানের উপর নির্ভর করিতে হয়। এক শ্রেণীর লোকেরা অবস্থার গুরুত্বকে ছোট করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই সমস্ত উদ্বাস্তুর অবস্থা দ্রুত শোচনীয় আকার ধারণ করিতেছে। অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে আরও লোক মারা যাইবে।

বরিশাল—“পুণ্যে বিশাল”

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙালী সমাজে যে নব-জীবনের সাড়া পড়িয়াছিল, সেই সময়ে বরিশাল “পুণ্যে বিশাল” রূপে দেখা দিয়াছিল। এই আবির্ভাবের সম্ভব হইয়াছিল অশ্বিনীকুমার-জগদীশচন্দ্রের সাধনার ফলে। ইতি-হাসের দাপটে সেই বরিশাল আজ মূল বাঙালী জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মাউণ্টব্যাটেন বিধানের প্রয়োজনে এবং আমাদের স্বীকৃতির ফলে এই অঘটন ঘটিয়াছে। যে রাষ্ট্রের অধীনে বরিশাল গিয়া পড়িয়াছে, সেই ইস্‌লামী রাষ্ট্রের প্রকৃতির মধ্যে পর মত ও পথ সম্বন্ধে এমন একটা অসহিষ্ণুতা বিদ্যমান যে বরিশালের তথা পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় নিজেদের প্রাণ, মান, ধন সম্বন্ধে আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। এই বিষয়ে কোন তর্কের অবসর নাই। “পাকিস্থানী” রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ নিজেদের প্রয়োজনে মুসলিম সম্প্রদায়ের মনে “কাফের” বিদ্বেষ এমনভাবে জিয়াইয়া রাখিতেছেন যে, তাঁহাদের বক্তৃতা ও ঘোষণা ভরসা না দিয়া ভয়ই জাগায়।

এর প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। কংগ্রেসী নেতৃবর্গের অনেকে পূর্ব্বেই দেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু সমাজের নেতৃবর্গকে উদ্বাস্তু করিবার জন্য তাঁহাদের বাড়ীঘর সরকারী প্রয়োজনের অজুহাতে দখল করিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এই দখলের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে গেলে শুনিতে হয় এই কথা—“আপনাদের সরিয়া যাইতে দুই বৎসরের অধিক সময় দেওয়া হইয়াছে।” বরিশালের নিকটবর্ত্তী কোন জেলার কর্ত্তা একজন হিন্দু প্রধানকে এই উত্তর দিতে দ্বিধা করেন নাই। যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িবেন না এইরূপ মনস্থ করিয়াছেন, যাঁহারা “পাকিস্থানের” সরকারী ঋণের আহ্বানে লক্ষ লক্ষ টাকার “খত” কিনিয়াছেন তাঁহাদেরও রেহাই দেওয়া হইতেছে না। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় যে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুকে তাঁহাদের মাতৃভূমিতে থাকিতে দেওয়া হইবে না—ইহাই “পাকিস্থানের” স্বরাষ্ট্র-নীতি হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্যায় কি করা কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে লোকের মন নিশ্চেষ্ট হইয়া নাই। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মুখপত্র “নব-সঙ্ঘের” ২রা আশ্বিনের সংখ্যায় সঙ্ঘগুরুর নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রকাশিত হইয়াছে :

বিগত ১০ই সেপ্টেম্বর, শনিবার ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ‘প্রবর্ত্তক ভবনে’ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায় বলেন—“বরিশালে শ্রীসরলকুমার দত্ত, শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ ও শ্রীপ্রাণকুমার সেনের সহিত আমার যে ক্ষুদ্র বৈঠক হয়, সেই বৈঠকের মর্ম্মকথা ব্যক্ত করার জন্য আমি অনুরুদ্ধ। বরিশালবাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আজ স্থান ত্যাগ করিবেন কিনা—এই প্রসঙ্গ লইয়া আমাদের আলোচনা হয়। আমি শুনিয়াছি ৩৬ লক্ষ বরিশালের অধিবাসী-সংখ্যার মধ্যে ২৬ লক্ষ মুসলমান। ৮ লক্ষ জল-অচল অস্পৃশ্য জাতি। মাত্র ২ লক্ষ বিভিন্ন জল-চল জাতির বাস। ৮ লক্ষ অস্পৃশ্য, ধর্ম্মহীন ; তাহারা নামে হিন্দু। অবশিষ্ট ২ লক্ষ হিন্দু অধিবাসীর সম্বন্ধেই সমস্যা উঠিয়াছে। এই সমস্যার সমাধানে আমি বলিয়াছি, বরিশালের এক শত অধিবাসীকে সর্ব্বপ্রথমে সংহতিবদ্ধ হইতে হইবে। প্রতি জন প্রথম বৎসরের জন্য একশত টাকা এই সংহতির ভাণ্ডারে দান করিবেন। এই টাকায় বরিশালবাসীর ৫ জন প্রচারক জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। আগামী ৪ মাসের মধ্যে এই ৫ জন প্রচারকের জীবন গঠনের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিব। ইঁহারা বরিশালের প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লীতে ভ্রমণ করিবেন। অস্পৃশ্য, জল-অচল বলিয়া কাহাকেও দূরে রাখা হইবে না। হিন্দু মাত্রকেই সমশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে হইবে। হিন্দু সংস্কৃতির ভিত্তিতে বরিশালের সংখ্যালঘু জাতি স্থির-প্রতিষ্ঠ হইয়া জমি চষিবে, কাপড় বুনিবে, ঘানি চালাইবে। শ্রমসাধ্য কর্ম্মে জীবনযাপনের ব্যবস্থা করিয়া লইবে। বরিশালের শিক্ষিত শ্রেণী আত্ম-সংস্কৃতি লইয়া লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর অস্পৃশ্য হিন্দু জাতিকে আপনার করিয়া লইবে। রাষ্ট্রশক্তি লাভের

আকাঙ্ক্ষা এই সংহতির থাকিবে না। সংগঠনের পথেই এই সংহতির লক্ষ্য দৃঢ় রাখিতে হইবে। এই কর্ম্মে অগ্রগামীদের আমি আহ্বান জানাইতেছি। পাকিস্থান ঈশ্বরবিধান বলিয়া রাষ্ট্র-বিরুদ্ধ কোন কথাই এই সংহতি আলোচনা করিবে না। বরিশালবাসী অশ্বিনীকুমার, জগদীশচন্দ্রের দেশে আত্ম-প্রতিষ্ঠ জীবন লইয়া বাস করুক—ইহাই আমার কামনা।"

সীমান্ত-রেখার হেরফের

একজন সুইডেনবাসী বিচারকের সভাপতিত্বে ভারত-"পাকিস্থানের" সীমান্ত-রেখার হেরফের করিবার জন্ত একটি অনুসন্ধান কমিশনের আয়োজন চলিতেছে। পঞ্জাব ও বঙ্গদেশ বিভাগ করিবার ফলে এই সীমান্ত-রেখার নির্দ্দেশে একটা জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল; লর্ড মাউণ্টব্যাটেন নিয়োজিত একজন ইংরেজ—সার সিরিল র‍্যাডক্লিফ—ইহার জন্ত দায়ী। তাঁহার নাম হয়ত দেশের লোক ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি নদীয়া ও শ্রীহট্ট জেলার লোকের মনে এখনও ইংরেজের প্রতি বিরূপ ভাবের পরিচয় প্রদান করে। ইংরেজের শাসন-পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্ত দেশের লোক এমনই পাগল হইয়া গিয়াছিল যে, একজন ইংরেজ-নিয়োগের বিপদ সম্বন্ধে অবহিত হইবার সময় ছিল না। সেইজন্ত আজও পূর্ব্ব-পঞ্জাবের লোকে র‍্যাডক্লিফ সীমান্ত-রেখাকে অভিশাপ দিতেছে; বাঙালী—নদীয়ার ও শ্রীহট্টের বাঙালী—"পাকিস্থানী" শাসনের মাহাত্ম্য বুঝিতেছে।

বিভক্ত পঞ্জাবের কথাও শুনিয়াছি যে, দুই প্রদেশের সীমারেখা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন—"the undrawn Radcliffe line"। এই অনিশ্চয়তার সুযোগ লইতে পাকিস্থানীরা সদাই তৎপর। দুই-তিন মাস পূর্ব্বে সুলেমানকি বাঁধ রক্ষার নামে তাহারা পূর্ব্ব-পঞ্জাবের ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে; এই বাঁধ ভারতের এলাকায়—যেমন আমাদের হুশেনওয়ালা বাঁধ পাকিস্থানী এলাকায় অবস্থিত। পরস্পর ব্যবস্থার ফলে এই দুই বাঁধ সম্বন্ধে অসামরিক শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর চলাচলে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু পাকিস্থানী সামরিক রক্ষিবৃন্দ এই ব্যবস্থা মানে না, তাহারা জোর করিয়া ভারতের এলাকায় প্রবেশ করে। ভারতীয় রক্ষিবৃন্দ দিল্লীর দিকে চাহিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে।

বাঙালী জীবনে র‍্যাডক্লিফ সীমান্ত-রেখার বিপর্য্যয় আরও চমৎকার। নদীয়া জেলার মাথাভাঙ্গা নদীর উৎপত্তি-স্থানের ম্যাপ জাল করিয়া সোহরওয়ার্দি মন্ত্রিমণ্ডলী র‍্যাডক্লিফ সাহেবকে ভুল বুঝাইয়াছিল; ফলে প্রায় ৫০০ বর্গমাইল পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। শ্রীহট্ট জেলায় কুশিয়ারা নদীর বুকে—মধ্যভাগে—সীমারেখা টানিয়া র‍্যাডক্লিফ-কলমের হাত সাফাই লোকচক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ফলে ঐ অঞ্চলে পাকিস্থানী হামলা লাগিয়াই আছে। গত ২৪শে কার্ত্তিকের একটি সংবাদে ভারতরাষ্ট্রের নিশ্চেষ্টতার আর একটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি অস্থায়ী পররাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার আসামে গিয়াছেন; উদ্দেশ্য মনে হয়, আগামী অনুসন্ধানের জন্ত প্রস্তুত হওয়া। সেই উপলক্ষে খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ও পূর্ব্ববঙ্গের সীমান্ত-রেখার সন্নিকটে তিনি ঘোরাফেরা করিতেছেন। শিলং হইতে প্রেরিত সংবাদটি এইরূপ :—

> "স্থানীয় জনসাধারণ শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারকে জানাইয়াছে এবং সরকারীভাবেও এই কথা সমর্থিত হইয়াছে যে, ভারত-পাকিস্থানের মধ্যবর্ত্তী সীমান্ত-রেখা হাফলং-এর নিকটে শিলং-শ্রীহট্ট রাজপথের ৫৩ মাইলে ছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে পাকিস্থানের সরকারী কর্ম্মচারী এই সীমারেখা নষ্ট করিয়া ফেলে এবং খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া প্রায় ৫১ মাইল ৭ ফার্লং-এর নিকটে ঘাঁটি স্থাপন করে। এ-ভাবেই তারা এক শত মাইল সীমান্ত বরাবর ভারতীয় ডোমিনিয়নের এক মাইলের অভ্যন্তরে বেআইনী ভাবে প্রবেশ করিয়াছে।

এই সংবাদ পাঠ করিয়া বুঝিতেছি যে ভারতরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই "পুকুর-চুরি"র ব্যাপারে কোন কিছুই করা হয় নাই। এই সংবাদ নিশ্চয়ই দিল্লীতে পৌঁছিয়াছিল। তবু প্রায় এগার মাসের মধ্যে পাকিস্থানীদের হঠাইয়া দিবার জন্ত কোন ব্যবস্থা হয় নাই কেন, তাহা জানিবার জন্ত কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আমরা সেই উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

আসামের সঙ্গে রেল-সংযোগ স্থাপন

মাউণ্টব্যাটেনের বিধানানুসারে বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ায় ভারতরাষ্ট্র হইতে আসাম প্রভৃতি পূর্ব্ব-সীমান্ত অঞ্চলের রেল ও জাহাজের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারানামা যখন জলপাইগুড়ির সঙ্গে মালদহ জেলার সম্পর্ক ছেদ করিয়া দিল, তখন পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। পররাষ্ট্রের মধ্য দিয়া এই যোগাযোগের সূত্র এমনই ঠুনকো যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোন রাষ্ট্র চলিতে পারে না। বাণিজ্য ব্যাপারে হাঙ্গামার কথা ছাড়িয়া দিলেও, ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্ব-সীমান্ত রক্ষার জন্ত আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধীন যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই অভাব অনুভব করিয়াই ভারতরাষ্ট্র আসামের সঙ্গে রেলপথ সংযোগের ব্যবস্থা করে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, পুরাপুরিভাবে ভারতীয় এলাকার মধ্য দিয়া ভারতের অবশিষ্টাংশের সহিত আসামের রেলওয়ে সংযোগ সাধন আগামী ফাল্গুন-চৈত্র মাস মধ্যেই সম্পূর্ণ হইবে।

এই পরিকল্পনানুযায়ী আসাম ও কুচবিহারের মধ্যে ১৪৫ মাইলব্যাপী একটি রেলওয়ে লাইন খোলা হইবে। এই নূতন

লাইনটি আসাম রেলওয়ে লাইনের ফকিরাগ্রাম হইতে পশ্চিম বঙ্গের আলীপুর দুয়ারের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিবে। আসামের হল্র, গোঁসাইগাও হাট এবং শ্রীরামপুর নামক তিনটি নূতন রেলওয়ে ষ্টেশন নির্ম্মাণ-কার্য্য ব্যতীত প্রথমোক্ত লাইনের নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে।

এই সকল কাজ ছয়টি ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশনের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের প্রধান কেন্দ্র কার্শিয়াঙে অবস্থিত। এই নূতন লাইনের কাজে ইঞ্জিনীয়ার, শ্রমিক এবং কর্ম্মচারী সমেত প্রায় ১,০০০ কর্ম্মী এখানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। গভীর অরণ্য পরিষ্কার করিয়া এই নূতন লাইনের কিছু অংশ বাহির করিতে হইয়াছে। তিস্তা, তোরসা, রাইদক এবং সানকোসা নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ-কার্য্য খুবই কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হইয়াছিল। বাহির হইতে নির্ম্মাণ-কার্য্যের জন্য যে সকল জিনিস আমদানী করা হইত, বস্তুতঃ উহাদের অভাবের জন্যই নির্ম্মাণ-কার্য্যে বিশেষ বিলম্ব হইতেছে। এই লাইন নির্ম্মাণ করিতে শুধু যে কেবল নূতন লাইনই বসাইতে হইয়াছে তাহা নহে, উপরন্তু কিছু অংশকে ন্যারো গেজ হইতে মিটার গেজে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে, দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই আসামের সঙ্গে ভারতের অবশিষ্টাংশের সংযোগকল্পে রেল লাইন নির্ম্মাণ-পরিকল্পনা স্থির হয়। এই ব্যবস্থায় পাকিস্থান রাষ্ট্রের হাতধরা হইয়া থাকিবার প্রয়োজনের শেষ হইল, এবং নিত্যনৈমিত্তিক ঝগড়ার অবসানের সম্ভাবনায় আমরা আশ্বস্ত হইলাম :—

বর্দ্ধমানের তাঁত-শিল্প

সম্প্রতি বর্দ্ধমান জেলার তাঁত-শিল্প সম্বন্ধে আমরা কিছু নূতন কথা শুনিয়াছি। তাহা "বর্দ্ধমানের কথা" হইতে তুলিয়া পাঠকবর্গের নিকট পরিবেশন করিলাম :—

> এখানকার (বর্দ্ধমানের) বেশীর ভাগ লোকই জানেন না যে, বর্দ্ধমানের তন্তুবায়েরা কত উচ্চ স্তরের ধুতি, শাড়ী তৈয়ারি করে থাকেন। ফরাসডাঙার ধুতির কথা অনেকেই শুনে থাকবেন। সেই ফরাসডাঙার ধুতি মেমারী থানার দেবীপুর ইউনিয়নের তন্তুবায়েরাই মাত্র বয়ন করেন এবং এই ধুতি দেবীপুর ছাড়া আর কোথায়ও প্রস্তুত হয় না। অন্যান্য জেলার মহাজন এসে এখানকার নিরক্ষর ও গরীব তন্তুবায়দের শোষণ করে ত নিয়ে যায়ই, উপরন্তু এঁদের নাম পর্য্যন্ত লোপ পাওয়ান হয়েছে। ধনেখালির নাম হ'ল আর এঁরা চিরান্ধকারেই রইলেন ; তার কারণ এই যে, এঁদের টাকা নেই, এবং ধনেখালির মহাজনের প্রদত্ত সামান্য মজুরী নিয়ে নিজেদের সর্ব্বনাশ করে থাকেন।

প্রবন্ধ-লেখক বড় দুঃখেই এই কথা লিখিয়াছেন। তিনি আমাদের আশার কথাও শুনাইয়াছেন। বর্দ্ধমানের তাঁতীরা সমবায় প্রথায় সংগঠিত হইতেছেন, মিহি সুতা পাইলে তাঁহারা প্রাচীন গৌরব ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন। তাঁহার মতে, "মাঝারি সুতায়" (২৮নং হইতে ৪০নং সুতায়) যাঁহারা কাজ করেন তাঁহাদের অবস্থা সঙ্কটপূর্ণ হইবে, যখন কাপড়ের উপর কন্ট্রোল প্রথা উঠিয়া যাইবে। মিহি সুতার ধুতি-শাড়ী ও মোটা সুতার গামছা ইত্যাদির বাজার অব্যাহত থাকিবে। বাঙালীর জীবনে যে ওলট-পালট আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময়ে বর্দ্ধমানের অভিজ্ঞতার সাহায্যে যুগোপযোগী ব্যবস্থা করাই বাঁচিবার একমাত্র উপায়।

ভারতরাষ্ট্রের আয়-ব্যয়

গত ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, ভারতরাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের হিসাবে ১৯৪৯-৫০ সনে প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। এখন শুনিতেছি, বৎসরের শেষে ৪৫ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে। কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ অভিযানেই নাকি ৩৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইংরেজ আমাদের গত বিশ্বযুদ্ধে জড়িত করিয়া প্রায় ৬৮০ কোটি টাকা ঋণের ভার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে ; তাহার সুদ বৎসরে প্রায় ২০ কোটি টাকা। এই অবস্থায় অধৈর্য্য হইবার কারণ আছে। কিন্তু এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় আমাদেরই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। "যুগবাণী" পত্রিকার ১৯শে কার্ত্তিকের সংখ্যায় বলা হইয়াছে :

> কিন্তু সব টাকা যদি সামরিক বিভাগ এবং সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাতেই শেষ হইয়া যায় তবে আর জাতীয় কল্যাণের জন্য টাকা থাকে না ; বাজেটে ঘাটতি হইলে ঋণ বাড়ে, ঋণ বাড়িলে সুদ বাড়ে, দীর্ঘকালের জন্য একটা অনাবশ্যক খরচের বোঝা করদাতাদের উপর চাপিয়া থাকে। যুদ্ধের সময় ইংরেজ নিজেদের প্রয়োজনে ভারত-সরকারের বাজেটের যে দুরবস্থা করিয়া গিয়াছে, এখনও তাহার প্রতিকার হয় নাই, বরং দুর্দ্দশা আরও বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে। সামরিক ব্যয় ১২ বৎসর আগে যাহা ছিল এখন তার চার গুণ এবং অসামরিক ব্যয় প্রায় পাঁচ গুণ। অসামরিক ব্যয় স্বাধীনতার দুই বৎসরে যাহা দাঁড়াইয়াছে যুদ্ধের সময়েও তাহা ছিল না। হইবেই বা না কেন? নয়াদিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে আগে চার হাজার টাকা বেতনের আটটি সেক্রেটারী ছিল, এখন হইয়াছে ২১টি। সেদিন পার্লামেন্টে ডাঃ মাথাই বলিয়াছেন, আমাদের বৈদেশিক দূতাবাস, "বিশেষজ্ঞদের" বিদেশ ভ্রমণ প্রভৃতিতে এবার প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে।

এরূপ অপব্যয়ের আরও অনেক উদাহরণ আছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হইলেও খরচ যথাযথ হওয়া প্রয়োজন। এই সব কথা বুঝিয়া আমাদের

ব্যয়-সংক্ষেপের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। শুনিতেছি সর্দার প্যাটেলের নির্দ্দেশে ৮০ কোটি টাকা ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহার ফলাফল কি হইবে জানি না। কর্ম্মচারীবৃন্দ সৎ ও কর্ম্মঠ হইলে নানাভাবে আয় বাড়িতে পারে। এক রেল-বিভাগের পরিচালন যদি সৎপথে চলে, তবে সরকারের আয় বাড়িবে, দ্রব্যাদির মূল্য কমিবে, লোকের ক্রয় ক্ষমতা বাড়িবে। মন্ত্রিবর্গের কর্ত্তব্য তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দকে সৎ পথে পরিচালিত করা। সেই চেষ্টার এখনও কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

ডাচ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ

প্রায় দেড়মাস টানা-হেঁচড়া করিয়া পূর্ব্ব-এশিয়ার কয়েকটি দেশের—জাভা, সুমাত্রা, মাদুরা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের—ডাচ সাম্রাজ্যবাদের পাশ ছিন্ন হইবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। মাঘ মাসের শেষ দিনের পূর্ব্বেই ইন্দোনেশিয়া তথাকথিত সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের মর্য্যাদালাভ করিবে।

আর একটি সাম্রাজ্যবাদ ইন্দোচীনে নিজের আসন অটুট রাখিবার জন্য শেষ যুদ্ধ করিয়া যাইতেছে। গণতন্ত্রের আদর্শ, রাষ্ট্র, সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার ধারক ফরাসী রাষ্ট্রের কথাই বলিতেছি। দুই-দুই বার জার্ম্মানীর কাছে হারিয়াও ফরাসী-গণতন্ত্র পরদেশ শাসন ও শোষণের প্রলোভন দমন করিতে পারিল না, পরাধীনতার অপমান নিজের জীবনে অনুভব করিয়াও অপর জাতিকে নিজের অধীনে রাখিবার এই যে প্রবৃত্তি এই কথা মনে করিয়া মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে নিরাশ হইতে হয়। ফরাসী দেশের জীবনে কি আরও অপমানের প্রয়োজন আছে?

কোন্ ভরসায় ফরাসীরা এই অপকর্ম্ম করিয়া যাইতেছে, তাহা সহজ-বুদ্ধির লোকে বুঝিতে পারে না। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দুইটা "বিশ্ব-যুদ্ধ" তাহাদের অগণিত লোকক্ষয় ও ধনক্ষয় করিয়াছে। আজ মার্কিনি আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের চলিতে হইতেছে। ইন্দো-চীনের গণ-নেতা ডাঃ হো চীন-মিন্‌হ ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে ফরাসী নিরপেক্ষ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করায় ঐ দেশের আড়াই কোটি লোকের শতকরা নব্বই জন তাঁহার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। তবুও দুই লক্ষ সৈন্যবাহিনী লইয়া ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ এই গণ-বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। এই যুদ্ধের ব্যয় কোথা হইতে আসিতেছে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের নেতৃবর্গ কেহই করিতেছেন না। এমন যে ভারতরাষ্ট্র যাহা ইন্দোনেশিয়াকে লইয়া, ডাঃ সুয়েকর্ণো, ডাঃ হাত্তাকে লইয়া এত হৈ চৈ করিল, তাহার মুখেও ইন্দো-চীনের, বা ডাঃ হো-র নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ্য উচ্চারিত হয় না।

ভারতরাষ্ট্রেও ফরাসী উপনিবেশ কয়েকটি আছে—চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, মাহে, কারিকল প্রভৃতি কয়েকটি শহর, বন্দর লইয়া ফরাসীর রাজত্ব। গণভোটের দ্বারা তাহাদের ভবিষ্যৎ স্থির হইবে। চন্দননগর নিজের পথ বাছিয়া লইয়াছে। অন্যান্যেরা আগামী পৌষ মাসের মধ্যে তাহা করিবে। ইত্যবসরে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ কি খেলা খেলিতেছে তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না; তবে গণভোটের দিন পিছাইয়া দিয়াছে। এই কয়েকটি স্থানকে নিজের সঙ্গে জড়াইয়া রাখিয়া কি লাভ হইবে তাহা তাহারাই জানে। যুগের ইঙ্গিত বুঝিয়া চলিতে পারিলে ভারতরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে তাহাদের ক্ষতি-সাধনের সম্ভাবনা নাই।

আর ফরাসী অধিকৃত এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোকের মনোভাব সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। ভারত-রাষ্ট্রও তাহার নীতি পরিষ্কার করিয়া ঘোষণা করিয়াছে। গত ১০ই কার্ত্তিক দিল্লী হইতে বলা হইয়াছে:—

> ভারতের ফরাসী উপনিবেশসমূহ যদি ভারত ইউনিয়নে যোগদানের সিদ্ধান্ত করে, তাহা হইলে এই সকল উপনিবেশের শাসনকার্য্য স্বায়ত্তশাসনশীল অংশ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।
>
> পরে আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইলে জনমত গ্রহণ করিয়া তাহা করা হইবে। এই উপনিবেশসমূহের জনসাধারণের ভাষা ও সংস্কৃতিগত স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা হইবে।
>
> শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য ভারত-সরকার যথোপযুক্ত অর্থসংস্থান করিবেন এবং বর্ত্তমান শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ পেন্সন প্রভৃতি বাবদ যে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, ভারত-সরকার তাহা পালন করিবেন।
>
> কেন্দ্রীয় আইনসভায় এই সকল উপনিবেশ হইতে প্রতিনিধি প্রেরণের বিধানও ভারতের আসন্ন শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদের তর্ক

বলশেভিক বিপ্লবের ৩২তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সহকারী প্রধানমন্ত্রী মঃ ম্যালেনকভ বলিয়াছেন:—

> সমগ্র বিশ্বকে দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধার পরিকল্পনাই আমেরিকা করিতেছে। হিট্‌লার ও গোয়েরিং এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদীর আক্রমণমূলক পরিকল্পনার সহিত এই নূতন যুদ্ধবাদীদের পরিকল্পনার পার্থক্য শুধু এই যে, ইহারা পূর্ব্ববর্ত্তী জার্ম্মান ফাসিষ্ট ও জাপানীদের সব দিক দিয়াই ছাড়াইয়া গিয়াছে। এশিয়াতে প্রভুত্ব বিস্তারের একটা প্রধান ঘাঁটি হিসাবে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নকে

পরিবেষ্টনের ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ শৃঙ্খলে পরিণত করার জন্য মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা চীনকে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিল।

একজন পাশ্চাত্য সাংবাদিক, "নর্থ চায়না ডেলী নিউজ" পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক মিঃ ও. এম. গ্রিন সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধে রাশিয়া সাম্রাজ্যের উত্তর এশিয়া বিজয়ের ইতিকথা বলিয়াছেন ; ১৬৮৯ সালে তাহা আরম্ভ হয়, ঋজু-কুটিল পথে ভ্রমণ করিয়া ১৯৪৯ সালে তাহা একটা পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইহার বর্ত্তমান রূপ লোকচক্ষে এইভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে :

> গত ৩০ বৎসরের মধ্যে দুইটি মহাযুদ্ধের ফলে সোভিয়েট রাশিয়া এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত কিরূপ বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে ভুক্তভোগী ভিন্ন সে সংবাদ হয়ত অনেকেই রাখেন না।
>
> ভারত সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্ত্তী ভ্লাডিভষ্টক বন্দর পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল পরিমিত স্থান বর্ত্তমানে রাশিয়ার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন। ৭০০ মাইল দীর্ঘ শাখালিন ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ যাহা জাপানের শীর্ষদেশ প্রায় স্পর্শ করিয়াছে, তাহা বর্ত্তমানে রুশ অধিকারভুক্ত। গত মহাযুদ্ধের ফলে মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির মধ্যে একমাত্র রাশিয়াই উক্ত দ্বীপগুলি অধিকার করিয়া আপন সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে।
>
> এশিয়া মহাদেশে রুশ রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, রাশিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ এক সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য করিয়া আসিতেছে। অবস্থার চাপে এই কার্য্য কখনও কখনও সাময়িকভাবে স্থগিত থাকিলেও সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয় নাই।

এই বিরাটত্বের সম্মুখীন হইয়া পৃথিবীর কোটি কোটি লোক ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়াছে। একদিকে মার্কিণী সংঘ, অন্য দিকে সোভিয়েট শক্তিপুঞ্জ—এই দুইয়ের আসন্ন সংঘর্ষের আশঙ্কা বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমস্যা। পরোক্ষভাবে প্রায় ১০০ কোটি নরনারী ইহার মধ্যে জড়িত। আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানগণ বলিতেছেন যে, আমরা তফাতে দাঁড়াইয়া থাকিতে চাই। বর্ত্তমান যুগে ইহা সম্ভব বলিয়া কেহই মনে করে না। ৩৪ কোটি নরনারী ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক ; প্রকৃতি আমাদের দেশকে দক্ষিণ এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে বসাইয়া দিয়াছে। সামগ্রিক যুদ্ধের শক্তি আমরা এখনও অর্জ্জন করিতে পারি নাই। ইতিহাস কিন্তু আমাদের জন্য বসিয়া থাকিবে না। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক আসন্ন সংঘর্ষ আমাদের কোন না কোন পক্ষে টানিয়া লইবে। ইহাই হইল আমাদের পররাষ্ট্র-নীতির গোড়ার কথা।

জ্যোতিশচন্দ্র দাশ

স্বদেশী যুগের আদর্শে অনুপ্রাণিত আর একজন বাঙালী প্রধান ৬৪ বৎসর বয়সে মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিলেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে দেশে শিল্প-বিজ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি সমিতি স্থাপিত হয় ; যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ (হাইকোর্টের বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষের পুত্র) এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। বিদেশে ভারতীয় যুবকদের শিল্প-বিজ্ঞানের কৌশল শিক্ষালাভ করিবার জন্য তাঁহাদের তথায় প্রেরণ করা সমিতির একটা কর্ত্তব্য ছিল। জ্যোতিশচন্দ্র সেই সুযোগ গ্রহণ করেন। জাপান তখন সবেমাত্র রাশিয়াকে পরাজিত করিয়া এশিয়া মহাদেশের নেতৃত্ব পদ লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছিল ; সুতরাং ভারতীয় যুবকের নিকট জাপানের শিক্ষাদীক্ষা আকর্ষণীয় ছিল। জ্যোতিশচন্দ্রও এই আকর্ষণে জাপান গমন করেন। জাপানে কাচ, পেন্সিল এবং অন্যান্য বিবিধ শিল্পে ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করিয়া তিনি আরও উচ্চ-শিক্ষালাভার্থ আমেরিকায় যান। এই সময় তিনি অনুভব করেন যে, সাফল্যের সহিত শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইলে অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করা প্রয়োজন। সুতরাং তিনি অর্থশাস্ত্র ও বাণিজ্য বিদ্যার ব্যাঙ্কিং, ইন্সিওরেন্স ও একাউন্টেন্সি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিবেন বলিয়া স্থির করেন। ১৯১০ সনে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্র্যাজুয়েট হন।

এই শিক্ষাই তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করে। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকরূপে তিনি সার্থকতা লাভ করেন। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি-প্রচেষ্টার উর্দ্ধেও তাঁহার একটা জীবন ছিল। গঠনমূলক জাতীয়তার সেবায় অকুণ্ঠ দান ও পরামর্শ তাঁহার জীবনের গৌরব। সেই গৌরব অম্লান রাখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

বিশপ ফস্ ওয়েস্টকট

চার্লস এণ্ড্রুজ ভারতবন্ধু ও দীনবন্ধু নামে পরিচিত। তাঁহার বন্ধু ও সতীর্থ ফস ওয়েষ্টকটও আমাদের দেশে শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে সরকারী ধর্ম্ম-বিভাগের প্রধান ছিলেন। কিন্তু এই সরকারী সম্পর্ক তাঁহার মানবতা ও মহত্ত্ব বিকৃত করিতে পারে নাই। আমাদের জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা ছিল অকৃত্রিম। হিন্দু মুসলমানের, ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে সেইজন্য তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা ছিল। এই মানব-হিতৈষী ও ভারত-হিতৈষী লোক-শ্রেষ্ঠের তিরোধানে আমরা আত্মীয় বিয়োগজনিত শোক অনুভব করিতেছি। ৮৩ বৎসর বয়সে তিনি মর-জগৎ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি এণ্ড্রুজের মত আমাদের দেশে জাগরূক থাকিবে।

প্রাচীন ভারতে বিদ্যাপ্রতিষ্ঠা

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যুগযুগান্তর ধরিয়া দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়া আসিয়াছে এবং তন্মধ্যে বিভিন্ন দেবতার প্রতিমা শাস্ত্রানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যসন্তানের প্রাচীন উপাসনা-পদ্ধতি অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে। যে শাস্ত্রানুসারে এই প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদিত হয় তাহার নাম "পঞ্চরাত্র" বা "সাত্বত" আগম। এই সুপ্রাচীন বৈষ্ণব আগমের উল্লেখ মহাভারতাদি গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই আগম-প্রতিপাদিত নারায়ণের বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহবাদ ভগবান্ বাদরায়ণ বেদান্তসূত্রে (২।২।৪৩-৫) খণ্ডন করিলেও রামানুজাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিচারপূর্ব্বক পঞ্চরাত্রমতের প্রামাণ্য স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন—শ্রীভাষ্যের "অব্যাহতং প্রামাণ্যং সাত্বতাগমানাং" প্রভৃতি উক্তি দ্রষ্টব্য। পঞ্চরাত্রমতের বহুতর গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু অতি অল্পই মুদ্রিত হইয়াছে। নব্যন্যায়ের ও নব্যস্মৃতির অতিমাত্রায় অভ্যুদয়কালে বাঙ্গলা দেশে "পঞ্চরাত্র" শব্দটি পর্য্যন্ত যে ভাবে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল তাহার একটি কৌতুকজনক গল্প আমরা পরিজ্ঞাত আছি। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রধান নৈয়ায়িকের নিকট তাঁহার এক ছাত্র শিবরাত্রি-ব্রতকথার —"পঞ্চরাত্রবিধানেন মূলমন্ত্রেণ চৈব হি"—পঙ্ক্তিটির অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। নৈয়ায়িক বলিলেন, পাঠে ভুল আছে—বিশুদ্ধ পাঠ হইবে "পঞ্চরত্নবিধানেন"! রঘুনন্দনের কৃত্যতত্ত্বের অনেক প্রতিলিপিতে শেষোক্ত ভ্রান্তপাঠ বস্তুতঃই দৃষ্ট হয়।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে মিথিলার দেবনাথ তর্কপঞ্চানন নানা শাস্ত্রে বহুতর গ্রন্থ রচনা করেন। তদ্রচিত "মন্ত্রকৌমুদী" নামক উৎকৃষ্ট তান্ত্রিক নিবন্ধ হইতে (রচনাকাল ৪০০ লক্ষ্মণাব্দ) আমরা পঞ্চরাত্র মতের পঁচিশটি মূল তন্ত্রের নামমালা উদ্ধৃত করিলাম :

> প্রোক্তানি পঞ্চরাত্রাণি সপ্তরাত্রাণি বৈ ময়া।
> বাস্তানি মুনিভির্লোকে পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া॥
> হয়শীর্ষং তন্ত্রমাদ্যং তন্ত্রং ত্রৈলোক্যমোহনং।
> ভৈরবং পৌষ্করং তন্ত্রং প্রাহ্লাদং গার্গ্য-গোতমম॥
> নারদীয়ঞ্চ মাণ্ডবাং শাণ্ডিল্যং বৈণুকন্তথা।
> সত্যোক্তং শৌনকং তন্ত্রং বাসিষ্ঠং জ্ঞানসাগরম্।
> স্বায়ম্ভুবং কাপিলঞ্চ তার্ক্ষ্যন্নারায়ণাত্মকম্॥
> আত্রেয়ন্নারসিংহাখ্যমানন্দাখ্যং তথারুণম্।
> বৌধায়নং তথাষ্টাঙ্গমিত্যুক্তস্তস্য বিস্তরঃ॥ (২ পত্র)

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে (১।২।২-৬) যে নামমালা আছে তাহাতে দুই স্থলে মাত্র পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শঙ্করাচার্য্য বেদান্তভাষ্যে (২।২।৪৫) শাণ্ডিল্যকে পঞ্চরাত্রমতের একজন আদি মুনি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—"চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োঽলব্ধ্বা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রমধিগতবান্।"

বাঙ্গলাদেশে যে সকল গ্রন্থানুসারে দেবতাদি প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে—রঘুনন্দনের মঠাদিপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব (প্রয়োগসহ), কৃষ্ণানন্দের বৈদিকসর্ব্বস্ব, বিষ্ণুদেবের বৈদিকার্ণব প্রভৃতি—সর্ব্বত্র "হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র" পরম প্রমাণগ্রন্থরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণুদেব হয়শীর্ষকে বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করেন :—(এই গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই)

> বাজিশীর্ষং নমস্কৃত্য তথা গুরুপদদ্বয়ং।
> দ্বিজশ্রীবিষ্ণুদেবেন তন্যতে বৈদিকার্ণবঃ॥

রঘুনন্দন তাঁহার গ্রন্থে একটি অতি মূল্যবান্ তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, বল্লালসেন হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের একটি সুপ্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং ঐ পুথিই রঘুনন্দনের হস্তগত হইয়াছিল :—"ইতি বল্লালসেনদেবাহৃতদ্বিখণ্ডাক্ষরলিপিত-হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রীয়-সঙ্কর্ষণকাণ্ডে সমুদায়পটলঃ" (প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব ৬।১ পত্র)। বুঝা যায় বিদ্যারসিক বল্লালসেন রাজগ্রন্থাগারে নানাবিধ গ্রন্থ আহরণ করিয়াছিলেন এবং হয়শীর্ষের পুথিটির অক্ষরলিপি বিচিত্র রকমের ছিল বলিয়া রঘুনন্দন বিশেষ করিয়া তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ "দ্বিখণ্ডাক্ষর" পুথি (যাহার অক্ষরগুলি মধ্যে বিচ্ছিন্ন এবং দুই খণ্ডে বিভক্ত) অতীব প্রাচীন এবং অত্যন্ত দুর্লভ।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হইল না, ইহা দুঃখের বিষয়। বহু বৎসর পূর্ব্বে 'দেবকীনন্দন' প্রেস হইতে ইহার স্বল্পাংশ মুদ্রিত হইয়াছিল এবং রাজসাহী মিউজিয়মের চেষ্টায় ইহার আদিকাণ্ডের ১৫ পটল পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইলেও তাহা অদ্যাপি অপ্রকাশিত রহিয়াছে। চতুষ্কাণ্ডাত্মক এই গ্রন্থের প্রতিলিপি দুর্লভ কিন্তু অপ্রাপ্য নহে। গ্রন্থমধ্যে যে সকল অতীব মূল্যবান্ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ সঙ্কর্ষণকাণ্ডের অন্তর্গত "বিদ্যাপ্রতিষ্ঠা" নামক পটলের বিবরণ বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল—প্রাচীন ভারতে গ্রন্থলিখন ও গ্রন্থরক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইত তাহার উজ্জ্বল চিত্র ইহাতে পাওয়া যায়। গ্রন্থাগারের ইতিহাসে এই পটলের মূল্য উপেক্ষণীয় নহে। প্রবন্ধের

প্রারম্ভে এই আগমগ্রন্থের আনুমানিক রচনাকাল নিরূপণ করার চেষ্টা করা হইল।

আদিকাণ্ডের দ্বিতীয় পটলে ২৫টি পঞ্চরাত্রতন্ত্রের নামোল্লেখের পর নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি দৃষ্ট হয় :

তন্ত্র' ভাগবতঞ্চৈব শিবোক্তং বিষ্ণুভাষিতং।
পদ্মোদ্ভবং পুরাণঞ্চ বারাহঞ্চ তথাপরম্ ।৮
ইমে ভাগবতানাম্ভ তথা সামান্যসংহিতা।
ব্যাসোক্তা সংহিতা চান্যা তথা পরমসংহিতা। ৯

এস্থলে পদ্মপুরাণ ও বরাহপুরাণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতেরও নামোল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এই গ্রন্থ পৌরাণিক যুগের অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। পঞ্চম পটলের প্রারম্ভে নিষেধবাক্যটি প্রণিধানযোগ্য :

ইদং ন হেতুবাদিভ্যো বক্তব্যং নাস্তিকাগ্রতঃ।
জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন এব চ।
কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ।
এতন্মতানুসারেণ বর্ত্তন্তে যে নরাধমাঃ।
তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তাস্তেভ্যস্তন্ত্রং ন দাপয়েৎ।

মীমাংসা, বৌদ্ধ, চার্ব্বাক, জৈন, সাংখ্য ও ন্যায়দর্শনের প্রতি গ্রন্থকারের এই বিজাতীয় আক্রোশ কুমারিলভট্ট প্রভৃতির যুগকে লক্ষ্য করিয়াই উদ্রিক্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। কুমারিলের তন্ত্রবার্ত্তিকে (পৃ. ১১৪) অন্যান্য মতের সহিত পাঞ্চরাত্র মতেরও অপ্রামাণ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং অনুমান করা যায় প্রায় ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ বর্ত্তমান আকারে প্রচারিত হইয়াছিল। তৃতীয় পটলে তন্ত্রবিদ্বেষক বর্জ্জনীয় ব্যক্তির বর্ণনায় কয়েকটি দেশের উল্লেখ আছে :

কচ্ছদেশসমুৎপন্নঃ কাবেরীকোঙ্কনোদ্ভবঃ।
কামরূপকলিঙ্গোত্থঃ কাঞ্চী-কাশ্মীর-কোশলঃ।
কুবৃত্তিশ্চ কুসঙ্গশ্চ মহারাষ্ট্র-সমুদ্ভবঃ।

অধিকাংশ দেশই দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত। উত্তরাপথে প্রান্তবর্ত্তী কামরূপ ও কাশ্মীর এবং মধ্যবর্ত্তী কোশলদেশ বাদ দিয়া অন্যত্র এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল—গৌড়মিথিলায় হওয়াও অসম্ভব নহে। লক্ষ্য করার বিষয়, কামরূপাদির বর্জ্জন দ্বারা শৈব ও শাক্তাগমের সহিত বৈষ্ণবতন্ত্রের বিরোধ এস্থলে স্পষ্ট সূচিত হইয়াছে।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র প্রধানতঃ 'প্রতিষ্ঠাতন্ত্র' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, একস্থলে (১।৩।১৪) 'প্রতিষ্ঠাতন্ত্ররীতিজ্ঞ' পদের প্রয়োগ হইতে ইহা সূচিত হয়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় কাণ্ডের নাম "সঙ্কর্ষণকাণ্ড", তাহার পটল সংখ্যা ৩৯। ৩১ পটলের নাম "বিদ্যাপ্রতিষ্ঠাপটলং"—অথবা 'বিদ্যাদানপটলং'। আমরা হস্তলিখিত মূলগ্রন্থ হইতে ইহার প্রয়োজনীয়াংশ উদ্ধৃত করিতেছি (১০৩-৬ পত্র)।

(১) শ্রীভগবানুবাচ :—

পুস্তকানাং প্রতিষ্ঠাঞ্চ লিখনং চ যথাবিধি।
সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যামি মহাপুণ্যফলপ্রদম্।
সুনক্ষত্রে সুযোগে চ সুপুণ্যে দিবসে নরঃ।
গৃহে বিবিক্তে হর্ম্ম্যে বা গোময়েনোপলেপিতে।
পুষ্পপ্রকরসংকীর্ণে চন্দ্রাতপবিভূষিতে।
স্বস্তিকং বিলিখেত্তত্র তণ্ডুলৈঃ পঞ্চরঙ্গিতৈঃ।
তত্র সংস্থাপয়েৎ ধীমান্ "শরযন্ত্রাসনং" শুভম্।
"দণ্ডাসনং" বা শ্রীমন্তং হেমরত্নাদিনির্ম্মিতম্।
শ্রীমৎ "সিংহাসনং" বাপি নাগদন্তাদিনির্ম্মিতম্।
তত্র সংস্থাপয়েৎ ধীমান্ পুস্তকদ্বিতয়ং গুরুঃ।
লেখ্যঞ্চ লিখিতঞ্চৈব দিব্যপট্টাংশুকাবৃতম্।

* * *

ততঃ পুণ্যাহঘোষেণ প্রারম্ভেল্লিখনং বুধঃ।
প্রাঙ্‌মুখঃ পদ্মিনীং ধ্যায়ন্ আলিখেৎ শ্লোকপঞ্চকম্।
রৌপ্যে পাত্রে মসীং স্থাপ্য লেখন্যা হৈময়া শুচিঃ।
কাশ্মীরৈর্ন্নাগরৈর্ব্বর্ণৈঃ সমশীর্ষৈঃ সুমাংসলৈঃ।
স্নিগ্ধৈরনাতিকৃশৈঃ স্থূলৈঃ হ্রস্বদীর্ঘাদিলক্ষিতৈঃ।
লেখয়েল্লেখকো ধীমান্ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
পঞ্চাবয়ববাক্‌সিদ্ধঃ ছন্দোলক্ষণবিত্তথা।
বাক্যালাপ-কলাভিজ্ঞো বিষ্ণুপূজনতৎপরঃ।
শ্লোকপঞ্চকমালিখ্য পূজয়েদ্বিষ্ণুকর্ম্মিণম্।

* * *

এবমারম্ভসময়ে কৃত্বা শাস্ত্রং লিখেত্ততঃ।
গুরুং বিদ্যাং হরিং নিত্যং পূজয়েৎ প্রণমেত্তথা।
এবং লিখেৎ প্রতিদিনং বিদ্যামাদ্যন্তয়োর্যজেৎ।
পুরাণানি লিখেদেবং ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
পঞ্চরাত্রান্ সুসিদ্ধান্তান্ ইতিহাসাদিকাংস্তথা। ***

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের সূচনা হয় মার্কণ্ডেয়-ভৃগুসম্বাদে এবং প্রশ্নকর্ত্তা মহেশ্বরের উত্তরে ব্রহ্মার উক্তিসকল "শ্রীভগবানুবাচ" বলিয়া ভৃগুমুনি প্রকাশ করেন। শুভদিনে নির্জ্জন গৃহে বা প্রাসাদে পাঁচরঙ্গের তণ্ডুল দ্বারা স্বস্তিক রচনা করিয়া প্রথমতঃ পুস্তকের আধার স্থাপন করিয়া তদুপরি দুইটি পুস্তক রাখিতে হইবে—লেখ্য অর্থাৎ অনুলিপি এবং লিখিত অর্থাৎ আদর্শ। তৎপর গুরুপূজা স্বস্তিবাচনাদি করিয়া 'পুণ্যাহ' উচ্চারণপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখী হইয়া পদ্মিনীর ধ্যানপূর্ব্বক আরম্ভে ৫টি শ্লোক লিখিতে হইবে। রৌপ্যপাত্রে মসী রাখিয়া সোনার কলমে "কাশ্মীর" অথবা "নাগর" অক্ষরে অতি সাবধানে লিখিতে হইবে। লেখক হইবেন সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ইত্যাদি। লেখা সারিয়া বৈষ্ণববন্দনা, গুরুপূজা ও সদক্ষিণা ব্রাহ্মণ-ভোজন কর্ত্তব্য। প্রতিদিন এইভাবে আদ্যন্তে পূজা করিয়া লেখা চলিবে। এ স্থলে কাশ্মীর ও নাগরলিপির উল্লেখ প্রণিধানযোগ্য। "হৈমলেখনী"র পরিবর্ত্তে এখন Fountain pen-এর ব্যবহার হয়ত শাস্ত্রবিগর্হিত বলা চলে না। এই ভাবে পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, পঞ্চরাত্র ও ইতিহাসাদি লেখা কর্ত্তব্য।

এ স্থলে ত্রিবিধ পুস্তকাধারের যে উল্লেখ আছে তাহা অত্যন্ত মূল্যবান্। নাগদন্ত অর্থাৎ হাতীর দাঁতের সিংহাসন বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু হেমরত্নাদি নির্ম্মিত "দণ্ডাসন"

কি বস্তু আমরা বুঝিতে অক্ষম—হঠযোগীদের ব্যবহৃত দণ্ড-জাতীয় বস্তু পুস্তকাধার ছিল কি না বিবেচ্য; অধুনাতন high desk তাহার স্থলাভিষিক্ত মনে করা যাইতে পারে। শরযন্ত্রের উল্লেখ অন্যত্রও দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহার প্রকৃত অর্থ কি জানা কঠিন। সুবন্ধুর "বাসবদত্তা"-গ্রন্থে সন্ধ্যাবর্ণনাস্থলে একটি উৎকৃষ্ট শ্লেষরচনা আছে। যথা, "সন্ধ্যারক্তাংশুকপটে প্রৌঢ়বিষমপ্ররূঢ়বিসলতা"শরযন্ত্রা"সুগতশতপত্রপুস্তকসনাথে-সদ্ধর্মমিব পঠতি বিকচকমলাকরভিক্ষৌ।" শিবরাম ত্রিপাঠীর দর্পণ টীকায় ব্যাখ্যা আছে—"শরযন্ত্রকং তালপত্রীয়-পুস্তকমধ্যসূত্ররজ্জুঃ" (সোসাইটীর সংস্করণ, পৃ. ২৫০)। এই ব্যাখ্যা সমীচীন নহে, বিষমপ্ররূঢ়বিসলতার সহিত শতপত্র অর্থাৎ শতদল পদ্মপুষ্পের আধারাধেয় সম্বন্ধ তদ্দ্বারা বুঝা যায় না। হয়শীর্ষগ্রন্থের শরযন্ত্রাসনপদ সুব্যক্তরূপে এই ব্যাখ্যার বিরোধী, রজ্জু কখনও আসন হইতে পারে না। বাণীবিলাস সংস্করণের ব্যাখ্যা উদ্ধারযোগ্য—"শরযন্ত্রং পুস্তকধারণায় পরস্পরান্তঃপ্রবেশিতং বর্ণবিচ্ছুরিতং ফলকদ্বয়ং, যস্য দ্রামিড-ভাষায়াং "শিকৃকুপ্যলকৈ" ইতি ব্যবহারঃ" (পৃ. ৩১৯)। কিন্তু সন্দেহ হয়, এই সুপ্রচলিত আধারে রাখিয়া গ্রন্থপাঠ সুকর হইলেও গ্রন্থলিখন সুকর কিনা। মৈথিল টীকাকার জগদ্ধর তত্ত্বদীপনী-টীকায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন "শরযন্ত্রঃ সরত ইতিখ্যাতঃ··· অন্যস্মিন্নপি ভিক্ষৌ শরযন্ত্রারোপিত-শতসংখ্যাকতালীপত্রপুস্তকসংগতে" (সোসাইটির পুথি ৫৬।২ পত্র)। এই সমীচীন ব্যাখ্যা প্রাদেশিক শব্দটির অর্থের উপর নির্ভর করে, কিন্তু আমরা তাহা বুঝিলাম না। বাঙ্গালী টীকাকার বৈষ্ণবনরসিংহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "শরযন্ত্রং পুস্তকস্থাপনার্থং কাষ্ঠবিশেষঃ তস্য শরযন্ত্রসাম্যাৎ" (কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথি ৩৪।২ পত্র)। ইহাও দুর্বোধ্য। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মিথিলার পূর্ণ অভ্যুদয়কালে শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থিগণ সর্ব্বশেষে "শরযন্ত্রপরীক্ষা" গ্রহণ করিয়া সর্ব্বোচ্চ পদবী লাভ করিতেন। দ্বারভাঙ্গার রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত একটি তত্ত্বচিন্তামণি পুথির পুষ্পিকা হইতে আমরা জানিতে পারি একজন বাঙ্গালী মহাপণ্ডিতও মিথিলায় গিয়া ঐরূপ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। পুথিটির লিপিকাল ৪০১ লক্ষ্মণাব্দ (খ্রীঃ ১৬শ শতকের দ্বিতীয় দশকে পড়ে)—"ভৌআলগ্রামে বিদ্যাবাগীশভট্টাচার্য্য-শ্রীযদুনন্দনমহানুভবেভ্যঃ 'শরযন্ত্রে' দত্তমিদং পুস্তকং লিখিত্বা শ্রীরত্নপাণিশর্ম্মণেতি।" এই লুপ্তস্মৃতি মহাপণ্ডিতের পরিচয়াদি গবেষণীয়।

২। বিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং কুর্ব্বীত বিধিনা যেন তচ্ছৃণু।
পূর্ব্ববন্মণ্ডপং কৃত্বা কুণ্ডবেদ্যাদিসংযুতং।
ঐশান্যাং ভদ্রপীঠে তু নির্ম্মলং দর্পণং হরেৎ।
তত্র তং পুস্তকং দৃষ্ট্বা সেচয়েৎ পূর্ব্ববদ্‌ঘটৈঃ।
নেত্রোন্মীলনকং ত্যক্ত্বা সর্ব্বং পূর্ব্ববদাচরেৎ।
* * *
দীনান্ধকৃপণাদীংস্তু নানাদ্রব্যেণ তোষয়েৎ।
গুরুং সংপূজ্য বিপ্রাংস্তু রথেন ভ্রাময়েৎ পুরম্।
অথবা হস্তিযানেন স্কন্ধযানেন বা পুনঃ।
বিতানবস্ত্রসংছন্নং পতাকাধ্বজশোভিতম্।
পুস্তকং বিধিবৎ পূজ্য ভ্রাময়ীত প্রদক্ষিণম্।
ধ্বজৈন নাবিধৈশ্চিত্রৈর্বিতানৈর্বিবিধৈরপি।
শঙ্খভেরীনিনাদৈশ্চ গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ।
চামরাসক্তহস্তাভি র্দিব্যস্ত্রীভিরনেকশঃ।

পুস্তকলেখা সমাপ্ত হইলে তাহার 'প্রতিষ্ঠা' আবশ্যক। উদ্ধৃত বিদ্যাপ্রতিষ্ঠাবিধির বচন হইতে বুঝা যায় দেবতা-প্রতিষ্ঠা হইতে তাহার বিশেষ পার্থক্য নাই—মণ্ডপ, কুণ্ড, বেদী, ভদ্রপীঠ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া রীতিমত পূজা, হোম, দক্ষিণাদি কর্ত্তব্য। তৎপর বিশেষ সমারোহের সহিত রথে, হস্তিযানে বা "স্কন্ধযানে" করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করান আবশ্যক, সঙ্গে চামরধারিণী পর্য্যন্ত থাকিবে।

৩। পশ্চাত্তু নৃপতির্গচ্ছেৎ স্বসৈন্যপরিবারিতঃ।
মহাশোভান্বিতং কৃত্বা নগরন্তু প্রদক্ষিণং।
পরিভ্রাম্য সমানীয় স্বগৃহং দেবতাগৃহং।
বিদ্যাগৃহং বা শ্রীমন্তং স্থাপ্য গন্ধাদিনা যজেৎ।
মণ্ডলত্রিতয়ং কৃত্বা মধ্যে সিংহাসনং ন্যসেৎ।
তত্র জ্ঞানন্তু সংস্থাপ্য দ্বিতীয়ে স্থাপয়েদ্‌গুরুং।
পুত্রত্রয়ঞ্চ সংপূজ্য পুজয়েৎ পুস্তকং ততঃ।
অবধার্য্য জগচ্ছান্তিং বাচয়েদ্বাচকঃ ততঃ।
নাতিদ্রুতং নাবিলম্বং নাত্যুচ্চং নাতিনীচকং।
* * *
এবং লিখেদ্বাচয়ীত পুস্তকং বিষ্ণুতৎপরঃ।
অন্যথা নিষ্ফলং জ্ঞেয়ং লিখিতে স্থাপিতে হ্যপি।

নগরপ্রদক্ষিণকালে রাজা সসৈন্যে আসিয়া প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া পুস্তক স্থাপন এবং পুস্তকপাঠের অনুষ্ঠান করিবেন। তৎকালে ত্রিবিধ প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থরক্ষার ব্যবস্থা ছিল বুঝা যায়—রাজগৃহে, মন্দিরে এবং "বিদ্যাগৃহে"। বাঙ্গলাদেশের তৎকালীন "চতুষ্পাঠী"-সমূহ বিদ্যাগৃহ হইতে অভিন্ন ছিল সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, এই ত্রিবিধ প্রতিষ্ঠানই রাজ-পরিচালিত ছিল।

পটলের অবশিষ্টাংশে বিদ্যাদানের মাহাত্ম্য সবিস্তার কীর্ত্তিত হইয়াছে। কারণ গ্রন্থলেখার উদ্দেশ্যই হইল:

এবং লিখেদাত্মনোর্থে দদ্যাদেবং জনার্দ্দনে।
বিষ্ণুরূপায় গুরবে দদ্যাদ্বা দ্বিজপুঙ্গবে।
ত্রীণ্যাহুরতিদানানি গাবঃ পৃথ্বী সরস্বতী।

লক্ষ্য করিতে হইবে এই আনুষ্ঠানিক বিদ্যাপ্রতিষ্ঠা প্রধানতঃ পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ বিষয়েই বিহিত হইয়াছে। বিদ্যাদানমাহাত্ম্যে পঞ্চরাত্র, পুরাণ, রামায়ণ ও ভারত, ধর্ম্মসংহিতা, বেদাঙ্গ এবং "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যা বিদ্যা সিদ্ধয়ে মতা"—এই সকলের উল্লেখ আছে। কিন্তু

আশ্চর্য্যের বিষয়, বেদ ও দর্শনশাস্ত্রের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। বুঝা যায় বৈদিক অনুষ্ঠানের অবনতির যুগেই হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র রচিত হইয়াছিল।

ধর্ম্মগ্রন্থপ্রচারের অঙ্গীভূত লিখন, প্রতিষ্ঠা, বাচন ও দান—এই চতুর্বিধ অনুষ্ঠানের উক্ত বিবরণ হইতে গ্রন্থ ও গ্রন্থরক্ষা বিষয়ে তৎকালীন সমাজের সুগভীর শ্রদ্ধা ও আত্যন্তিক নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থকে দেবতার ন্যায় পূজা করার প্রথা এতটা ব্যাপকভাবে অন্য কোন দেশে প্রচলিত ছিল কিনা জানি না। আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মানবপ্রগতির লক্ষ লক্ষ অশ্বশক্তিতে বলোন্মত্ত হইয়া আমরা মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে ঐ দেবতাকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টায় আছি। তদ্দ্বারা জগৎ কতটা শান্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা সকলেরই অনুভবগোচর। ক্ষণভঙ্গুর মুদ্রিত গ্রন্থের আপাতমনোরম প্রচারমহিমার কথা বাদ দিয়া আমরা হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থরাজির সাম্প্রতিক অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। মুসলমান ও ইংরেজযুগে রাজশক্তির বিপুল বিপর্য্যয় সাধিত হওয়ায় বিদ্যাপ্রতিষ্ঠার প্রথম কল্প 'রাজগৃহ' ভারতের সর্ব্বত্রই বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল—নতুবা বল্লালসেনের পুথি রঘুনন্দনের হস্তগত হইত না। 'দেবতাগৃহে'র গ্রন্থসমূহও বিলুপ্তপ্রায়। অন্ততঃ বাঙ্গলাদেশে মন্দিরে গ্রন্থরক্ষার প্রথাই খুব বিরল ছিল—বৌদ্ধবিহারে ধ্বংসলীলার স্মৃতি ইহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। দরিদ্রপ্রায় ব্রাহ্মণদের "বিদ্যাগৃহ"সমূহই এখন পর্য্যন্ত বহুস্থলে গ্রন্থদেবতাকে নিষ্ঠার সহিত অধিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে, তবে তাহাদেরও অদূর ভবিষ্যতে বিলোপসাধন ঘটিবে সন্দেহ নাই।

ইংরেজযুগের প্রারম্ভে দূরদর্শী কতিপয় ইংরেজ মনীষী বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করিয়া পাশ্চাত্ত্য দেশে পাঠাইয়া দেন—জোন্স, কোলব্রুক, চেম্বার্স প্রভৃতির সঞ্চিত পুথি এইভাবে লণ্ডন, বার্লিন প্রভৃতির পুথিশালা অলঙ্কৃত করিতেছে। ইংরেজ রাজপুরুষদের অনুকরণে ভারতীয় কতিপয় মহারাজা এইরূপ পুথিসঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন—তাঞ্জোর, মহীশূর, বরোদা, কাশ্মীর, আলোয়ার ও বিকানীর প্রভৃতি পুথিশালা তন্মধ্যে প্রধান। বাঙ্গলাদেশে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে একটি মূল্যবান্ পুথিসঞ্চয় ছিল, ইহার গঙ্গাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা হইলে স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চেষ্টায় কিয়দংশ নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগারে রক্ষিত হইয়াছে। কলিকাতার যে সকল সাধারণ প্রতিষ্ঠানে পুথি সঞ্চিত আছে তন্মধ্যে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সঞ্চয় প্রাচীনতম, এসিয়াটিক সোসাইটির পৃথক্ তিনটি সঞ্চয় একযোগে বিপুলতম, বঙ্গীয় ও সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদের সঞ্চয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনব সঞ্চয় নগণ্য নহে। বাঙ্গলার বাহিরে কাশী, পুণা ও মাদ্রাজের পুথিসঞ্চয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুর্ল্লভ সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধানে আমরা বহু বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলার সমস্ত প্রতিষ্ঠান, বহু প্রধান পণ্ডিতবংশের বিদ্যাগৃহ এবং বাঙ্গলার বাহিরে কতিপয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হইয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি তাহা মোটেই আমাদের জাতীয় জীবনের গৌরবজনক নহে। গ্রন্থরক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান উপায় বর্ত্তমানে দুইটি, সূচি ও বিবরণী প্রকাশ এবং গবেষকবৃন্দকে গ্রন্থপরীক্ষার সুযোগদান। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে Weber সাহেব বার্লিনের পুথি-বিবরণীর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। এই বিজ্ঞানসম্মত আদর্শ ইউরোপখণ্ডে অনুসৃত হইলেও ১০০ বৎসরেও ভারতে উচিতরূপে অনুসৃত হয় নাই বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। পুথির প্রতি শ্রদ্ধানিষ্ঠা অন্ততঃ বাঙ্গলাদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, দুই-একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের কথা ছাড়িয়া দিলে ইহা বেশ প্রতীত হয়। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে যে কয় খণ্ড সংস্কৃত পুথি-বিবরণী মুদ্রিত করিয়াছে তাহা প্রায়শঃ ভ্রমপ্রমাদবহুল, অনাবশ্যক বর্ণনাময় অথচ বহুস্থলে আবশ্যকতথ্যপূর্ণ নহে। তন্মধ্যে একটি পুথিও Weber, Aufrecht বা Eggeling-এর আদর্শে পরিশ্রমসাধ্য বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পরীক্ষিত ও বর্ণিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। উক্ত সোসাইটিতে পুথি ধার দেওয়া ও পুথির নকল দেওয়ার নিয়মাবলী অত্যন্ত কঠোর ও কলঙ্কজনক। বহু বৈদেশিক পণ্ডিত এবিষয়ে বিরক্ত হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি। পুণার প্রসিদ্ধ ভাণ্ডারকার গবেষণাগার হইতে ভারতের যে কোন দায়িত্বশীল গবেষক এককালে ৫ খানা পুথি অল্পব্যয়ে ধার লইতে পারেন। অর্থাৎ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির সমস্ত পুথি পুণায় স্থানান্তরিত হইলে (সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতি বাঙ্গলার শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ক্রমবর্দ্ধমান অনাদর দেখিয়া কেহ কেহ এইরূপ স্থানান্তর অনুমোদন করিতে পারেন) আমরা অল্পব্যয়ে ঘরে বসিয়া সেগুলি দেখিতে পারি। কলিকাতায় বহুব্যয় করিয়াও তাহা সম্ভব হইতেছে না। অথচ পুণা ও কলিকাতার সোসাইটি উভয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তিভোগী। এবিষয়ে অনুরূপ নিয়মাবলী ভারতের সকল প্রতিষ্ঠানে অনুসৃত হওয়া উচিত। পুথি ধার দেওয়ার ব্যবস্থাও পাশ্চাত্ত্য দেশে অত্যুৎকৃষ্ট। আমরা কলিকাতায় বসিয়া বিনা ব্যয়ে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের অতি দুষ্প্রাপ্য

পুথি আনাইয়া পরীক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। দ্বিতীয়তঃ, কলিকাতার বাহিরে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যাগৃহে পুথি সঞ্চিত আছে তাহা রক্ষা করিতে হইলে ক্রমশঃ সেগুলি কলিকাতার কোন দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক। নবদ্বীপের পাঠাগারে সম্বৎসর মধ্যে কয়টি পুথি কয়জন গবেষক পরীক্ষা করিয়াছে অনুসন্ধানযোগ্য। স্বাধীন ভারতে বিদ্যাপ্রতিষ্ঠার যুগ শ্রদ্ধাসহকারে পুনরুজ্জীবিত হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

মহাপ্রস্থান

শ্রীবিমলাচরণ দেব

সেণ্ট হেলেনায় পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ নেপোলিয়ন সম্বন্ধে বায়রণের কবিতা পড়িতেছিলাম। লিখিয়াছেন—"So abject, yet alive" এই অবস্থায় পড়িয়াছ, কিন্তু এখনও জীবনধারণ করিয়া আছ? ইহার পূর্বে মরিতে পার নাই?"

মনে পড়িল অনেক দিন আগেকার কথা। সবে "কলেজ আউট"। দেশে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে। এমন সময় কলিকাতায় নবাগত একজন মধ্যবয়সী আইরিশ ডাক্তারের সহিত ঘটনাচক্রে সাক্ষাৎ হয়। মনোভাবের ঐক্য থাকায় আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। আইরিশ বটে, যেমন অত্যুগ্র স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য প্রেম, সেইরূপ ইংরেজের উপর অতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ। মনে পড়িল His love was as deep as his hatred.—ভ্যাদ্‌ভেদে বিশ্বশান্তি বিশ্বপ্রেম নহে। আইরিশ জাতিসুলভ সূক্ষ্ম অনুভূতি- ও ভাবপ্রবণতা খুব। এখনও তাঁহার আবেগোজ্জ্বল মূর্তি চোখের সামনে ভাসিতেছে। কথায় কথায় আবেগের সহিত বলিলেন:

"The bitterest that you can hear is 'you have overstayed your leave.' Equally bitter to be told 'might have been.' I cannot think of a third thing as bitter to make a pair royal."

মোটামুটি বাংলায়—জীবনে তিক্ততম কথা, যদি কেহ তোমাকে বলে 'আর কেন আছ?' ঐরূপই তিক্ত 'হইতে পারিতে, হও নাই।' ইহাদের সমান আর একটি তিক্ত কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না, যাহাকে লইয়া তিক্তত্রয়ী গড়িতে পারি।

প্রথম কথাটিতে মনে পড়িল মহাভারতের মৌসলপর্ব। মুষলযুদ্ধ হইয়া বৃষ্ণিবংশ নির্মূলপ্রায়। "বালবৃদ্ধাবশেষিত"। কৃষ্ণ, বলরাম দেহত্যাগ করিয়াছেন। অর্জুন গিয়াছেন বৃষ্ণিবংশের অবশিষ্টকে উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য। কারণ পূর্বচুক্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরই সমুদ্র দ্বারকা গ্রাস করিবে। অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিতেছেন বৃষ্ণিবংশের অবশেষ লইয়া। পথিমধ্যে আভীররা আক্রমণ করিল। তাহাদের "অস্ত্র" যষ্টিমাত্র। অর্জুনের গাণ্ডীবকে তাহারা ভয় করিল না, অর্জুনও গাণ্ডীবের উল্লেখ করিয়া হুঙ্কার করিলেন। আভীররা কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া লুঠপাট করিতে লাগিল। অর্জুন এধারে গাণ্ডীবে জ্যা রোপণ করিতে অক্ষম হইলেন। বাণপ্রয়োগের মন্ত্রগুলি ভুল হইতে লাগিল। আভীররা নির্বিবাদে লুঠপাট করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। যে কোনও মানী লোক অর্জুনের মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিবেন।

অর্জুন বাড়ী ফিরিয়া বিমর্ষ বসিয়া আছেন। ব্যাসদেব আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "অর্জুন, তোমার এরূপ চেহারা কেন?" অর্জুন গভীর খেদের সহিত সব বলিলেন।

মহাভারত অপেক্ষা অর্বাচীন ভাগবতে এই খেদ একটু ফলাও ভাবে বলা আছে। মহাভারত প্রাচীন, তাহার সংযত ভাব নাই। ভাগবতে আছে— (১. ১৫. ২১)—

তদ্বৈ ধনুস্ত ইষবঃ স রথো হয়াস্তে
সোঽহং রথী নৃপতয়ো যত আনমন্তি।
সর্বং ক্ষণেন তদভূদসদীশরিক্তং
ভস্মন্ হুতং কুহকরাদ্ধমিবোপ্তমূষ্যাম্॥

সত্যই, সেই অগ্নিদত্ত গাণ্ডীব, সেই অক্ষয় তূণীর, সেই শ্বেতাশ্বযুক্ত রথ, আর সেই রথী আমি, যাহার কাছে রাজারা মাথা নোয়াইয়া আসিয়াছেন—এই সমস্তই না থাকার মত হইয়া গেল, যেমন প্রাণ চলিয়া গেলে শরীর, ভস্মে আহুতি, ভেল্কিবাজি, ঊষর ভূমিতে বীজ বপন।

সমস্ত শুনিয়া ব্যাসদেব বলিলেন—"আর নয়। তোমাদের সময় হইয়া গিয়াছে। চলিয়া যাও"। তাই পাণ্ডবেরা সমস্ত নির্মমভাবে ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থানে গেলেন।

এই "আমার আর থাকা উচিত নয়" অবস্থার উপলব্ধি আত্মসম্ভাবিত তীব্র মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যাইবার ঠিক সময় হইয়াছে, কে বলিয়া দিবে? এখন ত আর ব্যাসদেবের দর্শন পাওয়া যায় না।

এই উপলব্ধির কথা ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ক্লেমেসো বলিয়াছিলেন:

'A man should not continue to live once he has realised that he has exhausted his possibilities"

অপরার্কও গৃহস্থ সম্বন্ধে একটি গার্গ্যবচন উদ্ধার করিয়াছেন:

> মহাপ্রস্থানগমনং জ্বলনাম্বুপ্রবেশনম্।
> ভৃগুপ্রপতনং চৈব বৃথা নেচ্ছেৎ তু জীবিতুম্।

ঐ এক কথা—বৃথা বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে না।

মনুসংহিতা ৬, ৩২ মেধাতিথি ভাষ্যেও ঐ একই কথা—"স্বঃ কামী" অর্থাৎ নিজ ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ নিষেধসূচক বলিয়া সেই স্থানেই বলিতেছেন যে জরা, অনিষ্টদর্শনাদি দ্বারা বা অনিষ্ট আগতপ্রায় জানিয়া যদি কেহ স্ব-ইচ্ছায় দেহত্যাগ করে তাহাতে দোষ নাই।

এখন "ব্যাসদেব" কে হইবেন ঠিক সময় বলিয়া দিবার জন্য?

নিরুক্ত ১৩, ১২তে দেখি, দেবতারা ঋষিদের স্বর্গে লইয়া যাইতে লাগিলেন। মনুষ্যেরা দেবতাদের বলিলেন "ঋষিদের লইয়া যাইতেছেন, আমাদের কোনও সমস্যা হইলে সমাধান করিয়া দিবে কে? তাহাতে দেবতারা মনুষ্যকে তর্কশক্তি দিলেন ও বলিলেন যে এই তর্কশক্তি দ্বারা যাহা নির্দ্ধারণ করিবে তাহাই "আর্ষ" অর্থাৎ "ঋষি-নির্দ্ধারিত" হইবে। শাস্ত্র অনুভব ও শুদ্ধ তর্কশক্তি এই দুই আবশ্যক। এই দুইই নিজের হওয়া প্রয়োজন। বাহিরের কোনও লোক ইহার মধ্যে আনিলে সব গোলমাল হইয়া যাইবে। এই কথাই মনু ৪, ২৫৮ ও মহাভারত ১২, ১৯৩, ৩২ ও ১২, ২৪৫, ৪ এ আছে।

ইহারই অনুরূপ কথা পাইয়াছিলাম এফ. ডাবল্যু. রবার্টসন নামক একজন পাদ্রীর প্রার্থনায়:

"In the desert, in Pilate's judgment hall, in the garden, Christ was alone—alone must every son of man meet his trial hour. The individuality of the soul necessitates that Each man is a new soul in this world untried with a boundless possible before him. No one may predict what he may become, persecute his duties or mark out his obligations.

Each man's nature has its own peculiar rules, and he must take up his life-plan alone and persevere in it in a perfect privacy with which no stranger intermeddleth."

তোমার নিজের সম্বন্ধে তুমি নিজে ছাড়া আর কেহ ঠিক উপদেশ দিতে পারে না। অপর কেহ বিশেষ সঙ্কট-সময়ে যাহা উপদেশ দিবে তাহা অল্পবিস্তর ভুল হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং সেই উপদেশ অনুসরণ করিলে অকল্যাণ অনিবার্য।

এই জন্যই ভাগবত বলিয়াছেন:

> "আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।
> যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়সাবনুবিন্দতে।" (১১, ৭, ২০)

অর্থাৎ নিজের গুরু নিজে, বিশেষতঃ যে নিজেকে পুরুষ মনে করে তাহার। সে নিজ প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা নিজের শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হয়। এই-ই চিরকালের ব্যাসদেব—চিরজীবী।

সর্ব সময়ে, সংকট সময়ে, মহাপ্রস্থান সময়ে নিজ প্রত্যক্ষ ও নিজ অনুমান দ্বারা কার্য নির্ধারণ করিলে কল্যাণ হইবে।
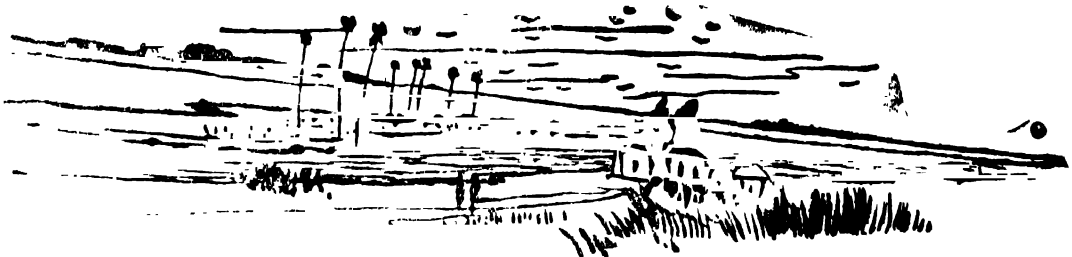
হেমাঙ্গিনীর স্যুটকেস্

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

খেয়াল অনেকের অনেক রকমের থাকে। হেমাঙ্গিনীর ছিল সংগ্রহ করবার খেয়াল।

জন্মের সহিত মানুষ তার প্রকৃতির বীজগুলিকে রক্ত-মাংসের মধ্যে বহন করে আনে। পরে, ঠিক উদ্ভিজ্জ বীজেরই প্রণালীতে শিক্ষা, শাসন, পরিবেশ প্রভৃতি জল-বায়ু-আলোকের প্রাচুর্য্য অথবা লঘুতার তারতম্য অনুসারে সেগুলি অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হতে থাকে। হেমাঙ্গিনীর জীবনে এই সংগ্রহ-প্রবৃত্তির প্রথম অঙ্কুরোদ্গম দেখা গিয়েছিল তার বাল্য-কালের খেলাঘরের সংসারেই। তার পুতুল-পুত্রকন্যাগুলি যখন প্রায় সদ্যোজাত শিশু, বিপণিসুতিকাগৃহের বদ্ধ কক্ষ থেকে তারা যখন সবেমাত্র নির্গত হয়ে হেমাঙ্গিনীর সংসারে প্রবেশ-লাভ করেছে, কেবলমাত্র একটি করে খাটো হাত-কাটা জামা পরিয়ে দিলেই যখন তাদের ভদ্রোচিত ভাবে আব্রু রক্ষা চলতে পারে—হেমাঙ্গিনীর সংগ্রহ-প্রচেষ্টার ফলে তখনই তাদের পরিণত বয়সের ব্যবহারের উপযোগী এত সাজসজ্জা জমে উঠেছিল, যা যে-কোনো পুতুল-যুবক ও পুতুল-যুবতীর বিবাহ-দিনের আড়ম্বরের পক্ষেও অগৌরবজনক নয়।

খেলাঘরের সংসার থেকে বাস্তব সংসারে প্রবেশ করার পরও হেমাঙ্গিনী এই সংগ্রহ করবার প্রবৃত্তিটিকে যথাপূর্ব্ব বহন করে চলেছিল। সংসারের মামুলি প্রয়োজনাদির মধ্যে যখন সে প্রবৃত্তি গা ঢাকা দিয়ে থাকত, তখন তার অস্তিত্ব তেমন বোঝা যেত না; কিন্তু মাঝে মাঝে এক-একটা অবান্তর অসাধারণ বিষয়কে আশ্রয় করে যখন তা প্রকট হ'ত, তখন তাকে খেয়াল ছাড়া আর কিছুই বলা চলত না। হেমাঙ্গিনীর ছাব্বিশ বৎসর বয়সের জীবনের একটি ঘটনা শুনলে একথা সুস্পষ্ট হবে।

তখন হেমাঙ্গিনীর স্বামী অবিনাশ আলিপুরে প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। আদালত থেকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে চা-পানাদির পর কোনো প্রয়োজনে দ্রব্যাদি রাখবার কক্ষে প্রবেশ করে হেমাঙ্গিনীর একটা স্যুটকেসের উপর মূল্যবান সিল্কের একটা ফ্রক দেখে অবিনাশ ঈষৎ বিস্মিত হ'ল। বাড়ীতে ত সবেমাত্র চারটি প্রাণী—বিধবা ভগ্নী বিরাজবালা, তার তিন বৎসর বয়সের পৌত্র রমেন, আর তারা দু'জনে স্বামী স্ত্রী। এ ফ্রক তবে কার জন্য? ফ্রকটি তুলে নিয়ে ছুটো হাতা ধরে ঝুলিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে নিরীক্ষণ করে অবিনাশ মনে মনে বললে, বড় জোর মাস ছয়েকের খুকীর মত। মাস ছয়েকের খুকী কে এমন তাদের আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে আছে, যাকে এই ফ্রকটি দেওয়া চলবে, তা কিন্তু সে ভেবে পেলে না।

তবে দিতে ইচ্ছা হয় বটে। ফ্রকটির এমনই অপরূপ কারুকার্য্য! ধবধবে সাদা বস্ত্রের সহিত নীলাভ রঙের ক্লাপড়ের নয়নানন্দকর সমাবেশ; তার উপর স্থানে বুকে বুকে ছোট ছোট চুমকির হাল্কা কাজের সুরুচিসম্মত সংযত জমক।

ঈষৎ ব্যস্ত ভাবে হেমাঙ্গিনী কক্ষে প্রবেশ করলে। তখনো ফ্রকটা অবিনাশের হাতে ঝুলছে। মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হতাশাব্যঞ্জক স্বরে সে বললে, "ঠিক যা ভেবেছি তাই! একটু অসাবধান হয়েছি, অমনি এ ঘরে তোমার কাজ পড়ল, আর ফ্রকটাও চোখে পড়ল!"

স্মিত মুখে অবিনাশ বললে, "এ ঘরে কাজ পড়াতে খুব বেশী অপরাধ হয় নি; কিন্তু ফ্রকটা চোখে না পড়লে সত্যিই অপরাধ হ'ত।"

মেঘ সরে গেলে শরৎকালের ছায়ামলিন শস্যক্ষেত্র যেমন নিমেষের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, অবিনাশের কথা শুনে হেমাঙ্গিনীর মুখমণ্ডলও তেমনি প্রফুল্ল হয়ে উঠল; হাসিমুখে বললে, "ভাল?"

"চমৎকার! কিন্তু কার জন্যে তা ত বুঝলাম না।"

"একটু ভেবে দেখ না।"

ক্ষণকাল চিন্তা করবার ভান করে অবিনাশ বললে—

"পুঁটির মেয়ের জন্যে?"

"বয়ে গেছে।"

পুনরায় একটু চিন্তা করে অবিনাশ বললে—"তবে বোধ হয় বিরাজের ছোট ননদের নাতনীর জন্যে।"

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে হেমাঙ্গিনী বললে, "খুব আন্দাজ তো তোমার! বছর তিনেকের মেয়ের জন্যে তিন মাসের মেয়ের ফ্রক! এই বুদ্ধি নিয়ে হাকিমী কর কেমন করে?"

স্মিত মুখে অবিনাশ বললে, "স্ত্রী-ভাগ্যে লোক ঠকিয়ে করি। কিন্তু হাকিম তো হার মানল, এখন কার জন্যে বল শুনি।"

"কার জন্যে?" হেমাঙ্গিনীর মুখমণ্ডলের হাসির মৃদু আমেজের মধ্যেই চোখ ছুটি ছলছলিয়ে এল; বললে—"তুমি ত দূরে দূরেই ঘুরলে, কাছে দেখলে না—কেমন করে বুঝবে কার জন্যে। কেন, আমাদের দু'জনের মধ্যে কারো আসবার সম্ভাবনা আর কি একেবারেই নেই? সুরেনবাবুর স্ত্রীরা তো বত্রিশ বৎসর বয়সে হয়েছিল।"

হেমাঙ্গিনীর কথা শুনতে শুনতে অবিনাশচন্দ্রের মুখখানা ম্লান হতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু সুরেনবাবুর স্ত্রীর কথার উল্লেখে পুনরায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললে—"সুরেনবাবুর স্ত্রীর কথাই বা কেন বলছ হেম? কুমোরদীঘির সৌরভী পিসিমার ত বিয়াল্লিশ বছরে হয়েছিল।"

"তবে?"

"তবে আর কি? তবে ত সবই ঠিক আছে।"

"কিন্তু তুমি হয়ত বলবে, এ আমার একটা রোগ।"

"কি রোগ?"

"এই এত আগে-ভাগে জিনিসপত্র সংগ্রহ করে রাখবার খেয়াল। কথায় বলে, গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। এ আবার কাঁঠালও নেই, শুধু গাছ। এটাকে রোগ বলবে না?"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে অবিনাশ বললে—"তা যদি বলি, তার উত্তরে তুমি চিরকাল যা বলে আসছ তাই হয় ত বলবে। তুমি বলবে, এ রোগ দূরদর্শীদের রোগ। সংগ্রহ তারাই করতে পারে যাদের দূরের অবস্থা দেখবার দৃষ্টি আছে। কিন্তু সে কথা যাক, এ ফ্রক কি তৈরি করালে?"

হেমাঙ্গিনীর মুখে মৃদু হাসি দেখা দিলে; বললে—"কেপেছ? যদিই বা দূরদৃষ্টি থাকে, অতটা তা বলে নেই। ওসমান পেটিওয়ালা এসেছিল; চোখে লাগল, রেখে দিলাম। ভেবেছিলাম, তুমি আসবার আগে তুলে ফেলব; কিন্তু প্রমীলা বেড়াতে আসায় কথায় কথায় একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।" এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে কি চিন্তা করে বললে—"দেখেই যখন ফেললে, সবটা দেখবে?"

উৎসুক হয়ে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করলে, "সবটা আবার কি?"

উত্তর না দিয়ে রিং থেকে একটা চাবি বেছে নিয়ে হেমাঙ্গিনী সুটকেসটা খুলল। বৃহৎ সুটকেস, বিস্মিত হয়ে অবিনাশ দেখলে, তার প্রায় সবটাই পূর্ণ হয়ে আছে শিশুদের ব্যবহারের উপযোগী জিনিসপত্রে। খুকীর জন্য ফ্রক, খোকার জন্য কোট; খুকীর জন্য ডলি-পুতুল, খোকার জন্য রেলগাড়ী; খুকীর রিবন, খোকার বেল্ট;—এ সকল স্বতন্ত্র প্রয়োজনের বিশেষ বিশেষ দ্রব্যাদি ত আছেই। তদুপরি জাঙ্গিয়া, বীভ, অয়েল ক্লথ, ফিডিং বটল্, বেবি-সুদার, ঝুমঝুমি, ঝিনুক প্রভৃতি সাধারণ সামগ্রীর ত অন্ত নেই।

দুঃখিত, সমবেদনাক্লিষ্ট অবিনাশের মনে হ'ল চামড়ার সুটকেসটা যেন হেমাঙ্গিনীর শুষ্ক আগ্রহাতুর হৃদয়, আর ভিতরকার বস্তুসমূহ যেন তার গোপন অন্তরের বাসনাকামনা।

"দেখলে?"

হেমাঙ্গিনীর প্রশ্নে অবিনাশ তাকিয়ে দেখলে, যে-মেঘ ক্ষণকাল পূর্বে হেমাঙ্গিনীর মুখমণ্ডলে ছায়া বিস্তার করেছিল, জল হয়ে তা চোখের কোণে চিক্ চিক্ করছে।

সংসারে যোগাযোগ বলে একটা ব্যাপার আছে, যা মাঝে মাঝে ঘটে থাকে, কিন্তু ঘটবার মূলীভূত কোনো কারণ সব সময়ে থাকে কি না তা একেবারেই বোঝা যায় না। হয় ত অকারণেই কারো কথা মনে মনে ভাবছি, হঠাৎ চেয়ে দেখি পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসছে।

কতকটা সেই ধরণের ব্যাপার হেমাঙ্গিনীর জীবনে ঘটল। এতদিন তার অন্তরের যে সুতীব্র অভিলাষ কোট ফ্রক এন্‌জিন রিবনের রূপ ধারণ করে চামড়ার সুটকেসের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে অজ্ঞাতবাস করছিল, তা উদ্ঘাটিত করে স্বামীকে দেখানোর সহিতই কোনো নিগূঢ় যোগ আছে কি না বলা কঠিন, কিন্তু দেখানোর অল্পদিনের মধ্যেই মনে হ'ল কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল ফলবার সম্ভাবনা সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে।

কলিকাতার একজন খ্যাতনামা প্রসূতি-চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হবার পর অবিনাশ উৎসাহ সহকারে মাস আষ্টেক পরের কথা ভাবতে আরম্ভ করলে: কে হবে ধাত্রী, কে থাকবে ডাক্তার, পরিচর্য্যার কাজ কে কে করবে, গৃহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর ঘর কোন্‌টা যেটা হবে সুতিকাগার, ইত্যাদি ইত্যাদি।

হেমাঙ্গিনী মুখ টিপে টিপে হাসে, আর বলে, "সে তো এখনো অনেক দিনের কথা। অত আগে থাকতে ভাবছ কেন? আমার দূরদৃষ্টির ভূত শেষ পর্য্যন্ত তোমার কাঁধে সওয়ার হ'ল না কি?"

ভ্রূ-কুঞ্চিত করে অবিনাশ উত্তর দেয়, "সত্যি। রোগটা দেখছি সংক্রামক।"

৩

মাস আষ্টেক পরে হেমাঙ্গিনী ও অবিনাশের জীবনের মধ্যে দেখা দিলে একটি শিশু। ঊষার প্রথম আভাসের মত স্নিগ্ধ লাবণ্যের প্রভায় শুধু বাপ-মার হৃদয়ই নয়, ঘর পর্য্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠল। হেমাঙ্গিনী সাধ করে কন্যার নাম রাখলে ঊষা। বাপমার হৃদয়-আকাশের ঊষা হয়ে ঊষা দিন দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল।

ঊষার জন্য কোনো দ্রব্যের প্রয়োজন দেখা গেলে অবিনাশ তৎপর হ'য়ে উঠে বলে, "যাই, বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসি।" হাসিমুখে হেমাঙ্গিনী বলে, যেয়ো! তার আগে সুটকেস্‌টা একবার খুলে দেখ না, যদি থাকে।"

বাজারে যে একেবারেই যেতে হয় না, তা নয়; কিন্তু প্রায়ই অবিনাশ সুটকেস্ থেকে অভীপ্সিত জিনিসটি বার করে এনে হেমাঙ্গিনীকে দেখিয়ে হাসি হাসি অপ্রতিভ মুখে বলে, "ঠিক বলেছ। আছে।"

"স্মিতমুখে হেমাঙ্গিনী বলে, "এখন বুঝছ?—সঞ্চয় করে রাখায় কত গুণ?

ফুল—শ্বেত পদ্ম, গন্ধরাজ, টগর, রজনীগন্ধা—এই সব।"

দরজা ঠেলে হেমাঙ্গিনী নিক্রান্ত হয়ে গেল।

অসুখ হয়ে পর্য্যন্ত রোগীর ঘরের দরজা-জানলা দিবারাত্রি খোলা থাকে। তরুণ ঊষার স্তিমিত আলোকে সমস্ত ঘর ভরে গেছে ; সেই আলোকের সহিত জড়িয়ে আছে এক মহা-বৈরাগ্যের ধূসরতা। এই অপরূপ পরিবেশের মধ্যে কক্ষের ভিতর তখন অভিনীত হতে আরম্ভ হয়েছে মহারজনীর তিমির সাগরে বিগতপ্রভা ঊষার নিমজ্জনের পালা।

হেমাঙ্গিনী যখন প্রবেশ করলে তখন ডাক্তাররা ষ্টেথোস্কোপ ইত্যাদি পকেটে পুরতে আরম্ভ করেছে ; একজন নার্স ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখছে ; আর কমলা পরলোকযাত্রিণীর নাসিকায় একটু দূরে অক্সিজেনের নলটা ধরে সক্ষিকণের অনুষ্ঠানটা যথাসম্ভব সহজ করবার চেষ্টা করছে।

হেমাঙ্গিনী দেখলে, অ্যান্টিফ্লজেষ্টিনের ব্যাণ্ডেজটা খোলা পড়ে রয়েছে মেঝের উপর। মহাপ্রস্থানের সুনিশ্চিত পথে যে পদার্পণ করেছে, তাকে আর বন্ধনের মধ্যে চেপে রেখে লাভ কি ? অতি সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষ নিঃশ্বাসগুলি যাতে অনন্ত আকাশে কতকটা সহজে মিশতে পারে, আপাতত ডাক্তাররা সেই দিকে লক্ষ্য রেখেছে।

শয্যার নিকট উপস্থিত হয়ে একজন ডাক্তারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে শান্ত কণ্ঠে হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করলে, "এখনো আছে ?"

ঈষৎ ঝুঁকে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন একটু লক্ষ্য করে ডাক্তার বললে—"আছে।"

নত হয়ে ঊষার নীলাভ ঠোঁটের উপর হেমাঙ্গিনী একবার চুম্বন করলে, তার পর শয্যার উপর উঠে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলে—"কোলে নিতে পারি ?"

"পারেন।"

ধীরে ধীরে ঊষাকে কোলে তুলে নিয়ে হেমাঙ্গিনী কন্যার অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করে স্তব্ধ হয়ে বসল।

মিনিট পাঁচেক পরে একজন ডাক্তারের সঙ্গে কমলার চোখোচোখি হ'ল। অক্সিজেনের নলটা সরিয়ে নিয়ে কমলা ষ্টপকক বন্ধ করে দিলে।

ডেথ্ সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিয়ে ব্যথিত সমবেদনাক্লিষ্ট ডাক্তার ও নার্সদের বিদায় দিয়ে অবিনাশ যখন ফিরে এল, তখনো হেমাঙ্গিনী নিস্পলকনেত্রে কন্যার মুখের দিকে চেয়ে পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। তার পার্শ্বে উপবেশন করে বিরাজবালা নিঃশব্দে অশ্রুপাত করছে।

অবিনাশের পদশব্দে চেয়ে দেখে মৃদু স্বরে হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করলে—"ফুল এসেছে ?"

কোঁচায় খুঁটে চোখ মুছে অবিনাশ বললে—"আনতে গেছে।"

এক মুহূর্ত্ত মনে মনে চিন্তা করে হেমাঙ্গিনী বললে—"তা হলে অন্য কাজগুলো ততক্ষণে সেরে ফেল।" আঁচল থেকে চাবির রিং খুলে অবিনাশের হাতে দিয়ে বললে—"সুটকেস্টা খালি করে কাউকে দিয়ে সব জিনিসগুলো এখানে আনাও।"

"কি হবে ?"

"খুকুর সঙ্গে যাবে।"

ঈষৎ কুণ্ঠিত কণ্ঠে অবিনাশ বললে—"কিন্তু সুটকেসে ত খুকুর আর বিশেষ কোনো জিনিস নেই মনে হচ্ছে ?"

বর্ষা দিনান্তের পাণ্ডুর আলোক-প্রভার মতো একটা অতি-ক্ষিপ্র হাসি মুহূর্ত্তের জন্য হেমাঙ্গিনীর মুখমণ্ডলে ঝিলিক মেরে গেল। উদাস নেত্রে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললে—"তবে কার জিনিস আছে ? খোকার ? ধক্কে কর ! আবার একদিন একটা ছেলে স্বপ্নের মধ্যে দেখা দিয়ে বলবে—'মা, তোমার সুটকেসের জিনিসপত্র শেষ হয়েছে, আমি চললাম !' —তার পথ একেবারে বন্ধ কর।"

মুখ নত করতে গিয়ে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অবাধ্য অশ্রু মৃত কন্যার মুখের উপর ঝরে পড়ল। আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে গিয়ে সহসা হেমাঙ্গিনী বিরত হ'ল। মনে মনে বললে—"তোর মার অন্তরের খানিকটা দুঃখের চিহ্ন সঙ্গে নিয়ে যা খুকু।"

সিন্ধুধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

পূর্বের প্রবন্ধত্রয়ে সিন্ধুধর্মের দুইটি অঙ্গের আলোচনা করা হইয়াছে। এই দুইটি অঙ্গ স্ত্রীদেবতার উপাসনা ও পুরুষ-দেবতার উপাসনা। এই আলোচনার প্রধান কথা সার জন মার্শালের যে দুইটি মতবাদ সাধারণে গৃহীত হইয়াছে তাহার সমালোচনা। প্রথম দুইটি প্রবন্ধে মার্শালের যুক্তি-প্রমাণ বিশ্লেষণ করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে. মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা ও বেলুচীস্থানের স্ত্রী-মূর্তিগুলি স্ত্রীদেবতার প্রতিমা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম-এশিয়া, বিশেষ করিয়া আনাতোলিয়ার প্রাচীন ধর্ম হইতে সিন্ধুধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে এই মতবাদের সমালোচনা করা হইয়াছে এবং এই মত অগ্রাহ্য করিবার কি যুক্তি আছে তাহা দেখান হইয়াছে।

প্রথম দুইটি প্রবন্ধের আলোচনার ফলে সিন্ধুধর্ম বাস্তবিক কি প্রকারের ছিল তাহা জানিতে পারা যায় নাই। এই আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল সার জন মার্শাল এবং তাঁহার মতবাদের সমর্থনকারী পণ্ডিতগণ সিন্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচার করিয়াছেন তাহার বাস্তবিক কোন ভিত্তি আছে কি না তাহা পরীক্ষা করা। কিন্তু এই আলোচনা মুখ্যতঃ নেতিবাচক হইলেও দুইটি সীলিং হইতে সিন্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে কিছু positive information বা প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায় দেখান হইয়াছে। এই দুইটির একটি প্রসিদ্ধ হরাপ্পার সীলিং যাহাতে দেখা যায় উদ্ভিদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্ত্রীরূপে কল্পিত হইয়াছেন। এই সীলিঙের একটি পৃষ্ঠের দৃশ্য হইতে এই দেবীর প্রীত্যর্থে মনুষ্য বলি দিবার প্রথা ছিল জানিতে পারা যায়। অন্তত নিদর্শন হইতে সিন্ধুধর্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে তাহাতে বলিতে হয় যে, এই দেবীর দেবত্বের পরিচয় দিবার ধরণ কতকটা 'আরকেইক।' দ্বিতীয় সীলিং হইতে দেখা যায় যে, বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্ত্রীরূপে কল্পিত হইয়াছেন। সিন্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনার প্রমাণ ইহার অধিক আর কিছু এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

তৃতীয় প্রবন্ধে, মোহেঞ্জোদারো সীলের ত্রিবক্ত্র পুরুষ মূর্তিটি শিবের প্রোটোটাইপ, সার জন মার্শালের এই মতের সমালোচনা করা হইয়াছে। মার্শালের মত অগ্রাহ্য করা হইয়াছে,' কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা হইতে সিন্ধুধর্ম সম্বন্ধে যে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। যোগসাধনা বা ধ্যানযোগ সিন্ধুধর্মে divine attribute বা দেবত্বের পরিচায়ক চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হইত। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। দেবত্বের এই চিহ্ন শুধু পুরুষ মূর্তিতেই দেখা যায়, কোন স্ত্রী মূর্তিকে যোগাসনে উপবিষ্ট দেখা যায় না। এইটি সিন্ধুধর্ম সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ positive information বা প্রধান তথ্য। মার্শালের ব্যাখ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে যোগাসনে উপবিষ্ট পুরুষ-দেবতার মূর্তিগুলির সহিত ধ্যানী বুদ্ধ (ও জৈন) মূর্তির সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, এই সাদৃশ্য এত ঘনিষ্ঠ যে ইহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। এই তাৎপর্য কি হওয়া সম্ভব তাহার আলোচনা করা হয় নাই।

সিন্ধুধর্ম সম্বন্ধে এই চতুর্থ প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সিন্ধুধর্ম সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাহা আলোচনা করা হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হইবে। দ্বিতীয় অংশে পরবর্তী ভারতীয় ধর্মসমূহের সহিত সিন্ধুধর্মের সম্পর্কের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইবে।

১

সার জন মার্শাল প্রমুখ পণ্ডিতগণ সিন্ধুধর্মে লিঙ্গোপাসনা, পশু উপাসনা, সর্প উপাসনা এবং বৃক্ষ উপাসনার কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যা এবং এই ব্যাখ্যার সমর্থনে যে সকল নিদর্শনের উল্লেখ করা হইয়াছে সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। এই সকল উপাসনা ব্যতীত সিন্ধুজাতি কতকগুলি প্রতীক (symbol) ব্যবহার করিত দেখা যায়। এই সকল প্রতীকের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইতেছে।

মধ্যস্থলে ছিদ্র আছে এইরূপ কতকগুলি শাঁখ, পোর্সিলেন ও পাথরের গোল চাকা এবং লম্বা ও মাথার দিকে সরু (conical shape) কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা ও বেলুচীস্থানের প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্তূপ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দুই শ্রেণীর নিদর্শন সিন্ধুধর্মে যোনি ও লিঙ্গ উপাসনা সম্বন্ধে সার জন মার্শালের মতবাদের ভিত্তি। যোনি উপাসনা সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদের আলোচনা ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর এই নিদর্শনগুলি সম্বন্ধে মার্শালের ব্যাখ্যা কি যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য মনে করা যায় না তাহা বলা হইয়াছে।

সিন্ধুধর্মে লিঙ্গ উপাসনা সম্বন্ধে মার্শাল যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে বলা যায় যে, ভারতীয় ধর্মে লিঙ্গ উপাসনার উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস মার্শালের ব্যাখ্যার সমর্থন করে

না। প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নিদর্শনগুলিকে লিঙ্গ বলা যায় কি না সে সম্বন্ধে মার্শালের নিজের মনেও সন্দেহ রহিয়াছে। তিনি বলিতেছেন—

"The only reason for interpreting the Mohenjo-daro examples as phallic ... is that their conical shape is now commonly associated with that of the Linga."

অর্থাৎ সাধারণতঃ লিঙ্গের আকার যেরূপ দেখা যায় প্রস্তর-খণ্ডগুলি সেইরূপ আকারের, এগুলিকে লিঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার ইহাই একমাত্র কারণ। মার্শাল উচ্চশ্রেণীর বিবেকবান পণ্ডিত—তাঁহার কথা আলাদা। কিন্তু দেখা যায় যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ, এমন কি ভারতবর্ষের সঙ্গে যাঁহাদের দীর্ঘ দিনের পরিচয় আছে তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে, ভারতবর্ষে আসিয়া হিন্দুরা লিঙ্গ উপাসনা করে জানিয়া প্রথম খ্রীষ্টধর্মের প্রচারক মনুষ্য জাতির এই কুরুচির পরিচয় পাইয়া লজ্জায় ও ঘৃণায় যে পরিমাণে অভিভূত হইয়াছিলেন তাহার প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। বর্তমানকালে এই লজ্জা ও ঘৃণার ভাব প্রকাশ করিবার রকমফের হইয়াছে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ হইতে প্রাপ্ত প্রত্যেকটি বিশেষ আকারের (conical shape) প্রস্তরখণ্ড লিঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। ব্রুসফুটের (R. Brucefoote) মত পণ্ডিত ব্যক্তি যাহাকে mortar বা মশলা পিষিবার নোড়া কল্পনা করিয়াছেন এই শ্রেণীর ধর্ম-ব্যাখ্যাতাগণ তাহাকে লিঙ্গ বলিয়া আখ্যাত করেন।

সে যাহা হউক, কয়েকটি নিদর্শনের সম্বন্ধে (M. I. C. P. XIV 24; Pl. XIII 3; Pl. XIV 2,4,5) মার্শাল বলিতেছেন যে, এগুলি লিঙ্গ সন্দেহ নাই এবং এগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে ভারতবর্ষে লিঙ্গোপাসনা প্রাক্-আর্যযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। মার্শাল এই প্রসঙ্গে স্যার অরেল ষ্টাইন কর্তৃক উত্তর-বেলুচীস্থানের দুইটি তাম্রযুগের স্তূপ হইতে প্রাপ্ত লিঙ্গ ও যোনি মূর্তির উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলিকে realistic specimen বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হরাপ্পায় আবিষ্কৃত একটি বৃহৎ, উপরের দিকে সরু প্রস্তরখণ্ডকে দয়ারাম সাহনী আধুনিক শিবলিঙ্গের সঙ্গে তুলনা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা "must have been used for worship"। ভাটসের বর্ণিত একটি পোড়ামাটির সীলের (oblong terra-cotta, Pl, XCIII, 303) উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। এই সীলের একটি পৃষ্ঠে একটি দোতলা বাড়ী দেখা যায়। তার পরের বর্ণনা এইরূপ,

"Below a bifurcated object which seems to be hanging down from a projection in front of the terrace is placed a *domical object* over the porch."

ভাটসের মতে বাড়ীটি মন্দির হইতে পারে। ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই domical object বা গোলাকৃতি বস্তুটি লিঙ্গ (*Development of Hindu Iconography* p. 187)। এই বস্তুটি লিঙ্গ হইলে এবং সিন্ধুধর্মে লিঙ্গ উপাসনার প্রচলন থাকিলে উহার এই প্রকার অবস্থান অদ্ভুত মনে হইবে।

"বস্তুতঃ পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, যাহাকে realism বলা হইয়াছে তাহা ছাড়া যে সকল নিদর্শনকে লিঙ্গ বলা হইয়াছে সেগুলিকে লিঙ্গ বলিবার আর কোন যুক্তি নাই।" এই সকল বস্তু যে পূজিত হইত তাহার কোন প্রকার প্রমাণই নাই। হিন্দুদিগের মধ্যে লিঙ্গ উপাসনার প্রচলন ব্যাখ্যাতাদিগকে প্রভাবিত করিয়াছে।

লিঙ্গ উপাসনার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে লেখকের *Linga Worship in the Mahabharata* (Indian Historical Quarterly, December, 1948) প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনার স্থান নাই, সংক্ষেপে দুই-একটি কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ মহাভারতে লিঙ্গ উপাসনার উৎপত্তির যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে, লিঙ্গ ভগচিহ্নিত। ইহাই lingam in arghya। যে শিবলিঙ্গের উপাসনা বর্তমানে প্রচলিত তাহা অর্ঘ্যে স্থাপিত লিঙ্গ। এরূপ অনুমান করা সহজেই চলে যে, লিঙ্গ ও অর্ঘ্য সংযুক্ত হইবার পূর্বে পৃথকভাবে পুরুষ ও স্ত্রী চিহ্নের উপাসনা প্রচলিত ছিল। সিন্ধুধর্মের ring stones ও phallic stones সম্বন্ধে মার্শালের ব্যাখ্যা এই অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ছাড়া পৃথক ভাবে স্ত্রী চিহ্নের উপাসনার প্রচলন নাই। শিবলিঙ্গ বা ভগচিহ্নিত লিঙ্গের উপাসনার পূর্বে পৃথকভাবে পুরুষ চিহ্ন বা লিঙ্গের উপাসনা প্রচলিত ছিল কি না অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, তিন শ্রেণীর লিঙ্গ মূর্তি পাওয়া যায়; যাহাকে realistic বলা হইয়াছে সেই শ্রেণীর লিঙ্গমূর্তি, মুখলিঙ্গ এবং অন্য এক শ্রেণীর লিঙ্গমূর্তি যাহার উপর লিপি খোদিত আছে। গুডিমল্লম লিঙ্গের কাল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ইহা মুখলিঙ্গ। ইহাতে অর্ঘ্যের বা পিণ্ডিকার অভাব হইলেও শিবের পঞ্চমুখ খোদিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর ভিটা লিঙ্গে লিপি ও পঞ্চমুখ খোদিত আছে। এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, এই লিঙ্গমূর্তি ও লিপি-খোদিত মূর্তিগুলি স্মারক চিহ্ন (memorial stones) বা দেবতার উদ্দেশ্যে দান করা হইত (native offerings)। মুখলিঙ্গ হইতে পরবর্তী কালের লিঙ্গোদ্ভব মূর্তির উৎপত্তি হইয়াছে।

কতকগুলি realistic লিঙ্গকে খাঁটি লিঙ্গ, অধম লিঙ্গ প্রভৃতি নামে শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। এইগুলিকে

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বলা চলে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর ও পরবর্তীকালের কতকগুলি মুদ্রায় লিঙ্গমূর্তি দেখা যায় বৃক্ষ, পর্বত প্রভৃতি শৈলচিহ্নের সহিত। কিন্তু শৈলচিহ্ন বর্জিত realistic লিঙ্গমূর্তিগুলির যেমন কাল নির্ণয় করা সম্ভব নয় সেইরূপ এগুলি বাস্তবিক পূজিত হইত কি না তাহা নিশ্চিতভাবে বলিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ শৈলচিহ্নবর্জিত লিঙ্গ বা লিঙ্গাকৃতি প্রস্তরখণ্ড যে পূজিত হইত বা উহার কোন ধর্মীয় তাৎপর্য ছিল তাহার কোন ট্র্যাডিশন বা অন্য কোন প্রমাণ দেখা যায় না।

এখানে বলা আবশ্যক যে, বর্তমানে কোন কোন শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে যে কোন আকারের প্রস্তরখণ্ডকে শিবলিঙ্গরূপে বা দেবীরূপে (সাধারণতঃ চণ্ডী আখ্যা দিয়া) পূজিত হইতে দেখা যায়। এই উপাসনা baetylic stone worship-এর দৃষ্টান্ত। মার্শালের মতে baetyls হইতে phalli-র উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু অনেক পণ্ডিত এই মত গ্রহণ করেন না। phalli বা লিঙ্গ উপাসনা তাঁহাদের মতে pillar cult হইতে আসিয়াছে।

ঋগ্বেদের শিশ্নদেব পদটির অর্থ করা হইয়াছে লিঙ্গ উপাসক। এই ব্যাখ্যা ইউরোপীয়, ভারতীয় নহে। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলেও সন্দেহ মিটে না। কারণ মহাভারত ও পুরাণে লিঙ্গের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে সেই বর্ণনা অথর্ব ও ঋগ্বেদের স্কম্ভের বর্ণনা হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়। বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড জ্যোতিঃপুঞ্জ, স্কম্ভের ন্যায় যিনি দ্যুলোক ও ভূলোক যোজনা করেন ইত্যাদি বলিয়া স্কম্ভের বর্ণনা করা হইয়াছে। পুরাণেও অগ্নিস্তম্ভরূপী লিঙ্গের বর্ণনা দেখা যায়। লিঙ্গের কল্পনার উৎপত্তি যদি এই জ্যোতিঃপুঞ্জরূপী স্তম্ভ হইতে হয় তাহা হইলে শিশ্নচিহ্নবর্জিত লিঙ্গাকৃতি প্রস্তরখণ্ডকে শুধু realism-এর যুক্তিতে উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। বৈদেশিক এবং তাঁহাদের অনুগামী এদেশী পণ্ডিতগণের প্রত্যেকটি বিশেষ আকারের প্রস্তরখণ্ডকে লিঙ্গ মূর্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রবৃত্তির মূলে কি ভাব থাকা সম্ভব তাহার উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। সিন্ধুধর্মে পুরুষ এবং স্ত্রী চিহ্নের উপাসনা প্রচলিত ছিল, লিঙ্গাকার প্রস্তরখণ্ড ও মধ্যে ছিদ্রযুক্ত গোল চাকার আবিষ্কারের ফলে ইহা প্রমাণিত হইতেছে, মার্শালের এই মতবাদ সিন্ধুধর্মে মহাদেবী বা Supreme Mother এবং শিবের প্রোটোটাইপের উপাসনার প্রচলনের সঙ্গে এমন সুন্দরভাবে মিলিয়া গিয়াছে যে সিন্ধুধর্মে পূর্ণবিকশিত শাক্ত ধর্মের প্রচলন ছিল এইরূপ মত ব্যক্ত করিবার লোভ সম্বরণ করা মার্শালের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তিনি বলিতেছেন—[*] পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কথা ভুলিয়া যাওয়া কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের পক্ষে সম্ভব নয়।

যাঁহারা সিন্ধুধর্মের উপর পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের প্রভাবের মতবাদের দ্বারা অভিভূত নহেন এবং ভারতবর্ষে লিঙ্গোপাসনার উৎপত্তির ইতিহাস ও ট্র্যাডিশনের সহিত যাঁহারা পরিচিত, কতকগুলি একদিকে গর্ত করা প্রস্তর ও পোড়ামাটির নিদর্শন আবিষ্কারের ফলে সিন্ধুধর্মে লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত ছিল এই মত গ্রহণ বিতর্কিত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ঋগ্বেদে শিশ্নদেবের উল্লেখ যাঁহারা আর্য্যদিগের শত্রু, প্রাক্‌ আর্য বা অনার্য আদিবাসীদিগের মধ্যে লিঙ্গোপাসনার প্রচলন ছিল এই মতের সমর্থন করে মনে করেন তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই যে, শিশ্নদেবের অর্থ লিঙ্গোপাসক হইলে আর্যগণও যে এই উপাসনা করিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ ঋগ্বেদ হইতে পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, লিপি ও বিভিন্ন পশুর মূর্তি খোদিত পোড়ামাটির লিঙ্গাকৃতি নিদর্শন (terra-cotta cones) হরপ্পা হইতে পাওয়া গিয়াছে। দয়ারাম সাহনী এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্যে এগুলি প্রদান করা হইত। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভিটা লিঙ্গের মত লিপি-খোদিত মুখলিঙ্গ ও মাত্র লিপি-খোদিত লিঙ্গ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত। লিঙ্গের এই ব্যবহার ও লিঙ্গোপাসনা একবস্তু নহে।

সিন্ধুধর্মের সহিত সর্পের সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া গেলেও সর্প উপাসনার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এই তথ্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বৈদিক, মহাকাব্যের যুগের ও পৌরাণিক ধর্মে এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে সর্পের উপাসনার প্রচলন দেখা যায়। দুটি সীলিঙে (M. I. C. III pl. CXVI. 29, Pl. CXVIII. 11) দেখা যায়, যোগাসনে উপবিষ্ট একবক্ত্র দেবমূর্তির সম্মুখে প্রার্থনার ভঙ্গীতে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট মনুষ্য মূর্তির পশ্চাতে সর্পের মূর্তি। মার্শাল বলিতেছেন সম্ভবতঃ মনুষ্যমূর্তিকে নাগ বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন নাগমূর্তিকে মনুষ্য মূর্তি হইতে পৃথক দেখান হইয়াছে, কেহ কেহ বলিতেছেন সম্ভবতঃ মনুষ্যমূর্তির পশ্চাদ্‌ভাগে নাগমূর্তি সংযুক্ত করা হইয়াছে। সে যাহাই হউক, নাগ এখানে উপাস্য নহে, উপাসক। দুইটি সীলিঙে যে ভাবে নাগকে দেখান হইয়াছে তাহা ভারহুতের নাগ রাজা এলাপত্রের দীক্ষার দৃশ্য বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়। নাগরাজা নাগ মূর্তি ত্যাগ করিয়া মনুষ্য মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। কাশ্যপের বোধি দ্রুমিন বৃক্ষকে নাগরাজা বন্দনা করিতেছেন, একপত্র নাগরাজা ভগবতো বন্দতে। একটি তামার সীলিঙের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে,

* "Moreover, although these are no visible traces of Saktism at Mohenjo-daro there are strong reasons for believing that it existed on Indian soil from a very early period, as it existed also in Western Asia and round the shores of the Mediterranean."

"Cobra with upraised hood sheltering beneath a kneeling suppliant. Between such designs a figure in Yogi attitude or the familiar Buddha attitude seated on a throne or dais."

এখানে kneeling suppliant সম্ভবতঃ সর্পেরই মনুষ্য মূর্তি।

বৌদ্ধ শিল্পে সর্প বা নাগ সাধারণতঃ মনুষ্য মূর্তিতে কল্পিত, মনুষ্য মূর্তির পশ্চাতে সর্পচক্র। নাগিনীর উপরার্দ্ধ নারী ও নিম্নার্দ্ধ সর্পমূর্তি। অবশ্য মনুষ্যমূর্তি ছাড়া সম্পূর্ণ সর্পমূর্তিও দেখা যায়। বৌদ্ধধর্মে নাগ উপাস্য নহে, অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলিয়া সম্মানের পাত্র। বৌদ্ধ পুরাণে নাগের সাধারণতঃ জলাশয় বা জলের সহিত সম্পর্ক দেখা যায়। নাগ, বুদ্ধ এবং বৃক্ষ, স্তূপ বা চৈত্য, ত্রিশূল, চক্র প্রভৃতি পবিত্র প্রতীকের উপাসনা করিতেছে দেখা যায়। সাঁচি, ভারহুত প্রভৃতি স্তূপে নাগের উপাসনার দৃশ্য দেখা যায় না, অমরাবতীর একটি দৃশ্যে দীর্ঘশ্মশ্রুধারী কয়েকজন ব্যক্তি একটি মন্দিরে সর্পের উপাসনা করিতেছে দেখা যায় (Fergusson, Pl. XXIV)। সর্পের চক্রের উপর বুদ্ধ যোগাসনে উপবিষ্ট, সর্প পদ্মের উপর রক্ষিত পবিত্র পদচিহ্ন চক্রের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছে দেখা যায়।

সিন্ধুধর্মীর শিল্পে মনুষ্যদেহধারী নাগ যোগাসনে উপবিষ্ট দেবতার উপাসনা বা স্তুতি করিবার দৃশ্য বৌদ্ধ ধর্মীয় শিল্পে মনুষ্যদেহধারী নাগের যোগাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধ মূর্তি উপাসনার দৃশ্য স্মরণ করাইয়া দেয়। সর্প উপাসনা নহে, সর্পকে উপাসকরূপে কল্পনা সিন্ধুধর্মের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য বৌদ্ধধর্মেও দেখা যায়। বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যধর্মে সর্প উপাস্য কখন স্বাধিকারে, কখন প্রধান দেবতাদিগের সঙ্গী হিসাবে।

সিন্ধুধর্মে পশু উপাসনা (animal worship) বিশেষ প্রচলিত ছিল এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে।

প্রথমে গো উপাসনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে আরম্ভে বলা আবশ্যক যে, মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা ও বেলুচীস্থানের নিদর্শনসমূহের মধ্যে গাভীর মূর্তি নাই, শুধু ষণ্ডের মূর্তি আছে। এই তথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। যাঁহারা সিন্ধুধর্মের উৎপত্তি পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বলেন তাঁহাদের একজনের বক্তব্য এইরূপ—

"The sanctity of the cow is foreign to the Rigveda and appears far more suggestive of the religions of Asia Minor, Egypt and Crete than of Indo-European invaders."

ঋগ্বেদে গাভীর পবিত্রতা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হইয়াছে ঋগ্বেদের মূল বা অনুবাদের এক পাতা যিনি উল্টাইয়াছেন তাঁহার পক্ষে সেরূপ মন্তব্য করা অসম্ভব। তারপর এশিয়া মাইনর, মিশর ও ক্রীটের ধর্মের সঙ্গে সিন্ধুধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল একথা বলা হইলেও দেখা যাইতেছে যে, কোন মূর্তি মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায় নাই (সার অরেল ষ্টাইন বেলুচীস্থানে একটি গাভীর মূর্তি পাইয়াছেন)। এই সম্পর্কে বলা প্রয়োজন যে, ষণ্ডমূর্তি মোহেঞ্জোদারো অপেক্ষা বেলুচীস্থানেই পাওয়া গিয়াছে বেশী সংখ্যায় মাত্র গুটি তিনেক স্তূপ হইতে। বেলুচীস্থানের শাহী টুম্প, কুল্লী ও মেহী অঞ্চলের স্তূপ হইতে দেড় শতাধিক ষণ্ডমূর্তি (humped bull) পাওয়া গিয়াছে। শাহী টুম্পের ৮৫ ও কুল্লীতে ৬৬টি মূর্তি একত্র পাওয়া গিয়াছে। এতগুলি মূর্তি একত্র পাইবার একটা অর্থ আছে। সার অরেল ষ্টাইনের মতে অর্থ এই যে, ষণ্ড "was an object of popular reverence, if not of actual worship." অন্যত্র তাঁহার বক্তব্য আরও বিশদ করিয়া বলিতেছেন যে, এই মূর্তিগুলি সম্ভবতঃ কোন সৃজনী শক্তির আধার (representing the creative power) রূপে কল্পিত দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হইত। তারপর তিনি বলিতেছেন যে, প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে ষণ্ড উপাসনার পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং শিবের বাহনরূপে ষণ্ড হিন্দুধর্মে যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ইহার মূলে রহিয়াছে সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচীস্থানের তাম্রযুগীয় অধিবাসীদিগের মধ্যে ষণ্ড উপাসনার জনপ্রিয়তা। একটি ষণ্ড মূর্তির গলায় রঙের দাগ আছে। মার্শালের মতে ইহা মাল্য এবং এই মাল্যধারী ষণ্ড নিশ্চয় কোন না কোনরূপ ধর্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত হইত।

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বেলুচীস্থানে প্রাপ্ত যে সকল ষণ্ড মূর্তির উপরে উল্লেখ করা হইল সেগুলি যে উপাস্য ছিল বা ধর্ম অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হইত এরূপ প্রমাণের অভাব আছে। যেহেতু শৈবধর্মে ষাঁড় শিবের বাহনরূপে পরিচিত এবং মিশর, পশ্চিম এশিয়া প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ধর্মে ষণ্ড উপাসনা প্রচলিত ছিল সেহেতু এই সকল ষণ্ডমূর্তির একটা ধর্মীয় তাৎপর্য দেওয়া হইয়াছে।

যে ত্রিবক্ত্র, যোগাসনে উপবিষ্ট মূর্তিটিকে শিবের প্রোটোটাইপ বলা হইয়াছে তাহার সিংহাসনের পাশে যে পশুমুখ দেখা যায় তাহার মধ্যে ষণ্ড নাই। ষণ্ডের অনুপস্থিতির কৈফিয়তে মার্শাল বলেন ষণ্ড উপাসনা একটি স্বতন্ত্র উপাসনা রূপে সিন্ধুধর্মে প্রচলিত ছিল।

কিন্তু এই সকল ব্যাখ্যার দ্বারা সিন্ধুধর্মে ষণ্ড উপাসনার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

ভাটসের বর্ণিত যে সীলটির উল্লেখ কয়েকবার করা হইয়াছে তাহাতে ত্রিশূলদণ্ডের নিকটে একটি ষণ্ডকে দণ্ডায়মান দেখা যায়। নিকটে একটি মনুষ্যমূর্তি দণ্ডায়মান। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করিয়াছেন যে, মূর্তিটির বামহস্তে একটি লম্বা দণ্ড ও দক্ষিণ হস্তে একটি জলপাত্র আছে। এইরূপ

ধরণের মূর্তি কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রায় (punch-marked coins) দেখা যায়। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সম্ভবতঃ ইহা শিবের প্রতিমূর্তি। সাঁচীর বৌদ্ধ শিল্পেও কতকটা এইরূপ মূর্তি দেখা যায়। সুতরাং ইহা শৈবমূর্তি না হইয়া বুদ্ধ মূর্তি হওয়া বা বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্বজ্ঞাপক মূর্তি হওয়া আশ্চর্য নহে। ত্রিশূল দণ্ড ও ষণ্ডের একত্র উপস্থিতি সহজে শৈবধর্মের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ত্রিশূলের যে সিন্ধুধর্মে কোন ধর্মীয় তাৎপর্য আছে তাহার প্রমাণাভাব, ত্রিশূল বা অন্য কোন প্রকার অস্ত্রধারী দেবমূর্তি সিন্ধুশিল্পে দেখা যায় না। বরং একটি সীলিতে ইহাকে সাধারণ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। আর মাত্র ত্রিশূলের সান্নিধ্য ষণ্ড উপাসনার প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সিন্ধুধর্মে ষণ্ডের কোন স্থান থাকিলে ষণ্ডকে ভক্তি নিবেদন করা হইতেছে বা ষণ্ড দেবতাকে ভক্তি জানাইতেছে সিন্ধুধর্মের নিদর্শনসমূহ হইতে এইরূপ প্রমাণ পাইবার আশা করা যাইত। এখানে একটি পতাকায় ষণ্ড মূর্তির উপস্থিতির উল্লেখ করা যাইতে পারে (Pl. CXVI-5,6)। একটি শোভাযাত্রায় এই পতাকা বহন করা হইতেছে। এই bull ensignএর কথা পরে বলা হইতেছে। এই নিদর্শনটি হইতে মনে হয় ষণ্ডকে sacred animal মনে করা হইত।

যুনিকর্ণ বা একশৃঙ্গ ষণ্ডকে মার্শাল সিন্ধুধর্মে বিশেষ স্থান দিয়াছেন। যুনিকর্ণ বাস্তবিক কল্পিত পশুর মূর্তি, ইহাকে এক-শৃঙ্গ ষণ্ড বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অনেকগুলি সীলে এই মূর্তি দেখা যায়। ইহার শৃঙ্গের পশ্চাদ্ভাগে আচ্ছাদন আছে, গলায় কয়েকটি দাগ এবং সম্মুখে মাটির উপর একটি দণ্ডের সঙ্গে আবদ্ধ দুইটি পাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মার্শালের মতে ইহা ধূপদানী। তিনি বলেন যুনিকর্ণ সীলগুলি কবচ হিসাবে ধারণ করা হইত এবং সম্ভবতঃ যুনিকর্ণের পূজা করা হইত (object of cult worpship)। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে সম্মুখের পাত্রটিকে ধূপদানী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া মার্শাল তাঁহার মতের সোপান প্রস্তুত করিয়াছেন। এই ধূপদানী না হইলে যুনিকর্ণ মূর্তির এই প্রকার ব্যাখ্যা দাঁড়াইতে পারে না। একটি সীলের (No. 387) দৃশ্য হইতে মার্শাল মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ অশ্বত্থ বৃক্ষের উপাসনার সহিত যুনিকর্ণের সম্পর্ক ছিল। বৃক্ষ উপাসনার আলোচনা কালে এ সম্বন্ধে বলা হইবে।

বৃক্ষ উপাসনার সহিত পশুর সম্পর্কের প্রসঙ্গ বৌদ্ধ শিল্পের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কারগুসনের গ্রন্থে (Pl. xcviii, Decorations on a Pilaster, Amaravati) অমরাবতীর স্তূপে একটি বৃক্ষের চিত্র আছে। ইহাতে একটি একশৃঙ্গ পশুর উপর আরূঢ় মনুষ্যমূর্তি দেখা যায়। এই একশৃঙ্গ পশুকে কেহ কেহ যুনিকর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

কতকগুলি সীলে বাইসন, মহিষ, হস্তী, ব্যাঘ্র মূর্তি দেখা যায়। এই মূর্তিগুলির সম্মুখে একটি পাত্র রক্ষিত। মার্শালের মতে এই সকল পশুর উপাসনা সিন্ধুধর্মে প্রচলিত ছিল। তিনি পাত্রের উপস্থিতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন—উপাস্য পশুকে খাদ্য নিবেদন করিবার ব্যবস্থা ছিল ("symbolises food offerings")। মার্শালের অনুসৃত এই প্রকারের ব্যাখ্যা প্রণালীর সাহায্যে সিন্ধুধর্মের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিবার কাজ নিঃসন্দেহে অতিশয় সহজ হইয়া যায়।

কতকগুলি সীলে দেখা যায় এক বা একাধিক পশুর দেহের উপর মনুষ্যের মস্তক অথবা দেহের অর্দ্ধেক পশুর ও অর্দ্ধেক মানুষের। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি সীলের উল্লেখ করা যায়। একটি সীলে (M. I. C. Pl xii, 18) বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উপাসনার দৃশ্য দেখা যায়। এই সীলে মনুষ্যের মুণ্ড-বিশিষ্ট একটি ছাগের মূর্তি আছে। মার্শালের মতে এটি একটি ছোটখাট দেবতা ("a protecting local divinity of minor type.")। তিনি ইহাকে মেসোপটেমিয়ার মনুষ্য-মুণ্ডবিশিষ্ট সিংহের মূর্তির সহিত তুলনা করিয়াছেন। একটি সীলে (Pl. xiii. 17) দেখা যায় অর্দ্ধেক মনুষ্য অর্দ্ধেক সিংহ একটি মূর্তি একটা শৃঙ্গধারী ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিতেছে। মার্শাল সুমেরীয় পুরাণের ইয়াবনীর সঙ্গে ইহার তুলনা করিয়াছেন, ইহা একটি দেবমূর্তি কিনা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। একশৃঙ্গধারী ব্যাঘ্র বা সিংহ প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পে দেখা যায়। একটি হরাপ্পা সীলের (Pl. xii. 12, উদ্ভিদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মূর্তি) এক পৃষ্ঠে দুইটি ব্যাঘ্রমূর্তি দেখা যায়। মার্শালের মতে ইহারা ধর্মানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিতেছে। ঈজিয়ান অঞ্চল ও উরে প্রাপ্ত নিদর্শনের সঙ্গে ইহার তুলনা করা হইয়াছে। কয়েকটি সীলে (Nos. 34, 494) তিনটি বিভিন্ন পশুর মস্তকবিশিষ্ট মূর্তি দেখা যায়। ত্রিমস্তু দেবতার সঙ্গে তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে ইহা triads of Zoomorphic deities, তিনটি পশুর মস্তক তিন জন দেবতার। কয়েকটি সীলে দুইটি, তিনটি বা চারটি পশুর বিভিন্ন অবয়বের সমাবেশে গঠিত মূর্তি দেখা যায়। ডাঃ ম্যাকে ও মার্শাল উভয়ের মতে এগুলির পূজা করা হইত।

উপরে কল্পিত বা প্রকৃত পশু মূর্তিসহ যে সকল সীলের উল্লেখ করা হইল সেগুলি মার্শাল ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ সিন্ধু-ধর্মের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক মনে করেন। মার্শালের ব্যাখ্যা হইতে দেখা যায় পশুর বাস্তব মূর্তি ও সম্পূর্ণ কল্পিত মূর্তি উভয়ই উপাস্য। তাঁহার ব্যাখ্যার সমর্থনে তিনি ভারতবর্ষে বিভিন্ন আদিবাসী ও অন্যান্য জাতির মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর পশুর পূজার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও সিন্ধুধর্মের ব্যাখ্যার সম্পর্কে এই সকল দৃষ্টান্ত অপ্রাসঙ্গিক। কতকগুলি সীলের

যুগের বেষ্টনী-মধ্যে অবস্থিত অশ্বত্থ বৃক্ষের সাদৃশ্য প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পে প্রচুর দেখা যায়। অশ্বত্থ বৃক্ষ গৌতম বুদ্ধের বোধি বৃক্ষ এবং প্রাচীন যুগের বৌদ্ধ শিল্পে তাঁহার প্রতীক হিসাবে ইহার পূজার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সীলটিতে বৃক্ষাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে স্ত্রী-মূর্তিতে দেখা যায়—সেই সীলে খাট ঘাঘরা ও লম্বা বিনুনীযুক্ত সাত জন উপাসকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ঠিক এইরূপ খাট ঘাঘরা পরিহিত মনুষ্য মূর্তি সাঁচীর শিল্পে দেখা যায়।

সিন্ধুধর্মের যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের আলোচনা উপরে করা হইল তাহা হইতে এই সকল বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব দেখা যাউক।

সিন্ধুধর্মে লিঙ্গোপাসনার প্রচলন ছিল যে প্রকার যুক্তির সাহায্যে ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার বাস্তবিক কোন মূল্য নাই। যুক্তি বা প্রমাণ অপেক্ষা অনুমান-মূলক ব্যাখ্যার সাহায্যে এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। নূতন আবিষ্কারের দ্বারা এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ না পাওয়া পর্য্যন্ত সিন্ধুধর্মে লিঙ্গোপাসনা ছিল কিনা তাহা সম্পূর্ণ সন্দেহের বিষয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু লিঙ্গ উপাসনা সন্দেহের বিষয় হইলেও রিংষ্টোন সম্বন্ধে মার্শালের ব্যাখ্যা ও লিঙ্গ উপাসনা ও রিংষ্টোন উপাসনা মিলাইয়া সিন্ধুধর্মে শাক্ত মতের প্রচলন সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছে তাহা অগ্রাহ্য করিতে হইবে। সর্প উপাসনা বলিতে যাহা বুঝায় সিন্ধুধর্মে তাহা ছিল না। সর্পকে যে ভাবে সিন্ধুধর্মে দেখান হইয়াছে তাহা বৌদ্ধধর্মের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই ভাব ব্রাহ্মণ ও গৃহ্য সূত্রের ভাব হইতে ভিন্ন। শতপথ ব্রাহ্মণে সর্পকে পৃথিবী হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে। কল্পিত ও বাস্তব যে সকল পশুকে সিন্ধুধর্মে অনুষ্ঠান ও পৌরাণিক দৃশ্যে দেখা যায় এবং উহাদিগকে যে স্থান দেওয়া হইয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে বৌদ্ধ শিল্পকে স্মরণ করাইয়া দেয়। হরিণ, ব্যাঘ্র, হস্তী, মহিষ, বাইসন প্রভৃতিকে সিন্ধুধর্মে যে বাস্তবিক পবিত্র বলিয়া মনে করা হইত তাহার প্রমাণাভাব। যে সকল ষণ্ড মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ষণ্ড উপাসনার প্রচলন ছিল মনে করা যায় না, কিন্তু ষণ্ড পূজিত না হইলেও যে ষণ্ডচিহ্নিত পতাকার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতে মনে করা যায় যে, ইহাকে পবিত্র বা sacred বলিয়া মনে করা হইত। পশু উপাসনা বাস্তবিক পক্ষে সিন্ধুধর্মের বৈশিষ্ট্য ছিল কিনা সন্দেহ, কতকগুলি বাস্তব ও কল্পিত পশুকে পবিত্র মনে করা হইত। অনুষ্ঠানের দৃশ্যে ইহাদের উপস্থিতির অন্য ব্যাখ্যা করা যায় না। পশু উপাসনা ও কোন কোন পশুকে পবিত্র মনে করা এক জিনিস নহে। সিন্ধুধর্মে বৃক্ষ উপাসনার প্রচলন ছিল। বৃক্ষ উপাসনার যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা বৌদ্ধধর্মের কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়।

এ পর্যন্ত দেখা গিয়াছে যে সিন্ধু শিল্পের নিদর্শনসমূহ হইতে সিন্ধুধর্মের যে সকল বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়া নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা বৃক্ষ উপাসনা, সিন্ধুধর্মে কল্পিত ও বাস্তব পশু, সর্প প্রভৃতির স্থান, সেই সকল বৈশিষ্ট্য বিশেষ করিয়া বৌদ্ধধর্ম ও প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পের অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সাদৃশ্য শুধু ভাব বা আইডিয়ার নহে, শিল্পে এই ভাব প্রকাশের ভঙ্গীর সহিতও সাদৃশ্য দেখা যায়। সিন্ধু উপত্যকার beast art-এর সঙ্গে মেসোপটেমিয়া, মিশর, ইরান অঞ্চলের beast art-এর যতটুকু সাদৃশ্য দেখা যায় তদপেক্ষা অনেক বেশী সাদৃশ্য লক্ষিত হয় খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতাব্দীর ও পরবর্তীকালের বৌদ্ধ শিল্পের সঙ্গে।

এখন সিন্ধুজাতির ব্যবহৃত এবং সাধারণে পরিচিত কতক-গুলি প্রতীকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল প্রতীক পদ্ম, স্বস্তিকা, চক্র (wheel and disc), স্তম্ভ (obelisk), ত্রিশূল।

মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পায় অনেকগুলি স্বস্তিকা সীল পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলি স্বস্তিকা সীলে দেখা যায় রেখা-গুলির শেষে শূলধারী মুণ্ড। বেলুচীস্থানের জেব উপত্যকায় কতকগুলি চিত্রিত পাত্রে দেখা যায় স্বস্তিকার নক্সা। চক্র (wheel) চিত্রিত পাত্রের উপর নক্সা হিসাবে এবং কয়েকটি সীলে দেখা যায়। মোহেঞ্জোদারো, বেলুচীস্থানের লরলাই জেলার সুর জাঙ্গাল স্তূপ প্রভৃতি হইতে কতকগুলি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে যাহাকে সোলার ডিস্ক (solar disc) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শঙ্খের এইরূপ নিদর্শন এবং অন্যপ্রকার নিদর্শন (সাত ও দশটি বাহুযুক্ত চক্র) পাওয়া গিয়াছে। দণ্ড বা স্তম্ভ (obelisk) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এইরূপ নিদর্শন (প্রস্তরের) হরাপ্পায় পাওয়া গিয়াছে। যে দুইটি সীলকে ত্রিশূল প্রতীক দেখা যায় তাহার উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হই-য়াছে। পাত্রের উপর নক্সা হিসাবেও ত্রিশূল চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। পদ্ম সাধারণতঃ পাত্রের উপর নক্সা হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। সিন্ধু দেশের মুকরে পদ্ম চিহ্নযুক্ত দুইটি প্ল্যাক পাওয়া গিয়াছে, ইহা পরবর্তীকালের বলিয়া মনে করা হয়।

বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ধর্মে এই সকল পরিচিত প্রতীকের উৎপত্তি ও ব্যবহার এবং তাহার ইতিহাস চিত্তাকর্ষক। কিন্তু এই ইতিহাস আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই। এই সকল প্রতীকের প্রসঙ্গে দুইটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, সিন্ধুধর্মে এই সকল প্রতীকের ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ও সন্তোষজনক আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই সকল প্রতীক ভারতবর্ষীয় ধর্মসমূহে অত্যন্ত পরিচিত হইলেও এইগুলির উৎপত্তি ও ব্যবহারের প্রসারের মূলে

ভারতবর্ষের কৃতিত্ব কতখানি তাহা সঠিক নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই, যদিও ভারতবর্ষে এইগুলি ব্যবহারের প্রণালীর মধ্যে তাহার নিজস্ব একটি ধারা আছে। এই সকল প্রতীকের অনেকগুলি প্রাচীন ধর্মসমূহের সাধারণ সম্পত্তি।

লক্ষ্য করিতে হইবে যে সিন্ধুযুগ হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত এই সকল প্রতীককে পবিত্র চিহ্ন বলিয়া গণ্য করা হইতেছে। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই সকল প্রতীক ভারতীয় অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধ ধর্মেই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দুইটি প্রতীক, ত্রিশূল ও চক্র, বৌদ্ধধর্মে উপাস্য। ইহার মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রায় স্থান পাইয়াছে। কয়েকটি বৈদিক ধর্মে স্থান পাইয়াছে। হিন্দুধর্মে সবগুলি পবিত্র প্রতীক।

এই সকল প্রতীকের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ বিশেষ নাই যদিও এইগুলি ব্যবহারের ধারায় পরিবর্তন হইয়াছে। এই কারণে সিন্ধুধর্মের পরিচয়জ্ঞাপক অন্যান্য নিদর্শন অপেক্ষা এই সকল প্রতীকের ব্যবহারে তাম্রযুগ হইতে বর্তমানকাল পর্য্যন্ত ভারতীয় ধর্মের ধারাবাহিকতার সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

২

সিন্ধুধর্ম সম্বন্ধে যে আলোচনা কয়েকটি প্রবন্ধে করা হইয়াছে তাহাতে সিন্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা এবং ত্রিবক্ত্র যোগাসনে উপবিষ্ট পুরুষ দেবতার উপাসনা সম্বন্ধে সার জন মার্শালের প্রচারিত ও পণ্ডিত সমাজে গৃহীত মতবাদের দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং প্রসঙ্গতঃ সিন্ধু-ধর্মের উৎপত্তি ও সিন্ধুধর্মের উপর পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে যে উদ্দেশ্যমূলক মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহার সমালোচনা করা হইয়াছে। অধিকন্তু সিন্ধুধর্মের অন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বা বিভিন্ন উপাসনার প্রচলন সম্বন্ধে যে সকল ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইয়াছে।

সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য লইয়া সিন্ধুধর্মের আলোচনা আরম্ভ করা হইয়াছিল, এই আলোচনা শেষ হইল। এই উদ্দেশ্য ছিল যাহা সিন্ধুধর্মের নিদর্শন বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা হইতে সিন্ধুধর্মের কতটা পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা। পরীক্ষার ফলে এই ধর্মের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অসম্পূর্ণ। নূতন আবিষ্কারের দ্বারা নূতন তথ্য পাওয়া গেলে এই অসম্পূর্ণতা দূর করা সম্ভব হইবে।

সিন্ধুধর্ম সম্বন্ধে কোন নূতন মতবাদ প্রচার করা এই আলোচনার সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যের অঙ্গ ছিল না। সিন্ধুজাতির মধ্যে জাতি সংমিশ্রণ সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হইলে এ সম্বন্ধে দুই-একটি ইঙ্গিত করিবার অবসর পাওয়া যাইবে।

আলোচনার আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। সিন্ধুধর্ম সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ বর্তমানে অসম্পূর্ণ হইলেও এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানের সাহায্যে সিন্ধুধর্মের যে চিত্র পাওয়া যায় সেই চিত্র বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিবার প্রেরণা আসিয়াছে ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজ ও তাঁহাদের অনুগামী এদেশীয় পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা হইতে। এই ভাষ্যকারগণ কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া সিন্ধুধর্মের উৎপত্তির মূলে বৈদেশিক ধর্মের প্রভাবের কথা প্রচার করিয়াছেন। পরবর্তী ভারতীয় ধর্মসমূহের সহিত সিন্ধুধর্মের যে সকল সাদৃশ্য দেখা যায় সেই সব সাদৃশ্যের প্রকৃত মূল্য বিচার করিতে তাঁহারা অক্ষম হইয়াছেন। হিন্দুধর্মের বহু বৈশিষ্ট্য সিন্ধুধর্ম হইতে আসিয়াছে এই সাধারণ বিষয়টি যে একটি মহামূল্য আবিষ্কার এই ভাবে উল্লেখিত হইয়াছে, যদিও এইরূপ সাদৃশ্য থাকা অতি সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার এবং এইরূপ সাদৃশ্য না থাকাই আশ্চর্য্যের কথা হইত। এই সাধারণ বিষয়টির উপর অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করিবার মূলে যে অভিপ্রায় রহিয়াছে তাহা আর কিছুই নহে, হিন্দুধর্মের অনেকখানি যে অনার্যদিগের ধর্ম হইতে গৃহীত তাহা প্রচার করা। এই ভাষ্যকারগণ সহজ ও সরল পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন যে মুহূর্তে তাঁহারা তাঁহাদের কাল্পত প্রাক্-বৈদিক ও হিন্দু বা উত্তর-বৈদিক যুগের মধ্যে সংযোগ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন মধ্যবর্তী বৈদিক যুগকে উল্লম্ফনের দ্বারা অতিক্রম করিয়া। সিন্ধু জাতি সম্বন্ধে আলোচনার কালে এই বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করা হইবে।

এই আলোচনা শেষ করিবার পূর্বে সিন্ধুধর্মের সহিত পরবর্তী ভারতীয় ধর্মসমূহের সাদৃশ্যের প্রকৃত মূল্য বিচার করিতে ব্যাখ্যাকারগণের অক্ষমতা সম্বন্ধে যে উক্তি করা হইয়াছে তাহার পুনরায় উল্লেখ করা হইতেছে।

প্রকৃত কথা এই যে, এই সকল সাদৃশ্য হইতে কিছুমাত্র প্রমাণ হয় না যে, সিন্ধুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাক্-আর্য বা বৈদিক যুগের। সিন্ধুধর্ম যে প্রাক্-আর্য যুগের তাহা যেসকল বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হাতে আছে সেই সকল প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই; সে সকল প্রমাণ ব্যবহার না করিয়া যে কারণেই হউক এই অনুমান মাত্র করা হইয়াছে যে, সিন্ধুধর্ম প্রাক্-আর্য যুগের। সিন্ধুধর্মের পরিচায়ক নিদর্শনসমূহ হইতে আর্য বা প্রাক্-আর্য প্রশ্ন উঠে না; এই সকল নিদর্শন হইতে এই প্রশ্ন উঠে যে, সিন্ধুধর্মের সহিত বৈদিক ধর্মের সাদৃশ্যের অভাব না থাকিলেও বৌদ্ধধর্ম (এবং জৈনধর্মের) সহিত এবং সিন্ধু-ধর্মীয় শিল্পের সহিত বৌদ্ধধর্মীয় শিল্পের যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায় তাহার কারণ কি ?

সিন্ধুধর্মের যে সকল বৈশিষ্ট্যকে প্রাক্-আর্য যুগের বলা হইয়াছে, যথা যোগসাধনা, বৃক্ষপূজা, সর্পপূজা, পশুপূজা, স্ত্রীদেবতার পূজা এবং অনেকগুলি প্রতীকের ব্যবহার, তাহা বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যধর্মেও দেখা যায়। বৈদিক আর্যগণ কি

তাঁহাদের ধর্মের এই সকল বৈশিষ্ট্য প্রাক্-আর্য যুগের সিন্ধুজাতির নিকট পাইয়াছিলেন? যদি তাহাই পাইয়া থাকেন তাহা হইলে সিন্ধুধর্ম কেন, বৈদিক আর্যদিগের ধর্মের বারো আনা প্রাক্-আর্য যুগের বলিতে হয়।

বৃক্ষপূজা, সর্পপূজা, পশুপূজা, প্রতীকপূজা ও যোগসাধনা বা ধ্যানযোগ বৌদ্ধধর্মে দেখা যায় এবং ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সিন্ধুশিল্পে এই সকল উপাসনার রীতি যে ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার সহিত বৌদ্ধ-শিল্পে এই সকল উপাসনার রীতি প্রকাশ করিবার ভঙ্গীর বিস্ময়কর মিল দেখা যায়। পরবর্তী যুগের বৌদ্ধধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা পরিবর্তিত রূপে স্থান পাইয়াছে; যোগ-সাধনার উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়, পরিবর্তিত ও বিস্তারিত রূপে ও দার্শনিক ব্যাখ্যাসহ ইহা উপনিষদে দেখা যায়, বৌদ্ধ-ধর্মে দিব্যজ্ঞানলাভের পন্থা হিসাবে ইহা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে; ব্রাহ্মণ্যধর্মে ইহার স্থান অতি উচ্চে। সিন্ধু-যুগের প্রতীকগুলির মধ্যে চক্র (wheel and disc) বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। চক্র, ত্রিশূল, স্তম্ভ প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মে পূজিত হইতে দেখা যায়; ব্রাহ্মণ্যধর্মে এই সকল প্রতীকের কতকগুলি বিভিন্ন দেবতার সহিত যুক্ত হইয়াছে, কতকগুলি মাঙ্গল্যচিহ্নরূপে গৃহীত হইয়াছে। একটি সিন্ধু-সীলে জলপাত্র ও দণ্ডসহ একটি দণ্ডায়মান মনুষ্যমূর্তি দেখা যায়; সাঁচীর বৌদ্ধ শিল্পে এইরূপ মনুষ্যমূর্তির সঙ্গে ছাগ রহিয়াছে। পতাকাসহ শোভাযাত্রা সাঁচী, অমরাবতী প্রভৃতির প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পে বহু আছে। এই সকল পতাকার মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্র ও নক্ষত্র চিহ্নিত (stars and crescent, Fergusson, Pl. XL), ত্রিশূল চিহ্নিত পতাকা প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। সিন্ধুযুগের একটি সীলে (three-sided faience prism pl. cxvi, M. I. C.), চারটি পতাকা বহন করিয়া একটি শোভাযাত্রা চলিয়াছে। রমাপ্রসাদ চন্দ এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

"The temptation to connect the Mauryan and Sunga tree and pillar cults (with animal standards) with the tree and pillar cults of the chalcolithic period in the Indus Valley is irresistible."

সিন্ধুধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের সাদৃশ্যের যে সকল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইল তাহা বিস্ময়কর মনে হয়। বৈদিক ধর্মের সহিত সিন্ধুধর্মের সাদৃশ্য সাহিত্যিক প্রমাণের সাহায্যে জানিতে পারা যায় কিন্তু বৌদ্ধধর্মের সহিত সাদৃশ্য প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের সাহায্যে জানা যায়। সিন্ধুধর্ম সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে তাহাও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে জানা সম্ভব হইয়াছে। যোগাসনে উপবিষ্ট দেবমূর্তি, দুইটি বৃক্ষের মধ্যে অবস্থিত স্ত্রী ও পুরুষ মূর্তি, বেষ্টনী মধ্যে অবস্থিত পবিত্র অশ্বত্থ বৃক্ষ, মনুষ্যমুণ্ডযুক্ত পশু, দুইটি বা ততোধিক পশুর অবয়বের সমবায়ে গঠিত কল্পিত পশু, এক শৃঙ্গধারী পশু, চক্র ও ত্রিশূল, পদ্ম, স্বস্তিক ও স্তম্ভ, খাটো ধাগরা ও লম্বা বিনুনীযুক্ত উপাসক, পতাকাসহ শোভাযাত্রা,—এতগুলি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আকস্মিক বা অকারণে হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং অনুমান করিতে হয় যে ভাবেই হউক বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে সিন্ধুধর্মের প্রভাব সাক্ষাৎভাবে পড়িয়াছে।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের উৎপত্তি পূর্ব-ভারতে; উভয় ধর্মই বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিরোধী, উভয় ধর্মেই ঔপনিষদিক চিন্তাধারার প্রভাব বিশেষভাবে পড়িয়াছে। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে পশ্চিম ভারতীয় প্রতিক্রিয়া রূপ পাইয়াছে সাত্বতদের ধর্মে বা ভক্তি ধর্মে।

যদি সিন্ধুধর্মের দ্বারা বৌদ্ধধর্মে (ও জৈনধর্মে) বিশেষ ভাবে রক্ষিত হইয়া থাকে তাহা হইলে কি এইরূপ অনুমান করিতে হইবে যে, যাঁহাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহারাই সিন্ধুজাতির সাক্ষাৎ প্রতিনিধি?

দাদূ-বাণী

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

("সো ধনি পিব জী সহজ সঁবারী"—বাণীর অনুবাদ)

সহজ শোভায় যে সাজায় নিজেরে
তাহারে বড় মানি।
জীবন যে হায় রাখা হ'ল দায়
দয়া লও মোরে চাহি।
যে বেশ আমার প্রিয় যাহে ভাল
সে বেশে সেজেছি আমি।

পথ চাহি মোর দিন যায় চলে
প্রিয়ের মিলনকামী।
এখন আমারে লহ তুমি লহ
নিজেরে করিনু দান—
এ বিপদে তব প্রার্থনা মোর
আকুল হয়েছে প্রাণ।

পাদ্রী লঙ ও আমাদের জাতীয়তা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

"নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারেখার,
অসময়ে হরিশ ম'লো লঙের হ'লো কারাগার।
প্রজার এবার প্রাণ বাঁচানো ভার॥"

বাংলার জাতীয় ইতিহাসে ১৮৬১ সনটি বিশেষ স্মরণীয়। অত্যাচারী নীলকরগণ ইহার পূর্ব্ব বৎসর সর্ব্বজনসমক্ষে অপদস্থ ও পর্য্যুদস্ত হইয়াও শেষ বারের মত নিরীহ বাঙালীর 'মকট মীর 'বীরত্ব' প্রদর্শন করিতে লাগিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক নীলচাষীর বন্ধু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগে নীলকরেরা আদালতে মামলা দায়ের করিল।

পাদ্রী জেম্‌স্ লঙ

হরিশ্চন্দ্র ইহার কোনরূপ নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বেই ১৮৬১ সনের ১৪ই জুন ইহধাম ত্যাগ ক'রলেন। নীলচাষীর আর একজন সুহৃদ পাদ্রী লঙ নীলকর সমাজের কোপে পড়িয়া এই বৎসর জুলাই মাসে কারারুদ্ধ হইলেন। প্রজার এই দুর্দ্দিনে তাহাদের দুঃখ ও বেদনার কথা লইয়া 'নীলদর্পণ' যে সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, উল্লিখিত পঙ্‌ক্তি কয়টি তাহার আরম্ভেই আছে। এই নীলদর্পণ আর কেহই নন, 'নীলদর্পণ' নাটক-প্রণেতা দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ' নাটক লিখিয়া তাঁহার নাম সার্থক করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে পাদ্রী লঙের ভারত-হিতৈষণামূলক কার্য্যকলাপ, কারাবরণ এবং তাহার ফলে আমাদের জাতীয়তা কতখানি অনুপ্রেরণা লাভ করে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পাদ্রী লঙের পুরা নাম জেম্‌স্ লঙ। তিনি ১৮১৪ সনে বিলাতে জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোরে কিছুকাল তিনি রাশিয়ায় কাটান। লঙ বহু ভাষাবিদ্ ছিলেন। তিনি নয়টি ভাষা জানিতেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে ১৮৪০ সনে বিলাতের চার্চ্চ মিশনরী সোসাইটির পাদ্রীরূপে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। এই সোসাইটি চার্চ্চ অব ইংলণ্ডের অধীন ছিল। কলিকাতায় আসিয়া তিনি সোসাইটির মির্জ্জাপুরস্থ স্কুলের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এখানে কিছুকাল থাকিবার পর কলিকাতার দক্ষিণে ঠাকুরপুকুর নামক গ্রামে স্থিত হন। এই গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার মিশনরী কার্য্য ও জনসেবা আরম্ভ হয়। তিনি এখান হইতে মফস্বলে বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করিতেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের উন্নতির বিষয় ভাবিতেন। যে সব জেলায় নীলচাষ হইত সে সব স্থলেও তাঁহার যাতায়াত ছিল। নীলচাষী প্রজাদের আর্থিক দাসত্ব হইতে মুক্তি দিতে না পারিলে নৈতিক, মানসিক কোন-প্রকার উন্নতিই যে সম্ভব নয় তাঁহার মনে ক্রমশঃ এই বিশ্বাস জন্মে।

কিন্তু তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল ভিন্ন রকমের। লঙ কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াই তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কেরী, ইয়েট্‌স্, পীয়ার্স প্রমুখ বিখ্যাত পাদ্রীদের ন্যায় ভাষা শিক্ষায় মন দিলেন। তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যেই বাংলা ভাষা এমন সুন্দররূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, ১৮৫০ সনে 'সত্যার্ণব' নামে একখানি বাংলা মাসিকপত্র সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি গবেষণা-কার্য্যেও রত হইয়াছিলেন। এদেশে চার্চ্চ অব ইংলণ্ডের অধীন বিভিন্ন পাদ্রী সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-প্রচার ও জনহিতকরমূলক কার্য্যকলাপ এবং গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয়াদি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ১৮৪৮ সনে *Hand-Book of Bengal Missions*, etc. নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। সে যুগের সামাজিক ইতিহাসের পক্ষে এখানি অমূল্য, যদিও ভুলভ্রান্তি ইহাতেও

কিছু কিছু বলিয়া গিয়াছে। গবেষণাশ্রিতরা তাঁহাকে ক্রমশঃ বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন অবস্থা নির্ণয়ে উদ্বুদ্ধ করে। এই কার্য্যে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রথমে কোনরূপ অর্থসাহায্য পান নাই, নিজ দায়িত্বেই ইহা করিতে সুরু করেন। পরে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের সুবিধা হইতেছে দেখিয়া তাঁহারাও তাঁহাকে নানারূপ উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

৩

লঙ বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভের পর ক্রিশ্চিয়ান স্কুল-বুক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হন। ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটির সদস্য পদও গ্রহণ করেন ১৮৫৩ সনে। এই সোসাইটি ১৮৫১ সনে কয়েক জন সদয় ইংরেজ ও বাঙালী কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। তখন ইহার নাম ছিল ভার্ণাকুলার ট্রান্স্লেশন কমিটি বা 'অনুবাদক সমাজ'। পরেও বাংলায় ইহা 'অনুবাদক সমাজ' নামেই পরিচিত হইতে থাকে। ভাল ভাল ইংরেজী বই হইতে সাধারণ পাঠোপযোগী পুস্তকসমূহ উপযুক্ত লেখকদের দিয়া বাংলায় ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশ করা ছিল এই সমাজের কার্য্য। সুপ্রসিদ্ধ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনুবাদক সমাজের আনুকূল্যে ইংরেজী পুস্তক অনুবাদের ভার লইয়াছিলেন; রাজেন্দ্রলালের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে মাসিক পত্রিকাও এই সমাজের আনুকূল্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। লঙ উপরোক্ত দুইটি সোসাইটি বা সমাজের সঙ্গে যুক্ত হইয়া বাংলা ভাষার সেবায় অধিকতর মনোযোগী হইলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—

"My peculiar position in Calcutta has brought me more in contact with the native press than other Missionaries, and this has led me as a member of the Christian School Book and Vernacular Literature Societies, to compile three volumes in Bengali of Selections which I made from the native press. I have also had to examine various Bengali manuscripts, and to edit works."*

অর্থাৎ, 'অন্যান্য পাদ্রীদের অপেক্ষা দেশীয় সংবাদপত্র-সমূহের সঙ্গে পরিচয় লাভের আমার অধিকতর সুযোগ ঘটে। ক্রিশ্চিয়ান স্কুল-বুক এবং ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটির সদস্যরূপে বাংলা সংবাদপত্র হইতে তিন খণ্ড সঙ্কলন-পুস্তক† বাহির করিতে সমর্থ হই। অন্যান্য বাংলা পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা এবং গ্রন্থাদি সংশোধন ও সম্পাদনও আমাকে করিয়া দিতে হইত।'

লঙ রিলিজীয়াস ট্র্যাক্ট সোসাইটি, ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট সোসাইটি প্রভৃতিরও সদস্য ছিলেন এবং খ্রীষ্টতত্ত্বমূলক বাংলা পুস্তক-পুস্তিকা রচনায় উঁহাদের সাহায্য করিতেন। ১৮৫২ সনে 'গ্রন্থাবলী' নামে লঙের একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চায় তৎপরতা দেখিয়া বাংলা গবর্ণমেণ্টও শীঘ্রই এতৎসংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ে লঙের সাহায্য গ্রহণে অগ্রসর হইলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডের নির্দ্দেশে লঙ-সংকলিত *Return of Authors and Translators of Vernacular Literature* নামীয় বাংলা ভাষায় গ্রন্থকার এবং অনুবাদকদের বিবরণ সম্বলিত একখানি পুস্তক আট শত খণ্ড মুদ্রিত হয়। লঙ ঐ বৎসরেই চৌদ্দ শত পুস্তক-পুস্তিকার যে একটি বিস্তৃত তালিকা-পুস্তক (*Classified Catalogue of 1,400 Bengali Books and Tracts*) প্রকাশ করেন। গবর্ণমেণ্ট তাহারও তিন শত খণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন। ইহাতে পুস্তক মুদ্রণের খরচা উঠিয়া যায়। লঙ ১৮৫৯ সনে দেশীয় সংবাদপত্রের যে 'রিটার্ণ' বা বিবরণী প্রস্তুত করেন তাহারও পাঁচ শত খণ্ড গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়াছিলেন।

রাজা রাধাকান্ত দেব

লঙ অন্য ভাবেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেন। ওয়ারেন স্মিথের সম্পাদনায় এবং কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ১৮৫৬ সনে 'এডুকেশন গেজেট' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। ইহার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অর্থসাহায্য সংগ্রহে লঙের সহায়তা উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৫-৫৬ সন

---

* *The Calcutta Christian Observer*, August 1851. লঙের ২০শে জুন (১৮৬১) তারিখের বিবৃতি হইতে উদ্ধৃত।

† 'সংবাদ-সার'

নাগাদ বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের অনুরোধে ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরির জন্য নতুন বাংলা মৌলিক গ্রন্থ ক্রয়ের নির্দেশ আসিলে তিনিই তাহা সংগ্রহ করিয়া দেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত সাহিত্যের 'বোডেন' অধ্যাপক উইলিয়ামসের অনুরোধে একবার সংস্কৃত মূল গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ পুস্তকগুলি ক্রয় করিয়া প্রেরণ করেন। দেশ-বিদেশের বহু বিদগ্ধ সমাজ, খ্রীষ্টান মণ্ডলী, দেশীয় রাজা, মহারাজা এবং সম্রান্ত ব্যক্তিও ভাল ভাল বাংলা বইয়ের জন্য লঙকে লিখিতেন এবং তিনিও যথাসময়ে এই সকল সরবরাহ করিতেন। ইহা ছাড়া সমসময়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরেজী সংবাদপত্রেও প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ছোটলাট সার জন পিটার গ্রাণ্টের আমলে গবর্ণমেণ্ট *Sketch of Vernacular Literature* নামে তাঁহার একখানি পুস্তকও প্রকাশ করেন।

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে স্থানীয় ও বিলাতের কর্তৃপক্ষ, বিদেশের শিক্ষিত সমাজ এবং এদেশের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের পরিচয় ঘটাইতে গিয়া একটি ব্যাপারে লঙ কিরূপে ভয়ানক বিপদে পড়িলেন, এই কথাই এখন বলিব। বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণকালে তিনি বাংলা দেশের দরিদ্র জনসাধারণের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকটিত বাঙালীর মনোভাবও তিনি সম্যক্ অবগত ছিলেন। নীল-চাষীদের দুর্দশার বিষয়ও তিনি জানিতেন বলিয়াছি। প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক ১২৬৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে (১৮৬০, সেপ্টেম্বর) ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। নদীয়া জেলার অন্তর্গত গুয়াতলীর মিত্র-পরিবার নীলকর-দের হাতে বিশেষভাবে নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এই পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া 'নীলদর্পণ' নাটক রচিত। 'নীলদর্পণ' প্রকাশের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই বাংলাদেশে নীলচাষীরা নীলকরদের বিরুদ্ধে জোট বাঁধে এবং নীলচাষ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে। তখন এই আন্দোলন এরূপ ব্যাপক ও বিসদৃশ আকার ধারণ করে যে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট একটি নীল কমিশন বসাইয়া এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাইতে বাধ্য হন। গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ডব্লিউ. এস্. সিটনকার কমিশনের প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি ছিলেন। নীলকরদের কীর্ত্তিকলাপ আহূত সাক্ষীদের, বিশেষতঃ নীলচাষীদের সাক্ষ্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে। লঙও এই কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। কমিশনের কার্য্য শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হইল।

লঙের হাতেও একখানা 'নীলদর্পণ' যথারীতি আসিল। এতদিন ইংরেজী পুস্তক-পুস্তিকা ও সারকলিপি মারফত এক পক্ষের কথাই লোকে বিশেষ করিয়া শুনিয়া আসিয়াছেন। নীলকর সমাজ তাহাদের সমালোচকদের বিরুদ্ধে কি প্রকার বিরূপ ভাব পোষণ করে তাহা তাহাদের দ্বারা প্রকাশিত ও প্রচারিত *Brahmins and Pariahs* পুস্তিকায়ই দেখা গিয়াছে। কিন্তু নীলকরদের প্রতি বঙ্গীয় সমাজের মনোভাব বাংলা সাহিত্যে এই 'নীলদর্পণ' নাটকের মধ্যেই সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত হইল। লঙ পুস্তকখানির বিষয়বস্তু স্বদেশবাসীদের জানিবার জন্য ইহার অনুবাদের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। সীটন-কারও প্রজাবন্ধু ছিলেন। নীলকরগণ তাঁহার বিরুদ্ধেও উক্ত পুস্তিকায় বিষোদ্গার করিয়াছিল। লঙের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করিয়া ইংরেজী নীলদর্পণের অনুবাদ করার অনুকূলে তিনি মত দিলেন। সীটন-কার বলিয়াছেন, তাঁহারই অনু-মোদনে এবং জ্ঞানগোচরে একজন দেশীয়[*] দ্বারা ইহার অনুবাদ করানো হয় এবং পাঁচ শত খণ্ড ছাপাইয়া বেঙ্গল আপিসে প্রেরিত হয়।

'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইলে নীলকর সমাজ এবং ইহার সমর্থক 'ইংলিশম্যান' ও 'বেঙ্গল হরকরা' ভীষণ ভাবে ক্ষেপিয়া উঠে। শেষোক্ত পত্রিকা দুইখানির বিরুদ্ধে বাংলা ভূমিকার ইংরেজী অনুবাদে ছিল যে, তাহারা হাজার টাকার বিনিময়ে নিরীহ প্রজাকুলকে অত্যাচারী নীল-করদের হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন। পুস্তকের মধ্যে নীলকরদের অত্যাচার-অনাচারের কথা ত ছিলই, কোন কোন নীলকরের মেম সাহেবের স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা ও তাহার ফলে নীল-প্রজাদের প্রতি অবিচারের কথাও উল্লিখিত হয়। নীলকর সমাজ এবং পত্রিকাদ্বয় প্রথমে এই অনুবাদ-পুস্তকের বিষয় কিছুই জানিতে পারে নাই। বিলাতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট নেতা ও পার্লামেণ্ট সদস্যের নিকট বাংলার গবর্ণমেণ্টের শিলমোহর যুক্ত হইয়া পুস্তকখানি প্রেরিত হইল। বাংলার বাহিরেও কোথাও কোথাও ইহা পাঠানো হয়। ১৮৬১ সনের মে মাসে লাহোর হইতে একখণ্ড ইংরেজী নীলদর্পণ কলিকাতার নীলকর সমাজের মুখপাত্র 'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স' এণ্ড কমার্সিয়াল এসোসিয়েশন অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া'র সেক্রেটারীর নিকট প্রেরিত হয়। মাত্র তখন তাহারা এবং তাহাদের পক্ষীয় সংবাদপত্রদ্বয় এ পুস্তকখানির কথা জানিতে পারে। এরূপ পক্ষপাতমূলক মানহানিকর পুস্তক বাংলা গবর্ণমেণ্টের শীল-মোহর যুক্ত হইয়া কেন প্রেরিত হইয়াছে তাহার কারণ অনু-সন্ধান করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট এসোসিয়েশনের তরফে পত্রও প্রেরিত হইল। সিটন-কার ইতিপূর্ব্বেই বাংলা গবর্ণ-মেণ্টের পক্ষে ভারতীয় আইন-সভার সদস্যপদে যুক্ত হওয়ায় ই. এইচ. লাসিংটন সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৬১, ৩রা জুন তারিখের পত্রে এই মর্ম্মে জবাব দিলেন, পুস্তক-খানি মানহানিকর বটে, তথাপি [illegible] কলিকাতা

[*] কবিবর মধুসূদন দত্ত 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ করিয়া দেন।

হইতে অনুপস্থিতকালে তাঁহার বিনা অনুমতিতে এইরূপ করা হইয়াছে। তিনি স্বীকার করেন যে, অনবধানতা বা ভ্রম বশতঃই গবর্ণমেণ্টের শীলমোহর ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এজন্য তাঁহারা দুঃখিত।

কিন্তু উক্ত এসোসিয়েশন তথা নীলকর সমাজ ছাড়িবার পাত্র নহে। তাহারা এবং 'ইংলিশম্যান' ও 'বেঙ্গল হরকরা' ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিল। পুস্তকের উপরে প্রকাশকের নাম 'ছল না। ক্যালকাটা প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং প্রেস হইতে মুদ্রাকর ক্লেমেণ্ট হেনরি ম্যানুয়েল কর্তৃক মুদ্রিত এইরূপ উল্লেখ ছিল। মূল অপরাধী প্রকাশকের নাম না পাওয়ায় একাকী ম্যানুয়েলের নামেই মানহানির মামলা রুজু হইল। লঙ আত্মগোপন না করিয়া ম্যানুয়েলের উকীলকে দিয়া আদালতকে জানাইলেন যে, ম্যানুয়েল মুদ্রাকর মাত্র, প্রকাশক হিসাবে তিনিই (লঙ) সব ঝুঁকি লইতেছেন। ম্যানুয়েলের মাত্র দশ টাকা জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

৫

অতঃপর লঙের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টের ফৌজদারী বিভাগে মানহানির মামলা আনিবার জন্য তোড়জোড় সুরু হয়। এসোসিয়েশনের পক্ষে ইহার সেক্রেটারী উইলিয়ম ফ্রেডারিক ফার্গুসন এবং সংবাদপত্রদ্বয়ের পক্ষে 'ইংলিশম্যান'-সম্পাদক ওয়াল্‌টার ব্রেট আদালতে মামলায় বাদীরূপে দাঁড়াইলেন। ইতিমধ্যে লঙ নিজ বক্তব্য সম্বলিত একটি দীর্ঘ বিবৃতি ১৮৬১, ২০শে জুন তারিখে সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য তিনি কি কি করিয়াছেন তাহা ইহাতে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। উপরে ইহা হইতে কিছু কিছু তথ্য উদ্ধৃত করিয়াছি। এই বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, জনসাধারণের অভিপ্রায় এবং মনোভাব বুঝিতে হইলে বাংলা পুস্তক-পুস্তিকা ও সংবাদপত্রের মর্ম্ম সরকারের গোচরীভূত হওয়া আবশ্যক। তিনি বেসরকারীভাবে এই কার্য্য দীর্ঘকাল করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পরামর্শে তৎকালীন ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে এই উদ্দেশ্যে একজন 'রিপোর্টার' নিযুক্ত করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু অর্থকৃচ্ছ্রতার ওজুহাতে ভারত-গবর্ণমেণ্ট ইহাতে তখন রাজী হন নাই।

লঙ এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিখ্যাত মুসলমান-নেতা স্যার সৈয়দ আহমেদ বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় আইন-সভায় দেশীয় সদস্য থাকিলে সিপাহী বিদ্রোহ আদৌ ঘটিত কিনা সন্দেহ। তিনি একথা দ্বারা ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, দেশীয় লোকেরাই দেশবাসীর মনোভাব জানিতেন। তাঁহারা কর্তৃপক্ষকে তাঁহাদের শাসন-পদ্ধতি এবং জনসাধারণের উপর

কালীপ্রসন্ন সিংহ

তাহার প্রতিক্রিয়ার কথা আগে হইতেই বুঝাইয়া বলিতে এবং ইহার ফলাফল সম্বন্ধে তাঁহাদের সতর্ক করিয়া দিতে সক্ষম। লঙ বলেন, কর্তৃপক্ষ দেশভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকায় দরুনও জনসাধারণের মনোভাব জানিয়া লওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তিনি যখন ১৮৫৩ সনে দিল্লীর অলি-গলিতে উর্দ্দু পুস্তকের অন্বেষণে ঘুরিতেছিলেন তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন মুসলমানদের মন গবর্ণমেণ্টের উপর কতখানি বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইবার পক্ষে সকলই প্রস্তুত ছিল, একটি মাত্র দেশলাইয়ের কাঠির অপেক্ষা। অথচ কর্তৃপক্ষ এদেশবাসীর মনোভাব জানিবার জন্য তাহাদের রচিত পুস্তক কি পত্রিকা কিছুই পড়া আবশ্যক বোধ করিতেন না। লঙ বলেন, বাংলাদেশও অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন। কর্তৃপক্ষীয়েরা প্রায় সকলেই বাংলা ভাষার পুস্তক বা সংবাদপত্রের ধার ধারেন না। অথচ বাঙালী জনসাধারণের মনের গতি-প্রকৃতি জানিবার ও বুঝিবার পক্ষে ইহা পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। বাংলার নীল-অঞ্চলগুলিতে যে যে-কোন দিন ভীষণ অনর্থ ঘটিতে পারে তাহা কয়জন অবগত আছেন? এই সকল কারণে লঙ বলেন,—

"I solemnly declare that I know nothing more important for the future security of Europeans in India and the welfare of the country, than that *all* classes of Europeans should watch the barometer of the Native mind. I feel strongly that peace founded

on the contentment of the native population is essential to the welfare of India, and that it is folly to shut our eyes to the warnings the Native press may give."

লঙ এখানে দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের ভাবী নিরাপত্তা এবং ভারতবাসীদের কল্যাণ—দুইয়ের পক্ষেই আর কোন বিষয় এতখানি প্রয়োজনীয় নহে, যতখানি প্রয়োজনীয় সকল শ্রেণীর ইউরোপীয়ের এদেশবাসীর মনের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক্ ওয়াকিবহাল থাকা। জনসাধারণের সন্তুষ্টিবিধান না করিতে পারিলে তাহাদের উন্নতির চেষ্টাই বৃথা। দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রে এবং পুস্তক-পুস্তিকায় কি লেখা হয় তৎসম্বন্ধে থাকার মত নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই হইতে পারে না।

লঙের বিবৃতি যাহাদের উদ্দেশে প্রদত্ত, সেই ইউরোপীয় সমাজের মধ্যে ইহার কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না। তবে হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে রাজা রাধাকান্ত দেব, রমানাথ ঠাকুর প্রমুখ সাতচল্লিশ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি লঙকে একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহার প্রত্যেকটি উক্তির সমর্থন করিলেন এবং নীলদর্পণে যে তাঁহাদের স্বদেশবাসীর মনের কথাই সুষ্ঠুরূপে ব্যক্ত হইয়াছে তাহার কথাও বলিলেন। পত্রখানি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এখানে হুবহু উদ্ধৃত হইল,—

To the Reverend J. Long,

Sir,—We, the undersigned, have perused with attention the Statement, which you have lately published, explanatory of your connection with the *Nil Darpan*, a work of fiction, illustrative of the feelings of the people of Bengal, on the subject of Indigo Planting, as carried on in this part of the country.

The part which you have for years together taken in the advancement of Vernacular Literature and in the dissemination of the views and feelings of the Natives on topics of administration and social improvement, as reflected through the medium of the Vernacular press, has justly entitled you to the gratitude of all classes of the native community, notwithstanding the difference of religious sentiment between you and them; and we believe the cause of good government has been not a little furthered by your industrious application in bringing those sentiments and feelings to the knowledge of the governing authorities, and the local European public.

Constituted, as the British Indian Government is, it is needless for us to dwell on the importance of consulting in matters of legislation and administration, native opinion and native feelings expressed in whatever form and through what medium soever, but we beg leave to state that we fully endorse your opinion that "peace founded on the contentment of the native population is essential to the welfare of India, and that it is folly to shut our eyes to the warnings the native press may give."

We are persuaded, Sir, that the part you have taken in carrying through the press the translation of the *Nil Darpan* has been in perfect accordance with your cherished convictions as to the importance of enlightening the European mind here on the contents of the Vernacular Press, and we have therefore observed with pain and sorrow the bitter personal controversy in the newspapers to which your laudable efforts in this direction have given rise.

That the *Nil Darpan* is a genuine expression of Native feeling on the subject of Indigo Planting we can with confidence certify. We are aware that there are passages in the original put into the mouths of females and others, which may grate on the ears of men of cultivated taste, but such passages only express the thoughts and ideas current in the order of society painted in the work. If, however, an occasional indelicacy of expression should be a reason for the suppression of a work of fiction, we fear the most ancient and the best classics of our land, which are so justly valued all the world over, would remain sealed from public view; and judged by the same standard, there are not a few of the master-pieces of European genius, both ancient and modern, which would suffer from the ordeal. We, however, apprehend that the open censure with which your effort has been visited is simply the result of an interested and factious opposition.

We have deemed it due to put you in possession of this expression of our opinion in this important question, in the belief that it may be the means of correcting the wrong impression which we have been sorry to find entertained, *viz.*, that the native community do not consider the *Nil Darpan* as an embodiment of popular feeling, and that they do not appreciate the motives which actuated you to bring its contents to the knowledge of the European public. Nothing could be more mistaken than this, and we do sincerely trust and hope that this letter will remove the misapprehension so much to be lamented.

We have the honour to be, Sir,
Your most obedient servants,
(*Sd.*) Radhakanta, Raja Bahadoor
Raja Kali Krishna Bahadoor
Raja Narendra Krishna
Babu Rumanath Tagore
and forty-three more principal Natives of Calcutta.

কিন্তু ইহাতেও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ইউরোপীয়দের মনে কোনরূপ ভাবান্তর ঘটিল না। তাহারা সুপ্রিমকোর্টের ফৌজদারী বিভাগে লঙের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা পরিচালনা করিতেই বদ্ধপরিকর হইল।

সুপ্রিমকোর্টে বিচারপতি স্যর মর্ডান্ট ওয়েলসের এজলাসে মামলা রুজু হইল। এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার পূর্বে আর একটি বিষয়ও এখানে উল্লেখ করা দরকার। ইংরেজ ও

বাঙালীদের মধ্যেকার প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক এই সময় প্রায় লোপ হইয়া যায়। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে উভয়ের মনোভাবে আশ্চর্য্য পরিবর্তন ঘটে। ভারতবাসীদের এবং সরকারী বেসরকারী প্রায় সকল শ্রেণীর ইংরেজের মধ্যেই শাসক-শাসিতের সম্পর্ক হইয়া দাঁড়ায়, আর প্রতি পদেই ইহার প্রমাণও পাওয়া যাইতে থাকে। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের মধ্যেও এই ধারণা বলবৎ হয়। ইংরেজ বাঙালী উভয়ের জাতিবৈরতা অর্থাৎ জাতির ভিত্তিতে পরস্পরের বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই কারণে যে সব ইংরেজ বাঙালীদের পক্ষ লইতেন বা তাহাদের হইয়া দুটা কথা বলিতেন তাঁহাদের উপরও সম্প্রদায় হিসাবে তাহারা খড়্গহস্ত হইত। লঙের বিচারকালে তাঁহার প্রতি বিচারপতি স্যার মর্ডান্ট ওয়েলসের মনোভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং বাঙালী-দের উপর তিনি যে সকল কটূক্তি বর্ষণ করেন তাহাতেই ইহা প্রমাণিত হয়।

স্যার মর্ডান্ট ওয়েলসের এজলাসে ১৮৬১, ১৯শে ও ২০শে জুলাই লঙের বিচার হইল। সাক্ষীসাবুদের জেরা, উভয় পক্ষের উকীলের সওয়ালজবাব, ওয়েলসের বক্তৃতা এবং জুরিদের মত প্রদান—সকলই এই দুই দিনের মধ্যে শেষ হইয়া গেল। লঙ ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয় আসামী; কাজেই তাঁহাকে জুরিদের মত প্রদানের পূর্ব্বে মুখ খুলিতেই দেওয়া হইল না। জুরিদের মধ্যে একজন ব্যতীত সকলেই ছিলেন ইংরেজ, ভারতীয় ছিলেন—কলিকাতার বিখ্যাত পার্শী ব্যবসায়ী ও দাতা রুস্তমজী কাওয়াসজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মানকজী রুস্তমজী। লঙের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ—(১) 'ইংলিশম্যান' ও 'বেঙ্গল হরকরা'র সম্পাদকদের মানহানি এবং (২) নীলকর সম্প্র-দায়ের মানহানি। জুরিরা পুস্তকখানি মানহানিকর বলিয়া দুইটি অভিযোগেই লঙকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন।

লঙের উকীলের অনুরোধে ওয়েলসের রায় দান ঐ দিনের মত স্থগিত থাকে। পরবর্ত্তী ২১শে জুলাই 'ফুল বেঞ্চে' বিচারের কথা হয়। ২৪শে জুলাই প্রধান বিচারপতি স্যার বার্নেস পীকক্ এবং স্যার মর্ডান্ট ওয়েলস দুই জনে লঙের বিচারের জন্য বিচারাসনে বসিলেন। লঙকে এই দিন তাঁহার বক্তব্য বলিতে অনুমতি দেওয়া হইল। লঙ এক দীর্ঘ বিবৃতিতে পূর্ব্ব বিবৃতির অনুযায়ী 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের কারণসমূহ বর্ণনা করিলেন। তিনি ইহাতে বলেন যে, কতকগুলি সৈন্য দ্বারাই ভারতবর্ষে ইংরেজের নিরাপত্তা রক্ষা করা যাইবে না, যেমন পারা যায় নাই অষ্ট্রিয়ান সৈন্য দ্বারা ইটালীতে অষ্ট্রিয়ানদের নিরাপত্তা রক্ষা করা। তিনি আরও বলেন,—

"Was it not my duty as a clergyman to help the good cause of peace, by showing that great work of peace in India could be best secured by the content-ment of the native population, obtainable only by listening to their complaints as made known by the native press and by other channels? I pass over French views in the East, but I say Forearmed is forewarned; and even at the expense of wounding their feelings in order to secure their safety, I wish to see the atten-tion of my countrymen directed to this important subject."

লঙ এখানেও পূর্ব্ব কথারই পুনরাবৃত্তি করিলেন। জন-সাধারণের মনে সন্তোষ বিধান করিতে হইলে, দেশভাষা অর্থাৎ বাংলায় পুস্তক-পুস্তিকা সংবাদপত্র প্রভৃতিতে যে সমুদয় অভিযোগের উল্লেখ থাকে তৎপ্রতি সজাগ থাকা এবং তাহা নিরাকরণে সচেষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। আগে হইতেই ইংরেজদের সতর্ক হওয়া উচিত। লঙ সাহেব বলেন, ভারতবর্ষে শান্তিস্থাপন এবং স্বদেশবাসীদের নিজ কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ করিতে গিয়া তিনি যদি কাহারও মনে আঘাত দিয়াও থাকেন তাহাতে তিনি দুঃখিত নন। প্রধান বিচারপতি পীকক্ লঙকে সমুদয় বিবৃতিটি পাঠ করিতে দেন নাই। পীকক্ এক সময় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লড়িয়াছেন, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পরে তাঁহার মত লোকেরও মমত্ব ভারতবাসীদের প্রতি বিরূপ হইয়া যায়। লঙের বিবৃতির শেষাংশটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"My conscience convicts me, however, of no moral offence, or of any offence deserving the language used in the charge to the jury. But I dread the effects of this precedent. This work being a libel, then the exposure of any social evil, of caste, of polygamy, Kulin Brahminism, of the opium trade, and of any other evils which are supported by the interests of classes of men, may be treated as libels too, and thus the great work of moral, social and religious reformation may be checked."

এই ২৪শে জুলাই তারিখেই লঙের বিচার-প্রহসনের পরিসমাপ্তি ঘটিল। বিচারপতি ওয়েলসের বিচারে লঙ দুইটি অভিযোগেই দোষী সাব্যস্ত হইলেন। তাঁহার এক মাস কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানা হইল। বিচারক বলিলেন, জরিমানা অনাদায়ে কারাবাসকাল আরও বর্দ্ধিত হইবে।

লঙের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ সমাজের আন্দোলনে এবং বিচার-কালে বাঙালীদের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। আদালত-ভবনে বহু গণ্যমান্য বাঙালী অর্থ লইয়া গমন করেন। উদ্দেশ্য যদি জরিমানা হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহা দিয়া দিবার জন্য। বিচারের রায় ঘোষিত হইলেই কালীপ্রসন্ন সিংহ জরি-মানার টাকা আদালতে জমা দিলেন। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ লঙের মোকদ্দমার যাবতীয় ব্যয় বহন করেন। এইরূপ বিচার-প্রহসনের ফলে বাঙালীরা যে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ

হইল তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ বিচারপতি ওয়েল্‌স বিচারকালে বাঙালী জাতির উপরে যে কটূক্তি বর্ষণ করেন তাহাতেও বঙ্গীয় সমাজ বিশেষ বিচলিত হইয়া উঠিল। লঙের কারাবরণে তাহারা বুঝিতে পারিল জাতিবৈরিতা শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়কে পাইয়া বসিয়াছে। ইহার প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে বাঙালীদিগকেও সংহত ও ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। তাহাদের মনুষ্যত্ব সহকারে ঐক্যবদ্ধ হইবার একটি প্রমাণও এই সময় পাওয়া গেল। তাহা হইল—বিচারপতি ওয়েল্‌সের বিরুদ্ধে আন্দোলন। শোভাবাজার রাজবাটীতে রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে ওয়েল্‌সের কটূক্তির প্রতিবাদে একটি জনসভার অধিবেশন হইল। এইরূপ সমবেত প্রতিবাদের ফল সম্বন্ধে ১৪ই এপ্রিল ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' লেখেন,—

"লঙ সাহেবের বিচারকালে সর মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স যাবতীয় বাঙালিকে গালি দিয়াছিলেন বলিয়া এতদ্দেশীয় সমুদায় প্রধান লোক একত্র হইয়া সভা বাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে এক সভা করিয়া মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সের দুঃস্বভাবের বিষয় ষ্টেট সেক্রেটারির গোচর করিলেন। প্রায় ২০,০০০ লোক ঐ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেন। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আবেদন পত্র গোপনে মুদ্রিত হইয়া স্বাক্ষরার্থ প্রায় এক মাস চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হয়, ইংলিশম্যান ও হরকরা সম্পাদক এক খণ্ডের জন্য ৫০০ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, এরূপ একতা হইয়াছিল যে, তথাপি কেহ এক খণ্ড দেন নাই। সর চার্লস উড আবেদনের উত্তরদানকালে মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সকে সাবধান করিয়া দিলেন।"

ষষ্ঠ দশকের প্রারম্ভেই লঙের কারাবরণে তথা বাঙালী জাতির অবমাননায় আমাদের জাতীয়তা বিশেষ প্রেরণালাভ করিয়াছিল। মেদিনীপুরে মনস্বী রাজনারায়ণ বসুর স্বাদেশিক সভাসমিতি, কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মান্দোলন, কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও ভারত-পরিক্রমা, নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলা এবং শিশিরকুমার ঘোষের সম্পাদনায় যশোহরের অমৃত বাজার হইতে প্রকাশিত 'অমৃত বাজার পত্রিকা' বাঙালী মনের নবজাত জাতীয় ভাবধারণাকে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিয়া তোলে।

লঙের পরবর্তী জীবনও ভারতবাসীর হিতার্থেই অতিবাহিত হয়। লঙ ১৮৬২ সনে বিলাতে গমন করেন। স্বদেশযাত্রার প্রাক্কালে কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। ১৮৬২ সন হইতে ১৮৬৬ সন পর্য্যন্ত লঙ বিলাতে কাটান। ইহার পর তিনি পুনরায় বঙ্গদেশে আগমন করিয়া একাদিক্রমে ছয় বৎসর এখানে অবস্থান করেন। এই সময় তিনি শিক্ষা ও বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চায়ই বিশেষ ভাবে লিপ্ত ছিলেন। এডামের বিখ্যাত এডুকেশন রিপোর্টের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ পাদ্রী লঙ কর্ত্তৃক ১৮৬৮ সনে প্রকাশিত হইল। নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় দেশী-বিদেশী প্রায় ছয় হাজার প্রবাদ সংগ্রহ, সংকলন ও অনুবাদ করিয়া তিন খণ্ডে যথাক্রমে ১৮৬৮, ১৮৬৯ এবং ১৮৭২ সনে ক্যালকাটা স্কুল-বুক সোসাইটি ও ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটির আনুকূল্যে তিনি প্রকাশ করেন। প্রবাদ-পুস্তকের শেষোক্ত খণ্ড প্রকাশের অব্যবহিত পরেই লঙ সাহেব বঙ্গদেশ ত্যাগ করিলেন। ১৮৭২ সনের ২১শে মার্চ্চ তারিখে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লিখেন,—

"আমাদের দেশের পরমবন্ধু লং সাহেব অদ্য ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন।...তিনি ত্রিশ বৎসর এখানে ছিলেন এবং ইহার প্রতি মুহূর্ত্ত তিনি কেবল ভারতের দীনহীন সন্তানগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কাটাইয়াছেন।"

লঙ সাহেব বিলাতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চায় রত ছিলেন। তিনি ট্রাবনার ওরিয়েণ্টাল সিরিজের জন্য একখানি বাংলা প্রবাদ-পুস্তক লিখিয়াছিলেন। লঙ ১৮৮৭ সনের ২৩শে মার্চ্চ ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময় ভারতবর্ষে কাটাইয়াছিলেন। পাদ্রী-রূপে আসিয়া তমসাচ্ছন্ন হিন্দুদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের আলো বিলাইয়া অত দশ জনের মত তিনি কর্ত্তব্য সমাধা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহাতেই তাঁহার কার্য্য নিবদ্ধ রহে নাই। বাংলার প্রজাকুলের দুঃখ-দৈন্য মোচন করিতেই তাঁহার বিপুল শক্তি বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। বাঙালী জাতির তিনি একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন।

পতঙ্গ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পরদিন বাজার করিয়া ফিরিয়াছেন এমনি সময় দারোগা সাহেব আসিয়া কহিলেন—শচীনবাবু, আমি আপনার শরণাপন্ন।

শচীনবাবু কহিলেন, যে দিনকাল তাতে ত ভয় হয়।

—না না, আপনার ভয় কি?

—ভূতের ভয় ত? সকল জায়গায়ই আছে—

মামুদ হোসেন কিছুক্ষণ শহরের কথা আলাপ করিয়া মন্তব্য করিলেন, শুধু শুধু হাঙ্গামা করে লাভ কি? ব্রিটিশ শাসন কি এমনি ঠুনকো যে দুটো শোভাযাত্রা বা মিটিং করে তাকে ভাঙা যায়?

—আজ্ঞে হাঁ, বিশেষতঃ আপনাদের মত একনিষ্ঠ কর্ম্মী থাকতে সেটা আর এমন কঠিন কি।

মামুদ হোসেন আত্মপ্রসাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ হাসিলেন।

অবশেষে আসল প্রস্তাব করিলেন, মেয়েটা নাইনে পড়ছে, কিন্তু একটু কাঁচা। হাঙ্গামায় ত আর পড়াশুনো হবে না, আপনি যদি একটু দেখতেন—

শচীনবাবু সংক্ষেপে কহিলেন, আমার সময় নেই—

—কেন? সন্ধ্যার সময়, এই ঘণ্টাখানেক?

ওই একটু যা বিশ্রাম, তা না হ'লে মানুষ বাঁচে কি করে?

—:হ'ক না, কয়েকটা মাস ত? তা ছাড়া শিক্ষক ঢের আরও আছেন, কিন্তু মেয়ের জেদ আপনার কাছেই পড়বে—

—কেন?

—কি জানি? তার ধারণা আপনি ছাড়া উপযুক্ত শিক্ষকই নেই। আপনাকে শ্রদ্ধা করে, কাজেই আপনার কাছে শিক্ষা নেবে। দারোগা হলেও এটুকু বুঝি, তা ছাড়া একমাত্র মেয়ে—

শচীনবাবু চিন্তা করিতেছিলেন। দারোগা সাহেব কহিলেন, যথাসাধ্য দেব, কুড়ি টাকা। আপনি আর অমত করবেন না।

শচীনবাবু বলিলেন, আচ্ছা, একটা ভালো দিন দেখে আরম্ভ করা যাবে।

মামুদ হোসেন খুশী হইয়াই চলিয়া গেলেন।

বৃহস্পতিবারে শচীনবাবু নবতম ছাত্রীকে পড়াইতে দারোগা সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। দারোগা সাহেব মেয়েকে তাঁহার সামনে আনিয়া বলিলেন—এই আমার মেয়ে, রিজিয়া। অঙ্ক ইংরেজি দুটোতেই কাঁচা, কিন্তু আপনি একটু মন দিয়ে পড়ালে একটা স্কলারশিপ পেতেও পারে।

পিতার প্রস্থানের পর রিজিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, আপনি আমাকে পড়াতে রাজী হবেন ভাবি নি।

শচীনবাবু প্রথম বিস্মিত হইলেন প্রণামে, দ্বিতীয়তঃ তাহার এমনি স্বচ্ছন্দ সাবলীল কথায়। তিনি হাসিয়া কহিলেন, কেন?

—একে ত কোথায়ও গিয়ে পড়ান না, বিশেষতঃ মেয়েদের—তাই। আমাদের তৈরি চা খাবেন কি, নিয়ে আসব?

শচীনবাবু আমাদের কথাটা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাই বলিলেন—থাক, তবে প্রয়োজন নেই। তোমার যদি খাওয়াবার প্রয়োজন থাকে আনতে পার—

রিজিয়া মুহূর্ত্তে চা ও বিস্কুট লইয়া ফিরিল। শচীনবাবু চা পান করিতে করিতে লক্ষ্য করিলেন, মেয়েটি সত্যই সুন্দরী। রিজিয়া হাসিয়া কহিল, আমাদের স্কুলের মেয়েরা বলে কি জানেন, আপনি যদি আমাদের সপ্তাহে অন্ততঃ দুটো দিনও পড়াতেন—

আমি এমন কি পড়াই, তোমার দিদিমণিরা ত বেশ পড়ান—

—ধাঃ; ছেলেরা আমাদের চেয়ে কত বেশী জানে। এমন সব কথা বলে যা ভাবি নি। আমাকে কিন্তু নোট লিখিয়ে দিতে হবে—

তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একটু অনুবাদ করিতে দিলেন, এবং কয়েকটা অঙ্ক মুখে মুখেই করিতে দিলেন। কিন্তু রিজিয়া কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, অঙ্ক করিবার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ ছিল না। শচীনবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি হাসিয়া কহিলেন, অঙ্ক হয়েছে?

—হবে স্যার।

কিন্তু অঙ্ক হইল না। রিজিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া শচীনবাবু প্রশ্ন করিলেন, কিছু বলবে আমাকে?

রিজিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, পুলিসের মেয়ে বলে কি আমাদের বিশ্বাস করেন না?

—কেন করব না। আর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা কেন?

রিজিয়া কহিল, প্রয়োজন আছে। বিশ্বাস করবেন, আমি আপনার কথায় সব করতে পারব। শচীনবাবু চিন্তান্বিত হইয়া ফিরিলেন।

দুই এক সপ্তাহ চলিয়া গেল, শহরের অবস্থা শান্ত, নেপথ্যে কিছু কিছু ধ্বংসমূলক কাজ চলিতেছে—অর্থাৎ কোথাও পোষ্ট আপিস পোড়ানো হইতেছে, টেলিগ্রাফের তার-কাটা চলিতেছে, কোথাও কোথাও শোভাযাত্রা পরিচালনা লইয়া পুলিসের সহিত সংঘর্ষ বাধিতেছে। শচীনবাবুর মু'খতে বাকি

রহিল না—শহরের বিপ্লবশক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—তাহারই ফলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই সকল ঘটনা।

সত্যর সঙ্গে অনেক দিন দেখা নাই, কোথায় কেমন আছে তাহাও শচীনবাবু জানেন না। স্কুল খুলিয়া গিয়াছে, ভাল ছেলেমেয়েরা রীতিমত স্কুল করিতেছে, কয়েকটি মাত্র ছাত্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে বিপ্লব-বহ্নিতে, তাহারা স্কুলে আসে না—শহরের জীবনযাত্রা চলে ঠিক যেমনটি চলিত। মাছ দুধ আসে, বিক্রয় হয়, উকিল মোক্তারগণ কোর্টে যান, হাকিম বিচার করেন—বেকারেরা সারাদিন আড্ডা দেয়। পথের যেখানটা সত্যদের রক্তে রাঙা হইয়াছিল সেখানে কেহ থমকিয়া দাঁড়ায় না, আপন মনে চলিয়া যায়। তাহাদের পায়ের তলার ধুলায় মিশিয়া থাকে রক্তের দাগ। শহরবাসী হয়ত ধীরে ধীরে ভুলিয়া যাইবে এ ক্ষুদ্র কাহিনী…

শচীনবাবু স্কুলে গিয়া একখানা পত্র পাইলেন—সত্য দেখা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছে। আজ রাত্রে সে শহরের কোনও এক স্থানে আসিবে। শচীনবাবুকে জানাইয়াছে তিনি বেড়াইয়া ফিরিবার পথে সন্ধ্যার পরে পায়ের কাছে দুইবার টর্চের আলো পড়িলে আলো-নিক্ষেপকারীর সঙ্গে তিনি যেন চলিয়া আসেন, তাহা হইলেই দেখা হইবে।

এমনি ভাবে সংগোপনে যাওয়া বিপদ সামনে করিয়া। শচীনবাবুর মনের মধ্যে কেমন করিতেছিল, তবুও যাহারা জীবনপণ করিয়া ঘর ছাড়িয়া দুর্গম পথে বাহির হইয়াছে তাহাদের জন্য এটুকু করিতেই হইবে—তাহাদের এমন বিশ্বাসের অমর্যাদা করা চলে না।

বৈকালে শচীনবাবু একখানা বই হাতে করিয়া বাহির হইতেছিলেন। নিত্যকার সঙ্গী রমণীবাবু, সুরেনবাবু, হরেনবাবু প্রভৃতি অন্যান্য শিক্ষকগণ সঙ্গে ছিলেন। একটা পুলের নিকটে পর পর দুই বার টর্চের আলো তাঁহাদের সম্মুখে পড়িল। শচীনবাবু বিদায় নিলেন— বাড়ি পড়াতে হবে—

সঙ্গীদের নিকট বিদায় লইয়া শচীনবাবু আলোর রেখা অনুসরণ করিয়া চলিলেন—কিছুক্ষণ চলিয়া বুঝিলেন ছেলেটি অনিল। গত বৎসর পাস করিয়া গিয়াছে। দ্রুত পা চালাইয়া অনিলের সঙ্গ ধরিলেন এবং তাহার পিছন পিছন শহরের এক ডাক্তারের বাড়িতে ঢুকিলেন—ভিতরবাড়ী অতিক্রম করিয়া শেষে রান্নাঘরের মাঝখান দিয়া তাহার পিছনে ছোট একটা কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

রান্নাঘরে একটি বর্ষীয়সী নারী উনুনে রুটি সেঁকিতেছিলেন, একটি তরুণী বধূ রুটি বেলিয়া দিতেছিল। শচীনবাবু সাবধানে দেখিলেন, তাহারা কেহ ঘোমটা টানিয়া দিল না, একটুও বিস্মিত হইল না, এমন কি মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়া দেখিলও না, কে এই অপরিচিত ব্যক্তি তাহাদের রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, গৃহটি স্বল্পালোকিত, একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সত্য প্রণাম করিয়া কহিল, ভাল আছেন ত স্যার?

—হ্যাঁ। তুমি কি করে এলে?

সত্য এ কয়দিনে কোথায় কি কাজ চলিয়াছে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত কিরিস্তি দিতেছিল—তরুণী বধূটি আসিয়া কহিল, একটু চা দেব, মাষ্টার মশায়?

—দিন।

প্রণাম করিয়া সে কহিল, দিন না, দাও। আমাকে আপনি বলছেন কেন? সত্য চা খাবে?

—খাবো বৈ কি?

ঘরের মধ্যে বসিয়া এই পরিবেশটি শচীনবাবুর নিকট বড়ই রহস্যময় বলিয়া মনে হইতেছিল। এই তরুণী বধূ কেমন করিয়া যেন সঙ্কোচ ও অকারণ লজ্জাকে ত্যাগ করিয়াছে—কেমন করিয়া অকুণ্ঠভাবে অপরিচিতকে অভ্যর্থনা করিয়াছে। সবই আশ্চর্য্য—

চা পান করিতে করিতে শচীনবাবু শুনিতেছিলেন সত্য কহিতেছে, আমাদের সকলেই ত একে একে গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। আমারও সময় আসন্ন। কম্যুনিষ্ট পার্টির ওরা আমাদের মধ্যে কিছু কিছু ছিল, তারা এখন আমাদের গতিবিধি সম্বন্ধে সমস্ত খবরই পুলিসকে দিচ্ছে তাই সকলেই গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। আমি বাকী আছি, কিন্তু আর ত বিশ্বাস করতে পারি না কাউকে, কাজেই একথা নিশ্চিত যে গ্রেপ্তার আমি হবই। এরা যদি সন্ধান না দিত তবে পুলিসের সাধ্য কি আমাদের খোঁজ পায়।

সত্য কতকগুলি ছেলে ও মেয়ের নাম করিয়া সাবধান করিয়া দিল, এরা সকলেই প্রচ্ছন্ন কম্যুনিষ্ট, আমাদের বিপ্লবকে নষ্ট করতে আমাদের দলে ঢুকেছিল। কাজেই আমাদের ইঙ্গিত ব্যতীত কারও কাছে কিছু বলবেন না, কাউকে বিশ্বাস করবেন না।

শচীনবাবু বসিয়া বসিয়া শুনিলেন।

সত্য বলিল, এখানে আর কাজ করা সম্ভব নয়—এখন অন্য জেলায় যাবো। সামনের ২০।২১ তারিখে সেখানে যাব, সেখানে কাজ হয়ত চলতে পারে…

একটু থামিয়া সে কহিল, আপাততঃ কাল বিকেলের মধ্যে ৫০৲ টাকা আমার চাই। টাকা আছে কিনা জানি না, কিন্তু কাল সন্ধ্যায় যদি না পেলে আমার চলবে না। এখানে চব্বিশ ঘণ্টা থাকলেই ধরা পড়তে হবে। আর বেশী কিছু আমি বলতে চাই নে স্যার। সন্ধ্যায় অনিল খেলার মাঠে যাবে…

ফিরিবার সময় সত্য প্রণাম করিয়া কহিল, আশীর্বাদ করবেন স্যার। হাঁ, আর এক কথা, আপনি যেখানেই যান যার সঙ্গেই দেখেন, সাবধান থাকবেন।

শচীনবাবু হাসিয়া কহিলেন—পুলিসের চেয়ে দলবিশেষের ভীতিই দেখছি প্রবল হয়েছে তোমাদের ?

তা হবেও বা।

সত্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়া শচীনবাবু বাহির হইয়া আসিলেন—কিন্তু রান্নাঘর হইতে বাহির হইতেই বসং ডাক্তারবাবুর সহিত দেখা। তিনি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শচীনবাবু অনিলের পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন।

অন্ধকার পথে ফিরিতে ফিরিতে শচীনবাবু একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিলেন।

বাসায় ফিরিয়া শুনিলেন অঞ্জলি অনেকক্ষণ যাবৎ অপেক্ষা করিতেছিল, সবেমাত্র গেল।

মীরা প্রশ্ন করিল—কোথায় গিয়েছিলে ?

শচীনবাবু আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন, তিনি আজিকার নূতন অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সমস্ত কথাই বলিয়া ফেলিলেন। পরিশেষে সাবধান করিয়া দিলেন—এসব প্রকাশ হলে গুরুতর বিপদ হবে।

মীরা সেকথা গ্রাহ্য না করিয়া কহিল—বৌটা তোমাকে চা দিলে ? অমন করে কথা বললে ?

—হাঁ।

—ও ডাক্তারবাবুর বেটার বৌ, ম্যাট্রিক পাস। কিন্তু কেমন করে পারলে ?

শচীনবাবু কহিলেন—সম্ভবতঃ সে জানে যারা দেশের কাজ করে তারা একই জাতের, তাই তাদের সে ভালবাসে, তাদের নিকট লজ্জা করা অনাবশ্যক বলে মনে করে।

মীরা চিন্তান্বিত হইল—সে কি যেন ভাবিতেছিল।

শচীনবাবু কহিলেন—আজ বুঝলাম, বিপ্লবী এই পরিচয়টুকু পেলেই এরা পরকে আপনার করে নেয়। তখন এদের সহানুভূতি এবং সাহায্য পাওয়ার পথে আর কোন বাধা থাকে না।

মীরা কহিল—তোমাকে যদি গ্রেপ্তার করে আমি কি করব ?

—বহু স্ত্রীর স্বামী গ্রেপ্তার হয়েছে, মরে গেছে—কিন্তু দেশের মুক্তি-সংগ্রাম থামে নি।

মীরা কহিল—আমি ভয় করি না, কিন্তু খোকা যে কি করবে ?

মীরার চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠিল।

শচীনবাবুর সামর্থ্য ছিল না ত্রিশ টাকা দিবার—

পরদিন দ্বিপ্রহরে গার্ল স্কুলে গিয়া শুনিলেন অণিমা অসুস্থ, স্কুলে আসেন নাই। শচীনবাবু দপ্তরীর মারফত একখানি চিঠি পাঠাইয়া টাকা দিবার অনুরোধ জানাইলেন। শ্রীমতী রায় তখন অত্যন্ত অসুস্থ, ঘন ঘন বমি হইতেছে, শচীনবাবুর পত্র পাইয়া কি করিবেন বুঝিতে পারিলেন না ; জ্বরের ঘোরে শুধু মনে হইল টাকাটা দিতে হইবে। কয়েকটি মেয়ে শুশ্রূষা করিতেছিল, তাহাদিগকে বাহিরে যাইতে বলিয়া বহু কষ্টে উঠিয়া টাকাটা বাহির করিয়া খামে ভরিয়া দপ্তরীকে ডাকাইলেন। দপ্তরী শচীনবাবুকে টাকাটা পৌঁছাইয়া দিল।

শচীনবাবু মনে মনে শ্রীমতী রায়ের কর্ত্তব্যপরায়ণতার প্রশংসা করিতে করিতে বাসায় ফিরিলেন।

বৈকালে মাঠের মাঝখানে বসিয়া আড্ডা দিতে দিতে রমণীবাবু কহিলেন, শচীনবাবু আপনারই ভাগ্য।

—অর্থাৎ ?

—বদনামের খোশখবরও ভাল।

সুরেনবাবু টিপ্পনী করিলেন, মিথ্যা হোক, সত্য হোক, অমন কথা আমাকে বললে ত আমি গর্ব্ব বোধ করতাম—

সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই যে, শ্রীমতী রায় ও শচীনবাবুর এই ঘনিষ্ঠতাকে কেহ কেহ প্রণয়ঘটিত ব্যাপার বলিয়া অপবাদ রটাইতেছে।

শচীনবাবু বলিলেন, সকলের সব কথায় কি কান দিলে চলে হরেনবাবু ?

হরেনবাবু কহিলেন, কিন্তু তারা ছাত্র যে।

—জানি। যে কয়েকটি নাম সত্য গত রাত্রে বলিয়াছিল সেই কয়টি নাম উচ্চারণ করিয়া শচীনবাবু কহিলেন, এরা বলছে ত ?

সুরেনবাবু স্বীকার করিলেন।

শচীনবাবু কহিলেন, আরও অনেক কিছু শুনতে পাবেন ওদের মুখ থেকে, অপেক্ষা করুন। ওদের পক্ষে ওটা দরকার—

অদূরে অন্ধকারে কে যেন পায়চারি করিতেছিল, শচীনবাবু একটা অজুহাতে উঠিয়া যাইয়া দেখিলেন, অনিল। টাকাটা দিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

যথাসময়ে স্কুল খুলিয়া গেল।

শচীনবাবু মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। কতকগুলি নিরপরাধ যুবক অনর্থক আত্মাহুতি দিয়াছে মাত্র—অশেষ কষ্ট সহ্য করিতে করিতে তাহাদের হয়ত কেহ ফিরিবে, কেহ হয়ত ফিরিবে না। শহরের জীবনযাত্রা, খাওয়া-পরা, রুজি-রোজগার সব এমনি অব্যাহতভাবে চলিয়াছে যে, এখানে গুরুতর ব্যাপার কিছু ঘটিয়াছে এমনও মনে হয় না। সত্যদের রক্তরঞ্জিত পথে মানুষ চলিয়াছে উদাসীন পদক্ষেপে।

স্কুল হইতে ফিরিয়া শচীনবাবু বসিয়া বসিয়া তাহাই ভাবিতেছিলেন—মনের ভিতরে একটা নিষ্ফলতার অভিমান পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, একটা কিছু করা প্রয়োজন। ওদের প্রজ্বলিত বহ্নিকে যেমন করিয়াই হোক জীয়াইয়া রাখিতে

হইবে। মাতৃপূজার এ বোধনিকাকে অনির্ব্বাণ রাখিতেই হইবে।

গীতা আসিল—অত্যন্ত ম্লানমুখে।

শচীনবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতেই গীতা বলিল, কি হবে দাদু!

—তাই ভাবছি

—আর ত কেউ নেই।

—কেন কেন? তোমরা আছ, আমি আছি—

—কিন্তু কি করা যায়?

—কাল আমাদের স্কুলে হরতালের কথা হচ্ছে, হয়ত সফল হবে না। কারণ ওই দুই পার্টির ছেলেরা আসবেই। তবে গার্ল স্কুলটার হয়ত হতে পারে।

—তবে তাই। জাতীয়তাবাদীরা জন আটেক আছে তারাই পেটে যাবে।

আপনাদের স্কুলে ধনারা কত জন আছে?

—জানি না, কে কোন্ দলে তা আর বুঝবার যো নেই, তবে তারা জন কুড়ি হবেই বৈ কি?

গীতা কহিল, তবে তাই হোক। গীতা চলিয়া গেল একটা অনিশ্চয়তা লইয়া।

শচীনবাবুর পুত্র একটা জাতীয় পতাকা হাতে করিয়া আসিয়া কহিল, বাবা, বন্দে মাতরম্—

—ও দিয়ে কি করবি?

খোকা যাহা জানাইল তাহার সারমর্ম এই যে, সে বড় হইয়া সভাপতির মত বিরাট শোভাযাত্রা লইয়া বাহির হবে। তাহার কাছে এটা একটা খুব মজার ব্যাপার।

শচীনবাবু কহিলেন, তা বেশ।

ধনা আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, আমায় ডেকেছেন সার?

—কে বললে?

—গীতাদি বললেন।

—হাঁ, কাল তোমরা কয় জন পিকেট করতে যাচ্ছ?

—জন কুড়ি—

—লাঠি চার্জ্জ হবে জান?

—ধনা একটু উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, জানি।

—তোমাদের যদি কিছু হয়!

—যদি আপনার অনুমতি পাই তবে সার, সকলেই মরতে প্রস্তুত।

শচীনবাবু ধনার মুখের পানে চাহিলেন—ছেলেটা অঙ্ক পারে না বলিয়া কতদিন তিনি তিরস্কার করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার চেতনা হয় নাই—সেই ধনার মুখে আজ অপূর্ব্ব একটা দীপ্তি। মনে মনে তিনি ধনাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

সন্ধ্যার পরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল—চারি পাশে ছড়িয়েছে অন্ধকার, আকাশটা যেন মাঝে মাঝে চিড় খাইয়া ফাটিয়া যাইতেছে—আর বাতাসের গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে…

মীরা শচীনবাবুর ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছিল। সে প্রশ্ন করিল, তুমি অমন গম্ভীর কেন? কি হয়েছে বল?

—হাঁ, আজ বলব। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক আজ সত্যদের সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়েছি। যে-কোন দিন আমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে, তার জন্যে তুমি প্রস্তুত থেকো—

মীরা নির্ব্বাক হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে সে বলিল, আমি কেমন করে থাকব?

—হৃষীকেশ পাঠকের কাহিনীটি বর্ণনা করিয়া শচীনবাবু বলিলেন, ভগবান তোমায় রক্ষা করবেন।

মীরা নির্ব্বাক।

—তোমার ভয় করে?

—না, সত্যদের মত ছেলেছোকরারা যদি জেলে যেতে পারে তবে তুমিও না হয় গেলে, কিন্তু খোকাকে নিয়ে আমি সংসার চালাবো কি করে?

—তুমি ভেবো না—যেমন করেই হোক সংসার চলবে।

মীরা চুপ করিয়া রহিল। শচীনবাবু লক্ষ্য করিলেন, ভীতা ত্রস্তা মীরার হৃদয়েও এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার সঙ্কল্প যেন দেখা দিয়াছে। তাহার তেজোদৃপ্ত মূর্ত্তির পানে তাকাইয়া শচীনবাবু মুগ্ধ হইলেন।

মীরা শুইয়া পড়িল, শচীনবাবুও শুইলেন, কিন্তু ঘুম আসিল না। কতকগুলি ছেলেমেয়েকে এমনি করিয়া বিপদের মুখে পাঠাইয়া কি তিনি ভালরূপ বুঝাছেন? যদি কেহ কাল গুরুতর রূপে আহত হইয়া মারা যায়! ভাবিতে ভাবিতে মাথাটা যেন কেমন গরম হইয়া উঠিল, শিয়রের জানালাটা খুলিয়া দিয়া দেখিলেন বর্ষণ কমিয়াছে, কিন্তু বাতাস রহিয়া রহিয়া প্রবল বেগেই বহিতেছে।

বিছানায় শুইয়া তিনি জাগিয়াই ছিলেন, জানালায় বহু আওয়াজ হইল—একটা বিড়াল নিত্যই এই সময় দুধ খাইবার প্রলোভনে আসে। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন না…দূরের কোনও একটা ঘড়িতে একটা বাজিল। বাতাসে মশারিটা উড়িতেছে, কিন্তু না—কে যেন টানিতেছে—

শচীনবাবু মশারি হইতে মুখ বাহির করিয়া জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইলেন, আকাশ ঘনান্ধকারে অবলুপ্ত, একটু বিজলী খেলিয়া গেল, তাহাতে স্পষ্টই মনে হইল কে যেন জানালায় দাঁড়াইয়া। তিনি প্রশ্ন করিলেন—কে?

—দরজা খুলুন।

শচীনবাবু যন্ত্রচালিতের মত দরজা খুলিলেন—আলো

জ্বালাইতে যেমনটি ধরাইয়াছেন অকস্মাৎ ফুঁ দিয়া নিভাইয়া দিয়া অদ্ভুত আগন্তুক কহিল, আমি অর্জুন, পিছনে লোক আছে।

—কি ?

—দু'টিন পেট্রোল এনেছি। নগেনদের বাড়ী পুলিস ঘেরাও করেছে। আপনার এখানে ছাড়া উপায় নেই। বহু কষ্টে বের করে এনেছি। আপনি যেখানে হয় রাখুন, আসি—

—তুমি—

—আমি চলে যাব—

আচম্কা অর্জুন বাহিরের সূচীভেদ্য অন্ধকারে মিশিয়া গেল। শচীনবাবু হাতড়াইয়া দেখিলেন তাহার পায়ের কাছে দুইটি পেট্রোলের টিন রহিয়াছে, কিন্তু পেট্রোলের গন্ধটা তেমন উগ্র নয়। তিনি সে দুটিকে চালের হাঁড়ির পিছনে রাখিয়া ডাক দিলেন, মীরা!

মীরা ঘুমাইতেছে, সে জবাব দিল না। শচীনবাবু আবার শুইয়া পড়িলেন।

পরদিন যথাসময়ে শচীনবাবু স্কুলে রওনা হইলেন—পথে দেখিলেন ছাত্রীরা গেটে পিকেটিং আরম্ভ করিয়াছে, অদূরে একদল পুলিস দাঁড়াইয়া আছে। স্কুলে ঢুকিবার পথে ধর্মঘটীরা কয়েকজন দাঁড়াইয়া—শিক্ষকদের তাহারা বাধা দিল না।

তিনি স্কুলের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। পিছনে একটা হৈ চৈ আরম্ভ হইল। ফিরিয়া দেখেন যে ছেলেগুলি তাঁহাকে আর শ্রীমতী রায়কে জড়াইয়া অশোভন একটা অপবাদ রটনা করিতেছে। তাহাদের নেতৃত্বে কতকগুলি ছেলে স্কুলে প্রবেশ করিতে উদ্যত, কিন্তু ধর্মঘটীরা গেটে শুইয়া পড়িয়াছে।

মুহূর্তে কি হইল, ধারণা করা যায় না। দেখা গেল, অপেক্ষমাণ পুলিসবাহিনী লাঠি চালাইয়া রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে এবং ছেলেরা বিজয়োল্লাসে স্কুল-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াছে। কতকগুলি ছেলে বাহিরে ছিল তাহারা পুলিসবাহিনীকে তিরস্কার করিতেছে—ভিতর হইতেও কতকগুলি ছাত্র তাহাদিগকে গালাগালি দিতেছে—

পুলিস-দল ক্রুদ্ধ হইয়া স্কুল-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল এবং নির্বিচারে লাঠি চালনা করিয়া চলিয়া গেল। সময় দু' এক মিনিট, কিন্তু এরই মধ্যে ত্রিশ জনেরও অধিক ছাত্র ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়াছে। পুলিসের লোকেরা এমনি ভাব দেখাইয়া বিজয়গর্বে চলিয়া গেল যেন যুদ্ধে জিতিয়াছে—

বাহিরে আহত সত্যাগ্রহীগণ একে একে সকলেই উঠিয়াছে, শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া হাঁকিতেছে, বন্দে মাতরম্।

ধনাকে উহারা ধরিয়া দাঁড় করাইয়াছে, তাহার মাথা ও কনুই হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছে—

ধনা ক্ষীণকণ্ঠে হাঁকিতেছে—'বন্দে মাতরম্'—আর দৌড়াইতে দৌড়াইতে চলিতেছে…

আর সবাই চলিয়াছে তাহাদের অনুসরণ করিয়া—জয়ধ্বনি মন্ত্রে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া।

শচীনবাবু দাঁড়াইয়া থাকিতেই এতগুলি ব্যাপার দ্রুত-গতিতে তাঁহার চোখের সামনে ঘটিয়া গেল। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া আপিস-কক্ষে গেলেন—তাঁহার পাশের ঘরে খাট-বেঞ্চের উপর জন পঞ্চাশ ছেলে শুইয়া যন্ত্রণায় কাতরাইতেছে, দুই জন ডাক্তার আসিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত পরীক্ষা করিতেছেন। দুই-চারজন অভিভাবক উকিল মোক্তারও আসিয়াছেন। হেডমাষ্টার বিপন্নভাবে নিজের ঘরে বসিয়া আছেন, দেহ যেন তাঁহার অবশ হইয়া আসিয়াছে।

শচীনবাবু ফিরিয়া দেখেন, পুলিস সাহেব বহু পুলিস লইয়া গেটের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। শচীনবাবু দ্রুত গেট বন্ধ করিয়া দিয়া সামনের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

পুলিস সাহেব দরজা খুলিতে হুকুম দিলেন—

শচীনবাবু বজ্রকণ্ঠে কহিলেন, হেডমাষ্টারের অনুমতি ছাড়া আপনারা ভেতরে ঢুকতে পারবেন না।

উকীল মোক্তার দুই-চার জন আসিয়া দাঁড়াইল। উভয় পক্ষে বচসা সুরু হইল—আইনের তর্ক, ঢুকিবার অধিকার আছে কি না তা লইয়া।

শচীনবাবু লক্ষ্য করিলেন, যে কনেষ্টবলটি "মোকরী ছোড় দেগা" বলিয়া একদিন অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল সেও এক প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া আসিয়াছে, কিন্তু অত্যন্ত বিমর্ষ ম্লান মুখে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। শচীনবাবুর সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইতেই সে যেন লজ্জা পাইয়াছে এমনি ভাবে আর একজনের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

বাদানুবাদের পর স্থির হইল, পুলিস সাহেব ভিতরে আসিয়া কথাবার্তা বলিবেন। পুলিসবাহিনী বাহিরে থাকিবে।

তাহাই হইল।

শচীনবাবু ছাত্রীদের সংবাদের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ফিরিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পিছনের গেট দিয়া তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলেন, পথে ধনাদের একজন জানাইল যে লাঠিচার্জ্জ হইলেও কেহ বিশেষ আহত হয় নাই। আর একটু অগ্রসর হইলে গার্লস্ স্কুলের দপ্তরী তাহাকে বলিল, দিদিমণি ডাকছেন—

শচীনবাবু গার্লস্ স্কুলে ঢুকিয়া পড়িলেন। দপ্তরী তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া অণিমা রায়ের বাসায় লইয়া গেলেন।

শ্রীমতী রায় নীরবে বসিয়া বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। শচীনবাবুকে দেখিয়া আর্তকণ্ঠে কহিলেন, আমার স্কুলের মেয়েদের এমনি করে মারবে আর আমি

নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে বসে দেখব—এ আমি পারব না, আমি আজই কলকাতা চলে যাব—

শচীনবাবু অবাক হইলেন—মিস রায়ের এই দুর্ব্বলতা দেখিয়া। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, আপনার এ ধরণের দুর্ব্বলতা শোভা পায় না মিস রায়।

—কেন?

—কান্না আর আর্ত্তনাদ সাধারণ মেয়েদের মানায়, আপনার মত উচ্চশিক্ষিতাকে নয়।

অপর্ণা রায় বিস্মিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শচীনবাবু বলিলেন, "আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে।"

শ্রীমতী রায় বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন, কাব্য করবার আর সময় পেলেন না।

—সে যাই হোক, কলকাতা আপনার যাওয়া হবে না। এখানেই থাকতে হবে। এখনও অনেক কাজ বাকী—কথাটা আদেশের মতই শুনাইল।

শচীনবাবু চলিয়া আসিলেন।

মীরা চাউল বাহির করিতে যাইয়া দেখে সেখানে দুইটি টিন—পেট্রোল। তাহার সামনে সমস্ত যেন মসীলিপ্ত হইয়া গেল। মীরা আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল—খোকা, খোকা!

খোকা নিকটেই ছিল, তাহাকে বুকে করিয়া মীরা কাঁদিয়া উঠিল। খোকা কহিল—কাঁদছ কেন মা?

—তোর বাবা আমাদের ফেলে চলে যাবে। আমরা কি করবো?

—আমি আর তুমি থাকব—

—কোথায়? কেমন করে বাবা!

—আমি বন্দে মাতরম্ নিয়ে খেলা করবো, তুমি কাজ করবে।

মীরা কাঁদিতেছিল। শচীনবাবু বিষণ্ণভাবে প্রবেশ করিলেন। মীরা প্রশ্ন করিল—কত কি ঘরে এনে জমা করছ, কি হবে?

শচীনবাবু কহিলেন—যা হবার তাই হবে। তুমি ভেবো না।

—খোকার কি হবে!

—তোমার খোকার মতই আদরের দুলাল সত্য, বলা, অঞ্জলি—তুমি ব্যস্ত হয়ো না। ভগবানই তাকে রক্ষা করবেন।

মীরা সান্ত্বনা পাইল না, সে কাঁদিতে কাঁদিতে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

মিঃ সেনের বাড়ীতে সাহিত্য-সমিতির দুইটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলই বোধ হয় মিঃ সেনের সহিত শচীনবাবুর একটু ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। দুই-এক জন অফিসার পর্য্যন্ত শচীনবাবুকে ঠাট্টা করিয়াছেন—মিঃ সেনের বাড়ীতে চায়ের আসরে বসবার সৌভাগ্য যখন আপনার হয় তখন আর চাই কি?

মিত্রের বাড়ীর সামনে শচীনবাবুর সহিত দেখা হওয়ায় মিঃ সেন শচীনবাবুকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা চলিল—সেন সাহেব এমন আলোচনা মাঝে মাঝে না করিতেন এমন নয়। আজ আলোচনা কিছু দীর্ঘ—যথাসময়ে চা বিস্কুটও আসিল। সেন সাহেব শ্রীমতী রায়কে লইয়া একটু ব্যঙ্গও করিলেন। শচীনবাবু সংক্ষেপে বলিলেন—যদিও মিথ্যা তবুও এই অপবাদকে তিনি সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে রিজিয়াকে পড়াইবার জন্য শচীনবাবু বাহির হইলেন। রিজিয়া আলো লইয়া পড়িবার ঘরে বসিয়াই ছিল। অভিবাদন করিয়া কহিল—সার, আসুন—ভাল আছেন?

শচীনবাবু বলিলেন—ভাল বৈ কি?

—ওরা সব ভাল?

কাহারা তাহা শচীনবাবু জানিতেন, তিনি জবাব দিলেন—হ্যাঁ, বাড়ীতে সব ভালই।

রিজিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কহিল—আঁক কষতে দিন সার। শচীনবাবু জটিল একটা অঙ্ক বাছিয়া দিয়া বসিয়া রহিলেন। রিজিয়া অঙ্ক কষিতে কষিতে হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল, ক্ষণকাল পরে চা লইয়া আসিয়া বলিল—চা খেয়ে নিন্ সার—

শচীনবাবু চা পান করিতে আরম্ভ করিলেন। রিজিয়া বলিল—আই বি থেকে খবর দিয়েছে, বাবা বলছিলেন, আপনি নাকি সব হাঙ্গামার গোড়ায় আছেন।

—ভাল কথা—

—আপনার বাসা সার্চ্চ হবে, টিনগুলো আমার এখানে দিয়ে যাবেন। শচীনবাবু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—তুমি—

রিজিয়া একটু হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ।

—কি করে?

রিজিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া চুপ করিয়া গেল এবং আপন মনেই খাতায় কি লিখিতে লাগিল।

ক্ষণিক পরে খাতাটা দিয়া কহিল—কষেছি, দেখে দিন্ সার।

শচীনবাবু পড়িলেন—"রাত্রি ঠিক এগারটায় আমাদের বাসার পশ্চিমে খালের ধারে রাখিয়া গেলে আমি তুলিয়া

আমেরিকায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু
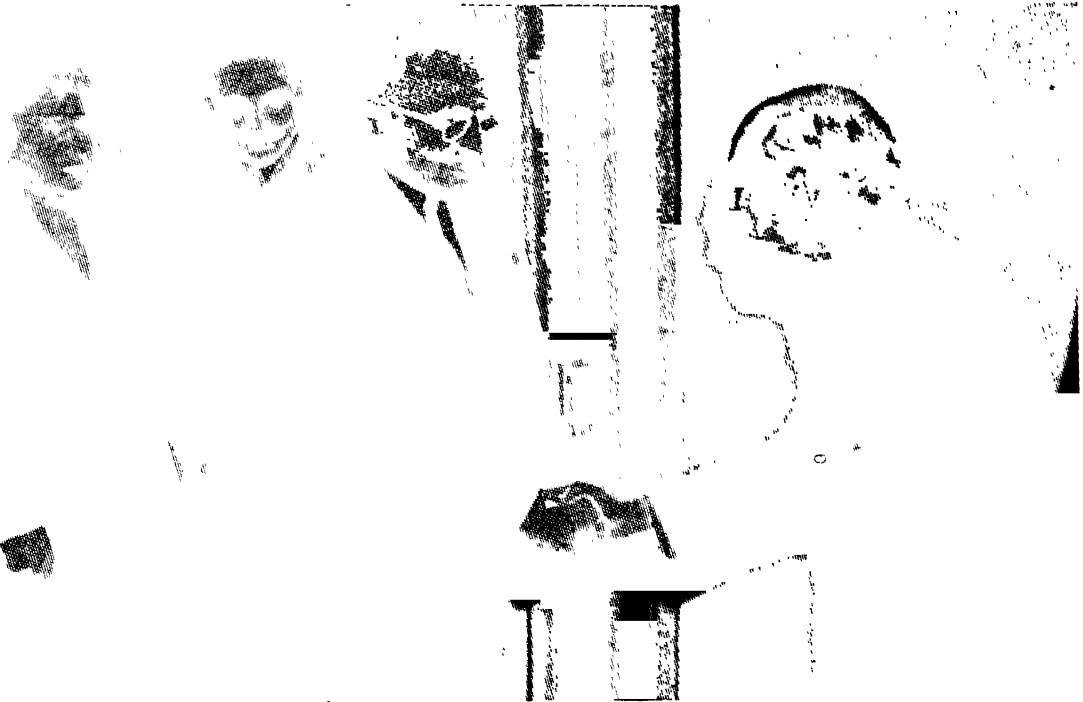
ওয়াশিংটনে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ও প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সাক্ষাৎকার। বাঁদিকে মিসেস ট্রুম্যান

রাশিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব আঁদ্রে ভিশিন্স্কি ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু
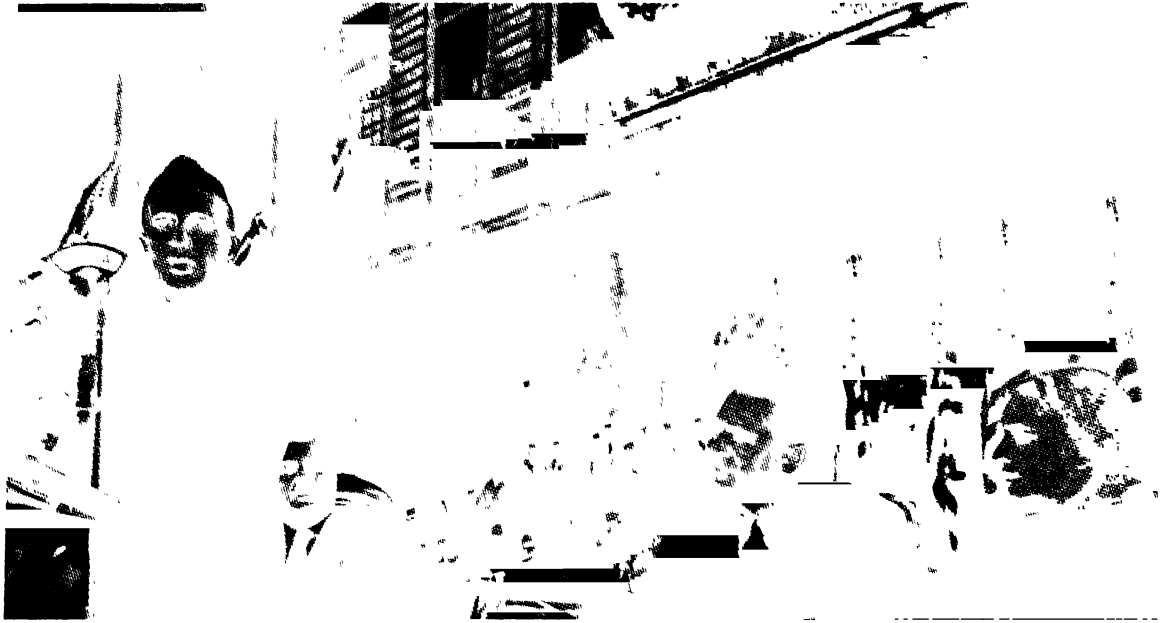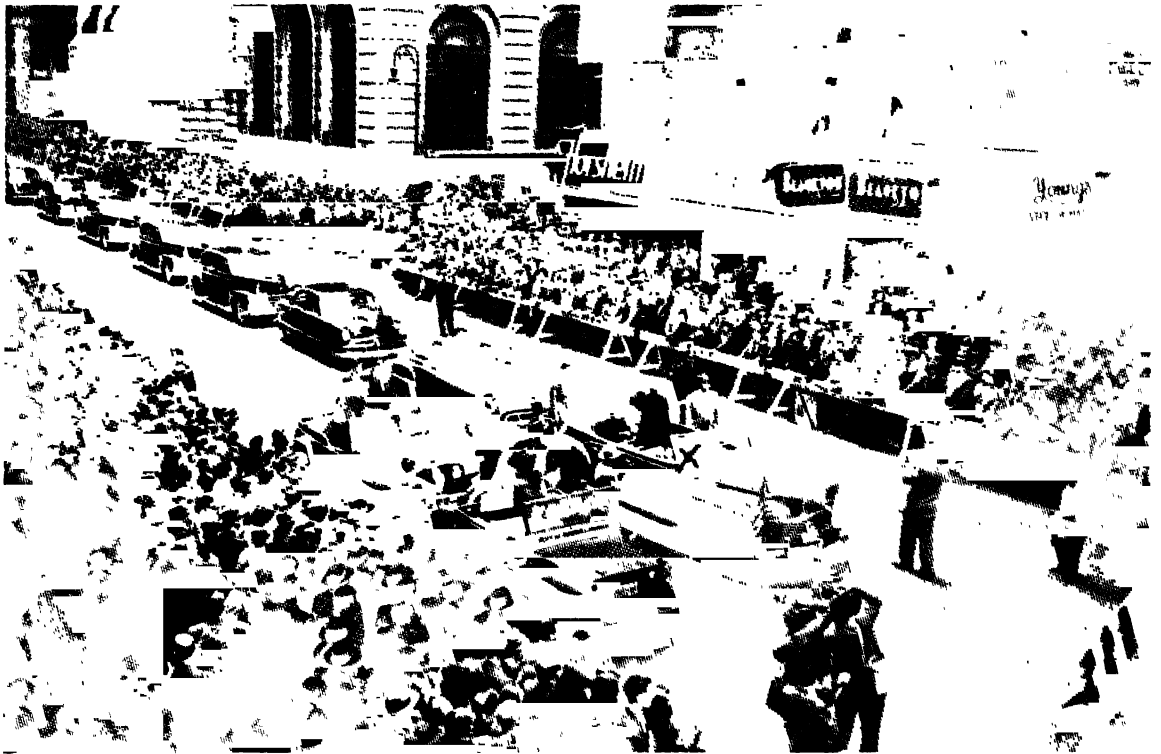
নিউ ইয়র্ক সিটি হলে পৌর-সম্বর্দ্ধনা সভায় পণ্ডিত নেহ্রু

নিউ ইয়র্কের পৌর সম্বর্দ্ধনায় যাইবার সময় জনতা কর্ত্তৃক পণ্ডিত নেহ্রুর অভ্যর্থনা।
ক্রসচিহ্নিত মোটরকারে পণ্ডিত নেহ্রু দণ্ডায়মান

[আনন্দবাজারের সৌজন্যে]

রাখিয়া দিবে এবং প্রয়োজন হইলেই ফিরাইয়া দিব
হইলেই ভাল হয়—বাবা মফস্বলে যাইবেন রাত্রি ন'টায়।"

শচীনবাবু "ইয়েস্" লিখিয়া দিলেন। ঝিরিয়া পাতাটা পেলিলে কাটিয়া-কুটিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

শচীনবাবু তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিতে উদ্যত হইলেন, তখন সাড়ে আটটা হইবে, সময়মাত্র আড়াই ঘণ্টা, ইহার মধ্যে কিরূপে টিন দুইটি পাঠানো যায় তাহা ভাবিতে ভাবিতে একটু বিপন্নই বোধ করিলেন। সদর রাস্তা দিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়, পুলিস ছাড়া বহু বেতনভোগী সংবাদদাতা সতত বিচরণশীল। ঝিরিয়াদের বাসার পিছন দিক দিয়া যে খালটা গিয়াছে তাহা দিয়া মাঝে মাঝে নৌকা যায় এই মাত্র।

পথে একটি মেয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিল—মুখখানি পরিচিত, নাম জানা নাই। মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে কহিল—শ্যামলী ভাল আছে, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

—ও হ্যাঁ! খবরটা তোমাদের দিদিমণিকে দিয়ে এস—তিনি বড্ড ব্যাকুল।

—তাঁকে দিয়েছি, তিনি আপনাকে বলতে বললেন—

—তুমি অঞ্জলিকে একটু খবর দিতে পার?

—দিচ্ছি।

শচীনবাবু বাসায় আসিয়া পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই অঞ্জলি আসিয়া হাজির। শচীনবাবু বলিলেন—তোমাদের টিন দিয়ে কি হবে?

অঞ্জলি বলিল—প্রথম পুলিস ব্যারাক পোড়ানো, দ্বিতীয় পোষ্টাপিস।

—ঝিরিয়া বললে, আমার এখানে নাকি সার্চ হবে।

অঞ্জলি বিস্ময়ে বলিল, তবে এক্ষুনি সরাতে হয়।

—কিন্তু কোথায়?

অঞ্জলি বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিল। শচীনবাবু বলিলেন, ঝিরিয়া বলেছে তার ওখানে রাখতে—১১টার মধ্যে—

—তা হয়। কিন্তু কে দেবে এখন?

—ধলারা কেউ।

—আচ্ছা আমি খবর দিয়ে যাচ্ছি।

মীরা খোকাকে ঘুম পাড়াইতেছিল। খোকা ঘুমাইয়াছে—মীরা বলিল, তুমি ত জেলে যাবেই, আজ হোক, কাল হোক। আমি কি করব?

—তুমি কি ভাবছ?

—আমি ত তোমাদের কাজ করব, তুমি জেলে গেলে আমি বসে থাকব না কিছুতেই।

—খোকা?

—তোমাদের কেউ নিশ্চয়ই রাখবে কাছে।

—তোমার এ সাহস কোথা থেকে হ'ল?

—এমনি ভাবে মেয়েদেরও যখন মেরেছে তখন এর প্রতি-বিধান করতে হবেই।

শচীনবাবু হাসিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই ধলা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জানাইল এ সামান্য কাজ সে অনায়াসেই করিতে পারিবে, নৌকা ভাড়া হইয়া গিয়াছে। ঐ পথে নৌকায় বাইতে বাইতে রাখিয়া যাইবে। আর একটি সংবাদ, তাহাদের নামেও নাকি অবিলম্বে ওয়ারেন্ট বাহির হইবে।

ধলা বলিল—তবে কি ফেরার হব?

—তোমরা সকলেই ফেরার হলে চলবে কেন? সে পরে দেখা যাবে। (ক্রমশঃ)

ঈপ্সিতা

শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী

তোমারে দেখেছি বাদামী রঙের সাড়ীতে
সুরভিত কচি অটুট চতুর্দশী,
তোমারে দেখেছি পূর্ণতা পানে বাড়িতে
রূপ-ঝলমল মুক্তপূর্ণশশী।

তোমারে দেখেছি রূপা-গলা এক প্রভাতে
রূপের প্লাবনে ভেসে চলা জলপরী,
তোমারে দেখেছি চলিষ্ণু দেব-সভাতে
মন-মন্দিত ছন্দিত অপ্সরী।

তুমি এসেছিলে পলকে ঝলকি কিনারে,
বিলোল-নয়না দীপ্ত তিলোত্তমা।
মধু ঢেলেছিলে আমার মনের মিনারে,
পুষ্পিত পাণি সুস্মিতা অনুপমা।

আমার কাননে ছড়ালে সুরের সুরভি,
কর্ণে কুহরি কঙ্কণ কিনিকিনি,
মঞ্জীরে তব মন-কেমনের পূরবী
ঈপ্সিতা মোর, চিনি গো তোমারে চিনি।

তুমি যে আমার আগামী প্রভাত-সবিতা,
মা-বলা বাণীতে রহিয়াছো বন্দুত,
তুমি যে আমার ক্ষণিকের কবিতা
তুমি বরাভয়, আমি ভীরু শঙ্কিত।

বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

যে-কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং শিল্পের প্রসার নির্ভর করে তাহার রেলপথের উন্নয়নের উপর। সেইজন্য

বি. এন. আর-এর জরীপ-মানচিত্র

রেলপথসমূহকে বাস্তবিকই দেশের রক্তবাহী শিরা বলা যাইতে পারে। এগুলির ভিতর দিয়াই প্রাণরস সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া জাতীয় জীবনকে পুষ্ট করিয়া থাকে।

বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে হইতেছে ভারতের অন্যতম প্রধান ধমনীস্বরূপ। বর্ত্তমানে ইহা ভারতবর্ষের ৩,৪০০ মাইল ব্যাপী বিরাট অঞ্চল জুড়িয়া বিস্তৃত এবং উক্ত অঞ্চল লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, তাম্র, কয়লা, চুণ প্রভৃতি বিবিধ খনিজ সম্পদ এবং কাঁচা মালে সমৃদ্ধ। এই সমস্ত কারণে স্বভাবতঃই ভারতের শিল্পোন্নয়নে এই রেলপথ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। যুদ্ধোত্তরকালে এই রেলপথের সংশ্লিষ্ট দুই হাজার মাইল জরীপ করা হইয়াছে। এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড যখন উক্ত রেলপথের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ট্রেন চলাচলের উপযোগী হইবে তখন বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের আয়তন হইবে ভারতের অন্য যে-কোনো রেলপথ অপেক্ষা বৃহত্তর। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, এই রেলপথের ভবিষ্যৎ বিপুল সম্ভাবনায় পূর্ণ।

১৮৮০ হইতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুর-ছত্তিশগড় মিটার গেজ ষ্টেট রেলপথ নির্ম্মিত হয়। এই রেলপথে নাগপুর হইতে রাজনান্দগাঁও পর্য্যন্ত ট্রেন চলাচল করিত। শেষে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী' রেজেষ্ট্রীকৃত হইলে পর উক্ত কোম্পানী এই রেলওয়ে ক্রয় করে। এই নবগঠিত কোম্পানী উক্ত রেলপথের স্বত্বাধিকারী হইয়া প্রথমেই নাগপুর রাজনান্দগাঁও লাইনকে মিটার গেজ হইতে ব্রড গেজ-এ পরিণত করে। ইহার পর কোম্পানী প্রধান লাইনসমূহ নির্ম্মাণে তৎপর হয় এবং তিন-চার বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি প্রধান এবং শাখা লাইন নির্ম্মিত হয়। ইষ্ট কোষ্ট (পূর্ব্ব-উপকূল) রেলওয়ের উত্তর অংশ নির্ম্মিত হয় ১৮৯৩ হইতে ৯৭-এর মধ্যে এবং এই লাইন ওয়ালটেয়ার হইতে কটক পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের এই সম্প্রসারণের ফলে কলিকাতা এবং মাদ্রাজের প্রধান প্রধান বন্দরগুলির মধ্যে রেলপথঘটিত প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয়। এর পর হইতে মুখ্যতঃ দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নয়নকল্পে আরও কতকগুলি শাখা লাইন খোলা হয়।

খড়্গপুর ষ্টেশন-প্রাঙ্গণ

এইভাবে দীর্ঘকাল বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর

তত্ত্বাবধানে উক্ত রেলপথের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। অবশেষে উক্ত কোম্পানী উঠিয়া গেলে পর বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আসে। বর্ত্তমানে ইহা ভারতের অন্যতম প্রধান সরকারী রেলপথ।

এই রেলপথদ্বারা কলিকাতা এবং ভিজাগাপটম ভারতের এই দুইটি শ্রেষ্ঠ বন্দরে পণ্যদ্রব্য চলাচলের ব্যবস্থা হইয়াছে। টাটানগরে অবস্থিত ভারতের বৃহত্তম ইস্পাতের কারখানার এবং বার্ন-পুরের কারখানার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের যোগস্থাপন এই রেলপথের দ্বারাই হইয়াছে। বিহার, উড়িষ্যা, বাংলা, মধ্যপ্রদেশ এবং মাদ্রাজের উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্পসম্পদ এই রেলপথের দ্বারাই ভারতের সর্ব্বত্র সরবরাহ হইয়া থাকে।

এই রেলপথের বিকাশ এবং উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ইহার কর্ম্মচারী-সংখ্যা এবং ব্যয়ভারও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪০-এ ইহার কর্ম্মচারীর

ভিজাগাপটম বন্দর

ঘুসির নিকটে 'দামুদিয়া ব্রিজ'

সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০,৮৯৪ জন, বর্ত্তমানে তাহা ১০৩,০০০ জনেরও অধিক। সুখের বিষয় যে, এই রেলপথে মাল চলাচল এবং যাত্রীদের গতায়াত উভয়ই যথেষ্ট বাড়িয়াছে। ১৯০৮ সালে এই রেলপথে ১২৪,৩১,০০০ জন যাত্রী এবং ১৩,৩২,০৮,০০০ মণ মাল বহন করিত; ১৯৪৮-৪৯-এ কিন্তু যাত্রীর সংখ্যা হইয়াছে ৫,১৬,১২,০০০ জন আর মালের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪১,১০,৬৮,০০০ মণ। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অঞ্চল বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক অঞ্চলে পরিণত হয়। এই অঞ্চলের প্রধান বিমান-ঘাঁটি-সমূহের কার্য্য-সৌকর্য্যার্থে প্রায় সত্তর মাইল 'সাইডিং' (প্রধান রেলপথের পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র রেলপথ) নির্ম্মিত হয়। ওয়ালটেয়ার, রায়পুর এবং অন্যত্রও সামরিক ঘাঁটিসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট আরও বহু মাইল ব্যাপী সাইডিং নির্ম্মিত হয়। অনেকগুলি প্রধান রেলওয়ে পুলের উপর, রেল-লাইনের পার্শ্বে সামরিক যানবাহন চলাচলের উপযোগী রাস্তা তৈয়ার করা হয়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন 'ইয়ার্ডে' পুনর্গঠন কার্য্যও শুরু করা হয়।

বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের সম্প্রসারণ ইত্যাদি সম্পর্কে যে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা যেমন ব্যাপক তেমনি বিরাট। ট্রেন চলাচলের উপযোগী দু' হাজার মাইল রাস্তা জরীপ ও এঞ্জীনিয়ারগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া রেলপথের খসড়া-নক্সা তৈরি করা হইয়াছে এবং আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রায় ২৬০ মাইল ব্যাপী একটি নূতন ব্রড গেজ রাস্তা নির্ম্মাণের পরীক্ষামূলক পরিকল্পনাও গৃহীত হইয়াছে।

গত বৎসর মার্চের মাঝে সম্বলপুরে মহানদীর উপরে একটি রেলওয়ে ব্রিজ নির্ম্মাণ শুরু হয়। ২৫টি খিলান সমন্বিত ২৭০০ ফুট দীর্ঘ এই পুলটি কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের মধ্যে যোগসূত্র-

স্বরূপ হইয়া থাকিবে এবং সম্বলপুরের সহিত রায়পুর ভিজিয়ানাগ্রাম শাখার যোগস্থাপনকারী ব্রড গেজ রেল লাইন এই পুলের উপর দিয়াই যাইবে। প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা ব্যয়ে যে বিশাল হীরাকুণ্ড বাঁধ নির্ম্মিত হইতেছে তাহার সহিতও এই লাইনের গুরুত্বপূর্ণ যোগ রহিয়াছে। এ ছাড়া রাওয়ানওয়ারা কয়লার খনি পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ মাইল দীর্ঘ একটি শাখা লাইন নির্ম্মাণের কাজ ১৯৪৭ সন হইতে সুরু হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে ৪৭০ মাইল দূরে মাদ্রাজ প্রদেশের ছত্রপুর নিকটে লাঙ্গুলিয়া নদীর উপরে বেঙ্গল নাগপুর-রেলওয়ের যে পুলটি আছে তাহার গার্ডার (কড়িকাঠ) ইত্যাদি নূতন করিয়া বসানোর কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই পুলের উপরকার গার্ডারগুলি আশানুরূপ দৃঢ় ছিল না বলিয়া আগে ইহার উপর দিয়া ভারী এঞ্জিন চলিতে পারিত না। তখন কেবলমাত্র হাল্‌কা এঞ্জিনগুলির গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করিয়া ইহার উপর দিয়া চালানো হইত, কিন্তু এখন সেই অসুবিধা দূর হইয়াছে।

মুদ্রামূল্য হ্রাস ও নূতন পরিস্থিতি

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ব্রিটেনের অর্থসচিব সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ঘোষণা করেন যে, ডলারের অনুপাতে পাউণ্ডের মূল্য কমাইয়া ৪·০৩ হইতে ২·৮০ করা হইল ও তদনুপাতে সোনার মূল্য বাড়িল। আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিলের এই পরিবর্ত্তনে সম্মতি ছিল কারণ এইরূপ পূর্ব্বসম্মতি ব্যতীত উক্ত তহবিলের সভ্যরাষ্ট্রগুলির মুদ্রামূল্য হ্রাস করিবার অধিকার নাই।

আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে তথা আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেত্রে বৈষম্য অনিবার্য্য হইয়া পড়িলেই এইরূপ ব্যবস্থা পূর্ব্বেও হইয়াছে। সুতরাং ব্রিটিশ অর্থসচিবের ঘোষণা আকস্মিক হইলেও অপ্রত্যাশিত নহে। গত জুন মাস হইতেই ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন ও বেলজিয়ম মার্শাল সাহায্য পাইবার ব্যাপারে ১৯টি দেশের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানে একমত হইতে পারে নাই। জুলাই মাসে ইউরোপের মার্শাল সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলির ডলার পাওয়া ব্যাপারে আরও জটিলতার এবং পরস্পরের লেনদেন সম্বন্ধে অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং ইংলণ্ডের স্বর্ণ-তহবিলের পরিমাণ দ্রুত কমিতে থাকে। ৭ই জুলাই ব্রিটিশ অর্থসচিব ঘোষণা করেন যে, ইংলণ্ডের স্বর্ণ-তহবিল—যাহা ১৯৪৭ সনে ৬৬,৪০,০০,০০০ পাউণ্ড ছিল তাহা কমিয়া ৪০,৩০,০০,০০০ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। তিনি তিন মাসের জন্য ডলার-এলাকা হইতে আমদানী বন্ধের সিদ্ধান্ত জানান। ইহার তিন দিন পরে ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মুখপাত্রগণ এক যুক্ত বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে বর্ত্তমান অচল অবস্থা নিরাকরণের জন্য সকল প্রকার চেষ্টা চলিতেছে। ইহার চারি দিন পরে অর্থাৎ ১৪ই জুলাই এক বিবৃতি দ্বারা সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ জানান যে, যুক্তরাষ্ট্র হইতে বৎসরের আমদানী ২৫ ভাগ অর্থাৎ ১,০০,০৯,০০০ পাউণ্ড কমাইয়া দেওয়া হইবে। ইহার চারি দিন পরে অর্থাৎ ১৮ই জুলাই ঘোষণা করা হয় যে, লণ্ডনে কমনওয়েলথ দেশগুলির অর্থসচিবগণ এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, অবিলম্বে যাহাতে ষ্টার্লিং এলাকায় স্বর্ণ-তহবিলের পরিমাণ হ্রাস না পায় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ২৩শে আগষ্ট আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের সভাপতি প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের জন্য লণ্ডনে সমবেত হইয়া এক আলোচনায় রত হন। ১৯৪৯-৫০ সনের মার্শাল সাহায্যের প্রস্তাবিত বরাদ্দ শতকরা ৩৬ অংশ কমাইয়া দেওয়ায় ক্রিপস ও বেভিন ওয়াশিংটনে গমন করেন এবং ৭ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়। ১০ই সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে জানান হয় যে, ডলার-এলাকা হইতে যাহাতে আরও বেশী অর্থ সরকারী ও বেসরকারী খাতে ষ্টার্লিং এলাকায় নিয়োজিত হয় সে বিষয়ে ত্রিশক্তি একমত হইয়াছে। আরও দুই দিন পরে অর্থাৎ ১২ই সেপ্টেম্বর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয় যে, ১৯৫২ সনের মধ্যে যাহাতে ইংলণ্ডের ডলার ঘাটতি বন্ধ হয়, ইংলণ্ড যাহাতে আরও স্বাধীনভাবে মার্শাল সাহায্যপ্রাপ্ত ডলার ব্যয় করিতে পারে, এই সম্পর্কে মার্কিন রপ্তানী-কর সংশোধন করা প্রভৃতির ব্যবস্থা হইবে। সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ১৭ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন। সুতরাং ১৮ই সেপ্টেম্বরের পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের ঘোষণা মোটেই অপ্রত্যাশিত নহে। স্বর্ণমূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধেও ঘোষণা করা হইল যে, অতঃপর এক আউন্স স্বর্ণের পূর্ব্বের দাম ১৭২ শিলিং ৩ পেন্স স্থলে ২৪৮ শিলিং হইবে। গত ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ড স্বর্ণমান (gold standard) পরিত্যাগ করে এবং নিজের স্বর্ণ-তহবিল রক্ষার জন্য মুদ্রামূল্য হ্রাস ব্যবস্থার আশ্রয় লয়। তখনও সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এইরূপ এক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল।

১৮ই সেপ্টেম্বরই ওয়াশিংটন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল হইতে পনরটি দেশের মুদ্রামূল্য হ্রাসের কথা ঘোষণা করা হয় এবং ইহাকে যথোপযুক্ত কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করা হয় (step in the right direction)।

ভারতবর্ষ—এক টাকা = ২১ যুক্তরাষ্ট্রীয় সেণ্ট

অষ্ট্রেলিয়া—এক পাউণ্ড = ২·২৪ ,, ডলার (পূর্ব্ব অনুপাত ৩·২২)

দক্ষিণ আফ্রিকা— ,, = ২·৮০ ,, ,,

মিশর—এক পাউণ্ড = ২·৮৭১ ,, ,,

ইরাক—এক দিনার = ২·৮০ ,, (পূর্ব্ব অনুপাত ৪·০৩)

নরওয়ে—ক্রোনার ৭·১৪২৮৬ = ১ ,, (পূর্ব্ব অনুপাত ৪·৯৬২৭৮

ডেনমার্ক— ,, ৬·৯০৭১৪ = ,, ,, (,, ৪·৭৯৯০১)

ইস্রাইল—এক পাউণ্ড = ২·৮০ ,, ,, (,, ৩·০০)

আয়ার— ,, = ২·৮০

কানাডা—এক ডলার = ১·১০ ,, ,, (শতকরা ১০ হ্রাস)

ফ্রান্স— ফ্রাঙ্ক ৩৫০ = ১ ,, ,, (পূর্ব্ব অনুপাত ৩৩০)

সেপ্টেম্বরের ২৩শে তারিখের মধ্যেই মোট ২৫টি দেশে মুদ্রামূল্য কমানো হয়, যথা—ইংলণ্ড, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়ম, ব্রহ্মদেশ, কানাডা, সিংহল, ডেনমার্ক, মিশর, ফিনল্যাণ্ড, ফরাসী দেশ, গ্রীস, হল্যাণ্ড, হংকং, আইসল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, আয়ার, ইরাক, ইস্রাইল, লুক্সেমবার্গ, নিউজিল্যাণ্ড, নরওয়ে, পর্ত্তুগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সুইডেন। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, ষ্টার্লিং মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়া কিরূপ ব্যাপক। ভারতের অর্থসচিব জন মাথাই সত্যই বলিয়াছেন যে, আত্মরক্ষা হিসাবে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস ব্যতীত বর্ত্তমান অবস্থায় গত্যন্তর ছিল না। ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসও অনুরূপ ঘোষণা করিয়া তাঁহার দেশবাসীকে জানাইয়াছেন যে, ব্রিটেনের রপ্তানী বৃদ্ধি করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। অবশ্য ডলারের মূল্য বৃদ্ধিতে দেশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে, কারণ খাদ্যদ্রব্য প্রধানতঃ আমেরিকা হইতে আমদানী হয়, কিন্তু এই অবস্থাকে মানিয়া লওয়া ও দুঃখকষ্ট সহ্য করা ছাড়া আর উপায় নাই। কয়েক বৎসর খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি চালাইতে পারিলে ভবিষ্যতে আমদানী-রপ্তানীর নূতন সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে, জাতির আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে বা রাখা যাইবে—ব্রিটিশ অর্থসচিব এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন এবং দেশবাসীকে সাময়িকভাবে সর্ব্বপ্রযত্নে উৎপাদন বৃদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করিতে বলিয়াছেন।

অবশ্য পাকিস্থান রাষ্ট্র ষ্টার্লিং এলাকার দেশ হইয়াও পাকিস্থানী টাকার মূল্য হ্রাস করে নাই, ডলারের অনুপাতে উহার টাকার পূর্ব্বমূল্য বজায় রহিল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য হইল এই যে, অন্যান্য যে-সকল মুদ্রামূল্য হ্রাস করা হইয়াছে পাকিস্থানী টাকার দর সেগুলির অনুপাতে বাড়িয়াছে। ২১শে সেপ্টেম্বর জানা যায়, পাকিস্থান নির্দ্ধারিত নূতন পাকিস্থানী টাকার মূল্য নিম্নলিখিত রূপ—

এক টাকা (পাকিস্থানী) = ২৫·৯ পেন্স (পূর্ব্ব মূল্য ১৮পেন্স)

এক পাউণ্ড = ৯·২৬ পাকিস্থানী টাকা

১০০৲ টাকা (পাকিস্থানী) = ১৪৪ ভারতীয় টাকা

১০০৲ টাকা (ভারতীয়) = ৬৯·৫০ পাকিস্থানী টাকা

দেশবিভাগের ফলে একই ভারতবর্ষে যেরূপ দুইটি স্বাধীন ও পারস্পরিক সম্পর্কবিহীন (?) রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে, পাকিস্থানের এই ঘোষণা দ্বারা সেইরূপ দুইটি মুদ্রা-এলাকার সৃষ্টি হইল। অর্থাৎ এখন ভারতের টাকা আর পাকিস্থানের টাকার সমমূল্যের রহিল না—ভারতবর্ষ ছাড়াও অন্যান্য মুদ্রামূল্য হ্রাসকারী দেশগুলির মুদ্রার তুলনায় পাকিস্থানী মুদ্রার দাম বাড়িল। কিন্তু আমেরিকার ডলারের সহিত পাকিস্থানের টাকার বিনিময়-মূল্যের পরিবর্ত্তন না হওয়ায় ৩৩০ পাকিস্থানী টাকা ১০০ মার্কিন ডলারের সমান রহিয়া গেল অথচ ভারতের মুদ্রাহ্রাসের বিধান অনুযায়ী ভারতীয় ৪৭১ টাকা ১০০ মার্কিন ডলারের সমান হইল। ইহার ফলে ভারতে আমদানী মার্কিন পণ্যের দাম বাড়িল অথচ পাকিস্থানে পূর্ব্বের দামই রহিয়া গেল। আবার ঐ যুক্তিতেই ইংলণ্ড হইতে আমদানী করা জিনিষের মূল্য পাকিস্থানে সস্তা হইয়া পড়িল। কারণ পূর্ব্বে একটি পাকিস্থানী ও ভারতীয় টাকায় ১৮ পেন্সের বিলাতী দ্রব্য পাওয়া যাইত, ভারতের মুদ্রায় এখনও ঐ হারে পাওয়া যাইবে, কিন্তু পাকিস্থান এক টাকায় পাইবে ২৫·৯ পেন্সের জিনিষ অর্থাৎ ৭·৯ পেন্সের (২৫·৯-১৮ = ৭·৯) বেশী মাল। অবশ্য যদি ইতিমধ্যে মাশুল, দ্রব্যমূল্য ইত্যাদি বৃদ্ধি না পায়। ইহাতে ভারতের দিক হইতে এইরূপ দাঁড়াইল যে, আমাদের দ্রব্য পাকিস্থানের বাজারে সস্তা হইল (প্রায় শতকরা ৩০) আর পাকিস্থানের মালের দর আমাদের বাজারে চড়া হইল। অবশ্য শুল্ক বসাইয়া এবং মূল্য বাড়াইয়া এই দ্রব্যমূল্যের ঊর্দ্ধ বা নিম্ন গতি সম্ভব। এইজন্যই ভারতবর্ষ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। পাকিস্থানও রপ্তানী-কর কমাইয়া তুলা প্রভৃতির ভারতীয় বাজারে রপ্তানী বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু পাটের বেলায় পাকিস্থান নিজেকে অধিক শক্তিমান মনে করিতেছে বলিয়া উহার রপ্তানী-কর কমাইতে বা স্থগিত করিতে এখন পর্য্যন্ত নারাজ। ইহা ব্যতীত এই নূতন ব্যবস্থা ভারতকে দিয়া স্বীকার করাইতে পারিলে ভারতের নিকট পাকিস্থানের যে ৩০০ কোটি টাকার ঋণ দেনা আছে, তাহার পরিমাণও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমিয়া যাইবে। এই

ব্যবস্থায় ভারত হইতে ১০০৲ মনিঅর্ডার করিলে পাকিস্থানে মাত্র ৬৯৷০ দেওয়া হইবে, অথবা ১৪৪৲ মনিঅর্ডার করিলে পাকিস্থানে ১০০৲ (পাকিস্থানী মুদ্রা) পাইতে পারিবে। আমদানী-রপ্তানী, দেনা-পাওনা, যাতায়াত প্রভৃতি ছাড়াও ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, এই নূতন ব্যবস্থায় এক দারুণ বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে খোলাখুলিভাবে আদান-প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পাকিস্থানের পাট ও তুলা আমদানী বন্ধ হইয়াছে এবং ভারতের কয়লা ও অন্যান্য রপ্তানী স্থগিত হইয়াছে। পূর্ব্বে দুই রাষ্ট্র এক ছিল—কাজেই এখন যাহারা পাকিস্থানের অধিবাসী তাহাদের অনেকের হাতে বিস্তর ভারতীয় মুদ্রা আছে—তাহার মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পাকিস্থানের অশিক্ষিত সাধারণ লোকেদের মধ্যে নোট ও টাকা—যাহা পূর্ব্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক পাকিস্থান সরকারের অনুমোদনে—ছাড়া হইয়াছিল, তাহার মূল্য হ্রাস বা অচল হইয়া পড়িয়াছে। ফলে আর্থিক ক্ষেত্রে দারুণ অবিশ্বাস দেখা দিয়াছে। ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে আর্থিক যোগাযোগ একেবারে ছিন্ন হইতে চলিয়াছে। ভারত ও পাকিস্থান এই দুই রাষ্ট্রের অধিবাসী, পরস্পর নির্ভরশীল ব্যক্তি ও পরিবারের আর্থিক দুর্গতি চরমে উঠিয়াছে, কারণ উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মনিঅর্ডার প্রভৃতি বন্ধ। ইহার উপর আবার উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে কতকগুলি দেনা-পাওনার অঙ্ক এখন পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। তাহার মীমাংসার আশা আরও সুদূরপরাহত হইল এবং পাওনাদারগণ যদি তাহাদের প্রাপ্য হইতে একেবারে বঞ্চিত হন তাহাতেও আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার কিছু নাই। অবশ্য ইহাতে পাকিস্থান রাষ্ট্রেরই বেশী লাভ হইবে, কারণ ভারতের পাওনার অঙ্কই বেশী। ভারতের অর্থমন্ত্রী ভারতীয় আইন পরিষদে পাকিস্থানের এই কার্য্যকে রাজনৈতিক চিন্তাপ্রণোদিত বলিয়া যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অমূলক নহে বলিয়াই মনে হয়। কারণ পাকিস্থানের ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৪৯-৫০ সনের আয়-ব্যয়ের অঙ্ক ৮৫ কোটি মূলধন বাবদ খরচের বরাদ্দ দেখা যায়। ইহার মধ্যে দেশের শিল্প উন্নয়ন খাতে মাত্র ৫॥০ কোটি টাকা। কিন্তু এক দেশরক্ষা (যুদ্ধ ও অস্ত্র) খাতে ৪৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই টাকায় আরও অধিক পরিমাণ অস্ত্র শস্ত্রাদি আমদানী করা পাকিস্থানী টাকার মূল্য হ্রাস না করিলেই সম্ভব হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পাকিস্থান এক ঢিলে বহু পাখী মারিতে অর্থাৎ এক মুদ্রামূল্য হ্রাস না করিয়া বহু সমস্যার সমাধান করিতে মনস্থ করিয়াছে।

কিন্তু দুনিয়ার আর সকলেও চোখ বুজিয়া বসিয়া নাই। তাহা ব্যতীত আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যাপারে আঘাত করিলেই প্রত্যাঘাত সহিতে হইবে। অন্যান্য দেশের প্রতি ব্যবস্থার সুবিধা—অসুবিধার, লাভ—লোকসানে পরিণত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ইহা যাহাতে না হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে কেবল ব্যবসাবাণিজ্য-ক্ষেত্রে নহে, আভ্যন্তরীণ আর্থিক সংগঠনেও সক্ষম হয় এজন্য আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ উভয় প্রতিষ্ঠানেরই বিশিষ্ট ও স্থায়ী সভ্য। আন্তর্জ্জাতিক অর্থতহবিলের সম্মতি লইয়া ভারতবর্ষ ব্রিটেনের সহিত টাকার মূল্য ডলারের অনুপাতে হ্রাস করিয়াছে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভারতের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি ও আন্তর্জ্জাতিক স্বার্থের সমন্বয় এই দুই উদ্দেশ্যেই এইরূপ করা হইয়াছে। অবশ্য ইহার প্রতিক্রিয়ার ফলাফল ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। পাকিস্থান উপরোক্ত কোন প্রতিষ্ঠানের সভ্য নহে, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্থানী মুদ্রার ভারতীয় টাকার অনুরূপ মর্য্যাদা নাই, এবং ইহার স্বর্ণ-মূল্যও (gold value) অনিশ্চিত, সুতরাং কতদিন এবং কি ভাবে পাকিস্থান তাহার নূতন মুদ্রা-বিনিময়-মূল্য রক্ষা করিবে তাহাই দেখিবার বিষয়। ইতিমধ্যে ব্রহ্মদেশ পাকিস্থানে চাউল রপ্তানী বন্ধ করিয়াছে এবং রপ্তানি করা কাঠের মূল্য পাকিস্থানী মুদ্রায় চাওয়া হইয়াছে। কিন্তু পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী হইতে সকল দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিই বলিতেছেন যে মুদ্রা সম্পর্কিত পাকিস্থানের ব্যবস্থার আর পরিবর্ত্তন হইবে না।

ব্রিটেনের এই মুদ্রামূল্য হ্রাসের কারণ বিশ্লেষণ করিলে সহজেই চোখে পড়ে যে, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে ক্রমেই সে দেশের রপ্তানীতে ঘাটতি পড়িতেছিল। এই রপ্তানী ঘাটতির অর্থই ব্রিটেনের ডলার তহবিলে ঘাটতি। কারণ রপ্তানী দ্বারাই আমদানী পণ্যের মূল্য পরিশোধ করা হয় ইহাই সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে আমদানী ও রপ্তানীর সাম্য রক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ডকে যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডা হইতে বা আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার হইতে কর্জ্জ লইতে হইবে। অবশ্য ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রের নিকটে মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ চাহিয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সনে রপ্তানীতে ক্রমাগত ঘাটতি চলিতে থাকে এবং ইংলণ্ডের স্বর্ণ-তহবিলের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। এইরূপ চলিতে থাকিলে স্বর্ণ-তহবিলের বিলুপ্তিও অসম্ভব নয়। রপ্তানী বাড়াইবার জন্য ইংরেজ জাতি গত দুই বৎসর সকল রকম ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। বলিতে কি, নিজেদের খাওয়া পরা কমাইয়া রপ্তানী বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। রপ্তানী বৃদ্ধি না করার অর্থ ব্রিটেনের পক্ষে দেউলিয়া হওয়ার পথে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু নহে। একদিকে ক্ষয়মান স্বর্ণ-তহবিল অন্যদিকে রপ্তানী-স্বল্পতা—এই উভয়সঙ্কটে ইংলণ্ডের

একমাত্র পন্থা রহিল মুদ্রামূল্য কমাইয়া দিয়া আমেরিকার বাজারে (ডলার এলাকায়) নিজের জিনিষ সস্তা করিয়া দেওয়া এবং রপ্তানী বৃদ্ধির শেষ চেষ্টা করা। আমেরিকারও এই অবস্থা স্বীকার করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। কারণ আর্থিক জগতে ইংলণ্ডের পতন হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া হইতে মার্কিন জাতি নিষ্কৃতি পাইবে না। তাহা ছাড়া মুদ্রামূল্য হ্রাসে ইংলণ্ডের আরও সুবিধা ছিল। যে সকল দেশের মুদ্রামূল্য-সমতায় গরমিল (Fundamental disequilibrium) সেই সকল দেশকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কর্জ দিতে পারে না। মূল্যহ্রাসের পূর্ববর্তী পাউণ্ড ও ডলার মূল্যে সাম্যের অভাব ছিল এজন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল হইতে ব্রিটেন কর্জ পাইবার অধিকারী ছিল না। কিন্তু পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের জন্য বিনিময় মূল্যের সাম্য স্থাপিত হইয়াছে এজন্য ব্রিটেন ৩২,৫০,০০,০০০ ডলার পর্য্যন্ত কর্জ পাইতে পারিবে। অবশ্য এই একই কারণে ভারতবর্ষ এবং অষ্ট্রেলিয়াও আন্তর্জাতিক মুদ্রা-তহবিল হইতে বেশী ধার পাইতে পারিবে। আমাদের টাকার মূল্য কেন পাউণ্ডের অনুপাতে কমানো হইল ইহার জবাবে ভারতের অর্থসচিব বলিয়াছেন যে, আমাদের বহির্বাণিজ্য এখনও ব্রিটেন ও ষ্টার্লিং এলাকার সহিত শতকরা ৭৫ ভাগ। সুতরাং ব্রিটেনের সহিত তাল না রাখিলে ভারতের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন হইয়াছে সুতরাং ষ্টার্লিং মুদ্রার অধীনতা স্বীকার করা আর উচিত নহে এবং উহার সমান তালে চলাও সমীচীন নহে। ইহার জবাবে অর্থসচিব জানাইয়াছেন যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের যে ধারা অনুযায়ী নির্দ্ধারিত টাকার মূল্যে পাউণ্ড ষ্টার্লিং ক্রয়-বিক্রয় করার ব্যবস্থা ছিল তাহা সংশোধন করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যে-কোন বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়ের (foreign exchange) অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কাজেই আইনের দিক হইতে ষ্টার্লিঙের সহিত টাকার গাঁঠছড়া বাঁধা আছে এই মত যুক্তিসহ নহে। ষ্টার্লিং এলাকায় থাকাই ভারতের স্বার্থ, কারণ এই এলাকার সম্পূর্ণ বহির্বাণিজ্যে যে ডলার পাওয়া বা সংগ্রহ হয় (pooled) তাহা এই এলাকার সকল দেশগুলির মধ্যে আবশ্যকমত ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এ পর্য্যন্ত ভারত এই তহবিল হইতে বেশী পাইয়াছে, কখনো কম পায় নাই। টাকা ষ্টার্লিঙের সহিত যুক্ত একথা যতটা সত্য, টাকা অন্যান্য বিদেশী মুদ্রার সহিতও যুক্ত ইহাও ততটাই সত্য।

ডলারের তুলনায় আমাদের টাকার মূল্য হ্রাস পাইল, ইহাতে মার্কিন দ্রব্যের মূল্য টাকার অঙ্কে বাড়িল ইহা সহজেই বুঝা যায়। ইহার প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবা দরকার। গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমরা আমেরিকা ও ডলার এলাকা হইতে কোটি কোটি টাকার খাদ্য-শস্য আমদানী করিতেছি। যদি এই আমদানী বন্ধ না করা যায় তবে দেশে খাদ্যের মূল্য বাড়িবে। যদি সরকার বেশী দামে কিনিয়া কম মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন, তবে দেশে কর বাড়াইয়া সে ঘাটতি পূরণ করিতে হইবে। সে করভারও পড়িবে দেশের লোকের উপর। অবশ্য কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরের শস্য আমদানী প্রায় শেষ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আর আমদানী হইবে না। আশার কথা বটে, তবে ইহার উপর ভরসা রাখিতে হইলে দেশবাসীকে আরও প্রচুর পরিমাণে খাদ্য-শস্য উৎপাদন করিতে হইবে যাহাতে দেশ এই বিষয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হয়। পণ্ডিত জবাহরলাল দেশবাসীকে কিছু অনশন অভ্যাস করিতে সদুপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, ভারতবর্ষের লোকসমষ্টির এক বিরাট সংখ্যক লোকই দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। বরং রাষ্ট্রের অনাবশ্যক ব্যয় ও অর্থের অপচয় বন্ধ করিতে পারিলে প্রকৃত কল্যাণ হইবে। মুদ্রামূল্য হ্রাস যে উদ্দেশ্যে করা হইল সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির অপর পন্থা হইল সরকারের ব্যয়ভার হ্রাস, উৎপাদনবৃদ্ধি এবং সকল প্রকার দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের চেষ্টা।

মার্কিন হইতে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্য প্রচুর মাল আমদানী করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই সকলের দাম বাড়িয়া গেল। সুতরাং হয় আমাদের পুরাতন বরাদ্দ অনুযায়ী কম মাল কিনিতে হইবে, নতুবা রপ্তানী বাড়াইয়া অধিক পরিমাণে ডলার সংগ্রহ করিতে হইবে। অবশ্য ভারতের দ্রব্যাদি এখন মার্কিন মুদ্রামূল্যে সস্তা হইবে এবং এজন্য পণ্যদ্রব্য, বিশেষতঃ পাট, চা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ এবং লঙ্কা ইত্যাদি বেশী রপ্তানীর সম্ভাবনা। কিন্তু পাটের ব্যাপারে ভারত-পাকিস্থানের বিনিময়ের গণ্ডগোল এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। যে সকল অত্যাবশ্যক ঔষধ প্রভৃতি আমেরিকা হইতে আসে তাহাদের দাম এখনই শতকরা ৬০ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে—ভবিষ্যতে আরও বাড়িবে। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য আগেকার আমদানী দ্রব্যের দাম যাহাতে না বাড়ে তাহার চেষ্টা করিতেছেন। আংশিকভাবে ইহা ফলপ্রদ হইতে পারে। তবে এই সকল দ্রব্যের আবার 'কালো-বাজার' সৃষ্টি হইতে চলিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতাই নিয়ন্ত্রিত বাজারের পার্শ্বে কালো-বাজারের সৃষ্টি করে।

কাজে কাজেই দেখা যাইতেছে, মুদ্রামূল্য হ্রাসের পরোক্ষ ফল হিসাবে মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যস্ফীতি দেখা দিতে পারে। যদি ইহা রোধ না করা যায় তাহা হইলে যে আশায় এই ব্যবস্থা করা হইল তাহা বিফল হইয়া যাইবে। এইজন্যই উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। বৃটিশ অর্থসচিব তাঁহার দেশবাসীকে খোলাখুলি বলিয়া দিয়াছেন যে, পাউণ্ডের মুদ্রামূল্য হ্রাসের অর্থ হইতেছে জীবন মূল্য বৃদ্ধি। দেশের

এবং জাতির ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া সকলকে দুঃখবরণ ও স্বার্থত্যাগে অভ্যস্ত হইতে হইবে। আমাদের দেশের কর্তাদেরও প্রায়ই এরূপ বলিতে শুনা যায়, কিন্তু আই. সি. এস ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীগণের মোটা মাহিনা ও সংখ্যাবাহুল্যের দরুন ও সরকারী অর্থ নানা ভাবে অপচয় হওয়ার জন্য জনসাধারণের মধ্যে সরকারের প্রতি কোন সহানুভূতিই পরিলক্ষিত হয় না। কথা ও কাজে সামঞ্জস্য বিধান না হইলে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎসাহিত হইবার কারণ দেখা যাইতেছে না। বর্ত্তমান সঙ্কট অতিক্রম করিতে না পারিলে অতীত পরাধীনতার গ্লানি পর্য্যন্ত যে স্বাধীনতালাভের পরবর্ত্তী অসফলতাকে হার মানাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তবে আশার কথা ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সচেতন হইয়াছেন এবং ঘোষণা করিয়াছেন বস্ত্র ও খাদ্যমূল্য শতকরা দশ অংশ কমাইবেন। অবশ্য এ বিষয়ে যথোচিত কার্য্যসূচী সরকার নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের, বিশেষতঃ উৎপাদনকারীদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতা না থাকিলে সাফল্যলাভ সম্ভব নহে। পুঁজিপতি ও শ্রমিকের লড়াই চলিবে অথচ উৎপাদন বাড়িবে ইহা আশা করা বাতুলতা মাত্র। আমরা বর্ত্তমানে এক দুষ্ট চক্রের (vicious circle) মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছি। ইহা ভেদ না করিতে পারিলে মঙ্গল নাই।

অবশ্য একদিকে যেমন মার্কিন মুলুক হইতে আমাদের আমদানী দ্রব্যের মূল্য শতকরা ত্রিশ টাকা বাড়িয়াছে অন্যদিকে তেমনি ডলার-মূল্যে টাকা সস্তা হওয়ায় এদেশে মার্কিন মূলধন নিয়োগ করা লাভজনক হইয়াছে। কিছুকাল হইতে ভারত ও পাকিস্থান পাল্লা দিয়া বিদেশী মূলধন নিয়োগ করিতেছে। বিদেশী মূলধনের আবশ্যকতা অস্বীকার না করিলেও ইহার ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া বা আশঙ্কার কথা স্মরণ রাখিতে হয়। মূলধন প্রদানের অছিলায় কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পররাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু ইহা তো সত্য যে, কর্জ্জ করা মূলধন কোন এক দিন পরিশোধ করিতে হইবে এবং মূলধনের উপর রীতিমত সুদ দিতে হইবে। ইহার অর্থই হইতেছে যে, কর্জ্জ করা মূলধন (অর্থাৎ বিদেশ হইতে আমদানী করা উৎপাদনের দ্রব্যাদি—capital goods) উপযুক্ত রূপে খাটাইতে হইবে। তাহা না করিলে আমাদের দায় বাড়িবে, আয় বাড়িবে না। শেষ পর্য্যন্ত রপ্তানী বাড়াইয়া সুদ ও আসল শোধ করিতে হইবে। ধরুন, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার জন্য দশ বৎসরে ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে। এই টাকার একটা বৃহৎ অংশ বাহিরের মূলধন। পরিকল্পনা সফল হইলে দেশবাসী সত্যসত্যই লাভবান হইবে। উৎপাদনবৃদ্ধি (কৃষি, বিদ্যুৎ, ইত্যাদি) হইতেই মূলধন ও সুদ পরিশোধ করার পরেও যাহা থাকিবে দেশবাসী তাহা ভোগ করিতে থাকিবে এবং দেশ স্থায়ীভাবে আর্থিক উন্নতির এক ধাপ উপরে উঠিবে। সুতরাং আসল কথা হইতেছে অপচয় নিবারণ এবং আর্থিক উন্নতির জন্য দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি ও সমবেত চেষ্টা। ইহা আত্মরক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক। এই সহজ কথা দেশের লোক বুঝিলে শুধু অপরের সমালোচনা করিয়াই দায়িত্ব শেষ হইল একথা না ভাবিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারিবে।

মুদ্রামূল্য হ্রাস আর্থিক সমস্যা সমাধানের একটা পথ মাত্র এবং এই পথে পা দিলে আবার বহু সমস্যার সম্মুখীন হইবার সম্ভাবনা। এই নূতন সমস্যাগুলিরও সমাধানের প্রয়োজন। এই সমাধানের জন্য চাই অক্লান্ত পরিশ্রম ও জাতীয় শক্তির সর্ব্বতোমুখী প্রয়োগ। মাহিনাবৃদ্ধির আন্দোলন কেবল মাহিনা বৃদ্ধির দ্বারা আরও জটিলতার সৃষ্টি করে। লোকের প্রাথমিক প্রয়োজন খাওয়া-পরার সংস্থান ও বাসগৃহের ব্যবস্থা। সমস্তই উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক মাত্র। সমস্যা এড়াইয়া সমস্যার সমাধান কূট রাজনীতির অঙ্গ হইলেও অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মে তাহা ব্যাহত হইতে বাধ্য।

রাসবিহারী বসু

শ্রীসোমেন্দ্রনাথ রায়

যখন ব্রিটিশরাজ বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর মাথার জন্য বেশ মোটা টাকা ঘোষণা করেন, তখন দেশের অবস্থা বিবেচনা করে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে কোন স্বাধীন দেশে গিয়ে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করতে লাগলেন। বিপ্লবী রাসবিহারীর ভারত-মাতার আশ্রয় ছেড়ে যাবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পরিশেষে বন্ধুদের পরামর্শে জাপানে গিয়ে কিছুদিন আত্ম-গোপন করে থাকাই স্থির হ'ল।

তখন পাসপোর্টের ব্যবস্থা ছিল না। একটা ছাড়পত্র পুলিস কমিশনারের দপ্তর থেকে নিতে হ'ত। রাসবিহারীর জন্য চারদিকে পুলিস গুপ্তচরের ঘোরাঘুরির হিড়িক খুবই ছিল। তা সত্ত্বেও রাসবিহারী সহসা একদিন নিজে পুলিস কমিশনারের দপ্তরে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন—"আমি রবীন্দ্রনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারী। কবি জাপান যাবেন। আমাকে আগে গিয়ে ওখানে সব ব্যবস্থা করতে হবে, কাজেই ছাড়পত্র নিতে এসেছি।" তখনই ছাড়-পত্রের ব্যবস্থা হয়ে গেল। রাসবিহারী ছাড়পত্র নিয়ে হাসতে হাসতে চলে এলেন। যে রাসবিহারীকে ধরবার জন্য বড় বড় ষ্টেশন এবং থানায় থানায় তাঁর ফটো রেখে দিয়ে মোটা টাকা ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই রাসবিহারী স্বয়ং কমিশনার সাহেবকে দর্শন দিলেন, অথচ সাহেবের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হ'ল না।

এই রকম কতবার হয়েছে তাঁর জীবনে। তাই যে-কথা তিনি নিজে প্রায়ই বলতেন তারই পুনরাবৃত্তি করি—"রাখে কেষ্ট মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে।" ভগবানের প্রতি রাসবিহারীর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। সিমলা থেকে আরম্ভ করে অনেক জায়গায় তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এই সকল মন্দিরে ভক্তেরা এসে মায়ের শৃঙ্খল কি ভাবে মোচন করা যায় তার পরামর্শ করতেন।

জাহাজ ঠিক করে রাসবিহারী খিদিরপুরে রওনা হলেন। সঙ্গে অনুশীলন সমিতির শ্রীশচীন সান্যাল ও গিরিজাবাবু গেলেন পৌঁছে দিতে। কে জানত দেশ থেকে এই তাঁর শেষ বিদায়।

প্রথম শ্রেণীর আরোহী রাসবিহারী, জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আগে থেকেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন, জাহাজ ছাড়বার পরে প্রথম ২।১ দিন তিনি ক্যাপ্টেনের সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করলেন। একদিন অনুমতি নিয়ে 'ডেকে' আরোহীদের অবস্থা এবং ব্যবস্থা দেখে ফিরে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে বললেন—ডেকে আমার যে সকল ভায়েরা কষ্ট করে যাচ্ছেন আমি তাঁদের সঙ্গে খেতে চাই। তার পর থেকে রাসবিহারী ওদের সহিত ডেকে বসে খেতেন এবং সব সময়েই তাদের সঙ্গে থেকেই সময় কাটাতেন। কিন্তু তাঁর
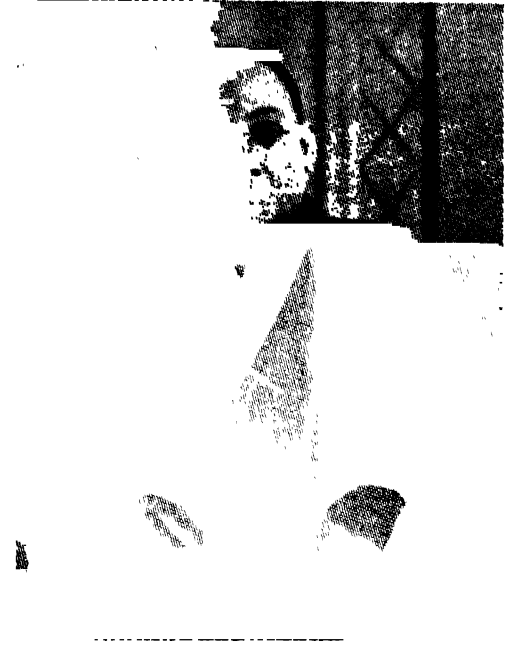
রাসবিহারী বসু

ডেকের সহযাত্রীরা জানতেন না যে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী তাঁদের সঙ্গী। এদের সাহচর্যে দেশের সঙ্গে বিচ্ছেদের ব্যথা ভুলবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু পারতেন না। আন্দামান যেমন নিকটে এল, দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন এবং ক্যাপ্টেনের অনুমতি নিয়ে জাহাজের মাস্তলে গিয়ে উঠলেন। তখন রাত্রি প্রায় ১২টা, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই; যতক্ষণ দেখা গেল একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন—এই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল। নেমে এসে ক্যাপ্টেনকে বললেন—দেখ, এই জায়গায় আমার দেশের কত ভাই যে পশুর চেয়েও খারাপ অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছেন তা তুমি না দেখলে বুঝবে না।—জাহাজ সিঙ্গাপুরে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গেই রাসবিহারী বিপদে পড়লেন। ব্রিটিশ সরকার খবর পেলেন রাসবিহারী ঐদিকে যাচ্ছেন। সিঙ্গাপুর পুলিসকে কড়া হুকুম দেওয়া হ'ল যে, বিপ্লবী রাসবিহারী জাহাজে ঐদিকে যাচ্ছেন, কাজেই

ওদিকে কোন জাহাজ পৌঁছালে যেন অনুসন্ধান করা হয় এবং প্রত্যেককে থানায় নিয়ে গিয়ে যেন নাম সহি করানো হয়। এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, রাসবিহারীর ডান হাতের আঙুলে ছিল কাটার দাগ, ঐ দাগ দেখে তাঁকে ধরা যাবে।

টোকিওর নিকটে পাহাড়ের উপর রাসবিহারী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্মৃতি-ফলক

এদিকে রাসবিহারীর জাহাজ বন্দরে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র পুলিসবাহিনী এসে জাহাজ ঘেরাও করল এবং তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করার পরে হুকুম হ'ল—প্রত্যেককে থানায় গিয়ে নাম সহি করতে হবে। প্রথম ডেকের যাত্রীদের পালা, তার পর দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর আরোহীদের। যাত্রীরা তো সব রেগে আগুন, একজন বিপ্লবীর জন্য সকলকে কষ্ট দেওয়া—এ কি রকম ব্যবস্থা। রাসবিহারীও সকলের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং দলের সহিত হৈ চৈ করতে করতে পুলিস বেষ্টিত হয়ে থানায় উপস্থিত হলেন। পুলিস-প্রধানের অবস্থা দেখে রাসবিহারী বুঝলেন যে, এর হাত থেকে সহজেই রেহাই পাওয়া যাবে। কারণ ডেকের যাত্রীদের সহি এবং আঙুলের দিকে নজর দিতে দিতে ওর মাথা প্রায় গুলিয়ে গিয়েছিল। রাসবিহারী নাম সহির সময় আসবার আগেই পুলিস-প্রধানকে সিগারেট দিয়ে এবং কথায় কথায় আরও অন্যমনস্ক করে ফেললেন এবং যেই নিজের নাম সহি করবার সময় হ'ল, তার আগে পুলিসকে একটা এবং অন্য দুই তিন জনকে দুই তিনটা সিগারেট দিয়ে নিজে একটা ধরালেন আর নকল নাম সহি করে সিগারেট টানতে টানতে জাহাজে এলেন। জাহাজ ছেড়ে দিলে। হংকং থেকে ডেক যাত্রীদের সঙ্গে যথাসময়ে তিনি জাপানে গেলেন।

জাপানে গিয়ে তিনি এক বৎসর আত্মগোপন করে ছিলেন এবং অবসর সময়ের সবটুকু জাপানী ভাষা শেখবার জন্য ব্যয় করতেন। এক বৎসরে জাপানী ভাষা এত ভাল ভাবে আয়ত্ত করেছিলেন যে, শিক্ষিত জাপানী মহলে যখন কিছু বলতেন, সকলে আশ্চর্য্য হয়ে যেত। উপরন্তু অল্প সময়ের ভেতর অনেকের শ্রদ্ধা অর্জন করে তিনি তাদের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বিখ্যাত নাকামুরা পরিবারের মেয়েদের রাসবিহারী কিছুদিন ইংরেজী ভাষা শেখাতে আরম্ভ করেন এবং মেয়েদের কাছ থেকে নিজেও জাপানী ভাষা শিক্ষায় সাহায্য পান। জাপানী ভাষায় তিনি অনেক বই লিখেছেন এবং সেগুলি সেদেশে খুবই উচ্চ স্থান অধিকার করে আছে।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশরাজ টের পেলেন যে, রাসবিহারী জাপানে আত্মগোপন করে আছেন, তখন জাপান গবর্ণমেণ্টকে দিয়ে রাসবিহারীকে ধরবার চেষ্টা চলতে লাগল—জাপান গবর্ণমেণ্টকে পুরস্কারস্বরূপ অনেক টাকা ভেট দেবার লোভও দেখানো হয়েছিল। ব্রিটিশ গুপ্তচরেরাও তাঁর সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এই সময়ে তিনি নাকামুরার বড় মেয়েকে বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রী এবং বন্ধুদের চেষ্টায় সে যাত্রা ব্রিটিশরাজ কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। জাপান গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ সরকারকে জানালেন, আমার প্রজা-কন্যাকে রাসবিহারী বিবাহ করেছেন, কাজেই আইনতঃ আমাদের কিছু করবার নেই, সেজন্য আমরা দুঃখিত। এই ব্যাপারের পর রাসবিহারী তাঁর শ্বশুরের সঙ্গে ব্যবসায়ে লিপ্ত হন, নিজের কর্ম্মশক্তি এবং বুদ্ধির দ্বারা তিনি সেই প্রতিষ্ঠানটিকে অনেক বড় করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি জাপানে সর্ব্বত্র 'নাকামুরায়া' নামে পরিচিত। এর বাৎসরিক আয় ছিল কয়েক লক্ষ টাকা।

রাসবিহারীর স্ত্রী একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রেখে পরলোকগমন করেন। ইহার কিছুকাল পরেই আবার ব্রিটিশরাজ রাসবিহারীকে ধরবার চেষ্টা করেন। তখন তাঁর বন্ধুরা গিয়ে ব্ল্যাক ড্রাগন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা তয়ামাকে গিয়ে ধরেন। জাপান গবর্ণমেণ্ট রাসবিহারীকে ধরে দেবার জন্য হুকুম দেন এবং তারা তাঁকে খুঁজতে থাকে। ঠিক এই সময় তয়ামা বললেন, বসুকে আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিও। রাসবিহারী তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। জাপানী পুলিস খবর পেলে তয়ামা তাঁকে নিজবাড়ীতে স্থান দিয়েছেন। পুলিস গবর্ণমেণ্টকে জানাল, বোসকে পাওয়া যাচ্ছে না—কাজেই ব্রিটিশরাজ কিছু করতে পারলেন না। তয়ামা মহাশয় সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর শিষ্যও ছিল অনেক, নিজে কোন কিছুর ভেতরে থাকতেন না, কিন্তু যদি বুঝতেন যে, তাঁর গবর্ণমেণ্ট কি দেশের লোক কিছু অন্যায় করছেন, অমনি তার প্রতিবাদ করতেন এবং তাঁকে

রুখবার সাধ্য কারও ছিল না। রুশ-জাপান যুদ্ধ প্রধানতঃ তয়ামার প্ররোচনায় হয়েছিল। গোড়ায় গবর্ণমেন্টের ইচ্ছা ছিল না, তিনিই জাপান গবর্ণমেন্টকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য করেন।

দুঃখকষ্ট এবং কর্মব্যস্ততার মধ্যেও রাসবিহারী তাঁর দেশের সহকর্মীদের কখনও ভুলতে পারেন নি এবং যাঁরা দেশ-মাতৃকার বেদীমূলে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে মায়ের পূজা করে গেছেন, তাঁদের স্মৃতিরক্ষার জন্য টোকিও থেকে কিছু দূরে পাহাড়ের উপর সুন্দর পাইন গাছের তলায় স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। প্রায়ই অবসর সময়ে পাহাড়ের উপর তাঁর নিজস্ব বাড়ীতে গিয়ে থাকতেন, এবং নির্জনে স্মৃতি-ফলকের কাছে বসে আত্মত্যাগী এবং মৃত্যুঞ্জয়ী বন্ধুদের কথা স্মরণ করে অভিভূত হয়ে পড়তেন।

ভারতের এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের ছেলেদের জন্য তিনি টোকিওতে 'এশিয়া লজ' নামে একটি সুন্দর ছাত্রনিবাস স্থাপন করেন যাতে গরীব ছেলেরা গিয়ে স্বাধীন দেশের পরিবেশ দেখে পরাধীনতার গ্লানি সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে। অধিকাংশ ছেলের থাকা খাওয়ার ব্যয় তিনি নিজেই বহন করতেন। বলতেন—দেখ, আমি এই ছাত্রাবাস বড়লোকের ছেলেদের জন্য করি নি। যাঁদের টাকা আছে তারা বড় বড় হোটেলে থাকতে পারবে। এটা গরীবদের প্রতিষ্ঠান। এখানে এসে আমার দেশের ছেলেরা চোখ মেলে দেখে যাক এরা কি করছে, দেশকে এরা কত ভালবাসে। রাসবিহারী জাপানের অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই জড়িত ছিলেন এবং মুক্ত হস্তে অর্থ দান করতেন।

তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্য অনেক শিক্ষাকেন্দ্র ও নানা প্রতিষ্ঠান থেকে অনুরোধ আসত এবং সময় পেলেই তিনি গিয়ে তাদের অনুরোধ রক্ষা করতেন। এশিয়াবাসীর জন্য তিনি জাপানে কালচারাল এসোসিয়েশন স্থাপন করেন। এশিয়ার মনীষীদের মধ্যে কেউ জাপানে গেলে তাঁর সঙ্গে উক্ত সমিতির সভ্যদের তিনি নানা বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করতেন। তা ছাড়া উক্ত সমিতির জাপানী পণ্ডিত এবং সভ্যদের মধ্যে কেউ কেউ কোন বিশেষ বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করতেন। এই ভাবে পরস্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হ'ত। এর অধিকাংশ ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করতেন। রাসবিহারী জাপানের প্রজা হবার পরেও (১৯৩৪ সাল) ব্রিটিশরাজ আরও একবার তাঁকে ধরে আনবার জন্য লোক পাঠান। একজন পার্সি গিয়ে এশিয়া লজে উঠেন এবং রাসবিহারীকে ধরবার চেষ্টা করেন, কিন্তু জাপানী পুলিস খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটির আর পাত্তা পাওয়া যায় নি।

স্মৃতি-ফলকের সম্মুখে রাসবিহারী বসু

তারপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাসবিহারী দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং তাঁরই চেষ্টায় প্রথমে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়। রাসবিহারী ছাড়া অন্য কেউ সেই সময় কোন প্রতিষ্ঠান গড়তে গেলে জাপানীরা বোধ হয় সেটিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করত। রাসবিহারী শেষে নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রকে জার্মানী থেকে আনিয়ে তাঁর হাতে সব ভার ছেড়ে দিলেন।

রাসবিহারী নিঃস্বার্থভাবে দেশসেবা করে গেছেন এবং কি করে দেশকে স্বাধীন করা যায় এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। যাতে ভারত জাপানের হাতে না যায় সেই উদ্দেশ্যে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজকে রীতিমত আঁটঘাট বেঁধে গঠন করেন। জাপানীরা ভারত জয় করলে তার অবস্থা অন্য আকার ধারণ করত। তা বুঝেই তিনি আগে থেকে জাপানীদের নানা ভাবে বুঝিয়ে তবে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করতে পেরেছিলেন। দেশের নিমিত্ত দুঃখকষ্ট বরণ এবং ত্যাগস্বীকার করায় রাসবিহারীকে জাপানীরা শ্রদ্ধা করত।

তাঁর সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা দেশের স্বাধীনতালাভ আজ আংশিক ভাবে পূরণ হয়েছে, কিন্তু তাঁর আর একটি ইচ্ছা ছিল দেশে ফেরবার। জাপানে ছেলেমেয়ে, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবই ছিল, কিন্তু দেশের কথা মনে পড়লে অথবা কেউ যখন দেশে ফেরবার জন্য তাঁর কাছে বিদায় নিতে যেতেন তখনই সেই বজ্রাদপি কঠোর বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠের চোখ দুটি ছল ছল করে উঠত।

দার্জিলিঙে

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

টাইগার হিল, টাইগার হিল, টাইগার হিল চল্,
কেউ-বা মোটরে, কেউ-বা ঘোড়ায়, কেউ কেউ পায়দল।
সারি বেঁধে চলে রাত্রি দুপরে
পদাতিক দল পথের উপরে,
পাঁচটার আগে পৌঁছিতে হবে
মন তাই উচ্ছল,
টাইগার হিল, টাইগার হিল, টাইগার হিল চল্।

গভীর রাত্রে যাত্রী জাগাতে মোটর-হর্ণ বাজে,
ঘুমিয়েছে যারা ধড়মড়ি উঠি' তারা তাড়াতাড়ি সাজে।
ঘোড়াওয়ালারা রাত্রি দুটায়
বন্ধুর পথে অশ্ব ছুটায়,
যায় না-কো যারা মুখের উপর
রাগ টেনে দেয় লাজে,
মনের ভিতর শিখরে যাবার মোটর-হর্ণ বাজে।

দার্জিলিঙের শৈলনিবাসে এসেছি আমরা সবে,
পথের দু ধারে চৌপর মাথায় দেবদারু-রাজি শোভে।
কখনো-বা রবি কুয়াশায় ঢাকা,
'ফগ' যারে বলে, তাল ব'লে রাখা,
কখনো-বা রবি উদ্ভাসিত সে
উজ্জ্বল নীল নভে,
দার্জিলিঙের নব নব কত দৃশ্য দেখেছি সবে।

যখন-সে দিন গুণ্ঠনহীন আকাশেতে মেঘ নাই,
দার্জিলিঙের রূপের তুলনা তখন কোথায় পাই?
শোভায় অতুল শৈলনগরী,
হিমালয় ত'রে আছে ক্রোড়ে ধরি,
রাজে অসংখ্য গিরির শৃঙ্গ
যখন যেদিকে চাই,
উজ্জ্বল দিন গুণ্ঠনহীন, আকাশেতে মেঘ নাই।

সন্ধ্যায় রূপ দেখেছি তোমার, তুমি যে শৈলরাণী,
কলরবহীন নির্জনতায় শুনেছি তোমার বাণী।
দীপালি সাজানো উঁচুতে নীচুতে,
বর্ণিতে শোভা পারি নে কিছুতে,
গন্ধর্ব্বের পুরী বুঝি এই
পর্ব্বত-রাজধানী,
তারায় খচিত আকাশের নীচে শোভিছ শৈলরাণী।

শান্ত নয়নে চেয়ে আছে চাঁদ অনন্ত স্নেহ-ভরে,
সুদূরের কোন্ সুরের মতন জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়ে।
আজ কোজাগরী রাত্রি জাগিয়া,
নূতন উষার উদয় লাগিয়া
নত-উন্নত পথ বাহি উঠি
শৈল শীর্ষ 'পরে,
পূর্ণচন্দ্র প্রতীক্ষা করে একান্ত স্নেহ-ভরে।

টাইগার হিল, টাইগার হিল, টাইগার হিল চল্,
উষা-আগমন দেখিতে আমার মন হ'ল চঞ্চল।
এসেছি আমরা গিরির চূড়ায়
যেথায় দেবতা কেতন উড়ায়,
বিচিত্র কত বর্ণ-বিভায়
দিগন্ত ঝলমল,
টাইগার হিল, টাইগার হিল, টাইগার হিল চল্।

দেখেছি দেখেছি অপূর্ব্ব সেই নবীন সূর্য্যোদয়,
দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা-শিখরে সোনার প্লাবন বয়।
প্রণমি আমার আলোর দেবতা,
কি তুমি, কে তুমি, কেমনে কব তা,
সুবর্ণ রথ, অরুণ সারথি,
কি পরম বিস্ময়!
উদয়-অচলে দেখেছি আমরা নবীন সূর্য্যোদয়।

হরিণঘাটা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে "হরিণঘাটা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহার পর গত ১০ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতির সভাপতি শ্রীযুত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং সমিতির অন্যান্য সভ্যদের সহিত আমিও হরিণঘাটা গিয়াছিলাম। হরিণঘাটা দেখিবার পূর্ব্বে প্রবন্ধে যে সকল বিষয় সাধারণভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম এবং মোটামুটি ভাবে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, হরিণঘাটা দেখিবার পর সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে মতের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন বলিয়া মনে হইতেছে না। বরং সেখানে এমন অনেক অভিনব ব্যাপার দেখিয়াছিলাম যাহা আমার পক্ষের মতই প্রবলতর ভাবে সমর্থন করে এবং আরও দৃঢ়তার সহিত বলা যায় যে, অযথা অজস্র অর্থের অপচয় হইতেছে।

গত ১১ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা বেলগাছিয়া পশু-মহাবিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গ ভেটিরিনারী এসোসিয়েশনের উদ্যোগে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীভূপতিচরণ মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। উক্ত সভায় ভারত-গবর্ণমেণ্টের পশু-বিশেষজ্ঞ (এনিম্যাল হাজবেণ্ড্রি কমিশনার) মিঃ পি. এন. নন্দা আমাদের দেশের গো-জাতির উন্নতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন। তিনি সম্মানজনক বিলাতী উপাধি অর্জন করিয়াছেন এবং একজন উঁচুদরের বৈজ্ঞানিক ও পশুবিশেষজ্ঞ, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় শ্রোতাদের চমক লাগাইবার প্রয়াস ছিল না, তাঁহার কথাগুলি সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য হইয়াছিল। সভার শেষে এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনাও হইয়াছিল। মিঃ নন্দা যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অনেকগুলিই হরিণঘাটা সম্বন্ধে প্রযোজ্য এবং আমার প্রবন্ধে লিখিত মতেরও সমর্থন তাহাতে পাইতেছি। সুতরাং তাঁহার কথাগুলি আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাজে লাগিতে পারে ভাবিয়া একে একে সেগুলির উল্লেখ করিতেছি:—

১। বিভিন্ন আবহাওয়া ও অবস্থাযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উপযোগী বিভিন্ন রকমের (type) গো-জাতির প্রয়োজন। এমন কি, একই প্রদেশের সকল অঞ্চলে একই রকমের গরু উপযোগী না হইতেও পারে। এই উদ্দেশ্যে যুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপযোগী গো-জাতির প্রজননের জন্য বিভিন্ন রকমের গরু লইয়া পরীক্ষা ও গবেষণা করা হইতেছে।

২। স্থানীয় গো-জাতি যদি অবনতির চরম সীমায় না পৌঁছিয়া থাকে এবং কতকগুলি বিশেষ গুণ (Quality) সম্পন্ন স্থানীয় গরু যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে স্থানীয় গরু

হরিণঘাটা পরিদর্শনকারিগণ

নির্ব্বাচনের দ্বারাই গো-জাতির উন্নতিসাধন অধিকতর বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মূল বংশের (basic stock) যদি খুবই অবনতি হইয়া থাকে তাহা হইলে অধিকতর সময় লাগিবে।

৩। এক জোড়া ষাঁড় ও গাভীর সম্মিলনে অধিক দুগ্ধবতী গাভীর জন্ম হইতে পারে, কিন্তু সেই ষাঁড় ও গাভীর মিলনে অধিক পরিশ্রমশীল বলদ জন্মিতে পারে না।

৪। খাদ্যের এবং গোচারণের জমির উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়া গো-জাতির উন্নতির চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে, বিশেষতঃ যদি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গরু গো-জাতির এই উন্নতিসাধনে ব্যবহৃত হয়। খাদ্যকেই সর্ব্বপ্রথমে প্রাধান্য দিতে হইবে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের সকল স্থানেই গো-খাদ্যের খুবই অভাব আছে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে গরুর খাদ্যব্যবস্থার সমাধান করা উচিত।

৫। গো-জাতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ স্থানীয় বেসরকারী ব্যক্তিগণ এবং গোজাতির প্রজনন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কোন্ অঞ্চলে কোন্ ধরণের গরু প্রয়োজন

তাহা নির্দ্ধারণ করা একান্ত দরকার। কোনও পরিকল্পনা প্রস্তুতের সময় খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে জনসাধারণের বর্ত্তমান সুবিধা এবং অসুবিধা উভয়দিকই বিবেচনা করিতে হইবে।

৬। গো-জাতির উন্নতিবিধানের সকল প্রচেষ্টা এইরূপ হওয়া দরকার যাহার ফল জনসাধারণ তাহাদের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থায়ও অতি সহজে লাভ করিয়া উপকৃত হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত নন্দা আরও বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে একই রকমের ও একই মানের পশু-চিকিৎসা-শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং পশু-চিকিৎসা শিক্ষায়তনগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারতের অনেক

হরিণঘাটার গোশালায় গরু রাখিবার উন্নত ধরণের ব্যবস্থা

প্রদেশের পশু-চিকিৎসা শিক্ষায়তনগুলির শিক্ষার 'মান' উন্নত করা হইয়াছে এবং সেগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ এখনও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে পশু-চিকিৎসা বিভাগের কর্ম্মচারিগণের মাহিনা, ভাতা প্রভৃতি আদৌ লোভনীয় নহে এবং এই কারণে পশু-চিকিৎসা শিক্ষার প্রতি শিক্ষিত যুবকদের তেমন আকর্ষণ নাই। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি বলেন যে, উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বোম্বাই প্রদেশের পশু-চিকিৎসা শিক্ষালয়ে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক যুবক শিক্ষালাভের জন্য আসিতেছেন না। সুতরাং পশু-চিকিৎসা বিভাগের কর্ম্মচারীদের বেতনাদির উন্নতি না হইলে পশুচিকিৎসা শিক্ষার জন্য যুবকদের যথোচিত আগ্রহেরও সৃষ্টি হইবে না।

হরিণঘাটার গোশালা

শ্রীযুক্ত নন্দার মতে পশু-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় সকল বিষয় এবং পশুজাতির উন্নতি সম্বন্ধে সকল প্রকার শিক্ষা, গবেষণা প্রভৃতি একই বিভাগের অধীনে থাকা বাঞ্ছনীয়। ভারতের অনেক প্রদেশেই এই ব্যবস্থা বলবৎ আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই ব্যবস্থা এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ইহা ব্যতীত প্রদেশের গো-জাতির উন্নতি সম্বন্ধে সকল প্রকার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্য্য-পদ্ধতি নির্দ্ধারণের জন্য সরকারী কর্ম্মচারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের লইয়া একটি পরামর্শদাতা সমিতি গঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

হরিণঘাটার মোরগ ও মুরগী

জানি না, হরিণঘাটার কার্য্যপরিচালনায় শ্রীযুক্ত নন্দার কোন পরামর্শ গ্রহণ করা হয় কি না। তবে হরিণঘাটার কার্য্যাবলী দেখিয়া মনে হয়, ইহার ব্যবস্থাদির সহিত তাঁহার কোনই সম্পর্ক নাই।

পথহারা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

হরনদীর ধারে যাঁরা বাস করেন তাঁরা কোন দিন কল্পনা করতে পারবেন না—এই জরাজীর্ণ নদীটিরও একদিন যৌবন ছিল। যৌবনের ধর্ম্মবশতঃ দুরন্ত আবেগে তটের বাধা অগ্রাহ্য করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ত গ্রামের উপর এবং তার দৌরাত্ম্যে তীরবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রাম একদা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তখন নদীর একটা মুখ গঙ্গার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। বর্ষার আধিক্যে সেই মুখ দিয়ে প্রবল বেগে আসত জলস্রোত, সু-উচ্চ তটের প্রাচীর সে বেগ রোধ করতে পারত না।

এখন দু' মুখ লুপ্ত অপরিসর নালায় যেটুকু ঘোলাটে জল পড়ে আছে—তাকে নদীর গৌরব দেওয়া চলে না। দু'ধারের চরভূমি আবাদ হওয়াতে নদী-মুখ লুকিয়েছে ধরিত্রীর কোলে। গঙ্গার দিকের বাঁধটা আজ নিরর্থক। তারই কোল বরাবর যোজন-বিস্তৃত মাটির স্তূপে সোনা-ফলানো মাঠের রূপ উঠেছে ফুটে। সবুজ ধানের শীষে দিনের আলো ঝলমল করে—বাতাসে সির সির করে দোলে তার স্তবকগুলি। তাদের স্তব্ধ গঙ্গার জল-কল্লোলধ্বনি শ্রুতির বাইরে চলে গেছে। গঙ্গা থেকে নদী বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

সেবারের মহাবন্যায় যে ক'খানা গ্রাম ভেসে গিয়েছিল—তার মধ্যে হরনদী গ্রামের ক্ষতিই হয়েছিল বেশী। তিন মাস জলের মধ্যে ডুবে ছিল গ্রাম—গ্রামবাসীরা বাসা বেঁধেছিল স্থানান্তরে।

নদীর স্বভাব অনেকটা বাঘের মত। পোষ মেনেও সুযোগ-সুবিধা পেলে হিংস্র হয়ে উঠতে তার বাধে না—এই প্রবাদ বাক্যটিকে মেনে নিয়ে পদ্মলোচন চিরদিনের মতই গ্রাম ছেড়েছিলেন। বিত্তসম্পদে তিনিই ছিলেন গ্রামের প্রধান—ব্রাহ্মণ বলে সমাজের শীর্ষস্থানীয়ও বটে।

২

সে হ'ল এক শতাব্দী আগেকার কথা। বিদেশী শাসন তখন সবে কায়েম হয়ে বসেছে। সিপাহী বিদ্রোহের অঙ্কুর ভারতবর্ষের মাটিতে অঙ্কুরিত হয় নি। এধার-ওধার চোর-ডাকাতের উপদ্রব যথেষ্ট থাকলেও সমাজের শাসন ছিল কঠিন। সমাজপতির ক্ষমতা রাজক্ষমতার মতই নিরঙ্কুশ ছিল। তবু নদীর ক্রুর স্বভাব স্মরণ করে পদ্মলোচন চিরদিনের মত গ্রাম ছেড়েছিলেন। চোর-ডাকাতের যথেষ্ট ভয় ছিল বলে বিত্তবান পদ্মলোচন কোন বসতিবিরল অনাত্মীয়-অধ্যুষিত গ্রামে গিয়ে বাসা বাঁধেন নি। হরনদী থেকে ক্রোশ দুই দূরে শহরঘাঁষা সুজাপুর গ্রামের একেবারে মাঝখানে বিঘা চারেক জমি কিনে ফেললেন। জনকয়েক আত্মীয়কে আনলেন টেনে। বসতবাড়ীর জন্য বিঘা দুই জমি রেখে বাকিটা তাদের ভাগ করে দিলেন,। এই ভাবে তাঁদের দ্বারা বৃংহিত হয়ে পদ্মলোচন নিরাপদ আশ্রয়নীড় রচনা করলেন।

তার পরেও কেটেছে পঞ্চাশ বছর। সিপাহী যুদ্ধ হয়েছে, দয়াময়ী মহারাণী কোম্পানীর হাত থেকে নিজে নিয়েছেন রাজ্যভার। যে তামাক এতকাল গলচে আড়াল দিয়ে খাওয়া চলত তা প্রকাশ্যেই টানা হচ্ছে—চক্ষুলজ্জার বালাই বড় একটা নাই।

পদ্মলোচন দেহ রেখেছেন। তাঁর পুত্র রাজীবলোচন বাপের মুখে শোনা গল্পটি মাঝে মাঝে স্মরণ করেন। গল্পটি এই হরনদী সম্বন্ধেই। বর্ষার দুটি মাস গঙ্গার হাতে হাত মিলিয়ে সে নদী তীরবর্ত্তী গ্রামগুলিকে প্রবল বিক্রমে শাসন করত। তার পর গঙ্গার প্রবল টানেই তার বিক্রম অন্তর্হিত হত সহসা। শক্তিমানের আপাত-সৌহার্দ্দ্যের দায় বহন করে প্রতি বৎসরে তার দু'পাশে জমত পলিমাটি। জলধারা হ'ত ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর। অস্থিসর্ব্বস্ব নদী এই ভাবেই নালায় পরিবর্ত্তিত হয়েছে। শোষিত দেশের অবস্থা এর চেয়ে একটুও উন্নত নয়। দেশের মাটিতে যারা শিকড় নামায় নি—দেশের উপর মমতা পোষণ করবে তারা কোন্ ভাগ্যবলে অনুসারে? এই কারণেই বিদেশী শিক্ষাকেও রাজীবলোচন প্রীতির চোখে দেখতে পারেন নি কোন দিন।

তবু তাঁর তিন ছেলে—রামলোচন, রামকিঙ্কর ও রামপ্রসাদ বিদেশী শিক্ষালাভ করলে। জমিজমার চেয়ে চাকরিতে তখন সম্মান বেশী। দুধ-ভাতের লোভে যেমন-তেমন চাকরিতে বাংলার মানুষগুলি মেতে উঠেছে। বাংলার বাইরে বিদেশী প্রভুর ছত্রছায়াতলে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে তারা রাজসম্মান লাভ করছে। বাংলা আর ভারতবর্ষ জুড়ে চলছে চাকুরির সাধনা। অন্য প্রদেশবাসীরা একটু ভাবুক প্রকৃতির—কিছু বা বিদেশী বিদ্যা-পরাঙ্মুখ। ম্লেচ্ছ সংস্পর্শের দোষটা তারা বিচার করে চলে। সদ্যরাজ্যভারমুক্ত মুসলমানরা তো অভিমানে মুখ ফিরিয়েছে। আগ্রা-অযোধ্যার তালুকদাররা প্রভুদের বিষদৃষ্টিতে পড়েছে। সারা ভারতবর্ষ অনুসন্ধান করলে গোনাগুন্তি যে ক'টি ঘরে যে কয়েকটি মারাত্মক অস্ত্র আবিষ্কৃত হতে পারে তার গুরুত্ব শাসকদের মনেও জাগে না। জাতিকে অস্ত্র-বঞ্চিত ও বীর্য্যহীন করার দায়িত্ব নিয়েছে প্রভুরা। নূতন আইনে সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলা বা লেখা বিপজ্জনক ব্যাপার। তবু বিদেশী

শাসনের উপর বীতস্পৃহ হয়েও বিদেশী শিক্ষাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে দেশ। রাজশক্তিকে ধারিয়ে দেবার জন্য বিদেশীরা আমদানী করেছে তাদের সাহিত্য, দর্শন, নীতি ও আইন। তবু এই শিক্ষার কৌলতেই...কিন্তু সে অনেক পরের কথা। আপাততঃ রাজীবের তিন পুত্র স্নেহ ভাবায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে সংসারের উন্নতিতে মন দিয়েছে।

রাজীবলোচন এতে সন্তুষ্ট নন। লোকেরা তাঁর পুত্র-সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত—তিনি কিন্তু উচ্চ-ভূমিতে উঠে অহঙ্কৃত হতে পারেন নি। তাঁর সন্দেহভারাক্রান্ত মন সর্বক্ষণ দুলতে থাকে—কোথায় বুঝি সুর কাটল—লক্ষ্মীর প্রসাদপুষ্ট প্রাসাদের কোন কোণে বিলাসের মাথায় বুঝি চুল পরিমাণ চিড় ধরল!

যে শিক্ষা ঘরের মানুষকে ঘরের বাইরে ঠেলে দেয়, সে শিক্ষার গৌরবে বুক ভরলেও মনের আকাঙ্ক্ষা মেটে না। যেমন বাইরের রাজশক্তি দু'হাত বাড়িয়েছে সম্পত্তি সংগ্রহ করতে—এও যেন সেই ধরণের ব্যাপার!

৪

বাড়ীতে গৃহদেবতা দামোদর আছেন। তাঁর নিত্য পূজা ও ভোগরাগ প্রভৃতির ব্যাপারে অনেকখানি সময় যায়। রাজীব মনে করেন, এই ভক্তি-অর্চনাকে কেন্দ্র করেই সংসার চলছে নির্বিঘ্নে। এই ব্যবস্থাই রাজীবলোচনের পূর্ব-পুরুষেরা করেছিলেন—তিনিও প্রাণপণে মেনে চলেন এই বিধান। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বুঝছেন—এই বিধান বেশী দিন স্থায়ী হবে না। তাঁর সামর্থ্য দিন দিন কমছে। সেবার এক সপ্তাহ জ্বরভোগের সময় বুঝলেন—গৃহ-দেবতার সেবা-পূজার পরিচালনা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

ছোট ছেলে রামপ্রসাদ কলেজের ছুটিতে বাড়ী এসেছে। রাজীবলোচন তাকে ডেকে বললেন, যে ক'টা দিন সেরে না উঠি দামোদরের পুজোটি করিস বাবা।

রামপ্রসাদ মাথা নেড়ে স্বীকার করলে।

বাইরে এসে মাকে বললে, তুমি পুজোর যোগাড় করে রাখ—আমি বাদ ভট্টাচার্যিকে ডেকে আনি।

মা বললেন, উনি শুনলে রাগ করবেন। তুই নিজেই পুজোটা—

রামপ্রসাদ হেসে বললে, পুজোর আমি জানি কি! কলেজে কি পুজোর মন্ত্র শেখায়?—মাকে অবাক হবার সুযোগ না দিয়ে বললে, কে পুজো করলে—কি বৃত্তান্ত, অতশত বাবার কানে তোলবারই বা দরকার কি!

বিছানায় শুয়েও রাজীবলোচন সব জানতে পারলেন। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বাবন আসল্‌গা হচ্ছে গিন্নী, আমার অবর্তমানে দামোদরকে গুরুর বাড়ী পাঠিয়ে দিও।

আচ্ছা—আচ্ছা ওসব এখন ভেবো না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাজীব বললেন, ভাবতাম না—যদি জমি জিরেত আর থাকতো। যদি হরদলীতে থাকতাম—তা হলেও হয়ত...

রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে স্থির করলেন, বংশের ধারা বজায় রাখবার জন্য বড় নাতিটিকে কাছে রাখবেন—তাকে বংশ-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তাঁর যা কিছু সঞ্চিত সম্পদ উৎসর্গ করে দেবেন দামোদরের নামে। তাঁর সেবাপূজা নিয়ে একটা মানুষ নিশ্চিন্তে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে পারবে।

৫

বড়ছেলে রামলোচন ভাল চাকরিই পেয়েছে। চাকরি ভাল বলেই তাকে যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সম্ভ্রম আছে—জাঁকজমক আছে। নানা জেলার জলহাওয়া চেখে চেখে বেড়াতে হয় বলে বউমাটি তার সঙ্গেই থাকেন।

ছেলের প্রশংসায় বাপের মন ভরে ওঠে, তবু মনে হয় এই খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে তাঁর লাভ কতটুকু! এ যেন বর্ণাঢ্য এক অপরাহ্ণের মেঘ পশ্চিম দিগন্তে কিছুক্ষণের জন্য সৌন্দর্যের আলিম্পন আঁকছে—তার পিছনে সঞ্চিত আছে রাত্রির নিবিড় তামস্রা। তাঁর সংসার-দিগন্তে এই শোভা আর সমারোহ কতক্ষণের জন্যই বা! গোত্র-পরিচয়ে ওরা দেশে দেশে এই গৌরব ছড়াবে—তবু মানুষই সেখানে আসল, বংশটা গৌণ। বংশের গৌরব বাড়িয়েও ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এই সংসার থেকে, এই স্নেহ-ভালবাসা-হাসিকান্নার পরিমণ্ডল থেকে।

দীর্ঘ দিন পরে ওরা যখন বাড়ী আসে, তখন সঙ্গে নিয়ে আসে যে সম্ভ্রম-মর্যাদা-বোধ তা ভেদ করে ওদের কাছে টানাই মুশকিল! ওরা স্মৃতি আপন হয়েও বহু দূরের। যেমন আলমারিতে সাজানো দুর্নির কারিগরের হাতে-গড়া পুতুলগুলি, যেমন দেওয়ালে টাঙানো স্বামীজীর মূর্তি—যেমন ট্রাঙ্কে সযত্নে-তুলে-রাখা দামী বেনারসী শাড়ী ও কাশ্মীরী জোড়োয়া শাল। নিত্য ব্যবহারে মলিন করা চলবে না—এসব অত্যন্ত আদরের বস্তু, অথচ নিত্য ব্যবহারে আসে না বলেই সম্যক্‌ তৃপ্তিও তো লাভ হয় না।

তবু কথাটা পাড়লেন একদিন। ওরা তখন ছুটিতে বাড়ী এসেছে। ছেলেমেয়েরা পুকুরে কঞ্চির ছিপ ফেলে আর বাগানের শিউলি ফুল কুড়িয়ে, বাতাবী লেবু আর আতা পেড়ে হৈ-হল্লোড় আমোদে মেতেছে।

বড় নাতিকে কাছে ডেকে বললেন, আচ্ছা বল্‌ দেখি ভাই, তোরা যে শহরে থাকিস সেই শহর ভাল, না এই পাড়াগাঁ ভাল?

আট বছরের নাতি সোৎসাহে মাথা নেড়ে বললে, পাড়াগাঁ ভাল।

থাকবি এখানে?

হুঁ। আপনি বলুন না বাবাকে।

মায়ের জন্য মন কেমন করবে না তো ?

ধ্যেৎ—আমি নাকি ছেলেমানুষ !

রাজীবলোচন মনে মনে খুশী হলেন। ভাবলেন, বংশের ধারা একপুরুষ বাদ দিয়ে ফিরে আসে এটা ঠিক কথা। এ ছেলে বংশের মর্য্যাদা রাখতে পারবে।

রামলোচনের কাছে কথাটা পাড়লেন।

রামলোচন হেসে বললে, ক্ষেপেছেন আপনি ! অতটুকু ছেলে ও ভাল-মন্দর বোঝে কি ! নূতন জায়গা দু'দিন তো ভাল লাগবেই।

নাড়ে—মাটির টান—

বেশ ত ভাল করে লেখাপড়া শিখুক—জগৎটা চিনুক তখন যদি চায়—

রাজীবলোচন বাধা দিয়ে বললেন, তোমরা তো দেশের টোলা ফেলে ফেলে বেড়াচ্ছ—তোমাদের সঙ্গে থাকলে ওর শিক্ষা কি হবে !

এই পাড়াগাঁয়ের সঙ্গও তো ভাল নয়, আপনি বুড়ো হয়েছেন তেমন দেখাশোনা করা তো আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। ওকে বোর্ডিঙে রেখে দেব।

রাজীবলোচন বুঝলেন তাঁর যুক্তি এদের মনে ধরবে না। দু'কালের দৃষ্টিভঙ্গীতে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি চুপ করলেন।

৬

মেজ ছেলে রামকিঙ্কর অবশ্য কলকাতাতেই কাজ করে—কোথাও বদ'ল হবার আশঙ্কা তার নাই। পদমর্য্যাদা তারও মন্দ নয়—সরকার থেকে বাড়ী পেয়েছে বসবাসের জন্য। মা-বাপের কষ্ট হবে বলে একটা বছর নিজেই কোন রকমে সিদ্ধ-পক্ক করে আহারের কাজটা চালিয়েছে। একদিন মা অনু-যোগ করলেন, এমন করে ক'দিন টিকবে শরীর ! কথায় বলে আগে নিজে বেঁচে ধর্ম্ম। তুই বাপু বউমাকে নিয়ে যা বাসায়।

ছেলে ক্ষীণ আপত্তি তুললে, তোমাদের কষ্ট হবে যে।

'কষ্ট' ! মা হাসলেন, 'হাঁ—ভারী তো কষ্ট। এতকাল দেবতা-অতিথ— গরু-বাছুর—ঠাকুর-সংসার এসব ঠেকালে কে ! দুটো লোকের আর কি-ই বা কাজ। আসচে মাসে একটা ভাল দিন দেখে বউমাকে বাসায় নিয়ে যা।

তিনিই রাজীবলোচনকে দিয়ে ভাল দিন দেখিয়ে ওদের রওনা করিয়ে দিলেন বিদেশে।

ওরা চলে গেলে রাজীবলোচনকে বললেন, কাজটা বাহাদুরি নেবার মত হ'ল, মন কিন্তু ভরল না গিন্নী।

গৃহিণী বললেন, আমাদের আর ক'টা দিন। ওদের সংসার ওরা বুঝে নিক।

সংসার আর রাখতে দিলে কই !

তুমি ভেব না, রামপ্রসাদের বিয়ে দেব পাড়াগাঁয়ে—ওকে চাকরী করতে পাঠাব না বিদেশে।

পারবে না গিন্নী—প্রাণে দু খোঁচা পড়বে! আমাদের কালের ধারা ওদের কালের গায়ে চাপবে না—যেমন খোকার জামাটা আমার গায়ে ছিলে হয়।

তুমি দেখো।

নারায়ণ পুজোর ব্যাপারটা মনে পড়ায় গৃহিণী সন্তর্পণে নিশ্বাস ফেলে ভাবলেন, সত্যিই কি তাই ! ওরা আমাদের ছেলে—আমাদের সুখ দুঃখ বুঝবে না ?

তবু লোকে বলে, এমন ছেলে হয় না। ছেলে তো নয় হীরের টুকরো সব। খাওয়া-পরার কিছু মাত্র কষ্ট রাখে নি —মণিঅর্ডারের পিঠে মণিঅর্ডার আসছে প্রত্যেক মাসে।

কিন্তু জগতে খাওয়া-পরার কষ্ট ছাড়া আর কোন বড় কষ্ট কি নেই !

৭

সেই কষ্ট ভুলতে রাজীবলোচন একদিন মরনদীতে বেড়াতে গেলেন। বাল্যকালের গ্রামের যে স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে মনের পটে আঁকা ছিল তা অবশ্য বর্ণশ্রী হারিয়েছে। নূতন মরনদীতে পুরাতন গ্রামের চিহ্ন মাত্র খুঁজে মিলবে না। চওড়া খালের দু'ধার প্রায় ভরাট হয়ে এসেছে—মাঝখানে নীল রঙের যে জলের কালিটুকু এখনও নদীর চিহ্ন জাগিয়ে রেখেছে, দুপুরের রোদে তা থেকে দুর্গন্ধময় বাষ্প উঠছে—পাটের রাশ চাপানো রয়েছে তার বুকে। ওগুলি পাটের কাঠি নয় নদীর পঞ্জরাস্থি। নদীর আয়ু শেষ হয়ে এল। নদীর ধারে সেই পাড়াগাঁ-ই বা কোথায় ? কোন বাড়ীর উঠানে একটি ধানের মরাইও তো চোখে পড়ল না, সব্জীক্ষেতের সবুজ গালিচার একাংশও তো কোনও ভিটের আশে-পাশে উঁকি মারছে না। দুপুরে গ্রাম যে ঘুমিয়ে পড়েছে। ক' ঘর চাষী এখনও বাস করে এ গাঁয়ে। তাদের জমিজমা নাই, পরের জমিতে গেছে জনমজুরি খাটতে। তাদের রোগজীর্ণ বউ আর ছেলেরা কোন রকমে জায়গার গোছ করে সংসারের কাজ চালাচ্ছে। তাদের মুখে হাসি নেই, গতিতে চাঞ্চল্য নেই। মধ্যাহ্নের আলস্যে উদাসীন নীল আকাশের মত এরাও যেন অকাল-বার্দ্ধক্যে থমকে দাঁড়িয়েছে।

রাজীবলোচনকে দেখে বুড়ো হারাম মণ্ডল আভূমি প্রণাম করলে। বললে, ঠাকুরমশাই—আপনারা দেশান ছেড়ে দিলে গাঙের উৎপাতে। আজ গাঙের পেরতাপ নেই—কাউকে ভিটে ছেড়ে দেশান্তরী হতে হয় না—তবু পানা-মজা পুকুরের মত গাঁয়ের পেরমাই ক্ষ্যায় হয়ে যাচ্ছে। আসছে বার আমাদের আর দেখতে পাবা না ঠাকুর—এই বিশ্যাস সত্যি।

না—নদীর সঙ্গে গাঁ-ও শেষ হয়ে যাবে। শেষ হয়ে

গেছেই হয় তো। নদীর ঢালু তীরে অবারিত মাঠ—গ্রামের পিছনে ক্রোশব্যাপী জঙ্গল—মজা পুকুরের ধারে তাল গাছের সারি—আজও মন ভোলাবার উপকরণ প্রচুর। তবু এ মাঠে আশ্বাস নেই—এ বনের বিস্তৃতিতে মৃত্যুর ইঙ্গিতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে—তালগাছের সারিতে আকাশ-শাসনের ভঙ্গিমা।

ওরা বললে, ঠাকুর মশাই—আমাদের শহরে একটু জায়গা দ্যান। রোগে রোগে জেরবার হলাম যে—খাটব কোথা থেকে। না খাটলে পেটের ভাত জুটবে না। দ্যান না একটু জমি—হেই ঠাকুর মশাই।

এই গাঁ ছেড়ে থাকতে পারবি?—জিজ্ঞাসা করলেন রাজীবলোচন।

পারব কর্তা—খুব পারব। না খেতে পেয়ে মিত্যুর ভয় তো থাকবে না। গতর কোলে করে শুকিয়ে তো মরব না।

ফিরে এলেন রাজীবলোচন।

হাঁগা—তুমি কিছু খাবে না?

না।

তুমি কাঁদছ?

গৃহিণীর বিস্ময়ে রাজীবলোচনও বিস্মিত হলেন। আশ্চর্য্য তাঁর চোখেও জল! কিসের দুঃখে অশ্রুর এই ধারা? পাড়া-গাঁয়ের দুঃখ তাঁর মনে বাসা বাঁধল—না শহর-বাসের দুষ্কৃতি তাঁকে পুড়িয়ে মারছে? বেদনা কি পূর্ব্বপুরুষের ধারা বজায় রইল না বলে—না বর্ত্তমানের স্রোতে পা রেখে—দাঁড়াতে পারছেন না—এই অক্ষমতায়! পরিজনেরা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল কি? যে বংশের ধারা বজায় রাখতে মানুষ সর্ব্বস্ব পণ করে—ঐহিক ঐশ্বর্য্যকে দু'হাতে সঞ্চয় করেও ক্ষুধা মেটে না, জরার স্পর্শ পেয়েও দীর্ঘজীবন লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে—তা বুঝি সফল হ'ল না! আপন মনে আবৃত্তি করলেন:

'উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অতল জলে।'

৮

ছোট ছেলে রামপ্রসাদ বললে, মা তোমরা দিন দিন কুঁড়ে হয়ে পড়ছ। উঠোনে—রোয়াকের নীচেয় এত জঙ্গল, এগুলো সাফ করতে পার না?

মা বললেন, দিন দিন বয়স তো বাড়ছে—পেরে উঠি না।

রামপ্রসাদ কোমর বেঁধে লেগে গেল জঙ্গল সাফ করতে।

মা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, ওরে ফুলগাছ উপড়ে ফেলিস না—দামোদরের পুজোর ফুলের জন্য কি ছুটব পরের বাড়ীতে!

রামপ্রসাদ বললে, এই ফুল। না গন্ধ না দেখতে ভাল।

ওরে ওই ভাল—এক সাজি টগর ওতে পুজো হয়। আর ওগুলো যে তুলসী গাছ—তুলিস নে।

রামপ্রসাদ রাগ করে বললে, একটা তো মাত্র নারায়ণ, তাঁর পুজোর জন্য তুলসীর জঙ্গল করে রেখেছ। বলে একটা গাছের গোড়া ধরে টান দিলে।

মা ছুটে এসে ছেলের হাত ধরলেন, করিস কি—করিস কি—শয়ানে তুলসী গাছ তুলতে আছে?

কেন—শয়ানে তুলসী গাছ তুললে কি হয়?

জানি না বাপু, বামুনের ঘরে জন্মে এটুকুও যদি না জানিস—

রামপ্রসাদ রাগ করে বললে, বেশ—তোমাদের বন নিয়ে তোমরা থাক—আমি আর বাড়ী আসছি না।

মায়ের আদরে ওর ক্রোধ বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। হেসে বললে, বেশ, বাড়ীর উঠোনে হাত দিতে না দাও—গ্রামের জঙ্গল আমি রাখব না।

উৎসাহী ছেলের দল নিয়ে রামপ্রসাদ জলা-জঙ্গল সাফ করতে লেগে গেল। সমিতির নাম দিলে—পল্লী-উন্নয়ন সমিতি।

একদিন বাজারের মাঝখানে সভা করে বক্তৃতা দিলে: হ'লই বা বিদেশী রাজা—আমাদের গ্রামকে আমরা উন্নত করব—সে অধিকার অবশ্যই আমাদের আছে। এত ম্যালেরিয়া কেন ঘরে ঘরে? যে রোগ একবার গাঁয়ে ঢোকে আর বার হতে চায় না কেন? নিজেদের বাড়ীতে জঙ্গল, যে পথে হাঁটি তা নোংরা, যে আলো রাস্তায় জ্বলে তাতে পথ দেখা যায় না, হোঁচট খেয়ে মরতে হয়। ময়লা সাফের ব্যবস্থা নেই—জল নিকাশের নয়নজুলি বুজে গেছে—এ ভাবে কতদিন বাঁচব আমরা? না এ ভাবে মানুষ বাঁচতে পারে না, দেশ বাঁচতে পারে না। আমাদের কল্যাণের জন্য—স্বাস্থ্যের জন্য—আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি—

চটপট করতালি-ধ্বনির সঙ্গে প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল। রামপ্রসাদ হ'ল সমিতির পরিচালক।

এরই সূত্র ধরে ওরা পৌর প্রতিষ্ঠানের আসনগুলি দখল করলে এবং গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিতে মনোযোগ দিলে।

৯

ক'টা বছরই বা কেটেছে—এরই মধ্যে গ্রামের চেহারা আমূল বদলে গেছে। বিশ বছরের অযেরামতি ভাঙ্গা-গড়ানো রাস্তা টুকটুকে লাল সুরকীর খোয়ায় নববধূর সীমন্তের মত শোভন হয়েছে। বর্ষাকালে মাঠে যে দুর্ভেদ্য জঙ্গল মাথা তুলত—তা আর চোখে পড়ে না। ভাঙা পুকুরগুলির রাঙা সিমেন্টের গাঁথনিতে হয়েছে মজবুত। সব চেয়ে আনন্দের কথা বৈদ্যুতিক-আলোয় গ্রাম হয়ে উঠবে উদ্ভাসিত। শহরের আভিজাত্যে দীক্ষা নেবার মত কিছু আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে বলা যায়। একটা কাপড়ের আর একটা পাটের কল বসবে নদীর ধারে।

কেবল নিজের বাড়ীর উঠানে হাত দিতে পারে নি রামপ্রসাদ। রাজীবলোচন প্রতিবাদ করেন নি তীব্র ভাষায়, কিন্তু ওঁর নীরব ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে যা ফুটে উঠেছে—তা সমস্ত প্রতিবাদের উপরে। বাড়ীতে ঢুকলেই রামপ্রসাদের মনে হয়, অতীতের প্রাণ এইখানেই নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেছে। বাপের মনে কষ্ট হবে বলে ফুলগাছের সঙ্গে আগাছাগুলিকে রাখতে হয়েছে—নইলে…

দেখতে দেখতে ক'টা মাস কেটে গেল। বিজলী-আলোর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে রামপ্রসাদ বাড়ীতে ফিরল। বললে, মা, কাল কলকাতা থেকে আমার জনচারেক বন্ধু আসবে, তাদের একটু ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা—

মা বললেন, তোদের আলোর কল টিপতে আসবে বুঝি তারা?

রামপ্রসাদ হেসে বললে, হাঁ। কাল ভারি একটা সভা হবে। পকেট থেকে একখানা সাদা কার্ড বার করে গলা নামিয়ে বললে, বাবাকে এই চিঠিখানা দিও তো।

মা কার্ডখানি হাতে করে বললেন, উনি কি মিটিংএ যাবেন? মনে তো হয় না।

রামপ্রসাদ বললে, বাবার কিন্তু ভারি অন্যায়। উনি কি মনে করেন—ওঁদের কাল চিরকাল থাকবে? গাঁ শহর হবে না?

মা নিশ্বাস ফেলে বললেন, কি জানি—উন্নতি বলতে তোরা কি বুঝিস! আমরা সেকেলে মানুষ অতশত বুঝতে পারি না।

১০

সভায় মিটিংএ গেলেন না রাজীবলোচন। তিনি পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন উত্তরের মাঠের দিকে। সেখান থেকে আর একটি সরু পায়ে-চলা পথ পড়ে—নীলকুঠির জঙ্গল ভেদ করে সোজা চলে গেছে হরনদীতে। চার মাইল দীর্ঘ পথ। পথের দু' পাশে আসশ্যাওড়া শিয়াকুলের ঝোপ। বুনো নীলের ফুলে নীলকুঠির পড়ো ভিটে এই সময়ে সেজেছে চমৎকার। কুঠির পিছনে লম্বা লম্বা সেগুন গাছ—পরস্পর শাখানিবদ্ধ হয়ে অরণ্যের পত্তন করেছে—সাদা মঞ্জরীর স্তবক দুলছে বাতাসে। এখানে নীল আকাশের ধীর মন্থর গতি মানুষকে কাছে টানে তার সঙ্গে দু' দণ্ড দাঁড়িয়ে দুটো সুখ দুঃখের কথা বলতে চায়।

সেই পথে চলতে চলতে রাজীবলোচন থমকে দাঁড়ালেন। বনের মধ্যে কিসের শব্দ? কারা যেন কাঠ কাটছে। ঠকা-ঠক—ঠকা-ঠক—ঠকা-ঠক। এক সঙ্গে অনেকগুলি কুড়ুলের আঘাত। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন সেগুনের মঞ্জরীগুলোর কাঁপন বাড়ছে। বাতাস নয়—মানুষের নিষ্ঠুর আঘাতে…না অরণ্য মানুষের কাছে ভাড়া খাচ্ছে—মানুষের হাতে ওর মৃত্যু অনিবার্য। মানুষ বাস্তুবিধির ধারাগুলি ভাল করে অনুশীলন করছে—মানুষ ক্রমশঃ সভ্য হচ্ছে। ইতিহাসে লেখা আছে তার ক্রমোন্নতিশীল সভ্যতার সন তারিখ। সুজাপুর আজ শহরের কৌলিন্যে উঠবে—ওর রাস্তায় রাস্তায় জ্বলবে বিজলী আলো। পুরাতন যা-কিছু নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আবার চলতে লাগলেন হরনদীর দিকে। প্রশ্ন করলেন মনে মনে, শহর যদি গ্রামকে গ্রাস করে তা হলেই কি মানুষের দুঃখ-অভাব কিছু থাকবে না? চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে নদীর শুকনো খাতের ধারে বসে পড়লেন। ঊর্দ্ধ পানে চেয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন—'হায় দামোদর! তুমি একদিন জগৎ সৃষ্টি করেছিলে—স্রষ্টা বলে মানুষ তোমায় সম্মান দিয়েছে—সিংহাসনে বসিয়েছে, পূজো করেছে। আজ সেখানে তোমার স্থান নেই। তোমার জগতে তুমি থাকবে না—এ তোমার কেমনতর লীলা প্রভু!' দু' হাত জোড় করে আকাশের পানে চেয়ে থাকেন। দুটি চোখের কোল বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে আসে। দেখতে দেখতে বহুক্ষণ কেটে যায়।

হরনদীর মাথায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে উঠছে—সাঁজালের ধোঁয়া। সন্ধ্যাবন্দনার সময় হ'ল।

ঢালু তীর বেয়ে নদীতে গিয়ে নামলেন। কিন্তু সেখানে জল কোথায়? নদীর বুকে পাটের রাশি চাপানো আছে—একটা বিশ্রী পচা গন্ধ উঠছে—দম বন্ধ হয়ে আসে।

আবার উঠে এলেন তীরে। চাইলেন গ্রামের দিকে। ধোঁয়ায় আর অন্ধকারে গ্রাম লুপ্ত হয়ে গেছে। চারিদিক থেকে নামছে অন্ধকার—রাশি রাশি অন্ধকার। এ অন্ধকারে পথ হারানো কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের নয়।

লাঠির ঠুক্ ঠুক্ শব্দ করে সুজাপুরের দিকে ফিরে চললেন রাজীব।

শান্তিনিকেতনের ইতিহাস

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন কর্মময়, অর্থাৎ কর্মের ঘটনাবলী লইয়াই জীবন-কথা। সুখ-দুঃখের জয়-পরাজয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট ভেদে কর্ম বিচিত্র বা বিবিধ। কর্মের উৎকর্ষে জীবনের সারবত্তা সার্থকতা, অপকর্ষে জীবন অসার ব্যর্থ। মহাপুরুষদের চরিতাবলী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহাদের জীবন-ধারা অনুকূল প্রতিকূল দশা বিপর্যয়ের বন্ধুর পথে আহত-প্রতিহত হইয়া সঞ্জাত গূঢ় গুণসমূহ সঞ্চিত করিয়াছে এবং তদনুরূপ উৎকৃষ্ট কর্মপরম্পরায় পর্যবসিত হইয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে জীবনের যে চরিতাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে উপরিলিখিত বিষয় সুবিশদ ও সপ্রমাণ হয়। তাঁহার অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে শান্তিনিকেতনে আশ্রম ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠা শীর্ষস্থানীয়। কেবল ইহাই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

শান্তিনিকেতন : মহর্ষি এই আশ্রম 'শান্তিনিকেতন' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন কেন, এই প্রশ্নের অনুকূল সিদ্ধান্তে কোন লিখিত বিবরণ, কিংবদন্তী বা ইঙ্গিত কিছুই পাওয়া যায় না। তাঁহার আত্মজীবনী লেখার পরে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"তিনি (মহর্ষি) সেই শান্তং শিবং সুন্দরং পরমেশ্বরের শান্তিময় ক্রোড়ের শীতল ছায়ায় অমৃত পান করিবার মানসে মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া ব্রহ্মসাধন করিতেন।" শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতার এই পঙক্তিগুলিতে মহর্ষির মনের ভাব যদি কিছু ব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই সূত্রে মনে হয়, "শান্তিময় ক্রোড়" সদৃশ এই আশ্রম তিনি 'শান্তিনিকেতন' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

সপ্তপর্ণ মূল, বেদিকা : এক সময়ে মহর্ষি বোলপুর ষ্টেশন হইতে রায়পুরে সিংহবাবুদের বাটীতে যাইতেছিলেন। কিছু দূর আসিয়া পথে এক সুবিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিবার সময়ে একটি সপ্তপর্ণ বৃক্ষ দেখিয়া পাল্কি রাখিতে বলিয়া বিশ্রামার্থ সেই সপ্তপর্ণমূলে উপবেশন করিয়াছিলেন। সম্মুখে পশ্চিমে সুদূর দিগন্তে প্রান্তরপ্রান্তে সম্মিলিত নির্মল নির্মুক্ত আকাশে তাঁহার প্রিয় অনন্তদেবের মহিমার প্রতিচ্ছায়া দেখিয়া তিনি যে 'শান্তি'-লাভ করিয়াছিলেন, মনে হয়, এই হেতু মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে নিভৃতে ব্রহ্ম সাধনার্থে সেই সপ্তপর্ণমূলে মর্মর বেদিকা নির্মিত করিয়াছিলেন। এই সূত্রে মনে হয়, "শান্তিনিকেতন" নামের মূলেও কি এই 'শান্তি' ছিল?

আশ্রম, মন্দির : রায়পুরের জমিদারের নিকট হইতে মহর্ষি ১২৭০ সালে এই প্রান্তরের একাংশে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থব্যয়ে তাহাতে শাল তাল আম্র মহুক দেবদারু আমলকী প্রভৃতি পত্রবহুল নানাবিধ বনস্পতি রোপণ করেন। রক্ষণের সুব্যবস্থায় বর্দ্ধিত বৃক্ষসমূহের পত্রপুঞ্জ পুষ্প ফলে সেই ঊষর ভূমিখণ্ড সুশ্যামল সুশোভিত সুস্নিগ্ধ আশ্রমপদে পরিণত হয়। সাংসারিক ব্যাপারের তাপের তীব্রতা হইতে বিরামার্থে, প্রাণের আরাম সাধনার অমৃতভূমি এই শান্তিনিকেতন আশ্রমে মধ্যে মধ্যে আসিয়া মহর্ষি ব্রহ্মসাধনা করিতেন। সপ্তপর্ণমূলে রচিত বেদিকা তাঁহার ধ্যান ধারণার নিভৃত আসন ছিল। মন্দির প্রতিষ্ঠার তিন বৎসর পূর্বে ১২৯৫ সালে ব্রাহ্ম নর-নারী-গণের উপাসনার্থ তিনি এই আশ্রম উৎসর্গ করেন।

আশ্রমে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন-কার্য ১২৯৭ সালে এবং পর বৎসর ১২৯৮ সালে ৭ই পৌষ সোমবারে মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

এই মন্দির বার্ন কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে বিরচিত হইয়াছিল। ইহা লৌহময় অবয়বে সংবদ্ধ ও রঞ্জিত কাচফলকে নির্মিত। ফলে ইহা যেমন সুদৃঢ় তেমনই বিচিত্র ও নয়ন-রঞ্জন। লৌহস্তম্ভ সুসংবদ্ধ, ইহার অবয়ব অটল। চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টনীরূপে রচিত শিলাময় সোপানপরম্পরা ও চারিদিকে প্রশস্ত প্রবেশপথ। পূর্বদিকে মন্দিরসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র ত্রিতলে পঞ্চচূড়া; চূড়ায় দীপ্তবর্ণে লিখিত "ওঁ তৎসৎ ঋতং সত্যং।" দক্ষিণ দ্বারের উপরিভাগে ধনুঃখণ্ডাকার লৌহফলকে লিখিত ব্রহ্মমন্ত্র। ইহার অনতিদূরে নাতিদীর্ঘ স্তম্ভোপরে সন্নিবেশিত শ্বেত শিলাপট্টে লিখিত ব্রহ্মলোক-মাহাত্ম্য।

আমার বড়দাদা যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহর্ষির সদরে খাজাঞ্চি ছিলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা-প্রসঙ্গে এক দিন তিনি বলিলেন, যদি তুমি এই উৎসবে যাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার সঙ্গে যাইতে পার। যাতায়াতের রেল ভাড়া, থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা সরকারী—মহর্ষির আদেশ। আমার শান্তিনিকেতন দেখার ইচ্ছা পূর্বেই ছিল; এক্ষণে এই সুযোগে আসিয়া উৎসব দেখা স্থির করিলাম। ৬ই পৌষ রবিবারে সকালের গাড়ীতে বড়দাদার সহিত শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইলাম। মনে হয়, তখন ষ্টেশনে যাওয়ার বড় রাস্তা ছিল না, মাঠের পথে যাতায়াত চলিত। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমার আগে আগে এই পথে আসিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁহার বৈবাহিক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। সকালে ও বিকালে অনেক মান্যগণ্য ব্রাহ্ম অতিথি ও মহর্ষির আত্মীয়স্বজন আসিয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রিয়-

নাথ শাস্ত্রী, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইঁহারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অতিথি। সকলকে সমুচিত অভ্যর্থনায় সম্মানিত ও প্রীত করিয়াছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ।

আশ্রমের দক্ষিণে অনতিদূরে অপেক্ষাকৃত নিম্ন এক ভূমিখণ্ডে একটি সুবৃহৎ বাংলোঘর ছিল। আশ্রমে অবস্থানের সময়ে মহর্ষি এই বাংলোয় বাস করিতেন। এই বাংলো হেতু এই স্থান 'নীচু বাংলো' নামে খ্যাত। এই বাংলোঘরে, আশ্রমের দেবদারু-বীথিকার দক্ষিণে সন্নিবেশিত একটি সুবৃহৎ তাঁবুতে ও দ্বিতল অতিথিশালায় অতিথিগণের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে, পুণ্য প্রত্যুষেই অতিথিশালায় কীর্তন আরম্ভ হইল। বেহালা হইতে আগত একদল ব্রাহ্মবন্ধু গায়ক মৃদঙ্গবাদ্যের সহিত, "প্রাণ ভরে আজ গান কর, তবে ত্রাণ পাবে, তবে আর নাহি ভয়"—গান করিতে করিতে ধীরে ধীরে মন্দিরের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অন্য অতিথিগণ বিনীতভাবে ভক্তিপূর্বক গায়কদলের অনুসরণ করিয়া মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সংকীর্তন বন্ধ হইল। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠাপত্র লইয়া দ্বারে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি প্রতিষ্ঠাপত্রে লিখিত,আশ্রমে উপাস্য-উপাসকের কর্তব্যতা স্বাভাবিক সুস্পষ্ট উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইলেন; পরে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল।

মন্দিরে প্রবেশপূর্বক দণ্ডায়মান হইয়া সকলে অর্চনা পাঠ করিলেন। প্রধান আচার্য দ্বিজেন্দ্রনাথ শ্রীযুত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ স্বামীর সহিত বেদীতে আসনগ্রহণপূর্বক উপাসনা সুসম্পন্ন করিয়া তৎকালোচিত বক্তৃতায় সকলের প্রীতিসাধন ও প্রতিষ্ঠাকার্য সমাপ্ত করিলেন। পরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় সকলের সন্তোষসাধন করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতে যোগ দিয়া গীতমাধুর্যে শ্রোতৃগণকে বিমোহিত করিয়াছিলেন।

সপ্তপর্ণ-মূলে বেদিকার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। আশ্রমে অবস্থানের সময়ে মহর্ষি এই নিভৃত বেদিকায় উপাস্য অনন্তদেবের ধ্যান-ধারণা করিতেন। সপ্তচ্ছদের স্কন্ধদেশে ধাতুফলকে, 'কর তাঁর নাম গান'—এই গীতাংশ লিখিত ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ভক্তগণ মন্দিরে উপাসনান্তে এই পবিত্র বেদীমূলে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে কয়েকজন গায়ক ঐ গানটি সম্পূর্ণ গাহিয়া সকলকে প্রীত করিয়াছিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহরে নিমন্ত্রিত অধ্যাপকগণের বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল। ইঁহারা সকলেই উপাসনার সময়ে উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় যোগ্যতানুসারে পাথেয় ও অর্থ দান করিয়া অধ্যাপকগণকে প্রীত ও সম্মানিত করিয়াছিলেন।

ক্রমে বেলা অবসান হইলে, ভক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তৎকালোচিত তত্ত্বগর্ভ বক্তৃতায় সকলকে উদ্বোধিত ও পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

প্রতাপচন্দ্রের বক্তৃতার অবসানে সঙ্গীতের পরে সান্ধ্য-উপাসনার সময় সমাগত হইল। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রধান আচার্যের কার্য করেন। উপাসনার সময়ে স্তোত্রপাঠে ও "অসতো মা সদ্ গময়" ইত্যাদি স্বাধ্যায়ে সকলে যোগ দিয়াছিলেন। উপাসনা সময়োপযোগী সুগম্ভীর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় তত্ত্ববিষয়ক উদ্বোধন উপদেশ ও বক্তৃতায় শ্রোতা ভক্তগণকে বিশেষ প্রীত ও পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

কলকণ্ঠ কবিবর গায়কদলে যোগদান করিয়া সুললিত গীতমাধুর্যে সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

সামাজিক শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত অতিথিসৎকারে ও আনুষঙ্গিক কর্তব্যতায় সুব্যবস্থায় অতিথিসেবায় কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে নাই।

দিবাব্যাপী প্রতিষ্ঠার উৎসব বহু ভক্ত অতিথির সমাগমে ও সানন্দ সাগ্রহ যোগদানে এইরূপে সফল ও সর্বাঙ্গসুন্দর অনুষ্ঠানে পরিসমাপ্ত হইয়াছিল।

এই সময়ে মহর্ষির শরীর জরাজীর্ণ, তিনি এই উৎসবে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে, শান্তিনিকেতনে মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব তাঁহার জীবনের অতিপ্রিয় শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান; তাই তিনি বলিয়াছেন,—আশ্রমে উপস্থিত হইতে পারিলাম না, কিন্তু জানিও, সকলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ মানসিক উপস্থিতি সর্ব সময়েই রহিয়াছে।

পর বৎসর ৭ই পৌষ বুধবারে শান্তিনিকেতনে প্রথম সাংবৎসরিক উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। প্রত্যুষেই ব্রহ্মনাম কীর্তন আরম্ভ হয়। আট ঘটিকার পূর্বে গায়কগণ গান করিতে করিতে মন্দির তিন বার প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে অর্চনা ও সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র হৃদয়স্পর্শী উদ্বোধন উপদেশ ও বক্তৃতায় সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

উপাসনান্তে একদল গায়ক কীর্তন করিতে করিতে সপ্তপর্ণতলে বেদীমূলে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে কুঞ্জবিহারী দেব প্রভৃতি গায়কগণ সঙ্গীত ও সংকীর্তন করিয়া সকলকে সবিশেষ প্রীত করিয়াছিলেন। মন্দির হইতে গান করিতে করিতে বেদীমূলে যাওয়ার যে নিয়ম আছে, এই বৎসর এই স্থানে তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল মনে হয়।

এই সাংবৎসরিক উৎসবে অন্ধ খঞ্জ অনাথ—সকলকে

দিবার জন্য পাঁচ শত বস্ত্রখণ্ড ও প্রচুর তণ্ডুল পাত্রে পাত্রে মন্দিরের চারিদিকে সোপানে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। উপাসনার পরে উৎসর্গ করিয়া সোপকরণ পাত্রগুলি বিতরণ করা হইল।

সান্ধ্য উপাসনা পূর্ব বৎসরের ন্যায় যথানিয়মে সম্পন্ন হইলে, সমাগত স্থানীয় লোকদিগের সন্তোষার্থ নানাবিধ চমৎকার আতসবাজি প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠার বৎসরে ও এই প্রথম সাংবৎসরিক উৎসবে মেলার বিবরণ পাওয়া যায় না। মনে হয়, এই সমাগত সাধারণ লোক মেলার ব্যবসায়ী ও ক্রেতা।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম: বিদ্যালয়ের প্রকোষ্ঠে বিদ্যাভ্যাসের বেদনা রবীন্দ্রনাথের মনে সতত জাগরূক ছিল। আদর্শ শিক্ষাব্রতী কবিবর তাই ১৩০৮ সালে ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে স্বীয় আদর্শে বিদ্যালয়—ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। পূর্বে শিলাই-দহে বালকবালিকাদিগের শিক্ষার্থ নিজ আদর্শে তিনি যে গৃহবিদ্যালয়ের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, এই ব্রহ্মচর্যাশ্রম তাহারই পূর্ণপরিণত প্রতিষ্ঠান। মহর্ষির মন্ত্রগ্রহণের দিন ৭ই পৌষ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠায় কবিরও জীবনেতিহাসের স্মরণীয় দিবস।

কালচক্রের আবর্তন পরিবর্তনশীল; ফলে সমাজের ও মনীষিগণের চিন্তাধারার পার্থক্য ও রুচিভেদ অবশ্যম্ভাবী। এই হেতু প্রাচীনের সহিত নবীনের ঐক্যসাধন সকলক্ষেত্রে সম্ভব হইয়া উঠে না। কবি ইহা বেশ বুঝিয়াছিলেন। তাই প্রাচীন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ও তাহা হইতে বর্তমান যুগের উপযোগী উপকরণ বাছিয়া লইয়া তাহাতে তাঁহার নবীন ব্রহ্মচর্যাশ্রম গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নবীনে প্রাচীনের হুবহু অনুকরণের প্রয়াস তাঁহার ছিল না। তাঁহার আশ্রমের নিয়ম ছিল—ছাত্রগণের প্রাতরুত্থান, প্রাতঃ-কৃত্যসাধন, প্রাতঃস্নান, রক্তচেল বস্ত্রে ও উত্তরীয়ে ব্রহ্মচারিবেশে নিভৃতে উপাসনা, নিরামিষ ভোজন, আহারে সংযম, বিহারে নিয়মনিষ্ঠা, ব্যবহারে শিষ্টাচার, বাক্যে সভ্যতা বিনয় ও সংযম, বিশুদ্ধবেশ, পাদুকাবর্জন, বিলাসদ্রব্যের পরিহার, গুরুজনে ও অধ্যাপকে ভক্তি। এই সকল নিয়ম পরিপালন করিয়া আশ্রম-বালকগণ প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবে, সংসারে সংসারীর আদর্শভূত হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার আশ্রম প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য।

কবির আদেশে ১৩০৯ সালে ভাদ্রের প্রথমে আশ্রমে আসিয়া আমি অধ্যাপনাকার্য গ্রহণ করি। প্রারম্ভে প্রতিষ্ঠান-মাত্রের উপকরণের আয়োজন স্বল্পই থাকে। এই আশ্রমেরও সূত্রপাতে সম্পত্তি ছিল তিনটি মাত্র—টালিতে ছাওয়া সুদীর্ঘ একটি কুটির (আধুনিক 'প্রাককুটির'), দক্ষিণে বারান্ডাওয়ালা তিনকুঠরীর একটি ক্ষুদ্র পাকা গ্রন্থাগার, পূর্বে ও দক্ষিণে বারান্ডাওয়ালা ছোট দুই কুঠরীর একটি পাকা পাকশালা। এই স্বল্পমাত্র উপকরণ সম্বল করিয়া কবি স্বীয় আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

স্বাধ্যায়ের নিমিত্ত শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত করা মহর্ষির ইচ্ছা ছিল। গ্রন্থাগারের দক্ষিণে আলিসার মধ্যস্থলে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' চুন-বালির পত্রে অঙ্কিত দেখিয়াছি—ইহা তাহার প্রমাণ। কিন্তু কবি তৎপরিবর্তে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূত্রপাত করিলেন। ইহার প্রারম্ভিক অধ্যাপকমণ্ডলী—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সিন্ধুদেশবাসী রেবাচাঁদ, জগদানন্দ রায়, শিবধন বিদ্যার্ণব। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় পরে আশ্রমে যোগদান করেন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত, প্রেমকুমার গুপ্ত, অশোককুমার গুপ্ত, সুধীরচন্দ্র নাগ—ইঁহারা প্রথম আশ্রম-বিদ্যার্থী।

পরবৎসর আশ্রমে অধ্যাপকরূপে আসিয়া অধ্যাপকবর্গে দেখিয়াছি—মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, সুবোধ-চন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। লেখক এই অধ্যাপক-বর্গের অন্যতম। সন্তোষচন্দ্র মজুমদার এই বৎসরের প্রবেশিকা-বর্গের ছাত্র রথীন্দ্রনাথের সহপাঠী। ছাত্রসংখ্যা এই বৎসর কিছু বাড়িয়া তের-চৌদ্দটি হইয়াছিল, মনে হয়।

প্রাককুটির তিন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ছিল। পূর্ব ও মধ্য প্রকোষ্ঠে অধ্যাপকেরা থাকিতেন। তৃতীয় প্রকোষ্ঠ অপেক্ষা-কৃত দীর্ঘ—ছাত্রগণের বাসস্থান ছিল। ইহার পূর্বপ্রান্তে আড়-দেয়ালের পাশে আমার বাসস্থান ছিল। এই প্রকোষ্ঠে উত্তর দেয়ালের জানলার নিকটে একটি ছোট টেবিল-হারমোনিয়ম ছিল। কবি সন্ধ্যায় এইখানে আসিয়া হারমোনিয়মের সুরে শিশুগণকে লইয়া গান করিতেন। কবির পার্শ্বে শিশুদিগের এই বেষ্টন পিতার কাছে সন্তানের শ্রেণীর মত বড় মনোরম ও মধুর দৃশ্যই ছিল। এই প্রকোষ্ঠ এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরে বিভক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থাগারের পূর্ব কুটিরে কবির লেখাপড়ার সাজসরঞ্জাম থাকিত; লেখাপড়ার কাজ এইখানেই চলিত, থাকিতেন তিনি অতিথিশালার দ্বিতলে। মধ্য কুটিরে চারিপাশে দেয়ালের গায়ে বইয়ের র‍্যাক্ সাজান, মাঝখানে বড় শতরঞ্চি পাতা ছিল। অধ্যাপকগণের সহিত কবি কখন কখন এই কুটিরে বসিয়া আশ্রমাদির বিষয় আলোচনা করিতেন। প্রবেশিকাবর্গের অধ্যাপনা আমি এইখানে করিতাম; অন্যান্য বর্গের পাঠনাস্থান ছিল আশ্রমের বৃক্ষমূল। তৃতীয় কুটির কেবল গ্রন্থাগার। হোরি নামে একটি জাপানী ছাত্র এই কুটিরে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃতের বিদ্যার্থী ছিলেন। তিনি দেবনাগরী অক্ষরে সমস্ত অমরকোষের অনুলিপি করিয়াছিলেন।

রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র ১৩০৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হয়। গ্রীষ্মাবকাশের পরে ১৩১০ সালে কবি ও সুলেখক সতীশচন্দ্র রায় আশ্রমের অধ্যাপনাকার্য গ্রহণ করেন। পরে ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল কবির ইচ্ছানুসারে শিক্ষক ও আশ্রমের অধ্যক্ষের কার্য স্বীকার করেন।

এই বৎসর পৌষোৎসবের পরে কিছুদিনের জন্য শীতের বন্ধ হয়। বন্ধের অবসানে মাঘের শেষে কলিকাতায় আসিয়া আমি কবির সঙ্গে দেখা করিলাম। কবি বলিলেন, আশ্রমে সতীশ বসন্তরোগে আক্রান্ত, বিদ্যালয় শিলাইদহে লইয়া যাইব, তোমরা এইখানে অপেক্ষা কর। এই সময় নগেন্দ্রনাথ আইচ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্বেই আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সতীশচন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। মাঘের শেষে বিদ্যালয়ের কার্য শিলাইদহের কুঠীবাড়ীতে আরম্ভ হইল। মোহিতচন্দ্র সেন এই সময় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় তখন আশ্রমের ধনাধ্যক্ষ ছিলেন। শিলাইদহে ছাত্রসংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

গ্রীষ্মাবকাশের পরে শান্তিনিকেতনে আশ্রমের কার্য্য পূর্ব্ববৎ আরম্ভ হয়। ভূপেন্দ্রনাথ এই সময় বিধুশেখর শাস্ত্রীকে আশ্রমে আনয়ন করেন। ক্ষিতিমোহন সেন পরে অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ক্রমে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নূতন অধ্যাপকও নিযুক্ত হইলেন। বাসস্থানের অভাবে প্রাক্‌কুটিরে পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে টালিছাওয়া দুইটি কুটির ও গ্রন্থাগারের ছাদে সুদৃঢ় সুদীর্ঘ স্তম্ভে প্রতিষ্ঠিত খড়ে-ছাওয়া একটি বৃহৎ ঘর ছাত্রগণের বাসার্থ নির্মিত হইল। পাকশালার দক্ষিণে দীর্ঘ ভোজনগৃহে স্থানাভাবে গ্রন্থাগারের উত্তরে একটি বৃহৎ ভোজন-গৃহ এই সময়ে প্রস্তুত হয়। বিদ্যালয়ের ধন সম্পত্তি এইরূপে আয়ের সঙ্গে বেশ কিছু বাড়িয়া গেল। সেই শিশু-আশ্রম এখন বিশ্বশ্রুত বিরাট বিশ্বভারতী।

কবি অতিথিশালার দ্বিতলে বাস করিতেন, বলিয়াছি। আশ্রমের চারিদিকে মরুময় প্রান্তর ছিল। কিছুকাল দ্বিতলে বাস করিয়া কবি আশ্রমের পূর্বদক্ষিণ প্রান্তেস্থিত প্রান্তরে বাসের জন্য খড়ে-ছাওয়া একটি বড় বাসগৃহ ও পাকশালা প্রভৃতি নির্মাণ করাইলেন। তখন কবিপত্নী স্বর্গগত, কবির পিসী-শাশুড়ী রাজলক্ষ্মী দেবী শিশু মীরা ও শমীকে লইয়া এই বাড়ীতে বাস করিতেন। দেহলীর ক্ষুদ্র মেটে-কুটির পরে নির্মিত হইল, কবি সেইখানেই থাকিতেন, লেখাপড়াও দেহলীতে চলিত। দেহলী দ্বিতল হইলে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া কবি দ্বিতলে বাস করিতেন। বাসস্থান পরিবর্ত্তন কবির স্বভাব ছিল। উত্তরায়ণে—কোণারক শ্যামলী প্রভৃতি কুটিরে ক্রমে ক্রমে বাসপরিবর্তন ইহার পরিচায়ক।

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার প্রায় দ্বাদশ বৎসরের পরে কবি আমাকে আশ্রমে আনিয়াছিলেন, প্রতিষ্ঠার সময় উপাসনাদি যেরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তখনও সকল প্রকারে সেই নিয়মই চলিতেছিল। উপাসনার্থ একজন আচার্য্য, উপাসনার সময় মৃদঙ্গবাদ্যের সহিত গানের জন্য একজন বাদক ও দুই জন গায়ক মহর্ষি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অঘোরানন্দ উপাসনা করিতেন, দুই জন গায়কের সঙ্গে বাদক মৃদঙ্গ বাজাইয়া সঙ্গত করিতেন। প্রতিষ্ঠার সময়ে মৃদঙ্গবাদ্যের উল্লেখ আছে, ইহা তাহারই নিয়মধারা। পরে কবি অধ্যাপক ও ছাত্র লইয়া প্রতি বুধবারে সান্ধ্য উপাসনা করিতেন।

মহর্ষি যখন সপ্তপর্ণ-মূলে আসিয়া বসিয়াছিলেন, তখন চারিদিকের প্রান্তরে নগ্নমূর্ত্তি কি প্রকার ভয়ঙ্কর ছিল, সেই প্রান্তরে পরে বিরচিত আশ্রমে তাহার অণুমাত্র নিদর্শন ছিল না। মন্দিরপ্রতিষ্ঠার সময় শান্তিনিকেতনে আসিয়া দেখিয়াছিলাম আশ্রমই, অর্থাৎ প্রান্তরের খণ্ডিত এই রূপ বনস্পতিচ্ছায়াচ্ছন্ন আশ্রমাকারে পরিণত—সুশ্যামল সুস্নিগ্ধ সুরম্য। চারিদিকে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরবিশেষ—বিশেষরূপে দেখার চক্ষু তখন ছিল না; উৎসবে আসিয়াছিলাম, উৎসবই দেখিয়াছিলাম, তাহাও অসম্পূর্ণভাবে। দ্বাদশ বৎসর পরে আবার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আসিলাম, তখন দেখিলাম বালুকাকঙ্করময় ঊষর প্রান্তর চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে—পশ্চিম প্রান্তর সুবিস্তীর্ণ, প্রান্তরেখা সুদূর দিগন্তে আকাশে মিশিয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে মরুরস-জীবী তৃণকণ্টকের ঝোপঝাড়—গাছপালা কিছুই নাই, কেবল একটি ছোট গাছের তাপজীর্ণ ম্লানমূর্ত্তি মনে পড়ে; দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম ইহা জীওল (জীবন?) গাছ। রবীন্দ্রনাথের রচিত উদ্যানে সুরক্ষিত হইয়া ইহা শাখা-প্রশাখা পত্রপুঞ্জে পরিমণ্ডলাকারে এখন বর্দ্ধিত হইয়াছে। মরুপ্রান্তরে বর্দ্ধিত ও আদিম গাছের আদর্শভূত বলিয়া ইহা উদ্যানে পালিত ও স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে, মনে হয়।

এখন চারিদিকের সেই তেপান্তর প্রান্তর বিশ্বভারতীর অট্টালিকা-গৃহ পথচতুষ্পথ ও উদ্যানের ঘনসন্নিবেশে বেশ হরিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সেই প্রাচীন মরুচিত্র এখন মনে মনেও অঙ্কিত করা বিশেষ প্রয়াসসাধ্য হইয়াছে।

রবীন্দ্র-জীবনদর্শন

শ্রীজীবনময় রায়

বিষয়টি যেমন বিরাট ও গভীর তেমনি জটিল ও বহুব্যাপক। সমগ্র হিমালয়ের একটা আলোকচিত্র তুলে দেখানো যদি সম্ভব হ'ত তবুও তাতে যেমন সেই দিগ্দিগন্তব্যাপী দেবতাত্মা নগাধিরাজের লীলাবৈচিত্র্যের কোনও স্পষ্ট পরিচয় দেওয়া সম্ভব হ'ত না, বিচিত্র বর্ণসম্ভারে ও রেখার বিভ্রান্তিকর রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের সমগ্র বিশিষ্ট রূপটি স্বল্প পরিসরের মধ্যে সুস্পষ্ট আকারে ফুটিয়ে তোলা তেমনি সম্ভব নয়। ওস্তাদের হাতে বাঁধা বীণায় যে রাগিণী স্তবকে স্তবকে পর্দায় পর্দায় বিস্তার লাভ করেছে, স্বল্পপরিসরের মধ্যে আমার এই ক্ষীণ একতারায় তার পরিপূর্ণ রূপটি উন্মোচন করে দেখানো অসম্ভব। আমি শুধু তাঁর জীবনদর্শনের মূল সুরটির মোটামুটি পরিচয় দেব।

ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব আকস্মিক নয়। ভারতবর্ষের চিরন্তন ও নিগূঢ় মর্মবাণীটি বহন ক'রে যুগে যুগে আমাদের দেশে সম্ভূত হয়েছেন তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষিগণ, নিজ নিজ সাধনার দিব্য জ্যোতিতে লীলাচঞ্চল এই বিচিত্র বিশ্বের অন্তরালে আবিষ্কার করেছেন সেই পরম জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষকে, অনেকদেকং সেই বিরাট 'এক'কে—

> একোবশী সর্বভূতান্তরাত্মা
> একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
> নি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ, স দেবঃ।

আতত বিশ্ব তাঁতে ব্যাপ্ত। তিনিই সকলের নিয়ন্তা ও সকলের অন্তরাত্মা। তিনি একক বহুতে পরিণত করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে লুপ্তপ্রায় ভারতীয় সাধনার আকরস্বরূপ বেদান্তগ্রন্থরাজিকে বিস্মৃতির গর্ভ থেকে উদ্ধার করে বিশ্বমানবের আদরবারে তার মহিমান্বিত স্বরূপটি প্রকাশিত এবং জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সেই সাধনাকে রূপায়িত করে তোলার পন্থা নির্দেশ করেছিলেন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। তিনিই বর্তমান ভারতের মুক্তিমন্ত্রের আদিগুরু। উপনিষদের মন্ত্র মুক্তিরই মন্ত্র। এ মন্ত্র মানবের পরিক্লিষ্ট ক্ষুদ্রায়িত আত্মাকে ভূমার অভিমুখে, বিস্তারের অভিমুখে পরমানন্দময় নির্ভরমুক্তির মন্ত্র। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। ক্ষুদ্রকে সাম্রাজ্যকে অতিক্রম করেই সেই মুক্তি। যো বৈ ভূমা তৎ সুখং—ভূমার মধ্যেই সেই মুক্তি। /

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের সেই বিরাটের সাধনাকে আপন অন্তরের ধ্যানলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সাধনারই বাণী-প্রকাশ।

শুধু লৌকিক অর্থে নয় ঔপনিষদ অর্থে রবীন্দ্রনাথ কবি ও মনীষী। সেই উপনিষদের বাণী মনের সামনে রাখলে রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের মূল কথাগুলি আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারব।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভূমার সাধনা যে মূল সূত্রটিকে অবলম্বন করে স্ফূর্ত হয়েছিল তা হচ্ছে—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। সেই এক মহান্ পরমেশ্বরের দ্বারা নিখিল জগৎ ব্যাপ্য রয়েছে। এই যে একের সর্বব্যাপিত্ব সেই সর্বব্যাপিত্বের অনুভূতিই রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের উপজীব্য। ওঁ যো দেবাগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনম্ আবিবেশ, য ওষধিষু যো বনস্পতিষু—যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি সমস্ত বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন, তিনি সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—তিনিই আনন্দরূপে অমৃতরূপে সমস্ত বিশ্বে প্রকাশিত। তিনিই আমাকে যা অসৎ, যা অনিত্য তার মধ্যে দিয়ে সত্যের মধ্যে লইয়া যান, অন্ধকারের ভেতর দিয়ে জ্যোতির মধ্যে লইয়া যান, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে (এই সকল বিপর্যয়কে এড়িয়ে নয়) অমৃতের মধ্যে লইয়া যান। আবিরাবীর্ম এধি—তিনি আবিঃ, তিনিই প্রকাশিত হন। রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং—রুদ্রের বেশে আবির্ভূত হয়ে তিনি আমাকে আমার আত্মার জড়তা মৃত্যু এবং সর্বনাশ থেকে মুক্ত করে তাঁর প্রসন্নমুখ আমার নিকট প্রকাশ করেন। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমা'নি ভূতানি জা'য়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি॥ এই বিশ্ব আনন্দ থেকেই উৎপন্ন, আনন্দের মধ্যেই এর স্থিতি এবং অবশেষে আনন্দের মধ্যেই এর প্রয়াণ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সেই আনন্দস্বরূপেরই প্রকাশ। রসো বৈ সঃ। তিনি রসস্বরূপ।

য একোঽবর্ণঃ বহুধাশক্তি যোগাৎ বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থ দধাতি। বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ। তিনি জ্যোতিঃ-স্বরূপ। উপনিষদের এই বাণী রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের প্রেরণার উৎস। এরই অনুভূতির জাগ্রত চেতনা রবীন্দ্রনাথের জীবন ও বাণীকে প্রাণবান করেছে।

এনি বেসান্ট যেবার কলকাতার কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হন সেবার শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় সর্বভারতের নেতাদের জীবনদর্শনের বাণী লিখিয়ে নিয়েছিলেন। তখন অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় লিখেছিলেন রসো বৈ সঃ এবং রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, য 'একোবর্ণঃ' ও 'রসো বৈ সঃ'। তবেই দেখা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রজীবন-দর্শনের মূলসূত্র ঐ ঋষিবাক্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এবং যদিচ রবীন্দ্র-

নাথ বলেছেন যে, তাঁর ধর্ম কোন শাস্ত্র থেকে উদ্ভূত হয় নি ; ধর্মকে নিজের অন্তর থেকে উদ্ভূত করে তোলাই তাঁর চিরজীবনের সাধনা ; তথাচ একথা অস্বীকার করার যো নেই যে, ভারতের সকল যুগের সকল শাস্ত্র ও সাধনার অন্তর্নিহিত তাঁর অন্তরের স্বকীয় ধর্ম ও দর্শনের এই আশ্চর্য পরিণতি। সুফীবাদ, মধ্যযুগের ভারতীয়, বিশেষভাবে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব দর্শন-সাহিত্যের প্রভাব তাঁর মধ্যে সুস্পষ্ট। এমন কি আউল, বাউল, ফকির ও বৈরাগীদের গানও তাঁর রচনার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

তবু একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ আদৌ আকণ্ঠ উপনিষদের রসে লালিত। শিশুকাল অবধি পিতার সাধনার রসপ্রভাব তাঁর কবিহৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে, যা সামান্য, যা ক্ষণিকের তাকে অতিক্রম করে, ভূমার সঙ্গে বিরাটের সঙ্গে অনন্তের নিরবচ্ছিন্ন ধারাপ্রবাহের মধ্যে অভিন্নরূপে তাকে অনুভব করবার মানসক্ষেত্র তাঁর প্রস্তুত হয়েছিল। বিশ্বের মধ্যে এই যে একটি সমগ্রতার, একটি অখণ্ডতার একটি সর্বব্যাপী নিরবচ্ছিন্নতার অনুভূতি, এই অনুভূতিই রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের মূল উৎস। এই অনুভূতিকেই তিনি নানা রূপে রসে সুরে ও ছন্দে প্রকাশ করেছেন—একেই বলেছেন সর্বানুভূতি বা বিশ্ববোধ। বিরাটের প্রকাশ-রূপ এই নিখিল বিশ্ব ও নিখিল মানবকে রবীন্দ্রনাথ জীবনে সেই অনুভূতির চেতনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন। "পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম, কস্তুরী-মৃগ সম।" রবীন্দ্র-জীবন-দর্শন বলতে এই বোঝায়। সে দর্শন তাঁর জীবন ও কাব্যে বিচিত্র রাগিণীতে ধ্বনিত হয়েছে ; কিন্তু সকলের অন্তরালে তার সর্বানুভূতি বা বিশ্ববোধের মূল সুরটি অব্যাহত আছে। বিশ্বের সকল স্পর্শ, জীবনের সমস্ত রস নিবিড়ভাবে পরমাত্মীয়-রূপে তাঁকে আকর্ষণ করেছে ; এবং এর সঙ্গে তাঁর সমগ্র সত্তা যে একটি নিগূঢ় প্রেমের যোগেই সঞ্জীবিত—এ চেতনা তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। সুতরাং মানুষের এই ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের বিচিত্র রসপ্রবাহ অহৈতুক নয়। যদি তা হ'ত তা হলে আনন্দস্বরূপ বিধাতার সৌন্দর্যময় এই অভিনব সৃষ্টি এবং এই ইন্দ্রিয়সমন্বিত মানবদেহের নির্দিষ্ট কোনো তাৎপর্য থাকত না। মানুষের মুক্তি ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে নয়। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" —সকল ইন্দ্রিয়কে সেই রসস্বরূপ সুন্দরের অমৃত আস্বাদনের জন্যে মুক্ত করে দিয়ে—যিনি সপর্যগা, সর্বব্যাপী।

• তবু কি তাই ? এই ইন্দ্রিয়ময় সত্তার পরম সার্থকতা কি শুধু আমারই দিকে ? পরিপূর্ণতার অভিমুখে আমাকে এই নিরন্তর বিকশিত করে, আমার এই দেহমনইন্দ্রিয়কে বিচিত্র রসগ্রহণের উপযুক্ত করে, বিশ্ববিধাতা কি শুধু আমাকেই চরিতার্থ করেছেন ? তা নয়। সৌন্দর্যমননিবিড় এই তাঁর সৃষ্টি, সেই আনন্দময় সৃষ্টির রসাস্বাদন না করে শিল্পীর তৃপ্তি কোথায় ? সেই অমৃতময় রসাস্বাদনের তৃষ্ণায় আমার সমস্ত দেহমনইন্দ্রিয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে আকূতি সে ত সামান্য নয়। বিধাতার আপন তৃষ্ণা যে সঞ্চারিত হয়েছে আমার এই পরমাশ্চর্য সত্তার মধ্যে। আমার সত্তার এই পবিত্র তীর্থে, আমার এই দেহভৃঙ্গার পূর্ণ করে, সেই তীর্থামৃত পান না করতে পারলে বিধাতার যে মুক্তি নাই। "আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।" "হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ, কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।"

নির্গুণ ও নির্বিকার ব্রহ্ম তাঁর নির্বিকল্পতার মহাব্যোম থেকে এক দিন বিশ্বরচনাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই চলেছে বিরহী বিধাতা আর নির্বাসিত মানবাত্মার পরস্পরকে ফিরে পাবার ব্যাকুল সাধনা। তাই সেই প্রবাসী মানবাত্মার সমস্ত আনন্দময় জীবনচেষ্টার অন্তরালে রয়েছে একটি অন্তঃশীলা সদাজাগ্রত বেদনাবিধুর আকূতি—'আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী'। কিন্তু এই আকুলতা ত শুধু মানবাত্মারই নয়। বিধাতা যে সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে বেরিয়েছেন আমারই অভিসারে। 'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি, সে যে আসে আসে আসে।'

রূপ ও অরূপের সম্পর্ক পরস্পর অভিন্নতার সম্পর্ক, অথচ সে অভিন্নতা নির্বিকল্প অভিন্নতা নয়। সে অভিন্নতায়—'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ', সে অভিন্নতায় 'সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।' রূপের পরিপূর্ণ উপলব্ধি তাকে অর্থাৎ রূপাতীতের উপলব্ধিতে। রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি। অনির্বচনীয়কে, রূপাতীতকে প্রকাশ করাই তাঁর ধর্ম। প্রকৃতির রূপ যেমন তার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র বস্তুকে অবলম্বন এবং অতিক্রম করে সমগ্রের ঐকতানে একটি অপরূপের আভাসে মনকে উতলা করে, পরিমিত বাক্য ও ছন্দকে বাহন অথচ অতিক্রম করে গীতিকবিতা তেমনি তার সমগ্রের সমবায়ে এক অনির্বচনীয় রসের সন্ধান দেয়।

কবির ভাষায়, "যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাস এবং অপরিচিত বিশ্বের জন্য মন কেমন করিতে থাকে।" "আমি উন্মন হে, হে সুদূর আমি প্রবাসী।"

বাইরের দিকে বিশ্বের মধ্যে অখণ্ডতার অনুভূতি যেমন অন্তরের দিকেও তেমনি এই বিশ্ব এবং মানবজীবনের মধ্যে একটা অখণ্ডতা সাধনের কাজ চলেছে—সে কাজ আমার জীবনদেবতার নিজের হাতের কাজ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। তিনি [illegible] [illegible] দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা

বিপুলের সহিত বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন। বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত আনন্দধারার বৃহৎ স্মৃতি তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।" মানবজীবনের মধ্যে জীবন শিল্পী বিধাতার এই বিশিষ্ট স্বরূপকেই কবি জীবনদেবতা আখ্যা দিয়েছেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবেই অনুভব করেছেন যে "আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া রহিয়াছে। সমস্তই সেই প্রেমলীলার উদ্বেল তরঙ্গমালা।"

আমার মধ্যে আমি গড়ে উঠছি এবং আমার মধ্যে তিনি গড়ে তুলছেন, এই দুই গঠনের যুগল নৃত্যে আমাদের রাসলীলা উঠেছে জমে। এই গড়ার যে দিকটায় আমি, সে দিকটায় এই মধুর সৃষ্টি তাঁর আমার পিপাসার্ত মানবজীবন, আর যে দিকটায় আমার জীবনদেবতা সেদিকে অনাদি কাল এবং অনন্ত প্রেম। যে প্রেম না থাকলে, আমি যে আছি, আমি যে হয়ে উঠছি, আমি যে প্রকাশ পাচ্ছি তার কোন সম্ভাবনাই থাকত না।

আমার জীবনে জীবনদেবতার এই প্রেমের লীলা বিচিত্র রূপে ও রসে প্রকাশিত—শিশুর হাসিকান্নায়, প্রেমের মিলনে, বন্ধুর প্রীতিতে, প্রকৃতির অজস্র সেবায়; আবার কখনো দুঃখের বেশে, কখনো অশান্তির মধ্যে, কখনো বা মৃত্যুর রূপে, কখনো রুদ্রের মূর্তিতে।

ভাষায় যে বাণী কূল পায় না "সুরের মাঝারে লুকাইয়ে কহি তাহারে।" রবীন্দ্রনাথের গান সেই অনির্বচনীয়ের বাণী—যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। "ভাষার অতীত তীরে, কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।" এই গানই রবীন্দ্র-দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। "আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে।" বাঁশিই শুধু তাঁর বচনাতীতকে ব্যক্ত করতে পারে। এই গান উৎসারিত হয়েছে কবির অন্তরলোক থেকে, প্রকৃতির অন্তঃপুর-বাতায়ন-বর্তিনী মোহিনীর গোপন ইঙ্গিতে। "তোমার নয়ন আমায় বারে বারে বলেছে গান গাহিবারে। ফুলে ফুলে তারায় তারায় বলেছে সে কোন ইশারায়।"

কিন্তু জীবনকে সত্য করে গভীর করে জানতে হলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় পাওয়া চাই। কেননা পলকে পলকে "মৃত্যুই ত প্রাণ হয়ে ওঠে ঝলকে ঝলকে।" কেননা, সে যে "তুলিতেছে শুচি করি মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।" মৃত্যু ত বিভীষিকা নয়। "মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।" রবীন্দ্র-জীবন-ধর্মের প্রধান সুর রুদ্রের অন্তঃসলিলা প্রেমের পরিচয়। জীবন দেবতার মাহন্‌ প্রেমই—"রোগের মতন বাঁধিব তোমারে দারুণ আলিঙ্গনে।"—রুদ্রের এই অন্তঃসলিলা প্রেমের পরিচয়ই রবীন্দ্র-জীবন-ধর্মের প্রধান সুর। রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখং। "এক হাতে ওর কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার, ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।" "বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ গান।" "ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়—তোমারি হউক জয়।"

তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়
তোমারি হউক জয়
হে বিজয়ী বীর নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়।*

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে।

অবিস্মরণীয়

শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

এমন করে ফেলিয়া যাওয়া চলে
যুক্ত করি নিবিড় বাহুপাশ।
এমন করে ভুলিয়া যাওয়া চলে
মিথ্যা করি অদ্ভুত আশ্বাস।
তিমির-ঘন বিরহ-অন্তপটে
উজল তব তাপস আঁখি দুটি
যত দুরাশা, যত ব্যথা যায়
উজলতর হয়ে উঠিছে ফুটি।

পরশাতীত হয়েছ কত কাল,
দরশাতীত হয়েছ কত যুগ।
পু[illegible] পথ চেয়ে
নয়নমন আজিও উন্মুখ।
দূরে গিয়েছ তাই না জানা গেল
কত গভীরে এসেছ মরমের,
জীবনে তব স্মৃতি যাবে না মোছা—
মুছিতে পারে পরশ মরণের।

পাগল

শ্রীঊষা ভট্টাচার্য্য

সেদিন রাস্তা দিয়ে চলছি, সঙ্গে রয়েছে এক বন্ধু। হঠাৎ সে আমার দৃষ্টি এক দিকে আকৃষ্ট করে বললে—"দেখ ভাই, একটা পাগল কি রকম মজার মজার কথা বলছে আর হাত-পা নাড়ছে।" আমি তাকিয়ে দেখলাম লোকটা সত্যিই পাগল।

সাধারণ লোকের কাছে পাগল, শুধু পাগলই। সে কেবল যা-তা বকে, রাস্তায় ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। আবার অনেক সময় হয়ত অত লোককে মারধোরও করে। মোটামুটি বলতে গেলে আমরা পাগল সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ঘামাই না।

পাগল সম্বন্ধে এই উদাসীনতা সব দেশেই চিরকাল ছিল। কিন্তু গত কয়েক বৎসর থেকে আমাদের এ ধারণা কিছু কিছু বদলে যাচ্ছে। আগে লোকের ধারণা ছিল যে, অনেক পাপ কাজ করলে তবে পাগল হয়। লোকে পাগলকে মোটেই ভাল চোখে দেখত না। পাগলকে অনেক সময় ডাইন বলা হ'ত, এবং এই অভিযোগে তাকে পুড়িয়ে মারবার দৃষ্টান্তও বহু দেশে পাওয়া যায়।

কিছুদিন থেকে মনোবিদ্‌রা পাগলামিকে মনের রোগ বলে প্রমাণ করেন এবং এই সঙ্গে আমাদের মন থেকেও আগেকার ঐ সব ভুল ধারণা ক্রমশঃ চলে যাচ্ছে। মনোবিদ্‌রা বলেন, যেমন শারীর রোগের রকমফের দেখতে পাই এবং লক্ষণ অনুসারে চিকিৎসকেরা কোনটাকে 'টাইফয়েড', কোনটাকে 'নিউমোনিয়া' ইত্যাদি নাম দেন; ঠিক সেই ভাবেই মনোবিদ্‌রা মানসিক রোগেরও ক্ষেত্রে নানা নামকরণ করেন। পাগলামি বলতে শুধু একপ্রকার রোগই বোঝায় না। এর ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রোগের নামকরণ করা হয়েছে। মানসিক রোগ শুধু এক রকমেরই হয় না। সাধারণ লোক, অল্প বিকৃতমস্তিষ্ক এবং সম্পূর্ণ বিকৃতমস্তিষ্ক ইত্যাদি নানা ধরণের লোক আমরা দেখতে পাই। মোটামুটি আমরা তিন প্রকারের মানসিক বিকৃতি লক্ষ্য করে থাকি। বিকৃতির গুরুত্ব অনুসারে যথাক্রমে নাম দিই—উদ্বায়ু (Neurosis), বায়ুরোগ (Psycho-Neurosis) এবং বাতুলতা (Psychosis)।

উদ্বায়ুক (Neurotic) বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি কতকগুলি সামান্য মানসিক বিকার যেগুলি আমরা সব সময় লক্ষ্য করি না, কিন্তু এগুলি মাঝে মাঝে রোগীর যথেষ্ট কষ্টের কারণ ঘটায়। উদ্বায়ু আবার দুই প্রকারের, যথা—উৎকণ্ঠা উদ্বায়ু (Anxiety-Neurosis)। এই রোগে রোগীর মনে সব সময় দারুণ উদ্বেগ আর অস্থিরতা দেখা যায়। যে-কোন সাধারণ ব্যাপার উপলক্ষ্য করে রোগীর মনে অযথা দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের সঞ্চার হয়। যেমন হয়ত রোগী সব সময় মনে মনে ভয় পায় যে যদি তার বাবা, মা বা কোন প্রিয়জনের মৃত্যু হয় তবে কি হবে। এই ভয় এদের সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী থাকে আর এর জন্য এরা মুহ্যমান হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় প্রকারের উদ্বায়ু হচ্ছে স্নায়বিক অবসাদ (Neurasthenia)। এই রোগে রোগী সর্ব্বদা অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে থাকে। হাতে পায়ে মোটেই জোর থাকে না। সামান্য পরিশ্রমে রোগী অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করে।

দ্বিতীয় প্রকারের মানসিক বিকৃতি হচ্ছে বায়ুরোগ (Psycho-Neurosis)। এরও আবার কয়েকটা প্রকারভেদ আছে, যথা—বিপরিণামী হিষ্টিরিয়া, (Conversion Hysteria), আবেশিক বায়ু (obsessional Psycho-Neurosis), এবং হাইপোকনড্রিয়া (Hypochondria); উৎকণ্ঠা হিষ্টিরিয়া। (Anxiety hysteria) ইত্যাদি।

হিষ্টিরিয়া রোগে রোগীর মূর্চ্ছাই স্বাভাবিক লক্ষণ। এর নানা রকম লক্ষণ হতে পারে যেমন—পায়ে ব্যথা, ফোস্কা, (blister); পক্ষাঘাত (paralysis), আরও নানারকম লক্ষণ দেখা যায়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, এই সকল রোগ মানসিক (functional)। এর কোনটাই শরীরের কোন রকম ক্ষত থেকে হয় না। যেমন একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারা যাবে। বিপরিণামী হিষ্টিরিয়ার কথাই ধরা যাক। এখানে রোগী কোন মানসিক চিন্তাকে সত্য বলে মনে করে। ধরুন কোন লোকের ঘাড়ে সংসারের চাপ রয়েছে। আর সে হয়ত কিছুতেই সংসার চালাতে পারছে না। সেক্ষেত্রে সামনে কোন উপায় না দেখে সে যদি কোন রোগের আশ্রয় নিতে পারে তবে হয়ত রেহাই পায়। রোগী ভাবনাচিন্তা এমন ভাবে করতে থাকে যে সে কাঁধে খুব ব্যথা অনুভব করে। অথচ চিকিৎসক পরীক্ষা করে হয়ত কোন কারণই খুঁজে পেলেন না। এসবই মানসিক। অবশ্য এর কারণ মনোবিদ্‌রা রোগীর সজ্ঞান মনে পান না, তবে পাওয়া যায় অবচেতন (unconscious) মনে। মনঃসমীক্ষণ দ্বারা তা খুঁজে পাওয়া যায়। আবেশিক বায়ু আবার দুই রকমের। একটা প্রকাশ পায় রোগীর চিন্তাধারার মধ্যে, আর একটা প্রকাশ পায় তার কার্য্যধারার ভিতরে। চিন্তার বিকৃতি কি রকম? আমি একটি লোককে জানি সে সব সময় এই চিন্তা করত যে বেতালের তিনটে পা না হয়ে চারটে পা হ'ল কেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এ আর এমন

কি কষ্টদায়ক চিন্তা। কিন্তু যার ওরকম হয় সে ছাড়া আর কেউ এর কষ্ট বুঝতে পারে না। রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে মনোবিদের কাছে ছুটে আসে।

কার্য্যক্ষেত্রে কি রকম হয় তা এবার বলছি। এমন অনেক লোকই আছেন যাঁরা হয়ত যত বারই সিঁড়ি দিয়ে উঠেন বা নামেন তত বারই সিঁড়িতে ক'টি ধাপ আছে না গুণে পারেন না বা রাস্তার ধার দিয়ে যেতে হলে প্রত্যেকটি ল্যাম্পপোষ্ট না ছুঁয়ে পারেন না। এঁরা এমন যে যদি কোন জায়গায় খুব তাড়াতাড়িও যেতে হয়, হয়ত বা ট্রেন ফেল হয়ে যায় তবুও এগুলি না করে পারেন না।

...হাইপোকনড্রিয়া রোগে আমরা দেখি যে রোগী তার শরীরের বিশেষ কোন অংশ সম্বন্ধে অভিযোগ করছেন। রোগী হয়ত মনে করেন যে, তার পেটের ভেতরে পাকস্থলীই নাই আর এই ধারণার বশে কিছুই খান না। কারণ তার পাকস্থলীই নাই, তবে খাবার খেলে যাবে কোথায়?

আপাতদৃষ্টিতে এ বিষয়গুলো খুবই হাস্যকর মনে হলেও বাস্তবিক পক্ষে এরকম অনেক লোক সচরাচর আমাদের মধ্যে আছেন যাঁদের হঠাৎ দেখলে কিছুই বুঝতে পারা যায় না, তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এগুলো প্রকাশ পায়।

এবার আমি কয়েকটি রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করব যেগুলো একেবারে বিকৃতমস্তিষ্কদের মধ্যেই শুধু দেখা যায়। যথা—চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (Dimentia Proecox) এই রোগে মানুষের সাধারণ বুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়ে যায়। রোগী নিজেকে বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করে রাখে। নিজের মনে মনে কল্পনায় সে পৃথক জগৎ সৃষ্টি করে। আর তার মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখে। তার মনে নানা রকমের অদ্ভুত ধারণা জন্মে। নিজেকে হয়ত পৃথিবীর রাজাই মনে করে, কারণ কল্পজগতে সবই সম্ভব। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তার কোন চেতনাই থাকে না। খুব কম কথা বলে, অল্প অল্প হাসে। অনেক সময় হয়ত বিড় বিড় করে যা তা বকে; চুপচাপ বসে থাকে—হয়ত খাওয়া-দাওয়াও ত্যাগ করে।

আর এক ধরণের রোগ আছে তাকে বলে খেপোন্মত্ত বাতুলতা (Manic Depressive Psychosis)। এই রোগের দুটি ধারা আছে। খেদ (Manic) অবস্থায় রোগী খুব উত্তেজিত থাকে। এত বেশী ও দ্রুত চিন্তাধারা মনের মধ্যে আসে যে, সে গুলো গুছিয়ে বলতে পারে না। কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়। অনেক অকথা কুকথা বলে ও খুব জোরে জোরে গান করতে ও নাচতে থাকে। আবার মাঝে মাঝে মারধোরও করে। কিছুদিন এই অবস্থায় থাকার পর বিষণ্ণ (depressive) অবস্থা আসে—বিষণ্ণ অবস্থায় রোগী খুব মুহ্যমান হয়ে থাকে। একেবারেই কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। আত্মহত্যা করার প্রবল ইচ্ছা থাকে। রোগী কিছুই খায় না। মুখে সর্বদা দুঃখের ভাব থাকে। বহুদিন যাবৎ এরূপ রোগগ্রস্ত হয়ে থাকলে মানুষ বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে যায়।

আর একটি প্রধান মানসিক রোগ হচ্ছে "ভ্রম বাতুলতা" (Paranoia)। এই রোগে রোগীর কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণা থাকে। অন্য সকল বিষয়েই সে সাধারণ লোকের মত ব্যবহার করে, শুধু তার বিশেষ ধারণার ক্ষেত্রে অদ্ভুত রকমের ব্যবহার করে। এই রোগে বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে নষ্ট হয় না। ভুল ধারণা এই রকমের হতে পারে, যথা—রোগী হয়ত মনে করে যে কেউ তাকে বিষ দিয়ে মারতে চাচ্ছে। না হয় মনে করতে পারে যে, সে মিশরের রাণী "ক্লিয়োপেট্রা", এবং সে সকলের সঙ্গে হয়ত সেইভাবে ব্যবহার করবে। অনেক রোগী হয়ত মনে করে যে, তার শরীরের কোন একটা অংশই নেই ইত্যাদি। এই রোগ আবার অনেক রকমের হয়। এর একটির নাম করছি বিভ্রম বাতুলতা (Paraphrenia)। এই রোগে সব সময় রোগীর মনে হয়—যে সবাই তার দিকে চেয়ে আছে, না হয় তার সম্বন্ধে কথা বলছে ইত্যাদি।

এতক্ষণ যে সব "বাতুলতা" সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম সেগুলোর কারণ সম্পূর্ণ মানসিক। কিন্তু আরও কতকগুলো মানসিক রোগ আমরা দেখতে পাই যেগুলির কারণ কতকটা মানসিক আর কতকটা শারীরিক। যেমন একটি রোগ আছে তার নাম "General Paralysis of the Insane"। সিফিলিস এই রোগের কারণ। এতে মাথার ভেতর ক্ষত দেখা যায়। এতে বুদ্ধিবৃত্তি একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। রোগী অনর্গল বকে। একটা কথার সঙ্গে আর একটা কথার কোনই সামঞ্জস্য থাকে না। তা ছাড়া রোগীর আত্মসংযম থাকে না।

অপস্মার (Epilepsy) রোগটিও মাথার মধ্যে কোন রকমের ক্ষত থেকেই হয়। এতে রোগীর 'ফিট' হয়। তবে এর মূর্চ্ছা হিষ্টিরিয়ার মূর্চ্ছা থেকে কিছু আলাদা। এতে রোগী অসম্ভব হাত পা খিঁচতে থাকে। এর আবার দুটো ভাগ আছে। একটির নাম (Grand Mal) এবং অপরটির নাম (Petit Mal)। পূর্ব্বোক্তটিতে রোগীর মূর্চ্ছা হয়। এই মূর্চ্ছা যেখানে সেখানে হতে পারে, কিন্তু হিষ্টিরিয়ার মূর্চ্ছা বেশ নিরাপদ জায়গা ছাড়া হয় না। মূর্চ্ছার সময় তড়কার মত হাত পা ছোঁড়ে। মূর্চ্ছার শেষে রোগী কিছুক্ষণ ঘুমায়। পরে মাথা ধরা ভাব থাকে। শেষোক্ত রোগটি সময়সময়ে হতে পারে। মূর্চ্ছা হয় না, তবে দু-এক সেকেণ্ডের জন্য রোগী হয়ত অন্যমনা হয়ে যায়। হয়ত বসে কাজ করছে হঠাৎ দু-এক সেকেণ্ড কি রকম হয়ে গেল—হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। এটা রোগী নিজেই বুঝতে পারে না—তবে তার সামনে যারা থাকে তারা বুঝতে পারে।

তা ছাড়া এক রকমের নানা খারাপ আছে যেটা অনেক স্ত্রীলোকের প্রসবের পর হয়; এর নানা রকমের লক্ষণ হতে পারে তবে এগুলি বেশী দিন থাকে না। এর নাম Puperal Insanity। বুড়ো বয়সে মস্তিভ্রম হয়, এটাকে ভীমরতি বলে।

উপরে যে সব রোগের বর্ণনা দিলাম সেগুলি খুবই সাধারণ। এ ছাড়াও আরও কতকগুলি ছোটখাটো রোগ আছে। সে সবের বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়।

তা হলে এখন আমরা বুঝতে পারি যে, পাগল বললে আমরা মাত্র এক রকম পাগলই বুঝি না। ভাবে অনুসন্ধান করলে এর মধ্যে আমরা নানা ভাগ করতে পারি। মনোবিদরা এক এক রোগের এক একটি কারণ বের করেছেন এবং মনোরোগ চিকিৎসকেরা (Psychiatrist) এদের চিকিৎসার জন্য নানা রকম উপায় বের করেছেন। আজকাল আর পাগল বললে মনে ঘৃণা বা উপেক্ষার ভাব আসে না। এদের চিকিৎসার জন্য অনেক জায়গায় ভাল ভাল হাসপাতালের ব্যবস্থা হয়েছে। এ সব জায়গায় ওদের রেখে সারিয়ে তোলবার ব্যবস্থা করা হয়।

ধর্ম্মঠাকুর ও কূর্ম্মমূর্ত্তি

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় বিগত আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে 'প্রাচীন বঙ্গে ধর্ম্মপূজা' নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া, ঢাকা গ্রন্থাগারে রক্ষিত দুইটি কচ্ছপের খোলে উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপির পাঠ নিরূপণ করিয়া তাহার নূতন একটি ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তাঁহার মতবাদকে তিনি নিজে চূড়ান্ত বলিয়া মনে না করিয়া 'প্রবাসী'র পাঠকদিগের মতামত জানিবার জন্যও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার মত পণ্ডিত ব্যক্তির যোগ্য কাজই হইয়াছে। তাঁহার এই আগ্রহ দেখিয়া এই বিষয়ে আমি আমার মতবাদ তাঁহাকে জানাইতে উৎসাহ বোধ করিতেছি। আশা করি, আমার মতবাদটিও তিনি পরীক্ষা করিয়া এই বিষয়ে তাঁহার নিজের মতামত পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

কচ্ছপের খোলে উৎকীর্ণ লিপি দুইটি ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডক্টর সরকার একটি লিপিতে 'ধম' (ধর্ম) কথাটি পাইয়া এবং তাহা কচ্ছপের খোলে উৎকীর্ণ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই 'ধম' 'আমাদের সুপরিচিত ধর্ম্মঠাকুর ব্যতীত আর কেহই নহেন।' কারণ তাঁহার মতে 'কচ্ছপের পিঠের খোলের ব্যবহার এই ধারণা সমর্থন করিতেছে।' কিন্তু এই সম্পর্কে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পূর্ব্ববঙ্গে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা অজ্ঞাত। পূর্ব্ব-বাংলার কোন অঞ্চলেই ধর্ম্মঠাকুরের কোন মন্দির নাই, তাঁহার সম্বন্ধে কোন জনশ্রুতি প্রচলিত নাই, প্রাচীন ও বর্ত্তমান লৌকিক সাহিত্যের মধ্যেও তাহার কোন প্রকার উল্লেখ মাত্রও পাওয়া যায় না। ধর্ম্মপূজা একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই প্রচলিত। ডক্টর সরকার তাঁহার উক্ত মতামতের সমর্থনে যে নজিরের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতেও এই মত নিশ্চিত ভাবে সমর্থিত হয় না। তিনি বলিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল তাঁহাদের "রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গলে"র ভূমিকায় দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্বে পূর্ব্ব এবং উত্তর-বাংলাতেও ধর্ম্মঠাকুর-পূজার প্রচলন ছিল। কিন্তু উক্ত সম্পাদকদ্বয় এই সম্বন্ধে এই একটি মাত্র বাক্যে এই কথাটি মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, "পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে চৈত্র-সংক্রান্তিতে যে "দেল" (অর্থাৎ দেউল) ও 'পাট' পূজা হয় তাহা ধর্ম্মঠাকুরের গাজনের অনুষ্ঠান-বিশেষের স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে।" বলা বাহুল্য, কেবলমাত্র এই কথাটির উপর নির্ভর করিয়া 'পূর্ব্বে পূর্ব্ব এবং উত্তর-বাংলাতেও ধর্ম্মঠাকুর পূজার প্রচলন ছিল' এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ পূর্ব্ববঙ্গে যে গাজন অনুষ্ঠিত হয় তাহা শিবের গাজন কিংবা নীলের গাজন বা নীলপূজা বলিয়াই পরিচিত; পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মপূজার বিশেষ কোন আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গেই ইহার কোন আচারাদির ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব উক্ত সম্পাদকদ্বয় যে 'পূর্ব্ব ও উত্তর বাংলাতে ধর্ম্মঠাকুর পূজার প্রচলন ছিল' বলিয়া 'দেখাইয়াছেন' এমন কথা বলা সমীচীন মনে হয় না।

ধর্ম্মঠাকুরের সুনির্দ্দিষ্ট কোন রূপ নাই। অতএব কূর্ম্মমূর্ত্তির সঙ্গে তাঁহার ঐক্য নির্দ্দেশ করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখি না। ধর্ম্মঠাকুরের সর্ব্বজনবিদিত প্রচলিত ধ্যান-মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে; তাহা এই—

'যস্যান্তো নাদিমধ্যো ন চ করচরণৌ নাস্তি কায়ো ন নাদঃ।
নাকারো নৈবরূপং ন চ ভয় মরণে নাস্তি জন্মানি যস্য।
যোগেন্দ্রৈর্ধ্যানগম্যং সকল জনময়ং সর্ব্বলোকৈক নাথম্।
ভক্তানাং কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিম্॥'

ইহাতে ধর্ম্মঠাকুরকে স্পষ্টতঃই করচরণহীন, নিরাকার ও

মালয়ের কথা

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়
রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়

বিচিত্র দেশ মালয়। ভারত মহাসাগরে অবস্থিত এই শান্তি-প্রদ উপদ্বীপটি যুগে যুগে বিশ্ব-ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব আনুমানিক ৬,০০০ অব্দে পাপুয়া দ্বীপ এবং অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগের পূর্ব্বজগণ মালয়ের পথে ঐ দুই স্থানে গমন করিয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব আনুমানিক ২,০০০ অব্দে আধুনিক মালয় জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ চীনের ইউনান প্রদেশ হইতে মালয়ে আগমন করে। পরে ইহাদেরই বিভিন্ন শাখা দ্বীপময় ভারতের সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। ঐতিহাসিক যুগে বৃহত্তর ভারতের বৌদ্ধ শ্রীবিজয়-সাম্রাজ্য মালয় উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চলের কিয়দংশে স্বীয় অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া মালাক্কা প্রণালীর উপর কর্তৃত্ব করিত। খ্রীষ্টোত্তর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যবদ্বীপের মজপহিত-হিন্দুসাম্রাজ্যের আক্রমণের ফলে শ্রীবিজয়ের গৌরব-রবি অস্তমিত হয়।

খ্রীষ্টীয় ১৪০৩ অব্দে শ্রীবিজয় বংশের এক রাজকুমার মালাক্কা দ্বীপে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। পরবর্তী শতবর্ষকাল মালাক্কা তদানীন্তন সভ্যজগতের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এই মালাক্কাকে কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় এবং আরবদেশীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ দ্বীপময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইস্লামের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে আলবুকার্ক মালাক্কা জয় করিয়া ইহাকে সুদূর প্রাচ্যের পর্ত্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত করেন। ১৬৪১ সনে ওলন্দাজগণ পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে মালাক্কা কাড়িয়া লয়। ইহার পর বহু বৎসর মালাক্কা প্রাচ্যভূখণ্ডের প্রধান ওলন্দাজ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। পরে বাটাভিয়া মালাক্কার স্থান অধিকার করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মালাক্কা যখন ইংরেজদিগের হস্তগত হয় তখন তাহার পূর্ব্ব গৌরবের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট ছিল না।

বিংশ শতাব্দীতে টিন এবং রবারের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ার ফলে সিঙ্গাপুরের অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। ১৯৪২ সনে জাপান কর্তৃক সিঙ্গাপুর অধিকৃত হওয়ার পর ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের রক্ষা-ব্যবস্থা তাসের ঘরের মত ভাঙিয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষের নিরাপত্তাও বিপন্ন হইয়া পড়িল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে মালয়ে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ইহার পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম মালয়ের জাতীয় ধর্ম্ম ছিল। আধুনিক মালয়বাসীর আচার-ব্যবহারে এবং ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে এখনও হিন্দুপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মালয় উপদ্বীপের পূর্ব্বাঞ্চলেই এই প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মালয়ের মুসলমান যাদুকরগণ আজও কালী, বিষ্ণু এবং গণেশের নামে মন্ত্রোচ্চারণ করে। বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের মূর্ত্তি লইয়া আজও মালয়বাসী শোভাযাত্রা বাহির করে। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে মালয়বাসী হিন্দুগণের মতই অবগাহন করিয়া থাকে। হিন্দু-দেবতা শিবকে মালয়বাসী জিনগণের (মুসলমান অপদেবতা বিশেষ) শীর্ষস্থানীয় বলিয়া মনে করে। তাহাদিগের ধারণা যে উল্কাখণ্ড তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের বাণ। তাহারা বিশ্বাস করে যে চল্লিশটি শৃঙ্গবিশিষ্ট বৃষ নন্দের শৃঙ্গের উপর পৃথিবী অবস্থান করিতেছে। অনন্তনাগের ফণার উপর পৃথিবীর অবস্থিতির সহিত এই বিশ্বাসের সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। মালয় উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চলে রামায়ণের কাহিনী সুপরিচিত। মালয়ের বহু মুসলমান ফকির এবং দরবেশের দরগা যে রূপান্তরিত হিন্দু-মন্দির তাহা সহজেই ধরা যায়। মালয়বাসীর ধর্ম্মে হিন্দু প্রভাব ব্যতীত হিন্দু-পূর্ব্ব যুগের জড়োপাসনার প্রভাবও বিদ্যমান।

আরবদেশীয়গণের নিকট হইতে আধুনিক মালয়বাসী ধর্ম্মমতের সঙ্গে মধ্য-প্রাচ্যে প্রচলিত সংস্কার, এবং ঐতিহ্যও বহুলাংশে লাভ করিয়াছে। গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটলকে তাহারা ম্যাসিডনীয় বীর আলেকজাণ্ডারের পুত্র বলিয়া মনে করে। মালয়বাসীর ধারণা যে এরিষ্টটল মালয়ে আগমন করিয়াছিলেন। মিশরীয় এবং পারসিকগণের ন্যায় মালয়বাসীও শুভাশুভ লক্ষণ এবং ভবিষ্যদ্বাণীতে আস্থাবান। তাহারা মনে করে যে, স্বপ্ন নিরর্থক নহে।

মালয়বাসীর আচার-অনুষ্ঠানে সর্ব্বদেশীয় এবং সর্ব্বজাতীয় প্রথার সমন্বয় ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পেরাক রাজ্যের সুলতানের অভিষেকের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজ্যাভিষেকের সময় সুলতান যে তরবারি ধারণ করেন তাহাতে আরবী লেখ উৎকীর্ণ। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, এই তরবারি এক দিন আলেকজাণ্ডারের হাতে শোভা পাইত পেরাকের সুলতানগণ মনে করেন যে, তাঁহারা আলেকজাণ্ডারের উত্তর পুরুষ: রাজকীয় ঘোষক সংস্কৃত ভাষায় সুলতানের সিংহাসনারোহণের কথা ঘোষণা করে। অন্যে যাহাতে জানিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে সুলতানের কানে কানে তাঁহার ভারতীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম তাঁহাকে জানাইয়া দেওয়া হয়। অভিষেকের সময় সুলতানের মাথার উপর হরিদ্রাবর্ণের রাজছত্র শোভা পায়। হরিদ্রা-ছত্র চীনের

রাজকীয় চিহ্ন। অভিষেক-উৎসবের সময় যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়, তাহাদের নাম পারস্যদেশীয়।

শ্যামের দক্ষিণে, সুমাত্রার উত্তরে, ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব্বে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত একটি সঙ্কীর্ণ উপদ্বীপ এবং তৎসন্নিহিত কয়েকটি দ্বীপ লইয়া ইংরেজশাসিত মালয় গঠিত। আয়তনে ইহা প্রায় ইংলণ্ডের সমান। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পূর্ব্বে মালয় নিম্নলিখিত তিনটি রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত ছিল—

১। সিঙ্গাপুর, পেনাঙ, মালাক্কা এবং লাবুয়ানের সমবায়ে গঠিত ষ্ট্রেটস সেটল্‌মেণ্টস।

২। পেরাক, সেলাঙ্গর, নেগ্রিসেম্বিলন এবং পাহাঙ এই চারিটি ইংরেজ-আশ্রিত মালয় রাজ্য লইয়া ১৮৯৫ সালে গঠিত মালয় যুক্তরাষ্ট্র।

৩। জোহর, কেদা, কেলাণ্টান, পার্লিস ও ট্রেঙ্গানু এই পাঁচটি ইংরেজ-আশ্রিত রাজ্য।

ষ্ট্রেটস সেটলমেণ্টস ইংরেজ-রাজ কর্ত্তৃক নিযুক্ত গবর্ণরের অধীনে ক্রাউন কলোনি রূপে, এবং উল্লিখিত রাজ্য নয়টি ইংরেজ উপদেষ্টার পরামর্শ অনুসারে স্ব-স্ব সুলতান কর্ত্তৃক শাসিত হইত।

রবার এবং টিনের উৎপাদনকেন্দ্র হিসাবে মালয়ের খ্যাতি সর্ব্বত্র। রবারের ক্ষেত্রে চাষের কাজ এবং খনি হইতে টিন উত্তোলনের জন্য জনবিরল মালয়ে বাহির হইতে বহুসংখ্যক শ্রমিক আমদানী করিতে হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় মালয়ের মোট অধিবাসীর শতকরা ৪২ জন মাত্র মালয়জাতীয় ছিল। এই সময় মালয়ের মালয়জাতীয় এবং চীনা অধিবাসীর সংখ্যা যথাক্রমে ২,২৫০,৩৩৩ এবং ন্যূনাধিক ২,৪০০,০০০ জন ছিল। মালয়ের প্রবাসী ভারতীয়-গণের সংখ্যাও একেবারে নগণ্য নহে। ১৯৩১ সালের আদমশুমারির হিসাব অনুযায়ী মালয়-প্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা ছিল ৬৪৪,২৮৩ জন। মালয়ের শ্রমজীবীদিগের অধিকাংশই চীনা অথবা ভারতীয়। শ্রমের ক্ষেত্রে বহিরা-গতের সংখ্যাধিক্যের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দার যুগেও মালয়ে বেকার-সমস্যা কোনদিনই উৎকট হয় নাই। ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থা খারাপ হইলে বাহির হইতে শ্রমিকের আগমন হ্রাস পাইত এবং প্রবাসী চীনাদের অনেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। প্রবাসী ভারতীয়গণের স্বার্থরক্ষার জন্য নিযুক্ত 'ইণ্ডিয়ান ইমিগ্রেশন কমিটি' কর্ত্তৃক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শ্রমক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের হার নির্দ্ধারিত হওয়ার ফলে বাণিজ্যের মন্দার সময়েও পারিশ্রমিকের হার বিশেষ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে পারিত না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে মালয়ের কৃষিক্ষেত্রসমূহে নিযুক্ত সাধারণ শ্রমিক ৩৫ হইতে ৬০ সেণ্ট (আমেরিকান) পারি-শ্রমিক পাইত। তখন ৩০·২২৫ সেণ্ট একটি ভারতীয় টাকার সমান ছিল। ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্তও মালয়ের শ্রমজীবিগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠে নাই। চীনা শ্রমিকগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত পারস্পরিক সাহায্যদান সমিতিগুলিকে যুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগে মালয়ের একমাত্র শ্রমজীবী সংগঠন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কালে মালয়ে শ্রমিক-ধর্ম্মঘট বাড়িয়া যায়। এই সময় শ্রমজীবীদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য একাধিক আইন প্রণয়ন করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের সময় জাপান মালয় অধিকার করে। জাপ শাসনাধীন মালয়ে বেকার-সমস্যা তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল এবং নিত্য প্রয়োজনীয় বিবিধ দ্রব্যের অভাব দেখা দিয়াছিল।

রবার এবং টিন মালয়ের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ। এই দুইটি পণ্যের জন্যই জগতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মালয়ের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে সমগ্র পৃথিবীতে মোট উৎপন্ন রবারের প্রায় অর্দ্ধাংশ মালয়ে উৎপন্ন হইত। সমগ্র পৃথিবীতে খনি হইতে মোট যত টিন উত্তোলন করা হইত, তাহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশের যোগানদার ছিল মালয়। রবার এবং টিনের তুলনায় মালয়ের অন্যান্য সম্পদের পরিমাণ একান্তই উপেক্ষণীয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে কয়েকটি জাপানী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক মালয় উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত খনিসমূহ হইতে ম্যাঙ্গানীজ, বক্সাইট এবং লৌহ উত্তোলিত হইত। মালয়ের কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে রবার ব্যতীত আনারস, নারিকেল তৈল, পাম অয়েল এবং ধানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মালয়ের কোন উল্লেখযোগ্য শ্রমশিল্প নাই বলিলেই চলে। অল্পস্বল্প যাহা কিছু আছে, সমস্তই সিঙ্গাপুর, পেনাঙ, মালাক্কা এবং লাবুয়ান অঞ্চলে অবস্থিত। শ্রমিকদিগের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত। মালয়ে যত টিন পাওয়া যায়, তাহার প্রায় সমস্তটাই পেরাক, সেলাঙ্গর, নেগ্রিসেম্বিলন এবং পাহাঙ যোগাইয়া থাকে। জোহর, কেদা, কেলাণ্টান, পার্লিস এবং ট্রেঙ্গানুতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধান উৎপন্ন হয়। মালয় উপদ্বীপের সর্ব্বত্রই রবারের চাষ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ (১৯৩৭-৪৫) মালয়ের অর্থ-নৈতিক জীবনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই যুদ্ধের সূচনা হইতেই প্রবাসী চীনারা জাপানী পণ্য বর্জ্জন করিতে আরম্ভ করে। জাপ মালিকের কারখানায় চীনা শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিয়া দিল। যুদ্ধের জন্য প্রবাসী চীনাদের অনেকের নিকট স্বদেশের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় অবস্থা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিল।

মালয়ের মোট কর্ষণযোগ্য জমির তিন-পঞ্চমাংশ অরণ্য-সমাচ্ছন্ন এবং অকর্ষিত। আরণ্য অঞ্চল বিভিন্ন আদিম জাতির আবাসস্থল। সুতরাং প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্য সত্ত্বেও মালয়

খাদ্যের দিক হইতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে। তাহাকে প্রয়োজনীয় চালের দুই-তৃতীয়াংশই বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। দুনিয়ার বাজারে টিন এবং রবারের চাহিদা দ্বারা মালয়ের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। মালয়ের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের ওঠা-নামার প্রভাব বিশেষ ভাবেই অনুভূত হইয়া থাকে।

মালয় উপদ্বীপের আদিবাসীদিগের মধ্যে সেমাঙ বা পাঙান, সাকাই, জাকুন, এবং ওরাঙ-লাউট জাতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদিগের মধ্যে কেদা, কেলান্টন এবং পেরাক রাজ্যের অধিবাসী খর্ব্বকায় সেমাঙ বা পাঙানগণ সর্ব্বাপেক্ষা অনগ্রসর। ইহারা অতিশয় নিরীহ এবং মোটেই অপরাধপ্রবণ নহে। ইহারা বন্য ফল-মূল এবং মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদিগের বর্ত্তমান সংখ্যা ২,০০০-এর অধিক নহে। পর্ব্বতবাসী সাকাই বা সেনোই জাতি সেমাঙ বা পাঙানগণের তুলনায় অনেক সভ্য। মূলতঃ ইন্দো-নেশীয়গণের সগোত্র হইলেও ইহাদিগের দেহে বিভিন্ন জাতির রক্ত মিশ্রিত হইয়াছে। সাকাইগণ কয়েকটি উপ-জাতিতে বিভক্ত। প্রত্যেক উপজাতি স্বীয় প্রধান বা মোড়ল কর্ত্তৃক শাসিত হয়। ইহারা সংখ্যায় ন্যূনাধিক ২০,০০০। কৃষিকার্য্য ইহাদিগের উপজীবিকা হইলেও ইহারা যাযাবর স্বভাব একেবারে পরিত্যাগ করে নাই এবং এক জায়গায় বেশী-দিন থাকে না। অরণ্যচারী জাকুনগণ ফল-মূল এবং মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ওরাঙ-লাউটগণ সমুদ্রচারী। মৎস্য শিকার ইহাদিগের জীবিকার একমাত্র উপায়।

সভ্য মালয় জাতি প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য ও মৃগয়া দ্বারা এবং স্বচ্ছন্দ বনজাত ফল-মূল আহরণ করিয়া কোন প্রকারে দিন গুজরান করে। ইহারা গর্ব্বিতস্বভাব এবং শ্রমবিমুখ। মালয়গণ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী এবং ব্যবহারিক জীবনে অতিশয় চতুর ও বুদ্ধিমান। ইহারা পারিবারিক জীবনে সাধারণতঃ সুখী হইয়া থাকে। মালয়জাতীয় স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই অল্পবয়সে বিবাহ হয়। বহুবিবাহ ইসলাম ধর্ম্মানুমোদিত হইলেও মালয়ী কৃষক একাধিক পত্নী গ্রহণ করে না। কিন্তু বন্ধ্যা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নহে।

মালয়ের ব্যবসায়-বাণিজ্য সমস্তই প্রায় প্রবাসী চীনা-দিগের হাতে। প্রবাসী চীনাদের মধ্যে অনেকে চাকুরি এবং আইন ও চিকিৎসা-ব্যবসায় ইত্যাদিতে নিযুক্ত আছেন। ইঁহাদিগের শ্রম এবং সহায়তা ব্যতীত মালয় বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে পারিত না।

মালয় ও ভারতবর্ষের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন। মালয়ের সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রভাবের ছাপ আজও একেবারে মুছিয়া যায় নাই। মালয়ী বর্ণমালা মূলতঃ ভারতীয়। মালয়বাসীর ধর্ম্ম এবং আচার-অনুষ্ঠানে হিন্দু প্রভাবের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, মালয়ের বর্ত্তমান প্রবাসী ভারতীয়গণ শতকরা ৯০ জনই দক্ষিণ-ভারত হইতে আগত তামিলজাতীয়। ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই রবারের বাগান, রেল-লাইন এবং পূর্ত্তবিভাগে শ্রমজীবীর কাজে নিযুক্ত আছে। প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে অল্পসংখ্যক ব্যবসায়ী, চিকিৎসক এবং ব্যবহারজীবীও আছেন। কেহ কেহ চাকুরিও করিয়া

মালয়ের অধিবাসীদিগের মধ্যে অল্পসংখ্যক সিংহলদেশীয় তামিলজাতীয় কেরাণী, রত্ন-ব্যবসায়ী, ছুতারমিস্ত্রী, ক্ষৌর-কার এবং শ্রমজীবীর কথাও উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য অধিবাসীর মধ্যে প্রায় এক হাজার ইহুদী, কয়েক হাজার আরব এবং ফিলিপাইন, শ্যাম ও আনাম দেশীয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মালয়ের অধিবাসিগণের মধ্যে কিছু ইউরেশীয়ও আছে। ইহাদিগের অনেকের ধমনীতেই পর্ত্তুগীজ শোণিত প্রবাহিত। ১৯৪৭ সনে মালয় যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ৯,১৮৬। ইহা ব্যতীত মালয় উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চলে কিছু শ্যামদেশীয় অধিবাসীও আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ ভাগে মালয় ইংরেজ-দিগের সংস্পর্শে আসে। ১৭৮৫ সালে ফ্রান্সিস লাইট নামক জনৈক ব্রিটিশ জাহাজের অধ্যক্ষ কেদার সুলতানের নিকট হইতে পেনাঙ ইজারা লন। ১৮০০ সালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেদার সুলতানের নিকট হইতে বর্ত্তমান ওয়েলেসলি প্রদেশ লাভ করেন। কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পরে ১৯০৯ সালে শ্যামরাজ কেদা, পার্লিস, কেলান্টান এবং ট্রেঙ্গানু এই রাজ্য চারিটি ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দেন। এইজন্য ইংরেজগণ শ্যামরাজকে অনেক টাকা ধার দিয়াছিলেন। তাহা ব্যতীত ইংরেজ নাগরিকগণ শ্যামে কোন অপরাধ করিলে ইংলণ্ডে প্রচলিত আইন অনুসারে তাহাদের বিচার করিবার অধিকারও এই সময় ইংলণ্ডকে ছাড়িয়া দিতে হয়। ১৮২৪ সালের স্বাক্ষরিত লণ্ডন সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইংরেজগণ মালাক্কা এবং মালয় উপদ্বীপ লাভ করে। ইহার পূর্ব্বেই ১৮১৯ সালে টমাস ষ্ট্যাম্ফোর্ড র‍্যাফলস নামক ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক কর্ম্মচারীর চেষ্টায় সিঙ্গাপুর ইংরেজদিগের হস্তগত হইয়াছিল।

১৮৭৪ সালে পেরাক এবং সেলাঙ্গরের সুলতান স্ব-স্ব রাজ্যের শাসনকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য ইংরেজ পরামর্শ-দাতা গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়ায় এই রাজ্য দুইটি ব্রিটিশ প্রভাবাধীনে আসে। ১৮৯৪ সালে পাহাঙ এবং ১৮৯৫ সালে নেগ্রিসেম্বিলনের সুলতানও স্ব-স্ব রাজ্যে ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখিতে সম্মত হইলেন। ১৮৮৫ সালে জোহরের সুলতান এবং ইংরেজদিগের মধ্যে স্বাক্ষরিত সন্ধি অনুসারে ইংরেজগণ জোহরকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিল। জোহরের সুলতান ইংলণ্ড ব্যতীত অপর কোন

বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ না হইবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন। সুলতান অঙ্গীকার করিলেন যে, ইংরেজগণ ইচ্ছা করিলে তিনি স্বীয় রাজ্যে একজন ইংরেজ কূটনৈতিক প্রতিনিধিও গ্রহণ করিবেন।

১৯১৪ সালে দ্বিতীয় ইঙ্গ-জোহর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির সর্তানুসারে সুলতান শাসনকার্য্যে সহায়তার জন্য এক জন ইংরেজ পরামর্শদাতা গ্রহণ করিলেন। সুলতান প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, মালয়বাসীর ধর্ম্ম এবং প্রাচীন প্রথা ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয়ে তিনি এই উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

সিঙ্গাপুর, পেনাঙ, মালাক্কা এবং লাবুয়ানের সমবায়ে গঠিত ষ্ট্রেটস সেটেলমেণ্টস্ সিপাহী যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক শাসিত হইত। যুদ্ধের পর কোম্পানী উঠিয়া গেলে বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিস কয়েক বৎসর ইহার শাসনকার্য্য পরিচালনা করে। ১৮৬৭ সালে ষ্ট্রেটস সেটেলমেণ্টস একটি ক্রাউন কলোনীতে পরিণত হইল। এই সময় হইতে ইহার শাসন এবং ব্যবস্থা-পরিষদে বেসরকারী সদস্য গ্রহণের রীতি হয়। ষ্ট্রেটস সেটেলমেণ্টসের অধিবাসিগণের মধ্যে প্রবাসী চীনাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য উভয় পরিষদেই ইংরেজ ব্যতীত অন্যান্য বে-সরকারী সদস্য অপেক্ষা চীনা সদস্য সংখ্যায় বেশী হইত। উভয় পরিষদেই মালয়, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় সদস্যও মনোনীত হইতেন। ব্রিটিশ ব্যবসায়ী সঙ্ঘসমূহ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ব্যবস্থা-পরিষদের দুই জন ইংরেজ সদস্য ব্যতীত অন্য সমস্ত বেসরকারী সদস্যই সেটেলমেণ্টসের গবর্ণর কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। বলা বাহুল্য, এই শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা প্রায় সর্ব্বাংশেই গবর্ণরের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

কেদা, পার্লিস, কেলাণ্টান, ট্রেঙ্গানু, জোহর, পেরাক, সেলাঙ্গর, নেগ্রিসেম্বিলন এবং পাহাঙ এই নয়টি মালয় রাজ্য বিভিন্ন সময়ে স্বাক্ষরিত সন্ধি অনুসারে ইংরেজের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। এই সমস্ত সন্ধির প্রত্যেকটিরই সারমর্ম্ম এই যে, রাজ্যের সুলতান একজন ইংরেজ রেসিডেণ্টের পরামর্শানুযায়ী চলিবেন। মালয়বাসীর ধর্ম্ম এবং রাজ্যে প্রচলিত প্রাচীন প্রথায় হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার রেসিডেণ্টের থাকিবে না। শাসনের সুবিধার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে একটি রাষ্ট্র-পরিষদ্ (State Council) থাকিবে। পরিষদের আইন প্রণয়ন এবং শাসনকার্য্যের ক্ষমতা থাকিবে। রাজ্যের প্রধান সামন্তবর্গ, রেসিডেণ্ট ও চীনা বণিকগণ এই পরিষদের সদস্য এবং সুলতান ইহার সভাপতি হইবেন। পরে কয়েক জন সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজ এবং ভারতীয়ও পরিষদের সদস্য মনোনীত হইবেন। স্বীয় কার্য্যের জন্য রেসিডেণ্টকে ষ্ট্রেটস সেটেলমেণ্টসের গবর্ণরের নিকট জবাবদিহি করিতে হইত। প্রত্যেকটি আশ্রিত রাজ্য নিজের জন্য স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করিত। ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার যোগাযোগ ছিল না।

১৮৯৫ সালে পেরাক, সেলাঙ্গর, নেগ্রিসেম্বিলন এবং পাহাঙ রাজ্যের সমবায়ে মালয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একজন রেসিডেণ্ট জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। ইংরেজের আশ্রিত মিত্রে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বে মালয়ের সুলতানগণ শাসনকার্য্য সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্যের প্রধানদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ১৮৮৯ সাল হইতে তাঁহারা স্ব-স্ব রাষ্ট্র-পরিষদের সহায়তায় আইন প্রণয়ন করিতেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে পরিষদের মতামত গ্রহণ করিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী রাজ্যগুলির সুলতানদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত না হইলেও তাঁহাদিগকে নিজ নিজ রাজ্যের রেসিডেণ্ট, যুক্তরাষ্ট্রের রেসিডেণ্ট-জেনারেল এবং ষ্ট্রেটস সেটলমেণ্টসের গবর্ণরের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে হইত। ষ্ট্রেটস সেটলমেণ্টসের গবর্ণর মালয় যুক্তরাষ্ট্রের হাই কমিশনার নিযুক্ত হইলেন।

রেসিডেণ্ট জেনারেলের সুপারিশক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধ রাজ্যসমূহ অপেক্ষাকৃত দরিদ্র রাজ্যগুলিকে অর্থ এবং নিপুণ কর্ম্মচারী দ্বারা সহায়তা করিতে সম্মত হইল। সুলতানদিগকে লইয়া একটি সভা গঠিত হইল। আইন প্রণয়নের বা অর্থ বরাদ্দের কোন ক্ষমতা এই সভার ছিল না। রেসিডেণ্ট-জেনারেলের হস্তে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হইল।

১৯০৯ সালে মালয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ (Federal Council) স্থাপিত হইল। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেক রাজ্যের স্থানীয় পরিষদগুলির হাত হইতে প্রায় সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের হাতে ন্যস্ত করা হইল। সুলতানগণ এই পরিষদের সদস্য এবং ষ্ট্রেটস সেটলমেণ্টসের গবর্ণর ও যুক্তরাষ্ট্রের হাই কমিশনার ইহার সভাপতি হইলেন। সুলতানগণ ব্যতীত রেসিডেণ্ট-জেনারেল, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক রাজ্যের রেসিডেণ্ট, তিন জন বেসরকারী ইংরেজ এবং এক জন চীনা এই পরিষদের সদস্য মনোনীত হইলেন। পরে সদস্য-সংখ্যা আরও কিছু বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৯২৭ সালে পরিষদে আট জন বেসরকারী সদস্য ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে পাঁচ জন ইংরেজ, দুই জন চীনা এবং এক জন মালয়-সামন্ত ছিলেন। এই বৎসরই পরিষদের সংস্কার করা হয়। এই সংস্কারের পর ইহার মোট সদস্য-সংখ্যা ২৪ জন হইল। ইহার মধ্যে ১১ জন সরকারী এবং ১৩ জন বেসরকারী সদস্য। 'সুলতানগণ আর যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য রহিলেন না। ৪ জন বেসরকারী মালয়জাতীয় সদস্য তাঁহাদের স্থান গ্রহণ করিলেন।

মালয় উপদ্বীপের উত্তরাংশে অবস্থিত জোহর, কেদা, কেলান্টান, ট্রেঙ্গানু এবং পার্লিস মালয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে নাই। কেদার সুলতানের সহিত ইংরেজদিগের যে সন্ধি হয়, তাহাতে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয় যে, কেদার রাষ্ট্র-পরিষদের অনুমোদন ব্যতীত তাহাকে ষ্ট্রেটস সেটলমেন্টস বা মালয় উপদ্বীপের অন্য কোন রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করা চলিবে না। জোহর এবং কেদার সঙ্গে ইংরেজদিগের সর্ত হয় যে, এই দুইটি রাজ্যে মালয়জাতীয় কর্মচারিগণ ইউরোপীয় কর্মচারিগণের মতই মর্য্যাদা লাভ করিবেন। আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে মালয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলি অপেক্ষা ইহার বহির্ভূত রাজ্যগুলি অধিক স্বাধীনতা ভোগ করিত। টাকাকড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে ইহারা সম্পূর্ণভাবেই ইংরেজ-কর্তৃত্ব-নিরপেক্ষ ছিল।

১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর জাপান মালয় আক্রমণ করে। ১৯৪২ সালের ৩১শে জানুয়ারীর পূর্ব্বেই ইংরেজগণ সিঙ্গাপুরে পশ্চাদপসরণ করে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাপান সিঙ্গাপুর অধিকার করিয়া লয়। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত মালয় জাপানের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। কেদা, কেলান্টান, পার্লিস এবং ট্রেঙ্গানু শ্যামের এবং সুমাত্রা জাপ-শাসিত মালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইল। জাপ শাসনাধীন মালয়ে সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই সময়ে মালয়ের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবন জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষের ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হইত। টোকিওর জঙ্গী দপ্তর কর্তৃক নিযুক্ত একজন ডিরেক্টর-জেনারেল জাপ-শাসিত মালয়ের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। স্বীয় কার্য্যকলাপের জন্য ইনি জঙ্গী দপ্তরের নিকট দায়ী ছিলেন। কয়েকজন উপদেষ্টা ও পদস্থ কর্ম্মচারী এবং মালয়ের অধিবাসী প্রধান প্রধান সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ ডিরেক্টর-জেনারেলের কার্য্যে সহায়তা করিত। প্রত্যেক রাজ্যেই অনুরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। তবে ডিরেক্টর-জেনারেলের পরিবর্ত্তে প্রত্যেক রাজ্যে একজন করিয়া গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন। জাপানী ব্যতীত অন্য কাহাকেও শাসন-বিভাগের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হইত না। স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা দেশীয় লোক কর্তৃক পরিচালিত হইত। জাপ শাসনের যুগে মালয়ের অর্থনৈতিক অবস্থার ঘোরতর অবনতি ঘটিয়াছিল। বেকার-সমস্যা অতিশয় উৎকট হইয়া উঠে। ইহার ফলে প্রবাসী ভারতীয় ও চীনারাই বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছিল।

১৯৪৫ সনে ইংরেজ পুনরায় মালয় অধিকার করে। বিলাতের কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব করিলেন যে, একমাত্র সিঙ্গাপুর ব্যতীত সমগ্র মালয় একটি যুক্তরাষ্ট্রে (Union of Malaya) পরিণত হইবে। মালয়ের তাঁবেদার সুলতানগণ যুদ্ধের পূর্ব্বে যে ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, নূতন সংস্কার-প্রস্তাবে তাঁহাদিগকে প্রায় সর্ব্বতোভাবে সে ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা হয়। জনসাধারণের হস্তে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদানের কোন ব্যবস্থাই এই প্রস্তাবে ছিল না। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী হিসাবে একজন ইংরেজ হাই-কমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থাও উল্লিখিত প্রস্তাবে ছিল।

পার্লামেন্টে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। মালয় হইতে অবসরপ্রাপ্ত ১৭ জন উচ্চপদস্থ রাজ-পুরুষ—ইঁহাদিগের মধ্যে একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবং চারজন প্রাক্তন গবর্ণর—সংস্কার-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 'টাইমস' পত্রিকায় এক খোলা চিঠি লিখিয়া মত প্রকাশ করেন যে, প্রস্তাবিত শাসন-ব্যবস্থায় মালয়ের স্বাতন্ত্র্য বিলোপ করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

মালয়ের সর্ব্বত্র এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলিতে থাকে। পূর্ণ এক সপ্তাহকাল শোকসূচক পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া মালয়বাসী সংস্কার-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইল। মালয় জাতীয়তাবাদী দল এবং সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকগণও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালাইতে থাকে। অবশেষে চাপে পড়িয়া ইংরেজ সরকারকে এই প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে হইল।

ইহার পর কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ সরকারী কর্ম্মচারী এবং মালয়দেশীয় প্রতিনিধি লইয়া মালয়ের ভবিষ্যৎ শাসন-বিধি প্রণয়নের জন্য একটি তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করা হয়। কমিটি সিঙ্গাপুর ব্যতীত সমগ্র মালয়কে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করিয়া ইহাকে 'ফেডারেশন অব মালয়' নামে অভিহিত করিবার সুপারিশ করিলেন। এই 'ফেডারেশন' একজন ইংরেজ হাই কমিশনার কর্তৃক শাসিত হইবে। সুলতানদের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করা হইবে না। সরকারী এবং বেসরকারী সদস্যের একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা হাই-কমিশনারের কাজে সহায়তা করিবে। কমিটির মালয়ী প্রতিনিধিগণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক রাজ্যেই একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন করিবার সুপারিশ করিলেন। পূর্ব্বের সংস্কার-প্রস্তাবে বহিরাগতদিগকে যে যে সর্ত্তে নাগরিকের অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছিল কমিটি তাহা বহাল রাখিতে সুপারিশ করিলেন। বিলাতের কর্তৃপক্ষ সামান্য রদবদলের পর কমিটির সমস্ত সুপারিশই গ্রহণ করিয়াছেন।

১৯৪৮ সনে মালয়ে নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। নূতন আইন অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যে একটি ব্যবস্থা-পরিষদ এবং একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হইয়াছে। নাগরিক ব্যতীত আর কাহারও ভোট দিবার এবং পরিষদ অথবা

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সদস্য হইবার অধিকার নাই। যে সমস্ত বহিরাগত মালয় যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে অথবা অন্যূন ১৫ বৎসরকাল যুক্তরাষ্ট্রে বাস করিয়াছে কেবলমাত্র তাহাদিগকে নাগরিকের অধিকার প্রদান করা হইবে। শেষোক্ত ব্যক্তিগণকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহারা মালয় যুক্তরাষ্ট্রকেই নিজ নিজ দেশ বলিয়া মনে করে।

এদিকে ১৯৪৮ সন হইতেই মালয়ে বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত একটি বিবরণে দেখা যায় যে, এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে ন্যূনাধিক ১০০,০০০ সশস্ত্র যোদ্ধা (সৈনিক ও পুলিস) নিয়োগ করিতে হইয়াছে এবং দৈনিক ৪৫০,০০০ টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে। সরকার এবং বিদ্রোহী এই উভয় পক্ষে হতাহতের সংখ্যাও নগণ্য নহে। ইহা সত্ত্বেও শান্তি ফিরিয়া আসিতেছে না। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার যুদ্ধোত্তর যুগে যে অশান্তির হাওয়া বহিতেছে কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা রাজনৈতিক রূপ ধারণ করিলেও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সমস্যা মূলতঃ অর্থনৈতিক। অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটাইয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন না করিতে পারিলে শান্তি-প্রতিষ্ঠার আশা সুদূরপরাহত।

জাতি বিভাগ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৩৫৫ সালের ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে জাতিভেদ নামক প্রবন্ধে শ্রীনীলিমা সরকার লিখিয়াছিলেন—প্রাচীন কালে জন্ম অনুসারে জাতি নির্দ্দেশ হইত না, প্রত্যেক ব্যক্তির গুণ ও কর্ম্ম বিচার করিয়া তাহার জাতি নির্দ্দেশ করা হইত। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে তিনি এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কোনও একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে হইলে তাহার সপক্ষের যুক্তিগুলি উল্লেখ করা যেরূপ প্রয়োজন, তাহার বিপক্ষের যুক্তিগুলি উল্লেখ করিয়া তাহা খণ্ডন করাও সেইরূপ আবশ্যক। কিন্তু লেখিকা তাহা করেন নাই। শাস্ত্রের যে বাক্যগুলি আপাতদৃষ্টিতে তাঁহার সিদ্ধান্ত সমর্থন করে, তিনি কেবল সেই বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মনোমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শাস্ত্রের যে বাক্যগুলি তাঁহার অভীষ্ট মতের বিরোধী তিনি সেগুলির উল্লেখ করেন নাই। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সকল বাক্যের উল্লেখ করিব এবং দেখাইব লেখিকা যে বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার ঠিকমত অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শাস্ত্রের কোনও বাক্যের অর্থ করিবার সময় দেখিতে হইবে যে, তাহা যেন শাস্ত্রের অপর বাক্যের বিরোধী না হয়। অন্য শাস্ত্রবাক্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে ব্যাখ্যা করা যায় তাহাই গ্রহণযোগ্য। লেখিকার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কতকগুলি সাধারণ যুক্তি আছে—আমরা প্রসঙ্গক্রমে সেগুলিরও উল্লেখ করিব।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" (৪।১৩)। লেখিকা ইহার অর্থ করিয়াছেন, "গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে আমি চারিটি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।" কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে এই বাক্যের এরূপ অর্থ করা যায় না।

(১) কোনও ব্যক্তির গুণ ব্রাহ্মণের ন্যায়, কিন্তু কর্ম্ম ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ন্যায় হইতে পারে; যদি গুণকর্ম্ম অনুসারে জাতি নির্ণয় করিতে হয় তাহা হইলে তাহার কি জাতি হইবে ?

(২) একজনের গুণের ও কর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। আজ যে ব্যক্তি ভাল পরে সে মন্দ হইতে পারে; আজ যে মন্দ পরে সে ভাল হইতে পারে। কর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। আজ যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিতেছে, পরে সে ব্যবসা করিতে পারে। এই ভাবে একজন লোকের গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে বার বার জাতি পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নয় এবং ইহাতে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

(৩) কোনও ব্যক্তির প্রকৃত গুণ কিরূপ তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। যে ব্যক্তিকে বন্ধুগণ ভাল বলেন, শত্রুরা তাহাকে মন্দ বলে।

(৪) দ্রোণ, কৃপ, পরশুরাম ইঁহারা যুদ্ধ করিতেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলা হয় নাই, ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছিল। কারণ তাঁহারা ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৫) অশ্বত্থামার গুণ বা কর্ম্ম কিছুই ব্রাহ্মণের ন্যায় ছিল না। তাঁহার কর্ম্ম ছিল যুদ্ধ, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম। গুণ হিসাবে তিনি এত নিষ্ঠুর ছিলেন যে, রাত্রিকালে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিয়া পাণ্ডবদের নিদ্রিত পঞ্চ পুত্রকে বধ করিয়াছিলেন, উত্তরার গর্ভস্থ ভ্রূণ হত্যা করিবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সুতরাং গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে

বিচার করিলে তাঁহাকে কিছুতেই ব্রাহ্মণ বলা যায় না। তথাপি যখন তাঁহাকে বন্ধন করিয়া আনা হইল এবং কি দণ্ড দেওয়া হইবে তাঁহার বিচার হইল তখন স্থির হইল, অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণ, তাঁহার প্রাণদণ্ড হইতে পারে না, মাথার মণি কাড়িয়া লইয়া অপমান করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হউক।

জিত্বা মুক্তো দ্রোণপুত্রো ব্রাহ্মণ্যাদ্গৌরবেণ চ

মহাভারত—সৌপ্তিক পর্ব্ব, ১৬।৩২

সুতরাং গুণ ও কর্ম্ম বিচার করিবার নিয়ম তখন ছিল না।

(৬) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বক্ষণে অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না, ভিক্ষা করিয়া খাইব।" গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে জাতি নির্দ্দেশ করা যদি শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেন, "ভাল কথা। তুমি এখন ব্রাহ্মণ হইবে। কারণ ব্রাহ্মণের গুণ (শম, দম, তপস্যা, শৌচ প্রভৃতি—গীতা ১৮।৪২) তোমার আছে। ভিক্ষা ব্রাহ্মণের একটি জীবিকা। সুতরাং তোমার গুণ ও কর্ম্ম উভয়ই ব্রাহ্মণোচিত হইবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহা বলিলেন না। তিনি বলিলেন, "তুমি যুদ্ধ না করিলে তোমার পাপ হইবে।" অর্থাৎ, তুমি ক্ষত্রিয় বংশে জন্মিয়াছ, অতএব ক্ষত্রিয়; ধর্ম্মযুদ্ধ পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের পাপ।

(৭) গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ।

তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।

গীতা ১৬।২৪

মনুসংহিতা একটি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ। বেদ বলেন, মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ঔষধের ন্যায়—"যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তৎ ভেষজম্" (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।২।১০।২)। মনুসংহিতা মহাভারতের বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। মহাভারত মনুসংহিতাকে প্রামাণিক বলিয়াছেন,—

পুরাণং মানবোধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতম্।

আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ।

কুল্লুকভট্ট মনুসংহিতার টীকার উপক্রমণিকায় এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন, জন্মের কয়েক দিন পরেই নামকরণ হইবে, ব্রাহ্মণ হইলে নামের শেষে শর্ম্মা থাকিবে, ক্ষত্রিয় হইলে বর্ম্মা।১। বলা বাহুল্য, জন্মের কয়েক দিন পরেই গুণ ও কর্ম্ম বিচার করিয়া জাতি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অতএব বুঝিতে হইবে জন্ম অনুসারেই জাতি স্থির হইবে। পুনরায় মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণের অষ্টম বর্ষ বয়সে উপনয়ন হইবে, ক্ষত্রিয়ের একাদশ বর্ষ, বৈশ্যের দ্বাদশবর্ষ বয়সে।২ এত অল্পবয়সে কর্ম্মবিচার করিয়া জাতি নির্ণয় করা অসম্ভব। অধিকন্তু মনু ১০।৫ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, পিতা ও মাতার সমান বর্ণ হইলে সন্তানেরও সেই বর্ণ হইবে। সুতরাং জন্ম অনুসারে জাতি নির্ণয় না করিয়া গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে জাতি নির্ণয় করিলে মনুসংহিতাকে অগ্রাহ্য করা হইবে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ১৬।২৪ শ্লোকে শাস্ত্রগ্রন্থকে প্রামাণিক বলিয়াছেন। মনুসংহিতা শাস্ত্রগ্রন্থের অন্তর্গত। আবার যদি গীতার ৪।১৩ শ্লোকে মনুসংহিতার বিপরীত ব্যবস্থা দেন তাহা হইলে তাঁহার উক্তিতে পরস্পরবিরোধিতা দোষ হয়।

৮। গীতা ১৮।৪৫ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজবর্ণ বিহিত কর্ম্ম উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারে।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্য ভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।

যদি কর্ম্ম অনুসারে জাতি নির্দ্দেশ হয় তাহা হইলে সংসারে এমন কেহই থাকিবে না যে, নিজবর্ণবিহিত কর্ম্ম না করে। যদি জন্ম অনুসারে জাতি নির্দ্দেশ করা যায় তাহা হইলে ইহা বলা যায় যে, যে ব্যক্তি তাহার বর্ণ বিহিত কর্ম্ম করে তাহার মোক্ষ হয়, যে না করে তাহার মোক্ষ হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে গীতার পূর্ব্বোদ্ধৃত ৪।১৩ শ্লোকে "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" এই বাক্যের যদি এরূপ অর্থ সঙ্গত না হয় যে, গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে জাতি বিভাগ হইবে তাহা হইলে এই বাক্যের অর্থ কি? এখানে কর্ম্ম শব্দের অর্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কর্ম্ম-বিভাগ অর্থাৎ কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিভাগ—ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যকর্ম্ম কি, ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্যকর্ম্ম কি, ইত্যাদি বিভাগ (গীতার ১৮।৪২-৪৪ শ্লোকে এই কর্ম্ম-বিভাগের বর্ণনা আছে)। এবং এখানে যে 'গুণ' শব্দের উল্লেখ আছে তাহা আমাদের জন্মের সময় যাহার যেরূপ সত্ত্ব, রজ বা তম গুণ থাকে তাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। গীতা ১৮।৪১ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন,—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।

কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈ গুণৈঃ॥

এখানে স্বভাব শব্দের অর্থ রামানুজ বলিয়াছেন "ব্রাহ্মণাদি জন্মহেতুভূতং প্রাচীনকর্ম্ম ইত্যর্থঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি জন্মের হেতুভূত পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম। অন্য আচার্য্যরাও এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সমগ্র শ্লোকটির অর্থ এইরূপ—পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফলে আমাদের বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে কাহারও সত্ত্বগুণ বেশী থাকে, কাহারও রজ বা তমোগুণ বেশী থাকে, তদনুসারে ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন জাতিতে জন্ম হয়, এবং জন্মকালীন এই সকল গুণ অনুসারে ব্রাহ্মণাদি জাতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল বিভাগ করা হইয়াছে। এই ভাবে ১৮।৪১ শ্লোকের সহিত এবং অন্যান্য শাস্ত্রবাক্য ও শাস্ত্রোল্লিখিত ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ৪।১৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম অনুসারে যে ব্রাহ্মণাদি জাতিতে জন্ম হয় ইহা

১। মনুসংহিতা ২।৩০।৩১।৩২

২। মনুসংহিতা ২।৩৬

নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে

লেডি চ্যাটার্লির প্রেম

ইউরোপীয় সাহিত্যজগতে 'লেডি চ্যাটার্লির লাভার'এর মতো আর কোনো উপন্যাস এতখানি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি বোধ হয় করেনি। ডি এইচ লরেন্সের এই উপন্যাসখানি নীতিবাদীদের কড়া শাসন সত্ত্বেও, আজো জীবন্ত হয়ে আছে, তার কারণ, বক্তব্য সম্বন্ধে যত মতভেদই থাক, লরেন্সের অসামান্য প্রতিভার বহ্নিদীপ্ত প্রকাশ এই বইএ কোনো মতেই অস্বীকার করবার নয়। লরেন্সের জীবনবেদ ইউরোপের কাছে যতটা দুর্বোধ আমাদের কাছে ততটা নাও হতে পারে, এই জন্যে যে আমাদের তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সংগে তার মিল বড় কম নয়। তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শনে তান্ত্রিক মতবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। জীবন সাধনার গভীরতম উপলব্ধিকেই 'লেডি চ্যাটার্লির প্রেম'এ লরেন্স রক্ত মাংসের রূপ দিয়েছেন। প্রচলিত সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা ছাড়িয়ে কাম ও কামনা এখানে অপরূপ এক রহস্যগভীর পূজানুষ্ঠানের উপকরণ হয়ে উঠেছে। দাম ৩।•

অনুবাদ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

অচিন্ত্যকুমারের

সহস্রের জনতায় কোথায় কে একজন সামান্য যুবক, আর কোথায় কে একটি সাধারণ মেয়ে।
কী এক আশ্চর্য মুহূর্তে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে আর চকিতে হাজার বছরের অন্ধকার ঘর আলো হয়ে যায়।
সেই সামান্য যুবক সম্রাট হয়ে ওঠে আর সেই সাধারণ মেয়ে হয়ে ওঠে রাজেশ্বরী। কিন্তু কতদিনের সেই স্বপ্ন রচনা, সেই আকাশচারণ? আছে সংঘর্ষসঙ্কুল পৃথিবী, দৈনন্দিন প্রাণ ধারণের তিক্ততা। সেই সম্রাট যুবক তখন এক ভবঘুরে বেকার আর সেই রাজেশ্বরী মেয়ে এক শিক্ষয়িত্রী। আবার তারা বিচ্ছিন্ন, অপরিচিত। কিন্তু যে প্রদীপে একদিন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর আলো হয়েছিল, সে কি নেববার? জীবিকার চেয়ে জীবন কি বড় নয়? প্রয়োজনের চেয়ে বড় কি নয় প্রেম? সেই অপরাভূত প্রেমের মহিমাময় কাহিনীই এই উপন্যাস। দাম ২।•

অচিন্ত্যকুমারের

সাধারণ পরিভ্রমণ দেশ থেকে দেশে, আর এই পরিব্রজ্যা হৃদয় থেকে হৃদয়ে। মানুষের অন্তরে যে একজন গৃহহীন বৈরাগী বাস করছে এ তারই ঘর খোজার কাহিনী। কাছের মানুষ হয়েও কোথায় সে দূরে বসে আছে — রূপে-রূপে সেই অপরূপার অনুসন্ধান। সংস্কারমুক্ত জীবনের অভিনব সংসার কামনা। য়ুরোপের সাহিত্যে যেমন নুট হামসুনের 'ওয়াণ্ডারার্স' বাংলা সাহিত্যে তেমনি এই 'বেদে'। বহু পৃথিবী পেরিয়েও যেমন আকাশ, তেমনি বহু প্রেম ও বহু প্রাপ্তি পেরিয়েও সেই অনির্বেয় আকাঙ্ক্ষা। বহু বাসনায় বিশ্বরমার উপাসনা। দাম ৩।•

শচীন্দ্র মজুমদারের

স্থান: এলাহাবাদ।
কাল: ১৯৪২। পাত্রী: বহ্নিশিখার মতো এক বাঙালী মেয়ে। এ-মেয়ে বিজ্ঞানের ছাত্রী। দেশই তার দয়িত, দেশজোড়া আগুনের মধ্যে নিজের শিখাটুকুকে মিলিয়ে তার সার্থকতা। প্রয়োজনে কালভার্টের নিচে রাত কাটায়, পুরুষের ছদ্মবেশে ছাত্রাবাসে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু ছায়ার মতো অবিরাম তাকে অনুসরণ করে একদিকে গোয়েন্দা বাহিনীর পুলিশ, অপরদিকে লালসামত্ত এক পুরুষ। সেই তৃষ্ণার্ত আলিঙ্গন থেকে তার ঊর্ধ্বশ্বাস পলায়ন। শচীন্দ্র মজুমদারের রোমাঞ্চকর রসঘন রচনা। দাম ৩৲

সিগনেট প্রেস ১০।২ এলগিন রোড, কলিকাতা ২০

উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে। "রমণীয়চরণাঃ রমণীয়াং যোনিমাপদ্যন্তে ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা" ইত্যাদি (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫।১০।৭)—অর্থাৎ যাহারা উত্তম কর্ম্ম করে তাহারা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য কোনও উত্তমযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। এই বাক্য হইতেও বুঝা যায় যে, জন্ম অনুসারে জাতি নির্দ্দেশ করাই বেদের অভিপ্রায়। গীতার ৪।১৩ শ্লোক বেদবিরোধী ভাবে ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হয় না।

লেখিকা মহাভারত এবং উপনিষদ হইতে আরও কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার এই মত প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, জাতি জন্মের দ্বারা নির্দ্দেশ না করিয়া গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা নির্দ্দেশ করা উচিত। কিন্তু তাঁহার উক্তিই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে পূর্ব্বোল্লিখিত অনেকগুলি আপত্তি উত্থিত হইবে। এক্ষণে দেখা যাক, লেখিকা অন্য যে বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন সকল শাস্ত্রবাক্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তাহাদের কি ভাবে অর্থ করা যায়।

লেখিকা ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে সত্যকাম-জাবালের কাহিনী উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং উপনিষদ বাক্যের এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জবালা যৌবনে বহু পুরুষের সহিত যৌনব্যভিচার করিয়াছিলেন, এজন্য সত্যকামের পিতা কে ছিলেন তাহা জবালা জানিতেন না। রবীন্দ্রনাথও উপনিষদ-বাক্যের কতকটা এই অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর জবালাকে ব্যভিচারিণী বলেন নাই। "বহ্ব অহং পরিচরন্তী" কথার অর্থ রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন "বহু পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া।" শঙ্কর "বহু" শব্দটি ক্রিয়ার বিশেষণ করিয়াছেন এবং পরিচারিণী শব্দের অর্থ করিয়াছেন পরিচর্য্যাকারিণী—গৃহকর্ম্মে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া গোত্রের বিষয় জানিতে পারি নাই। আজিও অনেক "শিক্ষিত" ব্যক্তিকে গোত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারেন না। অশিক্ষিতা রমণী জবালা হয়ত অল্পবয়সে বিধবা—গোত্রের কথা জানিতেন না, ইহা বিচিত্র নহে। জবালা যদি বলিতেন "তোমার পিতা কে তাহা আমি জানি না" তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাই সমীচীন হইবে। যেখানে কোনও আচার্য্য-জননীর দুশ্চরিত্রতার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায় সেখানে দুঃখের সহিত তাহা স্বীকার করিতে হয়। যেখানে ঐ মহিলার দুশ্চরিত্রতা খ্যাপন না করিয়া অন্যভাবে শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যা করা যায় সেখানে অন্যভাবের ব্যাখ্যাই সমীচীন। ব্যভিচার করিতে জবালার বিবেক যদি বাধা দেয় নাই, তাহা হইলে মিথ্যা কথা বলিতে কি বাধা ছিল—তিনি একটি মিথ্যা গোত্রের উল্লেখ করিতে পারিতেন। ব্যাকরণও শঙ্করের ব্যাখ্যা সমর্থন করে, 'বহু' ক্লীবলিঙ্গ দ্বিতীয়ার একবচন। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা যথার্থ হইলে পুংলিঙ্গ ও দ্বিতীয়ার বহুবচন হইত, "বহূন্ অহং পরিচরন্তী" হইত। পরিচর্য্যা করার অর্থ সেবা করা, গৃহকর্ম্ম করা। পরিচর্য্যার অর্থ ব্যভিচার এরূপ দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, জন্ম অনুসারে জাতি নির্দ্দেশ করাই সাধারণ নিয়ম এবং এজন্য গুরু গোত্র জানিতে চাহিয়াছিলেন। সত্যকাম যদি গোত্র বলিতে পারিতেন তাহা হইলে গুণের বিচার করা প্রয়োজন হইত না। সুতরাং সত্যকাম-জাবালের উপাখ্যান হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, জন্ম অনুসারে জাতি নির্দ্দেশ হইবে না। অন্য অনেক কারণেও যে এইরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায় না তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অতঃপর লেখিকার উল্লিখিত মহাভারতের সর্প-যুধিষ্ঠির-সংবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। সর্প জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্রাহ্মণ কে?" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "যাঁহাতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল প্রভৃতি গুণ আছে তিনি ব্রাহ্মণ।" পরে বলিলেন, "যদি শূদ্রে এই সকল গুণ থাকে, ব্রাহ্মণে না থাকে, তাহা হইলে শূদ্র শূদ্র নহে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহে।"৩ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহে—এই বাক্যে যে দুইটি ব্রাহ্মণ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে সেই দুইটি শব্দের অবশ্য দুইটি ভিন্ন অর্থ লইতে হইবে, নচেৎ বাক্যটি স্ববিরোধী হইয়া যাইবে। প্রথম ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ, যাহার জাতি ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ যাহার ব্রাহ্মণোচিত গুণ আছে। যে ব্রাহ্মণের এই সকল গুণ নাই সে জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণোচিত গুণ তাহার নাই; যে শূদ্রে এই সকল গুণ আছে সে জাতিতে শূদ্র হইলেও তাহাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মান করা উচিত। বস্তুতঃ এই বাক্যের তাৎপর্য্য সত্য দান প্রভৃতি গুণের প্রশংসা করা, জাতি নির্ণয় করার উপায় নির্দ্দেশ করা এই বাক্যের তাৎপর্য্য নহে। তাহা যদি হইত তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণের লক্ষণ উল্লেখ করা হইত; কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের নহে। লেখিকা বলিয়াছেন, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে, সত্যবতী এবং সত্যবতীর মাতা উভয়ে সত্যবতীর স্বামী মহর্ষি ঋচীকের নিকট দুইটি পুত্রলাভার্থ প্রার্থনা করিলে ঋচীক দুইটি চরু প্রদান করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল সত্যবতী একটি চরু ভক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণ-গুণযুক্ত পুত্রলাভ করিবেন এবং সত্যবতীর মাতা অপর চরু ভক্ষণ করিয়া ক্ষত্রিয়-গুণযুক্ত পুত্র লাভ করিবেন, কিন্তু তাঁহারা চরু পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। ইহাতে সত্যবতীর গর্ভে পরশুরামের জন্ম হইল এবং সত্যবতীর গর্ভে বিশ্বামিত্রের জন্ম হইল। তপস্যার শক্তি

৩। শূদ্রে তু যদ্ ভবেৎ লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ।
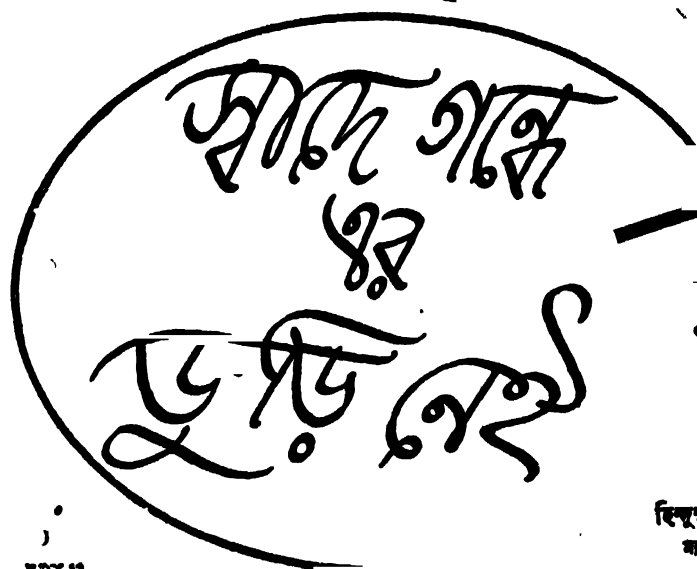
স্বাদে গন্ধে
এর
জুড়ি নেই
বনস্পতি
টিনে পাওয়া যায়
হিন্দুস্থান ডিভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড, কলিকাতা
ম্যানেজিং এজেন্ট : এস্. আর. সরকার অ্যাণ্ড কোং লিঃ
HDX 13

অলৌকিক। তপঃশক্তিতে দেহের উপাদান পরিবর্তন করা যায়। সুতরাং জাতির পরিবর্তন করা সম্ভব। এইরূপ তপঃশক্তির প্রভাবে জন্ম অনুসারে জাতিনির্দ্দেশ রূপ সাধারণ নিয়মের পরিবর্তন শাস্ত্রে কোনও কোনও স্থলে লিপিবদ্ধ আছে, লেখিকা তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। তপস্যার দ্বারা জাতি পরিবর্তন এবং গুণ ও কর্ম্ম বিচার করিয়া জাতি নির্দ্দেশ এই দুইটি ভিন্ন কথা। তপঃশক্তির দ্বারা জাতি পরিবর্ত্তনের উল্লেখ শাস্ত্রে কোনও কোনও স্থলে আছে। কিন্তু গুণ ও কর্ম বিচার করিয়া জাতি স্থির করিতে হইবে, একথা শাস্ত্রে কোথাও নাই, এবং ইহা সম্ভব নয়। জন্ম অনুসারে জাতি নির্দ্দেশ করিবে—শাস্ত্রে এই স্পষ্ট নিয়ম নানাস্থলে আছে।

বেদব্যাসের মাতা সত্যবতী ধীবরের পালিতা কন্যা, ধীবরের ঔরসজাত নহে। সত্যবতী রাজা বসু উপরিচরের ঔরসজাত

লেখিকা লিখিয়াছেন, "উপনিষদে দেখা যায় বহু রাজা ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোপদেশ দিয়াছেন।" ইহা হইতে লেখিকা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাজা ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছেন। এ সিদ্ধান্ত যথার্থ নহে। ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিলেও রাজা ক্ষত্রিয়ই ছিলেন, ব্রাহ্মণ হইলেন বলিয়া কোথাও উল্লেখ নাই। তিনি জনক ও বৃহদ্রথের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারাও ক্ষত্রিয় ছিলেন, ব্রাহ্মণ হন নাই।

লেখিকা একটি বড় রকম ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী ছিল, মৈত্রেয়ী ও গার্গী। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রীদের নাম মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। গার্গীর সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের বিচার হইয়াছিল। কিন্তু গার্গী তাঁহার স্ত্রী ছিলেন না।

যাঁহারা লেখিকার মত গ্রহণ করেন না তাঁহাদিগকে তিনি "কদর্থকারী" "সঙ্কীর্ণতা ও ঈর্ষ্যা"র আধার বলিয়াছেন। শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনাতে সংযত ভাষা প্রয়োগ করা উচিত। সম্প্রতি বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সংঘকর্তৃক "হিন্দুর নিকট নিবেদন" নামে একটি ছাপা কাগজ বিতরণ করা হইয়াছে।[৪] তাহাতে এই মত প্রচার করা হইয়াছে যে, জাতি জন্মের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। এই কাগজটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্বাক্ষর করিয়াছেন :—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীচণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য, ৺অশোকনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, ডক্টর শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম।

---

৪ কেহ যদি এই ছাপা কাগজ দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে প্রবন্ধ-লেখকের নিকট ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা ২০, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে কাগজটি তাঁহার নিকট পাঠানো হইবে।

পুস্তক পরিচয়

বিদ্রোহ ও বৈরিতা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। ১৩৫৬।

প্যাক্‌স্-ব্রিটানিকা অর্থাৎ শান্তির যুগ আনয়নই ইংরেজ রাজত্বের বিশেষত্ব—কেবলমাত্র সিপাহী বিদ্রোহই ইহার ব্যতিক্রম—সাধারণের মধ্যে এই ধারণাই প্রচলিত। কিন্তু ইহা যে পুরাপুরি সত্য নহে গ্রন্থকার তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে ভারতবাসীরা "যুগে যুগে শাসক ও শোষক ইংরেজের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছে।" তাহারা "কোন কোন অঞ্চলে সামান্যতঃ বা ব্যাপক ভাবে কখনও বিদেশীর কর্ত্তৃক অস্বীকার করিয়া তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, কখনও বা আধুনিক রীতিসম্মত রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন চালাইয়াছে।" সশস্ত্র সংগ্রামের দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং ওহাবী বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। তারপর অহিংস অসহযোগ অথবা রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজাকুলের নিরুপদ্রব প্রতিরোধ—যাহা মহাত্মা গান্ধী এদেশে প্রথম প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া সকলের ধারণা—তাহাও যে পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার প্রমাণস্বরূপ নীলচাষীদের বিদ্রোহের বর্ণনা করিয়াছেন।

বিদ্রোহ ব্যতীত ইংরেজের সহিত ভারতবাসীর বৈরিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ বেসরকারী, সাধারণ ইংরেজের অত্যাচার, খ্রীষ্টান পাদ্রীদের হিন্দুধর্ম্মনাশমূলক চেষ্টা ও সিবিল সার্বিস হইতে ভারতবাসীকে অবৈধ উপায়ে বঞ্চিত করা এবং এই সকলের বিরুদ্ধে যে সুদীর্ঘ ও ব্যাপক আন্দোলন হয় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে ইংরেজ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া স্বেচ্ছায় এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে। সুতরাং শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই এই ঘটনার সহিত পরিচিত। কিন্তু এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বহুল পরিমাণে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার বর্ণিত বিদ্রোহ প্রকৃত বিদ্রোহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নাই। বস্তুত এই সন্ন্যাসীগণ বাঙালীও ছিল না এবং সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিও তাহাদিগকে বিদ্রোহে প্রণোদিত করে নাই। ইহাদের অধিকাংশই ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী। ইহারা গ্রামাঞ্চল হইতে সকল সুস্থ ছেলেদের চুরি করিয়া আনিয়া নিজেদের দলপুষ্টি করিত এবং ধনী ব্যক্তির বাড়ী ডাকাতি করিয়া লুঠতরাজ করিত। ইহাদের মূল অভিপ্রায় কি ছিল তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই—কারণ ইংরেজী সরকারী বিবরণ ব্যতীত ইহাদিগের তরফ হইতে কোন বিজ্ঞপ্তি বা বিবরণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থকারের মতে ব্রিটিশ কর্ম্মচারী দ্বারা উৎপীড়িত হইবার ফলেই সাধারণ লোকেরা সন্ন্যাসীদলের কার্য্যকলাপের মধ্যে মুক্তির আশা পোষণ করিত। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন
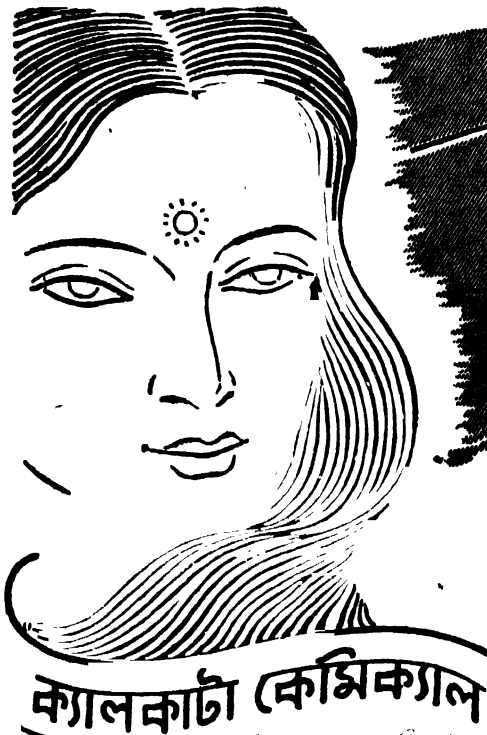
নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। তবে সন্ন্যাসীরা যে অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং সংখ্যায় অনেক ছিল এবং তাহাদিগকে দমন করিতে যে ইংরেজ সরকারকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্বন্ধে এদেশীয় সাধারণ শিক্ষিত লোকও বিশেষ কিছুই জানেন না। কিন্তু এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। নয় বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার কালীকিঙ্কর দত্ত সরকারী নথিপত্রের সাহায্যে এ সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লেখেন তাহাই এ বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ। গ্রন্থকার ইহার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার মতে সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনেরই বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু ইহা আংশিক ভাবে সত্য। স্থানীয় জমিদার ও মহাজনের অত্যাচারই সাঁওতাল বিদ্রোহের মুখ্য কারণ, কিন্তু পুলিস অত্যাচারের প্রতিরোধ না করায় পরে গৌণত সরকারের বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল—ডাক্তার দত্তের এই মতই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

সন্ন্যাসী বা সাঁওতালদের বিদ্রোহ প্রধানত ইংরেজ শাসন হইতে মুক্তি লাভের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এরূপ প্রমাণ নাই। কিন্তু তথাকথিত ওহাবী আন্দোলন প্রথমে মুসলমান ধর্ম্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে আরম্ভ হইলেও পরে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের আকার ধারণ করিয়াছিল। তবে ইহাকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় আন্দোলন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মুসলমান ধর্ম্মের নীতি অনুসারে অমুসলমান জাতির অধীনে বাস করা অধর্ম্ম জ্ঞান করিয়াই মুসলমানেরা এই বিদ্রোহের সূচনা করে—সুতরাং ইংরেজ ও হিন্দু উভয়েই ইহাদের বিদ্বেষের পাত্র ছিল।

আরব দেশে ওহাবী আন্দোলনের উদ্ভব হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে যে অনুরূপ আন্দোলন হয় তাহার সহিত এই ওহাবীদের কোন সম্বন্ধ ছিল এমন কোন প্রমাণ নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রায় বেরিলীর সৈয়দ আহ্‌মেদ ব্রেলভী যখন ভারতে এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করেন তখনও তিনি আরব দেশে যান নাই। তাঁহার দল অনেকটা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইবার পর তিনি মক্কা গমন করেন। ভারতে তিনি এক বিরাট সংঘ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহা প্রথমে শিখ ও পরে ইংরেজের বিরুদ্ধে যে তুমুল সংগ্রাম করে তাহাই এই আন্দোলনের প্রধান কীর্ত্তি। ইহার সহিত ওহাবী মতের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু আরবের ওহাবীর সহিত সংস্রব থাকুক বা না থাকুক ভারতের এই তথাকথিত ওহাবী আন্দোলনই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। ধর্ম্মমূলক হইলেও ইহার মধ্যে বিনষ্ট মুসলমান রাজশক্তি উদ্ধারের আশা বা আকাঙ্ক্ষা যে একেবারেই ছিল না—তাহা বলা যায় না। সুতরাং এই আন্দোলনকে এক হিসাবে ব্রিটিশ রাজত্বে মুসলমানদের প্রথম মুক্তি-সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

নীল বিদ্রোহ অধ্যায়ে গ্রন্থকার নীল-চাষীদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা বিশেষ মূল্যবান। বাংলার সাধারণ লোকের মধ্যে এইরূপ শক্তি ও সাহসের দৃষ্টান্ত সত্য সত্যই দুর্লভ। বর্ত্তমানকালে সুপরিচিত অসহযোগ আন্দোলনের মূল সূত্র ও সার্থকতার পরিচয় ইহার মধ্যে বিশদভাবে পাওয়া যায়।

গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ইংরেজের বিরুদ্ধে নানা কারণে অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইয়া কিরূপে দাবানলে পরিণত হইল গ্রন্থকার তাহার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র দিয়াছেন। ইংরেজ শাসনে ভারতীয়দের মনোভাব কিরূপে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হয়, ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে তাহার বিশ্লেষণ আবশ্যক।

মোটের উপর গ্রন্থখানিতে ব্রিটিশ যুগের অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। দুই-একটি ভ্রমের প্রতি গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ২৯ পৃষ্ঠায় ৮ পংক্তিতে ওয়ারেন হেষ্টিংসের পরিবর্তে মার্কুইস অব হেষ্টিংস হইবে। ১১৯ পৃষ্ঠায় ৫ পংক্তিতে ১৮৫৬-৭ এর পরিবর্তে ১৮৫৫-৫৬ হইবে।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

ত্রয়ী (বাল্মীকি, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ)—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৫৲ টাকা।

এ ধরণের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সরস আলোচনা আজিকার সাহিত্যে দুর্লভ। ইদানীং জ্ঞাননিরপেক্ষ বাচালতাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চোখে পড়ে। সংস্কৃত চর্চা কম লোকেই করেন; যাঁহারা করেন, তাঁহারাও অনেকে প্রকৃত রসজ্ঞ নহেন। গ্রন্থকার এদেশের প্রাচীন ও আধুনিক উভয় শ্রেণীর সাহিত্যের রসগ্রাহী; পাশ্চাত্য সাহিত্যও তিনি সযত্নে পড়িয়াছেন। তাই তাঁহার আলোচনা ফাঁকা কথা নহে, তাহাতে জানিবার ও ভাবিবার বস্তু অনেক আছে। ভারতের তিন মহাকবির রচনা পাশাপাশি দেখাইয়া তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা সরস ও চিন্তাবর্দ্ধক। এইজন্য সাহিত্যানুরাগীর কাছে এ গ্রন্থ বিশেষ সমাদরযোগ্য।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। দিগন্ত পাবলিশার্স, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা পৃঃ—১২৬। দাম—৩৲ টাকা।

কাহিনীটি গ্রামের মতই সরল—বাহুল্য-বর্জ্জিত। বেশী চরিত্রের ভিড় নাই—কাহিনীগত রসকে ফেনাইবার আড়ম্বর বেশী নাই। সাদাসিধা একই প্রেমকাহিনী—যে কাহিনী বৈষ্ণব-সাহিত্যের মধ্যমণি-স্বরূপ; নব-পরিবেশে তাহাই নূতন সজ্জায় পরিবেশিত হইয়াছে। সে প্রেম দেহ-কামনার দুরত্বে নিকষিত হেমের মতই মহিমময়—তাহাকে উর্দ্ধে তুলিবার প্রয়াসে প্রাকৃত জনের স্বভাবকে ঠিকমত মানিয়া লওয়া হয় নাই। এইখানে তীক্ষ্ণ অনুভূতির সঙ্গে বাস্তব জ্ঞানের বিরোধ স্পষ্টতর হইয়াছে। যে সমাজ হইতে চরিত্রগুলি বাছিয়া লওয়া হইয়াছে—বাহিরের দৃষ্টিতে সে সমাজের প্রাণ-প্রবাহের স্বরূপটি আয়ত্ত করা সম্ভব নহে, আরও নিবিড় মমতায় ও গভীর অভিনিবেশে তাহাকে চিনিয়া লওয়ার প্রয়োজন ছিল। বাহিরের দৃষ্টিতে ভঙ্গিটাই প্রাধান্য লাভ করে—সেই কারণে গ্রাম্য ছড়া প্রবচন প্রভৃতিতে কথোপকথনের ধারাটি সাবলীল ও স্বাভাবিক হইয়াছে। এই নিম্নস্তরের সমাজে শুধু প্রেম নহে—তার চারি ধারে আছে অভাব, গ্লানি বেদনা—ধূলা-কাদা—আশা আকাঙ্ক্ষা ত্রুটি স্খলন। এই সমস্তকে জড়াইয়া বহু সমস্যা দিন দিন প্রবলতর হইতেছে। এই সবের পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকিবার যথেষ্ট অবকাশ কাহিনীতে ছিল; পটভূমিকাকে বিস্তৃত না করিবার ইচ্ছায় লেখক সেগুলিকে পরিহার করিয়াছেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পাঁচ-মিশলি—শ্রীতনুজা দেবী। ১২নং প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১১৪ পৃঃ, মূল্য ২৷৹।

রন্ধনবিদ্যার বই। ইহাতে আধুনিক রন্ধন-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। লেখিকা নিজ রন্ধন-কুশলতায় রবীন্দ্রনাথকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। বইখানি যে বাংলার মেয়েদের খুব কাজে আসিবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তবে আমাদের মনে হয় যে, রন্ধন-প্রণালীসমূহের বর্ণনা আরও একটু বিশদ করিয়া দিলে ভাল হইত।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

মহাত্মাজীর তিরোধানে—শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী সম্পাদিত। শিক্ষক পত্রিকা অফিস, ৬১ বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। মূল্য—২৸৹

ভারতীয় মহাজাতির জনক গান্ধীজীর জীবনাবসান ভারতের তথা জগতের ইতিহাসে এক মর্ম্মন্তুদ ঘটনা। এ আকস্মিক আঘাতে শুধু ভারতবাসী নয়, সমগ্র বিশ্ববাসী অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল; সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, দেশবিদেশের মহাত্মাজীর অনুরাগীদের বেদনাবিহ্বল হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। মানুষের স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী নয়। মহাত্মাজীর জীবন-নাট্যের শেষ দৃশ্যে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর ধারাবাহিক কাহিনী আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার প্রয়োজন ছিল। লেখক এই প্রয়োজন মিটাইয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, এই সঙ্গে গান্ধীজীর জীবন-কথা, তাঁহার বাণী, তাঁহার শিক্ষানীতির মর্ম্মার্থ, প্রার্থনা-সভায় প্রদত্ত কয়েকটি ভাষণ এবং দেশদেশান্তরের গুণীজনের শ্রদ্ধাঞ্জলি সঙ্কলিত হইয়াছে। কতকগুলি মূল্যবান ছবি বহু তথ্য সম্বলিত এই পুস্তকখানির সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করিয়াছে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

আমার জীবন—শ্রীআলামোহন দাস। দাসনগর, হাওড়া। মূল্য ২৷৹।

যে স্বনামধন্য কর্ম্মবীরের সাধনা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টায় হাওড়ার জঙ্গলাকীর্ণ পতিত জমির উপর রূপকথার মায়াপুরীর মত অপূর্ব্ব দাসনগর গড়িয়া উঠিয়াছে; ভারত জুটমিল, ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোম্পানী, এশিয়া ড্রাগ কোম্পানী, দাস সুগার কর্পোরেশন, দাস ব্যাঙ্ক, হাওড়া ইনসিওরেন্স কোম্পানী প্রভৃতি শিল্পবাণিজ্যসম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলি যাঁহার বিপুল কর্ম্মশক্তি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী লাভজনক ভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহার কর্ম্মময় জীবনকাহিনী বাস্তবিকই বিস্ময়কর। এক মধ্যবিত্ত কৃষক-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথম জীবনে সামান্য বই বিক্রী দ্বারা তিনি জীবিকা অর্জ্জন সুরু করেন, পরে পি. এন. দত্তের বালতির কারখানায় এক কর্ম্মচারীর সহায়তায় প্রথমে এসিডের কারখানা, পরে তুলাযন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রের কারখানা স্থাপন এবং অবশেষে রেঙ্গুন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোম্পানী, ভারত জুট মিল, দাস ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বহু যৌথ কারবারের প্রতিষ্ঠা ও সুদক্ষ পরিচালনা যাঁহার দ্বারা সম্ভব হইয়াছে, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যাঁহাকে 'কর্ম্মবীর' আখ্যায় ভূষিত করেন, তাহার জীবনীপাঠে হতোদ্যম ব্যবসায়বিমুখ বাঙালী অনেক কিছু শিক্ষা করিতে পারিবে।

আলামোহন গান্ধীজীর মত হস্তচালিত চরকায় আস্থাবান নহেন, পরন্তু শক্তিচালিত যন্ত্রের সাহায্যে দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী মনে করেন। কৃষি-কর্ম্মে শতকরা ৬০ জন ও শিল্পবাণিজ্যে ৩০ জনের বিনিয়োগ দেশের পক্ষে কল্যাণকর মনে করেন এবং ধনোপার্জ্জন ও ধনবণ্টনের বৈষম্যকেই দেশের দুঃখদারিদ্র্যের কারণ নির্দ্দেশ করেন। যতক্ষণ না এই সকল ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইতেছে, ততক্ষণ কোন আইনের সাহায্যেই কম্যুনিজমকে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না, ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত মত।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

দেশ-বিদেশের কথা

হায়দ্রাবাদ প্রবাসী বাঙালীদের বিজয়া সম্মেলন

বিগত ১লা অক্টোবর হায়দ্রাবাদে প্রবাসী বাঙালীদের উদ্যোগে এবার বিজয়া উপলক্ষে একটি বিরাট উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। জাতিবর্ণধর্ম নির্ব্বিশেষে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ের প্রবাসী বাঙালীরাই যোগদান করিয়া উৎসবটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদের

হায়দরাবাদ-প্রবাসী বাঙালীদের বিজয়া সম্মেলন ; [শ্রীমতী পুষ্পরাণী দাসের সৌজন্যে

নারায়ণগুডার ওয়াই. এম. সি. এ.-র সেক্রেটারী শ্রীনিরঞ্জন সাহা মহাশয়ের উদ্যোগে ওয়াই. এম. সি. এ.-র সভাগৃহে প্রবাসী বাঙালীদের এই সম্মেলনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

পাদ্রী মণ্ডল মহাশয় সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন। সভাস্থলে নৃত্যগীত ও আবৃত্তির ব্যবস্থা হইয়াছিল। কুমারী শীলা শীল, কুমারী উষা লক্ষ্মীনারসু ও কুমারী শান্তি শীলের নৃত্য এবং শ্রীমতী শোভনা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। শ্রীনিরঞ্জন সাহার বাউল-সঙ্গীত প্রবাসী বাঙালীদের বিশেষ আনন্দদান করেন। মিসেস্ এ. কে. দাশের কবিতা আবৃত্তিও বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত প্রমোদলাল মুখোপাধ্যায় এবং মিসেস্ এস. কে. মুখার্জ্জী, মিসেস্ বি. শীল, মিসেস্ কে. চক্রবর্ত্তী ও মিসেস্, এ কে. দাশ প্রভৃতি কয়েকজন মহিলার আন্তরিক চেষ্টায় ও কর্ম্মতৎপরতায় উৎসবটি এরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

ইংলণ্ডে বাঙালী ছাত্রদের বিজয়া সম্মেলন

এবার ইংলণ্ডে প্রবাসী বাঙালী ছাত্রদের উদ্যোগে সাউদাম্পটনে মহাসমারোহে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত দ্বারা সভার উদ্বোধন করা হয় এবং ভারতীয় প্রথায় ফরাশের উপর গানবাজনার আসর বসে। বাংলা আর হিন্দী গান, আবৃত্তি এবং হাস্য-কৌতুকের অভিনয় সভাগৃহকে আনন্দমুখর করিয়া

তোলে। "জনগণমন অধিনায়ক" গানটি দ্বারা সভার পরিসমাপ্তি হয়।

রামানন্দ-স্মৃতিসভা

গত ২১শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় শিবনাথ মেমোরিয়াল হলে ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি চিত্র স্থাপিত হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রীবরদাকান্ত বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বর্তমান ভারতের উচ্চ রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অগ্রদূত বলিয়া স্মরণ করেন। তিনি বলেন, তাঁহার সময়ে অন্যান্য কাগজের সম্পাদকগণ মডার্ণ রিভিয়ুর সম্পাদকীয় মন্তব্য পড়িয়া তবে আপন আপন মত স্থির করিতেন, নূতন আলোক ইঁহারা রামানন্দবাবুর নিকটই পাইতেন। রাজনীতি, লোকসেবা, শিক্ষাসংস্কার, শিশু-সাহিত্যের প্রচার, স্বদেশী চিত্রকলার প্রতিষ্ঠা, অন্ধদের শিক্ষা, রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রচার প্রভৃতি সকলের মূলেই তিনি ছিলেন।
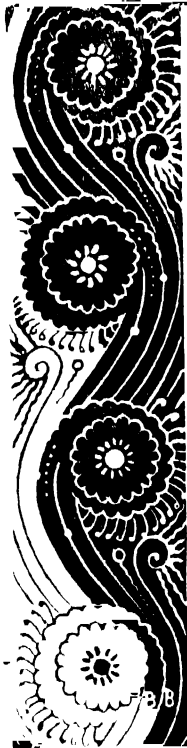
লণ্ডনে বাঙালী ছাত্রদের বিজয়া সম্মেলন

তাঁহার কীর্তির ফলভোগ এখনকার মানুষ করিতেছে। কিন্তু তাজমহলের শিল্পীদের ভুলিয়া গিয়া লোকে যেমন শুধু তাজমহলের সৌন্দর্য্য দেখে, তেমনই মানুষ তাঁহাকেও ভুলিয়া যাইতেছে।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রামানন্দবাবুর বহুমুখী প্রতিভার উৎস ভগবদ্ভক্তি ও তাঁহার নানা কর্ম্ম-প্রচেষ্টার কথা বলেন। বিভামন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। বক্তা বলেন, তিনি যখন শিক্ষা ও বিভার পীঠস্থানে নানা দুর্নীতির জন্ত বাঙালীকে বারবার সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কথা শুনিলে আজ বাঙালীকে এই কলঙ্কের ডালি বহন করিতে হইত না।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রামের প্রতি ও সাধারণ মানুষের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ও লোকসেবার কথা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রীবরদাকান্ত বসু চিত্র উন্মোচন করেন। রামানন্দবাবুর দৌহিত্রীগণ ব্রহ্মসঙ্গীত করেন।

পরলোকে সতীশচন্দ্র দে

বিগত ১৯শে কার্ত্তিক কলিকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক মহাশয় সতীশচন্দ্র দে এম-এ, এম-বি ৮১ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

১৮৬৯ সালের ২২শে জানুয়ারী সতীশচন্দ্র তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ইংরেজী লেখক ও বাগ্মী কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যান-ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নীলমণি দে কাপ্তেন ডি. এল, রিচার্ডসনের অন্ততম প্রিয় ছাত্র ছিলেন। জননী কুমুদিনী ছিলেন কিশোরীচাঁদের একমাত্র সন্তান।

কর্ম্মজীবনের ন্যায় সতীশচন্দ্রের ছাত্রজীবনও কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষা দেন এবং প্রথম স্থান অধিকার

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কলেজ হইতে তিনি ইংরেজী, গণিত, পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নে অনার্স সহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ইনি রসায়নশাস্ত্রে এম-এ এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করেন।

। পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার

। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ধাত্রীবিদ্যায় অনার্স সহ তিনি এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

লাউথ সুবার্ব্বন হাসপাতালের (এক্ষণে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠাকালে তিনি তথায় রেসিডেন্ট সার্জ্জন ছিলেন। তারপর তিনি কটকে এসিষ্টান্ট সার্জ্জন ও মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অতঃপর নানাস্থানে কার্য্য করিয়া তিনি বর্দ্ধমানের সিবিল সার্জ্জন নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। ৫৩ বৎসর বয়সে চাকুরি হইতে পেন্সন লইয়া সতীশচন্দ্র কলিকাতা বিশুদ্ধানন্দ মাড়োয়ারী হাসপাতালের প্রধান

ডাঃ সতীশচন্দ্র দে

চিকিৎসক নিযুক্ত হন এবং ৭১ বৎসর বয়সে ঐ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

সতীশচন্দ্র সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনেকগুলি তথ্যপূর্ণ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানবিষয়ক পাঠ্য পুস্তকও রচনা করেন। তিনি আজীবন অধ্যয়নশীল, কর্ত্তব্যপরায়ণ, পরোপকারী ও নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন।

কৃতী সাহিত্যিক ও কবি অধ্যাপক ডক্টর সুশীলকুমার দে ডি.লিট তাঁহার পুত্র।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

মজুর

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বিশ্বশান্তিবাদী সম্মেলন, শান্তিনিকেতন-

প্রতিনিধিগণ শোভাযাত্রা করিয়া আম্রকুঞ্জে সভামণ্ডপে গমন করিতেছেন

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিনিধিবর্গকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছেন

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"
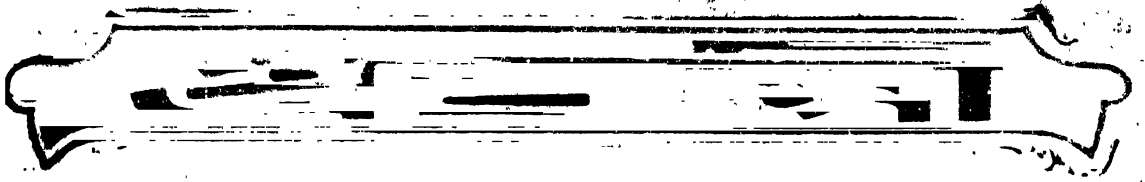
৪৯শ ভাগ } পৌষ, ১৩৫৬ { ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিম বাংলার অবস্থা

রাজনীতির মূলমন্ত্র রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের জনসাধারণের অভাব মোচন, নিরাপত্তা ও প্রগতি। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টি রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র পরিচালনে উচ্চতম অধিকারীর পদ লাভ করেন তাঁহার বা তাঁহাদের ঐ মূলমন্ত্রের দিকে খর দৃষ্টি না রাখিলেই বিপদ আসে। জনগণের অসন্তোষ রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রধান উপাদান এবং নিরাপত্তা ও প্রগতির অভাব রাষ্ট্রধ্বংসের বীজ। যে দেশের বা যে অঞ্চলের জনসাধারণ অন্নবস্ত্রের সমস্যা পূরণে ক্রমেই ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, যেখানে নিরাপত্তার অভাব চর্তুদ্দিকে দেখা দেয়, সে দেশে বা সে অঞ্চলে প্রগতির প্রশ্ন অবান্তর হইয়া পড়ে। অন্নবস্ত্রের চিন্তায় জর্জ্জরিত এবং নিরাপত্তার অভাবে শঙ্কিত জনসাধারণের মানসিক ও দৈহিক অবস্থা অবনতির দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে একথা ত সর্ব্বজনবিদিত।

এমত অবস্থায় জনসাধারণের প্রথম আক্রোশ গিয়া পড়ে শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গের উপর এবং ঐরূপ বিপরীত অবস্থাই বিপ্লববাদী ও রাষ্ট্রধ্বংসকারীর সুবর্ণ সুযোগ। অবস্থা আরও ঘোরালো হয় যদি রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ক্ষমতা-লোলুপ পেশাদার বুদ্ধিজীবীর দল একে অন্যের ছিদ্র অন্বেষণে অসন্তোষের বহ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে থাকেন। বলা বাহুল্য, ঐরূপ অপচেষ্টার ফলে দুই দলই ক্রমে সাধারণের অনাস্থাভাজন হন এবং সেই সুযোগে রাষ্ট্রধ্বংসের চক্রান্তকারী নিজের উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয়। বাংলায় আজ সেই অবস্থা প্রায় আসিয়াছে।

স্বাধীন দেশে জনসাধারণ যদি একবার স্বাতন্ত্র্যের আস্বাদ লাভ করে তবে তাহার পর স্তোকবাক্যে বা দমননীতির প্রয়োগে তাহাদের করায়ত্ত করা সম্ভব হয় না। এক দল যদি জনসাধারণের বিরাগভাজন হয় তবে সেই একই গোষ্ঠীর অন্য দলকে তাহারা সহজে স্থান দিতে চাহিবে না। তাহারা চাহিবে সম্পূর্ণ পৃথক দল—ভাল, মন্দ বা মামুলী। পরে হয়ত ইহা প্রমাণিত হইবে যে, "খাল কাটিয়া কুমীর" আনা হইয়াছে কিন্তু অসন্তোষ ও নিরাপত্তার অভাবজনিত আন্দোলনের মধ্যে সে বিষয়ে চিন্তা করে কয়জন?

পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত অধিবাসী যাহারা তাহারা এখন সর্ব্বহারা হইতে বসিয়াছে। এই প্রকৃত অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা রাষ্ট্রের কল্যাণ, প্রগতি ও স্বাতন্ত্র্যের জন্য সত্যসত্যই শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব পণ করিয়া লড়িয়াছে তাহাদের—অর্থাৎ মধ্যবিত্ত চিন্তাশীল পর্য্যায়ের ব্যক্তিদের—এখন প্রায় সম্বলহীন অবস্থা। ভদ্রস্থতা রাখা দূরের কথা, পরিবার-পরিজনের অভাব মোচনই অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। এদেশে এমন কয়েকটি অর্ব্বাচীন আছে যাহারা ইহাদেরও "বুর্জ্জোয়া" বলিয়া অবজ্ঞা ও অবহেলা করায় প্রশ্রয় দেয়। তাহাদের এইটুকুমাত্র জ্ঞান নাই যে, সমস্ত পৃথিবীতে উন্নতি, কৃষ্টি ও প্রগতি যাহা কিছু হইয়াছে, মনুষ্যসমাজের কল্যাণ ও শৃঙ্খলার যত পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে সে সকলের জন্য জগৎ ঋণী সমাজের ঐ শ্রেণীর কাছে। এ বিষয়ে তর্কের অবসর নাই।

পশ্চিমবঙ্গে যদি কেহ আজ সুখে থাকে তবে সে বিদেশী বা ভিন্ন প্রদেশীয় ব্যবসায়ী এবং বুদ্ধিজীবী, ফন্দিবাজ, পেশাদার রাষ্ট্রনীতিজীবী। আজ বরঞ্চ সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক—যাহার অধিকাংশই ভিন্ন প্রদেশবাসী—ও গৃহস্থ কৃষক সহজ অবস্থায় আছে, কিন্তু মধ্যবিত্তের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতে চলিয়াছে। চোরাবাজারীতে তাহার সর্ব্বস্ব লইয়াছে, বিদেশী ও ভিন্ন প্রদেশীয় কারবারী তাহাকে পেষণ করিতেছে, তাহার সন্তান-সন্ততির জীবিকা অর্জ্জনের পথ ভিন্নপ্রদেশীয় ও তথাকথিত "বাস্তুহারা" রোধ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, শিক্ষা বা প্রগতির প্রশ্নের উত্তর "টাকা নাই"। পুনর্বসতি তো বাস্তুহারার একচেটিয়া এবং জীবিকানির্ব্বাহের প্রশ্নে শুনা যায় প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে ভীষণ চীৎকার।

সকলের চেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে, প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের উচ্চতম অধিকারীবর্গ প্রায় সকলেই এই প্রদেশের প্রকৃত অধিবাসী জনসাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র হারাইয়াছেন। কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গের কথা বলাই বাহুল্য। সেখানে বাংলা বা বাঙালীর সকল সমস্যাই অকিঞ্চিৎকর, বাংলার সকল কথাই অগ্রাহ্য। কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিও দুই জন মাত্র। এই ত দেশের অবস্থা।

বিদ্যালয়ে কম্যুনিষ্ট সংগঠন

কলিকাতার বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাতঃকালীন শাখায় কম্যুনিষ্ট সংগঠন বিষয়ে আমরা অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে কিছু মন্তব্য করিয়াছিলাম। ইহার পর দেখিতেছি দৈনিক সংবাদপত্রেও এ বিষয়ে কিছু আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় উভয়েই নির্ব্বিকার। আমরা জানিতে পারিলাম, গত এক মাসে "উন্নতির"(!) মধ্যে এইটুকু হইয়াছে যে বিদ্যালয়ের যে শিক্ষয়িত্রীরা স্কুলের মধ্যে কম্যুনিষ্ট প্রচারকার্য্যের বিরোধিতা করিতেছিলেন তাঁহাদেরই বিতাড়িত করিবার আয়োজন হইতেছে। তাঁহাদের উপর উৎপীড়নের বিষয় গবর্ন্মেণ্টকে দরখাস্তের দ্বারা জানাইয়াও কোন প্রতিকার হয় নাই। কম্যুনিষ্টদের আহ্বানে ১৫ই নবেম্বর যে ধর্ম্মঘট হয় তাহাতে শুনা যায় সেক্রেটারী মহাশয় প্রকাশ্যেই সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর স্বামী ও পুত্র পিকেটিং করিয়াছিলেন একথাও অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরা গবর্ন্মেণ্টকে জানাইয়াছেন। ময়দানের সভায় যোগ দেওয়ার জন্য শিক্ষয়িত্রীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ক্লাস হইতে মেয়েদের ডাকিয়া লওয়া হইয়াছে, প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে ইহা জানাইয়াও প্রতিকার হয় নাই, স্কুল ইন্‌স্পেক্‌ট্রেসকে জানাইলে তিনিও দিবানিদ্রা দানই সুবিধাজনক মনে করিয়াছেন। ক্লাসের দেওয়ালে—"কংগ্রেসী দালালদের হত্যা করা হউক" এই কথা লিখিবার সময় একজন শিক্ষয়িত্রী দুইটি ছাত্রীকে ধরেন এবং প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে জানান, কিন্তু মেয়ে দুটি শাস্তি পাওয়ার বদলে যিনি তাহাদের ধরিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলেন তাঁহাকেই লাঞ্ছিতা হইতে হয়। পণ্ডিত নেহরুর কলিকাতা আগমনের সময় "খুনী নেহরু ফিরিয়া যাও" শ্লোগান দিয়া ধর্ম্মঘট করাইবার চেষ্টা হয় এবং উহাতে বাধা দিলে কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী অপমানিতা হন। একদিন ধর্ম্মঘটে বাধা দিতে গিয়া জনৈক শিক্ষয়িত্রী একটি কম্যুনিষ্ট ছাত্রী কর্ত্তৃক প্রহৃতা হন এবং তারও কোন প্রতিবিধান হয় নাই। এই সমস্ত ঘটনাই স্কুল ইন্‌স্পেক্‌ট্রেসকে লিখিতভাবে জানানো হইয়াছে।

প্রচারকার্য্যের কিছু নমুনা আমরা স্কুলের পত্রিকা "ঊষা" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম। ঊষার পরবর্ত্তী সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও একই ধারা অব্যাহত রহিয়াছে, তবে একটু সাবধানে। এবারকার কয়েকটি নমুনা—

"দশম শ্রেণীর একটি ছাত্রী একটি কাল্পনিক রাজ্য খাড়া করিয়া বর্ত্তমান শাসকদের আলোচনা করিয়াছে এইভাবে—'অজয়গড় রাজপুতানার অন্তর্গত ছোট একটি দেশ। সম্প্রতি সেই দেশ পরাধীনতার নাগপাশ হতে মুক্তিলাভ করেছে।.. কিন্তু সে স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ আছে অজয়গড়ের বড় বড় নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে। জনসাধারণ সামান্য স্বাধীনতাও পায় নি। এখনও দেশে হচ্ছে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, বিনা বিচারে বন্দী। গুলি এবং লাঠির প্রয়োগ এখনও সেখানকার সরকারকে করতে হয় অন্নবস্ত্র এবং শিক্ষার জন্য আকাঙ্ক্ষী জনসাধারণের মিছিল ভাঙ্গতে।... মিহির ডায়েরী লিখছে—১৯৪৯ সালের ৬ই মে ফিরে আসছেন দেশনেতা সুপ্রকাশ রায় অজয়গড়কে ব্রিটিশ চক্রান্তের চাকা কমনওয়েলথে বেঁধে। নিজে সমস্ত সাউথ ইষ্ট এশিয়ার গণতন্ত্রকে চেপে মারবার জন্য তিনি নিয়েছেন চিয়াং কাই-শেকের পর সে পদ। সমগ্র দেশ জুড়ে তাই বিক্ষোভের ঢেউ। কিন্তু ধনীদের হয়েছে আনন্দ। কারণ তারা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার জনসাধারণকে অত্যন্ত আতঙ্কের চোখে দেখতে আরম্ভ করেছে। তাই সে আতঙ্কের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে প্রয়োজন আমেরিকা আর ব্রিটিশের মত শক্তির। নির্লজ্জ সুপ্রকাশ বিশ্বাসঘাতকতা করেও আবার কি করে বলছেন আমি আমার শপথ রক্ষা করেছি। শপথ রক্ষা করার এই কি নমুনা? চলছে অজয়গড়ে নারী, কৃষক, ছাত্র, মজুর, হত্যা।..সেখানকার হত্যার বীভৎসতা হিটলারের ফ্যাশিষ্ট নীতিকেও হার মানায়। সেখানে বর্ত্তমান ফ্যাশিষ্ট সরকারের পুলিস গর্ভবতী স্ত্রীলোককেও পেটে লাথি মেরে হত্যা করতে কুণ্ঠা বোধ করে নি।"

এর পরের অংশ আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না।

"একটি রাজপথের আত্মকাহিনী' নামক প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে—আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু তাহা কেবলমাত্র হাতবদল ইংরেজ হইতে কয়েকজন গর্ব্বিত, আত্মাভিমানী, অর্থপিশাচ ব্যক্তিদের সহিত।...যারা এতদিন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছে তারাই আজ বুঝিয়াছে যে দেশ স্বাধীন তাহাদের জন্য হয় নাই হয়েছে তাদের জন্য যারা টাকার গদীতে বসে টাকার স্বপ্ন দেখে। দেশবাসীর আজ ভুল ভাঙ্গিলে তাহারা তাদের ন্যায্য দাবী আদায় করিবার প্রস্তাব করিলে তারা এমন কি শিশুকেও আমারই বুকে লাঠি ও বন্দুকের আঘাতে শয্যা লইতে হয়। সত্যের জন্য আজ বহু নরনারীকেও আমারই বুকের উপর দিয়া কারাগার অভিমুখে লইয়া যাওয়া হয়।"

অষ্টম শ্রেণীর একটি বালিকা 'পোষ্টার' শীর্ষক রচনাটিতে বে-আইনি পোষ্টার লাগাইবার যে অপূর্ব্ব কৌশল লিপিবদ্ধ করিয়াছে তাহাতে কৃতিত্ব ও নূতনত্ব উভয়ই আছে। "কালা কানুনকে ফাঁকি দেবার উৎসাহে চঞ্চল" দুটি ছেলে ঘুমন্ত কনেষ্টবলকে ফাঁকি দিয়া পোষ্টার লাগাইতেছে, "একটার পর একটা জলন্ত অক্ষর কালা কানুনকে যেন মুখ ভেঙচাচ্ছে", কনেষ্টবল উঠিয়া তাহাকে ধরিলে তাহাকে ধাক্কা দিয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিসের গাড়ী হইতে সার্জ্জেণ্ট সাহেব নামিলেন, তাঁহার হাতের "দেড় হাতি লম্বা টর্চ্চ লাইট বাঘের চোখের মত জ্বল জ্বল করে উঠল, আর সেই আলোতে দেখতে পেল

আইনকে মুখ ভ্যাঙচাচ্ছে বে-আইনি পোষ্টার"—ইত্যাদি। সুশিক্ষা বটে!

জনৈকা শিক্ষয়িত্রী মাঞ্চুরিয়ায় কম্যুনিষ্ট শাসনের মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। পত্রিকাটির দুই সংখ্যাতেই টাস এজেন্সির সংবাদ আছে। দ্বিতীয় সংখ্যাতেও প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর আশীর্ব্বাণী আছে তবে এবার আগের মত অতটা অসতর্ক এবং বেফাঁস কথায় পূর্ণ নয়।

কেবলমাত্র বক্তৃতা, পত্রিকা এবং ধর্ম্মঘটের দ্বারা বালিকাদের আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা হইতেছে মনে করা ভুল হইবে, এবার পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মারফতও প্রচারকার্য্য সুরু হইয়াছে। নবম শ্রেণীর গত বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজীর দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রে নিম্নলিখিত একটি মাত্র অনুচ্ছেদ বাংলা হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে দেওয়া হইয়াছে—

"রুশিয়ার ভলগা নদীর তীরে ছিল সিনবিরস্ক নামে একটি শহর। এই শহরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৭০ সালে লেনিনের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন জার সম্রাটের অধীনে একজন স্কুল ইন্সপেক্টর। লেনিন আইন পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন। ছোটবেলা থেকে তিনি জার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কাজে যোগ দেন। তার এক ভাইকে জার সম্রাট ফাঁসি দেন। এই লেনিনের নেতৃত্বে অত্যাচারী সম্রাটের শাসন শেষ পর্য্যন্ত শ্রমিকরা ধ্বংস করে। রুশিয়ার শ্রমিকদের এই বিপ্লব পৃথিবীর একটা অদ্ভুত ঘটনা। যারা লিখতে জানে না, পড়তে জানে না, আজীবনই বড়লোকের জুতো লাথি খেয়েছে, যাদের বড়লোকেরা কথায় কথায় ছোট লোক বলে গালি দেয়, তারা দেশের সম্রাট ও বড়লোকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল এবং শেষ পর্য্যন্ত ওদের তাড়িয়ে নিজেরা শাসন কর্ত্তার গদীতে বসল। এরাও শাসনকার্য্য চালাবে? কিন্তু ঠিক তারা চালিয়েছে। সবাই অবাক হয়ে ভাবে—এত তাড়াতাড়ি দেশ এত উন্নত হ'ল কি করে? বর্ত্তমানে সোভিয়েটের লোক-দের হাতে একটা গোপন অস্ত্র আছে, যার দ্বারা এ সম্ভব হয়েছে। এই গোপন অস্ত্রটি হচ্ছে—বিজ্ঞান।"

কম্যুনিষ্ট শোভাযাত্রার সঙ্গে স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের মুষি বাগাইয়া "রুখতে হবে, ভাঙ্গতে হবে, চলবে না"—ইত্যাদি শ্লোগান আওড়াইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে দেখিলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা খুব আশান্বিত হইয়া উঠিতে পারি না। বিদ্যায়তনগুলিই যদি এই সব কুশিক্ষার তালিম কেন্দ্র হইয়া উঠে তবে তো রীতিমত চিন্তার কথা। এই সমস্ত কুশিক্ষা বন্ধ করিবার জন্য গবর্ণেমণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় উভয়েরই অত্যন্ত অবহিত হওয়া উচিত। "কম্যুনিজম আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু" বলিয়া চিৎকার এক দিকে করিয়া অথচ অন্যদিকে উহার তালিম কেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী হইয়া গড়িয়া উঠিবার সুযোগ দেওয়া মোটেই সুস্থ রাষ্ট্রনীতির পরিচয় নহে। গবর্ণেমণ্টকে এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন দেখিয়া আমাদিগকে ইহা লইয়া এতটা বিশদ ভাবে আলোচনা করিতে হইল। সোশ্যালিষ্ট এবং জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হওয়ায় কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী কারখানা অঞ্চলসমূহে কম্যুনিষ্ট প্রভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে, এবার তাহারা সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে ছাত্রছাত্রীদের সংগঠনে। শ্রমিকেরা পাওনাগণ্ডা বেশী বুঝে, তাদের কাছে আগে মজুরী পরে রাজনীতি। কাজেই সেখানে এখন সুবিধা হইতেছে না। কিন্তু বাংলার ছাত্রছাত্রীরা সহজ দাহ্য পদার্থের মত অল্প উস্কানীতেই উত্তেজিত হয় এবং উত্তেজিত হইলে পরে তাহাদের অপরিণত বুদ্ধির সুযোগে তাহাদের দ্বারা সব কুকাজই করাইয়া লওয়া যায়। এইজন্য কম্যুনিষ্টরা এখন এই দিকে ঝুঁকিয়াছে এবং স্কুল-কলেজে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী হইয়া ঢুকিয়া পড়িতেছে। সময় থাকিতে এ বিষয়ে সতর্ক না হইলে বিপদের সময় শুধু আর্ত্ত-নাদই সার হইবে।

১লা ডিসেম্বরের শিক্ষক ধর্ম্মঘট

আশুতোষ কলেজের একটি কম্যুনিষ্ট অধ্যাপককে কলেজ গবর্নিং বডি পদচ্যুত করিয়াছেন। তাঁহার পুনর্নিয়োগ দাবি করিয়া প্রথমে ঐ কলেজে ছাত্র ধর্ম্মঘট হয় এবং ১লা ডিসেম্বর ঐ অধ্যাপকের পুনর্নিয়োগের দাবির প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্য অন্যান্য কলেজের কম্যুনিষ্ট অধ্যাপকেরা ছাত্রদের সঙ্গে একযোগে ধর্ম্মঘট বাধান এবং পিকেটিং করিয়া অন্য অধ্যাপক ও ছাত্রদের কলেজে প্রবেশ করিতে বাধা দেন। কোন কোন কলেজে এই ধর্ম্মঘট উপলক্ষে গুরুতর অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। পদচ্যুত অধ্যাপকটির পক্ষে কলেজ গবর্নিং বডির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বক্তব্য থাকিলে তাহা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটকে জ্ঞাপন করিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাহা করিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই।

১লা ডিসেম্বরের ধর্ম্মঘট হইয়াছিল একটি কলেজের গবর্নিং বডির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং উল্টাইয়া পাল্টাইয়া জোর করিয়া কম্যুনিষ্টদের সুবিধাজনক ভাবে উহার সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে। সুখের বিষয়, আশুতোষ কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ ইহাতে যথোচিত কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ছাত্রেরাও তাঁহাদের সিদ্ধান্তই মানিয়া লইয়াছে। সিটি কলেজেও গুরুতর গোলযোগ হইয়াছিল এবং ছাত্রদের সহায়তায় সেখানেও কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ অল্পদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে এবং ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম্মঘট বিরোধী মনো-ভাব দূর করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার। এই দিনের ধর্ম্মঘট হইয়াছিল একটি কলেজের গবর্নিং বডির বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য কলেজের কোন কোন অধ্যাপক উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। ইহা

অতিশয় গুরুতর শৃঙ্খলা ভঙ্গের দৃষ্টান্ত বলিয়া আমরা মনে করি। দ্বিতীয়ত: ১৫ই নবেম্বর এবং ১লা ডিসেম্বরের ধর্মঘটে কম্যুনিষ্ট অধ্যাপকেরা প্রচারকার্য্যে এবং পিকেটিং-এ ছাত্রদের দলে টানিয়াছিলেন। এই কার্য্য অনেক অধ্যাপক গর্হিত বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং কোন কোন কলেজের অধ্যাপাকেরা সভা করিয়া ঐ সব অধ্যাপকের সমক্ষে এই আচরণের নিন্দা করিয়াছেন। ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা গিয়াছে যে, কম্যুনিষ্ট অধ্যাপকদের পিছনে অধ্যাপক সমাজ বা ছাত্র সমাজ কাহারও ব্যাপক সমর্থন নাই; একটি ছোট সঙ্ঘবদ্ধ দল গোলমাল পাকাইবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়াই ইঁহারা এইরূপ বিশৃঙ্খলা বাধাইতে পারিতেছেন। এক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবিরোধী মনোভাব কুশিক্ষা ও কুপ্রচারের ফলে বাড়িয়া উঠিতেছে। এখন অধ্যাপকদের একটি দল যদি উহা আরও বাড়াইবার পক্ষে যোগ দেন তাহা হইলে শিক্ষার প্রসার পদে পদে ব্যাহত হইবে। কম্যুনিষ্টরা শিক্ষার উন্নতির কথা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু উহা তাঁহাদের লক্ষ্য নহে। তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য স্কুল কলেজের আদর্শবাদী ভাবপ্রবণ তরুণ প্রাণের ডিনামাইট নিজেদের দলগত স্বার্থে কাজে লাগানো।

আমরা মনে করি এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে সতর্ক হইবার সময় আসিয়াছে। রাশিয়া নিজের রাজনৈতিক মতাবলম্বী লোক ছাড়া আর কাহাকেও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে সহ্য করে না। আমাদের দেশে অন্ততঃ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে এই নীতি প্রবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে। স্কুল-কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের অতি কঠোর ভাবে শৃঙ্খলাভঙ্গকারী শিক্ষক ও অধ্যাপকদের শাস্তি দেওয়া উচিত এবং ইহার জন্য গোলযোগ ঘটিলে বা স্কুল কলেজ সাময়িক ভাবে বন্ধ করিতে হইলে তাঁহাদিগকে অর্থসাহায্য করা উচিত। যেখানে বৃহত্তর ছাত্র সমাজ ও অধ্যাপক সমাজের জাতির প্রতি মমত্ববোধ এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কর্ত্তব্যবোধ রহিয়াছে, সেখানে বিদেশীর চর এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোককে অপসারিত করিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে কালিমামুক্ত করা কঠিন নহে।

সিভিল সাপ্লাই কণ্ট্রোলারের ক্ষমতা

কয়েকদিন আগে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সেন বর্দ্ধমান জেলার সিভিল সাপ্লাই কণ্ট্রোলারের বিরুদ্ধে যে তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রায়ের সারমর্ম্ম এবং ঘটনার বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল:

বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে বাদী অমরকৃষ্ণ বসু যে রুল জারির আবেদন করেন তাহার বিচার প্রসঙ্গে বিচারপতি এই মন্তব্য করেন। রায়ে বিচারপতি বলেন যে, বাদী কলিকাতার একজন বস্ত্রব্যবসায়ী এবং পশ্চিমবঙ্গ কাপড় ও সূতা নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলবৎ না থাকার সময় তিনি কিছু কাপড় পাইয়াছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর পানাগড় হইতে বর্দ্ধমানে মোটরযোগে ঐ কাপড় চালান দেওয়ার সময় উহা আটক করা হয় এবং মোটরযানের ড্রাইভার ও ক্লিনার গ্রেপ্তার হয়। ইহার ছয় মাস পরে পুলিস চূড়ান্ত রিপোর্টে জানায় যে, আসামীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই এবং বাদীকে কাপড় ফেরত দেওয়া হউক। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ রিপোর্ট অনুসারে আসামীকে মুক্তি দেন এবং কাপড় ফেরত দেওয়ার আদেশ দেন। এই আদেশ অসামরিক সরবরাহ বিভাগের জেলা কণ্ট্রোলারের নিকট প্রেরিত হইলে উক্ত কণ্ট্রোলার ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ পালনে বাধ্য থাকিলেও উহা না করিয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ঔদ্ধত্যপূর্ণ পত্র লেখেন। তিনি জানান যে, মামলার পূর্ণ বিবরণ না জানিয়া এবং সন্তোষজনক প্রমাণ না পাইয়া তিনি এতগুলি কাপড় ফেরত দিতে পারেন না। বিষয়টি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করার জন্য তিনি আদালতের নিকট মামলার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন। বিচারপতি বলেন যে, এই অফিসারের আচরণ কৌতুকজনক। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতের আদেশ জারী হইয়াছে, তিনি আদেশ পালন দূরে থাকুক, স্বয়ং বিচারক হইয়া বসিয়াছেন। ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতের আদেশ যে পর্য্যন্ত কোন যোগ্যতাসম্পন্ন ট্রাইবুনাল স্থগিত না রাখে কিংবা বাতিল না করে, সে পর্য্যন্ত উহা ভালই হউক আর মন্দই হউক পালন করিতে হইবে। নতুবা শাসন বিভাগের পক্ষে উহা বিপজ্জনক হইবে। যিনি যতই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হউন এই নীতি স্মরণ রাখিতে হইবে। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত কণ্ট্রোলারকে আদালত অবমাননার জন্য অভিযুক্ত না করিয়া অত্যন্ত প্রশ্রয় দিয়াছেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটও ঐ চিঠির একটি নকল পাইয়া বাদীর নামে সমনজারী করিয়াছেন। ইহা বেআইনী কাজ হইয়াছে।

বিচারপতি বাদীর নামে সমন জারী এবং কাপড় ফেরত দেওয়া স্থগিত রাখার আদেশ নাকচ করেন। অসামরিক সরবরাহ বিভাগের জেলা কণ্ট্রোলারের প্রতি অবিলম্বে বাদীর আট গাঁইট কাপড় ফেরত দেওয়ার আদেশ দিয়া তিনি তাঁহাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া দেন। রুল বজায় রাখিয়া এই আদেশ বর্দ্ধমানের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের জেলা কণ্ট্রোলারের প্রতি জারী করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

এই রায়ে বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জেলা সিভিল সাপ্লাই কণ্ট্রোলারের যে আচরণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা হইতে বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রের অবনতির পরিমাণ অনেকটা বুঝা যায়। মামলা হইয়াছে, মহকুমা হাকিম রায় দিয়াছেন—অতঃপর হয় উচ্চতর আদালতে আপীল হইবে নতুবা রায় মানিয়া কাজ করিতে হইবে। সিভিল সাপ্লাই কণ্ট্রোলার মহকুমা হাকিমের রায়ের বিরুদ্ধে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা

মানিয়া লওয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষে চূড়ান্ত দুর্ব্বলতার কাজ হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে [illegible] টাকার জোর এবং লড়িবার ইচ্ছা আছে বলিয়া তিনি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন এবং সুবিচার লাভ করিয়াছেন। সহায় সম্বলহীন দরিদ্র বহু লোককে সিভিল সাপ্লাই কর্ত্তাদের তুষ্ট করিতে না পারার অপরাধে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় বলিয়া বহু লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে। ছোট বড় সর্ব্বশ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারীর একটা বড় অংশের মধ্যে প্রণামী না পাইলে জব্দ করিবার মনোবৃত্তি যেরূপ ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে অনেকের সেইরূপ অভিজ্ঞতা হওয়ায় এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে। উপরোক্ত মামলায় পুলিস অভি-যোগের কারণ নাই বলিবার পরেও জেলা কন্ট্রোলারের ঐরূপ আচরণ এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক তাঁহাকেই সমর্থনের দৃষ্টান্ত জনসাধারণের এ আশঙ্কা যে অমূলক নয় তাহাই প্রমাণ করিতেছে। বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সিভিল সাপ্লাই কন্ট্রোলার দুই জনকেই এই ঘটনার জন্য যথাযোগ্য শাস্তি দিয়া অবিলম্বে তাহা প্রেসনোটের মারফৎ জনসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া উচিত। নচেৎ এই মামলার ফল জন-চিত্তের উপর অত্যন্ত খারাপ হইবে।

ডাঃ মাথাইয়ের বক্তৃতা

কলিকাতায় ভারতীয় এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অফ কমার্সের বার্ষিক সভায় ডাঃ মাথাই এবার অভিভাষণ দিয়া-ছেন। এই সভায় বড়লাটদের বক্তৃতা করাই ছিল পুরাতন প্রথা, পণ্ডিত নেহরুও এই সভায় অভিভাষণ দিয়াছেন। এবার আসিয়াছিলেন ভারতের অর্থসচিব ডাঃ মাথাই। সাময়িক বৈষয়িক সমস্যাসমূহের পরিচয় এই সভার বক্তৃতাটিতে পাওয়া যাইত এবং বড়লাট ঐ সম্বন্ধে সরকারী নীতি ব্যক্ত করিতেন। এবার কিন্তু তাহা দেখা গেল না। সভাপতি মিঃ এলকিন্স কয়েকটি বাস্তব সমস্যার কথা তুলিয়াছেন এবং ডাঃ মাথাই কতকগুলি মামুলী ফাঁকা কথায় কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াছেন। ডাঃ মাথাইয়ের বক্তৃতার সার কথা তিনটি, ব্যবসায়ে টাকা লগ্নী করা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, উন্নয়ন পরিকল্পনার বরাদ্দ হ্রাস সাময়িক ভাবে করা হইয়াছে, প্রথম সুযোগেই আবার বাড়ানো হইবে এবং পাকিস্থানের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বোঝাপড়ার আশা ভারত-সরকার এখনও রাখেন। প্রথমটির বিশেষ কোন লক্ষণ আমরা দেখিতেছি না। দ্বিতীয়টি আমরা অনাবশ্যক বোধ করি এইজন্য যে, স্বাধীনতার পর সরকারী, [illegible] বেতন, ভাতা ও কন্টিজেন্সি প্রভৃতিতে যে বিপুল ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা সঙ্গত ভাবে কমাইলেই উন্নয়ন-পরিকল্পনার বরাদ্দে হাত দেওয়ার প্রয়োজন হইত না। অসামরিক ব্যয় এত বেশী বাড়িয়াছে যে, যুদ্ধের সবচেয়ে খারাপ বৎসরেও এত খরচ ছিল না। এই দিকটি সম্বন্ধে ভারত-সরকার একেবারে উদাসীন। তৃতীয়টি ভারত-সরকারের আশা মাত্র, বাস্তবের সহিত তাহার সম্পর্ক কতখানি তাহার সামান্য পরিচয় করাচীর ইসলামিক রাষ্ট্র সম্মেলনে পাওয়া গিয়াছে। "আজাদ কাশ্মীর গবর্মেণ্ট"র প্রতিনিধিকে ঐ সম্মেলনে আর সমস্ত প্রতিনিধিদের সমান মর্য্যাদা দিয়া পাকিস্থান বুঝাইয়া দিয়াছে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার আসল মনোভাব কি। সুখের কথা শুধু এইটুকু যে, ভারতবর্ষ পাকিস্থানের পাট ও তুলার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া না থাকিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার চেষ্টা করিবে এ কথাটা মাথাই মহাশয় সাহস করিয়া বলিতে পারিয়াছেন।

বর্ত্তমান সমস্যার সবচেয়ে খাঁটি কথা এবং মূল সমস্যার উল্লেখ করিয়াছেন মিঃ এলকিন্স। তিনি বলিয়াছেন, "আমরা মনে করি অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বিশেষ পরিমাণে হ্রাস করার উপর সরকারের সমস্ত পরিকল্পনা নির্ভর করে; খাদ্যের দাম না কমিলে জীবনযাত্রার ব্যয় কমিবে না, অতএব উৎপাদন-ব্যয়ও কমিবে না।" খাদ্যদ্রব্যের মূল্যহ্রাসের উপর সত্যসত্যই এখন সমস্ত কাজকর্ম্ম নির্ভর করিতেছে, দাম না কমা পর্য্যন্ত কোন দিকেই কূলকিনারা পাওয়া যাইবে না। অথচ আমরা বিস্মিত হইয়া দেখিতেছি বীরভূম ও চব্বিশ পরগণার কয়েকটি ভোটের লোভে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন অদূরদর্শী নেতা খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। মিঃ এলকিন্সের দ্বিতীয় কথা, শ্রমিক ছাঁটাই। তিনি দেখাইয়াছেন যে, দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিল্প সম্মেলনে শ্রমিক প্রতিনিধিরা শ্রমিক ছাঁটাইয়ের যুক্তি মানিয়া লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, দশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় শ্রমিকের মজুরী কম ছিল বলিয়া ভারতে শিল্পোন্নতি হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন উহা অত্যধিক বলিয়া শিল্পোন্নতি ব্যাহত হইতেছে। আমাদের মনে হয় মজুরী বৃদ্ধির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া যদি শ্রমিকদের কর্ম্মক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়িত তবে বেশী মজুরী ক্ষতির কারণ হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় কার্য্যতঃ তাহা ঘটে নাই, বরং বিপরীত অবস্থাই দেখা দিয়াছে। মজুরী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা কাজে ঢিলা দিয়াছে, অনুপস্থিতি এবং শৃঙ্খলার অভাব বাড়িয়াছে, উৎপা-দনের অনুপাত পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় মজুরী বৃদ্ধির দাবি তোলা শিল্পের পক্ষে অনিষ্টকর এবং পরিণামে শ্রমিকদের পক্ষেই ক্ষতিকর ইহা অন্যান্য দেশের শ্রমিকেরাও বুঝিতেছে। ব্রিটেনে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছে যে, মজুরী বৃদ্ধির দাবি এখন বন্ধ রাখা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কিন্তু প্রতিজনে উৎপাদনের অনুপাত বৃদ্ধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়াছে। আমেরিকায় ইহা অত্যন্ত সফল হইয়াছে। ব্রিটেন, রাশিয়া, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশেও শ্রমিকেরা এবিষয়ে খুব মন দিয়াছে। রপ্তানী বাণিজ্য বাড়াইতে হইলে উৎপাদন ব্যয় কমাইতে হইবে এবং মজুরী ঠিক রাখিয়া উৎপাদন ব্যয় কমাইতে হইলে মন দিয়া বেশী করিয়া কাজ করিতে হইবে এটা তাহারা বুঝিয়াছে, কিন্তু আমাদের শ্রমিক-দের একথাটা এখনও ভাল করিয়া বোঝানো হয় নাই। এখানে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া শ্রমিক মহলে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জ্জনের লোভে মজুরী বৃদ্ধির লড়াই এখনও চলিতেছে।

এদিকে এখন সমস্ত শ্রমিক নেতার মন দেওয়া দরকার। আমাদের নিজেদের ধারণা এই যে, যদি শ্রমিক ও কর্ম্মী প্রকৃত সততার সহিত উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাহার মন ও শক্তি নিয়োগ করে তবে ছাঁটাইয়ের কথা উঠিতেই পারে না, কেননা সকল ক্ষেত্রেই এখন সক্ষম কর্ম্মীর অভাব আছে। মজুরী ও মাগ্‌গী ভাতা বাড়াইয়া ফাঁকিবাজ ও ফন্দিবাজের পথ সহজ না করিয়া শ্রমিক ও কর্ম্মীর উচিত লাভের অংশে মন দেওয়া। উৎপাদন অধিক ও কম মূল্যে হইলে লাভ বেশী হইতে বাধ্য।

চিনির ভেল্কীবাজি

কি করিয়া চিনি—কল, গুদাম ও দোকান হইতে গত আশ্বিন মাসে উধাও হইয়া গিয়াছিল, তার কারণ বুঝিতে পারা যাইবে কেন্দ্রীয় আইন সভার নিম্নলিখিত বিবরণে—গত ১৪ই অগ্রহায়ণ (৩০শে নবেম্বর) তারিখের প্রশ্নোত্তরে। আইন সভার স্পীকার শ্রীমবলঙ্কার আশ্বিন মাসে চিনি সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে অনুমতি দেন নাই; সেই দিন বলিয়াছেন যে শীঘ্রই আলোচনার জন্য একটি দিন ধার্য্য করিবেন।

পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এইরূপ মন্তব্য করেন যে চিনির দুষ্প্রাপ্যতা সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও গবর্ন্মেণ্টের হাতে এতৎসম্পর্কিত সাধারণ তথ্যও নাই; ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়।

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বলেন, আলোচনার পূর্ব্বে গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পর্কে তাঁহারা সদস্যগণকেও ওয়াকিবহাল রাখিতে চাহেন; গবর্ন্মেণ্ট আলোচনার পূর্বে সদস্যগণের মধ্যে তথ্যাদির একটি নোট বিতরণ করিবেন।

পণ্ডিত কুঞ্জরুর মন্তব্যের পর খাদ্যসচিব শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম চিনি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেন।

শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী—খাদ্যসচিব কি তাঁহার বিবৃতিতে যে সকল স্থানে চিনি পাওয়া যাইতেছে না সে সকল স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন? (হাস্য)

শ্রীজয়রামদাস—আমি যে সকল স্থানে তদন্ত করিয়াছি সেই সকল স্থানের মূল্য উল্লেখ করিয়াছি।

শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনের একটি প্রশ্নের উত্তরে খাদ্যসচিব বলেন যে, প্রাদেশিক সরকারগুলিকে চিনির কলের ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের মজুত আটক করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

কুঞ্জরু—আটক করার নির্দ্দেশ জারীর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীদের মজুত মাল ধরার জন্য প্রাদেশিক সরকার-গুলি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন?

খাদ্যসচিব—প্রাদেশিক সরকারের অবলম্বিত ব্যবস্থা-বলীর বিস্তারিত বিবরণ আমি দিতে পারিব না।

কুঞ্জরু—আটকের নির্দ্দেশ জারীর পর প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তৃক মজুত ধরার কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে ব্যবসায়ীগণ যথেষ্ট সময় পাইয়াছে বলিয়া যে গুরুতর অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা কি আপনার দৃষ্টি-গোচর হয় নাই?

খাদ্যসচিব—হইতে পারে।

কুঞ্জরু—ইহা কি সত্য যে আটক করার নির্দ্দেশ জারী হইবার পর ১০ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে ডিলারদের চিনি দেওয়া হয় নাই।

খাদ্যসচিব—আটক করার নির্দ্দেশ দেওয়ার পর প্রদেশগুলির বরাদ্দ বণ্টনের প্রশ্ন দেখা দেয়; প্রত্যেকটি কারখানায় কি পরিমাণ মাল আছে তাহা না জানিয়া বরাদ্দ ঠিক করা যায় না। সেইজন্য কারখানাগুলির মজুত মালের পরিমাণ জানাই প্রথম প্রয়োজন।

খাদ্যসচিব বলেন যে, ব্যবসায়ীদের ফাটকাবাজী ও বর্ত্তমান বৎসরের উৎপাদনের একটি মোটা অংশ ইতিমধ্যেই বিক্রীত হইয়াছে এবং ফলে চিনির অভাব দেখা দিতে পারে বলিয়া সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক বিবৃতি প্রকাশের ফলেই মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, সিণ্ডিকেট রপ্তানি বাণিজ্য তহবিলে ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া-ছেন। সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে স্থানে স্থানে অনিয়ন্ত্রিত মজুত চিনির মূল্য মণ প্রতি ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠে।

শ্রী আর, মালব্যের প্রশ্নের উত্তরে খাদ্যসচিব বলেন যে, ভারত-সরকার চিনির অভাব দূর করার জন্য বিদেশ হইতে চিনি আমদানি করিতে চাহেন না।

খাদ্যসচিব শ্রীদৌলতরামের উত্তরে আমরা দুই-একটা কথা বুঝিতেছি। কলে উৎপন্ন চিনি সম্বন্ধে কোন হিসাব তাঁহারা রাখেন না; বিদেশ হইতে চিনি আনিয়া তাঁহাদের নিয়ন্ত্রাধীনে বিতরণ করিবার সাহস ও শক্তি তাঁহাদের নাই। এই অক্ষমতার কারণ সম্বন্ধে কোন গবেষণা করিব না। সর্দ্দার প্যাটেলের অনুরোধ-উপরোধে ফাটকাবাজদের মন যে গলি-য়াছে তাহার কোন প্রমাণ পাইলে সুখী হইতাম। এই অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, ১৯৩২ সাল হইতে চিনি শিল্পকে রক্ষা করিয়া দেশের লোককে ভুল করিয়াছে।

সেই কথাই "গণ-বাণী" পত্রিকার ১৭ই অগ্রহায়ণের সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে। সহযোগী বলিতেছেন:

সতেরো বছরে এই হাজার কোটির বেশী টাকা ভারত বর্ষের ৩৫ কোটি লোক বিহার ও যুক্তপ্রদেশের ছয় লক্ষ চাষী ও শ্রমিক এবং শত জয়েক ইউ-পি, ভাটিয়া, পঞ্জাবী, মাড়োয়ারী এবং ইংরেজকে ভাগ করিয়া দিয়াছে। গবর্ন্মেণ্টও ইহার এক বড় চাকলা আদায় করিয়াছেন।...

যে তথ্যের উপর এই মন্তব্য প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে তাহাও আমাদের পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি:

১৯৩২ হইতে ১৯৪৭ পর্য্যন্ত মোট ১,৬১,১৮,৩৩৩ টন অর্থাৎ ৪৩,৫১,৯৪,৯৯১ মণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। বাৎসরিক উৎপাদনের আলাদা হিসাব অঙ্কের বাহুল্য ভয়ে দেওয়া হইল না, যাঁহাদের প্রয়োজন তাঁহারা ১৯৪৭সালের টেরিফ বোর্ডের রিপোর্টের ২২ পৃষ্ঠা দেখিয়া লইবেন। ৮ টাকা মণ ডিউটি বসানোতে ঐ পরিমাণ দাম কৃত্রিম

ভাবে বাড়ানো হইয়াছে এবং ক্রেতাদের সস্তা জাভা কিউবার চিনির পরিবর্ত্তে চড়া দামে দেশী চিনি কিনিতে হইয়াছে। ১৭ বৎসরে ক্রেতারা এই ভাবে শুধু শুল্ক-বাবদই চিনিশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্ম দিয়াছে—৪৩,৫১,৯৪,৯৯১ ×৮=৩৪৮,১৫,৫৯,৯২৮৲।···

সংরক্ষণ শুল্কের আমলে চিনির কারবারে মোট আয় এবং ভাগাভাগির একটা মোটামুটি হিসাব এইরূপ দাঁড়ায়—

চিনি লর্ড (১৬৬ মিল)—	বড়জোর ১০০
চিনি ব্যবসায়ী (উচ্চতম পাইকার)	বড়জোর ৫০৯
শ্রমিক	১ লক্ষ
আখচাষী	৫ লক্ষ

চিনির কারখানার মধ্যে বিহার যুক্তপ্রদেশের অংশ শতকরা ৮৩ ভাগ।

মোট উৎপন্ন চিনির দাম (গড়ে ১৬৲ টাকা দরে, কারখানার দাম, বাজার দর নয়) ৬৯৬,৩১,১৯,৮৫৬ টাকা

সংরক্ষণ শুল্ক বাবদ অতিরিক্ত লাভ ৩৪৮,১৫,৫৯,৯২৮ ,,

এখন প্রশ্ন এই যে, সংরক্ষণ শুল্ক রাখা আর একদিনও উচিত কিনা।

রেল-বিভাগের কার্য্য

ভারতীয় রেলসমূহের চিফ কমিশনার শ্রী কে. সি. বাখলে বোম্বাইয়ের রোটারি ক্লাবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই বিভাগ যে তিনটি নীতিতে পরিচালিত হয় তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের প্রচার বিভাগের প্রধান কর্ত্তা কর্ত্তৃক পরিচালিত "যোগাযোগ" পত্রিকার গত ১৪ই কার্ত্তিকের সংখ্যায় তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। নিম্নে তাহা তুলিয়া দিলাম:

> ব্যবসা সম্পর্কিত দিক হইতে বিচার করিলে এক শ্রেণীর জনসাধারণ উহাকে প্রকৃত ব্যবসা নীতির উপরে নির্ভর করিয়াই চালিত হইতে ইচ্ছা করেন। দ্বিতীয়তঃ জাতীয় সম্পদের দিক হইতে অন্য এক শ্রেণীর লোকেরা উহা সমাজতন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া পরিচালিত হইবার পক্ষপাতী; তৃতীয়তঃ জনসাধারণের অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সেই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া উহার শাসনকার্য্য পরিচালনায় যাহাতে সাধারণের স্বার্থ রক্ষা হয় তাহার ইচ্ছা অপর এক শ্রেণীর লোক পোষণ করেন।

এই নীতি-ত্রয় সম্বন্ধে সাধারণ নাগরিকের বর্ত্তমানে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু সমস্ত নীতির উর্দ্ধে রেলওয়ে পরিচালনায় যে সততার অভাব আমাদের সকলকে প্রতিদিন পীড়িত করে, তৎসম্বন্ধে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ সজাগ থাকিলে আমাদের যন্ত্রণার লাঘব হইত। রেলগাড়ী হয়ত বেশী সংখ্যায় চলিতেছে; সময়মতও পৌঁছিতেছে। কিন্তু যে রোগের কথা আমরা উল্লেখ করিলাম, তাহার কোন চিকিৎসা হইতেছে না। রেলওয়ের অধস্তন কর্ম্মচারিবৃন্দের এই বিষয় কি কিছুই করণীয় নাই? রেলকর্ম্মীকে আত্মমর্য্যাদা সম্বন্ধে জ্ঞান দিবার কি কেহই নাই?

পশ্চিমবঙ্গের গণ-মনে বিক্ষোভ

"গণ-রাজ" মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটির মুখপত্র। এই পত্রিকার ১লা অগ্রহায়ণ তারিখের সংখ্যায় নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে:

> ···লোকে মনে করিতেছে যে কলিকাতাই একমাত্র স্থান যেখানে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি প্রচুর পরিমাণে সহজলভ্য হইবে। ফলে গ্রামগুলি আবার পরিত্যক্ত হইয়া যাইতেছে। বর্ষার সময় পল্লী অঞ্চলের রাস্তাঘাটগুলি দুর্গম হইয়া যায়। কিন্তু সরকার হইতে এই সকল রাস্তার সংস্কার সাধিত হয় নাই। অথচ কলিকাতা সহরের জন্য ভূগর্ভস্থ-রেল চলাচলের পরিকল্পনা এই সরকারই গ্রহণ করিতেছেন। পল্লী অঞ্চলে ও মফস্বলের অখ্যাত জেলার সহরগুলিতে যখন রাত্রে আলোর অভাবে অমাবস্যার অন্ধকার বিরাজ করে তখন কলিকাতার হাওড়া ব্রীজকে তীব্রতর আলোকমালায় সজ্জিত করিবার সরকারী পরিকল্পনা আমাদের শুনিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে যে, তাঁহাদের বর্ত্তমান কার্য্যক্রম কংগ্রেসের সুমহান আদর্শের পরিপন্থী হইয়া পড়িতেছে এবং একমাত্র সেই কারণেই জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাদের উপর বিরক্ত হইয়া পরোক্ষভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। বিকেন্দ্রীকরণের নীতিই হইল কংগ্রেসের মূল নীতি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ একমাত্র কলিকাতা মহানগরীকেই কেন্দ্র করিয়া কংগ্রেসের মূলনীতিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি লক্ষ্য করিয়া আমরা এই আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছি। প্রতিষ্ঠান হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের এই বিষয়ে দায়িত্ব রহিয়াছে। আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছি যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কংগ্রেস-পরিচালিত হইলেও কংগ্রেসের আদর্শ অনুযায়ী সরকারের কার্য্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না। সরকারের কার্য্যের ফলে জনসাধারণ কংগ্রেসের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িতেছে ও কংগ্রেসের বহু বিঘোষিত কর্ম্মপন্থার প্রতি সন্দেহের ভাব পোষণ করিতেছে। দেশে এই অবস্থা ও আবহাওয়া চলিতে দেওয়া আদৌ সঙ্গত নহে।···

"গণ-রাজ" এই মন্তব্যে প্রদেশব্যাপী অসন্তোষের রূপদান করিয়াছেন. "প্রবাসী"র বর্ত্তমান সংখ্যায় অন্যত্র পত্রিকা

হইতে যাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাও এই অসন্তোষের পরিপোষক। ভিষক্‌-শ্রেষ্ঠ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই রোগের কোন চিকিৎসার কথা ভাবিতেছেন কি?

ম্যালেরিয়া জ্বর

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ নীলরতন সরকার বলিয়াছিলেন যে, এক ম্যালেরিয়া রোগের কৃপায় বাঙালীর উপার্জ্জন প্রতি বৎসরে প্রায় ৪ কোটি টাকা কমিয়া যায়। আজও সেই অবস্থার বিশেষ প্রতিকার হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। বর্দ্ধমানের "দামোদর" তার এই ব্যর্থতার কথা বলিতেছেন:

> দারুণ ম্যালেরিয়া—ঔষধ ও চিনি না পাওয়ায় জনসাধারণের কষ্টের সীমা নাই। এবারে এ-অঞ্চলে অজস্র পুঁটিমাছ পাওয়া যাইতেছে। তাহার টক যে যত খাইতেছে ততই তাহার ম্যালেরিয়া হইতেছে। রায়না হইতে একজন লিখিয়াছেন—এখানে ম্যালেরিয়ার তাণ্ডব সুরু হইয়াছে। অধিকাংশ বাড়িতেই কেহ সুস্থ অবস্থায় নাই। কুইনাইন এমনকি পেলুড্রিনের ট্যাবলেটও মিলিতেছে না। বাজার হইতে চিনি অদৃশ্য হওয়ায় ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীরা সাগু পাইতেছে না। মানুষ মরিলে সৎকার করিবার লোক পাওয়া যায় না।

এই জনপদ-বিধ্বংসী ব্যাধির প্রতিকারের উপায় অজানা নাই। একজন চিকিৎসক-প্রধান পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী; তাঁহার আমলে এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিবার যে কোন ব্যাপক উপায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; তাহার সার্থকতার কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। প্রমাণ থাকিলে বর্দ্ধমান, বীরভূম হইতে এরূপ মন্তব্য শুনিতে হইত না।

বর্ত্তমান খাদ্য-সঙ্কট কালে যখন ধান ঘরে তুলিবার সময় হইয়াছে তখন যদি "চাষীমজুর আদি পাট-পারণে শুইয়া থাকে" তবে পশ্চিমবঙ্গে "অধিক খাদ্য ফলাও" আন্দোলনের সার্থকতা কোথায়? অন্য দেশে এই অবস্থায় স্কুল কলেজের ছাত্রবৃন্দ ধান ঘরে তুলিয়া দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিত; শিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহ করিবার দায় হইতে পিতামাতাকে কথঞ্চিৎ মুক্ত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। আমাদের "বাবুর" দেশে তা হইবার জো নাই; পার্কে রাস্তায় স্লোগান আওড়াইয়া আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ গঠনকারীরা কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, "বিপ্লব চিরজীবী" করেন, এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ডুবাইবার ব্যবস্থা করেন।

ভারতরাষ্ট্রদ্রোহী চোরাকারবারী

গত ১৩ই অগ্রহায়ণ তারিখের "যুগান্তর" পত্রিকায় সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীভোলানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলীর দৃষ্টি এই চোরাকারবারের প্রতি আকর্ষণ করিতে চাই:

> "হিঙ্গলগঞ্জ হইতে একজন বিখ্যাত অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী আরও কতিপয় ব্যবসায়ীর সহিত প্রতি সোম ও শুক্রবার এই সীমান্তের কালিন্দী নদীর তীরস্থ কানাইকাটির হাটে বিভিন্ন প্রকারের মাল লইয়া যায়। এই হাটের সামনেই একটি খেয়া আছে। খেয়ার নৌকাটি আর একটু দক্ষিণে কেলেখালির খাল ও কানাইকাটী গ্রামের সীমানায় ছিল। এখানেও একটি হাট আছে। এই সীমান্তের সাহেবখালির দুর্নীতিদমন 'অ্যান্টিম্যাগলিং' অফিসার ও ঘাঁটির পুলিশবাহিনী মিলিয়া... মাল পারাপারের সুবিধার জন্য খেয়ার নৌকাটি এদিককার হাটের সামনে চালাইবার জন্য হুকুম জারী করিয়াছেন; সে কারণে এই হাটের বিভিন্ন দোকানে মালও যাইতেছে প্রচুর; হাজার হাজার টাকার মাল পার করিয়া লইতেছে।...এই হাটটি একদিকে 'পাকিস্থানে মাল চালানী হাট' বলিয়া খ্যাত এবং এই হাটের কর্ত্তা ব্যক্তিটি এখানকারই বাসিন্দা। আমি কিছুদিন আগে একদিন এই হাটে উঠিয়া খেয়ার নৌকায় মাল চালান দেওয়ার কালে ধরিয়া চালান দেওয়াইয়াছি। হাটের কর্ত্তা ব্যক্তিটিকে সাবধান করিয়া দিয়াছি। আমার সাবধান করার পরও হাটের কর্ত্তাগণ ও দোকানদারগণ আজ কয়েক মাস ধরিয়া উৎসাহ, উদ্যমের সঙ্গে মাল পারাপারের কাজে লাগিয়া গিয়াছে। এর মূলে রহিয়াছে আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা পুলিশ প্রভুদের গোপন চুক্তি ও উদ্দীপনা। হিঙ্গলগঞ্জ হইতে যে অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীটি প্রচুর মাল পারাপারের জন্য এই হাটে লইয়া আসে, একদিন রাস্তার মাঝে ধরা পড়িয়া ১,১০০৲ টাকা প্রণামী দিয়া ছাড়া পাইয়াছিল...।
>
> "গুপ্তভাবে অনুসন্ধান কার্য্য চালাইলে যেসব ধুরন্ধর রাষ্ট্রদ্রোহী চালানকারী বা সাহায্যকারী ব্যক্তি আছেন, সব প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং তখনই তাহাদের একটি একটি করিয়া উৎপাটন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সহজ হইবে।
>
> "এই প্রসঙ্গে আরও দুই একটি বিষয়ে সরকার ও দেশবাসীর অবগতির জন্য লিখিতেছি। কিছুদিন আগে যখন এই সীমান্তের হাসনাবাদ হিঙ্গলগঞ্জ দিয়া হাজার হাজার গাঁইট কাপড়, সুতা ইত্যাদি পাকিস্থানে চোরাই চালান হইতেছিল, সেই সময়ের কিছু পরেই চালানকারী বা সাহায্যকারী সাব্যস্ত করিয়া কতিপয় ব্যবসায়ী ও বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির বিখ্যাত সভাপতিকে গবর্ণমেণ্ট এই অঞ্চল হইতে বহিষ্কার করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সময় কাপড়ের কেনা-বেচা যাহারা করিয়াছিল তাহাদের কাপড় আটক করার সময় উক্ত সভাপতি মহাশয়ের অনুগৃহীত আপনজনের দোকান খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তমানে উক্ত সভাপতি মহাশয় হিঙ্গলগঞ্জের ঠিক অপরপারে পাকিস্থানে বসবাস করিতেছেন।

"জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীরবি মিত্র ও মন্ত্রীরূপে শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী যখন হিঙ্গলগঞ্জে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন সেই সময়ে ইনি সভায় পাকিস্থানের বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করিয়াছিলেন। আজ যখন ইনি পাকিস্থানে বসবাস করিতেছেন তখন পাকিস্থান রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে পাকিস্থানের কল্যাণই যে তাঁহার লক্ষ্য তাহা বুঝা যায়। তাহা না হইলে ঐভাবে বিষ উদ্গীরণের পরে সেই রাষ্ট্রে যে সহজে বসবাস করা যায় না তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এদিকে হিঙ্গলগঞ্জের উক্ত সভাপতি মহাশয়েরও অন্য ব্যবসার সাঙ্গপাঙ্গবর্গ বহাল তবিয়তে ঘুরাফিরা করিতেছেন, আর পুলিস (ল্যাণ্ডকাষ্টমস্)···প্রভুদের কল্যাণে হাজার হাজার টাকার মাল অপর পারে পাকিস্থানে চলিয়া যাইতেছে।

"হিঙ্গলগঞ্জের অতি পুরাতন ও নূতন ব্যবসায়ীরা একদিন জানিতে পারিল যে, ওখানকার একজন নবীন ব্যবসায়ী কোনও অদৃশ্য ইঙ্গিতে বা কোনও অফিসারের দ্বারায় এক আধ বস্তা নয়, একেবারে ১০০০ এক হাজার বস্তা ডালের পারমিট পাইয়া গিয়াছে এবং সত্য সত্যই প্রথম কিস্তী ৩০০ শত বস্তা একদিন হিঙ্গলগঞ্জে আনিয়া ফেলিল। অতি পুরাতন বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা পর্য্যন্ত যেখানে ৫।১০।১৫ বস্তার বেশী ডাল আনিবার অধিকার আজ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া পাইতেছে না সেখানে 'ভানুমতির'-খেলের মত এই ভাবের পারমিট পাওয়ার মধ্যে যে গোপন হস্তের খেলা চলিতেছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জের ব্যবসায়ী মাত্রেই জানে উপরি-উক্ত নবীন ব্যবসায়ীর পকেটে নাকি সদাসর্ব্বদা বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ পারমিট আছেই। এইসব বিশেষ পারমিট দেওয়ার অর্থ যে পাকিস্থানে পার করা তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

"অদৃষ্টের পরিহাসে ইটিণ্ডাঘাট হইতে হিঙ্গলগঞ্জ এলাকা বরাবর···বিভাগ হইবার কিছু পর হইতেই ইছামতী কালিন্দী নদীর উপর এই সীমান্তে 'কারফিউ' জারী করা আছে।···

"ঐ কারফিউই উপরি-উক্ত মিলিত দলটির জীবনে মাহেন্দ্রযোগ আনিয়া দিয়াছে। এই সীমান্তের ইটিণ্ডাঘাট, টাকী, হাসনাবাদ, রামেশ্বরপুর, কাটাখালি, হিঙ্গলগঞ্জ এবং অন্যান্য জায়গায় পুলিস দল লোকেরা জাগিয়া আছে কি না টহল দিয়া দেখে, এবং অন্য দিকে যথানিয়মে মাল পাকিস্থানের পারে চলিয়া যায়।

"যাঁহারা এদিককার অবস্থা জানেন ও ব্যবসায়ীরাও বলিয়া থাকেন যে, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জে খরিদ্দারের অভাব। যে হিঙ্গলগঞ্জে রবিবার ও বিশেষ করিয়া বৃহস্পতিবারের হাট ঘুরিতে গেলে লোকের ভীড়ে অনবরত গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগিত, সেই হিঙ্গলগঞ্জে আজ সমস্ত হাটটাই লোকাভাবে খাঁ খাঁ করিয়া থাকে। এই সব বিশেষ জায়গায় যে মাল যায়, হাটবারেও যখন খরিদ্দারের ভীড় থাকে না, তখন ঐ সব প্রচুর পরিমাণ মালের কি হয়, তাহার কোনও প্রকার হদিশ্ গবর্ণমেণ্ট সরাসরি রাখেন কি ?···মিলিত দলটির ষড়যন্ত্রের জন্য 'সৎ-ব্যবসায়ীরা' কিছুই করিতে পারিতেছে না। ভাল লোকও ইচ্ছা থাকিলে বাহির হইতে পারে না, কেননা মাহেন্দ্রযোগ 'কারফিউ'।"

স্থানীয় সংবাদপত্র "সংগঠনী"'র গত ১৬ই কার্ত্তিকের সম্পাদকীয় মন্তব্যেও এই অভিযোগ সমর্থিত হইয়াছে : "গত কয়েক সংখ্যা 'সংগঠনী'তেই আমরা সুপারীর চোরাচালানের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছি। আমরা এই সকল ব্যাপার হইতে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, হাবড়া থানার এই অঞ্চলে (গোবরডাঙ্গা কিংবা মছলন্দপুর) অতিরিক্ত কাষ্টম তদন্তের স্থায়ী ব্যবস্থা না হইলে এইরূপ চোরাচালান ধরা আদৌ অসম্ভব। বর্ত্তমানে অধিকাংশ সরকারী কর্ম্মচারী, বিশেষ ভাবে কনষ্টেবল-দারোগারা ঘুষ গ্রহণ ছাড়া কোন কাজেই তেমন তৎপর নহে।"

ইহা এক কৌতুকে পরিণত হইয়াছে। "সৎলোক" সংঘবদ্ধ ভাবে কিছু করিতে গেলে পুলিসের গুলি খাইতে হয়; গবর্ণমেণ্ট পুলিসকে শাসনে রাখিতে পারিতেছেন না।

তন্তুবায় শ্রেণীকে হয়রান

বাঁকুড়ার "হিন্দুবাণী" পত্রিকায় ১৫ই কার্ত্তিকের সংখ্যায় একজন তন্তুবায় মহাশয়ের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সরবরাহ বিভাগের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিতেছি :

"মহাশয়, জনসংভরণ বিভাগের কি মাথা খারাপ হয়েছে ? লোককে অযথা হয়রান করাই ইহাদের কাজ ? কিছুদিন আগে তাঁতিদের লাইসেন্স বাহালোর (Renew) জন্য ১৲ টাকার ষ্ট্যাম্প জমা দিতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বহুদূর থেকে ১৲ টাকার ষ্ট্যাম্প জমা দিতে ১০ টাকা খরচ করে ষ্ট্যাম্প জমা দিয়ে ফিরে বাড়ী পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম পেলাম, এক টাকায় চলবে না, পাঁচ টাকার ষ্ট্যাম্প জমা দাও। সুতরাং আবার ৪৲ টাকার ষ্ট্যাম্প জমা দিতে খরচ করে আসতে হ'ল। আমরা গরীব লোক, খাটলে খেতে পাবো, না খাটলে বাঁধা মাহিনা তো আর কেউ দিবে না। তা আমাদের এই রকম ভাবে হয়রান করেই কি এরা দেশে কুটির-শিল্পের উন্নতি করবেন ?"

ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্ত

অল্প দিন পূর্ব্বে ভারতরাষ্ট্রপাল শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী আসামের রাজধানী শিলং নগরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শিলং মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যেসব সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার যথার্থ আশা করি আসামের মন্ত্রীমণ্ডলী

হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

"ভারতের সীমান্তের অধিবাসী হিসাবে আপনাদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। পূর্ব্বে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুশাসনের জন্য গবর্মেণ্টকে কেবল মাত্র ভারতের পশ্চিম সীমান্ত লইয়াই মাথা ঘামাইতে হইত, কেননা সর্ব্বদাই উহা উৎকণ্ঠার কারণ ছিল। কিন্তু এখন পূর্ব্ব সীমান্ত পশ্চিম সীমান্ত অপেক্ষাও অধিকতর উৎকণ্ঠার কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

"চীনে কি ঘটিয়াছে আপনারা তাহা জানেন। এক প্রকার বিনা যুদ্ধেই একটি নূতন গবর্মেণ্ট চীন দখল করিয়া লইয়াছে। ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও বিশেষ সঙ্কটময় এবং শৃঙ্খলা স্থাপন ও শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য গবর্মেণ্টকে বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে। শ্যাম ও মধ্যবর্ত্তী অন্যান্য দেশগুলি কিরূপ শক্তিশালী তাহা আমার ন্যায় আপনারাও বেশ ভাল ভাবেই জানেন। সুতরাং এই অবস্থায় আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী না হই, আমরা যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিচার-বিমূঢ়তা মুক্ত হইতে না পারি তাহা হইলে বিদেশীদের নির্দ্দেশে পরিচালিত বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সহজেই আমাদিগকে আক্রমণ করার সুযোগ পাইবে।

"রাষ্ট্রের অভ্যন্তরভাগের অধিবাসীরা সময় সময় কলহে মাতিলে উহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। কিন্তু সীমান্তে ঐরূপ কলহ মোটেই যুক্তিসঙ্গত নহে। ঐক্য রক্ষার জন্য আপনাদিগকে সর্ব্বদাই বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। আমরা যদি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য না করি এবং উহাকে দিনের পর দিন অধিকতর শক্তিশালী করিয়া না তুলি তবে কোন সীমান্তই নিজেকে নিরাপদ মনে করিতে পারে না। আমরা যদি ভারত সরকারকে শক্তিশালী করিয়া না তুলি এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ না হই তবে আমাদের চারিপাশে যে বিরাট বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হইতেছে আমরা কিছুতেই তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিব না।"

আসাম প্রদেশ সংহত, ঐক্যবদ্ধ নয়। ২৫ লক্ষ আদিম জাতি, ২৫।২৬ লক্ষ আহোম-ভাষাভাষী ও ২৪।২৫ লক্ষ বাংলা ভাষাভাষী লোকসমষ্টি আসামে বাস করিতেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা ইহাদের এক-তৃতীয়াংশের মতানুসারে পরিচালিত হইতেছে। ২৫ লক্ষ আদিমজাতি নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত, তাঁহারা নানা ভাষায় কথা বলেন। ২৪।২৫ লক্ষ বাঙালীকে "বিদেশী" বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে। আসামের গবর্ণর পরলোকগত আকবর হায়দারী দুই বৎসর পূর্ব্বে আসাম ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশন উপলক্ষে এই শব্দটিই বাঙালীর প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন; আসামের মন্ত্রীমণ্ডলীর সম্মতি না থাকিলে তিনি এই বাক্য ব্যবহার করিতে সাহস পাইতেন না।

এই অবস্থায় আসামের মন্ত্রীসভা "সীমান্তের অধিবাসী হিসাবে" তাঁহাদের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে "সচেতন" এই কথার ব্যবহার তর্কের বিষয় হইয়া পড়ে। ভারতরাষ্ট্রপাল ও তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডলী যদি ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্ব সীমান্তের ঐক্যবিধান সম্বন্ধে সজাগ থাকিতেন তবে বর্ত্তমান জটিলতা বৃদ্ধি পাইত না। আজ যে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার দাপটে ভারতের ঐক্যের কল্পনা খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে তাহা তাঁহারা বাধা দিতে পারেন নাই। শ্রীগোপীনাথ বড়দলৈয়ের মন্ত্রীসভা গণ-ভোটের সময়ে শ্রীহট্ট জেলাকে বিসর্জ্জন দিয়াও নিরুদ্বেগে রাষ্ট্র শাসন করিতেছেন; যেসব শ্রীহট্টবাসী রাজকর্ম্মচারী ভারতরাষ্ট্রকে সেবা করিবার দায় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের বঞ্চনা করিয়াও পার পাইয়া গেলেন; আসামের বাঙালী বসতি অঞ্চল হইতে "পাকিস্থানীরা" খণ্ড খণ্ড স্থান ছিনাইয়া লইতেছে; এই মন্ত্রীমণ্ডলী তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। এখন প্রশ্রয় পাইয়া যদি ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্বাঞ্চলকে তাঁহারা আরও বিপন্ন করেন তবে সেই সংবাদে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইব না। আপনি মজিয়া লঙ্কা মজাইয়াছিল রাবণ; রামায়ণের সেই সাবধানবাণী বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উচ্চারিত হইতেছে।

ইস্‌লামিস্থান

"পাকিস্থানের" মোসলেম লীগ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি চৌধুরী খালিকোজ্জমান মোসলেম জাহানে ঘুরিয়া আসিয়াছেন। পৃথিবীব্যাপী মোসলেম দেশসমূহের শক্তি-সামর্থ্য সংগঠিত করিবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সকল দেশেই নাকি অনুভূত হইয়াছে; অথচ দেখিতেছি যে, কায়েদে-আজম জিন্না-প্রতিষ্ঠিত "ডন" পত্রিকা (করাচী ও লাহোরের "পাকিস্থান টাইমস্‌ও" এই কল্পনার ঘোর বিরোধী) এবং ভারতরাষ্ট্রের সংবাদপত্রসমূহ এই কল্পনাকে হাসি-ঠাট্টা করিয়া নস্যাৎ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। পাকিস্থানী সংবাদপত্রের বিরোধিতা ও আমাদের সংবাদপত্রের হাসি-ঠাট্টার প্রেরণা এক হইতে পারে না। তবুও এইরূপ একাত্মতা কৌতুকজনক।

আমরা কিন্তু এরূপ কল্পনার মধ্যে একটা ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ইঙ্গিত দেখিতেছি। ইস্‌লামপন্থীদের এই কল্পনা সভ-প্রসূত নয়। প্রত্যেক জাতি, সমাজ এরূপ একতার কল্পনা করিয়া থাকে। মানব-সমাজের আদি হইতে বাস্তব অবস্থার আঘাতে, মানব প্রকৃতির সঙ্কীর্ণতার আঘাতে তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে "রাজচক্রবর্ত্তীর"

কথা শুনিয়াছি—যাঁহারা সমস্ত হিন্দুপন্থী ও বৌদ্ধপন্থীকে সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। খ্রীষ্টান যুগে বিশ্বব্যাপী সঙ্ঘের (Universal Church) কথা শুনিয়াছি; তাহা কল্পনা ও কথারই পর্য্যবসিত হইয়াছে। "বিশ্ব-নবীর" শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গের মনেও এরূপ কল্পনা জাগিয়াছিল; ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন তুরস্কের সাম্রাজ্যে ঘুণ ধরিয়াছিল তখন সুলতান আব্দুল হামিদ এই ইস্‌লামিস্থানের বার্ত্তা প্রচার করেন। তাহার পরিণতি কি হইয়াছে তাহা আমাদের অনেকে দেখিতে পাইয়াছি।

চৌধুরী খালিকোজ্জমানের চেষ্টা অনুরূপ ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি হইবে কি? ভবিষ্যৎ তাহা স্থির করিবে। "ডন" ও "পাকিস্থান টাইম্‌সের" আপত্তি মনে হয় এই কল্পনার বিরুদ্ধে নয়; এই দুই পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় বর্ত্তমানে এরূপ কল্পনার সার্থকতা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তাঁহারা প্রশ্ন তুলিয়াছেন—এই যুগসন্ধির সময়ে কে এই "ইস্‌লামিস্থানকে" রক্ষা করিবে? কোনও মোস্‌লেম রাষ্ট্রের সে শক্তি নাই; সমগ্র মোস্‌লেম জগতেরও সে সঙ্ঘবদ্ধতা নাই। বর্ত্তমানে এরূপ চেষ্টা করিলে হয় মার্কিন নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর আশ্রয় স্বীকার করিতে হইবে, না হয় সোভিয়েট রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর তাঁবেদার হইতে হইবে। এর কোন অবস্থাই সম্মানের নয়। এই আপত্তির সপক্ষে যুক্তি যে নাই, তাহা নয়। কিন্তু হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার ইহা নয়। করাচীতে অনুষ্ঠিত ইস্‌লামী অর্থনৈতিক সম্মেলন এইরূপ প্রচেষ্টার পরিপোষক। রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য তার একটা আছে; বিলাতের "ডেলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকা সেই কথা ভাবিয়াই বিচলিত হইয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে এই সম্ভাবনার প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে।

যুক্তপ্রদেশের সর্ব্বার্থক উন্নতি

ডিসেম্বর মাসের "মডার্ণ রিভিয়ু" পত্রিকায় শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় যুক্তপ্রদেশে সর্ব্বার্থক উন্নতিকল্পে যেসব প্রচেষ্টা চলিতেছে তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রত্যেক ভারতবাসীকে তাহা পাঠ করিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি। আমলাতন্ত্রের লাল-ফিতার প্রতি প্রীতি ও অপরাপর যে বাধা ভারতরাষ্ট্রের উন্নতির পথে দাঁড়াইয়া আছে তাহা লক্ষ্ণৌ নগরীতেও অভাব নাই; কংগ্রেসী নেতৃবর্গের ক্ষমতার প্রতি লোভ যুক্তপ্রদেশেও বিদ্যমান। তবুও সেই প্রদেশে যেসব উন্নতির কথা সতীশবাবু বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া স্বতঃই মনে প্রশ্ন উঠে—আমাদের এই প্রদেশে তাহা সম্ভব হয় নাই কেন? সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে সতীশবাবুর প্রবন্ধের আলোচনা হইতে দূরে চলিয়া যাইতে হইবে বলিয়া বর্ত্তমানে সেই চেষ্টা হইতে বিরত রহিলাম।

যুক্তপ্রদেশের কুটির-শিল্পের উন্নতি ও প্রসার করিবার জন্য যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাই সতীশবাবুর প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একজন স্বতন্ত্র ডিরেক্টর আছেন; তিনি বাঙালী; তাঁহার নাম বি. কে. ঘোষাল। প্রদেশের লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ; তাহাদের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক মাত্র "মহাযন্ত্র" পরিচালিত শিল্প প্রভৃতিতে নিযুক্ত; বাকী লোক পল্লীগ্রামের উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক কুটির-শিল্পের সেবায় নিযুক্ত আছেন; তাঁহারা বৎসরে প্রায় ১৭০ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করেন। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীকেশবদেব মালবীয় বলিতেছেন যে, আরও ৪০ লক্ষ লোককে পুরাতন ও নূতন কুটির-শিল্পে ব্যাপৃত রাখিতে হইবে।

এই আদর্শের অনুরূপ চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁত-শিল্পে; তুলা, রেশম ও পশম বুনিয়া গ্রাম্য তাঁতিরা বৎসরে প্রায় ৬০ কোটি টাকার বস্ত্রাদি প্রস্তুত করেন। সমস্ত কুটির-শিল্পাদির উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশের উপর এই মাজাতার আমলের একটি যন্ত্রে উৎপাদিত হয়। মন্ত্রী মহাশয় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট "মহাযন্ত্রের" মোহে আমাদের কুটির-শিল্পগুলিকে বিমাতার মত ব্যবহার করেন। মিলের রাক্ষুসী ক্ষুধা হইতে কুটির-শিল্পকে বাঁচাইবার কোন চেষ্টা এখনও হইতেছে না। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি এই অবস্থাটা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রায় ৫ সের ওজনের মিলের সূতায় মিলে প্রস্তুত ৩৮ গজ মার্কিন মাল বাজারে বিক্রয় হয় ২১৲ টাকায়; তাঁতিকেও সেই পরিমাণ মিলের সূতা কিনিতে হয় ২১৲ টাকায়। সুতরাং অসম প্রতিযোগিতায় সে হটিয়া যাইতেছে। এরূপ প্রতিযোগিতায় দাপটে তাঁতি কি করিয়া টিকিয়া আছে সে এক রহস্য। কিন্তু যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলীও নিরুৎসাহ হন নাই; তাঁত শিল্পের উৎপাদন বৎসরে ১০০ কোটি টাকা মূল্যের হউক, এই চেষ্টাই তাঁহারা করিতেছেন।

খাদি-উৎপাদনেও যুক্তপ্রদেশ আগাইয়া যাইতেছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ টাকা, ১৯৪৮-৪৯ সালে তাহা বাড়াইয়া দেওয়া হয় ৯ লক্ষে। প্রায় ১,৫০০ গ্রামে এই অর্থপুষ্ট খাদি কার্য্য চলিতেছে; প্রায় ১৫,০০০ কাটুনি শিক্ষালাভ করিয়াছে বা করিতেছে; নানা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে; তাহাদের সংখ্যা ৫২; তাহাদের সাহায্যের পরিমাণ ৬,১২,৮৭০ টাকা, তাহাদের বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ২২ লক্ষ বর্গ গজ; তাহার মূল্য প্রায় সাড়ে একুশ লক্ষ টাকা। খাদি শিল্পে কুশলীর সংখ্যা ১০০৭ জন।

আকের রস হইতে যে বিরাট উপার্জ্জনের পথ এই প্রদেশের লোকসমষ্টির সম্মুখে দেখা দিয়াছে তাহাও

লোভনীয়। কলের উৎপাদনে শতকরা সাড়ে সতের ভাগ মাত্র ব্যবহৃত হয়; শতকরা ৬৫ ভাগে গুড় উৎপাদিত হয়। এই গৃহশিল্পের উৎপাদনের মূল্য প্রায় ৭২ কোটি টাকা। তাল গাছের রস হইতে গুড় উৎপাদন এই প্রদেশে একটা নূতন শিল্প। ১৯৪৮ সালে ইহার প্রসারকল্পে সরকারী চেষ্টা আরম্ভ হয়। আশা করা যায় যে, প্রায় লক্ষ লোক এই শিল্পের প্রসাদে জীবিকা উপার্জ্জনের নূতন পথ পাইবে। এই শিল্পের উৎপাদনের মূল্য হইবে প্রায় আড়াই কোটি টাকা। পশ্চিম-বঙ্গ ও মাদ্রাজ তালের গুড় শিল্পের আদি স্থান। এই শিল্পের বিস্তারে আমাদের প্রদেশেও সরকারী চেষ্টা চলিতেছে।

সরিষার তেলের উৎপাদন যুক্তপ্রদেশের আর একটি প্রধান শিল্প। কলে উৎপন্ন হয় সাড়ে সতর মণ তেল; ঘানিতে উৎপন্ন হয় ৬০ লক্ষ মণ। ঘানির সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০ হাজার; তাহা বাড়াইয়া দেড় লক্ষ করিবার কল্পনা চলিতেছে। সরিষার বীজের উৎপাদন প্রায় সওয়া দুই কোটি মণ, তাহার মূল্য সাড়ে একত্রিশ কোটি টাকা। কলিকাতার তেল কল বসিয়া আছে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের সরিষার দিকে চাহিয়া। তাহাদের পরিচালকবৃন্দের না আছে সরিষার বীজ সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার চেষ্টা, না আছে এই প্রদেশের সরকারের এই শিল্প সম্বন্ধে কোন চিন্তা; সকলেই ঘুমাইয়া আছেন।

চামড়া শিল্পে কলই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। তাহাদের উৎপাদনের মূল্য প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। কুটির-শিল্পীর প্রস্তুত চামড়ার মূল্য ১০ কোটি টাকা।

প্রায় আড়াই লক্ষ কুমোর তাহাদের পৈত্রিক ব্যবসায় চালাইতেছে। তাহাদের উৎপাদনের মূল্য সাড়ে সাত কোটি টাকার উপর। সমবায় পদ্ধতিতে ইহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। সরকারী অনুপ্রেরণায় কুমোরদের উন্নতির আভাস দেখা যাইতেছে। এই শিল্পের পরিপুষ্টি করিতে পারে "চীনামাটির বাসন" শিল্প। কলিকাতায় এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। গৃহ-শিল্পরূপে ইহার সম্ভাবনার কথা পরীক্ষা সাপেক্ষ। পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের সংগঠন করিবার জন্য শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তকে যখন ডাকা হয়, তখন তিনি এই বিষয়ে একটা পরিকল্পনার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার সাহায্য প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, এবং এই সম্ভাবনাও অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়াছে।

ভারতরাষ্ট্রের দিকে দিকে নবজাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। সতীশবাবুর প্রবন্ধ তাহার একটা প্রমাণ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ঘুমাইয়া আছে।

চীনের কম্যুনিষ্ট গবর্ন্মেণ্ট

চীনের কম্যুনিষ্ট গবর্ন্মেণ্টকে "জাতে তুলিয়া" লইবার জন্য নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানগণ শিহরিয়া উঠিতে-ছেন; তার পররাষ্ট্রসচিব ডিন একিসন ত বলিয়া বসিয়াছেন যে মাও সে তুং-এর গবর্ন্মেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইবার আলোচনার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। অপরদিকে কিন্তু এশিয়ার অনেক দেশই তাহাকে স্বীকার করিয়া লইবার পক্ষপাতী। ভারতরাষ্ট্রের প্রধান ও পররাষ্ট্র-মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বলিতেছেন বাস্তবকে আর কতদিন ঠেকাইয়া রাখা যাইবে।

ব্রিটেন নাকি অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন স্বীকার করিয়া লইবার জন্য; তাঁহার নাগরিকবর্গের ৪০০ কোটি টাকার মূল-ধন চীনের নানা ব্যবসায়-বাণিজ্যে খাটিতেছে; মার্কিনের মাত্র ১০০ কোটি টাকা। কিন্তু আমরা মনে করি যে, টাকা-পয়সার হিসাবই এই ব্যাপারের একমাত্র প্রতিবন্ধক নয়। মার্কিন রাষ্ট্র চিয়াং কাই-শেক গবর্ন্মেণ্টের জন্য ৩০০।৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে।

এখন মাও সে তুং-এর পিছনে আছেন ষ্টালিন; ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, চীনের কম্যুনিষ্ট নেতা ষ্টালিনের নির্দ্দেশে চলিতে বাধ্য এবং যতদিন ট্রুম্যান-ষ্টালিন ঠেলাঠেলি চলিবে ততদিন পশ্চিম ইউরোপে যেমন পূর্ব্ব-এশিয়ায়ও তেমনই শান্তি আসিতে পারে না।

ব্রিটেন মার্কিন দেশের হাতধরা। এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাওয়াও সহজ নয়। পৌষ মাসে কলম্বো নগরীতে যে রাষ্ট্রমণ্ডলীর সম্মেলন হইবে ধার্য্য হইয়াছে, সেই সময় মার্কিনের উক্ত ও অনুক্ত নির্দ্দেশ বুঝিয়া এই বিষয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া সম্ভব। সমস্যা কঠিন সন্দেহ নাই। নিরপেক্ষতার পথে এশিয়া কতদূর যাইতে পারে ইহাই দ্রষ্টব্য।

"আশার কিরণ"

৪ঠা অগ্রহায়ণ (২০শে নভেম্বর) তারিখের বাংলা "হরিজন" পত্রিকায় কাকা কালেলকরের গঠনমূলক কার্য্যের একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের পাঠকবর্গের নিকট তাহা উপস্থিত করিতেছি:

> কোন কারণ নাই, কোনই উদ্দেশ্য নাই, অথচ লোকেরা গোটা দেশটাকে হতাশার এক মরুভূমি করিয়া তুলিয়াছে। এই মরুভূমিতেও এখানে সেখানে দুই-একটি মরূদ্যান আছে। গান্ধীগ্রাম সেগুলির অন্যতম।...
>
> ৭ই অক্টোবর গান্ধীগ্রামের দ্বিতীয় বার্ষিকী ছিল। বন্ধুবর শ্রী জি. রামচন্দ্রন ঐ দিন গান্ধীগ্রামে যাইবার জন্য আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমি খুশী হইয়া তাহাতে রাজি হই। শ্রীরামচন্দ্রনের স্ত্রী ডাক্তার সৌন্দরম্ গান্ধীগ্রামের উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। আমি তাহা জানিতাম। কিন্তু সে কাজ যে কিরূপ ও কতখানি তাহার কোন ধারণাই আমার ছিল না...

গান্ধীগ্রামের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে পাহাড়। মধ্যে গান্ধীগ্রাম স্বাস্থ্যকর কবিত্বময় জায়গা। ডিন্ডিগল ও মাদুরার মধ্যে আম্বাথুরাই নামে রাস্তার ধারের একটি ষ্টেশনের নিকটে এই গ্রাম।

এই কেন্দ্রে বুনিয়াদি শিক্ষা—কস্তুরবা কাজ সমগ্র গ্রাম-সেবা, সকল কাজই করা হয়। এখানে যেসকল কাজ করা হয় তাহার মধ্যে প্রসূতি-আগার, খাদির কাজ, চাষ, কুষ্ঠরোগীদের সম্মতি লইয়া তাহাদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা, বহুমুখী সমবায় সমিতি, এইগুলিই প্রধান। আমার সব চাইতে ইহাই ভাল লাগিল যে, এখানকার কর্ম্মীরা নিজেদের কাজ ভাল করিয়া শিখিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিজস্ব নিষ্ঠা, সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান লইয়া তাঁহারা অন্যদের শিখাইতেছেন। দুই বৎসরের মত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা যে ফল লাভ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা কেবল নিজেদের জেলা হইতেই কয়েক লক্ষ টাকা তুলিয়াছেন। মাদ্রাজ গবর্ন্মেণ্ট ইঁহাদের কাজের সারবত্তা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইঁহারা গ্রামোন্নয়নের যে সকল পরিকল্পনা করিয়াছেন, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই কেন্দ্রের মারফত সেগুলি কাজে পরিণত করার চেষ্টা করিতেছেন এবং ইহাকে বাড়াইবার উদ্দেশ্যে জমি সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। সব চাইতে আশার কথা হইল ইহাই যে, গান্ধীগ্রাম গ্রামবাসিগণের ঔদাসীন্য ভাঙ্গিয়া দিতে পারিয়াছে এবং তাহাদের মনে উৎসাহ ও আশার সঞ্চার করিতে পারিয়াছে।

গ্রামে যাঁহারা কাজ করিতে চান, আমি চাই, তাঁহারা এই প্রতিষ্ঠান যেন দেখিয়া যান। চারি দিকের হতাশাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও এক লক্ষ্য, মন ও নিষ্ঠা লইয়া যে কি কাজ করিয়া তোলা যায় তাহা তাঁহারা যেন নিজেদের চোখে দেখিয়া যান। গান্ধীগ্রাম প্রধানতঃ মেয়েদের প্রতিষ্ঠান, কিন্তু নর, নারী ও শিশুদের সমান ভাবে সেবা করা ইঁহাদের সংকল্প।

"দেশী খেলা"

কলিকাতার প্রায় অপর পারে বালিগ্রাম বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান করিয়া লইয়াছে। সেই গ্রামের মাসিকপত্র "সাধারণী" একটা প্রশ্ন করিয়াছেন; তাহার উত্তর দেশকে দিতে হইবে। "দেশ স্বাধীন হইয়াছে, কেন আমরা দেশী খেলা আরও বেশী করে খেলব না?" এই ভাবে ভাবুক হইয়াই পত্রিকাখানি বালির "বাচ্" খেলার বিবরণ দিয়াছিলেন। তার পর অন্য একটি খেলার নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন:

"আমাদের গ্রামে দেশী খেলার মধ্যে কপাটীরই সব চেয়ে প্রচলন। বালিতে সাধারণতঃ এই কয়টি সমিতি নিয়মিত-ভাবে কপাটি খেলে—সরস্বতী ব্যায়াম সমিতি, মারুতি ব্যায়াম বিদ্যালয়, বালি বারাকপুর সমিতি, দক্ষিণপাড়া সম্মিলনী, কল্যাণেশ্বর সম্মিলনী, দেশবন্ধু স্মৃতিসঙ্ঘ, যুবক সমিতি, বাল্য সমিতি, বালি ইউনিয়ন ক্লাব প্রভৃতি। বালির দলগুলি কলিকাতা, আলমবাজার (কুটিঘাট), বালি, উত্তরপাড়া, বেলুড়, চন্দননগর, গোঁদলপাড়া ইত্যাদি জায়গায় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে বালির সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। বালির যে সমস্ত সঙ্ঘ নিয়মিত কপাটি খেলে তারা প্রায় প্রত্যেকেই এক বা দুইটি প্রতিযোগিতা চালায়। এর ফলে গ্রামের ছেলেদের মধ্যে উৎসাহ বাড়ে। প্রতি-যোগিতার পরিচালকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ এই যে, তাঁরা যেন নিয়মিত অনুশীলনের দিকে ঝোঁক দেন। তা হলে আগামী আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় বালি থেকে আরও বেশী প্রতিযোগী নির্ব্বাচিত হবার আশা করা যাবে। কপাটি খেলার উপযুক্ত সময় শীতকাল। তাই এখন থেকে তার তোড়জোড় রীতিমত সুরু হওয়া দরকার।"

এই বিষয়ে একটা প্রশ্ন করিতে চাই। সব খেলারই অন্যতম উদ্দেশ্য সঙ্ঘ-শক্তির আয়োজন ও বৃদ্ধি। বর্ত্তমানে যে ভাবে এই প্রদেশে তাহা চলিতেছে, তাহার ফলে এই উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হয়?

বাঁশ বনাম লৌহ

"নাই নাই" করিয়া সব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসই অতলে ডুবিয়া যাইতেছে। রাষ্ট্রপরিচালকগণ নিঃসহায়ে এই তিরো-ধান উৎসব দেখিয়া যাইতেছেন। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, লৌহ নাই—কথা শুনিয়া শুনিয়া দেশের লোকের মনে একটা নিরাশার ভাব জমাট হইয়া বসিয়া যাইতেছে।

কৃষকের জীবনে লৌহের প্রয়োজন চাষের লাঙ্গল ও অন্য কৃষিযন্ত্রের জন্য। তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২২শে অগ্রহায়ণে প্রকাশিত বিবৃতিতে দেখিতেছি, "এই প্রদেশের নির্দ্ধারিত পরিমাণের শতকরা ৫০ ভাগ লৌহ ও ইস্পাত চাষীদের জন্য বর্ত্তমানে সংরক্ষিত আছে।" অথচ সরবরাহ মন্ত্রী মহাশয় শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, বর্দ্ধমান কালনা-কাটোয়া সাব-ডিভিসনের ৬ বর্গমাইল বিস্তৃতির মধ্যে কামাররা লৌহের অভাবে অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীর মুখে এই কথা শোনা গিয়াছে।

লৌহের অন্য ব্যবহারও আছে; ঘরদরজা প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনে নানা রকমে লৌহের ব্যবহার হয়। সেই প্রয়োজন

মিটাইবার অন্য একটা ব্যবস্থার কথা মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুর হইতে শুনিতে পাইয়া একটু আশ্বস্ত হইলাম। স্থপতিরা ও বিজ্ঞানসেবকেরা ইহার অনুসন্ধানে নাকি সকলকাম হইয়াছেন। শ্রী টি. এন্. বসু তাঁহাদের একজন। বিবরণ পড়িয়া মনে হয় যে, তিনি সিঙ্গাপুরে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন; নেতাজীর সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। বর্ত্তমানে তিনি হিন্দুস্থান কন্‌ষ্ট্রাকশন কোম্পানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই কোম্পানী মধ্যপ্রদেশের সরকারের আদেশে তাঁহাদের কর্ম্মচারীবৃন্দের ব্যবহারের জন্য প্রায় ২০০টি বাসাবাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছেন। ১৯২৭ সালে সিঙ্গাপুরে তিনি বাঁশের উপর সিমেণ্ট চড়াইয়া একটি ছাদ নির্ম্মাণ করেন। জাপানে ও চীনদেশে ইহার পরীক্ষা করিয়া তিনি বুঝিয়াছেন যে, ছাদে সিমেণ্ট ধরিয়া রাখিবার জন্য লৌহের ব্যবহার আরও কম করা যায়। নাগপুরে তাহার ব্যাপক পরীক্ষা হইয়া যাইবে।

ভারত-সরকার জার্ম্মান ইঞ্জিনিয়ার আনাইতেছেন আমাদের কলকারখানায় গৃহনির্ম্মাণের জন্য; কোটি টাকা ব্যয়ে তার কারখানা হইবে। এই সময়ে এই আবিষ্কার সময়োচিত হইয়াছে। বাঁশ এখনও আমাদের দেশ হইতে উধাও হইয়া যায় নাই। বাঁশ-ছনের ঘর পঞ্চাশ-ষাট বৎসর টিকিয়া থাকিতে আমরাও দেখিয়াছি। বসু মহাশয় বলিতেছেন বাঁশের আশ্রয়ে সিমেণ্টের ঘর ১০০ বৎসর টিকিবে। তাঁহার এই কল্পনার সাফল্য আমরা কামনা করি।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্ম্মল আনন্দ দান একটা পুণ্য কর্ম্ম; এই আনন্দপ্রকাশ উপলক্ষে অনেক সময় চোখের জলও উপচিয়া পড়ে। কেদারনাথ আমাদের নির্ম্মল আনন্দ দিয়াছেন তাঁহার লেখার মাধ্যমে; বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন-কথা কহিতে অনেক সময় চোখের জল ফেলিয়াছেন। আজ এই আনন্দের প্রস্রবণ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি ৮৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার কন্যা-জামাতা দৌহিত্রকে আমাদের সহানুভূতি জানাইতেছি।

বাংলা-সাহিত্যের দিকপাল এই লোকটির আশা-আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত সরল ও সহজ ছিল। তিনি সেই কথাই দুই বৎসর পূর্ব্বে শুনাইয়াছিলেন তাঁহার ৮৬তম জন্মতিথি উপলক্ষে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখের দিন-পঞ্জীতে তাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে তাহা লোকগোচর করেন।

"এ-জীবনে দুটি কথা ছিল এ দীনের মনে
শ্রীরামকৃষ্ণের-দর্শন লাভ, বন্ধুত্ব লাভ রবীন্দ্রের
পেয়েছি তা। আর কি আছে? ভাবিনিও এ-জীবনে;
আজ দেখি অকস্মাৎ কোথাও পেলাম তৃতীয়ের—
ছিল যাহা আশাতীত স্বাধীনতা অবশেষে
অচিন্ত্য অভাবনীয়, তারো দেখা পেলাম আজ
এখন মোরে শ্রীপদে লও কৃপা করি রসরাজ
শেষ কথাটি ব'লে যাই স্বাধীন মোরা স্বাধীন দেশ।"

"রসরাজ" তাঁহার পদতলে কেদারনাথকে স্থান দিন।

বিনয়কুমার সরকার

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের দেহত্যাগে স্বদেশী যুগের স্মৃতিপূত আর একটি জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেল। "ডন" সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে গড়া যে সব শিক্ষার্থী দেশের জ্ঞানবিজ্ঞান বিস্তারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন দেশ-বিদেশে বিনয়কুমারই তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কীর্ত্তিমান। তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা ছিল অদম্য।

বর্ত্তমান যুগোপযোগী ভাব ও চিন্তাধারার সাধক ছিলেন তিনি এবং তাহার কষ্টিপাথরে নিজের দেশের সংস্কৃতির নানা প্রকাশকে তিনি যাচাই করিতেন। যেখানে তাহা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত, সেখানে তিনি তাহার প্রচারের জন্য দেশবিদেশে ঘুরিয়াছেন; যেখানে তাহা উত্তীর্ণ হয় নাই, সেখানে তাহার নিন্দা করিয়া লোকগঞ্জনা সহ্য করিবার সাহসও তাঁহার ছিল। সেইজন্যই দেখিতে পাই যে গান্ধীবাদ গ্রহণ করিতে অক্ষম হওয়ায়, তিনি স্বাধীনতালাভের পরেও যথোচিত সম্মান পান নাই।

বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন তিনি। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙালীকে বাস্তব অর্থনীতিতে হাত পাকাইবার কর্ত্তব্য নিজের প্রাণের অফুরন্ত উৎসাহে তিনি গ্রহণ করেন। বঙ্গভাষার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে তিনি একটা নিজস্ব রীতি প্রবর্ত্তন করেন।

নিরভিমানী, আত্মভোলা এই জ্ঞানযোগীর তিরোধানে আমরা আত্মীয়জন বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুক!

কুমারী জোসেফিন ম্যাক্‌লাউড্

পরমহংসদেবের জীবনকথায় রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর একটা বিশিষ্ট স্থান আছে; তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাণ্ডারী। স্বামী বিবেকানন্দের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার কার্য্যে কুমারী জোসেফিন ম্যাক্‌লাউডের অনুরূপ একটা স্থান আছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই মহীয়সী মহিলা ৯১ বৎসর বয়সে গত আশ্বিন মাসে তাঁহার প্রার্থিত লোকে চলিয়া গেলেন। ১৮৯৩ সালে স্বামীজী চিকাগো ধর্ম্মসভায় যোগদান করেন। ১৮৯৫ সালে কুমারী [illegible] সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। সেই অবধি ভারতবর্ষের সেবায়

কুমারী ম্যাক্‌লাউড্ মন-প্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজীর মন্ত্র-শিষ্যা ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু "ভারতকে ভালবাসো"—স্বামীজীর এই অনুজ্ঞা তিনি ব্রতের মতন পালন করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্বব্যাপী কর্ম্ম-প্রচেষ্টার তিনি একজন ধারক ছিলেন। এই কার্য্যের প্রয়োজনে রাজনীতি হইতে তিনি দূরে থাকিতেন; একবার মাত্র তার ব্যতিক্রম হয়। লার্ট লিটনের সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একটা রাজনৈতিক বোঝা-পড়ার চেষ্টায় কুমারী ম্যাকলাউডের হাত ছিল বলিয়া শুনিয়াছি। সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁহার ২৫ বৎসর পর ইংরেজের রাজ-ক্ষমতা ভারতবর্ষ হইতে অপসারণ করা হইয়াছে। কুমারী ম্যাক্‌লাউড্ সেই সংবাদ শুনিয়া গিয়াছেন। এই সংবাদে এই "ভারতগতপ্রাণা" নারীর মনে কি ভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়। সেই কথা মনে করিয়া তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

হেমেন্দ্রনাথ বক্‌সী

কলিকাতার প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ বক্‌সী ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজ যখন স্কুল ছিল তখন তিনি তাহার অধ্যাপক ছিলেন। সেই স্কুলের অধ্যক্ষ পদ লাভ করার সময় তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্সের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অবসর গ্রহণ করিয়াও তিনি ডাক্তারী শিক্ষার নানা বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হন নাই; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বেঙ্গল ষ্টেট ফেকাল্টির তিনি পরীক্ষক ছিলেন। এই পরোপকারী, অজাতশত্রু চিকিৎসকের তিরোধানে কলিকাতার সমাজ একজন প্রবীণ লোক হারাইল।

জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী

৮০ বৎসর বয়সে অধ্যাপক জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী পরলোকগমন করিয়াছেন। হুগলী কলেজে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন। তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সাহচর্য্য লাভ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হয়। তারপর জ্যোতিভূষণ কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৫ সালে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি শেষজীবন কৃষ্ণনগরে কাটাইয়াছিলেন। বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠান এই জ্ঞানবৃদ্ধের সাহায্য ও উপদেশ লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছে। তাঁহার তিরোধানে আমরা তাঁহার আত্মীয়জনের সঙ্গে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

সুরেন্দ্রকুমার বসু

নদীয়া কৃষ্ণনগরের একজন নাগরিক-প্রধানের তিরোধানে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। জীবনের সকলপ্রকার পারিবারিক কর্ত্তব্য প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া ৭৫ বৎসর বয়সে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণনগরের সরকারী উকিলরূপে ও মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতিরূপে তিনি জেলা ও শহরের উন্নতির চেষ্টায় অক্লান্ত কর্ম্মী ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই তিনি আইন ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

কর্ম্মজীবনে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তিনি লোকের উপকার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; পরলোকগত আজিজুল হকের উন্নতিই তাহার একটা প্রমাণ। রাজনীতি হইতে তিনি দূরে থাকিতেন; কিন্তু ঘটনার পরিবর্ত্তনে তাঁহাকে একবার হিন্দু মহাসভার সমর্থকরূপে বঙ্গীয় শাখার বাৎসরিক সভার আয়োজনে নিবিষ্ট হইতে হয়; সেই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

শিক্ষা-বিস্তারে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল, বিশেষ করিয়া ব্যবহারিক শিক্ষায়। তিনি স্থানীয় ডন বসকো বিদ্যালয়ের শিক্ষার একজন সমর্থক ছিলেন। জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় যখন কলিকাতা হইতে নারীশিক্ষা সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত "মহিলা শিল্প ভবন" ও শচীন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্প-বিদ্যালয় কৃষ্ণনগরে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন সুরেন্দ্রকুমার সংগঠক ও অভিভাবকরূপে তাহাদের সুব্যবস্থা করেন। "হিন্দু কল্যাণ প্রতিষ্ঠান" নামে একটি উচ্চ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সুপরিচালনা করিয়া গিয়াছেন।

যাঁহারা তাঁহার ব্যক্তিগত পুস্তকাগার দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা কিরূপ প্রবল ছিল; বিজ্ঞানের অত্যন্ত আধুনিক গতি পরিণতি সম্বন্ধে তাঁহার কৌতূহলের অন্ত ছিল না। আমাদের সমাজ হইতে এরূপ জ্ঞানসাধক ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যাইতেছেন।

নিবারণচন্দ্র পাল

ফরিদপুরের বিপ্লবী নিবারণচন্দ্র পাল দেহত্যাগ করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের বিপৎ-সঙ্কুল পথে ১৯ বৎসর বয়সে যে জীবনের কর্ত্তব্যধারা বহিতে আরম্ভ হয় ইংরেজ শাসনমুক্ত ভারতে ৬২ বৎসর বয়সে তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এই বিয়াল্লিশ বর্ষকাল শাসকবর্গের নির্যাতনে, কারাগারের মধ্যে প্রায় তাঁহার অর্দ্ধেক জীবন কাটিয়াছে। কারাগারের বাহিরে আসিয়াও তাঁহার না ছিল বিশ্রাম, না ছিল শান্তি। ১৯০৮ সালে অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করিয়া রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে পদার্পণ করিলেও গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে গণজাগরণের বিরাট সম্ভাবনা দেখিয়া, নিবারণচন্দ্র গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত প্রত্যেক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

বিপ্লবীর ভাগ্যে গার্হস্থ্য-জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্ভব হয় না ; নিবারণচন্দ্রের জীবনে ইহাই আবার প্রমাণিত হইয়াছে। শেষবয়সে তিনি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কাটাইয়াছেন ; তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যবুদ্ধির হাতে ন্যস্ত করিয়া তাঁহার প্রার্থিত লোকে চলিয়া গিয়াছেন।

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্কট

"রামকৃষ্ণ মিশন" কর্ত্তৃক পরিচালিত "নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের" সাহায্যার্থ রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক মহাশয় যে আবেদন জানাইতেছেন, তাহা এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল। অনেক হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবার এই বিদ্যালয়ের নিকট ঋণী। তাহা অপরিশোধ্য। যখন বিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্কটের কথা লোকগোচর হইয়াছে, তখন শত শত বাঙালী পরিবারের উচিত এই সঙ্কট মোচন করিয়া কথঞ্চিৎ ঋণমুক্ত হওয়া।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতে যে নবজাতীয়তা উদ্বেলিত হইয়া নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে, সেই মুক্তি স্নানের আয়োজনে নিবেদিতার অবদান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া আছে। বর্ত্তমানে আমাদের শিক্ষিত দেশবাসী সেই ইতিহাস পাঠ করেন না। সেইজন্য তাঁহারা মনে করেন যে, ভারতে নবজাতীয়তার জন্ম ১৯১৭ সালে। এই মোহের হাত হইতে তাঁহাদের মুক্ত করিতে হইলে চাই নিবেদিতার কর্ম্মগাথার বহুল প্রচার। সেই কর্ম্মগাথার মধ্যে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ; তাহার আদর্শের ও আকৃতির মাহাত্ম্য প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম্মকথা বুঝিতে পারিব।

নানা অবস্থার তাড়নায় আমাদের সমাজজীবন বিপন্ন। আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় থাকিয়াই আমাদের বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। নিবেদিতা জীবনে সেই মরণবিজয়ী দীক্ষা বাঙালীকে দিয়াছিলেন। গুরুদক্ষিণা দিবার দিন আবার আসিয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশন ভগিনী নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়ে সাহায্যের জন্য আবেদন

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "অশেষ জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির আকর ব্রহ্ম প্রত্যেক নরনারীর অভ্যন্তরে সুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন—সেই ব্রহ্মকে জাগরিত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।"

এই উদ্দেশ্যসাধনে কৃতসঙ্কল্পা ও ব্রতচারিণী, গুরুগতপ্রাণা, পরমবিদুষী ভগিনী নিবেদিতা সকলপ্রকার দুঃখদৈন্য স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া ভারতীয় নারীদের মধ্যে যথার্থ শিক্ষার বিস্তারকল্পে প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার পূত জীবনের অদৃষ্টপূর্ব্ব নিষ্ঠা, ত্যাগ ও তপস্যা প্রভাবে এই শিক্ষামন্দিরে যে শক্তি সঞ্চিত আছে তাহার পরিচয় গত পঞ্চাশৎ বর্ষের কার্য্য সাফল্যে পাওয়া যাইতেছে। বহুসংখ্যক বালিকা-জীবন উহার সহায়ে বিদ্যার পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। বহু অন্তঃপুরচারিণী মহিলা এই মন্দিরে প্রকৃত শিক্ষালাভে ধন্যা হইয়াছেন। দরিদ্রা কুলবধূ শিল্পাদি কার্য্য সহায়ে জীবিকা অর্জ্জনে ও সমাজের কল্যাণসাধনে সমর্থা হইয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে আট শত ছাত্রীর মধ্যে পাঁচ শতকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত মাত্র আকাশবৃত্তি অবলম্বনে নীরবে শত শত বালিকার সেবায় রত থাকিলেও অর্থাভাবে ১৯৪৭ সাল হইতে উচ্চ-শ্রেণীগুলিতে বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ বেতন (যদিও গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট বেতন অপেক্ষা কম) লইতে বাধ্য হইতেছেন। বলা বাহুল্য, ভগিনী নিবেদিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত ও গুরুকুলের আদর্শে পরিচালিত শিক্ষায়তনের পক্ষে শিক্ষার্থীর সহিত এরূপ আর্থিক সম্পর্ক অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যাহা হউক, এখনও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে ঐরূপ কোনও বেতন লওয়া হইতেছে না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে শিল্পবিভাগের বহু অনাথা দরিদ্রা নারীকে যথোচিত সাহায্য করা যাইতেছে না। এই সকল বিভাগকে সুচারুরূপে চালাইতে হইলে বৎসরে আরও অন্ততঃ ৬,০০০৲ টাকা প্রয়োজন ; বর্ত্তমানে যথাসম্ভব ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াও বৎসরে ৪,০০০৲ টাকা ঘাটতি থাকিয়া যাইতেছে।

সারদামন্দির ছাত্রী-আবাসে স্থানাভাব হেতু বহু ছাত্রীকেও স্থান দেওয়া যাইতেছে না। নিবেদিতা বিদ্যালয় গৃহটি সুন্দর কিন্তু অতি শীঘ্র গৃহছাদগুলির সম্পূর্ণ সংস্কার আবশ্যক। ইহাতে অন্যূন ২০,০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে। এতদ্ব্যতীত ছাত্রীসংখ্যা-বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যালয়ের কতক অংশ পৃথক স্থানে করা একান্ত প্রয়োজন। উহার জন্য জমি ক্রয় ও গৃহ নির্ম্মাণে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ের সম্ভাবনা। যাঁহারা বিগত শতকের শেষভাগ ও বর্ত্তমান শতকের প্রথমাংশের ভারতের ইতিহাসের সহিত পরিচিত তাঁহারা জানেন যে ভারতীয় সংস্কৃতি শিক্ষা চারুকলা ও রাষ্ট্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতার অবদান কিরূপ মহিমময়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিলে, ভগিনী নিবেদিতা উমার ন্যায় তপস্যা করিয়া ভারতের আত্মারূপ শিবকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, সেই মহিমময়ী নারীর প্রতি যাঁহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন তাঁহারা কি নিবেদিতার সর্ব্বপ্রধান সাধন-ক্ষেত্র ও একমাত্র স্মৃতিমন্দিরের রক্ষাকল্পে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন না ?

স্বাক্ষরকারীর নিকট বা নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সম্পাদিকার নিকট (৫নং নিবেদিতা লেন, কলিকাতা) সাহায্য পাঠাইলে উহা ধন্যবাদ সহকারে গৃহীত হইবে।

(স্বাঃ) স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক।

ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার দুইটি অধ্যায়

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

"শ্বেতকায় বৈদেশিক আর্যজাতির ভারতবর্ষ আক্রমণ" (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৫২) নামক প্রবন্ধ লইয়া আরম্ভ করিয়া প্রবাসীর পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক ভাবে যে সকল প্রবন্ধ চার বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, ইতিপূর্বের প্রবন্ধটি (সিন্ধু সভ্যতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৬) সেই সিরিজের শেষ প্রবন্ধ। আঠারোটি প্রবন্ধে যে সকল কথা এত দিন ধরিয়া বলা হইয়াছে তাহার মূল সূত্রগুলি গুছাইয়া পাঠকের নিকট ধরিবার প্রয়োজন আছে।

প্রবন্ধগুলিতে ভারতবর্ষের দুইটি প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা, সিন্ধু ও বৈদিক সভ্যতাকে, ভারতবর্ষীয়ের ও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আরও বিশদ করিয়া বলিলে, সিন্ধু কৃষ্টি ও বৈদিক কৃষ্টির উৎপত্তি ও বিকাশ কোন্ গোষ্ঠীর জাতির দ্বারা হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের বর্তমান অধিবাসীদিগের সহিত তাহাদের কি প্রকার সম্বন্ধ সাহিত্যিক, পুরাতাত্ত্বিক ও নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক প্রমাণের আলোচনা করিয়া তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা প্রবন্ধগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। যে সকল তথ্য ও প্রমাণ আলোচনাসূত্রে উল্লেখ ও ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশ নূতন নহে, অজ্ঞাতও নহে, তবু সেগুলি কেন উপেক্ষিত হইয়াছে তাহার উত্তর পাঠক নিজে দিবার চেষ্টা করিবেন। এই সকল তথ্য ও প্রমাণের সাহায্যে যে সকল সিদ্ধান্তে আসা হইয়াছে তাহা কত দূর সঙ্গত ও বিচারসহ তাহা পণ্ডিতসমাজ স্থির করিবেন। এখানে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, প্রবন্ধগুলিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা পুনঃপুনঃ বলিবার প্রয়োজন আছে। সমগ্র আলোচনার ধারাটি যাহাতে সহজে দৃষ্টিতে পড়ে এজন্য এখানে প্রত্যেকটি প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য পর পর বলিয়া দেওয়া হইতেছে। যুক্তিতর্কের বিবরণ যাঁহারা চাহেন তাঁহারা মূল প্রবন্ধগুলি দেখিবেন। বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম অংশে এই ভাবে বক্তব্য বিষয়গুলির চুম্বক দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশে ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক কৃষ্টির দুইটি অধ্যায়ের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে দুই-চারিটি কথা বলা হইয়াছে।

১

প্রবন্ধগুলিকে দুইটি সিরিজে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম সিরিজের এগারোটি প্রবন্ধে বৈদিক ও আবেস্তিক কৃষ্টি এবং বৈদিক ও ইরাণী আর্যজাতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রথম প্রবন্ধে (শ্বেতকায় বৈদেশিক আর্যজাতির ভারত আক্রমণ—প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৫২) এক শ্বেতকায় বৈদেশিক আর্য জাতি কোন এক সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দাস ও দস্যু নামে অভিহিত অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য আদিবাসীদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া এদেশে আপনাদের রাজনৈতিক প্রভাব ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত ও এদেশে গৃহীত এই মতবাদের আলোচনাক্রমে বলা হইয়াছে যে, ইহার সপক্ষে পুরাতত্ত্বের ও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের কোন প্রমাণিত তথ্য উপস্থিত করা হয় নাই এবং ঋগ্বেদে এই মতবাদের সপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

উপরের মতবাদের আর একটি অংশ এই যে, আর্য জাতি দক্ষিণ রুশিয়া বা উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার খিরগিজ প্রান্তর হইতে মধ্য এশিয়ার পথে বা মেশোপটেমিয়ার পথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। মেশোপটেমিয়ার পথে আর্য জাতি আসিয়াছিল যাঁহারা বলেন তাঁহাদের কাহারও কাহারও মতে আসিবার পথে আর্যজাতির সহিত সেমেটিক রক্তের সংমিশ্রণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধে (বৈদিক আর্যগণ কি সেমেটিক?—প্রবাসী পৌষ, ১৩৫২) এই অংশের সপক্ষে যে সকল যুক্তি দেওয়া হয় সেগুলি আলোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই সকল যুক্তি অনুমান মাত্র, ঋগ্বেদ হইতে এই মতের সপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং আর্যজাতি যে উত্তর-পশ্চিম এশিয়া বা দক্ষিণ রুশিয়া হইতে আসিয়াছিল ইহা প্রমাণিত না হইলে মধ্য এশিয়া বা মেশোপটেমিয়ার পথের কথা উঠে না।

পরবর্তী দুইটি প্রবন্ধে (বেদের আর্য কাহারা? এবং ঋগ্বেদে দাস ও দস্যু—প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫২, শ্রাবণ ১৩৫৩) ঋগ্বেদের সাক্ষ্য-প্রমাণের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া ঋগ্বেদে আর্য, দাস, দস্যু—পদগুলি কি অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে, ঋগ্বেদীয় সমাজের কোন্ কোন্ অংশের সম্বন্ধে এই সকল পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং দাস ও দস্যু, ভারতবর্ষের অসভ্য বা অর্দ্ধ আদিবাসী এই মতের সপক্ষে ঋগ্বেদে কোন প্রমাণ আছে কিনা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আলোচনার ফলে এই সিদ্ধান্তে আসা হইয়াছে

যে, ঋগ্বেদে আর্যপদ কতকগুলি ক্ষেত্রে কৃষ্টিমূলক অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে, আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে জাতি-বাচক অর্থ দেখা যায়; এই পদ সাধারণতঃ ঋষিকুলগুলির সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে। দাস ও দস্যু পদ ঘৃণা বা অবজ্ঞাপ্রকাশক, এই পদগুলির কোন জাতিবাচক সংজ্ঞা নাই, খানিকটা কৃষ্টিবাচক সংজ্ঞা মাত্র দেখা যায়। কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তি বৈদিক দেবদেবীর উপাসক হইলেও ঋষিকুলগুলির প্রচারিত যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিরোধী বা উহাতে অনাসক্ত হইলে দাস ও দস্যু পদ তাহাদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইত।

ইহার পর একটি প্রবন্ধে (ঋগ্বেদে দেবতাদিগের মধ্যে ও ঋষিকুলগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব—প্রবাসী পৌষ, ১৩৫৩) ঋগ্বেদে ধর্মমতের বিরোধ, দেবদেবীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পুরুষানুক্রমিক পৌরোহিত্যের উৎপত্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এইরূপ ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, বৈদিক দেবদেবীগণ ঋষিকুলের প্রচারিত যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও ঋগ্বেদ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন।

পরবর্তী পাঁচটি প্রবন্ধে বৈদিক আর্য ও আবেস্তিক আর্য জাতির মধ্যে সম্পর্কের বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রথম প্রবন্ধে (বৈদিক আর্য ও আবেস্তিক আর্য—প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩) পণ্ডিতগণের মতে ঋগ্বেদ ও আবেস্তার মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য, এই দুই গ্রন্থ রচনার আনুমানিক সময়, জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্ম বিকাশের কয়েকটি স্তর এবং আর্যজাতির মধ্যে ধর্মমতের বিরোধ ও রাজনৈতিক কলহের ফলে জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের অভ্যুদয় ও বৈদিক আর্যগণের ইরাণ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষ অভিমুখে প্রস্থান, এই মতবাদের আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনাসূত্রে বলা হইয়াছে যে, জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের বিকাশের ইতিহাস হইতে এই ধর্মের অভ্যুদয়ের ফলে বৈদিক আর্য জাতি ও আবেস্তিক আর্য জাতির মধ্যে মনান্তর হয় ও বৈদিক আর্য জাতি ভারতবর্ষমুখে প্রস্থান করে—এই মতের কোনরূপ সমর্থন পাওয়া যায় না, বরং মনে হয় যে, আবেস্তায় দেবধর্মের প্রতি যে আক্রমণ দেখা যায় তাহা ব্রাহ্মণ্যধর্মের উত্তরমুখী প্রসারের বিরুদ্ধে।

ইহার পরের তিনটি প্রবন্ধে প্রাচীন পূর্ব-ইরাণ ও পশ্চিম-ইরাণের ইতিহাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, দেখা যায়, ইরাণী জাতি ও কৃষ্টি এবং জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের গতি পূর্ব হইতে পশ্চিমে, পশ্চিম হইতে পূর্বে নহে এবং আবেস্তার বর্ণনা হইতে প্রাচীন আর্যবসতি আইরিয়ানার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম প্রবন্ধে (বৈদিক আর্য ও ইরাণীয় আর্য—প্রবাসী কার্তিক, ১৩৫৩) পূর্ব ও পশ্চিম ইরাণের মধ্যে ভাষা ও জাতীয় চরিত্রের পার্থক্য, এই দুই অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস, মিডিয়ান ও হাকামনী সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়, গ্রীক আক্রমণ কালে পূর্ব-ইরাণের বিরোধিতার ইতিহাস উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, পূর্ব-ইরাণ হইতে ইরাণী জাতি ও ইরাণী কৃষ্টির সম্প্রসারণ ঘটিয়াছিল। পূর্ব-ইরাণ সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে যে, ইহাই ছিল আর্য জাতির দেশ বা airyao danhavo এবং এই প্রসঙ্গে আর্যদিগের এই দেশের মধ্যে ব্যাকট্রিয়া, পারস্য ও মিডিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল—এই মত খণ্ডন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, পারস্য ও মিডিয়া আর্যকৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু আর্যদিগের আদি বাসভূমি নহে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে (বৈদিক আর্য ও ইরাণীয় আর্য (২)—প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৩) আর্য জাতির দেশ সম্বন্ধে আলোচনা আরও অগ্রসর হইয়াছে। আবেস্তায় উল্লিখিত আহুরা-মাজদার সৃষ্ট ষোলটি আর্যবসতির বিস্তারিত ভৌগোলিক বর্ণনা দিয়া দেখান হইয়াছে যে, এই ষোলটি বসতির মধ্যে এগারোটি পূর্ব-ইরাণ, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যে পড়ে। এই এগারোটি বসতি লইয়া একটি পরস্পরসংলগ্ন ভৌগোলিক অঞ্চল (compact geographical area) পাওয়া যায়। অবশিষ্ট পাঁচটি বসতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। এই আর্যবসতির তালিকার মধ্যে ফার্স (পারস্য) ও মিডিয়া নাই। সুতরাং আর্য জাতির সম্প্রসারণ যে পূর্ব হইতে পশ্চিম মুখে হইয়াছিল এই মতের সমর্থন পাওয়া যাইতেছে।

তৃতীয় প্রবন্ধে (বৈদিক আর্য ও ইরাণীয় আর্য (৩)—প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫) মিডিয়ার মাজি সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের বিস্তারিত ইতিহাস, হাকামনী, আরসিকিডান ও সাসানীয় যুগে তাহাদের প্রভাব ইত্যাদির আলোচনা করিয়া জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের জন্মভূমি পূর্ব-ইরাণ হইতে আর্যকৃষ্টি পশ্চিম মুখে অগ্রসর হইয়াছিল প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আলোচনার উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, প্রাচীন ইরাণের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং কৃষ্টি-সম্প্রসারণের ইতিহাস হইতে দেখা যায়, আইরিয়ানা আর্য জাতির জন্মভূমি ও কৃষ্টিকেন্দ্র ছিল। আইরিয়ানার উত্তর সীমানা বোখারা, মার্ভ, খিবা, দক্ষিণ সীমানা সিন্ধু-গাঙ্গেয় অববাহিকা।

ইহার পরের প্রবন্ধে (আইরিয়ানা ও আর্য—প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫৫) য়ুরোপীয় পণ্ডিত সমাজে কিভাবে আর্য পদের অর্থবিকৃতি ও অপপ্রয়োগ ঘটিয়াছে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে ইউরোপীয় আর্যবাদের উৎপত্তির বিস্তারিত আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ভাষাবিজ্ঞানী ও পোলিটিকাল

প্রোপাগাণ্ডিষ্ট মিলিয়া এই আর্যবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। আর্যপদের অর্থ আইরিয়ানার অধিবাসী। আইরিয়ানা হইতে পরবর্তীকালে আইরান্‌, এরাণ ও ইরাণ নাম আসিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতসমাজ এই তথ্য বিস্মৃত হইয়াছেন বা অগ্রাহ্য করিয়াছেন যে আর্যপদের একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সংজ্ঞা ও ইতিহাস আছে, কোন প্রকার থিওরীর সাহায্যে এই ভৌগোলিক সংজ্ঞা উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

এই সিরিজের শেষ প্রবন্ধে (বৈদিক আর্য জাতি ও অবৈদিক আর্য জাতি—প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৫৪) আর্য জাতির সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত করা হইয়াছে। রমাপ্রসাদ চন্দের প্রচারিত তাকলামাকান হইতে আগত গোলমুণ্ড আর্যজাতি (যাহাদিগকে অবৈদিক আর্য জাতি বা Indo-Aryans of the Outer Band বলা হইয়াছে) এবং উত্তর-পশ্চিম এশিয়া বা দক্ষিণ-রুশিয়া হইতে আগত লম্বামুণ্ড বৈদিক আর্য জাতি সম্বন্ধে মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে যে, দুইটি ভিন্ন গোষ্ঠী-ভুক্ত জাতিকে আর্য বলা হইতেছে। ইহার অর্থ চন্দ মহাশয় ইউরোপীয় আর্যবাদ গ্রহণ করিয়া এই মতবাদের সঙ্গে নিজের মতবাদ জুড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে গোলমুণ্ড আর্য জাতি লম্বামুণ্ড আর্যজাতির পরে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। কিন্তু জানা গিয়াছে যে, তাকলামাকান হইতে আগত এই গোলমুণ্ড জাতি—চন্দের অবৈদিক আর্য জাতি—তাম্র যুগের সিন্ধু উপত্যকায় উপস্থিত ছিল।

এই প্রসঙ্গ হইতে সিন্ধু সভ্যতা ও সিন্ধু জাতি সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সিরিজের সাতটি প্রবন্ধে সিন্ধু জাতি ও সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম তিনটি প্রবন্ধে সিন্ধু সভ্যতার সহিত বৈদিক সভ্যতা ও প্রাচীন মেশোপটেমিয়ার সভ্যতার সম্পর্ক এবং সিন্ধু সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের অভিমতের আলোচনা করা হইয়াছে। পরবর্তী চারিটি প্রবন্ধে সিন্ধুধর্মের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রথম প্রবন্ধে (সিন্ধু যুগ হইতে বৈদিক যুগ—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৪) সিন্ধু যুগ ও বৈদিক যুগের মধ্যে যে ব্যবধানকে unbridgeable gulf বলা হয় সেই ব্যবধান বাস্তবিক কি প্রকারের তাহা লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়া এই দুই যুগের যে সময় নির্দেশ পণ্ডিতগণ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পর দেখান হইয়াছে যে, এই দুই যুগের মধ্যে যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান আছে এরূপ বলিবার কারণ পণ্ডিতগণ মনে করেন মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা প্রভৃতি স্থান পরিত্যক্ত হইলে সিন্ধু কৃষ্টি লুপ্ত হইয়া যায়। সিন্ধু কৃষ্টি গড়িয়া উঠিতে যে সময় লাগিয়াছিল, সিন্ধু কৃষ্টির স্থায়িত্বকাল এবং সিন্ধু কৃষ্টির বিস্তার প্রভৃতি বিবেচনা করিলে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন মনে হয় যে সিন্ধু-কৃষ্টি লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সিন্ধুধর্মের অনেক অঙ্গের সহিত হিন্দুধর্মের সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রশ্ন করা হইয়াছে—মধ্যে বৈদিক কৃষ্টি অবস্থান করিলেও এই সাদৃশ্য বৈদিক ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে এড়াইয়া বহুপরবর্তী হিন্দু-ধর্মে কি ভাবে আসা সম্ভব হইতে পারে? সিন্ধুধর্মের প্রভাব হিন্দুধর্মের উপর পড়িয়া থাকিলে সেই প্রভাব অবশ্য সিন্ধু জাতির বংশধরদিগের দ্বারা বাহিত হইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের গোলমুণ্ড জাতি সিন্ধু উপত্যকার গোলমুণ্ড জাতির প্রতিনিধি, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের এই মতের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে বৈদিক কৃষ্টির অভ্যুদয়ের যুগে এই জাতি ভারতবর্ষে ছিল। রমাপ্রসাদ চন্দ ইহাদিগকে অবৈদিক আর্য জাতি বলিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, ধর্ম ও জাতির ডবল খিলানের সেতু সিন্ধু-যুগকে বৈদিক ও বর্তমান যুগের সহিত যুক্ত করিয়াছে। সিন্ধুযুগের সহিত বৈদিক যুগের সম্পর্ক সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে (সিন্ধু সভ্যতা ও মেশোপটেমিয়া—প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৪) সিন্ধু জাতি ও সিন্ধু কৃষ্টি মেশো-পটেমিয়া হইতে আসিয়াছিল, কয়েকজন পণ্ডিতের প্রচারিত এই মতবাদের আলোচনাসূত্রে প্রাচীন মেশোপটেমিয়ার ইতিহাস, বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন, মেশোপটেমিয়া যুগের পরে ইরাণী যুগের অভ্যুদয়, উত্তর ও দক্ষিণ মেশো-পটেমিয়ার অধিবাসীদিগের মধ্যে জাতি-সংমিশ্রণ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের অভিমত, সিন্ধু উপত্যকার সহিত দক্ষিণ-মেশোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক ও অন্যবিধ সংযোগ এবং ডাঃ হাটন প্রমুখ পণ্ডিতগণের সিন্ধু কৃষ্টিকে দ্রাবিড় কৃষ্টি বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াসের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, সিন্ধু জাতি ও কৃষ্টি মেশোপটেমিয়া হইতে আসিয়াছিল, এই মতের সপক্ষে বিচারসহ কোন প্রমাণ উপস্থিত করা সম্ভব হয় নাই, এই মত সম্পূর্ণরূপে অনুমানমূলক। এই প্রসঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার সেরামিক্‌স্‌, স্থাপত্য, আর্ট, ধর্ম যে তাহার নিজস্ব জিনিস পণ্ডিতগণের এই মতের উল্লেখ করা হইয়াছে।

তৃতীয় প্রবন্ধে (সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি—প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৫৫) সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তির প্রসঙ্গে ও ইহার উপর বৈদেশিক প্রভাব প্রমাণ করিবার জন্য যে সকল তথ্য ও প্রমাণের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার বিস্তারিত আলোচনা

করা হইয়াছে। সেরামিক্সের প্রমাণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সীমান্ত অঞ্চলে বৈদেশিক প্রভাব লক্ষিত হয়। সিন্ধু উপত্যকার পোড়ামাটির স্ত্রীমূর্তিগুলিকে অন্যান্য দেশের স্ত্রী-দেবতার সঙ্গে তুলনা করিয়া সাদৃশ্যের প্রমাণে সিন্ধু উপত্যকাতেও স্ত্রী-দেবতা ও মহাদেবীর উপাসনার প্রচলন এবং এই উপাসনা বৈদেশিক প্রভাবজাত বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু দেখান হইয়াছে যে, সিন্ধু উপত্যকার এই স্ত্রীমূর্তিগুলির সহিত প্রাচীন যুগে অন্যান্য দেশে পূজিত স্ত্রীদেবতার কোন সাদৃশ্য নাই। সিন্ধুধর্ম পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বা আনাতোলিয়া হইতে আসিয়াছিল এই মতের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রাচীন আনাতোলিয়ার ধর্মের বিবরণ দিয়া দেখান হইয়াছে যে, এই মত বাস্তবিক মেডিটারেনীয়ান থিওরীর অংশ। মেডিটারেনীয়ান থিওরীর বিস্তারিত আলোচনা করিয়া এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, মেশোপটেমিয়া বা পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কৃষ্টির সঙ্গে সিন্ধু কৃষ্টির কোন সম্পর্ক ছিল না, ইহার সম্পর্ক ছিল সম্ভবতঃ মধ্য-এশিয়ার কৃষ্টির সঙ্গে (Bactrian Culture)।

ইহার পরবর্তী চারিটি প্রবন্ধে সিন্ধুধর্মের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রথম দুইটি প্রবন্ধে সিন্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে (প্রবাসী—আশ্বিন ও ফাল্গুন, ১৩৫৫) বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনার প্রধান কথা, সিন্ধু উপত্যকার পোড়ামাটির স্ত্রীমূর্তিগুলি দেবীমূর্তি, সর জন মার্শালের এই ব্যাখ্যা এবং সিন্ধু উপত্যকার এই দেবী পূজা পশ্চিম-এশিয়া হইতে আসিয়াছিল এই মতবাদের সমালোচনা। মেশোপটেমিয়া, সিরিয়া, মিশর, প্যালেষ্টাইন এবং আনাতোলিয়ায় পূজিত স্ত্রীদেবতাগুলিকে শিল্পে যে রূপ দেওয়া হইয়াছে তাহার সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার স্ত্রীমূর্তিগুলির সতর্কভাবে তুলনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে, মার্শালের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। সিন্ধু কৃষ্টিকে মেডিটারেনীয়ান প্রভাবের এলাকার মধ্যে টানিয়া আনিবার অভিপ্রায় এই ব্যাখ্যার ভিত্তি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, স্ত্রীমূর্তির মধ্যে বা সঙ্গে যে প্রকার বৈশিষ্ট্য থাকিলে মনে করা যায় যে উহা দেবীমূর্তিরূপে কল্পিত সে প্রকার বৈশিষ্ট্য দেখা যায় মাত্র দুইটি সীলিঙে, এবং ইহার মধ্যে একটি সীলিং বাহিরের আমদানী বলিয়া মনে হয়। আলোচনাক্রমে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে সিন্ধু উপত্যকার স্ত্রীমূর্তিগুলি ক্রীড়নক বা দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত মূর্তি (toys or votive offerings)

তৃতীয় প্রবন্ধে সিন্ধুধর্মে পুরুষদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে (প্রবাসী—শ্রাবণ ১৩৫৬) আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনার প্রধান কথা মোহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত ত্রিমুণ্ড, যোগাসনে উপবিষ্ট পুরুষদেবতার মূর্তি শিবের প্রোটোটাইপ, সর জন মার্শালের এই ব্যাখ্যার সমালোচনা। সিন্ধু উপত্যকার এক মুণ্ড, যোগাসনে উপবিষ্ট, পশুযূথবিহীন পুরুষদেবতার মূর্তি যে সীলিংগুলিতে পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ করিয়া এই মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ধ্যানযোগ দেবত্বজ্ঞাপক চিহ্নহিসাবে সিন্ধু উপত্যকায় পরিচিত ছিল মনে হয় এবং যোগসাধনা সম্ভবতঃ একটি স্বতন্ত্র কাল্টরূপে প্রচলিত ছিল। শিব স্বতন্ত্র দেবতা নহেন, বৈদিক রুদ্র পৌরাণিক আমলে শিব বা মহাদেব নামে পরিচিত। একদিকে স্বতন্ত্র যোগসাধনা ও অন্যদিকে স্বতন্ত্র লিঙ্গোপাসনার ধারা প্রাচীন রুদ্র-উপাসনার সঙ্গে পৌরাণিক যুগে যুক্ত হইয়াছে। সিন্ধু উপত্যকার ত্রিমুণ্ড বা এক মুণ্ড পুরুষদেবতা শিবের বা অন্য কোন হিন্দু দেবতার প্রোটোটাইপ নহে, প্রোটোটাইপ বলিতে হইলে বরং ইহাকে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তির প্রোটোটাইপ বলা যায়।

চতুর্থ প্রবন্ধে (সিন্ধুধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৬) প্রথমে সিন্ধুধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লিঙ্গ ও যোনি উপাসনা, সর্প উপাসনা, পশু উপাসনা, বৃক্ষ উপাসনা এবং চক্র, ত্রিশূল, পদ্ম, স্বস্তিকা প্রভৃতি প্রতীকের উল্লেখ করা যায়। আলোচনা-প্রসঙ্গে কতকগুলি প্রস্তরের নিদর্শনকে, লিঙ্গ ও যোনির প্রতিমূর্তি বলিয়া মার্শাল যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেই ব্যাখ্যার সমালোচনা করা হইয়াছে। তারপর পরবর্তী ভারতীয় ধর্মগুলিতে যথা, বৈদিক, ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে এই সকল বৈশিষ্ট্যের কতগুলি দেখা যায় তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার পর সিন্ধু ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে সর্প, পশু, বৃক্ষ উপাসনা ও প্রতীকগুলি সম্পর্কে ধারণা ও আর্টে তাহা প্রকাশ করিবার কৌশলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অভ্যুদয় যাহাদের মধ্যে ঘটিয়াছিল তাহারা সিন্ধু কৃষ্টির সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী।

ইহার পরবর্তী চারিটি প্রবন্ধে সিন্ধুবাসীদিগের মধ্যে জাতি-সংমিশ্রণ, তাম্রযুগের সিন্ধু উপত্যকায় আর্য-জাতির উপস্থিতি এবং যাহাদিগকে বৈদিক আর্য জাতি বলা হয় তাহারা কোন্ গোষ্ঠীভুক্ত ছিল নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক তথ্য ও প্রমাণের সাহায্যে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলি আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যায়

প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্তসার এখানে দেওয়া হইতেছে।

প্রথম প্রবন্ধে (সিন্ধু সভ্যতার বাহকগণ কোন্ জাতি?) মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা, মাক্রাণ এবং নালে যে সকল মনুষ্য দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ যে সকল সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন তাহার উল্লেখ ও আলোচনা করা হইয়াছে। তারপর দেখান হইয়াছে যে, নৃতত্ত্ববিজ্ঞান অনুযায়ী পরীক্ষার ফলে বিভিন্ন জাতির সিন্ধু উপত্যকায় উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেলেও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ ও অপর পণ্ডিতগণ পূর্ব সংস্কার বা মতের প্রভাবে এবং অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহাদের মধ্যে একটিমাত্র জাতিকে সিন্ধু কৃষ্টির সৃষ্টি ও বিকাশের কৃতিত্ব দিয়াছেন। এই জাতি মেডিটারেনীয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয় জাতি।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে (সিন্ধু সভ্যতা ও মেডিটো-আর্মেনয়েড জাতি) সিন্ধু কৃষ্টির সৃষ্টি ও বিকাশ মেডিটো-আর্মেনয়েড জাতির দ্বারা হইয়াছিল এই মতবাদের বিস্তারিত আলোচনাক্রমে দেখান হইয়াছে যে, প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মতে মেডিটারেনীয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীকে কোন দেশে তাম্রযুগের কৃষ্টির স্রষ্টা রূপে দেখা যায় না এবং হরাপ্পায় প্রাপ্ত একটিমাত্র আর্মেনয়েড করোটির প্রাপ্তি এই মতবাদ গ্রাহ্য করিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ইহার পর অমঙ্গোলীয় গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর করোটিগুলিকে আলপাইন ও আর্মেনয়েড এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিবার প্রণালীতে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের সিদ্ধান্তের মধ্যে যে সকল অসঙ্গতি দেখা যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

তৃতীয় প্রবন্ধে (সিন্ধুসভ্যতা ও ইরাণো-পামীরী জাতি) সিন্ধু উপত্যকার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে ইরাণো-পামীরী জাতির প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থানের আলোচনা করা হইয়াছে। পামীরের অধিবাসী, তাকলামাকানের অধিবাসী এবং উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্থান, পশ্চিম বোখারা, খোরাশান, সিস্টান, বেলুচীস্থান ও দক্ষিণ-হিন্দুকুশের অধিবাসীদিগের মধ্যে ইরাণো-পামীরী গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের প্রমাণ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। সিন্ধু উপত্যকায় যে গোলমুণ্ড পামীরী জাতির উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের জাতিগুলি যে সেই জাতির প্রতিনিধি নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণের এই মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। সিন্ধু উপত্যকার এই ইরাণো-পামীরী জাতি ভাষায় ও ধর্মে আর্য ছিল। তাহারা মৃতদেহ দাহ করিত। সিন্ধু উপত্যকার সহিত এই জাতির ভৌগোলিক সম্পর্ক হইতে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, এই জাতি সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসী এবং সিন্ধু উপত্যকায় অন্য যে সকল জাতির উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় তাহারা বৈদেশিক আগন্তুক।

চতুর্থ প্রবন্ধটিতে (সিন্ধুসভ্যতা ও আর্যজাতি) মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পায় প্রাপ্ত নিদর্শন হইতে যে দ্বিতীয় লম্বামুণ্ড জাতির উপস্থিতির প্রমাণ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা পাইয়াছেন এবং যাহাকে প্রোটো-নর্ডিক সম্পর্কিত বলা হইয়াছে সেই জাতির সম্বন্ধে আলোচনাক্রমে আর্য জাতি লম্বামুণ্ড গোষ্ঠী-ভুক্ত জাতি ছিল—এই মতবাদের বিচার করা হইয়াছে। দেখান হইয়াছে যে, এই জাতি প্রোটো-নর্ডিক বা আর্য হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, ভারতবর্ষে আর্য জাতির আক্রমণ সিন্ধুযুগে হইয়াছিল, আর্য জাতির মধ্যে লম্বামুণ্ড ও গোলমুণ্ড এই দুই গোষ্ঠীর লোক ছিল এবং এই দুই গোষ্ঠীর আর্যজাতি সিন্ধু উপত্যকায় উপস্থিত ছিল। ইহার পর বলা হইয়াছে যে, প্রোটো-নর্ডিকগণের আর্যনামের উপর কোন দাবি নাই, এই নাম আইরিয়ানার অধিবাসীর নাম। আইরিয়ানার অধিবাসী ইরাণো-পামীরী টাইপের গোলমুণ্ড জাতি ছিল। ঋগ্বেদ ও আবেস্তায় যাহারা আপনাদিগকে আর্য বলিত, তাহারা ছিল আইরিয়ানার অধিবাসী, দক্ষিণ-রুশিয়া ও উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার খিরগিজ প্রান্তর হইতে তাহারা আসে নাই। সিন্ধু উপত্যকা ছিল আইরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত এবং সিন্ধুকৃষ্টির সৃষ্টি ও বিকাশে তাহাদের দাবি অগ্রগণ্য।

২

সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার দুইটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হইল অনুমান খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রকে আইরিয়ানার দক্ষিণ অঞ্চল সপ্তসিন্ধুর দেশে। এই দেশে নূতন প্রস্তর যুগের আমল শেষ হইয়া তাম্রযুগ আরম্ভ হইয়াছে। পণ্ডিতগণের মতে প্রায় ঐ সময়ে পশ্চিম-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর জাতিগুলি নূতন প্রস্তর যুগের কৃষ্টি বহন করিয়া ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে, ফ্রান্সে ও ব্রিটিশ দ্বীপগুলিতে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। হিমালয় ও পামীর হইতে আল্পস্ পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তের মালভূমিগুলি (আর্মেনিয়া ও আনাতোলিয়া) হইতে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলি ধাতব যুগের কৃষ্টি বহন করিয়া দক্ষিণ-ইউরোপ হইতে মধ্য ও উত্তর-পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সম্ভবতঃ ইহার পূর্বেই সুমের ও এলামে মধ্য-এশিয়া (ব্যাক্‌ট্রিয়া) হইতে আগত

গোলমুণ্ড জাতি নূতন কৃষ্টির পত্তন করিয়াছিল। উত্তর-সেমাইটগণ মেশোপটেমিয়ার উত্তর ভাগে, সিরিয়ায় ও প্যালেষ্টাইনে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছিল। মিশরে হামাইট ও মেডিটারেনীয়ান ও পরে মিশ্র আর্মেনয়েড জাতি মিলিয়া মিশরীয় সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল। সম্ভবতঃ যখন মিশরীয় সভ্যতার পত্তন হইতেছিল সেই সময়ে হিমালয় হইতে আল্পস্ পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর পূর্বভাগে অবস্থিত মালভূমির অধিবাসী গোলমুণ্ড জাতি মধ্য-এশিয়ায় একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল। মধ্য-এশিয়ার এই সমৃদ্ধ কৃষ্টিকেন্দ্রের পরিধির অন্তর্ভুক্ত ছিল আনাউ, এলাম, মেশোপটেমিয়া, ব্যাকট্রিয়া ও সিন্ধু উপত্যকা। মধ্য-এশিয়ার কৃষ্টির বাহক জাতি-গুলি পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

সিন্ধু কৃষ্টির যুগ যখন আরম্ভ হইল সিন্ধু উপত্যকায় তখন ধাতুর ব্যবহার চলিতেছে। পূর্বে রাভী-তীরে অবস্থিত হরাপ্পা হইতে মোহেঞ্জোদাড়ো, মোহেঞ্জোদারো হইতে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে গৌরবোজ্জ্বল সিন্ধু কৃষ্টির অভ্যুদয়ের অপর্যাপ্ত নিদর্শন পণ্ডিতসমাজের সপ্রশংস বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছে। সিন্ধু কৃষ্টির নিকটতম সম্পর্ক সম্ভবতঃ মধ্য-এশিয়ার বা ব্যাকট্রিয়ার অতি প্রাচীন সমৃদ্ধ কৃষ্টির সঙ্গে। পণ্ডিতগণের মতে এই কৃষ্টি খ্রীঃ পূঃ ৫ম সহস্রক অপেক্ষা প্রাচীন হইতে পারে। সিন্ধু কৃষ্টির দূর সম্পর্ক দেখা যায় মধ্য-এশিয়ার কৃষ্টিকেন্দ্রের পরিধির মধ্যে অবস্থিত আনাউ, এলাম, দক্ষিণ মেশোপটেমিয়া বা সুমেরের কৃষ্টির সঙ্গে। স্থাপত্যে, আর্টে ও ধর্মে সিন্ধুসভ্যতার স্বাতন্ত্র্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন, সিন্ধুলিপির স্বাতন্ত্র্য ও উৎকর্ষও তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। এলাম-সুমের-ব্যাবিলোনীয় কৃষ্টির প্রভাব ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই প্রভাব মিশরীয় কৃষ্টির প্রভাবের সঙ্গে মিলিয়া ইউরোপের প্রাচীন কৃষ্টিকেন্দ্র গ্রীসকে প্রভাবিত করিয়াছে। সিন্ধু কৃষ্টির সম্প্রসারণ ক্ষেত্র দক্ষিণে বিস্তৃত।

সিন্ধুযুগে সম্ভবতঃ বেলুচীস্থানের পথে কিছুসংখ্যক মেডিটারেনীয়ান বা উত্তর সেমাইট এবং হিন্দুকুশ বা অক্সাস উপত্যকা ও কাবুল উপত্যকা হইয়া মোঙ্গলীয় গোল-মুণ্ড জাতি সিন্ধু উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছিল। ইহাদের কোন প্রভাব সিন্ধু কৃষ্টির উপর পড়িয়াছিল তাহা প্রমাণ করা সম্ভব হয় নাই।

সিন্ধুধর্মকে প্রোটো-বৌদ্ধধর্ম বলা যায়। সিন্ধু জাতির লিপি ব্রাহ্মী লিপির জনক (প্রোঃ ল্যাংডনের মত)। সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার না হইলে সিন্ধু জাতির ভাষা সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানা যাইবে না।

সিন্ধু উপত্যকা হইতে সিন্ধু জাতি পশ্চিম উপকূলের কচ্ছ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র-কর্ণাট হইয়া তামিল দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সিন্ধু গাঙ্গেয় উপত্যকা হইয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ বঙ্গদেশ হইতে তাহারা পূর্বে আসাম ও দক্ষিণে উৎকলে সম্প্রসারিত হয়। মধ্যভারতে এই জাতির সহিত সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব-যুক্তপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ও পূর্ব-বিহারে এই পরিচয় অধিক প্রকট। সর জন মার্শালের মতে সিন্ধু কৃষ্টি সম্ভবতঃ নর্মদা ও তাপ্তী উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন বৈদিক আর্যজাতির আক্রমণের ফলে সিন্ধু জাতি পঞ্জাব হইতে বিতাড়িত হইয়া দেশের অভ্যন্তরে ছড়াইয়া পড়ে। এই মতের পক্ষে প্রমাণ-সিদ্ধ কথা এই যে, একটি লম্বামুণ্ড জাতি পরবর্তীকালে উত্তর হইতে পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু কবে ও কোন্ স্থান হইতে ইহারা আসিয়াছিল সে সম্বন্ধে নানারকম অনুমান করা হইয়াছে। এই জাতিকে বৈদিক আর্যজাতি বলিবার কোন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ নাই। ইহারা যে সিন্ধু-জাতিকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হয় নাই তাহার প্রমাণ এই যে, এই লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীকে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে সিন্ধুজাতি যে গোষ্ঠীভুক্ত সেই গোষ্ঠীর জাতিগুলি। ইহাদের সহিত সিন্ধু উপত্যকার লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর সম্পর্ক থাকিতে পারে।

সিন্ধু কৃষ্টির বিভিন্ন প্রাচীন কেন্দ্রগুলি কোন্ সময়ে পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু কয়েকটি কেন্দ্রে সাসানীয় আমলের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার দ্বিতীয় অধ্যায় কোন্ সময়ে আরম্ভ হইল ঠিক জানা যায় না, পণ্ডিতসমাজ নানাপ্রকার অনুমান করিয়াছেন।

একদিকে সিন্ধু-সরস্বতী-দৃষদ্বতী তীরে যজ্ঞের ধূম্রজাল, ঋষিকুলের স্তোত্রগুঞ্জন ও বিবদমান রাজন্যগোষ্ঠীগুলির অস্ত্রের ঝনৎকার, অন্যদিকে অক্সাস-তীরে এক মুখে দেবধর্ম ও দেবধর্মের পুরোহিতগণের প্রতি কটূক্তি ও অভিশাপের গর্জন এবং অন্যমুখে হোমের স্তুতি, বৃত্রঘ্ন, নাসত্য, যিম, মিথ্রের স্তুতি, আহুরা মাজদার প্রতীক-অগ্নির স্তুতি, পঞ্চনদ ও ব্যাকট্রিয়ার এই দুই দৃশ্যের যবনিকার অন্তরালে দৃষ্টি প্রেরণ করিলে আইরিয়ানার প্রাচীন আর্যসভ্যতার একটি সমগ্র কিন্তু অস্পষ্ট চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ ঋষিকুলের বা পুরোহিত সম্প্রদায়ের

রচনা, আবেস্তাও তাহাই। জরাথুষ্ট্র নাম নহে, উপাধি; ইহার অর্থ প্রধান পুরোহিত। ঋগ্বেদীয় পুরোহিত সম্প্রদায় আক্রমণ করিয়াছেন অনুব্রত, অনদেব, যজ্ঞহীন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে; আবেস্তার পুরোহিত সম্প্রদায় আক্রমণ করিয়াছেন গর্বিত দেবধর্মের পুরোহিতদিগকে। কিন্তু এই দুই পুরোহিত-সম্প্রদায়ের ও তাঁহারা যাহাদের পুরোহিত ছিলেন তাঁহাদের পৈতৃক ধর্ম, ভাষা ও জাতি এক, দেশও এক। বৈদিক আর্যজাতি ও আবেস্তিক আর্যজাতি বলিয়া বাস্তবিক কোন জাতি ছিল না, বেদ ও আবেস্তা বিভিন্ন সময়ে প্রাচীন আইরিয়ানার আর্যজাতির দ্বারা রচিত হইয়াছিল। এই জাতির সাক্ষাৎ সিন্ধু কৃষ্টির আমলে সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া যায়। মধ্য এশিয়ার ব্যাকট্রিয়ার কৃষ্টিও যে এই জাতির কীর্তি তাহা মনে করা যাইতে পারে।

সেরামিক্স বা স্থাপত্যের কোন নিদর্শনকে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয় নাই, মনুষ্য দেহাবশেষের কোন নিদর্শনকেও যুক্ত করা হয় নাই, একমাত্র সাহিত্যিক দলিল এই অধ্যায়ের ইতিহাসের অবলম্বন।

এই দলিল হইতে দেখা যায় যে দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইবার পূর্বে বংশানুক্রমিক রাজন্যগোষ্ঠী ও পুরোহিত-গোষ্ঠী সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। ঋগ্বেদ যে সমাজের চিত্র উদ্ঘাটন করে তাহা কোন নবগঠিত সমাজ নহে, এই চিত্র একটি বহুকালের প্রাচীন সমাজের। ইহার অনেকগুলি স্তরের আভাস পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদে যে সকল রাজন্যগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় পরবর্তী ইতিহাসে তাঁহারা সুপরিচিত। ঋষিকুলগুলিও পরবর্তী ইতিহাসে সুপরিচিত। ঋগ্বেদের সময় হইতে ভারতীয় কৃষ্টির ইতিহাসের ধারা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

একদিক হইতে দেখিলে ঋগ্বেদ পরমত-অসহিষ্ণু, উগ্র, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ পুরোহিত-সম্প্রদায়ের দেবগণের উদ্দেশ্যে রচিত ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের গৌরব-প্রকাশক স্তোত্র-সমষ্টি, অন্যদিক হইতে দেখিলে ইহা আর্যজাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস, আবার ইহা অপ্রত্যাশিত-রূপে উদার দৃষ্টিভঙ্গী, উচ্চ মনোভাব, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক রচনাবলীর সমষ্টি। ইহার মধ্যে একাধারে আস্তিকতা ও সংশয়বাদিতার সমন্বয় দেখা যায়।

ঋগ্বেদের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত liturgical character রক্ষিত হইয়াছে এবং পুরোহিতসম্প্রদায় ও তাঁহাদের ক্রিয়াকাণ্ডের গৌরব কীর্তন স্তোত্রকারদিগের প্রধান বক্তব্য মনে করা যায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও স্তোত্রকারদিগের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে এত অধিক পার্থক্য দেখা যায় যে, প্রাচীন আর্য জাতির মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ হইয়াছিল এই সন্দেহ প্রবল হয়। ঋষি বা যজমান সম্বন্ধে গোত্রবর্ণের যে সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতে এই সংমিশ্রণের অনুমান সমর্থিত হয়। আরও দেখা যায় যে, আর্যপদ ক্রমে জাতিবাচক হইতে কৃষ্টিবাচক অর্থে ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

আর্যজাতির প্রাচীন ধর্মের পুরোহিতসম্প্রদায়ের সমর্থিত অংশকে ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই দেবতা, যজ্ঞ ও পুরোহিত, এই ত্রিপাদের উপর দণ্ডায়মান বৈদিক ধর্ম। আবেস্তা ধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস হইতে অনুমান করা যায় যে, এই বৈদিক ধর্ম সমগ্র আইরিয়ানায় প্রচলিত ছিল।

সিন্ধুসভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল সপ্তসিন্ধুর দেশে। ঋগ্বেদে ও আবেস্তায় এই সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুমান করা যাইতে পারে, আর্য জাতির কৃষ্টিকেন্দ্র স্থায়ী ভাবে আইরিয়ানার দক্ষিণ অঞ্চলে সরিয়া আসিয়াছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। নূতন নূতন জাতির প্রবাহ উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব হইতে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। প্রাচীন যুগ হইতে প্রায় খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় কৃষ্টির প্রবাহের গতি ছিল উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও পূর্বমুখী। ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্থান, সুগধা, পামীর, পূর্ব-মধ্য-এশিয়া, চীন ও তিব্বতে ভারতীয় কৃষ্টি বিস্তারের কথা মনে করা যাইতে পারে।

সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণ্যধর্মের উত্তরমুখী গতি বাধা পাইল ব্যাকট্রিয়ার বিদ্রোহ ঘোষণায়। কিন্তু এই বিদ্রোহ বিশেষ সফল হয় নাই। মনে হয়, জন্মভূমি হইতে এই বিদ্রোহী ধর্মমত নির্বাসিত হইয়া সুদূর পশ্চিমে মিডিয়ায় আশ্রয় লাভ করে। তারপর রাজশক্তির আশ্রয়ে পুনরায় পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু মিডিয়ার মাজি সম্প্রদায়ের হাতে জরাথুষ্ট্রের প্রচারিত ধর্মের রূপান্তর ঘটিয়া পুরোহিতসম্প্রদায় অধিকতর শক্তিশালী হইয়া দেখা দিল।

আর্যজাতি ও আর্যজাতির সম্পর্কে একটি সুপরিচিত সমস্যার এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। মেশোপটেমিয়ার মিটানী ও কাসাইটদিগের মধ্যে এবং উত্তর-আনাতোলিয়ার হিটাইটদিগের মধ্যে অনুমান খৃঃ পূঃ ১৫শ শতাব্দীতে কয়েকজন বৈদিক দেবতা পরিচিত ছিলেন প্রমাণ পাওয়া যায়। এই তথ্যের উপর যে, সকল মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া বলা যায় যে ঋগ্বেদে যাঁহাদের উল্লেখ পাওয়া যায় এইরূপ অনেক দেবতার উপাসনা ঋগ্বেদ রচনার সম্ভবতঃ বহুপূর্ব হইতে আইরিয়ানার আর্য জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের বাহিরে

যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের দ্বারা এই উপাসনা প্রচারিত হইয়া থাকিবে। মিটানী, কাসাইট ও হিটাইটদিগের মধ্যে আর্য জাতির সংমিশ্রণ ছিল কি না তাহার বিচার না করিয়া এবং বৈদিক আর্য ও আবেস্তিক আর্যদিগের—মনে রাখিতে হইবে যে এই নামকরণ কৃষ্টিবাচক, জাতিবাচক নহে—সহিত তাঁহাদের রক্তের সম্পর্ক ছিল এইরূপ অনুমান না করিয়া উপরে উল্লিখিত তথ্যটিকে সহজভাবে আর্য-জাতির দেবতাদিগের উপাসনা কত দূর বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে উত্তরে জরাথুষ্ট্রের বিদ্রোহের পরে পূর্বে মগধে আর একটি বিদ্রোহ দেখা দিল। বৌদ্ধধর্মীয় শিল্পে সিন্ধুধর্মের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য নূতন করিয়া ভারতবাসীর চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সিন্ধু কৃষ্টি বৈদেশিক আমদানী নহে। বর্তমান সময় হইতে সিন্ধুযুগের ব্যবধান কয়েক সহস্র বৎসর বটে, কিন্তু অধ্যাত্ম চিন্তার দিক দিয়া বেদ ও উপনিষদ অপেক্ষা ইহা হিন্দুদিগের নিকট বেশী দূরবর্তী নহে। সিন্ধুযুগে যে জাতি ধ্যানযোগের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারাই উপনিষদে গভীর তত্ত্বসমূহ প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহারাই আর্যজাতি, রূপকথার খিরগিজ প্রান্তর হইতে আগত আর্য নহে, অক্সাস ও সিন্ধুনদের প্রশস্ত, সূর্য-কিরণোজ্জ্বল উপত্যকার, আইরিয়ানার অধিবাসী।

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

গান্ধীজীর ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা বুনিয়াদী বা বনিয়াদী শিক্ষা নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মূল কথা, শিশু ও কিশোরদের কোনও শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন, কারণ শিশু হাতে কাজ করিতে ভালবাসে এবং বদ্ধ ঘরের বাঁধা নিয়মকানুনের মধ্যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের পাঠ্য-তালিকার সহায়তায় যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা ছাত্রদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। যে পরিবেশের মধ্যে শিশুর দেহ, মন ও আত্মা (আমি বলি, চরিত্র) পূর্ণ আনন্দে আপনার সুপ্ত শক্তি বিকাশের সুযোগ পায়, সেই-রূপ ব্যবস্থায় শিক্ষার পদ্ধতি গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। শিশু-মন সৃজনমুখী ; যাহা তাহার প্রাণে স্বতঃই উদিত হয়, সে তাহাকে আপনার শক্তিমত হাতের সাহায্যে রূপ দিতে চায়, কাদা মাখিয়া ছবি আঁকিয়া জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়া গড়িয়া সে আপনার জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিতে চায়। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি পদে পদে তাহাতে বাধা দিয়া তাহার শক্তিকে ক্ষুণ্ণ ও পর্য্যুদস্ত করিয়া থাকে।

শিশু এই সৃজনীশক্তি লইয়া আসিয়াছে। তাহার সৃষ্ট বস্তু যদি কাহারও কোনও কাজে লাগে, কেহ তাহা ঘরে রাখিয়া যদি আনন্দ পায়, তাহা মূল্য দিয়া কেহ যদি ক্রয় করিয়া লইতে চায় তাহা হইলে শিশুর সৃষ্টবস্তু "উপার্জ্জনের" পথ উন্মুক্ত করিতে পারে। এখানে ইংরেজী অর্থনীতি শাস্ত্রের "productive" অর্থাৎ "commodities of exchangeable value" কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা 'create' বা 'creative' অর্থাৎ যে প্রেরণা সৃজন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে—অপর কথা ভাবে না, তাহা হইতে ভিন্নার্থবোধক। সৃষ্ট বস্তুমাত্রেই 'productive' না হইতে পারে, অর্থাৎ 'মূল্য' হিসাবে তাহার কোনও 'মান' না থাকিতেও পারে।

মহাত্মাজীর মতে যাহারা উৎপাদন করে না তাহাদের ভোগ করিবার অধিকার নাই। ইহাতে 'অলস' অর্থাৎ যাহারা শারীরিক শ্রম দ্বারা নিজ নিজ জীবনধারণের সহায়ক দ্রব্যাদি উৎপাদন করে না, অথচ অর্থ উৎপাদন বা অন্ন-বস্ত্রাদি ক্রয়, সুখভোগের অনুপূরক শ্রম প্রভৃতি ক্রয় করিবার উপযুক্ত, অর্থ বুদ্ধি (বা দুর্বুদ্ধি) দ্বারা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ, এরূপ একটি শ্রেণী জন্মলাভ করে। ইহাতে সমাজে মানুষে মানুষে বৈষম্য হইয়াছে, কর্ম্মবিভাগে মানুষ 'ছোট' ও 'বড়' হইয়াছে, জন্ম বা বংশগত জাতির সৃষ্টি হই-য়াছে, ভারতবর্ষে এই বিভেদ স্থায়ী হইয়া বিষম অনর্থের মূল হইয়াছে। নিজের জীবনধারণ বা সুখভোগের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং সুস্থ সবল অবস্থায় আনন্দে থাকিবার জন্য যে পরিবেশ তাহা নিজ কায়িক শ্রম দ্বারা অন্ততঃ কতকাংশে সৃষ্টি করিতে না পারিলে সমাজে বাস করিবার অধিকার মানুষের নাই, অথবা সমাজ যে সকল সুযোগ-সুবিধা দান করে তাহা ভোগ করা তাহার উচিত নয়। সেরূপ মানুষ 'স্বার্থপর' বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য।

শিশু ও কিশোরদের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে কোনও হস্ত-শিল্প নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে। "মাধ্যম" কথাটি

প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী "through the medium" শব্দ কয়টির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই নির্ব্বাচিত বিষয়কে অবলম্বন করিয়া শিশুর সমস্ত শিক্ষা বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার বয়স অনুযায়ী প্রাথমিক এবং কাহারও কাহারও মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার কতকাংশ সম্পন্ন করিতে হইবে।

বিষয়বস্তু অর্থাৎ নির্ব্বাচিত শিল্প বা 'হাতের কাজ'গুলি এমন হইবে যাহা দ্বারা শিশুর দৈহিক ও মানসিক, এবং আত্মিক প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হয়। অন্ন-বস্ত্র, সুস্থ জীবন ও আনন্দময় পরিবেশ সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন, সুতরাং মহাত্মাজীর পরিকল্পনায় শিশুর উপযুক্ত কৃষি বা বাগান, শাকসব্জী, উৎপাদন, তুলা, চাষ প্রভৃতি, চরকা এবং অপর কোনও কুটীর-শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে, ছাত্রের নিত্যনৈমিত্তিক কাজের ভিতর দেহ ও বস্ত্রাদি পরিষ্কার রাখা, বাসস্থান ও বিদ্যালয়-গৃহ নিজের চেষ্টায় পরিচ্ছন্ন রাখা, দেহের ক্লেদ, মলমূত্র প্রভৃতি এবং বাড়ীর জঞ্জাল স্বহস্তে দূর করা অথবা প্রতিদিনের কাজের সহায়করূপে ব্যবহার করা প্রয়োজন। যাহারা চাষ করিবে তাহাদের জমির সাররূপে যাহাতে এই সকল [illegible] ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা, শিক্ষকের নির্দ্দেশে এবং সহযোগিতায় ছাত্রদের করিতে হইবে।

শিক্ষাকেন্দ্রের পরিবেশ ছাত্রদের মধ্যে যে ভ্রাতৃভাব ও পরস্পরের প্রতি যে প্রীতির সৃষ্টি করিবে, তাহা আপনার নির্দ্দিষ্ট সীমানার বাহিরে পরিবারস্থ লোকের স্বার্থ অতিক্রম করিয়া গ্রামের ও সমাজের কল্যাণে ছড়াইয়া পড়িবে। উচ্চ-নীচ, জাতি-বর্ণ বিভেদ ভুলিয়া এক একটি গ্রাম এক একটি গোষ্ঠীর আকার ধারণ করিবে এবং সকলে স্বতন্ত্রভাবে "উপার্জ্জনের" জন্য কাজ করিয়া পরস্পর নির্ভরশীল হইবে ও আনন্দলাভ করিবে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ যে কর্ম্মের লক্ষ্য তাহা সত্য, ন্যায় ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধ্য। এই সকল গুণ যদি শিক্ষার বনিয়াদ না হয়, তাহা হইলে উপরের কাঠামো অতিশয় ভঙ্গুর হইবে এবং স্বার্থ, অনৃত, হিংসার দ্বন্দ্বে সকলই অচিরে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। সংসারে যথেষ্ট অশান্তি বিদ্যমান এবং দিন দিন তাহা বৃদ্ধি পাইতেছে; ধন, বিদ্যা, বংশগৌরব, উচ্চনীচ জাতিভেদ প্রভৃতি লইয়া মানুষে মানুষে বৈষম্য বিরাট হইতে বিরাটতর হইতেছে, সেরূপ অবস্থায় ইহার একটা প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন এবং মহাত্মা-প্রদর্শিত পন্থাই সর্ব্বাপেক্ষা কালোপযোগী ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

মহাত্মাজীর পরিকল্পনার আলোচনাপ্রসঙ্গে নানা মত, এমন কি দারুণ বিরুদ্ধ মতও সৃষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা এই মতে বিশ্বাসী তাঁহারা মহাত্মাজীর নির্দ্দিষ্ট শিক্ষণীয় তালিকা প্রভৃতির প্রয়োজনীয় সংস্কার-সাধন করিয়াছেন। চরকা ও কৃষি বাদে অপরাপর কয়েকটি শিল্প শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক যাহা প্রয়োজন ছিল, তাহাও এখানে বলা হইতেছে। ইহা নিতান্তই লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত বলিয়া গ্রহণ করিলে ভাল হয়।

মহাত্মাজী অবশ্য একই ছাত্রের পক্ষে বিভিন্ন শিল্প-শিক্ষা-প্রচেষ্টার সহিত বৃক্ষশাখা-আশ্রয়ী আরামহীন বানরের তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিভিন্ন বৃক্ষ, বিভিন্ন ফললোভী, আপাততুষ্টিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট বানর যেমন বাসা বাঁধে না, তেমনই ছাত্রেরা বিভিন্ন শিল্পে চেষ্টান্বিত হইলে তাহাদের সকল শিক্ষার বনিয়াদই কাঁচা থাকিয়া যাইবে; তাঁহারা কোনটাই ভাল করিয়া শিখিবে না। মহাত্মাজীর মতে চরকা ও তাঁতের সাহায্যে সকল প্রকার শিক্ষা—বর্ণ-পরিচয় হইতে সাহিত্য ইতিহাস গণিত প্রভৃতি, সব শিক্ষাই দেওয়া যাইবে। ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন পাঠ্য সংযোজিত হইয়াছে; শিল্পের সাহায্যে শিক্ষা-ব্যাপারে যে জ্ঞান অসম্পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা পূরণের জন্য পাঠ্যবিধি, বা শিক্ষকের সাহায্যে বিদ্যাদানের চেষ্টা চলিয়াছে।

এখনও মহাত্মাজীর পরিকল্পনা এবং তাহার সংশোধিত রূপ সকল শিক্ষাবিদের মনঃপূত হয় নাই। প্রধান আপত্তি, শিক্ষার মাধ্যম অর্থাৎ হাতের কাজই শিক্ষার একমাত্র বাহন বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য কিনা। ইহার সাহায্যে সমস্ত "শিক্ষা" সম্পন্ন হওয়া সম্ভব কিনা, তাহা লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে; কিন্তু ইহার প্রতিকারকল্পে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় প্রশ্ন লইয়া বিতণ্ডা চলিতেছে। ছাত্রদের হাতের কাজ (productive) "উৎপাদনাত্মক" (ইহা ঠিক ইংরেজী শব্দের অর্থ প্রকাশ করে না) হইল কিনা, অর্থাৎ তাহার দ্বারা বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহের কথা ভাবিয়া অগ্রসর হইতে হইবে কি না, তাহার মীমাংসা হয় নাই।

বস্তুতঃ অনেকেই মনে করেন, শিশুদের বাধ্যতামূলক ভাবে কাজ করাইতে হইলে তাহা অত্যাচারের নামান্তর (forced child labour) হইবে। অভিভাবকেরা শিশুদের শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারেন নাই বলিয়া শিশুকে "খাটাইয়া" তাহারই উপার্জ্জনে তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে একথা মনে করিবার কারণ থাকিতে

পারে। তবে এ মতের সমর্থক বিশেষ নাই। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে শিশুর উপার্জ্জিত অর্থে তাহার শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব কি না এ বিষয়ে বহুলোকের মনে সন্দেহ আছে এবং যখন ইহা সম্ভব নয়, তখন অহেতুক অতিমাত্রায় "ছেলে খাটাইয়া" আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইলে শিশুর শিক্ষা ব্যাহত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট কতকটা এই মতের সমর্থক। তাঁহারা "বনিয়াদী" (basic) কথাটি ব্যবহার করিলেও সাধারণের প্রচলিত মতানুযায়ী বাংলায় "বনিয়াদী" শিক্ষা প্রচলনের জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। এই সম্পর্কিত পুস্তক-পত্রিকাদিতে "basic" কথা ব্যবহার করিলেও মহাত্মাজী-নির্দ্দেশিত শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে যে ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া "বুনিয়াদী" কথাটি উঠিয়াছিল, তাহার সহিত বাংলা-সরকারের শিক্ষানীতির মূলগত পার্থক্য ঘটিয়াছে। বনিয়াদী শিক্ষার জন্য তাঁহারা একই শ্রেণীর (one type) বিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষপাতী নহেন। শিল্প-শিক্ষা অপর শিক্ষার কেন্দ্র অথবা ইহা শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র বিষয় বা অঙ্গ বলিয়া পরি-গণিত হইতেছে, তাহাও সুস্পষ্ট নহে। সর্ব্বোপরি তাঁহারা "production" বা "উৎপাদনাত্মক কাজ" অর্থাৎ অর্থকরী কাজের উপর তত জোর না দিয়া ছাত্র যে কাজ হাতে লইবে তাহাই যেন চরম উৎকর্ষ লাভ করে, সেই দিকেই লক্ষ্য রাখার জন্য জোর দিয়াছেন। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত মত, "Educational consideration should on no account be subordinated to those of 'production'।"

ইহাতে ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনার সমর্থনকারীরা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। না-হইবারই কথা, কারণ যখন মূলনীতি পূর্ণ এমনকি আংশিকভাবেও সমর্থিত হইতেছে না, তখন ইহাকে basic education বা বনিয়াদী শিক্ষা না বলিয়া শিশু-শিক্ষার একটা নূতন রীতি বা বিধি বলিয়া চালাইলেই ভাল হইত।

বাস্তবিকই বাংলাদেশে এই বিষয়ের আলোচনার এক-রকম চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। কারণ গবর্ণমেণ্ট যখন লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ এবং নিজেদের অর্থে তাহা পুষ্ট ও তাহার প্রচার করিবার শক্তি রাখেন তখন অপর পক্ষের মত কতকটা চাপা পড়িয়া যাইবে, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা অনেকের সমর্থন লাভ করিবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, কারণ শিশুর উৎ-পাদিত বস্তু যে একটা উপার্জ্জনের পথ হইবে, তাহা অনেকেই মনে করেন না। প্রথম কথা, ঐ সকল বস্তু বাজারে প্রচলিত দক্ষ লোকের হাতের কাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না, সুতরাং যাহা ছাত্রদের অভিভাবকেরা মনে করেন তাঁহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু তাহা শীঘ্রই সমাজের প্রয়োজনে অবান্তর হইয়া পড়িতে পারে; সুতরাং তাহার মূল্য হ্রাস পাইয়া স্তূপাকারে পড়িয়া থাকিতে পারে। আরও একটি মত আছে। হয়ত একই কাজ বৎসরের পর বৎসর বা বাধ্যতামূলকভাবে করিতে হইলে এবং কিশোরেরা অন্ততঃ কেহ কেহ যখন বুঝিতে পারিবে যে, তাহার আয়ে তাহার পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় তখন তাহার মনোভাব শিক্ষালাভের অনুকূল না হইতে পারে। এরূপ মত পশ্চিম বাংলা সরকারের শিক্ষা-বিভাগের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট হইতেও শুনা গিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে এই কথা সাধারণ লোকের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়।

অপরপক্ষে, যাঁহারা বনিয়াদী শিক্ষাদানকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন তাঁহারা নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে বলিয়া থাকেন যে, শিশু এবং কিশোরের হাতের কাজ একেবারে মূল্যহীন ত নয়ই, বরং অনেক বিদ্যালয় আছে যেখানে হিসাব রাখিয়া দেখা গিয়াছে, বাস্তবিকই যে আয় হয়, তাহা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। যাঁহারা "উৎপাদনাত্মক" কাজে আস্থাবান তাঁহারা মনে করেন, ভবিষ্যতে প্রাথমিক বিদ্যালয় নিজের ব্যয় নিজেই নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে। কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে ইহাও বলা যায় যে, ছাত্ররা খুবই আনন্দের সহিত কাজ করে; মানসিক "বিকার" অনুভূত হয় নাই।

বনিয়াদী শিক্ষার ব্যাপারে শহরের কথা একবার ভাবিয়া দেখিতে হয়। শিল্পের মাধ্যমে, বিশেষতঃ চরকা তাঁতের সাহায্যে শিক্ষাদান করিতে বিদ্যালয়-কক্ষের যেটুকু পরিসর প্রয়োজন, তাহা শহরে মিলা কষ্টকর। অসুবিধা অবশ্যই আছে, কিন্তু এখানেও অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায়, একটি ঘরকে শিল্পশিক্ষার "কেন্দ্র" বলিয়া নির্দিষ্ট রাখিয়া অসুবিধা সত্ত্বেও কাজ চালাইয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছু কিছু শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং তাহা সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইতেছে। সেগুলির কোনটিই বনিয়াদী শিক্ষার অঙ্গরূপে পরিচালিত হয় না, এই যা পার্থক্য।

তর্ক করিলে, তর্কের নিবৃত্তি নাই। কিন্তু শিক্ষা-বিস্তার তর্কের ক্ষেত্র নয়, কাজের ক্ষেত্র। সুতরাং তর্ক-বিতর্ক ছাড়িয়া প্রকৃত কাজ কিসে হয়, তাহার চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন। আমাদের বাংলাদেশে অন্ততঃ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে নানা কারণে বনিয়াদী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা এ পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ এতাবৎ

কাল তাঁহারা মনস্থিরই করিতে পারেন নাই। ১৯৪৯ সালে ২৯শে জুন তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি স্থির হইয়াছে। বেসরকারী কোনও কোনও প্রতিষ্ঠান পূর্ব্বে কার্য্যারম্ভ করিয়াছে, তন্মধ্যে কলিকাতার দক্ষিণে হোটর ও মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিহার এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী; অপরাপর প্রদেশেও কাজ চলিতেছে। নূতন পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার-কার্য্যে আর বিলম্ব হইবার কোনও কারণ নাই। কয়েকটি প্রধান বিষয়ে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি একমত হইয়াছেন। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি কেবলমাত্র যে ছাত্রদের পক্ষে অনুপযোগী তাহা নহে, তাহা কতক পরিমাণে ক্ষতিকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। শিশুশিক্ষায় শিশুর কিছু "হাতিয়ার" প্রয়োজন; হাতের ভিতর দিয়া যে জিনিষ "মাথায়" প্রবেশ করে ("from the hand and the senses to the brain and the heart") তাহা সহজে বোধগম্য হয় এবং বহুদিন তাহা মনে থাকে। সুতরাং কেবল আমাদের দেশে নয়, অপরাপর সভ্যদেশে ছেলেদের যতদূর সম্ভব হাতের কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শিল্পের মাধ্যমে সকল রকম শিক্ষা দেওয়া সম্ভব কিনা, সে বিচারেরও কতকটা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। যতদূর সম্ভব শিল্প সংক্রান্ত দ্রব্যাদির সাহায্যে শিক্ষা দিবার চেষ্টা চলিতে পারে। যাহা বাকী আছে বলিয়া মনে হইবে, তাহার জন্য পুস্তকাদির সাহায্য গ্রহণ করিলে আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না।

শিল্পশিক্ষায় কাহারও কোনও আপত্তি উঠে নাই। যাঁহাদের আপত্তি থাকিতে পারে, তাঁহাদের জন্য দেশের বহু বিদ্যালয় থাকিবে, যেখানে তাঁহারা আপন আপন পুত্র-কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইতিমধ্যে বনিয়াদী শিক্ষার উপযোগিতার পরীক্ষা শেষ হইবে এবং আশা করা যায় তাহার ফলাফল দেখিয়া বনিয়াদী শিক্ষাদানে আর কাহারও আপত্তি থাকিবে না।

একসঙ্গে অনেকে হাতে কাজ করায়, এবিষয়ে যে শ্রেণীর লোকের আপত্তি থাকিতে পারে, তাহা দূর হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে হাতের কোনও কাজ করার অনভ্যাসবশতঃ আমরা হাতের কাজকে হীন বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছি, ফলে তথাকথিত ভদ্রঘরের ছেলেদের মধ্যে ত বটেই, এমন কি তাহাদের "সংস্পর্শে" আসিয়া কৃষক এবং শিল্পী ঘরের ছেলেরাও "দুপাতা" পড়িতে শিখিয়া ঘরগৃহস্থালির কাজ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান শিক্ষার এই গুরুতর দোষ বনিয়াদী শিক্ষা সাহায্যে দূর হইবে এবং ছোটবেলা হইতে এই সকল কাজে অভ্যস্ত হইয়া গেলে জীবনের কোনও অবস্থায়ই হাতের কাজকে "ছোট" বলিয়া মনে করিবার সুযোগ হইবে না।

হাতের কাজে সময় নষ্ট হইবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে শিক্ষা করা হাতের কাজ উত্তর জীবনে কাজে লাগিবে না বলিয়া একটা মত আছে। আমার কথা, বর্ত্তমানে বহু ছাত্র প্রাথমিক শিক্ষালাভ সম্পন্ন না করিয়াই পড়া ছাড়িয়া দেয়, তাহারা আবার নিরক্ষর হইয়া পড়ে। যত ছাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে তাহার শতকরা কতজন বর্ত্তমানে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে যায়, তাহার হিসাব লইলে এ সম্বন্ধে আর কাহারও আপত্তি থাকিবে না। তাহা ছাড়া হাতের কাজ একেবারে কেহ ভুলিতে পারে না। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, গরীব গৃহস্থ-ঘরের ছেলে, বাড়ীতে যে মজুর যখন খাটিত, ছুতারের কাজ, মাটিকাটা, কাঠকাটা, কোদাল পাড়া, ঘাস নিড়ানো, খড়কাটা, গোয়ালের কাজ, কাঁচা ইট (ফর্ম্মায় ফেলিয়া) তৈয়ারী, জাল ফেলা, ঘর ছাইবার জন্য খড় উপযুক্তভাবে সাজানো প্রভৃতি যে সকল কাজ শিখিয়াছিলাম তাহা আজও ভুলি নাই, অনভ্যাসের দরুন হয়ত সে দক্ষতা নাই। আমার নিজের বিশ্বাস এ সকল কাজ সাঁতার কাটা, সাইকেল চড়া শেখার মত; একবার আয়ত্ত হইলে কেহ ভুলে না। বার্দ্ধক্যে আর এ দুইটা কাজের কোনটাই চর্চ্চা করিবার এমন কি দস্তুরমত পরীক্ষা করিবার সুযোগ-সুবিধা নাই। তথাপি মনে ভরসা আছে, ইহাদের কোনটাই ভুলি নাই। কাজে কাজেই, যাহারা বাল্যে হাতের কাজে আনন্দলাভ করিবে এবং ইহাতে কতকটা দক্ষতা অর্জ্জন করিবে, তাহারা উহা একেবারে ভুলিবে না; জীবনের কোন না কোন সময়ে ইহা তাহাদের কাজে লাগিবে।

যাহারা একবার একটা শিল্পশিক্ষার স্বাদ পাইয়াছে, তাহাদের প্রথম অসুবিধা দূর হইয়াছে—তাহা অহঙ্কার; দ্বিতীয়তঃ তাহারা পাইয়াছে, কর্ম্মে চাড়মিশ্রিত দক্ষতা; ইংরেজীতে ইহাকে "aptitude" বলা চলে। যে একটা কাজ শেখে, সে মনে মনে অন্ততঃ সাহস রাখে, অপর একটা শিখিতে পারিবে; একেবারে না জানিলেও হাত চোখ মন যখন একসঙ্গে চালাইতে শিখিয়াছে, তখন সে অপর একটা শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে বনিয়াদ শক্ত করিয়া লইয়াছে, নূতন ক্ষেত্রে সে নিজেকে একান্ত অসহায় বোধ করিবে না।

ছাত্রদের আয়ে স্কুল চলিবে কিনা, তাহা লইয়াও আর মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন দেখি না। যদি ছাত্রদের আয়ে বিদ্যালয়ের কতকটা ব্যয়ও নির্ব্বাহ হয়, তাহাতে আশা

করি, কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। সুতরাং এ বিশ্বাস যাঁহারা রাখেন এবং তাঁহারা যদি উহা কার্য্যে পরিণত করিবার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত থাকেন, তাহা হইলে দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাদের উপর কতকটা ভার অর্পণ করিতে গবর্ণমেণ্ট যেন দ্বিধাবোধ না করেন। এ রকম বৈপ্লবিক নূতন পদ্ধতিতে পরীক্ষা করিতে কিয়ৎ পরিমাণ অপব্যয় হওয়া সম্ভব। অন্ততঃ তাহা মনে করিয়াও এ ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য করা প্রয়োজন। যতদূর জানি, যাঁহারা এই বিশ্বাসে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারা গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত—অনেকেই জনসেবা, সমাজের কল্যাণকর কার্য্য বলিয়া ইহাতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; অর্থের স্পৃহা ইঁহাদের বিচলিত করিতেছে না। সুতরাং শিল্পজাত দ্রব্য হইতে আয় হইবে এই মনে করিয়া অগ্রসর হওয়া ভাল। মহাত্মাজীর সহিত কাজ করিয়া যাহারা আত্মবিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তিরাই ইহার ভার লইয়া কাজ করিতেছেন।

তাহার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কার্য্যপদ্ধতি সকলের সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়াছে। তাহার কোনও পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন প্রয়োজন কিনা, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে। যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাদের শিক্ষা-পদ্ধতিও শিল্পের মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষাদান নয়। শিশু যে কাজটি ভালবাসে তাহাকে বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে তাহা দিয়া, নানাপ্রকার দ্রব্যাদির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে আপত্তির কারণ নাই, তবে আপত্তি আছে তাঁহাদের যাঁহারা basic education সম্পর্কে মহাত্মার ব্যাখ্যা পুরাপুরি গ্রহণ করেন।

আমার মনে হয়, এই শিক্ষাবিস্তারের প্রধান অভাব উপযুক্ত শিক্ষক। শিল্পের মাধ্যমে সকল প্রকার শিক্ষা দিবার মত জ্ঞান কত জন যুবক ম্যাট্রিক পাস করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে, তাহা একটা বিরাট প্রশ্ন। বি-এ পাস করিয়াও এ জাতীয় শিক্ষা দিতে কতটা অধিকার জন্মে তাহাও বিচার্য্য; তাহার উপর শিল্প-শিক্ষাদান সম্বন্ধে নিজের জ্ঞান ও তাহার প্রয়োগের অধিকার থাকা চাই।

যখন এইরূপ জ্ঞান একজন শিক্ষকের নিকট আশা করি, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দ্ধারিত প্রারম্ভিক বেতন ৩৫ টাকা (৩৫—৪।২—৭৫—৫।৩—৮০) কত জন গুণীকে আকৃষ্ট করিবে তাহা সন্দেহের বিষয়। ইহার পরিবর্ত্তন সংসাধিত না হইলে, বনিয়াদবিহীন বনিয়াদী শিক্ষা সুরুতেই বানচাল হইয়া যাইবে।

আরও একটি কথা ভাবি। অনেকে মনে করিতেছেন, বনিয়াদী শিক্ষা, বিশেষ করিয়া ইহা যখন ত্যাগীশ্রেষ্ঠ গান্ধীজী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত তখন ইহাতে বেশী খরচ পড়িবে না। এরূপ মনে করিলে, কতকটা ভুল করা হইবে। কোনও বিদ্যালয়ে একাধিক শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে কেবল যে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন তাহা নহে, তাহার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও উপযুক্ত পরিসর স্থানেরও আবশ্যক হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনে করিয়াছেন, দুই একর জমি এবং ঘর তৈয়ারী প্রভৃতির কতক খরচ স্থানীয় লোকের নিকট পাওয়া যাইবে। লোকের বর্ত্তমান আর্থিক এবং কিয়ৎ পরিমাণে মানসিক অবস্থার কথা জানা থাকায় বলিতে ইচ্ছা হয়, যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহাদের উপর বিশেষ ভরসা করেন তাহা হইলে বনিয়াদী শিক্ষা বিস্তারে এখনও বহুদিন সময় লাগিবে।

কবির সন্ধান

শ্রীকালিদাস রায়

কবিরে খুঁজিছ কোথা, এই দেহ মাঝে সে ত নাই,
তোমাদের মত মোর এই দেহ খেলবার ঠাঁই,
আমি যবে কাব্য রচি তখনো পাবে না তার দেখা,
দেহী আমি সে কবিরে বিন্দু বিন্দু জীবন যোগাই।

আমি কে? আমি ত শুধু চিরদিন সেবক তাহার,
মোর আহরণ যত তার শুধু মনের আহার
মোরে কবি বলি' কেন বৃথা বন্ধু, কর সম্ভাষণ,
তোমাদেরি চিত্তলোকে নিত্য কবি করিছে বিহার।

তোমাদেরি মনোলোকে ভূমিষ্ঠ হ'লাম একদিন
কবিরূপে, অন্বেষণ নয় তার এ ধরা কঠিন।
তোমাদেরি প্রীতিরসে শৈশবে সে হয়েছে লালিত,
আগে সেই সেথা রহি' বাজাতেছে যৌবনের বীণ।

আমারে ধরেছে জরা, নয়নের দীপ্তি আসে নিভে।
চিত্ত হতে চিত্তান্তরে কোথা তব কবিরে ঢুঁড়িবে,
রসিকের চিত্তে তার কোন দিন নাহিক মরণ
চিত্ত হতে চিত্তান্তরে চিরদিন আনন্দে ঘুরিবে।
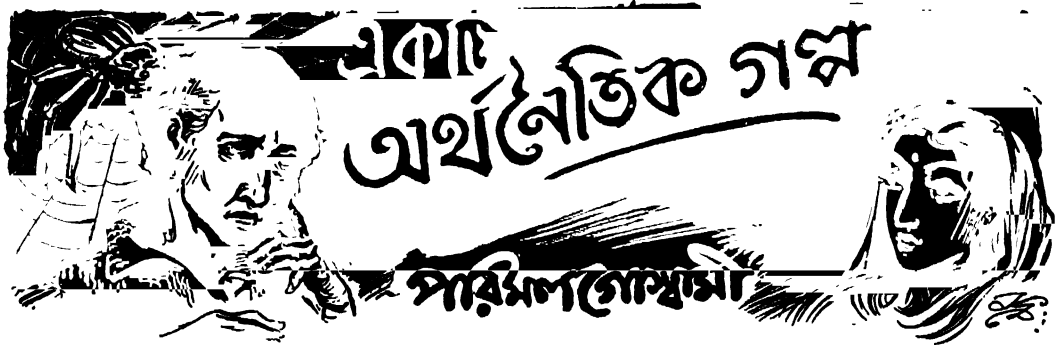
ভবানন্দ, মুকুন্দ আর জনার্দন।

ওরা তিন জনেই ছিল আমার সহপাঠী নিকট বন্ধু। আমরা ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত একসঙ্গেই ছিলাম, কিন্তু তারপর আমি প্রাণী-বিজ্ঞান এবং ওরা ইতিহাস ও অর্থনীতির দিকে ঝোঁকাতে আমাদের পথ পৃথক হয়ে গেল, ওরা শেষ পর্যন্ত হ'ল কলেজের প্রোফেসর, আর আমি আমার পৈতৃক সঞ্চয় আর নিজস্ব বিদ্যার সাহায্যে আমার বাড়ীর বহিরঙ্গনের এক নির্জন কোণে কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা সুরু করলাম।

কিন্তু এ আমাদের নিতান্তই বাইরের পরিচয়, এতে আমাদের বন্ধুত্ব কিছুমাত্র নষ্ট হয় নি, কারণ ঐ তিন জনের চরিত্রে এমন এক মহা আকর্ষণীয় গুণ ছিল যা আমাকে মুগ্ধ করত, হয় তো ওদের প্রতি আমার যে সহৃদয় ঔদার্য ছিল তাতে আমিও ওদের মুগ্ধ করে থাকব।

ওরা ছিল সম্পূর্ণ অভিনব চরিত্রের, ওদের চিন্তায় এবং কাজে একটা কৌতুককর মৌলিকত্ব ছিল যাতে ওদের চারপাশের আবহাওয়া হাসিতে হল্লাতে নাচে গানে সব সময় উজ্জ্বল হয়ে থাকত। এমন কি প্রোফেসর হবার পরেও যখন সামান্য বেতনে ওদের চলা দুঃসাধ্য হ'ল তখন বিনা দ্বিধায় মুখে রং মেখে, ঘুঙুর-পায়ে সন্ধ্যাবেলা পথে পথে নেচে গেয়ে পেটেণ্ট ওষুধ বিক্রি করতে সুরু করল, এবং দিনের ও রাতের উপার্জন মিলিয়ে সচ্ছলতার সঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ সরসতা বজায় রেখে চলল।

এর মধ্যে কত ঝড়-ঝঞ্ঝা এবং ঝঞ্ঝাট দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেল, কত দাঙ্গা, কত মৃত্যু, কিন্তু তবু ওদের উচ্ছলতা কিছুমাত্র দমল না, বরঞ্চ নব স্বাধীনতার দমকা হাওয়ায় ওদের প্রাণধর্ম আরও খানিকটা মাথা তুলে সবার উপর দিয়ে দুলতে লাগল। শুধু দোলা নয়—সে মাথায় সর্বত্র গুঁতো মেরে বেড়ানোর প্রবৃত্তিটিও বেশ ভালই জেগেছিল, আর তার প্রমাণও পেলাম আমারই গবেষণা-ঘরে।

দমকা হাওয়ার মতোই এসে ঢুকল একদিন ওরা তিন জন—হল্লা করতে করতে। মুকুন্দ হাসতে হাসতে আমাকে দুই ঝাঁকানি দিয়ে বলল, "কীটের সঙ্গে তুইও কীট হয়ে পড়েছিস, একবার বাইরে যা—বাইরে যা—দেখ্ কি আনন্দোৎসব চলছে সেখানে।" ভবানন্দ হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠল, "এ কি! আজকের দিনে তুই এতগুলো প্রজাপতিকে বন্দী করে রেখেছিস"—বলতে বলতেই আমার প্রজাপতির বাক্স খুলে সবগুলোকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। কিন্তু তারা হাওয়াতেই যেটুকু উড়ল, তার বেশি নয়, কারণ সেগুলো সবই বহুদিনের মরা প্রজাপতি। জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে ছিল কতকগুলো মাকড়সা, তবে তারা বন্দী ছিল না, তাদেরই জালে স্বাধীনভাবে বসে ছিল, কিন্তু জনার্দনের তা পছন্দ হ'ল না, সে সেই জাল ছিঁড়ে দিল অকারণ।

আমি বললাম, "আঃ! তোরা করছিস কি, এলি অনেক দিন পরে, স্থির হয়ে বোস্—"

ভবানন্দ চীৎকার করে বলল, "স্থির হয়ে বসব কি রে? কি সব ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে তোর যে হৃদয়ঙ্গমই হচ্ছে না।"

"কি এমন ঘটে যাচ্ছে?"

ভবানন্দ লাফিয়ে উঠে বলল, "স্বাধীনতা!—সবার চেহারা বদলে যাবে—যা কিছু পুরনো সব নতুন হয়ে যাবে—যা কিছু—"

মুকুন্দ আমার একখানা হাত খপ্ করে ধরে উন্মাদের মতো আমার দিকে চেয়ে বলল, "শুধু চেহারা বদলাবে না, নামও বদলাবে। তোমার ঐ হুগলী নদী আর হুগলী নদী থাকবে না—ঢাকুরিয়ার হ্রদ আর ঢাকুরিয়া হ্রদ থাকবে না—বঙ্গোপসাগরও নতুন নাম পাবে।"

আমি বললাম, "কি রকম?"

মুকুন্দ বলল, "হুগলী নদীর নাম হবে মধুমতী—কারণ সেখানে জলের বদলে বয়ে যাবে মধু—আর মধু। ঢাকুরিয়া হ্রদের নাম হবে দুগ্ধ-সরোবর। কত দুধ চাই? দুধে আর কেউ জল মেশাবে না, জলে দুধ মেশাবে, কারণ নির্জলা জলই হবে তখন দুষ্প্রাপ্য। আর মাছেরা কি করবে প্রশ্ন

তুললি না তো ?—সব মাছ বাসা নেবে তখন সমুদ্রে—মাছের পাহাড়ে গুঁতো খেয়ে জাহাজ ভেঙে যাবে। আর আজ বাজারে মাংস পাওয়া যাচ্ছে না, দু'দিন পরে কি হবে ভেবেছিস ? লাখ লাখ ভেড়া, পাঁঠা, মুরগী তোর দরজায় এসে ভিড় করবে—কাকে রাখবি কাকে খাবি ?"

বলতে বলতে তিন ভূতপূর্ব অধ্যাপক দাঁতের মাজনের গান গেয়ে নাচতে সুরু করল, আমি সভয়ে আমার মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রটি আলমারীতে বন্ধ করলাম। ওরা বিজ্ঞান-ঘরে উল্লাসের যে ঘূর্ণি হাওয়া বইয়ে দিল, সাময়িক-ভাবে আমিও ওদের স্ফূর্তিতে যোগ না দিয়ে পারলাম না। তার পর যাবার সময় আমাকে টানতে টানতে পথে বের করে বলল, "আর ঘরে ফিরিস না এখন।"

ভিতরে ভিতরে সামান্য একটু আশা বা বিশ্বাসের দানা থাকলে ওরা এই ভাবেই তাকে কেন্দ্র করে অনেক কিছু ফাঁপিয়ে বলতে পারে, সুতরাং দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ওদের মনে যে কিছু আশা ছিল এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। ওদের কথা শুনে তাই আমারও মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে রইল।

কিন্তু ক্রমে দিন যায়, দেখি লোকের মুখ শুকনো, তাতে নিরাশার ছায়া। বাজারে না কি চাল দুর্লভ, কাপড় পাওয়া যায় না, খবর পাই ; ক্রমে চিনি, কয়লা, নুন, অদৃশ্য হচ্ছে। সরষের তেল নেই, ঘি নেই, দুধ নেই, মাছ নেই, মাংস নেই।

আর সবচেয়ে শোচনীয়, কিছুকাল ভবানন্দ, মুকুন্দ এবং জনার্দনেরও দেখা নেই। এই শেষের ঘটনাটিই আমার কিছু উদ্বেগের কারণ হয়ে রইল। ওরা কেমন আছে এখন, কে জানে। কি করে যে ওদের চলছে কল্পনা করতে পারি না। কলেজের বেতনে চলা অসম্ভব, হয় তো ফেরিওয়ালার কাজে বেশি মন দিয়েছে, কিংবা অন্য এমন কোনো কাজ, যাতে আর দেখা করার সময় পাচ্ছে না।

মানুষের জগৎ হতে দূরে থেকে আমার ভালই হয়েছে এ কথা চিন্তা করি মাঝে মাঝে। আমার কীটপতঙ্গের জগতে কোনো রূপান্তর নেই, তাই আমার দিন কাটে ভাল। সম্প্রতি মৎস্যভুক মাকড়সা নিয়ে একটা গবেষণায় মেতে আছি। জলাধার থেকে মাছ টেনে তুলে কি কৌশলে সেটাকে খাওয়ার ব্যবস্থা করছে। কৌশলগুলো দিনের পর দিন লক্ষ্য করছি আর নোট বইয়ে টুকে টুকে রাখছি। বিষয়টি এমনই আমাকে ডুবিয়ে রেখেছে যে, আমার কাছে সংসারের আর সব মিথ্যা হয়ে গেছে। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক্, শুধু আমি থাকি আর থাক এই গবেষণাগারটি। আমাকে ঘিরে মধুর হাওয়া বয়ে যায়, আমার এখানে যে ফুলের গাছগুলি আছে তার উপর রোদ এসে খেলা করে, জলাধারটি ঝল্‌মল্ করে ওঠে, মাছেরা চঞ্চল হয়ে ওঠে, পাখীরা গান গায়, সব মিলিয়ে আমার এই নির্জন অঙ্গনটি এক অপার্থিব আনন্দ-রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু যখন মনে পড়ে (এবং বর্তমানে মাঝে মাঝেই মনে পড়ছে) যে আমার ব্যাঙ্কের হিসাবে জমার দিকটি বেশ খালি হয়ে এসেছে তখন মনটা দমে যায়, তখন বুঝতে পারি এক দিন (এবং সে দিনের বেশি দেরি নেই) আমার এ রাজ্যটির আর অস্তিত্ব রাখা সম্ভব হবে না, এবং শেষ পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে গিয়েই মিলতে হবে, জানি না নাচতেও হবে কি না। সুতরাং দেশের অবস্থা একটু তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার এ বিষয়ে মানসিক উদ্বেগ ক্রমশই অদম্য হয়ে উঠছে। এমন সময় আমার মনে আশা জাগিয়ে ভবানন্দ, মুকুন্দ এবং জনার্দন এসে পড়ল এক দিন ধূমকেতুর মতো। আমিই এবারে আনন্দে নেচে উঠলাম এবং প্রশ্নের পর প্রশ্নে ওদের অস্থির করে তুললাম।

কিন্তু ওদের খবর ভাল নয়। যা শুনলাম তা এই যে, ছদ্মবেশ ধরা পড়াতে কলেজের চাকরী গেছে তিনজনেরই। কর্তৃপক্ষ বলেছিলেন, "কলেজে থাকতে হলে সান্ধ্য ব্যবসা ছাড়তে হবে, আর যদি ব্যবসা রাখতে চাও তা হলে কলেজ ছাড়।" ওরা তিন জন অনেক পরামর্শ করে কলেজ ছেড়ে দেওয়াই ঠিক করেছে, কেননা মুখে রং মেখে নেচে গেয়ে ফেরি করায় উপার্জন অনেক বেশি। তা ছাড়া ছদ্ম-বেশী ফেরিওয়ালা হওয়াতে প্রোফেসর হিসাবে কলেজে যে পরিমাণ সম্মানের হানি হয়েছে, ক্রেতারা ঘুঙুর পায়ে রং-মাখা ফেরিওয়ালামাত্রকেই কোনো না কোনো কলেজের ছদ্মবেশী প্রোফেসর মনে করে সেই পরিমাণ খাতির করছে। ফলে সন্ধ্যাবেলার এই নৃত্যরত ব্যবসায়ীমাত্রেরই খুব সুবিধা হয়ে গেছে।

মুকুন্দ বলল, "তা ছাড়া ফেরিওয়ালার একটা ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু কলেজের প্রোফেসরের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, বিশেষ করে বাংলা বিভাগের পর কলেজে ছাত্রের সংখ্যা আর প্রোফেসরের সংখ্যা দুই-ই বেড়ে গেছে এবং বোধ হয় প্রোফেসরের সংখ্যাই বেশি হয়েছে আর তার ফলে আগে যেখানে একই প্রোফেসর মজুরদের মত দু' শিফ্‌ট তিন শিফ্‌ট করে কাজ চালিয়ে 'এক্সট্রা' পেত, এখন আর সে সুযোগ ততটা নেই। প্রোফেসরদের মধ্যে যারা চতুর তারা সবাই খবরের কাগজে ঢুকে গেছে, আর যারা আমাদের মত বেপরোয়া তাদের দিন চলছে না।"

আমি বললাম, "কিন্তু দেশের এ অবস্থায় ফেরি করার

ভবিষ্যৎই বা কোথায় ? ফেরিওয়ালার সংখ্যাও তো অনেক বেশি হয়েছে শুনেছি।"

এই প্রশ্নে ওদের তিন জনেরই মুখ থেকে নিরাশার অন্ধকার দূর হয়ে দপ্ করে আশার আলো জলে উঠল।

ভবানন্দ বলল, "দেশের অবস্থা তো ফিরছে অল্প দিনের মধ্যেই, কাজ সুরু হয়ে গেছে, যুগান্তরকারী সব পরিকল্পনা, ভয়টা কিসের ?"

মুকুন্দ বলল, "এক দামোদর বাঁধ তৈরি হলেই আমাদের সব অভাব ঘুচে যাবে।"

জনার্দন বলল, "কিন্তু তারও আগে আমাদের দুধের অভাব একেবারে মিটে যাচ্ছে, দেখ নি খবরের কাগজে পশ্চিমা গোরুর ছবি ?"

আমি কাগজ কদাচিৎ পড়ি, তাই জানতাম না।

জনার্দন বলতে লাগল, "শুধু তাই নয়, ফসল বাড়াও আন্দোলন আছে এর সঙ্গে। সব যদি মিলিয়ে দেখ, তা হলে বুঝতে পারবে আমাদের মুখের রং অল্পদিনেই ধুয়ে ফেলতে হবে, তখন আর ফেরিওয়ালা সেজে নাচব না, আনন্দে নাচব।"

লক্ষ্য করে দেখলাম তিন জনেরই পা একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার পর হঠাৎ দেখি মুকুন্দ এক লাফে উঠে গিয়ে আমার ফুলের গাছগুলো উপড়ে তুলে ফেলছে আর চীৎকার করে বলছে, "এখানে বেগুন লঙ্কা সিম যা হয় লাগাও, ফুল আর চলবে না।"

জনার্দন টেবিল থেকে একটি কাচের লম্বা গলা পাত্র তুলে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমি বাধা দেবার আগেই কাজটি শেষ হয়ে গেল ; বলল, "এ সব আর কি কাজে লাগবে ? আনন্দ কর, আনন্দ কর।"

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, যাবার সময় লক্ষ্য করলাম ওদের চোখের চারদিকে একটা কালো চক্র দেখা দিয়েছে।

বেশ বোঝা গেল ভিতরে ভিতরে ওদের মনের মধ্যে নৈরাশ্য স্থায়ী বাসা বেঁধেছে, বাইরে যে আশার কথা শোনাতে চেয়েছিল তা ওদের হয় তো অন্তরের কথা নয়, তাই গাছ উপড়ে এবং কাচের পাত্র ভেঙে যে আনন্দের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছিল তার সঙ্গে ওদের মনের সুর মিলল না ; কয়েক মাস আগে হলে ওদের এই ভাঙাচোরার কাজে হয় তো আমিও যোগ দিতাম, কিন্তু আজ পারলাম না বলেই আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। আমার মনে একটি প্রশ্ন ভেসে উঠল, অদম্য আশার সৌধ যদি এমন করে ভেঙে পড়তে পারে, তা হলে আমিই কি সংসার থেকে পালিয়ে একা বেঁচে যাব ?

এর পর মাসখানেক কেটে গেছে।

সন্ধ্যার দিকে, কাছাকাছি ম্যাডক্স স্কোয়ারের এককোণে মাঝে মাঝে চুপচাপ গিয়ে বসে থাকা আমার অভ্যাস। আমি যে কোণটিতে প্রায় বসি, সেদিন দেখি তিনটি কঙ্কালসার ব্যক্তি সেখানে বসে হাই তুলছে। একটু কাছে আসতেই চিনতে পারলাম তাদের এবং চিনে চমকে উঠলাম। আলাপের ভাষা খুঁজে পেলাম না, পুরনো কথাই তুললাম—জিজ্ঞাসা করলাম, "দামোদর বাঁধের খবর কি ?"

ভবানন্দ বলল, "দামোদর বাঁধ বোধ করি এ-জীবনে আর দেখা যাবে না।"

"দুগ্ধ পরিকল্পনা ?"

"ফোটোগ্রাফটি রেখেছি সঙ্গে, আর কিছু জানি না।"

"ফসল বাড়াও আন্দোলন ?"

"আর এক পুরুষ পরে জিজ্ঞাসা করিস।"

তার পর শুরু হ্যাস হেসে বলল, "কিছু টাকা ধার দিতে পারেন—অবশ্য শোধ দেওয়া সম্পর্কে একটু সন্দেহ রেখেও ?"

বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলাম ওদের।

ইতিমধ্যে আমার একটি গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি নিজের কাজে মেতে থাকি সেজন্যে বাইরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কম, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের ঘরের প্রতিও আমি যে এমন উদাসীনতা প্রকাশ করে এসেছি তা এত দিন খেয়াল করিনি। এক দিকের একাগ্রতা ভেঙে যাওয়াতে এত দিনে অন্য দিকেও দৃষ্টিপাতের সুযোগ এল। হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার স্ত্রী শ্রীমতী অমলা ভয়ঙ্কর রকম রোগা হয়ে পড়েছে। আমাদের বিবাহ হয়েছে পাঁচ বছর। স্বাস্থ্যবতী শিক্ষিতা স্ত্রী, ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করেছে, কিন্তু বিবাহিত জীবনে সে সর্বদা তার বিদ্যার পরিচয় ঢেকে রাখারই চেষ্টা করে এসেছে, কারণ সামান্য শিক্ষা পেয়ে মেয়েরা সাধারণতঃ যে পুরুষোচিত উগ্রতা এবং রুক্ষতায় নারীধর্ম হারিয়ে ফেলে, অমলা ছিল তাদের চেয়ে স্বতন্ত্র। সে ছাত্রীজীবনে নীরবে দেশসেবা করেছে, কারণ তার দেশপ্রেম ছিল উগ্র রকমের আন্তরিক। আমি তাকে পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছি, তারই হাতে সংসারের সকল ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আমার কাজ করে চলেছি। কিন্তু তার স্বাস্থ্য হঠাৎ এমন ভেঙে পড়ল কেন ? সংসার খরচে কার্পণ্য করার কথা নয়, অসুখের কথাও কখনও শুনি নি।

মাস তিনেক আগে এক দিন সে আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল ইকনমিক্সের তত্ত্ব। বলেছিল বিদেশ থেকে যে খাদ্য বা যা-কিছু আমদানি করতে হচ্ছে, তা যদি কিছু দিন একই ভাবে চলে তা হলে এ দেশ আরও গরিব হয়ে যাবে, সেজন্যে প্রত্যেকেরই উচিত প্রাণপণে দেশের প্রয়োজন দেশের মধ্যেই মেটাবার চেষ্টা করা। নইলে যন্ত্রপাতি কেনার টাকা থাকবে না, আর যন্ত্রপাতি যথেষ্ট কিনতে না পারলে দেশের কোন পরিকল্পনাই সফল হবে না।

কিন্তু আমি তখন গবেষণার এমন এক পর্যায়ে উপনীত যে, অর্থনীতির তত্ত্বে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারি নি।

আজ হঠাৎ মনে হ'ল এ কি সেই অভিমানের ফল ?

আমি নিজের অপরাধ উপলব্ধি করে কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে উঠলাম, আর তার ফল যা জানা গেল তাতে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। জানতে পারলাম অমলা প্রধানতঃ বাজারের ইনফ্লেশন কমানোর সাহায্য হবে বলে সংসারের খরচ যথাসাধ্য কমিয়ে দিয়েছে। টাকা বাজারে বেশি ছাড়লে জিনিসের দাম কখনো কমতে পারে না, তাই আমার খাদ্যমান যথাসম্ভব বজায় রেখে নিজের এবং অন্যান্য সবার বরাদ্দ একেবারে কমিয়ে ফেলেছে। তা ছাড়া যে বিদেশী গুঁড়ো দুধ আমাদের উভয়ের বরাদ্দ ছিল তা থেকে তার নিজের অংশটি একেবারেই বাদ দিয়েছে। এই গুরুতর অন্যায়টি সে কেন করল ক্ষোভে দুঃখে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে সংক্ষেপে ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল, "ডলার বাঁচাচ্ছি।"

আমার গবেষণা চুলোয় গেল, আমি প্রায় ক্ষেপে গেলাম। এর পর থেকে আমি আর পুরো বিজ্ঞান-গবেষক নই, পুরাপুরি পুরুষ হয়ে উঠলাম এবং নিজ হাতে সংসারের ভার নিয়ে এই গুরু অন্যায়ের প্রতিকারে মন দিলাম। আমার সংসর্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছাত্রীই রয়ে গেছে, গৃহিণী হতে পারে নি—সে দোষ সম্পূর্ণ আমারই।

দৈনন্দিন সংসার চালানোও একটা বিদ্যা এবং এর মধ্যেও একটি বিজ্ঞান আছে, আনন্দও আছে। এতদিন আমার জগৎটা ছিল নিতান্তই কীটপতঙ্গের জগৎ, এখন দেখি মানুষের জগৎও সুন্দর।

একদিন মুকুন্দ আমার মরা প্রজাপতি হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিল, তার মধ্যে মস্ত বড় একটা ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিল। আমার মনে হতে লাগল আমারই বন্দী মৃত মনটাকে সে বাইরের আলো-হাওয়ায় নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল। তার পর ওরা যতবার এসেছে ততবারই আমার গবেষণাগারের আবহাওয়াকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে চেয়েছে। আজ এসে যদি ওরা সব লুণ্ঠন করে নিয়ে যায় তা হলেও হয়তো আর দুঃখ হবে না। কিন্তু ওদের যে অবস্থা সেদিন দেখেছি—আর কি কখনো ওরা আসবে ? জীবন-যুদ্ধের প্রায় শেষ ধাপে পৌঁছে আর কোন্ আশা নিয়ে এখনও বেঁচে থাকবে ?

কিন্তু ওরা বেঁচে ছিল, এবং ভাল ভাবেই ছিল তার প্রমাণ পেলাম মাস দুই পরে।

এক দিন ওদের সম্বন্ধেই ভাবছিলাম, এমন সময় চিন্তার অন্ধকার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে তিন বন্ধু যেন একটা উগ্র আলোয় জ্বলতে জ্বলতে এসে হাজির হ'ল। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম তাদের দিকে চেয়ে। দেখলাম তাদের চেহারার অনেক উন্নতি হয়েছে, চোখের চারদিকের সেই কালো চক্র আর নেই, তার বদলে কালো-চশমা—ছদ্মবেশ ধরতে যা ব্যবহার করত। হাড়ে মাংস লেগেছে, চালচলন ভাবভঙ্গি সম্পূর্ণ অভিনব, চেহারা উজ্জ্বল, পরনে সম্পূর্ণ জাতীয় পোশাক, এবং সবচেয়ে

বিস্ময়কর, তারা হিন্দিতে কথা বলছে। দেখেশুনে কৌতুক বোধ করলাম, আনন্দও হ'ল খুব। মনে হ'ল রাজধানী থেকে কোনো বড় চাকরি বা কোন বড় দাঁও মেরে থাকবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কোনো পরিকল্পনা কি তা হলে ইতিমধ্যেই সফল হয়েছে?—দেশোন্নতির কোনো বৈপ্লবিক পরিকল্পনা?"

ওরা তিন জন একসঙ্গে হেসে উঠল। ভবানন্দ বলল, "কি পরিকল্পনা?"

"যেমন দামোদর"—

"দামোদরের বানে ভেসে গেছে।"

"তা হলে 'ফসল বাড়াও'?"

"ফসল বাড়তে দেরি হবে।"

"দুগ্ধ পরিকল্পনা?"

মুকুন্দ বলল, "কোনোটাই দরকার হ'ল না। সম্পূর্ণ নতুন এক পরিকল্পনা আর সবগুলোকে মেরে দিয়েছে।"

আমি সবিস্ময়ে বললাম, "কি রকম? পরিকল্পনা হ'তে না হ'তেই তার ফল ভোগ করছ না কি?"

জনার্দন বলল, "ঠিক ধরেছ। এ পরিকল্পনা অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিরাট, এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এর দ্রুত সাফল্য—যা একমাত্র এই পরিকল্পনাতেই সম্ভব।"

"তোমরা কি এর মধ্যে আছ?"—আমি প্রশ্ন করলাম।

ভবানন্দ বলল, "আছি, এবং আমরা প্রত্যেকে মোটা বেতনে এই গুরু দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছি। হাজার হাজার আপিস বসছে দেশের সব জায়গায়, হাজার হাজার লোক নিযুক্ত হচ্ছে—বক্তা, গায়ক, চিত্রকর সবাই। একেবারে 'মাস্ কণ্ট্র্যাক্ট!'"

আমি উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি কাজ করতে হচ্ছে তাদের?"

ভবানন্দ বলল, "জনতার মাঝখানে গিয়ে, যাদের এতকাল ঘৃণা করেছ, অস্পৃশ্য করে রেখেছ, একেবারে তাদের মধ্যে গিয়ে, তাদেরই একজন হয়ে, একেবারে তোমার গজদন্তমিনার থেকে পৃথিবীর মাটিতে নেমে এসে শুধু একটি কথা বলা, একটিমাত্র বৈপ্লবিক কথা, একটি মাত্র বীজমন্ত্র উচ্চারণ করা, শুধু বলা—'কম খাও'।"

বলেই পকেটে হাত দিয়ে চট করে ঋণের টাকাটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, "এবারে আসি ভাই, বড্ড জরুরি সব কাজ পড়ে আছে।"

আমি শুধু বিমূঢ় স্তম্ভিত ভাবে ওদের বিলীয়মান মূর্তিগুলোর দিকে চেয়ে রইলাম।

শ্যামদেশের বৌদ্ধধর্ম্ম

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্-এ.

শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও প্রসার দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। কেননা, ভগবান তথাগতের বৈরাগ্য-মন্ত্রই দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন জাতির হৃদয়ে এক উর্দ্ধমুখী অধ্যাত্ম-চেতনার নির্দ্দেশ দিতে
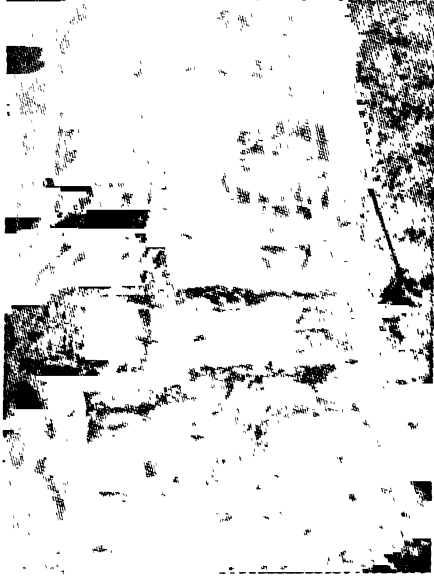
অক্োয়থোমের অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি

সক্ষম হয়েছিল। জগতের ইতিহাসে এর মূল্য অপরিসীম। এই উচ্চ অধ্যাত্ম-চেতনা শ্যাম তথা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার জাতিদের এমন এক উন্নত সাংস্কৃতিক স্তরে পৌঁছে দিয়েছে, যা একমাত্র "হীনযান" বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষেই সম্ভব। সুদূর মেনাম চাও ফায়া এবং মেকং নদীর উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে আজও বৌদ্ধধর্ম্মের যে দার্শনিক প্রভাব দেখা যায় তা বিস্ময়কর। এই ধর্ম্মের প্রজ্ঞাবাদ যেন তাদের মনকে এক মহান্ বিশ্বজনীনতার দিকে টেনে নিয়ে গেছে। শ্যামদেশের অধিবাসী "তালাইং" ("মেন" এবং "কারেন্" নামেও পরিচিত), "লাও", "শান্" এবং "থাই"দের বিনয়নম্র আচরণ, ধর্ম্মভাব এবং শিল্প-নৈপুণ্যের মূলে যে গৌতম বুদ্ধের বৈরাগ্যপূর্ণ চিন্তাধারা অনেকটা কার্য্যকরী হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সিংহলের প্রাচীন বৌদ্ধ-গ্রন্থ "মহাবংশ" এবং শ্যাম দেশের জন-প্রবাদ থেকে, আমাদের মনে এই ধারণা জন্মে যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে ভারতের সম্রাট্ অশোকের প্রেরিত দুই জন ভিক্ষু সোন এবং উত্তর সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় "হীনযান" বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। "থাই"দের কিম্বদন্তী অনুসারে জানা যায়, এই দুই জন ধর্ম্মপ্রচারক দক্ষিণ-শ্যামে অবস্থিত "নগর-প্রথমে" ("নাখন পাথোম") সর্ব্বপ্রথম জাহাজ থেকে অবতরণ করেন।[১] এ ছাড়া, শ্যামদেশে এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং শ্যাম দেশ পর্য্যটন করেছিলেন। অবশ্য শেষোক্ত জনপ্রবাদের সত্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সংশয় প্রকাশ করে থাকেন।

"মহাবংশে" নিবদ্ধ তথ্যাদি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শ্যামের আদি অধিবাসী "মন্" ও "খোমের"রা খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে পূর্ব্ব-ভারতের ধর্ম্মপ্রচারকদের প্রচারকার্য্যের ফলে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্পর্শে আসে। এর পর কয়েক শতাব্দী হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, সম্ভবতঃ পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা ইন্দো-চীন উপদ্বীপের শ্যামল ভূমিতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয়-কেতন উড্ডীন করে। ইন্দো-চীনের বিভিন্ন স্থান, যথা—আনাম (প্রাচীন "চম্পা"), কম্বোডিয়া (প্রাচীন "ফুনান"), শ্যাম (প্রাচীনকালে, 'দ্বারাবতী', 'লবপুরি', 'জয়শ্রী' নামে নানা রাজ্যে বিভক্ত) ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা এই উভয় ধর্ম্মকেই সাদরে গ্রহণ করে। বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার হয়েছিল প্রেম ও মৈত্রীর বলে তরবারির সাহায্যে নয়। কিন্তু ইউরোপ আপন সভ্যতা প্রসারের জন্য ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছিল। যে ষোড়শ শতাব্দীর ইউ-রোপীয় সভ্যতার নিয়ামক ছিল, পিজারো এবং ডন পেড্রো ডি আলভারাডো প্রভৃতি নৃশংস জলদস্যুগণ। স্পেনের খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকেরা আমেরিকায় ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছিলেন, বাইবেলের চেয়ে টোলে-ডোর ক্ষুরধার তরবারির উপর অধিক নির্ভরশীল হওয়ার দরুন। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্ম-প্রচারকদের সাফল্যের প্রধান কারণ তাঁদের প্রজ্ঞা এবং বিশ্বমৈত্রী।

ইন্দোচীনের অনেক আদিম অধিবাসীর চোখে হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। দুই

---

১ Major Erik Seidenfaden—"*Guide to Nakhon Pathom*" দ্রষ্টব্য।

ধর্মের মূলতত্ত্ব যে একই, সম্ভবতঃ সেটা তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। এই কারণেই বোধ হয় শ্যাম,
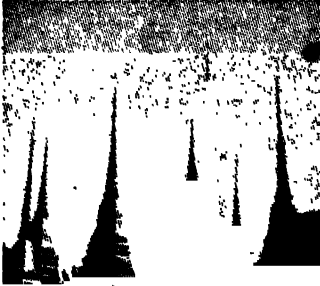
শ্যামদেশের কতকগুলি আধুনিক চৈত্য

কম্বোজ, চম্পা এবং লাও রাজ্যে যুগপৎ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কোন ধর্মগত অথবা সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি হয় নি। উপরন্তু, এই সব দেশে হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মের এমন এক সংমিশ্রণ হয়েছিল যার নিদর্শন আজ পর্য্যন্তও অব্যাহত আছে। শ্যামদেশের বর্ত্তমান অধিবাসী থাইরা গোঁড়া "থেরবাদ" অথবা "হীন-যান" বৌদ্ধধর্মে পরম আস্থাবান হলেও হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি এবং পূজা-পদ্ধতির প্রতি নিষ্ঠা তাহাদের অপরিসীম। নারায়ণ, মহাদেব, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী এবং গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীকে তারা আমাদের মতই শ্রদ্ধাভক্তি করে।

শ্যাম দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ফলে জয়শ্রী (অপর নাম 'নগর প্রথম'), বজ্রপুরি (থাই উচ্চারণ, 'পেচাবুরি'), লবপুরি (উচ্চারণ, 'লোপ বুরি'), ভীমপুরি (বর্ত্তমান 'ফিমাই') ইত্যাদি নগরসমূহে বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিশেষ চর্চ্চা আরম্ভ হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীতে এই সব নগরে অনেক মনোরম বৌদ্ধ বিহার (উচ্চারণ, 'বিহান') এবং মন্দির ('ওয়াট্') নির্ম্মিত হয়। তাদের সু-উচ্চ ভগ্নপ্রায় চূড়াসমূহ আজও তথাগতের বৈরাগ্য-মন্ত্রের জয় ঘোষণা করছে। বৃহত্তর 'থাই'-ভূমির অসংখ্য 'খেমির' বুদ্ধমূর্ত্তি আজও ভগবান বুদ্ধের আধ্যাত্মিকতার জ্যোতিঃ বিকিরণ করছে সুবর্ণ-ভূমির প্রান্তরে প্রান্তরে।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত 'পাল' ও 'সেন' যুগে বাংলাদেশে তান্ত্রিক 'মহাযান' ধর্ম্ম প্রভূত জনপ্রিয়তাঃ অর্জ্জন করে। এই ধর্মে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের একটা অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হয় এবং এই মিলনের প্রভাব দূর-প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হয়। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি, লম্বক, বোর্নিও এবং পশ্চিম-শ্যামে এই মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার ঘটে। এ ছাড়া পাল ও সেন যুগের বাংলার বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য মণিপুর, ব্রহ্মদেশ এবং "শান্"-মালভূমি অতিক্রম করে শ্যামদেশে প্রবেশ করে ক্রমে ক্রমে উত্তর এবং দক্ষিণ-শ্যামের 'থাই'-শিল্পকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করে।[১] বিশেষ করে উত্তর-শ্যামের চিয়েং সেনের বৌদ্ধভাস্কর্য্য বাংলার পাল-শিল্পের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়। বাংলার মহাযান ধর্ম্ম বোধ হয় কম্বোজে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। সেখানকার ধর্ম্মপরায়ণ সম্রাট যশোবর্ম্মণ "অঙ্কোরথোমে" যে বিরাট মন্দিরসমূহ নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন তার শিল্পকলার মধ্যে মহাযান ধর্ম্মবিশ্বাসের ছাপ সুস্পষ্ট। অঙ্কোরথোমের একটি মন্দিরচূড়ার চতুর্দ্দিকে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের যে বিরাট মুখাবয়ব নির্ম্মিত আছে তা শিল্পকলা এবং আধ্যাত্মিক ভাব উভয় দিক দিয়ে বাস্তবিকই অতুলনীয়। কারও কারও মতে অঙ্কোরথোম
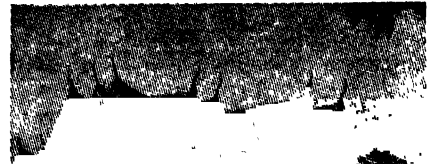
"ওয়াট্ পঞ্চম পবিত্র" মন্দির—ব্যাঙ্কক

মূলতঃ শৈব মন্দির। কোন কোন ঐতিহাসিক এবং শিল্প-তত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, রাজা যশোবর্ম্মণ সম্ভবতঃ বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরকে মহাদেবেরই অন্যতম রূপ হিসাবে কল্পনা করেছিলেন। এককালে অবলোকিতেশ্বরের পূজা চীন, জাপান, তিব্বত এবং অন্যান্য অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ব্রহ্মদেশের ইতিহাস থেকে অবগত হওয়া যায় যে, খ্রীষ্টীয় ১০৫৭ অব্দে ব্রহ্মের রাজা অনুরুদ্ধ টেনেসেরিম উপকূলে অবস্থিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার হীনযান বৌদ্ধ-

---

১। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-চীনের 'ইয়াংসি' নদীর উপত্যকা থেকে আগত 'থাই'রা শ্যামদেশ অধিকার করে সেখানকার আদি অধিবাসী মন, খেমির এবং লাওদের পরাজিত করে।

"ওয়াট্ ফ্রা কেও" মন্দিরের একটি অংশ—ব্যাঙ্কক

ধর্ম্মের কেন্দ্র ও মন্ জাতি-অধ্যুষিত থাটন জয় করেন এবং সেখানকার শিল্পীদের সাহায্যে নিজ রাজধানী পাগানের শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করেন। তিনি সেখান থেকে বহু বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থও লুণ্ঠন করে নিয়ে এসেছিলেন। অনুরুদ্ধের চরিত্রে নিষ্ঠুরতা এবং ধর্ম্মানুরাগের অপূর্ব্ব মিশ্রণের জন্য ঐতিহাসিকেরা তাঁকে মধ্যযুগীয় ইউরোপের সম্রাট সার্লেমেনের (খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দী) সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। শ্যামের পরলোকগত বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাজপুত্র দাম্‌রোং রাজানুভাবের মতে উক্ত ব্রহ্মদেশীয় সম্রাট যে নগরের সাংস্কৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করেছিলেন, সেটি আসলে নগর-প্রথম—থাটন নয়। স্বীয় মত সমর্থনে তিনি যে সকল যুক্তি দেখিয়েছেন—তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে এই যে, পাগানের বিখ্যাত "আনন্দ" মন্দিরের সঙ্গে নগর-প্রথমের "ফ্রা মেরু" (উচ্চারণ "ফ্রামেন") মন্দিরের স্থাপত্যরীতির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। রাজানুভাবের মতে, রাজা অনুরুদ্ধের নির্দ্দেশে পাগানের 'আনন্দ'-মন্দির নির্ম্মিত হয়েছিল নগর-প্রথমের শিল্পসুষমাময় "ফ্রা মেরু" মন্দিরের প্রায় হুবহু অনুকরণে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-চীন থেকে মোঙ্গলদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে থাই জাতি শ্যামদেশে প্রবেশ করে এবং ক্রমে ক্রমে সেখানকার প্রাক্তন অধিবাসী মন্ ও -খেমিরদের পরাজিত করে সেখানে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। বিজয়ী থাইরা বিজিত খেমির অথবা "খোম"দের উন্নততর সংস্কৃতি গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে নি, নবাগত থাইরা বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে "মন্-খেমির" বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। মধ্যযুগে চিয়েং সেন, সুখোদয়, স্বর্গলোক, বিষ্ণুলোক, অযোধ্যা (আয়ুথিয়া), লবপুরি, বজ্রপুরি, বাং-পা-ঈন ইত্যাদি বিভিন্ন নগরে বৌদ্ধ থাইরা অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করে। এ ছাড়া তারা পালি ভাষার বিশেষ চর্চ্চা করে এবং জাতক, পিটক ইত্যাদি বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ থাই ভাষায় অথবা 'থাই' অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়। মধ্যযুগে বিশেষ করে আয়ুথিয়া আমলে (Ayuthian period, 1350-1767 A. D.) থাই ভিক্ষু এবং জ্ঞানী স্থবিরদের সাধনায় ও চেষ্টায় হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মের যে উৎকর্ষ সাধিত হয়, বাস্তবিকই তা অতুলনীয়।

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে থাই রাজধানী আয়ুথিয়া ব্রহ্মদেশের রাজা সিন্ বুশিনের (Hsinbyushin) অভিযাত্রী সৈন্য-বাহিনীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। ব্রহ্মদেশীয় সেনা-বাহিনী আয়ুথিয়ার অধিকাংশ মঠ এবং মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। এর কিছুদিন পরে পরাজিত থাইরা তাদের জনপ্রিয় রাজা ফায়া তাগ্ সিন্ অথবা তাথসিনের (তক্ষশীলা) নেতৃত্বে তাদের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। শেষে নবনির্ম্মিত ব্যাঙ্কক অথবা ক্রুংথেপ (অর্থাৎ দেবতাদের শহর) নগরে বর্ত্তমান রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের পর থাইরা নবীন উদ্যমে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধসংস্কৃতির উৎকর্ষসাধনে রত হয়। ফলে ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শ্যামদেশের বিভিন্ন স্থানে নূতন স্থাপত্যরীতিতে বহুসংখ্যক মন্দির নির্ম্মিত হতে থাকে। এই সব মন্দির গঠনসৌন্দর্য্যে একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য লাভ করে। ব্যাঙ্কক নগরে যে সব মন্দির নির্ম্মিত হয় তন্মধ্যে "ওয়াট্ আরুণ," "ওয়াট্ ফ্রা কেও", "ওয়াট্ বেঞ্চামা পোবিত", "ওয়াট্ ফো" এবং "ওয়াট্ রাজোপোবিত"ই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বর্ত্তমানকালে বৌদ্ধধর্ম্মই শ্যামদেশের জাতীয় ধর্ম্ম (State Religion)। খ্রীষ্টানদের ক্যাথলিক মন্দির-বিধির মত শ্যামদেশের মন্দিরগুলি নানা শ্রেণীর পুরোহিত-দের দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত। যদিও "ধর্ম্মরক্ষক" (মধ্যযুগের ইউরোপীয় নৃপতিদের "Defender of Faith" উপাধির সঙ্গে তুলনায়) হিসাবে রাজার স্থান সর্ব্বোপরি, তথাপি তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। মন্দিরগুলিকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা সাধারণ মন্দির এবং রাজকীয় মন্দির। সাধারণ মন্দিরগুলির অধ্যক্ষদের "থান সোম ফান" এবং তাঁর সহকারীদের "থান মহা" বলা হয়।

"ওয়াট্ রাজপ্রাদিত্"—ব্যাঙ্ককের একটি আধুনিক বৌদ্ধ মন্দির

অপর পক্ষে রাজকীয় মন্দিরগুলির-ভিক্ষু অধ্যক্ষদের "চাও খুন থাই" এই শ্রেষ্ঠতম উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

থাইদের সকলকেই অন্ততঃ চার মাসের জন্য "ওয়াট্" অথবা মন্দিরে দীক্ষিত ভিক্ষু ('ফ্রা') অথবা পর্য্যবেক্ষক হিসাবে অবস্থান করতে হয়।

প্রতিদিন প্রত্যুষে 'থাই' ভিক্ষুরা ভিক্ষাগ্রহণের জন্য লোকালয় পরিক্রমা করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের আদি শাখা থেরবাদ অথবা হীনযান ধর্ম্মের এই নিয়ম। ভিক্ষান্ন সংগ্রহ না করলে সাধারণতঃ ভিক্ষুদের ভোজন নিষিদ্ধ। তাই বলে শুধু ভিক্ষান্নেই যে তাদের উদরপূর্ত্তি করতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই, প্রত্যহ প্রত্যুষে যখন মুণ্ডিতমস্তক ও ঈষৎ-গৈরিক চীবর পরিহিত বালক, তরুণ, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ ভিক্ষুরা ব্যাঙ্কক ও শ্যামদেশের অন্যান্য নগরের রাজপথে মৃদুগতিতে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে পদচারণা করেন এবং বিনয়-নম্র ভক্তেরা তাঁদের খাদ্যদ্রব্য উপহার দেয় তখন প্রবাসী ভারতীয়ের মনশ্চক্ষে স্বতঃই সুদূর অতীতের একটি দৃশ্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধও এমনি ভাবে বেরিয়েছিলেন ভিক্ষার উদ্দেশ্যে রাজগৃহের পথে নৃপতি বিম্বিসারের হৃদয়কে বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধায় অভিভূত ক'রে। শ্যামদেশে

শ্যামদেশের একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ

কতবার আনন্দাপ্লুত হৃদয়ে বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে বৌদ্ধ থাই ভিক্ষুদের ভিক্ষাগ্রহণের দৃশ্য দেখেছি এবং ভারতীয় সভ্যতার অফুরন্ত প্রাণশক্তি কোথায় নিহিত তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছি। প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ-প্রচারকদের কণ্ঠে যে প্রেম ও মৈত্রীর বাণী উদ্গীরিত হয়েছিল তারই প্রতিধ্বনি মুগ্ধ হয়ে শুনেছি দূরপ্রাচ্যের পথে ও প্রান্তরে।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ২৯,৩৭০ বর্গমাইল। বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গ যে সকল অঞ্চল লইয়া গঠিত হইয়াছে, গত আদমসুমারীর (১৯৪০) হিসাব অনুযায়ী ঐ সকল অঞ্চলের লোকসংখ্যা ছিল ২,১১,৯৬,৪৫৩ জন। ১৯৪১ সাল হইতে প্রতি বৎসর লোকসংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহা ছাড়া পূর্ববঙ্গ হইতে যে সকল আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যাও কম নহে। বর্দ্ধিত লোক ও আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা হিসাব করিয়া বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের সংখ্যা মোটামুটি আড়াই কোটি। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বর্গমাইলে (কলিকাতা সহ) ৮৫২ জন লোক বাস করে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীসুশীলকুমার দে, আই-সি-এস, কর্ত্তৃক সংকলিত *Prospectus of Agriculture in West Bengal* নামক পুস্তকে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের জমির পরিমাণ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে :

(১)	আমন ধান	৭৭৯৫০	একর
(২)	আউশ ধান	১৪৭০০	
(৩)	বোরোধান	৫৫০	
(৪)	গম	১০০০	
(৫)	ডাল শস্য	৯০৮০	
(৬)	আলু	৯২০	
(৭)	অন্যান্য সব্জী	৭৭৬০	
(৮)	ফল	২৮২০	
(৯)	সরিষা	১৩৮০	
(১০)	ইক্ষু	৫৪০	
(১১)	অন্যান্য খাদ্যশস্য	২৪৭০	
	মোট	১১,৯১,৭০০০	একর

এই হিসাবে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের মাথাপিছু খাদ্যশস্যের জমির পরিমাণ সবেমাত্র ০·৪৭ একর অর্থাৎ দেড় বিঘারও কম। মাথাপিছু ধানের জমির পরিমাণ ০·৩৭ একর অর্থাৎ মোটামটি এক বিঘা।

শ্রীযুক্ত দে মহাশয় তাঁহার পুস্তকের ১০ম পৃষ্ঠায় ৭ নম্বর টেবলে একরপ্রতি চালের গড় ফলনের এইরূপ হিসাব দিয়াছেন :—

আমন—	১২·৪ মণ
আউশ—	১০·৯
বোরো—	১৩·৬
গড়	১২·১৭

এই হিসাব অনুযায়ী সকল প্রকার চালের বাৎসরিক গড় ফলন মোটামুটি ৪২,০০,০০০ টন অর্থাৎ ১১,৩৪,২৪,৪০০ মণ।

কিন্তু দে মহাশয় তাঁহার পুস্তকের ২৬ পৃষ্ঠায় ২১ নম্বর টেবলে দেখাইয়াছেন যে, পাঁচ বৎসরের (১৯৪৩-৪৪ হইতে ১৯৪৭-৪৮ সাল) চালের বাৎসরিক গড় ফলন ৩৫,৪০,৪০০ টন অর্থাৎ মোটামুটি ৯,৫৫,৯০,৮০০ মণ।

দে মহাশয়ের উপরোক্ত দুইটি হিসাবের মধ্যে তারতম্য খুবই বেশী, এবং কোন্ হিসাব অনুযায়ী চালের গড় ফলন ধরা উচিত তাহা সাধারণের পক্ষে ঠিক করা কঠিন।

তাঁহার পুস্তকে গমের গড় ফলনের হিসাবেও এইরূপ তারতম্য দেখা যায়; ৭ নম্বর টেবলে একরপ্রতি গমের গড় ফলন হইতেছে আট মণ অর্থাৎ বাৎসরিক গড় ফলন ২৯,৬৩০ টন (আট লক্ষ মণ)।

২১ নম্বর টেবল অনুযায়ী গমের গড় ফলন বাৎসরিক ২৫,৮০০ টন (মোটামুটি ৬,৯৬,৬০০ মণ)।

জনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের হিসাব অনুযায়ী গত ছয় বৎসরের (১৯৪৪-৪৯) চালের ফলন এইরূপ :—

১৯৪৪	৪২,২১,০০০ টন
১৯৪৫	৩৫,১০,০০০
১৯৪৬	২৮,৯৬,০০০
১৯৪৭	৩৬,৪৮,০০০
১৯৪৮	৩৪,১৭,০০০
১৯৪৯	৩২,৯৩,০০০

উপরোক্ত ফলনের গড় হিসাব হইতেছে ৩৪,৯৭০০০ টন (মোটামুটি ৯,৪৪,২৮,০০০ হাজার মণ)। মন্ত্রী মহাশয়ের হিসাব অনুযায়ী গমের গড় ফলন ২৭,০০০ টন (৭,২৯,০০০ মণ)। এই হিসাবের সহিতও দে মহাশয়ের ২১ নম্বর টেবল অনুযায়ী গড় ফলনেরও কিছু পার্থক্য দেখা যায়।*

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাতত্ত্ব শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ পূর্ণেন্দুকুমার বসু মহাশয়ের মতে পশ্চিমবঙ্গে জোয়ার, বাজরার বাৎসরিক গড় ফলন ৪০ হাজার টন (১০,৮০,০০০ মণ)।

সুতরাং উপরোক্ত বিভিন্ন হিসাব অনুযায়ী চাল, গম, ভুট্টা, জোয়ার ও বাজরার ফলনের পরিমাণ বিভিন্ন। যথা :—

---

* এই প্রবন্ধ লিখিবার পর জানিতে পারিয়াছি যে অনেক আগে প্রতি বৎসরের শস্য-কর্ত্তন-পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া দে মহাশয়ের ৭ নম্বর টেবল অনুযায়ী হিসাব করা হইয়াছে।—লেখক

(১) শ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের ৭ নম্বর টেবল অনুসারে

চাল	৪২০০০০০	টন	(১১,৩৪,২৪,৪০০	মণ)
গম	২৯৬৩০	টন	৮০০০০০	মণ)
ভূট্টা ও বাজরা	৪০০০০	টন	১০,৮০০০০	মণ)
মোট	৪২৬৯৬৩০	টন	(১১,৫৩,০৪৪০০	মণ)

(২) শ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের ২১ নম্বর টেবল অনুসারে

চাল	৩০৪০৪০০	টন	(৯,৫৫,৯০৮০০	মণ)
গম	২৫৮০০	টন	(৬৯৬৬০০	মণ)
ভূট্টা ও জোয়ার	৪০০০০	টন	(১০৮০০০০	মণ)
মোট	৩৬০৬২০০	টন	(৯৭৩৬৭৪০০	মণ)

(৩) জনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের হিসাব অনুসারে

চাল	৩৪৯৭০০০	টন	(৯,৪৪,২৮,০০০	মণ)
গম	২৭০০০	টন	(৭২৯০০০	মণ)
ভূট্টা ও জোয়ার	৪০০০০	টন	(১০৮০০০০	মণ)
মোট	৩৫৬৪০০০	টন	(৯,৬২,৩৭,০০০	মণ)

বিশেষজ্ঞগণের মতে উৎপন্ন শস্যের শতকরা ১০ ভাগ বীজের জন্য এবং ক্ষয়-ক্ষতির জন্য বাদ দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং এই হিসাবে কেবলমাত্র খাদ্যের জন্য পাওয়া যায় :—

(১) শ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের ৭ নম্বর টেবল অনুসারে
৩৮৪২৬৬৭ টন অর্থাৎ ১০,৩৭,৭৩৯৬০ মণ

(২) শ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের ২১ নম্বর টেবল অনুসারে
৩২৪৫৫৮০ টন অর্থাৎ ৮.৭৬,৩০৬৬০ মণ

(৩) জনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রীমহোদয়ের হিসাব অনুসারে
৩২০৭৬০০ টন অর্থাৎ ৮,৬৬,১৩,৩০০ মণ

বিশেষজ্ঞগণের মতে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণের জন্য গ.ড় মাথাপিছু দৈনিক ৭ হইতে ৮ ছটাক (১৪ হইতে ১৬ আউন্স) চালের প্রয়োজন। আমরা মাথাপিছু দৈনিক ৮ ছটাক ধরিয়া হিসাব করিব।

বিভিন্ন সংখ্যাবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০০ জন লোকের মধ্যে গড়পড়তা হিসাবে প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যা শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ জন; কোন কোন বিশেষজ্ঞ ৮৫ জনও ধরেন; অর্থাৎ এক বৎসর বয়সের শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিসহ মোট ১০০ জনকে ৭৫ হইতে ৮৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সমান ধরা হয়।

ডাঃ এক্‌রয়েডের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের আড়াই কোটি লোক ২,০৯,:৩,৬৫০ জন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সমান; অর্থাৎ শতকরা মোটামুটি ৮৩·৬৫ জন।

আমরা ডাঃ এক্‌রয়েডের হিসাব অনুসারে প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সংখ্যা ধরিয়া খাদ্যের প্রয়োজনের পরিমাণের হিসাব ধরিব। এই হিসাবে প্রয়োজনের পরিমাণ এইরূপ :—
২০৯১৩৬৫০ × ৮ ছটাক × ৩৬৫ = ৩৫৩৪০০০ টন অর্থাৎ ৯৫৪,১৮,৫২৮ মণ।

এই হিসাব অনুযায়ী বাড়তি বা ঘাটতির পরিমাণ এইরূপ :—(১) শ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের ৭ নম্বর টেবল অনুযায়ী বাড়তির পরিমাণ ৩০৮৬৬০ টন অর্থাৎ ৮৩,৫৫,৪৩২ মণ।

(২) শ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের ২১ নম্বর টেবল অনুযায়ী ঘাটতির পরিমাণ—২৮৮৪০০ টন অর্থাৎ ৭৭,৮৭,৮৬৮ মণ।

(৩) জনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের হিসাব অনুযায়ী ঘাটতির পরিমাণ ৩২৬৪০০ টন অর্থাৎ ৮৮,০৫,২২৮ মণ।

জনসংভরণ বিভাগের সচিব মহাশয়ের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ২৭৫০০০ টন (মোটামুটি ৬৪,২৫,০০০ মণ) গমের প্রয়োজন হয়; উৎপাদনের পরিমাণ ২৭০০০ টন (মোটামুটি ৭২৯০০০ মণ)। সুতরাং তাঁহার হিসাব অনুযায়ী গমের ঘাটতির পরিমাণ ২,৪৮,০০০ টন (মোটামুটি ৬৬,৯৬,০০০ মণ) এবং চালের ঘাটতির পরিমাণ ৭৮,৪০০ টন (২১,১৬,৮০০ মণ) :—

মন্ত্রী মহাশয় অন্য এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—

"The position in West Bengal in this respect is worse than the All India position and Prof. Mahalanobis on the basis of several pre-war diet surveys has given us an estimate of over 15 ounces per day per capita normal consumption of cereals in West Bengal. On this basis the normal requirement at present is 3·8 million tons against the net yield of 3·4 million tons, revealing a normal deficit of over 400 thousand tons."

ইহার অর্থ এই যে, সর্বভারতীয় খাদ্যাবস্থা অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যের অবস্থা অধিকতর মন্দ; অধ্যাপক মহলনাবিশ যুদ্ধের পূর্বের খাদ্য সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার ভিত্তিতে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেক দিন মাথাপিছু ১৫ আউন্সের (৭॥ ছটাক) উপর তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। তাঁহার এই হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যের স্বাভাবিক বার্ষিক প্রয়োজন ৩৮ লক্ষ টন অর্থাৎ ১০,২৬,০০০০০ মণ, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ ৩৪ লক্ষ টন অর্থাৎ ৯,১৮,০০,০০০ মণ। অতএব ঘাটতির পরিমাণ চার লক্ষ টন অর্থাৎ ১,০৮,০০,০০০ মণ। এ ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন্ ভিত্তিতে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ৩৪ লক্ষ টন এবং প্রয়োজনের পরিমাণ ৩৮ লক্ষ টন ধরিয়াছেন তাহা বুঝা যাইতেছে না।

যাহা হউক, মোটামুটিভাবে বলিতে পারা যায় যে, দে মহাশয়ের ২১ নম্বর টেবল অনুযায়ী হিসাব এবং জনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের [illegible] হিসাব প্রায়

সমান এবং এই হিসাব অনুযায়ী ইহাও মোটামুটি ভাবে বলা যায়, তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যের ঘাটতির পরিমাণ ৩½ লক্ষ টন। তবে চালের ঘাটতির পরিমাণ মোটেই আশঙ্কাজনক নহে।

জনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় এক বক্তৃতায় সংগ্রহের যে হিসাব দিয়াছেন তাহা এইরূপ :

বৎসর	উৎপাদনের পরিমাণ টন	সংগ্রহের পরিমাণ টন	শতকরা সংগ্রহের পরিমাণ
১৯৪৪	৪২২১০০০	৫৭৯০০০	১৩.৭
১৯৪৫	৩৫১০০০০	৪১৫০০০	১১.৮
১৯৪৬	২৮৯৫০০০	৩৯৭০০০	১৩.৭
১৯৪৭	৩৬৪৮০০০	৪৪৭০০০	১২.৩
১৯৪৮	৩৪১৭০০০	৪৬৭০০০	১৩.৭

উপরোক্ত পরিমাণ আভ্যন্তরিক সংগ্রহ (মোটামুটি ৪½ লক্ষ টন) ব্যতীত মোটামুটি ৩½ লক্ষ টন (চাল, গম ও গমজাত খাদ্যসহ) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এবং ভারতের বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। সুতরাং মোট সংগ্রহের ও আমদানীর পরিমাণ মোটামুটি ৮ লক্ষ টন।

৮ লক্ষ টন সংগ্রহের ও আমদানীর সাহায্যে বিধিবদ্ধ "রেশন" (Statutory Rationing) অনুযায়ী কলিকাতা ও অন্যান্য শহরের ও বড় বড় প্রতিষ্ঠানের (রেলওয়ে, চা-বাগান ইত্যাদি) মোট ৬৪ লক্ষ লোককে নির্দ্ধারিত "রেশন" দেওয়া হইতেছে এবং ইহা ছাড়া অন্যান্য ঘাটতি অঞ্চলেও চাল সরবরাহ করিতে হয়। উপরোক্ত ৬৪ লক্ষ লোকের মধ্যে ৮ লক্ষ লোক বড় বড় প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত আছেন।

এই হিসাব অনুযায়ী ৬৪ লক্ষ লোক দৈনিক গড়ে প্রায় ৬ ছটাক (১২ আউন্স) চাল ও গমজাত খাদ্য পাইয়া থাকেন।

ঘাটতি অঞ্চলে চাল সরবরাহের মোটামুটি হিসাব এইরূপ :

(১)	২৪ পরগণা	৪০৬৪৫	মণ
(২)	হাওড়া	৬০১০০	"
(৩)	হুগলী	২৯৩০০	"
	মোট	১৩০০৪৫	মণ (৪৮১৭ টন)

উপরোক্ত ত্রৈরাশিক হিসাবের সাহায্যে দেখা যাইতেছে যে, দৈনিক মাথাপিছু গড়ে ৮ ছটাক তণ্ডুল-জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিলে পশ্চিমবঙ্গে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় মোটামুটি ৩½ লক্ষ টন। অনেকেই বলিতে পারেন যে, যখন ৩½ লক্ষ টন খাদ্য বাহির হইতে আমদানী করা হইতেছে তখন রেশন এলাকায় দৈনিক মাথাপিছু ৮ ছটাক হিসাবে তণ্ডুল জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করা হইতেছে না কেন? সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে বলা যায় যে, সংগ্রহের পরিমাণ কিছু বাড়াইলেই রেশন এলাকায় মাথাপিছু দৈনিক আট ছটাক হিসাবে দেওয়া যায়। আবার অনেকের মতে সরকারী গুদামসমূহে অযথা অধিক পরিমাণ চাল, গম প্রভৃতি নষ্ট হইতেছে। ইহা নিবারণ করিতে পারিলেই দৈনিক মাথাপিছু আট ছটাক হিসাবে দেওয়া যাইতে পারে। লেখকের ব্যক্তিগত মত এই যে, রেশন এলাকাসমূহে গড়ে দৈনিক মাথাপিছু ৮ ছটাক হিসাবে খাদ্য সরবরাহ করা অসম্ভব নহে। ইহা করিলে বর্ত্তমান অসন্তোষ অনেক পরিমাণে দূর হইবে এবং রেশন এলাকাসমূহের নিকটস্থ "কালোবাজার" খুবই মন্দ গতিতে চলিবে।

পরিশেষে এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলা দরকার। সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা এই যে, চালের গড় ফলন অনুযায়ী প্রতিবৎসর ফসল পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ ছয় বৎসরের মধ্যে এক বার কি দুই বার স্বাভাবিক বা গড় ফলন হয়; এবং এক বার স্বাভাবিক ফলন অপেক্ষা বেশী ফসল পাওয়া যায়। সুতরাং গড় ফলন ধরিয়া সকল বৎসরের ঘাটতির হিসাব করিলে উহা নির্ভুল হইবে না। দ্বিতীয়তঃ স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিকতর ফলন হইলেও ত্রৈরাশিক হিসাবে যদিও দেখা যাইবে যে, আড়াই কোটি লোকের খাদ্যাভাব ঘটিবে না, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্র উহার বিপরীতই দেখা যাইবে, কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফলনের সম্পূর্ণ অংশ বাজারে আসে না। ইহা জানা কথা যে, যাঁহাদের জমির পরিমাণ বেশী তাঁহারা উৎপন্ন ফসলের কতকাংশ গোলায় মজুত করিয়া রাখেন। স্বাভাবিক অবস্থায় ফসলের অন্ততঃ শতকরা ৭।৮ ভাগ বাজারে আসে না, বড় বড় কৃষকদের ঘরে গোলায় মজুত থাকে। এই ভাবে মজুত রাখা খুবই স্বাভাবিক, কারণ পল্লী অঞ্চলে ধানের গোলাই কৃষকদের ব্যাঙ্ক। কোন বৎসর ফসল না হইলে বা কোন বৎসর ফসলের পরিমাণ কম হইলে ধানের গোলাই তাঁহাদের রক্ষা করে; টাকার প্রয়োজন হইলেই ধান বিক্রয় করিয়া প্রয়োজন মিটানো হয়।

কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় "কণ্ট্রোল" (নিয়ন্ত্রণ) ও সংগ্রহনীতির ফলে বড় বড় কৃষকেরা শতকরা ১।২ ভাগের বেশী মজুত রাখিতেছেন না। ইহা নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি। নিজেদের প্রয়োজনমত ধান রাখিয়া যে অবশিষ্ট অংশ সরকারকে বিক্রয় করিতেছেন তাহা নহে; সরকারী সংগ্রহের আশঙ্কায় মজুত রাখিতেছেন না গোপনে অধিকমূল্যে অন্য স্থানে বিক্রয় করিতেছেন। কোথাও কোথাও পাকিস্থানেও চালান হইতেছে।

চীনের কু-মিন-টাঙ্‌ দলের শেষ আশ্রয় ফরমোজার একটি উপত্যকা
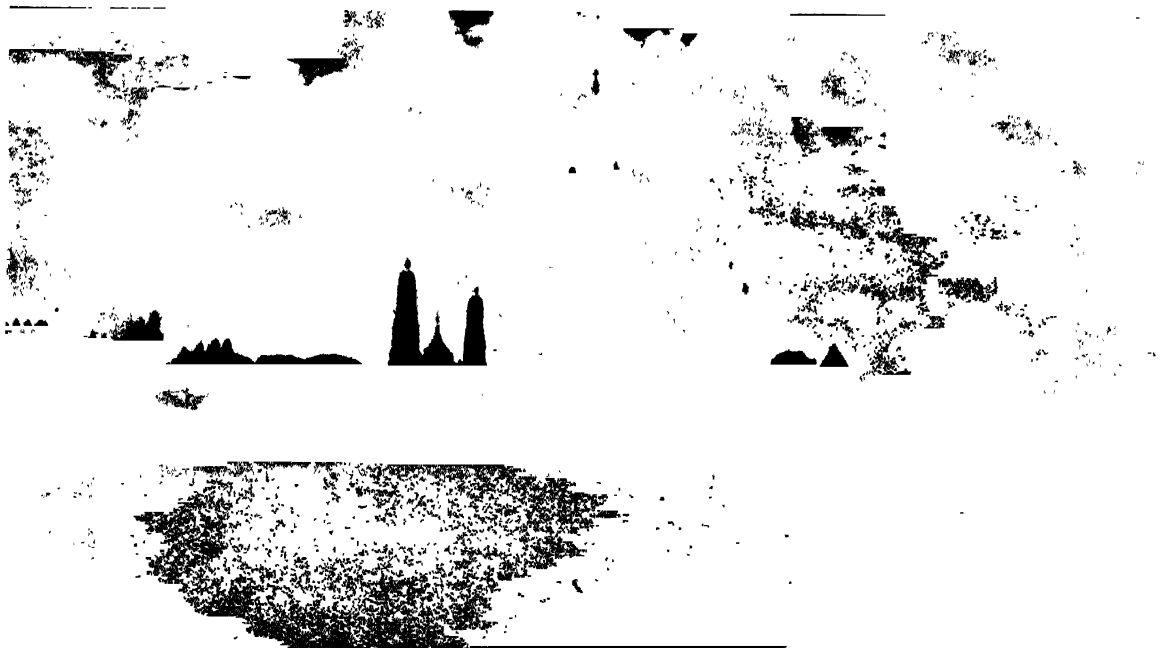
শ্যামের বৌদ্ধ মন্দির—'ওয়াট্‌ আরুণ'
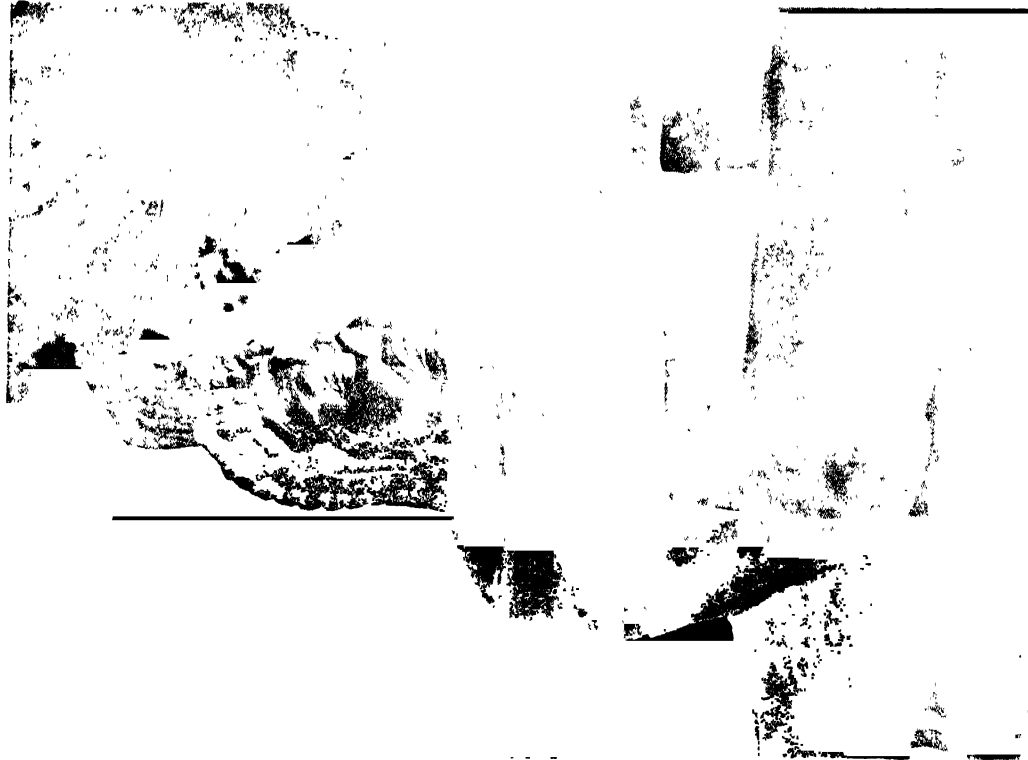
আঙ্কোর থোম মন্দির-তোরণে অসুর-মূর্ত্তি

কম্বোজের আঙ্কোর ওয়াট্ মন্দিরের তোরণে হিন্দু দেবীমূর্ত্তি

বিস্মৃত মহানগরী অশিও

শ্রীনিরুপমা নায়ার

অনাদিকাল থেকে রহস্যময়ী প্রকৃতির নিষ্ঠুর খেয়ালে যে কত সমৃদ্ধিশালী মহানগরী জনপদ ও মানবের বিবিধ কীর্ত্তির নিদর্শন পৃথিবীর বুক হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে তাহার অন্ত নাই। প্রকৃতির এই ধ্বংসলীলার একটি নিদর্শন সম্প্রতি উদ্ঘাটিত হইয়াছে ইন্দোচীনে। সাইগন যাদুগৃহের অধ্যক্ষ ডাঃ লুই ম্যালারেটের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে ভূগর্ভে বিলুপ্ত এই জনপদটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইন্দোচীনের দক্ষিণ-পশ্চিমে মেকঙ ব-দ্বীপে এটি অবস্থিত। স্থানটির অবস্থিতি এবং সেখানে প্রাপ্ত বিবিধ বস্তু হইতে অনুমিত হয় যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১০০ অব্দ হইতে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত জনপদটি বর্ত্তমান সিঙ্গাপুরের মত প্রাচ্যের একটি সমৃদ্ধিশালী প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ-ইন্দোচীনের চাষীরা স্থানটিকে 'অশিও' বলিয়া থাকে।

উক্ত স্থানটি এখন অধিকাংশ ব-দ্বীপের মত পঙ্কিল জলাভূমিবিশেষ। বৎসরে চারটি মাস মাত্র ইহার মাটি শুষ্ক থাকে, বাকি আট মাস নিমজ্জিত থাকে তিন ফুট জলের নীচে। ধান্য চাষের পক্ষে স্থানটি বিশেষ উপযোগী, কিন্তু স্থানীয় কৃষকেরা উক্ত জমিতে ফসল বুনিতে সম্পূর্ণ নারাজ। তাহাদের বিশ্বাস ঐ স্থানে বহু অপদেবতার বাস। যখনই কোন চাষী ওখানে ফসলের বীজ বপন করিয়াছে তখনই সে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সুতরাং কোন্ অজানা যুগ হইতে অশিওর সুবিশাল ১০০০ একর (প্রায় ৩৪০০ বিঘা) জমির বুকে কীর্ত্তিনাশা খেয়ালী মেকং নদী অবাধে পলিমাটি ঢালিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে জন্মিয়াছে বিবিধ তৃণগুল্ম তরুলতা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। নিকটবর্ত্তী পল্লীর চাষীরা আরও বলে যে, ঐ জঙ্গল-মধ্যে অসংখ্য, বিরাটকায় প্রস্তরখণ্ডসমূহ পড়িয়া আছে। প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট দিনে আশপাশের পল্লীসমূহের চাষীরা ফল-মূল, ঝলসানো বরাহ ও কুক্কুট লইয়া সেখানে যায় এবং সেই শিলাখণ্ডগুলিকে পূজা করিয়া দ্রব্যগুলি অপদেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া চলিয়া আসে। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, অশিওর অধিষ্ঠাতা অপদেবতাদের এ ভাবে তুষ্ট না করিলে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া চাষীদের বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতে পারে। বিস্মৃত অতীতে যে স্থান সুদূর রোম, মিশর, পারস্য, ভারত ও মহাচীনের বণিকদের নিকট বিশেষ আকর্ষণীয় বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল আজ সেই বিলুপ্ত নগরী অশিও সম্পর্কে স্থানীয় অধিবাসী, ইন্দোচীনের গরীব নিরক্ষর চাষীদের প্রমুখাৎ এই কুসংস্কারমূলক উক্তিটুকু ছাড়া আর কোন খবরই পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদের নিকট ভূতলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৃহৎ শিলাখণ্ডসমূহের কথা শুনিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ম্যালারেটের মনে সেগুলি পরীক্ষা করিতে দুর্দ্দমনীয় কৌতূহল জন্মে।

১৯৪২ সাল। সমগ্র ইন্দোচীন তখন জাপানের কবলিত হইয়াছে। ফ্রান্সের সহিত সমুদয় যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সারা দেশে অভূতপূর্ব্ব বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। কিন্তু নানারূপ বাধাবিপত্তি সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ম্যালারেট রহস্যাবৃত অশিওর কথা বিস্মৃত হন নাই। ঐ বৎসর এপ্রিল মাসে কয়েকজন সহকর্ম্মী সহ তিনি অশিও অভিমুখে যাত্রা করেন। সে সময় হঠাৎ মেকং নদী বন্যায় পরিপ্লাবিত হইয়া যায়। সাইগন থেকে স্থলপথে অশিওতে পৌঁছানো অত্যন্ত বিপজ্জনক ও কষ্টকর। মেকং ব-দ্বীপের শত শত একর-ব্যাপী ধান্যক্ষেত্র আড়াই ফুট বন্যার জলে নিমজ্জিত হইয়া যায়। দক্ষিণ-ইন্দোচীনে যে প্রকার ধান্য জন্মে কেবলমাত্র অনুরূপ জমি ও আবহাওয়াই তাহার উপযোগী। সেই বিশাল শস্যভূমির কিছু উত্তরে অবস্থিত এক অনতি উচ্চ শৈলশ্রেণী—নাম বোধি পাহাড়। ইন্দোচীন ও শ্যাম রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত হস্তী পর্ব্বতের (Elephant Mountains) ইহা একটি শাখাবিশেষ। বোধি পাহাড় হইতে কয়েক মাইল পশ্চিমে দিগন্তপ্রসারী সমতল ভূমি।

ডাঃ ম্যালারেটের চাষী গাইড বলে, ইহাই সেই অপদেবতাদের আবাসভূমি অশিও। বন্ধুদের সাহায্যে খানিকটা জমি পরিষ্কার করিয়া ডাঃ ম্যালারেট দেখেন সেখানকার জমি স্থানে স্থানে ঢেউ-খেলানো—তাঁহার মনে হয় এটা সম্ভবতঃ কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফল। উঁচু স্তরগুলি অধিকাংশ স্থলেই শুষ্ক ও পঙ্কমুক্ত। চাষীদের বর্ণিত, বড় বড় শিলাখণ্ডগুলি সেই উচ্চ স্তরের জমিতে পড়িয়া আছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, সেগুলি সমকোণ তবে বিভিন্ন আকারের। শিলাখণ্ডগুলি যে একদা সুবৃহৎ ইমারৎ বা নগর-প্রাচীর নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ ম্যালারেটের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সামনের দিকে অগ্রসর হইতেই ঐরূপ অগণিত প্রস্তরখণ্ড তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক স্থানে খানিকটা জমি খনন করিতেই তাঁহার সকল সংশয় ঘুচিয়া গেল:

তিনি বুঝিতে পারিলেন মৃত্তিকায় অর্দ্ধপ্রোথিত সেই প্রস্তরগুলি কোন বিস্মৃত নগরীর বৃহৎ অট্টালিকার সুদৃঢ় বনিয়াদ। সেখান হইতে মৃৎপাত্রের কয়েকটি ভগ্ন খণ্ডও আবিষ্কৃত হইল। দক্ষিণে আরও কিছু দূর গিয়া দেখিলেন, গভীর অরণ্যমধ্যে পড়িয়া আছে কতকগুলি স্তূপের ভগ্নাবশেষ। একটি ধ্বংসস্তূপের নীচে কারুকার্য্যখচিত একটি বৃহৎ লৌহখণ্ড তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অশিওর অনেকখানি জায়গা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ও ফটো লইয়া ডাঃ ম্যালারেট সেবার সাইগনে ফিরিয়া যান।

পর বৎসর জানুয়ারী মাসে তিনি অনেক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুসহ অশিও যান সেখানকার মৃত্তিকা খনন করিয়া ভূগর্ভে নিহিত রহস্য উদ্ঘাটিত করিবার অভিপ্রায়ে। তিনি ইহার বিভিন্ন অংশে প্রায় কুড়িটি খাত খনন করেন। এক স্থানে আড়াই ফুট গর্ত্ত খনন করিতেই মৃত্তিকামিশ্রিত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণকণা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই অংশটি ধরিয়া বরাবর যে ট্রেঞ্চ খনন করা হইয়াছিল সেটি দৈর্ঘ্যে ছয়শত গজ। তাহার প্রত্যেক অংশেরই মাটির ভিতরে অনুরূপ স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। প্রথমে ডাঃ ম্যালারেট মনে করেন, হয়তো ইহা প্রাচীন কালের কোন বিলুপ্ত নদীগর্ভের স্বর্ণখনি হইবে। কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্রে স্বর্ণকণাগুলি পরীক্ষা করিতেই তাঁহার এই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন সেগুলি স্বর্ণালঙ্কার নির্ম্মাণকালীন সোনার গুঁড়া। সুতরাং এই স্থানে একদা যে স্বর্ণকারপল্লী বিদ্যমান ছিল সে বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় হইলেন। ম্যালারেট আনন্দবিহ্বল কণ্ঠে তাঁর সহকর্ম্মীদের বলিলেন, "যেখানকার স্বর্ণকারপল্লী ছিল এতখানি জায়গা জুড়িয়া, না জানি সে জনপদ ছিল কত সমৃদ্ধিশালী।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, স্বর্ণকণাগুলি জমির উপরের স্তরে না থাকিয়া আড়াই ফুট নিম্নে নিমজ্জিত হইল কি করিয়া? ইহার উত্তর হইল এই যে, অশিও নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর উক্ত অংশে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে এরূপ একটি ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন ঘটে যাহার দরুন সমগ্র অশিও নগরী ভারতবর্ষের নালন্দার ন্যায় ভূগর্ভে ডুবিয়া যায়। বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ ডাঃ ভবি বলেন যে, হস্তী পর্ব্বত হইতে মেকং নদের আনীত অপর্য্যাপ্ত পলিমাটি এই দেড় সহস্র বৎসরে সমগ্র অশিওকে আড়াই ফুট পুরু আস্তরণে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। অশিওর দক্ষিণাংশেও একই স্তরে বিলুপ্ত অশিওর নাগরিকদের ব্যবহৃত নানারূপ দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হয়; যথা: কাঁচের পুঁতি, কয়লার টুকরা, ভগ্ন রেকাবী, পানপাত্র, কড়া, খুনতি, ছুরি, শাবল ছোট বড় কৌটা ও বাক্সের ভাঙা টুকরা। এই সমস্ত দ্রব্যের নীচে দৃষ্ট হয় প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহের ভিত্তি। কয়েকটি স্থানে দুই ফুট পরিধির কতকগুলি গলিত কাঠের গুঁড়ির অবশিষ্টাংশও দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি যে কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহের ভিত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। ইন্দোচীনের সাধারণ অধিবাসীদের ন্যায় অশিওবাসীরাও অধিকাংশই কাঠের গৃহে বাস করিত।

অশিওর উত্তরাংশে আড়াই ফুট জমির নিম্নেও কোন দ্রব্যাদি দৃষ্টিগোচর হয় না; তার সমস্তটাই পলিমাটি। ভাড়া করা শ্রমিকরাও প্রথমে মিছামিছি খনন করিতে রাজী হয় নাই। শেষে ডাঃ ম্যালারেট তাহাদের পারিশ্রমিক কিছু বাড়াইয়া দিয়া স্বয়ং শাবল লইয়া তাহাদের সহিত ট্রেঞ্চে অবতরণ করেন। আলগা মাটির মধ্যে একটি কঠিন চকচকে জিনিষ হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি তাহাতে উৎসাহিত হইয়া উঠেন, অল্প খনন করিবার পর দেখা যায় সেটি একটি পূজার তাম্র-পাত্রের ভাঙা অংশবিশেষ। ডাঃ ম্যালারেট তখন শ্রমিকদের মজুরি দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিয়া আরও খনন করিতে তাহাদের আদেশ দেন। সাড়ে সাত ফুট মাটি খুঁড়িবার পর লৌহদণ্ড, লৌহনির্ম্মিত কোন বিস্মৃত যন্ত্রের চাকা, তামার পাত, ওয়াশার, টিনের টুকরা, টিনের বাক্স, দস্তা, ব্রোঞ্জ, লোহার বৃহৎ চাঙর, তাম্র গলাইবার পাত্র এবং তাহার নিকট প্রস্তরনির্ম্মিত বৃহৎ চুল্লী ইত্যাদি আরও অনেক বিস্ময়কর বস্তু আবিষ্কৃত হয়। সেই বিলুপ্ত নগরীর অধিবাসীরা বিবিধ শিল্পে কিরূপ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল এই জং ধরা ভূ-প্রোথিত বস্তুগুলি তাহারই নিদর্শন। ডাঃ ম্যালারেট এই নব আবিষ্কৃত, ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীকে সুদূর প্রাচ্যের ভেনিস নামে অভিহিত করেন। অশিওর অধিকাংশ গৃহ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণার্থে প্রস্তরাদি নিকটবর্ত্তী বোধি পাহাড় হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

অশিওর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের অধিবাসীরা কেন যে প্রস্তরনির্ম্মিত উঁচু থাম বা বৃহৎ গুঁড়ি পুঁতিয়া তাহার উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিত তাহাও বুঝিতে পারা গিয়াছে। নগরের উক্ত অংশে অনুরূপ গৃহের নিদর্শন অনেক পাওয়া গিয়াছে। ডাঃ ম্যালারেট এই সমস্ত বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলেন যে, দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে অশিও সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত ছিল। উপকূলস্থ জমি বর্ষাকালে বন্যায় প্লাবিত হইত বলিয়া এই অংশে গৃহাদি অনুরূপ পদ্ধতিতে নির্ম্মিত হইত। কিন্তু প্রাকৃতিক বিধানে মেকং নদীর আনীত পলিমাটি দ্বারা অশিওর উপকূল-সীমা ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে সরিয়া যায়; ফলে দুই হাজার বৎসর পরে

আজ সমুদ্র হইতে অশিওর দূরত্ব ষোল মাইল! অশিওর সমকালে শ্যাম উপসাগর আরও প্রশস্ত ছিল। অনেক প্রাচীন পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে উহা মহাসমুদ্র নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু মেকঙের বদ্বীপক্ষেত্র সম্প্রসারিত হওয়ায় শ্যাম উপসাগরের পূর্ব্ব উপকূল-রেখা ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে আগাইয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিদগণ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সুবিশাল বদ্বীপের আয়তন বৎসরে আশী গজ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। মালয়ের উত্তরপ্রান্তস্থ কেলানটান জেলা হইতে ইন্দোচীনের দক্ষিণ-ভাগে জিহ্বাকৃতি বদ্বীপের দূরত্ব এখন ২৯৪ মাইল। এই বৃদ্ধি এভাবে চলিতে থাকিলে আরও ছয় হাজার বৎসর পরে অর্থাৎ ৭৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান শ্যাম উপসাগর দক্ষিণ-চীন সমুদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উত্তর-এশিয়ার উরাল হ্রদের মতই একটি বৃহৎ হ্রদে পরিণত হইবে; এবং মালয় ও ইন্দোচীনের মধ্যে প্রথম স্থলপথ রচিত হইবে।

জাপ-শাসিত ইন্দোচীনে ফরাসীদের উপর নানারূপ আইন-কানুন প্রযুক্ত হওয়ায় ডাঃ ম্যালারেটকে দ্বিতীয় অভিযান অসম্পূর্ণ রাখিয়াই সাইগনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

ওদিকে, অশিওর জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমিতে আসিয়া কতকগুলি সাহেব মৃত্তিকাগর্ভ হইতে অনেক মূল্যবান জিনিষ আহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে—এই গুজবটি নিকটস্থ পল্লীসমূহে প্রবেশ করিয়া নিরক্ষর চাষীদের চঞ্চল করিয়া তোলে। তাহারা মনে করে সেই স্থানে বুঝি স্বর্ণখনি বা গুপ্তধন লুকানো আছে। তাহার পর হইতে দলে দলে চাষীরা ঔৎসুক্য সহকারে শাবল কোদাল ইত্যাদি কাঁধে লইয়া অশিওর দিকে রওনা হয়। অশিওর বক্ষ খনন করিয়া বহু দ্রব্যসামগ্রী তাহারা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নিরক্ষর চাষীরা এই সমস্ত জিনিষের প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য বুঝিতে পারে নাই, এবং এগুলিকে সযত্নে রক্ষাও করে নাই—ফলে বিলুপ্ত নগরী অশিওর অতীত গৌরবের সাক্ষ্যস্বরূপ এই সমস্ত প্রত্নদ্রব্যাদি কিছু কিছু বিনষ্ট হইতে থাকে।

ডাঃ ম্যালারেট অনেক চেষ্টার ফলে জাপানীদের বন্দী-নিবাস হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং পরে জানিতে পারেন যে, অশিওর অতীত গৌরবের বহু অমূল্য নিদর্শন চাষীদের হস্তগত হইয়াছে। তিনি অবিলম্বে কয়েকজন সহকর্ম্মী সমভিব্যাহারে ঐ সকল পল্লীতে গিয়া চাষীদের নিকট প্রত্নদ্রব্যগুলির খোঁজ লন এবং সেগুলি উপযুক্ত মূল্যে কিনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন তাহারা প্রফুল্লচিত্তে ঝুড়ি বোঝাই করিয়া রকমারি দ্রব্য তাঁহার সম্মুখে আনিয়া হাজির করে। জিনিসগুলির সংখ্যা কুড়ি হাজার। ডাঃ ম্যালারেট সবগুলিই ক্রয় করেন। সেগুলির মধ্যে গিলটি-করা একটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া যায়; ইহা ওজনে পাঁচ পাউণ্ড এবং খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। অশিওতে প্রাপ্ত মূল্যবান্ প্রস্তরখণ্ডসমূহের কারুকার্য্য বিস্ময়কর; কিছুদিন পূর্বে উত্তর-মালয়ে কুয়ালা (টাইপিঙের নিকটবর্ত্তী) সেলিসিঙ পল্লীতে প্রাপ্ত কয়েকটি প্রত্নদ্রব্যের সহিত তাহাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সেই সঙ্গে প্রাপ্ত অনেকগুলি মৃন্ময় পাত্রের গাত্রস্থ কারুকার্য্যে তংকিঙ ও শ্যামী শিল্পীদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মেয়েদের অলঙ্কারাদিও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। অলঙ্কার-গুলি এত বিভিন্ন প্রকারের যে কোন্‌টি কোন্ অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিত তাহা ইন্দোচীনের আধুনিক অধিবাসীদের পক্ষে বলা সম্ভবপর নয়। সেগুলির অধিকাংশ রৌপ্য-নির্ম্মিত। ইহাদের মধ্যে নাকি অনেকগুলি স্বর্ণালঙ্কারও ছিল; কিন্তু ডাঃ ম্যালারেটের আগমনের পূর্ব্বেই চাষীরা অর্থের লোভে সেগুলি অন্যত্র বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। অলঙ্কারগুলির মধ্যে কয়েকটির সঙ্গে প্রাচীন রোমের অলঙ্কারের সাদৃশ্য আছে। রোমান ভাস্কর্য্য পদ্ধতিতে নির্ম্মিত কয়েকটি প্রস্তরমূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল এক যোদ্ধার মূর্ত্তি। তাহার শিরস্ত্রাণ ও অন্যান্য পোশাক-পরিচ্ছদের সহিত পারস্যের সাসানিদদের (২১৮—৬১৯ খ্রীঃ অঃ) পোশাকের বিশেষ পার্থক্য নাই। ইহা হইতে অনায়াসেই প্রমাণিত হয় যে, সুপ্রাচীন বাণিজ্য-কেন্দ্র অশিওর সহিত সুদূর রোম ও পারস্যের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল।

বিষ্ণু ও অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর এমন কয়েকটি প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে যেগুলির নিম্নভাগে প্রস্তর ফলকে সংস্কৃত শ্লোক উৎকীর্ণ। ডাঃ ডবি সেগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহার প্রত্যেকটি গুপ্ত যুগের (৩০০—৫০০ খ্রীঃ অঃ) সমসাময়িক। ভারতের সংস্কৃতি তথা হিন্দুধর্ম্ম সুদূরপ্রাচ্যের এই অঞ্চলে যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ইহা তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। চীন দেশের হান যুগে (১০০—২০০ খ্রীঃ অঃ) নির্ম্মিত একখানি কারুকার্য্য-খচিত রূপার ফ্রেমে আঁটা দর্পণও আবিষ্কৃত হয়। ইহা ছাড়া পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ-ভারতের শিল্পকলা ভাস্কর্য্য ইত্যাদির বহু নিদর্শন সেখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কোন্ অমূল্য পণ্যদ্রব্যের সন্ধানে সুদূর রোম, পারস্য, পেকিং হইতে বণিকেরা অশিওতে আসিয়া বাণিজ্যপোত নোঙর করিত তাহা আজও সঠিক ভাবে জানা যায় নাই। প্রস্তরে খোদিত কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক ছাড়া আর কোন উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ডাঃ ম্যালারেট বলেন,

অশিওতে সম্ভবতঃ এমন কোন মূল্যবান্ বস্তু পাওয়া যাইত যাহার লোভে তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ধনী ব্যবসায়ীরা অশিও বন্দরে আসিতেন। ইন্দোচীনের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে দক্ষিণ-ইন্দোচীনে মাছরাঙা জাতীয় এক প্রকার পাখীর বিচিত্র পুচ্ছ পাওয়া যাইত। উহা এক মূল্যবান পণ্যসামগ্রীরূপে সমগ্র পৃথিবীতে রপ্তানী হইত। চীনের হান আমলে রচিত একখানি কাব্য (তিয়েন নিও) হইতে জানিতে পারা যায় যে, "কোন এক-জন খণ্ড নাগরিক দক্ষিণ-ইন্দোচীন হইতে আনীত দুটি বিচিত্র বর্ণের নান-পে-হুঙ পক্ষী মহারাজাকে প্রদান করিয়া তাঁহার চিত্তরঞ্জন করিয়াছিলেন।" অধুনা উক্ত পক্ষীর বংশ লোপ পাইয়া গিয়াছে। খুব সম্ভব ঐ পক্ষীর পুচ্ছ ছিল অশিওর অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় পণ্যসামগ্রী।

এখন উক্ত বিলুপ্ত নগরীটির নাম সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের চাষীরা উহাকে 'অশিও' বলিয়া থাকে। এই 'অশিও' শব্দের যে কি অর্থ সে সম্বন্ধে গবেষণা হওয়া উচিত। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল স্থানে যে ভারতীয়দের উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়াছে। হয়তো তখন ইহার অন্য নাম ছিল। কালক্রমে ইহা অশিও নামে পরিচিত হইয়া উঠে। অশিওর বুকে বিভিন্ন রাজ্য ভাঙা-গড়ার অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

মালয়ের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত কেলানটান জেলাটি বর্ত্তমান অশিও হইতে ২৯৪ মাইল দূরে। দক্ষিণ-ইন্দো-চীনের সহিত প্রাচীন মালয়ের যে কিরূপ সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাহা পুরাতত্ত্বানুরাগীরা অবগত আছেন। প্রাচীন ইন্দোচীন সম্পর্কে অনেক খবর আমরা জানতে পারি কেলানটানের রূপকথাসমূহ হইতে। কিন্তু অশিও নামক কোন নগরীর নাম তাহাতে পাওয়া যায় না। তবে কেলানটানের জনৈক সমর-নিপুণ নৃপতির দিগ্বিজয় কাহিনীতে অশ্বপুর নামক এক নগরের উল্লেখ আছে। কাহিনীটি এই—"সুবিস্তীর্ণ পূর্ব্বসমুদ্রের (শ্যাম উপসাগর) অপর তীরে অবস্থিত আনসেই রাজ্যের নৃপতি একদা তাঁহার সাগরতীরে নির্ম্মিত বিচিত্র নগরী 'অশ্বপুর' দর্শনার্থে কেলানটানাধিপতি মহারাজ সুপর্ব্বকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহারাজ সুপর্ব্ব রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় নিজে যাইতে পারেন নাই, কিন্তু নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে স্বীয় অনুজ সুমিত্রকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অশ্বপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তুংকু সুমিত্র রাজ-সভায় বলিয়াছিলেন যে, অশ্বপুরের ন্যায় অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যশালী নগরী তিনি আর কোথাও দেখেন নাই,...অশ্বপুরের তিন দিক সু-উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল,...নাগরিকদের মধ্যে প্রায় সকলেই প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত। তাহাদের গৃহগুলি বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত ছিল। নগরের পূর্ব্বাংশে রাজপ্রাসাদ... প্রাসাদের সুপ্রশস্ত কক্ষগুলি স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যে খচিত আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। রাজপ্রাসাদের সু-উচ্চ শিখর হইতে সমগ্র বন্দরটি দৃষ্টিগোচর হইত। বন্দরে সর্ব্বদা শত শত বাণিজ্যপোত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে, মহার্ঘ্য পণ্যসামগ্রী বহন করিয়া আনিত। সে রাজ্যের স্ত্রীলোকেরা অসামান্যা সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। সকল বিষয়েই তাহারা পুরুষদের সমকক্ষ।" বলা বাহুল্য, তুংকু সুমিত্র স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় রাজদত্ত বিবিধ উপঢৌকন সহ একটি পরমাসুন্দরী রাজ দুহিতাকেও লইয়া আসিয়াছিলেন।

মালয়ের প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ ডাঃ ডবি বলেন, সম্ভবতঃ এই 'অশিও' শব্দটি সেই ঐশ্বর্য্যশালী অশ্বপুরেরই অপভ্রংশ। অবশ্য কেবল রূপকথার নজিরের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন অশ্বপুর ও বর্ত্তমান অশিওকে অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা সমীচীন নহে।

তবে 'নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ'—রূপকথা কিংবদন্তী ইত্যাদি সব সময় একেবারে অমূলক নাও হইতে পারে। ভবিষ্যতে প্রত্নতত্ত্ববিদদের গবেষণায় একথা প্রমাণিত হওয়া অসম্ভব নয় যে, ভূগর্ভে আবিষ্কৃত অশিও সেই সেই সমৃদ্ধশালী অশ্বপুরেরই ধ্বংসাবশেষ।

সেকালের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়

শ্রীকালীপ্রসাদ ঠাকুর

বর্ত্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো রচনায় অন্যান্য দেশের মতই আমাদের দেশের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখাগুলি ভারতবর্ষে যে সকল কাজকারবার করিয়া থাকে তাহা ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় যৎসামান্য হইলেও আমাদের স্বদেশী আবেষ্টনীতে ইহাকে একেবারে নগণ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করা চলে না। "চেক্" নামধারী যে বস্তুটির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ আজ আমরা পাইয়াছি, তাহারই দৌলতে টাকা-পয়সার লেনদেন ব্যাপারে আজ আর আমরা অযথা সময় নষ্ট বা চিন্তা-ভাবনা করি না। লক্ষ লক্ষ টাকার দেনাপাওনার হিসাব-নিকাশ যদি কাঁচা টাকায় করিতে হইত তবে কত সময় ইহার পিছনে নষ্ট হইয়া যাইত। তাহার উপর ছিল ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা। জাল নোট বা অচল টাকাও এই সকল লেনদেনে স্থান পাইত। চেকের অবিদ্যমানতায় সেকালে দেনাপাওনার কাজ ছিল এক অভিনব সতর্কতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্র।

সেকালের এই সব নিরর্থক ভাবনা আজ আর আমাদের ভাবাইয়া তুলে না। কোটি কোটি টাকার দেনা-পাওনা একখানি চেকপত্রে মিটিয়া যায়। শুধু কি তাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারেও আজ আমরা খাজাঞ্চীর কাজকর্ম্মগুলি নিজেদের ঘাড় হইতে সরাইয়া ব্যাঙ্কের উপর চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে আপন আপন কর্ম্ম করিয়া যাইতেছি। মুদি, দর্জ্জি, ডাক্তার-বৈদ্যের মাসিক পাওনা-গুলি পর্য্যন্ত হিসাব অনুযায়ী ব্যাঙ্কের উপর চেক্ কাটিয়া পরিশোধ করিয়া থাকি। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব, এমন কি বিবাহ-বাসরে বা বৌভাতে বর-কনেকে লাল কালিতে লেখা চেক্ দান করিয়া আশীর্ব্বাদ-পর্ব্বও সমাধান করিয়া থাকি। হয়ত আগামী দিনে চেকের প্রসারতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রেজকির ব্যবহার আরও কমিয়া যাইবে। তখন পূজার পার্ব্বণী, বাজার-খরচ, মেথর-মুদ্দফরাস প্রভৃতির পাওনাগুলিও চেক্ কাটিয়া মিটান যাইবে। তখন হয়তো "আজ নগদ কাল ধার" জাতীয় প্রাচীরপত্রগুলির সতর্কতা-সূচক ঘোষণার কোন প্রয়োজন থাকিবে না। অভিনব কথা নয় কি?

একালের বিদেশী শব্দ "ব্যাঙ্ক" কথাটির প্রচলন না থাকিলেও সেকালে আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। আলিবর্দ্দী খাঁর আমলের জগৎশেঠ প্রমুখ ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতায় মুঘল-পাঠান নবাব-বাদশাদের ঠাট বজায় থাকিত। সে ত ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। অংশীদারদের সীমাবদ্ধ দায়িত্ব পদ্ধতিতে গঠিত বর্ত্তমানের ব্যাঙ্কিং প্রতি-ষ্ঠানগুলির সূত্রপাত হয় ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। এই প্রথায় সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে "হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক লিমি-টেড"কেই অগ্রণী বিবেচনা করা যাইতে পারে। তাহার পর বহু প্রতিষ্ঠানের অভ্যুত্থান ও পতনের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লেখা রহিল। যাহা স্পষ্ট ভাষায় লেখা রহিল না আর যাহার প্রয়োজনীয়তা ছিল প্রচুর তাহা হইল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই সকল অধুনালুপ্ত অক্লান্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টা আর অভিজ্ঞতা, যাহার ফলে পরবর্ত্তীকালে ভারতীয় মূলধনে ও তত্ত্বাবধানে বিরাট বিরাট ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলা সম্ভব হইল।

সেকালের ও একালের ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে কি বিরাট প্রভেদ? কর্ম্মধারায়, দ্রব্যসম্ভারে এমন কি কর্ম্মচারীবৃন্দের শিক্ষাদীক্ষায়ও কি বিপুল পার্থক্য? সমস্ত জিনিসটাই এমনভাবে বদলাইয়া গিয়াছে যে দুই বা আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বেকার ব্যাঙ্কসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি যদি আজ জীবিত থাকিতেন তবে হয়ত তাঁহার পক্ষে আধুনিক ব্যাঙ্কের কার্য্য বুঝিয়া লওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়া-ইত। ঠিক এমনই ভাবে বিংশ শতাব্দীর একজন ব্যাঙ্ক কর্ম্মীর পক্ষে ঊর্দ্ধতন দুই শতাব্দীর আর একজন অগ্র-গামীকে সমশ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত করাও কঠিন হইয়া দাঁড়াইত।

জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ আমানত রাখা এবং ঐ টাকা চাহিবামাত্র পরিশোধ করা ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রধান কার্য্য। সেকালের তুলনায় টাকা-পয়সার রূপই কি ভাবে না পরিবর্ত্তিত হইয়াছে? হিন্দু বা মুসলমান রাজাদের মূর্ত্তি-অঙ্কিত সোনার মোহর বহুকাল পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইয়াছে। স্বর্ণকারের দোকানে অলঙ্কার গড়াইবার কার্য্যে কেবলমাত্র তাহাদের দর্শন মিলে। আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক আর্থিক লেনদেনের কাজ হইতে তাহারা অবসর গ্রহণ করিয়াছে। হাজার, দশ হাজার টাকার নোটগুলি পর্য্যন্ত আজ অকেজো হাতিয়ারে পরিণত। ব্যাঙ্কের বড় বড় লোহার সিন্দুকগুলি স্বর্ণমুদ্রার ঔজ্জ্বল্যে এখন আর ঝলমল করে না সেগুলি তাই যেন আজকাল একটু স্তিমিত

নিষ্প্রভ। বেশীর ভাগ নোটই এখন দশ, পাঁচ টাকার আর সবগুলি এক শত টাকার নোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এমন কি, রূপার টাকাগুলিও আজ ইতিহাসের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাঙ্কের ইমারতগুলি তাই আজ আর টাকার মিঠেকড়া আওয়াজে গুঞ্জরিত হয় না। টাকাগুলি নাকি এখন আর বাজে না—এগুলি একেবারেই বাজে।

সেকালে ব্যাঙ্কগুলির নজর ছিল প্রধানতঃ নোট ছাপাইয়া বাজারে বাহির করিবার দিকে। নগদ টাকা জমা রাখিতে বা আমানতী টাকা উঠাইয়া লইতে তখনকার দিনে আমানতকারীকে সশরীরে ব্যাঙ্কের দরজায় হাজির হইতে হইত। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা গেজেটে এক প্রচারপত্র জারী করা হয়, তাহাতে ঘোষণা করা হয় বেঙ্গল ব্যাঙ্কের আমানতকারীগণ আবেদন করিলে চেকপত্র দেওয়া হইবে। আমানতকারী স্বাক্ষরিত চেকপত্র দ্বারা আপন ইচ্ছানুযায়ী ব্যাঙ্কের মারফত টাকা লেনদেন করিতে পারিবেন। চেকের সহিত আজ আমরা এমন ভাবে পরিচিত যে উহার বিশদ বিবরণ শুনিবার জন্য জনসাধারণ অপেক্ষা করে না; তাই এখন আর ইহার বিজ্ঞাপনে কোন সার্থকতা নাই। তখনকার দিনে যে কেহ খুশীমত ব্যাঙ্কের সহিত চলতি আমানতী হিসাব খুলিতে পারিত। এখনকার ন্যায় সুপারিশপত্রের প্রয়োজন হইত না। সেগুলি সুখের দিন ছিল বৈকি। চেকের মারফত জাল জুয়াচুরি এদেশবাসী তখনও শিখিয়া উঠে নাই, তাই সতর্কতার তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না।

তখনকার দিনে এক জায়গা হইতে অন্যত্র টাকা-পয়সা পাঠাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। বাক্স বোঝাই করিয়া সিং, সরদার বরকন্দাজের সাহায্যে সরকার অথবা জমিদার তাহার খাজনা আদায়ী অর্থ স্থানান্তরিত করিত। জনসাধারণ কাপড়ের আঁচলে করিয়া বা কোমরে বাঁধিয়া অর্থ এধার-ওধার করিত। তবুও চুরি-ডাকাতিতে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। ক্রমে দেখা দিল "হুণ্ডি"। বিশ্বাসী কারবারীর স্থানীয় গদীতে টাকা জমা রাখিয়া অন্য স্থানীয় আড়ত হইতে অনুরূপ অর্থ গ্রহণ করা যাইত অবশ্য পারিশ্রমিক হিসাবে কারবারীকে বেশ কিছু মুনাফা বা বাট্টা দিতে হইত। ক্রমে ক্রমে দেখা দিল ব্যাঙ্কের মারফত টাকা প্রেরণের রীতি। নামমাত্র বাট্টার বিনিময়ে আজ আমরা কলিকাতা হইতে বোম্বাই টাকা পাঠাইতে পারি। জরুরী বোধে তারেও অর্থ প্রেরণ করা চলে। এখনও যে কয়খানি "হুণ্ডী" আমাদের নজরে পড়ে, কালক্রমে তাহাও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

সেকালে আমানতকারীরা সাময়িকভাবে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কর্জ্জ গ্রহণ করিতে পারিত না। এখন যেমন ঠেকা-বেঠেকায় ক্ষেত্রবিশেষে আমানতের তুলনায় অধিক অর্থের চেক কাটিয়া পাওনাদারের দাবি মিটান যায়, ব্যাঙ্কের পাওনা পরে শোধ করিলেও চলে—তখনকার দিনে এমনটি করা যাইত না। উপযুক্ত ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করা যাইত, কিন্তু কোনক্রমেই ঐ কর্জ্জের মেয়াদ চার মাসের অধিক হইত না।

আজকাল সাধারণতঃ ব্যাঙ্কের কর্জ্জের মেয়াদ থাকে প্রথমতঃ এক বৎসরের, তার পর পুনঃপ্রবর্ত্তন দ্বারা ঐ কর্জ্জকেই বছরের পর বছর ধরিয়া জীয়াইয়া রাখা চলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর তুলনায় ধনসম্পত্তি বলিয়া যেসব জিনিসকে গণ্য করা হইত তাহার পরিধিও বর্ত্তমানে নানাদিকে বর্দ্ধিত হইয়াছে। তখনকার দিনে শেয়ার-বাজারের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কোম্পানীর আইন বা অংশীদারদের সীমাবদ্ধ দায়িত্ব-পদ্ধতি তখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সুতরাং কোম্পানীর শেয়ার গচ্ছিত রাখিয়া বর্ত্তমানে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক যে অর্থ খাটাইয়া থাকে তাহার সুবিধা তখন ছিল না। সেদিনের ব্যাঙ্কগুলির প্রধান গ্রাহক ছিলেন সরকার। প্রয়োজনবোধে সরকারী ঋণে অর্থ নিয়োজিত করিয়া ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের মুনাফা আহরণ করিত।

তখনকার দিনে সুদের হার ছিল বর্ত্তমানের তুলনায় মারাত্মক রকম চড়া। জেনারেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চের বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় এই প্রতিষ্ঠানটি এক শত টাকা কর্জ্জের উপর বার্ষিক শতকরা চব্বিশ টাকা সুদ আদায় করিত। উহার উর্দ্ধে ব্যাঙ্কের সুদের হার ছিল বার্ষিক শতকরা ১২৲ টাকা মাত্র। তখন এদেশে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পত্তন হয় নাই। সুদেরও তখন কোন মাপকাঠি ছিল না। আজ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৩৲ টাকা ধার্য্য হওয়ায় তালিকাভুক্ত (সিডিউল্ড) ব্যাঙ্কগুলি জনসাধারণের নিকট হইতে শতকরা ৪৲ অথবা ৫৲ টাকার বেশী সুদ আদায় করিতে সাহসী হয় না। আমানতের উপরও তখন বেশ কিছু মোটা সুদ পাওয়া যাইত। অনেক ক্ষেত্রেই উহার পরিমাণ ছিল শতকরা আট হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত। আজ সেই আমানতের উপরই কোন সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্ক বার্ষিক শতকরা ১৲ টাকা মাত্র অথবা ১।০ টাকার বেশী সুদ দিতে রাজী হয় না।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যাপারে কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ যেন পৃথিবীর দূরত্ব সঙ্কীর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কালাপানি পার

হইতে আজ আর আমাদের মাসাবধি অপেক্ষা করিতে হয় না। কলিকাতা বোম্বাই তো ঘরের পাশে বলিলেই হয়।

বিজ্ঞানের ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা দিকে অর্থনৈতিক সুবিধাও ঘটিয়াছে। এখন প্রয়োজন বোধে পৃথিবীর যে-কোন উল্লেখযোগ্য শহর হইতে পৃথিবীর অন্য যে-কোন শহরে টাকা-পয়সা পাঠানো যাইতে পারে। নবাবী আমলে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় জিনিসটা এত সহজ ছিল না। তখন তার-বেতারের বালাই ছিল না। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজগুলি পণ্য বোঝাই করিয়া বছরের প্রথম দিকে সমুদ্র-যাত্রা করিত। জুলাই, আগষ্ট মাস নাগাদ এই সকল জাহাজ ভারতবর্ষের মাটি স্পর্শ করিত। বিলাতী মাল খালাস করিয়া ভারতের সোনা লুণ্ঠন করিয়া জাহাজগুলি আবার বর্ষশেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। বছরের এই শেষ সময়টিতে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের লেনদেন হইত। তাহার জন্য কলিকাতা গেজেটে রীতিমত বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত।

সেকালে ভারতবর্ষে কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছিল না, সুতরাং ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেরাই নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিত। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের সমগ্র মূলধনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কাঁচা টাকায় জমা রাখিত। বর্ত্তমানের তুলনায় উহা ছিল নিতান্ত অনাবশ্যক। বিংশ শতাব্দীর ব্যাঙ্কগুলি আমানতের শতকরা দশ-পনর ভাগ অর্থ নগদ টাকায় জমা রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাজ চালাইয়া যাইতে অসুবিধা ভোগ করে না। পাশ্চাত্য দেশে নগদ টাকার পরিমাণ আরও কমিয়া গিয়াছে। সেখানে আমানতের শতকরা আট ভাগ অর্থ নগদ টাকায় রাখিলে যথেষ্ট মনে করা যায়।

আবার অন্য কতকগুলি দিকে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়-পদ্ধতির তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রগতি পরিলক্ষিত হয় না। আজকাল ব্যাঙ্ক বলিতেই আমরা ধারণা করিয়া থাকি, সেখানে থাকিবে বড় বড় হলঘর, চারিদিকে বড় বড় থাম, পিতলের উজ্জল খিলান বেষ্টনী, ভাল ভাল চেয়ার-টেবিল, বিজলিবাতি ও পাখা- আমরা শিখি নাই যে ব্যাঙ্কের সত্যিকারের নিরাপত্তা নির্ভর করে তাহার ব্যবসায়-পদ্ধতির উপর—বাহিরের চাকচিক্যের উপর আর্থিক উন্নতি একেবারেই নির্ভর করে না। কিন্তু জনসাধারণের মন ভুলাইবার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কগুলি এই ধরণের আসবাবপত্রে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই ব্যয়ভার বহন করা প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রথম কয়েক বৎসর আমানতের টাকা ভাঙিয়া ঠাট বজায় রাখা কায়ক্লেশে সম্ভব হইলেও পরিণামে এই সকল প্রতিষ্ঠানকে কারবার বন্ধ করিতে হয়।

আধুনিক কায়দায় সদ্য-উদ্বোধিত একটি ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক-শাখার পক্ষে এদেশে আজকাল চাই—

ম্যানেজার বা এজেন্ট	১ জন
একাউন্টেন্ট্	১
কেরানী	২
খাজাঞ্চী	১
ঐ সহকারী	১
প্রহরী	১
চাপরাসী	৪ জন

এই সকল কর্ম্মচারীর বেতন ন্যূনকল্পে মাসিক একুনে ৮৫০৲ টাকা—ইহা ছাড়া আছে বাড়ীভাড়া, কাগজপত্র, বিজলি খরচ ইত্যাদি, ইত্যাদি। কমবেশী মাসিক খরচ বাবদ ১০০০৲ টাকা ব্যয়ভার প্রতিটি শাখাকে বহন করিতে হয়। এই ব্যয় নির্ব্বাহ করা নূতন নূতন শাখার পক্ষে কষ্টকর। মনে রাখা উচিত আমাদের দেশ গরীব। বাহিরের আদব-কায়দায় অযথা অর্থ ব্যয় না করিয়া যাহাতে অল্প খরচে ব্যবসায় চালানো যায় তাহাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। ইংলণ্ডে যখন একজন এজেন্ট, একজন কেরানী আর একজন খাজাঞ্চী দ্বারা একটি ক্ষুদ্রায়তন শাখা পরিচালনা করা যায়, তখন আমাদের দেশেই বা কেন উহা সম্ভবপর হইবে না?

বাহিরের চাকচিক্য যদিও আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি ওদেশের কর্ম্মকুশলতা আমরা আয়ত্ত করিতে পারি নাই। ইংলণ্ড বা আমেরিকায় চেক দাখিল করিয়া পাঁচ-সাত মিনিটে টাকা তোলা যায়; আমাদের দেশে কখনও কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া, দালানের কড়িকাঠ গুনিয়াও টাকা পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক উন্নতির ছোঁয়াচ আমাদের দেশের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্মপদ্ধতিতে তেমনভাবে লাগে নাই। টাইপরাইটার মেসিন ব্যবহার সত্ত্বেও প্রেসকপি আমরা ছাড়ি নাই। হাতে লেখা হিসাবের খাতা, ব্যাঙ্ক পাসবহি আজও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করিতেছি। মোমের বাতি, গালার শিল-মোহরের মোহ আজও কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। তাই ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালনা ব্যাপারে আমাদের অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হয়। বিদেশী প্রথায় অধিকতর যন্ত্রপাতির সাহায্য গ্রহণ করিলে ব্যবসায়ের অনেক ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারে। কাগজপত্রের অপচয়ও বহুলাংশে হ্রাস পাইবে।

বর্ত্তমানের মুদ্রাস্ফীতির চাপে জীবনযাপনের ব্যয়ভার এখন বহুগুণ বাড়িয়া যাওয়ায় ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীদের বেতনের হার বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতিরিক্ত বেতনের আকর্ষণে ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে আজকাল শিক্ষিত যুবকবৃন্দ ধাবিত হইতেছে। ব্যাঙ্কের চাকুরী এখন আর অল্প-শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ম্মস্থল বলিয়া বিবেচনা করা যায় না।

স্বাধীন ভারতে যে নবজীবনের সূত্রপাত হইবে তাহাতে অন্যান্য শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ও উন্নতিলাভ করিবে। অন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবে। বৈদেশিক বিনিময়-কার্য্য একমাত্র বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিরই একচেটিয়া ব্যবসায় থাকিবে না। যত্ন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা আমরা ভারতবাসী এদিকেও আমাদের কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিবার সুযোগ পাইব। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে কেবলমাত্র বেতন বৃদ্ধি ও চাকুরীর সুবিধা আদায় করিয়া ব্যাঙ্ককর্ম্মীর অবসর গ্রহণ করিলে চলিবে না। জনসাধারণের সেবাই ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধানতম কর্ম্ম। সে আদর্শ কর্ম্মে রূপায়িত করিতে যে মনোযোগের প্রয়োজন তাহাতে শৈথিল্য প্রকাশ করিলে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের উন্নতির পথে প্রবল অন্তরায় দেখা দিবে।

রাজবৈদ্য জীবক

শ্রীসুধাময়ী সেনগুপ্ত

ভগবান বুদ্ধ যখন মগধে তাঁহার করুণা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিতেছিলেন, রাজা বিম্বিসার তখন মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বিম্বিসার বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন, বৌদ্ধ সঙ্ঘে তাঁহার বিশেষ যাতায়াত ছিল। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। রাজ-পরিবারেও বুদ্ধের ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া স্বাভাবিক।

রাজকুমার অভয় একদা অনুচরগণসহ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। শহরের প্রান্তদেশে এক নির্জ্জন স্থান দিয়া যাইতে যাইতে সহসা এক দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন, এক স্থানে অনেকগুলি কাক কোন একটি বস্তুকে ঘিরিয়া কলরব করিতেছে। তিনি অনুচরকে বিষয়টি অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে বলিলেন। অনুচরটি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন একটি সুন্দর সদ্যোজাত শিশুকে কেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কাকগুলি মাংস ভক্ষণের আশায় তাহারই চতুর্দ্দিকে কলরব করিতেছে। কুমার শিশু-টিকে তুলিয়া আনিতে বলিলেন। এবং আনিলে দেখিলেন শিশুটি তখনও জীবিত আছে, কাকেরা তাহার বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে নাই এবং যত্ন করিলে শিশুটি বাঁচিয়া যাইতে পারে। অসহায় শিশুটিকে দেখিয়া তাঁহার মন করুণায় পূর্ণ হইল, তিনি শিশুটিকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া লালনপালন করিতে লাগিলেন। মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া জীবন লাভ করিল বলিয়া শিশুটির নাম হইল জীবক। এই জীবকই উত্তরকালে সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকরূপে খ্যাতিলাভ করিয়া পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে 'জীবক কোমার ভচ্চ' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কুমার কর্ত্তৃক লালিতপালিত হওয়ায় তাঁহাকে 'কুমারভক্ত' বিশেষণে অভিহিত করা হইত।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন বৈশালী নগরী ধনে জনে সুসমৃদ্ধ ছিল। সুন্দর সুসজ্জিত অট্টালিকশ্রেণী, প্রশস্ত রাজপথ, মনোরম উদ্যান প্রভৃতির শোভা সকলের নয়নমন পরিতৃপ্ত ও আনন্দে মুগ্ধ করিত। এই নগরীর সমৃদ্ধির খ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। অপূর্ব্ব সুন্দরী নটী আম্রপালীর রূপগুণের খ্যাতিও বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল।

বৈশালীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল রাজধানী রাজগৃহ। রাজগৃহ সর্ব্বদাই বৈশালীর সমকক্ষতা লাভের বা বৈশালীকে ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টায় রত ছিল এবং এই উদ্দেশ্যে রাজ-গৃহও বিশেষ সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হইয়াছিল। বৈশালীর সহিত পাল্লা দিবার জন্য রাজগৃহ-রাজও শালবতী নামে এক অপরূপ রূপলাবণ্যবতী ও সুশিক্ষিতা নটীকে আনয়ন করিলেন।

কালক্রমে শালবতী অন্তঃসত্ত্বা হইলেন, কিন্তু তাঁহার জীবিকা অর্জ্জনে ব্যাঘাত হইবে বলিয়া এই সংবাদ গোপন রাখিলেন; যথাসময়ে একটি সুন্দর পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, কিন্তু নিষ্ঠুরা জননী একটি সাজির মধ্যে করিয়া সন্তানটিকে কোন নির্জ্জন স্থানে পরিত্যাগ করিয়া আসিবার জন্য দাসীকে আদেশ করিলেন। এই পরিত্যক্ত শিশুই জীবক। কাহারও কাহারও মতে রাজকুমারই জীবকের পিতা।

রাজকুমার কর্ত্তৃক সযত্নে পালিত হইয়া ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত

হইলে জীবক চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশিলা গমন করিলেন। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় তখন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়রূপে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। দূর-দূরান্ত হইতেও বহু রাজকুমার, ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্রগণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য গমন করিতেন। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সকলের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করিতেন এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিও বিশেষ মূল্যবান বলিয়া পরিগণিত হইত। বৌদ্ধ জাতকের বহু গল্প তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণে পূর্ণ। এই সকল জাতকের গল্প হইতেই তথাকার ছাত্রজীবনের সুন্দর সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। ত্রি-বেদ, ধনুর্বিদ্যা, শস্ত্র-বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি অষ্টাদশ বিদ্যার সবগুলিই এখানে শিক্ষা দেওয়া হইত। জীবক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকের নিকট সাত বৎসর ধরিয়া সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা ও অধিগত করিয়া ফেলিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পরীক্ষা দিতে হইল। তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে একটি কুঠার দিয়া আদেশ করিলেন, তক্ষশিলার সমীপবর্ত্তী কয়েক যোজন স্থান অনুসন্ধান করিয়া এমন কোন একটি বৃক্ষলতা বা মূল লইয়া আসিতে হইবে, যাহা মানবের কোন রোগ-প্রতিষেধকরূপে ব্যবহার করা যাইবে না। জীবক সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও এমন একটিও বৃক্ষলতা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না যাহা মানবের কোনই কাজে লাগে না। তিনি বিষণ্ন মনে ফিরিয়া আসিয়া অধ্যাপককে তাঁহার বিফলতার কথা জানাইলেন। তাঁহার সন্দেহ হইল, হয়ত তাঁহার শিক্ষা সুসম্পূর্ণ হয় নাই! কিন্তু অধ্যাপক তাঁহার এই উত্তরে বিশেষ প্রীত হইলেন ও তাঁহাকে প্রভূত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, বৎস তোমার শিক্ষা সুসম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে তুমি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন কর। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে পাথেয়-স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন।

গুরুর আশীর্ব্বাদ ও পাথেয় সম্বল করিয়া জীবক গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। তখনকার দিনে যানবাহনের বিশেষ কোন সুবিধা ছিল না, পথও ছিল দুর্গম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পদব্রজেই যাতায়াত করিতে হইত। তক্ষশিলা হইতে রাজগৃহের দূরত্বও নিতান্ত কম নয়। কাজেই পথি-মধ্যেই তাঁহার গুরুদত্ত অর্থ নিঃশেষ হইয়া গেল। সুতরাং কিছু উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় জীবক কোন এক নগরে উপস্থিত হইয়া আপনাকে চিকিৎসক বলিয়া প্রচার করিলেন। সেই নগরেই এক মহাধনবান শ্রেষ্ঠীর স্ত্রী বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসার জন্য তাঁহারা জীবককে আহ্বান করিলেন। জীবক তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া কিঞ্চিৎ গলিত ঘৃত তাঁহার নাসামধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। গলিত ঘৃত নাসিকার মধ্য দিয়া মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করিতেই ঐ রমণী তাহা মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া একজন দাসীকে ঐ ঘৃত তুলিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। এই দৃশ্য দর্শনে জীবকের সন্দেহ জন্মিল যে, ঐ নারী অবশ্যই নীচ ও কৃপণস্বভাবা হইবেন, সুতরাং তিনি সত্বর তাঁহার পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া ঐ স্থান হইতে পলায়ন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু উক্ত রমণী তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া জানাইলেন যে, তিনি নীচমনা নহেন, পরন্তু একজন সুগৃহিণী, এবং প্রদীপ জ্বালানো অথবা অনুরূপ কোন কাজে লাগিবে বলিয়া ঐ ঘৃত তুলিয়া রাখিয়াছেন। অতঃপর ধীরে ধীরে ঐ মহিলা সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং চারি সহস্র সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া চিকিৎসককে পুরস্কৃত করিলেন। উপরন্তু তাঁহার স্বামী, পুত্র ও পুত্রবধূ প্রত্যেকে চারি সহস্র করিয়া সুবর্ণমুদ্রা দিলেন, তদুপরি তাঁহার স্বামী একটি ক্রীতদাস, একটি ক্রীতদাসী ও অশ্বযুগলসহ একটি শকটও উপহার প্রদান করিলেন।

জীবক রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উক্ত শ্রেষ্ঠীগৃহে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ রাজকুমার অভয়ের হস্তে প্রদান করিলেন। কুমার উহা গ্রহণ না করিয়া সমুদয় অর্থ তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে রাজগৃহেই বসবাস করিতে অনুরোধ করিলেন। কিছুদিন পরে রাজা বিম্বিসার একবার কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলে জীবক তাঁহাকে চিকিৎসা করিয়া নিরাময় করায়, রাজার অনুরোধে তিনি রাজবৈদ্যের পদ গ্রহণ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে চিকিৎসকরূপে জীবকের খ্যাতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার অপূর্ব্ব চিকিৎসার গুণে অনেক কঠিন রোগী ও সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। শিশু-চিকিৎসায় নৈপুণ্যের জন্যও তাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল।

এক সময় রাজগৃহের এক ধনী শ্রেষ্ঠী কঠিন শিরঃপীড়া রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়লেন। নগরের সকল খ্যাত-নামা চিকিৎসকের চেষ্টায়ও পীড়া উপশম না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। ক্রমে সকল চিকিৎসকই তাঁহার আরোগ্যের আশা ত্যাগ করিলেন, অবশেষে শ্রেষ্ঠীর আত্মীয়স্বজন শেষ চেষ্টাস্বরূপ রাজবৈদ্যের শরণাপন্ন হইলেন, রাজাও জীবককে চিকিৎসা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। জীবক আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিলেন এবং তাঁহার নিজের পারিশ্রমিকস্বরূপ লক্ষ মুদ্রা ও রাজার প্রণামীস্বরূপ সমপরিমাণ মুদ্রা অগ্রিম দাবী করিয়া রোগীকে প্রশ্ন করিলেন যে, তিনি প্রথমে এক

পার্শ্বে, তৎপরে অপর পার্শ্বে এবং অবশেষে চিৎ হইয়া এমনিভাবে প্রত্যেক অবস্থায় সাত মাস করিয়া শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে পারিবেন কিনা। রোগী রোগযন্ত্রণায় অধীর হইয়া উপশমের আশায় যে-কোন নিয়ম মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন, সুতরাং এই বিধানেও সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। জীবক তখন তাঁহাকে শয্যার সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া মস্তকের তালুতে অস্ত্রোপচার করিয়া মস্তিষ্কের মধ্য হইতে দুইটি পোকা বাহির করিয়া ফেলিয়া ক্ষতস্থান সেলাই করিয়া দিলেন। এই পোকা দুইটিই শ্রেষ্ঠীর জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। এত প্রাচীনকালেও আমাদের দেশে চিকিৎসা-পদ্ধতি কতদূর উন্নত ছিল, এই কাহিনী হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়।

পোকা দুইটিকে বাহির করিবার পর হইতেই ধীরে ধীরে উক্ত শ্রেষ্ঠীর পীড়ার উপশম হইতে আরম্ভ হইল, কিন্তু শেষে এমন হইল যে, তিনি আর ধৈর্য্য ধরিয়া উপরোক্ত প্রত্যেক অবস্থায় সাত মাস করিয়া থাকিতে পারেন না। তখন জীবক তাঁহাকে সাত দিন করিয়া এক অবস্থায় থাকিতে বলিলেন। রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে পর তিনি তাঁহাকে কেন ঐরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া এক এক অবস্থায় থাকিতে বলিয়াছিলেন এবং ঐ নিয়ম পালন না করা সত্ত্বেও রোগী কিরূপে সুস্থ হইলেন, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। রাজবৈদ্য বলিলেন, বস্তুতঃ রোগীর এক সপ্তাহ করিয়াই এক এক অবস্থায় থাকার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু গোড়ায় সাত মাস কালের কথা না বলিলে তাঁহার ঐ এক সপ্তাহও ধৈর্য্যধারণ করা সম্ভব হইত না, সেইজন্যই তিনি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এই অপূর্ব্ব চিকিৎসার ফলে জীবকের খ্যাতি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। রাজা বিম্বিসারের অনুরোধক্রমে তিনি ভগবান বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সঙ্ঘস্থ ভিক্ষুকগণেরও প্রয়োজনমত চিকিৎসা করিতেন। ক্রমে তিনি বুদ্ধদেবের পরম ভক্তরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। জীবক-প্রদত্ত আম্রবনে ভগবান্ বুদ্ধ মাঝে মাঝে বাস করিতেন। একবার ভগবান্ বুদ্ধ কোষ্ঠকাঠিন্যে কষ্ট পাইতেছিলেন। বিরেচক গ্রহণে পীড়ার উপশম ঘটিত, কিন্তু বিরেচক গ্রহণ করার মত শারীরিক অবস্থা তাঁহার ছিল না। এ হেন সঙ্কটকালে জীবককে আহ্বান করা হইল। সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জীবক ত্বরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং একটি সুন্দর প্রস্ফুটিত পদ্ম ভগবান বুদ্ধের চরণে প্রদান করিয়া প্রণাম করিলেন। পদ্মটি দেখিয়া বুদ্ধ বিশেষ প্রীত হইলেন ও তাহা আঘ্রাণ করিলেন। অতঃপর কিয়ৎকাল নানারূপ আলাপ আলোচনা করিতে করিতেই তিনি সবিস্ময়ে অনুভব করিলেন যে কোনরূপ ঔষধ সেবন না করা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে একটু একটু করিয়া সুস্থ বোধ করিতেছেন। জীবককে এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি জানাইলেন যে, ঐ পদ্মের মধ্যেই ঔষধ ছিল, ঘ্রাণের সঙ্গে তাহা দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কার্য্যকরী হইয়াছে।

রাজা বিম্বিসারের পারিবারিক চিকিৎসা এবং বৌদ্ধ সঙ্ঘের ভিক্ষুদের পরিচর্য্যা করিয়া জীবক অপর কাহারও চিকিৎসা করার অবসর পাইতেন না। অথচ কঠিন ও দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা তাহাদের সমুদয় ধনসম্পত্তির বিনিময়েও জীবকের সাহায্য প্রার্থনা করিত। বিশেষতঃ এই সময় মগধে কুষ্ঠ, শোথ, যক্ষ্মা, গণ্ড ও অপস্মার এই পাঁচটি রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই সকল রোগী তাহাদের চিকিৎসা করার জন্য জীবককে বিশেষ অনুনয়-বিনয় করা সত্ত্বেও তিনি সময়াভাব হেতু তাহাদের প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন। তখন তাহারা মনে করিল যে, জীবক ভিক্ষুদের চিকিৎসা করার জন্যই ত অপর কাহারও চিকিৎসা করার সময় পান না, অতএব ভিক্ষুসঙ্ঘে যোগদান করিলেই অপর ভিক্ষুগণ তাহাদের শুশ্রূষা করিবে এবং জীবকও চিকিৎসা করিবেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ঐ সকল রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ভিক্ষুসঙ্ঘে যোগদান করিতে লাগিল এবং এই উপায়ে রোগমুক্ত হইয়া পুনরায় গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। একবার দৈবক্রমে এইরূপ একজন গৃহপ্রত্যাগত ব্যক্তির সহিত জীবকের সাক্ষাৎকার ঘটিয়া গেল। তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ঐ ব্যক্তি এবং অনুরূপ আরও অনেকে স্বার্থ-সিদ্ধির আশায় সঙ্ঘে যোগদান করে এবং রোগ মুক্তির পরেই সঙ্ঘ পরিত্যাগ করে। এই বিষয়টি তিনি বুদ্ধের গোচরে আনিলেন, এবং অতঃপর বুদ্ধ এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলেন যে, ঐরূপ কোন প্রকার রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে আর সঙ্ঘে গ্রহণ করা হইবে না। সঙ্ঘে প্রবেশের পূর্ব্বেই প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তাহার ঐরূপ কোন রোগ আছে কিনা, থাকিলে তাহাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হইবে না। রোগ গোপন করিয়া কেহ সঙ্ঘে প্রবেশ করিলে তাহার প্রব্রজ্যা অসিদ্ধ হইবে এবং তাহাকে বহিষ্কৃত করা হইবে।

বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বে তিনি চুন্দ কর্ম্মারপুত্র নামে এক গৃহী কর্ত্তৃক প্রদত্ত শূকর মাংস ভক্ষণ করিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। এই সময়ও জীবক তাঁহার চিকিৎসা করেন। কিন্তু দেহত্যাগের উপলক্ষ্য-স্বরূপই এই ব্যাধি বুদ্ধকে আশ্রয় করিয়াছিল, কাজেই এইবার জীবকের চিকিৎসায় আপাত ফল লাভ ঘটিলেও তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিল না, এই ব্যাধি উপলক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ বুদ্ধ মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন।

আধুনিকী

শ্রীসাধনা কর

সকালবেলা উঠেই দাদা-বৌদিতে এক চোট ঝগড়া হয়ে গেল। দাদা লিখে থাকেন—গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, যখন যেটা আসে। সেদিন রবিবার। সকালে উঠেই দাদার মাথায় লেখা ভর করলে। সটান গিয়ে বসলেন টেবিলের সামনে। এদিকে সকালে উঠেই বৌদি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে কি বলতে এলেন—'বলি শুনছ'। দাদা বাধা দিয়ে বললেন—'না, শুনছি না, শুনব না'।—'বলছিলাম কি'…ভ্রূ কুঁচকে দাদা বললেন—'উ হুঁ হুঁ, এখন নয়, পরে এসো। লেখার ভাব আসছে।

বৌদি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। দাদা কলম বাগিয়ে ধরে কাগজ টেনে নিলেন। খানিকক্ষণ বসে রইলেন চোখ বুজে। পা-টা একবার দোলালেন, দুবার টান করে তার পরে এক সময় হঠাৎ গুটিয়ে নিয়ে আঁটসাঁট হয়ে চেয়ারে বসলেন। লেখা আরম্ভ হ'ল। এক পাতার দু' লাইন লিখলেন, খ্যাচ করে কেটে ফেললেন। গল্পটা কেমনতর কবিতার ধরণ নিয়ে আসছে। আর এক পাতা সুরু করলেন। নাঃ, ভাবটা বড় এলোমেলো, জমাটবাঁধা নয়। ফড়ফড় করে কাগজটা ছিঁড়ে কাগজ-ফেলা বাক্সে ছুঁড়ে দিলেন। কলমটা ধরা রইল হাতেই, কাগজটা সামনে। দাদা প্রথমটা বাইরের তাকালেন, তারপরে স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ছাদে। একবার ভাবটাকে ধরতে পারলে হয়। টুঁটি টিপে হিড়হিড় করে টেনে আনবেন কলমের ডগাতে। ঘণ্টাখানেক কাটল। বৌদির জরুরী কথার দরকার। অস্বস্তিতে এ ঘরের কাছাকাছি ঘুরঘুর ঘরে গেলেন। দাদা একমনে ভাবছেনই। গল্প ভাবতে প্রবন্ধ আসে, প্রবন্ধ ভাবতে কবিতা বেরোয়। সব মিশিয়ে একেবারে জগা-খিচুড়ী। দাদা উঠে দাঁড়ালেন। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপরে দ্রুতবেগে পায়চারি সুরু করলেন। পা ব্যথা করে উঠল, বিষম বিরক্ত হয়ে বিছানায় শুলেন একবার। খানিক পরেই দিব্যি একটা ভাব মনে জমে এল। এক অতি-আধুনিক কবিতা।

তারপরে, তারপরে…এই যাঃ। ভাবটা গেল বুঝি পালিয়ে। দাদা সজোরে কলম কামড়ে ধরে ভাবটাকেই বোধ হয় আটকাতে চাইলেন। বৌদি কিন্তু আর থাকতে পারলেন না। একেবারে ঘরে ঢুকে পড়ে বললেন—শুনছ, এবার কিন্তু তোমায় শুনতেই হবে।

দাদা রক্তচোখে তাকিয়ে বললেন—দেখ, সপ্তাহের ছ'টা দিন আপিসের হাড়ভাঙা খাটুনি, আর টিউশনি। বাড়ী এসে কোথায় কয়লা, কোথায় রে কেরোসিন, কোথায় কোন্ জিনিস সস্তা—ভাবতে ভাবতে, জানতে জানতে, ছুটতে ছুটতে ত প্রাণান্ত। ছুটির দিনটা; যদিই-বা একটু নিজের কাজ নিয়ে বসলুম, অমনি এলে গোল বাধাতে?

বৌদির আঁতে ঘা লাগল। রেগে উঠে বললেন—কাজের কথা বলতে এসেছি, শুনতে ইচ্ছে হয় শোন, নয় শুনো না। চালের দাম বেড়ে যাচ্ছে, এর পরে পাওয়াই যাবে না হয়ত। খোঁজ করে ক' মণ কিনে ফেলতে হবে। আজ কাপড়ের পারমিট পাওয়া যাবে, সেখানে যাওয়া দরকার। মাসের প্রথমে কণ্ট্রোলের এবং বাজারে গিয়ে মণিহারী খুচরো সওদাও অনেক করা অত্যাবশ্যক। একবার বেরুতেই হবে।

বৌদির কথায় দাদার মাথা ঘুরে উঠল। বললেন—তার মানে সারাটা দিনের ধাক্কা। পারব না, বলছি আজ ও সব পারব না। আজ একটু লিখবই।

বৌদি ভ্রূ কুঁচকে বললেন—ঘণ্টা দুয়েক ত দেখছি চোখ বুজে বসে আছ, কত কসরৎই করছ, এক পাতা লেখাও ত বেরুল না।

দাদা চটে বললেন—অত সহজে লেখা বেরোয় না বুঝেছ। লেখা একটি তপস্যা। যার ধ্যানে আহার নিদ্রা ঘুচে যায়, মন চলে যায় স্বপ্নলোকের ওপারে। সেখানে যে বেদনা, যে আনন্দ, যে শান্তি,—যে…।

বৌদি অধীর হয়ে বাধা দিয়ে বললেন—থাক্, সে সব আমার বুঝবার দরকার নেই। আমি জানি খেতে না পেলে কষ্টের সীমা থাকবে না, হাহাকারে অস্থির হয়ে উঠতে হবে। পাগল হইনি ত যে সংসার ভাসিয়ে দিয়ে স্বপ্নলোকের বেদনা অনুভব করতে বসব।

দাদা ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন—আমি পাগল।—নয় তো কি।

কথায় কথায় দাদা-বৌদিতে হয়ে গেল একচোট ঝগড়া। বৌদি শেষটা রাগে গুমরাতে গুমরাতে বেরিয়ে এলেন—লিখে উদ্ধার করবে সবাইকে। এদিকে সংসারটা ভেসে যাক্। মেয়েটা বছর পাঁচেকের হ'ল, লেখাপড়া না শিখে মুখ্খু হচ্ছে, কার কি। এই খুকী, বইপত্তর নিয়ে পড়তে বোস্ বলছি। নয় ত চুলের ঝুঁটিটা টেনে ছিঁড়ে ফেলব, বুঝেছিস।

বছর পাঁচেকের মেয়ে খুকুমণি বারান্দায় উঁকি-ঝুঁকি

মারছিল। যার কথায় সভয়ে একবার তার সখের বীধন-বাঁধা চুলে হাত বুলিয়ে নিলে। তারপরে প্রথম ভাগখানা নিয়ে বারান্দায় এসে বসল। বৌদিও বসলেন পাশে। পড়., গড়গড়িয়ে পড়ে যা বলছি। ও কি, অমন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিস কেন. দেব এক চড়।

খুকুমণি তবু উস্‌খুস্‌ করতে লাগল। বাপের আদুরে মেয়ে সে। সকাল থেকে বাপের অবস্থা দেখে তার অবাক লেগে গেছে। রাগারাগি করে দাদা তখন ক্ষিপ্ত-প্রায়। সশব্দে ঘরময় পায়চারি করে ছিন্নসূত্র কবিতার ভাবটার সঙ্গে প্রায় ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু করে দিয়েছেন। তাকিয়ে তাকিয়ে খুকুমণি ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে—বাবা'র কি হয়েছে মা, অমন করছেন কেন।

বৌদি একবার তাকিয়ে দেখলেন। গম্ভীর মুখে বললেন মাথায় ভূত চেপেছে, তাই ক্ষেপে গেছেন।

ভূত সম্বন্ধে খুকুমণির ধারণা অস্পষ্ট কিন্তু তিন-চার দিন আগে পাড়াতে একটা ক্ষ্যাপা এসেছিল। সে খালি উঠত, বসত, লাফাত, পায়চারি করত, হাত-পা ছুঁড়ত। কাছে গেলে মারতে আসত।

খুকুমণির সে ব্যাপারটা মনে ছিল। ক্ষ্যাপা সম্বন্ধে ভয় ছিল নিদারুণ। বাবা ক্ষেপে গেছেন শুনে মুখ তার কালো হয়ে গেল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল—আমি কেমন করে বাবার কাছে যাব বাবা কেন ক্ষেপে গেল…।

দাদা তখন ভাবে বিভোর হয়ে সম্ভবতঃ কবিতাটাকে মনে মনে এক রকম গুছিয়ে এনেছেন, কান্নার শব্দে সচকিত হয়ে কল্পলোক থেকে ধপ করে পড়লেন এসে কঠিন বাস্তব-জগতে। একেবারে আগুন হয়ে উঠলেন। ভাবলেন পড়াতে গিয়ে খুকুমণিকে বৌদি মেরেছেন। মেয়েকে মারা তিনি মোটে সহ্য করতে পারতেন না। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—যত সব অশিক্ষিতের কাণ্ড। না আছে বিদ্যেবুদ্ধি, না আছে ছেলেমেয়ে মানুষ করার শিক্ষা। শুধু জান রান্না করতে আর ঘরে বসে ঝগড়া করতে। দেখগে আজকালকার মেয়েরা কি না করছে। কবিতা লিখছে, গান গাইছে, দেশোদ্ধারে এগোচ্ছে, ঘর-সংসার গুছোচ্ছে, হাট-বাজার করছে। কেউ কি তোমার মত ঘরে বসে বসে শুধু স্বামীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকছে।…হুঁঃ, এমন সুন্দর ভাবটা জমে এসেছিল, দিলে নষ্ট করে।

টান মেরে টেবিল থেকে কাগজ কলম তুলে নিয়ে দাদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।…

বৌদি প্রথমটা হতবুদ্ধি। তারপরে খুকুমণিকে টানতে টানতে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন। শুধু জানি রান্না আর ঝগড়া করতে। কবিতার মর্ম বুঝি নে। আধুনিকা নই?

পরক্ষণেই দুপ দুপ শব্দে এ ঘরে এসে হাজির। আমি এতক্ষণ বসে বসে পরীক্ষার পড়া তৈরি করছিলাম, আর মজা উপভোগ করছিলাম দাদা-বৌদির ঝগড়াতে। শশব্যস্ত হয়ে উঠলাম। অগ্নিমূর্ত্তি বৌদি ঘরে ঢুকেই হাত থেকে বইটা নিলেন ছিনিয়ে—যাবে ত চল।

ত্রস্ত হয়ে বললাম—কোথায়।—শুধু ঘরে বসে রাঁধি আর ঝগড়া করি, আর কোনো গুণ নেই, ওঃ। সংসার গুছিয়ে যুদ্ধের বাজারের এত বড় টালটা সামলাল কে শুনি? আর ত একেবারে ন'শ পঞ্চাশ টাকা, আমি না থাকলে শুকিয়ে মরতে হ'ত, হাঁ। ওঠো, ওঠো, বাজারে যাব। আমরা যেন আর জিনিষ কিনে আনতে পারি না।

অবাক হয়ে বললাম—তুমি যাবে, রান্নার কি হবে। খুকুমণিই বা থাকবে কোথায়। দাদা ত বোধ হয় রেগে বেরিয়ে গেলেন

—হুঁ, বেরিয়ে গেলেন। মাথায় চেপেছে ভূত, বাড়ী থেকে বেরুবে আজ? দেখগে হয় ত গেটের পাশে আম-গাছটার তলায় বসে লিখছে। কিছু ভাবতে হবে না, তুমি ওঠ। খুকুমণির আজ পাশের বাসায় নেমন্তন্ন। আমরা ফিরে এসে ভাতে ভাত রান্না করে নেবো এখন যাবে ত শীগগির তৈরি হও। নয় তো ভেবেছ কি—একাই আজ চলে যাব। ঘর থেকে বেরুতে জানি নে না কি। সংসারের ঝামেলায় বেরুবার সময় পাই নে, তাই না এত খোঁচা।

বৌদি সবেগেই বেরোবার জন্য তৈরি হতে গেলেন। আমি আর উচ্চবাচ্য করতে সাহস পেলাম না।

বাড়ী থেকে বেরুবার মুখে দাদা ডাক দিলেন—এ কি, কোথায় যাওয়া হচ্ছে।

বৌদি উত্তর না দিয়ে গট্‌গট্‌ করে এগিয়ে গেলেন। আমি বললাম—বৌদি বাজারে বেরুচ্ছেন, আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

দাদা সটান উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—বাজারে। দেখ ভাল হবে না, এখনও ফেরো বলছি। ফিরলে না, আচ্ছা। আমিও এমন এক কাণ্ড করব দেখবে এখন।

* * *

বাজার করে ফিরতে বাজল একটা। তবু কণ্ট্রোলের দোকান রইল, পারমিটের দোকানে যাওয়াই হ'ল না। শুধু বাজারের ক'টা খুচরো জিনিষ, এবং মনিহারী দোকানে পছন্দমত কিছু জিনিস কিনতেই এতখানি বেলা। ঠিক দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে এক রিক্সা বোঝাই জিনিসপত্র নিয়ে যখন বাসায় ফিরলাম, ক্ষুধাতৃষ্ণায় দু'জনেই

তখন খিদেয় ক্লান্ত। বৌদির মেজাজ সপ্তমে চড়া— এর পরে গিয়ে রান্না করতে হবে ত? ঝি নেই, চাকর নেই, দায় যত আমার। এই ঠিক বলে রাখলাম ঠাকুরঝি তোমাকে, ঘর-সংসার ছেড়ে ছুড়ে একদিন নিশ্চয় বেরিয়ে পড়ব। আমি কেন একা ঘরে বাইরে খেটে মরব। এমন সংসার না করলে কি হয়। আজকেই গিয়ে বলছি—যার সংসার সে বুঝে নিক। আমি বাপের বাড়ী চললাম।

দু'জনে ক্লান্ত দেহে বাড়ী এসে ঢুকলাম। পাশের বাড়ীর বারান্দায় বসে খুকুমণি তার বন্ধুর সঙ্গে খেলা করছিল। বললে—ওদের বাসায় আমি খেয়েছি, মা।

—বেশ—বৌদি এদিক ওদিক তাকালেন। গাছতলায় দাদার বই খাতা ফেলা, তিনি কাছাকাছি কোথাও নেই। বৌদি নীচু গলায় বললেন—তোর বাবা কোথায় রে খুকু?

খুকুমণি বন্ধুর সঙ্গে খেলতে ব্যস্ত। বললে—বাড়ীতেই তো ছিলেন। খুঁজে দেখোগে।

খুঁজতে আর হ'ল না। ভিতরে ঢুকতেই শুনতে পেলাম রান্নাঘরে শব্দ উঠচে—ছ্যাক্, ছ্যাক্।

তীব্র কৌতূহলে সেই ধুলাপায়েই দাঁড়ালাম গিয়ে দরজায়। দেখি কাত হয়ে ভাতের হাঁড়ির মাড় ঝরছে। মাটির কলসীটা উল্টানো ঘর জলে ভেসে গেছে। আর দাদা এদিকে কাঁচা তেলে মাছ ভাজতে দিয়েছেন। মাছ ছিটকাচ্ছে ফট্ ফট্। খুন্তি হাতে হতভম্ভ দাদা থ' বনে দূরে দাঁড়িয়ে আছেন।

বৌদি আর আমি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলাম। দাদা চমকে উঠে বললেন—যাক, এসে গেছিস্।

হাসি চেপে বললাম—এসে তো গেছি, কিন্তু এটা কি হচ্ছে দাদা।

দাদা খুন্তি ফেলে হাত ধুতে ধুতে বললেন—কি আর হবে? রাগ করে ফেলেছিলাম, তারই প্রায়শ্চিত্ত। জানিই তো মস্ত কর্ম্মী সব বাজারে বেরিয়েছ, ফিরতে নিশ্চয় একটা। এমন সময় তেতে পুড়ে এসে যা রান্না হবে, সে মুখে দেওয়া যাবে না। তাই রান্নাটা সেরেই ফেলছি। এই ভাতটা তো হয়েই গেছে, মাছটাও এই এক্ষুনি করে ফেলছি। এ মাছগুলো বড় ছিটকোয়, নয় রে। আগে জানলে অন্য মাছ আনতাম। তোরা আসবার আগেই রান্না হয়ে যেত।

বৌদি আমি দু'জনেই হেসে ফেললাম। বৌদি বললেন, হাজার রকমের অন্য মাছ আনলেও কাঁচা তেলে মাছ ছাড়লে মাছ ছিটকে উঠবেই। কি যে বুদ্ধি সব!

হেসে বললাম—হায়, হায়, বৌদি, আর কথা বলো না। করেছ কি, কবিকে কলম ছাড়িয়ে শেষটা খুন্তি ধরালে। এমনি কলির কাণ্ড।

বৌদি কৃত্রিম ভ্রুভঙ্গি করে বললেন—যার ঘরের বউকে যে খোঁচা দিয়ে বাইরে যেতে বাধ্য করলে সেটা বুঝি তোমার দাদার দোষের হ'ল না?

দাদা গম্ভীরমুখে মাথা নেড়ে বললেন—'মোটেই না। আধুনিক কালে আপিসে রয়েছেন বড় বাবু, ঘরেতে গিন্নী। ভাববার সময় অল্প, লিখবার সময় কম। প্রেরণার বেশী রকম জোর চাই তো। খোঁচাটা দিয়ে তবু লেখার একটা প্লট পেয়ে গেলাম।' বৌদি সবিস্ময়ে গালে হাত দিয়ে বললেন—ওমা, আমাকে নিয়ে আবার গল্প লিখতে বসবে নাকি। সেকথা আগে বলতে হ'ত। লেখার নায়িকা হবার কায়দাটা একটু না হয় জেনে নিতাম। অন্তত ঝগড়াটা তো করতাম না।

দাদা আর আমি হেসে উঠলাম। দাদা হাসতে হাসতে বললেন—আমিও আর বাপু লিখতে বসছি নে। খুব শাস্তি হয়েছে। আমার ওই আপিস আর টিউশনি আর কনট্রোলের দোকান ঘোরাই সুখের। সরস্বতীর উপাসনা করে হাঙ্গামার দরকার নেই।

বৌদি ভ্রুভঙ্গি করে বললেন—হাঁ, যে কাজ যারে সাজে। শুধু শুধু আমার আট আনা দামের কলসীটা ভাঙল, কাঁচা তেলে মাছ ভেঙে গেল। ছা-পোষা জীব, তার আবার ঘোড়া-রোগ। কেরাণীর আবার লেখার বাতিক।

দাদা চটে উঠলেন—শুনেছিস্ খোঁচাটা। লক্ষ্মী বোন্, আমি যদি সময় না পাই, দোহাই তোর, দাদার অপমানের প্রতিশোধটা তুলতে হবে। লিখে ফেল্ দেখি একটা গল্প, এমনি এক বৌদির কথা।

বৌদি উজ্জ্বল মুখে চোখ নাচিয়ে বললেন—বেশ তো, লিখুক না দেখি। কোন গুণই তো নাকি আমার নেই, তবু একটা গল্পের নায়িকা হতে পারব তো।

নিম্নবঙ্গের কতিপয় প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন

শ্রীবিমলকুমার দত্ত, এম-এ

বঙ্গদেশের দক্ষিণভাগস্থ বিস্তৃত জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগ সুন্দরবন নামে খ্যাত। তন্মধ্যে যে অংশ চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত তাহাই পশ্চিম সুন্দরবন। পশ্চিম সুন্দরবনের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্ব্বে কালিন্দী ও পশ্চিমে হুগলী নদী। অসংখ্য নদীর অবস্থান হেতু এই অঞ্চলের দক্ষিণভাগ বহু দ্বীপ ও বদ্বীপে বিভক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে এই অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ও হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল ছিল। এতদিন পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এই ধারণা চলিত ছিল যে, বয়সে এই অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত নবীন। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল জয়নগর-মজিলপুর নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয় এই দুর্গম অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ফলে বঙ্গদেশের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইয়াছে।[১] এই অঞ্চল হইতে বহু প্রাচীন মন্দিরের ও অন্যান্য গৃহাদির ভগ্নাবশেষ, অষ্টধাতু, পাথর ও পোড়ামাটির বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি, তাম্রপট্টলিপি, মৃৎপাত্র ও প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।[২]

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এই অঞ্চলের কোন উল্লেখ দেখা যায় না কিন্তু টলেমীর মানচিত্রে কাম্বিসন ও মেঘা নামক দুই নদীর মধ্যে "পলৌরা" নামক একটি নগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়

প্রাচীন মুদ্রা তাম্রপট্টলিপি,[৪] বঙ্গদেশের প্রাচীন সাহিত্য,[৫] ডি ব্যারোজ,[৬] ভ্যানডান ব্রুক[৭] ও রেনেলের[৮] মানচিত্র হইতে জানা যায় যে, এতদঞ্চল দিয়া গঙ্গার প্রধান শাখা প্রবাহিত থাকায়—ইহা অন্যতম প্রধান বাণিজ্য পথ ছিল। এক্ষণে এই শাখা আদিগঙ্গা নামে খ্যাত। এই কারণেই বোধ হয় এই অঞ্চল এতাদৃশ সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। কিন্তু কিরূপে এই সমৃদ্ধ জনপদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলাকীর্ণ হইল তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। সম্ভবতঃ ভূমিকম্প, ভূমি-অবনমন (Submergence) প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ও আদিগঙ্গা ক্রমশঃ মজিয়া যাওয়াতেই এইরূপ ঘটিয়াছে।

এই অঞ্চলে ভূমি-অবনমনের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। কর্ণেল গ্যাসট্রেল ফরিদপুর, যশোহর ও বাখরগঞ্জ জিলার রেভিনিউ সার্ভে রিপোর্টে লিখিয়াছেন :—

"What maximum height the Sunderbans may have formerly attained is utterly unknown . . . But that a general subsidence has operated over the whole of Sunderbans, if not of the entire delta, is, I think, quite clear from the result of the examinations of cutting or sections made in various parts where tanks were being excavated. At Khulna, about 12 miles to the nearest Sunderban lot, at a depth from 18 ft. below the present surface of the ground and parallel to it, remains of an old forest were found consisting entirely of Sundri trees of various sizes with their roots and lower portions of the trunk exactly as they must have been existent in former days, when all was fresh and green above them."

স্বর্গীয় আর. ডি. ওল্ডহাম লিখিয়াছেন,—

"The peat bed is found in all excavations in Calcutta at a depth varying from about twenty to about thirty feet and the same stratum appears to extend over a large area in the neighbouring country. A peaty layer has been

---

(১) প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতি ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের ভাষণ।

(২) ক। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মনোগ্রাফ—৩।৪ ও ৫নং

খ। Catalogue of the Gupta coins (Kalighat). British Museum. Allan. p. xi.

গ। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির বার্ষিক কার্য্যবিবরণী, ১৯২৮-২৯, পৃঃ ২১-২২।

ঘ। এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের ঐ , ১৮৭৯, পৃঃ ২৪৫

ঙ। Descriptive List of Sculptures and Coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad. R. D. Banerjee. পৃ. ১৬।

চ। *Indian Historical Quarterly*. Vol. IX, 1933. পৃ. ২০২, ২০৭ ও Vol. X. No. 2-1934—পৃ ৩২১।

(৩) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত এফ, জি, মোনাহানের "*Early History of Bengal*" নামক পুস্তকে টলেমীর মানচিত্র।

(৪) মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের দক্ষিণ গোবিন্দপুর তাম্রলিপি··· *Inscriptions of Bengal* by Nani Gopal Mazumdar. Vol. VIII. পৃ ৯৯।

(৫) ক। বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তীর "মনসার ভাসান"—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৩

খ। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর "চণ্ডী কাব্য"—ইণ্ডিয়া প্রেস সংস্করণ পৃঃ ২০১।২০২

গ। বাংলার পুরাবৃত্ত—শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : পৃঃ ১৮-১৯

(৬) ডি বারোজ—১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ

(৭) ভ্যানডান ব্রুক—১৬৬০ "

(৮) জেমস্ রেণেল—১৭৬৪—১৭৭৭ "

noticed at Port Canning, thirty-five miles to the south-east and at Khulna, eighty miles east by north, always at such a depth below the present surface as to be some feet beneath the present mean tide level. In many of the cases noticed, roots of the Sundri trees were found in the peaty stratum. This tree grows a little above high watermark in grounds liable to flooding, so that in many instances roots occurring below the mean tide level, there is conclusive evidence of depression.৯

উপরোক্ত ভূমি অবনমনের দৃষ্টান্ত ও অন্যান্য ভৌগোলিক কারণে ওল্ডহাম সাহেব মনে করেন সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে সুন্দরবনের এই অঞ্চল গাঙ্গেয় বদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ইহা স্বতন্ত্র ও শুষ্ক স্থানবিশিষ্ট ছিল। *Manual of Geology of India* নামক পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন :—

"The evidence (of depression) is confirmed by the occurrence of pebbles, for it is extremely improbable that coarse gravel should have been deposited in water eighty fathoms deep and large fragments could not have been brought to their present position unless the streams which now traverse the country had a greater fall or unless which is now probable rocky hills existed which have been covered by alluvial deposits. The proportion of the beds traversed can scarcely be deltaic accumulation and it is therefore probable, that when they were formed, the present site of Calcutta was near the alluvial plain, and it is quite possible that a portion of Bay of Bengal was dry land."

উপরোক্ত উদাহরণ ব্যতীতও অন্যান্য অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যাহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এতদঞ্চলে ভূমি অবনমনের ফলে বহু গৃহ ও মন্দিরাদি ভূপ্রোথিত হইয়াছে। জয়নগর থানার অন্তর্গত ২৬ নং লাটে রাইদীঘির গাঙ নামক নদী প্রবাহিত। ভাটার সময় নদীর সাধারণ সীমারেখা হইতে প্রায় ৮ ফুট নিম্নে বৃহৎ ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

সম্প্রতি এই অঞ্চল হইতে আমি কতকগুলি প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাদের সহিত ভারত ও বহির্ভারতের অন্যান্য স্থানে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক শিল্প-নিদর্শনগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। উপরোক্ত ভূমি অবনমন, অন্যান্য ভৌগোলিক কারণ ও এই সমস্ত শিল্প নিদর্শন হইতে স্পষ্টই ধারণা করা যায় যে, নিম্নবঙ্গের এতদঞ্চলের ইতিহাস অতীব প্রাচীন। হয়ত বা অনুসন্ধানের ফলে কোনদিন প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সহিত ইহার গভীর যোগসূত্র আবিষ্কৃত হইবে।

প্রথমটি একটি হস্তনির্ম্মিত মৃৎপাত্র। ইহার বহির্ভাগে "basket marks" আছে এবং ইহার আকার ৫½ × ৪ ইঞ্চি। জয়নগর থানার অন্তর্গত ৩৪নং লাটের রূপনগর নামক গ্রামে মৃত্তিকা খননকালে এই মৃৎপাত্রটি পাওয়া যায়। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার সঠিক বয়স নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু অনুরূপ মৃৎপাত্র মিশরের প্রাচীন কবরের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। শবদেহের সহিত এইরূপ মৃৎপাত্রে খাদ্যপানীয় ও অন্যান্য উপকরণাদি দিবার ব্যবস্থা মিশরে প্রচলিত ছিল।১০ সম্প্রতি দক্ষিণ-ভারতে আরিকামেডু নামক স্থানে ভারত-সরকারের খননকার্য্যের ফলে এ্যারেটাইন স্তরের ও নিম্ন হইতে অনুরূপ "basket marks" সমেত পাত্রখণ্ড পাওয়া গিয়াছে।১১ অতি প্রাচীনকাল হইতে, সম্ভবতঃ নব্যপ্রস্তর যুগ হইতে সারা পৃথিবীতে এই প্রকার "basket marks" চিহ্নিত মৃৎপাত্র ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন চীনে১২, মোটলেকস্থ টেমসে১৩ ও অন্যান্য প্রাচীন স্থানে ইহার সন্ধান মিলিয়াছে। যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত চিহ্নের আসল উদ্দেশ্য ক্রমশঃ লোকে ভুলিয়া যায় এবং ইহা আলংকারিক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে।

দ্বিতীয়টি একটি পোড়ামাটির মাতৃকা-মূর্ত্তি। ইহা উর্দ্ধে মাত্র দুই ইঞ্চি। আদি গঙ্গার একটি শাখা নালুয়ার গাঙের কতক অংশ মজিয়া গিয়াছে। উক্ত স্থান খননকালে প্রায় ২০ ফুট নিম্ন হইতে এই মূর্ত্তিটি পাওয়া যায়। এই মাতৃকা-মূর্ত্তির হস্ত ও নাসিকা টিপিয়া তোলা (pinched) ও চক্ষু দুইটি অতিরিক্ত খণ্ডদ্বয় যোগ দ্বারা গঠিত। চক্ষুর উক্ত অতিরিক্ত খণ্ডদ্বয় না থাকিলেও উহার চিহ্ন বেশ পরিষ্কার। হরপ্পা যুগ হইতে অদ্যাবধি ভারতের নানাস্থানে এই প্রকারের মাতৃকা-মূর্ত্তি পাওয়া যায়। পশ্চিম সুন্দরবনে প্রাপ্ত এই মূর্ত্তিটির সঠিক গঠনকাল যদিও নির্দ্ধারণ করা যায় না তথাপি ডাঃ ক্র্যামরিশের মতে এইরূপ আদিম ধরণের মূর্ত্তিগুলি খুব প্রাচীন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"The chronology of the terracottas of India has given rise to much speculation and several conculsions have been drawn from the existence of various types. Primitive

(৯) আর, ডি, ওল্ডহাম প্রণীত "*Manual of Geology of India.*" ১৮৯২।

(১০) ব্রিটিশ মিউজিয়াম পোষ্টকার্ড : নম্বর : সিরিজ "বি" ৫৬ - নং বি ৩৩৬

১১। *Ancient India,* No. 2, July 1946. Plate xxvii, fig. (B).

১২। *The Civilization of the East* (China) Rene Grousset, page 5.

১৩। *An Outline of History.* H. C. Wells, Vol. I, 61, fig. 1.

types have been assigned an early and sometimes pre-historic date." ১৪

উক্ত মূর্ত্তিটি অত্যন্ত আদিম ধরণের এবং উহা ২০ ফুট ভূগর্ভনিম্ন হইতে প্রাপ্ত। সে কারণ নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, মূর্ত্তিটি অত্যন্ত প্রাচীন।

তৃতীয়টি একটি সমচতুষ্কোণ চৌকী। ইহা বেলে পাথরের তৈয়ারী এবং চারিখানি পায়াবিশিষ্ট। ইহার আয়তন ১৫×১২×৯ ইঞ্চি। মথুরাপুর থানার অধীন কঙ্কণদীঘির ২৬নং লাটের একটি মজা পুষ্করিণী খননকালে ১৬ ফুট ভূগর্ভনিম্ন হইতে ইহা পাওয়া যায়। দক্ষিণ-ভারতের তিনা-ভেলী (ত্রিবাঙ্কুর) নামক স্থানে খননকালে প্রাগৈতিহাসিক শিল্প-নিদর্শনসমূহের সহিত অনুরূপ একটি চৌকী পাওয়া যায়।১৫ শস্যমর্দ্দনের জন্য এইরূপ দ্রব্য প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গুপ্তযুগেরও অনুরূপ চৌকী পাওয়া গিয়াছে কিন্তু উহারা আকারে ক্ষুদ্র ও অলঙ্কারবহুল। ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন মিশরেও অনুরূপ চৌকী ব্যবহৃত হইত, কিন্তু উহাদের কোন পায়া থাকিত না।১৬

ভৌগোলিকদের মতে বঙ্গদেশ বয়সে নবীন। চব্বিশ পরগণা জিলায় ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে যে সকল প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত স্থান আদৌ নূতন নহে বরং উহা এত প্রাচীন যে, ইহার ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না হইলেও প্রত্নপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগের বহু নিদর্শন হুগলী, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলায় পাওয়া গিয়াছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভি-বল গোবিন্দপুর গ্রামের ১১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কুনকুন নামক গ্রাম হইতে ঐরূপ একটি নিদর্শন প্রাপ্ত হন।১৭ মেদিনীপুর জেলার ঝাটিবনি পরগণায় তামাজুড়ি নামক গ্রামের অধিবাসিগণ ভূমি-খননকালে তাম্রনির্ম্মিত একটি কুঠার-ফলক ভূনিম্ন হইতে আবিষ্কার করে।১৮ বর্দ্ধমান জেলার দুর্গাপুর নামক স্থানের নিকট অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনসমূহ পাওয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে ঐ সকল নিদর্শন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পূর্ব্বশাখায় পরীক্ষার জন্য রহিয়াছে। সম্প্রতি পুনরায় মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার অধীনে বামাল নামক গ্রামে নব্য-প্রস্তরযুগের কতকগুলি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।১৯

উপরোক্ত নিদর্শনসমূহ ব্যতীত পশ্চিম রাঢ়ের ষোড়শ মাতৃকা চিত্রলিপি ও বাঁকুড়াস্থ বিহারীনাথ পর্ব্বতগাত্রে যে শিলালিপি আছে তাহাদের সহিত হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক লিপির নিকট-সাদৃশ্য আছে এবং তুলনামূলক আলোচনার ফলে বোধ হয় যে, এক সময়ে উক্ত লিপি এতদঞ্চলে প্রচলিত ছিল। বাঁকুড়ার কুঁকড়া গ্রামে প্রাপ্ত কয়েকটি আলিপনা-চিত্রের সহিতও প্রাগৈতিহাসিক এবং ব্রাহ্মীখরোষ্ঠী লিপির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এই সকল নিদর্শন ও লিপিসমূহের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, বঙ্গদেশ আদৌ নবীন নহে। বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্য হইতে জানা যায়, বহুকাল এই অঞ্চল পক্ষী ইত্যাদি নামীয় অনার্য্যগণ দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। বঙ্গদেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা একমাত্র প্রত্ন-তাত্ত্বিক খনন-কার্য্যের দ্বারাই উদ্ধার করা যাইতে পারে।

১৪। Indian Terracottas, by Dr. Stella Kramrish, J.I.S.O.A.

১৫। *Annual Report. Archaeological Survey of India*, 1902-3, p. 139.

১৬। *An Outline of History*. H. G. Wells, Vol. I, p. 132-41.

১৭। Catalogue of the Pre-Historic Antiquities in the Indian Museum. T. C. Brown, p. 67.

১৮। *Ibid.*, p. 142.

১৯। *Science and Culture*, Vol. 14, No. 6, Dec. 1948.

পতঙ্গ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

কয়েকদিন চলিয়া গেল—

ধলা জিনিষগুলি যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। রিজিয়া উপস্থিত ছিল। সে কাঁকালে করিয়া ঘরে লইয়া গিয়াছে।

স্কুল আবার বন্ধ হইয়াছে দিন দশেকের জন্য। আপাততঃ কোন কাজ নাই। বাহিরে একটি থানায় একটা শোভাযাত্রা বাহির করিবার তোড়জোড় চলিতেছে। ধলারা কয়েকজন এবং অন্যান্য স্কুলের কতিপয় ছাত্র যাইবে স্থির হইয়াছে, কিন্তু কবে তাহার স্থিরতা নাই। স্থানীয় লোকে খবর দিবে, যখন সশস্ত্র পুলিসবাহিনী স্থানান্তরিত হইবে তখন যাইতে হইবে—শোভাযাত্রা বাহির করিবার প্রকৃষ্ট সময় তাহাই।

এদিকে অর্থাভাব। সত্যরা টাকার অভাবে কষ্ট পাইতেছে, প্রায়শঃই অনাহারে হাঁটিয়া যাতায়াত করিতে হইতেছে। তাহাদিগকে টাকা সরবরাহ করিবার উপায় নাই। অণিমা রায়ের যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে, যে টাকা এদিক-ওদিক হইতে আসিত তাহাও আসিতেছে না। মাত্র একজন ব্যাপারী সামান্য টাকা দিয়াছেন। ধলারা গেলেও টাকার দরকার, নৌকা ভাড়া, খাওয়া, ফিরিবার ব্যবস্থা সবই প্রয়োজন। শচীনবাবু তাই কয়েকদিন চিন্তান্বিত আছেন।

ঠিক এমনই সময়ে একদিন রাত্রে পেট্রল পার্টির সহিত টাকা সরবরাহকারী অনিলের দলের একটা সংঘর্ষ হইয়াছে। তাহাতে দুইজন কনষ্টেবল আহত হইয়াছে। সে পাড়ার অনেকেই এখন হাজতে—অনিলও। অনিল সংবাদ যাহা দিয়াছে তাহার সারমর্ম্ম এই যে, সংঘর্ষ এড়াইতে গেলে সত্য, স্বরাজ ও বিভূতি ধরা পড়িয়া যাইত। তাহারা উহাদের সহিতই ছিল এবং মারামারির ফলে পলাইবার সুযোগ পাইয়াছে আর অনিলদের বিচারের ভার মিঃ সেনের হাতে পড়িয়াছে—এক মাসের বেশী জেল হইলে সব পণ্ড হইয়া যাইবে।

শচীনবাবু চিন্তাকুল হইয়া অকারণ ঘুরিতে ঘুরিতে একটা রেস্তোরাঁয় চা খাইতে ঢুকিলেন। মণিবাবু চা খাইতেছিলেন, তাহার পাশে একজন পুলিসের জমাদার। মণিবাবু সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া চা খাওয়াইলেন। শচীনবাবুকে বিষণ্ণ দেখিয়া মণিবাবু বলিলেন—কি? আপনাকে যেন একটু বিমর্ষ মনে হচ্ছে?

• —হাঁ।

—কেন?

—অর্থাভাব! মাষ্টারের যা হয়—ইস্কুল বন্ধ মাইনে পেতে দেরি। ছাত্রেরা নিয়মিতভাবে বেতন দেয় না।

—তা ত বটেই। কতকগুলো ছেলের অপকর্ম্মের দরুন দেশের কত লোক কত কষ্ট পাচ্ছে।

—আপনার ভায়ের মামলার কি হ'ল? সেই ছুরিমারা ব্যাপার।

মণিবাবু একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন, তার আবার কি হবে? খালাস হয়ে যাবে।

—যে ছুরি খেয়েছে, তার ত শুনলাম আড়াই বছর হয়েই গিয়েছে।

—তা ত হবেই। সেটা ত অন্য আইনে—বিপ্লবী হিসেবে—

—আজ্ঞে হাঁ।

শচীনবাবুর বাদানুবাদ করিবার ইচ্ছা ছিল না, তিনি উঠিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে। অন্ধকার রাস্তা, একাকীই ফিরিতেছিলেন, পথে একটা কাঠের পুল, জায়গাটা অসমান, তিনি পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতেছিলেন। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছে, আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হইল—

কে যেন পিছন হইতে ডাকিল, মাষ্টার মশায়।

পিছন ফিরিলেন, একটি লোক দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু সেই অন্ধকারে আবছা দেখা গেলেও কে তাহা বুঝা যায় না। লোকটি তাঁহার কাঁধে হাত দিয়া আন্দাজে হাত ধরিল। তিনি একটু বিস্মিত ও ভীত হইলেন—কে?

লোকটি তাঁহার হাতে একখানা খাম গুঁজিয়া দিয়া বলিল, আপনার চিঠি।

দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করিয়া সে চলিয়া গেল। পিছনের লাইট পোষ্টের আলো বাঁকের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু অস্পষ্ট। লোকটি দ্রুত চলিয়া গেল, মনে হইল যেন কোন পুলিস অফিসার।

শচীনবাবুর মনে সংশয় জাগিল, কিন্তু তবুও নির্লিপ্তভাবে সেটা পকেটে পুরিয়া বাসায় ফিরিলেন। এতদিন আত্মরক্ষার একটা ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে হাল ছাড়িয়া দিয়া অনিবার্য্য ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বাসায় আসিয়া দেখেন খামের ভিতরে দুইখানা দশ টাকার নোট এবং ছোট একটি চিঠি, নামধামহীন অপরিচিত লেখা—"সাবধান হইবেন, যে-কোন দিন খানাতল্লাস হইতে পারে।" শচীনবাবু ভাবিতে লাগিলেন, এ কোন্ অজ্ঞাত দাতার দান ও সাবধান-বাণী।

সেদিন বর্ষণ-মুখর দিবস, সকাল হইতেই বৃষ্টি হইতেছে। শচীনবাবু বাসায়ই বসিয়া ছিলেন, অদূরে গলির মোড়ে পানের দোকানে একটা লোক বসিয়া থাকে নিত্য, নিয়মিত ভাবে। মাঝে মাঝে মনে হয় ও ছায়ার মত তাঁকে অনুসরণ করে, দিনে পঁচিশ বার পঁচিশ জায়গায় তাহার সহিত দেখা হয়, লোকটি গুপ্ত সংবাদদাতা সন্দেহ নাই—কিন্তু কে? শহরে নবাগত বলিয়া অনুমান হয়।

আজ তিনি ভাবিয়া ভাবিয়া বুঝিয়াছেন, সত্যর সাহিত্য-সমিতির এত কর্ম্মতৎপরতা কেন? তাহার সহিত বহু সরকারী কর্ম্মচারীর খাতির থাকাটা আজ একটা মূলধনস্বরূপ হইয়াছে, না হইলে বহুপূর্ব্বে শৈশবেই এই বিপ্লব-প্রচেষ্টার অকালমৃত্যু ঘটিত।

সারাদিন কোন কাজ ছিল না। বসিয়া বসিয়া দিন কাটিয়াছে, বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইবেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই রিম্ ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, ঐ লোকটি নির্ব্বিকার চিত্তে পানের দোকানে বসিয়া পান চিবাইতেছে আর দোক্তার পিক্ ফেলিয়া বৃষ্টির জলস্রোতকে শঙ্কারজনক রক্তিমতায় কুৎসিত করিয়া দিতেছে। মিঃ সেনের বেয়ারা আসিয়া জানাইল, তাঁহাকে মিঃ সেনের বাড়ীতে একবার যাইতে হইবে।

শচীনবাবু অনুমান করিলেন, মেঘমেদুর সন্ধ্যায় মিঃ সেনের বোধ হয় কাব্যপ্রীতি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই তাঁহার সহিত সন্ধ্যাটা কাব্যালোচনায় কাটাইয়া দিতে চান। শচীনবাবু ঘরে ছটফট করিতেছিলেন, ছাতা লইয়া বেয়ারার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলেন।

পথে অন্ধকার। মাঝে মাঝে মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছে—আলোর স্বল্পতায় পথের অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। শচীনবাবু চলিতেছিলেন, মাঝে মাঝে বৃষ্টির ছাট্ গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। বেয়ারা গেট খুলিয়া তাঁহাকে ভিতরে আসিতে বলিল। শচীনবাবু বিস্মিত হইলেন, বাড়ীর ভিতরে লইয়া যাইতে চাহিতেছে কেন? ভুল করিয়া নয় ত!...হয় ত মিঃ সেন ভিতরেই আছেন।

বেয়ারা শয়নকক্ষের একটা চেয়ারে তাঁহাকে বসিতে বলিয়া চলিয়া গেল।

কেহ কোথাও নাই, কেবলমাত্র শিশুকন্যাটি খাটের উপর নিদ্রিত। ডেপুটিবাবুর বাড়ীর একেবারে অন্দরে একাকী বসিয়া থাকিতে থাকিতে শচীনবাবু বিস্ময়-মিশ্রিত আতঙ্কে ঘামিয়া উঠিলেন। এমন সঙ্কটজনক অবস্থায় তিনি ত পূর্ব্বে কখনও পড়েন নাই।

মিসেস্ সেন একদিন মাত্র সাহিত্য সমিতির উৎসবে মিনিট পাঁচেকের জন্য ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে তেমন আলাপ পরিচয় তো হয় নাই...

ভাবিয়া ভাবিয়া শচীনবাবু কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। হঠাৎ মিসেস সেন এক প্লেট খাবার ও চা লইয়া আসিয়া টেবিলে রাখিলেন। নমস্কারান্তে অত্যন্ত সহজ সুরে বলিলেন, খেয়ে নিন্।

অবাক বিস্ময়ে শচীনবাবু তাকাইলেন, ব্যাপারটা বিশ্বাস হয় না, অথচ একেবারে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ ভাবে মিসেস্ সেন, যিনি কড়া হাকিমকে কড়া শাসনে রাখিয়া সিগারেট কণ্ট্রোল করিয়াছেন বলিয়া শহরে সুখ্যাতি।

শচীনবাবু বিমূঢ়ের মত বসিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, সমিতি গড়বার জন্যে এত লম্বা-চওড়া কথা বললেন আর এখন একেবারে চুপ করে আছেন?

শচীনবাবু কোন জবাব না দিয়া একটা সিঙাড়া মুখে পুরিলেন। মিসেস্ সেন একটু হাসিয়া বলিলেন, অবাক হয়েছেন বোধ হয়?

—হাঁ। এ ধরণের ব্যাপার ত নাটক-নভেলেও ঘটতে দেখা যায় না।

—কিন্তু এত অবাক না হয়ে এবার খাওয়াতে মন দিন দেখি।

শচীনবাবু জানিতেন, মিসেস্ সেন বড়লোকের মেয়ে এবং তাঁর বাবা যে হাতখরচ তাঁহাকে দেন তাই নাকি মিঃ সেনের মাহিনা হইতে বেশী। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, আমাকে কি খাবার জন্যেই ডেকেছেন?

—না। আর একটু কাজও আছে। আপনাকে একটা জিনিষ নিতে হবে। নেবেন ত?

—গ্রহণযোগ্য হলে নিশ্চয়ই নেব।

মিসেস্ সেন আঁচল হইতে দশখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিলেন, এটা আপনি নিয়ে যান।

—আমি! টাকা নিয়ে কি করবো!

—দিলুম—যা হয় করবেন।

শচীনবাবু শঙ্কিত হইলেন—চারি পাশে গুপ্তচরের দল তাঁহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, শেষে কি ইনিও! বলিলেন—নিতে আমার আপত্তি আছে। প্রথমতঃ, আপনার দান গ্রহণ করবো কেন? দ্বিতীয়তঃ গ্রহণ করলেও কি ইচ্ছামত খরচ করতে পারবো।

—আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব—দরকার আছে বলে করবেন। আর দ্বিতীয়তঃ, যেভাবে খুশী টাকাটা খরচ করবেন। যাই হোক্, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। চট্‌পট্ খেয়ে নিন।

শচীনবাবু কহিলেন, আপনার দান গ্রহণ করতে আমি অপারগ।

—কেন? সন্দেহ হচ্ছে? সরকারী টাকা ও নয়, ও আমার হাতখরচ থেকে দিয়েছি।

—তা'হলেও—আমাকে কেন দেবেন ?

—আমার ইচ্ছে।

—অন্তকে ত দেন না !

—আপনি কেমন করে জানলেন ?

—অন্ততঃ খ্যাতি শুনতাম তা হলে।

—খ্যাতি নেই, বরং কৃপণ বলে বদনাম আছে জানি। কিন্তু ঐ পুলিস আর ম্যাজিষ্ট্রেটদের চা খাওয়াতে আমার ইচ্ছে করে না। কিন্তু আপনাকে খাইয়েছি—

—আমি দরিদ্র হতে পারি কিন্তু অন্তের দান গ্রহণ করতে আমার আত্ম-সম্মানে ঘা লাগে—সেইজন্তেই—

মিসেস্ সেন চট্ করিয়া টাকা কয়েকটা তাঁহার বুক পকেটে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, উনি বোধ হয় আসছেন—

সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন লোকের দূরাগত কলরব কানে আসিল। বোধ হয় মিঃ সেন তাসের আড্ডা হইতে ফিরিতে-ছেন। মিসেস্ সেন ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আর ইতস্ততঃ করবেন না—টাকা আপনাদের কাজে লাগাবেন। আমার সঙ্গে আসুন, পেছনের দরজা দিয়ে আপনাকে বেরিয়ে যেতে হবে। নইলে উনি দেখে ফেললে বিপদ হবে।

মিসেস সেন তাড়াতাড়ি লণ্ঠন লইয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন এবং শচীনবাবু যেন অপরাধ করিয়া ধরা পড়িতে যাইতেছেন এমনি একটা উৎকণ্ঠা লইয়া তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন। অন্ধকার, পিছল উঠান। মিসেস্ সেন বারান্দায় লণ্ঠনটা রাখিয়া বলিলেন, আসুন—

শচীনবাবু অন্ধকারে মিসেস্ সেনের পিছন পিছন চলিলেন, এক রহস্যময় রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে তিনি পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

মিসেস্ সেন পিছনের ক্ষুদ্র দরজাটা খুলিয়া বলিলেন, এ পথের হদিস জানেন ত ? একটু এগিয়ে, পুকুরধারের রাস্তা দিয়ে ওদিকে গেলেই গলিতে পড়বেন।

—হ্যাঁ জানি—

তিনি দরজা দিতে যাইতেছিলেন···মিসেস্ সেন যেন একটু চকিত হইয়া উঠিয়াছেন। ইতিমধ্যে রাস্তার কলরব নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। দুরন্ত সামান্য হাত দুই—অনিলের কথাটা মনে হইল। এক মাসের বেশী জেল হইলে সত্যই সব নিবিয়া যাইবে।

কি করিয়াই বা তাঁহাকে ডাকেন ! হঠাৎ এক ঝলক বাতাসে মিসেস্ সেনের আঁচলটা শচীনবাবুর একেবারে হাতের কাছে আনিয়া দিল। তিনি তাড়াতাড়িতে তাহাই ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ করিয়া কহিলেন—

—শুনুন—

—বলুন তাড়াতাড়ি—

—অনিলের কেসটা মিঃ সেনের হাতে আছে, দেখবেন যেন এক মাসের বেশী না হয়।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

নিবিড় অন্ধকার। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোক-রশ্মি অবরুদ্ধ দরজার অন্তরালে বন্দী হইয়া গিয়াছে। শচীনবাবু একটু একটু করিয়া পা বাড়াইয়া পুকুরপাড়ে আসিলেন—হঠাৎ কাহারও সঙ্গে দেখা হইলে কি ভাবিবে এই আশঙ্কায় একবার এদিক ওদিক চাহিলেন, তাহার পর আর একটু ভাবিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। রাস্তাটা জনশূন্য—যাহারা যাইতেছিল, তাহারা মিঃ সেনের দল নহে।

শচীনবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া চলিলেন।

বাড়ীতে আসিয়া শচীনবাবুর অন্তর আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল, টাকা পাইয়াছেন, আপাততঃ সত্যদের দুর্গতি দু'চার দিনের জন্য কমিবে। তার উপর এই অভাবিতপূর্ব্ব সহানুভূতিতে তাঁহার অন্তরে একটা আশা জাগিয়াছিল, হয়ত এসব নিরর্থক নয়, হয়ত সত্যদের দুঃখবরণ সার্থক হইবে, হয়ত দেশ স্বাধীন হইবে। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে—সেখানে দুঃখকষ্ট থাকিবে না, শ্রমের বিনিময়ে উপযুক্ত অর্থ ও আহার্য্য মিলিবে। শাসকদের অত্যাচারে ও অবিচারে শত শত প্রাণ নষ্ট হইবে না, ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা মানুষের জীবন যাত্রাকে সুষ্ঠু করিয়া তুলিবে।

মীরা যখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, শচীনবাবু তখন আর গোপন করিতে পারিলেন না, সব কিছুই সবিস্তারে বলিয়া ফেলিলেন। মীরা সবিস্ময়ে কহিল, তা হলে হয়ত সত্যদের জয় হবে, না গো ? ওরাও যখন বুঝেছে——

—হ্যাঁ, হয়ত তাই—

বহুদিন পরে আজ মীরা ও শচীনবাবু অনেক গল্প-গাছা করিলেন। যেন একটা রঙীন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাইয়াছেন··· অনুদার পৃথিবীতে যেন একটু নিরাপদ আশ্রয় মিলিয়াছে।

অনেক রাত্রে তাঁহারা শয়ন করিলেন। বর্ষণক্লান্ত শীতল রাত্রি। জানালা দিয়া ভিজা বাতাস আসিয়া মশারি দোলাইতেছে। তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাত্রি দু'টার পরে অকস্মাৎ শচীনবাবু যেন অনুভব করিলেন, কে তাঁহার মাথায় ভিজা হাত দিয়া স্পর্শ করিয়াছে। বিছানায় উঠিয়া বসিলেন—মীরা ঘুমাইতেছে। তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—কে ?

—দরজা খুলুন স্যর···নারীকণ্ঠ।

শচীনবাবু দরজা খুলিলেন—অন্ধকারে কে যেন ঘরে ঢুকিল। তিনি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইতে যাইতেছিলেন, আগন্তুক কহিল, জ্বালাবেন না স্যর। আমি শ্যামলী।

—ওঃ, কি খবর বল ত !

—ধলাদায়া যাচ্ছে স্তর, কাল সেখানে শোভাযাত্রা হবে। আরও জন পনর আছে। টাকা অন্ততঃ এক শ' চাই, নৌকা ভাড়া হয়েছে তিরিশ টাকা—দুখানা নৌকো।

—তুমি কি করবে?

—ওরা সব নদীর ঘাটে বসে আছে, আমি টাকা নিয়ে গেলে তবে রওনা হবে!

—তুমি পারবে? এগিয়ে দেব!

—না—না। আপনি কখখনও আসবেন না। এখনও পুলিস আছে মোড়ে। আমি এমন পথে যাবো আপনি তা চিনবেন না।

—পারবে একা!

—হ্যাঁ, একা এলাম, আর যেতে পারবো না। আরতি আছে মোড়ে দাঁড়িয়ে।

—ও আচ্ছা—

শচীনবাবু অন্ধকারে টাকা গুণিতে গুণিতে বলিলেন, কিন্তু একশত হয় না। আশি নিয়ে যাও—তিনি সত্যদের জন্য কিছু সঞ্চয় করিলেন।

—তাই দিন—

শ্যামলী হাত পাতিয়া টাকা লইয়া বলিল, স্যর আপনি সাবধান থাকবেন, আপনার নামে ওরা খুব লাগিয়েছে, কিন্তু প্রমাণাভাবে আপনাকে ধরতে পারছে না। জানেন, এস্-ডি-ও আপনার ওয়ারেণ্টে সই করেন নি—আপনি সাহিত্যিক, তাই বিশ্বাস করেন নি যে আপনি এসব হাঙ্গামার মধ্যে আছেন।

শ্যামলী অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল—শচীনবাবু দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিলেন, কালো একটা অশরীরী মূর্ত্তির মত শ্যামলী বড় রাস্তায় উঠিয়া ওপারের একটা ক্ষুদ্র গলিতে ঢুকিল। অপরিসীম সাহস এই মেয়েটির! এই অন্ধকারে এমনি করিয়া ও যেন কি এক দুরন্ত আশা বুকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শ্যামলীর অপস্রিয়মান ছায়ার দিকে চাহিয়া শচীনবাবু মনে মনে বলিলেন, তোমাদের ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধন যেন সফল হয়। স্বাধীন ভারতে তোমরা পুরস্কৃতহইবে, দেশের দুঃখ মোচন হইবে।

পরের দিনটা অত্যন্ত অস্বস্তিতে কাটিতেছিল—

থানার সামনেই বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ফাঁক পাইলে তাহাতে আগুনও দেওয়া হইবে। যদি গুলি চলে তবে ধলাদের দুই-এক জন নিশ্চয়ই মারা যাইবে—অবশ্য মরিতে তাহাদের ভয় নাই, কিন্তু শচীনবাবু তাহাদের জন্য একটা দারুণ উৎকণ্ঠা ভোগ করিতেছিলেন।

বাকী চল্লিশ টাকা সত্যদের পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা এখন কোনও একটা গ্রামের লোকেদের বৈপ্লবিক কর্ম্মে প্ররোচিত করিতে লাগিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে মনটা এত বিষণ্ন হইয়া উঠিল যে, শচীনবাবু আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না—একাকী বাহির হইয়া পড়িলেন। কয়েক দিন শ্রীমতী অণিমার সহিত দেখা হয় নাই, একবার গেলে হয়।

পথে জনৈক দোকানদার সাদরে ডাকিয়া বসাইল, আসুন মাষ্টারমশাই বসুন, একটু চা খান।

ইহার তাৎপর্য্য তিনি বুঝেন নাই, তবে ইদানীং আশ্চর্য্য ও রহস্যময় অনেক ব্যাপারই ঘটিতেছে তাই তিনি বসিলেন। বলা যায় না—কোন সংবাদ হয়ত বা পাওয়া যাইতেও পারে।

দোকানদার বলিল, খবর শুনেছেন বোধ হয়—দারোগা খুন হয়ে গেছে। ছেলেদের উপর লাঠি চালাতে তারাও পাল্টা জবাব দিয়েছিল, তাই মরেছে।

শচীনবাবু শুনিলেন, এবং ইহার ভয়াবহ পরিণাম কল্পনা করিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন। ওখানে চলিবে এখন পুলিসের উস্কানিতে সম্প্রদায়বিশেষের গুণ্ডামি, লুঠতরাজ, বেপরোয়া মারপিট এবং নারীধর্ষণ—লাঞ্ছনায় অপমানে পীড়নে কত লোকের জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিবে।

আর একটা কথা সুস্পষ্ট—তিনি যে ঐ বিপ্লবীদের নেতা একথা আজ প্রায় সর্ব্বজনবিদিত, তাহা না হইলে এমন সব ঘটনা ঘটিতে পারিত না। তাঁহার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত, আজ হোক্ কাল হোক্ কারাবাস তাঁহার অনিবার্য্য।

তিনি উঠিতেছিলেন, দোকানী প্রশ্ন করিল—ধলারা ভাল ত মাষ্টারমশাই?

শচীনবাবু সংক্ষেপে বলিলেন, আমি কি করে জানবো।

তিনি বাহির হইয়া ধীরে ধীরে চলিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মিস্ রায়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিস্ রায়কে সংবাদ দিতেই তিনি আসিলেন। কুশল-প্রশ্নের পর শচীনবাবু বলিলেন, তা হলে কলকাতা আর যাচ্ছেন না ত।

—যেতে আর দিলেন কই?

—আমি দিলাম না!

—হ্যাঁ। বললেন, থাকতে হবে—

—যা হোক্—আপনার উপর আমার অধিকার আছে একথা স্বীকার করলেন তা হলে?

—আপনার কথাবার্ত্তা ক্রমশঃই ঘুর পথ নিচ্ছে—

—যাক্ সেকথা, নিশাযোগে আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের প্রয়োজন হতে পারে—তার পথটা দেখিয়ে দিতে হয়!

—রাত্রে আমার বাসায় আসবেন?

—হ্যাঁ! এর মধ্যে শুধু কর্ত্তব্যজ্ঞানই নয় একটু রোমান্সের গন্ধও যে রয়েছে।

—কিন্তু একথা বলতে আপনার একটু কুণ্ঠা বোধ করা উচিত ছিল।

—উচিত অবশ্যই ছিল, কিন্তু সঙ্কোচ বোধ করলে আর চলছে না।

—পেছনের দরজা টপ্‌কানো আপনার পক্ষে যদি অসম্ভব না হয় তবে এই জানালায় আসাও সম্ভব এবং…

শচীনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, সময় নিকট হয়েছে, বোধ হয় আর অল্প কয়দিন। কিন্তু আপনার হাতে কত আছে ?

—পোষ্টাপিসে শ-পাঁচেক আছে, তা ছাড়া আর নেই।

—যাক্‌ যথেষ্ট মূলধন আছে—

—আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত।

—আচ্ছা, আপাততঃ খুব সলজ্জ ভাবেই উঠি তা হলে! তবে হাতে কিছু টাকা রাখতে লজ্জিত হবেন না আশা করি।

শচীনবাবু হাসিতে হাসিতে চলিয়া আসিলেন।

পরদিন সকালে ঘুম হইতে জাগাইয়া মীরা বলিল, শীগ্‌গির ওঠ। চা খাবে। শচীনবাবু বলিলেন, এখানে দাও—

—না, রান্নাঘরে চল।

শচীনবাবু রান্নাঘরে গেলেন। সেখানে বসিয়া ধলা। ধলা বলিল, শুর যা হয় কিছু খেতে দিন। বড্ড ক্লান্ত—

—দারোগা মরলো কি করে ?

—বলছি।

মীরা কয়েকটা মুড়ির মোয়া দিল—চায়ের জল গরম হইতেছে। ধলা দুর্ভিক্ষপীড়িতের মত খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার পর বলিতে সুরু করিল—শোভাযাত্রায় ওখানকার ছাত্র নিয়ে প্রায় দু'শ ছেলে ছিল। পতাকাবাহী লাঠিগুলো একটু শক্ত দেখেই নিয়েছিলাম, থানার নিকটবর্ত্তী হতেই বোধ হয় বেলা ১২টা হ'ল, তারা কিছু না বলেই হঠাৎ বেপরোয়া লাঠি চার্জ্জ করতে আরম্ভ করলে। কিছুক্ষণ মার খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে এক ঘা মারলাম দারোগাকে, কিন্তু এমনি চোট লাগল যে, সেই যে পড়ল আর উঠল না। দু'একজন কনেষ্টবলও ঘা খেয়েছিল, তারা পালিয়ে গেল—আমরাও ফিরে এলাম।…

খানিকটা চা পান করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল—নৌকো ভাড়া করা ছিল, আমরা চলে আসবো, হঠাৎ সংবাদ পেলাম পুলিসের হুকুমে দাঙ্গা আরম্ভ হবে—তারা মুসলমানদের বেপরোয়া লুঠ-তরাজ করতে হুকুম দিয়েছে—এখন মেয়েদের সরানো দরকার। দু'খানা নৌকো বোঝাই করে ছেড়ে দেওয়া হ'ল, অন্য একখানি মহাজনী নৌকায় আরও কিছু এল…তখনই অপর প্রান্তে লুঠতরাজ আর নারী-হরণ আরম্ভ হয়েছে—সাহাদের বাড়ী লুঠ হয়েছে, একটা মেয়েকে…ধলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল তার পর আবার সুরু করিল, আমরা দেখলাম অন্ততঃ আধঘণ্টা তাদের আটকাতে না পারলে এদিকে সব বেরুতে পারবে না। তাই আমরা বাজারের রাস্তায় গেলাম তাদের মোহড়া নিতে—মারামারি হ'ল, একটি ছেলে মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হ'ল, তাকে পাঠিয়ে দেখি, ওরা যেন একটু ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে—এদিক ওদিক পালাচ্ছে—

আমরা চলে এলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা, হেঁটে রওনা দিলাম রাস্তা ধরে। সারাদিন খাওয়া জোটে নি তবুও ছুটছি আমরা চারজন। ওরা সব ওপারের গ্রামে কোন আত্মীয়-বাড়ীতে গেল। কি বিশ্রী রাস্তা, বর্ষার জলে কাদাময় হ'য়ে গেছে, ভেঙে গেছে মাঝে মাঝে, সাঁতার-জল, অন্ধকারে পথ চিনি না, তবুও চলেছি—

নদীর ধার দিয়ে আসতে আসতে কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা। তারা মাছ ধরছিল—তাদের হাতে দেশী লণ্ঠন। স্বল্প আলোয় আমাদের ভিজা কাপড় আর চলার ভঙ্গী দেখে বোধ হয় সন্দেহ করেছিল, তার উপর অত রাত্রি। তারা বললে, 'দাঁড়াও, গ্রামের চৌকিদার আর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারবে না।' গ্রামের প্রায় সকল অধিবাসীই অন্য সম্প্রদায়ের লোক, তারা ওখানকার ব্যাপার জানত তাই বললে, 'সেখানে মারামারি করে আসছেন ত ?' বললাম—না, মায়ের বিশেষ অসুখের খবর পেয়ে যাচ্ছি। তারা ছাড়লে না, আমরাও যাব না। শেষে তারা আমাদের জোর করে ধরে নিয়ে যাবে বললে। দেহে তখন আর তিলমাত্র শক্তি নেই, তাই বললুম, তাঁদের ডেকে নিয়ে এস, আমরা তোমাদের টং-এ অপেক্ষা করছি। তাই হ'ল, জনা ছয়েক রয়ে গেল আর দুই জন চৌকিদার ডাকতে গেল—

ধলা আবার কয়েক চুমুক চা খাইয়া লইয়া বলিল, শেষে আমরা স্থির করলাম জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে। হঠাৎ সুযোগ মিলল—আমরা জলে লাফিয়ে পড়লাম—

বর্ষার নদী, দুরন্ত স্রোত—ওদের হৈ চৈ ক্রমেই দূরে সরে গেল, বুঝলাম বেশ জোরেই ভাঁটিয়ে যাচ্ছি।…সারাদিন খাই নি, তার ওপর এই পরিশ্রম, স্রোতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, বুঝলাম বাঁচবার আর আশা নেই, হাত পা শিথিল হয়ে আসছে, চারদিকে অন্ধকার, কোথায় তীর বুঝবার উপায় নেই। ভাবলাম এমনি ভাবে কত লোক মরেছে।…

হঠাৎ দেখি গায়ে কি একটা ঠেকলো—কলাগাছ। বেঁচে গেলাম। তার উপর চড়ে বসলাম, বোধ হয় ঘুমিয়ে ছিলাম। কিছুই জানি না—ভোরে দেখি, ষ্টীমার-ষ্টেশনের ফ্লাট দেখা যাচ্ছে আর আমি ঘুরপাক খাচ্ছি। তখন একটু চেষ্টা করে উঠে এলাম—ওয়ারেণ্ট ত আছেই—তারপর সরাসরি একেবারে বাড়ীতে চলে এলাম। মা ভাত রাঁধছে, ভাবলাম খেয়েই চলে যাব…

হঠাৎ কে যেন বাহির হইতে ডাকিল, শুর।

শচীনবাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, যে কয়েকটি ছাত্র তাহাকে ও মিস্ রায়কে জড়াইয়া একটা রোমান্স সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদের একজন দাঁড়াইয়া।

শচীনবাবু প্রশ্ন করিলেন, কি হে ?

—আমাদের স্কুল কবে খুলবে স্যর ?

—সোমবার।

শচীনবাবু অত্যন্ত সংক্ষেপে উত্তর দিয়া আসিলেন। ধলা তখনও গোগ্রাসে মোয়া খাইতেছে। শচীনবাবু বলিলেন, শীগগির যা, ওরা ঠিক টের পেয়েছে—এসেছে কবে স্কুল খুলবে জানতে।

ক্লান্ত পা দুটিতে ভর দিয়া দরজা ধরিয়া ধলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বড় দুঃখ স্যর, যারা আমাদের এত কষ্ট দিলে তাদের একজনও ইংরেজ নয়, তারা আমাদেরই দেশবাসী, আমাদের ভাই—

শচীনবাবু বলিলেন, পিছনের দরজা দিয়ে, ময়রাবাড়ীর ভিতর দিয়ে চলে যা—নইলে বিপদ আছে।

ধলা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। শচীনবাবু রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলেন অত্যন্ত ভালমানুষ ছাত্রটি মোড়ের চায়ের দোকানে মণিবাবুকে কি যেন বলিল, তিনি হন্ হন্ করিয়া ছুটিলেন সম্ভবতঃ পুলিসে খবর দিতে।

শচীনবাবু আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, মীরা শিগ্‌গির একটা কাজ কর। তুমি ধলাদের বাড়ি চেনো ত ?

—হাঁ কেন ?

—শীগ্‌গির ভেতর দিয়ে গিয়ে বলে এস ধলা যেন না খেয়েই চলে যায়, নইলে দশ বারো মিনিটের মধ্যে ধরা পড়বে—

মীরা ইতস্ততঃ করিতেছিল, কেউ আমাকে চেনে না—

—তাতে কি ?

মীরা তাড়াতাড়ি রওনা হইল।

শচীনবাবু উৎকণ্ঠিত ভাবে বসিয়া রহিলেন। খোকা আঙিনার প্রান্তে একা একাই 'বন্দেমাতরম্' জুড়িয়া দিয়াছে। চীৎকার করিয়া বলিতেছে—বিশ্বাসঘাতকের বিচার হবে—ব্রিটিশ নিপাত যা—সা-রে-গামা-পাধা-নি, বোম ফেলেছে জাপানী, ইত্যাদি।

মীরা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি যেতে পারতাম না, পুলিসে ঘিরে ফেলেছে ওদের বাড়ী—তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—

শচীনবাবু আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, ওঃ—

সারাদিন অনাহারে থাকিয়া, জীবনপণে হাঙ্গামাকারীদের প্রতিরোধ করিয়া মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা করিয়াছে, দশ মাইল দুর্গম পথে হাঁটিয়াছে, চৌদ্দ মাইল জলে ভাসিয়া আসিয়াছে, তাহাকে কিছুই খাইতে পর্য্যন্ত দেওয়া হইল না। আর মায়ের রান্না ভাত ক'টিও সে মুখে দিবার সময় পাইল না, এই কি বিচার, বিধাতার ন্যায় ও সত্যের রক্ষণ! অভিমানে দুঃখে ক্ষোভে শচীনবাবুর চোখ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

মীরা বলিল, তুমি কাঁদছ ?

—ওঃ, ধলা দুটো ভাত খেয়েও যেতে পারলে না!

এই কথাটায় মীরার মাতৃহৃদয়ও কাঁদিয়া উঠিল, আহা তার খোকার মত ধলাও তার মায়ের আঁচলের নিধি, তাহাকে তিনি খাইতে দিতে পারিলেন না। মীরা ছুটিয়া গিয়া খোকাকে কোলে করিয়া অজস্র চুম্বনে তাহার স্নেহ আর আশীর্ব্বাদ ঢালিয়া দিল।

ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর আবর্ত্তন নিয়মিতই চলিয়াছে—

মানুষের আইন আদালত, মামলা মোকদ্দমা, খাওয়া-পরা, শোওয়া-বসা—সবই চলিয়াছে সেই একই নিয়মে। ফুল ফুটিয়াছে, ঝরিয়া পড়িয়াছে, বীজে অঙ্কুর হইয়াছে, ফলে বীজ সঞ্চয় হইয়াছে, কেবলমাত্র কয়েকটি পতঙ্গধর্ম্মী প্রাণ আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, অন্ধকার জনসমুদ্রে আবর্ত্তসঙ্কুল গভীর তলদেশে ক্ষতবিক্ষত দেহে আলোড়ন সৃষ্টি করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু সমুদ্রের উপরিভাগ নিস্তরঙ্গ, নিষ্ঠুর নীরবতায় মৌন।

শহর নীরব—নিশ্চিন্ত আলস্যে, নির্ম্মম স্তব্ধতায় দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে।

সাহিত্য সমিতির আর একটি অধিবেশন হইয়াছে মিঃ সেনেরই বাড়ীতে। অধিবেশনটি উৎসবমূলক, গান-বাজনায় বেশ জমিয়াছিল। উৎসাহে অখিলবাবু পর্য্যন্ত একটা আরত্তি করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

শচীনবাবুর কাজ নাই—মিঃ সেন মাঝে মাঝে ডাকেন, মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা হয়। অনিলরা হাজতে দিনাতিপাত করিতেছে—এখনও রায় বাহির হয় নাই।

সেদিন সকালে অমনি একটা আলোচনা হইতেছিল। রবিবার, মিঃ সেন তাই আজ একেবারে বেপরোয়া, আলোচনার গতিতে মনে হয় বারটার পূর্ব্বে সমাপ্ত হইবে না। শচীনবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন সেখান হইতে পর্দ্দার ফাঁকে বাড়ীর ভিতরের সামান্য একটু দেখা যায়।

অকস্মাৎ পর্দ্দাটা ফাঁক হইয়া মিঃ সেনের সামনে দুই কাপ চা ও দুইখানি বিস্কুট রক্ষিত হইল। বোঝা গেল মিসেস সেন স্বয়ং দিয়া গেলেন—কিন্তু ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। এই আকস্মিক চা দানের ব্যাপারে পর্দ্দাটা একটু বেশী ফাঁক হইয়া রহিল।

মিসেস সেন চা লইয়া আসিলেন। চা পান করিতে করিতে শচীনবাবু দেখিলেন, এবার র'ান্নাঘরের দরজা পর্য্যন্ত দেখা যায়। মিসেস্ সেন কয়েকবার আনাগোনা করিলেন এবং একবার চোখাচোখি হইতেই একটি আঙুল দেখাইয়া স্মিতহাস্যে চলিয়া গেলেন।

শচীনবাবু বুঝিলেন, অনিলদের এক মাসের জেল হইয়াছে।

ফিরিবার মুখে শচীনবাবু যথাস্থানে সংবাদটি দিয়াও আসিলেন।

ধলারা যে কয়জন একসঙ্গে জলে ঝাঁপ দিয়াছিল তাহাদের সকলেই ফিরিয়াছে, কিন্তু ফেরে নাই শুধু একজন। দুই বৎসর টেষ্টে ডিস্‌এলাউড হইয়া সে পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। শচীনবাবু ব্যথিত হইলেও বিচলিত হন নাই, আজ তাঁহার সুস্পষ্ট ধারণা, ইহারা আজ হোক, কাল হোক, দশ বছর বাদে হোক সকলেই ডুবিবে, কেহই বাঁচিবে না। ইহারা সুখে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জন্মায় নাই।

আজ কয়েকদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার। শেষ ভাদ্রের রৌদ্রে বর্ষণক্লান্ত আকাশ উজ্জ্বল আর পৃথিবী উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুক্লপক্ষের সপ্তমী হইবে, সৌখীন নরনারী সন্ধ্যার পরে নদীর ধারে, রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। চলমান মেঘের ছায়ায় আলো-আঁধারে বর্ষাস্নাত পৃথিবীর শ্যামলতা আনন্দময়—

কয়েকজন মহিলা আজ শচীনবাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। এমনই বেড়ানটা এই ক্ষুদ্র শহরের রেওয়াজ। তাঁহার অবস্থিতি মহিলাগণের আনন্দের অন্তরায় হইবে মনে করিয়া শচীনবাবু বাহির হইয়া যাইতেছিলেন একটি বধূ আসিয়া প্রণাম করিল।

মুখ দেখিয়া বুঝিলেন এটি ডাক্তারবাবুর পুত্রবধূ। তিনি প্রশ্ন করিলেন, কি? ভাল বৌমা!

—হাঁ।

—তার পর সকলে ভাল আছে?

—হাঁ, আজ ন'টার পর সত্যদা আসবে সেইখানে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। যাবেন—

—যাবো?

—হাঁ, সোজা রান্নাঘরে চলে যাবেন, চেনেন ত?

—আচ্ছা—

শচীনবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। পথে শিক্ষকগণের সহিত সাক্ষাৎ—তাঁহারা মিস্ রায় ঘটিত ব্যাপারের সাম্প্রতিক কিংবদন্তী সম্বন্ধে মুখরোচক বহু সংবাদ জানাইলেন।

আজ অন্ততঃ তাঁহার রসিকতায় প্রবৃত্তি ছিল না, তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, অন্যত্র চাকুরীর দরখাস্ত করতে হবে—

সুরেনবাবু কহিলেন, মণিবাবু এ ব্যাপারটা নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন বলতে পারেন।

—উনি সম্ভবতঃ ওখানকার হতাশ প্রেমিক তাই—

শচীনবাবু জানিতেন, ক্রমাগত তাঁহাকে ও মিস্ রায়কে জড়াইয়া এই কুৎসা প্রচারের ফলে একদল ছাত্রছাত্রী তাঁহাদের উপর শ্রদ্ধা হারাইয়াছে এবং সাহিত্য সমিতিটা যে মুখ্যতঃ উক্ত প্রণয়-লীলার ক্ষেত্রবিশেষ তাহা প্রায় সকলেই নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছে। এদিকে ধলার গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দলের সকলেই গ্রেপ্তার হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে খুনের চার্জ্জ দাখিল করা হইয়াছে। হয়ত ধলার ফাঁসিও হইতে পারে। এমন কত জনের ফাঁসি হইয়াছে,—হইবে।

মণিবাবুর ভাই যাহাকে ছোরা মারিয়া পেটফুটা করিয়া দিয়াছিল তাহার দুই বৎসরের জেল হইয়া গিয়াছে, এবং মণিবাবুর ভ্রাতা বেকসুর খালাস পাইয়াছে। তাহার পিতা সেকেণ্ড ক্লাসে ভ্রমণের খরচ আদায় করিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার যৎসামান্য মুনাফাও হইয়াছে।

রাত্রি নটায় ডাক্তারবাবুর বাড়ীর সামনের গলিটা একেবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। শচীনবাবু একটু শঙ্কিত পদক্ষেপে একবার পায়চারি করিয়া দেখিলেন—এদিকে ওদিকে কোথায়ও কেহ নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া ভয়ে ভয়েই বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। রান্নাঘরের দরজায় বসিয়া আছে ডাক্তারবাবুর পুত্রবধূ, অন্য কেহই বাড়ীতে নাই, শাশুড়ী সম্ভবতঃ গৃহান্তরে। একটা কেরোসিনের ডিবার শীর্ণ শিখা মাঝে মাঝে বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া পুঞ্জীভূত ধূম উদ্গীরণ করিতেছে—

বৌমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া শচীনবাবুকে পাশের ঘরে লইয়া গেল। ক্ষীণ প্রদীপের আলোকে ঘর স্বল্পালোকিত, সত্য শুইয়া আছে মনে করিয়া তিনি পাশে যাইয়া বসিলেন। সত্য উঠিয়া বসিল—

শচীনবাবু সত্যকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এ যেন সত্যর প্রেতাত্মা—শীর্ণ চেহারা, গায়ের রং রোদে পুড়িয়া তামার মত হইয়াছে, একমুখ দাড়ি-গোঁফ, মনে হয় বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। চোখে সে দীপ্তি, দৃষ্টিতে সে নির্ভীকতার অভিব্যক্তি নাই। নিষ্প্রভ কোটরগত চোখে একটা গ্লানিমার কারুণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে। মনে হয় যেন দীর্ঘদিন রোগে ভুগিয়া উঠিয়াছে—

—কেমন আছ?

—ভাল নয়, আজ এক মাস রক্ত আমাশয়ে ভুগছি। রাত-জাগা, পরিশ্রম অনাহার—শরীরের উপর কম অত্যাচার তো হয় নি স্যর, সুতরাং শরীরের আর দোষ কি?

কেমন করে দিন কাটাচ্ছ?

সত্য বলিয়া গেল অনেক কাহিনী, হাঁটিয়া সাঁতরাইয়া কত পথ যাইতে হইয়াছে। পুলিসের ভয়ে, গ্রাম্য লোকের ভয়ে কালো হাঁড়ি মাথায় দিয়া জলে রাত্রিবাস করিতে হইয়াছে। চারিপাশের অগুনতি জোঁক গায়ে লাগিয়া দেহে ছিদ্র করিয়া রক্তপান করিয়াছে। সেই সব কত

শুকাইতে দীর্ঘ দিন লাগিয়াছে। কোথায়ও গ্রামবাসী সহায়তা করিয়াছে, অনুবর্ত্তী হইয়া বৈপ্লবিক কাজ করিয়াছে, কোথায়ও আবার পুলিসে খবর দিয়া হয়রাণ করিয়াছে। কোথায়ও গ্রামবাসীরাই তাড়া করিয়াছে, ছুটিয়া বা আত্মগোপন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে, পাটের জমিতে ভাঁপ্‌সা গরমে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন কাটাইতে হইয়াছে—

সত্য স্মিতহাস্তে নিজেদের দুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করিয়া থামিল। শচীনবাবুর মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, এত কৃচ্ছ্রসাধনের ফল কি হইল? কিন্তু সে প্রশ্ন তিনি করিলেন না।

সত্য কহিল, আর ত কর্ম্মী নেই, সবই জেলে, এখন কি করা যায়!

—কর্ম্মী থাকলেই বা কি হ'ত?

—সত্যই তাই, বাইরের চেয়ে ঘরের শত্রু এত বেশী যে মনে হয় আর যেন পারি না।

—নিজেকে বাঁচাতে হলে ধরা দেওয়া ছাড়া পথ নেই। আর কিছু করাও সম্ভব নয়।

—তবে তাই করব। আর পারছি না যেন! কিন্তু আপনি এতদিন কি করে জেলের বাইরে আছেন সেইটেই আশ্চর্য্য।

—কেন?

—সকলেই ত জানে যে আপনি আমাদের নেতা?

শচীনবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন—নেতা? বল কি সত্য, আমি ত কাজে কিছুই করি নি। ঘরে বসে কেবল হা হুতাশ করেছি একটু আধটু···

—আপনার প্রতি সকলের শ্রদ্ধাই এতদূর এগিয়ে দিয়েছে আমাদের, [illegible] কি ছেলেরা এত নির্ভীক হতে পারত?

—থাক্, সে কথা।

সত্য একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—ভাগ্যিস, সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠার বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল। নইলে দু'দিনেই সব খতম হয়ে যেত। আচ্ছা এখন মেয়েদের দ্বারা কি কিছু হওয়া সম্ভব নয়?

—তারাই জানে।

বৌমা অদূরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, কি করবে?

—ধরুন, যদি এখানকার পোষ্টাপিসটা পুড়িয়ে দিতে পারত?

অবশ্য একটা প্রাণ কি দুটো প্রাণ যেত, কিন্তু···

—তা অঞ্জলি শ্যামলী পারে—

শচীনবাবু বলিলেন, তার প্রয়োজন কি? তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এমন কোন ক্ষতি হবে না—

—নাই হোক্, তাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া তো হবে, অন্ততঃ দুনিয়ার লোক জানবে এদের কৃত অত্যাচারকে জাতি মাথা পেতে নেয় নি—

ঘরের পিছনে শুকপত্রে পদধ্বনির মত একটা শব্দ শোনা গেল। বৌমা ত্বরিতপদে পিছন দিক দিয়া বাহির হইয়া গেল। সত্য ফুঁ দিয়া প্রদীপটা নিবাইয়া দিল।

নিবিড় অন্ধকারে শচীনবাবু ও সত্য মুখোমুখি নিঃশব্দে রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আবার একটা শব্দ হইল—আবার! সত্য চুপি চুপি প্রশ্ন করিল, পথে কি কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—না।

বৌমা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, সম্ভবতঃ গরু—ভয় নেই।

সত্য বলিল, তা হলে বরিশাল চলে যাই, সেখানে যদি সম্ভব হয় জিরিয়ে নেব, না হয় একেবারে জেলে গিয়েই বিশ্রাম।

—সে মন্দের ভাল। এমনি করেও ত বাঁচবে না। খরচের টাকা আছে?

না।

শচীনবাবু অন্ধকারে নিজের আংটিটা টানাটানি করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা খুলিতেছে না। বলিলেন, আংটিটা খুলে নাও, আর ত কিছু নেই। এটা তো খুলছে না—

বৌমা বলিল, না থাক্, এই আংটিটা নিন্—সে নিজের আংটি খুলিয়া দিল।

—কিন্তু—

—পুকুরের ঘাটে হারিয়ে গেছে বললেই হবে। আর এই দুল জোড়া আপনি রাখুন ভবিষ্যতের জন্তে—

শচীনবাবু অন্ধকারে হাত পাতিয়া দুইটিই লইলেন, একটা সত্যর হাতে দিয়া অন্যটি পকেটে রাখিলেন। বর্ত্তমানে এসব দান গ্রহণ করিতে তাঁহার আর সঙ্কোচ বোধ হয় না। নিজের আংটিটাও সত্যকে দিয়া কহিলেন, এটাও রাখো হয়ত কাজে লাগবে।

খাশুড়ী বৌমাকে ডাকিলেন, সে রান্নাঘরের প্রতিফলিত স্বল্পালোকে দাঁড়াইয়া বলিল, যতক্ষণ না আসি যাবেন না যেন।

সত্য বলিল, দুটো জিনিষ আপনার কাছে দেব গচ্ছিত রাখতে।

—কি?

—কতকগুলি কংগ্রেসের নির্দ্দেশ, ইস্তাহার আর—

—আর কি?

—আর একটা আগ্নেয়াস্ত্র, ও কিছু রসদ—

শচীনবাবু একটু যেন বিস্মিত হইলেন, তাহার পর বলিলেন, দিয়ো···আচ্ছা এখুনি দাও নিয়ে যাচ্ছি—

—না না, আপনি নেবেন না। কাল বৌদি গিয়ে দিয়ে আসবে—একটু সাবধানে রাখবেন যদি কোন কর্ম্মী আসে তার আত্মরক্ষার জন্তে দেবেন। অনেক সময় প্রয়োজন হয়।

—তাই হবে!

বৌমা আসিয়া শচীনবাবুকে বলিল, আপনি আসুন।

শচীনবাবু উঠিয়া আসিলেন। সদর দরজা দেওয়া ছিল, বৌমা তাহা খুলিয়া পুনরায় বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, পুলিস এসে গেছে!

—কেন?

—বোধ হয় সার্চ্চ করবে, সত্যদাকেও পালাতে হবে এক্ষুনি। দাঁড়ান দেখি—

শচীনবাবু নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, সত্য পিছন হইতে আসিয়া বলিল, আপনি আর আমি একসঙ্গে ধরা পড়লে কিন্তু সত্যিই আমি আনন্দিত হই—

—তার মানে?

—লোকে জানবে, আমি আপনার সত্যিকার অনুগত ছাত্র।

—কিন্তু সে দুটি জিনিস?

—সে পুলিস পাবে না। তার জন্যে চিন্তা নেই স্যর।

বৌমা আসিয়া জানাইল, পিছনের খিড়কিতেও পুলিস দাঁড়াইয়া আছে।

সত্য একটু হাসিয়া বলিল, বেশ লাগছে কিন্তু, ওদের ফাঁকি দিতে পারলে বেশ একটু আমোদ হ'ত—

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল। বৌমা জানালা দিয়া জানাইল, ডাক্তারবাবু বাড়ীতে নেই···না, কোন পুরুষমানুষ নেই।···না খুলব না দরজা।···ওঁকে ডিস্পেন্সারি থেকে ডেকে আনুন।

বৌমা আসিয়া বলিল, আপনারা খিড়কি দরজার আড়ালে থাকবেন, আমি জল আনতে যাচ্ছি। ফাঁক পেলেই চলে যাবেন—

বৌমা কলসী কাঁখে লণ্ঠন লইয়া আসিয়া খিড়কির দরজা খুলিল, লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল দুই জন কনষ্টেবল দাঁড়াইয়া আছে। বৌমা একটু ঘোমটা টানিয়া বলিল, একটু সরে যান, আমি জল আনতে যাব···

কনষ্টেবল দুই জন পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। সরু গলি—ঘরের বাঁকটা ঘুরিয়া একটু আগাইলেই টিউব ওয়েল। টিউব ওয়েলে শূন্যোদর কলসী পূর্ণ করিবার শব্দ হইল, এবং আলোটা নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

ঘরের কোণে আসিয়া বৌমা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "সাপ, সাপ ওরে বাবা রে, সাপে কেটেছে"। হাতের লণ্ঠনটি ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া নিবিয়া গেল।

কনষ্টেবল দুইটি সেই অন্ধকারে টর্চ্চের আলো ফেলিতে ফেলিতে ছুটিয়া গেল আর্ত্ত নারীকণ্ঠকে অনুসরণ করিয়া। সত্য নিঃশব্দে শচীনবাবুর হাত টানিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। বাম দিকে ঘুরিয়া একটা পুকুরের পাড়ে আসিয়া শচীনবাবু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন আর রাস্তা নাই।

সত্য পুকুরের পাড়ে একটি ঘরের পিছনে গিয়া সঙ্কেত-সূচক শব্দ করিল, সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলিয়া গেল। সত্য শচীনবাবুকে লইয়া সে বাড়ীর উঠান পার হইল।

আর একটা গলির মোড়ে আসিয়া সত্য বলিল, এই পথে যান—দত্তদের দোকানের পিছন দিয়ে সদর রাস্তায় পড়বেন। সত্য চলিয়া গেল। শচীনবাবু হাতড়াইতে হাতড়াইতে সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। রাস্তার মোড়ে জনতা—তাহারা বলিতেছে, ডাক্তারের বাড়ী সার্চ্চ হচ্ছে—তার বেটার বৌকে সাপে কামড়েছে তবুও নিস্তার নেই।

(ক্রমশঃ)

আন্দামান

অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আন্দামান অরণ্য-পরিপূর্ণ কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টি। আমাদের কল্পনায় আন্দামান ঊষর, পর্ব্বতসঙ্কুল, অস্বাস্থ্যকর, ম্যালেরিয়া-পূর্ণ, অবাঞ্ছিতদের নির্ব্বাসনের উপযোগী এক ভয়াবহ স্থান। আমাদের অনেকেরই ধারণা এখানকার অরণ্যে বাস করে কতকগুলি আদিমজাতীয় মানুষ। অষ্ট্রেলিয়ার মত এখানেও সভ্য মানুষ প্রথম বাস করার জন্য কয়েদীদের পাঠিয়েছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আন্দামান ভারতের কয়েদী-উপনিবেশে পরিণত হয়। তারপর নির্ব্বাসিত কয়েদীদের পরিশ্রমে সেখানে পোর্ট ব্লেয়ার শহরটি গড়ে উঠেছে। শহরটি বাস্তবিকই মনোরম। ছোট ছোট পাহাড় আর সমুদ্র তার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করেছে। সেখানকার রাস্তাঘাট চমৎকার, আশেপাশে গ্রাম পর্য্যন্ত বাস যাওয়া-আসা করে। দোকান, বাজার, ডাক্তারখানা, ভাল হাসপাতাল, বৈদ্যুতিক আলো, টেলিফোন সবকিছুই আছে। সম্প্রতি সেখানে কয়েদী পাঠানো বন্ধ হয়ে গেছে। পোর্ট ব্লেয়ারকে কেন্দ্র করে চার পাশে গ্রামের সংখ্যা বাড়ছে—স্বাধীন মানুষের একটা নূতন উপনিবেশ সেখানে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। একদা অবজ্ঞাত কয়েদী উপনিবেশ অষ্ট্রেলিয়া আজ যেমন সকলের কাছে আকর্ষণীয় হয়েছে, তেমনি ওখানেও যে অদূর

ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যকর, সমৃদ্ধিশালী একটি ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠবে আর তা সকলের কাছে আকর্ষণযোগ্য হবে, আমরা আন্দামানে গিয়ে তার লক্ষণ দেখে এসেছি। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, প্রতিবেশী-বিতাড়িত, খণ্ডিতদেশ, ভাগ্যবিড়ম্বিত বাঙালীর কি আন্দামানে স্থান হবে ?

আন্দামানের জেলখানা

আমাদের সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা এখানে বর্ণনা করব।

২৬শে সেপ্টেম্বর, সকাল সাতটা। সামনের ছোট্ট রসদ্বীপে যাওয়ার জন্য পোর্ট ব্লেয়ারে সমুদ্রতীরে আমরা মোটর-লঞ্চের প্রতীক্ষা করছি, সঙ্গে দুই বন্ধু—সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক শ্রীসুনীলাভ গুহ। চোখের সামনে ছোট ছোট পাহাড় আর সমুদ্রের বিরাট দৃশ্য। এ জায়গাটাতে সমুদ্র স্থির নিস্তরঙ্গ।

আন্দামানে মৎস্যের প্রাচুর্য্য আছে। আন্দামানের মাটি বাংলাদেশের মাটির চেয়ে বেশী উর্বর—অনেক জমিতেই দু'বার ফসল জন্মানো যেতে পারে। এমন কি, সেখানে আম গাছে পর্য্যন্ত বছরে দু'বার বউল ধরে, কিন্তু ভাল আমের চাষ এ পর্য্যন্ত সেখানে হয়েছে বলে শোনা যায় না। যদি তরি-তরকারি আর ধানের চাষ বাড়ানো যায়, তা হলে মাছের মত ধান-চাল, তরকারিও সেখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে। উর্ব্বর জমি সেখানে আছে, কিন্তু যথেষ্ট চাষী নেই।

পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারা শ্রীনিবারণচন্দ্র দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্যে অন্যান্য বাস্তুহারাদের সঙ্গে ওখানে গিয়েছেন। মৎলুটনে তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। মুরগী-পালন ওখানে প্রচুর লাভজনক বলে তিনি অনেকগুলি মুরগী পুষেছেন। তিনি বললেন, তাঁর মুরগীর ডিমগুলো আকারে হাঁসের ডিমের মত বড় বড় হয়।

বৃষ্টি মাথায় করে আমরা জাহাজ থেকে আন্দামানে নেমেছিলাম বৃষ্টিপাত সেখানে প্রচুর পরিমাণে হয়। পশ্চিম বাংলার গড় বৃষ্টিপাত বৎসরে ৬০ ইঞ্চি, পোর্ট ব্লেয়ারে গড়ে বৎসরে ১৪০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। বৎসরে আট-ন' মাস ওখানে বৃষ্টি হয়, তবে সে বৃষ্টি অবিরাম নয়। ডিসেম্বর থেকে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত সেখানে বিশেষ বারিপাত হয় না।

বৃষ্টির প্রাচুর্য্যের দরুন চাষের জমিতে জলসেচের ভাবনা চাষীদের নেই। ধানের চাষ সেখানে ভাল হয়। ভুট্টা, আখ, সুপারি, পেঁপে, কলা প্রভৃতি ভালই ফলে। নারিকেল-গাছও সেখানে প্রচুর জন্মে। বাঁশ-বেতের জঙ্গলও বিশেষ ভাবে নজরে পড়ে। চা, কফিও উৎপন্ন হয়, রবার গাছও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কৃষিতত্ত্ববিদ্‌দের দিয়ে ওদেশের অকর্ষিত মাটি পরীক্ষা করিয়ে দেখা দরকার কি কি ফসল প্রচুর পরিমাণে ওখানে জন্মানো যেতে পারে। আন্দামান যখন জাপানীদের দখলে ছিল তখন জাপানীরা তাদের খাদ্যশস্য যতটা সম্ভব ওখানেই জন্মাবার জন্য চেষ্টা করেছিল। পোর্ট ব্লেয়ারের পাহাড়ের ঢালুতে পর্য্যন্ত তারা চাষ করেছিল। তারা প্রচুর পরিমাণে রাঙা আলুর চাষ করেছিল।

দশ-পনের বিঘা থেকে দু-তিন শ' বিঘা পর্য্যন্ত চাষের উপযোগী সমতল জমি পাহাড়ের সর্ব্বত্র পতিত অবস্থায় আছে। খুব উঁচু পাহাড় আন্দামানে নেই—ওখানকার উচ্চতম পাহাড় আড়াই হাজার ফুট উঁচু হবে। পোর্ট ব্লেয়ারের কাছাকাছি সর্ব্বোচ্চ পাহাড়টির নাম মাউণ্ট-হ্যারিয়েট উচ্চতা ১১৯৩ ফুট। পূর্ব্ব-উপকূলের দিকে পাহাড়গুলি অপেক্ষাকৃত উঁচু।

আমরা পাহাড়ে বহু রবার গাছ দেখেছি। জলের ধারে অজস্র সুন্দরী গাছ চোখে পড়ে। জঙ্গলে প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট কাঠ পাওয়া যায়। ওখান থেকে মূল্যবান কাঠ ইউরোপ, আমেরিকায় চালান যেত। রঙ গুলবার জন্য গর্জ্জন কাঠের তেল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

ওখানকার দ্বীপগুলির তটরেখা আঁকাবাঁকা, ভগ্ন। বহু নিরাপদ পোতাশ্রয় ওখানে গড়ে উঠতে পারে। স্থানীয় কাঠে নৌকা তৈরি ও জাহাজ মেরামতির কাজ বেশ ভাল ভাবেই চলবে। তা ছাড়া ওখানকার কাঠ দিয়ে উৎকৃষ্ট আসবাব-পত্র তৈরি হতে পারে। ভাল ছুতার ওদেশে নেই। সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন ওখানে নারিকেল-তেল তৈরির একটি কারখানা স্থাপন করা—ঐ কারখানায় নারকেলের ছোবড়া থেকে বিবিধ পণ্য-দ্রব্যও তৈরি করা যেতে পারে। কোনো বিত্তশালী বাঙালী কি এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে পারেন না ?

বর্ত্তমানে বাঙালীর সেখানে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা লাভের সম্ভাবনা আছে। নিকোবর বাদে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে মোটামুটি আড়াই হাজার বর্গমাইল স্থান আছে। এর মধ্যে ৫৭৫ বর্গমাইল একটা দ্বীপ, দক্ষিণ আন্দামানের ৩২৫ বর্গ-

মাইল অঞ্চলে জনবসতি আছে। আন্দামানের মোট জনসংখ্যা (রেশন কার্ড অনুযায়ী) ষোল হাজার—হিন্দু প্রায় সাত হাজার, মুসলমান চার হাজার, খ্রীষ্টান তিন হাজার, আর ইন্দোনেশীয় ও ব্রহ্মদেশীয়ের সংখ্যা হবে হাজার দুই। হিংস্র

জেলখানার কেন্দ্রস্থলে তিন তলার উপরে রক্ষীরা দিনরাত সতর্কভাবে পাহারা দিত

প্রকৃতিবিশিষ্ট আদিম অধিবাসী জারোয়াদের দেখা পাওয়া সহজ নয়, তাদের সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করাও কঠিন। তারা গভীর অরণ্যে সভ্য মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে বাস করে। দ্বীপগুলির অধিকাংশ স্থানই অরণ্যসমাকীর্ণ। ওদেশে প্রচলিত সাধারণ ভাষা হিন্দী। পোর্ট ব্লেয়ারে উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীরা সকলেই বাঙালী। বহু বাঙালী সেখানে আছেন, আর বাংলা কথা অনেকেই বোঝেন। ওখানকার বাঙালীরা নবাগত বাঙালীকে সাধ্যমত সাহায্য করার চেষ্টা করেন। বর্ত্তমান সময়ে বাঙালীরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সামান্য একটু উদ্যমশীল হলে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জকে সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর নিজস্ব উপনিবেশ রূপে গড়ে তুলতে পারেন। আন্দামান তা হলে অদূর ভবিষ্যতে বৃহত্তর বাংলাদেশের একটা অংশে পরিণত হতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একজন বাঙালী চীফ কমিশনার এখন আন্দামানের শাসনকর্ত্তা।

বাংলা-সরকার পোর্ট ব্লেয়ারের গ্রামাঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করার জন্য দু'বারে ১৯৯টি বাঙালী পরিবার পাঠিয়েছিলেন। তার মধ্যে ৯টি পরিবার দেশে ফিরে এসে বহু অভিযোগ জানিয়েছেন। ১৯৯টি পরিবারের মধ্যে ৯টি পরিবারের ফিরে আসা অসম্ভব কিছু নয়। আরও কিছু কিছু লোক হয়তো সেখান থেকে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী যাঁরা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ওদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করছেন তাঁদেরও যদি একে একে ফিরে আসতে হয়, তা হলে সেটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হবে।

চট্টগ্রামের শ্রীপুলিনচন্দ্র মাহিন্দ্র দাস আমাদের পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাঁর জমির ধানগাছ আমাদের দেখাতে নিয়ে গেলেন। তাঁর জমিতে ধানগাছ খুব ভাল হয়েছে। তিনি বললেন, এবার তিনি মূলা আর লঙ্কার চাষ করবেন। তাঁর সঙ্গে ২০ বৎসর বয়সের একজন যুবক আছে। তাঁরা কয়েক মাস ধরে মাসিক ৬০৲ টাকা হিসাবে সাময়িক সরকারী সাহায্য পাচ্ছেন। তিনি জানালেন, তাঁর জমিতে জল দাঁড়ায় না, যদি কিছু এমন জমি পান যেখানে জল পাওয়া যায় তো ভাল হয়।

পূর্ব্ব বাংলার যে সকল চাষী নূতন দেশে নূতন পরিবেশে এসে পরিশ্রম করে জমি চাষ করেছেন, তাঁদের অনেকেই নিজেদের কাজের নিদর্শন দেখাবার জন্য আগ্রহভরে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সকলেরই মোটামুটি ধারণা ওখানকার জমি উর্ব্বর, স্বাস্থ্য ভাল। দেখলাম তাঁরা অনেকেই যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছেন এবং এমনি ভাবে যে পরিশ্রম করে চলবেনও তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বাবলম্বী হতে না পারার আগেই পাছে সরকারের সাহায্য আকস্মিক ভাবে বন্ধ হয়ে যায় এই ভেবে তাঁরা কতকটা দুশ্চিন্তা ভোগ করছেন।

আন্দামানের সাধারণ দৃশ্য
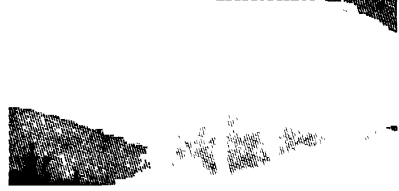
যে সকল মহিষ দিয়ে এখানকার জমি চাষ করা হয় সে-গুলি এক অদ্ভুত ধরণের জীব—বাছুরের মত উঁচু, অধিকাংশই বুড়ো। এরা এক ঘণ্টাও লাঙল টানতে পারে না। যে ঠিকাদার প্রত্যেকটি ৮০০৲ টাকা দামে এগুলি যোগান দিয়েছেন, আর যে সরকারী কর্ম্মচারী তাদের পরীক্ষা করে গ্রহণ করেছেন, সরকারের উচিত তাদের উভয়েরই উপযুক্ত জবাবদিহি করানো। প্রত্যেকটি পরিবার মহিষ পায় নি। অবশ্য সকলের জন্যই পরে মহিষ ভাড়া পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু এসব অব্যবস্থা গোড়ার দিকে ঔপনিবেশিকদের মনোবল হ্রাস করে।

সরকারী ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি চোখে পড়ল। ঔপনিবেশিকেরা অনেকে টিন পেয়েছেন, কিন্তু ঘর তৈরি

করার ব্যবস্থা না হওয়ায়, তাঁরা নিজেদের জমিতে নিজ নিজ ঘরে বাস করার সুযোগ এখনও পান নি। তাঁরা বিভিন্ন অঞ্চলে এক জায়গায় অনেকে মিলে আছেন।
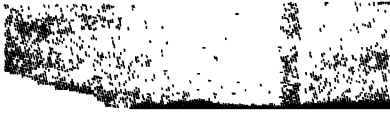
ভগ্ন তটরেখা আর নারিকেলগাছের সারি

চট্টগ্রামের স্বাবলম্বী, উৎসাহী এবং উদ্যোগী দু'জন বাঙালী তরুণের (শ্রীপরিমল দাস আর শ্রীসুবলচন্দ্র চৌধুরী) সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল ওখানকার বাজারে। সরকারী সাহায্যে অন্য বাস্তুহারাদের সঙ্গে তাঁরাও পোর্ট ব্লেয়ারে গিয়েছিলেন, কিন্তু নিজেদের উদ্যমে এবং চেষ্টায় দুই বন্ধু ওখানকার বাজারেই বৈদ্যুতিক আলোসহ একখানা ছোট ঘর মাসিক ১২৲ টাকায় ভাড়া নিয়ে কাপড় এবং মনিহারীর দোকান করেছেন। ছোট দোকানটি কয়েক মাস ধরে মন্দ চলছে না। পরিমলবাবু এতেই তৃপ্ত না থেকে দৈনিক ৩০৲ টাকায় একটা বাস ভাড়া নিয়েছেন। বাসটি পোর্ট ব্লেয়ার শহর থেকে দুপুরের পর কল্যাণপুর যায় এবং পরদিন সকালে আবার ফিরে আসে। ড্রাইভারের বেতন, পেট্রল, আর অন্য সব খরচই বাস-মালিকের। পরিমলবাবু কনডাক্টর হয়ে ঐ বাসে থাকেন। রাত্রিটা তিনি কল্যাণপুরেই কাটিয়ে দেন। তিন দিনের টিকিট বিক্রয়ের কথা শুনলাম—একদিন ৪০৲, এক-দিন ৫৭৲ আর একদিন ৪৬৲ টাকা হয়েছে।

নড়াইল পার্ব্বতী-বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীবিনয়ভূষণ চক্রবর্তীর কথাও উল্লেখযোগ্য। ভদ্রলোক এক হাঁটু কাদা মেখে ক্ষেত থেকে উঠে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। প্রত্যেকটি কেন্দ্রে বিনয়বাবুর মত একজন করে কর্ম্মী সর্ব্বদা উপস্থিত থাকলে কেউ আর হতাশ ও নিরুদ্যম হবে না। বিনয়বাবুর স্ত্রী হাসতে হাসতে বলেছিলেন, জলের কোনরকম ব্যবস্থা না হলে আমাদেরও হয়ত চলে যেতে হবে।

চাষের জন্য ওদেশে বৃষ্টির জলের অভাব নেই, কিন্তু স্থানে স্থানে গৃহস্থের জলের অভাব আছে। ওদেশে নদী নেই, নিত্য ব্যবহারোপযোগী ঝরণাও বিশেষ নেই। বর্ষার জল কোথাও কোথাও পাহাড়ে জমে থাকে, নানা ধারায় প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রেও চলে যায়। স্থানে স্থানে বসতির সন্নিকটে জল নেই। দূর থেকে জল বয়ে আনা কষ্টকর। সরকারী ভাবে কিছু অর্থ ব্যয় করে সর্ব্বত্র জলের ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। নলকূপ করে হোক, কূপ খনন করে বা পুষ্করিণী কাটিয়েই হোক অথবা পাইপ দিয়ে পাহাড় থেকে জল নামিয়ে এনেই হোক, যেখানে যেখানে নিকটে জল নেই সেই সেই স্থানে আশু জলের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। পোর্ট ব্লেয়ারে কলের জল আছে, উঁচুতে অবস্থিত অঞ্চল-গুলিতে মিউনিসিপালিটির গাড়ি গিয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে জল দিয়ে আসে। যে দেশে বৃষ্টিপাত বেশী, সরকারের চেষ্টা থাকলে সে দেশে অতি সহজেই জল সঞ্চয় করে রাখার কোন-না-কোন ব্যবস্থা হতে পারে। ওখানকার অনেক পরি-বার ঘরের চাল বেয়ে যে বর্ষার জল পড়ে, পাত্রে ধরে তা সঞ্চয় করে রাখেন।

পোর্ট ব্লেয়ারের প্রায় সকল শ্রেণীর লোকই আমাদের কাছে ওখানকার হাসপাতালের বিশেষ সুখ্যাতি করে-ছেন, কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। নূতন বসতিগুলির নিকটেই চিকিৎসকের প্রয়োজন। শিশু ও বালক-বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করাও অত্যাবশ্যক। ওখানে উচ্চশিক্ষার কোন ব্যবস্থা এখন নেই, কলেজ নেই। কিন্তু কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। প্রতি বৎসর ওখানকার কিছু কিছু ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়। শহরে শ্রীদুর্গাদাস সাইগল নামে জনৈক ভদ্রলোকের একটা সিনেমা হাউস আছে। সরকার থেকে প্রতিদিন ছোট্ট এক পাতা করে "প্রেস টেলিগ্রামস" ছাপান হয়। এই হচ্ছে ওখানকার সংবাদপত্র। এর চাঁদার হার মাসে বার আনা, বার্ষিক একসঙ্গে সাড়ে সাত টাকা। সমুদ্রের ধারে ধারে প্রচুর প্রবাল, শঙ্খ, ঝিনুক পাওয়া যায়। সমুদ্রতীর থেকে ওদেশে এক রকমের পাখীর বাসা সংগ্রহ করা হয়। এগুলি খুব চড়া দামে বিক্রয় হয়। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে বেতারে সংবাদ পাঠানোর ব্যয় তার-বার্ত্তা প্রেরণের খরচের সমান। মাসে একবার পনর-বিশ দিন অন্তর ওখানে জাহাজে চিঠিপত্র যায়। এটা বড় অসুবিধাজনক। বিমান অবতরণ-ক্ষেত্রের সংস্কারসাধন ক'রে সিঙ্গাপুরগামী কোন কোন বিমানে ডাক পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়ত খুব কঠিন নয়। দক্ষিণ-ভারত থেকেও এখন ওদেশে শ্রমিক আমদানী করা হয় দেখলাম। আন্দামান যাবার পথে জাহাজে রাঁচি অঞ্চলের বহু শ্রমিককে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম—ওরা যাচ্ছিল ওখানে কায়িক পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করতে।

ম্যালেরিয়ার কোন চিহ্ন আমরা পোর্ট ব্লেয়ারে প্রত্যক্ষ করি নি বটে, কিন্তু হাসপাতালে অনুসন্ধান করে জানলাম, ওখানেও ম্যালেরিয়া হয়, বনাঞ্চলে ম্যালেরিয়া আছে। তবে আমাদের দেশের চেয়ে ওখানে মোটের উপর অসুখ-বিসুখ কম।

গরমদেশ হলেও সমুদ্রের হাওয়ার দরুন কোন সময়েই গ্রীষ্মাধিক্য অনুভূত হয় না, আর আমাদের দেশে যখন শীতকাল তখনও ওখানে খুব বেশী ঠাণ্ডা পড়ে না, গরম কাপড়-চোপড়ের বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

গ্রীষ্মমণ্ডলে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে ২১৯ মাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত ছোট ছোট শ-দুয়েক আর প্রধান পাঁচটি দ্বীপ নিয়ে এই আন্দামান। পোর্ট ব্লেয়ার বন্দর কলিকাতা থেকে জলপথে ৭৮০ মাইল। মাদ্রাজ থেকে পোর্ট ব্লেয়ার ৭৪০ মাইল, আর রেঙ্গুন থেকে এর দূরত্ব ৩৬০ মাইল।

আন্দামান বেড়িয়ে আসবার মত জায়গা। ওখানে চীফ কমিশনারকে চিঠি লিখে অথবা টেলিগ্রাম করে পূর্ব্বেই যাওয়ার অনুমতি নিতে হয় আর জাহাজ ছাড়বার অন্ততঃ ৭নর দিন আগে কর্পোরেশন থেকে কলেরা-বসন্তের টিকা নিয়ে ছাপানো ফর্মে তার একটি সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে হয়। এস্. এস্. মহারাজা নামে একটা মাত্র জাহাজ আন্দামানে যাতায়াত করে। জাহাজ যাওয়া-আসার তারিখ এবং অন্যান্য সংবাদ পাওয়া যাবে 'টার্ণার মরিশস কোম্পানী'তে—টিকিটও ঐ কোম্পানীতে পাওয়া যায়। আন্দামান পর্য্যন্ত ডেকের ভাড়া কুড়ি টাকা, তৃতীয় শ্রেণীর ত্রিশ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর পঁয়ষট্টি টাকা আর প্রথম শ্রেণীর একশ ত্রিশ টাকার মত। এখন সরকারী কর্ম্মচারী ছাড়া সাধারণ যাত্রীদের নিকট জাহাজের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট বিক্রয় করা হয় না। এরকম নিয়ম উঠে যাওয়া দরকার।

আন্দামানে একটা সরকারী "গেষ্ট হাউস" আছে। সেখানে খাওয়া-থাকার দৈনিক ব্যয় দশ টাকা। সাধারণ বাঙালীর পক্ষে এই ব্যয় অত্যধিক। আন্দামানে বাঙালী ভ্রমণকারীরা গিয়ে যাতে অল্প ব্যয়ে সাময়িক বাসস্থান পায়,অনতিবিলম্বে সে রকম ব্যবস্থা করার জন্য কর্তৃপক্ষের মনোযোগী হওয়া দরকার।

পোর্টব্লেয়ারের বাঙালী অধিবাসীরা বিশেষ অতিথিবৎসল। তাদের সৌজন্যই যে শুধু মুগ্ধ করে তা নয়, তাদের দ্বারা অনেক উপকারও পাওয়া যায়।

তবু থাক

শ্রীকরুণাময় বসু

একটি মেয়ের মুখ আজো মনে পড়ে,
শ্যামল কিশোরী মেয়ে কচি কচি ম্লান মুখে কাঁচা সোনা ঝরে;
বাতাসের ঢেউ লেগে এলোমেলো চুলগুলি ওড়ে,
একটি মেয়ের ছবি আজো মনে পড়ে।
আকাশের রং ছিল সেদিন সুনীল,
সবুজ বনের সাথে মোর মনে ছিল কোথা মিল!
জলের কাঁপন লেগে আলোছায়া করে ঝিলমিল,
আকাশের রং ছিল নবঘন নীল।
লাল মেঘ ছুঁয়েছিল লতার কুসুম,
হাওয়ায় সুবাস আসে চোখে মুখে আবছায়া ঘুম;
পথেতে ছড়ানো ছিল ফুলরেণু, রাঙা কুঙ্কুম,
লাল মেঘ ছুঁয়েছিল লতার কুসুম।
বলেছিলে কতো কী যে, ভুলে গেছি সব,
এইটুকু মনে আছে ধ্রুবতারা চেয়েছিল একাকী নীরব;
জলভারে কেঁপেছিল আঁখিপল্লব,
বলেছিলে কতো কথা, ভুলে গেছি সব।

মেঘলা দিনের শেষে একদিন ফুটেছিল জলে-ভেজা যুঁই,
বলেছিনু কানে কানে, আমরা ঝড়ের পাখী,
এই ছাদ মনে হয় বিদেশ বিভুঁই;—
এসো হেথা নীড় বাঁধি, মনে মনে ভালোবেসে হাতে হাত ছুঁই;
কতদূর পার হয়ে এনু মোরা ঝড়ের চড়ই।
ছেঁড়া মেঘে লাল আলো, মরি মরি কেমনে রাঙালো—
কুঁড়িজাগা করুণ চাঁপায়,
পাগল বাতাস বুঝি এলোমেলো
কচিপাতা দু'হাতে কাঁপায়;
গোধূলির লালমেঘ জেগেছিল রঙীন আভায়
কুঁড়িজাগা করুণ চাঁপায়।
তারপর পথে যেতে বলেছিলে, তবে আমি যাই,
তবে যাই, সুরে সুরে বেজেছিল শরতের করুণ সানাই;
শিশিরে চাঁদের আলো ছলছল ম্লান হ'ল, তুমি কাছে নাই,
বলেছিলে, আমি তবে ভোরের চাঁদের মত ধীরে ধীরে—
দিগন্তে মিলাই।
বলেছিনু, তবে যাও—তবু এই শরতের তারাভরা রাতে
একটি কুসুমকলি ভালোবেসে দিয়ে যেও হাতে;
তারপর চলে যেও স্মরণের সরুগলি পথে
ভালোলাগা এ জীবন পার হয়ে বহুদূর ভুলের জগতে!
তুমি তো রবে না জানি, এ জীবন মনে হবে ফাঁকা,
প্রেমের সমাধি-বেদী তবু থাক ফুলে ফুলে ঢাকা।

বিদ্যাপতির কবিতার বিভিন্ন স্তর

শ্রীসতীশচন্দ্র বক্‌সী

যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া বিরাট পদাবলী সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং যাহার অজস্র ধারা বাঙালীর 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়া' তুলিয়াছিল—তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাই যে, এই সব পদকর্ত্তার পুরোভাগে দাঁড়াইয়া আছেন মিথিলার কবি বিদ্যাপতি। চৈতন্য-পরবর্ত্তী পদাবলী সাহিত্য এমন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যাহাতে কবির ব্যক্তিগত প্রতিভা গোষ্ঠীগত কবি-প্রতিভার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বহু সমালোচক এই সব পদের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই সব পদ এক একটি কবিগোষ্ঠীর রচনা। নামের ভনিতা এই সব কবিতায় যেন উপলক্ষ্য মাত্র। কাহার রচনায় যে কাহার ভনিতা প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করা সব সময় সহজসাধ্য নয়। মনে হয়, নামের ভনিতা দিবার একটা প্রথা ছিল তাই যেন ভনিতা দেওয়া হইয়াছে। বহু অপ্রসিদ্ধ বা স্বল্পখ্যাত কবি তাঁহাদের রচিত পদাবলী শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তাদের নামে চালাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য কি আত্মবিলোপ? এই আত্মবিলোপ কি ছিল তাঁহাদের সাধনার অঙ্গীভূত? যদি ধরিয়া লই যে ঐ সকল পদের ভাষা তাঁহাদেরই তথাপি একথা সত্য যে, ভাব তাঁহাদের মোটেই নিজস্ব নয়—ভাব ঐ কবিগোষ্ঠীরই ভাবধারা হইতে ধার করা। জনকয়েক শ্রেষ্ঠ কবি ছাড়া সাধারণ কবিদের রচিত পদাবলীতে এমন কোন ভাবের সন্ধান পাওয়া যায় না, যাহার মধ্যে ভাবের স্বকীয়তা আছে। কবির ব্যক্তিসত্তা সেখানে শ্রেষ্ঠতর এক বিরাট ভাবসত্তার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় তৎকালীন বৈষ্ণব পদাবলীর সমালোচনা অনেকটা ব্যক্তিনিরপেক্ষ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তথাপি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তাদের রচনার মধ্যে যুগলক্ষণের অতিরিক্ত বিশিষ্ট কবি-প্রতিভার নিদর্শন খুঁজিয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। চৈতন্য-পরবর্ত্তী কবিগণকে অনেকেই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনাই অধিকাংশ কবির আদর্শ ছিল। পাছে রসাভাস ঘটে, পাছে* সুরসঙ্গতি নষ্ট হয় অথবা আচার্য্যগণের অনুশাসন লঙ্ঘিত হয়, এই আশঙ্কায় যেন একটা বিরাট মহা-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে দুই একজন মূল গায়েনের সঙ্গে সকল কবিই সুর মিলাইয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতির আবির্ভাব যখন হইয়াছিল তখন কবিগোষ্ঠীর কোন প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না—কেননা বিদ্যাপতির আবির্ভাব চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে হইয়াছিল।* সুতরাং বিদ্যাপতির রচনা কোন রসিকগোষ্ঠী দ্বারা প্রভাবিত নহে এবং তিনি চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব হইতে মুক্ত। বিশেষতঃ বিদ্যাপতি বাঙালী নহেন—বাংলা ভাষায় কোন পদ তিনি রচনা করেন নাই। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন করিয়া চলিত (মৈথিলী?) ভাষায় পদরচয়িতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম পথিকৃৎ। এই হিসাবে বিদ্যাপতি এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁহার অসাধারণ কবি-প্রতিভার বিষয় বাদ দিলেও প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিবে। বিদ্যাপতির আবির্ভাব হইয়াছিল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। আধুনিক কালে কোন কোন বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রাহক রায়শেখরের কতকগুলি পদ বিদ্যাপতির নামে চালাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তাঁহারা চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের অত্যন্ত স্থূল লক্ষণগুলিও বিস্মৃত হইয়াছেন। চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বিদ্যাপতির রচনায় ভক্তসুলভ আত্মনিবেদনের ভাব হয়তো মিলিতে পারে, কিন্তু চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের পদকর্ত্তাদের রচনায় সখিভাব ও দাস্যভাবের যেরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে বিদ্যাপতির রচনায় কোথাও সেরূপ দেখিতে পাই না। কেহ কেহ মনে করেন, শেখর ভনিতাযুক্ত

> মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
> এই ভাবে করে যেই মোর শুদ্ধ রতি॥
> আপনারে বড় মানে আমারে সম হীন।
> সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

---

* চৈতন্যদেব সাধনায় মধুর ভাবের প্রবর্ত্তন করেন। মধুর ভাবের সহিত ঐশ্বর্য্য ভাব যুক্ত হইলে রসাভাস ঘটে। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

> ঐশ্বর্য্য ভাবেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
> ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত॥

* চৈতন্যচরিতামৃতে আছে, মহাপ্রভু বিদ্যাপতির পদ-গানে আনন্দ পাইতেন,

> চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
> কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
> স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
> গায় শুনে মনের আনন্দ॥

অন্যত্র,

> বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
> এই তিন মিলে করায় প্রভুর আনন্দ॥

'কাজর রুচিহর রয়নী বিশালা" নামক পদটি বিদ্যাপতির। কিন্তু উক্ত পদের শেষের চরণ দুইটি এইরূপ,—

"ষতনহি নিঃবরু নগর দুরন্তা।
শেখর আভরণ তেল বহন্তা॥"

এখানে এমন ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যেন কবি অভিসারিকা রাধার সহচরী হইয়া তাঁহার পরিত্যক্ত আভরণগুলি বহন করিয়া লইয়া সঙ্গে যাইতেছেন। ইহার মধ্যে যে একটা সেবাপরায়ণতার ভাব পরিস্ফুট তাহা চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী রচনায় কোথাও দেখা যায় না। বিশেষতঃ এই পদটি রায়শেখরের দণ্ডাত্মিকা পদাবলীর অন্তর্গত। কিন্তু মিথিলার কোন পুঁথিতে দণ্ডাত্মিকা পদ পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহাকে বিদ্যাপতির পদ বলা হয় কেমন করিয়া?

যাহা হউক, মোটের উপর এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, মধ্যযুগে বাংলায় যে বিরাট পদাবলী সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার তোরণদ্বারে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই যুগ্ম নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। বিদ্যাপতি যদিও পদকর্ত্তাদের মধ্যে প্রাচীনতম ও মিথিলার অধিবাসী তথাপি বাঙালী যুগে যুগে তাঁহার কাব্য হইতে চিরন্তন বিরহ-মিলনের রস সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়াছে আর চণ্ডীদাসের ভাবধারা মিশিয়া আছে বাঙালীর অশ্রুধারার সহিত।

বিদ্যাপতির কবিতায় বাৎসল্য বা বাল্যলীলার কোন পদ নাই—তিনি প্রধানতঃ মধুর রসের কবি। বিদ্যাপতির রাধা নবীনা কিশোরী। বয়ঃসন্ধির পটভূমিকায় তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি শৈশব ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে অর্দ্ধস্ফুট কলিকা। প্রথম যৌবনের মোহন স্পর্শে তাঁহার দেহতট বিচিত্র অনুভূতির জোয়ারে নিয়ত স্পন্দিত। চণ্ডীদাসের রাধা প্রথম হইতেই একটি স্বতন্ত্র ভাবময়ী রসমূর্ত্তি—তাঁহার কোন ক্রমবিকাশ নাই, অপর দিকে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া বিদ্যাপতির রাধিকার সুপ্ত যৌবনচেতনা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে,—

জব গোধূলি সময় বেলি, ধনি মন্দির বাহির ভেলি,
জনু নবজলধরে বিজুরি রেহা,
দ্বন্দ্ব পাসরি গেলি,
ধনি অলপ বয়সী বালা, জনু গাথনি পুহপমালা
থোড়ি দরশনে আশ না মিটল,
বাঢ়ল মদন জ্বালা।

ইহার পর কবি আমাদিগকে এমন স্তরে লইয়া গেলেন যাহা রাধিকার বয়ঃসন্ধিকাল। রাধিকা এখন শৈশব ও যৌবনের সন্ধিস্থলে উপনীত—কবি এই স্তরের নানা ভঙ্গির চিত্র আঁকিয়াছেন—এই চিত্রগুলি বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্তা রাধিকার দেহ-মনের নিখুঁত প্রতিরূপ।

কেলিক রভস জব মুনে আনে।
আনতহি হেরি ততহি দেই কানে॥
ইথে যদি কেও করএ পরচারী।
কাঁদন মাখি হাসি দএ গারি॥

বয়ঃসন্ধির বর্ণনা কাব্যের দিক দিয়া যেমন অনবদ্য, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়াও তেমনি সত্য।

ইহার পর অভিসারের স্তর। বিদ্যাপতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অভিসারের প্রকরণগুলি সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাবে ও ভাষায় তাঁহার এই স্তরের কবিতাগুলি অতুলনীয়। তিনি অভিসারের বিভিন্ন বিচিত্র রূপের বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। দুর্য্যোগময়ী ঘনান্ধকার রজনীতে শ্রীমতী নীলবসন পরিধান করেন, আবার জ্যোৎস্না-বিধৌত শুক্লা রজনীতে তিনি অঙ্গে শ্বেতচন্দন অনুলেপন করিয়া শ্বেতবসন পরিধান করেন।

অভিসারের বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যের বহু স্থানেই আছে। কিন্তু বিদ্যাপতি শ্রীমতীকে পুরুষবেশে পর্য্যন্ত অভিসারে বাহির করিয়াছেন। অভিসারিকার এই চরম দুঃসাহসিকতার নিদর্শন আর কুত্রাপি পাই নাই। বিদ্যাপতি যত প্রকার অভিসারের বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে বর্ষাভিসারই শ্রেষ্ঠ,—

রয়নি কাজর সম, ভীম ভুজঙ্গম,
কুলিস পড়এ দুরবার।
গরজ তরজ মন রোষে বরিখ ঘন
সংশয় পর অভিসার॥

এই অভিসারের পদগুলিতে প্রণয়ীর সহিত মিলনোৎকণ্ঠাকে অনুপ্রাস ও শব্দালঙ্কারের সাহায্যে এবং ছন্দের ইন্দ্রজালে বিচিত্রমধুর রূপ দেওয়া হইয়াছে।

ইহার পরবর্ত্তী স্তর হইতেছে মাথুর বা বিরহ। বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভার নিদর্শন এই স্তরের কবিতাগুলিতেই পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি এখানে প্রচলিত কবিরীতি অনুসরণ করেন নাই। অভিসারের স্তর পর্য্যন্ত আমরা বিদ্যাপতির কবিতায় দৈহিক মিলন-কামনাই লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্তু এই মাথুর স্তরে আসিয়া কবির দেহকামনামূলক কবিতার রূপান্তর দেখিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া যাই। এই স্তরে যে অশ্রুধারার ভিতর দিয়া রাধিকার দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ হইল সেখানে চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির গভীর ভাবসাদৃশ্য দেখিতে পাই। এইখানে বিদ্যাপতির রাধা দেহধারিণী হইয়াও দেহাতীত—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অধিবাসিনী হওয়া সত্ত্বেও অতীন্দ্রিয় লোকে উত্তীর্ণ, চণ্ডীদাসের রাধারই ন্যায় একটি ভাবময়ী রসমূর্ত্তিতে পরিণত। সেই লাস্যময়ী প্রগল্‌ভা নায়িকা যোগিনীতে পরিণত হইয়াছেন, তাই—

পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেল।

শ্রীমতী আরও বলিতেছেন,

হাম সায়রে তেজব পরাণ।
আন জনমে হোয়ব কান।
কান হোয়ব জব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা।

এই বিষাদের সুরেরই প্রতিধ্বনি পাইতেছি চণ্ডীদাসের পদে,

(আমি) মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন,
তোমারে করিব রাধা।

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে, এই "বিরহ মর্ম্মান্তিক হইলেও তাহা বিশ্বাস-মধুর ও মৃত্যু-বিভীষিকা হরণ করে।"

বিশ্বপ্রকৃতি আপন সৌন্দর্য্যভাণ্ডার হইতে অমূল্য বৈভব দিয়া তিল তিল করিয়া রাধাকে নিরুপমা করিয়া তুলিয়াছিল—কিন্তু আজ প্রণয়াস্পদ কাছে নাই, রূপ যৌবনে তাঁহার আর কি প্রয়োজন? তাই শ্রীমতী আবার বিশ্বপ্রকৃতিকে তাহার দান ফিরাইয়া দিতে চাহিতেছেন। আবার বর্ষা তাহার 'মেঘময় বেণী' খুলিল, আবার ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্য আরম্ভ হইল—কিন্তু তাঁহার বয়ঃসন্ধিকালে তাহারা আসিয়াছিল মিলনাকাঙ্ক্ষার পুলকানুভূতি জাগাইয়া, এবার আসিল বিরহ বেদনাকে দ্বিগুণীকৃত করিয়া।

হে সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।

এ গানে শুধু একটি বিরহিণী নারীর চিত্রই ফুটিয়া উঠে নাই, শ্রীমতীর বিরহ-বেদনাকে আশ্রয় করিয়া যেন জগতের সকল বিরহিনীর বেদনা বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এক চিরন্তন বিরহ-সঙ্গীতে।

এই দুঃসহ বিরহবেদনা ক্রমেই শ্রীমতীর সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। শয়নে স্বপনে সর্ব্বাবস্থায় কৃষ্ণই তাঁহার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। এই নিদারুণ বিরহ শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আত্মবিস্মৃত করিয়াছে, বাস্তব ও কল্পনার পার্থক্য তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন—কল্পনায় তিনি কৃষ্ণের সহিত মিলনানন্দ উপভোগ করিতেছেন,—

অনুখন মাধব, মাধব সোঙরিতে,
সুন্দরী ভেলি কানাই।

এখানে আমরা একটি অতীন্দ্রিয় মিলনের দিব্যানন্দ লাভের ব্যঞ্জনা স্পন্দিত হইতে দেখিতেছি। এই যে নিত্য বৃন্দাবনের স্বপ্ন—যে হৃদয়-বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ণ আর হারাইয়া যান না—ইহা যেন আত্মদর্শনেরই নামান্তর। শ্রীমতী বলিতেছেন,—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চির দিন মাধব মন্দিরে মোর॥

কাল্পনিক এই মিলনানন্দে শ্রীমতীর নিকট যেন জীবন-যৌবন সবকিছুই সার্থক বোধ হইতেছে। কৃষ্ণবিরহে প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্য তাঁহার নিকট ম্লান মনে হইত, আজ আবার মানস-মিলনের আনন্দানুভূতিতে সেই প্রকৃতিই তাঁহার চোখে অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছে, তাই,—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু।
পেখনু পিয় মুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশ দিশ ভেল নিরদ্বন্দা॥

প্রিয়তমের সহিত মিলনানন্দের কি অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি শ্রীমতীর মুখনিঃসৃত নিম্নোক্ত কথাগুলিতে,—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু।
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু।
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

গ্রিয়ারসন্ সাহেব বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "First yearning of the soul after God"। বাস্তবিকই এই সমস্ত পদে দৈহিক কামনা ঊর্দ্ধমুখী হইয়া ভাগবতী কামনায় রূপান্তরিত হইয়াছে। পরমাত্মার জন্য মানবাত্মার যে চিরন্তন বেদনা সেই বেদনার রসে এই কবিতাগুলি অভিসিঞ্চিত।

বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সেন

স্বদেশী যুগের প্রথম দিকে এমন একটা সময় ছিল যখন পুলিনবিহারী দাসের নাম স্বদেশী মনোভাবাপন্ন প্রত্যেক যুবকের মুখে মুখে ফিরিত। 'যুগান্তরে'র পুলিন দাসের নাম বিপ্লবী মনোবৃত্তিসম্পন্ন যুবকসম্প্রদায়ের মনে একটা সম্ভ্রম এবং গৌরবের ভাব জাগাইত। 'যুগান্তর' খ্যাতিলাভ করিয়াছিল নির্ভীক বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচারের জন্য, আর পুলিন দাস বিখ্যাত হইয়াছিলেন স্বকীয় সংগঠন-প্রতিভার জন্য। দেশের যুবশক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুশিক্ষিত একটি বিরাট বৈপ্লবিক সংস্থায় সংবদ্ধ করিয়া তিনি যে সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার তুলনা সচরাচর মিলে না। তিনি একক এক হাজার লোকের উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে আটকাইয়া রাখিতে পারেন এবং তাঁহার হাতের লাঠি যখন বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে থাকে তখন বন্দুকের গুলিও উহাতে প্রতিহত হইয়া ঠিকরাইয়া পড়ে, তাঁহার দেহ স্পর্শও করিতে পারে না, ইত্যাদি নানা রকম জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। নিরক্ষর এবং ধর্ম্মান্ধ মুসলমান জনতাকে বিভ্রান্ত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়া ব্রিটিশরাজ যে কূটনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা প্রধানতঃ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর কার্য্যকারিতার জন্যই অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছিল। তাঁহার স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী হিন্দুদের বহুস্থানে রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু কোন অবস্থায়ই প্রতিশোধমূলক পন্থা হিসাবে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেদের বাড়ীঘর জ্বালাইয়া অথবা লুঠপাট করিয়া নিজেদের শক্তির অপব্যবহার করে নাই।

ইংরেজ সরকার যে পুলিন দাসের উপর প্রসন্ন ছিলেন না, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু তাঁহার সকল কাজ এত সুপরিকল্পিত ছিল ও তাঁহার কর্ম্মীরা এত সুশিক্ষিত, সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুসংহত ছিলেন যে, তাঁহাকে কোনপ্রকার মামলায় জড়াইবার প্রয়াস পুনঃপুনঃ ব্যর্থ হইয়াছে। একবার ঢাকায় তাঁহাকে কোন এক মামলায় জড়িত করিবার চেষ্টা হয়। বেণ্টিঙ্ক সাহেব তখন ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট,—মামলাটি ইঁহার হাতে ছিল। ইনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান এবং বিবেকবান বলিয়া ইঁহার খ্যাতি ছিল। উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতিরেকে পুলিনবাবুদের দায়রায় সোপর্দ্দ করিতে ইনি অস্বীকার করেন। সরকারের মান আর থাকে না দেখিয়া বেসরকারী ইংরেজ—শাসন ব্যাপারে সেকালে ইঁহাদের প্রভাব নিতান্ত উপেক্ষণীয় ছিল না—এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার প্রভৃতি সকলে মিলিয়া বেণ্টিঙ্ককে ধরিয়া বসিলেন যেমন করিয়াই হোক, ইঁহাদের সেসনে দিতেই হইবে। শেষ পর্য্যন্ত এই সর্ত্তে রফা হইল, বেণ্টিঙ্ক সাহেব ইঁহাদের দায়রা সোপর্দ্দ করিয়া সরকারের মুখরক্ষা করিবেন, কিন্তু দায়রা জজকে ইঁহাদের ছাড়িয়া দিতে হইবে। যথাকালে দায়রা আদালত হইতে ইঁহারা মুক্তিলাভ করিলেন।

পুলিন দাসের সমিতি কিরূপে ভাঙিয়া দেওয়া যায় এবং তাঁহাকে হাতের মুঠার মধ্যে পাওয়া যায় তাহা সর্ব্বদাই তদানীন্তন বাংলা-সরকারের একটা বড় ভাবনার বিষয় ছিল। ১৯০৮ সনে আলিপুর বোমার মামলায় যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইল তাহাতে দেশে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের একটা সুসংবদ্ধ প্রয়াস চলিতেছে ইহা কার্য্যতঃ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারের উপরোক্ত সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করার বহুবাঞ্ছিত সুযোগ মিলিল। কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া যাবতীয় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে বে-আইনী ঘোষণা করিলেন এবং ভারত-সচিব কয়েকজন বহুমানাস্পদ নেতাকে নির্ব্বাসিত করিলেন। কেবল বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় দিনকয়েক পূর্ব্বে বিলাত যাত্রা করায় অল্পের জন্য এই নির্ব্বাসন-দণ্ড হইতে বাঁচিয়া গেলেন।

প্রকাশ্য কার্য্যকলাপ বন্ধ হইয়া গেলে মূল কর্ম্মীরা ভিতরে ভিতরে অধিকতর সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। এদিকে পুলিনবাবুকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য সরকার সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। বরিশালের কোন এক ডেপুটিনন্দনকে উপলক্ষ্য করিয়া যে ষড়যন্ত্রের মামলা দাঁড় করানো হইল, বহু চেষ্টা করিয়াও পুলিনবাবুকে সেই মামলায় জড়ানো সম্ভব হইল না। শেষ পর্য্যন্ত ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলায় তাঁহাকে সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরে পাঠাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে করিলেন।

* * *

১৯১১ সনের পরে (ঠিক কোন্ সনে এখন মনে পড়িতেছে না) যখন বর্ত্তমান লেখক অন্যান্যদের সঙ্গে পোর্ট ব্লেয়ার 'সেলুলার' জেলে আবদ্ধ ছিলেন তখন হঠাৎ একদিন জানা গেল মহারাজা জাহাজে নূতন কয়েকজন 'বোমগোলেওয়ালা' আসিয়াছেন। কয়জন আসিয়াছেন, কোথা হইতে আসিয়াছেন, কোন্ মামলা, বন্দীদের পরিচয় কি, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে উঁহারা কি বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়া থাকিতে পারেন, ইত্যাদি নানা জল্পনা-কল্পনায় বন্দীশালার একঘেয়ে জীবন বৈচিত্র্যময় হইয়া উঠিল। যখন জানা গেল নবাগত বন্দীদের মধ্যে একজন ঢাকার পুলিন দাস তখন আমাদের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং কৈশোরের

বহু বৈপ্লবিক কল্পনা এবং ভাবধারণার সহিত জড়িত এই স্বনামখ্যাত কর্মীর সহিত অচিরেই সাক্ষাতের সম্ভাবনায় আমাদের তরুণ মন বিচিত্র ভাবে [illegible] হইয়া উঠিল। সেই সময়ে 'বোমগোলেওয়ালা'দের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভাগ করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং মাঝে মাঝে উঁহাদের এক ওয়ার্ড হইতে অন্ত ওয়ার্ডে বদলি করা হইত। ইহাতে পরস্পরের সহিত পরস্পরের পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিত। পুলিন দাসের সঙ্গে পরিচিত হইবার সেই সুযোগ কবে আসিবে; তাহার জন্ত অধীর আগ্রহে আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

অবশেষে সেই বহুপ্রতীক্ষিত দিনটি আসিল। যতদূর মনে পড়ে, আমি সেই সময়ে এক নম্বর ওয়ার্ডের নিচের তলার একটি কুঠুরিতে আছি। পুলিনবাবু সেই ওয়ার্ডে বদলি হইয়া আসিলেন। ইহার পূর্ব্বেই নানা উপলক্ষ্যে তাঁহাকে চাক্ষুষ দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল, এবার তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য ঘটিল। দেখিলাম এক সৌম্যমূর্ত্তি আত্মস্থ পুরুষকে, যাহার মধ্যে পরুষ ভাব নাই, যিনি কারা-জীবনকে নিতান্ত সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, কোনরূপ চঞ্চলতা এবং বিক্ষোভ যাঁহার মধ্যে নাই এবং রূঢ় না হইয়াও যিনি সঙ্কল্পে বজ্রের মত কঠোর। কিছুকাল সান্নিধ্য লাভের পর বুঝিলাম মাতৃভূমিকে শৌর্য্যে, বীর্য্যে, সমৃদ্ধিতে মহিমান্বিত করিয়া তোলাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত; তজ্জন্য তিনি সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন এবং সর্ব্বস্ব হারাইয়াও তাঁহার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নাই; তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচন রূপ মহান্ লক্ষ্যে নিবদ্ধ এবং ক্ষুদ্রতর কোনকিছুই তাঁহাকে সেই লক্ষ্য হইতে বিভ্রান্ত করিতে অক্ষম। চিন্তাধারা এবং আদর্শের মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও এই আদর্শ কর্মীর প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক নত হইয়া আসিল।

* * *

তখনকার দিনে ঢাকায় একজন সন্ন্যাসী ছিলেন; তাঁহার সুঠাম শরীর এবং জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল হইতে তাঁহার বয়স কত হইয়াছিল অনুমান করা সহজ ছিল না। অতিবৃদ্ধেরাও বলিতেন, উঁহাকে বরাবর ঐ একই রকম দেখিয়া আসিয়াছেন। বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইনি ঈষৎ হাস্য করিতেন মাত্র, কিছুই উত্তর করিতেন না। খুব ফিটফাট হইয়া থাকিতেন বলিয়া ইনি বাবু সন্ন্যাসী নামে পরিচিত ছিলেন। যে রাস্তায় এঁর আশ্রম ছিল, ঐ রাস্তা 'স্বামীবাগ' নামে পরিচিত। পুলিনবাবু ইঁহারই নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সন্ন্যাসীর উপর তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ছিল এবং সকল প্রকার সমস্যায় ইঁহার উপর তিনি বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন বলিয়া মনে হয়। এঁর বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতাও সকল সময়েই পুলিনবাবু ও তাঁহার দলের লোকেদের কাজে লাগিত। একবার তরয়ারি খেলিতে গিয়া একজনের দেহে গভীর ক্ষত হয়। নির্দেশে বেগুনপাতা ছেঁচিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া দুঁদিনেই ক্ষত সারিয়া উঠিল। লাঠিখেলায় দেহে ক্ষত হইলে বেগুনপাতা ব্যবহার করিয়া সর্ব্বদাই সুফল পাইয়াছি। পুলিনবাবুর ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে গিয়া একবার জেলে একটা মজার কাণ্ড ঘটিয়াছিল। অনন্তানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের আমাশয় হইয়াছিল, পুলিনবাবু ইঁহাকে শুকনো লঙ্কা খাইবার ব্যবস্থা দেন। ব্রহ্মচারী মহারাজ পশ্চিমবঙ্গবাসী, বাঙালদেশের মত লঙ্কা খাইতে অভ্যস্ত নহেন, পুলিনবাবুর ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে গিয়া মারা যান আর কি!

পুলিনবাবু সকাল বেলা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সূর্য্যপ্রণাম করিতেন। কিছুক্ষণ সূর্য্যের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া জপ করিতেন। কাজের সময় একমনে কাজ করিয়া যাইতেন, কর্তৃপক্ষকে খুশী করিবার কোন প্রয়াসও পাইতেন না, আবার নিজের কাজেও কোনরূপ ফাঁকি দিতেন না। অবসর সময়টুকু সদালোচনায় বা বই পড়িয়া কাটাইতেন। তাঁহার নিকট কালিপ্রসন্ন সিংহের একখানা মহাভারত ছিল, ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বই তাঁহার কাছে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এই বইখানি তিনি সর্ব্বদা খুব নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেন। দেশের হৃত স্বাধীনতা বাহুবলে পুনরুদ্ধার করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার স্বপ্ন, অন্ত কোন উপায়ের কথা তিনি ভাবিতেও পারিতেন না। অস্ত্রবল ব্যতীত অন্ত কোন শক্তির নিকট ইংরেজ নতি স্বীকার করিবে, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। আত্মরক্ষার ও আক্রমণের বিবিধ কৌশল, শস্ত্রবিদ্যা, রণনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের দেশের বহুযুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্ত তাঁহার একটা অদম্য পিপাসা ছিল। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এবিষয়ে কি আলোক পাওয়া যাইতে পারে তাহা জানিবার জন্ত তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া পাশ্চাত্যের যাহা কিছু ভাল তাহা গ্রহণ করিতেও তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। পাশ্চাত্য সামরিক শৃঙ্খলার পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার অন্ধ অনুকরণ করেন নাই; উহাকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। বিপ্লবী সংস্থার গঠনপ্রণালী সম্পর্কে তাঁহার মনে একটি সুস্পষ্ট ছক ছিল। রুশীয় ইস্তাহার "(Russian Pamphlet)" নামে পরিচিত ইস্তাহারে বিপ্লবী সংস্থার যে ছক দেওয়া হইয়াছিল তাহার সহিত পুলিনবাবুর ছকের খুঁটিনাটি বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও কার্য্য-বিভাগ ও বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমগ্র সংস্থার তত্ত্বাবধান সম্পর্কিত তাঁহার ব্যবস্থা ছিল উহারই ন্যায় বিজ্ঞানসম্মত, সুপরিকল্পিত এবং যত্নসম্পূর্ণ। তাঁহার পরিকল্পনায় কোথাও অস্পষ্টতা ছিল না। উদ্দেশ্য এবং কার্য্যপন্থা সম্পর্কিত আলোচনায় তাঁহাকে কখনও গোঁজামিল দিতে দেখি নাই; ইহা [illegible] বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

নূতন নূতন বিষয় শিখিবার আগ্রহ এবং উৎসাহ পুলিনবাবুর চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। আত্মরক্ষা এবং আক্রমণের প্রকৃষ্ট কোন কৌশল বা অভিনব কোন প্রণালীর সন্ধান পাইলে তাহা শিক্ষার জন্ত যে-কোন প্রকার কষ্ট স্বীকারেই তিনি পরাঙ্মুখ হইতেন না। বর্তমান শতকের প্রথম দিকে শ্রীরামপুরে একজন ভুরষ্কদেশীয় ভদ্রলোক বাস করিতেন, ইনি "প্রফেসার মূর্তাজা" নামে নিজের পরিচয় দিতেন। তরবারি চালনায় ইঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। ইহা ছাড়া আত্মরক্ষার কতকগুলি বিশেষ কৌশল ইনি শিক্ষা দিতেন। ছোট লাঠি, একটি রুমাল, বস্ত্রখণ্ড, এমন কি শুধু হাতে বহু আততায়ীর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার কৌশল এই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন বিশেষ বিদ্যা যাঁহাদের আয়ত্ত, তাঁহারা সবটুকু সহজে অপরকে দিতে চাহেন না। পুলিনবাবু প্রোফেসার মূর্তাজার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সহিত ভাব করিয়া বহু আয়াসে তাঁহার নিকট হইতে কিরূপে এই সকল কৌশল আয়ত্ত করেন, মাঝে মাঝে তাহা বর্ণনা করিতেন। তাঁহার যাবতীয় অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অধিকতর সুষ্ঠ যে সকল প্রণালী তিনি প্রবর্তন করিয়াছেন, তাঁহার শিষ্যেরা যোগ্য উত্তরাধিকারীর মত সযত্নে এই সকল প্রণালী সংরক্ষণ করিলে এবং উহাদের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিলে উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা দেওয়া হইবে।

পুলিনবাবুর মতামতসমূহ দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ এবং সুস্পষ্ট ছিল। সংস্কারমুক্ত মন লইয়া সকল প্রকার বাস্তব সমস্তার সম্মুখীন হইয়া তিনি যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন তাহা সহজভাবে এবং সরল ভাষায় ব্যক্ত করিতেন বলিয়া তাঁহার বক্তব্য বুঝিতে কোন অসুবিধা হইত না। সে যুগে আমাদের ধারণা ছিল যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের সকলপ্রকার দুঃখবিপদ বরণ করিয়া লইবার যোগ্যতালাভের জন্ত চিরকৌমার্য্য অত্যাবশ্যক। পুলিনবাবুর মত "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" কর্ম্মীদের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা উপলব্ধি করি দেশের মুক্তিসংগ্রামে ব্রতী হইবার পথে বিবাহিত জীবন প্রতিবন্ধকস্বরূপ নয়। একদিন কথাপ্রসঙ্গে পুলিনবাবু বলিলেন, "আপনারা বিয়ে করবেন। আমাদের দেশে স্ত্রীকে শক্তি রূপে কেন ব্রিয়ে না করলে বুঝতে পারবেন না। তা ছাড়া বিয়ে করলে গণ্ডী প্রসারিত হয়।" সামান্ত কয়টি কথায় ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া গেল। মহৎ আদর্শের জন্ত দুঃখবরণ করিতে মেয়েদের কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। পিতা, মাতা, স্বামী অথবা সন্তানের আদর্শকে জয়যুক্ত করিবার জন্ত যে-কোন ত্যাগ স্বীকার তাঁহারা সহজভাবেই করিতে পারেন।

তামাকপাতা ব্যবহারের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়া একবার স্থির করিলাম 'সুখা' (বা 'খইনি') খাইবার অভ্যাস করিব। প্রথম চেষ্টায় প্রতিক্রিয়ায় যখন বমনোদ্রেক হইল তখন উহার কারণ জানিয়া পুলিনবাবু বলিলেন—একাজ কখনও করবেন না। গুরুগোবিন্দ শিখমণ্ডলীতে তামাক সেবন নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। নেশাখোরদের উপর দায়িত্বপূর্ণ কোন কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আর একজনকে নেশা করতে দেখলেই তারা কাজ ভুলে নেশা করতে বসে যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুলিনবাবুর স্বপ্ন ছিল নিজ বাহুবলে প্রতিপক্ষকে সম্মুখ-সংগ্রামে পরাভূত করিয়া মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচন করিবেন। কংগ্রেসের কর্ম্মপন্থা তাঁহার নিতান্তই নিরামিষ মনে হইত। কংগ্রেসের পন্থায় যে তাঁহার আস্থা নাই, একথা তিনি খোলাখুলি বলিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। কিন্তু তাই বলিয়া কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার বা কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করিবার চেষ্টায় কখনও নিজের শক্তি তিনি ক্ষয় করেন নাই। যে স্বজাতিদ্রোহ এবং ঈর্ষা ও যে ক্ষমতালোলুপতা যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের অধঃপতনের কারণ হইয়াছে এবং যাহা এখনও আমাদের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় তাহার প্রভাব হইতে তিনি মুক্ত ছিলেন। কারান্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া যখন দেখিলেন অবস্থার পরিবর্তনে তাঁহার সাবেক কর্ম্মপন্থার উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাব তখন তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে তাঁহার নিজ আদর্শ অনুযায়ী 'মানুষ' তৈরির কাজে লাগিয়া গেলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই সাধনারই রত ছিলেন। বাংলার যুবকেরা তাঁহার আদর্শের অনুসরণে সর্ব্বপ্রকার আত্মধ্বংসী মনোবৃত্তি হইতে মুক্ত হইয়া দেশ এবং সমাজের মঙ্গল-কামনাকেই একমাত্র লক্ষ্য করুন, তাহা হইলেই তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনা জয়যুক্ত হইবে।

জার্মান রাসায়নিক শিল্পোন্নতির মূল সূত্রের সন্ধান

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

আধুনিক সভ্যতা প্রকৃত প্রস্তাবে রাসায়নিক শিল্পের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। কারণ বসন-ভূষণ, কাগজ-কালি-কলম, ঔষধ-পথ্য, যান-বাহন প্রভৃতি প্রত্যেকটি জিনিষই রাসায়নিক শিল্পের দান। এমন কি টেলিফোন, টেলিভিসন, রেডিও, রাডার, মায় আণবিক বোমার উপাদানও রাসায়নিক শিল্প থেকেই উৎপন্ন হয়।

যাঁরা কলেজে পড়েছেন তাঁদের মনে রসায়ন-শাস্ত্র কথাটির সঙ্গে পচা ডিমের গন্ধযুক্ত একটি অপ্রীতিকর পরিবেশের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। অনেকেই জানেন রসায়নশাস্ত্র পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর পরিচয় বহন করে। এই শাস্ত্রের কল্যাণে মানুষ জানতে পেরেছে যে, পৃথিবীতে জীব উদ্ভিদ ও মৃৎ-প্রস্তরাদি যা-কিছু আছে সেগুলি মূলতঃ ৯২টি মৌলিক পদার্থের সমাবেশে গঠিত। ভাষার অসংখ্য শব্দ যেমন বর্ণমালার কয়েকটি মাত্র অক্ষরের বিভিন্ন প্রকার সমাবেশে গঠিত, এও যেন সেইরূপ। এই শাস্ত্রই হীরক ও কয়লাকে একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ বলে সপ্রমাণ করেছে। একদিকে এই শাস্ত্র যেমন পৃথিবীর বায়ু, জল, মৃত্তিকা, প্রস্তর, জীব ও উদ্ভিদ দেহের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে, তেমনই এই শাস্ত্র বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থের সমাবেশে নূতন নূতন পদার্থ প্রস্তুতির কৌশলও শিক্ষা দিয়েছে। একটি উদাহরণ দিলেই এটা পরিষ্কার বুঝা যাবে। বাংলাদেশের এক প্রকার উদ্ভিদ থেকে নীল তৈরির কথা অনেকেই শুনেছেন। গত শতাব্দীর শেষ দশকেও ভারতবর্ষ থেকে পাঁচ কোটি টাকার উপর খাঁটি নীল ইউরোপে চালান যেত, কিন্তু জার্মান রাসানিকগণ উদ্ভিজ্জাত নীল বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ আবিষ্কার করার পর আলকাতরার ভিতরকার কতকগুলি পদার্থ থেকে রাসায়নিক উপায়ে অবিকল উদ্ভিজ্জ নীলের ন্যায় রঞ্জন-পদার্থ প্রস্তুত করে ফেললেন। শীঘ্রই জার্মানীর রাইন নদীর তীরে লুডভিগ্‌সহাফেনের বাডিশে আনিলিন উণ্ড সোডা ফাব্রিক নামক কারখানায় প্রথিতযশা রাসায়নিক হাইনরিখ কারোর তত্ত্বাবধানে এই নীল প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত হতে আরম্ভ হ'ল। ফলে বাংলা ও বিহারের নীলের চাষ ধীরে ধীরে উঠে গেল। এ ছাড়া রাসায়নিক উপায়ে এমন সব পদার্থও প্রস্তুত হয় যেগুলির অস্তিত্ব ইতি-পূর্ব্বে পৃথিবীতে কোথাও ছিল না। ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের হাতে যে বেলুন দেখা যায়, সেগুলি প্রস্তুত হয় এইরূপ একটি পদার্থ থেকে। কৃত্রিম রেশম ও নাইলোনের বস্ত্রাদি, প্লাসটিকের চিরুনী, ঘড়ির ফিতা, বেল্ট প্রভৃতি এবং বেকে-লাইটের পেয়ালা, শিশির ছিপি ও আসবাবপত্রাদি এখন আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ। কৃত্রিম রেশম, নাইলোন প্রভৃতি প্লাসটিক প্রকৃতপক্ষে রসায়ন-শাস্ত্রেরই দান। সকলেই এখন এসব দেখছেন বলে এগুলির নাম উল্লেখ করা হ'ল। বস্তুতঃ কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, চর্ম্মরোগ প্রভৃতির অসংখ্য আধুনিক ঔষধ, কৃত্রিম রং, কৃত্রিম সুগন্ধি ও বিস্ফোরক পদার্থ এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই সব পদার্থ ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর জীবও উদ্ভিদ-জগতে কিংবা মৃত্তিকা বা প্রস্তরে কুত্রাপি দেখা যায় নি। এগুলি সম্পূর্ণরূপে রাসায়নিকগণেরই সৃষ্টি।

আমরা দেখলাম যে, রাসায়নিক শিল্প রসায়ন-শাস্ত্রের জ্ঞানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ থেকেই জার্মানীতে এমন কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মনীষী জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা রাসায়ন-শাস্ত্রকে অল্পদিনের মধ্যেই সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করতে সমর্থ হন এবং তাঁদের আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ অবলম্বনে জার্মান জাতি রাসায়নিক শিল্পসৃষ্টিতে তৎপর হয়ে ওঠে। এই সব জার্মান মনীষীর নাম মানবজাতি চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে।

সুবিখ্যাত ফ্যারাডে, ডেভি প্রভৃতি [illegible] গবেষণার ফলে ইংলণ্ডে কষ্টিক সোডা, সোডা, ক্লোরিন, ব্লিচিং পাউডার এবং সালফিউরিক প্রভৃতি এসিড ও তৎসম্ভূত লবণ-পদার্থ প্রভৃতি অজৈব রাসায়নিক শিল্প যথেষ্ট প্রসার-লাভ করলেও জৈব রসায়নশাস্ত্রের উপর যার ভিত্তি এবং পাথুরে কয়লা যার জননীস্বরূপ—সেই জৈব রসায়ন-শিল্পের বিকাশ গোড়ার দিকে ইংলণ্ডে আদৌ হয় নি। এই শাস্ত্র এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত শিল্প সম্পূর্ণরূপে জার্মানদেরই সৃষ্টি। আর প্রথম মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত এই শিল্পে জার্মানদেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল। জার্মান রাসায়নিক শিল্পের সূতিকাগৃহ ছিল জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক্‌পাল গবেষকগণের গবেষণাগার। এই সব মনীষীর দান মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। এঁদের কয়েকজনের বিচিত্র জীবন-কাহিনী এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে।

লিবিগ (১৮০৩-১৮৭৩)

১৮০৩ সালের ১২ই মে তারিখে জার্মানীর ডারম্‌ষ্টাট শহরে লিবিগের জন্ম হয়। এঁর পিতা ছিলেন কৃষক-পরিবারের সন্তান। কিন্তু তিনি একটি ছোট ল্যাবরেটরি খুলে রং, বারনিশ প্রভৃতি তৈরি করে ব্যবসা চালাতেন। লিবিগ ছেলেবেলা থেকেই এই ল্যাবরেটরির কাজ পর্য্যবেক্ষণ করতেন এবং সুযোগ পেলেই নিজেও নানাপ্রকার পরীক্ষা করতেন। ১৮২০ সালে তিনি 'বন' বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিষ্ট্রি পড়তে সুরু

করেন। অঙ্কশাস্ত্র এবং লাটিন, গ্রীক, ফরাসী, ইংরেজী ও ইটালীয় ভাষাতেও তাঁর বেশ দখল ছিল। কিছুদিন এরলাঙেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও প্যারিসে সুবিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক গেলুসাকের নিকট শিক্ষালাভ করে মাত্র ২১ বৎসর বয়সে তিনি গিসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫২ সাল থেকে মৃত্যুকাল অবধি মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র জৈব পদার্থের বিশ্লেষণ যে পদ্ধতিতে করা হয় লিবিগই তাহা আবিষ্কার করেন। লিবিগের নাম তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু বিখ্যাত রাসায়নিক ভোয়েলারের নামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এঁর সহযোগিতায় লিবিগ বেনজয়িক কম্পাউণ্ডগুলির স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। যথাযথ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রসায়নশাস্ত্রের শিক্ষাদানের প্রবর্ত্তনও করেন লিবিগ এবং এর ফলেই জার্ম্মানীতে দলে দলে নিপুণ রাসায়নিকের সৃষ্টি হয় আর এঁরা জার্ম্মান রঞ্জন-শিল্পের উৎকর্ষ-সাধনে আত্মনিয়োগ করাতে অল্পদিনের মধ্যেই ঐ শিল্প দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। জৈব রসায়নশাস্ত্রে বহু মূল্যবান গবেষণা করা ছাড়া জীবন-রসায়ন এবং কৃষি-রসায়নের ভিত্তিও লিবিগই স্থাপন করে যান। লিবিগের প্রতিষ্ঠিত 'আনালেন' নামক সুবিখ্যাত রসায়নশাস্ত্র বিষয়ক পত্রিকা এখনও রসায়ন-শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা।

নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার সঙ্গে একাগ্র সাধনা, তেজস্বিতা, বাগ্মিতা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবল অনুপ্রেরণা জাগাবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ। লিবিগের অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে হফমান এবং কেকুলের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

হফম্যান (১৮১৮-১৮৯২)

১৮১৮ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে ফ্রাঙ্কফুর্ট অঞ্চলের গিসেন শহরে হফম্যান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন স্থপতি এবং আদর্শ চরিত্রের লোক ছিলেন। হফম্যান শৈশবেই পিতার বিভিন্ন সদ্‌গুণের অধিকারী হন। ১৮৩৬ সালে হফম্যান গিসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ক্লাসে ভর্ত্তি হন। কিন্তু গণিত এবং বিজ্ঞানের ক্লাসেও তিনি যোগ দিতেন। ঐ সময় লিবিগ ছিলেন গিসেনের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক। যুবক হফম্যান লিবিগের অধ্যাপনায় মুগ্ধ হয়ে রসায়ন-শাস্ত্রের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। সৌভাগ্যক্রমে আলকাতরা থেকে প্রাপ্ত ক্ষারধর্মী এনিলিন নামক পদার্থ তাঁর প্রথম গবেষণার বিষয় ছিল। নানারূপ পরিবর্ত্তন-প্রবণ এই পদার্থ তাঁর মত প্রতিভাবান রাসায়নিকের হাতে পড়ে রঞ্জন-শিল্পের প্রধান উৎপাদক বলে প্রমাণিত হ'ল। ইতি-পূর্ব্বে, ১৮২৬ সালে অটো উনভেরডোরবেন নামক বার্লিনের একজন রাসায়নিক নীল 'ডিসটিল' (পরিস্রুত) করে তেলের মত একটি পদার্থ পান এবং নীল থেকে উৎপন্ন বলে এর নাম দেন 'আ-নিলিন'। হফম্যান আলকাতরাজাত বেনজিন থেকে রাসায়নিক উপায়ে নাইট্রোবেনজিন ও তা থেকে এনিলিন আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষ্কৃত এই দ্রব্য যে নীল থেকে প্রাপ্ত পদার্থ থেকে অভিন্ন তাও তিনি সপ্রমাণ করেন। এই এনিলিন যে নীল প্রভৃতি বিবিধ কৃত্রিম রঞ্জন-পদার্থের প্রধান উপাদান তাই নয়, বহু তেজস্কর আধুনিক ঔষধেরও ইহা মূল উৎপাদক।

১৮৪৫ সালে লণ্ডনে "রয়্যাল কলেজ অব কেমিষ্ট্রি" স্থাপিত হলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স আলবার্টের অনুরোধে হফম্যান ঐ কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণে স্বীকৃত হন। তাঁর অধ্যাপনা ও অনুপ্রেরণায় ইংলণ্ডে জৈব রসায়নশাস্ত্রের ও তৎসম্ভূত শিল্পের অপরিসীম উন্নতি হয়। হফম্যানের ইংরেজ ছাত্র পার্কিন মেজেণ্টা আবিষ্কার করে বিপুল অর্থ ও যশের অধিকারী হন। হফম্যান লণ্ডনে নিরলসভাবে গবেষণা ও অধ্যাপনায় অতিবাহিত করেন।

তাঁর ব্যক্তিত্ব, বক্তৃতাশক্তি এবং অসাধারণ প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে বহু মেধাবী ছাত্র তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হফম্যানের যে সব ছাত্র পরবর্ত্তীকালে যশস্বী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে পার্কিন, আবেল, নিকেলসন, ম্যানসফিল্ড, স্যার উইলিয়ম ক্রুকস, পিটার গ্রিস, জর্জ্জ মার্ক, মারটিয়স, ফলহার্ড প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জার্ম্মানীর এত বড় একজন কৃতী সন্তান ইংলণ্ডে অধ্যাপনায় রত থাকবেন এটা তদানীন্তন চিন্তাশীল জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকগণের পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন হয়ে পড়ল। লিবিগ প্রভৃতি মনীষী সম্মিলিতভাবে হফম্যানকে দেশে ফিরে আসবার জন্য আহ্বান জানালেন। হফম্যানের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিরাট গবেষণাগার বার্লিনে প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং তিনি ১৮৬৫ সালের মে মাসে জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে ঐ ল্যাবরেটরিতে গবেষণা আরম্ভ করলেন। হফম্যানের প্রত্যাবর্ত্তনের অল্পদিন পরেই ১৮৬৭ সালে জার্ম্মান কেমিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয় এবং তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্টের পদে বৃত হন।

হফম্যান জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে বিজ্ঞানের সাধনা করে ১৮৯২ সালের ৫ই মে তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন। জীবনে তিনি বহু দেশ থেকে প্রচুর সম্মানলাভ করেন। তাঁর সপ্ততিবর্ষ পূর্ত্তির সময় জার্ম্মান কেমিক্যাল সোসাইটি বিপুল সমারোহের সহিত তাঁর জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। ঐ সময় "হফমান ফাউণ্ডেশন" স্থাপিত হয় এবং তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসী তাঁকে তাঁর আবক্ষ প্রস্তরমূর্ত্তি উপহার দেন।

কেকুলে (১৮২৯-১৮৯৬)

১৮২৯ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ডামেষ্টাট শহরে অগষ্ট কেকুলে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি একজন সামরিক কর্ম্মচারীর

পরে। গিসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কেকুলে স্থাপত্য-বিদ্যা শিখতে যান, কিন্তু লিবিগের অধ্যাপনায় মুগ্ধ হয়ে তিনি কেমিষ্ট্রি পড়তে আরম্ভ করেন। সমস্ত মনপ্রাণ তিনি ঐ শাস্ত্রের চর্চায় ঢেলে দেন। কেকুলে নিজেই বলে গেছেন—এই সময় অধিকাংশ দিনই তিনি তিন-চার ঘণ্টার বেশী ঘুমাতেন না। এক রাত্রি জেগে পাঠাভ্যাস করাকে তিনি কর্ত্তব্যের মধ্যেই আনতেন না। পর পর দুই তিন রাত্রি জেগে পাঠে অতিবাহিত করলে তিনি অনেকটা স্বস্তি বোধ করতেন। ১৮৫২ সালে তিনি ডক্টরেট উপাধিলাভ করেন। অতঃপর প্যারিসে কিছুদিন তদানীন্তন বিখ্যাত রাসায়নিকগণের সঙ্গে কাটিয়ে কেকুলে হাইডেলবার্গে আসেন ও পরে ঘেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। এখানেই তিনি তাঁর বিখ্যাত জৈব রসায়নের বই লেখেন এবং ১৮৬৫ সালে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'বেনজিন থিওরি' আবিষ্কার করেন। জৈব রসায়নশাস্ত্র এবং তৎসঙ্গে রাসায়নিক শিল্প এই সময়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদিন রাসায়নিকগণ প্রায় অন্ধকারে হাতড়ে এটা ওটা আবিষ্কার করছিলেন, কিন্তু এখন থেকে প্রায় সমুদয় জৈব পদার্থের ভিতর-মহলের খবর রাসায়নিকগণের নিকট প্রকট হয়ে পড়ায় নূতন নূতন গবেষণা ও অভিনব রঞ্জন-পদার্থের আবিষ্কার সহজসাধ্য হয়ে উঠল। এই শাস্ত্র আলোচনাকারীরা কেকুলের উক্ত আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। হফম্যানের মত মনীষীও বলেছেন—"Alle meine Entdeckungen gabe ich hin gegen den einen Gedanken Kekule's"—অর্থাৎ, "আমার জীবনব্যাপী সাধনার ফল কেকুলের এই একটিমাত্র থিওরির বিনিময়ে আমি ছেড়ে দিতে রাজী আছি।" এই কথার উপরে এ সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কেকুলের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। তাঁর কাছে প্রেরণা পেয়ে যাঁরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে বেয়ার, লাডেনবুর্গ, ডেওয়ার, আনশুট্জ, থর্প এবং ভাণ্ট-হফের নাম রসায়নশাস্ত্রে অনুরাগীদের কাছে সুবিদিত।

আডলফ ফন বেয়ার (১৮৩৫-১৯১৭)

কেকুলের অন্যতম যশস্বী ছাত্র আডলফ বেয়ার ১৮৩৫ সালের ৩১শে অক্টোবর বার্লিনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সামরিক বিভাগের সার্ভে অফিসার। শৈশব থেকেই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বেয়ারের অনুরাগ লক্ষিত হয়। মাত্র ১২ বৎসর বয়সেই তিনি একটি নূতন যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। বার্লিনে কিছুদিন পড়ার পরে হাইডেলবার্গে তিনি বুনসেনের কাছে কেমিষ্ট্রি পড়তে যান। এখানেই কেকুলের সঙ্গে তিনি জৈব রসায়নশাস্ত্রে গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৮৫৮ সালে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করে প্রথমে স্ট্রাসবুর্গে ও পরে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ লাভ করেন।

গবেষণায় ক্লান্তি তাঁর ছিল না। কৃত্রিম উপায়ে নীল তিনিই প্রথমে তৈরি করেন। ১৯০৫ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। অর্থলিপ্সাহীন, ছাত্রবৎসল, কর্ম্মযোগী অধ্যাপক বেয়ারের নাম চিরদিন রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। তাঁর নিকট থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে ও তাঁরই নির্দেশক্রমে তাঁর প্রিয় ছাত্র গ্রেবে এলিজারিন নামক অতি মূল্যবান্ উদ্ভিজ্জাত রঞ্জন-পদার্থ সংশ্লেষণ করে অমর হয়ে আছেন।

বেয়ারের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য তাঁর ছাত্রদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে রসায়নশাস্ত্রে যাঁরা দিকপাল বলে বিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের অনেকেই ছিলেন বেয়ারের ছাত্র। অটো এবং এমিল ফিশার, রবার্ট ভিলস্টেটের, কোয়েনিগস, ক্লাইজেন, পার্কিন (ছোট), বুকনার, ডিকমান, ভিলাও, ডুইসবার্গ, ভাল্‌ডেন, ফ্রিডলাণ্ডার প্রভৃতি মনীষী বেয়ারের পদতলে বসেই রসায়নশাস্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

বেয়ারের গবেষণার ফলে রঞ্জনশিল্পে কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জনের পথ খুলে যায়, কিন্তু এই উদারহৃদয় অধ্যাপক তাঁর আবিষ্কারের পেটেণ্ট নিয়ে নিজে অর্থোপার্জ্জন করবার চেষ্টা আদৌ করেন নি।

এমিল ফিশার (১৮৫২-১৯১৯)

জার্ম্মানীর ছোট শহর অয়েসকিরশেনে ১৮৫২ সালের ৯ই অক্টোবর এমিল ফিশারের জন্ম হয়। তিনি পিতার অষ্টম সন্তান। তাঁর পিতার লোহা, সিমেণ্ট, রং প্রভৃতির ছোট কার-বার ছিল। কাজেই পিতার ইচ্ছা ছিল এমিলকে কেমিষ্ট্রির দিকে দেন। গণিত এবং পদার্থ-বিদ্যার প্রতি আকর্ষণ বেশী থাকলেও শেষ পর্য্যন্ত এমিল ষ্ট্রাসবুর্গে বেয়ারের নিকট রসায়নশাস্ত্র শিখবার জন্য যান। হাতের কাজের প্রতি প্রথম থেকেই তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ও দক্ষতা দেখা যায়। তাঁর গবেষণার ফলেই বিবিধ শর্করা, প্রোটিন, ক্যাফিন, ইউরিক এসিড প্রভৃতি জটিল পদার্থের স্বরূপ জানা যায়। ১৮৯২ সালে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। উপরোক্ত বিষয় বাদে রঞ্জন-পদার্থ সম্বন্ধেও ফিশার উচ্চাঙ্গের মৌলিক গবেষণা করেন। ১৯০২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। মৌলিক গবেষণাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত ও আনন্দের উৎস। প্রথম জীবনেই বাডিশে আনিলিন উণ্ড সোডা ফ্যাব্রিকের গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু এতে তাঁর মৌলিক গবেষণা চালানো ব্যাহত হবে জেনে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধ-সামগ্রি-

পূর্ব কমিশনের প্রেসিডেন্ট রূপে নানাবিধ Ersatz (অনুকল্প) প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

ফিশারের গবেষণার জৈব-রসায়নশাস্ত্রের বহু অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকে আলোকসম্পাত হওয়া ব্যতীত চিকিৎসাশাস্ত্রেরও অপরিসীম কল্যাণসাধন হয়েছে। ফলতঃ আজকাল বায়ো-কেমিষ্ট্রি বলতে যা বুঝায় ফিশারই প্রকৃত প্রস্তাবে তার স্রষ্টা।

অধ্যাপক হিসাবেও ছিলেন তিনি অসাধারণ কৃতী। তাঁর বহু ছাত্র পরবর্ত্তীকালে রসায়নশাস্ত্রের আলোচনায় ও গবেষণায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন।

পিটার গ্রিস (১৮২৯-১৮৮৮)

১৮২৯ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর কাসেলের নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রামের দরিদ্র কৃষক-পরিবারে গ্রিসের জন্ম হয়। শৈশবকাল থেকেই তাঁর পড়াশুনার প্রতি অনুরাগ এবং কৃষিকার্য্যের প্রতি ঔদাসীন্য লক্ষিত হয়। স্কুলের পড়া শেষ করে কিস্কেলব্রেক নামক স্থানে কাসেলের কাছে কেমিষ্ট্রির প্রাথমিক পাঠ নিয়ে তিনি মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে লিবিগের সংস্পর্শে আসেন। অতঃপর মারবুর্গে গিয়ে তিনি কোল্‌বের অধীনে গবেষণা সুরু করেন। ১৮৫৮ সালে তিনি "ডায়াজো রিয়্যাকশন" নামক এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের দ্বারা খ্যাতিলাভ করেন। এই আবিষ্কারের পর রঞ্জন-শিল্প-জগতে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। ইহার ফলে অসংখ্য নূতন নূতন রঞ্জন-পদার্থ প্রস্তুত হতে থাকে এবং রঞ্জনশিল্প দ্রুত অভাবনীয় উন্নতি লাভ করে।

অথচ এত বড় আবিষ্কার যিনি করলেন তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ইংলণ্ডের একটি মদ চোলাইয়ের কারখানায় কাজ করে কাটিয়েছেন। কারখানায় ৬।৭ ঘণ্টা খাটুনির পর তিনি অবসর সময়টুকু তাঁর নিজের ল্যাবরেটরিতে তাঁর প্রিয় 'ডায়াজো' বিষয়ক গবেষণায় কাটাতেন।

গ্রিসের আবিষ্কারের দরুন শিল্পপতিগণ কোটি কোটি টাকা উপায়ের নূতন পথের হদিস পেয়েছেন, কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, গ্রিস আজীবন দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে গেছেন। তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, নিরলস শ্রমশীলতা এবং একাগ্র সাধনা ছিল গ্রিসের বৈশিষ্ট্য। জৈব রসায়নশাস্ত্রের সঙ্গে গ্রিসের নাম অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত থাকবে।

জার্ম্মানীতে জৈব রসায়নশাস্ত্র গুরুশিষ্যপরম্পরায় অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই কিরূপে বিকশিত হয়েছিল ও আশাতীত ভাবে উৎকর্ষলাভ করেছিল তার মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায় উল্লিখিত মনীষীদের জীবন ও গবেষণার কথা আলোচনা করলে। এই সকল প্রথিতযশা অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভান্তে অনেক প্রতিভাশালী কেমিষ্টই রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন। কারখানা খুলে প্রধানতঃ রঞ্জন পদার্থ তৈরি করে ব্যবসা চালাতে থাকলেও তাঁরা মৌলিক গবেষণায় বিরত হন নাই, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সঙ্গে সর্ব্বদা গভীর যোগসূত্র স্থাপন করেই তাঁরা চলতেন এবং তাঁদের মৌলিক গবেষণার দ্বারায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানও ক্রমশঃ উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। কারখানায় যে সমস্ত খ্যাতনামা রাসায়নিক এই নীতি অনুসরণ করতেন তাঁদের মধ্যে হাইনরিখ কারোর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইনি গোড়া থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপকগণের মৌলিক গবেষণা অবলম্বনপূর্ব্বক শিল্পোন্নতির পথ প্রশস্ত করাই সমীচীন। হাইনরিখ কারো একাধারে উচ্চশ্রেণীর গবেষক ও সুলেখক ছিলেন, তদ্ভিন্ন কারখানা স্থাপনে এবং তার পরিচালনায়ও তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। "আলকাতরাজাত রঞ্জন-শিল্পের ক্রমবিকাশ" নামক পুস্তকে তিনি গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধের জার্ম্মান রাসায়নিক শিল্পের বর্ণনা নিপুণভাবে করেছেন।

এই পুস্তকে দেখতে পাই উল্লিখিত অধ্যাপকগণের সঙ্গে কারোর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। অধ্যাপক বেয়ারের সঙ্গে তাঁর যে অন্তরঙ্গতা তাকে আত্মিক যোগ বললেও অত্যুক্তি হয় না। বেয়ার ল্যাবরেটরিতে প্রথম কৃত্রিম নীল তৈরির যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন উচ্ছ্বসিত ভাষায় এক চিঠিতে তা তিনি কারোকে জানান। বলা বাহুল্য, কারো বেয়ারের আবিষ্কৃত পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক শীঘ্রই বাডিশে আনিলিন উণ্ড সোডা ফ্যাবরিকে প্রচুর পরিমাণে নীল প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন। অধ্যাপক বেয়ারের প্রিয় ছাত্র গ্রেবে যখন এলিজারিন নামক উদ্ভিজ্জাত রঞ্জন-পদার্থ—আলকাতরা থেকে প্রাপ্ত অ্যানথ্রাসিন নামক দ্রব্য থেকে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুতের পন্থা আবিষ্কার করেন তখন তা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করার ভারও পড়ে কারোর তত্ত্বাবধানে 'বাডিশে' কারখানায়। এ পদার্থের উৎপাদন এত লাভজনক হয় যে, ১৮৮১ সালে মাত্র এক বৎসরেই তা থেকে উক্ত কোম্পানী দেড় কোটি টাকা লাভ করেন। রসায়নশাস্ত্রের মৌলিক গবেষণা দেশের অর্থাগমে কিরূপ বিপুলভাবে সাহায্য করে তা এই একটিমাত্র উদাহরণ থেকেই বেশ বুঝা যায়।

শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক লিবিগ এবং কেকুলের জন্মধাম ডারমষ্টাট শহরে। সুতরাং এই ডারমষ্টাটে যে পৃথিবীবিখ্যাত রাসায়নিক কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? ওদিকে মার্ক-পরিবারের জর্জ্জ মার্ক শিক্ষালাভ করেছিলেন হফম্যানের মত [illegible] কাছে। জর্জ্জ মার্ক নূতন নূতন গবেষণালব্ধ ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যসম্ভারের দ্বারা পিতৃপুরুষের ছোট কারখানার খ্যাতি বৃদ্ধি করেন এবং সেটাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেন।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক-

গণের সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রের রাসায়নিকগণের সহযোগিতার অভাবে রাসায়নিক শিল্প তেমন বিকাশলাভ করতে পারছে না। এদিকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রসায়নের ক্ষেত্রে সত্যিকারের মৌলিক গবেষণার পরিমাণ এবং উৎকর্ষও এখন পর্য্যন্ত তেমন ভাবে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি।

হাইনরিখ কারোর পুস্তকে দেখতে পাই, কি সুন্দর সুন্দর বাগানসংযুক্ত স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের ব্যবস্থা ছিল কারখানার কর্ম্মীদের জন্য। ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, ক্লাব, স্কুল, স্নানাগার, সমবায় সমিতির দোকান প্রভৃতিরও ব্যবস্থা কারখানা থেকেই করা হয়েছিল। বার্দ্ধক্য ও ব্যাধির জন্য কর্ম্মচারীদের সংসারযাত্রা যাহাতে অচল না হয় সেই উদ্দেশ্যে কর্ত্তৃপক্ষই উপযুক্ত অর্থদানে ইনসিওরেন্সের ব্যবস্থা করে দিতেন। কর্ম্মীদের বিধবা স্ত্রী, অসহায় নাবালক পুত্র-কন্যারা কারখানা থেকে সাহায্য পেত। ফলতঃ আইন করে কারখানার কর্ত্তৃপক্ষকে কর্ম্মীদের কল্যাণকর্ম্মে নিয়োজিত করতে বাধ্য করার প্রয়োজন গবর্ণমেন্টের হয় নি। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের কাজের সুবিধার জন্য এবং কারখানার ভবিষ্যৎ উন্নতির উদ্দেশ্যে কর্ম্মী ও কর্ম্মচারীদের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দিয়ে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতেন। যাঁরা শিল্প-সম্বন্ধে আগ্রহশীল তাঁরা হাইনরিখ কারোর ইংরেজী অনুবাদ *Derelopment of ' oalter Colour Industry* বইখানি পড়লে সবিশেষ জানতে পারবেন।

গত বৎসর নবেম্বর মাসে ডারমষ্টাটে মার্কের কারখানা পরিদর্শনকালে রপ্তানী বিভাগের মিঃ ফিচের নিকট শুনলাম, তাঁদের কারখানার কর্ম্মীদেরও অনুরূপ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। ওঁদের 'কলোনি'তে ঘর খালি না থাকলে কোম্পানির কেনা জমি স্বল্পমূল্যে বিলি করে কোম্পানি থেকে নামমাত্র সুদে টাকা ধার দিয়ে কর্ম্মীদের নিজেদের বাড়ী তৈরি করার ব্যবস্থাও কোম্পানি করে দেন। মার্ক-পরিবারের প্রদত্ত অর্থদ্বারা কর্ম্মীদের অসুখ-বিসুখে স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনের খরচাও মিটানো হয়ে থাকে বলে শুনলাম। মার্কের কারখানায় বার্দ্ধক্যে পেনসনের ব্যবস্থা আছে। বড়দিনের সময় বোনাস সকলকেই দেওয়া হয়। কোনো কর্ম্মীর বা কর্ম্মচারীর কারখানায় ভর্ত্তি হবার ২৫, ৪০ এবং ৫০ বর্ষ পূর্ত্তির সময় আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করা হয় এবং ঐ উপলক্ষে সেই কর্ম্মী বা কর্ম্মচারীকে একটি বিশেষ 'বোনাস' দেওয়া হয়ে থাকে। কর্ম্মী ও কর্ম্মচারীদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির ভাব বজায় রাখবার জন্য কারখানায় খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে। কারখানার অর্কেষ্ট্রা এবং গানের দলেরও সুনাম আছে। বিশাল লাইব্রেরী রয়েছে, তাতে সব রকম বই আছে। প্রায়ই বিভাগীয় এবং মাঝে মাঝে কারখানার সকলের সমবেত প্রীতিসম্মিলনের আয়োজন করা হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থায় ছোটবড় সকলেই সেখানে অবাধে মেলামেশা করতে পারে এবং কারখানাকে একটি বৃহৎ পরিবারের মত দরদের দৃষ্টিতে দেখতে শেখে। Krapt durch freude—অর্থাৎ—'আনন্দের সঙ্গে শক্তির বিনিয়োগ'—জার্ম্মান চরিত্রের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

জার্ম্মান রাসায়নিক শিল্পের এরূপ উন্নতির দুটি মুখ্য কারণ :—প্রথম, জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রতিভাশালী গবেষকগণের অফুরন্ত মৌলিক গবেষণা। দ্বিতীয়, জার্ম্মান রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠাতাদের মৌলিক গবেষণার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ এবং তাঁদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, উদার, অপক্ষপাত পরিচালনা-কৌশল।

জার্ম্মান রাসায়নিক শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে এখন আমরা আমাদের দেশ কেন যে ঐ শিল্পে এত পিছিয়ে আছে তার হেতুটি সহজেই ধরতে পারব। আমরা সংক্ষেপে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা এখানে উল্লেখ করছি।

ভারতবর্ষে রসায়নশাস্ত্রের মৌলিক গবেষণা এবং রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠার পথপ্রদর্শক যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তা আর কাউকে নূতন করে বলার দরকার করে না। কিন্তু আজ জার্ম্মানীর রাসায়নিক শিল্পের আলোচনা করতে গিয়ে এ কথাও মনে আসে যে, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত বিরাট ব্যক্তিত্ব ও মনীষার অধিকারী রাসায়নিক যদি ঐ সময়ে এডিনবরায় ক্রামব্রাউনের মত সাধারণ একজন অধ্যাপকের কাছে না গিয়ে জার্ম্মানীতে বেয়ার, এমিল ফিশার বা হফম্যানের ল্যাবরেটরিতে শিক্ষালাভ করবার সুযোগ পেতেন তবে আজ আমাদের গোটা দেশেরই চেহারা বদলে যেত। আজ বেঙ্গল কেমিক্যালের চেয়ে হয়ত বহুগুণে বড়, বিরাট রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান আমরা এদেশে দেখতে পেতাম—অত্যাবশ্যক ঔষধপত্র, রঞ্জন-পদার্থ, বিস্ফোরক প্রভৃতির জন্য তা হলে আজ আমাদের বিদেশীর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হ'ত না। ইংরেজ জাতির বহু অনুকরণীয় গুণ থাকা সত্ত্বেও আত্মম্ভরিতা তাদের মধ্যে বড় বেশী প্রবল। জার্ম্মান চরিত্রের দৃঢ়তা এবং tho oughness প্রশংসনীয় এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে বিরল। আচার্য্য রায় যে সময় বিলাতে কেমিষ্ট্রি পড়তে যান, সে সময় বিলাতের মেধাবী এবং উচ্চাভিলাষী, রসায়নের প্রায় প্রত্যেক ছাত্র জার্ম্মানীতে ঐ বিষয় শিক্ষা করতে যেতেন।

স্বাধীন ভারতের শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারগণ যদি মেধাবী ছাত্রদের মার্কিন মুলুকে বা বিলাতে না পাঠিয়ে জার্ম্মানীতে বা জার্ম্মান রাসায়নিক দিক্‌পালদের পদাঙ্ক অনুসরণে আজ যেখানে রসায়নশাস্ত্রের চর্চ্চা পূর্ণোদ্যমে চলেছে সুইজারল্যাণ্ডের সেই জুরিখ শহরে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক কারার ও অধ্যাপক রুজিকার ল্যাবরেটরিতে পাঠান তা হলে সেই সব ছাত্রের অর্জ্জিত জ্ঞানে দেশের সত্যিকারের কল্যাণ হবে।

উপসংহারে আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গণিত, পদার্থ-বিজ্ঞান ও ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রি যেরূপ বিকাশলাভ করেছে সে তুলনায় জৈব রসায়নশাস্ত্র বা অরগ্যানিক কেমিষ্ট্রি তেমন উন্নত স্তরে উঠতে পারে নি। অথচ শেষোক্তটিই আধুনিক রাসায়নিক শিল্পের প্রাণস্বরূপ। এই শোচনীয় অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, হাজার হাজার বৎসর ধরে জাতিভেদ-প্রথার বিষে জর্জ্জরিত, আমাদের দেশের তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরা মস্তিষ্কচালনায় ও মননশক্তিতে যত নিপুণতা প্রদর্শন করছেন, স্বভাবতঃই হাতের কাজের প্রতি তাঁদের সেই পরিমাণে অপটুতা সুপরিস্ফুট। অরগ্যানিক কেমিষ্ট্রির বা জৈব রসায়নের উচ্চাঙ্গের গবেষণায় উন্নত স্তরের মানসিক শক্তির সঙ্গে হাতের কাজ সমান তালে চালানোর প্রয়োজন হয়। আমি প্রবন্ধের গোড়ার দিকে যে সব জার্ম্মান রসায়নবিদের জীবনকথা বর্ণনা করেছি সেগুলোতে দেখা যায় এঁদের অধিকাংশই ছিলেন কৃষক ও কারিগরের ছেলে—যাঁরা পুরুষানুক্রমে হাতের কাজে অভ্যস্ত।

স্বাধীন ভারতে জৈব রসায়নের উচ্চতর গবেষণা ও সঙ্গে সঙ্গে ফলিত রসায়নের এবং রাসায়নিক শিল্পের শ্রেষ্ঠ বিকাশ যদি সত্য সত্যই আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির অগৌণে সংস্কারসাধন করতে হবে। এখন শৈশব থেকেই ছেলেমেয়েদের লিখন-পঠনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নানা প্রকার হাতের কাজ শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা করতে হবে, তদ্ভিন্ন ব্যাপক সুষ্ঠু শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্বারা কৃষক এবং কারিগরশ্রেণীর অন্ধকার গৃহকোণও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত করে তুলতে হবে। শুধু মস্তিষ্কের শক্তির বিকাশের দ্বারা আমরা আইন, গণিত প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে কৃতিত্ব দেখাতে পারি, কিন্তু ফলিত বিজ্ঞানে সাফল্যের জন্য আমাদের মাথা, হাত ও চোখ সমভাবে চালনা করতে হবে এবং তার জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার-সাধন। সমাজের সর্ব্বস্তরে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঞ্জীবনী ধারা প্রবাহিত করানো এবং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ প্রদান করা। প্রত্যেক প্রদেশের নিজ নিজ বিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষার উন্নতিবিধানের সঙ্গে ইংরেজী ভাষার যথোচিত চর্চ্চা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্ম্মান প্রভৃতি সমৃদ্ধ বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও সমভাবে অপরিহার্য্য।

আলোচনা

"প্রাচীন বঙ্গে ধর্ম্মপূজা"

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি

'প্রবাসী'তে প্রকাশিত আমার "প্রাচীন বঙ্গে ধর্ম্মপূজা" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আলোচনা পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। ঐতিহাসিক বিষয়ে যত অধিক আলোচনা হয়, সত্যনির্ণয়ের পথ ততই সহজ হইয়া আসে। এই আলোচনার জন্য আমি শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য এবং প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়কে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বক্তব্য-সমূহ বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া আমি উহার কোনটিকেই সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছি না।

"পূর্ব্বে পূর্ব্ব এবং উত্তর-বাংলাতেও ধর্ম্মঠাকুর পূজার প্রচলন ছিল", ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই সিদ্ধান্তের বিরোধী। অবশ্য ইহা আমার সিদ্ধান্ত নহে। অপরের সিদ্ধান্ত সমীচীন বোধ হওয়াতে আমি উহা গ্রহণ করিয়াছি। 'রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল'-সম্পাদকদ্বয়ের ন্যায় আমি বিশ্বাস করি যে, পূর্ব্ব ও উত্তর-বাংলার পাটঠাকুর পূজার সহিত পশ্চিম বাংলার ধর্ম্মঠাকুর পূজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ধর্ম্মঠাকুর যেমন স্থানবিশেষে বিষ্ণু বা শিব, পাটঠাকুর তেমনই একাধারে শিব ও বিষ্ণু। ফরিদপুর অঞ্চলের গোধাকৃতি পাটঠাকুরের অঙ্গে উভয় দেবতার চিহ্নই দেখা যায়। ঐ অঞ্চলের মৎসংগৃহীত পাটঠাকুরের পূজাবিষয়ক একখানি পুঁথিতে 'পাট' সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

> বিশ্বকর্ম্মা দিলেন পাট নির্ম্মাণ করিয়া।
> শঙ্খচক্রগদাপদ্ম চারি মুদ্রা দিয়া ॥
> গাড়িলেন ত্রিশূল গোটা কাঁটা তিন সারি।...
> পাট বাণ শুরু করিলেন প্রভু ভোলা মহেশ্বর ॥ ইত্যাদি।

উক্ত সম্পাদকদ্বয়ের যে বাক্যটি ভট্টাচার্য্য মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎসঙ্গে তাঁহারা আরও বলিয়াছেন, "বগুড়ার যোগীর ভবনে ধর্ম্মঠাকুরের গাদি এখনও বর্ত্তমান।" ইহা তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সমর্থক, সন্দেহ নাই। শ্রীযুত সুকুমার সেন-কৃত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৪৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "ধর্ম্মঠাকুরের পূজা এখন রাঢ়দেশে ও তৎসীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এক কালে ইহা সমগ্র বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল।" যতটুকু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আমি এই ধারণা সত্য বলিয়াই মনে করি। বাংলার বাহিরেও ধর্ম্মপূজার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, ধর্ম্মঠাকুরের সহিত কূর্ম্মমূর্ত্তির কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই। অপরাপর লেখকের ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধীয় রচনাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার এই প্রকার উক্তিকে আমার নিতান্তই অপ্রামাণিক বলিয়া বোধ হইতেছে। পূর্ব্বোল্লিখিত 'রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গলে'র ভূমিকায় (পৃষ্ঠা ।৵০) সম্পাদকদ্বয় বলিয়াছেন, "কূর্ম্ম ধর্ম্মঠাকুরের আসন এবং প্রতীক। কূর্ম্মমূর্ত্তির পিঠে প্রায়ই ধর্ম্মের পাদুকা অথবা পদ-চিহ্ন আঁকা থাকে।" অতঃপর তাঁহারা 'ধর্ম্মপূজাবিধান' এবং একখানি সংগৃহীত পুথি হইতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন।

> "উলূকবাহনং ধর্ম্মং দেবং তেজোময়াত্মকম্।
> ইদানীং কূর্ম্মপৃষ্ঠে তু দিব্যরূপ নমস্ত তে ॥"
> "হাত পাতিয়ে ধর্ম্ম সৃজিলেন সৃষ্টি
> পাদুকা স্থাপিব লঞা কূর্ম্মের পিষ্টি ॥"

পরে তাঁহারা বৈদিক সূর্য্য-দেবতার সহিত ধর্ম্মঠাকুরের সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "কূর্ম্ম সূর্য্য-দেবতার প্রতীক। তাই কূর্ম্ম ধর্ম্মঠাকুরের প্রতীক এবং পাদপীঠ" (পৃষ্ঠা ।৵০-৸০)। পূর্ব্বোল্লিখিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ৪৯৩ পৃষ্ঠাতেও অনুরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে। *B. C. Law Volume, part I*-এ প্রকাশিত শ্রীযুত সুকুমার সেন-কৃত একটি প্রবন্ধে বলা হইয়াছে,

"The emblem of Dharma—rather his *padapitha* or foot-stool on which was placed or engraved the *paduka* (boots or sandals) of Dharma—is a tortoise. In most cases it is a natural bit of stone shaped like a tortoise, *in other cases it is a chiselled stone image of the same*. In very rare cases *the image is made of brass*. A miniature temple or chariot is also known to be worshipped as emblem of Dharma."

এই সম্পর্কে 'জার্নাল্ অব্ দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটী অব্ বেঙ্গল', ১৯৪২, ৯৯-১৩৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শ্রীযুত ক্ষিতীশ-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের "Dharma Worship" শীর্ষক মূল্যবান্ প্রবন্ধের সাক্ষ্যও উল্লেখযোগ্য। কারণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পশ্চিম বাংলার নানা অঞ্চলে ধর্ম্মপূজার অনুষ্ঠান এবং মূর্ত্তিসমূহ স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ও স্থলবিশেষে প্রামাণিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

"The images of this (*i.e.*, Dharma deity known as Yatrasiddhiray worshipped in the village Maynapur in

Bankura District) and several other Dharmas are said to be of stone and shaped like a tortoise, about 4 in. to 6 in. long." "According to Sri Jogesh Chandra Ray, the images are mostly tortoiselike in shape, and all have tortoise back." "*Most of the images of Dharma which the writer of this paper observed in the districts of Birbhum, Midnapur and 24-Parganas were shaped like tortoise.* In one case, it had a tortoise back only. But the size, though generally as noted above, varied."

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মত উদ্ধৃত করিতে গিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকার ১৬শ ভাগে প্রকাশিত রায়-মহাশয়ের শূন্যপুরাণ-বিষয়ক প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, সুদূরবর্ত্তী উতকা-মণ্ডে বসিয়া রায়-মহাশয়ের প্রবন্ধাবলী আমি পাঠ করিবার সুযোগ পাই নাই। কিন্তু ধর্ম্মপূজা সম্পর্কে যতগুলি গবেষণা-মূলক রচনা আমার পক্ষে এখানে পাঠ করা সম্ভব হইয়াছে, তাহা হইতে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, বাংলাদেশে ধর্ম্ম-ঠাকুর প্রধানতঃ কূর্ম্মমূর্ত্তির সাহায্যে পূজিত হন। এই প্রসঙ্গে আমি যাঁহাদের মতামত উদ্ধৃত করিলাম, আশা করি, তাঁহারা ধর্ম্মঠাকুরের কূর্ম্মমূর্ত্তি সম্বন্ধে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সন্দেহ নিরসন করিতে পারিবেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তৃতীয় কথা এই যে, নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় যে আলোচ্য লিপিদ্বয়কে অভিচার-মন্ত্র বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন তাহাই সমীচীন। আবার দ্বিতীয় লিপিতে উল্লিখিত ধর্ম্ম কথাটিকে তিনি বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্তর্গত ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিতে চান। কিন্তু ইহা যে ভট্টশালী মহাশয়ের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। এক্ষণে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মন্তব্যের উত্তর দিতে গিয়া ঐ পাঠ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় লিপিতে যাহার পাঠ "স্বস্তি-নিশ্রেয়সায়াস্তু জিনো জনানাং" (অর্থাৎ "জিন বা বুদ্ধ জনগণের মঙ্গল এবং মোক্ষের কারণ হউন") অত্যন্ত স্পষ্ট, উহাকে ভট্টশালী মহাশয় পড়িয়াছিলেন, "স্বস্তি। শ্রেয়সায় (নিশ্রেয়সায়)। সুজিনো জনানাং ॥" 'সুজিনো জনানাং' অংশের ভট্টশালীকৃত ব্যাখ্যা 'সদ্বৌদ্ধগণের'। তাঁহার মতে, লিপিদ্বয়ে সদ্বৌদ্ধগণের মঙ্গল-কামনা করা হইয়াছে এবং প্রধানতঃ এইজন্যই তিনি লিপি-দ্বয়কে বৌদ্ধগণের মঙ্গলার্থ প্রযুক্ত আভিচারিক মন্ত্র স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত বা প্রাকৃত কোন ব্যাকরণ অনুসারেই 'সুজিনো জনানাং'-এর অর্থ 'সদ্বৌদ্ধগণের' হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং অভিচারমন্ত্র বিষয়ক মতবাদটি নিতান্তই কাল্পনিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত [illegible] মনোভাবসম্পন্ন বৌদ্ধ-গণের অভিচার-মন্ত্রে ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করা হইবে কেন? যাহাতে প্রথমে 'ভগবান্ বাসুদেব'-কে নমস্কার করিয়া পরে 'বুদ্ধ'-কে নমস্কার করা হইয়াছে, তাহাকে হিন্দু-বিদ্বেষী গোঁড়া বৌদ্ধ প্রযুক্ত অভিচার-মন্ত্র কোন্ হিসাবে মনে করা যাইতে পারে? দ্বিতীয় লিপিতে আমি যাহা পড়িয়াছি "মন্থুংরসর্ম্মকারীতধর্ম্ম ॥" অর্থাৎ "মন্থুংরশর্ম্ম-কারিত-ধর্ম্মঃ", তাহার ভট্টশালীকৃত পাঠ "মনরসর্ম্ম-কারা-বধ-স্ম ॥" তাঁহার মতে, ইহাতে মনরশর্ম্মা বা মনোরথশর্ম্মা নামক একজন বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণের কারা বা বধের কামনা করা হইয়াছে। কোন্ ব্যাকরণ অনুসারে ঐ পাঠের এই ব্যাখ্যা হইতে পারে? 'কারা' এবং 'বধ' না হয় বুঝিলাম; কিন্তু 'স্ম' অর্থ কি? শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য এস্থলে 'ধর্ম্ম' কে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্তর্গত ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিতে চান। তাহাতে ভট্টশালী-কল্পিত 'কারা-বধ'-এর 'ধ' কাটিয়া গিয়া অর্থহীন 'কারাব' মাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং কিছুমাত্র অর্থসঙ্গতি হয় না। প্রকৃতপক্ষে, পাঠ ও ব্যাখ্যার দিক হইতে দেখিলে, 'সুজিনো-জনানাং' এবং 'কারা-বধ-স্ম' উভয়ই সমান হাস্যকর। ইহার উপর নির্ভর করিয়া আলোচ্য লিপিদ্বয়কে অভিচার-মন্ত্র মনে করা নিতান্তই যুক্তিহীন, সন্দেহ নাই। ভট্টশালীকৃত পাঠ অনুসরণ করিলে আর এস্থানে বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মরত্নকে কল্পনা সম্ভব হয় না। কারণ 'কারা-বধ' না থাকিলে ভট্টশালী মহাশয়ের অভিচার-মন্ত্র বিষয়ক কল্পনার পক্ষে উপস্থিত করিবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অবশ্য আমার পাঠ গ্রহণ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, কোন ব্যক্তি বৌদ্ধ ধর্ম্মরত্নের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে ধর্ম্মমূর্ত্তির সহিত কচ্ছপের খোলের কোনই সংস্রব দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, তাহা হইলে আর অভিচার-মন্ত্রের কথাই উঠিতে পারে না।

ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের চতুর্থ কথা এই যে, ধর্ম্মঠাকুর রূপে পূজিত শিলা স্বাভাবিক শিলাখণ্ড মাত্র; উহা কখনও কোন নির্দ্দিষ্ট আকারে নির্ম্মাণ করা হয় না। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য তাঁহার দ্বিতীয় মন্তব্যের উত্তরেই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। যিনি লিখিয়াছেন,

"In most cases it is a natural bit of stone shaped like a tortoise. *in other cases it is a chiselled stone image of the same.*" "In very rare cases, *the image is made of brass.*"

তাঁহার কাছে খোঁজ মিলেই সুনির্ম্মিত কূর্ম্মাকার ধর্ম্মশিলা এবং ধর্ম্মঠাকুরের পিত্তলনির্ম্মিত কূর্ম্মমূর্ত্তির সন্ধান মিলিবে। ইহার জন্য অধিক দূরেও যাইতে হইবে না; কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপকের পত্র হইতে জানিয়াছি যে, কলিকাতা অঞ্চলেও এইরূপ মূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে। যদি কেহ দয়া করিয়া ধর্ম্মঠাকুরের কোন সুনির্ম্মিত কূর্ম্মমূর্ত্তির [illegible] প্রকাশিত করেন, তবে আমরা অত্যন্ত উপকৃত বোধ করিব।

"ন্যাশনাল লাইব্রেরী"

বি, এস. কেশবন,
ন্যাশনাল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান

গত সংখ্যার 'বিবিধ প্রসঙ্গে' ন্যাশনাল লাইব্রেরী সম্বন্ধে আপনার যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য পাঠ করিলাম। যে কোনও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এইরূপ গঠনমূলক সমালোচনার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। এতে জনসাধারণকে সচেতন করে ঐ প্রতিষ্ঠানে তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের সতর্ক করে তাদের কর্ত্তব্যের প্রতি। কিন্তু গঠনমূলক সমালোচনার একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে—সেটি হচ্ছে সত্যের সব দিক প্রকাশ করা। কোন্ কোন্ সমস্যা বা পরিস্থিতির জন্য জনসাধারণের অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং এই অবস্থা স্থায়ী কি অস্থায়ী তাও জনসাধারণকে জানানো দরকার। আপনার মন্তব্যে পাঠকদের অসুবিধা সম্বন্ধে যে যে বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের নিম্নলিখিত বক্তব্যটুকু প্রকাশিত করলে বিশেষ বাধিত হব।

বর্ত্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে পাঠকদের বই পেতে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করতে হয়—এ বিষয়ে আমরা অবহিত আছি। আমরা এ জন্য বিশেষ দুঃখিত। কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই অসুবিধা অপরিহার্য্য। বইগুলি এস্‌প্লানেড থেকে সরানো হয়েছে সত্য, কিন্তু বেলভেডিয়ারে নূতন ধরণের র‍্যাক্ (পুস্তকাধার) তৈরী করার কাজ এখনও শেষ হয় নি বলে বইগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। নূতন র‍্যাক্ তৈরী করা এবং বেলভেডিয়ার ভবনটিকে লাইব্রেরীর উপযোগী করে তোলা একটু সময়-সাপেক্ষ। বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে লাইব্রেরীটিকে যথাসম্ভব উন্নততর করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে। পাঠ্য ও পাঠকের গভীরতর সংযোগ স্থাপনের চেষ্টার ত্রুটি করা হচ্ছে না।

যখনই কোন লাইব্রেরীকে স্থানান্তরিত ও নূতন জায়গায় পুনর্গঠিত করা হয় তখন সাধারণতঃ কিছু দিনের জন্য লাইব্রেরীটি বন্ধ রাখা হয়, কিন্তু আমরা পাঠকদের লাইব্রেরী ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ না রেখে তাঁদের চাহিদা আংশিকভাবে মিটানোর নীতি যুক্তিযুক্ত মনে করেছি এবং সেই অনুসারে আমাদের কাজ করে যাচ্ছি। পুনর্গঠনের কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পাঠকদের এই অসুবিধা ভোগ করা অনিবার্য্য। তবে যাতে এই অসুবিধা শীঘ্রই দুরীভূত হয় সে বিষয়ে আমরা যত্নবান হব।

বেলভেডিয়ারে লাইব্রেরীর প্রকাশ্য উদ্বোধন এখনও হয় নি, বইগুলি উন্মুক্ত অবস্থায় আছে, পুনর্গঠনের কাজের জন্য কোনও কিছুরই শৃঙ্খলা-বিধান করা সম্ভবপর হয় নি। বইগুলির নিরাপত্তার জন্য এবং সাধারণ বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য এখনও পাঠকের অবাধ প্রবেশের ব্যবস্থা করা যায় নি, তাই গেটে পুলিস-পাহারার ব্যবস্থা বলবৎ আছে। তবে যদি কোনও পাঠক বেলভিডিয়ারে বই পড়তে চান্, তিনি পত্র লিখলেই ডাকে পত্রযোগে প্রবেশাধিকারের কার্ড পাঠানো হয়।

লাইব্রেরীর প্রকাশ্য উদ্বোধন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাতে যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতি হয় সে বিষয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহিত আলোচনা করছি এবং আশা করি যাতায়াত যথেষ্ট পরিমাণে সহজ হবে।

লেণ্ডিং সেকশনের সংখ্যা বাড়ানো সম্বন্ধে নিউইয়র্ক লাইব্রেরীর তুলনা আমাদের লাইব্রেরী সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। কারণ আমাদের লাইব্রেরী সিটি লাইব্রেরী বা মিউনিসিপাল লাইব্রেরী ধরণের নয়, এই লাইব্রেরী ব্রিটিশ মিউজিয়ম বা লাইব্রেরী অব্ কংগ্রেস পর্য্যায়ের—অবশ্য আকারে তাদের তুলনায় অনেক ছোট। তাই লেণ্ডিং সেকশনের সংখ্যা বাড়ানোর প্রশ্ন উঠতে পারে না। জনসাধারণের ঐ প্রয়োজন মেটাবার ভার সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরীর, কিন্তু দুঃখের বিষয় কলিকাতায় সে ধরণের লাইব্রেরীর অস্তিত্ব নেই। এই বিষয়ে জনমত গঠন করার দায়িত্ব আপনাদের মত সুযোগ্য সংবাদপত্রসেবীদের সাগ্রহে গ্রহণ করা উচিত।

দিল্লীতে লাইব্রেরী স্থানান্তরিত হওয়ার আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ঐরূপ কোনও পরিকল্পনা থাকলে পুনর্গঠনের কাজে হাত দেওয়া হ'ত না এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সংগৃহীত পুস্তকগুলি সাদরে গৃহীত হ'ত না। লাইব্রেরীর নব উদ্বোধনের পরেই আপনারা নিজেরাই আমাদের এই আশ্বাসের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

আশা করি, জনসাধারণ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করে আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন।

প্রবাসী-সম্পাদকের মন্তব্য

লাইব্রেরীতে বই পাইতে অসুবিধা হইতেছে ইহা লাইব্রেরীয়ান মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন এবং কারণস্বরূপ বলিয়াছেন যে, বেলভেডিয়ারে র‍্যাক তৈরি এবং বাড়িটিকে লাইব্রেরীর উপযুক্ত করিবার কাজ এখনও বাকী আছে বলিয়া এই অসুবিধা ঘটিতেছে। আমরা এই যুক্তির তাৎপর্য্য বুঝিলাম না। বাড়ীর কাজ এবং র‍্যাক তৈরিই যখন অসম্পূর্ণ, তখন এত তাড়াহুড়া করিয়া বই সরাইবার কি প্রয়োজন ছিল? প্রায় দুই শতাব্দীর পুরানো ঐ বাড়ির মেঝে ও দেওয়াল ঠিক করিয়া না লইলে উই ধরিবার কথা; র‍্যাক তৈয়ারি হয় নাই একথা লাইব্রেরীয়ান

নিজেই বলিতেছেন। ইতিমধ্যেই কিছু বই উইয়ে নষ্ট করিয়াছে কি না লাইব্রেরীয়ান মহাশয় জানাইবেন কি? "বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে লাইব্রেরীটাকে যথাসম্ভব উন্নততর করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে"—লাইব্রেরিয়ান মহাশয়ের এই কথার পরিচয় পাইতেছি দুইটি কাজে—অনাবশ্যকভাবে চাকাওয়ালা র্যাক তৈরি করিতে লক্ষাধিক টাকা বেশী খরচ হইয়াছে এবং বই কেনার টাকা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চাকাওয়ালা "উন্নত ধরণের" র্যাক কাজের বেলায় উপযোগী হইবে কি না অনেক টাকা খরচ করিবার পর এখন সে বিষয়ে আশঙ্কা জাগিতেছে।

লাইব্রেরী স্থানান্তর এই প্রথম হয় নাই। শেষবার 'জবা-কুসুম হাউস' হইতে উহা এসপ্লানেডের বাড়ীতে যখন আসে তখন ১৫ দিন লাইব্রেরী বন্ধ ছিল এবং ঐ সময়ের মধ্যে স্থানান্তরীকরণ সম্পূর্ণ হয়। বর্ত্তমান স্থানান্তরীকরণ সেপ্টেম্বরে আরম্ভ হইয়াছে, তিন মাসের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা স্থাপন সম্ভব হয় নাই। এখন লাইব্রেরিয়ান মহাশয় বলিতেছেন, বাড়ী এবং র্যাক ঠিক না করিয়াই বইগুলি পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং "বইগুলি উন্মুক্ত অবস্থায় আছে।"

লাইব্রেরীর প্রকাশ্য উদ্বোধনের পর পুলিস পাহারা থাকিবে না, ইহা শুভ সংবাদ।

লাইব্রেরীতে যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিতে-ছেন বলিয়া লাইব্রেরিয়ান মহাশয় আমাদের আশ্বস্ত করিয়াছেন কিন্তু এটা আমাদের বক্তব্য ছিল না। গবর্ণমেণ্ট ৫বি বাস রুট প্রবর্ত্তন করিয়া বেলভেডিয়ারে যাতায়াতের সুবিধা অনেকদিন আগেই করিয়া দিয়াছেন। আমরা বলিয়া-ছিলাম যে, বেলভেডিয়ার হইতে এসপ্লানেডের রিডিং রুমে বই আনিবার জন্য লাইব্রেরীর নিজস্ব ভ্যান থাকা উচিত। ইহাতে অল্প সময়ের মধ্যে দিনে অনেকবার বই আনা যাইবে।

লাইব্রেরীর 'লেণ্ডিং সেকশ্যন' বাড়ানোর প্রতিবাদ করিয়া লাইব্রেরিয়ান বলিতেছেন, উহা মিউনিসিপাল লাইব্রেরীর কাজ, ন্যাশনাল লাইব্রেরী ব্রিটিশ মিউজিয়াম বা আমেরিকান লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের সহিত তুলনীয়, যদিও আকারে অনেক ছোট। এই যুক্তিও আমরা মানিতে পারিতেছি না। লাইব্রেরীর নিয়মানুসারে ভারতবর্ষের যে-কোন স্থানের লোক টাকা জমা পাঠাইয়া ডাকেও বই লইতে পারে। সুতরাং যে শহরে লাইব্রেরী অবস্থিত সেখানে 'লেণ্ডিং সেকশ্যনের' সংখ্যাবৃদ্ধি ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কাজ নয়, ইহা আমরা মানিতে পারি না। ব্রিটিশ মিউজিয়াম বা লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের সহিত শুধু সংখ্যা নহে, নীতির দিক দিয়াও আমাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরীর তুলনা হয় না। লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের বই পাণ্ডুলিপি, ম্যাপ, ফটোষ্ট্যাট প্রভৃতি লইয়া মোট সংখ্যা ২,৭০,০০,০০০। আমাদের লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা বড় জোর পাঁচ হইতে সাত লক্ষ। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন যে পৃথিবীর যে-কোন অংশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন পুস্তক প্রকাশিত হইলে তাহা এখানে রাখা হইবে। প্রধানতঃ ইংরেজদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভের উপযুক্ত পুস্তকাদি রাখাই এই লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য ছিল। এখানে বিলাতী বহু পত্রিকার ফাইল পাওয়া যায়, কিন্তু গান্ধীজীর হরিজন পত্রিকা কখনও রাখা হয় নাই। বিজ্ঞানের বই, এমন কি অঙ্কশাস্ত্রের বই কিছু কিছু আছে; বেশী রাখা হয় না এই কারণে যে, ঐগুলি টেকনিকাল বই, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী টেকনিকাল বইয়ের স্থান নয়। সাহিত্যের দিক হইতেও দেখা যায় বহু বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকেরও রচনা এখানে নাই, নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত সব লেখকের বই পর্য্যন্ত নাই। বাংলা বই ও পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে, অথচ লাইব্রেরী পরিচালনার মূল সূত্র এই যে, যে প্রদেশের লাইব্রেরী অবস্থিত থাকিবে সেই প্রদেশের বই পত্রিকা এবং পাঠকদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই দিকটি একেবারে উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। বাংলার চেয়ে এখানে উর্দ্দুর দিকে বেশী নজর দেওয়া হইয়াছে। লাইব্রেরীর রিডিং রুমে মিশরের আরবী পত্রিকাও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাংলা পত্রিকা দেখা যায় না। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নাম বদলাইয়া ন্যাশনাল লাইব্রেরী হইয়াছে সত্য, কিন্তু জাতীয়তা-বোধ উহার কোন স্তরেই প্রকাশ পায় নাই।

লাইব্রেরী দিল্লীতে সরাইবার এত চেষ্টা এত বার হইয়াছে যে এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। লাইব্রেরী ব্যবহারে অসুবিধা সৃষ্টি এবং পাঠক-সংখ্যা হ্রাস হইতে দেখিলে লোকের মনে এই আশঙ্কা জাগিবেই। ইহা দূর করিবার দায়িত্ব লাইব্রেরী কর্ত্তৃপক্ষের।

দেশাবলি বিবৃতি* ও বাঁকুড়া হইতে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত ভূমি

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

বিষ্ণুপুর বিবৃতির কিয়দংশ উদ্ধৃত করি :—

"বিষ্ণুপুরের সার্দ্ধ-তিন যোজন পশ্চিমে কানন-মধ্যে ছাতনা নামক রাজধানী। বিষ্ণুপুরের এক ক্রোশ পশ্চিমে বেত্রবতীর পার্শ্ব ভাগে রামসাগর। তাহার নিকট বন-মধ্যে নাপুরাখ্য প্রাচীন শিবলিঙ্গ। ইহা হইতে তিন ক্রোশ দূরে অন্ধগ্রাম (অঁদা)। ইহার দুই ক্রোশ উত্তরে গামিত্যা গ্রাম মধ্যে বাহুলী নামে দেবী। ইহার এক যোজন উত্তরে বালিয়াতোটক গ্রাম (?)—এখানে বহু কায়স্থ জাতির বাস। রাজা গোপাল সিংহের মন্ত্রী রাজীব তথায় বাস করেন। অন্ধকগ্রামের এক যোজন পশ্চিমে কজ্জলা নদীর তীরে শোহদম গ্রাম। ইহার অর্দ্ধযোজন পশ্চিমে বাগীনদীর নিকটে কোটালপুর মহাগ্রাম। বাগীনদীর দুই ক্রোশ পশ্চিমে ছুতেশ গ্রাম। ছুতেশের এক ক্রোশ পশ্চিমে বনের নিকট বাদলা গ্রাম।..."

দেখা যাইতেছে, "দেশাবলি বিবৃতি"র পণ্ডিত বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের সময় বিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন। বেলিয়াতোড়ের 'রাজীব' নামক কায়স্থ গোপাল সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। ওন্দাগ্রাম হইতে উত্তরে গামিদ্যাগ্রামের ভিতর দিয়া বেলিয়াতোড় যাইবার কাঁচা রাস্তা আছে। সম্ভবতঃ মন্ত্রী মহাশয় এই পথ দিয়া বেলিয়াতোড় গমনাগমন করিতেন। এবং দেশাবলির পণ্ডিত তাঁহার নিকট শুনিয়া উপরে উদ্ধৃত বিবৃতি লিখিয়াছিলেন। গোপাল সিংহের কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন মূল গ্রন্থটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল। সময়ের অবশ্য বিশেষ পার্থক্য হইতেছে না।

পণ্ডিত মহাশয় "গামিদ্যাগ্রাম মধ্যে বাহুলী নামে দেবী" লিখিয়াছেন, কিন্তু গামিদ্যগ্রামের অতি সন্নিকটে বাহুলাড়া গ্রামের প্রাচীন মন্দিরের কথা লিখেন নাই। কুঁকড়া জোড়ের (কজ্জলানদী) তীরে লোদ্না (লোহদম) গ্রামের কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু লোদনা ও বাঁকুড়ার মধ্যবর্ত্তী দ্বারকেশ্বরীর তীরে একতেশ্বর মন্দিরের কথা লিখেন নাই। বাগিজোড় (নদী)-এর তীরে কোটালপুর গ্রামের (মহাগ্রাম) কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু কোটালপুর ও ছুতসহর বা ছুতেশর (ছুতেশ) গ্রামের মধ্যবর্ত্তী সোনাতাপলের দেউলের কথা লিখেন নাই। ইহা আশ্চর্য্য।

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৫শ ভাগ দ্রষ্টব্য।

এই ভূ-ভাগকেই কি তিনি "দারিকেশী নদী পর্য্যন্ত মরুভূমি ধর্ম্মবর্জ্জিত" বলিয়াছেন ? হয়ত তিনি এই মন্দিরগুলিকে বৌদ্ধ মন্দির বলিয়া ভাবিয়াছিলেন।

সোনাতাপলের দেউল ও বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির দুইটি বাঁকুড়ার জৈনমন্দির বলিয়া খ্যাত। সোনাতাপলের দেউলটিকে কেহ কেহ আরও প্রাচীন মনে করেন। এই মন্দিরটি একটি ঢীপের উপর অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বদ্বারী। প্রভাতের প্রথম সূর্য্যরশ্মি এই মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ইহার অভ্যন্তর হইতে ধর্ম্ম-তপন দৃষ্ট হয়। হয়ত ইহাতে বহু পূর্ব্বে সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাঁকুড়ায় সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাহুলাড়ার মন্দিরটি বৌদ্ধমন্দির হইতে পারে।

এক্তেশ্বরের মন্দিরটি অতি প্রাচীন। হয়ত ইহা কোনও অসুর-রাজ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রবাদ—ইহাতে রাতা-রাতি স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি হইতেছিল; কোকিল ডাকিয়া দেওয়ায় সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহা অসুরদের প্রচেষ্টা। কালকাজ অসুর অগ্নিবেদী করিয়া স্বর্গে উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের বর্ত্তমান অনুষ্ঠানে শৈব, জৈন, বৌদ্ধ এবং নাথধর্ম্মের মিশ্রণ দেখা যায়।

ইহা ছাড়া সোনাতাপলের দেউলের অতি সন্নিকটে সোনা-দীঘির পাড়ে আর একটি ভগ্ন দেউলের স্তূপ আছে। সোনাতা-পলের পূর্ব্বে, কিছু দূরে, সোনাতাপলের দেউলেরই ন্যায় আর একটি দেউল আছে। ইহাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে কালো-পাথরের ধারেশ্বর শিবমন্দিরও আছে। বড় বড় রাজারা মন্দির, দেউল নির্ম্মাণ করিয়া দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। সাধারণ লোকে বৃক্ষতলে দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। বড়জোর সে ক্ষেত্রের প্রবেশ-পথে, রক্ষক হিসাবে অথবা দেবস্থানের চিহ্নজ্ঞাপক, ধনুকধারী মূর্ত্তি খোদিত দুইটি উচ্চ প্রস্তরখণ্ড কটকের ন্যায় প্রোথিত রাখিতে পারেন। এই ভূখণ্ডে প্রাচীনকালে কোনও বড় রাজা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু একমাত্র কুদিমবতীর গড় ছাড়া এ অঞ্চলে কোথাও সেরূপ গড়ের চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। বাঁকুড়ার দুই মাইল পূর্ব্বে দ্বারকেশ্বরীর তীরে এক্তেশ্বরের মন্দির এবং সোনাতা-পলের মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী গড়ের বন-ঝোঁজার পরিখা (দহ) বেষ্টিত স্থানকে লোকে এই গড় নির্দ্দেশ করে। গত বৎসর সরকার কর্ত্তৃক এই পরিখার কতক অংশের পঙ্কোদ্ধার হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান ভাদুলগ্রামের শেষ পূর্ব্বপ্রান্ত। ভাদুল বর্ত্তমানে বাঁকুড়ার প্রধান শিক্ষিত কায়স্থপল্লী। বর্ত্তমান লেখক এই গ্রামের বাসিন্দা। কায়স্থপল্লী অথচ আমার বাসবাটীর পশ্চাতে গোয়ালা পুষ্করিণী (গয়লাপুকুর)। নিকটে হরিঘোষ নামক পুষ্করিণী। গড়স্থানে বর্ত্তমানে কয়েক ঘর গোয়ালার বাস। এক ঘর ব্রাহ্মণও আছেন। গ্রামের মধ্যস্থলে বহু প্রাচীন ষষ্ঠীতলা বা ধর্ম্মতলা। এই গ্রামের মধ্য দিয়া বাঁকুড়া হইতে এক্তেশ্বর যাইবার প্রাচীন রাস্তা। এক্তেশ্বরের মন্দিরের নিকট 'গাইগয়লা' পুষ্করিণী। মনে হয় কুদিমবতীর গড়ে প্রাচীনকালে কোনও গোপরাজা ছিলেন। রাজা অপুত্রক ছিলেন। হয়ত তিনি পুত্রকামনায় সাড়ম্বরে ধর্ম্মের পূজা দিয়া থাকিবেন।

নাপুড় শিবলিঙ্গ এখন রামসাগর গ্রামের মধ্যে শুনিয়াছি। সেখানে গাজন হয়। রামসাগর হইতে সোনামুখী যাইবার পথে, দ্বারকেশ্বরীর অপর পারে অযোধ্যা গ্রাম; তাহারও উত্তরে পাকাল। সোনাতাপলের নিকট তপোবন নামক স্থান। সেখানে রাম-সীতার বিগ্রহ আছে; মহাবীরও আছেন। রামসাগর, অযোধ্যা, তপোবন-বেষ্টিত এই ভূভাগই হয়ত লক্ষ্মণপুরের মল্লদেশ। সে মল্লদেশের রাজধানী 'চন্দ্র-কান্তি'; মেদিনীপুরের নিকট চন্দ্রকোণা হইতে পারে। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে সুহ্মদেশের উল্লেখ আছে। সুহ্মদেশ—বর্ত্তমান দক্ষিণরাঢ়। বিষ্ণুপুরের নিকট গড়বেতায় ভীমকর্ত্তৃক বকাসুর-বধ হইয়াছিল। ময়ূরভঞ্জে ভীমের গড়, কীচক রাজার গড় আছে। বাঁকুড়ার পাকাল অঞ্চলে হয়ত পাণ্ডবদিগের কোনও শাখা বাস করিয়া থাকিবেন।

দণ্ডভুক্তি প্রদেশ মহারাজ শশাঙ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মেদিনীপুরের দাঁতন—দণ্ডভুক্তি। বাঁকুড়ার ডক্টর অবিনাশ দাস মনে করিতেন—মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণাই শশাঙ্কের কিরণ-সুবর্ণ। শশাঙ্কের সময়ের খুব কাছাকাছি জয়নাগ নামক অনৈক নরপতি কর্ণসুবর্ণের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার তৃতীয় রাজ্যবর্ষের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার বিস্তৃত অঞ্চল গোপচন্দ্র নামক একজন পরাক্রান্ত নৃপতির সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। গোপচন্দ্র, জয়নাগ কোন্ বংশীয় ছিলেন; এই ভূভাগেরই কোনও স্থানে তাঁহারা বাস করিতেন কিনা ভাবিবার বিষয়।

দেশাবলিবিবৃতির পণ্ডিত বাঁকুড়াকে 'বাদলাগ্রাম' বলিয়াছেন। হয়ত তাঁহার কলমে যেভাবে 'কুঁকড়া'—'কক্কলা' হইয়াছে, সেইভাবে 'বাঁকুড়া'ও বাদলা হই-য়াছে। কিম্বা হয়ত 'বাকুলা' পাঠভ্রমে 'বাদলা' হইয়াছে। অথবা বাঁকুড়ার পূর্ব্ব নাম হয়ত সত্যই 'বাদলা' ছিল। বাঁকুড়ায় 'বাদাল' গোপ রহিয়াছে। শুশুনিয়ার শিলালিপির চন্দ্রবর্ম্মা গোপজাতীয় ছিলেন কিনা কে জানে। বাঁকুড়ার কুদিমবতীর গড় এই চন্দ্রবর্ম্মার বংশীয় কোনও রাজার গড় নয় ত ?

ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি এই ভূমির দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

পুস্তক পরিচয়

ভারতের পণ্যতন্ত্র—শ্রীকালীচরণ ঘোষ—বিন্দুবাসিনী বাণী মন্দির, ৬নং রাজা বসন্ত রায় রোড, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬। দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৭৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০ মাত্র।

দশ বৎসর পর এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই ঘটনার মধ্যে বাঙালী শিল্পপতি ও বাঙালী ব্যবসায়ীর অনড় মনের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থমালা লিখিবার চেষ্টা না করিয়া ইংরেজী ভাষায় লিখিলে, মনে হয় অধিকতর সম্মান পাইতেন; নেতাজী নাকি এইরূপ অনুরোধই করিয়াছিলেন।

"ভারতের পণ্য"—খনিজ, তণ্ডুল ও তৈলবীজ, তন্ত্র—এই তিনখানি পুস্তকে গ্রন্থকার আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যে পরিচয় দিয়াছেন, নানা পুস্তক ঘাঁটিয়া যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তার জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন সেজন্য বাঙালী জাতি উত্তর-কালে তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। আজও আমাদের "কার্পণ্য"-দোষ দূর হয় নাই বলিয়াই এই পুস্তকত্রয়ের আদর হইতেছে না।

ইংরেজ শাসনের কল্যাণে আমাদের দেশের কোটি কোটি লোক বৃত্তি-হীন হইয়া পড়ে; এক শত পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস এই গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান পুস্তকের ৭৫ পৃষ্ঠায় যে আমদানী-রপ্তানীর হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহাই এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইংরেজ-শিল্পীর গুণে ও কৌশলে তাহা সম্ভব হয় নাই; রাজশক্তির অপব্যবহার করিয়া সে এই অঘটন ঘটাইয়াছিল। এই ধ্বংসের উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল ইংরেজের ঐশ্বর্য্য। আমাদের দেশে ইংরেজের নিজের প্রয়োজনে এই গঠন-কার্য্যের ছিটেফোঁটা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই গঠন-কার্য্যে আমাদের দেশের লোকও সহযোগিতা করিয়াছিল; তার প্রমাণও গ্রন্থকার দিয়াছেন।

আজ দেশের পুনর্গঠনের দায় আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। এই দায় মিটাইতে হইলে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা বাঙালী সংগঠক গ্রন্থকারের নানা পুস্তকে পাইবেন। এই আশায়ই পুস্তকাবলী লিখিত হইয়াছে এবং আমরাও সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়-বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর এই পুস্তক অবশ্য-পাঠ্য হওয়া উচিত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)—শ্রীসুকুমার রায়। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩, পৃষ্ঠা ৸৶+১৫৪।

মোট পনরটি অধ্যায়ে লেখক স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ (সিপাহী যুদ্ধ) হইতে জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তাক্ত কাহিনী পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সাধারণতঃ যেরূপ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া স্কুলপাঠ্য ইতিহাস লেখা হয় এ পুস্তক মোটেই সে ধরণের নহে। এতদিন পরে অবশ্য দেশের লোকের প্রকৃত ইতিহাস লেখার সুযোগ জুটিয়াছে। দেড় শত পাতায় এই বিরাট দেশের ১৮৫৭ হইতে ১৯১৭ এই ৯০ বৎসরের ইতিহাস লেখা বিশেষতঃ স্বাধীনতার ইতিহাস লেখা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু লেখক দক্ষতার সহিত এ কাজ করিয়াছেন। ওহাবী আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহের দীর্ঘ কাহিনী, দেশের রাষ্ট্রীয় চেতনার ক্রমবিকাশ, কংগ্রেস, বঙ্গভঙ্গ, অগ্নিযুগ, অনুশীলন-যুগান্তর-আত্মোন্নতি সমিতি, রাজনৈতিক ডাকাতি, গুপ্ত সমিতি, ভারত-জার্ম্মান ষড়যন্ত্র, বুড়ীবালামের যুদ্ধ কিছুই বাদ পড়ে নাই। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ইহাতে স্থান পাইয়াছে—যাহা এতদিন সহিংস আন্দোলন বলিয়া অবজ্ঞাত হইয়াছিল। সহিংস এবং অহিংস ঘটনার সমাবেশ হিসাবে উভয়ই ইতিহাসে স্থান পাইবে। কোনটা অধিক মর্য্যাদার অধিকারী ভবিষ্যতই তাহার বিচার করিতে পারে। বিখ্যাত বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। বাঙালী পাঠক মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। এইরূপ গ্রন্থ প্রত্যেক গ্রন্থাগারে স্থান পাওয়া উচিত।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ছন্দহারা—চার্ব্বাক লিখিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ২৭৪ পৃ.। গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী ১বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২। মূল্য ৩॥০।

উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে অনেক কথা ব্রিটিশ আমলে চাপা ছিল। স্বাধীনতালাভের পরে সে সব কথা ক্রমশঃ গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কাব্যে খোলাখুলি স্থান পেতে আরম্ভ করেছে। লেখক বহু ঘাটে জল খাওয়া অভিজ্ঞ লোক। রাজরোষ ছাড়াও অপরাপর শক্তি ও ব্যক্তির রোষও তাঁর উপর পড়েছে। বেশ গুছিয়ে উপন্যাসের সূত্রে মালা গেঁথে তিনি সে সব কথা পাঠকমহলে উপস্থিত করেছেন। নূতন রকম এবং উপভোগ্য বই। চার্ব্বাক ঋণ করে ঘি খাওয়ার সমর্থন করে গেছেন। আমাদের এই চার্ব্বাক ঋণ করেছেন মনে হয়, তবে ঘিটা বেশীর ভাগই অপরে খেয়েছে।

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। এ, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং। কলিকাতা ১২। মূল্য—৩৲০।

রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনায় যে স্বল্প সংখ্যক লেখক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, প্রমথবাবু তাঁহাদের একজন। তাঁহার 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ' ইতিপূর্ব্বে রসিকজনের সমাদর লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নাটিকাগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা ছয়টি অংশে বিভক্ত—গীতিনাট্য, কাব্য-নাট্য, নৃত্যনাট্য, ঋতুনাট্য, ঋতুচক্র এবং মূল কাহিনীর রূপান্তর। 'ঋতু-চক্র' অংশে স্থান পাইয়াছে 'অচলায়তন', 'বিসর্জ্জন', 'শারদোৎসব', 'ঋণ-শোধ', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী,' 'রাজা ও রাণী', রাজা, ফাল্গুনী। এই নাটকগুলির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখানে নাই। লেখক দেখাইতে চাহিয়াছেন, ইহাদের প্রত্যেকখানি নাটকে একটি বিশেষ ঋতুর সুর বাজিয়াছে। প্রমথবাবুর আলোচনা মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতি এবং আক্ষরিক ব্যাখ্যানে পরিপূর্ণ নহে, তাহাতে চিন্তা, বিচার ও রসগ্রাহিতার পরিচয় আছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সারেঙ—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। দিগন্ত পাবলিশার্স, পি-৬, মিশন রো এক্সটেনশ্যন, কলিকাতা। দাম ২৸০।

এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট গল্পগুলির মধ্যে আছে এমন কতকগুলি চরিত্র যাহারা নিত্য-দেখা হইয়াও অপরিচয়ের দূরত্বে বাস করে—যাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিমিত এবং সুখ-দুঃখের জগৎ সঙ্কীর্ণ। সরল, সমাজ-শাসনভীত, অবহেলিত এমন কতকগুলি মানুষকে আপন অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলে নূতন করিয়া লেখক প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নস্তরের জীবনে ময়লা-মাটি-ধূলা-কাদা লাগিয়াই থাকে, বাস্তববোধের দায়িত্বে সে সব পরিহার করা দুরূহ হইলেও প্রকাশভঙ্গীর সংযমে রসসৃষ্টির দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনেও লেখকের দায়িত্ব কম নয়। এই সংগ্রহে কোন কোন গল্পের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন সুষ্ঠু হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ যশোমতী গল্পটির উল্লেখ করা যায়। রিরংসা-উদ্দীপনামূলক বর্ণনায় গল্পটির অন্তর্নিহিত করুণ রস বীভৎস রসে পরিণত হইয়াছে। এ ছাড়া প্রায় সবগুলি গল্পই ভাল হইয়াছে। সারেঙ গল্পটি এই সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ গল্প। স্নেহ-বঞ্চিত একটি ছন্নছাড়া জীবনের করুণ কাহিনী অপূর্ব্ব দরদের সঙ্গে চিত্রিত হইয়াছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য মীমাংসা—বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ—৭০। শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে রসতত্ত্ব সম্বন্ধে উৎপত্তিবাদ, অনুমিতিবাদ, ভুক্তিবাদ ও অভিব্যক্তিবাদ নামে যে চারিটি বিশিষ্ট মতবাদ প্রচলিত আছে আলোচ্য পুস্তিকায় মুখ্যতঃ তাহাদের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ সাহিত্যের লক্ষণ ও সাহিত্যে অলঙ্কারের স্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রাচীন মতের বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হইয়াছে। পুস্তিকা-মধ্যে লেখকের অলঙ্কার-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়—রচনাভঙ্গী ও ব্যাখ্যান-কৌশলও প্রশংসনীয়। তবে উপজীব্য সংস্কৃত গ্রন্থের ভাব ও ভাষার আত্যন্তিক প্রভাব সাধারণ পাঠকের নিকট ইহাকে নিতান্ত দুরূহ করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অক্ষরে অক্ষরে—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র। দিগন্ত পাবলিশার্স, ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯। মূল্য ২।০।

উপন্যাস। সারদা প্রেসের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ, কিন্তু কাহিনীর জটিলতার সূত্রপাত হয় প্রকৃতপক্ষে উর্ম্মিলার ব্যর্থ প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া। নীলকমল ও উর্ম্মিলা গরীব বাপের ছেলেমেয়ে। সরিৎকুমার নীলকমলের বন্ধু—কবি এবং বড়লোকের ছেলে। ইহাকেই উর্ম্মিলা ভালবাসিল, সরিৎকুমারেরও অকুণ্ঠ সাড়া মিলিল অথচ উভয়ের মধ্যে বিবাহের প্রসঙ্গ উঠিবার সম্ভাবনা দেখা দিতেই সে আত্মগোপন করিল। উর্ম্মিলা প্রতিজ্ঞা করিল, সে বিবাহ করিবে না।

এদিকে নীলকমল উর্ম্মিলার নির্ব্বাচিত মেয়ে মণিমালাকে বিবাহ করিল এবং ভাই-বোনের মিলিত চেষ্টায় সারদা প্রেসের প্রতিষ্ঠা হইলে উর্ম্মিলা একান্তভাবে প্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করিল এবং শেষ পর্য্যন্ত প্রেস চলিল উর্ম্মিলার পরিচালনাধীনে। এমনই দিনে হঠাৎ সরিৎ দেখা দিল তার চলার পথে, উর্ম্মিলা তাকে অনাদরে বিদায় দিল।

সহসা নীলকমল যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। আর এই সুযোগে সরিৎ পুনরায় আসিয়া উর্ম্মিলার পাশে দাঁড়াইয়া প্রেসের সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিল। সরিতের সুষ্ঠু পরিচালনায় এবং মূলধন বিনিয়োগে প্রেস ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিল। একদিন উর্ম্মিলাকে সরিতের কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বলিতে শোনা গেল, "কি উপায় হবে আমার?"…সরিৎ বহু-পূর্ব্বেই বিবাহ করিয়াছে। এইরূপে ঘটনাপ্রবাহ আবার সরিৎ ও

ঊর্ম্মিলাকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। কাহিনীর পরিসমাপ্তি হইল ঊর্ম্মিলার পরিণয়ে আর তাহা তারই প্রেসের হেড কম্পোজিটার হেমন্তর সহিত।

মোটামুটি উপন্যাসখানি এই। নরেন্দ্রবাবু খ্যাতিমান লেখক, কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসখানি তেমন জমাইতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়া ঊর্ম্মিলার হেমন্তকে বিবাহের প্রস্তাব করার দৃশ্যটি অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হইল। মণিমালা-চরিত্রটি বড় ভাল লাগিয়াছে।

বিয়ের খাতা—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। সেনগুপ্ত ট্রাষ্ট, পি-৯৩, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা। দাম ২৷৷০।

উপন্যাস। ছেলের বিবাহ দিয়া যাঁহারা একই সঙ্গে অর্দ্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যালাভের স্বপ্ন দেখেন মুন্সেফ ধনগোপাল তাঁদেরই একজন। 'বিয়ের খাতা' ইঁহারই উর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রসূত। ইহাতে একের পর এক বহু মেয়ের ফটো, ঠিকুজি কুলজী, স্থানলাভ করিয়াছে, কিন্তু বছরের পর বছর অতিবাহিত হইয়া যায়, নির্ব্বাচন-সমস্যাটা উত্তরোত্তর জটিলতর হইয়া দেখা দেয়। ছেলের বয়স বাড়িয়া চলে, কিন্তু মনের মত কনে' পাওয়া যায় না। যখন বিশেষ ভাবে খোঁজ করিতে অগ্রসর হন তখন দেখা যায় ইতিমধ্যে বহু মেয়েই সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত তাড়াহুড়া করিয়া এক প্রবঞ্চকের মেয়েকে নির্ব্বাচন করিয়া বসিলেন। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়; মুন্সেফ-নন্দন অরিন্দম বিবাহ করিল অলকাকে এক অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে। অলকা তার পরিচিত এবং বাঞ্ছিত। উহাকে সে এক ঝড়ের মুখে জাহাজডুবির সময় নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া বাঁচাইয়াছিল। ঝড়ের দৃশ্যটি চমৎকার।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

দিনান্তের আগুন (নাটক)—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। প্রাপ্তিস্থান: শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—আড়াই টাকা।

যুগলক্ষণ প্রকাশ করা সমসাময়িক নাটকের একটি মস্ত বড় গুণ। দেশবিভাগের ফলে পূর্ব্ববঙ্গের এক অখ্যাত পল্লীগ্রামের হিন্দু ও মুসলমান বাসিন্দাদের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় আলোচ্য নাটক তাহারই একটি প্রতিচ্ছবি। ভীত, সন্ত্রস্ত স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীরা সম্মান ও মর্য্যাদাহানির ভয়ে পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে চলে যেতে ব্যস্ত, অপর দিকে অপরিণতবয়স্ক মুসলমানেরা ক্ষমতালাভের উল্লাসে হঠকারী এবং উত্তেজিত, কিন্তু এই দুই দলের মধ্যেও আছেন বিষ্ণু রায়ের মত জমিদার। শেষ পর্য্যন্ত গ্রামের মাটির টান ছাড়তে না পেরে তিনি গ্রামেই ফিরে এলেন। তা ছাড়া আছে করিম সর্দারের মত মুসলমান চাষী—দেশবিভাগের পরেও যার বিবেক ও শুভবুদ্ধি খণ্ডিত হয়ে যায় নি। যে বিষয়বস্তুকে উগ্র মালমশলা মিশিয়ে মেলোড্রামা করা যেত লেখক আশ্চর্য্য সংযমে সর্ব্বত্রই তার রাশ টেনে রেখেছেন। নাটক-রচনায় সংযম কম কথা নয়। চরিত্র-চিত্রণের গুণে এবং পূর্ববঙ্গীয় কথ্য ভাষার সংযোগে বিষ্ণু রায়, আইজদ্দি, পটল ডাক্তার, মেহের, করিম সর্দার, অতসী, ক্ষেমঙ্করী আমাদের সামনে সজীব হয়ে উঠে। প্রচলিত বাংলা নাটকের রুচি-পরিবর্ত্তনের দিক থেকেও 'দিনান্তের আগুন' উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গের গ্রাম্যগীতিকা নাটকের একটি বিশিষ্ট সম্পদ বলে গণ্য হবে।

অশোক (নাটক)—শ্রীমন্মথ রায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমন্মথ রায় রচিত যে কয়খানি নাটক বাংলা নাট্য-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, "অশোক" তাহাদের অন্যতম। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র থেকে সুরু করে দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং অপরেশচন্দ্র পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তর-বৈচিত্র্য সত্ত্বেও পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকরচনায় মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র দেখতে পাওয়া যায়—মন্মথ রায়ে এসেই তার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা দিল। বাস্তব জগতের ঘটনাকে মঞ্চ প্রাধান্য না দিয়ে—তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের অন্তর্লোকে যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়—মনোজগতের সেই তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকেই মন্মথ রায় তাঁর নাটকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছেন। এই কারণেই পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত তাঁর নাটকগুলির আবেদন আধুনিক মনের কাছে আজও অক্ষুণ্ণ এবং অব্যাহত আছে। আর একটি জিনিষ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়—মন্মথ রায়ের ভাষা। অশোক নাটকে তার চরম স্ফূর্ত্তি লক্ষণীয়। গুরুগম্ভীর শব্দযুক্ত ওজস্বিনী ভাষা নয়, অলঙ্কারের ভারে অবনত আবৃত্তিধর্ম্মী দীর্ঘ সংলাপ নয়—ছোট ছোট, সহজ অথচ সুরময় কথার সাহায্যে চরিত্রচিত্রণের এই পদ্ধতি, মন্মথ রায়ের সম্পূর্ণ নিজস্ব। রণপিপাসু চণ্ডাশোক কেমন করে ধর্ম্মাশোকে পরিণত হলেন, কেমন করে তথাগতের শরণ নিলেন—তা নানা ঘটনা-সংঘাত ও বিচিত্র নাটকীয় মুহূর্ত্তের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে "অশোক" নাটকে পশুশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর শক্তি অশোকের মনে প্রভাব বিস্তার করছে, ক্রমশঃ তিনি "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" মন্ত্রে অভিভূত হয়ে পড়ছেন—মানসিক দ্বন্দ্বের এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে গুপ্তশত্রুভীত অশোক গভীর নিশীথে ঘুমের ঘোরে তাঁরই আহ্বানে দর্শনার্থিনী প্রী দেবীকে হত্যা করলেন। অশোকের জীবনের ট্রাজেডি তাঁর মনোজগতে বিপ্লব সৃষ্টি করলে। সিচুয়েশন সৃষ্টির নৈপুণ্য যে কত উচ্চ স্তরে উঠতে পারে, এই একটি ঘটনাই তার।। নাটক-রচনায় মন্মথ রায় যে নব রীতির প্রবর্ত্তন করেছেন—আঙ্গিক-নৈপুণ্য এবং সংলাপের মাধুর্য্যে অশোক তার মধ্যমণি হয়ে থাকবে।

গজকচ্ছপ (নাটক)—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী। প্রকাশক: শ্রীকমলকৃষ্ণ গুপ্ত। ১৯৪বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। সম্পত্তি লইয়া ভ্রাতৃবিরোধের সেই পুরণো বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন করিয়া রচিত একখানি মামুলি নাটক। লেখকের 'জয়হিন্দ' নাটকে যে শক্তির পরিচয় ছিল, বিষয় বস্তু বা দৃষ্টিভঙ্গী কোনো দিক হইতে এই নাটকে তদনুরূপ পরিচয় খুঁজিয়া পাইলাম না।

আমার নাটক (উপন্যাস)—শ্রীহরি কাব্যতীর্থ। আলবার্ট লাইব্রেরী, নবাবপুর, ঢাকা। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

লেখক প্রথমেই নিবেদন করেছেন,"বইয়ের মত বই নিয়ে, জনসমাজের সামনে দাঁড়ানোর যোগ্যতা আমার নেই।...আমার এই বইখানার ছাপা-খরচ ভিন্ন সমস্ত বিক্রীর টাকা আমি দাঙ্গা-বিধ্বস্ত আমার ভারতীয় ভাই-বোনদের দিব।"

লেখকের উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই সাহিত্য রচনা করা চলে না। আন্তরিকতা এবং আবেগের প্রাবল্যই সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়। সার্থক সাহিত্য-রচনা শক্তিসাপেক্ষ। বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক মনের আবেগে শুধু কথার জাল বুনিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে না আছে গল্পের বাঁধুনি, না বর্ণনার আকর্ষণ। নিজের অভিজ্ঞতা অথবা অন্তর্গূঢ় সহানুভূতির রসরূপকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিলে—তবেই তা রসোত্তীর্ণ হয়। দুঃখের বিষয়—লেখকের সেই ক্ষমতার কোন চিহ্নই এই বইয়ে নাই।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

ক্যাপ্টেন সিকদার— শ্রীকালিদাস কাঞ্জিলাল। প্রাপ্তি-স্থান—রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন, পৃ. ২৩৭। মূল্য ৪৲

অভিমান যে প্রেমকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিতে পারিত তাহাই শেষে এক বিদেশী মেয়ের আত্মত্যাগে সফল হইয়া উঠিয়াছে। নায়ক বারীন সিকদার সৈনিকের কাজ গ্রহণ করিয়া বিদেশে নিজের জীবন লইয়া খেলা করিতে গিয়াছিল, সেখানে এক ইন্দোনেশীয় মেয়ে তাহাকে ভালবাসিয়াছিল এবং সেই মেয়েই নিজের প্রেমাস্পদের দিকে চাহিয়া তাহাকে তাহার দয়িতার হাতে তুলিয়া দিয়া চরম দুঃখ বরণ করিয়া লইল। লেখক নূতন হইলেও নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

ব.

শ্রীধাম শান্তিপুর—শ্রীচণ্ডীচরণ দে। নীলমণি লাইব্রেরী, শান্তিপুর। পৃঃ ৪৫, মূল্য—া৶৹

আমাদের দেশে গাইড-বুক নাই বলিলেই হয়। সে হিসাবে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি একটি অভাব মোচনের চেষ্টা করিয়াছে বটে, কিন্তু গ্রন্থকার আর একটু চেষ্টা করিলে ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে পারিতেন। যেমন শান্তিপুরের বস্ত্র-শিল্পের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা আরও বিশদ ও চিত্তাকর্ষক করিতে পারিতেন। শান্তিপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কথা বলিতে গিয়া ৬।৭ মাইল দূরবর্তী বাগআঁচড়া গ্রামের চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু ঐ গ্রামেরই উজ্জ্বল রত্ন ৺বৈদ্যনাথ বসু (যিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন), বা তাঁহার পুত্র রায় বাহাদুর হেমচন্দ্রের কথা বলেন নাই। ঐ বংশেরই অধুনালুপ্ত বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলের সর্বপ্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার রায় সাহেব যতীন্দ্রনাথ বসুর কথাও উল্লেখ করেন নাই। ঐ গ্রামের হেমন্তকুমার সরকারের অনুল্লেখ আমাদের পীড়া দিয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা সম্বন্ধে এত কথা লিখিলাম এই জন্য যে, যাঁহারা এই শ্রেণীর পুস্তক লিখিবেন তাঁহারা যেন একটু যত্ন করিয়া স্থানীয় তথ্য সংগ্রহ করেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

(১) ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ— শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২) ভারতের অধ্যাত্মবাদ— শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম

(৩) শিশুর মন— শ্রীসুখেনলাল ব্রহ্মচারী।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রত্যেকটির মূল্য—।৹

বাৎস্যায়ন-রচিত কামসূত্রের টীকাকার জয়পুরের সভাপণ্ডিত যশোধর স্বরচিত জয়মঙ্গল টীকায় কামসূত্রে উল্লিখিত আলেখ্যের ছয় অঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের শিল্পীগণ চিত্রের ষড়ঙ্গের সহিত পরিচিত ছিলেন। চীন ও জাপানের চিত্রশাস্ত্রে বর্ণিত ষড়ঙ্গের সহিত ভারতের ষড়ঙ্গের প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়, সুতরাং অনুমান করা কঠিন নয় যে, বৌদ্ধ শিল্পপদ্ধতি ও তাহার সহিত হিন্দু চিত্রের ষড়ঙ্গও চীনদেশে নীত হয়। এই ষড়ঙ্গ হইতে আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ চিত্রের প্রাণস্বরূপ ছন্দ ও রস নামক আর দুইটি অঙ্গের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শিল্পীর প্রকাশ-বেদনা বা উদয়-বাসনা ছন্দে সংবদ্ধ হইয়া রসের সাহায্যে কিরূপে আত্মা হইতে চিত্রে এবং চিত্র হইতে আত্মান্তরে সঞ্চারিত হয়, অনুপম ভাষায় শিল্পাচার্য্য তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

'ভারতের অধ্যাত্মবাদে' প্রকৃত হিন্দুধর্ম কিরূপ উদার ও ভারতের অধ্যাত্মদৃষ্টি সকল প্রকার বাধা-নিষেধ ভেদজ্ঞান ও সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কিরূপ সম্প্রসারিত ও মহিমান্বিত ছিল, গ্রন্থকার অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ প্রধানতঃ এই তিনটি সাধনপদ্ধতিই হিন্দুশাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে এবং সাধকগণ কর্তৃক অনুসৃত হইয়াছে। অধিকারীভেদে জ্ঞান, কর্ম্ম বা ভক্তিবাদকেই কেহ কেহ পরমার্থ বা মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাধনমার্গে এই তিনটির মধ্যে কোনটিরই মাহাত্ম্য অপরটি হইতে ন্যূন নহে। নিষ্কাম কর্ম্ম, অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান ও পরম প্রেমরূপ ভক্তি বিশ্বসভ্যতায় ভারতেরই নিজস্ব দান, বিশ্বের সহিত আত্মীয়তার যোগসূত্র স্থাপনই ভারতীয় দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এ বিষয়ে ভারতের নিকট জগতের অন্যান্য জাতির অনেককিছু শিখিবার আছে।

'শিশুর মন' লইয়া আলোচনা বর্ত্তমান যুগে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অপরাধতত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব ও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে আজকাল এই শিশু-মনস্তত্ত্ব এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। অতি শৈশবকাল হইতে শিশুগণকে যথোচিতভাবে পালন ও শিক্ষা না দিলে উত্তরকালে তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক চরিত্রের কিরূপে উৎকর্ষ বা অবনতি ঘটে, সহজ ভাষায় নানাদিক দিয়া গ্রন্থকার তাহাই সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

'বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত এই বইগুলি পড়িয়া জিজ্ঞাসু পাঠক অনেককিছু শিখিতে ও জানিতে পারিবেন।

ছোটদের রামায়ণ কথা—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু। দেশবন্ধু বুক ডিপো, ৮৪-এ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬। ১০৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲

সংক্ষেপে ছোটদের জন্য সাতকাণ্ড রামায়ণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষের দিকে গ্রন্থকার দশানন রাবণ বধের পরে অদ্ভুত রামায়ণের সহস্রানন রাবণ বধের কাহিনী শুনাইয়া রামায়ণের কথা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। উত্তরকাণ্ডে বাল্মীকির সঙ্গে লবকুশের রামায়ণ-গান, সীতার পাতালপ্রবেশ, লক্ষ্মণবর্জ্জন ও রামচন্দ্রের সরযূ জলে দেহত্যাগের বর্ণনা সুন্দর হইয়াছে। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সমগ্র কাহিনী এত স্বল্প-পরিসরের মধ্যে বর্ণনা করিয়া গ্রন্থকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

লেখকের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর। কয়েকটি রেখাচিত্র পুস্তকখানিকে আকর্ষণীয় করিয়াছে।

টুনটুনি আর ঝুনঝুনি—মৌমাছি—বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট। কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

টুনটুনি আর ঝুনঝুনি মৌমাছি-রচিত শিশুদের উপযোগী যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত একটি গল্পের বই। ভূমিকায় লেখক তাঁর ছোট বন্ধুদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"আমার ছোটবেলায় অমলিন স্মৃতি ও স্বপ্নকেই—মায়ের মুখের মিষ্টি ভাষায় শোনাবার চেষ্টা করেছি তোমাদের কাছে।" ছোট মেয়ে ঝুনু মায়ের বুকে শুইয়া স্বপ্ন দেখিল সে, যেন টুনটুনি পাখীর সঙ্গে কোন্ অজানা দেশে উড়িয়া চলিয়াছে। তাহার সেই স্বপ্নলোক-বিহারই কাহিনীটির বিষয়বস্তু। লেখকের ভাষার একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, সেই জন্য গল্পটিতে খাঁটি রূপকথার আমেজ লাগিয়াছে। শিশুদের আহার-নিদ্রা ভুলাইয়া দিতে পারে বাস্তবিক এমনি চমৎকার গল্পটি—অথচ ইহাতে কেমন করিয়া শুঁয়াপোকা হইতে প্রজাপতি হয়, কেমন করিয়া ফুল ফোটে, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আসলে কি—ইত্যাদি কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্যও সরস করিয়া পরিবেশন করা হইয়াছে। বইখানির বহিঃসৌষ্ঠবও অনবদ্য, শিশুদের পক্ষে রীতিমত লোভনীয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপাখ্যান—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। এ. মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী। ২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা

পুস্তকখানিতে গল্পচ্ছলে দেবীমাহাত্ম্য বা শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপাখ্যান সংক্ষেপে আদ্যোপান্ত বর্ণিত হইয়াছে। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, উপাখ্যানের মর্য্যাদা ও গাম্ভীর্য্য রক্ষার জন্য তিনি এই পুস্তিকার ভাষা একেবারে শিশুপাঠ্য না করিয়া সাধারণ পাঠক-পাঠিকার উপযোগী করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। যাঁহাদের পক্ষে মূল সংস্কৃত চণ্ডী পড়া সম্ভবপর নহে তাঁহারা এই পুস্তিকা হইতে চণ্ডীর গল্পাংশ মোটামুটি জানিতে পারিবেন। ভাষা একটু গুরুগম্ভীর হইলেও কাহিনীটি অনুধাবন করিতে শিশু পাঠক-পাঠিকার অসুবিধা হইবে না। প্রচ্ছদপটে অসুরনিধনরত চণ্ডীর ছবিটি চমৎকার।

যৌবনের ডাক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত। জেনারেল লাইব্রেরী—১১৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য আড়াই টাকা

বাজারে যৌনতত্ত্ববিষয়ক পুস্তকের অভাব নাই। কিন্তু বর্ত্তমান পুস্তকের একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়িল। সমাজের কল্যাণ-কামনাই লেখককে এই পুস্তক রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে। সেইজন্য অত্যন্ত সংযতভাবে তিনি বিষয়টির আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক। প্রাচীন ভারতীয় কামশাস্ত্র এবং আধুনিক যৌন-বিজ্ঞান—এ দুয়ের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি বইখানি লিখিয়াছেন। লেখকের ভাষাটি বেশ ঝরঝরে; সরস করিয়া লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে—সেজন্য এই জটিল তথ্যপূর্ণ বইখানি বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। নর-নারীর প্রণয়-লীলার বর্ণনা কোন কোন জায়গায় এত মধুর হইয়াছে যে তাহা পড়িয়া রস-সাহিত্য পাঠের আনন্দ পাওয়া যায়। প্রচ্ছদপটের ছবিটি কিন্তু সুরুচির পরিচায়ক নহে। উহা দেখিয়া পুস্তকখানি সম্বন্ধে পাঠকের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে।

মেয়েদের জন্য—কুলবাসী। প্রকাশিকা—শ্রীমায়া মল্লিক। ৩৮।১।১১এ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১৷৹।

আঠারটি নিবন্ধ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। বিদেশী লেখকদের রচনা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিলেও লেখিকা এই পুস্তকে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়াছেন। বিষয়গুলি অধিকাংশই মনস্তত্ত্বমূলক। প্রকাশভঙ্গীতে জটিলতা নাই, ভাষার আড়ষ্টতা কোথাও বক্তব্যকে অস্পষ্ট করিতে পারে নাই। লেখিকার কোন কোন মন্তব্যের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত না হইলেও স্বীকার করিতে দ্বিধা নাই যে, তিনি বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিতা ও স্বাবলম্বিনী তরুণীদের ব্যক্তিগত জীবনের বিবিধ জটিল সমস্যার সমাধানের পন্থা নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বইখানি দরদ দিয়া লেখা এবং লেখিকার আন্তরিকতার পরিচয় ইহার সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট। মেয়েমহলে এ ধরণের পুস্তকের বহুল প্রচার হওয়া আবশ্যক।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ছড়ার ছবি—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্কলিত ও শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রিত। শিশু-সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

বিলাতে ছাপা শিশুপাঠ্য ইংরেজী বই ছবিতে ভরপুর দেখিয়াছি। দেখিয়া দুইটি কথা মনে হইয়াছে। প্রথমতঃ শিশুদের প্রতি এমন যত্ন জাতির উৎকর্ষের একটি প্রমাণ, দ্বিতীয়তঃ কেবলই মনে হইয়াছে আমাদের দেশের জাতির ভবিষ্যৎ শিশুদের প্রতি কবে আমরা সজাগ হইতে ও প্রকৃষ্ট যত্ন লইতে শিখিব। আলোচ্য পুস্তকখানি হাতে পাইয়া বাস্তবিকই মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। আমাদের শৈশবকালীন শেখা ছড়াগুলি এমন সুন্দরভাবে চিত্রে রূপায়িত হইয়াছে যে, তাহা শিশুমনকে তো আনন্দদান করিবেই, বয়স্কেরাও এগুলি দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। আমাদের সুপরিচিত পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ লইয়া ছড়া কাটা। চিত্রে প্রত্যেকটি ছড়ার সঙ্গে পরিচিত-অপরিচিত জীবজন্তুর আকৃতি শিশুরা নব বেশে দেখিতে পাইবে, দেখিয়া আনন্দ পাইবে। হাতী-ঘোড়া, বিড়াল-কুকুর, সাপ-ব্যাঙ, মাগুর-কাতলা, গরু-পিঁপড়ে, কাক-ফড়িং প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীর চিত্র থাকায় ছড়াগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ সুচিত্রিত শিশুপাঠ্য বইয়ের অভাব দূরীকরণে প্রয়াসী হইয়া শিশু-সাহিত্য সংসদ সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দেশ-বিদেশের কথা

শান্তিনিকেতনে বিশ্বশান্তিবাদী সম্মেলন

গত ১লা ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে আম্রকুঞ্জে বিশ্বশান্তিবাদী সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। পৃথিবীর ৩৩টি দেশের প্রায় ৭০ জন প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং ভারতরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য-সচিব রাজকুমারী অমৃত কাউর সভানেত্রীর পদে বৃত হন। বিশ্বভারতীর কর্ম্মসচিব শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দকে সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলে পর সম্মেলনের উদ্যোগ-পরিষদের সভাপতি মিঃ হোরেস আলেকজাণ্ডার প্রতিনিধিদের সভ্য-মণ্ডলীর সহিত পরিচিত করাইয়া দেন।

বিশ্বশান্তিবাদী সম্মেলনে উদ্বোধন বক্তৃতারত পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু

শান্তিনিকেতনে শান্তিবাদী সম্মেলনের অনুষ্ঠান সপ্তাহাধিককাল ব্যাপিয়া চলে। প্রতিনিধিগণ পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হইয়া মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহার কর্ম্ম-সাধনার কথা আলোচনা করেন। সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে ইহার চেয়ারম্যান শ্রী সি. রামচন্দ্রন বলেন—"রবীন্দ্রনাথ বিশ্বশান্তির অগ্রদূত, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর আর কোনো ব্যক্তি যখন বিশ্বসমস্যা সমাধানের কোনো উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই তখন রবীন্দ্রনাথই প্রথম শান্তির বাণী প্রচার করেন।"

১০ই ডিসেম্বর কলিকাতায় এই সম্মেলনের একটি অধিবেশন হয়।

নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত

বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত গত ২৮শে নবেম্বর হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরে পরলোকগমন করিয়াছেন। বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে ১৯০০ সনে নলিনীভূষণের জন্ম হয়। বাংলা ও ইংরেজীতে এম-এ ও অনার্স সহ বি-টি পাস করিবার পর তিনি জলপাইগুড়ি কৰীন্দ্র দেব ইনষ্টিটিউশনে সহকারী প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন, শেষে গৌহাটির বেঙ্গলী হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদলাভ করেন এবং দীর্ঘকাল এই কার্য্যে ব্রতী থাকেন। গৌহাটিতে তিনি আর. এইচ. গার্লস কলেজেও অধ্যাপনা করিতেন।

শিশুদের উপযোগী গল্প কবিতা রচনায় নলিনীবাবু সিদ্ধহস্ত ছিলেন। শিশুসাহিত্যে তাঁহার খ্যাতি আছে। বার্ষিক শিশুসাথী ও অন্যান্য শিশুপাঠ্য নানা পত্রিকায় তাঁহার অনেক গল্প, কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। "বুলবুল", "ভূতের যুদ্ধ" প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিয়া তিনি বাংলা শিশুসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন। নলিনীবাবু অত্যন্ত সরল, অমায়িক, সদালাপী ও নিরহঙ্কার লোক ছিলেন।

নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

রসরাজ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

জন্ম ২৩শে জানুয়ারী ১৮৯৭

"ন অস্য ক্রোধঃ প্রসাদশ্চ নিরর্থোঽস্তি কদাচন।"
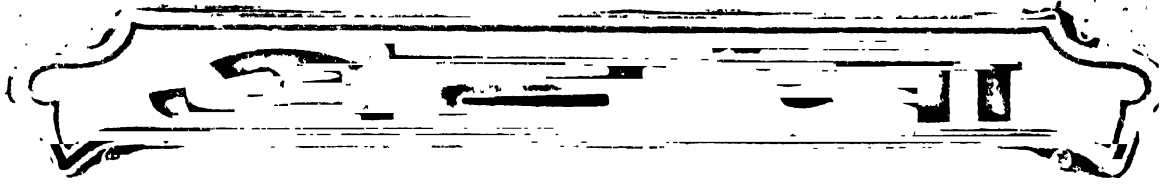
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৯শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৫৬

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ। প্রগতি বা অধোগতি ?

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি যেরূপ ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারেরও টনক নড়িয়াছে। উপরন্তু এখন পাকিস্থানের কয়লা বন্ধ হওয়ার অন্য কতকগুলি অনির্দ্দিষ্ট এবং গণনা ও বিচারের অতীত অঙ্ক ঐ পরিবেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা বহু দিন যাবৎ এইরূপ পরিস্থিতির কারণ ও প্রতিকারের বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া আসিতেছি। অন্যান্য সংবাদপত্রেরও কিছুদিন যাবৎ অল্পে-স্বল্পে সুর বদলাইতেছে দেখিতেছি। কিন্তু প্রতিকারের মূল সূত্রের খোঁজ এতদিন করার কোনও বিশেষ প্রচেষ্টা আমরা দেখিতে পাই নাই। এবার দেশের কর্ণধারদিগের অন্যতম সর্দ্দার প্যাটেল স্বয়ং খোঁজ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার এই উদ্যোগের ফল কি হইবে তাহা এখন হইতেই বিচার করা অনুচিত, সুতরাং আমরা সে বিষয় এখন স্থগিত রাখিলাম। অদ্যাবধি তাঁহার সহিত স্থানীয় ব্যক্তিগণের যে আলোচনা হইয়াছে এবং তাঁহার এখানে বিচারের ক্রম ও সূচী বিষয়ে দৈনিক সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। আমরা ইহা হইতে এইটুকু তথ্যই পাইতেছি যে, এখনও রোগ নির্ণয় পর্ব্বই চলিতেছে। অবশ্য বিকারের প্রকৃত কারণ নির্ণীত হইলে প্রতিকার সম্ভব হইতেও পারে :

সহকারী প্রধানমন্ত্রী কলিকাতায় পৌঁছিবার পর ১২ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহার সহিত লাটভবনে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া এই প্রদেশের বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল এই আলাপ-আলোচনা চলে এবং এই সময় অন্যান্য বিষয়সহ প্রদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার প্রশ্ন, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের পরিস্থিতি ও উদ্বাস্তু সমস্যাগুলিও আলোচিত হয় বলিয়া প্রকাশ। ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জিও ঐ আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সহকারী প্রধান মন্ত্রী ৪ দিন এখানে অবস্থান করিবেন এবং এই কয়দিবস তাঁহার স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থাসত্ত্বেও সর্দ্দারজী প্রদেশের বিভিন্ন স্বার্থ, দল ও জনমতের বহুসংখ্যক প্রতিনিধির সহিত প্রদেশের বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিবেন।

ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল শুক্রবার সকালে লাটভবনে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কর্ম্ম-পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পরিষদ দলের এক যুক্ত সভায় মিলিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ধরিয়া এই সভা চলে।

জানা গিয়াছে যে, সর্দ্দার প্যাটেল কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া ঐক্যবদ্ধ হইতে আহ্বান জানাইয়াছেন। প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস কর্ম্মিগণ জনসাধারণের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন না ; এ কারণ দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যদি ঐক্যবদ্ধ না হন, তাহা হইলে দেশের সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টিকারিগণও অসৎ কার্য্যের সুবিধা পাইবে।

আরও জানা গিয়াছে যে, সর্দ্দার প্যাটেল কম্যুনিষ্ট উৎপাতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই উৎপাত দমন করিতে হইলে কংগ্রেস কর্ম্মিগণের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া একান্ত দরকার। তাঁহাদের ঐক্যের দ্বারা কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিতে না পারিলে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না।

প্রকাশ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এই চার জন নেতা একত্রিত হইলেই পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে বলিয়া জনৈক সভ্য এই সভার পরামর্শ দান করেন। অপর একজন সভ্য বলেন যে, কেবলমাত্র নেতৃবৃন্দ মিলিত হইলেই চলিবে না ; মাঝে মাঝে কংগ্রেস কর্ম্মপরিষদ,

পরিষদ দল এবং জেলা কংগ্রেসসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ একত্র মিলিত হইয়া আলোচনা দ্বারা সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারিলে আরও ভাল হয়।

জানা গিয়াছে যে, সর্দ্দার প্যাটেল কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে নিজেদেরই তাঁহাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্ত সুবিধাজনক কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করিতে বলেন। বাহিরের কেহই তাঁহাদের সমস্তা সমাধানের পথ বাংলাইয়া দিবে না বলিয়া তিনি জোর দিয়া বলেন। প্রকাশ যে, সর্দ্দার প্যাটেলের আবেদনক্রমে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিরোধের মীমাংসার উপায় উদ্ভাবনের জন্য একত্র মিলিত হইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

সর্দ্দার প্যাটেল বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের নিকট শহরের বর্ত্তমান গোলযোগসমূহ দমনের জন্ত জনমত গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

জানা গিয়াছে যে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই সময়ে বিভিন্ন মহল্লায় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া বিশেষ পুলিশবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা উপস্থিত করেন।

প্রকাশ যে, আলোচনাকালে কয়েকজন নাগরিক বর্ত্তমান গোলযোগের কারণ সম্পর্কে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করিতে যাইয়া বেকার সমস্তা, অর্থনৈতিক মন্দা, শাসনকার্য্যে যোগ্যতার অভাব ও দুর্নীতি, সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগের স্বল্পতা প্রভৃতিকে বর্ত্তমান অসন্তোষের মূল কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহারা এই সকল ত্রুটি সংশোধনের জন্ত বলেন এবং তৎসহ সরকারকে সহযোগিতা দান করার প্রতিশ্রুতি দেন।

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল শুক্রবার অপরাহ্নে লাটভবনে কলিকাতার ছাত্র, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কলিকাতার অবস্থা এবং তাঁহারা ইহার প্রতিকারের জন্ত কোন পরিকল্পনায় অগ্রসর হইতে পারেন কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করেন।

জানা গিয়াছে যে, সর্দ্দার প্যাটেল ছাত্রদের নিকট জানিতে চাহেন অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টিকারীদের দমনের জন্ত তাহারা কি করিতে পারে। সরকারকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দিয়া তাহারা বর্ত্তমান শিক্ষানীতির কয়েকটি ত্রুটি সম্বন্ধে সর্দ্দারজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাত্রেরা তাঁহার নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করিয়া তাহাতে শিক্ষানীতির ত্রুটি সংশোধনের একটি পরিকল্পনা দেয় এবং ছাত্র-উদ্বাস্তু সমস্তার উল্লেখ করে। শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ নগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্যধিক ভীড়ের কথা উল্লেখ করিয়া জানান যে, ইহাতে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটিয়াছে।

কংগ্রেস কমিটি গঠনে অভিযোগ

পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিরুদ্ধে ভুয়া সদস্ত সংগ্রহ এবং মহকুমা কংগ্রেস কমিটি গঠনে স্বেচ্ছাচার সম্বন্ধে অভিযোগ হইতেছে। কংগ্রেসের সদস্ত সংগ্রহে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ, টেলিফোন গাইড, ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপালিটি প্রভৃতির ভোটার তালিকা নকল করিয়া "সদস্ত-সংগ্রহ" এবং তাহাদের চারি আনা চাঁদা স্বার্থসংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ মেজরিটি হাতে রাখার রেওয়াজ কংগ্রেসে নূতন নয়। উহা দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতেছে বলিয়া কংগ্রেসের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত শিথিল হইয়া গিয়াছে। আগে তবু একটা অসুবিধা ছিল যে, শুধু নাম লিখাইলেই হইত না, চারি আনা হিসাবে পয়সাটাও দিতে হইত বলিয়া জালিয়াতীর একটা সীমা থাকিত। এখন সে অসুবিধা উঠিয়া গিয়াছে। দুই বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে কংগ্রেসের বর্ত্তমান গঠনতন্ত্রের খসড়া যখন বেফাঁস হইয়া যায় তখনই আমরা মডার্ণ রিভিয়ুতে লিখিয়াছিলাম যে এবার কংগ্রেসের দুর্নীতি নিরঙ্কুশ হইবে, একনায়কত্বের রাজপথ বাঁধাইয়া দেওয়া হইবে। দেখা যাইতেছে তাহাই ঘটিয়াছে।

যে সমস্ত স্থানে সরকারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কংগ্রেস-নেতারা কর্ণধার সেখানে সদস্ত-সংগ্রহ কি ভাবে হইতেছে বর্দ্ধমানের পত্রিকা "দৃষ্টি"র সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে তার এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়,—"কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্ত-সংগ্রহ শেষ হইয়াছে; উপযুক্ত ও সক্রিয় সদস্ত সংগ্রহ হইতেছে। প্রাপ্ত সদস্ত তালিকা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় একই ব্যক্তির নাম একাধিক তালিকায় স্থান পাইয়াছে; একই হস্তে বহু লোকের নাম সহি হইয়াছে, টিপসহিও যথেষ্ট আছে। একই ব্যক্তি যে বহু লোকের নাম সহি করিয়াছে তাহা প্রমাণ করাও দুষ্কর হইবে না। চারি আনা হিসাবে বার্ষিক চাঁদা লইয়া যখন প্রাথমিক সদস্ত সংগ্রহ হইত তখন জনসাধারণের মধ্যে যে উৎসাহ ও সাড়া পাওয়া যাইত এবার তাহা আদৌ মিলে নাই। বহু স্থানে সিমেণ্ট, লোহা ও চিনির প্রলোভন দেখাইয়া, স্থানে স্থানে সরকারের ভয় দেখাইয়া বহু লোককে কংগ্রেস-সদস্ত করা হইয়াছে এবং ব্যক্তিগত প্রভাবের সুযোগ লইয়াও শুধু সহি বা টিপ সহি দাও বলিয়াও সভ্যতালিকা পূরণ করা হইয়াছে। জীবিত বা মৃত সে বিষয়ে কোন পরখ না করিয়াও শুধু ইউনিয়ন বোর্ড বা মিউনিসিপালিটির ভোটার তালিকা নকল করিয়াই কংগ্রেসের প্রাথমিক ভোটার-তালিকা প্রস্তত করা হইয়াছে। স্বেচ্ছায় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা কংগ্রেসের সভ্য হইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা তুলনায় স্বল্প। কংগ্রেসের যাঁহারা সভ্য হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মুসলমান, তপশীল, আদিবাসী ও নারীর স্থান উচ্চে। সজ্ঞানে কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী হইয়া যদি তাঁহারা কংগ্রেসে যোগদান করিতেন তাহা হইলে কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, জনসাধারণের উপর্য্যুক্ত

অংশগুলি ভয় ও অজ্ঞতার জন্য কুখ্যাত। তাঁহাদের ভয় ও অজ্ঞতার উপর কংগ্রেসকে বসাইবার প্রচেষ্টা বহু ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট। কংগ্রেসের আদর্শ ও গঠনতন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া সভ্য সংগ্রহের চেষ্টা স্বল্প ক্ষেত্রেই হইয়াছে। এখন কংগ্রেসের সভ্য হইলেও সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাইবেন একথাও বহু ব্যক্তি বলিয়াছেন।"

সিমেণ্ট লোহা চিনি প্রভৃতির পারমিট দিয়া এবং সরকারী অনুগ্রহ ও ভয় দেখাইয়া সদস্য-সংগ্রহের ক্ষমতা যে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গীয় কংগ্রেস-নেতার আছে এই গেল তাঁহাদের কার্য্য-পদ্ধতি। যাঁহারা সে ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন কিন্তু কংগ্রেসের খাতাপত্র হাতে রাখিতে পারিয়াছেন তাঁহারা কি করিতেছেন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কালা ভেঙ্কট রাও কর্ত্তৃক ২০শে ডিসেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির জেনারেল সেক্রেটারীকে লিখিত নিম্নলিখিত পত্র তাহার প্রমাণ :

"অমৃত বাজার পত্রিকায় গত ৭ই ডিসেম্বর মহকুমা কংগ্রেস কমিটিসমূহের ঠিকানা এবং সেক্রেটারীদের নামের যে তালিকা আপনারা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অনেক নাম ও ঠিকানা আপনাদের খুসী মত বসানো হইয়াছে বলিয়া আমাদের নিকট অনেক অভিযোগ আসিয়াছে। একটি অভিযোগের কথা বলিতেছি। ১০ই আগষ্ট তারিখে আপনার স্বাক্ষরে এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির শীল-মোহরে আসানসোল মহকুমা কংগ্রেস কমিটিকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সেক্রেটারীর নাম আছে শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ঘোষ। কিন্তু অমৃত বাজারে প্রকাশিত তালিকায় ঐ কমিটির সেক্রেটারীর নাম আপনি দিয়াছেন ডাঃ অনাথ কুমার ভট্টাচার্য্য। বারাকপুর, বর্দ্ধমান সদর, নদীয়া এবং বনগাঁ মহকুমা কংগ্রেস কমিটিসমূহ হইতেও ঐরূপ অভিযোগ পাইয়াছি। অভিযোগগুলি আমি এই সঙ্গে পাঠাইলাম। যে ভাবে আপনারা ঠিকানা এবং নাম বদল করিয়াছেন সেরূপ করিবার কোন অধিকার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নাই। ফেরত ডাকে অভিযোগগুলি সম্বন্ধে আপনাদের বক্তব্য জানাইবেন; নচেৎ আমরা এক তরফা আদেশ দিতে বাধ্য হইব। আর একটি কথা, কলিকাতার ন্যায় যে সমস্ত স্থানে মহকুমা কংগ্রেস কমিটি নাই, সেখানে মহকুমা কংগ্রেসের দায়িত্ব জেলা কংগ্রেস কমিটিতে অর্শিবে। কোন অন্যথা না করিয়া এই নির্দ্দেশ পালন করিবেন।"

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ কংগ্রেস দখল করার জন্য পাইকারী ভাবে ভুয়া সদস্য সংগ্রহ এবং অজানা সেক্রেটারী নিয়োগ করাইয়াছেন যাহাতে তাঁহাদের কুৎসিত পরিকল্পনা আগেকার মতই চলে।

পশ্চিমবঙ্গে ধান সংগ্রহ

গত ২৯শে নবেম্বর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যচাষী সম্মেলন হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পা এবং ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ সেখানে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দুই জনের বক্তৃতা লইয়া বিলক্ষণ উত্তেজনা এবং বাদবিতণ্ডা হইয়াছে। একটা ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পা এবং ডাঃ ঘোষ দু'জনেই খাদ্যচাষীদের এই বলিয়া উত্তেজিত করিতেছেন যে, তাহারা দুই বৎসরের ধান মজুত রাখুক, ধানের দাম সরকারের পরিবর্ত্তে চাষীরা ঠিক করুক এবং দরে না পোষাইলে সরকারকে ধান দেওয়ার পরিবর্ত্তে তাহারা scorched earth policy অনুসারে ধান পোড়াইয়া ফেলুক। দেশের বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কটের দিনে এই ধরণের পরামর্শ স্বভাবতঃই উত্তেজনার সৃষ্টি করিবে। গত ১লা জানুয়ারীর হরিজনে শ্রীযুক্ত মশরুওয়ালা এ বিষয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন :

"কলিকাতার ২৯শে নবেম্বরের সভায় শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পার বক্তৃতার রিপোর্ট আমার এক বন্ধু আমাকে পাঠাইয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পা চাষীদের পরামর্শ দেন, 'গবর্ন্মেণ্ট যদি তাহাদের স্বার্থ না দেখিয়া কেবল উৎপাদন বাড়াইতে বলেন তবে তাহাদের ফসল যাহাতে গবর্ন্মেণ্টের হাতে না পড়ে তার জন্য পোড়া মাটির নীতি অনুসরণ করা উচিত।' ডাঃ কুমারাপ্পার এই scorched earth policy শ্রীযুক্ত সুরেশ দাশ, শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর মিত্র এবং শ্রীযুক্ত সুধীর নিয়োগীর খুব ভাল লাগে। ডাঃ ঘোষ সরকারের নীতির সমালোচনা করেন এবং চাষীদের ঐক্যবদ্ধ হইতে বলেন। তিনি তাহাদিগকে সরকারের নিকট হইতে ন্যায্য দাম আদায় করিতে পরামর্শ দেন এবং বলেন যে তাহা না পাইলে উৎপন্ন ফসল নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন যে, গবর্ন্মেণ্ট যদি কংগ্রেসের আদর্শ মানিয়া চলিতে না পারে তবে উহা ধ্বংস হওয়াই ভাল। কুমার জানা ডাঃ কুমারাপ্পার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছেন; চাষীদের ঘরে ঘরে উহা পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। এই আন্দোলন সফল করিবার এবং সরকারী সংগ্রহ কার্য্যে বাধা দিবার জন্য শ্রীকুমারাপ্পা (না কুমার জানা), শ্রীদাশরথি তা এবং বীরভূমের শ্রীসত্যেন চাটার্জ্জিকে এই (ডাঃ ঘোষের) দল নির্ব্বাচন করিয়া চাষীদের মধ্যে কাজ করিতে পাঠাইতেছেন। ইঁহাদের একটি সম্মেলন বর্দ্ধমানে আহ্বান করা হইয়াছে এবং শীঘ্রই উহা অনুষ্ঠিত হইবে। সম্মেলনের পর এই দলের সদস্যেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গ্রামে গ্রামে সত্যাগ্রহ করিতে এবং চাষীরা যাহাতে সরকারকে ধান বা অন্য খাদ্যশস্য না দেয় তার জন্য চাপ দিতে পারেন। এই সত্যাগ্রহের সময় ও তারিখ এখনও স্থির হয় নাই।

"শ্রী জে. সি. কুমারাপ্পা বা ডাঃ পি. সি. ঘোষ তাঁহাদের অতি বড় রাগের মুহূর্ত্তেও উপরোক্তরূপ উপদেশ দিতে পারেন ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। উপদেশটি এত অবিশ্বাস্তরূপে নীতিবিগর্হিত (immoral) এবং হিংস যে রিপোর্টটিকে তাঁহা মিথ্যা মনে করিবার ইচ্ছাই আমার হইতেছিল। তাঁহারা দুই জন বা যে কোন এক জন ঐরূপ উপদেশ দিয়াছেন অভ্রান্ত ভাবে ইহা প্রমাণিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, অতি সাংঘাতিকভাবে হিংস মানসিক অবস্থায় তাঁহারা উহা করিয়াছেন। দেশ আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধেও scorched earth নীতি অহিংস টেকনিক নয়; সত্যাগ্রহে উহার কোন স্থান নাই। সত্যাগ্রহী চাষী তাহার জমি, বাড়ী, ফসল ও সম্পত্তি শত্রুকেও দখল করিতে দিবে। ফসল সংগ্রহে যত অন্যায় এবং অপ্রিয় কার্য্যই করিতে হউক, আমাদেরই জনসাধারণের একাংশের জন্য গবর্মেণ্ট উহা করিয়া থাকেন। ইহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিবাদের পথ খোলা থাকিতে পারে, কিন্তু একটি কণা খাদ্যশস্যও নষ্ট করা যায় না। ইহা ঈশ্বর ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে পাপকার্য্য হয়। এরূপ পরামর্শ যিনিই দিন না কেন কাহারও শোনা উচিত নয়।"

শ্রীযুক্ত মশরুওয়ালা লিখিতেছেন যে, তিনি শ্রীকুমারাপ্পা এবং ডাঃ ঘোষ দু'জনের কাছেই চিঠি লিখিয়া জানিতে চাহেন যে ঐ রিপোর্ট ঠিক কিনা। তিনি বলিতেছেন, "ডাঃ ঘোষ নিজের এবং শ্রীকুমার জানার তরফে ঐরূপ কোন উপদেশ দেওয়া বা সমর্থন করার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন।" "লোকে যে সময়ে পর্য্যাপ্ত খাদ্য পাইতেছে না তখন খাদ্য নষ্ট করার কথাই উঠিতে পারে না"—কুমার জানা এই কথা বলিয়াছেন বলিয়া ডাঃ ঘোষ লিখিয়াছেন এবং ইহা তাঁহারও মত। শ্রীকুমারাপ্পার বক্তৃতা সম্বন্ধে ডাঃ ঘোষ লিখিয়াছেন যে তাঁহার 'যত দূর মনে পড়ে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন। গবর্মেণ্ট যদি রিজার্ভ না রাখিতে এবং তাহাদের নিকট হইতে ক্ষতিকর দামে (unremunerative price) ফসল লইতে চাহেন তবে গবর্মেণ্টকে খাদ্যশস্য না দিয়া তাহাদের উহা ধ্বংস করাই উচিত। এই উপদেশ আমি সমর্থন করি না। আমি ইহা অন্যায় মনে করি। চাষীদের উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম দামে তাহাদের ফসল আদায় করাও আমি সমান অন্যায় মনে করি।' শ্রীকুমারাপ্পা সকলের শেষে বক্তৃতা করেন এবং তারপরেই সভা ভঙ্গ হইয়া যায় বলিয়া তিনি কোন প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই।

"অতঃপর আমি শ্রীকুমারাপ্পাকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন যে, ডাঃ ঘোষের চিঠি বা ঐ রিপোর্ট কোনটিতেই তাঁহার বক্তৃতা ঠিক ভাবে দেওয়া হয় নাই। আমাকে তিনি মুখে যাহা বলেন তাহাতে আমরা বুঝিয়াছি তিনি এই কথা বলেন যে, দস্যু সম্পত্তি অপহরণে উদ্যত হইলে লোকে যেমন উহা তাহার হাতে পড়ার পরিবর্তে ভাঙিয়া ফেলে, তেমনি এক্ষেত্রে তাহারা সম্পত্তি ধ্বংসে উদ্যত হইলেও তিনি আশ্চর্য্য হইবেন না। লোকে উহাই করুক একথা তিনি বলেন নাই। তিনি বলেন, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস গবর্মেণ্টের খাদ্য সংগ্রহনীতি লুঠ ছাড়া আর কিছু নয়।

"আমি শ্রীকুমারাপ্পার কথাই বিশ্বাস করিলাম। তবে তাঁহার যে বক্তৃতা ডাঃ ঘোষ বা কুমার জানার ন্যায় লোকের মনেই ঐরূপ ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা যেখানে নিত্য সাবোটেজ হইতেছে এবং প্রকাশ্যে সাবোটেজের প্রচার কার্য্য চলিতেছে সেখানে লোকের মনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে এ কথাও আমাদের মনে রাখা উচিত।"

পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্টও এই বিষয়টি লইয়া শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পার সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন এবং ঐ সম্পর্কিত চিঠিপত্র লোকসেবক পত্রিকার রিপোর্টের ইংরেজী অনুবাদ সহ তাঁহাদের বক্তব্য পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকুমারাপ্পা গবর্মেণ্টের ডেপুটি সেক্রেটারীর পত্রের উত্তরে লিখিয়াছেন, "প্রকৃত গণতন্ত্রে গবর্মেণ্ট ও জনসাধারণ উভয়ে অংশীদার। গবর্মেণ্ট যদি ফসল উৎপাদনে তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতে না পারে তবে তাহাতে ভাগ বসাইবার অধিকার তাহার নাই। এই ব্যাখ্যা সাপেক্ষে লোকসেবকের রিপোর্ট মূলতঃ ঠিক। ডাঃ ঘোষের বক্তৃতা সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে পারি না, তিনি বাংলায় বলিয়াছিলেন এবং আমি বাংলা জানি না।" লোকসেবকের রিপোর্টে শ্রীকুমারাপ্পার বক্তৃতায় scorched earth-এর কথা নাই। উহাতে আছে, শ্রীকুমারাপ্পা বলেন যে চাষীদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য দুই বৎসরের ধান সঞ্চিত রাখা উচিত। ইহার অতিরিক্ত ফসলটুকু ছাড়া আর একটুও না দেওয়ার সাহস তাহাদের থাকা উচিত। প্রয়োজন হইলে তাহাদের কারাবরণ করা উচিত।

স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পন্ন চাষীর ঘরে দুই বৎসরের ধান মজুত থাকিত এবং উহাতে গ্রামের অনটন দূর হইত, কিন্তু যুদ্ধের সময় ঐ সঞ্চয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত উহা পুনর্গঠনের সুযোগ আসে নাই। এই অবস্থায় হঠাৎ এক বৎসরে দুই বৎসরের সঞ্চয় রাখিতে গেলে দেশে দারুণ খাদ্যাভাব হইতে বাধ্য। খাদ্য বিষয়ে দেশে এখনও যে অবস্থা তাহাতে খাদ্য উৎপাদনে ও বণ্টনে বাধা সৃষ্টি হইয়া এক তিলও খাদ্যাভাব ঘটিতে পারে এরূপ কাজ করা বা কথা বলা কাহারও উচিত নয়। ডাঃ ঘোষ বা শ্রীকুমারাপ্পার ন্যায় লোকদের পক্ষে ইহা আরও অন্যায়। ঝোঁকের মাথায় বা রাগের বশে লোককে বিপথে পরিচালনা করা নেতৃত্বের নিদর্শন নহে। দুই জনে কে কি বলিয়াছেন তাহা লইয়া তাঁহারা নিজেরা এবং রিপোর্টারেরা একমত হইতে পারিতেছেন না ইহা আরও

আশ্চর্য্যের বিষয়। বস্তুতঃপক্ষে, এই ব্যাপারে সত্যাসত্য সঠিক ভাবে নির্ণয় করার বাধা যাহাই হউক, একথা ইহাতে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, মহাত্মাজী "প্রফুল্ল লালছমে গিয়গয়া" বলিয়া যে সন্দেহ করিয়াছিলেন তাহার আজ পূর্ণ প্রকাশ পাওয়া যাইতেছে। নিজের দলের স্বার্থের জন্য এবং অপরের দলের অপকারের জন্য যে ব্যক্তি দেশের সাধারণের সর্ব্বনাশের কথা ভাবিতে অবসর পায় না, ক্ষমতার লালসায় তাহার অধঃপতন কতটা হইয়াছে তাহা বলাও বাহুল্য।

খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি

এই বিষয়ে একটা আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে চলাইবার চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া মনে হয়। তাহা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ন্মেণ্ট একটি তথ্যপূর্ণ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহাতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, খাদ্যশস্যের মূল্য—ধানচালের মূল্য—গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক ক্রয়ের সময় আরও অধিক বাড়াইয়া দিলে মাত্র শতকরা ১৫ জন লোক উপকৃত হইবে, বাকী প্রায় ৮৫ জন লোকের মধ্যে ভূমিহীন চাষী, শহরবাসী লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এই বিবৃতি অনুমোদন করিয়া পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষক একটি বিবৃতি দিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে দিলাম :

"গত ৮ই ডিসেম্বর ১৯৪৯ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া যে 'প্রেস-নোট' প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের জীবনযাত্রার পথে এত প্রয়োজনীয় যে, ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি অতি যত্নের সহিত আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

"আমরা গত দুর্ভিক্ষের করুণ দৃশ্য ও কঠোর শিক্ষা প্রায়ই ভুলিয়া গিয়াছি। দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিশনের বিবরণী আমাদের স্মৃতি হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা যদি উক্ত বিবরণীর বিষাদপূর্ণ পাতাগুলি উল্টাইয়া দেখি তাহা হইলে আমাদের স্মৃতিপথে উহার গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলি উদিত হইবে। কমিশন বলিয়াছেন যে, বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রষ্টব্য বিষয়টি হইতেছে যে, চাউলের মূল্য বৃদ্ধি দুর্ভিক্ষের অন্যতম প্রধান কারণ এবং ইহা ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষসমূহের ইতিহাসে অদ্বিতীয় ঘটনা। আমরা মনে করি যে, আমাদের দেশে কেহই এমন কি অধিক ধান্য উৎপাদনকারী ব্যক্তিগণ গত দুর্ভিক্ষের বিষাদময় ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখিতে ইচ্ছা করেন না।

"জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বর্ত্তমান উচ্চমূল্য আমাদের দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির কত অবনতি ঘটাইতেছে তাহা সর্ব্বজনবিদিত। অল্প আয়-বিশিষ্ট বহুসংখ্যক ব্যক্তিগণ জীবনধারণের নিম্নতম মানের নিম্নে রহিয়াছেন। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যের মূল্য আরও বৃদ্ধি হইলে তাঁহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে। দেশের স্বার্থের দিক হইতে ইহা ঘটিতে দেওয়া কোনমতেই সুবিবেচনার কাজ হইবে না। যাঁহারা অধিক ধান্য উৎপাদনকারী এবং ধান্য মজুতকারী তাঁহাদের স্বার্থের দিক হইতে দেখিলেও খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি করা উচিত হইবে না।

"আমরা ইহাও বলিতে চাই যে, সম্প্রতি ধানের দাম বাড়াইবার জন্য কয়েক স্থানে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহা আমাদের সংগৃহীত তথ্যাদির দ্বারা সমর্থন করা যায় না। পরন্তু জীবনযাত্রার ব্যয়ের মান বর্ত্তমানে কমের দিকে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতায় এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্স-এর সভায় মাননীয় ডঃ জন মাথাইয়ের বক্তৃতা এবং ১৩ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে ভারতের খাদ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সুতরাং ধান্যের মূল্য বৃদ্ধির আন্দোলনের পরিণাম অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহা যদি ফলবতী হয় তাহা হইলে জনসাধারণের দুর্গতি চরম সীমায় পৌঁছিবে।

"পরিশেষে আমরা বলিতে চাই যে, এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিবার আমাদের প্রধান ও একমাত্র অধিকার এই যে, আমরা এই দেশের জনসাধারণের একটি অংশ-বিশেষ। আমরা কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত নহি। আমাদের নিজের কোন স্বার্থ নাই। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে দেশের সেবা করিয়াছি। আমরা জানি আমাদের দুর্ব্বল স্বর বেশী দূর পৌঁছিবে না কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও আমাদের সংগৃহীত তথ্যাদি ধানের মূল্য বৃদ্ধির আন্দোলন সমর্থন করে না। গবর্ন্মেণ্টের প্রেস নোট আমরা মোটামুটিভাবে সমর্থন করি।

"(১) যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক, আর্থিক জগৎ। (২) ভবদেব ভট্টাচার্য্য, ম্যানেজিং ডিরেক্টার, বেঙ্গল ফার্মস্ এণ্ড ইন্ডাসট্রিস্ লিঃ। (৩) অমরনাথ রায়, স্বত্বাধিকারী, গ্লোব-নার্সারী। (৪) জিতেশরঞ্জন ঘোষ, কৃষিক্ষেত্র, লস্করপুর (২৪ পরগণা)। (৫) তুলসীদাস মিত্র, কমন ম্যানেজার, মিত্র এষ্টেট। (৬) বিজয়কৃষ্ণ বসু, ব্যবসায়ী ও জমিদার। (৭) যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, আসাম কৃষি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধিনায়ক। (৮) ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত সহকারী কৃষি কমিশনার। (৯) সুজ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত বিশেষ কর্ম্মচারী, পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-বিভাগ। (১০) ধীরেন্দ্রনাথ সেন, মেদিনীপুর ফরেষ্ট ও এগ্রিকালচার লিঃ। (১১) অজিতকুমার রায়, ম্যানেজার, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক। (১২) বসন্তকুমার মিত্র, জমিদার। (১৩) সন্তোষকুমার চক্রবর্ত্তী। (১৪) দুর্গাদাস মণ্ডল, কৃষক, আঠারবাটি। (১৫) দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, সম্পাদক, "খাদ্য উৎপাদন" পত্রিকা।"

গবর্ন্মেণ্টের বিবৃতি ও এই বিবৃতির মধ্যে চাষের ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ দেখি। বিঘা প্রতি কৃষির ব্যয় বিভিন্ন জেলার ও অঞ্চলের নানাবিধ অবস্থার উপর নির্ভর করে;

ব্যয়ের পার্থক্য অনেক সময়েই লক্ষণীয়। কিন্তু এরূপ হিসাব নাই বলিয়াই নানাবিধ তর্কের জটিলতা বৃদ্ধি পায়। গবর্মেণ্টের খাদ্যশস্য ক্রয়ের রীতি এক করিলে কোন কোনও স্থলে কৃষকের অসুবিধা হইতে পারে এরূপও শোনা যায়। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে ঘাটতি অঞ্চল হইতেও ধান চাল ক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার কথা বলা যাইতে পারে। এই অঞ্চল বর্ত্তমান কৃষিমন্ত্রীর কর্ম্মস্থল ছিল। এই অঞ্চলের অবস্থা বিশেষরূপে জানিবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল। অথচ দেখিতে পাই যে তাঁহার অধীনস্থ ক্রয়বিভাগ এই ঘাটতি অঞ্চল হইতেও খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিতেছে। এই অঞ্চলে যাতায়াতের কোন সুবিধা নাই; ফলে ক্রীত শস্য রেশনের অঞ্চলে আনিতে অত্যধিক ব্যয় পড়িয়া যায়। এই অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত অভিযোগও শোনা যায়:

> ৫৸/০ ও ৬/০ টাকা দরে ধান্য কিনিয়া যদি বলা হয় যে চাষীদের উৎপা ব্যয় ইহা অপেক্ষাও কম, এবং ঐ ধান্য যদি ১০৷৷০ টাকা মণ দরে মাননীয় সরকার কর্ত্তৃক বিক্রীত হইলে বলা হয় যে সরকার ক্ষতিপূরণ হইতেছে না, তবে মধ্যপথে যে রহস্য থাকিয়া যায় তাহা কাহারও বুঝিতে সময় লাগে না।

এই প্রকার অভিযোগের প্রত্যুত্তর দেওয়ার দায়িত্ব কৃষিমন্ত্রী মহাশয়ের, কেননা যেখানে একদল লোক স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া কৃষকের মধ্যে অসন্তোষ প্রচারের অপচেষ্টা করিতেছে সেখানে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা সময়মত হওয়া প্রয়োজন।

চাষের জন্য সামরিক বিধি

দুই বিশ্বযুদ্ধের কল্যাণে জগতের সমাজ-জীবনে সামরিক বিধিব্যবস্থা, নিয়মকানুনের প্রবর্তন হইয়াছে। ল্যাণ্ড আর্মি—কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক—এই শব্দদ্বয়ের মধ্যে এ পরিচয় পাওয়া যায়। দেখাদেখি আমাদের দেশের যুবকবৃন্দ, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীগণ কৃষি কার্য্যে নিয়োজিত করিবার জন্য "গণফৌজে"র কথা বলিতেছেন। আমাদের কোটি কোটি ভূমি-হীন কৃষকের মধ্য হইতে এই "গণফৌজের" রংরুট করা যায়। আমাদের ছাত্রসমাজও "কৃষক মজদুর রাজে"র প্রতিষ্ঠাকল্পে কৃষির কাজে নিজেদের শক্তি নিয়োগ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন বক্তৃতায় ও সংবাদপত্র স্তম্ভে। কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের এই ধ্বনি রূপায়িত হইয়াছে, এইরূপ কোন পরিচয় এখনও আমরা পাই নাই।

কিন্তু বিলাতে গত দুই বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। "সত্যাগ্রহ পত্রিকা"র ২৫শে পৌষ তারিখের সংখ্যায় বিলাত প্রবাসী একজন বাঙালী ছাত্রের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাই যে ঐ দেশের ছাত্র-ছাত্রী ভাবের ও কর্ম্মের ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়াছে। লেখকের নাম শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোড়ই:

> "স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরাই···Land Force (ভূমিসৈন্যবাহিনীর) প্রধান সেনানী। দেশের ও জাতির খাদ্য সংরক্ষণে তাদেরও অবদান চাই। এই ভূমিসৈন্য বাহিনীতে মাত্র দু'এক সপ্তাহের জন্য হলেও যোগ দেওয়া চাই।···অনুরূপ কয়েকটি ক্যাম্পে লেখকের কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে আসিবার সৌভাগ্য ঘটেছিল।···গ্রেট ব্রিটেনের মত এই ক্ষুদ্র দেশটিতে এই বছর মোট ১,৩৩,৮৪১ জন স্বেচ্ছাসেবক···যোগ দিয়েছিল। তার মধ্যে আমরা বিদেশীয় ছাত্রছাত্রী ছিলাম ২২,৬৩০ জন।" আমাদের "বাবুর" দেশে ইহা সম্ভব কি?

আমাদের দেশের যুবকদের যেদিন শুভ বুদ্ধির উদয় হইবে, যেদিন তাঁহারা উদ্দাম "শাখামৃগ বৃত্তি"র উত্তেজনা ত্যাগ করিয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে শিখিবেন, সেদিন এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে।

পাকিস্থানে ভারতবিরোধী প্রচার

ঢাকার 'আজাদ' নিয়মিত কলিকাতায় আসে, এবং এখানকার মুসলমানেরা আগ্রহের সহিত উহা পাঠ করিয়া থাকে। এই পত্রিকাটিতে অত্যন্ত উগ্রভাবে ভারতবিরোধী সংবাদ প্রচার করা হয়। পঞ্জাব এবং আসামে মুসলমানদের উপর "অত্যাচারে"র যে সমস্ত কাহিনী গত ২৬শে পৌষ তারিখের আজাদে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সারমর্ম্ম আমরা এখানে দিলাম। আগামী আন্তঃডোমিনিয়ন সম্মেলনে বিষয়টি উত্থাপিত হওয়া উচিত; তাহার দেরি থাকিলে ভারত-সরকারের তরফ হইতে ইহার প্রতিবাদ পাকিস্থানে পাঠানো উচিত। আজাদ লিখিতেছে যে, পাকিস্থান ভারত-সরকারকে বিষয়টি জানাইয়াছে। সত্য অথবা মিথ্যা যাহাই হউক না কেন, এ বিষয়ে ভারত-সরকারের নীরব থাকা উচিত নয়। এই সমস্ত প্রচারকার্য্য এমন যে প্রতিবাদ না হইলে ধর্ম্মান্ধ লোকেরা উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে এবং ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান উভয় স্থানেই তাহার ফল খারাপ হইবে। আজাদের করাচী আপিস হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে "তুতে মিশ্রিত আটা খাওয়াইয়া মুসলিম মোহাজেরদের হত্যা; পূর্ব্ব পঞ্জাব কর্ত্তৃপক্ষের জঘন্য ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত; পাকিস্থানে শরণার্থী ৫৩ জন মোহাজেরের মৃত্যু ও দুই হাজার লোক অসুস্থ; পাকিস্থান কর্ত্তৃক ভারত-সরকারের নিকট অভিযোগ"—তিন কলমব্যাপী বড় বড় শিরোনামা দিয়া প্রথম পৃষ্ঠায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে:

"আম্বালা জেলার কুরালা আশ্রয়প্রার্থীকেন্দ্রে মুসলিম মোহাজেরদের মধ্যে তুঁতে বিষ মিশ্রিত আটা খাওয়ানো হইত। গত নভেম্বর মাসে উক্ত স্থান হইতে আসার সময় ট্রেনেই ১২ জন মোহাজেরের মৃত্যু হয় এবং দুই দিনের মধ্যে

আরও ৪১ জনের মৃত্যু হয়। তা ছাড়া প্রায় পাঁচ হাজার মোহাজেরের মধ্যে প্রায় দুই হাজার ব্যক্তিই বর্ত্তমানে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সকলই তুঁতে মিশ্রিত আটা খাওয়ার ফল। এ সম্পর্কে পূর্ব্ব পাঞ্জাব সরকার কোন জবাব না দেওয়াতে পাকিস্থান সরকার কর্ত্তৃক ভারত-সরকারের নিকট অভিযোগ করা হইয়াছে।"

ঘটনাটি গত নবেম্বর মাসের বলিয়া গোড়ায় লেখা হইয়াছে, কিন্তু পরে তারিখ দেওয়া হইয়াছে নভেম্বর ১৯৪৭। সংবাদের শেষে মন্তব্য করা হইয়াছে, "পূর্ব্ব পাঞ্জাব সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসলিম মোহাজেরগণকে হত্যা করার কার্য্যে লিপ্ত ছিল বলিয়া শেষ উপায় হিসাবে পাকিস্থান সরকার ভারত-সরকারের সহিত এ বিষয়ে লেখা-লেখি করিতেছেন।"

দুই বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বের এই ঘটনার তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্ব পঞ্জাবে যাহারা বিষাক্ত আটা খাইল তাহাদের ভারত প্রান্তে কিছু হইল না, পাকিস্থানে ঢুকিবার পর হঠাৎ সকলে মরিতে বা অসুস্থ হইতে আরম্ভ করিল। দুই বৎসর পরে এখন আবার এই সব কাহিনী নূতন করিয়া প্রচার অর্থহীন মোটেই নয়। ভারত-সরকারের সাবধান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, উপেক্ষা করিলে তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। নির্জ্জলা মিথ্যা প্রচার অকারণ করা হয় না।

আসামে মুসলিম নির্যাতনের কাহিনী

আসামের ব্যাপার আধুনিক এবং সমান চমকপ্রদ। উহা এইরূপ :

"মোমেনশাহী, ৮ই জানুয়ারী।—মোমেনশাহী জেলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত চরকুমারিয়ার জনাব আবদুল হামিদ জানাইতেছেন :—গত ৩০শে ডিসেম্বর আমরা ধানীখোলা চরকুমারিয়া হইতে ৬ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা মোট ৯ জন আত্মীয় বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেছিলাম। বিজনী ষ্টেশনে ট্রেন পৌঁছিলে কতিপয় লোক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আমাদিগকে ও আমাদের কামরার অন্যান্য যাত্রীকে আক্রমণ করে। বহু অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও তাহারা স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে অত্যাচার চালাইতে থাকে। পুরুষদের দাড়ি চুল পুড়াইয়া দেয় ও নাক কান কাটিয়া দেয়। মেয়েদের উপরও অনুরূপ নৃশংস আক্রমণ চালাইতে তাহারা কসুর করে না।

"অতঃপর গাড়ী সারভোক ষ্টেশনে আসিলে আমাদিগকে 'জয়হিন্দ, জয়কালী' ধ্বনি করিতে করিতে কামরার বাহিরে ফেলিয়া দেয়। মরণাপন্ন হইয়া অতিকষ্টে ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট যাইয়া আমরা সমস্ত কথা খুলিয়া বলি। কিন্তু ষ্টেশন মাষ্টার আমাদের কথায় কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ করে না।

"ব্যর্থ হইয়া আমরা সরভোগ থানায় দারোগার নিকট যাইয়া আমাদের করুণ কাহিনী বিবৃত করিতে চেষ্টা করি। উক্ত দারোগা আবেদন শোনা ত দূরের কথা; অপর পক্ষে আমাদিগকে আটক করিয়া রাখে। যথাসর্ব্বস্ব দিয়া সেখান হইতে মুক্তি পাইয়াছি। কিন্তু অন্যান্য আট জনের কোন খবর জানি না।"

চুলদাড়ি পোড়ানো এবং নাককানকাটা অবস্থায় নয় জন স্ত্রী পুরুষকে দেখিয়া ষ্টেশন মাষ্টার বা দারোগার মন ভিজিল না, ঐ অঞ্চলে বহু সংখ্যক মুসলমান থাকা সত্ত্বেও কাহারও নজরে এই মর্ম্মন্তুদ ব্যাপার পড়িল না, এ বিষয়ে ভারতীয় অন্ততঃ মুসলমান এবং ইংরেজ-চালিত সংবাদপত্রসমূহে একবর্ণ প্রকাশিত হইল না—এরূপ গল্পিকা ধূম প্রসূত গল্প বিশ্বাস করিতে আমাদের যতটা বাধা লাগে ধর্ম্মান্ধ মুসলমানের ততটা না লাগিতেও পারে। যাহা হোক পাকিস্থানে আজাদের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় অতিশয় গুরুতর সংবাদ রূপে ইহা স্থান লাভ করিয়াছে।

আর একটি "ঘটনা" এইরূপ :

"রংপুর, ২৭শে ডিসেম্বর। আসাম হইতে প্রত্যাগত এক ব্যক্তি জানাইতেছেন :—প্রায় ১৫।১৬ দিন পূর্ব্বে আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত বিজনী থানা এলাকার সোনাইখোলা গ্রামের মুসলমানগণ সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত হইতে কোন প্রকারে রক্ষা পায়। ঘটনার দিন শুক্রবার ছিল। উক্ত গ্রামের মুসলমানগণ মসজিদে যখন জুম্মার নামাজে রত ছিল, তখন জনৈক সাব ডেপুটি কালেক্টারের নির্দেশক্রমে হিন্দুগণ উক্ত মসজিদে অগ্নি সংযোগ করে। নামাজে রত মুসলমানগণ কোন প্রকারে সালাম ফিরাইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়।

"উক্ত সাব ডেপুটির উপস্থিতিতে এবং তাহার নির্দ্দেশক্রমে হিন্দুগণ উক্ত থানা এলাকার বহ্মগুড়ি এবং সামুখাখারী গ্রামদ্বয়ে যথাক্রমে ৯ ও ১৫ খানা বাড়ি এবং সামুখাখারীর একটি মসজিদ অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ ভাবে প্রত্যহ আসামে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের উপর হিন্দুর অত্যাচার বাড়িয়া চলিয়াছে।

"কোন কোন স্থানে মুসলমানের জমি খাসে আনিয়া হিন্দুদের নিকট পত্তন দেওয়া হইতেছে। অত্যাচারের ভয়ে মুসলমানগণ দলে দলে কংগ্রেসে নাম লিখাইতেছে।"

শেষ কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্দ্ধমান ম্যাজিষ্ট্রেটের বিজ্ঞপ্তি

বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরে বর্দ্ধমানের "দৃষ্টি" পত্রিকায় (৩১শে ডিসেম্বর) নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হইয়াছে :

"সংবাদপত্র মারফত এবং লোক পরম্পরায় সকলেই অবগত আছেন যে কিছুদিন পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত অগ্রদ্বীপের কতিপয় দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া দুইটি পুলিসের রাইফেল ছিনাইয়া

লইয়াছে। বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই সব ব্যক্তি সাংঘাতিক অপরাধমূলক, বিশেষতঃ সমাজবিরোধী ও রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত হইয়া এই কাজ করিয়াছে এবং সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিপূর্ণ আচরণ নিশ্চিতই সকল সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তবুও আমার ধারণা তাহারা অপর দুষ্ট লোকের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়াই ঐরূপ গুরুতর অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছেন এবং এখনও সংশোধনের পূর্ণ অবকাশ রহিয়াছে। সুতরাং যদি এই ঘোষণার ১০ দিনের মধ্যে রাইফেল দুইটি ফেরত দেওয়া হয় তবেই অপরাধীর পক্ষে অনুশোচনা ও সদিচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে এবং আমিও সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত থাকিব।"

ইহার পরবর্ত্তী অংশে "সমাজের সকল স্তরের সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের" নিকট রাইফেল উদ্ধারে পুলিসের সহায়তা করিবার জন্য আবেদন জানান হইয়াছে।

উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিটি সম্বন্ধে বিশেষ কোন মন্তব্য করিবার আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। শুধু এইটুকু জানিতে কৌতূহল হইতেছে যে, রাইফেল অপহরণের ন্যায় পিনাল কোডের গুরুতর অপরাধ মার্জ্জনা করিবার অধিকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের কবে এবং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে তো?

হাইকোর্ট সংস্কার

কলিকাতা হাইকোর্ট সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছিলাম। হাইকোর্টের এলাকা, গঠনপ্রণালী এবং ব্যয়বাহুল্য ইংরেজ আমলে বিদেশীদের সুবিধার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, পরে ভারতীয়েরা উহার সুবিধা ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে দেশবাসীর সেরূপ কোন লাভ হয় নাই। বোম্বাইয়ে সিটি কোর্ট প্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশের লোকের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের এলাকা এখন পূর্ব্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশে দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং দীর্ঘকাল বিচারক সংখ্যা পূর্ব্ববৎ রাখার আবশ্যকতা থাকিবে না। এটর্নী প্রথা এবং ব্যারিষ্টার ও এডভোকেট পার্থক্য কলিকাতা হাইকোর্টের একটি অসঙ্গত বিধি, এই দুইটিই এখন উঠিয়া যাওয়া উচিত। সম্প্রতি বাংলা-সরকার হাইকোর্ট সংস্কারের কথা বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। কমিটির গঠনপ্রণালী দেখিয়া কিন্তু উহার উপর জনসাধারণের আস্থা আসে নাই, লোকে মনে করিতেছে যে উহা সমস্তাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য গঠিত হইয়াছে এবং এ বিষয়ে সংবাদপত্রে আলোচনাও সুরু হইয়াছে। কমিটির দশ জন সদস্যের মধ্যে আছেন চেয়ারম্যান-রূপে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, সেক্রেটারী-রূপে বাংলা-সরকারের বিচার বিভাগের সেক্রেটারী, তিন জন ব্যারিষ্টার, দুই জন এডভোকেট, মফস্বল বারের এক জন উকীল, এক জন এটর্নী এবং এক জন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মফস্বল বারের প্রতিনিধিরূপে লওয়া হইয়াছে বর্দ্ধমানের একজন মুসলমান উকীলকে। হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ডে পত্র লিখিয়া এক জন উকীল বলিতেছেন যে কমিটির গঠন বিষয়ে কথা ছিল যে ব্যারিষ্টার ২ জন, এডভোকেট ২ জন, মফস্বল বারের ২ জন, এটর্নী ১ জন, সাবর্ডিনেট জুডিশিয়ারির ১ জন, আই-সি-এস ১ জন—এইরূপ ৯ জনকে লইয়া কমিটি গঠিত হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে চেয়ারম্যান বাদে ৯ জন সদস্যের বিলিব্যবস্থা ঐরূপে হয় নাই, ব্যারিষ্টার এক জন বেশী এবং জেলা বারের উকীল ১ জন কম লওয়া হইয়াছে। অবসরপ্রাপ্ত জজ যাঁহাকে লওয়া হইয়াছে তাঁহার স্বাধীনচিত্ততা বিষয়ে কিছুই জানা নাই। কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে নূতন যুগের উপযুক্ত পরিবর্ত্তনের কথা বলিতে পারেন এরূপ এক জন মাত্র সুপরিচিত লোক, শ্রীঅতুল গুপ্ত, কমিটিতে স্থান লাভ করিয়াছেন। এই কমিটি বাতিল করিয়া দিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ কর্ত্তৃক উহা গঠন করাইয়া লইলে এইরূপ সমালোচনার অবসর থাকিবে না। ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন এই মাসেই আরম্ভ হইবে, সুতরাং ইহাতে অসুবিধা বা বিলম্ব কোনটিই হইবার কথা নয়।

হিন্দু মহাসভার কলিকাতা অধিবেশন

গত ১০ই পৌষ শনিবার কলিকাতা নগরীতে হিন্দু মহাসভার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ইহার উদ্বোধন করেন শ্রীবিনায়ক দামোদর সাভারকর। এই কর্ম্মিশ্রেষ্ঠ ও ত্যাগিশ্রেষ্ঠের পরিচয় দিতে হইলে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে যাইতে হয়। লোকমান্য তিলকের অনুপ্রেরণায় মহারাষ্ট্রে যে নূতন "জীবন-প্রভাত" দেখা দেয়, সেই সময় হইতে ১৪ বৎসর বীর সাভারকর দেশের স্বাধীনতার জন্য দ্বীপান্তর দণ্ডভোগ করিয়াছেন; রত্নগিরি জেলায় প্রায় ১২ বৎসর অন্তরীণ ছিলেন। ১৯৩৭ সালে যখন বোম্বাই প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তিনি মুক্তিলাভ করেন, এবং নিজের বিশ্বাসের প্রেরণায় হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের "মুসলিম তোষণনীতি"র বিরোধী ছিলেন বলিয়া এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে "অহিংসা" নীতির প্রয়োগ অবাস্তব বলিয়া তিনি কংগ্রেসে যোগদান করিলেন না।

হিন্দু মহাসভা তাঁহাকে নেতৃত্বের পদে বরণ করিয়া লইল; তিনি ইহার কর্ম্মপন্থাকে গতিশীল, সংগ্রামমুখী করিবার চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই বলিয়াই ব্রিটিশ শাসনের অবসানে জাতীয় জীবনের নব-সংগঠনে হিন্দু মহাসভার কোন প্রভাব বিস্তার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এই পটভূমিকায়ই এই রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকলাপের বিচার করিতে হইবে। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে গত ১২৫ বৎসরের শিক্ষার ফলে শিক্ষিত হিন্দুর মন গোঁড়ামির আহ্বানে মাতিয়া উঠিতে পারে না। এই কারণেই কেবলমাত্র হিন্দু সংস্কৃতির নামে কোন রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের ডাকে তাঁহারা দ্বিধাবিহীন চিত্তে সাড়া দিতে পারেন না।

সেইজন্যই হিন্দু মহাসভার রাজনীতিক সংগঠনের মধ্যে অনেক হিন্দুই অনুপ্রেরণা পান না।

হিন্দু মহাসভার বর্ত্তমান অধিবেশন উপলক্ষেও এই অবস্থাটা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্পাদিত "দৈনিক বসুমতী" পত্রিকায় কংগ্রেসের কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে তিক্ত মন্তব্য করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না; তিনি ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির ভারত-ত্যাগের ফলে যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইয়াছে, তাহাকে "স্বাধীনতা" নামে অভিহিত করিতে অপারগ বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা তিনি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও সেই মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বীর সাভারকরের উদ্বোধনী বক্তৃতায় কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। মহাসভার সভাপতি ডাঃ শ্রীনারায়ণ ভাস্কর খারে মহাশয়ও বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার এই নূতন নেতার মত সমর্থন করেন নাই। মনোভাব ও মতভেদ প্রকাশের মধ্যে এই পার্থক্য হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে অন্তর্নিহিত বিরোধের কথা জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। এই পার্থক্যটা বুঝাইবার জন্য বীর সাভারকরের বক্তৃতা হইতে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:

"অতীতকালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় নানা সাহেবও ঐভাবে এক দিন বলিয়াছিলেন, 'ধাক্কা দেও, রাজাকে অপসারিত কর।' এত দিনে সেই ধ্বনি সার্থক হইয়াছে। রাজাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ আর রাজা নাই। এক্ষণে রাজার প্রতীক দিল্লীর সরকারী ভবন হইতে নামাইয়া ফেলা হইতেছে এবং তৎপরিবর্ত্তে হিন্দুর প্রতীক (অশোক স্তম্ভ) তথায় সংস্থাপিত হইতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুরা জয়লাভ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু সমস্যা এই যে, তাহারা যে জয়লাভ করিয়া চলিয়াছে তাহা তাহারা স্বীকার করিতে জানে না। নেপোলিয়ান এক দিন বলিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশরা হারে বটে; কিন্তু তাহারা হার স্বীকার করিতে জানে না। বক্তা সেই বাক্যই ঘুরাইয়া বলিতে চাহেন যে, হিন্দুরাও বিজয় লাভ স্বীকার করিতে জানে না। তাঁহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আজও অনেকের মনে এইরূপ হতাশার মনোভাব দেখা যায় যে, ভারত স্বাধীনতা পাইলেও পাকিস্থান সৃষ্টি করা হইয়াছে। ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে ফিরাইয়া আনা যায় নাই সত্য, কিন্তু তাহাতে হতাশার কারণ নাই। হিন্দুরা তো এক দিন সমগ্র ভারতবর্ষই হারাইয়াছিল। আজ সেই হৃত-সম্পত্তির তিন-চতুর্থাংশই তো তাহারা উদ্ধার করিয়াছে।"

আশা করি, বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ এই পার্থক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

কোচবিহার ও পশ্চিমবঙ্গ

১৭ই পৌষ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে কোচবিহার রাজ্যকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে কোচবিহারের রাজা বাহাদুরের হৃদয়ের স্বীকৃতি ছিল, ইহা মনে করিলে ভুল করা হইবে। তিনি প্রকাশ্যে বিবৃতি দান করিয়া এই অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, তিনি আসাম প্রদেশের সঙ্গে মিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। এই রাজ্যের সাড়ে ছয় লক্ষ অধিবাসীর একাংশ বর্ত্তমান ব্যবস্থার বিরোধী। কোচবিহার-রাজ্য প্রজা কংগ্রেসের সভাপতি জনাব আমানুল্লা আহাম্মদ তাঁহাদের মুখপাত্র; তাঁহারা কোচবিহার রাজ্যকে "কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে আনিবার জন্য অনুরোধ করিবেন; যদি ইহা অসম্ভব হয় তাহা হইলে কোচবিহারকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করিবেন।" এই বিরোধিতার কারণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "দীর্ঘদিন ধরিয়া কোচবিহার ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা আমাদের উপর নির্যাতন চালাইয়া আসিতেছে; সমাজ, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি কোন দিক হইতেই তাহাদের সহিত আমাদের কোনরূপ সাদৃশ্য নাই।"

কোচবিহারের রাজা বাহাদুর এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নাই; কয়েকজন হিন্দুও যোগ দেন নাই বলিয়া মনে হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়াছেন কেন, আমরা জানি না। রাজার কথা বুঝিতে পারি; তাঁহার শাসনক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইবে এই ব্যবস্থা তাঁহার ভাল লাগিতে পারে না। রাজপরিবারের অন্যান্য লোকের মনোভাব স্পষ্ট নয়; কেহ কেহ নূতন বিধান স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অধিকাংশ লোকেই ইহা যুগধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতরাষ্ট্রে রাজতন্ত্রের অবসান হইল। রাজ্যের মুসলমানধর্ম্মীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৪০ জন; এই সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক মনোভাব কি তাহা আমরা জানি; তাহারা অপর ধর্ম্মী প্রতিবেশী লোকের সঙ্গে সমানভাবে চলিতে জানে না। নানা বিসদৃশ অবস্থার দরুন এই রাজ্যে মুসলমান প্রাধান্যের একটা ঘাঁটি ছিল। তাহা ভাঙিয়া পড়িল। সেইজন্যই জনাব আমানুল্লা আহাম্মদের বিষোদ্গার।

রাজ্যের প্রধান ভাষা বাংলা। সুতরাং অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই এই অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের সহিত মিলিয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে মিলিত করিবার চেষ্টা যে হয় নাই, তাহা বলা যায় না। এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্তিতে পশ্চিমবঙ্গের পরিধি বাড়িল ১ হাজার ৬ শত ১৮ বর্গমাইল। এই অঞ্চলে ধান উৎপন্ন হয় প্রচুর—৪০ লক্ষ মণ; তামাক ২ লক্ষ ৩০ হাজার মণ; পাট ৬ লক্ষ মণ। অন্যান্য বনজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে পারা সহজ—যদি বর্ত্তমান যুগোপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ভবিষ্যতের এই উন্নতি নির্ভর করিবে এই অঞ্চলের লোকের

শ্রমশক্তির উপরে, আর যাহারা এই রাজ্যের নানা ভাগে নূতন করিয়া ঘর বাঁধিবেন। ইহারা অন্ততঃ স্বাভাবিক ভাবেই পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারা জনসমষ্টি হইতে আসিবে। কোচ-বিহারের পশ্চিমবঙ্গভুক্তি তাহাদের এই জীবন-যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণ রূপ এখনও ফুটিয়া উঠিতে দেরি আছে। বিহারে অন্তর্ভুক্ত বাংলাভাষী অঞ্চল যখন পশ্চিমবঙ্গের কোলে ফিরিয়া আসিবে তখনই এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। ১৯১১ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে বিহারী নেতৃবর্গের পক্ষ হইতে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। মানভূম, ধলভূম ও মহানন্দা নদীর পূর্ব্বাঞ্চল এই প্রতিশ্রুতির বিষয়বস্তু ছিল। কোচবিহারের পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তি মহানন্দা নদীর পূর্ব্বাঞ্চলের প্রত্যাবর্ত্তনের পক্ষে যুক্তি আরও দৃঢ় করিয়াছে। মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এখনও দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কোচবিহারের সহজ ও স্বাভাবিক যোগাযোগের ব্যবস্থা নাই। ইহাতে কোচবিহারকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার পথে নানা বাধার সৃষ্টি হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দকে ও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত ২৫,০০০ পুরুষ-নারীকে অনেক ভরসার কথা শুনাইয়াছেন, সংগঠনকার্য্যে তাহাদের সাহায্য চাহিয়াছেন। রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে যথেষ্ট আয়োজন করিলে, এই অঞ্চলের শ্রমশক্তি ও বুদ্ধিশক্তিকে নূতন করিয়া উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে তাঁহার আবেদন ব্যর্থ হইবে না। এই অঞ্চলের আদিবাসীদের মনে যে ভয় আছে তাহা দূর করিতে যে সংযম ও সহানুভূতির প্রয়োজন তাহা আমাদের সকলের চরিত্রে ফুটিয়া উঠুক, এই শুভ মুহূর্ত্তে সেই প্রার্থনা করি।

বাঙালীর সামরিক ঐতিহ্য

পশ্চিমবঙ্গে আস্তে আস্তে একটা সামরিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে বলিয়া মাঝে মাঝে দৈনিক সংবাদপত্রে বিবৃতি দেখিতে পাই। সরকারী প্রচার বিভাগ হইতে এই বিষয়ে জনসাধারণকে অধিকতর সজাগ করিবার কোনরূপ চেষ্টা যে হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাইতেছি না। হয়ত যে মন্ত্রী মহাশয়ের উপর এই কাজের দায়িত্ব পড়িয়াছে তিনি ইচ্ছা করেন না—এখন, এই সংগঠনের সময়, একটা হৈ-হল্লোড় করিয়া শক্তিক্ষয় করা হয়। এরূপ কথাও শুনিয়াছি যে পরদেশী রাষ্ট্রকে আমাদের আয়োজন-উদ্যোগের কথা জানিতে না দেওয়ার নীতি হইতে বর্ত্তমান গোপনীয়তা অবলম্বন করা হইতেছে।

এই নীতির সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হউক না কেন, বাঙালী সমাজে সামরিক বৃত্তি সম্বন্ধে এখনও একটা স্পষ্ট ধারণা দেখা দেয় নাই। দেশের চারিদিকে যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবৃত্তি উদগ্র হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা সংযত করিতে হইলে ইহাদের সামরিক শিক্ষার বিধিব্যবস্থার অধীন করিতে হইবে। তাহার জন্য চাই এই বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা। বাঙালী যুবকবৃন্দকে অতীত ইতিহাস শুনাইতে হইবে; বর্ত্তমানের সামরিক আয়োজন-উদ্যোগের কথা শুনাইয়া জাতিকে স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করিয়া তুলিতে হইবে। যাঁহারা বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করিবার সময় বিদ্রোহী-শক্তির সংগঠন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, জাতির লুপ্ত ক্ষাত্র-প্রবৃত্তি জাগ্রত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এই নূতন সংগঠন কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতে হইবে। হয়ত তাঁহাদের বর্ত্তমান রণনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের বৈপ্লবিক জীবনের অনুপ্রেরণায় এই অভাব পূরণ করা কঠিন হইবে না। আমাদের চোখের সামনেই এই বিষয়ে ট্রটস্কি-ষ্টালিনের উদাহরণ জ্বল-জ্বল করিতেছে।

বাঙালী চরিত্রের মধ্যে যে বিদ্রোহী ভাবের একটা ঐতিহ্য আছে, তৎসম্বন্ধে একটি নূতন প্রমাণ আমাদের দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছে। কাশীর "উত্তরা" নামক মাসিক "প্রবাসী বাঙালীর" মুখপত্র বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পত্রিকাখানি প্রায় পঁচিশ বৎসর হইতে বাঙালী সংস্কৃতির তন্ত্রধার হইয়া উত্তর-ভারতে বিরাজ করিতেছে। সেই পত্রিকার গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "বাংলার রাজনীতিক ইতিহাসের ধারা"—এই নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি দিল্লীর মিণ্টো রোড বেঙ্গলী ক্লাবের অধিবেশনে পঠিত; তাহার লেখক শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই ধারণা দৃঢ় হয় যে, ইংরেজ আমলের ন্যায় মুসলিম আমলেও বাঙালীকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা রাষ্ট্রনীতির অঙ্গ ছিল। লেখক "সয়ের মুতাক্ষরীনের" লেখক গোলাম হোসেনের লেখার উল্লেখ করিয়া তাঁহার মত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে নিম্নাংশ তুলিয়া দিলাম :

> "...গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, ইংরেজের একটা প্রধান দোষ হইতেছে বাংলার জমিদারদিগকে বিশ্বাস করা ও শাসন ব্যাপারে তাঁহাদের প্রাধান্য দেওয়া। এই বলিয়া তিনি বাংলার জমিদারবর্গের সম্বন্ধে প্রায় এক পাতার উপর নির্জ্জলা নিন্দা বর্ষণ করিয়াছেন। মোটের উপর তিনি বলিতেছেন, বাংলার এই জমিদারবর্গ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি; মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ ইহাদের স্বভাব; ফুরসৎ পাইলেই ইহারা বিদ্রোহ বা গোলমাল করিবে; অতএব এই জমিদারবর্গকে বদলে আনা ইংরেজের অত্যন্ত অন্যায়। গোলাম হোসেনের কথা আজ নিন্দাচ্ছলে স্তুতির ছায় শুনায় মাদের কর্ণে।..."

জাতীয় প্রকৃতির এই প্রমাণ মনে রাখিয়া পশ্চিমবঙ্গের সামরিক সংগঠন করিতে হইবে। প্রায় দেড় শত বৎসরের অনুশীলনের অভাব পূরণ করিতে হইলে, কলম-পেশা ও ঘর-মুখো বাঙালীকে বিষ্ণুপুর বীরভূমের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে হইলে ঐ পুরাতন কথা শুনাইতে হইবে। গুরুসদয় দত্ত রায়বেঁশে নৃত্যের যে ইতিহাস "বঙ্গলক্ষ্মী" মাসিক পত্রিকায় বিবৃত করিয়াছিলেন তাহা মনে করিলে এই সংগঠন-কার্য্য কঠিন হইবে না। সমাজের অত্যাচারে পশ্চিমবঙ্গের জাতিসমূহ আজ "অজ্ঞাতবাস" করিতেছে। ভারতরাষ্ট্রের স্বাধীন ব্যবস্থায় সেই "অজ্ঞাতবাসের" লাঞ্ছনা অতীতের দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে করা উচিত। রাষ্ট্রচালকবর্গ এই ইতিহাসের ইঙ্গিত বুঝিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য স্থির করুন।

ছাত্রসমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা

বর্দ্ধমানের "আর্য্য" পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে :

তুচ্ছ একটা খেলা লইয়া, জনৈক চিকিৎসক শিক্ষকের সামরিক একটা ব্যবহার লইয়া অভিজাত বংশের, ভদ্র-গৃহস্থের শিক্ষিত সন্তানেরা দুই দিন ধরিয়া যে অক্লান্ত রণ-দুর্ম্মদ হইয়া উঠিবেন,—ইহা বিস্ময়ের সহিত একটা মর্ম্মান্তিক লজ্জার বিষয়। বাংলার যে যুবক এক দিন অর্দ্ধোদয় যোগে সেবাকার্য্য করিয়া, দামোদর বন্যায় আত্মোৎসর্গ করিয়া, বিশ্বমানবের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহারাই আজ অসহিষ্ণুতার চরম মাত্রা প্রদর্শন করিল। ঘটনাটা যতই ভাবিতেছি,—ততই মনে হইতেছে কাফ্রী ও নিগ্রো—দুইটি আরণ্যক বর্ব্বরতা—যেন উন্মত্ত তাণ্ডবে মাতিয়াছে। যেন মরুভূমির দুইটি উপজাতি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে !! শিক্ষা, সংস্কৃতি, কালচার, উচ্চ শিক্ষার মহিমা—এ্যাডভাজমেণ্ট অব্ লারনিং—এক ভস্ম আর ছাই, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া গেল!...কাহাকেও অভিযুক্ত করিতেছি না। আতঙ্কিত হইয়া ভাবিতেছি—আমাদের ভবিষ্যৎ কি ? কোথায় যাইতেছি ? শতবর্ষের য়ুরোপীয় শিক্ষা সভ্যতা কোন্ আসুরিক অসংযমের মাঝে আমাদের টানিয়া লইয়া যাইতেছে। একটা কথা কর্ত্তব্য-বোধে বলিতেছি—বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ আমাদের স্নেহ-ভাজন। তাঁর পূর্ব্বজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যামন্দির লইয়া একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হইয়া গেল। তাঁর একবার উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। আজও বর্দ্ধমান তাঁহাকে মান্য করে। তিনি সম্মুখে দাঁড়াইলে ছাত্রদল নিশ্চয়ই শান্ত হইত।

কলিকাতার ছোঁয়াচ মফস্বলেও বিস্তারলাভ করিতেছে। যে বর্ব্বরতা [illegible] রাস্তা-ঘাটকে বিপৎসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে তাহার কারণ সম্বন্ধে সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী সকলেই অল্পবিস্তর চিন্তা করিতেছেন। ইহা কেবলমাত্র ছাত্রসমাজের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। গত ১৮-১৯-২০শে পৌষ তারিখে কলিকাতায় ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে যে বর্ব্বরতার উন্মাদনা দেখিয়াছি, তাহা লক্ষ্য করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতে হয়। বিদেশী যাঁহারা ভারতীয়ের সঙ্গে খেলা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করিবার কর্ত্তব্য ভুলিয়া আমাদের যুবকবৃন্দ দেশের গৌরববৃদ্ধি করেন নাই।

এই রোগের চিকিৎসা কি, তাহাই এখন ভাবিতে হইবে। খেলার মাঠে ইহা বন্ধ করিতে হইলে খেলোয়াড়দের এইরূপ সহস্র সহস্র বর্ব্বরদের সম্মুখে খেলিতে অস্বীকার করা উচিত। শুনিয়াছি একবার ক্রিকেট বীর ব্র্যাডম্যান খেলার মাঠে চীৎকার ও উন্মাদনা দেখিয়া খেলিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন ; এই ভর্ৎসনায় জনতা শান্ত হইয়াছিল। আমাদের যুবকবৃন্দকে সামরিক জীবনের কঠোর শিক্ষার মধ্যে ফেলিয়া দিলে ইহার প্রতিবিধান হইতে পারে। এইরূপ বাধ্যতামূলক শিক্ষায় পাড়ায় পাড়ায় অলস আড্ডাদারী বন্ধ হইবে। উচ্ছৃঙ্খলতার মূলে কুঠারাঘাত হইবে। এই ব্যবস্থা পরীক্ষার যোগ্য।

মণিমেলা সম্মেলন

আমাদের সমাজ-জীবনের বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খলতাই বাঙালীর একমাত্র পরিচয় নয়। গত ১৫-১৮ই পৌষ এই চারি দিন কলিকাতা নগরীতে যে মণিমেলা সম্মেলন উৎসব অনুষ্ঠিত হইল, তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা নানা নিরাশার মধ্যে আশার ইঙ্গিত দেখিতে পাইয়াছেন। একটা বিবরণীতে দেখিয়াছি যে, এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যবৃন্দ নিখিল-ভারতে বিস্তৃত ; তাহাদের সংখ্যা প্রায় পঁচাত্তর হাজার ; ইহার শাখার সংখ্যা প্রায় চারি শত। প্রাচ্যের এই "সর্ব্বাপেক্ষা" বৃহৎ কিশোর প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের কিশোরদের শিক্ষাকেন্দ্র। এই কেন্দ্রে তাহারা নূতন যুগের নূতন শিক্ষা লাভ করিতেছে—ভদ্রতা, শীলতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা—রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্ঘশক্তির অমোঘ পরীক্ষা যেসব গুণাবলীর মাধ্যমে সমাজ-জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইবে, মণিমেলা প্রতিষ্ঠান সেই গুণাবলীর অনুশীলন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

এক জন বাঙালী এই সংগঠনের প্রবর্ত্তক বলিয়া আমরা গৌরব বোধ করিতেছি। বাংলাদেশ হইতে তাহা দিকে দিকে বিস্তারলাভ করিয়া একটা সর্ব্বভারতীয় সঙ্ঘবদ্ধতার গোড়াপত্তন করিতেছে। এই পঁচাত্তর হাজার কিশোর যখন নাগরিক জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে, তখন তাহাদের শিক্ষার কল্যাণে দেশে নূতন জীবনের সূচনা দেখিতে পাইব, এই আশার মধ্যে আনন্দ আছে। আর এই আনন্দ বৃদ্ধি পায় এই ভাবিয়া যে, যে উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের জীবনকে বিকৃত করিতেছে, তাহার বিনাশ হইবে বর্ত্তমানে যাহারা কিশোর তাহাদের হাতে।

শুনিয়াছি, এই সংগঠনের সভ্যবৃন্দকে শিক্ষার সময়ে রাজ-

নীতি হইতে—দলগত রাজনীতি হইতে—দূরে থাকিতে হয়। বর্ত্তমানে যাহা রাজনীতি নামে পরিচিত তাহা হইতে দূরে থাকিবার এই নীতি সুবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। যাঁহারা এই সংগঠনের পরিচালক আমরা তাঁহাদের কর্ম্মের সাফল্য কামনা করি।

আসাম গবর্ন্মেণ্টের উদাসীনতা

গত ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে শিলং হইতে প্রেরিত একটি সংবাদে দেখিতে পাই যে, আসাম গবর্ন্মেণ্ট শেলা নামক স্থানে একটি বিমান ঘাঁটি প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের নিকট পাঠাইয়াছেন। এই স্থানটি শিলং হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত; এবং এই স্থানে একটি বিমান ঘাঁটি প্রস্তুত হইলে বর্ত্তমানে খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় অঞ্চলের অধিবাসীবর্গ "পাকিস্থানী" অবরোধে যে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহাও নিবারিত হইবে। এই অঞ্চলের কমলালেবু, চূণ, সুপারি, আনারস, আলু প্রভৃতির ব্যবসায় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত শ্রীহট্ট জেলার মাধ্যমে পরিচালিত হইত এবং গত ২৭ মাস হইতে "পাকিস্থানী" মর্জ্জির উপর নির্ভর করিয়া এই অঞ্চলের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে। একটা হিসাবে দেখিয়াছি যে বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। কিন্তু শ্রীহট্টে গণভোটের পরে দ্রব্যাদির সহজ ও স্বাভাবিক গতিপথে বাধা দিয়া পাকিস্থানীরা এই অঞ্চলের ৭০,০০০ লোকের উপর চাপ দিয়া পাকিস্থানে যোগদান করিবার মনোভাব তাহাদের মধ্যে সৃষ্টি করিতেছে।

অসমীয়া-ভাষাভাষী অঞ্চল নয় বলিয়া শ্রীগোপীনাথ বড়-দলৈয়ের মন্ত্রিমণ্ডলী এই কষ্ট ও ক্ষতির প্রতি এত দিন দৃক্‌পাত করেন নাই। মনে হয় সম্প্রতি নানা দিক হইতে আঘাত পাইয়া তাঁহাদের কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। আর এই মন্ত্রিমণ্ডলী বাঙালী-বিদ্বেষে অন্ধ হইয়া এমন আত্মঘাতী নীতি অনুসরণ করিয়া যাইতেছেন যে, অদূরভবিষ্যতে তাহার একটা হেস্তনেস্ত অবশ্যম্ভাবী। আমরা জানি বাঙালীকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য অসমীয়া-ভাষাভাষী নেতৃবর্গ জনাব সাদুল্লার মত মুসলিম লীগ প্রধানের সঙ্গে নানাভাবে জড়াইয়া পড়িতেছেন। কলিকাতার "যুগবাণী" পত্রিকা ৯ই পৌষ তারিখের সংখ্যায় আসামে মুসলমান-বৃদ্ধির একটা হিসাব দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে, "১৮৯১ সালে আসামের (শ্রীহট্ট জেলা বাদ) মোট অধিবাসী ৩৩,২২,২৪০ জনের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৩,১৯,৩৭১ অর্থাৎ প্রতি এগার জন অধিবাসীর মধ্যে মাত্র এক জন ছিল মুসলমান। ১৯৪১ সালে আসামের লোক-সংখ্যা (পাকিস্থানভুক্ত শ্রীহট্ট জেলা বাদ) ছিল ৭৬,০৬,০২৬ এবং তন্মধ্যে মুসলমান ১৭,৩৯,৯৮২ জন, অর্থাৎ প্রতি চার জন অধিবাসীর মধ্যে এক জন মুসলমান। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা ১৯৪১ সালের পর আজ পর্য্যন্ত আসামে মুসলমান জনসংখ্যা অন্ততঃ ডবল হইয়া গিয়াছে।"

এই বিপদ সম্বন্ধে আসামের বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী এক চক্ষু হরিণের মত চলিয়া ভারতরাষ্ট্রকে বিপন্ন করিতেছে। এই সম্বন্ধে আমাদের সহযোগীর সাবধান বাণী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

> পাকিস্থান আসামের বিরুদ্ধে পূর্ণ ব্লকেড (অবরোধ) চালাইতেছে, কিন্তু আসাম গবর্ন্মেণ্ট এখনো পাকিস্থানের সিমেণ্ট কোম্পানীকে পাথর ও কয়লা সরবরাহ করিয়া তাহা চালু রাখিতেছেন। এই সিমেণ্ট কোম্পানীর একজন বড় অংশীদার মন্ত্রী বলদেব সিংহের পিতা ইন্দ্র সিংহ। আসামের এই যোগান বন্ধ হইলে পূর্ব্ব পাকিস্থানের এই সবে মাত্র একটি সিমেণ্ট কোম্পানী এখনই বন্ধ হইয়া যায়। গান্ধী টেক্‌নিক্ পাকিস্থানের কাছে গান্ধীজীর আমলেই বার বার ব্যর্থ হইয়াছে একথাটা ভুলিলে ভারতরাষ্ট্রের বিপদ অনিবার্য্য। পাক-আসাম সীমান্তে এই বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে এবং বড়দলই গবর্ন্মেণ্টের অকর্ম্মণ্যতা এই সর্ব্বনাশকে ত্বরান্বিত করিয়া তুলিতেছে।

ভারতরাষ্ট্রে বাগ্‌বিতণ্ডা

ভারতরাষ্ট্রের পরিচালনা লইয়া তিক্ত আলোচনার অন্ত নাই। আমরা যে "নব-বৃন্দাবন" প্রত্যাশা করিয়াছিলাম পরদেশী শাসনক্ষমতার অবসানে তৎসম্বন্ধে অনেক কল্পিত বিবরণ দেখিয়াছি। প্রায় সকলেই গান্ধীজীর স্বপ্নের "রামরাজ্য" লইয়া অনেক কথা বলিতেছেন। কিন্তু তাহার মধ্যে কয়জন এই রামরাজ্যের উদ্দেশ্য ও নীতি আপনাদের জীবনে রূপদান করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা জানি না। তাঁহাদের সংখ্যা বেশী হইলে বর্ত্তমানের বাগ্‌বিতণ্ডার কোলাহল কথঞ্চিৎ শুদ্ধ হইত। তাহা হয় নাই; বরং বাড়িয়াই চলিতেছে। ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ও সহকারী প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি যেসব বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাই তাহার প্রমাণ। উভয়েই বলিয়াছেন—আমরা সাধ্যাতীত চেষ্টা করিতেছি; আমাদের চার-পাচ বৎসর সময় দাও ঘর গুছাইয়া লইতে; তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্রের যা' অভাব পরিশ্রম না বাড়াইলে, উৎপাদন না বাড়াইলে এবং খরচ না কমাইলে তাহা মিটিবার সম্ভাবনা কম। দেশের জনসাধারণ এই সব কথায় সান্ত্বনা পাইতেছে না।

একটি মাত্র উপায়ের কথা ভাবিতে পারিতেছি যাহা অবলম্বনে দেশের এই বাগ্‌বিতণ্ডা শান্ত হইতে পারে। সম্ভ পরদেশী শাসনমুক্ত অন্যান্য দেশে কি ঘটিয়াছিল, কি করিয়া তাহারা যুগান্তব্যাপী সমস্যাসমূহের সুমীমাংসা করিয়াছিল, সেই কর্ম্মপ্রচেষ্টার ইতিহাস আমাদের দেশের লোকের বুদ্ধিগম্য

করিতে পারিলে তাহাদের নিরাশা নিবারিত হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত একখানি পত্রিকায় এরূপ একটা চেষ্টা দেখিয়াছি। লেখক যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের—ম্যাস্যাচুসেটস ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির (Massachusets Institute of Technology) প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডা: এফ. এ. ওয়াকারের একখানি পুস্তকের বর্ণনা হইতে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের পরের অবস্থার চিত্র আঁকিয়া দিয়াছেন। তিনি আশা করেন যে, তাহা পাঠ করিলে ভারতরাষ্ট্রে যে নিরাশার ভাব দেখা দিয়াছে, তাহা দূর হইবে। পুস্তকখানির নাম—একটি জাতির সংগঠন (The Making of the Nation)।

সেই ইতিহাসই সংক্ষিপ্ত আকারে দিতে চাই। আমেরিকার ১৩টি ব্রিটিশ উপনিবেশ ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তারপর প্রায় এগার বৎসর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের স্বাধীন রাষ্ট্রীয়সত্তা স্বীকার করাইয়া লইতে সক্ষম হয়, যদিও তাহারা ১৭৮১ সালেই যুদ্ধে ব্রিটিশের উপর জয়লাভ করে। ১৭৮৭ সালে রাষ্ট্রের বিধিব্যবস্থা ১৩টি উপনিবেশের নাগরিকের প্রতিনিধি সভার নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করা হয়। এই যুক্তরাষ্ট্রের ৯টি যদি এই বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তবেই তাহা লোকগ্রাহ্য হইবে। এই সম্বন্ধে এরূপ গুরুতর সন্দেহ ছিল যে জর্জ্জ ওয়াশিংটনকে বলিতে শোনা যায়—"যদি অধিকাংশ ঔপনিবেশিক এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তবে পরবর্ত্তী সংস্করণ রক্তাক্ষরে লিখিত হইবে।"

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলি সর্ব্বপ্রথমে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে; কারণ বৃহত্তর প্রদেশগুলির শক্তি সম্বন্ধে তাদের একটা ভীতি ছিল। বৃহত্তম প্রদেশ, ভার্জিয়ানা, অনেক দিন দোমনা ছিল, কারণ তাহাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভাগে ক্ষুদ্রতমের সমান করা হইয়াছে। নিউ ইয়র্ক প্রদেশও সেই ভাবাপন্ন ছিল। যখন ১১টি প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধি গ্রহণ করিল, তখন কে আগে আসিল, কে পিছনে পড়িয়া রহিল, তৎসম্বন্ধে চিন্তার কারণ রহিল না। ১৭৯০ সালে সর্ব্বশেষ উপনিবেশ যোগদান করিল।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা ছিল ঋণের বোঝা। ফ্রান্স ব্রিটেনের শত্রু ছিল এবং বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিকে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। রাষ্ট্রের নাগরিকগণের নিকট হইতেও ততোধিক ধার করা হইয়াছিল। এই ঋণ লইয়া দেশ-বিদেশে তর্ক ও মনান্তরের সৃষ্টি হয়; প্রায় বিশ বৎসরে তাহা ক্ষান্ত হয়। এই নূতন রাষ্ট্রের আত্মাভিমানে আঘাত লাগিত যখন তাহাকে শুনিতে হইত যে ফরাসীর সাহায্য না পাইলে সে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিত না।

এই অভিজ্ঞতার মধ্যে অনেক কথা শুনিতে পাই যাহা ভারতরাষ্ট্রেও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা হইতেই ভরসা করিতে পারি যে নিরাশার কালো মেঘ সরিয়া যাইবে।

জম্মু-কাশ্মীর সমস্যা

জম্মু-কাশ্মীর সমস্যা ভারতরাষ্ট্রের জন্মাবধি সমস্ত গঠনমূলক কার্য্যকে ব্যাহত করিতেছে। "পাকিস্তান" জম্মু-কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া এই সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতরাষ্ট্র অস্ত্রবলে আততায়ীকে দূর করিয়া সে সমস্যার সমাধান করিতে পারিত। হয়ত তাহার সে শক্তি ছিল না; এবং শক্তি থাকিলে তাহার সদ্ব্যবহার কেন হইল না তৎসম্বন্ধে সদুত্তর আমরা এখনও পাই নাই।

সম্মিলিত জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানের দরবারে নালিশ ও আপীল করিয়া ভারতরাষ্ট্র লাভবান হয় নাই, আমরা তাহা দেখিতেছি। জম্মু-কাশ্মীর সমস্যা ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পায়তাড়ার মধ্যে জড়াইয়া গিয়াছে। সংঘ কর্ত্তৃক নিয়োজিত কমিশনের কার্য্যাবলী ও তাহাদের রিপোর্টে তাহার প্রমাণ। এই কমিশনের চারি জন সভ্য এক রিপোর্ট সহি করিয়াছেন; একজন সভ্য স্বতন্ত্র রিপোর্ট দিয়াছেন।

চারি জন সভ্য আক্রমণকারী ও আক্রান্তকে এক পর্য্যায়ে ফেলিয়া "খোলা মনের" একটা ব্যর্থ অভিনয় করিয়াছেন। অতীতে "পাকিস্তানের" কুকার্য্য সব ভুলিয়া গিয়া একটা রায় দিয়াছেন, যাহা সদবুদ্ধিপ্রণোদিত হইতে পারে না। একজন সভ্য সোজা বলিয়াছেন যে ব্রিটিশ ও মার্কিন গবর্মেণ্ট এই জটিলতার জন্য দায়ী। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানের কমিশন ভারত-রাষ্ট্র ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। তাহা ভারতরাষ্ট্রের নিকট প্রেরণ করিবার বা পৌছিবার পূর্ব্বেই ব্রিটিশ হাই কমিশনারদ্বয়ের (দিল্লী ও করাচীর) নিকট পৌছিয়া যায়।

ইহার পিছনে একটা ষড়যন্ত্র আছে নিশ্চয়ই এবং তাহার সন্ধান করিবার চেষ্টা করিলে পাওয়া যাইবে যে লণ্ডন ও ওয়াশিংটন নগরীর রাষ্ট্রকৌশলীগণ কোন অজ্ঞাত কারণে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বকে জিয়াইয়া রাখিতে চান। সেই কারণ সম্বন্ধে নানা সন্দেহের অবকাশ আছে। পাকিস্তান কি ভাবিতেছে তাহা জানি না। সে সন্তুষ্ট যে আক্রমণকারীর অভিনয় করিয়া সে বিশ্বের দরবারে সম্মান হারায় নাই। ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গ কমিশনের রায় গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বোচ্চ কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির (Security Council) প্রাক্তন সভাপতি কানাডার সেনাপতি ম্যাকনটন ব্রিটিশ মার্কিনী কট চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা ভারতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

ন্যায় ও মানবহিতের ক্ষেত্রে জোড়াতালির স্থান দিতে

অস্বীকার করিয়া ভারতরাষ্ট্র ভালই করিয়াছে। এই ভাবের রাজ্যে অটুট থাকিতে পারিলে সম্মিলিত জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানের কূটবুদ্ধিজীবীদের রঙ্গালয়ের দীপালোকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে। সে ধৈর্য্য ও শক্তি রক্ষা করিতে পারিলে সব দিক হইতে মঙ্গল। এই আশায় ভারতরাষ্ট্রের প্রজাপুঞ্জকে সংকল্পে দৃঢ় থাকিতে হইবে। বিলাতী-মার্কিনী-পাকিস্তানী ভাল ভাল কথায় বিভ্রান্ত বা অস্থির হইলে চলিবে না।

ভারত-ইতিহাসের রহস্য

বোম্বাই নগরীতে প্রসিদ্ধ গুজরাটী সাহিত্যিক শ্রীকানাইয়ালাল মুন্সী প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে "ভারতীয় বিদ্যাভবন" নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত করিয়াছেন। উহার উদ্দেশ্য ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলন। এই ভবনের নূতন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপাল শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী নিমন্ত্রিত হইয়া যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। সেইজন্ত ইহার কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম :

> ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতের দর্শন বিগত কালে ভারতকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আজ যদি তাহা অব্যাহত থাকিত, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অসম্পূর্ণতাজনিত ক্ষতির উপর হয়ত তেমন গুরুত্ব আরোপ করিবার প্রয়োজন থাকিত না। কেবলমাত্র পণ্ডিতের নয়, সাধারণ নরনারীর হৃদয়ে এবং তাহাদের গম্ভীর উপলব্ধির মধ্যে যদি বৈদান্তিক সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভবপর হইত, তবে স্কুল বা কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির ফলে তেমন মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হইত না। ক্ষোভের বিষয়, পরবর্ত্তী কালে আমাদের প্রাচীন সম্পদ দ্রুত হ্রাস পাইয়া আসিয়াছে। আমার আশঙ্কা হয়, তাহার কিছুই আর অবশিষ্ট নাই।...বৈদান্তিক সংস্কৃতি বলিতে যে শৃঙ্খলা, সংযম ও নীতিজ্ঞান বুঝায়, গত ৫০ বৎসরের অনুসৃত শিক্ষা-পরিকল্পনা দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞার সহিত দূরে ঠেলিয়া রাখা হইয়াছে। অথচ এই বর্ত্তমান শিক্ষা-পরিকল্পনা আমাদের প্রাচীন সম্পদের স্থানে কিছুই দেয় নাই।

এই ক্ষোভের উপর মন্তব্য করিতে গিয়া আমাদের সহযোগী "উজ্জ্বল ভারত" প্রশ্ন করিয়াছেন ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শন বলিতে কি বুঝায়? যাহা বৌদ্ধধর্ম্মকে দেশছাড়া করিয়াছে, যাহা ইস্‌লামের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারে নাই এবং যে হিন্দু-মুসলমান যুক্ত সংস্কৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতার দাপটের সম্মুখে প্রায় দুই শত বৎসর নতশির ছিল, "কূর্ম্মনীতি" অবলম্বন করিয়া যে সংস্কৃতি আপনার প্রাণ কায়ক্লেশে রক্ষা করিয়াছিল, তাহাই কি ভারতীয় সংস্কৃতি?

"মনস্তত্ত্বের কোন্ রন্ধ্রপথে বিদেশের আক্রমণকারীগণ প্রবেশ করিল, কেন প্রবেশ করিতে পারিল,"—এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া "উজ্জ্বল ভারত" বলিতেছেন :—"এতদিনকার ভারতীয় সংস্কৃতি বর্জ্জন-নীতির উপর, নেতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ভারতের পক্ষে পরদেশীকে "হজম" করা সম্ভব ছিল না; বর্ত্তমানেও সেই শক্তির উন্মেষ হয় নাই বলিয়াই ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়াছে।"

এই প্রশ্নাবলী ভারত-ইতিহাসের মূল রহস্যের অঙ্গ। কেবল বাঁচিয়া থাকায় কোন বিশেষ গৌরব না থাকিতে পারে। কিন্তু কেবল "কমঠ বৃত্তি" ও তার কৌশল অবলম্বন করিয়াই কি ভারত বাঁচিয়া আছে? রামমোহন যুগ হইতে গান্ধী যুগ পর্য্যন্ত কি একটা সমন্বয়ের চেষ্টা চলে নাই? জাতীয় জীবনের এই সংগঠকগণের জীবন প্রমাণ করে যে, আমাদের সমাজ-মন নিশ্চেষ্ট ছিল না। যতদিন এই প্রশ্নের সদুত্তর না পাওয়া যাইতেছে ততদিন এই রহস্যের স্বরূপ বুঝা যাইবে না।

ভারতীয় সংস্কৃতি

ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু যদি ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্ত্তনে হিন্দু সংস্কৃতির দানের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিতেন, তবে যখন তখন তিনি এরূপ ভাবে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেন না। ইংরেজী শিক্ষার কল্যাণে আমাদের বর্ত্তমান সংস্কৃতি নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে; নানা বিকৃতির আধারও হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ এই পরিবর্ত্তনের সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের দৃষ্টির অগোচরে যে বিরাট সমাজ প্রাচীন চিন্তাধারা ও রীতি-নীতি অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছে, তাহার সংবাদ আমরা সাধারণতঃ রাখি না। এত দিন তাঁহারা একটা পরদেশী উগ্র সমাজের তাড়নায় ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। তাঁহাদের সংস্কৃতিতে প্রায় অবিশ্বাসী ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়েরাই সেই পরদেশী সমাজের প্রভুত্বকে দূর করিয়াছেন। এবং প্রাচীনপন্থীরা মনে করিতেছেন পরদেশী শাসনের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহারা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ পাইবেন। এই আশার প্রকাশ শুনিতে পাই শান্তিপুর সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের সপাদ শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন মহাশয় একটি ভাষণ প্রদান করেন। 'সংঘবাণী' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

> আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জাতীয় সরকার। কাজেই জাতীয় সরকারের কর্ত্তব্য উপযুক্ত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের বৃত্তির বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তাঁহাদিগের সাহায্যে সংস্কৃত ভাষায় অন্তর্নিহিত যথার্থ ভাবধারা দেশবাসিগণের সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়া

তাহাদের জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত করা। দেশবাসী উপলব্ধি করুন তাঁহাদের অতীতের ইতিহাস, তাঁহারা উপলব্ধি করুন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সত্তা। ইহার জন্ম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ বিশেষভাবে এ বিষয়ে কার্য্য করিতেছেন সত্য, কিন্তু আজ দীর্ঘকাল ধরিয়া নদীয়া শান্তিপুরস্থিত বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ সামান্য আকারে হইলেও পুরাণের ভিতর দিয়া আর্য্য ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন। উৎসাহ পাইলে এই পরিষদ প্রসারিতভাবে আর্য্য ভাষা ও তদন্তর্গত বিবিধ তথ্যাদির প্রকাশ করিতে বিশেষ যত্ন করিবেন।

রাসায়নিক শিল্পের অবনতির কারণ

বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের অন্যতম প্রধান কর্ম্মী পশ্চিম ইউরোপে ভ্রমণ শেষ করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। নানাবিধ প্রবন্ধে তিনি তাঁহার নূতন অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিতেছেন। ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় তিনি জার্ম্মানীতে রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি ও ভারতে তাহার অবনতির কারণ সম্বন্ধে একটি আলোচনা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। জৈব রসায়নশাস্ত্রের উন্নতি-অবনতির উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন :

> আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত 'হিমালয়ান' ব্যক্তিত্ব ও মনীষার অধিকারী যদি ঐ সময়ে এডিনবরার অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউনের কাছে না গিয়ে জার্ম্মানীতে বেয়ার এমিল-ফিশার বা হফমানের ল্যাবরেটরিতে শিক্ষালাভ করতে যেতেন তবে আজ আমাদের গোটা দেশেরই চেহারা বদলে যেত—অত্যাবশ্যক ঔষধপত্র, রঞ্জক পদার্থ প্রভৃতির জন্যে আজ আমাদিগকে বিদেশীর মুখের দিকে আর চেয়ে থাকতে হত না। তাঁর শিষ্যদের মধ্যেও তা'হলে আজ সত্যিকারের রসায়নবিদ্ ও শিল্পবিদ্ আরও অধিক সংখ্যায় আমরা দেখতে পেতাম। তারপর আচার্য্য রায় যে সময় বিলাতে শিক্ষার্থে যান ঐ সময় বিলাতের মেধাবী উচ্চাভিলাষী রসায়নের ছাত্রমাত্রেই জার্ম্মানীতেই ঐ বিষয় শিক্ষা করতে যেতেন।
>
> স্বাধীন ভারতের শিক্ষাবিভাগের সুযোগ্য কর্ণধারগণ যদি অতীতের ঐ ভ্রমের পুনরাবৃত্তি নিরোধে কৃতসংকল্প হন, যদি সত্যিকারের দেশকল্যাণ যথার্থই তাঁদের কাম্য হয়, তবে উচ্চাভিলাষী মেধাবী ছাত্রদের সকলকেই মার্কিন মুলুক বা বিলাতে না পাঠিয়ে জার্ম্মানীতে বা জার্ম্মানীর দিকপাল রসায়নবিদ্‌গণের পদাঙ্ক অনুসরণে আজ যেখানে পুরাদমে রসায়নশাস্ত্রের উচ্চতর চর্চ্চা অবাধ গতিতে চলেছে—সুইজারল্যাণ্ডের সেই জুরিখ শহরে নোবেল লোরিয়েট অধ্যাপক রুজিকা ও কারারের ল্যাবরেটরিতে পাঠালে—তাঁদের অর্জিত জ্ঞানে দেশ সত্যসত্যই ধন্য ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

সাহিত্যে "উপেক্ষিতা"

নদীয়া কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ অনুবাদ সাহিত্যকে উপরোক্ত উপাধি দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র "ক্যালকাটা রিভিউ" পত্রিকার নভেম্বর ও ডিসেম্বর সংখ্যায় দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়ে নূতন ভাবে মনোযোগ দান করা উচিত। যখন আমাদের "রাষ্ট্রীয় ভাষা" করা হইয়াছে হিন্দি ভাষাকে যাহার শব্দসম্ভার ও প্রকাশভঙ্গী এই গুরু দায়িত্ব ও সম্মানের উপযোগী হইতে এখনও অনেক দিন লাগিবে, তখনই এই প্রয়োজন আরও অনুভূত হইতেছে। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব উপলক্ষ্যে কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া অনুবাদের সাহায্যে ভাষার উন্নতি বিধানের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কয়েকটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি ভারতরাষ্ট্রের অধিবাসীবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন।

ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে এরূপ আদান-প্রদান শিক্ষার অঙ্গ হওয়া উচিত। বাঙালী আমরা এই বিষয়ে ভাগ্যবান। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যের দিকপাল এইরূপ অনুবাদ সাহিত্যে হাত পাকাইয়াছিলেন। সেইজন্যই বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ করিয়া ভারতের অনেক ভাষা সম্পদশালিনী হইয়াছে। আজ নূতন পরিস্থিতিতে বাঙালীর এই বিষয়ে অবহিত না হইলে চলিবে না। প্রতিবেশী ভাষা-সমূহের উৎকৃষ্ট নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে আমাদের উদাসীনতা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সময় থাকিতে সাবধান হইতে হইবে। বাঙালীর সাহিত্য-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উচ্চ আশা নূতন গৌরবে মণ্ডিত করিতে হইলে অনুবাদ সাহিত্যের আরও উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। অধ্যাপক ঘোষের প্রবন্ধদ্বয় সেইজন্য সময়োপযোগী হইয়াছে।

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিশ্বের বহুধা-বিভক্ত প্রকাশের মধ্যে ঐক্যের "দর্শন" লাভ করা, তাহাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা ও লোকবুদ্ধি-গ্রাহ্য করাই হইল দার্শনিকের কর্ত্তব্য, চিন্তানায়কের জীবনব্রত। বাঙালী সমাজ হইতে এইরূপ একজন দার্শনিক ও চিন্তানায়কের তিরোধান হইল।

কৃষ্ণচন্দ্র প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য দর্শনের আলোকে নিজের জীবনের গতিপথ নির্ব্বাচন করিতে গিয়া জাতির ও তাঁহার নিজের প্রকৃতি হইতে বিচ্যুত হন নাই। দুইয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া নিজের চিন্তা ও ব্যবহারে এমনি একটি সংযত ও শান্ত রূপ দান করিয়াছিলেন যাহা বর্ত্তমান দার্শনিক সমাজে বিরল হইয়া উঠিতেছে বলিলে অন্যায় হইবে না। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা ছিল অনন্যসাধারণ; জ্ঞান বিস্তারের প্রয়োজনে যে অহমিকার প্রকাশ মাঝে মাঝে দেখা দেয় তাহা তিনি কঠোর হস্তে দমন করিয়াছিলেন। সেইজন্যই অনেকের মতে তিনি লোকের

নিন্দা-প্রশংসায় বীতস্পৃহ হইয়া, অর্থ ও সম্মান সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া দার্শনিকের প্রকৃত মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন।

এরূপ চরিত্রের লোক সমাজ-সংগঠনের ব্রত গ্রহণ করেন না বলিয়াই আমাদের জীবনে এত চিন্তা-সাঙ্কর্য্য, কর্ম্মে ও কর্ত্তব্যে এমন শিথিলতা। কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মত লোকই এইরূপ বিপদে আমাদের পথ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন। তিনি ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার পরিবারের ক্ষতি ও দেশের ক্ষতি এক পর্য্যায়ের।

পূর্ণচন্দ্র মৈত্র

লাট কার্জ্জনের "বঙ্গভঙ্গ" চেষ্টার বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ভারতবর্ষের রাজনীতিক চিন্তাধারা ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্ত্তনের সূচনা করে। পূর্ণচন্দ্র মৈত্র তার সাক্ষীরূপে ১৯৪৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া-ছিলেন। তিনি পরিণত বয়সে প্রার্থিত লোকে চলিয়া গেলেন।

পূর্ব্ববঙ্গে উক্ত আন্দোলন বিশেষ উগ্ররূপ ধারণ করে। বরি-শালের অশ্বিনীকুমার, ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ, ঢাকার আনন্দচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ; ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু, তারানাথ, সূর্য্যকান্ত; ত্রিপুরার মথুরামোহন, ভূধরচন্দ্র, অনঙ্গমোহন; চাঁদপুরের হর-দয়াল, মহেন্দ্রনাথ; চট্টগ্রামের যাত্রামোহন; শ্রীহট্টের শশীন্দ্রচন্দ্র, রাধাবিনোদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। ফরিদপুরে অম্বিকাচরণের নেতৃত্বে পূর্ণচন্দ্র আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার কার্য্যে বিশেষ তৎপর হইয়াছিলেন।

তাঁহার পরিবারবর্গ সেই ধারা বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

হরিসিং গৌর

এই মহারাষ্ট্রীয় আইনজীবী প্রধান ও শিক্ষাবিদ প্রায় ৮৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। জীবনের প্রায় সমস্ত উপার্জ্জন, প্রায় ২০ লক্ষ টাকা, মধ্য-প্রদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। শেষজীবনে তিনি যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার জীবনের একটি স্বাভাবিক পরিণতি, কারণ শিক্ষাদানে আগ্রহ তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল। নাগপুর, দিল্লী, আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলাররূপে তাঁর যে প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা সগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ভাইস্ চ্যান্সেলার রূপের মধ্যে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে।

হরিসিং গৌর সমাজ-সংস্কারক ব্রতেও অংশ গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। হরবিলাস সরদা বাল্য-বিবাহ-নিরোধ আইন পাস করাইয়া ভারতীয় সমাজের একটা দুর্ব্বলতা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। হরিসিং গৌর হিন্দু আইনের সংস্কার চেষ্টা করিয়া, এই সমাজের নানা শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান সহজ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শিক্ষাবিদরূপে তাঁহার কর্ম্ম-প্রচেষ্টা দেশের লোকের মনে তাঁহার স্মৃতি জাগরূক রাখিবে।

জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

পূর্ব্ববঙ্গের খুলনা জেলার একজন প্রধান ব্যক্তি কর্ম্মের পরপারে চলিয়া গেলেন। প্রথম "বঙ্গভঙ্গ" আন্দোলন উপলক্ষে যে জীবনের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার আরম্ভ, দ্বিতীয় "বঙ্গভঙ্গের" পর তার পরিসমাপ্তি। বিধাতার বিধান আমাদের বুদ্ধির অগম্য; তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

কর্ম্মজীবনের ঊর্দ্ধে ও বাহিরে জ্যোতিষচন্দ্রের আর একটা রূপ ছিল। তিনি ভোলানন্দ গিরির শিষ্য ছিলেন; আধ্যাত্মিক সত্যানুভূতির প্রতি তাঁহার একটা সহজ টান ছিল। সেইজন্য দেখিতে পাই বৃদ্ধবয়সে তিনি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছেন। কর্ম্ম ও ভাবের সমন্বয় সাধক আমাদের মধ্যে বিরল হইয়া যাইতেছে। জ্যোতিষচন্দ্র এই পথের পথিক ছিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ (পুরাতন রিপন কলেজ) তার অধ্যক্ষকে হারাইল। ৬৩ বৎসর বয়সে ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মরলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গের দুঃখে আমরা যোগদান করিতেছি।

তিনি এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাতজামাই ছিলেন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন-শাস্ত্রে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি "রিপন কলেজে" যোগদান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের পরিচালক সমিতির সভাপতিরূপে তিনি শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ সাহায্য করেন। সেই কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

বনলতা দাশ

রেডিং ও আরউইন বড়লাটদ্বয়ের আমলে সতীশরঞ্জন দাশ মহাশয় কেন্দ্রীয় আইন-সচিব ছিলেন। তাঁহার পত্নী বনলতা দাশ সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। বাংলার নারী-সমাজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিবিধায়ক চেষ্টার এক জন সমর্থকের তিরোধান হইল। শ্রীযুক্তা অবলা বসু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নারী-শিক্ষা সমিতির তিনি সহকারী সভানেত্রী ছিলেন, এবং অন্যান্য নারী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। নীরবে তিনি তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্যাদি পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের শোকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

লেখক-লেখিকাদের প্রতি নিবেদন

ইদানীং ডাকের গোলমালে প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত রচনাদি সমুদয় আমাদের হস্তগত হয় না। আমরাও যেসব লেখা ফেরত পাঠাই তাহার প্রত্যেকটি যে রচয়িতাদের নিকট পৌঁছিবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। এ কারণ লেখক-লেখিকাগণ সর্ব্বদা লেখার নকল রাখিয়া আমাদিগকে পাঠাইবেন। কবিতা ফেরত পাঠাইবার দায়িত্ব আমরা কোন ক্রমেই লইতে পারি না।—'প্রবাসীর সম্পাদক'।

বাংলার আদিকবি—চণ্ডীদাস না কৃত্তিবাস ?

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসের পৌর্ব্বাপর্য্য এবং অভ্যুদয়কাল নির্ণয়ে পুনর্ব্বিবেচনা আবশ্যক হইয়াছে। ১২৭৯ সনে রামগতি ন্যায়রত্ন চণ্ডীদাসকে বাংলা সাহিত্যের আদ্যকালে এবং কৃত্তিবাসকে মধ্যকালে স্থাপন করিয়াছিলেন—ত্রিপাদ-শতাব্দীর প্রচুর গবেষণা ও আলোচনার পরও আজ পর্য্যন্ত তাহাই বহুল পরিমাণে শিক্ষিত সমাজে সংস্কারবদ্ধ হইয়া আছে। এ বিষয়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে কতিপয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি ও যথোচিত আলোচনা আহ্বান করিতেছি।

১

চণ্ডীদাসের কালনির্ণয় দুইটিমাত্র প্রমাণের উপর নির্ভর করে—"শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" পুথির লিপিকাল এবং মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎকারপ্রসঙ্গ। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্নলিপিতত্ত্বের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া কতিপয় কালনির্দ্দেশযুক্ত পুথির অক্ষরলিপির সহিত তুলনাপূর্ব্বক "স্থির সিদ্ধান্ত" করেন যে, পুথিটি "১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল" (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ১ম সং, ১৩২৩, মুখবন্ধ, পৃ. ।৵০)। এই লিপিকাল নির্ণয় সর্ব্বসম্মত না হইলেও বহুল প্রচারলাভ করিয়াছে। শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় স্বয়ং ইহা অনুসরণ করিয়া চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল "... ১৪শ শতকের প্রথমার্দ্ধে" ধরিয়াছিলেন (ঐ, পৃ ২৮)। পুথির এই লিপিকালনির্ণয় সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক হইয়াছে। প্রথমতঃ, প্রত্নলিপিতত্ত্বের প্রমাণ দ্বারা কিম্বা গ্রন্থের ভাষা বিচার দ্বারা কোন পুথিরই লিপিকাল নিঃসন্দিগ্ধরূপে সঙ্কীর্ণ অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে স্থাপন করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বাংলা এবং সংস্কৃত পুথির লেখকদের মধ্যে একটা প্রভেদ সাধারণতঃ উপলব্ধি করা যায়—উভয়ের লিপির তুলনা বিজ্ঞানসম্মত হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, "শূদ্রপদ্ধতি"র লিপিকাল সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মারাত্মক ভ্রম করিয়াছেন—ইহা ১৪৪২ "সম্বৎ" (অর্থাৎ ১৩৮৫-৬ খ্রীঃ) নহে, পরন্তু ১৪৪২ "শকাব্দ"। কালনির্দ্দেশ স্থলে "সং ১৪৪২" অঙ্কসংখ্যার পর শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া "শাকে" লিখিত হইয়াছে এবং ১৪৪২ শকাব্দের পৌষ মাস কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি শনিবার বস্তুতই ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর পড়িয়াছিল বলিয়া গণনা দ্বারা পাওয়া যায়। সুতরাং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থির সিদ্ধান্ত সংশোধন করিয়া তাঁহার যুক্তিবলেই লিপিকাল হয় ১৪৩৬-৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে (অর্থাৎ বোধিচর্য্যাবতার পুথির পূর্ব্বে) মাত্র। বস্তুতঃ এস্থলে তাঁহার যুক্তিও মোটেই বিচারসহ নহে। তিনি স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিটির "অধিকাংশ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার আধুনিক" (উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ।০)। পুথিটির যে সকল অক্ষর তিনি "প্রাচীন" আকারের বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন তাহাদের ঐরূপ আকার বহুতর আধুনিক পুথিতে পাওয়া যায়; সুতরাং তাহাদের প্রাচীনতা প্রমাণসিদ্ধ হয় না। যথা—

(১) প্রাচীন আকারের "উ" এবং "ঊ"তে মাত্রার উপরে বক্রগতি ঊর্দ্ধরেখা নাই (পৃ. ।০)। চুঁচুড়ার বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর গ্রন্থালয়ে তাড়পত্রে লিখিত একটি হরিবংশের শেষ দুই পত্র আছে; লিপিকালাদির পাঠ এই—"শুভমস্তু শকাব্দাঃ ॥ ১৪৪৫ ॥ কেনাপি হরিচরণসরোজ-মধুমত্তমধুকরেণ শ্রীহরিহরপণ্ডিতেন লিখিতং ॥" এই পুথিতেও উকারের ঊর্দ্ধরেখা নাই ("উপায়েন" বধঃ কাল-যবনস্য প্রকীর্ত্তিতঃ)। ১৪৪৫ শকে ১৫২৩-৪ খ্রীঃ হয়।

(২) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির খ, ঘ, থ ও ষ প্রাচীন আকারের—ইহাদের নিম্নভাগে কোণ নাই। কিন্তু আমাদের নিকট রক্ষিত ১৬০১ শকাব্দের (১৬৭৯ খ্রীঃ) একটি তন্ত্রসারের পুথির বহুস্থলে এই তথাকথিত প্রাচীন আকারের ঘ ও ষ দৃষ্ট হয়।

(৩) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের তথাকথিত প্রাচীন আকারের চ ও জ উল্লিখিত হরিবংশের পুথিতে এবং অপরাপর বহু পরবর্ত্তী পুথিতেও দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিতে দৃশ্যমান বর্ণমালার আকার সমস্তই ১৫শ হইতে ১৭শ শতাব্দীর কোন না কোন পুথিতে পাওয়া যায় এবং ইহা স্থির সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করা যায় যে, পুথিটির লিপিকাল খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, ১৬শ শতাব্দীও হইতে পারে। সুতরাং তদ্দ্বারা চণ্ডীদাসের কাল নির্ণয় হয় না।

চণ্ডীদাসের সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকার ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইলে তাহাই চণ্ডীদাসের কাল-নির্ণয়ের একমাত্র সূত্র বলা যায়। মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিদ্যাপতির গ্রন্থ-রচনাকাল ১৩৯৫-১৪৪০ খ্রীঃ মধ্যে নির্ণয় করিয়াছিলেন (J. A. S. B., 1915, p. 392)। বিদ্যাপতির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে ভৈরবসিংহের নাম আছে এবং পক্ষধর মিশ্রের সহিত তাঁহার সম্বাদপ্রসঙ্গ উপেক্ষণীয় নহে। সুতরাং প্রায় ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ তাঁহার স্বর্গারোহণ-কাল ধরিয়া তাঁহার আনুমানিক জন্মকালের ঊর্দ্ধতন সীমা ১৩৭০

সনে স্থাপন করা যায়। তাঁহার সাহিত্য-রচনা ১৪শ শতাব্দীর শেষ দশকের পূর্ব্বে ঘটে নাই এবং চণ্ডীদাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ১৫শ শতাব্দীর প্রথম দশকে কিম্বা পরে ঘটিয়াছিল; কিন্তু পূর্ব্বে নহে। এতদনুসারে চণ্ডীদাসেরও জন্মকাল ১৩৭০ সনে অনুমান করা যায়।

সম্প্রতি ডঃ সুকুমার সেন চণ্ডীদাসকে "স্বচ্ছন্দে" শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ধরিয়া অনুসন্ধানলব্ধ কতিপয় অনতিপ্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের সহিত তাঁহার অভেদ কল্পনা করিয়াছেন (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ, ১৬৭-৬৯)। চণ্ডীদাসকে অকারণ আধুনিক প্রতিপন্ন করার এই চেষ্টা আমাদিগকে অতিমাত্রায় বিস্মিত করিয়াছে। "শ্রীচণ্ডীদাসাদিদর্শিত-দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি"র উল্লেখ সনাতনের বৃহত্তোষণীতে (১০।৩৩।২৬ শ্লোকের টীকায়) দৃষ্ট হয়, জীবের লঘুতোষণীতে নহে। সনাতন নিঃসন্দেহ শ্রীচৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন—তাঁহার কোন গ্রন্থেই চৈতন্যসম্প্রদায়ের বহির্ভূত কোন সমসাময়িক গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের নাম নাই এবং থাকার সম্ভাবনাও নাই। চণ্ডীদাস চৈতন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, ঘুণাক্ষরেও এরূপ কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। সনাতন কর্ত্তৃক জয়দেবের সঙ্গে চণ্ডীদাসের সসম্মান নামোল্লেখ হইতে (শ্রীচণ্ডীদাসাদির "আদি" পদটি লক্ষণীয়) চণ্ডীদাসের গ্রন্থরচনাকাল অধস্তন পক্ষে প্রায় ১৪৫০ খ্রীঃ অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত। ভাবচন্দ্রিকাকার চণ্ডীদাসকে শ্রীযুত বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় (১ম সং, পৃ. ১৪) পৃথক্ ধরিয়াছেন। ভাব চন্দ্রিকা গ্রন্থ অধুনা অপ্রাপ্য, গ্রন্থটি না দেখিয়া শুধু পুথি-বিবরণী (L. 2131) দেখিয়া গ্রন্থকারকে "ষোড়শ শতকের প্রথম অংশে" (পৃ. ১৬৭) স্থাপন করা অযৌক্তিক। আর, কাব্যপ্রকাশের 'দীপিকা'-কার চণ্ডিদাসকে ভাবচন্দ্রিকাকারের সহিত, কিম্বা গণমার্ত্তণ্ডকার নৃসিংহের পূর্ব্বপুরুষের সহিত অভিন্ন কল্পনা করার প্রশ্নমাত্রও ভ্রমাত্মক। চণ্ডিদাসের দীপিকা কাশীর সরস্বতীভবন গ্রন্থমালায় অংশতঃ মুদ্রিত হইয়াছে; এই চণ্ডিদাস সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের খুল্লপিতামহ এবং নিঃসন্দেহ খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীর লোক।

বর্দ্ধমান, কেতুগ্রাম নিবাসী গণমার্ত্তণ্ডকার নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন ঊর্দ্ধতন ১১ পুরুষের নামমালা ও কুলক্রিয়ার বিবরণ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—(I. O., 1, p.226), বাঙ্গালী গ্রন্থকারসমাজে ইহা এক অপূর্ব্ব বস্তু। ডঃ সেন ইহা সংক্ষেপে লতাকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ. ১৬৮)। দুঃখের বিষয়, রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীর প্রতি শিক্ষিতজনসুলভ বিজাতীয় বিদ্বেষ ডঃ সেনের চিত্তকেও অভিভূত করায়, এস্থলে তাঁহার পণ্ডশ্রম হইয়াছে—নৃসিংহের আসল কুলপরিচয়ই তাঁহার নিকট অজ্ঞাত রহিয়াছে। নৃসিংহের ঊর্দ্ধতন দশম পুরুষ চণ্ডিদাস* ছিলেন অশ্বপতির পুত্র এবং এই অশ্বপতি ছিলেন মুখ-বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ মুরারি ওঝার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভৈরবের পুত্র। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী হইতে ভৈরবের কারিকাংশ (প্রাচীন পুথির বিশুদ্ধ পাঠ দৃষ্টে) উদ্ধৃত হইল (নগেন্দ্রনাথ বসুর সং, পৃ. ৬৫):—

গজপত্যশ্বপতী চ হেরম্বো বামনস্তথা।
ভৈরবস্যাত্মজা এতে তেষশ্বপতিকঃ কৃতী।

অর্থাৎ ভৈরবের ৪ পুত্রের মধ্যে অশ্বপতিই কুলাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ভৈরব কবি কৃত্তিবাসের জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন, আত্মবিবরণীতে কৃত্তিবাস গজপতির কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়াছেন:—

ভৈরবসুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারানসি পজ্যন্ত কিত্তি ঘুসএ সংসার।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত একটি বিরাট কুলপঞ্জীতে (২১০২ সং পুথি) গজপতির ধারা বিবৃত হইয়াছে; নিজ গজপতির কুলবিবরণ অংশতঃ উদ্ধৃত হইল—(৪২৭।১ পত্রে) "গজপতিমহামণ্ডলস্য আর্ত্তি...বিসম্বাদসময়ে প্রতিপত্তিহানি ঘোং রত্নাকর নগাঞ্যা হানিঃ...তৎসুতা...।" মহামণ্ডল উপাধি দ্বারা তাঁহার বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা সম্যক্ সূচিত হইয়াছে, কিন্তু দেখা যায় কুলক্রিয়ায় তাঁহার "হানি" ঘটিয়াছিল। কৃত্তিবাসের ভ্রাতৃসম্পর্কিত এই গজপতি ও অশ্বপতি কৃত্তিবাস অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন সন্দেহ নাই, কারণ মুরারি ওঝার জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন ভৈরব এবং কৃত্তিবাস-পিতা বনমালী ছিলেন পঞ্চম পুত্র। সুতরাং অশ্বপতির পুত্র চণ্ডিদাস কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন। উক্ত কুলপঞ্জী হইতে অশ্বপতির ধারার নামমালা মাত্র (কুলক্রিয়াংশ বাদ দিয়া) উদ্ধৃত হইল নৃসিংহের উক্তির সহিত মিলাইয়া দেখিলে কুলপঞ্জীর প্রামাণ্যবিষয়ে সকলের সংশয় দূর হওয়া উচিত।

অশ্বপতি—সঙ্গীদাস চণ্ডীদাসনামা—(গরুড়শ্রীনাথ)গোপীনাথ মহানন্দকাঃ)—মাধব(বিদ্যানন্দ-সানন্দ অনন্তকাঃ)—নয়ন(ভুবনভোলাইকাঃ)—(সদানন্দ) কুমুদানন্দ (যাদবানন্দাঃ)—শ্রীহরিবাচস্পতি(গঙ্গাহরিকৌ)—শ্যামচরণ বিদ্যাবাগীশ (রামচরণৌ)—গোপালসার্ব্বভৌম (কৃষ্ণরামপ্রাণকৃষ্ণাঃ)—কুশলতর্কভূষণ (সুবলরামনাথাঃ)—নৃসিংহতর্কপঞ্চানন—রমাকান্ততর্কসিদ্ধান্তশ্রীকান্তৌ॥ কেতুগ্রামনিবাসী (৪২৭।২ পত্র)। এস্থলে কুলপঞ্জীতে কেবল কতিপয় ভ্রাতৃনাম বাদ গিয়াছে মাত্র এবং কুলক্রিয়াংশের বিবরণে নৃসিংহের উক্তির সহিত

* কালিদাসের ন্যায় চণ্ডিদাস সংজ্ঞাপদ বলিয়া হ্রস্ব-ইকারযুক্ত, ছন্দের খাতিরে নহে—কাব্যপ্রকাশদীপিকাকারও হ্রস্ব-ইকারই লিখিয়াছেন।

যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্যও দৃষ্ট হয়। বুঝা যায় গণমার্ত্তণ্ড হইতে এই নামমালা গৃহীত হয় নাই। তথাপি ঘটকদের নিজস্ব উপকরণ হইতে যে নামমালা উদ্ধৃত হইয়াছে নৃসিংহের উক্তির সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল আছে এবং একটি মূল্যবান্ অতিরিক্ত তথ্য আছে যে, চণ্ডীদাসের নামান্তর ছিল যষ্ঠীদাস।

সময়ের হিসাবে বাধা না থাকিলেও এই চণ্ডীদাসকে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকারের সহিত অভিন্ন কল্পনা করার বিন্দুমাত্রও হেতু বিদ্যমান নাই। বড়ু চণ্ডীদাস বিশ্রুতকীর্ত্তি, ফুলিয়ার মুখটিবংশীয় কবি কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, অথচ ৫০০ বৎসর-মধ্যে একথা ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিল না, ইহা কল্পনার অতীত। অশ্বপতি এবং সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্র চণ্ডীদাসও ফুলিয়ানিবাসী'ই ছিলেন, নিশ্চিতই নান্নুরনিবাসী ছিলেন না। বিদ্যাবিতরণে সুরদ্রুমসদৃশ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ভট্টাচার্য্যশিরোমণি এই চণ্ডিদাসের প্রশস্তিশ্লোকে তাঁহার একটি মাত্র "কৃতি"র (অর্থাৎ গ্রন্থের) উল্লেখ আছে—"অলঙ্কারটীকা"। এস্থলে নৃসিংহ সম্ভবতঃ কাব্যপ্রকাশদীপিকাকারের সহিত নিজ পূর্ব্বপুরুষের ভ্রান্তিমূলক অভেদ কল্পনা করিয়াছেন, কিম্বা বস্তুতই চণ্ডিদাসরচিত অপর একটি অলঙ্কারটীকা ছিল। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, কুলপঞ্জীর প্রমাণবলে "বড়ু" নামে নিকৃষ্টজাতীয় এক ব্রাহ্মণশ্রেণী বিদ্যমান ছিল—বড়ু চণ্ডীদাসও ঐ জাতীয় ছিলেন, রাঢ়ীয় প্রভৃতি উচ্চজাতীয় ছিলেন না, মনে করাই যুক্তিযুক্ত। প্রমাণটি উদ্ধৃত হইল:—বন্দ্যঘটীয় বাবলাবংশে নরাইজ বিপ্রদাস ৯৭ সমীকরণের কুলীন ছিলেন (ধ্রুবানন্দের মহাবংশ ১২৪ পৃ.)। তাঁহার অন্যতম পুত্র বিদ্যানন্দ—তৎপুত্র জগন্নাথের কুলবিবরণে আছে, "অস্য কন্যা রাজা নিধিচন্দ্রেন নীতা তেন সর্ব্বনাশ:" (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ৮১৫খ পুথির ২।২ পত্র, অস্মদীয় জয়ন্তীপুরের পুথির ৩৩৭।১ পত্র)। এস্থলে পরিষদের পূর্ব্বোদ্ধৃত পুথিতে (২১০২ সং, ৩।২ পত্র) অতিরিক্ত বিবৃতি আছে। যথা, "পশ্চাৎ কন্যা গুড়োমুখোটী রাজনিধিচন্দ্রে নীতা সা কন্যা "বড়ুশ্রোত্রিয়" × × × (অক্ষর অস্পষ্ট) পণ্ডীতে নীতা সর্ব্বনাশঃ মোড়শ্বরবাসী…।" রাজা নিধিচন্দ্র মলুটি-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ এবং প্রায় ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।*

* ৺ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত "মলুটি-রাজবংশ" গ্রন্থে (১৩২৮) লিখিত হইয়াছে, (পৃ ১৯-২০) বংশের "কয়েক পুরুষ উত্তরাধিকারীর নাম" পাওয়া যায় না। অথচ আমরা একাধিক কুলপঞ্জীতে সম্পূর্ণ বংশাবলী পাইয়াছি। প্রথমাংশ যথা, মুখ আহিতের অধস্তন ১১শ পুরুষ ভবানন্দ খাঁ—রাজা বসন্ত—রাম সাহা—রাজা নিধিচন্দ্র—রাজা উদয়চন্দ্র (ও রাজা রাম রায়)—রাজা জয়চন্দ্র ও বেণীচন্দ্র রাজা বসন্তের পৃষ্ঠপোষক দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দিন নহে, পরন্তু বাংলার আলাউদ্দিন হুসেন সাহ।

২

কৃত্তিবাস সম্বন্ধে গবেষণা শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে অতি কৌতুকজনক ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল। আন্দুলরাজ-সংগৃহীত "কায়স্থকৌস্তুভ" গ্রন্থের প্রথম সংখ্যায় (প্রকাশ-কাল ৩ শ্রাবণ, ১২৫১) লিখিত হইল, "কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত গৌড়কায়স্থ ছিলেন" (৶০ পৃ.)। পরবর্ত্তী ৫ ভাদ্রের "পূর্ণচন্দ্রোদয়ে" কৃত্তিবাসের ওঝা উপাধির প্রশ্ন উত্থিত হইলে ২৭ ভাদ্রের "পূর্ণচন্দ্রোদয়ে" উত্তর লিখিত হইল যে, ওঝা "ওষ" কায়স্থ, যাহাদের সমাজ ছিল 'ফুলে খড়দহ'—প্রমাণস্বরূপ জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লীক-রচিত 'রাজতরঙ্গ' ও 'কায়স্থহিতার্ণব' গ্রন্থের নাম লিখিত হইল (পৃ. ৯)। অতঃপর হরিশ্চন্দ্র মিত্র 'কবিকলাপ' গ্রন্থে এবং তদ্দৃষ্টে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'কবিচরিতে' (খ্রীঃ ১৮৬৯, পৃ. ২৫) লিখিলেন, "বিষবৈদ্য ও ভূতপ্রেতাদির মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে ওঝা কহে; বোধ হয়, মুরারি একজন বিখ্যাত ওঝা ছিলেন" ইত্যাদি। পরে হরিশ্চন্দ্র মিত্র স্বয়ং এই নিতান্ত 'ভ্রমাত্মক' ব্যাখ্যা সংশোধন করেন এবং সর্ব্বপ্রথম গায়ক-সম্প্রদায়ের নিকট জানিয়া কৃত্তিবাসের পরিচয়সূচক কবিতা প্রকাশ করেন:—

> মুরারি নামেতে ওঝা ছিলেন কাশীবাসী।
> করিলেন বসবাস ফুলিয়াতে আসি।
> হইলেন তাহার পুত্র বনমালী নাম।
> রামভক্ত অনুরক্ত নানা গুণধাম।
> বাপ বনমালী ওঝা মাণিকি উদরে।
> কৃত্তিবাস জন্মিলেন চারি সহোদরে।
> কৃত্তিবাস শ্রীনিবাস অদ্বৈত ভাস্কর।
> সবে সুপণ্ডিত অতি নানা গুণধর। ইত্যাদি

(৺কৃত্তিবাসের পরিচয় সংগ্রহ, ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭, পৃ. ৬ এবং মিত্রপ্রকাশ)।*

কবিচরিতে (পৃ. ২৮) কৃত্তিবাস আকবরের সময়ে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে। রামগতি ন্যায়রত্নের মতে (১ম সং, পৃ. ৭৫) অনুমান "১৪৬০ শকে [১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে] রামায়ণের রচনা হয়", অর্থাৎ মুকুন্দরামের চণ্ডীরচনার ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে। এই মতই রাজনারায়ণ বসু (পৃ. ১৫) গ্রহণ করেন। নগেন্দ্রনাথ বসু ১৩০০ সনে সর্ব্বপ্রথম রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী হইতে কৃত্তিবাসের বংশ উদ্ধার করিয়া ১৪১০ হইতে ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাবকাল স্থির করেন (বিশ্বকোষ, ১ম সং, ৪র্থ ভাগ, পৃ. ৩৩৬ ও ৪০২); পরে বঙ্গবাসী ও জন্মভূমি (চৈত্র ১৩০১) পত্রিকায় অনুরূপ আলোচনা

* হরিশ্চন্দ্রের কৃত্তিবাস পুস্তিকার শেষে তদ্রচিত "বঙ্গভাষা এবং বঙ্গীয় সাহিত্যবিবরণ" গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হয় ("১ম খণ্ড সঙ্কলিত হইতেছে")। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল মনে হয় না।

হয়। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার যুগান্তকারী গ্রন্থের ১ম সংস্করণেই (ডঃ ভট্টশালী ২য় স' লিখিয়া ভুল করিয়াছেন) কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী মুদ্রিত করেন (পৃ. ৬৭-৭১) এবং কৃত্তিবাসের কাব্যরচনার কাল ১৩৮৫ হইতে ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে (অর্থাৎ রাজা গণেশের রাজত্বকালে) নির্ণয় করিয়াছিলেন (পৃ. ১২৮)। অতঃপর "কৃত্তিবাস পণ্ডিত" শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে (সা-প-প, ১৩০৪, পৃ. ১১৭-৪২) কুলশাস্ত্রের প্রামাণ্যবাদী প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্তর আলোচনা করিয়া আনুমানিক ১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের জন্মকাল গণনা করেন (পৃ. ১৩৪)। তাঁহার প্রবন্ধের পরিশিষ্টে (পৃ. ১৪২-৪৯) আত্মবিবরণীটি পুনর্মুদ্রিত হয় এবং নগেন্দ্রনাথ বসু মন্তব্যে (পৃ. ১৫০-৫৭) কৃত্তিবাসকে ১৪০৮ হইতে ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দের লোক বলিয়া গ্রহণ করেন। প্রফুল্লচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম ধ্রুবানন্দের মহাবংশ হইতে মূল কুলকারিকা উদ্ধৃত করিয়া (পৃ. ১২৫) কৃত্তিবাস ও তাঁহার ভাইদের নাম মুদ্রিত করেন এবং আত্মবিবরণীর অনেক কথাই যে কুলগ্রন্থের সহিত মিলিতেছে তাহা লক্ষ্য করেন (পৃ.১৪৯)।

কৃত্তিবাস প্রভৃতির ওঝা উপাধি হইতে তাঁহার উপর মৈথিলদের দাবি হইতে পারে, আমাদের এইরূপ ধারণা ছিল—সম্প্রতি তাহা ফলিয়াছে। এডুকেশন গেজেটে (২৩ বৈশাখ, ১৩৫৬, পৃ, ৯-১৬) শ্রীকমলাকান্ত পাঠক পরাশর-গোত্র এক মৈথিল কৃত্তিবাস ওঝার সন্ধান দিয়াছেন, বর্ত্তমান বংশধরের উর্দ্ধতন দ্বাদশ পুরুষ, বাড়ী জেলা বীরভূম। এই কৃত্তিবাসেরও পিতা বনমালী এবং পিতামহ মুরারি। এই কৃত্তিবাসই বংশধরদের ও লেখকের মতে রামায়ণকার—এবং রাঢ়ের ফুলিয়ানগর হইল বীরভূমের অট্টহাসস্থিত শ্রীশ্রী৺ফুল্লরা মহাপীঠ। রামায়ণকার দুইজন কৃত্তিবাসের অন্যতরও ইনি হইতে পারেন বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে। নানা স্থানের বিভিন্ন কালের বহু লেখক পুথিতে চক্রান্ত করিয়া মিথ্যা "মুখটি-বংশ" লিখিয়াছেন এবং ফুলিয়ানগরীর "দক্ষিণ-পশ্চিম চেপ্যা বহে গঙ্গা সুরেশ্বরী" বর্ণনাটি মিথ্যা স্বীকার করিলে রাঢ়ের অগঙ্গা দেশে কৃত্তিবাসকে টানিয়া লওয়া যায়। কিন্তু এক পুরুষের গড়পড়তা ৪০ বৎসর ধরিয়াও মৈথিল কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ ১৪৬০ খ্রীষ্ট সনের পূর্ব্বে হয় না।

কৃত্তিবাসের অভ্যুদয়কাল যাঁহাদের মতে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি, তাঁহারা সকলেই—নগেন বসু-দীনেশ সেন-প্রফুল্লচন্দ্র-ভট্টশালী—কুলশাস্ত্রের উপকরণ সাদরে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তিতর্ক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে বিচার করা ত দূরের কথা, যে ভাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ গবেষকও কুলশাস্ত্রের প্রতি জাজ্বল্যমান অনাদর এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তাহা প্রযত্নপূর্ব্বক সমস্তই গোপন করিয়া গিয়াছেন (ডঃ সুকুমার সেনের গ্রন্থে, ২য় সং, পৃ. ৮৪-১০৬, কুত্রাপি পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধনিচয়ের উল্লেখ নাই), মনে হয়, সকল দিক সম্যক্ বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্তনির্ণয় এই শ্রেণীর লেখকের কাম্য নহে—একদেশদর্শী হইয়া ভ্রমপ্রমাদ জীয়াইয়া রাখা এবং সৃষ্টি করাই যেন ইঁহাদের কাম্য। ৮ বৎসর পূর্ব্বে "কৃত্তিবাসের কুলকথা ও কালনির্ণয়" প্রবন্ধে (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ১০৫ ২০) কুলশাস্ত্রোক্ত তত্ত্বসমূহ সাধ্যমত বিচার করিয়া আমরা দৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, নরসিংহ ওঝাকে দনুজমর্দ্দনের সভায় ১৪১৮ সনে টানিয়া আনা "একেবারেই অসম্ভব" (পৃ. ১১৪)। ডঃ সেনের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত এখনও হইল এই যে, নরসিংহের পৃষ্ঠপোষক "দনুজমর্দ্দন ছাড়া আর কেহ নহেন" (পৃ. ৯৭)। আমাদের যুক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি না করিয়াও (পূর্ব্বপ্রবন্ধে দ্রষ্টব্য) এ স্থলে ডঃ সেনের মারাত্মক ভ্রম স্বল্পপাঠী বালকেরও বোধগম্য হইবে। দনুজমর্দ্দন ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, ডঃ সেনের মতে নরসিংহ তখন 'বৃদ্ধ' এবং তৎপুত্র গর্ভেশ্বরের বয়স খুব বেশী হইলে ৪৮ ধরা যায়। তাহা হইলে গর্ভেশ্বরের জন্ম হয় ১৩৭০ সনে (তৎপূর্ব্বে নহে), তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মুরারির ১৩৯৫ সনে (একপুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া), মুরারির পঞ্চম পুত্র বনমালীর ১৪৩০ সনে এবং কৃত্তিবাসের জন্মের উর্দ্ধতন সীমা হয় ১৪৫৫ সন। যুক্তিযুক্ত গণনায় আরও অনেক পরে, ১৪৭৫-১৫০০ সনের মধ্যে, পড়িবে। কারণ, আমরা একাধিকবার দেখাইয়াছি যে, বাঙ্গলার শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পরিবারে কস্মিন্ কালেও ২৫ বৎসরে এক পুরুষ পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় ৩০-৪০ বৎসরে (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ১১৮, প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৯, পৃ. ২৩৬-৪৩ ; ঐ, ভাদ্র ১৩৫৪, পৃ. ৫০৭ প্রভৃতি)। সুতরাং "বয়সে সনাতন-রূপ কৃত্তিবাসের এক পুরুষ পরের লোক" (ডঃ সেন, পৃ. ৯৮) না হইয়া এক পুরুষ পূর্ব্বের হইয়া পড়েন। উর্দ্ধদিকের গণনায় ডঃ সেনের ভ্রম আরও অনেক মারাত্মক। নরসিংহ ওঝা হইলেন লক্ষ্মণসেনের অভিষেককালীন প্রথম সমীকরণের প্রথম কুলীন আহিতের প্রপৌত্র—লক্ষ্মণসেনের অভিষেক ১১৭৮ সনে ধরিয়া তৎকালে আহিতের বয়স ন্যূনপক্ষে ২৮ ধরিলেও তাঁহার জন্ম হয় ১১৫০ সনে, কিছুতেই তার পরে নহে। আর, দনুজমর্দ্দনের সময়ে নরসিংহের বয়স যদি চূড়ান্তভাবে ১০০ বৎসরও ধরা যায়, তাহা হইলেও এক পুরুষের গড়পড়তা হয় ৫৬ বৎসর! পারিবারিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে ইহা এক অভাবনীয় ঘটনা—৪ পুরুষে প্রায় ৩০০ বৎসর! অথচ যাহাদের মতে ৪ পুরুষে এক শতাব্দী মাত্র হয়, তাহাদের সাবধান লেখনাগ্র হইতে ইহা বাহির হইতে পারিল।

কুলশাস্ত্রের গহন বন হইতে উদ্ধার করিয়া আমরা কৃত্তিবাসের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বহু নূতন তথ্য প্রবন্ধান্তরে প্রকাশ করিয়াছি (ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৫৩, পৃ. ৫৩৬-৩৯)। কৃত্তিবাসের পাণ্ডিত্যের উপাধি "পণ্ডিত", তাঁহার মাতামহের পরিচয়, তাঁহার বিবাহ, বংশধারা ও ৪ কন্যার পরিচয় ঐ প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। দুইটি তথ্যের প্রমাণ-বলে তাঁহার জন্মাব্দ আমরা ঐ প্রবন্ধে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে (১৩৫০-৭৫ খ্রীঃ মধ্যে) নির্ণয় করিয়াছি। তন্মধ্যে একটি তথ্য আবশ্যকবোধে পুনরালোচিত হইল। "কাঞ্জিবিল্লীয়-রাজপণ্ডিত" কুবের রচিত ভাস্বতীব্যাখ্যার রচনাকাল ১২২৯ শকাব্দ (১৩০৭-৮ খ্রীঃ Indian Culture, XI, pp. 33-36 দ্রষ্টব্য)। রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে (পরিষদের ২১০২ সং পুথির ৫৪।১ পত্র) এই "কাং কুবের রাজ-পণ্ডিতে"র নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে, বন্দ্যঘটীয় 'বৃহদ্বজপাশ' বংশীয় উৎসাহ-পুত্র বাসুর কুলবিবরণে। এই বাসু প্রথম কুলীন মহেশ্বরের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ এবং কুবেরও প্রথম কুলীন কৃষ্ণের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ বলিয়া অনুমিত। কুবেরের জন্ম ১২৭৫ সনে ধরিয়া এবং তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া প্রথম কুলীন কৃষ্ণ-মহেশ্বরের জন্ম হয় অনুমান ১১১০ সনে—অর্থাৎ প্রৌঢ়বয়সে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে (১১৫৮-৭০+) প্রথম কুলীনদের মধ্যে ইহাদের অন্তর্ভুক্তি সময়ের হিসাবে সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করিল। কুবেরের গ্রন্থরচনাকাল (১৩০৭-৮ খ্রীঃ) সুতরাং সমগ্র কুলশাস্ত্রের একটি সুদৃঢ় ভিত্তি যোগাইতেছে। কুবেরের পিতা রবি ২৩ সমীকরণে এবং বাসুর পিতা উৎসাহ ২০ সমীকরণে সম্মানিত হইয়াছিলেন (ধ্রুবানন্দের মহাবংশ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ২১ সমীকরণে সম্মানিত (মুরারি ওঝার পিতা) গর্ভেশ্বর ইহাদের সমসাময়িক হইতেছেন এবং কুবের-বাসু-মুরারিও সমসাময়িক প্রতিপন্ন হন। অর্থাৎ মুরারি ওঝার জন্মও ১২৭৫ সনে অনুমান করা যায়, বরং কিছু পূর্ব্বে হওয়া সম্ভব, কারণ বাসু ছিলেন তাঁহার পিতার অষ্টম পুত্র, মুরারি জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং কুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও দুই সমীকরণ পরবর্ত্তী। কৃত্তিবাসের জন্মকালে মুরারি জীবিত ছিলেন, বয়স ১০০ ধরিলেও তাঁহার পৌত্রের জন্ম ১৩৭৫ সনের পরে হইতে পারে না। মুরারির পিতামহ নরসিংহ যে নিঃসন্দেহ দনুজমাধবেরই পাত্র ছিলেন তাহার অভিনব প্রমাণরূপে ইহা গ্রহণীয়।

উল্লিখিত কুবেরের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ "বিষ্ণুদাস সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য" সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণির সহাধ্যায়ী এবং যশোহর-মল্লীকপুরের 'দোহাকরা' ভট্টাচার্য্যবংশের আদি-পুরুষ ছিলেন: নামমালা যথা, কুবের—শত্রুঘ্ন পণ্ডিত—নীলকণ্ঠ পণ্ডিত—বিজয় পণ্ডিত—ধরাধর পণ্ডিত—বিষ্ণুদাস (পরিষদের উক্ত পুথি ৩১৮।১ পত্র)। শিরোমণির জন্মাব্দ অনুমান ১৩৬০-৬৫ সন (সা-প-প, ৫০, পৃ. ১৩-১৫), সুতরাং তাঁহার প্রপিতামহ-স্থানীয় কৃত্তিবাসের জন্ম হয় ১৩৬০-৬৫ সনে।

কুলগ্রন্থে কৃত্তিবাসের কালসূচক এ জাতীয় তথ্য অনেক আবিষ্কার করা যায়—পূর্ব্বপ্রবন্ধে একটির বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। এ স্থলে অজ্ঞাতপূর্ব্ব অপর একটি মূল্যবান তথ্য বিবৃত হইল। মুরারি ওঝা ৩৩ সমীকরণের কুলীন ছিলেন এবং ঐ সমীকরণের প্রথম কুলীন ছিলেন মুখ-বিকর্ত্তনবংশীয় গোবিন্দ (মহাবংশ, পৃ. ৩৮-৯)। এই গোবিন্দের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ ছিলেন বিখ্যাত চৈতন্যপার্ষদ "স্বরূপগোস্বামী": বংশাবলী যথা, গোবিন্দ—পৃথ্বীধর—গঙ্গাগতি—জিতামিত্র—প্রমোদন ন্যায়াচার্য—পুরুষোত্তমাচার্য্য "সন্ন্যাসী" নামান্তর স্বরূপগোস্বামী (পরিষদের ১৮১৫শ সং পুথির ৩৬৬।১ পত্র, ২১০২ সং পুথির ৪৬০।২ পত্র)। স্বরূপগোস্বামীর কুলপরিচয় এই প্রথম আবিষ্কৃত হইল—সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে তিনি গৃহী ছিলেন এবং তাঁহার এক পুত্রের নাম লিখিত আছে "বিপ্রদাস" (ঐ, ৩৬৬.২ পত্র)। এ স্থলেও কৃত্তিবাস স্বরূপগোস্বামীর প্রপিতামহ-স্থানীয় হইতেছেন এবং তিনি যে সনাতন-রূপের সমসাময়িক ছিলেন না, প্রত্যুত তাঁহাদের ১০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, এ কথা বেশ জোর করিয়াই প্রমাণপরতন্ত্র পণ্ডিতসমাজে বলা যায়। সভ্যসমাজের সর্ব্বত্র ব্যক্তিবিশেষের কালনির্ণয়াদি প্রধানতঃ পারিবারিক ইতিহাস দেখিয়া আলোচিত হইয়া থাকে। বাঙ্গলার সহস্র সহস্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের সম্বন্ধ বিবরণ হস্তলিখিত মূল কুলগ্রন্থে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। তাহা স্বেচ্ছায় পদদলিত করিয়া যে কেহ গবেষণা করিবেন ভ্রমপ্রমাদের গর্ত্তে তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। কৃত্রিম রচনাপূর্ণ ভ্রমপ্রমাদবহুল মুদ্রিত কুলগ্রন্থসমূহ আমাদের লক্ষ্যস্থল নহে।

উল্লিখিত আলোচনার ফলে কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪শ শতাব্দীর তৃতীয়পাদে নির্ণীত হওয়ার পর "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘমাস" পঙ্‌ক্তিটির প্রকৃষ্ট উপযোগিতা ধরা পড়ে। কারণ গণনাদ্বারা পাওয়া যায় ঐ পাদে মাত্র তিন বৎসরে ঐ সংযোগ সংঘটিত হইয়াছিল—১৩৫২, ১৩৭২ ও ১৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। মুরারির জন্ম যখন ১২৭৫ সনের পরে নহে, পূর্ব্বে হওয়ারই সম্ভাবনা, তখন কৃত্তিবাসের জন্ম ১৩৫২ সনে হওয়াই অধিক সম্ভব—প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দ্ধারিত ১৩৩৫ সন তাহা হইতে বেশী দূরবর্ত্তী নহে। এতদনুসারে কৃত্তিবাস নিঃসন্দেহ চণ্ডীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন এবং ১৩৭২-৫ সনে জন্ম ধরিলেও তিনি বড়জোর চণ্ডীদাসের

ঠিক সমসাময়িক হন, পরবর্ত্তী রহেন। সুতরাং বাঙ্গলার আদিকবির আসনে আমরা "বড়ু শ্রোত্রিয়" চণ্ডীদাসের পরিবর্ত্তে ফুলিয়ার মুখটিবংশীয় সরস্বতীর বরপুত্র "পণ্ডিত" উপাধিধারী কৃত্তিবাসকেই বসাইতে চাই। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক "রাজা গৌড়েশ্বর", তাঁহার পিতৃব্য নিশাপতির পৃষ্ঠপোষক "রাজা গৌড়েশ্বর," কিম্বা রাজপণ্ডিত কুবেরের পোষ্টা কে ছিলেন সে সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কার না হইলে অনন্তকাল বাদবিতণ্ডা চলিতে পারে। কৃত্তিবাস দনুজ-মর্দ্দনের সময়ে জীবিত ছিলেন কোন সন্দেহ নাই।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীনতম পুথিতে (১৫০২ শকে অনুলিখিত) পুষ্পিকায় একটি বিশেষণপদ আছে যাহার উপর কাহারও দৃষ্টি এ যাবৎ পতিত হয় নাই—"ইতি 'শ্রীবৎসপণ্ডিত' শ্রীকিৰ্ত্তিবাসবিরচিতং।" শ্রীবৎসপণ্ডিত পদটির ব্যাখ্যা আমাদের মতে এই। : পাঠসমাপ্তির পর কৃত্তিবাসের উপাধি হইয়াছিল "পণ্ডিত", সাধারণতঃ কোন রাজা বা রাজপুরুষের সভায় সসম্মানে এইরূপ উপাধি প্রদত্ত হইত। কৃত্তিবাস যাহার সভায় উপাধি পাইয়াছিলেন তাঁহার নাম ছিল "শ্রীবৎস।" এইরূপ প্রথার আর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে। সুবিখ্যাত রায়মুকুট (যাহার পদচন্দ্রিকাটীকা ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়) সর্ব্বপ্রথম "রাজ্যধর" নামক জল্লালদীননৃপতির মন্ত্রীর নিকট "আচার্য্য" ও "কবিচক্রবর্ত্তী" উপাধিদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—রায়-মুকুটের কোন কোন টীকার পুষ্পিকায় "রাজ্যধরাচার্য্য" পদ দৃষ্ট হয় (I. H. Q, XVII, pp. 457-8)। আশ্রয়দাতা ও আশ্রিতের এইরূপ সংযুক্ত নাম—শ্রীবৎসপণ্ডিত ও রাজ্য-ধরাচার্য্য—দুর্ল্লভ হইলেও মনোহর ও সুরুচির পরিচায়ক।

ব্রিটিশের বিচার

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বিচারনিষ্ঠ বলিয়া বড়াই
করেন ব্রিটিশ জাতি,
কতটুকু তাতে সুখ্যাতি—আর
কতখানি অখ্যাতি।
যীশুকে যাহারা দিয়াছিল ক্রুশে,
বিচার করায়ে,—বিচারক পুষে,
মোরা দেখি সব শ্বেতাঙ্গ জাতি
আজিও তাদেরি জ্ঞাতি।
পুণ্যপ্রতিমা 'জোয়ান ডি আর্ক'
ফরাসী বীরাঙ্গনা,
বিচার করিয়া কাহারা করেছে
তাঁর শত লাঞ্ছনা?
যে বিচার এক পাপ-প্রহসন,
শুনি কলুষিত হয় দেহমন,
বীভৎস সেই জঘন্যতার
করিব না আলোচনা।
'নন্দকুমারে' ফাঁসি দিল যারা
তাদেরো বিবেক আছে?
ওকে যদি বল ন্যায়!—অন্যায়—
স্পৃহনীয় ওর কাছে।
ওকি কদর্য্য বিচারের রূপ!
হীন কুৎসিত বিষ বিদ্রূপ,—
ও বিচারে মরে দেবতা মানুষ
অসুরই কেবল বাঁচে।
কি পেলে জাপান, ওই জার্ম্মানী
পরাজিত অবনত?
বিচার যা তাহা—প্রতিহিংসার
'এটম বম্বে'রই মত।
সুদূর ভবিষ্যতের চক্ষে—
শুধু মহাপাপী হলে অলক্ষ্যে,
বিচারাতঙ্ক-বীজাণু বাহন
বিজয়ী ভাগ্যহত।

দেহ শুধু শ্বেত, চেতোদর্পণে—
আবর্জ্জনার স্তূপ,
প্রতিফলিত কি হতে পারে সেথা
সত্য ন্যায়ের রূপ?
স্বার্থের নামে এতো বলিদান,
নাহিক যুক্ত-যুক্তির স্থান,
সব ত্যজিয়াছ—লজ্জা ত্যজো না,
হে ভদ্র রও চুপ।
ভেবো না তোমরা ন্যায়পরায়ণ,
বিচারে নরোত্তম,
কোথা বিশুদ্ধ নিরপেক্ষতা
বিবেকীর সংযম?
গুহামানবেরা ভাল বরঞ্চ,
রচে না ন্যায়ের বধ্যমঞ্চ,
হত্যাই করে—প্রবঞ্চনার
আড়ম্বরটা কম।
পূর্ব্বপুরুষ হনু ছিল বলো—
জানি না সত্য কিনা?
ও মত গ্রহণে সন্দেহ হয়
বিশেষ প্রমাণ বিনা।
হই নিশ্চিত—তবু মনে ভাবি—
হেসে মেনে লবে তোমাদের দাবি
অনাগত তব বংশধরেরা
হেরি বিচারের চিনা।

পতঙ্গ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পরদিন সন্ধ্যার পরে বেড়াইয়া ফিরিয়া শচীনবাবু শুনিলেন বৌমা জিনিষ দুইটিই বৈকালে দিয়া গিয়াছে। মীরা তাহা রাখিয়া দিয়াছে নির্ভয়ে এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। মীরা শুধু কহিল, কোথায় রাখবে ভাল করে রাখ—

কতকগুলি পুরানো পরীক্ষার খাতা তাকের উপর ছিল, শচীনবাবু ইস্তাহারগুলি তাহার মাঝে রাখিয়া আগ্নেয়াস্ত্রটিকে উপরে একটা স্থানে সংগোপনে রাখিলেন। কেবলমাত্র বসিয়াছেন ঠিক এমনি সময়ে ধলাদের দলের রঞ্জন আসিয়া উপস্থিত। সকলেই গ্রেপ্তার হইয়াছে, কিন্তু এই ছেলেটি আশ্চর্য্য উপায়ে ধরা পড়ার হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। দারোগা-হত্যার পরে সে নিকটবর্ত্তী এক আত্মীয়বাড়ীতে দুই-চার দিন থাকিয়া পরে আসিয়াছিল—

রঞ্জন প্রশ্ন করিল, সত্যদা কেমন আছেন ?

শচীনবাবুর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল সত্যর বিশীর্ণ শুষ্ক মুখখানা, সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতি ও করুণায় তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, ভাল নেই, আমাশয় হয়েছে আর সে পারে না।

—অসুখ বেশী ?

—না, তবে শরীর একেবারে ভেঙে গেছে, অথচ কোথাও একদিনের জন্যে বিশ্রাম নেবার উপায় নেই, চারিদিকে হয় পুলিস না হয় রাজভক্ত প্রজা—

—আর কতদিন পারবেন এমনি করে ?

আমিও তাই বলে'ছি তাকে, আর এমনি করে পালিয়ে বেড়িয়ে লাভ কি ? এ জাতির সবাই জড়বুদ্ধি, স্বার্থপর, অলস, আত্মকেন্দ্রিক—পরাজিতের মনোবৃত্তি আর আত্মসম্মান-জ্ঞানের অভাব এদের মজ্জাগত—

কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পরে রঞ্জন অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল, সত্যদা কোথায়, তার কাছে যাওয়া ছাড়া ত কোন কাজ নেই আর—

আত্মগত ভাবে শচীনবাবু বলিলেন, আজ রাত্রের ষ্টীমারে বরিশাল যাবে, যদি বাইরে থাকতে পারে তবে হয়ত কর্ম্ম-ক্ষেত্র খুঁজে পাবে।

—আমিও তা হলে বরিশালই যাই—

রঞ্জন আলোচনাকে যেন অনাবশ্যকরূপে এবং অত্যন্ত আকস্মিকভাবে সংক্ষেপ করিয়া উঠিয়া গেল।

• রঞ্জন চলিয়া যাইবার পর শচীনবাবুর হঠাৎ সন্দেহ হইল কথাটা বলিয়া ফেলিয়া ভাল হয় নাই, এতদিন ত এমন ভুল তাহার হয় নাই। রঞ্জন চলিয়া গেল এমনি ভাবে যেন সে একটা কিছু হদিস পাইয়াছে—তার উপর, ধলাদের সঙ্গে বহু নিরপরাধ লোকও জেলে গিয়াছে—কিন্তু ঐ ছেলেটি কারাদণ্ডের হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে—কেন ? সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল, রঞ্জনের পশ্চাদনুসরণ করিবার উদ্দেশ্যে শচীনবাবু তাড়াতাড়ি বাহির হইলেন কিন্তু রাস্তায় সে নাই, কিন্তু এত শীঘ্র গেল কোথায় ? তিনি একটু আগাইয়া আসিয়া মোড়ে দাঁড়াইলেন, বড় রাস্তায়ও নাই—একটু এদিক ওদিক চাহিয়া দেখেন রঞ্জন চায়ের দোকানে খাবার খাইতেছে, মণিবাবু দোকানে বসিয়া আছেন।

শচীনবাবু ফিরিয়া আসিলেন বিমর্ষভাবে—এত বড় একটা ভুল তিনি মুহূর্ত্তে করিয়া বসিলেন কেমন করিয়া ? ইহার পেছনে যেন রহিয়াছে নিয়তির দুর্জ্ঞেয় বিধান। মীরা প্রশ্ন করিল, কি হ'ল ?

—সত্য বোধ হয় কালই ধরা পড়বে।

—ভালই ত, তার যা শরীরের অবস্থা তাতে সে-ই ভাল হবে।

শচীনবাবু যেন সান্ত্বনা পাইয়াছেন এমনি ভাবে বলিলেন, হয়ত ভালই হ'ল। বৃথা আর কেন ?

মীরা বলিল, তুমি দুঃখিত হচ্ছ কেন ? সে ভালই হয়েছে।

শচীনবাবু দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন, কিন্তু মীরা জানিল না কেন ?

পরদিন বেলা ১২টার মধ্যেই সংবাদ পাওয়া গেল সত্য ষ্টীমারষ্টেশনেই গ্রেপ্তার হইয়াছে। ওখানকার লোকেরা তাহাকে মাল্যভূষিত করিয়া জয়ধ্বনি করিয়াছে। এই বাহবা ও জয়ধ্বনির নিষ্ফল সঞ্চয়কে হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়া সে কারাগারের প্রবেশদ্বার পার হইয়াছে।

যদিও ইহাতে বিমর্ষ হইবার যথেষ্ট কারণ নাই তবুও দেশসেবক কারাবরণ করিয়াছে এই সংবাদ পাইবার পরই শচীনবাবুর মনটা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। মিস্ রায়ও সংবাদটা জানিয়াছেন, কিন্তু কেমন করিয়া শচীনবাবু স্বীকার করেন যে এ ব্যাপার তাঁহারই অনিচ্ছাকৃত ভুলের পরিণাম। সারাটা দিন একটা অব্যক্ত অস্বস্তিতে কাটিয়া গেল—মিস্ রায়ের সহিত দেখা করিতে যেন লজ্জা করিতেছিল।

সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পরে অকস্মাৎ রিজিয়া আসিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করাটা দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। প্রশ্ন করিলেন, কি ?

—দু'দিন পড়াতে যান নি, তাই ভাবলুম আপনার অসুখ করেছে।

—না ভালই আছি—শচীনবাবু তাকাইয়া দেখিলেন রাস্তার রিজিয়ার একজন বান্ধবী দাঁড়াইয়া আছে।

—ওঃ ওদের ডাকো, বাইরে রয়েছে—

—না, আজ শেষরাত্রে আপনার বাসা সার্চ হবে তাই বলতে এলাম। যা আছে সরিয়ে ফেলুন—

—কেন ?

—সত্যদার কাছে আপনার আংটি পাওয়া গেছে—আপনার ছাত্রেরা সনাক্ত করেছে।

—ওঃ ভাল কথা—

রিজিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে দরজার নিকট হইতে প্রশ্ন করিল, কাল যাবেন ত ?

—হ্যাঁ, যদি শরীরটা ভাল থাকে।

রিজিয়া চলিয়া গেল—শচীনবাবু আশ্চর্য্য হইলেন। এই মেয়েটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের, ভিন্ন ধর্ম্মের। কিন্তু কেমন আন্তরিকতার সহিত এই সব কাজের সঙ্গে জড়াইয়া পড়িতেছে, কিসের জন্য বৈপ্লবিক কাজে তার এত অনুরাগ। এমন সুন্দরী, এমন চমৎকার স্বভাব। মেয়েটি বিধর্ম্মী না হইলে যেন তিনি খুশী হইতেন।

যাহাই হোক এ সংবাদটা ভাল নয়, এখন অকারণ গ্রেপ্তার হইয়া মীরাকে বিপন্ন করিবার কোন মানে হয় না। রাত্রেই যেমন করিয়াই হোক ওটাকে সরাইতে হইবে। কিন্তু কোথায় ? একমাত্র মিস্ রায় ছাড়া আর কে আছে ? আর সত্যর গচ্ছিত বস্তুকে রক্ষা করা তাঁহার কর্ত্তব্য—ধর্ম্ম।

মীরাকে তিনি সবই জানাইলেন—

মাঝে মাঝে আকাশের পানে চাহিয়া দেখিতেছিলেন শচীনবাবু। কোথাও এতটুকু মেঘ নাই। স্বচ্ছ সুন্দর জোছনায় পৃথিবী ঝলমল করিতেছে—শচীনবাবু পরিপূর্ণ জোছনা দেখিয়া একটু যেন হতাশ হইলেন। আজ যে নিবিড় অন্ধকারেরই প্রয়োজন।

আহারাদির পর মীরা ও শচীনবাবু নীরবে বারান্দায় বসিয়াছিলেন, কিন্তু এমন দিবালোকের মত সুপরিস্ফুট জ্যোৎস্নায় শচীনবাবু যেন সাহস পাইতেছিলেন না। কিছুক্ষণ বাদে রাত্রি প্রায় একটার সময় কতকগুলি খণ্ড মেঘ প্রদীপ্ত গোলকের মত চাঁদের উপর দিয়া দ্রুত ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। পৃথিবী একটা ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় অবচ্ছ হইয়া উঠিল।

শচীনবাবু বলিলেন—দাও ত মীরা, এখনই যেতে হবে—

মীরা আগ্নেয়াস্ত্র আনিয়া দিল, শচীনবাবু মনে মনে ভাবিলেন যদি তেমনিই হয়, না হয় আগ্নেয়াস্ত্র একবার ব্যবহারই করিবেন। ব্যবহার-কৌশল তিনি না জানেন এমন নয়। তিনি বাল্লালোকে গুলি কয়েকটা ভরিয়া লইলেন এবং নীল রঙের একটা ছিটের জামা পরিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

রাস্তা নির্জ্জন, কেহ কোথাও নাই। নগরী নিশ্চিন্ত সুষুপ্তির ক্রোড়ে নিমগ্ন। তিনি পিছনে, সামনে চাহিয়া চলিলেন—বাল্লালোকিত চিরপরিচিত পথ—পরমে দুই-একজন দোকানী বাহিরে বেঞ্চে শুইয়া আছে। কে যেন অদূরে বিকৃত কণ্ঠে গান করিতে করিতে ফিরিতেছে—আনন্দের রেশটুকু যেন এখনও রহিয়াছে তাহার মনে।

মোড়ের মাথায় পুলিস থাকে—কিন্তু দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন কেহ নাই। মোড়ের বিড়ির দোকানটা বন্ধ। সম্ভবতঃ কেহ নাই।

একখানা ঘন কালো মেঘ অকস্মাৎ চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া দিল—পথ আর দেখা যায় না। বিধাতার ইঙ্গিত মনে করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি মোড়টা পার হইতে অগ্রসর হইলেন।

মোড়টা প্রায় অতিক্রম করিয়াছেন ঠিক এমনি সময় পিছন হইতে কে বলিল, ঠারিয়ে।

শচীনবাবু হাতের অস্ত্রটিকে ভাল করিয়া ধরিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সেই কনেষ্টবলটি। সে আজও নোকরী ছাড়ে নাই। আজ রোঁদের পালা তারই।

শচীনবাবু একটু যেন হতভম্বের মত দাঁড়াইলেন—কি কর্ত্তব্য বুঝিলেন না। কনেষ্টবলটি কহিল, আইয়ে মাষ্টারসাব—সেলাম।

সে অত্যন্ত ভালমানুষটির মত দোকানের আড়ালে তার টুলে গিয়া বসিল। শচীনবাবু অগ্রসর হইলেন। অদূরেই বালিকাবিদ্যালয়—রাস্তা হইতে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন—কেহ কোথাও নাই।

দেয়ালের পাশ দিয়া তিনি নিঃশব্দে পিছনে গেলেন—পুকুরপাড়ে ছোট গেট, কিন্তু প্রবেশ সহজসাধ্য নয়। বহু কষ্টে উপরে উঠিয়া লাফাইয়া পড়িলেন—শব্দ একটু হইল।

কিন্তু আলো—বোর্ডিং ঘরে! সর্ব্বনাশ, ছাত্রীরা দেখিলে কি ভাবিবে! তাহারা মনে মনে সন্দেহ না করে এমন নয়। গেট খুলিতে গেলেও শব্দ হওয়া অনিবার্য্য।

একটু দাঁড়াইয়া তিনি কান পাতিয়া শুনিলেন, কোন সাড়া-শব্দ নাই। মনে হয় না যে কেহ জাগিয়া আছে। একটু একটু করিয়া বোর্ডিঙের জানালার নিকটে আসিলেন—একটি ছাত্রী আলো জ্বালাইয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এইমাত্র।

শচীনবাবু স্বস্তির সঙ্গে আগাইলেন। মিস্ রায়ের ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছে, মশারির ভিতরে তাঁহার ঘুমন্ত দেহখানা আলোর পরিপ্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট। কিন্তু মশারি হাতে নাগাল পাওয়া যায় না—জানালা হইতে দূরে।

উঠানে একখানা পাকাটি জোছনায় চিক্ চিক্ করিতে-

ছিল, সেটি লইয়া তিনি মশারি তুলিয়া মিস্ রায়ের গায়ে একটা খোঁচা দিলেন। মিস্ রায় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন।

শচীনবাবু রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, দরজা খুলুন।

—কে? শচীনবাবু?

—হ্যাঁ।

মিস্ রায় দরজা খুলিয়া দিতেই শচীনবাবু ঢুকিয়া পড়িলেন। বলিলেন, চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করেন নি এই ঢের।

—করা উচিত ছিল, অমনি করে খোঁচা দেয়! কি

শচীনবাবু কহিলেন, 'এতদিন পরে এসেছে আমার আজি অভিসার রাত্রি'।

—অভিসারে এসেছেন? যাক্ সে কথা, কিন্তু ব্যাপার কি? এত রাত্রে এভাবে আসার হেতুটা কি বলুন দেখি?

শচীনবাবু কহিলেন, সত্যর গচ্ছিত ধন নিয়ে এসেছি। আজ ভোরে আমার বাসা সার্চ্চ হবে। আপনার এখানে রাখতে হবে।

—কোথায় রাখব—

—সে আমি রাখছি। শচীনবাবু গুলি বাহির করিয়া কাগজে পুরিলেন।

—কোথায়?

—বাথরুমে ত টালির ছাদ?

—হ্যাঁ—

—তবে, আলো ধরুন।

মিস্ রায় আলো ধরিলেন। শচীনবাবু ক্রয়ো ও টালির মাঝে জিনিষগুলি সাবধানে রাখিলেন। নামিয়া আসিয়া বলিলেন, গচ্ছিত ধন, রাখবেন—আর বিশ্বস্ত ব্যক্তি পেলে দেবেন।

—হ্যাঁ, এখন আসুন তাড়াতাড়ি।

চেয়ারে বসিয়া শচীনবাবু বলিলেন, বসুন, একটু জিরিয়ে নি!

একটু পরে রহস্য করিলেন, এখন কেউ দেখে ফেললে বেশ মজা হয় না?

—কি আর হবে? বদনাম ত! তা হতে কি আর বাকী আছে। কিন্তু আমার পক্ষে সুনাম-দুর্নাম সবই এক।

—থাক্—খবর বলুন—

শচীনবাবু আনুপূর্ব্বিক সবই বলিলেন। সত্যর কাহিনী ও তাহাদের বাঁচাইবার জন্য বৌমার সর্পদষ্ট হওয়ার অভিনয়ের কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন। যখন দুই জনেই কথাবার্ত্তায় মশগুল হইয়া উঠিয়াছেন ঠিক সেই সময়ে উপরের টিনের চালের উপর চড় বড় করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল।

—বেশ হ'ল, এখন যাবেন কি করে?

—না হয় থাকি।

—রাত যে প্রায় ফিনটে—

—বৃষ্টিতে আমার যাওয়া আটকাবে একথা ভাবছেন

—হ্যাঁ, তাও ত বটে, আপনাদের গতি যে অপ্রতিহত। যাক্, আপাততঃ চা করি, খান্ তার পরে যা হয় হবে।

—কিসে চা করবেন?

—ষ্টোভে—

—শব্দ হবে যে!

—না স্পিরিট ল্যাম্প।

চায়ের জল গরম হইতে লাগিল। শচীনবাবু বলিলেন, সত্য বলেছিল সেদিন, আমার একসঙ্গে ধরা পড়লে সে খুব আনন্দিত হ'ত। আমারও তাই মনে হচ্ছে।

জল ফুটিলে মিসেস্ রায় চা তৈরি করিলেন…চা খাইতে খাইতে শচীনবাবু বলিলেন,—বেশ লাগছে কিন্তু স্থান কাল সবই মনে মোহজাল বিস্তার করবার উপযোগী।

—আপনার লজ্জা করা উচিত ছিল—নিঃসম্পর্কীয়া একজন মহিলার শয়নকক্ষে গভীর রাত্রে ঢুকে—শ্রীমতী রায় হাসিয়া উঠিলেন।

লঘু হাস্য-পরিহাসে চা পান সমাপ্ত হইল—তখনও ঝির ঝির করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। শ্রীমতী রায় ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, সাড়ে তিন।

—হ্যাঁ উঠি—আর দেখা হবে কি না কে জানে? জেলে যেতেই হবে বোধ হয়।

শচীনবাবু হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন। শ্রীমতী রায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু শচীনবাবু তথাপি কিছু বলিলেন না। অণিমা প্রশ্ন করিলেন, আপনার কি শীঘ্রই জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে?

—হাঁ, মনে হচ্ছে অতি সত্বর, নেহাত কিছু না পেলেও পুলিস ছাড়বে না—সত্যর কাছে আমার আংটি পাওয়া গেছে, আমার ভক্ত ছাত্রেরা তা সনাক্ত করেছে—কাজেই—

শচীনবাবু হঠাৎ আবার চুপ করিলেন, একটা চিন্তা তাঁহার মনকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল, মীরা ও খোকার কি হইবে—কেমন করিয়া তাহারা বাঁচিয়া থাকিবে? যাহারা সাহায্য করিতে পারিত তাহারা আজ কারা-প্রাচীরের অন্তরালে—যাহারা বাহিরে তাহারা নিশ্চিন্তে দিন গুজরান করিতেছে। কতকগুলি কর্ম্মীর গ্রেপ্তারের সুযোগে যাহাদের দোকানের খরিদ্দার বাড়িয়াছে তাহারা নিরন্তই কামনা করিতেছে তাহাদের কারাবাসের মেয়াদ দীর্ঘ হোক।…শচীনবাবু ভাবিতে লাগলেন,—তাঁহার আদরের খোকা—মীরা, ইহাদের কি গতি হইবে?

—শ্রীমতী রায় বলিলেন, কি ভাবছেন?

সে কথা বললে আপনি হয়ত আমাকে দুর্বলচিত্ত বলে ভুল করবেন।

—না, খোকাদের কথা ত। আমি বেঁচে থাকতে তারা কষ্ট পাবে না, আপনি নিশ্চিন্ত মনে যান। আপনি জয়যুক্ত হোন্।

—জয়-পরাজয়ের কথা জানি না। সত্যের কথাই বলি, একটা কিছু করতে হবে বলে সে কাজে নেমেছে, আমিও নামতে বাধ্য হয়েছি, ওদের দেশপ্রীতি আর আন্তরিকতাকে শ্রদ্ধা করি বলে।

স্থির বিশ্বাসের সুরে অণিমা দেবী কহিলেন, কিন্তু এই ত্যাগ, এই সেবা, ব্যর্থ হতে পারে না, জগতের ইতিহাসে কখনো তা হয় নি—

—হয়ত তাই। অঞ্জলিরা রইল প্রয়োজন হলে তাদের দেখবেন—

—হ্যাঁ জানি।

—জীবনে আর দেখা হবে কিনা কে জানে! তবে আপনাকে ভুলবো না।

—যেখানেই থাকুন, আপনার জন্যে আমার সহানুভূতি চিরকালই থাকবে।...অণিমার চোখ দুটি আসন্ন বিদায়ের ব্যথায় অশ্রু-আপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া শচীনবাবুকে প্রণাম করিলেন, তারপর সদর দরজাটি খুলিয়া দিলেন। শচীনবাবু রাস্তায় পড়িয়া একটু আগাইতেই দেখেন রঞ্জন এত রাত্রে ছাতা মাথায় দিয়া রাস্তায় ঘুর ঘুর করিতেছে। শচীনবাবু চমকাইয়া উঠিলেন—তবে ত কিছুই গোপন নাই।

বাড়ী যাইয়া শচীনবাবু বোধ হয় একটু ঘুমাইয়াছেন হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সবে সূর্য্যোদয় হইতেছে—পুলিশে বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে—

খানাতল্লাসী চলিতে লাগিল অতি নির্ম্মমভাবে। বালিশ ছিঁড়িয়া তুলা বাহির করিল, তোশক কাটিয়া দেখিল, চাল, ডাল, গুড়, তেল মিশাইয়া দেখিল—কিছুই বাদ গেল না, তাহার পরে পরীক্ষার কাগজের ভিতরে বাহির হইল কংগ্রেসের ইস্তাহার—ধ্বংসাত্মক কার্য্যের প্ররোচনা।

শচীনবাবুর হাতে হাতকড়া দিয়া বিজয়গর্ব্বে পুলিসের লোকেরা তাহাকে লইয়া চলিল। রাস্তার দুই পাশে বহু লোক ভিড় জমাইয়াছে। কেহ বিস্ময়ে, কেহ করুণায়, কেহ উল্লাসে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাকাইয়া দেখিতেছে। অত্যন্ত নিঃশব্দে নীরব জনতার কৌতুকদৃষ্টির উপর দিয়া শচীনবাবু চলিয়া গেলেন কারাগারের অন্তরালে।

শচীনবাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন, এখনও তাঁহার বাক্সে ১২।৵০ আছে। পাঠকদা একটি পয়সা রাখিয়া সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, 'বেঁচে থাকিস্'। তাহাদের সত্যই বাঁচিয়া ছিল, তিনি সেই তুলনায় তো বিরাট একটি রাখিয়া যাইতেছেন বিবেচনা করিয়া বেশ খুশী হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, ভগবান নিশ্চয়ই মীরা আর খোকাকে বাঁচাইয়া রাখিবেন। আর যদি নাই রাখেন তবে তাঁহার কি করিবার ক্ষমতা আছে? তিনি ত নিমিত্তমাত্র।

শচীনবাবু চলিয়া যাইবার পর মীরা ঘরে ঢুকিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল। কতদিন ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সে এই গৃহকে সাজাইয়াছিল। প্রত্যেকটি দ্রব্যকে অপরিসীম স্নেহ দিয়া সে আপনার করিয়াছে, মুহূর্ত্তে তাহা নষ্ট হইয়া গেল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে। মীরার মনটা অত্যাচারীদের উপর বিদ্রোহে নির্ম্মম হইয়া উঠিল—সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, এত দম্ভ অত্যাচারের শাস্তি পাইতেই হইবে।

কিন্তু মীরার এ নিস্ফল ক্রোধ—পরাজিতের অভিশাপ মাত্র।

কয়েকদিন পরের কথা।

মিস রায় মাঝে মাঝে আসেন, খোঁজখবর লন। খোকা তাহার সহিত বেশ জমাইয়া লইয়াছে—তাহাকে পিসিমা বলিয়া ডাকে। মাঝে মাঝে সে পিসিমার সহিত বেড়াইতেও যায়। মাঝে মাঝে সে প্রশ্ন করে—বাবা কোথায়?

মিস রায় বলেন, কলকাতায় বেড়াতে গেছেন শীগগিরই আসবেন।

—কবে আসবে?

—কাজ শেষ হলেই আসবেন।

সেদিন মীরা ভাত রাঁধিয়া খোকাকে ভাত মাখিয়া দিয়াছিল। খোকা নানারূপ বায়না করিয়া অবশেষে এক গ্রাস মুখে দিতে না দিতেই পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইল, মীরাকে নানারূপ প্রশ্ন আরম্ভ করিল। মীরা তাহাদের পানে না তাকাইয়াই উত্তর দিল, জানি না।

নানা প্রশ্নের একমাত্র 'জানি না' এই জবাব পাইয়া জনৈক অত্যুৎসাহী পুলিস-কর্ম্মচারী খোকার সামনের ভাতের থালাটা বুটের আঘাতে বাহিরে ফেলিয়া দিল—মীরা খোকার হাত ধরিয়া তাড়াতাড়ি উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। পুলিসপুঙ্গব সদম্ভে ভাতে ভরতি মাটির হাঁড়িটায় পদাঘাত করিয়া চূর্ণ করিয়া দিল।

মীরা চাহিয়া দেখিল—হঠাৎ চোখ দুইটি তাহার বাঘিনীর হিংস্রতায় ভরিয়া উঠিল, রাগে আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে সে বলিল, আপনারাও মানুষ!

জবাবের অপেক্ষা না করিয়া সে পাশের বাড়ীতে চলিয়া গেল। পুলিস বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া চলিয়া গেল।

মীরা আসিয়া দেখে তাহার বাক্স ভাঙা, কানের দুলজোড়া, বিবাহের আংটিটি ও নগদ টাকার কিছুই নাই।

মীরা আর একবার কাঁদিল—একান্ত অসহায়ের মত।

সে ভাবনায় মীরা একদিন শিহরিয়া উঠিত কি করিবে, কেমন করিয়া খোকাকে লইয়া থাকিবে, এই অবস্থায় সম্মুখীন হইয়া তাহার সে ভাবনা দূর হইয়া গেল। তাহার শুধু মনে হইতে লাগিল এই অত্যাচারের প্রতিবাদ না করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার চেয়ে মরিয়া যাওয়াই ভাল। ক্রোধে দুঃখে ক্ষোভে সে নাগিনীর মত ফুলিতে লাগিল।

শ্যামলী অঞ্জলি বৌমা ও মীরা সেদিন একত্র সমবেত হইল। পেট্রোল টিন দুইটি এখনও রহিয়াছে, সেগুলিকে লাগানো প্রয়োজন। দুইটি দল—একটি শ্যামলী ও মীরা আর একটি বৌমা আর অঞ্জলি—প্রথম দলের লক্ষ্য মুলি বাঁশের বেড়াঘেরা খড়ের পুলিস ব্যারাক, দ্বিতীয় দলের লক্ষ্য পোষ্টাপিস—সেও অনুরূপ ঘর। কলসী ভরিয়া পেট্রোল লইয়া যাইবার সুবিধা আছে, কারণ উভয় স্থানেই টিউবওয়েল আছে এবং মেয়েরা সন্ধ্যার পরে সেখানে জল আনিতে যায়।

পোষ্টাপিসের পূব ও দক্ষিণ দিক দিয়া এবং পুলিস ব্যারাকের দক্ষিণ দিয়া বড় রাস্তার পাশের খরস্রোত খালটি প্রবাহিত। আর একটি খালের জলধারা ব্যারাকের পিছনের খানিকটা জঙ্গলের পাশ দিয়া বহিয়া ঐ খালে পড়িয়াছে—উভয়ের মিলিত জলরাশি বড় রাস্তার পুলের নীচে দিয়া যাইয়া একেবারে মাঠে চলিয়া গিয়াছে। সেখান হইতে একটা ছোট রাস্তা বৌমাদের বাড়ীর সন্নিকটে গিয়াছে। ঠিক হইল—কার্য্য সমাধা করিয়া সকলে জলে ঝাঁপ দিবে কলসী লইয়া এবং এক স্থানে মিলিত হইয়া ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে গিয়া উঠিবে—আর যদি কার্য্য সুসম্পন্ন নাই হয় তবে অদৃষ্টে যা আছে তাই হইবে।

পুলিস-ব্যারাকের সামনেটা কাঁটা তারে ঘেরা, কিন্তু ঐ খালটি থাকায় পিছনটা উন্মুক্ত।

পারিপার্শ্বিক ও কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হইলে বৌমা মীরাকে কহিল—আপনার আর গিয়ে কাজ নেই, অন্য কিছু না হলেও গ্রেপ্তার অবশ্যম্ভাবী। খোকা রয়েছে, তাকে দেখবার ত কেউ নেই।

মীরা কহিল—খোকার জন্যেই আমাকে যেতে হবে, খোকার ভাতের থালা যারা পা দিয়ে মাড়িয়েছে, তাদের উপর প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে। স্বামী-পুত্র নিয়েই মেয়েদের সংসার, যদি তাদেরই এ দশা, তবে আমার বেঁচে থেকে কি ফল ?

অঞ্জলি কহিল—তবুও চিন্তা করা দরকার, আমরা ত যাচ্ছি—

মীরা দৃঢ়তার সহিত জানাইল, সে যাইবেই। অত্যাচারে মানুষ এমনি ভাবেই মরিয়া হইয়া উঠে, নহিলে কে ভাবিতে পারিত মীরার মত ভীরু কুলবধূর মনে এমন দুর্জ্জয় সঙ্কল্প আসিয়া দেখা দিবে।

অঞ্জলির প্রতিবাদ না করিয়া কহিল—আচ্ছা সে দেখা যাবে। আগে খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চয় ঠিক করা যাক্—

সকলে চলিয়া গেলে মীরা অনেকক্ষণ একাকী বসিয়া রহিল—তাহার মনের আকাশে প্রচণ্ড ঝড় যেন রহিয়া রহিয়া গর্জ্জাইতেছে। খোকার কি হইবে,সে কেমন করিয়া বাঁচিবে, অসহায় শিশু কি করিয়া এই অনুদার পৃথিবীতে আত্মরক্ষা করিবে এ সব চিন্তা সে ক্ষণিকের জন্যও করিল না, সে কেবল ভাবিল—আগুন দিতে হইবে—আগুনে পুড়িয়া উহারা মরুক, যদি নেহাতই বাঁচিয়া যায়—তাহা হইলেও পুড়িয়া মরিতে পারে এই আশঙ্কা যেন উহাদের রাত্রির নিদ্রাকে হরণ করে। এই একমাত্র চিন্তা তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

মীরা স্থিরসংকল্প হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—খোকা খাটের উপর অঘোরে ঘুমাইতেছে। মীরা নিদ্রিত পুত্রের কপালে চুম্বন করিয়া কহিল—বেঁচে থাকো—সত্যর মত বীর হও।

সেদিন সন্ধ্যার পর এক ফালি চাঁদ উঠিয়াছিল, কিন্তু সঞ্চরমাণ মেঘে তাহা অস্পষ্ট ঘোলাটে হইয়া উঠিয়াছে। রিজিয়াদের বাড়ীর পিছনে তাহারা যখন সমবেত হইল তখন ঈষৎ রাত্রি হইয়াছে—পথে বৈকালিক ভ্রমণার্থীর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমিয়া আসিয়াছে।

আজ শ্যামলী, অঞ্জলি ও বৌমা আসিয়াছে দেশপ্রেমের উত্তেজনায় মাতিয়া, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ জানাইতে হইবে এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া, কিন্তু মীরা আসিয়াছে প্রতিহিংসার অন্ধ উন্মাদনা লইয়া—অল্পশিক্ষিতা গৃহস্থ-ঘরের বধূ, আদর্শের প্রতি অনুরাগ তাহার নাই, কিন্তু তাহার ভিতরের প্রতিহিংসার অগ্নিশিখা প্রচণ্ড বেগে বাহির হইয়া আসিবে। সামনে যাহা পায় তাহাই সে গ্রাস করিবে।

যথাসময়ে রিজিয়া তাহাদের গৃহের পিছনে পেট্রোলের টিন বাহির করিয়া দিল—দুইটা কলসীতে তাহা ভরিয়া উহারা বিভিন্ন পথে রওনা হইল।

পোষ্টাফিসের পিছনে ও পুলিস-ব্যারাকের সামনের টিউবওয়েলে পাড়ার মেয়েরা সন্ধ্যার সময় যায়, পানীয় জল লইয়া আসে—কাজেই সন্দেহের কিছু ছিল না। মীরার কাঁকালে পেট্রোল ভর্ত্তি কলসী—আজ তাহার এতটুকু ভয় নাই—প্রাণ তাহার যায় যাক্, কিন্তু আগুন দিতেই হইবে—তাহার বুকে আজ দুর্জ্জয় সাহস—একমাত্র ভাবনা খোকাকে লইয়া সে তাহার পিসির কাছে থাকিবে।

ব্যারাকের সামনের টিউবওয়েলে শ্যামলী তাহার কলসী ভর্ত্তি করিয়া আবার শূন্য করিল। রাস্তায় কদাচিৎ লোকজন যাইতেছে—হঠাৎ রাস্তাটা যেন জনশূন্য হইয়াছে, মীরা অত দেখে নাই—সে শ্যামলীর ইঙ্গিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়া চলিল।

পিছনের অন্ধকারে তাহারা থামিয়া দাঁড়াইল—ছাউনি জনাকীর্ণ, ব্যারাকের ভিতরে কে একজন সেপাই খাটিয়ায় শুইয়া নাকি সুরে ভজন গাহিতেছে।

শ্যামলী কহিল—আমি পেট্রোল ছিটিয়ে দেই এই বেঁচা বেড়ার গায়ে আপনি দেশলাইয়ের কাঠি জেলে ছুঁড়ে দেবেন—আর সঙ্গে সঙ্গে কলসী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন জলে—ওরা গুলি করতে পারে—

—গুলি করবে?

—হ্যাঁ, ওদের উপর এখন এমনি হুকুমই আছে।

শ্যামলী প্রস্তুত হইয়া পেট্রোল ছিটাইতে যাইবে এমনি সময় একটা হৈ চৈ—সঙ্গে সঙ্গে আর্ত কণ্ঠের চীৎকার—আগুন আগুন—

লোকজনের ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি, চারিদিকে তুমুল কলরব। মীরা সহর্ষে কহিল—পোষ্টাপিসে ওরা লাগিয়েছে তা হলে—

শ্যামলী কহিল—হ্যাঁ—আর দেরি করবেন না, এই অবসর, সব ছুটেছে ওদিক পানে।

ভজনগান-রত লোকটি 'কেয়া কেয়া' করিতে করিতে বাহির হইয়া গিয়াছে। শ্যামলী কলসী হইতে বেড়ার গায়ে পেট্রোল ছিটাইয়া দিল, কলসী নিঃশেষ হইলে কহিল—লাগান বৌদি—

—কিন্তু ওরা যে ঘরে নেই—

—না থাক্ লাগান, পেট্রোলের গন্ধে সব এসে পড়বে—

মীরা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইয়া ফেলিয়া দিল—দেখিতে দেখিতে সমস্ত ঘর অগ্নিময় হইয়া উঠিল, আগুনের লেলিহান শিখা দেখিতে দেখিতে আকাশকে রক্তাক্ত করিয়া ফেলিল—

শ্যামলী কহিল—আসুন—মুহূর্তে সে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

মীরা অপূর্ব্ব আনন্দে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল—আগুন। ছিটা বেড়া পার হইয়া আগুন খড়ের চাল ধরিয়াছে, একটা বাঁশের গিট সশব্দে ফাটিয়া গেল। পরম উল্লাসে সে মনে মনে বলিল—জ্বলুক, আরো জ্বলুক… অত্যাচার, নৃশংসতা, সব পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাক্, ক্ষমতার ঔদ্ধত্য পুড়িয়া ভস্মীভূত হোক—

মীরা জলে ঝাঁপ দিতে ভুলিয়া গিয়াছে—আগুনের লেলিহান শিখার দিকে চাহিয়া সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে—খোকার থালা যাহারা লাথি দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে তাহারা পুড়িয়া মরিতেছে—তাহার সঙ্গে পুড়িতেছে অত্যাচার, অবিচার, আর সকল গ্লানি।…মীরা হর্ষে গর্বে অকস্মাৎ আত্মপ্রসাদে অভিভূত হইয়া পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়াই রহিল—তাহার কানে আসিতেছে যেন অত্যাচারীর হাহাকার, আর্ত কণ্ঠস্বর, করুণ ক্রন্দন—অগ্নিদগ্ধ নিরুপায়ের ভয়াবহ চীৎকার।

দুম্ করিয়া রাইফেল গর্জিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে মীরা পড়িয়া গেল। কি হইয়াছে সে জানে না—একটা উত্তপ্ত অগ্নি-শলাকা যেন অকস্মাৎ তাহার দেহ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোথায়—বুকে, পেটে না মাথায় বুঝিতে পারিতেছে না। অসহনীয় যাতনায়, আর্তস্বরে সে ডাকিল, শ্যামলী, খোকা, খোকা—শরীরের কোন একটা স্থান যেন ভিজা—সে হাত দিয়া দেখিল, সারা হাত রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে, আগুনের আভায় তাহা ঘোর রক্তবর্ণ দেখা যাইতেছে—তাহারই বুকের রক্ত—হোক, সে প্রতিশোধ লইয়াছে।

মনে মনে সে বলিল, বেঁচে থাকিস খোকা, এই রক্তের প্রতিশোধ নিতে তুই বেঁচে থাকিস।

অত্যন্ত ব্যাকুল আর্তকণ্ঠে সে আর একবার ডাকিল, খোকা—

তাহার পর সে আর কিছু জানে না।

রক্তে তাহার ক্ষীণতনু প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। সবুজ ঘাস, পৃথিবীর মাটি ভিজিয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে—এই নূতন নয়, যুগে যুগে পৃথিবীর মাটি এমনি ভাবে কতবার রক্তাক্ত হইয়াছে, অগ্নিকুণ্ডে কত মৃত পতঙ্গের ভস্মস্তূপের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে এই সভ্যতা।…

চারিপাশের আগুন নির্ব্বাপিত করিবার জন্য সহস্রাধিক ব্যক্তি সমবেত হইয়া কলরব করিতেছে, কিন্তু যে আগুন জ্বলিয়াছে তাহা নিবাইবার উপায় নাই। খড়ের ঘরের আগুন পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এক নিমেষে, তাহার উত্তাপের নিকটবর্ত্তী হওয়া একেবারেই অসম্ভব, তাই নিরুপায় জনতা নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া কেবল দেখিতেছে।

কয়েক মুহূর্ত্তেই সমুদয় গৃহ পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইয়া গেল—তাহার কিছুক্ষণ পরেই আসিল জোয়ার, নদীর জল প্রবল বেগে খালে পড়িল এবং আশেপাশের সব কিছু ভাসাইয়া অতি দ্রুত মাঠে নামিতে লাগিল।

নির্জ্জন অন্ধকারে খালের জল কলকল করিয়া বহিয়া চলিল নিরুদ্দিষ্ট নিম্নভূমির দিকে।

ভেজাল ও নকল

শ্রীরাজশেখর বসু

নন্দ গোয়ালা দুধে খুব জল দিচ্ছে। আপত্তি জানালে আকাশ থেকে পড়ে উত্তর দিলে, 'বলেন কি বাবু, আপনি পুরনো খদ্দের, আপনাকে কি ঠকাতে পারি? পাপ হবে যে।'

বললাম, 'দেখ নন্দ, দুধে অল্পস্বল্প জল থাকলে আমি কিছুই বলি না, কিন্তু এখন বাড়াবাড়ি হচ্ছে। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কালের সম্পর্ক। সত্যি কথা বলে ফেল।'

নন্দ লোকটি সজ্জন। মাথা চুলকে বললে, 'আজ্ঞে, সের পিছু মোটে আধ পো জল দিই, পরিষ্কার কলের জল। আমার কাছে তঞ্চকতা পাবেন না।'

'নন্দ, আর একটু সত্যি করে বল।'

'আজ্ঞে, এক পোর বেশী জল কোনও দিন দিই না, আমার এই গলার কণ্ঠির দিব্যি।'

এবারে বোধ হ'ল নন্দ সত্য বলেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, একেবারে খাঁটি দুধ কি দরে দিতে পার?'

'আজ্ঞে, টাকায় তিন পো দিতে পারি।'

'বরাবর খাঁটি দেবে তো? হাত সুড়সুড় করবে না?'

'তা কি বলা যায় হুজুর? মাঝে মাঝে একটু জল না দিলে চলবে কেন, গরিব লোক।'

'আচ্ছা, যদি সরকার আইন ক'রে দেয় যে দুধের দাম বাড়াতে পার, কিন্তু জল একদম দিতে পাবে না, দিলে মোটা জরিমানা বা জেল হবে, তা হলে কি করবে?'

'তা হলে তো ভালই হবে বাবু। টাকায় আধ সের বেচব, আমাদের লাভ বাড়বে।'

'কিন্তু নামজাদা ডেয়ারির খাঁটি দুধ তো টাকায় এক সের পাওয়া যায়?'

নন্দ অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে, 'খাঁটি কে বললে বাবু, মোষের দুধ জল মিশিয়ে দেয়।'

'আচ্ছা, টাকায় আধ সের হলে তুমি আর জল মেশাবে না তো?'

নন্দ ঘাড় নীচু করে হাসতে লাগল।

'মনের কথা বলে ফেল নন্দ।'

'তবে বলি শুনুন বাবু। সুবিধে মতন জল দিতেই হবে, এ হ'ল ব্যাবসার দস্তুর। আবার ইনস্পেকটারকে খাওয়াতে হবে, মাঝে মাঝে জরিমানাও দিতে হবে। ছাপোষা গরিব মানুষ, এসব খরচ পোষাতে হবে তো!'

এইবারে ব্যাপারটি বোধগম্য হ'ল। ব্যবসার দস্তুর অনুসারে গোয়ালা সনাতন প্রথায় যথাসম্ভব জল দেবেই। যতই ইনস্পেকটার থাকুক, শহরের সমস্ত দুধ পরীক্ষা করা অসাধ্য। অবশ্য মাঝে মাঝে ভেজাল ধরা পড়বে, তখন ইনস্পেকটারকে খুশী করতে হবে, সে বিমুখ হলে জরিমানাও দিতে হবে। দাম বাড়ালে বা আইন করলে বা অনেক ইনস্পেকটার রাখলেও সর্বদা নির্জল দুধ মিলবে না। কয়েকজন ভাগ্যবান যাঁরা চোখের সামনে দুইয়ে নিতে পারবেন তাঁদের কথা আলাদা। কোঅপারেটিভের দুধে বেশী তারতম্য দেখা যায় না, কিন্তু তাও নির্জল নয়।

শিউরাম পাঁড়ে এককালে আমার বাড়িতে রাঁধত, এখন স্বাধীন ব্যাবসা করে। একদিন একটা টিন এনে বললে, 'বাবু, বঢ়িয়া ভঁইসা ঘিউ আনিয়েসি, সস্তা আছে, ছে টাকা সের, লিয়ে লিন।'

ঘি খুব সাদা, শক্ত, একটু গন্ধও আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভেজাল কতটা দিয়েছ?'

'বনস্পতি? আরে রাম রাম!'

'দেখ পাঁড়ে, তোমার টিকি আছে, জনেউ আছে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর কপালে তিলকও আছে। মিথ্যা বলো না, পাপ হবে।'

শিউরাম সহাস্যে বললে, 'গাঁওসে আনিয়েসি, গোয়ালা কি করিয়েসে সে তো মালুম নহি। বাকী সে ভালা আদমী, সেরে আধ পৌয়ার বেশী মিশাবে না।'

'তারপর তুমি কত মিশিয়েছ?'

'সচ বাত বলছি বাবু, হামি সেরে এক পৌয়া মিশিয়েছি।'

'চেহারা আর গন্ধ থেকে মনে হচ্ছে সেরে সাড়ে তিন পোয়ার বেশী ভেজাল আছে। এ রকম ঘি আমি নিজেই বানিয়ে নিতে পারি, তাতে সওয়া তিন টাকায় এক সের হবে।'

'এ ছিয়া ছিয়া! আপনে ভেজাল ঘিউ বানাবেন?'

'দোষ কি, বেচব না তো। সজ্ঞানে নিজেরাই খাব।'

দুধ-ঘিএর কালবাজার নেই, ভেজাল দিয়েই লাভ বাড়ানো যায়। নকল দুধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি তাই যথাসম্ভব জল মেশানো হয়। ঘিএর নকল আছে, কিন্তু

শিউরাম পাঁড়ের বিদ্যা কম, তার ভেজাল সহজেই বোঝা যায়, স্বাভাবিক ঘিএর মতন রং নয়, বেশী জমাট, গন্ধ অতি কম। সেকালে যখন চর্বির ভেজাল চলত তখন চেহারা আর গন্ধ খাঁটি ঘিএর সঙ্গে অনেকটা মিলত। আজকাল ওস্তাদ ঘি-ব্যবসায়ীরা একটু নরম দেখে ঘনতেল (hydrogenated oil) কেনে, তাতে ঈষৎ হলদে রং এবং রাসায়নিক গন্ধ মিশিয়ে বেচে। ঘিএর এসেন্স বাজারে খোঁজ করলেই পাওয়া যায়। তার গন্ধ অতি তীব্র, একটু পচা ঘিএর মতন, এক সেরে কয়েক ফোঁটা দিলেই সাধারণ ক্রেতাকে ঠকানো যায়। সরষের তেলের এসেন্স আরও ভাল, রাই-সরষের মতন প্রচণ্ড ঝাঁঝ। চীনাবাদাম, তিল, তিসি—যে তেল যখন সস্তা, তাতে অল্প এসেন্স দিলেই কাজ চলে। যাদের সাহস বেশী তারা আরও সস্তায় সারে, অপাচ্য প্যারাফিন বা মিনারল অয়েলে গন্ধ দিয়ে বেচে। সরষের সঙ্গে শেয়ালকাঁটা-বীজের মিশ্রণ সম্ভবত ইচ্ছাকৃত নয়।

মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখা যায়, ভেজাল ঘি-তেল বেচার জন্য আদালতে অমুক অমুক লোকের জরিমানা হয়েছে। যাদের নাম ছাপা হয় তারা প্রায় অখ্যাত দোকানদার। যারা বড় বড় কারবারী তারা কদাচিৎ দণ্ড পেলেও তাদের নাম প্রকাশিত হয় না, তারা রিপোর্টারদের ঠাণ্ডা করতে জানে। যদি সমস্ত দণ্ডিত লোকের নাম সরকারী বিজ্ঞাপনে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয় তবে বদনাম এবং খরিদ্দার হারাবার ভয়ে ভেজাল-ব্যবসায়ীরা কতকটা শাসিত হতে পারে। সরকারী কর্তারা যদি এইটুকু ব্যবস্থাও না করতে পারেন তবে লোকে তাঁদেরও সন্দেহ করবে।

রেশনে যে বিদেশী ময়দা পাওয়া যায় তা আমাদের পূর্বপরিচিত ময়দার সঙ্গে মেলে না, লুচি বেলবার সময় রবারের মতন টান হয়। এই স্থিতিস্থাপকতা কি কানাডা-অষ্ট্রেলিয়ার ময়দার স্বাভাবিক ধর্ম, না কিছু মেশানোর জন্য? সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন করা কর্তাদের উচিত। আটা কি শুধু গম-যবের মিশ্র থেকে তৈরি হয়, না অন্য শস্যও থাকে? রেশনের আটায় ভুসির পরিমাণ অত্যধিক। তা কোথা থেকে আসে? চালের সঙ্গে অনেক সময় এত পাথরকুচি আর ভুসি পাওয়া যায় যে তাকে স্বাভাবিক বলা চলে না। এই ভেজাল কোথায় দেওয়া হয় তার খবর সরকারী কর্তারা নিশ্চয় রাখেন। তাঁরা কি প্রতিকার করতে অসমর্থ, না ওজন বাড়াবার জন্যই ভেজালে আপত্তি করেন না? অনেক রেশনের দোকানে ভাল চালের বস্তা আড়ালে থাকে, বাছা বাছা খদ্দেরকে তা থেকে দেওয়া হয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও আটার কলে বিস্তর সোপ-স্টোন পাওয়া গিয়েছিল। কয়েক গাড়ি তেঁতুল বিচিও একবার আটক করা হয়েছিল। এই সব খবর সাড়ম্বরে কাগজে প্রকাশ করা হয়, কিন্তু তার পরেই চুপ। অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করলে কি ক্ষতি হ'ত? গুজবের উপর জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস। ছেলে-ধরা, শিল-নোড়ায় বসন্ত রোগ, কেরোসিন তেলে জল, কলের জলে সাপ প্রভৃতি নানারকম গুজবে লোকে খেপে ওঠে। খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণকে নিশ্চিন্ত করা কি সরকারের কর্তব্য নয়?

জল-মেশানো দুধের মতন ভেজাল-মেশানো চাল আর আটা না দিয়ে যদি খাঁটি জিনিস দেওয়া হয় তবে হয়তো দাম না বাড়ালে চলবে না, কিন্তু তাও লোকের পক্ষে শ্রেয় হবে। অবশ্য নন্দ গোয়ালা যাকে ব্যবসায় দস্তুর বলে তা একেবারে নিবারণ করতে হবে, দাম বাড়াবার পরেও যেন ভেজাল না থাকে।

* * *

নিত্যব্যবহার্য বহু জিনিসের ভেজাল বা নকল দেখা যায়। অসময়ে বাজারে স্তূপাকার সবুজ মটরের দানা বিক্রি হয়। সবুজ রঙে শুকনো মটর ছুবিয়ে বস্তাবন্দী হয়। পাইকাররা সেই রঙিন মটর আড়ত থেকে কেনে এবং দরকার মতন জলে ভিজিয়ে ফুলিয়ে বিক্রি করে। অজ্ঞ লোকে তা কাঁচা মটরশুঁটির দানা মনে করে কেনে। যে রং দেওয়া হয় তা সবিষ কি অবিষ কেউ ভাবে না। মিউনিসিপালিটি উদাসীন, মার্কেটের যাঁরা অধ্যক্ষ তাঁদের সামনেই এই অপবস্তু বিক্রি হয়। মিষ্টান্নেও নানারকম রং থাকে, তা নির্দোষ কি না দেখা হয় না। ময়রাকে যদি বলা হয়—রং দাও কেন? সে উত্তর দেয়—খদ্দের যে রং না থাকলে কেনে না। কথাটা সত্য নয়। রঙের প্রচলন ময়রার বুদ্ধিতেই হয়েছে। নির্বোধ খদ্দের মনে করে রং থাকাটাই দস্তুর বা ফ্যাশন-সংগত। পাশ্চাত্ত্য দেশে খাদ্যের জন্য বিশেষ বিশেষ নির্দোষ রঙের বিধান আছে, অন্য রং দিলে দণ্ড হয়। এদেশে যত দিন তেমন ব্যবস্থা না হয় তত দিন খাবারে রং দেওয়া একেবারে বন্ধ করা কর্তব্য। সরকারী এবং মিউনিসিপাল কর্তাদের উচিত বার বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে সাধারণকে সতর্ক করা।

চায়ের দোকানে এবং হোটেলে যে চায়ের ছিবড়ে জমা হয় তা শুকিয়ে অন্য চায়ের সঙ্গে ভেজাল দেওয়া হয়। এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি থেকে অল্পাধিক আরক (essential oil) বার করে নেওয়ার পর বাজারে ছাড়া হয়। সব চেয়ে বেশী ভেজাল ও নকল চলছে ঔষধে। কুইনীন, এমেটিন

অ্যাড্রেনালিন প্রভৃতির লেবেল দেওয়া জাল ঔষধে বাজার ছেয়ে গেছে। শিশি-বোতল-ওয়ালারা বিখ্যাত দেশী বিলাতী ঔষধ ও প্রসাধনদ্রব্যের খালি শিশি ও টিন বেশী দাম দিয়ে গৃহস্থের বাড়ী থেকে কেনে, জালকারী তাতেই ছাইভস্ম পুরে বিক্রি করে। অনেক ভদ্র গৃহস্থ জেনে-শুনে এই পাপ ব্যবসায়ের সাহায্য করে। এই সব জাল জিনিস ফুটপাথে বিস্তর দেখা যায়, বড় বড় দোকানেও পাইকারী দরে বিক্রি হয়। পাকিস্থানে এই কারবার অবাধে চলছে। আজকাল কলকাতায় যে গ্যাস সরবরাহ হচ্ছে তার সম্বন্ধেও অভিযোগ শোনা যায় যে গ্যাস পূর্বের মতন নয়, তাতে হাওয়া মেশানো আছে।

ভেজাল ও নকল এদেশে নূতন নয়। দেশী বিক্রেতার সাধুতায় আমাদের এতই অনাস্থা যে অনেক ক্ষেত্রে খাঁটি জিনিসের জন্য 'সায়েব-বাড়ি'র শরণ হতে হয়। এই জাতিগত দুর্নীতিতে আমরা গ্লানিবোধ করি না। যুদ্ধের পর এবং স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশে যে মহাকলি-যুগের আরম্ভ হয়েছে তাতে সর্বপ্রকার দুষ্ক্রিয়া বেড়ে গেছে। সম্পূর্ণ প্রতিকার সরকারের সাধ্য নয়। জন-সাধারণের অধিকাংশেরই সামাজিক দায়িত্ববোধ কম, এক-জোট হয়ে আত্মরক্ষার উৎসাহ কিছুমাত্র নেই। সম্প্রতি আমাদের দেশে অনেক বীরপুরুষ ও বীরনারীর উদ্ভব হয়েছে। এরা ট্রাম-বাস পোড়ায়, বোমা ফেলে, পুলিসকে মারে, মান্যগণ্য লোককে আক্রমণ করে, শ্রমিক এবং স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েদের খেপায়; কিন্তু ভেজাল, নকল, কালবাজার প্রভৃতি দুষ্কর্ম সম্বন্ধে এরা পরম নির্বিকার। শুধু অসংযম ও অশান্তির প্রসারই এদের কাম্য।

কোনও অনাচার যখন দেশব্যাপী হয় এবং সাধারণে নির্বিবাদে তা মেনে নেয় তখন অল্প কয়েকজন সমাজ-হিতৈষীর উদ্‌যোগেই তার প্রতিকার আরম্ভ হয়। সতীদাহ নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন, পরাধীনতার বিলোপ প্রভৃতি এইপ্রকারে হয়েছে। ভেজাল ও নকল নিবারণের জন্য কয়েকজন নিঃস্বার্থ উৎসাহী লোকের প্রয়োজন। তাঁরা যদি প্রচার দ্বারা সাধারণকে উদ্‌বোধিত করেন এবং বিশুদ্ধ জিনিস্‌ বেচবার জন্য সমবায়-ভাণ্ডার খোলেন, তবে দাম বেশী নিলেও ক্রমশ তাঁরা সাধারণের আনুকূল্য পাবেন। তাঁদের প্রভাবে অন্যান্য ব্যবসায়ীও তাদের দস্তুর বদলাতে বাধ্য হবে।

দুর্ভিক্ষের সময় বিশ্বামিত্র প্রাণরক্ষার জন্য কুকুরের মাংস খেতে গিয়েছিলেন। আমাদের অত্যন্ত অন্নের অভাব হলে অনুকল্প খুঁজতেই হবে, নিকৃষ্ট খাদ্যে তুষ্ট হতে হবে। জন-সাধারণ অবুঝ, অনভ্যস্ত খাদ্যে সহজে তাদের প্রবৃত্তি হবে না। যাঁরা ধনী ও জ্ঞানী তাঁদের কর্তব্য নূতন বা মিশ্রিত খাদ্য নিজে খেয়ে সাধারণকে উৎসাহ দেওয়া। সরকার এইরূপ খাদ্যের উপযোগিতা প্রচার করবেন, কিন্তু অত্যুক্তি বা মিথ্যা উক্তি করবেন না, তাতে বিপরীত ফল হবে। মিথ্যা প্রিয় বাক্যের চেয়ে অপ্রিয় সত্য ভাল। কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও খাদ্যবিশারদ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ঘাস থেকে সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত হবে। সরকার যদি এরকম কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রচারের প্রশ্রয় দেন তবে সাধারণের শ্রদ্ধা হারাবেন। চাল-আটা দুর্লভ হলে লাল-আলু, টাপিওকা প্রভৃতির সপক্ষে প্রচার করতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে যে চাল-আটার সমান পুষ্টিকর না হলেও এই সব খাদ্যে জীবনরক্ষা হয়, স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কাও বিশেষ কিছু নেই; খরচ বেশী পড়তে পারে, কিন্তু এই দুঃসময়ে গত্যন্তর নেই।

সম্প্রতি পণ্ডিত নেহেরু জানিয়েছেন যে, কোনও এক ল্যাবরেটারিতে ভুট্টা থেকে সিন্থেটিক চাল তৈরির চেষ্টা সফল হয়েছে। আজকাল অনেক রাসায়নিক দ্রব্য কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হচ্ছে, যেমন নীল (indigo), কর্পূর, মেন্থল। কিন্তু রাসায়নিক বা অন্যবিধ কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় কোনও শস্য, ফল বা প্রাণী প্রস্তুত করা এখনও বিজ্ঞানের অসাধ্য। আমড়া থেকে আম অথবা ব্যাং থেকে মাছ তৈরি যেমন অসম্ভব, ভুট্টা থেকে চাল তৈরিও সেই রকম। পণ্ডিত নেহেরু যে বস্তুর কথা বলেছেন তাকে synthetic rice বললে সত্যের অপলাপ হবে, তা imitation rice বা নকল চাল, যেমন সোনার নকল কেমিক্যাল সোনা। টাপিওকা থেকে যেমন নকল সাগুদানা তৈরি হয়, সম্ভবত ভুট্টাচূর্ণ থেকে সেই রকমে চালের মতন দানা তৈরি হয়েছে, হয়তো প্রোটিনের মাত্রা সমান করবার জন্য কিছু চীনাবাদামের গুঁড়োও মেশানো হয়েছে। দেখতে চালের মতন হলে দরিদ্র অজ্ঞ লোককে ভোলানো যেতে পারবে, খেলে পেটও ভরবে, কিন্তু এই জিনিসের গুণ চালের সমান হবে না। সরকারী প্রচারে অসতর্ক উক্তি একেবারে বর্জন করতে হবে। 'সত্যমেব জয়তে'—এই রাষ্ট্রীয় মন্ত্রের মর্যাদাহানি যেন কদাপি না হয়।

এক দিনের স্মৃতি

শ্রীউপেন্দ্র রাহা

সেবার নৈহাটিতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব বাহাদুর সম্মেলনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তখন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় জীবিত ছিলেন। প্রধানত: তাঁহারই উদ্যোগে ও উৎসাহে তদীয় জন্মস্থান নৈহাটিতে সম্মেলনের অধিবেশন হয়। আমরাও প্রতিনিধিস্বরূপে এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলাম।

নৈহাটি ষ্টেশনের পাশেই কাঁঠালপাড়ায় সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাসভবন। আমরা সম্মেলনস্থল হইতে তাহা দেখিতে গেলাম। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সহিত এই বাড়ীর স্মৃতি অবিচ্ছেদ্যরূপে বিজড়িত। ইহা কেবল বাংলার সাহিত্য-তীর্থ নয়, সমগ্র ভারতের পুণ্যতীর্থ। বঙ্কিমের অমর লেখনীপ্রসূত সমস্ত উপন্যাস এবং অন্যান্য গ্রন্থ ও রচনাবলী কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গেলেও 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র ভারতের প্রতি প্রাসাদে ও কুটিরে, প্রত্যেক দেশপ্রাণ ভারতবাসীর চিত্ত সঞ্জীবনী-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া চিরকাল ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইবে। এক দিন ভারতের মুক্তিকামী স্বদেশী যজ্ঞের ঋত্বিক্‌গণ যে শক্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রজ্বলিত হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, যে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ভারতমাতার সহস্র সহস্র বীরসন্তান অবলীলাক্রমে মৃত্যুর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, যে মন্ত্রের অপরিসীম শক্তিতে তাঁহারা অশেষ দুঃখ দৈন্য ও বিপদ বরণ করিয়াছিলেন অম্লান বদনে প্রবল রাজশক্তির ভীষণ অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, দেশমাতৃকার মুক্তিব্রত উদ্‌যাপনে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া সর্ব্বরিক্ত হইয়াছিলেন, সেই মহামন্ত্রই ভারতের মুক্তিসাধনায় একমাত্র শক্তির উৎস, মহাজাতি সংগঠক ও মহৈক্যবিধায়ক ভারতের জাতীয় মন্ত্র, বেদের প্রণবের ন্যায় ইহাও 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের প্রণবস্বরূপ। ইহা অমরত্বের অমৃতে অভিষিক্ত, মৃত্যুহীন, ধ্বংসহীন। যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এই মহামন্ত্রের উদ্গাতা যিনি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরমে'র বাণীরূপ প্রদান করিয়াছেন, তিনিও অমরত্বের গৌরবে চিরপরিচিত, জাতির ইতিহাসে সেই মন্ত্র ও মন্ত্রপ্রণেতা ঋষির নাম স্বর্ণাক্ষরে চিরমুদ্রিত থাকিবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারে আরও দুই তিন জন সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইয়াছে। তন্মধ্যে তাঁহার অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র ও তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শচীশচন্দ্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সঞ্জীবচন্দ্রের লিখিত 'কণ্ঠমালা' 'জাল প্রতাপচাঁদ' প্রভৃতি অধুনালুপ্ত গ্রন্থের কথা বোধ হয়, আধুনিক পাঠক-সমাজে অনেকেই অবগত নহেন। তাঁহার 'পালামৌ' শীর্ষক সুলিখিত কাহিনীর অংশবিশেষ অনেক বাংলা পাঠ্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। শচীশচন্দ্র অনেকগুলি বাংলা উপন্যাসের রচয়িতা। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি জীবনীও প্রণয়ন করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যুজ্জ্বল প্রতিভালোকে বঙ্গের সাহিত্যাকাশ আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বিরল। তিনি যে ঘরে বসিয়া সাধারণত: লেখাপড়া করিতেন সেই ঘরটি দেখিলাম। তাঁহার সুবিস্তৃত বাসভবন জীর্ণদশায় পতিত, বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া জীর্ণদেহে দণ্ডায়মান আছে। বঙ্কিমের এই স্মৃতিতীর্থে আসিয়া কত কথাই মনে পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগে বিদ্যমান ছিলেন, সেই যুগের সাহিত্যের তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয়। সেই যুগে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, চন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি জ্যোতিষ্কসমূহের প্রতিভা-দীপ্তিতে বাংলার সাহিত্যগগন আলোকিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবন হইতে একজন বন্ধুর সঙ্গে ব্যাণ্ডেলে আসিয়া তথাকার পর্ত্তুগীজ মিশন হাই স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রলাল ধর মহাশয়ের গৃহে অতিথি হইলাম। ব্যাণ্ডেল কলিকাতা হইতে ২৬ মাইল দূরে অবস্থিত। পারস্য ভাষার 'বন্দর' শব্দ হইতে ব্যাণ্ডেল নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বন্দর শব্দের অর্থ বাণিজ্যস্থল—যেখানে দেশ-দেশান্তর হইতে বাণিজ্য-তরীসমূহ পণ্যসম্ভার বহন করিয়া আনে এবং যেখান হইতে বিবিধ পণ্য অন্যত্র বহন করিয়া লইয়া যায়। পর্ত্তুগীজেরা বন্দরকে 'ব্যাণ্ডেল' বলিত। তাহাদের বিকৃত উচ্চারণে হুগলী বন্দর 'Bandel de Ougolim'-এ পরিণত হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক বিবরণে জানা যায়, দিল্লীর বাদশাহ্ হুমায়ুন শের শাহের বিরুদ্ধে পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তদনুসারে পর্ত্তুগীজ নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষ এডমিরাল্ সেমপায়ো (Simpayo) ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নয়খানি জাহাজ লইয়া হুগলী বন্দরে আগমন করেন। তিনি অনেক বিলম্বে আসিলেও বাদশাহ তাঁহাকে পুরস্কার-স্বরূপ বাংলায় একটি কুঠি নির্ম্মাণের

অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে সেম্পায়ো হুগলীতে কুঠির স্থান নির্ব্বাচন করেন।

কিছুকাল পরে পর্ত্তুগিজেরা বর্ত্তমান 'জুবিলী সেতু' ও হুগলী জেলের মধ্যবর্ত্তী গোলাঘাট নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করে। এখনও সেই প্রাচীন দুর্গের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে তাঁহার অনুগৃহীত ট্রেভারেস্ নামক একজন পর্ত্তুগীজ কাপ্তেন এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার ও গীর্জ্জা নির্ম্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইহার পর ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কুঠির প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী ব্যাণ্ডেল গ্রামে একটি উপাসনা-গৃহ নির্ম্মিত হয়। অল্প কয়েকজন অগাষ্টিনপন্থী পর্ত্তুগীজ রোমান ক্যাথলিক যাজক এই স্থানে উপাসনার কার্য্য পরিচালনা করিতেন। কিছুকাল মধ্যেই হুগলী কুঠির সীমানার ভিতরেই আরও দুইটি গীর্জ্জা এবং দুর্গ-মধ্যে সৈনিকদের জন্য একটি ভজনালয় নির্ম্মিত হয়।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ বণিকগণ এখানে বিশেষ সাফল্যের সহিত বাণিজ্য করেন, ক্রমেই তাঁহাদের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। কালক্রমে তাঁহাদের বাণিজ্য-কুঠিও বহুল পরিমাণে সম্প্রসারিত এবং দুর্গ আরও সুদৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত হয়।

১৬২২ সালে শাহজাদা হারুণ (খুররম) তাঁহার পিতা সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হন। ইনিই পরবর্ত্তীকালে সম্রাট্ শাহজাহান নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। হারুণ তৎকালীন পর্ত্তুগীজ গবর্ণরকে অনেক ভূমি ও ধন-সম্পদের প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার পক্ষাবলম্বনের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু গবর্ণর মাইকেল্ রড্রিগ্‌স (Michael Rodrigues) তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। গবর্ণর এইরূপে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় শাহজাদা তাঁহার প্রতি নিতান্তই রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হন। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণে কৃত-সঙ্কল্প হন। বাংলার তদানীন্তন সুবাদারের সহিত পর্ত্তুগীজ-দিগের ঘোরতর শত্রুতা ছিল। তিনি সময় ও সুযোগ বুঝিয়া বাদশাহের নিকটে সংবাদ দিলেন যে, পর্ত্তুগীজেরা তাহাদের কুঠি-মধ্যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কামান বসাইয়াছে এবং নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে। সম্রাট্ এই সংবাদ পাইয়া পর্ত্তুগীজদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য সুবাদারকে আদেশ দিলেন। সুবাদার তদনুসারে ১৫ হাজার সৈন্য লইয়া হুগলী কুঠিতে উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার পর্ত্তুগীজ দুর্গ অবরোধ করিলেন। প্রায় এক মাসকাল পর্ত্তুগীজেরা আক্রমণ প্রতিরোধ করিল। অবশেষে সুবাদার কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি একজন উচ্চপদস্থ পর্ত্তুগীজ কর্ম্মচারীকে উৎকোচ প্রদান করিয়া বশীভূত করিলেন। একদিন দুর্গ-মধ্যে যখন মহাসমারোহে জন দি ব্যাপ্‌টিষ্টের উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তখন এই কর্ম্মচারীর সাহায্যে সুবাদারের সৈন্যগণ গোপনে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

১৬৩২ সালের ২৪শে জুন এই ঘটনা সংঘটিত হয়। উৎসবে উপলক্ষে যখন দুর্গবাসীরা উপাসনায় রত ছিলেন, তখন শত্রু-সৈন্য দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দুর্গ বিধ্বস্ত করিতে লাগিল, অস্ত্রাগারে অগ্নিসংযোগ করিল এবং সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করিয়া ফেলিল। দুর্গমধ্যে যথেচ্ছ হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। সুবাদার গবর্ণরকে বন্দী করিয়া জীবন্ত দগ্ধ করিলেন এবং এক হাজারেরও অধিক স্ত্রী-পুরুষ ও বালকবালিকাকে বন্দী করিয়া রাজধানী আগ্রায় পাঠাইয়া দিলেন। শত্রুসৈন্যের প্রচণ্ড আক্রমণে পর্ত্তুগীজদিগের গীর্জ্জা ও অট্টালিকাসমূহ ভূমিসাৎ হইল, সমগ্র কুঠি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। বন্দরে প্রায় ৩০০ পোত ছিল, তন্মধ্যে অল্পকয়েকটি মাত্র রক্ষা পাইল, অবশিষ্ট পোত-গুলি মোগলসৈন্যের কবলে পতিত হইল। এই বিপুল ধ্বংস-লীলার মধ্যে একমাত্র ব্যাণ্ডেলের গীর্জ্জাই শত্রুর অত্যাচার হইতে কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা পাইয়াছিল।

এই গীর্জ্জার বেদীতে একটি অতি সৌষ্ঠবময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। এই মূর্ত্তিই সুপ্রসিদ্ধ 'সুখযাত্রার দেবীমূর্ত্তি' (Lady of Happy Voyage)—১৬৩২ সালে হুগলীর দুর্গ অবরোধের সময় মূর্ত্তিটি আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পায়। প্রবাদ এইরূপ যে, তখন একজন পর্ত্তুগীজ বণিক এই দেবীমূর্ত্তিকে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহা বেদী হইতে তুলিয়া লইয়া মূর্ত্তিসহ নদীগর্ভে ঝম্পপ্রদান করে। অবরোধের পরবর্ত্তী বৎসরে পর্ত্তুগীজেরা যখন ব্যাণ্ডেলে ফিরিয়া আসিল, তখন সহসা এক দিন রাত্রিকালে এক প্রবল ঝটিকা উত্থিত হয়। তখন বাতাসের ভীষণ গর্জ্জন হইতেছিল। এই প্রচণ্ড গর্জ্জন-ধ্বনির মধ্যে গীর্জ্জার অধ্যক্ষ ফাদার ডা' ক্রুজ যেন সেই বণিকের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। সে যেন আকুলভাবে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "আমাদের বিজয়দাত্রী এই 'সুখ-যাত্রার দেবী'কে অভ্যর্থনা করুন। ফাদার, উঠুন, আমাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করুন।" ফাদার ডা' ক্রুজ এই আহ্বান শুনিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি দেখিলেন, নদীবক্ষ এক অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। কিছুকাল পরে সেই আলোকরাশি অন্তর্হিত হইল, নাবিকের সেই কণ্ঠধ্বনিও আকাশে বিলীন হইয়া গেল, প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিল। পরদিন প্রভাতে সেই দেবীমূর্ত্তিটি নদীকূলে গীর্জ্জার তোরণ হইতে কয়েক গজ দূরে পরিদৃষ্ট হইল। সম্ভবতঃ ঝটিকাক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার ঘাতপ্রতিঘাতে ইহা নদীতীরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ডা' ক্রুজ মূর্ত্তিটি আনিয়া প্রধান বেদীর উপর স্থাপন করিলেন। এই ঘটনার স্মরণার্থে একটি বিশেষ উৎসব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই উৎসব প্রতি বৎসরই অনুষ্ঠিত

হয়, তখন এই দেবীমূর্ত্তিকে লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করা হয়।

কয়েক বৎসর পরে মূর্ত্তিটি নদীতীরে যে স্থানে পাওয়া গিয়াছিল, তথায় একটি ঘাট নির্ম্মিত হয়। এই ঘাট এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তিটি যে বেদীতে স্থাপন করা হইয়াছিল, পরে তাহা হইতে তুলিয়া লইয়া গীর্জ্জার ছাদের উপর একটি আধারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্যাণ্ডেল গীর্জ্জায় একটি জাহাজের মাস্তুল প্রোথিত রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যখন দেবীমূর্ত্তিটি পুনঃপ্রাপ্তির পর গীর্জ্জামধ্যে বিবিধ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ আয়োজন হইতেছিল, তখন একটি পর্ত্তুগীজ জাহাজ আসিয়া গীর্জ্জা-তোরণের সম্মুখবর্ত্তী ঘাটে নোঙ্গর করে। গীর্জ্জায় উপাসনা শেষ হইলে, ঐ জাহাজের কাপ্তেন তাঁহার জাহাজখানা বঙ্গোপসাগরের মধ্যে কি অবস্থায় ভীষণ ঝড়ে পতিত হইয়াছিল এবং তিনি নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্যস্থানে উপনীত হইলে ঝড়ের দেবতাকে যথোচিত উপচার প্রদানের মানস করায় ঝটিকার বেগ ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া কিরূপে প্রকৃতি শান্ত ভাব ধারণ করিল, তাহা ফাদার ডা' ক্রুজের নিকট বর্ণনা করেন। অতঃপর কাপ্তেন জাহাজের একটি মাস্তুল অপসারিত করিয়া তাহা প্রতিশ্রুত উপচারস্বরূপ গীর্জ্জাপ্রাঙ্গণে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলেন। তিন শতাধিক বর্ষের পরও ইহা এখনও সগৌরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া অতীত কাহিনীর স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

ভূপেনবাবুর বাসায় রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে আমরা তাঁহার সঙ্গে ব্যাণ্ডেলের গীর্জ্জা দেখিতে গেলাম। গীর্জ্জার শীর্ষদেশে সেই 'সুখযাত্রার দেবীমূর্ত্তি' দর্শনে মন বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইল। বাস্তবিকই ইহা শিল্পীর অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যের এক বিচিত্র নিদর্শন। শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত অতুল সৌষ্ঠবমণ্ডিত, জীবন্তভাবের প্রাচুর্য্যে অভিষিক্ত সুগঠিত মাতৃমূর্ত্তি, ক্রোড়ে একটি অতি কমনীয় শিশুকে ধারণ করিয়া আছেন। মূর্ত্তির মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব মাতৃভাবের বিকাশে অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে; দেখিলে মনে হয়, যেন অনবদ্য শুচিতা, শুভ্রতা, কমনীয়তা এবং স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত মাতৃত্ব এখানে মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া দর্শনের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। বহুক্ষণ নয়ন ভরিয়া এই মূর্ত্তি দেখিলাম। অতঃপর ইহার স্মৃতিভারে হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে গীর্জ্জা-প্রাঙ্গণে অবতরণ করিলাম। অনেক দিন হইল, পর্ত্তুগীজেরা বাংলাদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের কত কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তির কথা অতীত কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বাংলায় পর্ত্তুগীজ-দিগের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ ব্যাণ্ডেলের গীর্জ্জা এই মহিমময়ী দেবীমূর্ত্তি শীর্ষে ধারণ করিয়া সার্দ্ধ ত্রিশতাব্দী কাল সর্ব্বসংহারী কালের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া আজিও অক্ষত শরীরে দণ্ডায়মান আছে। গীর্জ্জা হইতে ভূপেনবাবুর বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মধ্যাহ্নের ভূরিভোজন ও ভূপেনবাবুর অকৃত্রিম অতিথিবাৎসল্যে পরিতৃপ্ত হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। নৈহাটি সাহিত্য-সম্মেলনের স্মৃতির সহিত এই একদিনের স্মৃতি অচ্ছেদ্য-রূপে বিজড়িত হইয়া রহিল।

বৃথা তবে এই স্বাধীনতা

শ্রীনীলরতন দাশ

নব্যযুগের সব্যসাচী ও দধীচির সাধনায়,
মূর্চ্ছিতা দেশ-জননী জাগিল মুক্তির চেতনায়।
নরকাসুরের রাজ্য ভাঙিয়া পড়িল ধূলির 'পরে,
দুঃশাসনের রক্ত-চক্ষু নিমীলিত চিরতরে।
কংসের কারা ধ্বংস হইল, টুটে গেল বন্ধন;
তবু কেন এত দুঃখদৈন্য? তবু কেন ক্রন্দন?
অমারজনীর অবসানে যেই উজলিল চারিধার,—
রঙীন উষার দুয়ারে আবার ঘনালো অন্ধকার!
অন্নপূর্ণা ভারতমাতার ক্ষুধার্ত্ত সন্তান
পরের দুয়ারে আর কেন করে অন্নের সন্ধান?
বিশ্বের মাঝে নিঃস্বের সাজে বিবস্ত্র নরনারী
বিলাসপুরীর রাজপথে কেন চলে আজো সারি সারি?
হুজুরে মজুরে আজিও বিরোধ; যন্ত্রশালার কুলি
পেষণচক্রে গুঁড়া হয়ে কেন হতেছে পথের ধূলি?
চিত্তে তৃপ্তি দিল না মুক্তি, নিরাশায় ভরা বুক;
বহুবাঞ্ছিত স্বপ্নলোকের কোথা সে স্বর্ণযুগ?

প্রেতপিশাচেরা এখনো গোপনে হাসিছে অট্টহাস,
নাগিনীরা আজো চুপে চুপে ফেলে বিষাক্ত নিশ্বাস।
শান্তির নীড় পল্লী-কুটীর ভাঙে যে গুণ্ডারাজ,—
সম্বলহীন বাস্তুহারারা পথে পথে ফিরে আজ।
এখনো যে কত পল্লীভবন আর্ত্ত-অশোক বন,
বন্দিনী সীতা লাঞ্ছিতা সেথা কাঁদিছে অনুক্ষণ!
সমাজের অরি চোরাকারবারী মুনাফাখোরের দল
লক্ষ লোকের বক্ষ শুষিয়া চক্ষে ঝরায় জল।
ধনিকে বণিকে কাঞ্চন লুটে' সঞ্চিত করে টাকা,
বঞ্চিত জন লাঞ্ছিত শুনি' গালভরা বুলি ফাঁকা!
দেবতার তরে স্বর্গে এখনো মজুত হতেছে সুধা,
মর্ত্ত্যে মানুষ কণিকা তাহার পায় না মিটাতে ক্ষুধা!
শত শহীদের রক্তের স্রোত, মাতার অশ্রুধারা—
ব্যর্থ কি হ'ল? ধরার ধূলায় হ'ল কি সকলি হারা?
মুক্তির স্বাদ নাহি পায় যদি চির দুর্গত জন—
বৃথা তবে এই স্বাধীনতা, মিছে উৎসব-আয়োজন!
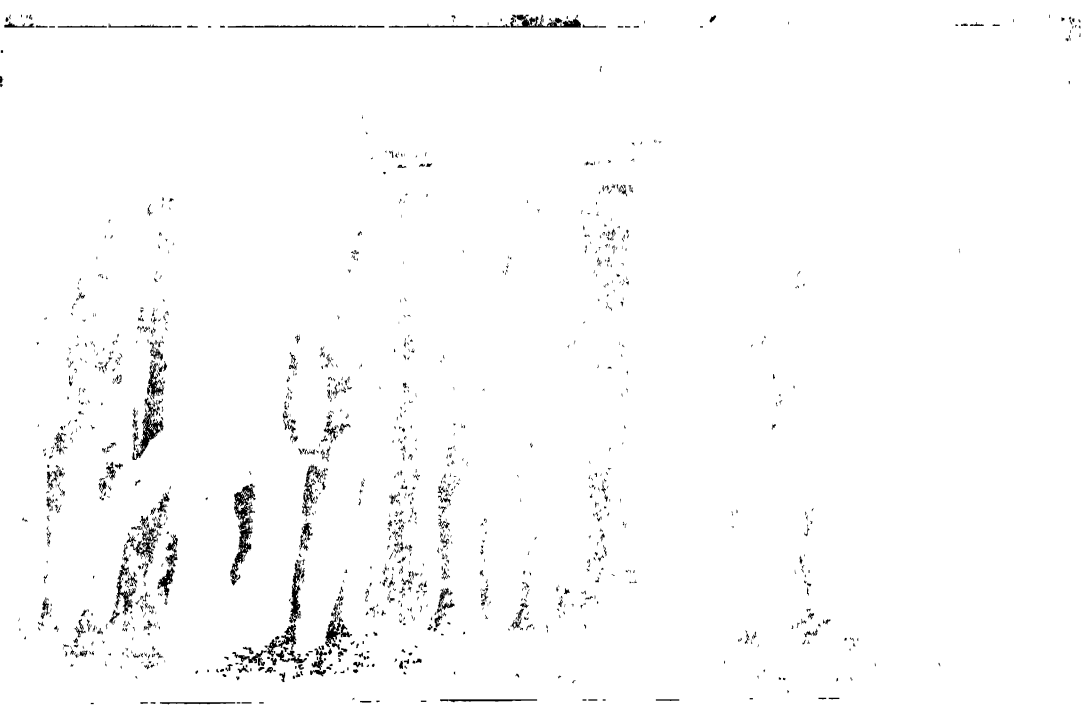
রথগাত্রের প্রতিকৃতি

মহাবল্লীপুর

শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত

অজন্তা-এলোরা না রামেশ্বর-সেতুবন্ধ, মাদুরা না মহীশুর-রাজ্য, কোদাইকানাল না কলম্বো? জল্পনা-কল্পনার পর স্থির হ'ল মহাবল্লীপুরে এবার পড়বে আমাদের বেদুইনী আস্তানা আর দু'দিনের ডেরাডাণ্ডা। কারো নেই পিছুটান, চল বেরিয়ে পড়; ইতিহাসের স্তূপ তার আমন্ত্রণ জানিয়েছে, বাতাসে বাতাসে ভেসে তা আমার কানে এসে পৌঁছেছে। আজ মুখর অতীতের বাণী শোনবার দিন। আর কি অপেক্ষা করা চলে?

সমস্ত রাত ট্রেনে কাটিয়ে ভোরবেলার দিকে মাদ্রাজের চল্লিশ মাইল দক্ষিণে চিঙ্গেলপেট ষ্টেশনে পৌঁছানো গেল। এখান থেকেই অসমতল ভূমির আভাস পাওয়া যায়। দিগন্তে অনতি-উচ্চ সবুজ পাহাড়ের শ্রেণী আর হ্রদ। একটু পরেই সূর্য্য উঠবে। আমাদের বেরুতে হবে বাহনের সন্ধানে। আরো কুড়ি মাইল পথ উজিয়ে যেতে হবে বাসে। যথাস্থানে বাসের জন্য ধরনা দিলাম। অন্য জায়গার গাড়ী একটা আসছে আর চলে যাচ্ছে। আমাদের বাহনটি কই? অপেক্ষা করে করে সবাই ক্রমে হতাশ হয়ে উঠছি।

—'ফিরে যাওয়া যাক্।'

—'না হয় সোজা মাদ্রাজের গাড়ীতেই উঠে পড়ি।'

—'কাঞ্চীপুর বলে রওনা দিলেই বা মন্দ কি!'

এমনি কথাবার্ত্তা আর সলাপরামর্শ চলছে। পৌনে দশটা বাজল। তখনো পরামর্শ চলেছে সমানে। দশটা নাগাদ পেট্রোলগ্রাসী যন্ত্রজন্তুটি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছাল। অবিলম্বে একটা অস্ত্রোপচার চাই—ওর মুখ দিয়ে জল পড়ছে হুড় হুড় করে, কাটাছেঁড়াটি নতুন করে জুড়ে দিতে হবে। এক ঘণ্টার মত আবার আমরা মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। ইঞ্জিন গেল যন্ত্রমেরামতি ডাক্তারের বাড়ী।

আরো ঘণ্টাখানেক গেলে গাড়ী প্রস্তুত হ'ল। ইতিমধ্যে যাত্রীরা ক্রমাগত উঠেছে। ক্রমে অধিকাংশকেই নাড়ুগোপাল হয়ে বসতে হয়েছে—নড়াচড়ার এতটুকু স্থান নেই। এবার মোটর ছাড়ল। প্রশস্ত রাস্তা জনবিরল প্রান্তরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়েছে সর্পিল রেখা এঁকে। গাড়ী চলেছে ঝড়ের বেগে—লোকসানি সময় পুষিয়ে নিতে হবে ত! মাঝ-রাস্তায় পক্ষীতীর্থে নামছে তীর্থযাত্রীরা। এই তীর্থের কথা অন্য এক সময় বলব। আমরা আজই পৌঁছাতে চাই মহাবল্লীপুরে। আরো কয়েকটা 'ষ্টপ' পেরিয়ে এল'ম। তারপর অকস্মাৎ দূরে দেখি সমুদ্রের নীল জলরেখা আর সু-উচ্চ বাতিঘর, দূরে বিরাট বিরাট পাথরের পাহাড়। ঐ ত আমাদের গন্তব্য।

মহাবল্লীপুরের সাধারণদৃশ্য। মোটরের পশ্চাতে 'গঙ্গাবতরণ' প্রস্তরফলক
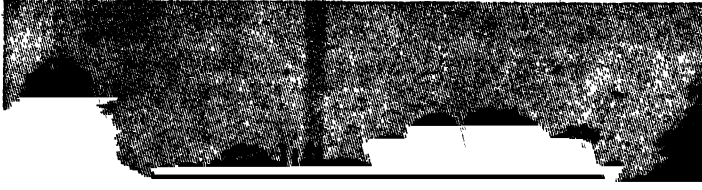
এবার আমরা এসে পড়েছি একটা প্রাচীন ইতিহাসের জগতে। জনশ্রুতি, কল্পনা, ঐতিহাসিক প্রমাণের ছিটে-ফোঁটা এর মধ্যে গা ঠেলাঠেলি করছে। এরই মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হবে। তবে ইত্যবসরে একটা ভূমিকা পাঠকের কিছু কাজে লাগতে পারে।

দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্যশিল্পকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, পাঁচটি রাজবংশ যে ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেছে সেই অনুযায়ী: (১) পল্লব (৬০০-৯০০ খ্রীষ্টাব্দ), (২) চোল (৯০০-১১৫০ খ্রীষ্টাব্দ), (৩) পাণ্ড্য (১১৩০-১৩৫০), (৪) বিজয়নগর (১৩৫০-১৫৬৫), (৫) মাদুরা (১৬০০ থেকে)। স্পষ্টতঃ পল্লবেরা কম-বেশী তিন শ বছর রাজত্ব করেছিল। এই তিন শত বছরের মধ্যে দুই রীতির স্থাপত্যশিল্প দেখা দেয়। প্রথম রীতি চলেছিল সপ্তম শতাব্দী ধরে, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে প্রচলন হয় আর এক রীতির। প্রথম রীতির শিল্প হ'ল খোদাই কাজ (monolythic বা rock-cut)—গোটা পাথর থেকে কেটে কেটে মূর্তি, চিত্র ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলা। দ্বিতীয় রীতির শিল্প সংযোজন-পদ্ধতির (structural) উপর প্রতিষ্ঠিত—পাথরের সঙ্গে পাথর সাজিয়ে এখানকার কক্ষ বা মন্দির গড়ে উঠেছে। প্রথম রীতির মধ্যে রয়েছে আবার দুই রকমের সৃষ্টি—(ক) মণ্ডপ, (খ) রথ। মণ্ডপগুলি ছোটখাটো কক্ষ—পাথরের গায়ে খোদাই করা—কতকগুলি স্তম্ভ তার মধ্যে ছাদ এবং মেঝেকে সংযুক্ত করে রেখেছে। একেবারে ভিতরের দিকে পাথরের গায়ে এক বা ততোধিক স্থানে খনন গভীরতর—এগুলিকে দেবদেবীর জন্য 'গর্ভগৃহ' বলা হয়। রথগুলিতে এরকম স্তম্ভ বা দেবদেবীর জন্য অন্তঃপুর-কক্ষ কিছু নেই; তার মধ্যে সবটাই প্রায় অলঙ্কারের কাজ। এই রথগুলিতে যদি দেবদেবীর স্থান না থাকে তবে ধর্মপ্রবণ ভারতীয়দের হাতে কেন তাদের সৃষ্টি হ'ল তা রীতিমত গবেষণার বিষয় এবং তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ থাকাও বিচিত্র নয়। বলছিলাম পল্লবদের দুই রীতির শিল্পের কথা; তাদের রাজত্বকালও এই দুই রীতি ধরে দু' ভাগে বিভক্ত করা যায়—

প্রথম ভাগ	মহেন্দ্র-পন্থী, ৬১০-৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ—শুধু মণ্ডপ।
	মামল্ল-পন্থী, ৬৪০-৬৯০ খ্রীঃ—রথ ও মণ্ডপ।
দ্বিতীয় ভাগ	রাজসিংহ-পন্থী, ৬৯০-৮০০ খ্রীঃ—মন্দির।
	নন্দীবর্ম্মণ-পন্থী, ৮০০-৯০০ খ্রীঃ—মন্দির।

ধর্ম্মশালার সামনে এসে নেমে পড়া গেল। জিনিষপত্রের মধ্যে তো প্রায় লোটা-কম্বল সম্বল বললেই চলে। সে-সব একটা ঘরে বন্দী করে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়া গেল। আমরা মোটামুটি জায়গাটা একবার প্রদক্ষিণ করে ফিরব এক ঘণ্টা বাদে—খাবার তৈরি রাখতে বলা হ'ল হোটেল-বিধাতা মুণ্ডিতমস্তক তামিল ব্রাহ্মণটিকে। গতকাল রাত্তির থেকে অভুক্ত থাকার পর সেদিন আমরা প্রত্যেকে যে পরিমাণ রসদ টেনেছিলাম তার পরিণাম বড় দুঃখের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছিল। কথাটা বলে নিই। দীর্ঘ মোটরযাত্রার পরে আরো এক ঘণ্টা রোদ্দুরে রোদ্দুরে টো-টো করে যখন পাত পেতে বসা গেল তখন প্রত্যেকের জঠরে দাবানল জ্বলছে। সাত্ত্বিক তামিল বামুন ভেবেছিল এই বাবুলোকেদের আর কত দৌড় হবে—দু'চার গ্রাস ভাত নাড়াচাড়া করেই উঠে পড়বে। কিন্তু একবার পা বাড়িয়ে একগলা জলে পড়ল সে। তরকারিতে টান পড়ল। ভাতও তথৈব চ। অবশেষে কোন রকমে যেন একটা শোচনীয় বিয়োগান্ত নাটককে টেনে-হিঁচড়ে বাঁচানো গেল। ফল হ'ল রাত্রে। খেতে বসে মুখে ভাত দিতে গিয়ে দাঁতে কাঁকর ঠেকছে, তরকারির আলু অন্তর্দ্ধান করেছেন—তার জায়গায় শোভমানা কৃষ্ণবর্ণা কাঁচকলা, 'সম্বর' নামক ডাল বলে যে পদার্থটি তার ঝালে মুখ ঝলসে যাবার যোগাড়; ব্যাপারটা চুপচাপ অত্যন্ত সংক্ষেপে শেষ হ'ল। কেউ কেউ মন্তব্য করলেন:

—'বেনে বামুন ওবেলাকার শোধ নিলে।'

—'আচ্ছা, আমাদের হাতেও অস্ত্র আছে। এক চড়াই পাখীতে গ্রীষ্ম হয় না।'

পল্লবদের রাজ্য এক সময়ে প্রায় বর্তমান মাদ্রাজ প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল—তাদের তখনকার প্রাচীন রাজধানী ছিল 'কঞ্জিভেরম'-এ (কাঞ্চীপুর)। পল্লবরাজ্য জুড়ে এই সব শিল্পের যে বিশেষ চর্চা হয়েছিল তার বহু প্রমাণ রয়েছে। মহাবল্লীপুর একটি প্রধান নিদর্শন—প্রথম ভাগের শিল্পের এখানে পরাকাষ্ঠা। আবার এই চরমোৎকর্ষ হয়েছিল প্রথম ভাগের শেষ দিকে, রাজা নরসিংহ বর্ম্মণের (৬৪০-৬৮ খ্রীঃ) রাজত্বকালে। নরসিংহ বর্ম্মণের এক উপাধি ছিল 'মহামল্ল' (অনেকটা তাঁর বীরত্বের ব্যঞ্জনাসূচক)—তাঁরই নামানুসারে নির্ম্মিত হয়েছিল সমুদ্রোপকূলস্থিত নগরী ও পোতাশ্রয় 'মামল্লাপুর'। কথিত আছে, এই মূল শহরটির সুদীর্ঘ ছয় মাইল স্থান এখন সমুদ্রগর্ভে বিলীন। ঐতিহাসিক এই জনশ্রুতির সত্যতা বিচার করবেন।

দুর্গা

আর একটা জনশ্রুতির কথা তুলছি। এটি সম্বন্ধেও পণ্ডিতেরা যথেষ্ট সংশয় প্রকাশ করে থাকেন। মহাবল্লীপুরের শিল্প গড়ে উঠেছিল সমাজ-পরিত্যক্ত একশ্রেণীর লোকের দ্বারা; সমাজের উচ্চবর্ণ কর্ণধারদের ওপর প্রতিহিংসার বশেই যেন তারা তাদের এই কঠিন শ্রমের বিজয়কেতন সগর্ব্বে তুলে ধরেছিল। সেন্টিমেন্টের দিক দিয়ে এরূপ একটা গল্পকে বিশ্বাসযোগ্য রূপ দেওয়া কঠিন নয়। কিন্তু ইতিহাসের প্রমাণ এর দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিপাত করেই চলেছে—আর তার প্রমাণ মানুষের মুখে মুখে নয়, কঠিন পাথরের উপর উৎকীর্ণ।

মহাবল্লীপুরের শিল্পনিদর্শনগুলির অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এখানকার পরিকল্পনার মধ্যে জলাধার, জল আনয়ন এবং জল নিকাশনের প্রণালকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। আজ অবশ্য এই চিহ্নগুলির অধিকাংশ ভেঙেচুরে গেছে এবং বালির স্তূপে চাপা পড়েছে—বালি আর বালির ঢিবি আর একান্ত নির্জ্জনতার মধ্যে এই একদা-জনবহুল কর্ম্মব্যস্ত বন্দর এখন শিরীষ আর ঝাউয়ের ছায়ায় বসে অতীত গৌরবের স্বপ্ন দেখছে। তার মধ্যে জলের স্রোত বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের স্রোতও নিথর হয়ে গিয়েছে। কেন এই সন্ধ্যা নেমে এল মহাবল্লীপুরে? সমুদ্র-গ্রাসিত হবার ভয়ে লোকজন সব পালিয়েছিল আরও অভ্যন্তরপ্রদেশে? তাই অসমাপ্ত শিল্পের এত মর্ম্মান্তিক ছিটেফোঁটা চিহ্ন? হয় তো এসেছিল রক্তক্ষরী রাষ্ট্রবিপ্লব—যার ফলে শিল্পীকেও যন্ত্র ফেলে অস্ত্র ধরতে হয়েছিল? দক্ষিণ-ভারতে রাজায় রাজায় সংঘর্ষের কাহিনী ত উপকথার মত অলীক কল্পনা নয়। কিম্বা নূতন এক রাজার (রাজসিংহ) অভিপ্রায়ে পুরাতন রীতিতে চলমান ধারার এখানে ঘটল পরিসমাপ্তি; তারপর অন্যত্র নূতন প্রচেষ্টা, নূতন শিল্পের আবির্ভাব?
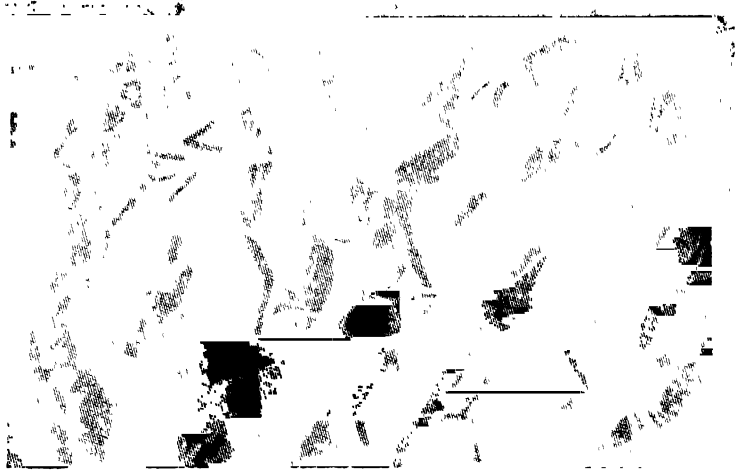
এই মহাবল্লীপুর এককালে ছিল সমৃদ্ধ পোতাশ্রয়। ভারতের পণ্যবোঝাই তরণীর সারি এই আশ্রয়ঘাট থেকে যেত সমুদ্র উজিয়ে দেশদেশান্তরে:

"For there is little doubt that from Mamallapuram, in the middle of the first millennium, many deep-laden argosies set forth, first with marchandise and then with emigrants, eventually to carry the light of Indian culture over the Indian Ocean into the various countries of Hither Asia. Amidst the opalescent colouring of Java's volcanic ranges, and on the lush green plains of old Cambodia, in the course of time there grew up important schools of art and architecture derived from an Indian source. That the origin of these developments is to be found in the Brahminical productions of the Pallavas, and, before them in the stupas and monastaries erected by the Buddhists under the rule of the Andhras, is fairly clear. It is possible to identify in the khmer sculptures at Angkor Thom and Angkor Vat, and in the endless bas-reliefs on the stupa-temple of Borobadur, the influence of the marble carved panels of Amaravati, while the architecture that this plastic art embelishes owes some of its character to the rock-cut monoliths of Mamallapuram."*

আমরা ইতিমধ্যে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মহাবল্লীপুর সম্বন্ধে একটা মোটামুটি চিত্র পেয়েছি। এবার শিল্পনিদর্শনগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। এগুলি গ্র্যানাইট জাতীয় দুটি বিরাটায়তন প্রস্তরস্তূপের গায়ে খোদাই করা। প্রথমটি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত—আধ মাইল দীর্ঘ ও সিকি মাইল প্রশস্ত, এক শ ফুটের বেশী উঁচু; একটু দূরে অন্যটি—

* Percy Brown—*Indian Architecture,* Vol. I.
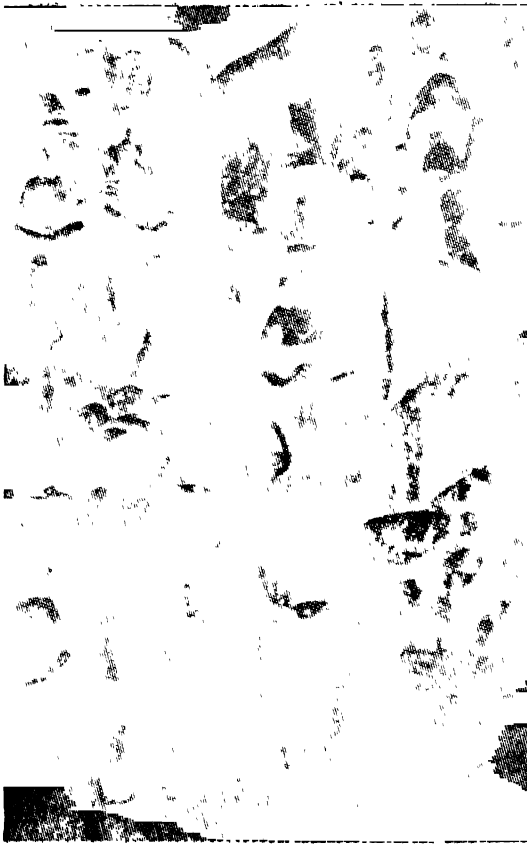
গঙ্গাবতরণের একাংশ

আড়াই শ ফুট লম্বা, উচ্চতা প্রায় পঞ্চাশ ফুট, দেখতে অনেকটা যেন রাক্ষুসে তিমি মাছের পিঠের মত।

প্রথমে মণ্ডপগুলির উল্লেখ করি। এদের সংখ্যা সর্ব্বসমেত দশ—নাম যথাক্রমে: (১) ধর্ম্মরাজ, (২) কোটিকাল, (৩) মহিষাসুর, (৪) কৃষ্ণ, (৫) পঞ্চপাণ্ডব, (৬) বরাহ, (৭) রামানুজ, (৮) পঞ্চগৃহ শিব, (৯, ১০) অসম্পূর্ণ। মণ্ডপগুলির প্রত্যেকটিতে যেমন এক একজন প্রধান অধিষ্ঠাতা দেবতার স্থান রয়েছে—তীর্থযাত্রীর কাছে তারা প্রধান আকর্ষণ, তেমনি আর এক দিকে তার অন্তর্ভাগে দেয়ালে দেয়ালে পাথর কেটে তোলা পুরাণের কাহিনী, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর খণ্ডচিত্র, মানব-মানবীর নানা অনুপম মূর্ত্তি। বরাহ-মণ্ডপটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তার কারুকার্য্য চমৎকার সুক্ষ্মতাতে গিয়ে পর্য্যন্ত পৌঁছেছে। অথচ তার মধ্যেই রয়েছে কেমন একটা অতি-রিক্ততার ভারহীন শুচিশুভ্র পরিচ্ছন্নতা। মণ্ডপরচয়িতা এই শিল্পীরা কক্ষগঠনে সুনিপুণতা দেখালেও প্রধানত: এঁদের মনে হয় ভাস্কর বলে—তাঁদের গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতিতেও এই ভাস্কর্য্যের ধর্ম্মই সুপরিস্ফুট। এ কথা পরবর্ত্তী কালের রথশিল্পের বেলাতেও সমান ভাবে প্রযোজ্য।

রথগুলি সব একই জায়গায় পাওয়া যায়—মণ্ডপগুলির মত তারা দূরে দূরে ইতস্তত: ছড়ানো নয়। সংখ্যা ৭টি মাত্র: উত্তর-পশ্চিমে—(১) বলয়কুটি ও বিদরি; দক্ষিণে— (২) দ্রৌপদী, (৩) অর্জ্জুন, (৪) ভীম, (৫) ধর্ম্মরাজ, (৬) সহদেব; উত্তরে—(৭) গণেশ—ছটি একই শ্রেণীতে, সপ্তমটি দ্বিতীয় শ্রেণীতে। দ্বিতয় শ্রেণীতে সপ্তম রথের সামনে একটি প্রকাণ্ড হস্তীমূর্ত্তি—জীবন্ত হস্তীর সমানই তার উচ্চতা, জীবন্ত হস্তীর মতই তাকে দেখতে। রথগুলি মনে হয় কোন মন্দিরের প্রতিকৃতি—প্রত্যেকটি যেন এক একটি মডেল, গোটা পাথরের চাঁই থেকে কেটে কুঁদে বের করা। সমস্ত গায়ে তার কারুকার্য্য, পাদপীঠ থেকে শীর্ষ অবধি। এগুলির প্রসঙ্গে ব্রাউন সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করছি:

"Solitary, unmeaning, and clearly never used, as none of their interiors are finished, sphinx-like for centuries these monoliths have stood sentinel over mere emptiness, the most enigmatical architectural phenomena in all India, truly a "riddle of the sands." Each a lithic cryptogram as yet undeciphered, there is little doubt that the key when found will disclose much of the story of early temple architecture in South India."*

এই রথগুলির গঠনশিল্পের মধ্যে যে পারিপাট্য ও মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় তাতে চমৎকৃত হতে হয়। সবচেয়ে কলাসৌষ্ঠবময় বোধ হয় অর্জ্জুনরথের গায়ে কেটে তোলা মূর্ত্তিগুলি। নিখুঁত তাদের গড়ন, অনুপম তাদের ঘাঙ্গমা রাজা নরসিংহ এবং কাশ্মীরাণীর যুগলমূর্ত্তি যেখানি—অর্দ্ধেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'রূপমে' এক সময়ে তার মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করেছিলেন:

"The portraits of men are given in terms of the heroic type, a body,—of medium height, and finely built,—from which the deeds on the fields of battle have subtracted all superfluous flesh. And the result is a frame of sinuous grace of stateliness and of restraint. To this male type, the female forms offer an exquisite parallel in the suppleness of their contours as in their bashful modesty of their gesture" †

আর যে একটি দ্বারপালের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ রয়েছে—তার দৃষ্টি কোন্ দূরের বস্তুতে নিবদ্ধ, তার তুলনা সহসা মেলে কি? একটা অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়: ভারতীয় ভাস্কর্য্যে 'ফিনিশ' এর অভাব। মামল্লার উদাহরণ এই শ্রেণীর মতাবলম্বীদের চোখের সামনে তুলে ধরতে ইচ্ছা করে—মামল্লাপুরের এই সব মূর্ত্তি, দুর্গার চিত্র, যেখানে ফুটে উঠেছে অবর্ণনীয় ভাব এবং শক্তির বিচ্ছুরণ; গঙ্গাবতরণের চিত্র—

* Percy Brown—*Indian Architecture,* Vol. I.

† *Rupam*: No. 27-28, July-October, 1926.

গঙ্গার : মৃতসঞ্জীবনী ধারা যেখানে নেমে আসছে উপর থেকে, ক্ষাত্রবীর এবং মুনি-ঋষিরা তাঁর আবাহন করছেন, নাগকন্যারা তাঁর উপাসনায় রত, তাঁর স্পর্শে সজীব হয়ে উঠছে মৃতকল্প ধরণী, আবার সচল হয়ে উঠেছে বিশ্বচরাচরের প্রাণীকুল ; নাগরাজ অনন্তের উপর শয়ান বিষ্ণু ; প্রত্যেকটি প্রস্তরফলকের কথা বলা এখানে সম্ভব নয়। শুধু মহাবল্লীপুর কেন, সমগ্র ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও শিল্পের মর্য্যাদা কি গুণী বিদেশীরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন নি ? এক তাজমহলই পার্থেননের সমান গৌরব দাবি করবার পক্ষে যথেষ্ট ; আগ্রা আর তার উপান্তস্থানগুলিই গ্রীসের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।"*

গঙ্গাবতরণের আর এক অংশ

রথগুলির আকার ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এবার দু'একটি বিষয় উল্লেখ করবার আছে। আকারে এগুলি বিপুলায়তন নয়। বৃহত্তমটি দৈর্ঘ্যে ৪২ ফুট এবং প্রস্থে ৩৫ ফুট—উচ্চতমটি উচ্চতায় ৪০ ফুট। রথের সংখ্যা আটটি, কিন্তু তার মধ্যে তিন রকম 'ষ্টাইল' বা গঠন-রীতি দেখা যায়। একমাত্র দ্রৌপদীরথ বাদে বাকী অন্যগুলি বৌদ্ধবিহার এবং মঠের অনুকরণে গঠিত। দ্রৌপদীরথটি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, কিন্তু শিল্প-সৌন্দর্য্যের দিক থেকে এটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; মনে হয় একটি পর্ণকুটীরের প্রতিচ্ছবি করে একে গড়ে তোলা হয়েছে। গণেশ রথটি বৌদ্ধবিহার এবং মঠের মিশ্র রীতিতে তৈরি। তার প্রবেশ-পথ প্রশস্ততর দিকের মাঝখানে, তার দ্বিতল ক্রমেই সূক্ষ্মাগ্র হয়ে উঠেছে শেষে ঢালু দ্বিকরপত্রের মত—পণ্ডিতেরা বলেন এই রীতি থেকেই পরে দক্ষিণী শিল্পের বিশিষ্ট 'গোপুরম'-এর জন্ম ও বিকাশ।

এই পর্য্যন্ত ত রথশিল্প দেখলাম। তারপর এলেন রাজা রাজসিংহ, আর এক নূতন পদ্ধতির শিল্প মাথা তুলল—এবার সত্যিকারের রাজমিস্ত্রীর কাজ সুরু হ'ল। মামল্লাপুরের তিনটি নিদর্শন—অধুনা-কথিত সমুদ্রতট-মন্দির (Shore Temple), ঈশ্বর, মুকুন্দ—ছাড়াও আরও দুটি নিদর্শন রয়েছে কাঞ্চীপুরে, ষষ্ঠটি দক্ষিণ আর্কট জেলায়। প্রধান হিসাবে গণ্য তিনটি—সমুদ্রতট-মন্দির, কাঞ্চীপুরের শিবমন্দির এবং বিষ্ণু-মন্দির। সমুদ্রতট-মন্দিরটির, অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়—নূতন ধরণের এই শিল্পের প্রথম সৃষ্টি বলেই নয়, তার অবস্থানও সেজন্য বহুলাংশে দায়ী। সমুদ্রের একেবারে গায়ে বলে তার লবণাক্ত জল ও হাওয়া এর কম ক্ষতি করে নি। তারপর অস্থির বালুতট ধ্বসিয়েছে অনেক গাঁথুনি। মন্দিরের গঠনকৌশল একটু বিশেষ ধরণের। বেদী একেবারে সমুদ্রের দিকে অনাবৃত, সম্মুখে এতটুকু প্রাঙ্গণ নেই, প্রবেশ তোরণ পর্য্যন্ত নেই। বোধ হয় উদ্দেশ্য ছিল মন্দিরের দেবতা পাবেন সূর্য্যোদয়ে প্রথম আলোর রশ্মি, দূরাগত যাত্রী সমুদ্র থেকেই দেখতে পাবে তাঁকে ; রাত্রিতে তাঁরই সামনে জ্বলবে যে দীপাধার তাই হবে নাবিকের সতর্কতার সঙ্কেতসূচক নিদর্শন। পরে অবশ্য অনুষঙ্গ হিসাবে কিছু কিছু বাড়তি কক্ষ ও চত্বর গড়ে উঠেছিল। সমস্ত মন্দির-সীমানা ঘেরা ছিল উঁচু দৃঢ় প্রাচীর দিয়ে—তার উপরে সারিবদ্ধ ছিল বৃষের উপবিষ্ট মূর্ত্তি, পাঁচিলের গায়ে সিংহের মুখাবয়ব। এই দ্রুত-ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরের দুটি গম্বুজই এখন দর্শনীয়। এরা পূর্ব্বোল্লিখিত রথশীর্ষেরই অনুকৃতি অনেকখানি। তবে এর চূড়া গিয়ে শেষ হয়েছে বর্শাফলকের তীক্ষ্ণতায়—রথশিল্পের বা বৌদ্ধ নিদর্শনের মত সুডৌল অর্দ্ধবৃত্তাকার চূড়া এখানে নয়। ফলে একটা লঘুতা এসেছে সমস্ত মন্দিরের গঠনে—তা যেন উড়ে উড়ে কোথাও দূর আকাশে উধাও হয়ে চলেছে।

সমস্ত দিন ঐ পাথরের ভগ্নস্তূপের আর সাইপ্রাসের ছায়ায় নির্জ্জন বালি-প্রান্তরের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ানো গেছে। আমাদের চটির সামনে বেশ খানিকটা সবুজ খোলা মাঠ। সূর্য্যাস্তের পর সন্ধ্যেবেলা তারই উপর গা এলিয়ে দিয়েছি। যেন এই পৃথিবীর কোন এক শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি আমরা—এখান থেকে তাকিয়ে দেখি লক্ষ যোজন দূরে কোলাহলমত্ত মানবের স্রোত।

হঠাৎ কাঁধে হাতের স্পর্শ পেলাম। স্বল্পালোকে ভাল চেনা যায় না, প্রশ্ন করলাম :

—'কে, ভেঙ্কটেশ ?'

—'না।'

---

* "Le Taj Mahal est seul digne de balancer la gloire du Parthenon ; Agra et ses alentours peuvent rivaliser avec la Grece."—Sylvain Levi : *Aux Indes Sanctuaires.*

—'কামেশ্বর ?'

—'না।'

—'তবে যুধাজিৎ সিং ?'

—'তাও নয়, পারলে না। দেখছি নিজের পরিচয় নিজেই দিতে হ'ল।' নিঃশব্দ পদক্ষেপে একটা আবছায়া মূর্ত্তি সম্মুখে এসে দাঁড়াল। 'পাথরের মধ্যে আমাকেই তো তোমরা খুঁজছিলে; এখন চিনতে পারছ না ? আমি কাঞ্চীকুমারী'—

এবার সোজা হয়ে বসতে হ'ল। পাশে অর্দ্ধনিদ্রিত দিব্যেন্দু, তাকে ডাকতে যাব। মূর্ত্তিটি ইঙ্গিতে বারণ করল :

—'তোমার সঙ্গেই দুটি কথা বলতে চাই।'

পল্লব-ইতিহাসে এই রাজনন্দিনীকে ত কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সেখানে রাজা, বড় জোর রাজমহিষীর উল্লেখ আছে। তাও রোমাঞ্চকর তেমন কিছু নয়।

মূর্ত্তিটি তখন যেন বলতে সুরু করলে,

'তোমার কাব্যের আমিই পাঠোদ্ধার করছি।···রাজায় রাজায় বাধে রণ আর স্বার্থের সংঘাত। এই হিংসার অনলে ইন্ধন যোগায় পুরনারীর দল। সহস্র হতদেহের পরিবর্ত্তে ওঠে বিজয়ের জয়রথ; ওই পাথরের মূর্ত্তি, ওর অন্তরালে শোণিতের স্রোত। আজ কালের তরঙ্গে তার রক্তাভা ম্লান হয়ে গেলেও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে কি ? তারপর বিজয়ীরও আসে শেষ দিন···।'

—'তোমার বিদ্রূপ বুঝতে পেরেছি রাজকুমারী। ইতিহাসের বাস্তব বর্ণনার ওপর তুমি হানতে চাও কঠিন কশাঘাত। তার কি প্রয়োজন ছিল।'

ইতিমধ্যে দিব্যেন্দু কখন উঠে বসেছে। বলছে,

—'হোটেলওয়ালাকে চেঁচিয়ে বল না গরম পকোড়ি আর কফি দিতে।'

তাকিয়ে দেখলাম কাঞ্চীকুমারীর চিহ্নও কোথাও নেই। দিব্যেন্দুকে বললাম :

—'বেশ গরম কফি চাই, আমার গলা পর্য্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে।'

দুঃখ-ঝড়ে

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

জীবনকে কেন্দ্র করে নানা দুঃখ আছে।
পদ-স্খলনের ভয় পাছে—
বক্ষ ওঠে কাঁপি'।
জীবন-মৃত্যুর দাপাদাপি
হানাহানি সর্বদা উদ্ধত।
যতটুকু পারি সাধ্যমত
দুই হাতে
রেখেছি তফাতে।
তবু যেন কোনো এক অসতর্ক ক্ষণে
বিষাক্ত ফণার আস্ফালনে
শশব্যস্ত আছি—
মৃত্যুর একান্ত কাছাকাছি।

সমুদ্রের মত অন্ধকার
মুহুর্মুহু বক্ষ কাঁপে, ভয়ত্রস্ত আকাশ আমার
নেই তা'তে কোনোই দ্যোতনা
নক্ষত্রের যত আনাগোনা।
ইতস্তত আনাচে-কানাচে
শুধুই সর্পের ফণা সমুদ্যত আছে—
অদৃষ্টের আরো কি লাঞ্ছনা ?
জীবন বড়ই বিড়ম্বনা।

যখন সম্ভাব্য মৃত্যু অন্ধকারে হাঁটে,
বিমর্ষ মুহূর্তগুলি শঙ্কা-ত্রাসে কাটে,
নিবিড় প্রশান্তি নিয়ে তখন ললাটে
কে সে কর রাখে ?
দূরে ঠেলে ঝড় ও ঝঞ্ঝাকে ?
কেউ নয়, সে স্বপ্ন ছড়ায়।
হৃদয়ের মগ্ন মমতায়
অন্ধকারে দীপ জ্বেলে যায়।
সে মুহূর্তে শুধু মনে হয়,
যদিও অনন্ত দুঃখ পরিব্যাপ্ত আছে
জীবন তবুও মিথ্যা নয়—
অত্যাশ্চর্য পরম বিস্ময়।
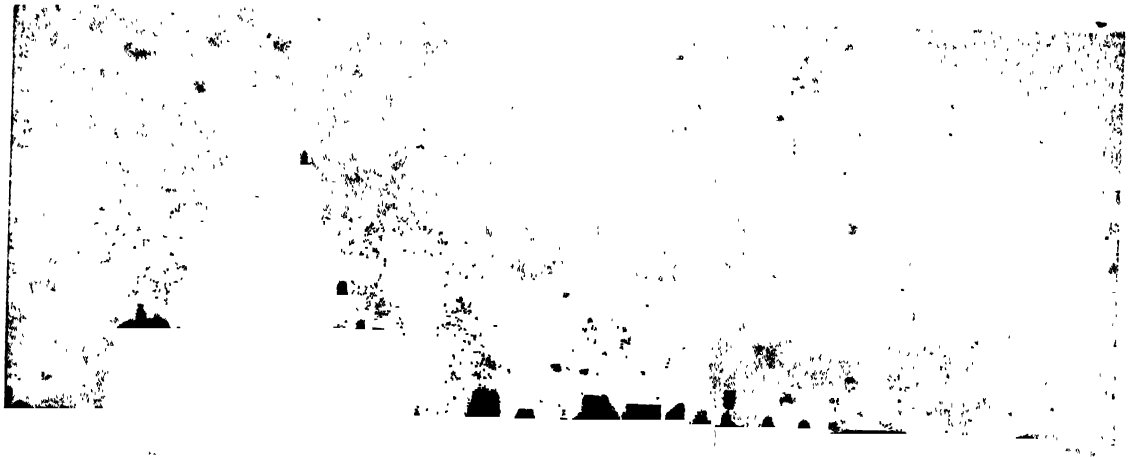
সমুদ্রতট-মন্দির

বরাহ মণ্ডপ
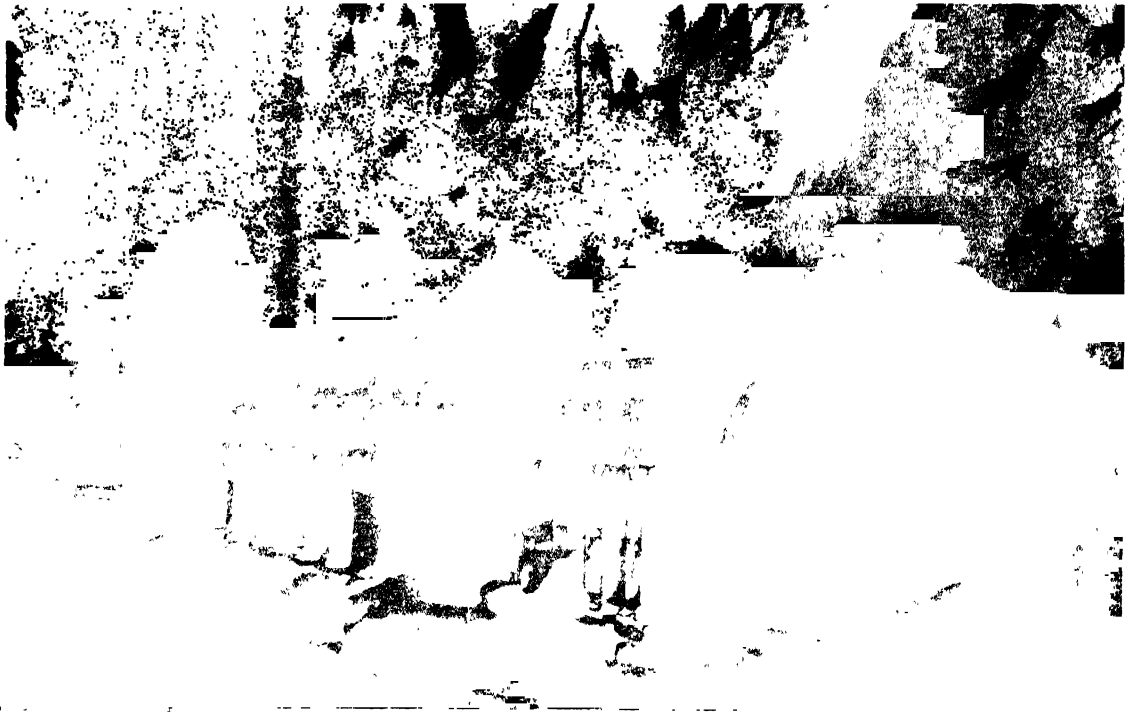
সপ্তরথ

সপ্তরথের আর এক অংশ

শিক্ষাব্রতী রিচার্ডসন

(১৮০১-১৮৬৫)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে সকল শিক্ষাব্রতী বঙ্গের যুবক-মনে নব ভাবধারার উন্মেষ সাধনে বিশেষ রূপে সহায়তা করেন, তাঁহাদের মধ্যে হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসনের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। ডিরোজিও রিচার্ডসন অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ও স্বল্পায়ু ছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশ ছিল তাঁহার জন্মভূমি; বঙ্গীয় যুবকদের মধ্যে নব্য-শিক্ষার আলোকে তিনি যেরূপ আলোড়ন উপস্থিত করিতে পারিয়াছিলেন, রিচার্ডসনের পক্ষে তেমনটি সম্ভবপর ছিল না। তথাপি তিনিও ডিরোজিওর পরে শিক্ষা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের মনে বিশেষ প্রেরণা যোগাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়ের গণ্ডীর বাহিরে প্রশস্ততর ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের মাধ্যমেও তিনি লোকশিক্ষায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। এখানেও ডিরোজিওর সঙ্গে তাঁহার তুলনা করা চলে। তবে স্বল্পায়ু হওয়ায় ডিরোজিওর পক্ষে সাংবাদিক রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করার সুযোগ হয় নাই। রিচার্ডসন কিন্তু এক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ডিরোজিও কবি, সাহিত্যিক। এদিক হইতেও রিচার্ডসন তাঁহার সমগোত্রীয়। কিন্তু ঐ একই কারণে ডিরোজিও অপেক্ষা তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা স্ফুরণে অধিকতর অবকাশ ঘটে এবং তিনি প্রচুর যশের অধিকারী হন। কিন্তু ডিরোজিও ও রিচার্ডসন উভয়েই ছিলেন সত্যকার শিক্ষাব্রতী। নব্য-বঙ্গের শিক্ষা ও সংগঠনের কথা বলিতে গেলে দুইয়ের কৃতিত্বই আমাদের স্মৃতিপথে জাগরূক হয়। ডিরোজিও সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হইয়াছে, রিচার্ডসনের কথাও এখন আমাদের জানা আবশ্যক।*

রিচার্ডসনের পিতা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে বাঙালী পল্টনে চাকরি করিতেন। ১৮০৮ সনে অবসর গ্রহণান্তর স্বদেশে ফিরিবার পথে জাহাজে তিনি মারা যান। তাঁহারও বেশ সাহিত্যিক খ্যাতি ছিল। পুত্র ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন তাঁহার সাহিত্যিক গুণপনার পূর্ণ অধিকারী হইয়াছিলেন। রিচার্ডসন ১৮০১ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮১৯ সনে সৈন্যবিভাগে গোলন্দাজ বাহিনীতে ভর্ত্তি হইয়া কলিকাতায় আসেন। বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক ও সমালোচক হ্যাজলিট তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তিনি যে অল্পবয়সেই মাতৃভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, ১৮২০ সন হইতে জেম্‌স সিল্ক

ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন

বাকিংহাম-সম্পাদিত 'দি ক্যালকাটা জর্ণালে' প্রকাশিত তাঁহার কবিতা ও অন্যান্য রচনা হইতে বুঝা যায়। এই সকল রচনা *Miscellaneous Power* নামক পুস্তকে একত্রে ১৮২২ সনে প্রকাশিত হয়। ১৮২৩, ১১ই জুলাই রিচার্ডসন লেফ্টেনান্টের পদে উন্নীত হন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় ইহার পর বৎসর তিনি বিলাতে ফিরিয়া গেলেন।

স্বদেশে গিয়া তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু তখনই ভারতবর্ষে না ফিরিয়া সাহিত্য ও সংবাদপত্র-সেবায় মন দিলেন। ১৮২৫ সনে তাঁহার *Sonnets and Other Poems* প্রকাশিত হইল। ইহার দুই বৎসর পরে, *Weekly Review* নামে একখানি সংবাদপত্রও তিনি বাহির করিলেন। হ্যাজলিট, রস্কো প্রমুখ সেযুগের সাহিত্য রথীগণ তাঁহার পত্রিকায় লিখিতেন। পত্রিকাখানি সাহিত্যক্ষেত্রে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু রিচার্ডসন ইহাকে অর্থের দিক হইতে স্বাবলম্বী করিতে পারিলেন না; নিজে ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি অবশেষে ইহার স্বত্ব বিক্রয় করিতে বাধ্য হন।

ভারতবর্ষে অর্জ্জিত অর্থ এইরূপে নিঃশেষিত হইলে রিচার্ডসন পুনরায় এদেশে আগমন করেন। এখানে আসিয়া রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল হেরাল্ড' পত্রের সম্পাদক হইলেন। এ পত্রিকাখানির প্রথম সম্পাদক ছিলেন আর. এম্. মার্টিন। তিনি তখন স্বদেশে গিয়া

* 'দি ক্যালকাটা রিভিয়ু' জানুয়ারী ১৯০৬ সংখ্যায় এস সি. সান্যাল 'Captain David Lester Richardson' নামক প্রবন্ধে রিচার্ডসনের জীবন-কথা লিখিয়াছেন। ভোলানাথ চন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ রিচার্ডসনের বিখ্যাত ছাত্রগণও তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সমসাময়িক ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্রে এবং সরকারী বার্ষিক শিক্ষা বিবরণেও রিচার্ডসনের বিষয় অনেক কথা জানা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচনায় প্রধানতঃ এই সকল সূত্র হইতে সাহায্য লইয়াছি।

করিতে উদ্যোগ করেন। 'বেঙ্গল হেরাল্ডে'র বাংলা সংস্করণ 'বঙ্গদূত' ৫ সেপ্টেম্বর ১৮২৯ তারিখে লেখেন,—

"বঙ্গদূতের সহচর বেঙ্গল হেরাল্ডের সম্পাদক শ্রীযুত আর, এম্, মার্টিন···প্রিয় জনের প্রয়োজনে স্বদেশ গমনে উদ্যুক্ত এ প্রযুক্ত সম্যক্ প্রকারে উপযুক্ত শ্রীযুত ডি এল্ রিচার্ডসন সাহেব এতৎপত্রের সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়াছেন। যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত সম্পাদকের বিচ্ছেদে অস্মদাদির হর্ষ বিপ্রকর্ষ হইয়া বিমর্ষ সন্নিকর্ষ, কিন্তু পাঠকবর্গ এ সম্ভাবনায় এরূপ ভাবনা করিবেন না যে বঙ্গদুত তজ্জন্য ক্ষুণ্ণ হইবেন যেহেতু ইহার সহচরের সাহিত্য রাহিত্য কদাচ হইবেক না কেবল সম্পাদকের পরিবর্ত্তন মাত্র।"*

সৈন্য বিভাগের কার্য্যও রিচার্ডসনের সমানে চলিয়াছিল। সে যুগে সরকারী যে-কোন বিভাগে কার্য্য করিলেও, কর্ম্মচারীরা সংবাদপত্র-সেবায় নিয়োজিত হইতে পারিতেন। ১৮২৯ সনের ২৯শে অক্টোবর রিচার্ডসন সৈন্য বিভাগে ক্যাপ্টেন পদলাভ করেন। বিকলাঙ্গ হওয়ার দরুন তিনি ১৮৩৩, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, 'ইন্ভ্যালিড' পেন্সন লইতে বাধ্য হন। সৈনিকের রণক্ষেত্রে গমন, যুদ্ধ এবং অন্যান্য কর্ত্তব্য হইতে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল, যদিও কর্ম্মীর তালিকায় তাঁহার নাম রাখা হয়। এইরূপে সৈনিকের করণীয় কার্য্যাদি হইতে অব্যাহতি পাইয়া রিচার্ডসন অতঃপর পরিপূর্ণ রূপে সাহিত্য-চর্চ্চা ও সংবাদপত্র-সেবায় মন দিলেন। 'ক্যালকাটা লিটারারী গেজেট', 'ক্যালকাটা মন্থলী জর্ন্যাল' এবং 'বেঙ্গল এন্যুয়াল' নামক সাময়িক পত্র-ত্রয় সম্পাদনে রত হইলেন। শেষোক্তখানি তিনি বড়লাট-পত্নী লেডী বেণ্টিঙ্কের নামে উৎসর্গ করেন। রিচার্ডসনের সাহিত্যিক গুণপনার প্রতি সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৪ সনে তাঁহাকে নিজ 'এডিকং' নিযুক্ত করিলেন। ইহার পরই তাঁহার শিক্ষাব্রত আরম্ভ হইল।

২

সাহিত্য ও সংবাদপত্রসেবীরূপে রিচার্ডসন দেশী বিদেশী বিদ্বজ্জনসমাজে পরিচিত হইয়া উঠেন। হিন্দু কলেজের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর আর. টাইটলার স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু ১৮৩৪ সনে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদবধি কলেজের অধ্যক্ষ-সভা একজন উপযুক্ত শিক্ষাব্রতীর অনুসন্ধানে ছিলেন। রিচার্ডসন টাইটলারের অবসর গ্রহণের বিষয় অবগত হইয়া শিক্ষা-সমাজের (General Committee of Public Instruction—যাহা পরে Council of Education-এ পরিণত হয়) সভাপতি টমাস বেবিংটন মেকলের নিকট এই পদলাভের নিমিত্ত স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। মেকলে ১৮৩৫, ৭ই ফেব্রুয়ারি তাঁহাকে এই মর্ম্মে লেখেন যে, হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভা—যাহার প্রায় সকল সভ্যই হিন্দু, কলেজের শিক্ষক ও কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া থাকেন, তবে শিক্ষা-সমাজের সভাপতি হিসাবে তাঁহার যাহা করণীয় তাহা তিনি নিশ্চয়ই করিবেন। রিচার্ডসনের সাহিত্যিক কৃতির কথা হিন্দু-প্রধানগণ পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন। তাঁহারা সানন্দে রিচার্ডসনকে ১৮৩৫ সনের আগষ্ট মাস হইতে কলেজের প্রধান অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করিলেন। ১৮৩৬ সনের শিক্ষা-সমাজের কার্য্যবিবরণে তাঁহার বেতন পাঁচ শত টাকা বলিয়া উল্লিখিত আছে। তিনি এই পদে তিন বৎসরাধিক কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে ১৮৩৯ সনের ১লা এপ্রিল হইতে মাসিক ছয় শত টাকা বেতনে কলেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষপদ লাভ করেন। রিচার্ডসন কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে তরুবীথিসমন্বিত একটি উদ্যান-বাটিকায় বাস করিতেছিলেন। সেখান হইতে প্রত্যহ মধ্যাহ্নে পাল্কীতে করিয়া কলেজে আসিতেন। অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হওয়ার পর হইতে কলেজ-সংলগ্ন এখন যেখানে এলবার্ট হল অবস্থিত সে স্থলের বাড়ীতে উঠিয়া আসেন। কলেজ-কর্তৃপক্ষ তাঁহার বাড়ীভাড়া বাবদ বেতন বাদে অতিরিক্ত এক শত চল্লিশ টাকা মঞ্জুর করিলেন।*

কলেজে রিচার্ডসনের উপর ইতিহাস, দর্শন এবং সাহিত্য পড়াইবার ভার থাকিলেও তিনি শেষোক্ত বিষয়ই ছাত্রদের বেশী করিয়া পড়াইতেন। ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যে শেক্সপীয়র এবং পোপ ছিল তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। এই দুই বিষয়েই তিনি ছাত্রদের মধ্যেও অনুরূপ প্রীতির ভাব উদ্রেক করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার আবৃত্তি ছিল অত্যুৎকৃষ্ট এবং অতুলনীয়। মেকলে তাঁহার শেক্সপীয়র আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন,

"If I were to forget everything of India, I could never forget your reading of Shakespeare."

'আমি ভারতবর্ষের সবকিছু ভুলিয়া গেলেও আপনার শেক্সপীয়র আবৃত্তি ভুলিতে পারিব না।' রিচার্ডসনের অধ্যাপনা-প্রণালী ছিল অভিনব। তিনি আবৃত্তির সহায়ে দুরূহ বিষয়ও ছাত্রদের কাছে সহজ করিয়া তুলিতেন। এই সকল বিষয় তাঁহার কোন কোন ছাত্র পরবর্ত্তীকালে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। রিচার্ডসনের অন্যতম বিখ্যাত ছাত্র ভোলানাথ চন্দ্র

---

* শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১ম খণ্ড (৩য় সং), পৃ ৩৮৩।

* "A Professor of English Literature at this Institution from August, 1835, to April, 1839, salary 500. As Principal he receives a house rent free, next the College—140 per month."—*Report* of the General Committee of Public Instruction, p. 51: "Establishment of the Hindu College as on the 30th April, 1842." 'Captain D. L. Richardson'-এর পাদটীকা।

হিন্দু কলেজে শেষ চারি বৎসর (১৮৪৮–৫২) তাঁহার নিকট ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অর্দ্ধশতাব্দীকাল পরেও রিচার্ডসনের আবৃত্তি সহায়ে অধ্যাপনার কথা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—

"Both Shakespeare and Pope were taught for my mental stomach at fifteen. But Richardson's excellent reading made them digestible. How shall I describe that reading? Resembling the march of soldiers with a disciplined foot-fall, the rise and fall in the stress of his voice went on smoothing down the difficulties that were slumbling block to my immature capacity, and unravelling the clue of the meaning to its very marrow and core. It proved to be the best commentary and explanation. The elegance, and beauty, and charm of that reading, with the most accurate pronunciation and appropriate emphasis on the most significant words, made an impression which has not yet worn-out in me."

সুন্দর আবৃত্তির দ্বারা দুরূহ বাক্য বা বাক্যাংশগুলির খুঁটিনাটি ভাব এবং অর্থও ছাত্রদের মনে রিচার্ডসন গাঁথিয়া দিতে পারিতেন। ভোলানাথ বলেন, কলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণকালে একবার তিনি কোনরূপ প্রশ্নপত্র না দিয়া শুধু তাঁহাদের আবৃত্তি শুনিয়াই পাঠোৎকর্ষ যাচাই করিয়া লইয়াছিলেন।* তাঁহার অধ্যাপনা সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসুও লিখিয়াছেন,—

"আমাদিগের সময়ে কাপ্তেন রিচার্ডসন (Captain David Lester Richardson) কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তাঁহার নিকট আমি তিন বৎসর পড়ি। তাহার পরে তিনি বিলাত যান। তৎপরে দুই বৎসর কর সাহেবের (James Kerr) নিকট পড়ি। কাপ্তেন সাহেব ইংরাজি সাহিত্যশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেক্ষপীয়র তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। তিনি আশ্চর্য্যরূপে সেক্ষপীয়র বুঝাইয়া দিতেন। হ্যামলেটে যেখানে আছে 'That shows its hoar leaves in the glassy stream' সেই স্থান বুঝাইবার সময় তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে গাছের পাতা সবুজ, 'hoar leaves' এই প্রয়োগ কবি কেন ব্যবহার করিলেন? ইহার উত্তর না দিতে পারাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে পাতার নিম্ন ভাগই জলে প্রতিবিম্বিত হয়, সে ভাগ সাদা।"†

রিচার্ডসনের আবৃত্তিও খুবই উচ্চাঙ্গের ছিল বলিয়াছি। ছাত্রেরা যাহাতে ভাল আবৃত্তি করিতে পারে সেদিকেও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। রাজনারায়ণ এ সম্বন্ধেও বলেন,—

"তিনি আমাদিগকে নাট্যালয়ে সর্ব্বদা যাইতে বলিতেন। তাঁহার বাটীতে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিতেন, 'Are you going to the theatre today?' তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে কবিতা আবৃত্তি বিদ্যা শিখিবার প্রধান স্থান নাট্যালয়। তিনি নিজে তথায় গিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিতেন, তাহারা সম্মানের সহিত তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত।...যখন তিনি বিলাত যান, তখন তাঁহাকে আমরা যে অভিনন্দন পত্র দিই, তাহা তাঁহার সম্মুখে পড়িতে তিনি আমাকেই মনোনীত করেন। আমি কলেজে সর্ব্বোত্তম আবৃত্তিকারী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম।"*

কলেজের কার্য্যের অবসরে রিচার্ডসনের সাহিত্যসেবাও সমানে চলিয়াছিল। কলেজে অধ্যাপনা তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চায় বরং সহায় হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। ১৮৩৬ সনে তিনি *Literary Leaves* প্রকাশিত করেন। বিলাত হইতে টমাস কার্লাইল পুস্তকখানির অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়া ১৮৩৮ সনের ১৯শে ডিসেম্বর তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্যিক গুণপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বড়লাট বেণ্টিঙ্কের মত ১৮৩৭ সনে তৎকালীন ডেপুটি গবর্ণরও তাঁহাকে 'এডিকং' নিযুক্ত করেন। ইহার পর শিক্ষা-সমাজের অনুরোধে ১৮৪০ সনের শেষে রিচার্ডসন *Selections from British Poets* নামে একখানি সংগ্রহ-পুস্তক প্রকাশিত করেন। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন, "ঐ সংগ্রহের প্রথমে ইংরেজী কবিদিগের জীবনী আছে। তাহা অতি সংক্ষেপ অথচ অতি সুন্দররূপে লিখিত। এই সকল গ্রন্থ এক সময়ে ভারতবর্ষের কৃতবিদ্য সমাজে সর্ব্বজনাদৃত ছিল।"†

দীর্ঘকাল একাদিক্রমে একই স্থলে বসবাস করায় রিচার্ডসনের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তিনি স্বাস্থ্যলাভের আশায় ১৮৪২ সনে দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্রোপকূলে গমন করেন। কিন্তু ইহাতেও বিশেষ ফল হইল না। তিনি কিছুকালের জন্য স্বদেশে অবস্থান করাই সাব্যস্ত করিলেন। ইতিমধ্যে কলেজে এমন একটি ব্যাপার ঘটে যাহার বিষয় সংবাদপত্রেও গড়ায় এবং তিনি আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়েন। রিচার্ডসন রাজনীতিতে 'টোরী' বা রক্ষণশীল দলভুক্ত ছিলেন। নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা'র অধিবেশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংস্কৃত (বা হিন্দু) কলেজের হল-ঘরে যথারীতি হইয়া আসিতেছিল। ১৮৪৩ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারীর অধিবেশনে স্থায়ী-সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর পৌরোহিত্যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ভারতে ব্রিটিশ

* "মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র" পুস্তকে (পৃ. ২৬২-৮৩) শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ *The Calcutta University Magazine*, July 1894 হইতে ভোলানাথের "Recollections of D.L.R." সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

† রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত, পৃ. ২১-২২।

* ঐ, পৃ. ২২-২৩।

† ঐ, পৃ. ২২।

আদালত ও পুলিশ বিভাগের সমালোচনা করিয়া এক বক্তৃতা পাঠ করেন। যখন সমালোচনা বিশেষ তীব্র হইতেছিল তখন রিচার্ডসন ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "I cannot allow the hall to be made a den of treason"—'কলেজ-গৃহকে রাজদ্রোহের আগার করিতে দিব না।' মূল বক্তা, সভাপতি এবং আরও কেহ কেহ তাঁহার এই উক্তির নিন্দাবাদ করায় রিচার্ডসন ইহা প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। 'রক্ষণশীল' রিচার্ডসন কিরূপে ভারতবাসীর সেবায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদারচিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন আমরা ক্রমে তাহা দেখিতে পাইব।

রিচার্ডসন ১৮৪৩ সনের ১৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত কলেজ হইতে বেতন গ্রহণ করেন। ইহার পরেই তিনি বিলাত যাত্রা করিলেন। তাঁহার গুণমুগ্ধ ছাত্রগণ বিলাত-যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র ও একটি প্রীতি-উপহার প্রদান করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রিচার্ডসনের ইচ্ছাক্রমে রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক অভিনন্দন-পত্রখানি পঠিত হয়। কলেজের ছাত্রেরা রিচার্ডসনের প্রতি কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন এবং রিচার্ডসনও যে হিন্দু ছাত্রদের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন—অভিনন্দন-পত্র ও তাহার উত্তর হইতে ইহা সম্যক্ প্রতীত হয়। [illegible] উত্তরটি এখানে প্রদত্ত হইল,—

My Friends and pupils,—I am sure you will give me credit for feeling as I ought on this occasion, though I am quite unable to express myself as I ought. The very presentation of your warm hearted address and elegant gift implies that you deem me worthy of it; and I certainly should not be worthy of your gratitude and good will, if I did not thoroughly reciprocate those feelings. If *you* are grateful and cordial—so also am *I*. The task of instruction has been to me a truly agreeable one, for never had a teacher in any country more earnest, more attentive and more able students. In Europe the teacher too often looks with an angry eye on disobedient pupils—the pupils too often see nothing but a tyrant in the teacher. It is very different here. Soon after I joined the college, the students instead of asking me to lessen their labours and my own, very earnestly solicited that I would double the hours of literary study. I was surprised and gratified. Such an unquenchable thirst for knowledge I have never met with, in the youth of any other country, neither have I anywhere else ever seen so clear and cordial an understanding between the teacher and the taught. A teacher's task therefore when he has Hindoo pupils is a peculiarly light and pleasant one, for they are always willing and respectful. It is only necessary for us to point out the road to knowledge—you need never be driven. Entertaining these opinions you may believe me when I say that I part from you all with the most sincere regret, and in the land to which I am going I shall continue to think of the Hindoo college students, with the deepest interest. Your present will serve in my native land as a morning and evening remembrance of the kind young friends I have left upon these shores. I shall always be delighted to hear of the prosperity of this College, and of all who have received an education, within its walls. I wish you heartily and affectionately farewell.*

[illegible] এই সময়কার ছাত্রদের মধ্যে অনেকে পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেন। প্যারীচরণ সরকার, আনন্দকৃষ্ণ বসু, ভোলানাথ চন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, গৌরদাস বসাক, জগদীশনাথ রায় প্রমুখ রিচার্ডসনের ছাত্রদের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

১৮৪৫ সনে কৃষ্ণনগরে সরকার একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। রিচার্ডসন প্রত্যাবৃত্ত হইলে এই বৎসর ২৮শে নবেম্বর প্রস্তাবিত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কলেজ ও স্কুল পরিচালনার্থ যে লোক্যাল কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়, রিচার্ডসন তাহারও সেক্রেটারী হইলেন। এই সময় স্বনামখ্যাত পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং রামতনু লাহিড়ীও স্কুল বিভাগের শিক্ষক-পদে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। নূতন কলেজের সংগঠন-কার্য্যে রিচার্ডসনের সহায়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলেজ ১৮৪৬, ১লা জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সনের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত তিনি কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে রিচার্ডসন হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া সেখানে চলিয়া যান। ১৮৪৮ সনের পূজাবকাশ পর্য্যন্ত সেখানে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন জেম্‌স কার। রিচার্ডসন সরকারের অনুমোদন ক্রমে জেম্‌স কারের সঙ্গে স্বীয় কর্ম্মস্থল পরিবর্ত্তন করিয়া হুগলী কলেজ হইতে হিন্দু কলেজে ১৮৪৮, ২৯শে অক্টোবর চলিয়া আসেন। এই বিষয়টি শিক্ষা-সমাজের বার্ষিক বিবরণে (from *1st May* 1848 to *1st October* 1849, pp. 3 & 4) এইরূপ উল্লিখিত আছে—

During the vacation Mr. J. Kerr, the Principal of the Institution [Hindu College], and Captain D. L. Richardson, the Principal of the Hooghly College, having expressed a desire to exchange appointments, the exchange was recommended by the Council of Education, and sanctioned by Government; and Captain D. L. Richardson took charge of the Hindu College on the 29th October, 1848.

কিন্তু এখানে আসিবার পর হইতেই যত রকমের গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। ক্রমশঃ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন এবং কলেজে আসা-যাওয়ার অনিয়ম সম্বন্ধে নানারূপ গুজব রটে। সরকারী ভাবে ইহার তদন্তও হইল। শিক্ষা-সমাজের তৎকালীন সভাপতি জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন এই দুইটি বিষয়ে রিচার্ডসনের কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। রিচার্ডসন কৈফিয়ৎ দেওয়া আত্মসম্মান হানিকর বিবেচনা করিয়া একেবারে পদত্যাগপত্র পাঠাইলেন। শিক্ষা-সমাজ কর্তৃক পদত্যাগ-

* *Cal. Star*, April 14 and *The Friend of India*, April 20, 1843, pp. 246-7.

পদ তৃতীয় হইল। শিক্ষা-সমাজের পরবর্তী বার্ষিক বিবরণে (১৮৪৯-৫০, পৃ. ১৮৫-৬) এ বিষয়ে এইটুকু মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে—

"There has been no change in the instructive establishment in the past session, Captain D. L. Richardson having resigned the post of the Principal, Mr. E. Lodge was appointed Principal in succession to him."

রিচার্ডসনের পদত্যাগ ব্যাপার লইয়া তখন ছাত্রদের, এমন কি বাঙালী-প্রধানদের মধ্যেও বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। সংবাদপত্রেও বিশেষ বাদানুবাদ সুরু হইল। এই সময় শিক্ষা-সমাজের সভাপতিরূপে বেথুনের সঙ্গে হিন্দু কলেজের হিন্দু অধ্যক্ষগণের ছাত্র ও শিক্ষকরূপে দেশীয় খ্রীষ্টানদের গ্রহণ করা লইয়া বিশেষ মতানৈক্য ঘটে, এবং শেষ পর্য্যন্ত রাজা রাধাকান্ত দেব চৌত্রিশ বৎসর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পর ইহার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হন। বেথুনের প্রতি বাঙালী-প্রধানদের বিরূপ হওয়ার মূলে এই কারণটি বিদ্যমান ছিল, সন্দেহ নাই। ইহার উপর রিচার্ডসনের মত সুযোগ্য জনপ্রিয় শিক্ষককে কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করাইবার কারণ হওয়ায় তাঁহারা বেথুনের উপর আরও চটিয়া গিয়াছিলেন। রিচার্ডসনের পদত্যাগের অল্প দিন পরে, ১৮৪৯ সনের ১৪ই নবেম্বর তাঁহারা রমানাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাপত্র প্রদানার্থ একটি সভায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন।* রিচার্ডসনকে প্রকাশ্যে সম্মান প্রদর্শন সরকারী নিয়মে আটকাইত। হিন্দু কলেজের প্রায় কুড়ি জন উৎকৃষ্ট ছাত্র নিজেদের স্বাক্ষরে সংবাদ-পত্রে শিক্ষা-সমাজের প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করিয়া একখানি পত্রে ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। বেথুন সাহেব সংবাদ-পত্রে জবাব না দিলেও পরবর্তী ২৪শে জানুয়ারী (১৮৫০) অনুষ্ঠিত সরকারী বিদ্যালয়সমূহের পুরস্কারবিতরণী সভায় এই কার্য্যের জন্য ছাত্রদের ভর্ৎসনা করিলেন। তিনি পত্রোক্ত বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, শিক্ষা-সমাজ হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষকে অভিনন্দন-পত্রাদি প্রদানে প্রতিবন্ধক হন নাই; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাংলা গবর্ণ-মেণ্টই এইরূপ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, বিদায়ী কোন সরকারী কর্ম্মচারীকেই অন্য সরকারী কর্ম্মচারীরা সমষ্টিগত ভাবে বিদায়-অভিনন্দন জানাইতে পারিবে না। সরকারী বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের পক্ষেও ইহা সমানে প্রযোজ্য।*

৪

রিচার্ডসন হিন্দু কলেজের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মেট্রো-পোলিটান একেডেমি (প্রতিষ্ঠাকাল ১লা এপ্রিল ১৮৪৯) তাহার একটি বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী হন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ গোবিন্দচন্দ্র সেন সহিত উহার জন্য ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি প্রসঙ্গের আলাপনে এই বিষয় জানিয়া 'সম্বাদ ভাস্কর' ১৫ নবেম্বর ১৮৪৯ তারিখে লেখেন,—

"অধ্যক্ষ কহিলেন হিন্দু কালেজ হইতে অনেক ছাত্র আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের আগমনের এক কারণ উক্ত কালেজের দুইজন প্রধান শিক্ষক কাপ্তান রিচার্ডসন সাহেব ও মণ্টেগ্র [?] সাহেব এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করিতেছেন, হিন্দু কালেজের নীচস্থ বালকেরা মাসিক পাঁচ টাকা দিয়াও যাঁহারদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারেন নাই মিটরো-পোলিটিক্যাল* একাডেমিতে মাসিক এক টাকা দুই টাকা দানে ঐ দুই প্রধান শিক্ষকের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবেন...।"

এই প্রসঙ্গে ভাস্কর-সম্পাদকের মন্তব্যটিরও কিয়দংশ উল্লেখ করিতেছি। ইহা হইতে তখনকার সাধারণ ইংরেজ-চরিত্র সম্বন্ধে কতকটা ইঙ্গিত মিলিবে। সম্পাদক শেষে লেখেন,—

"আমরা ইহাও বলিতেছি মিটরোপোলিটিক্যাল একাডেমিতে উক্ত সাহেবদ্বয়ের স্থায়িত্বের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি না, কাপ্তান রিচার্ডসন এবং মণ্টেগ্র সাহেব হিন্দু কালেজ হইতে বহির্ভূত হইয়াছেন, সেই রাগে এই নবীন বিদ্যালয়ে পরিশ্রম করিতেছেন তাঁহারদিগের ঐ রাগ শান্তির কোন উপায় প্রাপ্ত হইলে আর এস্থানে আসিবেন কিনা বলা যায় না, সাহেব জাতির প্রতিজ্ঞা প্রায় থাকে না, লাভের পথ পাইলে অনায়াসে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করেন অতএব ছাত্রেরা ইহাও বিবেচনা করিবেন, বরং উক্ত সাহেবদ্বয় এই বিদ্যালয়ে কতকাল থাকিবেক ইহার এক প্রতিজ্ঞা পত্র লেখাইয়া লইলে উত্তম কর্ম্ম হইবেক।"

'সম্বাদ ভাস্করে'র আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হইল। রিচার্ডসন বরাবর হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহের সঙ্গেই যুক্ত রহিলেন। তিনি মেট্রোপলিটান একাডেমিতে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। ১৮৫০, এপ্রিল মাসে এই বিদ্যালয়টি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির অধ্যক্ষ হরেকৃষ্ণ আঢ্য ক্রয় করিয়া লন। তখন তিনি ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনকে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির অন্যতম শিক্ষক গুরুচরণ দত্ত ১৮৫১ সনের ৭ই আগষ্ট বটতলায় ডেভিড হেয়ার একাডেমি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রিচার্ডসন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে তিন বৎসরকাল কার্য্য করিয়া এই বিদ্যালয়ে ১৮৫৩ সনের এপ্রিল মাসে সাহিত্যের অধ্যাপক পদে বৃত হন।† পরবর্তী মে মাসে

---

* 'সম্বাদ ভাস্কর', ১৫ নবেম্বর ১৮৪৯।

* *General Report of the Committee of Public Instruction for the Lower Provinces of Bengal for 1849-50*, p. 234.

* নামটি এই তারিখে বার বার এইরূপ ভুল মুদ্রিত হইয়াছে।

† এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় খণ্ড তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১০৪ দ্রষ্টব্য।

হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এ কথা পরে বলিতেছি।

হিন্দু কলেজ পরিত্যাগের পর রিচার্ডসন আরও দুইটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের (পরে, মহারাজা) গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময় 'বেঙ্গল হরকরা' সম্পাদনের গুরুভারও তিনি গ্রহণ করেন। ১৮৫২ সনে রিচার্ডসনের এই পুস্তকখানি বাহির হইল: *Literary Recreations or Essays, Criticism and Poems chiefly written in India.*

রিচার্ডসন সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্র ও সাহিত্য-সেবার ভিতর দিয়া লোকহিতে মন দিলেন এই মাত্র বলিয়াছি। ভারতবাসীদের প্রতি তাঁহার মমত্ববোধ ক্রমে সাধারণে বুঝিতে পারিল। হিন্দু কলেজ পরিচালনা লইয়া শিক্ষা-সমাজ এবং ইহার হিন্দু অধ্যক্ষগণের মধ্যে কিছুকাল যাবৎ মনকষাকষি চলিতেছিল। কলেজের উপর সরকারী কর্তৃত্ব এতখানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, ছাত্রদের ভর্তি করারও তাঁহারা আর হিন্দু অধ্যক্ষগণের মতামত গ্রাহ্য করা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন না। তাঁহারা ১৮৫৩ সনের প্রথমে হীরা বুলবুল নামে এক গণিকার পুত্রকে কলেজে ভর্তি করিলেন। ইহা লইয়া হিন্দু সমাজে জোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। হিন্দু-প্রধানেরা হিন্দু কলেজে নিজ সন্তানদের পাঠানো আত্ম-মর্য্যাদাহানিকর বলিয়া গণ্য করিলেন। এই সময় প্রধানত: কলিকাতা ওয়েলিংটনস্থ দত্ত-পরিবারের রাজেন্দ্রনাথ দত্তের চেষ্টা-উদ্যোগে মান্যগণ্য হিন্দুদের সহায়ে ১৮৫৩ সনের ২রা মে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।* ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের সাহায্যলাভে হিন্দুগণ প্রথম হইতেই সমর্থ হইলেন। ঐ দিনে কলেজের যে উদ্বোধন-সভা হয় তাহাতে সভাপতিত্ব করেন সুবিখ্যাত আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু)। রিচার্ডসন ছিলেন এই দিনের প্রধান বক্তা। তিনি বক্তৃতায় এরূপ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য, শিক্ষণীয় বিষয় প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। এই বিদ্যাগারটি তৎকালীন অন্য কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিরোধী না হইয়া যে পরিপূরক রূপে কার্য্য করিবে তাহা বলিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ আমাদের জাতীয় শিক্ষার পীঠস্থান হইবে, তিনি এই আশাও প্রসঙ্গত: ব্যক্ত করিলেন। 'সম্বাদ ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশও ('গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য') এই সভায় একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই দিন কলেজের অধ্যক্ষ-সভাও গঠিত হইল। রাণী রাসমণির দশ হাজার টাকা দানের উল্লেখও এই সভায় করা হয়।† গুরুচরণ দত্তের ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং একাডেমী এবং মতিলাল শীলের ফ্রি কলেজকে ভিত্তি করিয়াই হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের কার্য্য আরম্ভ হইল।

ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন প্রথম হইতেই হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ-পদে বৃত হইলেন। সে যুগের কয়েকজন খ্যাতনামা ইংরেজ শিক্ষকও এখানে আসিয়া জুটিলেন। বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন বিখ্যাত বাংলা নাটক-রচয়িতা পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন ('নাটুকে রামনারাণ')। বাংলা ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চ্চা এবং বাংলা সাহিত্য সেবা সম্বন্ধে তিনি ২২শে অক্টোবর, ১৮৫৩ দিবসে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের নিকট যে ভাষণ প্রদান করেন তাহা সে সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করে। কলেজের কোন কোন ছাত্র বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য চর্চ্চায়ও পরে অবহিত হইয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন প্রমুখ বিখ্যাত অধ্যাপকগণের শিক্ষার আকৃষ্ট হইয়া তৎকালীন সরকারী, বেসরকারী ও মিশনরী বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রেরাও এখানে আসিয়া ভর্ত্তি হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কয়েক মাসের মধ্যে ইহার ছাত্রসংখ্যা দাঁড়াইল প্রায় এক সহস্র। উমেশচন্দ্র দত্ত ও কৃষ্ণমোহন মল্লিক কলেজের সম্পাদক-পদে নিযুক্ত থাকিয়া ইহার পরিচালনায় বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। রিচার্ডসনও কলেজের কার্য্যে তন্মন ঢালিয়া দিলেন। মাত্র নয় মাসের মধ্যে যে কলেজের এত দ্রুত উন্নতি হইতে পারিয়াছিল তাহার মূলে রিচার্ডসনের কৃতিত্ব ছিল অনেকখানি। কলেজ-কর্তৃপক্ষ তাঁহার কৃতিত্বের স্মারক-স্বরূপ একটি চেন ঘড়ি দেওয়া সাব্যস্ত করেন। তাঁহাদের পক্ষে সম্পাদকদ্বয় ১৮৫৪ সনের ৩১শে জানুয়ারী একখানি পত্র লিখিয়া রিচার্ডসনকে ইহা প্রেরণ করিলেন। ইহার উত্তরে রিচার্ডসন ঐ দিনেই সম্পাদকদ্বয়কে একখানি পত্র লেখেন। পত্রোক্ত কোন কোন বিষয় আজিও আমাদের প্রণিধানযোগ্য। হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে যে হিন্দুদের ভাবনা, উদ্যোগ এবং অর্থ পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে—তাহা তিনি ইহাতে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন। রিচার্ডসনের পত্রখানির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল,—

"With respect to this Hindu Metropolitan College—This great national institution—I rejoice to be able to assert truly that its foundation owes nothing to foreign suggestion or foreign money. Its origin is due exclusively to native enterprize. It was no suggestion of mine or any other European. The scheme had been matured before I had heard a word upon the subject, and when you offered me Principalship, you had already engaged the services of other teachers. All the Native gentlemen who had a hand in the foundation of this new flourishing institution deserve the gratitude

* হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্ত আমি 'বাঙ্গলার শিক্ষক' জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪-তে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

† *The Hindu Intelligencer*, May 16. 1853 সংখ্যায় সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

of their country, but permit me to say, the Dutt family in particular must always occupy an Honorable place in the history of this monument of Hindu energy, patriotism and philanthropy. In spite of innumerable obstacles and the evil prognostication of ungenerous enemies and faint hearted friends, Baboo Rajendro Dutt, (zealously supported by his nearest relatives) went to work with a courage, enthusiasm and determination that resembled what are usually regarded as amongst the best characteristics of the European mind. This College has only been opened a few months, and yet it numbers a thousand paying students on its rolls, looks as if it would endure for centuries, and communicate to the people of Bengal a vast amount of intellectual and moral good when all who are now connected with it shall have passed into another world.

হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের এতাদৃশ উন্নতি দেখিয়া শিক্ষা-সমাজ কতকটা হকচকিয়া গেলেন। তাঁহারা হীরা বুলবুলের পুত্রকে কলেজ হইতে বিদায় দিলেন, উপরন্তু হিন্দুদের মনস্তুষ্টির জন্য নানা উপায়ও অবলম্বন করিতে লাগিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে দেখিয়া ছাত্র-বেতনও তাঁহারা কমাইয়া দিলেন। ক্রমে তাঁহাদের বিরুদ্ধ ভাব অনেকটা বিদূরিত হইল। ১৮৫৬-৫৭ সনে দেখি, শিক্ষা বিভাগের ইন্‌স্পেক্‌টর হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষা লইতেছেন। কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডসনও সরকারী কলেজের ছাত্রদের ইংরেজী সাহিত্যের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু কলেজ—প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হিন্দু স্কুল এই দুই ভাগে বিভক্ত হইলে শেষোক্তটির সঙ্গে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের মিলনের কথা উঠে। কিন্তু তাহা কখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ছাত্রদের পাঠোৎকর্ষে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বাংলা সাহিত্য চর্চ্চার উৎসাহদানের জন্য কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রদের মধ্যে উৎকৃষ্ট বাংলা রচনাকারীকে পদক এবং পুরস্কার দিবারও ব্যবস্থা করিলেন। রিচার্ডসনের ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা এই কলেজে অধ্যয়ন করিয়া পরবর্ত্তী কালে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, যদুনাথ ঘোষ, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৫

রিচার্ডসন যে শুধু কলেজে অধ্যাপনা-কার্য্যেই রত ছিলেন তাহা নহে, তিনি এই সময় সংবাদপত্র-সম্পাদনাও রীতিমত করিয়া আসিতেছিলেন। দীর্ঘকাল অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। তিনি ১৮৫৭ সনের এপ্রিল মাসে পুনরায় স্বদেশে গমনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার আশু বিলাত-যাত্রার কথা শ্রবণে ১৮৫৭, ১৫ এপ্রিল তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' যে মন্তব্য করেন, একটু দীর্ঘ হইলেও এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"আমরা শ্রবণ করত: সাতিশয় অনুতাপিত হইলাম যে বিখ্যাত সুকবি ও পরম পণ্ডিতবর সুলেখক শ্রীযুক্ত কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব, চিকিৎসকের [illegible] নামে [illegible] গমনের অভিপ্রায় [illegible] কাপ্তেন সাহেব এদেশে অবস্থান কালে আমাদের কি পর্য্যন্ত উপকার হইতেছিল তাহা আমরা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না, তাঁহার নিকট অধ্যয়ন পূর্ব্বক এদেশের কত ব্যক্তি সুলেখক ও কবিতা শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, কত ব্যক্তি ইউরোপীয় কবিবৃন্দের লিখিত ভাব, রস ও তাৎপর্য্য অবগত হইয়াছেন, এবং বিশুদ্ধ স্বভাব পরিধারণ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না। তিনি যখন হিন্দু কালেজ ও হুগলী কালেজ ও কৃষ্ণনগর কালেজের প্রিন্সিপালের পদে অভিষিক্ত ছিলেন সেই সময়ে ঐ কালেজত্রয়ের সুখ্যাতি জ্যোতি: বিকীর্ণ ছিল, মৃত মহাত্মা বীটন সাহেব অবিবেচনাপূর্ব্বক কাপ্তেন সাহেবের সহিত বিবাদ করাতে তিনি আপন ইচ্ছাপূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের শিক্ষালয়সমূহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছেন, কিন্তু তিনি পরিত্যাগ করণাবধি গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত কালেজের সুখ্যাতি ক্রমে হ্রাস পাইয়াছে।

"কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব গবর্ণমেণ্টের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের স্থাপিত যে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াছেন তত্তাবতেরই ছাত্রেরা নিয়মমত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজ তাঁহার সংযোগে অতি প্রধানরূপে গণ্য হইয়াছে, অতএব তাঁহার বিলাত গমনে ঐ কালেজের ছাত্রগণের পক্ষে নিতান্ত নিরানন্দজনক বলিতে হইবেক।

"কাপ্তেন রিচার্ডসন যে কেবল বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে অভিষিক্ত হইয়া এদেশের উপকার করিতেছেন এমত নহে, সম্পাদকীয় কার্য্যেও তাঁহাকে একজন অগ্রগণ্য রূপে মান্য করিতে হইবেক, তিনি লেখনী ধারণ পূর্ব্বক বাঙ্গাল হরকরা ও লিটরেরি গেজেট পত্র সম্পাদন করিতেছেন, এবং তাহাতে ঐ উভয় পত্রের যে প্রকার সম্মান বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বোধ হয় পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই অবগত হইয়া থাকিবেন। কাপ্তেন সাহেব যখন যে বিষয়ে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, তিনি পীড়িত শরীরেও এক দিনের নিমিত্ত লেখনীকে বিশ্রাম প্রদান করেন নাই, সাধারণের উপকারার্থ পরিশ্রম করিয়াই তিনি পীড়িত হইয়াছেন।..."

ছাত্র-বন্ধু রিচার্ডসনের বিলাত গমনের সংবাদে কলেজের ছাত্রেরা বিশেষ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা রিচার্ডসনের গৃহে ১৮৫৭, ২২শে এপ্রিল একটি সভায় সমবেত হইয়া তাঁহাকে একখানি বিদায় অভিনন্দন-পত্র এবং স্মারক চিহ্নস্বরূপ একটি ঘড়ি ও একটি কলম-দান প্রদান করিলেন। ছাত্রদের পক্ষে অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন পরবর্ত্তী কালের সুবিখ্যাত 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল। সাধারণের পক্ষে রিচার্ডসনের পূর্ব্বতন ছাত্র গৌরদাস বসাকও একখানি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। কলেজের শিক্ষাব্রতীদের পক্ষে অভিনন্দন-পত্র

প্রদান করেন উইলিয়ম মাষ্টার্স। কলেজের অধ্যাপকগণ এবং গণ্যমান্য হিন্দু-প্রধানেরা এই সভায় যোগদান [illegible]। [illegible] উত্তরে রিচার্ডসন যে বক্তৃতা দেন তাহা আজিও আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে। দেশ ধর্ম্ম বা বর্ণের বিভেদ যে কৃত্রিম তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন,—

"Our creeds are widely different—our countries are far apart—divided by a world of waters—but we are all the sons of the same Great Father who looks upon us all with equal eye and who bids us love one another—and so we *can*.

One touch of nature makes the whole world kin."*

ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার কিরূপ প্রীতির সম্পর্ক ছিল বক্তৃতায় তাহারও উল্লেখ করিলেন। তাহাদের মনে সাহিত্যানুরাগ উদ্রেকেও তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। রিচার্ডসন বলেন,—

"More docile, more affectionate, more industrious or more brilliant pupils no teacher could desire. They cannot but do honour to an able instructor if the instructor be true to himself, and use his best exertions and make his duty a labour of love. But I am not only delighted to find that I have won the affections of my pupils. It is also pleasant to me to remember that I have taught them to regard a liberal education as a source of happiness and refinement—to love literature *for its own sake*. I have taught them that the treasures that can be stored up in the small space of a single human skull are more precious and far more secure than those which could be locked up in a thousand iron chests. The riches of the mind are more truly ours than heaps of silver or gold. The riches of the coffer often make unto themselves wings and flee away, but the riches of the mind are a permanent blessing. A rupee is a good thing and a solid one, but a fine thought or a virtuous feeling is better, for it cannot be taken from us by tyranny, or knavery or misfortune. . . . The legacy which a great intellect leaves us, cannot be squandered. The more it is used the better. Intellectual wealth is increased not lessened the more it is diffused or divided. I have rejoiced that you have learnt that literature is its own exceeding great reward."*

রিচার্ডসন কলিকাতার বিখ্যাত 'ফিনিক্স' সংবাদপত্রের লণ্ডন-সংবাদদাতা হইয়া যান। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার ছাত্রদের সঙ্গে যে পত্র-ব্যবহার করিতেন তাহার প্রমাণ আছে। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একখানি পত্রের উত্তরে ১৮৫৮, ২২শে আগষ্ট তারিখে তিনি হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের প্রতিষ্ঠাতা দত্ত-পরিবারের আর্থিক বিপর্য্যয়ের সংবাদে এবং কলেজের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন। রিচার্ডসন বিকলাঙ্গ হওয়ায় সৈন্য বিভাগের প্রয়োজনমত কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু এতদিন তিনি ইহার অঙ্গীভূত ছিলেন। এই পত্রখানি হইতে জানা যাইতেছে, তিনি এতাদৃশ পদ হইতেও অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে বৎসামান্ত 'ইন্‌ভ্যালিড' বা বিকলাঙ্গ হওয়ার দরুন যে পেন্সন পাইতেছিলেন তাহা আজীবন পাইবেন। তিনি আরও লেখেন যে, সৈন্যবিভাগ হইতে পদত্যাগ করিলেও ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইতে তাঁহার কোন বাধা নাই।

বিলাতে দুই বৎসর থাকিয়া রিচার্ডসন পুনরায় ১৮৫৯ সনে ভারতবর্ষে চলিয়া আসেন। বাংলার তৎকালীন ছোটলাট সার জন পিটার গ্রাণ্ট তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার এই পদে নিয়োগের কয়েক মাস পরেই ভারত-সচিব ইহাতে বাদ সাধিলেন। তিনি এই যুক্তি দেখাইয়া এই নিয়োগ সম্পর্কে আপত্তি জানান যে, রিচার্ডসন সরকার হইতে 'বিকলাঙ্গ' পেন্সন পাইতেছেন, তাঁহাকে নূতন করিয়া কোন সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত করা চলিবে না। রিচার্ডসনকে অগত্যা অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করিতে হইল। তিনি ১৮৬১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে চিরতরে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যান। এই মাসের ৫ই তারিখে গুণমুগ্ধ প্রাক্তন ছাত্রগণ তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন তো দিলেনই, তদুপরি শ্রদ্ধাপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে এককালীন চারি হাজার টাকার একটি তোড়া উপহার দিলেন। ছাত্রদের অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে এবারেও তিনি একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। হিন্দুদের নিকটে যে তিনি কত ঋণী বক্তৃতার এক অংশে তাহার এইরূপ উল্লেখ আছে,—

"His Honour the Lieutenant-Governor was lately pleased to state in a public document that I was known as an earnest labourer in the cause of Indian education long before it was so popular and well-cared for as it is now. I was the first Principal of a College ever appointed in India, and then it was not by the Government but by a Committee of Natives. Lord, then Mr., Macaulay, though President of the Council of Education, could only recommend me to the Natives—which he did most generously—but it was the Natives who elected me from very many candidates—and this, perhaps, is not forgotten, though it happened exactly a quarter of a century ago. I have still in my possession Mr. Macaulay's reply to the application for my appointment. It is to the Natives then that I owed my first appointment as Principal of a College; Macaulay, you see, generously encouraged at the rising of the curtain; and you have kindly cheered me at the fall of it."*

* *The Bengal Hurkaru and India Gazette*, April 24, 18[illegible].

* *The Calcutta Review*, January, 1906. "Captain David Lester Richardson." By S. C. Sanial.

বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে সার জন উইলিয়ম কে কর্ত্তৃক *Allen's Ov rland Mail* ও *Homeword Mait* সম্পাদনায় তাঁহার সহকারী রূপে রিচার্ডসনকে নিযুক্ত করেন। এই কে সাহেব এক সময় রিচার্ডসনের 'ক্যালকাটা লিটারেরী গেজেটে' লেখা মক্স করিতেন। তিনি পরে 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'র সম্পাদক এবং সিপাহী যুদ্ধের ইংরেজী ইতিহাসকার বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। *S.under's and Ot.c's Oriental Budget* নামে একখানি সংবাদপত্রও রিচার্ডসন সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় ('হিন্দু পেট্রিয়ট'—১৪ এপ্রিল ১৮৬২)। *Court Circular* নামে একখানি সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া ইহার সম্পাদনায়ও তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন। রিচার্ডসন ইহার পর একবার ভারতবর্ষে আগমন করেন। 'সম্বাদ প্রভাকর' (১০ মে, ১৮৬৫)-এর মতে তিনি ১৮৬৫, মে মাসে কলিকাতা হইতে স্বদেশযাত্রা করিয়া-ছিলেন। এই সনের ১৭ই নবেম্বর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। রিচার্ডসনের মৃত্যুর বহু বৎসর পরে তাঁহার অন্যতম প্রিয় ছাত্র রাজনারায়ণ বসু আত্ম-চরিতে (পৃ. ২৩) লিখিয়াছেন, "তাঁহাকে স্মরণ হইলে কি পর্য্যন্ত ভক্তি ও প্রেম উচ্ছ্বসিত হয় বলিতে পারি না—তাঁহার স্বভাব বিশুদ্ধ ছিল না—কিন্তু তথাপি হয়।" নিজের ব্যক্তিগত দোষত্রুটি সত্ত্বেও যে শিক্ষক ছাত্রের মনে তৎপ্রতি এইরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা স্থায়ী ও অটুট রাখিতে পারেন তিনি সকলের নমস্য। রিচার্ডসনের মৃত্যুর পঁচাশী বৎসর পরেও তাঁহার কৃতির কথা স্মরণ করিয়া আমরা নিজেদের ধন্য বোধ করি।

ব্যর্থ সাধনা

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

কুশ্রীতার রথযাত্রা! পথে পথে মেলা বসে তার,
মেঘাবৃত অমানিশা নামে লয়ে গাঢ় অন্ধকার।
দেবতা বিদায় নিয়ে অন্তর্হিত দিগন্তের ভালে,
শূন্য বেদীমূলে তাই কেহ নাহি সন্ধ্যা-দীপ জ্বালে।
নির্ব্বাপিত ধ্রুবজ্যোতিঃ, জ্যোতিষ্কের নাহি অবশেষ,
জননীর দ্বারপ্রান্তে সন্তানেরে বলি দেয় দ্বেষ।

শুনিলাম কণ্ঠে কণ্ঠে নব যুগ এলো আজি দ্বারে,
পূরব গগনে চাহি নতি আমি জানালেম তারে।
ব্যর্থ মোর সে প্রণাম, ব্যর্থ হোলো জীবন-স্বপন,
মানবের কণ্ঠ রোধি' দানবের নির্ম্মম চরণ
দেখা দিল ক্রূর হেসে! এরি তরে এত আয়োজন,
এত ত্যাগ, এত প্রেম, জীবনের সব সমর্পণ!

ব্যর্থতার কূলে বসে চেয়ে থাকি একা—
হে সুন্দর, হে শাশ্বত, এ কি বেশে দিলে আজ দেখা!
সত্যে অনুরাগ নাই, নাই শ্রদ্ধা, নাই ভালবাসা,
স্বার্থ নিয়ে রেষারেষি, বুকে বিষ, শাঠ্যে ভরা ভাষা;
মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে গড়িবারে বুকে-হাঁটা প্রাণী
ছলা-ভরা কলা-জালে দিকে দিকে চলে কানাকানি।

এ কি আজ জাগরণ, এরি তরে আগমনী গান
গেয়ে গেল কবি যারা, বীর যারা দিয়ে গেল প্রাণ!
বীণাপাণি বীণা হাতে স্বপ্নে মোর বাজাইল বীণ,
আশার কুহকে ভুলি' জপিলাম ব্যর্থ এত দিন।
সুধা-পাত্র লয়ে দেবী আসে নাই, উঠেছে গরল,
পঙ্কিল সাগরে ওঠে তরঙ্গের ঘৃণ্য কোলাহল।

শ্মশান সৃষ্টির লাগি' আয়োজন দেবীর দেউলে,
হোমাগ্নি নিভিয়া যায়, দাবানল জ্বালায় বাতুলে।
বাণীর বীণার তন্ত্রী ছিঁড়ে ফেলে তোলে অট্টরব;
রুধির-লালসাময়ী বিভীষিকা নাচিছে তাণ্ডব;
অন্ধকার প্রান্তরের প্রান্তে বসি' শকুনি শিবায়
ভোজের প্রাচুর্য্যে মাতি' মদমত্ত জয়-গান গায়।

অবশেষে এই পথে উৎসবের জয়-যাত্রা রথী!
কুশ্রীতার উপচারে দেবতার করিবে আরতি?
ঘৃণ্য যাহা বরেণ্য তা—এই বাণী মূর্ত্ত হবে আজি?
পঙ্ক-স্রোতে অবগাহি' এ কি বেশে দেখা দিলে সাজি'?
জাগিয়া নয়ন মেলি' যারে আমি ভালবাসিলাম
দলিত সে চক্রতলে নিপীড়িত প্রথম প্রণাম!

দিগন্তের প্রান্ত হ'তে ভেসে-আসা অনন্ত আহ্বান
আমি যে শুনেছি রাতে, কণ্ঠ মোর গাহিয়াছে গান
আমার একেলা কোণে। মৃৎ-পাত্রে সন্ধ্যা-দীপ সম
বন্দনার নতি-ভরা, দেখেছি যে হে সুন্দরতম,
আঁধার পাথার মাঝে বিচ্ছুরিত একটু আলোক—
শীর্ণ-শিখ কম্প্র দীপে পূর্ণিমার পরম পুলক।

সে কি মিথ্যা, সে কি মিথ্যা? সত্য হবে হাহাকার শুধু?
অন্তহীন আঙিনায় পড়ে রবে মরুভূমি ধূ ধূ?
কুশ্রীতার শত ফণা উগারিবে বিষ সর্ব্বনাশা?
ব্যর্থ হয়ে মরে যাবে অমৃতের দুরন্ত পিপাসা?
অন্ধকার কারা-কক্ষে জন্ম লভে শিশু ভগবান—
সে কি মিথ্যা? তার লাগি' কোন কণ্ঠ গাহিবে না গান?

[illegible]ণী

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

ঘটনাটি দাক্ষিণাত্যে চোলরাজ্যের সীমান্তে, প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। ঐতিহাসিকদের বিবরণে বিবৃতিটি বাদ পড়ায় লিখিতে বাধ্য হইলাম। বক্তব্য বিষয় ঐতিহাসিকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হইলে ঘটনাচক্রকে দায়ী করিতে হইবে।

বসন্ত সমাগমে, বনফুলের মধুর গন্ধ মৃদু সমীরণস্রোতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। স্বচ্ছ কুহেলিকার অন্তরালে বনস্পতি ঈষৎ চঞ্চল, যেন বনলতার গাঢ় আলিঙ্গনকে অধিকতর ঘনীভূত করিয়া লইতে চায়। জ্যোৎস্নালোকে বনভূমি ভয়াল ও সুন্দরের মিলনক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে—উভয়ই আপন রূপে আত্মহারা, আবেষ্টনী রহস্যপূর্ণ।

প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যই যুবরাজ মল্লরাও উচ্চ টিলার উপর বসিয়াছিলেন। অরণ্য বেষ্টন করিয়া যে শৃঙ্গাররসের তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহার সহিত যুবরাজের চিত্ত মিল খুঁজিতেছিল। গোপন কথার সূত্র অনুসন্ধানের নিমিত্তই তিনি মৃগয়ার শিবির হইতে দূরে চলিয়া আসিয়াছিলেন, চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিলেন, ভয়ালকেই সুন্দর দেখিতেছিলেন।

টিলার পাদমূলেই নিবিড় বনানী, তাহারই ছায়ায় গতিশীল সন্দেহের বস্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করায়, যুবরাজ শরসন্ধান করিলেন। অঙ্গসঞ্চালনে অনুভব করিলেন জানু দুইটি জড়বৎ হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘকাল নিশ্চল অবস্থায় একই স্থানে বসিয়া থাকায়, রক্ত চলাচলের স্বাভাবিক গতি রোধ হইয়াছিল, তদুপরি দেখিলেন বাম জানুর কিয়দংশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে—বর্ণও সচল, বিস্ময়কর দৃশ্য। পরীক্ষা করিতে বাহির হইল, মসীকালো পিপীলিকার বাহিনী একত্রিত হইয়া গত কালের উন্মুক্ত ক্ষতের উপর নির্ব্বিবাদে নরমাংস আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। সহস্র সহস্র হিংস্র কীটের ভোজনসম্মেলন, তাড়াইলেও পালাইতে চায় না। বহু চেষ্টায় পরিত্রাণলাভের পর রক্তস্রাব রোধ করিবার নিমিত্ত রুমাল দ্বারা দংশনের স্থানটি ঢাকিতে যাইতেছিলেন। যথাস্থান স্পর্শ করায় বুঝিলেন ক্ষত গভীর হইয়া গিয়াছে, এত গভীর যে স্বচ্ছন্দে একটি আঙুল গহ্বরে ঢুকিয়া যায়।

নিজের প্রতি ধিক্কার আসিয়া গেল। ভাবিতে লাগিলেন মৃগয়াস্থলে এইরূপ অন্যমনস্কতার সংবাদ পাইয়াও নরভুক শার্দ্দূল কেন যে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, আশ্চর্য্যের বিষয়।

সন্দেহের স্থানটি প্রখর দৃষ্টির ভিতর আবদ্ধ রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রসিক ব্যাঘের ভয়ে নামিয়া যুবরাজ ভিন্ন জীব হইয়া গিয়াছিলেন। হিংস্র পশুর মতই সন্দেহকে সাথী করিয়া, প্রতিটি পদবিক্ষেপ সংযত করিতেছিলেন। গমনকালীন কটিদেশের তরবারির খাপ প্রতিনিয়ত শিলার সহিত সংঘর্ষিত হইতেছিল। অবাঞ্ছিত শব্দে বিরক্ত হইয়া স্বগত বলিয়া ফেলিলেন,—এতগুলি অস্ত্রে সুসজ্জিত হইলে শিকারীকেই শিকার হইতে হয়। এই অবস্থায় কোন জন্তু নিকটে আসিয়া পড়িলে আত্মরক্ষাও অসম্ভব। বীরের রাজসিক শোভা তাঁহার নিকট বিড়ম্বনা হইয়া উঠিল। নিরুপায় হইয়াই তরবারিসহ কটিবন্ধ খুলিয়া ফেলিলেন। লঘুভার হইয়া মাত্র কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছেন, দেখিলেন, বিশাল শার্দ্দূল, অতি নিকটেই বৃক্ষচ্ছায়ার তলদেশ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহার গতি শিকারান্বেষীর নহে, পদক্ষেপ পলাতকের, যেন কোন দ্বন্দ্বে বিতাড়িত হইয়া নিরাপদ স্থান খুঁজিতেছে।

তূণ হইতে তীর সংগ্রহ করিয়া, সবে ধনুকের সহিত যোজনা করিয়াছেন, এমনি সময় শার্দ্দূল হুঙ্কার দিয়া শূন্যে লাফাইয়া উঠিল। পরক্ষণেই আর একটি জীব তীরবেগে বাঘের দিকে ছুটিয়া গেল—বরাহ বাঘকে আক্রমণ করিয়াছে, বীরের সম্বর্দ্ধনায় বীর আসিয়াছে, মল্লযুদ্ধ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। এমতাবস্থায় কোন্‌টিকে মারা সঙ্গত, যুবরাজ স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, অকস্মাৎ বাঘ ধরাশায়ী হইয়া পড়িল। বরাহ এইবার যুবরাজের দিকে ফিরিয়াছে, ভয়াল রূপ, চলিতে চলিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া যাইবার ভঙ্গী দেখিয়াই যুবরাজ বুঝিয়াছিলেন, এই মুহূর্ত্তে তীর না চালাইলে, বধ্য ও ব্যাধের মাঝে ব্যবধান তিরোহিত হইয়া যাইবে। কালক্ষেপ না করিয়া ধনুকে টঙ্কার দিলেন। ত্রিফলা তীর বায়ুবেগে বরাহের মাথা বিদ্ধ করিয়া দিল। ফল হইল বিপরীত। অস্ত্রে বিদ্ধ হইয়াও প্রবল পরাক্রমশালী দাঁতাল যুবরাজের দিকে বেগে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। যুবরাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন, অন্য শর তূণের ভিতরেই রহিয়া গেল। পুনরায় অস্ত্র প্রয়োগের সময় পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। বরাহ কয়েক হাতের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। অতি নিকটে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করিয়া যুবরাজ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাংসল ভারী ওজনের পতন শব্দ শুনিলেন ঠিক তাঁহার পদতলে অথচ তাঁহার দেহে এতটুকুও আঘাত লাগিল না। চক্ষু উন্মীলিত করিতে দেখিলেন যূপকাষ্ঠে বধ্য জানোয়ারের মতই প্রাণবিয়োগের পূর্ব্বে যাতনায় নির্দ্দেশ দিয়া বরাহ অসাড়

হইয়া গেল। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে যুবরাজ আত্মগরিমায় স্ফীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সান্ত্বনা স্থায়ী হইল না। বরাহের মাথায় বিদ্ধ তীর ছাড়া আর একটি অস্ত্র দেখা যাইতেছে; হৃদয়ের কেন্দ্রে সূচ্যাকার বল্লম, বরাহকে একদিক দিয়া বিদ্ধ করিয়া অপর দিকে বাহির হইয়া গিয়াছে।

যুবরাজ রোষে আত্মসংযম হারাইলেন। কাহার এত বড় স্পর্দ্ধা যে তাঁহার শিকারে ভাগীদার হইতে চায়? আদেশ করিলেন, কে আমার শিকারে বল্লম চালাইয়াছ, শীঘ্র বাহির হইয়া আইস অন্যথায় কঠোর দণ্ড ঘোষিত হইবে।

উত্তর যাহা আসিল তাহা বামা কণ্ঠের হাসি—অবজ্ঞার হাসি, তাহার পরেই শুনিলেন শুষ্ক পত্রের মর্ম্মরধ্বনি। শব্দ দ্রুত অরণ্যের গভীরতার দিকে চলিয়া যাইতেছে। যুবরাজের আদেশ লঙ্ঘন, তাহার উপর অবজ্ঞার হাসি, মল্লরাওয়ের আত্মাভিমানে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল—পলাতকের গতি অনুমান করিয়া তীর চালাইয়া দিলেন। ঈপ্সিত স্থানেই তীর গিয়া আঘাত করিল, সঙ্কেত পাইলেন করুণ আর্ত্তনাদে। নারীর কাতর স্বরে যুবরাজ সচকিত হইয়া উঠিলেন, কালক্ষেপ না করিয়া জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়াই বুঝিলেন, তাঁহার মস্তিষ্কে বাতুলতার ক্রিয়া সুরু হইয়াছে। যে স্থানে দিবালোকের প্রবেশপথ রুদ্ধ সেই গভীর অরণ্যে তিনি কিসের সন্ধানে চলিয়াছেন? স্থির চিন্তায় অসম্ভবকে সফল করার প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যের বাহিরে আসার জন্য ফিরিলেন। বাহিরে আলোর দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই অগ্রসর হইতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, কেহ তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছে। পদবিক্ষেপ মানুষের মত, নিঃসন্দেহ হইবার নিমিত্ত চলা হঠাৎ থামাইয়া দিলেন, অনুসরণও সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গেল। আবার আগাইতে লাগিলেন, পুনরায় অনুসরণকারীও চলিতে লাগিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া জঙ্গলের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন, কখনও এই জাতীয় অসুবিধার সহিত পরিচয় হয় নাই। যুবরাজ চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন, মনে হইতে লাগিল তিনি অলৌকিক শক্তির কবলে পড়িয়া গিয়াছেন—অদৃশ্য অনুসরণকারী তাঁহাকে অজানা অনিশ্চিতের পানে টানিতেছে। অস্বাভাবিক প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তিনি নিজের সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। লোকালয়ে এইরূপ অবস্থায় তাঁহাকে কেহ দেখিলে বাতুল বলিয়া মনে করিত।

আপন মনে কথা বলিতে বলিতে আরও খানিকটা অগ্রসর হইলেন। অনুসরণকারীর আর কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য নিজের কাছেই লজ্জিত হইলেন। জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া পড়ার দরকার ছিল, কিন্তু যে আলোক এতক্ষণ বাহিরের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল তাহা অপসারিত হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার, স্থানে স্থানে চন্দ্রালোক তীক্ষ্ণধার বল্লমের ফলার মত উপর হইতে পত্রাবরণ ভেদ করিয়া মাটিতে বিদ্ধ হইয়া আছে, আলো জ্যামিতিক সরল রেখার মতই নিরেট ও সোজা। ছটার বিস্তার অত্যন্ত স্বল্প পরিধির মধ্যে আবদ্ধ। দৃষ্টিকে নিঃসন্দেহ করিতে হইলে, বেশ খানিকক্ষণ লক্ষ্য-বস্তু নিরীক্ষণ করিতে হয়। যুবরাজ ঐটুকু আলোর উপর নির্ভর করিয়াই চলিতে লাগিলেন। কয়েক পদ মাত্র গিয়াছেন, পিছন হইতে কেহ সাবধান করিয়া দিল, "আর অগ্রসর হইও না, রাজ গোক্ষুরা নূতন রাণীর সন্ধানে বাহির হইয়াছে।"

সতর্কতার বাণী থামিয়া গেল; বনভূমি নিস্তব্ধ, বায়ুর গতি প্রায় নিশ্চল, নিকটেই কোন স্থান হইতে গলিত মাংসের পূতিগন্ধ আসিতেছে—নিশ্চয় বাঘের দ্বারা নিহত কোন জানোয়ারের। অদূরে বিষাক্ত সরীসৃপের ফোঁসফোঁসানি, সামনেই বাঘ এবং পিছনে প্রেতলোকের বাণী। অপূর্ব্ব যোগাযোগ, মৃত্যু যেন সমারোহ করিয়া তাঁহার অভিষেকের আয়োজন করিয়াছে। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, নিকটেই মাংসভুকের ভোজন-শব্দ শুনিবার প্রত্যাশায়। কোনরূপ সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। বাঘ তাহা হইলে আহার পরিত্যাগ করিয়া মানুষের গতিবিধি জানিবার জন্য নিকটেই কোথাও আত্মগোপন করিয়াছে; জন্তুটির আক্রমণরীতি বরাহের মত নয়, সম্মুখ দ্বন্দ্বে তাহার অভ্যাস নাই, অকস্মাৎ আড়াল হইতে শিকার ধরাই তাহার নীতি। এইরূপ অবস্থায় বৃক্ষের উপর আশ্রয় না লইলে, বাঁচার আশা অনিশ্চিত। ভাগ্যগুণে নীচু ডাল নিকটে পাওয়ায়, গাছের উপরে উঠিয়া যাওয়ায় বিশেষ অসুবিধা হইল না। যেখানে আসন গ্রহণ করিলেন সেখানে বিশাল সরীসৃপ ব্যতীত অন্য কোন হিংস্র জন্তুর আসার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি সতর্কতার প্রয়োজন থাকায় কোষ হইতে ছোরা বাহির করিয়া সামনের শাখায় বিদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

বায়ুর গতি থামিয়া গিয়াছে, নিস্তব্ধতা চতুর্দ্দিক হইতে ভারী ওজনের মত তাঁহাকে চাপিতে সুরু করিয়াছে। কোন দিকেই প্রাণের সাড়া নাই, রাত্রি নিঝুম। যে-কোন প্রকারের ঝিমানো অবস্থা যুবরাজের পক্ষে পীড়াদায়ক। যুবরাজের বাহিরের রূপ দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে তাঁহার ভিতরে একটি দুর্দ্দান্ত জীব বাস করে। বিপদের সহিত খেলায় তিনি সুনিপুণ। যে বিপদ সম্মুখ হইতে আসে তাহার সম্বর্দ্ধনায় যুবরাজকে কখন কেহ পশ্চাৎপদ হইতে দেখে নাই। শিকারে বাহির হইবার সময় কখনও দেহরক্ষীকে সঙ্গে লন নাই।

যে সময় ঝিমানোর ভাব তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত সেই সময় চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হইল—শুনিলেন বীণার ঝঙ্কার, তৎসহ নারীর কোকিলবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর। যন্ত্রকে সুর অনু-

সরণ করিতেছে, সুর চলিয়াছে মূর্চ্ছনার দিকে। বসন্ত রাগ মৃদঙ্গের গম্ভীর ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া তানকে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিয়াছে। সুরের বিস্তার কখন খাদে নামিতেছে, কখন অন্তরার চড়া পর্দ্দায় উঠিয়া যাইতেছে। মূর্চ্ছনায় আবেষ্টনী মদির প্রভাবে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে।

সুর যুবরাজকে নেশাগ্রস্ত করিয়া ফেলিল, তিনি যেন মাতাল হইয়া উঠিলেন। ভয়াল অরণ্য তখন তাঁহার নিকট পুষ্পোদ্যানে পরিণত হইয়াছে; যুঁই, বেল, মল্লিকা, রজনীগন্ধা একত্রে গন্ধ ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। অপূর্ব্ব রসক্ষেত্রে যুবরাজের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঝিমানোর কবল হইতে মুক্তি পাইয়া তরুশাখা হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। সুর ও গন্ধকে অনুসরণ করিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন। গম্য স্থল নির্দ্দিষ্ট না হইলেও ক্রমে ক্রমে পথরেখা বাহির হইয়া আসিতেছিল। বহুক্ষণ চলিয়া অবশেষে তিনি যেন এক রহস্যলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে অন্ধকারে দৃষ্টি অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল, সামনেই দেখিলেন পাষাণের স্থাপত্য নিরেট, বায়ু চলাচলের কোন ব্যবস্থা নাই, প্রবেশ-পথও অদৃশ্য। এই সময় সুর থামিয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে বহু নারীর মিলিত হাসির শব্দ শুনা যাইতেছে, শ্লেষের অভিব্যক্তি? যুবরাজ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে নারী তাঁহাকে রসমদিরায় নিক্ষেপ করিয়া এই রহস্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকে যে-কোন প্রকারে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

হাসি আর শুনা যাইতেছে না। যুবরাজ দেয়ালের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ সুরু করিয়া দিলেন। কোন দিকেই প্রবেশ-পথ বা জানালার চিহ্নমাত্র নাই। এক বার দুই বার বহু বার ঘুরিলেন, কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। রোখ চাপিয়া গেল. পণ করিয়া বসিলেন প্রাতঃকালের প্রথম কাজ হইবে এই পাষাণস্তূপকে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলা। যে কয়টি হস্তী সঙ্গে আসিয়াছে, তাহাদের সাহায্যে কার্য্যটি সম্পন্ন করা অসম্ভব নয়। এই সঙ্কল্প করিয়া ফিরিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় বীণার তারে পুনরায় ঝঙ্কার উঠিল, শব্দ যেন ভূগর্ভ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া আসিতেছে। বদ্ধ বায়ু ও অভেদ্য পাথরকে অতিক্রম করিয়া যে ধ্বনি উপরে উঠিয়া আসিতে পারে তাহার সহিত মরলোকের কোন যোগ থাকা কি সম্ভব? যুবরাজের মত সাহসী পুরুষেরও মন বিচলিত হইয়া উঠিল। তবে কি এই স্থাপত্য কাহারও সমাধি? লোকান্তরিতের অধিষ্ঠানস্থল? যুবরাজ ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেলেন, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, স্থির হইয়া একই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন ঘটনার ক্রমবিবর্ত্তন দেখিবার জন্য। নূতন কিছু ঘটিল না। যুবরাজ ইতিমধ্যে অনেকটা ধাতস্থ হইয়া আসিয়াছিলেন। উত্তেজনা ও ভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য খুঁজিতে লাগিলেন। এইটুকু বুঝিয়াছিলেন রাত্রিবাস অরণ্যের ভিতরেই করিতে হইবে। দিগ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে পথ খুঁজিতে যাওয়াটা যতই সাহসের হোক সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। সমাধির উপর-দিকে তাকাইলেন—সেখানে দৃষ্টি চলে না। অতিকায় বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা সমাধিস্তূপকে এমন ভাবেই ঘিরিয়া রাখিয়াছে যে, স্থাপত্যের শেষ দেখিবার উপায় নাই। অগত্যা গাছের উপরেই উঠিয়া পড়িলেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল, কখনও কখনও বন্য কুক্কুট চীৎকার দ্বারা অরণ্যের নিস্তব্ধতাকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছে। ঊষা-সমাগমের আভাস পাইয়া, যুবরাজ তন্দ্রার কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বৃক্ষ হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছিলেন—নীচের দিকে দৃষ্টি পড়িতে মনে হইল যেন কেহ সমাধির ভিত্তিতল হইতে মাটির উপর উঠিয়া আসিতেছে। যে উঠিয়া আসিতেছিল, সে নারী, অবগুণ্ঠনবতী, দক্ষিণ হস্তে তাহার বল্লমের মত একটি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র। নারী উপরে যে ভাবে সমাধির আশে-পাশে ঘুরিতে লাগিল তাহাতে মনে হইল কিছু বা কাহাকেও খুঁজিতেছে। কিছুক্ষণ পরে নারী স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং উত্তরীয় মাটিতে ফেলিয়া দিয়া নীচু হইয়া দেয়ালে ঠোকা মারিল—সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালগাত্র হইতে একটি দ্বার খুলিয়া গেল। নারী ভিতরে ঢুকিয়া তখনই বাহির হইয়া আসিল। বল্লম প্রাচীরগাত্রে ঠেসান দিয়া চকমকির সাহায্যে ছিন্ন বস্ত্রে অগ্নি-সংযোগ করিল—সঙ্গে সঙ্গেই আগুন সহজেই ধরিয়া উঠিল। জ্বলন্ত অগ্নি সবলে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেই পতনস্থলে মুহূর্ত্তে আগুন লাগিয়া গেল।

আগুন ক্রমান্বয়ে কলেবর বিস্তার করিয়া চলিল, দেখিতে দেখিতে একটি শুষ্ক বনলতা সহজেই অগ্নিকে বৃক্ষচূড়ায় উঠাইয়া দিল। বনে আগুন ছড়াইয়া পড়িতে আর বিলম্ব নাই। যুবরাজ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া থাকিলে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নি-সংস্কারের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। নারী মানবী হউক বা ডাকিনী হউক, ঐ সমাধির ভিতর আশ্রয় লওয়া উপস্থিত বাঁচিয়া যাওয়ার একমাত্র পন্থা। উপর হইতে আদেশ করিলেন বল্লম দূরে ফেলিয়া দাও অন্যথায় তীর দিয়া বিদ্ধ করিয়া ফেলিব।

নারী হয়ত সন্ধানের বস্তু দেখিতে না পাইয়া অন্যমনস্ক ছিল। বৃক্ষচূড়া হইতে অপ্রত্যাশিত আদেশ শ্রবণে তাহার কিঞ্চিৎ সচকিত ভাব দেখা গেল, ক্ষণিকের ত্রস্ততা—পরক্ষণেই নারী বল্লম দেয়াল হইতে তুলিয়া দৃঢ় মুষ্টির ভিতরে ধরিল এবং উপর-দিকে তাকাইল। মুখে ক্রূর হাসির রেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, ভ্রূর উত্থান-পতনের সহিত গ্রীবা ঈষৎ বঙ্কিম ভাব ধারণ করিয়াছে—নারী যেন দংশনোদ্যতা নাগিনী। অগ্নিশিখার আভা তার সর্ব্বদেহের উপর ছিটকাইয়া পড়িয়াছে—যুবরাজ দেখিলেন, পরিপূর্ণযৌবনায় গণ্ডশ্রীতে অবর্ণনীয় রেখার সমাবেশ, যেন

ওস্তাদ শিল্পীর সুনিপুণ কারিকরির চরম সফলতা। প্রতিটি অঙ্গ সামঞ্জস্যের সীমায় আবদ্ধ হইয়া নিজের রূপেই অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। অগ্নি কামনার ইন্ধনে প্রজ্বলিত, রূপবহ্নি মোহ-মুগ্ধদের আত্মোৎসর্গের নিমিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। আকর্ষণ এমনই প্রবল যে পরিত্রাণলাভ সাধ্যের অতীত। যুবরাজ রূপবহ্নির ভিতর ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। আত্মরক্ষার যাবতীয় অস্ত্র বর্জন করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। অতি নিকট হইতে দৃষ্টির দ্বারা নারীর সর্ব্বদেহ স্পর্শ করিলেন, আশা আর মিটিতে চায় না। রূপের সম্মোহিনী শক্তিতে যুবরাজ নিজেকে হারাইয়া ফেলিলেন, আত্মাভিমান নারীর পদতলে অর্ঘ্য দিয়া কৃপার্থীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। নারীর নয়নযুগলে যে বাণ রক্ষিত ছিল তাহার ব্যবহারে যুবরাজের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতে লাগিল। এমন পুলকমিশ্রিত বেদনা জীবনে কখন অনুভব করেন নাই।

অকস্মাৎ জঙ্গলের আগুন নিবিয়া গেল, তৎক্ষণাৎ কয়েকজন অতর্কিতে পিছন হইতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। যুবরাজ আকস্মিক ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়া বাধা দিবার অবসর পাইলেন না। কাজেই তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিতে আততায়ীদের কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না। হাত ও পায়ের বন্ধন শেষ হইতে, উষ্ণীষ খুলিয়া দৃষ্টিও ঢাকিয়া দিল। অতঃপর তাহারা যুবরাজকে বহন করিয়া নীচের দিকে নামিতে লাগিল। শূন্যে থাকিয়াই যুবরাজ অনুভব করিতে লাগিলেন সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। আঁকাবাঁকা দীর্ঘ পথ ফুরাইতে আর চায় না। হঠাৎ একটি ঘণ্টার আওয়াজ শুনিলেন, লোকগুলির চলা যন্ত্রবৎ থামিয়া গেল। তাহারা তাঁহাকে মাটিতে দাঁড় করাইয়া দিল—পরক্ষণেই শুনিলেন—কোন নারী বলিতেছে—দক্ষিণ মণ্ডপায় পঞ্চম বট বৃক্ষের দ্বার তোমাদের পাহারায় রহিল—"রাজকুমারীর এই আদেশ।" লোকগুলি কোন উত্তর দিল না, যেন নিঃশব্দে চলিয়া গেল। যুবরাজ একই স্থলে দাঁড়াইয়া আছেন—নারী আসিয়া তাঁহার হাতের ও পায়ের বন্ধন খুলিয়া দিয়া বলিল—আমার হাত ধরুন, বিহার-গৃহে লইয়া যাইতেছি—চোখের বাঁধন সেইখানে খুলিয়া দেওয়া হইবে। আপত্তি অর্থহীন জানিয়াই যুবরাজ নারীর হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। আবার আঁকা বাঁকা পথ—তবে সিঁড়ি ওঠানামার প্রয়োজন হয় নাই—অবশেষে যেখানে আসিয়া থামিলেন, সে স্থানটি মধুর গন্ধে ভরপুর হইয়া ছিল, অজানা গন্ধ ধীরে অবগুণ্ঠনবতীর দিকে মন ফিরাইয়া দিল, ঠিক এই গন্ধ কয়েক মুহূর্তের জন্য পাইয়াছিলেন—যখন বল্কলধারিণী নারী তাঁহাকে নয়ন-বাণে বিদ্ধ করিতেছিল। এই সময় পথপ্রদর্শিকা নারী অগ্রসর হইয়া আসিল তাঁহার চোখের বাঁধন খুলিয়া দিবার জন্য। বস্ত্রের খস খস শব্দ যখন নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, তখন যুবরাজের চিত্ত-চাঞ্চল্য চরমে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু মানসিক উত্তেজনাকে কঠোর ভাবেই সংযত করিয়া রাখিলেন। অপরিচিতা রহস্যময়ী নারীকে চিনিবার জন্য চোখের বাঁধন উন্মোচনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চক্ষু উন্মীলিত করিতে দেখিলেন, তিনি গভীরতম অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছেন। মাথার ভিতর যেন চক্র ঘুরিতেছে। কিছুক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইতে আলোর সন্ধান পাইতে লাগিলেন। স্বল্প সময়ের ভিতর দৃশ্যস্থল আলোকিত হইয়া উঠিতে লাগিল; তখন কোন মানুষই তাঁহার নিকটে নাই।

যুবরাজ দেখিলেন—সুসজ্জিত প্রশস্ত ঘর, এক দিকে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা। যে পালঙ্কের উপর তাহা স্থান পাইয়াছে, তাহা স্বর্ণময় কারুকার্য্যখচিত। পদতলে বহু মূল্যবান গালিচা। দেয়াল খোদিত করিয়া কঠিন পাথরকেই নারীর রূপ দেওয়া হইয়াছে। সুকুমার কান্তি লইয়া মূর্ত্তিগুলি বিভিন্ন স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। গঠন এমনই সজীবতায় পূর্ণ যে মনে হয়, যে-কোন মুহূর্ত্তে পাথরের বাঁধন বিদীর্ণ করিয়া দেয়াল হইতে বাহির হইয়া আসিবে। বস্ত্রাবরণের আভাস যেটুকু আছে তাহাও কারিকরি কৌশলে স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। স্বচ্ছ আবরণী রূপকে অধিকতর চিত্তহারী করিয়া তুলিয়াছে।

পালঙ্কের পার্শ্বেই খর্ব্ব পিঠিকা, তাহার উপর স্বর্ণপাত্র, পানীয় বস্তুর আধার। প্রকোষ্ঠে কোন প্রদীপ নাই তথাপি কেমন করিয়া আলোক-রশ্মি প্রাচীরগাত্রে প্রতিফলিত হইতেছে। যুবরাজের দৃষ্টি ঘুরিয়া ফিরিয়া পাষাণ-মূর্ত্তিগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিল। দৃষ্টি আবিষ্কার করিল উহাদের ভিতর একটি অবগুণ্ঠিতার প্রতিমূর্ত্তি। মূর্ত্তি নড়িতেছে, মানুষ হইয়া গিয়াছে—দেয়াল ছাড়িয়া গালিচায় পা দিয়াছে। ক্ষণিকে যুবরাজের আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। এই সময় আলোক-রশ্মি ঝাপসা হইতে হইতে এমন একটি আলো-আঁধারিতে আসিয়া থামিয়া গেল যে, দৃষ্টিকে কার্য্যকরী করিতে হইলে স্পর্শের সাহায্য না লইয়া উপায় নাই।

যুবরাজ যখন নিজেকে ফিরিয়া পাইলেন, তখন নবজাগরিত দিবালোক অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখানে ঘরের চিহ্নমাত্র নাই, পাশ ফিরিতে চমকাইয়া উঠিলেন। অতিকায় বাঘ তাঁহার গা ঘেঁষিয়া শুইয়া আছে। মুহূর্ত্তে যেন তাঁহার রক্ত চলাচল থামিয়া গেল। অতি সন্তর্পণে ঘনিষ্ঠতা হইতে সরিয়া আসিলেন, দৃষ্টিবিভ্রম হয় নাই, শার্দ্দূলকে ঠিকই দেখিয়াছিলেন, তবে তাহা অসাড়, বল্লমের আঘাতে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। পরিচিত অস্ত্রের পুনঃপ্রয়োগ দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ঠিক বরাহ যে ভাবে বিদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রথায় বাঘও নিহত হইয়াছে।

গত রাত্রের ঘটনাগুলি অগোছাল অবস্থায় মনশ্চক্ষে দেখিতে লাগিলেন—প্রাণময়ী পাষাণ তাঁহার সামনে শক্তির প্রতীক্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ঐ শক্তির নিকট নত হইতে পারায় আনন্দ বোধ করিতেছেন, হৃদয়ের গোপন কথা স্বীকার করিতেও আপত্তি নাই। যে মানুষ নারীকে ক্ষণিকের ভোগ্য ব্যতীত অন্য কিছু ভাবেন নাই, যে মানুষ নারীর প্রেমকে কেবল বিপজ্জনক ক্রীড়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই মানুষ এক রাত্রির দীক্ষায়, পুরোপুরি বদলাইয়া গিয়াছেন, দাতা হইয়া উঠিয়াছেন কৃপাপ্রার্থী। অবগুণ্ঠনবতীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু সঙ্কল্পকে তখনকার মত স্থগিত রাখিয়া শিবিরে ফিরিলেন।

যুবরাজ যখন নিজের আস্তানায় আসিয়া পড়িয়াছেন তখন দেখিলেন শান্ত্রী পাহারা ব্যতীত সকলেই প্রাতঃনিদ্রায় অচৈতন্য। প্রথমে ঢুকিলেন সর্ব্বাধিকারী বীরভদ্রের আস্তানায়। প্রবেশপথেই যে সব নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হইল তাহাতে প্রাতঃনিদ্রার কারণ বুঝিতে বিলম্ব হইল না। চতুর্দ্দিকে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রদর্শনী এমনই বিকট হইয়া উঠিয়াছে যে, তাঁবুর ভিতরে বেশীক্ষণ থাকা যায় না। এই নরককুণ্ড পরিত্যাগ করিয়া তিনি ত্বরিতপদে আপন শিবিরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

অপরাহ্ণ সময় পার হইতে যুবরাজের নিদ্রাবসান হইল। শিবিরের বাহিরে বীরভদ্র অপেক্ষা করিতেছিলেন। যুবরাজ ডাকিয়া পাঠাইলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন, এবং সুদৃশ্য ও সুগন্ধযুক্ত পত্র যুবরাজের হাতে দিলেন। পত্রের বহিরাবরণ পরিচিত গন্ধ বহন করিয়া আনিয়াছে, তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। বীরভদ্র আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। প্রেম বড় সাংঘাতিক ব্যাধি, ঐ ছোঁয়াচে রোগ হইতে এতকাল তিনি যুবরাজকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন ব্যাধিটি কি অবশেষে যুবরাজের মধ্যেও সংক্রামিত হইল।

যুবরাজ পত্র খুলিলেন—পাঠকালীন তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল। যেন প্রতিটি ছত্র চীৎকার করিয়া তাঁহাকে উত্তেজক বার্ত্তা শুনাইতেছে। যুবরাজের মুখমণ্ডলে ক্রোধ ও বিরক্তির কুঞ্চিত রেখা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বীরভদ্র সবই লক্ষ্য করিতেছিলেন। যুবরাজকে পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত দেখিয়া বিনীত ভাবে জানাইলেন, অধীনের স্পর্দ্ধা ক্ষমা করিয়া পত্রটি আমাকে পড়িতে দিন, দেখি কোন প্রতিকারের সন্ধান পাইতে পারি কিনা ?

যুবরাজ তাঁহার হাতে পত্র দিবার উপক্রম করিয়াও শেষে ক্ষান্ত হইলেন। বক্তব্যে যে রসিকতা ছিল তাহার অর্থ জটিল নয়। পত্র নিজের কাছেই রাখিয়া আদেশ দিলেন, পত্রবাহককে এখুনি উপস্থিত কর।

বীরভদ্র মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, ধর্ম্মাবতার, যাহারা পত্র আনিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া গিয়াছে।

যুবরাজ অনেকক্ষণ কোন উত্তর না দেওয়ায় বীরভদ্র জানাইলেন, একটি আরজি আছে।

মল্লরাও বিরক্ত হইয়াছিলেন, উত্তর দিলেন, এখুনি না বলিলে নয় ?

বীরভদ্র—ব্যাপারটা লৌকিকতার সহিত জড়িত তাই এখুনি শেষ করিবার আজ্ঞা কামনা করি।

মল্লরাও—বল।

বীরভদ্র—আমরা যে জঙ্গলে আসিয়াছি, তাহা হিন্দুপুর রাজ্যের অধীনে। প্রবেশের জন্য কোন আদেশ লওয়া হয় নাই, তথাপি রাজকুমারী—এখানকার ভাবী রাণী, বহুবিধ উপহার পাঠাইয়াছেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, উপহারের সঙ্গে কতকগুলি অস্ত্রও আসিয়াছে, দুইটি আপনার নামাঙ্কিত ত্রিফলাবিশিষ্ট তীর এবং অপর দুইটি কারুকার্য্যখচিত ক্ষুদ্রাকার বল্লম—দেখাইতেছি। বলিয়া, দ্বারীকে অস্ত্র দুইটি আনিবার আদেশ দিলেন। দ্বারী অস্ত্রগুলি আনিলে যুবরাজের সামনে ধরিয়া জানাইলেন, এইগুলি লইয়াই ফাঁপরে পড়িয়াছি। এই ধরণের অস্ত্র সাধারণতঃ রাজকুমারীরা মৃগয়ায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। দুর্দ্দান্ত সাহসী ও অব্যর্থ লক্ষ্যভেদীকে এইরূপ অস্ত্র উপহার দেওয়ার কোন অর্থ বুঝিতেছি না। তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেই বল্লম, তলোয়ার, ছোরা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, আপনার সম্বন্ধে ত ওকথা অবান্তর।

মল্লরাও ভাবিতে লাগিলেন, সখা দেখিতেছি সন্ধান না করিয়াই বিদ্রূপের পুঁজি বাড়াইতেছে ? সপ্রশ্ন দৃষ্টি বীরভদ্রের উপর পড়িতে তিনি বলিলেন, আমি ভাবিতেছিলাম, ঐ বল্লম লইয়া রাজকুমারী যদি···কথাটা শেষ করা হইল না, সহসা চন্দ্রগিরির কুমার শিবিরে প্রবেশ করিলেন। সুগোল নধরকান্তি, যুবরাজের মান্য অতিথি। মৃগয়ায় তাঁহার তেমন প্রবৃত্তি নাই, আনুষঙ্গিক উপকরণের প্রতিই তাঁহার আকর্ষণ বেশী। সংক্ষেপে তিনি বিলাসপ্রিয়।

কুমার বেসামাল অবস্থায়ই ঘরে ঢুকিয়াছিলেন। চলার শ্রী দেখিয়া মল্লরাও বীরভদ্রকে জানাইলেন, লৌকিকতার ব্যবস্থা তিনি নিজে করিবেন, উপস্থিত কুমারের জন্য নূতন নটীর ব্যবস্থা করা হোক। এক চেহারা রোজ দেখিয়া কুমারের অরুচি ধরিয়া গিয়াছে।

বীরভদ্র বলিলেন—যে কয়জন সঙ্গে আসিয়াছিল, সবই পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তবে শুনিতেছি জ্যোৎস্না রাত্রে এই জঙ্গলেই বিবাহযোগ্যা রাজকুমারীরা মৃগয়ায় আসিয়া থাকেন। গতকাল অনেকেই সঙ্গীতলহরী শুনিয়াছে। বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলে রাজার দরবার হইতে নিমন্ত্রণ আসিবেই—আসরে কি নৃত্যের ব্যবস্থা থাকিবে না ?

রাজকুমারীদের সন্ধান পাইয়া কুমার বলিলেন, আমি এখুনি প্রস্তুত।

যুবরাজ কঠোর দৃষ্টি বীরভদ্রের উপর নিক্ষেপ করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, তাহার পর আদেশ দিলেন কুমারের জন্য শিকারের ব্যবস্থা করিয়া দাও—এক শত অশ্বারোহী দেহরক্ষী যেন নিকটেই থাকে।

কুমার বলিলেন, এক শত সওয়ার লইয়া কি করিব? রাজ্যের লোক সাক্ষী রাখিয়া রসকেলি কি সমীচীন হইবে? আমি বলি রাজকুমারীদের এইখানেই ডাকিয়া আনা হোক।

মল্লরাও—শোনা যায় রাজকুমারীরা বল্লম চালাইয়া থাকেন। অভ্যর্থনার পূর্ব্বেই জীববিশেষ ভাবিয়া যদি···

কুমার চমকাইয়া বলিলেন, এইরূপ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকিলে, তাঁহাদের অস্ত্র বর্জ্জন করিয়া আসিতে বলাই বাঞ্ছনীয়।

মল্লরাও—আপনার উপদেশ খুবই মূল্যবান, কিন্তু প্রস্তাবটি করিবে কে?

কুমার—আপত্তি না থাকিলে, আমিই দূতের কাজটা করিতে পারি, আগাম দর্শনের লাভটাও হইয়া যায়।

মল্লরাও—আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি—তবে বাছাই করিতে গিয়া যেন নিজে না ভেস্তাইয়া যান।

কুমার হৃষ্টচিত্তে নিজের শিবিরে ফিরিলেন।

যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন, তুলার বস্তাকে আগুনের মুখে ফেলিয়া দিয়া কাজটা ভাল করেন নাই। কিন্তু অতিথি-সৎকারের কর্ত্তব্যবোধ বেশীক্ষণ তাঁহার মনকে ব্যাপৃত রাখিতে পারিল না। সন্ধ্যার আগমনে রহস্যময়ী বনচারিণী তাহার মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। অতিথিকে আজ জঙ্গল ছাড়িয়া দিয়াছেন, ওদিকে যাইবারও উপায় নাই। মল্লরাও অন্যমনস্ক হইবার জন্য রুদ্রবীণ লইয়া বসিলেন। বাগেশ্রীর আলাপে অল্পক্ষণেই সুর জমিয়া উঠিল। শিবিরের হট্টগোলকে সুরধ্বনি যেন আদেশ দিয়া থামাইয়া দিল। সুরের মাধ্যমে অন্তরের কথা প্রকাশ হওয়াতে ভারী মন অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল।

বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ঘণ্টাচারেক রাগিণী আলাপের পর মল্লরাও দুঃখের দরদী বীণাকে সযত্নে যথাস্থানে রাখিয়া শিবির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। অস্ফুট চাঁদের আলোর চারিপাশের দৃশ্য আবছা দেখাইতেছে। নিকটেই স্রোতস্বিনী হইতে ক্ষীণ কুল কুল ধ্বনি আসিতেছিল, যুবরাজ রাজকুমারী-প্রদত্ত বল্লম লইয়া ঐ দিকে চলিতে লাগিলেন। রাজকুমারীর পত্রে শ্লেষপূর্ণ উক্তিগুলি যেমন এক দিকে তাঁহার আত্মাভিমানকে আহত করিতেছিল অন্য দিকে তেমনই এই পত্রপ্রেরিকা কেমন প্রকৃতির নারী তাহা জানিবার জন্য যুবরাজ অধীর হইয়া উ[illegible]। নিজের অজ্ঞাতেই মনে মনে বহু বার পাষাণ-মূর্ত্তির ভিতর রাজকুমারীকে আবিষ্কার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। প্রয়োজনীয়তার তাগিদে অনেক কিছুই তিনি কল্পনায় গড়িয়া [illegible]। অবশেষে যুবরাজ নিজের সম্বন্ধে একটি সত্য আবিষ্কার করিলেন, তাহা নির্ম্মম হইলেও একান্ত সত্য,···তিনি প্রেমে পড়িয়াছেন ঐ পাষাণীর সহিত। লোকে জানিলে অবাক হইবে, তাঁহাকে বাতুল ভাবিবে, কিন্তু বিধাতার অমোঘ বিধান।

চিন্তাস্রোত যে সময় তাঁহার মনকে অকূলের দিকে টানিতেছিল সেই সময় তাঁহার পিছনে কোন ধাতব দ্রব্যের পতনের শব্দ শুনিলেন। অরণ্যে সতর্কতা শিকারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে অবাক হইয়া গেলেন, পুনরায় বল্লমের আবির্ভাব! অস্ত্র নৃত্য সুরু করিয়াছে। কোন জন্তর অস্তিত্ব নাই, বল্লম প্রায় খাড়া হইয়া উঠিতেছে, পড়িতেছে এবং তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। চলন্ত বল্লম লক্ষ্য করিয়াই তাহার গোড়ার দিকে অস্ত্র চালাইলেন। তৎক্ষণাৎ প্রথম অস্ত্রটির অগ্রগতি থামিয়া গেল, কিন্তু ভিন্ন অস্ত্র তখন নাচিতেছে। যুবরাজের অস্ত্র নরম মাটি পাওয়ায় বল্লম মজবুত হইয়া নিজেকে দাঁড় করাইয়াছিল। অভিজ্ঞতার সাহায্যে অনুমান করিলেন যে প্রাণী বল্লমকে নাচাইতেছিল সে কোন বৃহৎ সরীসৃপ না হইয়া যায় না। লক্ষ্যভেদের সফলতায় শিকারীর কৌতূহল এমন একটি স্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল যে কি মারিলেন পরীক্ষা না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না।

নিকটে আসিতে দেখিলেন, তাঁহার অনুমান কিছুমাত্র ভুল হয় নাই, অতিকায় ময়াল তাঁহাকেই ভক্ষণীয় ঠিক করিয়াছিল। কিন্তু কে তাঁহাকে মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচাইল? প্রথম নিক্ষিপ্ত বল্লম পরীক্ষার জন্য সরীসৃপের আরও নিকটে গেলেন, সাপের মাথা যুবরাজের দিকে ফিরিল, ময়ালের বাকি দেহটা যে তখন মাটিতে গাঁথা অস্ত্রকে ভাঙ্গিয়া ফেলার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল সেদিকে যুবরাজ লক্ষ্য করিবার অবকাশ পান নাই, উত্তেজনাপূর্ণ কৌতূহল তাঁহাকে অস্ত্র-পরীক্ষায় সব কিছুই ভুলাইয়াছিল। নিকটে আসিতে গোড়ালিতে ঠাণ্ডা কিছুর ছোঁয়া লাগিল। সতর্কতাকে কৌতূহল বহুদূরে সরাইয়া দিয়াছে। ছোঁয়ার চাপ পড়িতে লাগিল, তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি অস্ত্র-পরীক্ষায় ব্যস্ত, হঠাৎ সাপের দেহ দুইটি পায়েই বেষ্টন করিয়া ধরিল; যুবরাজ মাটিতে পড়িয়া গেলেন। বাঁধনের চাপ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল। হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগিয়া গিয়াছে, অসহ্য যন্ত্রণায় দম বন্ধ হইয়া আসার উপক্রম; ইতিমধ্যে আর একটি বেড় আসিয়া পড়িল তাঁহার কোমরের উপর। নূতন বাঁধন তাঁহাকে উপুড় করিয়া

ফেলিল, সাহায্যের জন্য চীৎকার করিবার ক্ষমতা নাই, যেটুকু আওয়াজ গলা হইতে বাহির হইল তাহা শ্লেষ্মাজড়িত কাশির মত ঘড়ঘড়ানি শব্দ। চাপ বাড়িয়া চলিয়াছে, শেষে জ্ঞানও লুপ্ত হইয়া গেল।

পরের দিনের ঘটনা—যুবরাজের জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে, তিনি শিবিরে শুইয়া আছেন, বৈদ্য গোড়ালিতে ঔষধের প্রলেপ লাগাইতেছেন। বীরভদ্র নিকটেই দাঁড়াইয়া। মল্লরাও প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আমাকে বাঁচাইল।" বীরভদ্র উত্তর দিলেন, "রাজকুমারীর বল্লম"। তাহার পর বিশদ বর্ণনায় জানাইলেন, অতিকায় অজগর যুবরাজকে বাঁধিয়া হাড়গোড় চূর্ণ করিবার চেষ্টায় ছিল এমন সময় কেহ সাপকে বল্লমের সাহায্যে মারিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলে। যে তাঁহাকে বাঁচাইয়াছে সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াই কাজটি করিয়াছে।

যুবরাজ—শিবিরে খবর দিল কে ?

বীরভদ্র সঠিক উত্তর দিতে পারিলেন না, বলিলেন, খবর পাইয়াই আমরা এই দিকে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম, সংবাদ-দাতাকে সনাক্ত করিয়া রাখার মত মনের অবস্থা ছিল না।

যুবরাজ—দিক্ নির্ণয় করিলে কেমন করিয়া ?

বীরভদ্র—এদিকে ঝরণা তো একটিই এবং আমাদের শিবিরের ঠিক পিছনে।

যুবরাজ বৈদ্যকে বাহিরে যাইবার আদেশ দিলেন। বীরভদ্র পর্দা ফেলিয়া নিকটে আসিতে যুবরাজ অত্যন্ত অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলেন, সখা, আমাকে দগ্ধাইয়া মারিও না, বল কে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল।

বীরভদ্র উত্তর দিলেন, কে আপনাকে বাঁচাইয়াছিল বাস্তবিকই জানি না, তবে যিনি সংবাদ দিয়াছিলেন তিনি নারী। ইহার বেশী জানিবার চেষ্টা করিবেন না, কারণ আমি নিজে জানিতে পারি নাই কে তিনি। সংবাদ-দাতাকে অধিক প্রশ্ন করিবারও সময় ছিল না, কারণ তখন আপনি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে।

সপ্তাহখানেক কাটিয়া গেলে যুবরাজ চলাফেরা করিবার আদেশ পাইলেন। পায়ের হাড় না ভাঙ্গিলেও মাংসপেশী রীতিমত জখম হইয়া গিয়াছিল—সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে আরও কিছুদিন সময় লাগিবে।

যে সময় যুবরাজ পঙ্গু অবস্থায় শয্যাশায়ী, সেই সময় শিবিরে বিচিত্র ঘটনা ঘটিতে লাগিল। দুর্ঘটনার সংবাদ কেমন করিয়া হিন্দুপুরের রাজদরবারে উপস্থিত হইয়াছিল—ফলে মহারাজ স্বয়ং আসিয়া যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন—তাহার পর প্রত্যহ রাজার প্রেরিত অশ্বারোহী তাঁহার স্বাস্থ্যের সংবাদ লইয়া যাইতে লাগিল। ইহাই শেষ নয়—মহারাজা বীরভদ্রের নিকট প্রস্তাব করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার একমাত্র কন্যা, হিন্দুপুরের ভবিষ্যৎ রাণীর সহিত যুবরাজের বিবাহ হইলে হিন্দুপুর রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা হইতে তিনি নিষ্কৃতি পান। প্রস্তাবটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যুবরাজের নিকট পেশ করিতে এক কথায় তিনি "না" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। জীবন্ত পাষাণকে তিনি দেহমন সব কিছুই অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে অন্য পাত্রীর স্থান নাই। শুধু অসম্মতি জানাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, বীরভদ্রকে উপদেশ দিলেন চন্দ্রগিরির কুমারের সহিত রাজকন্যার বিবাহের চেষ্টা করিতে।

মল্লরাও চলিবার শক্তি ফিরিয়া পাইতেই প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় বাহির হইতে লাগিলেন—প্রেম-দীক্ষাদাত্রীর সন্ধানে। এক দিন দুই দিন করিয়া সময় কাটিয়া যাইতেছিল—সেই পাষাণময় সমাধির আর সন্ধান পাইলেন না।

সেদিন প্রাতে অরণ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ক্লান্তি দূরীকরণার্থে বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন। সহসা আকাশে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। গুরুগম্ভীর নিনাদের সহিত মুষলধারায় বৃষ্টি নামিল। বিশ্রামের স্থান পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয় খুঁজিতে লাগিলেন—সামান্য চেষ্টাতেই বিরাটকায় এক বটবৃক্ষের সন্ধান পাওয়া গেল। যেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন সে জায়গাটি শুধু অস্বাভাবিক রকমের পরিষ্কারই নয়—মানুষের পদচিহ্নও সেখানে রহিয়াছে। পদচিহ্ন এত স্পষ্ট যে অনুমান হয় একটু আগেই এখানে কেহ দাঁড়াইয়াছিল। যুবরাজ সামনে মুখ রাখিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে লাগিলেন। হঠাৎ বৃক্ষমূলে দরজা খোলার আওয়াজ শুনিলেন—মরিচা পড়া কব্জার ঘর্ষণ। পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই বৃক্ষকে আচ্ছাদিত কপাট সামান্য খুলিয়াছে—পাল্লায় নরম আঙ্গুলের ডগা দেখা যাইতেছে। যে দরজা খুলিতেছিল সে নিশ্চয়ই যুবরাজকে দেখিতে পায় নাই—আঙ্গুল দেখিয়াই বুঝা যায় তাহার মুখ যুবরাজের দক্ষিণ দিকে। এই সময় যুবরাজের মাথায় এক দুষ্টবুদ্ধি আসিল। তিনি এক হাতে দরজার উপর চাপ রাখিয়া অপর হাত দিয়া ভিতরের মানুষটির কব্জি ধরিয়া টান দিলেন। স্বল্প চেষ্টাতেই আঙ্গুলের মালিককে বাহির হইয়া আসিতে হইল। যে আসিল, সে নারী—লজ্জাবনতা। জোর করিয়া মুখ তুলিয়া ধরিতে দেখিলেন, ভুল করিয়াছেন। যাহাকে খুঁজিতেছিলেন, এ সে নয়। যুবরাজ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "ক্ষমা কর দেবী, কিন্তু জানিতে ইচ্ছা হয় গভীর অরণ্যে এই বিচিত্র গুপ্তস্থানে তুমি কি করিতেছ। দরজার গহ্বরে দেখিতেছি সুড়ঙ্গ-পথ; পথটি কোথায় গিয়াছে বলিতে পার ?"

নারী কৌতুহলে বলিল, আপনার সন্ধানেই আমি রাজ-

কুমারীর আদেশে আসিয়াছি—আপনি আমার সঙ্গে

মাটির নীচে রাজকুমারী ? তবে কি যাহাকে খুঁজিতেছেন সেই রহস্যময়ী বনচারিণীই যুবরাজকে স্মরণ করিয়াছে ? সন্দিগ্ধ পুলক যুবরাজের মনকে আগুয়ান করিয়া দিল। তিনি বলিলেন, চল, আমি প্রস্তুত। রমণী জানাইল তৎপূর্ব্বে রাজকুমারীর একটি অনুরোধ রাখিতে হইবে। আপনার চোখ বাঁধিয়া লইয়া যাইবার আদেশ আছে।

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, চোখ ত বাঁধিবে তুমি, ঐ নরম আঙুলের বাঁধন খুলিয়া ফেলিতে কতক্ষণ, মাঝ রাস্তায় এইরূপ ইচ্ছা হইলে তোমাদের গোপন পথ ত অজানা থাকিবে না।

রমণী—গোপন পথ একটি মাত্র, কিন্তু মাটির তলায় সুড়ঙ্গ যে অনেক আছে। রাজকন্তা এই সুড়ঙ্গপথ দিয়াই বরাহ ও বাঘের সন্ধানে ঘুরিয়া থাকেন। এই জঙ্গলে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে গুপ্ত সুড়ঙ্গগুলি পৌঁছাইয়া না দিতে পারে। তা ছাড়া আপনার সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইলে আপনি বাহির হইবামাত্র আপনার জানা পথ বন্ধ হইয়া যাইবে, প্রয়োজন হইলে পথের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। এইখানেই সাবধানতার শেষ নয়, আদেশের সামান্ত বিরুদ্ধাচরণ করিলেই, আপনার অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিবে। কয়েক দিন আগেই তাহার কিছু পরিচয় পাইয়াছেন।…একটু থামিয়া রমণী আবার বলিতে লাগিল :

আসলে এই সুড়ঙ্গ-পথগুলি যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছে। স্থলপথে আমাদের রাজ্য আক্রমণ করিতে হইলে জঙ্গল অতিক্রম না করিয়া উপায় নাই, এবং জঙ্গলে বিপক্ষের সেনা ঢুকিলে আমাদের যোদ্ধারা অলক্ষ্যে থাকিয়া কি ভাবে শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করিবে সহজেই অনুমান করিতে পারেন। এই সুড়ঙ্গের সাহায্য ছাড়া রাজকুমারী আপনাকে অজগরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন না। এই পর্য্যন্ত বলিয়া রমণী ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। কিন্তু তাহাতে যুবরাজের মোটেই চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল না। তিনি পুনরায় রাজকুমারীর প্রসঙ্গই উত্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের রাজকুমারীর কি মর্ম্মর-মূর্ত্তি আছে ? আমি যেন তাহা দেখিয়াছি।

রমণী—আমি যাহা বলিলাম তাহার অধিক জানিতে হইলে রাজকুমারীকেই জিজ্ঞাসা করিবেন, এখন ভিতরে আসুন।—তাঁহার কথামত যুবরাজ বৃক্ষগহ্বরে প্রবেশ করিলেন, রমণী দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গাঢ় অন্ধকার, তথাপি রমণী তাঁহার চোখ বাঁধিতে আরম্ভ করিল, সুকোমল স্পর্শ যুবরাজের মন্দ লাগিতেছিল না।

বন্ধন শেষ হইতে রমণী যুবরাজের হাত ধরিয়া বলিল—চলুন। সেই আঁকাবাঁকা পথ, সেই সিঁড়ির ধাপ। যখন চলা থামিল তখন রমণী হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল—আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি রাজকুমারীকে সংবাদ দিয়া আসি। রমণী চলিয়া গেল, কিন্তু ফিরিল না যুবরাজ বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, স্বহস্তেই বাঁধন খুলিয়া ফেলিতে যাইতেছিলেন। হঠাৎ কপালে নরম আঙুলের ছোঁয়া পাইলেন। চোখের বাঁধন খুলিয়া গেল, কিন্তু যে খুলিল, তাহাকে দেখা যায় না, জমাট অন্ধকারে দৃষ্টি অবরুদ্ধ। যে চোখের বাঁধন খুলিয়া দিতেছিল, সে নিঃসন্দেহ নারী—হাতের তেলোর স্পর্শ হইতেই তাহা অনুমান করা চলে। ধীরে ধীরে নারী অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। উভয়ের মাঝে ব্যবধান তিরোহিত হইয়া যাইতেছে, নারীর তপ্ত নিঃশ্বাস যুবরাজ গণ্ডের অতি নিকটে অনুভব করিতেছেন। এই সময় পূর্ব্বেকার মতই ধীরে আলো আসিতে লাগিল। যাহাকে দেখিলেন, তাহার সহিত পাষাণ-মূর্ত্তি বা পথপ্রদর্শিকা রমণীর কোন সাদৃশ্য নাই। যে উত্তেজনা এতক্ষণ যুবরাজকে অস্থির করিয়া রাখিয়াছিল তাহা ক্ষণিকে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন তিনি প্রবঞ্চনার মায়াজালে আটকা পড়িয়াছেন। নারীর প্রেমকে তিনি চিরকাল ক্রীড়ার বস্তু ভাবিতেন। সেই নিষ্ঠায় বিঘ্ন ঘটাইল অপরিচিতা প্রেমিকা। অকস্মাৎ যুবরাজ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। রমণীকে আদেশ দিলেন—তোমাদের রাজকুমারীকে ডাকিয়া দাও, তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের আশাতেই এখানে আসিয়াছি। রমণী পরম নির্লিপ্ততার সহিত উত্তর দিল—রাজকুমারী প্রমোদ-বিহারে ব্যস্ত আছেন, এখন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কোন আশা নাই। আপনাদের চন্দ্রগিরির কুমার নৃত্যশালায় উপস্থিত।

যুবরাজের হৃদ্গহ্বরে একটি বারুদখানা লুকানো থাকিত, ঠিক তাহার মাঝখানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ গিয়া পড়িল। বিনা শব্দে বিস্ফোরণ ঘটিল, তিনি প্রশ্ন করিলেন—প্রমোদ-বিহারের সঙ্গী হইবার জন্ত নিত্য নব নব পুরুষ আসিয়া থাকে নাকি ?

রমণী সে প্রশ্নের সোজা জবাব না দিয়া ঘোরালো ভাবে বলিল—আপনার অভ্যর্থনার ভার আমার উপর পড়িয়াছে। যুবরাজ বলিলেন—প্রবঞ্চনা তোমাদের অভ্যর্থনার অঙ্গ জানিলে এখানে আসিতাম না; এখন বাহির হইবার পথ দেখাইয়া দাও, তাহা হইলেই আমার প্রতি যথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করা হইবে। উত্তর কিছু আসিল না, কিন্তু ঘর মুহূর্ত্তে অন্ধকার হইয়া গেল, পুনরায় নারীদেহের স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলেন, স্খলিত বাক্যে নারী ব্যাকুল ভাবে আত্মনিবেদন করিয়া চলিয়াছে।

যুবরাজ ঈষৎ বলপ্রয়োগেই নারীর বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিলেন। স্থানটি তাঁহার নিকট নরককুণ্ড সামিল হইয়া উঠিয়াছিল। নারীর কবল হইতে মুক্তি পাইয়াও নিজেকে

নিরাপদ ভাবিতে পা[illegible] না। যে-কোন আকস্মিক ঘটনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। এই সময় ঘরের ভিতর সুমিষ্ট পরিচিত গন্ধ বহিতে সুরু করিল। পূর্ব্ব [illegible] যে চিত্তচঞ্চলকারী মাদকতা অনুভব করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাহার কোন প্রভাব নাই—বরং একটি অপরূপ স্নিগ্ধতা অনুভূত হইতেছে। গন্ধের সহিত আলো আসিতে লাগিল—তাহার সহিত নূপুরের রিমিঝিমি রব ধ্বনিত হইতে লাগিল। ধ্বনি নর্ত্তকীর পদবিক্ষেপ হইতে আসিতেছিল না। মনে হইল একাধিক নারী যেন তাঁহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে। যুগপৎ কুতূহলী ও সতর্ক হইয়া যুবরাজ নতুন ঘটনার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যুবরাজ দেখিলেন সখীপরিবেষ্টিতা হইয়া মন্থর গমনে মাল্যহস্তে আসিতেছেন এক অপূর্ব্ব সুন্দরী তরুণী—যেন সেই পূর্ব্বদৃষ্ট পাষাণমূর্ত্তিই সচল হইয়া উঠিয়াছে। কপালে চন্দনের টিকা, বাহুতে বাজুবন্ধ, অঙ্গবাসে রাঙা জবার রং উপচাইয়া পড়িতেছে, যেন কোন পবিত্র উৎসব-সম্মেলনে চলিয়াছেন। একান্ত বাঞ্ছিতার নব রূপ দর্শনে যুবরাজের মন গভীর প্রশান্তিতে ভরিয়া উঠিল।

রাজকুমারী যুবরাজের নিকটে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পদধূলি মাথায় লইয়া মালা যুবরাজের গলায় পরাইয়া দিলেন। যুবরাজ প্রথমে এমনই বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলেন যে, প্রবঞ্চনা, আত্মাভিমান ইত্যাদির কথা মনে আসে নাই। কিন্তু নারী পুরুষের পাদস্পর্শ করিয়াছে—যুবরাজের ক্ষুব্ধ পৌরুষ পুনরায় জাগরিত হইয়া উঠিল, রাজকুমারীর পত্রের শ্লেষ-বাণী মনে করাইয়া দিল—"তোমার সময় আসিয়াছে, যা-কিছু বলিবার আছে প্রাণ খুলিয়া প্রকাশ কর।" যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, মালাটা কি চন্দ্রগিরির কুমার ব্যবহার করেন নাই বলিয়া আমার জন্য লইয়া আসিয়াছ?

যুবরাজের প্রশ্ন শুনিয়া রাজকুমারীর মাথা নত হইয়া গিয়াছিল। অবনত মস্তকেই জানাইলেন, এই সুড়ঙ্গ-পথে যুবরাজ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ জীবন্ত অবস্থায় প্রবেশাধিকার পায় নাই। আমার সখীরা আপনাকে পরীক্ষা করিতেছিল, আমারই আদেশে। প্রভুকে যেদিন দেখিয়াছি, সেই দিনই নিজেকে আপনার দাসী ভাবিয়াছি, আপনার চরণতলে দেহ ও মনকে অর্ঘ্য দিয়াছি। আমাকে গ্রহণ বা পরিত্যাগ করা আপনার ইচ্ছা।

রাজ্যদানের কথাই [illegible] মন হইতে চলিয়া গিয়াছিল। যুবরাজের আত্মাভিমান তখনও সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত হয় নাই। পত্রের শ্লেষপূর্ণ কথাগুলি তখনও অন্তর জ্বালাইতেছিল, বলিলেন—তোমাকে বিশ্বাস করিতে আপত্তি নাই কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আমাকে কুৎসিত প্রলোভন দেখাইয়া সংগ্রহ করিলে কেন? রাজকুমারী উত্তর দিলেন, প্রভু, আপনি যে ভোগী, ভোগের প্রলোভন দেখাইয়া যদি আপনাকে পাইয়া থাকি, তাহা হইলেও দোষণীয় বলিতে পারেন না। যে মুহূর্ত্তে আপনাকে মন সমর্পণ করিয়াছিলাম সেই মুহূর্ত্তেই ধর্ম্মত: আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং স্ত্রী হইয়া যদি কামনা-উদ্দীপক ছলা-কলার আশ্রয় লইয়া থাকি তাহা হইলে তাহাকে কুৎসিত বলেন কেমন করিয়া? আপনাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টায় সখী দুইটি ব্যর্থ হওয়ায় আপনার প্রেমের একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে নি:সংশয় হইয়াছি। চন্দ্রগিরির কুমারের জন্য উহাদিগকে আপনার শিবিরে পাঠাইয়া দিয়াছি।

যুবরাজ তুষ্ট হইয়াই বলিলেন, এখন আমাকে যাইতে দাও, তাহা না হইলে কাল সকালে ঐ কুমারের সহিত তোমার বিবাহের প্রস্তাব রাজদরবারে উপস্থিত হইবে। কথা শুনিয়া রাজকুমারী কঠোর হইয়া উঠিতেছিলেন—সুস্পষ্ট আলোকেই যুবরাজ উৎকোচ দিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

শিবিরে পৌঁছিয়া যুবরাজ শুনিলেন, কুমারের আস্তানায় দুইটি নূতন নর্ত্তকী আসিয়াছে। যুবরাজ ভাবিয়া দেখিলেন, রাজকুমারীর সহিত কুমারের বিবাহের প্রস্তাব রাজদরবারে চলিয়া গিয়া থাকিলে পরিবর্ত্তন লজ্জাকর ব্যাপার। প্রস্তাবটি মহারাজার হাতে পড়ার আগে যেমন করিয়া হউক হস্তগত করিতে হইবে।

বীরভদ্রকে আলাদা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রগিরির কুমারের বিবাহ-প্রস্তাব চলিয়া গিয়াছে নাকি?

বীরভদ্র উত্তর দিলেন, কুমারের কাজ ত পাকা হয়ে গিয়েছে, তোমার আদেশেই মহারাজার কাছে খবর গেছে একটু আগে।

যুবরাজ প্রমাদ গণিলেন। বীরভদ্রকে বিদায় দিয়া ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া ছুটিলেন হিন্দুপুরের প্রাসাদাভিমুখে।

যুদ্ধ-নৃত্য সজ্জায় একদল নিগ্রো পুরুষ

নিগ্রোদের দেশ

শ্রীসুনীলপ্রকাশ সোম

নিগ্রোজাতির দেশ বলতে আফ্রিকাই বুঝায়। শ্বেতাঙ্গ লেখকেরা আফ্রিকাকে 'Dark Continent' অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলেন। নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগে বলে নিরপেক্ষভাবে কিছু লেখা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সেজন্য তাঁদের লেখায় আফ্রিকা এবং সেখানকার বাসিন্দা নিগ্রোদের সত্যচিত্র পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান লেখক যখন আফ্রিকায় যান পূর্ব্ব-আফ্রিকায় তখন পুরাদমে যুদ্ধ চলছিল। জেনারেল ভন্ লিটো ভরবেক্ অতি অল্পসংখ্যক জার্ম্মান সৈন্য নিয়ে অপূর্ব্ব বীরত্বের সহিত প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশবাহিনীর সহিত ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। জেনারেল স্মাট্‌স্ যখন পূর্ব্ব-আফ্রিকার জার্ম্মান অধিকৃত স্থানগুলি ধীরে ধীরে দখল করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করছিলেন তখন আমি পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ছিলাম। সেই সময়ে আফ্রিকাতে যা দেখেছি—আফ্রি[illegible] সম্বন্ধে যা জেনেছি, তাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে বর্ণনা করব।

আফ্রিকার অনেক শহরে এস্‌ফল্ট্ দেওয়া চওড়া রাস্তা আছে। পথের দু'ধারে সুসজ্জিত বাগানের পাশে সুন্দর সুন্দর বাংলো ধরণের বাড়ীগুলি দেখতে চমৎকার। মোম্বাসা, নায়রোবী, জান্জিবার, দার-উস্-সালাম, পোর্ট এমেলিয়া ইত্যাদি দেখে এই কথাটি মনে হয়েছিল, শ্বেতাঙ্গ লেখকগণ আফ্রিকা সম্বন্ধে লোকের মনে কি ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করবার প্রয়াসই না পেয়েছেন। পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য্য প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহের মধ্যে আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া প্রপাত এবং আমেরিকার নায়েগ্রা প্রপাতের নামই সকলের আগে মনে পড়ে। আফ্রিকার

মায়ের পিঠে শিশু

ভিক্টোরিয়া হ্রদ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় হ্রদ। এই হ্রদ থেকে একটি খণ্ড জলস্রোত বাইরে চলে গেছে। এই জল-স্রোতের নামকরণ করা হয়েছে ষ্ট্যানলী প্রপাত। এই প্রপাত থিনকা গ্রাম থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে অবস্থিত। শহরের ঠিক

দিয়ে একটা পথ দক্ষিণ দিকে বেঁকে একেবারে প্রপাতের কাছে চলে গেছে। যাতে স্রোত বাঁ দিকে আর

নাকে ও পায়ে উদ্ভট আকারের অলঙ্কার-পরিহিত একজন নিগ্রো পুরুষ

অগ্রসর হতে না পারে সেজন্তে প্রপাতের দিকটা বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রপাতের উভয় দিকেই শক্ত পাথর। কোয়ার্টস্, গ্র্যানাইট এবং মসৃণ স্যাণ্ডষ্টোন প্রপাতের বাম পার্শ্বে দেখতে পাওয়া যায়। প্রপাতের মাঝখানের গভীরতা আনুমানিক দশ থেকে পনর ফুটের বেশী হবে বলে মনে হয় না। ইঞ্জিনিয়ারদের ধারণা এখান থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যাবে তা দিয়ে সমগ্র আফ্রিকাকে আলোকিত করা সম্ভবপর হবে। অথচ খিনবাতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে প্রচুর কয়লা পোড়াতে হয়। এখানে পাওয়ার হাউসে উৎপন্ন বিদ্যুতের প্রত্যেক ইউনিটের মূল্য পঁচিশ থেকে ত্রিশ সেণ্ট। যদি এখানে জলস্রোত থেকে বিজলী তৈরির ব্যবস্থা হ'ত তা হলে এক সেণ্ট করে ইউনিট বিক্রী করলেও বেশ মুনাফা থাকত।

আফ্রিকার দাস-ব্যবসায় কিরূপ লাভজনক ছিল সেকথা অনেকেরই জানা আছে। আরব, পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি অনেক সভ্যদেশের ব্যবসায়ীরা এই ঘৃণিত ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। আরবেরা গ্রাম থেকে নিগ্রোদের ধরে নিয়ে আসত, আর শ্বেতাঙ্গরা তাদের কিনে নিয়ে বিদেশে চালান দিত। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে পর্তুগীজরাই এ ব্যবসায়ে সবাইকে টেক্কা দিয়েছিল। তারা হাজার হাজার নিগ্রোকে জাহাজে করে বিদেশে চালান দিত। যাদের ধরে আনা হ'ত, তাদের গভীর রাত্রে সংগোপনে জাহাজে উঠানো হ'ত; জাহাজ ভর্তি হয়ে যাবার পর যাদের স্থান সঙ্কুলান হ'ত না, তাদের মেরে ফেলা হ'ত। মোম্বাসাতে ভাস্কো-ডি-গামা ষ্ট্রীটে এদের জন্ম লোকচক্ষুর অগোচরে একটা প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ খনন করে রাখা হয়েছিল। এই সুড়ঙ্গের সহিত অনেক লোমহর্ষণ ব্যাপারের স্মৃতি বিজড়িত। লিভিংষ্টোন এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে ব্যথিত-চিত্তে লিখেছিলেন—

"Blood, blood, everywhere. Africa was bleeding to death. Villages were littered with skeletons
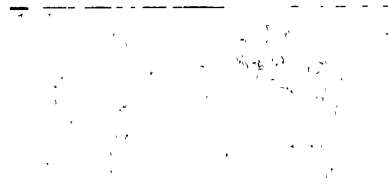
পূর্ব্ব-আফ্রিকার শঙ্খচূড় জাতীয় সর্প

in the slave raids and human blood and wildernesses reigned where there had been gardens." অর্থাৎ—রক্ত, রক্ত, সর্ব্বত্রই রক্ত—রক্তমোক্ষণ করতে করতে আফ্রিকা এগিয়ে চলেছে মরণের পথে। গ্রামগুলি দাস-ব্যবসায়ীগণ কর্ত্তৃক নিহত নরকঙ্কালে পূর্ণ। যেখানে এক সময় ছিল উদ্যানের শোভা, এখন সেখানে নররক্তের স্রোত আর

নির্জনতা।—কথিত আছে, লিভিংষ্টোন যখন আফ্রিকায় ভ্রমণ করতে যান তখন প্রতি বৎসরে প্রায় কুড়ি লক্ষ ক্রীতদাসকে জাহাজে করে বিদেশে চালান দেওয়া হ'ত।

আফ্রিকার জঙ্গলের অধিবাসী দুই জন উলঙ্গপ্রায় নিগ্রো

আফ্রিকায় ভারতের অনেক লোক বহুকাল যাবৎ বাস করে আসছে। প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে পোরবন্দরের গুজরাটী বণিকেরা আফ্রিকায় প্রথমে ব্যবসা করতে যায়। তখনকার দিনে পূর্ব্ব-আফ্রিকায় আরবদের খুব বেশী প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না। অনেক ভারতবাসী মোম্বাসা, জাঞ্জিবার এবং নায়রোবীতে দীর্ঘকাল ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রভুত অর্থ উপার্জ্জন করেছিলেন। এঁদের চেষ্টায় সেখানে ভারতীয়দের উপনিবেশও গড়ে উঠেছিল। পোরবন্দরের শাসনকর্ত্তা যখন শুনলেন যে সেই সুদূর বিদেশে গিয়ে হিন্দুরা উপনিবেশ স্থাপন করেছে, তখন তিনি ঔপনিবেশিক হিন্দুদের বিধর্ম্মী বলে ঘোষণা করেন। যে সকল হিন্দু লোকলস্কর ইত্যাদি নিয়ে যাবার জন্য পোরবন্দরে এসেছিল, তারাই প্রথমে পোর-বন্দরের শাসনকর্ত্তার আদেশে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তারা আফ্রিকায় ফিরে গিয়ে অন্যান্য জাতভায়েদের কাছে যখন বললে যে তারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে, তখন আফ্রিকায় প্রবাসী হিন্দুদের মনে স্বধর্ম্মচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় বিষাদের ছায়া পড়ল। অনেকেই দেশে ফিরে গিয়ে জানালে যে তারা সাগর পার হয় নি, বোম্বাই থেকে অথবা ভারতের অন্য কোন বন্দর থেকে ফিরে এসেছে। আফ্রিকায় যারা রয়ে গেল তারা প্রায় সবাই হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করল। এরই ফলে ভারতীয় হিন্দুদের আফ্রিকা যাত্রার উৎসাহ উবে গেল। এর কয়েক বৎসর পরে আরবেরা আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের আক্রমণ করে তাদের উপনিবেশ দখল করে নেয়।

পূর্ব্ব-আফ্রিকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই সুন্দর। সমতল ভূমির উপর হঠাৎ এক একটি পাহাড় যেন মাথা উঁচু করে

চামড়ায় তৈরি পোশাক পরিহিত দুইটি নিগ্রো যুবতী

দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের উপরকার জমি প্রায়ই বন্ধুর এবং উচ্চাবচ। সমতল অঞ্চলে অনেক জায়গায় রাস্তার দু'পাশে আনারসের বাগান, আখের ক্ষেত এবং মাঝে মাঝে কার্পাসের ক্ষেত দেখতে পাওয়া যায়। আনারসের বাগান, আম, কাঁঠাল এবং নারিকেল গাছ আফ্রিকার অনেক জায়গাতেই

রয়েছে। এখনও এরা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও শিক্ষার আলোক পায় নি। কয়েক জায়গায় খ্রীষ্টান মিশনরীরা তাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার প্রতিই উৎসাহ বেশী—লেখাপড়া বা অন্যান্য বিষয় শিক্ষাদানের প্রতি তেমন মনোযোগ নাই। কয়েকটি গ্রামে লক্ষ্য করে দেখেছি প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের মস্তক মুণ্ডিত। 'আলোকপ্রাপ্ত' নিগ্রোরা ছেলেমেয়েদের মাথা প্রায়ই মুণ্ডন করে দেয়। অনেকের ধারণা বার বার মস্তক মুণ্ডন করলে চুল আর তেমন কোঁকড়ানো থাকে না।

আফ্রিকার শহরগুলিতে 'ডু-ডু' পোকার ভয়ানক উপদ্রব। এই পোকার আক্রমণে এখানকার অধিবাসীদের যন্ত্রণার একশেষ হয়। ডু-ডু পোকা সাধারণতঃ হাত এবং পায়ের নখের ভিতরে এমন অদৃশ্যভাবে প্রবেশ করে যে, প্রথমে কিছুই টের পাওয়া যায় না। নখের মধ্যে প্রবেশ করার পর তারা নখের মাংস খেতে সুরু করে। এতে নখে ভয়ঙ্কর ব্যথা হয়। আফ্রিকার সর্ব্বত্র নিগ্রোরা কি করে নখ হতে ডু-ডু পোকা বের করতে হয় তা বেশ ভাল করে জানে। ডু-ডু পোকা দংশন করবামাত্রই তার প্রতিকারের জন্য যত্নবান হওয়া আবশ্যক—সময়ে সাবধান না হলে অনেক সময় দষ্ট স্থান বিষাক্ত হয়ে যায়, তখন অঙ্গচ্ছেদ ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। ডু-ডু পোকাকে ইংরেজীতে Giggers বলে।

আফ্রিকার একজন নিগ্রো পুলিশ কর্ম্মচারী ও তার স্ত্রী

আছে। সমতল অঞ্চলের অনেক জায়গায় জমির উপরটা ভিজা, আবার দু'হাত নীচেই একেবারে শক্ত পাথর।

আফ্রিকার অভ্যন্তর-প্রদেশে এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে আজও স্ত্রী-পুরুষ সকলেই উলঙ্গ থাকে। এরা চাষ-আবাদ কিছুই করে না। গো-পালন এদের একমাত্র বৃত্তি। গরুর দুধ, গরুর মাংস, শূকর ও ছাগল এদের প্রধান খাদ্য। এক দিন একটি গ্রামে একটি নালার পাশে একজন নগ্ন নিগ্রো পুরুষকে স্নানরত অবস্থায় দেখেছিলাম। কি সুন্দর সুগঠিত তার শরীর! নিগ্রোদের মাথার চুল ভেড়ার লোমের মত কোঁকড়ানো। ওদের কান ছোট, নাক চেপ্টা, বুক, হাত, পা বেশ চওড়া এবং পুষ্ট। এদের দেহের রং কালো কুচকুচে। স্নানরত লোকটি তার শরীর ভাল করেই মার্জ্জন করলে, কিন্তু মাথায় এক ফোঁটা জলও দিল না। কাছে গিয়ে দেখলাম একপ্রকার হলদে মাটি চুলে মাখানো

আফ্রিকার জঙ্গলের গণ্ডার

আফ্রিকার অনেক শহরে খোজা মুসলমান, গুজরাটী হিন্দু এবং পঞ্জাবী মুসলমান ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বাস করে। বহু শিখ মোম্বাসা, জাঞ্জিবার, নায়রোবী ইত্যাদি শহরে দিন-মজুরি করে জীবিকা অর্জ্জন করেছে। খোজা মুসলমান এবং গুজরাটী হিন্দুদের নিগ্রোরা এবং আরবেরা তেমন সম্মানের চক্ষে দেখে না। কেননা তারা আঘাত পেলে আঘাত ফিরিয়ে দেয় না। আরব এবং নিগ্রোরা প্রথম প্রথম শিখদেরও অবহেলার চক্ষে দেখত—পথে ঘাটে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত। শিখরা অনেক দিন সে অত্যাচার সহ্য করেছিল, কিন্তু হঠাৎ

পূর্ব্ব-আফ্রিকার গ্রামাঞ্চলের একটি পান্থশালা

এক দিন কালসিং নামক একজন শিখ তলোয়ার হাতে করে মোম্বাসার বাজারে বিচরণ করতে থাকে এবং কয়েকজন আরব, নিগ্রো এবং সোমালিকে হত্যা করে। এর পর থেকে শিখদের আরব ও নিগ্রোরা বেশ সমীহ করতে আরম্ভ করে এবং শিখদের শিখ না বলে 'কালাসিংহা' নাম দেয়।

আফ্রিকার উচ্চভূমিতে ভারতবাসী জমি কিনতে পারে না। আপন ইচ্ছামত বাড়ীঘর তৈরি করতেও পারে না। ডাক-বাংলোতে গিয়ে টাকা খরচ করে থাকবার সঙ্গতিও অধিকাংশ ভারতবাসীর নেই। ইউরোপীয় হোটেলেও তাদের প্রবেশ নিষেধ। ইউরোপীয় রেস্তোরাঁতে ভারতবাসীর প্রতি অনাদর প্রদর্শন করা হয়।

নিগ্রোদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশবার সুযোগ বর্ত্তমান লেখকের হয়েছিল। দেখেছি তারা বেশী কথা বলে না। তারা একতারার মত একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাদনে পটু। কেনিয়াতে এক দিন পথের পাশে বসে চারদিকের দৃশ্য দেখছিলাম। এমন সময় কতকগুলি নিগ্রো মেয়ে পাশ দিয়ে চঞ্চল চরণে দ্রুত-গতিতে চলে গেল। তাদের নাকে নথ ঝুলছে হিন্দুস্থানী মেয়েদের মত—হাতে এবং পায়ে তারা কাচের গহনা পরেছে। শরীরের সর্ব্বত্র উল্কি কাটা। নিগ্রোদের মধ্যে অঙ্গশোভা বর্দ্ধনের জন্য উল্কি পরা, দাঁত উঠিয়ে ফেলা, মাথায় হলুদে মাটি মাখা, নাকে এবং কানে ছিদ্র করে নানারূপ গহনা পরা ইত্যাদি নানা উৎকট প্রথা প্রচলিত আছে।

আফ্রিকার জঙ্গলে হাজার হাজার হরিণ একসঙ্গে বিচরণ করে। বন্য গরু, উটপাখী, জেব্রা, জিরাফ প্রভৃতিও এখানকার অরণ্যচারী জানোয়ার। জিরাফগুলি যখন মাথা তুলিয়ে দলে দলে এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় যেতে থাকে—তখনকার দৃশ্যটি উপভোগ্য। আফ্রিকার জঙ্গলের বন্য মহিষ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর জীব। সিংহ পর্য্যন্ত এই বুনো মোষের কাছে সংগ্রামে পরাস্ত হয়।

আফ্রিকার জঙ্গলের হাতীর পাল বড় বড় সিংহকে যখন একযোগে আক্রমণ করে তখন সিংহ প্রাণের ভয়ে পালাতে বাধ্য হয়। হাতী প্রায়ই জলাভূমিতে থাকে।

আফ্রিকার শহরে যে পল্লীতে ভারতীয়েরা থাকে সেই অঞ্চলের একটা বৈষম্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করে মনে বেদনা অনুভব করেছিলাম। সেখানে খ্রীষ্টান ভারতীয়েরা তাদের গির্জ্জা করেছে একটি নিতান্ত সাদামাটা ঘরে। নিগ্রোদের তার ভারতীয়েরাও শ্বেতাঙ্গদের গির্জ্জার ছায়া মাড়াতে পারে না। ওদিকে আবার বোরাদের মসজিদে খোজা ছাড়া অন্য মুসলমান অথবা নিগ্রোর প্রবেশ নিষেধ। নিগ্রোরা যদি কেউ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করতে চায়, তবে তাদের শিয়া ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয় না। পূর্ব্বেই বলেছি আফ্রিকার অনেক জায়গাতেই খোজা মুসলমানের বাস। খোজা স্ত্রীলোকেরা বাঙালী মেয়েদের ধরনে শাড়ী পরেন। তাদের ধর্ম্মপুস্তক নাকি পুরাতন সিন্ধী অক্ষরে লেখা।

নিগ্রোজাতির দেশ আফ্রিকাকে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়ে বেশ আরামেই প্রভুত্ব করছে। বেলজিয়ম দখল করে রেখেছে কঙ্গো প্রদেশ; ফরাসীর অধীনে সাহারা, ব্রিটিশের অধীনে পূর্ব্ব-আফ্রিকা, পশ্চিম-আফ্রিকা, মধ্য-আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা; পর্তুগীজের অধীনে আছে পূর্ব্ব-আফ্রিকার কিয়দংশ, তারপর আছে অন্যান্য ছোট ছোট

রাজ্য—আরবরা মিশর এবং আরও কয়েকটা জায়গা দখল করে রেখেছে। নিগ্রোরা যখনই স্বাধীন হবার জন্ত বিদ্রোহ করে, তখনই বিদেশীরা তাদের কঠোর হস্তে দমন করে। নিগ্রোরা স্বাধীনতার জন্ত অনেকবার সংগ্রাম করেছে। ব্রিটিশের সঙ্গেও তারা জোর লড়েছিল। ব্রিটিশের আগমনের পূর্ব্বে আরবদের সঙ্গেও তারা অনেকবার লড়াই করেছিল। কিন্তু আধুনিক মারণাস্ত্রের সামনে তাদের বর্শা, তীর ধনুক কার্য্যকরী হতে পারে নি। ছলে বলে কৌশলে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ আফ্রিকার উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং দীর্ঘকাল ধরে অকথ্য অত্যাচার-উৎপীড়ন করে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এমনিভাবে জাতি যখন অবনতির শেষ সোপানে এসে দাঁড়াল তখন কয়েকজন দেশপ্রেমিক নিগ্রো স্বদেশের দুর্গতি দূরীকরণ মানসে আমেরিকায় একটি সমিতি গঠন করলেন—তার নাম African Communities League—অর্থাৎ 'আফ্রিকার আদিম অধিবাসী সঙ্ঘ'। এই সমিতি নানা বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়ে নিগ্রোদের জন্মগত স্বাধীনতার দাবি প্রচার করতে লাগল। এই সমিতি কর্ত্তৃক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তার নাম 'Negro World' এই পত্রিকাখানিতে অনেক সুচিন্তিত রচনা প্রকাশিত হয়। নিগ্রো জাতির মুক্তির পথ প্রশস্ত ও নিষ্কণ্টক করবার উদ্দেশ্যে

আফ্রিকার 'আদিম অধিবাসী সঙ্ঘে'র সভ্যগণ

জাতীয়তাবাদী নিগ্রোরা আফ্রিকাকে নিজেদের মাতৃভূমি বলে জোরগলায় দাবি করতে সুরু করেছে। প্রেসিডেণ্ট মার্কাস গারভি অত্যাচরিত নিগ্রোদের স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে নিম্নোক্ত কথাগুলি বলেছেন :

"What is good for the whiteman is equally good for the negro, namely, freedom, liberty, and equality. If the Englishman claims England, the Frenchman France, the Italians Italy, as their native habitat, then the negroes claim Africa and will shed blood for their claim.

"The bloodiest of all wars is yet to come, when Europe will match its strength against Asia and that will be the negro's opportunity to draw sword for Africa's redemption."

পূর্ব্ব-আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহ

তাৎপর্য্য—"শিক্ষিত নিগ্রোরা নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্ত আফ্রিকায় গণতান্ত্রিকতার প্রবর্ত্তন কামনা করেন। নিগ্রোজাতি নিজেদের জাতীয় সত্তাকে ফিরে পাবার জন্ত যে ব্যাকুলতা অনুভব করছে, তাতে মনে হয় ভবিষ্যতে শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তারা পরবশ্যতার শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে নিজেদের মাতৃভূমিকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

স্বাধীনতা এবং সাম্য শ্বেতাঙ্গের পক্ষে যেমন কল্যাণকর নিগ্রোর পক্ষেও তেমনি সমভাবে মঙ্গলজনক। ইংরেজ যদি ইংলণ্ডকে, ফরাসী যদি ফ্রান্সকে, ইটালীর যদি ইটালীকে

নিজেদের বাসভূমি বলে দাবি করতে পারে তা হলে নিগ্রোরাও আফ্রিকার উপর তাদের দাবি জানাতে পারে এবং এই দাবি আদায় করবার জন্যে তারা রক্তপাতেও কুণ্ঠিত হবে না।... সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ যুদ্ধ আসতে এখনও অনেক দেরি। সেই যুদ্ধে এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের শক্তি-প্রতিযোগিতার পরীক্ষা হবে এবং আফ্রিকার মুক্তির জন্য তরবারি কোষমুক্ত করবার সেই হবে নিগ্রোদের সুবর্ণ-সুযোগ।"

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

মহাশূন্যে অনন্ত নীলিমা ;
অনন্ত মাধুরী রাজে নীলাম্বু সলিলে,
ধ্যানমগ্ন অরবিন্দ ঋষি !
কুমারিকা উচ্ছলিতা ধ্যানমহিমায়,
প্রভাতের নবার্ক-স্বপন
সিন্ধুর সলিল মাঝে উত্তরিল আসি'
চেতনার দিব্য রূপান্তরে
অনন্তের ছন্দ বিকশিয়া—
মূর্ত্ত হ'ল যুগ-গুরু সাধনা-প্রাঙ্গণে
ভাগবত অনুভূতি।

দৃশ্য যাহা, অদৃশ্য অতলে
অন্তরীক্ষে আছে বহমান—
জড়মাঝে প্রাণময় মনোময়
সূক্ষ্মরূপ ধরি'—
আনিলে সেথায় তুমি
বিবর্ত্তন সূত্র অনুসরি'
ভাগবত মানস-বিসার !
অভ্রান্ত দৃষ্টিতে
জাগে সেই ঊর্দ্ধায়নে মানব-চেতনা
লীলায়িত মুক্তির আবেশে !
কামনা তোমার নহে
ভৌগোলিক ভারতের স্বাধীনতা শুধু !
তুমি দিলে রূপ তার অমর আত্মার
স্বধর্ম্মের নিষ্ঠা-অধিকারে।
দিলে বাণী, ভারতের
নিমন্ত্রণ ঘরে ঘরে নিখিল জগতে !

অগ্নি-গর্ভ মন্ত্র তব
বেজেছিল একদিন
স্বদেশের সেবা লাগি'।
দুঃখ, ক্লেশ, কারাবাস
অম্লান রেখেছে ওই স্বর্ণোজ্জ্বল ছবি
তপস্যা-ভাস্বর !
আদর্শের লাগি'
নিলে স্থান নীরব নিভৃতে
যোগ মাঝে মৌন সাধনায় !
বীজ হ'তে বিরাট বৃক্ষের মত
সে সাধনা চলে আজি বিশ্বের বিমুক্তি লাগি'—
নহে শুধু ভারতের।
পার্থিব সত্তায়
দিব্যভাব নিশ্চিত বিকাশ—
এ তোমারি বাণী,
এ সাধনা অব্যয় তোমার—
যে ভারতে বেসেছিলে ভালো—
যার লাগি' সাধনা তোমার
অবিশ্রান্ত চলে অবিরত—
সে ভারত ধন্য আজি
বক্ষে ধরে তোমার গৌরব।

তোমার সাধনা—
তোমার জ্ঞানের বিভা,
তোমার সে দিব্য অনুভূতি—
আমারে দিয়েছ তুমি,
আমারে করেছ ধন্য—
আমারে দিয়েছ এক আদর্শ মহান্।
আমি সেথা শুধু আমি নয়—
সৃষ্টিমাঝে এক জীবকোষ,—
এ আমির মধ্যে আছে জেগে
নিখিলের সমষ্টি গুঞ্জন।
ছন্দ তার অফুরন্ত চলে
প্রাণস্রোতে মানস-ভেলায়
ঊর্দ্ধগতি, অতিমানসের
অনন্ত আলোর দেশে !
তোমার পার্থিব রূপে দিব্য ভাবে পূজ্য তুমি, দেব,
তোমারে প্রণাম।*

সরস্বতী

শ্রীসরোজকুমার সাহা

"যা কুন্দেন্দু তুষারহারধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতকরা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্কর প্রভৃতিভিঃ দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা॥"

সুদূর অতীতকাল থেকে কত রূপেই না বন্দনা হয়েছে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর! কত মুনি-ঋষি দেবীর উদ্দেশে কত শ্লোক রচনা করলেন, কত কবিই না সৃষ্টি করলেন স্তব-স্তুতি, বন্দনা-গীতি সুললিত মধুর ছন্দে। গ্রন্থারম্ভে সরস্বতীর বন্দনা করা প্রাচীনকালের কবিদের একটি প্রথাস্বরূপ ছিল। সংস্কৃত-সাহিত্যে এর প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাভারতের আরম্ভেও আমরা দেখি—

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।"*

কেবল সংস্কৃত সাহিত্যে কেন, আমাদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও কবিগণ এই প্রথা অনুসরণ করেছেন। কৃত্তিবাস বলেন—

'সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।'

তাই— 'কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতী বরে।'

বিজয়গুপ্তও বললেন—(পদ্মাপুরাণ)

'সরস্বতী দেবী বন্দম বচনদেবতা।'

ভবানীপ্রসাদ (দুর্গামঙ্গল) গাইলেন—

'প্রণাম করিয়ে মা কল্যাণী সরস্বতী।'

ভবানীশঙ্কর "মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা" রচনা করতে করতে লিখলেন—

'প্রণতি করিয়া বন্দম ভারতী চরণে।'

চৈতন্য ভাগবতকারের—

'জিহ্বায় স্ফুরায় তাঁর শুদ্ধা সরস্বতী।'

দুঃখী শ্যামদাস (গোবিন্দমঙ্গল) গাইলেন –

'সরস্বতী বন্দো মাগো মধুর পঞ্চম রাগে
বিষ্ণুর বল্লভা বীণা পাণি।'

মুকুর মহম্মদ 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে'র প্রসঙ্গে বললেন—

'নম মাতা সরস্বতী বিখ্যাত সংসারে।'

এ ছাড়া মুকুন্দরাম (কবিকঙ্কণ চণ্ডী), ভারতচন্দ্র (অন্নদা-মঙ্গল), রামপ্রসাদ (বিদ্যাসুন্দর), প্রেমানন্দ দাস (মনসার ভাসান) প্রভৃতি সে যুগের বাঙালী কবিগণ তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে এক-একটি 'সরস্বতী স্তব' প্রদান করেছেন।

* মহাভারতের প্রাচীন নাম 'জয়', 'জয়ো নামেতিহাসোহয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা। মহাভারত, আদি ৬২ অঃ, ২২ শ্লোক।

বৈদিক যুগের আরম্ভ থেকে এত স্তব-স্তুতি খুব কম দেব-দেবীর উদ্দেশেই রচিত হয়েছে। প্রাচীন আর্যগণের কাছে সরস্বতী কেবল মানবেরই উপাস্য দেবী ছিলেন না, দেবতা-গণও তাঁকে রীতিমত শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। মানুষ তাঁরই কৃপায় পায় কথা বলবার শক্তি, শুধু মানুষ কেন সর্ব চরাচর তাঁরই আশিসধারায় অভিষিক্ত। তিনি বিপুল শক্তিস্বরূপিণী, তাঁকে কেন্দ্র করে আর্য-ঋষিগণের জল্পনা-কল্পনার বিরাম ছিল না। স্বর্গে তিনি দেবতা-গন্ধর্বগণের প্রিয় হতে প্রিয় দেবী, মর্তে মানব-সংস্কৃতির উৎসস্বরূপ।

এ হেন দেবীর মাহাত্ম্যের কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই একটা প্রশ্ন মনে আসে। প্রাচীন আর্যগণ নানা শক্তির প্রতীকরূপে বহু দেবদেবীরই কল্পনা করেছিলেন। সরস্বতীও তাঁদের কল্পনা এবং উপলব্ধির সৃষ্টি। জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে যে ঐশ্বরিক শক্তির তাঁরা কল্পনা করলেন, সেই শক্তিরই নাম দিলেন সরস্বতী। আর্যদের কাছে 'সরস্বতী' শব্দটি ছিল অত্যন্ত প্রিয়। 'সরস্বতী' নামের মোহ থেকে মুক্ত হওয়া ছিল তাঁদের শক্তির বাইরে। আর্যদের এই বিশিষ্ট মনোভাবের কারণ জানতে হলে কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান করার প্রয়োজন।

সরস্বতী শব্দের নিরুক্তি

যাস্ক তাঁর নিরুক্তে (২, ২৩) সরস্বতী শব্দের দুটি অর্থ করেছেন, 'নদীরূপা' ও 'দেবতারূপা'—"...সরস্বতী ইতি এতস্য নদীবদ্দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি।"

১, ৩, ১২ ঋগ্‌ভাষ্যে সায়ণ বলেছেন—

"দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদ্দেবতা নদীরূপা চ।"

ঋগ্বেদ আলোচনা করলে সরস্বতীর উভয় অর্থেরই সার্থকতা দেখা যায়। 'সরস্' শব্দের আদিম অর্থ যে 'জল' ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না, তা বেদের গোড়ার দিকের মন্ত্র থেকে বেশ বোঝা যায়। কেউ কেউ 'সরস্' শব্দের আদিম অর্থ করেছেন জ্যোতি এবং এ নিয়ে তর্কেরও অবতারণা করেছেন যথেষ্ট। তবে আমাদের মনে হয় বেদের পরবর্তী যুগে হয় ত 'সরস্' শব্দের অর্থের রূপান্তর ঘটেছিল, কিন্তু বৈদিক যুগে 'সরস্' শব্দের দ্বারা জলকেই বুঝাত।

সরস্বতী নদী ও আর্যগণ

অতি প্রাচীনকালে আর্যজাতি কেমন করে কোন্ কোন্ স্থান অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন তার বিশদ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও সংক্ষেপে দু-একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন।

ভারতের বাইরে যে নদীর তীরে ছিল আর্যগণের আদিম বাসস্থান সেই নদীর উভয় তীর ছিল অত্যন্ত উর্বর, জল বায়ু, স্বচ্ছ ও নির্মল। উক্ত নদীর চতুর্দিকে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সপ্ত সিন্ধু (হপ্তহেন্দু) প্রবাহিত হ'ত। এই সপ্তসিন্ধুসমন্বিত ভূমিতে সপ্তসিন্ধুর অন্যতম সরস্বতী নদীর তীরে ইরাণী ও বৈদিক আর্যগণ বাস করতেন। বর্তমান অক্সস (Oxus) নদের প্রাচীন প্রবাহের সপ্ত শাখাই ছিল সপ্তসিন্ধু ব হপ্তহেন্দু এইখানেই আর্যজাতির মধ্যে হয় ত বিবাদ বাধে অথবা কোন নৈসর্গিক বিপৎপাতে আর্যজাতির এক শাখা উত্তর-পশ্চিম দ্বার দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন।

আর্যদের ভারতে আগমন সম্বন্ধে কিছু কিছু উপকরণ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। কিন্তু বৈদিক সূক্ত হতে এ সম্বন্ধে একেবারে গোড়াকার খবর কিছুই জানতে পারা যায় না। আর্যদের ভ্রমণের অতি সামান্য তথ্যই ঋগ্বেদ হতে পাওয়া যায়। প্রথমে আর্যেরা কাবুল নদের উপত্যকা দখল করেন। ক্রমে শতদ্রু ও পঞ্জাবের ঈশান কোণ পর্যন্ত তাঁদের অধিকারে এসেছিল। কিছুকাল পরে পূর্বদিকাভিমুখে তাঁরা আরও অগ্রসর হতে লাগলেন এবং সরস্বতী নদীর দুই তীরে বসতি স্থাপন করতে করতে গাঙ্গেয় ভূমির শীর্ষদেশ পর্যন্ত অধিকার করলেন—ঋগ্বেদের সূক্ত হতে এ ছাড়া আর বেশী কিছু জানা যায় না। আর্যেরা যখন কুরু পাঞ্চাল অধিকার করেন তখন ঋগ্বেদের সূক্ত রচনার পর্ব শেষ হয়ে গেছে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে আর্যেরা ভারতে এসে প্রথম যেখানে বসতি স্থাপন করলেন তা পঞ্চনদীর দেশ। ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, বিপাশা ও শতদ্রু এই হ'ল সেই পাঁচটি নদী। আর্যদের আদিম বাসস্থান ছিল সপ্তসিন্ধুসমন্বিত ভূভাগ। এখানেও মিলল পাঁচটি নদী। স্থানটি তাঁদের মনের মতনই হ'ল। কিন্তু সাতের মহিমা তাঁদের মনোমধ্যে ছিল বদ্ধমূল হয়ে—আজন্মের অভ্যস্ত নাম তাঁরা ভোলেন কেমন করে? তাই আরও দুটি নদীর নাম মিলিয়ে নিয়ে তাঁরা নব বাসভূমিরও নাম দিলেন সপ্তসিন্ধু। এই নদী দুটির একটির নাম দিলেন সিন্ধু, আর পূর্বস্মৃতি বজায় রেখে অপরটির নাম রাখলেন সরস্বতী। সরস্বতী নদীর উভয় তীরেই তাঁরা বসতি স্থাপন করেন।

'সপ্ত' সংখ্যাটি ছিল আর্যদের অতি প্রিয়। তাঁরা 'তিন' প্রভৃতি সংখ্যার ন্যায় সাতকে অতি পবিত্র বলে মনে করতেন। সপ্তসিন্ধু—সাতটি নদী। সাতটি নদীবিশিষ্ট প্রদেশও সপ্তসিন্ধু। আর্যদের বসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নদীগুলির নাম কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সাত সংখ্যাটির মোহ তাঁরা কোন দিনই ছাড়তে পারেন নি। সাতকে অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। নদী সম্পর্কে কোথাও কোথাও সাতের সংখ্যা যে কখন অতিক্রম করে নি এমন নয়, তবে সাতকে তাঁরা একেবারে পরিহার করতে পারেন নি। ঋগ্বেদে সরস্বতীর ভগিনীর সংখ্যা কখনও সাত হয়েছে এবং আর্য ঋষিগণ প্রার্থনা করেছেন—

উত নঃপ্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা।

সরস্বতী স্তোম্যাভূৎ—৬,৬১,১০

সপ্তনদীরূপা সপ্তভগিনীসম্পন্না আমাদের প্রিয়তমা সরস্বতী আমাদের স্তুতিভাজন হোন। কখনও আবার সরস্বতীকে নিয়েই তাঁরা সাত ভগিনী হয়েছেন; তাই ত্রিলোকব্যাপিনী এই 'সপ্তধাতু'—সপ্তাবয়বা।

আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করে প্রথমে পঞ্চনদ প্রদেশে সরস্বতী নদীর তীর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ক্রমে তাঁদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি আরও পূর্বে এবং মধ্যভারতাভিমুখে প্রসার-লাভ করে,—প্রয়োজনানুসারে তখন তাঁরা আবার নূতন করে সপ্তসিন্ধুর নামকরণ করলেন। হরিদ্বারের সুরেণু, পুষ্করের সুপ্রভা, হিমালয়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত বিমলোদা, কুরুক্ষেত্রের ওঘবতী, নৈমিষারণ্যের কাঞ্চনাক্ষী, কোশলের মনোরমা ও গয়ার বিশালা তখন সপ্তসরস্বতী নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। মহাভারতে দেখি এই সপ্তনদীর সমষ্টি সরস্বতী নাম ধারণ করেছে। ক্রমশঃ আর্যসভ্যতা যখন দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ল, তখন দেখতে পাই—সপ্তসিন্ধুর হ'ল সম্পূর্ণ নূতন নামকরণ। উত্তর-ভারতের সিন্ধু, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনার সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতের নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরীও মূর্তিমতী পবিত্রতা রূপে নূতন নাম লাভ করে হিন্দুর পূজার্চনার সঙ্গে যুক্ত হ'ল। তখন থেকে আজ পর্যন্ত সপ্তসিন্ধুকে আবাহন করে হিন্দু বলে—

'গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।

নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।"

সরস্বতী নদী ছিল আর্যদের কাছে পরম পবিত্র। এই নদীর তীরে মুনি-ঋষিরা অবস্থান করতেন। বহু রাজাও এঁর কূলে বাস করেছিলেন (ঋক্—৮,২১,১৮) "পঞ্চজাতা" এঁরই তটে বর্ধিত হয়েছিল (৬,৬১,১২)। সর্বোত্তম তীর্থ ছিল সরস্বতী। এই নদীর তীরে প্রজাপতি ব্রহ্মা ও দেবতাগণ পূর্বকল্প যজ্ঞ করেছিলেন এবং ভারতভূমিকে কর্মভূমিরূপে বরণ করে সরস্বতীর তীরবর্তী ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশকে তপস্যার উপযোগী, পবিত্রতম ও সর্বোত্তম স্থানরূপে নির্বাচিত করেন।

বর্তমান যুগে গঙ্গার যেমন মাহাত্ম্য পূর্বে সরস্বতীর গৌরব তদপেক্ষা অধিকই ছিল। সরস্বতীকে প্রাচীন আর্যগণ এত ভালবাসতেন যে, যেখানে তাঁরা গেছেন সেইখানেই এই নাম [illegible] উপর আরোপ করে এঁর স্মৃতিকে জাগিয়ে রেখে-ছেন। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গমস্থলই প্রয়াগতীর্থ। এমন কি বাংলাদেশে হুগলীর নিকটে ত্রিবেণীতে একটি নদীকে সরস্বতী আখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

বস্তুতঃ এমন কোন স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস নেই যাতে সরস্বতী নদী ও তাঁর তীরবর্তী অঞ্চলসমূহের বর্ণনা করা হয়

নি। মহাভারতের শল্যপর্বে গদাযুদ্ধ পর্বের বলদেব তীর্থ-যাত্রাধ্যায় এবং সারস্বতোপাখ্যানে এই সরস্বতী নদী ও কুরুক্ষেত্রের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। বলদেব শ্রেষ্ঠ তীর্থ সরস্বতীর উৎপত্তিস্থান প্লক্ষ-প্রস্রবণ দেখে প্রত্যাবর্তন-কালে বলেছিলেন—

সরস্বতীবাসসমা কুতো রতি: ?
সরস্বতীবাসসমা কুতো গুণা: ?
সরস্বতীং প্রাপ্যদিব গতা জনা।
সদা স্মরিষ্যন্তি নদীং সরস্বতীম্। ইত্যাদি

বলদেবের তীর্থযাত্রার বহুপূর্বেই সরস্বতীর বৃহৎ একাংশ অন্ত:সলিলা হয়। সেই স্থান বিনশন প্রদেশ নামে খ্যাতি-লাভ করে। এই বিনশন প্রদেশ বর্তমান উদয়পুর, মেবার ও রাজপুতানার পশ্চিম প্রান্তভাগের মরুপ্রদেশ—বিনশন প্রদেশও তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল এবং প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে এর মহিমা বহু স্থানে কীর্তিত হয়েছে।

হিমালয়ের প্লক্ষ-প্রস্রবণ থেকে সরস্বতী নদীর উৎপত্তি। এটিই বেদোক্ত মুখ্য সরস্বতী মহানদী। এর পূর্বাংশে কুরু-ক্ষেত্র স্থাণুতীর্থ আজ পর্যন্ত বিদ্যমান, এর লুপ্তাংশ বিনশন প্রদেশ এবং শেষাংশ আরাবল্লী পর্বতশ্রেণী থেকে উত্থিত পশ্চিম-ভারতের সরস্বতী। এই অংশ পশ্চিম-দক্ষিণ সিদ্ধপুর পাটনা অর্থাৎ মাতৃগয়ার নিকট আজও প্রবাহিত হয়ে কচ্ছ ও দ্বারকার পাশে সমুদ্রের খাড়িতে মিলিত হয়েছে।

কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, পারসিকদিগের জেন্দ-অবেস্তা গ্রন্থে আফগানিস্থানের পূর্বাঞ্চল বা Arachosia-র যে 'হরখৈ্তী' নদীর উল্লেখ আছে, বস্তুত: সেইটিই মূল সরস্বতী। পরে আর্যগণ পঞ্জাবের নদীর নাম দিয়েছিলেন সরস্বতী। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

ঋগ্‌বেদে আমরা দেখি, সরস্বতী অন্ত:সলিলা হবার পূর্বে এঁর মত বেগবতী নদী ভারতবর্ষে আর ছিল না। হিমগিরি থেকে সমুদ্র পর্যন্ত এর প্রবাহ ছিল অপ্রতিহত এবং এই নদীর প্রচণ্ড প্রবাহ শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করণার্থ আর্যদের নিকট ছিল সুরক্ষিত দুর্গের সুদৃঢ় দ্বার-স্বরূপ।

শাস্ত্রাদিতে এই সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন নদীর উদ্দেশ্যে যে কত স্তব-স্তুতি ও উক্তি আছে তা বলে শেষ করা যায় না। সরস্বতী নদী ছিল, আর্যদের প্রাণস্বরূপ। এর জল পান করে এরই তীরবর্তী উর্বর ভূমিতে চাষ-বাস করে তাঁরা জীবন-ধারণ করতেন। আর্যঋষিগণ এই নদীর তীরে করতেন যাগ-যজ্ঞ, জ্ঞানচর্চা। সারস্বত প্রদেশই ব্রহ্মাবর্ত নামে অভিহিত হয়ে-ছিল এবং ব্রহ্মাবর্ত থেকেই সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলো সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এক কথায় ব্রহ্মাবর্ত আর্য-সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং এর দ্বারা সারস্বত প্রদেশের মহিমাই কীর্তিত হয়।

তারপর কালক্রমে নদী সরস্বতী এক দিন দেবী সরস্বতীতে পরিণত হলেন। তখন আর্যদের অধ্যাত্মচিন্তাধারা একটা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করছে। কল্পনায় তাঁরা সন্ধান পেয়েছেন স্বর্গলোকের, ধ্যাননেত্রে দেখছেন নানা দেব-দেবীর মূর্তি। যে প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের তাঁরা ছিলেন উপাসক সেই শক্তি-গুলিকে ধ্যানলোকের এক একটি দেব অথবা দেবীর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে লাগলেন। জ্ঞান ও বিদ্যা, শক্তি ও সাধনার দেবী হলেন সরস্বতী। সরস্বতী নদীর তীরে জ্ঞান ও বিদ্যা-চর্চা হ'ত বলেই যে জ্ঞানের দেবী 'সরস্বতী' আখ্যা লাভ করেছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। সরস্বতী নদীর উপর আর্যদের ভক্তি বিশ্বাস ও ভালবাসা ছিল অসীম। তাই স্বর্গেও সরস্বতী সর্বশক্তিময়ী, দেবতাদিগের পরম প্রিয়, পরমারাধ্যা, সকল দেবদেবীর শীর্ষস্থানীয়া।

"অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি।" ঋক—২ ৪১ ১৬

ঋষিগণ দেবী সরস্বতীর রূপও বর্ণনা করলেন—সরস্বতী শুভ্রবর্ণা (ঋক—১৯৫৬; ১৯৬.৩)। তিনি ভীষণ হিরন্ময় রথে আরূঢ়া—

"উত স্যান: সরস্বতী ঘোরা হিরণ্যবর্তনি"—ঋক—৬.৬১.৭।

দেবী ভারতী ও বাগ্‌দেবী

ভরত নামে আর্যদিগের একটি শাখা সিন্ধুনদ অতিক্রম করে সরস্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হন এবং এই নদীর তীরে কিছুকাল বসবাস করেন। তাঁরাই সম্ভবত: তাঁদের জাতি-নামে সরস্বতীকে 'ভারতী'রূপে আখ্যায়িত করেছিলেন, কারণ বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করলে আমরা সরস্বতী ও ভারতীকে অভিন্নারূপেই পাই।

শুক্ল যজুর্বেদ বলেন, সরস্বতী 'অশ্বিভ্যাং পত্নী' (১৯ ৯৪)। শুক্ল যজুর্বেদের বহুস্থানেই সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয়ের সম্বন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। যজুর্বেদে একটি আখ্যায়িকা আছে—দেবতারা একবার এক যজ্ঞ করেন; সেই যজ্ঞে অশ্বিদ্বয় ভিষগ্‌রূপে এবং সরস্বতী 'বাচা'—ত্রয়ীলক্ষণা বাক্ সাহায্যে ইন্দ্রের বীর্য-সামর্থ্য বিধান করেছিলেন। এখানে আমরা প্রথম বাকের (বাক্যের) সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক দেখতে পাই। যখন তিনি বাক্য-দ্বারা ইন্দ্রের বলাধান করেছিলেন তখন তাঁকে 'বাগ্দেবী' বলা যেতে পারে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তে দেবী বাক্ নিজের পরিচয় নিজেই দিচ্ছেন—

'আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সহিত বিচরণ করি। আমি আদিত্য প্রভৃতি সকল দেবতাগণের সঙ্গে থাকি। আমি মিত্র ও বরুণকে ধারণ করি। আমি ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি।'

'আমি রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী, জ্ঞানসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপযোগী বস্তু সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।'

'দেবতা ও মনুষ্যগণ যাঁহার শরণাপন্ন হয়, তাঁহার বিষয় আমিই উপদেশ দিয়া থাকি। যাহাকে মনে করিব তাহাকে আমি বলবান, স্তোতা, ঋষি বা বুদ্ধিমান করিতে পারি। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার অবস্থান, ইত্যাদি।'

বাক্ ও সরস্বতীর গুণরাশির মধ্যে পার্থক্য বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না, তবে ঋগ্বেদের যুগে যে বাক্ ও সরস্বতী একই দেবী ছিলেন না একথা বলা যায়। পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য-যুগেই এই দুই দেবী অভিন্না হয়ে যান। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ স্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছেন যে, বাক্‌ই সরস্বতী। শতপথ ব্রাহ্মণও (৩,৯ ১.৭) বলেছেন—"বাগৈ সরস্বতী।"

মোটের উপর বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য আলোচনা করে আমরা বাক্, ভারতী ও সরস্বতীকে অভিন্নারূপেই পাই। ইড়াও ক্রমে সরস্বতীর সঙ্গে মিশে যান এবং ভারতবাসী সেই বৈদিক যুগ থেকেই সরস্বতীর আরাধনা করতে আরম্ভ করেন। আজও সমগ্র ভারত জুড়ে তাঁর পূজা-অর্চনা। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে বৈদিক দেবদেবীগণের পূজা-অর্চনা হয়েছে, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিরও তারতম্য ঘটেছে, অনেকে বিস্মৃতির অন্তরালেও চলে গেছেন। কিন্তু দেবী সরস্বতী সুদূর বৈদিক যুগ হতে আজ পর্যন্ত সমভাবে পূজিতা হয়ে আসছেন। পাণিনির 'দিব্' ধাতুর দশবিধ অর্থানুযায়ী দেবতা হবেন তিনিই "যিনি ক্রীড়া করেন, যাঁহার লীলা-কৈবল্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কারণ, যিনি অসুরগণের বিজিগীষু, পাপনাশক, যিনি সর্বভূতে বিরাজমান, ব্যবহারিক জগতে যিনি স্থাবর, জঙ্গম নানারূপে ব্যবহৃত হয়েন, যিনি স্তোত্রস্বভাব, যাঁহার প্রকাশে নিখিলবস্তু প্রকাশমান, যিনি সকলের স্তুতিভাজন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহারই গুণকীর্তন করে, যাঁহারই বিভূতি ঐশ্বর্য্য খ্যাপন করে, যিনি সর্বত্র গতিশীল, সর্বব্যাপক, যিনি জ্ঞানময়—চৈতন্যস্বরূপ, অখিলগতির যিনি লক্ষ্যস্থল, তিনি 'দেব'—তিনি 'দেবতা'।" দেবী সরস্বতীর মধ্যেও উক্ত গুণগুলির প্রত্যেকটিই বিদ্যমান।

পুরাণে সরস্বতী

সরস্বতীর আদিরূপ এবং মুনিঋষিদের ধ্যানযোগ ও কল্পনাবলে তাঁর সৃষ্টিরহস্যের গোড়ার দিক নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করলাম। এইবার দেখা যাক পৌরাণিক যুগে তাঁর কি রূপান্তর ঘটেছিল।

বেদ হ'ল ভারতের সর্বশাস্ত্রের মূল। পুরাণেরও উদ্ভব বেদ থেকে। বেদ আত্মা, পুরাণ দেহ—বেদ ভাব, পুরাণ চিত্র। ভাবের উপর তুলির আঁচড় যখন পড়ে কিছু রূপান্তর ঘটা স্বাভাবিকই। পুরাণেও হয়েছে তাই। হয়তো ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তৎকালীন মনীষিগণ এরূপ করে থাকবেন। সে যাই হোক, হিন্দুধর্ম্ম পৌরাণিক যুগেই দানা বেঁধে একটা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। নূতন নূতন দেবদেবীরও সৃষ্টি হয় এই সময়, তবে আলোচনা করলে বুঝা যায় যে বৈদিক দেবদেবীরাই প্রধানতঃ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপে মানুষের কল্পনা ও ধ্যান-ধারণার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন।

পুরাণে দেখি সরস্বতীর জন্মরহস্যের নূতন ব্যাখ্যা হ'ল। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বললেন, সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণমুখোদ্ভূতা। নারদীয় পুরাণ, ধর্ম্ম ও কূর্ম্ম-পুরাণ মতে তিনি শিবের কন্যা, আবার শিবের শক্তি। বরাহপুরাণের সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সম্মিলিত দৃষ্টি হতে জন্ম নিলেন ব্রাহ্মীকলা—সৃষ্টি—সর্বাসারা, বাগীষা, বিদ্যেশ্বরী, সরস্বতী। তন্ত্রগুলির মধ্যে বৃহন্নীল, কুলার্ণব ও সারদাতিলক মতে সরস্বতী শিবদুর্গার কন্যা। পুরাণাদি শাস্ত্রে আরও আমরা দেখতে পাই, সরস্বতী কখন হচ্ছেন ব্রহ্মাণী, কখন ব্রহ্মার কন্যা, কখন তিনি বিষ্ণুশক্তি, কখন বা শিবশক্তি।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে একটি আখ্যায়িকা আছে। এই আখ্যায়িকায় দেখা যায় যে, সরস্বতী শতরূপা প্রজাপতির মানসকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন, ইত্যাদি।

মোটের উপর পুরাণে সরস্বতীর পরিচয় বেশ একটু গোলমেলে হয়ে গেছে। সরস্বতী যে ব্রহ্মার স্ত্রী সে কথা শাস্ত্রকারগণ একরকম সাব্যস্ত করেই নিয়েছেন। ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টির অধীশ্বর, তাঁর অচ্ছেদ্য শক্তি সরস্বতী অধিষ্ঠিতা তাঁর মুখে। তিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী; তিনিই আবার সৃষ্টির আদিকারণ বাক্ বা শব্দব্রহ্ম (Logos)। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (৪ ১.২) বলেছেন, 'বাগ্ বৈ ব্রহ্ম।'

বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়, ব্রহ্মার চক্ষু মুদ্রিত, তিনি ধ্যানমুদ্রায় সাতটি হংসের রথে সমাসীন। দক্ষিণে সরস্বতী, বামে সাবিত্রী। এঁরা সুন্দরী, সালঙ্কারা। কালিকাপুরাণে চতুর্মুখ চতুর্ভুজ ব্রহ্মার এক বর্ণনা আছে। তিনি কখনও রক্তকমল, কখনও বা হংসারূঢ়া। এই ব্রহ্মারও বামে সাবিত্রী এবং দক্ষিণে

শতপথ ব্রাহ্মণে একটি আখ্যায়িকা আছে; এই আখ্যায়িকা অনুসারে ইন্দ্র নমুচি নামক এক অসুরকে বধ করবার জন্য সরস্বতীর শরণাপন্ন হন এবং সরস্বতী বজ্রের সৃষ্টি করেন। ইন্দ্র এই বজ্র দ্বারা নমুচিকে বধ করতে সক্ষম হন। কৌষীতকি ব্রাহ্মণে (১২২) আছে—'সরস্বতীতি তদ্‌দ্বিতীয়ং বজ্ররূপম।' নিরুক্তেও আমরা পাই, অন্তরীক্ষ-দেবতা বাক্‌ই বজ্র।

কিন্তু পুরাণে বজ্রের সৃষ্টিতত্ত্বের রূপান্তর ঘটেছে। এখানে ইন্দ্র দধীচিমুনির অস্থি থেকে বজ্র সৃষ্টি করছেন। সরস্বতীর সহস্রমুখী বিপুল শক্তি আপাতদৃষ্টিতে পুরাণে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়—কারণ বজ্র বাকেরই অংশ এবং বাক্‌ই সরস্বতী।

সরস্বতীপূজা

বঙ্গদেশে শ্রীপঞ্চমীর দিন কলা ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পূজা হয়। বাংলার বাইরে কোন কোন জায়গায় আশ্বিন শুক্লা-অষ্টমীতে সরস্বতীর পূজা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে অপ্রচলিত হলেও আশ্বিনে সরস্বতী পূজার শাস্ত্র-বিধি আছে। তবে বর্ত্তমানে শ্রীপঞ্চমীর (আর এক নাম বসন্ত পঞ্চমী) দিনই পূজা হয়। এই শ্রীপঞ্চমীতে কেমন করে দেবী সরস্বতী পূজালাভ করলেন সেকথা নিয়ে বর্ণিত হচ্ছে—

শ্রী অর্থে লক্ষ্মী। শ্রীপঞ্চমী লক্ষ্মী পঞ্চমীরই দ্যোতক। কিন্তু সরস্বতী কেমন করে এই তিথির অধিকারিণী হলেন? ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণ এ রহস্যের সমাধান করেছেন—

আবির্ভূতা যদা দেবী বক্ত্রতঃ কৃষ্ণযোষিতঃ।
ইয়েষ কৃষ্ণং কামেন কামুকী কামরূপিণী॥

কৃষ্ণযোষিতের মুখ থেকে আবির্ভূতা হয়েই বাগ্‌দেবীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা হ'ল শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পান। কিন্তু কৃষ্ণ তখন রাধাগত প্রাণ; তিনি অন্যদার হন কেমন করে? কাজেই বাগ্‌দেবীকে তিনি বললেন—তাঁকে পাওয়াও যা বিষ্ণুকে পাওয়াও তাই—কেমনা বিষ্ণু কৃষ্ণেরই প্রতিরূপ; তিনি বিষ্ণুকেই পতিরূপে গ্রহণ করুন। সরস্বতীকে শান্ত করবার জন্য বললেন—

"পতিং তমীশ্বরং কৃত্বা মোদস্ব সুচিরং সুখম্।"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড)

আরও বললেন, লোকে সরস্বতী পূজা করবে—

মাঘস্য শুক্ল পঞ্চম্যাং
বিদ্যারম্ভেষু সুন্দরি।" (ঐ পুরাণ)

পুরাণও বলছেন—

"আদৌ সরস্বতীপূজা শ্রীকৃষ্ণেন বিনির্ম্মিতা।
যৎ প্রসাদাদ্ মুনিশ্রেষ্ঠ মূর্খো ভবতি পণ্ডিত।"

(ঐ পুরাণ)

শ্রীকৃষ্ণের সময় থেকে হোক, অথবা পরে যে-কোন সময় থেকে হোক মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে সরস্বতীদেবীর পূজার রীতি প্রচলিত হ'ল। পূজার দিনের নামটা কিন্তু শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী-পঞ্চমীই রয়ে গেল। প্রথম প্রথম লক্ষ্মীই পূজা পেতেন, সরস্বতীর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশের উদ্দেশ্যে দোয়াত-কলম মাত্র পূজা হ'ত, কিন্তু কালক্রমে সরস্বতীই এই পূজার প্রায় সবটুকুর অধিকারিণী হয়ে উঠলেন। লক্ষ্মীদেবীর ভাগ্যে জুটতে লাগল শুধু ছটো মন্ত্র আর সামান্য ফুল। কালক্রমে 'শ্রী' শব্দের অর্থেরও একদিন পরিবর্ত্তন ঘটল। 'শ্রী' আর লক্ষ্মীর নাম রইল না; নূতন নাম হ'ল সরস্বতীর।

সরস্বতীপূজায় পশুবলি

পুরাণ এবং পৌরাণিক যুগের পরবর্তীকালে রচিত শাস্ত্রাদি নির্দেশিত বিধি-ব্যবস্থানুযায়ী বর্তমানে আমরা সরস্বতীপূজা করে থাকি। এই সকল ব্যবস্থা-নির্দেশাদি আমাদের অনেকেরই অল্পবিস্তর জানা আছে। কিন্তু সরস্বতীপূজায় যে পশুবলিরও ব্যবস্থা আছে এটা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। সাধারণতঃ সরস্বতীপূজায় আমাদের দেশে পশুবলি হয় না এবং এই কারণে এই পূজায় বলির ব্যবস্থা আছে শুনলে আমাদের আশ্চর্য বোধ হয়।

শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে, সরস্বতী অশ্বিদ্বয়ের সাহায্যে সোত্রামনী যাগের সৃষ্টি করে একটি মেষী বলিস্বরূপ পেয়েছিলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও সরস্বতীর প্রীত্যর্থে বলির ব্যবস্থা আছে। কোন ব্যক্তি যদি ভাল করে কথা বলতে না পারে, তাকে সরস্বতীর জন্য একটি মেধী হনন করতে হবে, কারণ সরস্বতীই বাক্। সরস্বতীর কাছে মেষ বলি দিলে নাকি সেই লোক দেবীর প্রসাদে বাগ্‌বিভব লাভ করবে। অশ্বমেধ যজ্ঞেও একটি মেষী সরস্বতীর বলি। পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে সরস্বতীপূজায় সাদা ছাগল আজও বলি দেওয়া হয়।

সরস্বতীর মূর্তি

দেবী সরস্বতী যে কেবল জ্ঞান, বিদ্যা ও শক্তির দেবতা তাই নয়, সৌন্দর্যের দেবতাও তাঁকে বলা যায়। বেদ, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রাদি তাঁর রূপের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অনবদ্য। তিনি জ্যোতির্ময়ী, তিনি কল্যাণী, তিনি প্রেমময়ী, তিনি শুভ্রা, তিনি নিষ্কলঙ্কতার প্রতিমূর্তি। স্বর্গে মর্তে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহান্ তার সবই যেন দেবীর অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান। এই সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে দেবীর বহুবিধ মূর্তি আমরা দেখতে পাই। সেই মূর্তিগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করে বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করব।

পদ্মাসীনা হংসবাহনা সরস্বতী

সচরাচর আমরা পদ্মাসীনা হংসবাহনা মূর্তিতে সরস্বতীকে দেখি। এটিই সর্বজনপরিচিত মূর্তি। হিন্দুর প্রায় সব দেব-দেবীই পদ্মাসীন বা পদ্মাসীনা; পদ্মের উপর দণ্ডায়মান দেবদেবীর মূর্তিও দৃষ্ট হয়। স্মরণাতীত কাল হতে পদ্ম ভারতীয় রূপভাবনা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বেদ, পুরাণ, সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে পদ্মকে অপার মাধুর্যময় ও সৌন্দর্যের সার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই সরস্বতী যে পদ্মাসীনা, অথবা পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা হবেন এ ত খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি হংস-বাহনা কেন?

পুরাণে সরস্বতী ব্রহ্মার শক্তি। তিনি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সংস্কৃত ভাষার জননী। ব্রহ্মা হংসবাহন। সেই হিসাবে ব্রহ্মাণী সরস্বতীও হংসবাহনা হবেন। দেবের যে বাহন, দেব

পক্ষীরও সাধারণতঃ সেই বাহন হয়। আবার পুরাণাদিতে নির্দেশ আছে, সরস্বতীর সৃষ্টি মানস-সরোবর থেকে, মানস-সরোবরের হংস চিরপ্রসিদ্ধ। কাজেই মানস-সরোবরের দেবীর সঙ্গে হংসের একটা সম্পর্ক কল্পনা করা অসঙ্গত নয়।

ময়ূরবাহনা সরস্বতী

বোম্বাই ও রাজপুতানায় ময়ূরবাহনা চতুর্ভুজা সরস্বতী মূর্তি দেখা যায়। কানিংহাম সাহেবের Archaeological Survey Report (vol. ix)-এ একটা সুন্দর কারণ দেখছি তাঁর মতে সরস্বতী নদীর তীরে ময়ূরের আধিক্যবশতঃ দেবীকে ময়ূরবাহনা বলে কল্পনা করা হয়েছে।

মেষবাহনা সরস্বতী

সোত্রামনী যাগে দেবী বলিস্বরূপ মেষ পেয়েছিলেন। তাই দেবীর মেষবাহনা মূর্তিও আমরা দেখতে পাই। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় এইরকম একটি মূর্তি আছে।

সিংহবাহনা সরস্বতী

"সিংহবাহনা সরস্বতী বৌদ্ধ সরস্বতী। বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর শক্তি সরস্বতী, মঞ্জুশ্রীর বাহন সিংহ; সুতরাং তাঁর শক্তি সরস্বতীর বাহনও সিংহ হয়েছে।" কলিকাতার প্রত্নশালায়ও একটি সিংহবাহনা চতুর্ভুজা বাগীশ্বরী মূর্তি আছে। তাঁর দুই হাতে পরশু ও গদা, অপর দুই হাতে দানবের জিহ্বা উৎপাটন করছেন।

বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা সরস্বতীর ভক্ত ছিলেন এবং বৌদ্ধযুগে নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান এবং যবদ্বীপে সরস্বতীর পূজা হ'ত। এই সব দেশে সরস্বতীর মন্দির ও দেবীর নানাপ্রকার মূর্তি আজও বিদ্যমান।

জৈনদের মধ্যেও সরস্বতী পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। জৈনসম্প্রদায়ের নিকটেও তিনি জ্ঞান ও কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। জৈনগণ সরস্বতীকে শাসন দেবীরূপেও শ্রদ্ধা করে থাকেন।

যে কয়প্রকার মূর্তির আলোচনা করলাম তা ছাড়াও দেবীর আরও বহুপ্রকার মূর্তি আছে। কোথাও তিনি একক দাঁড়িয়ে আছেন, কোথাও আছেন বসে; কোথাও ব্রহ্মা অথবা বিষ্ণুর পরিবার দেবতারূপে দণ্ডায়মানা। কখন তিনি 'বীণাপুস্তক-ধারিণী' দ্বিহস্তা, কখন চতুর্হস্তা, এবং ত্রিমুখ, চতুর্মুখ বা পঞ্চমুখ। কখন দেখি অপূর্ব নৃত্য ভঙ্গিমায় তিনি 'নৃত্যসরস্বতী,' কখন বা বীণাবাদনরতা 'ললিতাসনা,' কোথাও দেবী ত্রিনেত্রা 'বজ্র-সারদা,' কোথাও ধ্যানগম্ভীর 'প্রজ্ঞাপারমিতা'।

ভারতের প্রায় প্রতি প্রদেশেই সরস্বতীর বিভিন্ন প্রকার মূর্তি বিদ্যমান। অন্য কোন দেবদেবীর মূর্তির এত প্রকারভেদ আছে কিনা সন্দেহ। মানব-সভ্যতার প্রভাতে সেই সুদূর বৈদিক যুগ হতে সরস্বতীপূজার প্রচলন হয়েছে। তাঁকে পূজা করেছে বৈদিক ভারত, পূজা করেছে পৌরাণিক ভারত; সকল যুগে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সকল সম্প্রদায়ের কাছেই দেবী সমভাবে পূজা পেয়েছেন। শুধু ভারতের মধ্যেই এই পূজা সীমাবদ্ধ থাকে নি। বৌদ্ধযুগে ভারত থেকে সিংহল, যবদ্বীপ, তিব্বত, চীন ও সুদূর জাপান পর্যন্ত সরস্বতী পূজা বিস্তারলাভ করেছিল।

একালের জগৎশেঠ

শ্রীঅমলেন্দু সেন

সুবা বাংলার রাজকার্য্য চালাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে দুই-চারি কোটি টাকা জোগাইয়া মুর্শিদাবাদের শ্রেষ্ঠী ফতেচাঁদ জগৎশেঠ উপাধি পাইয়াছিলেন। উপাধিদাতা সম্রাট মহম্মদ শাহ্ আজ বাঁচিয়া থাকিলে বুঝিতেন যে শেঠজী একরূপ ফাঁকি দিয়াই এত বড় উপাধিটা লাভ করেন। কারণ ফতেচাঁদজীর এমন সামর্থ্য, সুযোগ কিংবা বাসনা ছিল না যে জগতের শেঠত্ব করেন।

যিনি যথার্থই জগৎ-শেঠত্ব দাবি করিতে পারেন, তাঁহার দেখা মিলিতেছে এতদিনে। তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন আজ চারি বৎসর হইল। এ অবতারে তাঁহার যুগল মূর্তি—আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (International Bank for Reconstruction and Development) এবং আন্তর্জাতিক ধন ভাণ্ডার (International Monetary Fund); ইঁহারা দুই জনে মোট প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা লইয়া রণবিধ্বস্ত জগতের দুঃখমোচনের কার্য্যে নামিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের কিছু পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬)। এবার আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার (সংক্ষেপে 'ভাণ্ডার') বিষয়ে দুই-চারি কথা বলিব।

ইউনাইটেড নেশুনস্ গঠিত হওয়ার সমসময়ে আমেরিকার ব্রেটন-উড্স্ নামক স্থানের বৈঠকে (জুলাই ১৯৪৪) বিভিন্ন

জাতির প্রতিনিধিবর্গের আলোচনার ফলে এই ব্যাঙ্ক এবং ধনভাণ্ডারের সৃষ্টি হয়। কাজ আরম্ভ হয় ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৪৫।

ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য মুখ্যত: তিনটি: (১) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুসমঞ্জস বর্দ্ধনের দ্বারা দেশে দেশে বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করা; (২) আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়-হার এবং আভ্যন্তরীণ মুদ্রামূল্য স্থির রাখা ও তজ্জন্য সদস্যরাষ্ট্রদিগের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করা; (৩) এই সকল কারণে প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করা।

আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার পরস্পরের পরিপূরকরূপে কার্য্য করেন। কারণ ব্যাঙ্কের কার্য্য দেশে দেশে উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপের প্রবর্ত্তন এবং ভাণ্ডারের লক্ষ্য দেশে দেশে মুদ্রা-মূল্যের স্থিরতা সংরক্ষণ। কিন্তু দেশে মুদ্রামূল্য বেশী উঠানামা করিলে শিল্প প্রসারের চেষ্টা ব্যাহত হয়, অপরন্তু দেশের উৎপাদনীশিল্পসমূহের প্রসার না হইলে মুদ্রামূল্যের স্থিরতা রক্ষা করা কঠিন। তাই ব্যাঙ্ক ও ভাণ্ডার সর্ব্বদা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলেন। উভয়েই ইউনাইটেড নেশ্যন্‌স্-এর অর্থ ও সমাজ পরিষদের (Economic and Social Council) সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন, এবং তাহার মধ্য দিয়া মহাসভার (General Assembly) সহিত সংযুক্ত।

যে সকল রাষ্ট্র এই ধনভাণ্ডারের সদস্য, তাঁহারা সকলেই যে ইউনাইটেড নেশ্যন্‌স্-এর সদস্য এমন নহে; যথা, ফিন্‌ল্যাণ্ড ও ইটালী। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাণ্ডারের সদস্যসংখ্যা ছিল ৪৬ অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশ্যন্‌স্-এর সকল সদস্য (৫৮) এই ভাণ্ডারে যোগ দেন নাই। ভাণ্ডারের সদস্যগণ সকলেই অবশ্য ব্যাঙ্কেরও সদস্য আছেন। ভারত তাঁহাদের একজন।

ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব একটি নিয়ামক-পরিষদের (Board of Governors) উপর ন্যস্ত আছে। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের নির্ব্বাচিত একজন নিয়ামক এবং একজন বিকল্প-নিয়ামক (Alternate Governor) অর্থাৎ মোট ৯২ জন প্রতিনিধি লইয়া এই পরিষদ গঠিত। বর্ত্তমানে ভারতের প্রতিনিধি আছেন স্যর বেনেগল রাম রাও।

ইহার কার্য্য পরিচালনার জন্য আছেন ১৪ জন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি নির্ব্বাহী পরিচালকমণ্ডলী (Executive Directors)। যে পাঁচটি রাষ্ট্র এই ভাণ্ডারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ দিয়াছেন তাঁহারা পাঁচ জনকে এবং অপর রাষ্ট্রগুলির নিযুক্ত নিয়ামকগণ (Governors) অন্য নয় জনকে মনোনয়ন করেন। এই ১৪ জন ডিরেক্টর বাহির হইতে একজন সভাপতি নির্ব্বাচন করেন, তাঁহাকে বলা হয় ম্যানেজিং ডিরেক্টর। প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টর হন বেলজিয়ামের ক্যামিল্ গাট।

ভাণ্ডারের সদস্যরাষ্ট্রগণ নিজ নিজ চুক্তি অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা দিয়াছেন। দেয় অর্থের এক-চতুর্থাংশ সোনা দিয়া দিতে হয়। কিন্তু তাহা কোনও সদস্যের পক্ষে সাধ্যাতীত হইলে সেই রাষ্ট্রের হাতে মোট যত সোনা আছে তাহার এক-দশমাংশ ভাণ্ডারকে দিবার নিয়ম। বক্রী টাকা দিতে হয় নিজ নিজ দেশের মুদ্রা দিয়া। ১৯৪৮ সনের ৩০শে এপ্রিল তারিখে ভাণ্ডারের হাতে এই হিসাবে মোট ৭৯০ কোটি ডলার (প্রায় ২৬৩৩ কোটি টাকা) জমা ছিল।

প্রথমেই দেশে দেশে স্থানীয় মুদ্রার সরকারী মূল্য (official par value) স্থির করিবার চেষ্টা করা হয়। পারস্পরিক আলোচনার ফলে প্রথমে ৩২টি দেশের এবং পরে আরও ছয়টি দেশের মুদ্রামূল্য নির্দ্দিষ্ট করা হয়। বহির্বাণিজ্যের লেনদেনের ব্যাপারের নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে এবং ভাণ্ডারের বিনানুমতিতে কোনও সদস্যরাষ্ট্রই তাঁহার মুদ্রার এই নির্দ্দিষ্টীকৃত মূল্য পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না।

এই মূল্য-স্থিরীকরণের ফলে বহু দেশের বিনিময় হারের মধ্যে যে সাময়িক অসামঞ্জস্য দেখা দেয় তাহা নিরাকরণের জন্য ভাণ্ডার হইতে ৩৮টি দেশকে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে, এ কথা ভাণ্ডারের মুখপত্র *International Financial Statistics* নামক মাসিক পত্রের ১৯৪৯ সনের জানুয়ারী সংখ্যায় দেখা যায়। তন্মধ্যে ইংলণ্ড লইয়াছিল ৩০ কোটি ডলার (১০০ কোটি টাকা), ফ্রান্স ১২॥০ কোটি ডলার, হল্যাণ্ড ৬।০ কোটি ডলার ও ১৫ লক্ষ পাউণ্ড। ভারত লয় ২ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার (প্রায় ৯⅓ কোটি টাকা)।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ফলে পৃথিবীর দেশগুলি নিজ নিজ অর্থসঙ্কট ও মুদ্রাসমস্যা সম্বন্ধে নিয়মিত ভাবে পরস্পরের সহিত আলোচনা করিবার সুযোগ পায়, এবং একে অপরের পরামর্শ ও সহযোগিতা লাভের আশা করিতে পারে। পরামর্শ দিবার জন্য প্রয়োজন হইলে আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার আপন রাষ্ট্রের অবস্থা পর্য্যালোচনার উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞদিগকে পাঠাইয়া থাকেন। ভাণ্ডারের দপ্তরে সকল সদস্যরাষ্ট্রেরই নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ মুদ্রাব্যবস্থা ও বহির্বাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ প্রতি মাসে পাঠাইয়া দিবার নিয়ম আছে।

অনাথপিণ্ডদসুতা সুপ্রিয়ার স্বপ্ন সফল করিবার ভার লইয়াছেন আজ ইউনাইটেড নেশ্যন্‌স্-এর আত্মজা এই ব্যাঙ্ক ও ধনভাণ্ডার। ভিক্ষা-অন্নে বসুধাকে বাঁচাইবার এই প্রয়াস কতদূর সফল হয় দেখা যাউক।

কলঙ্কিনী

শ্রীবি[illegible]ণ গুপ্ত

বর্তমানের দেশব্যাপী বিষাক্ত আবহাওয়ার স্পর্শ বাঁচিয়ে এখনও সে গ্রামের হিন্দু মুসলমান দিব্যি পাশাপাশি বাস করছে। কলহ, বিবাদ-বিসম্বাদ পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, কিন্তু তা নিয়ে অনাবশ্যক মাতামাতি নেই। বরং সহজ যুক্তির কাছে তার মীমাংসার পথ সব সময়েই খোলা আছে। নইলে এত বড় মাতব্বর ব্যক্তি ইয়াসিন মিঞাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে সে গ্রামের কারুরই সাহস হ'ত না। কিছুদিন ধরে তার সংসারের একটি অতি গোপন কথা নিয়ে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে অনেক কানাঘুষাই শোনা যাচ্ছে। সবিস্তারে না হলেও তার কিছু কিছু ইয়াসিনের কানেও এসেছে, কিন্তু সে তাকে মোটেই আমল দেয় নি। বয়স তার খুব বেশী না হলেও গ্রাম্য জীবনের অভিজ্ঞতা তার ষোল আনাই আছে, তাই সামান্য ব্যাপারকে অসাধারণ করে তুলতে চায় নি।

ইয়াসিন মিঞা পাকা চাষী গৃহস্থ। জোত, জমি, গোয়ালে গরু, উঠানে ধানের জোড়া মরাই—কোন কিছুরই অভাব নেই। সেই সঙ্গে আছে নগদ টাকা। কথাটা সকলের জানা। ইয়াসিন এ বিষয় একটু বিশেষ ভাবেই সচেতন। সংসার তার ছোট। খুবই ছোট। স্বামী স্ত্রী এবং একমাত্র মেয়ে আমিনা। আমিনার বিয়ের বয়স বহু দিন পার হয়ে গেলেও আজও সে অনূঢ়া। কারণ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ ভাল পাত্র আজও পাওয়া যায় নি, দ্বিতীয়ত ইয়াসিন তেমন ভাবে চেষ্টাও করে নি। অপত্যস্নেহ তাকে নিবৃত্ত করে রেখেছে। যে ক'টা দিন কাছে থাকে সেইটুকুই লাভ। তা ছাড়া কি আর এমন বয়স হয়েছে। সবে মাত্র তেরোয় পা দিয়েছে আমিনা। কিন্তু পুরন্ত গড়নের জন্যে বয়সের অঙ্কটা সহজে কেউ বিশ্বাস করে না। মেয়েও হয়েছে তেমনি—আজও বাপের সঙ্গে জাদালে মাছ ধরতে যায়। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কোমরে কাপড় জড়িয়ে গাছে চড়ে, ফল পাড়ে। সে ফল ওপাড়ার হিন্দু ঝি-বৌদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে আসে। তাদের সঙ্গে তাদের সংসারের নানা খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে আলাপ করে। নববিবাহিতা মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাইতেই ওর আগ্রহ বেশী। হাঁ করে সে ওদের গল্প শোনে। অন্তরে কি যেন একটা ব্যাকুলতা অনুভব করে। নূতন নূতন প্রশ্ন করে আলোচনার গতি অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে। মনে তার রং ধরেছে। সে রঙে তার পৃথিবী অপূর্ব্ব হয়ে উঠেছে। বাড়ী ফিরে আসে খুশীর আমেজে যেন ডানায় ভর করে, কিন্তু বাড়ীর আঙ্গিনায় পা দিতেই তার স্বপ্নের ঘোর কেটে যায়। মা চেঁচামেচি করে বাড়ী মাথায় করে তুলেছে। মেয়েকে ফিরে আসতে দেখেই সে ফেটে পড়ল—তোর আক্কেলডা কেমন লো আমিনা? এতহানি বেইল কোথায় আছিলি তুই? তোর বাপজানের ফেরবার সময় হইছে—বাসি ওই কয়হান থুইয়া লইয়া আয়।

আমিনা কঠিন বাস্তব সংসারে ফিরে এসেছে। বিনুদিদির ফুলশয্যা-রজনীর চিত্তাকর্ষক গল্পের সঙ্গে কোথাও এক বিন্দু মিল নেই। আমিনা দ্রুতপদে বাসি থালা-বাটি নিয়ে ঘাটের পথে অদৃশ্য হয়ে যায়। বাটির শব্দে আকৃষ্ট হয় তার পোষা দুটো হাঁস। প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করে জেগে ওঠে তারা। আলস্য ভেঙে দ্রুত অনুসরণ করে আমিনাকে। গ্রীবা বাঁকিয়ে চেয়ে দেখে আরও দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে যায় সে। হাঁস দুটো পেছনে পেছনে আসতে থাকে।

পুকুর-ঘাটে নামবার পূর্ব্বে মুহূর্তের জন্য আমিনা থমকে দাঁড়ায়। এঁটো বাসনগুলি নামিয়ে রাখে। হাঁস দুটো আরও দ্রুত গতিতে ছুটে আসে। আমিনার মুখে হাসি দেখা দেয়। ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, কিছু নাই রে···কিছু নাই।··· হাঁস দুটো বারকয়েক বাসনগুলোর চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে মাথা নেড়ে নেড়ে ডাকে প্যাঁক···প্যাঁক···প্যাঁক···

আমিনা বসে পড়ে। নীরবে একদৃষ্টে হাঁস দুটোর পানে তাকিয়ে থাকে। ওদের একটা অপরটাকে তখন সোহাগ জানাচ্ছে চঞ্চুতে চঞ্চু ঠেকিয়ে। আমিনা কি ভাবে তা সেই জানে। হয় তো বা বিনুদিদির কাছে শোনা তার ফুল-শয্যার রাতের কাহিনী তার মনকে নাড়া দেয়। দু'চোখ তার ভাবাবেগে গভীর হয়ে ওঠে। একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অনুভূতি তাকে বিহ্বল করে তোলে। আমিনা সহসা হাত বাড়িয়ে একটা হাঁসকে ধরে ফেলে বুকের উপর গভীর আবেগে চেপে ধরে। এমন সে ইতিপূর্ব্বে বহুবার করেছে, কিন্তু আজকের দিনটি তার বুকে এক অপূর্ব্ব স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে। হাঁসের মাথাটি গালের উপর চেপে ধরে সে চোখ বুজে বসে থাকে। কান পেতে শোনে তার বুকের মধ্যে এক নূতন সুরের ব্যঞ্জনা।···সহসা মায়ের কর্কশ কণ্ঠের তিরস্কারে চমকে উঠে আমিনা হাঁসটাকে ছেড়ে দিলে।

মা বলছিলেন,—ঢ্যাংড়া মাইয়া হইছস্, তোর বুদ্ধিহইবে কি মরলে! দুইহান থাল মাজ্‌তে আইছস দুই দণ্ড আগে না···

আমিনা চোখ তুলে দেখে মার পশ্চাতে তার বাবাও নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন। সে লজ্জায় এতটুকু হয়ে যায়। ছিঃ ছিঃ—বাবা কি ভাবলেন।

মা পুনরায় কাৎভকণ্ঠে চিৎকার করে উঠতেই ইয়াসিন তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, চুপ দে আমিনার মা। বিল্লি দিয়া হালচাষ করোম যায় না।

আমিনার মা কিন্তু থামতে পারলে না, বলতে লাগল—চুপ দেবার হয় তুমি ভাও। আমি মাইয়া মানুষ, আমারে শিখাইতে হইবে না। ঢ্যাংড়া মাইয়া ঘরে পুইষসা বাখপা হইবে না এমন দশা। তোর আইজ কোন খোয়ার করি দেখফি।

ইয়াসিন একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে তাকায়। আমিনাকে বলে,—খাড়াইয়া খাড়াইয়া শোনস কি আমিন্ তুই আমার লগে আয়।

এবার ইয়াসিন মেয়ের বিয়ের জন্য রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠল এবং এক মাসের মধ্যেই পাশের গ্রামের বসির আলীর একমাত্র ছেলে ইদ্রিসের সঙ্গে আমিনার বিয়ে হয়ে গেল।

দিব্যি লম্বাচওড়া ছেলেটি। মাথাভরা একরাশ কাল চুল। মাঝখান দিয়ে সিঁথি। দু'পাশ দিয়ে লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ। ভরাট গোলগাল মুখখানি। মিশকালো গায়ের বর্ণ। ঝকঝকে দু'পাটি দাঁত। মুখে হাসি লেগেই আছে। বয়স বছর কুড়ি; একটু বেশীও হতে পারে। আমিনার সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে।

আমিনা চেয়ে চেয়ে দেখে। মরদের মত চেহারা বটে। সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ। আমিনা তার দুই সবল বাহু-বেষ্টনের মধ্যে একান্ত নির্ভরতায় ধরা দেয়। জীবনের একটা নূতন দিক তার কাছে অভিনব রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

বসির আলি ইয়াসিন মিঞার মত অতটা সঙ্গতিপন্ন না হলেও মোটামুটি অবস্থা তার ভালই। খাওয়া-পরার ভাবনা নেই। নিজের জমিতে দুই বাপ বেটায় মিলে লাঙ্গল দেয়। তাদের মিলিত চেষ্টায় সেখানে সোনা ফলে। নগদ টাকাকড়ি বেশী নেই বটে, কিন্তু অনটনও নেই। পাকা গৃহস্থ।

আমিনার দিন এখানে ভালই কাটছে। স্বামীর কতকগুলি কাজ সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। এর উপর আছে গরুর জাবনা দেওয়া, সংসারের ছোটবড় ফাইফরমাস খাটা। ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। সারাদিন আমিনা চরকির মত হাসিমুখে ঘুরে বেড়ায়। মোটের উপর শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে সে সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। বাপ মাঝে মাঝে খোঁজখবর নেয়। নিয়ে যাবার কথা উঠলে আমিনা নিজে থেকে আপত্তি জানায়। বলে, বুড়া হাউড়ি—বাপ হাসিমুখে প্রস্থান করে। শাশুড়ী খুশী হন—ননদিনী আড়ালে মুখ টিপে হাসে। আর ইদ্রিস আয়নায় বার বার মুখ দেখে অপরের দৃষ্টি এড়িয়ে।...

শাশুড়ী, ননদিনী তাকে ভাল চোখেই দেখে। আমিনা এ বাড়ী আসার পর থেকে তারা একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচবার অবকাশ পেয়েছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। আমিনা রান্না করতে বসে ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। হাত চালিয়ে দ্রুত কাজ শেষ করতে গিয়ে আরও দেরী করে ফেলে। নিজের উপর নিজেই বিরক্ত হয়ে ওঠে। মনে মনে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে। অকারণে হাতা খুন্তি লোহার কড়াইয়ের উপর আছড়ে ফেলে। সেই শব্দে সে যেন কতকটা আশ্বস্ত হয়।

ননদিনী হাঁক দেয়,—হেই শোনছনি ভাইজান আইছে। এক ধামা হুরুম দিয়া যাও, আর বাপজানের তামাক। এগুলি আমিনার নিত্যকরণীয় কাজ। এর পরের দৃশ্যে ননদিনীকে দেখতে পাওয়া যায় রান্নাঘরে। এবার তাকেই নিতে হবে পাকশালার ভার। আমিনা খুশী হয়ে ওঠে বলে, কারেরথনে দুইহান দাউর লামাইয়া লইও। মোর মনে আছিল না। সন্ধ্যাবেলায় আমিনার ভুলচুক প্রায়ই হয়, কিন্তু তা নিয়ে কারুর তরফ থেকে অনুযোগ নেই।

আমিনা ত্বরিতপদে প্রস্থান করে। স্বামীকে একধামা মুড়ি দিয়ে শ্বশুরের জন্তে তামাক সাজতে বসে। ক'লকের কয়লায় আগুন দিয়ে নিঃশব্দে ফুঁ দেয়। আগুনের রক্তিম আভা আমিনার মুখে প্রতিফলিত হয়ে বড় চমৎকার দেখায়। অদূরে বসে মুড়ি খেতে খেতে ইদ্রিস মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখে। একবার বাপের অলক্ষ্যে হাত পা নেড়ে কিছু একটা ইসারা করতে চায়। কিন্তু কষ্টে নিজের ইচ্ছাটাকে দমিয়ে রাখে। আমিনা দেখেও দেখে না। একমনে ক'লকেতে ফুঁ দিতে থাকে।

ইদ্রিস বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না। বলে, বাপজানের তামাক দিয়া মোরে দুইডা কাচামরিচ দিয়া যাইও। খালি হুরুম খাওন যায় না।

আমিনা শ্বশুরকে তামাক দিয়ে স্বামীর জন্ম কাঁচা লঙ্কা আনতে যায়। তার পরনের কাপড়ে পা জড়িয়ে পত্ পত্ শব্দ হয়। ইদ্রিসেরও চোখ-কান সজাগ হয়ে ওঠে। আমিনার চলাফেরা, কথা বলা সবই তার মনকে দোলা দেয়।

রাত্রে একলা ঘরে আমিনা স্বামীর বক্ষলগ্ন হয়ে গদ গদ কণ্ঠে বলে, মোরে তোমার একখান কটোক দেবার পার নি।

ইদ্রিস বিস্মিত কণ্ঠে বলে, কটোক। মোর কটোক দিয়া তুই করবি কি?

আমিনা বলে, আমাগো গেরামের বিন্দুদিদি সোয়ামীর কটোক হায়ের লকেটে বন্ধাইয়া থইছে—ইদ্রিস দাঁত বের করে হাসে। আধো আলো আধো অন্ধকারে দাঁতগুলি তার ঝক্ ঝক্ করে ওঠে। সে খুশীর সুরে বলে, তোর হার নাই—ঝুলাবি কিসে?

আমিনা চটপট জবাব দেয়, ক্যান কালা সুতায়।

ইদ্রিস আবার হেসে ওঠে। গদ গদ কণ্ঠে বলে, আইচ্ছা, আইচ্ছা, দিমু তোরে একখান ফটোক।

আমিনা বলে, আমাগো গেরামের মাথমরাজ খুব ভাল ফটোক উডায়।···ইদ্রিস হাসিয়া আমিনাকে সজোরে বুকে চেপে ধরে।

ফটো একখানার ব্যবস্থা ইদ্রিসকে বহু আয়াসে করতে হয়, কিন্তু সে ফটো আমিনা গলায় ঝুলিয়ে রাখতে পারে নি। ফটো মিলেছে তাইতেই আমিনা খুশী। সে সযত্নে তা টিনের তোরঙ্গে রেখে দিয়েছে। মাঝে মাঝে দ্বিপ্রহরে স্বামী যখন ক্ষেতে কাজে ব্যস্ত থাকে, সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে আমিনা ফটোখানি বের করে তন্ময় হয়ে দেখে।

ইদ্রিস চাষী গৃহস্থ হলেও তার রসবোধ আছে। স্ত্রীকে সে আড়ালে আবডালে গান শোনায়—বাঁশীর সুরে মোহিত করে। আদর করে গাল টিপে দেয়।

কিন্তু তাদের জীবনের এই স্বচ্ছন্দ গতি এক দিন অতি অকস্মাৎ ব্যাহত হয়। এর জন্যে আমিনা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। জ্ঞান হবার পর থেকে যে পরিবেশে সে মানুষ হয়েছে তার সঙ্গে বর্তমানের কোথাও এক তিল মিল নেই, ফলে তার মন শুধু বিক্ষুব্ধ হয়েই উঠল না, তার প্রকাশ ঘটল তীব্র প্রতিবাদের রূপ নিয়ে।

ইদ্রিস চঞ্চল হয়ে উঠল। শঙ্কিত হয়ে উঠল নিকটেই পিতার উপস্থিতির কথা চিন্তা করে, কিন্তু স্ত্রীকে নিবৃত্ত করতে সে পারলে না, শুধু নিঃশব্দে তার মুখের পানে চেয়ে রইল। আমিনা তখন উচ্চ কণ্ঠে বলছিল, ক্যান হিন্দুরা তোমারগো করছে কি যে হ্যারগো খ্যাদাইবার চাও। এমন কাম তোমারে করতে দিমু না।

ইদ্রিস মৃদুকণ্ঠে বললে, বাপজান হুকুম দিছে আমিনা মুই করমু কি! পুবের সুয্যি পচ্চিমে ওড্‌লেও হুকুম বাপজান ফিরাইবে না।

আমিনার দু'চোখ জ্বলে ওঠে। বলে, তোমার বাপজান যদি মোরে খুন করতে কয়? প্রশ্নটা অত্যন্ত সহজ হলেও উত্তর দিতে গিয়ে ইদ্রিস চমকে উঠল। মনে মনে বলল, তোবা তোবা···আমিনা কি পাগল হইছে। কিন্তু মুখে কোন কথাই সে বলতে পারল না শুধু বড় অসহায়ভাবে আমিনার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আমিনা সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারলে না, তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল। কিন্তু পরক্ষণে বসির আলির উপস্থিতিতে কষ্টে নিজেকে সংযত করলে।

ইদ্রিস এক মুহূর্তে অনেক কথা চিন্তা করে ফেললে। তার বাপকে সে জানে। তার প্রচণ্ড ক্রোধের কথাও ইদ্রিসের অজানা নয়। সামান্য কারণেও যে বসির কত নির্মম হয়ে উঠতে পারে, তার যথেষ্ট প্রমাণ ··· কিন্তু ইদ্রিস আজ ভয় পেলে না। ধীরে ধীরে উঠে এসে স্ত্রী এবং বাপের মাঝখানে সোজা হয়ে দাঁড়াল। উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর কাঁপছে। বসির আলি এতক্ষণে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ সুরু করে দিয়েছে। তার প্রচণ্ড ক্রোধের কথা চিন্তা করেই সম্ভবতঃ বসিরের স্ত্রী ও কন্যা সেখানে উপস্থিত থেকেও নির্বাক ভাবে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ইদ্রিস এগিয়ে আসতে তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার মা বললে, তোমার মাথায় কি খুন চাপছে?

বসির আলি গর্জন করে ওঠে, তুমি চুপ দেও। চাইর আঙুল মাইয়ার এত সাহস! আইজ অর এক দিন কি আমারই এক দিন।

ইদ্রিসের দু'চোখ জ্বলে উঠল, তার শরীরেও যেন একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বসিরের তা দৃষ্টি এড়াল না। আপন অতীত যৌবনের দৃপ্ত প্রতিচ্ছবি সে পুত্রের মধ্যে আবিষ্কার করে ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল, এবং স্ত্রীর অনুরোধে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ঘটনাটার এখানেই যে শেষ হবে না এ কথা আঁচ করে মার সঙ্গে পরামর্শ করে সেই রাত্রেই ইদ্রিস আমিনাকে গোপনে তার বাপের কাছে পাঠিয়ে দিলে। এর চেয়ে কোন সহজ পন্থা তাদের চোখে তখনকার মত পড়ল না। তা ছাড়া গ্রামের আর দশজনার বিরুদ্ধে একলা কতক্ষণ সে লড়াই করবে। আমিনাকে ইদ্রিস মাঝে মাঝে বাপের বাড়ীতে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হবার প্রতিশ্রুতি দিলে। অথচ এমনি দুর্ভাগ্য যে, সে পথও তাদের রুদ্ধ হয়ে গেল। ইয়াসিন কন্যার এই অপমানকে মোটেই সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। মেয়ের পিঠ চাপড়ে বললে, সাবাস বাপের বেডি।···দু'চোখে তার আনন্দ এবং ঘৃণা একই সঙ্গে ফুটে উঠল। গ্রামের অন্যান্য মাতব্বর ব্যক্তিদের নিয়ে সে বৈঠক করলে। পাশের গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির এই যে আয়োজন চলছে তার প্রতিকার করতে তারা বদ্ধপরিকর হ'ল। নইলে তাদের নিজেদের গ্রামের ভাঙন রোধ করবে তারা কেমন করে? খবরটা ওগ্রামে গিয়ে পৌঁছাতে বিলম্ব হ'ল না। বসির আলির কাছে সে খবর আরও পল্লবিত হয়ে গিয়ে পৌঁছল, কিন্তু নিষ্ফল আক্রোশ শুধু শূন্যে হাত পা ছুঁড়ে তাকে ক্ষান্ত হতে হ'ল।

কিন্তু সত্যিকারের বিপদে পড়ল ইদ্রিস, আর চোখে অন্ধকার দেখল আমিনা। আজ একটি সপ্তাহ হ'ল সে বাপের বাড়ীতে এসেছে, এর মধ্যে একটি দিনের জন্যও ইদ্রিসের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। যতক্ষণ চোখের সম্মুখে থাকা যায় ততক্ষণই···নইলে···আমিনা তার বস্ত্রাভ্যন্তর থেকে স্বামীর ফটোখানি বের করে মুগ্ধ চোখে দেখে। একবার আশেপাশে চঞ্চল দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বুকের উপর চেপে ধরে

মুখের সন্নিকটে এগিয়ে নিয়ে যায়। মন অশান্ত হয়ে উঠে। অকারণে সে তার পোষা হাঁস দুটোকে পীড়ন করে। ওরা ভারস্বরে চীৎকার করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমিনা ঘরে ফিরে আসে। মাকে সামনে অকারণে পেয়ে খানিকটা ঝাঁজ দেখায়। তার পরে দুমদাম করে পা ফেলে ঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসে পড়ে।

আমিনার ঘরে মন টেকে না। বিনু দিদির কাছে ছুটে যায়। কিন্তু সেখানেও থাকতে পারে না। তার সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করতে গিয়ে কেঁদে ফেলে আমিনা। বিনু বলে, তুই কি পাগল হলি আমিনা। এমন ত বাপু কখনও দেখি নি। আমিনার মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে। সে সবেগে মাথা নেড়ে পালিয়ে যায়। বিনু বিস্মিত দৃষ্টিতে তার গমনপথের পানে চেয়ে থাকে।

*

রাত হয়েছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। আমিনার বাবা মা বহুক্ষণ শুয়ে পড়েছে। এতক্ষণে হয়ত গভীর নিদ্রায় মগ্ন। আমিনার চোখে ঘুম নেই। জানালা-পথে চাঁদের আলো এসে ঘরের মধ্যে পড়েছে, কিন্তু তা আমিনার জন্য কোন আশার আলো বহন করে নিয়ে আসে নি। দিন দিন আমিনার অশান্তির মাত্রা বাড়তে থাকে। তাকে ঠিক যেন আর চেনা যায় না। পরিবর্ত্তনটা এতই স্পষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মা মেয়ের জন্য চিন্তিত হন। পাড়াপড়শীরা বলে আহা এমন কাঁচা বয়েস যার···ইয়াসিন ক্ষেপে ওঠে···বসির আলির এত বড় ধৃষ্টতা। কিন্তু মীমাংসার কোন সহজ পথই তার চোখে পড়ে না।

এমনি এক অস্বস্তি যখন ইয়াসিনের সুখের সংসারকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেই সময়ই এক দিন সকালে ঘুম ভেঙে আমিনা এক নূতন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলে। তার অকস্মাৎ থেমে যাওয়া জীবনে দেখা দিলে—আনন্দের জোয়ার। আমিনা হয়ে উঠল উচ্ছল—তার চোখে মুখে ফুটে উঠল ভাবের আবেগ।

আমিনার মা শঙ্কিত হয়ে উঠল। বাপ খুশীমনে ক্ষেতের কাজে চলে যায়। প্রতিবেশিনীরা বলাবলি করে, মেয়েটার হ'ল কি।

আমিনার আজ অকস্মাৎ মনে হ'ল যে, এই দীর্ঘদিন ধরে সে মায়ের কোন কাজেই সহায়তা করে নি—বাপের পানেও ফিরে তাকায় নি। এমন কি তার পোষা হাঁস দুটোকেও নিরর্থক জ্বালাতন করেছে, এবং এই দীর্ঘদিনের ত্রুটিকে এক দিনে পুষিয়ে নিতে গিয়ে সে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করলে যাতে মা মেয়ের সম্বন্ধে রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠলেন। বাপ হেসে বললে, মোর পাগল মাইয়া খ্যাপছে—হাঁস দুটো কিন্তু পরমানন্দে আমিনার সঙ্গে সমান তালে নেচে নেচে [illegible] আর প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক···

দিন চলে যায়। আমিনার জীবনে জোয়ারের আকস্মিক বেগ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কিন্তু পথে ঘাটে, আনাচে কানাচে তাকে নিয়ে কানাঘুষো বেড়েই চলেছে। যে যার মনের মত করে গল্প রচনা করে চলেছে। কেউ বলে এরই জন্যে স্বামীর ঘর করতে পারলে না। সখ করে কি আর বাপের বাড়ী চলে এসেছে। কেউ বা বাধা দিয়ে বলে, দরকার কি স্বামীর ঘর করে, যদি নিত্য এমন নতুন নতুন···

ওদের আলোচনার মাঝখানে আমিনা হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়। হাসিমুখে বলে, ঠাকরুণ গো লোভ লাগে বুঝি···বলেই আর অপেক্ষা না করে হেলে দুলে এক বিচিত্র ভঙ্গীতে চলে যায়।

ওরা সকলে কানে আঙুল দেয়। ছিঃ ছিঃ···দিনে দিনে হ'ল কি। এক ফোঁটা মেয়ের এত আস্পর্দ্ধা! অবশ্য প্রকাশ্যে প্রতিবাদ কেউ করে না। তবে গোপন সমালোচনা আরও ঘটা করে চলতে থাকে। মিথ্যে কথা ত আর না। চণ্ডের বৌয়ের নিজের চোখে দেখা। সাহস বটে ছুঁড়ীর। নইলে রাত দুপুরে কেউ তাদের বাউতলায় যায়। এরই নাম আশনাই। কি বলছ? ছেলেটা দেখতে কেমন? ছ্যাচা লোহার দত্যি একটা।···

কথাগুলি শেষ পর্য্যন্ত ইয়াসিনের কানেও গেল। প্রথমে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও স্ত্রীর নিকট একই কথার পুনরুক্তি শুনে ইয়াসিন রাগে আগুন হয়ে উঠল। গ্রামের লোকে তাকে সর্দ্দার বলে খাতির করে। সমাজে তার একটা মানসম্ভ্রম আছে। প্রাণ গেলেও সে তার অমর্য্যাদা করতে পারে না। কিন্তু মেয়েকে ডেকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতেও তার আটকায়। মেয়ের মুখের পানে চাইলেই তার সব গোলমাল হয়ে যায়। অমন সুন্দর, নিষ্কলঙ্ক যার মুখ তার পক্ষে কখনও এমন নিন্দনীয় কাজ সম্ভব হতে পারে বলে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। অন্তরে সে কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু কষ্ট তার যত বড়ই হোক এর মীমাংসা তাকে করতেই হবে। মেয়ে বলে ইয়াসিন কিন্তু চোখ বুজে থাকতে পারে না।···

* * *

পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে দেখা দিয়েছে। আমিনা উদগ্রীব হয়ে তার ঘরে বসে আছে। আজ সারা বিকেল ধরে সে সযত্নে চুল বেঁধেছে। বেছে বেছে সে তার লাল কুর্ত্তাটি গায় দিয়েছে। পাছাপেড়ে শাড়ীখানি পরতেও ভুল করে নি। দুই ভ্রূর মাঝে সযত্নে লাগিয়েছে কাঁচপোকার টিপ—পায় পরেছে আলতা। বিনুদিদির কাছ থেকে চেয়ে আনা পাউডার লাগাতেও তার ভুল হয় নি।···

রাত একটু বেশীই হয়েছে। সমস্ত গ্রাম ঘুমে আচ্ছন্ন।

জেগে আছে। জেগে আছে একা অন্ধকার। উৎকর্ণ হয়ে ওঠে আমিনা। ভুল সে করে নি। এ শিসটাই তার সংকেতসূচক আহ্বান। আমিনা দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। সাড়া পেয়ে তার হাঁস দুটো নড়ে চড়ে ওঠে। আমিনা মৃদুকণ্ঠে বলে, লক্ষী আমার সোনা চুপ কইরগা ঘুমা···সে বাইরে উন্মুক্ত আকাশের তলায় এসে দাঁড়ায়। সঙ্কেত-শব্দ পুনরায় শ্রুতিগোচর হয়। এবারে আর অস্পষ্ট নয়। আমিনার গতি দ্রুততর হয়ে ওঠে।···

পাশের ঘরে আমিনার মা এবং বাবা এতক্ষণ জেগেই ছিল। মেয়ের আজকের হাবভাব তারা সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করেছে এবং হয়তো সেইজন্যেই মেয়ের উপর নজর রাখতে স্বামী স্ত্রী তারা এখনও জেগে আছে। দরজা খোলার শব্দে সচকিত হয়ে ইয়াসিন উঠে দাঁড়াল, ঘরের কোণ থেকে তার পাকা বাঁশের লাঠিগাছা তুলে নিয়ে অগ্রসর হ'ল। আমিনার মা দ্রুত এগিয়ে গিয়ে স্বামীকে চুপ করতে নির্দেশ দিলে এবং নিজে অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে মেয়ের পানে দৃষ্টি রেখে স্বামীকে কি ইঙ্গিত করলে। তার পরে উভয়ে আমিনাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করতে লাগল।

আমিনা ত্বরিতপদে অগ্রসর হয়ে চলেছে। সরকারী রাস্তা ধরে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সে মেঠো পথ ধরলে। চণ্ডেদের ঝাউতলায় যেতে এইটেই সোজা পথ। তা ছাড়া এই পথে বড় একটা লোক চলাচল করে না। কিন্তু তবুও কি পোড়া লোকের চোখ এড়িয়ে কিছু করবার জো আছে—আমিনা ভাবে_আর সঙ্গে সঙ্গে গতি তার আরও দ্রুত হয়ে ওঠে।

ইয়াসিন তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে পড়তে পড়তে বড় জোর সামলে নিলে। স্ত্রীকে মৃদু কণ্ঠে বললে, মাইয়াডারে কি দানোয় পাইছে?

আজও আমিনা এগিয়ে গিয়ে আঙিনায় দাঁড়াল। একবার চতুর্দিকে চেয়ে চেয়ে যেন কিসের সন্ধান করলে। ইয়াসিন এবং তার স্ত্রী একটা ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে মেয়ের উপর দৃষ্টি রাখছিল।

সহসা একটা উচ্চ হাসির শব্দের সঙ্গে আমিনার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এই ছাড়···ছাড়···ব্যথা লাগে—

ইয়াসিন সবিস্ময়ে দেখলে দুখানি বলিষ্ঠ বাহু ...... বেষ্টন করে কাছে টেনে নিলে।···সে একটা চাপা হুঙ্কার ছাড়লে, হুম্। ইয়াসিন শক্ত করে তার হাতের লাঠিগাছা চেপে ধরতেই আমিনার মা তাকে বাধা দিলে। চাপা কণ্ঠে বললে, থামো—

আমিনা এতক্ষণে আগন্তুকের বাহুবেষ্টনমুক্ত হয়ে ঝাউ-গাছের তলায় তারই গা ঘেঁষে বসেছে। দু'জনেই হেসে হেসে এ ওর গায়ের উপর গড়িয়ে পড়ছে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো এসে ওদের চোখেমুখে পড়েছে—

আমিনার মা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্বামীকে উদ্দেশ করে বললে, ঘরে চল—

ইয়াসিন বিস্মতভাবে স্ত্রীর পানে মুখ ফেরাতে সে ফিস্ ফিস্ করে বললে, আমাগো ইদ্রিস।

ইয়াসিন আর একবার ঝাউতলার দিকে ফিরে দেখে ঘুরে দাঁড়াল। হাতের লাঠিগাছা ফেলে দিয়ে সে স্ত্রীর একখানি হাত সহসা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরলে। ঝাউতলার যে চাঁদের আলো লুকোচুরি খেলছে তার অভাব এখানেও নেই। ইয়াসিনের হাতের মুঠি আরও শক্ত হয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টিও হয়তো বা মুহূর্তের জন্য চক্ চক্ করে উঠে থাকবে।

আমিনার মা মৃদু হেসে স্বামীর হাত ধরে আকর্ষণ করে···

একজন অর্দ্ধবিস্মৃত কবি ও তাঁর কাব্য

শ্রীসুনীলকুমার বসু

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে বাংলা কাব্যের স্রোতহীন বেলাভূমিতে যে নূতন রসানুভূতির জোয়ার এল, তা যেমন বিচিত্র তেমনি জটিল। তার বহু সুরের ঐকতানের মধ্যে একদিকে শোনা গেল, "surge and thunder of Odyssey",—মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে; তেমনি আবার শোনা গেল গীতিকাব্যের কলস্বন, যার প্রতি-ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছিল বাংলার গীতিগুঞ্জরিত প্রাঙ্গণ। বিহারিলাল সেই সঙ্গীতের অন্যতম প্রধান বৈতালিক। মধুসূদনের তীক্ষ্ণ তেজ তাঁকে ম্লান করে দিতে পারে নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যে আমরা কয়েকটি ধারা দেখতে পাই। প্রথমতঃ রঙ্গলাল প্রবর্তিত verse tale বা গাথা-কাব্যের ধারা। এ কাব্য রোমান্স-ধর্মী। দ্বিতীয়তঃ মহাকাব্যের ধারা এবং তা প্রধানতঃ মধুসূদনের লেখনী-নিঃসৃত। এই ধারা অনুসরণ করে একটা ক্লাসিক রীতির প্রবর্তন হ'ল। কিন্তু এই দুই জাতীয় কবিতা objective বা বহির্ভাবমুখী, একলা কবির নিঃসঙ্গ অন্তরের আকুলতা প্রকাশের যোগ্য বাহন নয়। কিন্তু গীতিকবিতার প্রয়োজন সব যুগেই থাকে এবং এ যুগেও ছিল। তাই দেখা যায় এ যুগে অসংখ্য গীতি-

কবিতা রচিত হয়েছে, যার অধিকাংশই আজ বিস্মৃত বা অর্দ্ধ-বিস্মৃত। এলিজাবেথীয় যুগে ইংরেজী সাহিত্যে এইরূপ গীতি-কাব্যের অজস্র বিকাশ ঘটেছিল। তৎকালীন সঙ্কলন-গ্রন্থগুলির ভিতর দিয়ে আজও সেই কাব্যধারা আধুনিক পাঠকদের কাছে পৌঁছে এবং তাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। দুঃখের বিষয় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সঙ্কলন-গ্রন্থ ছিল না বললেই চলে। ফলে বহু কবিতাই আজ পুরানো কীটদষ্ট পুস্তকের জীর্ণ পাতায় বিলীয়মান। এই বিরাট কাব্য-সাহিত্যের নিম্নলিখিতরূপ শ্রেণী-বিভাগ করা যেতে পারে; যেমন, (১) নীতিমূলক, (২) প্রণয়াত্মক, (৩) নিসর্গবিষয়ক, (৪) সমাজবিষয়ক, (৫) জাতীয়তাবোধক, (৬) আধ্যাত্মিক, (৭) বাউল প্রভাবিত ভাব-বিষয়ক, (৮) ব্রাহ্মধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ইত্যাদি। এই বিভিন্ন ও বিচিত্র কাব্যাবলীর ভিতর দিয়ে এ যুগের গীতিকাব্যের প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

এ যুগের বিস্মৃত এবং অর্দ্ধবিস্মৃত কবিদের মধ্যে চিরঞ্জীব শর্ম্মা একটা বিশেষ স্থান দাবি করতে পারেন। এঁর আসল নাম ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল। চিরঞ্জীব নামে ইনি অনেকগুলি বই লিখেছেন। গদ্যে ও পদ্যে বহু রচনার স্রষ্টা হলেও ইনি প্রধানতঃ কবি। গান ও গীতিকবিতার মধ্যে এঁর শক্তির মৌলিকতা ও রসপ্রাচুর্য্যের নিশ্চিত সাক্ষ্য বর্ত্তমান। 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী'তে বলা হয়েছে, "শান্তিপুরের নিকট ইঁহার জন্মস্থান।" 'সাহিত্য-পঞ্জিকা'র মতে চুপী (বর্দ্ধমান) এঁর জন্মস্থান। এঁর জীবিতকাল ১২৪৭-১৩২২। 'সঙ্গীত মুক্তাবলী'তে এঁর এইরূপ পরিচয় দেওয়া আছে, "ইনি বঙ্গদেশের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের এক জন অতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-কবি। ইঁহার অনেক সঙ্গীত নানা স্থানের ব্রাহ্মসমাজে গীত হইয়া থাকে।...কেশবচন্দ্র সেন ইঁহার সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইতেন।" এঁর বিভিন্ন গদ্য-পদ্য গ্রন্থগুলির নাম গীত-রত্নাবলী, বিংশ শতাব্দী, গরলে অমৃত, কেশব-চরিত, নব বৃন্দাবন, যুগল-মিলন, ঈশাচরিত, বাল্যসখা, যৌবন সখা, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি। এঁর মধ্যে সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মের একটা উদার ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁর কাব্যে বিদেশী কবির অস্ফুট ছায়া-রেখা লক্ষিত হয় এবং এঁর গানে ব্রাহ্মভাবের মধ্যে হিন্দুভাব ত আছেই; এমন কি খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের উপরও এঁর বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়।

"গীতরত্নাবলী" (১ম সং, শকাব্দ ১৮০৬, ২য় সং শকাব্দ ১৮০৮) নামক দুই খণ্ডে যে বিরাট গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে সঙ্কলিত ৯৮৫টি গান, কবির মূল প্রেরণা যে ছিল লিরিক তাঁর নিশ্চিত সাক্ষ্য দেয়। কোন বিশিষ্ট ধর্ম্ম-প্রেরণা থেকে লিখিত হলেও এগুলি সার্ব্বজনীনতায় পরিপুষ্ট। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় কবি বলছেন যে, ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের প্রেরণায় সাহিত্যের উন্নতি ঘটে থাকে, যেমন বৈষ্ণব-সাহিত্যের বেলায়। "ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধানের দ্বারা এ সম্বন্ধে অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে যে উন্নতি হইয়াছে তাহা আশ্চর্য্যজনক।......গীতরত্নাবলীতে যে সকল গান রহিল ইহা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির ইতিহাস বিশেষ। এই সকল সঙ্গীতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শাক্ত, বৈষ্ণব, জ্ঞানী, ভক্ত অশিক্ষিত নর-নারীগণ আপন আপন ভাবের ছবি দেখিতে পাইবেন।"

চিরঞ্জীব 'বাল্য-সখা' নামে একখানা শিশুপাঠ্য কবিতা-পুস্তক লিখেছিলেন। বইখানির বহু সংস্করণ হয়েছিল। এই কবিতা-পুস্তকে অনেক গতানুগতিক বিষয় থাকলেও শিশুমনের সূক্ষ্ম ভাবপরিবর্ত্তনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বুড়ী ঝিকে ঘিরে বসে ছেলের দলের ভূতের গল্প শোনা, নিদ্রালু ননীগোপালের শাস্তি প্রভৃতি এই ধরণের বিষয় সন্নিবেশের মধ্যে এটা সজীব নাটকীয়তা আছে। এই কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য—কল্পনার সহজ সরল স্বাভাবিক বিকাশ, সৌন্দর্য্যের ঋজু উদার অনুভূতি। প্রকৃতি-বর্ণনায় কবির সৌন্দর্য্যোপলব্ধির বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন,

ঘুচিল আঁধার উদিল তপন
রাঙা মুখখানি খুলি,
কোণে লুকাইয়া যেন কুলবধূ
দেখিছে ঘোমটা খুলি। (প্রভাত)।

পুনরায়:—

ছোট ছোট তারাগুলি আকাশের গায়,
মাথার উপরে বসি মিটি মিটি চায়;
আঁধার রজনীকালে সুনীল গগনথালে
সাজাইয়া দীপমালা বিবিধ শোভায়,
কে যেন বরণ করে জগৎ পিতায়। (আকাশ)

'যৌবন-সখা' নামে কবির আর একখানি কাব্য গীতি-কবিতা হিসাবে বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। 'বনমালা' নামক আর একখানি পুস্তকে 'যৌবন-সখা'র বিভিন্ন কবিতা স্থান পেয়েছে। কবির গীতি-প্রেরণার মধ্যে বিভিন্ন ভাবের উপাদান মিশ্রিত রয়েছে। প্রথমতঃ তিনি কবি হিসাবে বিশ্বের সমস্ত পরিদৃশ্যমান রূপের মধ্যে এক বিস্ময়-রস-সম্পৃক্ত সৌন্দর্য্য দেখেছেন। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের স্বচ্ছ ঊর্দ্ধলোকে সীমাবদ্ধ থাকতে তার গভীর ভাবদৃষ্টি অস্বীকার করেছে এবং নিবিড়তর অভিজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষায় বিস্ময়ের অতল নিস্পন্দ মর্ম্মমূলে ডুব দিতে চেয়েছে। তাই ইনি নিসর্গের কবি, প্রেমের কবি হলেও বাহ্যিক রূপের কবি নন। ইনি বিহারিলাল অপেক্ষা কয়েক বৎসরের ছোট হলেও (বিহারিলালের জন্ম সন ১৮৩৪) উভয়ের কাব্যজীবন প্রায় সমান্তরাল ভাবে চলেছিল। 'সারদা-মঙ্গল' রচনা ১২৭৭ সালে আরম্ভ হয় এবং ১২৮১ সালে 'আর্য্য দর্শনে' আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'যৌবন-সখা' প্রকাশিত

জন্ম ১২৯৪ সালে। সুতরাং 'সারদাম[illegible]ল' কাব্যের সঙ্গে এই কবির পরিচয় থাকা সম্ভব ছিল। তা ছাড়া নিসর্গপ্রীতির দিক দিয়েও চিরঞ্জীবের অনেক কবিতা বিহারিলালের অনুগামী। বিশ্বের মূলীভূত বিস্ময় উভয় কবির মনে একই রকমের সুর অনুরণন জাগিয়েছিল। 'বাগ্‌দেবী' কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং আবাহন (invocation) মধুসূদনগন্ধী। যেমন,

> বকীন্দ্র-জননী মাতঃ। চিত্তবিনোদিনী
> আদি কবি, [illegible], তব পদে
> করি গো প্রণতি করপুটে।

কিন্তু অবিলম্বে তিনি মধুসূদনের মহাকাব্যিক নৈর্ব্যক্তিকতা কাটিয়ে বিশ্বের আত্মগত ভাববিহ্বল রূপ ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হলেন এবং সেখানে তাঁর ভাবটি বিহারিলালের অনুসারী; তাঁর 'বাগ্‌দেবী' কবিতা রস-রূপে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করে নিসর্গে এবং মানুষের মনে ("And in the mind of man"—Tintern Abbey) নিবিড়ভাবে অবস্থিত। তাই তিনি প্রশ্ন করেন, "তবে হায় জড়বাদী কেন বলে জ্ঞানের বিকাশে পঞ্চ বিলুপ্ত হইবে?" কিন্তু কবির এই মানস-লক্ষ্মী শুধু বাগ্‌দেবী নন, ইনিই বিশ্বের মূলীভূত শক্তি যার আহ্বানে যীশু ক্রসে প্রাণ দিয়েছেন, চৈতন্ত প্রেমরসে ভেসেছেন—ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এক দৃপ্ত ও দীপ্ত প্রকাশ ("the awful shadow of some unseen power"—Shelley)। এই কবিতা মনে করিয়ে দেয়,

> "শুনিয়াছি, তারি লাগি
> রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্নকন্থা, বিষয়ে বিরাগী
> পথের ভিক্ষুক,...... ...."

আর একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই কবি যাকে 'কবি কল্পলতা' বলে সম্বোধন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে 'মানসসুন্দরী'তে 'কবিতা-কল্পনা-লতা' বলে আহ্বান করেছেন। চিরঞ্জীবের অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গী সজীব ও সরস। কবিতার আঙ্গিক পুরানো হলেও আত্মায় নবীনতার আস্বাদ আছে।

> "বিপুল যৌবনপূর্ণা প্রাবৃটের তটিনী
> কিবা প্রভাবতী!
> শিশুর বিনোদ হাস্তে বিমল কোমল আস্তে
> কেমন সৌন্দর্য্যচ্ছটা ভাসে দিন যামিনী
> মনোহর অতি।"

(আশা-সন্দীপন, বনমালা)

বিহারিলালের মত ইনিও চরাচরে বিশাল ও মহান্ প্রকাশ দেখে রসাপ্লুত হয়েছেন।

> "একি দেখি কীর্ত্তি, মহান প্রকাণ্ড
> শূন্যে ভ্রাম্যমাণ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড
> যেদিকে যখন ফিরাই নয়ন নিরখি বিচিত্র সৃষ্টি অগণন
> আকাশ ধরণী তলে।" (বিস্ময়, যৌবন-সখা)

মানুষের ক্ষুদ্র সংস্কারের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে কবির সুদূর পিয়াসী অন্তর সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না, সে চায় বিরাট ও মহানের মধ্যে, মহত্ত ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিতে। তাই তিনি বলছেন:

> "অনন্তের প্রশান্ত হৃদয়ে
> নির্ব্বাণের নিভৃত নিলয়ে
> ভুলিয়া উপাধি ধাম, দেশ কাল জাতি নাম
> ঢালি দি' এ ক্ষুদ্র প্রাণ মহা প্রাণময়ে
> মিশে থাকি একাকার হয়ে।"

(অজ্ঞানানন্দ, যৌবন-সখা)

এই বিশ্বচেতনা কবিকে সঙ্কীর্ণ অর্থে theist হতে দেয় নি, অনন্তের পটভূমিকায় অমর আত্মার তীর্থযাত্রার অবকাশ দিয়েছে। 'দেবপ্রভাব' ও 'বিস্ময়' নামক দুটি কবিতায় সেই মহান প্রকাশের কথা গভীর অনুভূতির সঙ্গে বলা হয়েছে:

> "পাখীর পাখায়, গাছের পাতায়
> সলিল-দর্পণে, অনল-শিখায়
> জলদের গায় শশীর ছটায়
> কার অপরূপ ভাতি শোভা পায়
> বিবিধ মুরতি ধরি?"

(বিস্ময়, যৌবন-সখা)

কবির কাব্যের মূল সুর অনন্তের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আকুলতা এবং মাঝে মাঝে ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত ইনিও দৃশ্যমান জগৎকে অতিক্রম করে অদৃশ্য মহা অনন্তের দিকে যাত্রা করতে চান:

> "যাইব স্বদেশে, আর রব না এখানে,
> পশ্চিম দিগন্তব্যাপী আঁধার সাগরে;
> চড়িয়া সমাধি-রথে অনন্ত জীবন-পথে
> ধাইব অনন্ত কাল অনন্তের পানে।"

(অজ্ঞানানন্দ, যৌবন-সখা)

এখানে 'স্বদেশ' শব্দটি লক্ষণীয়, এর মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক দ্যোতনা রয়েছে। উপরি-উক্ত কবিতায় অসীমের সঙ্গে মিলিত হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। যা সসীম ও অতিপরিচিত তাতে কবির তৃপ্তি নেই। সেই অসীমের জন্য একটা আকুলতা দেখা যায় কবির অনেকগুলি গানে; এবং 'পাখীর প্রতি', 'অজানিতের টান' (বঙ্গবাণী) প্রভৃতি কবিতায়। দূরের জন্য, অপরিচিতের জন্য, অসীমের জন্য গভীর আকুলতা ব্যক্ত হয়েছে কবির মরমী কণ্ঠে, সেই অচেনা দেশের ফুলের গন্ধ, অদৃশ্য অননুভূত পথে সমীরিত হয়ে কবির অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই গানগুলির উপর বাউল-প্রভাব স্পষ্ট, কবি বলছেন,

> "সে দেশে যাবার তরে প্রাণ যে কেমন করে!"

এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত গান,—

"কোন্ মেঘেতে আলা তোমায় কে জানে টিকানা
কোন্ গানের সুরের পারে তার পথের নেই নিশানা
ওগো সেই দেশেরি তলে, আমার মন যে কেমন করে,
তোমার মালার গন্ধে,… ।"

* * *

কবির প্রেম-বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে গভীর দার্শনিকতা এবং গেলীয় ভাবোচ্ছ্বাস অনুভব করা যায়। প্রেম দেহাশ্রয়ী হয়েও একটা দেহাতীত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, যা অন্তরের সঙ্গে অন্তরকে নিবিড় বন্ধনে বেঁধে দেয়। মানুষের অন্তরের এই প্রেমানুভূতির ভিতর দিয়ে অনন্তের প্রকাশ ঘটে।

অনন্তের প্রেমাভাস, হয় সবে স্বপ্রকাশ
মানবহৃদয়াধারে মূর্তিমান আকারে।
(বন্ধু অন্বেষণ, যৌবন-সখা)

পুনরায়,

হৃদয়ে হৃদয়ে আছে প্রেমবিন্দু
তার অন্তরালে মহাপ্রেম সিন্ধু
মিশে বিন্দু সনে সিন্ধুর সদনে
হায় আমি যাবো কবে ;
জীবনের আশা প্রাণের পিপাসা
হবে নিবারিতে দিয়ে ভালবাসা
পশিয়া মরমে গলিয়া চরমে
সিন্ধুমাঝে বিন্দু রবে।
(প্রীতিঃ পরম সাধনম্, যৌবন-সখা)

রোমান্টিক হলেও বিহারিলাল বা রবীন্দ্রনাথের মত রোমান্টিক চিরঞ্জীব নন ; বিস্ময়ের প্রাচুর্য্যে ইনি বিহারিলালের মত ভেসে যান নি, বিস্ময় এঁর অন্তরের শুধু আবেগ নয়, দুরূহ প্রশ্ননিচয়কেও জাগিয়ে তুলছে। এঁর কবিতায় অনেক দার্শনিক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে কবিতার রসরূপ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবে একটা লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মাঝে মাঝে কবির কল্পনা সুন্দর ভঙ্গিমার মধ্যে সুলক্ষণ পরিণতি লাভ করেছে। এই সব ক্ষেত্রে কবির তীক্ষ্ণ চেতনা তাঁর হৃদয়াবেগকে সংযত রূপের মাধ্যমে নব নব উপমার দ্বারা রূপায়িত করেছে :

প্রেমও কি ডুবে গেল কালের আঁধারে ?
তবে কি স্বপন আমি দেখিনু সংসারে ?
কাটিয়া আমার মায়া শ্মশানে প্রিয়ার কায়া
জ্বলন্ত অনলে পুড়ে গেছে একেবারে।
… … …
কালের আঁধার তলে অনন্ত জলধি জলে
বিলীন হয়েছে দেহ জন্মের মতন,
পাব না দেখিতে আর নয়নে সে রূপ তার
স্মৃতির দর্পণে মাত্র হয় দরশন।
(প্রেম নিরাকার, যৌবন-সখা)

এই কবির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো :
১, ইনি গতানুগতিক উপমার বদলে অনেক ক্ষেত্রে নূতন উপমার বহু প্রয়োগ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, এঁর কবিতার মধ্যে ব্যক্তিত্বের একটা সজীব স্পর্শ পাওয়া যায়। কল্পনার আতিশয্যে ও শব্দপ্রয়োগের নৈপুণ্যে এঁর প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাগুলি উপভোগ্য। যেমন,—

তরুলতিকামণ্ডিত
গিরিমালা, তদুপরি অনন্তশিখর-
শ্রেণী, যেন সেনাদল সৈনিক নিবাসে
দাঁড়াইয়া। দুগ্ধফেননিভ বারিধারা
রজতরঞ্জন, পড়ে খসি শিলাতলে
নাচিয়া নাচিয়া ; মুক্তাফল সম তার
বিন্দু ছুটে চারিদিতে, রঞ্জিত হইয়া
ভানুকরে নানাবর্ণে। (হিমালয়, যৌবন-সখা)

এখানে সৈন্যদলের সঙ্গে শিখরশ্রেণীর তুলনায় অভিনবত্ব রয়েছে। 'রজত-রঞ্জন', 'ভানুকর' প্রভৃতি কথার ব্যঞ্জনা সুন্দর। নিসর্গ পরিদর্শনে অতি ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্য-কণাও স্বর্ণরেণুর মত ঝলমল করছে।

চন্দ্রাতপ সম মণিমুক্তা খচিত-নীল
অনন্ত গগন,
করে তাহে ঝলমল রবি শশী তারাদল
হেরিলে সে শোভা আহা জুড়ায় নয়ন।
ইচ্ছা হয় নদীতটে পাতিয়া বসন
শুয়ে শুয়ে ঊর্দ্ধনেত্রে সৌরলোক সনে রে
করি সুখে প্রেম আলাপন।
কবিচিত্ত প্রমোদিনী ফুটন্ত গোলাপ আয় ;
তোরে বক্ষে ধরি
জুড়াই তাপিত হিয়া একদৃষ্টে নিরখিয়া
নাসারন্ধ্রে সন্তোষকরন্দ পান করি ;
হরিদ্বরণ পত্রে ঢাকা আহা মরি ;
কি রূপলাবণ্য তোর সহাস্য বদনে রে
লইল আমার প্রাণ হরি।
(স্বভাবসঙ্গ, যৌবন-সখা)

চিরঞ্জীব শর্ম্মার কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলির কথা আলোচনা করা হ'ল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম কবিদের পাশে হয় ত তাঁর স্থান হবে না। কিন্তু সে যুগের বিভিন্ন চিন্তাধারা ও ভাব-বিপ্লবের কেন্দ্রস্থলে যে তিনি এসেছিলেন সে পরিচয় তাঁর কাব্যেই আছে। ঊনবিংশ শতাব্দী একটা বিরাট সাংস্কৃতিক জাগরণের যুগ। সে যুগে বাংলার কূলে বহু তরঙ্গ এসে প্রতিহত হয়েছিল। সেই বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের রেখা বহন করছে চিরঞ্জীবের কবিতা।

সমবায়

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি, এম-এ

সামবায়িক পূর্ব প্রতিজ্ঞা
(Postulates of Induction)

সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী বলিতেছেন—সমবায়িত্বঞ্চ সমবায় সম্বন্ধেন সম্বন্ধিত্বং, ন তু সমবায়বত্বং সামান্যাদাব ভাবাৎ [ভাষা পরিচ্ছেদ ; ১৪ কারিকার টীকা], অর্থাৎ অভাব প্রভৃতি সমবায়ের অনুযোগীরূপে, কেহ বা প্রতিযোগীরূপে, কেহ বা উভয় রূপে সমবায়ের সম্বন্ধী হইয়া থাকে। "সমবায়ের স্বরূপ"* আলোচনায় অভাব ও গুণের অন্যতম বিভাগ অদৃষ্টকে প্রতিযোগীরূপে উপস্থাপিত করিয়া সমবায় সম্বন্ধ বিচার করা হইয়াছে। সপ্ত পদার্থের মধ্যে অভাব ও সমবায় ছাড়া আর পাচটির সাধর্ম্যকে অনেকত্ব ও সমবায়িত্ব বলে। যদিচ অনেকত্বটি অভাবেও আছে তথাপি অনেকত্ব সমানাধিকরণ-ভাবত্ব দ্রব্যাদি পাচটির সাধর্ম্য। জ্ঞেয়ত্ব বা জ্ঞান-বিষয়তা পদার্থের অন্যতম সাধর্ম্য [সাধর্ম্যং জ্ঞেয়ত্বাদিকমুচ্যতে—ভাষা পরিচ্ছেদ ; ১৩ কারিকার অংশ] এবং জ্ঞেয়ত্ব বলিতে অভিধেয়ত্ব প্রমেয়ত্বাদি বুঝায় [জ্ঞেয়ত্বং অভিধেয়ত্ব প্রমেয়াত্বাদিকম্ বোধ্যম্ ঐ ; সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।] অতএব চরম উপনয় বা উপাত্তের আশ্রয় হইতেছে (১) অভিধা বা সঙ্কেতগ্রাহ্য অতিরিক্ত পদার্থ [অভিধেয়ত্বমভিধা বিষয়ত্বমভিধান যোগ্যত্বং বেতি নৈয়ায়িকাঃ। সঙ্কেত গ্রাহ্যোঽতিরিক্ত পদার্থ ইতি মিমাংসকাঃ], (২) প্রমেয়ত্ব এবং (৩) অভিধা ও প্রমেয়ত্বের সম্বন্ধ [(১) The mind or the subject, (২) the thing known or the object and (৩) the relation between the subject and the object]। এই সকল প্রতিজ্ঞা ছাড়া সমবায়ী সাধ্যাভাবে আরও কয়েকটি প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে। আগেই বলিয়াছি যে, সমবায়ী সাধ্যাভাব দ্বারা পৃথক পৃথক কতকগুলি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া প্রকৃত ব্যাপার-বোধক নিখিলসাধ্য নিত্য নির্বক্তিতে উপস্থিতি ঘটে। "কতক" হইতে "সমূহে" বা "সামান্য" হইতে "বিশেষে" এরূপ উপস্থিতি (ক) সাধর্ম্যত্ব এবং (খ) অধিকরণত্ব বা হেতুত্ব [যেন সম্বন্ধেন হেতুত্বেনৈব তদধিকরণং বোধ্যং—ব্যধিকরণ ধর্মাবচ্ছিন্ন অভাব প্রকরণস্থ দীধিতি] দ্বারা সম্ভব হয়।

সাধর্ম্যত্ব (The Principle of Similarity) বলিতে সমান ধর্ম যাহাদের তাহাদিগকে বলে সধর্মা, তাহাদের ভাব অর্থাৎ ধর্মকে [সমানো ধর্মো যেষাং তে সধর্মানস্তেষাং ভাবঃ সাধর্ম্যং—১৩নং কারিকার সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী] বুঝায়। (পারিমাণ্ডল্য ভিন্ন) পদার্থের সাধর্ম্যকে কারণত্ব বলে এবং কারণত্ব বলিতে নিয়তা বুঝায় (ভাষা পরিচ্ছেদ—১৫।১৬ কারিকা)। পদার্থ মাত্রেরই ধর্মসাম্য বা ঐক্যই এই কল্পনার মূলবস্তু অর্থাৎ সমজাতির পদার্থে তাহাদের প্রকৃতিগত পূর্ব-বর্তিতা বা সধর্ম থাকায় কয়েকটির বিচার ফলে সকলগুলিরই সাদৃশ্য সম্বন্ধ ধরা যায়। এক কথায় ইহাকে প্রকৃতির একরূপত্ব বা নিয়মানুবর্তিতা ধর্ম (Law of Uniformity of Nature) বলে [অনন্ত স্বরূপানাং সম্বন্ধত্ব কল্পন গৌরবাদ লাঘবাদেক সমবায় সিদ্ধিঃ—ভাষা পরিচ্ছেদ ; ১১ কারিকার সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী]।

অধিকরণত্ব বা হেতুত্ব (The Principle of Ground and Consequent) বলিতে বুঝায় যে, পদার্থ মাত্রেরই গুণ বা স্বভাব তাহার স্বধর্ম বা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ; ফলে সমকার্যের সমকারণ বা কার্যকারণ সম্বন্ধ বিধি গুণ সাধর্ম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহাতে সমবেত হইয়া কার্য উৎপন্ন হয় তাহাই সেই কার্যের সমবায়ী কারণ [স্বকারণতাব-চ্ছেদক ধর্ম বিশিষ্টে যদ্ধর্মবিশিষ্টং কার্যং সমবায় সম্বন্ধেনোৎ-পন্নতে তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নং প্রতি তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নং সমবায়ি কারণ-মিত্যর্থঃ। যৎ সমবেতং কার্যং ভবতি জ্ঞেয়ন্ত সমবায়ি জনকং তৎ—ভাষা পরিচ্ছেদ ; ১৮ কারিকা]। কার্য ও কারণের সামানাধিকরণ্য না থাকিলে কার্যকারণ ভাব হয় না। এই জন্য যে স্থলে কার্যের সম্বন্ধ থাকে অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে যেখানে কার্য উৎপন্ন হয়, সেখানে কারণের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ অবশ্যস্বীকার্য। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, সাধর্ম্য, অধিকরণ এবং তাদাত্ম্য অর্থাৎ প্রকৃতির একরূপতা ধর্ম ও সামানাধি-করণত্ব সমস্ত সামবায়িক সিদ্ধ ব্যাপ্তিগ্রহের অন্তর্নিহিত পূর্ব প্রতিজ্ঞা মাত্র। [হেতু ব্যাপক সাধ্য…সমানাধিকরণত্বাংশ গ্রহে সহচার গ্রহোহেতুরিতি]।

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির একরূপতা বা নিয়মানুবর্তিতা ধর্ম—এবং সামানাধিকরণত্ব বা হেতুত্ব প্রত্যেক স্থির ও নিশ্চিত সমবায়ী ব্যাপ্তি গ্রহোপায়ের অবলম্বন। কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখিয়া হঠাৎ ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে পারে বটে, কিন্তু এরূপ সমবায় জ্ঞানকে অকাট্য সত্য বলিয়াও ধরা যায় না, কিংবা একেবারে বাতিল সত্য বলিয়াও বিবেচনা করা যায় না ; তাহারা সম্ভাব্য সত্য মাত্র। সামাজিক বর্ণ বা জাতি-বিভাগকে যখন পরম পুরুষের বিভিন্ন দেহাংশ হইতে উদ্ভূত ধরিয়া নিখিল প্রকৃতির জ্ঞানবিরুদ্ধ সত্যের প্রতিযোগীরূপে বিবেচনা করি তখনই সেই জ্ঞানের নিরসন হইয়া "মানব-সমাজে জাতিভেদ অভাব" এই সামবায়িক ব্যাপ্তি গ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়। অনুরূপ একাধিক বিভক্তির ব্যধিকরণে সন্দি-গ্ধতাও নিখিলসাধ্য ব্যাপ্তিগ্রহ মাত্র।

বিজ্ঞানের আদর্শ হইতেছে যে, সন্দেহশূন্য নিখিলসাধ্য

* প্রবাসী, মাঘ, ১৩৫০-এ প্রকাশিত।

নির্বক্তি বা নিয়মের আবিষ্কার করা এবং সেইরূপ ব্যাপ্তি-গ্রহকেই বৈজ্ঞানিক সমবায় (Scientific Induction) বলা হয়। বৈজ্ঞানিক সমবায়ে আমরা কয়েকটি মাত্র বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া "প্রকৃতির একরূপতা" ধর্ম এবং কার্যকারণ সম্বন্ধের উপর বিশ্বাস রাখিয়া নিখিলসাধ্য নির্বক্তি উপস্থাপিত করি এবং অন্যান্য দুর্বল সমবায়ে "প্রকৃতির একরূপতা" ধর্মের উপর সামান্য আস্থামাত্র রাখিয়াই একটা সম্ভাব্য মাত্র সিদ্ধান্ত করিয়া রাখি। অতএব বৈজ্ঞানিক বা অন্য যে-কোনও রূপ সমবায়ে "প্রকৃতির একরূপত্ব"কেই মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়া জ্ঞাত বস্তু হইতে অজ্ঞাত বস্তুতে উপস্থিতি ঘটে।

সমবায় ও অনুমানের সম্বন্ধ বিচার

কৃষ্ণদাস তাঁহার ভাষাপরিচ্ছেদে বলিয়াছেন—অনুভূতিশ্চ-তুর্বিধা প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতি স্তথোপমিতি শব্দজে। কৃষ্ণদাস প্রোক্ত এই চতুর্বিধ অনুভূতির প্রত্যক্ষ, উপমান ও শব্দকে একত্র সমবায়রূপে ধরিয়া ইহাদের সহিত অনুমানের সম্বন্ধ বিচার করা যাইতেছে। উক্ত গ্রন্থের ৬৮ কারিকার প্রথমাংশের মুক্তাবলীতে বলা হইয়াছে যে, ব্যাপ্তি বিশিষ্টস্য পক্ষেণ সহবৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞানমনুমিতৌ জনকম্; অর্থাৎ পক্ষের সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্টের বৈশিষ্ট্যবিষয়ক জ্ঞান বা পরামর্শ অনুমিতিতে কারণ। আবার ৫১ কারিকার মুক্তা-বলীতে বলা হইয়াছে। যে, যদ্যপি পরামর্শ প্রত্যক্ষাদিকং পরামর্শজন্যম্ তথাপি পরামর্শজন্যং হেত্ব বিষয়কং যজ্ঞানং তদেবানুমিতিঃ, অর্থাৎ যদিও পরামর্শের প্রত্যক্ষ ও পরামর্শের ধ্বংস প্রভৃতি পরামর্শ হইতেই উৎপন্ন তথাপি হেত্ববিষয়ক পরামর্শোৎপন্ন জ্ঞানই অনুমিতি, অর্থাৎ যে জ্ঞানটি হেতুবিষয়ক নহে, অথচ পরামর্শ হইতে উৎপন্ন সেই জ্ঞানই অনুমিতি। অতএব হেতুত্ব বা অধিকরণত্বই অনুমান ও সমবায়ের (প্রত্যক্ষ, উপমান ও শব্দের) পার্থক্য কারণ:

পূর্বে বলা হইয়াছে, আমরা যদি পূর্ণাঙ্গ সত্য লাভ করিতে চাই তাহা হইলে আমাদিগকে সমবায় এবং অনুমান উভয়েরই সাহায্য লইতে হইবে। সমবায় ও অনুমান উভয়েই অনুভূতির প্রকারভেদ, উভয় স্থলেই আমরা এক বা একাধিক পরামর্শ (premise) হইতে একটি নূতন সত্যে উপনীত হই। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে,—

(১) অনুমানে সিদ্ধান্তটি কখনও স্বীকৃত পরামর্শগুলি অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক হয় না, কিন্তু সমবায়ে সিদ্ধান্তটি সর্বদাই পরামর্শ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক হইবে। "সকল মনুষ্যই মরণশীল; রাম মনুষ্য, অতএব রাম মরণশীল"—ইহা অনুমানের দৃষ্টান্ত। "রামের মৃত্যু হইয়াছে, যদুর মৃত্যু হইয়াছে, হরির মৃত্যু হইয়াছে অতএব সকল মনুষ্যের মৃত্যু হইবে"—ইহা সমবায়ের দৃষ্টান্ত।

(২) অনুমানে আমরা পরামর্শগুলিকে সত্য বলিয়াই ধরিয়া লই, কিন্তু সমবায়ে সেগুলির সত্যতা সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সামবায়িক পরামর্শগুলির সত্যতা জ্ঞানের জন্য প্রকৃতির একরূপত্ব (Law of Uniformity of Nature) বা নিয়তা [নিয়তা পূর্ববর্তিতা কারণত্বং ভবেং—ভাষা পরিচ্ছেদ; ১৬ কারিকা] জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক।

(৩) অনুমানে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত আমাদের কোনও সম্পর্ক থাকে না। কতকগুলি পরামর্শ স্বীকৃত হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কোনও অপেক্ষা না রাখিয়াই সেই পরামর্শগুলি হইতে কোন্ সিদ্ধান্ত অনিবার্যরূপে নিঃসৃত হইবে তাহা নিরূপণ করাই অনুমানের কার্য। কিন্তু সমবায়ে পরামর্শগুলি ভুয়ো-দর্শন ও পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া সমবায়জ্ঞান হইতে পারে না। অনুমানের ত্রিবিধ বিভাগের মধ্যে কেবলান্বয়ীর সমবায় সাদৃশ্য থাকিলেও এই অনুমান বিভাগ প্রযত্ন (experiment) সাপেক্ষ না হওয়ায় সমবায় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাজেই কেবলান্বয়ী প্রতিযোগিতা ধর্মাবচ্ছিন্নই সমবায়।

(৪) যে-কোনও একটি প্রত্যক্ষ উপমিতি বা শাব্দ বোধ ব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়া সেই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি বৃত্তিতে বৃত্তি এবং অনুমিতিতে অবৃত্তি যে জাতি, সেই জাতিমত্ত্বকেই সমবায় লক্ষণ বলিতে হইবে [যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষাদিকমাদায় তদবৃত্তিরনুমিত্যবৃত্তি জাতিমত্বং (সমবায়ম্) বাচ্যমিতি—সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী]। সমবায়ে প্রত্যক্ষের উপর বিশেষ লক্ষ্য থাকায় আমাদিগকে আকারগত বৈধতা এবং বস্তুগত সত্যতা উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়—অর্থাৎ কোনও সিদ্ধান্ত কতকগুলি পরামর্শ হইতে নিঃসৃত হইতে পারে কিনা—মাত্র ইহা দেখিয়াই ক্ষান্ত হই না; সেই সিদ্ধান্তের সহিত বাস্তব জগতের সঙ্গতি আছে কিনা তাহাও নিরূপণ করিতে হয়। অনুমানে আমাদের লক্ষ্য থাকে আকারগত বৈধতা বা শুদ্ধতার দিকে; অর্থাৎ অনুমানে স্বীকৃত পরামর্শগুলি হইতে কোন সিদ্ধান্ত যথার্থই নিঃসৃত হইতেছে কিনা তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। সেই সিদ্ধান্তের সহিত বাস্তব জগতের সঙ্গতি আছে কিনা তাহা আমাদের বিবেচ্য নহে। "ধূমাৎ পর্বতো বহ্নিমান"—এই অনুমান বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রগতিশীল বাস্তব জগতের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়াই করা চলে, কিন্তু বিজলি আলো বহ্নিমান হইলেও ধূমবর্জিত হওয়ায় বর্তমান যুগে "বহ্নিমান ধূম" এই সমবায় জ্ঞান সিদ্ধ হয় না।

অনুমান ও সমবায়ের মধ্যে কোথায় সাদৃশ্য এবং কোথায় বৈসাদৃশ্য আছে তাহা দেখানো হইল। এক্ষণে উহাদের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক তাহার আরও বিস্তৃত আলোচনা করা যাক। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ যেরূপ বিপুলভাবে কেবলমাত্র অনুমান-খণ্ডের আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে অনুমানকেই মূল

অনুভূতি-পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করা সাধারণ যুক্তিতে আসিয়া যায়। সমবায়-পদ্ধতিকে একটু বিশিষ্ট স্থান দিতে গেলে ইহাকে অনুমানের বিপরীত প্রক্রিয়া বলিয়া ধরা যায়। দুইটি প্রক্রিয়ার গতি যদি বিপরীত দিকে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিপরীত প্রক্রিয়া (Inverse processes) বলা যাইতে পারে। বিয়োগ এবং যোগ, গুণ এবং ভাগ ইহাদিগকে পারস্পরিক সম্পর্কে বিপরীত প্রক্রিয়া বলা যায়। ন্যায়ানুভূতিতে দুইটি পরামর্শ থাকে, এবং তাহাদের মধ্যে অন্তত: একটি ব্যাপক বচন। অনুভূতির নিয়মগুলির অনুসরণ করিলে সেই দুইটি পরামর্শের মধ্যে নিহিত এবং তাহাদের অপেক্ষা অনধিক ব্যাপক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। সমবায়-পদ্ধতিতে কতকগুলি বিশেষ বস্তু বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিয়া আমরা সাধারণ সত্যে উপনীত হইয়া থাকি। অনুমানে আমাদের বিচারগতি সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যের অভিমুখী এবং সমবায়ে বিশেষ সত্য হইতে সাধারণ সত্যের অভিমুখী হয়। এইভাবে দেখিলে অনুমান ও সমবায়কে পারস্পরিক সম্বন্ধে বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে, অনুমানই যে একমাত্র নৈয়ায়িক পদ্ধতি অথবা সমবায় অনুমানের প্রকারভেদমাত্র তাহা সত্য নহে। একটি কাল্পনিক নিয়মকে পর্যবেক্ষিত তথ্যের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা সমবায়-পদ্ধতির একটা অঙ্গ বটে, কিন্তু এই নিয়মেরও একটা ভিত্তি থাকা আবশ্যক। এরূপ নিয়ম কল্পনা করিতে হইলেই কোনও না কোনও যুক্তি অবলম্বন করিতে হয়। বাস্তব তথ্যের সহিত সম্পর্কবিহীন কল্পনার স্থান বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নাই। যে সকল বস্তু বা ঘটনার সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া, পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া এবং বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে তাহাদিগকে দেখিয়া তবে আমরা একটি সাধারণ নিয়মে (তাহা যতই অনিশ্চিত হউক না কেন) উপনীত হইতে পারি। কতকগুলি বস্তু বা ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করিয়া এইভাবে একটি সাধারণ নিয়মে উপনীত হওয়া বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ এবং ইহাই সমবায় পদ্ধতি। কতকগুলি বস্তু বা ঘটনা দেখিয়া কোনও যুক্তির সাহায্য আদৌ না লইয়া নির্ব্বিচারে একটির পর একটি নিয়ম কল্পনা করিতে থাকিলাম এবং দৈবক্রমে তাহাদের মধ্যে কোনওটি বাস্তব তথ্যদ্বারা সমর্থিত হইলে তাহাকে সত্য বলিয়া স্থির করিলাম—এইভাবে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, নৈয়ায়িক প্রক্রিয়ার দুইটি বিশিষ্ট অঙ্গ আছে। সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যে উপনীত হওয়ার প্রতিক্রিয়াও সেইরূপ অপর একটি অঙ্গ। সুতরাং অনুমানই যে একমাত্র নৈয়ায়িক পদ্ধতি এবং সমবায় অনুমানের বিপরীত পদ্ধতিমাত্র ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমবায়ের তুলনা

পাশ্চাত্য জগতে সমবায়সম্বন্ধীয় চিন্তার বোধ হয় এরিষ্টটলই প্রথম। ভারতীয় সমবায়প্রকরণকে পাশ্চাত্য প্রকরণের সহিত তুলনা করিতে হইলে এরিষ্টটলের মতের সহিত তুলনা করা সেইজন্য অবশ্য কর্তব্য।

এরিষ্টটল বলেন, আমরা কতকগুলি বিশেষ বস্তু বা ঘটনা দেখিয়া একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই এবং সেইজন্য মনে করি যে, স্থান বিশেষ বস্তু বা ঘটনাসমূহের পরে। কিন্তু প্রকৃতিতে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত নিদর্শন মিলে। প্রকৃতিতে সাধারণ নিয়মের স্থান আগে, বিশেষ বস্তু বা ঘটনাগুলির স্থান পরে। কোনও বিশেষ বস্তু বা ঘটনা, কোনও এক সময়ে উদ্ভূত হইয়া আবার বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু যে সাধারণ নিয়মগুলি তাহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে, তাহারা তাহার উদ্ভবের বহুপূর্বেই বর্তমান ছিল এবং পরেও থাকিবে। এই সাধারণ নিয়মগুলি আছে বলিয়াই বস্তু বা ঘটনাগুলি বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছে এবং বিশেষগুণের অধিকারী হইয়াছে। প্রকৃতিতে সাধারণ নিয়ম ও বিশেষ বস্তুগুলির যে পৌর্বাপর্য সম্পর্ক রহিয়াছে, সমবায়ে আমরা তাহার বিপরীত দিকে গমন করি বলিয়া সমবায়কে অনুমানের বিপরীত প্রক্রিয়া বলা হইয়া থাকে।

ভারতীয় মতে সমবায় যে অনুমানের বিপরীত প্রক্রিয়া নয়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বস্তুত আইনষ্টাইন প্রভৃতি বিখ্যাত বিজ্ঞানীগণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রভৃতি মতবাদেও সাধারণ নিয়মের জ্ঞান যে আগে নয় তাহা বলিয়াছেন। তবে তাহারা এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় যে, জড় বা দ্রব্যজগৎ এবং তাহাদের গুণ ও কর্মজনিত প্রকাশ আপেক্ষিক ব্যাপার। কাজেই প্রাকৃতিক কোন নিয়ম আগে হইতে কিছু নাই যদিও জড় বা দ্রব্য এবং তাহাদের গুণ বা কর্ম এই উভয়ের সম্বন্ধ নিত্য। কৃষ্ণদাসও তাঁহার ভাষা পরিচ্ছেদ কারিকা এবং ন্যায় সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী টীকায়ও বলিয়াছেন—সমবায়িকারণত্বং দ্রব্যস্যৈবেতি বিজ্ঞেয়ম্—২৩ কারিকা এবং "সমবায়ত্বং নিত্যসম্বন্ধত্বম্"—১১ কারিকার মুক্তাবলী। এরিষ্টটলের পরবর্তী পাশ্চাত্য সমবায়ী নৈয়ায়িকগণও ভারতীয় মতের সহিত অনেকখানি একমত বলিয়াই মনে হয়।

সমবায়ী অবয়ব (Inductive Syllogism)-এর প্রণালী সম্বন্ধে এরিষ্টটলের সিদ্ধান্ত এই যে, রামের মৃত্যু হইল, শ্যামের মৃত্যু হইল, হরির মৃত্যু হইল, যদুর মৃত্যু হইল—এইরূপ আরও কয়েকটি ব্যক্তির মৃত্যু হইতে দেখিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিলাম—"সকল মনুষ্যই মরণশীল।" এখানে আমরা নিশ্চয়ই একটা যুক্তি প্রয়োগ করিতেছি। সেই যুক্তিকে আমরা তিন অবয়ব বিশিষ্ট ন্যায়ের আকারে পরিণত করিতে পারি কিনা—ইহাই প্রশ্ন। এরিষ্টটলের মতে এই যুক্তির যথার্থ আকার এইরূপ—

রাম, শ্যাম, হরি, যদু, এবং অন্যান্য অনেকে মরণশীল ;
রাম, শ্যাম, হরি, যদু ইত্যাদি ইহারাই সকল মনুষ্য ;
অতএব সকল মনুষ্যই মরণশীল।

এরিষ্টটলের মতে এ স্থলে সাধ্য, যে হেতুর সম্বন্ধে সত্য তাহাই পক্ষের সাহায্যে প্রমাণ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে পদগুলির বিস্তৃতি অনুযায়ী সাধ্য, হেতু এবং পক্ষের নামকরণ হইয়াছে। অর্থাৎ যে পদের বিস্তৃতি সর্বাপেক্ষা অধিক তাহাই সাধ্য এবং যাহার বিস্তৃতি সর্বাপেক্ষা কম তাহাই পক্ষ। এই সংজ্ঞানুসারে 'মরণশীল' সাধ্য 'সকল মনুষ্য' হেতু এবং রাম, শ্যাম, হরি, যদু ·····পক্ষ।

এই ন্যায়কে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সমবায়কে এই ভাবে ন্যায়ের আকারে পরিণত করিবার চেষ্টা নিষ্ফল। এখানে বলা হইতেছে যে, "রাম, শ্যাম, যদু, হরি ইত্যাদি ইহারাই সকল মনুষ্য"। ইহা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে, জগতে যত মনুষ্য আছে অথবা থাকিতে পারে আমরা তাহাদের প্রত্যেকটিকেই দেখিয়াছি। যদি তাহা সম্ভব হইয়া থাকে তাহা হইলে বস্তুত: আমরা কোনও জ্ঞাতপূর্ব সত্য হইতে অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হইতেছি না ; অর্থাৎ সিদ্ধান্তে কোনও নূতন সত্যের সমাবেশ নাই ; পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে ইহা তাহারই পুনরুক্তি মাত্র। কিন্তু সমবায়ের বৈশিষ্ট্যই এই যে, ইহাতে আমরা কয়েকটি মাত্র বস্তু দেখিয়া সমজাতীয় যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। সুতরাং সমবায়কে এই উপায়ে ন্যায়ের আকারে পরিণত করা হইলে তাহার এই বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যায়। আর যদি প্রত্যেক মনুষ্যকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব না হইয়া থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয় বচনটিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ আসিয়া পড়ে। বস্তুত: প্রভাকর-মতে যাহাকে নিত্য সমবায় (perfect Induction) বলা হইয়াছে, কেবলমাত্র তাহাকেই উপরে কথিত উপায়ে ন্যায়ের আকারে পরিণত করা যাইতে পারে। কিন্তু এই নিত্য সমবায় যে একমাত্র সমবায়-পদ্ধতি নয় তাহা বৃহতী টীকায় (আচার্য গুরু প্রভাকর মিশ্র প্রণীত মীমাংসা দর্শনের শাবর ভাষ্য টীকায়) বলা হইয়াছে।

সমবায়ের সমস্যা

আলোচনায় দেখা গেল যে, প্রকৃতির একরূপত্ব ধর্মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রত্যক্ষানুমোদিত যে নিখিলসাধ্য নির্বক্তি আসে তাহাকেই সমবায় বলে। প্রত্যেক সমবায়ে আমরা দুইটি সংস্কার বা ঘটনার সম্বন্ধ লক্ষ্য রাখিয়া সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়াস পাই। এই সাধারণ সিদ্ধান্তে উপস্থিতির সম্ভাব্য সম্বন্ধগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) অযুতসিদ্ধি (Co-existence) (২) সহচার (succession) (৩) সামানাধিকরণ্য (The relation of equality or inequality)। সমস্ত সম্ভাব্য সাধ্যাভাবই এই ত্রিবিধ সম্বন্ধের যে-কোনও একটিকে আশ্রয় করে।

(১) ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিনাশক্ষণ পর্য্যন্তং যয়োরাশ্রয়াশ্রয়ীভাবস্তয়োরযুত সিদ্ধি। এই অযুত সিদ্ধি সম্বন্ধ বিষয়ে বলা যায় যে, সমবায়ের মূলীভূত জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতে উপস্থিতির জন্য ইহাই একমাত্র ভিত্তিভূমি। আমরা দুইটি বস্তু বা গুণ লক্ষ্য করিতে পারি, কিন্তু যদি তাহাদের অযুতসিদ্ধি-জনিত সাধর্ম্য বা হেতুত্ব ধরিতে না পারি তাহা হইলে আমরা কখনও কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সম্বন্ধ-বিষয়ক সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। তবে ইহাও সত্য যে, কেবলমাত্র আশ্রয় ও আশ্রয়ী সম্বন্ধ হইলেই সমবায় হইবে না। ধূম ও বহ্নির মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকিলেও নিত্য সমবায় নাই এবং সেইজন্য "ধূমবান বহ্নি" বা "বহ্নিমান ধূম" ইহাদের কোনওটি নিখিলসাধ্য নির্বক্তি নহে। শীতকালে জলাশয় হইতে যে ধূম উত্থিত হয় তাহার সহিত বহ্নির কোন সম্বন্ধ নাই, অতএব "বহ্নিমান ধূম" এ কল্পনা সমবায়গ্রাহ্য নহে। আবার বৈদ্যুতিক আলো নির্ধূম বলিয়া "ধূমবান বহ্নি" ইহাও সমবায়ে অসিদ্ধ। উভয় স্থলেই ধূম ও বহ্নির মধ্যে আশ্রয়াশ্রয়ী সম্বন্ধ নাই এবং উভয় দৃষ্টান্তে আশ্রয়ীর বিনাশ-ক্ষণে আশ্রয়ের সহিত কোনও সম্বন্ধ আসে না, অতএব সমবায়ও ঘটে না।

(২) সহচার বলিতে—'সাধন বিশেষক সাধ্য সামানাধিকরণ্য প্রকারক" বুঝায়। সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী বলিতেছেন—এবমন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং সহচার গ্রহস্তাপি হেতুতা। ভাষা পরিচ্ছেদ—১৩৭ কারিকা দ্রষ্টব্য। অর্থাৎ সহচার জ্ঞানের হেতুত্ব সিদ্ধি জন্য অন্বয় ও ব্যতিরেকের জ্ঞান আবশ্যক। এই উভয় জ্ঞানের মধ্যে আবার ব্যতিরেকী সহচার (variable succession) সমবায়ী সাধ্যাভাবের ভিত্তি গঠিত করে না। ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমবায় অনুমানের বিপরীত প্রতিজ্ঞা নহে। অনুমানের মূল ভিত্তি ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের মূলকারণ হইতেছে ব্যভিচারের অজ্ঞান ও সহচারের জ্ঞান। সমবায়ের মূলভিত্তি হেতুত্ব এবং হেতুত্ব সিদ্ধির জন্য অন্বয়ী সহচার (invariable succession) উপযোগী উপাদান। কোনও ঘটনার হেতুত্ব হইতেছে তাহার অনন্যনিরপেক্ষ (unconditional) অন্বয়ী (invariable) ও অব্যবহিত পূর্বগ (immediate antecedent)। সুদৃঢ় অন্বয় থাকায় কার্যের পূর্বেই সুনিরূপিতরূপে কারণের স্থান। যদি কতিপয় নিরূপিত সহচারের দৃষ্টান্তে আমরা কারণ-সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে পারি তাহা হইলে নি:সন্দেহরূপে তাহাদের সম্বন্ধী সাধ্যাভাব আমরা ধরিতে পারিব। অতএব সমবায়ী প্রতিজ্ঞা সহচারজনিত ঘটনা বা নিসর্গতেতু সম্বন্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(৩) কৃষ্ণদাস তাঁহার ভাষা পরিচ্ছেদ ৬৯ কারিকার

দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলিতেছেন সাধ্যেন হেতোরৈকাধিকরণ্যং ব্যাপ্তি-রুচ্যতে। ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমানের মূলবস্তু; সমবায়ের সহিত ব্যাপ্তির বিশেষ সম্বন্ধ নাই। কাজেই সামানাধিকরণ্য অনুমান সিদ্ধান্তের বিশেষ উপাদান, কিন্তু হেতুর সহিত ইহার সম্বন্ধ থাকায় সমবায় সিদ্ধান্তেও সাহায্য করে; কেননা রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার "ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবিচ্ছিন্ন অভাব" গ্রন্থের দীধিতিতে বলিয়াছেন—তৎসামানাধিকরণ্য চ স্ববিশিষ্ট হেত্ব-ধিকরণাবচ্ছেদেন বোধ্যম্। যে সাধর্ম্ম্যজ্ঞান হইতে সমবায়-সিদ্ধি ঘটে তাহাকে সাজাত্য ধরিলে অধিকরণত্বের সহিত সম্বন্ধ আসিয়া যায় এবং তখন তাহার সমান (the relation of equality) ও অসমান (the relation of inquality) এই দুই ভাবে কল্পনা চলে। রঘুনাথও বলিয়াছেন—সাজাত্যং চ সমানং সমানাধিকরণ ধর্ম্মার্বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্বানাতর রূপেণ ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাবস্ত—দীধিতিঃ। আমরা কয়েকটি স্থলে সমান ও অসমান সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে পারি না বটে, কিন্তু হেতুত্ব সম্বন্ধ পাইলে সমান বা অসমান ভাব লক্ষ্য করিয়া সমবায় সিদ্ধান্ত করা যায়।

যদিও সমবায়ী প্রতিজ্ঞা নৈসগিক হেতুত্ব সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ তথাপি ইহা আমাদের নিকট দুই রূপে উপস্থিত হইতে পারে। প্রথম রূপে আমরা কারণ ধরিয়া কার্য বা ফলাফল জানিবার চেষ্টা করিতে পারি; আর দ্বিতীয় রূপে কার্য্য ধরিয়া কারণ জানিবার প্রয়াস পাইতে পারি।

প্রথম প্রকারের সমবায়ানুসন্ধানে আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বা প্রকৃত প্রযত্ন দ্বারা কারণ-বাহিত কার্য লক্ষ্য করি এবং তদ্দ্বারা তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ-সিদ্ধান্তে উপনীত হই। তবে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বিপজ্জনক অবস্থায় প্রযত্ন বা পরীক্ষা করা সম্ভবে না, কিন্তু এরূপ অবস্থায় কেবলমাত্র প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া থাকি এবং জটিল অবস্থায় অনুমানের সাহায্যে কারণবাহিত কার্য-পরিণামের হিসাব লই।

দ্বিতীয় প্রকারের সমবায়ানুসন্ধানে আমরা অতীতে পিছাইতে পারি না বলিয়াই প্রকৃত কি কারণে এই কার্য সম্ভব হইয়াছে তাহার সন্ধান লই। এরূপ স্থলে আমাদের এমন একটি কারণের ধারণা করিতে হয় যাহা ঐরূপ কার্য ঘটাইতে সমর্থ। নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তে এরূপ কল্পনার যাথার্থ্য প্রতিপাদন-জন্য সমবায়ী নিয়মের দ্বারা পরীক্ষা করাইতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে সমবায়ী প্রতিজ্ঞা উপরোক্ত দুই রূপের যে-কোনও রূপে আমাদের নিকট আসুক না কেন সমাধান একমুখী অর্থাৎ প্রকৃত বা কাল্পনিক হেতু হইতে কার্যের দিকে। কৃষ্ণদাসও বলিয়াছেন—উপায়েচ্ছার প্রতি ইষ্টসাধন-তার জ্ঞান কারণ বা হেতু [উপায়েচ্ছাং প্রতীষ্টসাধনতাজ্ঞানং কারণম্—ভাষা পরিচ্ছেদ; ১৪৬ কারিকার সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী]।

ভারতের বস্ত্রশিল্প

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ভারতবর্ষে প্রধানতঃ কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রেশম ও পশম যে পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তাহা অতিশয় নগণ্য। ভারতবর্ষের কথা বাদ দিলেও জগতের অন্যান্য দেশেও কার্পাসই বস্ত্রসমস্যা সমাধানের প্রধান বস্তু। বর্ত্তমান কালে অবশ্য কৃত্রিম সূতা তথা বস্ত্র প্রস্তুতের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় বস্ত্রের অভাব কিয়ৎপরিমাণে কৃত্রিম বস্ত্র-সাহায্যেই মিটানো সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্পাস-বস্ত্রের তুলনায় ইহার পরিমাণ যথেষ্ট নহে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে অদ্যাবধি কোন প্রকার কৃত্রিম বস্ত্র প্রস্তুতের কল স্থাপিত হয় নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে সামান্য পরিমাণে কৃত্রিম রেশম আমাদের দেশে আমদানী হইত তাহা আসিত প্রধানতঃ জাপান হইতে। আজ জাপান যুদ্ধে পর্য্যুদস্ত, সুতরাং তাহার বস্ত্রশিল্পের উন্নতিও অনেকাংশে ব্যাহত। তবে আশার কথা এই যে, সম্প্রতি ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশম তৈয়ারীর কলকব্জাদি স্থাপিত হইতেছে। তদ্ব্যতীত দরিদ্র ভারতবর্ষের পক্ষে রেশম, পশম বা অন্য কোন মূল্যবান বস্ত্র ব্যবহারের প্রশ্ন আপাততঃ উঠে না। নিম্নে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের শতকরা হিসাব দেওয়া হইল :—

সাল	তুলা	পশম	রেশম	কৃত্রিম রেশম
১৯৩৯	৭৩	১৩	১	১৩
১৯৪৩	৭১	১৪	১	১৫
১৯৪৪	৭২	১৪	১	১৩

সুতরাং ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্প বলিতে এক কথায় কার্পাস-বস্ত্রই বুঝায়। কার্পাস বস্ত্রশিল্প ভারতবর্ষে নূতন নহে। মহেন-জো-দাড়োতে যে কার্পাস-বস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা তিন সহস্র খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের বলিয়া অনুমিত হয়। অনেকের ধারণা যে, মিশরের পিরামিডের অভ্যন্তরে রক্ষিত মৃতদেহের আচ্ছাদন-বস্ত্র ভারতে উৎপন্ন কার্পাস-নির্ম্মিত। থিয়োক্রেসটাস্ (খ্রীঃ পূঃ ৩০৬ সাল), হেরোডেটাস্ (খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী), আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে আগত ঐতিহাসিকগণ, (খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ সাল) প্রভৃতির লিখিত বিবরণীতে ভারতের কার্পাস-বস্ত্রের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে তুলা ও তুলাজাত দ্রব্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইত। চীন এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ভারতবর্ষ হইতেই তুলার চাষ নীত হইয়াছে। তখনকার দিনে ভারতের কার্পাস-বস্ত্র কত উন্নত ধরণের ছিল ঢাকার মসলিনই তাহার প্রমাণ। হস্তচালিত তাঁতই ছিল তৎকালে বস্ত্রবয়নের একমাত্র উপায়। ইংরেজ এবং ইউরোপের অন্যান্য জাতির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের কার্পাস-শিল্পে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছিল। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম বস্ত্রবয়ন-যন্ত্রাদি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপর ভারতের বস্ত্রশিল্প উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইয়া পৃথিবীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৮৬৬ সালে সমগ্র ভারতে মোট ১৩টি মিলে ৩,৪০০ খানা তাঁত ছিল। ১৯৪৪ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে—৪০৭টি মিল এবং ২০১,৭৬১ খানা তাঁত; বর্ত্তমানে এই সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। বস্ত্রশিল্পে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের স্থান কোথায় তাহা নিম্ন তালিকা হইতে সুস্পষ্ট হইবে :—

দেশের নাম	উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ	
যুক্তরাষ্ট্র	৮ শত	৩৬ কোটি গজ
ভারতবর্ষ		৪২
জাপান		০
রাশিয়া		৬৭
ব্রিটেন		৬৫
অন্যান্য দেশ	১০	৭২
মোট	৩৪	৯৩

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, উৎপাদনের দিক দিয়া ভারতের স্থান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়। তবে লোক-সংখ্যার তুলনায় এই উৎপাদন যথেষ্ট নহে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জনপ্রতি গড়ে বৎসরে ১৬·৫ গজ বস্ত্র ব্যবহৃত হইত; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই পরিমাণ ছিল ৫৬ গজ, ব্রিটেনে ৪৫ গজ। চীনের অবস্থা ভারত অপেক্ষাও শোচনীয়, সেখানে এই পরিমাণ ৯ গজ মাত্র। সুতরাং দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে বা প্রতি ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত পরিমাণে বস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইলেও ভারতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য যে দেশে অধিকাংশ লোকই অনশনে বা অর্দ্ধাশনে কালাতিপাত করে সেদেশে খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্ত্তে বস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করা কতদূর সমীচীন হইবে তাহা বিবেচনার বিষয়। প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধের পূর্ব্বে যে পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ হইত, যুদ্ধকালীন ভারতের দুর্ভিক্ষ এবং তৎসঙ্গে 'অধিক শস্য ফলাও' আন্দোলন হেতু উক্ত জমির পরিমাণ তদপেক্ষা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে যে কার্পাস উৎপন্ন হয় তাহা বিভিন্ন রকমের। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হয় পঞ্জাব, সিন্ধু, হায়দরাবাদ, মধ্যপ্রদেশ, বেরার প্রভৃতি অঞ্চলে। পঞ্জাব ও সিন্ধু আজ পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উৎকৃষ্ট ধরণের তুলা ইদানীং ভারতবর্ষে অল্পই রহিয়াছে। বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে সমগ্র ভারতবর্ষে যে পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইত তাহা হইতে কতক কাঁচা তুলা

বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, অন্যপক্ষে বিদেশ হইতে বস্ত্র এবং মিশরের মোট আঁশের কাঁচা মালও এদেশে আমদানী হইয়াছে। নিম্নলিখিত পরিমাণ কাঁচা মাল বিদেশে গিয়াছে :—

সাল	রপ্তানীর পরিমাণ
১৯৩৯-৪০	২,৩৪৮,০০০ বেল
১৯৪০-৪১	২,০১৩,০০০ "
১৯৪১-৪২	৮৭৩,০০০ "
১৯৪২-৪৩	১৬০,০০০ "
১৯৪৩-৪৪	৩৮৩,০০০ "
১৯৪৪-৪৫	৪০১,০০০ "

রপ্তানী বাদ দিয়া অবশিষ্ট তুলা ভারতের কলগুলিতে বস্ত্র ও সুতা তৈয়ারীর নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে বিদেশ হইতে যে কাঁচা তুলা এদেশে আমদানী হইয়াছিল তাহার পরিমাণ ছিল প্রায় ৭ লক্ষ বেল, ভারতের কলগুলিতে ব্যবহার্য্য তুলার শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ। ভারতীয় মিলে উৎপাদিত বস্ত্র ও সুতার যে অংশ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহা এইরূপ :—

সাল	সুতার পরিমাণ (০০০ পাউণ্ড)	বস্ত্রের পরিমাণ (০০০ গজ)
১৯৩৮-৩৯	৩৭,৯৫৯	১৭৬,৯৯১
১৯৪২-৪৩	৩৪,২১০	৮১৭,৯৯২
১৯৪৩-৪৪	১৯,০৭৪	৪৬১,৩৩৮
১৯৪৫-৪৬	১৪,৪৯৭	৪৪০,৫০০

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সুতা রপ্তানী হইয়াছিল ১৯৪১-৪২ সালেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, পরিমাণ ৯ কোটি পাউণ্ড, এবং বস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রপ্তানী হইয়াছিল ১৯৪২-৪৩ সালে। বস্ত্র বিশেষভাবে অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল, ইরাক, রোডেসিয়া, আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইয়াছিল আর সুতা লইয়াছিল অষ্ট্রেলিয়া, ইরাক ও প্যালেষ্টাইন। যুদ্ধের পূর্ব্বে সমগ্র উৎপন্ন বস্ত্রের শতকরা ৬ ভাগ মাত্র বিদেশে চালান যাইত, ১৯৪২-৪৩ সালে এই পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া শতকরা প্রায় ২০ ভাগে দাঁড়াইয়াছিল। অথচ উৎপাদন তদনুপাতে বর্দ্ধিত হয় নাই। এমতাবস্থায় দেশে যে বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে!

যুদ্ধের পরবর্ত্তী কয় বৎসরে ভারতের বস্ত্রশিল্পে নানারকম অসুবিধাহেতু দেশের লোকের বস্ত্রাভাব শোচনীয় হইয়াছিল। দেশে হস্তচালিত তাঁতে তৈয়ারী বস্ত্র কিয়ৎপরিমাণে সমস্তার সমাধান করিয়াছিল বটে, কিন্তু অধিকসংখ্যক তাঁতী সুতার অভাবে কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল বলিয়া আশানুরূপ ফললাভ হয় নাই। সমগ্র ভারতে মোট প্রায় বিশ লক্ষ হস্তচালিত তাঁত আছে, ইহার মধ্যে শতকরা প্রায় ৭২ ভাগেই কার্পাস-বস্ত্র বয়ন করা হয়। সুতার অভাবে শতকরা ১৩ জন তাঁতীই বেকার বসিয়া ছিল। তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রের পরিমাণ মোট ১৭০ কোটি গজ। তাহা ব্যতীত যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদেশ হইতেই প্রচুর বস্ত্র এদেশে আমদানী হইত। ১৯৩৯ সাল হইতেই এই পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া মাত্র কয়েক লক্ষ গজে দাঁড়ায়। অন্য দিকে দেশব্যাপী দাঙ্গাহাঙ্গামা, মিলে ধর্ম্মঘট, উপযুক্ত যন্ত্রাদির অভাবও বস্ত্র-উৎপাদন বিশেষভাবে ব্যাহত করিয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে তাঁতের বস্ত্রসমেত ভারতের ৪২ কোটি অধিবাসীর নিমিত্ত মোট বস্ত্র পাওয়া গিয়াছিল ৪৬২ কোটি গজ—যাহা ১৯৩৮-৩৯ সালে ছিল ৬২২ কোটি গজ। তারপর মুষ্টিমেয় ধনিকসম্প্রদায়ের হস্তে মিল পরিচালনার একাধিপত্য থাকায় যে কালোবাজার ও নানারকম দুর্নীতি চলিতে থাকে তাহা বলা বাহুল্য। কণ্ট্রোল-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় শহরবাসীদের বস্ত্রসমস্যার কিয়ৎপরিমাণে সমাধান হইয়াছিল বটে, কিন্তু গ্রামবাসীদের দুর্দ্দশার জের অনেক দিন চলিয়াছে। এখনও যে এ সমস্যার সমাধান হইয়াছে তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।

কাঁচা তুলার মূল্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতীয় তুলা অন্যান্য দেশের তুলনায় সস্তাই রহিয়াছে। নিম্নে তাহা দেখানো হইল (প্রতি ক্যাণ্ডি অর্থাৎ ৭৮৪ পাউণ্ডের মূল্য দেওয়া হইয়াছে) :—

	১৯৩৯	১৯৪৮
ভারতীয় তুলা	২০০ টাকা	৯০০ টাকা
আফ্রিকার "	৩০০	১৮৫০ "
মিশরীয় "	৪০০	২,৮০০ "

দেখা যাইতেছে, ভারতীয় তুলার মূল্য যুদ্ধের পরে প্রায় ৫ গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু মিশরীয় তুলার মূল্য বাড়িয়াছে ৭ গুণ। তুলা হইতে বস্ত্র তৈয়ারী করিবার যন্ত্রপাতি, কর্ম্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচও বহু গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে; অথচ সেই অনুপাতে বস্ত্রের মূল্য আশানুরূপ বাড়ানো হয় নাই বলিয়া মিলমালিকগণ কণ্ট্রোল থাকাকালে নানা ওজর আপত্তি দেখাইয়াছিলেন। কাজেই কণ্ট্রোল উঠিয়া যাইবার পর তাঁহারা যে সুদে আসলে তাহার শোধ তুলিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কণ্ট্রোল উঠিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রের মূল্য যে অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছিল ইহাই তাহার একমাত্র কারণ নহে। বস্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহকারীগণ বলেন,—সুতা, রং, টাকু এবং অন্যান্য দ্রব্যের উপর কণ্ট্রোল রহিয়াছে, কিন্তু বস্ত্র উৎপাদন, মাল সরবরাহ এবং মূল্যের উপর হইতে কণ্ট্রোল তুলিয়া লইয়া সরকার মিলমালিকগণকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়াছেন এবং তাঁহারা এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। সরকার একথা ঠিকই জানেন যে, চাহিদার তুলনায় এখনও উৎপাদন পর্য্যাপ্ত নহে। উপরন্তু প্রতিবেশী সব কয়টি

রাষ্ট্রই বস্ত্রব্যাপারে ঘাটতি দেশ, সুতরাং চোরাকারবার চলা মোটেই অসম্ভব নয় এবং মালিকগণ কণ্ট্রোলের আমলে সরকারের জন্য যে আশানুরূপ লাভ করিতে পারেন নাই তাহাও তাঁহারা ভুলিয়া যান নাই। এশিয়ার বিরাট সমুদ্র-তীরবর্ত্তী দেশসমূহের সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় বস্ত্রের চোরাকারবার চলিতেছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছেন :

"There was a rise in the price and the consumers suffered…a chance was given to the industry but I could assert without contradiction that both the country and the government were let down by the industry."

একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার—কণ্ট্রোল তুলিয়া লওয়ার পর বস্ত্রাভাব হয় নাই, বরং ইহার প্রাচুর্য্যই পরিলক্ষিত হইতেছে। কণ্ট্রোল মূল্য অপেক্ষা তিন-চারি গুণ বেশী মূল্য দিলে বস্ত্রের অভাব নাই; অভাব পয়সার, বস্ত্রের নহে। সম্প্রতি আবার কাপড়ের কণ্ট্রোল উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, অবশ্য বর্ত্তমানে বস্ত্র-দুর্ভিক্ষের কতকটা সুরাহা হইয়াছে। বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বস্ত্র-ব্যাপারে সরকার কোন্ নীতি অনুসরণ করিতেছেন বুঝা কঠিন।

যাহাই হউক, ভারতের বর্ত্তমান বস্ত্রসমস্যা বিশেষভাবেই জটিল। কার্পাস চাষের নিমিত্ত জমির পরিমাণ যদিও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্থান অপেক্ষা অনেক বেশী, কিন্তু জমির তুলনায় ভারতে উৎপাদন কম বলিয়া তুলার জন্য ভারতকে বিদেশী মালের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হইবে। তবে কাপড়ের কলগুলির অধিকাংশই ভারতে অবস্থিত। ভারত ও পাকিস্থানের কার্পাস উৎপাদনের জমি ও উৎপন্ন তুলার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :

দেশ	জমির পরিমাণ	উৎপাদনের পরিমাণ
	১৯৪৪-৪৫	১৯৪৬-৪৭
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র	১১,২২৮,০০০ একর	১,৭৭৩,০০০ বেল
পাকিস্থান	৩,৬১৫,০০০ "	১,৩৭৭,০০০ "

সমগ্র জমির শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ পাকিস্থানে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ পাকিস্থানে শতকরা ৪০ ভাগের উপর। সিন্ধু ও পশ্চিম পঞ্জাবের জমির উৎপাদন-ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে; উৎপাদিত তুলাও উৎকৃষ্টতর। ভারতের খাদ্যাভাব হেতু তুলা চাষের নিমিত্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করাও আপাততঃ সম্ভব নহে। সুতরাং পাকিস্থানের বাড়তি তুলা যদি ভারত ন্যায়সঙ্গত মূল্যে ক্রয় করে তবে উভয় রাষ্ট্রেরই মঙ্গল।

রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। দি বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য বারো টাকা।

এখানি আলোচনা-পুস্তক। সুবৃহৎ গ্রন্থখানি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় ৩১২ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় অধ্যায় ২১৬ পৃষ্ঠা। দুই অধ্যায়ে শুধু গীতিকাব্যের বিচার। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে, এমন কি রবীন্দ্র কাব্য সম্পর্কেও সব কথা ইহাতে শেষ হয় নাই। গ্রন্থের ইহা প্রথম ভাগ মাত্র। কাব্যনাট্যগুলি এ বিচারের অন্তর্ভুক্ত নয়। সন্ধ্যাসঙ্গীতের পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা ছাড়া কড়ি ও কোমল, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কথা, এবং কল্পনা প্রভৃতি ষোলখানি কাব্যের বিস্তৃত আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে আছে। খেয়া, গীতাঞ্জলি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ লেখা পর্যন্ত একত্রিশখানি কাব্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। বলাকা, পলাতকা, পূরবী, মহুয়া, বনবাণী, বীথিকা প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন, "অগণিত সাধারণ পাঠকের পক্ষে কবিতার পূর্ণ অর্থ-সঙ্কেত বা স্থলবিশেষে ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তাই এই পুস্তকে তিন শতাধিক কবিতার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং প্রত্যেক কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন ভাবধারার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।" এই ব্যাখ্যা ও নির্দ্দেশের জন্য বিভিন্ন আলোচনা, "ছিন্নপত্র", "পত্রাবলী", "জীবনস্মৃতি", এবং "পঞ্চভূত" প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং গ্রন্থের বিরাট কলেবরেও কুলায় নাই, গীতিকবিতাগুলির পরিচয় ও বিচার-বিশ্লেষণেই প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করিতে হইয়াছে। বহু তথ্যের সমাবেশে এবং বিবিধ তত্ত্বের অবতারণায় গ্রন্থখানিকে পূর্ণতা-দানের চেষ্টায় ত্রুটি লেখক করেন নাই। জীবন-দেবতার আলোচনা জ্ঞানপ্রদ।

রবীন্দ্র-সাহিত্য বিস্তীর্ণ। বিস্তীর্ণতর সমালোচনা আয়ত্ত করা স্বল্প-স্থায়ী জীবনে সহজসাধ্য নয়। গ্রন্থকার অধ্যাপক। তাঁহার শিক্ষক-মনে বুঝাইবার আগ্রহ অত্যন্ত অধিক। সাহিত্যামোদী পাঠকের অপেক্ষা ছাত্রদের প্রয়োজনের কথা লেখককে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। অতএব যাহা অনিবার্য্য তাহাই অর্থাৎ কিছু অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়াছে। বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অরণ্যে পাঠকের হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। লেখক নিজেও যে আত্মহারা হইয়াছেন পূর্ব্বাভাষ পড়িলে তাহা বোঝা যায়। দীর্ঘ পূর্ব্বাভাষে তিনি বলিতেছেন, "বাস্তব জগৎ ও জীবন-বিমুখ একটা অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির উপর কি করিয়া এই বিরাট রবীন্দ্র-সাহিত্য স্তম্ভ গড়িয়া উঠিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।" আমরাও বিস্মিত হইতেছি, এমন জীবন-বিমুখ কবির কাব্যের আলোচনায় অধ্যাপক-গ্রন্থকারের এত অধ্যবসায় নিয়োগ করার কি প্রয়োজন ছিল? সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠের পর সীতার পরিচয়-জিজ্ঞাসাও এত বিস্ময়কর নয়।

জীবনের পর্য্যবেক্ষণ, জীবনের পর্য্যালোচনা, জীবনের প্রকাশ এবং জীবনের ব্যাখ্যা যাহাতে নাই তাহা কাব্য নয়। ম্যাথু আর্ণল্ড

প্রকৃত কাব্যের সংজ্ঞা কাল যেমন ছিল আজও তেমনি সত্য এবং যুগোপযোগী হইয়া ভবিষ্যতেও তেমনি সত্য থাকিবে। বাস্তবের উপর আদর্শের, সত্যের উপর কল্পনার প্রতিষ্ঠা। আদর্শ হোক, বাস্তব হোক, যে কাব্য জীবনের প্রতি বিমুখ তাহা মায়া মাত্র, তাহা একেবারেই "একক ইন্দ্রজালময় সাহিত্য"। লেখক অংশের মধ্যে হারাইয়া গিয়া সমগ্রকে দেখিতে পান নাই। তাই মূল কথাতেই ভুল হইয়াছে। লেখক অন্যত্র নিজেই নিজের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কয়েক পৃষ্ঠার পর 'পূর্ব্বাভাবে'ই তিনি বলিতেছেন, "কবি একান্তভাবে জগৎ ও জীবনের রূপরসভোগী···বাস্তবকে কবি মোটেই বাদ দেন নাই।" "কোন দিকে না তাকাইয়া নিজের অন্তর-প্রেরণাতেই কবি ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন"—এই কথা বলিয়াই লেখক স্থানান্তরে বলিতেছেন, "রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণতার কবি, প্রকৃতি ও মানব-জীবনের অসীম রহস্যের কবি।" যদি "তাঁহার নরনারী তাঁহার মনোজগতেরই সৃষ্টি" হয়, এবং "এই সৃষ্টিতে মানব-জীবনের গূঢ়তর ও মহত্তর রসবিলাস নাই"—এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পরপৃষ্ঠাতেই "রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লিরিক কবি" হইলেন কি করিয়া? 'পূর্ব্বাভাবে' যাঁহার মতে "আত্মগত ভাব, কল্পনা ও অনুভূতিকে অবলম্বন করিয়া কবি রসসাধনার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়াছেন; আবেষ্টনীর কোন নির্দ্দিষ্ট ছাপ তাঁহার সাহিত্যে পড়ে নাই,"—সোনার তরীর আলোচনায় সেই লেখকই বলিতেছেন, "কবির কাব্য এখন জীবনের কাব্যে পরিণত হইল।" "মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ ও কর্ম্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া লেখক নিজেই বলিয়াছেন, "বাস্তব বিশ্বের সত্য ও সুন্দর রূপ তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইল।···মানব জীবনের অসংখ্য বাস্তব বিকাশের মধ্য দিয়াই সেই সৌন্দর্য্য আমাদের মনকে স্পর্শ করিতেছে।" মন দ্বিধাগ্রস্ত বলিয়াই লেখক বার বার এইরূপ পরস্পরবিরোধী উক্তি করিয়াছেন। 'ভাববিলাস,' 'অতীন্দ্রিয় অনুভূতি' প্রভৃতি কথার ফ্যাশনের জালে নিজেকে জড়াইয়া না ফেলিলে লেখক দেখিতে পাইতেন, যে-কবি 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' বলিয়াছেন তিনি জগৎ-বিমুখ নহেন, এবং তাঁহার রচনায় ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপে জীবনের সাক্ষাৎকার লাভ করি বলিয়াই সে কাব্য এমন অপূর্ব্ব। তৎসত্ত্বেও বিচ্ছিন্নভাবে গ্রন্থে অনেক জানিবার কথা আছে। গ্রন্থকার যে উপকরণরাশি সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা পাঠককে উপকৃত করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বাংলার জনশিক্ষা (১৮০০-১৮৫৬)—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বিশ্বভারতী, ২নং বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৭৬। মূল্য আট আনা।

এই ছোট বইখানি বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থরাজির অন্যতম। ইহাতে বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে প্রধানতঃ বেসরকারীভাবে পরিচালিত জনশিক্ষার মূল তথ্যগুলি সমসাময়িক প্রমাণাদির সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধীয় আলোচনায় গ্রন্থকার ইহার বার্ষিক কার্য্যবিবরণসমূহের অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি বিশেষভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। এই সোসাইটি সম্বন্ধে স্বল্প পরিসরে এরূপ বিশদ আলোচনা সম্ভবতঃ এই প্রথম করা হইয়াছে, এবং ইহা শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। অ্যাডামের এডুকেশন রিপোর্ট এবং তাহার পরিণতি সম্বন্ধেও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠক পুস্তকখানিতে পাইবেন। তৎকালীন বাংলা গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্ট জনশিক্ষার প্রসারে অবহিত ছিলেন না। তাঁহাদের এই সংস্কার ছিল যে, উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে তাঁহাদের মারফত তথাকথিত নিম্ন বর্ণের সাধারণ লোকেরাও শিক্ষালাভ করিবে। আর এই সংস্কারবশে তাঁহারা দেশীয় পাঠশালার উন্নতির প্রতি মনোযোগী না হইয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজী শিক্ষাপ্রচারে তৎপর হইয়াছিলেন। ফলে জনশিক্ষার বিশেষ অনাদর ঘটে। পরে অবশ্য এই ত্রুটি সংশোধনের খণ্ডশঃ চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। হিন্দু কলেজ পাঠশালা ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার মত আদর্শ পাঠশালার কার্য্যও ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। আলোচ্য পুস্তকখানিতে এ সকল বিষয়ও বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গসূত্রে অ্যাডাম বলিয়াছিলেন যে জনশিক্ষার দায়িত্ব তো গবর্ণমেণ্টেরই। যোগেশবাবু তাঁহার পুস্তকে অ্যাডামের একটি উক্তির অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—

"কোন উপায়েই যদি অর্থের সংস্থান না হয় তবে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব হইতেই ইহা (অর্থাৎ জনশিক্ষার খরচ) জোগাইতে হইবে। কারণ ইহার উপরে লক্ষ লক্ষ নিঃসম্বল অজ্ঞ লোকের দাবি সবচেয়ে বেশী। ইহারাই তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া তাঁহাদের রাজস্ব উৎপাদনের পন্থা করিয়া দেয়। দশ কোটি লোকের শিক্ষার নিমিত্ত বাৎসরিক রাজস্ব কুড়ি কোটি টাকা হইতে মাত্র এক লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ আর কত কাল চলিবে?"

এইরূপ অনেক পুরাতন তথ্য যোগেশবাবুর বইখানিতে আছে। ইহা পড়িয়া দেখিলে অনেকেই শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন। বইখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন

খণ্ডিত বাংলা—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার মিত্র এম এস্‌,সি। ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, ১-বি, রসা রোড, কলিকাতা—২৫। পৃষ্ঠা ২১১। মূল্য ২৸৹।

ভারত বিভক্ত হওয়ায়, বিশেষতঃ বাংলাদেশ খণ্ডিত হওয়ায় লেখক মনে যে বেদনা বোধ করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে এই পুস্তক রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে। গত এক শত বৎসরের অনেক কথা লেখক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ইতিহাস নহে। লেখা আগাগোড়াই ভাবপ্রবণতাপূর্ণ, ভাষা উদ্দীপনাময়ী। লেখার প্রতি ছত্রে বাংলাদেশ, বাঙালী জাতি, বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি গ্রন্থকারের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইয়াছে। রচনার আন্তরিকতার সুরটি পাঠকের মনকে মুগ্ধ করে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের কথা— ডক্টর শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৮। দুই খণ্ডে বিভক্ত, ১ম খণ্ড বাংলা ১০৭ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ড ইংরেজী ১৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৭।০ টাকা।

বইখানি ধারাবাহিক ইতিহাস নয়, বিভিন্ন সময়ে রচিত ও সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের সমষ্টি; ফলে মাঝে মাঝে পুনরুক্তি-দোষ ঘটিয়াছে, ইতিহাসের পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষিত হয় নাই। এই গেল দোষ। গুণের দিক্ বিচার করিতে গেলে গ্রন্থকারের অধ্যবসায় ও উপকরণ-সংগ্রহের চেষ্টা প্রশংসনীয়। বিশেষ করিয়া নাথধর্ম্ম, গোপীচন্দ্র, বিবিধ মঙ্গলকাব্য, বাংলা রামায়ণ ও পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সেকালের বাণিজ্য, অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কার লইয়াও লেখক যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন। ইংরেজী অংশে বৃন্দাবন পরিক্রমা, রাজা গণেশ এবং বাংলার উপর ফার্সী প্রভাব প্রভৃতি বহু বিচিত্র বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বইখানি বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসের ছাত্রদের কাজে লাগিবে।

একটি কথা। গ্রন্থকার বাংলা-সাহিত্যের উৎপত্তি সপ্তম শতাব্দীতে ধরিয়াছেন, কিন্তু সে সময়ের সাহিত্যের কোনও নিদর্শনের উল্লেখ করিতে পারেন নাই।

ব.

অরণ্য কুহেলী—শ্রীকালীপদ ঘটক। পূর্ব্বাশা প্রকাশনী। ২০৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৪৲ টাকা।

কালীপদবাবু সুলেখক। আলোচ্য উপন্যাসখানি তাঁহার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। সাঁওতালদের জীবনের কতকগুলি ছোটবড় ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসখানি রচিত। সাঁওতাল-সর্দ্দার রাবণ মাঝির মেয়ের বিবাহ। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবে তাহার বাড়ী পূর্ণ, কিন্তু বিবাহ-সভায় এক সামাজিক গোলযোগের ফলে বিবাহ বন্ধ হইয়া গেল। উপন্যাসখানির মধ্যে যে অভিনবত্ব আছে কাহিনীর সূচনাতেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনার বিচিত্র প্রবাহ পাঠকের চিত্তকে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়। বিভিন্ন পরিবেশে প্রেমের বিচিত্র রূপ লেখকের নিপুণ তুলিকায় চমৎকার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাবণ মাঝি, কিষ্টু, টুয়াই, চাঁদরায় মাঝি, মোহন এবং টুংরা মাঝি ও দুলালী প্রত্যেকটি চরিত্রই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বিশেষতঃ টুংরা মাঝির অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ পাঠককে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে।

সাঁওতালদের জীবন সম্বন্ধে কালীপদবাবুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে রসকল্পনার সমন্বয়ে যে চমৎকার উপন্যাসখানি তিনি রচনা করিয়াছেন তাহা পাঠকের রসপিপাসাকে পরিতৃপ্ত করিবে। পুস্তকখানিতে অরণ্যের রহস্যময় পটভূমিকায় অরণ্যচারী সাঁওতালদের জীবনের বিচিত্র রূপ বিভিন্ন পরিবেশে অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখকের ভাষার মধ্যে এমনি একটা অপরূপ স্নিগ্ধতা আছে যে তাহা অরণ্য কুহেলীর মতই পাঠকের মনে মোহজাল বিস্তার করে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

জন-শিক্ষার সহচর—শ্রীবিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ জন-শিক্ষা পরিষদ। শিক্ষক পাব্লিশিং হাউস, ৬১নং বালিগঞ্জ প্লেস। ৯৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ টাকা।

গ্রন্থকার খ্রীষ্ট-সেবক, কিন্তু দেশের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কল্পনা তাঁর অসাধ্য বলিয়াই তিনি আজ প্রায় ১২ বৎসর যাবৎ জন-শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর লক্ষ টাকা দানের কল্যাণে, বাংলার নারী-সমাজের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ও সমাজের সাহায্যে অনুরূপ চেষ্টা নারী-শিক্ষা সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণও করিতেছেন।
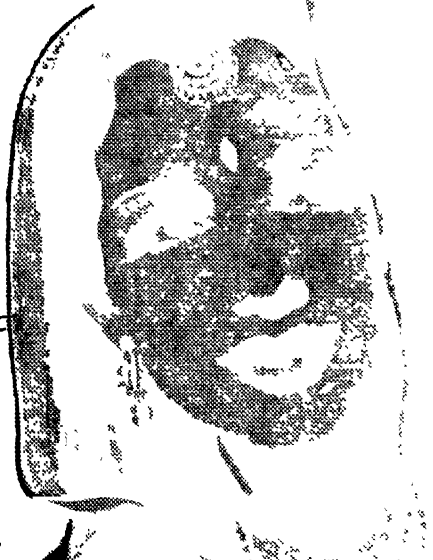
বর্ত্তমান পুস্তকখানি জনশিক্ষার আদর্শ ও উপায় সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ—গ্রন্থকারের বার বৎসরের নানা অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত।

বয়স্কদের শিক্ষা আজ রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এক পশ্চিম বাংলায়ই জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ—৯০০০,০০০ জন অক্ষরজ্ঞানবর্জ্জিত; বর্ত্তমান জগতের হালচাল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। এই অবস্থার পরিবর্ত্তনসাধন করিতে হইলে লেখকের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। তাহাই এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। নানা ছবি ও নক্সা দিয়া তিনি তাহা পাঠকসমাজের হৃদয়গ্রাহী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকখানি প্রত্যেক জনশিক্ষাব্রতীর "সহচর" হইবার যোগ্য।

জন-শিক্ষার কথা—শ্রীনিখিলচন্দ্র রায় ও শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়; বেঙ্গল মাস এডুকেশন সোসাইটি, ৯৯ ১এফ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪। ১৩২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ টাকা মাত্র।

এই পুস্তকখানিতে বয়স্ক-শিক্ষার আদর্শ ও বিভিন্ন দেশে যে যে উপায়ে তাহা সাফল্যলাভ করিয়াছে তাহার বর্ণনা আছে। ইহাতে এই শিক্ষার তত্ত্ব যেমন বিবৃত হইয়াছে, সেইরূপ আমাদের দেশের উপযোগী নানা উপায়ের বিচারও আছে। সরকারী পরিকল্পনাদির কথা যেমন আছে তেমনই আমাদের গ্রাম্য জীবনের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিচার করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থার কথাও আছে। প্রায় ৪০ পৃষ্ঠার পরিশিষ্টে গ্রন্থকারদ্বয় তাহার একটা ছক্ কাটিয়া দিয়াছেন।

আজ দেশের অজ্ঞানতা ও নানা বদ্ধমূল সংস্কার দূর ও পরিবর্ত্তন করিবার যে কর্ত্তব্য আমাদের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রয়োজনে এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। সরকারী বে-সরকারী নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এই পুস্তক হইতে জনশিক্ষা বিস্তারে প্রেরণালাভ করিবেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ১৯৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ২.০।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বর্ত্তমান জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে; এক দিক দিয়া বিশ্বত্রাস দুর্জ্জয় জার্ম্মানীকে পরাজিত করিয়া এবং অন্য দিকে পঞ্চবার্ষিক সংগঠনমূলক কার্য্যক্রম দ্বারা এক সুদৃঢ় বিরাট নব-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া সোভিয়েট রাশিয়া জগতের বিস্ময়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি মনীষিগণ মুক্তকণ্ঠে ইহার কৃতিত্ব ও অসাধ্যসাধনের প্রশংসা করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক ঠাকুরদার আসনে বসিয়া বর্ত্তমান যুগের নাতি-নাতনীদিগকে কথকতার ছলে সাম্যবাদী রাশিয়ার এই নব অভ্যুদয় এবং সঙ্কল্প ও সাধনার কাহিনী শুনাইয়াছেন। সত্যযুগে ব্রাহ্মণ্যরাজ, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে ক্ষত্ররাজ ও বৈশ্য-রাজের কাহিনী পুরাণ ও ইতিহাসে অনেক শুনা গিয়াছে কিন্তু, শূদ্ররাজ বা শ্রমিকরাজের কাহিনী এত দিন অশ্রুত ছিল। যাহারা সমাজ ও দেশের তিন-চতুর্থাংশ জুড়িয়া আছে সেই কৃষক ও মজুরের অথবা বিশ্বমানবের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নসাধের লক্ষ্মীর মূর্ত্তিমতীরূপে ধরা দেওয়ার কাহিনী এতদিন রূপকথার মতই অলীক কল্পনা ছিল; মরুভূমি, তুষার ও অরণ্যের দেশ রাশিয়ায় সেই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বর্ত্তমান গ্রন্থকার এবং অনেক মনীষী ইহার বিচিত্র বহুমুখী সাধনা ও বিরাট পরিকল্পনার হাতেকলমে পরীক্ষা ও ক্রমাভিব্যক্তির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র কল্পনা করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতি দেবীর পঞ্চভূতের শক্তি কাজে লাগাইয়া কিরূপে দেশের চেহারা ফিরাইয়া দেওয়া যায়, কৃষক-মজুরের সমবায়পদ্ধতি ও সর্ব্বসাধনা রাষ্ট্রীয়করণ দ্বারা জগন্মোহিনী বিশ্বারাধ্যা লক্ষ্মীর আসন রাষ্ট্রে কিরূপে স্থায়ীভাবে সুদৃঢ়

"শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা"

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শীত (ব্রোঞ্জ) ভাস্কর—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৯শ ভাগ, ২য় খণ্ড } ফাল্গুন, ১৩৫৬ { ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ন্যায় ও শৃঙ্খলা

কোনও রাষ্ট্রকে সুস্থ সবল ও কার্য্যক্ষম অবস্থায় রাখিতে হইলে তাহার প্রথম ও মুখ্যতম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ন্যায় ও শৃঙ্খলার, যাহাকে ইংরাজীতে বলে Law and Order। ইহার অভাবে রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যবস্থা অকেজো হইতে বাধ্য, এবং সেই কারণে রাষ্ট্রের অধোগতি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, কেননা ইহা সর্ব্বজনবিদিত রাষ্ট্রনীতির স্বতঃসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য নিয়ম। পশ্চিম বাংলায় সম্প্রতি কিছুদিন যাবৎ এই ন্যায় ও শৃঙ্খলার ব্যবস্থায় যে আংশিক শৈথিল্য দেখা দিয়াছে তাহার বিচার ও প্রতিকারের চেষ্টা এখন অতি সত্বর হওয়া প্রয়োজন, কেননা উহা এখন একান্তই অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি এইরূপ অবস্থা আরও কিছুদিন চলে তবে দেশে স্থায়ী অরাজকতার আশঙ্কা দেখা দিতে বাধ্য।

দেশে বিক্ষোভ বা ব্যাপক বিশৃঙ্খলা আসিলে তাহার দমন ও শৃঙ্খলার পুনঃস্থাপনের ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত আছে তাঁহারা যদি সাময়িকভাবে প্রতিকারের ব্যবস্থা মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হন তবে ঐ অবস্থার পুনরাবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, কেননা রাষ্ট্রধ্বংসে বা দেশে অরাজকতা আনয়নে যাহাদের স্বার্থসিদ্ধি হইবে তাহারা একবার হটিয়া গিয়া পুনর্ব্বার আরও ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার আয়োজন করে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তাহারা ন্যায়-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদিগের চেষ্টা আরও সম্যক্‌ভাবে ব্যর্থ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করে। শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গ যদি সেই অবসরে তাঁহাদের ব্যবস্থাও দৃঢ়তর এবং আরও দ্রুত কার্য্যকরী করার চেষ্টা না করেন তবে পরের বারের বিশৃঙ্খলা অধিক ব্যাপক ও প্রচণ্ড হয় এবং রাষ্ট্রনাশকারীগণ আংশিক সাফল্য লাভ করায় দ্বিগুণ উৎসাহে দেশব্যাপী অরাজকতার চেষ্টায় লাগিয়া, ঘন ঘন বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়া শাসনতন্ত্রকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। এইরূপ বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খলা ক্রমেই যদি শাসনতন্ত্র রাষ্ট্র-শত্রুদিগের সম্মুখে হটিতে থাকে তবে অরাজকতা দেশব্যাপী বাৎসরিকতারের সৃষ্টি করে।

সম্প্রতি রাষ্ট্রের বাহিরে অনাচার ও অত্যাচার হয়, ফলে জনমত বিক্ষুব্ধ হওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে—এইরূপ প্রকাশ। আমরা জানি একথা সত্য এবং আমরা ইহাও স্বীকার করি যে পূর্ব্ব পাকিস্থানে হিন্দুর উপর যে অত্যাচার হইয়াছে তাহার অকাট্য প্রমাণ রূপে হাজার হাজার দুঃস্থ ও উৎপীড়িত শরণার্থী এদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা একথাও বলিব যে, পাকিস্থানের প্রত্যেক ঘটনার প্রতিচ্ছায়া ব্যাপক ভাবে এদেশে পড়িবে ইহা আমরা মানিতে বাধ্য নহি।

পাকিস্থান আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। সেখানে যদি প্লেগ মহামারীতে লক্ষ লোক মরে তবে কি আমাদের দেশেও কুড়ি-বিশ হাজার লোক মরিতে বাধ্য? সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত দুই-চারি শত লোক এদেশে আসিতে পারে ও সেই কারণে দুই দশ জন লোক মরিতেও পারে, কিন্তু দেশে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা যদি সময় মত সুষ্ঠুভাবে হয় তবে সে মৃত্যু ঐখানেই শেষ হইবে এ কথা স্বীকার্য্য নয়, আশা করি শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গ সে কথা মানিবেন।

মূলকথা কি তাহা অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের ব্যবস্থার বিচারে পাওয়া যায়। আজ না হয় পাকিস্থানে এই অশান্তির হেতু পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে জানুয়ারী যে অরাজকতা ও বিক্ষোভ দেশের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের বিরাট অংশে, দেখা দিয়াছিল তাহার উৎপত্তিস্থল তো পাকিস্থান ছিল না? তবে কেন সে সময়েও সেই সকল স্থানে রাষ্ট্রের শাসন ও শৃঙ্খলা স্থাপনের শক্তি টুটিয়া গিয়াছিল—অন্ততঃপক্ষে আংশিক ভাবে?

একটা কথা আজকাল অশান্তি ঘটিলেই উচ্চতম অধিকারী-বর্গ বার বার বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। "জনসাধারণের

সাহায্য নাই", "জনসাধারণের সহানুভূতি নাই" "জনমত-শাসন বিরোধী" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই মতবাদের সূক্ষ্ম ও ব্যাপক বিচার এখন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কেননা আমরা দেখিতেছি যে জনসাধারণ এইরূপ উল্টাপাল্টা চীৎকারে ক্রমেই উদ্‌ভ্রান্ত ও হতাশ হইয়া পড়িতেছে। একদিকে বিক্ষোভকারিগণের সাহস ইহাতে বাড়িয়াই চলিয়াছে অন্যদিকে শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মচারীবর্গও ঐ অজুহাতে গা ঢিলা দিবার পূর্ণ সুযোগ পাইতেছে। এইরূপ অবস্থা আর কিছু দিন চলিলে শাসন ব্যবস্থা ক্রমে অচল হইয়া আসিবে।

প্রথমেই অধিকারীবর্গের সম্মুখে প্রশ্ন করি যে শাসনতন্ত্রে জনমতের অধিকার কি ও তাহার প্রকাশ ও ব্যবহার কিভাবে হইবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন শৃঙ্খলা-স্থাপনে ও বিক্ষোভ-দমনে জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি কি ভাবে চাওয়া হইতেছে। সরকার কি চাহেন যে জনসাধারণ ন্যায়-অন্যায় ও আইন-কানুনের বিচার ও প্রয়োগ সরাসরি নিজের হাতে লয়? তৃতীয় প্রশ্ন এই যে দেশের উচ্চতম অধিকারীবর্গ কি দেশ-চালনার অন্য সকল ব্যাপারে জনমত গ্রাহ্য করিতেছেন যে এই ক্ষেত্রে জনমতের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন? এবং সর্বশেষে বিচার্য্য এই যে, "জনমত" বস্তুটি কি? এই সকল প্রশ্নের উত্তর চাই।

শেষের প্রশ্নই বিস্তারিত ভাবে পুনর্ব্বার করা যাউক। যদি কোনও ব্যক্তিসমষ্টি—যাহার মধ্যে সংবাদপত্রের কর্মচারীও মুখ্য ও গৌণভাবে সংশ্লিষ্ট—পরস্বাপহরণের ব্যাপক ব্যবস্থা, যথা হিন্দুর জমি দখল, বাড়ী দখল ইত্যাদি করে এবং সেই দুষ্কার্য্য "জনমতের" ধূম্রজালে চাপা দিবার জন্য মুখের কথায় ও ছাপার অক্ষরে গোলমালের সৃষ্টি করে তবে কি তাহা "জনমত" হিসাবে গ্রাহ্য? যদি অন্য কোন ব্যক্তিসমষ্টি শরণার্থীদিগের নাম লইয়া সরকারী ব্যবস্থার ও প্রকৃত সেবাব্রতীদিগের বিরুদ্ধে চীৎকার তুলিয়া নিজের কাজ গুছাইবার চেষ্টায় প্রবল কোলাহল তোলে তবে কি সেই রবও "জনমত"? "ব্যক্তি গত স্বাধীনতার" চীৎকার তুলিয়া যদি কেহ প্রত্যক্ষভাবে নিজের বৈরীপীড়নের ব্যবস্থায় জনবিক্ষোভের সৃষ্টি করে তবে কি তাহার চালিত উন্মত্ত জনতার তাণ্ডব "জনমত"? বিদেশীর পঞ্চমবাহিনী যদি অপরিণতমস্তিষ্ক তরুণ-তরুণীকে বিদেশীর সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে বিপথে লইবার জন্য চতুর্দিকে অরাজকতা সৃজনে প্ররোচনা দেয় তবে কি তাহা "জনমত"? যদি কোনও পেশাদার "ত্যাগীমার্কা দেশ-সেবকের" দল নিজেদের দলগত স্বার্থসিদ্ধির কারণে দেশের শাসন, খাদ্য সরবরাহ ও সংগ্রহ ইত্যাদিতে বাধা দিবার জন্য প্রবল কলরব তুলে তবে কি তাহাও "জনমত"?

দেশের শাসন-পরিচালনা যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের এখন বুঝিতে হইবে যে স্বাধীন দেশ চালনায় শুধু কুসুমাদপি কোমল হইলে শত শত বৎসরের বাসব রোগ, হইতে শতমুক্ত নিজাত অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট হেতু প্রতিপন্ন হওয়া ভিন্ন আর কিছুই সম্ভব নয়। দুষ্টের দমনে বজ্রাদপি কঠোর হইলে তবে দেশের বর্তমান অবস্থায় প্রতিকার সম্ভব। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যাহারা নিযুক্ত তাহাদের কর্মচ্যুতি বা ত্রুটি যাহাতে মিথ্যা অজুহাতে চাপা দেওয়া না হয় সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিলে তবেই উহা সম্ভব।

সাম্প্রদায়িক গোলযোগ

পূর্ব্ববঙ্গে কিছুদিন যাবৎ হিন্দু উৎপীড়নের যে সমস্ত সংবাদ পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছিল তাহা সকলেই উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছিলেন। বনগাঁর ১৩ হাজার আশ্রয়প্রার্থীর আগমনের পর অবস্থা আরও গুরুতর হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতার কতকগুলি অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ ঘটিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকাতেও বেশ কিছু অরাজকতা ও অশান্তি হইয়াছে। প্রথম হইতেই এবার সামরিক সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে এবং কারফিউ জারী করিয়া ও অন্যান্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া শান্তি রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের দুই চীফ সেক্রেটারী ঢাকা সম্মেলনের পর একটি যুক্ত বিবৃতি দিয়াছেন, উহাতে যে সব সতর্কতার কথা বলা হইয়াছে তাহা এখানে পালিত হইতেছে এবং সমস্ত সংবাদপত্র ও জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ উহাতে সাহায্য করিতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গের সঠিক সংবাদ পাওয়ার উপায় নাই, তবে ঢাকার ঘটনার পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত "আজাদ" ভারতের সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় নেতাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার এবং পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলীর বিকৃত ও মিথ্যা প্রচারের দ্বারা সেখানে বিষ ঢালিতেছিলেন।

ব্যাপারটাকে আমাদের দুই দিক হইতে দেখা দরকার। প্রথম কথা পাকিস্থানে হিন্দুদের উপর উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতে মাঝে মাঝে দেখা দিতেছে। আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে বর্তমান গোলযোগের উৎস আমাদের নাগালের বাহিরে, সেখান হইতে যে বিষ ঢালা হইতেছে তাহাই আমাদের উপর পড়িয়া আমাদেরও সমাজদেহকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। এই বিষপ্রয়োগ বন্ধ করিবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, উহা কেবলমাত্র প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের নহে। প্রাদেশিক গবর্মেণ্টকে এইটুকু দেখিতে হইবে যে, এই বিষ যেন আমাদের ধ্বংস না করে, যথাসাধ্য উহার কুফল এড়াইয়া চলা এবং সমাজদেহকে এই বিষপ্রয়োগ সত্ত্বেও সুস্থ রাখিবার চেষ্টা করাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। ইহা অসম্ভব মনে হইতে পারে, কিন্তু এই অসম্ভবই আমাদের সম্ভব করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা বর্তমান সাম্প্রদায়িক গোলযোগকে ২৬শে জানুয়ারী দক্ষিণ-কলিকাতায় যাহা ঘটিয়াছে তাহার সহিত একযোগে দেখিতে চাই। ভারতরাষ্ট্রে এখন তিন শ্রেণীর লোক তৎপর হইয়া

উঠিয়াছে—তিন জনেরই উদ্দেশ্য এক, রাষ্ট্রের ধ্বংসসাধন। ইঁহারা হইতেছেন কম্যুনিষ্ট, পাকিস্থানী এবং কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত এক দল। ২৬শে জানুয়ারী দক্ষিণ-কলিকাতায় প্রায় ছয় ঘণ্টা গবর্ণমেণ্ট বলিয়া কিছু ছিল না। প্রকাশ্য দিবালোকে টালিগঞ্জ থানার এক শত গজের মধ্যে দক্ষিণ-কলিকাতা জেলা কংগ্রেসের সভাপতির বাড়ী লুঠ হইল, মেল-ভ্যান আক্রান্ত হইল, উহাও লুঠ হইল, ষ্টেট বাস ও ট্রাম আক্রান্ত হইল। পরম নিশ্চিন্ত মনে দুষ্কার্য্যকারীরা কার্য্য সমাধা করিল। পুলিস বাধা দিতে পারিল না, লুণ্ঠিত মাল উদ্ধারের চেষ্টা করিল না, মেল-ভ্যানের ড্রাইভার গাড়ীটি গুণ্ডাদের হস্তে সযত্নে সমর্পণ করিয়া সরিয়া পড়িল, উহা বাঁচাইবার কোন চেষ্টা করিল না। এই থানার পুলিসের এবং ঐ মেল-ভ্যানের ড্রাইভারের কোন কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই।

এখানে যে বিষয়টি আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার কথা তাহা হইতেছে এই ভারতরাষ্ট্রে শান্তি রক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনার দায়িত্ব যাহাদের উপর অর্পিত হইয়াছে তাহারা উহা যথাযথ ভাবে পালন করিতেছে কিনা—এবং কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে অথবা কর্ত্তব্য পালনে অক্ষম হইলে তাহাদের সরাইয়া তৎস্থলে নূতন লোক দেওয়া হইতেছে কিনা, অযোগ্যতা বা কর্ত্তব্যপালনে অবহেলার জন্য কেহ শাস্তি পাইতেছে কিনা। যে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে তাহার সংবাদ পূর্ব্বাহ্নে রাখা যাইত কিনা এবং ঘটিবার কত সময় মধ্যে উহা নিবারণ করিয়া অবস্থা আয়ত্তে আনা যাইত তাহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয়। ইহা হইলেই কর্ম্মচারীদের যোগ্যতা অযোগ্যতা ধরা পড়িবে। আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি এরূপ করা হইতেছে না। ইহা ভারতরাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে ঘোরতর বিপদের কথা। পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে আমাদের তফাৎ এই যে সেখানকার গবর্ণমেণ্ট দুর্বৃত্তদের উপর যথোপযুক্ত শাসন রাখিতে পারিতেছেন না, কিন্তু আমাদের এখানে এরূপ হওয়ার কথা নয়। আমাদের গবর্ণমেণ্ট অনেক বেশী শক্তিমান। আমাদের এখানে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, শান্তি রক্ষা এবং দুষ্কার্য্যকারীদের উপর কঠোর শাসন বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী, কারণ পশ্চিমবঙ্গ একটি সীমান্ত ঘাঁটি। এইজন্য আমরা বিশ্বাস করি যে, পূর্ব্ববঙ্গে যাহাই কেন ঘটুক না, পশ্চিমবঙ্গে তাহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ ব্যক্তিগত মারামারি ঘটিতে দিলে সমগ্র দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। এইজন্য এখানকার পুলিস এবং ম্যাজিষ্ট্রেটদের অত্যন্ত কর্ম্মক্ষম এবং সতর্ক হওয়া দরকার।

মাণিকতলা, বেলেঘাটা প্রভৃতি স্থানে যাহা ঘটিয়াছে তাহাতেও আমরা তিনটি বিভিন্ন দলের হাত লক্ষ্য করিয়াছি। একদল আগুন দিয়াছে, একদল লুঠ করিয়াছে এবং একদল বাস করিতে আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতটা যোগাযোগ আছে বা আদৌ আছে কিনা তাহা আমরা বলিতে পারিতেছি না, কিন্তু এটা দেখা গিয়াছে যে, গোলযোগের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ইহাতে এই কথাই মনে হয় যে, শান্তিরক্ষা পুলিসের পক্ষে কঠিন ছিল না এবং এখনও কঠিন নয়।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর অত্যাচার সুরু হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে তাহার কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করে। বাগেরহাটের ঘটনার উপর মিথ্যার চুণকাম করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট প্রেসনোট বাহির করিয়াছিলেন, মৌলবি ফজলুল হকের ন্যায় লোকেরাও পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর কিছুই হয় নাই বলিয়া বিবৃতি দিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কিছুদিন যাবৎ লোক আসা একেবারে বন্ধ হইয়াছিল, গত কয়েক দিন যাবৎ উহা আবার সুরু হইয়াছে এবং একমাত্র বনগাঁতে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ১৩০০০ লোক আসিয়াছে। ইহা পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের সহিত ভাল ব্যবহারের নিদর্শন নহে। সে যাহা হউক, তাহার আলোচনা এখানে করা উদ্দেশ্য নহে। সময়মত ও প্রয়োজন মত তাহা করা যাইবে। বর্ত্তমানে শান্তি স্থাপনাই মুখ্য সমস্যা।

পশ্চিমবঙ্গে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ওদিকে পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদেরও বাজেট অধিবেশন সুরু হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের পরিষদ-গৃহে হিন্দু সদস্যেরা বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানের অত্যাচারের আন্তর্জ্জাতিক তদন্ত দাবি করিলে তাহা প্রত্যাখ্যাত হয় এবং তাঁহারা বিধিসম্মত ভাবে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য পরিষদ গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসেন। এই অপরাধে তাঁহাদিগকে "রাষ্ট্রদ্রোহী" বলিয়া পাকিস্থানী সংবাদপত্রে প্রচার করা হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের কর্ণধারদের বিরুদ্ধে তাঁহারা কোনরূপ অসংযত বাক্য বা কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন একথা পাকিস্থানী পত্রিকাগুলি বলেন নাই। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে মুসলিম দল গবর্ণমেণ্টের পরিচালকদের অতি কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন। মৌলবী আবুল হাসিম বলিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট অতি সামান্য লাভের আশাতেই নিজেদের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের পায়ে সঁপিয়া দিয়াছেন এবং "বানর-বৃত্তি" অবলম্বন করিয়াছেন। হাসিম সাহেব অতীতে ছিলেন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী। এখন পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে বিরোধী দলের নেতা। তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে গালাগালি, গবর্ণমেণ্টকে হেয় করিবার দুরভিসন্ধি এবং রাষ্ট্রের শত্রুদের প্রতি প্রশংসা ও উৎসাহ বাক্যই সর্ব্বপ্রধান। কম্যুনিষ্টদের দরদে তিনি চোখের জলের বান ডাকাইয়াছেন। কলিকাতার কম্যুনিষ্ট নাশকতামূলক চেষ্টার পিছনে পাকিস্থানীরা আছে একথা আগেও আমরা লিখিয়াছি। যাঁহারা উহা বিশ্বাস করেন নাই, পরিষদে হাসিম সাহেবের

বক্তৃতায় তাঁহাদের চোখ খোলা উচিত। প্রদেশের ভিতরে রাষ্ট্রের শত্রু কম্যুনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের অর্থ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে সাহায্য করা; প্রদেশে এবং কেন্দ্রে বিরোধ বিদ্যমান এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করিবার চেষ্টাও ঐপ্রকার অভিসন্ধি-প্রসূত। মৌলবী হাসিম, মৌলবী জসিমুদ্দিন, মৌলবী রফিক প্রভৃতি অতীতে পাকিস্থানী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রথম সারির নেতা ছিলেন, এখনও পরিষদ গৃহের মধ্যেই তাঁহারা যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহা পাকিস্থানেরই সহায়ক, ভারত-রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি মমতার নিদর্শন নহে।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাসিম সাহেবের বক্তৃতায় সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম দল বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক গোলযোগে গবর্মেণ্টকে যতটা সাহায্য করিতে পারিতেন তাহা তাঁহারা সকলে করেন নাই। বর্ত্তমান গোলযোগের গোড়া পাকিস্থান, পাকিস্থানী নেতাদের অসংযত কথা ও ভারতবিরোধী কাজ ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ইঁহারা সদলবলে ঢাকায় গিয়া পূর্ব্ববঙ্গ গবর্মেণ্টকে চাপ দিয়া বলিতে পারিতেন যে পশ্চিম পাকিস্থানে হিন্দু নাই, এক কোটি যাহা আছে তা পূর্ব্ববঙ্গেই; ভারতে রহিয়াছে প্রায় চার কোটি মুসলমান; এখন যদি এই হিন্দুদের উপর অত্যাচার হয় তবে ভারতে তার প্রতিক্রিয়া পড়িবে, চার কোটি মুসলমান বিপন্ন হইবে। পাকিস্থান আনিবার জন্য ইঁহারাও রক্ত দিয়াছেন ও লড়িয়াছেন, খাজা নাজিমুদ্দীন বা মৌলবী নুরুল আমীনের পাকিস্থান শাসক হওয়ার মূলে তাঁহাদের হাত রহিয়াছে, সুতরাং এই দাবি করিবার অধিকার তাঁহাদের রহিয়াছে। কলিকাতার রাজাবাজার বা সাহেব বাগানে দুইটা সভা করিয়া প্রস্তাব পাশ করিলে বা গা বাঁচাইয়া বিবৃতি দিলে কোন কাজ হইবে না। ভারতরাষ্ট্রে মুসলমানেরা যে সমস্ত সুযোগসুবিধা, নাগরিক অধিকার এবং রাজকার্য্যে উচ্চ ক্ষমতা ভোগ করিতেছেন তাহার অনুরূপ ত দূরের কথা পাকিস্থানের হিন্দুদের তার লক্ষাংশের একাংশ অধিকারও নাই; উহা তাঁহাদিগকে না দিলে ভারতের মুসলমানের মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না,—এই কথা ইঁহারা অনায়াসে ঢাকায় গিয়া জোর গলায় বলিতে পারেন। তাহা না করিয়া ইঁহারাও পাকিস্থানীদের কূটনীতিতে গা ভাসাইয়া ভারতের প্রতিক্রিয়া পাকিস্থানে হইতেছে বলিয়া মিথ্যা প্রচার আরম্ভ করিলে তার বিষময় পরিণাম ইঁহাদিগকেই ভোগ করিতে হইবে। চার কোটি বনাম এক কোটি অথবা পঁয়ত্রিশ কোটি বনাম সাত কোটিতে জয় পরাজয় বুঝিতে খুব কষ্ট করিবার দরকার নাই। হিন্দু মুসলিম মিলন না হইলে ভারত স্বাধীন হইবে না এই মিথ্যা যেমন ভাঙিয়া গিয়াছে, ভারত-পাকিস্থান বিরোধে উভয় রাষ্ট্র ধ্বংস হইবে এই ইঙ্গ-পাকিস্থানী মিথ্যাও ধূলিসাৎ হইতে বিলম্ব হইবে না।

মৌলবী আবুল হাসিম প্রমুখ মুসলিম নেতৃবর্গ বলিতে পারেন যে ভারতে হিন্দু মুসলমানের সমান প্রজাস্বত্ব সুতরাং হিন্দু যদি রাষ্ট্রের বিরোধী কার্য্যক্রম চালাইতে পারে তবে তাঁহারাই বা কেন সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন? ইহার উত্তর তাঁহাদের বিগত কালের—অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে লীগ অধিকার যুগের—ইতিহাস। ভারতরাষ্ট্রের উন্নতিকল্পে বা সংস্কারের চেষ্টায় তাঁহারা সরকারের বিরোধিতা সম্মানে করিতে পারেন, ন্যায়সঙ্গত উপায়ে। কিন্তু ভারতরাষ্ট্রকে বিপন্ন করার অপচেষ্টায় বা ভারত-বিরোধী কোন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে কোন চেষ্টা রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্য্যায়ে পড়িতে বাধ্য। ভারতের চালকবর্গের সততা ও সদিচ্ছার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ছিদ্রান্বেষী শত্রুর চরের কাজ করার অধিকার কাহারও নাই, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান, যে যাহাই হউক। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে কে সত্যই ভারতরাষ্ট্রের সন্তান এবং কে প্রচ্ছন্ন পাকিস্থানী ইহা ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

ইংরেজের চক্ষে "পাকিস্থান"

১৪ই মাঘের 'আজাদ' (ঢাকা) পত্রিকায় লেফ্‌টেনেণ্ট জেনারেল মার্টিনের ও লণ্ডন 'টাইমস্‌' পত্রিকার প্রবন্ধ দুইটির অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমটি গত ২৫শে পৌষ (৯ই জানুয়ারি) তারিখে লণ্ডন 'ডেলী টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয়টি 'টাইমসে'র দিল্লীর বিশেষ সংবাদদাতা কর্তৃক লিখিত; লণ্ডন হইতে ১৩ই মাঘ তারিখে ইহা নানা দেশে রয়টার কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের কোন সংবাদপত্রে দুইটির একটিরও উল্লেখ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অর্থাৎ, ভারতরাষ্ট্রের রাজনীতিকেরা ও সাংবাদিকেরা শত্রুপক্ষের মতি-গতির প্রতি চক্ষু মুদিয়া থাকাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন। এক চক্ষু হরিণের উপাখ্যানটির কথা তাঁহাদের মনে রাখিতে অনুরোধ করিতেছি।

'আজাদ' পত্রিকা দুইটি প্রবন্ধকে ফলাও করিয়া প্রকাশ করিয়াছে। লেখক ১৫ বৎসর পরে পশ্চিম পাকিস্থানে ভ্রমণ করিয়া আকারে-ইঙ্গিতে নানা ভাবে ভারতরাষ্ট্রের কুৎসা প্রচার করিয়াছেন। মহিলা জাগরণের প্রশংসা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন:—

'প্রয়োজনীয়তাই প্রধান যুক্তিদাতা। পঞ্জাবে লক্ষ লক্ষ মুসলমান নিধন, ৬০ হাজার মুসলমান অপহরণ, ৭০ লক্ষ মুসলমান শরণার্থীর দুরবস্থা ও কাশ্মীরে ১ লক্ষ মুসলমানের নিধনের ফলে এই কঠিন সত্যই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এর দরুনই মুসলমান মেয়েরা পর্দার অন্তরালে না থাকিয়া প্রকাশ্যে কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠিয়াছে।'

রেলপথে চলাচল 'কতানুগতিক' ভাবে চলিতেছে। দেশ বিভাগের পর 'রেলগাড়ীর ভাগ বাঁটোয়ারাও পাকিস্থানের পক্ষে লাভজনক হয় নাই।' বিমানযোগে বড় বড় শহরে যাতায়াত করা যায়; 'অন্যত্র সম্প্রতি বিমান ও যাত্রীর অভাবে কতকগুলি পথে বিমান চালনা বন্ধ হইয়াছে'; তা ছাড়া, লেখকের সফরের পূর্ব্বে, 'ভারত হইতে কয়লা প্রেরণ বন্ধ হওয়ায় রেল চলাচল খুব সম্ভবতঃ কমাইয়া দিতে হইবে।'

'পাকিস্থানে'র সামরিক বাহিনীর বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক বলিতেছেন:—'পাকিস্থানী সৈন্যদলের প্রধান গুণ তাহাদের উদ্দীপনা ও বীর্য্য ভাব; তাদের এই গুণের জন্যই নানা বিষয়ের অভাব সত্ত্বেও পাকিস্থানী সৈন্যদল এত সুসংহত।' তাহাদের প্রধান অসুবিধা 'ভারী যুদ্ধ সরঞ্জাম ও কারিগরের অভাব।' 'এখনও এক হাজারের অধিক ব্রিটিশ অফিসার নিয়োজিত আছে, পাকিস্থান সামরিক বাহিনীর নানা শাখায় অভিজ্ঞ পাকিস্থানী সামরিক অফিসারের নিদারুণ অভাবের জন্যই এখনও এত অধিক ব্রিটিশ অফিসার রহিয়াছেন।' 'বিমানবাহিনী ছোট হইলেও বেশ কার্য্যকরী।'

সামরিক বাহিনীর 'কথ্য ভাষা' সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন,—'আমেরিকা ও ইংলণ্ডে এত বেশী সামরিক শিক্ষার্থী পাঠান হইতেছে বলিয়া' মনে হয় যে, ইংরেজী ভাষার ব্যবহার ছাড়া গত্যন্তর নাই।

রাওয়ালপিণ্ডি, পেশোয়ার, কোয়েটা ও কোহাট পাকিস্থানের প্রধান সৈন্য-শিবির। পূর্ব্বেও ইহাদের লেখকের দেখা ছিল, 'কিন্তু এইবার দেখিতে যাইয়া আমার মনে কেমন ভয় হইতে লাগিল, যদিও এই ভয় সম্পূর্ণ অহেতুক।' 'কোয়েটা ষ্টাফ কলেজে প্রত্যেক বৎসর ব্রিটিশ অষ্ট্রেলিয়ান ছাত্রগণ যোগদান করিয়া থাকে। এই বৎসর একজন মার্কিন ছাত্রও আসিবে।'

লেখক উক্ত কলেজে শিক্ষক ছিলেন; সুতরাং তুলনামূলক দৃষ্টিতে সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এখানকার অবস্থা 'মোটামুটি সুশৃঙ্খল' বলিয়াই মনে করেন।

'টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধে লেখক ভারতরাষ্ট্রের নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন; প্রবন্ধের শিরোনামা "ভারতীয় দিগন্তের প্রধান সমস্যা—ভারত-পাকিস্থান সম্পর্ক।" ভারত-রাষ্ট্রের রাজধানী দিল্লী নগরীতে থাকিয়া এই সংবাদদাতা অনেক গোপন কথার সন্ধান লন ও পাইয়াও থাকেন। তাহার বিশ্লেষণ করিয়া লেখক বলিতেছেন: "ভারত-'পাকিস্থান' আজ 'ফরাসী-জার্ম্মান' সম্পর্কের পর্য্যায়ে দাঁড়াইয়াছে", ইহার ভবিষ্যৎ "বিশেষ সঙ্কট সম্ভাবনাপূর্ণ।" এই কথার অর্থ আমাদের পাঠকবর্গকে মনে করাইয়া দিতে চাই যে এই তিক্ত সম্পর্কের ফলে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দুইটি বিশ্ব-যুদ্ধ ঘটিয়াছিল; ইউরোপের এত জ্ঞান-বিজ্ঞান শান্তি রক্ষা করিতে পারে নাই। সুতরাং আমাদের মত রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা ঘটিলে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। আশ্চর্য্য হই ইংরেজের সতীপনার ভান লক্ষ্য করিয়া।

কাশ্মীর সমস্যা সম্বন্ধে লেখক "ভালমন্দ যতই থাকুক না কেন" তাহা বিচার করিতে চান না; তবে তিনি এই কথা বুঝিয়াছেন যে "ভারত কোনরূপ আপোষ-মীমাংসায় রাজী হইবে না।" তাঁহার প্রবন্ধের চুম্বক প্রকাশ করিতে গিয়া "আজাদ" পত্রিকা একটু রং ফলাইয়াছে; দুই রাষ্ট্রের বিবাদের মূলে দেখিয়াছে "ভারতের স্বেচ্ছাকৃত কলহ" এবং "তজ্জনিত অর্থনীতিক কুফল এবং পক্ষান্তরে ভারতের আভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতিজনিত দুরবস্থা ও সরকারী অর্থনীতির উপর জনগণের আস্থার অভাব।" মুদ্রাস্ফীতিজনিত নানা অবস্থায় পাকিস্থান ভাল আছে জানিতে পারিলে আমরা অসুখী হইব না, তাহা হইলে কলিকাতার শিল্পাঞ্চলে ৫ লক্ষ পূর্ব্ববঙ্গবাসী মুসলমানকে "কাফেরে"র রাষ্ট্রে আসিয়া জীবিকা অর্জ্জনের পথ খুঁজিতে হইবে না। মুদ্রাস্ফীতিতে তাহাদের কোন ক্ষতি হইতেছে না নিশ্চয়ই। এই কথা ভাবিতেও সুখ; বাঙালীর একটা অঙ্গ ত অভাবের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে; আসামেও যাইতে হইতেছে না, "পবিত্রস্থানে" সকলেই ভাল আছে।

"টাইমস্" পত্রিকায় প্রকাশিত তাহার দিল্লীর সংবাদদাতার প্রবন্ধে আরও শুভানুধ্যায়ী অনেক কথা ছিল; রয়টার প্রেরিত চুম্বকে তাহা বুঝা যায় না। কাশ্মীর সমস্যাই তাঁহাকে চিন্তিত করিয়াছে দেখিতে পাই। যখন নিজেই এই সমস্যাটা সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দরবারে আনিয়াছে, তখন সেই প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বোচ্চ কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের—"নিরাপত্তা পরিষদে"র (Security Council) "রায় মানিয়া লইতে ভারত নৈতিকতঃ বাধ্য।" প্রবন্ধে একটু ভয় দেখানোও হইয়াছে।

"যদি এই লইয়া নিরাপত্তা পরিষদকে কর্ম্মপন্থাগত জটিলতার মধ্যে টানিয়া লওয়া হয়, তবে ভবিষ্যৎ সত্যই অন্ধকার। তাহা হইলে দুই দেশের মধ্যে 'স্নায়ুযুদ্ধ' চলিতেই থাকিবে, এবং পার্শ্ববর্ত্তী সিংকিয়াং প্রদেশে কম্যুনিষ্ট চীনের শক্তি যত বৃদ্ধি পাইবে, বিপদ ততই ঘনাইয়া আসিবে।"

উভয় দেশের উন্নতির নানা পরিকল্পনা ব্যাহত হইবে; "বিদেশী পুঁজিপতিরাও বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে পুঁজি নিয়োগ করিতে রাজী হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।" এই ভয় দেখানোর মধ্যে সৎ-অসৎ উদ্দেশ্যের স্বাভাবিক মিলন দেখিতে পাই। ভারতরাষ্ট্রের কম্যুনিজমের ভয় আছে হয়ত। কিন্তু "পাকিস্থানে"র ত সে ভয় নাই। ফিরোজ খাঁ নুন ত সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রদেশ হইয়া থাকিতে রাজী যদি ভারত এত জেদাজেদি হইয়া উঠে। সুতরাং ইংরেজের পক্ষে "পাকিস্থানকে" বুঝাইয়া-পড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলে ভাল হয় না?

বিহারে ভাষার বিরুদ্ধে অভিযান

প্রায় মাসখানেক পূর্ব্বে পুরুলিয়ার প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবর্ত্তক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ বঙ্গভাষার বিরুদ্ধে সরকারী অভিযানের প্রতিবাদস্বরূপ একটি বিবৃতি প্রচার করেন। তিনি তদুপলক্ষে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, উচ্চতম কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে ও নির্দ্দেশে তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। ভরসা ছিল যে, তাঁহারা এই অত্যাচারের প্রতিকার করিতে তৎপর হইবেন। কিন্তু ছয় মাসেও তাহা হয় নাই। স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ-আয়োজনে তাঁহারা এত ব্যস্ত আছেন যে, এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। একজন বিহারী প্রধান এই নূতন রাষ্ট্রের পালক ও ধারক মনোনীত হইয়াছেন; তদুপলক্ষে উৎসাহ আনন্দের বেগ শরীর মনের স্বাভাবিক বিশ্রামের প্রয়োজনে শ্লথ হইয়াছে। সুতরাং বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই দিকে একটু দৃষ্টি দিতে পারিবেন, এরূপ আশা মনে পোষণ করিলে অন্যায় হইবে না।

সেইজন্য, সেই আশায় মানভূম বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একখানি পত্রের কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। পত্রখানি লিখিত হইয়াছিল ১৫ই মাঘ তারিখে, স্বাধীন গণতন্ত্র ঘোষণার তিন দিন পরে। কলিকাতার "যুগান্তর" পত্রিকার ১৮ই মাঘ সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হয়। পত্রে উল্লিখিত অত্যাচার বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের অবগতির জন্য আমরা এখানে তুলিয়া দিলাম। তিনি বঙ্গভাষা জানেন; বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতায় পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন। সেই সময়ে বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতির রক্ষার জন্য বাঙালী যে সংগ্রাম করিয়াছিল তিনি তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন। আজ মানভূম, ধলভূম, পূর্ণিয়া প্রভৃতি বঙ্গভাষা-ভাষী অঞ্চলে এই ভাষার উপর যে অত্যাচার চলিতেছে এবং তার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ভারতীয় গণতন্ত্রে চলিতে দিলে তার রাষ্ট্রপালের কপালে কলঙ্কের টিকা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় হইয়া থাকিবে। বাঙালীরও তাহাতে লজ্জার কারণ আছে। এই কথা ভাবিয়াই আমরা মৃগেন্দ্র বাবুর পত্রাংশ তুলিয়া দিলাম। যথেষ্ট সময় নষ্ট হইয়াছে। লোকেরও ধৈর্য্যের সীমা আছে। সেই সীমা লঙ্ঘন করিয়া কোন রাষ্ট্র সম্মানের সহিত টিকিয়া থাকিতে পারে না।—

"মানভূম জেলা বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের একাদশ বার্ষিক অধিবেশনের সময় বিহার জন-নিরাপত্তা আইনের জন্য জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট উদ্যোক্তাদিগের পক্ষ হইতে অনুমতির জন্য আবেদন করা হয়। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ অনুমতি দিতে অযথা বিলম্ব করায় পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে জানান হয়। কর্ত্তৃপক্ষ নিছক সাহিত্য-সম্মেলন ও শাখা অধিবেশনরূপে মহিলা, সঙ্গীত প্রভৃতি সম্মেলনে বাধা দিলেন না বটে, কিন্তু তদানীন্তন অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদককে পুলিসের মারফত নানাভাবে হয়রানি ও জব্দ করিবার চেষ্টা করা হয়। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের এই সকল কার্য্যের প্রতি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক ও নিখিল-ভারত কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে বিন্দুমাত্র সাড়া পাওয়া যায় না। অধিকন্তু স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা সাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদককে সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক দল বিশেষের সদস্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলে। সম্পূর্ণ এক মিথ্যা খবরের উপর ভিত্তি করিয়া এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার ও অন্যান্য বহু শান্তিপ্রিয় বিশিষ্ট বাঙালীর গৃহে "বোমা ও বারুদে"র সন্ধানের অজুহাতে ব্যাপকভাবে তল্লাস করিয়া হয়রানি ও জব্দ করার চেষ্টা করা হয়। ইহা ব্যতীত অনেককে নানা মিথ্যা মামলায় জড়িত করিয়া জব্দ করিবার কৌশল প্রয়োগের ব্যাপক পরিকল্পনা বাস্তব ক্ষেত্রে দিন দিন প্রকট হইয়া দেখা দিতেছে।

"জেলাবাসী যাহাতে তাঁহাদের প্রকৃত স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে না পারে এই কারণে বিহার জন-নিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগ করিয়া একাদশ বার্ষিক অধিবেশন বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তাদিগকে সম্মেলনের প্রায় তিন দিন পূর্ব্বে এক ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থীমূলক সর্ত্তাদি আরোপ করিয়া অনুমতি দেওয়া হয়। ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া সম্মেলন স্থগিত রাখা হয়।

"সম্প্রতি সঙ্গীত, মহিলা, কৃষি প্রভৃতি বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের শাখা সম্মেলন বর্ত্তমান বৎসরে বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের অনুমতি চাহিয়া জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় প্রায় তিন সপ্তাহের অধিককাল গত হইয়া গেল এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে কোন লিখিত জবাব পাওয়া যায় নাই। এইরূপ বিলম্বের জন্য জেলা যথা দেশবাসীর মনে নানারূপ বিরুদ্ধ ধারণার সৃষ্টি হইতেছে। অনেকে নানারূপ আশঙ্কা করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ অনুমতি দিতে অযথা বিলম্ব করায় জন্য সম্মেলনের কার্য্যে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে।"

পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমি বৃদ্ধি

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিমণ্ডলীর অনুমোদনে তাঁহাদের বিশেষ চেষ্টায় চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বিবৃতির হিসাব সম্বন্ধে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার উত্তরে গত ৯ই পৌষ তারিখে একটি নূতন বিবৃতি দিয়া তাহা অবসান করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সেই চেষ্টা সফল হইবে কিনা জানি না। তবে তথ্যগুলি জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

১৯৪৮-৪৯ সালে পাট, আউস ধান ও আমন ধানের উৎপাদনে যথাক্রমে ৯'৪৫ লক্ষ বিঘা, প্রায় ৩৭ লক্ষ বিঘা ও প্রায় ২ কোটি ২৪ লক্ষ বিঘা জমির ব্যবহার হয়। ১৯৪৯-৫০ সালে তাহার হিসাব এইরূপ : পাট ৯'২১ লক্ষ বিঘা, আউস ধান প্রায় ৩৬ লক্ষ বিঘা এবং আমন ধান প্রায় ২ কোটি ৪১ লক্ষ বিঘা। এই হিসাবে দেখা যায় যে, পাটের জমি বৃদ্ধি পাইয়াছে, আউস জমি কমিয়াছে, আমন জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আউস ও আমন ধানের উৎপন্ন বাড়িয়াছে ৮৯৩৫৫ লক্ষ মণ হইতে ১০০১'৭৪ মণ। এই বৃদ্ধির চেষ্টায় গবর্মেণ্টেরও অংশ আছে। দীঘিপুকুর সংস্কার ও ছোট ছোট নদী-নালা পুনরুদ্ধারের ফলে প্রায় ২ লক্ষ ৬২ হাজার বিঘা জমি চাষে আসিয়াছে, ট্রাক্টরের সাহায্যে সরকারী জমি আবাদযোগ্য করা হইয়াছে প্রায় ৫ হাজার বিঘা এবং সরকারী ও বেসরকারী ট্রাক্টরের কল্যাণে প্রায় ১৫ হাজার বিঘা পতিত জমি চাষের যোগ্য করা হইয়াছে।

এইরূপ উৎপাদন বৃদ্ধির হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যভাণ্ডার কতটা ভরিয়াছে তাহা জানি না। যে "নাই নাই" ধ্বনি তুলিয়া দেশের গণমনকে বিক্ষিপ্ত করা হইতেছে, সেই ধ্বনি বন্ধ হইলে আমরা নিশ্চিন্ত হইব। খাদ্যাভাবকে বড় করা হইতেছে নানাবিধ প্রচারের মাধ্যমে। তবুও বলিব আরও জমি বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। "সত্যাগ্রহ পত্রিকা"র ১৯শে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মেদিনীপুর জেলায় এরূপ জমির সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :

"কেলেঘাই নদীর উত্তর পার্শ্বে খুব কমে ৬ হাজার একর বা ১৮ হাজার বিঘা আবাদযোগ্য পতিত জমি পড়িয়া রহিয়াছে। সমস্ত জায়গা প্রায়ই লাগাও এবং বর্ত্তমানে বেনা ঘাসের দ্বারা আক্রান্ত। এই সকল বেনা প্রায়ই ৪ হইতে ৭ ফুট উঁচু এবং ট্রাক্টর ব্যবহারের দ্বারা এইগুলির উচ্ছেদ হইতে পারে। মাটি এঁটেল ও সরস। আগে এই সকল জায়গায় প্রচুর আমন ধান হইত। কিন্তু কেলেঘাই ও বাঘুইর বন্যার জন্য এই সমস্ত জায়গা পতিত হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় কৃষকেরা এই সকল জমিকে ট্রাক্টরের দ্বারা সংস্কার করিয়া চাষের উপযোগী করিয়া দেওয়ার জন্য বিশেষরূপে জিদ করিতেছেন।

অধিকতর খাদ্য উৎপাদন করিতে হইলে কোলন্দা এবং নৈপুরে একটি হিসাবে দুইটি ট্রাক্টর কেন্দ্র খুলিতে হয়। প্রত্যেক কেন্দ্রে দুইটি ট্রাক্টর থাকিবে।

স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত এই যে, কোদাল দ্বারা এক বিঘা জমির বেনা ফেলিয়া দিতে হইলে ৪০ টাকার কম খরচ পড়িবে না, কিন্তু ট্রাক্টরের দ্বারা ঐ কাজ করিলে বিঘা প্রতি ১৫ টাকার বেশী পড়িবে না।

এদিকে দেখিতে পাই যে, হুগলী জেলায়ও অনুরূপ চেষ্টার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। 'নির্ণয়' পত্রিকার ১৬ই পৌষের সংখ্যায় তাহার একটি বিবরণ দেখিলাম। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত সার দেওয়া হইল :

"দাদপুর ইউনিয়নের এই কাঁটুল-অনন্তপুর বাঁধটি প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় চাষী ও জমিদারের চেষ্টায় নির্ম্মিত হয়। বাঁধটি কাণা নদীর (কাঁটুল) উপর অবস্থিত। নদীসংলগ্ন বাঁধের উপর চাষীরা ও স্থানীয় জমিদার একটি 'কপাটিয়া কল' তৈয়ার করিয়াছিলেন।

"বর্ত্তমানে ঐ বাঁধটি ভগ্নপ্রায় তাহা ছাড়া কপাটিয়া কলটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। ফলে বহু হাজার একর জমির ফসল উৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। স্থানীয় চাষীরা প্রায় ২,০০০ টাকা খরচ করিয়া ঐ কপাটিয়া কলের তিন-চতুর্থাংশ সম্পূর্ণ করিয়াছে। এক্ষণে ঐ বাঁধ ও অসম্পূর্ণ কপাটিয়া কলটির সংস্কার করিতে হইবে। এইজন্য আনুমানিক ৩,৮০০ টাকার প্রয়োজন। স্থানীয় চাষীরা ৮০০ টাকা ব্যয় বহন করিতে প্রস্তুত আছে।

"এই বাঁধটি সংস্কৃত হইলে বহু একর আবাদী ও ১৮০ বিঘা পতিত জমিতে জল সরবরাহের সাহায্য হইবে। ফলে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার মণ ধান্য ও অন্যান্য ফসল উৎপন্ন হইবে। অথচ বর্ত্তমানে তথায় মাত্র ৭২ হাজার মণ ধান্য ও ফসল পাওয়া যাইতেছে।

"কাঁটুল হইতে পুইনান পর্য্যন্ত যে জলসেচনের খালটি ছিল, তাহা সম্পূর্ণ মজিয়া গিয়াছে। উক্ত খালটি সংস্কার করিলে প্রায় ৯ হাজার বিঘা আবাদী ও ৯০ বিঘা পতিত জমিতে অধিক খাদ্য-শস্যোৎপাদনে সাহায্য করিবে।

"দাদপুর ইউনিয়নেরই অনন্তপুর হইতে শ্রীরামপুর, কৃষ্ণপুর ও কাঁটাগোড় হইয়া সোমসাড়া পর্য্যন্ত যে জলসেচনের খালটি রহিয়াছে তাহা সংস্কার করিলে প্রায় ৬ হাজার বিঘা আবাদী ও ৪৫ বিঘা পতিত জমিতে অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে।"

"সেকেন্দারপুর হইতে খরসাট, রসুলপুর ও মহেশ্বরপুর হইয়া তামিলা পর্য্যন্ত জলসেচনের খালটির সংস্কারের জন্য প্রায় ৩৫৬০ টাকা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনায় প্রায় ৯ হাজার বিঘা আবাদী ও ৪৫ বিঘা পতিত জমির সুব্যবস্থা হইবে।"

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুর মহকুমায়ও অনুরূপ চেষ্টা দেখিতে পাই। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সরকারী বে-সরকারী ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। "স্বেচ্ছাশ্রমে"র দ্বারা এই বিরাট পরিকল্পনা সফল করিবার চেষ্টা হইতেছে। মুরশিদাবাদ "গণ-রাজ" পত্রিকার ১লা মাঘের সংখ্যায় তাহার একটা পরিচয় পাওয়া যায় :

"(ক) আসুরা পরাণচণ্ডীপুর খাল খনন। ফরাক্কা থানা।

"এই খালটি মজিয়া যাওয়াতে ষোলশো বিঘা জমিতে ফসল পাওয়া যাইত না, কারণ একটু জোর বর্ষা হইলেই জল

নিকাশের অভাবে ধান নষ্ট হইয়া যাইত এবং রবিশস্যও লাগান যাইত না। সেইজন্য ঐ অঞ্চলের ঊনিশখানি গ্রামের সকল কর্মক্ষম লোক মিলিয়া মোট ষোলশো যাট জন লোক খাটিয়া এই দেড় মাইল দৈর্ঘ্যের খালটি মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন।

"(খ) নয়ানপুর, বগলাউরী ও পাতি বিল।

"করাকা থানায় এই তিনটি বিলের জল নিকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গঙ্গায় গিয়া পড়ে এমন একটি খালের সঙ্গে এই বিলগুলিকে কাটিয়া জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। জলার জন্য এখানে তেইশ শত বিঘা জমি অনাবাদী পড়িয়াছিল। নয়টি গ্রামের ষোলশত লোক মিলিয়া নিজেদের চেষ্টায় প্রায় দেড় মাইল করিয়া লম্বা, বারো ফুট চওড়া আর গড়ে আড়াই ফুট গভীর কয়েকটি খাল কাটিয়া এই অনাবাদী জমিকে ফসল বাড়াইবার কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"(গ) চোকপাড়া ওসমানপুর খাল।

"পান্না জলের মুখ হইতে আধ মাইল দূরে সুখা বিল। সুখা বিলের জল এই বিল্ল অপেক্ষা নীচু এবং এই বিলের জল ভাগীরথীতে গিয়া পড়ে। পান্না জল মাঠের জল নিকাশের জন্য, তাহা সুখা বিলের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ওসমানপুর ও সন্নিহিত ৫খানি গ্রামের অধিবাসিগণ মিলিয়া গত অক্টোবর মাসের প্রথমে এই খাল খনন করে। ইহা ছাড়া ১১টি পয়ঃপ্রণালী খনন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। সমগ্র পয়ঃপ্রণালীর দৈর্ঘ্য আনুমানিক ১১ মাইল হইবে এবং ইহাতে মোট ১২৩২০ বিঘা জমি প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হইবে। খরচের পরিমাণ হিসাব করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে ৩৬৩৫০৲ টাকার প্রয়োজন, কিন্তু প্রধানতঃ স্বেচ্ছাশ্রমের দ্বারাই ইহা সম্পন্ন হইবে।

"গো-মহিষের অত্যাচারে অনেক স্থানে রবিশস্য উৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। শস্য-সংরক্ষণকল্পে প্রতি গ্রামে স্বেচ্ছসেবক কর্মীদল গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা নূতন আবাদী ফসল রক্ষা করিবার জন্য তৎপর রহিয়াছেন। ইতিমধ্যে ২৫০০ বিঘা অনাবাদী জমিতে রবিশস্য জন্মানো সম্ভব হইয়াছে। বিস্তীর্ণ অনাবাদী ভূখণ্ড আবাদযোগ্য করিবার জন্য সমিতি কলের লাঙলের সাহায্য লইবেন স্থির করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা লইয়া প্রাথমিক অনুসন্ধান চলিতেছে। সুতী থানার হিলোরা ইউনিয়নভুক্ত বংশবাটি এবং নাজিরপুর মৌজা মধ্যে প্রায় ৪,৭০০ বিঘা অনাবাদী জমি আবাদযোগ্য করিবার প্রচেষ্টা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। অধিক খাদ্য উৎপাদন কার্য্যে উৎসাহ দিবার জন্য প্রতি থানাতে ধান্যের শ্রেষ্ঠ উৎপাদনকারীকে ১৫০৲ টাকা করিয়া একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।"

এরূপ স্বাবলম্বনের দৃষ্টান্ত পশ্চিমবঙ্গের দিকে দিকে বিস্তৃত হউক। এই সম্পর্কে মেদিনীপুর উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের প্রচেষ্টা প্রশংসাযোগ্য। তাহারা সঙ্কল্প করিয়াছিল যে বাৎসরিক পরীক্ষার পর তাহারা ধানের ফসল গৃহজাত করিবার কার্য্যে সহযোগিতা করিবে। সেই সঙ্কল্পানুযায়ী তাহারা গত ২৬শে অগ্রহায়ণের প্রাতঃকাল হইতে দলে দলে ফসল কাটার গান গাহিতে গাহিতে সারিবদ্ধ হইয়া কাস্তে হাতে ধানের ক্ষেতে গিয়া বেলা ১১টা পর্য্যন্ত ধান কাটিয়াছে। উহাদের সহিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও যোগ দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৬০ বৎসর বয়স্ক সংস্কৃতের পণ্ডিত শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও ছিলেন।

ছাত্রদের শ্রমের মূল্যস্বরূপ ১৭৫৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকজন ছাত্রের বেতন শোধের জন্য ৮৫৲ টাকা লাগিয়াছে। বাকী টাকা দিয়া ছাত্রদের ইউনিফরম তৈয়ারী হইতেছে।

বাঙালী তরুণের নিকট দেশ-মাতৃকা এই সেবার জন্যই প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি

গত মাসের "প্রবাসী" পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমরা বলিয়াছিলাম যে, এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সরবরাহ বিভাগের পক্ষ হইতে ও পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতির সম্পাদক প্রমুখ কয়েকজন কৃষিবিদ্ ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞের পক্ষ হইতে যে দুইটি বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কৃষির ব্যয় সম্বন্ধে কোন উল্লেখ বা হিসাব দেখিতে পাইলাম না। তাহার উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতির সম্পাদক শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র মিত্র একটি হিসাব পাঠাইয়াছেন। এই ধান্যের মূল্যবৃদ্ধির আন্দোলনের সময় এইরূপ হিসাবের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। একটা কথা লক্ষ্য করা উচিত যে, এক জেলায়ই ক্ষেত্রভেদে ও অবস্থাভেদে কৃষির ব্যয়ের তারতম্য দেখা যায়; তাহা দুই-এক টাকার নয়। আমরা এই গুরুত্বের জন্য হিসাবটি প্রকাশ করিতেছি। সরকারী দপ্তর হইতে আমরা এইরূপ হিসাব পাই নাই বা প্রত্যাশা করি না। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতির মত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্য প্রার্থনীয়।

হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানা :

বীজক্ষেত্র প্রস্তুত : এক বিঘা

(১) ছয়টা লাঙল—(১৸০ হিসাবে)	১০৷৷০
(২) বীজ ধান ২ মণ	২৪৲
(৩) ৮০ ঝোড়া গোবর-প্রয়োগের খরচ	৪৲
(৪) আনুষঙ্গিক ব্যয়	৩৷৷০
	৪২৲

এক বিঘা বীজক্ষেত্রের চারা ১৪।১৫ বিঘায় রোপণ করা

হার ; সুতরাং এক বিঘার জন্ত চারা উৎপাদনের ব্যয় তিন টাকা।

আমন জমি : এক বিঘা

(১) তিনখানা লাঙ্গল (৩॥০ টাকা হিসাবে)	১০॥০
(২) রোয়া ৪ জন (প্রতিজন ২৲ হিসাবে)	৮৲
(৩) নিড়ান ২ জন („ „ ১৸০ „)	৩।০
(৪) আইল বাঁধা	২৲
(৫) ধান কাটা চার জন (২৲ হিসাবে)	৮৲
(৬) বহন ও গাদা দেওয়া, আড়াই জন	৭॥০
(৭) ঝাড়া তিন জন (১৸০ হিসাবে)	৫।০
(৮) চারার খরচ	৩৲
(৯) জমির খাজনা	৪৲
	৫১৸০

নদীয়ার সুবর্ণপুর (হরিণঘাটার নিকট) :

(১) লাঙ্গল চারখানি (৩৶০ হিসাবে)	১২॥০
(২) চারার দাম	৪৲
(৩) চারা তুলিয়া ক্ষেতে লইয়া যাওয়া—দুই জন ১॥৶০ হিসাবে	৩।০
(৪) রোপণ চার জন—১॥৶০ হিসাবে	৬॥০
(৫) ধান কাটা চার জন—১॥৶০ হিসাবে	৬॥০
(৬) ধান আঁটি বাঁধা একজন	১॥৶০
(৭) বহন	৪৲
(৮) মাড়াই দুই জন	৩।০
(৯) ঝাড়ন, গাদা দেওয়া দুই জন	৩।০
(১০) জলসেচন চার জন	৬॥০
(১১) নিড়ান দুই জন	৩।০
	৫৪॥৶০

মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অঞ্চল :

(১) সার	৯৲
(২) বীজ	২॥০
(৩) লাঙ্গল	৯৲
(৪) আলি বন্ধন	২॥০
(৫) রোপণ	৬॥০
(৬) নিড়ান	২৲
(৭) ছেদন	২॥০
(৮) আঁটিবন্ধন ও বহন	৭৲
(৯) ঝাড়ন, মাড়ন	২॥০
	৩৯॥০

চব্বিশ পরগণা রাজবল্লভপুর অঞ্চলের হিসাব	৫৫৲
চব্বিশ পরগণা ভাঙ্গড় খামার	৩৭৲

ভারতে পাট উৎপাদন

কেন্দ্রীয় পাট কমিটির ষান্মাসিক অধিবেশনে সভাপতি সর্দার দাতার সিং ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী বৎসরে ৫০ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপাদিত হইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে ; ...১০ লক্ষ গাঁইট মেস্তা ও অন্যান্য প্রকার তন্তুও উৎপাদন করা হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এই চারিটি পাট-প্রধান প্রদেশ ছাড়াও ত্রিপুরা, কুচবিহার, উত্তর প্রদেশ ও ত্রিবাঙ্কুরে পাট উৎপাদন করা হইতেছে। উত্তর প্রদেশে পাট চাষের পরিমাণ ১৫ হাজার বিঘা জমি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯ হাজার বিঘা এবং উড়িষ্যার ৬৯ হাজার বিঘা জমি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১,৫৩,০০০ বিঘা দাঁড়াইয়াছে। আগামী বৎসরে উত্তর প্রদেশ ও উড়িষ্যায় যথাক্রমে অতিরিক্ত ১,২৯,০০০ ও ১,৫০,০০০ হাজার বিঘা জমিতে এবং আসামে ৩ লক্ষ বিঘা জমিতে পাট চাষ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরে পরীক্ষামূলকভাবে পাট চাষ করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। সেজন্য সেখানে ৬০ হাজার বিঘা জমিতে পাট চাষ করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গে ১৩ লক্ষ ৭১ হাজার বিঘার অধিক পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করা যাইতে পারে।

বীজের উৎকর্ষ সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভের জন্য সরকারী তালিকাভুক্ত উৎপাদকদের দ্বারা এবং সরকারী কৃষিক্ষেত্রে বীজ উৎপাদন করা হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে বিহারে প্রায় ১,২০০টি, আসামে ৫০০টি, পশ্চিমবঙ্গে ৩০০টি এবং উড়িষ্যায় ২০০টি প্রদর্শনীক্ষেত্র আরম্ভ করা হইবে। বীজ সংগ্রহ ও ঘাটতি প্রদেশগুলিতে ও উপরাষ্ট্রসমূহে উহার বণ্টনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন এবং বীজ সংগ্রহের কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এদেশে উৎপন্ন পাটের পরিপূরক হিসাবে "মেস্তা" পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। বর্তমানে পাটকলে পাটের সহিত মেস্তা মিশ্রিত করিয়া সুফল পাওয়া যাইতেছে। আশা করা যায় যে, তিন লক্ষ বিঘা জমিতে মেস্তা চাষ বাড়ানো যাইতে পারে এবং উহাতে আগামী বৎসরে ৯ লক্ষ গাঁইট মেস্তা পাওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, অন্যান্য উপায়ে আরও এক লক্ষ গাঁইট বিকল্প তন্তু পাওয়া যাইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের পাটের জমি সম্বন্ধে একটা নূতন ব্যবস্থার কথা শুনা যাইতেছে। এই প্রদেশের ৬ লক্ষ বিঘা জমি, পরে জানিলাম ১২ লক্ষ বিঘা, "আউস" ধান্যের চাষ হইতে লইয়া পাটের জমিতে রূপান্তরিত করা হইবে। এই জমি উপরোক্ত ১৩ লক্ষ ৭১ হাজার বিঘার অন্তর্ভুক্ত কিনা তাহা জানাইয়া দেওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গে চাউই প্রধান খাদ্যশস্য ; এবং সরকারী হিসাবপত্রে ইহা ঘাটতি প্রদেশ। এই অবস্থায় ১২ লক্ষ বিঘা "আউস" ধান্যের জমিতে যে ৪০ লক্ষ মণ চাউল

পাওয়া যাইত, তাহা এই প্রদেশে উৎপাদিত না হইলে, আবার কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের দরজায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। শোনা যাইতেছে যে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট এই পরিমাণ চাউল প্রাপ্তি সম্বন্ধে একপ্রকার অঙ্গীকার করিয়াছেন; ৪০ লক্ষ মণ চাউল তাঁহারা দিবেন। অপর দিকে শুনি তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের ভাগে তাঁহাদের দেয় খাদ্যশস্যের পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধেক করিয়া দিয়াছেন; গত বৎসর দিয়াছিলেন প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ মণ; ১৯৫০ সালে দিবেন প্রায় ৬৭ লক্ষ মণ। ব্যাপারটা ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে।

মৌমাছির চাষ

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যে আধুনিক পদ্ধতিতে মৌমাছি-পালন কিছুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বেসরকারী ভাবে বাংলার কোনও কোনও স্থানে—বিশেষ করিয়া খাদি-প্রতিষ্ঠানে মৌমাছির চাষ অনেক দিন হইতে চলিতেছে। ইহার পালন-পদ্ধতি ১৩৪৬ সালের ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে এক প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

গত ডিসেম্বর মাসে সংবাদপত্রে প্রকাশিত যুক্তপ্রদেশ গবর্মেণ্টের এক প্রেস নোটে জানা যায় যে, উক্ত গবর্মেণ্টের কৃষি বিভাগ হইতে মৌমাছি-পালন শিক্ষাদানের জন্য বর্ত্তমানে শিক্ষার্থী আহ্বান করা হইয়াছে। ফেব্রুয়ারি মাস হইতে শিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ হইবে। শিক্ষাকাল চার মাস। যুক্ত-প্রদেশের অধিবাসী-শিক্ষার্থীর জন্য এই শিক্ষাকালের এক-কালীন ফি ২০৲ কুড়ি টাকা এবং বাহিরের শিক্ষার্থীর জন্য ৭৫৲ পঁচাত্তর টাকা। শিক্ষা অন্তে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে প্রশংসাপত্র দেওয়া হইবে।

বাংলা-সরকারের কৃষি বিভাগ এই কাজ আরম্ভ করিতে পারেন যাহা অপর প্রদেশের গবর্মেণ্ট দীর্ঘ দিন হইতে করিয়া আসিতেছেন। বাংলার বিভিন্ন স্থানে কৃষি বিভাগের কয়েকটি পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র আছে। মৌমাছি-পালন শিক্ষাদানের জন্য এই স্থানগুলি উৎকৃষ্ট কেন্দ্র হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

বাংলা-সরকারের বনবিভাগ গত জুন মাসে সুন্দর বন হইতে কিছু মধু সংগ্রহ করিয়া উহা বিক্রয়ার্থ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। সুন্দরবন অঞ্চলে ধোঁয়া দিয়া, মৌমাছিকে তাড়াইয়া, পোড়াইয়া, চাক চট্‌কাইয়া প্রতিবছর ঐপ্রকার মধু বরাবরই সংগৃহীত হইয়া থাকে। ঐ মধু সহজ-প্রাপ্য। আধুনিক পদ্ধতিতে চায়লব্ধ নয় বলিয়া ঐ মধু অল্প সময়ে বিকৃত হইয়া ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া যায়।

বাংলা-সরকার যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৌমাছি পালনের শিক্ষাদান আরম্ভ করেন তবে একদিকে মৌমাছিগুলি অনর্থক অকাল মৃত্যু হইতে বাঁচিয়া যায়, অপর দিকে একটি খাদ্যপদার্থ আধুনিক পদ্ধতিতে সংগৃহীত হওয়া সহজসাধ্য হয়। আজ দিকে দিকে 'অধিক খাদ্য উৎপাদন কর'—এই অভিযান চলিয়াছে। মধু একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। উপযুক্ত উপায়ে উহা সংগ্রহ করায় শিক্ষাদানের অভাবে এই সম্পদ নষ্ট হইতেছে। বাংলার কৃষিমন্ত্রীর দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করি।

তালগুড় ও খেজুরগুড়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রদেশে তালগুড়, খেজুরগুড়, নারিকেলগুড় এই তিনটি শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া শুনিয়াছি। আজ প্রায় আড়াই বৎসর হইতে এই কার্য্য চলিতেছে; তাহার কোন বিবরণ পাই নাই; "হরিজন" পত্রিকার মাধ্যমে তাহা দেখিলাম। এই কার্য্যের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ সংগঠক নিযুক্ত হইয়াছেন যেমন নিযুক্ত হইয়াছেন সর্ব্বভারতের জন্য শ্রীগজানন্দ নায়েক।

একটি হিসাবে দেখিয়াছি যে ভারতরাষ্ট্রে প্রায় ৫ কোটি তাল গাছ আছে; পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১ কোটি গাছ। স্বচ্ছন্দ বনজাত এই দুইটি গাছ হইতে যে গুড়-চিনির উৎপাদন হইবে, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের মিষ্টদ্রব্যের অভাব মিটাইবার জন্য উত্তর-প্রদেশ ও বিহারের চিনির কলের ও খান্দিশরী গুড়ের নিকট হাত পাতিতে হয় না, বিরাট দুইটি পল্লীশিল্পও গড়িয়া উঠে; লক্ষ লক্ষ লোকের বেকার সমস্যার সমাধান হয়। ১ কোটি মণ গুড় প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এতদিন তালগুড় শিল্প মাত্র তিনটি জেলায় চালু ছিল। শিউলী—তালগাছ ও খেজুর গাছ হইতে যারা রস বাহির করে—বৎসরে ২।৩ মাস এই শিল্পের সেবায় আত্মনিয়োগ করিত।

তালগুড়ের মরসুম আরম্ভ হয় মাঘ মাসে, আর শেষ হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে। একজন ভাল কারিগর ১৫টি গাছের রস প্রত্যহ সংগ্রহ করিতে পারে। এই রসে এক মরসুমে ২২ মণ গুড় হয়। ইহাতে তার ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত নিট আয় হইতে পারে। তালরসে শতকরা ১৪ হইতে ১৬ ভাগ গুড় হয়।

খেজুর গুড়ের মরসুম সাধারণতঃ আশ্বিন মাসে সুরু হইয়া মাঘ মাসে শেষ হয়। দক্ষ একজন কারিগর ৬০টি খেজুর গাছে রস বাঁধিতে পারে। উহাতে মরসুমে ২০ মণ গুড় হয়। খরচ বাদে ইহাতে নিট আয় ২৫০৲ টাকা হইতে পারে। খেজুররস হইতে শতকরা ১০% হইতে ১২% ভাগ গুড় হয়।

সরকারের চেষ্টা সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহা তালগুড়, খেজুরগুড়, নারিকেলগুড়, এই তিন প্রকার গুড় শিল্পের উন্নয়ন ও তালমিশ্রি প্রস্তুত প্রণালীর উন্নততর বিধানের জন্য গবেষণা—চারিটি বিভাগে গঠিত। ১৯৪৮-৪৯ সালে এই শিক্ষাদান ১২টি কেন্দ্রে আরম্ভ হইয়াছিল।

১২০-জন শিক্ষার্থী লইয়া এই ১২টি তালগুড় শিল্প শিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হইয়াছিল। শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু মাসিক ৪০৲ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। এই ১২০ জন গ্রামবাসীকে

তালগাছ হইতে রস নিষ্কাশন ও গুড় প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেওয়া ছাড়া তারকেশ্বর মহকুমায় ১৫০ জন পুরাতন তালগুড় শিল্পীকে উন্নত প্রণালীতে গুড় প্রভৃতির কৌশল দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ১২টি শিক্ষাকেন্দ্রে মোট ১২০টি তালগাছ শিক্ষাকার্যের জন্য লওয়া হইয়াছিল। শিক্ষোত্তীর্ণদের মধ্যে জনকয়েক একক এবং জনকয়েক সমবায় পদ্ধতিতে গুড় প্রস্তুত করিয়া পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এই বৎসরে (১৯৪৯-৫০) পুনরায় ১২০ জন শিক্ষার্থী লইয়া ১২টি শিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। শিক্ষার্থী বৃত্তি এবার মাসিক ৩০৲ টাকা; তাহা ছাড়া প্রত্যেকে যে গুড় তৈয়ারি করিবে তাহার শতকরা ৪৫ ভাগ সে নিজে পাইবে।

খেজুরগুড় তৈয়ারি শিক্ষণ কেন্দ্র ৬টি খোলা হইবে। প্রত্যেকটিতে ১০ জন শিক্ষার্থী লওয়া হইবে।

হস্তচালিত সেনট্রিফিউগ্যাল যন্ত্র সাহায্যে তালরসের 'রাব' (ঝোলা গুড়) হইতে তালচিনি ও তালমিছরি করিবার পদ্ধতি দুই জন অভিজ্ঞ শিক্ষক কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঘুরিয়া পল্লীবাসীদের শিক্ষা দিতেছেন। রস হইতে সরাসরি চিনি তৈয়ারীর পদ্ধতিও শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে।

মাদ্রাজ প্রদেশে মুদবিদ্রিতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় তালগুড় শিক্ষণ স্কুল (সেনট্রাল পামগুড় ট্রেনিং স্কুল)-এ ১০ জন শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য পাঠান হইয়াছে। শিক্ষান্তে উঁহাদিগকে বিভাগীয় কাজে নিয়োগ করা যাইবে, আশা করা যায়।

এই বিবরণীতে এই ২১৩টি পল্লী শিল্পের প্রসারের পথে কোন বাধা আছে কিনা এবং তাহা কি, তৎসম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত দেখিলাম না। একটির প্রতি আমরা মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। তালের ও খেজুরের রস জ্বাল দিবার জ্বালানী কাঠের অভাব সর্ব্বপ্রধান বলিয়া অনেকের মুখে শুনিয়াছি। বন-বাদাড় যেরূপ ভাবে উজাড় হইয়াছে তাহার ফলে ইহার অভাব পল্লী-অঞ্চলের গার্হস্থ্য-জীবন বিপন্ন করিয়াছে। রান্না করিবার জন্য পল্লীর গৃহলক্ষ্মীদের কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়, গাছের শুকনা পাতা, ধানের তুষ, গোবর পুড়াইয়া স্বামী-পুত্র-শ্বশুর-শাশুড়ীর সামনে আহার্য্য দ্রব্য ধরিতে পারেন, তাহার লাঞ্ছনা অভিজ্ঞ লোকে জানে। শহর-অঞ্চলে কয়লা আসিয়া এই যন্ত্রণার কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে; কিন্তু পল্লীগ্রামের এই নিদারুণ অভাবের কথা কেহ [illegible] কিনা, তাহার কোন পরিচয় পাই নাই। স্বাস্থ্য, শিল্প, অর্থোপার্জ্জনের কোন ব্যবস্থাই পল্লী-অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দিয়া করা হইতেছে না। অথচ গান্ধীজী গ্রাম-কেন্দ্রিক সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। আর, আমরা সকলেই তাঁহার আদর্শের উপাসক।

শাসনকার্য্যে ব্যয়বাহুল্য

শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী যখন ভারতরাষ্ট্রের গবর্ণর-জেনারেল ছিলেন, তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা একটি কমিটি নিয়োগ করেন রাষ্ট্রের শাসনকার্য্যে যে ব্যয়বাহুল্য দেখা দিয়াছে, তাহা কাটিয়া-ছাঁটিয়া নূতন ব্যবস্থা করিবার জন্য। এই কমিটির অনুসন্ধানের ফলে তাঁহাদের রিপোর্টে আমরা অনেক নূতন কথা শুনিতে পাই। গত ২৯শে অগ্রহায়ণ তাহা চুম্বকরূপে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দের মাহিনা বিদঘুটেরূপে (fantastic) বাড়িয়াছে। এই অভিযোগ প্রমাণ করিবার জন্য কমিটি বলিয়াছেন—খাদ্য-মন্ত্রীর নিজস্ব মুন্সী (private secretary) একজন রাজনৈতিক কর্ম্মী ছিলেন; ৮০০৲ টাকা বেতনে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়; ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহাকে আঞ্চলিক খাদ্য কমিশনাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়; বেতন তাঁহার ১,৮০০৲ টাকা। পশুবিদ্যার একজন অধ্যাপক ২৮০৲ টাকা বেতনে প্রথম নিযুক্ত হন; তাঁহার পরের পদলাভ হয়, ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে ৬০০৲ টাকা বেতনে; পদের উপাধি পশু-শক্তির সদ্ব্যবহার বিষয়ে সহকারী পরামর্শদাতা (Assistant Cattle Utilization Adviser); ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঐ বিভাগেই ডেপুটি পরামর্শদাতারূপে তাঁহার বেতন দেখা যায়—১,১৫০৲ টাকা। এর উপর মাগ্‌গী ভাতা, ভ্রমণের ব্যয়, বিশেষ ভাতা প্রভৃতি নানা ভাতা আছে। সেইজন্যই দেখিতে পাই পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীবৃন্দেরও বেতনের পরিমাণ ৬ কোটি ৭৯ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকার কিঞ্চিদধিক; নানাবিধ ভাতার পরিমাণ ৩ কোটি ৯৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার কিঞ্চিদধিক। এইরূপ না হইলে নাকি পদমর্য্যাদা রক্ষা পায় না। অথ ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা।

বাঁকুড়ায় পল্লীসংগঠন

এই জেলার কাপিষ্টা গ্রামে একটি পল্লীসংগঠনের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ঐ গ্রামেরই কর্ম্মী শ্রীঅনাদিনাথ গোস্বামী এই কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে গঠনকর্ম্মের পরিচয়লাভ করিয়া তিনি এই কর্ম্মে হাত দিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাই। এই কার্য্যে সাফল্য অর্জ্জন করিতে হইলে সাধকোচিত মনোভাবের প্রয়োজন। ভারতের ৬ লক্ষ গ্রামের বুকে যে তামসিকতার পাষাণ প্রায় অনড় হইয়া বসিয়া আছে, তাহা সরাইতে হইবে। তাহাই হইবে সর্ব্ব-প্রথম কার্য্য।

[illegible] আরম্ভ করিয়াছেন একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া। বর্ত্তমানে শতাধিক ছাত্রী হইয়াছে। মনে হয় কষ্টেসৃষ্টে চলিতেছে; গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা

করিয়া এখনও সাড়া পাওয়া যায় নাই। তাহার পর ম্যালেরিয়া নিবারণের প্রশ্ন। "সারথি" পত্রিকার ২৪শে পৌষ সংখ্যায় এই বিষয়ে অনাদিনাথের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে অবস্থার গুরুত্ব বুঝা যাইবে :

"আমাদের গ্রামে প্রায় ২।৩ হাজারের (বরং বেশী) লোকের মধ্যে কেহই এ বৎসর ম্যালেরিয়ার কবল হইতে রক্ষা পায় নাই, সকলেই ২।৪ বার করিয়া জ্বর ভোগ করিতেছে। গ্রামে মাত্র একটি ডাক্তার, তাঁহাকেই প্রায় ৩০।৩৫খানি গ্রামের চিকিৎসা করিতে হয়। এই গ্রামেই প্রায় সব সময়ে পনর-ষোল শত রোগী বর্ত্তমান। সামান্য কুইনাইন, প্যালোড্রিন ইত্যাদি পাওয়া বিশেষ শক্ত যাকে বলে সুদুর্লভ, তার উপর পথ্যাপথ্য। দেশবাসী যেন ডাক্তার দেখাইতে দেখাইতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে চলিয়াছে। আমি দুই বার জ্বর ভোগ করার পর আবার এই সাত-আট দিন জ্বর ভোগ করিতেছি।"

ভারতে ইংরেজ বণিক

ভারতবর্ষে বিদেশী মূলধন কি পরিমাণে ও কি সর্ত্তে খাটাইতে দেওয়া যায় তাহা লইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ বিতর্ক চলিতেছে। বিদেশী মূলধনের বিরুদ্ধেই দেশের লোক অভিমত প্রকাশ করিয়াছে এবং ইহা লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বহু তিক্ত আলোচনাও হইয়াছে। জনমত এ বিষয়ে এত তীব্র হইয়া উঠিতেছিল যে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে বিলাতী কোম্পানীগুলির অধিকার সংরক্ষণের জন্য দশটি ধারা সংযোজিত হয় এবং উহা লইয়াও কেন্দ্রীয় পরিষদে তুমুল বিতর্ক হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথমটা বিদেশী মূলধনের বিরুদ্ধেই জনমত তীব্র হয়, ভারত-সরকারের কর্ণধারেরাও ঐরূপ কথাবার্ত্তা বলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের কমনওয়েলথ-প্রবেশের পর অকস্মাৎ এ বিষয়ে মোড় ফিরিয়াছে এবং বিলাতী মূলধন আমদানীতে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে বিলাতী ও দেশী কোম্পানীতে কোন প্রভেদ করা হইবে না এবং বিলাতী কোম্পানীগুলি তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতেছে।

দেশী ও বিলাতী কোম্পানীতে একটা খুব বড় পার্থক্য আছে। শুধু ডিভিডেণ্ট দেখিলেই চলিবে না, এখানে উচ্চপদে কর্ম্মচারী নিয়োগ, কণ্ট্রাক্ট, ডিবেঞ্চার প্রভৃতির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। বিলাতী কোম্পানীতে এই তিন দিক দিয়া ইংলণ্ডে টাকা পাঠাইবার খুব ভাল ব্যবস্থা করা হয়। বিলাতী এবং ম্যানেজিং এজেন্সি পরিচালিত ব্যবসার মূলসূত্র এই যে কোম্পানীর খরচ উহাদের লাভ; ডিভিডেণ্ডের উপর উহাদের দৃষ্টি থাকে না। উহাদের প্রধান লক্ষ্য স্বজন কর্ম্মচারীদের বেতন, কণ্ট্রাক্ট, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং পণ্য বিক্রয়ের [illegible] ডিবেঞ্চারের সুদ ইত্যাদি। এগুলির সবই দেখান হয় কোম্পানীর খরচ। তার উপরও লাভ থাকিলে ডিভিডেণ্ডের ভাগ আসে, না আসিলে ক্ষতি নাই। এই ব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ম্যানেজিং এজেন্সির প্রতি ভারত-সরকার দৃষ্টি দিয়াছেন কিন্তু বিলাতী কোম্পানীর খরচের দিকটায় তাঁহারা এখনও দৃষ্টি দেন নাই। গত এক বৎসরে ভারতের বিলাতী কোম্পানীগুলিতে কতগুলি করিয়া নূতন ইংরেজ কর্ম্মচারী আসিয়াছে তার হিসাব লইলেই অনেক ব্যাপার প্রকাশ পাইবে। এবিষয়ে সম্প্রতি 'যুগবাণী' পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে উহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল :

"ভারত রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা দিবসকে ঠাট্টা করিয়া বিলাতী কার্টুনিষ্ট লো সাহেব চার্চ্চিলপন্থীদের সংবাদপত্র 'ইভ্‌নিং ষ্টাণ্ডার্ডে' কার্টুন দিয়াছেন যে কমনওয়েল্‌থের অন্তর্ভুক্ত ভারত রিপাবলিকে ইংরেজ ও ভারতবাসী বাহুতে বাহু বাঁধিয়া নূতন ভাবে যাত্রা সুরু করিয়াছে, কয়েক মাস আগে ভিন্‌সেন্ট সী'ন আমেরিকার 'হলিডে' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ কমনওয়েল্‌থে প্রবেশের পর বোম্বাই এবং কলিকাতার ইংরেজদের দিন ফিরিয়া গিয়াছে, তাদের অবস্থা এখন আগের চেয়েও অনেক ভাল। সংসারে দায়িত্ব নাই ক্ষমতা আছে, পয়সার বেলায় নিজে, দুর্ভোগের বেলায় অন্যে, এটা অতি লোভনীয় জিনিস। ভারতে ইংরেজ আগমনের আরম্ভে কোম্পানীর আমলে এই অবস্থাই ছিল, আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের অতিরিক্ত ভদ্রতার দরুন আবার সেই অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে।

"সাহেবদের কপাল কিভাবে ফিরিয়া গিয়াছে, চট, কয়লা, চা, ইঞ্জিনিয়ারিং, বহির্ব্বাণিজ্য প্রভৃতিতে তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। আপাততঃ কেবল চটকল হইতে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল। স্বাধীনতার পর সাহেবরা রীতিমত চমকাইয়া গিয়াছিল, অনেকে অতীত দুষ্কার্য্যের শাস্তির ভয়ে পলাইয়াছিল এবং যাহারা এখানে রহিয়া গিয়াছিল তাহারাও ভয়ে ভয়ে ভারতীয়দের খাতির যত্ন আরম্ভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ কমনওয়েলথে প্রবেশের পর আবার ইহারা পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধরিয়াছে এবং ভারতীয়দের মুখের উপর দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাড়িয়া মেজাজ দেখানো সুরু করিয়াছে।

"বাংলাদেশের চার পাঁচটি চটকল ছাড়া সমস্তগুলি ইংরেজ ম্যানেজিং এজেন্টদের অধীন। এই সমস্ত মিলের ম্যানেজার এবং এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার সকলেই ইংরেজ। যুদ্ধের সময় ইহাদের অনেকে কমিশনে চলিয়া যাওয়ায় কতকগুলি মিলের এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার পদে ভারতীয় নিয়োগ করা হয়। যুদ্ধের সময় যখন কাজের চাপ অত্যধিক এবং দায়িত্ব ও অসুবিধা সবচেয়ে বেশী তখন ইঁহারা সম্পূর্ণ দক্ষতার সহিত কাজ করিয়াছেন। স্বাধীনতার পর ইঁহাদিগকে পাকা করি-

যার কথা চলিতেছে এমন সময় ভারতবর্ষ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হইল এবং ইঁহাদের কপাল পুড়িল। আট বৎসর যাঁহারা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করিয়াছেন নির্বিকার চিত্তে ইংরেজ ম্যানেজিং এজেণ্টরা তাঁহাদিগকে 'ইনএফিসিয়েণ্ট' আখ্যা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়ার সাহস পাইল।

"এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারদের বেতন আরম্ভ হয় ১০৫০ টাকা হইতে; বৎসরে ৫০ টাকা বাড়ে এবং ঊর্দ্ধ সীমা নামে ১২৫০ টাকার মত হইলেও কার্য্যতঃ উহা বাড়িয়াই চলে। ইহার উপর আছে ২০০ টাকা ডি-এ, প্রোডাকসন বোনাস, বিনা-ভাড়ায় আসবাবপত্রসজ্জিত চমৎকার বাড়ী, কোম্পানীর খরচে ৬৪ টাকা বেতনের একজন বেয়ারা ইত্যাদি। সন্ধ্যাবেলা আলো জ্বালিবার সময় ফ্যাক্টরীতে থাকিলেই এক গিনি ওভার-টাইম। মাসে প্রায় হাজার দুই আড়াই টাকা প্রথম হইতেই ইহাদের প্রত্যেকের পিছনে কোম্পানীর খরচ হয়। বিনা পয়সায় চিকিৎসাও ইহাদের প্রাপ্তি তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ডাক্তার সুপারিশ করিলেই হিল ষ্টেশনে গিয়া কোম্পানীর খরচায় ইহারা স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারে, যাতায়াতের সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়া এবং হোটেলে থাকার জন্য দৈনিক দশ টাকা পায়। পুরা বেতন তো আছেই। ভারতে আসিয়া হিন্দী শিখিবার জন্য সপ্তাহে এক শত টাকা করিয়া মাষ্টারের খরচ পায়। ছুটিও ভালই মিলে। বছরে একমাস ছুটি তো আছেই, তদুপরি তিন বছরে একবার পুরা বেতনে দেশে যাওয়ার জন্য ছয় মাস ছুটি এবং সপরিবারে যাতায়াতের ভাড়া পায়। গ্রাচুইটি, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতিরও ভাল ব্যবস্থা আছে।

"এদের জন্য খুব ভাল ক্লাব আছে। সেখানে এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারদের প্রবেশ নিষেধ। ভারতীয় এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারদের যে অল্প কয়েকজন যুদ্ধের পর অবশিষ্ট আছেন তাঁদের কোয়ার্টার্স দেওয়া হয় না, সাহেবদের বাড়ী খালি থাকিলে তালাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তবু ইঁহারা পান না। এঁরা বেতন পান সর্ব্বপ্রকার ভাতা সমেত সাড়ে তিন শত বা চার শত টাকা, ডি-এ বেতনের শতকরা দশ টাকা। ব্যস এই পর্য্যন্ত ভারতীয় এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারদের প্রাপ্তি। মেডিকেল সার্টিফিকেট ছাড়া ছুটি নাই। বালী মিলে সাহেবদের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুইমিং পুল তৈরি হইতেছে।

"এই গেল ছোট সাহেবদের ব্যাপার। বড় সাহেবদের বন্দোবস্ত আরও অনেক দরাজ। লর্ড হেওয়ারসনের বালী মিলের বড়সাহেব স্কট-কার দেশে গিয়াছেন, তিনি যাওয়ার সময় বেতন ছিল পাঁচ হাজার, কমিশন পৌনে দুই লাখ, বিরাট কোয়ার্টার্স, তাঁর ১৮টি দারোয়ান, ২৪টি মালী। ২২টি ভৃত্য তাঁর ফরমাস খাটিত। কলিকাতা হইতে লরী করিয়া তাঁর জন্য পরিষ্কার জল যাইত।

"এই মারাত্মক বিন্যাসের খরচ দেয় কে? সমস্ত খরচ কোম্পানী দেয়, অর্থাৎ অংশীদার, ক্রেতা এবং গবর্ণমেণ্ট তিন পক্ষের ঘাড় ভাঙিয়া টাকাটা আসে। খরচটা উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে ঢোকে, উৎপাদন ব্যয় বাড়িলে দাম বেশী পড়ে, ক্রেতার ক্ষতি হয়; পড়তা বেশী পড়িলে লাভ রাখা কঠিন হয়; ইহাতে অংশীদারেরা লভ্যাংশে এবং গবর্ণমেণ্ট ট্যাক্সে বঞ্চিত হয়। এই দুইয়ের প্রতি ম্যানেজিং এজেণ্টদের কোন দরদ নাই, কারণ খরচের খাতায় মোটা মোটা টাকা লিখিয়াই ইহারা অজস্র টাকা বাহির করিয়া লইয়া যাইতেছে। অনাবশ্যক ভাবে বহু সংখ্যক সাহেব নিয়োগ করিয়া এক দিকে টাকা বাহির হইতেছে, অপর দিকে বাহির হইতেছে মিলের সমস্ত মাল বিলাতী কোম্পানী হইতে কেনায়। ইহাদের Appointment এবং Store purchase policy উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ। এই দুইটিতেই ইহাদের সবচেয়ে বড় লাভ। ব্যালান্স শীটে কোম্পানীর লোকসান দাঁড়াইলে ইহাদের কিছু মাত্র যায় আসে না, কারণ ব্যালান্স শীট তৈরির আগেই লাভ-লোকসানের খতিয়ানে খরচের খাতে যা কিছু আদায়ের দরকার তাহার ব্যবস্থা হইয়া যায়।

"আড়াই হাজার টাকার সাহেব এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার এবং চারশত টাকার দেশী এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার যদি একই দক্ষতার সহিত কাজ করে তবে ঐ সকল পদে ভারতীয় নিয়োগ করিলে একটা বিরাট খরচ বাঁচিয়া যায়। যে সব সাহেব এ দেশে আসে তাহাদিগকে টেকনিশিয়ান বলিয়া আনা হয় কিন্তু বস্তুতঃ ইহারা টেকনিকের ট-ও জানে না। কারখানায় দেশীয় মিস্ত্রীদের নিকট হইতে যেটুকু পারে শিখে। যে কাজ ইহাদের করিতে হয় তাহাতে টেকনিশিয়ানের কোন দরকারও নাই। অনেক টাকা ইহাদের মারফত বিলাতে পার করিতে হইবে বলিয়া ইহাদিগকে গাল ভরা মস্ত মস্ত 'ডেজিগ্নেশন' দেওয়া হয়। আসলে ইহারা সতেরো আঠারো বা বিশ বছরের বালক ভিন্ন আর কিছু নয়। প্রত্যেক মিলে এরূপ ১০।১৫টি করিয়া আমদানী হইতেছে এবং প্রায় শতখানেক মিল আছে।

"এই সমস্ত শ্বেত হস্তী পুষিতে এই ভাবে দুই দিক দিয়া ভারতবর্ষের লোকসান হয়। সম্প্রতি এই অপচয় খুব বেশী বাড়িয়াছে। আগে খুব বড় ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসেও এক যোগে দশ-বারো জনের বেশী ইংরেজ অফিসার থাকিত না এখন সেখানে শতাবধি আসিয়াছেন। মর্টন জোন্স, উইল, ফিনি প্রভৃতি সুপরিচিত পুলিস অফিসারেরা সাড়ে তিন হাজার চার হাজার টাকা বেতন এবং নানারূপ অতিরিক্ত প্রাপ্তি ও সুবিধা পাইয়া ইংরেজ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসগুলিতে চাকুরিতে আসিয়াছেন। এই বিরাট টাকা ভারতবর্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষ যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

অধীনে ছিল তখন এই ভাবে টাকা যাইত, এখনও ঠিক সেই ভাবেই অদৃশ্য শোষণ সুরু হইলে তাহা যে শুধু অন্যায় কথা হইবে তাহা নহে, ভয়ের কথাও বটে।"

কাশ্মীর ও পণ্ডিত নেহরু

নয়া দিল্লীতে গত সাংবাদিক বৈঠকে পণ্ডিত নেহরু কাশ্মীর সম্বন্ধে দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন ইহা খুব সময়োপযোগী হইয়াছে। কাশ্মীর সম্বন্ধে পাকিস্থানে গত দুই বৎসর যাবৎ প্রবল প্রচারকার্য্য চলিতেছে এবং কাশ্মীর পাকিস্থানের প্রাপ্য এই কথা সমানে বলা হইতেছে। পাকিস্থানের অন্যায় দাবি এক শ্রেণীর ইংরেজ ও আমেরিকান পত্রিকা প্রথম হইতে সমর্থন করিয়া আসিতেছে। সাংবাদিক বৈঠকে পণ্ডিত নেহরু সে বিষয়েও তীব্র মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনের জবাবে ঢাকার 'আজাদ' পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য (২৫শে মাঘ) বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া উহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"ভারত-সরকার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কাশ্মীর, হায়দরাবাদ ও জুনাগড়ের ব্যাপার আর ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের প্রচার বিভাগ যথেষ্ট শক্তিশালী বলিয়া প্রথমে তাঁহারা এরূপ আশা করিয়াছিলেন যে, উপরোক্ত দেশগুলি সম্বন্ধে ইউরোপ-আমেরিকার শক্তিগুলিকে চিরদিনই অন্ধকারে রাখা যাইবে। চেষ্টার ত্রুটি অবশ্য তাঁহাদের দিক হইতে হয় নাই ; কিন্তু ছাই চাপা দিয়া যেমন হীরক ঢাকিয়া রাখা যায় না, সত্যও তেমনি মিথ্যা প্রচারের ধূম্রজাল তুলিয়া চিরকাল ঢাকিয়া রাখা চলে না। সম্প্রতি উপরোক্ত দেশগুলি সম্বন্ধে যাহা খাঁটি সত্য তাহা ইউরোপ-আমেরিকার জনসাধারণের গোচরীভূত হইয়াছে। কাজেই বিলাতের "ইকনমিষ্ট", "টাইমস" ও "স্পেক্টেটার" এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "নিউইয়র্ক টাইমসে"র মত শক্তিশালী সংবাদপত্রগুলিও কাশ্মীর ও হায়দরাবাদে ভারতের আচরণ সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিলাতী পত্রিকাগুলি যে সব মতামত ব্যক্ত করিয়াছে তাহা মোটেই ভারতের মনঃপূত হয় নাই। "নিউ ইয়র্ক টাইমস" পত্রিকা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতকে দোষী করিয়াছে। পত্রিকাটি বলিয়াছেন : "ভারতই সালিশীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেছে। কারণ ভারতের উজিরে আজম বলিয়াছেন, 'এরূপ ব্যাপারে সালিশী চলিতে পারে না।' কাজেই বাহিরের লোকেরা যদি মনে করে যে, ভারতের দাবি এ ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়াই সে সালিশীর প্রস্তাব মানিয়া লইতেছে না, তবে ভারত তাহাদিগকে দোষ দিতে পারে না।

"অতঃপর কাশ্মীরের ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া পত্রিকাটি বলিয়াছেন যে, ভারত হায়দরাবাদ দখল করে এই যুক্তিতে যে, সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক হিন্দু। আবার কাশ্মীর কুক্ষিগত করিতে চাহিতেছে এই যুক্তিতে যে, সেখানকার শাসক হিন্দু। ইহা হইতে মনে হয়, ভারত সব দিক হইতেই সমান সুবিধা ভোগ করিতে চাহিতেছে।

"পত্রিকাটির এই আলোচনা দৃষ্টে মনে হয়, ভারতের উজিরে আজম খুব জাঁকজমকের সহিত আমেরিকা ভ্রমণ করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাঁর বোধ হয় ধারণা ছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে লম্বাচওড়া গোয়েবলসী ধরণের বক্তৃতা দ্বারা আরও কিছুকাল বিভ্রান্ত রাখা চলিবে। তাঁহার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্যও সম্ভবতঃ ছিল তাহাই, কিন্তু তা সম্ভব হয় নাই দেখিয়া নেহরুজী ভয়ানক চটিয়া গিয়াছেন। দিল্লীর এক সাম্প্রতিক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি চড়া কণ্ঠে বলেন যে, নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের প্রাক্কালে কাশ্মীর সম্বন্ধে বৈদেশিক সংবাদপত্রগুলি যে 'প্রচার' আরম্ভ করিয়াছে, তাহা নিতান্তই ভারতকে চাপ দিবার জন্য। অতঃপর তিনি বলেন যে, কাশ্মীর সম্বন্ধে গত দুই বৎসর ধরিয়া তিনি যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহা তাঁর মতে সম্পূর্ণ নির্ভুল। কাজেই তিনি ঘোষণা করেন যে, যাহা কিছুই আসুক না কেন, জম্মু ও কাশ্মীর সম্বন্ধে তাঁর অনুসৃত নীতি তিনি এতটুকুও পরিবর্ত্তন করিবেন না, এজন্য তিনি তাঁর সমস্ত সুনাম পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে রাজী আছেন।

"কলিকাতার 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা পণ্ডিত নেহরুকে একবার 'impetuous pundit' অর্থাৎ 'অস্থিরমতি পণ্ডিত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। উপরোক্ত সাংবাদিক বৈঠকে তিনি যে সব মন্তব্য করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে মনে হইল 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার নামকরণ সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার অস্থির মস্তিষ্কের দরুণ আমাদের অবশ্য সুবিধাই হইয়াছে, কিছুই রাখিয়া ঢাকিয়া বলিবার আর্ট পণ্ডিতজী জানেন না বলিয়া উত্তেজনার মুখে তাঁহার বক্তব্যের ঝুলি হইতে বিড়াল ছানা সহজেই বাহির হইয়া যায়। এবারও হইয়াছে তাহাই। উত্তেজনার মুহূর্ত্তে তিনি দুনিয়ার লোককে জানাইয়া দিয়াছেন যে, কাশ্মীরে তিনি বিগত দুই বৎসর ধরিয়া যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন দুনিয়া এক দিক হইলেও তার এক চুলও পরিবর্ত্তন হইবে না। এ ব্যাপারে তিনি নির্ভুল। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই ঘোষণার পর নিরাপত্তা পরিষদে বা দুনিয়ার অপর কোন রাষ্ট্রের এ ব্যাপারে কোন কিছু করার থাকে না ; কারণ নিজের অনুসৃত নীতি যিনি কোনক্রমেই পরিবর্ত্তন করিবেন না, মধ্যস্থতা, সালিশী প্রভৃতির প্রস্তাব করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কোন সুফল লাভের আশা নাই।"

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী রাওলপিণ্ডিতে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ ... 'ভারত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত

হইতেছে। ভারতের অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের বিরাট বিরাট কারখানাগুলিতে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে পুরাদমে লোক ভর্ত্তি চলিতেছে। কিন্তু যত বড় ত্যাগ স্বীকারই করিতে হউক না কেন আমরা কোনমতে ভারতকে অস্ত্র বলে কাশ্মীর দখল করিতে দিব না।" ইহার দুই এক দিন আগে পশ্চিম পঞ্জাবের গবর্ণর সর্দার আবদুর রব নিস্তার বলিয়াছেন, "কাশ্মীর সম্পর্কে জনমত পাকিস্থান সরকারের সম্পূর্ণ বিদিত। কাশ্মীর পাকিস্থানের এবং এ বিষয়ে ভারতের সহিত কোনরূপ আপোষ করা হইবে না।" অথচ এ দিকে ভারতের প্রেসিডেণ্ট তাঁহার প্রথম বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষ যুদ্ধ চায় না এবং সত্যই যে চায় না তার প্রথম প্রমাণ স্বরূপ এ বৎসরেই ভারতের সামরিক বরাদ্দ কমাইয়া দেওয়া হইবে। পাকিস্থানী নেতাদের এই শ্রেণীর প্রচার কার্য্যে পাকিস্থানে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে ভারত পাকিস্থানের শত্রু এবং ইহারই ফল হইতেছে হিন্দুদের উপর আক্রমণ। মুদ্রামূল্য হ্রাসের ব্যাপার এই তিক্ততাকে তিক্ত-তর করিয়াছে এবং যে সমস্যা কাশ্মীর লইয়া জটিল হইয়া উঠিয়াছে তাহা জটিলতর হইয়াছে। পাকিস্থানের সঙ্গে কোন মীমাংসার কার্য্যই সম্ভব হইতে পারে না যতক্ষণ না পাকিস্থান অন্যায় ও অসঙ্গত দাবি ছাড়িয়া ন্যায় ও যুক্তির পথ ধরে। তাহা না করিয়া কেবলই বল প্রয়োগের আস্ফালন করিতে থাকিলে বল প্রয়োগই তাহার একমাত্র প্রত্যুত্তর হইতে বাধ্য।

শ্রীঅরবিন্দ-জীবনের এক অধ্যায়

কলিকাতা নগরীতে তাঁহার জন্মোৎসবের উদ্যোগী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা শ্রীঅরবিন্দের বহুমুখী বিপ্লবী জীবনের সম্যক্ পরিচয় দিতে চান নাই বা পারেন নাই। এই উৎসবের উদ্যোগ-আয়োজন দেখিয়া মনে হয় যে, রাজনৈতিক চিন্তানায়ক ও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের প্রবর্ত্তক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের কর্ম্মস্মৃতি দেশবাসীর মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টাই তাঁহারা করিতেছেন। এই চেষ্টার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা কি তাহা আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই। উৎসব উপলক্ষে যে বক্তৃতাদি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের প্রাক্-পণ্ডিচেরী জীবনের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ দু'একটা তথ্যের উল্লেখ করিতে চাই। দৈনিক সংবাদপত্রে এই উৎসব উপলক্ষে যে সব প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কল্যাণে একটা ধারণার সৃষ্টি করা হইয়াছে যে অরবিন্দ ১৮৯৭-৯৮ সালের পূর্ব্বে বাংলা ভাষা জানিতেন না; দীনেন্দ্র রায় মহাশয়ই তাঁহাকে তাঁহার মাতৃভাষা শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু এই কথা অতি অল্পসংখ্যক বাঙালী জানেন যে ১৮৯৪ সালের ১৬ই জুলাই তারিখ হইতে বোম্বাই নগরীর "ইন্দুপ্রকাশ" নামক পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; শেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ২৭শে আগষ্ট তারিখে।

এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে ইহা প্রমাণিত হয় যে, অরবিন্দ বঙ্কিমযুগ, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী যুগের সকল বাঙালী সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কের চিন্তাধারার সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন। অনুবাদের মাধ্যমে সে জ্ঞান অর্জ্জিত হয় নাই; এই সব সাহিত্যিকের পুস্তকাবলী সেই সময় এবং এখনও অতি অল্পসংখ্যকই অন্য ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে। প্রায় সেই সময়েই ঐ পত্রিকা-স্তম্ভে কংগ্রেসের তদানীন্তন নীতি ও উপায় সম্বন্ধে অরবিন্দের কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধাবলীতে কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করা হয়।

এই প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত করিলে অরবিন্দ-জীবনের প্রায় এক অজ্ঞাত অধ্যায় দেশবাসী জানিতে পারিত; তাঁহার জীবনের গতি কোন্ পথে চালিত হইতেছে, কোন্ পরিণতি লাভ করিয়া তাহা সার্থক হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতাম। কেন যে উৎসব-সমিতি এই চেষ্টা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিলেন না, তাহা অবোধ্য রহিয়া গেল। মানবের জীবন খণ্ডিত করিয়া দেখিলে তাহার প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝা যায় না। অতীত বর্ত্তমান এক সূত্রে বাঁধা। এই কথা মনে থাকিলে শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও অরবিন্দ ঘোষের জীবন পৃথক করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইত না; অরবিন্দ ঘোষের জীবনকে বিস্মৃতির কোটরে ঠেলিয়া দিয়া, শ্রীঅরবিন্দের জীবন লইয়া এরূপ ভাবে মাতামাতি করিবার চেষ্টা হইত না।

এশিয়া সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিকগণ ও সাংবাদিকগণের বক্তৃতা ও লেখা পড়িয়া আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, তাঁহারা জানেন না কি করিয়া তাঁহাদের শত্রু কম্যুনিজমের বা একনায়কত্বের (totalitarianism) আক্রমণ প্রতিরোধ করিবেন। চীনদেশে কয়েক শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া, চীনের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিয়া তাঁহারা দেখিয়াছেন সবই ব্যর্থ হইয়াছে। প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিব ডীন একিসন একখানি ১,০০০ পৃষ্ঠার বই রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের নিকট দাখিল করেন। তাঁহার দেশের সমরনায়কগণ ও কূটরাজনীতিকগণ এই ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে কি মতামত পোষণ করেন, তাহা এই বিরাট পুস্তকে সংগ্রহ করা হয়। এই পুস্তকের এই সব মতামত বিচার করিয়া ডীন একিসন তাঁহার নিজের সিদ্ধান্ত ট্রুম্যানকে জানাইয়া দেন। সেই উপলক্ষে তিনি বলেন, চীনের গণ-মন যে এমন করিয়া কম্যুনিজমের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই-শেকের অধীনে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা চলিতেছিল তাহার চূড়ান্ত ব্যর্থতা; নতুবা এমন করিয়া তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য-সামন্ত যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্র মাও-সে-তুং-এর সৈন্যবাহিনীর হাতে

সমর্পণ করিত না। এই ব্যবস্থার ভুল বলিয়াছিল-বলিয়াই তাহা এমন করিয়া ভাঙিয়া পড়িল।

[illegible]গণের এই মতের সঙ্গে সাংবাদিকগণের মতের মিল আছে বলিয়া মনে হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার বিভাগের সৌজন্যে আমরা যে সব তথ্যাদি প্রাপ্ত হই তাহার মধ্যে প্রথমোক্তদের বক্তৃতা ও শেষোক্তদের প্রবন্ধাদি প্রধান। ডীন একিসনের একটি বক্তৃতার উপর মন্তব্য করিতে গিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৈনিক "নিউইয়র্ক টাইমস" বলিয়াছেন :

"চীনের ব্যাপারে দেখা যায় যে, সেখানকার সমস্যা কেবল একটা সামাজিক বিপ্লব বা সাধারণ গৃহযুদ্ধ নয়, আসলে সেখানে যাহা অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা দুরভিসন্ধিমূলক বিরাটাকারের বহিরাক্রমণ ছাড়া আর কিছু নয়।"

ডীন একিসনের বিভাগের সহকারী সচিব জর্জ ম্যাকৃঘী যাহা বলিয়াছিলেন, ইহার প্রায় এক মাস পূর্ব্বে তাহা "নিউ-ইয়র্ক টাইমসে"র ব্যাখ্যা সমর্থন করে বলিয়া মনে হয় না। কেবল যুদ্ধের পথে "কম্যুনিজম প্রতিরোধ করিলে সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে না।" এশিয়ার বিভিন্ন "স্বাধীন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কল্যাণ সাধনে ব্রতী হওয়া আমাদের উচিত।" কিন্তু শুদ্ধ মন লইয়া এরূপ কল্যাণ সাধনের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বড় একটা দেখা যায় নাই বলিয়াই যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিতে অনেক রাষ্ট্র দ্বিধা বোধ করে। ম্যাকৃঘী ইয়ং ডেমোক্রেটিক ক্লাবের বক্তৃতায় যদিও বলিয়াছিলেন যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যে বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে, দক্ষিণ-এশিয়ার কয়েকটি রাষ্ট্র তাহাতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিতে চান, "সশ্রদ্ধ চিত্তে" তাহা বিচার করা হইতেছে। কিন্তু যে কূটনীতিক চাল এই সব ব্যাপারে লক্ষ্য করিতেছি তাহার মধ্যে "শ্রদ্ধার" প্রভাব অনুভব করিতে পারিতেছি না। কাশ্মীর তাহার একটি প্রমাণ।

হাইড্রোজেন বোমা

জাপানের নাগাসাকি ও হিরোসিমা বন্দরের উপর এটম বোমা ফেলিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শেষশত্রু জাপানকে নতি-স্বীকার করাইয়াছিল। জার্ম্মানীর হামবুর্গ, ফ্রাঙ্কফোর্ট, বার্লিন নগরীর উপর হাওয়াই জাহাজ হইতে বোমা ফেলিয়া ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি করা হইয়াছিল। কিন্তু আণবিক বোমার ভয়ে প্রায় চারি বৎসর দুনিয়ার সভ্য দেশসমূহে বাগ্‌বিতণ্ডার সীমা-পরিসীমা ছিল না। আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকগণ আণবিক বোমা নির্ম্মাণের কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন। দুই-একটি বোমা প্রস্তুত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার ভাঙিয়া দিয়াছেন। সুতরাং "নূতন কিছু কর" এই নির্দ্দেশ পাইয়া যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] তৎসম্বন্ধে তৎপর হইয়াছেন, ফলও পাইয়াছেন প্রায় হাতে হাতে। হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ধ্বংসলীলার শক্তি নাকি আণবিক বোমা হইতে অনেক গুণ বেশী। আরও দুই-তিন বৎসর এই লইয়া হৈ-হুল্লোড় চলিবে।

ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র

ব্যবহারশাস্ত্রে পণ্ডিত একজন বাঙালী সমাজ হইতে তিরোহিত হইলেন। ইংরেজ আমলে তিনি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আইন-সদস্য ছিলেন; তিনি দেশের এক যুগসন্ধির সময়ে বরোদা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হন; কয়েক মাসের জন্য তিনি বাংলা দেশের গবর্ণর ছিলেন। ৭৫ বৎসর বয়সে তিনি দেহ-ত্যাগ করিলেন। তিনি স্বাধীন ভারতের সেবা করিবার সুযোগ পান নাই, যদিও তাঁহার কৌশলী নেতৃত্বে দেশের এক সঙ্কট সময়ে ভারতীয় রাজন্যবর্গের অধিকাংশ ভারতরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ মন্ত্রী-মিশন ইংরেজ শাসনের অবসানের অঙ্গস্বরূপ রাজন্যবর্গকে তাঁহাদের সার্ব্বভৌমত্বের অধিকার ফিরাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন। ভূপালের নবাব 'নরেন্দ্রমণ্ডলী'র মুখপাত্র (Chancellor of the Chamber of Princes) ছিলেন; 'পাকিস্থানী মনোভাবাপন্ন' এই রাজার প্ররোচনায় অনেক রাজাই ভারতরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার কল্পনা করিতেছিলেন। ব্রজেন্দ্রলালের পরামর্শে বরোদার মহারাজা এই পরামর্শের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন; তাঁহার উদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া বিকানীর, পাতিয়ালা প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিবৃন্দ ভারতরাষ্ট্রকে ছিন্নভিন্ন হইতে দিলেন না। ১৯৪৭ সালের মধ্য ভাগে তাঁহাদের প্রতিনিধিরা প্রকাশ্য ভাবে ভারতরাষ্ট্রের সংগঠক সংসদে যোগদান করিলেন। ইংরেজের কূটনীতি পরাজিত হইল; ভারতরাষ্ট্রকে খণ্ডবিখণ্ড করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এই জন্যই ব্রজেন্দ্রলালের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করিবে।

সুধীরচন্দ্র বসু

নেতাজীর চতুর্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুধীরচন্দ্র বসু ৫৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অকাল মৃত্যুর দেশ এই বাংলাদেশ। সুধীরচন্দ্র ধাতব দ্রব্যাদির তত্ত্বাবধায়করূপে টাটা লোহা ও ইস্পাত শিল্প-কেন্দ্র জামসেদপুরে কাজ করিতেন। নানা জাতি, নানা পরিচয়, নানা ভাষা-ভাষী লোক এই নগরীর বর্ত্তমান বিরাট রূপদানে সাহায্য করিয়াছে। সেই সর্ব্বজাতির সংমিশ্রণে একটা নূতন সংস্কৃতির জন্ম হইয়াছে, একটা নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই সমাজের এক জন নেতা ছিলেন সুধীরচন্দ্র। কনিষ্ঠ ভ্রাতার রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের জন্য তাঁহাকে উত্যক্ত হইতে হইয়াছিল। নীরবে তাহা তিনি সহ্য করিয়াছেন। ব্যবহারে বা কথাবার্ত্তায় ক্ষোভের কোন পরিচয় দেন নাই; মানবপ্রকৃতির উপর বীতশ্রদ্ধ হন নাই। চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি পরিচিতের শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধানে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীশরৎচন্দ্র বসু ও তাঁহার পত্নী কন্যার উদ্দেশে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

গান্ধীজী স্মরণে

শ্রীহেমপ্রভা দেবী

গান্ধীজীর তিরোধানের পর দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর চলিয়া গেল। আবার সেই ৩০শে জানুয়ারী নিদারুণ দুঃখের স্মৃতি বহন করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। সারা বৎসর যদি বা কাটাইয়া দেওয়া যায়, এই ৩০শে জানুয়ারীকে কোন প্রকারেই এড়াইয়া যাওয়া চলে না। এই দিনটি যখন উপস্থিত হয় তখন আবার সেই ক্ষত-স্থানে নূতন করিয়া দাহ উপস্থিত হয় এবং বেদনায় সমস্ত দেহ ও মন পীড়িত হইতে থাকে। ৩০শে জানুয়ারী আমাদের জীবনে বার বার আসিবে ও তেমনি করিয়া নাড়া দিয়া যাইবে, যেমন করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় সমস্ত প্রকৃতিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া যায়।

গান্ধীজীকে অবলম্বন করিয়া আমাদের জাতীয় জীবন রূপ গ্রহণ করিতেছিল। দেশের দুর্দিনে যখন তাঁহার উপস্থিতি সব চাইতে বেশী প্রয়োজনীয় ছিল তখনই আমরা তাঁহাকে অতর্কিতে হারাইয়াছি। গান্ধীজী চলিয়া গিয়াছেন, আজ রিক্ত মনে ভাবিতেছি তাঁহার বাৎসরিক স্মৃতি-দিবসে, এই পুণ্য তিথিতে, কি দিয়া তাঁহার তর্পণ করিব। কি সম্বল আছে, কি সঞ্চয় করিয়াছি যাহা দিতে পারি। কিছুই খুঁজিয়া পাই না, একমাত্র অশ্রুজল ছাড়া।

মনে হয়, যখন তিনি ছিলেন তখন যেন সবই ছিল। তাঁহার আলোয় নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখিয়া নিজেদেরও অনেক বড় বলিয়া মনে হইত। কিন্তু আজ দেখিতেছি সবই মিথ্যা, যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভাবে অর্জুনের হাতে গাণ্ডীব মিথ্যা হইয়া গিয়াছিল। আমরা যেন আজ একেবারে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছি।

গান্ধীজী ছিলেন মহামানব। যুগে যুগে মহামানবগণ বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া লোকশিক্ষার জন্যই আসিয়া থাকেন। তাঁহারা জগৎকে পবিত্র করিয়া দিয়া যান। গান্ধীজীও ভারতবর্ষের উদ্ধারের জন্য আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের নিজস্ব জিনিস সত্য ও অহিংসা। সত্য ও অহিংসার বাণী গান্ধীজী তাঁহার স্বকীয় বিশেষ ধারায় নূতন করিয়া জগৎকে শুনাইলেন। সত্য ও অহিংসার পথেই তিনি ভারতের সেবা করিয়া, ভারতকে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়াছেন এবং জগৎকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

গান্ধীজী সমগ্র ধর্মের পরিপূর্ণ মূর্তি ছিলেন। তিনি একাধারে জ্ঞানী, কর্মী, সাধক, প্রেমিক ও ভক্ত ছিলেন। তাঁহার সাধনা ছিল সম্পূর্ণ নূতন ধরণের; ইহার জন্য কোনও কিছু ত্যাগ করিয়া কোথায়ও একক হইয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন হয় নাই। জগতে যত কিছু ভাল ও মন্দ আছে তাহারই মধ্যে বাস করিয়া সকল রকম কর্ম করিয়াই নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি তাঁহার সাধনা সম্পন্ন করিয়াছেন। পদ্মপত্রে জলের মত তিনি বাস করিতেন। কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। সব রকমের মানুষই তাঁহার নিকট আশ্রয় পাইয়াছে। সর্ব প্রকারের প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান তিনি অতি আশ্চর্য্যভাবে নিমেষমাত্রে করিয়া দিয়াছেন। কাহাকেও দূরে সরাইয়া দেন নাই। নিজেকেই সকলের মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছিলেন।

২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। দেশের এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গান্ধীজীই রচনা করিয়া গিয়াছেন। আজ তিনি নাই। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই দিনটি আজ একাধারে আনন্দের ও দুঃখের দিন। কে জানিত আমাদের ভাগ্য এমন হইবে। আমাদের আনন্দ ও অশ্রুর মালা একত্রে গাঁথা হইয়া রহিল। ভারতের ভাগ্যবিধাতা আমাদের ভাগ্য এই ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিলেন।

গান্ধীজীর কথা বলিতে গেলে ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তিনি মহৎ ছিলেন, সুন্দর ছিলেন, আকাশের মত উদার ও সাগরের মত বিশাল ছিলেন। তিনি একাধারে আমাদের জনক ও জননী ছিলেন। জননীর মত কোমল হস্ত সকলে অনুভব করিয়াছেন। তিনি যে কি ছিলেন আর কি ছিলেন না তাহার কোন সীমারেখা টানা যায় না।

তিনি খুব ছোট ছোট কাজও এমন সুন্দর এবং নিপুণ ভাবে করিতেন যাহা আর কেহই পারিত না। ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, যাঁহার মাথায় সারা বিশ্বের ভাবনা তিনি কেমন করিয়া ইহা করিতেন। তাঁহার নিকট কিছুই তুচ্ছ ছিল না—ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। এমনই করিয়া সকলকেই টানিয়া লইয়াছিলেন। তাই আজ তাঁহার অভাব যেন আমাদের আশ্রয়শূন্য অভিভাবকশূন্য অবস্থায় আনিয়া দিয়াছে। গান্ধীজী আমাদিগকে শিখাইয়াছেন মৃত্যুতে শোক করিতে নাই। জীবন ও মৃত্যু একত্রেই বাস করে—দিন ও রাত্রির মত। শোকাচ্ছন্ন মন ত বাধা-স্বরূপ। উহা হইতে মুক্ত থাকিতেই হইবে। তাঁহার এই শিক্ষাকে বার বার স্মরণ করি। তাঁহার জীবিতকালে

তাঁহার বাণী আমাদের মধ্যে যেমন শক্তির সঞ্চার করিত আজও যেন সেইরূপ করে। তাঁহার ঈপ্সিত কর্ম যেন আমাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। অলক্ষ্যে থাকিয়া তিনি আমাদিগকে পরিচালিত করুন।

গান্ধীজী বলিতেন তাঁহার জীবনের জন্য যেন আমরা কেহ উদ্বিগ্ন না হই। তাঁহার জীবন সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের অধীন। ঈশ্বর যখন তাঁহাকে লইতে চাহিবেন তখনই যাইতে হইবে। আর রাখিতে চাহিলে কাহারও সাধ্য নাই কিছু করিতে পারে। একটি গাছের পাতাও ভগবানের ইচ্ছা ভিন্ন পড়িতে পারে না। তিনি সব সময়ই সব অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন তাঁহার সময় আসিল, নির্বিকার চিত্তে রাম নাম করিতে করিতে স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেলেন। পিছনের দিকে তাকাইলেন না। কি পড়িয়া রহিল, অসমাপ্ত রহিল, কিছুই তাঁহার মনে আর স্থান পাইল না। আমরা প্রস্তুত ছিলাম না, তাই অহোরাত্র দাহ লইয়া ফিরিতেছি। কবির ভাষায় বলিতে গেলে—

"আমরা কোথায় আছি, কোথায় সুদূরে
দীপহীন জীর্ণভিত্তি অবসাদ পুরে
ভগ্ন গৃহে;"

তাঁহাকে দেখিয়াছি যখন যাহা গড়িয়া তুলিতেন তাহা ছোটই হউক আর বড়ই হউক তাহার জন্য কি অক্লান্ত চেষ্টা ও শ্রম করিতেন। আবার যখন তাহা ভাঙিয়া ফেলিবার প্রয়োজন মনে করিতেন, খেলাঘরের মতই তাহাকে ভাঙিয়া ফেলিতেন। কখনও হিসাব করিতেন না উহাতে কত অর্থ ও শ্রম গিয়াছে। এমনই অনাসক্ত তাঁহার মন ছিল। অন্যদিকে আবার এক বিন্দু জলের অপচয়ও সহিতে পারিতেন না।

গান্ধীজী আমাদিগকে অনেক দিয়াছেন, অনেক শিখাইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। মাধুর্যপূর্ণ সেই স্মৃতি আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া আছে। এই আনন্দের স্মৃতি আমাদিগকে অগ্রগামী করুক। গান্ধীজীর কর্ম ও শিক্ষা ত ব্যর্থ হইবার নহে। উহা যে শাশ্বত সত্য। আকাশে ও বাতাসে উহা ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

আমাদের জীবনে ৩০শে জানুয়ারী প্রতি বৎসরই আসিবে। ঈশ্বর করুন আমরা যেন এই দিনটির জন্য প্রস্তুত হইতে, যোগ্য হইতে পারি। এই দিনটি যেন আমাদের সালতামামি হয়; কি করিলাম, কি পাইলাম তাহার হিসাব-নিকাশ যেন করিতে পারি। গান্ধীজীর যোগ্য অর্ঘ্য যেন সঞ্চয় করিতে পারি।

সমস্ত হৃদয় দিয়া গান্ধীজীকে আজ স্মরণ করি, প্রণাম করি। আমাদের অন্তর-বাহির পবিত্র হইয়া উঠুক। গান্ধীজীর আশীর্বাদ আমাদের জীবন প্লাবিত করিয়া দিক্।

সংগঠনে সুভাষচন্দ্র

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

নেতাজীর বিষয়ে তাঁর প্রিয় শিষ্য ও যুদ্ধক্ষেত্রে সহকর্মী শাহ নওয়াজ খাঁ লিখেছেন :

"আমি আজও জানি না তাঁহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে সাধারণ মানুষ, সেনানায়ক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্ এই তিনের গুণ কি ভাবে মিশ্রিত ছিল।

"কোনও লোকের কর্মের ধারা বুঝিতে হইলে প্রথমে তাঁহাকেই চিনিতে হয়। ঐরূপ গুণাবলীযুক্ত অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। তিনি একেলা, নিজের হাতে সমস্ত পূর্ব্ব-এশিয়াবাসী ভারতীয়দিগকে এক সঙ্ঘে সংগঠিত করিয়া, সমস্ত পূর্ব্ব-এশিয়ার জাতিপুঞ্জকে ভারত ও ভারতীয়দিগের সহিত মৈত্রী ও বন্ধুত্বসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন।...তাঁহার প্রতি সর্ব্বসাধারণের এই গভীর প্রেম ও অসীম শ্রদ্ধার মধ্যে কি গুপ্ত মন্ত্রবল ছিল? মনে হয় ইহার কারণ, তাঁহার শৌর্য্য, চরিত্রবল এবং উদার মন।"

ঠিক কথা! বাংলায়, তথা সমগ্র ভারতে, কোন্ জীবন্ত প্রাণ মন আছে যা আজ নেতাজীর স্মরণে সাড়া দেয় না, যা আই-এন-এ সেনাদলের অমর কীর্ত্তি-কথায় চঞ্চল হয়ে উঠে না? কিন্তু কয়জন ভাবে যে, ঐ অলোকসামান্য পৌরুষ-যুক্ত ব্যক্তিত্বের বিকাশ হ'ল কোথায় ও কি উপায়ে?

চরিত্রবল ও জ্ঞানপিপাসা সুভাষ পতামাতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এরই অঙ্গস্বরূপ দেশপ্রেম ও সেবায় নিষ্ঠা তাঁতে অতি অল্প বয়সেই দেখা দেয়। যে দেশপ্রেম ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ও যে দেশসেবায় তিনি উত্তরকালে

সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন তার প্রথম পরিচয় আমরা পাই তাঁর কৈশোরে। কটক স্কুলে ছাত্রাবস্থাতেই, ১৯০৯ সালে, মাত্র ১২ বৎসর বয়সে তিনি প্রথমে কয়েকজন সঙ্গীকে নিজের দলে টেনে দরিদ্র ও আর্ত্তের সেবা আরম্ভ করেন। ১৯১১ সালে জাজপুরে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেয়। ১৪ বৎসর-বয়স্ক কিশোর সুভাষচন্দ্র সেই সময়ে সহপাঠীদের মধ্যে সেবাদল গঠন করে সেবাকার্য্যে ব্রতী হন। সমবয়সী-দের উপর তাঁর চরিত্র ও চিন্তাশক্তির প্রভাব তখন থেকেই আমরা দেখতে পাই। কিন্তু ঐ সেবাদল সংগঠন বা আলাপ-আলোচনা তাঁর পড়াশুনার কোনও ব্যাঘাত জন্মাতে পারে নি—১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি সমস্ত পরীক্ষার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

তার পর আরম্ভ হ'ল কলকাতায়, প্রেসিডেন্সী কলেজে সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন। এই সময়েই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও উপদেশ তাঁর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ধর্ম্মজীবনের ব্যাকুলতায় তিনি ১৯১৪ সালের গোড়ায় গুরুর সন্ধানে ঘরের বার হয়ে, কয়েক মাস ধরে বৃথাই হিমালয় অঞ্চলে এবং উত্তর-ভারতের নানা তীর্থ ঘোরা-ফেরা করেন।

তারপর তাঁর ছাত্রজীবনে ক্রমে এল প্রথমে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সামরিক শিক্ষাশিবিরে সৈনিক-জীবনের অভিজ্ঞতা আর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সহিত পরিচয়ের পর্ব্ব। পরে আরম্ভ হ'ল ছাত্রসংগঠন এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই এল তাঁর ছাত্রজীবনের উপর প্রচণ্ডতম আঘাত। কর্তৃপক্ষ তাঁকে কলেজ ছাড়তে বাধ্য করায় কিছু দিন তাঁর লেখাপড়ায় বাধা পড়ে। সাধারণ বাঙালী ছেলে হলে এখানেই তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হয়ে উন্মার্গগামিতা আরম্ভ হ'ত, কিন্তু সুভাষ ছিলেন উন্নত ও বিশুদ্ধ ধাতুতে তৈরি। কিছুদিন পর আবার চলল পড়াশুনা সমান ভাবে। তবে সামরিক শিক্ষায় রূপ দিল তাঁর যোদ্ধৃভাবকে এবং প্রেসি-ডেন্সি কলেজ থেকে বিতাড়নের ফলে মনের উপর পড়ল গভীর ছাপ—স্বাধীনতা ও আত্মমর্য্যাদা সম্পর্কে।

এদেশের লেখাপড়া সাঙ্গ করে বিদেশযাত্রা, আই-সি-এস পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ এবং দেশের ডাকে সে সব বিসর্জ্জন দেওয়া—এ কথা তো সর্ব্বজনবিদিত।

দেশে তখন স্বাধীনতার ডঙ্কা বেজে উঠেছে। চারি-দিকে তুমুল আন্দোলন। সুভাষ করলেন আত্মনিয়োগ স্বাতন্ত্র্যের সংগ্রামে। তাঁর যৌবনের অভিষেক হ'ল ত্যাগে, সাধনায় ও সংগঠনে।

১৯২১ সালে আমরা তাঁকে দেখি অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ রূপে গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যা আয়তনের সংগঠনে। ঠিক সেই সময় এদেশে এলেন ব্রিটিশ যুবরাজ, সুভাষ দল গঠন করে পূর্ণ উদ্যমে চালালেন বয়কট এবং যুবরাজের অভ্যর্থনা পণ্ড করার আয়োজন। ক্রমে এল আইন-অমান্য আন্দোলন এবং সেই সময়েই আমরা প্রথম পরিচয় পেলাম সুভাষের দল পরিচালনা-ক্ষমতার। বৎসরের শেষে দেশবন্ধুর সঙ্গে হ'ল সুভাষের প্রথম কারাবরণ।

জেল থেকে বেরুলেন ১৯২২ সালের মধ্যভাগে। সেই বৎসর উত্তরবঙ্গে অকাল-প্লাবনে লক্ষ লক্ষ লোক বিপন্ন হয়ে পড়ায়, আচার্য্য রায়ের আহ্বানে সুভাষকে ছুটতে হ'ল আর্ত্তের পরিত্রাণে। সেখানে উত্তরবঙ্গ সেবাদলের কাজ এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে তিনি "বাংলার কথা"র সম্পাদক রূপে এবং "অল বেঙ্গল ইয়ুথ লীগ" ও "ইয়ং বেঙ্গল পার্টি"র অধিনায়করূপে, কংগ্রেসের স্বাতন্ত্র্য অভিযানের প্রচার এবং বাংলার যুবশক্তিকে দেশের কাজে যোজনা এই দুই কাজই সমানে চালাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে "স্বরাজ পার্টি"র ভিত্তি স্থাপনা হ'ল এবং তার প্রচারের কাজ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য ইংরেজী দৈনিক "Forward" জন্মলাভ করল। সুভাষের উপর পড়ল তারও কার্য্যাধ্যক্ষ পদের ভার। স্বরাজ পার্টির প্রচার বিভাগ তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এতই সুষ্ঠুভাবে চলেছিল যে কলিকাতার প্রধান বিদেশী দৈনিক বলতে বাধ্য হয়েছিল, "সুভাষ বসুর আই-সি-এস্ পদত্যাগে গবর্ণমেণ্টের লোকসান হয়েছে অনেক এবং কংগ্রেসের লাভ হয়েছে ততোধিক।" সত্য সত্যই তখন সুভাষ সকল বিষয়ে দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্ত।

অল্প দিন পরেই এল মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড বিধানে ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচন এবং কলিকাতা কর্পোরেশন অধিকারের পর্ব্ব—সুভাষের যুবসংগঠন এবং প্রচার বিভাগের পরিচালন দেশবন্ধুর এই দুই অভিযানকে অশেষ সাহায্য করে সফল করে তুলল।

কর্পোরেশন অধিকার করে দেশবন্ধু সুভাষকে লাগালেন তার সংস্কারের কাজে। কলিকাতা নগরীর তখন এক আনা অংশ—অর্থাৎ সাহেবপাড়া—ছিল ভূস্বর্গ-বিশেষ, বাকী পনর আনা—অর্থাৎ কালা আদমীর মহল্লা—ছিল নরকতুল্য। সুভাষের সমস্ত উদ্যম ও শক্তি লাগল এই অসাম্য দূর করার প্রয়াসে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তত দিনে বুঝে নিয়েছিল সুভাষের ক্রান্তি-বিপ্লবকারী সংগঠন-শক্তির আকার-প্রকার। ১৯২৪ সালের এপ্রিলের শেষে সুভাষ নিযুক্ত হলেন চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসাররূপে। ছয় মাসকাল পূর্ণ উদ্যমে কাজ চালাবার পর ২৫শে অক্টোবর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'ল।

প্রায় আড়াই বৎসর জেলভোগের পর ভগ্নস্বাস্থ্য কিন্তু

অটুট উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে সুভাষ ফিরলেন দেশের কাজে। সেই সময়েই ব্রিটিশ সরকার পাঠালেন সাইমন কমিশন। সে কমিশনকে বিফল করে ফিরাতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল সমস্ত কংগ্রেসপক্ষ এবং সেই সঙ্গে চলল ব্রিটিশ পণ্যবর্জ্জন। বাংলার যুবশক্তি তখন সুভাষের ইঙ্গিতে চলে, সুতরাং বাংলায় এই বর্জ্জন ও প্রত্যাখ্যান-নীতি অন্য সকল প্রদেশের চেয়ে বেশী জোরালো হয়ে উঠল।

পরের বৎসর কলিকাতায় হ'ল কংগ্রেসের অধিবেশন, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু রাষ্ট্রপতি। সেবারের কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর গঠন ও পরিচালন সমস্তই হয়েছিল সুভাষের নেতৃত্বে। স্বেচ্ছাসেবক দলের শোভাযাত্রায় আমরা প্রথম পাই "নেতাজী সুভাষে"র পূর্ব্বাভাস। কেউবা তখন বাহবা দিয়েছিল আবার বাঙালীসুলভ খেলো বিদ্রূপও করেছিল অনেকে। কেবলমাত্র "Welfare" নামক সাময়িক পত্রের সম্পাদক লিখেছিলেন, "It was a sight·· No! It was a vision! A promise of the future."—এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—না, না এটা স্বপ্নের মত ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস!

এই কংগ্রেসেই সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকদিগের সঙ্গে সুভাষের প্রথম সাক্ষাৎ আদান-প্রদান হয়। ৩০,০০০ দলবদ্ধ শ্রমিক জোর করে কংগ্রেসের সভায় ঢুকতে চায়। তাদের চালচলন দেখে সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, সুভাষ কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে শ্রমিক দলকে ধীরে চালনা করে সভার ভিতর দিয়ে নিয়ে গেলেন।

এই ব্যাপারের পর তাঁর দৃষ্টি পড়ল শ্রমিক সংগঠনের দিকে। জামশেদপুরের শ্রমিকসঙ্ঘ তাঁকে করল নেতৃত্বে বরণ। এই নেতৃত্ব গ্রহণ করার ফলে তাঁকে একসঙ্গে লড়তে হয় মালিকানা স্বত্ব, ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র এবং প্রতিদ্বন্দ্বী পেশাদার শ্রমিক নেতার সঙ্গে। বিষম বাধা সত্ত্বেও, অশেষ ধৈর্য্যের সঙ্গে শ্রমিক সংগঠন করে, তিনি প্রথম দুই পক্ষের নিকট জয়লাভ করে প্রতিদ্বন্দ্বীর চক্রান্তে ১৯৩০ সালের সভায় শ্রমিক দল দ্বারাই আক্রান্ত ও আহত হন, কিন্তু অসীম সাহসের সঙ্গে আন্দোলন পরিচালনা করে তিনি কার্য্যোদ্ধার করেন। সেই শ্রমিক দল সুভাষকে গুরুদক্ষিণা দেয় ১৯৪২ সালে, যখন সমগ্র ভারতের শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে এক মাত্র সুভাষের নিজহাতে গড়া ঐ শ্রমিক-সঙ্ঘই দেশবাসীর উপর ব্রিটিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করে সরকারী চণ্ডনীতিতে বাধা দেয়।

১৯৩০ সালের পর ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র সুভাষকে দমন করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৩৭ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় বৎসরের মধ্যে মাত্র ছয় মাস তিনি স্বাধীন ভাবে দেশে ছিলেন, বাকী সময় তাঁকে হয় জেলে, নয় বিদেশে নির্ব্বাসনে কাটাতে হয়। পরের বৎসর ১৯৩৮ সালে তিনি হরিপুরায় কংগ্রেসের অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হন। পরের বৎসরেও তিনি নির্ব্বাচনে জয়লাভ করেন। কিন্তু তারপরই এল তাঁর জীবনের এক সন্ধিক্ষণ। তিনি রাষ্ট্রপতির পদ ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পদ ত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলেন।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হয়ে গেল। ব্রিটিশের সুনজর তো সুভাষের উপর ছিলই। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে গ্রেপ্তার হয়ে ডিসেম্বরের গোড়ায় ৭ দিন প্রায়োপবেশনের পর তাঁকে এলগিন রোডস্থ বাসভবনে নজরবন্দী অবস্থায় আনা হয়। ১৯৪১ সালের জানুয়ারীতে ব্রিটিশ পুলিস ও আমলাতন্ত্রের নজর এড়িয়ে তিনি বিদেশে চলে যান। তার পরের কথা হ'ল আই-এন-এ সংগঠন ও পরিচালনের অমর কাহিনী। তার বিশদ বিবৃতির স্থান-কাল এটা নহে।

সবশেষে ফিরে আসা যাক গোড়ার প্রশ্নে। কোথা থেকে এল এই অনন্যসাধারণ সংগঠনশক্তি ও নেতৃত্বের অপূর্ব্ব ক্ষমতা? ধাতুর আকর আগুনে গললে লোহা হয়। সেই লোহা দিয়ে সাধারণ ভাবে গড়া হয় চাষীর কোদাল, খন্তা। আবার সেই লোহা যখন ময়দানবের চুল্লীতে হাজার বার উল্কার জালায় জলে, লক্ষ বার প্রবল আঘাত পড়ে তার উপর, তখন জন্মায় বীরের অস্ত্র, বজ্রকঠিন রত্নপ্রভ শাণিত অসি-ফলক। মানুষের সন্তানের মধ্যে যদি থাকে সেই উপাদান, শৌর্য্য, পৌরুষ ও সংযম তবে শত অগ্নিপরীক্ষায় ত্যাগের অনলে পুড়ে যায় তার সকল মল ক্লেদ হীনতা; দূর হয় মলিনতা—আসে পুরুষকারের জ্যোতি, জগৎ অবাকবিস্ময়ে চেয়ে দেখে মহামানবের আবির্ভাব।*

* অল্-ইণ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা কেন্দ্রে কথিত ও রেডিও-কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত।

আর্টের মর্মকথা

অধ্যাপক শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

জীবনের প্রাঙ্গণে সুন্দরের আবির্ভাব বারবারই ঘটেছে, তবু মানুষ আজও বুঝি তার পূর্ণ অর্থ খুঁজে পায় নি। ক্ষণিকের একান্ত রূপলীলার মাঝে অরূপের সন্ধান চলেছে, চলেছে অনুসন্ধিৎসার অভিযান। জানি না সে অভিযান ব্যর্থ হবে কি সার্থক হবে। মানুষের অন্বেষণের শেষ নেই। তাই চরম বিচার করবার দিন আজও আসে নি, কখনো আসবে কিনা তার উত্তরও দেবে ভবিষ্যৎ। বসন্ত-বাতাস আন্দোলিত পলাশ-পারুলের গতিচ্ছন্দ মর্মর-মুখরিত সায়াহ্নের রহস্যঘন নিঃসঙ্গ বনপথ আমাদের মনে বিভিন্ন রসের সঞ্চার করে, এ কথা সত্য। বালার্কসম্ভবা প্রত্যূষের শিশু-সূর্য তার আলোর আবেদনের মাঝে যে বারতা প্রচ্ছন্ন রাখে, তা আমাদের কাছে পরম বিস্ময়ের। এখানে ফুল-ফোটা জ্যোৎস্না, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের নিরন্তর ভেসে যাওয়া; ওখানে বাতাসের বাঁশরীর সঙ্গে সঙ্গে বনবেতসের সাবলীল নৃত্যভঙ্গিমা রূপ-পূজারী মানুষের কাছে আবেদন জানায়। তাই মানুষ চায় তার ছন্দে ও সুরে, তার লেখায় ও রেখায়, তার বর্ণবিন্যাসে শাশ্বত করতে এই পলাতক সৌন্দর্যকে। সে ইলোরা ও অজন্তার বুকে আঁকে তার স্বাক্ষর, সে কালির আঁচড়ে কাগজের বুকে রচনা করে মানুষের শাশ্বত প্রণয় আর বিরহ-বেদনার অমর কাহিনী। ছন্দের উজ্জয়িনী আজও মরে নি। কবি-কল্পনা-উজ্জীবিত উজ্জয়িনী আজও বেঁচে আছে হাজারো মনের গহনে। সেখানে মেয়েরা আজও কালো কেশের মাঝে কুরুবকের চূড়া পরে, আজও জীবন সেখানে মন্দাক্রান্তা তালেই চলে। যে যুগের জীবন নিঃশেষ হয়ে গেছে মহাকালের স্থূল হস্তাবলেপে তাকেই শিল্প শাশ্বত করেছে, অমর করেছে মানুষের স্মৃতির মণি-কোঠায়।

এই শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, এক কথায় যাকে আমরা আর্ট বলব, তার সত্যিকারের মূল্য কতটুকু? এই ধরণের মূল্য-বিচারের প্রশ্ন ওঠে তখনই যখন আমরা প্লেটোর কথা পড়ি; যখন তাঁর মত মনীষী আর্টকে "copy of a copy" অর্থাৎ 'অনুকৃতির অনুকৃতি', নকলের নকল', এই আখ্যা দিয়ে তাঁর আদর্শ 'রিপাব্লিক' থেকে নির্বাসিত করতে চান। তাঁর মতে শাশ্বত সত্য হ'ল 'Idea' এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ, হাসিগান-আলো-ভরা, মায়াময়, মধুময় প্রকৃতি সেই আইডিয়ার ছায়ামাত্র। আর্ট আবার প্রকৃতিকে অনুকরণ করে। তাই আর্ট হ'ল অনুকৃতির অনুকৃতি। প্লেটোর মতে 'Art is doubly removed from reality,' —আর্টের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে মহাসত্তার অবস্থান। তাই আর্টে আমরা সত্যের সন্ধান পাই না। আর্টের মধ্যে সত্যের প্রকাশ নেই। তাই আর্ট সত্যের বাহন নয়।

আর্টের মূল্য-বিচারের এই কি শেষ কথা? মহা দার্শনিক প্লেটোর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রে আমরা বলব যে আর্টের মূল্য-বিচারের এই শেষ কথা নয়। আর্ট প্রকৃতিকে প্লেটোর অর্থে অনুকরণ করে কিনা সে বিষয়েও মতভেদের অসদ্ভাব নেই। অবশ্য আর্টে প্রকৃতির অনুসরণ অনস্বীকার্য, এ অনুসরণ অন্ধ অনুসরণ নয়, এ হ'ল নূতন করে প্রকৃতিকে সৃষ্টি করা। দার্শনিকেরা যাকে 'mechanical imitation' বলেছেন, এ তা নয়। স্রষ্টার সৃষ্টি যেখানে ব্যাহত হয়েছে জড়পদার্থের জড়ত্বের জন্য, সেখানে শিল্প তাকে পূর্ণ করে তোলে। শিল্পীর ধ্যানে বাস্তবের রূপান্তর ঘটে, শিল্পীর শিল্প-সৃষ্টিতে বাস্তব নূতনতর মহিমায় সমৃদ্ধ হয়।

ঠিক এই ধরণের কথাই আমরা শুনি এরিষ্টটলের মুখে; আবার দার্শনিকশ্রেষ্ঠ হেগেলও শুনিয়েছেন ঠিক একই ধরণের কথা। দৃশ্যমান জগতের বাইরে যে নিরালম্ব মহাসত্তার স্বেচ্ছাবৃত নির্বাসন ঘটেছে, তারই অপূর্ণ প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি আমাদের অতিপরিচিত জগতে। আর্ট হ'ল প্রকৃতির মাঝে এই আংশিক ব্যক্ত সত্যকে পরিপূর্ণ রূপদানের প্রয়াস। জড়পদার্থের অন্তর্নিহিত অবস্থাবৈগুণ্যে জড়জগতের মধ্যে সত্যকে আমরা তার পূর্ণ স্বরূপে পাই না। তাই প্রয়োজন হয় আর্টের। 'Art supplements nature'—আর্ট অপূর্ণ প্রকৃতিকে পূর্ণতর করে। শিল্পীর কাছে, শিল্প-রসিকের কাছে এই হ'ল আর্টের সত্যিকারের পরিচয়। মানুষের আত্মার স্বাক্ষর পড়ে সার্থক শিল্পে। তাই শিল্প বা আর্টের মর্মকথা হ'ল চিন্ময় আত্মার নিগূঢ় মর্মবাণী। প্রকৃতির অগীত সঙ্গীত বিশুদ্ধ তান-লয়ে গীত হয় শিল্পীর লেখা ও রেখায়, সুর ও ধ্বনির অপূর্ব সমন্বয়ে। 'স্বয়ংপ্রকাশ' (absolute) ভাস্বর হয় শিল্পের বর্ণ-আলিম্পনে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে ইন্দ্রিয়াতীতের প্রতিষ্ঠা করে আর্ট। তাই হেগেল বলেছেন, 'Art is the sensuous representation of the absolute' —যিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত, সেই মহাসত্তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপদানের প্রয়াসই হ'ল আর্টের মূল কথা, শিল্পের পরম তত্ত্ব।

এখন আমরা এটুকু বলতে পারি যে, আর্ট শুধু কথা নিয়ে বা রঙ্ নিয়ে, সুর নিয়ে বা ঢঙ্ নিয়ে খেয়ালী মানুষের বিলাস নয়। আর্টের গোড়ার কথা হ'ল 'রিয়ালিটী' বা পরম সত্যকে প্রকাশ করা। তুলির বর্ণবিন্যাসে, কালির আঁচড়ে বা সুরের সার্থক সৃষ্টিতে শিল্পী যে ইন্দ্রলোকের প্রতিষ্ঠা করে, তা 'রিয়ালিটি'-মুখী। আমি রিয়ালিটি অর্থে 'বাস্তবতা' বোঝাতে চাই নি। দার্শনিকপ্রবর ব্রাডলির অর্থেই 'রিয়ালিটি' শব্দের ব্যবহার করেছি। পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে মহাসত্তার 'অবাঙ্মনসোগোচর' অবস্থান তাঁর প্রকাশই হ'ল সত্যিকারের শিল্পীর শিল্প-এষণা। আমাদের বাইরের জীবনে আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজনে, বহিরঙ্গের তৃপ্তিসাধনে অথবা চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে হয়ত আর্টকে আমরা ব্যবহার করি সাধারণ পণ্যের মত, কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই যে আর্টের এটা অপচয়ের দিক, অপব্যবহারের দিক। যাকে আমরা 'art in industry' বলি, সেখানে আর্টের প্রকৃত মর্যাদা পদে পদে ক্ষুণ্ণ হয়। আর্টের সত্যিকারের প্রয়োজন মানুষের প্রবৃত্তির ক্ষুধা মেটানো নয়। আর্টের এই ধরণের অপব্যবহার লক্ষ্য করে হেগেল বলেছেন,

"In this mode of employment art is indeed not independent, not free but servile."—অর্থাৎ এই ধরণের অপব্যবহারে আর্টের স্বাধীনতা ব্যাহত হয়, আর্ট অপরের দাসত্বে স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে। শিল্পরসিকের আনন্দলোকে উত্তরণের স্বপ্ন নিষ্ফল হয়।

এই প্রসঙ্গে আর্টের ক্ষেত্রে অসুন্দরের (ugly) স্থান আছে কিনা সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলতে চাই। আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে আর্টের ক্ষেত্রে অসুন্দরের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু শিল্প-রসিকের কাছে, শিল্প-সমালোচকের দৃষ্টিতে অসুন্দর অপাংক্তেয় নয়। আর্টের রাজ্যে কেবল 'সুন্দরের'ই (beautiful) একচেটে অধিকার সাব্যস্ত হয়নি। সুন্দরের সঙ্গে আর্টের আত্মিক যোগের কথা এরিষ্টটল স্বীকার করেন না,—

"Aristotle's conception of fine art so far as it is developed is entirely detached from any theory of the beautiful—a separation which is characterstic of all ancient aesthetic criticism."

বুচার এরিষ্টটলের আর্ট সম্পর্কে মতবাদের আলোচনা করতে গিয়ে আরও বলছেন,—

"He makes beauty a regulative principle of art but he never says or implies that the manifestation of the beautiful is the end of art."

আর্টের লক্ষ্য সুন্দরকে রূপদান করা নয়, সত্যকে প্রকাশ করা। সত্যের ব্যাপ্তি কেবলমাত্র সুন্দরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, অসুন্দরের রাজ্যেও তার অবাধ প্রবেশ। তাই ক্রোচ্ প্রমুখ আধুনিক নন্দনতত্ত্ব (aesthetics)-বিদেরা অসুন্দরের দাবিকে অসম্মান করবার অন্যায় স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেন নি। দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই প্রশ্নের বিচার করতে বসলে আমরাও 'অসুন্দর'কে আর্টের রাজ্যে প্রবেশাধিকার না দিয়ে পারি না। কারণ সুন্দর এবং অসুন্দর, ভাল এবং মন্দ, সকল ক্ষেত্রেই আমরা একই মহাসত্তার প্রকাশ দেখতে পাই। এই মহাসত্তার প্রকাশ যদি আর্টের উপজীব্য হয় তবে আর্টের ক্ষেত্রে সুন্দর এবং অসুন্দর উভয়ের দাবিই হবে স্বতঃস্বীকৃত। অবশ্য ক্রোচ অন্য যুক্তি দিয়ে অসুন্দরকে আর্টের রাজ্যে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলছেন,

"But if the ugly were complete, that is without any element of beauty, it would for that very reason cease to be ugly.···The disvalue would become non-value, activity would give place to passivity."

অর্থাৎ, সহজ ভাষায় বলতে গেলে অবিমিশ্র অসুন্দর জগতে কখনই সম্ভব নয়। তাই আপাত-অসুন্দরের মধ্যেও সুন্দরের স্পর্শ শিল্পরসিক খুঁজে পান। সুন্দরের অলক্ষ্য স্পর্শে অসুন্দরের মধ্যেও যে রূপান্তর ঘটে তা ধরা পড়ে শিল্পীর চোখে। তাই দেখি শিল্পে ও সাহিত্যে সমাজের নীচের তলার অসুন্দর জীবনের কাহিনীও রসোত্তীর্ণ হয়েছে। এ যুগের মনোবিজ্ঞানী মানুষের রসবোধের মূল সূত্রটি অনুধাবন করেছেন সঠিকভাবে। তাই দেখি এ যুগের আর্ট ক্রমেই হচ্ছে গণতান্ত্রিক অর্থাৎ জীবনের সর্ব স্তরের সর্ব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে। 'গণতান্ত্রিক' কথাটি এখানে রাজনীতিগত অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, এর ব্যবহার পুরোপুরি নন্দনতত্ত্বগত। যা-কিছু বীভৎস, কুৎসিত, অসুন্দর তাই পরিত্যাজ্য নয়। আর্টের রাজ্যে প্রবেশের তারও রীতিমত দাবি আছে। এ কথাটি ফরাসী কবি বোদেলের যেমন সুন্দরভাবে তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের বুঝিয়েছেন, এমনটি বিরল। স্বর্গের সৌন্দর্য অনেক কবিই দেখেছেন, মর্ত্যের সৌন্দর্যের কথা শুনিয়েছেন আরো অনেকে, কিন্তু নরকের সৌন্দর্য কয়জনই বা দেখেছেন এবং শিল্পের মাধ্যমে তা আরও দশ জনকে দেখিয়েছেন? অসুন্দরের সৌন্দর্য-সত্তার রসপিপাসু পাঠকের কাছে বোদেলের অনাবৃত করেছেন কবিচিত্তের সহজ সৃষ্টি-

লীলায়। তাঁর কাব্য পড়ে আমরা বুঝতে পারি ক্রোচের উপরি-উদ্ধৃত উক্তির সার্থকতা।

সার্থক শিল্পীর চোখে সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্ব নেই। বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্নও সেখানে অবান্তর। যা ঘটে, যা প্রত্যক্ষ, আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যাকে পাই, তার চেয়েও বড় সত্য হ'ল আমাদের শিল্প-লোক। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"কবি, তব মনোভূমি,
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য, জেনো"

কবিগুরুর এই কথা কয়টি শুধু কবির অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসই নয়, এর পিছনে রয়েছে নন্দনতত্ত্বের বিরাট সত্যের ইঙ্গিত। রামায়ণের রামের সার্থক জন্ম হয়েছিল কবির মানসলোকে। বাল্মীকির রামই শাশ্বত; অক্ষয়-জীবনের উত্তরাধিকার কবি তাঁর হাতে অর্পণ করেছেন। আমরা ঐতিহাসিক রামকে জানি না, আমরা চিনি মহাকবি বাল্মীকির কল্পনা-প্রসূত শ্রীরামচন্দ্রকে। বাস্তবের ক্ষণভঙ্গুরতাকে জয় করেছে শিল্পের শাশ্বত মহিমা। মহাকালের নির্দেশকে উপেক্ষা করে আর্ট মৃত্যুকে লঙ্ঘন করেছে,—এই তার অমৃতত্ব লাভের দুরূহ সাধনা।

পতঙ্গ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পরদিন প্রত্যূষে শ্যামলী ও অঞ্জলিকে চলিয়া যাইতে হইল কারাগারে—বৌমা দিনের পর দিন অন্তঃপুরে ঘোমটা টানিয়া ঘরকন্নার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল, গৃহস্থ-ঘরের নম্র সলজ্জ বধূটির মত। শাশুড়ী জানেন বৌমা তাঁহাদের লক্ষ্মী বৌ—তবে স্নান করিতে গিয়া আংটি হারাইয়াছে এই তাহার একমাত্র ত্রুটি।

মীরার শব পাওয়া যায় নাই—তাহার মৃতদেহের কি গতি হইয়াছে কেহ জানে না।

প্রত্যূষে খোকা ঘুম হইতে উঠিয়া দেখে মা নাই। সকালে খাইতে না দিয়া মা কোথায় গেল? হয়ত ঘাটে—সে ঘাটে গিয়া খুঁজিয়া আসিল—মা সেখানেও নাই।

ঘরে মুড়ির কলসী খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু সব এমন অগোছালো হইয়া রহিয়াছে যে কিছুই পাওয়া গেল না। সে অভিমান-স্ফুরিত অধরে খানিক বসিয়া রহিল,—মা মা বলিয়া ডাকিল, কেহ সাড়া দিল না—

অকস্মাৎ সে চাহিয়া দেখে মাষ্টারনী পিসিমা পাশেই দাঁড়াইয়া।—পিসিমা বলিতেছে—খোকা এদিকে আয়, সন্দেশ খাবি—

খোকা আগাইয়া আসিয়া সানন্দে সন্দেশ খাইয়া লইল। প্রশ্ন করিল, মা কোথায়?

মিস্ রায়ের চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল, তিনি নিবিড় আলিঙ্গনে খোকাকে বুকে চাপিয়া কি বলিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না—চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

—মা কোথায়?

—কলকাতা,—আসবে। চল তুমি আমার কাছে থাকবে—

—কবে আসবে—

—চিঠি দেবে, তারপরে আসবে—

দপ্তরী ঘরে তালা দিয়েছিল, খোকা তাই প্রশ্ন করিল, ঘরে তালা দেয় কেন?

—তুমি আমার কাছে থাকবে যে! কত বই দেব—যাবে?

খোকা কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছিল, অসহায়ের মত মিস্ রায়ের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল—হুঁ।...

সে আজ কি হারাইয়াছে, কেন হারাইয়াছে তাহা জানে না—পিসিমার পিছনে পিছনে সে উল্লাসের সহিতই চলিল। পিসিমা সন্দেশ দিবে বলিয়াছে অতএব আর দুঃখের কি আছে।

তবুও পিছন ফিরিয়া একবার বোধ হয় দেখিল, মা কোথায়।

রঞ্জন আর মণিবাবু বলিলেন, খোকার আর এমন কষ্ট কি? মেজমার কাছে ভালই থাকবে—

অনেকে বিদ্রূপের হাসি হাসিল, অনেকে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। কেহ 'আহা' বলিয়া সমবেদনা প্রকাশ করিল—কিন্তু তাহাদের সকলেরই জীবনযাত্রা আগের মতই চলিতে লাগিল একান্ত নিশ্চিন্তে।

পৃথিবীর আবর্ত্তন চলিয়াছে আপনার অক্ষকে কেন্দ্র করিয়া একই ভাবে, একই নিয়মে, দিন-রাত্রি, শীত-গ্রীষ্ম, মাস-বর্ষ সৃষ্টি করিয়া।

তাহার মাঝে একটি বিশেষ চিহ্নিত দিন ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ।

শচীনবাবু এই বিশেষ দিনটির কয়েক মাস পূর্ব্বে জেল হইতে বাহির হইয়াছিলেন। সত্য, বলা প্রভৃতিও ছাড়া পাইয়াছিল, অঞ্জলি, শ্যামলী অনেক আগেই মুক্তি পাইয়াছে। শচীনবাবু মীরার মৃত্যুসংবাদ জেলেই পাইয়াছিলেন। প্রথমে চোখের জল ফেলিয়াছিলেন, পরে ভাবিয়া ভাবিয়া বিস্মিত হইতেন অত্যন্ত ভীরু লজ্জাশীলা মীরা এমনি করিয়া জীবনাহুতি দিবার সাহস কোথা হইতে কেমন করিয়া পাইল। অত্যাচার ও লাঞ্ছনাই যে তাহার সুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়াছিল তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না।

মিস্ রায় নানারূপ অশান্তি ভোগ করিয়া কপালে কলঙ্কের টীকা পরিয়া স্থানান্তরে চাকুরি লইয়া চলিয়া গিয়াছেন—খোকা তাহার এক দূরসম্পর্কীয় মাসীর বাড়ীতে কয়েকটি বৎসর অত্যন্ত অসহায়ের মত কাটাইয়া দিয়াছে। শচীনবাবু আসিয়াই তাহাকে লইয়া আসিয়াছেন—এখন তিনি সপুত্র স্কুল-বোর্ডিঙে থাকেন। বাসায় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই অর্থাৎ তখন তিনি নিঃসম্বল।

শহরে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করিতেছে যে-কোন সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিতে পারে, এই আশঙ্কা সকলের মনকে উদ্বেগে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। শচীনবাবু কিভাবে নিজ সম্প্রদায়ের লোকেদের বাঁচানো যায় তাহারই উপায় নির্দ্ধারণে ব্যস্ত ছিলেন। ঠিক এমনি সময় স্বাধীনতা দিবস ঘোষিত হইল, চারিপাশে আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল।

১৫ই আগষ্ট। কলিকাতা বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে মুখরিত, নরনারী আনন্দে উৎফুল্ল, বাসে ও ট্রামের মাথায় চলিতেছে লোকেদের তাণ্ডব নৃত্য—সেই দিনের কথা।...

ওদিকে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পূর্ব্ব-পাকিস্থানের মফস্বল শহরেও আনন্দের সাড়া পড়িয়াছে। স্কুলের ময়দানে জনসভা হইবে—পাকিস্থানের পতাকা উত্তোলনের পরে সুরু হইবে পতাকা-অভিবাদন ও বক্তৃতার পালা। কংগ্রেস-নেতা শচীনবাবুকে পতাকা উত্তোলনে উপস্থিত থাকিবার অনুরোধ তথা আদেশ দেওয়া হইয়াছে, সত্যও থাকিবে। শচীনবাবু বক্তৃতা করিবেন। সত্যকেও কিছু বলিতে হইবে। এর আসল তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, তাহাদিগকে পাকিস্থানের প্রতি প্রকাশ্যে আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে।

মাঠে লোক-সমাগম হইয়াছে প্রচুর, এত লোক বহু দিন এখানে একত্র সমবেত হয় নাই। খোকা বাবার সঙ্গে আসিয়াছিল, সে এখন বড় হইয়াছে, সে বুঝিতে পারিয়াছে তাহার মা মারা গিয়াছেন; বন্দেমাতরম্ আসলে কি তাহাও সে কিছু কিছু বুঝে। তাহার বয়স আট—আগেকার সেই সুন্দর ফুটফুটে চেহারা আর নাই, অত্যন্ত কৃশ হইয়া গিয়াছে।

শচীনবাবু প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন, সত্যও আপত্তি [illegible], কিন্তু লীগের কর্তৃপক্ষের যুক্তি অন্যরূপ। কংগ্রেস-নেতাগণই লীগবিরোধী, তাঁরা যদি আজ সভায় অকুণ্ঠ আনুগত্য স্বীকার না করেন তবে তাঁরা দেশদ্রোহী প্রমাণিত হইবেন এবং দেশদ্রোহীর পক্ষে শাস্তি যে অনিবার্য্য তাহা না বলিলেও বুঝা কঠিন নয়। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত রাজী হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্তর তাঁহাদের বার বার বিমুখ হইয়া উঠিতেছিল—এইজন্যই কি তাঁহারা এত কৃচ্ছ্র-সাধন করিয়াছেন। এইজন্যই কি মীরা মরিয়াছে? মাতৃহারা খোকা কি বাঁচিয়া আছে এই আনুগত্যের জন্য। মীরার বুকের রক্তে মৃত্তিকা রঞ্জিত হইয়াছিল কি এইজন্যই!

বিরাট জনসভা।

হাজার হাজার লোক সমবেত হইয়াছে পাকিস্থানের স্বাধীনতা-উৎসবে। এক পাশে দাঁড়াইয়া আছেন সেই বীরবৃন্দ, অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন একদা যাঁহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহাদের অন্তর কাটিয়া যাইতেছে পরাজয়ের বেদনায়, মুখে আনুগত্য স্বীকারের কৃত্রিম হাসি দিয়া তাহা ঢাকিবার একটা নিষ্ফল প্রয়াস তাঁহাদের অবস্থাকে অধিকতর শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে। কেহ কেহ তাহা লইয়া ব্যঙ্গ করিতেছে—কি আর করবেন, দেশে যখন থাকতে হবে!

শচীনবাবুকে পতাকার নীচে লইয়া যাওয়া হইল—সেখানে মঞ্চ বাঁধা হইয়াছে। সত্য তাঁহার পাশে পাশে চলিয়াছে। আজ উহাদের বড় প্রয়োজন শচীনবাবু ও সত্যকে দিয়া বক্তৃতা করানো, কারণ তাহারই মাঝে পরিতৃপ্ত হইবে তাহাদের নিষ্ঠুর অনুদার বিজয়োল্লাস।

হাজার হাজার কণ্ঠে জিগীর উঠিল—পাকিস্থান জিন্দাবাদ। সকলে সমবেতকণ্ঠে আনুগত্য স্বীকার করিল।

শচীনবাবু বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—ভাইসব, আজ বড় শুভদিন...কিন্তু তাঁহার অন্তর বেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, কণ্ঠ তাঁহার রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি বেশী কিছু বলিতে পারিলেন না—বার বার মনে হইতেছিল মীরা কেমন করিয়া খোকাকে ফেলিয়া গিয়াছিল, কেমন করিয়া উত্তপ্ত সীসক-গোলক তাহার কোমল বুক ভেদ করিয়া গিয়াছিল, উষ্ণ রক্তে পৃথিবী আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সে গুলিবিদ্ধ দেহ কেহ দেখে নাই, তাহার কোনো সন্ধান কেহ পায় নাই—সেই শবদেহকে কেহ বিজয়-মাল্য ভূষিত করে নাই।

শচীনবাবু অতি কষ্টে হৃদয়াবেগ সংযত করিয়া কোনো-মতে বক্তৃতা শেষ করিয়া কহিলেন, আর একবার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হউক,—পাকিস্থান জিন্দাবাদ। সঙ্গে সঙ্গে হাজার কণ্ঠে প্রতিধ্বনি হইল।

এই সময়ে মঞ্চের এক প্রান্তে একটা সোরগোল উঠিল, শিশুকণ্ঠে ধ্বনিত হইল "বন্দেমাতরম্" এবং তার পরক্ষণেই

মহাত্মা গান্ধী
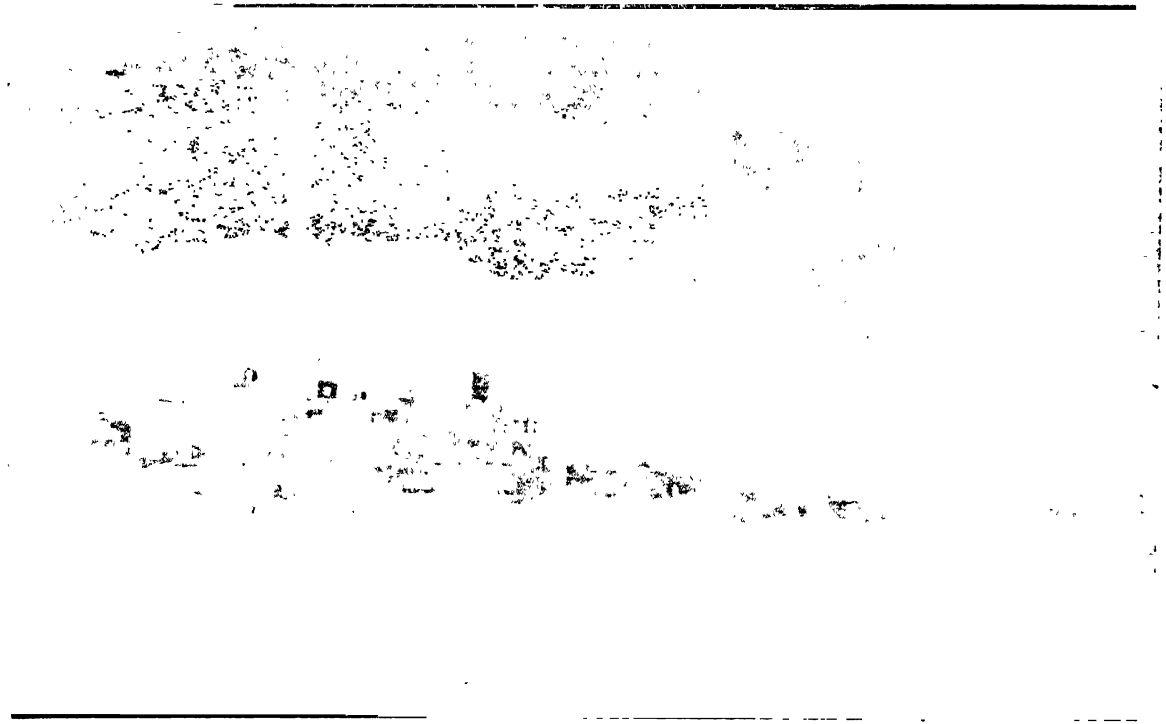
গঙ্গাবক্ষ হইতে হরিদ্বার শহরের দৃশ্য। পশ্চাতে শিবালিক পাহাড়শ্রেণী
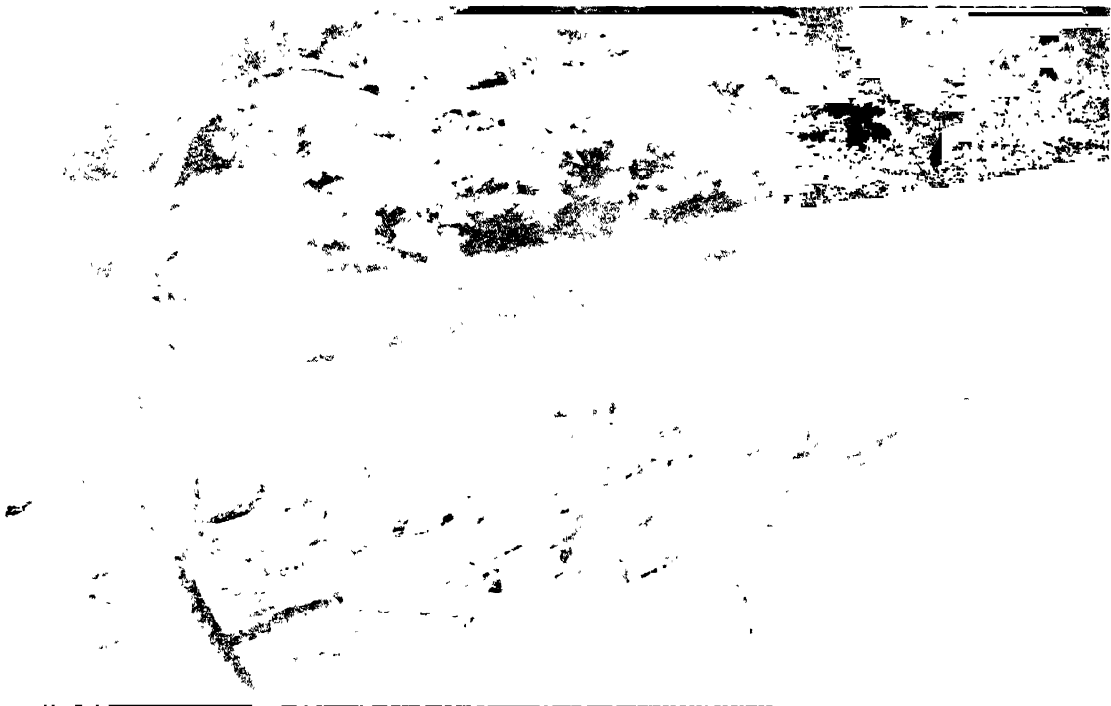
হরিদ্বারের সাধারণ দৃশ্য

একটা আর্ত্ত কণ্ঠের চীৎকার শচীনবাবুর কানে আসিয়া পৌঁছিল। কণ্ঠস্বর পরিচিত যেন খোকার—

তিনি ছুটিয়া গেলেন সেখানে—দেখেন মঞ্চের নিচে খোকা পড়িয়া আকুলভাবে কাঁদিতেছে, কয়েকজন যুবক তাহাকে ধরিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে কেবল চীৎকার করিতেছে—বাবা! বাবা! শচীনবাবু ছুটিয়া গেলেন, খোকাকে তুলিয়া দেখেন তাহার বামহাতের কনুইয়ের যেন হাড় সরিয়া গিয়াছে। সত্যও আসিল, তাঁহারা দুই জনে খোকাকে লইয়া ভিড়ের বাহিরে আসিলেন। তখন একজন স্থানীয় মৌলবী উদ্দীপনাময়ী ভাষায় ইস্‌লাম ও পাকিস্থানের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন।

শচীনবাবু আহত পুত্রকে কোলে করিয়া চলিয়াছেন নির্ব্বাকভাবে। সত্য পিছু পিছু চলিয়াছে।

—কে ওকে ফেলে দিলে সত্য!

সত্য মাটির দিকে চাহিয়া বলিল, ও পাকিস্থানের শ্লোগান না বলে বন্দেমাতরম্ বলেছিল বলে কোন অত্যুৎসাহী যুবক ওকে ধাক্কা মারে—তার পর পড়ে গিয়ে—

নীরবে দুই জনে আরও কিছুক্ষণ চলিলেন। ভাবিতে ভাবিতে শচীনবাবুর হৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, ওর মা চলে গেছেন, আর আমি বেঁচে রইলুম কি এই দেখতে?

শচীনবাবু সত্যর পানে চাহিলেন। সত্য নির্ব্বাক ভাবে চাহিয়া আছে মাটির দিকে—সে অপরাধীর মত বলিল, নলিনীবাবুকে ডেকে আনছি আমি। হয়ত হাড় মচকে গেছে—

সত্য উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেল।

খোকার হাতটা ক্রমশ: সারিয়া উঠিল বটে, কিন্তু একটু বাঁকা হইয়া রহিল। স্কুলের পরে শচীনবাবু হোষ্টেলের বারান্দায় বসিয়াছিলেন, সত্য আসিয়া প্রণাম করিল। শচীনবাবু বলিলেন, বসো। খোকার হাতটা একটু বাঁকা হয়েই রইল—আমাদের আনুগত্যের চিহ্নস্বরূপ!

—আপনি রিজাইন দিয়েছেন শুনলাম।

—হ্যাঁ।

—তারপর কি করবেন?

—প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাটা পেলেই চলে যাব দেশে, সেখানকার জমি বিক্রী করে যদি কিছু পাই পেলাম না পাই ওই নিয়েই চলে যাব পশ্চিম-বাংলায়। সেখানে গেলে তবু একটা সান্ত্বনা পাব যে, স্বাধীন ভারতে বাস করছি—যে স্বাধীনতার জন্যে ওর মা প্রাণ দিয়েছেন···

—সেখানে কত লোক গেছে, যাবে। সেখানে গিয়ে কি বাড়ীঘর, চাকরি-বাকরি পাবেন? কংগ্রেস যেতে বারণ করছে—এত আশ্রয়প্রার্থীর জায়গা নাকি সেখানে হবে না।

শচীনবাবু উদাসভাবে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, চাকুরী বা বাড়ীঘরের আশায় যাচ্ছি না—যদি নেহাত মরতে হয় তা হলে খোকার মা যে পতাকার মর্য্যাদা রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছে, সেই পতাকা যেখানে উড্ডীন সেখানেই মরতে চাই। নিত্য এই পরাজয়ের গ্লানি, এই অসম্মান, এই ভয় নিয়ে বাঁচা চলে না, এমনি দুর্ভর জীবন বয়ে বেড়ানো সম্ভব নয়। তা ছাড়া ভাবছি খোকার কথা—সে বড় হয়ে যখন জানবে সব ইতিহাস তখন এই স্থানের আবহাওয়া তার জীবনকে দুঃসহ করে তুলবে···

সত্য চুপ করিয়া রহিল। শচীনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কোন তর্ক করিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। সে কহিল, আমাদের এই অন্তর নিয়ে—যারা এক দিন সত্যই ভালবেসেছিল···

শচীনবাবু তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়াই অকস্মাৎ প্রশ্ন করিলেন, কেন? তুমি যাবে না?

—যাব, আর একটু দেখে যেতে চাই।

—এ কেবল আরম্ভ, এখন এই লাঞ্ছনা উত্তরোত্তর বাড়বে। যারা এই অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে চলতে পারবে তারা থাকবে—সব দেশেই এমন লোকের অভাব নেই যারা সকল অবস্থার সঙ্গেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে, যাদের সহনশীলতা অপরিসীম। কাজেই সকলে যাবে না—যারা এক দিন দেশের জন্তে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই আবার নাম-যশ-অর্থ-প্রতিপত্তির মোহে নিজেদের আদর্শকে বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হবে না। ঐ শ্রেণীর লোকের স্বভাব এই। ইতিহাসে দেখা যায়, যুগে যুগে এক দল লোক নিজেদের দেহের রক্তে পৃথিবীর বুক সিক্ত করে দিয়ে যায় আর এক দল লোকের জন্যে—তারা সেই রক্তপুষ্ট উর্ব্বর ধরিত্রীর বক্ষ থেকে অমৃত পান করে। তোমরা প্রথমোক্ত দলের, সত্য—পতঙ্গধর্ম্মী; আগুন দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়বে, কিন্তু যারা বুদ্ধিমান্ তারা তোমাদের পুড়তে উৎসাহ দিয়ে পেছনে থাকবে ফলভোগ করতে। এটাই জগতের ইতিহাসের ধারা।

শচীনবাবু গভীর অভিমানে চুপ করিলেন। হঠাৎ যেন তিনি বুঝিতে পারিলেন, আপনার খেয়ালে তিনি অপ্রাসঙ্গিক কতকগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। সত্য চিন্তা করিতেছিল—শচীনবাবু কি বলিলেন, তাঁহার কথাগুলির আসল তাৎপর্য্য কি?

খোকা সামনের উঠানে লাটু ঘুরাইতেছিল। সত্য অনেকক্ষণ সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, একটা কথা বলব ভয়!

—বল।

—আপনাকে কোন কথা বলতে আজকাল যেন ভয় হয়।

—কেন?

—জানি না, তবে হয়। আপনি এমন ভাবে কথা বলেন যার উপর তর্ক চলে না। আপনার দুঃখ···কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই সে থামিল।

শচীনবাবু হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, ভয় কি বল?

—আপনার মত শিক্ষিত লোক যাঁরা এখানকার হিন্দুদের আশাভরসা তাঁরা যদি এখান থেকে চলে যান তবে অশিক্ষিত হিন্দুজনসাধারণ তো একান্ত নিরুপায় হয়ে ভবিষ্যতে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হতে পারে—এমনি ভাবে তো এখানে হিন্দুর সত্তাই লোপ পেয়ে যেতে পারে।

শচীনবাবু বলিলেন, ওটা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। যেদিন তোমরা না খেয়ে, রোগে ভুগে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের আহ্বান করেছিলে সেদিন ত তারাই তোমাদের ধরিয়ে দিতে গিয়েছে—তারা তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লীগের সঙ্গে মিতালি করেছিল, সেদিন একথাই তারা বলেছিল কংগ্রেস বর্ণ-হিন্দু প্রধান। বর্ণ-হিন্দুর অত্যাচার ও ঘৃণা সহ্য করা অপেক্ষা ধর্মান্তর গ্রহণ শ্রেয়। তবে আজ তাদের কথা চিন্তা করে কি লাভ হবে। ব্রাহ্মণে চণ্ডালের অন্ন খেয়েও তার প্রীতি পায় নি, সহানুভূতি পায় নি—তার অন্তরকে জাগাতে পারে নি—

—সে জন্যে দায়ী তাদের শিক্ষার অভাব ও স্বার্থান্বেষীর প্ররোচনা। তারা ত দায়ী নয়।

—না জেনে বিষ খেলেও তার প্রতিক্রিয়া হয়। অজ্ঞতার জন্যে বিষের ক্রিয়া বন্ধ থাকে না।

—এটা অভিমানের কথা স্যর, যুক্তির কথা নয়—

শচীনবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, হয়ত নয়, তবে তাদের প্রীতি ও ভালবাসা লাভ করার জন্যে অপেক্ষা করার সময় আমার নেই। সে ধৈর্য্যও নেই। আমার বয়স হয়েছে, খোকাকে আমি উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে চাই—তোমরা অপেক্ষা কর, চেষ্টা কর। তরুণ মনের উদারতা নিয়ে আর একবার চেষ্টা কর।

শচীনবাবু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে সত্য বলিল, তা হলে আপনি যাচ্ছেন স্যর?

—হ্যাঁ, যথাসম্ভব শীঘ্রই যাব। তোমরাও যাবে, তবে কিছুদিন পরে। এখানে যখন মনে প্রাণে আনুগত্য স্বীকার করতে পারবে না, এদেশকে নিজের বলে ভাবতে পারবে না, তখন যাবে—

—যেখানেই যান, চিঠিপত্র দেবেন স্যর। দিদি কলকাতায়ই আছে। সেখানে তার সঙ্গে দেখা করতে একবার যাব—

শচীনবাবু বলিলেন, তোমার সে গচ্ছিত জিনিষটা তার কাছেই ছিল, তারপর কি হয়েছে জানি না—

—আমি জানি। ফেরত পেয়েছি—আপনি চিন্তিত হবেন না। সত্য প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল—

শচীনবাবু দূরের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। সাও-ক্লাব আজও আছে, কিন্তু বৈঠক নিয়মিত বসে না, শচীনবাবু ক্লাবের উদ্দেশ্যেই রওনা হইবেন কিনা ভাবিতেছিলেন।

শচীনবাবু চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া দেশে আসিলেন।

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের শ' পাঁচেক টাকা মাত্র সম্বল, তাহার উপর বেশী দিন নির্ভর করা চলে না। মহকুমা শহর হইতে মাইল চৌদ্দ দূরে তাঁহাদের বাড়ী, পৈতৃক বাড়ী ও জমিজমার তিনি কয়েক আনা অংশীদার, তাহাতে তাঁহার বিঘা দশেক জমি ও দালানের একটা কোঠা ছিল, আর একখানা টিনের ঘর তিনিই তুলিয়াছিলেন; পূজা ও গ্রীষ্মের বন্ধে আসিয়া মাঝে মাঝে থাকিতেন। বাল্যকালে এই বাড়ীর প্রাঙ্গণের ধূলা গায়ে মাখিয়া তিনি বড় হইয়াছিলেন, উঠানের এক প্রান্তে তাঁহারই মায়ের স্বহস্তে রোপিত একটা নারিকেল গাছে সবে ফল ধরিয়াছে। বাল্য-কৈশোর-যৌবনের শত স্মৃতিবিজড়িত এই বাস্তুভিটা,—এই পৈতৃক ভিটার উঠানেই নবোঢ়া মীরা তাঁহার পাশে প্রথম দাঁড়াইয়া গুরুজনদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিল। উহারই এক কোণে তাঁহার পিতার মৃতদেহের পাশে গঙ্গাজলি হইয়াছিল, এমনি কত স্মৃতি মনের মাঝে ভিড় করিয়া আসিতেছিল। তাঁহার মনে অতীতের শত স্মৃতি যেন জাগ্রত হইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল—এখানে তাঁহার মা বসিতেন, ওখানে বসিয়া মীরা কুটনা কুটিত, ওখানে বসিয়া তিনি খোকার ভাতের মন্ত্র পড়িয়াছিলেন। পিতৃ-পিতামহের পদরেণুকণাপূত এই বাস্তু-ভিটাকে পরিত্যাগ করিয়া চিরদিনের মত চলিয়া যাইতে হইবে—একথা ভাবিতেই যেন তাহার অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিত—বার বার বলিতেন, বিধাতা কোন্ পাপে এমনি করিয়া সুখের স্বর্গলোক হইতে আমায় বঞ্চিত করিলে। ইহার প্রতি ধূলিকণা, ইহার প্রতি বৃক্ষ, পত্র, সব যেন তাঁহার একান্ত আপনার—এ সব ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন? কোথায়—

যে অভিমান ও জ্বালা লইয়া শচীনবাবু আসিয়াছিলেন তাহা যেন ধীরে ধীরে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল—মাঝে মাঝে মনে হইত না হয় নাই গেলাম, আমার জীবনটা না হয় এখানকার ধূলিকণায়ই এক দিন মিশিয়া যাইবে, তাহার পর খোকা যেন তাহার যেখানে খুশি সেখানে আপনার ঘর বাঁধে।

মায়ের রোপিত বৃক্ষ, পিতার স্বহস্তনির্ম্মিত আসবাবপত্র, মীরার তৈরি রান্নাঘরের মৃত্তিকার জলপিঁড়ি সবকিছু একসঙ্গে যেন তাঁহার মনকে দুর্ব্বার ভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল—এই একান্ত আপনার গৃহ ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন, কোন্

সুদূরে? সে যেন মৃত্যুর পরপারের অজানা দেশ, একান্তই অপরিচিত।

মীরার মৃত্যু-সংবাদ গ্রামে নানা মুখে নানা রূপে পল্লবিত হইয়া রটিয়াছিল। কেহ বলিত মীরা লড়াই করিয়া মরিয়াছে, কেহ বলিত সে পুলিসের গুলিতে মরিয়াছে, কেহ বলিত অন্যরূপ।

গ্রামের লোকজন শচীনবাবুকে বুদ্ধিমান ও বিবেচক বলিয়া মনে করিত। তাহারা দুই চারি জন ব্যাকুল ভাবে শচীন বাবুকে প্রশ্ন করিল—বল ত, শচীন কি করি? দেশে কি থাকা যাবে? এত দিনের বাস্তুভিটা কি ত্যাগ করতে হবে!

বৃদ্ধ তারিণী চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করিলেন—এই বুড়ো বয়সে কোথায় যাব শচীন? সামান্য দুই-এক ঘর যজমান ও দু-চার বিঘে খামার এই নিয়ে কোনমতে আছি—এখন কি করব?

শচীনবাবু নীরব। এ সব প্রশ্নের উত্তর নাই—তার উত্তর নিহিত আছে ভবিষ্যতের গর্ভে। এই সব প্রশ্নের উত্তরে শচীনবাবু তাই নীরবই রহিলেন।

একজন প্রশ্ন করিলেন—এরা কি কেবল অত্যাচারই করবে—এত দিনের প্রেমপ্রীতি, বিশ্বাসের কোন মূল্য দেবে না—যে সব হিন্দু-পরিবারের গৃহিণীদের মা বলে ডাকে তাদেরও অপমান করবে।

এই সব কাতরোক্তির পিছনে রহিয়াছে বাস্তুভিটা আঁকড়াইয়া থাকিবার একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যক্ষ বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া ভাবপ্রবণ অন্তর অপ্রত্যক্ষ আশার উপর নির্ভর করিতে চাহিতেছে।

তারিণী খুড়ো কহিলেন—যে সমস্ত ছোকরা মুখ তুলে কথা বলে নি, বলতে সাহস পায় নি—কটে, গোদো, ছামাদ সর্দার, সম্বা, আহাদ—তারা ভটচায্যিদের পুকুরঘাটে বসে শুনিয়ে শুনিয়ে নাম ধরে ধরে বলে, অমুককে বিয়ে করব, অমুকের বৌকে নিকে করব। স্বকর্ণে এ সব কথা শুনে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু মুখ বুজে থাকতে হয়, প্রতিবাদের সাহস নেই। তারা বলে···

তারিণী খুড়ো কি বলিতে যাইয়া চোখের জল ছাড়িয়া দিলেন—প্রসঙ্গটা একান্ত বেদনাদায়ক। তাঁহার কুমারী কন্যা বাসন্তী সুন্দরী সবে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে পাত্রস্থ করা সম্ভব হয় নাই—তাহাকে উহারা জোর করিয়া লইয়া যাইবে এইরূপ একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যাইতেছে—তারিণী খুড়ো তাই সর্বদা সচকিত আতঙ্কে কালাতিপাত করিতেছেন।

শুনিয়া শচীনবাবু ব্যথিত হইলেন, কিন্তু করিবার কিছু নাই—পুলিসে সংবাদ দিয়া লাভ নাই, বিপরীত ফল হইতে পারে।

শচীনবাবু বলিলেন—আমার মনে হয় সংসারে দুই রকমের লোক আছে। একদল যারা বেঁচে থাকাটাকেই বড় মনে করে, তার জন্যে সম্মান আত্মমর্য্যাদা বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, আর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা নিজের, সমাজের ও দেশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে জীবন বিসর্জন দেয়। যারা প্রথম শ্রেণীর তারা যাবে না, যারা দ্বিতীয় শ্রেণীর তারা যাবে—বেঁচে থাকতে নয়, মরতেই। কিন্তু ভাবছি এত লোকের ব্যবস্থা কে করবে, তা ছাড়া সেখানে চোরা-কারবারী আর সুবিধাবাদীরা নিজেদের স্বার্থের জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে।

—তুমি কি যাবে?

—হ্যাঁ, যাবই স্থির করেছি, এই গ্লানি ও অসম্মানের মাঝে বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া আমার কি আছে? কোন্ আকর্ষণে থাকব?

—তারিণী খুড়ো বলিলেন—তোমার কি শচীন, বিদ্যেবুদ্ধি আছে, যেখানেই যাবে ভগবানের কৃপায় অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে নিতে পারবে, কিন্তু আমরা—

—একই কথা খুড়ো—সেখানে আমার মত [illegible]ন লাখো লাখো আছে। যাবেও অনেকে, [illegible] কাজেই সমস্যার কোনও সমাধান হবে বলে মনে [illegible] না। তবে—না বাঁচতে পারি মরব তাতে আমার দুঃখ নেই—

আলোচনা চলে, কিন্তু কিছুই মীমাংসা হয় না—আলোচনা সমস্যার জটিলতা সম্বন্ধে তাঁদের অধিকতর সচেতন করিয়া তোলে মাত্র। সকলেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজ নিজ বাড়ীর দিকে রওনা হন।

জমির খরিদ্দার সংগ্রহের চেষ্টায় সে দিন শচীনবাবু বৈকালে বাহির হইলেন। হিন্দু খরিদ্দার নাই, মুসলমান ছাড়া কেহই জমি কিনিবে না। পরিচিত দুই-চার জন মুসলমান মাতব্বরের কাছে কথাটা প্রকাশ করিলে হয়ত ক্রেতা জুটিতে পারে।

কিন্তু পথে যাইতে যাইতে একটা ঘটনায় তাঁহাকে থামিতে হইল। ভট্টাচার্য্যরা পুরাতন বর্দ্ধিষ্ণু ঘর, গ্রামের সকলেই তাঁহাদিগকে ভয়ভক্তি করিয়া চলে; সেটা তাঁহাদের অর্থের জন্যই নয়, তাঁহারা পরোপকারী ও একমাত্র তাঁহাদেরই চেষ্টায় ও অর্থে গ্রামে যাহা কিছু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে সেইটাই প্রধানতম কারণ।

কে একজন নিষেধ না মানিয়া তাঁহাদের পুকুরে ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছে, প্রতিবাদ গ্রাহ্য করে নাই। ফলে একটা বচসা চলিতেছিল।

—তুমি জোর করে দিনদুপুরে মাছ ধরে নিয়ে যাবে ?

মুসলমান যুবকটি হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে না, জোর করব কেন ? এত দিন আপনারাই ত সব ভাল মন্দ খেয়েছেন, এখন পাকিস্থান হয়েছে আমরাও একটু খেয়ে নি—এর মধ্যে জোরজবরদস্তির তো কিছুই নেই।

সে নির্বিকার চিত্তে ছিপ তুলিয়া টোপ পাল্টাইয়া ধীরে সুস্থে পুনরায় মৎস্যশিকারে মনোনিবেশ করিল। ভট্টাচার্য্য মশায় বলিলেন—দেখ শচীন কথার ছিরি, এদের জন্যে ইস্কুল হাসপাতাল করেছি আমরা।

শচীনবাবু কহিলেন—পাকিস্থান হয়েছে তার মানে কি এই যে, হিন্দুর সব কেড়ে নেওয়া যায়—স্বাধীন হওয়ার অর্থ কি তাই ?

—আজ্ঞে না, তবে ধরুন আপনাদের খেয়েই ত আমরা আছি—আপনাদের খেয়েই থাকব—দু'একটা মাছ ধরলে আর আপনাদের কি ক্ষতি ?

—সকলেই যে ধরতে চাইবে—

—আজ্ঞে তাই ঠিক হয়েছে, কাল জাল নিয়ে সকলেই আসবে আমি একটু আগেই এসেছি।

—তা হলে মোদ্দা কথা তুমি উঠবে না, মাছ ধরবেই।

—উঠবু বৈ কি মাছ পেলেই উঠব।

শচীনবাবু বুঝিলেন বাদানুবাদে লাভ নেই—যুবকটির কথা বলিবার ভঙ্গীতে তেমনি ব্যঙ্গ ও তাচ্ছিল্য সুপরিস্ফুট। তিনি কহিলেন—এখানে বাস করতে হলে এ ধরণের অত্যাচার সহ্য করতেই হবে—

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন—সেদিন কথা নেই, বার্ত্তা নেই—দেখি দু'জন নারিকেল গাছে উঠেছে, জিজ্ঞাসা করলে ঠিক এমনি জবাব দিলে—এখন আপনাদেরই ত খাবো—অর্থাৎ এখন ওরা ইচ্ছামত আমার তোমার সবকিছুই খাবে, নেবে, এতে প্রতিবাদ করা চলবে না—

শচীনবাবু কহিলেন—তাই ত দেখছি—

তিনি ফিরিয়া আসিলেন, আজিকার ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার অন্তরে আর কোনরূপ দ্বিধা রহিল না—যত শীঘ্র সম্ভব এই স্থান ত্যাগ করাই সঙ্গত।

ও ছেলেটিকে তিনি জানেন—ও প্রাইমারী পাস করিয়া কয়েক বৎসর মাদ্রাসায় পড়িয়া মৌলবী হইয়াছে। উগ্র সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধিতে কলুষিত ওর মন।

শচীনবাবুর মনে নানা চিন্তার উদ্রেক হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—সকল দেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রহিয়াছে। কিন্তু তাদের অবস্থা এত শোচনীয় নয়। কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত জনসাধারণ—এদের বিশ্বাস করা চলে না—এদের ভালমন্দ বিচার-শক্তি নাই। তাহাদের উগ্র প্রবৃত্তি কখন যে উৎকট উল্লাসে জাগিয়া উঠিয়া চরম সর্ব্বনাশ সাধন করিবে তাহার ঠিক নাই। এই অনিশ্চয়তা, এই অসম্মানেরও মাঝে মানুষ বাস করিতে পারে না।

ঘটনাটা হয় ত সামান্য, কিন্তু তাহা বাস্তুভিটার প্রতি শচীন বাবুর আসক্তিকে দূর করিয়া দিল। তিনি পূর্ণোদ্যমে বাস্তু ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শচীনবাবু কিছু জমি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন জলের দরে। বিঘা প্রতি দর হয় ত ছয় শত, তিনি তাহা তিন শত টাকায় দিয়া দিলেন। অর্দ্ধেক জমি বিক্রয় করিয়া কোনরূপে বার শত টাকা সংগ্রহ করিলেন। পাড়ার সকলে হা হা করিয়া উঠিল—মাটি-ই সোনা, সোনা চুরি যায়, কিন্তু এ কখনো চুরিও হয় না, জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, তাকেই তুমি এমনি করে নষ্ট করছ—

তারিণী খুড়ো এক দিন কহিলেন—তোমার বাবা পেটে গামছা বেঁধে এই ক' বিঘা জমি করেছিল—সে চলে গেছে, তাকে এ দৃশ্য দেখতে হ'ল না। কিন্তু আমি যে সহ্য করতে পারছি না। তোমার বাবার সে কি টান, কি ভালবাসা ছিল এই জমির উপর—বৃদ্ধ তারিণী খুড়ো অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

শচীনবাবুর হৃদয়ের কোমলতম স্থানে বার বার আঘাত করিয়া তাঁহার মনকে এঁরাই দুর্ব্বল করিয়া দিতেছিলেন, তিনি বলিলেন—ইচ্ছা করে ত করছি না, কিন্তু এর মাঝে কেমন করে থাকি ?

বাকী জমির খরিদ্দার স্থির হইয়াছিল, কিন্তু অকস্মাৎ তাহারা সকলেই জমি কিনিতে অস্বীকার করিল। কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল মৌলবী মাতব্বরগণ প্রচার করিয়াছেন যে, হিন্দুরা চলিয়া গেলে জমি বিনা পয়সায়ই পাওয়া যাইবে—অতএব টাকা দিয়া কেনা নিরর্থক। তাহার কথায় মুসলমানেরা বিনা মূল্যে ভূমিলাভ করিবার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া হিন্দুদের প্রস্থানের অপেক্ষায় আছে।

শচীনবাবু অতঃপর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ে তৎপর হইলেন ! ঘটি বাটি পিঁড়ি খাট, পালঙ্ক, আলমারী চেয়ার টেবিল—পুরুষানুক্রমে বাড়ীতে কত জিনিষই না সঞ্চিত হইয়াছে ! তিনি টিনের ঘরখানিও বিক্রয় করিয়া দিলেন।

এমনি করিয়া আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ হইল।

একটু ঠাণ্ডা লাগিয়া শচীনবাবু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। জ্বর সামান্য, কিন্তু ভয়ানক মাথার যন্ত্রণা। দালানে শুইয়া ছিলেন। খোকা তাহার সাধ্যমত পরিচর্য্যা করিতেছিল।

সেদিন টিনের ঘরের ক্রেতা মিস্ত্রি ও লোকজন লইয়া চালের টিন খুলিতে আরম্ভ করিল—টিনের উপর হাতুড়ির

আঘাতের শব্দ হইতেছে অত্যন্ত তীব্র। প্রতিটি আঘাতের শব্দে মনে হইতেছে যেন তাঁহার মাথায় হাতুড়ি পিটিতেছে। আওয়াজ অসহ্য হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই।

শচীনবাবু চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন—এক একখানা টিন খুলিয়া পড়িতেছে, বেড়া অপসারিত হইতেছে···

মনে পড়িল, তিনি নিজে মিস্ত্রির সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া এইগুলি করিয়াছিলেন, কত শ্রমে কত যত্নে কত আশা-উদ্দীপনা লইয়া। তাঁহার মায়ের ও মীরার সযত্ন পরিমার্জ্জনে ঘরদোর যেন পবিত্র হইয়া উঠিত। দীর্ঘকালের স্মৃতিবিজড়িত পিতামহী-জননী-গৃহিণীর কল্যাণকরস্পর্শপুত সেই বাস্তভিটা শূন্য হইতে চলিয়াছে।

শচীনবাবুর বুকের মাঝে হাহাকার করিয়া উঠিল—কোথায় স্বর্গতা মাতা, কোথায় মীরা? তাঁহাদের অন্তরও কি আজ এমনি হাহাকার করিতেছে?

টিনের উপর অবিরত হাতুড়ির আওয়াজ যেন সরাসরি একেবারে মাথার ভিতরে গিয়া ঢুকিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বার বার চোখ ভরিয়া জল আসিতেছে।

শচীনবাবু ব্যাকুল ভাবে কহিলেন, খোকা, ওদের একবার ডাক্, উঃ! আর ত পারি না।

খোকা ডাকিয়া আনিল। ক্রেতা নিজেই আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল।

শচীনবাবু ব্যগ্রভাবে কহিলেন, বড় মাথা ধরেছে, হাতুড়ির শব্দ সহ্য হচ্ছে না, আর এক দিন না হয় ভাঙতে—

—এতগুলি লোক এনেছি।

—আমি দু'চার দিনের মধ্যেই চলে যাব, তার পরেই না হয় ঘরখানা নিয়ে যেতে—

—এতগুলি লোকের মজুরী খামোকা দিতে হচ্ছে—তাতে ঘর কিনে আমার লোকসান হয়েছে—

শচীনবাবু কহিলেন, লোকসান হয়েছে?

—হ্যাঁ, সবাই বলছে, আর দুই-চার মাস পরে এরকম ঘর এমনিই পাওয়া যাবে—আর তা যদি নাও হয় তা হলে বিশ-পঞ্চাশ টাকায় তো নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে!

শচীনবাবু হতাশভাবে পুনরায় শুইয়া পড়িলেন। লোকটি সান্ত্বনা দিবার সুরে কহিল, এই ত হয়ে গেছে, একটু কষ্ট করে থাকুন—

শচীনবাবু শুইয়াই রহিলেন—ঘরের টিনগুলির সঙ্গে সঙ্গে বুকের পাঁজরগুলিও যেন খুলিয়া পড়িতেছে। নিদারুণ বেদনায় উৎসারিত অশ্রু গোপন করিতে তিনি বিছানায় মুখ গুঁজিয়া মৃতের মত পড়িয়া রহিলেন।

সুস্থ হইয়া শচীনবাবু দেরী করিলেন না। একটা শুভদিন দেখিয়া নৌকা ঠিক করিয়া ফেলিলেন।

খালের ঘাটে নৌকায় প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বোঝাই হইল—শচীনবাবু পুরাতন মণ্ডপে শেষ প্রণাম করিয়া খোকাকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। প্রতিবেশী স্ত্রী-পুরুষ সকলে সমবেত হইলেন বিদায় দিতে।

তারিণীখুড়ো কহিলেন, আমাদের ফেলে রেখে ত চললে বাবা! কপালে কি আছে জানি না—যদি সময় হয় মাঝে মাঝে না হয় এমনিই বেড়াতে এস।

শচীনবাবু ফিরিয়া চাহিলেন, পিছনে দেখা যায় তাঁহাদের ভিটার উপর ন্যাড়া খুঁটিগুলি দাঁড়াইয়া আছে। পূর্ব্বপুরুষের অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া তাহারা যেন সূর্য্যকিরণে চক্ চক্ করিতেছে। এই গৃহ—ইহারই আকর্ষণে কত শত ক্রোশ অতিক্রম করিয়া প্রবাসী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

খোকা প্রশ্ন করিল, আমরা আর বাড়ী আসব না বাবা!

শচীনবাবুর বুকের মাঝে রুদ্ধ ক্রন্দন গুমরিয়া মরিতেছিল। তিনি কহিলেন, না বাবা, এই শেষ—

কথাটির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, মাঝি নৌকা ছাড়ো—

তাঁহার অন্তর আর্ত্তনাদ করিতেছে। ফিরিয়া দেখেন শূন্য ভিটায় সেই একক খুঁটিগুলি সহস্র স্মৃতির পতাকা উড্ডীন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘাটের পার্শ্বে অপসৃয়মান জনতার পাছে অশ্রুচোখে দাঁড়াইয়া আছে কিরণের মা—তাহার মায়ের সমবয়সী নমশূদ্র বিধবা।

শচীনবাবু পঞ্জিকা দেখিয়া শুভদিনেই রওনা হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু দিনটা সত্যই শুভ কিনা তাহা বলা কঠিন।

কলিকাতার উপকণ্ঠে তাঁহার এক আত্মীয় চাকুরী করিতেন, তিনি প্রথমে তাঁহারই আশ্রয়ে আসিয়া উঠিলেন। তিনি জানিতেন বেশী দিন এ আশ্রয়ে থাকা চলিবে না—স্থান নাই, রেশনের মাপাজোখা চাল, এখানে দু'চার দিনের বেশী থাকা সঙ্গত নয়। তিনি একটা বাসা খুঁজিতে লাগিলেন। যা জোটে তিনি ও খোকা উভয়ে মিলিয়া রাঁধিয়া খাইবেন, মাষ্টারী টিউশনি করিয়া শ'খানেক টাকা রোজগার করিতে পারিলে, ধীরে ধীরে একটু জায়গা কিনিয়া খোকার মাথা গুঁজিবার একটু ঠাঁই করিয়া দেওয়াও হয়ত অসম্ভব হইবে না। তাহা হইলেই তাঁহার ছুটি।

বাসা খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু বাসা কোথায়? লাখো লাখো লোক আসিয়া গ্যারেজ, গোয়াল, ভাঙা-বাড়ী সবই উচ্চহারে ভাড়া করিয়া ফেলিয়াছে। কোথাও তিল ধারণের স্থান নাই। বাসাটা আত্মীয়বাড়ীর নিকটে হইলেই ভাল হয়—তিনি এখানে ওখানে গেলে খোকার বাড়ীতে থাকিতে অসুবিধা হইবে না এবং তাঁহারা তাহাকে একটু দেখাশুনাও করিতে পারিবেন। বহু চেষ্টায় নিকটেই একটা বাড়ীর সন্ধান

পাওয়া গেল—তাহা বড় বাড়ী, একপাশ ধ্বসিয়া গিয়াছে, সেখানে অশ্বত্থ গাছ জন্মিয়াছে, কিন্তু অন্যপার্শ্বের দুইটি ঘর ভাল আছে, একটিতে রান্নাবান্না চলে ও অন্যটিতে থাকা যায়। এই বাড়ী ভাড়া হইতে পারে তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। আত্মীয়টিকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীওয়ালার সহিত শচীনবাবু দেখা করিলেন। তাঁহারা কলিকাতাবাসী, পূজায় বাড়ীতে আসেন, ধুমধাম সহকারে পূজা করিয়া চলিয়া যান—দানধর্ম্ম যথেষ্ট। শুনিয়া শচীনবাবু আশান্বিত হইয়াছিলেন।

কলিকাতায় মালিকের বাড়ী বিরাট। সামনেই কল, তাহার পাশে গ্যারেজ—তিনখানি মোটর। কর্ত্তা বাড়ীতেই ছিলেন, শচীনবাবুর আত্মীয় পাঁচুবাবুকে তিনি চিনিতেন। বলিলেন—এস হে পাঁচু, কলকাতা এসেছ কেন? বাজার করতে—

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পরে পাঁচুবাবু প্রস্তাব করিলেন, এই ভদ্রলোক বাস্তুত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছেন, আপনাদের পুরনো ভাঙা বাড়ীতে এঁকে যদি আশ্রয় দেন।

—নিশ্চয়ই। ওদের সাহায্য করাই উচিত, কেন করব না? জায়গা জমি বাসা ত দিতেই হবে!

—উনি দরিদ্র শিক্ষক ছিলেন, বর্ত্তমানে বেকার, আপনারা বড়লোক, ভাড়া আর কি নেবেন?

মালিক হাসিয়া সিগারেটের ছাই ঝাড়িয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—সেটা ঠিকই বলেছ পাঁচু, দেওয়াই উচিত, কিন্তু একটা নিয়মিত ভাড়া না দিলে ওরও দাবি থাকে না, আর ধর আমারও মতিভ্রম হয়ে কোন দিন বলতে পারি উঠুন মশায়। কিন্তু ভাড়া দিলে আজকাল আইনে আর ওঠাবার উপায় নেই। একটু থামিয়া তিনি পুনরায় হাসিয়া বলিলেন, বুঝেছ, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কাজ করতে হয়। আমি একাই ত মালিক নয় সরিক আছে—

শচীনবাবু কথাটার সত্যতা উপলব্ধি করিলেন। তিনি বলিলেন, তা হলে ভাড়াটা···

—হ্যাঁ, কিন্তু সেটা আমি ত বলতে পারি না। দশ জনের অংশ আছে—আমি যদি কম ভাড়া বলে ফেলি ভায়ারা বলবেন, বাড়ী ভাড়া দেওয়াটা আমাদের ব্যবসা, বাড়ীগুলো ধর্ম্মশালা নয়। তাই বলি পাঁচু, আমি ওখানকার সরকার কেষ্টকে বলে দেব তার সঙ্গে ঠিক করে নিও। সে উচিত ব্যবস্থা করে দেবে, আমারও দোষ রইল না, তোমাদেরও কাজ হাসিল।

তাঁহারা বিদায় লইলেন। শচীনবাবু ভদ্রলোকের কথায় সহানুভূতির সুর লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইলেন।

দুই চার দিন পরে সরকার কেষ্ট জানাইল, হুকুম আসিয়াছে, ভাড়া মাসিক ২৫৲ টাকা।

পাঁচুবাবু চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, বল কি? ছ'মাস আগে এর ভাড়া আট আনাও হ'ত না, ২৫৲ টাকা চাইছে—

—আমার হাত ত নয়, বাবু বলেছেন। তিনি বললেন, যে রকম রিফুজি আসছে তাতে তিরিশ টাকা পর্য্যন্ত ভাড়া হবে—আর বলতে কি সকালেই এক ভদ্রলোক ২০৲ টাকা বলে গেছে—

শচীনবাবু চিন্তা করিলেন। পাঁচুবাবু বলিলেন, মানুষ বিপদে পড়লে কি এমনি করে তাকে শোষণ করা ভাল, না এটা ধর্ম্ম?

কেষ্ট হাসিয়া বলিল, বাবু বলেন, মানুষ বিপদে না পড়লে টাকা দেয় না।

শচীনবাবু অনেক চিন্তা করিলেন, কুটুম্বের গলগ্রহ হইয়া থাকা যায় না। যাহা হউক, দুই চার মাস থাকিয়া কোথাও চাকুরী পাইলে সেখানেই চলিয়া যাইবেন, কয়েক মাস না হয় ভাড়া দিলেনই। শচীনবাবু পাঁচুবাবুকে তাহার মত জানাইলেন, পাঁচুবাবুও একটু হৃষ্টভাবে বলিলেন, যা বলছেন, অবস্থা যা হয়েছে শেষে ঐ বাড়ীই হয়ত চল্লিশ টাকা ভাড়া হবে।

অতএব শচীনবাবু খোকাকে লইয়া ভাড়াবাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন।

প্রথম দিন নূতন বাসায় যাইয়া খোকা মহা পুলকিত হইল—সে পরম উৎসাহে ভাঙ্গা হাতে জল আনিল, চাল ধুইল, শচীনবাবু কোন মতে খিচুড়ি রাঁধিয়া নামাইলেন। খোকা খাইতে খাইতে পরম উৎসাহে বলিল, বেশ হয়েছে, বাবা, আমিও ত রাঁধতে পারি।

আহারান্তে প্রথম কাজ রেশনকার্ড করিতে রেশন আপিসে যাওয়া। খোকাকে বাসায় থাকিতে বলিয়া শচীনবাবু রওনা হইলেন। রেশন আপিসে দরখাস্ত দিয়া জানিতে পারিলেন, পনর দিন বাদে কার্ড পাওয়া যাইবে।

তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু এই দুই হপ্তা কি খাব?

কর্ম্মচারীটি জবাব দিলেন, এতদিন যা খেয়েছেন তাই খাবেন।

—তা হলে প্রকারান্তরে আপনারা কালোবাজারে কিনতে বলছেন।

—আমরা বলি না, তবে মানুষ প্রয়োজনে করে··· আমরা ইনস্পেক্টর পাঠাব, তাঁরা রিপোর্ট দেবেন, তার পর কার্ড লেখা হবে ইত্যাদি—তাতে পনর দিন কি বেশী সময়?

—কিন্তু আপাততঃ পনের দিনের খাবার দিতে পারেন না? আর একটু কেরোসিন—

—সে অনেক দেরি, কার্ড পাকা হবে তারপর—

—ততদিন।

—বাতি জ্বালাবেন, দেশী বাতি, দেশী শিল্পের উন্নতি হউক—তিনি চলিয়া গেলেন। শচীনবাবু বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। লোকটি যাহা বলিয়াছে তাহার সবই সত্য।

শচীনবাবু ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, খোকা সারা দ্বিপ্রহর অশেষ শ্রমে ঘর সাজাইয়াছে, তাহার ফলে সব তচনচ হইয়া গিয়াছে। জল আনিতে ঘর ভিজিয়াছে, বাসন গোছাইতে কাপ ভাঙিয়াছে, বিছানা করিতে বালিশ ছিঁড়িয়াছে ইত্যাদি। তিনি পুনরায় সমস্ত গুছাইয়া বাহিরের বারান্দায় বসিলেন। এক ভদ্রলোক অদূরে গামছা পরিয়া হুঁকা টানিতেছিলেন, তিনি নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি বুঝি ভাড়া নিয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

উভয়ের পরিচয় হইল। শচীনবাবু জানিতে পারিলেন, ভদ্রলোক বাড়ীতেই থাকেন, কিছু ভূসম্পত্তি আছে, তাহাতে কোনমতে চলিত, বর্ত্তমানে দুইখানা বাড়ী ভাড়া দিয়া ভাল ভাবেই চলিতেছে। শেষে বলিলেন, তবে আমি ত বড়লোক নয় তাই বুঝি আপনাদের দুঃখ, আগে ত এখানকার বাড়ী ভাড়াই হ'ত না, অধিকন্ত লোক রাখতে হ'ত দেখাশোনার জন্যে। এখন সেখানে ভাড়া পাচ্ছি...পাঁচখানা ঘর পঁচিশ টাকা ভাড়া। মন্দ কি? বেশ চলে যাচ্ছে, জিনিষপত্রের দাম যদি বাড়ে বলব তাদের আরও কিছু দিতে। অধর্ম্ম করব না—তবে ওঁরা বড়লোক, ওঁরা ত আপনার কাছে পঁচিশ টাকা নেবেনই, আগে জানলে আমি একখানা ঘর আপনাকে দিতাম. কিন্তু এখন—

শচীনবাবু সমবেদনায় একটু বিচলিত হইয়া বলিলেন, সকলেই ত ধর্ম্মভীরু হয় না। তবে আপনি ভাববেন না, চাকুরির চেষ্টা করছি, পেলেই চলে যাব। আপাততঃ আশ্রয়টুকু চাই। (ক্রমশঃ)

কলিঙ্গদেশে গুপ্ত অধিকার

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি

মোটামুটি বলিতে গেলে মহানদী ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী বঙ্গোপসাগরের তীরবর্ত্তী অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল কলিঙ্গ। অবশ্য মহানদীর উত্তর-পূর্ব্বদিকৃস্থিত বৈতরণী নদীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলও প্রাচীন কলিঙ্গ দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ইহা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক অর্থের কলিঙ্গ। সঙ্কীর্ণ অর্থে কলিঙ্গ বলিতে কেবল আধুনিক পুরীগঞ্জম্ অঞ্চল বুঝাইত। কালিদাসকৃত রঘুবংশে (আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ) কলিঙ্গরাজকে 'মহেন্দ্রনাথ' অর্থাৎ মহেন্দ্র পর্ব্বতের অধীশ্বর বলা হইয়াছে। এই মহেন্দ্র পর্ব্বত আধুনিক গঞ্জম্ জেলার অন্তর্গত মহেন্দ্রগিরি। কালিদাসের যুগে কলিঙ্গ দেশের পূর্ব্বোত্তর দিকে উৎকল দেশ অবস্থিত ছিল। আধুনিক বালেশ্বর জেলা এবং মেদিনীপুর ও কটকের কিয়দংশ উৎকলের অন্তর্গত ছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী ও তন্নিকটবর্ত্তী সময়ের কতকগুলি তাম্রশাসনে দেখা যায়, সিংহপুর, বর্দ্ধমান, দেবপুর, পিষ্টপুর প্রভৃতি স্থানের নরপতিগণ আপনাদিগকে কলিঙ্গাধিপতি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। গঞ্জম্ জেলার চিকাকোল বা শ্রীকাকুলমের নিকটবর্ত্তী আধুনিক সিঙ্গুপুরম্ নামক গ্রামই প্রাচীন সিংহপুর। বর্ত্তমান বিশাখপত্তনম্ জেলার পালকোণ্ড তালুকের অন্তর্গত বাদামা বলিয়া মনে হয়। দেবরাষ্ট্র নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী দেবপুর ঐ জেলার য়েল্লামঞ্চি তালুকে অবস্থিত ছিল। পিষ্টপুর আধুনিক গোদাবরী জেলার অন্তর্গত পিঠাপুরম্ নামক স্থান। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে প্রাচ্য গঙ্গবংশীয় রাজগণ কলিঙ্গনগর (অর্থাৎ আধুনিক গঞ্জমের অন্তর্গত মুখলিঙ্গম্) এবং চিকাকোলের নিকটবর্ত্তী দন্তপুর নগরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা আপনাদিগকে কলিঙ্গাধিপতি বা ত্রিকলিঙ্গাধিপতি বলিয়া প্রচার করিতেন। খ্রীষ্টীয় ৪৯৬-৯৮ অব্দ মধ্যের কোন তারিখ হইতে প্রাচ্য গঙ্গ-রাজগণের ব্যবহৃত সালের গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহারা মহেন্দ্রগিরির শিখরবর্ত্তী গোকর্ণেশ্বর শিবের ভক্ত ছিলেন। প্রাচ্য চালুক্যবংশীয় রাজগণের লিপিতে বিশাখপত্তনম্ জেলার অংশবিশেষকে মধ্যমকলিঙ্গ বা এলামঞ্চি কলিঙ্গ দেশ বলা হইয়াছে

গুপ্তবংশীয় মহাপরাক্রান্ত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণাপথের অনেক রাজ্যাধীশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে ইহার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই লিপিতে কলিঙ্গ দেশের কোন উল্লেখ নাই। ইহা হইতে মনে হয়, চেদি-মহামেঘবাহন বংশের অধঃপতনের পর কলিঙ্গ দেশ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছিল। এই বংশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নরপতি 'কলিঙ্গ চক্রবর্ত্তী' খারবেল খ্রীষ্টপূর্ব্ব

প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন বলিয়া জানা যায়। সম্ভবতঃ এই বংশে শিশুপাল নামক অপর একজন নরপতি ছিলেন এবং ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী শিশুপালগড় তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহাভারতে শিশুপালসংজ্ঞক চেদিরাজের উল্লেখ দেখা যায়। তাঁহার নামানুসারেই কলিঙ্গের জনৈক চেদিবংশীয় রাজার নামকরণ অসম্ভব নহে। যাহা হউক, সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক বিজিত দক্ষিণাপথের রাজগণের তালিকায় কলিঙ্গ অঞ্চলের কতিপয় নরপতির উল্লেখ আছে। ইঁহারা কোট্টুরপতি স্বামিদত্ত, পিষ্টপুররাজ মহেন্দ্র গিরি, এরণ্ডপল্লপতি দমন এবং দেবরাষ্ট্ররাজ কুবের। মহেন্দ্র গিরির সমীপবর্ত্তী কোঠুর নামক স্থানকে প্রাচীন কোট্টুর বলিয়া মনে করা হয়। এরণ্ডপল্ল আধুনিক চিকাকোলের নিকটে অবস্থিত ছিল। এলাহাবাদ-লিপি হইতে মনে হয় যে, সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণাপথ-রাজগণকে পরাজিত করিবার পর ঐ নরপতি-দিগকে পুনরায় স্ব-স্ব রাজ্যে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণাপথের কোন রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। তবে দক্ষিণ-ভারতের নানা অঞ্চলে গুপ্তপ্রভাব বিস্তারের অন্তবিধ কিছু কিছু প্রমাণ আছে। বেরার অঞ্চলের বাকাটক রাজবংশ এবং কর্ণাটদেশের কদম্বরাজ-পরিবারের সহিত গুপ্তসম্রাটগণ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। কদম্ববংশীয় নরপতি কাকুৎস্থবর্ম্মার একখানি তাম্রশাসনে গুপ্তসংবতের ব্যবহার দেখা যায়। দক্ষিণ কোশল অর্থাৎ আধুনিক ছত্রিশগড় অঞ্চলের রাজা ভীমসেনের আরং তাম্রশাসনেও গুপ্তাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দক্ষিণ কোশলরাজ প্রসন্নমাত্রের মুদ্রায় গুপ্তপ্রভাব লক্ষিত হয়। সম্প্রতি মহেন্দ্রাদিত্য নামক অপর একজন কোশলরাজের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি সম্ভবতঃ গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্যের সামন্ত মধ্যে গণ্য ছিলেন। অনেকদিন পূর্ব্বে সাতারা জেলায় কুমারগুপ্তের বহুসংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

কলিঙ্গদেশেও গুপ্তসংবতের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের বালুগাঁ ষ্টেশনের নিকটে সালিয়া (প্রাচীন সালিমা) নদী প্রবাহিতা। ইহার তীরে কোঙ্গোদ নগরী অবস্থিত ছিল। কোঙ্গোদে শৈলোদ্ভববংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। শৈলোদ্ভববংশীয় সৈন্যভীত দ্বিতীয় মাধববর্ম্মা গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের সামন্ত ছিলেন। ৩০০ গুপ্তাব্দের তারিখ-সংবলিত তাঁহার একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, মেদিনীপুরে আবিষ্কৃত শশাঙ্কের রাজত্বকালীন তাম্রশাসনদ্বয়ে গুপ্তসংবতের ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্তু প্রায় সমসাময়িক শত্রুভঞ্জ নামক উত্তর ও দক্ষিণ তোসলীর জনৈক নরপতির তাম্রশাসনে গুপ্তাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আধুনিক বালেশ্বর অঞ্চল উত্তর তোসলীর এবং পুরী, কটক ও গঞ্জামের কিয়দংশ দক্ষিণ তোসলীর অন্তর্গত ছিল। সুতরাং প্রাচীন কলিঙ্গের পূর্ব্বোত্তর অঞ্চলেরই পরবর্ত্তীকালীন নাম দক্ষিণ তোসলী। অশোকের যুগে তোসলী (পুরী জেলার অন্তর্গত ধৌলি) কলিঙ্গ দেশের অন্যতম প্রধান নগরী ছিল। সম্ভবতঃ প্রাচ্য গঙ্গেরা কলিঙ্গনগরে রাজত্ব আরম্ভ করার পর উত্তর কলিঙ্গের নরপতিগণ স্বরাজ্যের স্বতন্ত্র নামকরণের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। যাহা হউক, উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, কলিঙ্গ দেশে গুপ্তপ্রভাব বিস্তারের কিছু প্রমাণ আছে। কিন্তু উহাতে প্রমাণ হয় না যে, কলিঙ্গ এক সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। সদ্য আবিষ্কৃত একখানি তাম্রশাসন এই সম্পর্কে নূতন আলোক-পাত করিয়াছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে উড়িষ্যার খল্লিকোট রাজ্যের অন্তর্গত সুমণ্ডলগ্রামের মৃত্তিকাস্তূপ হইতে একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। ব্রহ্মপুর হইতে প্রকাশিত 'মনোরমা' পত্রিকায় ইহার বিবরণ এবং চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই লিপির প্রথম ছয় পঙ্‌ক্তির পাঠ নিম্নরূপ :

১। [সিদ্ধম্।] স্বস্তি ॥ চতুরুদধিমেখলায়াং
সপ্তদ্বীপপর্ব্বতসরিৎপত্তন—
২। ভূষণায়াং বসুন্ধরায়াং বর্ত্তমানগুপ্তরাজ্যে বর্ষশতদ্বয়ে
৩। পঞ্চাশদুত্তরে কলিঙ্গরাষ্ট্রমনুশাসতি শ্রীপৃথিবীবিগ্রহ—
৪। ভট্টারকে তৎপাদানুধ্যাতঃ পল্লখোল্যাং
মহারাজোভয়ান্বয়ো
৫। বপ্পদেব্যামুৎপন্নতনুঃ সহস্ররশ্মিপাদভক্তো
মহারাজ-ধর্ম্মরা
৬। জঃ কুশলী পরকৃথলমার্গ্‌গ বিষয়ে বর্ত্তমানভবিষ্যৎসামন্ত

—ইত্যাদি। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, গুপ্তসংবতের ২৫০ বর্ষে গুপ্তসম্রাট্‌গণের অধীন কলিঙ্গরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা ছিলেন পৃথিবী-বিগ্রহ এবং তাঁহার সামন্ত মহারাজ উভয়ের বংশধর বা পুত্র রাজ্ঞী বপ্পদেবীর গর্ভজাত মহারাজ ধর্ম্মরাজ আধুনিক খল্লিকোট অঞ্চলে অবস্থিত পল্লখোলীতে রাজত্ব করিতেছিলেন।

উল্লিখিত সুমণ্ডল লিপির আবিষ্কারে নানা ঐতিহাসিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। প্রথমতঃ, এতদিন কলিঙ্গে গুপ্ত সম্রাট্‌গণের অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এই শাসনে কলিঙ্গদেশকে গুপ্তরাজ্যের অন্তর্গত বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই লিপিতে দেখা যায়, ২৫০ গুপ্তাব্দে অর্থাৎ ৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তসাম্রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, এই তারিখের প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বেই মগধের গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, এই লিপিতে দেখা যায়, ৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তসম্রাটের প্রতিনিধি পৃথিবীবিগ্রহ কলিঙ্গরাষ্ট্র শাসন করিতেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণবলে জানা যায় যে, ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ

পূর্ব্বেই কলিঙ্গ নগর ও মহেন্দ্র গিরি অঞ্চলে প্রাচ্যগঙ্গবংশীয় রাজগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং শত্রুঘ্নাঃ নামক নরপতি ৫৭৯ এবং ৬০২ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ও দক্ষিণ তোসলীদেশের অধিপতি ছিলেন।

প্রথম সমস্তাটির সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, দক্ষিণ কোশলে এবং ঐ দেশের মধ্য দিয়া কলিঙ্গদেশে গুপ্ত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। দ্বিতীয় সমস্তাটি অপেক্ষাকৃত জটিল। কারণ জৈন কিংবদন্তী অনুসারে গুপ্তসম্রাট্-গণ ২৩১ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্ত-সংবতের আরম্ভ। সুতরাং উল্লিখিত কিংবদন্তী অনুসারে ৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। এই সিদ্ধান্তের একটি সমর্থক প্রমাণ আছে। মৌখরিরা বিহার ও যুক্তপ্রদেশের অঞ্চলবিশেষে গুপ্তরাজগণের সামন্তরূপে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের হরাহা লিপিতে দেখা যায়, মৌখরিবংশীয় ঈশানবর্ম্মা স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন এবং পূর্ব্বপরিচিত গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রায় কেন্দ্রস্থলে অধিকার বিস্তার করিয়াছেন। অবশ্য এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহার পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত দুই একজন নামাবশেষ গুপ্তসম্রাট্ কোনরূপে টিকিয়া ছিলেন। হয়ত তাঁহাদের দশা খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজ্যহীন মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের ন্যায় ছিল। কিন্তু এই দুর্দ্দিনেও কলিঙ্গের শাসনকর্ত্তা পৃথিবী-বিগ্রহের ন্যায় কেহ কেহ তাঁহাদের অনুরক্ত ছিলেন। পৃথিবী-বিগ্রহের সহিত গুপ্তবংশের রক্তসম্বন্ধ থাকাও অসম্ভব নহে। আবার যে কারণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নিকট হইতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন, ঠিক সেই ধরণের রাজনৈতিক কারণেই পৃথিবীবিগ্রহ বিগতশ্রী কিন্তু স্বনামখ্যাত গুপ্তসাম্রাজ্যের সহিত আপন রাষ্ট্রের সম্পর্ক ঘোষণার প্রয়োজন অনুভব করিতে পারেন। হয়ত এইরূপে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিগণের সম্মুখে আপনার দাবি অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। অবশ্য যাঁহারা মনে করেন যে, তথাকথিত উত্তরকালীন গুপ্তবংশ অর্থাৎ কৃষ্ণগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ প্রাচীন গুপ্তসম্রাট্ বংশের অন্যতম শাখা এবং এই বংশীয় রাজগণ প্রথম হইতেই মগধে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে উল্লিখিত দ্বিতীয় সমস্তার সমাধান কঠিন নহে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, কৃষ্ণগুপ্ত-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের সহিত মূল গুপ্তবংশের সম্পর্কের কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ, হর্ষবর্দ্ধনের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত এই বংশের রাজগণ মালব দেশে রাজত্ব করিতেছিলেন।

তৃতীয় সমস্তাসম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীবিগ্রহ সম্ভবতঃ শত্রুঘ্নাঃ নামক রাজার অব্যবহিত পূর্ব্বে দক্ষিণ তোসলী অর্থাৎ প্রাচীন [illegible] উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চল শাসন করিতেছিলেন। শত্রুঘ্নার লিপিতে ঐ অঞ্চলে মানবংশের আধিপত্যের উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবতঃ পৃথিবীবিগ্রহের অনতিকাল পরেই ঐ দেশে গুপ্ত-অধিকার উচ্ছিন্ন হইয়া মানরাজগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। গঞ্জমের অন্তর্গত কোঙ্গোদের শৈলোদ্ভববংশীয় রাজগণ প্রথমে পৃথিবীবিগ্রহের; পরে শত্রুঘ্নার এবং তৎপরে শশাঙ্কের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। অপর একখানি তাম্রশাসনে লোকবিগ্রহ নামক জনৈক [illegible]তির উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। উল্লিখিত 'মনোরমা' পত্রিকায় এই তাম্রশাসনকে কনাসা লিপিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। যাহা হউক, এই লোকবিগ্রহ এবং সুমণ্ডললিপির পৃথিবীবিগ্রহ একই বংশের লোক হইতে পারেন।

সুমণ্ডললিপিতে উল্লিখিত মহারাজ উভয় এবং সূর্য্যদেবতার ভক্ত মহারাজ ধর্ম্মরাজ সম্পর্কে অধিক কিছু জানা যায় নাই।

মেঘদূতের ফলপুষ্প ও তরুলতা

শ্রীসুনীতিকুমার পাঠক

মেঘদূতের কবি কালিদাস নিসর্গপ্রিয় ছিলেন। এই কাব্যে দেখি বিরহী যক্ষ তার প্রিয়ার উদ্দেশে প্রাণের আকৃতি জানিয়েছে। যক্ষের নির্বাসন-কাহিনীর মধ্যে সত্যতা কতটুকু তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। আর তার তেমন প্রয়োজনও নেই। আসল কথা এই যে, এতে শাশ্বত কালের বিরহীর মর্মবেদনা মন্দাক্রান্তা ছন্দে ফুটে উঠেছে। প্রিয়ার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন যক্ষ চেতন ও অচেতনের বোধ হারিয়ে ফেলে-ছিল।১ কবি সত্য ও কল্পনার মিশিয়ে তার সেই মনোভাবকে অবলম্বন করে এই অপূর্ব কাব্য রচনা করেছেন।

মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির একটা অংশ ও অঙ্গ এই কথাটা মেঘদূতে সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। মানুষের সঙ্গে বিশ্বের সবকিছুর কোথায় যেন একটা যোগসূত্র রয়েছে, তাই অভিশপ্ত যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিনের মেঘমালাকে সমব্যথী ভেবে নিজের মনের কথা জানাচ্ছে।

মানুষের সঙ্গে বিশ্বের আত্মীয়তাবোধকে কবি তাঁর কাব্যে ফলপুষ্প ও তরুলতার মধ্য দিয়ে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ করে তুলেছেন। সেজন্যে নিসর্গপ্রকৃতি তাঁর কাব্যে যেন প্রাণবান ও মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই কাব্যে দেখি প্রকৃতি মানুষের দুঃখে কেঁদেছে, আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য কবি প্রকৃতিকে

দেবতার আসনে বসিয়েছেন, কিন্তু [illegible] মত স্বর্গ ও মর্ত্যকে মিলাতে পারেন নি। [illegible] কাব্যে মাটির তরু স্বর্গে গিয়ে তার মর্ত্যভাব হারিয়ে ফেলেছে, তার পাতা ঝরে নি, তার ফুল শুকায় নি। মৃত্যুর ক্ষয়স্রোতকে তারা জয় করেছে। শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী ও কুমারসম্ভবে এর পরিচয় আছে।

মেঘদূতে যক্ষপুরীর তরুলতা যেন মায়া দিয়ে তৈরি। সে-জন্তে সেখানে সকল ঋতুর সকল ফুল যুগপৎ ফুটে এক অপূর্ব বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।২ কালিদাসের মত এমন অভিনব দৃষ্টিতে আর কোন কবি নিসর্গশ্রীকে দেখেন নি।

দক্ষিণের রামগিরি থেকে উত্তরে হিমালয়ের শিখর পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মেঘদূত কাব্যের পটভূমিকা। এই বিরাট ভূখণ্ডে সে যুগে যে সকল উল্লেখযোগ্য বৃক্ষে ফল ধরত এবং তরুলতায় পুষ্পোদ্গম হ'ত মেঘদূতে তার পরিচয় মিলে। উপরন্তু সেই সকল তরুলতা ফুলফল সেকালের মানুষের জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তাও স্পষ্ট ধরা দেয়। আষাঢ়ের নবমেঘ—যে বর্ষার তরুলতাকেই মর্ত্যের সীমায় কেবল দেখেছে, যক্ষপুরে ঢুকবার পর তার সঙ্গে সকল ঋতুর ফল-পুষ্পের পরিচয় হয়েছে; বর্ষার সেই কদম্ব ত আছেই, উপরন্তু বর্ষেতর ঋতু হেমন্তের লোধ্র, বসন্তের কুন্দ, অশোক, কমল, নবকুরবক ও নিদাঘের বকুল এবং শিরীষগুচ্ছ পাশাপাশি ফুটে রয়েছে।

এখন মেঘদূতের পূর্বমেঘ অংশে রামগিরি পর্বত থেকে সুরু করে ক্রমে ক্রমে যে সকল ফলফুল ও তরুলতার বর্ণনা পাওয়া যায়, সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

রামগিরি পাহাড়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি বলছেন—

দক্ষিণের রামগিরি পাহাড়টি ছায়া৩ বা নমেরু আর নিচুল৪ বা স্থল-বেত দিয়ে ঘেরা।

ঘনছায়াযুক্ত নমেরু পার্বত্য বৃক্ষবিশেষ। এরই তলায় বসে মহেশ্বর ধ্যান করেছেন (কুমারসম্ভব ১।৫৫; ৩।৪৩)। 'রঘুবংশে' সৈন্যেরা নমেরু বৃক্ষের তলায় ক্লান্তি দূর করেছে। (৭।৭৪)। শব্দার্ণব অভিধানে ছায়াবৃক্ষকে নমেরু বলা হয়েছে। 'ছায়াবৃক্ষো নমেরু স্যাদিতি শব্দার্ণবঃ'। বিশ্বকোষে আছে, "নমেরুঃ সুর পুন্নাগঃ"। মনিয়ের উইলিয়মসের সংস্কৃত ইংরেজী অভিধানে 'Elaeocarpus Ganitrus' নাম দেওয়া হয়েছে। ঐ গ্রন্থে নিচুলের ইংরেজী নাম Barringtonia acutangula। মল্লিনাথ—নিচুলাঃ স্থলবেতসঃ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

ঐ পর্বতের অদূরে বিন্ধ্যাচল। তার পাশে নর্মদার স্রোত জম্বুবনের মধ্য দিয়ে বয়ে যায়।৫

জম্বু বা জামের কথা মেঘদূতে পুনশ্চ বলা হয়েছে৬—মেঘ যখন দশার্ণের বনস্থলীর পাশ দিয়ে যাবে তখন জাম পেকে শ্যামবর্ণ ধারণ করবে। বিক্রমোর্বশীতেও এই ফলের উল্লেখ আছে (৪র্থ অঙ্ক, ৬০ শ্লোক)।

নির্বাসিত বিরহী যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিনে কুটজ ফুলের অর্ঘ্য দিয়ে নব মেঘকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাল।৭ এ ফুলটি মেঘের বড় প্রিয়।৮

কালিদাস ঋতুসংহারে কদম্ব অর্জুন ও নীপপুষ্পের প্রসঙ্গে ঐ ফুলের কথা বলেছেন। কুটজ ও ককুভ এক। শব্দার্ণবে আছে, ককুভঃ কুটজেঽর্জুনঃ।

মেঘের যাবার সময় আম্রকূট পাহাড়ের আমগুলি সব পেকে যাবে।৯ যে পথ দিয়ে মেঘ চলে যাবে তার পরিচয় রাখবে মুকুলিত কেতকী১০, হরিতকপিশ নীপ১১, শিলীন্ধ্রা বা কন্দলী১২, আর যূথিকা১৩।

কালিদাস ঋতুসংহারে কদম্ব সর্জ ও অর্জুনের সঙ্গে কেতকীর কথা বলেছেন। (ঋতু ২।১৭) শব্দার্ণবে বলা হয়েছে যে কেতকী মুকুলের অগ্রভাগ সূচের মত সরু। "কেতকী মুকুলাগ্রেষু সূচিঃ সাৎ।" কেতকীর রুচির গন্ধ ও তার মুকুলের সূচি-শোভার কথা কবি রঘুবংশ ও ঋতুসংহারে অনেকবার বলেছেন।

নীপের কেশরগুলি ঈষৎ শ্যামবর্ণ, হরিৎ-কপিশ। নীপ ও কদম্বের কথা কবি প্রায়ই পাশাপাশি বর্ণনা করেছেন। মল্লিনাথ "নীপং স্থলকদম্বকুসুমম্" বলেছেন। মেঘদূতে কবি "প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ" বলেছেন। অভিধানকারেরা দুটিকে একই ফুল বলে ধরেছেন। কবি ঋতুসংহার (২।২৩,২৪), রঘুবংশ (১৪।২৭) ও কুমারসম্ভবে (৩।৬৮) যে প্রকার বর্ণনা করেছেন তাতে মনে হয় নীপ ও কদম্ব এক। কদম্ব হ'ল পূর্ণপ্রস্ফুটিত অবস্থা আর নীপ হ'ল অর্দ্ধস্ফুট অবস্থা, বিক্রমোর্বশীতে কবি রক্তকদম্বের কথা বলেছেন (৪র্থ অঙ্ক ৩০ শ্লোক)। দুটি ফুলই সেকালের বিলাসিনীদের অঙ্গরাগ ও অঙ্গভূষণ রূপে ব্যবহৃত হ'ত।

শিলীন্ধ্রা বা কন্দলী পুষ্প বিকশিত অবস্থায় সাদার উপর ঈষৎ লাল রঙের আভাযুক্ত—যেমন তুষারের উপর বৈদুর্যমণি, কালিদাস ঋতুসংহারে এই ভাবে বর্ণনা করেছেন (২।৫)। শিলীন্ধ্রা পুষ্প ভাবী ফসলের সূচক একথা মেঘদূতে বলা হয়েছে।১৪ কন্দল্যাস্ত শিলীন্ধ্রাঃ স্যাদিতি—শব্দার্ণবঃ। মনিয়ের উইলিয়মসের অভিধানে এই নামটির কোন ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া হয় নাই।

যূথিকা (যুঁই) মাগধী ফুল, এ কথা অমরকোষে আছে। গণিকা যূথিকাম্বষ্ঠা। অথ মাগধী। ঋতুসংহার (২।২৪) ও বিক্রমোর্বশীতে (৪।২৪) উল্লেখ আছে।

এদিকে মেঘ নব নব দেশ অতিক্রম করে গম্ভীরা নদীর উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। যক্ষ বলছে—

গম্ভীরা নদীতটের বেতবন১৫ দেখে মেঘের মন চঞ্চল

হয়ে উঠবে। দেবগিরির বনে উডুম্বর১৬ বা যজ্ঞডুমুর বর্ষার হিমবাতাসে পরিণত হয়ে যাবে। পুষ্পলাবীদের কর্ণভূষণ উৎপল১৭ যদি ঘামে ভিজে যায় তবে ছায়া দিয়ে মেঘ যেন তাদের শ্রান্তি দূর করে। পুকুরের কমল১৮গুলির দল বর্ষার তীব্র ধারায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

বাণীর (বেতস)। মল্লিনাথ টীকায় বলেছেন, 'বাণীর শাখা বেতস শাখা।" তবে এটা জলবেতস তা বলা বাহুল্য। বাণীর ও বেতস কালিদাসের কাব্যের বহু স্থানেই আছে। বাণীর-গৃহ ছিল কাব্যের নায়িকা ও নায়কের গোপন মিলন-স্থান। শকুন্তলা (২৩।২৪), রঘুবংশ (১৩।৩৫, ১৬।২১) দ্রষ্টব্য।

সমিধকাষ্ঠ হিসাবে কালিদাসের কুমারসম্ভবে উডুম্বরের উল্লেখ থাকলেও সজীব ফলবান বৃক্ষরূপে অন্যত্র এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। অমরকোষে বলা হয়েছে, উডুম্বরো জন্তুফলো যজ্ঞাদো হেমদুগ্ধকঃ। Fiens Glomera'a ইংরেজী নাম (M.W.)।

পদ্মের উল্লেখ কালিদাসের সাহিত্যে বিরল নয়। কবি পদ্মের অনেক প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন। মেঘদূতে অম্ভোজ (পূর্বমেঘ ৬২), কমল (পূর্বমেঘ ৩৯, উত্তরমেঘ ২, ১৯), কুবলয় (পূর্বমেঘ ৫৩, ৪৪, উত্তরমেঘ ৩৪), নলিনী (পূর্বমেঘ ৩৯, উত্তরমেঘ ৫), পদ্ম (উত্তরমেঘ ১৯), পদ্মিনী (উত্তরমেঘ ১২, ২২)। কমল ও উৎপলের পার্থক্য কবি নিজেই রঘুবংশে দেখিয়েছেন (৬।৩৬)। টীকাকার মল্লিনাথ অর্থ করেছেন, "কমলাচ্চিরোৎপন্নাম্লবাবতারমচিরোৎপন্নমুৎপলম্‌" অর্থাৎ কমল যে অনেক আগে ফুটেছে, আর উৎপল যে অল্পক্ষণ মাত্র ফুটেছে!

এবার কীচকের প্রসঙ্গে আসা যাক। কবি বলেছেন—ধীরে ধীরে মেঘ গিরিনদী জনপদ অতিক্রম করে যখন হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে হাজির হবে তখন কীচকের বংশীরব১৯ শোনা যাবে।

কালিদাস তাঁর কাব্যের আরও দুই-এক স্থানে কীচকের কথা বলেছেন। কুমারসম্ভব (১।৮), রঘুবংশ (২।১২ ; ৪।৭৩)। মল্লিনাথ বলেছেন, "বাংশিকোঽপি বংশরন্ধ্রাণি মুখমারুতেন পুরয়তি ইতি প্রসিদ্ধিঃ" (কুমার ১।৮ সঞ্জীবনী)। অমরকোষে আছে, কীচকাঃ। বেণবঃ কীচকাস্তে স্যু র্যে স্বনন্ত্যনিলোদ্ধতাঃ। Arundo Karka (M.W.) বিশ্বকোষে আছে, "কীচকো দৈত্যভেদে স্যাচ্ছুষ্কবংশে ক্রমান্তরে।"

যক্ষপুরীর রমণীদের হাতে লীলাকমল, অলকে কুন্দস্তবক, মুখে লোধ্রফুলের রেণু, চূড়াতে নবকুরবক, কানে শিরীষগুচ্ছ ও সিঁথির উপর নীপ, এই তাঁদের পুষ্পাভরণ।২০

এই সকল পুষ্প ছিল সেকালের বিলাসিনীদের প্রসাধনের উপকরণ। কুন্দ বাসন্তী পুষ্প। পরিণতশ্যামল পত্রের মাঝে প্রস্ফুটিত তুষারধবল কুন্দের শোভা যেমন কবিকে মুগ্ধ করেছে তেমনই কুন্দস্তবকের উপর ভ্রমরের চঞ্চল স্পর্শ কবির চোখ এড়ায় নি (মালতীমাধব ৩।৮, মেঘদূত পূর্বমেঘ ৪৯)। কুন্দফুলের কথা কবি অনেকবার বলেছেন।

লোধ্রফুলের রেণু সুন্দরীর দেহের তৈলাক্ত ভাব দূর করার উপকরণ। এটি হৈমন্তিক পুষ্প। "গালবঃ শাবরো লোধ্রস্তিরীটস্তিল্বমার্জনী" অমরকোষে বলা হয়েছে। এর ইংরেজী নাম Bassia Latifolia (M.W.) কুমারসম্ভব (৭।৯, ৭।১৩), রঘুবংশ (২।২৯) ও ঋতুসংহারে (৪।১) উল্লেখ আছে। লোধ্র-রেণু মাখা পাণ্ডুবর্ণ মুখের কথা রঘুবংশে বলা হয়েছে, "মুখেন সা লক্ষ্যত লোধ্রপাণ্ডুনা।" (৩।২)

দুই পাশের শ্যামল বা কৃষ্ণ বর্ণের মাঝে রক্তিম কুরবকের শোভা কবি মালতীমাধবেও উল্লেখ করেছেন (৩।৫)। রসিক কুরবক-শাখা শকুন্তলার গতিরোধ করেছিল। এমনি ভাবে কালিদাসের কাব্যের বহুস্থানে কুরবকের কথা পাওয়া যায়। এটি বাসন্তী পুষ্প—ঋতুসংহারে বলা হয়েছে। অম্লানস্তু মহাসহা। তত্রশোণে কুরবক ইত্যমরঃ। A red Kind of Barleria (M.W.)।

শিরীষের বড় কোমল প্রাণ, সে ভ্রমরের পদভার সহ্য করতে পারে না (কুমারসম্ভব ৫।৪)। এটি কর্ণভূষণ রূপে ব্যবহৃত হ'ত। ঘামে জড়িয়ে গিয়ে সুন্দরীদের আরও শোভা বাড়ত—(শকুন্তলা (১।২৭ ; রঘু ১৬।৪৮)। এর সৌকুমার্যের কথা কুমারসম্ভব (১।৪০) ও রঘুবংশে (১৮।[illegible]) রয়েছে। শিরীষস্তু কপীতনঃ। ভণ্ডিলোঽপি [illegible] ইত্যমরঃ—Acacia Sirissa (M.W.)।

মন্দার তরুর মধ্য দিয়ে মন্দাকিনী বয়ে গেছে।২১ সেই সুরভিত জলে যক্ষরমণী ও সুরনারীরা জলক্রীড়া করেন। অলক থেকে খসে পড়া মন্দার পুষ্প অভিসারিকাদের গোপন অভিসার-পথের পরিচয় দেয়।২২ কল্পতরু তাঁদের সকল অভাব মিটিয়ে দেয়।২৩

এই দুইটি স্বর্গের পুষ্পতরু। তবে কবি কালিদাস তাঁর কাব্যের বহুস্থানে এগুলির কথা উল্লেখ করেছেন।

অলকাপুরীর ধনপতির বাড়ীর অনতিদূরে উত্তরে যক্ষের আলয়। তোরণের দুই পাশে ছোট ছোট মন্দার-তরু, যক্ষবধূ সেগুলিকে পুত্রের মত ভালবাসেন।২৪ দীঘির ধারে সোনার কদলী-বৃক্ষের শ্রেণী ক্রীড়াশৈলকে ঘিরে আছে।২৫ সেখানে মাধবীলতার ঘরটি কুরবকে ঘেরা, দুই পাশে দুটি তরু, অশোক আর বকুল যাদের দোহদদানের ভার নিয়েছেন স্বয়ং গৃহস্বামিনী।২৬ মালতীলতাটি অদূরে, বাতাসে তার গন্ধ ভেসে আসে।

যক্ষপুরীতে কদলীবৃক্ষ সোনার। কদলীবৃক্ষের শৈত্য ও গুরুতা কবি উপমাচ্ছলে ব্যবহার করেছেন (কুমার ১।৩৬ ; উত্তরমেঘ ৩৫), মাধবী লতার কথা বহুবার শকুন্তলা ও বিক্রমোর্বশীতে বলেছেন (শ. ৩।৮, ৬।৮, শ ২।১০ ;

বি ২।৪, ২।৭)। "অতিমুক্ত পুণ্ড্রক ভাষালন্তী মাধবীলতা ইত্যমরঃ।" অশোকতরু কালিদাসের কাব্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রায় প্রত্যেক কাব্যেই কবি বহুবার তার কথা বলেছেন। কেশরোবকুল ইত্যমরঃ। শকুন্তলা (১।১৮,৪।৩), কুমারসম্ভব (৩।৫৫), ঋতুসংহার (২।২০,২৪) ও রঘুবংশে (৪।৬৭, ৯।৩০, ১৯।১২) উল্লেখ আছে। মালতী২৭ বর্ষাকালের সুবাসিত পুষ্প। ঋতুসংহারে বহুবার এর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

নির্বাসিত যক্ষের মনে পড়ে তার প্রিয়ার কথা—সুখস্পর্শ শ্যামা বা প্রিয়ঙ্গু২৮ লতার কাছে সে ছুটে যায়। উত্তুরে হাওয়া যখন দেবদারুর২৯ গন্ধ বয়ে আনে তখনও প্রিয়ার কথা তার স্মৃতিপথে সমুদিত হয়। এমনি করেই সে দিন কাটায়।

প্রিয়ঙ্গু ও শ্যামা এক, অমরকোষে বলা হয়েছে। শ্যামা তু মহিলাহ্বয়ো···প্রিয়ঙ্গু ফলিনীফলীত্যমরঃ। Panicum Italicum (M.W.) ঋতুসংহারেও এই ভাব দেখা যায় (ঋ ৪।১০, ৩।১৮)।

দেবদারুর কথা হিমালয় বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি বারবার উল্লেখ করেছেন। আর কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ উভয় কাব্যেই এর উল্লেখ আছে। পার্বতী এক দেবদারুকে পুত্রের মত পালন করেছিলেন—রঘুবংশে (২।৩৬) বলা হয়েছে। দেবদারুর বর্ণনা করা হয়েছে—দেবদারুবৃহদ্ভুজঃ (কুমার ৬।৫১)।

মেঘদূতের বহুস্থানে কবি অলঙ্কারের উপকরণ হিসাবে পদ্মকে ব্যবহার করেছেন (পূর্ব ৪২, ৫০, উত্তর ১৯,৩৪,২২)। এ ছাড়া কদলী (উত্তর ৩৫), কুন্দ (পূর্ব ৪৯), কুমুদ (পূর্ব ৪২), জবা (পূর্ব ৩৮) ও স্থলকমলিনী (উত্তর ২৯) বহুক্ষেত্রে অঙ্গ শোভা বর্দ্ধনের জন্য অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তার উল্লেখ করা হয়েছে।

১ মেঘদূত পূর্বমেঘ ৫ শ্লোক।
২ মেঘদূত উত্তরমেঘ ২ শ্লোক।
৩ স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥ (পূর্বমেঘ ১)
৪ স্থানাদস্মাৎসরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং···॥ (পূর্বমেঘ ১৪)
৫ জম্বুকুঞ্জপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ। (পূর্বমেঘ ২০)
৬ ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যাম জম্বু বনান্তাঃ···। (পূর্বমেঘ ২৩)
৭ স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ। (পূর্বমেঘ ৪)
৮ কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্বতে পর্বতে তে। (পূর্বমেঘ ২২)
৯ ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈঃ···। (পূর্বমেঘ ১৮)
১০ পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃত্তয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈঃ···। (পূর্বমেঘ ২৩)
১১ নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেসরৈরর্দ্ধরূঢ়ৈঃ···। (পূর্বমেঘ ২১)
১২ আবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্। (ঐ)
১৩ উদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকা-জালকানি। (পূর্বমেঘ ২৬)
১৪ কর্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাম্···। (পূর্বমেঘ ১১)
১৫ তস্যাঃ কিঞ্চিৎকরধৃতমিব প্রাপ্য বানীরশাখম্···। (পূর্বমেঘ ৪৩)
১৬ শীতো বাতঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাম্॥ (পূর্বমেঘ ৪৪)
১৭ গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিত পুষ্পলাবীমুখানাম্॥ (পূর্বমেঘ ২৬)
১৮ ধারাপাতৈ স্তমিব কমলাণ্যভ্যবর্ষ-মুখানি॥ (পূর্বমেঘ ৫০)
১৯ শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্য্যমাণাঃ···। (পূর্বমেঘ ৫৮)
২০ হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম্
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননেশ্রী।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥ (উত্তরমেঘ ৭১)
২১ মন্দাকিন্যাঃ সলিলশিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভি
র্মন্দারাণাং তটবনরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণা॥ (উত্তরমেঘ ৬)
২২ গত্যুৎকম্পাদলক পতিতৈর্যত্র মন্দার পুষ্পৈঃ···। (উত্তরমেঘ ১১)
২৩ একঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ॥ (উত্তরমেঘ ১৩)
২৪ হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দার-বৃক্ষঃ॥ (উত্তরমেঘ ১৪)
২৫ ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলী-বেষ্টন প্রেক্ষণীয়ঃ। (উত্তরমেঘ ১৬)
২৬ রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরবকবৃতের্মাধবী মণ্ডপস্য। (উত্তরমেঘ ১৭)
২৭ প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবজালকৈ মালতীনাম্। (উত্তরমেঘ ৩৭)
২৮ শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতম্···। (উত্তরমেঘ ৪৩)
২৯ ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিসলয়পুটান্ দেবদারু দ্রুমানাং···। (উত্তরমেঘ ৪৬)

রণ-তাণ্ডবে

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতায় আমাদের পাড়ায় মায়ের আবির্ভাবের কাহিনীটা কতক কতক চালু আছে এখনও; বিশ্বাস জিনিসটা এমনই যে···

যাক্ গল্পটাই বলি। দাঙ্গার সময়কার কথা। যে-কোন সময় যে-কোন জায়গায় একটা কাণ্ড ঘটিয়া যাইতে পারে, জীবনটা যে সত্যই বুদ্বুদ শঙ্কর-বুদ্ধও এত পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই। দূরে কাছে, যখন-তখন জয় হিন্দ! আল্লা হো আকবর! বন্দেমাতরম্! কথাগুলার মানে বদলাইয়া গেছে, সেই মাতালটার কথা মনে পড়ে—বেটারা মধুর হরিনামকে তেতো করে দিলে!

ওর মধ্যে আবার বিবাহ আছে, পূজা আছে, যাত্রা-থিয়েটার আছে; সিনেমা আছে, জীবন-বুদ্বুদ যতটুকু থাকে একটু আলোর ঝিকিমিকি মাখিয়া থাকিতেই চায়।

যেখানেই দেখ ঐ এক আলোচনা। লোকে চলিতে চলিতে যেন জট পাকাইয়া যাইতেছে—গলিতে, ফুটপাথে, পার্কে; চারিদিককার খবর আসিয়া জুটিতেছে—সত্য, কাল্পনিক; আবার জট খুলিয়া যে-যার কাজে-অকাজে চলিয়া গেল; চাপা আতঙ্ক, সেইটাই আবার মত্ত শ্লোগানে রূপান্তরিত হইয়া উঠে—জয় হিন্দ! আল্লা হো আকবর! ভয়-ভরসায় চলে মাখামাখি।

এ ভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় দল আছে, রীতিমত কুচকাওয়াজ, ডিসিপ্লিন্; অস্ত্র সংগ্রহ। অবশ্য আত্মরক্ষার ওজুহাতেই, তবে সেটা প্রধানতঃ অজুহাতই: আমাদের পাড়ার দলটা আড্ডা করিয়াছে দত্তদের বৈঠকখানায়। দত্তরা কেয়ার, একটা নেপালী দারোয়ানের হাতে চাবি, বেশ ভাল করিয়া তাহাকে দলের মধ্যে টানিয়া লইয়াছে। সবাই হাবিলদার সাহেব বলিয়া ডাকে। এ খেতাবটা যে ওর পূর্ব্ব থেকেই ছিল এমন তো শুনি নাই; মানে, দস্তুরমত মিলিটারি কাণ্ড। ও. সি., মেজর, হাবিলদার, ক্যাপ্টেন—কিছুই বাদ নাই।

যেমন সব ক্ষেপিয়াছে, একটু যোগসূত্র ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করি। মাঝে মাঝে ঘরটাতে গিয়া বসি। নিজেদের নাম দিয়াছে সঙ্কটত্রাণ সমিতি; খবর লুকায়, তবু বুঝি অপরের সঙ্কট কম বাড়াইতেছে না। উপায় নাই, ওদিককার কাণ্ড শুনিয়া এক এক সময় নিজেদের রক্তই গরম হইয়া উঠে। তবুও গিয়া বসি মাঝে মাঝে, বোঝাই, যতটা ঠাণ্ডা থাকে।

বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহার পর সেদিন সকাল থেকে গুজব রটিল ওদিককার ওরা লীগ গবর্ণমেণ্টের উস্কানি পাইয়াছে, সেই দিনই আমাদের পাড়ার আক্রমণ চালাইবে।

তুমুল উত্তেজনায় কাটিতে লাগিল দিনটা; যতই কিছু না হইতে লাগিল, মনে হইল খুব গুরুতর রকমের কিছু একটা ঘটাইবার জন্যই ওদিকে সময় লইতেছে; সমস্ত পাড়াটা সমিতির ছেলেদের উদ্যোগে অস্ত্রেশস্ত্রে প্রস্তুত হইয়া উঠিল, ক্রমেই অধিক অধিক ভাবে। এর যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল সেই-টাই আশঙ্কা করিতে লাগিলাম—অর্থাৎ ওদিক থেকে যদি কিছু না হয়, এই আয়োজনের বিপুলতার চাপে এরাই শেষ পর্য্যন্ত মারমুখো হইয়া উঠিবে। ব্যাপারটা ক্রমেই আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতে লাগিল।

সমস্ত দিনটা কিছু হইল না। সন্ধ্যার পর পাড়াটা হঠাৎ কেমন যেন থমথমে হইয়া পড়িল। লক্ষণটা ভাল বোধ হইল না। সমিতিই সমস্ত পাড়াটার কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করে, প্রতিটি কণ্ঠের শ্লোগানটুকু পর্য্যন্ত। হঠাৎ এমন নিস্তব্ধ ভাবটা কেমন যেন অস্বস্তিকর বোধ হইল। একটু খোঁজ লওয়া দরকার।

দত্তদের বৈঠকখানায় গিয়া দেখি বেশ ভরা ঘর, একটা কি চাপা মন্ত্রণা চলিতেছিল, আমি গিয়া পড়িতে সবাই একটু তটস্থ হইয়া পড়িল। আর চাপাচাপি করা চলে না, প্রশ্ন করিলাম—"সন্ধ্যের পর একটু যেন অন্য ভাব দেখছি আজ; ব্যাপারখানা কি—বলতে আপত্তি আছে?"

দু'একটা কণ্ঠে "আজ্ঞে···আজ্ঞে" করিয়া একটু কুণ্ঠার ভাব, তাহার পরই সমিতি মুখর হইয়া উঠিল—"ওপক্ষের ওরা আজকে জুৎ করতে পারে নি, তাই এগুল না···অথচ আজ যদি কোন রকমে টেনে আনতে পারি—উইক কিনা—একটিকে ফিরে যেতে দেব না···আজ্ঞে, তাই একটু ঘাপটি মেরে ঠাণ্ডা হয়ে থাকা···বাছাধনেরা যখন দেখবে···"

কথাবার্ত্তার মধ্যেই ঝমঝম্ ঝমঝম্ করিয়া একটা আকস্মিক শব্দে সবাই চকিত হইয়া উঠিলাম; এক লহমা, তাহার পর ঘর ফাটাইয়া সবাই একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল—"জয় হিন্দ!"

আমার কণ্ঠও মিশিয়াছিল।···বুড়োরা ছেলেদের টানিতে পারে না, ছেলেদের আকর্ষণই বড়।

বাহিরে আসিয়া সবাই অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম, এক ঝলক হাসিও উঠিল উছলাইয়া—দুইটা গলি পরেই জেলে আর গোয়ালাদের মিশ্র বস্তি; আওয়াজটা সেইখান হইতেই উঠিয়াছে—কি উপলক্ষ্য করিয়া সেটা পরে আপনি প্রকাশ পাইবে বলিয়া এখানে আর লজ্জার মাথা খাইয়া উল্লেখ করিলাম না।

ঘরে আসিতে আসিতে নানা কণ্ঠে মন্তব্য শুনিতে লাগিলাম

—"ওরাই পারে···ওদেরই মানায়···সমস্ত দিন ঐ কাণ্ড করে, সন্ধ্যার পর যদি একটু এই রকম করে গা না এলায় তো বাঁচবে কি করে?···আর একা নয় তো, মেয়ে-পুরুষে লেগে গেছে—কচুকাটা করছে···আর সত্যিই তো, মেয়েদের আর ঘোমটা টেনে বসে থাকা চলে?···"

ঘরে আসিয়া আবার পলিসির আলোচনা চলিল।···লোক বাড়িতে লাগিল, নূতন নূতন খবর আসিয়া পড়িতে লাগিল—ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, খিদিরপুর। এদিকেও চর পাঠানো হইয়াছে—কেহ ফিরিয়া রিপোর্ট দিল, কাহারও ফিরিতে এত দেরি হয় কেন? মাঝে মাঝে দলের ছেলেরা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে। একজন একজন করিয়া তাহাদের সন্ধানেও আরও জনচারেক রওনা হইয়া গেল।···বিষাদেরই আবহাওয়া, তবুও ছেলেগুলার বুকের পাটা দেখিয়া আনন্দ হয় বৈ কি।

ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। বসিয়া আছি, বসিয়া থাকিয়াই যতটুকু সংযত রাখা যায়। নিখোঁজ সঙ্গীগুলার জন্যই উত্তেজনাটা বাড়িয়া যাইতেছে ক্রমে ক্রমে; জাপানীদের মত সুইসাইড্ স্কোয়াড্ বা আত্মঘাতী বাহিনীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে—চারি জন গিয়াছিল; আরও দুই জন চঞ্চল হইয়া উঠিল; কোনমতেই রোখা গেল না।

মৃদু 'জয় হিন্দ' ধ্বনির সঙ্গে তাহাদের বিদায় দিবে এমন সময় আগে যাহারা গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে দুই জন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল এবং প্রবল হাঁপানির মাঝে কিছু বলিয়া উঠিতে পারার আগেই পাড়াটার উত্তর-পূর্ব্ব দিক মথিত করিয়া একটা তুমুল কলরব উঠিল—আল্লা হো আকবর!

সমস্ত দলটা একটু চকিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—নিশ্চয় আগে যে একটা ধোঁকা খাইয়াছে সেই স্মৃতিতেই। তাহার পর কিন্তু আর কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। ঘরের মধ্যে অস্ত্র সাজানো, অত ক্ষিপ্রতার মধ্যেও একটু গোলমাল হইল না, নিজের নিজেরটি তুলিয়া লইয়া সবাই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

ঘরটা খালি হইয়া গেল, রহিয়া গেলাম শুধু আমিই। অস্ত্রও নাই, শরীরে ওদের মত স্নায়ুর ক্ষিপ্রতাও নাই, আছে বয়োধর্ম্মের যা সম্বল—বিবেক, বিবেচনা, একটু থিতাইয়া জিরাইয়া চারিদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখা।

মনস্থির করিয়া বাড়ী হইতে একটা পিস্তল লইয়া বাহির হইতে মিনিট পনের হইয়া গেল। ডোবা 'ভরাট করা' একটা পড়তি জায়গা, সেইখানেই কাণ্ডটা হইয়াছে। যখন পৌঁছিলাম তখন ওদিককার ওরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে, চঞ্চল জনতার মধ্যেই এর-ওর মুখে শুনিলাম পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে কয়েকজনকে রাখিয়াই। তাহাদের অবশ্য সন্ধান পাইলাম না।

হঠাৎ পড়্তি জমিটার একদিকে একটা তুমুল কলরব উঠিল—"মা!—মা!—মা!—মা এসেছেন!···জয় মা!···"

সবাই সেই দিকে ছুটিল। যেন চাকের গায়ে মৌমাছি জমিয়া উঠিল, আর ঐ শব্দ—আকাশ যেন মথিত হইয়া যাইতেছে। ভিড় চিরিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে বিস্ময়ে একেবারে বাক্-রোধ হইয়া গেল। কল্পনাতীত ব্যাপার।

একটি স্ত্রীলোক। আমি পিছনের দিকটায় গিয়া দাঁড়াইয়াছি, ভাল দেখিতে পাইতেছি না, তবুও অদ্ভুত! স্ত্রীলোকটির পরিধানে একটা টক্‌টকে রাঙা চেলি, কতকটা মহিষমর্দ্দিনীর মতই গাছকোমর করিয়া পরা। মাথার কাপড় খানিকটা সরিয়া গিয়া আলুলায়িত কুন্তলের একটা রুক্ষ গুচ্ছ দক্ষিণ বাহুর উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। পাশ দিয়া যতটা দেখা যায় মুখের চোয়ালটা কঠোর, কতকটা পুরুষালিই, হাতটা পেশীবহুল, করতল রক্তবর্ণ; আমার সামনেই পায়ের পাতাটা উল্টাইয়া রহিয়াছে, পেলব নয় মোটেই, তবে সমস্তখানি আলতায় রাঙা, ধুলার যা একটু মলিন করিয়াছে।

সবচেয়ে যা বিস্ময়কর—রোমাঞ্চকর বলাই ঠিক—রমণী একটা গুণ্ডাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া তাহার নাভিকুণ্ডের উপর ডান হাঁটুটা চাপিয়া দুই হাতে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া যাইতেছে। গুণ্ডাটার মুখটা শ্মশ্রুবহুল হওয়ায় সমস্ত দৃশ্যটা এমন নিখুঁতভাবে মহিষমর্দ্দিনীর চিত্রের মত হইয়া উঠিয়াছে যে সত্যই সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন অভিভূত হইয়া পড়ে। লোকটাকে দেখিলে মনে হয় তাহার আয়ু প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

কিছুক্ষণ মাথায় কিছুই বুদ্ধি আসিল না, তারপর হঠাৎ কানে গেল—"মা! মা! এই নাও, শেষ করে দাও মা···" সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনতার একটা উল্লসিত চীৎকার—"জয় মা!"

ঘুরিয়া দেখি একটি যুবকের হাতে একটা ছোরা। হুঁস হইল, একরকম লাফাইয়া গিয়াই তাহার হাত হইতে সেটা কাড়িয়া লইলাম।

ঐতেই বুদ্ধিটা ফিরিয়া আসিল কতকটা, বলিলাম, "দেখছ কি? তোল ওঁকে, ছাড়িয়ে দাও···"

নিজেই গিয়া হাতটা ধরিলাম। খানিকটা নিশ্চয় আমারও ঘোর আসিয়া গেছে, তা ভিন্ন স্ত্রীলোকই তো, বলিলাম, "মা, যথেষ্ট হয়েছে···ছেড়ে দাও, দয়া কর, তুমি যে কারুর মা-ই সেইটুকু মনে কর···"

অসীম ক্ষমতা শরীরে, আর যেন সংহারের নেশায় মাতিয়া গেছে; তবে কি মনে হওয়ায় আমার দেখাদেখি আরও কয়েক জনে আসিয়া ধরিয়া ফেলিল।

পড়্তি জমির অপ্রচুর আলোকে যতটা সম্ভব চেহারাটা ভাল করিয়া দেখিলাম। বিকট, কোনখানে এতটুকু রমণী-সুলভ মাধুর্য্যের অবশেষ নাই। শুধু চক্ষু দুইটি বিশাল, আয়ত; তাহাও কিন্তু ললাটের নিয়ে অগ্নিপিণ্ডের মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। আরও যা—কি বলিব?—ভাবা পাইতেছি না—আরও যা ভীষণ, রহস্যময়—মুখে অল্প অল্প সুরার গন্ধ! কিন্তু

কোন কথা নাই, ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত স্ফীত নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়া যে একটা সাঁ সাঁ শব্দ বাহির হইতেছে—শব্দের মধ্যে মাত্র সেইটুকু।

'মা-মা!' শব্দ গগন ভেদ করিয়া উঠিতেছে। ভিড় আরও চাপ বাঁধিয়া উঠিতেছে।...কি করা যায়? বুদ্ধি কাজ করিতেছে না।

হঠাৎ চৈতন্য হইল, সমিতির দু'চারজন অগ্রণীকে বলিলাম, "ভুল হয়ে যাচ্ছে—ভিড় সরাও, দাঙ্গার জায়গা এখুনি পুলিস এসে পড়বে..."

"ওঁকে?...মাকে?"

"ওঁকে দত্তদের বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি...শীগ্‌গির ভিড় পাংলা কর..."

খুবই শক্ত ব্যাপার, সাক্ষাৎ মা কালীর অবতরণ হইয়াছে, লোকে মত্ত উল্লাসে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মহলা দিয়া দিয়া ছেলেরা পোক্ত হইয়া উঠিয়াছে, চমৎকার নিয়মানুবর্ত্তিতা—দেখিতে দেখিতে সমিতির ছেলেরা ছাড়া সমস্ত ভিড়টা প্রায় পরিষ্কার হইয়া গেল—কতকটা ভয়ে, কতকটা আবার ইহাদের দাবেও। কিন্তু হাসপাতালও আছে, গুণ্ডাটাকে সেইখানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া স্ত্রীলোকটিকে মাঝে করিয়া দত্তদের বৈঠকখানায় লইয়া আসিলাম। আপত্তি মোটেই করিল না, তবে একটা কথাও বলিল না। অত্যন্ত অন্যমনস্ক, যেন অন্য কোন্ লোকে রহিয়াছে, শুধু স্ফুরিত নাসারন্ধ্র দিয়া ব্যর্থ আক্রোশের চাপা গর্জ্জন আসিতেছে বাহির হইয়া।

জায়গাটা থেকে দত্তদের বাড়ী বেশ খানিকটা দূরে, গোটা-কতক গলি দিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সবাই নিস্তব্ধ, একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে; হিন্দুরই মন তো। প্রথমে যাই ভাবি, সময় পাইয়া আমি সে বিশ্বাসটা অবশ্য কাটাইয়া উঠিয়াছি। তবে সাক্ষাৎ মা কালী না আসুন, একটা বিপন্ন জাতির উদ্ধারের জন্য মানুষের মধ্যেও তো দৈব শক্তির আবির্ভাব হয়—জোয়াঁ অব্ আর্কের মধ্যে ইতিহাসই যে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে—হয় তো ইনি কুমারী নন, তা সবাইকেই যে কুমারী হইতে হইবে তাহার মানে কি?—শক্তির আধার কি এক রকমই?

বৈঠকখানায় আনিয়া একটি সোফায় বসাইলাম। বলিলাম—"এবার শীগ্‌গির এঁর একটু আহারের ব্যবস্থা কর।"

একটি ছোকরা চাপা গলায়, তবুও যাতে স্ত্রীলোকটির কানে যায়, এই ভাবে বলিল—"ভোগ বলুন স্যার।"

বলিলাম—"হাঁ, ভুল হয়েছে, ভোগই...শীগ্‌গির দেখো, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।"

এতক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটি একটু মুখ খুলিল, খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিল—কিম্বা...যেন এই রকম শুনিলাম—"মাংস।"

সমস্ত ঘরটা আবার নিস্তব্ধ হইয়া গেল। আমারও বুদ্ধি আবার লুপ্ত হইয়া আসিতেছে,—এ কি আহারের আদেশ! কতকটা বিমূঢ় ভাবেই বলিলাম—"মাংস আনো...মাংস।"

সেই ছেলেটি সেই ভাবে প্রশ্ন করিল—"বলির ব্যবস্থা করি?"

সকলেই একবার মুখের পানে চাহিল, মূর্ত্তি শুধু 'না'র ভঙ্গিতে একবার মাথাটা ঈষৎ নাড়িল।

আমার বুদ্ধি মাঝে মাঝে ফিরিয়াও আসিতেছে একটু একটু, বলিলাম—"চপ কাটলেট, কোর্ম্মা...এই রকম...শীগ্‌গির ...হোটেল থেকে..."

মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম আপত্তির কোন ইঙ্গিত নাই। জনপাঁচেক ছেলে এক রকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল।

এমন সময় একটা কাণ্ড হইল। ঘরে তো তিল ফেলিবার জায়গা নাই, বাহিরের বারান্দাটাও গেছে ভরিয়া; গোটা-দুয়েক জানলা সামনের দিকে—তা এক একটাতে রাশীকৃত কুতূহলী মুখ গরাদ চাপিয়া আছে; দরজাটা একেবারে ঠাসাঠাসি। তবে এক চাপা 'মা-মা' ছাড়া কোন শব্দ নাই।

এমন সময় হঠাৎ গলিতে একটু দূরে একটা কচি গলার কান্না উঠিল এবং পরক্ষণেই বোঝা গেল ছেলে বা মেয়ে যেই হোক, দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া যেন এই দিকেই আসিতেছে।

আবার একটা ত্রস্ত গুঞ্জন উঠিল ঘরটাতে, একটা সচকিত ভাব, বলিলাম—"দেখতো...কাঁদে কেন?..."

তাহার আগেই চার-পাঁচ জন ছুটিয়া বাহির হইয়া গেছে। একটু পরেই একটা ছেলেকে ধরাধরি করিয়া আনিয়া বারান্দার প্রান্তে দাঁড় করাইল। আমি দরজার কাছে আগাইয়া গেলাম। ভিড় দু'পাশে, একটু সরিয়া দাঁড়াইতে দেখি এও এক অদ্ভুত ব্যাপার—অলকা-তিলকা আঁকা, ধড়া-চূড়া পরা একটি আট নয় বছরের শ্রীকৃষ্ণ, তাহার কান্নাও তখন স্পষ্ট—"জেঠা-মশাই!...জেঠামশাইকে দেখব...আমার জেঠামশাইকে মেরে ফেলেছে!..."

"কোথায় ছিল তোর জেঠামশাই?"

ততক্ষণে তাহার দৃষ্টিটা ভিতরের দিকে পড়িয়া যাওয়ায় হঠাৎ যেন আড়ষ্ট হইয়া চুপ করিয়া গেল। তাহার পর মূর্ত্তিটির দিকে দেখাইয়া বলিয়া উঠিল—"ঐ তো, ও জেঠামশাই গো।..."

একটু নিস্তব্ধতা; সবাই বুঝিল বেচারার মাথা বিগড়াইয়া গেছে।

কয়েকজন ঘিরিয়া বলিল—"ও তো মেয়েছেলে, দেখছিস ...কাঁদিস নি, খুঁজে বের করছি তোর [illegible]...ঠাণ্ডা হ' দিকিন..."

"না, মেয়েছেলে নয়···আমার মা···ছেড়ে দাও আমায়···"

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন নেশাখোর গোছের লোক খিঁচাইয়া উঠিল—"একবার মা, একবার জেঠামশাই···বেটা, মাথা খারাপ হয়েছে তো না হয় বাবাই বল্—একটা লোককেই ভাসুর আর ভাদরবৌ···"

মূর্তি মাথাটা হেঁটো করিয়া লইয়াছে। আমি যে এতক্ষণ কথা বলি নাই তাহার কারণ আছে—মাথাটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। আগাইয়া গিয়া বলিলাম—"ছেড়ে দাও ওকে···ব্যাপারটা কি রে? এদিকে আয় তো, বল্ খুলে, ভয় নেই···"

কোঁপাইতে কোঁপাইতে এবং তাহারই মধ্যে আড়াল দিয়া কতকটা ভয়ে এবং কুণ্ঠায় মূর্তিটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিল—"জেঠামশাই-ই তো···যাত্রায় মা যশোদা সেজেছেল, আমি হনু কেষ্ট···তারপর গড়পাড় থেকে মোছলমানেরা এসে পড়ল—তারপর···"

সবাই থ হইয়া গেছে।

মূর্তিটা হঠাৎ উঠিয়া পড়িল, ছেলেটার হাতটা ধরিয়া বলিল—"চ" হারামজাদা—হ'ল যদি দু'টো চপকাটলিসের জোগাড় তো কোথা থেকে শনির মতন এসে জুটল—মালের মুখে যে একটু তোয়াজ করে লোক খাবে···"

ছেলেটাকে টানিতে টানিতে ভিড় চিরিয়া ঈষৎ টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

প্রশ্ন

শ্রীনারায়ণ দত্ত

তোমায় আমি যে ভালবাসলেম
তুমি যদি জানতে
বিশাল নয়ন মেলে বিস্ময় হানতে।
ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল সন্ধ্যা;
তোমার মানস আজো অনুভূতি বন্ধ্যা—
অর্ঘ্য সাজিয়ে মিছে আসলেম।
চেয়ে আছি কবে ঢল নামবে
শঙ্কার জটা বেয়ে উচ্ছল কামনায়
পাগলাঝোরার ধারা আনবে···
আমার পথের শেষে দিগন্ত রিক্ত,
এখানে তো ফুল নেই নেই বন রঙ নেই
রাত্রির বর্ণেই প্রাণ অভিষিক্ত;
এখানে দিনেরা শুধু তমসার শঙ্কায়
বিবর্ণ সূর্যের মত অভিশপ্ত।

আমার জীবন ঘিরে অবিরাম ঝঞ্ঝা,
এখানে দেখেছি আমি মৃত্যুর তাণ্ডব
এখানে নিয়তি রূঢ়-ছন্দা;
এখানে দিনের শেষ রক্তের প্লাবনেই
শোষণে ও শাসনেই শুরু;
মর্মের সাগরের ঊর্মির দোল নেই—
শিলায়িত পুষ্পের স্বপ্ন।
এখানে তবুও আমি জীবনের সাধনায়
সূর্যের কামনায় মগ্ন,
তোমার বিশাল চোখে বক্ষের তৃষ্ণায়
খুঁজে ফিরি আরণ্য লগ্ন।
তোমায় আমি যে ভালবাসলেম
কারণটা যদি শুধু জানতে
বিশাল নয়ন মেলে আমার প্রাণের 'পরে
কি চাহনি বল তবে হানতে?

ভীমসেন — গণপতি — ভীমসেন
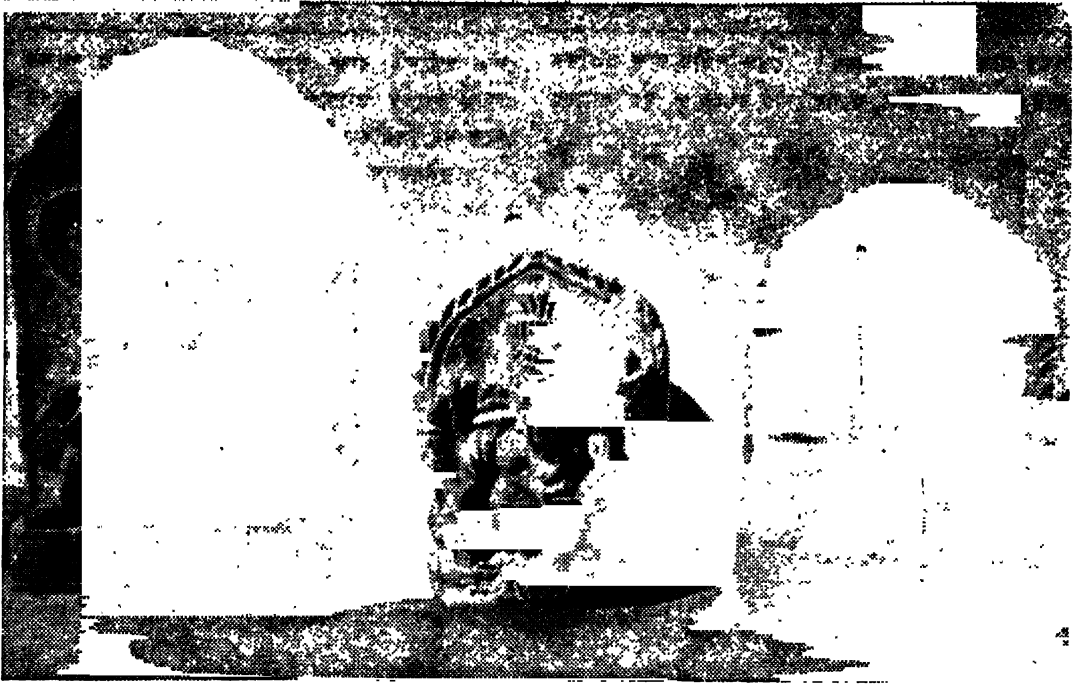
প্রথাগত কাঠখোদাই মূর্ত্তি। শিল্পী—শ্রীঋতেন্দ্র মজুমদার

শিল্প-কলা প্রদর্শনী

শ্রীদ্বিজেন মৈত্র

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের উদ্যোগে চার জন শিল্পীর শিল্পকলার একটি মিলিত প্রদর্শনী কিছু দিন আগে কলিকাতা শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই শিল্পীদের মধ্যে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও ৺রামকিঙ্কর এঁরা দু'জনে শিল্পরসিক মহলে সুপরিচিত। শ্রীমতী লীলা মুখোপাধ্যায় ও ঋতেন্দ্র মজুমদার এখনো শিক্ষার্থী। এঁরা সম্প্রতি নেপাল পরিভ্রমণ করে এসেছেন। সেখানকার পারিপার্শ্বিক এঁদের মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে তার পরিচয় পাওয়া গেল এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন স্কেচ, কাঠখোদাই, পাথর ও ধাতু তক্ষণের মধ্য দিয়ে।

এই রূপময় জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আমাদের মত সাধারণ লোকদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটা গতানুগতিকতা আছে। যখন কোন শিল্পী তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা নতুন দেশের রহস্যময় ভাষা আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলেন তখনই আমাদের গতানুগতিক দৃষ্টির ব্যর্থতা ও শিল্পীর দৃষ্টির অনন্যতন্ত্রতা সম্বন্ধে আমরা সজাগ হই। এই প্রদর্শনীতে যে কয়টি চিত্র ও অন্যান্য শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়েছে সেগুলির বিষয়বস্তু নেপালের পারিপার্শ্বিক, প্রকৃতি, মানুষ, জনতা, হাট, বাজার, মন্দির প্রভৃতি থেকে গৃহীত। এই শিল্প-রচনাগুলির মধ্যে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য কতটুকু এবং শিল্পকলার দিক থেকে তার আসল মূল্য কি প্রধানত: সে বিষয়েই আমাদের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হওয়া আবশ্যক।

এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা প্রদর্শিত সমুদয় চিত্ররচনার একটি মাত্র পরিচায়িকা দিয়েছেন—"রঙ ও কালিকলমের স্কেচ।" যে সঙ্কীর্ণ অর্থে 'স্কেচ' কথাটির প্রয়োগের সঙ্গে আমরা পরিচিত সেদিক থেকে উক্ত প্রদর্শনীর যাবতীয় চিত্ররচনাকে 'স্কেচ' নামাঙ্কিত করা অসঙ্গত। চিত্রশিল্পের মধ্যে যে বিশদ ষ্টাডি ও finished drawing-এর প্রত্যাশা করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই যদি এগুলিকে 'স্কেচ' পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়ে থাকে তবে বলা যেতে পারে যে কি ইউরোপীয়, কি ভারতীয় অনেক বিখ্যাত আধুনিক শিল্পী শুধু 'স্কেচ'ই সৃষ্টি করেছেন, [illegible] বা চিত্ররচনা করেন নি। এমন কি আচার্য্য নন্দলাল—[illegible] চিত্রকর্ম্মের বিশ্লেষণাত্মক ট্রিটমেণ্ট ও [illegible] বিস্ময়ের বস্তু, তাঁরও অনেক চিত্ররচনা, বিশেষ করে কয়েকটি নিসর্গ-চিত্রকে স্কেচ পর্য্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু এ হ'ল ব্যাপক অর্থে স্কেচ বলতে কি বুঝায়—আসলে স্কেচ হ'ল

দৃশ্যবস্তুর প্রাথমিক শিররূপায়ণ। স্কেচ-শিল্পীর কাজ প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে চয়ন করা, রূপের নোট সংগ্রহ। স্বল্প সময়ের
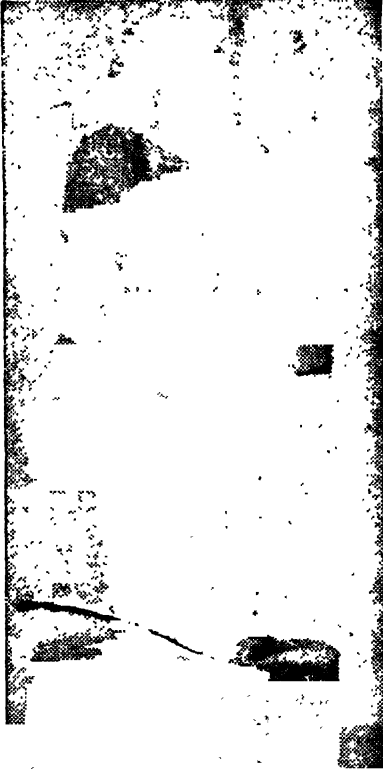
স্নাতক (নেপাল)
কাঠখোদাই। শিল্পী—শ্রীখতেন মজুমদার

পরিসরে মনোজগতে রূপময় বিশ্বের যে বিশিষ্টতাটুকু ধরা পড়ল স্কেচ হ'ল তারই "first fine careless rapture" অর্থাৎ—চরম আনন্দের অযত্নকৃত প্রাথমিক মধুর প্রকাশ। রস-বিচারের এই মাপকাঠিতে বিনোদবিহারীর চিত্রশিল্পকে 'স্কেচ' বলে স্বীকার করে নেবার পথে একটা বাধা আছে। যদিও শিল্পীর মানসপটে যাবতীয় দৃশ্যবস্তুর দ্রুত প্রতিফলনের ছাপ ছবি-গুলির সর্বত্র স্পষ্ট তবুও ফর্ম্ম বা রূপ আবিষ্কারের দিকে একটা অখণ্ড মনোযোগ, রঙের বিশিষ্ট প্রয়োগে দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করবার প্রয়াস, পরিবর্জন ও গ্রহণের দ্বারা চিত্রের ভারসাম্য সৃষ্টি প্রভৃতি তাঁর শিল্প-রচনাগুলিতে স্কেচের চেয়ে চিত্রশিল্পের মৌল ধর্ম্মকেই ব্যক্ত করেছে অধিক। তাঁর অনেক চিত্র একান্ত ভাবেই সুসম্পূর্ণ। সে সম্পূর্ণতা শুধু চিত্রণের দিক থেকে নয়, শিল্পীর মানসিকতার দিক থেকেও।

ড্রাফটসম্যান হিসাবে বিনোদবিহারীর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য্য হলেও এ সব চিত্রের প্রাথমিক উৎকর্ষ দেখা দিয়েছে রেখা-বিন্যাসের স্থিতিস্থাপকতা থেকে। যে-কোন পরিবেশ থেকেই 'ফর্ম্ম' আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে মূলতঃ ড্রইংয়ের দক্ষতায়। রঙের প্রয়োগ তাকে স্পষ্টতর করেছে মাত্র। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে চিত্রের বিশিষ্ট গুণ ফুটিয়ে তুলবার জন্যে একটি বিশেষ রঙের প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেছে। যেমন কোন চিত্রে সিঁদুরে রঙের একটি স্পর্শ চিত্রকে একটি বিশেষ সংহত রূপ দান করেছে। কিন্তু যখনই শিল্পীকে নেপালের মানুষ, জনতা প্রভৃতিকে তুলিতে রূপায়িত করতে হয়েছে,

ধারাস্নান
শিল্পী—শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

তখনই তাকে রেখার সেই প্রকৃতি আবিষ্কার করতে হয়েছে, যা সেই বিষয়বস্তুর যথার্থ প্রতিভূ হয়ে ধরা দেয়।

স্বতন্ত্র পন্থা দেখা গেল রামকিঙ্করের শিল্পকলায়। রাম-কিঙ্করের রচনার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন যে, তিনি মাত্র রঙের মাধ্যমেই 'ফর্ম্ম' আবিষ্কারের কৌশলটি আয়ত্ত করেছেন এবং massএর solidity-র (বস্তু-পুঞ্জের ঘনত্বের) নিখুঁত আকার দিতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি নিঃসংশয়েই আধুনিক, যে আধুনিকতার প্রধানতা হ'ল মৌল
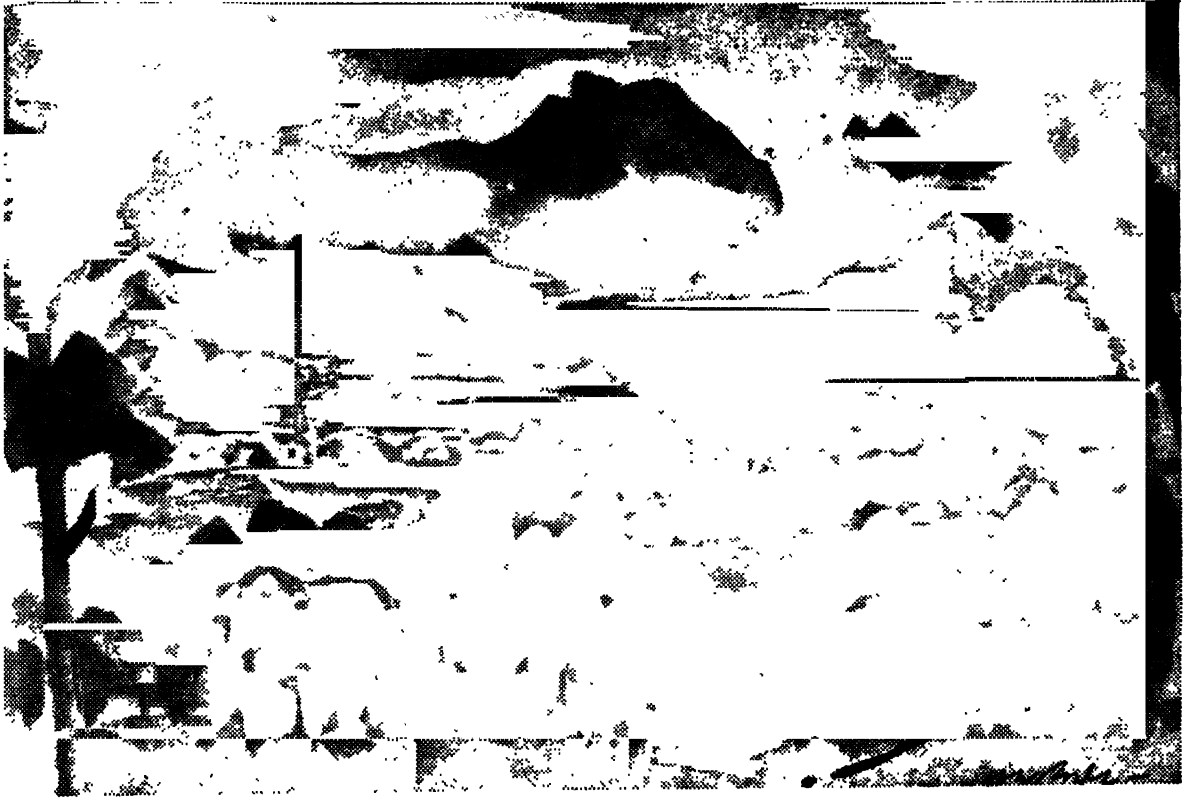
তুষার শৈল শিল্পী—রামকিঙ্কর

বস্তুর রূপের পরিচয় দেওয়াতে। এই দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা সার্থক শিল্পসৃষ্টি করতে গিয়ে তাঁর প্রধানতম সহায় হ'ল রঙ। অথচ তাতে ইমপ্রেসনিষ্ট পন্থার আভাস মাত্র নেই।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিল্পীর প্রাথমিক উদ্দেশ্য বস্তুর বাহ্যরূপের একটা বর্ণনা দেওয়া ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার লক্ষ্য থাকে কর্ম্মের দিকে। রঙ এই কর্ম্ম সৃষ্টির একটা উপায় মাত্র। রামকিঙ্কর এ সত্য ভাল ভাবেই জানেন, তাই তাঁর চিত্রে বিষয়বস্তুর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। অন্য দিকে রস-চেতনাকে উদ্বোধিত করার অন্যান্য কৌশলও তাঁর অনায়ত্ত থাকে নি। তাই তিনি শুধু বর্ণবিদ্ নন, রঙ কর্ম্ম ডিজাইন প্রভৃতি রূপব্যঞ্জনার মুখ্য কৌশলগুলির সৌসামঞ্জস্য তাঁর চিত্রে দেখা গেছে। আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পে যাঁরা Colourist বা বর্ণবিদ্ বলে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যও এইখানেই। এই প্রসঙ্গে সোজানের নাম স্মরণীয়। কিন্তু রামকিঙ্করের শিল্প ত শুধু রঙের সুষ্ঠ প্রয়োগ নয়, তাঁর শিল্পকলায় আরও অনেক quality বা গুণের সংমিশ্রণ সুপরিস্ফুট। তাঁর শিল্প প্রকৃতির খুব কাছাকাছি এবং বাস্তব অভিমুখী কিন্তু পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনাময়। তাঁর তুলিকায় রূপায়িত প্রকৃতি সর্ব্বদাই গতিমুখর। পাহাড়, গাছ, মেঘ সকলের মধ্যেই একটা গতির প্রচণ্ড স্পন্দন অনুভব করা যায়। সোজানের শিল্প একেবারেই গতিহীন—গাছ, পাতা, জল, মেঘ সব নিথর। তা যেন "antithesis of expressive art"—ব্যঞ্জনাময় শিল্পের বিরুদ্ধধর্ম্মী।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক, রামকিঙ্করের "তুষার শৈল" নামে চিত্রটি। ছবিটির রচনা-পদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে সোজানের বিখ্যাত চিত্র "Monte Sainte Victorie"র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে দুটি চিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের শিল্পসৃষ্টির মূলগত বিভিন্নতাই দুটি চিত্রের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। উভয় শিল্পীর রচনাতেই যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই তা হ'ল প্রকৃতির বিশৃঙ্খলতার মধ্যে সুসমঞ্জস ঐক্য আবিষ্কার আর তাকেই তাঁরা রূপায়িত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু সোজানের রঙের ব্যবহার যেখানে একান্তভাবে জ্যামিতিক কর্ম্মের অতিরিক্ত কিছুই নয়, রামকিঙ্করের রঙের প্রয়োগ সেখানে plastic quality ব্যতীত একটা আবেগের কমনীয়তাও এনে দিয়েছে।

এই প্রদর্শনীতে রামকিঙ্করের যে কখানি চিত্র

প্রদর্শিত হয়েছে, তার সব কয়টিই নেপাল সম্পর্কিত এবং সবগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা না হলেও এর থেকেই শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিকতা ও বিশেষত্বটুকুর পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলেছি, এ প্রদর্শনীর আর দু'জন শিল্পী এখনও ছাত্র। তবু এঁদের রচনা যে সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করতে চলেছে তা বুঝতে পারা যায়। শ্রী ঋতেন্দ্র মজুমদারের ছবিতে বিনোদবিহারীর প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। তবে এই প্রভাব যে অনুকরণে পর্য্যবসিত হয়নি এইখানেই শিল্পীর কৃতিত্ব।

ধান-চালের মূল্য বৃদ্ধির আন্দোলন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিষেরই দাম অসম্ভবরকম বাড়িয়া গিয়াছে। সাধারণ মানুষ দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। যে হারে জিনিষপত্রের মূল্য বাড়িয়াছে, সেই হারে সাধারণ মানুষের আয় বাড়ে নাই। সম্প্রতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য-মান কিছু কমতির দিকে যাইতেছে বটে, কিন্তু কবে যে মূল্য যুদ্ধের পূর্ব্বের মানে পৌঁছিবে তাহা কেহই বলিতে পারেন না।

বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, মূল খাদ্যের মূল্যের উপরেই অন্যান্য দ্রব্যাদির মূল্য প্রধানতঃ নির্ভর করে। সাধারণ লোকেরাও এই মত পোষণ করেন। বাস্তবক্ষেত্রেও এই মতের সমর্থন দেখা যায়। সুতরাং চাল ও গমের মূল্য কি উপায়ে কমানো যায় তাহা প্রত্যেক দেশহিতৈষীর চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। এমন কার্য্যকরী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে যাহার দ্বারা চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন হয় এবং উৎপাদনের ব্যয়ও কমে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরকার ও দেশের জনসাধারণকে একযোগে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। কলিকাতায় ভারতীয় এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্সের বার্ষিক সভায় সভাপতি মিঃ এলাকজ ঠিকই বলিয়াছেন, "আমরা মনে করি অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বিশেষ পরিমাণে হ্রাস করার উপর সরকারের সমস্ত পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, খাদ্যের দাম না কমিলে জীবনযাত্রার ব্যয় কমিবে না।" এ সম্বন্ধে গত পৌষ মাসের 'প্রবাসী'র মন্তব্যও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রবাসী লিখিয়াছেন, "খাদ্যদ্রব্যের মূল্যহ্রাসের উপর সত্য সত্যই এখন সমস্ত কাজকর্ম নির্ভর করিতেছে, দাম না কমা পর্য্যন্ত কোন দিকেই কূল-কিনারা পাওয়া যাইবে না।"

কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন, দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতেও ধান-চাউলের মূল্য বাড়াইয়া দিলেই (অস্বাভাবিক উপায়ে?) দেশের বর্ত্তমান দুর্গতির অবসান হইবে। অবশ্য ইহাদের সংখ্যা খুবই কম। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, বর্ত্তমানে ধান্য উৎপাদনের ব্যয়ের সহিত উহার মূল্যের কোন সামঞ্জস্য বা সমতা নাই। তাঁহারা আরও বলেন যে, বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট যে মূল্যে ধান সংগ্রহ করিতেছেন তাহা উৎপাদনের ব্যয়ের তুলনায় খুব কম। গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট মূল্য মণপ্রতি সাড়ে সাত টাকা। ইহার ফলে ধান্য-উৎপাদনকারীগণের তথা কৃষকসম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত নাই এবং ধান্য চাষের প্রতিও তাঁহাদের কোন উৎসাহ নাই। এই মত কত দূর সমর্থনযোগ্য তাহা প্রত্যেকেরই বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা দরকার যে, ধান্য উৎপাদনের খরচ কত তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা খুবই কঠিন, এমন কি অসম্ভবও বলা যাইতে পারে। যাঁহারা ধানের মূল্য বৃদ্ধির পক্ষপাতী তাঁহাদের মধ্যেও এ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। তাঁহাদের মধ্যে এক জন কৃষিবিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন যে, তিনি মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে এক মণ ধান্য উৎপাদনের খরচা অন্ততঃ ১০৲ টাকা পড়ে, আর এক জন বলিয়াছেন ৮৲ টাকা।

বিভিন্ন স্থানের অবস্থার উপর ধান্য উৎপাদনের খরচ নির্ভর করে; এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার যে, বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে উৎপাদনের পরিমাণেরও তারতম্য হইবে। এমন কি একই এলাকায় প্রায় একই রকমের চাষবাসের প্রণালী সত্ত্বেও, এমন কি দুই-একটি কারণের জন্য উৎপাদনের পরিমাণের যথেষ্ট তারতম্য দেখা যাইবে, অথচ খরচ প্রায় সমানই হইবে। সুতরাং উৎপাদনের পরিমাণ এবং উৎপাদনের খরচের মোটামুটি একটা গড় হিসাব ধরিয়া লইতে হইবে। এই গড় হিসাবের দ্বারাও এমন কথা বলা যাইবে না যে, প্রত্যেক ধান্য-উৎপাদনকারী ধানের চাষে লাভবান হইবেন, কারণ গড় অপেক্ষাও বিভিন্ন কারণবশতঃ কাহারও কাহারও ফলন কম হইতে পারে। বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, বর্ত্তমান সময়ে সাধারণতঃ এক মণ ধান উৎপাদনের জন্য ৫।৬ টাকার বেশী খরচ হয় না। নিম্নে একখানি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলাম:

মাহাড়ী, সিলদা
মেদিনীপুর
২৮।৮।৫৬

মহাশয়,

আপনার ১১।১২।৪৯ তারিখের চিঠি পেয়ে এক বিঘা জমি চাষ করিতে এখানে কি খরচ হয় এবং কত ধান ও খড় উৎপন্ন হয় তাহা বিশেষভাবে নিয়ে লিখিত হইল। আমাদের এই অঞ্চল (মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ) উচ্চ কঙ্করময় ভূমি। এখানে চারি প্রকার জমিতে (আওয়াল, দোয়েম, সোয়েম ও চাহারাম) ধান চাষ হয়। প্রথম শ্রেণীর জমির পরিমাণ খুব কম, অন্যান্য জমিও হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জমির মত উর্বর নয়। তবে এখানকার মজুরি অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কিছু সস্তা।***

বিনীত
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী ভূভাগের এক বিঘা জমির ধানের চাষের হিসাব :

বিঘা প্রতি গড় খরচ—

সার—৯৲	রোপণ—৬॥০
বীজ—২॥০	নিড়ান—২॥০
লাঙ্গল—৯৲	ছেদন—২॥০
আলিবন্ধন—২॥০	আঁটিবন্ধন ও বহন—৩৲
	ঝাড়ন, মাড়ন—২॥০
	মোট—৪০৲ টাকা

গরীব দেশ, সকলে উপরোক্ত পরিমাণ খরচ করিতে পারে না।

ফলন	ধান	খড়
আওয়াল	৮ মণ	৸৴০ পণ
দোয়েম	৬॥০ „	৸/০ „
সোয়েম	৫।০ „	॥৶০ „
চাহারাম		॥/০ „

মনে রাখিতে হইবে, উপরে একটি অনুর্বর অঞ্চলের হিসাব দেওয়া হইল।

আর একটি অঞ্চলের (হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত) হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল—ইহা নিজের অনুসন্ধানে জানিয়াছি।

এক বিঘা বীজ-ক্ষেত্র প্রস্তুতের খরচ :

(১) ছয় বার লাঙ্গল— (প্রতিবার ১৸০ হিসাবে)	১০॥০
(২) বীজ ধান ২ মণ	২৪৲
(৩) গোবর সার (৮০ ঝোড়া) বহনের ও প্রয়োগের খরচ	৪৲
(৪) অন্যান্য খরচ	৩॥০
	৪২৲ টাকা

উপরের হিসাবে গোবরের মূল্য ধরা হয় নাই ; সাধারণতঃ কৃষকগণ নিজেদের গোয়ালের গোবর ব্যবহার করেন।

এক বিঘা বীজক্ষেত্রে উৎপন্ন চারা ১৪।১৫ বিঘায় রোপণ করা যায়।

এক বিঘা ধানের চাষের খরচ :

(১) তিনবার লাঙ্গল (প্রতি লাঙ্গল ৩॥০ টাকা হিসাবে)	১০॥০
(২) রোয়া ৪ জন (প্রতিজন ২৲ হিসাবে)	৮৲
(৩) নিড়ান ২ জন („ „ ১৸০ „)	৩॥০
(৪) জমির আইল বাঁধা এক জন	২৲
(৫) ধান কাটা চার জন	৮৲
(৬) আঁটি বাঁধা, বহন, গাদা দেওয়া আড়াই জন	৭॥০
(৭) ঝাড়ন, মাড়ন তিন জন (প্রতিজন ১৸০ হিসাবে)	৫।০
(৮) আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ	২।০
(৯) চারার খরচ	৩৲
(১০) জমির খাজনা	৪৲
	৫৪৲ টাকা

ফলন : ধান—৮ মণ
খড়—১ কাহন

বর্তমান সময়ে উক্ত অঞ্চলে ধানের মূল্য প্রতি মণ ১১৲ টাকা এবং এক কাহন খড়ের মূল্য ২২৲ টাকা, সুতরাং ধান ও খড়ের মোট মূল্য ১১০৲ টাকা। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, বর্তমান বৎসরে ধানের ফলন গড় ফলন অপেক্ষা অতিরিক্ত হইয়াছে। সুতরাং লাভের অঙ্কও অধিক।

অনেকের মত এই যে, পূর্ব্বে এবং এখনও ধানের চাষে যে পরিমাণ খরচ হয় তাহা ধানের মূল্যের প্রায়ই সমান। কেবল মাত্র উৎপন্ন ধানের মূল্য হিসাব করিলে ধানের চাষে লাভ কিছুই থাকে না। খড়ই লাভের অঙ্কে যায়। বর্তমানে খড়ের মূল্য খুবই বেশী।

ধানের চাষে লাভ-লোকসান হিসাব করিতে হইলে আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রধান হইতেছে, বর্গাচাষের পরিমাণ এবং নিজ হস্তে চাষের পরিমাণ। এই হিসাবও সঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। তবে মোটামুটিভাবে একটা হিসাব করা যাইতে পারে এবং সেই হিসাবের দ্বারা প্রকৃত অবস্থার মোটামুটি ধারণা হইতে পারে। যে সকল কৃষক বা জমির অধিকারী বর্গাচাষীর সাহায্যে ধানের চাষ করিয়া থাকেন তাঁহারা বিনা খরচে তাঁহাদের জমির উৎপন্ন ধানের একটা নির্দিষ্ট অংশ পাইয়া থাকেন। চাষের ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, যাঁহাদের পাঁচ

একর (১৫ বিঘা) পরিমাণ পর্য্যন্ত জমি আছে তাঁহারা প্রধানতঃ নিজ হস্তে জমির চাষ করিয়া থাকেন ; যাঁহাদের জমির পরিমাণ পাঁচ একর হইতে দশ একর তাঁহারা আংশিকভাবে বর্গাদারের উপর নির্ভর করেন এবং যাঁহাদের দশ একরের বেশী জমি আছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বর্গাচাষীদিগের উপর নির্ভর করেন।

সরকারী হিসাব অনুযায়ী পাঁচ একর পর্য্যন্ত ধান্ত-উৎপাদনকারী পরিবারের সংখ্যা ১৭'৩৬ লক্ষ এবং পাঁচ একরের অধিক ধান্ত-উৎপাদনকারী পরিবারের সংখ্যা ৬'১৪ লক্ষ। এই হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে, ৬'১৪ লক্ষ পরিবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাষের জন্ত সম্পূর্ণরূপেই বর্গাচাষীর উপর নির্ভর করেন এবং ১৭'৩৬ লক্ষ পরিবার আংশিকভাবে তাহাদের উপর নির্ভর করেন। সুতরাং চাষের ব্যয় বৃদ্ধি অনুসারে হিসাব করিলে উৎপাদনের খরচের হিসাব ঠিক হইবে না। কত পরিমাণ শস্ত বর্গাচাষের জন্ত বিনা খরচে পাওয়া গেল এবং কত পরিমাণ শস্ত কি খরচে পাওয়া গেল তাহার সঠিক হিসাবের দরকার।

সমগ্র জীবনযাত্রার ব্যয়ের মানের সহিত চালের বর্ত্তমান মূল্য-মানের তুলনা করিয়াও এই বিষয়ে কতকটা ধারণা হইতে পারে। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয়ের মান ছিল ৩৪২'৫ এবং শ্রমিকশ্রেণীর মান ছিল ৩৫৯'৬। পল্লী অঞ্চলে এই মান ইহা অপেক্ষা সামান্ত কম হইবে। আবার যাঁহাদের বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ধান বা চাল আছে তাঁহাদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের মান অনেক পরিমাণে কম ; কেননা মোট ব্যয়ের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগই খাদ্যের জন্ত ব্যয় হয়, এবং খাদ্যের মূল্যও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং যাঁহাদিগকে ধান চাল ক্রয় করিতে হয় না, ইহার মূল্য বৃদ্ধির জন্ত তাঁহাদের কোন ক্ষতি নাই। সুতরাং এই ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, তাঁহাদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের মান তিন শতের বেশী হইবে না। এ ছাড়া ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ১৯৩৮–৩৯ সালে চালের মূল্য ছিল ৩।৵০ কিন্তু বর্ত্তমানে উহা ২০'২৩ হইতে ২৩ ৪৮ টাকার মধ্যে উঠা-নামা করিতেছে। এখন চাউলের মূল্য-মান ৫৭১। সুতরাং সমগ্র জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় চালের মূল্য-মান খুবই বাড়িয়াছে। চালের মূল্য আরও বাড়িলে জীবনযাত্রার অন্তান্ত ব্যয়ের মূল্যও সেই অনুপাতে বাড়িয়া যাইবে।

আরও একটি কথা এই যে, জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় চাষের ব্যয় অনেক বিষয়ে কম আছে। কৃষি-শ্রমিকদের মজুরি শতকরা ৩০০ ভাগের বেশী বৃদ্ধি পায় নাই। জমির খাজনাও অপরিবর্ত্তিত আছে। সুদের হারও বাড়ে নাই।

ধান-চালের মূল্য বাড়াইলে কাহারা এবং লোকসংখ্যার শতকরা কত ভাগ লাভবান হইবে তাহাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বিবেচনা করা দরকার। নিম্নলিখিত হিসাব হইতে এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে :

জমির পরিমাণ	ধান উৎপাদনকারী পরিবারের সংখ্যা (লক্ষ)	মোট পরিবারের সংখ্যার শতকরা হার	ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত (হাজার টন)
১। ২ একরের কম	১০'৩৬	৪৪'১	– ৬৯৩
২। ২ হইতে ৩ একর	২'৭৫	১১'৭	– ৪৭
৩। ৩ হইতে ৪ একর	২২'৬	৯ ৬	+ ৩৬
৪। ৪ হইতে ৫ একর	১'৯৯	৮'৫	+ ৯৭
৫। ৫ হইতে ১০ একর	৪'৩২	১৮'৪	+ ৫৪১
৬। ১০ হইতে ২৫ একর	১'৬৫	৭'০	+ ৩৬২
৭। ২৬ একরের বেশী	'১৭	০'৭	+ ১১৫
	২৩ ৫০	১০০'০	+ ১০৩৬

উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইবে প্রথম দুই শ্রেণীর কৃষক-পরিবারকে চাল ক্রয় করিয়া খাইতে হয়। এই দুই শ্রেণী সমগ্র ধান্ত-উৎপাদনকারী পরিবার-সংখ্যার শতকরা ৫৫'৮ ভাগ। যদিও তৃতীয় শ্রেণীর পরিবারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু পরিমাণ চাল উৎপন্ন হয়, কিন্তু নানাবিধ প্রয়োজনের জন্ত তাহাদিগকে ফসলের সময় শস্ত বিক্রয় করিতে এবং অন্ত সময় ক্রয় করিয়া খাদ্যের সংস্থান করিতে হয়। এই তিন শ্রেণীতে মোট ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার পরিবার আছে ; অর্থাৎ সমগ্র পরিবার-সংখ্যার শতকরা ৬৫'৪ ভাগ। শেষ চারি শ্রেণীতে মোট আট লক্ষ তের হাজার পরিবার অথবা মোটামুটি ৪০ লক্ষ লোক আছেন এবং ইঁহাদের চাল ক্রয় করিতে হয় না। ইঁহারাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাল বিক্রয় করেন। সুতরাং ধান-চালের মূল্য বাড়িলে বাংলাদেশের আড়াই কোটি লোকের মধ্যে ৪০ লক্ষ লোক (অর্থাৎ শতকরা ১৫।১৬ ভাগ) লাভবান হইবেন এবং অবশিষ্ট ২ কোটি ১০ লক্ষ লোককে অধিকতর মূল্যে চাল ক্রয় করিয়া দুই বেলা উদরান্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই দুই কোটি লোকের মধ্যে আছেন—অল্প জমি-চাষী কৃষক, বর্গাদার, ভূমিহীন শ্রমিক, অকৃষি শ্রমিক, কারিগর এবং ম[illegible]।

সকল কাজের এবং সকল পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্ত হইতেছে "greatest good to the greatest number" অর্থাৎ অধিকতম সংখ্যার জন্ত অধিকতম মঙ্গল সাধন। কিন্তু ধানের মূল্য বৃদ্ধির পরিকল্পনার সাহায্যে এই উদ্দেশ্ত সাধিত হইবে কি ?

এই প্রসঙ্গে ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের কথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে। এই মন্বন্তর সম্বন্ধে দুর্ভিক্ষ-কমিশন বলিয়াছিলেন—

"The rise in the price of rice was one of the

principal causes of famine and this has made it unique in the history of famines in India."

অর্থাৎ, দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণগুলির মধ্যে ছিল চালের মূল্য বৃদ্ধি এবং ইহাই ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে এক নূতন এবং অদ্বিতীয় ঘটনা।

ধানের মূল্য বাড়াইয়া দিলেই ধানচাষের প্রতি কৃষক-সম্প্রদায়ের উৎসাহ বাড়িবে এবং ধানের জমির পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে তাহাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। অনেক শাক-সব্জীর মূল্য খুবই বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই অনুপাতে জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে কি? সরিষার তৈলের মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে সরিষার চাষ প্রসারলাভ করে নাই। এইরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। আমন ধান যে পরিমাণ জমিতে জন্মে মোটামুটি সেই পরিমাণ জমিতেই জন্মান হইতেছে। আমন ধানের জমির পরিমাণ বাড়াইতে হইলে ধান-চালের মূল্য মণপ্রতি দুই-এক টাকা বাড়াইয়া দিলে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। আমন ধানের চাষের বিস্তৃতির পথে যে সকল অন্তরায় আছে তাহা দূর করিতে হইবে। ইহার মধ্যে প্রধান অন্তরায় হইতেছে উঁচু জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা এবং নীচু জমি হইতে জল নিকাশনের বন্দোবস্ত করা। আরও অনেক বাধা আছে যেমন স্থানীয় স্বাস্থ্যের অবনতি, বলদের অভাব, শ্রমিকের অভাব, অর্থের অভাব ইত্যাদি। পল্লী অঞ্চলে ত চালের মণ পঁচিশ ত্রিশ টাকা—ইহাতেও চাষের জমি তেমন বাড়ে নাই। ধরাপাদ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেব বলেন যে, খেজুরে গুড়ের মূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে খেজুরে গুড়ের উৎপাদন বাড়ে নাই, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে—জ্বালানির অভাব। সুতরাং কোন্ কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পথে কি কি অন্তরায় আছে তাহা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া সেগুলি দূর করিতে পারিলেই উহার উৎপাদন বাড়িবে।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, কৃষকেরা ধানের চাষে লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখেন না; তাঁহাদের সহজ বুদ্ধি এই যে, নিজেদের পরিশ্রমের দ্বারা যতদূর সম্ভব নিজেদের ও গরুর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ছাড়া ধানের চাষে ঘর হইতে তাঁহাদের নগদ অর্থ বাহির করিতে হয় না। বীজ-ধান ঘরেই থাকে, সারের বিশেষ বালাই নাই; এমন কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোবর-সারও ব্যবহার করা হয় না।

আমার নিজ এলাকায় (হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া, আঁটপুর, তড়া, আনরবাটী, কোমরবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে) বহু সাধারণ কৃষকের সহিত আলোচনা করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, তাঁহারা ধানের দাম বাড়াইবার পক্ষপাতী মোটেই নহেন, বরং কমাইবারই সপক্ষে। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, মধ্যে মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনের জন্য তাঁহাদের কিছু কিছু ধান বিক্রয় করিতে হয় বটে, কিন্তু বৎসরের অধিকাংশ [illegible] সময়েই তাঁহাদের ধান ক্রয় করিতে হয়। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের লোকসানই হইবে। এইরূপ কৃষকের সংখ্যাই বেশী।

বিজনে

শ্রীরবি গুপ্ত

পাহাড়-শিখর যেথা রচে ছায়া প্রাচীন পাদপ-ডোর,
বসি তারি 'পরে বিষাদে সতত অস্ত-দিবস-পলে;
লক্ষ্য-বিহীন সমতলভূমে ফেরাই দৃষ্টি মোর,
শত বিভিন্ন ছবি জেগে ওঠে আমার চরণতলে।

হেথায় গরজে রচি' আবর্ত ঊর্মি স্রোতবীর,
সর্পিল-পথে হয়েছে সে কোন ধূসর-সীমার হারা;
সেথা, অবিচল হ্রদে ছেয়ে যায় তারি ঘুমন্ত নীর
নীলাভবর্ণে যেথা ফুটে ওঠে গোধূলি-ক্ষণের তারা।

পর্বত যেথা ঘন অরণ্যে ঢেকেছে শৃঙ্গ তার—
অস্ত-রবির একটু আভাস বুঝি বা এখনো রয়,
নিশীথ-রাণীর ছায়া-যান ওই ওঠে বেগে অনিবার—
অস্ত-মুখর ময়ূখ-মালায় দীপিত দিগ্বলয়।

কিন্তু তবুও উদ্ভূত কোন মন্দির-চূড়া হ'তে
অমরা-স্বর্গ-সুর-ঝঙ্কার বহুরে বাজে হায়:
ধামে পথচারী, সুদূর আগত প্রহর-ধ্বনির স্রোতে
শেষ বেলাকার সময় হারায় অমিয়-মূর্ছনায়।

নিরাশা-নিহিত হৃদয় আমার মধুর দৃশ্যদল
জাগে না হেরিয়া পুলক-উচ্ছলে, ওঠে না হরষে মাতি;
মনে হয় মোর এ বসুধা শুধু যেন ছায়া চঞ্চল:
জ্বলে কি অতীত জনের হৃদয়ে চির নভোমণি-ভাতি!

পর্বত হ'তে পর্বত 'পরে বিফল ফিরায়ে আঁখি,
দক্ষিণ হ'তে উত্তরাচলে, ঊষালোক হ'তে সাঁঝে
ফিরি যেথা রয় পাহাড়মৌলী অনন্ত-বুকে জাগি
কহি আপনায়: "তব তরে সুখ কোনোখানে নাহি রাজে।"

গিরি-কন্দর, রাজার-প্রাসাদ, পর্ণ-কুটীর তারা
ধূলিসম সবে—হরষ তাদের মোর লাগি নাহি আর।
প্রিয় নীরবতা, পাহাড়, বনানী, নদীতরঙ্গ-ধারা
একটি হৃদয় বিহনে বিরচে দৃপ্ত শূন্যতার।*

---

* Alphonse Lamartine-এর মূল ফরাসী হইতে

ব্রিষ্টলের কথা

শ্রীচিত্রিতা দেবী

ধক্ ধক্ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ট্রেন চলেছে এগিয়ে। দু'ধারে গড়িয়ে পড়ছে ঘন সবুজের ঢালু জমি—কি সবুজ চারিদিকে, পৃথিবী ঢাকা পড়েছে নরম সবুজ কার্পেটে। চোখ জুড়িয়ে যাওয়া ঘন স্নিগ্ধ রঙের প্রলেপ মাখানো দিগন্ত। নবীন শ্যামলের বুকের ওপরে দলে দলে চরে বেড়াচ্ছে নানা রঙের গরুর পাল—সেবায় যত্নে হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। মোটা মোটা উপুড় করা কলসীর মত ঝুলে পড়েছে দু'ধের বাঁট।

ব্রিষ্টলের ট্রাম রাস্তার কেন্দ্র। দূরে একটি জাহাজ দেখা যাইতেছে

কামরায় কেবল আমরা তিন জন। তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় লাল ভেল্‌ভেটের উঁচু স্প্রীঙের গদি, কোট ঝোলাবার আলনা, আয়না ও টুকিটাকি জিনিষ রাখবার তাক—ব্যাগ রাখবার উঁচু তাক অর্থাৎ আমাদের প্রথম শ্রেণীর কামরার চেয়ে অনেক ভালো ব্যবস্থা। বসে বসে সমুদ্রপারের ছোট দ্বীপটির বিস্তীর্ণ শস্যসম্ভারের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে দিলাম। গরুর জন্যে নির্দিষ্ট ঘাসের ক্ষেতের আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষের খাদ্য-শস্যের শাকসব্জীর ক্ষেত। দু'এক জায়গায় গমের শীষ হাওয়ায় দুলছে, কিন্তু সে খুব কম। বেশীর ভাগই কপি ও মটরজাতীয় সব্জীর ক্ষেত কিম্বা রাসবেরী ও ষ্ট্রবেরী ফলের ক্ষেত। কোথাও দেখা যায় ঘন সবুজের মাঝখানে অনেকখানি ধূসর রঙের ফাঁক—সেখানে টুপী মাথায়, জুতো পায়ে চাষীরা চাষ করছে।

ক্রমে গাড়ীর গতি মন্থর হয়ে এসে থামল একটা ছোট ষ্টেশনে টিনের শেড্ দেওয়া কাঠের প্ল্যাটফর্ম, ছোট একটি ষ্টেশন। লোকের ভিড় নেই বললেই হয়।

বাইরের পানে তাকিয়ে দেখি—টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার চলে গেছে সোজা দূর গ্রামান্তরে, কিন্তু তারের ওপরে পাখীর সারি বসে নেই কেন? কোথাও ট্রাক্টারে চলছে চাষ—কোথাও এখনো পুরোনো কালের প্রথা—ঘোড়া দিয়ে হাল-চাষ করানো হচ্ছে। ঘোড়াগুলো মোটা-সোটা, কপাল ঢেকে চুল পড়েছে ঝুলে, বেঁটে বেঁটে পাগুলো হাঁটুর নীচ থেকে মোটা হয়ে এসে গোড়ালির কাছে লুকিয়ে পড়েছে ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে। খুকু লাফিয়ে উঠল, ঘোড়াগুলো ওরকম কেন? খুকুর বাবা জবাব দিলেন, এ ওদের হালচষা ও গাড়ীটানা ঘোড়া কিনা, তাই ওরকম। তরঙ্গায়িত সবুজের মধ্যে হীরের কুচির মত ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট ডেজি—মাঝে মাঝে দু'একটা গোলাবাড়ী চোখে পড়ে—বাগানে ঘেরা ঢালু ছাদের নীচু বাড়ীর পাশে কাঠের শেড্ দেওয়া বার্ণ। সেখানে কোথাও বা দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ একটা ঘোড়া, বা একটা ছোট ট্রাক্টার। কোথাও ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে জাল দিয়ে ঘেরা ঘরের মধ্যে বড় বড় মুরগীগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথাও প্যাক্ প্যাক্ করছে হাঁস—সরু সরু খালের মত জল-রেখা চলে গেছে কোন গ্রাম বেষ্টন করে। সবুজ বন্যার মাঝে কোথাও ভেসে ওঠে ছবির মত ছোট ছোট গ্রাম। পঁচিশ-তিরিশটা ছোট ছোট বাড়ী—রাঙা টালির ছাদ—জানলা দিয়ে দেখা যায় রঙিন লেসের পরদা ঝুলছে। প্রত্যেক বাড়ীর সঙ্গেই বাগান, মেহেদীপাতার বেড়া দিয়ে আলাদা করা। বাগানে খেলছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। মেয়েদের সোনালী চুলে রিবন বাঁধা, ছেলেদের ছোট পাজামা কাদামাখা। প্রায় সকলেই এক একটা ছোট তিন-চাকার সাইকেল বা স্কুট্যার নিয়ে খেলছে।

রেল-লাইনের পাশ দিয়ে সোজা চলে গেছে পিচমোড়া রাস্তা—বাস চলেছে যাত্রীদের নিয়ে—বড়লোকদের মটর চলেছে ছুটে। মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে ছোট কাঁচের ঘরে পাব্লিক টেলিফোন, পরিপাটি সাজানো। ছোট ছোট ঢালু ছাদের বাড়ীগুলোর ছোট কাঁচের জানলা ঘিরে রঙিন পর্দা। ছোপানো এপ্রন বেঁধে মেমগিন্নীরা বেড়াচ্ছে নানা কাজে। বড় রিবনের বো বাঁধা বাচ্চা মেয়েগুলোকে কে বলবে মোমের পুতুল নয়। ওদিকে খুকুর প্রশ্নের অন্ত নেই। খুকুর বাবা রেলগাড়ীর দেয়ালে টাঙানো ইংলণ্ডের রেলপথের ম্যাপ দেখছেন। আমি চেয়ে দেখি লম্বা করিডোরটা দিয়ে অনেক লোক আসছে যাচ্ছে—কারো বা বেশ ফিট্‌ফাট ধোপদুরস্ত পোশাকপরিচ্ছদ, পালিশ করা জুতো, কারো বা জীর্ণ মলিন বেশ-বাস, চুলগুলো উড়ছে। একটি ছোট মেয়ে পাশের

ব্রিষ্টলের একটি উপকণ্ঠ

কামরা থেকে বেরিয়ে আড়চোখে একবার খুকুকে দেখে নিয়ে আবার ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে। খুকুরও একই দশা। ভাব করার লোভ ছ'পক্ষেরই সমান, অথচ সঙ্কোচও কম নয়। ট্রেন এবারে বড় একটা জংসনের কাছাকাছি এসেছে। ট্রেন ছাড়বার প্রাক্কালে অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত এক ভদ্রমহিলা কামরায় এসে ঢুকলেন, তার সঙ্গে বেশ আলাপ জমে উঠল। 'জ' মহাশয় উচ্ছসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—"ঐ চেয়ে দেখ ব্রিষ্টল দেখা যাচ্ছে। ঐ যে সবুজ পটভূমিকায় অসংখ্য বাড়ী—রাঙা টালির ছাদওয়ালা ছোট ছোট বাড়ী, বড় বড় গির্জ্জার চূড়া, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সৌধশ্রেণী—ভারি সুন্দর লাগছে দেখতে। লিভারপুলের মত ধোঁয়ায় আর কালিতে আচ্ছন্ন শহর নয়। সুন্দর উজ্জ্বল।

ওদিকে কামরায় রাজনৈতিক আলোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে, সেই আলোচনায় খুকুর বাবাকেও যোগ দিতে হয়েছে।

'জ' মশায়ের কিন্তু উৎসাহ ক্রমবর্দ্ধমান হয়ে উঠেছে—ঐ যে দেখা যায় এভন নদীর তটরেখা—ঐ ত অতিপরিচিত শহর—দশ বছর আগে এখানে তিনি বছর তিনেক কাজ করেছেন কোন কারখানায়। যথাসময়ে আমরা ব্রিষ্টল শহরে এসে অবতরণ করলাম।

ব্রিষ্টল শহরের একটি বৈচিত্র্য এই যে, শহরের ঠিক মাঝখানে নদীটা কেমন করে ঢুকে পড়েছে এবং সেইখানেই শহরের কেন্দ্র, জাহাজ আছে দাঁড়িয়ে। ছ'পাশ দিয়ে জনস্রোত যাচ্ছে বয়ে—বড় বড় বাসে লাফিয়ে উঠছে কেউ, কেউ বা দাঁড়িয়ে আছে কিউ-এর শেষ প্রান্তে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে পাশেই দেখতে পাবে, তিনরঙা জাহাজের মাস্তুলে নিশান উড়ছে পত্ পত্ করে, রঙীন কাগজের মালায় সাজানো নৌকো আছে বাঁধা। শহরের ঠিক মাঝখানে বন্দর আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। এ শহরটি ইংলণ্ডের একটি পুরনো শহর, অবশ্য ইংলণ্ডের পক্ষে যতটা পুরনো হওয়া সম্ভব। রোমান-দের আমলে শহর হিসেবে এর নাম কোথাও পাওয়া যায় না। তবে তখনও হয়ত এইখানে, এই এভন নদীর তীরে তাঁবু পড়ত মাঝে মাঝে। 'বাথ' শহরে স্নানে যাবার পথে এইখানে হয়ত হ'ত বিশ্রামের আয়োজন।

ক্রমে সে যুগের পালা হ'ল শেষ। তারপরে শতাব্দীর পথ বেয়ে কত এঙ্গল, স্যাকসন, ডেন, নর্ম্যান—লড়াইয়ের ঘূর্ণিপাকে দেশটাকে দিলে পাক খাইয়ে। যুদ্ধ আর মৃত্যু—খালি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া, মারা এবং মরা। পরস্পরকে হারিয়ে দেবার তীব্র প্রতিযোগিতায় ধীরে ধীরে একটা ইতিহাস গড়ে ওঠে পৃথিবীর এই ছোট দ্বীপটির ভৌগোলিক
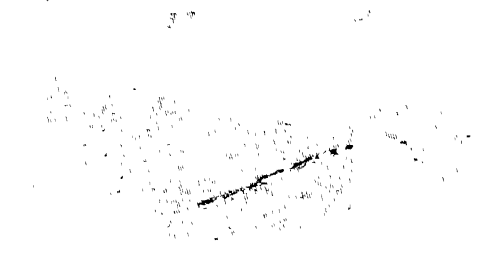
নদীর একাংশের দৃশ্য

সীমার মধ্যে। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রগতির যুগেও যে মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ একেবারে লোপ পেয়ে যায় নি তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ব্রিষ্টলের সাস্‌পেনসন ব্রিজ। দুই পাহাড়ের মাঝখানে বহু নিচে দিয়ে এভন বয়ে যাচ্ছে। তার ওপরে আধমাইল লম্বা টকটকে লাল একটি পথ ঝুলছে শূন্যে। কোন রকম জবড়জঙ্গ লোহার কারিগরি নেই—সোজা একটা পথ। এ পাশে নরম কোমল ঘাসের বিছানায় ছোট ছোট সাদা ডেজির তারা—মাঝে বেগুনী ও গোলাপী 'মে' ফুলের গাছ পুষ্প স্তবকে ভরা। সেই ঘোরানো পাথরবাঁধানো পায়ে চলা পথ দিয়ে উঠে যেতে পার ব্রিষ্টলের সবচেয়ে উঁচু জায়গায়। ঘোরানো রাস্তাটির বাঁকে বাঁকে পাতা আছে লোহার আসন—তাতে বসে চতুষ্পার্শ্বের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবে যেতে পার। নীচে এভন যাচ্ছে বয়ে, মাঝখানে এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত লাল পুলটি—যেন শূন্যতার বুকে রক্তবহনীর মত দৃশ্যমান। আর চারপাশে ছেলেমেয়েরা কলরব করে খেলে বেড়াচ্ছে। পিকনিকে এসেছে দলে দলে স্ত্রীপুরুষ কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে। আরো একটু উঁচুতে উঠলে

ঝোলানো সেতু

দেখতে পাওয়া যায় একটি ছোট ঘর। সেখানে আছে একটা ধাঁধাঁ-লাগানো ক্যামেরা। সিঁড়ির মুখে প্রায় ৫০ জনের কিউ। আমরা ৮ জন সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। অন্ধকার ঘরে একটা গোল বোর্ডের ওপর ফোকাস করে আলো পড়েছে, যেমন পড়ে সিনেমার বোর্ডের ওপর। আর পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের রাস্তা ত বটেই, আরও দূরে, বহু দূরে, প্রায় সমস্ত শহরটারই প্রতিচ্ছবি পড়ছে তার ওপরে। ঐ যে রাস্তা দিয়ে একটা মোটর যাচ্ছে। বাস চলছে—ব্যস্তসমস্ত ভাবে লোকজনেরা চলাফেরা করছে।

এখানে শহরের সঙ্গে প্রকৃতির ঘটেছে মিতালি। এক দিকে প্রায় আধখানা শহর জুড়ে মাঠ। তাকে এরা বলে ডাউনস্। এই ডাউন্সের কাছাকাছি একটা বাড়ীর গবাক্ষে বসে লিখছি। সামনে ছোট্ট একটু ফুলের পাড় দেওয়া ঘাসে ঢাকা জমি, পিছনে অনেকটা খোলা জায়গা, তাতে সব্জী ফলানো হয়। বাড়ীতে আছে কর্ত্তা, গিন্নী, একটি ভারতীয় বোর্ডার এবং বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য একটি ঝি। এদের সকলেরই আবার এক একটি পোষ্য আছে, কর্ত্তার একটা প্রকাণ্ড সাদা বুলটেরিয়ার, গিন্নীর একটা বুড়ী টিয়া 'পোলি', ভারতীয়ের একটি ঘনরোমা কুকুরী। দাসীর একটি ছোট ছেলে আছে নাম মাইকেল। ভারতীয়টির নাম দেওয়া যাক 'গ'। 'গ' সাহেব শিশুকাল থেকে এদেশে আছেন। পঁচিশ বছর ধরে ইংলণ্ডের জলবায়ুর প্রভাব একে মনে প্রাণে ইংরেজ করে তুলেছে। ইনি অশনে বসনে আচারে ব্যবহারে ভাবনা কল্পনায় সব দিক দিয়েই ইংরেজ-ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছেন। ইনি ইংরেজদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, এবং ইংরেজের মতই ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত রক্ষণশীল।

এখন বেলা পড়ে এসেছে। 'গ' গেছেন বন্ধুর সঙ্গে তাঁর পুরনো কর্ম্মস্থলে, গিন্নী দিবানিদ্রায় মগ্ন, কর্ত্তা গেছেন কাজে, যদিও বয়েস ৭০। খুকুকে নিয়ে এলিস গেছে বেড়াতে। সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ নিঝুম। শুধু পোলি কোথাও এতটুকু আওয়াজ পেলেই কর্কশ স্বরে 'হ্যালো' 'হ্যালো' বলে চেঁচাচ্ছে। জানালা দিয়ে দেখা যায়, সামনের সারির এক মাপের এক ধাঁচের বাড়ীগুলো। কালো চওড়া রাস্তা বাঁদিক দিয়ে উঠে ডান দিকে নেমে আসা বড় রাস্তাকে অতিক্রম করে পিছন দিকে চলে গেছে। তকতকে ঝকঝকে পরিপাটি চারদিক, কচিৎ চলেছে দুটি-একটি মেয়ে। দুপুরবেলা যে যার কাজে ব্যস্ত।

কল কল করতে করতে এলিসের সঙ্গে খুকু এসে ঢোকে ঘরে। এলিস বাড়ীর দাসী। সপ্তাহে ১॥ পাউণ্ড তার মাইনে, তার ও তার ছেলের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা এই বাড়ীতেই তিন তলার ওপরে চমৎকার একটি ঘরে এলিস থাকে। গদিওয়ালা খাট, ধবধবে চাদর পাতা বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, দেরাজ আলমারী, কার্পেট, ফুলসমেত ফুলদানী দিয়ে গৃহিণী ঘর সাজিয়ে রেখেছিলেন দাসী এসে সে ঘরে অধিষ্ঠিত হবার আগেই। এলিসের বয়স ৩০। হাসিখুশী চেহারা—মাথার চুলগুলি কাঁপিয়ে ওপরে তোলা, ঠোঁট দুটি সব সময়ে টুক টুক করছে। এরা দাসদাসীকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে না। শ্রীমতী বিও দুপুর বেলা দাসীর সঙ্গে খেতে বসেন। স্নানের ঘরে এলিসের জন্যে নিজের হাতে টবে গরম জল ধরে রাখেন।

ঝোলানো সেতুর নিচ দিয়া প্রবাহিত একটি নদী
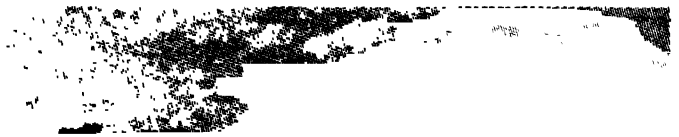
খুট করে আওয়াজ হ'ল শ্রীমতী 'বি' ফ্রিল দেওয়া এপ্রন বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছেন —"এলিস এবারে আমাদের ডিনারের জন্মে তৈরি হতে হবে।" এলিস ঘড়ি দেখে বললে, "ওমা তাই ত সাড়ে পাঁচটা বাজে যে।" "এলিস বুঝি সারা দুপুর বক্ বক্ করে তোমাকে বিরক্ত করেছে", শ্রীমতী বি অনুতপ্ত সুরে বলেন। 'ওমা সেকি', এলিস সজোরে প্রতিবাদ করে, "আমি তো খুকুকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। নয় কি—বল না শ্রীমতী জ ?" আমি বললাম, "নিশ্চয়ই, এই তো এলিস ফিরল।"

যাই হোক, শ্রীমতী 'বি' তাড়া লাগালেন—খাবার দেরি হয়ে যাবে। শ্রীযুত 'গ' ঘড়ি দেখে বললেন—সত্যিই তো ছ'টা বেজে গেল।

ব্রিষ্টলের সিগারেটের কারখানা

এদেশের জলহাওয়ার প্রভাবে আমাদের পাকস্থলীর গ্রহণ-ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছে। আরো দু'জন ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হয়েছেন, সকলেই 'জ'এর পূর্ব্বতন বন্ধু। খাবার টেবিলে গল্প জমে ওঠে। বাড়ীর গৃহিণী ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত অভিজাত ব্যক্তির নাতনী এবং চার্চ্চিলের অন্ধ ভক্ত। শ্রমিক সরকারের গুণকীর্ত্তন দিয়ে আমাদের ভোজের টেবিলের আলাপের উদ্বোধন হয়। আমিও আলোচনায় যোগ দিই। বলি শ্রমিক-সরকার অত্যন্ত অবিবেচক—তা না হলে এতগুলো অকৃতদারকে জেলের বাইরে রাখে। শ্রীমতী 'বি' আমাকে সমর্থন করেন—বিশেষ যখন ওদেশে মেয়ের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে তখন বিয়ে না করাটা ছেলেদের পক্ষে একটা মারাত্মক অপরাধ। এতগুলি কুমার বন্ধুর সামনে হংসো মধ্যে বকো যথা সস্ত্রীক সকন্যা শ্রীযুত 'জ' হয়ত একটু সঙ্কোচ বোধ করছিলেন, আমার সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। "কিন্তু খুকু কেন ঠিকমত খাচ্ছে না" 'গ' উৎকণ্ঠিত হলেন। নিন্দে করা ঠিক নয়, খাবার আয়োজন যথেষ্ট। অবশ্য নুন খেলে তবেই গুণ গাইতে হয়। কিন্তু এদের রান্নায় নুন নেই। টেবিলে আছে নুনের পাত্র, ইচ্ছামত নাও। অনেকে হয় ত আলুনি খেয়েই উঠে যায়। তা নুন যখন খাই নি, তখন দোষ কীর্ত্তন করতে আপত্তি কি ? খাবারের আয়োজন যথেষ্ট। যুদ্ধোত্তর বিলেতের আহারের একটু বর্ণনা দেবার চেষ্টা করা যাক। সাড়ে পাঁচটার এই আহারকে এরা সাধারণত বলে 'সাপার'—ডিনার বলতে বোধ হয় লজ্জা পায়। প্রত্যেকে দেড় টুকরো করে পেতে পারে এই পরিমাণ রুটি রাখা আছে পাত্রে। কিন্তু কেউ এক টুকরোর বেশী নিচ্ছে না।

মসৃণ কাঠের ট্রেতে এলিস খাবার বহন করে নিয়ে আসে। অতিথিদের জন্যে বিশেষ করে বার করা হয়েছে সযত্নে রক্ষিত, বহুকাল আগেকার কেনা সুন্দর আল্পনা-আঁকা চীনা বাসন। সেই সুদৃশ্য ঈষদুষ্ণ পাত্রে আছে প্রকাণ্ড এক খণ্ড ধূমপক্ক হ্যাডক মাছ। ছোট্ট এক টুকরো লেবু, কুচি-আলু ও বরবটী সিদ্ধ। প্রত্যেকটা জিনিষ থেকে ধোঁয়া উঠছে এত গরম। ধূমগন্ধী সামুদ্রিক মৎস্যের একটু ছোট অংশ কাঁটায় ঠেকিয়ে মুখে দিলাম। ওঃ, এত লোকের সামনে বসে আছি, ভাগ্যিস অভদ্র কাণ্ড কিছু হয় নি। মুখ তুলে দেখি সবাই আহারে মন দিয়েছে এবং এত বড় মাছ সংগ্রহ করা যে আজকাল কত কঠিন সেই বিষয়ে বক বক করছে। মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করলাম—কি দরকার ছিল, এত বড় মাছ সংগ্রহ করবার। যদি ছোট্ট হ'ত কোনমতে পার করে দেওয়া যেত। কিন্তু ভেতরের সব কিছুই যে বেরিয়ে আসতে চায়! এখন তো আর ফেলে দেওয়া চলবে না। খাদ্যদ্রব্যের সামান্য অংশটুকুও এরা নষ্ট করে না। তাকিয়ে দেখি 'জ' মহাশয়ের চোখে দুষ্টুমির হাসি—তিনি আমার অবস্থাটা বেশ উপভোগ করছেন। মুহূর্ত্তে আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি এল—"ও প্রিয় 'জ'" আমি সোৎসাহে বলে উঠি, "তুমি এই মাছ খেতে কি ভালই বাস, আমারটা থেকে কিছু নাও"—বলতে বলতে মাছটির তিন চতুর্থাংশ কেটে ফেললাম। তখন সবাই মিলে স্বামীর প্রতি আমার এ পক্ষপাতিত্ব দেখে কলরব করে উঠল। তখন 'জ' এর প্রতি করুণাবশে আমি বললাম—"আচ্ছা বেশ তোমরা সবাই এর থেকে একটু একটু পেতে পার। জান তো ভারতীয় মেয়েরা স্বার্থত্যাগের জন্যে বিখ্যাত।"

আহারের পরে বসবার ঘরে সবাই এসে জড়ো হয়। খুকুকে গা ধুইয়ে গরম বিছানার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আমি

ব্রিষ্টলের নিকটে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য

মোটা ভাত কাপড়ের একই ব্যবস্থা। অবশ্য যার যেমন সাধ্য খাওয়া-পরার বৈচিত্র্য আনতে পারে—কিন্তু মূল ব্যবস্থাটি এমনি চমৎকার যে, মোটা ভাত-কাপড় থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না, কেউ বেশী পাবে না। যদি কারুর বিশেষ প্রয়োজন হয় সে তাই পাবে সংসারের সাধারণ খরচের খাতা থেকেই। যেমন প্রত্যেক শিশু ও বালকবালিকা দু' বোতল করে খাঁটি দুধ পাবে। পাঁচ বছরের নীচে পর্য্যন্ত ধনীদরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল শিশুই রেশনকার্ডের ব্যবস্থামত খাঁটি কমলালেবুর ঘন নির্য্যাস সপ্তাহে এক বোতল করে পাবে। যদি কেউ অসুস্থ হয়, ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রে সেও পাবে, আর পাবে গর্ভিণী ও প্রসূতিরা। রেশন-ব্যবস্থায় এই নির্য্যাসের দাম হয় পেনি মাত্র—অথচ সেই জিনিষ বড়লোকেরা সখ করে যদি খেতে চায় ত সমপরিমাণ নির্য্যাসের দাম পড়বে ছয় শিলিং। আগে সরকারী ব্যবস্থায় প্রয়োজন মিটিয়ে তবে দোকানে জিনিষ যায়। পাঁচ বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের কার্ডে দুধের আলাদা ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থামত রোজ সকালে বাড়ীর দরজায় খাঁটি দুধের মুখ বন্ধ করা বোতল পাবে—সূর্য্যোদয়ের আগেই ডেয়ারী ফার্ম্ম থেকে লোক এসে দুধ দিয়ে যায়। পাঁচ বছর বয়স হলেই প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিতে হয়। তখন আর তার দুধ তার মায়ের কাছে আসে না, যায় তার স্কুলে। প্রত্যেক স্কুলে প্রত্যেক বালকবালিকার নামে দু' বোতল দুধ দেওয়া হয়। বাড়ীতে দিলে যদি-বা বাচ্চাদের উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধ পান থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু স্কুলে তেমনটি হবার জো নেই, কারণ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর বিরুদ্ধে নালিশ করা চলে। বাচ্চাদের বেলায় যেমন প্রচুর দুগ্ধ বিতরণের ব্যবস্থা, বয়স্কদের বেলায় তেমনি কার্পণ্য, কাজেই পুডিং ইত্যাদিতে বেশী খরচ করা চলে না।

বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণের তাগিদে স্তিমিত আলোয় স্বল্পালোকিত ঘর। রেডিওর মৃদু সুরের পটভূমিকায় অনুচ্চকণ্ঠে চলে আলাপ-আলোচনা। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরিস্থিতিই প্রধান আলোচ্য বিষয়, আর সে সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রতি কথায় প্রকট হয়ে ওঠে। আমি ঢুকতেই একজন উঠে এসে জ্বালিয়ে দিল বড় আলোটা। 'প' তাড়াতাড়ি উষ্ণীকরণ যন্ত্রটাকে বোতাম টিপে জ্বালিয়ে দিয়ে পায়ের কাছে এনে রাখলে। মেয়েদের প্রতি সৌজন্যের আতিশয্য এক এক সময়ে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। তবু সত্যি কথা বলতে কি, বাড়াবাড়িটা লাগে মন্দ নয়, বিশেষতঃ প্রাচ্য দেশ থেকে আসে যারা, নূতনত্বের স্বাদ তাদের ভাল লাগবারই কথা।

সেদিন সকালে রেশনের দোকানে গিয়েছিলাম কার্ড করাতে। দোকানের সমস্ত কর্ম্মচারীই মেয়ে। চটপট 'ছাড়-পত্র' মিলিয়ে মিনিট কুড়ির মধ্যে পাওয়া গেল তিনটি বই। এত শীঘ্র যে রেশনকার্ড পাওয়া সম্ভব তা দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়। ভেবেছিলাম আরও দিন দুয়েক অন্ততঃ ঘোরাঘুরি করতে হবে। সাবান থেকে আরম্ভ করে টিনের খাবার ও চকোলেট পর্য্যন্ত সব কিছুই রেশন-ব্যবস্থার অধীন। ফলে দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে সকল প্রকার খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়। কারণ রেশনের যাবতীয় জিনিষের দাম খুব সস্তা। সেজন্যে এদেশে খাদ্যাভাবে কেউ শুকিয়ে মরে না, আবার অতিরিক্ত আহারের দরুন যকৃতের বিকৃতিজনিত মৃত্যুও এদেশে বিরল।

এদের দেশে সমাজ-জীবনের সংহত রূপটি দেখে বেশ আনন্দ হয়। সমস্ত দেশটা যেন একটা বৃহৎ পরিবারের মত গড়ে উঠেছে, যার ভাঁড়ারঘর একটাই এবং যেখানে সাধারণের

এদিকে বসবার ঘরে আড্ডা জমে ওঠে। "ভারতবর্ষের কথা বল। কি তোমাদের ব্যাপার। এত মারামারিই বা কেন?" "কি আর বলব সেকথা,—ভারতের কথা কি এত চট্ করে বলা যায়। কি দরকার সে সব অপ্রিয় কথা তোলবার? বিশেষ করে এখানে দেখছি সবাই টোরী-দলীয়। ভারতের দুঃখের কথা বলতে গেলে এত সাধের জমাট আড্ডাটি ভেঙে যাবে। বলতে বলতে আমি উত্তেজিত হয়ে পড়ব, এবং তোমরা দুঃখিত হবে।" শ্রীযুত ট বললেন, "তোমার কি মনে হয় স্বাধীনতা পাওয়া ভারতের পক্ষে এখনি ভাল হবে।" "সে আবার কি" 'ক' ভদ্রা অবাক হয়ে বলেন,

"ভাল হোক, মন্দ হোক, স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার এবং অনেক আগেই তা আমাদের পাওয়া উচিত ছিল।" আশ্চর্য্য এই যে, এত দিনেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এদের মনে একটা সুনির্দ্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হ'ল না। আমাদের দেশ সম্বন্ধে ভাসা ভাসা ঝাপসা একটা ছবি আঁকা আছে এদের মনের পটে, সেই সঙ্গে আছে একটা প্রবল অহমিকা, মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে ভারতকে আধুনিক সভ্যতার তীর্থক্ষেত্রে পথ দেখিয়ে আনার দায়িত্ব ছিল এদেরই, তাই কথাবার্ত্তায় এদের একটা মুরুব্বিয়ানার সুর। 'গ' জাতিতে ভারতীয়, কিন্তু মনে প্রাণে ইংলণ্ডের অনুরাগী ও ইংরেজের অনুকারী। ভারত তাঁর জন্মভূমি বটে, কিন্তু তাঁর মনোজগৎ ইংলণ্ডের আবহাওয়ায় সৃষ্ট। ভারত তাঁর সেকেলে জননী, ইংলণ্ড তাঁর বিমাতা। দুঃখিনী জননীকে পরিত্যাগ করে বিমাতার স্নেহচ্ছায়াতলে তিনি আছেন ভালই। তিনি ঘাড় নেড়ে সর্ব্বজ্ঞের ভঙ্গীতে বললেন, "এখন কি হয়েছে জানি না, কিন্তু পঁচিশ বছর আগে ভারতের সে যোগ্যতা ছিল না।" স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, "তুমি কি ভারতীয়?" 'জ' মশায় বুঝতে পারলেন আমি একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছি। ব্যাপারটাকে হাসিঠাট্টায় তরল করে আনবার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্তাকে লক্ষ্য করে বললেন, "সে ত বটেই, তখন যে তুমি ভারতে ছিলে। তোমার মত লোক থাকতে ভারত স্বাধীন হবে কি করে।" ঘরে হাসির ধুম পড়ে গেল। গম্ভীর মুখে বলি, "পঁচিশ বছর আগে ভারত কি ছিল, সে-কথা বলবার আগে ভেবে দেখো দেড় শ' বছর আগে সে কি কি ছিল। এই সুদীর্ঘকালের অকথ্য অত্যাচার আর অবাধ শোষণের ফলে যার জীবনীশক্তি লোপ পেতে বসেছে, সেই মুমূর্ষুকে হঠাৎ সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের অযোগ্য বলে অপবাদ দেবার আগে ভেবে দেখা উচিত আসল গলদ কোথায়? আর ভারত যোগ্য হোক, অযোগ্য হোক তার স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবার কোন অধিকার ব্রিটেনের নেই, সে গায়ের জোরে লোভের তাড়নায় এ কাজ করেছে, ভারতের স্বার্থ রক্ষা কিংবা ভারতকে বাঁচানো তার উদ্দেশ্য ছিল না। এই সত্যটাকে সকলেরই স্বীকার করা উচিত।" শ্রীযুত 'ম' বলেন, "সে ত ঠিকই, জোর যার মুলুক তার, এইটেই ত হচ্ছে বর্ত্তমান সভ্যতার নীতি।" "মুলুক ত নিলেই, তার ওপরে যখন বড় বড় মিথ্যে কথা দিয়ে সেই কেড়ে নেওয়াটাকে হিতৈষণা বলে দুনিয়ার লোককে বিভ্রান্ত করতে চাও তখনই প্রতিবাদ

মেণ্ডিপ পাহাড়ের একটি দৃশ্য

করি। তোমাদের এই অপপ্রচারের দরুনই আমাদের ত্রুটিগুলো এত বড় হয়ে সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ে, আর কূটনীতিতে তোমরা ওস্তাদ বলে তোমাদের দোষগুলো ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু এটা জেনে রেখ, ভারত কারও চেয়ে কম নয়। তোমরা জান কি আমাদের জাতীয় মুক্তিসাধনার ইতিহাস? আয়ারলণ্ডের দুঃখের খবর তোমাদের জানা আছে। কিন্তু ভারতের ছেলেরা যে দেশের দুঃখমোচনের জন্যে দুঃসহ দুঃখ এমন কি মৃত্যুবরণ করতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হয় নি সে খবর তোমরা কয় জনে রাখ?" 'ট' বলেন, "বেশ, আমাদের সঙ্গে যাই হোক, তোমরা নিজেদের মধ্যে এত মারামারি কাটাকাটি কর কেন?" "তার কারণ আমরা তোমাদের কূটনীতি বুঝতে পারি নি—তোমাদের ফাঁদে ধরা দিয়েছি। আজকের এ মারামারির পেছনে রয়েছে তৃতীয় পক্ষের বহু দিনের ভেদবুদ্ধি সৃষ্টির অপপ্রয়াস আর এই তৃতীয় পক্ষ হচ্ছ তোমরা।" 'ম' বললেন, "দুর্ভাগ্য আমাদের, সব দোষই যে তোমরা শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ঘাড়ে চাপাও সে আমি শুনেছি।" "এটা ভুল শোন নি। কারণ ভারতের সকল দুর্গতির মূলেই যে ব্রিটিশের কারসাজি এটা দিবালোকের মত প্রত্যক্ষ সত্য।"

কিছুক্ষণ আগে 'প' এসে বসেছেন। তিনি শ্রমিকসভের সভ্য—এ সভার অনাহূত—এসেছেন দশ বছর পরে পুরনো বন্ধুকে দেখতে। তিনি এতক্ষণ চুপ করে বোধ হয় আমাদের বাগ্‌যুদ্ধ উপভোগ করছিলেন। এবারে গম্ভীরভাবে বললেন, "এ বিষয়ে আমি শ্রীমতী 'জ'র সঙ্গে একমত। ভারতবর্ষ
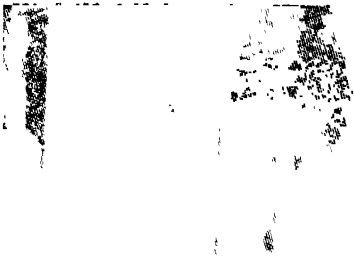
ম্যাগনোলিয়া হাউস—চেডার

নিজেই তার যোগ্যতার বিচার করবে। যদি সে অযোগ্যও হয়, তা হলেও অপেক্ষাকৃত শক্তিশালীর কোন অধিকার নেই তাকে দাবিয়ে রাখবার।" 'প'র কথা শুনে 'জ' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন, শ্রীমতী 'জ' ঠাণ্ডা হন, 'গ' বিরক্ত হন, 'টি' মুখ টিপে হাসেন, 'ম' কিছু বলতে যান, কিন্তু এমন সময় এলিস এসে দাঁড়ায় দ্বারপ্রান্তে—শ্রীমতী 'বি' জিজ্ঞেস করছেন, "তোমরা কি এক কাপ করে চা খাবে?" 'জ'রা আমাদের জন্তে চমৎকার চা এনেছে—দার্জিলিঙের চা।" 'ম' বললেন, "সত্যি আমরা অকৃতজ্ঞ—এমন লোভনীয় জিনিষ ভারত আমাদের উপহার দেয়, তবু আমরা তার নিন্দে করি।"

আজ শনিবার। 'প' বাড়ী যাবে তার বাপের কাছে। আমাদেরও সঙ্গে যেতে হবে। তার বাপ বহুবার টেলিফোন করে সব ঠিকঠাক করেছে।

যথাসময়ে 'প'-র বাবা এলেন গাড়ী নিয়ে, ৭৫ বছরের বৃদ্ধ, শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে; টাকের ওপরে দু'এক গাছা সাদা পাতলা চুল। এত বয়স হলে কি হয় সাজসজ্জার ত্রুটি নেই, নিভাঁজ নেভী-ব্লু স্যুট—বাটনহোলে একটা প্রকাণ্ড টকটকে লাল গোলাপ, লাল মুখের সঙ্গে ম্যাচ করেছে ভাল। নিজে গাড়ি চালিয়ে এসেছেন ২৫ মাইল দূরের চেডার নামক গ্রাম থেকে। চেডারের চীজ বিখ্যাত। চেডার পেরিয়ে ছোট একটি গ্রামে তাঁর বাস। সেখানে আমাদের একটা সপ্তাহ কাটিয়ে আসতেই হবে তাঁর নতুন গৃহস্থালিতে, দেখতে হবে ইংলণ্ডের পল্লীর রূপ। 'প'র মা বাবার গল্প 'জ'র কাছে এত আগে শুনেছি। ভদ্রলোক বিপত্নীক হবার পর বছর না ঘুরতেই পুনরায় নবপত্নী সংগ্রহ করেছেন। এই নবপরিণীতা অবশ্য যুবতী তরুণী ভার্য্যা নন, কারণ তাঁরও বয়েস ভাঁটার দিকে। বরের বয়স ৭৫ এবং কনে হচ্ছেন বাহাত্তুরে বুড়ী। ব্যাপারটা আমাদের ধারণার অতীত—এই নবদম্পতি কিন্তু বিবাহিত জীবনকে বেশ সহজভাবেই নিয়েছেন। বাহাত্তর বছরের নব বধূকে দেখবার জন্তে মনে ঔৎসুক্য জমা হয়ে ছিল। বৃদ্ধ তাঁর অনেক গল্প করলেন—সে নাকি দেখতে আমারই মত ছোটখাটো। ছোট-বেলায় নাকি তাঁদের একবার বিয়ের কথা হয়ে ভেঙে যায়। তার পরে কে ভাবতে পেরেছিল ভবিতব্যের এ বিচিত্র নির্ব্বন্ধের কথা?

ব্রিষ্টল থেকে চেডার ২০ মাইল পথ। দু'ধারে ঘনসবুজ—ঢালু উঁচুনীচু প্রান্তর—মাঝে মাঝে সারিবাঁধা পত্র-নিবিড় তরুশ্রেণী। পীচমোড়া কালো রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে। পথে নজরে পড়ল একটা চুণের কারখানা। পাহাড়ের রং সাদা খড়ির মত—পাশ দিয়ে খাদ নেমে গেছে নীচু জমি পর্য্যন্ত। বৃদ্ধ বললেন, 'চেডার গর্জ্জের কথা তোমার মনে আছে 'জ'? চল ঘুরে যাই সেদিক দিয়ে।"

দূর থেকে পাহাড়ের উঁচু মাথা নজরে পড়ে—সাদাটে সাদাটে চৌকো চৌকো পাহাড়ের চূড়ো, রাস্তার দু'ধারে যেন ছবির মত সাজানো। যেমন এদের এক মাপের বাড়ী, পাহাড়গুলোও কি তাই? রাস্তার দু'পাশে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে, যেন হাতখোলা একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে চলেছি। ভারি চমৎকার লাগছে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে একটা দুটো গাড়ী—পাথরের ওপর কম্বল বিছিয়ে চলছে পিক্‌নিক্। পাহাড় যেন প্রাচীরের মত আড়াল করে রেখেছে ওপারের পৃথিবীকে। এইখানে এই মেণ্ডিপ পাহাড়ে বহু হাজার বছর আগেকার গহ্বর আছে। সেই সব গহ্বরে নাকি আদি মানবের অস্থি পাওয়া গেছে।

বাংলা সাহিত্যে বিনয়কুমার সরকার

শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনার দ্বারা সমৃদ্ধ এবং উন্নত করবার সাধনায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন বিনয়কুমার সরকার তাঁদের অন্যতম। দেশীয় ভাষা ব্যতীত ইংরেজী, জার্মান, ইটালিয়ান এবং ফরাসী ভাষায়ও তাঁর বিশেষ দখল ছিল। কিন্তু আমৃত্যু তিনি যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সাধনায় ব্রতী ছিলেন একথা হয়ত আজকাল অনেকে জানেন না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেও বিনয়কুমারের দান সামান্ত নহে।

"স্বদেশী", "স্বদেশসেবা", "স্বদেশনিষ্ঠা", "জাতীয় উন্নতি" ছিল বঙ্গবিপ্লবের মূলমন্ত্র। ১৯০৫-এর বৈপ্লবিক আবহাওয়ায় বিনয়কুমার স্বদেশসেবার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। ১৯০৬ সনে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই তিনি দেশের সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ই তিনি উপলব্ধি করেন দেশ ও জাতির উন্নতির জন্ত চাই এক দিকে জনশিক্ষার প্রসার, অপর দিকে প্রয়োজন মাতৃভাষা এবং সাহিত্যের অনুশীলন। কেননা ভাষার মধ্য দিয়েই জাতীয় চেতনা মূর্ত্ত হয়ে উঠে।

১৯০৬ সনে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৭ সনে বিনয়কুমার রাজনীতি ও ইতিহাসের অবৈতনিক অধ্যাপক-রূপে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে যোগদান করেন। মালদহ, বিক্রম পুরের সেনিহাটি প্রভৃতি নানা কেন্দ্রে তিনি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সব বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভারও তিনি গ্রহণ করেন। জাতীয় শিক্ষা যাতে কার্য্যকরী হয় সে দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। তিনি এই সময় প্রচার করেন, শিক্ষাব্যবস্থাকে স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, প্রাথমিক স্তরে বাস্তব-বিজ্ঞান শিক্ষা দানের ব্যবস্থা থাকা চাই। শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক চর্চ্চার সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে, শিক্ষাকে করতে হবে জীবিকার্জ্জনের উপযোগী। মাতৃভাষাই হবে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা প্রদানের মাধ্যম। আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হ'ল বিনয় সরকার প্রবর্ত্তিত শিক্ষাবিধির অন্যতম প্রধান কথা। ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত ভাষা শিক্ষাদান বিনয়বাবুর শিক্ষাবিধির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

"বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা" (১৯০৭), "শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা" (১৯১০), "প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা" (১৯১০। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত), "ভাষা শিক্ষা" (১৯১০), "সংস্কৃত শিক্ষা" (১৯১২), ইংরাজী শিক্ষা (১৯১২) "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" (১৯১২), "শিক্ষাসোপান" (১৯১২), "শিক্ষা-সমালোচনা" (১৯১২), "সাধনা" (১৯১২), "বিশ্বশক্তি" (১৯১৪) নামক গ্রন্থগুলির মধ্যে বিনয়বাবুর শিক্ষাবিষয়ক মতবাদ ধরে রাখা হয়েছে। শিক্ষা সম্বন্ধে বিনয়কুমার শুধু নিজস্ব মতবাদ প্রচার করেই বিরত হন নি, তিনি তাঁর মতবাদকে বাস্তব রূপ দেবার জন্ত প্রাণপণ প্রয়াসও পেয়েছেন নিজের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাদানের ভিতর। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর প্রবর্ত্তিত শিক্ষাবিধি বাংলা তথা ভারতের শিক্ষাজগতে রীতিমত আন্দোলন জাগিয়ে তুলতে
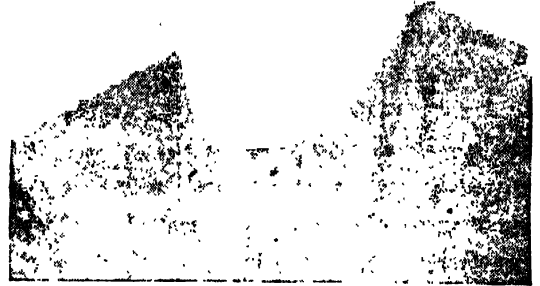
বিনয়কুমার সরকার

পেরেছিল। তাই 'স্বদেশী যুগে' বিনয় সরকারের শিক্ষাবিধি বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি মনীষীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছিল।

ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার যে রীতি বিনয়কুমার প্রবর্ত্তন করেন তা তদানীন্তন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হয়। কাশীর পণ্ডিতসমাজ তাঁর নূতন প্রণালীতে আকৃষ্ট হন এবং গুণগ্রাহিতার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁরা বিনয়বাবুকে "বিদ্যাবৈভব" উপাধি প্রদান করেন (১৯১২)।

বুনিয়াদি বা কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে স্বাবলম্বী

করে তোলা ছিল বিনয়বাবুর শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্যতম মূলনীতি। সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য তিনি আমেরিকার শিক্ষা-ব্রতী বুকার টি. ওয়াশিংটনের আত্মজীবনী "আপ ফ্রম স্লেভারি" গ্রন্থের অনুবাদ "নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর" নামে প্রকাশ করেন।

ইতিহাসকে বিজ্ঞানের দৃঢ়ভিত্তিতে দাঁড় করাবার জন্য বিনয়বাবু প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিলেন। ১৯১১ সনে ময়মনসিংহ জেলার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে তিনি "ইতিহাস-বিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা" প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে তিনি দেখান ইতিহাসও একটা বিজ্ঞান, ইতিহাসের মূলকথা হ'ল বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার। বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহারের উপরই ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। কাজেই উন্নতির প্রচেষ্টায় কোন অবস্থাতেই মানুষের নিরুৎসাহ হবার কারণ নেই। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু। বিনয়কুমারের উক্ত রচনা ১৯১১ সনে 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়। পরে উহা "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা করা হয়। বিশ্বশক্তি সদ্ব্যবহারের মতবাদ আরও জোরের সঙ্গে প্রচারিত হয় "বিশ্বশক্তি" (১৯১৪) নামক গ্রন্থে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" গ্রন্থের ভূমিকায় পুস্তকখানির গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বদেশীযুগে লেখা "সাধনা" সম্ভবতঃ বিনয়বাবুর বহুল প্রচারিত বাংলা রচনা। অক্ষয়চন্দ্র সরকার "সাধনা"র ভূমিকা লেখেন।

১৯০৯ থেকে ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত বিনয়বাবু প্রত্যেকটি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করতেন এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য তৎপর ছিলেন। ১৯১১ সনে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে (মালদহ) তিনি মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা প্রয়োজন বলে আবেদন জানান। এ বৎসরেই তিনি ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মেলনে উক্ত আবেদন কার্য্যকরী করে তোলবার উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব আনয়ন করেন এবং বলেন মাতৃভাষার দ্রুত উন্নতির জন্য 'সংরক্ষণ নীতি' গ্রহণ করতে হবে—বিদেশী ভাষায় লেখা দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সমালোচনার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা নিতান্তই জরুরী। বিনয়বাবুর প্রস্তাব "সাহিত্যসেবী" প্রবন্ধ আকারে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে প্রথম পঠিত হয়। রচনাটি 'প্রবাসী'তে (১৯১১) প্রকাশিত হয় এবং পণ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রস্তাব ইংরেজীতে "The Man of Letters: A scheme for fostering Indian vernacular literatures" নামে 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় (এপ্রিল, ১৯১১) প্রকাশিত হয়। প্রস্তাবের হিন্দী এবং মারাঠী অনুবাদও ১৯১১ সনের হিন্দী এবং মারাঠী সাহিত্য সম্মেলনে বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হয়। হিন্দী ও মারাঠী সাহিত্য-সমাজে বিনয়বাবুর প্রস্তাব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তাঁর প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলে স্থির করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তত্ত্বাবধানে বাংলা-ভাষার অনুবাদের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে তার জন্য তিনি অর্থসংগ্রহে উদ্যোগী হন এবং অনুবাদকার্য্যে অগ্রসর হবার মত প্রয়োজনীয় অর্থ পরিষদের হস্তে প্রদান করেন (১৯১১)। বিনয়বাবুর প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রথম যে গ্রন্থ অনূদিত হয় তার নাম গীজো প্রণীত "ইয়োরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস" (অনুবাদক: রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ)।

অনুন্নত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবার জন্য বিদেশী ভাষায় রচিত ভাল ভাল গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিনয়বাবু তাই বার বার সেদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও ইংরেজী, জার্ম্মানী ও ফরাসী ভাষায় লেখা একাধিক গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছেন। "নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর" (বুকার টি. ওয়াশিংটনের আত্মজীবনী, ১৯১৪), "নবীন রাশিয়ার জীবন প্রভাত" (ট্রট্স্কি রচিত রুষ-বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী রুষ-কাহিনী, ১৯২৪), "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" (জার্ম্মান ভাষায় লেখা এঙ্গেলসের রচনা, ১৯২৬), "ধনদৌলতের রূপান্তর" (ফরাসী ভাষায় লেখা লাফার্গের রচনা, ১৯২৮) এবং "স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণনীতি" (জার্ম্মান ভাষায় লেখা ফ্রেডরিক লিষ্টের রচনা, ১৯৩২)—বাংলাভাষায় বিনয়বাবুর উল্লেখযোগ্য অনুবাদ গ্রন্থ।

১৯১১ সন থেকেই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহিত বিনয়বাবুর যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ১৯১২ সনে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক পরিষদের পত্রিকা ও প্রকাশ বিভাগের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

১৯১১ থেকে ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত বিনয় বাবু মাসিক "গৃহস্থ" পত্রিকা পরিচালনা করেন। এই "গৃহস্থ" বিনয়কুমারের সাহিত্যসাধনার একটি শ্রেষ্ঠ দিগ্দর্শন। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। দেশে সেই সংবাদ পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই বিনয়বাবু "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী" নামক একটি সুদীর্ঘ রচনা গৃহস্থ পত্রিকায় প্রকাশ করেন এবং "গৃহস্থে"র উক্ত সংখ্যার নামকরণ করেন "রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয় সংখ্যা"। "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী" পরে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৯১৪)।

১৯১৪ থেকে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত বিনয়কুমার চীন, জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকায় পরিভ্রমণ করেন। এই বিশ্বপর্য্যটনের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বস্তুনিষ্ঠ প্রচার এবং দ্বিতীয়তঃ ইয়োরামেরিকার জীবনচর্চ্চা ও অভিজ্ঞতাকে ভারতের উন্নতি সাধনে নিয়োগ করা। তাই এই যুগে (১৯১৪-২৫) বিনয়বাবু একদিকে অবিশ্রান্ত ভাবে

ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব নিয়ে ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান ও ইটালীয় ভাষায় লেখনী চালনা করেছেন, অপর দিকে বাংলাদেশের জন্য তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের ফলাফল রোজনামচার আকারে লিপিবদ্ধ করেন। এই অভিজ্ঞতা ও পর্য্যটনের কাহিনীই পরে "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থমালার তের খণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৯১৫-৩৫)। বিদেশে অবস্থান কালে "বর্ত্তমান জগতে"র অধিকাংশ প্রবন্ধ প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, বঙ্গবাণী প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাদিতে মুদ্রিত হয়ে পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯১৪-২৫ সালের যুবক-বাংলার নিকট "বর্ত্তমান জগতে"র আবেদন যে খুব বেশী ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

"বর্ত্তমান জগতে"র প্রভাব শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলা পত্রিকাদিতে প্রকাশিত বহু লেখাই হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে অনূদিত হ'ত। এখানে প্রসঙ্গত: বলা যেতে পারে যে কাশীর শিবপ্রসাদ গুপ্তের দৈনিক হিন্দী "আজ" পত্রিকায় ১৯২১ থেকে ২৫ পর্য্যন্ত বিনয়বাবুর বিশ্বপর্য্যটনের অভিজ্ঞতা বাংলা থেকে অনূদিত হয়ে প্রতি সপ্তাহে "হামারি য়ুরোপ কী চিট্‌ঠি" নামে প্রকাশিত হয়। শিবপ্রসাদ গুপ্তের "পৃথ্বী-প্রদক্ষিণ" গ্রন্থ বিনয়বাবুর "বর্ত্তমান জগৎ" রচনাবলীর উপরই ভিত্তি করে রচিত১।

'বর্ত্তমান জগৎ' বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। 'বর্ত্তমান জগতে'র তের খণ্ডের নাম এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় নিয়ে দেওয়া গেল :—

(১) কবরের দেশে দিন পনেরো (পৃ: ২১০, ১৯১৬)
(২) ইংরাজের জন্মভূমি (পৃ: ৫৪৬, ১৯১৬)
(৩) বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র (পৃ: ১৫০, ১৯১৫)
(৪) ইয়াঙ্কিস্থান বা অতিরঞ্জিত য়ুরোপ (পৃ: ৮২৪, ১৯২৩)
(৫) নবীন এশিয়ার জন্মদাতা : জাপান (পৃ: ৪৮৫, ১৯২৭)
(৬) বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য (পৃ: ৪৫০, ১৯২৮)
(৭) চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ (পৃ: ২৫০, ১৯২২)
(৮) প্যারিসে দশ মাস (পৃ: ৩১২, ১৯৩২)
(৯) পরাজিত জার্ম্মানি (পৃ: ৭০৭, ১৯৩৫)
(১০) সুইট্‌জারল্যাণ্ড (পৃ: ৭৫, ১৯৩০)
(১১) ইটালিতে বার কয়েক (পৃ: ৩০২, ১৯৩২)
(১২) দুনিয়ার আবহাওয়া (পৃ: ২৭৬, ১৯২৫)
(১৩) নবীন রাশিয়ার জীবন প্রভাত (পৃ: ১০০, ১৯২৪)

বিনয়বাবু দ্বিতীয় বার বিদেশ ভ্রমণ করেন ১৯২৯ সনের মে মাস থেকে ১৯৩১ সনের অক্টোবর পর্য্যন্ত। এই সময় তিনি ইটালি, সুইট্‌জারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং অষ্ট্রিয়া গমন করেন। 'বর্ত্তমান জগৎ' গ্রন্থমালায় এই সময়কার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বিশেষ পরিচয় নেই, তবে জার্ম্মানী (১৯১৫) এবং ইটালির (১৯৩২) উপর লেখা গ্রন্থদ্বয়ে কিছু কিছু অংশ যুক্ত করা হয়েছে মাত্র।

'বর্ত্তমান জগৎ' আন্তর্জাতিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, চিত্র, ভাস্কর্য্য, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বহু বিভার উৎসস্বরূপ। 'বর্ত্তমান জগৎ' গ্রন্থমালায় ভারতবর্ষের সহিত পৃথিবীর নানা দেশের তুলনা করা হয়েছে। মানুষের জীবনচর্চ্চা এবং মানব-সভ্যতার উন্নতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ 'বর্ত্তমান জগতে'র মূল প্রতিপাদ্য। 'বর্ত্তমান জগৎ' গ্রন্থমালা বিনয়বাবুর বাংলা সাহিত্য ও স্বদেশ সেবার জীবন্ত নিদর্শন।

১৯১৪ থেকে ১৯২৫ পর্য্যন্ত বিনয়কুমার দেশ থেকে দূরে ছিলেন বটে, কিন্তু "স্বদেশ" ছিল তাঁর সমস্ত হৃদয় জুড়ে। বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের খুঁটিনাটি কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারত না। ১৯২২ সালে বার্লিন থেকে প্রকাশিত "দি ফিউচারিজম অব ইয়ং এশিয়া" গ্রন্থে দেখতে পাই বিনয়বাবু বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতম গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যের কৃতিত্ব কি পাশ্চাত্যের কাছে তা তুলে ধরেছেন।

বিদেশে অবস্থান কালেই এঙ্গেলসের জার্ম্মান-রচনা "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" নামে অনুবাদ করেন। পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে বাংলাভাষায় প্রথম গ্রন্থ। "হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন" (পৃ: ৩৮০) নামক পুস্তকও বিদেশে অবস্থান কালেই লিখিত হয়। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের উৎসাহে বইখানি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় প্রবাসে অবস্থানের সময় রচিত হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সনে বিনয়বাবুর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদকে বিনয়কুমার "স্বদেশীয়ানা"র একটা বড়রকমের কর্ম্মকেন্দ্র বিবেচনা করতেন। স্বদেশে অবস্থান কালে পরিষদের সহিত তাঁর যোগাযোগ ছিল নিবিড়। বিদেশে গিয়েও তিনি পরিষদকে ভুলে যান নি। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তরফ থেকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিনয়কুমারকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে গিয়ে প্রসঙ্গত: বলেন, "তুমি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু। যে দেশেই যখন গিয়াছ, সাহিত্য-পরিষদের মঙ্গল কামনা করিয়াছ। তোমারই কল্যাণে পরিষদের নাম নানা দেশে বিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রায় সকল দেশ হইতেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে" (এপ্রিল, ১৯২৭)।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই বিনয়বাবু অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ প্রচার করেন এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে ধন-

১ অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস সম্পাদিত "দি সোসাল এণ্ড ইকনমিক্ আইডিয়াস অব বিনয় সরকার" (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪০) গ্রন্থের পৃ: ৫৩৫-৩৬ দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার জন্য ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা প্রভৃতির সহায়তায় "আর্থিক উন্নতি" নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন (এপ্রিল, ১৯২৬)। এই সময় হতে বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের গবেষণা সুরু হয়। পরে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে গবেষণার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন 'বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ' (১৯২৮)। বিনয়বাবুই বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের গবেষণার প্রধান পথ-প্রদর্শক। গবেষণার পথকে সুগম করবার জন্য তিনি ধন-বিজ্ঞানের বহু পরিভাষার সৃষ্টি করেন। বাংলাভাষায়ও যে প্রথম শ্রেণীর ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করা যায় তা বিনয়বাবু প্রমাণ করলেন তাঁর "ধনদৌলতের রূপান্তর" ১৯২৮); "একালের ধনদৌলৎ ও অর্থশাস্ত্র" (১ম ভাগ, ১৯৩০; ২য় ভাগ, ১৯৩৫), "স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি" (১৯৩২) নামক গ্রন্থসমূহ রচনার দ্বারা। ধন-বিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিনয়বাবুর অক্লান্ত প্রয়াসের পরিচয় "বাংলায় ধনবিজ্ঞান" (১ম ভাগ, ১৯৩৭; ২য় ভাগ, ১৯৩৯)। "বাংলায় ধনবিজ্ঞান" গ্রন্থের দুই খণ্ড বিনয়বাবুর পরিচালনায় "বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের" গবেষক ও সহযোগীদের ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণার ফল।

অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও তুলনামূলক জীবনচর্চার মত ও পথ দেখাবার প্রয়াসে বিনয়বাবু লেখেন, "নয়া বাংলার গোড়া-পত্তন" (১ম ভাগ, ১৯৩২; ২য় ভাগ, ১৯৩২) এবং "বাড়তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪)। "নয়াবাংলার গোড়াপত্তন" এবং "বাড়তির পথে বাঙালী" গ্রন্থদ্বয় বিনয়বাবুর কর্মবাদ এবং জীবনদর্শনের নিদর্শন।

বাংলাভাষায় সমাজবিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনার ধারা প্রবর্তন করা বিনয়বাবুর অন্যতম কৃতিত্ব। বিনয়বাবুরই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় "বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষৎ" ১৯৩৭ সনে স্থাপিত হয়। সমাজবিজ্ঞানের আলোচনাকে বাংলাভাষায় স্থায়ী রূপ দেবার জন্য বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক-দের সহায়তায় তিনি "সমাজবিজ্ঞান" (১ম ভাগ, ১৯৩৮) নামে সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

ধনবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মত বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের আলোচনা চালাইবার জন্যও বিনয়বাবুর প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবার পর অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির উৎসাহে "বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ" এবং পরিষদের মুখপত্র "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম থেকেই এই দুই কর্মকেন্দ্রের সহিত বিনয়বাবুর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। "জ্ঞান ও বিজ্ঞানে"র প্রথম সংখ্যাতেই বিজ্ঞান বিষয়ে বিনয়-বাবুর একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল বাংলা ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন বিনয়বাবু তাঁর উল্লিখিত রচনায় বিজ্ঞান-সেবীদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করেন।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিনয়বাবুর দরদ ছিল কত গভীর এবং দৃষ্টি ছিল কত সজাগ তার সাক্ষ্য বহন করছে হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লিখিত "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (দুই খণ্ড, ১৯৪২-৪৫, পৃঃ ১৫২০)। 'বৈঠকে'র পাতা উল্টালেই বুঝতে পারা যায় বিনয়বাবু বঙ্কিম থেকে অতি-আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন ধারা, দেশী ও বিদেশী প্রভাবের ফলাফল, বর্তমান সাহিত্যের রূপ, সমালোচনা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি ইত্যাদি নিয়ে কত গভীর ও ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবার কামনায় বিনয়বাবু আজীবন লেখনী চালনা করেছেন। তাঁর এই বিরাট সাধনা দেখে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। বাংলা ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা বিভাগের আলোচনায় তিনি পথপ্রদর্শকই শুধু নন, বাংলাভাষায় একটা নূতন রচনা-রীতিরও তিনি প্রবর্তক। তাঁর ভাষা হ'ল যুক্তিতর্কের ভাষা। ভাষা ভাবের বাহন। বাহনকে ভাবপ্রকাশের উপযোগী করবার জন্য তিনি বাংলাভাষায় আরবী, ফারসী, হিন্দী এবং নানা বৈদেশিক শব্দ আমদানি করেছেন, সংস্কৃত শব্দের সহিত অবাধে গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করেছেন। এতে তাঁর ভাষা দুর্বল হয় নি, বরং ভাবপ্রকাশের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হয়েছে।

বিনয় সরকারের ভাষার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। এই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ভাষায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠতে পেরেছে এইজন্য যে তিনি কখনও বড় বড় কথা বা বাক্য লিখতেন না। তিনি ছোট ছোট বাক্য ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর বাংলা রচনায় দেখা যায় বাক্যগুলি অল্প কয়েকটি শব্দেই সমাপ্ত হয়েছে। ছোট বহরের বাক্যরীতি অনুসরণ করার ফলেই বিনয়বাবুর ভাষায় একটা প্রদীপ্ত তেজ ও প্রচণ্ড শক্তির স্ফুরণ সম্ভব হয়েছে। বিনয়-বাবুর বাংলা রচনায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কখনও বাংলা রচনায়, এমন কি বৈঠকী কথাবার্তার মধ্যেও ইংরেজী বা অন্য কোন বৈদেশিক শব্দ ব্যবহার করতেন না। তাঁর বাংলা রচনায় কোথাও ইংরেজী বা অন্য বিদেশী শব্দের ব্যবহার বড় একটা দেখা যায় না। বাংলা রচনায় যেখানেই তিনি বিদেশী শব্দ ব্যবহার করা নিতান্ত প্রয়োজন মনে করেছেন, সেখানেই তিনি বাংলা হরফে বৈদেশিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে বাংলা রচনায় ইংরেজী অথবা অপর কোন বিদেশী শব্দ বৈদেশিক হরফে ব্যবহার করা অমার্জনীয় অপরাধ।

পরিভাষা

শ্রীঅনাদিনাথ সরকার

প্রাতঃকাল ; কালীবাবুর বৈঠকখানা ; শতরঞ্চি আস্তীর্ণ তক্তাপোশে, 'সরকারী কার্য্যে ব্যবহার্য্য পরিভাষা', গিরীশ বিদ্যারত্নের 'শব্দসার', রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা', সুবল মিত্রের 'ইংরেজী-বাংলা অভিধান', শ্লেট, পেন্‌সিল লইয়া কালীবাবু নিবিষ্ট মনে পাঠ-নিরত ; ছোট-বড় চার-পাঁচটি পুত্র-কন্যা সকৌতুকে পিতাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে।

কালী—Additional অপর, Assistant সহ, Chief মুখ্য, Deputy উপ, General মহা, Head প্রধান, Joint যুক্ত, Under অবর। Under মানে অবর ? নিশ্চয় ছাপার ভুল। খুকী, দেখ দেখি মা, বাংলায় অবর একটা কথা আছে নাকি।

বড় মেয়ে খুকী 'শব্দসার' দেখিয়া—শব্দসারে ত পাচ্ছি না বাবা। এবার কোন্ বইটা দেখব ?

কালী—বাংলা কথাই নয়, গিরীশ পণ্ডিত মশায় জানবেন কি করে ? ঐ লাল নূতন বইটা দেখ।

খুকী চলন্তিকা দেখিয়া—এতে দিয়েছে বাবা, অবর মানে নিকৃষ্ট, পশ্চাদ্‌বর্ত্তী, কনিষ্ঠ।

কালী—এ মাসের মাইনে পেলে দিলুকে (কালীবাবুর বড় ছেলে) দিয়ে আমায় একখানা ঐ বই আনিয়ে দিস্ মনে করে। এখানা আবার আপিসের এক বাবুর, তার বই সে ফেরত চেয়েছে। তারও তো এই বিড়ম্বনা চলছে।

কালীবাবুর স্ত্রী প্রবেশ করিয়া বলিলেন—হ্যাঁগা, তোমার একি কাণ্ড ? প্রাতঃ-সন্ধ্যা করলে না, ছেলেমেয়েদের পড়াতে লেগেছ ? বাজার যাবে কখন, আমার উনুন জ্বলে যাচ্ছে।

কালী—ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছি কোথায়, আমি নিজেই বাংলা পড়ছি, ওরা আমায় সাহায্য করছে। আজ দিলুকে বাজারে পাঠাও। আমি একবার ঠাকুরঘরে গিয়ে দশ বার গায়ত্রী জপ করে নিই। সন্তানদের প্রতি—তোদের একজন এখানে দাঁড়া, আমি এখুনি আসছি।

কালীবাবুর স্ত্রী—ওমা, তুমি বুড়ো বয়সে বাংলা পড়ছ ? তুমি না এম্-এ পাস দিয়েছিলে ?

কালী—হ্যাঁ, পাস দিয়েছিলুম ত, ইংরেজীতে ফার্ষ্ট ক্লাস, কিন্তু তাতে আর কাজ চলছে না।

কালীবাবুর স্ত্রী—বড় সব ; তিরিশ বছর চলল আর আজ চলছে না।

কালী—তুমি যাবে কি যাবে না ? আমায় পড়তে দেবে না ?

কালীবাবুর স্ত্রী—ক'দিন ধরে কি যে তোমার হয়েছে, শুধু শুধু কথা শোনাও। তিনি অন্তঃপুরে গেলেন।

কালীবাবু তাড়াতাড়ি গায়ত্রী জপ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং বই-পুথি লইয়া পড়ায় মন দিলেন। এমন সময়—"কালীদা বাড়ী আছ ?" বলিয়া সুকুমারবাবু সদরের কড়া নাড়িলেন। "নাঃ, কাল থেকে উপরের ঘরেই পড়ব। ভেবেছিলুম আজ প্রথম পাতাটা শেষ করব, তা আর হতে দিলে না। তোরা সব ভেতরে যা।" বলিয়া সদর খুলিয়া দিয়া সুকুমারবাবুকে লইয়া ঘরে আসিয়া বসিলেন ও শ্লেট, পেন্‌সিল বইগুলি গুছাইতে লাগিলেন।

সুকুমার—কি হচ্ছিল কালীদা, সকালবেলায় ছেলেদের পড়াচ্ছিলে নাকি ? আমি এসে বাধা দিলুম।

কালী—পড়ায় বাধা দিয়েছ তা সত্যি, কিন্তু ছেলেদের নয়, আমিই বাংলা শিখছিলুম।

সুকুমার—সেকি কথা কালীদা, তুমি না ফার্ষ্ট ক্লাস এম্-এ ? দেশ স্বাধীন হয়েছে তাই, নইলে তোমার ত রায় বাহাদুর হওয়ার কথা ছিল।

কালী—আর রায় বাহাদুর, চাকরীই থাকে কিনা ঠিক নেই। ফার্ষ্ট ক্লাস এম্-এর বিড়ম্বনা দেখে ব্রাহ্মণী খোঁটা দিয়ে গেলেন। তুমিও তাই বলছ ? আপিসে হুকুম হয়েছে গবর্ণমেন্টের সব লেখা-পড়া বাংলায় চলবে। কাল একটা খসড়া-পত্রের নিদর্শ (Draft letter form) লিখে দিয়েছিলুম, যুক্ত কর্ম্মসচিব (Joint Secretary) তার উপরে মন্তব্য লিখে ফেরত দিয়েছেন "কিছু হয়নি।" দু'দিন বাদে আমার উপকর্ম্ম সচিব (Additional Deputy Secrotary) হবার কথা, আর কাল যে ছোকরারা আপিসে এসেছে তারাও মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। আমি ভাবছি আর সাড়ে তিন বছর পর আমার পেন্‌সন্ হবে, শেষের ছ মাস ছুটি নিলেও পাকা তিন বছর কাজ করতেই হবে। এখন এই বয়সে কি একটা নূতন ভাষা শেখা যায় ?

সুকুমার—কালীদা, তুমি ত এক্‌লো-স্যাক্সনের পেপারে সবার চেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছিলে, আর বাঙালীর ছেলে হয়ে এইটে রপ্ত করতে পারবে না, এ আমি বিশ্বাস করি না।

কালী—তুমি ভুলে যাচ্ছ তাই যে, তখন আমার বয়েস ছিল কম। সন্ধ্যা-আহ্নিক করতাম না, গঙ্গাস্নানের বালাই ছিল না, সংসারের ভাবনা ছিল না। তা ছাড়া যে বাংলা জানি এ ত তা নয়, এ যে একেবারে একটা কিম্ভূতকিমাকার

নূতন ভাষা। বড়রা বক্তৃতা দিচ্ছেন ইংরেজীতে, আর বে-কায়দায় পড়েছি আমরা বুড়ো সরকারী কর্ম্মচারীরা।

সুকুমার—আচ্ছা কালীদা, দেখি তুমি কেমন বাংলা শিখেছ, বল ত' First Instalment-এর বাংলা কি হবে?

কালী—কেন প্রথম কিস্তি?

সুকুমার—না, হ'ল না; এর বাংলা হবে প্রথম স্তবক; এই দেখ মলাটের উপরেই ছাপা আছে। বলিয়া পরিভাষার মলাট দেখাইলেন।

কালী—তবেই দেখ, বাংলা না ভুলতে পারলে কি করে এ ভাষা শিখব? চিরকাল ধরে শুনে আসছি, জমিদারের কিস্তি, লাটের কিস্তি, কোর্টের কিস্তি, মহাজনের কিস্তি, আর আজ হ'ল স্তবক! স্তবক মানে ত গুচ্ছ, যেমন পুষ্পের স্তবক—কিনা এক গোছা ফুল। ওদিকে আবার বিনয় করে মুখবন্ধে লেখা হয়েছে "বহু প্রচলিত বাংলা শব্দগুলি বিশেষ যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত ত্যাগ করা অনুচিত হইবে।"

সুকুমার—আমি বলছি কালীদা, হতাশ হয়ো না, ঠিক হয়ে যাবে।

কালী—"হতাশ কি আর অমনি হয়েছি সুকুমার, এই ত সবে পয়লা কিস্তি, আরও কত কিস্তি বেরবে কে জানে।" একটু অন্যমনস্ক থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "এখন দিন পড়েছে—নূতন কিছু কর, না হয় বাংলাকে মার। প্রথম স্তবকের সবটাই একবার পড়ে দেখলুম, তোমার এই স্তবকীরা দুরুচ্চার্য্য সংস্কৃত কথার যেন দানসাগর করেছেন। এক একটা শব্দ উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যায়। তুমি বইটার ইংরেজী কলম না দেখে পরিভাষা পড়ে দেখ, কি বোঝাতে চাচ্ছে বুঝতেই পারবে না।"

সুকুমারবাবু পরিভাষা হাতে লইয়া একটু দেখিয়া বলিলেন—কালীদা, তোমার কথা ঠিক বলেই মনে হচ্ছে, সত্যিই বাংলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে এই পরিভাষা কিছুতেই খাপ খাবে না, এ পরিভাষা একটা অভিনব উদ্ভট ভাষা, একে অন্ততঃ বাংলা কিছুতেই বলা চলে না।

কালী—বইখানা পড়লেই তুমি দেখবে যেন বাংলার উপরেই যত রাগ; ভারতের অন্যান্য প্রদেশের গ্রহণযোগ্য আর বোধগম্য করা কর্ত্তাদের প্রধান লক্ষ্য, তা নিরেবব্বুই জন বাঙালী বুঝুক আর নাই বুঝুক। মনের ভাবপ্রকাশ করা যদি ভাষার উদ্দেশ্য হয়, এ পরিভাষায় কি বাঙালীর পক্ষে তা সম্ভব হবে?...

—দেখ সুকুমার, তবে আমি বাঙালী, বাংলা আমার মাতৃভাষা, আমি এই প্রার্থনা করি আমরা মাতৃভাষার অনুরাগী সকল বাঙালী যেন এবিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই যে, আমরা বাংলায় চলতি শব্দগুলি কিছুতেই ত্যাগ করব না, ভারতের সকল প্রদেশের লোকদের বোধগম্য হবে শুধু এইজন্যেই আমাদের মাতৃভাষার রূপকে আমরা বিকৃত করে তুলব না। একটা কথা বলতে পার সুকুমার, নিজেদের বৈশিষ্ট্য পরিহার করে, বাঙালীত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে বাঙালীর বেঁচে থেকে কি লাভ?

কালীবাবুকে ভাবাবেগে বিচলিত হইয়া উঠিতে দেখিয়া সুকুমারবাবু বুঝিতে পারিলেন আজীবন ইংরেজী সাহিত্যের আওতায় পুষ্ট হইলেও মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ কত অকৃত্রিম, বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির প্রতি তাঁহার প্রীতি কত সুগভীর! তাঁহার মনে হইতে লাগিল পরিভাষার নামে অপভাষা সৃষ্টির এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সমস্ত বাঙালী জাতির সমবেত প্রতিবাদ যেন কালীবাবুর কণ্ঠে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষণকাল তিনি মুগ্ধনেত্রে এই প্রৌঢ়ের ঋজুদীর্ঘ মূর্ত্তির পানে তাকাইয়া রহিলেন, তার পর একান্ত শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ঝড়

শ্রীকমলরাণী মিত্র

মেরু-সাগরের ঝড় দেখে আসি চলো!
তুষার-ঝটিকা বহিছে রাত্রিদিন,
ঝড়ের ঝাপটে আকাশ পৃথিবী যেন
ধুয়ে' মুছে এক একাকার হয়ে গেছে;—
ঝড় আর ঝড়, উদ্দাম ঝড়রাশি
বহিছে শূন্যে অ-কূল শূন্য ছেয়ে;
ধূসর আঁধার থরথর করে' কাঁপে
—[illegible] আর শীত, শীত আর ভয় শুধু।

মহাকাল যেন মহোৎসব পেতে'
মৃত্যুকে নিয়ে বসে আছে কোলে করে,
বুঝি-বুকভাঙা দারুণ দীর্ঘশ্বাস
ভেঙে পড়ে আর থাম্ থাম্ হয়ে যায়!
বলো, যাবে সেই মহা-প্রলয়ের মুখে?
কাল-বোশেখীর প্রলয় বাতাসে আর
ঝড় ওঠে নাকো শিথর বকোমাঝে;—
বড়ো চেনা যেন কালো কাল-বৈশাখী!
চলো না সেখানে আবেগ বাসর বাঁধি
চির-রাত্রির অরোরা বোরিয়ালিসে।

রাইপুরের মহামায়া ও শিখরবংশ

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ সীমান্তে কাঁসাই নদীর কিনারে রাইপুর বা গড়-রাইপুর একটি প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। স্থানটিও স্বাস্থ্যকর। বাঁকুড়া হইতে ছত্রিশ মাইল দূরে কাঁসাই-তীরের এই গ্রামটি এক সময় প্রাচীন শিখররাজাদের রাজধানী ছিল। পরবর্ত্তী কালে 'ধবল'রা ইহার মালিক হন। শিখর-আমল রাইপুরের গৌরবময় যুগ। সে যুগের জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টির বহু ভাস্কর্য্য-নিদর্শন আজিও রাইপুর, মণ্ডলকুলি, অম্বিকানগর, সারেঙ্গড় প্রভৃতি স্থানে এবং কাঁসাই ও কুমারী নদীর ধারে ছড়াইয়া আছে। পুরাকালে এদেশে জৈনধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল, পরে শাক্ত ও শৈব-মতের প্রতিষ্ঠা হয়।

খাস রাইপুরের পুরাকীর্ত্তিগুলির মধ্যে মহামায়া দেবী, শিখরগড় ও শিখর-সায়র উল্লেখযোগ্য। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে আশী বিঘা জমির উপর পুরাতন গড়ের ধ্বংসস্তূপ। স্তূপটিতে অনেক কুঠরির চিহ্ন বিদ্যমান। আশেপাশে দুই-চারিটি পাষাণ-মূর্ত্তি ও কিছু কিছু প্রত্ননিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। রাজবাড়ী ইষ্টকনির্ম্মিত ছিল। সে ইট আজকালকার ইট অপেক্ষা পাতলা ও বড়—অনেকটা টালির মত। স্তূপটি খনন করিলে শিখরবংশের অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

শিখর-সায়র শত বিঘা স্থান ব্যাপিয়া একটি বিশাল চতুষ্কোণ সরোবর। এই সরোবরের সহিত রাজবংশের একটি করুণ কাহিনী জড়িত আছে। রাইপুরের আর একটি দ্রষ্টব্য মস্তানী পীরের সমাধি। এককালে এখানে পীরসাহেবের প্রভাব খুব বেশী ছিল। গ্রামের পূর্ব্বাংশে উপরবাঁধা নামক মুসলমান পল্লীটির অস্তিত্ব এই প্রভাবের নিদর্শন।

সে শিখরবংশ আজ নাই, সে রাইপুরও নাই, কিন্তু দেবী মহামায়া আজও রাইপুরে তাঁহার পূর্ব্বমহিমায় বিরাজ করিতেছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই মহামায়া মূর্ত্তিটি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। মহামায়া রাইপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—জাগ্রত দেবতা! লোকে বলে, তিনি শিখর-রাজাদের প্রতিষ্ঠিতা ও তাঁহাদের কুলদেবী। যত দিন মহামায়া আছেন তত দিন রাইপুরে দুর্গা প্রতিমা গড়াইয়া পৃথক্ পূজা করিবার অধিকার কাহারও নাই। প্রাচীনকাল হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে দেবীর সম্মুখে নরবলি হইত। এখনও তাঁহার নিত্যভোগে আমিষ না হইলে চলে না। গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে চাঁহড়াঙা পল্লীসংলগ্ন একটি উচ্চ ভিটায় দেবীর স্থান। পূর্ব্বে দেবী বৃক্ষতলে থাকিতেন, কয়েক বৎসর আগে তাঁহার জন্য একটি ছোট পাকা ঘর বা মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের নিকটস্থ নিম্নভূমিতে একটি চতুষ্কোণ পুষ্করিণী। এই পুষ্করিণী খননকালে সেই স্থানে মহামায়ার পাষাণমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। স্বপ্নাদেশে সেখান হইতে আনিয়া দেবীকে তাঁহার বর্ত্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। মন্দির-মধ্যে বেদীর উপর পাশাপাশি তিনটি পাষাণ-বিগ্রহ। মধ্যস্থলে মহামায়া, তাঁহার দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা দেবী ও বামে সর্ব্বমঙ্গলা। মন্দিরের পশ্চিম দেয়ালের কুলুঙ্গিতে একটি গণপতি মূর্ত্তি। মহামায়া মূর্ত্তিটি উচ্চতায় দুই হাত। দেবী অসুরের উপর দণ্ডায়মানা, ষড়ভুজা, বিবিধ অলঙ্কারভূষিতা ও খড়্গ, চক্র, ত্রিশূল, খর্পর প্রভৃতি নানা প্রহরণধারিণী। তাঁহার পরিধেয় বসন দক্ষিণী ছাঁদে কোঁচা করিয়া পরা। শীর্ষদেশ বেষ্টিয়া প্রভামণ্ডল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র তাঁহার মুখাবয়ব। দেবী মেষ বা অজমুখী! সর্ব্বমঙ্গলা মহামায়ারই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সংস্করণ। সম্ভবতঃ পুরাকালে উৎসবাদিতে মূর্ত্তিটিকে বাহিরে আনিয়া নগর পরিক্রমা করা হইত। তুঙ্গভদ্রা দেবী প্রভা-মণ্ডল বিশিষ্ট একটি পাষাণপিণ্ড। মনে হয় এটি কোন বড় মূর্ত্তির শীর্ষদেশ।

এই বিচিত্র মহামায়া মূর্ত্তিটির সহিত বাংলা বা উত্তর-ভারতের প্রচলিত দুর্গামূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য নাই। অথচ ইনি পুরাকাল হইতে দুর্গারূপেই পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। পূজারীরা বলেন, ইনি বারাহী। শুম্ভ নিশুম্ভ বধের প্রাক্কালে দেবতারা মহাদেবীর সাহায্যার্থে স্ব-স্ব শক্তিকে পাঠাইয়াছিলেন। বারাহী, যজ্ঞবরাহরূপী বিষ্ণুর অনুরূপ মূর্ত্তিধারিণী শক্তি। বারাহীর ধ্যানরূপের সহিত আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিটির মিল নাই। তাহা ছাড়া, বারাহী প্রভৃতি দৈবশক্তির কোনও পাষাণমূর্ত্তি এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই,—প্রধান দেবতারূপে ইঁহাদের পূজাও প্রচলিত নাই। তবে ইনি কোন্ দেবতা? একমাত্র দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ী দুর্গা ভিন্ন অন্য কোন দেবতার সহিত মহামায়ার সাদৃশ্য নাই। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ যাহা কিছু তাহা শুধু নামের। দ্রাবিড়ী দুর্গা মহামায়ার কন্যা। তিনি সিংহমুখাসুরের উপর দণ্ডায়মানা, ষড়ভুজা, নানালঙ্কারভূষিতা। তাঁহার ছয় করে খড়্গ, চক্র, ত্রিশূল, খর্পর, ছাগ ও বরাভয়। মস্তকের চারিদিকে সমুজ্জ্বল দিব্যজ্যোতি। তিনি নীলবর্ণা ও অজমুখী। তাঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্যে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটি প্রচলিত আছে। মহামায়া এক পরমাসুন্দরী কামুকী দানবী। সম্ভোগ-লালসায় নানা ছলাকলা প্রদর্শন করিয়া তিনি মহর্ষি কশ্যপের তপোভঙ্গ করেন। মহামায়া ও কশ্যপ উভয়ে মেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়া মিলিত হন। সেই মিলনের ফলেই অজ বা মেষমুখী [illegible] জন্ম। দেবতার রূপ, তাঁহার বসন পরিবার ভঙ্গী [illegible] তুঙ্গভদ্রা দেবীর অধিষ্ঠান প্রভৃতি দেখিয়া মনে [illegible]

মহামায়া দ্রাবিড়ী দুর্গা ভিন্ন অপর কেহ নহেন। তুঙ্গভদ্রা দাক্ষিণাত্যের একটি নদী। গঙ্গা-যমুনার মত নারী রূপে কল্পিত হইয়াছে।

কোথায় তুঙ্গভদ্রা, কোথায় কাঁসাই-তীরে রাইপুর। এখানে দ্রাবিড়ী দুর্গার আবির্ভাব ঘটিল কেমন করিয়া? কবেই বা সেই প্রাচীন যুগে সুদূর দাক্ষিণাত্যের সহিত বাংলার যোগাযোগ স্থাপিত হইল? শিখর-রাজারাই বা কোন্ সূত্রে এই মূর্ত্তি পাইলেন? প্রথম দুইটি প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, খ্রীষ্টাব্দ ১০১২ হইতে ১০২৫ সালের মধ্যে কোনও সময়ে দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া দক্ষিণ রাঢ় জয় করেন। তাঁহার তিরুমলৈ গিরিলিপিতে উৎকীর্ণ আছে যে, তিনি দিগ্বিজয় ব্যাপদেশে বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত মধুকর-নিকর পূর্ণ উদ্যানবিশিষ্ট দণ্ডভুক্তির রাজা ধর্ম্মপালকে পরাজিত করেন।

দণ্ডভুক্তির অবস্থান-স্থল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ ইহাকে বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাঁতনের সহিত অভিন্ন মনে করিয়াছেন। দণ্ডভুক্তি রাইপুর রাজ্যের পূর্ব্বনাম হওয়াও বিচিত্র নহে। রাজেন্দ্র চোলের অভিযাত্রী বাহিনীর সহিত মহামায়া রাইপুরে আসিয়া থাকিবেন। শিখর-রাজারা এ মূর্ত্তি কিরূপে পাইলেন, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। হয় রাজেন্দ্র চোলের কোনও সেনাপতি দাক্ষিণাত্যে না ফিরিয়া শিখরবংশের আদি পুরুষ-রূপে রাইপুর অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই স্থানেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। কিম্বা শিখরবংশ দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ের কোনও স্থানীয় রাজবংশ। দক্ষিণী বাহিনীর নিকট পরাজিত হইয়া ঐ বংশের জনৈক রাজা বিজেতার চাপে বা স্বেচ্ছায় রাইপুরে মহামায়ার প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের প্রথম অনুমান সত্য হইলে শিখর-রাজারা দাক্ষিণাত্যের আদিবাসী দ্রাবিড়ী হইয়া পড়েন।

শিখরবংশ দ্রাবিড়ী বা স্থানীয় রাজবংশ যাহাই হউন তাঁহাদের রাজধানীর "রাইপুর" নাম হইতে মনে হয়, তাঁহাদের উপাধি "রায়" বা "রায় শিখর" ছিল। কথিত আছে, একবার কোন বহিঃশত্রু স্থানীয় রাজশক্তিকে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ করিয়া শিখরগড় অবরোধ করে। রাজা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া সপরিবারে শিখর-সায়রে জীবন বিসর্জ্জন দেন। কবেকার কথা? কেই বা সেই পরাক্রান্ত শত্রু? সেই হতভাগ্য শিখররাজারই বা পরিচয় কি—কেহ বলিতে পারে না।

শিখরবংশের কীর্ত্তিকলাপ রাইপুর রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাঁকুড়া জেলার খাতড়ানগরের সন্নিকটে সুপুর গ্রামে শিখর-কীর্ত্তির কিছু কিছু নিদর্শন দেখিয়া মনে হয়, এক সময় [illegible] একটি ক্ষুদ্র শিখর-রাজ্যের রাজধানী ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে দামোদর নদীর ধারে পঞ্চকোট রাজ্যও একটি শিখর রাজ্য। এই রাজ্যের আদি রাজা পঞ্চকোট পাহাড়ের পাদদেশে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। অতীত গৌরবের বহু নিদর্শন আজিও সেখানে বিদ্যমান। এক সময় পঞ্চকোট রাজধানী শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। একমাত্র রাজা ছাড়া রাজপরিবারের প্রায় সকলেই নিহত হন। রাজা কোনও রূপে পলায়ন করিয়া মণিহারা গ্রামের এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শত্রুর দেশত্যাগের পর রাজা পঞ্চকোট ত্যাগ করিয়া কাশীপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। আজিও পঞ্চকোট রাজ্য জনসাধারণের নিকট শিখরভূম নামে পরিচিত। পঞ্চকোট রাজবংশের আর এক বিশেষত্ব ইহাদের গুরুবংশ মাদ্রাজী। ইঁহারা কয়েক পুরুষ ধরিয়া জয়ন্তী পাহাড়ের সন্নিকটে বেরোগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন। রাজগুরুকে বলা হয় মহাপ্রভু। বরাকরের সন্নিকটে নদীর ধারে পাহাড়ের কোলে একটি নির্জ্জন ও মনোরম স্থানে দেবী কল্যাণেশ্বরীর পীঠস্থান। পঞ্চকোটাধিপতি কল্যাণেশ্বরীর সেবাইত। দেবী খুবই জাগ্রতা। পূর্ব্বে তাঁহার সম্মুখে নরবলি হইত; এখনও পূজা-পার্ব্বণে, বিশেষতঃ মাকরী সপ্তমীর দিনে সেখানে মহিষ, মেষ ও অসংখ্য ছাগ বলি হয়। পাথরের নালা দিয়া রুধিরস্রোত মন্দির-সংলগ্ন একটি কুণ্ডে আসিয়া পড়ে। প্রত্যহ দেবীর দর্শনার্থী বহু যাত্রীর সমাগম হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার—দেবী দেয়ালের দিকে মুখ ও ভক্তের দিকে পিছন ফিরিয়া থাকেন। পিছন দিকেই তিনি পূজারীর পূজা গ্রহণ করেন। এই কারণে কেহ কখনও দেবীর মুখ দেখিতে পায় না। কল্যাণেশ্বরীর এই অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে অবস্থিতি হইতে মনে হয় দেবীমূর্ত্তিতে এমন কোন বৈশিষ্ট্য আছে যাহা সাধারণের গোচরীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কাশীপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পরে মহারাজা কল্যাণেশ্বরীকে কাশীপুরে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দেবী স্বস্থান হইতে নড়েন নাই। তবে রাজার কাতর প্রার্থনায় স্বপ্নে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে কাশীপুরে আসিবেন। সেই সময় দেবী-প্রতিমার কাছে একটি সোনার থালায় সিন্দুর ছড়াইয়া রাখিলে সেই সিন্দুরের উপর তাঁহার পায়ের ছাপ পড়িবে। ইহা হইতেই "মরেরা শিখরে পা" প্রবাদের উৎপত্তি। আজিও কাশীপুরে মহাষ্টমীর সময় দেবীর নির্দ্দেশমত থালায় সিন্দুর ছড়াইয়া রাখা হয়।

পঞ্চকোট রাজ্য প্রতিষ্ঠার কিছু পরে পশ্চিমবাংলায় সামন্তভূম রাজ্যের পত্তন হয়। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্খরায়ও সম্ভবতঃ শিখরবংশসম্ভূত ছিলেন। "সাঁওৎ" রাজারা বহিরাগত—সামন্তভূমের আদিম বাসিন্দা নহেন। শুনিয়াছিলাম শঙ্খরায় কয়েকজন অনুচরসহ শিলদা পরগণা হইতে ছাতনায় আসেন।

শিলদা পরগণা প্রাচীন রাইপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তাহা ছাড়া পঞ্চকোট রাজবংশের সহিত সামন্ত রাজাদের বৈবাহিক আদান-প্রদানে বাধা নাই অথচ পার্শ্ববর্তী মল্লরাজাদের সহিত তাঁহাদের কোনকালেই "চলং" ছিল না। এই সকল কারণে "সাঁওৎ"দের শিখরবংশের একটি শাখা বলিয়া মনে হয়। সামন্তভূমের রাজধানী ছাতনা নগরের সন্নিহিত মৌলবনা গ্রামে কুম্ভকার-গৃহে অজ্ঞাতবাসকালে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন শঙ্খরায় বার জন অনুচরসহ "ভক্ত্যা"র ছদ্মবেশে মৌলেশ্বরে গাজন দেখিতে আগত ছাতনার ব্রাহ্মণ-রাজা ভবানী বন্দ্যাতের সমীপস্থ হইয়া খড়্গাঘাতে তাঁহাকে হত্যা করেন ও স্বয়ং রাজা হইয়া বসেন। সেই খড়্গ আজিও ছাতনার রাজবাটীতে রক্ষিত আছে। সামন্তরাজ প্রথম হামির উত্তরের রাজত্বকালে ছাতনার বাসুলী দেবী ও কবি চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হয়। বৌদ্ধদেবী হইলেও মহামায়ার মত বাসুলী দেবীকেও প্রত্যহ আমিষ ভোগ দেওয়া হয়। কথিত আছে, একবার নিশা-যোগে শত্রু ছাতনা আক্রমণ করিয়া রাজাকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতে থাকে। সে সময় বাসুলী মায়াপ্রভাবে অসংখ্য সৈন্য সৃষ্টি করিয়া রাজাকে পাশমুক্ত ও শত্রুকে বিতাড়িত করেন।

শিখর-রাজাদের কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। আবার মহামায়ার প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাক। দ্রাবিড়ী দুর্গার অজমুখ আপাতদৃষ্টিতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা স্থানীয় বিশেষত্ব বলিয়া মনে হইলেও আসলে তাহা নয়। আমাদের শাস্ত্রে কোনও কোনও স্থানে দুর্গাকে "কোকমুখী" বলা হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'মাসিক বসুমতী'তে মিশরে আবিষ্কৃত এক ব্যাঘ্র-দুর্গামূর্ত্তির কথা পড়িয়াছিলাম। সে মূর্ত্তিটি দ্রাবিড়ী দুর্গারই অনুরূপ। মূর্ত্তির পাদপীঠে নাকি মিশরীয় চিত্রলিপিতে "দুর্গাম্বা" এই কথাটি লিখিত আছে। প্রায় সকল প্রাচীন সভ্য দেশে দেবদেবীর আদি মূর্ত্তিগুলিতে পশুমুখ বা অর্দ্ধাঙ্গ পশু ও অর্দ্ধাঙ্গ মানবাকৃতি দেখা যায়। মিশরের অধিকাংশ মূর্ত্তিই পশুমুখ। গ্রীক দেবতা "ব্যাকাসের" ও রোমান দেবতা "স্যাটারনেলিয়া"র অজমুখ। আমাদের দেশে দক্ষযজ্ঞ পণ্ডের পর দক্ষ অজমুণ্ড হইয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা বলেন, দক্ষের অজমুণ্ড জ্যোতিষিক রূপক। রাশিচক্রের আদি মেষ-রাশির প্রথম নক্ষত্র "অশ্বিনী"ই নাকি দক্ষের অজমুণ্ড। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় শারদোৎসবের জ্যোতিষিক ভিত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। কে জানে সিংহমুখাসুরের উপর দণ্ডায়মানা ষড়্‌ভুজা, অজমুখী দুর্গাও কোন জ্যোতিষিক রূপক কিনা। সিন্ধু-সভ্যতার যুগেও দ্রাবিড়ীদের মধ্যে মাতৃকাপূজা প্রচলিত ছিল। অজমুখী দুর্গা কি তাহাদেরই পরিকল্পিত? উত্তর-ভারতের দুর্গামূর্ত্তিতে দেখিতেছি অজমুখের স্থলে নারীমুখ আসিয়াছে—সে মুখে রুদ্র ও করুণ ভাবের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। সিংহমুখাসুর দেবীর বাহন সিংহরূপে পরিণত ও দেবীর বধ্যরূপে অপর এক অসুর—মহিষাসুরের আবির্ভাব হইয়াছে। বিভিন্ন যুগের মহিষাসুর মূর্ত্তিতেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। ভুবনেশ্বরের বেতাল-দেউলের দুর্গার মহিষাসুরের নরদেহ, মহিষমুখ। দেবীর দক্ষিণ পদ অসুরের বাম স্কন্ধে ও ও বাম পদ অসুরের দক্ষিণ স্কন্ধের উপর স্থাপিত। সিংহ অসুরের বাম পদ দংশনে উদ্যত। ময়ূরভঞ্জের খিচিঙে অসুরের নিম্নাঙ্গ মহিষ, ঊর্দ্ধাঙ্গ মানব। বাংলার বর্ত্তমান কালের প্রতিমার মুণ্ডটি ছাড়া মহিষের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই, অসুরও সম্পূর্ণ মানবাকার ধারণ করিয়াছে। দক্ষিণ দেশে প্রচলিত মহিষ-মর্দ্দিনীর কল্পনায় দেবী অষ্টভুজা ও তিনি মহিষের ছিন্ন মুণ্ডের উপর দণ্ডায়মানা। এই ছিন্ন মহিষমুণ্ডই অসুরের প্রতীক। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া সংশয় জাগে—অনার্য্য দুর্গামূর্ত্তি কি নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান আকারে পৌঁছিয়াছে অথবা আর্য্য দেবতা অনার্য্যের হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছেন?

শিল্প-কলা প্রসঙ্গে শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর পরিচয় নূতন করে দেওয়া অনাবশ্যক। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। তাঁর ভাস্কর্য্য এবং চিত্রকর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়েছে। শিল্প-কলা এবং সংস্কৃতির অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই তাঁর সংস্পর্শে এলে লাভবান হবেন, তাঁর শিল্পকলার মর্ম্মকথা অনুধাবন করবার হদিস পাবেন। তিনি নিজেই বলেন, কোন শিল্পীর কাজের স্বরূপ বুঝতে হলে প্রথমে শিল্পীকে বুঝতে হবে।

রায়চৌধুরী মহাশয় পিতৃভূমি ত্যাগ করে জন্মস্থান থেকে বহুদূরে মাদ্রাজে শিল্পকলার সাধনায় রত আছেন। আজন্ম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত অভিজাত শিল্পীর এই স্বেচ্ছাবৃত নির্ব্বাসন শিল্পকলার প্রতি তাঁর অপরিসীম অনুরাগের পরিচায়ক। যাঁরা তাঁর আত্মজীবনী পড়েছেন তাঁদের নিকট তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনকথা সুবিদিত। তিনি একাধারে লেখক, শিল্পী ও একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি। মধ্যে শিল্পকুশলতা এবং মননশীলতার এক অপূর্ব্ব

ঘটেছে। বস্তুতঃ দেবীপ্রসাদের মত এমন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বিরল।

দেবীপ্রসাদের সঙ্গে শিল্পকলা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করবার সুযোগলাভ করা মস্তবড় একটা সৌভাগ্য। তাঁর মুখে শিল্পের নিগূঢ় তত্ত্ব ও রসের ব্যাখ্যান শুনলে মনে হয় শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং যেন তাঁর জিহ্বাগ্রে বিরাজ করছেন। তাঁর সুস্পষ্ট উক্তিগুলি সরাসরি শ্রোতার অন্তরের একেবারে অন্তস্তলে গিয়ে পৌঁছে এবং সুন্দরের প্রতি তার অনুরাগকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে সাহায্য করে। আপাতদৃষ্টিতে দেবী-প্রসাদকে মনে হয় অত্যন্ত রাশভারি, পরুষপ্রকৃতির। কিন্তু এই কর্কশ বহিরাবরণ ভেদ করে যদি একবার তাঁর হৃদয়ের কোমলতম স্থানে ঘা দিতে পারা যায় তা হলে তিনি তাঁর অন্তরের মণিকোঠায় সঞ্চিত সম্পদরাশি একেবারে উজাড় করে ঢেলে দেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষমতা এবং বোধশক্তি অনুযায়ী তাঁর সুভাষিতাবলী থেকে সারসংগ্রহ করে উপকৃত হতে পারেন। কেউ যদি গ্রহণ করতে পারে তো দানে তাঁর কার্পণ্য নেই।

মাদ্রাজই দেবীপ্রসাদের কর্মক্ষেত্র। সেখানে তিনি যে শুধু নিভৃতে শিল্প-সাধনায়ই রত আছেন তা নয়, জনসাধারণের মধ্যে যাতে শিল্পানুরাগ জাগ্রত এবং বর্দ্ধিত হয় সেজন্যে তাঁর চেষ্টারও অন্ত নেই। মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত খাদি স্বদেশী ও শিল্পপ্রদর্শনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর্ট গ্যালারির সংগঠনে তাঁর নির্দ্দেশ বিশেষভাবে কার্য্যকরী হয়েছে। উক্ত আর্ট গ্যালারির সম্পাদক শ্রীবিনায়কমের সঙ্গে সমাজ ও শিল্প-কলা বিষয়ে দেবীপ্রসাদের যে কথোপকথন হয় তার মর্ম্মানুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হ'ল :

শ্রীবিনায়কম—আপনার মতে সমাজের সহিত আর্টের সম্পর্ক কি এবং সমাজে আর্টের স্থান কোথায় ?

রায়চৌধুরী—সমাজ হচ্ছে কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি। এখন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি কিভাবে সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব প্রতিপালন করে তারই উপর এর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ নির্ভর করে। এই বিষয়টির সঙ্গে যে মূল প্রশ্নটি জড়িত সেটি হচ্ছে জীবনের প্রতি ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গী। সেজন্যে সমাজের প্রত্যেকটি লোকের মানসিক গড়ন এমন হওয়া উচিত যেন সুন্দরের দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপের সংস্পর্শে তার হৃদয়ে সাড়া জাগে এবং মনে সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ভাবাবেগের সঞ্চার হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি এই দিক দিয়ে একেবারে জড়তাগ্রস্ত, তাদের সেই সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা নেই। সম্ভবতঃ শিল্পকলার আসল মূল্য নিরূপণে আমাদের ভ্রান্ত বিচার-বুদ্ধিই এজন্যে দায়ী।

বিনায়কম—আপনার কথা আমি যতটুকু বুঝতে পারলাম তাতে মনে হয়, আপনি একথাই বলতে চাচ্ছেন যে, চিত্রে এবং ভাস্কর্য্যে সুন্দরের যে রূপটি ফুটে ওঠে তাকে উপলব্ধি করবার জন্যে আমরা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালনা করি না। কিন্তু আমাদের বোধশক্তি যদি এতই জড়তাগ্রস্ত হয় তা হলে সাহিত্যে সুন্দরের প্রকাশ আমাদের অনুরাগকে এরূপ উদ্দীপিত করতে সক্ষম হয় কেমন করে। আধুনিক কালে সে অনুরাগ তো আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান বলেই মনে হচ্ছে। এর কি ব্যাখ্যা আপনি করেন ?

রায়চৌধুরী—বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সাহিত্যকে টেনে আনবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও আমার ছিল না। সে যাই হোক, আমি জোর গলায়ই একথা বলছি যে, কেবল সাহিত্যই সুন্দরের বহুধা-বিচিত্র প্রকাশের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ এবং একমাত্র মাধ্যম হতে পারে না, কেননা আর্টের অন্যান্য শাখার তায় এরও নিজস্ব একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী আছে। চিত্রকলায় এবং ভাস্কর্য্যে রং এবং রূপকে যেমনভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় সাহিত্যে কখনও তেমনটি সম্ভব হয় না। কথার সাহায্যে ছবি আঁকবার অর্থাৎ সাহিত্যে বর্ণনার দ্বারা রং ও রূপকে প্রতিফলিত করবার যে চেষ্টা করা হয় তা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে না, কল্পনা-গ্রাহ্যই থেকে যায়।

মনে ভাবাবেগ সঞ্চারের প্রসঙ্গে আমি আরও বলতে চাই যে, আর্টের এক রূপ আর এক রূপের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। পার্থক্যটা হ'ল প্রকাশের বাহনের মধ্যে। চিত্র-কলা ও ভাস্কর্য্য সাহিত্যের মত মুখর নয়, তার ভাষা হ'ল মূকের ভাষা এবং তাদের প্রকাশরীতি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বলে তাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। অন্য দিকে নিরন্তর ব্যবহারের দরুন সাহিত্যের ব্যবহারিক ক্ষেত্র ব্যাপকতর বলে তার রসগ্রাহী এবং বোদ্ধার সংখ্যাও অধিক। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ভাবের ও চিন্তার আদানপ্রদানের জন্য সাহিত্য হচ্ছে একটি অপরিহার্য্য মাধ্যম-স্বরূপ। সেইজন্যেই সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ ঘনিষ্ঠতর। কিন্তু কঠোর বাস্তব দুঃখকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যে শিল্পীর তুলি এবং ভাস্করের ছেনিতে রূপায়িত সুন্দর মূর্ত্তি থেকে আনন্দোপ-ভোগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা যদি সচেতন হই তা হলে আমরা দেখব যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়েরই কল্যাণসাধনে ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা সাহিত্যের চেয়ে কোন অংশেই ন্যূন নয়।

বিনায়কম—একথাটা আমার জানতে ইচ্ছা হয় যে, আমা-দের সমাজে শিল্প-সচেতনতা বিকাশের প্রকৃষ্ট পন্থা কি ?

রায়চৌধুরী—আমার মনে হয় ঘনিষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ ই একমাত্র কার্য্যকরী পন্থা। তাই হচ্ছে সমাজে শিল্প-সচেতনতা বিকাশের শ্রেষ্ঠ সহায়ক।

বিনায়কম—কেমন করে ?

রায়চৌধুরী—প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের জন্যে আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে সেই কৌতূহলকে

জাগিয়ে তোলা যা তাদের মনকে টেনে নিয়ে যাবে আমাদের উদ্দিষ্টের অভিমুখে। সেই জাগ্রত কৌতূহলবশতঃ কালক্রমে তারা এমন অভিজ্ঞতা অর্জন করবে যার দরুন তারা শিল্পকলার বাহ্যরূপে বিভ্রান্ত হবে না এবং চক্ষুর বিভ্রম-উৎপাদক চটক-দার বাহ্যবস্তুর পিছনে লুকায়িত গোপন গহ্বরের শূন্যতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবে। বাহ্য রূপ কথাটা আমি বিশেষ বিবেচনা-পূর্ব্বকই ব্যবহার করছি। কেননা এর মধ্যে এমন একটা সস্তা চটক আছে যা শিল্পকলার মর্ম্মকোষে সঞ্চিত মধু আহরণের পরিপন্থী। বাহ্যিক চটক যে রস-সন্ধানীর মন ভোলায়, শিল্প-কলার অন্তর্লোকে ভাব-ব্যঞ্জনার সঞ্চয়-ভাণ্ডারে তার প্রবেশ-পথ অবরুদ্ধ। সাধারণ অর্থে বাহ্য রূপ বলতে বোঝায় বিষয়-বস্তু, তার প্রতি থাকে একটা ভাবপ্রবণতামূলক আকর্ষণ। কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু তো বহিরঙ্গ মাত্র—এহ বাহ্য, শুধু তাই দিয়ে আর্টের মূল্য যাচাই হয় না, আর্টের আসল মূল্য নিরূপিত হয় বিষয়বস্তু কি ভাবে প্রকাশিত হ'ল তাই বিচার করে—সেই জন্য আর্টের জগতে বিষয়বস্তুর চেয়ে প্রকাশভঙ্গীর গুরুত্ব ঢের বেশী। এখন এই দিক দিয়ে আমরা জটিলতার সম্মুখীন হয়েছি অর্থাৎ বিশ্লেষণ করে শিল্পকলার নিগূঢ় তাৎপর্য্য উপলব্ধি করবার প্রয়াস পাচ্ছি। এই মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা শিল্পকলার রস উপলব্ধি করা ধৈর্য্য ও সময়সাপেক্ষ। এটা খুব সহজসাধ্যও নয়। আপাততঃ এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা অনাবশ্যক।

বিনায়কম—তা হলে আপনি কি বলতে চান যে, জন-সাধারণের জন্যে উপযুক্ত সুযোগের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও তারা শিল্পকলার রসোপলব্ধিজনিত প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হবে না?

রায়চৌধুরী—যেখানে নির্বিকার ঔদাসীন্য বিদ্যমান সেখানে আর্টের নিগূঢ় তাৎপর্য্যের উপলব্ধিজনিত স্থায়ী আনন্দ-লাভ সম্ভবপর নয়। আমাদের দেশের সাম্প্রতিক কালের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অতিরিক্ত অন্য কিছু ভাববার অবকাশ নেই। এটার ব্যবস্থা সে যেমন তেমন ভাবেই হোক করে নেয়।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যাক একজন কেরাণীর কথা। তার আছে আপিস। আর তার জীবনের মুখ্য কাজ হ'ল নিয়মিত ভাবে সেখানে হাজিরা দেওয়া। সেই পবিত্র পীঠস্থানে উপস্থিত হওয়ার জন্যে তাকে ধরতে হয় প্রথম 'বাস', সেখানে গিয়ে গভীর নিষ্ঠা সহকারে রত হতে হয় তাকে নথিপত্রের পূজায়, কারণে-অকারণে ঘন ঘন প্রণতি জানাতে হয় আপিসের বড়-বাবুকে। দুর্ভাগ্যক্রমে পরমতীর্থ চাকরিস্থানে হাজিরা দিতে যদি তার দু'এক মিনিট দেরি হ'ল তো বড়বাবু নামধেয় সেই উদার সর্বদেবতাটির নিকট তার কর্ত্তব্য-সচেতনতা প্রমাণের সকল আয়োজন এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন সবকিছুই ব্যর্থ হয়ে যায়। ষোল আনা ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, যে বাসটি সেই পবিত্রতম মুহূর্ত্তের মধ্যে তাকে বড়বাবু অধিষ্ঠিত স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে দেবে সেটিকে সে প্রায়ই 'মিস' করে। ফলে যথাস্থানে পৌঁছুতে তার বিলম্ব হয়—কম্পিত বক্ষে সে আপিস-কক্ষে প্রবেশ করে। সময় নষ্ট করার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে সে যে একান্ত নিরুপায় সে কথা কে শোনে! এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ আপিসের নিয়মানুবর্ত্তিতা মেনে চলবার জন্যে তার উপর আদেশ জারী করা হয়। সে নত মস্তকে সেই আদেশ গ্রহণ করে এবং যে বেতনের জন্যে সে নিজের দেহমনকে বিক্রী করেছে তা উপার্জ্জন করবার জন্যে একেবারে মরীয়া হয়ে খাটতে থাকে। কর্ম্মক্লান্ত দিনের শেষে সে বাড়ী ফিরে যায়—যেন একটি ভগ্ন জীর্ণ মনুষ্য দেহ-ধারী যন্ত্রবিশেষ।

সেখানে আবার সুরু হয় সংসারের করণীয় কাজ, কিন্তু তাতেও কোনো স্বতঃস্ফূর্ত্ততা নেই বলে সেগুলোও হয় প্রাণ-হীন, নেহাতই দায়সারা গোছের। এক সময় সে ছিল তার প্রিয়তমা পত্নী এবং গৃহের প্রতি একান্ত অনুরক্ত, কিন্তু প্রতিকূল অদৃষ্টের সঙ্গে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম এবং কৃত্রিমতাপূর্ণ কর্ম্মজীবনের চাপে অতীতের সেই প্রেমের হয়েছে সমাধি-রচনা। যাই হোক, রঙ্গমঞ্চে পেশাদার অভিনেতা যেমন যে ভূমিকায় অভিনয় করে সেটা যে তার আসল স্বরূপ নয়, ধারকরা ব্যক্তিত্বমাত্র সেকথা ভুলে যায়, উক্ত মসীজীবীটির অবস্থাও হয় তদনুরূপ অর্থাৎ জীবিকা অর্জ্জনের জন্য যে কৃত্রিম জীবন তাকে যাপন করতে হয় সেটা যে তার আসল সত্তা নয়, সেকথা সে বিস্মৃত হয় এবং এই কৃত্রিম জীবনই তার কাছে একান্ত ভাবে সত্য হয়ে ওঠে, ফলে তার প্রকৃত ব্যক্তিসত্তা বিনষ্ট হয়ে যায়।

তখন তার জীবননাট্যের পট পরিবর্ত্তন হয়ে অবতারণা হয় নূতন দৃশ্যের। প্রিয়তমা পত্নীকে প্রণয়-বচনে পরিতৃপ্ত করার পরিবর্ত্তে সে তাকে দেয় অভিশাপ। একপাল অবাঞ্ছিত ছেলেমেয়ের জন্মের জন্যে স্বামী তাকেই দায়ী করে, জীবনের এই নিরানন্দ একঘেয়েমির জন্য সে তারই উপর করে দোষা-রোপ। আর এটা তো জানা কথা যে নিজের দোষত্রুটি অপূর্ণতা ইত্যাদির জন্য অপরকে দায়ী করে মানুষ লাভ করে পরম সান্ত্বনা। যাই হোক, স্বামী কর্ত্তৃক ভর্ৎসিতা বেচারী স্ত্রী কিন্তু পতিদেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে এই সমস্ত প্রশস্তিবাক্য নীরবে হজম করে। রাত্রি কেটে যায় দুঃস্বপ্নের ঘোরে, আর পরদিন থেকে সুরু হয় সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। যে কাহিনী বর্ণনা করলাম সেটি হচ্ছে সমাজের এমন এক-জনের জীবনের বাস্তব ও সত্য চিত্র, আনন্দের সন্ধান করবার অবকাশ তো দূরের কথা, আনন্দের অস্তিত্বেই যার আস্থা নেই। আনন্দ হচ্ছে তার নিকট নিষিদ্ধ বস্তু। এখন যুক্তি, হিসাব সংগ্রহ করতে সুরু করা যায় তা হলে দেখা যাবে যে,

সমাজেরই আরও বহু ব্যক্তি অনুরূপ ভাবে নিরানন্দময় গতানুগতিকতার অনুবর্তন করে চলেছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যে কেরাণীটির কথা বলা হ'ল তার সঙ্গে তাদের অল্পই পার্থক্য আছে, অনেক ক্ষেত্রে আবার কিছুমাত্র পার্থক্যও নেই।

বিনায়কম—কিন্তু…

রায়চৌধুরী—দয়া করে আমাকে বক্তব্যটা শেষ করতে দিন—আমি কি বলছিলাম?

বিনায়কম—বলছিলেন লোকের আনন্দের প্রতি বিশ্বাস লোপের কথা।

রায়চৌধুরী—হাঁ। একদা পৌত্তলিক ধর্মের প্রতি বিশ্বাস আমাদের দেশের শিল্প-কলার বিকাশের পথে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। বরং একথাই আমি বলব যে, ধর্মবিশ্বাসই সেই শিল্পকলা-সৃষ্টির মূল প্রেরণা জুগিয়েছিল যার পেছনে ছিল জনগণের সমর্থন। দেবমন্দিরের সহিত ভক্তের সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য যদিও ছিল ভিন্ন প্রকার তথাপি মন্দিরের অধিষ্ঠাতা সুন্দরের প্রচণ্ড প্রভাব দর্শকের মনেও সঞ্চারিত হ'ত। এমনিভাবে উপাস্য দেবতার নিরন্তর সান্নিধ্যের দরুন ভক্তের হৃদয়-মনে যে ছাপ পড়ত তা স্বভাবতই হয়ে দাঁড়াত একেবারে বদ্ধমূল। দেবতা অলক্ষ্যে তার হৃদয়ের শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করে দিতেন। গ্রহীতা জানতেও পারত না কেমন করে সুন্দর তার অন্তরের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এসে আসন পেতেছেন।

বিনায়কম—আচ্ছা ছবির গভীর রসোপলব্ধি হয় কেমন করে? এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?

রায়চৌধুরী—এটা নির্ভর করে কৌতূহল কিভাবে জাগ্রত হ'ল আর ছবির মূল রহস্য-সন্ধানী কি পর্য্যন্ত অগ্রসর হতে পারে তার উপর। কিন্তু এখনই এত তত্ত্বানুসন্ধানের কি দরকার। আমি আগেই বলেছি যে, আপাততঃ আমাদের এ নিয়ে মাথা ঘামানো অনাবশ্যক। মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, এখন আমরা চাই সেই পরিবেশের সৃষ্টি করতে যা জনসাধারণকে দেবে আনন্দ। গোড়ায় আমরা কেন শুধু তাই নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকব না! কোনো উত্তম খাদ্য যদি আমাদের রসনার তৃপ্তি বিধান করে তা হলে সকল সময় আমরা যে সকল মশলা সংযোগে এবং যে প্রাকপ্রণালীতে সেই খাদ্য প্রস্তুত হয়েছে তা আবিষ্কার করবার জন্যে পাচকের পেছনে ধাওয়া করি না। আর্টের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগের স্বাস্থ্যকর অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি যদি করতে সক্ষম হই তা হলেই আমরা এই মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করব যে, মানুষকে নিষ্ঠুর বাস্তবের প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে আমরা যথাসাধ্য করেছি—বাস্তবিকই আমরা জনসাধারণের সেবায় লাগতে পেরেছি। আসুন আমরা এমন আর্ট-গ্যালারি স্থাপন করি যা অতীতের মন্দিরের ন্যায় দর্শকের মনে সুন্দরের প্রতি অনুরাগকে উজ্জীবিত করে তুলতে সক্ষম হবে—অতীতে মন্দির দ্বারা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ত বর্তমানে তাই সাধিত হবে আর্ট-গ্যালারি দ্বারা।

বিনায়কম—আপনার বক্তব্য আমি ঠিক অনুধাবন করতে পারছি না। আপনি কি বলতে চান যে, আর্ট-গ্যালারিগুলো গ্রহণ করবে মন্দিরের স্থান।

রায়চৌধুরী—সুন্দরের মন্দির।

বিনায়কম—আচ্ছা, আপনি কি একথা মনে করেন না যে, কোনো শিল্পীর কাজ ভাল করে বুঝতে হলে তার ব্যক্তিত্বের সহিতও পরিচিত হওয়া প্রয়োজন?

রায়চৌধুরী—শিল্প হচ্ছে শিল্পীর চিন্তার প্রতিফলন। সুতরাং কেমন করে তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে বাদ দেওয়া যেতে পারে? কিন্তু এটা কি আপনি ভেবে দেখেছেন যে, এতে অপরের সময়ের উপর কিরূপ অত্যাচার করা হবে। এ ধরণের কৌতূহল নিবৃত্ত করবার জন্যে কয়জন তাদের শক্তি ও সময় ব্যয় করতে পারে। কারো কারো বাহ্য আকৃতি দেখে মনে হয় লোকটি অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির; কিন্তু তার অন্তরের কোমল বৃত্তিগুলির সন্ধান পেতে হলে যেমন চাই সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব তেমনি আবশ্যক ধৈর্য্য। গতিশীল জগতে আমাদের বাস। সবকিছু চলছে এক পূর্ব্বব্যবস্থিত পরিকল্পনা অনুযায়ী। এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাতমাত্রেই আমাদের দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় এবং তাই হচ্ছে চরম। আপনি যে দিকটার প্রতি ইঙ্গিত করছেন সেটি হচ্ছে আর্টের তত্ত্ব এবং সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ সম্বন্ধে লোকের মনে কৌতূহল জাগানোর প্রশ্ন, কিন্তু আপাততঃ তার প্রয়োজন আমাদের নেই।

বিনায়কম—রং এবং রূপের আসল মূল্য আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করেন এবং এগুলির মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়াই বা কি?

রায়চৌধুরী—যাবতীয় মূল্যই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং আপেক্ষিক। রং এবং রূপের বেলায়ও তাই। ছবিতে অবাঞ্ছিত ছায়ার সংস্পর্শে এলে অথবা নিজের পারিপার্শ্বিকের সহিত সৌসামঞ্জস্য স্থাপন করতে না পারলে রং আর্তনাদ করে উঠতে পারে। রূপসমূহ গড়ে ওঠে সুমিত রেখার বিন্যাসে এবং মাত্রাজ্ঞানের সহায়তায়। সঙ্গীতে বিবাদী সুর যেমন রাগরাগিণীর মাধুর্য্য নষ্ট করে তেমনি রঙের প্রয়োগ আর রেখার বিন্যাস যথাযথভাবে না হলে ছবির রস ক্ষুণ্ণ হয়।

যদি আমরা কারও মনের উপর ভাল মন্দ উভয় প্রকার শিল্পকলার প্রতিক্রিয়া দেখবার প্রত্যাশা করি তা হলে সর্ব্বাগ্রে তার মুড, মানসিক গড়ন এবং রসোপলব্ধির ক্ষমতা কিরূপ তাই বিচার করে দেখতে হবে। যদি তার সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়গুলি নির্জীব বা চেতনাহীন হয়ে থাকে তা হলে আমাদের সকল প্রত্যাশাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কেননা তা হলে ভাল যা

মন্দ কোন রকম ছবিই তার মনে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারবে না। নানা কারণে আমাদের সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়গুলি চেতনাহীন হয়ে গেছে—এখন আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে তার চিকিৎসা আর এর ওষুধ হচ্ছে অন্তরের সহানুভূতি। অনাহূত ভাবে কৃপা প্রকাশ দ্বারা বা উৎসাহের আতিশয্যে কেতাদুরস্ত প্রচার দ্বারা এর প্রতিকার হবে না। এর দ্বারা মূল রোগের প্রতিবিধান অল্পই হয়, কেননা এ ধরণের প্রচারমূলক আন্দোলনের অন্তর্নিহিত আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথমে নিজেকে জাহির করে আত্মপ্রসাদ লাভের উপায় সন্ধান। এভাবে অনেক তথাকথিত শিল্প-সমালোচকের স্বমত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বহু ক্ষেত্রে আসল উদ্দেশ্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

বিনায়কম—আর্ট কি মানুষের চরিত্রকে প্রভাবিত করতে পারে?

রায়চৌধুরী—চরিত্রের আদর্শ পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও দেশ-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন। সুতরাং চরিত্র কথাটির সংজ্ঞা আরও সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

বিনায়কম—প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, আর্টের অনুশীলন নৈতিক বোধ বিনষ্ট করে।

রায়চৌধুরী—নীতিসমূহ হচ্ছে মানুষের প্রয়োজনে তৈরি কতকগুলো আদর্শ—মানুষ তাদের প্রবর্তন করেছে সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে। নৈতিক বিধানগুলো যেন প্রহরীস্বরূপ, এবং যখনই কেউ সামাজিক অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে তখনই তার বিবেককে পীড়ন করবার জন্য সেগুলি সর্বদা সজাগ থাকে—আর অনুশাসন মানেই তো বিনা প্রশ্নে কোন বিধান বা মতবাদকে মেনে নেওয়া।

আর্টেরও নিজস্ব রক্ষক আছে, কিন্তু আর্টিষ্টের নীতিধর্ম সীমাবদ্ধ তার অশান্ত অন্তরের ভাবকল্পনার প্রকাশের আন্তরিকতার মধ্যে। তার সৃষ্টি ঘটনাচক্রে প্রচলিত নৈতিক আদর্শকে সমর্থন করতেও বা পারে। কিন্তু যদি তা নাই করে তাতে আর্টিষ্টের কিছু যায় আসে না, সেটা প্রচলিত দুর্বল *নৈতিক বিধানেরই দুর্ভাগ্য বলতে হবে।*

বিনায়কম—আর্টের ক্ষেত্রে যৌন প্রবৃত্তির স্থান কোথায় তা জানতে আমার ইচ্ছা হয়।

রায়চৌধুরী—যৌন প্রবৃত্তিই হচ্ছে মূল প্রেরণা যা শিল্পীকে সৃজনকার্যে প্রবৃত্ত করে। এটা হচ্ছে মহান্ লক্ষ্যে পৌঁছবার মহৎ পন্থা। একেবারে আদিম যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের ধর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, যৌন প্রবৃত্তি ধর্মের ক্ষেত্রেও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। চিত্রে, সাহিত্যে এবং ভাস্কর্যে এর সাক্ষ্য মেলে। অমর কবি কালিদাস তাঁর মহাকাব্য কুমার-সম্ভবে মহাযোগী শিবের ধ্যানে বিঘ্ন উৎপাদন করাতেও দ্বিধা করেন নি। পার্বতীর বর্ণনা পড়লে মনে হয় এ যেন নিপুণ ভাস্করের গঠিত অনবদ্য মূর্তি—সেই মূর্তির ঋজু বঙ্ক রেখাগুলি যেন চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে। অজন্তা গুহায় প্রভু বুদ্ধের তপস্যায় বিঘ্ন-সৃষ্টির চিত্র আমাদের চোখের সামনে সেই একই দৃশ্য উদ্ঘাটিত করে। শ্রেষ্ঠ ভাস্করগণ মন্দিরাদির কঠিন পাষাণ-প্রাচীরে মানুষের আদিম হৃদয়াবেগসমূহকে তিন ডাইমেনসনে রূপায়িত করেছেন এবং মূর্তিগুলোকে তাঁরা একেবারে যেন জীবন্ত করে গড়েছেন। গঠনকৌশলে তাদের এমনি বাস্তব বলে মনে হয় যে, দর্শকের মনে এগুলোকে হাত দিয়ে স্পর্শ করবার আকাঙ্ক্ষা জাগে—এ সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শন নীতিবাগীশদের বিরুদ্ধ সমালোচনা এবং যুক্তিতর্ককে ব্যর্থ করে দিয়ে আজও বেঁচে আছে।

ব্যষ্টি এবং সমাজ উভয়ের পক্ষেই যৌন প্রবৃত্তির অপব্যবহার অনিষ্টকর হতে পারে, কিন্তু এর উপযুক্ত ব্যবহার পৌরুষ ও শক্তিমত্তার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়, আর এটা যার আছে সে ভাগ্যবান ব্যক্তি।

বিনায়কম—কোনো কোনো মহলে এ ধারণা প্রচলিত যে, আর্টের অনুশীলন বিলাস মাত্র।

রায়চৌধুরী—যদি তাই হয় তা হলে শ্রেষ্ঠ কবিদের লেখা সমুদয় বই পুড়িয়ে ফেলে ছেলেদের আর্টের চর্চার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় না কেন? বিভিন্ন শিল্প-কলার যা উদ্দেশ্য, কবিতারও তাই—অর্থাৎ সেগুলোর মত কবিতাও আমাদের শুধু আনন্দই দেয়—আমাদের কোনো ব্যবহারিক প্রয়োজনে আসে না। আজকের দিনে আমাদের খাদ্যাভাব নিদারুণ বলে আমরা আকুলভাবে আর্তনাদ সুরু করেছি এবং নিজেদের দারিদ্র্যের কথাও তারস্বরে ঘোষণা করছি। এর উপর অকারণে আমরা কি আর এক শ্রেণীর দৈন্যকে বরণ করে নেব আর মনকে রাখব উপবাসী। আর্ট হচ্ছে মনের খোরাক এবং এর সঞ্জীবনী শক্তি শ্রেষ্ঠতর কর্মে এবং উন্নততর জীবনযাপনে মানুষকে প্রবৃত্ত করে।

* * *

দেবীপ্রসাদ বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন। তিনি একাধারে দার্শনিক, ভাস্কর, চিত্রকর এবং লেখক। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হৃদয়কে অভিভূত করে সেগুলি হচ্ছে শক্তি, সৌন্দর্যানুভূতি এবং সংবেদনশীলতা বা দরদ। তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যেও এগুলির প্রকাশ লক্ষণীয়। বাস্তবিকই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং শ্রেষ্ঠ ভাস্কর।*

* মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত খাদি স্বদেশী এবং শিল্পপ্রদর্শনীর (১৯৪৯-৫০) *Souvenir*

শত্রু

শ্রীজীবনময় রায়

নদীর ধারে একটা ছিপ হাতে করে বসে আছে বান্নু। শাল-মহুয়ার বনের ধারে ছোট্ট পাহাড়ে নদী। তার এক দিক ঘেঁসে একটা স্রোতের ধারা। তারই মধ্যে এক কোলে জলটা একটু গভীর। ভোরে উঠে বান্নু ছিপ নিয়ে এসে বসেছে সেই জলের ধারে, আর একটা কাঁচা পেয়ারায় একটু একটু করে কামড় দিয়ে অনির্বচনীয় রস সম্ভোগ করছে। চোখ দুটো কিন্তু ফাৎনার উপরে একেবারে আঁটা। ছোট্ট একটা মাছও এর মধ্যে ধরা পড়েছে, মনটা তাই খুশী আছে। চর্বণের ফাঁকে ফাঁকে বিড়বিড় করে বকছে— আসুক না আজ উল্‌খান্‌, তারপর কালকের শোধ তুলে নেব। আমার মাছ ছুঁতে এলে দেব এক পট্‌কান জলের মধ্যে, হুঁঃ। হৈঃ—যাঃ মাছটা পালিয়ে গেল। কে ঢিল মারলে রে! পিছন ফিরে দেখে উল্‌খান্‌ আর একটা ছিপ হাতে প্রায় কাছে এসে পড়েছে।

—তবে রে, ঢিল মারলি কেন? মাছটা আমার পালিয়ে গেল! দাঁড়া দেখাচ্ছি।

—তুই আমার জায়গায় কেন বসবি? দে আমার মাছের ভাগ দে।

—দিচ্ছি দাঁড়া। বলেই বান্নু ছিপ নিয়ে উল্‌খান্‌কে তেড়ে গেল। সাঁই সাঁই, পট্‌পট্‌ ছিপ দিয়ে পেটাপিটি চলল খানিকক্ষণ। বান্নুর কপালটা কেটে রক্ত পড়ছে গাল বেয়ে; উল্‌খানেরও ঠোঁট আর ভুরু কেটে গেছে। দু'জনেরই মুখ দেখাচ্ছে ঠিক বটতলার সিঁদুরমাখা কালো পাথরের ডেলার মত।

হঠাৎ উল্‌খান্‌ দৌড়ে গিয়ে এক লাথিতে বান্নুর মাছের খালুইটা জলে ফেলে দিলে; আর বান্নু ছুটে এসে এক ধাক্কায় উল্‌খান্‌কে একেবারে নদীর মধ্যে ফেলে দিয়ে বললে, যা, এখন ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধর গিয়ে। এই বলে, উল্‌খান্‌ ওঠবার আগেই ছুটে বাড়ী পালিয়ে গেল। এই গেল সকালে।

সেই দিনই দেখা গেল দুপুর বেলা বনের মধ্যে একটা হরিতকী গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে, পা ছড়িয়ে বসে, বুনো কুল খাচ্ছে দু'জনে। সকালবেলার খণ্ডযুদ্ধে ভেঙেচুরে ছিপ দুটোর আর কিছু ছিল না। ছিপ কাটতে এসেছে তাই দু'জনে দুপুর বেলা এই জঙ্গলে।

২

বান্নু আর উল্‌খান্‌ একই গাঁয়ে পাশাপাশি পাড়ায় থাকে। ছেলেবেলা থেকেই একদণ্ড দু'জনের দু'জনকে না হ'লে চলে না, আবার উভয়ের মধ্যে রেষারেষিও দুর্দান্ত। খেলাতেই বল, কি পালপার্বণে তীরবর্শা চালানোতেই বল, কিংবা শিকারে কি গাছ বাওয়ায়, যাতেই বল, দু'জনের মধ্যে একটা রেষারেষি না হলে কারোরই তৃপ্তি হয় না। কেমন করে একজন আর একজনকে একেবারে ঘায়েল করে ছাড়বে এই ছিল তাদের দিন রাতের চিন্তা। এ শুধু রেষারেষি বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, এ যেন জন্মান্তরের শত্রুতা।

বয়স যখন তাদের সবে সতেরো কি আঠারো, তখন নাথু সর্দারের মেয়ে ঝুমরিকে নিয়ে দু'জনের মধ্যে একদিন খুব ঝগড়া হয়ে গেল। তাতে উল্‌খান্‌ নির্বিকার চিত্তে বান্নুর বুকে বর্শার ফলক বসিয়ে দিলে ইঞ্চি তিনেক; আর উল্‌খানের তেলমাখানো চেরা সিঁথি বরাবর হেঁশোর কোপ বসিয়ে দিলে বান্নু ইঞ্চি পাঁচেক, বেশ পরিপাটি করে। ফলে দু'জনকেই মাস দুই শহরের হাসপাতালে গিয়ে বন্দী হয়ে থাকতে হ'ল। আর কেউ কাউকেই খুন করতে পারে নি বলে অতি অপদার্থ জ্ঞানে ঝুমরি ঘেন্নায় দু'জনকেই ত্যাগ করলে। ছ্যাঃ! এ দুটো আবার মরদ!

এদিকে হাসপাতালে শুয়ে দু'জনে জ্বরের ঘোরে অনবরত প্রলাপ বকছে। তাতে তিনটে কথা স্পষ্ট বোঝা গেছে। এক—যে, ঝুমরী এই ঝগড়ার ঠিক লক্ষ্য নয়—উপলক্ষ্য, মানে, একটা বলবার মত অজুহাত চাই ত—খুনোখুনিটাই আসল লক্ষ্য। দুই—যে, মোক্ষম ঘা মারতে পারে নি বলে দু'জনেরই আপসোসের আর অন্ত নেই, এবং তিন—যে, ভবিষ্যতে খুন করার সুযোগ পাবার জন্যে লড়াইয়ের দেবতা বোঙ্গার কাছে একে অন্যের প্রাণ ভিক্ষা চায়। কেননা শত্রুই যদি মারা গেল তবে বেঁচে থেকে আর সুখ কি?

বোঙ্গা বোধ করি তাঁর সুযোগ্য ভক্তদের প্রার্থনা পায়ে ঠেলতে পারলেন না। কেননা দেখা গেল যে দু'জনেই ঠিক বেঁচে উঠল।

৩

কিন্তু তাদের জীবনের যে ঘটনাটি বলার জন্যে তাদের বাল্য এবং কৈশোরের এতখানি পরিচয় দিতে হ'ল তার মত অদ্ভুত ঘটনা জীবনে কখনও শুনি নি। সেইটেই এখন আপনাদের বলব।

গ্রামের মধ্যে সকলেই একথা জানত যে, হয় বান্নু না হয় উল্‌খান্‌ একদিন গ্রামের সর্দার হবে। কেননা ওদের জুড়ি আর ও গাঁয়ে কেউ ছিল না। সেই সর্দার বাছাইয়ের দিন ঘনিয়ে এল বুড়ো সর্দারের মৃত্যুতে। শুরু হ'ল দু'জনের মধ্যে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দু'জনেই পঞ্চায়েৎ-বুড়োদের হাত করার মতলবে আর নিজের দলে লোক টানবার চেষ্টায় অসাধ্যসাধন করছে। গ্রামের লোকও প্রায় সমান ভাগে কেউ এর দলে কেউ ওর দলে ভিড়েছে। বীভৎস চিৎকারে ঢাকঢোল পিটিয়ে এক দল অন্য দলের পরাজয় এবং স্বদলের জয়বার্তা ঘোষণা করছে। তলে তলে গোপনে চলেছে, একের অপরের আয়োজন পণ্ড করার চেষ্টা, আর সর্বনাশ করার ফিকির-ফন্দী। এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল যে পক্ষপাতী পঞ্চায়েৎ উলুখান্‌কেই সর্দার বলে ঢোলশহরৎ করে প্রচার করে দিলে। রাগে বায়ুর মাথায় গেল খুন চড়ে। কাউকে কিছু না বলে সভা ছেড়ে উঠে সে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঘরে বসে বসে শুনতে পাচ্ছে বায়ু উলুখানের দলের হুঙ্কার। কাড়া নাকাড়া ডুগির আওয়াজ আসছে কানে—ডুগ্‌ ডুডুগ্‌ ডুগ্‌, ডুগ্‌ ডুডুগ্‌ ডুগ্‌ যেন তার মাথার চাপা হাঁড়িটার মধ্যে রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে তারই শব্দ। হাজার রকমের শব্দ উৎসবের। নূতন সর্দারকে নিয়ে গ্রাম উৎসবে মেতেছে। তাড়ি উড়ছে ভাঁড়ের পর ভাঁড়। মাদল বাজছে—ডিমি ডিমি ডিমি ডিম্‌, ডিমি ডিমি ডিমি ডিম্‌।

দেয়াল থেকে ধনুকটা নামিয়ে বাঁ হাতটা গলিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে নিলে। তারপর এক মনে তীর বাছাই করতে লাগল। কঠিন মুখের একটা পেশীও নড়ছে না, কেবল চোখের ভিতর দিয়ে ঝিলিক দিচ্ছে মনের আগুনের লহর। বিড় বিড় করে বলছে—একটার বেশী দুটো তীর না লাগে শয়তানকে মারতে; নইলে মারার সুযোগ আর জুটবে না কোন কালেই। তারপর কি ভেবে তীরধনুক রেখে টাঙ্গিটা পেড়ে নিলে। তার ধার পরীক্ষা করে বললে, হাঁ, ঠিক আছে। এক কোপে একেবারে—পাকা তালটির মত টুপ করে কাঁচা মাথাটা ধড় থেকে খসে পড়বে—রক্ত ছুটবে ফিন্‌কি দিয়ে…ইঃ।

হঠাৎ কি একটা মতলব মাথায় আসতে বায়ুর কালো পাথরের মত মুখটা যেন একটা পৈশাচিক হাসিতে সজীব হয়ে উঠল। মনে মনে ভারি পছন্দ হয়েছে ফন্দীটা। দেয়ালের গায়ে টাঙ্গিটা টাঙিয়ে রেখে ধীরে সুস্থে সে বাইরে বেরিয়ে গেল। ওদিকে তখন উলুখান্‌কে নিয়ে চলেছে নাচ গান আর হুল্লোড়। মত্ত হয়ে নাচছে উলুখান্‌, খোশ মেজাজে, উদ্ভিন্নযৌবনা ঝুমরির পরিপুষ্ট দেহের দিকে ঝুয়ে ঝুয়ে, দুলে দুলে—ঝুমরির নাচের তালে তালে। সাপ খেলাচ্ছে যেন ঝুমরি—হেলিয়ে দুলিয়ে এগিয়ে যায়, ধরতে গেলে এড়িয়ে পালায়। মাদল বাজছে, ডিডি ডিম্‌ ডিডিম্‌ ডিডিম্‌—ডিডি ডিম্‌—ডিডিম্‌ ডিডিম্‌। যৌবনের নেশা, মদের নেশা—তাড়ি আর ঝুমরি। মাতাল করে তুলছে উলুখান্‌কে। পা টলছে, পা টলছে, রক্তে জ্বলছে আগুন। ঝুমরি…। দুই হাতে আকাশ আঁকড়াতে আঁকড়াতে সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। বেহুঁশ উলুখান্‌কে সেদিন ধরাধরি করে সবাই তার ঘরে রেখে এল।

৪

পরদিন সকালে চড়চড়ে রোদের ঝাঁঝ লেগে চোখ মেলল উলুখান্‌—এ কি! নড়তে পারে না কেন? সমস্ত দেহটা যেন আড়ষ্ট, কাঠের মতন! কি একটা অসহ্য অস্বস্তি আষ্টেপৃষ্ঠে হাড়ে-মাসে যেন সেঁটে ধরে আছে। জেগে দেখে দশ মাইল দূরে, কিছু দিন আগে যে বাঘের ফাঁদটা পেতে এসেছিল দু'জনে বিজনীর জঙ্গলে, তারই মধ্যে পাটাতনের সঙ্গে লতায় দড়ি দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে আগাপাছতলা বাঁধা হয়ে পড়ে আছে সে। ওঠবার বা নড়বার যো নেই। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, সাক্ষাৎ শয়তানের প্রতিমূর্তি বায়ুটা এক চোখ মটকে হাসছে আর শরীর দুইয়ে বিদ্রূপ করে বলছে—গড় হই সর্দার গোঃ, চললুম এখন। আবার এক দিন ফিরে আসব তোর হাড় ক'খানার পূজো দিতে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ…। থামতেই চায় না যেন আর দুশমনটার হাসি।

রাগের চোটে উলুখান্‌ প্রাণপণে ঝাঁকি দিল দুই হাতের বাঁধনে। থর থর করে কেঁপে উঠল মোটামোটা শালের খুঁটি দিয়ে তৈরি সেই বাঘের ফাঁদ, বাঁধন কিন্তু ছিঁড়ল না। দশ মিনিট প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করে নির্জীব হয়ে পড়ে রইল সে নিঃসাড়ে।

দুপুরবেলার পাহাড়ে রোদে মুখের বুকের চামড়া যেন পুড়ে যাচ্ছে। চোখের ভিতর শেয়াকুলের কাঁটা কোটাচ্ছে যেন। তেষ্টায় ছাতি ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে পড়বে মনে হচ্ছে। প্রতি লোমকূপে আগুনের শিখা।

রাগের চোটে গর্জাচ্ছে উলুখান্‌—খাঁচায় পোরা বাঘ। মাথার খুলিটা রাগের দাপটে মদের বোতলের ছিপিটার মত দম্‌ করে উড়ে যাবে যেন। জ্ঞান ক্রমে তার লোপ পেয়ে আসছে। শুধু মাথার মধ্যে লাটুর মত পাক খেয়ে ফিরছে একটা কথা—মরলে চলবে না, মরলে চলবে না, মরলে চলবে না। বায়ুকে খুন না করে মরতে পারবে না সে; কিছুতেই না।

সন্ধ্যার দিকে আবার তার জ্ঞান একটু একটু করে ফিরে আসছে। খিদের চোটে পেটের মধ্যে নাড়িভুঁড়িগুলো খামচাচ্ছে চটকাচ্ছে চিবোচ্ছে যেন। আর একবার প্রাণপণ শক্তিতে সে বাঁধন ছিঁড়তে চেষ্টা করলে। সাধ্য কি! বুনো মোষের মত তার দেহ, তেমনি বল তার শরীরে। মেলায় সে বায়ুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কত মোটা মোটা কুয়োর দড়ি ছিঁড়েছে; কিন্তু বুনো লতার এই শক্ত বাঁধন সে ছিঁড়তে পারলে না। ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে রইল চুপ করে। ঘুমাতে চেষ্টা করতে গিয়ে কিছুতে ঘুম এল না। ঝুমরি আর উৎসব

আর শরতান বাবুটার কথা ভাবতে ভাবতে কখন এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে, যেন ঝুমরির সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তার। চারদিকে মশালের আলো, মাদলের বাগু; হাঁড়িয়ার গন্ধে আকাশ বাতাস মাতাল হয়ে উঠেছে। এমন সময় প্রকাণ্ড একটা ভালুকের মত বাবুটা হঠাৎ কোথা থেকে এসে ঝড়ের মত আসরে ঢুকে পড়ল—আর, ও কি! ঝুমরিকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিলে। হাসছে ঝুমরি খিল খিল করে, বাবুর কোলে চড়ে, ওর গলা জড়িয়ে ধরে। যেন ভারি একটা কৌতুকের ব্যাপার। রেগে উল্‌খান্‌ বাবুকে খুন করবে বলে লাফিয়ে উঠতে গেল। কিন্তু এ কি! কারা সব ওর হাত পা চেপে গলা টিপে ধরেছে, বুকের উপর চড়ে বসেছে।

আরে! দম বন্ধ করে মারবে নাকি। প্রাণপণে ওদের হাত ছাড়াতে চেষ্টা করছে সে—কিছুতেই পারছে না। ওরা, হেঁসো দিয়ে হাতটা কাটছে করাতের মত করে। ঘুম ভেঙে দেখে যে ঘুমের ঘোরে ধস্তাধস্তিতে লতায় তার হাত কেটে গেছে—আর রক্ত পড়ছে ঝরঝর করে।

নির্জীব হয়ে পড়ে আছে উল্‌খান্‌। শরীর তার ঝিমিয়ে আসছে ক্রমে। একটানা একটা ঝিঁঝির ডাক—মাথার কোন্ একটা কোকরে বাসা বেঁধেছে যেন। কেমন একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। সমস্ত চৈতন্যকে ঘুলিয়ে দিচ্ছে। হাত পা গা এলিয়ে আসছে। দেহ থেকে প্রাণটা আল্‌গা হয়ে গেছে যেন—আর ধরে রাখতে পারছে না। এ কি! সে মরে যাবে নাকি শেষে? কিছুতেই নয়, মরা তার হতে পারে না। বাবু বেঁচে থাকতে সে মরবে? না—না—না মরতে পারবে না সে।

এমনি চলল তিন দিন তিন রাত। চতুর্থ দিন ভোরের বেলা ঘোলা ঘোলা চোখ মেলে সে তাকাল। চারদিকে মনে হয় যেন ছায়া ছায়া কি সব ঘুরছে। ভয়ে ভয়ে ঘাড়টা ফেরাল সে। কে? বাবু? না, না, একটা হুণ্ডার, ঐ যে আরো একটা। ওর মরার অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে আছে সব। মস্ত ভোজ হবে ওদের। ই-স! কিছুতেই মরবে না সে! মরতে পারবে না। বাবু বেঁচে থাকতে নয়। হু-উ; হাঃ! হুণ্ডার ছুটো লাফ দিয়ে পিছিয়ে গিয়ে স্থির হয়ে বসে।

সকাল হয়ে এল। ঘাড় বড়ই ব্যথা করছে। ঘাড়টাকে অন্তদিকে ফেরাতেই দেখে সারি সারি লাইন বেঁধে, লম্বা লম্বা ঘাড় হেঁট করে উপাসকমণ্ডলীর ভঙ্গীতে নীরবে বসে আছে, এক পাল শকুন। ঠিক এমনিটি সে দেখেছিল শহরে, গির্জার মাঠে, কোন্ একটা পরবের দিনে। বসে আছে ওরা অসাধ বৈর্যে, ওরই মরণের প্রতীক্ষায়। সত্যিই মরতে হবে নাকি! এঁ্যা! বাবুটা দিব্যি ঝিক্‌ঝিকে বেঁচে থাকবে, সর্দার হবে, ঝুমরিকে—উঃ! কক্ষণ হতে দেবে না তা। মরবে না সে! মরা কিছুতেই চলবে না তার।

দুপুর রোদে মুখ আর বুকের চামড়া পুড়ে তিতির চামড়ার মত হয়ে উঠেছে। গা বমি বমি করছে রোদ্দুরে। অন্ত পাশে মাথাটা ফেরাতেই এক ঝলক বমি হয়ে গেল—রক্ত বমি। তেতো! মাথার ভিতরে পান্‌চাককী ঘুরছে যেন—ঘরর্‌ ঘরর্‌। শরীর ঝিমিয়ে জ্ঞান লোপ পেয়ে আসছে। পান্‌চাককীর আওয়াজ শুনছে ঘরর্‌ ঘরর্‌। ঝুমরির হাতের হাতের বালায় কাঁসার চুড়িতে ঝুমঝুমি বাজছে—ঠুক্ ঠুক্ ঝুম্ ঝুম্, ঝুম্ ঝুম্ ঠুক্ ঠুক্। মাথায় গোঁজা ডালসুদ্ধ এক থোকা কল্‌কে ফুল দোল খাচ্ছে তালে তালে ঝুমরির এলো খোঁপা বাঁধা ঘাড়ের উপরে এসে, ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে ওর গাল। খুব দূরে কোথায় যেন একটা রেলের বাঁশী বাজছে একটানা সুরে—কু-উ-উ।

৫

অলাহ জঙ্গল। জনমনুষ্য আসে না এদিকে বড় একটা। সেদিন দূর গাঁয়ের কয়েকজন লোক চলেছে, জঙ্গল ভেঙে সোজা পথে। ফাঁদটার কাছাকাছি এসে সামনের লোকটা থমকে দাঁড়াল।

প্রথম—ওরে ভাই, একটা বাঘের ফাঁদ!

দ্বিতীয়—আর দেখ দেখ ওটার মধ্যে একটা শুয়োর মেরে রেখে গেছে।

প্রথম—চল, চল, ওটাকে বের করে পুড়িয়ে খাই।

চতুর্থ—খাবি ত। আবার বাঘ মশাই তোকে না খায়।

সকলেই এগিয়ে খাঁচার কাছে এল। সামনের লোকটা চেঁচিয়ে উঠল—ওরে শুয়োর নয়, ও একটা মানুষ বটে রে।

তৃতীয়—এ আবার কি রে!

আর একজন ফাঁদের ফাঁকে মুখ রেখে বললে, মরা নয় কিন্তুক। ওর পেটটা নড়ছে যে রে। জিয়ান্ত মানুষ বটে। তখন সকলে মিলে বাঁধন কেটে উল্‌খান্‌কে কাঁধে করে নিয়ে চলল নিজেদের গাঁয়ে।

দিন পনের পরে ওদের যত্নে বেঁচে উঠল উল্‌খান্‌। এখন সে একটু একটু করে জোর পাচ্ছে—সকালবেলা কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে বুড়ো মহুয়াতলায় এসে উবু হয়ে রোদ্দুরে বসতে পারে। সারাদিন গাছের ছায়ায় বসে থাকে আর ভাবে, কবে যে পুরো জোর পাবে। সেদিন আর দেরি করবে না। একটা টাঙি নিয়ে বেরবে সে বাবুর সঙ্গে ভেট করতে। চমকে উঠবে বাবুটা—ভাববে ভূতটা বটে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

এমনি করে আরো পনের কুড়ি দিন কেটে গেল। এক দিন রীতিমত তীর ধনুক, টাঙি, বর্শা, ঢাল নিয়ে সেজেগুজে

বেরিয়ে পড়ল উল্‌খান্‌, নিজেদের গাঁয়ের প্রান্তে। দেহে স্ফূর্তি আর যেন ধরে না। পথে চলেছে সে—যেন হাওয়ায় উড়ছে।

খুন করার উপায়গুলো কিন্তু কিছুতেই তার মনে ধরছে না—তীর? টাঙ্গি? বর্শা? নাঃ, যথেষ্ট নিষ্ঠুর বলে ঠেকছে না তার কাছে। ওর কোনটাতেই বেশীক্ষণ বাঁচিয়ে রেখে রেখে শেষ করা যায় না। ভাবছে আর চলেছে—চলেছে হন্‌ হন্‌ করে আর ভাবছে। ভাবনার বেগে চলার বেগ বাড়ছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল উল্‌খান্‌। একটা ভারি জবর ফন্দী মাথায় এসেছে। ভাবতে ভাবতে ভারি মজা লাগছে ওর। ওঃ—হোঃ-হোঃ-হোঃ-হো। এমন রগড় তাদের গাঁয়ে কেউ কখনো আর দেখে নি। বায়্‌ কে সে ধরে নিয়ে যাবে বিজনীর জঙ্গলে, নিজের দলের লোক দিয়ে, চুরি করিয়ে। সেখানে একটা বড় মহুয়াগাছের ডালে পায়ে দড়ি বেঁধে ঝোলাবে তাকে। তারপর নীচে জ্বেলে দেবে একটা আগুনের কুণ্ড। একটু একটু করে, ঝলসে ঝলসে, জ্যান্ত পুড়ে মরবে—আর ওর গা থেকে চর্বি গলে গলে আগুনে পড়বে—ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ, আর জ্বলে জ্বলে উঠবে। কানে শুনতে পাচ্ছে যেন সেই শব্দ, ছ্যাঁৎ, ছ্যাঁৎ। ওঃ কি রগড়ই হবে!

ভাবতে ভাবতে গাঁয়ের কিনারায় এসে পড়েছে ও। মাদল বাজছে গাঁয়ের উত্তর দিকে—যে দিকে মাটি দেয়—ডুডু ডুম্‌-ডুম্‌ ডুডুম্‌, ডুড্‌ ডুম্‌-ডুডুম্‌ ডুডুম্‌। কে আবার মরল। উমরু নিশ্চয়। বড্ড বুড়ো হয়েছিল। পড়ে পড়ে গাল পাড়ত বৌটাকে। আর বৌটা ভাত নিয়ে এসে বলত—নে নে ভাত নে, খেয়ে মর।

৭

তাড়াতাড়ি ছুটে চলল সে উত্তর দিকে। কিন্তু বেশী দূর আর যেতে হ'ল না। পথেই খবরটা পাওয়া গেল। মরেছে উমরু নয়—বায়্‌। তার চিরদিনের সঙ্গী, তার চির প্রতিদ্বন্দ্বী, তার চিরদিনের শত্রু বায়্‌ মরে গেছে! ভালুক শিকার করতে গেলে ভালুকে ছিঁড়ে মেরেছে তাকে। সেই গণ্ডারের মত মজবুত, চিতা বাঘের মত চটপটে, সিংহের মত নির্ভীক আর হায়নার মত ধূর্ত বায়্‌—সাত গাঁয়ে যার তুলনা নেই সেই দুর্দ্ধর্ষ বায়্‌ মারা গেছে! আর তাকে পাবে না, তার সঙ্গে কাজিয়া আর হবে না। নেই, নেই—বায়্‌ নেই। বুকে যেন কে হাতুড়ির ঘা মারছে—হা হা করে উঠছে তার বুকের মধ্যে—হঠাৎ যেন খালি হয়ে গেছে বুকটা। সমস্ত সংসারটা এক নিমেষে উল্‌খানের কাছে ফাঁকা অর্থহীন হয়ে গেছে। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, আশ্রয়, উদ্দেশ্য চিরশত্রু বায়্‌ আর নাই।

নিজের বাড়ীতে আর ঢুকতে পারলে না সে। যে গাঁ থেকে এসেছিল সেই গাঁয়েই ফিরে গেল তাদের ঘরে। সর্দারীর আকাঙ্ক্ষা, ঝুমরির আকর্ষণ কোন কিছুই আর তার মনে আজ ঠাঁই পেল না।

৮

পরদিন সকালে ওরা সকল উল্‌খানের কাছে এসে দেখে সে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে আছে। বললে, চলো, বাইরে গিয়ে বসবে চলো। কি হয়েছে গো তোমার?

উঠতে চেষ্টা করল উল্‌খান্‌; উঠতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। হাঁটুতে আর বল নেই তার।

একজন বললে, কি হ'ল তোমার? ওঠ!

হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উল্‌খান্‌ বললে—কোন্‌ কবরের তল থেকে কথা বলছে যেন—বললে, আমি আর উঠতে পারছি না গোঃ।

সবাই বললে, সে কি! এই ত কালই তুমি একটা বুনো বরার মত ছুটে চলেছিলে; আজ কি হ'ল তোমার!

কি হয়েছে?—তা, সে কেমন করে বোঝাবে কি হয়েছে। তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী, তার জীবনের চিরশত্রু বায়্‌র অভাবে জগৎটা তার কাছে শূন্য—শূন্য হয়ে গেছে অকস্মাৎ—বুকটা খালি হয়ে গেছে তার। বেঁচে থাকার ভিত তার সরে গেছে পায়ের তলা থেকে—খুঁজে হাতড়ে জীবনের কোন অবলম্বন আজ আর সে পাচ্ছে না। শত্রু তার মারা গেছে, তারপর—তারপর কি নিয়ে আর সে বেঁচে থাকতে পারে? এর পর আর বেঁচে থাকার মানে কি?

একদিন সকালে সকলে এসে অবাক হয়ে দেখে যে সেই বুড়ো মহুয়া গাছতলাটায় এসে সে মরে পড়ে আছে। গায়ে তার পুরো জঙ্গী সাজ। তার তীর, ধনুক, টাঙ্গি, বর্শা, ঢাল নিয়ে একেবারে যুদ্ধের সাজে তৈরি হয়ে বেরিয়েছে সে।

বোধ করি, মরণ নিশ্চয় ঘনিয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি সে সেজে বেরিয়ে এসেছে বড় আশায়—তার চিরশত্রু বায়্‌র সঙ্গে ভেট করতে।*

* একটি ইংরেজী গল্প হইতে 'আইডিয়া' পাইয়া নূতন প্লটে লিখিত।

অল্‌ ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে

স্বাধীন ভারত

রেজাউল করীম

স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী ভারতে গৌরবময় প্রথম দিবসকে অন্তরের অভিনন্দন জানাইতেছি। আজিকার এই পুণ্যক্ষণের সার্থক সাফল্যের জন্য অতীতে কত জনে কত তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই অপরিসীম ত্যাগের আদর্শ দেখিয়া ভারতের জাতীয় কবি পুলকিত চিত্তে গাহিয়াছেন: "বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা, একি ধরার ধুলায় হবে হারা?" না, এই অজস্র রক্তস্রোত ও অশ্রুধারা ধরার ধুলায় বিলীন হয় নাই। তাঁহাদের প্রতি রক্তকণিকায় ছিল বিপ্লবের রক্তবীজ, অশ্রুতে ছিল অপূর্ব্ব জীবনীশক্তি। তাই জাতির ত্যাগ ও তপস্যার ফলস্বরূপই আজ আমরা স্বাধীনতার রসাস্বাদন করিবার সুযোগ পাইয়াছি। জাতির জীবনে সে দিন ছিল ত্যাগের দিন, সাধনার দিন। কবে, কতদিনে অমানিশার ঘনান্ধকার বিদূরিত হইবে তাহা জাতি জানিত না। তবুও আশাবাদী কবি আশ্বাস দিয়াছিলেন "এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে।" আজ সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর সত্যই সে দিন আসিল। আজিকার এই শুভ দিনের পুণ্য প্রভাতে অমরলোকবাসী কবিকে কহিব, "হে বিশ্ববরেণ্য কবি! আজ তোমার বাণী সফল হইয়াছে। আজ সত্যই সেদিন আসিয়াছে। দেশজননীর শৃখল মুক্ত হইয়াছে। হে সাধক কবি, তুমি আজ স্বর্গলোক হইতে আমাদের এই পুণ্যদিনকে সম্বর্দ্ধনা কর, সমগ্র জাতিকে আশীর্ব্বাদ কর।" যে সব ত্যাগবীর কর্ম্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দেশের স্বাধীনতার জন্য অক্লান্ত সাধনা করিয়া জীবনপাত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিব, আজিকার প্রাপ্তি তোমাদেরই দান। তোমরা করিয়াছ আত্মবলিদান, আর এ যুগের ভারতবর্ষ তাহারই ফলভোগ করিতেছে। তোমাদের আত্মত্যাগের অমর অবদান ভারতবাসী কখনও ভুলিবে না। তাই আজ বারবার তোমাদের কথাই স্মরণ করিতেছি।

আজ অমারজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রত্যুষে যে নবারুণ আত্মপ্রকাশ করিবে, সে দেখিবে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী ভারতের নূতন মূর্ত্তি। স্বাধীন আত্মনির্ভরশীল ভারতের শুভ জন্মদিন। আর ভারতবাসী প্রাতে জাগ্রত হইয়া যে ভারতবর্ষ অবলোকন করিবে, তাহাও নূতন ভারতবর্ষ। আজ এই স্বাধীন ভারতবর্ষকে সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছি।

আজিকার এই স্বাধীন ভারতবর্ষকে সার্থক, সুন্দর ও সাফল্য মণ্ডিত করিতে হইবে আমাদের সমবেত সাধনার দ্বারা। স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য জাতি যে ত্যাগ করিয়াছে, আজ স্বাধীন ভারতকে শক্তিশালী, সুদৃঢ়, ঐক্যবদ্ধ ও সুগঠিত করিবার জন্য তদপেক্ষা অনেক অধিক ত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন। কর্ম্মী ও সাধকগণের ত্যাগের তপঃপ্রভাবে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে, অধিকতর ত্যাগ ও তপস্যার দ্বারা এই আয়াসলব্ধ স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করিতে হইবে। পরিপূর্ণ ও অবিমিশ্র গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপরই আমাদের স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। ব্রিটিশ যুগের সাম্প্রদায়িকতার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপূর্ণ স্ফুরণের ক্ষেত্র প্রশস্ত করা হইয়াছে। মানুষের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, ব্যক্তিগত মত সব কিছুকেই অবাধে বিকশিত হইবার সকল সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। এই নবগঠিত রাষ্ট্রের ব্যবস্থা ও কাঠামোর মধ্যে তেমন কোন ত্রুটি নাই। ইহা রাজনৈতিক আদর্শবাদের দিক হইতে আদর্শ রাষ্ট্র না হইতে পারে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল যে "Idealy best state"-এর কথা বলিয়াছেন, তাহা ত পৃথিবীতে কোথাও নাই। যে সব রাষ্ট্র হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলি কখনই Ideally best state হইতে পারে না। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষকে যে অহিংসার মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই যদি আমাদের মূল লক্ষ্য হয় তবে আজ না হউক, এক দিন ভারতবর্ষই Ideally best state গঠন করিতে পারিবে। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল লক্ষ্য গান্ধীবাদের নীতিকেই পূর্ণ রূপ দেওয়া। সেইরূপ আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করা এক দিনেই সম্ভব নহে। প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত অনেক মহাপুরুষই আদর্শ রাষ্ট্রের কাল্পনিক ছবি আঁকিয়াছেন। কিন্তু অহিংসার ভিত্তিতে গান্ধীজী যে আদর্শ রাজ্যের, যে "রামরাজ্য"র ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহাতে কল্পনা অপেক্ষা বাস্তবতা ও কার্য্যকারিতার প্রভাবই বেশী। সুতরাং আশা করা যায় যে ভারতবর্ষ যদি গান্ধীজীর নীতি পরিত্যাগ না করে, তবে আদর্শ রাষ্ট্র ভারতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু তাহার জন্য সময় চাই, সাধনা চাই, ত্যাগপূত মানুষ চাই। আজিকার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কথা চিন্তা করা যাক। প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বেকার রাজা জনের নিকট হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি মৌলিক অধিকারই ত উহার ভিত্তি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে, ধাপে ধাপে, কখনও মন্থরগতিতে, কখনও দ্রুতগতিতে, কখনও বিপ্লবের পথে, কখনও বিবর্ত্তনের পথে—এই ভাবে অগ্রসর হইতে হইতে আজ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট চরম অধিকারী হইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্র জাতির

পরিপক্ব মস্তিষ্কের সুচিন্তিত সাধনার ফলেই পূর্ণকলেবর প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার মৌলিক নীতি অত্যন্ত উদার, ইহার আদর্শ অত্যন্ত ব্যাপক। বর্তমান জগতের কতিপয় শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের সারাংশকেও ইহার মধ্যে গ্রথিত করা হইয়াছে, পূর্ণবিকাশের সমস্ত সুযোগ ইহাকে দেওয়া হইয়াছে। আজ প্রথম অবস্থায় ইহাকে স্বীকার করিয়া লওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহার পর ইহাকেই অবলম্বন করিয়া কাজ আরম্ভ করিলে বিকাশের পথে যদি কোন ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দেয়, তবে তাহার সংশোধন করিবারও সুযোগ রহিয়াছে। গণতন্ত্রের যেমন সুবিধা আছে, তেমনই বহু বিপদ এবং অসুবিধার মধ্যেও ইহাকে চলিতে হয়। প্রথম অবস্থায় গণতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই তাহার বিকাশের চেষ্টা করা সমীচীন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ এই ভাবেই বিকশিত ও সম্প্রসারিত হইয়াছিল; কিন্তু গণতন্ত্রের প্রথম অবস্থা হইতেই যদি তাহাকে বাধা দেওয়া হয়, ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হয়, মেকী বিপ্লবের খেয়ালী নেশায় বিভোর হইয়া 'ভাঙিবার জন্য ভাঙিবার নীতি'কে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে কোন দেশেই স্থায়ী রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রের পুনঃপুনঃ ভাঙাগড়ার ধাক্কাতে দেশ সর্বনাশের সম্মুখীন হইবে। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা যখন এইরূপ অরাজক হইয়া পড়ে, তখনই সুযোগ বুঝিয়া ডিক্টেটর বা সর্বাধিনায়কগণ সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিতে চেষ্টিত হন।

গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে রাষ্ট্রস্থিত প্রত্যেক নাগরিকের কতকগুলি বিশেষ গুণের অধিকারী হওয়া দরকার। প্রাচীন এথেন্সের গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করিতে গিয়া জে, পি, মাহাফি তাঁহার *"Problems in Greek History"* নামক গ্রন্থে বলিতেছেন:

"Even far more deeply did the lessons of Athenian political life act upon the practical character of the citizens, and train him to be a rational being submitting to the will of the majority, to which he himself contributed in debate, taking his turn at commanding as well as obeying, regarding the labours of office as his just contribution to the public weal, regarding even the sacrifices he made as a privilege, — the outward manifestation of his loyalty to the State which had made him in the truest sense an aristocrat among men. Even when he commanded fleets, or armies, he did so as the servant of the State, any attempt to redress private differences by personal assertion of his right, other than law provided, was regarded as essentially a violation of his civility and a return to barbarism."

মর্মার্থ—এথেন্সের রাজনৈতিক জীবনের শিক্ষার প্রভাব তাহার প্রত্যেক নাগরিকের চরিত্রের উপর গভীরভাবে পতিত হইয়াছিল। সে সর্বদা যুক্তির পথ ধরিয়া চলিত। রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠের বিধানকে স্বীকার করিয়া লইত। রাষ্ট্রের কাজে সে যোগদান করিত, তর্কবিতর্কেও যোগ দিত। প্রয়োজনবোধে সে কখনও কর্তৃত্বের অধিকারী হইয়া আদেশ দিত, আবার সেই একই লোক অন্য অবস্থায় স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের আদেশ পালন করিত। রাষ্ট্রের সেবা করাকে সে সর্বসাধারণের কল্যাণের কাজে নিজের ব্যক্তিগত দান বলিয়া মনে করিত; ত্যাগে সে গৌরব অনুভব করিত। সে মনে করিত আত্মত্যাগ দ্বারা রাষ্ট্রের প্রতি স্বীয় বাহ্যিক আনুগত্য প্রকাশ করিতেছে। আর এই ভাবে রাষ্ট্রের সেবা করিয়া সে একটা আভিজাত্যের গরিমা লাভ করিত। যখন সে পোতাধ্যক্ষ অথবা সেনাধ্যক্ষের অধিকার লইয়া কাজ করিত, তখন সে নিজেকে রাষ্ট্রের দাস ও সেবক বলিয়া মনে করিত। আইনানুমোদিত উপায় ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই ব্যক্তিগতভাবে সে কোন অসুবিধাই দূর করিত না। এরূপ করাকে সভ্যজনোচিত কাজ বলিয়া মনে করিত না। তাহার নিকট এরূপ কাজ বর্বরতার নামান্তর।"

প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশের অধিবাসীদের এইরূপ মনোবৃত্তি হওয়া উচিত। এই পথেই গণতন্ত্র সফলতা লাভ করে। গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকগণ যদি কথায় কথায় ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের নামে রাষ্ট্রের বিধিব্যবস্থা ভাঙিতে উদ্যত হয়, রাষ্ট্রের সেবা অপেক্ষা রাষ্ট্রের নিকট হইতে পুরাপুরি নিজেদের স্বার্থ আদায়ের চেষ্টা করে, রাষ্ট্রের সেবাকে ও রাষ্ট্রের জন্য ত্যাগ করাকে আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া না মনে করে, তবে সে রাষ্ট্র স্থায়ী হইতে পারে না, সে রাষ্ট্রে অহরহ বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। ইহাতে অরাজকতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। আইন-অমান্য, বিশৃঙ্খলা, অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ, নিজের হাতে আইন গ্রহণ ও স্বেচ্ছাচারমূলক ভাবে আইনের অপপ্রয়োগ—এই সব গণতন্ত্রবিরোধী অপকর্ম প্রশ্রয় পাইতে থাকিলে, তাহা সর্বদাই সীমা লঙ্ঘন করে, তাহার গতি নিশ্চল হইয়া থাকে না, আর কোথায় গিয়া তাহার পরিণতি হইবে তাহা কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, এইভাবে দেশে অরাজকতা উপস্থিত হয়। অরাজকতা শান্তির চরম শত্রু। অরাজকতা হইতে অশান্তি, আর অশান্তি হইতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এই বিশৃঙ্খলার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লোকে অস্থির হইয়া উঠে। তখন একটি মাত্র বুলিই সকলের মুখে শুনা যায়, Peace at any cost—যে-কোন প্রকারেই শান্তি চাই। ডিক্টেটর শ্রেণীর লোকেরা এই সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। যখন "যে-কোন প্রকারে শান্তি চাই।"—এই বুলি দেশময় ব্যাপক হইয়া উঠে, তখনই গণতন্ত্রকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা হয়। গণতন্ত্র নিধন করিয়া এইভাবে বিভিন্ন দেশে স্বৈরাচারী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গণতন্ত্রকে একনায়কত্বের খপ্পর হইতে

রক্ষার প্রধান উপায় হইতেছে গণতন্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে গণতান্ত্রিক উপায় ব্যতীত অন্য কোন ভাবেই দূর করিতে চেষ্টা না করা। একবার গণতান্ত্রিক পন্থা পরিত্যাগ করিলে আর সহজে তাহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায় না। সেইজন্য শত ত্রুটি-সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক পন্থা কোন প্রকারেই পরিত্যাগ করা উচিত নহে। গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে হইলে কেবল তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুল-ভ্রান্তির দিকে ইঙ্গিত করিলে চলিবে না। প্রত্যেক নাগরিককে গণতান্ত্রিক ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে হইবে।

আজ দেশে গণতন্ত্রবিরোধী তথা রাষ্ট্রবিরোধী মনোভাব এক শ্রেণীর লোককে এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে, তাহারা নিজেদের বিকৃত আদর্শের জন্য রাষ্ট্রের তথা গণতন্ত্রের চরম ক্ষতিসাধন করিতেছে। ভারতের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমাদের সকলের প্রিয়বস্তু। ইহার রক্ষা ও সংগঠনের দায়িত্বও আমাদের সকলের। স্বাধীনতা আজ আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে সমুপস্থিত, ইহাকে সাগ্রহে বরণ করিয়া লওয়াই ত সমুচিত কাজ। গান্ধীজী আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতাই আমাদের চরম লক্ষ্য নহে। সত্যকার "রামরাজ্য" প্রতিষ্ঠাই জাতির চরম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য এই স্বাধীনতা প্রথম পাদপীঠমাত্র। সেই গৌরবময় "রামরাজ্যের" জন্য সাধনা করিতে হইবে গান্ধীজীর নির্দেশিত পন্থায়। আমাদের রাষ্ট্রের মূলনীতি অহিংসা, প্রেম, সেবা ও আত্মবলিদান। এই নীতির বলে বলীয়ান হইয়া ভারতবর্ষ জগতের সম্মুখে এমন এক সার্ব্বজনীন আদর্শ স্থাপন করিবে, যাহা বিবদমান জাতিসমূহকে সত্যকার প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারিবে। এই পথেই ভারতবর্ষ বিশ্বশান্তি স্থাপনে সহায়তা করিবে, বিশ্বসমস্যার সমাধান করিবে। আজ ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের উদ্বোধনের দিনে এই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করিতেছি। ইহার স্থায়িত্ব কামনা করিতেছি। আজ বিভেদকে প্রশ্রয় দিব না, ঐক্য ও প্রীতির দ্বারা দেশের সকলের সহিত এক হইয়া যাইব। আজিকার পুণ্যদিনে এই শপথ গ্রহণ করিব যে, আমাদের বাক্য দ্বারা, আচরণ দ্বারা, মনোভাব দ্বারা, চিন্তার দ্বারা অহরহ রাষ্ট্রের সেবা করিতে থাকিব; রাষ্ট্রের রক্ষার জন্য এই জীবন উৎসর্গ করিব, গণতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সতত সচেষ্ট থাকিব। দেশবাসীর সকলের কল্যাণের কাজে রত থাকিব। ন্যায়, সত্য, প্রেম ও মনুষ্যত্বের জয়স্তম্ভ রচনা করিয়া তাহাই রাষ্ট্রকে উপহার দিব।

স্বাধীন ভারতের জয় হউক।

মাঘী পূর্ণিমা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

এল কি জ্যোৎস্না, এল—পূর্ণিমা-প্লাবন এল ?
বহু দিবসের বুদ্ধির বাঁধ ভাসিয়া গেল।
সন্দেহভরা কোথা গেল সব সতর্কতা,
বিচার-আচার, বিবেচনা আর যুক্তি, প্রথা।
সব ভেসে যায়, কিছুই থাকে না চন্দ্রালোকে,
তুমি আছ চাঁদ, আমি আছি, নাই কেউ ত্রিলোকে।

নিঃশব্দের সঙ্গীত চলে ঊর্দ্ধাকাশে,
জীবনে বন্ধু, মাঘী পূর্ণিমা কবার আসে ?
দিনের দুঃখ, দ্বিধা ও বেদনা বিদায় হোলো
ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবো না, হৃদয় খোলো,
রেখো না রেখো না অন্তরে কথা সঙ্গোপনে,
স্মৃতি-বিস্মৃতি কোন আবরণ রেখো না মনে।

পদে পদে শুধু সংশয় আর শঙ্কা-ভয়,
কি হ'ত জীবনে যদি না আসিত এ বিস্ময়!
চলে কি চলে না—সময়ের গতি পাই না টের,
ভুলে যাই সব, ভুলে গেছি কথা প্রত্যহের।
ঘুমে-অচেতন সকল প্রহরী, দুয়ার খোলা,
চাঁদের আলোয় তাইতো হৃদয়ে লেগেছে দোলা।

মরীচিকা পিছে ছুটিতে ছুটিতে দিবস গেল,
তুমি এলে চাঁদ, তাইতো জীবনে জ্যোৎস্না এল।
দিনের আলোয় হারিয়েছে যাহা, যা কিছু নাই,
রাতের জগতে, চাঁদের জগতে ফিরিয়া পাই।
ভুবন ভরিয়া রহস্যময় কি হাসি ফোটে,
হৃদয়-সাগর তাইতো এমন উথলি ওঠে।

আমি যে পেয়েছি মুক্ত চাঁদের মধুর স্নেহ,
জ্যোৎস্নায় স্নান ক'রে পবিত্র হ'ল এ দেহ,
অপরূপ রূপে উদ্ভাসিত যে দিগ্বিদিক,
অমর জীবন, কিছু নয় আজ অলৌকিক।
সুন্দর হ'ল, অম্লান হ'ল তনু ও মন,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে মিলন চলেছে অনুক্ষণ।

প্রভাত আসিলে পূর্ণিমা-রাতি চলিয়া যাবে,
তখন খুঁজিলে চাঁদকে তোমায় কোথায় পাবে ?
যতটুকু পার সুধাসঞ্চয় করিয়া লও,
চন্দ্রকিরণে জীবনপাত্র ভরিয়া লও।
আজি পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা, নয়ন মেল,
জ্যোৎস্না-প্লাবনে বিশ্বভুবন ভাসিয়া গেল।

পুণ্যতীর্থ হরিদ্বার

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পরে হরিদ্বারে আবার পূর্ণকুম্ভ মেলা হইতেছে। এই উপলক্ষে ভারতের সকল প্রদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ নরনারী ও সাধু-সন্ন্যাসী উক্ত পুণ্যতীর্থে সমবেত। ফাল্গুন হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত তিন মাস এই মেলা থাকিবে। পঞ্জাবী বাস্তুহারাদের আগমনে হরিদ্বারের লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হইয়াছে। কুম্ভরাশিতে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে প্রায় বার-চৌদ্দ লক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু তথায় সমাগত। এই তিন চারি মাসের জন্য হরিদ্বার বিপুল জনাকীর্ণ স্থানে পরিণত। জনৈক পাশ্চাত্ত্য পর্য্যটক গতবারে হরিদ্বারের কুম্ভমেলা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম ধর্ম্মমেলা।'

উদ্যান-বেষ্টিত মন্দির। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল

শাস্ত্রে আছে—'অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকা।' অর্থাৎ—অযোধ্যা মথুরা, মায়াপুরী, কাশী, কাঞ্চী, উজ্জয়িনী ও দ্বারকা এই সাতটি মোক্ষতীর্থ। মুক্তিতীর্থ মায়াপুরীর অন্য নাম হরিদ্বার। হরিদ্বারকে হরদ্বার বা গঙ্গাদ্বারও বলা হয়। হিমালয়স্থ কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ তীর্থের পথে ইহা দ্বারস্বরূপ। কেদারনাথ শিবতীর্থ এবং বদ্রীনারায়ণ বিষ্ণুতীর্থ। সেইজন্য শাস্ত্রোক্ত মুক্তিতীর্থ মায়াপুরীকে শৈবগণ হরদ্বার ও বৈষ্ণবগণ হরিদ্বার বলিয়া থাকেন। হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে মায়াদেবীর প্রসিদ্ধ প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। মন্দিরে ত্রিমুণ্ডকবিশিষ্টা চতুর্ভুজা মায়াদেবী এবং তাঁহার সম্মুখে অষ্টবাহু সর্ব্বনাথ শিবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মায়াপুরীর নামকরণ সম্বন্ধে পুরাণে এই বিবরণ পাওয়া যায়:—একদা প্রজাপতি দক্ষ একটি বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। স্বীয় জামাতা মহাদেবের সহিত মনোমালিন্য হেতু দক্ষরাজ তাঁহাকে যজ্ঞোৎসবে নিমন্ত্রণ করেন নাই। অন্যান্য দেবগণ ও মুনিঋষিদের দক্ষযজ্ঞে যাইতে দেখিয়া সতীদেবী শিবানুচরগণ সহ তথায় বিনা নিমন্ত্রণেই উপস্থিত হইলেন। দক্ষকন্যা যজ্ঞস্থলে অন্যান্য দেবগণের এবং পিতার অন্যান্য জামাতৃগণের যজ্ঞভাগ নির্দ্দিষ্ট দেখিলেন। কিন্তু স্বীয় পতির জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা না দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া পিতা দক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাভাগ পিতৃদেব! এই যজ্ঞোৎসবে সকল দেবতা আপনার আমন্ত্রণে উপস্থিত এবং তাঁহাদের প্রাপ্য যজ্ঞাংশ নির্দ্ধারিত। কিন্তু আমার পতির জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নাই কেন?" কন্যার প্রশ্নে দক্ষরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া দিগম্বর জামাতার নিন্দা করিলেন। পিতার মুখে পতিনিন্দা শ্রবণে পতিপ্রাণা সতী যজ্ঞস্থলে অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সতীর দেহত্যাগে ক্রুদ্ধ হইয়া বীরভদ্রাদি শিবানুচরগণ যজ্ঞ ধ্বংসের আয়োজনে মাতিয়া উঠিলেন এবং দক্ষের মুণ্ড ছিন্ন করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। এই প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে সমবেত দেবগণ একাগ্রচিত্তে আশুতোষ মহাদেবকে স্মরণ করিলেন। কৈলাসপতি দেবগণের প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া যজ্ঞস্থলে আগমনপূর্ব্বক দক্ষের ধড়ের উপর ছাগমুণ্ড স্থাপন করিয়া তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। জামাতার কৃপায় পুনরায় বাঁচিয়া উঠিয়া দক্ষ স্তবাদি দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। তখন মহাদেব বলিলেন, "এই যজ্ঞভূমি পুণ্যক্ষেত্র। এই মহাক্ষেত্রের নাম আজ হইতে মায়াপুর হইবে। ইহা তীর্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। এই তীর্থের স্মরণমাত্র সর্ব্বপাপ মোচন হইবে। যাঁহারা এই তীর্থে বাস করিবেন তাঁহারা ধন্য। দক্ষেশ্বর শিবরূপে আমি এই তীর্থে বিরাজ করিব। দক্ষেশ্বরকে দর্শনমাত্র অষ্ট সিদ্ধি লাভ হইবে।" দক্ষের যজ্ঞস্থল হইতে বার যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমি মায়াপুরীর অন্তর্গত। কনখল, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থান মায়াপুরীর অন্তর্ভুক্ত।

কনখলে দক্ষেশ্বর শিবমন্দির অবস্থিত। কনখল আদি-গঙ্গার তীরবর্ত্তী। এখানে গঙ্গা ত্রিধারায় বিভক্ত। দক্ষেশ্বর মন্দিরের অনতিদূরে সতীকুণ্ড, রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম, [illegible] দক্ষিণ দিকে মায়াপুর নামক স্থানে [illegible]

প্রভৃতি আশ্রম অবস্থিত। এই স্থানের নাম কনখল কেন হইল সে সম্বন্ধে শাস্ত্রে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটি আছে। একদা দক্ষালয়ে কতিপয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ যখন ধর্ম্মালোচনায় রত ছিলেন তখন ধর্ম্মকেতু নামক এক নাস্তিক খল ব্রাহ্মণ এই সকল ব্রাহ্মণের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ মানসে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণে তাহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইল। অনুতপ্তচিত্তে সে ব্রাহ্মণগণের নিকট স্বীয় মুক্তির উপায় জানিতে চাহিল। ব্রাহ্মণগণ তাহাকে দক্ষেশ্বর শিবমন্ত্র জপ করিতে এবং গঙ্গাস্নান করিতে উপদেশ দিলেন। এই নির্দ্দেশ পালন করিয়া খল ব্রাহ্মণ পরিত্রাণলাভ করিল। 'কো ন খলঃ তরতি' অর্থাৎ এমন খল কে আছে যে এই তীর্থে পরিত্রাণ লাভ না করিবে? স্থানমাহাত্ম্যে এখানে কেহ খল নাই উক্ত অর্থে মুনিগণ এই স্থানের নাম রাখিলেন কনখল।

হরিদ্বার হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ইহা যুক্তপ্রদেশের সাহারাণপুর জেলার একটি অতি প্রাচীন স্থান। কলিকাতা হইতে রেলপথে ইহার দূরত্ব ৯২২ মাইল। দিল্লী হইতে এখানে আসিবার সুন্দর রেলপথ আছে। হরিদ্বার ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের একটি ষ্টেশন—শৈবালিক নামক উন্নত শৈল-শ্রেণীর পাদমূলে এবং গঙ্গার দক্ষিণ-উপকূলে অবস্থিত। এখানে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আপিস, থানা, হাসপাতাল, প্রায় ত্রিশটি ধর্ম্মশালা, বাজার, হাই স্কুল, সংস্কৃত পাঠশালা আছে এবং একটি কলেজও সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে, কপিল মুনি এখানে আশ্রম স্থাপনপূর্ব্বক সাংখ্যদর্শন রচনা করিয়াছিলেন। সেইজন্য হরিদ্বারের আর একটি নাম কপিল-স্থান। হরিদ্বার উত্তরাখণ্ডের অন্তর্গত। রায় বাহাদুর পতিরাম তাঁহার *History of Garhwal* নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, ছয়টি প্রধান হিন্দুদর্শনের প্রায় পাঁচটি উত্তরাখণ্ডে প্রণীত। সূর্য্যবংশীয় রাজা ভগীরথ সগরের ষাট হাজার পুত্রের উদ্ধারার্থ পতিতপাবনী গঙ্গাকে মর্ত্যলোকে এই তীর্থে আনয়ন করেন। এইজন্য হরিদ্বারের একটি নাম গঙ্গাদ্বার। গঙ্গোত্রী হইতে উদ্ভূত গঙ্গা হিমালয়ের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া এখানে সমতলভূমিতে অবতীর্ণা। হরিদ্বারের প্রধান তীর্থ ব্রহ্মকুণ্ড। কুম্ভযোগের সময় এখানে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী স্নান করিয়া পবিত্র হন। ব্রহ্মকুণ্ডে যে সুবিস্তৃত স্নানঘাট ও সুন্দর প্লাটফর্ম্ম আছে তাহা ১৮৯৩ সনে পঁচাশি হাজার টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত। প্লাটফর্ম্মে দানবীর বিড়লা একটি সু-উচ্চ ক্লক-টাওয়ার তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। ভগীরথের গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনয়ন কালে ইলাবৃত্ত-খণ্ডের রাজা শ্বেত এই স্থানে বহু বৎসর তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা যখন বর দিতে চাহিলেন তখন রাজা শ্বেত করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন, 'এখানে আমার আশ্রমে যতটুকু স্থান আছে ততটুকু আপনার নামে প্রসিদ্ধিলাভ এবং এখানে আপনি স্বয়ং গঙ্গা বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে সর্ব্বদা বিরাজমান থাকুন—ইহাই আমার প্রার্থনীয়।' ব্রহ্মা রাজার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'তথাস্তু'। এখন হইতে পৃথিবীতে এই স্থান ব্রহ্মকুণ্ড নামে পরিচিত হইল। যে কেহ এখানে স্নান-দানাদি করিবে তাহার অক্ষয় পুণ্যলাভ হইবে। কাহারও কাহারও মতে এখানে প্রজাপতি ব্রহ্মার যজ্ঞে বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে প্রবিষ্টা হন। ব্রহ্মা স্বীয় কমণ্ডলু হইতে যেস্থানে গঙ্গাধারাকে মুক্তি দেন তাহাই ব্রহ্মকুণ্ড নামে অভিহিত।

ব্রহ্মকুণ্ডের পার্শ্বে প্রস্তরচিহ্নিত স্থানকে 'হর কী পৈড়ী' বলে। শৈবগণ ইহাকে হরপাদপদ্ম এবং বৈষ্ণবগণ হরি-পাদপদ্ম জ্ঞান করেন। তীর্থযাত্রীগণ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানান্তে এই পাদপদ্ম দর্শন করেন। গঙ্গার পুণ্যধারাকে এমনই ভাবে এই ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করানো হইয়াছে। ঘাটটি গঙ্গা-বক্ষে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের মত। দুইটি পুল দিয়া তীর হইতে ঘাটে যাইতে হয়। সন্ধ্যায় শত শত যাত্রী তথায় বসিয়া গঙ্গাপূজা করেন। ব্রহ্মকুণ্ডের সান্ধ্য দৃশ্য অতি মনোরম। যাত্রীগণ প্রজ্বলিত দীপমালাকে শালপাতার ঠোঙায় বসাইয়া ফুলের মালায় সাজাইয়া গঙ্গাবক্ষে ভাসাইয়া দেন। ভাসমান শত শত প্রদীপ তরঙ্গের তালে তালে নাচিতে নাচিতে স্রোতের টানে যখন চলিতে থাকে তখনকার দৃশ্যটি অপূর্ব্ব। ব্রহ্মকুণ্ডের পাশে গঙ্গাতীরে মন্দিরে মন্দিরে যখন সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে তখন ঘাটে দাঁড়াইয়া শত শত যাত্রী গঙ্গাদেবীর আরাত্রিক করেন।

এই বৎসর অমৃত কুম্ভযোগের সময় হরিদ্বারে তিনটি প্রধান তীর্থস্নান হইবে—৩রা ফাল্গুন শিবরাত্রি, ৪ঠা চৈত্র অমাবস্যা এবং ৩০শে চৈত্র মহাবিষুব সংক্রান্তি দিবসে। কুম্ভযোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিষ্ণুযাগ, ধর্ম্মশাসন প্রভৃতি গ্রন্থে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। মন্দার পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড আর বাসুকি নাগকে মন্থনরজ্জুতে পরিণত করা হয় এবং বিষ্ণু কূর্ম্মরূপ ধারণ করেন। অতঃপর হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত ক্ষীরোদ সাগর মন্থনার্থ দেবাসুরগণ মিলিত হন। সমুদ্র-মন্থনের ফলে গরল উত্থিত হইবামাত্র দেবতা এবং অসুর সকলেই মূর্চ্ছা গেলেন। তখন বিশ্বের কল্যাণার্থ মহাদেব উক্ত কালকূট পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইলেন। পুনরায় সমুদ্রমন্থনের ফলে অমৃতপূর্ণ কুম্ভসহ ধন্বন্তরী সমুত্থিত হইয়া কুম্ভটি ইন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত দেবতা-দিগের নির্দ্দেশে অমৃতপূর্ণ কুম্ভ লইয়া স্বর্গে উপস্থিত হইলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের আদেশে অসুরগণ বলপূর্ব্বক অমৃতকুম্ভ অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে দেবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দেবাসুরের এই তুমুল সংগ্রাম একাদিক্রমে দ্বাদশ দিবস চলিল। এই যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হইলেন। যুদ্ধকালে তাঁহারা পৃথিবীর যে চারিটি তীর্থে অমৃতকুম্ভ লুকাইয়া রাখেন সেই

সাধারণ হাসপাতাল। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল

রাশিতে এবং সূর্য্যের মেষরাশিতে অবস্থানকালে হরিদ্বারে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে। অন্যান্য শাস্ত্রেও কুম্ভস্নানের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। একস্থানে আছে, 'গঙ্গায়াঃ স্নানমাহাত্ম্যং নালং বক্তুং চতুর্ম্মুখঃ। হরিদ্বারে কুম্ভং স্নানং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জনম্॥' অর্থাৎ হরিদ্বারে কুম্ভযোগে গঙ্গাস্নানের পুণ্যফল বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এই স্নানের ফলে মুক্তিলাভ হয় এবং পুনর্জন্ম হয় না।

কুম্ভমেলা কত প্রাচীন সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের অনুকরণে হিন্দু ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য আচার্য্য শঙ্কর কর্তৃক কুম্ভমেলা প্রবর্ত্তিত হয়। শঙ্করের পূর্ব্বে কুম্ভমেলা হইত কিনা, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কুম্ভমেলায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম হইলেও ইহাতে শঙ্করের অনুগামী দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। ইহাতে মনে হয়, আচার্য্য শঙ্কর এবং তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণের চেষ্টায় ইহা হিন্দু ভারতের বৃহত্তম ধর্ম্মমেলায় পরিণত হইয়াছে। দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় ব্যতীত বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, কুলাচারী, অবধূত, আলেখিয়া, পঞ্চধুনী, লিঙ্গায়েৎ, অঘোরপন্থী প্রভৃতি বহু ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সাধুগণ এখানে উপস্থিত হন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক-একটি আড্ডা দেখা যায় এবং তথায় ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর সম্মুখে শাস্ত্রপাঠ, ভজন, আলোচনাদি চলিতে থাকে। তিন মাসব্যাপী কুম্ভ-মেলার সময় হরিদ্বার স্বর্গধামে পরিণত হয়। তখন এই পুণ্যতীর্থে যে দিব্যভাবের স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি আর জীবনে ভুলিতে পারিবেন না। হিন্দুজাতির প্রাণশক্তির অনন্ত উৎস কোথায় তাহা কুম্ভমেলা দেখিলে বুঝা যায়।

কুম্ভস্নানে সময় সময় বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেজন্য সরকারকে শান্তিরক্ষার্থ পুলিসের ব্যবস্থা করিতে হয়। গতবার হরিদ্বারে কুম্ভমেলার সময় আসন ও স্থানের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া উৎকলের বিখ্যাত জগন্নাথ বাবাজীর দলের সহিত অন্যান্য কয়েকটি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিরোধ উপস্থিত হয়। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিরোধ আগেকার দিনেও কুম্ভমেলায় ঘটিত। এশিয়াটিক রিসার্চ গ্রন্থে (৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩১৭ পৃষ্ঠা) উল্লিখিত আছে যে, দাবিস্তান নামক

সেই স্থানে কিছু কিছু অমৃত পড়িয়া যায়। তদবধি কুম্ভযোগ উক্ত চারিটি তীর্থে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ভগবান মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কুম্ভস্থ সুধা দেবগণের মধ্যে বিতরণ করেন। অসুরগণ যুদ্ধে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও সুধালাভে বঞ্চিত হয়। দেবলোকের দ্বাদশ দিবস মর্ত্ত্যলোকের দ্বাদশ বৎসরের সমান। তাই দ্বাদশ বর্ষ অন্তে এক একবার গঙ্গাতীরে হরিদ্বার, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগ, উজ্জয়িনী এবং গোদাবরীতটস্থ নিসাকে কুম্ভস্নান ও তদুপলক্ষে মেলা হয়।

দেবাসুর সংগ্রামের সময় দেবগণের মধ্যে বৃহস্পতি, সূর্য্য, চন্দ্র ও শনি কুম্ভরক্ষা করিয়াছিলেন। এইজন্য উক্ত দেবচতুষ্টয় বিভিন্ন রাশিতে অবস্থান করিলে বিভিন্ন স্থানে কুম্ভযোগ হয়। স্কন্দপুরাণে আছে, 'কর্কেগুরুস্তথাভানুচন্দ্রক্ষয়স্তথা যদা গোদা-বর্য্যাং তদা কুম্ভং জায়তে অবনীমণ্ডলে॥' অর্থাৎ কর্কটরাশিতে বৃহস্পতি, চন্দ্র ও সূর্য্যের একত্র অবস্থানকালে অমাবস্যা-যোগ ঘটিলে গোদাবরীতটে নাসিকে কুম্ভমেলা হয়। উক্ত পুরাণে আছে, 'ঘটে সুরি শশি সূর্য্যঃ দামোদরে স্থিতা যদা। ধারায়াং চ তদা কুম্ভ জায়তে খলু মুক্তিদঃ॥' অর্থাৎ তুলা রাশিতে বৃহস্পতি, সূর্য্য ও চন্দ্র যখন অবস্থান করেন তখন অমাবস্যা তিথি হইলে ধারাতে (উজ্জয়িনীতে) কুম্ভযোগ হইয়া থাকে। এই পুরাণেই আছে, 'মেষরাশি গতে জীবে মকরে চন্দ্র ভাস্করৌ। অমাবস্যা তদা যোগঃ কুম্ভাখ্যস্তীর্থনায়কে॥' অর্থাৎ বৃহস্পতি মেষরাশিতে এবং সূর্য্য ও চন্দ্র মকররাশিতে থাকিলে তীর্থরাজ প্রয়াগে কুম্ভযোগ হয়। উক্ত পুরাণে আরও আছে, 'পদ্মিনীনায়কে মেষে কুম্ভরাশি গতে গুরৌ। গঙ্গাদ্বারে ভবেৎ যোগ কুম্ভনাম্না তদোত্তমম্॥' অর্থাৎ বৃহস্পতির কুম্ভ-

পারসীক পুস্তকে দেখা যায়, ১৭১৭ শকে হরিদ্বার কুম্ভে শিখ-সম্প্রদায় দুই দল সাধুকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিতাড়িত করেন। এশিয়াটিক রিসার্চেস গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ৪৫৫ পৃষ্ঠা) আরও উল্লিখিত আছে, ১৭২৯।৩০ শকে হরিদ্বারে ধর্মোন্মত্ত শৈব সন্ন্যাসীগণ আঠার হাজার বৈরাগীকে হত্যা করেন। ১৭৬০ সনে গোস্বামী ও বৈরাগীদের দাঙ্গায় প্রায় দুই হাজার লোক নিহত হইয়াছিল। ১৭৯৫ সনে শিখ-তীর্থযাত্রীগণ পাঁচ শত গোস্বামীকে হত্যা করেন। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অধিনায়কদের সম্মিলিত চেষ্টায় এই প্রকার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড এখন বন্ধ হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের কয়েকজন হিন্দু রাজা এবং মণ্ডলেশ্বর মিলিত হইয়া এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের এক একটি এক এক স্থানের কুম্ভমেলায় অগ্রে স্নান করিবেন এবং তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্নান হইবে।

ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে চণ্ডী পাহাড়। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় দুই হাজার ফুট উচ্চ। উহার একটি চূড়ায় চণ্ডীদেবীর একটি প্রাচীন মন্দির ও অন্য চূড়ায় হনুমানের মাতা অঞ্জনা-দেবীর মন্দির বিদ্যমান। নীলধারা অতিক্রম করিয়া চণ্ডীপাহাড় যাইতে হয়। চণ্ডীপাহাড় হইতে হরিদ্বারের দৃশ্য অতি সুন্দর। ব্রহ্মকুণ্ডের পশ্চিমে মনসা পাহাড়। উহার শিখরে মনসাদেবীর মন্দির অবস্থিত। মনসা পাহাড় হইতে ব্রহ্মকুণ্ডের দৃশ্য অতীব মনোহর। মনসাপাহাড় কাটিয়া দুইটি রেলওয়ে সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত। এখান হইতে চারি শত মাইল খাল খনন করিয়া সরকার যুক্ত-প্রদেশে কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্ম-কুণ্ড ও নীলধারার নিকটে উচ্চ বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া গঙ্গাস্রোতকে খালের মধ্যে আনা হইয়াছে। ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণে অল্প দূরে কুশাবর্ত্ত তীর্থ অবস্থিত। লোকের বিশ্বাস—এখানে গঙ্গাস্নান ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি করিলে মুক্তিলাভ হয়। প্রবাদ আছে যে, দত্তাত্রেয় ঋষি এই তীর্থে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করেন। তিনি যখন গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তখন গঙ্গা আসিয়া তাঁহার কোশাকুশি ও কুশাদি ভাসাইয়া লইয়া যান। কিন্তু কুশগুলি আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরপাক খাইতেছিল। ঋষি দত্তাত্রেয় ধ্যান-ভঙ্গের পর স্বীয় কুশাদি গঙ্গাস্রোতে আবর্ত্তিত হইতেছে দেখিয়া ক্রোধে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার নিকট আসিয়া স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। দেবতা-গণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ঋষি বলিলেন, এই তীর্থ কুশাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ হউক। আপনারা সকলে এখানে অবস্থান করুন। যাঁহারা এখানে গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিবেন তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হইবে না।

হরিদ্বারের অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। ইহা কনখল ক্যানেলের তীরে অবস্থিত। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ উক্ত সেবাশ্রম এই পুণ্যতীর্থের শত শত সাধু-সন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রীর সুখস্ব[illegible] বিধান এবং সেবাশুশ্রূষা করিয়া আসিতেছে। সেবাশ্রমে পঞ্চাশটি বেডযু[illegible]াসপাতাল, বৃহৎ ডিসপেন্সারী, অতিথিশালা, যক্ষ্মারোগীর ওয়ার্ড, মন্দির ও লাইব্রেরি প্রভৃতি আছে। এই বৎসর কুম্ভমেলা উপলক্ষ্যে আরও পঞ্চাশটি অস্থায়ী বেড বাড়ানো হইয়াছে। সেবাশ্রমে তাঁবু ফেলিয়া এবং খড়ের 'কুঠিয়া' করিয়া প্রায় এক সহস্র সাধু ও গৃহী তীর্থযাত্রী [illegible] বাস করিয়াছিলেন। হরিদ্বারের তিনটি স্থানে তিনটি চিকিৎসাকেন্দ্র খুলিয়া সেবাশ্রমের সেবকগণ শত শত পীড়িত তীর্থযাত্রীকে ঔষধ-পথ্যাদি দিয়াছেন। তাঁহাদের ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়টি তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরিয়া রুগ্ন-নারায়ণের সেবাশুশ্রূষা করিয়াছে। উক্ত সেবাশ্রম স্বামী [illegible] সেবাধর্ম্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত, তৎশিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ কর্ত্তৃক ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বামী কল্যাণানন্দ যখন হরিদ্বারে পর্ণকুটীর বাঁধিয়া সেবা-কার্য্য আরম্ভ করেন তখন স্থানীয় সাধুসম্প্রদায় তাঁহাকে আমল দেন নাই। ভাঙ্গী মেথরদের সেবাকার্য্য করিতেন বলিয়া তাঁহাকে অন্নসত্রেও ভিক্ষা দিত না। তিনি এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া গুরুর আশীর্ব্বাদে অবিচলিত চিত্তে গুরুভ্রাতা স্বামী নিশ্চয়ানন্দের সহযোগিতায় প্রায় ছত্রিশ বৎসর কাল একনিষ্ঠভাবে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই সেবাশ্রম আজ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতার কোন বদান্য ব্যক্তির অর্থসাহায্যে তিনি ১৯০৩ সনের এপ্রিল মাসে প্রায় পনর বিঘা জমি ক্রয় করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার সেবাকার্য্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পূর্ব্বাশ্রমে স্বামী কল্যাণানন্দের নাম ছিল দক্ষিণারঞ্জন গুহ। পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল জেলার অন্তর্বর্ত্তী বানরীপাড়া গ্রামে দক্ষিণারঞ্জন ১৮৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণারঞ্জন যখন হাই স্কুলের ছাত্র তখন হইতে আর্ত্তের সেবায় বিমল আনন্দলাভ করিতেন। তিনি চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৮৯৮ সনে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৮৯৯ সালের প্রথমার্দ্ধে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক স্বামী কল্যাণানন্দ নাম গ্রহণ করেন। স্বামী কল্যাণানন্দজীর গুরু-ভক্তি ছিল অসাধারণ। ১৯০১ সনে তাঁহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দ যখন বেলুড় মঠে বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতে-ছিলেন তখন তিনি কলিকাতা হইতে কিছু বরফ আনিবার জন্য আদিষ্ট হন। তখন কলিকাতা ও বেলুড়ের মধ্যে 'বাস' বা ষ্টীমার চলিত না। গুরুভক্ত কল্যাণানন্দ অবিলম্বে কলিকাতা গিয়া প্রায় আধ মণ বরফ লইয়া মঠে আসেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া গুরু শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, 'ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যখন কল্যাণানন্দ সেবার দ্বারাই পরমমঙ্গল লাভ করিবে।'

স্বামী কল্যাণানন্দ ১৯১২ সনে কলিকাতা হইতে দুর্গাপ্রতিমা আনাইয়া কনখল সেবাশ্রমে দুর্গাপূজা করেন। তখন হইতে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা ও কালী-পূজাদি নিয়মিত ভাবে উক্ত সেবাশ্রমে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। সেবাশ্রমের গ্রন্থাগারে ৩৭৭১ খানি গ্রন্থ আছে। উক্ত সেবাশ্রম এই পুণ্যতীর্থে বাঙালীর এক শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। হরিদ্বারে লালতারাবাগে ভোলাগিরির আশ্রমটিও বাঙালী সন্ন্যাসী-দের বলিলে সত্যের অপলাপ হয় না। উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরিও বাঙালী এবং উত্তর-ভারতের সাধু-সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। কনখলের অনতিদূরে গুরুকুলের কলেজ, বৃহৎ লাইব্রেরি, গোশালা এবং বিড়লা-প্রতিষ্ঠিত উপাসনালয় দর্শনীয়। কনখলে ক্যানেলের অপর পার্শ্বে ঋষিকুল বিদ্যালয়। ইহা সনাতনী হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান। ছাত্রগণকে এখানে গুরুর সান্নিধ্যে রাখিয়া প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রাদি ও আধুনিক বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। গুরুকুলের নিকটবর্তী গুরুমণ্ডলে 'হরিবংশ' গ্রন্থের একখানি পুরাতন পাণ্ডুলিপি আছে।

সংক্রামক রোগের হাসপাতাল। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল

হরিদ্বারে বিল্বকেশ্বর, নীলতীর্থ প্রভৃতি আরও বহু দ্রষ্টব্য স্থান আছে। চণ্ডী পাহাড়ের প্রাচীন নাম নীলগিরি বা নীল পর্ব্বত। নীল পর্ব্বতে ভগবতী চণ্ডী তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া উহার একাংশকে চণ্ডী পাহাড় বলে। নীল পর্ব্বতের পাদদেশে প্রবাহিতা গঙ্গাকে নীলধারা বলা হয়। কথিত আছে, কোন ব্রাহ্মণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব তাঁহাকে নীল নামক গণরাজ হইবার বর দেন এবং স্বয়ং নীলেশ্বর নামে তথায় বিরাজ করেন। চণ্ডী মন্দির হইতে এক ক্রোশ উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে নীলেশ্বর মন্দির এবং নীলগিরির সানুদেশে গঙ্গাতীরে নীলকুণ্ড অবস্থিত। শাস্ত্রে বলে, নীলকুণ্ডে স্নান করিলে স্নানার্থী পাপমুক্ত ও শিবময় হইয়া যান। হরিদ্বার হইতে কনখল যাইবার পথে লালতারা নামক যে পুল আছে সেই পুল পার হইয়া রেলপথ অতিক্রম করিলে পাহাড়ের নীচে একটি মনোরম স্থানে বিল্ব-কেশ্বর মন্দির দেখা যায়। উহার অনতিদূরে পাহাড়ের একটি গুহায় একটি দেবীমূর্ত্তি। উভয় মন্দিরের মাঝখান দিয়া প্রবাহিতা পাহাড়ী নদীর নাম শিবধারা। একমাত্র বর্ষাকালেই শিবধারা জলপূর্ণ থাকে। যাত্রীগণ হরিদ্বারে রামতীর্থ, লক্ষ্মণ-তীর্থ প্রভৃতি আরও অনেক তীর্থ দর্শন করেন।

হরিদ্বার সাধুসন্ন্যাসীদের স্থান। শত শত ব্রহ্মচারী সাধু-সন্ন্যাসী এখানে বাস করেন। তাঁহাদের জন্য প্রায় শতাধিক মঠ, আশ্রম, আখড়াদি আছে। হরিদ্বারে নিরঞ্জনী আখড়া, যুনা আখড়া ও আনন্দ আখড়া, ভীমগড়ায় দশনামী আখড়া, কমলদাসের কুটিয়া ও কৈলাস আশ্রম এবং কনখলে নির্ব্বাণী আখড়া, ঘণ্টা কুটিয়া, সুরথগিরির বাংলো, অটল আখড়া, হরি ভারতীর মঠ, রামনিবাস, হরিহর আশ্রম, চেতনদেবের কুটিয়া, মুনিমণ্ডল, বিরক্ত কুটিয়া প্রভৃতি বহু আশ্রমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণ থাকেন। কুম্ভমেলার সময় নানা সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসীগণ বিশেষ ভাবে ধর্ম্ম প্রচার এবং সেবাকার্য্য করেন। তখন বিরাট প্রদর্শনীও খোলা হয়। কাশী, নাসিক প্রভৃতির ন্যায় হরিদ্বারেও শতাধিক সংস্কৃত পাঠশালা আছে। সেগুলিতে সহস্র সহস্র বিদ্যার্থীকে পণ্ডিত-গণ ন্যায়, বেদান্ত, ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পড়াইয়া থাকেন। হিন্দু-স্থানের তীর্থগুলি হিন্দু ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এই তীর্থস্থানগুলির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য আমরা যতই মনো-যোগী হইব ততই হিন্দু সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক আদর্শ ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হইয়া আমাদের সমাজ-জীবনকে পুষ্ট করিবে।

পল্লী অঞ্চলের জনচিকিৎসা

শ্রীমিহিরকুমার দাস

পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করার প্রশ্নটি ভারতের সম্মুখে এক বিরাট সমস্যা। আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারগণও সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে রচিত কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া এক্ষেত্রে এখনও কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই। প্রায় পাঁচ বৎসর আগে স্যার জোসেফ ভোরের সভাপতিত্বে গঠিত "হেলথ সার্ভে এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কমিটি" ভারতের চিকিৎসা-সমস্যা সমাধানকল্পে এক হাজার কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ একটি দশবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন। তখন স্থির হইয়াছিল, যুদ্ধোত্তর কালে ভারত-সরকার ঐ পরিকল্পনাকে রূপ দিবার চেষ্টা করিবেন। ভোর কমিটির বিবরণীতে দেশীয় চিকিৎসার প্রতি অনুকূল মনোভাব প্রদর্শিত হয় নাই বলিয়া সে সময় ইহার বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল। যে বিলাতী চিকিৎসা-পদ্ধতি বিদেশীয় সরকারের সমর্থনে এদেশে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, ভোর কমিটির পরিকল্পনায় তাহা আরও ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল মাত্র। ইতিমধ্যে স্বাধীন ভারতের নিশ্চিত জন্ম-সম্ভাবনা লইয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের প্রতিষ্ঠা হইল। সুতরাং নূতন পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সমস্যাগুলির আবার নূতন ভাবে বিচার করিবার সময় উপস্থিত হয়। জনসাধারণের ন্যায় আমাদের নেতৃবৃন্দও অনুভব করিতেছিলেন যে, শত শত বৎসরের অবহেলিত দেশীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিকে ইহার প্রাপ্য মর্য্যাদা ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এলোপ্যাথি চিকিৎসার পাশাপাশি এদেশীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিকে বিকাশলাভের পূর্ণ সুযোগ দিতে হইলে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহা যোগান বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের সাধ্যাতীত। অতএব ভোর কমিটির পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হয় এবং এদেশীয় চিকিৎসা-পদ্ধতির সহিত পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করিবার কোন উপায় আছে কি না, তাহা বাহির করিবার জন্য ১৯৪৬ সনের ডিসেম্বর মাসে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের নির্দ্দেশে কর্ণেল চোপরার সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। গত ফেব্রুয়ারী মাসে চোপরা কমিটির বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটি ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-ব্যবস্থার সমন্বয়পূর্ব্বক একটি নূতন চিকিৎসা-প্রণালী প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করিয়াছেন।

ভারতের জনসাধারণের চিকিৎসা-সমস্যা সমাধানে "ভোর কমিটি"র পরিকল্পনাই গৃহীত হউক, আর চোপরা কমিটির পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হউক—তাহার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ আসিবে কোথা হইতে? অর্থাভাবের জন্য আমাদের জাতীয় সরকার যথাসম্ভব ব্যয়-সঙ্কোচের নীতিই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং কেন্দ্রীয় কিংবা বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের উন্নয়ন-পরিকল্পনাগুলি যে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবে এইরূপ ভরসা হয় না। এমতাবস্থায় বহুব্যয়সাধ্য মন্থরগতি সরকারী পরিকল্পনার পরিপূরক হিসাবে স্বল্পব্যয়সাধ্য আয়ুর্ব্বেদীয় গৃহ-চিকিৎসার বিধিব্যবস্থাগুলিকে জনসমাজে, বিশেষ করিয়া পল্লী অঞ্চলে প্রবর্ত্তন করার প্রস্তাব সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

সাধারণ রোগ চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদীয় গৃহ-চিকিৎসার স্থান

চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয় বলিয়াই লোকসমাজে চিকিৎসক নামক বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তবে মানুষ এক অর্থে স্বভাব চিকিৎসক অর্থাৎ রোগ জটিল না হইলে, সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে মানুষ তাহার দেহস্থ কতকগুলি রোগের প্রকৃতি মোটামুটি বুঝিতে পারে এবং ঔষধের প্রয়োগবিধি জানা থাকিলে ঐরূপ অবস্থায় নিজের চিকিৎসা নিজেই করিতে পারে। মানুষকে চিকিৎসা সম্বন্ধে যথাসম্ভব স্বাবলম্বী করার জন্যও বটে এবং সব সময় সকলের পক্ষে দর্শনী দিয়া অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারস্থ হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াও বটে, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী প্রভৃতি সকল চিকিৎসাশাস্ত্রেই গৃহ-চিকিৎসাবিধি গড়িয়া উঠিয়াছে। গৃহ-চিকিৎসাবিধিকে চিকিৎসার সাধারণতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা যায়। এই সাধারণতন্ত্র আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাপদ্ধতিতে যতটা প্রসারিত ও প্রচারিত হইয়াছে, অন্য কোন চিকিৎসাপদ্ধতিতে ততটা হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদীয় গৃহ-চিকিৎসার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, উহার উপকরণ প্রধানতঃ সহজপ্রাপ্য বনৌষধি বা উদ্ভিজ্জ ভেষজ। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই সেদিন পর্য্যন্ত সহজপ্রাপ্য ভেষজের সাহায্যে আমাদের দেশের গৃহস্থ-পরিবারে সাধারণ রোগের চিকিৎসা চলিয়া আসিতেছিল। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ-পরিবারের গৃহিণীরা অনেক রোগের ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ ও পাচনাদির ব্যবহার অবগত ছিলেন এবং ঐ সকল মুষ্টিযোগ ও পাচনাদি অবলম্বনে পরিবারবর্গের অনেক রকম সাধারণ ব্যাধির চিকিৎসা চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়াই করিতে পারিতেন। কালধর্ম্মে আমাদের রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আজকাল পল্লী অঞ্চলের গৃহিণীরাও পারিবারিক চিকিৎসার ব্যবহার্য্য ভেষজসমূহের গুণাগুণের সহিত তেমন

পরিচিত নহেন। পারিবারিক চিকিৎসার প্রযোজ্য ভেষজ-সমূহ হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এদেশের ঘরে ঘরে সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। যদি সহজ উপায়ে রোগ আরোগ্য হয় তবে ঘটা করিয়া চিকিৎসার আড়ম্বর করিব কেন? দেশীয় টোটকা ও পাচনাদির দ্বারা যে রোগ আরোগ্য হইতে পারে, তাহার জন্য অধিক মূল্যের বিদেশীয় ঔষধ সেবনের সার্থকতা কোথায়?

এদিকে আমাদের দেশে যে সকল সরকারী বা আধা সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, সেগুলিতে প্রত্যহ রোগীর ভিড় এত বেশী হয় যে, চিকিৎসকের পক্ষে সমাগত রোগীদিগের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। একবার রোগীর চেহারার দিকে তাকাইয়াই চিকিৎসক রোগ নির্ণয় ও ঔষধ নির্বাচন করিয়া থাকেন—এইরূপ ঘটনা প্রায় প্রত্যেক দাতব্য চিকিৎসালয়ের নিত্যকার ঘটনা। তারপর আবার রোগী-দিগকে প্রায়ই নিজের পয়সায় ঔষধ কিনিয়া খাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। অদূর ভবিষ্যতে এই অবস্থার বিশেষ কিছু পরি-বর্ত্তন হইবে কিনা সন্দেহ। কেননা, আমাদের দেশবাসীর অধিকাংশই দরিদ্র এবং দরিদ্রতানিবন্ধন রোগও বেশী। জন-সমাজে ব্যাপক ভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় গৃহ-চিকিৎসার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইলে, সাধারণ রোগের চিকিৎসা গৃহেই হইতে পারিবে। তখন সাধারণ রোগ-চিকিৎসার জন্য কেহ বড় একটা দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারস্থ হইবে না। ফলে দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসকগণও অপেক্ষাকৃত কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগীদের প্রতি নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হইবেন।

গৃহস্থ-পরিবারের সাধারণ রোগ।

প্রথমেই দেখা যাক, গৃহস্থ-পরিবারের সাধারণ ব্যাধিগুলি কি? জ্বর, সর্দ্দি, কাসি, পেটের অসুখ, পেটফাঁপা, অম্লপিত্ত, কোষ্ঠবদ্ধতা, আমাশয়, রক্তামাশয়, খোসপাঁচড়া, ফোঁড়া, চুলকানি, ঘামাচি, দাদ, ক্রিমি, পেটব্যথা, মাথাঘোরা, মাথা-ব্যথা, অনিদ্রা, মুখের ঘা, দাঁতের মাঢ়ী ফোলা, অর্শের রক্ত-পাত, কানপাকা, চক্ষু উঠা, যকৃৎ বৃদ্ধি, প্লীহা বৃদ্ধি প্রভৃতি গৃহস্থ-পরিবারের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাধি। স্ত্রীরোগের মধ্যে রজঃকষ্ট, অনিয়মিত ঋতুস্রাব ও সূতিকা সাধারণ রোগ। তা ছাড়া শরীরের কোন অংশ থেতলে যাওয়া, মচকে যাওয়া, কোন স্থান কাটিয়া গিয়া রক্তপাত, আগুনে পোড়া, বোলতা বা বিছার কামড়, কুকুর-দংশন প্রভৃতি দ্বারাও গৃহস্থ-পরিবারকে আকস্মিক ভাবে ব্যাকুল হইতে হয়।

গৃহ-চিকিৎসার ব্যবহার্য্য ভেষজ।

উপরি-উক্ত সাধারণ ব্যাধিগুলির প্রতিকারার্থ আয়ুর্ব্বেদানু-মোদিত যে সকল উদ্ভিজ্জ জান্তব এবং পার্থিব বা ধাতব ভেষজ ব্যবহার হয় সেগুলির একটি মোটামুটি তালিকা নিম্নে দিতেছি। তালিকাটি অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, প্রায়শঃ গাঁটের কড়ি খরচ না করিয়া কিংবা কখনও কখনও অতি সামান্য ব্যয়েই গৃহ-চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ভেষজ সংগ্রহ করা যায়। এই ভেষজগুলিকে নিম্নে ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া দেখান হইল,—

(১) অশ্বগন্ধা, অশ্বত্থ, অশোক, অপরাজিতা (শ্বেত), আমলকী, আকন্দ, আপাং, আমরুল, আম, আনারস, আদা, এরণ্ড, ওল, ওলটকম্বল, করবী (শ্বেত ও রক্ত), কয়েদবেল, কালমেঘ, কাঁটানটে, কাকমাচী, কামিনীফুল, কার্পাস, কাল-কাসুন্দে, কুল, কুলেখাড়া, কুকসিমা, কুড়চি, কেশুর্ত্তে, কৃষ্ণকলি, খেজুর, কেতপাপড়া, গন্ধভাদুলে, গাব, গাঁদাফুল, গুলঞ্চ, গোয়ালেলতা, ঘেঁটু, ঘৃতকুমারী, চাকুন্দে, চাঁপাফুল, চিতা, ছাতিম, জবা, জয়ন্তী, ঝাঁতিফুল, তুলসী, তেলাকুচা, থানকুনি, ডালিম, ধুতুরা, নাটাকরঞ্জা, নিসিন্দা, নিম, পটল, পলতা, পান, পাথরকুচি, পালিধা মাদার, পুনর্ণবা, পুঁই, পেঁপে, পেয়ারা, বকফুল, বকুল, বরুণ, বচগুল, বাসক, ব্রাহ্মী, বেড়েলা, বাবলা, ভাঁট, ভৃঙ্গরাজ, মনসাসীজ, মানকচু, মালতী ফুল, যজ্ঞডুমুর, রাস্না, লেবু, হলুদ, হিঞ্চেশাক, হিমসাগর, শতমূলী, শিমুল, শেয়ালকাঁটা, সজিনা, সিউলী, সেওড়া, স্থল-পদ্ম—এই সকল বৃক্ষের বিভিন্ন অংশ যথা, পত্র, পুষ্প, ফল, বীজ, কাঠ, বল্কল, ক্ষীর, মূল ইত্যাদি কাঁচা অবস্থায় ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়।

(২) আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, দারুচিনি, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, বড় এলাচ, পিপুল, তেজপাতা, জীরা, কালজীরা, ধনে, গোলমরিচ, মেথি, যোয়ান, বনযোয়ান, ইসবগুলের ভুষি, গমের ভুষি, মুসব্বর, সোমরাজ, শুঁঠ, মৌরি দানা, গোক্ষুর, দারু হরিদ্রা, অনন্তমূল, আতইচ, বামুনহাটি, কণ্টকারী, বৃহতী, ছোট চাদরের মূল, তামাকপাতা, ফিটি, বেণার মূল, ভেউড়ী, লাক্ষা, তোপচিনি, কাবাব চিনি, চিতামূল, দন্তিমূল, চিরতা, চৈ, বচ, কুড়, যষ্টিমধু, সোঁদাল, সোনাপাতা, জায়ফল, পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ, কলাই, মসুর, যব, তিল, সুপারি, অর্জ্জুন ছাল, অশোক ছাল, রোহিতক ছাল, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, কটকী, শ্বেত ও রক্তচন্দন, শিমুল মূল, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, জটামাংসী, তালজটা, শ্যামলতা, বৈত্রী, ধুনা, গঁদ, তোকমারী, মাজুফল, কিসমিস, বন আদা, কুলবীজ, তুলাবীজ, শশাবীজ, পলাশবীজ, জামবীজ, কাঁকুড়বীজ, মসিনা, মাসকলাই, আতপ চাউল—এই সকল উদ্ভিজ্জ ভেষজ শুকাবস্থায় ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া গুড়, চিনি, মিশ্রী, পুরাতন গুড়, পুরাতন তেঁতুল, সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, তিল তৈল, রেড়ির তৈল, তার্পিন তৈল, মসিনা তৈল, খয়ের, ডাবের জল, গোলাপ জল, হিং, ধুনাগুল, সিদ্ধি, আফিং, আরারুট প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ দ্রব্য-গুলিও ভেষজরূপে ব্যবহৃত হয়

(৩) দুধ, দই, মাখন, ঘি, মধু, পুরাতন ঘৃত, মৃগনাভি, ঘোঁষ, শামুক, শঙ্খ, হরিণের শিং, ময়ূরপুচ্ছ, গোদন্ত, গোবর, গোচোনা—এইগুলি গৃহ-চিকিৎসায় ব্যবহার্য্য জান্তব ভেষজ।

(৪) সোহাগা, গন্ধক, তুঁতে, হীরাকষ, সচল লবণ, বীটলবণ, সৈন্ধব লবণ, সোরা, হরিতাল, নিশাদল, যবক্ষার, লৌহভস্ম, বঙ্গভস্ম, সফেদা, চুণ, চুণের জল, হিঙ্গুল, মনঃশিলা, গেড়িমাটি, ফিটকারী, ফুলখড়ি, উনানের পোড়ামাটি, সমুদ্র-ফেন—এইগুলি গৃহ-চিকিৎসায় ব্যবহার্য্য পার্থিব বা ধাতব ভেষজ।

১ম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ভেষজগুলির জন্য ভেষজ উদ্যানের প্রয়োজন। ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ দ্রব্যই পসারী দোকানে পাওয়া যায় এবং বাকীগুলি অন্য ভাবে সংগ্রহ করা কঠিন নহে। পাচনের কতকগুলি উপকরণ ব্যতীত গৃহ-চিকিৎসায় সর্ব্বদা ব্যবহার হয়, এরূপ প্রায় সমস্ত ভেষজই এই তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। তবে গ্রামাঞ্চলে এবং শহরেও দেখা যায়, কেহ কেহ বিশেষ বিশেষ রোগের আশ্চর্য্য ফলপ্রদ গাছ-গাছড়ার প্রয়োগ জানে এবং তাহারা ঐগুলিকে "মন্ত্রগুপ্তি"রূপে রক্ষা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ঐ প্রকার ভেষজ এই তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। উপরি-উক্ত তালিকায় উল্লিখিত এক বা একাধিক ভেষজের সংযোগে এক একটি ঔষধ কল্পিত হইয়া রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এই সকল ঔষধ ব্যবহারে কোন-বিপদাশঙ্কা নাই কিংবা প্রয়োগ বিষয়ে কোন জটিলতা নাই। উহাদের দ্বারা সব সময় উপকার না হইলেও, অপকার হয় না। আয়ুর্ব্বেদীয় গৃহ-চিকিৎসার ঔষধাবলীর ইহাও একটি বৈশিষ্ট্য।

গৃহ-চিকিৎসায় মকরধ্বজ।

মকরধ্বজ নামক সর্ব্বজনপরিচিত মহৌষধটি আমাদের দেশের প্রায় ঘরে ঘরেই কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়। আবহমান কাল হইতেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণও সর্ব্ববিধ রোগে মকরধ্বজ প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। এই আয়ুর্ব্বেদীয় মহৌষধটির গুণে মুগ্ধ হইয়া অধুনা অনেক বড় বড় ডাক্তার বিবিধ রোগে ইহার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। অনুপানভেদে ব্যবহারে মকরধ্বজ এক দিকে সকল প্রকার পীড়ানাশক মহৌষধ, অপর দিকে আবার স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তিবর্দ্ধক শ্রেষ্ঠ রসায়ন। সদ্যোজাত শিশু, আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোক এবং মুমূর্ষু রোগীকেও ইহা নির্ভয়ে সেবন করান যায়। শত সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতায় ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে রোগ নির্ণয় করিয়া যথোপযুক্ত অনুপানের সহিত খাঁটি মকরধ্বজ ব্যবহারে যে-কোন পীড়ার প্রথম অবস্থায় প্রায়ই চমৎকার উপকার পাওয়া যায়। ঔষধটি দামেও সস্তা। বাজারে প্রতি মাত্রা এক আনা হইতে পাঁচ পয়সার মধ্যে কিনিতে পাওয়া যায়। এদিকে দিন দিন রোগের চিকিৎসা যেরূপ ব্যয়বহুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে পারিবারিক চিকিৎসায় মকরধ্বজের আরও বহুল প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

মকরধ্বজের মত একটা মহোপকারী ঔষধের অপেক্ষাকৃত বহুল প্রচলনের পথে কতকগুলি অন্তরায় আছে। প্রথমতঃ অনেকের ধারণা, মকরধ্বজ নামে বাজারে যাহা বিক্রয় হয়, তাহা প্রায়শঃ শাস্ত্রোক্ত উপায়ে প্রস্তুত বিশুদ্ধ মকরধ্বজ নহে এবং এজন্য অনেকে মকরধ্বজ ব্যবহার করিতে চায় না। লোকের মন হইতে এরূপ ধারণা দূর করিবার দায়িত্ব অবশ্যই মকরধ্বজ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলির। তবে গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে মকরধ্বজ তৈয়ারী হইয়া কুইনিনের মত পোষ্ট আপিসের মারফত বিক্রীত হইলে, ঐ মকরধ্বজে সহজেই সকলের আস্থা হইবে। তারপর অনুপান-দ্রব্য সংগ্রহের অসুবিধাও আছে এবং এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিতেছি। তৃতীয়তঃ মকরধ্বজ বিশেষ পরিচিত ঔষধ হইলেও ইহার ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান না থাকায়, অনেকে ইহার প্রয়োগে অনেক সময় বাঞ্ছিত ফল পায় না কিংবা বিবিধ রোগে সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করিতে পারে না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য মকরধ্বজের অনুপান ও বিস্তারিত ব্যবহারবিধি সম্বলিত পুস্তিকা রচনা করিয়া ঐগুলি ঘরে ঘরে প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

গৃহ-চিকিৎসায় পাচন।

অনেক কঠিন কঠিন রোগও পাচন ব্যবহারে আরোগ্য হইয়া থাকে। কোন কোন রোগের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ পাচনের ব্যবস্থা আয়ুর্ব্বেদে আছে। সুতরাং কতকগুলি পাচনের প্রয়োগে কিছু জটিলতা আছে, এবং এজন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান প্রয়োজন হয়। কিন্তু আবার এমন কতকগুলি ফলপ্রদ পাচনও আছে, যেগুলি ব্যবহারে কোন জটিলতা নাই এবং পারিবারিক চিকিৎসায় নিরাপদে ব্যবহার করা যায়। এই শ্রেণীর পাচনই গৃহ-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইত এবং প্রাচীনা গৃহিণীরা ঐ সকল পাচনের বিবিধ ব্যবহার অবগত ছিলেন। ঐ পাচনগুলি আবার ঘরে ঘরে প্রচারিত হওয়া উচিত।

গৃহ-চিকিৎসার সহায়ে ভেষজ উদ্যান।

সেকালে পারিবারিক চিকিৎসায় বনৌষধিসমূহ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত এবং ঐগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দিকে লোকের দৃষ্টি ছিল। এখন আর তাহা নাই। কয়েক প্রকার ভেষজ পল্লী অঞ্চলের এখানে সেখানে সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ প্রয়োজনীয় বনৌষধি আজকাল কোথাও অনায়াসে পাওয়ার উপায় নাই। গৃহ-চিকিৎসার ব্যবহার্য্য

বনৌষধিগুলিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইলে, প্রথম কাজ ই [illegible]দিকটি সহজলভ্য করা এবং তাহা করিতে হইলে পল্লী অঞ্চলের স্থানে স্থানে ভেষজ উত্তান স্থাপন করার প্রয়োজন অপরিহার্য্য। তবে যে সকল বনৌষধি কাঁচা অবস্থায় প্রয়োগ হয়, প্রধানত: সেই সকল বনৌষধি সংগ্রহের জন্ত ভেষজ-উত্তানের আবশ্যক। শুষ্কাবস্থায় ব্যবহার্য্য অনেক উদ্ভিজ্জ ভেষজ সব রকম জলবায়ুতে জন্মায় না। তা ছাড়া পূর্ব্বাহ্নে রোগের কল্পনা করিয়া নানা প্রকার ভেষজ সংগ্রহ করত: শুষ্ক করিয়া ঘরে রাখা গৃহস্থ পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং শুষ্কাবস্থায় ব্যবহার্য্য ভেষজসমূহের কিছু কিছু উত্তানে রোপণ করা গেলেও, ইহাদের জন্ত প্রধানত: পসারী দোকানের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। যাহা হউক, প্রয়োজনীয় ভেষজ সমন্বিত গ্রাম্য ভেষজ উত্তানগুলি এমন স্থানে রচনা করিতে হইবে, যেখান হইতে উত্তানের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের লোক অনায়াসে উত্তান হইতে গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করিতে পারে। বাজারের সন্নিকটে উত্তানের স্থান নির্ব্বাচিত হইলেই ভাল হয়। কেননা, তাহা হইলে গ্রামের সকলেই একে অন্তের সাহায্যে উত্তান হইতে ভেষজ সংগ্রহ করিয়া লইবার সুবিধা পাইবে।

মকরধ্বজ এবং বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের অনুপানরূপে যে সকল কাঁচা গাছ-গাছড়ার ব্যবহার হয়, সেগুলি সংগ্রহের অসুবিধা হেতু পল্লী অঞ্চলের লোকেরা অনেক সময় মকরধ্বজ কিংবা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সেবন করিতে চায় না। পূর্ব্বোক্ত ভেষজ-তালিকার ১ম শ্রেণীটির অন্তর্ভুক্ত ভেষজগুলির সমন্বয়ে উত্তান রচিত হইলে, পল্লী অঞ্চলের লোকের এই অসুবিধা দূর হইবে। পারিবারিক চিকিৎসায় মকরধ্বজের গুরুত্ব বিবেচনা করিলে, শুধু মকরধ্বজের অনুপানের জন্তই ভারতের সর্ব্বত্র ভেষজ-উত্তান রচিত হওয়া উচিত।

যে সকল ভেষজ পল্লী অঞ্চলের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, ভেষজ- উত্তানে ঐ শ্রেণীর ভেষজ রোপণ না করিলেও চলিতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, যত্র তত্র হইতে সংগৃহীত উদ্ভিজ্জ ভেষজকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা চলে না। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ এইরূপ—পথে, বৃক্ষতলে, অপবিত্র স্থানে, কূপপার্শ্বে, উইয়ের মাটিতে, ক্ষারপ্রধান মাটিতে এবং শ্মশানভূমিতে জাত ওষধিবৃক্ষসকল ফলপ্রদ হয় না। অল্প কয়েক রকম গাছগাছড়া চারা অবস্থায় ঔষধে লাগে। তা ছাড়া সর্ব্বক্ষেত্রেই বৃক্ষাদি সম্পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইলে ঔষধার্থে ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংগ্রহ করিতে হয়; সুতরাং পূর্ণবীর্য্যবান ঔষধের জন্ত ভেষজ-উদ্যানের একান্তই প্রয়োজন আছে। সাধারণত: ৭।৮টি গ্রামের প্রয়োজন মিটাইতে পারে, এমন এক একটি উত্তানের জন্ত এক একরের মত জমির আবশ্যক হইবে। কোথাও এক লপ্তে এক একর জমি না পাওয়া গেলে, একাধিক অংশেও উত্তান রচিত হইতে পারে। ভেষজ-উত্তানের জন্ত তেমন উর্ব্বর জমির দরকার নাই। পতিত ডাঙ্গা জমি (high land) ভেষজ-উত্তানের সমধিক উপযোগী। সুতরাং খুব অল্প মূল্যেই জমি সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। বৃক্ষাদি রোপণের ব্যয়ও বেশী নহে। লেখকের বিবেচনায় এক একর জমির দাম ও উত্তান রচনার ব্যয় ৬০০৲ হইতে ৮০০৲ টাকার মধ্যে সঙ্কুলান হইবে। কোন মর্য্যাদা-সম্পন্ন জনকল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠান কিংবা গবর্ণমেন্ট উত্তোগী হইলে, অনেক স্থলেই ভেষজ-উত্তানের প্রয়োজনীয় জমি ধনী গৃহস্থদের নিকট হইতে বিনামূল্যে অর্থাৎ দান হিসাবে সংগ্রহ করিতে পারিবেন। উত্তান তৈয়ারী হইবার পর ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েৎ সভা স্বচ্ছন্দেই উত্তান রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে নূতন পরিকল্পিত বুনিয়াদি শিক্ষালয়ের সন্নিকটে উত্তান-রচনা করিয়া উত্তান পরিচর্য্যার কাজ বিত্তালয়ের [illegible] উপর দেওয়া যাইতে পারে। বাল্যকাল হইতেই বালক-বালিকারা যদি ওষধি-বৃক্ষের যত্ন লইতে শিখে এবং উহাদের গুণাগুণের সহিত পরিচয়লাভ করিবার সুযোগ পায়—তাহার ফল শুভই হইবে। ভেষজ উত্তানের জন্ত তেমন বিশেষ যত্নেরও আবশ্যক করে না। বর্ষার প্রারম্ভে একবার এবং বর্ষার শেষে আর একবার উত্তানের আগাছা পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। কোন কোন সময় চারিপাশের বেড়ার ভগ্ন অংশ মেরামত করিয়া দিতে হয়। তা ছাড়া মাঝে মাঝে নূতন লতাপাতা এবং গাছ-গাছড়া রোপণ করিবার প্রয়োজনও আছে। এই সমুদয়ের জন্ত এক একটি উত্তানের পিছনে প্রতি বৎসর ৩০।৪০৲ টাকার অধিক ব্যয় হইবে না।

বেদ, বৌদ্ধযুগের সাহিত্য এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পাঠেও জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে রাজানুকূল্যে ওষধি-বৃক্ষের জন্ত দেশের সর্ব্বত্র ভেষজ-উত্তান নির্ম্মিত হইত। সেই পুরাতন ব্যবস্থাকে পুন:প্রবর্ত্তিত করার সময় উপস্থিত হয় নাই কি ?

গৃহ-চিকিৎসার যুগোপযোগী পুস্তক রচনা।

পারিবারিক চিকিৎসাবিধিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইলে, একদিকে যেমন পল্লী অঞ্চলের স্থানে স্থানে ভেষজ-উত্তান রচনা করার প্রয়োজন আছে, তেমনি অন্ত দিকে বিভিন্ন ভেষজের প্রয়োগবিধি বৈজ্ঞানিকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া জনসমাজে প্রচার করিতে হইবে। "গৃহ-চিকিৎসার মুষ্টিযোগ", "পারিবারিক চিকিৎসা", "সহজ টোট্‌কা চিকিৎসা" প্রভৃতি নামধের কতকগুলি পুস্তিকা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। এগুলি প্রায়ই বাজে। প্রয়োগ ও পরীক্ষা দ্বারা যে সকল ভেষজের গুণাগুণ উপযুক্তরূপে নির্ণীত হয় নাই, এইরূপ অনেক ভেষজ ঐ সকল পুস্তিকায় ফলপ্রদ ঔষধরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে। তা ছাড়া ঔষধের মাত্রা

প্রয়োগের ক্ষেত্রবিচার প্রভৃতি বিষয়েও সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকে না। সত্য কথা বলিতে কি, এই শ্রেণীর পুস্তিকাগুলি রোগক্লিষ্ট দরিদ্র জনসাধারণের দুর্ব্বলতার সুযোগে পুস্তক প্রণেতা ও প্রকাশকদের কিছু অর্থ লাভের উপায় মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদীয় গৃহ-চিকিৎসার যুগোপযোগী গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে, প্রথমে কয়েকজন বিজ্ঞ ও বহুদর্শী প্রাচীন কবিরাজ লইয়া একটি কমিটি গঠন করিতে হইবে। এই কমিটি বিভিন্ন রোগাধিকারের আয়ুর্ব্বেদানুমোদিত পারিবারিক চিকিৎসার ভেষজসমূহের গুণাগুণ ও প্রয়োগবিধি বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন। এই প্রাথমিক সংগ্রহকে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া জনসমাজে প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তারপর "আঞ্চলিক তথ্য সংগ্রহ কমিটি" নামে কতকগুলি কমিটি গঠন করিতে হইবে। প্রথম কমিটি কর্ত্তৃক রচিত গ্রন্থে উল্লিখিত ভেষজাদির ক্রিয়া ও প্রয়োগবিধির বিবরণ পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার দায়িত্ব এই আঞ্চলিক কমিটিগুলির উপর ন্যস্ত করিতে হইবে। আঞ্চলিক কমিটিগুলি নির্দ্দিষ্ট পন্থায় স্ব স্ব অঞ্চলের ভেষজব্যবহারকারীদের নিকট হইতে বিভিন্ন ভেষজের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবেন। এই সঙ্গে সম্ভব ক্ষেত্রে দেশ-প্রচলিত অন্যান্য ভেষজ সম্বন্ধেও অনুসন্ধান এবং তথ্যসংগ্রহ চলিতে থাকিবে। এই ভাবে অন্ততঃ তিন বৎসর কাজ চলিবার পর সংগৃহীত তথ্যগুলির বিচার ও বিশ্লেষণের ভার অপর একটি কমিটির উপর দিতে হইবে। এই শেষোক্ত কমিটি নূতন তথ্যের আলোকে গৃহ-চিকিৎসাবিধির একটি প্রামাণ্য পুস্তক প্রণয়ন করিবেন। যাঁহাদের ধারণা, চর্চ্চার অভাবে গত কয়েক শতাব্দীতে আয়ুর্ব্বেদে অনেক জঞ্জালের সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহারাও ঐরূপ গৃহ-চিকিৎসার গ্রন্থকে নিঃসঙ্কোচে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন। এখন গৃহ-চিকিৎসায় প্রযোজ্য ভেষজ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান এবং গৃহ-চিকিৎসার পুস্তক রচনায় ব্যয়ের কথা। সুষ্ঠুভাবে এই কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে আড়াই লক্ষ হইতে তিন লক্ষ টাকার মত ব্যয় হইতে পারে। পরে পুস্তক বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে এই টাকার বড় অংশ উঠিয়া আসিবার সম্ভাবনা আছে।

মানুষ যতই প্রকৃতির অনুসরণ করে, স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ততই সে বেশী সুখী হয়। আয়ুর্ব্বেদীয় গৃহ-চিকিৎসাবিধি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অনুসরণে কল্পিত, সুতরাং বৈজ্ঞানিক। জনসমাজে আয়ুর্ব্বেদীয় গৃহ-চিকিৎসাবিধি পুনঃপ্রচলন বিষয়ক এই প্রস্তাবটি দেশহিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে একবার ভাবিয়া দেখিবার জন্য আমি অনুরোধ করিতেছি।

নিষ্ফল কামনা

শ্রীকরুণাময় বসু

দেখেছি তোমার স্বপ্ন প্রভাতের আলোর শিশিরে,
কুসুম-কুঁড়ির গন্ধে ; চিত্রাঙ্কিত বর্ণাভ আকাশ
বিচিত্র সৌন্দর্য-পথে বারম্বার করেছে আহ্বান,—
তুমি সে ঝর্ণার বাণী, অর্থহীন আনন্দ ঝলক।

অলক দুলায়ে যাও মেঘকক্ষে কজ্জল দিবসে
উজ্জ্বল বিদ্যুৎসম আঁখি-পক্ষে অগ্নিশিখা হানি' ;
কখনো এসেছ কাছে, মৃদু হেসে গেছ দূরান্তরে
স্বপ্নের অতীত তীরে ; হৃদয়ের বড়ো কাছাকাছি।

চিত্রিতা খড়ির বন, তৃতীয়ার ভাঙা চাঁদ কাঁপে
অধীর ঊর্মির প্রান্তে ; বিস্মৃতির বাঁকা লেখা যেন
বিরহের মূর্তি ধরে, হিম অশ্রু ফেলে একাকিনী
হিমান্তের অর্দ্ধরাত্রে জীবনের ভাঙা ঘাটে বসি।

হে অচেনা, কে গো তুমি, গায়ে লাগে ব্যাকুল নিশ্বাস,
তবু তো এলে না কাছে তুমি যেন নক্ষত্র-বালিকা ;—
সন্ধ্যায় সাগর-জলে খেলাছলে ঝিনুক কুড়াও,
আবার কোথায় যাও শুক্ল রাত্রে ধ্রুবতারা-দেশে।

আমারে ডেকেছো কেন, রিক্ত আমি, ভাঙা বাঁশী হাতে,
মানুষ ডাকে না মোরে, দুঃখ নাই, তুমি শুধু ডাকো ;
তুমি ডাকো, তুমি ডাকো, তারপর মৃত্যু দাও মোরে ;—
আমার সমাধি-চিহ্ন তৃণপুঞ্জে ঢাকা পড়ে থাক।

ঢাকা থাক অরণ্যের শুষ্কপত্র দগ্ধ তরুমূলে,
অনাবৃত সূর্যকর দিয়ে যাক আতপ্ত চুম্বন ;
তুমি শুধু ভালোবেসে এক বিন্দু ফেলো অশ্রুজল,
ভাগ্যহত জীবনের এই মোর অন্তিম প্রার্থনা।

সাধক নাম্মালোয়ার

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যুগ-স্রষ্টাদের চিন্তা ও সাধনাকে কেন্দ্র করিয়া অর্শিবের পূজারী আত্মবিস্মৃত মানবজাতি ধ্বংসের ভয়াবহ পরিণতি হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। মানবজাতি যখনই স্রষ্টাকে বিস্মৃত হইয়া 'প্রলয়-মন্থন ক্ষোভে ভদ্রবেশী বর্বরতা'র পূজায় মত্ততাবশে পশুবলে ধর্মকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হয় তখনই যুগাবতারগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। মানবের প্রতি ভগবৎপ্রেম জাগ্রত হইয়া দেখা দেয় এই সকল মহামানবের মধ্যে। যুগাবতারগণের সান্নিধ্যে জাতি আবার উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে এবং ক্লৈব্যবর্জিত এক অমর আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করে। এই আত্মদর্শনের ভিতর দিয়া তাহারা পশুত্বের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় এবং সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের স্বরূপ চিনিতে পারিয়া ধন্য হয়। মহাকালের ধ্বংস-চক্রে জগতের সমস্ত বস্তুই ছিন্নভিন্ন হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু এই ধ্বংসের আবর্তচক্রে অবিনশ্বর হইয়া থাকে তাহাদের ভাবধারা আদর্শ ও সাধনা। ব্যক্তি-জীবন ধ্বংস হইয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহার আদর্শ শাশ্বত হইয়া থাকে সহস্র জীবনধারার মধ্যে—ভাবীকালের জনগণের মাঝে। যুগে যুগে মহাপুরুষগণ সত্যের যূপকাষ্ঠে স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের বিদেহী আত্মা শত সহস্রের মধ্যে জীবন্ত হইয়া থাকে। অবতারগণ যুগধর্ম-প্রয়োজনে যে অনুপ্রেরণা দিয়া থাকেন তাহাতেই মানবজাতি সত্য ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত হইয়া থাকে। এই সকল মহামানবের সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

These incarnations are always conscious of their own divinity; they know it from their birth. They are like the actors whose play is over, but who, after their work is done, return to please others. These great ones are untouched by aught of earth, they assume our form and our limitations for a time in order to teach us, but in reality they are never limited; they are ever free.—*Inspired Talks.*

ভগবান তথাগতের মহাপরিনির্বাণের সময় মল্লগণ (কুশী নগরের রাজবংশ) দুঃখ প্রকাশ করিলে তিনি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন—'তথাগত চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইতেছেন, এরূপ প্রকাশ করিও না।' তাঁহার দেহের ধ্বংস হইতেছে, উপদেশাবলী চিরস্থায়ী, ইহা অপরিবর্তনীয়। আলস্য পরিত্যাগ কর; মুক্তির জন্য উত্থিত হও।' সত্যদ্রষ্টা ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন—'মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁরা পথ-নির্মাতা, পথপ্রদর্শক।...মানুষ অশান্ত যাত্রা করেছে অন্নবস্ত্রের জন্য নয়, আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে মানবলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠা করবার জন্য, আপনার জটিল বাধার থেকে আপনার অন্তরতম সত্যকে উদ্ধার করবার জন্য। মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে, এই যে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—

> ...তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
> চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে,
> ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে,
> অন্তর প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
> তাহার আহ্বানগীতি, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে,
> সংকট-আবর্ত-মাঝে দিয়েছে সে সব বিসর্জন।
> নির্যাতন, সয়েছে সে বক্ষপাতি, মৃত্যুর গর্জন
> শুনেছে সে সংগীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
> বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠার,
> সর্ব প্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
> চির জয় তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম হুতাশন।
> শুনিয়াছি তারি লাগি
> রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
> পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
> প্রত্যহের কুশাঙ্কুর।

হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাবধারায় বৈষ্ণব ধর্মের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব ধর্মের জাগরণের সূত্রপাত হয় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের প্রারম্ভে। পল্লব বংশের রাজত্ব-কালেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই তামিল রাজগণ সগৌরবে রাজত্ব করেন। এই যুগে আলোয়ার আখ্যাধারী বৈষ্ণব সাধকগণ হিন্দু ধর্মের অভ্যুদয় ও তামিল-ভূমির জনসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের হ্লাদিনী শক্তির প্রেরণা সঞ্চারে সবিশেষ সাহায্য করেন। দক্ষিণাপথে বৈষ্ণব সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে এই আলোয়ারগণের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণচরিত অবলম্বনে তাঁহারা স্তব রচনা করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। আলোয়ার অথবা 'মিষ্টিক্' বৈষ্ণবগণ ভক্তিমার্গের উপাসক ছিলেন। তামিল বৈষ্ণব সাহিত্য 'থেবারম্', 'থিরুবাচকম্', 'থিরুবৈমঝ্হি', 'তিরুপ্পঞ-ঝল্' ইত্যাদি নামে পরিচিত। উপনিষদের গভীর তত্ত্বসমূহ সরল ভাষায় রচিত হইয়া এই সমস্ত তামিল সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। বিভিন্ন জাতীয় আলোয়ারগণ এই সমুদয় তামিল স্তোত্রগাথা রচনা করিয়াছেন। রাম, কৃষ্ণ, নারায়ণ, নরসিংহ প্রভৃতি শ্রীভগবানের বিভিন্ন অবতারের উদ্দেশে এই সমস্ত স্তোত্র

রচিত ও নিবেদিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে শ্রীরামানুজ আলোয়ারগণের এই ধর্মানুষ্ঠানকে প্রপত্তিমার্গ রূপে সাধারণ্যে প্রচার করেন। সুবিখ্যাত বৈষ্ণবকুলতিলক রঙ্গনাথাচার্য কর্তৃক বিভিন্ন আলোয়ারের রচিত স্তোত্রগাথাগুলি সংগৃহীত হয়। এই সংগৃহীত রচনাবলী 'দিব্যপ্রবন্ধম্' নামে পরিচিতি লাভ করে। ইহাতে চারি হাজার স্তুতিগান আছে। রঙ্গনাথাচার্য সর্বসাধারণ্যে নাথমুনি নামে পরিচিত। ইনি খ্রীষ্টীয় নবম শতকের শেষার্ধ ও দশম শতকের প্রথম ভাগে শ্রীরঙ্গম্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, একদা কতিপয় ব্রাহ্মণ কুম্ভকোনম্ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমূর্তির উদ্দেশ্যে ভজন-সঙ্গীত গাহিতেছিলেন। ঐ সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত ভাব-মাধুর্যে রঙ্গনাথাচার্য অতীব মুগ্ধ হন। জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, স্তুতিগানগুলির রচয়িতা সাধক নাম্মালোয়ার। অতঃপর তিনি বহু আয়াস স্বীকারে নাম্মালোয়ারের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত স্তুতি-গাথাগুলির সংখ্যা এক হাজার। এই স্তুতিগানগুলি আজও দক্ষিণ-ভারতের প্রত্যেক বৈষ্ণব দেব-দেউলে ভক্তিসহকারে গীত হইয়া থাকে।

পল্লব-রাজত্বের অবসানে খ্রীষ্টীয় নবম শতক হইতে দাক্ষিণাত্যে চোল নরপতিগণের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়। প্রথম চোলরাজগণ শৈব ছিলেন। সুতরাং আলোয়ার-গণের উপর অত্যাচার-অবিচার সুরু হয়। কিন্তু পরবর্তী চোলরাজগণ বৈষ্ণবপন্থী ছিলেন। বিখ্যাত সুব্রহ্মণ্য মন্দির রাজা রাজেন্দ্র চোলের অমর কীর্তি। দাক্ষিণাত্যের আধ্যাত্মিক ভূমি আজও এই দুইটি ধর্মদর্শন দ্বারা উর্বর রহিয়াছে। আলোয়ারগণ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের প্রতি দোষারোপ বা বর্ণবৈষম্য ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে 'সংগ্রাম' ঘোষণা করেন নাই। তাঁহাদের মতে, জন্মদ্বারা কাহারও মুক্তি নির্ধারিত হয় না, কর্মদ্বারাই ইহা নিরূপিত হইয়া থাকে। হরিভক্ত-গণের মধ্যে কোন উচ্চনীচ ভেদাভেদ নাই। এই বিশ্বে সবাই সেই 'অমৃতের সন্তান'—ভাই ভাই। 'প্রস্থানত্রয়ে'র (ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ ও গীতা) পরিবর্তে তাঁহারা ভক্তিমার্গের প্রাধান্য সাধারণ্যে প্রচার করেন। কারণ গীতার একাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বিশ্বরূপদর্শন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,

> নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
> শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।
> ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
> জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ।৫৩।৫৪

'তুমি আমার যে রূপ দেখিলে, তাহা বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান অথবা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ দ্বারাও দেখিতে পাওয়া যায় না। হে পরন্তপ অর্জুন! অনন্যভক্তি দ্বারাই ঈদৃশ রূপধারী আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে (শাস্ত্রতঃ) পর্যবেক্ষণ করিতে এবং প্রত্যক্ষতঃ আমাতে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হয়।' এই প্রেম-ভক্তি-বাদই ভারতের মধ্যযুগের ধর্মান্দোলনের বিশেষত্ব। 'ভক্তির জন্ম হইল দ্রাবিড় দেশে, উত্তরে তাহা আনিলেন রামানন্দ। তাহার পর সাধকশ্রেষ্ঠ কবীর তাহা সপ্তদ্বীপ নব খণ্ড বসুধায় বিস্তার করিলেন।'

> ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ।
> প্রগট কিয়ো কবীর নে সপ্তদ্বীপ নৌ-খণ্ড॥

এই প্রেম-ভক্তি সম্বন্ধে কবীর বলিয়াছেন—

> প্রেম বিনা সব কর্ম বৃথা প্রেম বিনা সব জ্ঞান।
> প্রেম বিনা ঢিগ দূর হৈ প্রেম মিলে ভগবান।

আলোয়ারগণের 'তামিলনাদে'র ভিতর দিয়া গীতার এই পরম সত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়া সর্বসাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে। এই 'তামিলনাদের' জন্মরহস্য কৌতুকপ্রদ। 'পদ্মপুরাণে' এই বৃত্তান্তটি দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রাবিড় দেশে ভক্তিদেবীর জন্ম হয়। কর্ণাটকে পুষ্পিত যৌবন কাটাইয়া গুর্জরপ্রদেশে তিনি বৃদ্ধত্বপ্রাপ্ত হন। তাঁহার দুই পুত্র—জ্ঞান ও বৈরাগ্য। তাঁহারাও যথাসময়ে বৃদ্ধ হইলেন। একদা ভক্তিদেবী পুত্রদ্বয়সহ শ্রীবৃন্দাবনধামে উপনীত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! সেখানে ভক্তিদেবী বিগত যৌবনশ্রী ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দেহের কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্তন সাধিত হইল না। ইহাতে তাঁহারা বড়ই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে দেবর্ষি নারদ ভক্তিদেবী সকাশে উপনীত হইয়া প্রকাশ করিলেন, "দেবি, দুঃখ করো না। সমস্তই সেই বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানের ইচ্ছা। তুমি তাঁর পদপল্লবযুগল স্মরণ কর। আমি বেশ জানি, তুমি তাঁর অতীব প্রিয়—তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে রয়েছ। তোমার প্রেমের কাছে তিনি তাঁর প্রাণকেও তুচ্ছ বলে মনে করেন। তোমার আহ্বানে তিনি দীনের পর্ণকুটীরে এবং নীচজনের অন্তরেও আসন পেতে থাকেন। ভক্তহৃদয়ে আশার সঞ্চার করে তাঁদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই তোমায় তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। মুক্তিকে দাস এবং জ্ঞান বৈরাগ্যকে পুত্ররূপে ধরাধামে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। মহাদেবি! শ্রবণ কর, সকল যুগের মধ্যে কলিযুগই শ্রেষ্ঠ। এ যুগে তোমাকে প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে স্থাপন করব। নতুবা আমার হরিদাস নামই বৃথা বলে মনে করব। একমাত্র বৃন্দাবনের গোপী-জনোচিত প্রেম-ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়। তপস্যা কিংবা প্রস্থানত্রয়ের পথে তাঁকে পাওয়া যায় না।"

তখন ভক্তিদেবী দেবর্ষি নারদকে বলিলেন, "আমার প্রতি যদি তোমার সত্যিকারের শ্রদ্ধা থাকে তবে এদের মৃতকল্প দেহকে শক্তি সঞ্চারে প্রবুদ্ধ করো।"

দেবর্ষি 'ভাগবত ধর্ম' প্রভাবে জ্ঞান-বৈরাগ্যের দেহে যৌবন সঞ্চার করিলেন। 'ভাগবত পুরাণে'র একাদশ অধ্যায়, যাহা

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট উপদেশচ্ছলে ব্যাখ্যা করেন, সাধারণতঃ 'ভাগবত ধর্ম' নামে পরিচিত। কলিযুগে ইহা নারদীয়া ভক্তি নামে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আনন্দে বিহ্বল ভক্তিদেবী পুত্রদ্বয়কে দুই বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এক অলৌকিক রস-ভাবে সকলে বিভোর হইয়া পড়িলেন। ভক্তি-দেবীর এই মোহন ভাবাবেশ হইতেই 'তামিলনাদে'র জন্ম।

তিন্নেবেল্লী জেলার অন্তর্গত তাম্রপর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত থিরুনগরীতে পরম ধার্মিক বেল্লাল জাতীয় এক রাজপুত্র বাস করিতেন। তাঁহার নাম করিমারন্। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। অল্প বয়সে উদয়ানঙ্গই নামে এক পরম রূপবতী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। উদয়ানঙ্গইর পিতার নাম বৈষ্ণবহ্মানিক। ইনি থিরুবন্ পরিসরম্ গ্রামের অধিবাসী। দাম্পত্যপ্রেমের অনাবিল আনন্দে তাঁহাদের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। বহুদিন যায়, তাঁহাদের কোন সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করিল না। ইহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে এক অব্যক্ত গভীর বেদনার সঞ্চার হইল। সতীসাধ্বী উদয়ানঙ্গই স্বামীসহ কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করিতে লাগি-লেন। একদা পিত্রালয় হইতে গৃহে প্রত্যাগমনকালে ব্রতচারিণী উদয়ানঙ্গই এক বিষ্ণুমন্দির দেখিতে পান। স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া মন্দিরে অবস্থিত বিগ্রহের চরণে প্রাণের আকুতি জানাইয়া পুত্রকামনা করিলেন। তাঁহাদের আকুল আবেদনে দেবতার আসন টলিল। দিন যায়। যথাসময়ে উদয়ানঙ্গই অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। রাজ্যময় মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাণীর প্রসব-কাল উপস্থিত হইল। মন্দিরে মন্দিরে ষোড়শোপচারে দেবতার পূজা হইতে লাগিল। অন্তঃপুরে শাঁখ বাজিয়া উঠিল; মহিলারা মঙ্গলগান গাহিতে লাগিল। যথাসময়ে উদয়ানঙ্গই একটি পুত্র প্রসব করিলেন। রাজা রাণী উভয়েই আনন্দে বিহ্বল হইলেন। কিন্তু জন্মের পর নবজাতক ক্রন্দন পর্যন্ত করিল না—কিম্বা চক্ষুরুন্মীলন করিল না। এমন কি মায়ের স্তন পানও করিল না। নবজাত শিশুর অদ্ভুত লক্ষণ দেখিয়া রাজ্যে আনন্দের পরিবর্তে বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিল। মাতাপিতা ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। শিশুটি দেব-অংশসম্ভূত মনে করিয়া রাজারাণী তাহাকে নিকট-বর্তী বিষ্ণুমন্দিরে লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁহারা শিশু-সন্তানকে একটি তেঁতুল গাছের ছায়ায় নীচে রাখিলেন। ভগবানের লীলা অপূর্ব। সমবেত জনতা বিস্মিত চিত্তে দেখিল, সেই তেঁতুল গাছের কোটরে শিশুটি দ্রুতগতিতে প্রবেশ করিয়া পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন হইল। শিশুর মধ্যে *চেতনার চাঞ্চল্য বিন্দুমাত্র পরিলক্ষিত হইল না। এই ভাবে* দেখিতে দেখিতে ষোলটি বৎসর কাটিল। এই শিশুই পরবর্তী কালে নাম্মালোয়ার নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। নাম্মালোয়ার শব্দের অর্থ মরমী সাধক। অবশেষে পরম বৈষ্ণব মাধুরকবির সহিত এই সাধকপ্রবরের যোগাযোগ স্থাপনের ভিতর দিয়া দক্ষিণ ভারতের ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল।

মাধুরকবি জাতিতে সামবেদীয় ব্রাহ্মণ। চোলদেশের অন্তর্গত থিরুক্কুইলোর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। অতি অল্প বয়সেই তিনি বেদাদি শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ব্রহ্মের স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে তাঁহার সমস্ত দেহমন একান্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, শুধু পুঁথিগত বিদ্যাদ্বারা ভগবানের সান্নিধ্যলাভ করা যায় না। সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত অমৃতের আস্বাদন লাভ করা যায় না। তাই কবীর বলেন—

> গুরু বিন জ্ঞান ন উপজৈ গুরু বিন মিলৈ ন ভেব।
> গুরু বিন সংশয় না মিটে জয় জয় জয় গুরুদেব।

গুরুর কৃপা ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না, গুরুর সহায়তা ব্যতীত রহস্যের সন্ধান পাওয়া মুশকিল, গুরু ভিন্ন মনের সংশয় দূরীভূত হয় না—জয় জয় জয় গুরুদেবের। তাই মাধুরকবি সদ্‌গুরুর অন্বেষণে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি উত্তরাপথের অযোধ্যা, মথুরা, কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি পরিদর্শন করিলেন। অতঃপর দক্ষিণাপথে তীর্থপর্যটন কালে তিনি বহু দূর হইতে এক বিমল আলোকরশ্মি দেখিতে পাই-লেন। এই অপূর্ব দৃশ্য ক্রমান্বয়ে তিন দিন তিনি দেখিতে পাইলেন। রহস্যের যবনিকা উত্তোলনের জন্য তিনি ক্রমাগত আলোকরশ্মির অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে থিরুনগরীতে উপনীত হইবার পর সেই আলোকরশ্মি আর তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। তত্রত্য জনপদবাসীদের জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি সাধক নাম্মালোয়ারের আশ্চর্য জন্মবৃত্তান্ত ও জীবনযাপন-প্রণালী অবগত হইলেন। অতঃপর মাধুরকবি যেখানে নাম্মালোয়ার সমাধিমগ্ন রহিয়াছেন সেখানে গমন করিলেন। সাধকপ্রবরের চেতনা সঞ্চারের জন্য তিনি বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। অবশেষে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"মহাত্মন্, অবিদ্যাসম্ভূত নশ্বর দেহান্তরগামী অথবা সেই দেহেই অবস্থিত আত্মার খাদ্য এবং পানীয় কি?" মাধুরকবির প্রশ্নে সেই জ্ঞানতপস্বী দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিতহাস্যে উত্তর করিলেন—"বৎস, জড়দেহে অবস্থিত আত্মা প্রকৃতির দ্বারাই *লালিত-পালিত* হইয়া থাকে। কারণ শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, "*আমি নিজ সামর্থ্য প্রভাবে পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়া সমস্ত ভূতকে* ধারণ করিয়া আছি এবং আমিই রসময় সোমরূপে ওষধিসমূহ *পরিপুষ্ট করিতেছি।*"*

---

* গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহ মোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।—১৫।১৩ গীতা।

নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইতে দেখিয়া মাধুরকবি বিস্ময়ে হতবাক হইলেন। এই অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহামানবকে তিনি গুরুপদে বরণ করিলেন। নাম্মালোয়ারের নিকট মাধুরকবির শিষ্যত্বগ্রহণ উচ্চ-নীচ বর্ণের ভেদাভেদ দূরীভূত করিয়া মিলনরাখী বন্ধনের সূত্রপাত করিল। এই তামিল মরমী সাধকের আধ্যাত্মিক আলোকরশ্মি মাধুর-কবির ন্যায় সুযোগ্য শিষ্যকে কেন্দ্র করিয়া সাধারণ্যে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। ভক্তিসাধনার নবধা গুণের সমন্বয় মহাভাগবত মাধুরকবির মধ্যে দেখা যায়। তিনি শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শ্রীশুকদেব, স্মরণে দৈত্যকুলপ্রদীপ প্রহ্লাদ, পাদসেবনে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী, অর্চনায় পৃথু, বন্দনায় অক্রূর, দাস্যভাবে মহাবীর, সখ্যভাবে তৃতীয় পাণ্ডব ও আত্মসমর্পণে দৈত্যরাজ দানবীর বলি। একমাত্র গুরুদেবের মহিমা আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য তিনি শ্রীশুকদেবের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। নাম্মালোয়ারের শ্রীমুখবিনিঃসৃত বেদের গভীর তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার লেখনীর যাদুতে প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। মাধুরকবি স্বীয় গুরুদেবের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"আমি অন্য কোন দেবদেবী চিনি না বা জানি না; গুরুদেবের যশঃকীর্ত্তনই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। আমি তাঁর সেবক; জগদ্‌গুরুর কৃপাকণালাভে আজ আমার সমস্ত অহমিকা—বিদ্যার অহঙ্কার, যশের অহঙ্কার দূরীভূত হয়েছে। মোহগ্রস্ত আমাকে তিনি প্রিয় শিষ্যের অধিকারদানে ধন্য করেছেন। তিনি আমায় দিব্য চক্ষু দান করেছেন। মোহাচ্ছন্ন মানবজাতিকে গুরুদেবের চিরমধুনিষ্যন্দী বাণী শুনিয়ে প্রবুদ্ধ করাই আমার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। তাঁর পাদসেবনই আমার সাধনা।"

কথিত আছে, স্বয়ং লক্ষ্মী-নারায়ণ নাম্মালোয়ারের সকাশে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন এবং কলিযুগে 'নারদীয়া ভক্তি' প্রচারের নির্দেশ দিয়া অন্তর্হিত হন। নাম্মা-লোয়ার শ্রীভগবানকে 'বিশ্বাতীত', 'বিশ্বানুগ', 'বিশ্বদেব', 'পরম-ব্রহ্ম', 'জীবন-দেবতা' প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করিয়া-ছেন। ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনের দুর্লভ সৌভাগ্য একমাত্র ভক্তেরই হইয়া থাকে।

নাম্মালোয়ারের কৈশোর ও যৌবনের ঘটনাবলী এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে বৈষ্ণব গ্রন্থ 'গুরুপরম্পরায়' কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যায় না। তাঁহার কতিপয় স্তোত্র-গাথা দাক্ষিণাত্যের বহু দেব-দেউলের বিগ্রহের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় পরিব্রাজকবেশে অতিবাহিত করিয়াছেন। নাম্মালোয়ার সম্ভবতঃ চিরকুমার ছিলেন।

নাম্মালোয়ার যে শুধু পরম বৈষ্ণব ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন কবিও ছিলেন। তিনি প্রকৃতির সত্তার সহিত আপন চিত্তের যোগাযোগ স্থাপন করিয়া প্রকৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতিকে মানবধর্মী (humanised) করিয়া তুলেন। প্রকৃতির হৃদয়-মুকুরে তিনি অতিপ্রাকৃতের লীলাবৈচিত্র্য প্রতিবিম্বিত দেখিতে পান। প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহার কাছে শুধু নৈসর্গিক দৃশ্যমাত্র নহে; ইহা তাঁহার কাছে দেখা দিয়াছে অনন্তের অসীমের বাণী লইয়া। তিনি বিরাটের রূপকে অনুভব করিতে চাহিয়াছেন প্রকৃতির বিভিন্ন সৌন্দর্য্যের মধ্যে। 'রোমান্টিক' ভাবপ্রবণতা তাঁহার কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য। ভগবানের দেহশ্রী বর্ণনায় তিনি পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের মাঝে ভগবানের সত্তা আরোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার রচনাবলী ভাব-ঐশ্বর্য্যে অনির্বচনীয়, অপূর্ব্ব রসকল্পনায় শ্রীমণ্ডিত। একবার তামিল কবি কম্বন্ স্বরচিত রামায়ণ ব্যাখ্যা করিতে শ্রীরঙ্গম মন্দিরে গমন করেন। তিনি পুস্তকটি শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের চরণে স্থাপন করিলে অকস্মাৎ প্রত্যাদেশ শুনিতে পাইলেন।

—হে কম্বন্! তুমি কি আমার ভক্ত নাম্মালোয়ারের প্রশংসা-গীতি গেয়েছ?

—প্রভো! আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জনা কর; এখনই আমি তাঁর কবিত্বের প্রশস্তিসহ তামিল-সঙ্ঘে আমার রামায়ণ ব্যাখ্যা করব।

অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত কথাগুলি বলিয়া সমবেত জন-মণ্ডলীর সমক্ষে নাম্মালোয়ারের ভাব-সমৃদ্ধ রচনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলেন,—

"হে সুধীবৃন্দ! নাম্মালোয়ারের একটি কবিতার সহিতও পৃথিবীর সমস্ত কবিতার তুলনা চলে না। সূর্য্যের সহিত কি জোনাকির তুলনা করা যায়? উর্ব্বশীর সমকক্ষ কি পিশাচী? সাধারণ কবির নাম তো তাঁর কাছে উল্লেখযোগ্যই নয়।" এই ঘটনায় নাম্মালোয়ারের নাম সাধারণ্যে সুপরিচিত হয়। তিনি মানব-সমাজের কল্যাণকামনায় নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেন,—

"হে ভ্রান্ত মন! ভগবানের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ কর। শয়নে জাগরণে তাঁর নাম স্মরণ-মনন কর। তিনি সমস্ত প্রাণি-জগতের পিতামাতা। জগতের সমস্ত বস্তুতেই ভগবান বিরাজিত। অন্তরে বাইরে তাঁর রূপ অন্বেষণ কর; আমিত্ব বর্জন কর। পার্থিব ভোগৈশ্বর্য্যের প্রতি আকর্ষণ রেখ না—অহেতুকী ভক্তি অর্জন কর। স্মরণ রেখ, আত্মা অবিনশ্বর। আপনার বলতে মানুষের যা কিছু বুঝায় তৎসমুদয় থেকে ভগবান প্রিয়তর। সর্ব্বধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র ভগবানের চরণে শরণ লও। বিষয়-বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা চঞ্চল মনকে বশীভূত করতে চেষ্টা করবে। কৃষ্ণের নামে দুর্ব্বার কলি ভয়ে পালিয়ে যাবে।"

নাম্মালোয়ার মধ্যযুগে আবির্ভূত হন। ডক্টর হুল্টজ্‌চ (Hultzsch) বলেন,—

"Namamalwar must have lived centuries before A.D. 1000."

শৈবাচার্য তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি বিরাজ করেন। শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা তিরুমঙ্গই আলোয়ার ইঁহার সমসাময়িক ছিলেন।* তিনি নাম্মালোয়ারের কবিত্ব-মাধুর্যে মুগ্ধ হন। তখন পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহ বর্মনের রাজত্বকাল (খ্রী: ৬২৫-৬৪৫)। অধ্যাপক সুন্দরম্ পিল্লাই বলেন—

"The opening of the seventh century is the latest period that can be assigned to Sambhandar."

তিরুমঙ্গই আলোয়ার নাম্মালোয়ারের সমসাময়িক ছিলেন। অধ্যাপক কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার নাম্মালোয়ারের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট আছে। তিনি বলেন,

"....we shall have to look for the age of Nammalwar in the period of struggle between Buddhism and Brahminism for mastery in South India and that period is between A.D. 500 and 700."

নাম্মালোয়ার পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দেহরক্ষা করেন। পার্থিব ভোগৈশ্বর্যের প্রতি তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র আকর্ষণ ছিল না। ভগবানের সান্নিধ্য লাভের জন্য তাঁহার চিত্ত সর্বদা উন্মুখ হইয়া থাকিত। দিব্য ভাবের আবেশে সময় সময় তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। তখন তাঁহার দুই নয়নে অবিরলধারায় প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইত। তিনি বৃন্দাবনধামের গোপীজনোচিত ভাবে ভগবানের সাধন-ভজন করিতেন। যেন—

"জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি,
পরাণ-পুতলী তুমি জীবনের সখি।
অঙ্গ আভরণ তুমি শ্রবণ রঞ্জন
বদনে বচন তুমি নয়নে অঞ্জন।
নিমেষে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি
স্থায় বসন্ত কহে পহু প্রেমরাশি।"

নাম্মালোয়ারের মৃত্যুর পরও মাধুরকবি কিছুকাল জীবিত ছিলেন। তিনি গুরুর আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপনে ব্রতী হন। নাম্মালোয়ারের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি গুরুদেবের একটি প্রস্তরমূর্তি থিরুনগরীতে স্থাপন করেন। তিনি মূর্তিটির প্রাত্যহিক, মাসিক এবং বাৎসরিক পূজা ও উৎসবের সুবন্দোবস্ত করেন। বর্তমানে মূর্তিটি থিরুক্কুরুহুর নামক দেব-দেউলে স্থাপিত রহিয়াছে। প্রতি বৎসর বহু বৈষ্ণবভক্ত ও সাধক তীর্থদর্শন মানসে এখানে সমবেত হইয়া থাকেন। নাম্মালোয়ারের স্তোত্র-গাথা দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন বৈষ্ণব দেব-মন্দিরে ভক্তিসহকারে গীত হইয়া থাকে।

ভারত ঋষিদের সনাতন ধর্মের লীলাভূমি। সেই গৌরবোজ্জ্বল আধ্যাত্মিকতার তপোভূমি অতীত ভারতকে বিস্মৃত হইলে চলিবে না, উহার সুদূর অতীতের কাহিনী স্মরণপথে রাখিতে হইবে। আজ পৃথিবী হিংসায় উন্মত্ত। জড় বিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিকতার ঊর্ধ্বে আসন দেওয়ায় পৃথিবী ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। বর্তমান জগতের সভ্যতা যদি ভারতের আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে মানবজাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ দিব্য-দৃষ্টিতে ইহা লক্ষ্য করিয়াই এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। মানবতার আদর্শ বিস্মৃত হইয়া মানুষ আজ আত্মঘাতী লীলায় উন্মত্ত। নানা মতবাদের সংঘর্ষে ধরিত্রী আজ প্রপীড়িতা। অমৃতের পুত্রেরা মৃত্যুভয়ভীত ক্লান্ত অবসন্ন। হে মধ্যযুগের সাধকপ্রবর—'আবিরাবির্ম এধি'। হে অলোকবিহারী জ্যোতির্ময়ের পূজারী, 'সম্ভবামি যুগে যুগে'র বারতা লইয়া আমাদের মাঝে আবার তোমার 'তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়' হউক। দ্বেষহিংসাকলুষিত মানবসমাজকে তুমি অমর জীবনের পথে পরিচালিত কর।

* প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৫৫।

প্রগতিশীলা—শ্রীসন্তোষকুমার বিশ্বাস। ৯।৭ বি, প্যারীমোহন সুর লেন, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

ভাগ্য-তাড়িত তরুণ-তরুণীর বিচিত্র প্রণয়কাহিনী এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু হইলেও ইহাতে দক্ষিণ-তীর্থের বিস্তীর্ণ পটভূমিকাটি হইয়াছে অধিকতর উজ্জ্বল। বহু শতাব্দীর শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাধনাসমৃদ্ধ প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রাণধারাটিকে চিনাইয়া দিবার আয়োজন লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। মনোজ্ঞ বর্ণনভঙ্গীর আকর্ষণে লেখক পাঠককেও সেই সুদূর তীর্থরাজির পরিমণ্ডলে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং সেই কারণেই ভ্রমণের নেশায় কাছে কাহিনীর কৌতূহল হইয়াছে স্বাদহীন। এটিকে উপন্যাসের লেবেল না মারিয়া দিলেও ক্ষতি ছিল না। অবশ্য বাংলা-সাহিত্যে নামকরা এমন দু'একখানি ভ্রমণ-কাহিনী আছে, যাহার ভ্রমণ অংশকে কাহিনী অংশ অসঙ্কোচে গ্রাস করিয়াছে। তথাপি সে লেখা রসিকমহলে আদৃত হইয়াছে একটি মাত্র কারণে। সেই সব ক্ষেত্রে কাহিনীর কল্পনা ও ভ্রমণের বাস্তবতাকে লইয়া তর্কের অবকাশ ঘটিলেও রচনার মধ্যে রসসৃষ্টিই হইয়াছে পাঠকচিত্ত আকর্ষণের মুখ্য বস্তু। আলোচ্য গ্রন্থখানিও এই পর্য্যায়ে পড়ে। লেখকের দৃষ্টিতে ভারত-তীর্থের প্রকৃত রূপ ধরা পড়িয়াছে এবং প্রভাবিত চিত্তে তিনি ছবির পর ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। ছবিগুলি মোটের উপর সার্থক হইয়াছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

জাতিভেদ—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

হিন্দুর বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ ও আধুনিক নানা বিবরণ-গ্রন্থ অবলম্বনে আলোচ্য পুস্তকে জাতিভেদ-প্রথার সূচনা ও ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে বিস্তৃত ও কৌতুককর বিবরণ সংকলিত হইয়াছে। বেদ পুরাণ স্মৃতিতে এ সম্পর্কে কোথাও কঠোরতা, কোথাও কোথাও বা ঔদার্য ও শৈথিল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ব্যবহারের মধ্যে এ বিষয়ে যে প্রচুর বৈচিত্র্য, বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য বিদ্যমান আধুনিক নানা গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে তাহা অনেকাংশে উল্লিখিত হইয়াছে। সকল প্রদেশের আচার-ব্যবহারের নিখুঁত বিবরণ সংগৃহীত ও আলোচিত হইলে এ সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন তথ্য জানা যাইবে। সুপণ্ডিত গ্রন্থকার মহাশয় এই বিষয় সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত তথ্যের সমাবেশ ও সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি প্রাচীনকালের নারীজাতির অবস্থার—বিশেষ করিয়া জাতিভেদজনিত তাহাদের দুর্দ্দশা ও দুর্গতির বিবরণ দিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে জানিবার, শিখিবার ও বিবেচনা করিয়া দেখিবার প্রচুর উপকরণ ছড়ান রহিয়াছে। গ্রন্থশেষে সংযোজিত নির্দ্দেশপঞ্জী বিষয়ানুসারে সংকলিত হইলে পাঠকের পক্ষে বেশী উপযোগী হইত। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝা যাইবে। 'বিধবা বিবাহে'র নির্দ্দেশপঞ্জীতে কয়েক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে—'পাঞ্জাবে বিধবাবিবাহ,' 'বিধবাবিবাহ, কথাসরিৎসাগরে', 'ব্রাহ্মণ-

দের মধ্যে বিধবাবিবাহ'। 'বিধবাবিবাহ' শব্দের সঙ্গেই একত্র এই বিষয়গুলির উল্লেখ থাকিলে সুবিধা হইত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, বৈদিকযুগে বিধবাবিবাহের যে নিদর্শন গ্রন্থমধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখ এই পঞ্জীতে নাই।
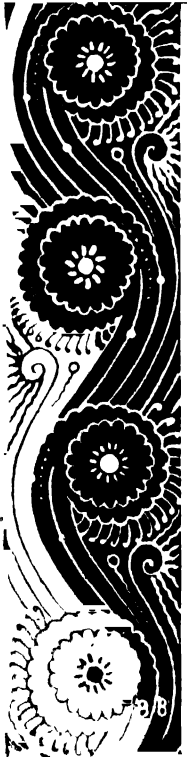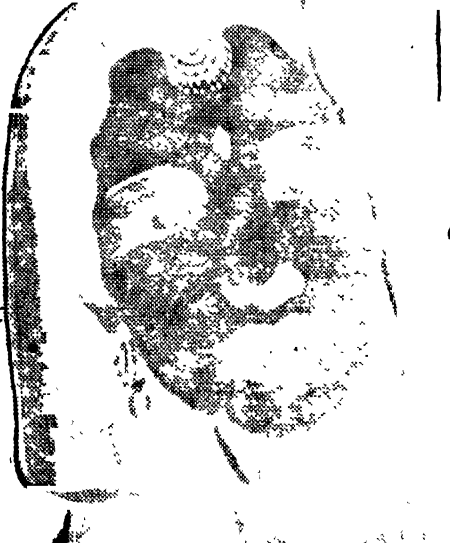
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

সন্ধ্যামালতী—শ্রীআশুতোষ সান্যাল। উষা পাবলিশিং হাউস, ৩৫ মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা। মূল্য ১৸৹ মাত্র।

এখানি কাব্যগ্রন্থ। পঁয়ত্রিশটি কবিতা আছে। আশুতোষ সান্যাল সুকবি। পাণ্ডিত্যের ভারে কোথাও তাঁহার কবিতা ক্লিষ্ট হয় নাই। একটি সহজ, ঋজু এবং আন্তরিক প্রকাশভঙ্গী কবিতাগুলিকে উপভোগ্য করিয়াছে। বর্তমানের রূপ কবিকল্পনাকে পীড়িত করিতেছে বলিয়া লেখক বলিতেছেন, "বাঁশরীর সুর ছাপি' উঠে সদা হায়, কল্পান্তের তূর্য্যনাদ।" যে সময়ে "আসে ধেয়ে ব্রহ্মাণ্ড অখিল—রক্ত-আঁখি,"

"সে সময় শুনি তব ভৈরব আহ্বান,
হে কবি, আপন মনে গাহ তুমি গান।"

একটি কবিতায় পাই,

"বনের কাঁটা তুলতে পারি, মনের কাঁটা যায় না তোলা,
মরমে যা রইলো গাঁথা, সহজে তা যায় কি ভোলা?"

'অন্তর্হিতা'র লেখক বলিতেছেন,

"লুকিয়ে আছে, হারায় নিকো, আছে চোখের আড়ালে,
জানি আমি আসবে ছুটে দুখানি হাত বাড়ালে।"

ব্যথিতের জিজ্ঞাসা—

"সন্ধ্যামালতী, বলিতে পারিস, কে তোরে বাসিত ভালো?
দিনের অন্তে সাজাতিস্ তুই কার কুন্তল কালো?"

"ভৈরবী আর পূরবীতে মিলন হ'ল আমার চিতে" বলিয়া মন কেবলই প্রশ্ন করে, "ভাল কি লাগিবে মোর ভালবাসা, আমার স্বপন-কল্পনা-আশা?" কেদারবাহিনী গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া শেষে লেখক বলিতেছেন,

"দিবি কি মা, একবার দগ্ধ প্রাণের 'পর তুহিন শীতল কর বুলায়ে?"

"সন্ধ্যামালতী"র মধ্যে যে একটি করুণ মধুর সুর ধ্বনিত হইতেছে তাহা কাব্যামোদী পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বাঙালী—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক—সিটি কলেজ, বাণিজ্য বিভাগ, কলিকাতা। মূল্য ২৷৹। পৃষ্ঠা ১৪৩।

এই গ্রন্থে সাতটি অধ্যায়ে গ্রন্থকার বাঙালী জাতির বহু সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। অধ্যায়গুলির নামকরণ—এইরূপ 'আমরা বাঙালী', 'ইতিহাসের পাতায়', 'সমাজের রূপ ও রূপান্তর', 'অর্থনীতির সন্ধানে', 'সংস্কৃতির ধারণা', 'যদিও সন্ধ্যা' এবং 'বন্ধ করো না পাখা'। এই নামকরণ হইতেই পুস্তকের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করিতে পারা যায়। বহু বিশিষ্ট বাঙালী ও অবাঙালী লেখকের মতামত উদ্ধৃত করিয়া লেখক তাঁহার বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার ও সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য লেখকের যুক্তি ও মতের সহিত সকলে একমত না হইতে পারেন, কিন্তু একথা সত্য যে তাঁহার তথ্য সংগ্রহ ও আলোচনাপদ্ধতি

উত্তম হইয়াছে। বিষয়বস্তুতে লেখক যতটা মনোনিবেশ করিয়াছেন প্রকাশভঙ্গির দিকে ততটা দৃষ্টি রাখেন নাই। তবে গ্রন্থকার পুস্তকখানি দরদ দিয়া লিখিয়াছেন বলিয়া পাঠকমাত্রেই তৃপ্তিলাভ করিবেন। বাংলার ১৬৬০, ১৭৬০, ১৯০৫, ১৯১২ এবং ১৯৪৭ সালের মানচিত্র ও কয়েক বৎসরের জনসংখ্যার হিসাব পুস্তকখানিকে তথ্যের দিক দিয়া মূল্যবান করিয়াছে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মিলনবাণী (২য় সংস্করণ)—স্বামী সিদ্ধানন্দ। কলিকাতা সারস্বত সঙ্ঘ—১৬, বিডন ষ্ট্রীট। মূল্য এক টাকা।

আমি কি চাই—শ্রীশ্রীনিগমানন্দ পরমহংস। হালিসহর দক্ষিণ-বাংলা সারস্বত আশ্রম হইতে শ্রীমৎ নলিনী ব্রহ্মচারী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চার আনা।

বই দুখানি ঠাকুর শ্রীশ্রীনিগমানন্দের প্রদত্ত উপদেশাবলীতে পূর্ণ। প্রথমখানি পদ্যে রচিত—তাহাতে হালিসহরের আশ্রমের আচার-অনুষ্ঠানাদির বর্ণনাও কতক আছে। দ্বিতীয়টিতে ভক্তদের প্রতি ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত চল্লিশটি বাণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভক্ত পাঠকপাঠিকা পুস্তক দুখানি পাঠে উপকৃত হইবেন।

শ্রী উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কবিতা চ্যাটার্জী—শ্রীকুমারকৃষ্ণ বসু। বেলেভিউ পাবলিশার্স। পি ১৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ নর্থ। কলিকাতা—৫। মূল্য ২৲।

উপন্যাসখানিতে বস্তুর চেয়ে ভাবাবেগের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইল। তদুপরি ইহার স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের একখানি অতিপরিচিত উপন্যাসের ছায়াপাত হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও কিন্তু পুস্তকখানিতে লেখকের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা ভাল, কিন্তু শব্দ প্রয়োগে কিছু কিছু ভুল আছে। প্রচ্ছদপট মনোরম।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

সঙ্কল্প ও সাধনা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। ভারতী বুক ষ্টল, ৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য ১৷৹।

ব্রিটিশাধিকারের প্রথম যুগ থেকে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে ভারতের খণ্ডিত স্বাধীনতালাভ পর্য্যন্ত ভারতবাসী ইংরেজের অন্যায় অবিচার ও অত্যাচারের প্রতিবাদের সঙ্কল্প নিয়ে ঐকান্তিক সাধনার বলে কিরূপে মুক্তিলাভের পথে ধাপে ধাপে প্রস্তুত ও অগ্রসর হয় এবং অবশেষে স্বরাজলাভে সফলকাম হয়, কয়েকটি সুলিখিত ধারাবাহিক অধ্যায়ে গল্পের মত করে গ্রন্থকার কিশোরদের শিক্ষার জন্য তাই লিখেছেন। বইখানি সংক্ষেপে লেখা হলেও প্রচুর জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ এতে আছে। এখানি গ্রন্থকার প্রণীত 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যেতে পারে। ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস প্রত্যেক ছাত্রের জানা আবশ্যক। গ্রন্থখানি ছাত্রদের হাতে দেখলে আনন্দিত হব।
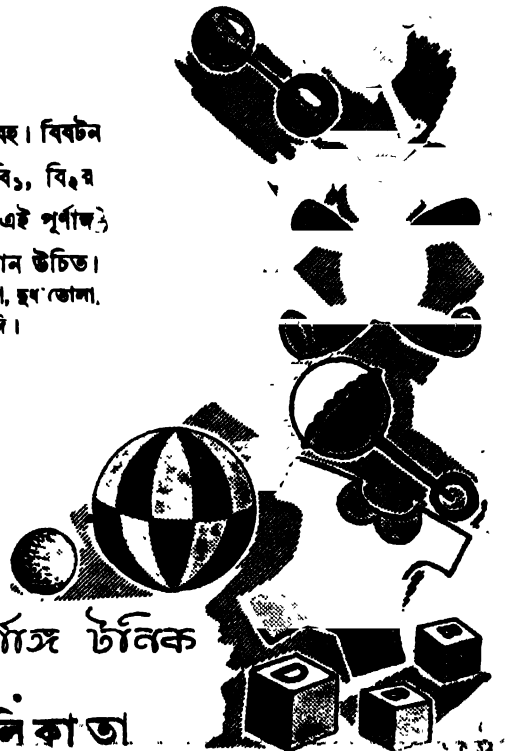
(১) ছোটদের রামায়ণ, (২) ছোটদের জাতক, (৩) ছোটদের ঈসপ, (৪) ছোটদের গ্রিম, (৫) ছোটদের রবিন-হুড—শ্রীতারাপদ রাহা। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা; (১) মূল্য ৸৹, ২, ৩, ৪, ৫, প্রত্যেকখানির মূল্য ৷৹।

প্রথম ভাগ শেষ করেই শিশুগণ যাতে সহজেই নানারকম চিত্তাকর্ষক গল্পের বই পড়ে অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারে সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার এই যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত বইগুলি লিখেছেন। গল্পগুলি শিশুবোধ্য সহজ ও চিত্তহারী ভাষায় লিখিত। উৎকৃষ্ট কাগজ, বহু একরঙা ও রঙীন ছবি এবং সুন্দর সচিত্র মলাট বইগুলিকে বিশেষ লোভনীয় করেছে।

ছোটদের প্রথম ভাগ—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা। বোর্ড বাঁধাই, মূল্য ৸৹।

বইখানিতে দুটি নূতন জিনিষ দেখা যায়। প্রথমতঃ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাংলা বর্ণমালা শেখবার ও লেখবার সুবিধার জন্ম একটা অক্ষর থেকে কেমন করে দুটো তিনটে এমন কি পাঁচটা সাতটা পর্য্যন্ত অক্ষর রূপান্তর গ্রহণ করেছে, বড় বড় অক্ষর সাজিয়ে কয়েক পৃষ্ঠায় তাই দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, পুস্তকের শেষে কাগজের থলির মধ্যে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের অক্ষর এবং ইকার-উকার মাত্রাক্ষরগুলি আলাদা আলাদা কেটে পুরে রাখা হয়েছে। এইগুলি চিনে ও সাজিয়ে শিশুরা যথেষ্ট আমোদ পাবে, সঙ্গে সঙ্গে বানানও ভালরূপে শিখে নিতে পারবে। প্রচুর উৎকৃষ্ট চিত্র ও ঝরঝরে টাইপে ছাপা প্রশংসনীয়।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

পদ্মদীঘির বেদেনী—শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ২৸৹।

'কল্লোলে'র যুগে যে কয়জন তরুণ কথাসাহিত্যিকের রচনায় শক্তির পরিচয় পাইয়া পাঠক-সম্প্রদায় তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ তাঁহাদের অন্যতম। দীর্ঘকাল সাহিত্যক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া তিনি পুনরায় অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ রচনাসম্ভার লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে পূর্ব্ববঙ্গের সমাজ-জীবনের নীচুতলার একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক উদ্ঘাটিত হইতেছে।

নদীমাতৃক দেশ পূর্ব্ববঙ্গের বেদেরা যাযাবর-সম্প্রদায়। বিচিত্র তাহাদের জীবনধারা। সারা জীবন তাহারা নৌকায় নৌকায় ঘুরিয়া বেড়ায়—গ্রামে গ্রামে গৃহস্থদের বাড়ীতে গিয়া দেখায় সাপের খেলা, কোথাও তাহারা ঘর বাঁধে না। জাতিতে তাহারা মুসলমান, কিন্তু একান্ত ভক্তিভরে মা মনসার পূজারতি করে। এই বেদে-সম্প্রদায়ের এক দম্পতি - ময়না আর তার স্বামী - এক শ্যামল পল্লীর ক্রোড়ে ভগ্নজীর্ণ, পরিত্যক্ত শ্রীহীন, নির্ব্বংশ জমিদার-বাড়ীর নিকটে পদ্মদীঘির তীরে আসিয়া নীড় বাঁধিল। কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে ময়নার স্বামী অকালে মরিল সর্পাঘাতে। তার পর পদ্মদিঘীর সেই

নিঃসন্তান বেদেনীর জীবনে আবির্ভাব হইল বৈষ্ণব সাধু ভৈরবের। সাধু তাহাকে গেরুয়া বাস ধরাইল, দীক্ষা দিতে চাহিল বৈরাগ্যমন্ত্রে কিন্তু সন্তানহীনা বেদিনীর হৃদয়ে মাতৃত্বের নিদারুণ বুভুক্ষা—তাহার কণ্ঠে আকুল স্বরে ধ্বনিয়া উঠিল—"তুই হামাকে একটি ছেলে দে গোঁসাই।" ভৈরব কিন্তু পাষাণ-দেবতার মত নির্বিকার। নারীর এই আকুল আকুতি তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না—একতারাটি হাতে লইয়া সে পাড়ি জমাইল অজানার উদ্দেশ্যে।—ইহাই পদ্মদীঘির বেদেনীর সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

কাহিনী-বর্ণনায় স্থানে স্থানে অস্বাভাবিকত্ব এবং অসঙ্গতি থাকিলেও লেখক যে শক্তিমান সে পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ রাজাসাহেবের বজরে পানোন্মত্ত বেদে ও বেদেনীদের ভোগলালসা পঙ্কিল উৎসব-রজনীর যে বর্ণনাটি লেখক দিয়াছেন তাহা একেবারে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের প্রকৃতি-বর্ণনার হাত বড় মিঠা। এই উপন্যাসে পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীঅঞ্চলের একটি অপূর্ব্ব ছবি লেখকের তুলিকায় নিপুণভাবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। বনজঙ্গলবেষ্টিত কচুরিপানার পরিপূর্ণ বিরাট পদ্মদীঘি যেন পাঠকের চোখের সামনে মায়াজাল বিস্তার করে।

ত্রিলোচন কবিরাজ—রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

অকালে পরলোকগমন করিলেও রবীন্দ্র মৈত্র বাংলা কথা-সাহিত্যে স্বকীয় প্রতিভার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। যেমন করুণ রসের অবতারণায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন তেমনি ব্যঙ্গ রচনায়ও তাঁর জুড়ি ছিল না। 'ত্রিলোচন কবিরাজ' একখানি গল্পের বই। ইহাতে ত্রিলোচন কবিরাজ, অল ষ্টার ট্র্যাজেডি, নারী নির্যাতন, জোয়ার, সংস্কারক, একটি আধুনিক গল্প, শেষ পৃষ্ঠা এই কয়টি গল্প স্থান পাইয়াছে। প্রায় সব কয়টি গল্পই ব্যঙ্গরসাত্মক, কিন্তু শুধু ব্যঙ্গই গল্পগুলির একমাত্র উপজীব্য নয়। কাহিনীর ভিতর দিয়া লেখক মানুষের ভণ্ডামি, ন্যাকামি ইত্যাদিকে তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন।

এই সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ এবং অপূর্ব্ব গল্প জোয়ার। দাম্পত্য কলহকে কেন্দ্র করিয়া গল্পটি রচিত। গল্পটি রসপ্রাচুর্য্যে টলটল করিতেছে। স্বামী-স্ত্রীর কলহের অবসানে যে ভাবে তাহাদের পুনর্ম্মিলন ঘটানো হইয়াছে তাহাতে অভিনবত্ব আছে। রবীন্দ্র মৈত্রের চোখ ছিল হিউমারিষ্ট বা হাস্য-রসিকের চোখ। অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ঘটনার মধ্যেও যে একটা কৌতুকের দিক থাকে তাহা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না। গুরুগম্ভীর বিষয়ের বর্ণনা করিতে করিতে একটি মাত্র উপমায় বা সামান্য দুটি হাল্কা কথায় কৌতুকরসের অবতারণা দ্বারা contrast সৃষ্টির যে রীতি রবীন্দ্র মৈত্রের শেষের দিকের রচনা, বিশেষতঃ ঘৃতকুম্ভকে একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল 'মোহিয়ার' গল্পটিতে তার আভাস পাওয়া যায়। গল্পের উপ-সংহারটি লেখনীর উপর লেখকের অসাধারণ সংযম এবং মাত্রাবোধের পরিচায়ক।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

মহাচীন—শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়। বীণা লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃ. ৮+২৪০। মূল্য চারি টাকা।

মহাচীনের অন্তর্দ্বন্দ্বের ছেদ সম্প্রতি অনেকটা টানা হইয়াছে। 'অনেকটা' বলিতেছি এইজন্য যে বাহিরের বিদেশীর চেষ্টায় যে উহা পুনরায় জাগরিত হইতে পারে এরূপ সম্ভাবনা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এই মহাচীনের কথা জানিবার জন্য উৎসুক নয়, এরূপ লোক বিরল। সংস্কৃতি ও ধর্মের দিক হইতে ভারতবাসী আমরা চীনাদের আত্মীয় বলিয়া মনে করি। এখানে চীনের কথা জানিবার আকাঙ্ক্ষা থাকা তো স্বাভাবিক। সুধাংশুবিমলের এই পুস্তকখানি পাঠকের জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবে, এবং নূতন অনুসন্ধিৎসারও উদ্রেক করিবে। মহাচীনের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্ম্ম ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় নানা তথ্যে ইহা সমৃদ্ধ। চীনের পুরাতন ইতিহাস অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। আধুনিক চীনের কথাই ইহাতে বিশেষভাবে লেখক বলিয়াছেন। চীনের আভ্যন্তরিক ইতিহাস, পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে তাহার যোগ, পাশ্চাত্ত্য কূটনীতির ছলাকলায় তাহার আর্থিক ও সামাজিক অবনতি, এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার হানি, মাঞ্চুরাজের নির্য্যাতন—এসকল মিলিয়া যে এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, যুগমানব সান-ইয়াৎ-সেনের কর্ম্মকুশলতায় তাহা অনেকাংশে বিদূরিত হয় এবং চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সান-ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পর চীনের নেতৃত্ব চিয়াংকাইশেকের হস্তে পতিত হইলে অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ তাহা ভীষণাকার ধারণ করে। ১৯৩৭ সনে জাপান কর্তৃক চীন আক্রান্ত হইলে চিয়াংপন্থী জাতীয় দল এবং মাও-সে-তুং ও চু তে প্রমুখ সাম্যবাদীরা একত্র হইয়া তাহা প্রতিরোধ করিতে থাকে। গত মহাযুদ্ধেও এই মিলন বজায় ছিল। কিন্তু মহাসমর অন্তে আবার অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। গত কয়েক বৎসরের যুদ্ধবিগ্রহের ফলে সাম্যবাদীরা বর্ত্তমানে চীনের শাসনতন্ত্র দখল করিয়া লইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিবৃত করা সম্ভব হয় নাই, তথাপি পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়ই সরল ভাষায় লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। এখানি পাঠে পাঠকের জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে। পুস্তকখানি সচিত্র।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দেশ-বিদেশের কথা

চারুচন্দ্র ঘোষ

অখণ্ড বঙ্গের রেশম বিভাগের প্রাক্তন উপ-অধিকর্ত্তা (Dy. Director of Sericulture) চারুচন্দ্র ঘোষ, বি. এ., এফ, আর. ই. এস (লণ্ডন) মহাশয়ের পরলোকগমনে বাংলাদেশের বিশেষ ক্ষতি হইল। ঘোষ মহাশয় বাঁকুড়া জেলায় এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায়-গুণে কর্ম্মজীবনে সবিশেষ খ্যাতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুষা কৃষি-গবেষণাগারে কীটতত্ত্ব বিষয়ে একজন সাধারণ সহকারীরূপে তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। তিনি ভারতীয় কীটপতঙ্গ বিশারদ সুপ্রসিদ্ধ কীটতত্ত্ববিদ্ ম্যাক্সওয়েল লেফ্রয়ের সহকারী হিসাবে কাজ করিবার সুযোগ লাভ করেন এবং পরবর্ত্তী কালে কীটতত্ত্ববিদ্‌রূপে প্রভূত যশ অর্জ্জন করেন। ব্রহ্মদেশে কৃষি-বিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ববিদ্‌রূপে কাজ করিবার সময় তিনি ব্রহ্মদেশে রেশম-শিল্পের উন্নতি-সাধনে ও প্রসারে সমর্থ হন। পরবর্ত্তীকালে তিনি জাপান, ফ্রান্স, ইটালি, আমেরিকা এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া তত্তদ্দেশীয় রেশম-শিল্প বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জ্জন করেন এবং অবশেষে ভারত-সরকারের আনুকূল্যে "জাপানের রেশম শিল্প" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি ১৯৩৬ সালে বঙ্গীয় রেশম বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত হন। তাঁহার চেষ্টায় বাংলায় রেশম-শিল্পের বিভিন্ন বিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

তাঁহার কার্য্যকালে কেন্দ্রীয় রেশম-শিল্প গবেষণা বিদ্যালয় এবং কলিকাতা রেশম-পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়। তাঁহার বাংলার সমস্যা", "জাপানের উন্নতি হইল কিরূপে", বাংলার "রেশম শিল্প", "ভারতে রেশম উৎপাদন ও বয়ন" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি সুলিখিত।

ব্রজসুন্দর রায়

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ব্রজসুন্দর রায় ৭৫ বৎসর বয়সে দেহ-ত্যাগ করিলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ একজন একনিষ্ঠ সেবক হারাইল। শ্রীহট্টের বাণিয়াচঙ্গ গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিবার জন্য তাঁহাকে কৃচ্ছ্র সাধন করিতে হইয়াছিল। শিক্ষা যখন শেষ হইল এবং লোকে যাকে 'সুখের মুখ' বলে তাহা দেখিবার সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন আসিল বাঙালী জীবনে 'স্বদেশী'র বন্যা। ব্রজসুন্দর নীরবে তাহাতে অবগাহন করিলেন; রঙ্গপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ লইলেন। তার পর বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপকরূপে, কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপকরূপে, শিলং কীন কলেজের অধ্যক্ষরূপে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই। জীবনের শেষ ২।৩ বৎসর তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র, 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। নানা ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার সশ্রদ্ধ আলোচনা এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য ছিল।

নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত

বাঙালী সংস্কৃতির বন্ধু, বাংলা সাহিত্যের সেবক এই ব্যবসায়ীপ্রধান ৬৪ বৎসর বয়সে অনেক কর্ম্ম অপূর্ণ রাখিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। কর্ম্মজীবনে বাঙালী জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যাপক চেষ্টা তাঁহার ছিল, আবেগ ছিল অফুরন্ত। সেই আবেগের প্রেরণায় তিনি বঙ্গভাষা প্রচার সমিতির একজন মুক্তহস্ত পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার ব্যবসায়ে ক্ষতি হইয়াছে; অ-বাঙালী ব্যবসায়ীরা তাঁহার পথে নানা বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ আপনার জ্ঞান-বিশ্বাসের জোরে চলিয়া বৈষয়িক জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। কিন্তু অর্থ তাঁহাকে নিজ প্রদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিস্তারে সক্ষম করিয়াছিল এবং এই প্রীতির জন্যই তাঁহার নাম বাঙালী সাহিত্যের অনুরাগীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। তাঁহার নিকট বাঙালীর ঋণ অপরিসীম।

শৈলেশ্বর সিংহ রায়

বিলীয়মান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একজন প্রতিভূ পশ্চিমবঙ্গ হইতে মৃত্যুর কোলে চলিয়া গেলেন। বর্দ্ধমান চকদীঘির জমিদার-পরিবারের শৈলেশ্বর সিংহ রায় ৫৬ বৎসর বয়সে গত ১১ই মাঘ তারিখে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯২৬ হইতে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত তিনি পুরাতন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন; প্রায় ২৫ বৎসর তিনি বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডের সভ্য ছিলেন; আলীপুর চিড়িয়াখানার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার নানা উন্নতি-বিধায়ক কার্য্যে তাঁহার নীরব নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়; প্রাচীন আভিজাত্যের যে একটা সামাজিক দায়িত্ববোধ ছিল, শৈলেশ্বর সিংহ রায়ের চরিত্রে তাহা ছিল দেদীপ্যমান। তাঁহার পিতা শ্রীমণিলাল সিংহ রায় প্রায় ৪০ বৎসর বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডের কর্ণধার ছিলেন; শৈলেশ্বর ছিলেন তাঁহার সর্ব্ব-কার্য্যের সহায়ক। পিতা ৮৩ বৎসর বয়সে বাঁচিয়া আছেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শাহ্‌জাহানের দরবারে পারস্য-দূত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

দূরের যাত্রী (ব্রোঞ্জ)
ভাস্কর—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

দূরের যাত্রী (ব্রোঞ্জ)
ভাস্কর—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"
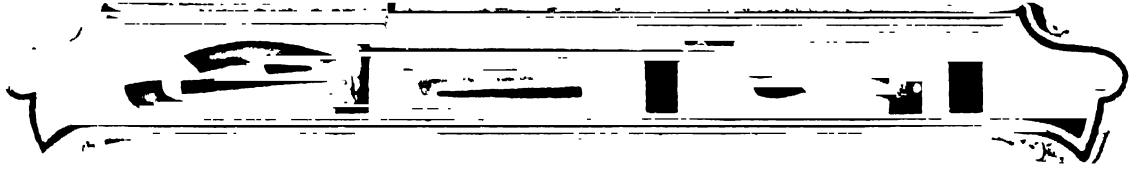
৪৯শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৫৬

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাস্তব ও অবাস্তব যুদ্ধ

অল্পদিন পূর্ব্বে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দাবি প্রবলভাবে উঠিয়াছিল। জনসাধারণের পক্ষ হইতে যুদ্ধের দাবি ইতিহাসে খুব কম আছে। পূর্ব্ববঙ্গে প্রায় সওয়া কোটি হিন্দু নরনারী যে বিভীষিকা ও অপমানের মধ্যে বাস করিতেছেন তাহাতে বাংলার ও ভারতের মন চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে এবং বাঙালী মানবতার অপমানের প্রতিকারকল্পে যুদ্ধ চাহিতেছে।

যুদ্ধের দাবী ও যুদ্ধের আহ্বান যে কি বস্তু তাহা দীর্ঘ তিন-চার শতাব্দীর দাসত্বে আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি। সুতরাং বর্ত্তমানে যে আবেগ আলোড়নের মধ্যে "যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ চাই" বলিয়া চিৎকার উঠিয়াছে তাহা অবাস্তবের পর্য্যায়ে পড়িতেছে।

যুদ্ধের আহ্বান আসিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝা যায় কে লড়িবে কাহার সঙ্গে। "যুদ্ধ ঘোষণা কর" এই চিৎকার তখনই বাস্তব রূপ গ্রহণ করে যখন আহ্বানকারী বলে "আমি লড়িব" বা "আমি পুত্র, পাত্রমিত্র, আত্মীয়স্বজন লইয়া যুদ্ধে নামিব।" এরূপ না হইলে সে যুদ্ধের আহ্বান অবাস্তব। যিনি যুদ্ধ ঘোষণা চাহিতেছেন তাঁহার সেই সঙ্গেই বলা প্রয়োজন যে যুদ্ধের অনলে তিনি কি আহুতি দিতে প্রস্তুত আছেন ; নহিলে তাঁহার সে আবেগ বৃথাই যাইবে। বাঙালীরই আত্মীয়-স্বজন ভীষণ বিপদে পড়িয়াছে, তাহাদের যাতনার আর্ত্তনাদ আমাদের হৃদয়েই বিঁধিয়াছে বেশী, কিন্তু যুদ্ধের দাবিতে দেখিতেছি যেন আমরা চাই আমাদের হইয়া মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রীয়, রাজপুত, শিখ, পঞ্জাবী, বিহারী ও হিন্দুস্থানী বাঙালীর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে নামে।

যদি দেখিতাম যুদ্ধের আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে শত-সহস্র বাঙালী যুবক সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইতে চলিয়াছে, যদি দেখিতাম বাংলার রক্ষীদলে অস্ত্রশিক্ষা ও যুদ্ধশিক্ষার জন্য হাজারে হাজারে ছেলের দল চলিয়াছে, তবে বুঝিতাম এই "যুদ্ধ চাই" কলরবের পিছনে পৌরুষ আছে, ক্ষাত্রধর্ম্মের উদ্দীপনা আছে। সেরূপ অবস্থার অভাবে আমরা বুঝিতে বাধ্য যে এই যুদ্ধের আহ্বান বাঙালীর আকুল হৃদয়ের অবাস্তব উচ্ছ্বাসমাত্র। যুদ্ধ এভাবে হয় না ও হওয়া উচিতও নয়।

যুদ্ধের জন্য যে প্রস্তুতি প্রয়োজন তাহার দিকে বাঙালী যুবকদিগের মন দিতে না দেখিয়া আমরা কিন্তু আশ্চর্য্য হইতেছি। রক্ষীবাহিনীতে শিক্ষালাভের সুযোগ যুবকেরা গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না। স্থিরবুদ্ধি লোকমাত্রেই জানেন যে, প্রস্তুত না হইয়া যুদ্ধে নামা পরম অনিষ্টকর হইবে। যুদ্ধ করিতে আন্তর্জ্জাতিক জটিলতা সৃষ্টি হইবে। পূর্ব্ববঙ্গ দখলে হয়ত বেশী সময় না লাগিতেও পারে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। তখন আবার যুদ্ধের রক্তপ্লাবনের সঙ্গে সঙ্গেই ইন্‌ফ্লেশন, কণ্ট্রোল, মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি যুদ্ধকালীন নানা-বিধ অসুবিধা দেখা দিবে। তার উপর আছে আভ্যন্তরীণ পাকিস্থানী ও কম্যুনিষ্টদের অরাজকতা সৃষ্টির ভয়। যুদ্ধে নামিতে হইলে সমস্ত দিক যত্ন সহকারে বিবেচনা ও বিচার করিতে হইবে। কাজেই ইহা সময়সাপেক্ষ। পাকিস্থান নিজে যদি যুদ্ধ আরম্ভ করে তাহা হইলে দেশরক্ষার আয়োজন কি হইবে তাহাও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কাশ্মীরে বরফ গলার পর পাকিস্থান যদি আবার সেখানে যুদ্ধ আরম্ভ করে, যুদ্ধ বিরতির সর্ত্ত যদি ভঙ্গ করে তবে হয়ত ভারতবর্ষকে পঞ্জাব ও পূর্ব্ববঙ্গে তার জবাব দিতে হইতে পারে। পণ্ডিতজী বিনা কারণে কাশ্মীর ও পূর্ব্ববঙ্গকে এক সূত্রে গাঁথেন নাই। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন হইলে প্রস্তুতির প্রয়োজন, আমরা কি তাহা করিতেছি ?

আমাদের হাতে যুদ্ধ ছাড়াও বড় অস্ত্র আছে, উহা হইতেছে 'ইকনমিক্ স্যাংসন' অর্থাৎ আর্থিক অবরোধ। পাকি-স্থানকে অনেক জিনিষের জন্য ভারতের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। কাঁচা পাট ও তুলা বিদেশে বেচিয়া তাহারা এমন বৈদেশিক মুদ্রা পায় না যাহা দ্বারা ভারতবর্ষকে বাদ দিয়া তাহারা চলিতে পারে। এ কথাও বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখা দরকার। ইহা ভিন্ন আমাদের হাতে আছে পশ্চিম পঞ্জাবের জল সেচের দুইটি প্রধান মুখ, পাকিস্থান-পঞ্জাবের উত্তর অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহের মুখ এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকি-স্থানের চলাচলের জলপথ ও আকাশ-পথ।

পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা এখন একটি সর্ব্বভারতীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু ইহাকে কাশ্মীর সমস্যার সহিত সমান পর্য্যায়ের বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে পূর্ব্ববঙ্গের ব্যাপারের প্রতি আমাদের সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। একমাত্র ঢাকার ঘটনার পর তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গে গোলযোগের যে বিবরণ দিয়াছিলেন, তাহাই পূর্ব্ববঙ্গের শোচনীয় অবস্থা বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতির পর ফেণী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা হইতে যে সমস্ত হত্যা, লুণ্ঠন, নারী-হরণ ও ট্রেন আক্রমণের সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ হইতেছে যে হয় পূর্ব্ববঙ্গ গবর্মেণ্ট সেখানে শান্তিরক্ষায় একেবারে অক্ষম, নতুবা বর্ত্তমান অত্যাচারের পিছনে তাঁহাদের পরোক্ষ সমর্থন রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে যাহা ঘটিয়াছে তাহা সরকারী প্রেস নোটে প্রকাশিত হইতেছে এবং আমরা ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের সহিত মিলাইয়া দেখিতে পাইতেছি যে প্রেস নোটে সত্য কথাই বলা হইয়াছে। প্রেস নোট সম্বন্ধে বরং হিন্দুদের অভিযোগ আছে যে তাহাদের উপর বেশী করিয়া দোষারোপ হইয়াছে, মুসলমানদের অন্যায় কার্য্যের উল্লেখ প্রেস নোটে কম আছে। পার্ক সার্কাসের ঘটনা সম্পর্কিত প্রেস নোট ইহার নিদর্শন; সেখানকার গোলযোগের দিন হিন্দু-বাড়ীতে যেমন বোমা পাওয়া গিয়াছে, তেমনি মুসলমান বাড়ী হইতে অস্ত্র উদ্ধার হইয়াছে; কিন্তু প্রথমটির উল্লেখ প্রেস নোটে আছে, শেষেরটির উল্লেখ নাই।

পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্টের প্রেস নোটের সহিত যেমন সত্য সংবাদের অমিল খুব কম, পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের প্রেস নোট তার বিপরীত, উহার সহিত সত্যের সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। অন্ততঃ প্রকাশিত সংবাদের সহিত পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের প্রেস নোটের কোনই মিল নাই। পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মৌলবী নুরুল আমীন সেখানকার ঘটনাবলী সম্পর্কে ১০ই মার্চ্চ পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে যে দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন তাহার পূর্ণ বিবরণ "পাকিস্থান অবজার্ভার" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গের ঘটনাবলী চাপা দিবার এবং উহার দায়িত্ব ভারতের উপর চাপাইবার যে অপপ্রয়াস পাকিস্থানে চলিতেছে, এই বিবৃতি তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের প্রেস নোট এখানে বিশেষ পাওয়া যায় নাই, পূর্ব্ববঙ্গ প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতেই সমস্ত ঘটনার সরকারী বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। মৌলবী আমীনের প্রধান বক্তব্য এই :

(১) বৎসরাধিক কাল যাবৎ 'মাইনরিটি প্রটেকসন কাউন্সিল' পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের কাল্পনিক দুর্দশার কাহিনী প্রচার করিতেছে; পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রসমূহের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াইতেছে, ভারত বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে বহুবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছে, ডিসেম্বর নাগাদ এই কাউন্সিল ও হিন্দু মহাসভা রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে এবং ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটাইয়াছে।

(২) সেপ্টেম্বর মাস হইতে পূর্ব্ববঙ্গ গবর্মেণ্টের বারম্বার অনুরোধ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট তাহাদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটি আইন প্রয়োগ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন (flatly refused)।

(৩) ভারতবর্ষ সেকুলার ষ্টেট বা ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে দিতে পারে না এই কারণে পূর্ব্ববঙ্গ গবর্মেণ্ট আন্তঃ-ডোমিনিয়ন চুক্তি অনুসারে হিন্দু মহা-সভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টকে চাপ দিয়াছে কিন্তু ফল তো হয়ই নাই বরং তাহাদের পাকিস্থান-বিরোধী ও মুসলিম-বিরোধী প্রচারকার্য্য সভা ও সংবাদপত্র মারফত চালাইতে দেওয়া হইয়াছে।

(৪) ২৪শে ডিসেম্বর কলিকাতায় হিন্দু মহাসভার সম্মেলন হয় এবং তার পর হইতে অখণ্ড ভারত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বলপূর্ব্বক পাকিস্থান-দখল এবং ভারতীয় মুসলমানদের "জাতীয়করণের" (nationalisation) কথা ঘোষিত হইতে থাকে। ইহাতে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম-বিরোধী মনোভাব বাড়ে।

(৫) ১৫ই জানুয়ারী সর্দ্দার প্যাটেল কলিকাতার বক্তৃতায় মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং ১৯৪৬ সালের কলিকাতা দাঙ্গা সম্বন্ধে অত্যন্ত অসন্তোষজনক মন্তব্য করেন এবং বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের সীমারেখা কৃত্রিম; পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত হইতে পূর্ব্ববঙ্গের "ভ্রাতাদের" "সাহায্যে" লোক গেলে তিনি বাধা দিতে পারিবেন না। সর্দ্দার প্যাটেলের মনোভাবকে রূপ দেওয়ার জন্য সম্পাদকীয় মন্তব্য, প্রাচীরপত্র, পুস্তিকা প্রভৃতি আবির্ভূত হয়।

(৬) ২০শে ডিসেম্বর বাগেরহাটের ঘটনা ঘটে, উহা সাম্প্রদায়িক নহে, পুলিশের সহিত কম্যুনিষ্ট প্রভাবান্বিত জনতার সংঘর্ষ। সর্দ্দার প্যাটেলের বক্তৃতার পর ১৮ই জানুয়ারী আনন্দবাজার ও যুগান্তর পত্রিকায় বাগেরহাটের ব্যাপার লইয়া সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। এই ঘটনা যদি সত্যই সাম্প্রদায়িক হইয়া থাকিবে তবে এক মাস তাঁহারা চুপ করিয়া রহিলেন কেন?

(৭) এইভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া হিন্দু মহাসভা এবং মাইনরিটি প্রটেকসন কাউন্সিল ২৪ পরগণা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় হাঙ্গামা আরম্ভ করায়। ১৯শে জানুয়ারী বনগাঁয়

মসজিদ অপবিত্রকরণ প্রভৃতি ঘটে। ২১শে জানুয়ারী জে পি মিত্র স্বয়ং বনগাঁর মহাসভা ও তাঁহার কাউন্সিলের একটি মিলিত সভায় বক্তৃতা করেন। ২৪শে জানুয়ারী বহরমপুরে মহাসভা একটি বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান করে। এই সভার পরেই হিন্দুরা গোরাবাজারের মুসলমানদের আক্রমণ করে। ২৬শে জানুয়ারী উল্টাডাঙ্গা, বেলিয়াঘাটা ও মাণিকতলায় অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ২৯শে জানুয়ারী বাটানগরে মাইনরিটি কাউন্সিল সভা আহ্বান করে। ৫ই ফেব্রুয়ারী সেখানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়।

(৮) জানুয়ারীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বাগেরহাটের ঘটনা লইয়া কিরূপ প্রচার কার্য্য চলিয়াছে পূর্ব্ববঙ্গ গবর্মেণ্ট তাহা জানিতে পারে নাই। ৩রা ফেব্রুয়ারী বাগেরহাটের ঘটনার বিবরণ দিয়া আমরা প্রেস নোট বাহির করি। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ বিধান রায় উহার তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন যে আমাদের প্রেস নোটটি—যাঁহারা ঘটনা ভাল করিয়া জানেন না তাঁহাদের ফাঁকি দেওয়ার জন্য প্রচারিত হইয়াছে।

(৯) ৬ই ফেব্রুয়ারীর প্রেস নোটে পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট প্রথম স্বীকার করিলেন যে সেখানে ব্যাপকভাবে হাঙ্গামা হইয়াছে। তবে এই প্রেস নোটে বলা হয় যে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উত্তেজনা দেওয়াতেই ঐরূপ ঘটে। ইহার ফলে কলিকাতা এবং উহার কারখানা অঞ্চলে দুই দিন পরে ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ব্যাপকভাবে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আরম্ভ হয়।

(১০) পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট ইহার পরেও প্রেসনোটে এমন সব কথা বলেন যাহাতে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সুবিধা হয়। ৮ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে ডাঃ রায় বলেন—"অসুবিধা এই যে পূর্ব্ববঙ্গে যে ঠিক কি ঘটিতেছে তাহা জানা যাইতেছে না, তবে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে লোক আসার মত (৩০ হাজার বনগাঁয়ে ইতিমধ্যেই আসিয়াছে) এবং এখানে মাইনরিটিদের ভীত হওয়ার মত কোন কোন ঘটনা সেখানে ঘটিয়াছে।" অথচ এই দিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থানে একটিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে নাই।

আসাম হইতে ৫ লক্ষ মুসলমান বিতাড়নের প্রস্তাবে পূর্ব্ববঙ্গে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জানুয়ারীর শেষের দিকে করিমগঞ্জ হইতে বহু অস্বস্তিকর সংবাদ আসে। ৩রা ফেব্রুয়ারী লামডিং-এ মুসলমান যাত্রীরা আক্রান্ত হয়।

(১১) এই অবস্থায় ৯ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় উভয় বঙ্গের চীফ সেক্রেটারীদ্বয়ের সাক্ষাৎকার হয়। তাঁহাদের মধ্যে যে চুক্তি হয় পূর্ব্ববঙ্গের সংবাদপত্রগুলি তাহা পালন করে এবং পশ্চিমবঙ্গের পত্রিকাগুলি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে।

(১২) ১০ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় দাঙ্গা আরম্ভ হয়। ভারত বিভাগের পর পূর্ব্ববঙ্গে ইহাই প্রথম দাঙ্গা। পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম হইতে উৎপীড়িত মুসলমানেরা ঢাকা আসার পর উত্তেজনা জন্মে। যে দিন দাঙ্গা আরম্ভ হয় সেই দিনই সন্ধ্যায় ইষ্ট পাকিস্থান রাইফেল, সশস্ত্র পুলিশ এবং মিলিটারীর চেষ্টায় অবস্থা আয়ত্তে আসে। কারফিউ জারী হয় এবং বদলোকদের গ্রেপ্তার করা হয়। ১০ হাজার লোককে আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে সরানো হয়। পরের দুই দিন সামান্য দুই চারিটা ঘটনা ঘটে। ঢাকায় আসা যাওয়ার পথে ট্রেন আক্রান্ত হয়। সমস্ত ট্রেনে সশস্ত্র প্রহরী দেওয়া হয়। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে মিলাইয়া মোট নিহতের সংখ্যা ১৯৮ এবং আহত ২২৩। পুলিশ ২২ বার গুলি চালায় এবং ১২৬৮ জনকে গ্রেপ্তার করে। বহু বাড়ী তল্লাসী হয় এবং লুণ্ঠিত সম্পত্তির খুব বড় অংশ (very substantial part) উদ্ধার হয়। অভূতপূর্ব্ব দ্রুততার সহিত ঢাকার গোলযোগ আয়ত্তে আসে।

(১৩) ১৩ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার বাহিরে ফেণী, বরিশাল, চট্টগ্রাম, জামালপুর এবং শ্রীহট্টে গোলযোগ হয়। উভয় ক্ষেত্রেই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে বাহির হইতে আগত এজেণ্ট প্রভোকটোরেরা লোককে উত্তেজিত করিয়া দাঙ্গা বাধাইয়াছে। বরিশালে ৮টি গৃহদাহ হয়, তন্মধ্যে প্রথম আগুন লাগে সরকারী শস্যের গুদামে। ১৪ জন ছুরিকাহত হয়। ১৬ই হইতে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ঝালকাঠি ও নলচিটিতে লুঠ, গৃহদাহ ও আক্রমণ হয়। ১৪ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামে ৭ জন ছুরিকাহত হয় ও ৪টি গৃহদাহ হয়। ফেণীতে ৪০০০ হিন্দুকে বিপজ্জনক এলাকা হইতে সরাইয়া ফেলায় বিশেষ কিছু হয় নাই। ১৩ই হইতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত করিমগঞ্জ হইতে ২০,০০০ বাস্তুহারা আসায় শ্রীহট্টে উত্তেজনা দেখা দেয় কিন্তু বিশেষ কিছুই ঘটে নাই।

(১৪) ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভৈরবে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী সান্তাহারে ট্রেণ আক্রান্ত হয়।

(১৫) ঢাকার বাহিরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১১৫, তন্মধ্যে ৩১ জন মারা গিয়াছে।

(১৬) ভারতে পাকিস্থান-বিরোধী প্রচারকার্য্য চরমে ওঠে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পার্লামেণ্টে পণ্ডিত নেহরুর বিবৃতিতে। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের ঘটনার একটি অতিশয় অতিরঞ্জিত বিবরণ দান করেন।

(১৭) জলপাইগুড়ি, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বনগাঁ ও কলিকাতা হইতে পূর্ব্ববঙ্গে ৩৮৩৪০ জন বাস্তুহারা আসিয়াছে; কাছাড় হইতে শ্রীহট্টে আসিয়াছে ২৩,১১৫ এবং গোয়ালপাড়া হইতে রংপুরে আসিয়াছে ৫৪,৫৬৯। ইহা ছাড়া হাঁটা পথে আরও বহু সহস্র আসিয়াছে।

(১৮) মৌলবী নুরুল আমীন বলিতেছেন, "১৩ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় দাঙ্গার আগে ডাঃ রায় আমাকে অত্যন্ত চাপ দিয়া লেখেন যে কলিকাতার মাণিকতলা এলাকা হইতে প্রায়

১৫০০০ লোককে এক সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে সরাইয়া লওয়া উচিত। তিনি বলেন যে উহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছে এবং এই অবস্থায় সেখানে থাকিলে উত্তেজনার কারণ বিদ্যমান থাকিবে। ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারও এই মর্ম্মে আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে বলেন।" দুর্ভাগ্যের বিষয় সমস্ত লোক সরাইয়া দেওয়ার ঝোঁক এখনও রহিয়াছে (unfortunately that emphasis on wholesale evacuation still continues.)

(১৯) পূর্ব্ববঙ্গের চতুর্দ্দিকে লৌহ যবনিকা তুলিয়া রাখার মিথ্যা অভিযোগ করা হইয়াছে।

(২০) পণ্ডিত নেহরুর "ভিন্ন পন্থা"র ঘোষণা মহাসভা-পন্থীদের মনে মিথ্যা আশা জাগাইয়াছে এবং প্রকাশ্যে যুদ্ধের দাবী করা হইতেছে। পাকিস্থান যুদ্ধ চায় না কিন্তু ভারতবর্ষ যদি চায় তবে সে পাকিস্থানকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত দেখিতে পাইবে।

মৌলবী নুরুল আমীনের বিবৃতির যাথার্থ্য

মৌলবী নুরুল আমীনের বক্তব্য নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত অবস্থার সহিত মিলাইয়া বিচার করিলে দেখা যায় উহাতে পশ্চিমবঙ্গের ঘটনার নিতান্তই অতিরঞ্জন এবং পাকিস্থানের ঘটনা চাপা দিবার ও লঘু করিবার আগ্রহ সুপরিস্ফুট। তাঁহার প্রথম যুক্তি ভুল ইহা এখানে সকলেরই জানা; কলিকাতার রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাসভা বা মাইনরটি কাউন্সিলের কোন প্রভাব নাই বলিলেই হয়। যাঁহারা সাম্প্রদায়িক গোলযোগ ঘটাইবার চেষ্টা করেন নাই তাঁহাদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটি আইন নিছক একটি বৈদেশিক গবর্ন্মেণ্টের অনুরোধে কেহ প্রয়োগ করিতে পারে না। ভারতবর্ষ সেকুলার ষ্টেট এবং সে হিসাবে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গঠন এখানে বাঞ্ছনীয় নহে; কিন্তু ডেমোক্রাটিক রিপাবলিকে এরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে তাহা জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়াও সমান অন্যায় হইবে। সর্দ্দার প্যাটেলের কলিকাতার বক্তৃতা যেভাবে বিকৃত করিয়া তার কদর্থ করা হইয়াছে সর্দ্দারজী স্বয়ং তার জবাব দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার সময়েই মিঃ লিয়াকৎ আলি জবাবে মুখ খুলিয়াছিলেন কিন্তু তখনও তাহার এরূপ ব্যাখ্যা হয় নাই যেমন এখন আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার মুখে যে সমস্ত কথা চাপানো হইয়াছে তাহাও যে একেবারে কল্পিত ইহাও তিনি বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ লিয়াকৎ আলি সাহেবকে কলিকাতায় দশ হাজার মুসলিম নিধনের সংবাদ যে মিথ্যুকের দল দিয়াছিল সর্দ্দারজীর বক্তৃতাও তাহারাই রিপোর্ট করিয়াছে।

বাগেরহাটের ঘটনার প্রায় এক মাস পরে উহা কলিকাতায় প্রকাশিত হওয়ার একমাত্র কারণ এখানকার সংবাদপত্রসমূহের উত্তেজনা বন্ধ রাখিবার আগ্রহ। ব্যাপারটা প্রকাশ করিলে পাছে এখানে লোকে উত্তেজিত হয় এই আশঙ্কাতেই তাঁহারা উহা প্রকাশে বিরত ছিলেন। কিন্তু বাগেরহাট হইতে ৩০ হাজার বাস্তুহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে যখন মুখে মুখে উত্তেজনা ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করে তখনই সংবাদপত্রসমূহ সত্য সংবাদ প্রকাশ করিয়া গুজবের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য উহা ছাপাইয়াছিলেন। এক মাস দেরীতে ছাপার যে কদর্থ পাকিস্থানী প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি এবং পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী মৌলবী নুরুল আমীন করিতেছেন তাহা সত্য নহে। এই ধরণের সংবাদ বিলম্বে ছাপার কিরূপ প্রতিক্রিয়া পাকিস্থানে হয় তাহাও আমাদের সংবাদপত্রসমূহের লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। ডাঃ বিধান রায়ের প্রেস নোটেই বাগেরহাট ঘটনার প্রকৃত তথ্য প্রকাশ পায়।

বনগাঁয়ে জে. পি. মিত্রের কাউন্সিলের ও হিন্দু মহাসভার বৈঠক, তাহার সঙ্গে মসজিদ অপবিত্রকরণ ইত্যাদির সম্পর্ক এবং জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক গোলযোগের সংবাদ কত বড় বানানো তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ২৬শে জানুয়ারী ও উহার পরবর্ত্তী কয়েকদিন কলিকাতায় কম্যুনিষ্ট গোলযোগ ঘটিয়াছিল ইহা জানা কথা।

৬ই ফেব্রুয়ারীর প্রেসনোটে ব্যাপক হাঙ্গামার কথা কোথাও উল্লেখ নাই। মুর্শিদাবাদে ইতস্ততঃ যে কয়টি সামান্য ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার সত্য ও সঠিক সংবাদ আছে। কলিকাতায় প্রথম সাম্প্রদায়িক ঘটনা ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর সামান্য একটি ঘটনা। ৮ই ফেব্রুয়ারী মাণিকতলার ঘটনা ঘটে। ইহার মূলে ছিল মুসলমান কর্ত্তৃক একটি হিন্দু কনেষ্টবলের ছুরিকাহত হওয়া এবং একটি হিন্দু ভদ্রলোককে টানিয়া বস্তির মধ্যে লইয়া গিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া মসজিদ প্রাঙ্গনে কবর দেওয়া। ইহার পর জনতার উত্তেজনা প্রশমিত করিতে গবর্ন্মেণ্টকে বিষম বেগ পাইতে হয়। পূর্ব্ববঙ্গের ঘটনা সম্বন্ধে সঠিক সংবাদের অভাবে পশ্চিমবঙ্গে উত্তেজনা প্রশমন কঠিন হইতেছিল, এই কথা বলিয়া ডাঃ রায় সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। এই দিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গের কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নাই কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ফেণীর নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে হিন্দু দোকান লুণ্ঠিত হয় এবং বহু হিন্দু পলাইয়া আগরতলায় আশ্রয় লয়,এই সংবাদ ইউনাইটেড প্রেস-প্রচার করেন। ঘটনা কম ঘটিলেও একথা ঠিক যে ঢাকার ব্যাপারের অনেক পূর্ব্ব হইতে হিন্দুবাড়ী রিকুইজিসন, বেপরোয়া হিন্দু গ্রেপ্তার প্রভৃতির দ্বারা দাঙ্গার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইতেছিল। ভদ্র ও প্রভাবশালী হিন্দুদের হত্যা করিয়া গরীব ও অসহায়দিগকে ধর্ম্মান্তরিত করিবার যে সুপরিকল্পিত প্ল্যান নোয়াখালিতে দেখা গিয়াছিল এক্ষেত্রেও তাহাই দেখা গিয়াছে। ঢাকার ঘটনার পূর্ব্বে আজাদের দুই তিন সপ্তাহের প্রচারকার্য্য ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

চীফ সেক্রেটারীদ্বয়ের যুক্ত বিবৃতি প্রকৃতপক্ষে কাহারা

প্রথমে ভঙ্গ করিয়াছে তাহা অনুসন্ধানসাপেক্ষ। এ বিষয়ে পাকিস্থানের অভিযোগ বিশ্বাস করা যায় না।

ঢাকার দাঙ্গা পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম খুব বড় দাঙ্গা হইতে পারে কিন্তু ইহার আগেকার বাগেরহাটের ঘটনাকে উপেক্ষা করা যায় না। ঢাকা মেল আক্রমণকে তাঁহারা প্রথমটা অসাম্প্রদায়িক ডাকাতি শ্রেণীর ঘটনা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এখন বাগেরহাটের ব্যাপারটাতেও সেইরূপ রং চড়াইতে চাহিতেছেন। ঢাকা ও ঢাকার বাহিরের দাঙ্গায় হতাহতের যে সংখ্যা মৌলবী সাহেব দিয়াছেন তাহা অবিশ্বাস্য; এখানে সংবাদপত্রে নাম ঠিকানা দিয়া নিহতদের যে সমস্ত তালিকা প্রকাশিত হইতেছে তার সহিত উহার কোন মিল নাই। ফেণী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, জামালপুর ও শ্রীহট্টে এজেন্ট প্রভোকেটারেরা গোলমালের সূত্রপাত করিয়াছিল; ইহারা কাহারা এবং ধরা পড়িয়াছে কিনা মৌলবী সাহেব তাহা বলেন নাই।

নুরুল আমীন সাহেব বলিয়াছেন যে ভৈরবে ও সান্তাহারে ট্রেন আক্রান্ত হইয়াছে এবং ভারতে একমাত্র লামডিং ছাড়া আর কোথাও এরূপ হইয়াছে বলিয়া তিনি বলিতে পারেন নাই। ঢাকা-মেল আক্রমণের কথা তিনি একেবারে চাপিয়া গিয়াছেন এবং ঐ সব ট্রেন ছাড়া আরও বহু ট্রেন আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া এখানে সংবাদ আসিতেছে। পর পর এতগুলি ট্রেন আক্রমণ তাঁহারা সশস্ত্র প্রহরী দিয়াও নিবারণ করিতে পারেন নাই।

ঢাকার মোট নিহতের সংখ্যা ১৯৮ এবং তার বাহিরে মৃত্যুসংখ্যা মাত্র ৩১, ইহা একেবারে অবিশ্বাস্য।

আমাদের প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতিতে অতিরঞ্জন বিন্দুমাত্র নাই, বরং ঘটনা যথাসম্ভব লঘুর দিকে টানিয়াই তিনি বিবৃতি দিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম হইতে বেশী মুসলমান পাকিস্থানে গিয়াছে এইজন্য যে এখান হইতে যাওয়ার পথে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগমনের অবাধ গতি খুলিয়া দিলে তখন এ বিষয়ে তুলনা করা সম্ভব হইবে।

ঢাকার দাঙ্গার আগে ডাঃ রায় মাণিকতলার ১৫০০০ হাজার মুসলমানকে পূর্ব্ববঙ্গে লইয়া যাওয়ার জন্য পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রীকে বলিয়াছিলেন কিনা তাহা আমরা জানি না। এ বিষয়ে মৌলবী নুরুল আমীনের প্রকাশ্য বিবৃতির পর একটি প্রেস নোটে সত্য সংবাদ বাহির হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পূর্ব্ববঙ্গের চতুর্দ্দিকে লৌহ-যবনিকা সৃষ্টির কথা প্রমাণসহ পি. টি. আই নিজেই বলিয়াছেন।

পাকিস্থান যুদ্ধ চায় কিনা তাহার বিচারে দেখা যায় কাশ্মীরে তাহারাই যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, পাট বন্ধ করিয়া অর্থনৈতিক যুদ্ধ তাহারাই সুরু করিয়াছে এবং পূর্ব্ববঙ্গে অত্যাচার আরম্ভ করিয়া তাহারাই ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে বাধ্য করিতে চাহিতেছে। মৌলবী নুরুল আমীনের সুদীর্ঘ বিবৃতিতে নারীহরণের একেবারে কোনরূপ উল্লেখ নাই। ইহাতেই তাঁহার ওকালতির মূল তথ্য ধরা পড়ে।

বর্ত্তমান অবস্থায় লোকবিনিময়

লোকবিনিময়ের কথাটা খুব জোরের সঙ্গে উঠিয়াছে। এক দল লোকের যুক্তি এই যে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মুসলমান অধিবাসীসংখ্যা প্রায় আশি লক্ষের কাছাকাছি হইবে; উহাদিগকে পাকিস্থানে পাঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে হিন্দুদের লইয়া আসা হউক। পশ্চিবঙ্গ ও আসামের মুসলমানেরা চাষীশ্রেণীর লোক, পূর্ব্ববঙ্গে যে হিন্দুরা রহিয়াছে তাহারাও প্রধানতঃ তাই। সুতরাং উভয় পক্ষই যদি ঘরবাড়ীতে আগুন না দিয়া পরস্পর বদল করিয়া লয় তবে কেন লোকবিনিময় সম্ভব নহে? পাকিস্থানীরা বলিতেছেন লোকবিনিময় করিতে হইলে তাহা আংশিক হইলে চলিবে না, পাকিস্থানের সমস্ত হিন্দুর পরিবর্ত্তে ভারতের সমস্ত মুসলমান বিনিময় করিতে হইবে। ইহাতে পাকিস্থানকে সাড়ে তিন কোটি অতিরিক্ত লোক লইতে হয় বলিয়া তাঁহারা উহাদের জন্য আরও ভূমি দাবী করিয়াছেন। 'আজাদ' লিখিয়াছে যে লোকবিনিময় করিলে অতিরিক্ত সাড়ে তিন কোটি অধিবাসীর জন্য পাকিস্থানকে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম এবং পূর্ব্ব পঞ্জাবের একাংশ ছাড়িতে হইবে। লোকবিনিময় করিতে গেলে ভারতের সাড়ে চার কোটি মুসলমান ও পাকিস্থানের সওয়া কোটি হিন্দু এই পৌনে ছয় কোটি লোককে পৈত্রিক ঘরবাড়ী, জমিজমা, বিষয়-সম্পত্তি ফেলিয়া আসিয়া নূতন সংসার পাতিতে হইবে। উহা সুপরিকল্পিতভাবে করিতে গেলে সময়ের দিক দিয়াও অর্দ্ধ শতাব্দী লাগিবার কথা। সামর্থ্যের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। পাকিস্থান কর্ত্তৃক আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ব পঞ্জাবের অংশ দাবীর পক্ষে কোন যুক্তি নাই; কারণ তাঁহারাই দুই জাতি নীতি অনুসারে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান বাস করিতে পারে না বলিয়া পাকিস্থান চাহিয়াছিলেন এবং তাহা পাইয়াছেন। ভারতের সকল মুসলমানকেই পাকিস্থানে লওয়ার কথা ছিল কিন্তু তাহা না করিয়া অখণ্ড ভারতের প্রায় অর্দ্ধেক মুসলমানকে ভারতেরই ঘাড়ে চাপাইয়া রাখা হইয়াছে। ভারতবর্ষ সেকুলার ষ্টেট বলিয়া মুসলমানদের তাড়ায় নাই কিন্তু পাকিস্থান ভারতের সমগ্র মুসলমানের বাসভূমি হিসাবেই দাবী করা হইয়াছিল। বাস্তব দিক দিয়া এই কথা বলা যায় যে পাকিস্থান যেভাবে কিস্তিতে কিস্তিতে হিন্দুদের তাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতের মুসলমানদের বুনিয়াদ ক্রমশঃই শিথিল হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষকে যদি পাকিস্থানের হিন্দুর জন্য স্থান করিয়া দিতেই হয় তখন ভারতীয়

মুসলমানদের পাকিস্থানে গমন ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না এবং এই সাড়ে চার কোটি মানুষের মহা সর্ব্বনাশের সমস্ত দায়িত্ব হইবে পাকিস্থানের।

বর্ত্তমান অবস্থা ও শান্তিরক্ষা

ভারতরাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া যে কত বেশী আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে তাহা পূর্ব্ববঙ্গের গোলযোগে পরিস্ফুট হইয়াছে। সমগ্র ভারতে পাকিস্থানী গুপ্তচরবাহিনী কাজ করিতেছে। ইহারা কতদূর শিকড় বিস্তার করিয়াছে লায়েক আলির পলায়ন তার প্রমাণ। প্রতিদিন ভারতের বহু স্থানে পাকিস্থানী চর ধরা পড়িতেছে। বাহিরে পাকিস্থান, ভিতরে কম্যুনিষ্ট ও প্রচ্ছন্ন পাকিস্থানী এই দুই চাপে ভারতের নিরাপত্তা বস্তুতঃই বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে জনসাধারণ এবং সরকারী কর্ম্মচারী উভয়কেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। জনতার উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণে যাহাতে সরকারের শক্তি ক্ষয় করিতে না হয় দেশবাসীকে তৎপ্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পাকিস্থানে আইন ও শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, হিন্দুর সম্পত্তি লুণ্ঠন ও হিন্দু নারী হরণ এখন পাকিস্থানীদের ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছে কিন্তু ভারতে যেন ঐরূপ অবস্থা না ঘটে। প্রবল উত্তেজনার মধ্যেও জনতা এখন পর্য্যন্ত প্রশংসনীয় ধৈর্য্য দেখাইয়া আসিয়াছে।

সরকারী কর্ম্মচারীদের দিক হইতে কিন্তু এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পুলিস অতি শোচনীয় ব্যর্থতা দেখাইয়া আসিতেছে। কয়েক সপ্তাহ আগেও মুষ্টিমেয় কতকগুলি কম্যুনিষ্ট পুলিসকে কলিকাতা সহরময় নাচাইয়া বেড়াইয়াছে। এখন ইহারা অদৃশ্য, কারণ অশান্তি সৃষ্টির ভার গ্রহণ করিয়াছে পাকিস্থানীরা। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, ভারতরাষ্ট্রের ধ্বংসসাধন; এইজন্য বেশ যোগাযোগে কাজ চলিতেছে। ফেরারী কম্যুনিষ্টরা ধরা পড়ে নাই, তাহাদের হ্যাণ্ডবিল প্রভৃতি অবাধে প্রচারিত হইতেছে, গোয়েন্দা পুলিস কিছু করিতে পারে নাই। সংবাদ-সংগ্রহ (espionage), অপরাধ নিবারণ (prevention) এবং অপরাধী গ্রেপ্তার ও মামলা পরিচালন (detection and prosecution)—পুলিসের এই প্রাথমিক কর্ত্তব্য তিনটিই কলিকাতায় ও বাংলাদেশে উপেক্ষিত হইতেছে। কলিকাতার বর্ত্তমান গোলযোগে পাকিস্থানীদের যথেষ্ট হাত আছে এরূপ বহু প্রমাণ আছে। ইণ্টালির ফুলবাগান বস্তির নিকটে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ পাইয়া পুলিস সেখানে তল্লাসী করিয়া বহু বোমা, ছোরা, কার্ত্তুজ প্রভৃতি উদ্ধার করে। বেলগাছিয়ায় আর একটি বস্তিতে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ পাইয়া পুলিশ গিয়া সেখানে বোমা তৈরির সরঞ্জাম ইত্যাদি পায়। এই সমস্ত আবিষ্কার ঘটনাচক্রে হইয়াছে, ইহাতে গোয়েন্দা পুলিসের কোন কৃতিত্ব নাই অথচ প্রতি বৎসর গোয়েন্দা পুলিসের খরচ বাড়িয়া চলিয়াছে।

অপরাধ নিবারণের কথা না বলাই ভাল। কম্যুনিষ্ট গোলযোগে দেখা গিয়াছে অল্প কয়েকটি লোকের নিকট কলিকাতার এত বড় এবং অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত পুলিসবাহিনী অসহায়। পাকিস্থানী গোলযোগেও তাহাই। কোথাও কোন ঘটনা ঘটিলে লরীভর্ত্তি পুলিস লাফাইয়া পড়িয়া রাস্তার লোককে লাঠিপেটা করে; এই ভাবে লোককে পুলিসের উপর আরও চটাইয়া দেওয়াই যেন এখন পুলিসের প্রধান কাজ।

অপরাধী গ্রেপ্তারের অবস্থা আরও শোচনীয়। পুলিস কমিশনার মাসে মাসে সাংবাদিক বৈঠক করেন এবং উহাতে মাসের অপরাধ সংখ্যা ও গ্রেপ্তার সংখ্যা দেন। কিন্তু কতগুলি মামলা আদালতে গেল এবং কতগুলিতে সাজা হইল তাহা বলেন না। অথচ এই চারটি তথ্য এক সঙ্গে না দিলে পুলিশের কৃতিত্ব বুঝা যায় না। ময়দানের সভায় পণ্ডিত নেহরুকে লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং একজন সশস্ত্র পুলিশ কনেষ্টবল নিহত হইয়াছিল। তিন চার জন লোককে ঘটনাস্থলে গ্রেপ্তার করা হয়। শেষ পর্য্যন্ত সকলেই মুক্তিলাভ করিয়াছে, কাহারও বিরুদ্ধে মামলা টিকে নাই। ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া দশ লক্ষ লোকের সভার মধ্যে বোমা নিক্ষিপ্ত হইল, অথচ পুলিশ প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতে পারিল না; যাহাদিগকে হাতেনাতে ধরা হইল তাহারাও প্রমাণাভাবে ছাড়া পাইল, অথচ পুলিশকে সাহায্য করিবার জন্য সকলেই ইচ্ছুক।

মামলা পরিচালনে অযোগ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন মিলিয়াছে গত জানুয়ারী মাসে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বহুবাজারে একটি হিন্দু মেয়ে অপহৃতা হয়। সন্দেহক্রমে রিয়াসৎ বেগ এবং আর কয়েকজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু মেয়েটিকে পাওয়া যায় নাই বলিয়া তাহারা মুক্তি পায়। কিন্তু একজন ডিটেকটিভ সব-ইন্সপেক্টর এই তদন্ত চালাইতে থাকে। প্রায় এক বৎসর পরে পাকিস্থানে রংপুরে মেয়েটির সন্ধান পাইয়া উহাকে সেখান হইতে কৌশলে উদ্ধার করিয়া আনা হয়। মেয়েটি বিভিন্ন স্থানে ধর্ষিতা হইয়া শেষে যে বাড়ীতে থাকে সেটি রিয়াসৎ বেগের শাশুড়ীর বাড়ী। মেয়েটির জবানবন্দীক্রমে আবার রিয়াসৎ বেগকে গ্রেপ্তার করা হয়। আদালতে পুলিশ প্রথমে বলে আসামীদের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ আছে; কিছুদিন বাদে অকস্মাৎ তাহারা ঘুরিয়া দাঁড়ায় এবং রিয়াসৎ বেগের নামে চার্জ্জসিট দাখিল না করিয়া তাহাকে খালাস করিয়া দেয়। স্বাধীন ভারত হইতে হিন্দু নারী অপহৃতা হইল, এক বৎসরের চেষ্টায় তাহাকে পাকিস্থান হইতে উদ্ধার করা হইল, যে ব্যক্তি তাহাকে হরণ করিয়াছিল বলিয়া মেয়েটি জবানবন্দী দিল সে ঐ ব্যক্তির শাশুড়ীর বাড়ী হইতে উদ্ধার

হইল, সমগ্র ব্যাপারটির আনুপূর্ব্বিক পুলিশ ডায়েরী রহিয়াছে, ইহার পরেও কি বলিতে হইবে যে মামলা রুজু করিবার মত প্রাথমিক প্রমাণের অভাব আছে? তবে এই মামলা ডিটেক্-টিভ ডিপার্টমেণ্ট ছাড়িয়া দিল কেন?

টাকা এবং লোক বাড়াইলেই যে পুলিশের দক্ষতা বাড়ে না ইহার প্রমাণ প্রয়োজন হইয়া থাকিলে কলিকাতা পুলিশ তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পুলিসের দক্ষতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে উচ্চতম কর্ম্মচারীদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর। গত তিন বৎসর কলিকাতা পুলিসের দক্ষতা একেবারে রসাতলে গিয়াছে। স্বাধীনতার প্রথম যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা দেখিয়াই আমরা এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং আমাদের আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতার সিকিউরিটির উপর ভারতের নিরাপত্তা নির্ভর করে, এই সময়ে শহরের পুলিসের দক্ষতা বাড়াইতে না পারিলে রাষ্ট্র বিপন্ন হইবে।

বর্ত্তমান সঙ্কটে টাকার অভাব

পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহু সহস্র বাস্তহারা আসিয়াছে, পাকিস্থান বাস্তহারা আগমনের কড়াকড়ি হ্রাস করিলে কত লক্ষ আসিয়া পৌঁছিবে তাহার স্থিরতা নাই। ভারত সরকার টাকা দিলেও প্রাদেশিক সরকারেরও বেশ কিছু খরচ হইবে। এই সময় ট্যাক্স আদায় সম্বন্ধে সতর্ক ও জাগ্রত থাকা কর্ত্তৃ-পক্ষের কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা দেখিতেছি সেলস ট্যাক্স বিভাগে তার বিপরীত ঘটিতেছে। কোনও এক প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর সেলস ট্যাক্স ধার্য্য করায় বাধা পাওয়ার একটি বিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই ট্যাক্সটা আদায় হইলে সরকারের বাজেটের এবারকার ঘাটতির মোটা অংশ একজনের নিকট হইতেই আদায় হইতে পারে ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

ঘটনাটি সংক্ষেপে এইরূপ। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে সেলস ট্যাক্সের এসিষ্টাণ্ট কমিশনার শ্রীএন সি রায় একটি কটন মিলের বিক্রয়-কর ধার্য্য করিবার জন্য তাহাদের ম্যানু-ফ্যাকচারিং হিসাব দাখিল করিতে বলেন। তিনি কমিশনারকে বলেন যে কয়েকটি কোম্পানী নিম্নলিখিত উপায়ে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়াছে; ম্যানুফ্যাকচারিং হিসাব পরীক্ষা করিলে ঐগুলি ধরা যাইত:—

(১) অস্তিত্বহীন ব্যক্তিগণ হইতে মাল ক্রয়ের ভুয়া হিসাব লিখিয়াছে।

(২) উৎপাদনের হিসাব গোপন রাখিয়াছে এবং বেনামীতে ঐ মাল বিক্রী করিয়াছে।

(৩) কাল্পনিক রেজিষ্টার্ড ডিলারের নামে মাল বিক্রী দেখাইয়াছে।

(৪) তাহাদের বড় বড় ব্যবসা হইতে টাকা ধার দিয়া নূতন সাবসিডিয়ারি কোম্পানী স্থাপন করিয়াছে এবং এগুলির মারফত খরিদ বিক্রী করিয়াছে ও ট্যাক্স আদায়ের পূর্ব্বে ঐ-গুলিকে লিকুইডেশনে দিয়াছে।

(৫) ফ্যাক্টরী প্রসার ও বাড়ী তৈরির জন্য বহু পরিমাণ লোহা ও বাড়ী তৈরির মালমসলা ক্রয় করিয়া পরে গোপনে ঐগুলি বিক্রী করিয়াছে এবং ফ্যাক্টরী ও বাড়ী ঘর তৈরির খাতে এই ব্যয় দেখাইয়াছে।

(৬) ফাটকা বাজারের মারফতে তাহাদের নিজেদের সৃষ্ট কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের সহিত কারবারে ব্যবসায়ের ন্যায্য লাভের টাকা লোকসান দেখাইয়া দিয়াছে।

উপরোক্ত কটন মিল এই চাপে পড়িয়া প্রথমে বলিল তাহারা ম্যানুফ্যাকচারিং হিসাব রাখে না। ম্যানুফ্যাকচারিং হিসাব না রাখিলে উৎপন্ন কাপড়ের পড়তা ফেলা অসম্ভব বলিয়া ইহা অবিশ্বাস্য; এসিষ্টাণ্ট কমিশনার ইহা লইয়া ক্রমাগত চাপ দিতে লাগিলেন। ঐ ব্যবসায়ী দল তখন ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল যে তাহারা উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিবে। ৮ই এপ্রিল হইতে ২২শে জুন পর্য্যন্ত এইরূপ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর ২৩শে জুন তারিখে এসিষ্টাণ্ট কমিশনার নিম্নলিখিত পত্রটি কমিশনারের নিকট হইতে পাইলেন—"আমি মৌখিক যেরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছি সেই মতে অন্য আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত আপনি উক্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সংক্রান্ত এসেসমেণ্ট কিম্বা অন্য কোন বিষয় যাহাতে তাহাদের উপস্থিতি বা কৈফিয়তের প্রয়োজন হইতে পারে এমন যে সব ফাইল আপনার হাতে আছে তাহাতে কোন কাজ করিবেন না।"

৬ই আগষ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি পুনর্গঠিত হয় এবং ডাঃ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেনের মিলন হওয়াতে মন্ত্রি-মণ্ডল পুনর্গঠনের কথা উঠে। ঐ দিনই বি, পি, সি, সি নির্ব্বাচনের সংবাদপ্রাপ্তির পরমুহূর্ত্তে কমিশনার তাঁহার পূর্ব্ব-লিখিত আদেশ প্রত্যাহার করেন। অতঃপর এসিষ্টাণ্ট কমি-শনার ঐ ব্যবসায়ীদের অন্য এক প্রতিষ্ঠানের উপর ২৬,১৫,৬৭০ টাকা কর ধার্য্য করেন। কিন্তু প্রথমোক্ত কটন মিল কিছুতেই ম্যানুফ্যাকচারিং একাউণ্ট দিতে চায় না। ম্যানুফ্যাকচারিং একাউণ্ট সম্বন্ধে জোর তাগাদা দিলে তাহারা এবার বলিল যে, তাহাদের খাতাপত্র পুড়িয়া গিয়াছে।

মন্ত্রিমণ্ডলের ফাঁড়া কাটিয়া যাওয়ার পর কমিশনার আবার পূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এসিষ্টাণ্ট কমিশনার শ্রীএন সি

রায়কে মফস্বলে বদলী করা হইল এবং শ্রীএস কে বসুকে তাঁহার স্থলে নিযুক্ত করা হইল। বসু মহাশয় আসিয়া ফাইল দেখিয়া উক্ত ব্যবসায়ী দল কর্তৃক প্রদত্ত হিসাবের উপর এসেসমেণ্ট করিতে অস্বীকার করিলেন এবং তিনিও ম্যানুফ্যাকচারিং একাউণ্টই আর এক ভাবে চাহিলেন। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্রথমোক্ত কটন মিল সে হিসাব দেয় নাই। ১৯৪৮ সালের ৮ই এপ্রিল হইতে ১৯৫০-এর ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দুই বৎসরকাল একটি কোম্পানী হিসাব দাখিল করিতে অস্বীকার করিতেছে এবং যে হিসাব পাইলে ৪০ লক্ষ টাকা একটি মাত্র কোম্পানীর নিকট হইতে আদায় হইবে বলিয়া এসিষ্টাণ্ট কমিশনার বলিতেছেন সেই হিসাব চাপা দিতে কোম্পানীকে সাহায্য করা হইতেছে ইহা বিচিত্র ব্যাপার। এ বিষয়ে ডাঃ রায়ের নিজের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

বিহারে বাঙালী অঞ্চলের সমস্যা

গত মাসের "প্রবাসী" পত্রিকায় আমরা ভারতরাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বিহার প্রদেশে অবস্থিত বাঙালীর নানা অভিযোগ সম্বন্ধে একটু অবহিত হইতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে তিনি তাঁহার নিজ প্রদেশে গিয়া রাজসম্মান লাভ করিয়াছেন। সেই সময়ে তিনি কেবলমাত্র মানপত্র ও তার রৌপ্যের এবং স্বর্ণের আধার কুড়াইয়াছিলেন, এরূপ অভিযোগে কর্ণপাত করিতে আমাদের মন চায় না। আমরা আশা করি বিহারের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের বাঙালী-প্রধানগণ, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার সহযাত্রীগণ, তাঁহাদের ভাষার উপর যে অত্যাচার চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এরূপ আলোচনার ফলাফল কি হইয়াছে, তাহা এখনও আমরা জানিতে পারি নাই। কিন্তু বিহারের মন্ত্রিমণ্ডলী ও কংগ্রেসী-প্রধানগণ তাঁহাদের ব্যবহারে যে সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন, তৎপ্রতি রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

বিহারের বাঙালী-প্রধানগণ কি ভাবিতেছেন তাহা আমরা জানি। শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে "সত্যাগ্রহ" আন্দোলন তার সাক্ষীরূপে বিদ্যমান আছে। কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধে সাত মাস পূর্ব্বে সেই আন্দোলন স্থগিত রাখা হয়। এই অনুরোধের উদ্দেশ্য ছিল আলাপ-আলোচনা করিয়া এই ভাষা ও সংস্কৃতি সমস্যার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করা। এই সাত মাসের মধ্যে কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই; তাঁহারা কুচবিহার-রাজ্যকে পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার অবসর পাইলেন। কিন্তু গত ৩৮ বৎসর হইতে যে সমস্যা বাঙালী ও বিহারীর সম্পর্ককে প্রতিনিয়ত বিষাক্ত করিতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে তাঁহাদের অবসর হইতেছে না।

এইরূপ টালবাহানা করার ফলে বাঙালী সমাজের মন কংগ্রেসী আদর্শ ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে সন্দেহাতুর হইতেছে। এই বিপদ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ নিজে ডাকিয়া আনিয়াছেন। বাঙালী তাহার সংস্কৃতির জন্য কি করিতে পারে, গত ৪৫ বৎসরের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কংগ্রেস নেতৃবর্গের তাহা ভুলিলে চলিবে না। মানভূম পরিষদের সম্পাদক শ্রীসনৎ মুখোপাধ্যায়ের একটি বিবৃতি "সারথি" (সাপ্তাহিক) পত্রিকার গত ১৫ই ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র বাঙালী সমাজের মনোভাব এইবিবৃতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এ কারণ আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম,—

"জনসাধারণ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখার পর মানভূমের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইয়াছে, যদিও ইহা শুনা গিয়াছিল যে, মানভূমের জনগণের যুক্তিসঙ্গত দাবিগুলি পূরণের নিমিত্ত কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বিহার সরকারকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, এমন কি জেলার মাতৃভাষা সম্পর্কেও বিহার সরকার কেন্দ্রের নির্দ্দেশ যথাযথ পালন করেন নাই। তাহা ছাড়া দুঃখের বিষয় যে, মানভূম সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত চারিজনের সাব-কমিটি এই সুদীর্ঘ সাত মাসের মধ্যেও নাকি তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করার সময় পান নাই, যদিও ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও পণ্ডিত প্রজাপতি মিশ্র গত জুন মাসেই তাঁহাদের অকিঞ্চিৎকর অনুসন্ধান কার্য্য শেষ করিয়াছেন। ইহা সত্য যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বর্ত্তমানে বহু গুরুতর সমস্যা লইয়া ব্যাপৃত আছেন; কিন্তু মানভূম সমস্যাও এমন একটি গুরুতর সমস্যা যাহার সমাধানে মোটেই বিলম্ব ঘটা উচিত নহে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের এবম্বিধ নীরবতার সুযোগ লইয়া বিহার সরকার মানভূমের জনগণের উপর যথেচ্ছ পীড়ন চালাইতেছেন। সেখানে এমন এক নিরাপত্তা আইন এখনও বহাল রাখা হইয়াছে যাহার বলে এমন কি সাহিত্য বা সংস্কৃতি সম্মেলনও বিনা অনুমতিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"পরিস্থিতি ক্রমশঃ এতই জটিল হইয়া উঠিতেছে যে, মানভূম লোকসেবক সঙ্ঘের পক্ষে আর নীরব দর্শক হইয়া থাকা সম্ভব নহে। আমি জানিতে পারিলাম যে, গত ৪ঠা ও ৫ই জানুয়ারীতে মাঝিহীড়া সম্মেলনে তাঁহারা এই মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে মানভূম সমস্যার সমাধান না করিলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ করা হইবে। ইহা সত্য হইলে ওয়ার্কিং কমিটির সম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে, কারণ তাঁহাদের অনুরোধেই গত এপ্রিল মাসে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হইয়াছিল; যথাশীঘ্র ওয়ার্কিং কমিটির একটা ব্যবস্থা করা উচিত।

"আমার মতে মানভূম সমস্যার একমাত্র সমাধান হইল মানভূমের পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তি। শাসক যদি শাসিতের

প্রতিভূ না হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্র কাজ করিতে পারে না এবং মানভূমের ক্ষেত্রে ইহা অত্যন্ত প্রকট সত্য। তাহা ব্যতীত ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশগঠন ছাড়া প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনও অর্থহীন। অনেকে প্রচার করিয়া থাকেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান জনসংখ্যার চাপ অপনোদনের জন্ত কিংবা বাস্তহারাদের পুনর্ব্বসতির জন্য মানভূমের বঙ্গভুক্তি প্রয়োজন। কিন্তু ইহার চেয়ে বড় সত্য হইল মানভূম একান্তভাবে বাংলা ভাষাভাষী এলাকা এবং সকল বাংলা ভাষাভাষী এলাকার বাংলায় যুক্ত হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে শাসক শাসিতের যথার্থ প্রতিভূ হইতে পারে।"

ভারতরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে একটি নূতন বিধান সংযোজিত হইয়াছে। তদনুসারে (৩য় বিধান) রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া কোন প্রদেশের পুনর্গঠন হইবে না। তিনি সংশ্লিষ্ট আইন সভার মত লইবেন। বিহারে অন্তর্ভুক্ত বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলসমূহের ভবিষ্যৎ স্থির করিবার জন্ত বিহারের ব্যবস্থাপক সভার মত লইলে ফল কি হইবে, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বাঙালী সমাজের মনে এই সন্দেহও দেখা দিয়াছে যে এই বিষয়ে রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিরপেক্ষ হইতে পারিবেন না। এইরূপ সন্দেহ উভয় পক্ষের পক্ষে লজ্জাজনক। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা বিস্তার-লাভ করিতেছে, এবং তাহার জন্য দায়ী কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ। ভাষার ভিত্তিতে ভারতরাষ্ট্রের প্রদেশসমূহ পুনর্গঠিত হইবে কংগ্রেসের এই প্রতিশ্রুতি লইয়া যেভাবে ছল-চাতুরী চলিতেছে, তাহার ফলেই এইরূপ সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হইয়াছে।

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের শেষ চেষ্টা

প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া নামক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান গত ১২ই ফাল্গুন নিম্নলিখিত সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছে: সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মনির্ব্বাহক সমিতি নিরাপত্তা পরিষদের (Security Council) সভায় এই পরিষদের ফেব্রুয়ারী মাসের সভাপতি ডাঃ কার্লো ব্রাকো একটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবটি এইরূপ—

"১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারী এবং ২১শে এপ্রিল তারিখে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্থানের জন্ত যে কমিশন গঠিত হইয়াছিল, পরিষদ সেই কমিশনের রিপোর্ট বিবেচনা করিয়াছেন। ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিয়া জেনারেল এ জি এল ম্যাকনটন যে রিপোর্ট দিয়াছেন পরিষদ তাহাও বিবেচনা করিয়াছেন।

"১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্ট এবং ১৯৪৯ সালের ৫ই জানুয়ারী তারিখে কাশ্মীর কমিশনের প্রস্তাবে জম্মু ও কাশ্মীরের সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া, যুদ্ধ বিরতি এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণভোটের ভিত্তিতে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ সম্পর্কে যে কথা বলা হইয়াছিল, তাহাতে একমত হওয়ার জন্ত পরিষদ ভারত ও পাকিস্থানের রাজনীতিকোচিত কার্য্যের প্রশংসা করিতেছেন।

"নিরাপত্তা পরিষদ ভারত ও পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টকে এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর পাঁচ মাসের মধ্যে নিজেদের অধিকার ক্ষুন্ন না করিয়া জেনারেল ম্যাকনটনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে অথবা ঐ প্রস্তাবে বর্ণিত নীতি সংশোধন সম্পর্কে পরস্পর একমত হইয়া তদনুযায়ী সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্পর্কে পরিকল্পনা রচনা করিতে অনুরোধ করিতেছেন। পরিষদ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিতেছেন—(ক) তিনি যেখানে প্রয়োজন মনে করিবেন সেইখানেই তাঁহার কাজ করিবার ক্ষমতা থাকিবে। পূর্ব্বে উল্লিখিত সেনাদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্পর্কিত পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য এবং সেই কর্ম্মপন্থা কার্য্যে পরিণত করার বিষয়ে তত্ত্বাবধান। (খ) ভারত ও পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের কার্য্যে সাহায্য করিবেন, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য লইয়া উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে বিরোধ বাধিয়াছে তাহার সমাধানকল্পে তিনি যে সকল উপায় ভাল বলিয়া মনে করিবেন সংশ্লিষ্ট গবর্ণমেণ্টের অথবা নিরাপত্তা পরিষদে তাহা উত্থাপন করিবেন। (গ) কাশ্মীর কমিশনের উপর যে সকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল, তিনি সেই সকল ক্ষমতার অধিকারী হইবেন। (ঘ) সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়ার কাজ চলিতে থাকার কালে উপযুক্ত সময়ে গণভোট পরিচালক এডমিরাল চেষ্টার নিমিৎস কর্ত্তৃক কার্য্য-ভার গ্রহণের ব্যবস্থা করা।"

পরের সংবাদে প্রকাশ, নরওয়ে, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র প্রভৃতির প্রতিনিধিবর্গ এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করিয়াছেন। সকলেই এই উপলক্ষে ডিসেম্বর মাসের সভাপতি ক্যানাডার জেনারেল ম্যাকনটন যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার মূল নীতি সমর্থন করিয়াছেন। জেনারেল ম্যাকনটন যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কোন্ নীতি বিদ্যমান, তৎসম্বন্ধে এই সংবাদে কোন উল্লেখ নাই। পরের আলোচনায়ও তাহার স্পষ্ট কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। নীতি হইতে পারে যে কাশ্মীর আক্রমণের জন্ত দোষ-গুণ বিচার করিয়া যখন লাভ নাই ("unprofitable")—এই শব্দটিই জেনারেল ম্যাকনাটন ব্যবহার করিয়াছিলেন—তখন এই আক্রমণে লাভবান যে রাষ্ট্র—পাকিস্থান—তাহার দোষ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না করিলেই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। ২৪শে ফাল্গুন যে আলোচনা হয় তাহাতেও আমরা অন্য কোন যুক্তি দেখিলাম না।

সুতরাং আলোচনার ধারা লক্ষ্য করিয়া মনে হয় যে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ জম্মু-কাশ্মীর সমস্যার কোন সমাধান

করিতে পারিবে না। ন্যায়ের প্রতিশোধের স্থান একটা বিশ্ববিধানে আছে; মানুষ অনেক সময় প্রায়শঃই তাহা ভুলিয়া যায়। রাবণ ভুলিয়া গিয়াছিল, হিটলার ভুলিয়া গিয়াছিল। সীতাকে আশ্রয় করিয়া বিধাতার রোষ রাবণের উপর পড়িল, ক্ষুদ্র পোলাণ্ডকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া চেম্বারলেনের হিটলার তোষণনীতির প্রতিশোধ আমাদের চক্ষের সামনে ঘটিয়াছে। সেইরূপ কাশ্মীর-জম্মুর উপর অত্যাচার করিয়া পাকিস্থান রেহাই পাইবে না, এবং তাহাদের কৌশল ব্যর্থ হইবে, যাহারা পাকিস্থানকে তোষণ করিবে, ক্ষণিক স্বার্থের প্রেরণায় এই অত্যাচারের ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে বিচার করিতে অস্বীকার করিবে—১৯৪৭ সালের আগষ্ট-অক্টোবর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৫০ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত যে অন্যায় প্রশ্রয় পাইয়াছে তার বিচারে অসম্মত হইবে—লাভ নাই ("unprofitable") বলিয়া।

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ-সম দহে"—বিশ্বকবির এই সাবধানবাণী মানুষের ইতিহাসে প্রতিপদে প্রমাণিত হইতেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস

প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে নানা দৈনিক সংবাদপত্রে একটা সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ভারত গবর্ন্মেণ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করিবার জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন; সেই উপলক্ষে একটি কমিটি নিয়োগের কথা এবং কয়েকজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের নামও করা হইয়াছিল। গত ২৩শে ফাল্গুন ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সংসদ বা ব্যবস্থাপক সভায় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই বিষয়ে একটা চূড়ান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। নিম্নে তাহা তুলিয়া দিলাম :

"সর্ব্ববিধ সম্ভাবিত সূত্র হইতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তথ্য সংগ্রহের জন্য এবং সেই সব সংগৃহীত তথ্য হইতে মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্য ভারত-সরকার একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানের উপাদান সংগৃহীত হওয়ার পর একটি সম্পাদকীয় বোর্ড গঠন করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের লইয়া একটি প্রাথমিক কমিটি গঠিত হইয়াছে :—

(১) ভারত-সরকারের শিক্ষা-সম্পর্কিত উপদেষ্টা ডাঃ তারাচাঁদ—পদাধিকার বলে সভাপতি, (২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, (৩) দেশরক্ষা দপ্তরের ঐতিহাসিক বিভাগের ডিরেক্টর ডক্টর বিশ্বেশ্বর প্রসাদ, (৪) শিবগঙ্গার রাজা দোরাই সিঙ্গম স্মৃতি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী সি. এস. শ্রীনিবাসাচারী, (৫) দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন, (৬) তথ্য ও বেতারসচিব শ্রীআর. আর. দিবাকর এবং (৭) ডক্টর জি. সি. নারাঙ্গ।

সরকারী তত্ত্বাবধানে ইতিহাস রচনার চেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের মনে একটা সন্দেহ বরাবরই আছে। সেই সন্দেহের কারণাদি বর্ত্তমানে উল্লেখ না করিলেও এই কথা বলিতে পারি যে, সরকারী অনুপ্রেরণায় ইতিহাস রচনার সময় এখনও আসে নাই, এবং কমিটির সভ্যবৃন্দের যে সব নাম ঘোষিত হইয়াছে, তাঁদের সম্বন্ধেও যথেষ্ট আপত্তির কারণ আছে। সময় আসে নাই এইজন্য যে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিলেন এরূপ সাহিত্যিক ও লেখক যাঁহারা আছেন এই সংগ্রামের ব্যাপকতা সম্বন্ধে তাঁহারা এখনও নানা তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন; কেহ কেহ অসম্পূর্ণ তথ্যাদির উপর নির্ভর করিয়াই পুস্তকাদি প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতরাষ্ট্রের ১৪টি প্রধান ভাষায় এরূপ বহু বই প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। তাহা শেষ হইলে সংগৃহীত তথ্যাদির সমালোচনা হইবে, বিচার হইবে; তাহার সত্যাসত্য, অত্যুক্ত্যাদি পরীক্ষা করিয়া তবেই প্রকৃত ইতিহাস রচনার উপযোগী সময় আসিবে। আমাদের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় ভাবে যোগদান করিয়াছেন বা যাঁহারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনাপতি-বৃন্দের সাহচর্য্যের সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহাদের প্রত্যক্ষ সহযোগ ব্যতিরেকে এই মহৎ ও বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা বাঞ্ছনীয় নয়। এরূপ কার্য্যের জন্য একটা ঐতিহ্যের প্রয়োজন, একটা অন্তর্দৃষ্টি ও ভাবগ্রাহিতার প্রয়োজন যাহা সরকারী মনোনয়নের কল্যাণে লাভ করা যায় না। বর্ত্তমান কমিটির সভ্যবৃন্দের সকলের পরিচয় আমরা জানি না। কিন্তু যাঁহাদের কথা জানি তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প কয়েকজনই আমাদের প্রস্তাবিত মানদণ্ডের যোগ্য হইতে পারিবেন। তাঁহারা ইতিহাসে পণ্ডিত, পাথুরে ও তাম্রলিপির প্রমাণ সংগ্রহ ও উদ্ধারে এক একজন দিকপাল হইতে পারেন। কিন্তু ভারতের গত ১২৫ বৎসরের ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস—পাথুরে বা ধাতব প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাহা জীবন্ত প্রাণবান মানুষের রক্তে ও চোখের জলে লেখা। তাহার মর্ম্মার্থ উদ্ধার করিতে হইলে সরকারী দপ্তরখানার বাহিরে আসিতে হয়।

চিনির কথা

গত যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ রাজ্যের প্রয়োজনে ভারতবর্ষের লোক-সমষ্টিকে অনেকভাবে বঞ্চিত জীবন-যাপন করিতে হইয়াছিল। ভাত, কাপড় ও নিত্য-প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যাদির জন্য সরকারের নিকট হাত-ধরা হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনে বাংলাদেশে খাদ্যের অনটন ঘটে; প্রায় ৩৫ লক্ষ লোক মারা যায়। এই অপমৃত্যুর নানাবিধ কারণ

আলোচনা করিয়া উডহেড কমিশন সিদ্ধান্তে পৌছেন (১৯৪৪ সালে) যে ব্যবসায়ীদের কাট্‌কাবাজীর জন্য এই লোকক্ষয় হইয়াছে। এই দুর্নামের স্মৃতি এখনও লোকের মনে জাগিয়া আছে এবং ভারতবর্ষের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় এবং সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দের একাংশের সহযোগিতায় যে "কালো-বাজার" এখন পর্য্যন্ত আমাদের জীবন বিপন্ন করিতেছে, তৎসম্বন্ধে গণ-মন বিষাক্ত হইতেছে ও গবর্মেণ্টের অকৃতকার্য্যতায় তাহা প্রায় দিগ্-বিদিকশূন্য হইয়া পড়িতেছে।

এই যে বিষ আমাদের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীশ্রেণীর ব্যবহারে নিত্য ফুটিয়া উঠিতেছে তার প্রমাণ মিলিয়াছে শর্করা শুল্ক অনুসন্ধান বোর্ডের সুপারিশসমূহে। সুগার সিণ্ডিকেট নামে একটি শর্করা শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে ১৯৪৯ সালের প্রথম হইতে চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার পর এই সমিতি কালো-বাজারের সৃষ্টি করিয়া চিনির বাজারে কোটি কোটি টাকা অন্যায় মুনাফা করিয়াছে। দুই বৎসর দেশের লোকের মন এই গলা-কাটাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে গুমরিয়াছে; গবর্মেণ্ট ঢিমে-তেতালাগিরি করিয়া তাহা নিবারণ করিতে অপারগ হইয়াছেন। এখন শুল্ক-কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা গত ২২শে ফাল্গুন নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন:

"(১) আখ মাড়াইয়ের বার্ষিক লাইসেন্স পাইবার জন্য পূর্ব্ব-সর্ত্ত হিসাবে উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের সকল কারখানাকে অবশ্য সিণ্ডিকেটের সদস্য হইতে হইবে বলিয়া যে নিয়ম প্রবর্তিত ছিল তাহা বাতিল করা হইবে। (২) সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক অতি দ্রুত এবং অত্যধিক পরিমাণে চিনির বরাদ্দ (কোটা) ছাড় দেওয়ার জন্যই মুখ্যত: জুলাই-আগষ্ট ১৯৪৯-এ শর্করা (শিল্পে) সঙ্কট দেখা দিয়াছিল; এবং (৩) শর্করা শিল্পে সংরক্ষণ শুল্ক ব্যবস্থা ৩১শে মার্চ্চ ১৯৫০ তারিখের পর বলবৎ রাখা হইবে না। সংরক্ষণ শুল্কের স্থলে সরকার 'প্রয়োজন অনুযায়ী' রাজস্ব খাতে কর ধার্য্য করিবেন। গত সপ্তাহে ভারতীয় সংসদে যে ফিনান্স বিল উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহার একটি সর্ত্তে এই পরিবর্ত্তন সাধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।"

এই সিদ্ধান্তসমূহ কার্য্যকালে কি ফল প্রসব করিবে তাহা এখন বলিতে পারি না। এই শর্করা শিল্পটির ত্রুটি-বিচ্যুতির সঙ্গে অন্যান্য অনাচার ও অব্যবস্থাও জড়িত আছে। শুল্ক কমিশন তাহার উল্লেখও করিয়াছেন।

অত্যধিক মালগাড়ী সরবরাহ সম্পর্কে বোর্ড সুপারিশ করেন যে 'জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে এবিষয়ে পূর্ণ তদন্ত হওয়া আবশ্যক'।

'১৯৪৯ সালে ভারতে ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট চিনি প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ব এবং পশ্চিম পাকিস্থানে যথেষ্ট পরিমাণ চালান দেওয়া হইয়াছে' বলিয়া অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের তদন্ত করা উচিত।

গত ১৮ বৎসর ভারতবর্ষের লোকসমষ্টি এই শিল্পকে রক্ষা করিতে গিয়া বেশী দামে চিনি কিনিয়াছে যেমন করিয়াছিল গত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ বস্ত্রশিল্পের রক্ষাকল্পে। যুদ্ধের সময় যখন সব জিনিষের দাম বাড়িয়াছিল, তখন চিনির মূল্য এই রক্ষা-ব্যবস্থার কল্যাণে খুব বেশী বাড়ে নাই; দ্বিগুণ মাত্র বাড়িয়াছিল। আজ আমরা ১৯৩৯ সালের তিনগুণ মূল্য দিতেছি। কিন্তু চিনির ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বা আখের চাষী দেশবাসীর এই ত্যাগের মাহাত্ম্য বুঝে নাই। সুতরাং তাহাদের প্রতি দেশের লোকের দরদ থাকিতে পারে না।

এই রক্ষা-শুল্ক প্রত্যাহার করিবার স্বপক্ষে শিল্প-কমিশন যুক্তি দিয়াছেন এইরূপ: ভারতে উৎপন্ন চিনির দর (২৮৷০) এবং বিদেশী চিনি আমদানীর আনুমানিক মোট খরচের (২২৷০) মধ্যে প্রতি মণ ৬৲ হিসাবে পার্থক্য আছে। সুতরাং দেশীয় শর্করা শিল্পের সংরক্ষণের প্রয়োজন থাকিলে, প্রতি মণ ৬৲ হিসাবে বর্ত্তমানে যে কর ধার্য্য আছে তাহাই পর্য্যাপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয়। আগামী দুই তিন বৎসরের মধ্যে আমদানীকৃত চিনির দর হ্রাস পাইবার (এবং সে কারণে প্রতিযোগিতার) আশঙ্কা নাই। কারণ 'খোলা বাজারে' (অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে) প্রাপ্তব্য উদ্বৃত্ত চিনির পরিমাণ কম থাকিবে বলিয়া মনে হয়। এতদ্ব্যতীত বৈদেশিক বাণিজ্যের খতিয়ানে ঘাটতির জন্য ভারত সরকার প্রচুর পরিমাণ চিনি আমদানীর অনুমতি দিবেন না।

শুল্ক বোর্ড আরও বলিয়াছেন যে, ভারতে উৎপন্ন চিনির ন্যায্য কারখানার দর (বর্ত্তমানে ২৭৲) ১৯৫০-৫১ সালে ২৪৸০ দরে হ্রাস করা যাইবে বলিয়া মনে করি। গত ১৮ বৎসর ধরিয়া শর্করা শিল্পে সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে, শর্করা শিল্পের উন্নয়নের দায়িত্ব যাঁহাদের তাঁহারা অর্থাৎ সরকার, শর্করা-শিল্প এবং চাষী সকলের মধ্যেই শৈথিল্য দেখা দিয়াছে।

দামোদর ক্যানেল

"সত্যাগ্রহ" পত্রিকা নিম্নলিখিত অভিযোগের প্রতি দেশবাসী ও গবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে:

"দামোদর ক্যানেলের কার্য্য বাংলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সার জন এণ্ডারসনের সময়ে আরম্ভ হয়। ইহা বর্দ্ধমান জেলার নিম্ন অঞ্চলের ধান্য উৎপাদন ব্যাপারে অত্যন্ত সাহায্য করে। দামোদরের জলকে এনিকাটের দ্বারা উচ্চ করিয়া তাহাকে একটি পার্শ্বস্থ খালের ভিতরে ঢুকাইয়া নিম্নাভিমুখীকরত: মাঝে মাঝে রেগুলেটার ও স্লুইসের দ্বারা নিয়ন্ত্র ক্ষেত্রগুলিতে পৌছাইয়া দিয়া শস্যোৎপাদনে সাহায্য করাই ইহার কার্য্য। এই ক্যানেল ২৮ মাইল লম্বা, ইহার দ্বারা এক লক্ষ আশি হাজার

একর জমির উপকার হয়। ইহা বর্দ্ধমান জেলার একটি অমূল্য সম্পদ। যাহারা ইহার জল পাইতে পারে, অথচ পায় না, তাহারা ইহার জল পাইবার জন্য দরখাস্ত করে। সেচ বিভাগ তদন্ত করিয়া দুঃখের সহিত বলেন যে, আর অতিরিক্ত জল দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ যে এলাকায় তাঁহারা জল দেন তাহাতে জল তাঁহারা যথোপযুক্ত রূপে সরবরাহ করিতে পারেন না।

ইহা সত্য হইলেও দরখাস্তকারীদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, অভাব হইলে গবর্মেণ্ট তাহাদিগকে জল দিবে এই বিবেচনায় কৃষকেরা জল সংরক্ষণ করে না। তাহাদের জমিতে কোন আইল থাকে না, কিংবা যদি থাকে তাহা যথোপযুক্ত উচ্চ নহে। যদি আইল থাকিত এবং কৃষকেরা যদি যথেচ্ছ জল ছাড়িয়া না দিত, তাহা হইলে দরখাস্তকারীদের বিবেচনায় ঐ অতিরিক্ত জলের দ্বারা আরও অধিকতর জমিতে জল দেওয়া যাইতে পারিত। অভিযোগটি গুরুতর।

বর্দ্ধমানের প্রায় সমগ্র উত্তর সীমা ব্যাপিয়া অজয় নদ ছড়াইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ব সীমা বাহিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত এবং দক্ষিণ সীমায় তিন-চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া দামোদর নদ প্রবাহিত। আবার দামোদরের শাখা বরাকর ইহার পশ্চিমের সীমাটুকুকে প্রায় ঘিরিয়া রহিয়াছে। কুনুর, খড়ি, বাঁকা প্রভৃতি নদী ইহার অঙ্গে ছড়াইয়া রহিয়াছে। দামোদর ও ইডেন ক্যানেল ইহার শস্য বৃদ্ধির্তে সাহায্য করিতেছে। দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে এই জেলার প্রকৃত উপকার হইবে।

কিন্তু এই পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে সময় যাইবে। ইতিমধ্যে পুরাতন পুকুরগুলিকে কাটাইয়া লওয়া, ছোট ছোট সেচ ও জল নিকাশ পরিকল্পনাকে কার্য্যে রূপায়িত করা দেশবাসীর কর্ত্তব্য।"

হুগলী জেলায় স্বাবলম্বন

"প্রবাসী" পত্রিকার প্রায় প্রতি সংখ্যায় সরকার-নিরপেক্ষ গঠনমূলক কার্য্যের বিবরণ আমরা প্রকাশ করিয়া থাকি। দেশের লোকে নিজের ভাবনা, নিজের কাজ নিজে করিতেছেন, নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছেন, তদপেক্ষা মহৎ উদ্দীপনার কথা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই ভাবের ভাবুক হইয়া বাঙালী চিন্তা-নায়কগণ ভারতবর্ষে যুগান্তরের সূচনা করেন। সেই কথা আমাদের দেশের রাজনীতির ব্যবসায়ীরা ভুলিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন তাঁহার জীবনাদর্শ যাঁহাকে তাঁহারা "জাতির জনক" বলিয়া নিজের দলে টানিতে চায়। আমরা ৫০ বৎসর পূর্ব্বের অনুপ্রেরণায় চলিতে চেষ্টা করি বলিয়া দেশের লোকের মধ্যে স্বাবলম্বনের চেষ্টা দেখিলে উৎফুল্ল হই, সেই কীর্ত্তিকথা প্রচার করিয়া আনন্দ পাই। এ মাসেও এরূপ একটি ক্ষুদ্র কর্ম্মপ্রচেষ্টার বিবরণ শ্রীরামপুরের "নির্ণয়" (৬ই ফাল্গুন) হইতে তুলিয়া দিলাম:

"হরিপালের অন্তর্গত হড়াগ্রামে কাণানদী হইতে একটি খাল কাটিয়া কয়েক মাইল দূর পর্য্যন্ত চষদ্ জমিগুলির সেচ করিবার এক পরিকল্পনা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় জনসাধারণ গ্রহণ করেন। জনসাধারণ নিজেরাই প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত খালের খানিকটা কাটিয়া রাখেন। এই প্রচেষ্টাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য সরকারী কৃষি বিভাগ এই পরিকল্পনাটি আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়া এ বৎসর (১।৩ ভাগ চাঁদা সমেত) ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। ৪ঠা পৌষ ১৩৫৬ সাল হইতে পুনরায় খাল খনন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

এই কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য একটি সক্রিয় পরিচালক সমিতি গঠিত হইয়াছে। স্থানীয় কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীশরৎ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই সমিতির সভাপতি ও স্থানীয় হিন্দু মহাসভার সম্পাদক ডাঃ রবীন্দ্রকুমার ঘোষাল সমিতির সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন।

এই মাসের (ফাল্গুন) মধ্যে খননকার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।"

ঐ পত্রিকার এই সংখ্যায়ই আরামবাগ মলয়পুর ইউনিয়নের একটি কর্ম্মবিবরণীর চুম্বক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা বাঙালীর জানিয়া রাখা প্রয়োজন; মলয়পুর ইউনিয়নে যাহা সম্ভব হইয়াছে তাহা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও সম্ভব:

"ইউনিয়ন বোর্ডের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যাঁহাদের সামান্য পরিচয় আছে, তাঁহারাই জানেন যে, ট্যাক্স আদায় করিয়া আবশ্যক ব্যয় বাদে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাতে বিশেষ কিছু কাজ করা সম্ভব হয় না। অথচ পল্লীর অভাব বহু প্রকারের—এইরূপ অবস্থায় সহৃদয় ব্যক্তির আর্থিক সাহায্য ও কর্ম্মীবৃন্দের সহযোগিতা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অত্যন্ত আনন্দের কথা, মলয়পুর ইউনিয়নে ইউনিয়নবাসীর সহযোগিতার লেশমাত্র অভাব ঘটে নাই। মলয়পুর ইউনিয়নের সুসন্তান জনাব মির্জ্জা আবদুর রসিদ ও শ্রীশৈলধর ঘোষের সাহায্য বিবরণটিতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। জনাব রসিদ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে নির্ম্মিত ১০টি নলকূপ ও শ্রীশৈলধর ঘোষ ৫টি নলকূপ খননের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কেশব-পুর শ্রীরামকৃষ্ণ পল্লী সমিতির সভ্যগণের সাহায্যের কথাও বিবরণীতে বিশেষভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। নলকূপ স্থাপন খাতে জনাব রসিদ সাহেবের নিকট হইতে ৩৫৭০৲ টাকা, শ্রীশৈলধর ঘোষের নিকট হইতে ১৭৪৬৸৶৬ ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ মারফত ১০০৲ টাকা, সর্ব্বসাকুল্যে ৫৪১৬৸৶৬ পাই সংগৃহীত হইয়াছিল ও সমস্ত অর্থই ব্যয়িত হইয়াছে।"

বাস্তুত্যাগীর বাস্তব ব্যবস্থা

বারাসত, বসিরহাট ও বনগাঁ মহকুমার মুখপত্র "সংগঠনী" পত্রিকার ১৬ই ফাল্গুন সংখ্যায় এই বিষয়ে যে একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা সকলে বিচার করিলে ভাল হয়। আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গের অনেক অঞ্চলে এরূপ সহৃদয়তার সহিত "বাস্তুত্যাগীদের" আশ্রয় ও চাষের জমির ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং বাস্তুত্যাগীরাও দেখাইয়াছেন যে তাঁহারা উন্নততর কৃষির কৌশল জানেন; এই বিষয়ে প্রথম কাজ হওয়া উচিত—গ্রামের সংখ্যা ও কত শত বা সহস্র বাস্তুত্যাগীর আশ্রয়ের ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা। কেহ যদি অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল মাত্র এই বিষয়ে মনঃসংযোগ করেন, তবেই এই প্রস্তাবের প্রকৃত পরীক্ষা হইবে :

"গ্রামবাসীদের নিকট আমাদের প্রস্তাব যাহারা কর্ম্মক্ষম অথচ কাজ করিবে না তাহাদিগকে কোন সাহায্য দিবেন না। আপনাদের নিকট আমাদের অনুরোধ বাস্তুত্যাগীদের সাহায্যের জন্য আপনারা কমিটি গঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করুন এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের ও বাস্তুত্যাগীদের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রতি গ্রামে ৫।৭টি বাস্তুত্যাগী পরিবারকে আশ্রয় দিবার জন্য প্রস্তুত হউন। ৫।৭টি পরিবারের বেশী লইতে যাইবেন না। কারণ তাহাতে গ্রামবাসীদের উপর অত্যধিক চাপ পড়িলে আপনাদেরই অন্নসংস্থানের কষ্ট দেখা দিবে ও তাহাতে বাস্তুত্যাগী ও আপনারা উভয়েই মারা পড়িবেন। আর আমাদের বিশ্বাস সম্প্রতি যে সংখ্যক বাস্তুত্যাগী পরিবার এখানে আসিয়াছে তাহাদের যদি পুনর্ব্বসতি ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করিতে হয় তাহা হইলে বনগাঁ, বারাসত ও বসিরহাট মহকুমার প্রতি গ্রাম পিছু ৫।৭টি করিয়া পরিবারকে আশ্রয় দিলেই চলিবে ও ইহাতে গ্রামবাসীদের উপরও চাপ অত্যধিক পড়িবে না এবং উহারা গ্রামবাসীদের সহায়তায় অতি অল্প দিনের মধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।"

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কার্য্যপদ্ধতি

পশ্চিমবঙ্গের নানা সরকারী বিভাগের কার্য্যপদ্ধতি লইয়া অনেক সময় নানা অভিযোগ শোনা যায়। ইহা শুনিয়া শুনিয়া বিভাগের লোকেরা কানে তুলো ও পিঠে কুলো দিবার অভ্যাসে পটুত্ব লাভ করিয়াছে এবং জনমত রুদ্ধ আক্রোশে দিন গুণিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে খাদ্যশস্যের ফসল বাড়াইবার কাজে সরকারের সময় ও অর্থ ব্যয় হইতেছে বলিয়া শুনিতেছি। কিন্তু তজ্জন্য সরকারী কৃষি-বিভাগের কর্ম্মতৎপরতা বাড়িয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। সংবাদপত্রে চাষীর পক্ষ হইতে অভিযোগ করা হয় যে, যেখানেই বীজ ও সারের জন্য কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারীবৃন্দের উপর নির্ভর করিতে হয়, সেখানেই সময়মত বীজ বা সার মিলে না। তার পরে কৃষি-বিভাগ কাগজের উপর কৈফিয়তের আঁচড় ক কর্ত্তব্য পালন করেন।

বর্দ্ধমানের "দামোদর" পত্রিকার ১৫ই ফাল্গুন সংখ্যায় "হাড়ের গুঁড়ার হদিশ" শীর্ষক একটি মন্তব্যে জনমতের একটা প্রকাশ পাইতেছি। লেখক "হলধরের" ছদ্মনামে মনের জ্বালা ব্যক্ত করিয়াছেন :

"ফাগুনের অর্দ্ধেক তো পগারপার। বাঁশের ঝাড়ে আগুন দেবার সময় এলো এদিকে বেগুনও বুড়িয়ে গেল। দু'চার ফোঁটা বৃষ্টিও হয়ে গেল। এইবার ধুলায় চাষ আরম্ভ দিতে হয়েছে—হাড়ের গুঁড়াও এই সময় থেকেই দিতে হবে। কি হাড়ের গুঁড়ার পাত্তা পাওয়া ভার। কোন্ দরগায় কোন্ পীরের কাছে গেলে মিলবে চাষীদিগের এখনো পর্য্যন্ত হদিশ দেওয়া হয় নাই। ভাদ্র মাসে জমির গাঁজ মারবার জন্য সরকারী তুঁতে এলো কার্ত্তিক মাসের ৮ই। অতএব সেই অনুপাতে হাড়গুঁড়ো যে ফাগুনের স্থলে আষাঢ়ে আসবে না তাই কে বলতে পারে! লাফানে হেলের মত এইরূপ ঝটিতি কাজ করবার জন্যেই আমাদের বিগত কৃষি-মন্ত্রীর মাইনে বাদে যেটের কোলে মাত্র আট হাজার টাকা সফর খরচ! তবু আমরা বলি, আমাদের জীবনযাপনের মান উন্নত হয় নাই!!"

মিষ্ট কথা বলিয়াও কোন ফল পাওয়া যাইতেছে না। সেই কথাই "খাদ্য-উৎপাদন" (পাক্ষিকের) সম্পাদক মহাশয় গত ১লা ফাল্গুনের সংখ্যায় বড় দুঃখে আমাদের শুনাইয়াছেন : "কৃষি ও খাদ্য বিভাগের সমুদয় পরিকল্পনা, প্রত্যেক পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্যপ্রণালী ও তাহার ফলাফল, কোন্ সময়ে কি কি বীজ, সার, কৃষিযন্ত্র, ইত্যাদি কি মূল্যে বা কি সর্ত্তে সরবরাহ করা হয়, কোন্ অঞ্চলে কৃষি-বিভাগের প্রচেষ্টায় স্থানীয় কৃষির কতদূর উন্নতি হইয়াছে ইত্যাদি অনেকেই জানিতে ইচ্ছা করেন এবং অনেকেই এ সম্বন্ধে আমাদের নিকট চিঠি পত্র লেখেন এবং দেখা করিতে আসেন। আমাদেরও প্রবল ইচ্ছা যে, এ বিষয়ে প্রত্যেককে যথাযথ ও সঠিক সংবাদ দিই। কিন্তু আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও এ বিষয়ে কৃষি ও খাদ্য বিভাগের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারি নাই; সময়ে সময়ে তাঁহাদের নিকট পত্র লিখিয়াও কোন উত্তর পাই নাই। এমন কি আমাদের অনুরোধসত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের 'প্রেস নোট' আমাদিগকে পাঠান না। "খাদ্য-উৎপাদনের" প্রত্যেক সংখ্যায় আমরা কৃষি ও খাদ্য বিভাগের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছি। কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের সহযোগিতার কথা প্রায়ই বলিয়া থাকেন—কিন্তু সহযোগিতা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও অনেকেই সহযোগিতা করিতে পারেন না। আমরা ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দ্দেশও সকল সময়ে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক পালিত হয় না।"

সোভিয়েট কৃষির প্রথম অধ্যায়

ব্রিটিশ প্রচার বিভাগ আর্মল্ড ইয়র্ক লিখিত একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কৃষি-উন্নতির ইতিহাস প্রচার করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে :

"সোভিয়েট 'এনসাইক্লোপিডিয়া'য় প্রকাশিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে ১৯১৯ সালে লেনিন ক্ষুদ্র চাষীদের সমবায়-পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেন। সমবায় সমিতির সদস্য পরস্পর চাষের যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম এবং প্রয়োজন হলে শ্রমিক দিয়েও সাহায্য করত। চাষীরা এই ব্যবস্থা মেনে নিতে বিশেষ আপত্তি করে নি, কারণ সমবায় পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করারও সুবিধা ছিল। লেনিনের এরূপ পরিকল্পনা ছিল যে এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হলে সমস্ত সমবায় সমিতিকে যৌথ-কৃষি ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা সম্ভব হবে; সে ব্যবস্থায় রাষ্ট্রই কৃষিকার্য্যের সমস্ত যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম এবং গবাদি পশুর একমাত্র মালিক হবে।

এই পরিকল্পনার নাম ছিল 'লেনিন সমবায় পরিকল্পনা' তার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল সমবায় পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করা নয়, সমগ্র রাশিয়ার কৃষি-ব্যবস্থাকে সোভিয়েট অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করা। বৃহৎ ভূম্যধিকারীদের উচ্ছেদ করা হ'ল, কিন্তু কৃষিকার্য্যে প্রচুর অভিজ্ঞতার জন্য কুলাকদের (ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র ভূম্যধিকারী) কিছুকালের জন্য বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন হ'ল। চাষীদের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা ও উৎসাহ দেওয়া হ'ল।

কিন্তু ষ্টালিনের শীঘ্রই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। ১৯২৬ সালে 'লেনিনবাদের সমস্যা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে মজদুর ও কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ষ্টালিন বলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়াতে যখন মজদুররাজ অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট পার্টির সর্ব্বময় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন কৃষি-ব্যবস্থাকেও অবিলম্বে গবর্ণমেন্টের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রাধীনে নিয়ে আসতে হবে।

সুতরাং ১৯২৬ সালে পুরাতন ভূম্যধিকারীদের স্থলে নূতন সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ আরম্ভ হ'ল। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্টি কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশনে যৌথ কৃষি-ব্যবস্থা প্রচলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুলাক (বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী) বিতাড়ন এবং প্রোলিটারিয়েট আমলাতন্ত্রীগণ কর্ত্তৃক কৃষি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ সুরু হতে বিলম্ব হ'ল না। ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে ষ্টালিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষি-ব্যবস্থা গঠন করার জন্য শহর থেকে ২৫,০০০-এরও অধিক সংখ্যক শ্রমিক গ্রামে প্রেরিত হ'ল। তাদের উদ্দেশ্য প্রধানত: রাজনৈতিক হলেও তারাই কৃষকশ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করল।

ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে ষ্টালিন মার্কসবাদীদের এক সম্মেলনে একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি কুলাক-শ্রেণীকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করার নীতি ঘোষণা করেন। ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে কুলাকদের বিতাড়ন এবং তাদের জায়গা জমি, গবাদি পশু ও চাষের সাজসরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা সরকারী আদেশনামা প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসর শীতকালের মধ্যেই প্রায় ৫,০০,০০০ কুলাককে নির্ব্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। এদের মধ্যে অনেককেই সুদূর সাইবেরিয়ার খনিমধ্যে বা অন্য কোন কষ্টসাধ্য কার্য্যে শ্রমিকের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। পরবর্ত্তী দু'বৎসর অর্থাৎ ১৯৩২ সালের মধ্যে মোট ২০,০০,০০০ কুলাক ও অবস্থাপন্ন জোতদারকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করা হয়।

এর ফলে কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞ চাষীদের অভাব ঘটল; আমলাতন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে যৌথ কৃষি-ব্যবস্থা প্রচলন করার প্রত্যক্ষ ফল হ'ল গুরুতর উৎপাদন হ্রাস এবং ইউক্রেন ও দক্ষিণ রাশিয়ায় নিদারুণ দুর্ভিক্ষ।

অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি 'গণতান্ত্রিক' ব্যবস্থার পুন:প্রবর্ত্তন করতে বাধ্য হলেন। শহরগুলিতে কৃষিজাত দ্রব্যাদির অবাধ ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হ'ল। যৌথ ফার্ম্মগুলি ও স্বতন্ত্র চাষীরা সরকারকে নির্দ্দিষ্ট কোটা অনুযায়ী শস্য দেওয়ার পর অবশিষ্ট শস্য বাজারে বিক্রয় করার স্বাধীনতা পেল।

এই ব্যাপার ঘটে ১৯৩৫ সালে, কিন্তু বর্ত্তমানেও অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নি।"

চীন-সোভিয়েট মৈত্রী-চুক্তি

গত ২রা ফাল্গুন মস্কো রেডিও প্রচার করিয়াছিল যে, সেই দিন চীনের কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্টের নায়ক মাও-সে-তুং সোভিয়েট রাষ্ট্রের সঙ্গে এক মৈত্রী-চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। বিশ্বের মোট অধিবাসী-সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ এই চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। দুই মাস আলাপ-আলোচনার পর সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব আঁদ্রে ভিসনস্কি ও মাও-সে-তুং এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

গত ১৬ই ডিসেম্বর বর্ত্তমান চীনের রাষ্ট্র-নায়ক মাও সে-তুং রাশিয়ায় উপনীত হন। এক মাস পরে নয়াচীনের পররাষ্ট্র সচিব চৌ এন লাই তাঁহার সহিত মিলিত হন।

চুক্তির সর্ত্তাবলী

"চুক্তিপত্রে পোর্ট আর্থার নৌ-ঘাঁটি হইতে সোভিয়েট সৈন্য অপসারণ এবং মাঞ্চুরিয়ার চাং-চুং রেলওয়ে চীনের নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রত্যর্পণ করা হইবে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হইবার পর উক্ত সর্ত্ত দুইটি কার্য্যকরী হইবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার জন্য রাশিয়া চীনকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করিবে।

"১৯৪৫ সালের চীন-সোভিয়েট চুক্তি বাতিল করিয়া উভয়

রাষ্ট্রের মধ্যে বার্তা-বিনিময় হইয়াছে। নূতন চুক্তিতে বহির্মোঙ্গোলিয়ার পূর্ণ সার্ব্বভৌম অধিকার স্বীকার ও অনুমোদন করা হইয়াছে।

"মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েট অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হস্তগত জাপানী মালিকদের সম্পত্তি রাশিয়া চীনের নিকট কোন-রূপ ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকেই হস্তান্তরিত করিবে। উভয় রাষ্ট্রই জাপান ও অন্যান্য শক্তির সাম্রাজ্যবাদ ও পররাজ্য অধিকার লিপ্সার পুনঃপ্রকাশ প্রতিরোধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

"যদি চুক্তি-সম্পাদনকারী দেশ দুইটির যে কোনটি জাপান বা জাপানের মিত্রপক্ষীয় কোনও রাষ্ট্রের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ফলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে অপর দেশটি আক্রান্ত দেশকে অবিলম্বে যথাশক্তি সামরিক ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিবে।

"উভয় দেশই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সম্মিলিত পক্ষের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সহিত ও একযোগে জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত চীন বা সোভিয়েট রাশিয়া বিরোধী কোনও চুক্তিতে তাহারা আবদ্ধ হইবে না বলিয়াও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এই চুক্তি ত্রিশ বৎসরকাল বলবৎ থাকিবে। চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর যদি কোন পক্ষই এক বৎসরের মধ্যে উহা বাতিল না করে, তাহা হইলে উহা আরও পাঁচ বৎসর বলবৎ থাকিবে এবং পরে ইহার মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করা যাইবে।

"চীনকে প্রদত্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের ঋণ (৩০০ কোটি ডলার—প্রায় এক হাজার কোটি টাকা) দশটি বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর হইতে কিস্তির মেয়াদ গণনা করা হইবে। ছয় মাস পর পর সুদ দিতে হইবে।

"মৈত্রী ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব লইয়া উভয় রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও সার্ব্বভৌম ক্ষমতাকে সম ও পূর্ণ মর্য্যাদা-দানের ভিত্তিতে চীন ও রাশিয়া অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করিতেছে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ নিবিড়তর করার জন্য এবং পরস্পরকে সর্ব্বপ্রকার অর্থনৈতিক সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য তাহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছে।"

এই সংবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ সেই রাষ্ট্রের কূট-রাজনীতিকগণ বলিতেছেন যে, মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীনের কয়েকটি বন্দরের প্রতিদানে বর্ত্তমানে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় চীন রাষ্ট্র কোন কোন সুবিধা আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছে। অবিশ্বাস ও আক্রোশ কোন কারণে মনে দানা বাঁধিলে গত দিনের বন্ধু আজ শত্রু হইয়া পড়ে। চিয়াংকাই-শেকের চীন আর মাও-সে-তুং-এর চীন যখন ভিন্ন রাজনীতিক-পন্থী, তখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরও মত ও ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

এটম্‌ বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৭ অধিবেশন পুনা নগরীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই উপলক্ষ্যে অনেক বিদেশী বিজ্ঞান-শাস্ত্রী নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ফ্রান্সের কুরী দম্পতি—অধ্যাপক জলিয়ট কুরী ও ম্যাডাম আইরেন কুরী—ও যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক কম্‌টন এটম্‌ বোমার আবিষ্কারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। অধ্যাপক কম্‌টন পুনায় এক বক্তৃতা উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন যে ফ্রান্সেই প্রথম পরমাণু-ভঙ্গের কাজ আরম্ভ হয়; তার পর জার্ম্মানীতে, তার পর বিলাতে ও যুক্তরাষ্ট্রে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজনে এই আবিষ্কার ত্বরান্বিত হয় এবং তার শক্তি পরীক্ষা হয় দুইটি জাপানী নগরের উপরে; তাদের নাম নাগাসাকি ও হিরোশিমা।

এই পরীক্ষায় এটম্‌ বোমার যে প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে বিশ্বজগৎ কাঁপিয়া উঠে এবং এই জন-পদবিধ্বংসী অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠান জন্মাবধি এই বিষয়ে ব্যাপৃত আছে। কিন্তু সফলতার সদুপায় সম্বন্ধে সকলে একমত হইতে পারে নাই। কারণ সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হইতেছে যে এই অস্ত্রের ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে একেবারে নিষিদ্ধ হউক, যুক্তরাষ্ট্র বলিতেছে যে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করুক। এই তর্কের এখনও শেষ হয় নাই।

ইতিমধ্যে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকেরা এটম্‌ বোমা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন; ফলে যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার বিনষ্ট হইয়াছে। এই ঘোষণার পরে যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকগণ জগতের শান্তি সম্বন্ধে আরও চিন্তান্বিত হইয়াছেন। তাঁদের এই মনোভাব দুই জন বৈজ্ঞানিক প্রকাশ করিয়াছেন তাহা জানিয়া রাখা প্রয়োজন মনে করি।

আমেরিকার অন্যতম প্রধান পরমাণু বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ডাঃ হ্যারল্ড সি উরি একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন, রাশিয়া সম্ভবতঃ আগামী দুই বৎসরের মধ্যে পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারক জাতি হিসাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের অবসান ঘটাইবে। ডাঃ উরি "হেভি হাইড্রোজেন" আবিষ্কর্ত্তা এবং বোমা প্রস্তুত বিষয়ে অগ্রদূত, তিনি নোবেল পুরস্কারও পাইয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে ডাঃ উরি আরও বলিয়াছেন, বিগত যুদ্ধের পর হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বোমা উৎপাদনের কাজের গতি কতকটা মন্থর হইয়া গিয়াছে; অপর পক্ষে রাশিয়ায় যুদ্ধকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেরূপ গতিতে কাজ হইয়াছে সেইরূপ গতিতে কাজ চলিতেছে।

তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে "অপর্য্যাপ্ত এবং নৈরাশ্যজনক" বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি

বলেন, খুঁটিনাটি নিরাপত্তা বিধান ও কম্যুনিষ্ট মনোভাবাপন্ন বলিয়া অভিযোগ আনয়নের ফলে বহু প্রতিভাবান পরমাণু-বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক বিরক্ত হইয়া কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকবৃন্দ এটম্‌ বোমার ধ্বংসের ক্ষমতা লইয়াই ব্যস্ত নহেন। তাঁহারা ইহাও বলিতেছেন যে তদপেক্ষা মারাত্মক অস্ত্র প্রস্তুত করিবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আছে। তন্মধ্যে হাইড্রোজেন বোমার নাম উঠিয়াছে এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান নাকি তাহা প্রস্তুত করিবার ঢালাই আদেশ দিয়া দিয়াছেন। আমাদের পুরাণে দ্বাদশ সূর্য্যের তেজের অধিকারী সৃষ্টিবিধ্বংসী শক্তির কথা আছে। আমরা কি সেই অবস্থায় আসিতেছি?

শরৎ চন্দ্র বসু

গত ৮ই ফাল্গুন এই রাজনীতিক নরশ্রেষ্ঠ মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন; নেতাজীর জীবনের স্মৃতিপূত, নেতাজীর তন্ত্রধারক একজন তাঁহার আরব্ধ কাজ অপূর্ণ রাখিয়া মাত্র ৬১ বৎসর বয়সে চলিয়া গেলেন। দেশের দুর্ভাগ্য, জাতির দুর্ভাগ্য।

বর্ত্তমান যুগের মধ্যবিত্ত ভারতবাসী শিক্ষা-দীক্ষায় যেসব সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শরৎ চন্দ্রের পক্ষে সহজলভ্য হইয়াছিল, পিতা জানকীনাথের সুব্যবস্থায়। কিন্তু শরৎ চন্দ্রের কৈশোরে জাতির জীবনে এমন একটি নবজাগরণের বন্যা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, যাহার ফলে শিক্ষিত ভারতবাসীর অনেকের পক্ষে অভ্যস্ত জীবনযাত্রা অসহ্য হইয়া উঠিল। যাঁহারা নিজে এই বন্যায় ঝাঁপ দিতে পারিলেন না, তাঁহারা "পাড়ানীর কড়ি" যোগাইতে পশ্চাৎপদ হইলেন না। অর্থে ও পরামর্শে তাঁহারা তান্ত্রিক দেশ-সেবকদের মৃত্যুগহন যাত্রাপথের সহায়ক ছিলেন। শরৎ চন্দ্রের জীবন সেইরূপ কনিষ্ঠ সুভাষচন্দ্রের "খাজাঞ্চী" হইয়া আরম্ভ হয়।

ইংরেজ রাজের রোষবহ্নিতে পড়িয়া তাঁহার জীবনের শেষ ২৫ বৎসর কাটিয়াছিল। তাহাতে কষ্ট ছিল, ত্যাগ ছিল সমগ্র পরিবারের। কিন্তু শরৎ চন্দ্র এই আঘাতে মুহ্যমান হইলেন না; বিদেশী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মন তাঁহার কঠোর হইতে কঠোরতর হইল। সুভাষচন্দ্রের চরিত্রে যে অনমনীয় মনোভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, তাঁহার মেজদার জীবনেও তাহা দেদীপ্যমান ছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, স্বাধীনতার আদর্শে সর্ব্বস্ব বলিদান তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়া পড়িল।

বাঙালী চরিত্রের দোষ-গুণ তাঁহার জীবনকে একটা বৈশিষ্ট্যদান করিয়াছিল। আমাদের অনেক সময় মনে হইয়াছে যে, যে ঐতিহ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি, স্পর্শকাতর আত্মসম্মানবোধ, তার ধারা, বোধ হয়, শরৎ চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া গেল। দরাজ মন, মুক্ত হস্ত, বন্ধু-বাৎসল্য, চরিত্রের শুচিতা এই বৈশিষ্ট্যগুলি শরৎ চন্দ্রের জীবনকে মহিমময় করিয়াছিল; তাহা বাঙালী-জীবন হইতে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যাইতেছে। সেই কথা ভাবিয়াই আমরা তাঁহার তিরোধানে আত্মীয়জন-বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি।

সচ্চিদানন্দ সিংহ

বিহারের এই নাগরিক-প্রধান ৭৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অনেকে তাঁহাকে নব-বিহারের একজন স্রষ্টা বলিয়াছেন, যে বিহার ১৯১২ সালে সৃষ্টি করা হইয়াছিল বাংলা দেশ হইতে বিহার ও উড়িষ্যাকে বিযুক্ত করিয়া। তাহার ফলে ১৯৩৭ সালে বিহার হইতে উড়িষ্যাকে আবার বিযুক্ত করিয়াছিল ইংরেজ; তাহার একমাত্র কারণ ছিল যে বিহারীর ও উড়িয়ার ভাষা এক নয়।

কিন্তু বিহারকে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রদেশে সংগঠিত করিবার প্রথম ও প্রধান অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন ৺মহেশনারায়ণ। সচ্চিদানন্দ সিংহ প্রভৃতি ছিলেন তাঁহার অনুগামী, এবং সৈয়দ আলি ইমাম বড়লাটের—হার্ডিঞ্জের—আইন সচিব ছিলেন বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল যখন কার্জনের বঙ্গ-বিভাগ রদ করা প্রয়োজন মনে করা হইয়াছিল ইংরেজের স্বার্থরক্ষার জন্য।

সচ্চিদানন্দ সিংহ ছিলেন একনিষ্ঠ সাংবাদিক। তাঁহার "কায়স্থ পত্রিকা" রূপান্তরিত হইয়াছিল "হিন্দুস্থান রিভিউ" নামে। প্রায় ৫০ বৎসর এই মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে সচ্চিদানন্দ সিংহ দেশের সেবা করিয়াছেন "নরমপন্থী" রাজনৈতিকরূপে। ব্রিটিশ আমলে তিনি সর্ব্বাবস্থায় এই শাসনকার্য্যে সহযোগ করিয়াছেন।

হরেন্দ্রনাথ ঘোষ

গত ২৬শে ফাল্গুন আকুমার বিপ্লবী এই জননেতা ৬৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বিপ্লবের প্রয়োজনে সামরিক জ্ঞান অপরিহার্য্য। তাহা অর্জ্জনের জন্য হরেন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থায় বিলাতে ১৯১৪ সালে ইংরেজের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। সেই মন লইয়াই তার পর সমস্ত জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে যোগ দেন। গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত আন্দোলনাদিতে হাওড়া জেলার সংগঠনে তাঁহার কৃতিত্ব ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অনুরূপভাবের প্রেরণায় যখন সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন, তখন তাঁহার সহকর্ম্মীবর্গের মধ্যে, "ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বে, হরেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট স্থান ছিল। শেষ জীবনে সেইজন্য তাঁহাকে দেখিতে পাই কংগ্রেসী রাজনীতির বিরোধী। এই বিদ্রোহী মনোভাবই হরেন্দ্রনাথের জীবনের প্রকৃত পরিচয়। তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

বুদ্ধের বিদ্রোহী শিষ্য দেবদত্ত

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

শাক্যবংশীয় অভিজাত ক্ষত্রিয়কুলে দেবদত্তের জন্ম হয়।১ শাক্যরাজ ভদ্দিয়, তাঁহার বন্ধু অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভগু ও কিম্বিল নামে কয়েকজন সমশ্রেণীর সহচর ও তাঁহাদের নাপিত উপালির সহিত দেবদত্ত বুদ্ধের নিকট দীক্ষা লইয়া সংঘে প্রবেশ করেন।২

তিনি শক্তিমান এবং প্রতিভাবান ছিলেন। নিষ্ঠাও তাঁহার কম ছিল না। শীঘ্রই তিনি বুদ্ধের একাদশ জন প্রধান শিষ্যের অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য সারিপুত্র পর্যন্ত এককালে তাঁহার গুণগান করিয়া বেড়াইতেন।৩ বুদ্ধ নিজেও তাঁহার এই এগার জন শ্রেষ্ঠ শিষ্যের প্রত্যেকের প্রশংসা করিতেন।

এক দিন যখন এই একাদশ জন শিষ্য বুদ্ধের নিকট আসিতেছিলেন তখন বুদ্ধ বলিয়া উঠেন: "ভিক্ষুগণ, দেখ! —ঐ ব্রাহ্মণগণ আসিতেছেন।"

ইহা শুনিয়া একজন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ভিক্ষু প্রশ্ন করেন: "ভগবান্ ব্রাহ্মণ কে? কোন্ গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ হয়?"

বুদ্ধ তাহার উত্তরে বলেন—

"যাঁহারা অসৎ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়াছেন
যাঁহারা স্মৃতিযোগে বিচরণ করেন
বন্ধন যাঁহাদের ছিন্ন হইয়াছে
সেই জ্ঞানী ব্যক্তিগণই এই জগতে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হন।"৪

বুদ্ধের এইরূপ একজন শ্রেষ্ঠ শিষ্য হইয়াও এক দিন তিনি সংঘ হইতে বাহির হইয়া নূতন সংঘ গঠন করেন। অজাতশত্রু তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হন।

বুদ্ধের সহিত দেবদত্তের বিচ্ছেদের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ধর্ম সম্বন্ধে এবং সংঘের নিয়মকানুন বিষয়ে মতভেদই ঐ বিচ্ছেদের কারণ।

বিনয়ে দেখিতে পাই [বুদ্ধের পরিনির্বাণের আট বছর পূর্বে] দেবদত্ত কয়েকজন ভিক্ষুর সহিত বুদ্ধের নিকট নিম্নোক্ত রূপ প্রস্তাব করেন:৫ (১) ভিক্ষুগণ সমস্ত জীবন বনে বাস করিবেন। (২) তাঁহারা কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না, কেবলমাত্র ভিক্ষাপ্রাপ্ত অন্নের দ্বারাই জীবন ধারণ করিবেন। (৩) পরিত্যক্ত ছিন্নবস্ত্র সীবন করিয়াই তাঁহারা তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিবেন, গৃহস্থের প্রদত্ত নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিবেন না (৪) তাঁহারা সর্বদা বৃক্ষতলে বাস করিবেন।৬ (৫) আমিষ আহার সর্বথা পরিত্যাগ করিবেন। (৬) এই সমস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বুদ্ধ বলেন যে, তিনি এই সমস্ত নিয়ম বাধ্যতামূলক করিতে চান না। তবে যাঁহার ইচ্ছা তিনি এই নিয়মগুলি পালন করিতে পারেন। কেবল বর্ষাকালে বৃক্ষতলে জীবন যাপন তিনি অনুমোদন করেন না।৭

ইহাতে দেবদত্ত সংঘ হইতে বাহির হইয়া যান। বহু ভিক্ষু-ভিক্ষুণী তাঁহার নবগঠিত সংঘে যোগদান করেন।৮

বৌদ্ধ সাহিত্যে নানা কল্পিত, পরস্পরবিরুদ্ধ ও অতিরঞ্জিত কাহিনী হইতে দেবদত্ত সম্বন্ধে এই তথ্যটুকু নিরপেক্ষ পাঠকের চোখে পড়ে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে দেবদত্ত সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যে তাঁহার সম্বন্ধে বহু বিস্তারিত বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত বর্ণনার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়—দেবদত্ত ধর্মদ্রোহী, সংঘভেদক, বুদ্ধের বধকামী, নারীহত্যাকারী, পরস্ত্রীপরায়ণ—এক কথায় যাহা কিছু জঘন্য তাহার সমন্বয় হইলেন তিনি।

বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে—বুদ্ধ যখন দেবদত্তের প্রস্তাবিত এই পাঁচটি নিয়ম আবশ্যিক করিতে অস্বীকার করিলেন তখন দেবদত্ত পাঁচ শত নবদীক্ষিত ভিক্ষুকে দলে টানিয়া গয়াতে চলিয়া গেলেন। ইহার পর বুদ্ধের আজ্ঞাক্রমে সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন ভিক্ষুগণকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য গয়া রওনা হইলেন। দেবদত্ত তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সেদিন অধিক রাত্রি পর্যন্ত ধর্মব্যাখ্যা করিতে করিতে দেবদত্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে ধর্মব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে তাঁহার বন্ধু কোকালিক বলিয়া উঠেন: "ভন্তে দেবদত্ত, আপনি ইহাদের বিশ্বাস করিবেন না। ইহাদের দুষ্ট অভিপ্রায় রহিয়াছে।"

বন্ধু এইভাবে সতর্ক করিয়া দিলেও দেবদত্ত তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া ধর্মব্যাখ্যানের জন্য আহ্বান করিলেন এবং নিজে বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। ইত্যবসরে সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন সমস্ত ভিক্ষুকে স্বমতে আনিয়া তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। ইহা দেখিয়া কোকালিক ব্যস্ত হইয়া দেবদত্তকে জাগাইলেন। জাগ্রত হইয়া দেবদত্ত রক্ত বমন করিতে লাগিলেন।৯

পরবর্তী কালে রচিত বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে—অন্তিম কালে দেবদত্তের অত্যন্ত অনুতাপ হয়। তিনি বুদ্ধের দর্শনার্থী হইয়া শকটারোহণে যাত্রা করেন। জেতবনের সমীপে আসিয়া তিনি শকট হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে বুদ্ধের বাসস্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন—পথিমধ্যে মেদিনী বিদীর্ণ হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করে। তিনি অবীচিতে প্রবেশ করেন।১০

বুদ্ধের গোঁড়া ভক্তবৃন্দ তো এইভাবে দেবদত্তকে মাটি চাপা দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিলেন এবং ইহা পাঠ করিয়া পাঠকদেরও ধারণা হইল দেবদত্ত এবং তাঁহার প্রবর্তিত সংঘ কয়েক দিনের জন্য মাথা তুলিয়া চিরতরে অতলে তলাইয়া গেল।

কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় নাই। দেবদত্তের মৃত্যুর পরেও সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ তাঁহার সংঘ প্রতিষ্ঠিত ছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকেও শ্রাবস্তীতে তাঁহার সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে।

৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে ফা হিয়েন বলিতেছেন: "দেবদত্তের এখন পর্যন্ত অনেক ভক্ত ভিক্ষু রহিয়াছেন। তাঁহারা শাক্যমুনির পূজা না করিয়া অতীত তিন বুদ্ধের পূজা করেন।"

সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন সং বলিতেছেন: "কর্ণসুবর্ণতে (পূর্ববঙ্গে) হীনযান সম্প্রদায়ের দশটি সংঘারাম আছে যেখানে ভিক্ষুগণ দুগ্ধ বা ঘৃত ব্যবহার করেন না। ইহারা দেবদত্ত প্রচারিত ধর্ম অনুসরণ করেন।"১১

যাঁহার প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায় বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মের প্রবল প্রভাব সত্ত্বেও সহস্রাধিক বর্ষকাল জীবিত ছিল, তিনি যে নিতান্ত জঘন্য অসার এবং অপদার্থ ব্যক্তি ছিলেন ইহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়?

দেবদত্ত সম্বন্ধে প্রাচীন পালিসাহিত্যে কোথায় কি পাওয়া যায় এবং তাহা কতদূর নির্ভরযোগ্য এইবার আমরা তাহা বিচার করিব।

দীঘনিকায় ও সুত্তনিপাতে কোথাও দেবদত্তের উল্লেখ পর্যন্ত নাই। মজ্ঝিমনিকায়ে মাত্র দুই বার তাঁহার উল্লেখ আছে।

(১) "দেবদত্তের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে" ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে ভিক্ষুদের আহ্বান করিয়া লাভসম্মান শীল জ্ঞানাদি হইতে যে অভিমান উৎপন্ন হয় তাহার বিপদ এবং তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দেন। দেবদত্তের প্রসঙ্গেই এই ভাষণ, কিন্তু সমস্ত পরিচ্ছেদে দেবদত্তের আর উল্লেখ নাই।

মজ্ঝিম (পি, টি, এস্) ১ম, ১৯২ পৃষ্ঠা

(২) অভয় রাজকুমার সুত্র

কথিত আছে, বুদ্ধকে জব্দ করিবার জন্য মহাবীর অভয় নামক এক রাজকুমারকে তাঁহার নিকট পাঠান। অভয়কে বলা হয়—তুমি বুদ্ধকে নিম্নোক্তরূপ প্রশ্ন করিবে: যে বাক্য অন্যের অপ্রিয়, বিরাগজনক, তাহা বুদ্ধ বলেন কি না? যদি বুদ্ধ উত্তর দেন যে তিনি ঐরূপ বাক্য বলিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে বলিবে—"তাহা হইলে আপনার সঙ্গে প্রাকৃত জনের প্রভেদ কোথায়?"

আর বুদ্ধ যদি উত্তর দেন—তিনি ঐরূপ বাক্য বলেন না তাহা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে—কেন তবে তিনি দেবদত্তকে অপায়িক, নৈরয়িক, অচিকিৎস্য ইত্যাদি বলিয়াছেন?

অভয়ের প্রশ্নে বুদ্ধ বলেন—"অভয়, তোমার ক্রোড়স্থ এই বালকটি (অভয়ের ক্রোড়ে তখন একটি বালক ছিল) যদি কাঠি বা কাঁকর মুখে পুরে, তবে তুমি কি করিবে?"

অভয় বলেন—"আমি উহা তখনই ইহার মুখ হইতে বাহির করিয়া আনিব। ভালভাবে না হয় জোর করিয়াও তাহা করিব। তাহাতে রক্তপাত হয় তাহাও স্বীকার। কারণ এই বালক আমার স্নেহের পাত্র।"

বুদ্ধ বলিলেন—"হে রাজকুমার, ঠিক এই ভাবেই তথাগত যে বাক্য সত্য বলিয়া জানেন তাহা শ্রোতার অপ্রিয় ও বিরাগজনক হইলেও (তাহার হিতের জন্য) তিনি তাহা বলিয়া থাকেন।" (মজ্ঝিম, ১ম, ৩৯২ পৃষ্ঠা)

সংযুত্তনিকায়ে তিন বার দেবদত্তের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে।

১। দেবদত্তের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে এক সময় ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আসিয়া এই গাথা উচ্চারণ করেন।

কদলীর ফল কদলীকে নষ্ট করে। বেণু ও নলকেও তাহাদের ফল নষ্ট করে। ঠিক এই ভাবেই সৎকার (সম্মান) অসৎ পুরুষকে ধ্বংস করে। যেমন অশ্বতরীর গর্ভ তাহার ধ্বংসের কারণ হয়। সংযুত্ত (পি, টি, এস্) ১ম খণ্ড, ১৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা।

২। ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় সারিপুত্র, মহামৌদ্গল্যায়ন, মহাকাশ্যপ, অনুরুদ্ধ, পুণ্ণ মন্তানিপুত্ত, উপালি, আনন্দ এবং

দেবদত্ত প্রত্যেকে বহু ভিক্ষুর সহিত অদূরে ভ্রমণ করিতেছিলেন।

ঐ সময় বুদ্ধ, উক্ত প্রধান শিষ্যবৃন্দ ও উঁহাদের অনুচর ভিক্ষুগণ সম্বন্ধে তাঁহার সমীপস্থ শিষ্যদের নিকট পৃথক পৃথক মন্তব্য করেন। যেমন সারিপুত্র ও তাঁহার শিষ্যগণকে বলেন—'মহাপ্রজ্ঞ'; মৌদ্গল্যায়ন ও তাঁহার অনুচরবর্গকে বলেন—'মহা-ঋদ্ধিসম্পন্ন' ইত্যাদি। দেবদত্ত ও তাঁহার অনুচরবৃন্দ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন—"এই ভিক্ষুগণ পাপাভিসন্ধ"। (ঐ, ২য়, ১৫৫-৫৬ পৃ.)

৩। লাভ ও সম্মানের প্রসঙ্গ চলিতেছিল। কিভাবে লাভ ও সম্মান মানুষকে নষ্ট করে তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে দেবদত্তের কথা উঠিল। ভগবান বলিলেন—"লাভ ও সম্মানের দ্বারা দেবদত্তের শুক্লধর্মের উচ্ছেদ হইয়াছে। লাভ ও সংকারের দ্বারা অভিভূত হইয়া খিন্নমনা দেবদত্ত সংঘভেদ করিয়াছে।"

ইহার পরই আছে:

দেবদত্তের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে এক সময় ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেখানে ভগবান ভিক্ষুগণের নিকট দেবদত্তের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

"হে ভিক্ষুগণ! নিজের বধের জন্যই দেবদত্তের লাভ ও সংকার লাভ হইয়াছিল। পরাভবের জন্যই তাহার লাভ ও সংকার লাভ হইয়াছিল" ইত্যাদি।

এখানেও কদলী, বেণু, নল ও অশ্বতরীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর আছে:—

ভগবান যখন রাজগৃহে বেণুবনে কলন্দক নিবাপে বিরাজ করিতেছিলেন সেই সময় কুমার অজাতশত্রু পঞ্চশত রথ লইয়া প্রতিদিন প্রভাতে এবং সন্ধ্যায় দেবদত্তের নিকট উপস্থিত হইতেন এবং পঞ্চশত পাত্রে নানা সুখাদ্য সঙ্গে লইয়া যাইতেন। বহু ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট গিয়া এই সংবাদ নিবেদন করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন—"ভিক্ষুগণ, তোমরা দেবদত্তের এই লাভ ও সংকারের প্রতি স্পৃহা করিও না। ইহাতে দেবদত্তের কুশলধর্মের হানিই হইবে।

"কোনো ভীষণ প্রকৃতি কুকুরের নাকের উপর পিত্তের থলি কাটাইলে১২ সে যেমন অধিকতর ভীষণ হইয়া উঠে এই লাভ ও সংকার দেবদত্তের পক্ষেও তেমনি হইবে। ইহাতে দেবদত্তের কুশলধর্মের প্রতি আগ্রহ কমিতে থাকিবে।" ঐ, ২য়, ২৪০-৪২ পৃষ্ঠা।

অঙ্গুত্তর নিকায়ে আছে:

১। দেবদত্তের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে বিহার করিতেছিলেন। তিনি দেবদত্তের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া লাভ ও সংকারের নিন্দা করিতে লাগিলেন।

"আত্মপদের জন্যই দেবদত্তের লাভ ও সংকার লাভ হইয়াছিল।" "কদলীর ফল যেমন কদলীকে নষ্ট করে" ইত্যাদি পূর্ববৎ। (অঙ্গুত্তর (পি, টি, এস্) ২য়, ৭৩ পৃষ্ঠা।)

২। ভগবান যখন কৌশাম্বীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ককুধ নামে মৌদ্গল্যায়নের একজন সদ্যোমৃত অনুচর-শিষ্য দিব্যরূপ ধারণ করিয়া মৌদ্গল্যায়নকে বলেন—"ভন্তে! 'আমি ভিক্ষুসংঘকে চালনা করিব'—দেবদত্তের এইরূপ অভিলাষ হইয়াছে। এবং এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ঋদ্ধিহানি হইয়াছে!"

এই সংবাদ মৌদ্গল্যায়ন বুদ্ধের গোচরে আনেন। বুদ্ধ ইহা শুনিয়া বলেন—"মৌদ্গল্যায়ন, তুমি কি ককুধের চিত্তে প্রবেশ করিয়া বুঝিয়াছ যে সে যাহা বলিয়াছে তাহাই হইবে তাহার অন্যথা হইবে না।" মৌদ্গল্যায়ন বলিলেন, "হাঁ ভগবান"। তখন বুদ্ধ বলিলেন—"এই বাক্য গোপন রাখ। সেই মূর্খ নিজেই নিজেকে প্রকাশ করিবে!" (ঐ, ৩য়, ১২২-২৩ পৃষ্ঠা)।

৩। ভগবান বুদ্ধ তখন কোশল দেশে। এক জন ভিক্ষু এক দিন আনন্দকে প্রশ্ন করিলেন, "ভগবান যে দেবদত্তকে অপায়িক, নৈরয়িক, অচিকিৎস্য বলিয়াছেন—উহা কি তিনি ধ্যানযোগে জানিয়াছেন কিংবা কোন দেবতা তাঁহাকে উহা বলিয়াছেন?"

এই কথা আনন্দ বুদ্ধকে জানাইলে বুদ্ধ প্রশ্ন করেন—"আনন্দ ঐ প্রশ্নকারী কি অল্পদিন প্রব্রজ্যাগ্রাহী নূতন ভিক্ষু, স্থবির অথবা বালক? (অর্থাৎ আমার এই উক্তিতে তাঁহার সংশয় জন্মাইল কেন?) আমি যাহা বলি তাহার অন্যথা হয় কি?"

"কেশাগ্রপ্রান্তে যতটুকু বস্তু থাকা সম্ভব, যতদিন আমি দেবদত্তের মধ্যে ততটুকু ধর্মও দর্শন করিয়াছি ততদিন পর্যন্ত আমি বলি নাই—দেবদত্ত অপায়িক ইত্যাদি। কিন্তু যখন দেখিলাম কেশাগ্রপ্রান্তে যতটুকু বস্তু থাকা সম্ভব ততটুকু ধর্মও তাহার মধ্যে নাই তখনই আমি বলিলাম—দেবদত্ত অপায়িক ইত্যাদি"।১৩ অঙ্গুত্তর, তৃতীয়, ৪০২-৩ পৃ.

৪। দেবদত্তের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে বিহার করিতেছিলেন। সেই সময় এক দিন তিনি দেবদত্তের প্রসঙ্গে বলিলেন—"লাভের দ্বারা, যশের দ্বারা, সম্মানের দ্বারা, অলাভের দ্বারা, অযশের দ্বারা, অসম্মানের দ্বারা, পাপাভিসন্ধির দ্বারা, পাপমিত্রের দ্বারা অভিভূত হইয়া খিন্নমনা দেবদত্ত অপায়িক, এক কল্পকাল নরকগামী ও অচিকিৎস্য হইয়াছে।...এই সব অসৎ

ধর্মের দ্বারা অভিভূত হইয়া খিন্নমনা দেবদত্ত এইরূপ হইয়াছে।"১৪ ঐ, ৪র্থ, ১৬০ পৃ

ঐ খণ্ড অঙ্গুত্তরের ১৬৪ পৃষ্ঠাতেও এই প্রসঙ্গেরই পুনরাবৃত্তি আছে।

৫। এই গ্রন্থের উক্ত খণ্ডের ৪০২-৩ পৃষ্ঠায় দেবদত্তের একটি ধর্মভাষণের উল্লেখ আছে। ঐ ভাষণে তাঁহার একটি ধর্মমতের পরিচয় পাওয়া যায়?—"ধ্যানযোগে চিত্তের সমাধির দ্বারাই [আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের শিক্ষার দ্বারা নহে] মানুষ অর্হৎ হয়।"১৫

মজ্ঝিম্ সংযুত্ত, ও অঙ্গুত্তরের যেখানে যেখানে দেবদত্তের উল্লেখ আছে মোটামুটি সেই সমস্তই এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুধীগণ দেখিবেন দেবদত্ত কর্তৃক বুদ্ধের বধ-প্রচেষ্টার কোনও নিদর্শন এগুলিতে নাই।

বুদ্ধের বধপ্রচেষ্টার ন্যায় এত বড় একটা গুরুতর ব্যাপারের উল্লেখ পর্যন্ত [দীঘ] মজ্ঝীম, সংযু, অঙ্গুত্তর [সুত্ত নিপাত] করিলেন না—ইহা কি আশ্চর্য ব্যাপার নহে? বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে একই বিষয়ের পুনরুক্তি দৃষ্ট হয়। একই কথা ফেনাইয়া বলাই তাহাদের রচনাশৈলী। এমন অবস্থায় এত বড় ঘটনার উল্লেখ পর্যন্ত তাহারা করিবে না—ইহার কারণ কি?

প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে বিনয় পিটকের চুল্লবগ্গে দেবদত্তের অকীর্তিবিষয়ক বিস্তৃত বর্ণনা (বুদ্ধের বধপ্রচেষ্টাও) পাওয়া যায়। আমরা এখানে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

[প্রথম অংশ]

ভগবান বুদ্ধ তখন কৌশাম্বীতে অবস্থান করিতেছিলেন। দেবদত্ত নির্জনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তাঁহার মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল—এখন আমি কাহার উপর আধিপত্য করিব? কাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিলে আমার প্রচুর লাভ ও সম্মানলাভ হইবে?

তাঁহার মনে হইল কুমার অজাতশত্রু এখন যুবক। ভবিষ্যৎ উঁহার উজ্জ্বল—উঁহার উপরই আধিপত্য করা যাক।

ইহা স্থির করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ রাজগৃহ যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি তাঁহার ঋদ্ধিশক্তির দ্বারা একটি শিশুর রূপ ধারণ করিলেন—কটিদেশে তাঁহার সর্পের মেখলা। এই শিশুর রূপেই তিনি অজাতশত্রুর ক্রোড়ের উপর আবির্ভূত হইলেন। অজাতশত্রু ইহাতে ভীত ও চমকিত হইয়া উঠিলেন। তখন দেবদত্ত বলিলেন—"কুমার তুমি কি আমাকে ভয় করিতেছ?"

কুমার উত্তর দিলেন—"হাঁ! কে আপনি?"

"আমি দেবদত্ত!"

ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন—"যদি আপনি সত্যই দেবদত্ত হন—তবে অনুগ্রহপূর্বক নিজ রূপ ধারণ করুন!"

দেবদত্ত তখন সেই শিশুরূপ পরিত্যাগ করিয়া নিজরূপ ধারণ করিলেন। দেহে তাঁহার কাষায় বস্ত্র এবং হস্তে তাঁহার ভিক্ষাপাত্র। অজাতশত্রু তাঁহার ঋদ্ধিশক্তির এইরূপ পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

(১) তখন হইতে প্রতিদিন প্রভাতে এবং সায়ংকালে তিনি দেবদত্তের নিকট পঞ্চশত রথ লইয়া উপস্থিত হইতেন। প্রতিদিন পঞ্চশত পাত্রে আহার্য লইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিতেন।

(২) এইরূপ লাভ ও সংকারলাভ করিয়া দেবদত্তের চিত্তে এই চিন্তার উদয় হইল—"আমারই ভিক্ষুসংঘের নেতা হওয়া উচিত।" এই চিন্তা উদয় হইবামাত্র তাঁহার ঋদ্ধি-শক্তি অন্তর্ধান করিল।

(৩) সেই সময় ককুধ নামে মৌদ্গল্যায়নের একজন অনুচর-ভিক্ষুর মৃত্যু হইয়াছিল। সেই ককুধ একদিন দিব্য-রূপ ধারণ করিয়া মৌদ্গল্যায়নকে দেবদত্তের ঐ মনোভাবের বিষয় এবং তাঁহার ঋদ্ধিহানির কথা বলিয়া গেলেন। মৌদ্গল্যায়ন তাহা বুদ্ধের গোচরে আনিলেন।

বুদ্ধ মৌদ্গল্যায়নকে প্রশ্ন করিলেন—"তুমি কি ওই দিব্যরূপধারী ককুধের চিত্তে প্রবেশ করিয়া জানিয়াছ যে, সে যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য, তাহার অন্যথা হইবে না।"

মৌদ্গল্যায়ন বলিলেন, "হাঁ।"

বুদ্ধ বলিলেন, "ইহা গোপন রাখ। ঐ মূর্খ নিজেই নিজেকে প্রকাশ করিবে।"

(৪) ইহার পর বুদ্ধ রাজগৃহে গেলেন। সেখানে বহু ভিক্ষু তাঁহার সমীপে নিবেদন করিল যে, কুমার অজাতশত্রু প্রতিদিন প্রাতে এবং সায়ংকালে পঞ্চ শত রথসহ দেবদত্তের নিকট যান এবং প্রতিদিন পঞ্চ শত পাত্রে আহার্য-সামগ্রী তাঁহাকে নিবেদন করেন।

বুদ্ধ বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা করিও না। দেবদত্তের লাভ সম্মান ও যশ দেখিয়া হিংসা করিও না। যত দিন এই ভাবে অজাতশত্রু উহার সৎকার করিবেন তত দিন দেব-দত্তের উন্নতি হইবে না—তাহার ধার্মিক প্রবৃত্তির হানি হইবে।

"কেনো ভীষণ প্রকৃতির কুকুরের নাকের উপর পিত্তের থলি ফাটাইলে সে যেমন অধিকতর ভীষণ হয়, দেবদত্তও সেইরূপ হইবে। এই লাভ ও সৎকার দেবদত্তের ধ্বংসের কারণ হইবে। যেমন কদলীর ফল কদলীর ধ্বংসের কারণ হয়" ইত্যাদি পূর্ববৎ।

[দ্বিতীয় অংশ]

বুদ্ধ বহু ভিক্ষু, রাজা এবং তাঁহার অনুচরগণকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্মোপদেশ দান করিতেছিলেন। এমন সময় দেবদত্ত দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "ভগবান এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। এখন তাঁহাকে আমাদের বিশ্রাম দেওয়া উচিত। তিনি শান্তিতে বাস করুন। ভিক্ষু-সংঘের চালনার ভার আমার উপর দেওয়া হউক।"

ভগবান ইহার উত্তরে বলিলেন, "তুমি যথেষ্ট বলিয়াছ। ভিক্ষু-সংঘের নেতা হইবার ইচ্ছা করিও না। সারিপুত্ত ও মৌদ্গল্যায়নকে পর্যন্ত আমি ভিক্ষু-সংঘের ভার দিব না। তোমার মত জঘন্য ব্যক্তিকে কেমন করিয়া দিই।"

দেবদত্ত ইহাতে ক্ষুণ্ণ হন। তিনি মনে মনে বলেন, "রাজা এবং তাঁহার অনুচরবর্গের সম্মুখে ভগবান আমাকে জঘন্য (নিষ্ঠীবনতুল্য)১৬ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন।"

অপ্রসন্ন ক্রুদ্ধ চিত্তে তিনি বুদ্ধকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

দেবদত্ত বাহির হইয়া যাইবার পর ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষু-সংঘকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "রাজগৃহে দেবদত্তের বিরুদ্ধে এই কথা ঘোষণা কর যে, দেবদত্তের প্রকৃতি পূর্বে এক রূপ ছিল এখন অন্য রূপ হইয়াছে। এখন হইতে সে যাহা কিছু করিবে তাহার জন্য সে স্বয়ং দায়ী। বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ তাহার দায়িত্ব লইবেন না।"

এই বিষয় ঘোষণা করিবার জন্য বুদ্ধ সারিপুত্রকে আদেশ দেন। সারিপুত্র তাহার উত্তরে বলেন, "পূর্বে আমি রাজগৃহে 'দেবদত্ত মহাঋদ্ধিসম্পন্ন, দেবদত্ত মহা শক্তিমান' বলিয়া তাঁহার গুণগান করিয়াছি। এখন আমি কেমন করিয়া সেই রাজগৃহে দেবদত্তের বিরুদ্ধে এমন কথা বলিব।"

অবশেষে বুদ্ধের আজ্ঞায় এবং সংঘের নিদেশে এই সারিপুত্রকেই উক্তরূপ ঘোষণা করিতে হয়।

এই ঘোষণা শুনিয়া এক দল লোক বলিতে লাগিল, "এই শাক্যপুত্র শ্রমণগণ ঈর্ষাপরায়ণ। দেবদত্তের লাভ ও সৎকার দেখিয়া ইহাদের হিংসা হইয়াছে।" অন্য এক দল বলিতে লাগিল, "সমস্ত রাজগৃহে ভগবানের নির্দেশে যখন এইরূপ ঘোষণা করা হইতেছে তখন ইহা কখনও সামান্য ব্যাপার নহে।"

অতঃপর দেবদত্ত অজাতশত্রুর নিকট যাইয়া বলিলেন, "আপনি আপনার পিতাকে হত্যা করিয়া রাজা হউন। আমি স্বয়ং বুদ্ধকে হত্যা করিয়া বুদ্ধ হই।"

অজাতশত্রুর আজ্ঞায় এবং দেবদত্তের নির্দেশে কয়েক জন তীরন্দাজ বুদ্ধকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা প্রায় সকলেই তাঁহার প্রভাবে অভিভূত হইয়া (সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া) তাঁহার নিকট দীক্ষা লয়। একজন শুধু ফিরিয়া গিয়া দেবদত্তকে বলে, "বুদ্ধকে হত্যা করিতে পারি নাই। তিনি ঋদ্ধিসম্পন্ন এবং শক্তিমান।"

তখন দেবদত্ত নিজেই বুদ্ধকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। পর্বতের শিখরদেশ হইতে এক বৃহৎ শিলাখণ্ড তিনি বুদ্ধের উপর নিক্ষেপ করেন। কিন্তু বুদ্ধের প্রভাবে দুইটি পর্বতশৃঙ্গ সহসা আবির্ভূত হইয়া ঐ শিলাখণ্ডের গতিরোধ করে। কেবল এক খণ্ড শিলাচূর্ণ তাঁহার চরণে আসিয়া লাগে এবং তাহাতে রক্তপাত হয়। বুদ্ধ দেবদত্তকে দেখিতে পাইয়া ভর্ৎসনা করিতে থাকেন।

ইহার পর রাজহস্তী নালাগিরির দ্বারা দেবদত্ত তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঋদ্ধি ও মৈত্রীর প্রভাবে হস্তী বুদ্ধের বশীভূত হইয়া যায়।

এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া দেশবাসী সকলেই দেবদত্তের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং তাহাতে দেবদত্তের লাভ ও সৎকার বন্ধ হয় এবং বুদ্ধের লাভ ও সম্মান বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অতঃপর দেবদত্ত তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহিত সংঘভেদের পরামর্শ করেন। তিনি বলেন, "আমরা ভিক্ষু-সংঘের জন্য পাঁচটি নিয়মের প্রস্তাব করিব। শ্রমণ গৌতম উহা স্বীকার করিবেন না। তখন দেখিবে সাধারণ লোক আমাদের পক্ষে আসিবে।"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বন্ধুপরিবৃত দেবদত্ত ভগবান বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইয়া ঐ পাঁচটি নিয়মের প্রস্তাব করিলেন। বুদ্ধ তাহা স্বীকার করিলেন না। দেবদত্ত রাজগৃহের সর্বত্র জনগণের নিকট বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, "শ্রমণ গৌতম এই সমস্ত নিয়ম পালন করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ইহাই পালন করি।"

ইহাতে এক দল লোক তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই শ্রমণগণ পাপ দূর করিয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ বশে আনিয়াছেন, কিন্তু শ্রমণ গৌতম বিলাসী এবং প্রাচুর্যের পক্ষপাতী।"

অন্য এক দল দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেবদত্ত ভগবান বুদ্ধের সংঘভেদের চেষ্টা করিতেছেন।"

ভিক্ষুগণ ইহা বুদ্ধকে জানাইলেন।

বুদ্ধ দেবদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবদত্ত ইহা কি সত্য যে তুমি সংঘভেদের চেষ্টা করিতেছ?"

দেবদত্ত উত্তর দিলেন, "হাঁ ভগবান।"

বুদ্ধ বলিলেন, "দেবদত্ত, সংঘভেদে যেন তোমার

অভিলাষ না হয়। এরূপ সংঘভেদ অত্যন্ত শোচনীয়। হে দেবদত্ত! সংঘে যখন শান্তি বিরাজ করিতেছে তখন যে সংঘভেদের চেষ্টা করে সে এক কল্প ধরিয়া নরকে পচিতে থাকে। আর সংঘে যখন ভেদ উপস্থিত হয়, তখন যে তাহাতে শান্তি স্থাপন করে সে এক কল্প কাল স্বর্গে সুখে কালযাপন করে। অতএব সংঘভেদে যেন তোমার অভিলাষ না হয়।"

অতঃপর এক উপোসথের দিন প্রভাতে আয়ুষ্মান আনন্দ যখন ভিক্ষার জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন দেবদত্ত তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন, "বন্ধু আনন্দ, আজ হইতে আমি ভগবান এবং ভিক্ষুসংঘ হইতে পৃথকভাবে উপোসথ এবং সংঘকর্ম করিব।"

রাজগৃহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আনন্দ আহারাদির পর এই কথা ভগবান বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন। ভগবান ইহা শ্রবণ করিয়া এক গাথা উচ্চারণ করিলেন:

সাধুর পক্ষে সাধুকর্ম সুকর।
সাধুকর্ম পাপীর পক্ষে দুষ্কর।
পাপীর পক্ষে পাপকর্ম সুকর।
আর্যের (সাধুর) পক্ষে পাপকর্ম দুষ্কর।১৭

সংঘভেদ রোধ হইল না। দেবদত্ত পঞ্চ শত নবদীক্ষিত ভিক্ষুসহ চলিয়া গেলেন। ইহার পর সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন গয়ায় গিয়া কৌশলে ঐ ভিক্ষুগণকে লইয়া আসেন।

নিদ্রাভঙ্গের পর এই সংবাদ শুনিয়া দেবদত্ত রক্ত বমন করিতে থাকেন।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন—বিনয়-বর্ণিত বিবরণের প্রথম অংশ, মজ্ঝিম, সংযুত্ত ও অঙ্গুত্তরের উদ্ধৃত পাঠসমূহের সহিত মিলিতেছে। প্রথম অংশের প্রত্যেকটি ঘটনা যথা (১) দেবদত্তের প্রতি অনুরক্ত অজাতশত্রুর প্রতিদিন দেবদত্তের সহিত সাক্ষাৎকার ও আহার্য নিবেদন (২) দেবদত্তের ভিক্ষু-সংঘের নেতা হওয়ার অভিলাষ (৩) প্রেতাত্মার সে বিষয় মৌদ্গল্যায়নের এবং মৌদ্গল্যায়নের বুদ্ধের গোচরে আনয়ন (৪) অজাতশত্রু কর্তৃক দেবদত্তের পরিচর্যার বিষয় ভিক্ষুগণের বুদ্ধকে নিবেদন এবং তৎসম্বন্ধে বুদ্ধের উপদেশ প্রায় হুবহু অঙ্গুত্তরাদিতে পাওয়া যাইতেছে। পাওয়া যাইতেছে না কেবল বিনয়-উদ্ধৃত পাঠের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বুদ্ধের বধ-প্রচেষ্টার কোনও কাহিনী।

দেবদত্তের সংঘ চালনার অভিলাষ, প্রেতাত্মা কর্তৃক তাহা মৌদ্গল্যায়নের এবং মৌদ্গল্যায়ন কর্তৃক তাহা বুদ্ধের গোচরে আনার ন্যায় সামান্য সামান্য ঘটনাও ঐ গ্রন্থসমূহে সংকলিত হইয়াছে আর সংকলিত হয় নাই কেবল বুদ্ধের বধ-প্রচেষ্টার ন্যায় গুরুতর বিষয়। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া স্বাভাবিক যে বুদ্ধের বধ-প্রচেষ্টার কাহিনীসমূহ পরে রচনা করা হইয়াছে।

দেবদত্তের নেতা হইবার প্রস্তাব, বুদ্ধের তাহা প্রত্যাখ্যান, দেবদত্তের প্রস্থান—তাঁহার বিরুদ্ধে ঘোষণা অর্থাৎ সংঘ কর্তৃক তাঁহাকে অস্বীকার বা বহিষ্কার—বিনয়-বর্ণিত কাহিনীর এই অংশ পর্যন্ত কোনো অমিল লক্ষ্য হয় না। কিন্তু ইহার পর [তারকা-চিহ্নিত অংশ দ্রষ্টব্য] বুদ্ধকে বধ করিবার বহুবিধ ষড়যন্ত্র করিয়া, বধ-প্রচেষ্টার সময় বুদ্ধ-কর্তৃক দৃষ্ট ও ভর্ৎসিত হইয়া, সংঘ-বহিষ্কৃত দেবদত্ত পুনরায় বুদ্ধের নিকট আসিয়া সংঘের অন্তরঙ্গ ভিক্ষুর ন্যায় পাঁচটি নিয়মের প্রস্তাব করিতেছেন—উহা কিরূপ কথা! উহাকে কি একটা খাপছাড়া ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না?

ধর্মসম্বন্ধে এবং সংঘের নিয়মকানুন বিষয়ে বুদ্ধ ও দেবদত্তের মধ্যে মতভেদ হইয়াছিল—সেই মতভেদেরই পরিণতি হয় সংঘভেদে। দেবদত্ত-প্রবর্তিত সংঘে পাঁচটি সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। সংঘভেদের পূর্বে সম্ভবত দেবদত্ত বুদ্ধের নিকট ঐ পাঁচটি সংস্কারের প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। সংঘভেদের পর ঐরূপ কোনো প্রস্তাবের কথাই উঠিতে পারে না।

ঐ পাঁচটি সংস্কার বা নিয়ম কি—সে সম্বন্ধে কিন্তু পালি ও তিব্বতী বিনয়ে যথেষ্ট অনৈক্য দৃষ্ট হয়। আমরা এখানে তিব্বতী বিনয়োক্ত ঐ পাঁচটি নিয়ম উদ্ধৃত করিলাম:—

দেবদত্ত তাঁহার অনুচরবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মাননীয় মহোদয়গণ! শ্রমণ গৌতম দধিদুগ্ধাদি আহার করিয়া থাকেন (১) আমরা আজ হইতে উহা আহার করিব না। কেননা, দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া আমরা গো-বৎসের অনিষ্ট করি। শ্রমণ গৌতম মাংসাহার করেন (২) আমরা উহা আহার করিব না। কেননা মাংসাহারের জন্য জীবহত্যা করিতে হয়। শ্রমণ গৌতম লবণ ব্যবহার করেন (৩) আমরা উহা ব্যবহার করিব না। শ্রমণ গৌতম বস্ত্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহা হইতে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করেন (৪) আমরা উহা করিব না। কেননা বস্ত্রকে ঐরূপ খণ্ড খণ্ড করিলে শিল্পীর শিল্পকার্য নষ্ট হয়। শ্রমণ গৌতম গ্রাম হইতে দূরে বনে বা প্রান্তরে বাস করেন (৫) আমরা গ্রামে বাস করিব। কারণ গ্রামে বাস না করিয়া বনে বাস করিলে (দান-ধ্যানের দ্বারা) লোকসেবার সুযোগ লাভ হয় না।
—Rockhill, *Life of Buddha*, pp. 87-88.

ইহার মধ্যে একমাত্র মাংস বর্জন সম্বন্ধীয় নিয়মটিতেই উভয় বিনয়ের ঐক্য রহিয়াছে। পালি বিনয়োক্ত বনবাস

সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রস্তাব দেখিতেছি তিব্বতী বিনয়ে। পরিচ্ছদ সম্বন্ধীয় নিয়মেও উভয় বিনয়ে কোনও মিল নাই।

দেবদত্ত-প্রবর্তিত সংঘে যে দুগ্ধ ও তজ্জাতীয় খাদ্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল তাহা আমরা হুয়েনসাং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে পাইতেছি। দেবদত্তের ভক্তগণ বৃক্ষতলে বাস করিতেন না, তাঁহাদের সংঘারাম ছিল—ইহাও আমরা উক্ত ভ্রমণ-কাহিনী হইতে অবগত হই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, তিব্বতী বিনয়োক্ত নিয়মগুলি কাল্পনিক নহে উহার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ঐতিহাসিক নথিপত্রের সহিত উহা (অন্তত অংশত) মিলিতেছে।

কোথাও কোথাও দেবদত্তকে ভিক্ষুণী উৎপলবর্ণার হত্যাকারী[১৮] বলা হইয়াছে। উহাও ভুল। পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে লিখিত উৎপলবর্ণার যে দুইটি জীবনী পাওয়া যায় তাহার কোনটিতেই উহার উল্লেখ নাই।

মহাবস্তুতে আছে—বুদ্ধের গৃহত্যাগের পর দেবদত্ত যশোধরার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করেন[১৯]। উহাও কল্পিত, পালি সাহিত্যের কোথাও উহার উল্লেখ নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, দেবদত্ত যদি বুদ্ধের বধচেষ্টা করেন নাই, নারীহত্যা করেন নাই, এবং পরদারাকাঙ্ক্ষীও ছিলেন না তবে তাঁহাকে "অপায়িক" "এক কল্পকাল নরকস্থায়ী" বলা হইয়াছে কেন?

ইহার উত্তর এই যে, সংঘভেদের (দল ভাঙার) জন্যই তাঁহাকে "অপায়িক" "এক কল্পকাল নরকস্থায়ী" বলা হইয়াছে। চুল্লবগ্গের ঐ উদ্ধৃত অংশেরই এক স্থানে রহিয়াছে, "হে দেবদত্ত, সংঘে যখন-শান্তি বিরাজ করিতেছে, তখন যে সংঘভেদের চেষ্টা করে, সে এক কল্পকাল ধরিয়া নরকে পচিতে থাকে।"

মতান্তর হইতে পরম বন্ধুদের মধ্যেও মনান্তর উপস্থিত হয়। স্বমতবিরোধীর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার, তাঁহাকে হীন, জঘন্য বলিয়া চিত্রিত করা অতি প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি পৃথিবীর সর্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। সংঘে (দলে) থাকিতে যে দেবদত্তকে ব্রাহ্মণ বলা হইল, সংঘ (দল) ত্যাগের পর সেই দেবদত্তই "অপায়িক" "এক কল্পকাল নরকস্থায়ী" ও অচিকিৎস্য হইয়া গেল।

কালস্রোত যখন মহাপুরুষের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ধৌত করিয়া তাঁহাকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে, তখন সেই দেবতার ভক্তবৃন্দের নিকট তাঁহার তৎকালীন প্রতিপক্ষ সাক্ষাৎ শয়তান বলিয়া গণ্য হন। মহাপুরুষের বিরুদ্ধবাদী প্রতিপক্ষও যে সাধু হইতে পারেন একথা সেই ভক্তবৃন্দের-কোনরূপেই বিশ্বাস হয় না।

দেবদত্ত বুদ্ধের বিরুদ্ধবাদী হইলেও সৎ লোক ছিলেন, অন্তত কোন এক সময়েও জিতাত্মা জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন[২০]—ইহা পরবর্তী বৌদ্ধগণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বাল্যকাল হইতেই তিনি অসাধু ছিলেন, এমন কি জন্মজন্মান্তরেও তিনি অসৎ ছিলেন ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার সম্বন্ধে পল্লবিত নানা কাহিনী রচিত হইতে লাগিল। পরবর্তী বৌদ্ধসাহিত্যে তাহার প্রচুর নিদর্শন আছে।

দক্ষিণী ও উত্তরী, পালি ও সংস্কৃত, বৌদ্ধধর্মের দুই শাখায় ইহা লইয়া যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল।

শৈশবে আমরা দেবদত্তের বাল্যকালের "হাঁস মারার কাহিনী" পড়িয়া মুখস্থ করিয়াছি। আজও আমাদের ছেলেমেয়েরা উহা পড়িতেছে। অথচ পালিসাহিত্যের কোথাও উহার উল্লেখ নাই। সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যে "হাঁস মারা" হইতে "হাতী মারা" পর্যন্ত দেবদত্তের বাল্য-লীলার বহু উদ্ভট কাহিনী কল্পিত হইয়াছে।

১। প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে দেবদত্তের পিতৃপরিচয় পাওয়া যায় না। পরবর্তী গ্রন্থে যথা মহাবংশ [পি, টি, এস, ২,২১] মহাবংশ টীকা [পি, টি, এস, ১৩৬ পৃষ্ঠা] ধম্মপদ-অট্‌ঠ কথায় [পি, টি, এস, ৩য় খণ্ড, ৪৪-৪৭ পৃ] তাঁহাকে শুদ্ধোদনের শ্যালক সুপ্রবুদ্ধের পুত্র বলা হইয়াছে। কিন্তু তিব্বতী [Rockhill, *Life of Buddha*, p. 13] মতে দেবদত্ত শুদ্ধোদনের ভ্রাতা অমৃতোদনের এবং মহাবস্তুর [পি, টি, এস, ৩য়, ১৭৬ পৃ] মতে শুক্লোদনের পুত্র।

বিনয়ে এক স্থানে [Oldenberg সম্পাদিত, ২য়, ১৮৯ পৃ; চুল্লবগ্গ, ৭,৩২] দেবদত্তকে গোধিপুত্র বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় তাঁহার মাতার নাম ছিল গোধি বা গোধী। অন্যত্র তাঁহার মাতার নাম পাওয়া যাইতেছে অমৃতা বা অমিতা (পালি)। ইঁহাকে শুদ্ধোদনের ভগিনী বলা হইয়াছে। মহাবংশ, ২।১১-২২।

মহাবংশ, ধম্মপদ-অট্‌ঠ কথাদির মতে দেবদত্তের ভগিনী ভদ্রা কাত্যায়নীর (ভদ্দকচ্চানা) সহিত সিদ্ধার্থের বিবাহ হয়।

২। ঠিক কোন্ সময় তিনি সংঘে প্রবেশ করেন প্রাচীন গ্রন্থসমূহ হইতে তাহা নিশ্চিত ভাবে জানা যায় না। বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ (Malalasekera) সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বলাভের দ্বিতীয় বৎসরে আবার কেহ কেহ (Rhys Davids) বিংশতি বৎসরে তিনি সংঘে প্রবেশ করেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

৩। বিনয়, ২য়, ১৮৯ পৃষ্ঠা (চুল্লবগ্গ, ৭।৩,২)। ধম্মপদ-অট্‌ঠ কথা, ১।৬৪।

৪। বাহিত্বা পাপকে ধম্মে যে চরন্তি সদা সতা।
খীণ সংযোজনা বুদ্ধা তে বে লোকস্মিং ব্রাহ্মণা। উদান, ১।৫
স্মৃতি বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ বিষয়ের যথাযথ স্মরণের নাম স্মৃতি।

৫। চুল্লবগ্গ, ৭,৩,১৫।

৬। যাহা চক্ষে দেখেন নাই, যাহার কথা শোনেন নাই। যাহা তাঁহার জন্ত হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া তিনি সন্দেহ করেন না—সেইরূপ প্রবস্তু মাংস বুদ্ধশিষ্য আহার করিতে পারেন। উহা দোষমুক্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ এইরূপ বিধান দিয়াছিলেন। মহাবগ্‌গ, ৬৩১।১৪।

৭। মহাবগ্‌গ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৮। চুল্লবগ্‌গ, ৭।৪।১

৯। চুল্লবগ্‌গ ৭।৪।১-৩

১০। ধম্মপদ-অট্‌ঠ কথা ১।১৩৩-৫০ পৃষ্ঠা। মিলিন্দ পঞ্‌হ, ১০১, ১০৮।

১১।

These heretics were seen by Fa-hien at Sravasti in or about 405 A.D. "There are also companies of the followers of Debadatta still existing. They regularly make offerings to the three previous Buddhas but not to Sakyamuni Buddha" (*Travels*, Ch. XXII in Legge's Version; all the versions agree as to the fact).

In the Seventh Century Hiuen-Tsang found three monasteries of Debadatta's Sect in Karnasuvarna, Bengal.

Smith's *Early History of India* (4th edition) P. 33.

Debadatta, too, has still a number of priests who make offerings to the past three Buddhas but not to Sakyamuni.

Giles, *Travels of Fa-Hsien*, pp. 35-36.

There are about ten *Sangharamas* here (*viz.*, Karnasuvarna) and 300 priests. They study the little Vehicle belonging to the Sammatiya School. Besides these there are two (2) *Sangharamas* where they do not use either butter or milk. This is the traditional teaching of Debadatta.

S. Beal, *The Life of Hiuen Tsang*, P. 131.

Besides these there are three *Sangharamas* in which they do not use thickened milk (*U Lo*) following the direction of Debadatta (*Ti-p'o-ta-to*).

Beal, *Records of Western Countries*, Vol. II. P. 201.

১২। চণ্ডসস কুক্কুরসস নাসায়া পিত্তং ভিন্দেষ্যুং।

১৩। এখানে ভগবান উদাহরণ স্বরূপ বলিয়াছেন—মলপরিপূর্ণ কূপে, কোনো মানুষ নিমজ্জিত হইলে তাহার শরীরের বিন্দু পরিমাণ (কেশাগ্র-প্রান্তের দ্বারা বিদ্ধ করা যায় এতটুকু) স্থানও যেমন শুদ্ধ থাকে না, দেবদত্তকে যখন আমি ঠিক সেইরূপ দেখি—তখনই তাহাকে বলি—"অপায়িক, এককল্পকাল নরকগামী" ইত্যাদি।

১৪। তুলনীয়: চুল্লবগ্‌গ, ৭।৪।৭

১৫। চেতসা চিত্তং সুপরিচিতং হোতি। তস্‌স এতং ভিক্‌খুনো কল্লং বেয়্যাকরণায়:— খীণা জাতি, বুসিতং ব্রহ্মচরিয়ং কতং করণীয়ং নাপরম্‌ ইত্থত্তায়াতি পজানামীতি।

১৬ তিব্বতী বিনয়=নিষ্ঠীবনভক্ষক

১৭ তুলনীয়: উদান ৫।৮

১৮ Rockhill, *Life of Buddha*, pp. 106-7

১৯ মহাবস্তু, ২য় খণ্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা; Rockhill p. 107

২০ পণ্ডিতোতি সমঞ্‌ঞাতো ভাবিতত্তোতি সম্মতো।
জলং ব যসসা অট্‌ঠা দেবদত্তোতি মে সুতং।

চুল্লবগ্‌গ, ৭।৪।৮, ইতিবুত্ত, ৮৯ এবং পূর্বোক্ত, উদান, ১।৫ দ্রষ্টব্য।

স্মৃতিরক্ষা

শ্রীকালিদাস রায়

স্মারক তোমার গড়বে শুনি তাই ত গুরু ভাবি,
তোমার স্মৃতি বোধন করার কতটা তার দাবি।
গেলে তুমি এই ধরারে নতুন ক'রে গ'ড়ে,
এই ধরাতে থেকে তোমায় ভুল্‌ব কেমন ক'রে?
গঙ্গাধারার প্রতিটি ঢেউ স্মরায় তোমায়, কবি।
উষায় হেসে দিনের শেষে স্মরায় রাঙা রবি।
ঘাটের নেয়ে, বাটের বাউল, মাঠের রাখাল দূরে,
স্মরায় তোমায় সারাটি দিন আপন আপন সুরে।
স্মরায় তোমায় বনের ঝিঁঝিঁ, কোণের পারাবত,
স্মরায় তোমায় ঘরছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ।

বন-বাগানে যুঁইসুরভি, লাল করবী, জবা,
প্রতিদিনই করছে কবি তোমার স্মৃতিসভা।
তালতরুদের মৌন ধেয়ান শাল-বীথিকার ছায়া,
সঞ্চারিছে স্বপনঘোরে তোমার স্মৃতির মায়া।
মেঘ সারা রাত পড়ে তোমার স্মৃতিশতক শ্লোক,
বৃষ্টিধারা সৃষ্টি করে তোমার স্মৃতিলোক।
বাতাস দুলায় পাখীর কুলায়—ভুলায় মোরে সবি,
মনে পড়ায় উদাস ধরায় শুধু তোমায়, কবি।
স্মরায় তোমায় সখীর আদর, সখার ভালবাসা,
স্মরায় তোমায় এই জীবনের সকল তৃষা আশা।
তাই মনে হয় তোমার স্মৃতির স্তম্ভ যারা গড়ে,
তারা আপন দম্ভটাকেই দীর্ঘজীবী করে।

পতঙ্গ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সকাল বিকাল সেই ভদ্রলোক হুঁকা হাতে করিয়া প্রায়ই আসিতেন—তাঁহার নাম মহেশ ভট্টাচার্য্য। ধীরে ধীরে শচীনবাবুর সঙ্গে তাঁহার বেশ অন্তরঙ্গতা হইল। লোকটি সহানুভূতিশীল, গাছের দুটি ফল, কখনও একটু রাঁধা তরকারি হাতে করিয়া আসিয়া গল্প করিতে বসিতেন। মাঝে মাঝে বলিতেন, কেন অন্যত্র যাবেন, এখানেই থাকুন। আপনার সঙ্গে কথা বলে যেন বেশ আনন্দ পাই—

শচীনবাবু বলেন, কিন্তু সে ভগবানের হাত, যেখানে চাকরি পাব সেইখানেই মাথা গুঁজবার একটুখানি ঠাঁই করে নিতে হবে। ঠিক বাড়ী বলতে যা বুঝায় তা আর এ জীবনে হবে না।

মহেশবাবু বলেন, কেন?

শচীনবাবু হাসিয়া বলেন, বাড়ী মানে ত কেবল কয়খানি ঘর নয়। বাড়ীর সঙ্গে থাকে নাড়ীর যোগ—পূর্ব্বপুরুষের আর নিজের শৈশবের শত স্মৃতি বিজড়িত হলে তবেই বাড়ী হয়—

শচীনবাবু ভাবেন নিজের বাড়ীর কথা,—পিতামাতা আত্মীয় পরিজন বাড়ীতে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহাদের কথা। তাঁহার মাতা অপত্যস্নেহে একটি নারিকেলগাছ প্রতিপালন করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ তাহার অস্তিত্ব নাই। শচীনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন…

'কিছু না, কিছু না—মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে আবার নূতন করে আরম্ভ করুন'—বলিয়া মহেশবাবু সন্ধ্যার অন্ধকারে বিদায় গ্রহণ করেন। শচীনবাবু একলা বসিয়া থাকেন পুঞ্জীভূত বেদনার বোঝা বুকে লইয়া। অতীতের কত স্মৃতি, দুঃখ আনন্দের কত কথা মনের মাঝে ঘুরিয়া বেড়ায়—বার বার মনে হয়, ফিরিয়া যান সেই চিরপরিচিত উদার মাঠের পথে আম্রকানন ঘেরা আপনার গৃহে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, সে গৃহ আর গৃহ নাই, তা লাঞ্ছনার কণ্টকশয্যা। দুঃখ হয়—যে দেশের জন্য যাঁরা জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে সে দেশে তিনি অপরিচিত, অপরিজ্ঞাত, অনুগ্রহপ্রার্থী মাত্র। মহেশবাবুর সান্ত্বনাকে ছাপাইয়া কত লাঞ্ছনা আসে নিত্য জীবনের মাঝে। তবুও মন্দের ভাল যে, ঐ লোকটি সহৃদয় প্রতিবেশী। ইঁহার সান্নিধ্য হৃদয়ের ক্ষতস্থানে একটুখানি শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়।

* * * *

শচীনবাবু কলিকাতা যাইবার জন্য একটা রেলের মাসিক টিকিট করিয়াছেন।

প্রত্যহ সকালে রাঁধিয়া খাইয়া তিনি কলিকাতা রওনা হন। সেখানে পৌছিয়া আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যার্থ যে সকল আপিস খোলা হইয়াছে সেগুলিতে ঘোরাফেরা করেন, চাকরির জন্য দরখাস্ত পেশ করেন এবং সন্ধ্যায় ক্লান্ত দেহে বড়বাজার হইতে বাজার করিয়া ফিরিয়া আসেন। রোজই আশা লইয়া যান, হয় ত একটা চাকরির সংবাদ পাইবেন, কিন্তু অত্যন্ত নিরাশায় দুঃখিত অন্তরে ফিরিয়া আসেন।

এমনই করিয়া তিনটি মাস কাটিয়া গিয়াছে—হাতে টাকা যা ছিল ধীরে ধীরে তাহা ফুরাইয়া আসিতেছে—শীঘ্রই হাত একেবারে খালি হইয়া যাইবে, ইহার পূর্ব্বে যদি একটু জমি সংগ্রহ না করা যায় তবে মাষ্টারী করিয়া আর তাহা হইবে না। তিনি জমি কিনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

পাঁচুবাবু সংবাদ লইয়া আসিলেন—বাবুরা দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদের কয়েক বিঘা জমি বিলি বন্দোবস্ত করিবেন। শচীনবাবু ভাবিয়া দেখিলেন এখানে তবুও এক ঘর আত্মীয় আছে, এখানে জায়গা কিনিলে শচীনবাবুর অবর্ত্তমানেও খোকা একজন আত্মীয় পাইবে, কিন্তু অন্যত্র খোকা একেবারেই অসহায়। যেরূপ আশ্রয়প্রার্থী আসিতেছে তাহাতে অচিরেই জমির মূল্য আগুন হইয়া উঠিবে, অতএব হাতে টাকা থাকিতে থাকিতে কিছু জায়গা কিনিয়া রাখা প্রয়োজন। দুই মাসে না হোক ছয় মাসে একটা চাকরি হইবেই। শচীনবাবু অনেক চিন্তা করিয়া মন স্থির করিলেন—সেলামী বিঘাপ্রতি আট শত টাকা—খাজনা বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা। আশেপাশে জমি এই দরেই বিলি হইয়াছে—বিলম্ব করা হয়ত সমীচীন হইবে না। শচীনবাবু সেদিন সারাদিন ঘুরিয়া চার শত টাকা সেলামী ও পঁচিশ টাকা বার্ষিক খাজনায় দশ কাঠা জমি বন্দোবস্ত করিয়া ক্লান্ত দেহে ফিরিয়া আসিলেন।

বড় তৃষ্ণা পাইয়াছিল তাই হাত-পা ধুইয়া একটু গুড় ও জল খাইয়া ডাকিলেন, খোকা!

খোকা কহিল, কি বাবা?

—ওই যে বড় তেঁতুলগাছ ওর পাশে বাঁশঝাড়ের পরে যে জায়গাটুকু ওখানে তোর বাড়ী হবে।

খোকা উজ্জ্বল চোখ দুইটি মেলিয়া কহিল, আমার বাড়ী!

—হ্যাঁ, দুখানি পাকা ঘর, সামনে ফুলের বাগান, আর পিছনে—

—জামরুলগাছ বাবা। আর পেয়ারা গাছ—

—হ্যাঁ—

—কবে হবে বাবা?

—এই ত চাকরি হলেই আরম্ভ করব—

—মা আসবে ত ?

শচীনবাবু হঠাৎ থামিয়া গেলেন। তাহার পর কহিলেন, হাঁ, -আসবে বৈ কি !

বাহিরে কে যেন ডাকিল 'শচীনবাবু' 'শচীনবাবু'। হুঁকার শব্দ ও কণ্ঠস্বরে বুঝা গেল মহেশবাবু। শচীনবাবু কহিলেন, বসুন, যাচ্ছি—

মহেশবাবুর ধূমপানের রকম দেখিয়াই শচীনবাবু অনুমান করিলেন তিনি উত্তেজিত। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্রমাগত হুঁকা টানিতেছেন। শচীনবাবু সহাস্যে কহিলেন, বসুন মহেশবাবু—

মহেশবাবু ধুপ করিয়া বারান্দায় বসিয়া বলিলেন, মশায়, আপনার বাড়ী কোন্ জেলায়—

—যশোর—

মহেশবাবু কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া বলিলেন—আচ্ছা, আপনারা সব মরতে এখানে এসেছেন কেন বলুন দেখি—আপনাদের সবাইকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করলে মনের দুঃখু যায়।

—কি হ'ল ?

—'আবার কি হবে ?' মহেশবাবু অত্যন্ত উত্তেজনার সঙ্গে ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, 'আপনারা বড় সহজ পাত্র নন মশাই। কয়জন আশ্রয়প্রার্থী আমাকে এসে ধরলে যে এখানে বাড়ী করবে, সব শিক্ষিত ভদ্রলোক, কিছু জায়গা দিতে হবে। আমিও ভাবলুম সত্যিই তারা বিপাকে পড়েছে, তাই এক ভদ্রলোককে পাঁচ বিঘা জমি দিলাম। সে নাকি তার আত্মীয়স্বজনকে বণ্টন করবে, ভাল। লাভ-লোভসান ভাবি নি, দয়া হ'ল দিলাম নইলে জমি দেওয়ার দায় কি। এক শ টাকা বিঘে, আড়াই টাকা খাজনা প্রতি বিঘায়—

—তারপর—

—সেই নচ্ছার পাজী কি করেছে শুনবেন, কাঠা পঞ্চাশ টাকা আর খাজনা কাঠাপ্রতি আড়াই টাকায় তার দেশভায়েদের বিলি করেছে, প্রচুর মুনাফা নিয়ে বাড়ী আরম্ভ করেছে। কিন্তু আমি দেখে নেব, কালই উকিলের কাছে যাচ্ছি, দেখি বেটার কত টাকা আছে—

—তাতে কি হবে—জায়গাটা কোথায় ?

—ঐ ত তেঁতুলতলার পরের বাঁ হাতি জমিটা—একটা জঙ্গলে জায়গা। বিজয়নগর কলোনি হচ্ছে—ধুত্তোর নিকুচি করেছে—

শচীনবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—আমিও ত ওরই পাশে জমি কিনেছি দশ কাঠা—চার শ টাকা সেলামী, ২৫৲ টাকা খাজনা—

—ঠিক হয়েছে, কেন নেবে না। আপনাদের টাকা চুষে নেবে, দোষ কি ? বাড়ীভাড়া পঞ্চাশ টাকা নেবে—এই বাজারে আমিই ভালমানুষি করে ঠকলাম।

শচীনবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন, আপনার কথায় একটা জিনিষ পরিষ্কার হ'ল।

—কি ? কি হ'ল ?

—এক দল লোক জগতে এমনি লাভ করে, করবার বুদ্ধি আছে বলে; আর এক দল লোক আছে যারা আপনার মত ঠকে। ভালমানুষি করে এরা নিজের সর্ব্বস্ব খোয়ায়, আর তাদের ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে অন্যেরা বড়লোক হয়।

মহেশবাবু ক্ষণিক চিন্তা করিয়া কহিলেন, ঠিক, ঠিক বলেছেন শচীনবাবু। নইলে বাড়ী একজনে পঞ্চাশ টাকা বলে গেল, তাকে ভাড়া দিলুম না কেন জানেন ? কারণ আর একজনকে কথা দিয়েছি তিরিশ টাকা ভাড়ায় থাকতে দেব বলে।

—ঠিক তাই। আমিও আপনারই মত, এক শ টাকায় জমি কিনে হাজার টাকায় বিক্রি করিনি বলে পঞ্চাশ টাকার জমি পাঁচ শ' টাকায় কিনলাম—আমাদের মত বোকা যারা, তাদের পক্ষে ঠকাটাই স্বাভাবিক—

মহেশবাবু আরও কিছুক্ষণ নির্ব্বাপিত হুঁকা টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—কিন্তু যাই বলুন আমি উকীলের পরামর্শ নিয়ে দেখব, দু-চার নম্বর দেওয়ানী করে দেখবই—

—অন্যায়ের প্রতিকার কোনকালে হয় নি, হবেও না। ওর জন্যে বৃথা টাকা খরচ করে কি হবে !

—না হোক—দেখবই কি হয়—

মহেশবাবু উত্তেজিত ভাবেই চলিয়া গেলেন।

আরও দুই-এক মাস চলিয়া গেল।

শচীনবাবু কলিকাতায় চাকুরির সন্ধানে ঘোরাঘুরি করিতে করিতে প্রায় নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু কোন সুবিধা এখনও হয় নাই। একজন হোমরা-চোমরা সেদিন একটা মাষ্টারীর জন্য তাঁহার একখানা দরখাস্ত বিশেষভাবে অনুমোদন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন—সেই চাকুরী অবশ্যই হইবে এইরূপ ধারণা তাঁহার জন্মিয়াছিল, তাই অত্যন্ত আশান্বিত হইয়া সোৎসাহেই তিনি আজ কলিকাতা রওনা হইলেন।

আশ্রয়প্রার্থীদিগের সাহায্যার্থ প্রতিষ্ঠিত সরকারী আপিসে ভিড় ক্রমশঃ বাড়িতেছে। শচীনবাবু উক্ত অফিসারের সহিত দেখা করিবার জন্য বসিয়াছিলেন। বেয়ারা জানাইল, তিনি লঞ্চ খেতে গিয়াছেন দুইটার পরে সাক্ষাৎ হইবে—

অপেক্ষা করিতেই হইবে, তাই একটা বেঞ্চিতে বসিয়া ছিলেন। হঠাৎ একজন খদ্দরমণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, শচীনবাবু নমস্কার !

শচীনবাবু চাহিয়া দেখেন, তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত মণিবাবু। তিনি নমস্কার করিতে ভুলিয়া গেলেন।

—কি চিনতে পারছেন না?

—চিনতে পেরেছি, কিন্তু—

—অবাক হয়ে যাচ্ছেন এই ত, তা হোন্, ক্ষতি নেই—কিন্তু এখানে কেন? আসুন আমার ঘরে। কার সঙ্গে দেখা করবেন?

—কমিশনার সাহেব না কে, এই ঘরে বসেন—

—অনেক দেরি আছে তাঁর আপিসে আসবার। এখনও আসেন নি—

—তিনি লাঞ্চ খেতে গেছেন—

—ওটা আমরা বলে থাকি, কিন্তু আপিসেই আসি ছুটোয়—যাক্ আসুন—

শচীনবাবু মণিবাবুর পিছন পিছন চলিলেন। মণিবাবু একজন বিশিষ্ট অফিসার, ঘর আলাদা। তিনি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন—বসুন শচীনবাবু—বোধ হয় চাকরির জন্য, না?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু লাখো লাখো লোকের চাকরির ব্যবস্থা কোন সরকারই করতে পারে না। আর আমরা আপনাদের দরখাস্ত পাঠালে তাতে কাজ হবে এমন কোন ভরসা তো দিতে পারছি না—কাজেই...

—হ্যাঁ, এত দরখাস্ত দিলুম, একটা চাকরি পঞ্চাশ ষাট টাকার জুটল না!

—কি করে জুটবে! কোন সাহায্য পেয়েছেন সরকার থেকে—

—না, শুনছি, স্কিম হচ্ছে—

—হ্যাঁ স্কিম হচ্ছে বৈকি? স্কিম হতেই ধরুন সরকারের লাখ লাখ টাকা খরচ হ'ল। সোজা কথা ত নয়। তবে যারা কংগ্রেসের কাজ করেছে, ধরুন আমাদের মত যারা, তারা কিছু সুযোগ সুবিধা অবশ্য পেয়েছে।

শচীনবাবুর চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিতেছিল—লোকটা সজ্ঞানে কথা বলিতেছে ত?

মণিবাবু হাসিয়া বলিলেন—কি বল হে বটু—

বটু পাশের টেবিল হইতে মাথা তুলিয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ—

মণিবাবু একটু থামিয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন—আমরা আপনাদের রিলিফের ব্যবস্থা করতে পারি আর নাই পারি অন্তত: এই সব ছোটখাটো চাকরি পেয়ে নিজেরা যথেষ্ট রিলিফ বোধ করছি।

শচীনবাবুর মনটা এমন বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল যে মণিবাবুর সহিত তাহার আর বাদ-প্রতিবাদ করিবার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি সংক্ষেপে কহিলেন—আমি উঠি, কাজ আছে—

—বসুন—আমি নিয়ে যাবো আপনাকে তাঁর কাছে—

—থাক্, আজ আর দেখা করব না—

শচীনবাবু উঠিয়া আসিলেন। সাহায্যের কোন আশা নাই বুঝিলেও একবার শেষ চেষ্টা করিয়া যাইবেন মনে করিয়া তাঁহার মুরুব্বী অফিসারের ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। একটু পরেই একটি যুবক আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল—সত্য।

—সত্য!

—হ্যাঁ—স্যর, আপনি এখানে!

—হ্যাঁ, চাকুরীর চেষ্টায়।

—থাক্, আপনি আর এখানে আসবেন না। চলুন—আমার সঙ্গে—

—কোথায়?

—চলুন না, অনেক কথা আছে—অনেক সংবাদ আছে। এখানে ঘুরে কিছু হবে না—চলুন।

—চল—

ডালহৌসী স্কোয়ারের একটা নিরালা জায়গায় বসিয়া সত্য কহিল—বসুন স্যর—ভাল আছেন? খোকা?

শচীন বাবু বসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, ভালই।

—কোথায় আছেন?

—এই মাইল পনর দূরে—একটা ভাঙ্গা বাড়ী ভাড়া করে আছি। যা এনেছিলাম সব গেছে—

সত্য প্রশ্ন করিল—চাকুরীর চেষ্টায়, বা সাহায্যের আশায় এখানে আসেন ত?

—হ্যাঁ।

—আর আস্‌বেন না।

—কেন?

—মণিবাবুকে দেখেও কি বুঝতে পারেন নি? সাহায্য করার উদ্দেশ্য ওদের নেই—আপনি এটুকু বুঝবেন আশা করেছিলাম।

—তা ত বুঝি নি।

—হ্যাঁ, চাকরিও এরা দিতে পারে না। চাকুরির সন্ধানে বৃথা ঘোরাঘুরি করে নিঃসম্বল হয়ে কি লাভ? যাক্ সেকথা, আমাদের ওখানে চলুন আজ—

—আমাদের মানে, তোমরা কে কে এখানে আছ এখন?

সত্য একটু লজ্জিত ভাবে বলিল—আপনি জানেন না,

অঞ্জলিকে আমি বিয়ে করেছি। সে মাষ্টারী করছে—বাসা হাওড়ায়, আমি আপাততঃ কিছু করি না—যাবেন আজ? আমরা সত্যিই খুশী হব—

—আজ ত হয় না সত্য! বাসায় খোকা একা, সন্ধ্যায় পৌঁছুতেই হবে আমাকে।

—তবে থাক্, এক দিন সকাল সকাল যাবেন। সত্য আগ্রহ সহকারে ঠিকানা ও যাইবার রাস্তা বলিয়া দিল।

শচীনবাবু বলিলেন, কিন্তু বড়ই বিপন্ন বোধ করছি আজ। আর এক মাসের মাঝে চাকরি না পেলে খোকাকে আর আমাকে অনাহারে মরতে হবে—

সত্য হাসিয়া বলিল, আপনার মত সরল যারা, তাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অনাহারে মৃত্যু—

—কেন?

—সরকারের উপর আপনার আস্থা আছে বলেই একথা বলতে হ'ল; এঁদের কাছে বেশী আর কি আশা করতে পারেন। অথচ এঁদেরই কথায় আমরা জেলে গিয়েছিলাম—আপনি গৃহহীন। কিন্তু আমরা আজ সব দিক দিয়ে বঞ্চিত। জমির দাম দশগুণ, ঘরের ভাড়া বিশগুণ, ধনিকরা বেশ দু'পয়সা করে নিয়েছে আমাদের সর্ব্বস্বান্ত করে, তারা ফেঁপে উঠছে আমাদের শোষণ করে। নেতারা দেশসেবায় মূলধনকে সুদশুদ্ধ আদায় করে ঘরে তুলছেন, কিন্তু আজ আমরা আশ্রয়প্রার্থী মাত্র, এ ছাড়া আমাদের অন্য পরিচয় নেই, আমরা অত্যন্ত করুণার পাত্র, ভিখারী।

বলিতে বলিতে সত্য উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। শচীনবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, কিন্তু কয়েকজনের অনাচারের জন্য এতবড় একটা মহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রতি এমনি দোষারোপ করতে পার না তুমি—এ তোমার অভিমান!

—অভিমান নয় স্যর। আমি সাহায্য পাই নি, চাকরি পাই নি, টাকা পাই নি বলে আমার অভিমান নয়। যেদিন আপনার পদধূলি নিয়ে পুলিসের লাঠির সামনে মাথা পেতে দিয়েছিলাম সেদিন চেয়েছিলাম দেশের মুক্তি, তার বিনিময়ে যশ খ্যাতি অর্থ কিছুই আমার কাম্য ছিল না। আজও নিজের জন্যে কিছু চাই না, কিন্তু দুর্ব্বলের শোষণদ্বারা কাউকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে দেওয়া কাপুরুষতা। আমরা জীবনপণে তার প্রতিরোধ করব—পুঁজিবাদীর স্পর্দ্ধা স্বীকার করব না, তার অহমিকাকে ধূলিসাৎ করব—যেমন করে একদিন বলেছিলাম ভারতকে স্বাধীন করব···

—তোমার কথা শুনে আজ সন্দেহ হয় যে···। তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সত্য বলিল, আমি সাম্যবাদী! যে নামই আমাকে দিন, কিন্তু আমি জানি আমরা এসেছি মরতে। তবে আপনি মরবেন অনাহারে, আমরা মরব গুলির আঘাতে, এই তফাৎ!

—তার মানে?

—এই পৃথিবীতে একদল লোক জন্মায় আমাদের মত যারা নিঃশেষে নিজেদের জীবন আহুতি দিয়ে যায়। তাদের রক্তের উপরে গড়ে ওঠে নূতন সম্পদ, নূতন সমাজ, নূতন রাষ্ট্র—তারা তার ফলভোগ করে না। তারা আত্মবলি দিতেই জন্মায়, কিন্তু তাদেরই শোণিতে পৃথিবীর গ্লানি দূর হয়, আর যারা সুবিধাবাদী তারা সেই সুযোগে নিজেদের আখের গুছিয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করে। জগতের এই নিয়ম—

—জগতের এই নিয়ম?

—হ্যাঁ, যে সমস্ত সৈনিকের রক্তপাতের ফলে নেপোলিয়নের বিজয়স্তম্ভ গড়ে উঠেছিল তারা কি পেয়েছে জগতে? যিশুর মানবপ্রেমের পুরস্কার ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু। এমনি আরো কত দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। তাই বলছি ক্ষমতার মোহে যারা আজ মত্তপ্রায় তাদের কাছে আপনি কি আশা করেন?

শচীনবাবু চিন্তান্বিতভাবে বলিলেন, কিন্তু এত লোককে সরকার কি করে সাহায্য করতে পারেন?

—কেন? যুদ্ধ হলে লক্ষ লক্ষ লোককে সৈন্যবাহিনীতে ভর্ত্তি করা হয় না? সে যাক্, যারা আমাদের মাথায় একদিন লাঠি মেরেছে তারাই আজ স্বাধীন দেশের পুলিসরূপে শান্তি রক্ষা করছে। পঞ্চাশ টাকার জন্য আত্মহত্যাকে খুন ও খুনকে আত্মহত্যা প্রতিপন্ন করছে, যে হাকিমেরা ব্রিটিশের গোলামী করবার সময় বিচারের নামে চূড়ান্ত অবিচার করেছেন তাঁরাই আজও হাকিমরূপে বিরাজ করছেন; সেই আদালতে সেই কেরাণীকুলই রয়েছে। সেই কালোবাজার সমানে চলেছে—তারা আজ নুন, কাল চিনি লোপাট করে ফেঁপে উঠছে—সঙ্গে সঙ্গে ফেঁপে উঠছেন কর্ত্তারা। এ অবস্থায় পুনরায় বিপ্লব অনিবার্য্য—আপনি এদের কাছে কিছু আশা করবেন না স্যর। যদি বাঁচতে চান তা হলে আত্মক্ষমতায়ই বাঁচতে হবে—সাহায্যপ্রার্থী হলে অনাহারেই মরতে হবে।

—আবার বিপ্লব?

—হ্যাঁ, যদি এঁরা জনগণকে ভালবাসতে না পারেন, নিজেদের স্বার্থ ও সুখকেই একান্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকেন তবে গণশক্তির বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সুনিশ্চিত।

অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে কথাগুলি বলিয়াই সত্য যেন হাঁপাইয়া উঠিল। সে দ্রুত নিশ্বাস লইতে লাগিল। মানসিক উত্তেজনা একটু শান্ত হইলে পুনরায় বলিতে লাগিল—কেন ভারতে অনাবাদী জমির তো অভাব নেই। বিদেশ থেকে খাদ্য না এনে রেফুজিদের দিয়ে সেই পতিত জমি আবাদ করান

যায় না ? তা হলে খাদ্য-সমস্যার সমাধান হতে কত দিন লাগে ? কিন্তু সে সদিচ্ছা কোথায় ? আমরা তাদের চোখে ভিখারী মাত্র।

শচীনবাবু কহিলেন, শিশুরাষ্ট্র কত দিকে সামলাবে ? আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি—

সত্য অধিকতর উত্তেজিতভাবে কহিল, শিশুরাষ্ট্র বলেই ত অন্তর্বিপ্লবকে ভয় করা দরকার, এমন ভাবে দেশকে গড়ে তোলা দরকার যাতে বিপ্লবের সুযোগ না থাকে, লোকের মনে অসন্তোষ না জাগে। কিন্তু নিজেদের উদরপূর্ত্তি করতে গিয়ে এরা আর পুঁজিবাদীরা এমন অসন্তোষের বহ্নি জ্বালিয়েছে যে মানুষ অতিষ্ঠ এবং অধীর হয়ে উঠেছে।

শচীনবাবু প্রশ্ন করিলেন, সে যাক্, আজকাল কি করছ ?

—যা বললাম ওই করছি স্যর। আমাদের অভিযান এই সব দেশদ্রোহীর বিরুদ্ধে—তাদের এই চোরাকারবারলব্ধ টাকা, ঘুষের টাকা ভোগ করতে দেব না। নিজেদের জীবন দিয়েও এই অনাচার প্রতিরোধের চেষ্টা করব।

—বিপ্লব করবে ?

—হ্যাঁ, আপনার অজানা নেই—দিদিমণির কাছে যা ছিল তা এখনও আছে আরও সংগ্রহ করেছি। আমরা বিপ্লব করব, সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচতে আসি নি সংসারে। তাই মরব কিন্তু অন্যায়ের কাছে, অবিচারের কাছে মাথা নীচু করব না। আপনার মত বিনা প্রতিবাদে অনাহারে মরতে পারব না আমরা। জীবন তুচ্ছ, তা আহুতি দেব আমরা, আমি একা নয়—বহু জন···

—কিন্তু—

—কিন্তু নেই স্যর। আপনার স্ত্রীর রক্তে যে দেশের মাটি রঞ্জিত হয়েছে, সে দেশ আপনাকে কি দিয়েছে ? আপনি মরবেন অনাহারে, খোকা ভিখারীর মত অসহায় হবে পৃথিবীতে—

শচীনবাবু চম্‌কাইয়া উঠিলেন—খোকা অসহায় হবে পৃথিবীতে !

উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে সত্য উঠিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ আপনার তালুতে মুষ্টির আঘাত করিয়া কহিল—প্রতিশোধ নেব, অত্যন্ত নির্ম্মম প্রতিশোধ নেব ওই মণিবাবুদের উপর, মাথা নীচু করব না। সেইজন্যেই অঞ্জলিকে · যাবেন, আমাদের ওখানে, দেখবেন কত ব্যাপক আমাদের আয়োজন—

সত্য উন্মাদের মত দ্রুতপদে চলিয়া গেল, একবারও পিছন পানে চাহিল না। সশব্দে গেটের দরজাটা ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। শচীনবাবু সবিস্ময়ে তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই সেই সত্য ! শান্ত স্থির সমবেদনা-কাতর সদাহাস্যময় সত্য ! এ কি হইয়া উঠিয়াছে—ও যেন উন্মত্ত প্রলয়ঝটিকা বুকের ভিতর চাপিয়া রাখিয়া হাঁপাইতেছে।

শচীনবাবু ধীরে ধীরে উঠিয়া ট্রামের পয়সা বাঁচাইবার জন্য হাঁটিয়াই হাওড়া রওনা হইলেন। সত্যর এতগুলি উত্তেজনাপূর্ণ কথার কোনটিই তাঁহার হৃদয়কে দোলা দেয় নাই কিন্তু একটা কথা তাঁহার অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনাকে যেন উন্মথিত করিয়া দিয়াছে। তার মৃত্যুর পরে খোকা হইবে ভিখারীর মত অসহায় ! সত্যই ত আজ যদি আকস্মিক ভাবে তাহার মৃত্যুই হয় তবে মীরার এত আদরের খোকা কোথায় দাঁড়াইবে ! কোথায় যাইবে, তাহার অবর্ত্তমানে খোকার কি গতি হইবে—তাঁহার চোখ দুইটি বার বার জলে ভরিয়া উঠিতেছিল—

অন্যমনস্কভাবে সেকথা ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতেছিলেন—একখানা মোটর প্রায় তাঁহার গা ঘেঁসিয়া যাইতেই তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। এমনি করিয়া অকস্মাৎ যদি মোটর চাপা পড়েন !

শচীনবাবু আর ভাবিতে পারেন না—

এক জন বাস্তুত্যাগী ভিক্ষার্থী ট্রেনে ভিক্ষা করিতেছিল। শচীনবাবুর মনে হইল তিনিও যেন ভিখারী হইয়া পড়িয়াছেন, খোকা অনাহারে রহিয়াছে।

সত্যর কথা কয়টি ক্রমাগত তাঁহার মনে আনাগোনা করিতেছিল, তদুপরি যে মোটরটি তাঁর গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল সেটি যেন ভাবী অশুভ ঘটনার আভাস দিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার অন্তরের বেদনার ভার গুরুতর হইয়া উঠিতেছিল। কোনমতেই তিনি তাহাকে চাপিয়া আত্মস্থ হইতে পারিতেছিলেন না—বার বার চোখ ছাপাইয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল

সহসা তাঁহার মনে হইল, বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, সৎ অসৎ যে কোন উপায়ে হোক্ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। খোকাকে এমনি অনুদার পৃথিবীতে একাকী ফেলিয়া কোনমতেই অকালে মরা যায় না।

ভাবিতে ভাবিতে তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, বাঁচিতেই হইবে। সত্যদের বৈপ্লবিক কার্য্যের সহায়ক হইয়াও বাঁচিতে হইবে। তিনি কোনমতেই মরিতে পারেন না। অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করিয়া তাঁহাকে বাঁচিতেই হইবে।

শচীনবাবু নিঃশব্দে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—এক দিকে মহেশবাবুর সেই প্রজা ও স্থানীয় বাবুরা অসহায় দরিদ্রদের শোষণ করিয়া নিজেদের উদর স্ফীত করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছে না, অন্য দিকে সত্য উন্মাদের মত ছুটিয়াছে কাহার আহ্বানে কে জানে ! তাহার মত পতঙ্গধর্ম্মীরা আদর্শের আগুনে নিজেদের পোড়াইয়া ভস্ম করিতেছে, আর অন্যেরা সেই ভস্ম অঙ্গে মাখিয়া উৎসব করিতেছে বাস্তব পৃথিবীর অনুদার আঙিনায়। এই পৃথিবী ! ইহাই পৃথিবীর চিরন্তন ইতিহাস—

শচীনবাবু দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া বাহিরের ঘনীভূত অন্ধকারের পানে চাহিয়া রহিলেন।

২

আরও একমাস পরের কথা—

তিনি চাকুরির জন্য কয়েকখানি দরখাস্ত করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একটিতে ফল হইল। বর্ত্তমানে নিকটেই একটি স্কুলে তিনি একটি মাষ্টারী পাইয়াছেন, বেতন ৫০৲টাকা, একটি টিউসনিও জুটিয়াছে স্কুলের পরে পড়াইয়া আসেন, তাহাতে রোজগার হয় ১৫৲ টাকা। বাড়ীভাড়া দিলে বাকী চল্লিশ টাকায় দুই জনের কোনমতে চলিতে পারে।

কয়েক মাসে হাতের জমানো টাকা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল, কয়েকটি মাত্র টাকা ছিল তাই দিয়া টায়টোয় মাসের কয়েকটি দিন কাটাইতে হইবে, তারপরই মাহিনা পাইবেন। দিন একরূপ চলিয়া যাইবে। টিউশনি দুই একটা পাইলে ভালই চলিবে।

তাঁহাকে যাইতে হয় গাড়ীতে, মাসিক টিকিট আছে কিন্তু এদিক ওদিক দুই মাইল হাঁটিতে হয়, তাহাতে ক্লান্তি আসে। সকালে তাড়াতাড়ি রাঁধিয়া খাইয়া ৯টায় গাড়ী ধরেন, বৈকালে ৭টায় ফেরেন। খোকা আপনমনে খেলা করিয়া বেড়ায়; একটু পড়াশুনাও করে।

বর্ষাকাল। বেশী বৃষ্টি হইলে ফাটলধরা ছাদ দিয়া জল পড়ে, সারারাত্রি বিছানা এদিক ওদিক টানিয়া লইয়া বেড়াইতে হয়। গতরাত্রি তাই শচীনবাবুর ঘুম হয় নাই, ঘরের মাঝে ছাতা মাথায় দিয়া বসিয়াছিলেন।

সকালে যৎসামান্য কিছু রাঁধিয়া ও বৈকালের রুটি তৈয়ারী করিয়া রাখিয়া তিনি নয়টায় গাড়ী ধরিয়াছেন। মাঝে মাঝে বৃষ্টি, আর ভাপসা গরমে শরীরে একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। গাড়ীতে বসিয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন, বৈকালে যাহা তিনি খান তাহাতে অত্যধিক খরচ হইতেছে, এত পয়সা খরচ করিলে চলিবে না।

বৈকালে চায়ের দোকানে যাইবার পথে দেখিলেন বেগুনি ফুলুরীর দোকান, বেশ সস্তায় পেট ভরে, তিনি চার পয়সার বেগুনি খাইয়া ও চা পান করিয়া পড়াইতে গেলেন।

ফিরিবার মুখে পেটে অসহ্য বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। ষ্টেশনে নামিয়া আষাঢ়ের অশ্রান্ত বর্ষণে ভিজিয়া কোনমতে বাসায় পৌঁছিলেন, কিন্তু এত দুর্ব্বল বোধ করিতে লাগিলেন যে তাঁহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

বর্ষণে ঘর ভিজিয়া গিয়াছে, বিছানা পাতিবার স্থান নাই। খোকা ছাতা মাথায় দিয়া লণ্ঠন জ্বালাইয়া একাকী বসিয়া আছে নির্ভীক ভাবে। আজ কোন আত্মীয় আর আসেন নাই খোঁজ করিতে, এমনি বর্ষণে বাহির হওয়া যায় না।

শচীনবাবু বলিলেন, খোকা, বড্ড পেটে অসুখ করেছে, তুই রুটি দুখানা খেয়ে শুয়ে পড়, আমি রাত্রে আর খাব না।

ঘরের যে স্থানটি অপেক্ষাকৃত শুষ্ক সেই স্থানটায় সংক্ষিপ্ত বিছানা পাতিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন, খোকা গুড় রুটি খাইয়া একপাশে ঘুমাইয়া পড়িল।

বাহিরে গাঢ় অন্ধকার, ঘন বর্ষণের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে, মাঝে মাঝে বাতাসের গর্জ্জন—সমস্ত গ্রাম নিঝুম, যেন অন্ধকার-সমুদ্রের তলদেশে ঘুমাইয়া আছে। কিছুক্ষণ বাদে শচীনবাবু শরীরে একটা অসম্ভব জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন, সারা দেহের ভিতরে বাহিরে কে যেন লঙ্কাবাটা লাগাইয়া দিয়াছে। হাতে পায়ে খিল ধরিয়া যাইতেছে, সর্ব্বাঙ্গে অপরিসীম অব্যক্ত যন্ত্রণা।

শচীনবাবু সম্ভবতঃ অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, জাগিয়া অনুভব করিলেন ছাদ হইতে টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে। জলের ছাটে বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে। তিনি একটু সরিয়া শুইতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু পারিলেন না, হাত-পা অবশ অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তিনি কি মরিতে বসিয়াছেন! সঙ্গে সঙ্গে অজস্র অশ্রুধারায় গণ্ড ভাসিয়া গেল, খোকা, অসহায় নিঃসম্বল—ও জগতে কেমন করিয়া বাঁচিবে? ওর যে আর কেহ নাই।

খোকাকে ডাকিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ. ডাকিবার শক্তি নাই। পরক্ষণে ভাবিলেন—থাক্, ঘুমাইয়া থাক্, যদি তিনি মরিয়াই যান তবে নিশীথ রাত্রের এই অন্ধকারে মাতৃহীন শিশু ভয়ে ভাবনায় অসাড় হইয়া যাইবে, কেমন করিয়া মৃত পিতাকে লইয়া ও রাত্রি কাটাইবে! এই দুর্য্যোগে কোথায় যাইবে!

—হায়! হায়! এই কি তাঁহার জীবনের শেষ, এমনি করিয়া তাঁহার আদরের খোকাকে তিনি পথের ভিখারী করিয়া চলিয়া যাইবেন। তিনি একান্ত মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—ভগবান কয়েকটি বৎসর আমায় পরমায়ু ভিক্ষা দাও—আমার নিজের জন্য নয়,—খোকার জন্য, মীরার জন্য, যে মীরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য মরিয়াছে—

বুকের উপর টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে, হিমশীতল দেহকে নাড়িবার ক্ষমতা নাই তাঁহার। প্রাণপণ শক্তিতে তিনি ডাকিতে চেষ্টা করিলেন, খোকা! কিন্তু কণ্ঠস্বর চির দিনের মত শুব্ধ হইয়া গিয়াছে, দেহ চিরতরে নিষ্ক্রিয়, নির্জ্জীব, অসাড়।

ভোরবেলা বাদলের মাতন থামিয়াছে—

পূবের আকাশ পরিষ্কার, খোলা জানালা দিয়া আলো আসিয়াছে, ঘরের মাঝে স্পষ্ট দেখা যায়। পাখীরা ভিজা ডানা ঝাড়িয়া ডাকিতেছে। খোকা জাগিয়াছে—কিন্তু বিছানা

ভিজা, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আপনমনেই কহিল, সব ভিজে গেছে—

ডাকিল, বাবা! বাবা!

পিতা উত্তর দিলেন না। সে উঁবু হইয়া বসিয়া ডাকিল, বাবা!

পিতা নিরুত্তর।

বাবা কেমন করিয়া তাকাইয়া আছে, দেখিলে ভয় হয়, চোখ দুইটি যেন যাতনায় ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। চোখের কোণে গালের উপরে অশ্রুর দাগ শুকাইয়া রহিয়াছে।

খোকা কহিল, বাবা কাঁদছ কেন? বাবা!

কোন উত্তর নাই। খোকা তাঁহার গায়ে একটা ধাক্কা দিল, দেহ হিমশীতল, বাবা কথা বলে না, কেমন করিয়া যেন তাকাইয়া আছে।

ভয়ে দুঃখে খোকা কাঁদিয়া ফেলিল।

চোখ মুছিয়া দেখে বাহিরে সুস্পষ্ট দিনের আলোক। একটি অজানা ভয় ও দুর্জ্ঞেয় অস্বস্তিতে সে বাহিরে আসিল, বৃষ্টিধৌত আলোকিত রাস্তা, সে তাহাই বাহিয়া চলিতে আরম্ভ করিল—তার পর বড় রাস্তা। বড় রাস্তায় কত গাড়ী চলিয়াছে। সে চারি পাশের ঘরবাড়ী, গাড়ী, যানবাহন দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিল। সুন্দর, রঙীন গাড়ী, দো-তলা তিন তলা বাড়ী, বড় বড় গাছ, রাশি রাশি তার কত দূরে গিয়াছে;—কত দূর···

আপন খেয়ালে চলিতে চলিতে সে আসিল একটা স্থানে—বিরাট ঘর, বহু লোকজন। রেলের গাড়ী হুস্ হুস্ করিয়া আসিয়া চলিয়া গেল। কত বড় গাড়ী, কত বেগে যাইতেছে, মাটি কাঁপিয়া উঠিতেছে এত তার শক্তি।

খোকা একখানা বেঞ্চিতে বসিয়া দেখিতে লাগিল।

একখানা গাড়ী আসিল, সকলে ছুটাছুটি করিয়া গাড়ীতে উঠিতেছে। মজার ব্যাপার, অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে সেও গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। গাড়ী গড় গড় করিয়া চলিবে—কি আনন্দ, কি মজা!

গাড়ী চলিয়াছে—বন, মাঠ, গ্রাম, শহর অতিক্রম করিয়া। খোকা জানালায় বসিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া চাহিয়া দেখে,—গাছ ছুটিয়াছে, মাঠ ছুটিয়াছে গাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিয়া···

কিন্তু ক্ষুধা পাইয়াছে বেজায়, কাল রাত্রিতে দুইখানি মাত্র রুটি খাইয়াছে সে। এখন বেলা হইয়াছে। কে এক জন হাঁকিতেছে, চানাচুর,—গরম গরম—

খোকা লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। লোকে এক-এক আনা দিয়া কিনিয়া তাহারই সামনে বসিয়া খাইতে লাগিল। পাশের লোকটি বসিয়া চোখ বুজিয়া চিবাইতেছে, দাঁতে দাঁতে কট্‌মট্‌ শব্দ হইতেছে।

খোকা কহিল, আমায় চারটা পয়সা দেবেন—ঐ খাবো—

খোকার ভাষায় দেশজ টান ছিল। একজন যাত্রী বলিল, না, এই রিফুজিগুলোর জন্যে আর চলা যায় না। পথে-ঘাটে সব জায়গায় ভিক্ষে···

খোকা সবিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল। লোকটা কি বলিল, সে বুঝিতে পারে নাই। অন্য ব্যক্তি কহিল—ওঁরা এসেছেন দয়া করে—এখন মাথায় করে রাখো। গাড়ীতে চলবার যো নেই, পথে চলার যো নেই···তিনি আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু অন্য এক ভদ্রলোক বাধা দিলেন। তিনি একটি চানাচুরের প্যাকেট কিনিয়া খোকার হাতে দিলেন, খোকা তাহা চিবাইতে চিবাইতে জানালার বাহিরে তাকাইয়া ধাবমান গাছপালা দেখিতে লাগিল, কৌতুকভরে—পরম বিস্ময়ে—

ওদিকে রেফুজি সমস্যা লইয়া দুই ভদ্রলোকের মধ্যে বচসা শুরু হইয়াছে।

খোকার এসবে আগ্রহ ছিল না—সে কিছু বুঝিতেও পারে না। সে জানালার কাছে ঘন হইয়া বসিল—সম্মুখে উদার মাঠ, উন্মুক্ত প্রান্তর—ধাবমান বৃক্ষশ্রেণী!

পৃথিবী ঘুরিতেছে আপন অক্ষের উপর—অবিরাম, অশ্রান্ত গতিতে।

গতির সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাসে যুক্ত হইতেছে সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, ভাঙ্গা-গড়ার অনন্ত কাহিনী। মানুষের বুকের রক্তে সিক্ত হইতেছে পৃথিবীর ঊষর মৃত্তিকা, মানুষ বিত্ত অর্জ্জন করিতেছে, সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। যারা পতঙ্গধর্ম্মী তারা ছুটিয়া চলিয়াছে আদর্শের ভাস্বর বহ্নিশিখার পানে—তাহারা নিজেরা পুড়িয়া, পোড়াইয়া পৃথিবীকে দিতেছে আবর্ত্তনের শক্তি। পৃথিবী ঘুরিতেছে, তাহাদের বুকের রক্তে উর্ব্বর হইতেছে ধূসর মৃত্তিকা, শ্যামল হইতেছে পাণ্ডুর মাঠ। ভস্মীভূত পতঙ্গস্তূপের উপর যুগে যুগে উঠিয়াছে মণিবাবুদের মর্ম্মর প্রাসাদ। এমনি করিয়া গিয়াছে মীরা, শচীনবাবু। সত্য ছুটিয়াছে সম্মুখের পানে পৃথিবীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে··· ভবিষ্যৎকে সুন্দর করিতে ভাবীকালের আদর্শকে জয়যুক্ত করিতে।

পৃথিবী ছুটিয়াছে—

জানি না এই অনুদার নিষ্ঠুর স্বার্থান্ধ পৃথিবীর বুকে খোকা আজও বাঁচিয়া আছে কি-না।

সমাপ্ত

বিশ্বশান্তি সম্মেলনের সার্থকতা কোথায়?

অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পিএচ-ডি

কয়েক মাস পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বিশ্বশান্তি সম্মেলনের কয়েকটি অধিবেশন হইয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে ও পরে সম্মেলনের প্রতিনিধিদিগকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্মেলনে পৃথিবীর ৩৩টি দেশের প্রায় ৭০ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন এবং তাঁহারা বিশেষ সম্মান ও সমাদরলাভ করিয়াছেন। কিন্তু 'রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব্ কালচার'এর কলিকাতায় ভবনে বিশ্বশান্তি সম্মেলনের প্রতিনিধিদের সম্বর্দ্ধনা সভায় কয়েক জন খ্যাত-নামা পণ্ডিতের বক্তৃতা শুনিয়া ও শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর তাহার প্রভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, এরূপ সম্মেলনের সার্থকতা সম্বন্ধে অনেকের মনে ঘোরতর সন্দেহ আছে। যাঁহারা এ বিষয়ে সন্দিহান তাহাদের মতে ইতিহাসের দিক হইতে আলোচনা করিলে অথবা মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয় যে, অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে যুদ্ধবিরতি ও বিশ্বশান্তি যে আসিতে পারে এরূপ কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে শান্তি অপেক্ষা যুদ্ধের উপকারিতা কম নহে। যুদ্ধে অনেক লোকক্ষয় ও ধনসম্পত্তির ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু তাহার ফলে মানবসমাজের অনেক মঙ্গলও হয়। বিগত মহাযুদ্ধ সমুদ্রমন্থনের ন্যায় অনেক বিষোদ্গার করিলেও ভারত ও অন্যান্য দেশের মুক্তিরূপ অমৃতফলও প্রসব করিয়াছে। অতএব বলিতে হয় যে, বিশ্বশান্তি সম্ভবও নহে আর বাঞ্ছনীয়ও নহে। যদি তাহাই হয় তবে এই বিশ্বশান্তি সম্মেলনের সার্থকতা কোথায়?

দার্শনিক দৃষ্টিতে এই বিষয়টি আলোচনা করা যাইতে পারে এবং তাহাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কি সম্ভব ও কি অসম্ভব তাহা বোধ করি কোন সাধারণ মানুষ বলিতে পারে না। অনেক জিনিষ এককালে অসম্ভব ও অভাবনীয় বলিয়া মানুষের মনে হইত। কিন্তু এখন এরূপ অনেক কিছু শুধু সম্ভব হয় নাই, একেবারে কার্য্যকরী দৈনন্দিন ব্যবস্থায় পরিণত হইয়াছে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কে ভাবিত যে মানুষ আকাশে উঠিতে ও বিচরণ করিতে পারিবে? কিন্তু আজ কে না জানে যে কিছু অর্থব্যয় করিলেই আকাশে ভ্রমণ করিতে পারা যায়? সেইরূপ আজ ইতিহাস বা মনুষ্য প্রকৃতি দেখিলে বিশ্বশান্তি সম্ভব বলিয়া মনে না হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে কোনকালে সম্ভব নয় সেকথা বলা যাইতে পারে না। দেশ ও কালের আদি নাই, অন্ত নাই, শেষ নাই। যাহা এদেশে হয় না তাহা অন্য দেশে হইতে পারে; যাহা একালে হয় না তাহা অন্যকালে হইতে পারে। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহারা বলিবেন যে স্থূলদেহ বিনষ্ট হইলে অনেক জীবাত্মা ইহলোক হইতে লোকান্তরে গমন করে এবং সেখানে কোন দ্বন্দ্ব, কলহ বা অশান্তি ভোগ করে না। লোকান্তরিত জীবাত্মারা যে আমাদের মত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকে তাহা একটু কটুকল্পনা বলিয়াই মনে হয়। অতএব বিশ্বশান্তি যে একেবারে অসম্ভব তাহা বলা যায় না। অবশ্য একথা সত্য যে মানুষের এখনকার প্রকৃতি দেখিলে বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া একেবারে অসঙ্গত নয়। কিন্তু এবিষয়ে দুইটি কথা বলা যাইতে পারে। মনুষ্য-প্রকৃতিতে দুইটি ভাব আছে। উহাদের মধ্যে একটি পাশবিক, অপরটি প্রজ্ঞাত্মক ও বিচারবুদ্ধিগত। একটি মানুষকে পশুত্বের নিম্নস্তরে টানিতেছে, অপরটি দেবত্বের উচ্চস্তরে আকৃষ্ট করিতেছে। এই দুইটিকেই মানুষের মধ্যে স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা ভাল মানুষ মন্দ মানুষ, পাপী ও পুণ্যাত্মা লোক প্রভৃতি প্রচলিত ব্যবহারিক শ্রেণীভেদ নিরর্থক হইয়া পড়িবে। যত দিন মানুষের মধ্যে পাশবিকতা (animality) থাকিবে তত দিন পশুদের মত মানুষ হিংসা, দ্বেষ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিবেই।

কিন্তু মানুষের আর একটা দিক আছে। ইহা তাহার প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধি (rationality)। ইহা যে মানবেতর প্রাণীর মধ্যে একেবারে নাই তাহা বলা যায় না, কারণ পশুরাও তাহাদের ভালমন্দ, ইষ্টানিষ্ট, কতকটা বুঝে বলিয়াই মনে হয়। মানুষ তাহার বিচারবুদ্ধির সাহায্যে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখ-প্রাপ্তির চেষ্টা করে। কোন মানুষই দুঃখ চাহে না। সকলেই সুখ ও শান্তি কামনা করে। যদি মানুষের পশুস্বভাব অপেক্ষা এই বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞাস্বভাব প্রবল হয়, তবে মানুষ দেবত্বের স্তরে উঠিতে পারে। এখন প্রশ্ন এই, মানুষের কোন্ দিকটা প্রবল আর কোন্ দিকটা দুর্ব্বল। যদি মানুষের পশুপ্রকৃতিই প্রবল হয়, তবে বিশ্বশান্তি যে অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে অসম্ভব তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। আর যদি তাহার বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার দিকটা প্রবল হয় বা প্রবল হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে বিশ্বশান্তিও সম্ভব হইবে। আর এক কথা এই যে, ক্রমবিকাশের (evolution) নিয়ম অনুসারে মানুষ ক্রমোন্নতির দিকে চলিয়াছে, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণতা ও প্রসারতালাভ করিয়া তাহাকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে উন্নত করিয়াছে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির উচ্চ সোপানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। অবশ্য একথা সত্য যে ক্রমবিকাশের ফলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির যতটা উন্নতি হইয়াছে তাহার নৈতিক চরিত্র বা আধ্যাত্মিক ভাবের সে পরিমাণ স্ফুরণ হয় নাই। বোধ হয় এইজন্যই আজ মানুষ

বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের অপপ্রয়োগ করিয়া শান্তির পরিবর্তে পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু বর্তমান ইতিহাসের এরূপ ঘটনাবলী দেখিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইবার কারণ নাই। যেমন কোন বালকের হাতে একটা অস্ত্র দিলে সে প্রথমে তাহার অনাবশ্যক ব্যবহার বা অনুচিত প্রয়োগ করে এবং তাহার জ্ঞানবুদ্ধি হইলে তাহাতে নিবৃত্ত হইয়া অস্ত্রটির সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে, সেইরূপ সভ্যতার বর্তমান স্তরে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ হইলেও উহার উচ্চতর স্তরে যে উন্নত-চরিত্র ও বিজ্ঞ-মনুষ্যকুলের আবির্ভাব হইবে তাহাতে বিজ্ঞানকে মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত প্রয়োগ করা হইতে পারে। অতএব বর্তমানকালের বিভীষিকা দেখিয়া চিরকালের জন্য বিশ্বশান্তির আশা-ভরসা ত্যাগ করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না, কারণ বর্তমান যুগ অনন্তকালের এক ক্ষণ মাত্র।

এখন বিশ্বশান্তি যে সম্ভব তাহা স্বীকার করিলেও কোন বিশ্বশান্তি সম্মেলন দ্বারা এই সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে পারা যায় কিনা তাহা বিবেচ্য। কারণ তাহার উপরই এরূপ সম্মেলনের সার্থকতা স্থূলতঃ নির্ভর করে। এ বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, বিশ্বশান্তি সম্মেলনের সাফল্য চতুর্বিধ অবস্থা বা সর্ত্তসাপেক্ষ।

প্রথমতঃ, এই বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হইতে যাঁহারা যোগদান করিবেন তাঁহাদের মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিবর্গের প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক। অবশ্য দুর্ব্বল বা পরাধীন দেশগুলির প্রতিনিধি থাকিবেন না একথা বলিতেছি না। পৃথিবীতে যুদ্ধের বিরতি ঘটাইয়া শান্তি স্থাপন করিবার দায়িত্ব প্রধানতঃ শক্তিমান জাতিগুলিরই। যাহারা দুর্ব্বল বা অশক্ত তাহারা ত এমনিই শান্তি কামনা করে। কিন্তু পৃথিবীতে শান্তি থাকিবে, না যুদ্ধবিগ্রহ চলিবে তাহা তাহাদের ইচ্ছা বা কথার উপর নির্ভর করে না। যাহাদের যুদ্ধ করিবার শক্তি আছে, তাহাদেরই যুদ্ধ বিরতির ও শান্তিস্থাপনের ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার অর্থ হইতে পারে। যেমন শক্তিমান ও শাস্তিদানে সক্ষম ব্যক্তির মুখেই ক্ষমা ও অহিংসার কথা সাজে, কিন্তু হীনবল ও কাপুরুষের পক্ষে উহা হাস্যাস্পদ হয়, সেইরূপ বিশ্বের শক্তিমান জাতিগুলির পক্ষেই শান্তির কথা বা প্রচেষ্টা সার্থক হইতে পারে। এইজন্যই বলিতেছি বিশ্বশান্তি সম্মেলনে সকল শক্তিমান জাতির প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যাঁহারা যোগদান করিবেন তাঁহাদিগকে তাঁহাদের দেশের জনসাধারণের ও শাসকশ্রেণীর যথার্থ প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করা যায় কিনা তাহা দেখিতে হইবে। কারণ এসব ব্যক্তির শান্তিপ্রচেষ্টায় যদি তাঁহাদের দেশের লোকের ও সরকারের সহানুভূতি ও সমর্থন না থাকে তবে তাঁহাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া কথায় পর্য্যবসিত হইবে। অবশ্য তাঁহারা তাঁহাদের দেশের সরকারের নিকট হইতে কোন লিখিত সনদ আনিবেন এমন কথা নয়। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যে দেশের ও দশের সহানুভূতি ও অনুমোদন থাকা আবশ্যক, নতুবা তাঁহাদের শান্তিপ্রচেষ্টা সফল হইবে না।

তৃতীয়তঃ, সম্মেলনের প্রতিনিধিরা যে সব দেশ হইতে আসিয়াছেন সে সব দেশের সরকারের শান্তি-সম্মেলনের প্রস্তাবাদি মানিয়া লইয়া তদনুসারে কাজ করিবার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি থাকা আবশ্যক। তাঁহারা যাহা ভাল বলিয়া মনে করিবেন এবং যে সব পন্থা অবলম্বন করিবার জন্য উপদেশ দিবেন, তাঁহাদের দেশের শাসকবর্গকে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে; নতুবা তাঁহাদের সব কাজই বিফল হইবে।

শান্তি-সম্মেলনের সাফল্যের জন্য আর একটি জিনিষ অত্যাবশ্যক। যে সব প্রতিনিধি ইহাতে যোগদান করিবেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য অন্য কিছু না হইয়া বিশ্ব-শান্তিমাত্রই হওয়া দরকার। ইহার মধ্যে কোন ছল-চাতুরী বা কূটনীতি থাকিলে চলিবে না। এমন না হয় যে, শান্তি-সম্মেলনের নাম করিয়া কোন দেশ বা জাতির স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে বা একটা রাষ্ট্রগোষ্ঠী (bloc) সৃষ্টি করিয়া নিজ দেশের সপক্ষে দল ভারি করিবার ফন্দী হইতেছে এবং পরে আবশ্যকমতে উহার সদ্ব্যবহার করা হইবে। আবার এমনও না হয় যে শান্তির বাণী প্রচার করিয়া কোন কোন দেশ বা জাতিকে অস্ত্র ত্যাগ করাইবার বা তাহার দেশরক্ষা-প্রচেষ্টা শিথিল করিবার চেষ্টা চলিতেছে। অবশ্য বর্তমান বিশ্বশান্তি সম্মেলনে এমন কিছু হইতেছে তাহা বলিতেছি না, কেবল এরূপ সম্মেলনের সাফল্য যে বহুলাংশে প্রতিনিধিদের সাধু উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে তাহাই বুঝাইতেছি।

এখন আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, বিগত বিশ্বশান্তি সম্মেলনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত চারিটি সর্ত্ত প্রতিপালিত হইয়াছে কিনা। প্রথম তিনটি সর্ত্ত যে পুরণ করা হয় নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ সম্মেলনে যে সব প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পৃথিবীর কোন কোন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রশক্তির কোন লোক ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাশিয়ার সোভিয়েট ইউনিয়নের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ ছাড়া অন্যান্য অনেক দেশ হইতে কোন প্রতিনিধি স্থানীয় শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন নাই। তাহার পর যাঁহারা সম্মেলনে আসিয়াছিলেন তাঁহারা নিজ নিজ দেশের ও জাতির প্রতিনিধিত্ব করিবার কোন দাবি রাখেন না। তাঁহারা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভাবেই সম্মেলনে যোগদান করেন। তৃতীয় কথা, যে সব দেশ হইতে এক বা একাধিক ব্যক্তি এই সম্মেলনে

আসিয়াছিলেন সেখানকার জনসাধারণ বা শাসকশ্রেণী ইহার প্রদর্শিত পথে চলিতে বা নির্দ্দেশ মানিতে প্রস্তুত নহেন, এমন কি এই সম্মেলনের প্রতি তাঁহাদের আনুগত্য বা সহানুভূতি দেখা যায় না। অবশ্য চতুর্থ সর্ত্ত, অর্থাৎ সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যের সাধুতা সম্বন্ধে আমরা এখন কিছুই বুঝিতে পারি না। অতএব এ বিষয়ে আমাদের কোন দিকে কিছু না বলাই ভাল। এ সব কথা ভাবিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, এরূপ সম্মেলনের সাফল্য বা উপযোগিতা সম্বন্ধে কোন কোন লোকের মনে সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

বাংলার ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ একজন বিশিষ্ট শান্তিবাদী ও শান্তি-সম্মেলনে আস্থাবান ব্যক্তি। বিশ্ব-শান্তি সম্মেলনের কলিকাতায় যে অধিবেশন হয় তাহাতে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি যে সব কথা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে দুইটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "ভারতবর্ষ যদি পাকিস্থানের সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হইতে না পারে, তবে আমাদের একতরফা শান্তিরক্ষার (unilateral steps) কথাও ভাবিয়া দেখা উচিত, যদিচ তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে।" ইহার সরলার্থ এই যে, পাকিস্থান ভারত আক্রমণ করিলেও আমরা শান্ত ও নিষ্ক্রিয় থাকিব। তিনি আরও বলিয়াছেন যে যখন কংগ্রেস আমলাতন্ত্রের আমলে সামরিক অর্থাৎ দেশরক্ষার খাতে এত অত্যধিক ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে তখন আর কোন বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবীর মুখে শান্তি ও অহিংসার কথা শোভা পায় না। ডঃ ঘোষের এসব কথায় কাহারও কাহারও মনে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে এবং সেটা বোধ হয় খুব অসঙ্গত নহে। কারণ আমাদের দেশের ও পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে দেশের স্বাধীনতা এবং দেশবাসীর ধন, প্রাণ ও মান রক্ষা করিবার জন্য যে ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা সঙ্গত বই অসঙ্গত মনে হইবে না। বিশেষ করিয়া এ যুগের মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি এবং ভারতের যমজ স্বাধীন রাষ্ট্রের রীতি-নীতি ও মতিগতি ভাবিয়া দেখিলে দেশরক্ষাখাতে ভারত-সরকারকে ব্যয়-সংকোচ করিতে বলা কোন বুদ্ধিমান রাজনীতিবিদের উচিত হইবে না। অহিংসা সম্বন্ধে ডঃ ঘোষ যে কথা বলিয়াছেন তাহা যেন অতি অদ্ভুত মনে হয়। তাঁহার কথাটার তাৎপর্য্য এই যে, যদি অহিংসার কথা বলি তবে আবার দেশরক্ষার জন্য সামরিক ব্যবস্থা করিব কেন? বেশ কথা! কিন্তু অহিংসা কথাটার অর্থ কি তাহা একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। ইহার অর্থ যদি এই হয় যে, কোন অবস্থায় ও কোন কারণে কোন জীব হত্যা করা চলিবে না, তবে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া তাহা ঠিকভাবে সাধন করিতে গেলে অল্পক্ষণের মধ্যেই দেহত্যাগ ও মোক্ষলাভ করিতে হইবে। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, মানুষকে বাঁচিতে হইলে কোন না কোন রূপে কোন না কোন জীব হত্যা করিতে হয়। এখনকার রাষ্ট্রনেতারা যাহাই বলুন না কেন, অহিংসা শব্দটা মূলে হিন্দুশাস্ত্রের কথা। [illegible] মতে অহিংসা কথার অর্থ অবৈধ পশুবধ বা জীবহিংসা না করা। ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝা যায়, যখন হিন্দুধর্ম্মে পশুবধের অত্যধিক প্রাবল্য হইয়াছিল তখন উহার প্রতিক্রিয়া রূপে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে অহিংসাকে অতি কঠোর আকারে একটি মহাব্রত বলিয়া প্রচার করা হয়। জৈনধর্ম্মে অহিংসাব্রতের যে কঠোর ও অবাস্তব রূপ দেওয়া হয় তাহাই বোধ হয় আমাদের দেশের কোন কোন নেতৃস্থানীয় মহাজনের অহিংসানীতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এরূপ ধারণা হিন্দুশাস্ত্রে অনুমোদিত নহে। হিন্দুধর্ম্মের মূল বেদ ও উপনিষদের সার-সংগ্রহ শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা পাঠ করিলে একথার সত্যতা বেশ বুঝা যায়। হিন্দুশাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ইহাতে বৈধ হিংসার কথাও আছে। দেশ কাল পাত্র ভেদে হিংসা শুধু যে বৈধ তাহাই নহে পরন্তু উহাই ধর্ম্ম। অহিংসার নামে পাপ ও পাপীকে প্রশ্রয় দেওয়াই অধর্ম্ম, তাহাদের সমুচিত শাস্তিবিধানই কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্ম। অহিংসানীতির প্রকৃত অর্থ কি তাহা এখন আমাদের দেশের লোকের ভাবিয়া দেখা উচিত এবং উহা সর্ব্ব ক্ষেত্রে ও সর্ব্ব অবস্থায় প্রয়োগ করা উচিত কিনা তাহাও অনুধাবন করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে যে সব কথা বলা হইয়াছে তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আলোচ্য বিশ্বশান্তি সম্মেলন দ্বারা পৃথিবীতে যুদ্ধনিবৃত্তি ও স্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। তথাপি এরূপ সম্মেলনের কোন উপযোগিতা নাই একথা বলিতে পারি না। পৃথিবীতে এখন যে বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে সন্দেহের মনোভাব এবং হিংসা, দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-কলহের বিলক্ষণ প্রবৃত্তি দেখা যায় তাহা কোনক্রমেই মনুষ্যজাতির পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। পক্ষান্তরে ধরাবক্ষে যদি অপেক্ষাকৃত শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকে তবেই মানুষ সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতে পারে এবং তাহার সেই প্রচেষ্টাও ফলবতী হইতে পারে। বিশ্বশান্তি সম্মেলন এই দিক দিয়া জগতের মহৎ কল্যাণ করিতে পারে।

মানুষ কোন্ ভাবে ভাবিত হইলে এবং কোন্ পথে চলিলে তাহার প্রকৃত কল্যাণ হইবে এবং উহার প্রতিকূল অবস্থা দূর করিতে ও অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিতে কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী আবশ্যক তাহা এরূপ সম্মেলনের সাহায্যে স্থির করিয়া দেশে দেশে প্রচার করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে পৃথিবীর ইতিহাস হইতে আমরা কি শিক্ষা পাই তাহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সাধারণভাবে বলিতে গেলে পৃথিবীর ইতিহাস এক বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনী, যাহাতে যুদ্ধ ও শান্তির কথা আছে, সাম্রাজ্যের ও

সভ্যতার উত্থান-পতনের বিবরণ আছে। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই ইতিহাসের গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর পাশ্চাত্ত্য খণ্ডে যত যুদ্ধবিগ্রহ ও অশান্তি অনাচার হইয়াছে, প্রাচ্যখণ্ডে বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে তাহা ঘটে নাই। এই দুই ভূখণ্ডের ইতিহাসের এরূপ পার্থক্য কেন হইল? ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, উহা দুই দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিণতি। পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলির মধ্যে পররাজ্য ও পরধন হরণ করিবার একটা প্রবল প্রবৃত্তি এক প্রকার ব্যাধিরূপেই কোন কোন স্থলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং সেইজন্যই তাঁহারা পৃথিবীর অনেক দেশের সুখশান্তি নষ্ট করিয়া যুদ্ধবিগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের দেশে কিন্তু এইরূপ অবিশ্রান্ত যুদ্ধোদ্যম ও পররাজ্য জয় করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হয় নাই। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে সব মূলমন্ত্র তাহা হইতে এগুলির সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ভারতের সনাতন আর্য্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলসূত্রের কথা এখানে আলোচনা করিলেই আমাদের বক্তব্য বুঝা যাইবে। প্রথম, ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শনে এই সত্য ঘোষণা করা হইয়াছে যে সর্ব্বজীবশরীরে একই প্রাণশক্তির বিকাশ হইয়াছে। একই বিশ্বব্যাপী প্রাণের স্পন্দন আব্রহ্মস্তম্ভ সর্ব্বত্র অনুভূত হইতেছে। যদি তাহাই হয় তবে সকল প্রাণীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া উচিত, কাহাকেও অবৈধ ও অনাবশ্যক হিংসা করা অবিধেয়। এজন্য ভারতের প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-গুলিতে "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর ভারতীয় দর্শনমালার 'কৌস্তভমণি' বেদান্তে এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, সব জীবে এক আত্মা বিরাজিত আছেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্যের নাম-রূপ ভেদমাত্র। অতএব বেদান্তের দৃষ্টিতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, এক ভগবান বহু নরনারীরূপে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান আছেন এবং এই পৃথিবীর সকল নরনারীকে যিনি ভালবাসিতে পারেন, তাহাদের দৈন্য দুঃখ দূর করিয়া সুখশান্তি দিতে পারেন কিংবা দিবার চেষ্টা করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সেবা ও পূজা করেন। যদি ভারতীয় আর্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই মূল শিক্ষাগুলি সকল দেশে ও সকল জাতির মধ্যে প্রচারিত হয় এবং তাহাদের উপর যথাযোগ্য প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তবে পৃথিবীতে কতকটা সুখ-শান্তি আসিতে পারে, বিশেষ করিয়া পৃথিবীর যে যে দেশ ও জাতি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও সুখ-সম্ভোগের জন্য অন্য দেশ ও অন্য জাতির প্রতি অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার করে, ধর্ম্মোন্মত্ততা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া হিংস্র পশুর ন্যায় অন্যান্য দেশ, জাতি ও ধর্ম্মের লোকের প্রতি অমানুষিক আচরণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না এবং ধর্ম্ম বা জাতীয়তার নামে মানবতার অবমাননা করে, সেই সেই দেশের ও জাতির মধ্যে বেদান্তের ঐক্যের বাণী, মিলনের মন্ত্র এবং লোকসেবার আদর্শ প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে তাহাদের তমসাচ্ছন্ন অন্ধ চক্ষু উন্মীলিত হইবে এবং তাহারা দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া এক নূতন জগৎ, নূতন সমাজব্যবস্থা এবং সাম্য ও মৈত্রীর ভিত্তিতে এক নূতন পৃথিবী গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইবেন।* এই নূতন লোক-ব্যবস্থায় পৃথিবীর সকল দেশ ও সকল জাতি এক যৌথ পরিবারের অঙ্গরূপে গণ্য হইবে এবং সকল নরনারীর কল্যাণ সাধনে যে তাহাদের সমান দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে তাহা স্বীকৃত হইবে। পৃথিবীর বর্ত্তমান প্রতিকূল ও বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থায় যদি বিশ্বশান্তি সম্মেলনের একাধিক অধিবেশনে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলমন্ত্রগুলি এবং বেদান্তের জীবনাদর্শ দেশে দেশে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা হয়, তবে এ বিশ্বশান্তি সম্মেলনের সার্থকতা ও সাফল্যলাভের বিশেষ সম্ভাবনা আছে মনে করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সংশয়-সমস্যা-ভরা শতাব্দীর বিবর্ত্তন চলে,
কোথা যাই? কোন্ পন্থা? বার বার ধ্বনিছে জিজ্ঞাসা।
নির্ভর কিসের 'পর? কার মাঝে রাখি পূর্ণ আশা?
সে প্রশ্নের সমাধান হ'ল নাকো মনীষার বলে।
বুদ্ধি তারে যুক্তি দিয়া আবরিত করে নানা ছলে।
তৃষার্ত্ত মানব, তার শুষ্ক তর্কে মেটে না পিপাসা।
জীবন্ত উত্তর তুমি, উপলব্ধি পায় যেথা ভাষা,
অমৃতের স্পর্শ লভি' আনন্দে যে অন্তর উচ্ছলে।

মুনিদের নানা মত। যত মত তত পথ আছে,
লক্ষ্য এক, অনন্ত সে, দিলে তুমি পথের সন্ধান।
মুদ্রা আর মৃত্তিকার মূল্যে ভেদ নাহি কার কাছে?
শিহরিয়া শোনে বিশ্ব অনাহত স্বর্গের আহ্বান।
প্রণমি শ্রীরামকৃষ্ণ, বিস্মিত যুগান্ত হেরিয়াছে
মর্ত্ত্যের মানব-তীর্থে মিলে যায় ভক্ত-ভগবান।

নাইনিতাল

শ্রীমনোরঞ্জন সেন

কুমায়ুন পর্ব্বতমালার মধ্যে অবস্থিত নাইনিতাল শহরটির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রথম দৃষ্টিপাতেই দর্শককে মুগ্ধ করে। প্রকৃতি আপন ঐশ্বর্য্যসম্ভার এখানে অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ছড়িয়ে রেখেছেন। নাইনিতালে প্রবেশ করে প্রথমেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম তার

নাইনিতাল হইতে চীনা শৃঙ্গের দৃশ্য

স্ফটিকস্বচ্ছ সরোবরের অপূর্ব্ব শোভা দেখে। চারদিকে শৈলমালাবেষ্টিত সেই নিস্তরঙ্গ নীল হ্রদের সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। হ্রদের জলে সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে পাহাড় ও বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত আকাশের ছবি।

হ্রদটিকে স্পর্শ করে আছে একটি তৃণাবৃত ভূমিখণ্ড—যেন সরোবরের সঙ্গেই তার মিতালী। সেই সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাটির রসে পরিপুষ্ট হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ওক ও সাইপ্রাস বৃক্ষের শ্রেণী। তাদের উন্নত মস্তক মানুষের দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করে রাখে। কিছুদূরে দেখা যায় টিনের ছাদ দেওয়া ছোট ছোট ঘর। প্রকৃতির বক্ষে এগুলিকে যেন শান্তির নীড় বলে মনে হয়। কর্ম্মময় জীবনের ক্লান্তি দূর করবার জন্যে অনেকেই ছুটে আসে এই স্নিগ্ধ পার্ব্বত্য আবেষ্টনীতে।

নাইনিতাল উপত্যকার উত্তর দিক বেষ্টন করে আছে ৮৫৬৪ ফুট উচ্চ চীনা শিখর। উপত্যকা থেকে ৩০০০ ফুট উঁচুতে উঠে হিমগিরির বিরাট মহিমা দর্শন করলাম। রজত-শুভ্র বরফে আচ্ছাদিত হিমালয়ের সে সৌন্দর্য্য চোখে না দেখলে কল্পনা করা যায় না। রামায়ণ, মহাভারতেও কুমায়ুনের উল্লেখ রয়েছে। নাইনিতাল কুমায়ুনেরই অংশ। পৌরাণিক যুগে হিমালয়ের এই অঞ্চলে গর্গমুনির আশ্রম ছিল বলে এ জায়গাটা গর্গাচল নামেও অভিহিত হয়। যে হ্রদটির কথা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, সেইটি "ত্রিরিষিতল" নামে পরিচিত ছিল। এ বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। অতীত যুগে একদা অত্রি, পৌলস্ত্য ও পুলহ নামে তিন জন ঋষি এই উপত্যকার ভিতর দিয়ে কৈলাসের পথে যাত্রা করেছিলেন। দ্বিপ্রহরে আহ্নিকের সময় হয়ে গেল; অথচ স্নান করে শুচিশুদ্ধ হবার জন্য জল পাওয়া গেল না। কি করা যায়! তিন জন ঋষি মিলে তখন একটি গর্ত্ত খুঁড়লেন ও নিজেদের অলৌকিক শক্তির প্রভাবে মানস সরোবরের জল এনে তাতে জলস্রোত বইয়ে দিলেন। এই হ'ল "ত্রিরিষিতলে"র জন্মরহস্য।

বর্ত্তমান নাইনিতাল শহরটির পত্তন হয়েছে ১৮৪১ সালে। ১৮১৫ সনে গুর্খা যুদ্ধের বৎসরে ইংরেজ সৈন্যদল আলমোরা থেকে এই উপত্যকার পূর্ব্বদিকে বামরী গিরিপথে (বর্ত্তমান কাঠগোদাম) কতবারই

চীনা শৃঙ্গের পথে

না যাতায়াত করেছে। তাদের চলাচলের পথের এত কাছেই যে এমন সুন্দর একটি হ্রদ অবস্থিত একথা তারা কল্পনাও করতে পারে নি। তাই সেই যুদ্ধের প্রচণ্ড কোলাহল সেদিন এই নিভৃত অঞ্চলের শান্তি ভঙ্গ করতে পারে নি।

সাধারণের বিশ্বাস এই উপত্যকা ভূমিতে নারায়ণী দেবী নিদ্রাসুখ উপভোগ করে থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্য-ভাগ পর্য্যন্তও এই স্থানটি জনকোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে নি। শুধু সেপ্টেম্বরের শেষে বা অক্টোবরের প্রথমে বিভিন্ন পার্ব্বত্যজাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই হ্রদের তীরে এসে নারায়ণী দেবীকে অর্ঘ্য প্রদান করে যেতেন। বৎসরের অন্য সময় এখানে জনমানবের চিহ্ন কদাচিৎ দেখা যেত।

নাইনিতাল হ্রদের একাংশ

দুই জন ভুটিয়া নাইনিতাল বাজারে কয়লা বিক্রয় করিতে আসিয়াছে
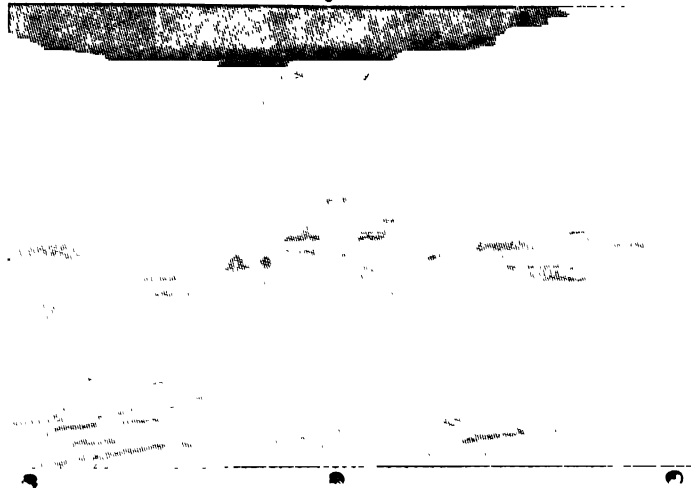
১৮৪১ সনে মিঃ ব্যারণ হিমালয়ের এই প্রদেশে আগমন করে আকস্মিকভাবে কুমায়ুনের নিভৃত অঞ্চলে অবস্থিত এই হ্রদটিকে আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথম হ্রদটির বর্ণনা করে ও এখানে একটি শহর গড়ে তুলবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে "আগ্রা আকবরে"র সম্পাদকের কাছে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠির মারফতেই এই সৌন্দর্য্য-নিকেতনের কথা চারদিকে প্রচারিত হ'ল। ধীরে ধীরে এখানে শহর গড়ে উঠতে লাগল, দলে দলে লোকেরা এখানে এসে বাস করতে সুরু করল। অল্পদিনের মধ্যেই নাইনিতাল এক জন-কোলাহলমুখরিত শহরে পরিণত হ'ল।
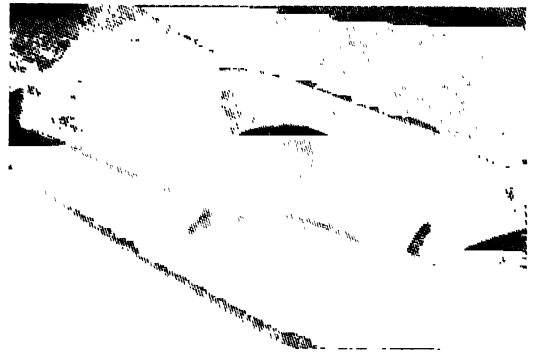
একটি সবল সুস্থ শিশু

১৮৫৭ সনে সিপাহী-যুদ্ধের কালে শহরটির জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ল। যুদ্ধের ধ্বংসলীলার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে লোকেরা দলে দলে পাহাড়ের এই শান্ত পরিবেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করল। এখন এখানে নাগরিক জীবন আরও সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে লাগল। যুক্তপ্রদেশের লেঃ গবর্ণরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী নাইনিতালে স্থাপন করার পরিকল্পনা হ'ল। ১৮৬২ সনে ষ্টোনলেতে প্রথম গবর্ণরের বাসভবন নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট হাউস, সেক্রেটারিয়েট

নাইনিতালে সর্ব্বকনিষ্ঠ পর্য্যটক

জনৈক সব্জী বিক্রেতা

বিল্ডিংস ১৯০০ সনে এন্টনি ম্যাকডোনাল্ডের সময় তৈরি করা হয়েছিল। ধীরে ধীরে এখানে নানারকম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নাগরিক জীবনের অন্যান্য সুখ-সুবিধার ব্যবস্থাও হ'ল। স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল।

গোড়ার দিকে যাতায়াতের জন্যে কেবল ঘোড়া, টাঙ্গা ও ডাণ্ডীর ব্যবস্থাই ছিল। অন্য কোন রকম যানবাহন চলাচলের সুবিধা ছিল না। ১৯১৫ সনে প্রথম কাঠগোদাম ও নাইনিতালের মধ্যে মোটর চলাচলের ব্যবস্থা হয়। ১৯২২ সনে ব্যাপক ভাবে জল ও বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। যাতায়াতের পথ সুগম হওয়ায় অনেক রকম ব্যবসা-বাণিজ্যও এখানে গড়ে ওঠে। এখানে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, শিকার ব্যবস্থা, অবকাশ যাপনের ব্যবস্থা—সবকিছুই আছে, কোনদিকেই কোন ত্রুটি নেই।

কয়েক বছর আগে যখন নাইনিতালে আসি, তখন এখানকার ধনসম্পদের প্রাচুর্য্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। কিন্তু এবার এসে দেখছি, যে নাইনিতাল একদা ঐশ্বর্য্যের ছটায় নবাগত দর্শকের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করত আজ সেখানে আর্থিক দুর্গতি দেখা দিয়েছে। সেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দনির্ঝর যেন সহস্র ধারায় উৎসারিত হচ্ছে না। কেন এমন হ'ল, তার কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম অনেক ইংরেজ ব্যবসায়ী এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ায় এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা পড়ে গেছে। নাইনিতাল এখন আর প্রাদেশিক সরকারের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী নয়। কাজেই এখন আর তার আগেকার জৌলুস নেই। জনসংখ্যা কমে যাওয়ার দরুন হোটেলওয়ালা, রিকসাওয়ালা প্রভৃতির অর্থ উপার্জ্জনের পথে বাধা পড়েছে।

খাদ্য সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিকল্পনা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত যুদ্ধের সময় হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, বাংলাদেশ কোন প্রকার খাদ্য সম্বন্ধেই আত্মনির্ভরশীল নহে ; এমন কি বাংলাদেশের অধিবাসিগণকে প্রধান খাদ্য অন্নের জন্যও বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। বাংলাদেশ বিভক্ত হইবার পর পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। খাদ্যবিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, আমরা প্রায় সকল প্রকার খাদ্য সম্বন্ধেই পরনির্ভরশীল ; তাঁহার হিসাব এইরূপ :

খাদ্যের নাম	প্রয়োজন	উৎপাদন
(১) ডাল	৬,৩৮,৯০০ টন	২,৪০,১০০ টন
(২) চিনি ও গুড়	৪,২৬,০০০ "	৯২,০০০
(৩) আলু	১,২৭৭,৮০০ "	৩,১২,৭০০
(৪) সরিষার তৈল, ঘি	৪,২৬,০০০ "	৯,৯০০
(৫) দুধ	২১,২৯,০০ "	৩৫৩,৫০০ "
(৬) জান্তব প্রোটিন জাতীয় খাদ্য	৬,৩৮,৯০০ "	মাংস ৩০,০০০ "
		মাছ ২,৪৩,০০০ "
		মুর্গী ও হাঁস ২৭০০ "
(৭) তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যশস্য—(চাউল ও গম)	৪২,০০,০০০ "	৩৮,০০,৭০০ "

কৃষি-বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, আই-সি-এস মহাশয় তাঁহার পুস্তকে (*Prospectus of Agriculture in W. Bengal*) খাদ্যের ঘাটতির পরিমাণ এইরূপ দিয়াছেন :

খাদ্যের নাম	আভ্যন্তরিক উৎপাদন	বাহির হইতে আমদানী	মোট প্রয়োজন	ঘাটতি
(১) ডাল	২৪০১০০	১০০০০০	৬৩৮৯০০	২৯৮৮০০
(২) চিনি ও গুড়	৯২০০০	১৮৬৫০০	৪২৬৩০০	১৪৭১০০
(৩) আলু	৩১২৬০০	১২০০০০	১২৭৭৮০০	৮৪৫২০০
(৪) ফল (আম ও কমলা লেবু)	৩৭৩২০০	৩২০০০	৬৩৮৯০০	২৩৩৭০০
(৫) ঘি ও মাখন	৬৯০০	৬০০০	৪২৬০০০	৩৬৬২০০
(৬) সরিষার তৈল	১০৯০০	৩৭০০০		
(৭) দুধ	৩৫৩৫০০		২১২৯৯০০	১৭৭৬৪০০
(৮) মাংস (ভেড়া, ছাগল, গরু)	৩০০০০			
(৯) মাছ	২৪৩০০০		৬৩৮৯০০	৫৪৮৮০০
(১০) পোলট্রি	২৭০০			
(১১) ডিম	৪৭৭ (মিলিয়ন)	৮০ (মিলিয়ন)	৭৬৩৩৫ মিলিয়ন	৭৫০৫৮ মিলিয়ন

উপরোক্ত হিসাবে দে মহাশয় চাউলের ঘাটতির পরিমাণ দেন নাই। যাহা হউক, দুইটি হিসাব হইতে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যের অবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞানলাভ করা যাইবে।

খাদ্য সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিবার জন্য বড়, মাঝারী, ছোট দীর্ঘমেয়াদী, অল্পমেয়াদী প্রভৃতি অনেক রকমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে ; এবং ইতিমধ্যেই উহাদের মধ্যে কতকগুলি পরিকল্পনা (মাঝারী ও ছোট) ফলপ্রসূ হইয়াছে বা হইতেছে বলিয়া কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু উহাদের ফলের পরিমাণ এত অল্প যে, উহা সাধারণের দৃষ্টি মোটেই আকর্ষণ করে নাই কিম্বা ঘাটতি পূরণে বিশেষ সহায়ক হয় নাই। বড় বড় পরিকল্পনার ফলে কবে দেশ কিভাবে আবার শস্য-শ্যামলা হইবে তাহা বলা খুবই কঠিন। মনে হইতেছে এক 'প্রেস নোটে' দেখিয়াছিলাম যে, কর্তৃপক্ষের মতে ছোট ছোট পরিকল্পনার দ্বারা স্থায়ী উন্নতি বা ফল পাওয়া যাইবে না। বড় বড় পরিকল্পনা যখন সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ হইবে তখনই পশ্চিমবঙ্গে আবার "সোনা ফলিবে"। মোট কথা, ছোট ছোট পরিকল্পনা কেবল "জোড়াতালি" মাত্র। আমাদের মতে এই "জোড়াতালির"ও প্রয়োজন আছে ; তবে "জোড়াতালি"টা 'টেকসই' হওয়া দরকার। অনেকের মতে এই "জোড়াতালি"কে টেকসই করিবার দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি নাই ; বহু ক্ষেত্রেই অনেক রকমে অনর্থক প্রচুর অর্থের অপচয় হইতেছে। উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধের আকার বাড়াইতে ইচ্ছা করি না।

এখন কথা হইতেছে এই যে, সকল প্রকার খাদ্য সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, না কেবল কয়েক প্রকার খাদ্যের উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে ? সকল প্রকার খাদ্য সম্বন্ধে দেশকে আত্মনির্ভরশীল করা যায় কিনা, এবং যদি না যায় তো কোন্ কোন্ খাদ্য সম্বন্ধে কত দিনে কি পরিমাণে করা যায় সে বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া কোন পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে কিনা তাহাও সাধারণ লোকের জানা নাই।

প্রায় সরকারী, বে-সরকারী সকল বিবৃতি, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, বিবরণী প্রভৃতিতে পাশ্চাত্য দেশের নানাবিধ ফসলের পরিমাণের উল্লেখ থাকে এবং তাহার সহিত তুলনা করিয়া বলা হয় যে, আমাদের দেশের ফসলের পরিমাণ খুবই অল্প। জ্ঞান লাভের জন্য এইরূপ তুলনা ভাল বটে, কিন্তু উহা হইতে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে না। পাশ্চাত্য দেশের অবস্থা ও আমাদের দেশের অবস্থা সমান নহে ; মাটি, জল-বায়ু, কৃষি-পদ্ধতিও বিভিন্ন ; ইহা ছাড়া পাশ্চাত্য দেশসমূহে বৈজ্ঞানিক কৃষি,

[জ্ঞানের বিস্তার, সরকারের প্রচেষ্টা ও কার্য্য-প্রণালী এবং সর্ব্বোপরি কৃষকদের শিক্ষা, শক্তি, সামর্থ্য প্রভৃতিও বিবেচনার বিষয়। সুতরাং এইরূপ তুলনা অনুসারে আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্য স্থির করা ঠিক হইবে না। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন অবস্থায় সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ফলন নির্ণয় করিবার জন্ত তেমন সুচারুরূপে ও ব্যাপকভাবে কোন পরীক্ষা করা হয় নাই। কিন্তু এইরূপ পরীক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে এখনও কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ কোন সার প্রয়োগ দ্বারা কোনরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন না করিয়া কেবল স্থানীয় পদ্ধতিতে স্থানীয় বীজ বপন করিয়া ও জলের জন্য স্বাভাবিক বারিপাতের উপর নির্ভর করিয়া বিঘা প্রতি চৌদ্দ-পনর মণ ধানের ফলন পাওয়া যায়। কি কারণে পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধান বিশেষ আবশ্যক। শুনিতে পাই বর্দ্ধমান জেলার কোন কোন অঞ্চলে ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বিঘা প্রতি বিশ-বাইশ মাণ ধান পাওয়া যাইত। সরকারী হিসাব মতে বর্ত্তমানে বিঘাপ্রতি ধানের গড় ফলন হইতেছে মোটামুটি ছয় মণ।

এই প্রসঙ্গে একটি পরিকল্পনার আভাস কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনিবার চেষ্টা করিব। কর্ত্তৃপক্ষ ত অনেক বিষয়েই অনেক রকমের পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিতেছেন এবং সকল পরীক্ষাই যে অর্থব্যয়ের তুলনায় ফলপ্রসূ হইতেছে তাহা নয়। সুতরাং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুসন্ধান ও পরীক্ষায় কিছু অর্থব্যয় হইলে অন্ততঃ কোন কোন অঞ্চলের খাদ্য সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করা যাইতে পারে। পরিকল্পনাটি এইরূপ :

১। দুই-তিনটি ইউনিয়ন লইয়া একটি কর্ম্মকেন্দ্র গঠিত হইবে।

২। এই কেন্দ্র সম্বন্ধে অতি যত্নপূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিষয়-গুলি অনুসন্ধান করিতে হইবে :

(ক) বিভিন্ন বয়সের অধিবাসীর (পুরুষ, স্ত্রী) সংখ্যা : পেশা :

(খ) অধিবাসীদিগের সুসম খাদ্যের জন্য কোন্ প্রকার খাদ্য কত পরিমাণ প্রয়োজন :

(গ) বর্ত্তমানে কোন্ প্রকার খাদ্য কত পরিমাণ উৎপন্ন হয়।

(ঘ) প্রত্যেক রকম খাদ্যের বাড়তি ও ঘাটতির পরিমাণ : [বাড়তি কোন্ কোন্ অঞ্চলে কি ভাবে রপ্তানী হয়, এবং ঘাটতি কোন্ কোন্ অঞ্চল হইতে কি ভাবে আমদানী করিয়া পূরণ করা হয় : উৎপাদনকারীদের মূল্যের সহিত মধ্যস্থ ব্যবসায়ীগণের মূল্যের প্রভেদ]

(ঙ) কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে প্রত্যেক প্রকার খাদ্যের পরিমাণ কত দিনে কতদূর বাড়ানো যায়। [প্রত্যেক রকম খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ, কার্য্যপ্রণালী, মোট ব্যয়, বাৎসরিক ব্যয়, প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিতে হইবে]

(চ) কেন্দ্রের কুটীরশিল্পের, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃত বিবরণ এবং উহাদের উন্নতিসাধনের নিমিত্ত বিস্তৃত পরিকল্পনা ও আনুমানিক ব্যয়।

(ছ) কেন্দ্রের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, যানবাহন প্রভৃতির বর্ত্তমান অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ এবং উহাদের প্রত্যেকের উন্নতিসাধনের জন্য বিস্তৃত পরিকল্পনা ও আনুমানিক ব্যয়।

(জ) স্থানীয় প্রত্যেক সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসিগণের ঋণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান।

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত প্রত্যেক দফার অনুসন্ধানের জন্য পৃথকভাবে বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রত্যেক বিষয়ের উন্নতিসাধনের জন্য বর্ত্তমানে যে সকল অন্তরায় বিদ্যমান আছে তাহা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং সেই অন্তরায়গুলি কি ভাবে দূর করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রস্তুতের প্রয়োজন।

একটি বেসরকারী সমিতি Statistical Institute ও সরকারী কর্ম্মচারিগণের পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানে উপরোক্ত অনুসন্ধানকার্য্য চালাইবেন এবং পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন। কেন্দ্রের প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ দুই জন কর্ম্মী থাকিবেন। পাঁচ-ছয়টি গ্রামের কার্য্য তত্ত্বাবধান করিবার জন্য এক জন পরিদর্শক থাকিবেন। প্রত্যেক ইউনিয়নের জন্য এক জন তত্ত্বাবধায়ক এবং কেন্দ্রের জন্য এক জন প্রধান তত্ত্বাবধায়ক থাকি-বেন। সাধারণতঃ কর্ম্মী, পরিদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রধান তত্ত্বাবধায়কগণ স্থানীয় ব্যক্তি হইবেন। ইঁহাদের প্রত্যেককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে। সরকারের নিকট হইতে বেসরকারী সমিতি বাৎসরিক আর্থিক সাহায্য (grant) পাইবেন। সেই সাহায্য হইতে সকলকে পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে। এক জন সরকারী হিসাবপরীক্ষক সমিতির হিসাব নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরীক্ষা করিবেন।

কয়েকটি ইউনিয়নের কথা আমি জানি, যেখানে স্থানীয় ব্যক্তিগণ উদ্যম ও উৎসাহের সহিত স্থানীয় বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং কয়েকটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই সকল ইউনিয়নে কাজ আরম্ভ করিলে উহা শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে। উদাহরণস্বরূপ হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার জাঙ্গিপাড়া, কোতলপুর, রাধানগর ইউনিয়নের কথা বলিতে পারি। প্রথমে একটি অঞ্চলে কাজ আরম্ভ করাই বাঞ্ছনীয়, এবং উহা হইতে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হইবে তাহা পরে অতি সহজে অন্য অঞ্চলে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বাংলার পালরাজাদের 'জয়স্কন্ধাবার'

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এস্‌সি

সকল রাজ্যেরই রাজধানী থাকে; কিন্তু পালরাজাদের রাজধানী ছিল, এমন বিবরণ কোন পুঁথি, প্রস্তর-লেখ বা তাম্র-শাসনাদিতে এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। কিন্তু বিভিন্ন তাম্র-শাসন দ্বারা জানা গিয়াছে যে, বাংলার এই পালরাজাদের জয়স্কন্ধাবার নামক রাষ্ট্রযন্ত্রের কেন্দ্র থাকিত। রাজারা ভাগীরথী-তীরস্থ (ভাগীরথীর তীরস্থ বলার কারণ পরে লিখিতেছি) এই সকল জয়স্কন্ধাবার হইতে দান করিয়া তাম্রশাসন প্রদান করিতেন এবং এই জয়স্কন্ধাবার হইতে আরও অন্যান্য কার্য্যও হইত।

একই রাজার নিজ রাজত্বকালে বিভিন্ন জয়স্কন্ধাবার থাকিত। আবার একের নির্ব্বাচিত জয়স্কন্ধাবারের স্থান পরবর্ত্তী রাজাদের ও জয়স্কন্ধাবারের স্থান হইত; কেহ আবার নবতর স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া অভিনব জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করিতেন।

এই জয়স্কন্ধাবারের বর্ণনায় যে শ্লোকটি তাম্রশাসনগুলিতে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা এই—

সখলু ভাগীরথীপথপ্রবর্ত্তমাননানাবিধ নৌবাটক সম্পাদিত সেতুবন্ধনিহিত শৈলশিখরশ্রেণীবিভ্রমাৎ নিরতিশয় ঘন-ঘনাঘন ঘটাশ্যামায়মানবাসরলক্ষ্মীসমারব্ধসন্ততজলদসময় সন্দেহাৎ। উদীচীনানেকনরপতিপ্রাভৃতী কৃতাপ্রমেয়হয়বাহিনী খরখুরোৎখাত ধূলীধূসরিত দিগন্তরালাৎ পরমেশ্বর সেবা-সময়াতাশেষ জম্বুদ্বীপভূপালানন্ত পাদাতভরনমদবনে :১...... নগরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ। পরমসৌগতোমহা-রাজাধিরাজ শ্রী২.........পালদেবপাদানুধ্যাত পরেশ্বরপরম-ভট্টারকো মহারাজাধিরাজ: শ্রী৩.........পালদেব কুশলী।

উপরোক্ত শ্লোকের অর্থ—

যেখানে ভাগীরথীপথে প্রবর্ত্তমান নানাবিধ নৌবাটক দ্বারা সম্পাদিত সেতুবন্ধনিহিত হওয়ায় শৈলশিখরশ্রেণী বলিয়া বিভ্রম হইতেছিল, নিরতিশয় ঘনমেঘবর্ণাশ্রিত বাসর-লক্ষ্মীকে (দিনশোভাকে) তমসাচ্ছন্ন করায় যেন জলদ সময় সমাগত বলিয়া সন্দেহ হইতেছিল, যেখানে উত্তরাঞ্চলবাসী নরপতিপ্রদত্ত অসংখ্য হয় (অশ্ব) বাহিনীর খর খুরাঘাতে উৎখাত ধূলিরাশি দ্বারা দিগন্তরাল ধূসরিত হইতেছিল, যেখানে পরমেশ্বরের সেবার জন্য আগত অশেষ জম্বুদ্বীপ-ভূপালগণের অনন্তপদভরে পৃথিবী মথিত হইতেছিল, সেই১......নিকট স্থাপিত জয়স্কন্ধাবার (বিজয়ী শিবির) হইতে (এই দান প্রদত্ত হইল)। পরম সৌগত মহা-রাজাধিরাজ শ্রী২........পালদেব পাদানুধ্যান করিয়া পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমান৩.........দেব কুশলে (অবস্থান করুন)

এই বর্ণনার অতিশয়োক্তি কতকটা কমাইয়া দিলেও ইহাই অনুমান করা যাইতেছে যে রাজা নৌকা দ্বারা সম্ভবত: নদী দিয়া চলাচল করিতেন। এই ভাবে সমগ্র রাজ্য পরিদর্শন ও শাসনাদি করিতেন। সমগ্র না হউক, অধিকাংশ খাস রাজ-কর্ম্মচারী এই সময় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত; করদরাজারা আসিয়া প্রণতি জানাইতেন; রাজপুরনারীরা রাজাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন; ইঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক পড়িয়া শুনাইবার জন্য রাজা ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিতেন [মদনপালের মনহলি-লিপিতে আছে যে পট্টমহিষী চিত্রমতিকা কর্ত্তৃক বেদব্যাসপ্রোক্ত মহাভারত পাঠের উদ্‌যাপনের দক্ষিণাস্বরূপ শ্রীবটেশ্বর শর্ম্মাকে সংশ্লিষ্ট দান প্রদত্ত হইয়াছিল: সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৫ ১৫৭ পৃ:]; সময় সময় এক একটি বড় বন্দর, দুর্গ, রাষ্ট্রকেন্দ্র বা ধর্ম্মক্ষেত্রে কিছুদিন তিষ্ঠিয়া থাকিতেন এবং সেইটি জয়স্কন্ধা-বারের অবস্থানরূপে বর্ণিত হইয়া তাম্রশাসনে উল্লেখিত হইত। তাম্রশাসন হইল দলিল। সুতরাং আধুনিক দলিলে যেহেতু রেজেষ্ট্রী আপিসের নাম রাখিতে হয় তেমনি তাম্র-শাসনে সেকালে সেই জয়স্কন্ধাবারের অবস্থানের নাম দিতে হইত যেখান হইতে রাজা ঐ দান প্রদান করিতেন।

যুগে যুগে গঙ্গানদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—কিন্তু অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী (পালরাজাদের আমল) পর্য্যন্তই আমাদের আলোচ্য। এই সময় মধ্যে এই নদীতীরে যে সকল বড় বড় স্থান ছিল তাহাতেই জয়স্কন্ধাবারগুলির অধিষ্ঠানের সন্ধান করিতে হইবে। (গঙ্গা ও ভাগীরথীকে কেন অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লইতেছি তাহা পরে লিখিতেছি।)

পালরাজাদের নাম, তাঁহাদের প্রদত্ত তাম্রশাসনগুলির মধ্যে যেগুলি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহার জয়স্কন্ধাবারগুলির নাম এখানে প্রদত্ত হইল—

১ এখানে জয়স্কন্ধাবারের নাম থাকে।
২ এখানে দাতা রাজার পিতার নাম থাকে।
৩ এখানে দাতা রাজার নাম থাকে।

১ এখানে জয়স্কন্ধাবারের নাম থাকে।
২ এখানে দাতারাজার পিতার নাম থাকে।
৩ এখানে দাতারাজার নাম থাকে।

দাতার নাম	লিপির পরিচয়	জয়স্কন্ধাবারের নাম
ধর্ম্মপালদেব	খালিমপুর১	পাটলীপুত্র সমাবাসিত
নবম শতক		
দেবপালদেব	মুঙ্গের২	শ্রীমুদ্গগিরী সমাবাসিত
নবম শতক		
নারায়ণপালদেব	ভাগলপুর৩	
দ্বিতীয় গোপাল	জাজিলপুর৪	বটপর্ব্বত্তিকা সমাবাসিত
মহীপাল	বাণগড়৫	বি [লা] সপুর সমাবাসিত
মহীপাল	বেলওয়া৬	শ্রীসাহসগণ্ডনগর সমাবাসিত
তৃতীয় বিগ্রহপাল	আমগাছি৭	শ্রীমুদ্গগিরি সমাবাসিত
তৃতীয় বিগ্রহপাল	বেলওয়া৮	বিলাসপুর সমাবাসিত
মদনপালদেব	মনহলি৯	শ্রীরামাবতীনগর পরিসর সমাবাসিত

এই সব জয়স্কন্ধাবারের নাম উল্লেখ করায় সময়ই প্রতিবার উপরোক্ত "ভাগীরথীপথ প্রবর্ত্তমান......" শ্লোকটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

সুতরাং যদি কোন অপপ্রয়োগ করা না হইয়া থাকে তবে এই জয়স্কন্ধাবারের স্থান ভাগীরথীতীরেই খুঁজিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই জয়স্কন্ধাবারগুলির স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। •

এই উদ্দেশ্যে আমরা নানা তথ্য সন্নিবেশ করিতেছি। ইহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয়।

সমস্যা

(১) পাটলীপুত্র নগর যখন ভাগীরথী তীরে বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তখন বর্ত্তমান পাটনা পাটলীপুত্র হইয়া থাকিলে

১ গৌড়লেখমালা, ১৪ পৃঃ শাসনের ২৫ পংক্তি হইতে

২ ঐ ৩৮ পৃঃ শাসনের ২৪ পংক্তি হইতে

৩ ঐ ৬০ পৃঃ শাসনের ২৪ পংক্তি হইতে

৪ ভারতবর্ষ, ১৩৪৪, শ্রাবণ, ২৬৭ পৃঃ, শাসনের ১৬ পংক্তি হইতে

৫ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৫, ১৬৯ পৃঃ, শাসনের ২৪ পংক্তি হইতে

৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৪ বর্ষ, ৩,, ৪র্থ সংখ্যা, ৫০ পৃঃ, শাসনের ২৩ পংক্তি হইতে

৭ গৌড়লেখমালা, ৯৫ পৃঃ, শাসনের ২৪ পংক্তি হইতে

৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের জন্ত এই লেখকের সম্পাদিত পাঠ, টীকা ইত্যাদি সমন্বিত প্রবন্ধ।

৯ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৫, ১৫১ পৃঃ, শাসনের ২৭ পংক্তি হইতে

গঙ্গা ও ভাগীরথী, কেবল বর্ত্তমানের ভাগীরথী বা হুগলীনদী এখানে বর্ণিত হইতেছে না ধরিয়া লইতে হয়। আবার গঙ্গার যে বিপুল জলরাশি পূর্ব্ববঙ্গের দিকে যাইয়া পদ্মানদী আখ্যা পাইয়াছে তাহার কোথায় গঙ্গা নাম শেষ হইয়া কবে হইতে পদ্মা নাম সুরু হইল তাহাও (রেনেল পূর্ব্ববঙ্গীয় পদ্মাকেও গঙ্গা নদী বলিতেছেন) ধরিতে পারিলে সুবিধা হয়। কারণ তাহা হইলে আর পদ্মার তীরে বৃথা খুঁজিয়া ফিরিতে হয় না। শুধু ইহাতেই সমস্যা শেষ হইল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া গঙ্গার তটরেখা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং সেকালে যাহা নদীর গর্ভ ছিল হয়তো একালে তাহা বিল বা জলাভূমি অথবা সমতল জনবসতির ক্ষেত্র।

(২) সন্ধ্যাকর নন্দীকৃত রামচরিতে আছে যে বরেন্দ্রী হইল পালরাজাদের 'জনকভূ' অর্থাৎ পিতৃভূমি। সেই বরেন্দ্রীতে গোপাল মাৎস্যন্যায় দূরীকরণার্থ প্রজাগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রথম নরপতি হইয়াছিলেন (ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুর লিপি; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২; মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভিঃ লক্ষ্যাঃ করং গ্রাহিতঃ শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ—শিরসাং চূড়ামণি-স্তত্ ভূতঃ।) এবং এই রাজবংশ পশ্চিমে পাটলীপুত্র অতিক্রম করিয়া রাজ্যসীমা প্রসারিত করিয়াছিল। ইহাদের পূর্ব্বে অন্য রাজারা এই সব স্থানে রাজত্ব করিতেন। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ ও দেশী এবং বিদেশী প্রাচীন গ্রন্থে তাহাদের বিবরণ পাওয়া যায় (যদিও ইহার অনেক পুঁথি পরবর্ত্তীকালে সর্ব্বদা যোজিত ও বর্দ্ধিত হওয়াতে ঠিক কোন্ অংশ প্রারম্ভেই রচিত ছিল তাহা বলা শক্ত)। তাহাদের প্রদত্ত গঙ্গা-তীরের উন্নত স্থানগুলির নাম কালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে. প্রাচীন উন্নত স্থানগুলি পরে এতকাল ধরিয়া উন্নত থাকা সম্ভব নয় এবং সব প্রাচীন অনুন্নত স্থানগুলি আবার যুগ যুগ ধরিয়া অনুন্নত কেমন করিয়া থাকিবে? নদীর গতি পরিবর্ত্তন, রাজার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ সবই নূতন স্থান গঠনে ও প্রাচীন স্থান পরিত্যাগে সহায়তা করিয়াছে। আবার হিন্দু আমলের নাম মুসলমান আমলে পরিবর্ত্তনের চেষ্টা সর্ব্বদাই ছিল—যেমন ইংরেজের দেওয়া নাম আমরা এই স্বাধীনতার দিনে ছাড়িয়া দিয়া পুরাতন ভারতীয় নাম বা জাতীয়তাবোধক নাম গ্রহণ করিতেছি। সুতরাং যুগ যুগ ধরিয়া এই পরিবর্ত্তন অনুসরণ করা সহজ নহে।

(৩) উপরোক্ত ফর্দ অনুযায়ী জয়স্কন্ধাবারগুলির রাজাদের রাজত্বকাল মোটামুটি এখানে লিখিতেছি (সঠিক নির্ণয় হয় নাই); জয়স্কন্ধাবারগুলির স্থান নির্ণয়কালে এই রাজত্বকালের কিছু পূর্ব্বেকার বা পরবর্ত্তীকালের উপকরণে এই জয়স্কন্ধাবারের স্থানের উল্লেখ পাইলেই আমাদের উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হইবে।

রেনেল রচিত ১নং ম্যাপ হইতে বিশ্বভারতী কৃত ব্লকের ছবি
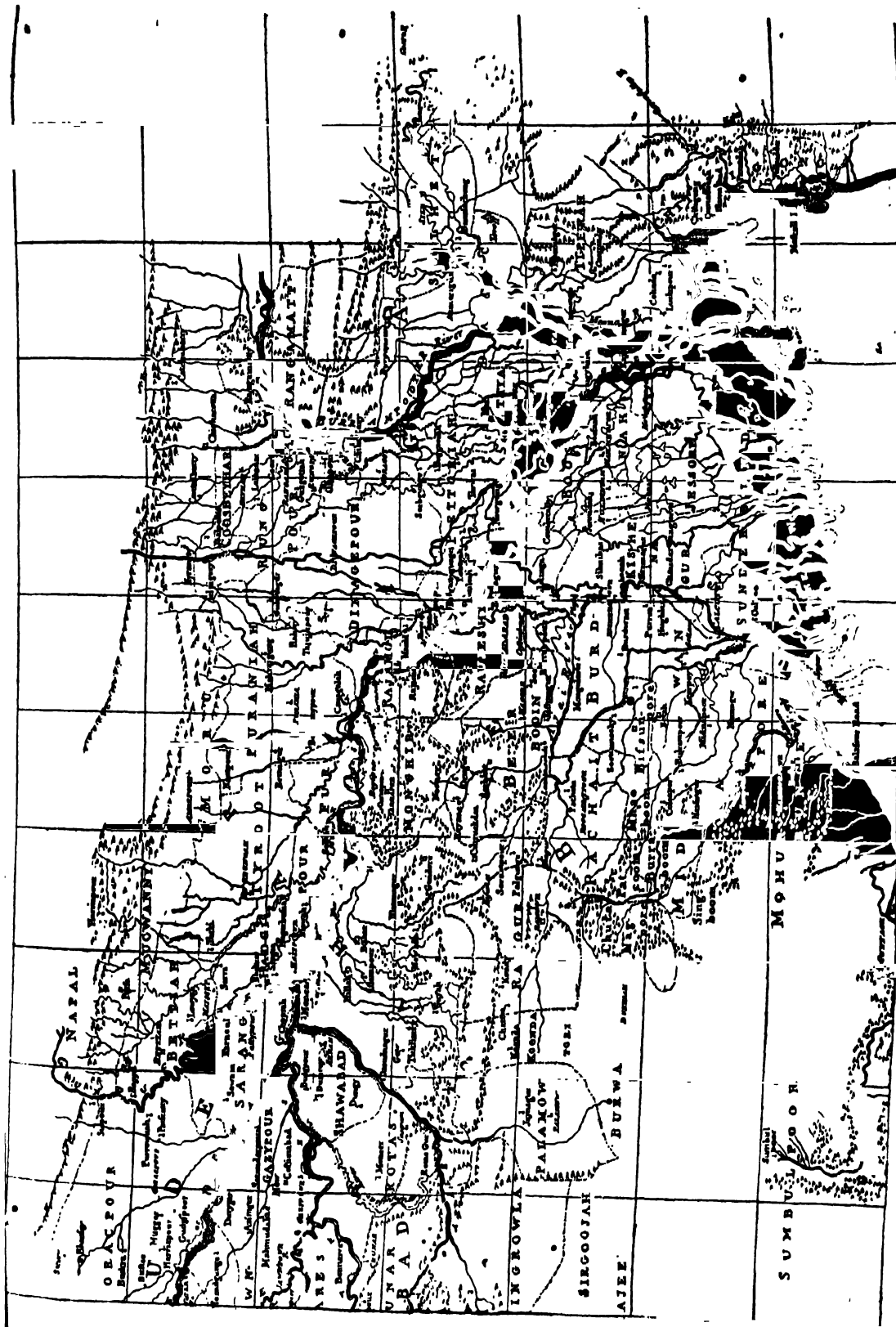
গোপাল (৭০০-৭৪০)
=দেদ্দাদেবী ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন

২ ধর্ম্মপাল (৮০০ — বাক্‌পাল
=রণ্নাদেবী (কান্যকুব্জরাজকে পরাজিত করেন)

৩ দেবপাল (৪৮ বৎসর রাজত্ব করেন) — জয়পাল
|
বিগ্রহপাল
|
নারায়ণপাল

রাজ্যপাল
|
দ্বিতীয় গোপাল
|
দ্বিতীয় বিগ্রহপাল
|
মহীপাল (৯৭৮-১০৩০ খ্রীঃ)
|
নয়পাল
|
তৃতীয় বিগ্রহপাল

দ্বিতীয় মহীপাল শূরপাল রামপাল (১০৮৪-১১৩০ খ্রীঃ)

রাজ্যপাল কুমারপাল মদনপাল

প্রসঙ্গ কথা

(ক) টলেমী ভারতের যে মানচিত্র দিয়াছেন (Murray's *Discoveries & Travels in Asia*, Vol. I, page 481-এর সম্মুখে এই মানচিত্রের ছবি অতি সুন্দর ছাপা আছে) তাহাতে দেখা যায় যে, হিমালয়ের অল্প দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা, তাহার দক্ষিণে অগভীর অল্প প্রশস্ত (কোন কোন স্থানে ২০।২৫ মাইল) সমুদ্র ; তাহার দক্ষিণে তাপ্রোবেন (Taprobane) নামক বিরাট দ্বীপ। হিমালয়ের পূর্ব্বদিকে সমুদ্রতীরে জম্বুদ্বীপ। গঙ্গানদী হিমালয় হইতে বাহির হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার দিকে নামিয়া আসিয়াছে এবং উহারই পার্শ্ব দিয়া উড়িষ্যার কাছে সমুদ্রে মিশিয়াছে।

(খ) মহাভারতে বনপর্ব্বে বর্ণনা আছে যে, অগস্ত্য ঋষি বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আসিয়া দক্ষিণে উপস্থিত হন··· তিনি সমুদ্র পান করিয়া নিঃশেষ করেন ও জীর্ণ করেন। (ইহা কি ভারত ও তাপ্রোবেনের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রশোষণের রূপক বর্ণনা ?—লেখক)

(গ) ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাস (*India & Jambu Island*) মনে করেন যে, ভারত ও তাপ্রোবেন দ্বীপটির মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রে স্থল সৃষ্টি হইয়া ঐ অগভীর সমুদ্রটি নিশ্চিহ্ন হইয়াছে ও উহাই দাক্ষিণাত্য।

(ঘ) ভূভাগগঠন, নদীর গতিপরিবর্ত্তন ইত্যাদি কাজ কেমন করিয়া ঘটে তাহার এক বিবরণের তাৎপর্য্য শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাসের উপরোক্ত পুস্তকের ভূমিকা হইতে এখানে দিতেছি।

(১) সমুদ্রতীরের স্রোত তীরের অমসৃণ গায়ে জিনিসপত্র বহিয়া আনে। ইহা মূল ভূভাগের সঙ্গে তাপ্রোবেন যুক্ত করায় সহায়তা করিয়াছে।

(২) সমুদ্রের জোয়ার দুই দ্বীপের মধ্যস্থলে বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া আঘাতে আঘাতে পলি জমায়। যদি আঘাত না করিয়া স্রোত একমুখী হয় তবে ঘুরিয়া গিয়াও যে দিকে যে ক্রিয়া করে তাহাতেই পলি জমিয়া স্থলভাগ সৃষ্টি হওয়ার কাজ চলিতেই থাকে। এমনই করিয়া ভারত ও তাপ্রোবেন এবং ব্রহ্মদেশ ও লঙ্কার (এই লঙ্কা কোন্ লঙ্কা ?—লেখক) মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রে স্থলভাগ গঠনের কাজ চলিয়াছিল।

(৩) সমুদ্রের স্রোতবেগ তীরদেশে বিপুল চাপ প্রয়োগ করে। এই তীব্র চাপে তীরদেশে পর্ব্বতমালা সৃষ্টি হয়—বিশেষতঃ যদি ওদিকে আবার জলের চাপ থাকে তবে এই পর্ব্বতমালা সৃষ্টির আরও সুবিধা হয়।···এই হেতু এই ভাবে বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার দিকে যে সব নদী বহিয়া আসিত তাহাদের দ্বারা বিন্ধ্যগিরি ক্রমশঃ উচ্চতর হইয়াছে এবং সেহেতু আবার ঐ নদীগুলির গতিপথ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পুরাণগুলিতে বারংবার ইহার উল্লেখ আছে। এই ভাবে টলেমীর পরবর্ত্তীকালে বোম্বাই হইতে কানারা পর্য্যন্ত পশ্চিম ঘাটের সৃষ্টি হইয়াছে।···

(৪) কোন পর্ব্বতমালার মধ্যে কোন সরু নিম্নভূমি দিয়া যখন নদী বহিয়া যায় তখন পথের মধ্যে কোন দুর্ব্বল স্থান পাইলে সেই স্থান দিয়া আবার স্রোত চলিবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বৃষ্টিদ্বারা নিকটের পাহাড়ধোয়া জল যদি বেশী না হয় এবং উজানের দিকে যদি প্রচুর জলের সমাবেশ না হয় তবে এই পথ ক্রমশঃ ভরাট হইয়া যায়। বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া গঙ্গার যে পথ ছিল তাহা পরিবর্ত্তনের ইহাই কারণ।

গঙ্গা ও ভাগীরথীর অভিন্নতা

প্রসঙ্গ কথায় যেরূপ আলোচনা হইল তাহারই সূত্র ধরিয়া বিহার বঙ্গে আসিলে পালরাজ্যের পশ্চিম সীমায় সম্ভবতঃ পাটলীপুত্র সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর। এই অঞ্চলের ভূমি, নদীপথ ইত্যাদির বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা ও বাঙালীর পক্ষে ভাগীরথীর অভিন্নতাও বর্ণিত হইতেছে।

(ক) গ্রীক্-বর্ণিত পালিবোথরাকে কেহ বলিতেছেন—
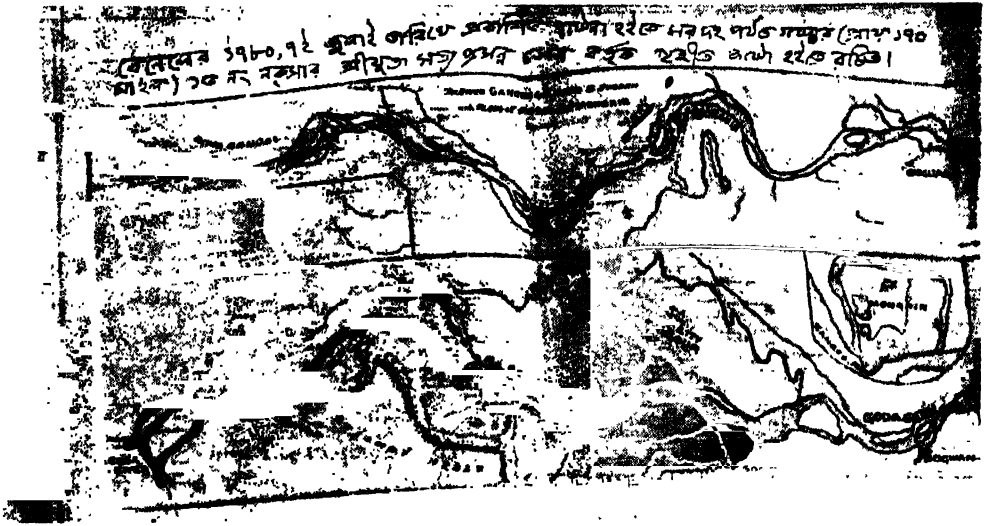
পাটলীপুত্র = পাটনা ; শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাস মহাশয় ইহাকে নানা তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া পালামৌ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীতে দেখা যায় যে পালিবোথরায় ভূমিকম্প ও বন্যাহেতু সহসা গঙ্গার গতিপথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং গঙ্গার প্রচুর জলরাশি সমস্ত ভূভাগ প্লাবিত করিয়া ফেলে। টলেমী-প্রদত্ত ম্যাপে পালিবোথরা গঙ্গা নদীর তীরে।

(গ) মহাভারতে বনপর্ব্বে আছে যে, সগর রাজার ছেলেরা অশ্বমেধের ঘোড়া লইয়া কপিল মুনির কোপে পাতালে বন্দী হন। এঁদের উদ্ধার করার জন্য সগরের নাতি ভগীরথ গঙ্গাকে আবাহন করিয়া স্বদেশে আনেন। এই রূপকের অর্থ এই যে, সগর দ্বীপ (এই সেদিনও অর্থাৎ ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় সেবাষ্টিন ম্যানরিক যখন এদেশে ধর্ম্মপ্রচারে আসিয়াছিলেন তখন সগর দ্বীপ ঘিরিয়া যে ধর্ম্মসংস্কার ও নরবলি ইত্যাদি ছিল তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়—Murray's *Discoveries & Travels in Asia*, Vol II, page 102) সমুদ্রের নীচে তলাইয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহাকে গঙ্গার পলিদ্বারা উঁচু করার উদ্দেশে খাল কাটিয়া গঙ্গার জল গঙ্গাসঙ্গমের দিকে আনা হয়। বিশেষ করিয়া এই কারণেই দক্ষিণবাহিনী গঙ্গার নাম ভাগীরথী। সুতীর গঙ্গা ও ভগবানগোলার জলঙ্গী বর্ত্তমানে ইহার দুই বাহু—ইহাই ভাগীরথী, ইহাই হুগলী নদী।

(গ) উপরোক্ত বন্যার সময় ঐ বিপুল জলরাশি বিন্ধ্যপর্ব্বতের পথে আর সমুদ্রের দিকে যাইতে পারে না ; সে পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, উহা বাংলার বুকে আসিয়া সব ভাসাইয়া দেয়। পরে ঐ জলের খানিক মাটির নীচে চলিয়া যায় এবং পথ করিয়া ক্রত মাটির নীচ দিয়া দক্ষিণে সাগরে চলিয়া যায়। (তাই কি গঙ্গার অপর নাম ভোগবতী ?) এই ভাবে নল বাহিয়া বেশী জল প্রবল বেগে বাহির হইলে যেমন সম্মুখে গর্ত্ত হইয়া যায়, বঙ্গসাগরে বাংলার দক্ষিণে তেমনই গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সমুদ্রের তীরদেশ যেমন ক্রমশঃ ঢালু হইয়া সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছে, এই স্থানের তীর সেরূপ নহে, সহসা এক বিপুল গর্ত্ত। এদিকে নীচের জলপথে অনেক জল বাহির হইয়া যাইবার পর উপরের মাটি ধ্বসিয়া যায় এবং সেহেতু নিম্নবঙ্গে অজস্র নদীমালা দক্ষিণাভিমুখী হইয়া সমুদ্রে গিয়াছে।

(ঘ) রেনেলের ম্যাপে আমরা দেখি, গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরে রাজমহল। তাহার উল্টা দিকে পূর্ব্বতীরে গৌড়। এখানে মহানন্দা উত্তর হইতে আসিয়া গঙ্গায় মিশিয়াছে। তারপর গঙ্গার পথ ছিল বর্ত্তমান স্রোতের উত্তর দিক দিয়া—যে গর্ভ বদল হওয়ায় বেতুরিয়া রাজ্যের (?) বিলগুলি (মউণ্ডা ও নওগাঁর নিকটবর্ত্তী বিরাট বিলগুলি, চলনবিল, বিলাবকরী প্রভৃতি বিস্তীর্ণ জলা ও নিম্নভূমি) সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিল ও নিম্নভূমির উপর দিয়া যাইবার পর গঙ্গা তিস্তার উপর দিয়া সোজা বিক্রমপুর (বাংলার অন্যতম রাজধানী) চলিয়া গিয়াছিল। [রেনেলের ম্যাপের ৯ ও ১৬ নম্বর নক্সা দ্রষ্টব্য] গঙ্গার ইহাই আসল গতিপথ ছিল, পরে এখানে ক্ষুদ্র স্রোত রাখিয়া দক্ষিণে নামিয়া, তাহাই আসল জলধারা হইয়াছে—এই মতও প্রচলিত আছে।

(ঙ) প্রাচীনকালে সমগ্র বাংলাদেশে জনবসতি কম ছিল। যাহা ছিল তাহা নদীতীরেই ছিল। বস্তুতঃ নদীর তীরে ও উচ্চভূমি না হইলে তাহা বসবাসের যোগ্যস্থান বলিয়া বিবেচিত

হইত না। বিশেষত ভগীরথের স্বদেশে গঙ্গা আনয়নের পুরাণ-কাহিনী বাঙালীর মনে এতখানি আলোড়ন আনিয়াছিল যে, ভাগীরথীকে সকলেই শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ করিতেন। সেই হেতু যিনি ভাগীরথী-তীরবাসী ছিলেন তিনি অধিকতর সম্মানিত ছিলেন এবং নিজেকে অপর অপেক্ষা পুণ্যবান্, সম্ভ্রান্ত ও সভ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই হেতু সমগ্র গঙ্গানদীকেই (পদ্মাসমেত) পালরাজাদের পক্ষে (যাহাদের জনকভূ অর্থাৎ পিতৃভূমি ছিল বরেন্দ্রী), তৎকালে ভাগীরথী নাম দেওয়া অসম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ গঙ্গার পূর্ব্বাংশের পদ্মানাম তো অনেক পরবর্ত্তীকালের (ডাঃ নীহার রায়ের বাংলার নদনদীতে আলোচনা দ্রষ্টব্য : ২৬ পৃঃ হইতে)।

জয়স্কন্ধাবারগুলির অবস্থান

এই ভাবে আমরা পালরাজাদের জয়স্কন্ধাবারের অবস্থান নির্ণয়ের পটভূমিকা স্থির করিয়া লইলাম। এখন একে একে পৃথক পৃথক জয়স্কন্ধাবারগুলির অবস্থান বর্ণনা করিব।

পাটলীপুত্র

কেহ বলিয়াছেন, ইহা পাটনার প্রাচীনতম নাম এবং গ্রীক সাহিত্যে ইহারই নাম ছিল পালিবোথরা (রামপ্রাণ গুপ্তের প্রাচীন রাজমালা পৃঃ ৯০ এবং রামপ্রাণের প্রাচীন ভারত, পৃঃ ১২৯)। আবার পালিবোথরা যে পালামৌ, তৎকালে গঙ্গা পালামৌ দিয়া প্রবাহিত হইত, এই মতও আছে। (অমরনাথ দাসের *India and Jambu Island*, page 13?, etc.)। আবার পাটনার অতি নিকটে Dr. D. B. Spooner সম্রাট্ অশোকের প্রাসাদ, সভাগৃহ প্রভৃতির (তাহা নাকি দারায়ুসের সভাগৃহের অনুকরণে রচিত বলিয়া অনুমিত হয়) ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করিয়াছেন [J. R. A. S. (Bombay), 1917, pages 457-532]। সুতরাং পাটলীপুত্র (ইহা সম্রাট্ অশোকের রাজধানী ছিল) যে বর্ত্তমান পাটনার সমীপেই ছিল তাহা ধরিয়া লওয়া যায়।

মুদগগিরি

পাটলীপুত্রের পর গঙ্গা দিয়া বাংলার দিকে আসিতে গঙ্গাতীরস্থ পর্ব্বতোপরি প্রথম যে প্রধান দুর্গটি পড়ে সেই স্থানটির বর্ত্তমান নাম মুঙ্গের। এই দুর্গটি অতি প্রাচীন। হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বের চিহ্ন ইহার স্তরে স্তরে। (১) ব্রহ্মখণ্ড নামক সংস্কৃত ভূগোল গ্রন্থে কীকট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মুদ্গরোড নামক নগরের উল্লেখ আছে। (২) অতি প্রাচীন কালে মুদগল ঋষি এই স্থানে তপস্যা করিতেন বলিয়া কথিত আছে। তাই এই স্থানের নাম মুদগলগিরি হইয়াছে। (৩) হরিবংশে জানা যায় যে গাধিসুত বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের মধ্যে মুদগল নামে এক রাজা এই স্থানে (?) রাজত্ব করিতেন। (৪) কথিত আছে যে, পূর্ব্বকালে কর্ণরাজ এখানে বাস করিতেন। (৫) কানিংহাম ইহাকেই হিউএনসঙের 'হিরণ্য পর্ব্বত' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, রাবণবধের পাপ এখানে গঙ্গাস্নানদ্বারা হরণ করায় যে ঘাট 'কষ্ট-হারিণী'র ঘাট হয় তাহা কালে 'হরণ' হইতে 'হিরণ্য' নাম পায় (Arch, S. Rep. XV pp. 15-18 & Anc., Geo. p. 476)

দুর্গটি একটি পার্ব্বত্যভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫ হাজার ফুট, প্রস্থে সাড়ে তিন হাজার ফুট। প্রাচীরটি প্রায় ১৫ হাত উঁচু। একদিকে গঙ্গা, অপরদিকে সুগভীর পরিখা বিদ্যমান আছে। দুর্গদ্বারে কতকগুলি লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধমূর্ত্তি (পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন) বিরাজমান। এই বিষয় *Transactions of the Asiatic Society*, Vol. IX, pages 56-57-এ বর্ণনা আছে এবং নন্দলাল দে কৃত *The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India*-র ১৩২ পৃষ্ঠাতে বিবরণ আছে।

বটপর্ব্বতিকা

মুঙ্গের ছাড়িয়া গঙ্গা বাহিয়া পূর্ব্বদিকে বঙ্গাভিমুখে চলিবার পথে কহলগাঁওর (ভাগলপুর জেলা) নিকট বটপর্ব্বত নামক এক পর্ব্বতশিখর আছে। ইহাতে বটেশ্বর নামক শিব আজও প্রাচীন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং নদীতীর দিয়া পর্ব্বতোপরি বিস্তীর্ণ স্থানব্যাপী ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। (১) উত্তর পুরাণে বটেশ্বর নাথের পর্ব্বতগাত্রের ভাস্কর্য্যের অনেক বিবরণ আছে (*Ancient Geography*—N. L. Dey, page 27), (২) ১১৭৭ সন অর্থাৎ এখন হইতে ১৮০ বৎসর পূর্ব্বে বিজয়রাম সেন তাঁহার গঙ্গাপথে তীর্থভ্রমণের বিবরণ লিখেন। ইনি জলঙ্গী-ভাগীরথী দিয়া নৌকাযোগে বহু গঙ্গা দিয়া (সুতীর পথে নহে) ভগবানগোলা, গোদাগাড়ী ও রাজমহল হইয়া কাশীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মুদ্রিত তাঁহার পুঁথি 'তীর্থমঙ্গলে' ৪৬, ৪৭, ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে গঙ্গাপ্রসাদ তেল্যাগাড়ি বামে রাখিয়া…লক্ষীপুর শ্রামপুর বামে রাখিয়া—

> সম্মুখে আছেন এক বটেশ্বর পর্ব্বত।
> দেখিয়া চালায় নৌকা চলে যেন রথ॥
> তাহার নিকট আছেন দেবতা বিস্তর।
> যাত্রী লয়্যা মহাশয় চলিলা সত্বর॥
>
> * * *
>
> কুঠরের মধ্যে দেব করিলা প্রণাম।
> বিস্তর পাথর হেতু পাথরঘাটা নাম॥
>
> * * *
>
> পাহাড্যা রাজার বাটি কাহল গ্রামেতে
> মন্দ মন্দ চলে নৌকা রাখি বাম ভিতে॥

(৩) বটেশ্বর পর্ব্বত, পাথরঘাটা ও কহলগ্রাম—এই বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া চারিদিকে বহু প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন পড়িয়া

আছে (ভারতবর্ষ, ১৩৫০, জ্যৈষ্ঠ, ৪০৫ পৃঃ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার উপরোক্ত উপকরণ সাহায্যে বটপর্ব্বতিকার অবস্থান নির্ণয় করিতেছেন)। (৪) রাজা ধর্ম্মপাল-প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীলা বিহারের স্থান বিষয়ে নানা তর্ক আছে। কেহ বলিতেছেন উহা নালন্দার নিকট; কেহ বলিতেছেন উহা ভাগলপুর জেলার সুলতানগঞ্জের নিকট জাঙ্গিরা পর্ব্বতে; কেহ বা পাথুরেঘাটার সন্নিহিত খননদ্বারা প্রাপ্ত বিবিধ বুদ্ধমূর্ত্তি ও অন্যান্য নিদর্শন দ্বারা ইহাকেই বিক্রমশীলার অধিষ্ঠান বলিয়া গণ্য করিতেছেন (J.A. S. B. X. 1914. p. 342)। (৫) মনহলি লিপির দাতা মদনপালদেব যে পণ্ডিতকে দান করেন তিনি হইলেন চম্পহিট্টি গ্রামনিবাসী পণ্ডিত শ্রীভূষণ (উপাধিধারী) বটেশ্বর স্বামিশর্ম্মা। সুতরাং সেকালে যে বটেশ্বর কোন খ্যাতিসম্পন্ন দেববিগ্রহের নাম ছিল তাহাও লক্ষ্য করার বিষয়। (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৫ম ভাগ, ১৫৭ পৃঃ)

বিলাসপুর ও সাহসগণ্ড

মহীপাল দেবের দুই জয়স্কন্ধাবার—বিলাসপুর ও সাহসগণ্ড। বটপর্ব্বতের পর যে স্থানগুলি স্থানগুণে খ্যাত তাহা হইল তেড়িয়াগলি, সিকড়িগলি (ইহাই কি মুসলমান আমলের Gurhy ?), রাজমহল (সুতীগঙ্গা সঙ্গম সন্নিহিত), গৌড় (মহানন্দা গঙ্গা সঙ্গম সন্নিহিত) ও গোদাগাড়ী (জলঙ্গী [ভগবানগোলা] গঙ্গা সঙ্গম সন্নিহিত)।

তেড়িয়াগলি ও সিকড়িগলির গঙ্গার তটরেখা (পর্ব্বত-সঙ্কুল এই দেশ) খুব পরিবর্ত্তন হইয়াছে মনে হয় না, এবং এই সকল স্থানে অল্প অল্প প্রাচীন চিহ্ন বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ণিত অন্যান্য জয়স্কন্ধাবারগুলির অধিষ্ঠানে যেরূপ বিস্তীর্ণ প্রাচীন চিহ্ন আছে সেরূপ বিস্তীর্ণ প্রাচীন চিহ্ন এই সকল স্থানে দেখা যায় না। কিন্তু অতি বিস্তীর্ণ প্রাচীন চিহ্ন দেখা যায় রাজমহল পর্ব্বতে।

(১) উপরোক্ত 'তীর্থমঙ্গল' পুস্তকে আছে—পৃঃ ৪২, ৪৩

যুদ্ধস্থান উদয়নালা বামভাগে রাখি।
শীঘ্রগতি চলে নৌকা উড়ে যেন পাখি ॥১৯৬
দুই দণ্ড বেলা যখন গগনে আছয়।
রাজমহল আসা নৌকা উপস্থিত হয় ॥১৯৭
*   *   *
রাজমহল নগরের অপূর্ব্ব কথন।
কত শত বালাখানা আশ্চর্য্য রচন ॥১৯৯
পাঁচ ক্রোশ সহরখান ঘন ঘন ঘর।
কতো কতো মুদিখানা দেখিতে সুন্দর ॥২০০
হাট বাজার স্থানে স্থানে রহে ঘড়ীখানা।
সর্ব্বদা নহবত বাজে তাহা নাহি মানা ॥২০১
ঘোষালের আগমন ফৌজদার শুনিয়া।
আশ্চর্য্য পালকীতে চড়ি মিলিল আসিয়া ॥২০২

(২) কেবল এই ফৌজদার নহে, তাহার অনেক আগে মুসলমান আমলে সুজার সময়ে ইহা তাহার রাজধানী ছিল। মানসিংহ ইহাকেই উড়িয়া বিজয়ান্তে (১৫৯২ খ্রীঃ) বাংলার রাজধানীরূপে (আগমহাল) মনোনীত করেন। মানসিংহ-নির্ম্মিত জুমামসজিদের চিহ্ন এখনও আছে। [রামপ্রাণগুপ্ত সম্পাদিত রিয়াজ-উস্‌-সালাতিনে রাজমহল বা আগবরনগর উল্লেখে ইহার বিবরণ আছে। ৩৫ পৃঃ। (৩) কিন্তু তাহার অনেক আগে হিন্দুরাজত্বের আমলে এই রাজমহলের স্থানমহিমা কি রাজাদের নজরে পড়িয়া কোন রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিষ্ঠান হইতে পারে নাই ? ইহা আমাদের মনে হয় না। ফানডেন ব্রোকের নক্সাতে (১৬৬০ খ্রীঃ) দেখা যায় যে, এখনকার মত দুইটি (সুতীর ভাগীরথী ও ভগবানগোলার জলঙ্গী) নহে, তখনকার দিনে রাজমহলের পূর্ব্বদিকে গঙ্গা হইতে অন্ততঃ তিনটি স্রোত দক্ষিণ দিকে নামিয়া আসিয়া কিছু দক্ষিণে ধীরে ধীরে একের সঙ্গে অন্যে মিলিত হইয়া পরে একদেহ-ভাগীরথী হইয়াছে। অর্থাৎ সুতীর পশ্চিমে রাজমহলের গায়ে আর একটি দক্ষিণবাহী স্রোত ছিল এবং তাহা এই পর্ব্বতাকীর্ণ রাজমহলকে অধিকতর বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল।

আমরা অনুমান করিতেছি যে মহীপালের সময় (একাদশ খ্রীষ্টাব্দে) রাজমহল তাহার অন্যতম জয়স্কন্ধাবার হইবার যোগ্যতা ধারণ করিত। তখন ইহার নাম কি ছিল ? তখন ইহার নাম ছিল হয় বিলাসপুর নতুবা সাহসগণ্ড। অধিকতর প্রমাণ অভাবে ইহা সঠিক বলিবার উপায় নাই। [যে সকল স্থানে মুসলমান রাজাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের কেন্দ্র দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল সেখানে হিন্দুরাজত্বের চিহ্ন, নামধাম বড় বেশী মুছিয়া গিয়াছে বা চাপা পড়িয়াছে। দিল্লী যদি হস্তিনাপুর হইয়া থাকে তবে যুধিষ্ঠিরের চিহ্নাদি ও নামধামওয়ালা চিহ্ন সেখানে এতদিন পরে সন্ধান করিয়া বাহির করা শক্ত।]

রাজমহল যদি বিলাসপুর হইয়া থাকে তবে সাহসগণ্ড কোথায় ? রাজমহলের পরই গঙ্গানদী বাংলাদেশে পড়িয়া নরম মাটি পাইল এবং তখন তাহার তটরেখা আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এক রহে নাই। এই বিষয় পূর্ব্বে কতক আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং সাহসগণ্ড যদি বিস্তীর্ণ ১২।১৪ মাইল ব্যাপী গৌড়নগরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে চাপা পড়িয়া যাইয়া না থাকে তবে তাহার গঙ্গাতীরস্থ ধ্বংসাবশেষ কোথায় গেল ? তাহার নামটি তো আর এখন শুনিতে পাই না। প্রাচীন কোন্ নামই বা অবিকৃত আছে যে শুনিতে পাইব ?

(১) গণ্ড হইতে গড়—গড় হইতে বাঙালী গাড়ী নাম বানাইতে পারিবে বৈ কি ? যিনি সাহসী ও বলী তিনি সর্দ্দার হইয়া থাকেন। যিনি দলের সর্দ্দার তিনিই পালের গোদা। তাই কি কালে কালে সাহসগণ্ড গেঁয়োলোকের

মুখে গোদাগাড়ী নাম লইয়াছিল? গোদাগাড়ী জলঙ্গী-গঙ্গার সঙ্গমস্থলের নিকট গঙ্গার উত্তর পারে অবস্থিত। এই স্থানটি এখন বড় বন্দর—রেল ও ষ্টীমার ষ্টেশন—এখান হইয়াই গৌড়-মালদহ যাইবার পথ। সাহসগণ্ড যে কালে ক্রমে গোদাগাড়ী হইয়াছে তাহা আমার অনুমান মাত্র। পরবর্ত্তীকালে কোন ভাগ্যবান্ সন্ধানী ইহার সমর্থক আরও অধিক উপকরণ পাইতে পারেন, ইহাই আমাদের আশা। (২) এই প্রসঙ্গে একটু তথ্যও পাওয়া যায়। বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন পাল-রাজাদের নিকট হইতে বাংলার রাজরশ্মি কাড়িয়া লন। তিনি বিজয়পুরে রাজাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিজয়পুর উল্লিখিত গোদাগাড়ীর সন্নিহিত বিজয়নগর গ্রাম বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে (J. R. A. S. 19 4 p. 101)। এখানে বিরাট টিলার মধ্যে প্রাপ্ত প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে রক্ষিত আছে। ইহাই স্বাভাবিক যে, একদা যে গোদাগাড়ী পালরাজাদের অন্যতম শাসনকেন্দ্র ছিল বিজয়লাভ করিয়া বিজয়সেন স্বনামে তাহার উপর জলঙ্গী-গঙ্গার সঙ্গমস্থল বরেন্দ্রভূমির এই দ্বারদেশে রাষ্ট্রকেন্দ্র বিজয়পুর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঐ রাজধানীই পরে বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেন আরও পশ্চিমস্থিত মহানন্দা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলস্থ রামাবতী নগরের (রামপালের রাজধানী) সান্নিধ্যে স্থানান্তরিত করিয়া স্বনামে 'লক্ষ্মণাবতী' নামকরণ করেন। (৩) পূর্ব্ববঙ্গে নদীতীরস্থ প্রাচীন সম্পন্ন গ্রামগুলির স্থান পরিবর্ত্তন হয়, আমরা দেখিয়াছি। নদী গতি-পরিবর্ত্তন করিতে থাকে, বাসিন্দারা পূর্ব্ববাসস্থান ত্যাগ করিয়া নিকটেই নদীতীরে অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত স্থান খুঁজিয়া বাস সরাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু গ্রামের নামটি পরিত্যাগ করে না, নূতন স্থানে পুরাতন গ্রামের নামটি আনিয়া ব্যবহার করে। নদীর গতি পরিবর্ত্তনে যদি প্রাচীন জনপদ ভাঙ্গিয়া তাহার কীর্ত্তিনাশ হয় তবে আর তাহার প্রাচীন চিহ্ন থাকে না, যদি নদী কেবল দূরে সরিয়া যায় তবে পরিত্যক্ত হৃতশ্রী নগরের চিহ্ন দেখিবার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের গোদাগাড়ী সাহসগণ্ডের সেইরূপ নূতন সংস্করণ হওয়া অসম্ভব নহে।

রামাবতী

গঙ্গা ও মহানন্দার সঙ্গমস্থলের কাছে গঙ্গার উত্তর তীরে গৌড়ের বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ আজও বর্ত্তমান। ইহা অতি বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া থাকিবার কারণ এই যে, নদীর গতি সম্ভবতঃ দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, তাই জনপদটি ক্রমশঃ নদীর তীর ঘেঁসিয়া বিস্তৃত হইতেছিল এবং প্রাচীন বসতি অঞ্চলের স্থান-মাহাত্ম্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল।

মুসলমান আমলে গৌড়নগরের নামও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু গৌড় গৌড়বঙ্গের রাজধানী হওয়ার দরুন গৌড়নাম লুপ্ত হয় নাই, এবং গৌড় লক্ষ্মণসেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতীর অধিষ্ঠান হওয়াতে তাহার 'লক্ষৌতি' নামও দীর্ঘকাল (মুসলমান আমলেও) এইখানে চলিয়াছিল। নিকটেই রামাবতীর অধিষ্ঠান ছিল। তাই আইন-ই-আকবরীতে তখনও 'রামৌতি' উল্লেখে ইহা পরিচিত হইয়াছে। [শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ৭১ পৃঃ।]

পূর্ব্বরাগ

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

অসূর্য্যম্পশ্যার মতো যদি কিছু মেঘ ভেসে এসে
জলকন্যার কোনো যৌবনের গোপন সৌরভ—
ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় যদি একা সেই মেঘনার দেশে :
যেখানে তোমার মন নীল-রাতে ফিরে পায় সব।
আলো-মাখা শাল-তাল-পিয়ালের অরণ্য-বাতাস
অনেক রোদের ভিড়ে যারা সব হয়েছে শ্যামল,
যেখানে ঘুমের দেশে মিশেছিল শত বালুহাঁস
সেখানেও সেই মেঘ স্বপ্নের মতো ঝলমল।

তোমার বকুলতলে তারি যদি হাওয়া এসে লাগে
এলোমেলো উদ্দাম—সীমাহীন আকাশের গায়।
ধূসর বালুর চরে সুনিবিড় প্রাণের সোহাগে
খুশী হবে জানি তবে বাদলের কোনো সন্ধ্যায়।
—শ্রাবণের মেঘে মেঘে ভেসে-আসা মেঘনার গান
এনে দেবে নির্জ্জনে এই সব স্মৃতির উদ্যান।
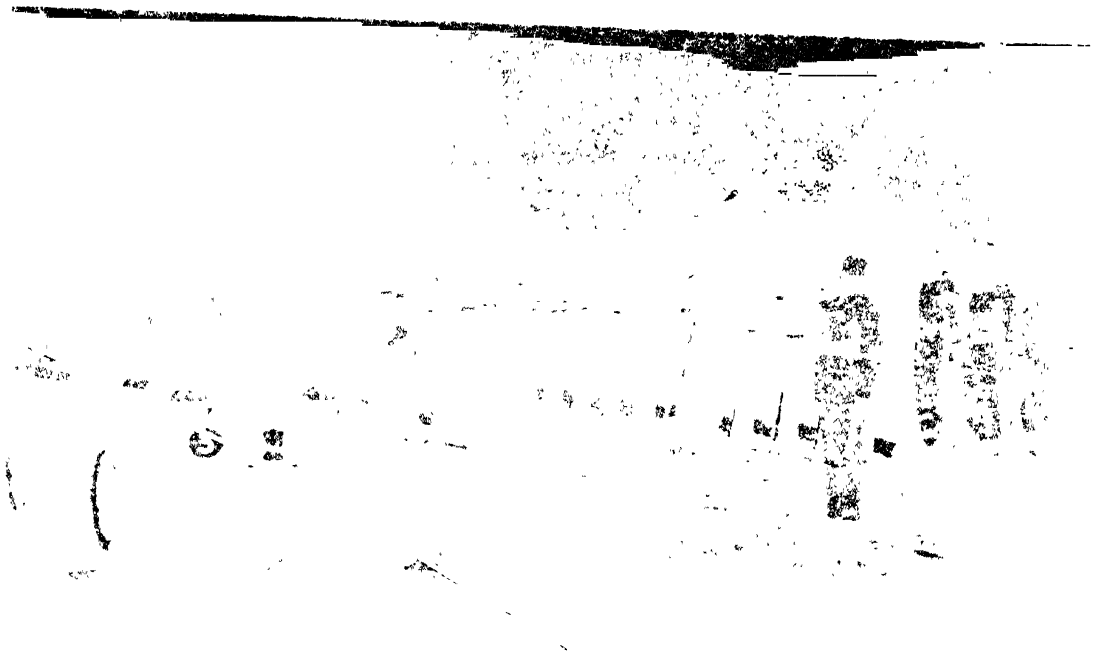
রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ নয়াদিল্লীতে সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করিতেছেন
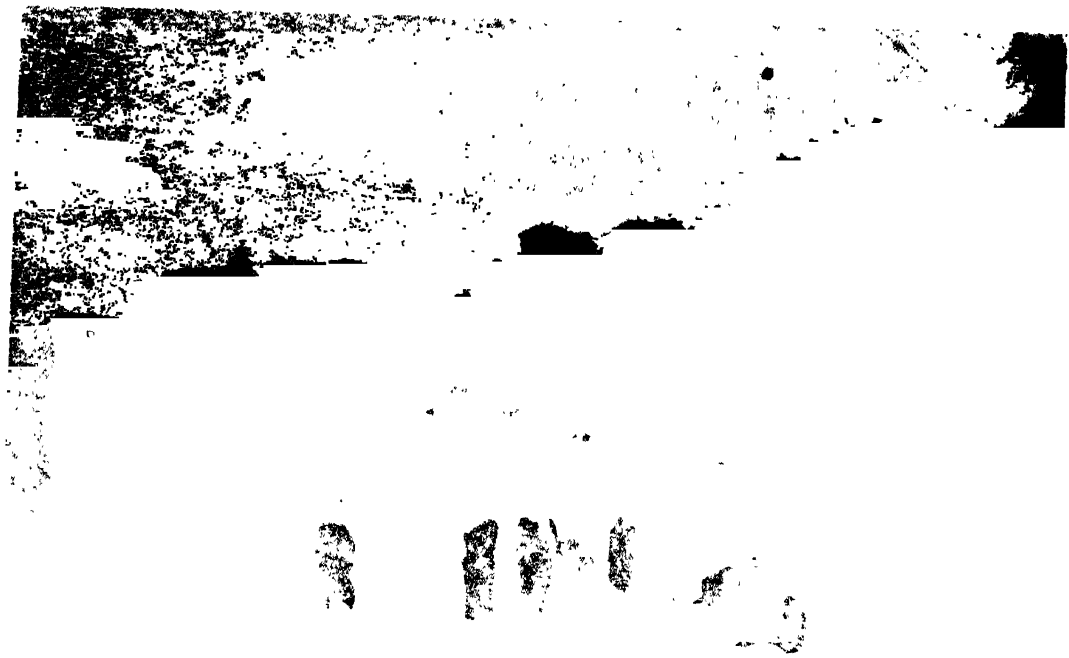
কনখলে সতীর মন্দির, হরিদ্বার

ফটো—শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

লছমনঝোলা সেতু

ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট

ফটো—শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবেশিনী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

ছোট গ্রাম—রাণীদি। এ গ্রামের মধ্যে বিমলাকে না জানে এমন লোক নাই। সবাই খাতির করে তাকে—আবার ভয়ও করে। বিমলা বলে, খাতির কি আর আমাকে করে, খাতির করে আমার গতরকে। যেখানে যাব—গতর খাটাব, দু'মুঠো ভাত—আর পরনের একখানা দশি—এ কেউ না দিয়ে পারবে না। আমার আবার—আপন-পর কি! সারা গেরামটাই তো আমার ঘর। যে ডাকবে আদর করে, তারই বাড়ীতে যাব। যেচে কারও বাড়ীতে পা দেবে—হেন ব্যক্তি আশু চক্কত্তির মেয়ে বিম্‌লী নয়।

সেটা অত্যুক্তি নয়। ছেলেবেলায় মাকে হারিয়ে বাপের যত্নে ও বড় হয়ে ওঠে। বাবা ভাল ঘর বর দেখে বিয়ে দিতে পারেন নি। ভাল ঘরে বিয়ে দেবার সাধ্যও ছিল না তাঁর। তিনি ছিলেন যাজনিক ব্রাহ্মণ—ভাল লেখাপড়া শেখেন নি, বড় বড় ক্রিয়াকর্ম্মে কেউ তাঁকে ডাকত না। ষষ্ঠী পূজা—মনসা পূজা, ইতু, মঙ্গলচণ্ডী—বড়জোর জলচৌকিতে পাতা ধান্যরূপিণী লক্ষ্মী বা পুস্তকরূপিণী সরস্বতীর আরাধনা তাঁর ভাগ্যে জুটত। এসব পূজার দক্ষিণা—তাম্রমুদ্রা, পাওনা—নৈবেদ্যের চাল কলা—উপরি জলখাবার বা ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ। কালেভদ্রে নান্দীমুখে—দু'একখানা গামছা বা আট হাতি ধুতি শাড়ী মিলত। ইউরোপের যুদ্ধ তখন পৃথিবীতে দুর্ভাগ্য ছড়ায় নি—মোটা ভাত কাপড়ের দুর্ভোগও ঘটে নি তাঁর—তাই কোন রকমে বিমলার সঙ্গে আরও তিনটি ছেলেকে মানুষ করে তুলতে পেরেছিলেন।

বিমলা বলে, পাখীরা যেমন আহার জোগায় না বাচ্চার মুখে—তেমনি আর কি। নেহাৎ ভগবানের দয়া তাই কোন রকমে খুঁটে খেয়ে বেঁচেবর্ত্তে রইলাম সব। ছেলে মানুষ করবার ক্ষ্যামতাই যদি থাকত বাবার—তো ভাইয়েরা জজ ব্যালিষ্টার হ'ত না? অমন ঠিকে দোকানদারি করবে কেন—ভাইনে আনতে যার বাঁয়ে টান ধরে। আমারই বা এ দুগ্‌গতি কেন! একটা বুড়ো ঘাটের মড়া ধরে—আইবুড়ো নাম খণ্ডন কল্লেন বাবা। হতে হ'ল কি—ছের কালটা থান কাপড় পরে বাপের ঘরেই রইলাম। বোঝা নামাব বললেই নামানো যেত যদি তা হলে আর ভাবনা থাকত না!

স্বামীর জন্ত বিমলা কোন দিন খেদ করে নি। সে প্রসঙ্গ উঠলে বলে—ভারি সুখে রেখেছিল কিনা—তাই তার জন্তে কাঁদব! পোড়া কপাল! ছের জন্ম একাদশী করতে রেখে গেল যে ঘাটের মড়া তার সঙ্গে আমার সুবাদটা কি।—ধর্ম্ম? ও যার ধর্ম্ম তার সাজে—অন্তের মাথায় লাঠি বাজে।

২

বাবা গত হলে বিমলা ভায়ের সংসারেই ছিল। তখন সবে বিয়ে হয়েছে বড় ভাইয়ের; ছেলেমানুষ বউ—তাকে ঘর-সংসার চিনিয়ে না দিলে লোকেই বা বলত কি? কিন্তু বউ যখন ভাল করে ঘর-সংসার চিনল তখন বিমলা এসে উঠল মেজ ভায়ের সংসারে। অর্থাৎ আসতে বাধ্য হ'ল সে। বাপের সংসারে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক না থাকায় সব কাজই সে স্বাধীন ভাবে করত। তার গিন্নীপনা ছিল নিরঙ্কুশ। সেই কারণে তার মুখের আটক ছিল না—কোন কাজ দিয়ে কেউ আটকে রাখতে পারত না তাকে বাড়ীর মধ্যে। হয়ত উনুনে ভাত চাপিয়ে সে পাড়ায় যেত গল্প করতে, হয়ত বা নিজের সংসারের রোগী ফেলে পরের বাড়ীতে যেত রোগের খবরদারি করতে।

এক দিন বড়বউ স্বামীকে একান্তে বলেছিল, এমন ঘর জ্বালানী—পর ভোলানী নিয়ে সংসার করা পোষাবে না আমার—তুমি বাপু আমাকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও।

কথাটা বিমলার কানে যায়। না যাবার কোন হেতু ছিল না। পাশাপাশি শোবার ঘর—মাঝখানে দরমার বেড়া। যত নীচু গলায় গোপন আলোচনাই হোক—একটু কান পাতলে প্রত্যেক বর্ণই শ্রুতিগোচর হবে। বিমলা আড়ি পাতে—এ কথা ওর সামনে বলতে সাহস করবে না কেউ, কিন্তু পাশাপাশি ঘরে বাস করে কৌতূহল দমন করে রাখতে পারে এমন সাধু সন্ন্যাসী বিমলার নজরে আজ অবধি পড়ে নি।

সেই রাত্রিতেই তুলকালাম ঝগড়া।

বড়বউ গলা ছেড়ে বললে—মরণ আর কি! বড় ভাই পিতৃতুল্যি—তার ঘরে আড়ি পাততে লজ্জা করল না তোর!

বিমলাও সতেজে জবাব দিলে—তোরা বলতে পারিস—আর যত দোষ আমার শুনতেই! বেহায়া—কালামুখী কোথাকার—গতর জল করে খাটব—আবার খোঁটাও শুনব? কেন? বলে,—লাভ নেই ভুতো,

কাঠ পাড়ার গুঁতো।—

সাত ঝাঁটা মারি তোর সংসারের মুখে।—

মেজ ভাইয়ের সংসারেও স্থায়ী হতে পারলে না সে। নিজে মেয়ে সন্ধান করে তার বিয়ে দিলে—তার বউকে নিয়ে যথেষ্ট সাধ-আহ্লাদ করলে—কিন্তু বউ এলে ভায়েরা সব একদম বদলে যায়। তারা তখন মানুষ থাকে না, পরের মেয়েদের লাগানি ভাঙ্গানিতে—তারা জানোয়ার বনে যায়। জানোয়ার কখনও আত্মকুটুম্ব নিয়ে বাস করতে পারে! কি একটা সামান্ত কথায়—মেজ ভাই লাঠি নিয়ে তেড়ে

উত্তম মধ্যম ঘা কয়েক বসিয়েও দিলে বিমলাকে। কাঁদতে কাঁদতে অভিশাপ দিয়ে সে এসে উঠল ছোট ভাইয়ের কাছে।

ছোট ভাইটা বাউণ্ডুলে গোছের—বিয়ে-থাওয়া করে নি, এ-দেশ সে-দেশ করে ঘুরে বেড়ায়। দু' পাঁচ দিনের জন্য বাড়ী আসে, হৈ হৈ করে, আবার উধাও হয়ে যায় কিছু দিনের মত। তারই সংসার (অর্থাৎ শূন্য ঘর) আগলে পড়ে থাকে বিমলা। সংসার আগলানো মানে রাত্রিতে শোবার একটা আচ্ছাদনের ব্যবস্থা আর কি! নইলে সারাদিন—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত টো টো করে এবাড়ী সেবাড়ী ঘুরে বেড়ানোর কামাই তার নাই। কারও বাড়ীতে বিয়ে—ডাক বিমলাকে; কারও প্রসবকাল উপস্থিত—বিমলাকে তাঁর চাই, মেয়ের ঘটকালি করতে আর মেয়ের সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ী যেতে বিমলা ছাড়া গাঁয়ে আর আছেই বা কে! আবার দুর্দ্দিনেও বিমলা বুক দিয়ে গিয়ে পড়বে। কেউ গেলেন বিদেশে—বাড়ী-ঘর বিমলার জিম্মায় রইল—কারও অসুখে মুখে জল দেবার লোক নেই—বিমলা সেখানে হাজির। সারা গাঁয়ের প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বিমলা যেন অপরিহার্য্য। কিন্তু নিত্য পাওয়া সূর্য্যের আলোর মত সহজ বলেই ওর মূল্য বিশেষ করে চোখে পড়ে না। সেজন্য ক্ষোভ নাই বিমলার মনে। পরনের কাপড়খানা নিত্য তুলে ধরে কে আর বলে—খাসা জমি—চমৎকার পাড়! কাপড় তো প্রশংসার লোভে মানুষের লজ্জা নিবারণ করে না। বিমলাও ভাল কথার প্রত্যাশায় আপদে বিপদে বিনা আহ্বানে গিয়ে দাঁড়ায় না। তার স্বভাবে যা প্রতিষ্ঠিত—তাই তার ধর্ম্ম, সুতরাং তা থেকে তাকে বিচ্যুত করা সহজ নয়।

৩

গাঁয়ের মধ্যে মিত্রদের অবস্থা ভাল। দুই ভাই—উপায় করে; একজনের গোলদারি দোকান—একজন বড় চাকুরে। একান্নবর্ত্তী পরিবার। সম্প্রতি চাকুরের চালের সঙ্গে ব্যবসায়ীর চালের সামঞ্জস্য হচ্ছে না। গরমিলটা মাঝে মাঝে প্রকট হয়—কিন্তু সেটা মারাত্মক নয়। ভায়েদের সামনে—বউদের মুখ খোলে না—তবু বাইরের কেউ না বুঝলেও বাড়ীর দু' পক্ষ বুঝেছে এ ভাবে বেশী দিন একান্নবর্তিতা বজায় রাখা চলবে না। দুই বউয়ের মধ্যে কাজেকর্ম্মে গা ঢালা গোছ ভাব এসেছে, পারতপক্ষে কেউ শ্রমসাধ্য কাজগুলি করতে চায় না।

এক দিন বড়বউ সুহাস বিমলাকে ডেকে বললে, ভাই ঠাকুর-ঝি—দিনকতক থাকবি আমার কাছে? বাতের ব্যথা নিয়ে হাজার বার ওপর নীচে করতে বড় কষ্ট হয়—ভাঁড়ার সামলাতে পারি না।

বিমলা বললে, এ আর বেশী কথা কি বড়বউদি, তোমরা কি আমাদের পর?

ভাঁড়ার বার করে দেওয়া নিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে খিটিমিটি বাধল বিমলার। ঠাকুর আপত্তি তুললে, এক বাটি ঘি তরকারিতে দিতে কুলোয় না। তা জলখাবারের লুচি কিসে হবে?

বিমলা বললে, কায়দা করে অল্প ঘিয়ে লুচি ভাজতে না পার ত কিসের রাঁধুনি তুমি?

ঠাকুর রাগ করে চলে গেল।

বিকালে ছোটবাবুর ছেলেমেয়েরা জলখাবার খেলে না ভাল করে। ছোটবউ কিরণের কাছে নালিশ জানালে অল্প ঘিয়ে ভাজা টানা পরোটা নাকি খাওয়া যায়!

ছোটবউ কিরণ ঠাকুরকে ধমক দিলে, ঠাকুর ছেলেদের জন্যে লুচি করা হয় নি কেন?

ঠাকুর বললে, আজ্ঞে ঘিয়ের বরাদ্দ কমালে আমি কি করব বলুন?

কেন—বরাদ্দ কমান হ'ল কেন? কে কমালে?

আজ্ঞে পিসি ঠাকরুণকে জিজ্ঞাসা করুন।

কিরণ বড়লোকের মেয়ে—স্বামী বড় চাকুরে। পান থেকে চুণ খসলে ওর মেজাজ রুক্ষ হয়ে ওঠে। বললে এ বাড়ীর জনে জনে কর্ত্রা নয়—এ কথাটা তোমার পিসি-ঠাকরুণকে বল। সংসার-খরচ কিছু কম দেওয়া হয় না—ছেলেদের লুচি খাবার ঘিয়ের অভাব হবার কথা নয়।

বিমলা উপর থেকে ছুটতে ছুটতে এসে বললে, কেন অভাব হবে ঘিয়ের? ওই ঘিয়ে আমি দশ জন ছেলেকে লুচি ভেজে খাওয়াতে পারি।

ছোটবউ বললে, অত টানাটানি করে বি বার করে দেবার মানে কি ঠাকুরঝি? ওতে আর কত সাশ্রয় হবে!

ওরে ভাই পাঁচফুলে সাজি ভরে। সংসারে অঢেল আছে বলেই যে অপচো করতে হবে তার মানে নেই। লক্ষ্মী অনাদরের নন—

থাক তোমাকে আর সাউখুরি করতে হবে না—কিসে কি হয় আমি বুঝি।

এ ভাবে মুখঝামটা খাওয়া বিমলার স্বভাব নয়। সেও অকস্মাৎ রুখে উঠল, মুখ করছিস যে ছোটবউ! আমি কি কারও কেনা বাঁদী যে চোপা সয়ে হেনস্তার অন্ন মুখে তুলব?

না তুমি রাজরাণী—

গোলযোগ বেড়ে উঠতেই বড়বউ সুহাস উপর থেকে নেমে এল। মোটা-সোটা মানুষ, তাড়াতাড়ি আসতে হয়েছে বলে হাঁপাচ্ছে। বললে, তোমাদের ব্যগ্রতা করি বাপু—চুপ কর।

ছোট বউ কিরণ বললে, ব্যগ্রতার কথা নয় দিদি, নিজের সংসারে চোর হয়ে বাস করব—তেমন মেয়ে আমি নই।

'তবে করবি কি ?' সুহাস শাসনের সুরে বললে, 'ঠাকুরঝি যা করেছে আমাদের ভালর জন্তেই।'

তা জানি, না হলে এত লোক থাকতে ওকেই বা ডাকবে কেন ! কথায় বলে না সাত কুটুমের নাম গেল—হিদে জোলার নাতি ! তোমারও হয়েছে তাই।

কথাটা বড় কর্তার কানে উঠল। তিনি বড় বউকে ডেকে বললেন, বিমলিকে বিদেয় কর—ওর জন্য তো যত অশান্তি।

বড়বউ বললে, অশান্তি আজ নতুন হয় নি। তোমরা পুরুষ মানুষ—বাইরে থাক—জান না কোথায় কি হচ্ছে।

'জানি।' বড়কর্তা ধমক দিলেন, 'তাই বলে বাইরে লোক হাসাবে নাকি ?'

বড়বউ চোখের জল ফেলতে ফেলতে উঠে গেল—সে রাত্রিতে সে আর অন্ন স্পর্শ করলে না।

পরের দিন ছাড়া কাপড়খানা বগলদাবা করে বিমলা বললে, চললাম বড়বউদি, তোমার ভাঁড়ারের চাবিটা নাও—আর জিনিসপত্তর—

বড়বউ বললে, তোমাকে অবিশ্বাস করব এমন সাহস আমার নেই ঠাকুরঝি। কিছু মনে কর না।

না—আমরা ভাই জোয়ারের ময়লা, এক জায়গায় থাকতে পারি কৈ ! একটু হেসে বললে, এমন পোড়াকপাল বড়বউদি যে, সবাই বলে এস লক্ষ্মী যাও বালাই। তোমরা ত পর নও—আসব বৈ কি।

হাসতে হাসতে বিমলা চলে গেল।

সে চলে গেলেও মিত্তিরদের চিড়-ধরা কাচের সংসার আর জোড়া লাগল না। ছ'মাসের মধ্যে দুই ভাই পৃথক হয়ে গেল। ছোট ভাই জমিজমা বাড়ী বাগানের ভাগ বুঝে নিয়ে বউ ছেলেকে রেখে চাকরিস্থলে চলে গেলেন। ওদেরও বিদেশে নিয়ে যেতে পারতেন—কিন্তু সদ্য ভাগকরা জমিজমার স্বত্বটা পাকা করে নেবার জন্যই পরিবারবর্গকে দেশের বাড়ীতে রেখে গেলেন।...

সংসার ঘাড়ে পড়তেই ছোট বউ কিরণ চোখে অন্ধকার দেখল। সাহায্যকারিণী কাউকে না পেয়ে সে একদিন বিমলার বাড়ীতে এসে হাজির।

সেদিন বিমলার ছোট ভাই বলাই বাড়ী এসেছে। বিমলা বহুদিন পরে ঘটা করে রাঁধতে বসেছে। আজ কোন রকমে ভাতে ভাত সিদ্ধ করে ক্ষুধা নিবৃত্তি চলবে না। আজ পাড়া-বেড়ানোর স্বাদের চেয়ে সংসারের দাবি হয়েছে স্বাদুতর। বহুদিন আগেকার কথা মনে পড়ছে বিমলার। তখন সবে দু'একখানা তরকারি রাঁধতে শিখেছে। বাপের সামনে থালা সাজিয়ে প্রায়ই বলত, একটি জিনিস যদি ফেলে রাখবে ত অসুখ করব বাবা। আর কেমন হয়েছে রান্না ঠিক ঠিক বলবে কিন্তু।

বাবা হেসে বলতেন, তোর রান্নার নিন্দে করতে পারলাম না কোনদিন—কার কাছে এত শিখলি বল ত ?

এই কথায় প্রখরা বিমলার মুখে সলজ্জ মেদুর ছায়া নামত। মুখ নীচু করে বলত, রান্না আবার মেয়েমানুষকে শিখিয়ে দিতে হয় বুঝি !

তা বটে।

আজ রাঁধতে রাঁধতে আপন মনে স্মরণ করছিল সেই ভুলে-যাওয়া দিনগুলির ঘটনা। রান্না মেয়েদের জন্মগত জিনিস—কিন্তু তাও যে ভুলতে বসেছে সে। শুধু নিজের উদরপূরণের জন্য যে আয়োজন তাতে আর কতটুকু আগ্রহ জাগে ! কাউকে খাইয়ে তার তৃপ্ত মুখখানি না দেখলে—তার মুখ থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসাবাণী না শুনলে নারী-জীবনের সার্থকতা কি ?

কিরণ এসে বললে, আজ যে ঠাকুরঝির রান্নার ভারি ঘটা। বলাই বাড়ী এসেছে বুঝি ?

হাঁ ভাই বোস। পিঁড়িখানা বাঁ হাতে ঠেলে দিয়ে বললে, থাকে বিদেশ বিভুঁয়ে, কি ছাইভস্ম খায় কে জানে ! ক্ষ্যামতা ত নেই ভাল-মন্দ কিনে খাওয়াবার—

তা ঠাকুরঝি একটা কথা রাখ ত বলি।

ভণিতা কেন—বল না।

আমার কাছে দিনকতক থাকতে হবে। শরীর খারাপ—সংসারের কিছু দেখতে শুনতে পারি না।

কিছুদিন আগেকার অপ্রীতিকর ব্যাপারটা বিমলার মনেই এল না—সে হেসে বললে, ওমা একথা এতদিন বলনি কেন ? আমরা থাকতে—

সে মুখ আমার নেই ঠাকুরঝি। তোমার কাছে কত অপরাধ যে করেছি—

ওমা—কথা দেখ ! দোষঘাট দু' পক্ষেরই হয়—কথায় বলে না—এক সঙ্গে থাকতে গেলে হাঁড়িতে-কলসীতে ঠোকাঠুকি হবেই—তাই বলে সে সব আঁচলে গিঁট দিয়ে রাখলে কি সংসার চলে ! বলে না আপন যে জন সে মেরেও যায়—আবার ফিরেও যায়—তা ভাই এ ক'দিন ত পারব না—ছোঁড়া চলে গেলেই।

তাই যেয়ো ভাই, তুমি না গেলে সংসার আমার চলবে না।

দিন দুই পরে একখানা গামছা জড়ানো কাপড় বগলে করে বিমলা কিরণের সংসারে এসে আশ্রয় নিলে।

বড়বউ স্বগতোক্তি করলে :

বেহায়ার নাহি লাজ নাহি অপমান।
সুজনকে এক কথা মরণ সমান।

আমাদের বিমলির হয়েছে তাই।

কথাটা বিমলার কানে যেতেই সে ফোঁস করে উঠল, যে দুর্জ্জন তার আবার লাজলজ্জা কি বড়বউদি। তা ছাড়া যে আমায় আদর করে ডাকবে—

বড়বউ বললে, আদর গোবর থাকলেই ভাল!

বিমলা বললে, আদরের কপালই যদি হবে তো সোয়ামীর ঘর বরাতে সইল না কেন? কেন ভায়েরা বিদেয় করে দিলে? সে পিত্যেশ আমি করি না বড়বউদি। তবে তোমরা পাঁচ জনে ভালবাস—আদর করে ডাক তাই।

বড়বউ বললে, তবে পায়ে তোমার কাক বাঁধা ঠাকুরঝি, বেশী দিন এক জায়গায় তো থাক না—

সে আমার বরাত ভাই। কপালে তর্জ্জনী ঠেকিয়ে বিমলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

দিনকয়েক পরে বিমলা বড়বউকে বললে, এক কুপি কেরাছিন তেল দেবে বড়বউদি? কাল বাড়ী ফেরবার সময় আঁধারে হোঁচট খেয়ে মরি।

আচ্ছা নিয়ে যাস।

কেরোসিন নিতে এসে বিমলা বললে, উরে বাসরে এত তেলের টিন তোমাদের ঘরে! তবে যে সব্বাই বলে তেলের অভাবে সারা গেরাম নিঝ্‌ঝুম?

চুপ কর্‌, একথা কোথাও যেন গল্প করিস নে।

কেন বড় বউদি, দাদা বেলাকে তেল বেচে বুঝি?

জানি না ভাই—তবে বলতে নিষেধ আছে। নদীর ওপারের গাঁয়ে কোম্পানী নাকি তেল দেয় না—ওনারা সেইখানে বেচে দেন। খবরদার আর কাউকে যেন বলিস্‌ নে!

না গো না—আমি তেমনি মেয়ে কিনা।

কিন্তু বাড়ী এসে বিমলার ভারি অস্বস্তি বোধ হ'ল। খবর দেওয়া আর নেওয়ার মধ্যে যে তৃপ্তি তা থেকে কে যেন ওকে জোর করে বঞ্চিত করছে। ওর জীবনের সবচেয়ে সেরা উপভোগ হ'ল এই তৃপ্তি। এ তৃপ্তিকে রোধ করা—তার চেয়ে মৃত্যু শতগুণে ভাল। অতি আপনার জন ভাবা যায় যাদের তাদের সুখদুঃখের সঙ্গে নিজের ভাল-মন্দকে না জড়ালে মনুষ্যজন্মই তো বৃথা। আপন জনের ভালটা বলে যেমন মনটা ফুলে ওঠে—তেমনি আপন জনের মন্দ খবরটা পাঁচ জনকে ভাগ করে দিয়ে বুকের বোঝাটা হাল্কা হয়ে যায়। আর এত বড় একটা খবর—সারা গাঁ অন্ধকারে থমথম করে—আর মিত্তির বাড়ীর চোর-কুটুরিতে ঠাসা টিনের মধ্যে আছে অঢেল তেল! এত তেল যে, এক মাস ধরে সারারাত রোশনাই চালালেও ফুরিয়ে যাবে না।

খবরটা কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পৌঁছল কেউ বলতে পারে না—দিন কয়েক বাদে মিত্তির-বাড়ি লাল পাগড়ীতে ঘিরে ফেললে। অল্প খুঁজতেই চোরকুটুরি থেকে অনেকগুলি চকচকে টিন বার হ'ল এবং বড় কর্ত্তা পুলিসের মোটরে চেপে বহু পরিতৃপ্ত দৃষ্টির ঘন আস্তরণ ভেদ করে থানার দিকে রওনা হলেন।

৫

ব্যাপারটা ঘটেছিল বেলা দশটায়। বিমলা ইতিমধ্যে বার-দুই সমবেদনা জানাতে এসে ফিরে গেছে। আত্মীয়পরিপূর্ণ বাড়ীতে এত কোলাহলের মধ্যে সান্ত্বনার ভাষা যোগায় না মুখে—হাটের হট্টগোলে দুঃখের মর্য্যাদা নষ্ট হয়ে যায়। তৃতীয় বার—তখন প্রায় অপরাহ্ণ বেলা—এসে বিমলা দেখলে হিতার্থী ও আত্মীয় দল পাতলা হয়ে গেছে। যারা সকালে 'হায়' 'হায়' করছিল—তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম করছে—বিকালে আবার সমবেদনার বেসাতি খুলবে হয়ত। ইতিমধ্যে তারও কিছু বলা দরকার। যেখানে শুব্ধ বড়বউ বসেছিল—তার কাছে গিয়ে বললে, শুনে ভয়ে তো আমার হাত পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেছে বড়বউদি।

সুহাস ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, সাপ হয়ে কামড়ে রোজা হয়ে ঝাড়তে আসে যারা তাদের কি ঘেন্নাপিত্তি কিছু আছে! বলে :

বেহায়ার বালাই দূর,
কাটা কানে চাপা ফুল।

বিমলা কেঁদে বড়বউয়ের হাত ধরে বললে, তোমার দিব্যি বড়বউদি—আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি না!

বটে—ন্যাকা?

রূঢ় স্বরে পিছন ফিরে চাইলে বিমলা। বড় কর্ত্তা কখন এসে দাঁড়িয়েছেন পিছনে। হাতে তাঁর একগাছি লিক্‌লিকে সরু বেত। কুঞ্চিত ভ্রূ আর দন্তধৃত ওষ্ঠের ভঙ্গিতে বিজাতীয় ঘৃণা ও ক্রোধ ফুটে বেরুচ্ছে। সেই ক্রোধের আবেগে হাতের মুঠোয় ধরা বেত কাঁপছে থর থর করে।

বড় কর্ত্তা আর একটু এগিয়ে এসে বেত উঁচু করে তুললেন। শয়তানী—সঙ্গে সঙ্গে সপাং করে বেতের ঘা বসালেন বিমলার পিঠে।

বিমলা চীৎকার করে উঠল, উঃ—মাগো।

বড়বউ ছুটে এসে স্বামীর হাত চেপে ধরলেন।

এক ধাক্কা মেরে বড়বউকে ঠেলে দিয়ে বড় কর্ত্তা যন্ত্রের মত বেত চালাতে লাগলেন, সপাং—সপাং—

পাড়ার লোক ছুটে এল, খবর পেয়ে বিমলার দুই ভাইও ছুটে এল। বড় ভাই কানাই মিত্তিরদের গোলদারি দোকানে কাজ করে—সে বিশেষ কিছু বললে না। মেজ ভাই নিতাই কাজ করে মাইলখানেক দূরে গঞ্জের বাজারে একটা সাইকেল

মেরামতির দোকানে। সে হুমকি দিয়ে উঠল, তাই বলে মানুষ খুন করবে?

মিত্রদের সৌভাগ্যদ্বেষী কয়েকজন মাতব্বর প্রতিবেশী এগিয়ে এসে তাকে যথাসাধ্য উৎসাহ দিতে লাগল। ওরা বললে, এখুনি থানায় ডায়েরি করা হোক, ডাক্তারের একটা রিপোর্ট নেওয়া হোক—যা খরচ লাগে সবাই চাঁদা করে দেব। গ্রাম তো অরাজক হয়ে যায় নি যে একজন সহায়হীন অবলাকে মেরে যাদু পার পেয়ে যাবেন! ব্লাক মার্কেটের পয়সায় বড় তেল হয়েছে মিস্ত্রিরের!

অতঃপর বিমলাকে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হ'ল।

নিতাই বললে, দিদি—দারোগাকে খবর দিতে লোক গেছে—যথার্থ বৃত্তান্ত বলবে তার সামনে।

বিমলার কাতরানি মুহূর্ত্তে থেমে গেল। সে অসহায় কণ্ঠে বললে, হাঁরে নিতে—তোরা কি এমনি নির্দ্দয়—পাষাণ? একটুও দয়ামায়া নেই তোদের?

কেন দিদি—দোষীর সাজা হোক এ তোমার ইচ্ছে নয়?

বিমলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, দোষীর সাজা দেবার তুই আমি কে রে? সে সাজা দেবেন ভগমান। তাঁর রাজ্যে কে দোষী নয়? তুই নোস? আমি নই?

নিতাই বললে, ভাল রে ভাল—আমার দোষটা কি হ'ল!

না—তোরা সব সাধু পুরুষ! একটু থেমে বললে, এত যদি তোদের মানের গুমোর তো অনাথা দিদিকে দু'মুঠো দিতে পারিস্ নে কেন? পরনে একখানা দশি দেবার মুগ্যতাও তো নেই! বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর!

নিতাই রেগে গিয়ে বললে, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!

থাক—তোকে আর সাউখুরি করতে হবে না, তুই যা।

নিতাই বললে, থানায় খবর দেয়া হয়েছে—যা বলবার দারোগার সামনেই বলবি।

বলবই তো। ভাইবুনে যেন ঝগড়া হয় না—যেন মারামারি হয় না? এই তো সেদিন—লাঠি দিয়ে মেরে আমার গতর গুঁড়ো করে দিয়েছিলি—তখন কোন্ থানায় নালিশ করেছিলাম রে ড্যাকরা? নালিশ করলে তোরা থাকতিস্ কোন্ চুলোয় শুনি?

নিতাইয়ের পৃষ্ঠপোষক প্রবীণ বসু মহাশয় এগিয়ে এসে বললেন, নিজের ভাই—আর পাড়াপড়সী সমান হ'ল বিমলা? এক হাট লোকের সামনে মারলে—বলি তোমারও তো মান-মর্য্যাদা আছে।

এই কথায় বিমলা কাঁদতে লাগল।

বসু মহাশয় উৎসাহিত হয়ে বললেন—দারোগা আসুক, সব বলবে। দুর্জ্জনের শাস্তি হওয়াই ভাল।

বিমলা আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললে—না কায়েত-কাকা—ওর সাজা হলে আমার মান তো ফিরে আসবে না। আর আমার আবার মান!—তোমাদেরই পাঁচ জনের খেয়েই তো মানুষ। আমার কানু—নিতুও যে—আপনারাও তাই।

বসু মাথা নেড়ে বললেন—তা হয় না বিমলা—সত্যি কথা না বললে—দারোগা তোমাকেই সাজা দেবে।

তা দিক্। বিমলা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

বসু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—তা কি বলে ঢাকবে শুনি? তোমার পায়ের দাগগুলো তো ঢাকতে পারবে না।

তা কেন ঢাকব! বলব ওকে গালমন্দ করেছিলাম বলে ও আমায় মেরেছে। ভাই বুনে এমন মারামারি হয় না? যান আপনারা—কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দেবেন না।

বিমলা ডুকরে কেঁদে উঠল।

বসু মশাই নিতাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন—তোমার বোনের উচিত সাজাই হয়েছে বাপু—তা ভালই বল—আর মন্দই বল। এমন একগুঁয়ে মেয়েছেলে আমি দেখিনি।

৬

সন্ধ্যার পর পাড়াটা নিস্তব্ধ হয়েছে। বিমলার যন্ত্রণাও কিছু কমেছে—অন্ততঃ কাতরানি না থাকাতে তাই মনে হয়। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে তার আড়ষ্ট ব্যথা—পাশ ফিরতে কষ্ট বোধ হয়। পাড়ার কে একজন এসে চুণে-হলুদে গরম করে প্রলেপ দিয়ে গেছে এক সময়। দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে বিমলা বহু দিন আগেকার কথা ভাবছিল। ভাবছিল তার মান-সম্ভ্রমের কথা। যাজনিক ব্রাহ্মণের মেয়ে সে—নিত্য পূজার জন্য বহু লোক তার বাপকে ডেকে নিয়ে গেছে বটে—সে আহ্বানে কোন দিন তো সম্ভ্রমের সুর বাজে নি। তিনি গামছায় চাল-কলা বেঁধে বাড়ী ফিরেছেন। একখানা গামছা কি ন'হাতি কাপড় পাওনা হলে—পাওনার লোভটাকে বহু বার জাঁকিয়ে প্রকাশ করেছেন ছেলেমেয়েদের কাছে। নৈবেদ্যের ফল মূল বাতাসা চিনি দিয়েছেন ছেলেমেয়েদের হাতে—লোভীর মত তারা গোগ্রাসে গিলেছে সে সব। মান-সম্ভ্রম কোথা থেকে জন্মায়—কাদের ঘরে তার বাসা—কি তার আকৃতি—বিমলার ধারণায় আসে না। তার বাড়ী—আর তার গ্রাম—মুখুজ্জেদের অন্দর মহল আর নাপিত বউয়ের বেড়াহীন উঠান, শাল-আলোয়ান গায়ে নায়েব মশায়—আর ছেঁড়া কোঁচার খুঁট গায়ে ছিদাম গোয়ালা—কোনটার প্রভেদই তার কাছে স্পষ্ট নয়। বায়ুর মতই সে সর্ব্বত্রগতি—বাতাসের কি মান-মর্য্যাদা আছে?

অন্ধকারে শুয়ে নানান কথা ভাবছিল বিমলা, মনে হ'ল কে যেন ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। কাপড়ের খস্ খস, শব্দ খুব আস্তে চলা পায়ের শব্দ আর মানুষ জন কাছে এলে তার গায়ের গন্ধ যেমন পাওয়া যায়—তেমনি উপলব্ধিতে বিমলা চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলে, কে?

আমি—বড়বউ। মূর্ত্তি ধীরে ধীরে এসে বিমলার শিয়রে দাঁড়াল।

ও, বড়বউদি। বিমলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

বড়বউ বিমলার মাথায় একখানি হাত রেখে বললে, বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে ঠাকুরঝি, রাগ—না চণ্ডাল! উনি খালি কাঁদছেন আর বলছেন, কেন আমার এমন মতিচ্ছন্ন হ'ল—কেন ওর গায়ে হাত তুললাম! আমার যে নরকেও ঠাঁই হবে না।

অশ্রুবাষ্পে বিমলার দু' চোখ আচ্ছন্ন হয়ে এল। ধরা গলায় সে বললে, ওনার দোষ কি ভাই—আমার কর্ম্মফল।

না ভাই, কর্ম্মফল বললে ত আমাদের পাপ হাল্কা হবে না, আমাদের প্রাশ্চিত্তির করতেই হবে।

বিমলা বললে, কি প্রাশ্চিত্তি করবে ভাই?

বড় বউ আঁচলের গ্রন্থি খুলতে খুলতে বললে, তিন পুরিয়া ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন উনি, হরিশ ডাক্তারের ওষুধ—খেলে নাকি গায়ের ব্যথা জল হয়ে যাবে।

অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে বিমলা বললে, দাও।

তার হাতখানি ধরে বড়বউ বললে, আর ভাই এই দশ টাকার নোটখানি উনি দিয়েছেন—ভাল ফল-টল কিনে—

চকিতে বিমলার হাতখানা সরে গেল—কান্না-ভেজা কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল রুক্ষ। সে বললে, যাও—যাও তুমি বড়-বউদি—গরু মেরে আর জুতো দান করতে হবে না।

বড়বউ কাতর অনুনয় করলে, অবুঝ হোস নে ভাই—একটা কথা আমার রাখ—

যাও—যাও তুমি। বিমলা চীৎকার করে উঠল। না যাও যদি আমি চেঁচিয়ে লোক ডাকব—কেঁদে অনর্থ করব। তোমরা কসাই—তোমরা চামার—ইতর-

বিমলা পাগলের মত বুক চাপড়াতে লাগল। ওর বুকের মধ্যে একটা ব্যথা ঠেলে ঠেলে উঠছে, বুকখানা খালি খালি বোধ হচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছে এই মাত্র ওর পিতৃবিয়োগ হ'ল। যাদের ও আপন মনে করে—তারা কেউ আপনার নয়—বহু দূরের অনাত্মীয়—টাকা দিয়ে লাঞ্ছনার ক্ষত পুরিয়ে দিতে চায় তারা—তারা পর—পর—

বালিশে মুখ গুঁজে হু হু করে কেঁদে উঠল বিমলা।

ব্রহ্মদেশের সমাজ-জীবন

শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশ ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। ব্রহ্ম-সংস্কৃতি মূলতঃ ভারতীয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতীয় এবং ব্রহ্ম সংস্কৃতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রহ্মদেশের সমাজ-সংগঠন এবং রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বংশানুক্রমিক আভিজাত্য ব্রহ্মদেশের সমাজ-জীবনে অপরিজ্ঞাত হইলেও সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং বিভিন্ন স্তর বিদ্যমান। প্রাক্-ইংরেজ যুগে দীনতম ব্যক্তিরও যোগ্যতা থাকিলে উচ্চপদ লাভের পথে কোন অন্তরায় ছিল না। কিন্তু সে যুগে উচ্চপদ, বিস্তীর্ণ জায়গীর এবং বংশানুক্রমিক খেতাব ইত্যাদি সমস্তই রাজানুগ্রহের উপর নির্ভর করিত।

আধুনিক ব্রহ্মদেশের শহরবাসী এবং ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় বৃহত্তর জগতের সহিত পরিচিত। নিম্নব্রহ্মের ইরাবতীর ব-দ্বীপবাসী এবং কারেণগণ উত্তরব্রহ্মের অধিবাসীগণ অপেক্ষা ধনাঢ্য। প্রথমোক্তগণ যে অন্ততঃ বেশী টাকা-কড়ি লেনদেন করে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। উত্তর এবং দক্ষিণ ব্রহ্মের অধিবাসিগণের আর্থিক অবস্থার তারতম্যের জন্যই ১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কার আইনে ব্যবস্থা হইয়াছিল যে উত্তর এবং দক্ষিণ ব্রহ্ম হইতে ব্যবস্থা-পরিষদের উচ্চতর কক্ষ সিনেটের সদস্য পদ প্রার্থীর বার্ষিক যথাক্রমে অন্ততঃ ৫০০৲ এবং ১০০০৲ রাজস্ব দেওয়া চাই। কিন্তু মোটের উপর বোধ হয় উত্তরব্রহ্মবাসীর জীবনে দক্ষিণ-ব্রহ্মবাসীর জীবন অপেক্ষা অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা কম।

ব্রহ্মদেশীয় বাসগৃহগুলিতে সাধারণতঃ তরজার (চেরা বাঁশের) বেড়া, কাঠের মেঝে এবং খড়ের ছাউনি থাকে। সম্পন্ন গৃহস্থ এবং মোড়লের (Thugyi) বাসগৃহের বেড়া ও চাল অনেক সময় কাঠ এবং টিনের হয়। গ্রাম্য বাস-গৃহ সম্বন্ধেই অবশ্য একথা প্রযোজ্য। রেঙ্গুন ও অন্যান্য শহরে সম্ভ্রান্ত ব্রহ্মদেশীয়গণের বাসগৃহ তাঁহাদিগের ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রতিবেশীগণের গৃহ অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। পল্লী-অঞ্চলে বাসগৃহগুলি সাধারণতঃ ৫ ফুট উচ্চ খুঁটির উপর নির্ম্মিত হইয়া থাকে। নীচে সুতা কাটিবার এবং কাপড় বুনিবার সাজসরঞ্জাম রাখা হয়। সকল গৃহস্বামিনী এইখানে বসিয়াই বস্ত্র বয়ন করেন। একটু সচ্ছল গৃহস্থের ঘরে কেরোসিনের আলো জ্বলে। উত্তর-ব্রহ্মের গ্রামগুলি সাধারণতঃ বাঁশের বেড়া দ্বারা ঘেরা থাকে। বেড়ার

গায়ে একটি মাত্র দরজা থাকে। রাত্রিতে এই দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। গ্রামের বাহিরে গোচারণ ক্ষেত্র অবস্থিত। ইহা সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি।

প্রত্যেক গ্রামেই দু'চারটি দরজির দোকান আছে। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও দোকান আছে। উত্তরব্রহ্মের প্রত্যেক গ্রামেই তৈলের ঘানি আছে। এই ঘানির সাহায্যে তিল হইতে তৈল বাহির করা হয়। বড় বড় গ্রামগুলিতে কামারের দোকানও আছে। এই সমস্ত দোকানে কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ এবং মেরামত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত নিম্নব্রহ্মের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একজন চৈনিক অথবা ভারতীয় দোকানদার দেখা যাইত। ইহারা একাধারে গ্রামের দোকানদার, মহাজন এবং দালালের কাজ করিত। যুদ্ধোত্তর যুগে কি উত্তরব্রহ্ম, কি নিম্নব্রহ্ম, সর্ব্বত্রই ভারতীয়গণের সংখ্যা দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইতেছে।

খুব বড় বা খুব ছোট নহে এই রকম একখানি গ্রামে ২৪ হইতে ৪৮ ঘর গৃহস্থ বাস করে। নিম্নব্রহ্মের কোন কোন বৃহদায়তন গ্রামে ২০০ ঘর গৃহস্থকেও বাস করিতে দেখা যায়। বাংলাদেশ, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামগুলির মত ব্রহ্মদেশীয় গ্রামগুলি পরস্পর সংলগ্ন নহে। এক গ্রাম হইতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের দুরত্ব ন্যূনাধিক ২ মাইল। প্রায় প্রতি গ্রামেই সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য কয়েকটি করিয়া কূপ আছে। যে সমস্ত গ্রামে কূপ নাই সে সমস্ত গ্রামের অধিবাসিগণ অনেক সময় সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া জল আনিবার জন্য একজন লোক নিযুক্ত করে। সে গ্রাম হইতে দূরে অবস্থিত নদী বা জলাশয় হইতে জল আনিয়া দেয়। গ্রামের প্রান্তে 'ফুঙ্গিচাউং' বা সঙ্ঘারাম অবস্থিত। এই 'চাউং'এ বালক-বালিকাগণ বর্ণমালা এবং গণিতের প্রাথমিক নিয়মগুলি আয়ত্ত করে। তাহাদিগকে সামান্য ভূগোল এবং ইতিহাসও পড়ানো হইয়া থাকে। তবে ভূগোল এবং ইতিহাসের নামে যাহা শিখানো হয়, প্রকৃত তত্ত্ব এবং তথ্যের সহিত তাহার প্রায় কোন সম্পর্কই নাই বলিলেও চলে। 'ফুঙ্গি' বা শ্রমণগণ সমাজের বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি। গ্রামের কাহারও অসুখ বিসুখ হইলে এবং গ্রাম্য সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য স্থানীয় 'ফুঙ্গি'র পরামর্শ এবং উপদেশ লওয়া হয়।

ব্রহ্মদেশে জীবন-সংগ্রাম খুব কঠোর নহে, কিন্তু তাহা না হইলেও যে কাজ না করিলে চলে এমন নহে। চীন এবং ভারতবর্ষের মত অন্তহীন শোচনীয় দারিদ্র্য না থাকিলেও সচ্ছল ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য কাজ না করিলে চলে না। অন্ন ব্রহ্মবাসীর প্রধান খাদ্য। ইহারা ভাতের সঙ্গে মাছ, মাংস এবং নানা প্রকার শাকসব্জী খাইয়া থাকে। 'ঙাপ্পি' বা লবণের সাহায্যে রক্ষিত বহু দিনের বাসি এবং উৎকট গন্ধযুক্ত মাছের নামে ইহাদের নোলায় জল পড়ে। উত্তরব্রহ্মবাসী অপেক্ষা দক্ষিণব্রহ্মবাসিগণ মাছের বেশী ভক্ত। সামর্থ্যে কুলাইলে শহরবাসিগণ অনেক সময় বিলাতী খানা খায়। শহরবাসী অপেক্ষা গ্রামবাসীদিগের সাধারণ স্বাস্থ্য মোটের উপর ভাল। ভাজা সম্বন্ধে ব্রহ্মদেশে এক অদ্ভুত কুসংস্কার আছে। ব্রহ্মদেশবাসীর ধারণা যে ভাজার গন্ধে অসুখ হয়। সেইজন্য ইহারা ভাজা জিনিষ খায় না বলিলেও চলে। কোন জিনিষ ভাজিতে হইলে সাধারণতঃ বাসগৃহ হইতে অনেক দূরে তোলা উনুনে এই কাজ করা হয়।

পূর্ব্বে পুরুষেরা শরীরের হাঁটু হইতে কোমর পর্য্যন্ত অংশ উল্কি চিত্রিত করিত এবং স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পান খাইত। এই উভয় প্রথাই অত্যন্ত দ্রুত লোপ পাইতেছে। চুরুট বা সিগারেটের ধূম পান করে না এমন লোক ব্রহ্মদেশে প্রায় চোখে পড়ে না। মেয়েদের মধ্যে ধূমপান অপেক্ষাকৃত কম। অনেকে মদ্যপানও করিয়া থাকে। মদ্যপান সমাজে নিন্দনীয় নহে। বিলাতী মদ এবং দেশী তাড়ি দুইই চলে। কিন্তু 'বানেসা' অর্থাৎ অহিফেনসেবীকে সকলেই ঘৃণা করে।

প্রাচীনপন্থী এবং দরিদ্র পরিবারে গৃহস্বামী ও অন্যান্য পুরুষদিগের খাওয়ার পর সকন্যা গৃহস্বামিনী আহার করেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই একসঙ্গে আহার্য্য গ্রহণ করেন। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারেই কাঁটা-চামচের ব্যবহার প্রচলিত আছে। ব্রহ্মবাসিগণ সাধারণতঃ অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করে এবং চা অথবা কফি খাইয়া যে যাহার কাজে চলিয়া যায়। যাহাদিগকে আপিস, স্কুল, কলেজ প্রভৃতিতে যাইতে হয়, তাহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। সকালে যাহারা কাজে বাহির হয়, বেলা ১০।১১টা পর্য্যন্ত কাজ করিবার পর তাহারা একবার ভাত খাইয়া লয়। সন্ধ্যার সময় ইহারা আর একবার ভাত খায়। সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া যাওয়ার ফলে মেয়েরা বিশ্রাম এবং রান্নাবান্না ছাড়া অন্য কাজ করিবার অনেক সময় পায়। মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারের গৃহিণীর ন্যায় ব্রহ্মদেশীয়া গৃহিণীকে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত হাঁড়ি কোলে করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। মুখে নারী-স্বাধীনতা এবং নারী-প্রগতির বুলি আওড়াইলেও মেয়েরা যে রক্তমাংসের জীব, তাহাদেরও যে বিশ্রাম এবং চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন আছে কার্য্যতঃ আমরা অনেক সময় তাহা ভুলিয়া যাই। সান্ধ্য ভোজনের পর ব্রহ্মবাসিগণ প্রতিবেশীদিগের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে অথবা বেড়াইতে বাহির হয়। 'পোয়ে' নৃত্য (ব্রহ্মদেশের জাতীয় নৃত্য) এবং অন্যান্য তামাশা দেখিবার জন্য অনেকেই গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকে। ব্রহ্মজাতীয়গণ অত্যন্ত স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। নিয়মানুবর্ত্তিতা ইহাদিগের ধাতসহ নহে। সুতরাং পূর্ব্বে ইহারা সাধারণতঃ সৈন্য বা পুলিস বিভাগের

কাজের জন্য উপযোগী বিবেচিত হইত না। এখন অবশ্য অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

ব্রহ্ম-সভ্যতা মূলত: ভারতীয় সভ্যতা হইতে উৎপন্ন হইলেও আধুনিক ব্রহ্ম-সভ্যতার সহিত শ্যামদেশীয় সভ্যতারই অধিক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। জাতিভেদ প্রথা ব্রহ্ম-সমাজে অপরিজ্ঞাত। প্রাচ্য মহাদেশের যে কোন অঞ্চলের নারী অপেক্ষা ব্রহ্মরমণী অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে। ইংরেজ-পূর্ব যুগেও ব্রহ্মদেশে সম্পত্তির অধিকার, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের অধিকার-সাম্য স্বীকৃত হইত। ব্রহ্মদেশে নারী এবং পুরুষের স্বার্থের সংঘাত আজও আরম্ভ হয় নাই। ব্রহ্মনারী সাধারণত: গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম এবং ছোটখাট ব্যবসায় করিয়াই সন্তুষ্ট। আজ পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতির অধিকার সম্প্রসারণের জন্য কোন আন্দোলন (Feminist movement) সেখানে হয় নাই। ইহার কারণ এই যে মেয়েরা এখনও তাহাদের এবং পুরুষদের স্বার্থ অভিন্ন মনে করে।

অবরোধপ্রথা ব্রহ্ম-সমাজে অজ্ঞাত। পাশ্চাত্য দেশসমূহে সচরাচর যে বয়সে বিবাহ হয়, ব্রহ্মদেশেও সাধারণত: প্রায় সেই বয়সেই বিবাহ হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশীয় সমাজ-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—গতানুগতিকতার উপর নহে। সেইজন্যই বিবাহ ব্যাপারে বর-কনের মতামত মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। ব্রহ্মদেশীয় জীবনযাত্রার সাধারণ মান চীন, শ্যাম এবং ভারতবর্ষের তুলনায় উন্নত। জন্ম এবং মৃত্যুর হার চীন এবং ভারতবর্ষ হইতে কম। ব্রহ্মদেশীয় পরিবারগুলি প্রায়ই ছোট ছোট। ১৮ হইতে ২০ বৎসর বয়সে সাধারণত: মেয়েদের বিবাহ হয়। যাহারা শহরে থাকে তাহাদের বিবাহ অনেক ক্ষেত্রে ইহার পরেও হয়। পল্লী-অঞ্চলে মেয়েদের বিবাহ অনেক সময় ১৮ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেও হয়। মেয়েরা একা একাই হাটে-বাজারে, ছবি দেখিতে এবং অন্যান্য স্থানে যায়। ব্রহ্মদেশীয় পরিবারগুলি একান্নবর্ত্তী নহে। ইহাতে হয়ত কিছু অসুবিধা হয়। কিন্তু বঙ্গদেশের অধিকাংশ একান্নবর্ত্তী পরিবারে আজকাল যে অপ্রীতিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, ব্রহ্মদেশে তাহার সম্ভাবনা নাই। চীন এবং ভারতবর্ষে পুত্র-বধূকে সম্পূর্ণভাবে শাশুড়ীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে হয়। ব্রহ্মদেশে ইহার প্রয়োজন হয় না। বহুবিবাহ প্রথা প্রায় অজ্ঞাত। বিধবা নারী ইচ্ছা করিলে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। বিবাহের পর মেয়েদিগের নামের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। স্ত্রী বা পুরুষ কেহই সাধারণত: নামের পূর্ব্বে বা পরে পদবী ব্যবহার করে না। সুতরাং লা ব'র পুত্রের নাম হয়ত তান্ পে এবং তাহার পুত্রের নাম হয়ত বা তং। আধুনিক রুচিসম্পন্ন কোন কোন পরিবারে আজকাল পদবীর ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। আজকাল অনেকে ইউরোপীয়দিগের অনুকরণে বিবাহোৎসব করিয়া থাকে। খ্রীষ্টানদিগের মধ্যেই এই অনুকরণ-স্পৃহা সমধিক পরিলক্ষিত হয়। নববিবাহিত দম্পতী কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহের পর অল্প কিছুদিন—ন্যূনাধিক এক বৎসর—বর বা বধূর পিতৃগৃহে বাস করিবার পর পৃথক সংসার পাতে। বিবাহ ব্যাপারে ব্রহ্মদেশীয়গণের কতকগুলি অদ্ভুত সংস্কার আছে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। যে মেয়ে রবিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার পক্ষে মঙ্গলবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এমন পাত্রকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করা হয়।

বিবাহের পর মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। বিবাহিতা নারী দোকান-পাট বা কুটির-শিল্প-সংক্রান্ত বিবিধ কার্য্য করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করে, সে নিজেই তাহার মালিক। কিন্তু অবিবাহিতা নারীর উপার্জ্জিত অর্থে তাহার নিজের অধিকার থাকে না। তাহার মাতাপিতা সেই অর্থ গ্রহণ করে। বিবাহের পূর্ব্বে ব্রহ্মতরুণী সাধারণত: পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া স্বাধীন জীবনযাত্রা আরম্ভ করে না। ব্রহ্মজাতীয়া নারী কারেণ, শান, চিন, এবং অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতীয়া নারী অপেক্ষা অধিক স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে। কারেণ নারী ধাত্রী এবং শুশ্রূষাকারিণীর কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিনী। কিছুদিন পূর্ব্বেও ব্রহ্মদেশের প্রায় সমস্ত সরকারী হাসপাতালেই কারেণ ধাত্রী এবং শুশ্রূষা-কারিণী দেখা যাইত।

বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্রহ্ম-সমাজে বিশেষ দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথা ক্রমশ: লোপ পাইতেছে। স্বামী বা স্ত্রী যে কেহ বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। পল্লী-অঞ্চলে গ্রামবৃদ্ধগণ বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন। স্বামী এবং স্ত্রীর যদি কোন যৌথ সম্পত্তি থাকে, সরকারী কর্ম্মচারীর সহায়তায় তাহা ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। সকল ক্ষেত্রেই বিবাহকালে স্ত্রীর যে সম্পত্তি ছিল, তাহা তাহারই থাকে। বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় স্বামী এবং স্ত্রীর যুক্ত পরিশ্রমে অর্জ্জিত বিত্তের অর্দ্ধাংশ সাধারণত: স্ত্রীকে দেওয়া হয়।

সমস্ত পৃথিবীতে ব্রহ্মদেশ বোধ হয় বিভিন্ন জাতির মধ্যে যৌনমিলনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। ব্রহ্মনারী বিদেশীয়গণের মধ্যে চীনাদিগকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ করে। ভারতীয় স্বামী চীনা স্বামীর মত বাঞ্ছনীয় নহে। ইউরোপীয় পুরুষ এবং ব্রহ্মরমণীর মধ্যে বিবাহের সংখ্যা অত্যন্ত কম। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ইংরেজ কর্ত্তৃক ব্রহ্মবিজয় সম্পূর্ণ হইবার পরও শ্বেতাঙ্গিনীগণ বহুদিন পর্য্যন্ত সাধারণত: ব্রহ্মদেশে আসিতে সাহসী হইত না। সেই যুগে ব্রহ্মরমণী বহু শ্বেতাঙ্গের বিরহব্যথা দূর করিত।

এই প্রসঙ্গে সত্যের খাতিরে একটি কথা উল্লেখ করিতে

হয়। অনেক ভারতবর্ষীয়—ইহাদিগের মধ্যে বোধ হয় চট্টগ্রামের মুসলমানই বেশী—বৎসরের পর বৎসর ব্রহ্মনারীকে লইয়া ঘর করিবার পর দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় ব্রহ্মদেশীয়া পত্নী বা তাহার গর্ভজাত সন্তান-সন্ততির ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা করিয়া যায় না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহারা একেবারে অকূল পাথারে পড়ে। ইউরোপীয়গণ দেশে ফিরিবার সময় ব্রহ্মদেশীয়া স্ত্রী (রক্ষিতা?) এবং তাহার সন্তানগণকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদিগের ভরণপোষণের একটা ব্যবস্থা করিয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সমাজ যেন এখনও এই সম্বন্ধে খুব সচেতন নহে। ভিন্ন দেশীয় স্বামী-পরিত্যক্তা নারীকে সমাজ খুব শ্রদ্ধার চোখে না দেখিলেও তাহার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না। তাহার পুত্র কন্যাদিগকেও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয় না। গণিকা-বৃত্তি ব্রহ্মদেশে প্রায় অজ্ঞাত। গণিকালয়ে গমনকারীদিগের মধ্যে বিদেশীয়গণের আপেক্ষিক হার ব্রহ্মদেশীয়গণের তুলনায় অধিক।

ব্রহ্মনারী এখনও রাজনীতিতে খুব বেশী আকৃষ্ট হয় নাই। ১৯৩৭ সালে শাসন সংস্কার-প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে সাইমন কমিশন কর্ত্তৃক সাক্ষ্য গ্রহণ কালে মহিলা সাক্ষীগণ নারীদিগের জন্য পুরুষের সমান অধিকার দাবি করিয়াছিলেন। কমিশনের জনৈক সদস্য নারীর অধিকার সম্প্রসারণের প্রধান সমর্থকের নাম জানিতে চাহিলে মৌলমিনের আইন ব্যবসায়ী মিঃ রফির নাম করা হয়। এই উত্তর যথেষ্ট হাস্যরসের সঞ্চার করিয়াছিল। শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে নূতন শাসন-ব্যবস্থায় নারীদিগের জন্য আইন-পরিষদে তিনটি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করিবার কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু বার্ম্মা রিফর্ম্মস কমিটি-র মহিলা সদস্য ডাঃ মা স সা জানাইয়া দিলেন যে নারী-দিগের জন্য এই রক্ষাকবচের প্রয়োজনীয়তা নাই। তাঁহার পরামর্শ অবশ্য গ্রহণ করা হয় নাই।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্রহ্মনারী যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। বহু নারী ব্যবহারজীবী, চিকিৎসক এবং দন্ত-চিকিৎসকের ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। ইঁহাদিগের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিভিন্ন সরকারী, অর্দ্ধ-সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়া অনেক নারী অন্ন-সংস্থান করেন। ব্রহ্মদেশীয়া মহিলাদিগের মধ্যে ড কা টুন সর্ব্বপ্রথম মিউনিসিপ্যালিটির সভানেত্রী নির্ব্বাচিতা হইয়া-ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্রহ্মনেতা উ চিট হলাইঙের ভগ্নী ড হ্লিন মিয়া ১৯৩২ সালে আইন-সভার এবং ড আ মা নামক অপর একজন মহিলা ১৯৩৬ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে উত্তরব্রহ্ম হইতে হাউস অব রিপ্রেসেন্টেটিভ্‌স্-এর সদস্য নির্ব্বাচিতা হইয়াছিলেন। ড মিয়া সিন নামক একজন মহিলা ব্রহ্ম গোল-টেবিল বৈঠকের অন্যতম সদস্যরূপে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ড মি ম্রি কিন বহু বৎসর রেঙ্গুন হাইকোর্টের সহকারী রেজিষ্ট্রারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। ড ড সু দীর্ঘকাল ব্রহ্ম ভাষায় প্রকাশিত বিখ্যাত দৈনিক 'নিউ লাইট অব বার্ম্মা'র স্বত্বাধিকারিণী এবং প্রকাশিকা ছিলেন। বহু নারী 'তাজি' বা মোড়লের কাজে দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়া সরকারী পুরস্কার লাভ করিয়া-ছেন। অনেক নারী স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

১৯৩১ সালের আদমসুমারির বিবরণী অনুযায়ী ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ নারীদিগের শতকরা ১০ জন এবং খ্রীষ্টান নারীদিগের শতকরা ২৮ জন অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্না ছিল। ১৯৪১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে সমতলবাসিনী ব্রহ্মরমণীদিগের মধ্যে প্রতিশতে ৩৫ জন অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্না।

জাপ-যুদ্ধের পূর্ব্বে রেঙ্গুনে মহিলাদিগের কয়েকটি ক্লাব এবং নারী-পরিচালিত কয়েকটি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান ছিল। এই সমস্ত ক্লাব এবং প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণের মধ্যে চীন, ব্রহ্ম-দেশ, ইউরোপ, ভারতবর্ষ ইত্যাদি সর্ব্বদেশীয়া মহিলাই ছিলেন। এই ধরণের নারী-পরিচালিত সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে "ন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন ইন বার্ম্মা", "গার্ল গাইড্‌স্", "সোশ্যাল সার্ভিস লীগ", "রেঙ্গুন" ভিজিল্যান্স সোশ্যাইটি", "প্রিজনার্স এড্ সোসাইটি" প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য।

বহু পরিবারেই কর্ত্তা অপেক্ষা কর্ত্রীর প্রভাব অধিক হইলেও কর্ত্তাকেই প্রধান মনে করা হয়। আজও পল্লী-ব্রহ্মের সর্ব্বত্র পথ চলিবার কালে স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করে। অন্ধকার রাত্রিতে পত্নী প্রদীপহস্তে পতির পথ-প্রদর্শিকার কাজ করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে ব্রহ্মদেশীয় জীবনযাত্রার সাধারণ মান চীন, শ্যাম এবং ভারতবর্ষের তুলনায় উন্নত। এইজন্যই ব্রহ্মবাসীর সাধারণ স্বাস্থ্যও অপেক্ষাকৃত ভাল। ব্রহ্মদেশীয় বাসগৃহ এবং ব্রহ্মদেশের জাতীয় পরিচ্ছদ দেশের আর্দ্র বিষুবীয় জলবায়ুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ব্রহ্মদেশের স্ত্রী এবং পুরুষ দিবসের অধিকাংশ সময় ঘরের বাহিরে মুক্ত বায়ুতে কাটায়। দেশে খাদ্যাভাব নাই। এই সমস্ত কারণ দেশবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটাইতে সহায়তা করিয়াছে। ব্রহ্মদেশীয় প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র একান্ত অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে। কিম্বদন্তী আছে যে ব্রহ্মদেশীয় 'কুঞ্জি' এবং বৈদ্যগণই কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার জন্য সর্ব্বপ্রথম চালমুগরার তৈল ব্যবহার করিয়াছিলেন। দেশের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল হইলেও রাজধানী রেঙ্গুন অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। রেঙ্গুনে যক্ষ্মারোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। যৌনব্যাধির প্রকোপও ব্রহ্মদেশে অত্যন্ত বেশী। ব্রহ্মদেশে শিশুমৃত্যুর হারও ভয়াবহ। ১৯৩৫ সালে প্রতি এক

সহস্র শিশুর মধ্যে পল্লী অঞ্চলে ১৭৬-৫৫টি এবং নগর-অঞ্চলে ২৫৫'২টি শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

জাপান কর্তৃক ব্রহ্মদেশ আক্রান্ত এবং অধিকৃত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সমগ্র দেশে ৩১৫টি হাসপাতাল এবং দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। ইহার মধ্যে প্রায় সব কয়টিই সরকার কর্তৃক পরিচালিত হইত। বিভিন্ন খ্রীষ্টান মিশন ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কয়েকটি এবং রামকৃষ্ণ মিশন একটি হাসপাতাল পরিচালনা করিত। যুদ্ধের পর এগুলির কাজ আবার আরম্ভ হইয়াছে।

আয়তনে ব্রহ্মদেশ ফ্রান্স অপেক্ষা বৃহত্তর। অথচ জাপ আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইংলণ্ডের একমাত্র সারে জেলার চিকিৎসক-সংখ্যা অপেক্ষা সমগ্র ব্রহ্মদেশের চিকিৎসক-সংখ্যা অনেক কম ছিল। এই সময় লণ্ডনের যে কোন দুইটি বড় হাসপাতালের শিক্ষিতা শুশ্রূষাকারিণীর সংখ্যা ব্রহ্মদেশের মোট শুশ্রূষাকারিণীর সংখ্যা অপেক্ষা অধিক ছিল। চিকিৎসকদিগের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র ব্রহ্মদেশীয় এবং দুই-তৃতীয়াংশ ভারতীয় ছিলেন।

১৯৩৭ সালে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে পৃথক্ হইবার পূর্ব্বে ভারত সাম্রাজ্যের প্রদেশসমূহের মধ্যে ব্রহ্মদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক অপরাধ অনুষ্ঠিত হইত। খাস ভারতবর্ষে যত চুরি হইত, জনসংখ্যার অনুপাতে ব্রহ্মদেশে তাহার সাড়ে তিন গুণ বেশী চুরি হইত। ডাকাতি, নরহত্যা, গৃহপালিত পশু অপহরণও খাস ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী হইত। ইংরেজশাসনের শেষ ভাগে বিভিন্ন সময়ে ব্রহ্ম-ভারতীয় দাঙ্গা, ব্রহ্ম-চৈনিক দাঙ্গা, বৌদ্ধ-মুসলিম দাঙ্গা সংঘটিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও মধ্যে মধ্যে ব্রহ্ম-কারেণ দাঙ্গার কথা শোনা গিয়াছে। ইংরেজ আমলে ব্রহ্মদেশে সন্ত্রাসবাদমূলক কার্য্যকলাপ কোন দিনই অনুষ্ঠিত হয় নাই।

ব্রহ্মদেশে অপরাধ বাহুল্যের চারিটি প্রধান কারণ বিদ্যমান। প্রথমতঃ, ব্রহ্মবাসী খুব সহজেই রাগিয়া যায়। তাহারা নিজেরাও জানে এবং স্বীকার করে যে তাহারা রগচটা। ইহা বোধ হয় মঙ্গোলীয় রক্তের প্রভাব। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মদেশে সর্ব্বসমেত ২০,০০,০০০ নবাগত বৈদেশিক আছে। ইহারা অনেকেই নিঃসম্বল অবস্থায় জীবিকার সন্ধানে এদেশে আসিয়াছে। অনেকে আবার স্বদেশে গুরুতর অপরাধ করিয়া শাস্তির ভয়ে দেশত্যাগ করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পূর্ব্বে ইরাবতীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রতি বৎসর প্রায় ২০০,০০০ বহিরাগত যাতায়াত করিত। ধান কাটিবার মরশুমে উত্তর-ব্রহ্ম হইতে অনেক শ্রমজীবী কাজের সন্ধানে ব-দ্বীপ অঞ্চলে আগমন করিত। অল্পমেয়াদী ভূমি-বন্দোবস্ত প্রথা প্রচলিত থাকিবার ফলে ব-দ্বীপ অঞ্চলের অধিবাসিগণ প্রায়ই বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে অপরাধীকে ধরা এবং তাহার শাস্তিবিধান সহজসাধ্য নহে। পূর্ব্বে গ্রাম ও শহরে মোড়ল এবং পুলিস কর্ম্মচারীদিগের অপরিচিত বহু ব্যক্তিকে প্রায়ই দেখা যাইত। ফলে অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করা একটা কঠিন সমস্যা ছিল। এই সমস্যা এখনও আছে। তৃতীয়তঃ, ১৯৩০ হইতে ১৯৪০ এই ১০ বৎসরের মধ্যে সংঘটিত বিভিন্ন দাঙ্গা এবং বিদ্রোহের ফলেও অপরাধের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। চতুর্থতঃ, সমাজ জেল-খালাস কয়েদীকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে না। সাধারণের ধারণা যে দণ্ডভোগ করিবার ফলে তাহার সমস্ত অপরাধ দূর হইয়া সে শুদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশময় ব্যাপক অশান্তির ফলে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন ইত্যাদি পূর্ব্বাপেক্ষা বহু গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। অন্তর্বিপ্লবের ফলে সমাজ-বিরোধী শক্তিগুলি সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মদেশে জনসাধারণের ধনপ্রাণ আজ নিরাপদ নহে। স্বাধীন ব্রহ্ম-সরকার সমস্ত দোষ বিদ্রোহীদিগের ঘাড়ে চাপাইয়াই যেন স্বীয় কর্তব্য সম্পন্ন করিতে চাহেন।

রেঙ্গুন এবং প্রোমের মধ্যে অবস্থিত তারাওয়াডি জেলা ব্রহ্মদেশের সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধপ্রবণ অঞ্চল। ১৯৩১-৩২ সালের সায়া শান বিদ্রোহ এই জেলাতেই আরম্ভ হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় তারাওয়াডি দরিদ্র। শান অধিত্যকা এবং সীমান্তের পার্ব্বত্য অধিবাসিগণ সমতলবাসী ব্রহ্মজাতীয়গণের মত অপরাধপ্রবণ নহে। দণ্ডিত অপরাধীদিগের মোটামুটি চার-পঞ্চমাংশ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে শতকরা ৭০ জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতি বৎসর প্রায় ১০০ অপরাধী প্রাণদণ্ডে এবং প্রায় ২০০ অপরাধী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইত।

কোক-মুখা দুর্গা-প্রতিমা

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

এতকাল আমরা মহিষ-মর্দিনী দুর্গা-প্রতিমা দেখিয়া আসিতেছি। বঙ্গদেশে মৎস্য-পুরাণ-বর্ণিত দুর্গা-প্রতিমা নির্মিত হইয়া আসিতেছে। এই প্রতিমায় মহিষাকৃতি অসুরের উর্ধ্বদেশ বিদীর্ণ করিয়া নরাকৃতি অসুর বিনিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। ইহার মস্তক ও দুই হাত নরাকার, নিম্নভাগ চতুষ্পদ মহিষ। এইরূপ প্রতিমা পূর্ববঙ্গে ও বাঁকুড়া জেলায় নানাস্থানে অদ্যাপি নির্মিত হইতেছে। দক্ষিণরাঢ়ে অসুর সম্পূর্ণ নরাকৃতি হইয়াছে। মহিষের ছিন্নমুণ্ড পৃথক প্রদর্শিত হইয়াছে। শত বৎসরের মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

কিন্তু কোক-মুখা দুর্গা-প্রতিমা অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়া রাইপুরে এইরূপ প্রতিমা দেখিয়া গত ফাল্গুনের প্রবাসীতে "রাইপুরের মহামায়া ও শিখরবংশ" প্রবন্ধে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রতিমায় দুর্গা দুই হস্ত উচ্চ নারীমূর্তি, কিন্তু মুখ অজতুল্য। ষড়্‌ভুজা এবং আয়ুধহস্তা। পরিধান-বস্ত্র সম্মুখে কুঞ্চিত। এইরূপ বস্ত্র-পরিধান উত্তর-ভারতে, মধ্যপ্রদেশে ও দক্ষিণাপথে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। রাইপুরের প্রতিমাটি পূর্বে বৃক্ষতলে ছিল; এক্ষণে এক মন্দিরে স্থাপিত হইয়া পূজিত হইতেছে।

কিন্তু এই প্রতিমা নূতন নয়। মহাভারতে ভীষ্মপর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জুন দুর্গার স্তব করিয়াছেন। তিনি দুর্গাকে কোক-মুখা বলিয়াছেন। কোক নেকড়ে বাঘ অথবা 'বুনা কুকুর' অর্থাৎ বন্য কুক্কুর। নেকড়ে বাঘ, বন্য কুক্কুর, অজ, শৃগাল ও বরাহ, ইহাদের মুখের সাদৃশ্য আছে। মহাভারতের বর্ণনা যত নূতনই হউক, অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন। অতএব রাইপুরের দুর্গামূর্তির কল্পনাও দুই সহস্র বৎসর পূর্বে হইয়াছিল।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে কোথায় কোন্ রূপ প্রতিমা আছে, তাহা অদ্যাপি কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণের ত্রিবান্দ্রমনগর হইতে ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থপাল আমার সহিত পত্র-ব্যবহারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশে বামন-প্রতিমা ও বামন-মন্দির আছে কিনা। তাঁহার দেশে বামন-পূজা অতিশয় প্রসিদ্ধ এবং তাহার উত্তম মন্দিরও আছে। আমি তাঁহার জিজ্ঞাস্যের উত্তর করিতে পারি নাই। বিষ্ণুর চারি দিব্য-অবতার; যথা—কূর্ম, বরাহ, বামন ও মৎস্য। মৎস্য-পুরাণে আছে, কূর্ম, বরাহ ও মৎস্য অবতারের আকার এই এই প্রাণীর আকারের তুল্য। বামন-অবতারের আকার,—একটি বালক, দক্ষিণহস্তে কমণ্ডলু, বাম হস্ত দ্বারা মস্তকের উপর ছত্র ধারণ করিয়া আছে। এই চারি অবতারের প্রতিমার পূজা ভারতে নিশ্চয় প্রচলিত আছে। কিন্তু কোথায় কোথায় আছে, তাহার বিবরণ দেখি নাই। বঙ্গদেশেই কোথায় কোন্ কোন্ দেবদেবী প্রতিমা আছে, বোধ হয় তাহাও কোন পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয় নাই। বাঁকুড়ায় জৈনমূর্তি প্রচুর। বোধহয়, ইহাও মূর্তি-ঈক্ষণিকেরা অবগত নহেন। বাঁকুড়ায় আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ-রাঢ়ে কূর্মাবতার ধর্মঠাকুর নামে পূজিত হইতেছেন। উত্তর-বঙ্গে এবং দক্ষিণ-ভারতেও নাকি কূর্ম-মূর্তি আছে। কূর্মাবতার অনার্যের কল্পিত নয়। আমি ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে বিষ্ণুর বরাহ ও কূর্ম-অবতার, শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে বামনাবতার এবং আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে মৎস্যাবতারের উৎপত্তি দেখাইয়াছি। চারিটির কল্পনাই ঋগ্‌বেদে আছে। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি কালপুরুষ নক্ষত্র এবং মৎস্যাবতারটি ধ্রুব-মৎস্য অবলম্বনে কল্পিত হইয়াছিল। কালপুরুষ নক্ষত্র আশ্রয় করিয়াই মহিষাসুর এবং আরও অনেক পৌরাণিক উপাখ্যানের উৎপত্তি হইয়াছে। দক্ষযজ্ঞ-নাশে দক্ষের অজমুখ হইয়াছিল। দক্ষও কালপুরুষ নক্ষত্র। ঋগ্‌বেদে এই দক্ষের নামও আছে, কালপুরুষ নক্ষত্রের মস্তকের তিনটি তারার সন্নিবেশ হইতে কোক-বরাহ-অজ-কুক্কুর-মুখের কল্পনা হইয়াছিল। কালপুরুষ নক্ষত্র আশ্রয় করিয়াই ঋগ্‌বেদে রুদ্রের মূর্তি বর্ণিত হইয়াছে। আমি ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে পৌষের 'প্রবাসী'তে দুর্গা প্রতিমা-কল্পনার উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছি। রুদ্রের ও রুদ্রাণীর রূপ একই। শুক্ল যজুর্বেদে (১৬।২৮) রুদ্রের মুখ কুক্কুরের তুল্য বলা হইয়াছে।

রাইপুরের কোক-মুখা দুর্গা-প্রতিমা কতকালের তাহা দেব-দেবী-মূর্তি-ঈক্ষণিকেরা বলিতে পারেন। রাইপুরে এই দুর্গার নাম মহামায়া। তাঁহার পার্শ্বে ছোট আকারের আর একটি কোক-মুখা দুর্গা-প্রতিমা আছে। লোকে তাহার নাম তুঙ্গভদ্রা রাখিয়াছে। দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নামে এক নদী আছে। কি কারণে সে নদীর এই নাম হইয়াছিল, তাহাও অনুসন্ধেয়।

ফাল্গুনের প্রবন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহামায়ার

দক্ষিণী ছাঁদে বস্ত্র-পরিধান ও পার্শ্বস্থ তুঙ্গভদ্রা নামের প্রতিমা দেখিয়া অনুমান করেন, ইহা দক্ষিণ দেশে নির্মিত হইয়া রাইপুরে আনীত হইয়াছিল। অসম্ভব নয়। কিন্তু কে আনিয়াছিল এবং কতকাল পূর্বে আনিয়াছিল, সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

রাইপুর, এই নামকে বাঁকুড়ার লোকে গড়রাইপুর বলে। রাইপুর, রায়পুর নামের অপভ্রংশ এবং রায়পুর রাজপুর ব্যতীত অপর কিছু নয়, অর্থাৎ রাজনগর বা রাজধানী। কোন্ রাজার পুর ছিল, তাহা অজ্ঞাত। নিকটে শিখর-সায়র নামে এক বৃহৎ সায়র আছে। এই নাম হইতে পাইতেছি, এই সায়র শিখর-বংশীয় কোনও রাজার খনিত। পঞ্চকোট রাজবংশের নাম শিখর-বংশ; আর, রাজ্যের নাম শিখরভূম। রায়পুরে পুরাতন গড়ের চিহ্ন আছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, গড়ের পরিমাণ ৮০ বিঘা। শিখর-সায়র গড়ের বাহিরে, পরিমাণ ১০০ বিঘা। ইহা হইতে অনুমান হয়, গড়নির্মাণের পরে শিখর-বংশের কোনও রাজা সায়র খনন করাইয়াছিলেন। কতকাল পূর্বে কোন্ রাজা গড় নির্মাণ করাইয়াছিলেন?

আর এক কারণে রায়পুর বিখ্যাত হইয়াছে। দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের ঐতিহাসিক মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৩য় সংখ্যা, ৫০ ভাগ) 'আকবরনামা' হইতে লিখিয়াছেন, পাঠান কুৎলু খাঁ উড়িষ্যা হইতে আসিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম লুঠপাট করিতেছিল। মানসিংহ উড়িষ্যা জয় করিবার নিমিত্ত বিহার হইতে আসিয়া জাহানাবাদে, বর্তমান আরামবাগে শিবির-স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন বর্ষাকাল আসন্ন। কুৎলু খাঁ পূর্বদিকে ক্রমশঃ সৈন্যসহ আসিতেছিল। মানসিংহ তাহার গতি প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার পুত্র জগৎসিংহকে এক ফৌজসহ পাঠাইয়া দেন। কুৎলু খাঁ ধরমপুরে আসিয়াছিল এবং জগৎসিংহ রায়পুরে উপস্থিত হইলে তাহার সেনাপতি বাহাদুর কুরুঃ তাঁহাকে আক্রমণ করে। বাহাদুর এক দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিল। রায়পুরে যুদ্ধ হয় (২১ মে ১৫৯০); সে যুদ্ধে জগৎসিংহের সৈন্য পরাজিত হয়। জগৎসিংহ মদ্যপানে মত্তাবস্থায় ছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া (হস্তীপৃষ্ঠে) নিজ রাজধানী বিষ্ণুপুরে লইয়া আসেন। সরকার মহাশয় রায়পুর খুঁজিয়া পান নাই। সে রায়পুর এই গড়রায়পুর। ইহারই সন্নিকটে ধরমপুর। লিখিত আছে, আরামবাগ হইতে রায়পুর ২৫ ক্রোশ এবং বিষ্ণুপুর ১২ ক্রোশ। এই অঞ্চলের মানচিত্রে দেখিতেছি, আরামবাগ হইতে রায়পুর উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ২৫ ক্রোশ এবং রায়পুর হইতে বিষ্ণুপুর প্রায় ১২ ক্রোশই বটে। রায়পুর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এক কাঁচা রাস্তা আছে। জগৎসিংহ আরামবাগ হইতে গোঘাট—গোঘাট হইতে গড়বেতা এবং গড়বেতা হইতে রায়পুরে আসিয়া থাকিবেন। রায়পুর কাঁসাই নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। বর্তমানে ইহা বাঁকুড়ার একটি থানা।

প্রায় ১৫ বৎসর হইল, ঢাকার ঐতিহাসিক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী (এক্ষণে স্বর্গগত) আমায় এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, বাঁকুড়া জেলার একস্থানে এক যুদ্ধ হইয়াছিল; এক নদীর তীরে; সেখানে বেতবন ছিল। বাঁকুড়ার কোন্ স্থানে নদী এবং বেতবন আছে, তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন। তৎকালে অনুসন্ধান করিয়া আমি বাঁকুড়া জেলায় বেতগাছ পাই নাই। পরে জানিয়াছি, দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে বেতগাছ আছে। কাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল, আমি ভুলিয়া গিয়াছি। আমার বোধ হইতেছে, ভট্টশালী মহাশয় যে যুদ্ধস্থল খুঁজিয়াছিলেন, তাহা এই রায়পুর। সেখানে কাঁসাই নদী আছে। চারি বৎসর হইল আমি জানিয়াছি, কাঁসাই নদীকূলে বেতসগাছ আছে। বোধহয় পূর্বে রায়পুরে অসংখ্য বেতস গাছ ছিল। কাঁসাই নদী তীরবর্তী লোকেরা সংস্কৃত কবিপ্রসিদ্ধ বেতসলতাকে বেত বলে (প্রবাসী, ১৩৫৫। মাঘ)।

আমীর খসরু

এ. এন. এম. বজলুর রশীদ

'তুতীয়ে হিন্দ' (ভারতের তোতা পাখী) আমীর খসরু ১২৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বিস্ময়কর প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আমীর শরফুদ্দীন মাহ্‌মুদ শমসী ছিলেন বল্‌খের অধিবাসী। ভারতে ভাগ্যান্বেষণে আসিয়া তিনি পাতিয়ালায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। আমীর খসরুর মাতা ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের অন্যতম সমর-সচিব ইমদাদুল মুল্‌কের কন্যা।

আমীর খসরুর বয়স যখন নয় বৎসর তখন তাঁহার পিতা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। মাতা পুত্রের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বীর্যবতী মাতার তত্ত্বাবধানে ও সজাগ দৃষ্টির ছায়াতলে আমীর খসরু সর্ব বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবি-প্রতিভার স্ফুরণ হইতে থাকে—চারিদিকের সুন্দর পরিবেশ ও সজীব প্রাণের স্পর্শ তাঁহার কবি-মনকে বিচিত্র ভাব-চেতনায় বিকশিত করিয়া তাঁহার অন্তরে অপার রসমাধুর্য ও রূপসুষমার সৃষ্টি করিল।

দিল্লীর তখ্‌তে তখন ভাঙাগড়া চলিয়াছে—শাহীরক্তে-রঞ্জিত সিংহাসনে একের পর এক সুলতানের আবির্ভাব হই-তেছে। যুদ্ধবিগ্রহ, ষড়যন্ত্র, বিপ্লব ও বিদ্রোহ দিল্লীর আব-হাওয়া বিষাক্ত ও তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। খসরুর কবি মন ইহাতে পীড়িত হইলেও যে নিভৃত জগৎ তিনি তাঁহার অন্তর্লোকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার ভিতর নিমজ্জিত হইয়া কাব্যরস আস্বাদন ও পরিবেশন হইতে তিনি বিরত হন নাই। কবির নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত মন শত কোলাহল ও বিক্ষোভের মধ্যেও সুন্দরের ধ্যানে সমাহিত থাকিত। প্রকৃতির বিচিত্র লীলার ভিতর চিরসুন্দরের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শের অনুভূতি তাঁহার মনে নিবিড় ও গভীর হইয়া উঠে। এই গভীর উপলব্ধি কবির জীবনে আরও বিচিত্র ও সুন্দর হইয়া দেখা দেয় এক মহাতপা সাধকের সাহচর্যে। তাঁহার কথা যথাসময়ে উল্লিখিত হইবে।

বিশ বৎসর বয়স হইতে তাঁহার কর্মজীবন সুরু হয়। বহু ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের পুত্র বাংলার শাসন-কর্তা বুঘরা খানের সহিত তিনি বাংলাদেশে আগমন করেন। কিন্তু বাংলাদেশের আবহাওয়া তাঁহার সহ্য না হওয়ায় তিনি দিল্লী ফিরিয়া আসেন। দিল্লীতে আসিয়া সুলতান-পুত্র মুহাম্মদের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই পরিচয় শেষে নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হইল। মুহাম্মদ ক্রমে খসরুর একজন অনুরক্ত ভক্ত ও সমঝদার হইয়া পড়েন। বন্ধুর সাহচর্য ও অন্তরঙ্গতার ভিতর দিয়া খসরুর দিন কাটিতেছিল। উত্তর ভারতের পথ দিয়া তখন দুর্ধর্ষ মুঘলগণ বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতেছিল। তাহাদের সহিত এক সংঘর্ষে মুহাম্মদ নিহত ও খসরু বন্দী হন। বন্দীদশায় অশেষ দুঃখকষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর তিনি মুক্তিলাভ করেন।

এই মুক্তি তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা করিল। ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে ও বিক্ষুব্ধ চিত্তে খসরু মায়ের স্নেহশীতল আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিলেন। জননীর কল্যাণকর-স্পর্শে তাঁহার দেহমনের সকল গ্লানি দূর হইল, সমস্ত সংশয় ও বেদনার নিরসন হইল। কায়কোবাদ তখন দিল্লীর তখ্‌তে বসিয়াছেন। তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইতেই তিনি খসরুকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। সুলতান কায়কোবাদের উচ্ছৃঙ্খলতায় তাঁহার পিতা বাংলার শাসনকর্তা বুঘরা খান বিরক্ত হন এবং পুত্রকে সংযত ও কর্তব্যনিষ্ঠ হইতে উপদেশ প্রদান করেন। ইহাতে পারিষদবর্গ-চালিত সুলতান কায়কোবাদই পিতার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, কিন্তু পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইতেই তিনি তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। পিতাপুত্রের মিলন হইল এবং কায়কোবাদের অনুরোধে খসরু এই মিলনকে অমর করিবার জন্য 'কিরানুস্‌-সাদাইনে' এই কাহিনীর কাব্যরূপ দান করেন। এই কাব্যই কবির প্রথম 'মসনভী'।

কায়কোবাদের পর সুলতান জালালুদ্দীন খল্‌জীর দরবারে খসরু উচ্চতম সভাসদ ও সভাকবির পদে অভিষিক্ত হন। পরবর্তী সুলতান আলাউদ্দীন খল্‌জীও তাঁহাকে এই সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় তাঁহার কাব্যপ্রতিভার সম্যক্ স্ফুরণ ও ব্যাপ্তি হয়। আলাউদ্দীন খিল্‌জীর কাব্যরসিক পুত্র খিজির খানের সহিত তাঁহার গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বকে কেন্দ্র করিয়া কবির কাব্যশক্তি ও প্রকাশভঙ্গী অপূর্ব বিশিষ্টতা লাভ করে। খিজির খানের বীরত্ব-কাহিনীকে তিনি আপনার অনুপম ছন্দে গ্রথিত করিয়া 'কেস্‌সায়ে খিজির খান' কাব্যে কালজয়ী অমরত্ব দান করেন।

এই পর্যন্ত কবির বিখ্যাত চারিটি 'দিওয়ানে'র মধ্যে 'তুহ্‌ফাতুস্ সিগর' বা তরুণের দান ও 'ওয়াসতুল হায়াত' বা মধ্য বয়সের দান—এই দুইখানি দিওয়ান প্রকাশিত হইয়াছে। তরুণ বয়সের স্বপ্ন ও প্রাণচাঞ্চল্য এবং মধ্য বয়সের ভাব-গাম্ভীর্য ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার আনন্দ-বেদনা যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় দিওয়ানে স্থান লাভ করিয়াছে। 'গুরবাতুল কামাল' বা পূর্ণ আলোক এবং 'বকেয়া নকেয়া' তখনও

পরিণত বয়সের পরম উপলব্ধি ও প্রেমধর্মের পূর্ণ পরিণতির অপেক্ষায় আছে। পরবর্তী জীবনে সুফী ভাবের যে অনাবিল আনন্দ তাঁহার জীবনকে সার্থক, সুন্দর ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছিল সেই নিবিড় আনন্দরসের আস্বাদ তখন পর্যন্ত মুরশেদের অভাবে তাঁহার অন্তরে দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই, কিন্তু কবি-জীবনের প্রথম হইতেই চিরসুন্দরের সান্নিধ্যলাভের জন্য তিনি হৃদয়ে যে বেদনা অনুভব করিতেন, প্রেমাস্পদের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষার যে ব্যাকুলতা তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত কোণে কুঁড়ির বক্ষে অবরুদ্ধ গন্ধের ন্যায় উচ্ছ্বসিত ও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিত তাহার আভাস ও নিবিড়তার স্পর্শ কাব্যের ছন্দে ছন্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তখন পর্যন্ত সেই অনুভূতি সুস্পষ্ট পথের সন্ধান বা ইঙ্গিত লাভ করে নাই।

খসরুর কবি-প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর, তাঁহার খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া দ্রাক্ষাকুঞ্জপরিপূর্ণ পারস্যের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। হাফিজ, সাদি ও রুমির অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভা ও কাব্যরসমুগ্ধ পারস্যবাসীদের পক্ষে বিদেশী কবিকে স্বীকার বা গ্রহণ করা অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিল, কিন্তু খসরুর বিরাট ও সর্বতোমুখী প্রতিভায় বিস্মিত হইয়া পারসিকগণ খসরুকে রুমি, জামি ও সাদির পার্শ্বেই সাদরে স্থান দিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। আর কোনও ফারসী ভাষার লেখক ভারতীয় কবির এই সৌভাগ্যলাভ হয় নাই। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত মুসলমান মনীষী শিবলী নোমানি বলিয়াছেন, 'গত ছয় শত বৎসরের মধ্যে আমীর খসরুর ন্যায় বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী কবি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই।' বস্তুত: পারস্যদেশের কাব্যক্ষেত্রেও এইরূপ বিরাট কবি-মনীষীর আবির্ভাব খুবই কম হইয়াছে। সাদী, হাফেজ বা ফেরদৌসী কাব্যরচনার এক একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র ও প্রকাশভঙ্গির ভিতর দিয়া নিজ নিজ ভাবধারা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমীর খসরুর মসনভী, গজল, কাসিদা ও রুবাই ফারসী কাব্যরস পরিবেশনের এই প্রধান চারিটি ধারায় বিচিত্র ভাবরসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

আমীর খসরু এক জন বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ এবং সুরকারও ছিলেন। তাঁহার আবিষ্কৃত সেতার বাদ্যযন্ত্র ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গত ও সুরবাহনরূপে বিরাজ করিতেছে। তাঁহার এই সেতার যন্ত্র আবিষ্কার সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একদিন ভ্রমণকালে তিনি দেখিলেন বৃক্ষ-কোটরে বিলম্বিত একটি মৃত বাঁদরের শুষ্ক অন্ত্রে শাখার আঘাত লাগিয়া বিচিত্র ধ্বনি ও সুরসঙ্গতির সৃষ্টি হইতেছে। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখিয়া ও সুর শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তিনি সেতার যন্ত্রের রূপদান করেন।

সুফী কবি খসরুর কাব্য পরিক্রমার পূর্বে সুফী ভাবধারার সহিত পরিচয় একান্ত প্রয়োজন। পারস্যের গুলাবসুরভিত ও দ্রাক্ষারসসিক্ত ভূমি হইতে সুফীবাদের জন্ম। সুফী সাধক-শ্রেষ্ঠ মৌলানা জালালুদ্দীন রুমি, জামি ও হাফেজের কাব্য ও ভাবসাধনায় উহার লালন, পোষণ ও বিকাশ হয় এবং আমীর খসরুর কাব্য-সাধনার ভিতর সেই সুফীবাদ ফারসী ভাষার মাধ্যমে ভারতবর্ষে প্রচার ও প্রসারলাভ করে। সুফীবাদ ইসলামের তাছাওউফ্ বা প্রেমধর্মের ভাবরসকে অবলম্বন করিয়াই বিবর্তিত হইয়াছে। সৃষ্টির সহিত স্রষ্টার, মানুষের সহিত আল্লার, প্রেমিকের সহিত প্রেমাস্পদের যে বন্ধন ও যোগ তাহা মূলত: প্রেমের যোগ। সাধক মনে করেন, তাঁহার সহিত আল্লার যে সম্বন্ধ তাহা অহৈতুকী প্রেমের সম্বন্ধ অর্থাৎ যে সম্বন্ধের মধ্যে স্বার্থের সম্পর্ক বা বাধ্যবাধকতা নাই, ভীতি প্রদর্শন বা শাস্তির বিধান নাই—এক মধুর প্রেমের বন্ধনে মানুষ স্রষ্টার সহিত হয় যোগযুক্ত। এই পারস্পরিক প্রীতি ব্যতীত স্রষ্টা ও সৃষ্টি দুয়েরই অস্তিত্ব নিরানন্দ ও নিরর্থক। প্রেমিক সুফী সাধক প্রেম-সাধনার পথে প্রেমাস্পদ আল্লার সান্নিধ্য ও দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কারণ তাঁহার আত্মা সেই পরমাত্মার আনন্দময় সাহচর্য্য হইতে বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে—তাই তাঁহার সহিত মিলনের জন্য সাধকের এত ব্যগ্রতা ও ব্যাকুলতা। দেহের কারায় বন্দী মানবাত্মার ক্রন্দন, প্রেমাস্পদের বিরহ-বেদনায় অধীর সাধক-মনের আকুলতা সুফী সাধকদের রচিত কাব্য ও সঙ্গীতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের প্রেমার্ত হৃদয়ের আবেদন ফুটিয়া উঠিয়াছে পারস্যের সুফী কবি জামির ভাবগম্ভীর কণ্ঠে :

> আমার মস্তক তোমার দ্বারে করেছি নত—
> পারিশ্রমিকের লোভে নয়—
> তোমার প্রেমের আদেশে।

প্রেমাস্পদের বিরহ-বেদনা এবং তাহার প্রতি প্রেম ভক্তি ও ব্যাকুলতা প্রকাশের জন্য সুফী কবিগণ বহু শব্দ ও ভাব-প্রতীক গ্রহণ করিয়াছেন। পারস্যের সুফীদিগের মত আমীর খসরুও প্রিয়া, সাকী, পিয়ালা, শরাব, গুলাব প্রভৃতি শব্দ প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করিয়া আপনার অন্তরের আনন্দ-বেদনা অনুভূতিরসে সিক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমীর খসরুর এই সুফী ভাবধারা সঞ্জীবিত ও উদ্দীপিত হইয়া উঠে সাধক-শ্রেষ্ঠ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার সাহচর্য ও সংস্পর্শে। সুফী-সাধক নিযামুদ্দীন আউলিয়ার সান্নিধ্য লাভ করিয়া আমীর খসরুর ভাবোচ্ছ্বাস শতধারায় বিপুল বেগে উৎসারিত হইতে থাকে। বস্তুত: আমীর খসরুর কবি- ও -সাধক-জীবনের পূর্ণ স্ফূর্তি ও পরিণতির ব্যাপারে সাধকপ্রবর নিযামুদ্দিন আউলিয়ার আধ্যাত্মিক শক্তি বিশেষ ভাবে কার্যকরী হইয়াছে। যেটুকু দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও জড়তা খসরুর অধ্যাত্ম-জীবনকে আচ্ছন্ন ও আড়ষ্ট করিয়াছিল

খাজা নিয়ামুদ্দীনের সাধনার দীপ্তিতে তাহা অপসৃত হইয়া যায়।

আমীর খসরু ছিলেন নিয়ামুদ্দীন আউলিয়ার নিত্য-সঙ্গী। একদিন খসরু খাজা সাহেবের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে যমুনা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। যমুনা নদীতে তখন কয়েকজন পুণ্যার্থী হিন্দু নরনারী স্নান করিতেছিলেন। তাঁহাদের দেখিয়া খাজা সাহেব মন্তব্য করিলেন, প্রত্যেক ধর্মেরই একটি সহজ পথ আছে। খসরু খাজা সাহেবের দিকে ফিরিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন, আমি কিন্তু 'কায্ কুলাহ্'কে আমার কেবলাহ্ বা লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, খাজা সাহেব 'কায্ কুলাহ্' নামেও খ্যাত ছিলেন, কারণ তিনি সর্বদা মাথার এক দিকে বাঁকা ভাবে টুপি পরিধান করিতেন। 'কায্ কুলাহ্' শব্দের অর্থই হইল 'বাঁকা টুপি'।

আমীর খসরুর কবিতায় বিশেষ করিয়া তাঁহার 'দিওয়ানে' ভাবধারা রসপক আঙ্গুর ফলের মত জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। সুফী সাধকের উদারতা, ভাবতন্ময়তা ও সুদূরের পিপাসা তাঁহার দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তিকে স্বচ্ছ করিয়াছে এবং তাঁহার অন্তরে চিরসুন্দরের বিরহ-বেদনা যে তীব্রতালাভ করিয়াছে, প্রেমাস্পদের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা যে আশা-নিরাশার আনন্দ-বিষাদে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা সর্ব-কালের মুক্তিপিপাসু ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে এবং চির অজানার সন্ধানে ভক্তমনকে উদ্বুদ্ধ করে। সাধনার ক্ষেত্রে আমীর খসরু প্রেমের পথকেই বরণ করিয়াছিলেন। এই পথে যুক্তি নাই, তর্ক বিচারের স্থান নাই—শুধু আছে প্রেম ও প্রীতির সহিত সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া চিরসুন্দর প্রিয়তমের সন্ধান করা। অন্তরের নিবিড় বেদনা-বোধই সাধককে এই পথের নির্দেশ দান করে। প্রেমাস্পদের জন্য ভক্তপ্রেমিক আমীর খসরুর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে—কোন যুক্তিই সে উন্মাদনাকে সংযত করিতে পারিতেছে না:

যুক্তি দিয়ে যায় কি ঢাকা
উন্মাদনা সত্যিকার
বুদ্ধি বিচার সকল কিছু
লোপ পেয়েছে আজ আমার
এ সব বালাই রইলে বিপদ—
নইলে সবি চমৎকার।
প্রেম ও বিচার এই দুটো চিজ
যেন তফাৎ আগুন জল।

একমাত্র একনিষ্ঠ প্রেমই এই পথের পাথেয়। যুক্তিতর্ক মানুষের মনকে নীরস ও শুষ্ক করিয়া তোলে—শুধু প্রেমই দেয় সেই অজানা পথের সন্ধান। রবীন্দ্রনাথ এই একই সুরে গাহিয়াছেন—

মিথ্যা আমি কি সন্ধানে যাব কাহার দ্বার
পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।
শুধাতে যাই যারই কাছে
কথার কি তার অন্ত আছে
যতই শুনি চক্ষে ততই লাগায় অন্ধকার—
পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।

আর ভক্তসাধক কবীর বলিতেছেন—

ডগরা (পথ) মোহে কোন দিখাই···
ডর নাহি কুছো ডগরা না পুছো
বাঁশরী শুনত কবীরা বাঢ় যাঈ
পিতম (প্রিয়তম) বোলাও ত আনহারি (অন্ধকার)
কি পারসে
কৌন বেশরম আজ মোর সাথ যাঈ।

আমীর খসরুও অন্ধকারের পার হইতে প্রিয়ের আহ্বান শুনিতে পাইয়াছেন এবং সেই অন্ধকারের নিভৃত কোণে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তিনি আপনার সকল দুঃখের অবসান করিতে চাহেন।

কেমন করে বাঁচবো বলো
জীবন মরণ তোমার হাত,
হয় মরণ আজ দাও তুমি হায়
আর কাটে না দুঃখের রাত।
না হয় এসে বাঁচাও মোরে—
সইতে নারি আর জ্বলন।
অন্তরালের অন্ধকারে
মিলতে যে চাই তোমার সাথ।

কিন্তু কবি প্রেমাস্পদের দেওয়া দুঃখকে ভয় করেন না—মৌলানা রুমির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া তিনি বলিতেছেন,

তোমার হাতে সুখ পাবো না—
জানি আমি সুনিশ্চয়
দুঃখ যদি দেবেই তবে
যেমন তোমার ইচ্ছে হয়।
পরাণ ভরে দুখ্ দিয়ে যাও,
করো নাকো তিল কসুর।
দুখ্ দিয়ে সুখ পেলে তুমি
এই ভেবে খোশ্ মোর হৃদয়।

এই দুঃখের দাহ কবির অন্তরে প্রেমাস্পদের স্মৃতি ও মিলনাকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত রাখিতেছে, বিরহের বেদনাকে তীব্র করিয়া প্রিয়ের অভাবকে আরও তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

এই করেছ ভাল নিঠুর
এই করেছ ভালো
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।

আমার এ ধূপ না জ্বালালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে,
দেয় না কিছু আলো।

আমীর খসরুও তাঁর বিরহতপ্ত হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করিতেছেন—

'মোমের মতো ঝরছে গ'লে
ব্যথা-কাতর মোর হৃদয়,
কেমন করে ভুলবো বলো
তোমার কাজল দীঘল চোখ,
তোমার নীলিম নয়ন, বধূ
ছড়িয়ে আছে আকাশময়।"

এই বিরহের প্রহর গণনা, অনন্ত বেদনা বক্ষে ধরিয়া প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় জীবন যাপন ও কাব্যের ভিতর দিয়া পরম সুন্দরের প্রতি খসরুর আত্মনিবেদনের সাধনা এক দিন সার্থক হইয়া দেখা দেয়। আমীর খসরু সুফী সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হইয়া আত্মসমর্পণের পরম আনন্দে ব লতেছেন,

মন্ তু শুদম তু মন শুদী
মন্ তন্ শুদম্ তু জাঁ শুদী
তা কস্ না গোয়েদ বাদ আযী
মন্ দিগরম্ তু দিগরী।

আমি হই তুমি, তুমি হও আমি
আমি হই তনু তুমি তার প্রাণ।
যেন, ইহার পর কেহ বলিতে না পারে :
তোমাতে আমাতে দূর ব্যবধান।

শুধু সুফী কবি ও সাধক হিসাবে নহে, সর্বপ্রথম উর্দু লেখক ও ঐতিহাসিক রূপেও তাঁহার খ্যাতি আছে। হিন্দী সাহিত্যও তাঁহার দানে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

মুহাম্মদ তুগলকের রাজত্বকালের প্রারম্ভে সাধকশ্রেষ্ঠ পীর নিয়াযুদ্দীন আউলিয়া দেহত্যাগ করেন। দিল্লীর পশ্চিম প্রান্তে বর্তমান জঙ্গপুরায় তাঁহার দেহ সমাধিস্থ হয়। নিত্য সহচর সাধকের মৃত্যুতে আমীর খসরু সর্বত্যাগী হইয়া তাঁহার সমাধির পার্শ্বে দিন কাটাইতে থাকেন। কিন্তু বন্ধু বিয়োগের ব্যথা তাঁহাকে আর অধিককাল সহ্য করিতে হইল না। খাজা সাহেবের মৃত্যুর ছয়মাস পরে ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনিও পরলোকে তাঁহার অনুগমন করেন।

আমীর খসরু ছিলেন 'আজাদ মাশরাব' বা মুক্ত ঘাটের সাধক অর্থাৎ সেই উদার ও মুক্ত দৃষ্টির সাধক যিনি সর্বঘটে, সর্বস্থানে এবং সর্বলোকে স্রষ্টার অনন্ত মহিমা ও অস্তিত্ব অনুভব করেন। মুক্ত বিহঙ্গমের মত বন-প্রান্তর ও উদ্যানভূমির বিচিত্র বর্ণগন্ধের পুষ্পসম্ভারে তিনি আস্বাদন করেন সেই পরম সুন্দরের উচ্ছ্বসিত প্রেমের শরাব। তাই 'আজাদ মাশরাতে'র সাধকগণ স্পর্শ করিয়াছেন সর্বকালের মানুষের মনকে, প্রকাশ করিয়াছেন প্রেমময়ের অনন্ত প্রেমের লীলা-বৈশিষ্ট্যকে।

তিমির বিদারি তোমার অভ্যুদয়

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

এখানে আকাশ দুর্যোগ-মেঘে আজি হায় ভরপুর,
সবাকার মনে বিষাদ কালিমা কণ্ঠে হতাশা-সুর।
জনগণ আজি দীন হ'তে দীন—
অন্ন-বস্ত্র-শান্তিবিহীন ;
পঙ্কিলতার কণ্টক লতা ঘিরিয়াছে নিঃশেষে,
রোগ-শোক-ক্ষোভ মহামারী সবে আসিছে ভীষণ বেশে!

জাতির জীবনে দুর্দ্দিন এলো—খণ্ডিতা দেশমাতা—
হাসিছে ভ্রাতার সর্ব্বনাশে যে তাহারি আপন ভ্রাতা।
সন্তান আজি জননীর কোলে,
মরণের মাঝে পড়িতেছে ঢলে ;
দারিদ্র্য আর অনাহার এসে নিতেছে সকলি লুটি—
পারে না মানুষ বাঁচাতে জীবন দুটি যে অন্ন খুঁটি'!

—তবু হুঁস নাই—ঘিরিছে যে আজ অমানিশা-আন্ধার,
মানব-জীবন লয়ে চলে হেথা চৌর্য্যের কারবার।
অর্থগৃধ্নু পিশাচ-শকুন
মানুষেরে নিতি করিতেছে খুন,—
অধর্ম্ম ও পাপের প্রভাবে হ'ল সবি নিঃশেষ ;
স্বার্থান্বেষীর অনাচারে হায় ভরে গেল সারা দেশ!

অধর্ম্ম যবে ধর্ম্মের গলে ফাঁসি দিবে অবহেলে
—তোমারি অভ্যুদয় যে তখন,—তুমি দেব, বলেছিলে,
আজি ভারতের সেই দুর্দ্দিন,
পাপের আঁধারে হয়েছে বিলীন
মঙ্গল তব পাঞ্চজন্যে জাগাও সবার প্রাণ ;
তমসার ঘোর বিদারি উঠুক শান্তির সামগান!

গোধূলির আলোয়, কাথিয়াওয়ার

শিল্পী হীরাচাঁদ দুগার ও তাঁর চিত্রকলা

শ্রীদ্বিজেন্দ্র মৈত্র

সম্প্রতি কলিকাতায় শিল্পী হীরাচাঁদ দুগারের এক শিল্পপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। যে শিল্পীর আসন এত দিন প্রতিষ্ঠিত ছিল শুধু তাঁর সতীর্থ ও অনুরাগীদের মানসলোকে, সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পরে আজ নিজের সমগ্র শিল্পসৃষ্টির ঐশ্বর্য্য সহসা সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করে তিনি শিল্পরসিকদের চমক লাগিয়ে দিয়েছেন।

শিল্পী হীরাচাঁদের প্রাথমিক শিল্পশিক্ষার সূত্রপাত হয় কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে। রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে কলাভবন প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময়কার প্রথম ছাত্রগোষ্ঠীর তিনি অন্যতম। শান্তিনিকেতনে থাকতেই শিল্পী রূপে তাঁর কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তার পর নানা কারণে সুদীর্ঘকাল তাঁকে শিল্পসাধনা পরিত্যাগ করতে হয়। মাত্র কয়েক বছর আগে তিনি নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আবার তুলি ধরলেন। বর্ত্তমান প্রদর্শনী তারই ফল।

এই ত হীরাচাঁদের শিল্পী জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছবার চেষ্টা করা অসমীচীন যে, শিল্পী শান্তিনিকেতনের ছাত্র সুতরাং তাঁর রচনা সেই শিল্পীগোষ্ঠীর আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত যা শান্তিনিকেতন স্কুল অব পেণ্টিং বা শিল্পপদ্ধতি নামে পরিচিত। সেটা হওয়াই হয়ত খুব স্বাভাবিক ছিল। কারণ শিল্পী দুগার যাকে গুরু বলে স্বীকার করেন সেই শিল্পীশ্রেষ্ঠ নন্দলালের সংস্পর্শে এসে তাঁর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা গেল শিল্পী দুগারের শিল্পকলায়। গুরুর প্রভাব কোথাও তার স্বকীয়তাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। দুগারের ছাত্রাবস্থায়, নব্য-বঙ্গীয় শিল্পান্দোলনের ভরা জোয়ার দেখা দিলে, কিন্তু তার কিছুমাত্র নিদর্শনও তাঁর তখনকার শিল্পকলায় পাওয়া গেল না।

শ্রীহীরাচাঁদ দুগার শ্রীনন্দলাল বসু-কৃত স্কেচ

তারপর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্পী শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁদের নূতন নূতন মতবাদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। ইউরোপীয়

ফতেসাগর হ্রদ, উদয়পুর

কেশরীয়াজীর মন্দির
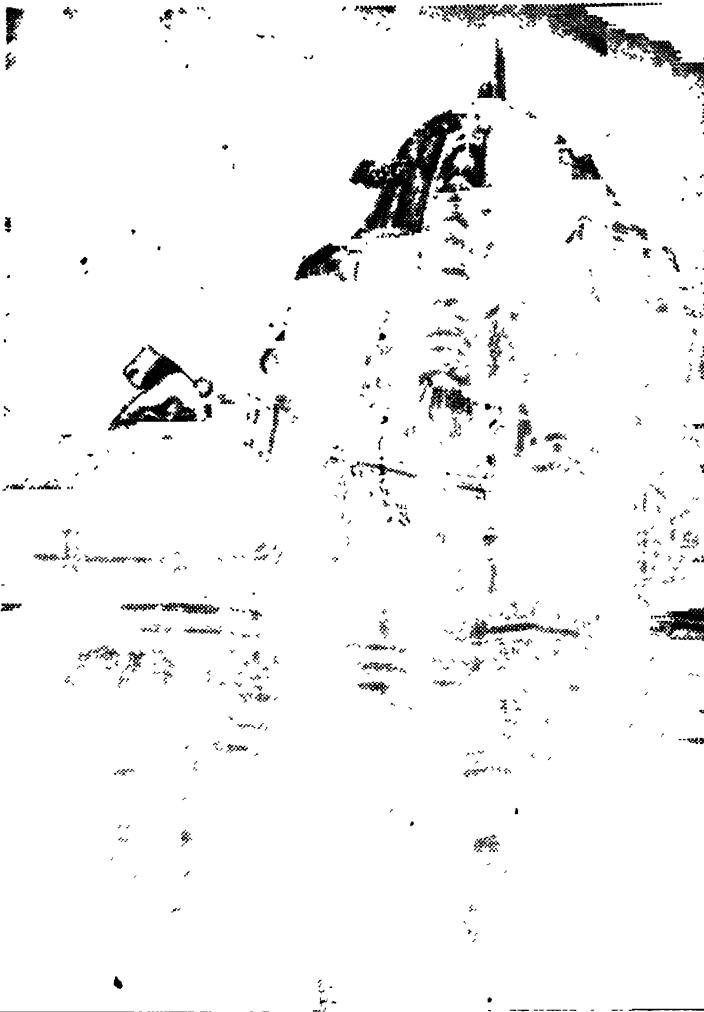
আধুনিক শিল্পরীতিও আজ আমাদের শিল্পীদের অজ্ঞাত নেই। কিন্তু শিল্পী হীরাচাঁদ সমসাময়িক যাবতীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে শিল্পসাধনায় রত ছিলেন। তাই তিনি আজ আমাদের যা উপহার দিলেন তাতে স্বকীয়তার ও মৌলিকতার ছাপ সুপরিস্ফুট। তাঁর প্রতিভার অনন্য-তন্ত্রতাকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য।

কিন্তু শিল্পী একান্ত ভাবেই ভারতীয় শিল্পের আদর্শে অনুপ্রাণিত। কিন্তু সে ভারতীয়ত্ব কোন সঙ্কীর্ণতার আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হয়নি। প্রাচ্য শিল্পের অনেক মাধুর্য্যই তাঁর শিল্পে এসে গিয়েছে। শিল্পীর এই উদার দৃষ্টিভঙ্গীর দরুন সমালোচকেরা তাঁর শিল্পে, চৈনিক, রাজস্থানী, মুঘল শৈলীর প্রভাব আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হবেন। কিন্তু এই সব শিল্পের ঐতিহ্য পটভূমিকায় থেকে দুগারের শিল্প-রচনাকে এক ব্যাপক ও উদার দৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত করেছে, তাকে কোথাও আচ্ছন্ন করে অনুকারকের পর্য্যায়ে ফেলেনি।

সাধারণভাবে দেখতে গেলে দুগারের শিল্প মিনিয়েচারধর্ম্মী। কিন্তু যাঁরা পারসিক মুঘল অথবা রাজস্থানী মিনিয়েচারের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন সেগুলির সঙ্গে হীরাচাঁদের শিল্পরচনার পার্থক্য কতখানি। কোন জিনিসকে সূক্ষ্ম ও নিবিষ্টভাবে দেখার মধ্যে একটা বিশেষ আনন্দ আছে। মিনিয়েচারের এই বৈশিষ্ট্যটুকুই শিল্পী
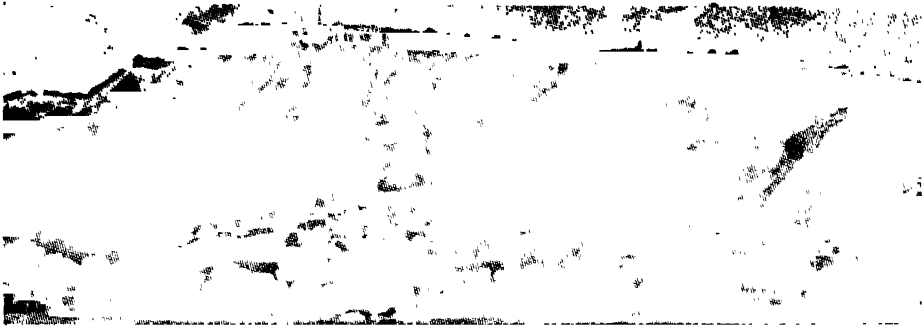
নাহারগড়, জয়পুর শিল্পী—হীরাচাঁদ দুগার

তাঁর শিল্পকলার আঙ্গিক রূপে নিয়োজিত করেছেন, কোথাও শিল্পীর তুলিচালনা ও রেখারচনার দক্ষতার অহঙ্কার তাতে ব্যক্ত হয় নি। তাঁর কয়েকটি রচনা ব্যতীত অধিকাংশ রচনাই আকারের দিক থেকে বিশাল। বিশাল চিত্রপট বিশুদ্ধ মিনিয়েচার-শিল্পের আশ্রয় নয়। কারণ মিনিয়েচারের সার্থকতা দৃষ্টির কেন্দ্রীভূত একাগ্রতায়। কিন্তু চিত্রপট বিরাট হলে প্রতিমুহূর্তে দৃষ্টিকে স্থানান্তরিত করতে হয়। সুতরাং নিবিষ্টভাবে উপভোগের রস থেকে মন বঞ্চিত হয়। শিল্পী দুগার মিনিয়েচারের আশ্রয় নিয়েছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। এই মিনিয়েচারের প্রতি প্রবণতা শিল্পীর অন্তর্নিহিত বাস্তববাদিতা ও ডেকোরেটিভ মানসিকতার প্রকাশ মাত্র। কিন্তু শিল্পী দুগার যতখানি বাস্তববাদী তার চেয়েও ঢের বেশী আদর্শবাদী। মানসিকতার এই যুগ্মধারা তাঁর শিল্পকে এক বিশেষ মহিমা দিয়েছে। মিনিয়েচার-পন্থীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এইখানেই।

প্রশান্তি, প্রতিকৃতি, জীবনের ঘটনা সব কিছুই শিল্পীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছে। কিন্তু তাঁর প্রতিভার চরম বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে। ভারত-শিল্পে নিসর্গের স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। অবশ্য ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষা যখন আমাদের দেশে প্রবর্তিত হ'ল তখন অনেকেই প্রকৃতিকে বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে শিল্পরচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের সে প্রয়াস শুধু ব্যর্থ অনুকরণেই পর্য্যবসিত হয়েছে, মৌলিক শিল্পরচনা হয়নি। প্রকৃতির মধ্যে যে একটি সহজ ভাবালুতার দিক আছে, সেই দিকেই আমাদের শিল্পীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। যখন প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের শিল্পের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সুরু হ'ল তখন রূপ-জগতের এই অবহেলিত

প্রাচীন মন্দির, রাজগৃহ
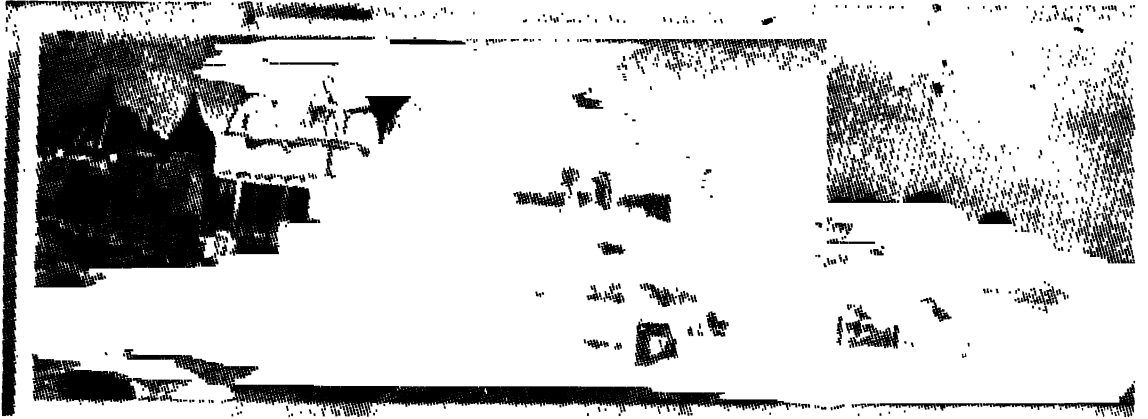
রাজগীর কুণ্ড

দিকটির প্রতি আমাদের শিল্প-চেতনা জেগে উঠল। তারই প্রথম প্রকাশ দেখা গেল অবনীন্দ্রনাথের নিসর্গচিত্রে। তারপর অনেক শিল্পীই নিসর্গ-চিত্রের দিকে নজর দিয়েছেন। কোথাও কোথাও শিল্পীর মৌলিকতাও লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু শিল্পী দুগার নিসর্গ-চিত্রের যে রূপটি আজ আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করলেন তা এত সার্থক, এত হৃদয়গ্রাহী যে কি প্রাচীন, কি আধুনিক সমগ্র ভারতশিল্পে তার তুলনা পাওয়া কঠিন। তাঁর আঁকা কাশ্মীরের চিত্রাবলীর মধ্যে যে রোমান্টিক অথচ স্পর্শ-কাতর শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া গেছে তার মাধুরী সকলের মনেই প্রভাব বিস্তার করবে। তারপর রাজগীর বা রাজগৃহ উদয়পুর ও কাথিয়াওয়াড়ের দৃশ্যাবলী তাদের গাম্ভীর্য্যে, বিশালতায় ও মহত্ত্বে এক অভিনব রূপ-জগতের সন্ধান দিয়েছে।

পূর্ব্বেই বলেছি, শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে দুটি বিপরীত মানসিকতার আশ্চর্য্য সমন্বয় ঘটেছে। শিল্পীর নিসর্গ-চিত্র-গুলিতে এটা আরও স্পষ্ট করে অনুভব করা যায়। একদিকে একটা নিবিড় বস্তুলীনতা (objectivity) চিত্রের মধ্যে সুস্থতা (Sanity) ও স্থিরতা এনে দিয়েছে, আর এক দিকে আত্মলীন (subjective) মানসিকতা বাস্তবকে আত্মসাৎ করে এক অখণ্ড ভাব-জগতের সৃষ্টি করেছে। যাঁরা শিল্পীর মনের এই রহস্যটুকু উপলব্ধি না করে তাঁর চিত্র দেখবেন তাঁদের কাছে তাঁর অনেক চিত্রই ফোটোগ্রাফিক বা আলোকচিত্রধর্মী বলে প্রতীয়মান হবার সম্ভাবনা। শিল্পীর এই বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখবারও একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে। তা হচ্ছে প্রকৃতির পরিচ্ছন্ন ও শান্ত রূপের দিক—পাহাড়, গাছপালা, সরোবর সব কিছুই শান্তির বিমল আলোকে স্নিগ্ধ।

যে যুগে আমরা বাস করছি, তার উত্তেজনা ও কোলাহল আজ যাবতীয় শিল্পকলা ও সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত। হীরাচাঁদ হয়ত বিগত যুগের শেষ প্রতিনিধি। আধুনিকতার প্রভাবমুক্ত এই শিল্পী চেষ্টা করেছেন সুন্দরকে সুন্দরতর করে প্রকাশ করতে, তাই তাঁর শিল্পে পাওয়া যায় সূক্ষ্মতা, মননশীলতা সুস্থতা ও শান্তি এই কয়টির সমন্বয়।
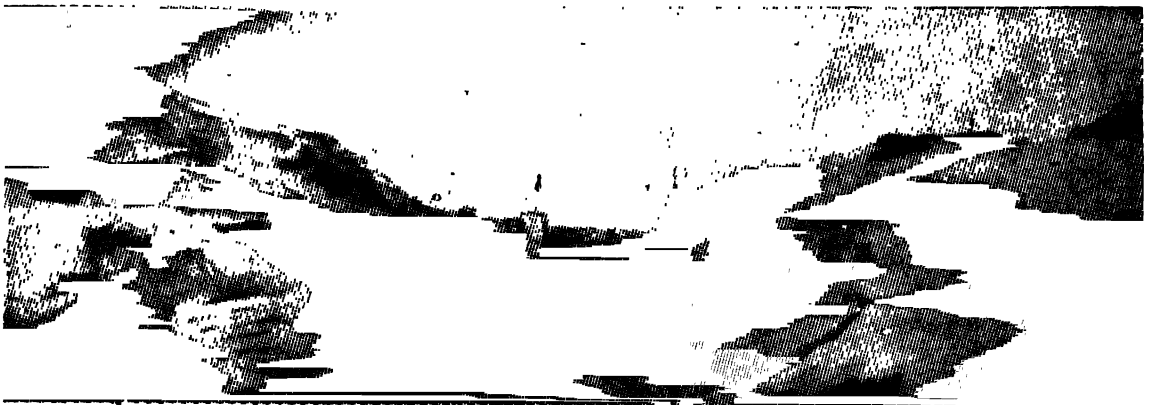
বাণগঙ্গা, রাজগৃহ

নব-বোধন

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

ভর্ত্তির উমেদারের তালিকায় নাম ছিল শ'খানেকেরও বেশী। তথাপি সুরবালা আসতে না আসতেই 'বেড' পেয়ে গেল। সেটা তদ্বিরের জোরে নয়, তার নিজের কোন বিশেষ গুণের জন্যও নয়, স্রেফ তার রোগের গুরুত্বের জন্য।

আউট-ডোরের ডাক্তার দু'চারবার তার পেট টিপেই ভ্রূকুটি করে বললে, এত দিন আনেন নি কেন একে? এখন তো দেখছি একেবারে শেষ অবস্থা—অপারেশন ছাড়া কোন উপায়ই নেই। রাজী আছেন আপনারা?

পাছে সুরবালা শেষ মুহূর্ত্তে আবার একটা গোলমালের সৃষ্টি করে বসে সেই আশঙ্কায় রসময় তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়ে ফেললে, নিশ্চয়—সেইজন্যই তো অত দূর থেকে এখানে আসা।

লেখাপড়ার পর্ব্ব শেষ করে ডাক্তার পাশের কুলিকে সংক্ষেপে বললেন, ফিমেল সার্জ্জিক্যাল।

কুলিটিও তৎক্ষণাৎ সুরবালার কাছে এগিয়ে এসে বললে, চলিয়ে মাইজী—উপর চলিয়ে।

কিন্তু সুরবালা অনড়—সে যেন পাথরের মূর্ত্তি।

ভিড় ঠেলে রসময় নিজেই তার কাছে এগিয়ে গেল, তার হাত ধরে অনুনয়ের কোমল স্বরে বললে, ওঠ, উপরে যাও তুমি—তোমাকে ভর্ত্তি করে নেওয়া হয়েছে।

দাঁতে দাঁত চেপে এতক্ষণ আত্মসম্বরণ করেছিল সুরবালা, কিন্তু এবার তার অত যত্নের অত শক্ত বাঁধ একেবারেই ভেঙে পড়ল। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে সে বললে, আবার তোমায় দেখতে পাব তো?

কি পাগল!—রসময় বিব্রত হয়ে বললে।

ঘরভরা লোক, জোড়া জোড়া অনেকগুলি চোখ কুতূহলী হয়ে তাদের উপর এসে পড়েছে। তথাপি স্বামীকে প্রায় জড়িয়ে ধরেই সুরবালা আবার বললে, বড্ড ভয় করছে আমার।

'ছিঃ!'—রসময় ভর্ৎসনার সুরে আশ্বাসের মিশাল দিয়ে উত্তর দিলে, বলি নি তোমায়? খুব ভাল ব্যবস্থা আছে এখানে, স্বরাজ হবার পর আরও ভাল হয়েছে—বাড়ীর চেয়ে কত ভাল!

রসময় বলেছিল সবই। আজন্ম পল্লীবাসিনী স্ত্রীকে কলকাতার হাসপাতালে যেতে রাজী করাবার জন্য জানা সত্য আর কল্পনার সৃষ্টি একত্র মিশিয়ে সরকারী হাসপাতালকে সে স্ত্রীর চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলেছিল অপূর্ব্ব মনোহর রূপে।

রোগক্লিষ্ট মানুষকে নিরাময় করবার জন্য বিজ্ঞানের যে অপরিমেয় দান তাকেই সাধারণের কাজে লাগাবার সুব্যবস্থার বাহ্যিক রূপই তো হাসপাতাল। বড় ডাক্তারের মোটা দক্ষিণা, ভাল ভাল ওযুধ আর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির দাম দেবার সাধ্য গরীবের নেই বলেই বড়লোকদের উপর ট্যাক্স বসিয়ে সেই টাকায় হাসপাতাল গড়া হয়েছে। স্বরাজ হবার পর হাসপাতালের সুব্যবস্থা সম্বন্ধে আরো অনেক কথাই বলেছিল রসময়।

সুরবালার মনে ছিল সবই, কিন্তু স্মৃতি থেকে এক ফোঁটাও সান্ত্বনা পেলে না সে, স্বামীর মুখের কথাগুলি থেকেও নয়। সব কথা কানেও গেল না তার—নিজের বুকেরই অবিরাম ঢিপ ঢিপ শব্দের নীচে যেন চাপা পড়ে গেল সেগুলি।

আরও দুর্দ্দৈব—বিদায়কালে স্বামীর মুখ ভাল করে দেখতেও পেলে না সে।

বুক ফেটে কান্না উঠেছে তার। শ্রাবণের বৃষ্টিধারার মত উদ্বেলিত অশ্রুর অবিরাম প্রবাহকে ভেদ করে চোখের দৃষ্টি যেতে পারে না। অতগুলি সিঁড়ি ডিঙিয়ে, অতবড় বারান্দা অতিক্রম করে, অতগুলি কামরা পার হয়ে কতক্ষণে কেমন করে যে নিজের ওয়ার্ডে এসে সে পৌঁছল তা সে বুঝতেও পারলে না।

কিন্তু অমন যে অবিরল অশ্রুপ্রবাহ তাও ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই থেমে গেল—এক নিমেষেই বাহির ও ভিতরের সব জলই বাষ্প হয়ে উড়ে গেল যেন। দেখতে না চাইলেও যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল তা কোন দিন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি সে।

বড় হাসপাতালের সার্জ্জিকাল ওয়ার্ড। এ যেন আসুরিক প্রক্রিয়ায় যমের সঙ্গে মানুষের মরণপণ সংগ্রামের রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্র।...যেমন সব রোগ তেমনি তাদের চিকিৎসা। মানুষের সহজ, সাবলীল, সুন্দর রূপকে অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রয়াসে বিকৃতি ও বীভৎসতার প্রয়োগের দুর্ব্বোধ্য পরিকল্পনা।

কোন না কোন অঙ্গে হয় গভীর ক্ষত, না হয় ভগ্ন বা বিকল অস্থি নিয়ে যন্ত্রণাকাতর মুখে অনির্দ্দিষ্ট প্রতীক্ষা—বিভিন্ন অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কুঞ্চিত বা প্রসারিত করে আরামের প্রত্যাশায় পলক গণনা—কাঠের পিঞ্জরের মধ্যে সচল দেহকে বন্দী করে নিষ্প্রাণ জড়তার দুঃসহ ভার বহন—উর্দ্ধবাহু বা উর্দ্ধপদ হয়ে সন্ন্যাসের কৃচ্ছ্রসাধনার অবাঞ্ছিত অনুকরণ—তুলা ও কাপড়ের বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ দেহগুলি যেন মানবদেহের ক্রমবিবর্ত্তনের এক একটি সযত্নে রক্ষিত নিদর্শন।

ওষুধের তীব্র গন্ধের সঙ্গে গলিত ক্ষতের দুর্গন্ধের সংমিশ্রণে ভিতরের বাতাস বোধ করি বা নরকেরই ক্ষীণ আভাস দেয়।

লোহার ছোট বড় পাত্র ও কাঠের বিভিন্ন আকৃতির নানা সরঞ্জামের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণের মধ্যে যেন মানুষের সহনশীলতার চরম পরীক্ষা চলছে সেখানে।

মাথার মধ্যে কেমন করে উঠল সুরবালার। যন্ত্রচালিতের মত সে উপরে উঠে এসেছিল, মূর্চ্ছিতের মত একটা খাটের উপর এলিয়ে পড়ল সে।

সুরবালার চেতনা ফিরে এল একটা সম্ভাষণে, শুনুন তো, —এ কি—কাঁদছেন কেন?

অচেনা গলা তবে রুক্ষ নয়। শুধু মেয়েলী বলেই কোমল নয়; অনুনয় তো বটেই, একটু যেন আন্তরিকতারও রেশ আছে তাতে। সসঙ্কোচে চোখ তুলে তাকাল সুরবালা।

কাঁচা বয়সের মেয়ে—তারই সমবয়সী হবে হয় তো। অদ্ভুত সাজ—মাথায় সাপের ফণার মত উন্নত কি এক রকমের চূড়া; ব্লাউজের সঙ্গে কালোপাড়ের শাড়ী এমন আঁটসাঁট করে পরা যে দেহের প্রায় প্রত্যেকটি রেখাই দেখা যায়। কাপড় যে এত সাদা হতে পারে তা আগে ভাবতেও পারে নি সুরবালা। তাদের গাঁয়ে, তার চেনা-জানা যত মেয়ে আছে তাদের মত একেবারেই নয়। তবে মেমসায়েবও নয় মেয়েটি। একবার চেয়েই দেখতে পেলে সুরবালা যে ঐ নিঃসঙ্কোচ আরুহীন মেয়েটির মুখেও বাংলার পল্লীর কচি কলাপাতার স্নিগ্ধ শ্যামলিমা মাখানো রয়েছে—ঠোঁটের উপরেই খেলে বেড়াচ্ছে বেশ মিষ্টি রকমের হাসির চঞ্চল একটি টুকরা।

সে সেবিকা। সুরবালা পরে জানতে পেরেছিল যে তার নাম মীনা সরকার—এই হাসপাতালেই কাজ শিখে পরে চাকরি পেয়েছে।

চোখে চোখ মিলতেই মীনা আগের চেয়েও কোমল কণ্ঠে বললে—কাঁদতে নেই—ছিঃ! কি রোগ হয়েছে আপনার?

পেটে ব্যথা, ঢোঁক গিলে উত্তর দিলে সুরবালা।

পেটে ব্যথা! মীনার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ বেজে উঠল যেন—কৈ, দেখি। বলে তার হাতের কাগজখানা টেনে নিলে সে; আগ্রহের সঙ্গে পড়ল সবটা; কিন্তু পরে আশ্বাসের স্বরে বললে—না, শক্ত কিছু নয়।

কিন্তু উনি যে বললেন, কাটাকুটি করতে হবে?

কে বললেন, ডাক্তার বাবু?

না—আমাদের উনি।

উনি কে? ও—আপনার স্বামী বলেছেন ও কথা?—বলতে বলতে হেসে ফেললে মীনা। সুরবালা লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিলে।

মীনা সহাস্যকণ্ঠেই আবার বললে—ডাক্তারবাবু লেখেন নি সে কথা। আর কাটাকুটি করতেও যদি হয়, তাতে ভয়ের কিছু নেই। কত জনের কত রকম কাটাকুটিই ত এখানে হচ্ছে—রোজই।

তারপর মুখ ফিরিয়ে ডাকলে আর একটি মেয়েকে, 'টগর, নূতন এসেছেন ইনি; এঁর বিছানা, কাপড়-চোপড় ঠিক করে, দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে দাও সব।'

কণ্ঠস্বর কর্তৃত্বের, মুখখানা তো আগেই গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল—আর কোন কথা তাকে জিজ্ঞাসা করবার সাহস হ'ল না সুরবালার। কিন্তু মীনা নিজেই চলে যাবার উপক্রম করেও হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আবার তাকাল সুরবালার মুখের দিকে, ঠিক আগের মতই মিষ্টি হেসে আশ্বাসের কোমল স্বরে বললে, কিছু ভাববেন না আপনি, এখানে কোন কষ্ট হবে না আপনার। আমরা ত আছি—দিন হোক, রাত হোক, ডাকলেই কোন একজনকে আপনি নিশ্চয়ই পাবেন।

মীনা চলে যাবার পর টগরের দিকে তাকাল সুরবালা।

নামের সঙ্গে মুখের সাদৃশ্য নেই। প্রৌঢ়া নারী, বয়স ত্রিশের উপর নিশ্চয়ই। দেহের বাঁধুনি আর নেই, চামড়ায় লোল ধরেছে, মেদের বাহুল্য সুস্পষ্ট, রঙও কালো। তবে মুখের গড়নটি মন্দ নয়, ভাবটাও হাসিখুশী। পরিচ্ছন্ন শাড়ীখানার দৃঢ় ও সুবিন্যস্ত বন্ধনের মধ্যে ভালই দেখায় তাকে।

একটু উঠুন ত আপনি, টগর তাকে বললে, বিছানাটা পেতে দিই।

সুরবালা উঠে দাঁড়াল, কিন্তু কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আপনি কেন? ছিঃ! আমিই পাতছি বিছানা।

তা কি হয়! টগর উত্তর দিলে, আপনি হলেন গিয়ে রুগী। আমি থাকতে আপনি বিছানা পাতবেন কেন?

আপনি?

আমি এখানকার ঝি।

ঝি!

হ্যাঁ ঝি—আমায় আপনি 'তুমি' বলবেন,—বলে টগর বিছানায় মন দিলে।

বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইল সুরবালা। বাড়ীতে ঝি তার কোনদিনই ছিল না। কথাটার চলতি মানে সে জানে এবং সেই জানাটাই তার বিহ্বলতার কারণ। নিজের বাড়ীতে না হলেও দেশের জানাশোনা বড়লোকের বাড়ীতে এ পর্য্যন্ত যত দাসী সে দেখেছে তাদের কারও সঙ্গেই ঐ রমণীটির কোন সাদৃশ্য নেই। কথাবার্ত্তায়, চালচলনে একে ছোট ঘরের মেয়ে বলে বোঝাই যায় না। ওর পরিচ্ছন্নতাও অসামান্য। দেহের নির্ম্মলতা আর বস্ত্রের শুভ্রতায় গ্রামের ছোট জাতের মেয়েদের কেন, স্বয়ং সুরবালাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে ও। বিশেষ করে এই প্রত্যক্ষ সত্যটা উপলব্ধি করেই সুরবালা আরও বেশী অনুচিত হয়ে পড়ল।

টগরের হাতের কাজ শেষ হবার আগেই আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললে সে, আপনাকে তুমি বলে ডাকতে পারব না আমি।

কি বললেন ?—চমকে সোজা হয়ে দাঁড়াল টগর।

সুরবালা কুণ্ঠিত স্বরে আবার বললে, আপনি যা'ই হউন না কেন, আপনাকে ডাকতে 'তুমি' মুখে আসবে না আমার।

কেন ?

আর কিছু না হোক, আপনি বয়সে আমার বড় সেইজন্যে। আমি আপনাকে দিদি বলে ডাকব, আর আপনি আমার নাম ধরে তুমি বলে ডাকবেন।

টগর কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে, তারপর হেসে ফেলে বললে, মাঝামাঝি একটা রফা করা যাক তা হলে, কোন পক্ষেই আপনি বলবার দরকার নেই। তুমি আমায় দিদি বলে ডাকতে চাও ত ডেকো, তবে আমিও তোমায় দিদিমণি বলব। এখন এস ত এখানে—না শুলেও বিছানায় উঠে বোস। হাসপাতালের নিয়ম বড় কড়া,—না মানলে নাম কেটে বের করে দেবে।

বেশ যত্ন করে টগর নিজেই গুছিয়ে দিলে সব। চট্ করে একটা পরদা খাটিয়ে তারই আড়ালে সুরবালাকে হাসপাতালের শাড়ী ব্লাউজ পরিয়ে দিলে সে। মাথার কাছে ছোট আলমারিটির ভিতরে টুকিটাকি দরকারী জিনিসগুলি এবং উপরে ঢাকা-দেওয়া জলের গ্লাসটা গুছিয়ে রেখে তারপরে সে জিজ্ঞাসা করলে, কি অসুখ করেছে তোমার দিদিমণি ?

'পেটে ব্যথা', উত্তর দিলে সুরবালা, মোটামুটি উপসর্গগুলির একটা বর্ণনাও দিলে সে।

শুনে বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে টগর বললে, বুঝেছি, আঁতে ঘা হয়েছে তোমার—তলপেট কাটতে হবে।

কিন্তু উনি—মানে, তোমাদেরই ঐ মেয়েটি যে বললেন, কাটতে হবে না ?

ওরা অমন বলেই থাকে, বলে মুখ টিপে হাসলে টগর।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই ব্যস্ত হয়ে উঠে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে আবার বললে, ও কি, মুখ শুকিয়ে গেল কেন ? কত রুগীর পেট কাটা হয় এখানে।

হয় !

হয় না ? সপ্তাহে দু'এক জন ত নিশ্চয়ই। ঐ দেখ না, তোমার পাশেই যিনি আছেন, তাঁর পেট কাটা হয়েছে পাঁচ-ছ' দিন আগে।

তাকিয়ে দেখলে সুরবালা—বুক পর্য্যন্ত কম্বলে ঢাকা দিয়ে মেয়েটি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে—মুখ বিবর্ণ, চোখ বোজা।

কিন্তু টগর আবার তাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, ভাল হয়ে যায় সবাই, আর খুব বেশী দিন কাউকে ভুগতেও হয় না। এই ওঁকে দেখ না, উনি সেরে উঠেছেন—পুরো তিনটি সপ্তাহও লাগে নি।

আধাবয়সী যে মেয়েটিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে টগর কথাগুলি বললে, সে এগিয়ে এল সুরবালার কাছে ; হাসিমুখে তার মুখের পানে চেয়ে বললে, সত্যি, ভয় পাবেন না আপনি। কাটবার সময় জানাই যায় না, আর সেরেও যায় খুব শীগ্‌গির। এ'রা সেবা যত্নও করেন খুব।

অত বাড়িয়ে বল না, দিদি!

ক্ষীণ কিন্তু তীক্ষ্ণ কণ্ঠের প্রতিবাদ কানে এল সুরবালার। তিন জনেই চমকে উঠল, তিন জোড়া অনুসন্ধিৎসু চোখের দৃষ্টি একসঙ্গে গিয়ে পড়ল পাশের খাটে শায়িতা রোগিণীটির মুখের উপর।

কিন্তু একটুও অপ্রতিভ হ'ল না সে ; বরং সুরটা আরও এক পরদা উঁচুতে চড়িতে বললে, যত্ন না ছাই! দশ বার ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না, তার আবার—ঠোঁট বেঁকিয়ে মুখখানা ফিরিয়ে নিলে সে।

টগরের মুখখানা একটু যেন কঠিন হয়ে উঠল, বেশ একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই সে উত্তর দিলে, সত্যি দশ বার ডেকেও সাড়া যদি নাই পাওয়া যেত তবে কথাটা শোনাবার জন্য আপনি দিদি আর বেঁচে থাকতেন না এতদিন।

কিন্তু ফিরে সুরবালার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে সে, বললে, হয়েছিল কি জান দিদিমণি ? নার্স দিদিমণিদের মীটিং ছিল সেদিন। যার ডিউটি ছিল আসতে একটু দেরী হয়েছিল তার। সেই কথাটাই উনি সুযোগ পেলেই আজও শোনাচ্ছেন।

প্রতিবাদ করলে না রোগিণীটি, কিন্তু সুরবালা হক্‌চকিয়ে গেল। টগরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার মুখের ভাব সহজ হয়ে এসেছিল, কিন্তু আবার যেন সন্দেহের মেঘ নেমে এল তার মুখের উপর।

বোধ করি বা সেটা লক্ষ্য করেই টগর বললে, এস দিদিমণি, স্নানের ঘর-টর সব দেখিয়ে দিই তোমায়।

দেখতে দেখতে সন্দেহ ও আশঙ্কার ভাবটা কেটে গেল সুরবালার। রোগের বিকৃতি এখানে আছে বটে, কিন্তু আশ্বাসের দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই।

সত্যই বিপুল আয়োজন,—আজন্ম পল্লীবাসিনী সুরবালার চোখে সে এক বিরাট বিস্ময়।

প্রকাণ্ড ঘর, উঁচু ছাদ, দু'ধারেই প্রশস্ত বারান্দা, দু'দিকেই বড় বড় দরজা আর জানালা—হু হু করে অনবরত বাতাস খেলছে। ভিতরে সারি সারি খাট, তার উপর পরিপাটি করে বিছানা পাতা। ধবধবে শাদা চাদরের উপর টকটুকে লাল কম্বল—বর্ণের উদ্ভত বৈচিত্র্য। সুশৃঙ্খল বিন্যাসের হাল্কা

বন্ধনের মধ্যে সংযত শালীনতায় শান্ত। প্রত্যেকটি খাটের মাথার কাছে ছোট, নীচু এক একটি আলমারি, নীচে পিকদানী। খটখটে শান-বাঁধানো মেঝেতে এক তিলও ধুলো নেই—এমন মসৃণ আর এমন পরিষ্কার যে মনে হয়, ওতে আয়নার মত মুখই দেখা যাবে হয় তো!

সত্যি, স্নান প্রসাধন সবকিছুরই ব্যবস্থা এখানে চমৎকার! সুরবালা অবশেষে মুখ ফুটে বলেই ফেললে। তার কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বাস।

টগর স্মিত মুখে উত্তর দিলে, হ্যাঁ দিদিমণি—সরকারী ব্যবস্থা কিনা! গরীবের জন্য অঢেল টাকা ঢেলে এ সব আয়োজন করেছেন এঁরা।

সুরবালাকে নিজের বিছানায় বসিয়ে দিয়ে টগর বললে, বোস তুমি দিদিমণি, তোমার দুধের কথাটা বলে আসি।

দুধ!

হ্যাঁ গো—ভর্ত্তির দিন রুগীকে দুধ ছাড়া আর কিছুই দেওয়া হয় না। আর তোমার যা রোগ—ক'দিন কেবল দুধ খেয়েই থাকতে হয় কে জানে!

সে ভাবনা সুরবালার মনে ওঠে নি। সে ভাবছিল কেবল ঐ দুধের কথা—স্নিগ্ধ, সুমিষ্ট, প্রাণপূর্ণ অমৃতের নিশ্চিত প্রাপ্তির অপ্রত্যাশিত প্রতিশ্রুতির।

পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, পাড়াগাঁয়ের বৌ সুরবালা। তথাপি দুধ বস্তুটি তার কাছে দুর্লভ। যৌথ পরিবারের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার পর গরীব স্বামী তার জন্য দুধের ব্যবস্থা করতে পারে না। অথচ সেই দুর্মূল্য, দুষ্প্রাপ্য বস্তুটিই এখানে হবে তার একমাত্র পথ্য!—

দাম লাগবে না তো, দিদি?—সে জিজ্ঞাসাই করে ফেললে।

টগর চমকে ফিরে তাকাল, কিন্তু হেসে ফেলে বললে, না দিদি, ওষুধ-পথ্যের দাম লাগে না এখানে—গরীবদের ওয়ার্ড কি না এটা!

তবু বিশ্বাস হয় না। টগর চলে যাবার পরেও বিহ্বলের মত ভাবতে থাকে সুরবালা।

কিন্তু সত্যই দুধ এল!

ঠিক দুধের স্বাদ অবশ্য নয়। রঙটাও কেমন যেন কালচে ধরণের। তবু তা দুধ, আর সঙ্গে চিনিও—পাড়াগাঁয়ে যা সে চোখেও দেখতে পায় না। পরিমাণে এত বেশী যে সবটা সে খেতেও পারলে না। তলায় অনেকটা থাকতেই গ্লাসটা নামিয়ে রাখলে সুরবালা।

কেমন খেলেন দুধ?

চমকে ফিরে তাকাল সুরবালা। পাশের খাটের সেই মেয়েটি,—একটু আগেই টগরের সঙ্গে যে তর্ক করেছে, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মেয়েটির ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ এক টুকরা হাসি।

থতমত খেয়ে সুরবালা বললে, একটু পানসে—কাঁচা গাইয়ের দুধ হবে বা!

'তার জন্য নয়', মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বললে, 'এক সের দুধে তিন সের জল ঢেলে রুগীর পথ্য তৈরী করেছে এরা, পাশকরা নার্স কি না!'

বড্ড রূঢ় শোনাল কথাটা। সুরবালার মনে হ'ল যেন তারই গায়ে বিঁধছে। টগর বা সেই চূড়া মাথায় মেয়েটি বা আর কেউ শুনতে পেলে কি যে মনে করবে তাই ভেবে নিজেই সে বিব্রত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি চোখ তুলে তাকাল সে।

সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে কেউ কোথাও নেই, কেবল রোগিণীরা যে যার খাটের উপর শুয়ে আছে, অনেকেই নিদ্রিত।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে সুরবালা; ফিরে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে বললে, টগরদি'কে দেখছি না তো!

'আর কাউকেই কি দেখছেন?' মেয়েটি আগের মতই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের কণ্ঠে বললে, 'কাউকেই পাবেন না এখন, যাদের ডিউটি আছে তারাও এখন বিশ্রাম করছেন। এরা আপনার মা, বোন বা মেয়ে কেউ তো নয় যে আপনার মুখের দিকে চেয়ে শিয়রে জেগে বসে থাকবে!'

কঠিন, নির্ম্মম কণ্ঠস্বর। সুরবালার মনের তারে যে সুর বেজে চলেছে তার সঙ্গে ওর একেবারেই কোন সঙ্গতি নেই। তাই উত্তরে বলবার মত কোন কথা ভেবে পেলে না সে।

মেয়েটিই তাকে জিজ্ঞাসা করলে, কিছু চাই আপনার?

ঘাড় নেড়ে মৃদুস্বরে সুরবালা বললে, না।

তবে ঘুমোন। ওরা আসবে সেই সন্ধ্যার একটু আগে।

ভাল লাগে না সুরবালার, না সুর না কথাগুলি। রোগিণীটির উপরেই তার মন বিরক্ত হয়ে ওঠে। বড্ড খিটখিটে ওর স্বভাব, সর্ব্বদাই খুঁৎ ধরবার জন্য যেন ওৎ পেতে রয়েছে।

কি এমন দোষ করেছেন ওঁরা! সুরবালা ভাবে। টগরের হাসিমাখা মুখখানি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে যেন; মনে পড়ে কচি কলাপাতা রঙের সেই তরুণী সেবিকাটিকেও, সে আসতে না আসতেই কত যত্ন করে তার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ওঁরা। না হয় মুখের উপর চোখ পেতে বিছানার পাশে বসে নেই কেউ। তেমন মা-বোনেরাও তো সব সময় থাকে না, তাদেরও তো দরকার হয় বিশ্রামের। সব ব্যবস্থা করে দিয়ে তবেই না এখানকার এঁরা বিশ্রাম করতে গিয়েছেন।—

আর কি চমৎকারই না এখানকার ব্যবস্থা! বাইরে থেকে হু হু করে হাওয়া আসছে; ঘরের মধ্যে নিঃসঙ্গ মনে হয় না। ঘরভরা সব লোক—অথচ সব চুপচাপ। পেটের ভিতরটা খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে না, ব্যথাটাও নেই মনে হয়।

আর কি নরম পরিচ্ছন্ন বিছানা! আরামে সুরবালার দু'চোখ বুজে এল।

ঘুম যখন তার ভাঙল তখন বেলা পড়ে এসেছে। ঘরের মধ্যে অলস মধ্যাহ্নের সে স্তব্ধতা আর নেই, জাগরণের চাঞ্চল্য বাতাসে ধ্বনির ঢেউ তুলেছে। লোকজনের পায়ের শব্দ, শাড়ীর খস্ খস্, দু'একটি ক্ষীণ কাতরোক্তি, অনেকগুলি মৃদু কণ্ঠের সমবেত অস্পষ্ট গুঞ্জন সুরবালার কানে গিয়েই তার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে।

চোখ রগড়ে উঠে বসল সে। বিহ্বলের মত চারদিকে তাকিয়ে দেখলে। সব কথা স্মরণ করে নিজের অবস্থাটা অনুধাবন করতে বেশ একটু সময় লাগল তার।

না স্বপ্ন নয়, অথৈ জলেও সে পড়ে নি, কিন্তু পরিচিত কোন মুখও তার চোখে পড়ল না।

দুই চোখের সবটুকু দৃষ্টিশক্তি দিয়ে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও টগরকে সে দেখতে পেলে না, মাথায় চূড়াপরা সেই চেনা মেয়েটিকেও নয়। তাদের মত কাজ যারা করছে তাদের সব অচেনা মুখ। ঘরের মধ্যেও অপরিচিত মুখের বাহুল্য। আত্মীয়-আত্মীয়ারা রোগিণীদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

সবচেয়ে বেশী চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে বারান্দায়। ধবধবে সাদা শাড়ী আর সাদা চূড়াপরা সেবিকারা তর তর করে যাচ্ছে আর আসছে। বড্ড চঞ্চল তাদের গতি, মুখে চোখে উত্তেজনার সুস্পষ্ট ছাপ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দু'তিনটি মেয়ে একত্র কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছে।

শুধু মেয়েরা নয়, পুরুষেরাও। সব ক'জনই যুবক, অধিকাংশই পেণ্টলান পরা। অনুমান করা যায় তারা ডাক্তার, তবে একথাও বোঝা যায় যে ওদের সমবেত মাতামাতিটা চিকিৎসা বা শুশ্রূষার মত কোন কাজের উপলক্ষে নয়।

কতকটা বিহ্বলের মতই ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল সুরবালা; হঠাৎ তার কানে এল, কি দেখছেন?

পাশের খাটের সেই রোগিণীটি। তার ঠোঁটে হাসি—তাতে কৌতুকের চেয়ে বিদ্রূপই বেশী।

সুরবালা বিব্রতের মত উত্তর দিলে, না, অমনি দেখছিলাম।

ওরা সব সেবিকা আর হাউস-সার্জন। ওরা কি করছে জানেন?

না, কি?

ষ্ট্রাইক করবার ফন্দী আঁটছেন।

ষ্ট্রাইক কি?

ষ্ট্রাইক জানেন না? বড্ড সেকেলে তো আপনি? রোগিণীটি এবার শব্দ করেই হেসে উঠল।

লজ্জা পেল সুরবালা, মুখ নীচু করে কুণ্ঠিতস্বরে বললে, আমি কলকাতায় থাকি না তো—গ্রাম থেকে এসেছি।

তা হলেও জানা উচিত ছিল, গাঁয়েও তো ষ্ট্রাইক হয় শুনেছি।

তার পর নিজেই বুঝিয়ে বললে, এঁরা সভা করবেন, মিছিল করবেন, তার পর জোট পাকিয়ে কাজ বন্ধ করবেন।

কেন?

নিজেদের মাইনে বাড়াবার জন্য।

মেয়েটির মুখের উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল সুরবালা। শোনা কথার সঙ্গে চোখের দেখার মিল হ'ল না। কাজ করছে সবাই। ঘর-মোছা শেষ করে জমাদারনী পিকদানীগুলিকে ধোবার জন্য একত্র করছে। জনৈক পরিচারিকা চলৎ-শক্তিহীনা একটি রোগিণীকে হাত ধরে স্নানের ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আরও আশ্বাসের কথা, সেবিকার চেনা পোশাক পরা অচেনা একটি মেয়ে একটি রোগিণীর খাটের পাশে দাঁড়িয়ে তার নাড়ী দেখছে।

কৈ, কাজ বন্ধ করেন নি তো এরা! সুরবালা ফিরে তাকিয়ে পাশের মেয়েটিকে উদ্দেশ করে বললে।

মেয়েটি মুখ টিপে হেসে উত্তর দিলে, করেন নি, করবার আয়োজন করছেন। তবে সেজন্য আমার কোনও দুর্ভাবনা নেই। আমার ব্যারাম সেরে গিয়েছে, কাল না হলেও পরশু চলে যাব আমি।

কথাটির মধ্যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত যা ছিল তা কাজ করল সুরবালার মনের উপর। কি একটা অজ্ঞাত বিপদের অস্ফুট আশঙ্কায় তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। এতক্ষণ বসেই ছিল সে, হঠাৎ পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

শুলেন যে? পাশের সেই মেয়েটি আবার জিজ্ঞাসা করলে।

সুরবালা ক্ষীণস্বরে উত্তর দিলে, শরীরটা ভাল লাগছে না।

আপনার স্বামী এলেন না আপনাকে দেখতে?

প্রশ্নটা সুরবালার বুকে গিয়ে লাগল একটা আঘাতের মত। সেই মুহূর্তে ঐ কথাটাই ভাবছিল সে। বড্ড একা, নিজেকে যেন বড় বেশী অসহায় মনে হচ্ছিল তার।

প্রশ্নকারিণীর চোখ দুটিকে এড়িয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠিত স্বরে সে উত্তর দিলে, তিনি তো এখানে নেই, আমায় ভর্ত্তি করে দিয়েই দেশে চলে গিয়েছেন।

ও! তা কোন আত্মীয়স্বজনও কি আপনার এখানে নেই?

না।

ঘরের মধ্যে বিজলীর আলো জ্বলছে, একটি নয়, অনেকগুলি। তা এত উজ্জ্বল যে মেঝেয় একটি সূচ পড়লেও বোধ করি স্পষ্ট দেখা যাবে। তথাপি সুরবালার চোখের সম্মুখ থেকে সব দৃশ্যই যেন এক সঙ্গেই মুছে গেল। দু'চোখ ফেটে জল এল তার, এতগুলি অপরিচিত মুখের পরিবর্ত্তে একটি চেনা মুখও যদি কাছে থাকত—সেই দেশের বাড়ীতে যেমন ছিল—দুঃসহ রোগের যন্ত্রণা সইতে পারত সে।

চোখের জল লুকাবার জন্ত বালিশে মুখ গুঁজল সে।

চেনা মুখ দেখা গেল পর দিন সকালে।

ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই সুরবালা দেখতে পেলে, কেবল টগরকেই নয়, সেই কচি কলাপাতা রঙের সেবিকা মেয়েটিকেও।

কাল বিকেলে দেখতে পাই নি কেন, দিদি? টগর কাছে আসতে না আসতেই জিজ্ঞাসা করলে সুরবালা।

টগর উত্তরে বললে, ওমা! বিকেলে দেখবে কেমন করে? এ মাসে ওবেলায় ডিউটি নেই তো আমার!

কোথায় গিয়েছিলে?

যাই নি কোথাও, বাসায়ই ছিলাম।

কাছেই বাসা বুঝি?

বাসা আর কি—সরকারী কোয়ার্টার।

টগর বুঝিয়ে বললে, হাসপাতালের চৌহদ্দির মধ্যেই তাদের থাকবার জায়গা দেওয়া হয়েছে। জায়গা মানে—ব্যারাক-বাড়ীতে একখানি মাত্র ঘর আর ওরই সঙ্গে রাঁধবার একটু স্থান। স্বামী আর নাবালক দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ওরই মধ্যে তার সংসার।

আমি সারাদিন এখানে পড়ে থাকলে সংসার কে দেখবে, সকৌতুকে বললে টগর।

অপ্রতিভ হয়ে চোখ নামাল সুরবালা; কুণ্ঠিত স্বরে বললে, তা বলি নি আমি। বিকেলে দেখতে পাই নি কিনা—তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

তবু ভাল, টগর মুখ টিপে হাসল, কত রুগী আসে এখানে—তোমার মত খোঁজখবর নেয় না কেউ।

কিছুক্ষণ পর আবার যখন টগর এল তখন তার হাতে এক বাটি দুধ। সবটুকু সুরবালার গ্লাসে ঢেলে দিয়ে সে বললে, তোমার পথ্যটুকু নিজেই নিয়ে এলাম দিদিমণি। বাবুর্চিখানার যা কাণ্ড—দুধের ব্যবসা চলে সেখানে। নাও চট্ করে খেয়ে নাও। সারা দিনে আর কিছু হয়তো খেতে পাবে না।

'কেন?' বলার সঙ্গে সঙ্গে সুরবালার প্রসারিত হাতখানাও কেঁপে গেল, 'ষ্ট্রাইক হবে বুঝি?'

'ষ্ট্রাইক!' বলে টগর সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকাল, 'ষ্ট্রাইকের কথা তুমি কার কাছে শুনলে?'

কতকটা যন্ত্রচালিতের মতই সুরবালা পাশের খাটের দিকে তাকাল। শয্যা খালি—মেয়েটি বোধ করি স্নানের ঘরে গিয়েছে।

উত্তরটা আন্দাজ করে নিয়ে টগর বললে, উনি বলেছেন বুঝি? না, ষ্ট্রাইকের কথা ভেবে বলি নি আমি। নার্স বলছিলেন, সার্জন সাহেবের ঘরে তোমার ডাক পড়েছে। তিনি পরীক্ষা করে তোমার খাওয়া বন্ধও করে দিতে পারেন তো!

সত্যই খাওয়া শেষ হতে না হতেই ওদিক থেকে তার ডাক এল; সেবিকা মীনা তার কাছে এসে বললে, চলুন, সার্জন আপনাকে ডেকেছেন।

সুদীর্ঘ আর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা। নানা রকম যন্ত্রপাতির সাহায্যে মেয়ে-পুরুষ তিন-চার জন মিলে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে তাকে পরীক্ষা করলে। তার পর ওদের মধ্যে বয়সে যিনি সকলের বড় তিনি মীনাকে বললেন, কালকের জন্যই একে 'রেডি' কর।

কালই অপারেশন হবে আপনার, ঘরে ফিরিয়ে এনে মীনা সুরবালাকে বললে, আজ যেন আর কিছু খাবেন না, এখন জোলাপের ওষুধ দিচ্ছি।

সুরবালার মুখে কথা ফুটল না। পরীক্ষার নামে তার শরীরের উপর যে জুলুম হয়েছে সাধারণ নারীদেহের পক্ষে তা-ই অসহ্য। তার প্রতিক্রিয়াই তখনও সে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তার উপর এই দুঃসংবাদ। ঠিক বিনামেঘে বজ্রপাত না হলেও বজ্রপাতের মতই ভয়ঙ্কর। ঘরে এসেই সে খাটের উপর বসে পড়েছিল, এবার হাত বাড়িয়ে খাটের বাজু আঁকড়ে ধরলে সে।

কিন্তু তার ভাব দেখে মীনা হেসে ফেললে; বয়সে বেমানান হলেও মা-মাসীর মতই সুরবালার গায়ে-মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললে, এত ভয় পাচ্ছেন কেন আপনি? কিচ্ছু লাগবে না, বিশ্বাস করুন আমায়, কোথায় কাটছে, কি করছে তা আপনি জানতেও পারবেন না।

মিনিট পাঁচেক পর কাচের গ্লাসে করে জোলাপের ওষুধ এনে সে বললে, মিষ্টি করে এনেছি, নিন, খেয়ে ফেলুন:

মিষ্টি ঠিকই, তবু রেড়ির তেল তো! গলায় ঢেলেই মুখ বিকৃত করলে সুরবালা; গিলে ফেলবার পর ওয়াক্ ওয়াক্ করে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ল সে।

মীনা এবার একটু বিরক্ত হয়েই বললে, বড্ড নার্ভাস আপনি। আচ্ছা, চুপ করে শুয়ে থাকুন এখন, পা দুটি ঢেকে রাখবেন।

শুয়েও শান্তি নেই, রেড়ির তেলের প্রতিক্রিয়া তখনও চলছে। বিশ্রী লাগছিল সুরবালার। গা গড়াচ্ছে, জিভে তেলের পিচ্ছিলতার সঙ্গে গন্ধটাও লেগে রয়েছে যেন—অন্ততঃ মনে তো নিশ্চয়ই। আচ্ছন্নের মত বিছানায় পড়ে রইল সে।

পেটের মধ্যে দুঃসহ একটা মোচড় অনুভব করে সুরবালা চোখ মেলে যখন তাকাল তখন তার মনে হ'ল যে ঘুমের মধ্যে এতক্ষণ বোধ করি বা স্বপ্নই দেখেছে সে। তখন ঘর বেশ শান্ত। টগরকে কোথাও চোখে পড়ল না। কিন্তু বাথরুমের দিকে যেতে যেতে মীনাকে দেখতে পেলে সে। বারান্দার একটি কোণে ছোট একটু ভিড় জমেছে—দু'তিনটি

ছেলে আর মীনারই মত সেবিকার পোশাক-পরা কয়েকটি মেয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে নীচু গলায় কথা বলছে। কিন্তু সকলের মুখে চোখেই উত্তেজিত ভাব।

কিন্তু ফিরতি পথে তাদের আর সেখানে দেখা গেল না। মীনা তখন ঘরের মধ্যে। স্মিতমুখে তার কাছে এসে সে বললে, সুরু হয়েছে বুঝি? এ বেলায় কিছু খাবেন না যেন—আর ও বেলায়ও কেবল বার্লির জল।

একটু থেমে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর কণ্ঠে সে আবার বললে, ভালই হ'ল কাল অপারেশন হয়ে যাবে আপনার। না হলে হয়তো আর হ'তই না।

কেন? সুরবালা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

মীনা উত্তরে বললে, পরশু থেকে আমাদের ষ্ট্রাইক হবার কথা আছে কি না!—

ষ্ট্রাইক! প্রতিধ্বনির মত কথাটা উচ্চারণ করলে সুরবালা। চকিতে মনে পড়ে গেল পাশের খাটের মেয়েটির সেই ইঙ্গিত, সেই শ্লেষোক্তি। একটা অব্যক্ত অশুভ সম্ভাবনার কল্পনায় বুক কেঁপে উঠল তার।

নানা কারণে গলাটা শুকিয়েই ছিল; কম্পিত, অস্ফুট কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করলে, সত্যি, দিদি, সবাই মিলে কাজ বন্ধ করবেন আপনারা? কেন?

মুচকি হেসে মীনা উত্তর দিলে, কাজ বন্ধ না করলে মাইনে যে এরা বাড়িয়ে দেয় না!

কত মাইনে পান আপনি?

কত আর? সব মিলিয়ে শ'দেড়েক।

দেড়শ'!

মোটে দেড়শ', বলুম তো, ওতে কি কুলোয়?

কুলোয় না?

ওমা! কুলোবে কেমন করে জিনিসপত্রের যা দাম!

সুরবালা অবাক হয়ে মীনার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে এক দুর্বোধ্য প্রহেলিকা। ষ্ট্রাইক, মীনার অভাববোধের তীব্রতা, তার বেতনের হার, এর কোনটাই সে বুঝতে পারে না, কারণ এর কোনটাই তার অভিজ্ঞতার জগতের অন্তর্ভুক্ত নয়। দেড়শ' টাকা একত্র জীবনে কোন দিনই সে চোখে দেখে নি, কল্পনাও করতে পারে না কত।

কথাটা মুখ ফুটে বলেই ফেললে সে, আমাদের কিন্তু ষাট টাকা মাইনেতেই চালাতে হয়।

ষাট টাকা!

মীনা হঠাৎ যেন মুষড়ে পড়ল। এতক্ষণ বেশ হাসিখুশি ছিল তার মুখ; ষ্ট্রাইকের কথা বলতে বলতে উৎসাহে উদ্দীপনায় তার শ্যামবর্ণ মুখখানি বেশ একটু লালই যেন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এক মুহূর্ত্তেই সবই বদলে গেল। থতমত খেয়ে সে বললে, ষাট টাকা! কি করেন আপনি—মানে, আপনার স্বামী?

মাষ্টারি করেন।'

ও, মাষ্টারি!

বলে চুপ করলে মীনা; অকারণেই ফিডিং কাপটা এক জায়গা থেকে তুলে আর এক জায়গায় রাখলে; তার পর সুরবালার মুখের পানে চেয়ে বললে, না, আমাদের চলে না।

পর দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে অপারেশন হয়ে গেল।

সেটা শোনা কথা, ঠিক কি যে হয়েছে সুরবালা তা জানতেও পারে নি। আছে কতকগুলি এলোমেলো স্মৃতি আর অসহ্য যন্ত্রণা।

ব্যথার অনুভূতি অবশ্য নূতন কিছু নয়—পেটের ব্যথাই ত তার রোগ। কিন্তু এবারের অনুভূতি অভূতপূর্ব্ব। পেটের উপরে কে বুঝি একরাশ জ্বলন্ত কয়লা রেখে দিয়েছে, থেকে থেকে দপ দপ করে জ্বলছে সারা জায়গাটা। আর কেবল পেটেই তো নয়—সমস্ত দেহেই অসহ্য যন্ত্রণা! ব্যথার অনুভূতি ছাড়া মনের আর যেন কোন উপলব্ধিই নেই।

তবে ভাসা ভাসা স্মৃতি আছে। স্ত্রী পুরুষ কত রকমের লোক, কত উদ্ভট আওয়াজ আর একটা উৎকট গন্ধমিশ্রিত তীব্র আস্বাদের। আর ওরই সঙ্গে কানে গিয়েছিল ঢাকের বাজনা, শ'খানেক ঢাকের একটা মিছিল যেন দূর থেকে তার দিকে এগিয়ে আসছিল। তবু ওরই মধ্যে ঘুমও এসেছিল—গভীর সুষুপ্তি।

কিন্তু সে ঘুম সে শান্তি আর নেই—আছে কেবল পেটের মধ্যে অসহ্য জ্বলুনি, মাথার মধ্যে শূন্যতার দুর্ব্বহ এক বোঝা, স্মৃতির পরতে পরতে সেই গন্ধ ও আস্বাদের ঘন প্রলেপ আর তারই প্রতিক্রিয়ায় একটা দুর্দ্দান্ত, অসংবরণীয় বিবমিষা।

ওরই একটা অপ্রতিরোধ্য আক্ষেপের মধ্যে একবার একটা নিবিড় স্পর্শ অনুভব করেছিল সে, একজন তার মুখের মধ্যে এক টুকরা বরফ পুরে দিয়ে স্নেহমাখা কণ্ঠে তাকে বলেছিল, এটা চুষুন তো—কিছু ভয় নেই আপনার—শীগ্‌গিরই সেরে উঠবেন।

সিসার মত ভারী চোখের পাতা দুটিকে টেনে তুলে জবা-ফুলের মত লাল চোখ দুটি দিয়ে তাকিয়ে তাকে চিনতে পেরেছিল সুরবালা, সে মীনা।

কিন্তু সে যেন কত যুগ আগের কথা। সেবিকা মীনার কচি কলাপাতা রঙের সুডৌল মুখখানি কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে, থেমে গিয়েছে তার মধুর কণ্ঠস্বর, মুখের মধ্যে বরফের টুকরা দূরে থাক, এক ফোঁটা জলও যে কোন দিন পড়েছিল তাও মনে হয় না। আছে কেবল পেটের মধ্যে অসহ্য একটা দপ্‌দপানি, মুখ থেকে বুক পর্য্যন্ত ঊষর মরুভূমির উত্তপ্ত

শুষ্কতা, আর দেহের প্রতি অণুপরমাণুতে সেই উৎকট বিবমিষার অপ্রতিরোধ্য আক্ষেপ।

জল—ওমা—একটু জল দাও গো!

বমি করবার একটা ব্যর্থ চেষ্টার অবসানে সুরবালা ক্ষীণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে উঠল।

পাশের খাটের উপর থেকে উত্থানশক্তিরহিত রোগিণীটি আর একজনকে সম্বোধন করে বললে, ওকে একটু জল দাও না দিদি, আহা, বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন উনি।

'এই দিই।' আর একটি মেয়ে বললে। জল নিয়ে এগিয়েও এল সে, ফীডিং কাপের নলটা সুরবালার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বললে, নিন, জল খান।

চোঁ চোঁ করে অনেকটা জল টেনে খেয়ে ফেললে সুরবালা, তারপর চোখ মেলে তাকাল সে।

দিদি কোথায়—টগরদি?—অস্ফুট জড়িত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করলে।

উত্তর হ'ল, ও মা—সে কি আর এখানে আছে!

মীনাদি?

তিনিও নেই।

ঠোঁট বেঁকিয়ে কথাটাকে শেষ করলো সে, কেউ নেই, দিদি, সবাই ষ্ট্রাইক করেছে যে!

অ্যাঁ!

হ্যাঁ গো; কথা তো ছিলই, আজ সকাল থেকে কেউ আর কাজ করছে না।

অত কথা সুরবালার কানে গেল না কারণ ঐ ষ্ট্রাইক কথাটাই তার শ্রবণশক্তির সবটুকুকে অধিকার করে নিয়েছে।

সেই অপারেশনের দিন উঁচু টেবিলের উপর শুয়ে যে ঢাকের আওয়াজ শুনেছিল সে সেই ঢাকেরই বাজনা যেন, তবে আরও উঁচু পরদায়, আরও সুস্পষ্ট, ষ্ট্রাইক্, ষ্ট্রাইক্, ষ্ট্রাইক!

আর সেই সঙ্গেই পেটের মধ্যে জলন্ত অঙ্গার-স্পর্শের অসহ্য প্রদাহ। উত্তাপে বুকের ভিতরটা আবার শুকিয়ে উঠে, আচ্ছন্ন দৃষ্টির সম্মুখে সব দৃশ্যই একাকার হয়ে যায়।

পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রেখে ভাবতে পারে না সুরবালা। এক এক বার তার মনে হয় যে হয়তো এর কিছুই সত্য নয়—হাসপাতালে সে আসেই নি—টগর-মীনা থেকে সুরু করে পেটের ভিতরের ঐ দপদপানিটা পর্য্যন্ত সবই বোধ করি এক নিরবচ্ছিন্ন সুদীর্ঘ স্বপ্ন।

ললাটের উপরে কোমল হাতের স্নিগ্ধ স্পর্শটাকেও সে স্বপ্নই মনে করলে—ফিস্ ফিস্ স্বরের ডাকটাকেও।

দিদিমণি—ও দিদিমণি, কি বলছ বিড়বিড় করে?

চোখ মেলে তাকাল সুরবালা—সামনেই টগরের মুখ।

বিশ্বাস করতে পারলে না সে। এক ঝটকায় মাথাটাকে ঘুরিয়ে সুরবালা বাঁদিকে তাকাল, তারপর সামনে, তারপর ডাইনে, তারপর নীচে মেঝের দিকে।

অস্পষ্ট আলোকে চেনা ঘরের পরিচিত জিনিস আর অর্দ্ধ-পরিচিত মানুষগুলিকে আবছারকম দেখা যায়। বড় বড় দরজা-জানালাগুলির অধিকাংশই খোলা, আলমারির উপর অবিন্যস্ত থালাগেলাসের কণ্টকিত বিশৃঙ্খলা, মেঝের উপর স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত জঞ্জাল, খাটে খাটে রোগিণীরা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। বাতাসে একটা উগ্র বোটকা গন্ধ। আলোর স্বল্পতা, রাত্রির স্তব্ধতা আর ঐ গন্ধের তীব্রতা—সব মিলে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। কিন্তু স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না,—সবই বড় বেশী বাস্তব।

বিশেষ করে নিজের মুখের সামনে টগরের মুখখানি।

বিহ্বলকণ্ঠে সুরবালা বললে, টগরদি!

চুপ, চুপ—টগর কিন্তু ঠোঁটে আঙুল দিলে, ফিস্ ফিস্ করে বললে, আস্তে দিদিমণি।

সুরবালা আরও বিহ্বল হয়ে বললে, কেন, টগরদি?

ওমা ষ্ট্রাইক হয়েছে যে!

ষ্ট্রাইক!

কেন মনে নেই তোমার?

হয়তো ছিল, হয়তো ছিল না; কিন্তু নূতন করে মনে পড়ল সবই, গত কয়দিনের অত তোড়জোড়, ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়ে-পুরুষের আনাগোনা, ফিস্ ফিস্ করে কথা, পাশের খাটের রোগিণীটির বক্রোক্তি, সেবিকা মীনার উত্তেজিত মধুর কণ্ঠের বিশদ ব্যাখ্যা।

শোনা কথাই কেবল নয়, পেটের মধ্যে দপ্ দপানি, মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম ভাব, জিভ, গলা ও বুকের মধ্যে দুঃসহ শুষ্কতার অনুভূতি, বাস্তব জৈবিক সত্তার প্রতি অণুপরমাণুতে পর্য্যন্ত তার নিবিড় উপলব্ধি।

কোনও রকমে একটা ঢোঁক গিলে সুরবালা বললে, একটু জল।

জল খাবে? এই দিই, টগর ব্যস্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু ফিডিং কাপে জল নেই; পাশের কোন আলমারির উপরেও জল পাওয়া গেল না। কুণ্ঠিত স্বরে টগর বললে, একটু সবুর কর, দিদিমণি, আমি জল আনছি।

সে যেন এক যুগের প্রতীক্ষা—তবে জল এল। টগরের হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে এক নিশ্বাসেই সবটুকু জল পান করে ফেললে সুরবালা।···সত্যই যেন একযুগ প্রতীক্ষার পর সুগভীর পরিতৃপ্তি। সে তৃপ্তি সুরবালার দুর্ব্বল কণ্ঠেও ঝঙ্কার দিয়ে বেজে উঠল, ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে, দিদি, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল আমার।

কিন্তু টগর ফিস্ ফিস্ করে বললে, কাউকে কিন্তু বলো না, দিদিমণি।

কেন, দিদি?

ওমা, ষ্ট্রাইক হয়েছে যে! এ সময়ে কি এখানে আমাদের আসতে আছে!

নেই ?

সর্বনাশ ! কেউ দেখলে পা ভেঙে দেবে, মেরেই ফেলবে যা !

সুরবালার কণ্ঠে আর কথা ফুটল না, তার গলাটা আবার যেন শুকিয়ে উঠছে।

কিন্তু টগরই তার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে আবার বললে, লুকিয়ে এসেছি, দিদিমণি। তোমার অপারেশন হয়েছে দেখে গিয়েছিলাম, আরও দুটি রোগীর অবস্থা ছিল খারাপ। মন কেমন করতে লাগল, একবার না এসে পারলাম না।

হঠাৎ কি যেন হ'ল সুরবালার; খপ্ করে দুই হাতে টগরের হাতখানা চেপে ধরে সে বললে, তুমি বড় ভাল, টগরদি !

ধেৎ !

লজ্জা পেয়ে হাত টেনে নিলে টগর। কিন্তু পরক্ষণেই আগের চেয়েও বরং আরও একটু বেশী নত হয়ে সুরবালার কপালের উপর হাত রেখে সহাস্যে, সস্নেহ কণ্ঠে বললে, কিচ্ছু ভয় করো না, দিদিমণি; অপারেশনের পর এমন সকলেরই হয়, আবার ভালও হয়ে যায় সবাই।

কিন্তু সুরবালা খাপছাড়া রকমে প্রশ্ন করে বসল, কিন্তু তোমরা—তুমি টগরদি ?

আমরা কি ?

তোমরা আসবে না ? কবে কাজে আসবে ?

টগর বিব্রত হয়ে পড়ল, চোখ ফিরিয়ে উত্তর দিলে সে, ষ্ট্রাইক মিটে গেলেই কাজে আসব আমরা, কালও আসতে পারি।—বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে, কিন্তু সুরবালা আর কোন প্রশ্ন করবার আগেই আবার তার মুখের পানে চেয়ে সে বললে, আমরা না এলেও ভাবনা কি তোমার ? তোমার স্বামীও কালই এসে যাবেন হয়তো !

কে ? সুরবালা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল যেন।

টগর হাসিমুখে উত্তর দিলে, তোমার স্বামী।

কি করে জানলে ?

ওমা—ডাক্তাররা তোমার স্বামীকে তার করে দিয়েছে যে—সকলের অভিভাবককেই তার করেছেন এঁরা !

সুরবালার মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেল, মুখে আর কথা ফুটল না তার।

টগর স্মিত মুখে আবার কিছুক্ষণ তার মুখের পানে চেয়ে রইল, তার পর নিতান্ত কচি মেয়েটির মতই সুরবালার গাল-দুটিকে টিপে দিয়ে বললে, কিছু ভেবো না, দিদিমণি। ভাল হয়ে যাবে তুমি—ভাল তো হয়েছই। এখন ঘুমোও।

চোরের মতন পা টিপে টিপে বের হয়ে গেল সে।

আবার নিঃসঙ্গ অস্তিত্ব।

প্রকাণ্ড হলঘর, বাতাসে কেমন একটা ভাপসা গন্ধ—কোথায় যেন একটি রোগী যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করছে, অস্পষ্ট আলোকের পাতলা পরদায় অন্তরালে যেন অতিপ্রাকৃত জগতের অস্ফুট একটা আভাস।

পেটের মধ্যে সেই দপ্‌দপানিটা এতক্ষণ চাপা পড়েছিল—আবার চারা দিয়ে উঠল। মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম ভাব, দেহে রাজ্যের গ্লানি, জিভটাও আবার যেন শুকিয়ে আসছে। অস্ফুটকণ্ঠে 'মা গো' বলে চোখ বুজল সুরবালা।

কিন্তু মনের চোখ-কান বন্ধ হয় না। সে চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার বাড়ী, তার স্বামীর মুখ, টগর, মীনা, পাশের খাটের ছুটি-পাওয়া রোগিণীটি, মোটা কালো ফ্রেমের চশমাপরা সার্জন-ডাক্তার। কানে আসে—ভাল হয়ে যাবে তুমি, সব ভাল হবে···

এংলো-ইণ্ডিয়ানদের পরিচয়

শ্রীশান্তিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

বহুদিনের না হলেও এংলো-ইণ্ডিয়ানদের ইতিহাস বিচিত্র। ভারতের ইতিহাসের এ একটা অঙ্গ। যখন এদের জীবন-প্রভাত হয় তখনও মুঘলবাদশাহীর কেন্দ্রশক্তি লোপ পায় নি। ভাস্কো দা-গামার প্রদর্শিত পথে একে একে পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমার ও ওলন্দাজ বণিকেরা এসে জুটে এবং ক্রমেই প্রতিযোগিতাও তীব্রতর হয়ে উঠে। বাদশাহের অনুগ্রহে তখন কেউ কেউ কুঠিস্থাপন করতেও সক্ষম হয়।

বণিকেরা বুঝেছিল সেই সমস্তাসঙ্কুল দিনে, সাত-সমুদ্র তের-নদী পারাপারকালে, 'পথি নারী বিবর্জিতা' নীতিটি খুবই কাজের। কিন্তু দেখা গেল মানুষের ঘর-গড়ার আর জৈবিক তাগিদ থেকেই যায়। ফলে বিভিন্ন কুঠির সাহেবেরা তত্রস্থ ভারতীয় নারীর সান্নিধ্যলাভের চেষ্টায় উন্মুখ হয়ে উঠল। কর্ত্তা-দের চোখে যখন কাণ্ডটা পড়ল, তাঁরা উল্লসিত না হয়ে পারেন নি। কারণ প্রথমত এসব বিবাহ হবে দুটি জাতির মধ্যে মিলনের সেতু; দ্বিতীয়ত এদের সন্তানেরা হবে খ্রীষ্টান এবং তৃতীয়ত পিতার ধর্ম্ম, ভাষা ও আকৃতি নিয়ে অনেক কাজেই এরা সহায়তা করতে পারবে, যাতে খাঁটি ভারতীয়দের বিশ্বাস করা যায় না।

কর্ত্তারা যে কি রকম খুশী হয়েছিলেন তা বেশ প্রকাশ পায় ১৬৭৮ সালে লেখা এক পত্রে। জন কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা মাদ্রাজের কুঠিয়ালকে পত্রখানা লেখেন :

"The marriage of our soldiers to the women of

Fort St. George is a matter of such consequence to posterity that we shall be content to encourage it with some expense, and have been thinking for the future to appoint a pagoda to be paid to the mother of any child that shall hereafter be born of any such future marriage, upon the day the child is christened, if you think this small encouragement will increase the number of such marriage."

সোজা কথায় কিছু ঘুষ দিয়েও যদি এদের মধ্যে বিয়ের চলন করা যায় তা করতেও কর্ত্তারা রাজী ছিলেন।

কোম্পানীর সাধারণ কর্ম্মচারীরা বা সৈন্যেরা আরও উৎসাহ পেল, যখন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা এবং অভিজাত বংশীয়েরাও এরকম বিবাহ-বন্ধনে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হতে লাগলেন। লর্ড গার্ডনারের ভাইপো উইলিয়ম গার্ডনার বিয়ে করেন কাম্বের নবাবজাদীকে। গার্ডনার পরিবারের এক মহিলা সুসানের বিয়ে হয় মুঘল-সম্রাটের আত্মীয় নবাবজাদা শেখোর সঙ্গে। এ ছাড়া স্কিয়ারসি ও স্কিনার প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক বিয়ে করেন এক হিন্দু বিধবাকে এবং শোনা যায় বিখ্যাত সেনাপতি সার্ আয়ার কুট সেই চার্ণকেরই এক মেয়েকে বিয়ে করেন। কানপুরের সার হিউ ম্যাসি হুইলার এক হিন্দু রমণীকে বিয়ে করেন। আরও জানা যায় বিখ্যাত ইংরেজ সেনাপতি ফিল্ডমার্শাল লর্ড রবার্টসের বিমাতা ছিলেন এক ভারতীয় মহিলা। তালিকাটি শুধু ইংরেজদের সঙ্গেই সম্পর্কিতদের। কিন্তু বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি এভাবে এক বর্ণ-সঙ্করের জন্ম দেয়। এরাই এংলো-ইণ্ডিয়ান। বস্তুত: এদের ইন্দো-ইউরোপীয়ান এমন কি ইউরো-এশিয়াটিক বোধ হয় বলা চলে; সম্পর্কটা এত ব্যাপক হয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজ-রাই এদেশে টিকে থাকল বা প্রাধান্য পেল বলে এই বর্ণসঙ্করের খ্যাতি বা অখ্যাতির সঙ্গে তাদের নামটা যুক্ত হ'ল।

এই অবাধ মিলন বেশী দিন চল্‌ল না। ইংরেজ তো এজন্য এদেশে আসে নি। সে তখন যা করেছে, প্রয়োজনের তাগিদে করেছে; বাণিজ্যই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তারপর যখন 'বণিকের মানদণ্ড, পোহালে শর্ব্বরী, দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে', তখন আর কাউকেই গ্রাহ্য করার প্রয়োজন নেই। দাস ভারতীয়ের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন বা তজ্জনিত সন্তানদের পিতৃ-পরিচয় দেওয়া তত দিনে বোধ হয় লজ্জাকর দাঁড়িয়ে গেছে। ব্রিটানিয়া তখন সমুদ্রশাসন করছেন। দেশ থেকে যাতায়াতের পথ আর বিঘ্নসঙ্কুলও নয়। তবুও কুঠির অনাথ অপোগণ্ডদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আপার অর্ফানেজ স্কুল নামে ফোর্ট উইলিয়ামে তাদের জন্যে একটা উচ্চশিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। বিশিষ্ট ছাত্রদের বিলাতেও পাঠানো হ'ত উচ্চতম শিক্ষা দেবার জন্যে।

হঠাৎ ১৭৮৬ সালে কোম্পানীর কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্স তা বন্ধ করে দিলেন, পাছে এসব ছাত্র বিলাতে গিয়ে বিয়ে করে আর তার ফলে বিশুদ্ধ ব্রিটন-রক্তে অশুদ্ধি এসে যায়,—

"The imperfections of the children, whether bodily or mental, would in process of time be communicated by inter-marriage to the generality of the people of Great Britain and by this means debase the succeeding generations of Englishmen."

চার বছর পরের কথা। কোর্ট অব ডিরেক্টর্স এক স্থায়ী আদেশ জারী করলেন যে ভারতীয় রক্ত যাদের শিরাতে বইছে তারা অসামরিক, সামরিক ও নৌবিভাগীয় "(civil, military or marine)" কোন রকম কাজেই ভর্ত্তি হতে পারবে না। আরও রকমারি ওজর-আপত্তি ক্রমশ দেখা দিতে লাগল। শেষে ১৭৯৫ সালে সপরিষদ গবর্ণর-জেনারেল ঘোষণা করলেন যে মাতৃকুল ও পিতৃ-কুল উভয়ত্র ইউরোপীয় রক্ত যাদের বইছে না, তারা কোম্পানীর কাজে অযোগ্য। আইনটি অনতিবিলম্বে কাজে লাগানো হ'ল আর তখন দেখা গেল, আগেকার নিয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই তা হলে বাতিল করে দিতে হয়। এংলো-ইণ্ডিয়ানেরা পড়ল বিষম বিপদে। মুশকিল-আসান করলেন ভারতীয় নৃপতিরা। বিভিন্ন কাজে, বিশেষ করে সৈন্য-বিভাগে এদের চাকুরী দিলেন আর অজ্ঞাতসারে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারলেন।

এংলো-ইণ্ডিয়ানদের প্রতি ইংরেজদের মনোভাব বেশ বুঝা গেল। আরও স্পষ্ট করে চোখে আঙুল দিয়ে একেবারে দেখিয়ে দিলেন ভাইকাউণ্ট ভ্যালেন্সিয়া। ১৮১১ সালে লেখা এক পত্রে তিনি বলছেন:

"The most rapidly accumulating evil of Bengal is the increase of half-caste children. In every country where this intermediate caste has been permitted to rise, it has ultimately tended to its ruin. Spanish America and San Domingo are examples of this fact. ....It becomes too powerful to control....With numbers in their favour, with a close relationship to the natives......what may not in future be dreaded from them ?"

এংলো-ইণ্ডিয়ানেরা কিন্তু দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকতেও ভ্যালেন্সিয়াদের বিপদে ফেলে নি।

তখন মরাঠা যুদ্ধ ঘনিয়ে এসেছে। কামানের মুখে দাঁড়াবে কে? ইংরেজের প্রাণ তো অমূল্য! তখন এংলো-ইণ্ডিয়ানদের ডাক পড়ল। আশ্চর্য্য এই যে, সমস্ত অপমান হজম করে কৃতজ্ঞতার মুখে ছাই দিয়ে এংলো-ইণ্ডিয়ানেরা চলে এল মরাঠাদের ছেড়ে। একজন এংলো-ইণ্ডিয়ান ঐতিহাসিক লিখেছেন:

"They heard the call of the blood and obeyed it with alacrity. Parron and the Marhatta chiefs endeavoured to bribe them with tempting offers, but failed

to shake their loyalty. To a man they remained true to their father's people, preferring death to lifting sword against England."

এরা সব রক্তের ডাক শুনেছিল, শুনে আর স্থির থাকতে পারে নি। যেমন স্কিনার ছিলেন যশোবন্ত রাও হোলকারের সৈন্যদলে একজন পদস্থ কর্মচারী। ১৮০৩ সালে হোলকারের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধে। ইংরেজ এঁটে উঠতে পারছে না—এমনি একদিনে স্কিনার ইংরেজ শিবিরে পালিয়ে এলেন। আর একজন সেনানায়ক ছিলেন গার্ডনার। তিনিও দলত্যাগের সুযোগের খোঁজ করছিলেন, কিন্তু হোলকার সাবধান হয়ে গেছেন। ফরাসী অস্ত্রশিক্ষক পার্ঁ শ্রেন দৃষ্টি রাখছেন। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় গার্ডনার ঘাস-কাটুনির ছদ্মবেশে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেকের কাছে পালিয়ে গেলেন।

এংলো-ইণ্ডিয়ানেরা পিতৃকুলের ("Father's people") চিন্তাতেই মশ্গুল। এই সব "মান্ধাতা"দের মাতৃকুলের দিকে নজর পড়ে নি; পড়ে নি সে-দেশটির ওপর, যে-দেশ সম্পদে-বিপদে তাদের আশ্রয় দিয়েছে, পালন করেছে। বর্ত্তমান কালেও দেখি তাই। "ক্যাবিনেট মিশন" যখন এদের অগ্রাহ্য করলে, এদের মুখপাত্র সার্ হেন্‌রি গিড্‌নি বুঝলেন কাল বদলেছে; কিন্তু ভারতীয় নেতাদের কাছে নীচু হতে তাঁর বাধ্‌ল। ফ্রাঙ্ক এণ্টনি তাঁর পরিত্যক্ত আসন নিয়ে রিচার্ড বাটলার প্রমুখ রক্ষণশীল নেতাদের সাহায্য নিতে কসুর করেন নি। আজ অবশ্য তিনি বলেন:

"Gidney's experience made me realize more than ever that the community could survive only by the goodwill and generosity of the Indian leaders and the Indian people."

ভারতীয়দের সত্যই ঔদার্য্য আছে এবং তা নির্ভরযোগ্য। নূতন শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু হিসাবে এরা বহু সুযোগই পাচ্ছে। গত ১৮ই মে তারিখে সংখ্যালঘুদের বিশেষ সুযোগ রোধের যে নীতি গণপরিষদে ঘোষিত হয়েছে, তাকে পাশ কাটিয়ে এদের রকমারি সুবিধা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, আইন হয়েছে প্রাদেশিক আইন সভায় প্রতি লক্ষে একজন এবং কেন্দ্রীয় সভায় প্রতি দশ লক্ষে একজন মাত্র প্রতিনিধি প্রেরণ করা যাবে; কিন্তু বাংলাদেশেই নাকি এরা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী, তাও মোটে ৩০,০০০। অর্থাৎ প্রাদেশিক আইন সভায় একজনও প্রতিনিধি এদের থাকতে পারে না। তেমনি সারা ভারতে এখন আড়াই লক্ষ থেকে তিন লক্ষ এংলো-ইণ্ডিয়ান আছে, কাজেই কেন্দ্রেও কোন রকমে এদের লোক যেতে পারে না। তবু অন্য ব্যবস্থায় অর্থাৎ মনোনয়ন প্রথাবলে এদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ইংরেজের দেওয়া বিশেষ সুবিধাগুলি এখনই লুপ্ত হবে না। প্রতি দু'বছর অন্তর শতকরা দশ ভাগ কমে দশ বৎসরে তা একেবারে রদ হবে। শিক্ষা এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও তারা অনুরূপ সুযোগ পেয়েছে।

এই সুযোগ দানের পাত্র বিচার করতে গিয়েই চোখে পড়ে যে, ইতিহাসে একমাত্র ইহুদিরা ছাড়া এমন স্বাতন্ত্র্যশীল (exclusive) সম্প্রদায় আর নেই। এরা [illegible] সঙ্গে মেশে নি এদেরই কটা চামড়া এবং পিতৃ-পরিচয়ের গর্ব্ব নিয়ে আর পিতৃকুলে মেশে নি রক্তদুষ্টির ভয়ে। তবু ভারতীয়দের তুলনায় এরা ইংরেজের কাছ থেকে কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে। তা কিন্তু আত্মীয় ইংরেজের নিকট থেকে নয়, শাসক ইংরেজের নিকট থেকে। দাস এবং কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয়দের চেয়ে শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা যে কত উঁচুতে, তা প্রমাণের জন্য অবনত অর্দ্ধশ্বেতাঙ্গদেরও বিশেষ সুযোগ দিয়ে ধন্য করা হয়েছে। ফলে আজ এদের অবস্থা যেন ছাদে তুলে দিয়ে মই সরিয়ে নেওয়ার মত হয়েছে। কতখানি অসহায় এরা! কত বড় দুর্ভাগাই বা যে, এই দু'শ বছরে উক্ত সম্প্রদায় থেকে শিক্ষায়, সামাজিক আন্দোলনে, রাজনীতিতে বা অর্থনীতিতে একটিও প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা বের হ'ল না।

দেরীতে হলেও এখনও যদি এরা ভারতীয়দের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক বুঝতে পেরে থাকে তবেই মঙ্গল। নূতন দিনে আমরা পরস্পরকে উপেক্ষা করতে পারব না। একদা শক, হুন প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ভারতে এসে এদেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। ভারতও তখন নবীন; তার পর তার সেই সজীবতা এবং স্বাঙ্গীকরণের ক্ষমতা লোপ পায়। জাতি-গঠনের কাজ সেইখানেই অসমাপ্ত থেকে যায়, দেশকে এক বিষম দুর্য্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। আজ নবজীবনের উন্মেষ কালে সেই ক্ষমতা নিয়ে ভারত আবার এগিয়ে যাবে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক সবাইকে নিয়ে নূতন এক মহাজাতি অচিরে গড়ে উঠবে। আজও যদি কেউ সরে থাকে 'আপনারে চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান', তবে তার আর গতি নেই।

পশ্চিম বাংলার সালতামামি

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ইংরেজ আমলে বাজেট প্রকাশিত হইলে একটা সাড়া পড়িয়া যাইত, তাহা লইয়া নানা প্রকার আলোচনা হইত এবং আইন-পরিষদে প্রচণ্ড বিতণ্ডাও হইত। বাজেট উপলক্ষ্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের উপর অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করার চেষ্টা হইত। দলে বে-দলে টানাটানি পড়িয়া যাইত, ভোট ভাঙাভাঙি চলিত। কেহ কেহ নির্ব্বাচনকালে যে ব্যয় হইত, তাহা ভোট বিক্রয় করিয়া উশুল করিয়া লইত। আবার ইহাও দেখা যাইত, প্রতিপক্ষেরা এমন যুক্তি প্রয়োগ করিতে পারিতেন, যাহা জিদের বশে গবর্ণমেণ্ট এক বৎসর গ্রহণ না করিলে পর বৎসর, সেই ভাবে বাজেট প্রস্তুত করিতেছেন।

বর্ত্তমানে বাজেট সম্বন্ধে সে উৎসাহ দেখা যায় না। তাহার প্রথম কথা, ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে, অতএব সর্ব্বপ্রথম যে আপত্তি উঠিত, 'ইংরেজের স্বার্থদুষ্ট বাজেট, তাহার মধ্যে নানা ধূর্ত্তামি আছে, জনসাধারণের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া ইংরেজ-বিদ্বেষ বৃদ্ধি করিতে হইবে"—সে কারণ আর বিদ্যমান নাই। দ্বিতীয়তঃ, আমাদেরই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা দেশের স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া করা হইয়াছে। সুতরাং তাহার মধ্যে ত্রুটি থাকিলেও স্বকৃত ত্রুটি হিসাবে, তাহা উপেক্ষা করিলেও চলিতে পারে। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লাভ নাই। কংগ্রেসের যে দল কিছুদিন হইতে তাহার বিপক্ষে সমস্ত বিরুদ্ধ মত নির্ম্মমভাবে দলন করিয়া আসিতেছে এবং বহু বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ-বিদ্বেষ আমলে তাহার সুযোগ লইয়া যে দল নির্ব্বাচিত হইয়া বসিয়া আছে, তাহা একচ্ছত্র। পরিষদ-কক্ষেও এমন প্রতিপক্ষ নাই, যাহাকে সমীহ করিয়া চলা দরকার, সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যেও যেমন পরমত সহ্য করিবার শক্তি নাই, কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টও সেই দোষ ষোল আনা স্থলে আঠারো আনা লাভ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের কোনও সমালোচনা আজকাল আর তাঁহারা সহ্য করেন না; যে আমার পক্ষে নয়, সেই বিপক্ষে; কেহ কেহ দলনিরপেক্ষভাবে গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের কল্যাণে কথা বলিতে পারে, গবর্ণমেণ্ট তাহা মনে করেন না। অত্যন্ত দুর্দ্দিন পড়িয়াছে, যাঁহারা সৎসাহসের সহিত এতদিন অন্তরের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের অনেককেই এখন নানা ভাবে গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষুদ্র বৃহৎ কৃপাপ্রত্যাশী। গবর্ণমেণ্টের বাজেট প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহাদের অনেকেই হয় ত নানা বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন না। এই সকল কারণে গবর্ণমেণ্টের বাজেট আজকাল আর চঞ্চলতা এমন কি কোনও উৎসাহ সৃষ্টি করে না।

নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এ অবস্থার অবসান হইবে নূতন নির্ব্বাচন হইলে। আজ যাঁহারা নিশ্চিন্তে বসিয়া রাষ্ট্রীয়কার্য্য পরিচালন করিতেছেন তাঁহাদের অনেকেরই পরিবর্ত্তে নূতন লোক আসিবে। লোকমত ক্রমেই যে গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে চলিতেছে সে প্রমাণের অভাব নাই এবং তাহাই যে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ আলোচনা তাহা সহজেই গ্রহণ করিতে পারা যায়। বাজেট দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতি ধরিতে পারা যায়; তাহা জনসাধারণের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহার দ্বারা গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে লোকের মনোভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে লোকের মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, যে যত লক্ষ পক্ষে বা বিপক্ষে আছে, তাহা অপেক্ষা বহু গুণ, অথবা জনসাধারণের অধিকাংশই, গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে বিরক্তিসূচক তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের বাজেট লইয়া তাহারা বেশী মাথা ঘামাইতে চায় না।

১৯৫০-৫১ সালের হিসাব

আগামী বৎসরের হিসাব উপলক্ষ্যে বর্ত্তমান (১৯৪৯-৫০) সালের শেষের দিকের আর্থিক অবস্থা আলোচিত হইয়া থাকে। আমার মনে হয় লোকে এ দুইয়ের কোনটার দিকেই মন দেয় নাই। তাহারা দেখিল, ভাত, কাপড়, তেল, কয়লা, চিনির কোনও সুরাহা হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে কি না। আমরা বহু আশার কথা পাইয়াছি, গবর্ণমেণ্টের বহু দুশ্চিন্তার কথা শুনিয়াছি, কিন্তু যাহাতে এই সকল জিনিসের দর কমে, বা দর কমিবার ব্যবস্থা হয়, তাহার কোনও চেষ্টা হয় নাই, লক্ষণও বর্ত্তমান নাই। পশ্চিম-বাংলা সরকার খুব সন্তুষ্ট যে ট্যাক্স আর বাড়ে নাই; যখন বাড়ে নাই, তাঁহারা দয়া করিয়া আর যে বাড়াইবার ব্যবস্থা করেন নাই, ইহার জন্য পশ্চিমবঙ্গবাসী অবশ্য খুবই কৃতজ্ঞ। এবার কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট যে নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করেন নাই, ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যাহা চাপাইয়া দিয়াছেন, এখন স্বচ্ছন্দে তাহার ফলভোগ করিতে পারিবেন।

ট্যাক্স প্রদানের শক্তি

মানুষের স্থিতিস্থাপকতা শক্তি যে অপরিসীম ইহাতে সন্দেহ নাই, তাহা না হইলে সমস্ত বাংলা যে ট্যাক্স দিত, আজ এক-তৃতীয়াংশ বাংলা তাহাই দিতে বাধ্য হইতেছে। বাংলা বিভাগের পূর্ব্বে সরকারী আয় ছিল ৩৯ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা আর ১৯৫০-৫১ সালের বরাদ্দ ৩৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ শতকরা মাত্র ১৫ টাকা কম, অথচ জনসংখ্যা ও আয়তন কমিয়াছে শতকরা ৬৬ ভাগ। সুতরাং

কত অল্পসংখ্যক লোক কত বেশী ট্যাক্স দিতেছে তাহা এই হিসাব হইতে পরিস্ফুট হইতেছে। ইহার মধ্যে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় কৃষি আয়কর, অর্থাৎ ১৯৪৩-৪৪ সালে ছিল না, ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে ৫০ লক্ষ টাকা আয় আন্দাজ করা হয়, ১৯৪৮-৪৯ সালে ৪৩ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছিল, ১৯৪৯-৫০ সালে হঠাৎ তাহা কমাইয়া কেন ৪০ লক্ষ করা হইল বুঝা যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও প্রকৃত পক্ষে পাওয়া গেল ৬০ লক্ষ টাকা; ১৯৫০-৫১ সালের বরাদ্দ ৬০ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। যেখানে ৬০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে, সেখানে মাত্র ৪০ লক্ষ টাকার হিসাব ধরা হইয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে বাজেটের কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। এই ভাবে ট্যাক্স বাড়িয়া যাওয়ায় সাধারণ শস্য-মূল্য যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহা ত সকলেই বুঝিতে পারেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট চালাইতে হইলে টাকা চাই।

বিক্রয়-কর

বিক্রয়-কর সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা যাইতে পারে; ১৯৪১ সালে বিক্রয়-কর আইন পাস করা হয় এবং ১৯৪১-৪২ সালে ১৫'৬ লক্ষ টাকা আয় হয়। অবিভক্ত বাংলায় ১৯৪৬-৪৭ সালের বরাদ্দ ছিল ৩ কোটি টাকা; ১৯৪৮-৪৯ সালে কিন্তু বিভক্ত বাংলায় প্রকৃত আদায়ের পরিমাণ ৪'৩২ কোটি টাকা। ১৯৪৯-৫০ সালে বরাদ্দ ৪ কোটি টাকা; কিন্তু প্রকৃত আদায় ৪'৩০ কোটি টাকা। এখানেও বরাদ্দ বেশ কমাইয়া ধরা হইয়াছিল। আবার ১৯৫০-৫১ সালে ৪'৫ কোটি টাকার স্থলে ৪ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। ট্যাক্স দিতে দিতে লোকের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা, অনেক লোকেরই আয়ের পথ রুদ্ধ হইতেছে, সেই হিসাবে আগামী বৎসর আয় কম হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। বিক্রয়-কর ক্রমেই মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের উপর চাপিয়া বসিতেছে, গবর্ণমেণ্টের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। মাননীয় অর্থমন্ত্রী কয়েক বৎসর বাৎসরিক মাত্র দুই হাজার টাকা আয়কারী লোকের উপর ত্রিশ টাকা ট্যাক্স আদায় করিয়াছেন; তাহার নাম ছিল 'employment tax'। যাহারা চাকুরী দ্বারা কায়ক্লেশে জীবন যাপন করেন এবং যাঁহারা মাসিক তিন, পাঁচ, দশ হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন, সমদর্শী সরকার মহাশয়ের নিকট ট্যাক্সের ব্যাপারে সকলেই সমান ছিলেন। মুসলিম লীগ আমলেও যে সকল জিনিষের উপর ট্যাক্স ছিল না, তাহার উপরও ট্যাক্স চড়াইয়া আয় হইতেছে। গত বৎসরে সরিষার তৈল, কয়লা, শাকসব্জী, ফল প্রভৃতি নানা দ্রব্যের উপর বিক্রয়-কর ধরা হইয়াছিল; কিন্তু সাধারণের অত্যন্ত বিরুদ্ধ-সমালোচনায় সরিষার তৈল, কম পরিমাণ কয়লা প্রভৃতির উপর ট্যাক্স চাপাইয়া দেওয়া হয় নাই। সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতে হয়, কখন নিত্য প্রয়োজনীয় কোন্ বস্তুর উপর বিক্রয়-কর ধার্য্য করা হইবে। আমার ত মনে হয়, বিক্রয়-করের তালিকা হইতে অন্ততঃ পক্ষে, প্রাথমিক শিক্ষার পুস্তক, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, কম দামের জুতা ও ছাতা, কাপড় প্রভৃতি বস্তুগুলি বাদ দেওয়া প্রয়োজন। বিক্রয়-কর প্রভৃতি ক্রমবর্দ্ধমান হিসাবে চাপাইতে থাকিলে আর দ্রব্য-মূল্য হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা নাই।

ভূমি রাজস্ব

জনসাধারণের ধারণা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারীতে খাজনা বৃদ্ধির উপায় নাই। একথা কতকাংশে সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। পূর্ব্বে কৃষি-আয়করের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার পর রোড সেস্, শিক্ষা-কর প্রভৃতি আছে। জমির উপর এই সকল করের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। তাহা ছাড়া অপর দিকও আছে। জমিদারদিগের খাজনা আদায় করিবার ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, কারণ কিছু খাস-মহল ও বাকী জমিদারদিগের নিকট হইতে নির্দ্ধারিত কর আদায়ের জন্য ১৯৪৮-৪৯ সালের গবর্ণমেণ্টের খরচ ২৮'৫৮লক্ষ টাকা; ১৯৫০-৫১ সালে ৪১'৬৯ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইতেছে। ভূমিরাজস্ব খাতে ১৯৫০-৫১ সালে ২'০৬ কোটী টাকার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আয় ১'৩৯ টাকা। ঐ টাকা বাদ গেলে মাত্র ৬৭ লক্ষ টাকা থাকে; তাহার তত্ত্বাবধান করিতে গবর্ণমেণ্টের যে ভাবে ব্যয়ের বহর বাড়িতেছে, তাহাতে এই সময় জমিদারী বিলোপ করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি রাজস্ব আদায়ের ভার লন, তাহা হইলে ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রী হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। আদায়ের জন্য যে খরচ বাড়িয়াছে, তাহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর অতিরিক্ত আয় বলিয়া ধরিয়া সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কি প্রথায় জমি ব্যবস্থা হইবে এবং তাহাতে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে জানিলে তবে জমিদারী প্রথা বাতিল করিবার কথা ভাবিতে হইবে।

সরকারী যানবাহন

আয় বৃদ্ধির কথা ভাবিতে গেলে যে সকল বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া আছে, পূর্ব্বে সেই দিকে মন দেওয়া দরকার। এরূপ ক্ষেত্রে নিজেদের কৃতিত্ব প্রমাণিত হইলে, যাহা সন্তোষজনক কাজ দিতেছে, তাহার উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। সরকারী যানবাহন ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে হতাশ হইতে হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে আয় হয় ১০'৭৪ লক্ষ টাকা, খরচ হয় ৫'৯১ লক্ষ টাকা। ১৯৪৯-৫০ সালে আনুমানিক আয় ধরা হইল ৮৭৫ লক্ষ টাকা, কিন্তু আদায় হইল মাত্র ৩৪'৫০ লক্ষ টাকা; কিন্তু ব্যয় দাঁড়াইল ৩৩ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ উদ্বৃত্ত থাকিল ১'৬৫ লক্ষ টাকা। ইহা অপেক্ষা হাসির কথা আর কি হইতে পারে? আরও

সুন্দর ব্যবস্থা হইতেছে। ১৯৫০-৫১ সালে আয় হইবে ১৪'১০ লক্ষ টাকা; প্রকৃত আয় যে কত হইবে তাহার স্থিরতা নাই; খরচ পড়িবে ৯১'৫১ লক্ষ টাকা। পরিচালক দুই জন আছেন, তাঁহাদের ব্যয় ১৯৪৮-৪৯ সালের দুই হাজার টাকা হইতে ১৯৫০-৫১ সালে ৭০২ লক্ষ টাকা হইবে। যানবাহন খাতে ১৯৪৮-৪৯ সালে ২৭'৫৪ লক্ষ, ১৯৪৯-৫০ সালে ৭২'২৫ লক্ষ টাকা মোট ৯৯'৭৯ লক্ষ অর্থাৎ এক কোটি টাকা খরচ হইয়া ১৯৪৯-৫০ সালে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা আয় হইয়াছে; মোট কথা শতকরা ১'৬ বা দেড় টাকা লাভ পড়িয়াছে। যদি লাভের পরিমাণ সত্যই এইরূপ থাকিত, তাহা হইলে আর কেহ বাস্ চালাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত না। হিসাব লইয়া দেখা গেল, বাস্ প্রভৃতির লাভ শতকরা ন্যূনপক্ষে ১৫ টাকা। আমার মনে হয়, সরকারী কর্ম্মদক্ষতায় যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে একটি আধা-সরকারী কর্পোরেশন সৃষ্টি করিয়া, এক কোটি টাকা মূলধন দিয়া ছাড়িয়া দিলে ঢের বেশী লাভ পাওয়া যাইত। ইহাই শেষ নয়, ১৯৫০-৫১ সালে আরও ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হইবে। কলিকাতায় সরকারী বাস্ দেখিয়া যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা অপব্যয়ের বহর দেখিয়া হতাশা এবং আশঙ্কায় পরিণত হইয়াছে।

আবগারী

মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের ব্যবস্থা করিবে বলিয়া কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়া রাখিয়াছে। কোনও কোনও প্রদেশ তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে। পশ্চিম বাংলার রাজস্বের অবস্থা বিবেচনা করিয়া সরকার-পক্ষ তাহাতে নিবৃত্ত আছেন বলিয়া মনে হয়। আবগারীর আয় পশ্চিম বাংলার "লক্ষীর ঝাপি" বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অবিভক্ত বাংলায় সোয়া ছয় কোটি লোকের নিকট হইতে যখন ৬'৪২ কোটি টাকা পাওয়া যাইত, তখন বিভক্ত বাংলায় আড়াই কোটি লোকের নিকট হইতে ৫'৮৮ কোটি অর্থাৎ মাত্র ৫৪ লক্ষ কম পাওয়া কি গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে নিতান্ত আনন্দ ও আশার কথা নহে? ইহার উপর ঘোড়দৌড় প্রভৃতি বাজি ধরা খেলা, যাহা জুয়ার নামান্তর, বৎসরে এক কোটি টাকা দিতেছে। কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট আবগারী ও জুয়া খেলার কোনটাই বন্ধ করিতে পারিতেছে না। সম্ভবতঃ ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে বহু বৎসর সময় লাগিয়া যাইবে।

শাসন-ব্যবস্থা

আমরা শুনিতে পাই, স্বাধীনতা লাভ করিবার পর, শাসন-ব্যবস্থার এত কাজ বাড়িয়াছে, যাহাতে লোক না বাড়াইলে আর উপায় নাই, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ের বহর বাড়িয়া চলিয়াছে বিরাম নাই, অবসাদ নাই। একটি কথা মনে রাখিলে সব বিচার বিতর্ক শুরু হইয়া যায়। কাজ ত বাড়িয়াছে বুঝিলাম; কিন্তু অবিভক্ত বাংলার যত টাকা ব্যয় হইত, তাহা অপেক্ষা টাকা ত বাড়ে নাই এবং তখন এক টাকায় যত জিনিষ দ্রব্য বা শ্রম ক্রয় করা যাইত, এখন তাহা অপেক্ষা কমিয়াছে। সুতরাং কাজ যে খুব বেশী বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহা মনে করা ভুল। ধরিয়া লওয়া গেল, কাজ বাড়িয়াছে, লোকবৃদ্ধি করিতে হইয়াছে; কিন্তু ১৯৪৮-৪৯ সালে বাংলা বিভাগের পরও খরচ ছিল ১'৮ কোটি টাকা। আর ১৯৫০-৫১ সালের বরাদ্দ ২'৩৮ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা ৩১ টাকা বেশী। হিসাব দৃষ্টে বোঝা যায়, সাধারণ নির্ব্বাচন-রণে প্রস্তুত হইবার জন্য মাত্র ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। লেখকের ব্যক্তিগত মত এ সময় সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভারতের প্রধান মন্ত্রী দশ লক্ষ লোকের সম্মুখে বলিয়া গেলেন বাংলায় সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দুই দুইটা অধিবেশনে তাহা সমর্থন করিলেন। বাংলা গবর্ণমেণ্ট নিরুপায়, তোড়জোড় চলিতে লাগিল। হঠাৎ জ্ঞানোদয় হইল ভারত সরকারের; "খুড়ি" বলিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন নির্ব্বাচন সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেওয়া ভুল হইয়াছে। ইতিমধ্যে বাংলার শূন্যপ্রায় তহবিল হইতে ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গেল; তন্মধ্যে ১৯৪৯-৫০ সালে ২৭ লক্ষ পড়িতেছে। ইহার জন্য ভারত সরকারের নিকট হইতে খেসারত দাবী করা প্রয়োজন। পশ্চিমবাংলার অনেকগুলি উপনির্ব্বাচন পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা যে কেন হয় না, তাহা জনসাধারণ আজও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

প্রচার বিভাগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায়, ১৯৪৮-৪৯ সালে বরাদ্দ হইল ৮ লক্ষ টাকা; খরচ হইল ১১'৭ লক্ষ টাকা। ১৯৪৯-৫০ সালে বরাদ্দ হইল ১২'৪৭ লক্ষ টাকা, খরচ হইল ১৬'২ লক্ষ। ১৯৫০-৫১ সালের জন্য ১৫'৭৭ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, আশা করা যাক কার্য্যকালে ইহা ২০ লক্ষ টাকা অতিক্রম করিয়া যাইবে।

পুলিস

অনেক বিষয় বলিবার আছে, স্থানাভাবে তাহা সম্ভব নয়। তবে পুলিস সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। ইংরেজ আমল হইতে বাজেট প্রকাশিত হইলেই পুলিসের উপর সকলের নজর পড়িত। পুলিসের নজর চোর, ডাকাত, জোচ্চোর, বাটপাড়, রাজদ্রোহী প্রভৃতি অন্যায় আচরণকারীর উপর। আর গবর্ণমেণ্টের মোট আয়ের একটা বড় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে পুলিসের উপর সহজেই লক্ষ্য পড়ে। এবার যেন আরও বেশী করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। অবিভক্ত বাংলার ব্যয় ছিল ৪'৭৮ কোটি টাকা, আগামী বৎসরে (১৯৫০-৫১) তাহা ৪'৮৩ কোটি হইতেছে। বাংলার আয়তন ও জনসংখ্যার

কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া মনে রাখা প্রয়োজন। কমিউনিষ্ট উৎপাত বাড়িতেছে তাহাতে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা, কিন্তু যে ভাবে খরচ বাড়িয়াছে তাহা কোনও প্রকারে সমর্থন করা যায় না। তাহার পর, যে-কোনও কারণে হউক পুলিসের দক্ষতা ও কর্ম্মতৎপরতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, তাহার জন্য কর্ম্মকর্ত্তারা কতটা দায়ী তাহা একবার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। মনে হইতে পারে "কণ্ট্রোল" প্রভৃতি ব্যাপারে পুলিসের কাজ বাড়িয়াছে, তাহাতেই অধিক ব্যয় দেখা যাইতেছে। কিন্তু ঘটনা একটু স্বতন্ত্র; তাহার জন্য অতিরিক্ত ৩৪ লক্ষ টাকা ধরা আছে, অবশ্য তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ খরচ হইয়া গিয়াছে। তদুপরি Extra-ordinary charges হিসাবে পুলিস বিভাগে আরও ২৯.৮ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখা যায়।

শিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা বিভাগের ব্যয় যথেষ্ট বাড়িয়াছে; বাংলা বিভাগের পূর্ব্বে ৩.২ কোটি টাকা ছিল। ১৯৪৯-৫০ সালে ২.৯৪ কোটি ধরা ছিল, খরচ হইয়াছে ২.৭৬ কোটি। ১৯৫০-৫১ সালে ৩.০৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। সুতরাং শিক্ষা-ব্যবস্থার বিশেষ কোনও উন্নতি না হইলেও, শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যপরিচালনার ব্যবস্থার উন্নতি হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রভূত সাহায্য পাইতেছে, তাহা ছাড়া শিক্ষার উন্নতি-কল্পে প্রাথমিক শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি হইতে কারিগরী শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি নানা কারণে সম্মিলিত ব্যয় ১৯৪৯-৫০ সালে ১৬.৩৪ লক্ষ টাকা; ১৯৫০-৫১ সালে ৭৯ লক্ষ টাকা পড়িবে। দুঃখের বিষয় কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় কাজের জন্য টাকার বরাদ্দ থাকিলেও কাজ আরম্ভই হয় নাই।

অপরাপর বিভাগ

চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি সকল বিভাগের ব্যয়ই উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে টাকা আছে, কিন্তু কাজ আরম্ভ হয় নাই বা যাহা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত উপেক্ষণীয়। অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদন আন্দোলনের যাহা ফল হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। ইহার জন্য এযাবৎ কেন্দ্রীয় সরকারের অন্ততঃ ২৫ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। মাননীয় অর্থ-সচিব বলিলেন, সারা ভারতে শস্যের ফলন হ্রাস পাওয়ায় ১৯৪৮ সালে যখন ২.৮ মিলিয়ন (২৮ লক্ষ) টন তণ্ডুল প্রভৃতি আমদানী করিতে হইয়াছিল ১৯৪৯ সালে উহা ৩.৫ মিলিয়ন, অর্থাৎ ৩৫ লক্ষ টনে দাঁড়াইয়াছে। কৃষি বিভাগ ও তৎসঙ্গে খাদ্য উৎপাদন আন্দোলন অধিকাংশ কাগজ ও ফাইল মারফত কাজ সমাপন করিয়া থাকেন; মাটি লইয়া যত অধিক কাজ হয় ততই মঙ্গল। কৃষি বিভাগের প্রায় অধিকাংশ টাকা কর্ম্মচারীদের মাহিনা যোগাইতে চলিয়া যায়। প্রতি জেলায় বড় বড় "বাদা" বা ক্ষেতের মাঝে অন্ততঃ দশ বিঘা জমি নিজ তত্ত্বাবধানে চাষ করিয়া যদি কৃষি বিভাগ আপনাদের কাজের সফলতা দেখাইতে পারেন তাহা হইলে প্রচার অপেক্ষা বেশী কাজ হয়। মোটা খরচের মধ্যে বীজ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয় করিয়া পরে খাদ্য উৎপাদন খাতে বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করা। তাহা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কাজ নাই। শিল্প বিভাগের প্রতি করুণা প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। শিল্প ও মৎস্য উৎপাদন বিভাগে মোট ব্যয় ৫০ লক্ষ টাকা; তাহার মধ্যে দুই জন বড় কর্ম্মকর্ত্তা পান ৪১ হাজার টাকা; তাঁহাদের আপিস প্রভৃতির ব্যয় মিলিয়া ১,৯৩,৫০০ টাকা পড়ে। শিল্প শিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে তাহার উল্লেখ না করাই মঙ্গল; অর্থাৎ সমস্ত মাহিনা সমেত মোট সাড়ে আট লক্ষ টাকা, তাহার মধ্যে নানা স্কুলে সাহায্য ৪ লক্ষ টাকা।

সেচ বিভাগ

সমগ্র পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, সেচ বিভাগের উপর এবং আমার মনে হয় ইহার উপর যথা-যোগ্য মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। ময়ূরাক্ষী ও দামোদর পরি-কল্পনার জন্য সাড়ে ছয় কোটি টাকা এক বৎসরে ব্যয় হইতেছে; কেন্দ্রীয় সরকার এই টাকা পশ্চিম বাংলা সরকারকে ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সময় সময় প্রতিশ্রুত টাকা না আসাতে বা অঙ্গীকার প্রত্যাহার করিবার ভয় প্রদর্শন করায় কাজে বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। কিন্তু খাল, বিল, মজা পুষ্করিণী উদ্ধার এবং ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার উপর দেশের বহু মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। সাত মণ তেল পুড়িলে রাধা নাচিয়া থাকেন, ইহাই চলতি প্রবচন। সাত মণ তেল পুড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে, আমরা হয়ত সমস্ত রোশনাই দেখিয়া যাইব না, কিন্তু ছোট ছোট বাঁধ প্রভৃতি দেওয়া, নানাভাবে সেচ প্রভৃতির ব্যবস্থা যাহা চলিতেছে, তাহাতে মনে হয় অপরাপর বিভাগ হইতে সেচ বিভাগে কাজ ভাল হইতেছে। যে সকল পরিকল্পনা আজ বিশ বা ততোধিক বৎসর যাবৎ গবর্ণমেণ্টের নিকট পড়িয়া আছে, যাহা ইঞ্জিনীয়াররা অমত করেন, আর স্থানীয় লোকে যুক্তিদ্বারা তাহার উপযোগিতা প্রমাণ করেন, সেখানে জনসাধারণের মতের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। যদি কোনও প্রত্যবায় ঘটে, তখন লোকে গবর্ণমেণ্টকে দোষ দেয় না। এরূপ ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে গবর্ণমেণ্টের তরফে এযাবৎ অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে এবং তাহাতে কাজে অযথা বিলম্ব হইয়াছে। যাহারা বর্দ্ধমানের মোহনপুরের হানার বাঁধ এবং চব্বিশ পরগণার সোনারপুর হইতে বারুইপুরের বাদার জল-নিকাশের ব্যবস্থার কথা জানেন, তাঁহারা আমার যুক্তির সার-বত্তা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সেচের সহিত কৃষি, মৎস্য, জলনিকাশের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য এবং লোকের নানাভাবে উপজীবিকার পন্থা জড়িত; সুতরাং এক্ষেত্রে কোনও কৃপণতা করা উচিত নয়, সম্ভবতঃ তাহা হইতেছেও না।

বাজেট আরও বিশদভাবে আলোচনা করা যাইত, কিন্তু লোকের ধৈর্য্যের সীমা আছে। ধীরভাবে বাজেট পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যে সকল ক্ষেত্রে অহেতুক এবং হঠাৎ ব্যয় বাড়িয়াছে, সে সকল ক্ষেত্রে অপব্যয় যথেষ্ট আছে। যে সকল ক্ষেত্রে বা যাহার জন্য যত ব্যয় করা উচিত নয়, অর্থাৎ কম ব্যয়ে ঢের বেশী কাজ পাওয়া যায়, সেরূপ উপায় সকল প্রতিপালিত হয় বলিয়া মনে হয় না। আজ আমাদের হাতে আয় ব্যয়ের ভার পড়িয়াছে, তাহা সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করিতে না পারিলে দোষ আমাদেরই, অপরের নহে। যাঁহারা সরকারের কল্যাণ ও দেশের মত চাহেন, তাঁহাদের বাজেটে উন্নতি করা যাইতে পারে, এবং তাহার জন্য সর্ব্ব- প্রকারে চেষ্টা করা উচিত।

পূর্ব্ব-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা

স্বামী পরমানন্দ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর নেতৃত্বে প্রেরিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন ব্রিটিশ-শাসিত পূর্ব্ব-আফ্রিকার টাঙ্গানাইকা টেরিটরি, উগাণ্ডা প্রোটেক্টরেট্ এবং কেনিয়া কলোনী—এই তিনটি দেশের বহু শহরে ও পল্লীতে ব্যাপক ভ্রমণ করিয়া এক বৎসর চার মাস পরে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। মিশনের সহনেতা স্বামী পরমানন্দজী পাটনাস্থ প্রেস ট্রাষ্ট অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পূর্ব্ব-আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ বিবৃতি দিয়াছেন :

ভারতীয়দের অর্থনৈতিক অবস্থা

বহুকাল যাবৎ পূর্ব্ব-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল ছিল। রাজনৈতিক কারণে ক্রমেই সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে চলিয়াছে। এইবার উগাণ্ডা ও অন্যান্য স্থানের কার্পাস তুলার ফলন প্রচুর হওয়ায় ভারতীয় তুলাকলের মালিকদের ব্যবসায় সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ খুবই আশাপ্রদ প্রতীত হইলেও স্থানীয় শাসকবর্গের সংরক্ষণ নীতির যথোচিত ব্যবস্থার অভাবে উক্ত অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় এবং অবধারিত বিপর্য্যয় ঘটে। ভারতীয় প্রবাসীদের মধ্যে তুলার কলের মালিকেরাই সর্ব্বাধিক সঙ্গতি-সম্পন্ন; এবার এইভাবে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। ঘটনা দৃষ্টে অনুমান করা কঠিন নয় যে, ইউরোপীয় তুলাকলের মালিক-দিগকে পুনঃসংস্থাপনের ইহা প্রাথমিক পর্ব্বমাত্র। এই সকল তুলাকলের পাশ্চাত্ত্য মালিকগণ এত দিন ভারতীয়দের সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে উক্ত ক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করিবার গুপ্ত উপায় অনুসন্ধানে রত ছিল। সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবসায়ীসম্প্রদায়কে পাশ্চাত্ত্য ব্যবসায়ীদের দ্বারা উদ্ভাবিত কঠোর প্রতিযোগিতায় যুগপৎ ইউরোপীয় ও আফ্রিকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অবতীর্ণ হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এই ক্ষেত্রে নিজ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের দায়ে পাশ্চাত্ত্য প্রভুরা আফ্রিকার নিগ্রোদিগকে সর্ব্বপ্রকার কৃত্রিম সমর্থন দ্বারা আপন উদ্দেশ্যসাধনে উৎসাহিত করিতেছে।

পাদ্রীদের প্ররোচনা

এখন ইহা আর অপ্রকাশ্য নয় যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনে তৎপর খ্রীষ্টীয় পাদ্রীগণ শহরে ও সুদূর পল্লীর সর্ব্বত্রই অন্তরাল হইতে আফ্রিকাবাসী নিগ্রোদিগকে এমন ভাবে উস্কানি দিয়া আসিতেছে যাহাতে তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জন করে। এই প্রকার চেষ্টার ফল কোথাও কোথাও উগ্র আকার ধারণ করিতে দেখা গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আফ্রিকার কতিপয় নেতার যথাকালীন সহানুভূতিপূর্ণ চেষ্টায় এযাত্রা দুর্ঘটনা বেশীদূর গড়াইতে পারে নাই। নিরপেক্ষ দর্শকের পক্ষে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এই সব পাদ্রী সুপরিকল্পিত নির্দ্দিষ্ট পন্থায় অন্তরাল হইতে জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবার তালে আছেন। একথা ভুলিলে চলিবে না যে, এই সব তথাকথিত সম্ভ্রান্ত পাদ্রীর উপরই মানবকল্যাণ, শান্তিস্থাপন ও সভ্যতা সংস্কৃতি বিস্তারের পবিত্র দায়িত্ব ন্যস্ত।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় জাতিবিদ্বেষের আগুন

যখন দক্ষিণ-আফ্রিকায় জাতিবিদ্বেষের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়া হতভাগ্য প্রবাসী ভারতীয়দের সর্ব্বস্বান্ত করিতে-ছিল তখন পূর্ব্ব-আফ্রিকায়ও ইহার অগ্নিশিখা পৌঁছিবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণলাভের সুবুদ্ধিতে সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ একযোগে প্রশংসনীয় চেষ্টা করেন। এই ভাবে তাঁহারা নূতন ক্ষেত্রে উহার বিষাক্ত প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনায় গতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হন। ফল

সুন্দর হইল। পূর্ব্ব-আফ্রিকা বাঁচিল। কিন্তু যাহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতীয়দের বিতাড়িত করিয়া নিষ্কণ্টকভাবে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লওয়া, তাহারা এইরূপ ভয়াবহ জাতিসংঘর্ষের সুযোগকে স্ব-স্ব উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত করিবার ফিকিরে আছে। ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রভাবশালী ইউরোপীয়দের মধ্যে এমন কতকগুলি সম্প্রদায় রহিয়াছেন যাঁহাদের স্বার্থ ও নীতি এরূপ উদ্দেশ্যমূলকভাবে অন্তরাল হইতে পরিচালিত করা হয়, যেন পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমৃদ্ধিশালী ঔপনিবেশিক অঞ্চলসমূহের জনসংখ্যার অবিচ্ছিন্ন ভারতীয় অংশকে নিঃশেষে চিরতরে বিতাড়িত করা যায়। তথায় ভারতীয়দের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদলাভের যোগ্যতাসত্ত্বেও অধিকার নাই। হাইল্যাণ্ড বা উচ্চ মালভূমিতে শুধু পাশ্চাত্ত্য শ্বেতকায় শাসক জাতিরই অধিকার আছে। এমন কি যাহাদের মাতৃভূমি তাহারাও ঐসব স্বাস্থ্যকর উর্ব্বর অঞ্চল হইতে বিতাড়িত; তাহারা শুধু শ্বেতাঙ্গ সেবার অধিকার পাইয়া প্রভুগণকে অতুল সম্পদের অধিকারী করিয়া তুলিবার জন্য পরিশ্রম করিতে পারে মাত্র—তাও স্বল্প বেতনে। ভারতীয়দের স্থায়ী জমিলাভের সম্ভাবনা নাই। ব্যবসায়ের পারমিট প্রতি বৎসর নূতন করিয়া লইতে হয়। অশ্বেতাঙ্গ বহিরাগতের পারমিটে নিদারুণ কড়াকড়ি। শ্বেতাঙ্গ প্রভুরাই আফ্রিকার উর্ব্বর ভূমির প্রকৃত অধিকারী। তাঁহারাই আফ্রিকার সোনা, হীরা-জহরৎ প্রভৃতি খনির মালিক।

সামাজিক অবস্থা

ভারতীয়দের দুরবস্থার মূলে আভ্যন্তরীণ কারণও আছে। হিন্দুদের সমাজ দেহের অভ্যন্তরে ধর্ম্মগত এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থবোধের অভাব ও উদাসীনতা পরস্পরকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অধিকন্তু পাশ্চাত্ত্যের দাসসুলভ অন্ধ অনুকরণ ও বিলাস-ব্যসনের প্রবৃত্তি প্রবাসী ভারতীয়গণকে প্রবাসে অধীন ও অবনত করিয়া রাখিবার একটি কারণও বটে। তাঁহাদের ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার গৌরবময় আদর্শকে প্রবাস-জীবনে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বহু শহরে মন্দির বা ধর্ম্মস্থান নাই। জনসাধারণ নিজেদের ধর্ম্ম কি, সংস্কৃতি কি, নীতি কি জানিবার সুযোগ পাইতেছে না। এইরূপ অবস্থায় তাহারা বৈদেশিক শিক্ষা সভ্যতার প্রভাবে কেন প্রভাবান্বিত হইবে না? খ্রীষ্টান ও মুসলমান প্রচারকগণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদিগকে স্ব-স্ব ধর্ম্ম ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার জন্য যথেষ্ট তৎপরতা ও উৎসাহ দেখাইয়াছেন। এই ক্ষেত্রে হিন্দুগণের কোনও কর্ম্মপন্থা নাই বলিলে অপলাপ হইবে না। তাঁহারা ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিদেশে প্রচারের মহান্ কর্ত্তব্যকে বরাবরই উপেক্ষা করিয়াছেন; ফলে স্থানীয় সমর্থন ইঁহাদের পশ্চাতে কিরূপে থাকিতে পারে? এই ভাবে তাঁহারা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতীয়দের সম্পর্কে অধিকাংশ আদিম অধিবাসীরই এইরূপ ধারণা। ইহার ফল মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী হইবে, বিশেষতঃ পূর্ব্ব-আফ্রিকার মত স্থানে। এখন অবস্থার চাপে আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব? সময় অতীতপ্রায়। নিজেদের অদূরদর্শিতার জন্য আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়ের দাবিও উপেক্ষিত।

তাহাই যদি হয় তবে ভারতবাসীর প্রবাস-জীবন নিশ্চয়ই দুঃখকর ও দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিবে।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য

ভারত বিভক্ত হওয়ার পরেই পূর্ব্ব-আফ্রিকাস্থ ভারতীয় মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যে উহার বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে—আভ্যন্তরীণ আলোড়ন দেখা দিয়াছে। ফলে, কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রে মুসলমানগণ তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সংরক্ষণ কল্পে পৃথক নির্ব্বাচন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন। ইহাতে ফল এই হইয়াছে যে, তাঁহাদের বাস্তব জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে বিশেষ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির প্রসার লাভ করিতেছে। অবশ্য, পূর্ব্ব আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে উহাকে প্রশমিত করিবার প্রভূত চেষ্টা হইয়াছে। মনে হয়, উহা আর কার্য্যকরী হইবার নয়। স্বল্পসংখ্যক মুসলমান কর্ম্মী ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও ভারতের প্রতি পূর্ব্ব আনুগত্য ও প্রেম প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের কোনও প্রভাব বর্ত্তাইতেছে না।

সম্প্রতি তথাকার মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারকল্পে ব্রিটিশ রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ মোম্বাসায় একটি সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। এখানে ভবিষ্যতে ইহার ফল বিষময় হইবার সম্ভাবনা আছে। ভারতীয়গণকে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য রাজনৈতিকদের হস্তে ক্রীড়নক না হইয়া কি ভাবে ঐক্যবদ্ধরূপে নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবেন এবং তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও অভ্যাসকে পরিবর্ত্তিত করিয়া তাঁহাদের ঔপনিবেশিক সত্তাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে পারেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার

সঙ্ঘ-প্রেরিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন আফ্রিকার উপরি-উক্ত তিনটি দেশে ভারতীয়দের দ্বারা অধ্যুষিত বহু শহর ও গ্রামে এক বৎসর চারি মাস কাল ব্যাপক পরিভ্রমণ, প্রচার ও সংগঠন-কার্য্য দ্বারা বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিকারার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। মিশনের সভ্যগণ কখনও সমবেত ভাবে, আবার কখনও দুই-তিন দলে বিভক্ত হইয়া, বহু শহর ও গ্রামের স্কুল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সহস্রাধিক বক্তৃতা করিয়াছেন। সাংস্কৃতিক, সামাজিক, দার্শনিক, ধর্ম্মবিষয়ক আন্তর্জাতিক,

নৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে গভীর আলোচনা সর্ব্বত্র হইয়াছে। স্থানে স্থানে প্রদর্শনী, উপদেশ, খেলাধূলা, সমবেত প্রার্থনা, ভজনাবলী, যোগশিক্ষা দান, ছাত্রসম্মেলন, শিক্ষক সম্মেলন প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, রাজনৈতিক, সামাজিক দলাদলি ও মতভেদের বিদ্বেষ যাহাতে প্রসারলাভ করিতে না পারে সে বিষয়ে তাঁহারা নানা ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবাসী ভারতীয়দিগকে একই সাধারণ ক্ষেত্রে সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়া তাঁহারা বিভিন্ন শহরে ও পল্লীতে মিলন-মন্দির পরিচালক কমিটি স্থাপন, এবং নাইরোবী ও মোম্বাসা শহরে দুইটি স্থায়ী কেন্দ্র গঠন করিয়াছেন। প্রবাসী বাঙালী বালকদের পড়িবার জন্য নাইরোবীতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। কামুলী ও কিটালে শহরে স্থানীয় জনগণের সাহায্যে তাঁহারা দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন; উহাদের সঙ্গে গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতিও সংযোজিত হইয়াছে। জাঞ্জিবার ও টাঙ্গা শহরে বালকদের চরিত্রগঠনোপযোগী বাল-মিলন মন্দির হইয়াছে। মিশনের সভ্যবৃন্দ পূর্ব্ব-আফ্রিকার সর্ব্বত্রই সাদর অভ্যর্থনা পাইয়াছেন। সর্ব্বত্রই অভাবনীয় উৎসাহের সঞ্চার দেখা গিয়াছে। প্রবাসী ভারতীয়গণ মিশনকে প্রতি বৎসর আফ্রিকায় আসিয়া প্রচার ও সংগঠন কার্য্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ ও সহানুভূতি লাভ করিয়া সঙ্ঘপ্রেরিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন পূর্ব্ব-আফ্রিকায় গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংস্কৃতি অভিযান অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

গোরক্ষা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

এক্ষণে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে, সকলের নিজ ধর্ম অনুসরণ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে, কোনও সম্প্রদায় নিজ ধর্মমত অন্য কোনও সম্প্রদায়ের উপর জোর করিয়া চাপাইতে পারিবে না। অনেকে মনে করেন, হিন্দুরা যদি বলে যে ভারতে কেহ গোবধ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে হিন্দুর ধর্মমত খ্রীষ্টান, মুসলমান, পার্শি প্রভৃতি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। ইহা অন্যায়। অবশ্য যে গরু দুধ দেয় বা লাঙল টানিতে পারে সেরূপ গরু কাটিলে দেশের আর্থিক ক্ষতি হইবে। আইনের দ্বারা সেরূপ গরু কাটা নিষেধ করা যাইতে পারে। ভারতের বিধানপরিষদে সেরূপ ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু বৃদ্ধ বা রুগ্ন গরুও কেহ কাটিতে পারিবে না হিন্দুরা কখনও এরূপ দাবি করিতে পারে না।

আপাত দৃষ্টিতে এরূপ উক্তি যুক্তিযুক্ত মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ভ্রান্ত। কারণ হিন্দুধর্মে কেবল গরু কাটিতে নিষেধ করা হয় নাই, গরুকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতে বলা হইয়াছে, সুতরাং গরুকে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে বলা হইয়াছে। হিন্দুকে নিজ ধর্ম পালন করিবার সুযোগ দিতে হইলে তাহাকে গোরক্ষা করিতে দিতে হইবে। মনে করুন, একটি প্রস্তরখণ্ডকে হিন্দুরা দেবতা বলিয়া পূজা করে। অন্য ধর্মের লোক মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করে না বলিয়া তাহাকে সেই প্রস্তরখণ্ড ভাঙিতে দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ ইহাতে হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিবে। সেইরূপ অন্য ধর্মের লোক গরুকে পবিত্র মনে করে না বলিয়া তাহাকে গোবধ করিতে দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ হিন্দু গরুকে পবিত্র ও পূজনীয় মনে করে। খ্রীষ্টান ও মুসলমান গোমাংস খাইতে ভালবাসে বলিয়াই তাহাকে নির্ব্বিচারে গোমাংস খাইতে দিতে হইবে এরূপ কোনও কথা নাই। গোমাংস খাওয়া যখন হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করে এবং সকলের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত হইতে রক্ষা করা যখন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কর্তব্য তখন খ্রীষ্টান বা মুসলমানকে কিছুতেই হিন্দুধর্মে আঘাতকারী কার্য করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। এক দিকে হিন্দুর ধর্মে আঘাত করা, অপর দিকে অহিন্দুর রসনা-তৃপ্তিতে ব্যাঘাত জন্মানো, রাষ্ট্রকে এই দুয়ের মধ্যে একটা কার্য বাছিয়া লইতে হইবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের এবং সভ্য রাষ্ট্রের কোন্ পন্থা বাছিয়া লওয়া উচিত তাহা বলিতে হইবে কি? ধর্মবিশ্বাসকে রক্ষা করিতে গিয়া যদি কোনও ব্যক্তির বা সম্প্রদায়বিশেষের রসনা-তৃপ্তির ব্যাঘাত ঘটে, তাহাতে রাষ্ট্রশক্তির ইতস্ততঃ করা উচিত নহে।

এক্ষেত্রে মুসলমান ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্মের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করার কোনও প্রশ্নই উঠে না। আমাদের খ্রীষ্টান ও মুসলমান ভ্রাতারা সাধারণভাবে যে গোমাংস ভোজন করেন তাহা তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থে বিহিত কোনও ধর্মানুষ্ঠান নহে। এক বক্‌রিদের সময় গোবধকে মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠান বলা যাইতে পারে। কিন্তু বক্‌রিদের গোহত্যা বিষয়েও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে কোনও বিধান নাই।

কোরান বা অন্য ধর্মগ্রন্থে ইহা বলা হয় নাই যে, গরু না কাটিলে বকরিদ সম্পন্ন হইতে পারে না। বকরিদের সময় যে সকল প্রাণীকে হত্যা করিতে পারা যায় বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে গরুর উল্লেখ নাই। ছাগ, মেষ, দুম্বা এই সকল পশুর উল্লেখ আছে। যখন গরু ভিন্ন অন্য প্রাণীকে বধ করিয়া বকরিদ সম্পন্ন করা যায় তখন মুসলমানদের তাহাই করা সমীচীন। বাবর, আকবর, বাহাদুর শাহ প্রভৃতি সম্রাটগণ গোবধ নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহাতে মুসলমান ধর্ম ক্ষুণ্ণ হইলে তাঁহারা কখনও তাহা করিতেন না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গোবধ নিষিদ্ধ না করিলে হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করা হয়। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি যাহাতে বর্দ্ধিত হয় এরূপ কার্য করা ভারত-রাষ্ট্রের নেতাদের কর্তব্য। মুসলমান গো-হত্যা করিলে তাহার প্রতি হিন্দুর প্রীতি হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে পারে। হিন্দু এরূপ ভাবিবে, "গরুকে আমি পূজা করি, আমার মুসলমান ভ্রাতা যদি আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত, তাহা হইলে যাহাতে আমার ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে এরূপ কার্য কখনই করিত না।" উদারহৃদয় মুসলমান স্বেচ্ছায় এরূপ কার্য হইতে বিরত থাকিবেন।

বৃদ্ধ বা রুগ্ন গরু যে দেশের কোনও উপকারে আসে না তাহা নহে। সুতরাং তাহাদিগকে কাটিতে দেওয়াও ক্ষতিজনক। ইহাতে আর্থিক ক্ষতি হয় কেহ যদি এ কথা স্বীকার না-ও করেন তাহা হইলেও পূর্বোক্ত ধর্মসংক্রান্ত কারণে গোবধ অন্যায় ইহা তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে।

ঈশ্বরকে দেখা যায় না। এজন্ত যাহাতে ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ দেখা যায় হিন্দুরা তাহার পূজা করে। ঈশ্বর যেরূপ আমাদিগকে সৃষ্টি করেন এবং জলবায়ু, অন্ন প্রভৃতির দ্বারা আমাদের প্রাণরক্ষা করেন, পিতামাতাও সেইরূপ আমাদিগকে লালনপালন করেন। এজন্ত হিন্দুশাস্ত্রে পিতামাতাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতে বলা হইয়াছে।* গাভী দুগ্ধ দিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা করে, বলদ লাঙ্গল টানিয়া অন্ন উৎপাদনে সহায়তা করে এজন্য গোজাতির সেবা করা উচিত—ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের বিধান। গাভী ও বৃষ অকর্মণ্য হইলেও তাহাদিগকে পালন করা উচিত।

গোবধ বন্ধ হইলে দুধ, ঘি সস্তা হইবে, তাহা হিন্দু গৃহস্থের যেরূপ কল্যাণজনক, মুসলমান গৃহস্থেরও সেইরূপ। বলদ সুলভ হইলে যে কেবল হিন্দু-চাষীরই সুবিধা হইবে তাহা নহে, মুসলমান-চাষীরও ইহা সমান সুবিধাজনক। সুতরাং গোরক্ষা হইলে সমগ্র দেশবাসীরই কল্যাণ হইবে।

ইহলোকে উন্নতি এবং পরলোকে মোক্ষলাভ উভয়ই হিন্দু-ধর্মের উদ্দেশ্য।† হিন্দুধর্মের বিধানগুলি এই দ্বিবিধ কল্যাণ-সাধন করে। গোরক্ষার বিধানও এইরূপ। ইহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, পুণ্যসঞ্চয়ও হয়।

অধিক অন্ন উৎপন্ন করিবার চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে তৎপর। বলদের সংখ্যা অধিক হইলে এবং সেজন্য মূল্য সুলভ হইলে চাষী বেশী জমি ভাল করিয়া চাষ করিতে পারিবে, সুতরাং বেশী অন্ন উৎপাদন করিতে পারিবে। গোরক্ষার সহিত অধিক অন্ন উৎপাদনের এই সুস্পষ্ট সম্বন্ধ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কেন দেখিতেছেন না?

* "মাতৃদেবো ভব পিতৃদেবো ভব" তৈত্তিরীয় উপনিষদ।

† যতো অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্মঃ। (কণাদ-বৈশেষিক দর্শন)

তিব্বতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব

শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়ন, ত্রিপিটকাচার্য্য

[কালিম্পং ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ কালচারে রাষ্ট্রভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতা। ইন্‌ষ্টিটিউটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দাশরথি রায় কর্ত্তৃক অনুলিখিত এবং বক্তা কর্ত্তৃক সংশোধিত।]

তিব্বতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে উহা কয়েকটি খণ্ড ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। তথাকার অধিবাসীরা ছিল সর্ব্বপ্রকার সভ্যতাবর্জ্জিত; না ছিল তাহাদের নিজস্ব লিপি—না ছিল কোনও বিশিষ্ট সংস্কৃতি। সভ্যতা ও সংস্কৃতিবিহীন এই জাতির মধ্যে, ব্রহ্মপুত্রের নিম্নভাগে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে সামান্য এক সর্দ্দারের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন সরঙ্গ-চান-গাম্বো (Srong chan gambo)—চেঙ্গিজ খাঁনের মতই তাঁহার মনে দেশবিজয়ের বাসনা উদিত হইল। তিনি দেখিলেন তিব্বতীদের মধ্যে যাহারা যাযাবর শ্রেণীর লোক তাহারাই অধিকতর বলশালী এবং কষ্টসহিষ্ণু। এই যাযাবর-শ্রেণীর মধ্য হইতে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিরাট এক সেনা-দল সংগঠন করিলেন। অশিক্ষিত অ-সভ্য কিন্তু প্রতিভাবান এই সেনানায়ক তাঁহার সংগঠিত সেনাদলের সাহায্যে অচিরেই সমগ্র হিমালয় অঞ্চল জয় করিয়া লইলেন। উত্তরে পূর্ব্ব-মধ্য-এসিয়া, দক্ষিণে দার্জ্জিলিং জেলা ও নেপাল, পশ্চিমে গিলগিট এবং পূর্ব্বে চীনদেশীয় প্রাচীর—এই সীমারেখার মধ্যবর্ত্তী বিশাল ভূখণ্ড তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত হইল। তিনি নেপাল এবং চীনের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

তখন তিব্বতে শুধু কথ্য ভাষাই প্রচলিত ছিল, তাহার নিজস্ব বর্ণমালা বা লিপি ছিল না। প্রকাণ্ড রাজ্যের সুব্যবস্থা ও সুশাসনের জন্য সরঙ্গ-চান-গাম্বো লিখিত ভাষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলেন তিনি থনমী সাম্ ভোটে (Thanmi sam bhote) আখ্যায় অভিহিত এক ব্যক্তিকে ভারতবর্ষে—সম্ভবতঃ কাশ্মীরে, প্রেরণ করিলেন। থনমী সাম্ ভোটের প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। তিব্বতী ভাষায় থনমী সাম্ ভোটের অর্থ থন্ গ্রামের মহান্ তিব্বতী। থনমী সাম্ ভোটে ভারতে আসিয়া ভারতীয় লিপি-মালা অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করিলেন এবং তিব্বতে প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়া ভারতীয় লিপির ছাঁচে তিব্বতী বর্ণমালা সৃষ্টি করিলেন। দুই রীতির অক্ষর তিব্বতে প্রচলিত হইল—একটি মাত্রাবিহীন ও অপরটি মাত্রাযুক্ত। মাত্রাবিহীন অক্ষরগুলি (সম্ভবতঃ তাড়াতাড়ি লেখার সুবিধার জন্য) পত্রাদি লিখন-কার্য্যে ব্যবহৃত হয় এবং মাত্রাযুক্ত লিপি পুস্তকাদি লিখনকার্য্যে ব্যবহার করা হয়। মাত্রাযুক্ত অক্ষরগুলি ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর ভারতের প্রচলিত লিপির সহিত সর্ব্বপ্রকারে সাদৃশ্যযুক্ত। তিব্বতী লিপি প্রণয়নে ভারতীয় বর্ণমালার সব কয়টি বর্ণই লওয়া হইয়াছে, কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিবর্গের চতুর্থ বর্ণ যথা ঘ, ঝ, ঢ, ধ এবং ভ এইগুলি বর্জ্জিত হইয়াছে, কারণ তিব্বতী ভাষার উচ্চারণে এই ধ্বনিগুলির প্রয়োজন হয় না।

এভাবে লিপির সৃষ্টি হইলে পর থনমী নিজ ভাষার জন্য দুইটি ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন—একটির নাম সুম-চুপা (Soom choopa) এবং অপরটির নাম তাগ-চুপা (Tag choopa)।

তিব্বতীরা এবার নিজেদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে প্রযত্নশীল হইল। থনমী ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে ভারতের সাহায্য চাই। তখন আমন্ত্রণ করা হইল ভারতীয় পণ্ডিতগণকে, তাঁহারা এ আহ্বান প্রত্যাখান করিলেন না। হউক কষ্টসাধ্য দুর্গম দীর্ঘপথ—হউক তুষারমণ্ডিত তিব্বত—জ্ঞানবর্ত্তিকা লইয়া কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—ইহা খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর কথা। এই সময় হইতে তিব্বতী ভাষায় ভারতের সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের অনুবাদকার্য্য আরম্ভ হইল। ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে অনুবাদকার্য্য পরিমাণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে এবং দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা চলিয়াছিল। ভারতীয় পণ্ডিত ও তিব্বতীদের সমবেত চেষ্টায় যে ব্যাপক অনুবাদকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছিল তাহা আজিও জগতের বিস্ময় হইয়া আছে। তান্‌জুর (Tanjur) এবং কন্‌জুর (Kanjur) নামক যে দুইটি অনূদিত গ্রন্থের সঙ্কলন আজও তিব্বতে বিদ্যমান তাহাদের আয়তনের বিশালতা দ্বৈপায়নব্যাসকৃত মহাভারতের দশটির সমান। তানজুর ২৩৫ (দুইশত পঁয়ত্রিশ) ভাগে এবং কনজুর ১০৩ (একশত তিন) ভাগে বিভক্ত এবং ইহাদের প্রত্যেক ভাগ ৪০০-৫০০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই সকল গ্রন্থে এমন সব ভারতীয় ন্যায় এবং দর্শনশাস্ত্রের অনুবাদ রহিয়াছে যাহার কোনও চিহ্নই আজ ভারতবর্ষে নাই। অনুবাদ অতি নিখুঁত এবং পাছে কোথাও ভুল থাকে এই জন্য প্রত্যেক গ্রন্থ পর পর তিন বার করিয়া অনূদিত হইয়াছে।

এই সকল গ্রন্থ সযত্নে গোম্পায় (Gompa) বা মঠে সুরক্ষিত অবস্থায় আছে এবং লামা বা তিব্বতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এগুলি পরম শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মের বিষয়ে ভারতবর্ষ দ্বারা তিব্বত সম্পূর্ণ প্রভাবিত—কারণ তিব্বতীদের ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্ম। অধিকাংশ তিব্বতী বালিকার নাম ডোলমা (Dolma) (অর্থাৎ ভারতবর্ষের তারা

দেবী) এবং য্যাঙ চান্ মা (Yang-Chan-Ma) (অর্থাৎ ভারতবর্ষের সরস্বতী)।

তিব্বতের শিল্পকলাও ভারতীয় আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। তিব্বতের চিত্রকলায় এবং ভাস্কর্য্যে ভারতীয় প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। মূর্ত্তিগুলির নাক-মুখ-চোখের গঠন সম্পূর্ণ ভারতীয়। পরবর্ত্তী যুগে অবশ্য তিব্বতীয় ছাপ পড়িয়াছে, তাহা সত্ত্বেও মূর্ত্তিসমূহের পরিহিত বসনভূষণাদি কিন্তু ভারতীয় পদ্ধতিতেই অঙ্কিত বা খোদিত হইয়া আসিতেছে।

মিলারেপা তিব্বতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সকল তিব্বতীই তাঁহার কবিতাগুলি আবৃত্তি বা গান করিয়া থাকেন। ইঁহার যিনি গুরু তাঁহার নাম মারূপা এবং মারূপার গুরু ভারতবর্ষীয় mystic বা মরমী কবি নারোপা।

ভারতবর্ষ এবং ভারতীয়দের প্রতি তিব্বতী স্ত্রীপুরুষ কি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। লাদাকের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্ত পরিভ্রমণ কালে একদিন প্রার্থনারতা এক বৃদ্ধা তিব্বতী রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "পরজন্মে কোথায় জন্মিবার অভিলাষ কর?" জীবনসায়াহ্নে উপনীতা, শান্ত-সমাহিতচিত্ত বৃদ্ধা শ্রদ্ধাবিকশিত আননে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল "পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে—ভগবান্ বুদ্ধের পদরেণুপূত বুদ্ধ-গয়ায়।"

তিব্বতী সংস্কৃতির উৎস ভারত। তিব্বত যাজ্ঞা করিয়াছে প্রকৃত শিক্ষার্থীর মনোভাব লইয়া—ভারত দান করিয়াছে উদার অকুণ্ঠ চিত্তে। দাতা ভারতের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিব্বতকে স্বকীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত করিলেও সে তাহার জাতীয় সত্তাকে বিনষ্ট করে নাই। তিব্বতও ভারতের সে দান গ্রহণ করিয়াছে আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখিয়া।

তিব্বত ও ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। যতদিন তিব্বত তিব্বত থাকিবে এবং ভারত ভারত থাকিবে ততদিন এই সম্পর্ক ছিন্ন হইতে পারে না, এবং তিব্বত আসলে কোন্ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী তাহা যখন আমরা যথার্থরূপে উপলব্ধি করিতে পারিব তখন এই সম্পর্ক দৃঢ়তর হইবে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বিধান ১৪টি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে বা হইতেছে। তিব্বতী ভাষায়ও ইহার অনুবাদ হইবে কারণ লাদাক প্রভৃতি অঞ্চলের বহু ব্যক্তির মাতৃভাষা তিব্বতী। রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক শব্দসমূহের পরিভাষা ইংরেজীর পরিবর্ত্তে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত হইতেছে। তিব্বতীরাও এই সকল শব্দ অতি সহজেই গ্রহণ করিতে পারিবে।

পুস্তক পরিচয়

সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা—৬ (১৩৫৬)। (১৮০+৮১৪ পৃষ্ঠা)। মূল্য সাড়ে বার টাকা।

এই সুপরিচিত গ্রন্থখানির বিস্তৃত পরিচয় ও আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্রে যে সমুদয় তথ্য পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্যই ব্রজেন্দ্রবাবু এই গ্রন্থের পরিকল্পনা করেন। প্রথম খণ্ডে ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ পর্য্যন্ত তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে।

'প্রবাসী' পত্রিকার গত কার্ত্তিক সংখ্যায় এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণের সমালোচনা প্রসঙ্গে এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধেও তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য। ব্রজেন্দ্রবাবু বহু আয়াস সহকারে যে সমুদয় বিবিধ তথ্য আহরণ করিয়াছেন, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ও বাঙালীর ইতিহাস-লেখকের পক্ষে তাহা অমূল্য সম্পদ। বস্তুতঃ এই গ্রন্থগুলি পড়িতে পড়িতে শত বর্ষ পূর্ব্বেকার বাঙালী-সমাজের যে চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে, অপর কোন গ্রন্থের সাহায্যেই আমরা তাহার ধারণা করিতে পারি না।

প্রথম খণ্ডের ন্যায় দ্বিতীয় খণ্ডেও সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি যথাক্রমে শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম ও বিবিধ এই কয়টি প্রধান ভাগে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণের শেষে "সম্পাদকীয়" শীর্ষক অধ্যায়ে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই গ্রন্থে যে সমুদয় তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখও বর্ত্তমান সমালোচনায় অসম্ভব। তবে দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক মনে করি। ৫১৯ পৃষ্ঠায় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা হইতে একখানি পত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, ১৮৩১ সনের প্রারম্ভে "কাঁচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাঁচঘর সাকিনে একজন পোদের ভবনে বিবিধ বর্ণ প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক এক পংক্তিতে বসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়া ও হালিশহর নিবাসী প্রায় শত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিত্তলের থাল ও সন্দেশাদি বিদায় পাইয়াছেন।" ঐ স্থানে "ফিরিঙ্গীতে বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন।" পত্রপ্রেরক "আশ্চর্য্য হইয়া" এই সংবাদটি 'নিবেদন করিয়াছেন'। আমরাও এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য বোধ করি যে, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেই এইরূপ অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও সর্ব্বধর্ম্মের মধ্যে প্রীতি-সম্মেলনের চেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছিল।

অপর দিকে হিন্দু কলেজে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে এ দেশের যুবকদের মনে প্রাচীন ধর্ম্ম ও সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া কত দূর চরমে উঠিয়াছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পূর্ব্বোক্ত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ১৮৩১ সনের ১৪ই মে তারিখে প্রকাশিত একখানি পত্রে (২৩৭ পৃ) লিখিত হইয়াছে যে কলিকাতার একজন গৃহস্থ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কালীঘাটের মন্দিরে যান। সকলেই সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু হিন্দু কলেজের ছাত্র "উক্ত গৃহস্থের সুসন্তানটি প্রণাম করিলেন না। ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্যা যিনি তাঁহাকে ঐ ব্যালীক বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল যথা গুড মার্নিং ম্যাডম্।" তৎকালে প্রকাশ্য দিবালোকে খ্রীষ্টান মিশনরীরা জোর করিয়া গৃহস্থ-সন্তানকে ধরিয়া লইয়া গিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করাইত, তাহারও বিবরণ একখানি পত্রে পাওয়া যায় (২৩৯ পৃঃ)। এইরূপ সেকালের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য এই গ্রন্থে আছে। বাহুল্যভয়ে উল্লেখ করিলাম না। উপসংহারে বক্তব্য যে, সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি বাংলা ভাষার ইতিহাসের দিক হইতেও খুবই মূল্যবান্। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের ভাষা হইতে কিরূপে চলতি ভাষার উদ্ভব হইল, এই গ্রন্থ পড়িলে সে বিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে। মোটের উপর বাঙালীর জাতীয় জীবন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থখানির মূল্য খুবই বেশী। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবু এই গ্রন্থমালা সঙ্কলন করিয়া সমগ্র বাঙালী জাতিকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

গান্ধীজীর দিল্লী ডায়েরী—শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। 'হরিজন' পত্রিকা কার্য্যালয়, ২৭।৩ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩:৬ পৃষ্ঠা।৴ মূল্য ৪৲ টাকা মাত্র।

প্রায় ৩০ বৎসর কাল গান্ধীজীর আদর্শে নিজের জীবন গঠন করিবার চেষ্টা করিয়া, তাঁর ভাবের আলোকে জীবনের পথে চলিয়া, বাংলা 'হরিজন' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনেক বিষয়ে তৎভাবভাবিত হইতে পারিয়াছেন। ইংরেজী *Delhi Diary* নামে পরিচিত পুস্তকের বর্ত্তমান অনুবাদের মধ্যে তার অনেক পরিচয় পাই। গান্ধীজীর জীবনের শেষ ২ মাস ১০ দিনের প্রার্থনান্তিক ভাষণগুলির মধ্যে এমন একটা আবেগ ও মর্ম্মবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে সর্ব্বকালের ইতিহাসে ও সাহিত্যে তাহা অমর হইয়া থাকিবে।

মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধন অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকিবে—এই আদর্শের সাধনায় গান্ধীজীর জীবনের প্রায় ৫০ বৎসর কাটাইয়াছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন তার সোপান মাত্র। সেই স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমরা জঘন্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া পড়িলাম—এই দৃশ্য দেখিয়া গান্ধীজী মরণান্তিক যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। অনুবাদের সংযত ভাষায় সেই বেদনার প্রকাশ অনেকের মনকে ব্যথিত করিবে। এই কৌশল সাধনালব্ধ। তজ্জন্য অনুবাদক বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

১৯৪৬ সালের আগষ্ট ও অক্টোবর মাসে কলিকাতা, নোয়াখালি, বিহারে যে তাণ্ডব আরম্ভ হয় তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও

গান্ধীজী মানব-প্রকৃতির উপর শ্রদ্ধা হারান নাই। কিন্তু ১৯৪৭ সালের আগষ্ট-নভেম্বর মাসের মধ্যে পঞ্জাবে মানব-প্রকৃতির যে অবনতি দেখিলেন তাহাতে তাঁহার সমস্ত বিশ্বাসের ভিত্তিমূল কাঁপিয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বাঙালী পাঠক এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাহার সম্যক্ পরিচয় পাইবেন।

বর্ত্তমান ভারতে যখন গণ-রাজের জাগরণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে, তখন এইরূপ অনুবাদ-সাহিত্যের প্রয়োজন যে বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বাধীন ভারতের শাসন-তন্ত্র—শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ। দি বুক এক্সচেঞ্জ, ২১৭নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৪৮ পৃষ্ঠা, মূল্য—২৲ টাকা মাত্র।

১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসের ২৬শে তারিখে স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার একটা চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয় এবং প্রায় দুই মাস পরে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই গণতন্ত্রের ঘোষণা করা হয়।

যে গণ-পরিষদ ২ বৎসর ১১ মাস ১৭ দিন ধরিয়া নানা তর্কবিতর্ক শেষ করিয়া শাসনতন্ত্র রচনার কাজ সম্পন্ন করিয়াছে তাহাতে আছে মোট ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ ও ৮টি তপশীল। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও জানিয়া রাখা ভাল যে অনুরূপ শাসনতন্ত্রের আলোচনা শেষ করিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাগিয়াছিল ৪ মাস, কানাডায় ২ বৎসর ৫ মাস, অষ্ট্রেলিয়ায় ৯ বৎসর, দক্ষিণ আফ্রিকায় ১ বৎসর।

ভারতরাষ্ট্রের এই নূতন শাসনতন্ত্রের বাংলা অনুবাদ দুই মাসের মধ্যে শেষ করিয়া অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় ইহার মূল লিপিবদ্ধ হয়। ১৫০ বৎসরের বিজাতীয় শিক্ষার দোষে আমরা আমাদের পুরাতন রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এক প্রকার অজ্ঞ ছিলাম। সুতরাং এইরূপ অনুবাদের ভাষায় আড়ষ্টতা মাঝে মাঝে দেখা দিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। অনেক সময় ইংরেজী শব্দই রাখিতে হইয়াছে—যেমন 'মনি বিল,' 'ইউনিয়ন লিষ্ট' 'ষ্টেট লিষ্ট' 'কন্‌কারেণ্ট লিষ্ট' এবং এখনও কোন কোন স্থলে সর্ব্বগ্রাহ্য নাম স্বীকৃত হয় নাই—যেমন এই বইয়ে আছে 'লোক-সভা' শব্দ; সংবাদপত্রে দেখি 'রাষ্ট্র-সংসদ'—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা।

স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকবর্গের সম্মুখে নানা সমস্যা দেখা দেয়। আমাদের দেশে রাষ্ট্রভাষা সমস্যা অন্যতম প্রধান সমস্যা। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে চিন্তা করিতে শিখিয়াছ প্রায় ১২৫ বৎসর, হঠাৎ হিন্দী বা অন্য ১৩টি ভাষার—আসামী, বাংলা, গুজরাতী, কানাড়ী, কাশ্মিরী, মালয়ালম, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, উর্দ্দু প্রভৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম্ম চালাইতে হোঁচট খাইব, ইহা অস্বাভাবিক নয়। এক পুরুষের—২৫ বৎসরের—মধ্যে এই দোষ সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

কুমারী আর ভ্যারের দিনপঞ্জী—উপন্যাস। অনুবাদক—শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—এম, এম, রায় চৌধুরী। ৭২, হারিসন রোড, কলিকাতা। দাম—সাড়ে তিন টাকা।

এই উপন্যাসের মূল লেখিকা তরু দত্ত। বিদগ্ধ সমাজে তাঁহার পরিচয় নূতন করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন অনেকেই হয় তো স্বীকার করিবেন না, কিন্তু সর্ব্বধ্বংসী কালের আকাশে পুরাতন লেখা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া আসে বলিয়াই মাঝে মাঝে তাহাতে নূতন কালি বুলাইতে

হয়। আধুনিক যুগের আকাশে বাঙালী মেয়ে তরু দত্তের নামটিও তেমনি অস্পষ্টপ্রায় পুরাতন লেখা—বাংলা-সাহিত্যের আসরে যাঁহাকে নূতন করিয়া পরিচিত করার আবশ্যকতা উপলব্ধ হইতেছে। ইংরেজী ও ফরাসী ভাষার মাধ্যমে সুদূর পাশ্চাত্ত্যে তাঁহার সাহিত্যসাধনা সুরু হয়। কতকগুলি খণ্ড কবিতায় ও একখানি উপন্যাসে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর জাজ্বল্যমান। মাত্র আঠার বৎসর বয়সে যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় তাঁর রচনায় তিনি রাখিয়া গিয়াছেন—তাহা সত্যই বিস্ময়কর। প্রায় এক শতাব্দী আগেকার কথা—তখনও বঙ্গদর্শনের সূত্রপাত হয় নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের তিন চারিখানি উপন্যাস মাত্র বাহির হইয়াছে—সেই যুগে বিদেশী ভাষায় তরু দত্ত এই অপরূপ উপন্যাসখানি রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে মূল ফরাসী ভাষা হইতে খুব কম অনুবাদ হইয়াছে বলিয়াই এই উপন্যাসখানি এতদিন বিস্মৃতির গর্ভে পড়িয়া ছিল। অনুবাদক ইহাকে ভাষান্তরিত করিয়া বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। মূল ফরাসী ভাষার সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত নহেন—উপন্যাসখানির অন্তর্নিহিত রস উপলব্ধি করিয়া তাঁহারাও শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে স্বীকার করিবেন বহু যুগসঞ্চিত সংস্কৃতি-সম্পদের অধিকারী না হইলে এমন সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। কুমারী আর ভ্যারের চরিত্রে নম্র মধুর সংবেদনশীল বাঙালী মনেরই প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। প্রতিভাময়ী লেখিকা জাতিধর্ম্মের গণ্ডীর বাহিরে সর্ব্বকালের কুমারী-অন্তরের মাধুর্য্যকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ভূমিকায় ডাঃ কালিদাস নাগ সত্যই বলিয়াছেন—"তরু দত্তের উপযুক্ত মর্য্যাদা আমরা এখনও দিতে পারি নি।" স্বাধীন ভারতে এই ত্রুটি সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন।

তিন তারা—শ্রীরমাপদ চৌধুরী। পূর্ব্বাচল প্রকাশক। ৬, কলেজ রো, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা।

ভূমিকায় লেখক জানাইয়াছেন, ''তিন তারা' ঠিক গল্প বা উপন্যাস নয়। কি, তা ঠিক বোঝাতে হলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে প্রবন্ধ ফাঁদতে হবে।' নূতন শব্দ সৃষ্টি করা নিরর্থক বোধে সে দায়িত্বভার তিনি সমালোচকের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

এই ক্ষুদ্র বইখানি সযত্নে পড়িয়াও আমরা কিন্তু লেখকের সঙ্গে একমত হইতে পারিলাম না। আসলে এটি গল্প উপন্যাসের উপাদানেই তৈয়ারী। পূর্ণাঙ্গ গল্প বা উপন্যাস হইবার পথে যেটুকু বাধা সৃষ্টি হইয়াছে—তাহা লেখকের ইচ্ছাকৃত অথবা অক্ষমতাজনিত ত্রুটিতে ঘটিয়াছে বলা অবশ্য কঠিন। ছাড়া ছাড়া ঘটনাগুলিকে সুসংবদ্ধ করার কৌশল লেখকের হয়ত অজানা নহে, অথচ মনে হয়, নূতন সৃষ্টির প্রলোভনে তিনি সে চেষ্টা করেন নাই। তাঁর লেখার মধ্যে ইঙ্গিতগুলি অর্থব্যঞ্জক—দু'একটি টানের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ছবির আভাস পাওয়া যায়। সত্য বটে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে মানবীয় নীতিধর্ম্মের অপঘাতে মানুষের চিরাচরিত বৃত্তির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বস্তুভারে ভাবের ফেনা ভাঙিয়া গিয়াছে—গৃহরচনার মোহ অর্থ-গৃধ্নুতার তীব্রতায় শুকাইয়া গিয়াছে; দীপেন, ব্রিজলাল, লখিয়া, সাঁওন হানিফ ইহারাও যুগধর্ম্মের আবর্ত্তে পাক খাইয়া চলিয়াছে—ইহাদের হাসিকান্নায় ক্লেদে-লালসায় পৃথিবী পরিপূর্ণ। তবু এই পৃথিবীর সীমা ছাড়াইয়া আকাশের গায়ে জাগিয়া থাকে তারা—যে তারার পানে চাহিয়া পুরাতন পৃথিবীর মানুষেরা স্বপ্ন দেখে এবং নূতন পৃথিবীর মানুষেরা সেই স্বপ্নকে মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াও তৃপ্তি পায় না। অবহেলায় ছড়ানো জিনিসগুলি একত্রে গাঁথিয়া তুলিবার চেষ্টা করুন না লেখক—তাঁহার হাতে সৃষ্টির কাজটি ভালই জমিবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বুদ্বুদ—শ্রীরাখালদাস সোম। এস্. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং লিঃ। ৫৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য দুই টাকা।

মাত্র ১১৩ পৃষ্ঠার প্রবন্ধের বই। তিনটি প্রবন্ধ আছে—ইজ্‌ম্, ফুটবল ও বেতার। রচনা স্নিগ্ধ হাস্যরসে মণ্ডিত এবং স্থানে স্থানে গল্পের আমেজ আসিয়াছে। আধুনিক সমাজের চাপল্যকে লেখক সকৌতুক অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। ভাবিবার কথাকে এমন সরস, উপভোগ্য করিয়া তুলিতে পারা কম কৃতিত্বের কথা নহে। চিন্তাশীলতার সহিত মার্জিত কৌতুক বোধ মিলিয়া গ্রন্থখানিকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতের রণনীতি ও সমরসজ্জা—প্রথম খণ্ড। শ্রীবিশ্বেশ্বর চৌধুরী। ইউনিভারস্যাল পাবলিশার্স, ২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ৩৲ টাকা, পৃষ্ঠা ১৮৬।

খণ্ডিত ভারতে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে ভারতের সামরিক ও দেশরক্ষার সমস্যা সেগুলির অন্যতম। লেখক এই বিশেষ সমস্যাটি বিশদভাবে বর্ত্তমান গ্রন্থে মোট সাতটি অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছেন যথা—(১) আমাদের দেশ, (২) দেশ রক্ষার দায়িত্ব, (৩) আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি, (৪) এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, (৫) আক্রমণকারী ও আক্রমণপথ, (৬) দেশরক্ষা সমস্যা এবং (৭) দেশরক্ষা সংগঠন—প্রথম দুইটি অধ্যায়ে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও দেশবাসীর স্বাধীনতা রক্ষার গুরুদায়িত্বের কথা আলোচিত হইয়াছে। লেখক সত্যই বলিয়াছেন—"স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার, সুতরাং স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব মানুষের জন্মগত।" আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি এবং এশিয়ার রাজনৈতিক পরিবেশের আলোচনায় গ্রন্থকার দার্শনিক মতবাদ ও ধর্ম্মবিশ্বাসের দিক হইতে বিভিন্ন দেশকে বিচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং চীন, জাপান, পাকিস্থান, সোভিয়েট রুশিয়া, মধ্য-প্রাচ্য (সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্সজর্ডান, মিশর, ইরাক, সৌদি আরব), তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্থান এবং ইহুদী রাষ্ট্রের অবস্থান, সামরিক শক্তি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় আলোচনা করিয়া ভারতের নিকট ইহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক বিশ্বাস করেন না যে কেবল মাত্র ধর্ম্মের ভিত্তিতেই পৃথিবীর তথা এশিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি দল বাঁধিয়া পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে—এমন কি ধর্ম্মের নামে সমস্ত মুসলমান রাষ্ট্রগুলিরও এক হইবার সম্ভাবনা বেশী নহে। আরব লীগ আরব-রাষ্ট্রের অন্তর্গত দেশসমূহকে এক করিলেও তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্থান ও সোভিয়েট রুশিয়ার মুসলমান রাষ্ট্রগুলিকে দলে টানিতে পারে নাই। পাকিস্থানের প্রচারও এই দিকে বিশেষ ফলপ্রদ হইতে পারে নাই। লেখকের মতে "ভারতে মুসলমান ধর্ম্মের বিস্তার এবং ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাব অন্যান্য মুসলমান অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।"

ভারত কি ভাবে এবং কোন রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে এবং ভারত রাষ্ট্র রক্ষার সমস্যা ও সংগঠনের বিষয় শেষের তিন অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধ হইতে পারে একথা গ্রন্থকার স্বীকার করেন, কিন্তু পাকিস্থানের পক্ষে বাহিরের সাহায্য ব্যতীত ভারত আক্রমণ সম্ভব নহে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। অবশ্য চীনের সাম্প্রতিক পরিবর্ত্তনের কথা এই গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। সাম্প্রতিক চীন ও পাকিস্থানের ঘটনাবলী অনুধাবন করিলে অবশ্য ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয়।

ভারত-রাষ্ট্রকে ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিলেই যথেষ্ট নহে, ইহাকে যুদ্ধ-বিরোধী রাষ্ট্র বলা চলে। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় এবং ভারতকে খণ্ডিত করিয়া হিংসায় বিশ্বাসী এবং আক্রমণমূলক মনোভাবসম্পন্ন পাকিস্থান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতেছে উহার পরিণতি।

কোথায় তাহা অনুমান করা গেলেও সঠিক ভাবে বলা শক্ত। গ্রন্থকার নানা স্থানে দার্শনিক মতবাদের আলোচনা করিলেও বাস্তবের ভিত্তিতেই বিষয়বস্তু বিচার করিয়াছেন—ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। এই পুস্তক পাঠকের চিন্তার খোরাক যোগাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মুসাফির (নাটক)—শ্রীবিমল সেনগুপ্ত। গীতা এণ্ড কোং, জেইল রোড, শিলং। মূল্য—দেড় টাকা।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের জন্য নতুন ধরণের নাটক রচনার দাবি দর্শকদের ভিতর ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছে এবং কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও নতুন আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু অবলম্বনে নাটক-রচনায় কয়েকজন নূতন লেখক ব্রতী হয়েছেন। 'মুসাফির' এই ধরণের প্রচেষ্টার একটি ফল। বিগত মহাযুদ্ধ, আগষ্ট আন্দোলন, মন্বন্তর এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়াকে নাট্যকার এই নাটকে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছেন। নূতন কথা ও নূতন আঙ্গিকের দিকে লেখকের ঝোঁক খুব বেশী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বহু বিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র দৃশ্যের সাহায্যে তিনি নাটক গড়ে তুলেছেন। এতে সিনেমার প্রভাব খুব বেশী মনে হয়। তা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্য-সংস্থাপনের ফলে রস ঘনীভূত হওয়ার আগেই তা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। আজকাল কলিকাতার ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ পর্য্যন্ত দৃশ্যের স্থায়িত্বের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিচ্ছে এবং অধুনা অভিনীত একখানি নাটকে মাত্র দুটি দৃশ্য যোজনা করা হয়েছে অর্থাৎ পুরো নাটকটি দুই দৃশ্যে বিভক্ত। সুতরাং 'মঞ্চ ঘুরে গেল' এই আঙ্গিক নতুন লেখকদের অন্ততঃ ঘন ঘন ব্যবহার করা উচিত নয়। নূতন নাট্যকারকে নিরুৎসাহ করবার জন্য এই ত্রুটির কথা যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা তা নয়—বরং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নূতন চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতাও তাঁর আছে, কিন্তু আঙ্গিক বিন্যাসের ত্রুটীর জন্য নাটকখানির রস ততটা নিবিড় হয় নি। নতুবা যে বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি নাটক লিখেছেন—তা আরও জোরালো নাটক হতে পারত এবং রঙ্গমঞ্চেও সমাদর লাভ করত।

দিন আগত ঐ (নাটক)—শ্রীবিমল সেনগুপ্ত। গীতা এণ্ড কোং, জেইল রোড, শিলং। মূল্য—বারো আনা।

'দিন আগত ঐ' 'শুভলগ্ন' এবং 'সংঘাত' এই তিনটি ক্ষুদ্র নাটিকার সমষ্টি। বিলাতে মূল নাটক সুরু হওয়া আগে একটি ক্ষুদ্র নাটিকা অভিনয়ের রীতি আছে—যাকে বলে curtain riser. বাংলায় অভিনয়যোগ্য ভালো ক্ষুদ্র নাটিকা খুব কমই লেখা হয়েছে। বিমলবাবুর এই নাটিকা সে অভাব পূরণে কিছু সাহায্য করবে। 'শুভলগ্ন' একটি ভালো নাটিকা। সংলাপরচনায়ও লেখকের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। 'সংঘাত' নাটিকায় স্বগতোক্তির সাহায্যে পাত্রপাত্রীর প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। অবচেতন মনকে প্রকাশ করবার এই কৌশলটি তিনি সম্ভবতঃ প্রখ্যাত নাট্যকার ইউজিন্ ও'নিলের 'ষ্ট্রেঞ্জ ইনটারলিউড' নাটক থেকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমাদের মঞ্চ এই অভিনব আঙ্গিককে কার্য্যকরী করবার যান্ত্রিক কুশলতা দেখাতে এখন পর্য্যন্ত সক্ষম হয় নি। অবশ্য প্রগতিবাদী নাট্যকাররা যে মঞ্চকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবেন—তাতে আর সন্দেহ কি! 'দিন আগত ঐ' নাটক হিসেবে সার্থক হয় নি। লেখক যদি আঙ্গিকের দিকে বেশি নজর না দিয়ে লিখতে চেষ্টা করেন—তবে তাঁর কাছে আমরা ভবিষ্যতে ভাল নাটক পাব। কারণ তাঁর লেখবার ভাষা ও দেখবার দৃষ্টি—দুই-ই আছে।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

জীবন সংগ্রাম—শ্রীযতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত। কমলা বুক ডিপো। ১৫ নং বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট। কলিকাতা। মূল্য ২৷৹

উপন্যাস। বহু পুরুষ ও নারী পুস্তকে ভিড় করিয়া আছে, কিন্তু একটি চরিত্রও সুষ্ঠভাবে ফুটিয়া উঠে নাই, যদিও সেগুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। অবশ্য বর্ণনায় মাঝে মাঝে লেখক মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন।

নায়ক বিলাসের চরিত্রের পরিণতি অত্যন্ত বেমানান এবং অস্বাভাবিক মনে হইল। শব্দপ্রয়োগও ত্রুটিবহুল।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্ব্বানন্দ। উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। (৪+৩৮২ পৃ.) মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থ নিবেদন ও প্রস্তাবনা ছাড়া ছাপ্পান্নটি নিবন্ধে পরমহংস রামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ ত্যাগী শিষ্য মহাপুরুষ শিবানন্দ স্বামিজীর জীবনালেখ্যে সুসম্পূর্ণ। মহাপুরুষজীর পূর্ব্বাশ্রমের নাম তারকনাথ ঘোষাল। গুরুভ্রাতৃমণ্ডলীতে তিনি তারকদা বলিয়াই অভিহিত হইতেন। যৌবনের প্রারম্ভে বিবাহ করিয়া অর্থার্জ্জনের জন্য চাকরীও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল এবং তখনই পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ, সান্নিধ্য ও অনুপম কৃপালাভ তাঁহার ঘটে। অল্প দিনের ভিতরই পত্নীবিয়োগ হওয়ায় তিনি কর্ম্মত্যাগান্তে সম্পূর্ণভাবে শ্রীশ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। গুরুদেবের নিকট হইতে জননীর মত স্নেহযত্ন পাইয়া সাধনভজন শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে তাঁর দেহরক্ষা পর্য্যন্ত গুরুসেবায় ব্রতী ছিলেন। গুরুর তিরোভাবের পর চলিল প্রব্রজ্যা ও কঠোর সাধনভজন। পরে গুরুভ্রাতৃমণ্ডলীকর্ত্তৃক সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনা ও দ্বিতীয় সঙ্ঘনায়করূপে দীর্ঘকাল মিশনের গুরুদায়িত্ব বহন করিতে করিতে তিনি পরিপূর্ণ বার্দ্ধক্যে মহাপ্রয়াণ করেন।

গ্রন্থকার এই জীবনালেখ্যের স্তরে স্তরে স্তরে সুষ্ঠ ভাবে দেখাইয়াছেন শৈশব-কাল হইতে ক্রমে 'বহুজন হিতায় চ বহুজন সুখায় চ' এই মহাপুরুষের মহৎজীবন কি ভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে, কত অসংখ্য ত্যাগী শিষ্য, গৃহী শিষ্য-শিষ্যা তাঁহার অভয় আশ্রয়ে ধন্য হইয়াছেন এবং কি অনুপম সাধনা ও কর্ম্মশক্তি তাঁর জীবন-ব্রতকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে। সাধু মহাপুরুষদের জীবনী প্রণয়ন অতীব দুরূহ ব্যাপার, গ্রন্থকার প্রভূত যত্নসহকারে এই ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। মহাপুরুষজীর বিভিন্ন সময়কার ছয়টি চিত্র এবং জ্যাকেটের সুন্দর প্রচ্ছদপট গ্রন্থের সৌষ্ঠব বাড়াইয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চরকাশেম—শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ। বুক ওয়ার্ল্ড লিঃ। ৫, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১। মূল্য তিন টাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের চাষা-ভূষো মাঝি-মাল্লা জেলে-জোলা প্রভৃতি তথাকথিত নীচশ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাহাদের সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে লেখক যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাই তিনি এই উপন্যাসখানিতে রূপায়িত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। রাক্ষসী পদ্মার বুকে জাগিয়া উঠা একটি চরকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে। মেছো হাসেমের ছেলে কাসেম। তার মনিবের কন্যা ফুলমনকে সে ভালবাসে, সে তাকে বার বার প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু বাপের গোলামের এই আস্পর্দ্ধা ফুলমনের নিকট দুঃসহ বলিয়া মনে হয়। কাসেম তার নিকট হইতে পায় শুধু লাঞ্ছনা আর অপমান। অবশেষে নসীবের জোরে সহায়-সম্বলহীন কাসেম পদ্মার বুকে জাগিয়া উঠা নিরানব্বই কানি জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করে। তার চেষ্টায় সেই

নির্জন চরে গড়িয়া উঠে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত উপনিবেশ—মসজিদের পাশে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দুর মন্দির,—ক্রমে ক্রমে ধূ ধূ করা বালুচরে ফসল ফলে, জাগে প্রচণ্ড জীবনকল্লোল, চরের শূন্যতা ভরিয়া উঠে নবঅঙ্কুরিত ফসলের শ্যাম সমারোহে। তারপর একদিন অপরিসীম দুঃসাহসে ভর করিয়া কুলসমের বিয়ের রাত্রিতে কাশেম তাহাকে কৌশলে চুরি করিয়া চরে লইয়া আসিয়া ঘর বাঁধে। অভিজাত পরিবারের কন্যা কুলসম চরকাশেমের বিচিত্র জীবনপ্রবাহের সঙ্গে নিজের জীবনকে মিলাইয়া দেয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশের মন্বন্তরের ছোঁয়াচ আসিয়া এই নবগঠিত উপনিবেশের জীবনযাত্রাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়।

উপন্যাসখানির মধ্যে মনকে সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ করে লেখকের ভাষা আর প্রকৃতিবর্ণনার নৈপুণ্য। কাহিনীর তুলনায় পটভূমিকাটি যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পদ্মার চরে প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্য লেখকের শিল্পীমনকে মুগ্ধ করিয়াছে এবং উপন্যাসখানিতে তিনি নিপুণ তুলিকায় ছবির পর ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন আর এই চরের বাসিন্দা নীচ শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানদের কাহিনী বর্ণনায় তিনি দরদী মনের পরিচয় দিয়াছেন। তবে উপন্যাসখানির একটি বড় ত্রুটি এই যে ইহাতে চরিত্রগুলির development বা ক্রমবিকাশ ঠিকমত দেখানো হয় নাই এবং কাহিনীটি স্বচ্ছন্দ গতিতে স্বাভাবিক পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

অনাদি মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা সাউথ ক্লাবের সম্পাদক ও ভূতপূর্ব্ব কাষ্টমসের এপ্রেজার অনাদি মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া বালীগঞ্জস্থ বাসভবনে প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

অনাদি মুখোপাধ্যায়

তাঁহার অমায়িক ও সরল ব্যবহারে সকলে তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন। অনাদিবাবুর পিতা শ্যামাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। অনাদিবাবু পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে বহু সদ্গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মশক্তি অপরিসীম ছিল। কলিকাতা সাউথ ক্লাবের উন্নতির মূলে রহিয়াছে তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা। তিনি অমায়িক ও সরল ব্যবহারের জন্য সকলের প্রীতি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

আমরা সন্ধান পাইয়াছি, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিশ্বেশ্বর দাস কর্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান' নামক মাসিক-পত্রে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সাহিত্য-জীবনের গোড়ার কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'রামেন্দ্র-রচনাবলী' সম্পূর্ণ করিবার জন্য ঐ প্রবন্ধগুলির নকল আবশ্যক। যদি কাহারও সংগ্রহে বা সন্ধানে 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান' থাকে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইলে বাধিত হইব। ইতি—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭৫, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা